কেশ-সংস্কার

[ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

বিশ্রাম

[ফোটো—শ্রীহরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ
১ম খণ্ড } বৈশাখ, ১৩৬৪ { ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নববর্ষ

প্রতি বৎসরই শুভ নববর্ষ আগমনের প্রতীক্ষায় লোকের মনে আশার সঞ্চার হইয়া থাকে। নবীনের মনে সেটা হয় অত্যধিক, এবং আশা পূর্ণ না হইলে তাহার প্রতিক্রিয়াও হয় খুবই বেশী। প্রবীণ যাঁহারা, তাঁহারা আশা রাখেনও কম এবং নৈরাশ্যে বিচলিত হওয়াও কম হয় তাঁহাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের কাছে সন ১৩৬৪ বিশেষ আশার আলো জ্বালিতে পারে নাই।

আমাদের আশা ছিল যে, কংগ্রেসের অধোগতি এই বিগত ১৩৬৩ সালেই প্রতিরুদ্ধ হইবে এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ও নিজ দলের দোষত্রুটি দেখিতে শিখিবেন—যাহাতে দেশের এই দুর্দশা ও দুর্নীতির স্রোত ব্যাহত হইয়া আবার সুদিনের আলোক আসিতে পারে। এইরূপ আশা করার কারণ ছিল পুরাতন বৎসরের সঙ্গে পুরানো লোকসভা ও বিধানসভাগুলি বাতিল হইয়া নূতন প্রতিনিধির দল আসিবেন, যাঁহারা নূতন মন লইয়া কংগ্রেসের যাবতীয় ত্রুটিবিচ্যুতির সংস্কারে মন দিবেন ও দেশের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে নূতন উদ্যম যোগাইবেন। বলা বাহুল্য, ঐ আশা অঙ্কুরেই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছে। কেন হইয়াছে তাহাও বলা প্রায় নিরর্থক, তবুও কিছু বলা প্রয়োজন, কেননা তরুণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে।

প্রথমেই দেখা গেল যে, লোকসভার ও বিধানসভার নির্বাচনে যে সকল প্রার্থী কংগ্রেসের অনুমোদন পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পুরানো পাপী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের শতকরা ৯৯ জন আবার উপস্থিত, এবং পুরানো অকেজো দলেরও শতকরা ৯০ জন ফের আসিয়াছেন। দু'চার জন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আগেও ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আরও দুই-চারটি নিরীহ সজ্জনকে লওয়া হইয়াছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যেভাবে মনোনয়ন করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, পালের সর্দারেরা নিজস্বার্থ আগে দেখিয়াছেন, পরে দলের স্বার্থ ও সর্ব্বশেষে দেশের ও দশের জন্য যৎকিঞ্চিৎ।

তাহার পর আসিল নির্ব্বাচন। সেখানে আবার দলের চাঁইদের কুকীর্ত্তি ও বুদ্ধির অভাবের ফলে কয়েকটি সজ্জন বাদ পড়িয়া গেলেন, অবশ্য অপকৃষ্ট লোকও অল্প কয়েকজন বাদ পড়িল। আবার কর্মঠ সজ্জনও কিছু আসিলেন, যাঁহারা ১৯৫২ সনের পরীক্ষায় পাস করিতে পারেন নাই। হরেদরে দেখা গেল, কংগ্রেসের ক্ষমতা কিছু কমিল—এবং কংগ্রেস-সংস্কারের অবকাশও যথেষ্ট কমিয়া গেল, কেননা পুরানো কলুষ আনিয়াছিল যাহারা তাহাদের অপকার্য্যের ক্ষমতা রহিয়া গেল প্রায় সমানই।

কংগ্রেসের ক্ষমতা কমিয়াছে বহু ক্ষেত্রে। যে কয়টি প্রদেশ সমস্যাপূর্ণ তাহার মধ্যে কেরল ত মাথা গোল করিয়া অপরূপ অবস্থা আনিয়াছে। সেখানে এক দিকে কম্যুনিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইয়াছে, যদিও একেবারে একচ্ছত্র অধিকার লাভ তাঁহারা করিতে পারেন নাই। অন্য দিকে ভারত-বিভাগের মূল কারণ যে মুসলিম লীগ, তাহারও প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন কয়েকজন, এমনই অপরূপ বুদ্ধি-বিচারের নিদর্শন দেখাইয়াছেন কেরলের লোক-সাধারণ। উড়িষ্যায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি দাঁড়াইয়াছেন, রাজন্যবর্গের গোষ্ঠী, যাঁহারা দেশের সাধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে উপকার অতি অল্পই করিয়াছেন, অপকার যথেষ্টই করিয়াছিলেন।

বাংলায় কংগ্রেস বাঁচিয়া গিয়াছে। কলিকাতার নগরকেন্দ্রে ও শিল্পকেন্দ্রে কংগ্রেস হারিয়াছে, কিন্তু জেলায় জিতিয়াছে। হরেদরে হারজিত প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সকল ক্ষেত্রের কার্য্যাবলী ও ফলাফল সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহাদের কাছে ইহা সুস্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস আরও ক্ষীণ হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, বিপক্ষ দলগুলির প্রতিনিধি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরও নিকৃষ্ট, আরও অপদার্থ ছিল। যদি বিপক্ষ দলগুলি দলের নির্ব্বোধ চাঁইদের ছাড়িয়া কিছু সংলোক আনিতে পারিত, যাঁহাদের সততা ও দেশসেবার স্পৃহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত, তবে কংগ্রেস আরও কুড়ি-পঁচিশটি কেন্দ্রে হার মানিতে বাধ্য হইত।

কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা রহিয়াছে এবং "গৌরীসেনের" টাকার থলি আছে, সুতরাং দুনিয়ার ভাগ্যান্বেষী শঠ ও খোশামুদে অপদার্থ তাহার পাশে, গুড়ের ভাঁড়ের নিকট মাছির মত, ঘুরিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এইমাত্র যে, কংগ্রেসের নেতৃবর্গ, যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর ছায়ায় মানুষ হইয়াছেন, মুখে গান্ধীবাদের জয়গান যাঁহারা অষ্টপ্রহর করেন, তাঁহারাই এরূপ লোক পালন পোষণ করেন। শুধু পালন করিলেও কথা ছিল, এখন অনেকেই ইঁহাদের কথায় উঠেন বসেন এবং যদি কেহ খোশামোদ না করিয়া সমালোচনা

করে তবে তাহার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। খোশামোদ ও ক্ষমতালোলুপত্ব এমনই পদার্থ!

এইরূপে, "কর্ণেন পশ্যন্তি" নীতি চলায়—অর্থাৎ নীতির অভাবে উপরে ভাল লোক থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের অবনতির চূড়ান্ত হইতে চলিয়াছে। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের দিক হইতে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিপাতির ঘোঁট, বিশ্বাসঘাতকতা, সবকিছুরই পরাকাষ্ঠা দেখা দিয়াছে। বলিতে কি, যদি আগামী পাঁচ বৎসর এই ভাবেই চলে তবে কংগ্রেসের ও পূর্ব্ববঙ্গের মুসলিম লীগের মধ্যে প্রভেদ বিশেষ কিছু থাকিবে না এবং পরিণতিও একই হইবে।

তবে উপায় এখনও আছে। যদি কেরল, উড়িষ্যা ও কলিকাতায়—কলিকাতার নামও করিতেছি কেননা উহা প্রায় একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ—কংগ্রেসের পরাজয়ে উচ্চতম অধিকারীবর্গের কিছু চৈতন্যের উদয় হয়, যদি মন্ত্রীসভা গঠনে ও দেশের শাসনতন্ত্রের পরিচালনা ব্যাপারে, শুধু জল উঁচু করার ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগবাঁটোয়ারা না করিয়া সততা ও কার্য্যক্ষমতার অনুপাতে, গুণীজনের হাতে, কাজের ভার দেওয়া হয়, তবে এখনও শোধরাইবার আশা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি শৃঙ্খলা, শিক্ষা, হাসপাতাল ও পথঘাটের ব্যবস্থা রসাতলে যাইতে বসিয়াছে। চুরি, ডাকাতি, লোক-ঠকানো, নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার—এ ত বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই বিষয়গুলির উপর কাহারও প্রখর দৃষ্টি নাই। শান্তি শৃঙ্খলা বিষয়ে খবরের কাগজে—বিশেষে হাত ধরা কাগজে—সরকারী বাহবা লইবার প্রয়াস খুবই আছে। কিন্তু আমাদের মত ভুক্তভোগীরা জানে যে, চুরি রাহাজানি, এমনকি খুনেরও—শতকরা ৯৮টির কোনও কিনারা হয় না এবং সে বিষয়ে কাহারও মাথাব্যথা নাই। গোঁজামিল ষ্টাটিসটিক্সে চোরাই মাল ফেরে না, বা চাপা পড়িয়া মরা লোক বাঁচে না—একথা কি বুঝান প্রয়োজন?

পশ্চিম বাংলায়, তথা সমস্ত ভারতে, মন্ত্রীসভা গঠনে অতিশয় সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেস এবারও ক্ষমতা পাইয়াছে। কিন্তু বার বার এইরূপ অপব্যবহারে দেশের লোক বিরূপ হইতে বাধ্য। হারজিতের কারণ নির্ণয় হওয়া অতিশয় প্রয়োজন, চাপা দিয়া সাফাই গাহিলে পাঁচ বৎসর পরে আরও বিষম ফল ফলিবে। দুঃখের বিষয় এখনই চাপা দেওয়ার চেষ্টাই চলিতেছে।

ডাঃ রায়ের ভাষণ

আমরা নির্ব্বাচনের পরে ডাঃ রায়ের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:

"শুক্রবার ২৯শে চৈত্র, কলিকাতায় গ্র্যাণ্ড হোটেলে ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক সম্বর্দ্ধনার উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শহর এলাকার জন্য গত পাঁচ বৎসরে 'আমরা বেশী কিছু করিতে পারি নাই' ইহা স্বীকার করিয়া এইরূপ ঘোষণা করেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরে শহর অঞ্চলের জন্য বর্ত্তমানের তুলনায় 'আমাদের অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।'

ডাঃ রায় পশ্চিমবঙ্গে বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফলের সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেন এবং শহর ও শিল্পাঞ্চলের ভোটদাতারা ঐ নির্ব্বাচনে যে "সুস্পষ্ট রায়" দিয়াছেন উহার পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, শহর এলাকায়ই সমগ্র রাজ্যের সর্ব্বাধিক "মুখর" অংশ বাস করেন এবং যখনই কোন সমস্যার উদ্ভব হয়, তখন তাঁহারা সুযোগমত উহা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শহর এলাকায়ই তাঁহারা জীবিকার্জ্জনের সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাঝারি ধরনের শিল্পপতিদের সমস্যার উল্লেখ করিয়া বলেন, তিনি বরাবরই এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিয়াছেন যে, ছোট, মাঝারি এবং বড় শিল্পগুলি একযোগে কাজ করিতে না পারিলে এদেশে শিল্প-সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এদেশে বেকারের সংখ্যা অনেক এবং বড় বড় শিল্পগুলিতে সীমাবদ্ধ সংখ্যক লোক নিয়োগ করা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বণিক সভার সভাপতি কলিকাতা ও শিল্প এলাকায় কংগ্রেস দলের পক্ষে নির্ব্বাচনে 'ভাল ফল' না করিতে সক্ষম হওয়ার কথা বলিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস দল জেলা অঞ্চলগুলিতে উল্লেখযোগ্য ফল লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি কোন প্রকার আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব হইতে এই কথা বলিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গে মোট ১ কোটি ৪ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে ৪৮ লক্ষ লোক কংগ্রেসের পক্ষে এবং স্বতন্ত্রসহ বিভিন্ন দলের পক্ষে ৫৬ লক্ষ লোক ভোট দিয়াছেন। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলের ফলাফল সত্ত্বেও কংগ্রেস শতকরা ৪৬টি ভোট পাইয়াছে। ১৯৫২ সনে কলিকাতায় মোট ২৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৬টি আসন পায় এবং কংগ্রেসের পক্ষে শতকরা ৪৩টি ভোট প্রদত্ত হয়। এবার যদিও কংগ্রেস ২৬টি আসনের মধ্যে মোটে ৮টি আসন পাইয়াছে, তৎসত্ত্বেও প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা শতকরা ৪০'৫। শ্রমিক-প্রধান অঞ্চলসমূহে ৩৯টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ১৮টি আসন এবং স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য দল ২১টি আসন লাভ করিয়াছে। শ্রমিকগণ কংগ্রেসের অনুকূলে মোট ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ভোট দিয়াছে এবং বিরোধী পক্ষ পাইয়াছে ৫ লক্ষ ১৯ হাজার ভোট। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসের পক্ষে প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা মোট প্রদত্ত ভোটের প্রায় অর্দ্ধেক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অতীতে বাংলার সীমানা বার বার বিভক্ত হইয়াছে এবং বিবিধ দুর্বিপাকে এই রাজ্যের আর্থিক অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। তিনি ইহা 'অজুহাত' হিসাবে খাড়া করিতে চাহেন না, ইহা ইতিহাসের ব্যাপার। ভারতের অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে ১৯৩৭-৩৯ এবং ১৯৪৫-৪৭ সনে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা থাকায় কিছু কাজ হইয়াছিল। বাংলায় এইরূপ কোন সুযোগ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং স্বাধীনতার পর তাঁহাদের একেবারে গোড়া হইতে কাজ সুরু করিতে হইয়াছে।

ডাঃ রায় বলেন, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চল এবং তথাকার জনসাধারণের কল্যাণসাধনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। "আমি স্বীকার করি, গত পাঁচ বৎসরে আমরা শহর

এলাকার জন্য বেশী কিছু করিতে সক্ষম হই নাই।" ১৯২৩ সনে বস্তীগুলি যে অবস্থায় ছিল, বর্তমানে কতকটা উন্নতি সত্ত্বেও ঐগুলির অবস্থা এখনও তেমনই আছে। রাস্তাঘাটের অবস্থাও এখনও প্রায় পূর্ব্বের মতই আছে, জলসরবরাহের অবস্থাও বর্তমানে ত্রুটিপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রথম শিক্ষা হইল যে, আগামী পাঁচ বৎসরে শহর এলাকার জন্য বর্তমানের তুলনায় অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে।

ডাঃ রায় বলেন, নির্ব্বাচনের দ্বিতীয় শিক্ষা হইতেছে যে, গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ 'অবুঝ' নয়, তাহারা কোন্‌টি তাহাদের স্বার্থে এবং কোন্‌টি তাহাদের স্বার্থবিরুদ্ধ, তাহা বেশ বুঝিতে পারে। নির্ব্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া তিনি এই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তৃতীয় শিক্ষা হইতেছে যে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা জনসাধারণের মনে 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে। বর্তমানে গ্রামের জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজন কি, তাহাদের কল্যাণ কিসে তাহা বুঝিতে শিখিয়াছে। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামে গ্রামে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। গ্রামবাসীরা ইহা বুঝিতে শিখিয়াছে যে, দেশের উন্নয়নে তাহাদেরও সাহায্য প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরাও এরূপ দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছি, কারণ, আমরা জানি যে, রাজ্যের উন্নয়নে জনসাধারণের কি প্রকারের অবদান হওয়া উচিত, তাহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শ্রীটনটনিয়া বলিয়াছেন যে, কলিকাতা 'ভাঙ্গনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।' কিন্তু "আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে, আমি এখনও ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই।" তিনি সকলকে ধৈর্য্য ধরিয়া একযোগে কাজ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিবেন। একমাত্র গণতান্ত্রিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়াই ইহা সম্ভব হইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রী মালিক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট বড়, বুদ্ধিজীবী, বেকার সকলেরই উদ্দেশ্যে শুধু স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়া যথাসম্ভব সমন্বয়, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক বুঝাপড়ার মনোভাব বজায় রাখিয়া চলিবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, ইহা হইলেই "আমরা সমস্যাসঙ্কুল ও ভাগ্যহত পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণ-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হইতে সক্ষম হইব।"

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পুনরায় জয়ী হইয়াছে। সম্মিলিত বামপন্থীরা বিকল্প সরকার গঠনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। নির্ব্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিভিন্ন দলগুলির অবস্থা নিম্নরূপ: কংগ্রেস ১৫২, কম্যুনিষ্ট ৪৬, প্রজাসমাজতন্ত্রী ২১, ফরওয়ার্ড ব্লক ৮, লোকসেবক সঙ্ঘ ৭, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ৩, ফরওয়ার্ড ব্লক মার্ক্সিষ্ট ২, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার ২, স্বতন্ত্র ১১ এবং সরকার মনোনীত ৪ (এংলো ইণ্ডিয়ান) —মোট ২৫৬।

নূতন বিধানসভায় বিরোধীদল পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগুরু হইয়াছে। কিন্তু জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা একটি আসনও দখল করিতে সমর্থ হয় নাই। পূর্ব্ববর্তী বিধানসভায় কংগ্রেস ব্যতীত অপর কোন দলই বিধানসভায় দল হিসাবে স্বীকৃতি পায় নাই, কারণ বিরোধীদলের কাহারও সদস্যসংখ্যা ত্রিশ ছিল না। এবারে কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪৬টি আসন লাভ করায় স্বতঃই তাহারা বিরোধীদল হিসাবে সরকারী স্বীকৃতিলাভ করিবে এবং তাহাদের নেতা বিরোধীদলের নেতা হিসাবে পরিগণিত হইবে।

নূতন বিধানসভায় বিরোধীদল যে কেবল সংখ্যার দিক হইতেই প্রবল তাহা নহে, নেতৃত্বের দিক হইতেও বিরোধীদল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে শক্তিশালী হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী, শ্রীসত্যেন্দ্রনারায়ণ রায় এবং শ্রীবঙ্কিম মুখার্জ্জীর সহিত বিতর্কে আটিয়া উঠা কংগ্রেস দলের পক্ষে বিশেষ সহজ হইবে না। কংগ্রেস দলের নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে শ্রীবিমলকুমার সিংহ ও শ্রীভূপতি মজুমদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরকারী দলের পুরাতন পাঁচ জন মন্ত্রী নূতন বিধানসভায় অনুপস্থিত থাকিবেন: দুই জন নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন, দুইজন নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন নাই এবং একজন লোকসভায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও পরাজিত হইয়াছেন। পুরাতন মন্ত্রীসভার এগার জন সদস্য নূতন বিধানসভার সদস্য হইয়াছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পুনরায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় কংগ্রেসী দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কিন্তু লিখিবার সময় পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভা গঠন লইয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম ব্যতীত আর সকল রাজ্যেই মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। এই তিনটি প্রদেশে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ দলাদলি তীব্র হওয়ার দরুন মন্ত্রীসভা গঠন বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মার্চ্চ মাসের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হইয়াছে—অথচ এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত নূতন মন্ত্রীসভার নাম ঘোষণা সম্ভব হইল না।

বিধানসভায় চার জন এংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য মনোনয়ন লইয়াও বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। গত বিধানসভায় মাত্র এক জন মনোনীত সভ্য ছিলেন, বর্তমানে মনোনীত সভ্যের সংখ্যা চার। পশ্চিমবঙ্গে এংলো-ইণ্ডিয়ানদের মোট সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার। যেখানে সাধারণ ভাবে এক লক্ষ লোকের জন্য মাত্র একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয় সে স্থলে ৩৭ হাজার লোকের জন্য চার জন প্রতিনিধি মনোনয়ন অনেকের নিকট যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়নাই।

পশ্চিমবঙ্গ হইতে লোকসভায় নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের অবস্থা নিম্নরূপ (ব্রাকেটের মধ্যবর্তী সংখ্যা অধুনালুপ্ত লোকসভায় সদস্য-সংখ্যার সূচক): কংগ্রেস ২৩ (২৪), কম্যুনিষ্ট ৬ (৫), প্রজাসমাজতন্ত্রী ২ (০), ফরওয়ার্ড ব্লক ২ (০), বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী ১ (১) লোকসেবক সংঘ ১ এবং স্বতন্ত্র (বামপন্থী-সমর্থিত) ১ (১)। বর্তমান নির্ব্বাচনে জনসংঘ এবং হিন্দু মহাসভার কোন প্রার্থী লোকসভায় নির্ব্বাচিত হইতে পারেন নাই।

লোকসভার নির্ব্বাচনে যে সকল সদস্য পরাজিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন, কম্যুনিষ্ট দলের শ্রীকমল বসু, শ্রীনিকুঞ্জ চৌধুরী এবং শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায়, বামপন্থী প্রার্থী শ্রীমোহিতকুমার মৈত্র, হিন্দুমহাসভার শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্ত।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শহরাঞ্চলে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে। কলিকাতায় প্রথম নির্ব্বাচনে কংগ্রেস বিধানসভায় ষোলটি আসন পাইয়াছিল, এবার পাইয়াছে মাত্র আটটি। কম্যুনিষ্ট পার্টি, প্রজা-সমাজতন্ত্রী, ফরওয়ার্ড ব্লক, ফরওয়ার্ড ব্লক মার্ক্সিষ্ট এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল লইয়া গঠিত সম্মিলিত বামপন্থী ফ্রন্ট এবারে কলিকাতায় আঠারটি আসন লাভ করিয়াছে। বিধানসভার নির্ব্বাচনে কলিকাতায় সাতজন বর্ত্তমান কংগ্রেসী সদস্য পরাজিত হইয়াছেন। লোকসভার নির্ব্বাচনে অবশ্য কংগ্রেস (১) এবং বিরোধী দলের সদস্যসংখ্যা (৩) পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ফল হইল মেদিনীপুর জেলায় বিরোধী দলগুলির পরাজয়। ১৯৫২ সনে মেদিনীপুরের মোট ৩৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছিল মাত্র এগারটি আসন, এবারে পাইয়াছে ৩২টির মধ্যে ২২টি। প্রথম নির্ব্বাচনে বামপন্থীদের মধ্যে একতা ছিল না—বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে বামপন্থী দলগুলি সম্মিলিত ভাবে নির্ব্বাচন চালাইয়াও ওখানে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না।

মেদিনীপুরে এই বৎসর ১৫,৩০,১৮৯ জন লোক ভোট দিয়াছে—গতবারের তুলনায় ৩,০৫,২৯৬ জন অর্থাৎ শতকরা ২৪·৯ জন এবারে বেশী ভোট দিয়াছে। কংগ্রেস তন্মধ্যে শতকরা ৪৮·৫ জনের ভোট পাইয়াছে—১৯৫২ সনে পাইয়াছিল শতকরা ৩৪ ভাগ। কম্যুনিষ্ট পার্টি গতবারের তুলনায় শতকরা ১·৮ ভাগ বেশী ভোট পাইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

৩০শে মার্চ্চ কলিকাতা এবং হাওড়াতে পৌর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচনে উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাসহ জয়লাভ করে। নির্ব্বাচনের পর কলিকাতা কর্পোরেশনে বিভিন্ন দলের কাউন্সিলারদের সংখ্যা হইয়াছে : কংগ্রেস ৪২, সংযুক্তনাগরিক কমিটি ২৬ এবং স্বতন্ত্র ১২। অলডারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পাইয়াছে তিনটি আসন এবং বিরোধী দল দুইটি। সুতরাং মোট ৮৫টি আসনের মধ্যে কংগ্রেসী দল ৪৫টি আসন লাভ করিয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্ব্বাচনে হাওড়া এবং কলিকাতা উভয় স্থানেই কংগ্রেস পরাজিত হইয়াছে—অথচ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পৌর নির্ব্বাচনে উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস জয়লাভ করিয়াছে। ইহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে ক্ষেত্রে সাধারণ নির্ব্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতেছে সেক্ষেত্রে পৌর নির্ব্বাচনে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার সমর্থন করা যায় না। এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, শীঘ্রই কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনী আইন সংশোধন করিয়া কর্পোরেশন নির্ব্বাচনে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকেই ভোটাধিকার দেওয়া হইবে। এই প্রস্তাব অত্যন্ত সমীচীন এবং বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের একাধিক পৌরসভার নির্ব্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-সংক্রান্ত একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে এবার অধিকাংশ ভোটারেরই নাম তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। কর্পোরেশনের লাইসেন্স-হোল্ডার, বাড়ীর মালিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণও অনেক ক্ষেত্রে ভোটার লিষ্ট হইতে বাদ পড়িয়াছেন। অন্যান্য ধরনের ভোটারদের তো কথাই নাই। কিন্তু নির্ব্বাচনের তিন দিন পূর্ব্বে ছাড়া একথা কাহারও স্মরণে আসে নাই।

কর্পোরেশনের পরিস্থিতি সম্পর্কে ১৬ই চৈত্র "যুগবাণী" যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। উহা এখানে তুলিয়া দিলাম :

"কর্পোরেশন নির্ব্বাচন সম্পর্কে আমরা আগেও লিখিয়াছি যে, মিউনিসিপালিটিতে পার্টি রাজনীতি ঢোকানো আমরা ভাল মনে করি না। কংগ্রেস ইহা করিয়াছে, এখন বামপন্থীরাও তাহাই করিতেছেন। পার্টি ফণ্ডে টাকা দিয়া কণ্ট্রাক্ট পাওয়া এবং পার্টির অযোগ্য লোককে চাকরি দেওয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের দুর্নীতি ও অযোগ্যতার প্রধান কারণ। কংগ্রেস বরাবর ইহা করিয়াছে। ইউ-সি-সি'র অন্তর্ভুক্ত কমুনিষ্ট এবং পি-এস-পি'ও এই জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। কর্পোরেশনে নলকূপ কেলেঙ্কারির নায়ক এক কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে কমুনিষ্ট কাউন্সিলার সুব্রত সেনশর্ম্মা, প্রশান্ত সুর এবং পি-এস-পি কাউন্সিলার শ্যামস দত্তের ঘনিষ্ঠতা এখন প্রকাশ্য আলোচনার বিষয় শুধু নয়, এই কেলেঙ্কারী সম্পর্কে যাহাদের বাড়ী তল্লাসী হইয়াছে, এই তিনজন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। পুলিস তদন্তের পরিণতি কি হয় তাহার জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া আমরা ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব। যে পাপ ব্যক্তিগত ভাবে ঢুকিয়াছে তাহা পার্টিগত ভাবে ঢুকিবেই, ইহাদিগকে পুনরায় ইউ-সি-সি মনোনয়ন দেওয়াতে তাহা বুঝা যাইতেছে। কমুনিষ্ট কাউন্সিলার শচীন সেনের নামে আচার্য্য নন্দলাল বসুর জাল ভোট দেওয়ানোর মামলার পর ইহাকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে না বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাঁহারাও হতাশ হইয়াছেন। কংগ্রেসের কালো দুর্নীতি এবং কমুনিষ্টের লাল দুর্নীতি দুইটাকেই আমরা সমান দুর্নীতি বলিয়া জ্ঞান করি এবং বর্জ্জন করা উচিত মনে করি। চিত্ত চ্যাটার্জ্জি কংগ্রেসের লোক হইয়া গোপনে কালীঘাটের কমুনিষ্ট প্রার্থীকে সমর্থন করিয়াছেন এবং তার পুরস্কারস্বরূপ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কর্পোরেশনে ঢুকিয়াছেন। আবার হয়ত তাঁহাকে কংগ্রেসেরই উচ্চপদে দেখিতে পাইব। কবিরাজ পরিমল সেনগুপ্ত কংগ্রেসকে অনুরোধ করিয়া-

ছিলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী না দেন। তিনি বর্ণচোরা হইয়াই থাকিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস রাজী হয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কমুনিষ্ট প্রার্থীকে সাহায্য করেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে ইউ-সি-সি কোন প্রার্থী দিল না। ইহাকে আমরা সুবিধাবাদ বলিয়াই মনে করি। পরিমল সেনগুপ্ত, সুব্রত সেনশর্ম্মা এবং শ্যামল দত্ত বর্ত্তমান দুর্নীতিপরায়ণ কমিশনারের সর্ব্বপ্রধান সমর্থক। কমুনিষ্ট পার্টি কর্পোরেশন দখল করিলে সুব্রত সেনশর্ম্মা, শচীন সেন, শ্যামল দত্ত প্রভৃতি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন ইহা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না। কংগ্রেসের দুর্নীতি এবং অত্যাচারের ফলে দেশে যে বিষাক্ত হাওয়া উঠিয়াছে তাহার মাঝখানে সত্য কথা বলার প্রয়োজন একান্তভাবেই দেখা দিয়াছে। উভয় পক্ষ কেন, সহস্র পক্ষের অপ্রিয় হইলেও এই সত্য-ভাষণের প্রয়োজন আছে।"

নলকূপ কেলেঙ্কারী

নলকূপ কেলেঙ্কারীর নিম্নস্থ রিপোর্ট আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"কলিকাতা কর্পোরেশনের বহুবিতর্কিত 'নলকূপ কেলেঙ্কারী'র কাহিনী সম্পর্কে চূড়ান্ত পর্য্যায়ের সূচনা করিয়া কলিকাতা পুলিসের এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ গত বুধবার ভোরে ঐ ব্যাপারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিবার অভিযোগে কর্পোরেশনের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (বর্ত্তমানে ড্রেনেজ বিভাগের রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার) এবং অপর আট জন কর্ম্মচারী সহ মোট সতের জনকে গ্রেপ্তার করে। উহাদের মধ্যে কয়েকজন কণ্ট্রাক্টারও আছেন।

"কলিকাতার মেয়র শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বিগত ২১শে জুলাই (১৯৫৬) কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত এ-আর-পি'র কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের অব্যবহার্য্য নলকূপসমূহের ক্রয় ও বিলিব্যবস্থা সংক্রান্ত কতকগুলি অভিযোগ সম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাজ্য সরকারের চীফ সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র লেখেন। উহারই ভিত্তিতে এনফোর্সমেণ্ট বিভাগ উহার ডেপুটি কমিশনার রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির নেতৃত্বে ব্যাপক তদন্ত সুরু করে। গত নয় মাসকালের গোপন তদন্তে পুলিস কর্পোরেশনের একাধিক অফিসার ও কাউন্সিলারের গৃহেও তল্লাসী চালায়। অতঃপর এই সম্পর্কে উপরোক্ত সতের জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ, ঐ 'নলকূপ কেলেঙ্কারী' সম্পর্কে পুলিস হইতে কয়েকদিনের মধ্যে আরও চাঞ্চল্যকর গ্রেপ্তার হইবার সম্ভাবনা আছে।

"শুক্রবার কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্ব্বাচনের ঠিক পূর্ব্বদিনেই পুলিস হইতে এইরূপ ব্যাপক গ্রেপ্তার হওয়ায় বৃহস্পতিবার কর্পোরেশনে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া, উক্ত ১৭ জন ধৃত ব্যক্তিকে এই দিন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীএম. মুখার্জ্জির এজলাসে যখন হাজির করা হয় তখন আদালতকক্ষেও খুব ভিড় জমিয়া যায়।

"নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিয়া আদালতে হাজির করা হয়:

"(১) শ্রীজীবানন্দ সেন (কর্পোরেশনের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী), (২) শ্রীশিশিরকুমার দাস (ড্রেনেজ বিভাগের রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনীয়ার ও ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার), (৩) শ্রীযশোদানন্দ ব্যানার্জ্জি (কর্পোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), (৪) শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, (৫) শ্রীসনৎকুমার ঘোষ, (৬) শ্রীলোকনাথ গাঙ্গুলী, (৭) শ্রীদেবব্রত সেনগুপ্ত, (৮) শ্রীশশিভূষণ সরকার এবং (৯) শ্রীরবীন্দ্র মহলানবীশ (প্রত্যেকেই টিউবওয়েল ইনস্পেক্টর), (১০) শ্রীজলগোবিন্দ রাম (কর্পোরেশনের পিয়ন), (১১) শ্রীরমেশচন্দ্র রায় (কণ্ট্রাক্টর), (১২) শ্রীসিদ্ধিরাম এবং (১৩) শ্রীরাজারাম যশোয়াল (মেসার্স সিদ্ধিরাম রাজারাম কোম্পানীর অংশীদার—রাজেন্দ্র দেব রোডের পুরাতন লোহা-বিক্রেতা), (১৪) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং (১৫) শ্রীসত্যরঞ্জন ব্যানার্জ্জি (ম্যাঙ্গো লেনস্থিত মেসার্স ইউনিয়ন ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী), (১৬) শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য (টিউবওয়েল ডিলার্স সিণ্ডিকেট) এবং (১৭) শ্রীহরিপদ ব্যানার্জ্জি (একটি ভুয়া কোম্পানীর মালিক)।

"প্রতারণা করিবার ষড়যন্ত্র, ভুয়া দলিল ব্যবহার, বিশ্বাসভঙ্গ এবং এই সকল অপরাধে সাহায্য করিবার অভিযোগে উক্ত ব্যক্তিগণকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি, ৪২০, ৪৭১, ৪০৯ এবং ১০৯ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগে ইহাও প্রকাশ যে, কর্পোরেশনের উক্ত কর্ম্মচারিগণ অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত এ-আর-পি নলকূপগুলির বিলিব্যবস্থার মারফত কর্পোরেশনকে কয়েক লক্ষ টাকা প্রতারণা করে। প্রকাশ, এই নলকূপগুলি পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪৭ সনে কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়।

"পুলিস হইতে এইরূপ অভিযোগ করা হয়, তাঁহারা তদন্তকালে দেখিয়াছেন যে, এ সকল ষড়যন্ত্রকারী টিউবওয়েল সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতারণামূলক কার্য্যসিদ্ধির জন্য মূল্যবান সিকিউরিটি জাল করিয়াছেন, কতকগুলি ভুয়া এবং অস্তিত্ববিহীন কোম্পানী খাড়া করিয়া প্রকৃত তথ্য গোপনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং এইভাবে তাঁহারা কর্পোরেশনকে টিউবওয়েলগুলি হস্তান্তর করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

"পুলিসের অভিযোগ এই যে, ১৯৪৭ সনে তৎকালীন বাংলা সরকারের পাবলিক হেলথ বিভাগ কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে রাস্তায় প্রোথিত ২৭০৩টি নলকূপ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনকে দান করেন। ঐ সময় নলকূপগুলির অবস্থান এবং ঐ নলকূপগুলির অবস্থাদি বর্ণনা করিয়া একটি নথীবহিও দেন। ঐ বহির উপরে এরূপ লেখা ছিল—'১৯৪৭ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সংশোধিত'। পুলিসের অভিযোগ এই যে, ঐ লেখাটা তুলি

ফেলিয়া উহার পরিবর্ত্তে '১৯৪৪ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত সংশোধিত' এরূপ লিখিয়া দেওয়া হয়। ঐ নলকূপগুলি হস্তান্তরিত হইবার ছয় মাস পরেই ১৯৪৭ সনের অক্টোবর মাসে কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ এরূপ এক নোট দেন যে, ১,২০০ নলকূপ অকেজো হইয়াছে। এই ভুল সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া ঐ তথাকথিত অকেজো নলকূপগুলির বিক্রয় ও বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য ওয়াটার ওয়ার্কস কমিটিতে বিষয়টি প্রেরিত হয়। পরে ১৯৫৪ সনে কর্পোরেশন ১,৪০০ নলকূপ বিক্রয় করিয়া দিবার এক প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কর্পোরেশনকে ঐ সময় জানানো হইয়াছিল যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত ১,৪০০ নলকূপ অকেজো হইয়া গিয়াছে। ইহার পর নলকূপগুলি বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য টেণ্ডার আহ্বানের পালা। পুলিস হইতে অভিযোগ করা হয় যে, এই সময়ই কর্পোরেশনের এক দল অফিসারের যোগসাজশে কয়েকটি ভুয়া কণ্ট্রাক্টার ফার্ম্ম গজাইয়া উঠে। একটি ফার্ম্ম অকেজো নলকূপগুলি তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য নলকূপপিছু ৩৫/০ দর দেয়। কিন্তু এই ফার্ম্মের লোকের নিকট হইতে কর্পোরেশনের জনৈক অফিসার তৃতীয় এক ব্যক্তির মাধ্যমে দশ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি তাহা দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় প্রথম দিকে উক্ত ফার্মের টেণ্ডার বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু পরে ঐ একই ফার্ম্ম প্রতি নলকূপের জন্য মাত্র ১২॥০ টাকা করিয়া দাম দিবার যে, টেণ্ডার দেয় পূর্ব্বোক্ত দাম অপেক্ষা অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও সেই টেণ্ডারই গৃহীত হয়। অভিযোগে আরও প্রকাশ যে, কর্পোরেশনের ১,৪০০ অকেজো নলকূপ বিক্রয় করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও উক্ত ফার্ম্ম কণ্ট্রাক্ট পাইয়াই অতি সত্বর ১,৮০০ নলকূপ রাস্তা হইতে তুলিয়া ফেলে। এই নলকূপগুলির মধ্যে অন্ততঃ ১৪টি এমন নলকূপ ছিল যেগুলিতে জল পাওয়া যাইতেছিল এবং যেগুলি হইতে জনসাধারণ পানীয় জল পাইতেছিল। পুলিসের অভিযোগ এই যে, ঐ কার্য্যে কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের কোন কোন অফিসারের যোগসাজশ ছিল। একটি ফার্ম্ম ১১৪টি নলকূপের নল ছাড়াও ঐগুলির মাথা বা উপরের অংশও তুলিয়া লইয়া যায়। অথচ টেণ্ডারের কণ্ট্রাক্ট অনুযায়ী উপরের অংশ কর্পোরেশনের সম্পত্তি।

নলকূপগুলি কেজো আছে কিনা এবং ঐগুলিতে জল উঠে কিনা তাহা দেখিবার জন্য যে ফার্ম্ম কণ্ট্রাক্ট লয় সেই ফার্ম্ম ১২২টি নলকূপের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা না করিয়াই ঐ কার্য্যের জন্য কর্পোরেশন হইতে বিলের টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে। অথচ কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী বিলগুলি ঠিক আছে বলিয়া পাস করিয়া দিয়াছেন।

কর্পোরেশনের ডাক স্লিপগুলি পরীক্ষা করিয়া পুলিস দেখিতে পাইয়াছে যে, সেক্রেটারী বিভাগের পদস্থ কোন অফিসারের খাস পিওন মারফত ঐসব ফার্ম্মের নিকট চিঠিপত্র পাঠানো হইয়াছে; কিন্তু নিয়মমত চিঠিপত্র ডাকে যাওয়াই উচিত।

পুলিসের আরও অভিযোগ এই যে, ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের একদল নলকূপ ইন্সপেক্টর এইসব অপকার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে অকেজো নলকূপগুলি তোলা হইয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট দিয়াছেন এবং নলকূপগুলির কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার ভুয়া বিলও ঠিক আছে বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন।

উপরোক্ত অপকার্য্য করিতে গিয়া একটি ভুয়া ফার্ম্ম একটি বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম্মের অনুরূপ নাম গ্রহণ করিয়া কণ্ট্রাক্ট লয় এবং এই ব্যাপারে কোন কোন অফিসারের যোগসাজশ রহিয়াছে।

পুলিসের রিপোর্টে বলা হয় যে, কর্পোরেশনের যে সকল কর্ম্মচারী এই নলকূপ কেলেঙ্কারীর সহিত জড়িত আছেন তাঁহারা প্রায়ই অভিযুক্ত ফার্ম্মগুলির মালিক অথবা কর্ম্মচারীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন, এমনকি তাহাদের বাড়ীতেও ঘনঘন যাতায়াত করিতেন। তদন্তকালে পুলিস কোন কোন কর্ম্মচারীকে কোন কোন কণ্ট্রাক্টারের বাড়ীতে বসিয়া সলাপরামর্শ করিতেও দেখে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিস এই সমগ্র ব্যাপারে কণ্ট্রাক্টারদের মধ্যে এক ব্যক্তিকেই 'নাটের গুরু' বলিয়া মনে করে এবং অভিযোগ করে যে, ঐ ব্যক্তি কর্পোরেশনে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং কোন কোন কাউন্সিলারের উপর অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এই কাজ করিয়া লইতে অগ্রণী হন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সেক্রেটারী শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ তদন্তকালে পুলিসের নিকট যে বিবৃতি দেন পুলিস তাহা খুব সহায়ক বলিয়া মনে করে।"

নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার বাড়িয়াছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক দলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই, তথাপি পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনেও সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং প্রচার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে জনাব রেজাউল করিম সম্পাদিত "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" ১৯শে মার্চ্চ যে সম্পাদকীয় মন্তব্য করিয়াছেন, বিশেষ উপযোগী বোধে আমরা তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম :

"এবারকার নির্ব্বাচনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সাম্প্রদায়িকতার আমদানী। অন্যান্য জেলায় কি হইয়াছে বলিতে পারি না; কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এই জেলায় নির্ব্বাচনের সময় রীতিমত ভাবে সাম্প্রদায়িকতার দোহাই দেওয়া হইয়াছিল। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, স্বাধীনতা পাওয়ার পর লীগের যুগের সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উসকাইয়া দেওয়া হইবে না; কি আমাদের সে আশা পূর্ণ হইল না। সস্তায় নির্ব্বাচনী বৈতরণী পার হইবার জন্য বিভিন্ন প্রার্থী নানাভাবে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ফলে, এবারকার নির্ব্বাচন সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে হইয়াছে। ইহাতে দেশের যে চরম ক্ষতি হইতেছে সে-কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি সাম্প্রদায়িক নেতাদের নাই। এদেশে হিন্দু-

মুসলমানকে পাশাপাশি বসবাস করিতে হইবে। হিন্দুর বিপদে মুসলমান আগাইয়া আসিবে, আবার মুসলমানের বিপদে হিন্দু আগাইয়া আসিবে, এই ভাবেই ত জাতীয় আদর্শ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব জাগ্রত হইবে। বিপদে-আপদে নয়, অন্যান্য সময়ে বিশেষতঃ নির্ব্বাচনের সময়েও হিন্দু দিবে মুসলমানকে ভোট, আর মুসলমান দিবে হিন্দুকে ভোট। তবেই ত নির্ব্বাচিত ব্যক্তি-সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব দাবি করিতে পারিবেন, তবেই ত নির্ব্বাচনের মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্বার্থবোধ জাগ্রত হইবে; কিন্তু যদি এক সম্প্রদায়ের ভোটারগণ স্থির করে যে, অপর সম্প্রদায়ের প্রার্থীকে ভোট দিবে না, তবে ধর্ম্মনিরপেক্ষ সেকুলার রাষ্ট্রের আদর্শ একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। যে দুই-জাতিত্বের দাবি ভারতকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছে, স্বাধীনতার পরেও যদি স্বাধীন সেকুলার রাষ্ট্রে সেই চির অভিশপ্ত দুই-জাতিত্বের ভিত্তিতেই নির্ব্বাচনকার্য্য চলিতে থাকে তবে তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যাহারা একদিন কোন কিছু না বুঝিয়া কেবল লীগ লীগ করিয়া চীৎকার করিয়াছে, তাহারা আবার স্বাধীন ভারতের ব্যক্তি-স্বাধীনতার সুবিধায় ছদ্মবেশে অন্য নামে সেই অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িকতাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা এই ধরনের আচরণের ঘোর নিন্দা করিতেছি। গতবারকার নির্ব্বাচনের সময় কিছুটা সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে দেশের আবহাওয়া ততটা বিষাক্ত হয় নাই; কিন্তু ভূতপূর্ব্ব লীগ-নেতা ও সমর্থকগণ এবার নগ্নমূর্ত্তিতে নিজেদের সাম্প্রদায়িক রূপকে প্রকটিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মুসলিম স[ম্প্র]দায়ের কল্যাণের জন্যই যদি এই সা[ম্প্র]দায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়া থাকে তবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিব যে, ইহাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের কোন কল্যাণ হইবে না। বরং নানাদিক দিয়া অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। গতবার কংগ্রেস এই জেলায় ছয়টি আসনের জন্য মুসলমান প্রার্থীকে মনোনয়ন দিয়াছিল। তাহারা সেই ছয়টি আসন অধিকার করিল, তদুপরি আরও একটি অতিরিক্ত আসনও অধিকার করিল। এবার নানাদিক বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড এ জেলার জন্য ষোলটি আসনের মধ্যে আটটি আসনের জন্য মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও যদি অধিক আসনের জন্য দাবি করা হয় তবে তাহা অন্যায় ও অশোভন হইবে। লোক-সভায় বিপ্লবী-নেতা শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর জন্য কংগ্রেস কোন প্রার্থী দেয় নাই। জেলাবাসীর উচিত ছিল এবারের মত শ্রীত্রিদিব চৌধুরীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসনটি ছাড়িয়া দেওয়া; কিন্তু তাহা হইল না, ত্রিদিববাবুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র ভাবে একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইলেন। কে ইহাদেরকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে উৎসাহিত করিল তাহা জানি না; কিন্তু ইহারা দেশের সমূহ ক্ষতির কারণ হইলেন। মুসলিম প্রার্থীকে কেন্দ্র করিয়া এ জেলার বহরমপুর নির্ব্বাচনকেন্দ্রে এমন এক অবাঞ্ছিত সাম্প্রদায়িক মনোভাব জাগ্রত হইল যাহার ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার কথা চিন্তা করিয়া অনেকে বিচলিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় কেন এ ধরণের সাম্প্রদায়িক ভোটিং হইবে? সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ করিবার জন্য অপর সম্প্রদায়ের মত মুসলিম স[ম্প্র]দায়কেও আগাইয়া আসিতে হইবে। অর্থ-নৈতিক সমস্যা যেখানে সেখানে মূল-সমস্যা; সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিলে সর্ব্বনাশ হইবে। দেশে খাদ্যাভাব, শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই, বন্যা, প্লাবন, অভাব, অনটন ও গৃহের সমস্যা —এই সব যখন দেশবাসীকে অহরহ বিব্রত করিতেছে তখন আসন লইয়া কেন এত সাম্প্রদায়িকতা? কেন এই আগুন লইয়া খেলা? আটটার স্থানে যদি আরও দু'চারটা আসন মুসলমান বেশী লাভ করিতে পারে তবে কি তাহাতে তাঁহাদের সব সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে? আমরা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, বেলডাঙ্গা, নওদা, হরিহরপাড়া ও বহরমপুর লোকসভার আসনের জন্য রীতিমত ভাবে নগ্ন মূর্ত্তিতে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। যিনিই নির্ব্বাচিত হউন না কেন তিনি সমগ্র দেশের প্রতিনিধি; কিন্তু এই প্রতিনিধিটি যদি মনে করেন যে তিনি এক সম্প্রদায়ের কোন ভোট পান নাই, অথবা এক সম্প্রদায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাঁহাকে ভোট দেয় নাই, তবে নির্ব্বাচনের পর তাঁহার নিকট কি আশা করিতে পারা যাইবে? এরূপ অসা[ম্প্র]দায়িক ভাবে ভোট দিতে হইবে যেন নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ম[ন]ে করিতে পারেন যে তিনি সকল সম্প্র-দায়ের বিশ্বাসভাজন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই তিনি নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। তাহা না হইলে দেশ হইতে সাম্প্র-দায়িকতা দূর হইবে না। দেশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে এমন এমন লোককে বাছিয়া লইতে হইবে যাঁহারা সর্ব্বপ্রকার সা[ম্প্র]দায়িক মনোভাবের ঊর্দ্ধে। হিন্দু মেজরিটি এলাকা হইতে মুসলমানকে এবং মুসলমান মেজরিটি এলাকা হইতে হিন্দুকে নির্ব্বাচিত করিয়া দেখাইতে হইবে যে, আমাদের এ জেলায় কোন-রূপ সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই। বিপ্লবী নেতা ত্রিদিববাবু এমন এক জন মহান ব্যক্তি যাঁহার মনে কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই। তিনি এ জেলার হিন্দু-মুসলমান সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। এইরূপ শত শত কর্ম্মী সৃষ্ট হোক যাঁহারা দেশ হইতে সাম্প্র-দায়িকতাকে নিশ্চিহ্ন করিতে অগ্রসর হইবেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এ জেলার হিন্দু-মুসলমান সকলকে আকুল আহ্বান জানাইতেছি।"

ভারতে মাথাপিছু আয় ও ব্যয়

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্প্রতি বলিয়াছেন, ১৯৫৪-৫৫ সনে জাতীয় আয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, বর্ত্তমান মূল্যমানের ভিত্তিতে বাৎসরিক ব্যক্তিগত আয় গড়পড়তায় দাঁড়ায় ২৬২ টাকায়। ১৯৫৫-৫৬ সনের সংশোধিত বাজেট অনুসারে মাথাপিছু গড়পড়তা বাৎসরিক করের হার দাঁড়ায় উনিশ টাকা সাত আনায়। তিনি

স্বীকার করিয়াছেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যথা : ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনদেশে মাথাপিছু আয়ের সহিত ব্যক্তিগত করহারের কি সম্বন্ধ তাহার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় নাই।

আমাদের বক্তব্য এই যে ব্যক্তিগত আয়ের সহিত করহারের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অর্থমন্ত্রী কি প্রমাণিত করিতে চান? তিনি কি বলিতে চান যে, ব্যক্তিগত করহার আয়ের তুলনায় অত্যল্প? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সম্পর্ক দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। ভারতবর্ষে ৩৬ কোটি লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ৮ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষ কর দেয় এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ শত ব্যক্তির আয় বছরে তিন লক্ষ টাকার অধিক। সুতরাং ব্যক্তিগত আয়ের গড়-পড়তা হিসাব দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত আয়ক্ষমতা প্রমাণিত হয় না, কাহারও আয় অত্যধিক, কাহারও আয় অত্যল্প; সেইরূপ ভাবে কাহাকে অত্যধিক কর দিতে হয়, আবার কাহাকেও বা কোনও কর প্রত্যক্ষভাবে দিতে হয় না। কর ব্যতীত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রকারান্তরে করের সামিল, কারণ ইহা পরোক্ষভাবে করের কার্য্য করে। ইহার ফলে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে ব্যক্তিগত আয়বৃদ্ধির হার অতি নগণ্য। ব্যক্তিগত জাতীয় আয়ের সূচী হইতে দেখা যায় যে ১৯৫০-৫১ সনে ১০০ হইতে ১৯৫৫-৫৬ সনে ১১১তে ইহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে দেখা যায়, ব্যক্তিগত ব্যবহারিক দ্রব্যের উপর খরচার হারও এই কয় বছরে ১০০ হইতে ১০৯-এ উন্নীত হইয়াছে। অর্থাৎ যে হারে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রায় সেই হারে জীবনমানের খরচাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং মাথাপিছু আয় এবং করহার জাতীয় সমৃদ্ধির পরিচায়ক নহে —যেখানে মূল্যবৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধির হার সমান।

কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় ঋণ

চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৫২২ কোটি টাকার মত বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৭ সনের ১লা মার্চ ভারতের জাতীয় ঋণের পরিমাণ ছিল ২৮৩৯·৬৮ কোটি টাকা এবং ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৩৩৬১·৬৭ কোটি টাকায়। ৫২২ কোটি টাকার নূতন ঋণের মধ্যে ৩৬৫ কোটি টাকার ঋণ হইবে স্বল্পমেয়াদী ট্রেজারী বিল কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে দাদন আকারে। নূতন আর্থিক বৎসরে প্রায় এই পরিমাণে অর্থের (৩৬৫ কোটি টাকা) ঘাটতি ব্যয় হইবে। নূতন বাজেটে রাজস্ব ও মূলধন খাতে যে ঘাটতি হইবে তাহা এই ঘাটতি ব্যয় দ্বারা পূরণ করা হইবে। চলতি টাকার ঋণের পরিমাণ ৬৫·৯৩ কোটি বৃদ্ধি পাইবে, ডলার ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ৫৬·২৩ কোটি টাকায়। সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট ৩২·৪৩ কোটি টাকার ঋণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ৩·০২ কোটি টাকার ঋণের মেয়াদ পূরণ হইবে। ৬২ লক্ষ টাকার মত ষ্টার্লিং ঋণের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। নিম্নলিখিত তালিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণের অবস্থা দেখানো হইল : (কোটি টাকা হিসাবে)

	১৯৩৯	১৯৫৭	১৯৫৮
১। টাকার ঋণ :	৩১শে মার্চ্চ	৩১শে মার্চ্চ	৩১শে মার্চ্চ
চলতি ঋণ	৪৩৭·৮৭	১,৫৮৮.৪৫	১,৬৫৪·৩৮
ট্রেজারী বিল ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ঋণ	৪৬·৩০	৮৬৫·২৫	১,২৩০·২৫
বিশেষ খাতে ঋণ	—	২১২·৬০	২১২·৬০
মেয়াদীশেষ ঋণ	০·৬৫	১১·৩৩	১৪·৩৫
	৪৮৪·৮২	২,৬৭৭·৬৩	৩,১১১·৫৮
২। ষ্টার্লিং ঋণ :			
চলতি ঋণ	৩৯৬·৫০	০·৫৬	০·৫৩
যুদ্ধ ঋণ	২০·৬২	২০·৬২	২০·৬২
রেলপথ মূলধন বার্ষিকী	৪৭·৮২	১·০৭	০·৪৮
মেয়াদীশেষ ঋণ	০·০১	০·০২	০·০২
	৪৬৪·৯৫	২২·২১	২১·৬৫
(৩) ডলার ঋণ		১৩২·৯৫	১৮৯·১৮
(৪) সোভিয়েট রাশিয়ার ঋণ		৬·৮৩	৩৯·২৬
মোট ঋণ	৯৪৯·৭৭	২,৮৩৯·৬৮	৩,৩৬১·৬৭

ব্রিটিশ যুদ্ধঋণের দায়িত্ব সম্প্রতি স্থগিত আছে এবং রেলপথের মূলধনী বার্ষিকী ষ্টার্লিং চুক্তির দ্বারা ব্রিটিশ সরকারকে মোটা অর্থ প্রদান করা আছে যাহা হইতে দেয় বার্ষিকী প্রদান করা হইবে। এইগুলি বাদ দিয়া চলতি বৎসরের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,৮১৮ কোটি টাকায় এবং আগামী বৎসর ৩১শে মার্চ্চ ইহার পরিমাণ হইবে ৩,৩৪১ কোটি টাকা। ১৯৩৯ সনের তুলনায় ভারতের জাতীয় ঋণ প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য কয়েক প্রকার ঋণের দায়িত্ব আছে যথা : বিভিন্নপ্রকার প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের জমা; পোষ্ট আপিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, পোষ্ট আপিস ক্যাশ, ন্যাশনাল সেভিংস ও ন্যাশনাল প্ল্যান সার্টিফিকেট, রেলওয়ের উদ্বৃত্ত মজুত, এবং ডাক ও তার বিভাগের টাকা। এই সকল অর্থের পরিমাণ বর্ত্তমানে ১০৬০ কোটি টাকা এবং আগামী বৎসরের মার্চ্চ মাসে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ১,১৬৩ কোটি। সুতরাং বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের যথারীতি ঋণ ও অন্যান্য দায়িত্বের পরিমাণ ৩,৮৭৮·৩৯ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ ৪,৫০৩·৯২ কোটি টাকায় দাঁড়াইবে। বর্ত্তমান চালু ঋণের মধ্যে সুদসহ ঋণের পরিমাণ ৩,৬৭৬ কোটি টাকা এবং ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ সুদসহ ঋণের পরিমাণ হইবে ৪,২৯৮ কোটি টাকা।

এই ঋণের কিছু অংশ সরকারী সম্পত্তিতে নিয়োজিত আছে যথা : রেলপথে আছে ১০৭৩ কোটি টাকা, ডাক ও তার বিভাগে ১৫০ কোটি টাকা, সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে ১৩৬ কোটি, প্রাদেশিক সরকারদিগকে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত ১,১৮৭ কোটি টাকা

ইত্যাদি। কিন্তু পাকিস্থানের নিকট হইতে যে ৩০০ কোটি টাকা পাওনা আছে তাহা হিসাবে দেখানো নিরর্থক, কারণ সে ঋণের টাকা কোন দিনই উদ্ধার করা যাইবে না।

ভারতের ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়

ভারতে প্রায় চার হাজার মাইল সমুদ্রতীর আছে এবং ইহার মধ্যে ছয়টি বৃহৎ বন্দর বা পোতাশ্রয় আছে। এই বন্দরগুলি যথাক্রমে—কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম ও কাণ্ডলা। ইহা ব্যতীত প্রায় ২২৬টি ক্ষুদ্র বন্দর আছে, ইহাদের মধ্যে ১৫০টি বন্দর কার্য্যকরী। ইহাদের প্রত্যেকে বৎসরে এক লক্ষ টনের অনধিক ও ১,৫০০ টনের অধিক মাল আমদানী-রপ্তানী করে। যে সকল বন্দরে ১,৫০০ টনের নিম্নে মাল চলাচল হয় সেগুলিকে বলা হয় সাবপোর্ট। ১৮টি বন্দর হইতে বৎসরে ১ লক্ষ টন পর্য্যন্ত মাল চলাচল হয়, ইহাদিগকে বলা হয় মাধ্যমিক বন্দর।

স্বাধীনতার পূর্ব্বে কেবলমাত্র বৃহৎ পোতাশ্রয়গুলির মারফত আমদানী-রপ্তানী করা হইত। স্বাধীনতার যুগে মাধ্যমিক ও ক্ষুদ্র বন্দরগুলি যথাযথভাবে সরকারী সমর্থন পায় নাই। সম্প্রতি এষ্টিমেট কমিটি (ভারতীয় পার্লামেন্টের হিসাব-পরীক্ষক কমিটি) মাধ্যমিক ও ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়গুলি সম্বন্ধেএকটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই পোতাশ্রয়গুলির উন্নতিকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। সমস্ত বৃহৎ বন্দরগুলি হইতে একত্রে যত মাল চলাচল হয়, মাধ্যমিক ও ক্ষুদ্র বন্দরগুলি হইতে তাহার এক-ষষ্ঠাংশ মাল চলাচল হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ বন্দরগুলির উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য ৬১ কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছিল; অথচ সেই তুলনায় মাধ্যমিক ও ক্ষুদ্র বন্দরগুলির জন্য মাত্র ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা খরচ ধার্য্য করা হইয়াছিল। এই নির্দিষ্ট ২·৪০ কোটি টাকার মাত্র ৪০ শতাংশ, অর্থাৎ মাত্র ৯৬ লক্ষ টাকা এই ক্ষুদ্র বন্দরগুলির উন্নতির জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে খরচ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বৃহৎ বন্দরগুলির উন্নয়ন ও বিস্তৃতির জন্য ৮১ কোটি টাকা খরচ ধার্য্য করা হইয়াছে, কিন্তু মাধ্যমিক ও ও ক্ষুদ্র পোতাশ্রয়গুলির উন্নতির জন্য কেবলমাত্র ৫ কোটি টাকা খরচ ধার্য্য করা হইয়াছে। বড় বন্দরগুলির এক-ষষ্ঠাংশ মাল চলাচল ছোট বন্দরগুলি করে, কিন্তু তাহাদের উন্নতির জন্য বড় বন্দরগুলির খরচের মাত্র ষোল ভাগের এক ভাগ খরচ করা হইবে। বড় বন্দরগুলিতে বর্ত্তমানে অত্যধিক মাল চলাচলের চাপ পড়িতেছে, বিশেষতঃ, কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দরে। ইহার ফলে জাহাজ ও মালগুলিকে অযথা আটক পড়িয়া থাকিতে হয়। এক-দিনের আটকের ফলে ৫ হাজার হইতে ৮ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি হয়। সুতরাং বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। বড় বন্দরে কার্য্যের চাপ পড়ার কারণ—প্রধানতঃ অনেকগুলি জাহাজের একসঙ্গে আগমন, শ্রমিক গণ্ডগোল, রেলযান ও মোটরযানের অভাব, বন্দরে অল্পসংখ্যক জেটি এবং মাল মজুত রাখিবার সুবন্দোবস্তের অভাব। এষ্টিমেট কমিটি সেই কারণে মনে করেন যে, কতকগুলি মাধ্যমিক বন্দরকে বৃহৎ বন্দরে রূপান্তরিত করা অতি অবশ্য প্রয়োজন। কতকগুলি বড় বন্দর অত্যধিক কার্য্যের চাপে বিব্রত, কিন্তু অন্যান্য কতকগুলি বন্দরে কার্য্য নাই বলিলেও চলে, যথা, কোচিন, কাণ্ডলা, ভাবনগর, ওখা ইত্যাদিতে। যানবাহন মন্ত্রী-বিভাগ এই বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ নহেন, তাঁহাদের উচিত—অন্যান্য বন্দরে কার্য্যের সুবণ্টন করিয়া দেওয়া, অর্থাৎ, জাহাজগুলিকে একটি বন্দরে ভিড় করিতে না দিয়া অন্যান্য বন্দরে চালান করা।

ক্ষুদ্র বন্দরগুলির উন্নয়ন-দায়িত্ব বর্ত্তমানে সংবিধানের যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত, এইগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রের হাতে থাকা উচিত, সুতরাং এই বিষয়টি যুগ্ম তালিকা হইতে কেন্দ্রীয় তালিকায় পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন। জাতীয় বন্দর কমিটি বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, প্রতি বন্দরে আমদানী ও রপ্তানী মালের প্রতি টনে এক আনা করিয়া উন্নয়ন কর ধার্য্য করিলে ক্ষুদ্র বন্দরগুলির উন্নয়নের জন্য অর্থের অভাব হইবে না। কিছুদিন ধরিয়া পশ্চিম বাংলায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান-গুলি প্রস্তাব করিয়া আসিতেছে যে, কলিকাতা বন্দরের উপর চাপ কমাইবার জন্য গেঁওয়াখালি বন্দরের উন্নয়ন অতি অবশ্য প্রয়োজন। কয়লা ও অন্যান্য খনিজদ্রব্য গেঁওয়াখালি বন্দর হইতে রপ্তানী করার সুবিধা হইবে। পাকিস্তান যদি খুলনাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে উন্নীত করিতে পারে, তাহা হইলে গেঁওয়াখালি অবশ্য একটি মাধ্যমিক বন্দর হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ আশ্চর্য্যজনকভাবে উদাসীন।

কলিকাতার রাস্তায় বাস দুর্ঘটনা

কলিকাতার রাস্তায় বাস দুর্ঘটনা প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে এবং এই দুর্ঘটনাগুলির সহিত ষ্টেট বাসগুলি অনিবার্য্য ভাবে জড়িত। পূর্ব্বে ব্যক্তিগত বাসের আমলে দুর্ঘটনা প্রায় বিরল ছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বাস সার্ভিসকে একচেটিয়া করিবার পরিকল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে দুর্ঘটনাগুলিকে একচেটিয়া করিয়া লইবারও যেন পরিকল্পনা করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কলিকাতার বাস দুর্ঘটনার দুইটি প্রধান কারণ হইতেছে—চালকদের প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি এবং দ্বিতীয়তঃ বাসগুলির যান্ত্রিক অব্যবস্থা। কলিকাতার ট্রামের সহিত বাসচালকদের রেষা-রেষি অত্যন্ত পুরাতন, তবে তখন পাঞ্জাবী চালকেরা রেষারেষি করিলেও সমঝিয়া চলিতে জানিত, কিন্তু বর্ত্তমানে ষ্টেট বাসচালকদের ট্রামের সহিত রেষারেষি করিবার মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু সমঝাইয়া চলিবার ক্ষমতা নাই। এই রেষারেষি করিবার প্রধান উপায় হইতেছে ট্রামের পথ বন্ধ করিয়া ট্রামের আগে আগে চলা। সম্প্রতি চৌরঙ্গী দুর্ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে এলিয়ট রোডে যে ট্রাম ও ষ্টেট

বাসে সংঘর্ষ হইয়াছিল তাহার প্রধান কারণ ছিল ষ্টেট বাসচালকের ট্রামকে অতিক্রম করিয়া তাহার পথরোধ করা। অতিক্রম করিবার সময় উদ্‌ভ্রান্তভাবে আসিয়া সামনের ট্রামের সঙ্গে ধাক্কা খায়। ট্রামের সহিত বাসের এইপ্রকার রেষারেষি বন্ধ করিতে না পারিলে কলিকাতায় বাসের দুর্ঘটনা সহজে বন্ধ হইবে না। এইরূপ প্রতিযোগিতার যথার্থ কোন কারণ থাকিতে পারে না এবং ইহার জন্ম দায়ী সম্পূর্ণরূপে বাসচালকেরা। বাসে বাসে প্রতিযোগিতাও দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। দুর্ঘটনার দ্বিতীয় প্রধান কারণ এই যে, ষ্টেট বাসগুলির যান্ত্রিক পারিপাট্য ও ক্ষমতা বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয় না এবং অনেক সময় যান্ত্রিক গোলযোগ থাকিলেও গাড়ীগুলিকে রাস্তায় বাহির করা হয়। এ সম্বন্ধে গ্যারেজের কারিগরদের আরও তৎপর এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

ট্রেন বিভ্রাট

কলিকাতায় ট্রেন বিভ্রাট প্রায় লাগিয়াই আছে। হাওড়া লাইনে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলিতে থাকার ফলে বহুদিন হইতেই ট্রেন যথাসময়ে আসিতে পারিতেছে না। ফলে, যাঁহারা আপিসের কাজে দৈনিক কলিকাতায় যাতায়াত করেন তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। শিয়ালদহ লাইনে বৈদ্যুতিকীকরণের অসুবিধা নাই, কিন্তু তথায় একটা না একটা গোলমাল লাগিয়াই রহিয়াছে—ট্রেনে ট্রেনে সজ্ঘর্ষ, ইঞ্জিন লাইনচ্যুত হওয়া প্রভৃতি প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। যাত্রীসাধারণকে এজন্য যে দুর্ভোগ ভুগিতে হয় তাহা বর্ণনাতীত। শুধু যে যাতায়াতেরই অসুবিধা তাহা নহে, যাঁহাদিগকে ট্রেনে আসিয়া আপিস আদালত করিতে হয়, তাঁহাদিগকে নানা দিক হইতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই এপ্রিল মাসেই যখন রেলওয়ে সপ্তাহের জন্ম কলিকাতাস্থিত রেল আপিসগুলি সুসজ্জিত করা হইতেছিল তখন একদিন শিয়ালদহ লাইনে ট্রেনে ট্রেনে ধাক্কা লাগিয়া গাড়ী চলাচল প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বানচাল হইয়া যায়।

রেল বিভাগের সমস্যা অনেক—উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাব, পুরানো লাইন ও ইঞ্জিন, সুদক্ষ কর্ম্মীর অভাব প্রভৃতি বাস্তব কারণ রহিয়াছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও একথা সর্ব্বজনবিদিত যে, রেলবিভাগের কর্ম্মক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। রেলবিভাগের দুর্নীতি প্রায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হইতে চলিতেছে। প্রশাসনিক বিভাগগুলি যদি এভাবে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে তবে তাহাতে দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার ও কর্ম্মীদের লাভ হয় বটে, কিন্তু জনসাধারণ এবং সরকারের তাহাতে সমূহ ক্ষতি। দিনের পর দিন বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে যেভাবে অকর্ম্মণ্যতা প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাতে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, এইরূপ অবস্থার প্রতিকার নাই। কিন্তু চীনের দিকে নজর দিলেই বোঝা যাইবে যে, সরকার ইচ্ছা করিলেই দুর্নীতি এবং অকর্ম্মণ্যতা দূর করিতে পারেন।

সরকারী অকর্ম্মণ্যতা

সরকারী আপিসগুলিতে অকর্ম্মণ্যতা যে কিরূপ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে, সম্প্রতি প্রকাশিত কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের বাৎসরিক বাজেট বিবরণী হইতে তাহার এক দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান, একজন সিনিয়র আই-সি-এস অফিসার ট্রাষ্টের চেয়ারম্যান। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যখন সরকারীভাবে অপর কোন সরকারী বিভাগ সম্পর্কে অভিযোগ করে তখন তাহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

ট্রাষ্টের ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেট রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বিগত বাজেট বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের একাউণ্টেণ্ট-জেনারেল আপিসের গাফিলতির দরুন ট্রাষ্ট প্রায় ছয় লক্ষ টাকা যথাসময়ে না পাওয়ায় ট্রাষ্টকে ব্যাঙ্ক হইতে ওভারড্রাফট গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে স্থলে ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও যথাসময়ে টাকা পাওয়া সম্ভব হয় না সেস্থলে সাধারণ লোকের অদৃষ্ট সহজেই কল্পনা করা যায়। অথচ একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলের আপিস সম্পর্কে যদি অনুসন্ধান করা যায় তবে দেখা যাইবে যে, দেশবিভাগ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার তুলনায় অফিসারের সংখ্যা সর্ব্বক্ষেত্রেই চার গুণেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

অভিযোগটি বিশেষভাবে যদিও একটি আপিসের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে তথাপি অল্প বস্তুর সকল সরকারী বিভাগ সম্পর্কেই উহা সত্য। সরকারী আওতায় লাইফ-ইন্‌সিউরেন্স ব্যবস্থার কি পরিণতি হইয়াছে ভুক্তভোগী মাত্রই তাহা জানেন। যে কাজ আগে পাঁচ মিনিটে হইত এখন তাহাতে লাগে অন্ততঃপক্ষে আধ ঘণ্টা।

এই সকল অকর্ম্মণ্যতার জন্ম প্রধানতঃ দায়ী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের অযোগ্যতা এবং কর্ম্মে অনিচ্ছা। সরকারী আপিসে উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগকে দুই একটি সহি ব্যতীত আর কোন কাজই করিতে হয় না—তথাপি কোন অভিযোগ তাঁহাদের নিকট গেলে তাহারা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন না। উপরন্তু ঊর্দ্ধতন অফিসারদের অকর্ম্মণ্যতা দেখিয়া নিম্নতন কর্ম্মীদেরও কাজে সেরূপ উৎসাহ থাকে না।

৬ই এপ্রিল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাবের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন। রাষ্ট্র যে জনসাধারণের কল্যাণেই পরিচালিত হইতেছে তাহা বুঝিতে দেওয়াই প্রকৃত গণতন্ত্রের লক্ষ্য; তাহা না হইলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায়ও বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে।

পণ্ডিত নেহরু শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোনই পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। সরকারী আপিসের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঊর্দ্ধতন অফিসারকে খুশী রাখাই কর্ম্মীদের প্রধান কাজ। আসল কাজ না করিলেও চলিতে পারে। ঊর্দ্ধতন অফিসারগণ কাজ করেন না, কাজেই তাঁহাদের নিকট কাজের লোকেরও বিশেষ দাম নাই, আছে চাটুকারদের।

কেবল উপর হইতে চাপ আসিলেই কাজের কথা একটু পাড়িতে হয়, কিন্তু সেখানেও তাহাদের ব্রহ্মাস্ত্র রহিয়াছে, সরকারী আপিসের কানুন অনুযায়ী যেহেতু অফিসারগণ নাম সহি ব্যতীত আর কোন কাজই করেন না, সে হেতু ভুল-ত্রুটির দায়িত্ব অধস্তন কর্মচারীর উপর চাপাইয়া দিতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

নয়া পয়সা

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছে। পরিবর্তনের মধ্যে এক টাকাতে ৬৪ পয়সার পরিবর্তে ১০০ নয়া পয়সা পাওয়া যাইবে। টাকা, আধুলি এবং সিকির মূল্য যথাপূর্ব্বই থাকিবে—আনি, দুয়ানি এবং পুরানো পয়সা উঠিয়া যাইবে। তবে ১৯৬০ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বর্তমান মুদ্রা (পয়সা, আনি, দুয়ানি ইত্যাদি) সকলগুলিই চালু থাকিবে।

নয়া পয়সা এবং পয়সার পরিবর্তনের হার সম্পর্কে ভারত-সরকারের অর্থ-বিভাগ এবং ডাক-তার বিভাগ দুই রকম বিধি করায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। কিন্তু এই কথা আমরা "প্রবাসী"তে দুই মাস পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন অবশ্য কেহই তাহাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। দুই প্রকার সরকারী বিনিময়-হার প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে, সকলেই নূতন পয়সা গ্রহণ করিবার সময় ডাক-বিভাগের বিনিময় হারের উপর জোর দিতেছে, কিন্তু নয়া পয়সা দিবার সময় সরকারী সাধারণ বিনিময় হারে দিতেছে। খাম, মণি-অর্ডার কমিশন এবং সংবাদ-পত্রের বুকপোষ্টের খরচ বৃদ্ধি পাইয়াছে; ট্রাম বাসভাড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রেও মূল্য বৃদ্ধি দেখা গিয়াছে।

১লা এপ্রিল হইতে নয়া পয়সা চালু হইবে বলিয়া বহু পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইলেও ঐদিন অধিকাংশ ব্যাঙ্কের নিকটই উপযুক্ত নয়া পয়সা ছিল না। সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সকল সরকারী এবং সওদাগরী আপিসে ১লা এপ্রিল হইতে টাকা, আনা পাইয়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র টাকা এবং নয়া পয়সাতে হিসাব রাখার বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু উক্ত তারিখে উপযুক্ত পরিমাণ নয়া পয়সা না পাওয়ায় অধিকাংশ আপিসেই পুরানো মুদ্রায় কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়, ইহাতে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া নয়া পয়সা দিতে সমর্থ না হওয়ায় সরকারী এবং অর্দ্ধ-সরকারী আপিসগুলিতে বেতন দিতে অযথা বিলম্ব ঘটে। কলিকাতার পোষ্ট-আপিসগুলিতে যে অবস্থা ঘটে তাহা অবর্ণনীয়। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতার কোন ডাকঘর মারফতই কাজ চালানো প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

নয়া পয়সা সরকারী হিসাবের সুবিধার জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শ এবং বহু জল্পনা-কল্পনার পর এই নূতন মুদ্রা চালু হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের অধিকাংশের নিকটই এই নূতন পরিবর্তন অবাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইতেছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়া পয়সার প্রবর্তন উপলক্ষে কলিকাতায় যাহা ঘটিয়া গেল তাহাতে এই আশঙ্কা দৃঢ়তর হইয়াছে যে, মুদ্রাপরিবর্তনের মাধ্যমে সাধারণ লোকের ক্ষতি হইবে।

আসানসোলের সমস্যাবলী

আসানসোল শহরে হঠাৎ কয়লার অভাব দেখা দিয়াছে। আসানসোলে কয়লার অভাব—কথাটা শুনিলে স্বভাবতঃই অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তথাপি ইহা সত্য। আসানসোল হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" পত্রিকা ৩রা এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"নদীর তীরে বসিয়া পিপাসায় ছাতি ফাটিতেছে বলিলে লোকে যেমন বিশ্বাস করে না, আসানসোলে কয়লা পাওয়া যাইতেছে না বলিলেও লোকে সেইরূপ অবিশ্বাস করিবে। কিন্তু ঘটনা সত্যই এই প্রকার। আজ কয়েক মাস যাবৎ আসানসোলে বাস করিয়াও লোকে কয়লা পাইতেছে না। চেষ্টা করিয়া গৃহস্থেরা যে কয়লা সংগ্রহ করে তাহার দরও গলা-কাটা এবং ওজনের কোন বালাই নাই। এই ওজনের কয়লা এত মূল্যে পাইব আসানসোলে তাহার কোন স্থিরতা নাই। আপনি ২-২॥০ টাকা মূল্যে যে কয়লা কিনিলেন তাহা ওজনে পনের সের, আধমণ বা পঁচিশ সের যাহা কিছু হইতে পারে। ইহাতে কোন কথা বলা চলিবে না। দর যাহার কাছে যেমন পাইবে তাহাই আদায় করিবে—এক্ষেত্রেও কোন প্রতিকার নাই। আসানসোলে কয়লা-পরিস্থিতি বর্তমানে এইরূপ—ভুক্তভোগীরা তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন।"

কয়লা-সমস্যা অপ্রত্যাশিত; কিন্তু আশা করা যায় যে, উহা চিরস্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই সমস্যাটি দূর হইবে। কিন্তু আসানসোল শহরের জলসরবরাহের সমস্যা বোধ হয় আর কখনও মিটিবে না। গত চারি বৎসর যাবৎ প্রতি গ্রীষ্মেই আসানসোল শহরে জলাভাব সম্পর্কে অভিযোগ আমরা প্রকাশ করিতেছি। সমস্যা যে যথাপূর্ব্বই রহিয়াছে "বঙ্গবাণী"র সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় মন্তব্য তাহারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

"বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন:

"আসানসোলের কলের জলের কথা বলিতেছি। গ্রীষ্ম পড়িতে না পড়িতে কলের জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। দারুণ গ্রীষ্মে হয় ত এক বালতি জলের জন্য ছুটাছুটি করিতে হইবে—·০ আনা ।৶০ পয়সা দিয়াও হয়ত দুই টিন জল পাওয়া যাইবে না। পিপাসার জলও হয়ত মাপিয়া পান করিতে হইবে।

"আসানসোলের এই জলাভাবের সমস্যা কি প্রতিকারহীন? নহিলে আজ ১৮ ১৯ বৎসর ধরিয়া অবস্থা একই দেখিয়া আসিতেছি, অথচ তাহার কোন প্রতিকার হইল না। কত রাজা, মন্ত্রী পার হইয়া গেল—কত চেয়ারম্যান আসিল যাইল, পরাধীন দেশ স্বাধীন হইল, কিন্তু আসানসোলের অধিবাসীরা গ্রীষ্মের দিনে স্নানের

ও পানের জলের জন্য পূর্ব্বের মতই ছটফট করিতে লাগিল। ইহার কোন প্রতিকার হইল না।

"শুনিয়াছিলাম এক বৎসর পূর্ব্বে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকজন কমিশনার যখন এই উদ্দেশ্য লইয়া পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন ডাঃ রায় নাকি আসানসোলের জলকষ্ট নিবারণের জন্য অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করা হইবে এইপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এবং স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জালানকে কমিশনারগণের সাক্ষাতে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছিলেন। ডাঃ রায়ের উচ্চারিত কথার সূত্র ধরিয়া এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করার কোন চেষ্টা স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ করিয়াছেন কি? যদি না করিয়া থাকেন তাহা হইলে কেন করেন নাই তাহাও জানাইবেন কি?"

কেরলের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য ফল হইল কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন। এই প্রথম নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে কম্যুনিষ্ট দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইল। অবশ্য কেরল স্বতন্ত্র রাষ্ট্র নহে, ভারতরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তথাপি ভারতীয় রাজনীতিতে কম্যুনিষ্ট পার্টির এই জয়লাভ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

গত ৫ই এপ্রিল কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা শপথ গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এলমকুলম মানা শঙ্করন্ নাম্বুদিরিপদ। নাম্বুদিরিপদ-মন্ত্রীসভায় মোট এগার জন সদস্য লওয়া হইয়াছে। অপরাপর সদস্যদের নাম: শ্রী সি. অচ্যুত মেনন, কে. সি. জর্জ্জ, টি. ভি. টমাস, পি. কে. চাথন, শ্রীমতী কে. আর. গৌরী, টি. এ. মজিদ, জোসেফ মুন্দাসেরী, এ. পি. মেনন এবং ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার।

শপথগ্রহণের পর এক বিবৃতিতে নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী নাম্বুদিরিপদ বলেন, "আমরা এক গুরু দায়িত্ব বহন করিতেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং বিশেষ একটা শাসন-কাঠামোর মধ্যে আমাদের কাজ করিতে হইবে—যাহা আমাদের মনঃপূত নহে। কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্ব্বাচনী ইস্তাহারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধতর কেরল রাজ্যগঠনের কর্ম্মসূচী উপস্থাপিত করা হইয়াছে। আমরা সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতে চাই যে, এই কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব।"

ভূমিসংস্কার ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দান সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেরলে ভূমি-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। তাই ভূমিসংস্কার কর্ম্মসূচী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের সহিত পরামর্শ ও আলোচনা করিয়া কাজ করিতে হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিসংস্কার কমিটি ইতিমধ্যেই ভূমি-সমস্যা সমাধানের কতকগুলি নীতি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন এবং এই নীতি কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট, প্রজাসমাজতন্ত্রী এবং কৃষকদের প্রতিনিধি অন্যান্য কতকগুলি দলেরও সমর্থনলাভ করিয়াছে। অতি অল্প সময়ে এবং একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে আমরা বিধানসভায় এক বা ততোধিক বিল আনয়ন করিয়া ন্যায্য ভূমিকর, কৃষকদের দখলী স্বত্ব নিরূপণ, জমির মালিকানার সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ প্রভৃতি স্থির করিব"।

কার্য্যভার গ্রহণের পর কেরলের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল—ভূমিসংস্কার সংক্রান্ত আইন প্রণয়নকাল পর্য্যন্ত জমি হইতে কৃষকদের উচ্ছেদ বন্ধ করিয়া অর্ডিন্যান্স জারী, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সরকারের আদেশের সাসপেনশন এবং শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের দণ্ড মকুব ও দণ্ডহ্রাস।

শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীদের দণ্ড মকুব ও দণ্ডহ্রাস করিবার সিদ্ধান্ত করায় কেরলের কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীসভা বিশেষ সমালোচনার সম্মুখীন হইয়াছেন। কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে যাঁহার অভিমত যেরূপই হউক না কেন বন্দীমুক্তি সম্পর্কে কেরল সরকারের যে সমালোচনা করা হইয়াছে তাহাকে কোনদিক হইতেই সুবিবেচনাপ্রসূত অথবা যুক্তিযুক্ত বলা যায় না।

শ্রীমন্নারায়ণের আপ্তবাক্য

কিরূপ স্তোকবাক্যে কালোকে সাদা করা যায় তাহার একটি নমুনা নীচে দেওয়া হইল:

"কালিকট, ৬ই এপ্রিল—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীমন্নারায়ণ আজ এখানে মালয়ালম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় বলেন যে, কেরলের নির্ব্বাচকমণ্ডলীর দোষত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করায় কোন লাভ নাই। তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বাদেশিকতার উপর কংগ্রেসের যথেষ্ট আস্থা আছে; তবে কংগ্রেসকে নিজের ত্রুটিমুক্ত হইয়া সকলের সেবা করিতে হইবে।

তিনি বলেন যে, কেরলে কংগ্রেস পরাজিত হইলেও উদ্বিগ্ন না হওয়াই উচিত। এখানে কংগ্রেসকে বিরোধীদলের ভূমিকায় অভিনয় করিতে হইবে। তবে একটি বিষয় ভাবনার। কম্যুনিষ্ট পার্টি যেভাবে কাজ করিয়া থাকে, যেভাবে শ্রেণীসংঘর্ষ ও হিংসার পথে তাহারা চলে, তাহাই চিন্তার বিষয়।

তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, তাহা সর্ব্বোদয় বলিয়া অভিহিত। উহা কম্যুনিষ্ট আদর্শের বিরোধী। ভারত ও কংগ্রেস নিরুপদ্রব গণতান্ত্রিক এবং অহিংস উপায়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। কেরলের ঘরে ঘরে এই বাণী পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

ত্রিপুরারাজ্যে নির্ব্বাচন

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরারাজ্যে কংগ্রেসেরই জয় সূচিত হইয়াছে। ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পার্লামেণ্টে দুইটি আসনের কোনটিই লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু এবারে কংগ্রেস একটি আসন লাভ করিয়াছে। লোকসভার নির্ব্বাচনে ১৯৫২ সনে কংগ্রেস পাইয়াছিল শতকরা ২৬ ভাগ

ভোট, এবার পাইয়াছে শতকরা ৪৬ ভাগ ভোট। ১৯৫২ সনে কম্যুনিষ্ট পার্টি সমগ্র ভোটের শতকরা ৫৯ ভাগ পাইয়া লোকসভার দুইটি আসনেই জয়লাভ করিয়াছিল, এবারে তাহারা শতকরা ৪৫ ভাগ ভোট পাইয়া একটি আসন লাভ করিয়াছে। লোকসভার নির্ব্বাচনে তিনজন স্বতন্ত্র প্রার্থী শতকরা ৯ ভাগ ভোট পাইয়াছেন।

১৯৫২ সনে ইলেক্টরাল কলেজ নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কম্যুনিষ্ট পার্টি সমগ্র ভোটসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ পাইয়া দশটি আসনে জয়লাভ করে। দুইটি আসনে কম্যুনিষ্টপ্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাহারা মোট বারোটি আসন পায়। ১৯৫৭ সনের আঞ্চলিক পরিষদে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টি শতকরা ৩৭ ভাগ ভোট পাইয়া বারোটি আসন লাভ করে।

প্রথম নির্ব্বাচনে কংগ্রেস ইলেকটোরাল কলেজে ৯টি আসন লাভ করে; উহার মধ্যে তিনটি আসন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ই লব্ধ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছয়টি আসন লাভ করিয়া কংগ্রেস শতকরা ২৯ ভাগ ভোট পায়। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পাইয়াছে পনরটি আসন এবং শতকরা ৪০ ভাগ ভোট।

১৯৫১-৫২-এর নির্ব্বাচনে ত্রিপুরার ইলেকটোরাল কলেজে চয়জন স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং তিনজন গণতান্ত্রিক সঙ্ঘের প্রার্থী নির্ব্বাচিত হন। এবারে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শতকরা ১৫টি ভোট পাইয়া দুইটি আসন এবং গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ শতকরা ৫ ভাগ ভোট পাইয়া একটি আসন লাভ করিয়াছে।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে দশটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা কোন আসনলাভে সমর্থ হয় নাই। প্রজাসমাজতন্ত্রী দল শতকরা পাঁচ ভাগ ভোট পাইয়াছে।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদে বিভিন্ন দলের চূড়ান্ত আসনসংখ্যা নিম্নরূপ:

কংগ্রেস ১৫, কম্যুনিষ্ট ১২, গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ ১, স্বতন্ত্র ২, এবং কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত ২—মোট ৩২।

আঞ্চলিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেসদলের নেতা হিসাবে রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীতড়িৎ দাশগুপ্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

উপরোক্ত তথ্যগুলি আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও ত্রিপুরারাজ্য

ত্রিপুরারাজ্যে রাস্তাঘাট নিস্মাণ অন্যতম জরুরী বিষয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাজ্যে পথঘাট নির্ম্মাণের জন্য মোট তিন কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল এবং স্থির হইয়াছিল যে, প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে ৬৪ লক্ষ টাকা দিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ ত্রিপুরা সরকার প্রথম বৎসরের টাকা পুরা পান নাই।

স্বাধীনতার পর এই সর্ব্বপ্রথম অর্থাভাবে ত্রিপুরারাজ্যে পথঘাট-নির্ম্মাণকার্য্য ব্যাহত হইল। ইতিপূর্ব্বে রাজ্যের পূর্ত্তবিভাগ কোন সময়ই বরাদ্দীকৃত বার্ষিক অর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই—প্রতি বৎসরই বহু অর্থ কেন্দ্রীয় সরকারকে ফেরত পাঠাইতে হইত। কিন্তু এবার যে-কোন কারণেই হউক কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে বরাদ্দীকৃত অর্থ সম্পূর্ণ দেন নাই।

কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ রহস্যপূর্ণ ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিতেছেন:

"পূর্ত্তবিভাগ সরকারের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কারণ ত্রিপুরার উন্নয়ন উক্ত বিভাগের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। এতদ্ভিন্ন রাজ্যের পরিবহন সমস্যার সমাধানও দ্রুতগতিতে সড়ক নির্ম্মাণের উপর নির্ভর করে। সরকারের এবং জনসাধারণের প্রকৃত সেবা পাইতে হইলে উক্ত ডিপার্টমেন্টকে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন করা আবশ্যক। একাধিক বার এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া আমরা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, পূর্ত্ত বিভাগকে প্রয়োজনীয় এবং যোগ্যতাসম্পন্ন টেকনিক্যাল ষ্টাফ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য না করিলে উক্ত ডিপার্টমেন্টের কাজ জনগণের চাহিদা মিটাইতে পারিবে না। পূর্ত্ত বিভাগের দায়িত্বে যে পরিমাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয় তাহার সম্পূর্ণ ফল লাভ করিতে হইলে উক্ত ডিপার্টমেন্টের আরও অনেকখানি সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। সড়ক ও বিল্ডিং-এর জন্য তিনটি ডিভিশন এবং মেকানিক্যাল ওয়ার্কসের জন্য আরেকটি ডিভিশন (অধুনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) বর্ত্তমানে রহিয়াছে। ত্রিপুরারাজ্যের চাহিদা এত বেশী যে, এই কয়টি ডিভিশন দিয়া চাহিদার সামান্যতমও মিটিতে পারে না। এখানে সড়ক ও বিল্ডিং নির্ম্মাণ ব্যতীত অন্যান্য জরুরী কাজও রহিয়াছে। উক্ত ডিপার্টমেন্টকে উপযুক্ত ভাবে কাজ করিতে হইলে একমাত্র সড়ক ও বিল্ডিং নির্ম্মাণের জন্যই আরও দুইটি ডিভিসন স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। ডিপার্টমেন্টের উপর কাজের অতিরিক্ত চাপ থাকায় সবক্ষেত্রেই উপযুক্ত কাজ যে হইতে পারে না তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইজন্য বোধ হয় মূলতঃ দায়ী সরকারের নীতি।"

পঞ্জাবে নূতন মন্ত্রীসভা

৯ই এপ্রিল শ্রীপ্রতাপ সিং কাইরনের নেতৃত্বে পঞ্জাবের মন্ত্রীমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রীমণ্ডলীতে আট জন মন্ত্রী এবং ছয় জন উপমন্ত্রী আছেন। একজন মন্ত্রী ও একজন উপমন্ত্রী সেদিন শপথ গ্রহণ করেন নাই। নূতন মাল্লত্ব গ্রহণের পর শ্রীকাইরন যে নীতিসম্পর্কিত বিবৃতি দিয়াছেন তাহা কয়েকটি দিক হইতেই উল্লেখযোগ্য। মন্ত্রীসভা দুর্নীতি দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং তিন বৎসরের মধ্যেই ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত অবৈতনিক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতের অপর কোন রাজ্যসরকার এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

কাইরন মন্ত্রীসভার নীতি ঘোষণায় বলা হইয়াছে:

"রাজ্যের শাসন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে দুর্নীতিমুক্ত করিয়া

পরিচালনা করা হইবে। আজ রাজ্যে যে দুর্নীতি রহিয়াছে তাহা মুক্ত করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। যাঁহারা অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ তাঁহাদের আমরা শাস্তি দিব এবং যাঁহারা সৎ ও কঠোর পরিশ্রমী তাঁহাদের উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিব। জেলা ও স্থান অনুযায়ী জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ মোচনের চেষ্টা আমরা করিব। জনসাধারণের সহিত কার্য্য করার সময় আমাদের অফিসাররা বিনয় ও সহানুভূতি দেখাইবেন।"

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সরকার দৃঢ় হস্তে বিশৃঙ্খলা দমন করিবেন এবং রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার জন্য যে আঞ্চলিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষভাবে রূপায়িত করা হইবে।

মন্ত্রীসভা ঘোষণা করিয়াছেন, "আমরা বিনা বেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়াইবার ও বাধ্যতামূলকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়াইবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিব। নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য আমরা আন্দোলন আরম্ভ করিব। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য বিধানের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করিব ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করিব।"

সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য এবং বন্যানিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষকদের যে শস্যহানি হয় তাহা হইতে তাহাদের রক্ষা ও শস্যের জন্য বীমা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হইবে। কৃষক, শ্রমিক এবং স্বল্পবিত্ত ব্যবসায়ীদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্যের জন্য সরকার সতত সচেষ্ট থাকিবেন। সর্ব্বোপরি সীমান্তবর্ত্তী রাজ্য হিসাবে ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে অভেদ্য করিয়া তুলিতে তাঁহারা শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত ঢালিয়া দিবেন।

শ্রীকাইরন বলেন, "আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতির প্রমাণ কার্য্যে দিতে পারিব বলিয়া আশা করি।"

শিক্ষায় দুর্নীতি

নিম্নের সংবাদটি প্রণিধানযোগ্য। আমরা শ্রীযুক্ত শ্রীমালীকে সমর্থন করিতেছি:

"লুধিয়ানা, ৬ই এপ্রিল—অদ্য এখানে পঞ্জাব শিক্ষক-সমিতির প্রথম শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের সহকারী মন্ত্রী ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী বলেন, যে সমস্ত দুর্নীতির ফলে শিক্ষকতার দুর্নাম হইয়াছে গৃহশিক্ষকতা ও ছাত্রদের জন্য তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ তাহার অন্যতম। তিনি বলেন, শিক্ষকগণ ক্লাশে ভালভাবে না পড়াইয়া ছাত্রদিগকে তাঁহাদের নিকট পৃথকভাবে পড়িতে উৎসাহিত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক রাজ্যেই নিয়মিত বেতন অপেক্ষা গৃহশিক্ষকতা করিয়া অনেক বেশী আয় করার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ডাঃ শ্রীমালী বলেন, এই ব্যাপারে দুর্নীতি এত বেশী যে, কোন কোন রাজ্যসরকার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারণের দায়িত্ব নিজেদের হাতে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কোন শিক্ষক-সমিতি শিক্ষকতার মর্য্যাদাহানিকর এই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করিয়াছেন বলিয়া তিনি জানেন না।

সহকারী মন্ত্রী বলেন, এই বৃত্তির মান উন্নয়ন ও যোগ্যতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার উপরই শিক্ষকতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

ডাঃ শ্রীমালী বলেন, এখনও শিক্ষকবৃত্তির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা কম বেতন দেওয়া হয়। অদূরভবিষ্যতে ইহা দূর করা হইবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থা

অষ্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরাতে সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া চুক্তি-সংস্থার এক অধিবেশন বসে। অধিবেশনের শেষে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতে সামরিক আক্রমণের ভয় এখন আর তেমন নাই। সিয়াটোর সংগঠনের সময়েই ভারত সরকার বলিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় এরূপ একটি সামরিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা নাই। বর্ত্তমানে সিয়াটোর বিবৃতিতে ভারত সরকারের সমালোচনার যাথার্থ্যই প্রমাণিত হইয়াছে। যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়াতে সামরিক আক্রমণের ভয় না থাকে তবে কাহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সিয়াটোকে এখনও জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে? সিয়াটো সম্মেলনের বিজ্ঞপ্তিতে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

কমিউনিজম প্রতিরোধের নামে এশিয়ার দেশগুলির রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করাই সিয়াটো গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য। সিয়াটোর এশীয় সদস্যগণ অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে উদ্ধারের আশায় ক্রমশঃই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের সেই আশা পূরণ করিতে পারিতেছে না। ফলে, সিয়াটোর এশীয় সদস্যদের মধ্যেও অসন্তোষের আভাস দেখা দিয়াছে।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবী

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জনসাধারণ বহুদিন যাবৎ আন্দোলন করিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের এই আন্দোলনের বিরোধিতা করিতে গিয়াই মূলতঃ পূর্ব্ব-পাকিস্থানে মুসলীম লীগ দলের পতন ঘটিল। লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও হক্ সাহেবের কৃষক-শ্রমিক দলের কর্ম্মসূচীর অন্যতম প্রধান দাবি ছিল পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য স্বায়ত্তশাসন এবং কেন্দ্রীয় পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে বাংলার ন্যায্য দাবি আদায়। সেই দাবিকে রূপ দিতে গিয়া হক্‌সাহেব গদিচ্যুত হন। হক্‌সাহেবের পদচ্যুতির পর হইতেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনীতিতে পুনরায় দুর্নীতি আত্মপ্রকাশ করে এবং স্বার্থান্বেষীদের মধ্যে সংঘাত বাধে। এই সুযোগে এবং পশ্চিম-পাকিস্থানের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাকে কাজে লাগাইয়া সুরাবর্দী সাহেব পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সুরাবর্দী যে আওয়ামী লীগের টিকিটে পাকিস্থান পার্লামেণ্টে গিয়াছেন সেই আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মসূচী পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্ত-শাসন আদায় করা।

গণ-আন্দোলনের চাপে এবং মৌলানা ভাসানীর নীতি-নির্ভর

নেতৃত্বের ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যেও আংশিক নৈতিক উন্নতি ঘটিল যাহার ফলে গত ৩রা এপ্রিল পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধান-পরিষদে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ সদস্য মহিউদ্দীন আহম্মদ কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটিতে বলা হইয়াছে, "এই বিধানসভার মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রের উপর ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার দানের জন্য পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকারের পক্ষে পাক-সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবি জানান সঙ্গত: (১) মুদ্রা, (২) পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এবং (৩) প্রতিরক্ষা।"

বিধানসভায় বিরোধীদলের শ্রীআবুহোসেন সরকারও প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন।

১৫০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত দুইটি অঞ্চলে সুষ্ঠু শাসনকার্য্য চালাইবার পক্ষে এইরূপ স্বায়ত্তশাসন যে কতদূর দরকারী তাহা বিবেচনা না করিয়া সুরাবর্দ্দী রাজ্যবিধানসভার প্রায় সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তকে একটি "চাল" বলিয়া অভিহিত করেন। পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী মীর গোলাম আলী খান তালপুর আর এক ডিগ্রী ছাড়াইয়া যান এবং বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব-পাকিস্থানের পৃথক হইয়া গিয়া পশ্চিমবঙ্গের (ভারতের) সহিত মিলনের প্রচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রও দেখিতে পাইয়াছেন।

সুরাবর্দ্দীর আস্ফালন

নিম্নে সুরাবর্দীর সংবাদ বিনা মন্তব্যে দেওয়া গেল:

"লাহোর, ১লা এপ্রিল—পাক প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ. এস. সুরাবর্দী আজ এখানে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা কাশ্মীর লইব অথবা মৃত্যুবরণ করিব।'

সুরাবর্দী বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতের নীতি সুস্পষ্ট নহে এবং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের অভিমত ব্যক্ত করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার নীতিও কখন সুস্পষ্ট থাকিতে পারে না।

জনাব সুরাবর্দী আজ সন্ধ্যায় এখানে এক ছাত্র সমাবেশে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

পশ্চিম পাকিস্থানে নিয়মতান্ত্রিক সরকার পুনর্গঠনের ন্যায় আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া জনাব সুরাবর্দী বলেন যে, এখানে আসিয়া তিনি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন, কিন্তু কি করা উচিত সে সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

পাক প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, বিভিন্ন শক্তি অথবা দল একত্র হইয়া সংবিধান বানচাল করার চেষ্টা করিলে তাহা সহ্য করা হইবে না। যদি কোন রাজনৈতিক দল সংবিধান বানচাল করার চেষ্টা করে তাহা হইলে উহাকে মুছিয়া ফেলা হইবে।

জনাব সুরাবর্দী বলেন, রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি সমর্থন জনসাধারণের নিকট হইতে আসিবে এবং জনসাধারণের ইচ্ছা ও অনিচ্ছার উপরেই মন্ত্রিত্বের অস্তিত্ব বা পতন নির্ভর করিবে।

তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্থানে প্রেসিডেণ্টের শাসন অবশ্যম্ভাবী, অবশ্য বাজেট অনুমোদনের জন্য ইহা প্রয়োজন।"

এশীয় দেশসমূহের সম্পর্কে পঠন-পাঠন

কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি নিজ ভবনটি মেরামত এবং পাঠাগারের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অর্থসাহায্য চাহিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাহায্য-দানে অস্বীকৃত হইয়াছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি বঙ্গের এবং ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে এক বিশেষ গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সোসাইটির বহুমূল্য প্রাচীন পুঁথিগুলি ঐতিহাসিক গবেষণায় বিশেষ সহায়তা করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে। কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে পুঁথিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। সোসাইটির ভবনটিও বহু পুরাতন—উহার আশু সংস্কার প্রয়োজন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সোসাইটিকে সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্য দিতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। সোসাইটির সভাপতি ড. সেন জানাইয়াছেন যে, উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নাকি উপদেশ দিয়াছেন পাঠাগারটির প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন না করিলেও চলিতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিরূপ আচরণে সকলেই বিস্মিত হইবেন: কত সামান্য কারণে সরকার অর্থব্যয় করিয়া থাকেন, অথচ এশিয়াটিক সোসাইটির ন্যায় এইরূপ একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে সরকার সাহায্যদানে অক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে বিস্মিত না হইয়া উপায় নাই!

এশিয়াটিক সোসাইটির আর একটি প্রস্তাব ছিল কলিকাতায় একটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পাঠকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। ব্রিটিশ আমলে ভারতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আইন ও অর্থনীতি পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। মাত্র সাত বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রাজনীতি শাখার উদ্বোধন হয়। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আইন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে বিশেষ গবেষণার কোন সুযোগ-সুবিধাই নাই। বস্তুতঃ দিল্লীতে নবপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান স্কুল অব ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টাডিজ (Indian School of International Studies), মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক ঘটনা-বলীসম্পর্কিত আলোচনাচক্র এবং পুণাতে অবস্থিত গোখেল ইনষ্টিটিউট অব পলিটিক্যাল সায়ান্স ব্যতীত আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনার আর কোন কেন্দ্রই ভারতে নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা ভারতের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ মারফত বিশ্বে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতকে সততই অবহিত থাকিতে হইতেছে।

এমতাবস্থায় ভারতে আন্তর্জাতিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় প্রসার হওয়া একান্ত কর্তব্য। উপরন্তু, এশিয়া ও আফ্রিকার নবগঠিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গতা হওয়ায় ইহাদের সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ করাও জরুরী প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। এশিয়ার দেশগুলি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং একদেশদর্শী। এক্ষেত্রে এই সকল বিষয়ে ভারতীয় পণ্ডিতগণকে আলোচনার সুযোগ না করিয়া দিতে পারিলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ব্যবস্থা করা সেজন্য অবশ্য প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার কি কারণে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করিলেন স্বভাবতঃই জনসাধারণ তাহা জানিতে চাহিবে।

পরমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা ও এশিয়া

সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই এশিয়াকে তাহাদের পরমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে বাছিয়া লইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিকিনি ও পরে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে পরীক্ষা চালাইয়াছে এবং বর্তমানে ব্রিটিশ সরকার ক্রিশ্চিয়ান দ্বীপপুঞ্জে নূতন করিয়া আণবিক অস্ত্র পরীক্ষার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের গণপ্রতিবাদ তাহাদিগকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জাপান সরকারী ভাবে ব্রিটেনের নিকট প্রস্তাবিত আণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে"র স্বার্থে ব্রিটিশ সরকার এই প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জাপান সরকার সোভিয়েট সরকারের নিকটও অনুরূপ এক প্রতিবাদ-লিপি পাঠাইয়াছেন। সোভিয়েট সরকার তাহার কি উত্তর দিয়াছেন জানা যায় নাই।

আণবিক বিস্ফোরণে যে ক্ষতি হইবার—মার্কিন অথবা সোভিয়েট যে রাষ্ট্রই বিস্ফোরণ ঘটাক না কেন তাহাতে ক্ষতি সমানই হইবে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েটের পরমাণবিক বিস্ফোরণ সম্পর্কে কেহ কিছু বলেন নাই। জাপান সরকারীভাবে একই সময় ব্রিটেন এবং সোভিয়েট সরকারের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া যে নৈতিক বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়াছে তাহা সর্বাংশে প্রশংসার্হ। কিন্তু একথাও ভুলিলে চলিবে না যে, আজ পর্যন্ত যে পরমাণবিক অস্ত্র-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব তাহার বৃহত্তর দায়িত্ব পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর। বর্তমান বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে কোন দেশেই পরমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণের সংবাদ আর গোপন রাখা সম্ভব নহে। যদি পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিতেন তবে কথামত সোভিয়েট ইউনিয়নও তাহার পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দিত। এইরূপ আন্তর্জাতিক চুক্তির পরও যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন পরমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ করিত তবে তাহা নিশ্চয়ই ধরা পড়িত এবং তখন সোভিয়েটের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি সম্পর্কে পশ্চিমী জোট যে সকল কথা বলিয়া থাকেন তাহা প্রমাণের সুযোগ তাঁহারা পাইতেন। কিন্তু তাঁহারা সে পথে না গিয়া নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র বৃদ্ধি করিতেছেন এবং সোভিয়েটের চতুর্দিকে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া যাইতেছেন। ইহাকে যদি সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রমণাত্মক মনোভাব বলিয়া ধরিয়া লয় তাহাতে দোষ ধরা যায় না। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহও অনুরূপ মনোভাব পোষণ করে।

বিভান ও ভারতীয় রাজনীতি

ব্রিটেনের শ্রমিক দলের বামপন্থী নেতা মিঃ অ্যানুরিন বিভান সম্প্রতি ভারত সফর করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতের কমনওয়েল্থ সম্পর্ক, কাশ্মীর এবং কেরল সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ বিভান ভারতকে কমনওয়েল্থ ছাড়িয়া না আসিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। শ্রীনগরে ভারতকে সমর্থন করিয়া কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে মিঃ বিভান যে বক্তৃতা দেন "সত্যবাদী" এবং "স্বাধীনতার পূজারী" ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন বোধ করে নাই।

"যুগান্তরে"র লণ্ডনস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীসুনন্দ কাবাদী লিখিতেছেন, "ব্রিটিশ পত্রিকাগুলিতে মিঃ বিভানের বক্তৃতা এই ভাবে চাপিয়া যাওয়ার একটি কারণ হইতেছে এই যে, রয়টার প্রভৃতি সংবাদ-পরিবেশক এজেন্সীগুলির সহিত একযোগে এই পত্রিকাগুলি মিঃ বিভানের বক্তৃতার উপর স্বেচ্ছায় সেন্সর ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছে। কারণ শ্রীনগরে মিঃ বিভান যাহা বলিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ পররাষ্ট্রদপ্তর ও পাকিস্থান সরকারের অপছন্দ হইতে বাধ্য।"

কেবলমাত্র লণ্ডনের "টাইমস" পত্রিকা এবং ব্রিটিশ ব্রডকাষ্ট কর্পোরেশন (বি. বি. সি) মিঃ বিভানের বক্তৃতার উল্লেখ করেন।

ভারতের পররাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপার সম্পর্কে বিভান মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা ভারতের বিপক্ষে হইলেও কাহারও বলিবার কিছু থাকে না। কাশ্মীর সম্পর্কে তিনি কাশ্মীরের জনসাধারণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দান করিয়া ভারতের নীতিকে সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে তিনি প্রশংসার্হ।

কিন্তু কেরল সম্পর্কে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাকে সেরূপ প্রশংসার্হ বলা চলে না। অবশ্য এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরেই তিনি তাহার মন্তব্য করেন, কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। ভারতে নবনিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাঙ্কারকে যখন কেরল সরকার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি কোন কথা বলিতে অস্বীকার করেন। বিভানের বক্তৃতা হইতে ভারতের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সম্পর্কে তাঁহার অজ্ঞতারই প্রমাণ মিলিয়াছে। তিনি কেরলে দ্বিতীয় বার নির্বাচন হইবে কি না তাহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের নির্বাচন-পরিচালন প্রণালী সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকিলে তিনি ঐরূপ মন্তব্য করিতেন না। নির্বাচনের ব্যাপার কোন রাজ্য সরকারের হাতে নাই—রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইলেকশন কমিশনের হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নির্দেশ অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতাই কোন রাজ্য সরকারের নাই—কেরল সরকারেরও নাই। বিভানের ন্যায় ব্যক্তির মুখের এই অসতর্ক উক্তি বিদেশে ভারতের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে—সেজন্যই ইহার প্রতিবাদ আবশ্যক।

গীতা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিদ্যাবাচস্পতি

প্রথমে গীতা সম্বন্ধে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের মত উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "যাহা আমরা ভগবদ্‌গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণপ্রণীত নহে। উহা ব্যাসপ্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহাই আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।" (কৃষ্ণচরিত্র, নবম পরিচ্ছেদ।)

দার্শনিক পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্তও অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,"গীতাও স্থানে স্থানে পরিবর্তিত এবং নূতন শ্লোক-সংযোজন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। (গীতায় ঈশ্বরবাদ—পৃঃ ২০২)।

বিষ্ণুপুরাণ মতে মহাভারতের যুদ্ধের সময় ১৪৩০ খ্রীঃপূঃ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা সমর্থন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তিনি ভারতযুদ্ধের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। বর্তমান গীতার রচনা যে বহুকাল পরবর্ত্তী, তাহা গীতার ভাষা ও ছন্দ হইতে পরিস্ফুট। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত গীতা—গীতার প্রাচীনতম সংস্করণ গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান গীতা মহাভারতের গীতা হইতেও রূপান্তরিত হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বলা হইয়াছে যে, গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। কিন্তু প্রচলিত গীতায় শ্লোকসংখ্যা ৭০০। এই প্রচলিত গীতারও পাঠান্তর আছে। আমি একটি গুরুতর পাঠান্তরের বিষয় গত ভাদ্র সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

বলা বাহুল্য, মহাভারতের অন্তর্গত গীতাতেও মহাভারতের ন্যায় নানা প্রক্ষেপ ও পাঠপরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে। এক্ষণে আদিমগীতা (Proto Gita) আবিষ্কার অনেকটা অনুমানসাপেক্ষ হইয়াছে। কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। গীতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে:

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।"

যখন গীতার মূল উৎস উপনিষদ, তখন উপনিষদের কষ্টিপাথরে গীতার প্রাচীন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যাইবে। অবশ্য আদিমগীতা উপনিষদের পরবর্ত্তী, কিন্তু পুরাণের বহু পূর্ববর্ত্তী। "শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা" প্রবন্ধের (মাঘ, ১৩৬৩) বিজ্ঞ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে, "বেদে বা উপনিষদে অবতারের কথা নাই।...অবতারবাদ পুরাণের কথা"। বেদান্তদর্শনকে আদিমগীতার সমসাময়িক কিংবা কিঞ্চিৎ পূর্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এই বেদান্তদর্শনেও অবতারবাদের কোনও ইঙ্গিত বা আভাস নাই। ইহা শাস্ত্রবিদ্‌ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অভিমত (গীতায় ঈশ্বরবাদ, পৃঃ ২১১)। সুতরাং প্রচলিত গীতায় অবতারবাদ দেখিয়া আমাদের সন্দেহ হয় যে, ইহা আদিমগীতার শিক্ষা, নহে, প্রচলিত গীতায় ইহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। পূর্বোক্ত 'শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা' প্রবন্ধের মাননীয় লেখকও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত আলোচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে কালানুযায়ী তিনটি স্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তিদ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পাদন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।...তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পুরিয়া দিয়াছে। শান্তিপর্ব ও অনুশাসনিকপর্বের অধিকাংশ ভীষ্মপর্বের শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পর্বাধ্যায়, বনপর্বের মার্কণ্ডেয় সমস্যা পর্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্বের প্রজাগর পর্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়।" (কৃষ্ণচরিত্র, ১১শ পরিচ্ছেদ)।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন, "এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না। কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষ শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই বা এমন কোনও আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইতে

পারে। বরং একস্থানে তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, 'আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।' " (কৃষ্ণচরিত্র, ৫ম পরিচ্ছেদ।)

সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের অবতারবাদ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত এই যে—"মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে ; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারতত্ত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে ; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার একথাও আছে যে, অবতার অসংখ্যেয়।" (বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, চতুর্থ অধ্যায়।)

এ পর্যন্ত আমার শ্রদ্ধেয় পূর্বগামীদের মত উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে আমার যুক্তি নিবেদন করিতেছি। "শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা" প্রবন্ধের পূর্বোক্ত লেখকের মতে "শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সখা অর্জুনও বিশ্বরূপ দর্শনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলিয়া জানিতেন না। বিশ্বরূপ দর্শনের পর জানিতে" পারেন। কিন্তু আমি প্রমাণ করিব যে, এই বিশ্বরূপ দর্শন পৌরাণিক যুগের একটি মতবাদ, যাহা আদিমগীতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভাগবতপুরাণে বালককৃষ্ণের দুইবার বিশ্বরূপ প্রদর্শনের বৃত্তান্ত আছে। এই বৃত্তান্ত দুটি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি :

১। "মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভর মূর্তি ধারণ এবং স্বীয় ব্যাদিতানন মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথমে ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।"

২। "কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেকথা অস্বীকার করায় যশোদা তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

এই জনপ্রিয় উপন্যাস মহাভারতের ভগবদ্যান-বৃত্তান্তে এবং গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমি এখানে অশেষ শাস্ত্রপারদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"এ পর্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যান-বৃত্তান্ত সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক, কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রাকৃত কিছুই নাই ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ডূয়ননিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতিগোষ্ঠী ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহারা কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপ প্রদর্শন বর্ণিত আছে।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৭ম পরিচ্ছেদ)।

ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ প্রদর্শন যতই কবিত্বপূর্ণ ও চমৎকার হউক না, তাহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা বিচার করিলেই বুঝা যায়। প্রচলিত গীতায় অর্জুনের উক্তি ৮৪টি শ্লোক। কিন্তু মহাভারতের ভীষ্মপর্বে বলা হইয়াছে যে, অর্জুনের উক্তি ৫৭টি শ্লোক। তাহা হইলে আধুনিক গীতায় অর্জুনের উক্তির ২৭টি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। গীতার একাদশ অধ্যায়ে (যাহাতে বিশ্বরূপ প্রদর্শন বর্ণিত) ৫৫টি শ্লোক আছে, ইহার মধ্যে অর্জুনের উক্তি ৩৩টি শ্লোক। এই ৩৩টি শ্লোক হইতে ২৭টি বাদ দিলে বিশ্বরূপ প্রদর্শন বাদ পড়িয়া যায়। এই অধ্যায়ে মাত্র ছয়টি শ্লোক অর্জুনের খাঁটি উক্তি। এইগুলি ১, ২, ৩৬, ৪১, ৪২, ৫১। এই বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মধ্যে অসঙ্গতিও আছে। অর্জুনের উক্তিতে বলা হইয়াছে—

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি
ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে।৪৬

অর্থাৎ, আমি পূর্বে তোমার যে রূপ দেখিয়াছি, সেইরূপই কিরীটযুক্ত, গদাধারী চক্রহস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি। হে সহস্রবাহু। হে বিশ্বমূর্তি ! এক্ষণে সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতে আবির্ভূত হও।

পূর্বে যে কখনও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখিয়াছেন, তাহা আদিস্তরের মহাভারতের কোথাও বর্ণিত হয় নাই। তার পর অর্জুনের উক্তিতে ৫১শ শ্লোকে (যাহা খাঁটি) বলা হইয়াছে—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥

অর্থাৎ, হে জনার্দন, তোমার এই সৌম্য মানুষরূপ দেখিয়া ইদানীং আমি সচেতন এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম।

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই কিরীট-গদা-চক্রধারী চতুর্ভুজ মূর্তি কি সৌম্য মানুষমূর্তি ?

মহাভারতের শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে আমরা দেখি যে, শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম কর্তৃক ঈশ্বর রূপে অভিহিত হইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্তী লেখকের অনেক হাত আছে।" (কৃষ্ণচরিত্র, ৯ম পরিচ্ছেদ)। এখানে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব খ্যাপনে এই দ্বিতীয় বা অন্য পরবর্তী স্তরের লেখকেরই কীর্তি—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব—যাহা মহাভারতের স্থানে স্থানে, গীতার একাদশ অধ্যায়ে ও অন্য কতক শ্লোকে দেখা যায়, তাহা বেদ, উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রে অজ্ঞাত এবং মহাভারতে ও গীতায় প্রক্ষিপ্ত ইহা আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রেরও ইহা অভিমত। আমি মনে করি যে, ঈশ্বরবাদের পূর্বে অবতারবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। আমি আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৬৩) মহাভারত, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, বলরামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও একজন অংশ অবতার ; এই মত এক সময়ে স্বীকৃত হইয়াছিল। গীতার অভিনব-গুপ্তধৃত পাঠান্তর "আত্মাংশং" (প্রচলিত পাঠ আত্মানং)—সেই অংশ-অবতারবাদই সূচিত করিতেছে। "শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা" প্রবন্ধের পূর্বোক্ত লেখক "আত্মানং" এবং "আত্মাংশং" এই দুই পাঠে কোনও অর্থগত ভেদ বিবেচনা করেন না। তিনি তাঁহার সমর্থনে "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" এই আপ্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বচন বৃহদারণ্যক উপনিষদের আরম্ভে ও অন্যান্য উপনিষদে আছে। ইহা যজুঃ শান্তিমন্ত্র। ইহার পূর্ব্ব শ্লোকার্থ "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।" উপনিষদের কোনও স্থানে অবতারবাদের আভাসও নাই। সুতরাং ইহা অবতারবাদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। পণ্ডিত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইহার ভাবার্থে বলেন, "তিনি পূর্ণ পূর্ণ সম্পূর্ণ—তাঁহার কোনকিছু ত্রুটী-অভাব নাই" (উপনিষদ্-ব্রহ্মতত্ত্ব, পৃঃ ২০১)। অভিনবগুপ্ত আত্মাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—

"ভগবান্ কিল পূর্ণষাড়্গুণ্যত্বাচ্ছরীর সম্পর্কমাত্ররহিতোঽপি স্থিতিকারিত্বাৎ কারুণিকতয়াত্মাংশং সৃজতি। আত্মা পূর্ণষাড়্গুণ্যঃ অংশ উপকারত্বেন প্রধানভূতো যত্র তদাত্মাংশং শরীরং গৃহ্নাতি ইত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, নিশ্চয় ভগবান্ পূর্ণষড়্গুণবিশিষ্ট হওয়ার কারণে শরীর সম্পর্করহিত হইলেও কারুণিকতাবশতঃ আত্মাংশ সৃজন করেন। আত্মা পূর্ণষড়্গুণবিশিষ্ট, অংশ উপকার হেতু প্রকৃতি হয়। যাহাতে তাঁহার আত্মাংশ শরীর গ্রহণ করে—এই অর্থ।

ইহা সুস্পষ্ট যে "আত্মানং" শব্দ দ্বারা পূর্ণাবতার এবং "আত্মাংশং" শব্দ দ্বারা অংশাবতার বুঝায়। ইহাই মহাভারতের আদিপর্বে (৬৭।৭১) পরিষ্কাররূপে কথিত হইয়াছে।—

যস্তু নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো মানুষেষ্বাসীদ্ বাসুদেবঃ প্রতাপবান্॥

অর্থাৎ, যিনি নারায়ণ নামে সনাতন দেবদেব প্রতাপশালী বাসুদেব, মনুষ্যগণের মধ্যে তাঁহার অংশ ছিলেন। শান্তিপর্বের মোক্ষধর্ম পর্বাধ্যায়ে (৩৪০ অধ্যায়) উক্ত হইয়াছে—

"আমি (নারায়ণ) হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী এই দশরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।)

পূর্ণাবতার এবং অংশাবতারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ, জলপাত্র মধ্যে সূর্যের পূর্ণভাবে অবস্থান ও তাহার প্রতিবিম্বের মধ্যে যেমনই প্রভেদ। জলপাত্রের মধ্যে গোটা সূর্যের অবস্থান যেমন অসম্ভব, মানবদেহ মধ্যে পূর্ণ ভগবানের অস্তিত্বও সেইরূপ অসম্ভব। কেহ বলিতে পারেন, যিনি সর্বশক্তিমান্ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। তবে আমি বলিব, ঈশ্বরের পক্ষে পরদারধর্ষণ, চৌর্য্য, মিথ্যাকথন এ সকলও কি সম্ভব ? ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, কিন্তু তিনি বেদ ও উপনিষদ্ মতে বিশ্বাত্মা অথচ বিশ্বাতিগ, বিরাট্, অশরীর অপাণিপাদ, অজ, অমর, নিত্য, পরমজ্যোতি, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। সুতরাং যেমন ঈশ্বর নিজেকে ধ্বংস করিতে পারেন না, সেইরূপ তিনি জন্মমৃত্যুশীল মানবে পরিণত হইতে পারেন না, কোনও পাপকর্ম করিতে পারেন না। তিনি সর্বশক্তিমান্ এই অর্থে যে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহা করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ কোনও ইচ্ছা করেন না। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন, পরম সাধু ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ন্যায় মিথ্যাকথনে সমর্থ হইলেও, কখনও মিথ্যা বলেন না। ইহাতে তাঁহার অক্ষমতা বোঝায় না, ইহাতে তাঁহার পরম সাধুতাই বোঝায়।

গীতাতে (১৫।৭) উক্ত হইয়াছে—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। অর্থাৎ, আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে অবস্থিত। (এইরূপ মতবাদ উপনিষদেও পাওয়া যায়।)

ইহার বাহ্যার্থে সাধু-অসাধু, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সবল-দুর্বল সকল জীবই ঈশ্বরের অংশ। তখন শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার হওয়ার গৌরব কোথায় ? গীতায় (১০।৪১) উক্ত হইয়াছে—

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশ সম্ভবম্॥

অর্থাৎ, যাহা কিছু বিভূতিবিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত সত্ত্ব, সে সমস্তকেই তুমি আমার তেজের অংশ হইতে সম্ভূত বলিয়া জান।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মানুষ; কিন্তু বিভূতিবিশিষ্ট, শ্রীযুক্ত, ওজোযুক্ত সত্ত্ব। এই জন্য তাঁহার গৌরব। ইহার দৃষ্টান্ত সূর্যকিরণ সর্ব পদার্থে পতিত হয়, কিন্তু দর্পণতুল্য স্বচ্ছ পদার্থ ভিন্ন অন্যত্র প্রতিবিম্বিত হয় না।

এখানে বলা কর্তব্য যে, কোনও কোনও উপনিষদে জীবকে পরমব্রহ্মের অংশ বলিলেও উভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিয়াছে। বেদান্ত-দর্শনে এই মত সমর্থিত হইয়াছে:—

"অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ।" ২।১।২২

অর্থাৎ, ব্রহ্ম জীব হইতে অধিক, যেহেতু শ্রুতি উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দেশ করিয়াছেন।

জীব-ব্রহ্মের ঐক্যের ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা কি ফল হইয়াছে, তাহা আমি দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলি, "অজ্ঞ দুর্বল দুঃখক্লিষ্ট পাপবিদ্ধ জীব, শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্বজ্ঞ নির্মল সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত আপনাকে তুলিত করিয়াছে। তাহার ফলে, সমাজে নানা অনিষ্টের উপদ্রব ঘটিয়াছে। কর্মহীনতা, কঠোরতা, দাম্ভিকতা, আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতা, অনধিকারীর সংসারবিমুখতা এই বীজেরই ফলবান বৃক্ষ।" (গীতায় ঈশ্বরবাদ, পৃঃ ২৩৬)। ইহার পাদটীকায় তিনি বলেন, "ইহার একটি চরম দৃষ্টান্ত একজন সংস্কৃত কবি রঙ্গচ্ছলে বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, একজন স্বৈরিণীকে প্রতিবেশিনীরা গঞ্জনা দিলে সে অদ্বৈত মতের দোহাই দিয়া উত্তর দিয়াছিল যে, পতিতে ও উপপতিতে যখন একই ব্রহ্ম বিরাজিত, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদজ্ঞান করা নিতান্তই মূঢ়তার কার্য।" সুবিজ্ঞ হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই মন্তব্য বিজ্ঞ চিকিৎসকের অস্ত্রোপচার দ্বারা বিষাক্ত ক্ষতের দুর্গন্ধ পুঁজ নিঃসারণ স্বরূপ মনে করিতে হইবে।

মহাভারত ও গীতায় যাহা অংশাবতার, তাহাই বেদের ঋষিবাদ। "ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ।" ঋষিগণ ঐশীবাণী দর্শন করেন। ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥" ৮।৮

অর্থাৎ, হে পার্থ! অভ্যাসরূপ উদ্যোগ দ্বারা অনন্য চিত্তে বারংবার চিন্তা করিতে করিতে দিব্য পরমপুরুষকে পাওয়া যায়।

বেদান্ত-দর্শনেও এই মত প্রচারিত হইয়াছে—

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।" ৩।২।২৪

শঙ্করভাষ্যানুযায়ী ইহার অর্থ—"যোগীরা সংরাধনকালে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। সংরাধন অর্থে ভক্তি, ধ্যান, প্রণিধানাদির অনুষ্ঠান।" (গীতায় ঈশ্বরবাদ, পৃঃ ৩১১)।

এই বিষয়ে মুণ্ডক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি
নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ পরাৎপরং
পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥"৩।২।৮

অর্থাৎ, যেমন নদীসকল প্রবাহিত হইয়া নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সেইরূপ বিদ্বান্ (ব্রহ্মজ্ঞানী) নামরূপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন।

এইরূপ সাধককে বেদান্তে মুক্তপুরুষ বলা হইয়াছে। মুক্তপুরুষ কতক ঐশ্বরিক গুণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশে তাঁহার কোনও কর্তৃত্ব থাকে না। তাই বলা হইয়াছে—

"জগদ্ব্যাপারবর্জম্" ।৪।৪।১৭

মুহম্মদীয় শাস্ত্রেও অনুরূপ মত দৃষ্ট হয়। যথা—বুখারীর হদীস গ্রন্থে আল্লাহের উক্তি—"আমার দাস অতিরিক্ত সাধনা দ্বারা আমার নিকটবর্তী হইতে থাকে, এ পর্যন্ত যে আমি তাহাকে প্রেম করি। তখন আমি তাহার শ্রবণশক্তি হই, যাহাদ্বারা সে শোনে; আমি তাহার দৃষ্টিশক্তি হই, যাহাদ্বারা সে দেখে; আমি তাহার হাত হইয়া যাই, যাহাদ্বারা সে ধরে; আমি তাহার পা হইয়া যাই, যাহাদ্বারা সে চলে। সে যাহা চায়, নিশ্চয় আমি তাহাকে দিই।"

সুতরাং এইরূপ সিদ্ধ সাধকগণের দ্বারা অলৌকিক কার্য (miracle) অসম্ভব নহে। তবে তাহার প্রতি বিশ্বাসের জন্য উপযুক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ আবশ্যক।

"There are more things in heaven and earth Horatio, than are dreamt of in your philosophy.'

কেবল সাধনাদ্বারা কেহ এই ঋষি বা মুক্তপুরুষের পদ পাইতে পারে না। তজ্জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের অনুকম্পা (grace, আরবী ফযল)। শ্রুতি বলেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া
ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে স তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা
বিবৃণুতে তনূং স্বামিতি॥"
(কঠ, ১।২।২২)

অর্থাৎ, এই পরমাত্মা প্রবচন, বুদ্ধি বা বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহে; ইনি যাহাকে বরণ করেন তাহাদ্বারাই

তিনি লভ্য। তাহাকেই এই পরমাত্মা আপন স্বরূপ বিবৃত করেন।

উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণকে আঙ্গিরস ঘোর ঋষির শিষ্য রূপে দেখা যায়। মহাভারতের বহুস্থানে পাওয়া যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ ঋষিরূপে বদরিকাশ্রমে এবং অন্যান্য তীর্থে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি অবশ্য সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অর্জুনের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গীতা প্রচার করেন।

আমি এক্ষণে মহাভারতের কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ আমার উক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করিতেছি :

"আমি (বাসুদেব) কোন কারণবশতঃ ধর্মের ঔরসে দুই মূর্তিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নর ও নারায়ণ রূপে প্রখ্যাত হইয়া গন্ধমাদন পর্বতের ধর্মযানে আরোহণপূর্বক তপস্যা করিয়াছিলাম।"

(শান্তিপর্ব, মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়, ৩৪৩ অধ্যায়)

"এই বাসুদেব ও অর্জুনকে তুমি কখনই পরাজয় করিতে পারিবে না ; ইঁহারা পূর্বে নর ও নারায়ণ নামে সুরপুরে বিখ্যাত ছিলেন।"

(আদিপর্ব, খাণ্ডবদাহনপর্বাধ্যায়, ২৮৮শ অধ্যায়)

"হে কৃষ্ণ! পূর্বে তুমি যত্র-সায়ং-গৃহ মুনি হইয়া দশ সহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করিয়াছিলে। তুমি পুষ্করতীর্থে কেবল জলপান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলে। তুমি অতিবিস্তৃত বদরিকাশ্রমে ঊর্ধ্ববাহু হইয়া বায়ুভক্ষণপূর্বক শত বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। তুমি সরস্বতী-তীরে উত্তরীয় বস্ত্রবিবর্জিত, শীর্ণ ও শিরাব্যাপ্ত-শরীর হইয়া দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলে। তুমি সাধুজনসেব্য প্রভাসতীর্থে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দেবপরিমিত দশ সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে।"

(বনপর্ব, অর্জুনাভিগমনপর্বাধ্যায়, ১২শ অধ্যায়)

"সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে নর ও নারায়ণ উভয়েই বদরিকা আশ্রমে গমনপূর্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন।... তখন তপোধনাগ্রগণ্য নারদ নর ও নারায়ণের সমীপে উপবেশন করিয়া যাহার পর নাই প্রীত হইয়া মহাত্মা নারায়ণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,...কিন্তু তুমি আজি কোন্ দেবতা ও কোন্ পিতৃলোকের আরাধনা করিতেছ ? তখন ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে!...যিনি সূক্ষ্ম, অবিজ্ঞেয়, কার্যবিহীন, অচল, নিত্য এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্বভূত হইতে অতীত, পণ্ডিতেরা যাঁহাকে সর্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দেশ করেন, যাঁহা হইতে সত্ত্বাদি গুণ-ত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্তভাবে অবস্থানপূর্বক প্রকৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, সেই পরমাত্মাই আমাদের উৎপত্তির কারণ। আমরা সেই পরমাত্মাকেই পিতা ও দেবতা জ্ঞান করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছি ; তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পিতা, দেবতা ও ব্রাহ্মণ কেহই নাই। তিনি আমাদের আত্মাস্বরূপ।" (শান্তি-পর্ব। মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়, ৩৩৫ অধ্যায়)

"মহাত্মা বাসুদেব বদরিকাশ্রমে সহস্র বৎসর কেবল সেই সনাতন মহাদেবের আরাধনা করিয়াই তাঁহার প্রসাদে জগদ্-ব্যাপ্ত ও সর্বভূতের প্রিয়তম হইয়াছেন।" (অনুশাসনপর্ব, ১২শ অধ্যায়)

"আমি (বাসুদেব) ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়া মহাদেবকে পরিতুষ্ট করাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিয়াছেন, বৎস! তুমি অর্থ অপেক্ষা লোকের প্রিয়, যুদ্ধে অপরাজিত ও অনলতুল্য তেজস্বী হইবে। আমি পূর্বাবতারে মণিসন্ধ পর্বতে বহু সহস্র বৎসর ঐ দেবদেবের আরাধনা করিয়াছিলাম। পরিশেষে, তিনি আমার ভক্তিভাবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া একদা আমাকে আত্মপ্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন আমি কহিলাম, ভগবন্! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন অনন্তকাল আপনার প্রতি অচলা ভক্তি থাকে। তিনি 'তথাস্তু' বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।" (অনুশাসনপর্ব, ১৮শ অধ্যায়)

তিনি যে যোগযুক্ত হইয়া গীতা উচ্চারণ করেন, তাহা মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্বের ১৬শ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে (ইহা আমার পূর্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি)। সুতরাং আদিমগীতায় যে পরমাত্মবোধক অহং, মাং (আমি, আমাকে) ইত্যাদি উত্তম পুরুষ সর্বনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা ঈশ্বরকেই বুঝাইবে, শ্রীকৃষ্ণকে নয়। ইহা বেদান্ত-দর্শনের ১।১।২৯, ৩০ সূত্রদ্বয় দ্বারা সমর্থিত হয় (লেখকের পূর্ব প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

সুতরাং আদিমগীতা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ মানুষ অথচ ঋষি বা মুক্ত পুরুষ। পরে মহাভারত ও গীতায় তাঁহাকে অংশাবতার বলা হইয়াছিল। কিন্তু পরের স্তরে তাঁহাকে অবতার না বলিয়া অবতারী বা স্বয়ং নররূপী পূর্ণ পরমেশ্বর করা হইয়াছে। তাই ভাগবত-পুরাণে অন্যান্য অবতার হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিবার জন্য বলা হইয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।"

অর্থাৎ এই সকল পুরুষ (অবতার সকল) অংশকলা-বিশিষ্ট ; কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

মহাভারতে পরমেশ্বর অর্থে—বাসুদেবের অর্থ বসুদেবের অপত্য না বুঝাইয়া তাহার অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

"বাসু শব্দের অর্থ নিবাস ও দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। আমি (=নারায়ণ) সূর্যস্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎ-সংসার প্রকাশিত করি এবং সমুদায় জীব আমাতেই বাস করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমার নাম বাসুদেব।" (শান্তি-পর্ব, মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়, ৩৪২ অঃ)

মহাভারতের বহু স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ঋষি নারায়ণ ও নররূপে এক পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, তাহাতে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে—মহাভারতের একস্তরে উভয়কেই অবতাররূপে গণ্য করা হইত। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে "বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্" (৪।৩।৯৮) সূত্রেও এই উভয়কে এক সঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে বোঝা যায় যে, পাণিনির সময়ের পূর্ব হইতেই উভয়ে পূজিত হইতেন। মনে করা যায় যে, পরবর্তী কালে বলরামকে অর্জুনের স্থানে অবতাররূপে গ্রহণ করা হয়। মহাভারত রচনার বহু পরে পুরাণে বুদ্ধকে শ্রীকৃষ্ণের স্থানে অবতাররূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।

যাঁহারা মনুষ্যকে পরমেশ্বর মনে করে, তাঁহারা বস্তুতঃ পরমাত্মাতত্ত্ব জানে না। তাহাদের সম্বন্ধে উপনিষদে "আত্মহা" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা ঈশোপনিষদে—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে আত্মহনোজনাঃ॥

অর্থাৎ, যাহারা আত্মাকে হত্যা করে, তাহারা মৃত্যু অন্তে অন্ধতম দ্বারা আবৃত অসূর্য নামক লোকসমূহে গমন করে।

আমার নিকট শ্রীকৃষ্ণের দুইটি বাণী অমূল্য। একটি নিষ্কাম কর্মবাদ, অন্যটি ভক্তিবাদ।

(১) কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফল হেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥২।৪৭

অর্থাৎ, কর্মেই তোমার অধিকার, কদাচ কর্মফলে নয়। তুমি কর্মফলের হেতু হইও না, অথচ অকর্মেও যেন তোমার আসক্তি না থাকে।

(২) মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্ যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৯।৩৪

অর্থাৎ, আমাতে (=ঈশ্বরে) নিবিষ্টমনাঃ হও, আমার ভক্ত হও, আমার পূজক হও, আমাকে প্রণাম কর। এইরূপে মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে নিজকে যুক্ত করিলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।

শুভ নববর্ষ ১৩৬৪

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

শুভ নববর্ষ এসো, আনন্দ সুন্দর,
কর দেশ, জীব, জাতি পুণ্য পুণ্যতর
দেবতারা হোক পুনঃ নরের আত্মীয়
ভুবন ও ভগবানে এক করে দিও।
সুদূরের আকাঙ্ক্ষিতে আন সন্নিকটে,
উছলি উঠুক সুধা ও মঙ্গল ঘটে।

এসো শিব, সুমঙ্গল এসো শুভঙ্কর,
কর শুচি, নিষ্কলুষ মানব-অন্তর।
তপঃক্লিষ্ট এ ভারতে কর সমর্পণ—
শত শতাব্দীর কৃচ্ছ্র তপস্যার ধন।
ধুয়ে মুছে দাও তুমি যুগান্তের মসী
জন্মভূমি স্বর্গ-চেয়ে হোক গরীয়সী।

নাশো শত্রু দাও রূপ, দাও যশ জয়—
মোদের পার্থিব রজঃ হোক মধুময়।

পয়ঃকুম্ভ বিষমুখ

শ্রীসুনীলকুমার চক্রবর্ত্তী

হবে না, হবে না করে অবশেষে বাড়ীটা তৈরী শেষ হ'ল। কত বাধা, কত বিপত্তি! বাব্বাঃ! উৎপল ত ভেঙেই পড়েছিল। দু-দু'বার করে কন্ট্রোলের সিমেণ্ট বেরুল, দু'বারই গেল লোকসান হয়ে, একবার হ'ল চুরি, একবার গেল জমে। তার পর হঠাৎ উৎপল গেল বদলী হয়ে, বছরখানেকের জন্য মাদ্রাজ। এত সবও কোনমতে উৎরে ওঠা গিয়েছিল, কিন্তু বাড়ীটা যে সময় তৈরি করা আরম্ভ হবে হবে তখন কোথা থেকে জমির এক ওয়ারিশান গজিয়ে উঠে দিল মামলা রুজু করে। যাঁর কাছ থেকে জমিটা কেনা হয়েছিল তখন তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। তিনি তখন কাশী না কোথায় বেমালুম হাওয়া কেটেছেন। সেই মামলা মিটতে প্রায় বছরদেড়েকের ধাক্কা।

অগত্যা উপালী একরকম নিরুপায় হয়েই বলল—"থাক বাপু, আর বাড়ী করে কাজ নেই, দাও জমিটা বেচে।"

উৎপলও ক'দিন ধরে এই কথাটাই ভাবছিল, কিন্তু বলতে পারছিল না উপালীকে সাহস করে। কারণ উপালীর আগ্রহাতিশয্যেই বাড়ীখানা করছিল উৎপল।

উপালীর বাড়ী সাজাবার সখ খুব। কিন্তু ভাড়াটে বাড়ীতে থেকে তা মেটে না। যতই সাজাক, যতই গোছাক, মনটা থাকে খুঁতখুঁতে। শত হলেও পরের বাড়ী। আপন বোধ আসে না। তাই মনে শান্তিও পাওয়া যায় না।

বছর দুই ধরেই তাগিদ দিচ্ছিল উৎপলকে উপালী। উৎপল 'করি' 'করছি' বলে কেবলই পাশ কাটাচ্ছিল। শেষ পর্য্যন্ত উপালী চিঠি লিখে লিখে দেওর বিপুলকে ছুটি নিয়ে আসতে বাধ্য করল বোম্বাই থেকে। তার পর বৌদির প্রেরণা ও ঠাকুরপোর কর্ম্মতৎপরতার যোগফল এই জমিখণ্ড, এবং দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর বহু ঝড়-ঝাপ্‌টার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর এই ইমারতটি খাড়া হ'ল।

দিনকতক বাড়ী সাজানোয় মেতে রইল উপালী। এটা-সেটার ফরমাশে হাঁপিয়ে ওঠে উৎপল। রাজ্যের জিনিস কিনে সাজাচ্ছে উপালী। সময় তার মোটে নেই, কোলের ছেলেটার ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে যেটুকু সময় ব্যয় হয়, তখনও সে মনে মনে প্ল্যান আঁটে। আজ যেভাবে ঘর সাজানো হ'ল কাল তা পালটে গেল। আপিসে যাবার সময় ব্র্যাকেটটা যেখানে দেখে গেল উৎপল, আপিস-ফেরত এসে টুপিটা রাখতে গিয়ে দেখে সেটা পুব থেকে পশ্চিমের দেয়ালে চালান হয়ে গেছে। রেডিও সেটটা উত্তর থেকে দক্ষিণে। ঝি চাকরের দফারফা, কিছু বলতে গিয়ে আরও বিপদে পড়তে হয় উৎপলকে। এত সব প্ল্যান তখন শোনাতে আরম্ভ করবে উপালী যে, উৎপলের তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে ইচ্ছে করবে।

উপালী বলে—"ঘর সাজানো একটা আর্ট। যার তার কর্ম্ম নয়।"

প্ল্যানের জন্য বোম্বাইয়ে চিঠি যায় বিপুলের কাছে। উত্তরে সে প্ল্যান এঁকে পাঠায়, এ্যারো পয়েণ্ট করে চিহ্নিত করা থাকে, কোথায় থাকবে রেডিও সেট, কোথায় থাকবে ফুলদানি, কোথায় থাকবে জুতো রাখবার র‍্যাক।

রাত্রে বিপুলের ও নিজের প্ল্যান দুখানা পাশাপাশি রেখে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয় উপালী। মাঝে মাঝে [illegible] চেষ্টা করে উৎপলকে। উৎপল লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বলে—"বলে যাও শুনছি।"

উপালী বলতে থাকে—"দেখ ঠাকুরপো, তার প্ল্যানে দেখিয়েছে—দোতলায় সিঁড়ির মুখেই বাঁ পাশে থাকবে জুতো রাখবার র‍্যাক। বোঝ ব্যাপারখানা! ধর একজন ভদ্রলোক এলেন বাড়ীতে, এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই প্রথম দেখবেন বুঝি কতকগুলো জুতো? না, না, যত সব 'ন্যাষ্টি' ব্যাপার। এ হতেই পারে না। আমার প্ল্যান হচ্ছে সিঁড়ির দু'পাশে থাকবে দুটো ছোট্ট টিপয়, তার উপর থাকবে দুটো ফুলদানি, যিনি আসবেন তাঁকে যেন অভ্যর্থনা করবে এই দু'পাশের ফুলদানির দুই ফুলের গুচ্ছ। এরা যেন হবে আমাদের প্রতিনিধি, প্রতিচ্ছবি কি বল?"

পাশবালিশটা জুৎ করে চেপে ধরে পাশ ফিরে চোখ বুজল উৎপল। জবাব না পেয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বলল উপালী—"কি গো, বলছ না যে কিছু?"

সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয় উৎপল—"ভাবছি।"

তার পর চোখ বুজেই সারারাত ভেবে চলে উৎপল নাক-ডাকার মধ্য দিয়ে।

এই ভাবে চলল মাস দুই। তার পর অনেক অদল-বদল হবার পর বাড়ীটা একটা স্থায়ী সজ্জা পরল। তখনই হ'ল বিপদ উপালীর, একান্ত নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজকে।

উৎপল আপিসে চলে গেলে থাকার মধ্যে থাকে এক বছরের খোকন, ঝি সিন্ধুর মা আর চাকর। এত বড় বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করে গিলে খেতে চায় উপালীকে। সময় যেন আর কাটতে চায় না। এমন সময় খবর এল, বিপুল বদলী হয়ে আসছে কলকাতায়ই।

উপালী ধরে বসল উৎপলকে বিপুলকে বিয়ে করাবার জন্য। বিপুলের সঙ্গিনী এলে উপালীর নিঃসঙ্গতা ঘুচবে। উৎপল সমর্থন করে উপালীর প্রস্তাবটা। কিন্তু উদ্যোগ-আয়োজনের ভার পড়ে উপালীর উপরেই।

উৎপল বলল—"তুমি মেয়ে দেখ আর বিপুলকে দিয়ে পছন্দ করাও, তার পর অবসরমত আমি একবার গিয়ে 'হ্যাঁ' দিয়ে অভিভাবকত্ব ফলিয়ে আসব'খন। ব্যস্, বিয়ে হয়ে যাবে।"

বিপুল এল। প্রস্তাব শুনে সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। বলল—"বল কি বৌদি, আমার বিয়ে! আমার দ্বারা ওসব হবে-টবে না বাপু।"

উপালী বলে—"বাঃ, বেশ কথা বলছ ত? তোমার বিয়ে, সে কি তবে ওপাড়ার গদাইকে দিয়ে হবে নাকি! ওসব বাজে বায়নাক্কা রাখ। মেয়েদেরও যেমন ধিঙ্গী হলে ঘরে রাখতে নেই, দোসর জুটিয়ে দিতে হয়; ছেলেদেরও তেমনি ঢেঙ্গা হলে বাইরে ছাড়া রাখতে নেই, গলায় দড়ি পরিয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া, বয়সের ছেলেরা বিয়ে না করলে কতকটা যেন অনাথের মত ঘোরাফেরা করে। কথাবার্ত্তায় না থাকে ছিরিছাঁদ, না থাকে কোন দায়িত্ব-বোধ।"

বিপুল হাত জোড় করে বলল—"তোমার সঙ্গে কথায় পেরে উঠব না তা আমি জানি। কিন্তু দোহাই তোমার, এই নাবালক ঠাকুরপোটিকে তুমি গলা টিপে মেরো না। কলকাতা বদলী হয়ে এসেছি একটু পড়াশুনা করতে, তাতে তুমি বাদ সেধো না। এম-এ পাসটা করতে দাও। তার পর বিয়ে যতবার খুশি।"—বলে হেসে উঠল বিপুল। তার পর হাসি থামিয়ে বলল—"তা ছাড়া আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে একটি বেশ ভাল দেখে দজ্জাল সঙ্গিনী এনে দেব। তার সঙ্গে কথাকাটাকাটি করে তুমি দিব্যি সময় কাটাতে পারবে।"

উপালী শেষ চেষ্টা করে বলল—"বউ এলে যে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে, এটা নিশ্চিত বুঝলে কি করে? সে তোমার বিঘ্ন না হয়ে সহায়কও ত হতে পারে।"

বিপুল বলল—"ধরে নিলাম তিনি আমার সহধর্ম্মিণী, প্রেরণাদায়িনী সবকিছু। কিন্তু দেবী আপাততঃ একটু তফাতেই থাকুন।"

উপালী জানায় উৎপলকে। উৎপল বলে—"আমার সময় এখন নয়, তোমাদের সিদ্ধান্তের পর আমার পালা।"

অবশেষে উপালী বলল বিপুলকে—"অগত্যা দেখে শুনে এক ঘর ভাড়াটে না হয় এনে দাও। নীচের ঘর দুটো ভাড়া দিয়ে দিই। তবুও যাহোক সঙ্গী জুটবে।"

বিপুল বলল মাথা নেড়ে—"এ একটা কথার মত কথা বলেছ বটে। আমি দেখছি।"

'দেখছি' বলেও কেটে গেল ছ'মাস। বিপুলের এদিকে কোন চেষ্টা না দেখে একদিন জোর তাগাদা দেয় উপালী, বলে—তোমরা ভেবেছ কি বল ত? একটা লোককে খাঁচায় পুরে মেরে ফেলতে চাও নাকি? আমি যেন জেলখানার কয়েদী, কারো সঙ্গে কথা বলতে পারব না, কারো মুখ দেখতে পারব না, কি বিশ্রী কাণ্ড!

তাড়া খেয়ে বিপুল প্রতিজ্ঞা করে বসল—কলকাতার এই জনসমুদ্র মন্থন করে একটি ভাড়াটে-রত্ন সে যোগাড় করবেই করবে এবং সেটা আগামী কাল সূর্য্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্তের মধ্যেই।

পরদিন আপিস-ফেরত বিপুল কাপড় কেনবার জন্য দোকানে ঢুকতেই শোনে, দোকানদারকে এক খদ্দের বলছেন—হ্যাঁ মশাই, দুখানা ঘরের খোঁজ দিতে পারেন?"

বিপুল লুফে নিল কথাটা এবং সবকিছুই জেনে নিল।

খুশীমনে বাড়ী ফিরে বিপুল উপালীকে বলল—এই নাও বৌদি, তোমার ভাড়াটে ঠিক করে এলাম।"

উপালী বলল ঠোঁট উল্টে—এ যেন রাজ্য জয় করে এলেন। বাড়ীভাড়ার জন্য লোক হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর উনি ছ'মাস ধরে ভাড়াটেই খুঁজে পেলেন না। সত্যি ধন্যি দিতে হয় তোমাকে।"

বিপুল বলল—"ভাড়াটে একটা হলেই হ'ল? দেখে শুনে আনতে হবে না? বিয়ের কনে দেখার চাইতে এটা কিছু কম দায়িত্বের নয় জেনো। ছ। যাক শোন, তোমার ভাড়াটের বিবরণ—ভদ্রলোকের নাম শ্রীঅবলাকান্ত দস্তিদার। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। মাথায় নিটোল টাক। কাঁচা পাকা মিলিয়ে এক জোড়া গোঁফ, নাকটি লম্বা প্রায় সাড়ে চার ইঞ্চি, ভুঁড়ির বেড় পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি। চলেন গদাইলস্করী চালে, কথা বলেন বৈষ্ণবী কায়দায়। সন্তান-সন্ততি মা ষষ্ঠীর কৃপায় একুনে আটটি। বড়টি মেয়ে, বয়স সতের—বিয়ে হয় নি এখনও। তার পরেরটি ছেলে, বয়স বারো। তার পরেরটি মেয়ে, বয়স সাত। তার পর থেকে এক-সাইজ অন্তর কল্পনা করে যাও, তা হলেই কোলের ছেলেটির বয়স গিয়ে দাঁড়াবে দু'বছর। ভদ্রলোকের

জীবিকা—ব্যবসা। এই হ'ল তাঁর মোটামুটি বিবরণ। কাল সকালেই তিনি আসছেন ঘর দেখতে। অথ, ভাড়াটে প্রসঙ্গ সমাপ্ত।'' যেন মস্ত একটা দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেল বিপুল।

পরদিন বেশী আর কথা বাড়াতে হ'ল না। অল্প কথায়ই ভাড়াটে ও ভাড়া ঠিক হয়ে গেল। উভয় পক্ষই খুশী, উপালী শুধু একবার বিপুলকে বলেছিল, 'ভদ্রলোকের স্ত্রীকে একবার ঘর দু'খানা দেখিয়ে নিলে হ'ত না?'

শুনতে পেয়ে অবলাবাবু বিনীতভাবে হেসে বললেন, "তাঁকে আর দেখাতে হবে না মা, আমার পছন্দেই তাঁর পছন্দ।''

উপালীও এ নিয়ে আর মাথা ঘামায় নি।

অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীঅবলাকান্ত দস্তিদার সপরিবারে গৃহপ্রবেশ করলেন।

উপালী যেচে এল আলাপ করতে অবলাবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে। তাঁর বড় মেয়েটি এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "চলুন মাসীমা, আমরা ওঘরে গিয়ে গল্প করি।"

মেয়েটির ডাক নাম মরণী। মেয়েটিকে ভালই লাগল উপালীর, কিন্তু তার মা? মহিলাটি কথাই বললেন না। জিনিষপত্র গোছাতেই ব্যস্ত।

উপালী চেষ্টা করে অবলা-গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ জমাতে। কিন্তু সুবিধা হয় না। একদিন দুপুরবেলা, উপালী এসে জোর করে চেপে ধরে বসল অবলা-গৃহিণীকে। বলল, "ও দিদি, চলুন আজ আমাদের উপরে।"

কিন্তু ফল ফলল উল্টো। অবলা-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "কেন, উপরে যাব কেন, শুনি? কোন অমৃত বয়ে যাচ্ছে যে আমার না গেলেই চলবে না। হ্যাঁ, এসে অবধি দেখছি, তুমি ঘুরঘুর করছ। অত গায়েপড়া আলাপ আমি মোটেই পছন্দ করি না। বাড়ীওয়ালা আছ, তাতে কি যায় আসে গা? ভাড়া দেব থাকব, তা অত দেমাক কিসের! শাস্ত্রেই বলে, 'অতি বাড় বেড়ো না, ঝড়ে ভেঙে যাবে, অতি ছোট হয়ো না, ছাগলে মুড়ে খাবে।' হুঁ।" বলে মুখখানাকে বিকৃত করে ঘুরিয়ে নিলেন—সবে ত ডাইনে থেকে বাঁয়ে, তবু যতটা ঘোরানো সম্ভব।

থ' বনে যায় উপালী, কথা খুঁজে পায় না কিছু। হাত পা আড়ষ্ট হয়ে উঠল যেন। কানের দু'পাশ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল ঝাঁ ঝাঁ করে। নড়বার শক্তি রইল না তার। বড় মেয়ে মরণী এসে মাকে বলল, "আঃ মা—!" বলে উপালীর হাত ধরে বলল, "চলুন মাসীমা, আমরা ওঘরে যাই।"

বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অবলা-গৃহিণী মরণীর উপর। বলল, "কি! তোর পেটে আমি হয়েছি, না আমার পেটে তুই হয়েছিস যে, আমাকে তুই শাসন করতে এয়েছিস! তুই ভেবেছিস তোর তেজ আমি সহ্য করব! তেমন মা পাস নি আমাকে। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।" বলে উপালীর সামনেই সেই সোমথ মেয়ের চুলের ঝুঁটি ধরে এলোপাথাড়ি কিল-চড় মারতে লাগল। উপালীর অবস্থা হয়ে উঠল অত্যন্ত করুণ। একান্ত অসহায় বোধ করল সে নিজেকে। এমত অবস্থায় একটা কিছু করা বা বলা উচিত তার। অথচ কি করবে, কি বলবে ভেবে পায় না কিছু। মরণী মার খেতে খেতেও বলতে থাকে—"আপনি উপরে যান মাসীমা, উপরে চলে যান।" চলে এল উপালী। কি করে এল, সে তা নিজেই বুঝতে পারে না। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল সে নিজের ঘরে।...বিকেলে আপিস থেকে বিপুল আসতেই কেঁদে ফেলল উপালী, বলল—"ও ঠাকুরপো, এ তুমি কি এনে ঠাঁই দিয়েছ।"

সব শুনে বিপুল বলল, "আচ্ছা, দেখছি।"

পরদিন দুপুরবেলা উপালী একখানা বই পড়ছিল নিজের ঘরে বসে। হঠাৎ দুম্ দুম্ করে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল অবলা গৃহিণী, সঙ্গে মরণী। অত্যন্ত সহজভাবে বলল, "কৈ, এই বুঝি তোমার শোবার ঘর?"

থতমত খেয়ে গেল উপালী। তাড়াতাড়ি চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "বসুন।"

হেসে গড়িয়ে পড়ল অবলা-গৃহিণী, বলে, "দেখ, আক্কেলখানা! আরে তোমরা হলে গিয়ে বামুন, তোমাদের সামনে আমি বসব কিনা চেয়ারে। না, না, এই মেঝেয়ই বসি। তা, পান-দোক্তা আছে, না শুধু শুধুই নেমন্তন্ন?"

ব্যস্ত হয়ে বলে উপালী, "একটু বসুন, আনিয়ে দিচ্ছি।"

অবলা-গৃহিণী নাক সিঁটকে বলল, "কি! দোকান থেকে? থুঃ—থুঃ ওতে আমার গাল ভরে না। যা ত মরণী নীচ থেকে আমার পানের কৌটোটা নিয়ে আয় ত মা।"

তারপর ঘরখানাকে এক লহমায় পরিক্রমা করে বলল, "ঘরখানাকে যে পট আঁকা ছবি বানিয়েছ গো! তা ভাল। বাবা মা আছেন, না খেয়েছ?"

উপালী বলল, "বাবা মা দু'জনেই আছেন।"

অবলা-গৃহিণী বলল, "তবু ভাল। আমি ত পাঁচ বৎসর বয়সেই দু'জনকে খেয়ে বসে আছি।"

অবলা-গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ক্ষণিকের জন্য চুপ করে গেল।

তারপর একথা সেকথা চলল, সেই বিকেল অবধি।...

বিকেলে চা খেতে খেতে বিপুল বলল, "অবলাবাবুকে

তা হলে, সামনের মাসে অন্য বাসায় চলে যেতে বলি। কি বল যেদি ?"

উপালী হেসে বলল, "না, তার বোধ হয় দরকার হবে না। যতটা ভেবেছিলাম ততটা নয়।"

বিপুল বলল, "ভাল, কর্ত্তার ইচ্ছেয় কর্ম। তোমার পছন্দ নিয়ে কথা।"

পরদিন ঘটল আর এক ঘটনা। সেই অতি ভোরে উঠে পাহাড়প্রমাণ ময়লা কাপড়চোপড় নিয়ে অবলা-গৃহিণী বাথ-রুমে গিয়ে ঢুকেছে, সাবান কাচতে। আর বেরুবার নামটি নেই। দুপ দাপ, ধুপ-ধাপ, কেচে চলেছে ত চলেছেই।

উৎপল বারকয়েক চেষ্টা করে বিফল হয়ে উপরে যে জল ধরা ছিল, অগত্যা তাই দিয়েই কোনমতে মাথা ধুয়ে খেয়ে আপিসে চলে গেল। বিপুলও সেই পথই ধরলে। বেলা নটার সময় ঝি বলল উপালীকে, "খাবার জলও ত ধরা হ'ল না মা!" বলে, ঝি কুঁজোটা নিয়ে, নীচে চলে গেল, এমন সময় বাথ রুম থেকে বেরিয়ে এল অবলা-গৃহিণী, কাচা কাপড়ের মোট নিয়ে।

ঝি ফস করে বলে ফেলল, "বাব্বাঃ! জন্মে এমন আর দেখি নি। বাড়ীটাকে যেন ভাটিখানা বানিয়ে বসেছে। অন্য লোকের যেন আর কাজ থাকতে নেই।"

কটমট করে একবার অবলা-গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে ঝি বাথ রুমে ঢুকে কলের নীচে কুঁজোটা বসিয়ে দিল। কিন্তু এদিকে অবলা-গৃহিণী, সেই কাচা কাপড়ের মোট নিয়েই একপাক যেন নেচে নিল। হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। ভাড়া দিয়ে থাকি না? অমান নাকি!"

ঝিও পেছপা হবে কেন? বাগড়াটা ত তারও জন্মস্বত্ব, সেও সমানে যুঝতে লাগল। এ যেন বহুদিন পর যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে দুই পালোয়ান পরস্পারের মহড়া নিচ্ছে।

উপর থেকে উপালী চেঁচাতে থাকে—"ওরে শিদ্ধুর মা', তুই চলে আয়, চলে আয়"—কিন্তু কে কার কথা শুনে।

অবলা-গৃহিণী এই সময় কলতলায় ঢুকে কলের নীচে পাতা কুঁজোটা এনে বোঁ করে মারে ছুঁড়ে উঠানে। কুঁজোটা গেল খান্ খান্ হয়ে। শিদ্ধুর মা জুড়ে দিল মড়াকান্না—"ওরে মাগো রে, মেরে ফেলল রে!"

উপালী শুধু দিশেহারার মত বলতে থাকে, "ওঃ, কি যে করি! কি যে করি!"

এমন সময় অবলাবাবু আসতেই উপালী যেন পথ খুঁজে পেল। ভাবল—"যাক্, এবার একটা ব্যবস্থা হবেই।"

কিন্তু আধ ঘণ্টা যায়, থামবার কোনও লক্ষণই নেই। চলেছে ত চলেছেই। উপালী নীচে চেয়ে দেখল—অবলা-গৃহিণীর ছেলেমেয়ে—যারা এতক্ষণ মায়ের বিক্রম দেখছিল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারা একটিও আর বাইরে নেই। সব গিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

তর্ তর্ করে নেমে এল উপালী, এসে মরণীকে ডেকে বলল, "তোমার বাবা কোথায়, মরণী?"

মরণী বলল অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে—"বাবা খেয়ে দেয়ে এইমাত্র শুতে গেছেন, বোধ হয় এখনো ঘুমান নি। ডেকে দেব?"

অবাক কাণ্ড! চোখের উপর এই তাণ্ডব নৃত্য দেখেও কি করে যে একটা লোক অক্লেশে খেয়ে দেয়ে ঘুমাতে যেতে পারে, ভেবে পায় না উপালী।

উপালী কতকটা যেন স্বগত-উক্তির মতই বলল, "ঘুমিয়েছেন?"

উপালীর গলা শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন অবলা-বাবু। দুয়ারের ওপাশ থেকে, উপালীকে উদ্দেশ করে মরণীকে বললেন, "মা আমার কি বললেন গো মরণী?"

অবলাবাবুর গলার স্বরের কোমলতা অন্তর স্পর্শ করল উপালীর, ক্ষণপূর্ব্বের বিরক্তিটা টুকু ও চলে গিয়ে মনটাকে সহানুভূতিশীল করে তুলল।

মরণী তার বাবাকে বলল, "মাসীমা জিজ্ঞেস করছেন, তুমি ঘুমিয়েছ কিনা।"

অবলাবাবু বললেন, "অবাক হয়েছেন ত? কিন্তু কি করব বলুন, আমাদের বিয়ে হয়েছে এই উনিশ বৎসর, এই উনিশটি বৎসরই আমাকে জেগে কাটাতে হ'ত তা হলে।" একটু থেমে চাপা গলায় বললেন, 'কুঁজোটা বুঝি আপনাদের ছিল? আমি না হয় ওবেলা একটা কুঁজো নিয়ে আসব'খন, কিছু মনে—"

মরণী থামিয়ে দেয় বাবাকে। বলল, "মাসীমা চলে গেছেন বাবা।"

অবলাবাবুর সামনে নিজেকেই যেন অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল উপালীর। চলে এসেছে, অবলাবাবুর কথা শেষ না হতেই।

এদিকে কলতলায় তখনও যেন বাজ পড়ছিল। কানে আঙুল দিয়ে থাকার অবস্থা হ'ল উপালীর।...

উপালীর বিপদ বাড়ল। বিপুলকে এখন আর সে কিছুই বলতে পারবে না। রাতে উৎপলকেই সবিস্তারে সব বললে উপালী। অবলাবাবুদের অন্য বাসায় উঠে যাবার জন্য নোটিস দিতে পরামর্শ দিলে। কারণ—ভাড়ার টাকাটাই ত সব নয়। অবলাবাবু বা ছেলেমেয়েদের উপর সত্যই একটা সহানুভূতি জাগে। কিন্তু কানের কাছে, এই ভাবে

যদি অষ্টপ্রহর জাঁতাকলে কলাই পিষতে থাকে, তবে কাঁহাতক সহ্য করা যায়।

সব শুনে উৎপল হেসে বলল, "বিপুল তা হলে দেখে-শুনে, সঙ্গিনীর বদলে তোমাকে একটি সং এনে দিয়েছে বল!"

উপালী বলল, "হেসো না। আমার ভাল লাগে না।"

অগত্যা পরদিন কথাটা অবলাবাবুকে বলবে বলে কথা দিয়ে উৎপল পাশ ফিরে শুল।

রাতের বেলা আর এক কাণ্ড। হঠাৎ চীৎকার ও আর্ত্তনাদে, উপরে সকলের ঘুম ভেঙে গেল। উপালী, উৎপল, বিপুল এসে বারান্দায় দাঁড়াল। নীচের দিকে তাকিয়ে উপালী মরণীকে ডেকে বলল "কি হয়েছে রে, মরণী?"

মরণী বেরিয়ে এসে বলল, "মার জ্বর হয়েছে।"

উপালী বলল, "জ্বর কি খুব বেশী নাকি? তোমার বাবা কোথায়?"

মরণী বলল, "তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

বিস্মিত হয় উৎপল ও বিপুল। উৎপল বলল, "ঘুমুচ্ছেন? সে কি! ঘরে এমন একটা রুগী, আর উনি দিব্যি ঘুমুচ্ছেন?"

গলা খাটো করে মরণী বলল, 'জ্বর বেশী নয়, চীৎকারই বেশী। মার ধারণা, অসুখ হলেই তিনি মরে যাবেন।"

সকলে যে যার ঘরে গেল।

উৎপল বলল, "অদ্ভুতই বটে!"

বিপুল বলল উপালীকে, "বুঝলে বউদি, ভদ্রলোক হচ্ছেন অবলা, অথচ এঁর স্ত্রীটি—অত্যন্ত সবলা। সেই আমাদের কবরেজ মশাই বলতেন শোন নি—'দুর্ব্বলস্য বলং নাড়ী, সা নাড়ী প্রাণবাতকা।' তাই সবলা নারীর দাপটে পাছে অবলাবাবুর নাড়ী ছেড়ে যায়, সেই ভয়ে ভদ্রলোক, চোখ কান বন্ধ করে পড়ে থাকেন। হাঃ হাঃ হাঃ।" বিপুল হেসে নিল একচোট।

পর দিন সকালে উৎপল নীচে নামবার জন্য পা বাড়াতেই উপালী এসে স্মরণ করিয়ে দিল কথাটা। ঘাড় নেড়ে, সিঁড়ি দিয়ে নামল উৎপল। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল অবলাবাবুর সঙ্গে, সিঁড়ির গোড়াতেই। তিনিও উৎপলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই উপরে যাচ্ছিলেন। একগাল হেসে কয়েকখানা নোট, উৎপলের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, "আগাম দেওয়ার কথা ছিল, সেই টাকাটা—"

উৎপল দপ্ করে বলে ফেলল, "দেখুন, ভাড়ার টাকাটাই ত সব নয়—"

পাদপূরণ করেন অবলাবাবু, "তা ত বটেই। উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধটাই হ'ল আসল।"

এমন সময় বাইরে থেকে কে একজন ডাকতেই উৎপল বাইরে চলে গেল। কথাটা ওইখানেই চাপা পড়ল।

দিনকয়েক পরে উৎপলের ভগ্নীপতি শৈলেশবাবু এলেন শিলং থেকে। উঠলেন এসে উৎপলদের বাড়ীতেই। খাওয়া-দাওয়া, হৈ হুল্লোড়, ধুমধড়াক্কা শেষ হতে না হতেই বিপদ এসে দেখা দিল অপ্রত্যাশিতভাবে। শৈলেশবাবু সেই রাতেই কলেরায় আক্রান্ত হলেন।

ডাক্তার করলেন চিকিৎসা, উপালী করল শুশ্রূষা। ভোর হতেই শোনা গেল—অবলা গৃহিণীর ঠেস দেওয়া কথা। একা একাই বকে যাচ্ছে; "এ বয়সে কতই ত দেখলাম, তেজ থাকলেই সব কিছু পারা যায় না। রুগীর শুশ্রূষা করা কি চাট্টিখানি কথা! বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। জানা আছে সকলকেই।"

কলতলায় যেতেই বাধা পেল উপালী অবলা-গৃহিণীর তরফ থেকে। "কলেরা রুগী ত ঘেঁটে এলে, তা কোন্ আক্কেলে, মেয়েটার গা ঘেঁষে দাঁড়ালে?"

উপালী লক্ষ্য করেনি যে তার ছোট মেয়েটি পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সঙ্কুচিত ভাবে বলল, "আমি দেখতে পাইনি দিদি।"

অবলা-গৃহিণী বলল, "তুমি দেখতে না পেলে কি হবে, রোগ ত ঠিকই দেখতে পায়। হে মা কালী, রক্ষে কর মা, রক্ষে কর। নিজের রোগ যারা পরকে জড়াতে চায়, তাদের তুমি—"

কেঁপে উঠল উপালী, বলল, "আঃ দিদি—!"

ভেংচি কেটে বলল অবলা-গৃহিণী, "উচিত কথা বললেই—আঃ দিদি! আমি যেন বড় দোষের কথাই বলেছি!"

রেগে যায় উপালী, ধৈর্য্যের বাঁধন গেল ভেঙে। যথাসম্ভব গম্ভীর অথচ দৃঢ়ভাবে বলল, "আপনি সরুন, আমি কলতলা যাব। সরুন।"

তারপর থেকে চলল অবলা-গৃহিণীর একতরফা গলাবাজি।

উপরে এসে উপালী কেঁদে ফেলল উৎপল ও বিপুলের সামনেই। বলল, "এ আপদ বিদেয় কর। বিদেয় কর। না হলে আমি মাথা খুঁড়ে মরব।"

বিপুল বলল, "দাদা, তুমি অবলাবাবুকে বলবে, না আমি বলব?"

উৎপল তখনি চাকরকে দিয়ে নীচে বলে পাঠাল, অবলাবাবু যেন তার সঙ্গে দেখা করেন।...

শৈলেশবাবু সেরে উঠলেন, কিন্তু উপালীর দেহে সংক্রামিত হ'ল সেই কাল রোগের বীজাণু—আত্মপ্রকাশ করল অতি ভয়ঙ্কর রূপে। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল

উৎপল ও বিপুল। কে শুশ্রূষা করবে, কেই বা দেখাশুনা করবে—কিই বা করা যায়।

ডাক্তার এলেন। বললেন, "রোগ কঠিন। ওষুধ ও শুশ্রূষা—এই দুই মিলিয়েই হ'ল চিকিৎসা। ওষুধ আমি দিচ্ছি, কিন্তু শুশ্রূষা? তা কি আপনারা পারবেন? হয় আপনাদের নার্স রাখতে হবে, না হয় রুগীকে হাসপাতালে দিতে হবে। আমি বলি, হাসপাতালে দেওয়াই ভাল।"

বিহ্বল বিপুল শুধু একটানা বলে যেতে থাকে, "এ হতে পারে না, এ হতে পারে না।" কিন্তু কি উপায় যে হবে তাও তো সে ভেবে পায় না।

শেষ পর্য্যন্ত চোখের জল চেপে উৎপল সায় দেয় ডাক্তারের কথায়।

ডাক্তার বললেন,"তা হলে আমি এম্বুলেন্সে খবর পাঠাচ্ছি।"

"কি ঘরের বউকে হাসপাতালে পাঠায়, এ কেমনধারা কথা গা!"

সচকিত হয়ে সকলেই তাকায় দুয়ারের দিকে।

অবলা-গৃহিণী এসে ঘরের মধ্যে হাজির। মাথায় নেই ঘোমটা—সঙ্কোচের বালাই নেই। বলল, "রোগ হয়েছে বলে কি বউটাকে ফেলে দিতে হবে?"

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ডাক্তারই প্রথম কথা বললেন, "আহা—হা—এটা ফেলে দেওয়া ত নয়। ঘরের বউ থেকে আরম্ভ করে সকলের জন্যই ত হাসপাতাল—"

হাতমুখ নেড়ে অবলা গৃহিণী বলল, "আরে রেখে দিন আপনার হাসপাতাল। বলে কাশী মিস্ত্রিরের ঘাটও চিনি, আর ঐ যে কি বলে—যদু মিস্ত্রিরের ঘাটও চিনি, আমার চিনতে আর বাকি নেই। মোদ্দা কথা, ঘরের বউকে হাসপাতালে দেওয়া চলবে না।"

ডাক্তার বললেন, "কিন্তু শুশ্রূষা করবে কে?"

অবলা-গৃহিণী অত্যন্ত সহজভাবে বললে, "আমি?"

একেবারে চমকে উঠল উৎপল ও বিপুল।

উৎপল বলল, "আপনি—মানে, আপনার কোলে একটি ছেলে আছে যেন? তাকে রাখবে কে?"

অবলা-গৃহিণী বলল, "সে মরণী রাখবেখ'ন।"

উৎপল কথাটা মরণীকে বলতেই মরণী বলল, "মাকে আপনারা ফেরাতে পারবেন না। যে কারুরই অসুখ হোক্ না কেন, উনি গিয়ে হাজির হবেনই। আপনাদের জামাই-বাবুর অসুখের সময়েও মাকে ডাকেন নি বলে তাঁর মনে খুব কষ্ট হয়েছিল।"

তার পর একদিকে যম আর একদিকে ডাক্তার ও অবলা-গৃহিণী—উপালীকে নিয়ে চলল টানাটানি। অবশেষে জয় হ'ল ডাক্তার ও অবলা-গৃহিণীরই। অবলা-গৃহিণী সেই যে বসেছে রুগীর শিয়রে আর উঠবার নামটি নেই। একাই সব করে যাচ্ছে। বুক দিয়ে রক্ষা করছে উপালীকে যেন মায়ের মত। রুগীর যন্ত্রণা উপশমের জন্য সে কি অক্লান্ত প্রয়াস!

ডাক্তার একবাক্যে স্বীকার করলেন, "একমাত্র শুশ্রূষার জন্যই এ যাত্রা বেঁচে গেলেন রোগিণী। এমন শুশ্রূষা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলেই মনে হয়।"

সুস্থ হ'ল উপালী।

সেদিন দুপুরবেলা; উপালীর শয্যা ঘিরে বসে উৎপল বিপুল ও শৈলেশবাবু। কেটে-যাওয়া বিপদ সম্বন্ধেই আলোচনা হচ্ছিল।

শৈলেশবাবু বললেন, "আমিই এই দুর্যোগের অগ্রদূত।

বিপুল হেসে বলল উপালীকে, "বউদি, আমি দেখে শুনে তোমার কেমন সঙ্গিনী এনেছিলাম বল দেখি?"

এমন সময় গলাখাঁকারি দিয়ে ঢুকলেন এসে অবলাবাবু, হেসে বললেন, "ডেকে পাঠিয়েছেন কেন, জানি। এই বিপদের মধ্যে আর আসি নি। কালই আমি এ বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

উৎপল বলল, "চলে যাচ্ছেন—?"

অবলাবাবু বললেন, "আজ্ঞে আমি কোনও বাসায়ই তিন মাসের বেশী থাকতে পারি নি। এক বাসায় গিয়েই আমি আবার বাসা দেখতে সুরু করি। এই ভাবেই চলেছে আমার বিবাহিত জীবনের উনিশটি বছর।"

অবলাবাবুর মুখের উপর অন্তরের চাপা ক্ষোভের ছায়া পড়ল। হাসিটা গেল তার আড়ালে মিলিয়ে।

বিব্রত, বিচলিত হ'ল উপস্থিত সকলেই।

একগলা ঘোমটা দিয়ে অবলা গৃহিণী, সরাসরি একেবারে উপালীর বিছানার পাশে গিয়ে হাজির হ'ল। ঘোমটা সরিয়ে বলল, "আবার গোছগাছ করে নিতে হবে ত। হয়-ত বা দেখা করবার সময়ই পাব না। তাই এলাম। কালই বাসা ছেড়ে চলে যাচ্ছি গো খোকার মা।"

উপালী ক্লান্ত হাতে অবলা গৃহিণীর আঁচলটা চেপে ধরে বলল, "না, যেও না।"

অবলা-গৃহিণী বলল, "যাব না কি, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব নাকি এখানে থেকে?"

উপালী বলল, "হ্যাঁ, তুমি আমার একজন ঝগড়াটে দিদি হয়েই থাক।"

অবলা-গৃহিণী হঠাৎ উপালীর হাত দুখানা ধরে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল। বলল, "পাঁচ বছর বয়সে বাবা মাকে হারাবার পর থেকে, এমন কথা এমন করে, আজ পর্য্যন্ত আমাকে কেউ বলেনি খোকার মা, কেউ বলে নি।"

স্নেহের উত্তাপে জমাট বরফ গলে গেল।

কাগজ কাটা

শ্রীনলিনী রাহা

কাগজ কাটা নানা দেশে প্রচলিত আছে; আমার শিশু-বাস থেকে এই শিল্প দেখে আসছি। তবে আমি যা দেখেছিলাম তাকে ঠিক শিল্প বলা চলত না—এটা ছিল অনেকটা ম্যাজিক দেখানোর মত। অন্ততঃ ছেলেবেলায়

অশোক

আমার ত তাই মনে হ'ত। মনে পড়ে আমাদের পাশের বাড়ীর এক খ্রীষ্টান ভদ্রমহিলা আমাকে এমনি কাগজ কেটে কেটে হাতধরা পুতুলের ছবি বানিয়ে দিতেন। একটা বা আধখানা কাটা ছবির পরত খুলে খুলে সারি সারি অনেকগুলি পুতুল হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়ে গেল—এ যে শিশু-মনকে কি অপূর্ব্ব বিস্ময় আর আনন্দে ভরিয়ে দিত তা আজও মনে পড়ে। শুধু মনে পড়ে নয় পরবর্তী জীবনে যখন শিক্ষাব্রত গ্রহণ করলাম তখনও আমার ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীদের এমনি কাগজ কাটার খেলা দিয়ে আনন্দ দিয়েছি। তাদেরও দেখেছি একটা বা আধখানা ফুলের পাপড়ি থেকে খুলে খুলে যখন সম্পূর্ণ একটা ফুল হয়ে যায়, একটা পুতুলের অবয়বের পরত খুলতে খুলতে বহু পুতুল হাতধরাধরি করে দাঁড়িয়ে যায় তখন তারা আনন্দে বিস্ময়ে

শান্তিনিকেতনের তালগাছ
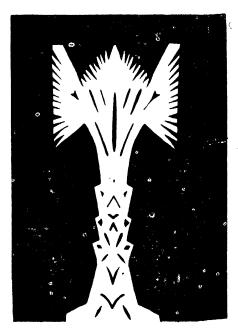
অধীর হইয়া ওঠেই। এতে কাগজ কাটাকে চিরকালই মনে করে এসেছি ছোটদের মন-ভোলান খেলা এবং তাদেরই জন্য "হাতের কাজ"। বড়জোর স্কুলের অভিনয় প্রভৃতিতে কাগজে কাটা নক্শা ব্যবহার করে সুন্দর সুন্দর পোশাক তৈরি হয়েছে বা ঐ রকম নানা কাজে তাকে লাগাতে পেরেছি, কিন্তু এ যে বড়দেরও মনে সৃষ্টির আনন্দের খোরাক জোগাতে পারে সেকথা কখনও মনে হয় নি।

চীনদেশে কাগজ দিয়ে নানা রকমের ছবি ও নক্শা কাটার রীতি প্রচলন আছে শুনেছি কিন্তু তা দেখবার

ছোটদের হাতের কাজ

পাথরের সোরাই

ফণীভূষণ মহাদেব

অমিতাভ
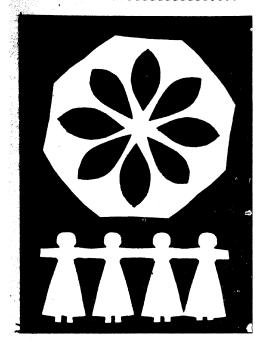
সৌভাগ্য আমার হয় নি। বাংলা দেশেও শুনেছি, কাগজের উপর প্রথম এঁকে নিয়ে তার পর নরুণ দিয়ে কেটে কেটে সূক্ষ্ম নক্‌শা কাটার প্রচলন ছিল, কিন্তু তাও আজ পর্য্যন্ত দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে কিছুদিন আগে অর্থাৎ আমার নিজের এই কাগজ কাটার শিল্প অনেকটা অগ্রসর হবার পর মথুরায় প্রচলিত নরুন দিয়ে কাটা একরকম সূক্ষ্ম ও সুন্দর নক্‌শা আমি দেখেছি এবং তা আমার খুব ভাল লেগেছে।

ময়ূরপঙ্খি

তবে আমার মনের উপর সেই শিশুমনের ভাল লাগার ছাপ বোধ হয় আজও লেগে আছে, তাই কাগজ ভাঁজ করে ছবি কাটার পর যখন ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলে সেটি চোখের সামনে খুলে ধরি, তখন সেই হঠাৎ করে নূতন দেখার আনন্দের সঙ্গে মিশে যায় সৃষ্টির আনন্দ।

ফুলের সোরাই

(উপর থেকে নীচে) (১) পাখী—পোকা দেখতে পেয়েছে (২) মা ও ছেলে (৩) ঘুমন্ত কুকুর —(এই ছবি তিনটি বড় ছবির ছাঁট থেকে তৈরী)

ছোটদের জন্তে যেমন করে ভাঁজ করা কাগজ কাঁচি দিয়ে কাটা হয় আমার এই কাগজ কাটাও প্রায় তাই—তবে এতে কারিগরি কিছু বেশী এবং কাগজ ভাঁজের কৌশল অপেক্ষাকৃত জটিল। এও পেনসিল দিয়ে না এঁকে কাগজ-কাঁচির আলপনা দেওয়ার মত। ছোটদের জন্তে নিত্য নূতন নক্‌শা কাটতে কাটতে মনের কল্পনা আপনা হতেই একে একে রূপ নিতে লাগল। হঠাৎ অজানার মধ্য দিয়ে একদিন আবিষ্কার
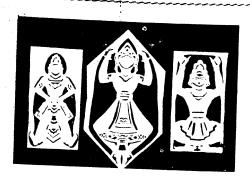
ধানরোপা

নৃত্য

করলাম আমার ভিতরের যে শিল্পীমন প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে ম্রিয়মাণ হয়েছিল এই কাগজ ও কাঁচির সাহায্যে সে জেগে উঠেছে। রং তুলি আর ক্যাম্বিস নানা সরঞ্জামের আর প্রয়োজন হ'ল না, এমনকি রবার-পেনসিলও দরকার হ'ল না, আমি যা চেয়েছি, আমার যা ভাল লেগেছে এ জীবনে যত সৌন্দর্য্য আমি অনুভব করেছি তার অনেকখানি প্রায়-বার্দ্ধক্যে এসে এই কাগজ-কাঁচির আলপনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে আমার শিল্প-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে চলেছি।

আমি নিজে এই কাগজ কাটার নিয়মকানুন জানি না—যেমন ভাবে আমার হাত চলেছে ও মন চেয়েছে তেমনি ভাবেই কেটে গেছি এবং কাটতে কাটতে নিজের মত করে মনে মনে কিছু নিয়ম গুছিয়ে নিয়েছি। আমার মনে হয়, সুশিক্ষিত শিল্পীরা যদি একে শিল্পজগতে স্থান দেন তবে নিশ্চয়ই এর অনেক উন্নতি হবে এবং সুকুমারশিল্প হিসাবে এও একটা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হতে পারবে একদিন এবং কাগজ কেটে ছবি লিখবার নিয়মকানুনও তাঁরা বিধিবদ্ধ করে দিতে পারবেন।

গাঁয়ের মেয়ে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আকাশের ঘুম নাই, বাতাসের ঘুম নাই,
পৃথিবীর চোখে ঘুম নাই যে,
চাঁদ-নেভা এ নিশীথে মাঠ আর বনানীতে
কানাকানি চলে, সুর পাই যে !
ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, তারাভরা কালো দীঘি
এখনও রাত শেষ হয় নি,
ওপারের চখা সাথে ঘুমভাঙা মাঝরাতে
এপারের চখী কথা কয় নি।
এলোমেলো বাদলা হাওয়া থেকে থেকে ভরে ওঠে
ঘুমহারা পাখীদের কূজনে,
বনতুলসীর রেণু আঁধারেও উড়ে আসে,
সে রেণু মেখেছি মোরা দুজনে।

থাক্ দূরে শহরের ইটপাথরের কারা,
থাক্ সরে আধুনিকা রূপসী,
ধানের সুগন্ধভরা মাঠপথে যেতে যেতে
শিশিরের কণা লব পরশি'।

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, মায়াবী আকাশ আজ
চুপি চুপি এল নেমে কাছে যে,
তোমার ও এলোচুলে কালো মেঘ করে খেলা,
কালো চোখে বিদ্যুৎ নাচে যে !
প্রিয়াহারা পাপিয়াটা বাতাবি ফুলের বনে
সারারাতে ফেরে কারে ডাকিয়া,
বকুল-ঝরানো পথে উদাসী বাতাস কাঁদে
হারানো-ফাগুন ধূলি মাখিয়া।

নিদ্রালু রাত আর নিদ্রালু যৌবন
বলে কত রূপকথা জান কি ?
সাতসাগরের পারে যে কথা হারায়ে গেছে,
তারি স্মৃতি আজো মনে আনো কি ?
রূপকথা, রূপকথা – অত রূপ পাবে কোথা,
রাজার কুমার কেন সাধরে,
কবরী এলায়ে দিও রূপসায়রের ঘাটে,
ভ্রমরার চুমা নিও অধরে।

আজ চোখে ঘুম নাই, রূপকথা ফিরে পাই
তোমার ও লাজভরা আননে,
শুনি যেন রূপকথা মুকুল-ফোটার গানে,
ঘূর্ণিহাওয়ায় জাগা কাননে।

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, কথা কও, কথা কও,
এ নিরালা রাতে নাই বাধা রে,
কাঁপিছে গভীর রাত, কাঁপিছে আকাশে তারা,
কাঁপিছে বিরাট মাঠ আঁধারে।
আম-বউলের পথে অতনুর লিপিখানি
পাও নি তোমার তনুদ্বারে কি?
কে জেলেছে দুটি চোখে কামনার দীপখানি
চিনেও চেন নি আজো তারে কি?
সজিনাফুলের বাসে স্বপনে কাছে কে আসে
ঝির্ ঝির্ পাতা-কাঁপা নিশীথে,
রূপসী পৃথিবী আর তোমার উপোসী মন
এক সাথে সাড়া দেয় কি গীতে?

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, কোথায় চলার শেষ,
শুকতারা দেখা দেয় আকাশে,
জাগিছে একটি তৃষা দিশাহারা এ আঁধারে,
—পাও নি উষার স্বাদ বাতাসে?
দেখেছি ও কালো চোখে কাজলা দীঘির ছায়া
আকাশ নিরালা যেথা দেয় ঘুম,
দেখেছি ও যৌবনে নিতল রাতের মায়া,
বনশিউলিরা জাগে নিঃঝুম।
নুয়ে-পড়া কেয়াবনে বন্দিনী ফুলগুলি
কাঁটার আড়ালে কাঁপে তরাসে,
অন্ধ বাতাস শুধু কাঁদিছে আমারি মত
ভুলপথে খুঁজে খুঁজে হুতাশে।

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, উষার এ নীল আলো
কুয়াসায় নেমে এল লজ্জায়,
শুকতারা ডুবে গেল সোনালীর ছোপধরা
আকাশের লঘুমেঘসজ্জায়।

শঙ্খচিলের দল অশরীরী ছায়া যেন,
ঝাপটায় ডানা ফিকে আকাশে,
ঘুমভাঙা পৃথিবীর কৌতুকভরা হাসি
শোনা যায় ঝিরঝির বাতাসে।
বনকাপাসের ফল ফেটে সাদা প্রজাপতি
ওড়ে যেন মেলে তার পাখনা,
যেন কোন্ যাদুকরী পৃথিবী হয়েছে আজ,
খোলে মায়া-পেটিকার ঢাকনা।

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, তুমি কি সে কেশবতী
হাতে নিয়ে বরণের ডালা রে,
তুমি কি সে কলাবতী রূপসায়রের ঘাটে,
তুমি কি হারানো মেঘমালা রে?
ঝরা-শিউলির বনে দক্ষিণ সমীরণে
সে কথা বলিবে কানে কানে কি,
মায়াবী অতীত আজ রূপকথা-পথ হতে
তোমারে ভুলায়ে কাছে আনে কি?
সোনা ও রূপার কাঠি কোথায় এসেছ ফেলে,
যৌবন আজো রবে ঘুমায়ে?
উষার রঙিন আলো চোখে কি লেগেছে ভালো,
কে দিল স্বপনপুরী রাঙায়ে?

ওগো ও গাঁয়ের মেয়ে, সমুখে দাঁড়াও আসি
কেতকীফুলের বেণী দুলায়ে,
শিরীষ ফুলের রেণু অঙ্গে মাখিয়া এস
কর্ণে কদমকলি ঝুলায়ে।
সরল দিঠিতে তব আদিম যুগের গীতি
তৃষ্ণা ছড়ায়ে দিক ভুবনে,
রূপালি আকাশতলে তোমার রূপালি তনু
কাঁপুক উষায়-জাগা পবনে।
যে কথা হয় নি বলা কত না হারানো রাতে
অনাদি বিরহ-ব্যথা বহিয়া,
নিরালা গাঁয়ের কোলে ফুলফোটা বনপথে
সে কথাটি যাবে মোরে কহিয়া?

সৌন্দর্য্য

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সর্ব্বত্র; শিউরে উঠল মানুষ। এমন অসম্ভব ব্যাপারও ঘটে পৃথিবীতে। মা আর মাসীতে তফাৎই বা কতটুকু? দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধরার ক্লেশটুকু যা সহ্য করে না মাসী, কিন্তু তার মত স্নেহের প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যেতেও পারে না কেউ। মাসীর বাড়ীর কিলচড়ের কল্পনা কেউ করে না, অথচ যা ঘটেছে তার চেয়ে লোমহর্ষক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে। কেমন করে এটি সম্ভব হ'ল? কালের দোহাই দিলেও মন সুস্থির হয় না। যাঁরা ঘটনাপরম্পরার সূত্র সংযোজনা করে বিষয়টির উপর আলোকপাত করতে চেয়েছেন তাঁরাও বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। তাঁদের সংযোজিত সূত্র ধরে কাহিনীর মূলে পৌঁছবার চেষ্টা করব আমরা।

প্রমীলা আর উর্ম্মিলা দুই বোন। দু'জনেরই বিয়ে হয়েছে ভাল ঘরে। বংশের নাম, অর্থ ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি দুই ঘরেই বিদ্যমান। প্রমীলার স্বামী চাকরি করেন মফস্বলের ব্যাঙ্কে। মাইনেটা ভালই—চালচলনে যথেষ্ট সচ্ছলতা দেখা যায়। পর পর তিনটি মেয়ে কোলে আসার পর প্রমীলা যখন বেশ মুষড়ে পড়েছে—তখনই কণুর জন্ম হ'ল। দুর্লভ বলেই স্নেহের স্রোতটি প্রবল বেগে বয়ে গেল ওর উপর দিয়ে। বেশ আনন্দেই কাটতে লাগল প্রমীলার দিনগুলি।

উর্ম্মিলার দিনের পায়েও খুশির ফানুস বাঁধা। মাস ও বছরের আকাশে সেগুলি লঘু আয়াসেই ভেসে চলে, ভার জমায় না। একদিন কিন্তু ভার জমল: একটি ছেলে নিয়ে উর্ম্মিলা বিধবা হ'ল। সম্পত্তি ছিল, অভিভাবক ছিল না। পিতৃকুলের সবাই গত হয়েছেন। অগত্যা ছেলেটিকে নিয়ে প্রমীলার সংসারেই বাসা বাঁধল সে।

দু'টি ছেলেই একবয়সী। আদর-যত্ন খাওয়া-খেলা পোশাক-পরিচ্ছদ পরানো প্রভৃতির ভার উর্ম্মিলাই নিজের হাতে তুলে নিল। বাইরে যে কেউ দেখলে বলবে—দুটি এক মায়ের পেটের ভাই। আকৃতিতে কিন্তু অনেকটা তফাৎ। প্রমীলার ছেলেটির রং ফরসা, গোলগাল মুখ, বড় বড় চোখ, কোঁকড়া চুল—দেখতে রাজপুত্রটির মত। ওর পাশে উর্ম্মিলার খোকাটি বেমানানই। ওর ছেলেটি মোটাসোটা, চোখ ছোট, চুল কোঁকড়ানো নয়, রং ময়লা। যারা সহোদর বলে ভুল করে তারা অবশ্য দু'টিকে কানাই-বলাই বলেই আদর করে। প্রমীলার ছেলের নাম রত্নেশ্বর—উর্ম্মিলার ছেলের নাম প্রদীপ। ওদের ডাক নাম কণু আর লাটু।

যে যাই বলুক আড়ালে—উর্ম্মিলার চোখে ওরা দু'জনেই সুন্দর—স্নেহে দুজনেই তুল্যমূল্য। এমনি করে বেশ কিছুদিন কাটল।

একদিন দাস সাহেবের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ হ'ল প্রমীলাদের। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করতে এসে দাসজায়া বার বার করে অনুরোধ করলেন, ছোট ছেলেরা কেউ যেন এই উৎসবে অনুপস্থিত না থাকে। ওদের জন্য বিশেষ একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এবং দাস সাহেবের একান্ত ইচ্ছা ক'চিরা সমবেত হয়ে ওদের খেয়ালখুশির দ্বারা সেটিকে সফল করে তুলবে। সেইমত ব্যবস্থাও হয়েছে: নানান রকমের খেলার সরঞ্জাম, খেলনার সমাবেশ, ফুল-লতা-পাতা দিয়ে দোলনা প্রভৃতি সাজানো, বল, বেলুন, কৃত্রিম ফোয়ারা পাহাড়—ছোটদের চিত্তবিনোদনের যত কিছু ব্যবস্থা সবই থাকবে সেখানে। সেখানে এক হয়ে ছোটরা ভাব জমাবে, খেলা করবে, ঝগড়া-খুনসুটি করবে, দৌড় লাফ ঝাঁপ চীৎকার গণ্ডগোল করবে—রীতিমত শিশু-মহোৎসবের ব্যাপার। তাই ছোটদের সকলেরই যাওয়া চাই।

ছেলেদের সাজিয়ে গুজিয়ে দুই বোনে গেল নিমন্ত্রণ রাখতে। তেতলার বিরাট ছাদে তৈরী হয়েছে—শিশু-প্রমোদাগার। এক প্রান্তে মা, দিদি, মাসী-পিসীদের বসবার জায়গা। ওঁরা দূর থেকে বসে বসে উপভোগ করবেন আনন্দ-মেলার গতি-প্রবাহ।

ছেলেদের প্রমোদক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়ে প্রমীলা উর্ম্মিলা বসল দর্শকদের আসনে। সেখানেও বেশ ভিড়।

একটি মেয়ে বলল, চমৎকার আইডিয়া মিঃ দাসের।

একজন বর্ষীয়সী বললেন, ভাবছি ওরা মারামারি করে না দক্ষযজ্ঞ বাধায়।

এমন সময় কণু ও লাটু প্রবেশ করল রঙ্গমঞ্চে।

বর্ষীয়সী বললেন, ওমা, এ যে কানাই-বলাই এল দিদি।

উদ্দিষ্টা দিদি বললেন, পোড়া কপাল—ওই নাকি কেষ্টর শ্রী!

বর্ষীয়সী বললেন, তা হোক—ও আমাদের কানাই। এত ছেলের মধ্যে ওর মত গায়ের রং কার বা আছে।

মন্তব্যটা কানে গেল উর্ম্মিলার। চমকে চাইল মেলার পানে। নানা রঙের পোশাকে-মোড়া কচি প্রাণগুলি যেন বিচিত্র বর্ণের কুসুমদল। একক এবং মিলিত সৌন্দর্য্যে ওদের তুলনা নাই। কিন্তু এত ছেলের মধ্যে উর্ম্মিলার খোকাটি একলা। ওর মত ময়লা-রঙের ছেলে একটিও নাই। পাউডারের প্রলেপে অন্য সব ছেলের শ্যামবর্ণকে ঘনশ্যাম মনে হচ্ছে না, কিন্তু পাউডারকে ঠেলে লাটুর দেহবর্ণ কি নির্লজ্জ ভাবেই না আত্মপ্রকাশ করছে। এমন সুন্দরের মেলায় লাটুকে মানাচ্ছে না মোটেই।

লাটুর সামনে একটি ফুটফুটে ছেলে রাঙা একটা বল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। লাটু এসেই খপ করে ওর হাত থেকে বলটা কেড়ে নিলে। ছেলেটি চীৎকার করে উঠল। চারদিক থেকে আরও ছেলে এসে জমল, এবং সুরু হ'ল হট্টগোল।

ফুটফুটে ছেলেটির মা তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। ওঁর চোখে-মুখে বিরক্তির চিহ্ন। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন, যেমন রূপ—তেমনি কি গুণ ছেলের! ময়ূরের মাঝখানে একটি দাঁড়কাক।

উর্ম্মিলা কশাহতের মত জায়গা ছেড়ে উঠল। অতঃপর সপক্ষে বিপক্ষে নানা কণ্ঠের মন্তব্য।

কে জানে কেমন মা! ছেলের ছেলের অমন খুনসুটি হয়ই—তাই বলে অমনি ক্যাট ক্যাট করে বলবে!

ছি—ছি!

বলবে নাই বা কেন? ছেলেকে সহবৎ শেখাতে পারে না যে মা—সে কেমন মা!

আহা—অবোধ শিশু, ওরা সভ্যতা ভদ্রতার কি ধার ধারে।

ওদের আচরণ থেকেই বোঝা যায় বাড়ীর লোকেদের আচার-ব্যবহার।

উর্ম্মিলা লাটুর হাত ধরে টেনে আনল এধারে। অতঃপর কোন কথা না বলে নীচে নেমে গেল। ছাদের উপরে ততক্ষণে জটলা সুরু হয়েছে—উর্ম্মিলার নিঃশব্দ অন্তর্দ্ধান কারও চোখে পড়ল না। প্রমীলারও নয়। আহারের ডাক পড়তেই প্রমীলা বুঝল উর্ম্মিলা চলে গেছে। না খেয়ে গেলে অভদ্রতা বলে ও রয়ে গেল।

প্রমীলা ফিরে এসে উর্ম্মিলার দুয়ারে ধাক্কা দিয়ে ডাকল, উর্ম্মি, জেগে আছিস কি? দোরটি খোল না ভাই।

উর্ম্মিলা জবাব দিল, বড্ড মাথা ধরেছে—উঠতে পারছি না।

ডাক্তার ডাকব কি? লক্ষ্মী ভাই, একবার খোলই না দরজা।

কিছু করতে হবে না—ঘুমুলেই সেরে যাবে।

অগত্যা ফিরে এল প্রমীলা। বিস্মিত হ'ল, ব্যথা বোধ করল। উর্ম্মিলা তো কোনদিন কথার অবাধ্য হয় নি, এমন অধীর কণ্ঠে জবাবও দেয় নি। সত্যিই ওর মাথা ধরেছে, না মন খারাপ হ'ল, কে জানে!

পরের দিন সে উর্ম্মিলাই নয়। দাস সাহেবের বাড়ীর কথা প্রসঙ্গক্রমেও তুললে না। মনের কোথাও যে রেখাপাত হয়েছে—এমনটি আভাসে-ইঙ্গিতেও পাওয়া গেল না।

কিন্তু রেখাপাত হয়েছিল গভীর ভাবে। তার প্রমাণ স্নো ক্রীম পাউডার প্রভৃতি ত্বক-উজ্জ্বলকারী নানা প্রসাধনদ্রব্যে আলমারী ভরে উঠতে লাগল।

একদিন কথায় কথায় বলল প্রমীলাকে, আচ্ছা দিদি, পাহাড়ে গিয়ে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হয়, মানে রং ফরসা হয়।

তা হবে। শুনেছি প্লেনে এলে পাহাড়ীদের রঙের জেল্লা থাকে না।

এর কিছুদিন পরে উর্ম্মিলা বলল, একটা কথা ভেবেছি দিদি, লাটুটা দিন দিন যে রকম দুষ্ট হয়ে উঠছে, ওকে বোর্ডিংএ রাখলে কেমন হয়? না হলে ওকে সামলানো মুশকিল।

প্রমীলা বলল, বোডিঙে রাখতে চাস—কিন্তু ত ... পাহাড় ছাড়া কি জায়গা নেই? আর কতটুকু ছেলে মা ছেড়ে থাকতে পারবে কেন।

আমি না হয় যাব সেখানে।

বোর্ডিঙে ত থাকতে দেবে না তোকে।

তা কেন, একখানা ছোটমত বাড়ী নেব। আমার কাছেই থাকবে—যতদিন না বোর্ডিঙে থাকবার মত হয়। ভাবছ কেমন করে থাকব? তা খুব পারব দিদি। খরচের কথাও ভাবছি না আমি। ওই একটিই ত ছেলে—যা কিছু আছে ওকে মানুষ করতেই না হয় যাবে। তুমি জামাইবাবুকে বলে মত করিয়ে দাও। অনুনয় করল উর্ম্মিলা।

প্রমীলা নানাভাবে বুঝিয়েও ওকে নিবৃত্ত করতে পারল না।

প্রমীলার স্বামী দিব্যেন্দু হেসে বলল, ভালই হ'ল, আমাদেরও চেঞ্জে যাবার একটা ডেরা ঠিক করা থাকবে। কার্সিয়াঙে ডাউ হিলে ছোট ছেলেমেয়েদের একটি স্কুল আছে, ওইখানেই বন্দোবস্ত করা যাক।

নাতিশীতোষ্ণ কার্সিয়াং—চারিদিকে অপূর্ব্ব প্রকৃতি-পরিবেশ। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল শৃঙ্গমালা সৌন্দর্য্যে ঝলমল করে ওঠে। বহুদূরে তিনটি বিশাল মহীরুহের নিশানায় ভুটান-সীমা চিহ্নিত। একদিকে পাহাড় হয়েছে ঊর্দ্ধমুখী—অন্য দিকে গভীর খাদ। পাহাড়ের গায়ে বুনো গোলাপের ঝাড়। মাঝে মাঝে ঝাউ, দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের সরল উন্নত শির—পাহাড়ের গায়ে চা-বাগানের কেয়ারী-করা সবুজ বন। হিমালয়ের বিশাল পটভূমিতে ধূমল-ধূসর সাদা সবুজের নানা রেখাবিন্যাস।

এসব দেখেও উর্ম্মিলার মন ভরল না। এই রেখা ও রঙের রাজ্যে সবই অপরূপ, লাটু এখানে সৃষ্টিছাড়া। ইংরেজ শিশুদের সাদা রঙের কথা না ধরলেও ভুটিয়া-নেপালীদের বাচ্চারাও ত পাহাড়ের কোলে কম মানানসই নয়। হিমালয় ওদের আদিভূমি। আর যে দিক দিয়ে যত খুঁতই ধরা পড়ুক—দেহবর্ণে ওরা হীন নয়। সমতলবাসীদের শিশুও কি চোখে পড়ছে না উর্ম্মিলার? ওরাও রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু লাটু এ সবের মধ্যে বেমানান। বিধাতা সবই দিয়েছিলেন উর্ম্মিলাকে—ধনসম্পদ, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, প্রেমময় স্বামী··· স্বামীর কথা মনে হতেই তাঁর দেহবর্ণটি ফুটে উঠল মানসচক্ষে। এতকাল ফুটে ওঠে নি। স্বাস্থ্য, চরিত্র, বিদ্যা, সরস আলাপ, তেজ এইগুলিই এতদিন রূপের পরিমণ্ডল রচনা করেছিল। বর্ণটা ছিল গৌণ। স্বামীর অবর্ত্তমানে ওসবের স্মৃতি দূরশ্রুত সমুদ্র-কল্লোলের মত অস্পষ্ট হয়ে আসছে। চোখের সামনে যা থাকে না—মনের আয়নায় তা মলিন হয়ে ওঠে হয় ত

বা এমনি করেই। কিন্তু লাটু রয়েছে সামনে—স্বামীর দেহবর্ণ ওই আয়নাতেই হয়েছে স্পষ্ট। স্বাস্থ্য, চরিত্র, বিদ্যা, পরিহাস-প্রিয়তা এ সব ছায়া ছায়া মনে হচ্ছে। এত সম্পদ দিয়েও বিধাতা যে কোন্ অলক্ষ্যে উর্ম্মিলাকে এতদিন বঞ্চিত করে রেখেছিলেন। না—এখানে আর থাকা চলবে না। এই ত দেখতে দেখতে ছ'টা মাস চলে গেল, লাটুর উন্নতি হ'ল কৈ? খাদের নিকট শ্লেটংভের পাহাড়টির মতই ও যে অত্যন্ত স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। দূরের কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল রশ্মি ওর দেহকে কোনকালেই বুঝি স্পর্শ করতে পারবে না।

পাহাড় ছাড়বার সঙ্কল্প করল উর্ম্মিলা। এই সময়ে লাটু অসুস্থ হওয়াতে চলে আসার কৈফিয়তটা সহজ হয়ে গেল।

প্রমীলাকে বলল, চলে না এসে উপায় কি দিদি! ডাক্তার বললেন, পাহাড়ে থাকলে ছেলে আরাম হবে না—নীচে নামিয়ে নেওয়া দরকার।

লাটু কিন্তু আর সুস্থ হয়ে উঠল না। একটু একটু করে ক্ষয় হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল।

উর্ম্মিলার জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

একদিন ওর ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল প্রমীলা।

এ কি রে—ঘরটিকে যে কাকবাসা করে রেখেছিস? কি শ্রী হয়েছে টেবিলটার—একরাশ বই-কাগজ ছড়ানো। আলমারিতে যত রাজ্যের ময়লা কাপড়-জামা ঠাসা! পায়াভাঙা চেয়ারটা উল্টে রয়েছে ড্রেসিং টেবিলটার পায়ার উপর। ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাতেই বা চিড় ধরালে কে। আর কাঁচগানার দশা। যত রাজ্যের মানুষ এসে ওটার গায়ে ছাই তুলে তুলে কুয়াসা জমিয়েছে বুঝি? ঘরের মেঝেয় হাঁটুভর ধুলো—তুই হলি কি উর্ম্মি?

প্রমীলার হাত থেকে সম্মার্জনী কেড়ে নিয়ে উর্ম্মিলা বলল, আমার এই ভাল লাগে।

ছি বোন, এমন করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন।

না—না—ভেঙ্গে পড়ব কেন! একটি কালো কুচ্ছিত ছেলে তার জন্য···হু-হু করে চোখের জল উপচে পড়তেই আঁচলে মুখ ঢাকল উর্ম্মিলা।

প্রমীলা অনেকক্ষণ ধরে প্রবোধ দিল বোনকে। টেনে বার করল ঘর থেকে—রুণুকে ওর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলল, দেখ দেখি তোকে না পেয়ে ছেলেটা হেদিয়ে কি দশা করেছে। একেও ভুলে থাকতে পারলি।

রুণুকে বুকে চেপে ধরে ভিতরকার বড় ব্যথাটা ভুলতে চাইল উর্ম্মিলা।

ভোলা কি এতই সহজ!

নাইয়ে ধুইয়ে ফরসা পোশাক পরিয়ে রুণুকে টেনে নিয়ে এল আয়নার সামনে। চিরুনী দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ে দিল ওর চুল। হাল্কা টানে পাউডার পাফটা বুলিয়ে দিল মুখে—মাথার কাঁটার ডাটি দিয়ে কপালে এঁকে দিল খয়েরের একটি বিন্দু। বাঁ হাত দিয়ে থুতনিসমেত গাল দুটি নিজের দিকে তুলে ধরতেই মনে হ'ল, কি সুন্দর রুণু। সকালের শিশির-ধোয়া পদ্মপাতাটির মত চকচকে। ওর কচি প্রাণের তাজা স্পর্শ বুলিয়ে অনেক প্রাণকেই সরস করার ক্ষমতা ওর অপরিসীম।

পরক্ষণেই থর থর করে কেঁপে উঠল ওর সর্ব্বাঙ্গ। খয়েরের ক্ষুদ্র টিপটি বৃহৎ কলঙ্কচিহ্নের মত ছড়িয়ে পড়ল রুণুর মুখে। সে মুখ রুণুর নয়—আর কারও। সে মুখ—

জ্ঞান হয়ে দেখল প্রমীলা তার মাথাটা কোলে নিয়ে ব্যাকুল ভাবে ঝুঁকে পড়েছে। ওর মুখে-চোখে আতঙ্ক।

ওকে চাইতে দেখে প্রমীলা বলল, উর্ম্মি, এখন কেমন বোধ করছিস? এক কাপ গরম দুধ এনে দেব?

না—ভালই আছি। উর্ম্মিলা উঠে বসল।

অমনধারা হ'ল কেন রে?

ও কিছু না, মাথাটা কেমন ঘুরে গেল—তাই। অনেকক্ষণ ছিলাম বুঝি?

না—অল্পক্ষণই। ডাক্তারকে খবর পাঠিয়েছি।

পাগল! হাসল উর্ম্মিলা। কিছুই হয় নি তো। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয় নি, তাই হয় তো—

হেসে উড়িয়ে দিল কথাটাকে। মনে মনে বুঝল—এ দুর্ব্বলতা শুধু দেহের নয়, মনেরও। মন দুর্ব্বল না হলে যা সকলের ভাল লাগে—তা ওর চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে কেন? কত ভাল লাগত বিকেলবেলাটিকে—ছাদে উঠে দূর আকাশের পানে চেয়ে থাকত মুগ্ধ বিস্ময়ে! গোধূলিলগ্নে আকাশে যখন ধূসর রং ধরত—দিক্-চক্রবাল সীমা থেকে উড়ে আসত বকের পাঁতি। সন্ধ্যার আগে বাসায় পৌঁছবে বলে কত ত্বরা ওদের। কখনো তীব্র স্রোতের মুখে সাদা ফুলের ঘন একটি মালা হয়ে ভেসে যেত দূরে—কখনও বা একটি বায়ুমুখ তীরের মত মাথার উপর দিয়ে ছুটত সেই পাঁতি। গতির তরঙ্গ—সৌন্দর্য্যের স্বাদে অপরূপ হয়ে উঠত—কি যে ভাল লাগত! আজ অপরাহ্নের আকাশের পানে চাইতে ইচ্ছা করে না; ছাদে ওঠা ছেড়েই দিয়েছে উর্ম্মিলা। ভোরবেলাকার আকাশও ওকে মুগ্ধ করে না আর! ঘরের সজ্জা—নিজের সজ্জা কিছুই ভাল লাগে না। পৃথিবীর আছে সুন্দরের পিপাসা, সে পিপাসা মানুষের মনেও। কিন্তু যে মানুষের পৃথিবী গেছে ফুরিয়ে···

সৌন্দর্য্য দেখলে আজ উর্ম্মিলার দু'টি চক্ষু জ্বালা করে ওঠে। রুণুকে দেখলে এক একবার হঠাৎ মনে হয়, ওকে দুঃখ দেবার জন্য সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছে। সবাই ওর শত্রু। ভাবতে ভাবতে প্রায়ই জ্ঞান হারায় উর্ম্মিলা।

ডাক্তার বললেন, শক্টা বেশীই পেয়েছেন—ওঁকে এখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যান।

প্রমীলা ঠিক করল—পূজার বন্ধে সবাই মিলে পুরী গিয়ে থাকবে মাসখানেক। উর্ম্মিলাকে জিজ্ঞাসা করল, কি রে, যাবি?

যাব। উর্ম্মিলা সাগ্রহে বলল।

যাবার আগের দিন প্রমীলা বলল, দেখ, উর্ম্মি রুণুর পোশাক-গুলো তুই গুছিয়ে দিস—মাঝারি সুটকেসটায়। ওটা তোর জিম্মাতেই থাকবে।

মাঝারি সুটকেসে ধরল না পোশাকের রাশি—উর্ম্মিলা বড় সুটকেসটা নিয়ে পোশাক গোছাতে বসল। বিচিত্রবর্ণের পোশাক, নানা ডিজাইনের। এ পর্য্যন্ত যত রকমের জামা ও ইজেরের ছাট-কাট শিশুরাজ্যে দখলীস্বত্ব নিয়েছে—তার কোনটিই বাদ পড়ে নি। রুণুর গায়ে উঠলে সব ক'টিরই বাহার খোলে। ফরসা গোলগাল চেহারার ছেলে—ভাসন্ত চোখ, কোঁকড়ানো চুল—যা পরে, মানায়। শুধু মানায় না, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করে। যেমন কার্সিয়াঙের সুদৃঢ় কাঞ্চনজঙ্ঘার বিস্ময়কর প্রকাশ—যেমন ঝাউ, দেবদারু ছায়া-আশ্রিত ঢেউখেলানো ধূমল পাহাড়ের গায়ে রক্তবর্ণ গোলাপের রূপ-আলিম্পন, যেমন শৈলসানুদেশে হরিৎ শষ্পাচিত্রিত একখানি গ্রাম।

শুধু এক জনের জন্য নয়, জোড়া মিলিয়ে তৈরী হয়েছিল এই সব বিচিত্রবর্ণের পোশাক। আর এক জনের গায়ে উঠেও করেছিল সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রয়াস। কিন্তু হায়···হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল। সামনে দাঁড়িয়ে ছিল রণু—তাকে ধরে সামলাবার চেষ্টা করলে উর্ম্মিলা। কিন্তু সে প্রচণ্ড বেগ রোধ করবার সাধ্য ছিল না ওর। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগল—এই বুঝি শেষ—জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হতে বিলম্ব নাই আর।

জ্ঞানের রাজ্যে ফিরে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল উর্ম্মিলা। রুণুকে সকল শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল সে। রুণু শ্বাস রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল। সে আর্ত্ত স্বর উর্ম্মিলার কানে পৌঁছল না। সুন্দরের প্রতি বিতৃষ্ণাকে জয় করতে না পারলে ওর মৃত্যু অনিবার্য্য। ওকে বাঁচতেই হবে—ফিরে আসতে হবে জীবনের রাজ্যে, ফিরে আসতে হবে জ্ঞানের রাজ্যে···

বিচারক বললেন, কেন আপনি এমন কাজ করলেন! ছেলের বাপ মা এমন কি আচরণ করেছিলেন যা আপনার মনকে ক্ষুব্ধ করেছিল? এদের দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে কি—

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এল উর্ম্মিলার। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিচারকের পানে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে ও বলল, ওসব কিছুই হয় নি। ছেলেটাকেই আমার ভাল লাগত না।

কারণ? শুনেছি আপনি ওকে খুবই স্নেহ করতেন—নিজের ছেলের চেয়েও—

না—না—না। আর্ত্ত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল উর্ম্মিলা।

বিচারক বললেন, তা ছাড়া ছেলেটি দেখতেও সুন্দর। সুন্দর জিনিস যে দেখে তারই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। আপনিও নিশ্চয়—

স্থির কণ্ঠে জবাব দিল উর্ম্মিলা, না—আমি ভালবাসি না। সুন্দর জিনিস আমার দু'চক্ষের বিষ! পৃথিবী মোটেই সুন্দর নয়। তাই সৌন্দর্য্যকে আমি পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলাম। আমি ভুল করি নি—অন্যায় করি নি—

রূপান্তর

শ্রীকালীপদ ঘটক

যতদিন ছিলে কাছে
মনে হতো সবই আছে,
এ জগতে সবই মধুময়।
তুমি আছ, আমি আছি,
দু' জনের কাছাকাছি;
আছে প্রেম চির অক্ষয়।

যেই দূরে সরে গেলে
সব কিছু হরে গেলে,
দিকে দিকে রঙ্গহীন কালো।
তুমি নাই, আমি নাই,
চির দিবা যামী নাই;
নিভে গেছে পৃথিবীর আলো।

জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ—কাহার স্বার্থে ?

শ্রীকরুণাকুমার নন্দী

২

পূর্ব প্রবন্ধে জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ হইবার প্রাক্কালে বীমাকারীর স্বার্থসংরক্ষণ ব্যবস্থার কি আয়োজন প্রচলিত ছিল তাহার বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। এই আলোচনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ করা গিয়াছে যে, প্রচলিত আইনের দ্বারা বীমা কোম্পানীর পরিচালকদের হাত এমন ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল যে, সেই আইনের নির্দেশ সম্পূর্ণ মানিয়া চলিলে পরিচালকের দোষে বীমাকারীর স্বার্থে অপঘাত লাগিবার আশঙ্কা একরকম ছিল না বলিলেই হয়। যে সকল ক্ষেত্রে আইনের নির্দেশ উপেক্ষা করিবার ফলে বীমাকারীর স্বার্থে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, সরকারী কন্ট্রোলার মহাশয়কেই সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা উচিত। আইনের নির্দেশ উপেক্ষা বা অমান্য করিলে বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালকগোষ্ঠীকে সমষ্টি ও ও ব্যক্তিগত দুই ভাবেই দায়ী করার আয়োজন আইনে লিপিবদ্ধ করা ছিল। এই আইন প্রয়োগ করিবার হর্তা-কর্তা ছিলেন কন্ট্রোলার, ক্ষেত্রবিশেষে তাহা না করিবার জন্য তাঁহাকে দণ্ডিত করাই উচিত ছিল। কিন্তু তাহার বদলে দোষীকে পুরস্কৃত করিয়া রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা সমগ্র ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়টিকেই এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র বীমাকর্মী ও গৌণভাবে লক্ষ লক্ষ বীমাকারীদিগকেও দণ্ডিত করা হইল!

অতএব বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার অছিলায় জীবনবীমা ব্যবসায়ের সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ একটা অজুহাত মাত্র আসল উদ্দেশ্য অন্য এবং তাহা খুব প্রচ্ছন্নও নহে। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা বীমাকারীর স্বার্থ অধিকতর সুরক্ষিত হইল বা উহা বিপদগ্রস্তই হইয়া পড়িল সে কথাটাও বিচার করিয়া দেখিবার মত। অল্পদিন পূর্বে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার "চিঠিপত্র" বিভাগে একটি পত্র প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছিলাম। এই পত্রপ্রেরক জানাইতেছেন যে, সাধারণতঃ তিনি তাঁহার নিজের জীবনের উপরে গৃহীত বীমাপত্র বাবদ চাঁদার টাকা নির্দিষ্ট সর্বশেষ দিনে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর ঐ ভাবেই সর্বশেষ দিনে তিনি পিয়ন মারফত চাঁদার টাকা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু এঁদের সময়ের অভাবের অজুহাতে ঐদিন চাঁদার টাকা—বড় বেশী কাজ এবং এখন শেষ মুহূর্তে টাকা লইয়া রসিদ দিবার সময় নাই এই অজুহাতে—লইতে অস্বীকার করিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সর্বশেষ নির্দিষ্ট দিনে চাঁদা দিবার মৌলিক অধিকার বীমাকারীকে বীমাপত্রের সর্ত অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে, কোনও অজুহাতেই কেহ তাহার এই মৌলিক অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে না। লক্ষ লক্ষ বীমাকারী এই ভাবেই সর্বদা তাহাদের দেয় চাঁদার কিস্তী দিয়া থাকে। এভাবে শেষ দিনে ইচ্ছামত চাঁদার টাকা লইতে অস্বীকার করিলে কত বীমাপত্র যে ল্যাপ্স হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থায় কত রকমে যে বীমাকারীর স্বার্থ বিপদগ্রস্ত হইবে তাহা অনুমানে বলা কঠিন। কিন্তু সরকারী অধিকাংশ ব্যাপারেই যেমন হইয়া থাকে, সাধারণের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীদের ইচ্ছা বা অভিরুচির উপরে নির্ভর করিয়া থাকিলে, এক্ষেত্রেও যে অনুরূপ হইবে না তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যে কেহ কখনও কোন সরকারী দপ্তরের সহিত কারবার করিয়াছেন তাঁহারাই এই উক্তির তাৎপর্য মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন।

বীমা কোম্পানীগুলির পরিচালনায় যখন জীবনবীমা ব্যবসায় চলিত তখন বীমাকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের সবার চেয়ে নিশ্চিত ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। পূর্ব প্রবন্ধেই দেখান হইয়াছে কি করিয়া এই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে সম্প্রতি বীমাপত্রের চাঁদার হার প্রভূত পরিমাণে কমিয়া গিয়াছিল। এই ক্ষেত্রে ভারত সরকারের রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থাই এখন একক ব্যবসায়ী বা monopolists হইয়া বসায় এই প্রতিযোগিতার অবসর আর থাকিবে না। তাহার ফলে নানা ভাবে বীমাকারীর অর্থের অপচয় ঘটিয়া চাঁদার হার যে আবার বাড়িয়া যাইবে না একথা কে বলিতে পারে?

যাহা হোক, বীমাকারীর স্বার্থরক্ষার কথা যদি কেবলমাত্র অজুহাত, তবে জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের আসল উদ্দেশ্য কি? পূর্বেই বলিয়াছি, আসল উদ্দেশ্য খুব প্রচ্ছন্ন ছিল না। বক্তৃতায়, বিবৃতিতে, নানা ভাবে সরকার পক্ষ হইতে এই উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করা হইয়াছে। সরকারী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে দেশের ধনসংস্থার (economy) রাষ্ট্রায়ত্ত বিভাগে

(public Sector) ন্যূনাধিক ৫,০০০ পাঁচ হাজার কোটি টাকা পুঁজি লগ্নীর প্রয়োজন হইবে হিসাব করা হইয়াছে। যতপ্রকার সম্ভাব্য উপায় হইতে যতটা সম্ভব অর্থ সংগ্রহের আয়োজন করিয়াও হিসাবে আরও অন্ততঃ ১২০০ কোটি টাকার পুঁজির ঘাটতি পূরণ করা দরকার হইবে। নূতন ট্যাক্সের আমদানী, সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ ইত্যাদি ধরিয়া লইয়াও আরও প্রায় ৯০০ কোটি টাকার ঘাটতি থাকিয়া যায়। জীবনবীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা উহার সঞ্চিত আমানতী প্রায় ৪০০ কোটি টাকার লগ্নী সরকারের আয়ত্তে আসিয়াছে। ইহা লগ্নী করা অর্থ এবং ইহার শতকরা প্রায় ৬৬ ভাগই সরকারী ঋণে লগ্নী করা ছিল। কিন্তু এই ৪০০ কোটি টাকা লগ্নীর ঋণমূল্য বা credit value সরকারী আয়ত্তের মধ্যে থাকিবে। ইহা ছাড়া জীবনবীমা ব্যবসায়ের বার্ষিক নীট লগ্নীযোগ্য আয় বা investable surplus (অর্থাৎ, সকল প্রকার ব্যয় ও দায় মিটাইয়া যে অর্থ লগ্নীর জন্য অবশিষ্ট থাকে) বর্তমান হারে দাঁড়ায় প্রায় বাৎসরিক ৩৫।৪০ কোটি টাকায়। জীবনবীমা ব্যবসায় দ্রুত প্রগতিতে আগাইয়া চলিতেছিল। কিছুকাল পূর্বের অর্থমূল্যের উঠ্‌তি-পড়তির কারণে এই প্রগতির গতি সাময়িক ভাবে দুই-এক বৎসরের জন্য ব্যাহত হইলেও সাধারণ অবস্থায় এ ব্যবসায়ে বার্ষিক শতকরা ২০।২৫ ভাগ স্ফীতি খুবই সম্ভাব্য বলিয়া মনে হয়। যদি মোটামুটি শতকরা বার্ষিক ২০ ভাগ স্ফীতির গতি অব্যাহত রাখিতে পারা যায় তবে এই ব্যবসায়ের দ্বারা ৫ বৎসরে মোট ২৬০ কোটি টাকা নীট লগ্নীর জন্য অবশিষ্ট থাকিবার কথা। অর্থাৎ এক জীবনবীমা ব্যবসায়ের সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পুঁজির ঘাটতির অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বা তাহারও বেশী পূরণ করিয়া লওয়া সম্ভব হইতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যাপারটাও এমন কঠিন কিছু নহে, রাষ্ট্রশক্তি আয়ত্তেই রহিয়াছে, তাহার জোরে কাড়িয়া লইলে কে বাধা দিতে পারে ? অবশ্য এই কাড়িয়া লওয়াটাকে পৃষ্ঠপোষকের বিপুল সংখ্যাধিক্যের জোরে পার্লামেণ্টে আইনের সঙ্গতি ও সম্মতি দিলেই চলিবে। হইয়াছেও তাহাই।

স্বাধীনতার পর হইতে কোন কোন ব্যবসা সরকারপক্ষ হইতে অনুরূপ ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইহার পূর্ব্বেও করা হইয়াছে। কিন্তু কেবল এক বিমান-পরিবহন ব্যবসায়টিকে বাদ দিলে অন্য কোনও ক্ষেত্রেই এমন সামগ্রিক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয় নাই। বিমান-পরিবহন ব্যবসায়টির কথা একটু ভিন্ন। এই ব্যবসায়টি অনেকটা সরকারী অর্থসাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আন্তঃস্বদেশীয় পরিবহন ক্ষেত্রেই ইহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। অর্থ বাণিজ্যের (credit industry) ক্ষেত্রে জীবনবীমা ব্যবসায়ের উপরে হাত দিবার পূর্বে কেবল এক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কেবলমাত্র ঐ ব্যাঙ্কটিকেই এভাবে সরকারী হাতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, দেশের সামগ্রিক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়টিকে নহে। এ ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কায়েমী আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা যাহা ছিল তাহার কোন অদলবদল করা হয় নাই, কেবল মালিকানা স্বত্ব প্রভৃত ক্ষতিপূরণ স্বীকার করিয়া পূর্ব অংশীদারদের হাত হইতে সরকারী হাতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র।

জীবনবীমা ব্যবসায়ের বেলা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ব্যবস্থায় নতুন পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এদেশে সর্বসাকুল্যে ১৫৭টি দেশী কোম্পানী কেবলমাত্র জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল এবং আরও ৪১টি দেশী কোম্পানী অন্যান্য ধরনের বীমা ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবনবীমা ব্যবসায়ও করিত। উল্লেখযোগ্য যে, শেষোক্ত দলের মধ্যে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানীটিও ছিল। ইহা ছাড়া আরও ১৯টি বিদেশী কোম্পানী অন্যান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে জীবনবীমা ব্যবসায়ও করিত। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা এদেশে যত দেশী ও বিদেশী কোম্পানী জীবনবীমা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল তাহাদের সামগ্রিক জীবনবীমা ব্যবসায়টিও তৎসম্পর্কিত আয়, তহবিল ইত্যাদি সকলই রাষ্ট্রাধীন করিয়া লওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ ২১৭টি বড়, মাঝারি, ছোট নানা আকারের বিভিন্ন জীবনবীমা সংস্থা মিলিয়া যে কাজটুকু করিত তাহা সমগ্র ভাবে একটি একক রাষ্ট্রাধীন সংস্থায় পরিণত করিয়া লওয়া হইল।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কটিকে যখন রাষ্ট্রাধীন করিয়া লওয়া হইয়াছিল তখন তাহার চলমান বা functional দিকটায় কোনও আকস্মিক আঘাত লাগে নাই। ব্যাঙ্কের সকল শাখাপ্রশাখা সমেত এটি যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল, কেবল মালিকানা বদল হইল মাত্র। জীবনবীমা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত ২১৭টি কোম্পানী ও তাহাদের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাগুলিকে কিন্তু নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিবার প্রয়োজন হইল। পূর্বে প্রত্যেক কোম্পানী আইনের নির্দ্দেশের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া আপন আপন বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী তাহাদের ব্যবসায় চালাইত। তাহাদের চাঁদার হার পরস্পর হইতে ভিন্ন ছিল, বীমাকারীর সহিত চুক্তিপত্রে বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে নানা রকমের বৈচিত্র্য ছিল, মুনাফার হার কম বেশী ছিল। সমগ্র ব্যবসায়টিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া এক কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রানুগত জীবনবীমা সংস্থার মধ্যে এতগুলি বিভিন্ন কোম্পানীকে আনিয়া ফেলিতে তাহাদের

ব্যবসায় প্রণালী ইত্যাদি সকলই একটি একক (uniform) নিয়ম ও প্রণালীর মধ্যে বাঁধিয়া লওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অর্থাৎ, সমগ্র ব্যবসায়টিকে একটা নির্দিষ্ট ছাঁচে নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইল। ৮৫ বৎসর ধরিয়া চলতি ক্রমবর্ধমান এবং নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ এরূপ একটি বিভিন্ন পরিচালনায় নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে সামগ্রিক ভাবে ঢালিয়া সাজা সহজ নয়, সমীচীনও বোধ হয় নয়। যাহা হউক এই ঢালিয়া সাজার কাজ বর্তমানে চলিতেছে, কবে ইহা সম্পূর্ণ হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যে এই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজার হিড়িকে চলতি কাজ অবশ্যম্ভাবী ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বীমাকর্মীদের নিকট হইতে যাহা শোনা যায় তাহাতে মনে হয় যে, নূতন বীমাপত্রের ক্ষেত্রে চলতি কাজের পরিমাণ তাহার স্বাভাবিক অঙ্কের প্রায় এক-দশমাংশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে। অতটা যদি নাও হইয়া থাকে তবু যে চলতি কাজের পরিমাণ সাংঘাতিক ভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

জীবনবীমা ব্যবসায়টি অন্যান্য নানা বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় হইতে একেবারেই অন্য রকম। ইহাকে গাণিতিক বা mathematical ব্যবসায় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের নিয়মের ধারা এবং ইহার চলতি প্রণালী সম্পূর্ণ ভাবে গাণিতিক হিসাবের উপরে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত। সেই কারণে জীবনবীমা ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি ও ইহার চলতি প্রণালী জীবনবীমা ব্যবসায়ের গাণিতিক প্রক্রিয়ায় শিক্ষিত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের নিয়ন্ত্রণের উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। শুনা যায় যে, রাষ্ট্রাধীন নূতন জীবনবীমাধিকরণ প্রতিষ্ঠা করিবার কালে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সাহায্য ও পরামর্শ সরকারপক্ষ হইতে লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই নূতন জীবনবীমাধিকরণে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার কাজেও যে এ প্রকার বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন হইতে পারে সে ধারণা সম্ভবতঃ সরকারী মহলে স্বীকৃত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের অতীত ইতিহাসের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এই ব্যবসায়ের সুরু হইতে অনেকদিন পর্যন্ত পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ীদিগের ধারণা ছিল যে, বীমা-বিশেষজ্ঞ বা এ্যাকচুয়ারীর দ্বারা জীবনবীমা কোম্পানীগুলির চাঁদার হার ইত্যাদি এবং বীমাপত্রের সর্তাদির খসড়া করাইয়া লওয়া এবং প্রতি ত্রৈবার্ষিক, চতুর্বার্ষিক বা পঞ্চবার্ষিক হিসাবনিকাশ করাইয়া লইলেই জীবনবীমা ব্যবসায় সুষ্ঠুভাবে চলিতে পারে। কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন পরিচালনা, ইহার তহবিল লগ্নীকরণ ইত্যাদি অন্যান্য সকল রকম পরিচালন নিয়ন্ত্রণ কাজে এ সকল বিশেষজ্ঞের বিশেষ কোনও কাজ নাই। এ ধারণা যে আজিও একেবারে মুছিয়া গিয়াছে তাহাও নহে। এভাবে সাধারণ ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাধীনে বহু জীবনবীমা কোম্পানী বড়ও হইয়াছে ইহাও সত্য। কিন্তু সমস্ত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য কোম্পানীগুলির তুলনায় যে সকল কোম্পানীর পরিচালন-দায়িত্ব বিশেষ ভাবে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বীমা-বিশেষজ্ঞদের উপরে ন্যস্ত ছিল, সেগুলি অনেক বেশী দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠু ভাবে কাজ করিয়াছে, কম খরচে বেশী পরিমাণ কাজ করিতে পারিয়াছে, বীমাকারীর স্বার্থ নানা দিক দিয়া অধিকতর সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং তাহাদের প্রগতির গতি বিজ্ঞানানুমোদিত পথে দ্রুততর পরিণতি লাভ করিয়াছে।

সরকারী জীবনবীমাধিকরণে দুই-চারিটি দক্ষ বীমা বিশেষজ্ঞকে যে লওয়া হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু এই সামগ্রিক (monopolist) নূতন অধিকরণের সকল ব্যবস্থাপনায় তাঁহাদের পিছে সরাইয়া দিয়া যাঁহারা সম্মুখে আগাইয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের না আছে কোন বিজ্ঞানানুমোদিত বিশেষজ্ঞ শিক্ষা, না আছে জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালনে কোনও বিশেষ পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা। দুইটি ব্যক্তি বিশেষ করিয়া এই রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের সর্বাধিনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছেন দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের একজন ভারত সরকারের রাজস্ব ও অসামরিক ব্যয় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীএম. সি. শাহ ও অন্য জন ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের অন্যতম কর্মসচিব শ্রীএইচ এম প্যাটেল। ইঁহাদের এক সরকারী ক্ষমতার জোর ছাড়া এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার গুরু দায়িত্ব লইবার মত অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা কোনটাই আছে বলিয়া শুনাও যায় নাই, দেখাও যাইতেছে না। অথচ অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ধুরন্ধর শ্রেষ্ঠ শ্রী কৃষ্ণমাচারী কি করিয়া ইঁহাদের এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল করিলেন তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। একমাত্র কারণ হইতে পারে যে, ইঁহারা দু'জনেই অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের অনুগত তাঁবেদার এবং অর্থমন্ত্রী ইঁহাদের মাধ্যমে এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির উপরে নিজস্ব ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবার সুযোগ পাইবেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অঙ্কের দিক দিয়া বিচার করিলে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণ বর্তমানে এদেশের বৃহত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। সঞ্চিত ও বার্ষিক চলতি মোট আমদানীর দিক হইতে বিচার করিলে একমাত্র রেলওয়ে
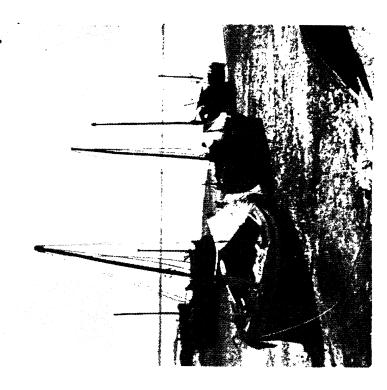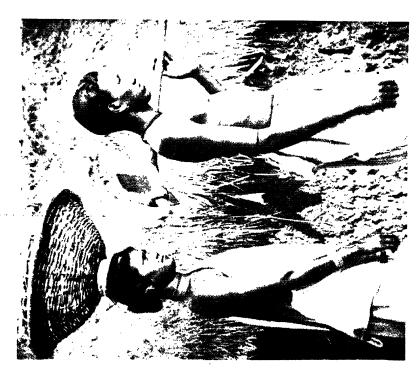
কাজের ডাক [ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

ডাঙ্গায় পরিত্যক্ত [ফোটো—শ্রীবিনয়ভূষণ দাস

সফদারগঞ্জ বিমানঘাঁটিতে শ্রীভি. কে. কৃষ্ণমেনন এবং ডাঃ সৈয়দ মামুদসহ জার্ম্মানীর ফেডারাল রিপাব্লিকের পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ হাইনরিখ ফন ব্রেণ্টানো
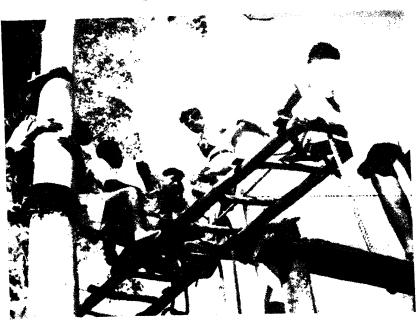
দেরাদুনে আই-এ-এফ অফিসারদের 'সিলেকশ্যন বোর্ডের' সমক্ষে কর্ম্মপ্রার্থীদের একটি যৌথ-কৃত্য সম্পাদন

ব্যতীত আর এমন কোনও একক একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এখন এদেশে নাই যাহা কোনও রকমেই এই প্রতিষ্ঠানটির সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালন ব্যবস্থাপনায় অসাধারণ দক্ষতা ও সাবধানতার প্রয়োজন সহজেই অনুমিত হইবে। দুইটি গুণের একত্র সমাবেশেই কেবল এরূপ প্রয়োজনীয় দক্ষতা লাভ হইতে পারে—এ ব্যবসায়ের বৈজ্ঞানিক পরিচালন-প্রণালীতে সর্বোচ্চতম বিশেষজ্ঞ শিক্ষা ও এই ব্যবসায় পরিচালনায় প্রভুত পূর্ব অভিজ্ঞতা। দুঃখের বিষয়, এমন সব ব্যক্তি এরূপ বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লইয়াছেন, যাঁহারা এই দুইটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণের কোনটারই অধিকারী নন। ফলে এ পর্য্যন্ত ইহার ব্যবস্থাপনায় যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে একটা অসম্ভব জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র, কার্য্যকরী কোনও ব্যবস্থাই হয় নাই।

অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভার পড়িলে তাহাতে যে কেবল জটীলতারই সৃষ্টি হয় শুধু তাহাই নহে, নানা অন্যায় ও অবিচারও হইয়া থাকে। জীবন বীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রক্রিয়ায় এভাবে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ অন্যায় ও অবিচার যে এ পর্য্যন্ত হইয়াছে এবং তাহা অপনোদন প্রচেষ্টায় যাহারা ভুক্তভোগী তাহাদের সকল আবেদন যে সরাসরি অগ্রাহ্য করা হইয়াছে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ নিত্যই পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন অঞ্চলে পূর্বেকার কোম্পানী-বিশেষের ভূতপূর্ব কর্মচারীরা কিম্বা বিশেষ করিয়া বাছাই করা কোন কোন কোম্পানী বিশেষের কর্মচারীদের বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে এবং ইঁহাদের চেয়ে দক্ষতর, এমনকি পূর্বে উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত অনেককে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পদ লইতে বাধ্য করা হইয়াছে, কিম্বা যাঁহারা তাহাতে স্বীকৃত হন নাই, তাঁহাদের কোনও পদই জোটে নাই। এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ লেখকের নিজেরই জানা আছে। একটি বিভাগীয় দপ্তরে (Divisional office) ম্যানেজার করা হইয়াছে এমন একজনকে যিনি মাত্র ৮ বৎসর পূর্বে একটি কোম্পানীর শাখা দপ্তরের কেরাণীর পদ হইতে শাখা-অধ্যক্ষের পদ পাইয়াছিলেন এবং যাঁহাকে সেই কোম্পানী ক্রমে বড় মাঝারী এবং সর্বশেষে ছোট্ট একটি শাখা আপিসে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। সেই একই দপ্তরে এমন আর একজনকে সামান্য ডেভেলপমেণ্ট এ্যাসিষ্ট্যোণ্টের পদে বহাল করা হইয়াছে যিনি বড় বড় কোম্পানীর বৃহত্তম শাখা আপিস বহুকাল ধরিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। আবার একটা আঞ্চলিক দপ্তরের সর্বাধিনায়ক করিয়া এমন একজনকে বসান হইয়াছে যিনি বুক ঠুকিয়া অধিকতর ল্যাপ্স হইবে জানিয়াও বার্ষিক ব্যবসায়ের অঙ্ক স্ফীত করিতে এবং এই লইয়া প্রকাশ্যে বড়াই করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। এই মহাত্মাটি একটি কোম্পানীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এবং ইনি একচুয়ারীও বটেন। একদা তাঁহার পরিচালনায় কোম্পানীটির আপাতঃ ব্যবসার পরিমাণ বাড়িলেও ল্যাপ্স যে অপেক্ষাকৃত আরও বেশী বাড়িতেছে এ প্রশ্নের জবাবে একটি বীমাকর্মী সভায় নির্লজ্জের মত তিনি বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে ল্যাপ্স লইয়া অনর্থক লোকে মাথা ঘামাইয়া থাকে—ব্যবসায়ের পরিমাণের দ্রুত ও বৃহদায়তন প্রসার লাভ করিতে হইলে, অনুপাতের অধিক ল্যাপ্স অবশ্যম্ভাবী এমনকি লাভজনকও বটে। জীবনবীমা ব্যবসায়ের গাণিতিক ভিত্তির সহিত যাঁহারা সামান্যমাত্র পরিচিত আছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কমপক্ষে ৩ বৎসর চলিবার পূর্বে প্রতিটি ল্যাপ্স হওয়া পলিসি একদিক দিয়া যেমন কোম্পানীর—অর্থাৎ স্থায়ী বীমাকারীর আর্থিক স্বার্থহানিকর, তেমনি সমগ্র জীবনবীমা ব্যবসায়ের দিক দিয়াও ঐগুলি সুনামের হানিকর। তথাপি যেভাবে আমাদের দেশে জীবনবীমা ব্যবসায় পরিচালিত হয়, যাহাদের দিয়া বীমাপত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থাপনা করিতে হয়, তাহাতে অন্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ল্যাপ্সের পরিমাণ অবশ্যম্ভাবী ভাবে কিছু বেশী সর্বদাই হইয়াছে। সকল সুপরিচালিত বীমাকোম্পানীই সর্বদা ঐদিকে নজর রাখেন এবং অনবরতঃই নানা ব্যবস্থা ও সর্ত্তের দ্বারা ল্যাপ্সের পরিমাণ কমাইবার চেষ্টা সততই করিয়া থাকেন। কেহ ল্যাপ্স বাড়া ভাল এ বলিয়া বড়াই করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণের এই নবনিযুক্ত আঞ্চলিক সর্বাধিনায়ক বা 'Zonal Manager'টি এককালে তাহাও করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি যখন পূর্ববর্ণিত কোম্পানীটির সর্বাধিনায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিগত আয়ের খানিকটা তাঁহার পরিচালনাধীন কোম্পানীর বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণের উপরে নির্ভরশীল ছিল। সে যাহাই হউক, শিক্ষিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারের পক্ষে এ ভাবে ল্যাপ্সের গুণকীর্তন হইতে এটুকু স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এ রকম মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে বীমাকারী স্বার্থজড়িত দায়িত্বপূর্ণ ও তদনুযায়ী ক্ষমতাসম্পন্ন পদে প্রতিষ্ঠিত করায় বিপদ ঘটা অসম্ভব নহে।

এ দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, নূতন জীবনবীমাধিকরণে ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠালাভ যে কেবলমাত্র শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিতেছে তাহা নহে। রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমাধিকরণে যাঁহাদের, অন্ততঃ কোন কোন অঞ্চলে, গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজে

বহাল করা হইয়াছে, প্রতিযোগিতামূলক কার্য্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতা, কিম্বা পুর্বার্জিত সুনাম ও দক্ষতার উপরেই মাত্র তাঁহাদের নিয়োগ নির্ভর করে নাই। অবশ্যম্ভাবীরূপে ইঁহাদের অন্ততঃ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, নিয়োগ করা হইয়াছে ব্যক্তিগত প্রভাব ও অনুরূপ কোন কারণে। সাধারণের মনে এরূপ একটা ধারণা যে ইহার মধ্যেই বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং ইহার ফল যে নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা সংস্থার পক্ষে কিরূপ বিষময় হইতে পারে তাহার সম্যক্ ধারণা প্যাটেল-শাহ্ জোটের আছে কিনা জানি না।

পুর্বেই যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে যে, মোটের উপরে কোম্পানীসমূহের ব্যক্তিগত পরিচালনাধীনে এই ব্যবসায় চলিতে থাকার কালে, দায়িত্বহীন কিম্বা অসৎ পরিচালনার দ্বারা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বীমাকারীর স্বার্থে অপঘাত লাগিবার দায়িত্ব ঐ সকল কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলীর যতটা ছিল, সরকারী বীমাকন্ট্রোলারের নিজেরও তাহার কম ছিল না। তিনি তাঁহার দায়িত্ব যথাযথভাবে বহন করিলে এবং আইন-নির্দিষ্ট কর্তব্য নিরপেক্ষ ভাবে পালন করিলে এরূপ ঘটা সম্ভব হইত না। ইহার দ্বারা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ফলেও সরকারী সততার উপরে সাধারণের আস্থা এক প্রকার ছিল না বলিলেই হয়। সেই অবস্থায় নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থার উপরে এমনি সাধারণের আস্থা গড়িয়া তোলা কঠিন হইত। তাহার উপরে দায়িত্বপূর্ণ ও ক্ষমতাবান পদে এই নতুন সংস্থায় কর্ম-কর্তা নিয়োগের যে প্রণালী এ পর্য্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে অবলম্বিত হইয়াছে তাহার দ্বারা এই আস্থার অবশিষ্টাংশও সমূলে ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছে। অন্যপক্ষে নিম্ন পদাধিকারীদিগকে লইয়া ইঁহারা যে খেলা খেলিতে সুরু করিয়াছেন তাহার দ্বারা রীতিমত ভয়াবহ অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহা সর্বজনবিদিত প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, জীবনবীমা ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি ইহার বীমাপত্র বিক্রয় আয়োজনের উপরে। এই আয়োজনটির এদেশে কায়েমী প্রতিকৃতিতে নানারকম বৈচিত্র্য অবস্থিত ছিল। কিন্তু মোটামুটি এই আয়োজনের সামগ্রিক আকারে প্রধানতঃ তিনটি স্তরভেদ ছিল। কোম্পানী ও বীমাপত্র-ক্রেতার অন্তর্বর্তী ব্যবধান পূর্ণ হইত অর্গানাইজার, ইন্সপেক্টার ইত্যাদি কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারী, স্পেশাল এজেন্ট ও এজেন্টদিগের দ্বারা। মোটামুটি বীমাপত্র বিক্রয়ে প্রাথমিক বা 'primary' দায়িত্ব বহন করিত এজেন্টগোষ্ঠী। কিন্তু এজেন্টদিগের নিকট হইতে কাজ আদায় করিবার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিত কমিশনভোগী স্পেশাল এজেন্ট বা বেতনভোগী ইন্সপেক্টার, অর্গ্যানাইজার কিম্বা সময়ে সময়ে একাধারে উভয়েরই উপরে। পূর্ব অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, কোম্পানীর বেতনভোগী ইন্সপেক্টার বা অর্গানাইজার ইত্যাদির সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র এজেন্ট বা স্পেশাল এজেন্টদের দ্বারা আশানুরূপ ফল-লাভ হওয়া সম্ভব হয় না। এই মোটামুটি কাঠামো অনুযায়ীই প্রধানতঃ সকল জীবনবীমা কোম্পানীর বীমাপত্র বিক্রয় আয়োজন গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। অবশ্য ইহার মধ্যেও বিভিন্ন কোম্পানীর আয়োজনে নানা রকম-ফের ছিলই।

সাধারণতঃ এই আয়োজনে কোম্পানীর বেতনভোগী কর্মচারীদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে অনিশ্চয়তাপূর্ণ। কোন কোন কোম্পানী অবশ্য ইঁহাদিগকে তাহাদের নিজেদের কায়েমী কর্মচারীগোষ্ঠীর অন্যতম বলিয়া গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাদের চাকুরী পাকা বনিয়াদের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের সর্বাগ্রগণ্য বীমাকোম্পানীগুলির অন্যতম একটিতে এইরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল এবং ইহার অনুসরণে কোম্পানীর ব্যবসায়ের সর্বদিক দিয়া প্রভূত উন্নতিও হইতে-ছিল। বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণে যেমন এই কোম্পানীটি সর্বাগ্রে ছিলেন, তেমনি পরিচালন ব্যয়ও ছিল ইঁহাদের প্রায় নিম্নতম স্তরে—অন্যদিকে বীমাকারীদিগের মধ্যে বণ্টনযোগ্য মুনাফার হারও ছিল ইঁহাদের প্রায় সর্বোচ্চ হারে।

এই প্রসঙ্গে এই কোম্পানীটির বিক্রয় আয়োজনের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা সমীচিন। এই কোম্পানীটির প্রায় শৈশব হইতেই—ইহা ভারতের প্রাচীনতম জীবনবীমা কোম্পানীগুলির অন্যতম—একটা সুনির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানানু-মোদিত ধারায় ইহার বিক্রয় আয়োজনের কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিল। কোম্পানী ও বীমাকারীর অন্তর্বর্তী কেবলমাত্র দুই স্তরের কর্মী লইয়া ইহা কাজ করিত, এক, কোম্পানীর বেতনভোগী ইন্সপেক্টার ও দ্বিতীয়, ইন্সপেক্টারের অধীনস্থ-কমিশনভোগী এজেন্ট। ইন্সপেক্টাররা কোম্পানীর পাকা কর্মচারী ছিলেন এবং তাঁহাদের চাকুরীর স্থায়িত্ব ও অবসর গ্রহণের নিয়মাবলী মোটামুটি কোম্পানীর অন্যান্য সকল কর্ম-চারীর অনুরূপ ছিল। ইঁহাদের কাজ ছিল, কোম্পানীর সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিয়া কোম্পা-নীর এজেন্ট সংগ্রহ করা, তাহাদিগকে পরিচালনা করা এবং মোটামুটি কোম্পানীর ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রসার-কল্পে চেষ্টা করা। অন্যান্য অধিকাংশ ভারতীয় জীবনবীমা কোম্পানীর বিক্রয় আয়োজন ব্যবস্থা এরূপ পদ্ধতিতে পরি-চালিত হইত না। তাহাদের প্রায় সবাকারই অধীনস্থ বেতনভোগী ইন্‌স্‌পেক্টার বা অর্গ্যানাইজারদের চাকুরী ব্যবসায়ের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল থাকিত। বস্তুতঃ, তাহাদের চাকুরী প্রায় অন্য সকল ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ের পরি-

মাণের সর্ত্তাধীন ছিল। যদি কেহ ব্যবসায়ের পরিমানের সর্ত্ত পুরণে অক্ষম হইতেন, তবে তাঁহার চাকুরী থাকা না থাকা সম্পূর্ণ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের দয়ার উপরে নির্ভর করিত। আবার অনেক ক্ষেত্রেই এই সর্ত্তটি এমন ভাবে আরোপ করা হইত যে, ইন্সপেক্টার কিম্বা অর্গ্যানাজারের মাসিক বেতন পাওয়া না পাওয়া মাসিক বা ত্রৈমাসিক ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুযায়ী নির্ভর করিত।

বলা বাহুল্য, জীবনবীমা ব্যবসায়ের বিক্রয় আয়োজন ব্যবস্থার নিম্নোক্ত পদ্ধতি না ছিল সম্পূর্ণ বিজ্ঞানানুমোদিত না লাভজনক। মানুষের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা তাহার দৈনন্দিন জীবিকার উপায়ের স্থায়িত্ব ও নির্ভরশীলতা। ইহারই উপরে তাহার বিশ্বস্ততার মান এবং পরিশ্রমের প্রেরণা বহুল পরিমানে নির্ভর করে। অন্যপক্ষে জীবনবীমা ব্যবসায়ের লাভজনক প্রগতি অনেকটা পরিমানে নির্ভর করে পরিচালন ব্যয়ের ক্রমিক সঙ্কোচনে। দৈনন্দিন ব্যবসায়ের পরিমানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল আনুপাতিক বেতন বা ভাতা দ্বারা এই দুয়ের কোনটাই সম্ভব হয় না। সেই কারণে ভারতের প্রায় দুই শতাধিক চলতি জীবনবীমা কোম্পানীর মধ্যে সত্যকার প্রগতিশীল ছিল মাত্র গুটিকয়েক বিশিষ্ট কোম্পানী। বস্তুতঃ,ইহাদের মধ্যে মাত্র ছয়টি কোম্পানী সকল কোম্পানীর মিলিত বার্ষিক ব্যবসায়ের পরিমাণের শতকরা ৬৫ ভাগ নিজেদের দখলে আনিয়া ফেলিয়াছিল। জীবনবীমা কর্মচারীদের পক্ষ হইতে সেই কারণে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সংবাদটি আপাতঃ শুভ সংবাদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অধীনে তাঁহাদের চাকুরীর মান, স্থায়িত্ব ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় সকলকার চেয়ে প্রগতিশীল কোম্পানীর প্রণালীর অনুযায়ী পাকা হইবে এবং এই কাজে তাঁহারা কায়মনে তাঁহাদের সকল কৌশল, সকল দক্ষতা নিয়োগ করিবার সুযোগ লাভ করিবেন। ইহার দ্বারা ইঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা সংস্থা উভয়েই এমন একটা সহজ পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্বদ্ধ হইবেন যে, উভয় পক্ষই তাহার দ্বারা লাভবান হইবেন। এ পর্যন্ত কিন্তু ঠিক তাহার উল্টাটাই হইয়াছে। নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত বীমাধিকরণ বিলের পার্লামেণ্টে আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্ত্রী শ্রীএম. সি. শাহ্ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাতেই ইঁহাদের মতলবের স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছিল। বেতনভোগী ক্ষেত্রকর্মীদের (field workers) বিষয় উল্লেখ করিয়া শ্রীশাহ্ তখন বলিয়াছিলেন যে, ঐ স্তরের জীবনবীমা কর্মীদের একটা আপাতঃদৃষ্ট বেতন ধার্য করা থাকিলেও বস্তুতঃ তাঁহারা মূলতঃ কমিশনভোগী কর্মচারী—কেননা তাঁহাদের বেতনের অনুপাত সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের পরিমাণের সঙ্গে যুক্ত। শ্রীশাহ এই উক্তির দ্বারা কেবল যে জীবনবীমা ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহার অজ্ঞতা প্রমাণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যবসায়ে এদেশে ক্ষেত্রকর্মীদের উপর প্রযোজ্য বিভিন্ন কোম্পানীর প্রণালীর বিভিন্নতা এবং সর্বোপরি চলতি বীমা আইনের নির্দেশসমূহ সম্বন্ধেও একাধারে তাঁহার অজ্ঞতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। স্বরাজ্য দলের অধীনে যখন কলিকাতার পৌরসংস্থা বা করপোরেশন কাজ করিতেছিল, সেই সময়ে চৌরঙ্গী রোডের দুরবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করিতে গিয়া স্টেটসম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখেন যে, স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে কলিকাতা পৌরসংস্থার প্রধান কর্মসচিব সুভাষবাবু একদা প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা এই পৌরসংস্থার মারফত চিৎপুর রোডকে চৌরঙ্গী রোডের সমপর্যায়ে উন্নীত করিবেন। চিৎপুর রোডকে যদিও ইঁহারা এখনও চৌরঙ্গীর পর্যায়ে উন্নীত করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে চৌরঙ্গীকে যে ইঁহারা চিৎপুর রোডের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। ইহাও কম বাহাদুরী নহে। ভারতীয় জীবনবীমা ব্যবসায়ের সম্পূর্ণ রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ও তৎপরবর্তী ব্যবস্থার দ্বারা শাহ্-প্যাটেল জোটে মিলিয়া প্রায় অনুরূপ ভাবেই এই ব্যবসায়ের মান ইহার পূর্বতন নিকৃষ্টতম উদাহরণের সমান স্তরে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই প্রাণপণে করিতে সুরু করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

স্থানাভাবে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা সম্ভব হইল না। তবে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহার দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হইবে যে, রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ এদেশে ঘোরতর মসীময় সম্ভাবনায় আবৃত। জ্ঞান, দক্ষতা, পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতা, এ সকলের কোনটারই কোন মূল্য সরকার পক্ষের কর্মকর্তারা দিতেছেন না। এমনকি কর্মচারী নিয়োগে যে সামান্যতম সততা ও সুবিচারপ্রবণতা প্রয়োজন তাহারও প্রয়োগের স্পষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার উপরে আছে দায়িত্বহীনতার অসাধারণ উদাহরণসমূহ। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পর সরকার পক্ষ হইতে সকল এজেন্টদিগকে জানান হয় যে, তাঁহাদের আর লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না। ফলে কেহই লাইসেন্স রিনিউয়ালের দরখাস্ত করেন নাই। তাহার পর আবার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় যে, বীমা আইন যতদিন প্রত্যাহার না করা হইয়াছে ততদিন লাইসেন্স লইতেই হইবে অতএব যাঁহাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে, তাঁহাদিগকে ৩০্ জরিমানা দিতে হইবে। ইহাতে কেহই রাজী না হওয়ার ফলে অবশেষে দিল্লী হইতে নির্দেশ আসিয়াছে যে, যাঁহাদের লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে

তাঁহারা পুরাতন লাইসেন্স 'রিনিউ' না করিয়া নূতন লাইসেন্স লইলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যাইবে। কিন্তু একবার লাইসেন্স লইলে উহা নূতন করিয়া রিনিউ না করিলে নূতন লাইসেন্স দিবার নিয়ম নাই। তাহা হইলে দরখাস্তকারীকে হলপ করিয়া বলিতে হইবে তিনি পূর্বে কখনও আর লাইসেন্সের জন্য দরখাস্ত করেন নাই। অর্থাৎ বীমা দপ্তর হইতে সরকারী ভাবে জীবনবীমা এজেন্টদিগকে হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতে প্ররোচিত করা হইতেছে।

অতএব সব দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইতেছে যে, জীবনবীমা ব্যবসায়ের রাষ্ট্রায়ত্তকরণের দ্বারা না বীমাকারী না বীমাকর্মী কাহারই স্বার্থ সংরক্ষিত হইবার ভরসা নাই, পরন্তু উভয়েরই স্বার্থসমূহ বিপদ্গ্রস্ত হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সরকারপক্ষ হইতে যে আশা করা হইয়াছিল—ইহার দ্বারা তাঁহাদের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনার অন্ততঃ আংশিক রসদ সংগ্রহ করা সহজ হইবে, তাহার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। যে ধারায় এবং প্রণালীতে নূতন রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা ব্যবসায়ের পরিচালন ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে, তাহার দ্বারা সমগ্র ব্যবসায়টিরই সমূলে বিনষ্টির সম্ভাবনা স্পষ্ট চোখের সামনে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই আশঙ্কা অতি ভয়াবহ আশঙ্কা। জীবনবীমা ব্যবসায়টি যদি এভাবে নষ্ট করিয়া ফেলা হয় তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী কেবল যে এককালীন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে শুধু তাহাই নহে, তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা পর্যন্ত ভীষণ ভাবে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পড়িবে, এবং এই বিপদের সবচেয়ে কঠিন আঘাত আসিয়া লাগিবে সমাজের সেই অংশে যেখানে সঞ্চিত থাকে দেশের চিন্তা ও ভাবধারার সমগ্র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, যাহারা দারিদ্র্য ও বঞ্চনার মধ্য দিয়াও দেশের জীবনকে রূপ, রস ও ভাবের ঐশ্বর্যে চিরকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে।

তবে কি জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণে কাহারও স্বার্থ নাই? —এ প্রশ্নের জবাব স্পষ্ট করিয়াই দেওয়া প্রয়োজন। যাহাদের স্বার্থ স্বভাবতঃ জীবনবীমা ব্যবসায়ের গতি ও প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল—তাহাদের কাহারও স্বার্থ যে ইহার দ্বারা সংরক্ষিত হইবার আশা নাই, তাহার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের সামগ্রিক জীবনবীমা ব্যবসায়ের ভাগ্যনিয়ন্তা হইয়া যাঁহারা বসিয়াছেন, বসিতেছেন বা ভবিষ্যতে বসিবেন, তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সমৃদ্ধিলাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ইহাতে আছে

নবীনের আবির্ভাব

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বসন্তের শেষ প্রান্তে এলে তুমি নব আগন্তুক,
শ্যামলা ধরণী হ'ল স্বর্ণোজ্জ্বলা করি রৌদ্রস্নান,
নীলাম্বর পানে ওঠে আত্মহারা আলোকের তান,
ঈপ্সিত, তোমার তরে আনন্দিত প্রকৃতি উন্মুখ।
কনকের বর্ণ ধরে স্পর্শে তব—চম্পক উৎসুক,
কোথা থেকে ভেসে আসে মৃদু আম্রমুকুলের ঘ্রাণ,
মৌমাছি গুঞ্জরি' ফেরে নিদ্রাতুর মধ্যাহ্নের গান,
তোমার পানে যে চেয়ে ভুলে গেছি সব দুঃখসুখ।

স্মৃতির সঞ্চিত রসে রসায়িত রূপ কি তোমার,
কে জানে আশার রঙে রঞ্জিত কি বরেছি তোমারে?
অতীত ও ভবিষ্যৎ মিলেছে কি তোমার মাঝার?
চেনা কি অচেনা তুমি? অপরূপে কে বুঝিতে পারে!
তোমারে বন্দনা করি, হে নবীন, ধর উপহার,
সাজায়ে এনেছি ডালা স্নিগ্ধ শুভ্র মল্লিকা-সম্ভারে।

সুবোধের সংসার

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

বেলা ন'টা, ক্লান্ত পদে বাড়ীর দরজায় আসিয়া সুবোধ কড়া নাড়ে। ভিতর হইতে কোন সাড়া আসে না, সুবোধ আবার কড়া নাড়ে। এইবার চাকর বিশু আসিয়া দরজা খুলিয়া দেয়, সুবোধ ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙিয়া দোতলায় ওঠে, তার পরে একপ্রান্তে নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়ে।

ব্যারাকপুরের এক বড় কারখানায় সুবোধ ফোরম্যান, রাত্রে তাহার ডিউটি। প্রথম প্রথম সে কখনও দিনে, কখনও রাত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু কয়েক বছর হইল বরাবর রাত্রেই কাজ করিতেছে। ইহাতে আয় অনেক বেশী, সুবোধ ইচ্ছা করিয়াই এই ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। টালিগঞ্জ হইতে ব্যারাকপুর অনেক দূর, কারখানায় পৌঁছিতে এক ঘণ্টারও বেশী সময় লাগে, তাই সন্ধ্যা ছয়টায় সে বাড়ী হইতে বাহির হয়। এদিকে আবার সকালে বাড়ী পৌঁছিতেও তাহার ন'টা বাজিয়া যায়।

বিশু আসিয়া পায়ের কাছে জুতা খুলিতে বসে। চোখ বুঁজিয়া সুবোধ প্রশ্ন করে "বীণু কোথায় রে?" বিশু বলে "আজ্ঞে চান করছেন দিদিমণি। আপনার শরীরটা আজ কেমন, কাল যে বলেছিলেন ভাল নেই?" "আজ ভালই আছি" বলে সুবোধ। "রোজ রোজ রাত জাগা শরীরে সইবে কত" দরদ দিয়া বলে বিশু। সুবোধ চোখ বুঁজিয়াই জবাব দেয় "হুঁ।"

ঠাকুর চা-টোষ্ট আনিয়া পাশে টিপয়ের উপর রাখে। চায়ে চুমুক দিয়া সুবোধ বলে "খবরের কাগজখানা নিয়ে আয় বিশু।" বিশু কাগজ আনিয়া হাতে দেয়, সুবোধ কাগজ খুলিয়া ইজিচেয়ারে পা এলাইয়া দিয়া বসে।

"এই যে এসেছ বাবা" বাহির হইতে বলে বীণু। কাগজ নামাইয়া সুবোধ বলে, "হ্যাঁরে, তোর চান হয়েছে!" বীণু জবাব দেয়, "এই ত হ'ল। মা আজ তোমার জন্যে আড়াই মিনিট দেরি করে বাড়ী থেকে বেরুল, তোমার আসতে আজ বড্ড দেরি হয়েছে।" সুবোধ বলে, "হ্যাঁ, প্রায় মিনিটপাঁচেক দেরি হয়েছে, সেই ব্যারাকপুর থেকে ট্রামে-বাসে টালিগঞ্জ আসা—বুঝতেই পারিস। একবার এদিকে আয় ত মা।" দরজার ভিতর দিয়া নাকটুকু বাহির করিয়া বীণু বলে, "আমি যে খেতে যাচ্ছি বাবা।"—'বলছিলাম কি—" সুবোধের কথাটা শেষ করিতে না দিয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বীণু বলে, "একদম সময় নেই বাবা, দশটা বাজে, স্কুলে যেতে হবে।"

সুবোধ আবার খবরের কাগজ তুলিয়া লয়। পাশের ঘরে বীণু গুন গুন করিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়, সুবোধ বোঝে সে স্কুলে যাইবার জন্য কাপড় বদলাইয়া প্রস্তুত হইতেছে। একটু পরে দুম করিয়া দরজা বন্ধ হইয়া যায়, খুট্ খুট্ আওয়াজ করিয়া একজোড়া জুতা বারান্দা পার হইয়া সিঁড় দিয়া একতলায় নামিয়া যায়।

ঘড়িতে দশটা বাজে, বিশু আসিয়া বলে, "বাবু চান করুন।" কাগজ ফেলিয়া দিয়া একটা মস্ত বড় হাই তুলিয়া সুবোধ বলে, "বাড়ীর সব খবর ভাল ত।" বিশু বলে, "আজ্ঞে খবর সব ভাল—তবে ঐ বসবার ঘরে ফুলদানিটা হঠাৎ পড়ে ভেঙে গেছে।"—"বড় সুন্দর জিনিষটা ছিল"—বলে সুবোধ।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আর দিদিমণির জন্যে একটা নতুন টেবিল-ল্যাম্প কেনা হয়েছে।"

—"বেশ বেশ।"

—মা আজকাল সাড়ে আটটায় আপিসে যান—বড্ড খাটুনি পড়েছে।

—কেন?

—আপিসে লোক ছাঁটাই হয়েছে।

—তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফিরতেও আজকাল অনেক দেরি হয়।

—হুঁ।

—কাল রাত্রে মামাবাবু বেড়াতে এসেছিলেন।

—তাই নাকি!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর মেজ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে।

—ভাল কথা।

—শ্যামবাজারের নবীনবাবুর ছেলে, এম-এ পাশ, সরকারী কাজ করে।

—ভাল কথা।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন হাজার টাকা পণ দিতে হবে, তা ছাড়া গহনাপত্র।

—তা এমন আর বেশী কি।

—দিদিমণির জন্তে এমনি একটি ছেলে যদি পাওয়া যায়।

উঠিয়া দাঁড়ায় সুবোধ, চিন্তিত ভাবে বলে "তাই ত।"

স্নান আহার শেষ করিয়া সুবোধ আসিয়া ঘরে বসে। বিশু ভিটামিনের পিল আনিয়া হাতে দেয়, পানের ডিবা ও সিগারেটের টিন আনিয়া কাছে রাখে। সুবোধ পান মুখে দিয়া টিন হইতে একটা সিগারেট তুলিয়া ধরায়। ঘরের দরজাটা টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বিশু বলে "মা চিঠি লিখে রেখে গেছেন টেবিলের উপর।" সুবোধ উঠিয়া টেবিলের উপর হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া বিছানায় আসিয়া বসে, তার পরে বালিশের উপর কাত হইয়া চিঠি খুলিয়া পড়িতে সুরু করে—

শ্রীচরণেষু—

আশা করি আমার আগের চিঠি পেয়েছ। কিছুদিন তোমার চিঠি না পেয়ে চিন্তিত আছি। দাঁতের ব্যথাটা আজকাল কেমন? গত রবিবার ডাক্তার দেখাবার কথা বলেছিলাম, ডাক্তার দেখিয়েছ কিনা জানিও। যদি না দেখিয়ে থাক তা হলে অবশ্য দেখাবে।

আমি একপ্রকার আছি। পুরনো চশমাতে কাজ চলছিল না, তাই এক জোড়া নূতন চশমা তৈরি করিয়েছি। বীণুর পরীক্ষা এসে পড়ল, তাকে পড়াবার জন্যে একজন টিউটার রেখে দিয়েছি। রাত্রে এক ঘণ্টা করে পড়ায়।

চিঠির উত্তর অবশ্য দিও।

ইতি—

তোমার রমা

চিঠি পড়া শেষ করিয়া সুবোধ কাত হইয়া চোখ বুঁজিয়া শোয়।

চায়ের ট্রে হাতে করিয়া বিশু নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিলেও সুবোধ টের পায়। চোখ বুঁজিয়া থাকিলেও অভ্যাসমত ঠিক চারটায় তাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া জানালার ধারে চেয়ার টানিয়া সে বসে, পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিয়া বিশু জামাকাপড় গুছাইবার কাজে লাগে। চায়ের পেয়ালা তুলিয়া লইয়া একটি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুবোধ বাহিরের দিকে তাকায়। গলির ওপারে একতলা বাড়ীটার পিছনে যে আমগাছটা এত দিন ধূলিধূসর রুক্ষ চেহারা লইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে কখন কোন ফাঁকে পুঞ্জ পুঞ্জ রক্তাভ কচি পাতায় সাজিয়া অপূর্ব্ব হইয়া উঠিয়াছে। সুবোধ অবাক হইয়া সেই দিকে তাকাইয়া থাকে। হঠাৎ যেন তাহার মনে হয় চারিপাশে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বাতাসে এক মৃদু উষ্ণতা অনুভব করে, একটা সৌগন্ধ্য পায়। ভিতরে ভাব উদ্বেল হইয়া উঠে, ক্রমে সে ভাব ভাষা হইয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসে :

আজিকার দিন না ফুরাতে
হবে মোর এ আশা পুরাতে—
শুধু এবারের মত বসন্তের ফুল যত
যাব মোরা দুজনে কুড়াতে।

বিশু জুতা পালিশ করিতেছিল, সুবোধ তাহাকে বলে, "আহা, রবীন্দ্রনাথ ঠিক মনের কথাটি বলেন, বিশু তুই বুঝিস কিছু।" মাথা নাড়িয়া বিশু বলে, "আজ্ঞে না।" সুবোধ বলে, "এর মানে হচ্ছে এই যে, জীবন তো শেষ হয়ে এল, অন্ততঃ এই বসন্তের ফুল আমরা দু'জনে একসঙ্গে কুড়াব; অর্থাৎ, তোমার আমার ভালবাসা, অর্থাৎ—না, তুই এ সব বুঝবি নে।" ঘাড় নাড়িয়া বিশু বলে, "আজ্ঞে না।"—"নাই বা বুঝলি, শুনেও আনন্দ আছে শোন—

আবরিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে
সার্থক হ'ল যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।
হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলন-মাঙ্গল্য-হোম প্রজ্জ্বলিত পলাশে পলাশে
রক্তিম আগুনে॥

হঠাৎ হুটপাট করিয়া কয়েকটি মেয়ে উপরে উঠিয়া আসে, পাশের ঘরে একটা বিষম হট্টগোল লাগিয়া যায়—কেউ হাসে, কেউ গান গায়, কেউ চেয়ার উল্টাইয়া দেয়, কেউ টেবিল ধরিয়া টানে। সুবোধ কবিতার পংক্তি ভুলিয়া যায়। বিশু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলে, "দিদিমণির বন্ধুরা এসেছেন।" এমন সময় সেই হট্টগোলের উপরে বীণুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "বিশু, ওরে বিশু—চা নিয়ে আয়, বিসকিট আর মাখনের কৌটো, বিশু, কোথায় গেলি বিশু, বিশু বিশু—" বিশু ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

সুবোধ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়িতে চমকাইয়া ওঠে—সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে যে—এক চুমুকে পেয়ালার ঠাণ্ডা চা শেষ করিয়া সে উঠিয়া পড়ে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরিতে গিয়া সার্টের বোতাম ছিঁড়িয়া ফেলে, টাই খুঁজিয়া পায় না, এক বার ক্ষীণ কণ্ঠে বিশুকে ডাকে, কিন্তু সে ডাক বিশুর কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। কোনরকমে পোশাক পরা শেষ করিয়া

সুবোধ কাগজ টানিয়া চিঠি লিখতে বসে—সে লেখে—

কল্যাণীয়াসু

তোমার চিঠি পেয়ে বিশেষ সুখী হলাম। আমার দাঁতের ব্যথা অনেকটা কম, ডাক্তার দেখাবার দরকার হয় নাই। তুমি চশমা বানিয়ে ভালই করেছ। বীণুর টিউটার রাখা ঠিক হয়েছে। আশা করি তোমার শরীর ভাল আছে। চিঠি লিখো। ইতি—

তোমার সু

খামে বন্ধ করিয়া চিঠিখানা টেবিলের উপর রাখিয়া সুবোধ বাহির হইয়া যায়। বারান্দার প্রান্ত হইতে হঠাৎ সে কি ভাবিয়া ফিরিয়া ঘরে আসে, চিঠিখানা খুলিয়া আবার লেখে—

পুনশ্চ, কাল লাঞ্চের ছুটির সময় জি-পি-ওর সামনে একটু দাঁড়াতে পারবে কি? আমি ঐ সময়ে এসে এক মিনিটের জন্যে দেখা করতাম—একটা বিশেষ কথা আছে।

সুবোধ চিঠি বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর রাখে, তার পরে তাড়াতাড়ি পথে গিয়া নামে।

পল্লীবাসীর সমস্যা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

নির্ব্বাচন পর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে, কংগ্রেস বিজয়ী হইয়াছেন, নিজেদের আসনে বসিয়াছেন। পল্লীবাসিগণই কংগ্রেসকে বিজয়ী করিয়াছেন এবং পুনরায় তাঁহাদের গদীতে বসাইয়াছেন। এই নির্ব্বাচন পর্ব্বে কত পরিমাণ অর্থ ধ্বংস হইয়াছে জানি না এবং যাঁহারা জিতিয়াছেন ও যাঁহারা হারিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে কত অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহাও জানি না। তবে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, অমুক লোক ষাট হাজার টাকা খরচ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন অমুক লোক এক লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ বলেন—অমুক লোক দুই লক্ষ টাকা খরচ করিয়াছেন। শুনিতে পাই নির্ব্বাচন পর্ব্বে নামিলে অন্ততঃ পনর-কুড়ি হাজার টাকার দরকার। কিন্তু পল্লী-অঞ্চলের এমন কয়েকজনকে জানি—যাঁহারা নির্ব্বাচনে জিতিয়াছেন বা যাঁহারা হারিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে এত টাকা ব্যয় করা মোটেই সম্ভব নয়। তবে কোথা হইতে তাঁহারা এত টাকা পাইলেন? কেহ বলেন "পার্টি ফণ্ড" হইতে পাইয়াছেন, কেহ বলেন অন্য স্থান হইতে পাইয়াছেন, আবার কেহ কেহ যাহা বলেন তাহা লিপিবদ্ধ না করাই ভাল। "পার্টি ফণ্ড" হইতে নির্ব্বাচনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ পাইতে হইলে কি কি গুণ থাকা দরকার বা কি কি সর্ত্তে সেই অর্থ পাওয়া যায় তাহাও জানি না; জানা থাকিলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতাম। এই প্রসঙ্গে এই কথা তোলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই গণতন্ত্রের যুগে যেখানে সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ ও সুবিধা—দারিদ্র্যবশতঃ বহু উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে নামিতে পারেন না; শহরের ও পল্লী-অঞ্চলের এমন অনেক ব্যক্তিকে জানি যাঁহারা নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়া সফল হইলে বিধানসভায় বা লোকসভায় জনসাধারণের উপযুক্ত প্রতিনিধি হইতে পারিতেন এবং তাঁহাদের দ্বারা বিধানসভা বা লোকসভা অলঙ্কৃত হইত—আর বহু ক্ষেত্রে জনসাধারণ উপকৃত হইত। তাঁহারা কেবল 'হাত-তোলা'র দলে থাকিতেন না। কিন্তু প্রধানতঃ দারিদ্র্যবশতঃই নির্ব্বাচনের কাছে-ধারে ঘেঁসিতে পারেন না। এই ত আমাদের গণতন্ত্র—সকলের সমান সুযোগ ও সুবিধা!

এই গণতন্ত্রেও প্রায় সব কাজেই প্রচুর অর্থের দরকার—দরিদ্রের কোন স্থান নাই—তাহার যতই যোগ্যতা থাকুক না। নির্ব্বাচন আর কিছুই নয়, টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলা মাত্র। শহরে বা পল্লী-অঞ্চলে এই যে টাকা লইয়া "ছিনিমিনি" খেলা চলিল, তাহার দ্বারা জনসাধারণ কতটুকু উপকৃত হইল জানি না। কেবল যে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বেই টাকার ছড়াছড়ি হইয়াছে, তাহা নহে; পালার শেষে যাঁহারা জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের লইয়া শোভাযাত্রার বহর দেখিয়া বিমূঢ় হইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে ইহা বর্ব্বরতার সীমাও অতিক্রম করিয়াছে। এই সকল শোভাযাত্রাতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছে। একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক নির্ব্বাচনে বিজয়ী কোন উচ্চশিক্ষিত ও ধনীব্যক্তির মহত্ত্বের কথা বলিতেছিলেন; তাঁহার মহত্ত্বের যে সকল উদাহরণ দিতে ছিলেন সকল উদাহরণই তাঁহার সাফল্যের প্রধান সহায়ক ছিল। এক বন্ধু সেই যুবকটিকে বলিলেন—তুমি ত অর্থাভাবহেতু তোমার বিবাহযোগ্যা ভগিনীর বিবাহ দিতে পারিতেছ না—কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য এই ধনী ও মহৎ ব্যক্তির কাছে যাও না কেন, এই ধনী ও মহৎ ব্যক্তিটি ত নির্ব্বাচনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন—তোমাকে অন্ততঃ দু'এক শত টাকা সাহায্য করিতে পারেন। দরিদ্র যুবকটি উত্তর করিল—টাকা ত আমি পাবই না,

পর্যন্ত আমাকে দারোয়ানের অপমানসূচক কথা শুনিয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। যুবকটির এই উত্তর জনসাধারণের উত্তরের প্রতিধ্বনি মাত্র।

কংগ্রেস বিজয়ী হইয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের হৃদয় জয় করিয়া বিজয়ী হইতে পারে নাই—এ কথা কংগ্রেসকে স্বীকার করিতেই হইবে। কংগ্রেস-শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এই বিষয়ে প্লেবিসাইট গ্রহণ করিলেই কংগ্রেসের অবস্থা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। এই প্রবল বিক্ষোভের ফলেই কংগ্রেসের কয়েকজন খাঁটি ব্যক্তি এই নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। যাঁহারা এই সকল ব্যক্তিকে পরাজিত করিয়াছেন তাঁহারাই এই কথা বলিয়াছেন এবং পরাজিত ব্যক্তিদের চরিত্র, পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত আমি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা জানি এবং 'প্রবাসী'র মারফতে কর্তৃপক্ষদের গোচরে আনিবার বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু সফল হই নাই। আমার এলাকার নির্ব্বাচনের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম এবং নির্ব্বাচনে কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে যাহা অবগত হইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলে প্রবন্ধের আকার বৃহৎ হইবে এবং পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। দু'একজনের উক্তির উল্লেখ করিতেছি এবং এই উক্তিকে জনসাধারণের অভিমত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। একজন বলিল—দৈনিক এক টাকা মজুরী পাই, আমার দৈনিক দুই সের চালের দরকার—এই দু'সের চালের দাম এক টাকা, গড়ে মাসে পনর দিন মজুরের কাজ পাই বাকী পনর দিন অলস ভাবেই দিন কাটাই; কোন উপার্জ্জন নাই, সারা শীতকালটা কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়াই কাটাইতে হইল, একটি গেঞ্জীও কিনিতে পারিলাম না। অপর একজন বলিল—আমার চারি আনা ট্যাক্স ছিল, উহা বাড়িয়া এখন দেড় টাকা হইয়াছে, অথচ আমার সম্পত্তি বা উপার্জ্জন কিছুমাত্র বাড়ে নাই বরং কমিয়া আসিয়াছে: কি হারে ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স বাড়ে আমরা জানি না। তৃতীয় জন বলিল যে, বড়লোকেরাই সিমেণ্ট করোগেট টিন ইত্যাদি পাইয়া থাকে, আমরা দরখাস্ত করিয়াও পাই না। চতুর্থ জন বলিল—মিনিষ্টার, জেলা শাসনকর্ত্তা প্রভৃতি আসেন, মিটিং করিয়া চলিয়া যান—আমাদের অভাব-অভিযোগ শুনিবার অবকাশ তাঁহাদের থাকে না, আমরা যদি যাই তাঁহাদের চাপরাশী আমাদের তাড়াইয়া দেয়। পঞ্চম জন বলিল—পূর্ব্বে এত দুর্নীতি দেখি নাই এখন চারিদিকেই দুর্নীতি, তদ্বির ও ঘুষ ছাড়া কোন কাজ হয় না। এইরূপ উক্তি প্রত্যেক লোকই করিল। এই প্রসঙ্গে কলিকাতা হইতে প্রায় চৌদ্দ মাইল দূরের একজন শিক্ষিত বাসিন্দার কথা বলিতেছি। তিনি বলিলেন, কলিকাতায় সাড়ে ছয় আনা সের আটা; আমার এলাকার দোকানে নয় আনায় কমে এক সের আটা পাওয়া যায় না, কলিকাতা হইতে আমায় আটা কিনিয়া আনিতে হয়। তিনি আরও বলিলেন—অল্প পরিমাণ টিন ও সিমেণ্টের জন্য দরখাস্ত করিয়া শীঘ্র কোন ফল পাইবার আশা নাই, তাই কালোবাজারে কিনিতে হইতেছে। এই ধরনের কথা অনেকেই বলিয়াছেন।

পল্লী-অঞ্চলে গঠনমূলক কাজ কোথায় কি হইতেছে, তদ্দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরা কতটা উপকৃত হইতেছেন এবং বেকারের সংখ্যা কতটা হ্রাস পাইয়াছে তাহার সঠিক হিসাব জানি না। সেদিন জাতীয়-সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একজন কর্ম্মী বলিলেন যে, রাস্তাঘাটের কিছু সংস্কার হইতেছে বটে, স্থানে স্থানে নলকূপও বসান হইতেছে, কিন্তু জনসাধারণের অন্নবস্ত্রের কষ্ট পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে। লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একটি এলাকার জলাভাব দূর করিবার জন্য কয়েকটি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সেই এলাকার কয়েকজন লোককে নলকূপের কথা বলাতে তাহারা বলিল—জল খাইয়াই কি পেট ভরান যায়।...জনসাধারণের আরও একটি অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সময়ের অধিকতর মূল্য দিয়াও কোন জিনিষ খাঁটি পাওয়া যায় না—সব জিনিষেই ভেজাল—আটা, ময়দা, তেল, চিনি, চাল, ডাল, ঔষধ ইত্যাদি কোন জিনিষই ভেজালশূন্য নহে—ভেজালই যেন আজকালকার দিনের বৈশিষ্ট্য। একজন বলিলেন, শিক্ষার ব্যাপারেও ভেজাল; আর একজন বলিলেন, প্রীতি ভালবাসা, স্নেহের মধ্যেও ভেজাল। যাক্ এই সব কথা।

কংগ্রেস বিজয়ী হইয়াছে, খুবই সুখের কথা; কিন্তু জনসাধারণের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন গদী এবং প্রভুত্ব অধিকার করিয়া পল্লীবাসীদের সমস্যা সমাধানের প্রতি পূর্ব্বের মত অন্ধ হইয়া না থাকেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরুর কথায় বলিতে পারি, তাঁহারা যেন জাঁকজমক ও আড়ম্বরের বেষ্টনীর মোহ ত্যাগ করিয়া পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য ও অভাব-অভিযোগ দূরীকরণের চেষ্টা করেন। মোট কথা, কংগ্রেসকে পুনরায় বিজয়ী হইতে হইলে পল্লী-অঞ্চলের অভাব-অভিযোগ নিরাকরণের চেষ্টা করিতেই হইবে।

বারুণী-স্নান

শ্রীসুখময় সরকার

বাঁকুড়া শহরের বায়ু-কোণে প্রায় বার মাইল দূরে শুশুনিয়া পাহাড়। দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, একটা নীলবর্ণ শিশু-নাগ (হস্তী-শাবক) শয়ান রহিয়াছে। কখনও কখনও দেখা যায়, খণ্ড খণ্ড মেঘমালা উহার শিখরদেশে অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ পাহাড়ের প্রায় মধ্যস্থলে শিলা বিদীর্ণ করিয়া শীতল, নির্ম্মল, সুস্বাদু জলের এক প্রস্রবণ বাহির হইয়াছে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, সেই জলধারার বিরাম নাই। সাত-আট হাত উচ্চে জলধারা রুদ্ধ করিয়া সিংহাকৃতি একটা শৈলময় জীবের অঞ্জলি হইতে যাহাতে জলধারা বেগে পতিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নির্ম্মল জলধারা উত্তম পানীয়; স্থানীয় লোকেরা এখান হইতেই পানীয় সংগ্রহ করে। সকলেই প্রয়োজন-মত এই ধারার নিম্নে মাথা পাতিয়া স্নান করে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক ও রাখালেরা অঞ্জলি ভরিয়া এই ধারার জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। বাল্যকাল হইতে শুনিতেছি, বারুণীর দিন শুশুনিয়া-ধারায় অধিকতর জলস্রবণ হয়। বাঁকুড়া ও পার্শ্ববর্ত্তী মানভূম জেলার অগণিত পুণ্যার্থী নরনারী বারুণীর দিনে শুশুনিয়া-ধারায় স্নান করিতে আসে। বারুণীতে গঙ্গাস্নান বিধেয়, কিন্তু গঙ্গা তো নিকটে নহে। এতদঞ্চলের অধিবাসিগণ শুশুনিয়া-ধারাকে গঙ্গার জলধারার তুল্যই পবিত্র মনে করে। অন্ততঃ, তাহাদের বিশ্বাস, বারুণীর দিন এই ধারায় স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের তুল্য ফললাভ।

শৈশবে ও কৈশোরে বারুণী উপলক্ষে কয়েকবার শুশুনিয়া-ধারায় স্নান করিতে গিয়াছি। সেদিন সেখানে স্নান সহজসাধ্য নহে। লোকে লোকারণ্য। সেই ভিড় ঠেলিয়া সহজে পথ করিয়া যাইবার উপায় নাই। সম্মুখে তির্য্যক ভূমি, তাহাতে ইতস্ততঃ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। চারিদিকে শাল-পিয়াল-পলাশ-হরিতকীর বন, পশ্চাতে ঘন বনাকীর্ণ পাহাড়। ধারার পার্শ্বে প্রস্তরে ক্ষোদিত একটি 'নরসিংহ'-মূর্ত্তি,* সেখানে আপাদ-লম্বিত জটাজুটধারী এক সাধু বসিয়া আছেন। লোকে ধারায় স্নান করিয়া নরসিংহ-মূর্ত্তিতে সিন্দুর ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া এবং সাধুবাবাকে প্রণামী দিয়া বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে। লোক-সমাগম হইলেই দোকানীরা দোকান ফাঁদে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। তবে যখনকার কথা লিখিতেছি তখন এখানে দোকান লইয়া আসা কষ্টসাধ্য ছিল। বাতাসা-মুড়কি-মিঠাই লইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের ময়রারা দোকান করিত, সাঁওতালেরা বনফল বিক্রয় করিত। কাঠের পুতুল, বাঁশের ঝাঁটা, ময়ূর-পাখা বিক্রয় হইত; কদাচিৎ কোন দোকানী নূতন পাঁজি বিক্রয় করিত, মূল্য এক পয়সা। চৈত্র মাস, চারিদিকে বসন্তের মহোৎসব। দীর্ঘ শালবৃক্ষে গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেতবর্ণ পুষ্পের সুঘ্রাণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত; কিংশুকের শুকচঞ্চুর ন্যায় রক্তবর্ণ পুষ্পরাজি চতুর্দ্দিকে যেন হোলির রং ছড়াইত। পিয়াল ও হরিতকী বৃক্ষে শুকপক্ষীর দল কলরব করিত; দূর হইতে কোন বৃক্ষচূড়ায় কপোতের করুণ কণ্ঠস্বর শোনা যাইত। এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে বারুণী-স্নান করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিতাম। শুশুনিয়া-ধারায় এখনও বারুণী-স্নান চলিতেছে, এখন বড়রকমের মেলা বসে। পাহাড়ের পাশ দিয়া পাকা রাস্তা গিয়াছে, সর্ব্বদা মোটরগাড়ী যাতায়াত করিতেছে। এখন লোকসমাগম অনেক বেশী হয়, দোকানপাট প্রচুর বসে। পুণ্যস্নান হউক বা না হউক, অনেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর কোন কোন 'সুসভ্য' ব্যাধ অগ্নিবাণে নিরীহ কপোতপক্ষীর প্রাণ সংহার করিয়া বারুদের শ্বাসরোধী দুর্গন্ধে বনস্থলীর বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করিয়া তোলে।

ছয়-সাত বৎসর পূর্ব্বের কথা। একদা স্বর্গত আচার্য্য যোগেশ-চন্দ্রের সহিত শুশুনিয়ার বারুণী-স্নান সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, "আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা রণজিৎ রায় আরামবাগের দক্ষিণে এক দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দীঘিতে এখনও লোকে বারুণী-স্নান করে। দীঘির পাড়ে প্রকাণ্ড 'যাত'* বসে। অনেকদিন হতে চলে আসছে।"

ঘটনাক্রমে আরামবাগের নিকটে এক গ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এ বৎসর বারুণীর দিনকয়েক পূর্ব্বে এক বন্ধু বলিলেন, "চলুন, দীঘির যাত দেখে আসি।"

"কোন্ দীঘি?"

"রাজা রণজিৎ রায়ের দীঘি।"

আচার্য্যদেবের কথা মনে পড়িয়া গেল। দীঘির মেলা দেখিতে নিশ্চয় যাইব, স্থির করিয়া ফেলিলাম। এ বৎসর (১৩৬৩) ১৫ই চৈত্র বারুণী-স্নান হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিন রাত্রি দশটার সময় গরুর গাড়ীতে চড়িয়া দীঘিতে বারুণী-স্নান করিবার মানসে যাত্রা

---

* সাধারণ লোকে বলে 'নরসিংহ'-মূর্ত্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। অনতি-উচ্চ স্তম্ভের উপর খোদিত সিংহমূর্ত্তি। মনে হয়, কোনও প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি, অথবা যুদ্ধ বা ঐরূপ কোন ঘটনার স্মৃতি।

* সংস্কৃত 'যাত্রা' শব্দ হইতে 'যাত'। বর্ত্তমানে দেবদেবীর উৎসব উপলক্ষে যে মেলা বসে অনেক স্থানে তাহাকে 'যাত' বলে।

করিলাম। সঙ্গে দুইজন বন্ধু। আমাদের দেখাদেখি আর একদল যুবক গরুর গাড়ীতে আমাদের অনুসরণ করিল।

আরামবাগের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে রাজা রণজিৎ রায়ের দীঘি। এখান হইতে আট মাইলের কম নহে। শস্যহীন বিস্তীর্ণ মাঠ পড়িয়া আছে, তাহার উপর দিয়া গরুর গাড়ীর পথ। চাকার নাভিতে সম্ভবতঃ তৈলের অভাবে আমাদের গাড়ীটি ক্রন্দন করিতে করিতে চলিয়াছে। জমির আলির উপর কখনও উঠিতেছে, কখনও বা ঝাকানি দিয়া নামিতেছে। মাথার উপর নক্ষত্র-খচিত নির্মল নভোমণ্ডল, দক্ষিণ হইতে প্রবাহিত মৃদুমন্দ পবন-হিল্লোল। প্রকৃতির সেই উদার মহিমায় প্রাণমন ভরিয়া গেল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। প্রায় তিন মাইল যাইবার পর সরকারী পাকা রাস্তা। সেখানে স্নানযাত্রীর ভিড়। অগণিত গরুর গাড়ী সারি দিয়া চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের গতি মন্থর হইয়া পড়িল। ইহার উপর দুই-একটা মোটরগাড়ী ধূলা উড়াইয়া এবং তীব্র আলোকে চোখ ধাধাইয়া আমাদের যাত্রাপথ দুর্গম করিয়া তুলিতে লাগিল। একটা মোটরের ভেঁপুর শব্দে হতচকিত হইয়া আমাদের সম্মুখের গাড়ীর গরুগুলা পথভ্রষ্ট হইয়া গেল। বাঁধা রাস্তার দুই দিকে নীচু জমি; সামলাইতে না পারিয়া গাড়ীখানা একেবারে উল্টাইয়া গেল। আরোহীদিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া দেখি, তাহারা মুসলমান, তাহারাও বারুণী-স্নান করিতে চলিয়াছে! দৈবক্রমে তাহারা কেহ আহত হয় নাই। 'মায়ের কৃপায়' এ যাত্রা তাহারা বাঁচিয়া গেল।

"মায়ের কৃপা। কি রকম?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

বন্ধু বলিলেন, "মা যে ঐ দীঘির পাড়ে শাঁখারীর কাছে শাঁখা পরেছিলেন, জানেন না?"

"না, জানি নে। বলুন না, গল্পটা।"

"গল্প নয় মশায়, সত্য ঘটনা। স্বয়ং মা ভগবতী রাজা রণজিৎ রায়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই কন্যা রাজাকে ছলনা করবার জন্য প্রায়ই বলতেন, 'বাবা, আমি যাই, আমি যাই।' একদিন কর্ম্মব্যস্ত রাজা বিরক্ত হয়ে বলে ফেললেন, 'আচ্ছা, কোথায় যেতে চাস, যা।' মা অমনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে দীঘির পাড়ে বটতলায় বসে রইলেন···"

"বলুন না, থামলেন কেন?"

"দাঁড়ান, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।···হ্যাঁ, তার পর এক শাঁখারী সেই পথ দিয়ে শাঁখা বেচতে যাচ্ছিল। মা তাকে ডেকে বললেন, 'আমার দু' হাতে দশগাছা শাঁখা পরিয়ে দাও।' শাঁখারী বললে, 'সে কি বাছা! দশগাছা শাঁখা পরবে কি!' সে তো আর জানে না যে তিনিই স্বয়ং দশভুজা। মা বললেন, 'আমি রাজা রণজিৎ রায়ের মেয়ে।' রাজার মেয়ে শুনে শাঁখারী শাঁখা পরিয়ে দিলে। মা বললেন, 'যাও, বাবার কাছে দাম নাও গে।'···

গল্পের শেষটা আমার জানা ছিল। তথাপি আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, "তার পর···তার পর···"

"তার পর শাঁখারী রাজার কাছে গিয়ে শাঁখার দাম চাইলে। রাজার মনে সন্দেহ হ'ল, 'মেয়ে আমার দশগাছা শাঁখা পরেছে!' দীঘির পাড়ে বটতলায় এসে তিনি মেয়ের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। তখন দীঘির জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শাঁখা-পরা দশটি হাত। রাজা বুঝলেন, মা এসেছিলেন তাঁর মেয়ে হয়ে, ছলনা করে চলে গেলেন। আর মায়ের হাতে শাঁখা পরিয়ে শাঁখারীর জীবনও হ'ল ধন্য। এই জন্যই তো দীঘির মাহাত্ম্য। মেলায় দীঘির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বই পাওয়া যায়।"

গল্পটি তন্ময় হইয়া শুনিলাম। এমন গল্প তো নূতন নহে, বাঁকুড়া জেলায় অন্ততঃ তিনটি স্থানে শুনিয়াছি। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আলোচনার এ স্থান নয়। দীঘির মাহাত্ম্য কিছু না থাকিলে লোকে নিকটস্থ দ্বারকেশ্বর নদ ফেলিয়া সেখানে বারুণী-স্নান করিতে যাইবে কেন? আমি বিশ্বাস না করিলে কি হইবে, সহস্র সহস্র লোকে বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাসের অনুরূপ ফলও হয়ত লাভ করে।

গল্প করিতে করিতে দীঘির নিকটবর্তী হইয়া পড়িলাম। রাত্রি তৃতীয় প্রহর শেষ হইতে চলিয়াছে। পশ্চাতের গাড়ীতে আমাদের অনুযাত্রীর দল গান জুড়িয়া দিয়াছে। দূর হইতে অসংখ্য ডে-লাইটের আলো দৃষ্টিগোচর হইল। ক্রমশঃ জনকোলাহল শ্রুতি-পথে প্রবেশ করিল। একদণ্ডের মধ্যে দীঘির পাড়ে উপস্থিত হইলাম। কত যে গরুর গাড়ী আসিয়া সেখানে বিশ্রাম করিতেছে, গণিতে পারা যায় না। আমরাও গাড়ী ছাড়িয়া দীঘির উত্তর পাড়ে নামিয়া পড়িলাম। সারি সারি দোকানপাট। রাত্রি-কাল, তাই ক্রয়-বিক্রয় অতি অল্পই হইতেছে। পাল টাঙ্গাইয়া অথবা খড় দিয়া অস্থায়ী ঘর বাঁধিয়া দোকান করিয়াছে, দোকানে দোকানে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে। বিস্তীর্ণ দীঘির উত্তর পাড়ে নানা দ্রব্যের দোকান বসিয়াছে, অন্য পাড়গুলি তখনও প্রায় জন-শূন্য। দীঘি প্রকাণ্ড, চারি পাড় একবার প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। দীঘি প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা যখন দক্ষিণ পাড়ে উপস্থিত হইলাম, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

উত্তর পাড়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের সারি, তাহাদের ফাঁকে ফাঁকে দোকানের আলো দেখা যাইতেছে। অশ্বত্থ-বীথির মাথার উপরটা সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিগন্তের উপর কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর ক্ষীণতনু পাণ্ডুবর্ণ কলাচন্দ্র উদিত হইলেন। পার্শ্বে শতভিষা নক্ষত্র দীপ্তি পাইতেছে। ক্ষয়রোগাক্রান্ত চন্দ্রদেবকে ক্রোড়ে লইয়া শতভিষা যেন শতপ্রকার ভেষজ প্রয়োগে চিকিৎসা করিতেছে। এ দৃশ্যটি কখনও ভুলিব না। দেখিতে দেখিতে সে মায়াময় দৃশ্য অস্পষ্ট হইয়া গেল, পূর্ব্ব-গগনে অরুণ-রাগ প্রকাশিত হইল। দীঘির পাড়ে স্নানার্থীদের ভিড় জমিতে লাগিল। উষাকালে রণজিৎ রায়ের দীঘিতে স্নান করিলাম। কচি আম বিক্রয় হইতেছিল, স্নানান্তে কয়েকটা ক্রয় করিয়া দীঘির জলে নিক্ষেপ করিলাম; স্নান করিয়া দান করিতে হয়। দানগ্রহণের লোকের অভাব নাই। দীঘির পাড়ে ভিক্ষুকেরা কেহ বা হাত

পাতিয়া, কেহ বা কাপড় পাতিয়া বসিয়া আছে। সাধ্যমত দান করিয়া পশ্চিম পাড়ের দিকে অগ্রসর হইলাম। তখন কাতারে কাতারে অগণিত নরনারী স্নান করিতে আসিতেছে। স্নান করিয়া দীঘির নির্মল জল তাহারা কর্দমাক্ত করিয়া তুলিতেছে। ঘাটের পাশে কেহ বা সাবিত্রী-সত্যবানের প্রতিমা করিয়া রাখিয়াছে এবং লৌহ-বলয় ও সিন্দুরের একটি ছোট দোকান করিয়াছে। সীমন্তিনী-গণ স্নানান্তে লৌহ-বলয় ক্রয় করিয়া সাবিত্রীর হাতে পরাইয়া দিতেছে এবং সিঁথির উপর সিন্দুর দিয়া প্রণাম করিতেছে। স্নানের পর সকলেই এক অঞ্জলি কচি আম দীঘির জলে নিক্ষেপ করিতেছে। এতদিন কেহ আম্র ভক্ষণ করে নাই; বারুণীর দিন দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আম্র ভক্ষণ আরম্ভ করিবে।

দীঘির পারে আর লোক ধরে না। এই মেলার উল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার কদলী-বিক্রয়। একপ্রকার পরিপুষ্ট কদলী প্রচুর আমদানী হয়। যাহারা মেলা দেখিতে আসে তাহারা অন্ততঃ একছড়া কলা অবশ্যই ক্রয় করিবে। এই কদলী সুলভ অথচ সুস্বাদু। ইহা ব্যতীত মাদুর-পাখা, ঝুড়ি-ঝাকা, বাবুইদড়ি, লাঙ্গল-জোয়াল, মরিচ-মসলা, শাক-সব্জী—সকল দ্রব্যের অসংখ্য দোকান আসিয়াছে। লোকে বাছিয়া বাছিয়া দরদস্তর করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। চা, পান, বিড়ির দোকান, মোণ্ডা-মিঠাই-সন্দেশের দোকান, মনিহারী দোকান এবং 'পবিত্র হিন্দু হোটেল'র অভাব নাই। লোহার দ্রব্য এবং কাঁসার বাসনের দোকানও দুই-চারিটা বসিয়াছে। একস্থানে ফটোগ্রাফির দোকানে দিবারাত্র ফটো তোলা হইতেছে; অন্য একস্থানে ম্যাজিক হইতেছে, আর এক স্থলে বাঘ-দোলায় চড়িয়া বালক-বালিকারা ঘুরিতেছে। দীঘির এক পারে মাইক সংযোগ করিয়া এক সাধু ও তাঁহার অনুচর-গণ 'হরেকৃষ্ণ' নাম গাহিতেছেন, আর এক পারে একদল ছোকরা মাইক লাগাইয়া সিনেমার হিন্দী গান জুড়িয়া দিয়াছে। এক জন ঔষধের দালাল 'হারমনি' বাজাইয়া ভাটিয়ালী সুরে নিজের ঔষধের গুণগান করিতেছে। গলাটি মিষ্ট, লোক জমিয়া যাইতেছে। একটা মোটরগাড়ীতে এমপ্লিফায়ার দিয়া গ্রামোফোন রেকর্ডে গান হইতেছে, গান শুনিতে লোক জমিলে এক দালাল একটা কবিরাজী ঔষধের মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছে। জনতার মধ্যে একটা অতিকায় হস্তী মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। বালকবালিকারা কৌতুক করিয়া তাহার সম্মুখে একটা কলা অথবা একটা পয়সা লইয়া ধরিতেছে। হস্তী কলাটি লইয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিতেছে এবং পয়সাটি শুণ্ডের সাহায্যে তুলিয়া মাহুতের হাতে দিতেছে। নিকটবর্তী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রসংস্থাগুলি জলছত্র খুলিয়াছে; তৃষ্ণার্ত লোকেরা সেখানে গিয়া জলপান করিতেছে। স্থানে স্থানে পুলিস পাহারা দিতেছে এবং প্রয়োজন হইলে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। মেলা দেখিতে দেখিতে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে করিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল। অনেক চেষ্টা করিয়াও দীঘির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোনও বই পাইলাম না। গরুর গাড়ীতে পুনর্যাত্রা করিলাম।

বারুণীর দিন স্মৃতিতে গঙ্গা-স্নান বিহিত হইয়াছে। অনেকেই সেদিন গঙ্গাস্নান করেন। আমার দেখা দুইটি বারুণী-স্নানের মধ্যে একটি ধারা-স্নান, অপরটি দীঘি-স্নান। বারুণী উপলক্ষে নানা স্থানে নানাবিধ উৎসব হয়; এখানে কেবল দুইটি স্থানের উৎসব বর্ণিত হইল। স্মৃতিতে বারুণী-স্নানে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। স্মৃতিকার বলিতেছেন, বহু শত সূর্যগ্রহণ কালে গঙ্গা-স্নানের যে ফল, একবার মাত্র বারুণী-স্নানে সেই ফললাভ করা যায়। ভারতের কোটি কোটি নরনারী শাস্ত্রের সেই বিধান অদ্যাপি মানিয়া চলিতেছে এবং বারুণী-স্নানে পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া দূরদূরান্তর হইতে পুণ্য-জলাশয়ের তীরে সমবেত হইতেছে। লোকসমাগম হইলেই মেলা বসে, সেটা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। এখনকার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, অনেকে শুধু মেলা দেখিতেই যায়।

কিন্তু 'বারুণী' নামের অর্থ কি? স্মৃতিকার বারুণী-স্নানে এত গুরুত্ব দিলেন কেন? কতকাল ধরিয়া ভারতবাসী এই উৎসব প্রতিপালন করিতেছে? এখানে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে বারুণী। সেদিন চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। ভারতীয় জ্যোতিষ যাঁহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক এক নক্ষত্রের এক এক দেবতা বা অধিপতি কল্পিত হইয়াছিলেন। যেমন, অশ্বিনীর অধিপতি অশ্বী, ভরণীর যম, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা, ইত্যাদি।* শতভিষা নক্ষত্রের অধিপতি হইলেন বরুণ। বরুণের সহিত সম্পর্কযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রেরই নাম বারুণী। 'বারুণী-স্নানে'র অর্থ—যে তিথিতে চন্দ্র বারুণী অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রে অবস্থান করেন সেই তিথিতে স্নান। কিন্তু চন্দ্র তো প্রত্যেক মাসেই একদিন করিয়া শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন, তাই বলিয়া প্রত্যেক মাসেই তো বারুণীর স্নান হয় না। ইহা হইতে বুঝিয়াছি বারুণী-দিনের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্মৃতিতে বারুণী-স্নানের এত মাহাত্ম্যের কারণ এই যে এককালে সেদিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। নববর্ষ-দিবসটিকে স্মরণীয় করিবার জন্য নানাবিধ ধর্মানুষ্ঠান বিহিত হইয়া থাকে; স্নান-দান তাহাদের অন্যতম। বিজয়া দশমীর বিজয়যাত্রা, দ্যূত-প্রতিপদের দ্যূতক্রীড়া, দোলপূর্ণিমার আনন্দোৎসব, কোজাগরীর রাত্রিজাগরণ দশহরার গঙ্গাস্নান, এ সমস্তই নববর্ষোৎসবের লক্ষণ। বিশাল ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নববর্ষারম্ভের দৃষ্টান্ত অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়; প্রাচীনকালেও নিশ্চয় এইরূপ ছিল। বিগত বর্ষের সকল মালিন্য, সকল পাপ-তাপ—পুণ্য জলাশয়ের জলে ধৌত করিয়া নববর্ষে আমরা শুচি হইতে ইচ্ছা করি এবং দরিদ্রকে দান করিয়া মানবসেবায় ব্রতী হই। ভারত-কৃষ্টির সেই আদি-

* নক্ষত্রের অধিপতি-কল্পনার মূলে কি তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা গবেষণার বিষয় এবং বিশদ আলোচনাসাপেক্ষ।

কাল হইতে স্নান ও দান পুণ্যানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু স্নান-দান বিশেষ বিশেষ 'যোগে'ই বিহিত হইয়াছে। এই 'যোগ' জ্যোতিষিক যোগ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা নববর্ষারম্ভের শুভ দিবস। পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশে অন্নজল নিবেদন শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের অনুবন্ধ মাত্র; ইহাও প্রাচীন-কালে নববর্ষ দিবসে অনুষ্ঠিত হইত।

কতকাল পূর্ব্বে বারুণীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হইত? জ্যোতি-র্গণিতের সাহায্য লইয়া সেই কাল নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমরা দেখিয়াছি, এককালে বারুণীর দিন নববর্ষ আরম্ভ হইত। নববর্ষ যে-কোন দিনে আরম্ভ হইতে পারে না, ইহার জন্য বিশেষ জ্যোতিষিক যোগের প্রয়োজন হয়। এই জ্যোতিষিক যোগ বলিতে অয়নাদি অথবা বিষুব-সংক্রান্তি বুঝায়। বৎসরে দুই অয়ন ও দুই বিষুব। এক্ষণে ৭ই চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়। বারুণী-স্নান কোন কোন বৎসর ৭ই চৈত্রের পূর্ব্বেও হইয়া থাকে। প্রাচীন-কালে চৈত্রমাসে মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইতে পারিত না। অতএব বারুণী-স্নানের যোগ বিষুব-সংক্রান্তিতে নহে। মহাবিষুবের পূর্ব্ববর্ত্তী যোগ উত্তরায়ণ। অতএব নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়, উত্তরায়ণ দিনেই বারুণী-স্নান বিহিত হইয়াছিল। চৈত্র কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথি চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ধরিতে পারা যায়। ইহা হইতে বুঝিতেছি, যে-কালে চৈত্র মাসের মাঝামাঝি রবির উত্তরায়ণ হইত, বারুণী-স্নানে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। সে কত কালের কথা? এখন ৭ই পৌষ রবির উত্তরায়ণ হয়। অতএব অয়ন দিন:

পৌষের ২২ দিন = ¾ মাস
মাঘ ৩০ দিন = ১ মাস
ফাল্গুন ৩০ দিন = ১ মাস
চৈত্রের ১৫ দিন = ½ মাস

মোট = ৩¼ মাস

তদবধি ৩¼ মাস পশ্চাদগত হইয়াছে। অয়নদিন একমাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে; অতএব ৩¼ মাস পশ্চাদগত হইতে ২১৬০ × ৩¼ = ৭০২০ বৎসর, স্থূলতঃ ৭০০০ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০০ অব্দে চৈত্র-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে রবির উত্তরায়ণ হইয়াছিল; বারুণী-স্নানে সেই স্মৃতি রক্ষিত হইয়াছে।

অন্য উপায়েও এই কাল নির্ণীত হইতে পারে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বারুণীর দিন চন্দ্র শতভিষা নক্ষত্রে থাকেন। শতভিষা চতুর্ব্বিংশ নক্ষত্র; অর্থাৎ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রগণনায় ইহার স্থান চতুর্ব্বিংশতিতম। কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীতে রবি ও চন্দ্রের দূরত্ব হয় দুই নক্ষত্র-ভাগ। অতএব সেদিন রবি থাকেন ষড়্‌বিংশ নক্ষত্রে, উত্তর-ভদ্রপদায়। দোলপূর্ণিমার দিন রবি পূর্ব্বভদ্রপদা নক্ষত্রে থাকেন। দোলপূর্ণিমায় অদ্যাবধি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বের উত্তরায়ণ দিনের স্মৃতি রক্ষিত আছে।* অয়নদিন শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদগত হইতেছে। এক নক্ষত্র-ভাগ পশ্চাদগত হইতে প্রায় সহস্র বৎসর সময় লাগে। অতএব, যদি অদ্যাবধি ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে দোলপূর্ণিমার দিন (রবির পূর্ব্বভদ্রপদায় অবস্থিতিকালে) উত্তরায়ণ হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় অদ্যাবধি সাত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বারুণীর দিন (রবির উত্তরভদ্রপদায় অবস্থিতি কালে) উত্তরায়ণ হইয়াছিল। যাঁহারা জানেন, ভারতে আর্য্য-সভ্যতার বয়স চারি সহস্র বৎসরের অধিক নহে, তাঁহাদিগকে একবার এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। স্মৃতিতে বারুণীর দিন 'মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী' ব্রতের বিধান আছে। চৈত্র মাসের আর্ত্তব নাম 'মধু'। যজুর্ব্বেদের কালে মধু-মাধব, শুক্র-শুচি, ইষ-উর্জ্জ ইত্যাদি ঋতু সম্বন্ধীয় মাস-নামের প্রচলন ছিল। যেকালে মধু ও মাধব, এই দুই মাসে বসন্ত ঋতু ছিল, 'মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী'তে সেই কালের ইঙ্গিত পাইতেছি। মধুমাস তখন বসন্ত-ঋতুর প্রথম মাস ছিল। যজুর্ব্বেদেই এই গণনা প্রসিদ্ধ আছে। আভ্যন্তরীণ জ্যোতিষিক প্রমাণে যজুর্ব্বেদের কাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ অব্দের নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। অতএব মধু-কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর ব্রতে প্রায় ৪৫০০ বৎসরের পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত আছে। কত কালের প্রাচীন ইতিহাস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বণের মধ্য দিয়া আমরা বাঁচাইয়া রাখিয়াছি, ভাবিলে বিস্ময়ে বিহ্বল হইতে হয় এবং হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়।

* পূজাপার্ব্বণ (দোলযাত্রা)—আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে

শ্রীঅবনীনাথ রায়

বয়সের অঙ্কে আমার অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হয়েছে অনেক দিন। এখন পিছন ফিরে তাকাতে পারি। স্মৃতি-রোমন্থনের বিলাস এখন আমার প্রাপ্য। কিন্তু শুধুই কি বিলাস! পিছনে যা ফেলে এসেছি তার সবকিছুই আজ অপরূপ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ভেসে উঠছে। যা পেয়েছি তার পাওয়া যেন সার্থক হয়, যা পাই নি তার জন্য যেন মনে ক্ষোভ বহন না করি!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ সে একেবারে আকস্মিক। তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছানো আমার পক্ষে দুরূহ ছিল। তিনি ছিলেন বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের আশ্রম-গুরু, আমি ছিলাম যশোহর জেলার কোন পাড়াগাঁয়ের দরিদ্র পরিবারের নগণ্য সন্তান। তিনি তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি, কিন্তু বাংলা কাব্যের কীর্তি-শিখর তাঁর জ্যোতিতে তখন সমুদ্ভাসিত। ইংরেজী ১৯১১ সন। রবীন্দ্রনাথ এবং আমার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তা মানুষের বুদ্ধিতে সেদিন কোন মতেই অতিক্রমণীয় ছিল না; কিন্তু ঘটনাস্রোতে তা সম্ভব হ'ল। তাই ঘটনাটি এইবার বলছি।

তখন ব্রিটিশ শাসনের পীড়ন-নীতির যুগ। দেশকে স্বাধীন করার নির্ভীক চেষ্টা যেমন এক দিক দিয়ে চলছে, তেমনি অপর দিকে পুলিসের এবং গুপ্তচরের দৌরাত্ম্যে মানুষ তখন সন্ত্রস্ত। বাংলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে বাঙালীকেও ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার চেষ্টা লর্ড কার্জন করেছিলেন। তারই প্রতিবাদকল্পে "ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই" এই মন্ত্র উচ্চারণ করে বাংলা ৩০শে আশ্বিন তারিখে ভায়েদের হাতে রাখী বেঁধে দেওয়ার বিধি নেতারা প্রবর্ত্তন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই সত্য স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, আমরা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করলেও আসলে আমরা পৃথক নই—আমরা পরস্পরের ভাই। সেদিন অরন্ধনেরও ব্যবস্থা থাকত। রাখীবন্ধন পুণ্য ব্রত বলেই সেদিন গণ্য হ'ত। আমিও রাখীবন্ধনকে সেই ভাবেই নিয়েছিলাম। আমাদের গ্রামে আমি এবং আমার আর একটি বন্ধু ৩০-এ আশ্বিন রাখী বেঁধে বেড়িয়েছিলাম। গ্রামের এক ভদ্রলোক ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান। তিনি তখন চেষ্টা করছিলেন নানা রকমে সরকারের মনোরঞ্জন করতে, যার ফলে তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব লাভ করতে পারেন, আমাদের রাখীবন্ধন করার ঘটনাটি তাঁর স্বার্থসিদ্ধির পক্ষে খুব লোভনীয় বলে মনে হ'ল। তিনি তা পল্লবিত করে কর্তৃপক্ষের গোচর করলেন। এই রিপোর্টের ফলে আমি এবং আমার বন্ধু দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়ে গেলাম।

পি. মুখার্জ্জি বা ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তখন প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের ইনসপেক্টার অব স্কুলস্। আমাদের গ্রামের সঙ্গে তাঁর কিছু আত্মীয়তার যোগ ছিল। বাল্যকালে আমাদের গ্রামের স্কুলে তিনি পড়েছিলেন। তাঁর এক আত্মীয়ের কাছ থেকে চিঠি সংগ্রহ করে মুখার্জ্জি সাহেবকে ধরা গেল। তিনি ছিলেন অতিরিক্ত মাত্রায় সাহেবী মেজাজের। বেশ মনে পড়ে অত্যধিক সিগার খাওয়ার ফলে তাঁর দাঁতগুলি কালো হয়ে গিয়েছিল। বালিগঞ্জে ঝাউতলা রোডে তিনি থাকতেন। যাই হোক, তাঁর সুপারিশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বহিষ্করণ এক বছরের জন্য মাফ হয়ে গেল।

এই সব কারণে গ্রামের স্কুলের উপর আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল। যদি পারি ত অন্য জায়গায় পড়ি, এই রকম তখন মনের ভাব। অথচ যাই-ই বা কোথায়? এই মনোভাব নিয়ে কলিকাতায় একদিন বেড়াতে এলাম। আমাদের গ্রামের এক ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের জমিদারী এষ্টেটে চাকরি করতেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একদিন সকালবেলা ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, জোড়াসাঁকোয় গেলাম। তাঁকে সমস্ত বলায় তিনি বললেন, তা এক কাজ কর না—বাবুমশায়কে একবার বলে দেখ না। উনি যদি মনে করেন, শান্তিনিকেতনে ওঁর স্কুলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারেন। বাবুমশায় মানে রবীন্দ্রনাথ।

আমি বললাম, তা কি আর নেবেন?

হাজারিদা সাহস দিয়ে বললেন, চেষ্টা করতে দোষ কি?

একখানি শ্লেটে নাম লিখে হাজারিদা-ই পাঠিয়ে দিলেন।

তার পর বসে আছি ত বসেই আছি, কোন সাড়াশব্দ নেই। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে।

দেখলাম দোতলার বারান্দা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। আমি জমিদারী সেরেস্তার বারান্দায় যেখানটায় বসে ছিলাম, দোতলা থেকে সে জায়গাটা দেখা যায়। একটু পরে দেখি রবীন্দ্রনাথ হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছেন। পুনঃপুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও যে দারোয়ানেরা আমাকে রবীন্দ্রনাথের দরবারে হাজির করে নি, তাদের মধ্যে তিন জন দেখি তিন দিক থেকে তখন আমার কাছে ছুটে এসেছে। তারা এক রকম ধরেই আমাকে রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রথম অনুভূতিটা এখনও স্মরণ করতে পারি। সময় প্রাতঃকাল—কবি তাঁর অভ্যস্ত পোশাক পরে চটি পায়ে ধীরে ধীরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। দীর্ঘকায়—লম্বা চুল

ফুটেরও অধিক, কাঁচা পাকা দাড়ি, গৌরবর্ণ—রক্তের জ্যোতিঃ যেন গাত্রাবরণ ফুটে বেরুচ্ছে। চোখে পাঁসনে চশমা।

আমি যেতেই কবি থেমে দাঁড়ালেন। প্রণাম করতে হবে—হাজারি-দা বলে দিয়েছিলেন—আমি ভক্তিভরে কবির পদধূলি মাথায় নিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ালাম।

কবি বললেন, কি গো, তোমার কোথায় বাড়ী?

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এই আমি প্রথম শুনলাম। মনে হ'ল একাধিক বীণার তার যেন এক সঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। মানুষের কণ্ঠস্বর যে এত মিষ্টি হয়, ইতিপূর্ব্বে আমার সে ধারণা ছিল না।

তখন আমার পনের বৎসর বয়স—তবু মনে করতে পারি যে, ঐ কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় আমার কান জুড়িয়ে গিয়েছিল।

বাড়ী বললে কবি আমাদের গ্রাম চিনলেন—কারণ আমাদের গ্রামের দুই জন ভদ্রলোক ইতিপূর্ব্বে ঠাকুর এষ্টেটে ম্যানেজারি করেছিলেন।

আমি তাঁদের কেউ হই কি না জিজ্ঞাসা করার পর কবি একেবারে হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি শান্তিনিকেতনে যাবে?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম এবং মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে তিনি আমার প্রাণের কথা শুনেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, তা হলে তুমি পরশু দিন এখানে এসো—বেলা বারোটার গাড়ীতে আমরা বোলপুর যাব।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি কবির জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম—আমার সঙ্গে জিনিষপত্র বিশেষ কিছুই ছিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পৌঁছে গেলাম। বোলপুর ষ্টেশন থেকে কবিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একখানি ঘোড়ার গাড়ি এসেছিল। আশ্রমে প্রবেশ করার মুখে খুব একটা মিষ্টি ফুলের গন্ধ আমাকে অভিভূত করেছিল, একথা মনে আছে। পরের দিন সকালে দেখলাম সেটা মধুমালতী ফুলের গন্ধ—একটা দোতলা বাড়ীর গা বেয়ে গাছটি উপরে উঠে গেছে।

ভোজনাগারে রাত্রের আহার গ্রহণ করার পর সে রাত্রিটা গেষ্টরুমে কাটল। এই গেষ্টরুম তখন ছিল 'শান্তিনিকেতন' নামক দোতলা বাড়ীটার নীচের তলায়। পাশেই থাকতেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরের দিন সকালে উঠেই শুনি কবি আমাকে খুঁজছেন। আমি গেলে আমাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন এবং আশ্রমের আদ্য বিভাগে আমার থাকবার স্থান হ'ল।

এর পর প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে কবির কাছ থেকে যে স্নেহমমতা এবং সহৃদয়তা পেয়েছি, তার তুলনা বিরল। তিনি যে সব বিষয়েই কত বড়, তাঁর তুলনা যে একমাত্র তিনিই—একথা বোঝার বয়স তখন নয়। তাই তাঁর স্নেহের পরিপূর্ণ মর্য্যাদা তখন দিতে পারি নি—তাঁর লেখা কত চিঠি ছিল, একবার আমার পিসেমশায়ের বাড়ী যাওয়ার পথে সব হারিয়ে ফেলি। এবড়োখেবড়ো কাগজে কবিতা লিখে তাঁর কাছে নিয়ে যেতাম—দুপুরবেলা তিনি যখন শান্তিনিকেতনের 'হলে' বসে চিঠি লিখতেন, তখন তাঁর কাছে গিয়ে বলতাম, আমার কবিতা কারেক্ট করে দিন। আশ্চর্য্যের বিষয় কোন দিন বিরক্ত হন নি, তাড়িয়ে দেন নি—হাসিমুখে কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন। আজ তাই মনে মনে ভাবি, আর চোখ জলে ভরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ কোন বিষয়েই 'না' বলতে জানতেন না। কোথায় যেন পড়েছিলাম অজিত বাবু (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পদ্মায় বোটে বাস করেছিলেন। একবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে আমি বায়না ধরলাম, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদা যাব। তিনি রাজী হলেন। সঙ্গে ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন সেই সময় রবীন্দ্রনাথ আর পদ্মায় বোটে থাকতেন না—তখন "কুঠীবাড়ী" তৈরী হয়েছে। এখানে থাকার বিবরণ আমি ইতিপূর্ব্বে অন্যত্র লিখেছি।

রবীন্দ্রনাথের স্নেহের, প্রীতির, মহানুভবতার ছোটখাটো কাহিনী আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক লিখেছি—তবু যেন মনে হয় সে কাহিনী ফুরাবার নয়। তার কারণ সে কাহিনীর উৎসস্থান আমার চিত্তভূমি—সেখানে সে সব স্মৃতি বিচিত্র রঙে অনুরঞ্জিত হচ্ছে—সে পুরানো হতে পারে না।

সেই স্মৃতির অতল থেকে আর একটি ঘটনা উদ্ধৃত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব।

আমি যখন মীরাটে ছিলাম তখন আমার এক হিন্দুস্থানী বন্ধু ছিলেন—তাঁর নাম ভগবৎ দয়াল। তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজ থেকে ইংরেজীতে এম-এ পাস করে পিলানী কলেজে অধ্যাপকতা করেন—এখন মিঃ বিড়লার প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়েছেন। তিনি এক বার প্রস্তাব করলেন যে, তিনি বাংলাদেশ দেখতে আসবেন—আর বাংলাদেশের মহাপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করবেন। তাঁর ধারণা ছিল এই যে, বাংলাদেশের বরিশাল জেলা দেখলেই বাংলাদেশ দেখা হ'ল এবং রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে দেখলেই বাংলাদেশের মহাপুরুষদের দর্শনলাভ শেষ হ'ল। করলেনও তাই—কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশ পরিক্রমা করে মীরাটে ফিরে এলেন। যে রাত্রে মীরাটে ফিরলেন তার পরদিন সকালেই তিনি আমার বাসায় এসে হাজির। আমার কাঁধে একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "How the hell Tagore knows you so deeply—he was speaking of you for half an hour"। ভগবৎ দয়ালের তখন ভাব এসে গিয়েছিল। সাধারণতঃ তিনি হিন্দীতেই আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতেন—কখনো বা ইংরেজীতে—বাংলাও কিছু কিছু বুঝতেন, যদিও বলতে পারতেন না। বাঙালীদের মত তিনি ধুতি কামিজই পরতেন—তাঁর রঙ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মত। তাঁকে বাঙালী বলে ভুল করা অস্বাভাবিক ছিল না।

ঘটেছিল ও তাই—রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে

বলেছিলেন, তিনি মীরাট থেকে এসেছেন। মীরাটের কথা উঠতেই রবীন্দ্রনাথ আমাকে স্মরণ করেছেন এবং আধ ঘণ্টা ধরে কিছু বলেছেন। ভগবৎ দয়ালের কাছ থেকে না রাম না গঙ্গা কোনরূপ প্রত্যুত্তর না পেয়ে রবীন্দ্রনাথের হুঁশ হয়েছে যে, যাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছেন তিনি বাঙালী ত? তখন রবীন্দ্রনাথ ভগবৎ দয়ালের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন এবং তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পেরেছেন যে, তিনি তাঁর বক্তব্য বড় একটা বুঝতে পারেন নি। তারপর ক্ষমা চেয়েছেন। ভগবৎ দয়াল সঙ্কুচিত হয়ে বলেছেন—না, না, এতে তাঁর কিছুমাত্র অপরাধ হয় নি—সব কথা বুঝতে না পারলেও তাঁর অনুপম কথাগুলি তিনি উপভোগ করেছেন এবং মাঝপথে বাধা দিয়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চান নি।

এই ত গেল ঘটনা। এখন ভগবৎ দয়ালের সমস্যা হ'ল এই যে, রবীন্দ্রনাথের মত এক জন বিশ্ববিশ্রুত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের এক জন সাধারণ প্রবাসী বাঙালীর সম্বন্ধে আধ ঘণ্টা ধরে কি বললেন। আমাদের দেশে বড়লোক বলতে তাঁদের বোঝায় যাঁদের দরজায় দারোয়ানের বাহুল্য এবং যাঁদের বন্ধ ভেদ করে গৃহস্বামীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো দুরূহ ব্যাপার। তাঁরা সকলের সঙ্গে পরিচয় রাখেন না বা পরিচয় থাকলেও স্বীকার করেন না—কারণ, তাঁদের পরিচয়-স্বীকৃতির মানদণ্ড নির্ভর করে পরিচিতের সাংসারিক অবস্থা বা ষ্টেটাসের উপর। তাঁর ধারণা রবীন্দ্রনাথও ত সেই ধরনের বড়লোক—আভিজাত্যে, ধনে, মানে, বংশে একেবারে উদ্ভাসিত। তাঁর সঙ্গে পরিচয় রাখার দাবি করতে পারেন তিনি—ধনে, মানে, আভিজাত্যে যিনি তাঁর সমকক্ষ—অন্ততঃ কাছাকাছি। সেই রবীন্দ্রনাথ আমার মত এক জন সামান্য লোকের সঙ্গে শুধু সম্বন্ধ-স্বীকারই করলেন না, তাঁর প্রসঙ্গে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এ ব্যাপার ভগবৎ দয়ালের কাছে প্রহেলিকা বলে তো বোধ হবেই।

ভগবৎ দয়ালের কাছে আমি সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম সেটা আজও মনে আছে। আমি ভগবৎ দয়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, টেগোর আমার কথা এমন করে বলেছেন দেখে তুমি ত একেবারে অবাক হয়ে গেছ। মনে কর, তাঁর যদি কোন সন্তান মীরাটে থাকত এবং তুমি যদি তার কাছ থেকে গেছ এমন হ'ত, তবে তিনি কি তার কথা অমন করে বলতেন না? এর মানে কি এই যে, সেই ছেলে গুণে জ্ঞানে বিদ্যাবত্তায় একেবারে পিতার সমকক্ষ?

ভগবৎ দয়াল আমতা আমতা করতে লাগল। বললে, সে আলাদা কথা—তা হয়ত তিনি বলতেন…কিন্তু এ ত সে রকম নয়…

আমি বুঝতে পারলাম রবীন্দ্রনাথের সন্তান বলে আমি যে স্থান নিয়েছি তাতে ভগবৎ দয়ালের মন সায় দিচ্ছে না।

আমি কথাটা ঘুরিয়ে আর এক রকম করে বললাম। বললাম, মনে কর টেগোরের যদি কোন অনুগত প্রিয় জন মীরাটে থাকত এবং তুমি যদি তার কাছ থেকে যেতে, তবে কবি তার কথাও কি অমনি করে বলতেন না?

এখানে আর একটা কথাও জানিয়ে রাখতে পারি। প্রিয় ভৃত্য সম্বন্ধে পর্যন্ত তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় ভৃত্য উমাচরণের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের স্নেহের অন্ত ছিল না—এ আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

ভগবৎ দয়াল কি বুঝল জানি না, খুশী হ'ল কি না তা-ও বলতে পারি না, কিন্তু সে আর কথা বাড়াল না। বাড়ী চলে গেল।

জীবনে আমাদের এই ভুলই হয়। মহাপুরুষদেরও আমরা নিজেদের প্রচলিত বাটখারায় ওজন করি এবং তার সঙ্গে না মিললেই দোষারোপ করি। ভুলে যাই যে, প্রচলিত মাপকাঠির সীমাকে অতিক্রম করেছেন বলেই তাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের হৃদয়ের ঔদার্য এবং বিস্তৃতি সীমাহীন—তাঁদেরই স্নেহরসধারায় যুগে যুগে মানুষ তৃপ্ত হয়েছে, জ্বালা জুড়িয়েছে, জীবনপথের পাথেয় সংগ্রহ করেছে।

পঁচিশে বৈশাখ

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

বিশ্ববাসী শোনো শোনো অমৃতের পুত্র আমি শোনো—
পেয়েছি আলোর স্বাদ, এই স্বাদ হয়তো কখনো
আসিবে জীবনে ফিরে—অকস্মাৎ অন্য জন্মান্তরে
প্রতিটি প্রভাতে। দেখি অন্ধকার দূরে যায় সরে
পূর্বাচলে আদিত্যের হিরণ্ময় নিঃশব্দ প্রকাশ
পৃথিবীতে, এই জন্মে কত মুক্ত প্রাঙ্গন আকাশ
পেয়েছে তাহার স্পর্শ। ধন্য আমি, ঘাসের ডগায়
রাতের শিশিরবিন্দু ঝলোমলো প্রসন্ন লতায়—
নতুন পাতার মেলা ফুলে ফুলে শালমঞ্জরীতে—
সূর্যের সরাগ স্পর্শ সপ্তপর্ণে রক্তকরবীতে
এই মুখে চোখে আহা, ভরে যায় তৃপ্তিতে হৃদয়
জীবন ফুলের মত, কত বর্ণ রস গন্ধময়।
আছে দুঃখ মৃত্যু, তবু পৃথিবীর মাটিতে প্রথম
জেনেছি সুন্দর তুমি—অপরূপ তুমি প্রিয়তম;
এখানে তৃণের সাথে ভাগ করে লয়েছি প্রসাদ
তোমার প্রেমের। বন্ধু, জীবনের তিক্ততা বিস্বাদ
ভুলেছি। আশ্চর্য কত রাত্রি নামে বিবর্ণ প্রান্তরে
অথবা অবাক স্বপ্নে, সংখ্যাতীত দুঃসহ প্রহরে
তিমিরের প্রান্তে তুমি, জানিলাম প্রাণের আরাম
পঁচিশে বৈশাখে তাই রেখে যাই আমার প্রণাম।

আশায় আশায়

শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী

—বসে কে? বিনোদিনী নাকি? জিজ্ঞেস করল জগু।

সদর শহর থেকে রাত্রি নয়টায় শেষ বাস 'আগমনী' এসে থামল ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তার উপর। পৌঁছতে রাত্রি হয় বাসটার। ঠিক সময়ে কোন দিনই আসে না। কখনও রাত্রি দশটা কখনও বা আরও অধিক। ঘুমিয়ে পড়ে সারা গ্রামখানি। নামো কুলির বাউরীদের ঘরের দরজায় 'আগুড়' পড়ে যায়। জেগে থাকে শুধু বাস ষ্ট্যাণ্ডের কয়েকটি দোকান। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ চা খায়। দূরের যাত্রীদের খাবার ব্যবস্থাও করে। সারাটা রাত তারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দাটায় পড়ে থাকে সকালের অপেক্ষায়। জেগে থাকে রাস্তার অপর পারের রাণীসায়রের পাড়ের উপর ছোট্ট চালাঘরটায় গোষ্ঠ বাউরী। বসে বসে পুকুর পাহারা দেয়—কেউ যাতে মাছ চুরি করে না নিয়ে যেতে পারে। জেগে থাকে কয়েকটি অর্দ্ধ-উলঙ্গ কালো মানুষ। চায়ের দোকানের এক পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকে বাসের প্রতীক্ষায়, দু' চার পয়সা রোজগারের আশায়। একটা কুকুর রাস্তার উপর পড়ে-থাকা বেঞ্চির পাশে বসে লাল ফেলে। আর এদের সঙ্গেই জেগে বসে থাকে বিনোদিনী। সারাটা দিন বাবুদের ঘরে খেটে এসে সন্ধ্যায় নিজের ঘরে ঢোকে। বুড়ো বাপ নেপাল খানদারকে খাইয়ে দিয়ে শুতে বলে, এসে বাইরে বসে থাকে।

প্রত্যহই এই ঘটনা ঘটে। কিসের একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ তাকে টেনে এনে বাইরে বসিয়ে দেয়। কতবার মানা করেছে নেপাল, সে মানা কানে তুলে নি বিনোদিনী। আজও তাই এসে বসেছিল। যতক্ষণ বাসটা না এসে পৌঁছয় ততক্ষণ বিনোদিনীর দৃষ্টি থাকে সামনে প্রসারিত। কান দুটো সজাগ থাকে একটা যান্ত্রিক শব্দ শুনবার আশায়, মাঝে মাঝে প্রান্তরের উপর দিয়ে এক ঝলক পাগলা হাওয়া এসে ওর বুকের আঁচল উড়িয়ে দেয়, পরিপাটি করে বেঁধে রাখা মাথার চুলের গুচ্ছকে স্থানচ্যুত করে দেয়। শিউরে উঠে বিনোদিনী। চমকে উঠে আখগাছের শুকনো পাতার কম্পনে। একটা অদ্ভুত শব্দে ভীত হয়ে কয়েকটা শেয়াল আখের ক্ষেত থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। একবার পিছন ফিরে দেখে নেয় কেউ আসছে কি না, তার পরেই চলে যায়। এই সব দেখতে দেখতেই সময় কেটে যায় বিনোদিনীর। সন্ধ্যা হতে রাত্রি এগারোটার এ পাড়ার ইতিহাস বিশদ ভাবে বলে দিতে পারে বিনোদিনী। কখনও কখনও এই পরিবেশ তার কাছে অসহ্য মনে হয়। মনে হয়—এখান থেকে, এই গ্রাম থেকে দূরে, বহু দূরে গিয়ে বাস করে। আবার কখনও ভালবাসতেও মনে হয় তার। এই পরিবেশের মধ্যে যে তার আত্মিক জীবন, তার জৈব জীবন আছে জড়িয়ে। ঐ প্রান্তর, ঐ আখক্ষেত, ঐ পাগলা হাওয়া, এমনকি ভীত-সন্ত্রস্ত শেয়ালগুলোও তার কাছে অত্যন্ত আপন বলে মনে হয়। কোন কোন দিন এদের একটার অদর্শনে কষ্ট পায় বিনোদিনী।

জগু বাউরী 'আগমনী' বাসের ক্লীনার। যৎসামান্যই পায়। কিন্তু মাইনের জন্য সে এ চাকরি নেয় নি। তার সাধ, সে ড্রাইভার হবে। হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে গাড়ী চালাবে। আশপাশের পরিদৃশ্যমান জগৎটার চেহারা ক্ষণে ক্ষণে প্রতিফলিত হবে তার গাড়ীর মাডগার্ডের উপর। গর্ব্বে তার বুকখানা ভরে উঠবে। তখন তার চাহিদা কত হবে। সবাই চাইবে জগু ড্রাইভারকে। তাই গাড়ী-পরিষ্কারকের চাকরি নিয়েই ঢুকেছে জগু 'আগমনী' কোম্পানীতে। কাজ তাকে সবই করতে হয়। ইঞ্জিনে জল ভরা, গাড়ীর 'বডি' পরিষ্কার করা। কোন কলকব্জা বিগড়ে গেলে গাড়ীর নীচে চিৎ হয়ে শুয়ে তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা—এমনকি ড্রাইভার কণ্ডাক্টারের কাপড়-জামায় সাবান লাগিয়ে দেওয়া, তাদের ফাই-ফারমাশ খাটা কাজও তাকে করতে হয়। রাত্রিতে গাড়ীটাকে গ্যারেজে তুলে দিয়ে তার বেঞ্চগুলি পরিষ্কার করে ড্রাইভার আর কণ্ডাকটারের বিছানা পেতে দিয়ে বাড়ীতে ফিরে সে।

আজও ফিরছিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞেস করলে, গাড়ীর পেসিঞ্জার সব গেল নাকি জগু?

—হু। আজ পেসিঞ্জারই নাই। একেবারে ফাকা গাড়ী লিয়ে আইলুম। এমনি দিনকতক চললে কোম্পানী ডকে উঠবেক।

একটা ভারী নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক ঠেলে। সে উঠে দাঁড়াল।

জগু একটা বিড়ি বের করে ধরাল। বিনোদিনীর হাতে একটা সিগারেট তুলে দিয়ে বলল, লে খা।

সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে রেখে বিনোদিনী জিজ্ঞেস করল, শহর থেকে আসছিস, কিছু লোতুন খবর আনিস নাই জগু?

জগু জানে কোন নতুন খবরের আশায় এমন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আজ তিন মাস এই দরজার গোড়ায় বসে থাকে বিনোদিনী। কিন্তু প্রত্যহ তাকে ব্যথা দিতে কষ্টই অনুভব করে জগু। তবু যা সত্য তাই বলতে হয়।

—না রে। ঢের কাজ যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাই না। তার খবর লিবি কি ?

মেয়েটার উপর কেমন যেন একটা সহানুভূতি জাগে জগুর অন্তরে। ওর দুঃখের একটুখানি পরশ হয়ত জগুর মনে গিয়ে ছোঁয়া লাগায়। তাই বললে 'আজ ঢের রাত হৈছে, বিনোদিনী শুগা যা, কাল লিয়ে আসব খবর।' খবর—একটি খবরের জন্য আজ তিনটি মাস এমনি ভাবে দিন কাটছে বিনোদিনীর। একটি খবরের আশায় এমনি ভাবে বাইরে এসে বসে থাকে বিনোদিনী। কিন্তু সব দিনই তাকে হতাশ হয়ে উঠে যেতে হয়, আজও তাই।

—দেখিস ভুলিস না জগু। কুম্পানীকে কৈয়ে টুক্চা সোময় লিয়ে লিবি না হয়—বলল বিনোদিনী।

তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছে জগু। হয়ত তার কথা জগুর কানেই গেল না। সে কোন উত্তরই দিল না। শুধু নেহাত জানালে—হাঁ, তাই করবে।

অহিভূষণ চক্রবর্তী নকুলের মনিব ছিল না। অহিভূষণ গাঁয়ের মালিক। হাজার বিঘা জমির একচ্ছত্র অধিপতি। এ ছাড়া আছে পাহাড়-জঙ্গল। অহিভূষণের কাঁটা-পাহাড়ী জঙ্গলের পাশেই দীর্ঘকাল ধরে পড়ে-থাকা একটা জায়গায় গরু চরাত নকুল। সকাল হলেই বাড়ী-বাড়ী গিয়ে গাঁয়ের গরুগুলিকে গোয়াল থেকে খুলে নিয়ে যেত কাঁটা-পাহাড়ীর মাঠে। এই খানেই গাঁয়ের বাথান। এটাই গোচারণভূমি। গরুগুলি মনের আনন্দে মাটিতে মুখ লাগিয়ে কচ কচ করে ছিঁড়ে নিয়ে আসত ঘাসগুলিকে জিভের সাহায্যে। জাবর কাটত। আর নকুল একটা গাছের ছায়ায় বসে আপন মনে সুর ভাঁজত। সুরের লহরী সৃষ্টি করত নকুল—কবি নকুল, গায়ক নকুল। সন্ধ্যাবেলায় গরুর ক্ষুরের আঘাতে গ্রামের ধূলি রাস্তায় যবনিকা রচনা করত। ওদের নিয়েই ওর জীবন—ওরাই ওর সারা দিনের সঙ্গী। সন্ধ্যায় গোয়ালে গরুগুলিকে বেঁধে দিয়ে বলত—আজকার মতন থাক আবার কাল সকালে যাবি। ওদের আদর করে গলকম্বলে একবার হাত বুলিয়ে দিত। উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে থাকত গরুগুলি। হয়ত ওর বিচ্ছেদ ওদের সহ্য হ'ত না। হাসত নকুল ওদের রকম দেখে।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর গানের আসর বসত নেপালের ঘরে। ছোট্ট উঠানের উপর একটা চাটাই বিছিয়ে দিত বিনোদিনী। নেপাল তার ঢোলটা কোলের উপর নিয়ে বসত। ঝুমুর গাইত নেপাল—'কালা আমার বেলায় তুমি শুধু কালা হে।' গোরা পাগলার ঝুমুর ওর গলায় খেলত ভাল, যারা শুনত তারা মুগ্ধ হয়ে যেত। বিনোদিনীর আর গৃহস্থালির কাজ করা হ'ত না। হাতের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে বসত অদূরে। মুগ্ধ হয়ে গান শুনত আর মনে মনে তারিফ করত, তারই সঙ্গে একটি গোপন বাসনাও উঁকি মারত তার মনে। কিন্তু সে বাসনাকে বাইরে প্রকাশ হতে দেয় নি বিনোদিনী। আশঙ্কা হ'ত,পাছে যেটুকু অযাচিত ভাবে পাচ্ছে—সেটুকুও না হারিয়ে যায়! এমনিতেই গাঁয়ের লোকে, পাড়ার লোকে তার নাম দিয়েছে 'ভাতারখাওকী'। নেপাল দু'দুবার বিয়ে দিয়েছিল বিনোদিনীর, দু'বারই তাকে বিধবা হতে হয়েছে। এর পর নেপাল আবার চেষ্টা করেছিল মেয়ের সাঙা দেবার, কিন্তু আপত্তি তুলেছিল বিনোদিনীই। তাই আর সে পথে এগোয় নি নেপাল। সেদিনের অনিচ্ছার আচ্ছাদনে কোথায় একটি বাসনার বীজ হয়ত অনাদৃত হয়ে পড়েছিল, আজ তাকে অঙ্কুরে পরিণত হতে দেখে পুলক-শিহরণ জাগত তার শুকিয়ে-যাওয়া যৌবন-সরসীর নীরে। নব অঙ্কুরটিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠত বিনোদিনী। একটুখানি পরশ পাবার আশায় মাঝে মাঝে তামাক সেজে দিয়ে আসত সে, আপত্তি করত নকুল। নেপালকে বলত, আমি থাকতে আবার বিনোদিনী কেনে গুরুজী! হাসত নেপাল। নকুল বিনোদিনীর হাত থেকে কল্‌কেটা কেড়ে নিয়ে বলত, বিনোদিনীর অমন সোনার রং আগুনের তাপে গৈলে যাবেক যে!

সোনার রং অবশ্য নয় বিনোদিনীর। তবু প্রশংসা শুনে খুশীই হ'ত সে। আস্তে আস্তে বলত,. গলে গেলেই বা কার কি ক্ষতি শুনি ?

—সে তুইই জানিস—বলে হেসে উঠত নকুল।

নকুলের মনের কথাটা শুনতে সাধ হ'ত বিনোদিনীর, কিন্তু নকুল বড় দুষ্ট। পীড়াপীড়ি করেও তার মুখ থেকে কোন কথা বের করা যেত না। শুধু বলত, সময় হৈলে বৈলব।

মাঝ রাত্রি পর্য্যন্ত চলত ঝুমুরগান। আগমনী বাসের কনডাক্টার একবার উঁকি মেরে যেত বাইরে থেকে। তার পর গিয়ে হয়ত ঘুমিয়েই পড়ত বাসের ভিতর। নামো কুলির বাউরীদের এই নৈশ আসর সারা গ্রামে ছড়িয়ে-থাকা নৈঃশব্দ্যের গায়ে আঘাত হানত। আখক্ষেত থেকে শৃগালগুলো বেরিয়ে এসে বাউরীদের হাঁস মুরগী ধরতে পারত না।

গান শুনতে শুনতে কোন্ সময় খাল্লি মাটির উপরই শুয়ে পড়ত বিনোদিনী, ঘুমিয়ে যেত। নকুল তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে সুর করে গাইত :

শুন বিনোদিনী রাই
ভূমিশয্যা ছাড় এবার—
তোমার ধুলায় অঙ্গ সাজে নাই।

ঘুম ভেঙে যেত বিনোদিনীর—তবু যেন উঠতে মন চাইত না। তাই ছল করে পড়ে থাকত মাটিতে। নেপাল বলত, উয়াকে উঠাঞ দে নকুল, শুক্ আইসে বিছানায়।

নকুল হাত ধরে তুলে দিয়ে বলত—'সাঙ্গ হৈল ব্রজের খেলা, শুগে বিনু এই বেলা।'

হেসে উঠত বিনোদিনী। চুপি চুপি বলত, কাল খেলা বৈসবেক ত।

এমনিই চলছিল জীবনের সাবলীল গতি। কোথাও বাধা নেই—বিঘ্নহীন। অকস্মাৎ কোথা থেকে একটা প্রতিবন্ধ এসে

থামিয়ে দিল ধারার গতি। আবর্ত্তিত হ'ল জীবনস্রোত। গুমরে গুমরে উঠল ফেনপুঞ্জ। বাধাকে সরিয়ে দেবার জন্য দেখা দিল আবদ্ধ স্নেহের সংগ্রাম।

নেপালের বাড়ীতে আসা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল নকুলের। সান্ধ্য আসরের অভাবে নেপালের ছোট্ট উঠানখানি খাঁ খাঁ করতে লাগল। নৈশ বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে-যাওয়া নেপালের কণ্ঠসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা হয়ে গেল বন্ধ। হাঁপিয়ে উঠল নেপাল। তার ঢোলটার গায়ে জমে গেল ধুলো। একদিন বিনোদিনীকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, নকুল আর আসে না কেনে বিনি? তুই কি কিছু কয়্যাছিস উয়াকে?

বিনোদিনীরও ঐ জিজ্ঞাসা। কিন্তু সাহস করে সে শুধাতে পারে নি তার মাকে। আজ বাপের প্রশ্নের উত্তরে বলল, আসে না কেনে তা আমি কি কৈরে জানব। আমি কি কইব শুনি?

অভিমানে গুমরে গুমরে উঠল তার বুক। বারকয়েক সে গিয়েছিল নকুলের বাড়ীতে। নকুলের সঙ্গে দেখা হয় নি—সাহস করে নকুলের মাকেও জিজ্ঞেস করতে পারে নি বিনোদিনী। এক এক বার ঐ মানুষটার উপরও তার রাগ হ'ল, এ কেমনতর আচরণ?

—না আমি কইছি নাই উ কথা।

বলি যদি কিছু কয়্যাছিস। একবার খোঁজ লে বিনু।

খোঁজ নিল বিনোদিনী। পেল সন্ধান। না আসার কারণ জানতে পারল নকুলের মার কাছ থেকেই।

—আমার বাবা ত তুমার ব্যাটার তরে ক্ষ্যাপে গেইছে খুড়ি।

—আ বাছা উয়ার কি আর এখন ঘরে থিতি আছে। ক্ষ্যাপে গেইছে বাপ, নকুলও আমার ক্ষ্যাপে গেইছে। বলে, আজ তিন-চার পুরুষের অধিকার এমনি ছাড়্যা দিব? তাই বটে, বাছা আজ ত লোতুন লয়—ঐ ঝাঁটীপাহাড়ীর তলেই ত এই গাঁয়ের গোরু চরে—তা লোতুন হুকুম দিয়্যাছে চকরবতী, উঠ্যানে গোরু চরান বন্ধ হয়্যা গেইছে। ঐ করেই ত খাচ্ছিলুম বাছা, এখন খাওয়াও—আর বলতে পারল না নকুলের মা। সব ব্যাপারটা সম্যক্ উপলব্ধি করল বিনোদিনী।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ চক্রবর্ত্তীর। হাজার বিঘা জমির আয়েও দিন চলে না—তাই খাজনা চেয়েছিল চক্রবর্ত্তী নকুলের কাছে—গোরুপ্রতি এক আনা! আর তা না দিতে পারলে গোরু চরানো বন্ধ। সুদের কারবার করে বড়লোক হয়েছে চক্রবর্ত্তী, তাই সবকিছুতে সুদের অঙ্কই কষে সে।

মনে মনে নকুলকে তারিফ করে বলল, ইট অন্যায় কৈরেছে চকরবতী। তুই ত বাছা উয়াদের ঘরে কাজ করিস, শুনেছি চকরবতী নাকি তুখে ভালবাসে, একবার কয়্যা দেখবি—যদি টুকচা দয়া কৈরে।

—সে লোক অহি চকরবতী লয় খুড়ি। তুমি ত জান উ কেমন লোক। না পারে এমন কাজ নাই, না করে এমন অন্যায় নাই।

সত্যই তাই। প্রতিপক্ষকে জব্দ করবার জন্য, নিজের মাথা নিজের হাতে কাটিয়ে দিতে পারে। তার চেয়েও শক্ত কাজ করার কথাও জানে বিনোদিনী। মানুষকে খুন করতে ওর প্রাণে কষ্ট হয় না।...

হঠাৎ একটা ছবি মনে হতেই শিউরে উঠল বিনোদিনী। চক্রবর্ত্তীর বাবা এক সময় চিকিৎসালয় করতে জমি পুকুর আরো সব কি কি দান করেছিলেন দশকে। সে জমির উপর পাকা ঘর তুলে হয়েছিল চিকিৎসালয়। তার চিকিৎসক ছিলেন মণীন্দ্র রায়। বুড়ো চক্রবর্ত্তী মরে যাওয়ার পর অহি চক্রবর্ত্তী উক্ত দান করা জমি ফিরে পাবার জন্য একদিন নোটিস দিল চিকিৎসককে। কিন্তু দানের সর্ত্ত ছিল যতদিন চিকিৎসালয় থাকবে ততদিন জমি থাকবে চিকিৎসালয়ের। তাই উত্তর দিয়েছিলেন মণীন্দ্র রায়। কিন্তু এর পরিণাম হয়েছিল বড় মর্ম্মন্তুদ। একদিন চিকিৎসককে তার নিজের বাড়ীতেই রক্তাক্ত অবস্থায় মৃত দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। কারা তার গলাটা কেটে দিয়েছিল, আজও তার হদিস হয় নি। কিন্তু বিনোদিনী জানে। যে পুলিস এসেছিল তদন্তে তাদের কাছে ঘটনাচক্রে সব শুনেছে সে। পাপ কখনো ঢাকা থাকে না। ঐ খুনের সঙ্গে অহিভূষণের নামটা জড়িয়ে আছে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলতে সাহস করে না।

তাই আজ আশঙ্কায় তার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। নকুলের মা কোন জবাবই দিল না। মুখখানি দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গেল। নকুলের মাকে নীরব থাকতে দেখে বিনোদিনী বলল, চকরবতীদের সাথ লিয়াই কৈরে কেউ কি ট্যাকতে পারাছে খুড়ি?

— তুই একবার উয়াকে বুঝাঞে বল বিনু।

যেমন করেই হোক্ নকুলকে এই সর্ব্বনাশা পথ থেকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য বিনোদিনী উঠে পড়ে লাগল। কিন্তু যাকে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তার সঙ্গেই দেখা হ'ল না বিনোদিনীর। সারাটা দিনের মধ্যে ঘরে বা গাঁয়ে তাকে পাওয়া যায় না। কোথায় যায়, কি করে কেউই বলতে পারে না—এমনকি নকুলের মা-ও নয়। জিজ্ঞেস করতে একদিন বলেছিল নকুলের মা, কোথায় যায় কি করে তাই কি আমাকেই কয় বিনু।

—রাতে ঘরকে আসে ত?

—কখন আসে, কখন আসে না। উয়ার দশা দেখে আমার বড় ভয় হয় বিটি। কাজ নাই আমাদের গোরু চরাঞে খাবার। দশটা লয় পাঁচটা লয়—ঐ একটি—

শেষ করে আর বলতে পারে নি নকুলের মা। বেদনার শক্ত একটা পিণ্ড গলায় আটকে গিয়েছিল।

বাবুদের বাড়ীর কাজ সেরে ফিরতে ইদানীং একটু রাত্রিই হয় বিনোদিনীর। বড় বাবুর সম্বন্ধী তাঁর পরিবার নিয়ে এসেছেন।

সঙ্গে কয়েকটা কাচ্চাবাচ্চাও আছে। কাঁখে-পিঠে বৌটার ছেলে। ওদের আসাতে কাজ বেড়ে গেছে বিনোদিনীর, সম্বন্ধীবাবুর ছেলেদের খানিক খেলাতে হয়, কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। তার পর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকলে ছুটি পায় বিনোদিনী। যখন ফিরে, তখন গ্রামের রাস্তায় আর লোক দেখা যায় না। থম্ থম্ করে রাস্তা। নির্জনতার যেমন একটা সুন্দর রূপ আছে, অবস্থা-বিশেষে তাই আবার ভয়াবহ হয়েও দেখা দেয়। দু' পা চলতেও ভয় লাগে। একমনেই ফিরছিল বিনোদিনী। হঠাৎ নকুলের বাড়ীতে কয়েকটা মানুষকে ঢুকতে দেখে থমকে দাঁড়াল সে, শরীরটা কেঁপে উঠল। অকস্মাৎ মণীন্দ্র রায়ের মৃতদেহটার কথা মনে পড়তেই ভয়ে অসাড় হয়ে গেল বিনোদিনীর শরীর। খানিক দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার রাস্তার উপর। তার পর সাহসে ভর করে এগিয়ে চলল। ঔৎসুক্য জাগল তার মনে। চুপি চুপি পা ফেলে এগিয়ে এল। নকুলের দরজার গোড়ায় এসে থামল। কান পেতে শুনবার চেষ্টা করল আগন্তুকদের আলাপ-আলোচনা। কিছুই শোনা গেল না। ছাড়া ছাড়া কয়েকটা কথা যা ওর কানে এসে প্রবেশ করল—তা দিয়ে সম্যক্ অর্থ বের করা যায় না। সে কি করবে তাই ভাবছিল—এমনি সময় ভিতর থেকে একটি পুরুষের কণ্ঠ ভেসে এল, উঠ্যানে দাঁড়াঞে আছিস কে?

ধরা পড়বার আশঙ্কায় দ্রুত পায়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই কে একজন ছুটে এসে তার শাড়ীর আঁচলটা ধরে জিজ্ঞেস করল, কে তুই?

—আমি, আস্তে আস্তে উত্তর দিল বিনোদিনী।

—ও বিনোদিনী! আড়ালে দাঁড়াঞে কি আমাদের পরামর্শ শুনছিলি? শুধাল নকুল।

এত দিন যাকে খুঁজছিল বিনোদিনী আজ তাকেই সামনে পেয়ে, যে কথা বলার প্রয়োজন অথচ বলা হয় নি, তাই বলবার জন্য তৈরী হ'ল সে। একবার মনে হ'ল হাতে ধরে বলে, 'তুমি এই সব্বনাশা পথ হৈতে সরাঞে আইস'—কিন্তু বলা হ'ল না। পরিহাস করবার একটা বাসনা জাগল তার। বলল, হুঁ। রাতের অন্ধকারে এমন সব সলা করা ভাল লয় গো! চকরবর্তীর অনেক চোখ আর কান আছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি, না হৈলে তুই এমন অন্ধকারে দাঁড়াঞে রইবি কেনে?

—তা যার নুন খাই তার গুণ গাইতে ত হবেই! নকুলের হাতটায় ধরে গাঢ় স্বরে অনুরোধ করল বিনোদিনী, চকরবর্তীর সাথ লিয়াই কৈর না গো!

—ক্যানে?

—ভাল হবেক নাই। জলে বাস কৈরে কি কুমীরের সাথ লিয়াই করা চলে?

কথাটা শুনে হঠাৎ একঝলক রক্ত উঠে গেল নকুলের মাথায়। এক ঝাপটায় হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বিনোদিনীর গালে সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে নকুল, বলল—যা তুর গলাকে (মুনিব) বাবুকে বলগা বিনোদিনী, যে জলে কুমীরই শুধু থাকে না—কুমীরকে ঘায়েল করবার মত জীবও থাকে।

কথা কয়টি বলেই হন্ হন্ করে চলে গেল নকুল।

প্রহৃতা হয়েও কিন্তু চোখে জল বেরুল না বিনোদিনীর। শুধু ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগল তার। নাসারন্ধ্রের আবরণগুলি ক্ষণে ক্ষণে ফুলে ফুলে উঠল। অভিমানে ভেঙে পড়ল বিনোদিনী। গায়ে শক্তি আছে নকুলের—তারই পরিচয় দিয়ে গেল ও। বেদনায় জ্বালাটা কমতেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

পরদিন যথারীতি বাবুদের ঘরে গেল বিনোদিনী। ওর প্রথম কাজই হচ্ছে বড়বাবুর ঘর থেকে গত রাত্রের উচ্ছিষ্টের থালাটা নিয়ে আসা। তাই আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল বিনোদিনী। পরক্ষণেই আবার কি ভেবে থালাটা তুলে নিয়ে ফিরে আসবার পথেই স্বয়ং অহিভূষণ বললেন, তোর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোর একটা কিছু হয়েছে বিনু?

—না, কিছু না।

—আমার কাছে আবার লজ্জা কি বিনু! বল, কি বলবি। এ কি, তোর গালটা ফুলো দেখছি যে।

বিনোদিনী কিছুই বললে না মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

এবার ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন চক্রবর্ত্তী—কি হয়েছে?

—কিছু না।

—মিথ্যা কথা। বল।

অহিভূষণের গুরুগম্ভীর গলা শুনে চমকে উঠল বিনোদিনী মুখ তুলে আর তাকাতে পারল না।

—আমি বুঝেছি, কাল রাতে হয়ত কোথাও গিয়েছিলি?

কোন উত্তর দিতে পারল না বিনোদিনী।

—কোথায় গিয়েছিলি? কার কাছে?—ধমক দিয়ে উঠলেন চক্রবর্ত্তী। কেমন যেন ঘাবড়ে গেল বিনোদিনী। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গত রাত্রের ঘটনা অকস্মাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

হেসে উঠলেন চক্রবর্ত্তী। চমকে উঠল বিনোদিনী।

একটা সাদা কাগজ বের করে দিয়ে চক্রবর্ত্তী বললেন, এই জায়গায় একটা ছাপ দিয়ে দে আঙুলের।

যন্ত্রচালিতের মত তাই করল বিনোদিনী।

বিনোদিনী চলে যাবার সময় শুনল—চক্রবর্ত্তী আপন মনেই বলছেন, বড়ই বেড়ে উঠছে নোক্‌গুলা।

জীবনধারা আবার সহজ রাস্তা ধরল। কোন হাঙ্গামা নেই গ্রামে। মাঝে একদিন নেপালই নকুলকে টেনে আনল বাড়ীতে। হাতে ধরে পাশে বসিয়ে বলল, গানবাজনা একেবারে ছাড়াই দিলি নকুল।

বিনু বলছিল, ঘরটায় আর টেকা যায় না বাবা! সত্যিই রে নকুল—বুড়া হ য়েছি মিছা কথা কইব নাই, আমারও কেমন

কেমন লাগে। গান না করিস—নাই করলি, আইসে বসতে পারিস ত দু' দণ্ড। কেনে আসিস না?

নকুল বুঝল এ সমস্ত প্রশ্ন বৃদ্ধ নেপালের নয়—এ সব বিনোদিনীর। আজও আসত না নকুল—নেহাত জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে নেপাল—ওকে গুরু বলে স্বীকার করেছে—তাই প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি, এসেছে। কিন্তু সেদিনের সেই ব্যবহারের পর আর বিনোদিনীর মুখ দেখবে না বলেই স্থির করেছিল নকুল। তাই নেপালের কথার জবাবে বলল, কেনে আসি না তা তুমার বিটিকেই জিগ্যাস কৈরবে গুরুজী।

বিনোদিনীর প্রসঙ্গ আসতেই একবার পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল নেপাল। তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল বিনোদিনী, কোন্ সময় যে বাইরে চলে গেছে টেরও পায় নি। বিনোদিনীকে ডাকল নেপাল।

—আজ তবে উঠি গুরুজী। রাত বাড়ছে!

উঠে পড়ল নকুল। বিনোদিনীর পাশ দিয়েই হন্ হন্ করে গেল চলে। একটুখানি গায়ের হাওয়া লাগল বিনোদিনীর শরীরে। মনে হ'ল নকুলের পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলে, 'ওগো আমার অপরাধ লিও না।' কিন্তু তা বলবার সুযোগই দিল না নকুল। যে পথ দিয়ে গেল নকুল, খানিকক্ষণ সেই পথের পানে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক ঠেলে। নিজেই চমকে উঠল নিঃশ্বাসের শব্দে!

—বিনোদিনী! ও বিনু, আর বাইরে থাকিস না মা, এবারে শিয়র পড়বেক যে। ভিতর থেকেই হাঁক দিল নেপাল।

বিনোদিনী লঘু পায়ে ভিতরে গিয়ে আপনার বিছানায় শুল। কতক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করল। উঠে জল খেল, আবার শুল, কিন্তু কিছুতেই চোখে ঘুম এল না। পাশে অন্য একটা বিছানা থেকে নেপালের নাকডাকার শব্দ আসছে। বড় অসোয়াস্তি মনে হ'ল তার। কোথায় একটা কুকুর চীৎকার করে উঠল তীব্র ভাবে!

থম্ থম্ করছে রাত্রি। নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছে প্রহর। আখ-ক্ষেতের ওপারের বিহারীনাথের চূড়া থেকে নেমে আসছে হাওয়া। ছটফট করে উঠছে ষষ্ঠীতলার বুড়ো বটগাছের পাতাগুলো। একটা পাখীর ডানার ঝাপটে আন্দোলিত হয়ে উঠছে বটগাছের কয়েকটা প্রশাখা। ভয় পেয়ে একই সঙ্গে কতকগুলো পাখী উঠছে চীৎকার করে। ঘুম বিনোদিনীর হবে না। বিছানাটা কণ্টক মনে হচ্ছে তার। উঠে বসল সে। ভেজানো দরজাটা একটু খুলে দিতেই বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল একটা উৎকট পচা গন্ধ। একটা বেড়াল মরেছে। মরেছে নয়, মেরেছে ওকে চক্রবর্তীর নাতি! হয়ত কেউ টেনে এনে বাউরীপাড়ায় ফেলে দিয়ে গেছে। পচনক্রিয়া সুরু হয়েছে মৃত বেড়ালটার দেহে। তারই গন্ধ সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করে তুলেছে। নাঃ, অসহ্য এই গন্ধ। নাকের উপর আঁচল চেপে ধরল বিনোদিনী তার পর উঠে এল বাইরে। ওর পদশব্দে ভীত হয়ে কি একটা জানোয়ার তড়াক করে গেল পালিয়ে। সেদিকে খেয়াল নেই বিনোদিনীর। একবার মুক্ত আকাশের পানে তাকাল—অসংখ্য তারা। ওদের দেখে মনে পড়ল বাপের কাছে শোনা গল্প—"উয়ারা তারা লয় বিনু; উয়ারা সব মহাপুরুষ, মরে তারা হ'য়্যাছে। ঐ বিরসপতি, ঐ সাত ভাই চম্পা, ঐ কালপুরুষ—

তারাদের পানে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল বিনোদিনী। হঠাৎ একটা টর্চের তীব্র আলো তার গায়ে এসে লাগতেই শিউরে উঠল ও। আলোর রেখা অনুসরণ করল তার দৃষ্টি।

অদূরে চক্রবর্তীর বাগানবাড়ীটায় দেখা গেল কয়েকজন মানুষকে। মনে পড়ল, আজ চক্রবর্তী থানায় গিয়েছিল সকালে। থানার পুলিস কিংবা বাইরের অভ্যাগত এলে ঐ বাগানবাড়ীতেই তাদের থাকতে দেয় চক্রবর্তী। কিন্তু আজ কে ওদের শিকার? মনে পড়ল চক্রবর্তীর কথা। সেদিন বলেছিল, 'একদিনেই ঝেড়ে দিব ওর রংতামাশা। তোর গায়ে ও হাত দেয়?' এই কথার সঙ্গে পুলিসের এই নৈশ অভিযানের একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে শিউরে উঠল বিনোদিনী। ওরা হয়ত ধরতেই আসছে নকুলকে। আর ভাববারও সময় নেই বিনোদিনীর। দরজাটা খোলাই রইল। পিঠে ছড়িয়ে পড়ল খোপা থেকে বিচ্যুত চুলের গুচ্ছ—শাড়ীটা পাল্টাবার কথাও মনে হ'ল না তার। প্রাঙ্গণ ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল সে। একটা পথচারী কুকুর সন্তর্পণে এসে তার আঁচলের অগ্রভাগটা শুঁকে নিশব্দেই গেল চলে।

বিনোদিনী নকুলের দরজায় এসে দাঁড়াল সন্তর্পণে। ডাকল চাপা স্বরে—প্রথম নকুলের মাকে, তার পর নকুলকে। উঠে এল নকুল। চোখে ঘুম জড়ানো। দরজা খুলতেই একটি নারী-মূর্তি দেখে চমকে উঠল নকুল—কে?

—আমি।

—বিনোদিনী। এই শেষ রাতে? কি হঁয়্যাছে। গুরুজী—

—ভাল আছে। বেশী কথা বলবার সময় নেই—তাই অকস্মাৎ নকুলের হাত দুটি ধরে বলল, আমি তুমার কাছে কখন কিছু চাই নাই, আজ আমার এক-ট কথা রাখ।

—বল, কি কথা।

—বল রাখবে।

—রাখবার মতন হৈলে রাখব।

—আমার গা ছুঁয়্যা কও।

রাত্রিশেষে এইরূপ নাটকীয় দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিল না নকুল। মনে মনে খানিকটা বিরক্তই হ'ল। এই মেয়েটা বেজায় ক্ষতি করেছে তাদের দলের। চক্রবর্তীর হুকুমের বিরুদ্ধে নকুল জড়ো করেছিল অনেককেই। বলেছিল তাদের—তার বেদনার কাহিনী। বলেছিল, 'আজ খাজনা না হলে গরু চরানো বন্ধ হ'ল—কাল

সংকলের রাস্তায় চলা বন্ধ হবে। সবাই তৈরী হচ্ছিল তারই বিরুদ্ধে। এমনি সময়েই বিনোদিনীর জন্ত সব পণ্ড হয়েছে।

—বেশ তাই কইলাম। বল এখন। বিরক্তিভরেই বলল নকুল।

—তুমাকে এখুনি এখান থাক্যা চৈলে যাত্যা হবেক।

—কেনে ?

—না হৈলে যা করবে ঠিক কৈরেছ তা যে হবেক নাই।

—কিসে বুঝলি।

—পুলিস আস্যাছে গাঁয়ে। উয়ারা তুমাকে—যাও এখুনি যাও! আর বেশী বলতে পারল না বিনোদিনী। তার সময়ও পেল না। কাদের পদশব্দ যেন এগিয়ে এল নিকটে।

—তুমি যাও উয়ারা আসছে।

—উয়ারা যে আমাকেই ধৈরতে আসছে কি করে জানলি ?

—জানি জানি—আমি সব জানি। তুমি যাও।

নকুলকে একরূপ ঠেলেই বের করে দিল বিনোদিনী। তার পর আগন্তুকদের পদশব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল সে। যেতে হ'ল না বেশী দূর।—খানিকটা গিয়েই থমকে দাঁড়াল বিনোদিনী একপাশে।

—কৌন্ হ্যায় ? একজন গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করল।

প্রথম কোন উত্তরই দিল না বিনোদিনী। যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমনি রইল।

—কৌন্ হ্যায় ? আবার প্রশ্ন করল দারোগাসাহেব।

—আমি বিনোদিনী নেপাল থানদারের বিটি।

—কে ? বিনোদিনী ?

হঁা গো বাবুরা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল বিনোদিনী। বিনোদিনী পরিচিত এদের কাছে।

তা এত রাতে কোথায় গিয়েছিলি ?

—যাই নাই গো যাচ্ছিলুম বাগানবাড়ীতে। বাপকে ঘুম্ পাড়াতে যায়্যা নিজেও ঘুমায় গেইছিলুম কিনা—তাই রাত হুয়্যা গেইছে। বলি দারোগাসাহেব, এই রাতে কুথায় ? রণে দিতে নাকি ? ফিক্ করে হেসে উঠল বিনোদিনী।

সব কথা বলা চলে না। তাই প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে দারোগা বলল, নিজেদের কাজ করতে যাচ্ছি।

—তা হলে কি আমি ফিরে যাব! একটা শাণিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করল বিনোদিনী।

দারোগার লালসাভরা দৃষ্টি যুবতী বিনোদিনীর সারা অঙ্গে খেলে গেল।

—চল আমি আসছি।

দারোগা তার দলবল নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে বিনোদিনী। ওরা নকুলের দরজায় গিয়ে আঘাত করল। দরজা খুলে গেল, পুলিসবাহিনী ভিতরে ঢুকল এবং খানিক পরে বেরিয়ে এল। পায় নি আসামীকে।

একটা নির্ভাবনার নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল বিনোদিনীর বুক থেকে।

কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর একদিন একটা আদালতের চিঠি এসে হাজির হ'ল বিনোদিনীর কাছে। বিনোদিনীকে একটা নির্দিষ্ট তারিখে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

চক্রবর্তীর লোকেই ওকে নিয়ে গেল আদালতে। আদালত-গৃহে গিয়ে একপাশে খানিকক্ষণ বসে থাকবার পরেই যে দৃশ্য নজরে পড়ল তা দেখতে হবে বলে কল্পনা করে নি বিনোদিনী। ওরই সামনে দিয়ে নকুলকে হাতকড়া লাগিয়ে নিয়ে গিয়ে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। বিনোদিনীর বুকে কে যেন হাতুড়ি মারল জোরে জোরে। নিজের হৃদপিণ্ডের আওয়াজ ও নিজেই শুনতে পেল। জিভখানি কেমন শুকনো শুকনো মনে হ'ল।

নকুলকে বিচারক বললেন, যা বলবে সত্য বলবে।

নকুল হলফ করেই বলল, হুজুর গাঁয়ের ঐ একটি গরু চরাবার জায়গা আর হুজুর আমার ওতেই বাঁচ্যা থাকতে হয়। সেই জায়গার উপর গরুপিছু এক আনা খাজনা ধরলেক চক্রবর্তীবাবু। কোথায় পাই বলুন। তার উপর উ জমির কখনও খাজনা ছিল না।

বিপক্ষের উকীল বললে, এ সব বাজে কথা হুজুর। এ জমিদারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, জমিদারকে তার প্রাণনাশ করবে বলে শাসিয়েছিল—জোট তৈরি করছিল গ্রামে। আর এই রাস্তা হতে বিনোদিনী বাউরীন, তাকে ফেরাতে গিয়েই হয়েছিল নিগৃহীতা। পাষণ্ড নকুল বাউরী—সেই অবলা নারীর উপর হাত চালাতে কসুর করে নি।

—না হুজুর এসব মিথ্যা। চীৎকার করে বলে উঠল নকুল।

—মিথ্যা কি সত্যি তার প্রমাণ হুজুরের কাছেই আছে। আর আছে বিনোদিনী বাউরীন।

বিনোদিনীর ডাক পড়ল সাক্ষ্য দেবার। কম্পিত চরণে এগিয়ে গেল বিনোদিনী। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল মাথা নীচু করে।

উকীল জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে মা, এই নকুল বাউরী মেরেছিল না ? সত্য বলবে মা! মিথ্যা বললে সাজা হয়ে যাবে।

তাই হোক, সাজাই হোক তার। কিন্তু সে একথা কিছুতেই বলতে পারবে না।

—আচ্ছা দেখত মা, এই কাগজে তুমি হাকিম সাহেবকে কি বল নি এই অত্যাচারের প্রতিকার করবার জন্ত। এটা ত তোমারই টিপসই মা!

এক মুহূর্তে কাগজের দিকে তাকিয়ে—বলল, হাঁ।

বিনোদিনীর সাক্ষ্যে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল নকুলের।...

বাড়ীতে এসে কত কাঁদল বিনোদিনী। আপনার মৃত্যুকামনা করল। এ তুই কি করলি হতভাগিনী! দেখা হলে একবার তার

পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নেবে বিনোদিনী। একবার শুধু বলবে—'তুমি বিশ্বাস কর—সজ্ঞানে এ কাজ আমি করি নি।' তাই ওর মুক্তির দিন গোনে বিনোদিনী। ছুটি মাস কেটে গেছে—এই তৃতীয় মাস। তাই শেষ বাসের যাত্রীর অপেক্ষায় থাকে দরজায় বসে। জগুকে বলেছিল, কেমন আছে নকুল তাই জেনে আসতে।

বুড়ো নেপাল ভিতর থেকে ডাকল, আয় বিনু ইবারে ও আইসে।

অসহযোগ আন্দোলন

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়

১৯২০ সন। দেশের রাজনৈতিক হাওয়া বড় এলোমেলো—বড় গোলমেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ ঘোষণা করেছিল, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্যই এই যুদ্ধ—এই সাধু উদ্দেশ্য মাথায় নিয়েই মিত্রশক্তি যুদ্ধে নেমেছে। ভারতবাসী আশামুগ্ধ হয়ে সেই কথায় বিশ্বাস করেছিল। ভারতীয় নেতারা যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা নানাভাবে করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ইংরেজ ও মিত্রশক্তির জয় হলে ভারতেও সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে—অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করবে। কিন্তু দেখা গেল, সব যেন ক্রমশঃ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মিত্রশক্তির জয় হ'ল। জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসন আরও কড়া, আরও কঠিন, আরও কুৎসিত এবং বর্ব্বর হয়ে উঠতে লাগল। কোথায় বা গণতন্ত্র, কোথায় বা স্বরাজের পথে যাত্রা—এ যে দেখি শুধু স্বেচ্ছাতন্ত্র, স্বরাজের সকল পথেই যে কাঁটা পড়ে গেল। ইংরেজ গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করেছে। গণতন্ত্র লাভ করবার আশায় ভারতবর্ষ ইংরেজের যুদ্ধে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে, লক্ষ লক্ষ লোককে ইংরেজের রণক্ষেত্রে পাঠিয়েছে, সর্ব্বরকমে ইংরেজের সহায়তা করেছে। আর যুদ্ধ জয় হবার পরই কি না ভারতে রৌলট আইন পাস হ'ল—যে আইনে উকিল নেই, দলিল নেই, আপীল নেই, যে আইনের বলে যাকে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা ইংরেজ গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে জেলখানায় আটক করে রাখতে পারে। যুদ্ধ জয় হ'ল—কিন্তু ভারতে ইংরেজের অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই যেতে লাগল। পঞ্জাবে সামরিক আইন জারী হ'ল—মানুষকে নিয়ত অপমান ও নির্যাতন সহ্য করতে হতে লাগল। তার পর রামনবমীর পুণ্যদিনে অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রায় এক হাজার হিন্দু-মুসলমান শিখ নরনারী শিশুকে একান্ত অসহায় অবস্থায় অভূতপূর্ব্ব নৃশংসতা প্রদর্শন করে অকারণে মিথ্যা অজুহাতে গুলী করে হত্যা করা হ'ল। রক্তের নদী বয়ে গেল। কি সে বুককাটা কান্না—সে ক্রন্দন অমৃতসর থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। পৈশাচিক হত্যার সেই মর্ম্মঘাতী আঘাত ভারতের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভারতের প্রতি অঙ্গে সুকঠোর অনুভূতি জাগাল—জালিয়ানওয়ালার বেদনা ভারতবাসীর মর্ম্মে প্রবেশ করল। দুঃখের আঘাতে ভারতবর্ষ এক সাড়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল—তার প্রাণময় অখণ্ডতা এর আগে বুঝি এমন করে আর কখনও অনুভূত হয় নি। একদিকে যেমন তার সকল আশায় ছাই পড়ল, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় জনগণের চেতনায় প্রতিকারের সঙ্কল্প ধীরে ধীরে কঠোর ও কঠিন হয়ে উঠতে লাগল। প্রতিকার চাই—মানবতার এত বড় অপমান ভারতবর্ষ সহ্য করবে না। এমনি করেই বজ্র-বেদনায় ভাগ্যবিধাতা ভারতের জাগরণ ঘটালেন।

১৯২০ সনের ১লা আগষ্ট ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা লোকমান্য তিলক বোম্বাইয়ে দেহত্যাগ করলেন। "স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার"—এই ছিল লোকমান্যের বাণী। লোকমান্যের প্রতিভা ছিল অলোকসামান্য, কর্ম্মশক্তিও ছিল অনুপম। ১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় কংগ্রেস বিশ্বাস করেছিল যে, তাদের আবেদন-নিবেদন ও নিপুণ ওকালতীতে ইংরেজের মন ভিজবে এবং স্বরাজ পাওয়া যাবে ইংরেজের কৃপণ হাতের দান-স্বরূপে—দফায় দফায়। তিলক-অরবিন্দ-লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতাগণ কংগ্রেসের মোড় ফিরিয়ে দিলেন। অসহায়ভাবে ইংরেজের মুখ-চাওয়া ঘুচিয়ে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর আত্মশক্তি উদ্বোধনের পথ খুলে দিলেন। সেজন্য ইংরেজের হাতে তাঁদের লাঞ্ছনার অন্ত রইল না। এদিকে বাঙ্গালী যুবক বুকে গীতা এবং হাতে রিভলবার নিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে নির্ভীক পদক্ষেপে আরোহণ করল। ভারতবর্ষ জুড়ে সে কি বিস্ময়! এইরূপে জাতি আত্মশক্তির সন্ধান পেয়ে গেল।

এইবার এল সেই শক্তি প্রয়োগের পালা। দুঃখ ও অপমানের নির্ম্মম আঘাতে ভারতের অন্তর থেকে এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠল

> "এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
> দূর করি দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়
> রাজভয়, লোকভয়, মৃত্যুভয় আর—"

তখন সঙ্কটভয়ত্রাতারূপে ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালেন গান্ধীজী। লোকমান্য তিলকের পর তিনিই ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী

নেতা। অসহযোগের অস্ত্র তাঁর হাতে। যুদ্ধ ইংরেজের সঙ্গে—লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা। যুদ্ধে হিংসা বা অসত্যের পথে যাওয়া চলবে না। অসহযোগে সত্য ও অহিংসাই হবে আশ্রয়। অসহযোগের উদয় দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "পৃথিবীতে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যলাভের ইতিহাস রক্তধারায় পঙ্কিল, অপহরণ ও দস্যুবৃত্তির দ্বারা কলঙ্কিত। কিন্তু পরস্পরকে হনন না করে, হত্যাকাণ্ডের আশ্রয় না নিয়েও যে স্বাধীনতা লাভ করা যেতে পারে, গান্ধীজী তাঁর পথ দেখিয়েছেন।...মহাত্মা যদি বীরপুরুষ হতেন বা লড়াই করতেন তবে আমরা এমনি করে আজ তাঁকে স্মরণ করতাম না। কিন্তু এই যে একটা অনুশাসন, মরব তবু মারব না এবং এই করেই জয়ী হব—এ একটা মস্ত বড় কথা, এ একটা বাণী। এটা চাতুরী কিংবা কার্য্যোদ্ধারের বিষয়িক পরামর্শ নয়—মনুষ্যত্বের যুদ্ধ, ধর্ম্মযুদ্ধ, নৈতিক যুদ্ধ। মহাত্মা নম্র অহিংস্র নীতি গ্রহণ করেছেন, আর চতুর্দ্দিকে তাঁর জয় বিস্তার হচ্ছে।"

অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সঙ্গে ভারতবর্ষের জয় বিস্তার সুরু হয়ে গেল।

১৯২০ সনের আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় ভারতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হ'ল। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন পঞ্জাবকেশরী স্বনামধন্য লালা লাজপৎ রায়। ইংরেজের দরবারে বহুবর্ষব্যাপী আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। এইবার আপন শক্তির প্রয়োগে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পালা সুরু হ'ল। সারা ভারতবর্ষ থেকে কত শত প্রতিনিধি এই যুগপ্রবর্ত্তনকারী কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। অসহযোগ-প্রস্তাব এই কংগ্রেসে অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহের সহিত গৃহীত হ'ল। প্রস্তাবের সারমর্ম্ম এই—যেহেতু খিলাফৎ ব্যাপারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি গভীর অবিচার করেছে এবং যেহেতু পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে যে অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে তার প্রতিকার দূরে থাক একান্ত দাম্ভিকতার সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সেই অত্যাচার ও অত্যাচারীর সমর্থন করেছে সেইহেতু প্রতিকারের উপায় স্বরূপ কংগ্রেস ভারতবর্ষের জনগণকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত অহিংস অসহযোগ করতে আহ্বান করছে। অসহযোগের প্রথম পর্ব্বে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আহ্বান এল—যাঁরা ইংরেজের খেতাব বা টাইটেলধারী তাঁরা খেতাব ত্যাগ করুন, যাঁরা ইংরেজের কাউন্সিল প্রভৃতির সদস্য তাঁরা সদস্যপদ ছেড়ে দিন, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজে পড়ার ও পড়ে—তাঁরা সেই স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করে দেশের কাজে নেমে পড়ুন, আর আইন-ব্যবসায়ী উকীল ব্যারিষ্টার আদালতে তাঁদের কার্য্য বন্ধ করে দিন। স্কুল-কলেজ, কাউন্সিল আদালতের কার্য্যে দেশের লোকের সম্মতি ও সহযোগ আছে বলেই ইংরেজের জোর, ইংরেজের শাসনচক্র এই দেশের লোকের হাতেই তাই চলছে। এখন সেই হাত সরিয়ে নেওয়া হোক। হিংসা নয়, বিদ্বেষ নয়, অসত্য নয়—অহিংসা ও সত্যের পথে দেশের সর্ব্বত্র এই অসহযোগ চলতে থাক, তা হলেই দেশের লোকের মনে একদিকে যেমন আত্মবিশ্বাস জেগে উঠতে থাকবে, অপরদিকে তেমনি শাসনচক্রের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে এসে ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে আসবে—

অসহযোগের সঙ্গে গঠনকর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা হ'ল। দেশের গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ চরকা চলতে থাক—গ্রামগুলি অন্নবস্ত্রের জন্য কারও মুখ না চায়। সর্ব্বত্র হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব দৃঢ় করবার চেষ্টা করা হোক। মাদকদ্রব্য ব্যবহার সর্ব্বত্র বন্ধ করা হোক। আর হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের মূলোৎপাটন করা হোক। আর মহামতি তিলকের স্মরণার্থ তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডার স্থাপিত হ'ল। দেশের লোকের কাছ থেকে কংগ্রেস ও গান্ধীজী সেই ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা দান চাইলেন :

"ক্রোড় টাকা কার ভিক্ষাঝুলিতে অপরূপ অবদান।"

ভারতবর্ষের মরা গাঙে যেন বান এসে পড়ল—

"এবার তোর মরা গাঙে বান্ এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।"

মহা-আন্দোলনের আলোড়নে দেশের গ্রাম-শহর সর্ব্বত্র সে কি বিপুল প্রাণকম্প। শহরের শিক্ষিত জনগণের গণ্ডী ছাড়িয়ে অসহযোগ আন্দোলন শত মুখে শত দিকে লক্ষ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ দেশের দিকে দিকে হিমালয় হতে কুমারিকা এবং দ্বারকা হতে পুরী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রচারকার্য্য চালাতে লাগলেন। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে অসহযোগের কারণে যদি নির্য্যাতন আসে তবে হাসিমুখে বুক পেতে তা নিতে হবে। কিন্তু কোন আঘাতের প্রতিঘাত করা চলবে না। অসহযোগী সত্য পালন করবে, হিংসার পথ ছাড়বে, নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আপন কার্য্য করে অগ্রসর হবে—সর্ব্বত্র নির্ভীক ও নম্র হয়ে থাকবে।

অনেক লোক খেতাব ছাড়লেন, অনেক সদস্য কাউন্সিল ছাড়লেন, অনেক উকীল আদালত ছাড়লেন—দক্ষিণে রাজা-গোপালাচারী, উত্তরপ্রদেশে মতিলাল, জওহরলাল, বোম্বাই অঞ্চলে বল্লভভাই, বিহারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং তাঁদের অনুবর্ত্তীগণ। বাংলার ব্যারিষ্টার সি, আর, দাশ—তাঁর অত বড় ব্যারিষ্টারী ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালেন। বিমুগ্ধ জনগণ তাঁকে তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলে বরণ করে নিল। সুভাষচন্দ্র ২৫ বৎসর বয়সে আই-সি-এস পাস করে সবেমাত্র বিলাত থেকে ভারত অভিমুখে জাহাজে রওনা হয়েছেন—অসহযোগের সংবাদ পেয়ে তিনি স্বর্গসুখদায়ক সেই আই-সি-এস চাকরি তৃণবৎ পরিত্যাগ করে সমুদ্রজলে ভাসিয়ে দিলেন। ভারতের সর্ব্বত্র বিশেষ করে বাংলায় ছাত্রগণ স্কুল-কলেজ খালি করে দিয়ে চলে এল। অসহযোগের মধ্য দিয়ে দেশ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল। কংগ্রেসের পরিচালনায় ও গান্ধীজীর অলোকসামান্য নেতৃত্বশক্তির বলে দেশের সর্ব্বত্র কাজের বন্যা এসে পড়ল।

কর্ম্মপথে জেগে উঠল দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ, সংহতি, সেবাবুদ্ধি, স্বাধীনতা লাভের জন্য অক্লান্ত চেষ্টা, অপরাজেয় আশা, অকুতো-

জড়তা। যারা ছিল ছায়াভয়চকিতমূঢ়, তারা আজকার যাদুস্পর্শে অসাধ্য সাধনের পথে যাত্রা করল।

চরকা চালাবার সে কি বিপুল প্রয়াস। ছাত্র ও যুবকদের সে কি উৎসাহ উত্তম! শহরের সৌখীন ছেলেরা আরাম ও বিলাস ভুলে গ্রামের দিকে যাত্রা করল। গ্রামে গ্রামে সব জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হতে লাগল। বন্যা বা মহামারীর সময় তারা গ্রামের লোকের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করতে লাগল। চরকার সুতায় গ্রামের তাঁতে খদ্দর উৎপাদন হতে লাগল। কর্ম্মীদের অঙ্গে এই নূতন মোটা বস্ত্র নূতন শোভা এনে দিল। দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হতে লাগল। লক্ষ লক্ষ লোক কংগ্রেস সদস্য হ'ল। লক্ষ লক্ষ লোক চরকা ও খদ্দর গ্রহণ, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, মাদকদ্রব্য বর্জ্জন এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা লক্ষ লক্ষ লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হতে লাগল। ১৯২১, ৩০শে জুনের মধ্যে তিলক-স্বরাজ-ভাণ্ডারে এক কোটি টাকা সংগ্রহের উৎসাহ ভারতের প্রতি গ্রামে সাড়া জাগাল। প্রদেশে প্রদেশে গঠনকর্ম্মের প্রতিযোগিতায় ঢেউ উঠল। ঐ তারিখের মধ্যে ২০ লক্ষ চরকা চালাবার কাজ শেষ করবার জন্তেও সাড়া পড়ে গেল। জড়তাগ্রস্ত অতি প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এইরূপে নূতন প্রাণের স্পন্দন জাগল—নূতন কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র সুরু হয়ে গেল। ভারতের এই নবজাগরণে প্রভু ইংরেজ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভারতবাসীকে শান্ত ও সংযত করবার জন্তে তাঁরা রাজার প্রতিনিধি হিসাবে ডিউক অফ কনটকে এদেশে পাঠালেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডিউককে সবিনয়ে বয়কট করা হ'ল। অন্যায়ের প্রতিকার না হলে রাজপ্রতিনিধি ডিউককে ভারতবর্ষ স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে পারে না। ডিউকের আগমনে হরতাল ঘোষণা করা হ'ল। বোম্বাই, এলাহাবাদ, কলকাতা প্রভৃতি সহরে কোথাও জনসাধারণ ডিউক দর্শনে গেল না। মনে পড়ে খিদিরপুর ডক জেলে তখন আমরা প্রায় দেড় হাজার কয়েদীর অনেকে শীতের দিনে গঙ্গাতীরে রৌদ্রে বসে আছি। রব উঠে গেল—ডিউকের জাহাজ আসছে—ডিউক কলকাতা ছেড়ে রেঙ্গুন যাচ্ছেন। অমনি শত শত কয়েদী—শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান, যুবক-বৃদ্ধ, ছাত্র-মজুর প্রভৃতি সকলে মুখ ফিরিয়ে উল্টা মুখে বসে গেল। এরা সব সরকার পক্ষ থেকে হরতাল বে-আইনী ঘোষণার পর হরতালের উত্তোগ দেখিয়ে জেলখানায় এসেছিল। এইরূপে অসহযোগ আন্দোলনে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সুস্পষ্টরূপে জেগে উঠল। ভারতবাসীর ভয় ভাঙল, ভারত জুড়ে স্বরাজের আশা জাগল, ভারতবাসী লক্ষ্য সাধনের জন্তে নির্যাতন সহ্য করবার প্রথম পাঠ পেয়ে গেল।

তার পর একে একে সকলে কারারুদ্ধ হলেন। দেশবন্ধু আলিপুর জেলে বন্দী হলেন। জেলা, মহকুমা সর্ব্বত্র জেল ভর্ত্তি হয়ে গেল। শেষে মহাত্মা গান্ধীকে ইংরেজ গ্রেপ্তার করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। এই হ'ল অসহযোগের প্রথম কথা। অসহযোগ—আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ মূলতঃ একই ব্যাপার, এক সূত্রে গাঁথা। একে একে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার প্রকাশ হয়ে, নব ইতিহাস রচিত হতে হতে শেষে ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট আমাদের পরাধীনতা শৃঙ্খল মোচন হয়ে গেল।*

* অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও—কলিকাতা কেন্দ্রে কথিত ও রেডিও-কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্তে প্রকাশিত।

করুণানিধানকে

শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক

কল্পনা-কালিন্দী-তীর্থে ললিত মধুর গীতি লীলায়িত মনে
প্রকৃতিপূজার কবি নির্জ্জনে নৈবেদ্য হাতে অঘ্রাণের বনে
তুমি যে অপরাজিতা। বাসন্তিক পৃথিবীর কোটা ফুলে ফলে
পাহাড়ে প্রান্তরে প্রেম রূপে বর্ণে অনুভূতিধারা কলজলে,
তালীবনে তমালের গেরুয়া মাটির শুনি একতারা গান
তোমার সঙ্গীতে হ'ল নিত্য-পাওয়া, সাঝে সাঝে দীপ-অর্ঘ্য দান
তুলসীমঞ্চের চক্ষে। জীবনে সৌন্দর্য্য নিত্য বুঝি শান্তিপুরে
ছন্দে ভরে পদাবলী ধৈবত ও গান্ধারের নিরুদ্ধ যে সুরে
স্নিগ্ধ সৃষ্টি শতনরী। ঝর্ণারই রূপালী তরল জলঝারি
হৃদয়ে সুষুপ্ত স্বপ্ন ধানদূর্ব্বা শান্তিজল নিয়ে দেয় পাড়ি
আকাশ সুনীল প্রেমে, মন তবু মাটিভেজা সবুজের ঘাসে
মাঘের শিশিরে মিশে প্রকৃতির আশ্বাসের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে—
এ শাশ্বত পৃথিবীর গীতারতি প্রসাদীর দিলে ঝরা ফুল
করুণানিধান, মন স্নেহ দিয়ে ভালবেসে মানুষের কূল।

নির্ব্বাচনী কথা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন হইয়া গিয়াছে ; সঙ্গে সঙ্গে লোকসভারও নির্ব্বাচন হইয়া গেল। নির্ব্বাচনের ফলাফল লইয়া সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে ও সাধারণের চিঠি-পত্রে নানারূপ আলাপ-আলোচনা হইতেছে। সম্মিলিত বামপন্থীরা নাকি এবার খুব জনমতের সমর্থনলাভ করিয়াছেন ; হিন্দু মহাসভা নাকি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। আমরা এখানে কতকগুলি তথ্য দিয়া সাধারণভাবে আলোচনা করিব। পরে নির্ব্বাচনের যে মূল ভিত্তি নির্ব্বাচকমণ্ডলী তৎসম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলিব।

এবারকার সাধারণ নির্বাচনে কোন দল বিধানসভায় কতটি ভোট ও কয়টি আসন পাইয়াছে এবং ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে কতটি ভোট ও কয়টি আসন পাইয়াছিল তাহার তুলনা করিব :

দল	১৯৫৭ আসন	শতকরা হিসাব	ভোটসংখ্যা	শতকরা হিসাব	১৯৫২ আসন	শতকরা হিসাব	ভোটসংখ্যা	শতকরা হিসাব
কংগ্রেস	১৫২	৬০·৩	৪৭,৩৪,৩০৫	৫১·৩	১৪৯	৬২·৯	২৮,৯৭,৮৮১	৩৮·৯
কম্যুনিষ্ট	৪৬	১৮·২	১৮,০৩,৫০০	১৯·৬	২৮	১১·৮	৮,০০,৯৩১	১০·৮
প্রজা-সোশ্যালিষ্ট	২১	৮·৩	১০,৩২,৭২৩	১১·২	*১৫	৬·৩	৮,৮২,৮৩০	১১·৯
ফঃ ব্লক (মাঃ)	১০	৪·০	৪,৫০,৪১৪	৪·৯	৮	৩·৩	৩,৯৩,৫৯৭	৫·৩
জনসঙ্ঘ	০	০	১,০৭,০১৯	১·২	৯	৩·৮	৪,১৭,৮৭৯	৫·৬
হিন্দুমহাসভা	০	০	২,০৫,৬৪৪	২·২	৪	১·৭	১,৭৬,৭৬২	২·৪
লোকসেবক সঙ্ঘ	৭	২·৭	১,৪০,৭০০	১·৫	...		...	
স্বতন্ত্র	১০	৪·০	৪,২৫,৫৬৬	৪·৬	২৪	১০·২	১৮,৭৪,৪৪৫	২৫·১
অন্যান্য দল	৬	২·৫	৩,১৮,০৫৮	৩·৫				
মোট	২৫২	১০০	৯২,২১,৯২৯	১০০	২৩৭	১০০	৭৪,৪৪,২২৫	১০০

উপরের ভোটের ফলাফল হইতে জানা যায় যে, গত বারে কংগ্রেস শতকরা ৩৮·৯টি ভোট পাইয়া শতকরা ৬২·৯টি আসন দখল করিয়াছিল। ইহা ভোটের অনুপাতে খুব বেশী। এইবারে কংগ্রেস শতকরা ৫১·৩টি ভোট পাইয়া শতকরা ৬০·৩টি আসন দখল করিয়াছে। এবারে কংগ্রেস ভোট পাইয়াছে বেশী, কিন্তু আসন দখল করিয়াছে কম। গত বারে বিধানসভায় কংগ্রেসদলকে পুরাপুরি জনপ্রতিনিধি দল বলা চলিত না ; এইবারে কিন্তু কংগ্রেস ন্যায্য ভাবে এই দাবি করিতে পারে, কারণ উহা অর্দ্ধেকের উপর ভোট পাইয়াছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্টগণ ভোটের তুলনায় কিছু অল্পসংখ্যক আসন পাইয়াছে। জনসঙ্ঘের ভোট পূর্ব্বাপেক্ষা শতকরা হিসাবে ও সংখ্যা হিসাবে খুব কমিয়া গিয়াছে। হিন্দু মহাসভা একটি আসনও দখল করিতে না পারিলেও উহার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ১৯·৪ করিয়া এবং অনুপাতও প্রায় সমান আছে। হিন্দু মহাসভার পরাজয়ের প্রধান কারণ যে যে স্থানে উহা প্রবল ছিল সেই সব স্থানের নির্ব্বাচনকেন্দ্রগুলিকে এমন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যে, কোন নির্ব্বাচনকেন্দ্রেই উহা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইতে পারে নাই। ইংরেজীতে যাহাকে "জেরিম্যানডারিং" বলে তাহাই করা হইয়াছে। ফল সব সময়েই যে কংগ্রেসের অনুকূল হইয়াছে তাহা বলা চলে না। কলিকাতায় কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের ইহা একটি অন্যতম প্রধান কারণ। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় হারিতে হারিতে রহিয়া গেলেন। কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসুর—বরাহনগর নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন করার ফলে সুবিধা হইয়া গেল। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের পরাজয়ের ইহা একটি প্রধান কারণ ; পক্ষান্তরে উপমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের সুবিধা হইয়া গেল।

নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন

আমাদের সংবিধানের ৮২ ধারা মতে প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠন করা হইবে। ইহার ভাল দিকও আছে, মন্দ দিকও আছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে আসনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ; আবার কোন স্থানের লোকসংখ্যা কমিয়া

* ১৯৫২ সনের সোশ্যালিষ্ট পার্টি ও কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি একত্র করিয়া এইটি দেখান হইয়াছে।

যাইলে আসনসংখ্যা কমা উচিত। কিন্তু বারবার নির্ব্বাচনকেন্দ্র পুনর্গঠনের ফলে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধির বা নির্ব্বাচনপ্রার্থীর জনসংযোগের অসুবিধা হয় ও আগ্রহ কমিয়া যায়। এইটি গণতন্ত্রের পক্ষে হিতকর নহে।

আবার নির্ব্বাচনকেন্দ্রগুলি এমনভাবে গঠিত হয় বা গঠিত হইতে বাধ্য যে, কেন্দ্রের স্বাভাবিক রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ১নং নির্ব্বাচনকেন্দ্র "ক" মিউনিসিপ্যালিটির খানিকটা ও "খ" মিউনিসিপ্যালিটির খানিকটা ও "গ" ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া গঠিত। ইহার লোকজনের সাধারণ স্বায়ত্তশাসন বিষয়ক স্বার্থ বিভিন্ন; সহজে রাজনৈতিক চেতনা দানা বাঁধিতে পারে না। গ্রাম-পঞ্চায়েত স্থাপিত হইলে যেমন "জেরিম্যানডারিং"-এর সুবিধা হইবে তেমনি রাজনৈতিক চেতনা এখনকার অপেক্ষা সহজেই দানা বাঁধিতে পারিবে।

এই বিষয়টি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীসংখ্যা

গত নির্ব্বাচনে বহু দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে নামিয়াছিলেন। ফলে সাধারণ ভোটার সহজেই বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এবারে বামপন্থীরা একজোট বাঁধায় দলের সংখ্যা ও প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয়, ছোট ছোট দলগুলি উঠিয়া যাইবে। তিনটি আদর্শবাদী দল হইবে; যথা: বামপন্থী দল, মধ্যপন্থী দল ও দক্ষিণপন্থী দল। কংগ্রেস হইবে দক্ষিণপন্থী, জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি হইবে মধ্যপন্থী এবং কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি দল বামপন্থী হইবে।

গত বারে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১১৮৭ জন। প্রত্যেকটি আসনের জন্য গড়ে ৫ জন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবারে ৯৩০ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন—গড়ে প্রত্যেকটি আসনের জন্য ৩·৭ জন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গত বারে স্বতন্ত্রপ্রার্থীর সংখ্যা ৭৫০ জন ছিল এবারে কমিয়া ৩৪৬ জনে দাঁড়াইয়াছে।

নির্ব্বাচকমণ্ডলী

এইবার আমরা নির্ব্বাচকমণ্ডলী লইয়া একটু বিশদ আলোচনা করিব।

নির্ব্বাচনের কথা আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই নির্ব্বাচকমণ্ডলীর কথা আইসে। আমাদের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটের অধিকার আছে। সংবিধানের ৩২৬ ধারায় লিখিত আছে যে, 'যিনিই ভারতের নাগরিক এবং যাঁহার বয়স একুশ বৎসরের কম নহে' তিনিই ভোটাধিকার পাইবেন। এখন একুশ বৎসরের অর্থ কি? আমরা সাধারণতঃ কুড়ি উত্তীর্ণ হইয়া একুশে পা দিলেই বয়স একুশ বৎসর বলি। যেমন রামের বয়স ১৩৬৪ সালের ১লা বৈশাখ ২০ বৎসর ১ দিন—রাম একুশে পা দিল, আমরা রামের বয়স একুশ বলি। ভারতীয় সাবালকত্ব আইনের (ইং ১৮৭৫ সনের ৯ আইন) ৪ ধারামতে একবিংশতিতম জন্মদিনে ২১ পূর্ণ হইবে এবং সেইদিন তিনি সাবালক হইবেন। রাম ১৩৬৫ সালের ১লা বৈশাখ ভোটাধিকার পাইবেন। প্রশ্ন হইতে পারে, ভারতীয় সাবালকত্ব আইন আমাদের সংবিধানের ধারায় প্রযুক্ত হইবে কিনা? শ্রীযুক্ত দুর্গাদাসবাবু তাঁহার বহু সুধীজন প্রশংসিত ভারতীয় সংবিধানের সুবিখ্যাত "ব্যাখ্যা"য় এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভোটারের তালিকা প্রস্তুত করার সময় এই বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য রাখা হয় নাই এবং এ বিষয়ে যাঁহারা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কোনও আদেশ দেন নাই।

১৯৫১ সনের সেন্সাসের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের বয়স-বিভাগ এইরূপ:

বয়স	প্রতি হাজারে
০	২৬·০
১-৪	৯১·০
৫-১৪	২৩৫·৭
১৫-২৪	১৯৯·৮
২৫-৩৪	১৭২·০
৩৫-৪৪	১২০·৭
৪৫-৫৪	৮১·২
৫৫-৬৪	৪৫·০
৬৫-৭৪	২০·৩
৭৫-এর উপর	৮·৩
অনির্দ্দিষ্ট	০·৮

যাহারা ২৪-এর উপর তাহাদের অনুপাত হাজারকরা ৪৪৭·৩ জন।

এইরূপ ভাবে বয়স বিভাগ করিবার হেতু, আমাদের দেশে লোকে বয়স বলিবার সময় সাধারণতঃ বয়স ৩০, ৪০, ৫০···এইরূপ বলে, যাহারা আর একটু সঠিক ভাবে বলেন, তাঁহারা ২০, ২৫,৩০, ৩৫···এইরূপ ভাবে বলে। এইভাবে বয়স-বিভাগ করিলে প্রকৃত বয়সের সহিত কথিত বয়সের খুব কাছাকাছি মিলিয়া যায়—দেখা গিয়াছে।

এক্ষণে ১৫-২৪-এর মধ্যে কতজনের বয়স ২২-২৪ হইতেছে দেখা দরকার। এ বিষয়ে ১৯২১ সনের সেন্সাস রিপোর্টের ২৩৫ পৃষ্ঠার একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবে পরিমার্জ্জিত বয়স-বিভাগ দেখান হইয়াছে। এটি যদিও সমগ্র বঙ্গের তথাপি পশ্চিমবঙ্গের বয়স-বিভাগের সহিত ইহার বেশী তফাৎ হইবার কারণ নাই। আবশ্যক পরিমার্জ্জিত বয়স-বিভাগ স্ত্রী-পুরুষভেদে নিম্নে দিলাম:

প্রতি ১,০০,০০০ লোকের মধ্যে

বয়স	পুরুষ	স্ত্রী
১৫	২,১৫৯	২,১৬০
১৬	২,১১২	২,১১৩
১৭	২,০৮৬	২,০৮৫
১৮	২,০২৩	২,০২০
১৯	১,৯৮৩	১,৯৭৮
২০	১৯,৪৬	১,৯৫৭
২১	১,৯০৯	১,৯০০
২২	১,৮৭৭	১,৮৬৮
২৩	১,৮৪০	১,৮৩১
২৪	১,৮০৪	১,৭৯৩
২৫	১,৭৬৮	১,৭৫৪
(ক) ১৫-২৪	১৯,৭৩৯	১৯,৭০৯
(খ) ২২-২৪	৫,৫২১	৫,৪৯২
(খ) (ক)-এর শতকরা	২৮'০	২৭'৪
গড় :	২৭'৭	

এমতে পূর্ব্বোক্ত ১৯৯'৮ হইতে ইহার শতকরা ২৭'৭ ; অর্থাৎ ৫৫'৪ জন ৪৪৭'৩ জনে যোগ দিতে হইবে। এই হিসাবে ২১-এর উপর লোকের অনুপাত হাজারকরা ৫০২'৭ জনে দাঁড়ায়। জনসংখ্যার অর্দ্ধেকের উপর লোক ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। আর এই ভোটের অধিকার স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকলেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক বলিয়া ভোটের অধিকার পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশ কিছুর উপর ৪০-এর কম বয়সের। আমাদের দেশ গরম দেশ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই লোকে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হন। এজন্ত যাঁহাদের বেশী বয়স হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে স্থবির বা অথর্ব্বদের অনুপাত অনেক বেশী ; তাঁহাদের পক্ষে পায়ে হাঁটিয়া, বিশেষ করিয়া রাস্তাঘাটবিহীন পল্লী-অঞ্চলে অনেক সময় খাল-বিল পার হইয়া ভোট দিতে আসা কষ্টকর। এজন্ত যাঁহারা ভোটগ্রহণকেন্দ্রে আসিয়া ভোট দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকবয়স্ক লোকেদের, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, ভোটার তালিকায় তাঁহাদের সংখ্যাগত যে অনুপাত তদপেক্ষা তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক।

বয়স্ক লোকেরা সাধারণতঃ "স্থিতিশীল" বা conservative। একে ত তাঁহাদের সংখ্যা কম ; তাহার উপর তাঁহারা ভোট দিতে আসিতে না পারার দরুন তাঁহাদের মতাবলম্বীদের বা তাঁহারা যাঁহাকে ভোট দিবেন তাঁহার ভোটে পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিক। যে মতবাদ অল্পবয়স্কদের মনে লাগিবে বা মনে ধরিবে সেই মতবাদেরই সহজে জয়ী হইবার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে শহর ও পল্লী অঞ্চলে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে যাঁহারা অবিবাহিত—যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসার পালনের দায়িত্ব লন নাই ; যাঁহারা সহজে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে সায় দিবেন বা বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দিবেন, তাঁহাদের শতকরা অনুপাত নিম্নে দিলাম ঃ

১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে
এই বয়সের ১০০ লোকের মধ্যে অবিবাহিত

বয়স-বিভাগ	পুরুষ		স্ত্রী	
	শহর	পল্লী অঞ্চল	শহর	পল্লী অঞ্চল
১৫-২৪	৬২'৫	৫৬'৬	২৪'৮	১০'৫
২৫-৩৪	২০'৮	১১'২	৩'৮	১'৬
৩৫-৪৪	৬'৪	৩'৫	১'৪	০'৫

উপরোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, শহরে সর্ব্ববয়সে অবিবাহিতদের অনুপাত কি পুরুষের মধ্যে, কি স্ত্রীলোকের মধ্যে অধিক। একই বয়সের লোকেদের মধ্যে পুরুষ-অবিবাহিতদের সংখ্যা ও অনুপাত স্ত্রীলোক-অবিবাহিতাদের অপেক্ষা বেশী। এইটি হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ আমাদের দেশে স্বামী স্ত্রী অপেক্ষা বয়সে বড়। ১৯২১ সনের হিসাব অনুযায়ী গড়ে পুরুষের বিবাহের বয়স ২০'৭৩ বৎসর ; আর স্ত্রীলোকের ১২'০৩ বৎসর। বয়সের পার্থক্য ৮'৭০ বৎসর।

শারদা আইন পাস হওয়ার দরুন, লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়ার দরুন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে কি পুরুষ, কি স্ত্রী সকলেই বর্ত্তমানে বেশী বয়সে বিবাহ করেন। ২০-এর পূর্ব্বে পুরুষরা ত বিবাহ করেনই না ; ২০-এর কম বয়সে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অনুপাত ও সংখ্যা দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। এই কারণে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

অবিবাহিতদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের যে আনুপাতিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় তাহা হইতে একথা বলা চলে যে, স্ত্রীলোকেরা "স্থিতিশীল" বা conservative ; আর পুরুষরা যে-কোন উদ্ভট বা উৎকট অথবা বৈপ্লবিক মতবাদ সহজেই গ্রহণ করিতে পারেন। শহর অঞ্চলে, যেখানে লোকে পল্লীর শান্ত পরিবেশ হইতে দূরে, যেখানে নিজের বাপ-মা ভাইবোন হইতে দূরে বাস করেন, যেখানে অবিবাহিতদের অনুপাত বেশী সেখানে উদ্ভট, উৎকট বা বৈপ্লবিক মতবাদ সহজেই জয়যুক্ত হইতে পারে।

এবারকার নির্ব্বাচনে কলিকাতায় ও তাহার আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে, বামপন্থীরা যে জয়ী হইয়াছেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই সামাজিক পরিবেশ। ইহার উপর আরও একটি কারণ হইতেছে যে, ভোটারদের মধ্যে কম বয়সের ভোটারদের অনুপাত বাড়িতেছে। স্বাভাবিক কারণেই এইটি হইতেছে। আর ইহার উপর আছে বয়সের হিসাব না করিয়া ভোটারতালিকায় নাম উঠানো।

বর্ত্তমানে দেশের লোকসংখ্যা প্রতি দশ বৎসরে শতকরা মোটা-মুটি ১০ জন করিয়া বাড়িতেছে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি-হেতু ভোটারের সংখ্যাও শতকরা ৫ করিয়া বাড়িবে। এক্ষণে যাহারা ভোটার

আছেন তাহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে মারা যাইবেন। ১,০০০ হাজার ভোটারের মধ্যে মোটামুটি হিসাবে ৫ বৎসরে ৫×১০ জন মারা গেল। বর্ত্তমান ভোটারদের মধ্যে ৯৫০ জন ৫ বৎসর বাদে জীবিত থাকিবেন। মোট ভোটারের সংখ্যা আবার ১,০০০ হইতে ১০,৫০ জন হইবে: অর্থাৎ নূতন ১০৫০—৯৫০=১০০ জন ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইবেন। ইঁহাদের সকলেরই বয়স ২১ হইতে ২৬-এর মধ্যে হইবে। ইঁহাদের অনুপাত হইতেছে শতকরা ৯'৫ জন। আর ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অবিবাহিত। দ্রুত লোকসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত এই অনুপাত আরও বাড়িবে।

যদি লোকসংখ্যা আরও দ্রুত বাড়িতে থাকে তাহা হইলে এই অনুপাত আরও বেশী হইবার সম্ভাবনা। অন্তবিধ আর্থিক ও সামাজিক কারণে বিবাহে অনিচ্ছা বাড়িয়া যাইতেছে। যাহারা বিবাহ করিতেছেন তাঁহারাও বেশী বয়সে বিবাহ করিতেছেন এবং ছেলে 'মানুষ' হইবার পূর্ব্বেই মারা যাইতেছেন। এজন্য ভবিষ্যতের নাগরিকদের পূর্ব্বের ন্যায় "মানুষ" করিতে পারিতেছেন না। এই সব নূতন নাগরিকদের মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় বয়সের প্রতি সম্মান; ধর্ম্মভাব, সুশিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির আশা করিতে পারা যায় না। তাঁহারা সহজেই নূতন নূতন বুলির দাস বা তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন। এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা, সমাজ-বিজ্ঞানীরা যদি দৃষ্টি দেন ত ভাল হয়।

ভুয়া ভোট

১৯৫২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় যে ভোটার তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে ১,২৪,৯৭,৭১৪ জনের নাম ভোটার হিসাবে স্থান পাইয়াছিল। এই তালিকায় ১৯৫০ সনের জন-প্রতিনিধিত্ব আইনের ২১ ধারা অনুসারে ১৯৫০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে যাঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাঁহাদের নাম ভোটার তালিকায় আছে তাঁহারা ১৯৫১ সনের সেন্সাসের সময় (অর্থাৎ ১৯৫১ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে) সকলেই ২২ পার হইয়াছেন। এইরূপ লোকের অনুপাত হাজারকরা ৪৮৪ জন।

১৯৫১ সনে আদমশুমারির হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের (চন্দননগর বাদে—কেননা তখন পর্য্যন্ত চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয় নাই) লোকসংখ্যা ২,৪৮,১০,৩০৮ জন। ইহার মধ্যে আছে বৈদেশিক নাগরিক—যাঁহারা ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী আদৌ ভারতের ভোটার হইতে পারেন না। এইরূপ বৈদেশিক নাগরিকদের সংখ্যা ৩,০৮,১৮৭ জন। আর আছেন উদ্বাস্তগণ, উদ্বাস্তদের সংখ্যা হইতেছে ২০,৯৯,০৭১ জন। ইঁহারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান ভেদে বিভিন্ন বৎসরে ভারতে আসিয়াছেন নিম্নলিখিত সংখ্যা অনুযায়ী:

	পূর্ব্ব পাকিস্থান	পশ্চিম পাকিস্থান
১৯৪৬	৪৪,৬২৪	—
১৯৪৭	৩,৭৭,৮৯৯	৮,০৬২
১৯৪৮	৪,১৯,০১৮	১,৯৯৫
১৯৪৯	২,৭৩,৫৯২	৬৬৯
১৯৫০	৯,২৫,১৮৫	৫২৮
১৯৫১	৩০,৮৭৯	৭৩
	২০,৭১,১৯৭	১১,৩২৭

আমাদের সংবিধানের ৬ ধারায় এইরূপ বিধান আছে যে যাঁহারা পাকিস্থান হইতে ১৯৪৮ সনের ১৯শে জুলাই বা ঐ তারিখের পর ভারতে আসিয়াছেন তাঁহারা উপযুক্ত ভারতীয় কর্ম্মচারীর নিকট দেশীয়করণ (naturalisation) করিলে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন, কিন্তু দেশীয়করণ-জন্য আবেদন করিবার পূর্ব্বে তাহাদিগকে অন্ততঃ ছয় মাস ভারতে বাস করিতে হইবে।

এমতে ১৯৪৯ সনের ১লা অক্টোবরের পরে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন, ১৯৫০ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখে তাঁহারা কিছুতেই ভারতের নাগরিক হইতে পারেন না। এজন্য উপরোক্ত উদ্বাস্তসংখ্যা হইতে আমরা ১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের বাদ দিলাম। এইরূপ উদ্বাস্তর সংখ্যা পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান হিসাবে নিম্নে দেওয়া হইল:

	পূর্ব্ব পাকিস্থান	পশ্চিম পাকিস্থান
১৯৫০	৯,২৫,১৮৫	৫২৮
১৯৫১	৩০,৮৭৯	৭৩
মোট	৯,৫৬,০৬৪	৬০১

১৯৪৯ সনে যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কিছি-সংখ্যক লোককে বাদ দেওয়া উচিত। এমতে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা হইতে প্রথমে আমরা বৈদেশিক নাগরিকদের সংখ্যা বাদ দিলাম। যথা:

২,৪৮,১০,৩০৮
৩,০৮,১৮৭
———————
২,৪৫,০২,১২১

১৯৫০ ও ১৯৫১ সনে যাঁহারা পাকিস্থান হইতে ভারতে আসিয়াছেন, শেষোক্ত সংখ্যা হইতে তাঁহাদের সংখ্যা বাদ দিলাম:

২,৪৫,০২,১২১
৯,৫৬,৬৬৫
———————
২,৩৫,৪৫,৪৫৬

সর্ব্বশেষ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ভোটার তালিকায় ভোটারদের অনুপাত হইতেছে হাজারকরা ৫৩০'৮ জন। যেখানে ৪৮৪'০ জন ভোটার হইবেন সেখানে হইয়াছেন ৫৩০'৮ জন। হাজারকরা

(৫৩০'৮—৪৮৪'০=)৪৬'৮ জনের ভোটের তালিকায় স্থান পাওয়া উচিত নহে, অথচ স্থান পাইয়াছে। তবুও ১৯৪৯ সনে পাকিস্থান হইতে ভারতে আগত কোনও উদ্বাস্তুকে বাদ দেওয়া হয় নাই।

এইরূপ বেশী ভোটার হইবার কারণ—যাঁহাদের ভোটার হইবার বয়স হয় নাই এইরূপ বহুলোক ভোটারের তালিকায় স্থান পাইয়াছে; যাঁহাদের নাম প্রাথমিক তালিকায় স্থান পাইয়াছিল তাঁহারা মৃত হইলেও চূড়ান্ত তালিকায় তাঁহাদের নাম কাটিয়া দেওয়া হয় নাই, যাঁহারা দেশে থাকেন তাঁহাদের নাম দেশের তালিকায় ও এক-আধবার অন্যত্র কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন বলিয়া সেখানেও দুইবার করিয়া লেখানো হইয়াছে, এবং এমন বহু লোকের নাম লেখানো হইয়াছে যাঁহাদের অস্তিত্ব আদৌ নাই।

এইরূপ হইবার প্রধান কারণ—তালিকা প্রস্তুতকারকদের টাকা-প্রতি এতগুলি নাম দিতে হইবে এইরূপ সরকারী নির্দ্দেশ থাকায় তাহারা যত পারে নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে ও সেই হিসাবে টাকা লইয়াছে। তাহাদের তৈয়ী তালিকা সঠিক হইল কিনা দেখিবার কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। "শিশু-রাষ্ট্র", "প্রথম নির্ব্বাচন" ইত্যাদি কৈফিয়ত সৃষ্টি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের দায় এড়াইয়া গিয়াছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল ভোটারের তালিকায় বহু ভুল থাকিয়া গেল। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইব তাহারই মধ্যে ভূত প্রবেশ করিল।

এইবারে ১৯৫৭ সনে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় ১,৫১,১৮,০৬১ জনের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গত বারের তুলনায় ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৬,৩০,৩৪৭ জন—শতকরা ২০'৮ জন করিয়া। এই বৃদ্ধির কারণ :

(১) পশ্চিমবঙ্গের এলাকা বৃদ্ধি—চন্দননগর, পুরুলিয়া ও কিষেণগঞ্জের কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হইয়াছে, (২) লোকসংখ্যা বৃদ্ধি—লোকসংখ্যা বৃদ্ধি দুই কারণে হইয়াছে, (ক) জন্ম ও মৃত্যুহারের তারতম্য হিসাবে স্বাভাবিক বৃদ্ধি, আর (খ) উদ্বাস্তু আগমন, এবং (৩) পূর্ব্বের ন্যায় ভোটার তালিকায় ভুলভ্রান্তি।

পশ্চিমবঙ্গের এলাকা বৃদ্ধির জন্য বিধানসভার আসন ২৩৮ হইতে বাড়িয়া ২৫২ হইয়াছে। এই বৃদ্ধি ১৯৫১ সনের সেন্সাস অনুসারে লোকসংখ্যাবৃদ্ধির অনুপাতে হইয়াছে। এলাকা বৃদ্ধির জন্য ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে মোটামুটি হিসাবে শতকরা ৫'৯ জন বা ৮,৬৪,০০০ জন।

এবারকার ভোটার-তালিকা ১৯৫৬ সনের ১লা মার্চ্চ তারিখের ভিত্তিতে তৈয়ারী হইয়াছে। গত ছয় বৎসরে (১৯৫৬—১৯৫০=৬) স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে এইরূপ :

হাজারকরা

সন	জন্মহার	মৃত্যুহার	বৃদ্ধি
১৯৫০	১৬'৭	১০'৩	৬'৪
১৯৫১	২১'৯	১৩'০	৮'৯
১৯৫২	২৩'১	১০'৮	১২'৩
১৯৫৩	২২'৭	১০'২	১২'৫
১৯৫৪	২১'৯	৯'১	১২'৮

পাঁচ বৎসরে গড় বার্ষিক বৃদ্ধি হাজারকরা ১০'৬ জন করিয়া। এইভাবে ৬ বৎসরে বৃদ্ধি হইয়াছে হাজারকরা ৬৩'৬ জন বা শতকরা ৬'৪ জন করিয়া। সুতরাং স্বাভাবিক কারণে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হেতু ভোটার-সংখ্যা শতকরা ৬'৪ জন বাড়িতে পারে।

সরকারী পুনর্ব্বাসন দপ্তর হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় দেখানো হইয়াছে যে, ১৯৫৬ সনের শেষ পর্য্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ৩০,৮৮,০০০। ইহাদের মধ্যে ১৯৫৫ সনে আসিয়াছেন ৩,২০,০০০—ইহারা কেহই ভোটার হইতে পারেন না। ইহাদের সংখ্যা বাদ দিলে যাঁহাদের মধ্য হইতে ভোটার হইতে পারেন এইরূপ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ২৭,৬৮,০০০। ইহাদের মধ্যে আবার আমাদের পূর্ব্ব হিসাব অনুযায়ী ১১,১৪,৫৩২ জনের মধ্য হইতে প্রাপ্তবয়স্কেরা পূর্ব্বেই ভোটার হইয়াছেন। সুতরাং নূতন ভোটার হইতে পারেন তাহার পরে নবাগত উদ্বাস্তুদের মধ্য হইতে। এইরূপ উদ্বাস্তুর সংখ্যা ১৪,৫৩,০০০ আর ইহাদের মধ্য হইতে প্রাপ্তবয়স্কের সংখ্যা—৭,০৩,০০০ জন। উদ্বাস্তু আগমনের জন্য ভোটার-সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ৫'৬ জন করিয়া!

এই তিনটির সমষ্টি করিলে মোট বৃদ্ধি দাঁড়ায় শতকরা ১৭'৯ জন। কিন্তু বাড়িয়াছে শতকরা ২০'৮ জন। বক্রী বৃদ্ধি (২০'৮—১৭'৯=২'৯)—আমাদের মতে ভোটার তালিকায় ভুলভ্রান্তির জন্য।

পূর্ব্বের ভোটার-তালিকায় ভুলভ্রান্তি ছিল শতকরা ৪'৭ জন হিসাবে। এইবারে ইহাতে ২'৯ জন যোগ করিতে হইবে। মোট ভুলভ্রান্তির পরিমাণ শতকরা ৭'৬ জনে দাঁড়ায়। প্রত্যেক ১৩ জনের মধ্যে ১ জন ভুয়া ভোটার।

এইমাত্র দেখিলাম, শতকরা ৭ জন ভুয়া ভোটার। রামবাবু শ্যামবাবুকে ভোটে হারাইলেন। কিন্তু রামবাবুর ভোট-সংখ্যা যদি শ্যামবাবুর ভোট-সংখ্যা অপেক্ষা শতকরা ৭-এর কম হয় তাহা হইলে মনে সন্দেহ থাকিয়া যায় যে, রামবাবু প্রকৃতপক্ষে ভোটে জয়ী হইয়াছেন, না ভুয়া ভোটের সাহায্যে জনসাধারণের প্রতিনিধি সাজিয়াছেন। এই ভুয়া ভোট দিবার ব্যাপার কিরূপ ব্যাপক ভাবে চলিয়াছিল, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিব।

কলিকাতার কোন লোকসভার নির্ব্বাচনে কলিকাতা কর্পোরেশনের বহু কুলি, মেথর ও ধাঙ্গড়দের ভোটার সাজাইবার ভার কোন কাউন্সিলার লন। কোন ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীর বাড়ীর উঠানে তাহাদের দাঁড় করাইয়া তালিম দেওয়া হইল—তোমার নাম "সুমেরু চামার", তোমার বাপের নাম "ভুখন চামার", তুমি থাক "৪নং গলাকাটা লেনে"। পাশের লোককে শিখানো হইল—তোমার নাম "রামচরিত্তর ওঝা" তোমার বাপের নাম "দিনুদাস", তুমি থাকো "দশ-এক-বি মাসকাটা লেনে।" এই রকম চলিতে লাগিল। সকলকে তেলেভাজা সিঙ্গাড়া ও বোঁদে খাইতে দেওয়া হইল। বলা হইল, যে ভোট দিয়া হাতে কালির দাগ দেখাইতে পারিবে তাহাকে এক টাকা করিয়া বকশিশ দেওয়া হইবে।

"সুমেরু চামার" ভোট দিতে গেল, প্রতিপক্ষের লোক চেঁচাইয়া তাহার বাপের নাম বলিতে বলিল। "সুমেরু চামার" ভড়কাইয়া গেল, বলিল 'বাপকে নামতো পুরজামে লিখা হ্যায়, হামকো কাঁহে পুছতা"। সুমেরুর ভোট দেওয়া হইল না বা বকশিশ মিলিল না। রামচরিতের কিন্তু পড়া ঠিক ঠিক বলিল—ভোট দিল ও বকশিশ পাইল।

ভোট দিতে যাইয়া শুনিলাম যে, আমার মাতাঠাকুরাণী মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে ভোট দিয়া গিয়াছেন! দুর্ভাগ্যবশতঃ এই অধম সন্তানকে দেখা দিলেন না। ব্যাপক ভাবে ভুয়া ভোট দেওয়া আজকালকার নির্ব্বাচনে যেন রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে ভোটারের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে, এক-একটি নির্ব্বাচনকেন্দ্রে ৫০।৬০ হাজার ভোটার—এজন্য ভুয়া ভোট দেওয়া সহজ, একথা বলিলে চলিবে না।

যেখানে ভোটারের সংখ্যা খুব সীমাবদ্ধ সেখানেও কিরূপ ব্যাপক ভাবে ভুয়া ভোট দেওয়া হইত বা হয় তাহার একটি উদাহরণ দিব। উদাহরণটি পুরাতন হইলেও এখনও খাটে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ভোটার হইতে হইলে সম্পত্তি থাকা দরকার। ১৯৩০ সনের ৫নং মুসলমান নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ছিল ৬৭৯ জন; ইহাদের মধ্যে ৪৮৭ জন ভোট দেন। শতকরা ৭২ জন পুরুষ ভোটার ভোট দেন। স্ত্রী ভোটারদের সংখ্যা ছিল ২১০ জন; ইহাদের মধ্যে ২০৮ জন ভোট দিয়াছিলেন বলিয়া কাগজে প্রকাশ। অর্থাৎ শতকরা ৯৯ জন স্ত্রীলোক ভোট দিয়াছিল। সেবারকার কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে ইহাই হইল সবচেয়ে বেশী ভোট। এই যে মুসলমান-ঘরানা স্ত্রীলোকগণ ভোট দিয়া গেলেন বলিয়া কাগজে প্রকাশ তাঁহারা কেহই ভোট দিতে আসেন নাই। তাঁহারা ঘরানা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক বলিয়া বড় বড় মোটরে করিয়া বোরখা-পরিহিত বাইজীরা আসিয়া তাঁহাদের হইয়া ভোট দিয়া গেল। ইহাকে প্রকৃত নির্ব্বাচন না বলিয়া নির্ব্বাচনের প্রহসন বলা সঙ্গত।

বিত্তশালিনী ঘরানা পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদের বেলায় যদি এইরূপ প্রতারণা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গণভোটের যুগে কলিকাতা শহরে —যেখানে পাশের বাড়ীর লোক প্রতিবেশীর কোন খবর রাখেন না, সেখানে যে কি হয় বা হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইলেকশান কমিশন প্রথম সর্ব্বভারতীয় নির্ব্বাচনের ফলাফল আলোচনাকালে লিখিয়াছেন যে, ৮,৮৬,১২,১৭১ জন ভোট দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ২৩০৬টি ক্ষেত্রে ভোট দিতে আসিলে তাহাদের চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং ইহাদের মধ্যে ১৭৩২টি আপত্তি নাকচ করা হয়। জাল-ভোটার সাজিয়া আসার সংখ্যা ৫৭৪টি মাত্র। এত অল্পসংখ্যক চ্যালেঞ্জ হইবার কারণ—চ্যালেঞ্জ করিতে হইলে প্রথমে ১০্ টাকা জমা দিতে হয়। পোলিং এজেন্টদের কাছে নগদ প্রায়ই এত টাকা থাকে না। একজনকে চ্যালেঞ্জ করা হইল; জাল সাব্যস্ত হইল; কিন্তু সেই ১০্ টাকা তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হইল না। ভোট গ্রহণ শেষ হইলে ঐ ১০্ টাকা ফেরত দেওয়া হইবে—ইহাই নিয়ম করা হইয়াছিল। এজন্য বহু ক্ষেত্রে জাল-ভোটারদের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব হয় নাই। এক-একটি নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে বহু ভোটগ্রহণকেন্দ্র থাকে। সমগ্র ভারতে গড়ে প্রত্যেক নির্ব্বাচক-মণ্ডলীতে ভোটগ্রহণকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৩টি। প্রত্যেক ভোটগ্রহণ-কেন্দ্রে চ্যালেঞ্জ করিবার জন্য এত টাকা কোন প্রার্থীই তাঁহার পোলিং এজেন্টগণের নিকট দিতে পারেন না।

প্রথম নির্ব্বাচনে কিরূপ ব্যাপকভাবে জাল-ভোট দেওয়া হইয়াছিল তাহার একটি আন্দাজ পাওয়া যাইবে "টেণ্ডার ভোটের" সংখ্যা হইতে। ইলেকশান কমিশন বলিয়াছেন যে, সমগ্র ভারতে মাত্র ৫৮,৮৮৭টি "টেণ্ডার ভোট" দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, যেখানে ৮,৮৬,১২,১৭১ জন ভোট দিয়াছেন সেখানে এই সংখ্যা অতি নগণ্য। প্রতি ১০,০০০ হাজারে "টেণ্ডার ভোটের" সংখ্যা ৬·৬টি মাত্র। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে এই সংখ্যা নগণ্য নহে।

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলির—তা কি কংগ্রেস কি কম্যুনিষ্ট বা অন্য দল, বহু শাখা-সমিতি আছে। এই সব রাজনৈতিক দলগুলি বা তাহাদের শাখা-সমিতিগুলি নির্ব্বাচনের সময় কে প্রার্থী দাঁড়াইবেন, না দাঁড়াইবেন; কোন প্রতিপক্ষ দলের প্রার্থীর কি কি কেচ্ছা আছে, ভোটের মিটিং কোথায় কোথায় করিতে হইবে, কি কি পোষ্টার ছাপাইতে হইবে, কোন কোন বিষয়ে হাতে লেখা বাণী বা কেচ্ছা দেয়ালের গায়ে মারিতে হইবে ইত্যাদি বিষয়ে যে রকম আগ্রহ দেখান ও দিনের পর দিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত যেরূপ জটলা করেন ও যে প্রকার উৎসাহ দেখান তাহার তুলনায় ইহার শতভাগের এক ভাগ আগ্রহ ও উৎসাহ ভোটার-তালিকা প্রণয়নের সময় যদি তাঁহারা দেখাইতেন তাহা হইলে এইরূপ ভুল-ভ্রান্তিপূর্ণ ভোটার তালিকা হইত না, জাল-ভোট দিবার সুযোগ-সুবিধা হইত না; দেশের মঙ্গল হইত, জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনারও উন্মেষ ঘটিত। আগামীবারে ভোটার-তালিকা তৈয়ারী হইবার সময় তাঁহারা এ বিষয়ে কি সজাগ হইবেন ও নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন?

শুধু রাজনৈতিক দলগুলি বা তাঁহাদের কর্ম্মীদের দোষ দিই কেন? শিক্ষিত ব্যক্তিরাই বা কি করেন? ভোটের সময় ট্রামে, বাসে বা চায়ের দোকানে অথবা ট্রেনের কামরায় বসিয়া ডাঃ বিধান রায়ের দোষ-সংখ্যা ১০১টি বা ৯৯টি, জ্যোতিবাবু কত ভাল লোক বা কত বদ লোক ইত্যাদি বিষয়ে যে উৎসাহ দেখাই বা তর্ক করি তাহার শতাংশও যদি নিজ নিজ বাড়ীর লোকের বা নিজের আশেপাশের লোকের নাম ভোটার তালিকায় উঠিল কিনা ও যে সকল মৃত ব্যক্তির নাম আছে তাহা কাটিয়া দেওয়া হইল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে দেখাইতাম তাহা হইলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হইত।

জাল ভোট

এইরূপ ভুয়া ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় থাকার সুযোগ প্রত্যেক প্রার্থীই বা তাঁহার দলের লোক নির্ব্বাচনের সময় লন। এ বিষয়ে সকল দলের সকল প্রার্থীই যেন সমান ; জাল-ভোট চালানো বিষয়ে কেহই মনে হয় কম যান না। তবে ভোটে হারিয়া যাইলে অপর পক্ষ যে বেশী পরিমাণ জাল ভোট দিয়াছিলেন এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া কিছু ক্ষোভ মিটানো যায়। আর যিনি নির্ব্বাচিত হইলেন তিনি ত প্রকৃতপক্ষে জয়ী হন নাই বা আসলে জনসাধারণের প্রতিনিধি নহেন, জাল-ভোটের প্রতিনিধি এই বলিয়া হয়ত কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করা যায়।

একজন ভোট দিতে আসিয়া দেখিল তাহার নাম জাল করিয়া অপর এক ব্যক্তি ভোট দিয়া গিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে, তোমার ভোট হইয়া গিয়াছে। তথাপি যদি সেই ব্যক্তি চলিয়া না গিয়া ভোট দিতে চাহে, তবে আসে তাহার সনাক্তকরণ-পর্ব্ব। এই সনাক্তকরণ-পর্ব্ব জাল-ভোটারের সনাক্তকরণ-পর্ব্ব অপেক্ষা শক্ত। তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সেই গ্রামের বা সেই স্থানের সেই নামের সেই ব্যক্তি। সনাক্তকরণ শেষ হইলে তাঁহাকে আলাদা ভোটপত্র দেওয়া হইবে। এই ভোটপত্র তাঁহার মনোমত প্রার্থীর বাক্সে ফেলিতে দেওয়া হইবে না—তিনি যাঁহাকে ভোট দিতে চাহেন সেই সেই প্রার্থীর নাম কর্ত্তৃপক্ষকে বলিতে হইবে। কর্ত্তৃপক্ষ সেই সেই প্রার্থীর নাম সেই ভোটপত্রে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও আলাদা একটি নামে রাখিয়া দিবেন। ইহাতে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষিত হইল না। আর এই "টেণ্ডার-ভোট" কাজে আসিবে কখন? যদি কোনও প্রার্থীর নির্ব্বাচন-নাকচের মামলা হয় তখন নির্ব্বাচনী-আদালতের জজেরা এই "টেণ্ডার-ভোট" অন্ত প্রমাণ গ্রহণের পর ব্যবহার করিবেন। এইরূপ উৎসাহী ভোটার সর্ব্ব দেশেই কম—আমাদের দেশে আরও কম।

আমাদের ধারণা ১০০টি জাল ভোটে একজন এইরূপ "টেণ্ডার-ভোট" দাখিল করেন। এই ধারণা সত্য হইলে জাল-ভোটের সংখ্যা ৬'৬ হয়। ইহা যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে বহু জাল-ভোট পাচার হইয়া গিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে জোর করিয়া বলা চলে।

এইবারকার নির্ব্বাচনে এই সম্বন্ধে অনেকটা উন্নতি হইয়াছে বটে, তথাপি বহু জাল-ভোট দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

শিক্ষিত ভোটারের সংখ্যা

আমাদের দেশে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা খুব কম। লিখিতে পড়িতে জানিলেই যে তিনি শিক্ষিত একথা বলা যায় না, তবে লিখন-পঠনক্ষমতা শিক্ষার একটি মাপকাঠি—এই হিসাবে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা হইতে শিক্ষিতের সংখ্যা বা অনুপাতের একটা হিসাব পাওয়া যায়।

ভারতে লিখন-পঠনক্ষম লোকের অনুপাত শতকরা ১৬'৬ জন। এইজন্য সংবাদপত্রে ও সাধারণ আলোচনায় প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে মাত্র দুই আনা লোক শিক্ষিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই উক্তি প্রযোজ্য নহে। পশ্চিমবঙ্গে লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ১৯৫১ সনের আদমশুমারি হইতে যে নমুনা-তালিকা (Sample Table) প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, শতকরা ২২ জন 'শিক্ষিত'। যদি আমরা কেবলমাত্র ২৪ বৎসর বয়সের উপর লোকের হিসাব ধরি তাহা হইলে এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৫'৮ হইতেছে। আর ২১-এর উপর লোকের হিসাব ধরিলে এই অনুপাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শতকরা ২৬'১-এ দাঁড়ায়। এইরূপ হইবার কারণ দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসার। যত দিন যাইবে এই অনুপাত তত বাড়িবে। ইহা ছাড়া আরও এক কারণে লিখন-পঠনক্ষম লোকের অনুপাত বাড়িবে—দেশে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে এবং বয়স্করাও অতি আগ্রহের সহিত এই সুযোগ গ্রহণ করিতেছে।

আমাদের মনে হয় যে, বর্ত্তমান ১৯৫৭ সনে নির্ব্বাচকদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন লিখন-পঠনক্ষম।

কলিকাতা শহরে লিখন-পঠনক্ষম ব্যক্তির অনুপাত শতকরা ৪৫'৭। আর যাহারা ২৪ বৎসরে উপর তাঁহাদের মধ্যে অনুপাত শতকরা ৫১'৪ জন। বর্ত্তমানে নির্ব্বাচকদের মধ্যে আমাদের আন্দাজ (estimate) অনুযায়ী শতকরা ৬০-এর কাছাকাছি। কলিকাতায় কংগ্রেস ২৬টি আসনের মধ্যে ৮টি আসন পাইয়াছেন, ইহা কি শিক্ষিত ভোটারদের কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হওয়ায় ফল, না অন্য কিছু?

ভোটারদের সাম্প্রদায়িকতা

আমাদের দেশে ভোটারদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব খুব প্রবল। মুসলমান মুসলমানকে ভোট দিবেন ; পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়কে ভোট দিবেন ; মাহিষ্য মাহিষ্যকে ভোট দিবেন ইত্যাদি। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিহারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। আর আমাদের রাজনৈতিক দলগুলি—কি কংগ্রেস, কি কমুনিষ্ট সকলেই এই বিষয়টি জানেন ও প্রার্থী মনোনয়নের সময় ইহার প্রশ্রয় দেন। যে অঞ্চলে হিন্দী ভাষাভাষীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে হিন্দীভাষী প্রার্থী দাঁড় করাইলেন ; যে অঞ্চলে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয় প্রার্থী দাঁড় করাইলেন ; যে অঞ্চলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলে মুসলমান প্রার্থী দাঁড় করাইলেন।

আর ভোটাররাও প্রার্থীর জাতি দেখিয়া ভোট দিলেন। রাজনৈতিক মতবাদ পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। মুসলমানদের মধ্যে এই উগ্র সাম্প্রদায়িক ভাব সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি : (১) তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কোরানের উপদেশ। কোরানের নবম সুরায় আছে :

"O true believers, take not your fathers or your brethren for friends, if they love infidelity above faith."

ইহার অনুবাদ দিলাম না। আবার আছে :

"O true believers, verily the idolaters are unclean : let them not therefore come near unto the holy temple after this year."

ঐ সুরায় অন্যত্র আছে :

"It is not allowed unto the prophet, nor those who are true believers, that they pray for idolaters, although they be of kin."

(২) ১৯২০ হইতে ১৯৪৭ সন পর্য্যন্ত পৃথক নির্ব্বাচনপ্রথা ছিল। এই প্রথায় যদিও মুসলমান কেবলমাত্র মুসলমানকে ভোট দিতে বাধ্য তথাপি যে মুসলমান যত অধিকমাত্রায় সাম্প্রদায়িক তিনি তত বেশী ভোট পাইয়াছেন। ১৯৪৬ সনে বাংলায় যে নির্ব্বাচন হইয়াছিল তাহাতে মুসলিম লীগের ন্যায় উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ভোট পাইয়াছিল ২০,৩৬,৭৭৫টি, আর জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা ভোট পাইয়াছিলেন ১,৭৯,১৮৯টি—যদিও শেষোক্তরা অধিকতর শিক্ষিত ও অর্থশালী। ১০০০ মুসলীম ভোটের মধ্যে জাতীয়তাবাদীরা পাইয়াছিলেন মাত্র ৮১টি। ১১৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ দখল করে ১১৪টি আসন, কংগ্রেসী মুসলমান মাত্র ৪টি ও ১ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। দিল্লীর ৩০টি আসনের একটিতেও কংগ্রেস বহু চেষ্টা করিয়া মুসলমানপ্রার্থী দাঁড় করাইতে পারেন নাই—নির্ব্বাচিত করা ত দূরের কথা।

শুধু বাংলায় নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বত্র—কি মুসলমানগরিষ্ঠ প্রদেশ, কি মুসলমানলঘিষ্ঠ প্রদেশে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা কম ভোট পাইয়াছিলেন। নিম্নে আমরা প্রদেশ অনুযায়ী তথ্যগুলি দিলাম। যথা :

প্রদেশ	জাতীয়তাবাদী মুসলমান কত ভোট পাইয়াছেন	মুসলিম লীগ কত ভোট পাইয়াছেন	জাতীয়তাবাদী মুসলমান মোট মুসলমান ভোটের শতকরা কত ভোট পাইয়াছেন
আসাম	৩১,১৯৭	১,৫৮,১৯০	১৬·৫
বিহার	৩৯,৪১৮	১,৪৬,০৭৮	২১·৩
বাংলা	১,৭৯,১৮৯	২০,৩৬,৭৭৫	৮·১
বোম্বাই	৫,৯৮৬	২,৫১,৩৩১	২·৩
মধ্যপ্রদেশ	৫৩১	৪৬,৮৮৯	০·১
মাদ্রাজ	৮,২৮৮	৩,০৭,৩৯৮	২·৬
উঃ পঃ সীমান্ত	৭,৮৭৫	১,৪৭,৮৮০	৫·০
উড়িষ্যা	৪৩১	৪,৩৩৬	০·১
পঞ্জাব	৪১,৬০৮	৬,৭৯,৯২৩	৫·৭
সিন্ধু	৩৫,৩০৫	১,৯৯,৬৫১	১৫·০
ইউ, পি	১,১৫,০০০	৫,২২,৭০৫	১৮·০
সমগ্র ভারত	৪,৬৪,৮২৮	৪৫,০১,১৫৬	৯·৩

সাম্প্রদায়িকতাবোধ কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা নিম্নের উদাহরণ হইতে বুঝা যাইবে। জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গড় নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে ভোটারদের মধ্যে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তৎপরেই মুসলমানেরা। এই কেন্দ্রে দুইটি আসন—দুইটি পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা দখল করেন ১৯৫২ সনের নির্ব্বাচনে—একজন কংগ্রেসী, অপর জন কম্যুনিষ্ট। কংগ্রেসী পাইয়াছিলেন ১৬,৯৪৩টি ভোট, কম্যুনিষ্ট পাইয়াছিলেন ১৬,১৭৬টি ভোট। বর্ণহিন্দু কংগ্রেসী পাইয়াছিলেন ১১৯৭০টি ভোট, বর্ণহিন্দু-কম্যুনিষ্ট পাইয়াছিলেন ১৫,৪৩৬টি ভোট।

বর্ত্তমান (১৯৫৭) নির্ব্বাচনে লোকসভার ডায়মণ্ডহারবার নির্ব্বাচন-কেন্দ্রেও এই ভাব দেখা যায়। এই কেন্দ্রে পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়েরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রতিপত্তিশালী। কম্যুনিষ্ট-তপশীলী পাইয়াছেন ২,৪৭,৭৮৫ ভোট, কংগ্রেসী-তপশীলী পাইয়াছেন ২,৪৫,২৬৬ ভোট। ইঁহারা উভয়েই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে কম্যুনিষ্ট সদস্য পরাজিত হইয়াছেন তিনি পাইয়াছেন ২,৪৪,৭৬৩টি ভোট। এই কেন্দ্রে ২১,৮৫০টি ভোট বাতিল হইয়াছে। অর্থাৎ একজন ভোটার একই ব্যক্তিকে ২টি ভোট দিয়াছেন—যাহা তিনি দিতে পারেন না। যাঁহারা গণনার সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বলেন, এই সব ভোট তপশীলী প্রার্থীদের বাক্স হইতে বাহির হইয়াছে। ইহারা যদি জাতি হিসাবে ভোট না দিয়া রাজনৈতিক দল হিসাবে দিতেন তাহা হইলে দুইটি আসনই একটি রাজনৈতিক দল পাইতেন।

দুঃখের বিষয়, সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, ও রাজনৈতিক দলসমূহ প্রকারান্তরে ইহার প্রশ্রয় দিতেছেন।

এই সাম্প্রদায়িকতার ফলে বহু ভোট নষ্ট হইতেছে। তপশীলী-ভোটার তাঁহার দুইটি ভোটই তপশীলী প্রার্থীর বাক্সে দিলেন—ফলে তাঁহার একটি ভোট নষ্ট হইল। নষ্ট হয় হউক, অপর বর্ণহিন্দু-প্রার্থীও পাইল না। এ বিষয়ে 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় একজন দক্ষিণ ভারতীয় যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহা নিম্নে দিলাম :

লোকসভার নির্ব্বাচন-কেন্দ্র	ভোটারের সংখ্যা	যে ভোট দেওয়া হইয়াছে	বাতিল ভোট
সাহাপুর	৭,৭৮,৯৫৫	৬,২৩,৭১৪	২৭,৫০১
মাহবুবনগর	৭,৬৩,৫৬০	৫,৮৩,৭১৫	৩,৭৫,৩৩১
ফৈজাবাদ	৮,১১,৭৮৯	৬,৭৫,৬০৯	৬০,৬৫৫
ফুলপুর	৭,০৯,২৭৭	৬,৪৯,৬০৭	৩২,৭৪৫
চিদম্বরম	৮,৪৬,০৫৯	৮,২৫,০০১	৬৪,৭৬১
মোট	৩৯,০৯,৬৪০	৩৩,৫৭,৬৪৬	৫,৬০,৯৯৩

মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে শতকরা ১৬·৬টি ভোট নষ্ট হইল। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকাংশ বাতিল ভোট তপশীলী-প্রার্থীর বাক্স হইতে পাওয়া গিয়াছে। এবিষয়ে ইলেকশান কমিশনের তদন্ত করা দরকার।

রাজনৈতিক আগ্রহ

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও কংগ্রেসী দলের নেতা। তাঁহাকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিতে পারিলে প্রতিপক্ষ

দলের, বিশেষ করিয়া সম্মিলিত পঞ্চবামপন্থীদলের, বিশেষ লাভ হইবে; এজন্ত তাঁহারা চেষ্টার ক্রটি করেন নাই—এমনকি মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগীর ও উত্থানি অবধি দিয়াছিলেন। অপর পক্ষে কংগ্রেস ও বিধানচন্দ্র দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়াছেন, নাখোদা মসজিদের ইমামদের 'দোওয়া' লইয়াছেন। বিধানচন্দ্র যে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন তাহা হইল কলিকাতার মধ্যস্থিত বহুবাজার-কেন্দ্র। ভোটারদের সংখ্যা ৬৩,২২৯ জন—ইহার মধ্যে ২৪ হাজার মুসলমান, হিন্দু ৩৫ হাজার, চীনা ভোটার ১ হাজার—ইহা ছাড়া পার্শী, শিখ ও জৈন ইত্যাদি আছেন। এই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে ৩ জন প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন। কে কত ভোট পাইয়াছিলেন নিম্নে দেওয়া হইল :

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	—১৫,৫৫০
মহম্মদ ইসমাইল	—১৫,০১০
মহেন্দ্রকুমার ঘোষ	— ৫০০
বাতিল	— ৩৮
	৩১,০৯৮
টেণ্ডার-ভোট	১০২

প্রকৃত ভোটার ভোট দিতে আসিয়া যদি দেখেন তাঁহার পক্ষে অপর একজন ভোট দিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি টেণ্ডার-ভোট দেন। এই ভোট ভোটগণনার সময় ধরা হয় না। পরে নির্ব্বাচনী-মামলা হইলে এই ভোট সম্বন্ধে রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। দেখা যায় জাল-জুয়াচুরিসমেত শতকরা ৪৯'২ জন ভোট দিয়াছিলেন। বাকী শতকরা ৫০'৮ জন ভোট দিতে আসেন নাই। কারণ কি? প্রধান কারণ—সাধারণ ভোটারদের মধ্যে রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব। আরও কতকগুলি ছোট ছোট কারণ আছে, যেমন মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার তালিকায় থাকা, এক নাম দুই বার থাকা, ভুয়া ভোটারদের নাম থাকা—যাহার সংখ্যা শতকরা ৭'৮ জন হইবে, ভোটের সময় ভোটগ্রহণকেন্দ্র হইতে বহু দূরে থাকা, শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি। এই সব ছোট ছোট কারণ বাদ দিলেও দেখা যায় ভোটারদের না আসার প্রধান কারণ রাজনৈতিক আগ্রহের অভাব।

১৯৫২ সনের সাধারণ নির্ব্বাচনে একটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে বিনা বাধায় একজন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এবারেও ১ জন প্রার্থী বিনা বাধায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যে যে নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ২টি করিয়া আসন সেখানে প্রত্যেক ভোটারদের ২টি করিয়া ভোট। এইরূপ বহু কেন্দ্র আছে। সেজন্ত ভোটের সংখ্যা হইতে কয় জন ভোটার ভোট দিতে আসিয়াছিল তাহা বলা যায় না। গত বারে যে যে কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল সেই সেই কেন্দ্রের মোট যত ভোট তাহার মধ্যে যে সংখ্যক ভোট বিভিন্ন প্রার্থীরা পাইয়াছিলেন তাহার হিসাব করিয়া ইলেকশান কমিশন দেখাইয়াছেন—পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৪২টি ভোট দেওয়া হইয়াছিল।

এইবারে ভোটারের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২০'৮ জন করিয়া। আর প্রদত্ত ভোটের সংখ্যা বাড়িয়াছে শতকরা ২৩'৯টি হিসাবে। সুতরাং ভোটদানের আগ্রহ মোটামুটি হিসাবে বাড়িয়াছে ২৩'৯—২০'৮=৩'১। পূর্ব্বের শতকরা ৪২-এ এই সংখ্যা যোগ করিয়া আমরা পাই শতকরা ৪৫। ভোটারদের ভোট দিবার আগ্রহ বাড়িলেও খুব কম হারে বাড়িয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকায় সাধারণতঃ শতকরা ৮০ জন ভোট দেয়। আগামী বারে যদি ডবল নির্ব্বাচন-কেন্দ্র উঠিয়া যায় তাহা হইলে ভোটদানের পরিমাণ আরও বাড়িবে বলিয়া আশা করা যায়।

দাগ

শ্রীদীপক চৌধুরী

তপার বিবৃতি

এক

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষের কথা মনে পড়ল প্রথম। কি করে যে সে এত কাছে এসে পড়ল ভেবে আশ্চর্য হলাম খুবই। পুরুষমানুষকে কাছে আসতে দেব না বলেই ত আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চেয়েছিলাম। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে টাকাগুলো আমি মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলাম সারাদিন। রাত্রে বিছানায় গিয়ে যখন এলিয়ে পড়লাম তখন একশ' টাকার বড় নোট দুখানা আমার সঙ্গেই ছিল। সে রাত্রির রোমাঞ্চ আমার নারীজীবনের একমাত্র কুশল-সংবাদ।

আমার দু'পাশে নোট দুখানা পড়েছিল। ঘরে আলো জেলে রেখেছিলাম। সারারাত তেল পুড়ল। ওদের ভাল করে দেখবার জন্যে পলতের মুখে আগুন রেখেছিলাম প্রচুর। ভোর না হওয়া পর্যন্ত আগুনের তেজ সেদিন কমে নি।

শুধু একটা রাত্রির মধ্যে তাদের দেখবার সাধ আমার ফুরিয়ে যায় নি। দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রে মনে হয়েছিল, দুটো নোট জোড়া লেগে এক হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে তার হাত-পা গজাল। চোখও ফুটল শ' টাকার নোটের। তৃতীয় রাত্রির সুরুতে বোধ হয় সেই কাগজখানাই পুরুষমানুষ হ'ল।

দেখতে বেশ লম্বাচওড়া। লাল টুকটুকে ঠোঁটের ভাঁজে মৃদু মৃদু হাসি। আমি দেখলাম, লোভের ঢেউ লেগে লেগে হাসির রেখাটি ভাঙছে। তার পর পলতেটার পরমায়ু গেল ফুরিয়ে। ঘরময় অন্ধকারের নেশা। আমার দেহের সৈকতে পূর্বরাগের পুলক।

আর বেশীদূর ওকে এগোতে দিই নি। ঘটনাটা পাঁচ বছরের পুরনো, তবু আমার মনে আছে ওকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম মেঝের ওপর। পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়ে-ছিলাম শ' টাকার নোট। সেই রাত্রির ইতিহাসে আজও বোধ হয় আমার হিংস্রতার দাগ লেগে আছে। আমার নব-লব্ধ স্বাধীনতার প্রমাণ আমি রেখে এসেছি।

দু'শ' টাকা আমার প্রথম উপার্জ্জন। আমার একলার। আমার মুঠোর মধ্যে শ'টাকার নোট দুখানা মাথা গুজে পড়েছিল বাহাত্তর ঘণ্টার ওপর। ওদের আর্তনাদের ভাষা আমি অনুভব করেছি বটে, কিন্তু মুক্তি তাদের দিই নি। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে আমি বুঝেছিলাম, সমাজের মুঠো এবার আলগা হয়েছে। আমার জীবনের ত্রিশটা বছর তারই মুঠোয় আবদ্ধ হয়ে ছিল।

চতুর্থ দিন সকালবেলা মাসীমাকে বলেছিলাম, "এই নাও টাকা। এবার থেকে আমরা তোমার সত্যিকারের পেইং-গেষ্ট হলাম।"

"কাল বুঝি মাইনে পেয়েছিস?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

বললাম, "কাল নয়, মাইনে পেয়েছি পয়লা তারিখে।"

"তবে যে পয়লা তারিখে আমি টাকা চাইলাম, তুই বললি —না বাপু তোদের ব্যাপার কিছু বুঝি না। দিগম্বর মুদী কাল আমায় জানিয়ে গেছে বাকিতে আর এক পয়সার নুনও দিতে পারবে না। তপা, তোরা কি মাসীমার দুঃখ কোন দিনই দেখতে পাবি নে? এবার বোধ হয় হোটেলের দরজা বন্ধ করতে হবে। পরের ঝক্কি বয়ে বেড়াবার বয়স আর নেই।"

নোট দুখানা মাসীমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছিলাম, "পরের ঝক্কি বইবে না ত কি করবে তুমি? তোমার নিজের ঝক্কি ত কিছু নেই। মাসীমা, তোমার হোটেলের দরজা খোলা রেখেছেন পঞ্চানন ঠাকুর। চেষ্টা করলেও তুমি বন্ধ করতে পারবে না।"

"না বাপু, তোদের কথা আমি বুঝি না। পয়লা তারিখে টাকা ক'টা দিয়ে দিলে দিগম্বর কাল আমায় এমন করে কথা শোনাতে পারত না।"

মনের কথা সেদিন মাসীমার কাছে চেপে গিয়েছিলাম। পয়লা তারিখে কেন টাকা দিই নি তার কারণটা তাঁকে বলি নি। দিগম্বরের অপমান তাঁকে বিঁধেছিল। পরে একদিন বলেছিলাম, "মাসীমা, প্রথম মাসের মাইনে যেদিন পেলাম সেদিন আমার কি মনে হয়েছিল জান?"

"তুই বল, আমি শুনি।"

"আমার সারা জীবনের দাসত্ব সব ঘুচে গেল।"

"বলিস কি তপা? এই ত সেদিন দস্যু ইংরেজরা দেড় শ' বছরের দাসত্ব সব ঘুচিয়ে দিয়ে ভারতবর্ষের বন্দর থেকে বিদায় নিয়ে গেল—ওরে ওরা যে গেল তাও ত কম দিন হয় নি—" মনে মনে হিসেব করে মাসীমাই আবার বললেন, "হ্যাঁ, পাঁচ বছর হয়ে গেছে। অথচ তুই বলছিস তোর দাসত্ব ঘুচল এ মাসের পয়লা তারিখে।"

"মাসীমা, তুমি ছাড়া আমার মনের কথা কেউ বুঝবে না। ইংরেজদের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কম। কিন্তু তুমি নিজেই

ত দেখেছ, সমাজ আমায় মুক্তি দেয় নি। স্বদেশের চেনা লোকগুলোই ত আমার পায়ে শেকল পরিয়েছিল। এবার আমি স্বাধীন। টাকার স্বাধীনতা যার নেই সে ত সর্বহারা। মাসীমা, পয়লা তারিখে তোমায় টাকা দিই নি তার কারণ, আমি পরীক্ষা করে বুঝতে চেয়েছিলাম যে, সত্যিই আমি স্বাধীন কিনা। কোন তারিখে টাকা দেব তা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না? করে, নিশ্চয়ই করে। ইচ্ছে না থাকলে তোমায় আমি চার তারিখের সকালবেলায়ও টাকা দিতাম না।"

"দিগম্বর যে আমায় অপমান করল?"

"আমার মুক্তির দিনটিতে দিগম্বরের কথা মনে পড়ে নি।"

আমার কথা শুনে মাসীমা সেদিন কি ভেবেছিলেন জানি না। জানবার চেষ্টাও করি নি।

মহীতোষ আজ আসবে। ছ'মাস আগে সে আমায় ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকার-কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি নি। সেই জন্যেই আমি তাকে দ্বিতীয় বার আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সে এসেছিল। আমার সঙ্গে দেখা হয় নি। একতলায় নেমে আসবার মত শক্তি আমার ছিল না। বুকের ডান দিকটাতে আঘাত লেগেছিল খুব। মাসীমা দেখেছিলেন, আধ ইঞ্চির মত গর্ত হয়েছিল দুটো পাঁজরার মাঝখানে। মাসীমার বিশ্বাস, জুতোর তলায় লোহার নাল বাঁধা না থাকলে ক্ষতের গভীরতা আধ ইঞ্চির চেয়ে কমই হ'ত।"

আমি আরোগ্য হয়ে উঠেছি। পনর দিনের বেশী ছুটি আমায় নিতে হয় নি। মহীতোষের কাছে শুনেছি, লাহিড়ী সাহেব আমার খোঁজ নেন নি। মাদ্রাজী স্টেনোর কাজ তিনি পছন্দ করেন। পছন্দ যে করেন তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। পনর দিন পরে কাজে যোগ দেওয়ার সময় ছোট সাহেবের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন তিনি ফাইলের দিকে চেয়ে বলেছিলেন, "আরও দু'এক মাসের ছুটি নিলেই ত পারতেন। বড্ড শুকিয়ে গেছেন।"

তিনি বোধ হয় সেই মুহূর্তে সুয়েজখালের কথা ভাবছিলেন। খালটায় প্রচুর জল থাকা সত্ত্বেও একটা জাহাজও ভারতবর্ষের বন্দরে এসে পৌঁছতে পারছে না। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতেই লাভের অঙ্ক শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি জানি, তিনি আমায় দেখেন নি। আগের চেয়ে শরীর আমার খারাপ হয় নি। আমি এত বেশী রোগা যে শুকিয়ে যাওয়ার মত আধ ইঞ্চি মাংসও আমার উদ্বৃত্ত নেই। আমি তাঁকে বলেছিলাম, "আমি ভাল হয়ে উঠেছি। ছুটি নেওয়ার দরকার নেই স্যার।"

"তা হলে নোট নিন।" এই বলে ছোট সাহেব ফাইল নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ব্যস্ততার মাঝখানে হঠাৎ তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বেশী দিনের ছুটি চেয়ে আপনি কি বড়বাবুর কাছে লোক পাঠান নি?"

"না স্যার।"

"তা হলে—আচ্ছা নোট নিন। হ্যাঁ দেখুন, আজ যেন পাঁচটার সময় চলে যাবেন না, পাঁচটার পরেও কাজ করতে হবে। খুব প্রেসার আছে আজ। চিঠিপত্র অনেক জমে রয়েছে। গত পনর দিনে কোন কাজই হয় নি। সুন্দরম্ বলে যে মাদ্রাজী ছেলেটি আছে তার স্পীড বড় কম।"

বললাম, "ছেলেমানুষ, আস্তে আস্তে স্পীড তার বাড়বে।"

তার পর ছ'মাস কেটে গেছে। মহীতোষ এর মধ্যে সরকার-কুঠিতে এসেছে বারদশেক। কিন্তু কয়েক দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। পাঁচটার মধ্যে তাকে গড়িয়ায় পৌঁছবার সময় দিয়ে আমি গড়িয়া থেকে বেরিয়ে এসেছি তিনটের আগে। রবিবারের ছুটির দিনগুলো আমি সরকার-কুঠিতে বসে নষ্ট করতে চাই নি। একদিন মাসীমা আমায় বলেছিলেন, "তপা, মহীতোষ সেই রাত আটটা পর্যন্ত বসে বসে চলে গেল। এ কি রকম ব্যবহার?"

"কেন? কি করলাম?"

"তুই তাকে পাঁচটার সময় আসতে বলেছিলি না?"

"বলেছিলাম। তোমরা কি তার সঙ্গে কথা কও নি?"

"মহীতোষ আমাদের সঙ্গে কথা কইতে আসে না। তুই ত খুকী নোস—তোকে কি আমায় নতুন করে বর্ণপরিচয় শেখাতে হবে? তা ছাড়া এই নিয়ে তুই বোধ হয় চার দিন ওর সঙ্গে ইয়ারকি মারলি।"

"ইয়ারকি?"

"তা নয় ত কি? ওকে পাঁচটার সময় আসবার জন্যে বলে এলি আর তুই রাত ন'টা পর্যন্ত বাড়ী নেই। হ্যাঁ রে, ব্যাপারটা কি?"

ভেবে চিন্তে মাসীমাকে জবাব দিয়েছিলাম, "পরীক্ষা করে দেখলাম, আমার স্বাধীনতা আজও অটুট আছে কিনা। শুধু কথা দেওয়ার অধিকার থাকলে চলবে কেন? কথা ভাঙার অধিকারও আমার থাকা চাই। মাসীমা, পরাধীনতার ফাঁস অনেক সময় চোখে দেখে চেনা যায় না, হাত দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে হয়।"

"বলিস কি তপা! ওই মহীতোষই না তোকে ময়দান থেকে তুলে নিয়ে এসেছিল?"

"আবার ওই মহীতোষরাই একদিন পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিতে পারে।"

"না বাপু তোর কথা আমি বুঝতে পারি না। ওরে ও জলা, বল্ ত কি চাস্ তুই ?"

"আগুন। শতাব্দীর গায়ে গলিত মাংসের কুচিগুলো বাদুড়ের মত ঝুলছে। আগুনের গোলা মেরে মেরে ওদের পুড়িয়ে দিতে চাই। এ আগুন কেউ নেভাতে পারবে না। শড়িয়ার খালে জল নেই। মাসীমা, কাল যখন আমি ফিরলাম তখন বেশ রাত হয়েছে। খালের দিক থেকে কি রকম একটা আওয়াজ আসছিল। আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম তোমার গোয়ালের পেছন দিকটাতে। তুমি বল, ওই জায়গায় জলের গভীরতা সবচেয়ে বেশী। দেখবার জন্যে মুখ নিচু করলাম আমি। হঠাৎ আমার মাথার ওপর দিয়ে হাওয়া বইতে লাগল, গরম হাওয়া। হাওয়াতে আওয়াজ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে আমি দেখলাম, জল সব শুকিয়ে গেল। খালের বুকটা আমার চেয়েও শুকনো হয়ে উঠল। মাসীমা, কাল রাত্রে লালুদার নিশ্বাস আমার গায়ে লেগেছে।"

হাতের পাঞ্জা প্রসারিত করে মাসীমা তাঁর দু'হাত দিয়ে কান দুটো ঢেকে ফেলেছিলেন।

সকালের দিকে ঘুম ভাঙল আজ। রবিবার বলে বিছানায় শুয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওপাশের খুপরিটাতে কোন সাড়াশব্দ নেই, রতন এখনও ঘুমুচ্ছে। গত দু'রাত্রি খুবই কষ্ট পেয়েছে সে।

রতন আগে আমার ঘরেই ঘুমাত, আলাদা বিছানায়। গত এক মাস থেকে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমারই ঘরের সংলগ্ন ছোট্ট একটা বারান্দা ছিল, কঞ্চির বেড়া দিয়ে বারান্দাটাকে ঘিরে দিয়েছেন মাসীমা। খরচ যা লেগেছিল সবই আমি দিয়েছি।

বিছানায় শুয়ে টেবিলের দিকে হাত বাড়ালাম। ঘড়িটা টেনে নিয়ে দেখলাম পৌনে আটটা। এবার উঠতে হয়। মহীতোষকে আসতে বলেছি বারোটার মধ্যে। মহীতোষ আজ মাসীমার হোটেলে খেতে আসবে, কাল তাকে আমি নেমন্তন্ন করে এসেছি। বলরামকে নিয়ে ষষ্ঠীদার বাজারে যাওয়ার কথা আছে। বেশী খরচার জন্যে কাল রাত্রিতেই ষষ্ঠীদাকে কুড়িটা টাকা আমি দিয়ে রেখেছিলাম। বোধ হয় এতক্ষণে সে ফিরে এসেছে।

হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হতে মিনিট পনর লাগল। ছুটির দিনে বিন্দুমাত্র তাড়া ছিল না। তবুও তাড়াতাড়ি করে কাপড়-চোপড় বদলে নিয়েছি। একতলায় নামতে হবে, রান্নার দায়িত্ব শুধু মাসীমার একলার নয়, আমারও। হ্যারিসন রোডের হোটেলে যা রান্না হয় তার স্বাদ নাকি গত পাঁচ বছরের মধ্যে একটুও বদলায় নি। মহীতোষ আজ নতুন স্বাদের অন্বেষণে সরকার-কুঠিতে আসছে।

সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল ষষ্ঠীদার সঙ্গে। বলরামের মাথায় মস্ত বড় ঝুড়ি। পোনা মাছের ল্যাজটা ঝুড়ির ওপর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। ষষ্ঠীদা সেই দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, হাসিতে তার জয়ের বিজ্ঞাপন। বাজারের সবচেয়ে বড় পোনা মাছটা আজ তার সামর্থ্যের ঝুড়িতে লম্বা হয়ে শুয়ে রয়েছে।

আমাকে দেখে বলরামও দাঁড়িয়ে রইল। চৌদ্দ বছর বয়সের বলরামের মাথায় কুড়ি টাকার বাজার। আনন্দে আর গর্বে বলরাম তার বুকের ছাতি চওড়া করবার চেষ্টা করছিল। খালি গা, শার্ট দুটো আজকাল ষষ্ঠীদার বাক্সেই থাকে। আমি দেখলাম, কুড়ি টাকার সওদা থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে জল পড়েছে বলরামের বুকে। হঠাৎ মনে হয়, সারাটা পথ সে কাঁদতে কাঁদতে আসছে, হয় ত কেঁদেছে, কিন্তু এ কান্না আনন্দের।

ষষ্ঠীদা বলরামকে ইশারা করল। তার পর দুজনে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। সিঁড়ির মুখে আমিই শুধু দাঁড়িয়ে রইলাম একা।

দাঁড়িয়ে থাকতেই আমি চেয়েছিলাম। পেছন থেকে ষষ্ঠীদাকে দেখছিলাম আমি। লোকটির মধ্যে কি অদ্ভুত পরিবর্তন এসেছে!

মাসীমার হোটেলে আমার চেয়েও ষষ্ঠীদা পুরনো বাসিন্দা। ষষ্ঠীদাকে কেউ কখনও কথা বলতে শোনে নি। হ্যাঁ এবং না দুটি শব্দ দিয়েই সে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কথার সম্পর্ক বজায় রেখেছে। মেসোমশাই বলেন, গত দশ বছরের মধ্যে ষষ্ঠীদা নাকি দশটার বেশী কথা বলে নি। এমন একটি অবাঙালী চরিত্রের দিকে চেয়ে মাসীমা বলেন—ষষ্ঠীর মনে বিদ্বেষ আছে। হয় ত এ বিদ্বেষ ওর সংসারের প্রতি, কিন্তু এমন নিঃশব্দে ত কাউকে কখনও বিদ্বেষ পোষণ করতে দেখি নি। তপা, এই ধরনের বিদ্বেষ বড় সাংঘাতিক—এর চেয়ে মারাত্মক রকমের বিষ সাপের মুখে ত দূরের কথা, বৈজ্ঞানিক-দের বইয়ে পর্যন্ত নেই।

মাসীমার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অবিশ্বাসই বা করি কি করে ?

এক তলার চানঘরের পাশে ষষ্ঠীদা থাকে। ঘরখানা খুবই ছোট, চানঘরের ভেজা আবহাওয়া সারা দিনে শুকোয় না বলে তার নিজের ঘরখানা আর্দ্রতার আক্রমণ থেকে মুক্তি পায় না। মেসোমশায়ের কাছে শুনেছি, ষষ্ঠীদা যখন প্রথম এল তখন সে দোতলার বড় ঘরখানাতেই ছিল। মাসের প্রথম তারিখে টাকাপয়সা সে চুকিয়েও দিত। তার পর

বছর তিন পরে তাকে নিচে নেমে আসতে হয়। হয় ত সরকারকুঠির পলস্তারার মত তার আয়ের পলস্তারাও খসে পড়েছিল। অল্প ভাড়ার সবচেয়ে খারাপ ঘরে এসে তাকে একদিন আশ্রয় নিতে হ'ল। ষষ্ঠীদার অতীত ইতিহাস হয় ত মাসীমাই শুধু জানেন।

বিজয়বাবু নাকি মাঝে মাঝে মাঝরাত্রিতে দেখেন যে, লণ্ঠন জ্বালিয়ে ষষ্ঠীদা বুকের তলায় বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে লেখাপড়া করে। বিজয়বাবু উঁকি দিয়ে দেখেছেন, ষষ্ঠীদার হাতে কলম, ফাউণ্টেন পেন। সামনে তার একটা বাঁধানো খাতা। বিজয়বাবুর খবর শুনে মাসীমা সেদিন হেসে হেসে খুন! তিনি আমাদের ডেকে বলতে লাগলেন, "বিজয় মাষ্টারের কথা শোন্—ষষ্ঠীর হাতে নাকি ও ফাউণ্টেন পেন দেখেছে।"

আমি বলেছিলাম, "বিজয়বাবু হয়ত ঠিকই দেখেছেন। কেন, ষষ্ঠীদা কি ফাউণ্টেন পেন কিনতে পারে না?"

"পারবে না কেন? ষষ্ঠীর যদি একটা ফাউণ্টেন পেন থাকে, আমি নিশ্চয়ই দেখতাম। ষষ্ঠীর যা ঐশ্বর্য তার কোন কিছুই গোপন নেই। তা ছাড়া, কলম দিয়ে ও কি লিখবে? বিজয় বোধ হয় হাতে ওর তুলি দেখেছে। ষষ্ঠী আজকাল প্রধান নায়িকাদের ছাড়া অন্য কারও মুখে রং মাখায় না। চিত্রতারকাদের বাড়ী যায় ষষ্ঠী। ও হচ্ছে গিয়ে আজকাল ও লাইনের শিল্পীসম্রাট। বলি ও বিজয়, তোমার কি ইস্কুলে যাওয়ার সময় হয় নি? পুরো মাইনে নিচ্ছ, লেট হলে চলবে কেন? ষষ্ঠীকে নিয়ে অমন ঠাট্টা করো না বাছা। লেখাপড়ার লাইন হচ্ছে গিয়ে তোমাদের—হ্যাঁ রে তপা, তোরও কি আজ আপিস নেই? লেট হলে ছোটসাহেব রাগ করবেন না?"

মাসীমা জানতেন, সেদিন আমাদের আপিস বন্ধ ছিল। তবুও তিনি আমায় আপিসে যাওয়ার জন্যে তাগাদা দিতে লাগলেন বার বার। আমি বুঝতে পারলাম, ষষ্ঠীদার গোপন খবর নিয়ে তিনি আর আলোচনা করতে চান না। হয়ত তিনি মনে মনে ব্যথা পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতেন যে ষষ্ঠীদার কোন ঐশ্বর্যই তাঁর চোখে গোপন নেই। কিংবা ফাউণ্টেন পেনের গোপন ঐশ্বর্য তিনি একাই জানতে চান বলে মাসীমা আমাদের সামনে হেসে হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

রান্নাঘরে এসে দেখি বলরাম মাথা থেকে ঝুড়িটা তার নামিয়ে ফেলেছে। ষষ্ঠীদা লিস্ট দেখে দেখে জিনিষগুলো সব মিলিয়ে মেঝের উপর রাখছে। মাসীমা বসে ছিলেন সামনেই।

সরকার-কুঠিতে দু'জন রাঁধুনি বামুন রয়েছে, কিন্তু শম্ভু ঠাকুর একলাই রাঁধে। মাসীমাকে অবশ্য সারা সকালই রান্নাঘরে থাকতে হয়। তিনি বলেন, "ভাড়া করা লোক দিয়ে সংসারের সব কাজ চলে না। বিশেষ করে খাবার জিনিস মেয়েদের হাতেই থাকা উচিত।"

আমাকে দেখতে পেয়ে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই এখানে কি করতে এলি?"

বললাম, "তোমাকে খানিকটা সাহায্য করতে চাই।"

"সাহায্য? ও, বুঝতে পেরেছি—বলরাম, মাছটা তোল ত ঝুড়ি থেকে।" মাসীমা মুখ নিচু করে হাসতে লাগলেন।

আমি জানি, মাসীমা আমায় ভুল বুঝলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "হাসছ যে?"

"না বাপু, দু'একটা রান্না তুই নিজে হাতে আজ রাঁধ্। হ্যাঁ রে, মহীতোষ ত বাঙাল, খুব ঝাল খায় বুঝি?"

ঝুড়ি থেকে মাছটা টেনে তুলতে গিয়ে বলরাম দেখি চেয়ে রয়েছে মাসীমার দিকে। হাত থেকে ওর পোনা-মাছটা পড়ে গেল মেঝের উপর। রান্নাঘর থেকে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছিস বলরাম? দাঁড়া, মাছটা যে তোকেই কেটে দিতে হবে।"

"পারব না?"

"কেন? এত বড় মাছ মাসীমা ত কাটতে পারবেন না।"

"আমিও পারব না—"

"কেন কি হ'ল?"

"তোমরা আমাদের বাঙাল বল কেন?"

বলরামের কথা শুনে মাসীমা উঠে এসে ওকে জড়িয়ে ধরলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আয় বাছা, আয়—পেটে ভাত নেই, কিন্তু মেজাজ আছে ষোল আনা। বলরাম, তুই যদি মাছটা কেটে না দিস, তা হলে আমরা সবাই আজ উপোস করে থাকব!"

বলরাম ফিরে এল। আমি এবার বললাম, "ষষ্ঠীদা যে তোকে দিনরাত রিফিউজীর বাচ্চা বলে গাল দেয় তখন ত তোর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে না—"

বঁটির মুখে পোনামাছের ঘাড়টা ঠেকিয়ে দিয়ে বলরাম বলল, "ষষ্ঠীদা আমায় গাল দেয় না, ভালবাসে।"

পোনামাছ তখন দু'টুকরো হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। মাসীমা মুখ টিপে হাসতে হাসতে বললেন, "ভালবাসে? তোকে কেন ভালবাসতে যাবে রে মুখপোড়া? ষষ্ঠী কি তার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে?"

"ষষ্ঠীদা নিজেই ত বিয়ে করে নি।" এই বলে বলরাম

উঠে পড়ল। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সে বলল, "আমি আসছি, টাইগারের থালাটা নিয়ে আসি। রক্তটুকু ধরে রাখব।"

তাজা মাছ, ঘাড় থেকে অনেকটা রক্ত পড়েছে। মেসোমশাই একটা কুকুর পোষেন। তার নাম হচ্ছে টাইগার। এতদিন কুকুরটার স্বাস্থ্যআত্তি কিছু হয় নি। বলরাম আসবার পর থেকে টাইগারের গায়ে জোর বেড়েছে। রাত্রি জেগে পাহারা দেয় সে। নতুন লোক দেখলে দিনের বেলায়ও চেঁচায়।

বলরাম বেরিয়ে যাওয়ার পরে মাসীমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, তিনি মাছটার ঘাড়ের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন, তাজা রক্ত ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে উঠেছে। আমি বুঝতে পারলাম, বিয়াল্লিশের সেই পুরনো দৃশ্যটা মাসীমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

বলরাম ফিরে আসবার আগে ষষ্ঠীদা বলল, কুড়ি টাকায় কুলোয় নি তপাদি, তিনটে টাকা তোমার বেশী খরচ হয়েছে। আমি এবার চলি আজও আমায় ডিউটিতে যেতে হবে।"

"কখন ফিরবে?"

"তিনটের মধ্যে! তোমরা খেয়ে নিও—"

"তা কি করে হয় ষষ্ঠীদা?"

এই সময় বলরাম ফিরে এসে ঘোষণা করল, "মাসীমা নতুন লোক এসেছে।"

"ক'জন?" জিজ্ঞাসা করলেন মাসীমা।

"একজন?"

"দাঁড়া, আমি যাচ্ছি। তপা, বলরামকে দিয়ে মাছটা কাটিয়ে নিস—"

মাসীমার পিছু পিছু ষষ্ঠীদাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

টাইগার নতুন মানুষ দেখেছে। রান্নাঘরে বসে আমি ওর গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। বড্ড বেশী ঘেউ ঘেউ করছে। মাছ কাটতে কাটতে বলরাম বলল, "দুটো রদ্দা খেলেই মুখ ওর বন্ধ হয়ে যাবে।"

"দুটোতে বোধ হয় বন্ধ হবে না, এত বেশী রক্ত খাওয়াচ্ছিস ওকে—"

"দেখবে? যাই—" বলরাম উঠে পড়ছিল, আমি বললাম, "না, থাক, বেলা বাড়ছে, তাড়াতাড়ি রান্না চাপাতে হবে। মশলাবাটাও হয় নি—"

"সব আমি ঠিক করে দেব। আচ্ছা তপাদি, মহীতোষবাবু তোমাদের আপিসে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমায় একটা কাজ দাও না তোমাদের আপিসে? মাইনে বেশী দিতে হবে না।"

"কম মাইনের কাজ ত আমাদের আপিসে নেই।"

আমার কথা শুনে বলরাম গম্ভীর হয়ে গেল। অন্যমনস্ক ভাবে টুকরোগুলো গুনতে লাগল সে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা দিয়ে কি করবি?"

"মাসীমাকে দেব। একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। আমায় তুমি বুঝিয়ে দেবে তপাদি?"

"দেব। কি কথা রে?"

শম্ভু ঠাকুরের দিকে মাছের থালাটা এগিয়ে দিয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "দু'মুঠো ভাতের জন্যে মানুষকে সারাদিন কাজ করতে হয় কেন? কাজ করলেই খেতে পাব, আর কাজ না করলে উপোস করব এমন নিয়ম কে তৈরি করেছে তপাদি?"

সহসা জবাব দিতে পারলাম না। জবাব দিলামও না। আমি শুধু জিজ্ঞাসা করলাম ওকে, "কাজ করতে তোর ভাল লাগে না?"

"না।"

"তবে কি করতে চাস তুই?"

"বাঁশী বাজাতে চাই।"

"কৈ, আমরা ত কেউ তোর বাঁশী শুনি নি?"

"টাইগার শুনেছে। আর—আর ষষ্ঠীদাও শুনেছে। গেল রবিবার আমরা তিন জনাতে মিলে হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। এখান থেকে প্রায় তিন ক্রোশ দক্ষিণে। ষষ্ঠীদা হাঁফিয়ে পড়ল, একটা পুকুরের পাড়ে এসে বসলাম আমরা। ষষ্ঠীদা বলল, পুকুরটার নাম হচ্ছে মান্নাদের গড়া। পাঁচ-দশ মিনিট জিরিয়ে নিলাম আমি, তার পর বাঁশী বাজাতে লাগলাম। প্রায় এক ঘণ্টা একটানা বাজালাম। ষষ্ঠীদা বলল, 'টাইগার ঘুমিয়ে পড়েছে। এ বাজনা কলকাতার মত ছোট ছোট ষ্টুডিওতে দাম পাবে না। বলরাম, এ হচ্ছে কুচো চিংড়ির দেশ। তোকে বোম্বাই যেতে হবে, আমি নিয়ে যাব। সেখানকার ফিল্ম কোম্পানীতে আমার কাজের অভাব হবে না। এখন বাড়ী চল, অনেক বেলা হয়ে গেল।' তপাদি, আমি বাঁশী বাজাই, দাম দিয়ে কি করব? কিন্তু ষষ্ঠীদা বলে, দাম না দিলে টাইগারকে আধখানা গৎও শোনাতে পারবি নে। কলকাতা হচ্ছে গিয়ে নগদ কারবারের জায়গা। ভাবছি, আমি আবার বাঘা যতীন কলোনীতেই ফিরে যাব।"

টাইগারের গলার আওয়াজ আবার শুনতে পেলাম। বলরাম বলল, "নতুন লোক দেখেছে, বাবুটি সাহেবের মত দেখতে। আমাদের এখানে মানাবে না।"

"মহীতোষবাবুকে মানাবে?"

"হ্যাঁ—মাসীমার হোটেলের যুগ্যি লোক তিনি। কবে তিনি এখানে থাকতে আসবেন তপাদি?"

ইতিমধ্যে টাইগার দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিল, বলরামকে ডাকতে এসেছে সে। একেবারে সম্পূর্ণ নতুন লোক না হলে টাইগার এতটা বিচলিত হয়ে পড়ত না। বলরামকে বললাম, "যা ত একবার দেখে আয় কে এল।"

একটু বাদে মাসীমা নিজেই এসে ঢুকলেন রান্নাঘরে। একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন তিনি। মুখ দেখে কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। বোধ হয় পয়লা তারিখে আগাম টাকা দেওয়ার মত লোক নয়। মাসীমার হোটেলে যারা আসে তারা সব বাকীতে খাওয়ার খদ্দের।

পিঁড়িটা টেনে নিয়ে মাসীমা বসলেন। একটু জিরিয়ে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, "আজ ত সরকার-কুঠি একেবারে ভাঙা। দেখাবার মত কিছু নেই এখানে। তবুও সাহেবটি সব দেখতে চাইলেন, বাগানটা দেখলেন ঘুরে ঘুরে। আম আর কাঁঠালগাছগুলো মরে যাচ্ছে দেখে দুঃখপ্রকাশ করলেন তিনি। পেছন দিকটাতেও নিয়ে গেলাম, গড়িয়াখালে জল নেই, তাও দেখলেন তিনি।"

"এত বেশী দেখালে কেন, পয়লা তারিখে টাকা দেবেন ত?"

"তা তুই যাই বলিস না কেন, আমাদের চণ্ডীর গণনায় ভুল থাকে না। ও বলে, সময় হলে সৌভাগ্য নিজে থেকে মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। তপা, সাহেবটি দোতলার ঘরগুলোও সব দেখলেন। বাইরে থেকে তোর ঘরটাও আমি দেখালাম। দিনদুপুরে দরজায় তালা লাগিয়ে এসেছিস কেন?" প্রশ্ন করে মাসীমাই তাঁর নিজের জবাব তৈরি করলেন, "সৌভাগ্য যখন আসে তখন সে তালা ভেঙেই ঘরে ঢুকে পড়ে। ওরে ও তপা, কাপড়টা বদলে আয়। মুখে একটু পাউডার মাখিস মা। না, না, নতুন করে কনে সাজতে তোকে বলছি না রে মুখপুড়ী! তোর দিকে যে কেউ একবার মুখ তুলে চায় না—অমন করছিস কেন? মুখ তুলে কেউ চেয়ে দেখলেই গায়ে ফোস্কা পড়ে নাকি? এবার যা, ছোটসাহেব তোকে ডাকছেন।"

"কে?"

"লাহিড়ী সাহেব। গাড়ি নিয়ে একাই বেড়াতে বেরিয়েছিলেন ভোরবেলা। উত্তরভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন—সাহেবটি বড় ভালমানুষ রে তপা! চা পাঠাচ্ছি হাঁা রে, মাসীমার হোটেলে আজ তাঁকে খেতে বল্ না। এখানে উদ্বৃত্ত কিছু নেই বটে, কিন্তু অভাবও ত কিছু দেখতে পাচ্ছি নে।"

উনুনে কেটলী চাপালেন মাসীমা।

১৬২ ক্রমশঃ

পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী

শ্রীপ্রেমকুমার চক্রবর্ত্তী

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বহু বিদেশী পর্য্যটকের আগমন হইয়াছে। তাঁহারা অনেকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন। কেহ রাজদূত হিসাবে, কেহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে, কেহ ধর্ম্মপিপাসু তীর্থযাত্রী রূপে, অথবা জ্ঞান ও পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত এবং নিছক দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যেও যে আসেন নাই এমন নহে। এই পর্য্যটকগণের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনী ও লিপি ভারতবর্ষের তদানীন্তন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিয়াছে। এই সকল পর্য্যটকের অনেকে ইটালী দেশীয় ছিলেন। মার্কোপোলো, আন্দ্রিয়া কোর্শালী, ফিলিপ্পো সাসেট্টি ও পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী প্রভৃতির নাম তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত ইটালীয় পর্য্যটক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী সম্বন্ধে ও তাঁহার লিখিত পত্রাবলীতে প্রকাশিত ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় বিবরণীর বিষয় এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

সাসেট্টির পরবর্ত্তী পর্য্যটক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল বিখ্যাত রোমনগরীতে কোনও এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কারণে প্রাচীন রোম নগরের নাগরিক বলিয়া তিনি গর্ব্বও অনুভব করিতেন। যোদ্ধা ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের একজন বিশিষ্ট নাগরিক বলিয়া তাঁহার সম্মান ছিল। সঙ্গীতকলাতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। প্রথম যৌবনে উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তৎপরে জীবনের একটি বিশেষ অবস্থায় প্রণয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়া জ্ঞান ও পুণ্য অর্জ্জনের নিমিত্ত তিনি বিদেশ পর্য্যটনে যাত্রা করার সঙ্কল্প করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সুবিখ্যাত চিকিৎসক মেরীও সিপানোর পরামর্শ গ্রহণ করিবার জন্য নেপলস নগরীতে গমন করেন। এই বন্ধু মেরীও সিপানোকে সম্বোধন করিয়াই বিদেশ পর্য্যটনকালে তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী সম্বলিত চুয়ান্নখানি পত্র

লিখিয়াছিলেন। এই পত্রাবলী তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়। ১৬৫৮-১৬৬৩ অব্দে রোম নগরীর জনৈক পুস্তক বিক্রেতা, গিওপিয়েত্রো বেল্লোরী "পরিব্রাজক পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লীর ভ্রমণ-কাহিনী ও পণ্ডিত বন্ধু মেরীও সিপানোকে লিখিত পত্রাবলী" এই শিরোনামায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি তিন খণ্ডে বিভক্ত—(১) তুরস্ক, (২) পারস্য ও (৩) ভারতবর্ষ। এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডেই আমার আলোচনা বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখিব।

দেল্লা ভেল্লী বিদেশযাত্রাকালে আপনাকে তীর্থযাত্রী বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬১৪ অব্দের ৮ই জুন তিনি নেপলস নগরী হইতে সর্ব্বপ্রথম ইটালীয় ভূমি পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টীয় পবিত্রধাম জেরুজালেমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ভ্রমণকালে এই নেপলস নগরীর ও তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু সিপানোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ তাঁহার চিত্তকে সর্ব্বদা অধিকার করিয়াছিল। ১৬১৮ সনের মে মাসে পারস্য হইতে লিখিত পত্রে এই আকর্ষণের কথা বিশেষ ভাবে জানা যায়। তিনি নেপলস নগরীর প্রাচীন সৌধমালা, অধিবাসী, সমুদ্র, আকাশ বাতাস সকলেরই স্বপ্ন দেখিতেছেন। তদুপরি বন্ধু সিপানোর স্মৃতি এক মুহূর্ত্তের জন্যও চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। সিপানোর প্রতি এই আকর্ষণই এই পত্রাবলী রচনার একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান করা যায়।

১৬১৭ সনের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের পত্র হইতে জানা যায়, পারস্য দেশেই তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীদের সংস্পর্শে আসেন। এই পত্রে তিনি লিখিতেছেন যে, বিভিন্ন ভারতীয়গণের ধর্মানুষ্ঠান, রীতিনীতি ও প্রথার বহু পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন। নিষ্ঠাবান ভারতীয়েরা জীবহত্যা করিতেন না। তাঁহারা কীটপতঙ্গ এমনকি ছারপোকা পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া কোনও রূপ আঘাত না হানিয়া মৃত্তিকার উপর ছাড়িয়া দিতেন। ভারতীয়গণ অনেক সময় পিঞ্জরাবদ্ধ পশু-পক্ষী অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়াও মুক্তি দিতেন বলিয়া তিনি লিখিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনার কথা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক অভারতীয় খ্রীষ্টান ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়া বাজার হইতে কতিপয় পক্ষী ক্রয় করে। বিক্রেতা খ্রীষ্টান ক্রেতার নিকট হইতে মূল্য পাওয়া মাত্র পিঞ্জর দ্বার খুলিয়া পাখীগুলিকে উড়াইয়া দেয়। ইহাতে সেই খ্রীষ্টান ক্রেতা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে। তখন বিক্রেতা বুঝিতে পারে যে, তাহার ক্রেতা ভারতীয় নহে এবং অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় বিপদাপন্ন হইয়া পড়ে। উপস্থিত অপরাপর পথচারীর ব্যঙ্গবিদ্রূপে বিক্রেতা তখন মূল্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয়। দেল্লা ভেল্লীর এই পত্র হইতে স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, সেই সময় বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী বাণিজ্যোপলক্ষে পারস্য দেশে বসবাস করিতেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকেই [illegible] ছিলেন। হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃই ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানের বিভিন্নতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এই পত্রে ভারতীয়গণের গো-সেবাও যে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পারস্য দেশেও ভারতীয়গণের গো-শৃঙ্গ অনেক সময় স্বর্ণ ও অলঙ্কারাদি ভূষিত দেখিয়াছেন।

পারস্য দেশ হইতে লিখিত উপরোক্ত পত্রের পাঁচ বৎসর পরে (২২শে মার্চ্চ, ১৬২৩) সুরাট হইতে গো-সেবা ও ভারতবর্ষের পশু-চিকিৎসালয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণসহ একটি পত্র লেখেন। এই সকল পশু-চিকিৎসালয়ে তিনি সকল প্রকার গৃহপালিত পশু-পক্ষী চিকিৎসা ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে, বর্ত্তমানকালের পশু-চিকিৎসালয়সমূহ হইতে উহারা বিশেষ নিকৃষ্ট ছিল না। এই পত্রে তিনি একটি ইন্দুর শাবককে পক্ষীপালকের সাহায্যে দুগ্ধ সেবন করাইতে দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিভিন্ন শ্রেণীর পশু ও পক্ষীর জন্য পৃথক পৃথক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসালয়েরও উল্লেখ তাঁহার পত্রে আছে। গো-সংরক্ষণের ও গো-হত্যা নিবারণের নানাবিধ ব্যবস্থার কথাও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

পিয়েত্রো দেল্লা ভেল্লী ভারতের কেবল মাত্র ধর্ম্মব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহারের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার পত্রে অনেক স্থলে জ্ঞানগর্ভ তথ্য ও জ্ঞানস্পৃহার পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ১৬২২ অব্দের ২৯শে নভেম্বরের পত্রে এবং পূর্ব্বোলিখিত ১৬২৩ অব্দের পত্রেও তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাষা 'সংস্কৃতে'র প্রতি পাশ্চাত্ত্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনিই সম্ভব সর্ব্বপ্রথম পাশ্চাত্ত্য জগৎকে জ্ঞাপন করেন যে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ভারতের 'সংস্কৃত' শাস্ত্র ও সাহিত্যে নিবদ্ধ। তাঁহার বক্তব্য বুঝাইবার চেষ্টায় তিনি লিখিতেছেন যে, ইউরোপে 'লাটিন' ভাষা যেমন প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির বাহক তেমনি 'সংস্কৃত' ভাষা ভারতীয় কৃষ্টির বাহক; ইহাই ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর ভাষা। তাঁহার এই পত্রাবলী প্রকাশিত হইবার পর পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ ক্রমশঃ সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

অপর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, প্রাচীন দেবদেবী, অদ্ভুত আকারের মূর্ত্তি (গণেশ, নরসিংহ প্রভৃতি) এবং পৌরাণিক উপাখ্যান প্রভৃতির বাহ্য রূপই দেখিয়াছি, কিন্তু চক্ষুর অগোচরে তাহার অন্তর্নিহিত কোনও গূঢ় অর্থ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যাও আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ হয়ত বিশেষ উদ্দেশ্যে বহু উচ্চ দর্শন ও নৈতিক শিক্ষা ইহাদের মধ্যে লুকায়িত রাখিয়াছেন। এই সকল কথা নিঃসন্দেহে দেল্লা ভেল্লীর চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করে।

ভারতীয় ধর্ম্ম সাধনা ও সামাজিক রীতিনীতির বহু বর্ণনাও দেল্লা ভেল্লী তাঁহার পত্রাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৬২২ ও ১৬২৩ অব্দে লিখিত পত্রাবলীতে ভারতীয় 'যোগী' ও 'সতীপ্রথা' সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বহু বর্ণনা

আছে। তিনি একস্থানে লিখিতেছেন, "মন্দির দর্শনান্তে বাহিরে আসিতে নগরীর অপর পার্শ্বে প্রবাহিত সবরমতী নদী দৃষ্টিগোচর হইল। নদীর তীরে প্রখর রৌদ্রে বহু যোগী উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিতে পাইলাম। যোগিগণের উলঙ্গ দেহ শ্মশানভস্মে আচ্ছাদিত এবং বদন ও মস্তক দীর্ঘ শ্মশ্রু ও জটামণ্ডিত। এই যোগীরা অতি কঠোর জীবন ধারণ করেন। তাঁহারা গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করিয়া সকল প্রকার পার্থিব সম্পদ পরিহার করেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতির ন্যায় বংশপরম্পরায় যোগী হন না। তাঁহারা এই জীবন ব্যক্তিগত ভাবে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা ভিক্ষান্নে জীবন অতিবাহিত করেন ও পথে প্রান্তরে বনে জঙ্গলে, মন্দির অলিন্দে বাস করেন। তাঁহাদের দৈহিক কৃচ্ছ সাধনার ক্ষমতা অসাধারণ।" তাঁহাদের যৌগিক প্রক্রিয়া অনেক বিষয় বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া দেল্লা ভেল্লা মনে করিতেন। তিনি লিখিতেছেন যে, পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই ভাল ও মন্দ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। যোগিগণের মধ্যে অনেক ভণ্ড দুশ্চরিত্র থাকে বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও অনেক যোগীর অদ্ভুত প্রাণায়ামের শক্তি ও ভেষজ দ্রব্যের গুণ সম্বন্ধে আশ্চর্য্য জ্ঞান তিনি অবলোকন করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। দেল্লা ভেল্লীর ভাল ও মন্দ উভয় দিক সম্বন্ধে বর্ণনা ও আলোচনা তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং শিক্ষিত মনের পরিচয় প্রদান করে।

১৬২৩, ২২শে নভেম্বর তিনি ইক্‌কেরী (সৌরাষ্ট্র?) হইতে তাঁহার বন্ধুকে লিখিতেছেন, "অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাগমনকালে একটি রমণীকে অশ্বপৃষ্ঠে নগরের পথে ভ্রমণ করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার স্বামী বিয়োগ হইয়াছে এবং সে ভারতীয় প্রথা অনুসারে স্বেচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সহমরণ বরণ করিতে যাইবে। অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় সেই রমণী কি বলিতেছিল বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর অতি করুণ ও বেদনাপ্লুত মনে হইল। ভাষা না বুঝিলেও তাহার আলুলায়িত কেশদাম বেষ্টিত উন্মুক্ত বদন মণ্ডলে শোকের আভাস লক্ষ্য করিলাম। তাহার পশ্চাতে আরও বহু নর-নারী তাহার অনুগমন করিতেছিল; তাঁহারা সম্ভব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব প্রভৃতি। তাহার সম্মুখে একটি বাদ্যকরের দল বাদ্য বাজাইয়া অগ্রসর হইতেছিল। রমণীর বদনমণ্ডল অতি করুণ হইলেও লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম তাহা অতি স্থির ও অচঞ্চল। তাহার চক্ষে অশ্রুধারার চিহ্নমাত্রও নাই। ভাষা জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, সে নিজের মৃত্যুর জন্য বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই, তাহার স্বামী শোকেই সে অভিভূত। এই প্রথা যতই বর্ব্বর ও নির্দ্দয় হউক না কেন, এই রমণীর নির্ভিকতা, প্রেম ও ঔদার্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।" দেল্লা ভেল্লী অতঃপর লিখিতেছেন, তিনি সহমরণের সময়ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই রমণীকে বিবাহ বাসরের নববধূ বেশে অলঙ্কার ভূষিতা অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহাকে প্রফুল্লচিত্তে হাসিয়া কথা বলিতেও দেখিলেন। তিনি তাহার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সে নিজেই তাঁহার নিকট উঠিয়া আসিল এবং বিনা দ্বিধায় আলাপ করিল। সেই রমণী বলিল, তাহার নাম গিয়াক্কামা (Giaccama=গিরিকুমারী?)। আমি তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত হইবার জন্য অনেক প্রকার যুক্তি দেখাইলাম; সে তাহাতে হাসিয়া উত্তর করিল যে, সে স্বেচ্ছায় ও স্বাধীন চিত্তেই সতীদাহ বরণ করিতেছে এবং কেহই তাহাকে প্ররোচিত করে নাই। সে বলিল, তাহার স্বামীর অপর দুইটি পত্নী বর্ত্তমান আছে, তাহারা সহমরণে সম্মত হয় নাই এবং কেহ তাহাদিগকে এই কার্য্যে বাধাও করে নাই।

দেল্লা ভেল্লীর বিবরণী হইতে এই অনুমান করা যায় যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে কোনও কোনও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সতীদাহ সম্বন্ধে মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই ক্রম পরিবর্ত্তিত মনোভাবের ফলেই দেল্লা ভেল্লীর পর্য্যটনকালের দুই শত বৎসর পরে (১৮২৯) সতীদাহ প্রথা রহিত করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা চলে।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল বিদেশ পর্য্যটনের পর দেল্লা ভেল্লী স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন ও ১৬৫২ সনের ২১শে এপ্রিল দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায় যে, তিনি জীবনের একটি বৃহৎ "সত্য" জানিতে পারিয়াছিলেন; তাহা হইল পৃথিবীর সর্ব্বদেশের মানুষই এক, তাহাদের দোষ ও গুণ, ভাল ও মন্দ সর্ব্বতোভাবে মানবীয়। সকল দেশেই জনমত ও দেশীয় প্রথাসমূহ মানুষের উপর অব্যাহত প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের দুঃখ বেদনা অনুভব করার মত উদার হৃদয় তাঁহার ছিল এবং সেই জন্যই তাহাদের সম্বন্ধে অনেক বিষয় ঠিক ঠিক ভাবে তিনি তাঁহার পত্রাবলীতে লিখিতে পারিয়াছেন। অন্যান্য বহু বিদেশীর ন্যায় ধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁহার অনেক মতামত সঙ্কীর্ণ বলিয়া অনুভূত হইলেও তাঁহার বর্ণনায় কোথাও স্বেচ্ছাকৃত শ্লেষোক্তি দেখা যায় না।*

---

* যোসেপ ড লরেঞ্জোর একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে।

রূপলোকের সন্ধানে

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

অনুকূল ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, অনুপম শ্রীমণ্ডিত শিল্পকলা-সম্পদ ইত্যাদির জন্যে ইউরোপের রূপলোক ইটালীর প্রতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর সকল অংশের পর্যটকদের অনুরাগ আছে এবং তা চিরকাল থাকবে বলেও আশা করা যায়। যেমন বিপুল খ্যাতি এর সমুদ্রস্নান এবং তাপকেন্দ্রসমূহের তেমনি এদেশের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পর্ব্বত এবং সমুদ্রতীরস্থ স্বাস্থ্যনিবাস, এর মন্দির এবং পুণ্যস্থানসমূহের কথাও সর্ব্বত্র প্রচারিত।

মা ও ছেলে [শিল্পী—পেরুজিনো

ইটালীতে ভ্রমণ-সংস্থার সংগঠন অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের। মাত্র অর্দ্ধ শতাব্দীর অনধিককাল যাবৎ এর অস্তিত্ব। এই ক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাব হয় 'দি টুরিং ক্লাবে'র—এর অব্যবহিত পরে গড়ে উঠে 'দি এসোসিয়েৎসিওন পার ইল মৌভিমেন্তো ফরেসতিয়েরি', 'দি এসোসিয়েৎসিওনে দেগলি আলবারগেত্তোরি' (হোটেলরক্ষকদের সঙ্ঘ) প্রভৃতি সংস্থা—এদের কর্ম্মক্ষেত্র কিন্তু ছিল সীমাবদ্ধ।

অবশেষে বেসরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসাবে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে 'ই-এন-আই-টি'; সি-আই-টি এবং সকলের শেষে 'দাইরেৎসিওন, জেনারেইল, পার ইল, তুরিসমো' নামক সংস্থাত্রয় গঠিত হওয়ার পরই ইটালীতে প্রকৃতপক্ষে সংগঠিত ভ্রমণ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হ'ল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভ্রমণ-ব্যবস্থা সংগঠিত জাতীয় উদ্যোগরূপে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে। কিন্তু যুদ্ধের দরুন ব্যাহত হয় এর কর্ম্মপ্রচেষ্টা এবং প্রগতি—ক্ষয়ক্ষতি ও দুঃখ-দুর্দ্দশার সে এক দীর্ঘ

সংগ্রামরত যোদ্ধা
(ক্যাপিটোলিন্ মিউজিয়মে রোমান আমলের প্রস্তরমূর্ত্তি)

কাহিনী। যুদ্ধের ফলে বিনষ্ট হ'ল শিল্পকর্ম্মের মূল্যবান নিদর্শনসমূহ, ভস্মীভূত হ'ল রেলষ্টেশনগুলি, ভেঙে চুরমার হ'ল রেলপথ, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল কারখানাসমূহ—ভ্রমণ-ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের এই ধ্বংসলীলার প্রতিক্রিয়া হ'ল গুরুতর। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু প্রাগযুদ্ধকালীন কার্য্যকারিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে পুনর্গঠনকার্য্যে

কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করল ইটালিয়ান ষ্টেট রেলওয়েসমূহ। বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এখনও পুরোপুরি হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু রেলওয়ে বর্ত্তমানে পূর্ণোদ্যমে কর্ম্মরত এবং ইউরোপের প্রধান ট্রাঙ্ক লাইনগুলোর সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুনঃপ্রবর্ত্তিত হয়েছে। যেমন আকাশপথ, রাজপথ, সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতির, তেমনি তথাকথিত গৌণ (·econdary) রেলপথসমূহের উপর দিয়েও যানবাহন চলাচলের সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন হচ্ছে।

ফলসম্ভারসহ নবীন যুবক [শিল্পী—কারাভাজ্জিও
(রোম, বোরঘিজ গ্যালারি)

যুদ্ধের দরুন ব্যাপক ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও যানবাহন চলাচল-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। একদিকে যেমন পর্য্যাপ্ত রাজপথগুলি পর্য্যটকবাহী যানবাহন চলাচলের প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ, অন্যদিকে তেমনি সমুদ্রপথে যাতায়াত-ব্যবস্থাও প্রাগযুদ্ধকালীন অবস্থার সমস্তরে পৌঁছতে সমর্থ হয়েছে। আকাশপথে গমনাগমন-ব্যবস্থারও উন্নতি এবং বিকাশসাধন হচ্ছে।

যুদ্ধের সময় থেকে সাগরপারস্থিত দেশসমূহ হতে আগত পর্য্যটকদের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এটা বুঝতে পারা যায় যে, এই শ্রেণীর ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থার দরুন ইটালীর জাতীয় অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ইটালীতে প্রতি বৎসর বিদেশ থেকে কত পর্য্যটকের সমাগম হয় সে সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক। ১৯৪৯ সনে বিদেশাগত পর্য্যটকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ—এ হচ্ছে ১৯৪৮ সনের সামগ্রিক সংখ্যার দ্বিগুণেরও অধিক (উক্ত বৎসরে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষের কিছু বেশী। কাজেই এ আশা পোষণ করা যাচ্ছে যে, ১৯৩৭ সনে বৈদেশিক পর্য্যটকের যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা ৫০,১৮,৭০৬ জন বলে নির্দ্ধারিত হয়েছিল, একটা পরিমেয় সময়ের মধ্যে আবার তাতে পৌঁছানো যেতে পারে।

এটা নির্দ্দেশ করা বেশ চিত্তাকর্ষক বলে গণ্য হবে যে, ১৯৪৯ সনে যে ১২,০২,২৩৬ জন বৈদেশিক পর্য্যটক ইটালীতে আসে তম্মধ্যে এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক ভ্রমণ করেছিল রেলপথে আর সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত ভ্রমণকারীর সংখ্যাই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

খ্রীষ্টকে সমাধিস্থকরণ [শিল্পী—রাফেল
(রোম, বোরঘিজ গ্যালারি)

নীচেকার পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে পারা যাবে, যথাক্রমে ১৯৪৮ এবং ১৯৪৯ সনে কোন্ কোন্ দেশ থেকে বিভিন্ন পর্য্যটকদল ইটালীতে প্রবেশ করেছিল এবং তাদের সংখ্যাই বা কত ছিল :

রেলপথে		
ফ্রান্স	১৩৪,৭৪২	৩৭৩,৭৩৪
সুইজারল্যাণ্ড	৫৩১,০৩৫	৬৮১,৩৫৪
অষ্ট্রিয়া	১৬৫,৩৯৭	১২৯,২৭৬
যুগোশ্লাভিয়া	১১,৬৯৩	১৭,৮৭২
স্থলপথে		
ফ্রান্স	১৪৪,৭৬৮	৬৭৩,৬৫০
সুইজারল্যাণ্ড	৩৭৩,৮৭০	১,১৫৭,৫৩১
অষ্ট্রিয়া	১০০,৪০৭	১২৬,৭০৭
যুগোশ্লাভিয়া	৮,৮৩৮	২২,৫৭২
সমুদ্রপথে	৫০,৮৬৯	৯১,৯৪৮
আকাশপথে	৬৮,৪৩২	১২৭,০৩৭
মোট	১,৫৯০,০৩৩	৩,৪০১,৬৬২

"দি ইটালিয়ান ষ্টেট রেলওয়ে"
(এই রেলপথে ট্রেনে ইটালির যে-কোনো স্থানে আরামে দ্রুত পৌঁছানো যায়)

"পপুলার হোটেল", তরুণ-তরুণী এবং পারিবারিক দলের হোটেল এবং আরও, সমুদ্রতীরস্থ এবং পার্ব্বত্য আশ্রয়স্থলও আছে যা মুখ্যতঃ ব্যবসায়িক প্রণালীতে সংগঠিত নয়। সাধারণ হোটেল সংস্থাসমূহ থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এবং বিদেশাগত পর্যটকদের এক ভগ্নাংশের মাত্র স্থানসঙ্কুলান তাতে হতে পারে।

রোম নগরীর প্রতি বৈদেশিক পর্যটকদের আকর্ষণ অপরিসীম—নগরীর গীর্জ্জা এবং প্রাসাদ ইত্যাদির অতুলনীয় সৌন্দর্য তো আছেই, তা ছাড়া এখানকার আর্ট গ্যালারি এবং মিউজিয়ামগুলোতে সযত্ন-রক্ষিত ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ বিদেশাগত কলারসিকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে যেন এক নিরুপম রূপলোকের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করে দেয়। বোর্ঘিজ গ্যালারিতে রাফেল, কারাভাজ্জিও প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি এবং ক্যাপিটলিন মিউজিয়ামে রোমান আমলের ভাস্কর্য্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। বৎসরের সকল ঋতুতে অতীতের ঐতিহ্য এবং রূপৈশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ এই মহানগরীতে বৈদেশিক পর্যটকদের ভিড় লেগেই আছে। একে তো নগরীর জনসংখ্যা অত্যধিক, তার উপর বহিরাগত অবিরাম জনস্রোতের দরুন এখানকার বাসস্থান-সমস্যা নিরতিশয় গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বাসগৃহের অভাব দূরীকরণার্থে রোমের পৌরসভা (Municipality) বর্ত্তমান ব্লকসমূহের উপরে অতিরিক্ত তলা নির্ম্মাণের অনুমতি দিয়ে জরুরি আদেশ জারী করেন। উপরন্তু পৌরসভা-অধিকৃত কতকগুলি গৃহের অবস্থিতি-স্থান (Building Site) অত্যন্ত অনুকূল সর্ত্তে 'কোঅপারেটিভ' বিল্ডিং সোসাইটি-সমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয় এবং কতিপয় বীমা কোম্পানী ও অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানকে গৃহনির্ম্মাণকল্পে অধিকতর মূলধন বিনিয়োগের জন্য অনুরোধ করা হয়; কিন্তু যদিও এসম্পর্কে অনেক-কিছু করা হয়েছে তথাপি সমস্যাটি যে আকার ধারণ করেছে তাতে এর সমাধান ঢের বেশী কঠিন বলে মনে হয়।

হোটেলে স্থানসঙ্কুলান অবশ্য ভ্রমণকারীদের যাতায়াত-ব্যবস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত একটি সমস্যা। ১৯৫০ সনের জুন মাসে জেনোয়ার নের্ভিতে অনুষ্ঠিত প্রথম 'টুরিজম ফর ওয়ার্কাস কংগ্রেসে' ঘোষিত হয় যে, ইটালীতে প্রাপ্তব্য, শয্যাসম্বলিত সাময়িক থাকাখাওয়ার জায়গা বা আবাসের সংখ্যা প্রায় ৩৬৫,০০০, তন্মধ্যে প্রায় ২০০,০০০টিই পর্যটকসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভ্রমণকারীদের হার যে পরিমাণে বাড়ছে এবং আগামী বৎসরগুলিতে তা যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে তদনুপাতে বাসস্থানের সংখ্যা বাড়ানোর দিকেও যে অবহিত হতে হবে তা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। ভ্রমণোদ্দেশ্যে পারিবারিক দল এবং মাঝারি আকারের দলগুলির জন্য প্রয়োজনীয় স্বল্পমূল্যের বাসস্থানের তুলনায় ইটালীতে বিলাস-নিবাসের (Luxury accommodation) সংখ্যা সম্ভবতঃ ঢের বেশী। অবশ্য বহুসংখ্যক তথাকথিত

ভ্রমণকারীদের যাতায়াতকে—তা ব্যষ্টিগতই হোক্ বা সমষ্টিগতই হোক্—উৎসাহিত করবার জন্যে সম্প্রতি ইটালিয়ান ষ্টেট রেল-

ওয়ে কর্তৃক অভাবনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদত্ত হচ্ছে। যেমন: পরিবারসমূহের জন্ত নিম্নমূল্যের টিকেট, রিটার্ন টিকেটের বিশেষভাবে মূল্যহ্রাস, 'সার্কুলার টিকেট' নামে এক ধরনের বিশেষ সুবিধাজনক মূল্যের টিকেট, 'বড় দলের' টিকেট ইত্যাদি। শেষোক্তটির মূলনীতি হচ্ছে এই যে, "দল যত বড় হবে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের ভাড়া পড়বে তত কম।" ভ্রাম্যমাণ জনসাধারণ এই সকল সুযোগসুবিধাকে এরূপ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে যে, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এগুলোর অধিকতর উৎকর্ষবিধানকল্পে মনোযোগী হয়েছেন।

নেপলস—নৈশ দৃশ্য

কাপরির একটি দৃশ্য

গঠনের, কিন্তু ফল যা হয়েছে তা খুবই সন্তোষজনক বলতে হবে।

টুরিষ্ট ট্রেনগুলি এ পর্যন্ত কেবলমাত্র রবিবার দিনেই চলাচল করবে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মাইল হিসাবেও দূরত্বকেও সীমিত করা হয়েছে—উর্দ্ধকল্পে ২৫০ কিলোমিটারে অথবা তিন ঘণ্টার ট্রেন-ভ্রমণে। অবশ্য কালেভদ্রে এর ব্যতিক্রম হয়—যখন নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ দূরত্ব থেকে দূরবর্ত্তী স্থানে জনসাধারণের পক্ষে চিত্তাকর্ষক শিল্পপ্রদর্শনী, খেলাধূলো বা অন্তবিধ ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। এই সকল রবিবাসরীয় ভ্রমণপর্ব্বের মধ্যে কোন কোনটি —দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় রোম-নেপলস-কাপরি অথবা বোলোগনা-ট্রেন্টো, কিংবা জেনোয়া-কোমোর কথা—প্রত্যেক ট্রেনে এক হাজারেরও অধিক যাত্রীকে আকৃষ্ট করেছে। ত্রিয়েস্তে থেকে ভেনিস পর্য্যন্ত এক যাত্রায় একটি মাত্র ট্রেনে মোট ১৮০০ যাত্রী ভ্রমণ করেছিল।

'টুরিষ্ট ট্রেন' চালু হয়েছে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ—যাদের অর্থসংস্থান কম সেই সকল টুরিষ্ট এবং ভ্রাম্যমাণ জনসাধারণের মধ্যে যারা প্রাচুর্য্য থেকে বঞ্চিত এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের উপকারার্থে। টুরিষ্ট ট্রেনগুলিতে দিনের মধ্যে ফিরে আসা ভাড়া (Day-return fare) খুব বেশী রকম হ্রাসপ্রাপ্ত করা হয়েছে এবং সাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক স্থানসমূহ পরিদর্শন ব্যাপারে সহায়তাকল্পে গাইডের ব্যবস্থা করা হয়েছে—খাদ্য এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ ধরে নেওয়া হয় ভাড়ার মধ্যেই। এটি হচ্ছে একটি অভিনব উদ্যোগ; ইটালীর রেলওয়ের ইতিহাসে এ ধরনের নজীর আর নেই। এর জন্তে প্রয়োজন হয়েছে অনেক অতিরিক্ত কাজের এবং একটি বিশেষ সংস্থা

পাশ্চাত্যে রূপরসিকের স্বর্গলোক যদি কোথাও থাকে তো তা এই ইটালীতে। র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো এবং লিওনার্দ্দো দা ভিঞ্চির মত শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আবির্ভাব হয়েছিল এদেশে—তাঁদের রূপসৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ দেখে যাঁরা নয়ন সার্থক করতে চান, আকুল আগ্রহে তাঁরা ছুটে আসেন এদেশে। শিল্পকলানুরাগীর পরম পবিত্র তীর্থভূমি এই দেশ, প্রকৃতি এদেশের পথেঘাটে যেন সৌন্দর্য্যের
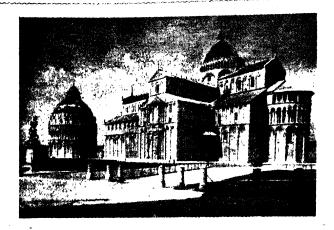
পিসার ক্যাথেড্রাল

হাট খুলে বসেছেন, কাপরির নিরুপম পার্ব্বত্য শোভা ভ্রমণকারীর চোখে যেন মায়া-অঞ্জন বুলিয়ে দেয়—আল্পসের উন্নত শিখর যেন তাকে কোন সুদূরের পানে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আবার বিভিন্ন নগরীর কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের আকর্ষণও কম নয়—আলোকোদ্ভাসিত নেপল্‌সের নৈশ সৌন্দর্য্য বিদেশী ভ্রমণকারীর চোখ ঝলসে দেয়। বস্তুতঃ শুধু প্রকৃতির দান নয়, মানুষের রূপসৃষ্টিও ইটালীকে পরিণত করেছে এক নিরুপম কল্পলোকে। এই রূপলোকের সন্ধানে প্রতি বৎসর দেশদেশান্তর থেকে শত শত কবি, শিল্পী, ভাস্কর সমাগত হন ইটালীতে। আজ ইটালিয়ান ষ্টেট রেলওয়ের কল্যাণে ইটালীর সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়ানো যে কত সহজসাধ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।*

* East & West অবলম্বনে।

নদীয়ার পল্লীগীতি—"বোলান"

শ্রীহারাধন দত্ত

আমরা সকলেই অল্পবিস্তর কবিতাপ্রিয়। সেজন্য এদেশে যেমন শিক্ষিত কবির অভাব নেই—তেমনই নিরক্ষর পল্লী-কবির সংখ্যাও কম নয়। আজিও বাংলার পল্লীজীবনে এই নিরক্ষর গ্রামীণ কবিদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, চণ্ডীদাস গ্রামবাসীদের বড় প্রিয়; রামপ্রসাদী গান, দাশুরায়ের পাঁচালী বা কোন লোকগাথা বা প্রণয়গাথা যে তাদের প্রিয় তা বলাই বাহুল্য। বাংলার পল্লীসমাজে আনন্দোৎসব ও ধর্ম্মোৎসবে পল্লী-কবিদের প্রভাব এখনও লুপ্ত হয় নি। দীনেশচন্দ্র সেন ও চন্দ্রকুমার দে'র ঐকান্তিক প্রয়াসে পল্লীগাথা বিশেষ ভাবে বিদগ্ধ সমাজের গোচরে আসে। ক্রমশঃ সেই প্রয়াস এখনও চলেছে। বাংলার ঘরে ঘরে কত গান, গাথা, কথা, ছড়া, গল্প লুকিয়ে আছে তার হিসাব দেওয়া কঠিন। সম্প্রতি নদীয়ার কয়েকটি গ্রাম্য সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয়কালে এই কথাই মনে হয়েছে যে, সমুদ্রোপকূলে বালুকারাশির মধ্যে যেমন অগণিত মণিমুক্তা ছড়ানো থাকে, বাংলার পল্লীজীবনে তেমনই বহু অমূল্য রত্ন বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। এই সঙ্গীতগুলি আলোচনার পূর্ব্বে আরও কিছু বলা প্রয়োজন।

আমাদের সংগৃহীত গানের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি। এই গানগুলি "বোলান" নামে পরিচিত। কলিকাতা হতে উত্তরবঙ্গের পথে মাঝদিয়া ষ্টেশনের কাছেই মাথাভাঙ্গা নদী ইচ্ছামতী ও চূর্ণী এই দুই দিকে প্রবাহিত হয়েছে। সেখান থেকে চূর্ণীর তীর ধরে অগ্রসর হলেই সম্মুখে শিবনিবাস। এটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গ্রাম—অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। পাশেই কৃষ্ণপুর গণ্ডগ্রাম ও পাবাখালি—একটু দূরে নূতন গ্রাম, পায়রাডাঙ্গা,

ময়ূরহাট হাঁসখালি। চূর্ণীর অপরতীরে শোণঘাটা, চৌগাছা, চন্দননগর, কুমারপুর, বাবলাবন, নিদিরপোতা, ভৈরবচন্দ্রপুর, বাটিকামারী। শিবনিবাস-সন্নিহিত এই বিশাল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে কিছুদিন আগেও মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই চাষী। ধর্মীয় ও সমাজ-জীবনে হিন্দু-মুসলমানের মধুর স্মৃতি ভোলবার নয়। এই অঞ্চলে মুসলমানের বাড়ীতে 'রামায়ণ গান' হয়— আবার হিন্দুদের বাড়ীতে মাণিকপীর-সত্যপীরের পাঁচালী শুনেছি। কালীপূজায়, দুর্গাপূজায় মুসলমানেরা যোগদান করে। ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, পাঁচুঠাকুর, ধর্মঠাকুর, পীর, দরগা সকলেই এখানকার মানুষের পূজা ও শ্রদ্ধা পায়। কৃষ্ণরাধা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গানও যেমন এই অঞ্চলে শোনা যায়—তেমনই দিগন্ত বিস্তৃত জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ের সবুজ ধানের ক্ষেতে কর্ম্মরত কৃষাণের কণ্ঠে বেহুলা লখীন্দর, গোনাইবিবি, রাজকুমার-রাজকন্যা ও পলাশীর করুণ কথাও গীত হয়ে প্রান্তর আলোড়িত করে। এই সমাজক্ষেত্রেই "বালাকি গানে"র সৃষ্টি ও প্রতিষ্ঠা।

এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎসব গাজন ও চড়ক। চৈত্রের মাঝামাঝি মাঠের কাজ শেষ হয়। নানাবিধ রবিশস্যে কৃষাণের গৃহ পূর্ণ হয়। মানুষ-পশু সবাই তখন মুক্ত। এদিকে রৌদ্রের তাপও বড় প্রখর, কোথাও বৃষ্টি নেই, মাঠেও চাষের কাজ বন্ধ। চাষীরা আর গৃহকোণে থাকতে চায় না, একটু আনন্দ উৎসবের অনুসন্ধান করে। এমনই সময়ে পল্লী-আকাশ মুখরিত করে উঠে কাঁসি, সিঙা ও ঢক, ঢোলের নিনাদ। শিবপূজার উৎসব সুরু হয়, পথেঘাটে দেখা যায় গাজনের সন্ন্যাসী। এই অঞ্চলের গাজন উৎসবগুলির মধ্যে হাঁসখালি ও কৃষ্ণপুরের উৎসব বিশেষ প্রসিদ্ধ। উভয় উৎসবে যাদববংশীয় ঘোষেরাই প্রধান। হাঁসখালির গাজন উৎসবস্থান "হাজরাতলা" নামে পরিচিত। হাঁসখালির শিবের নাম "হাজরা"। কৃষ্ণপুরের উৎসবে নীলপূজার দিন হতেই ভিন্ন গ্রামের লোকের সমাগম হয়। চড়কের দিন মেলা বসে। আবার চড়কের পরের দিনই গোষ্ঠবিহার। চড়কপূজার প্রায় চৌদ্দ-পনের দিন পূর্ব্ব হতেই গ্রামাঞ্চলে নানারকম গীতবাদ্যাদি হয়। বিভিন্নপ্রকার গীতের মধ্যে কয়েকজন গ্রামীণ কবির রচিত গান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদঞ্চলে এই সকল পল্লীকবির গান প্রায় সত্তর-আশী বৎসর ধরে চলে আসছে। কৃষ্ণপুরের অশিক্ষিত লোকসমাজের মধ্যে হতে আমি যে সব গান সংগ্রহ করেছি—সেগুলির কোন কোনটিতে কবির নাম যুক্ত আছে, কোন কোনটির ভনিতায় কবি-পরিচয় নেই। মোট তেরটি গানের ভনিতায়, প্রহ্লাদ, হেমন্ত, দ্বিজ নগেন্দ্র, হরিদাস, কেশবদাস ও অর্জুনদাসের নাম আছে। এগুলির মধ্যে ছয়টি আবার প্রহ্লাদের। সর্ব্বাগ্রে এই প্রহ্লাদ সম্বন্ধেই দু'একটি কথা বলিব।

বাংলা দেশের গাজন-উৎসব পরবর্ত্তীকালের বৌদ্ধ উৎসবের প্রকারভেদ। সাধারণ লোক বৌদ্ধ তত্ত্ব বুঝিত না, সেজন্ত নৃত্য, বাদ্য, সং প্রভৃতির দ্বারা সাধারণের হৃদয় জয় করার জন্ত এই বৌদ্ধগাজনের সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের সময় হতে এই বৌদ্ধ বা ধর্ম্মের গাজন হিন্দুর শিবপূজার গাজনে পরিণত হয়—এর বিলক্ষণ কারণ বর্ত্তমান আছে। নদীয়ার যে অঞ্চলের কথা বলেছি—সেখানে চড়ক বা নীলপূজার সময় যে সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে তা হিন্দু শিবপূজাসম্মত নয়। "আদ্যের গম্ভীরা" নামক প্রবন্ধে হরিদাস পালিত মহাশয় লিখেছেন—"শোভা ও গাজনতলা হইতে অন্য গাজনতলায় গমন, চিরন্তন প্রথানুসারে নৃত্যগীতাদি উৎসবামোদাদি সহকারে আচরিত হয়। প্রত্যেক 'গাজুনে সন্ন্যাসী' আপন আপন গাজনতলা হইতে তৎতৎ স্থানীয় প্রধান ও প্রাচীন শিবের গাজন তলায় দেশীয় প্রথামত গীতবাদ্য ইত্যাদি উৎসব সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া গমন করে এবং অন্যান্য গাজনতলা হইতে আগত সন্ন্যাসিগণের সহিত নৃত্যগীত ও বাদ্যাদিসহ উৎসবামোদে যোগদান করিয়া শোভাবর্দ্ধন করে, কোথাও কোথাও কবিগানের ন্যায় চাপান, চিতেন, জবাব প্রভৃতি ভাবে গীতাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে।"[১] শিবঠাকুর নৃত্যপ্রিয় ও কৌতুকপ্রিয়। সুতরাং তাঁর ভক্তগণ নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁর সন্তোষবিধানের চেষ্টা করবেন তা স্বাভাবিক। শিবনিবাসের শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ বাংলা দেশে সুপ্রসিদ্ধ। কৃষ্ণপুরের গাজুনে সন্ন্যাসীরা যখন নদীতে স্নান করবার জন্য বের হয় কিংবা অন্য গাজনতলা বা শিবঠাকুরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হয় তখন নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদির অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর লক্ষিত হয়। সন্ন্যাসীবন্ধন এই অঞ্চলে খুব কৌতুকপ্রদ। পথে পথে গ্রাম্য বালক-বালিকা ও নিরক্ষর লোকেরা ছড়ার সাহায্যে সন্ন্যাসীদের নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। নিয়ম সন্ন্যাসীরা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন ছড়ায়। অন্যথায় তাঁদের পথ রুদ্ধ থাকবে। ঐ সময় গ্রাম্য পথ-ঘাটে গীত-বাদ্যাদি ও তৎসহ এই ছড়ায় উত্তর-প্রত্যুত্তর বড়ই উপভোগ্য। এই উত্তর-প্রত্যুত্তর ও ছড়ার গানগুলোকেই আবার গ্রামীণ কবিরা "বোলান" বলেছেন।

এই অঞ্চলে আবার কৃষ্ণযাত্রা খুব প্রচলিত। রাই উন্মাদিনী-খ্যাত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর বাসস্থান ছিল এই অঞ্চলের নিকটেই ভামঘাট গ্রামে। নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের প্রভাবও বড় কম নয়। সেজন্য এখানে কীর্ত্তন ও কৃষ্ণবিষয়ক গীতির খুব প্রচলন। নদীয়া জেলা গীতিকা, গাথা, লোকসঙ্গীতের জন্য ময়মনসিংহ, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, মালদহ, শ্রীহট্ট, মেদিনীপুর প্রভৃতির ন্যায় তেমন প্রসিদ্ধ নয়। বিশেষতঃ ভাগীরথী এখান হতে অধিক দূরে নয়। আর এই ভাগীরথীর দুই তীরে বহু সংস্কৃতির অনুশীলন সুপ্রসিদ্ধ। সেজন্য এই অঞ্চলে লোক-সংস্কৃতির সম্যক্ বিকাশ হওয়ারই কথা। কিন্তু সমগ্র নদীয়া সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য নয়। এই দেশে আউল, বাউল, দরবেশ, নাথ-গীতিকা, আচার্য্যি ঠাকুরের গীত এবং নানাপ্রকার লৌকিক গানেরও ছড়াছড়ি দেখা যায়। বটতলা-প্রকাশিত একটি গ্রন্থে দেখা যায়—"কোম্পানীর আমলে রাজধানী কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজার কালে কত জাতিগীতের প্রচলন ছিল। সেই আমোদেতে পূজার দিনে রাসযাত্রা,

১। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৬ বর্ষ

চণ্ডীগীত, পাঁচালী, মনসার ভাসান, কবি, পীরের গীত, জাতিগীত, পুতুলনাচ, কুস্তিখেলা, নৌকা বাইচ, ঘোড়াদৌড় চইয়া রাজবাড়ীর প্রাণ থাকিত।"২ এই গ্রন্থের প্রকাশকাল সিপাহীবিদ্রোহের সময়। ইহা হইতে বোঝা যায়—এদেশেও লোকসঙ্গীত এবং সংস্কৃতির অভাব ছিল না। কেবল ঐ প্রাণবৃত্তি ও হৃদয়ধর্মের নিদর্শনগুলি ক্রমে আমাদের কাছে অবহেলিতই হয়ে এসেছে।

নদীয়ার এই গানগুলির আঞ্চলিক নাম "বালাকি" হইলেও ভনিতাহীন একটি বন্দনাগীতে "বোলান" কথাটির উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ গানগুলি বোলান শ্রেণীরই। আমাদের গ্রামীণ কবির "বন্দনাগান" হতে কিছু উদ্ধৃত করছি :

এসগো মা সরস্বতী কি বলিতে জানি।
ওগো প্রথমে বন্দিব মায়ের চরণ দুখানি।
এসগো মা সরস্বতী স্কন্ধে দে মা পা।
গলায় দে মা সুরধনী, স্কন্ধে সুর রায়।।
এসগো মা সরস্বতী বসগো মা রথে।
বুলান বলিতে হবে বালকের সাথে।।
যে বুলান বলিবা মাগো তাই বলিব আমি।
দশের মাঝে ভাঙ্গলে বুলান লজ্জা পাবে তুমি।।

গ্রামীণ গায়নদের খাতায় যেমন লেখা আছে—এখানে ঠিক সেই ভাবেই উদ্ধৃত করা হ'ল। এই বন্দনাগান দীর্ঘ। এখানে সমস্ত উদ্ধৃত করা গেল না। এই বন্দনাগানে নদীয়ার দেবদেবীদেরই অধিক উল্লেখ আছে। অন্য একটি গানের ভনিতায়ও এই "বোলান" গানের স্বীকৃতি আছে। যেমন—

হরিদাস ভনে বুলান গাহে গঙ্গাধর।
বদন ভরিয়ে ডাক রাম গদাধর।।

সুতরাং আমার মনে হয় পল্লীকবিরা বোলান গানই রচনা করেছিলেন। এই "বোলান" গানের আলোচনা আমাদের সাহিত্যে তেমন হয় নি। সম্প্রতি শ্রীঅমলেন্দু মিত্র বীরভূমের কয়েকটি বোলান গান প্রকাশ করেছেন।৩ কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন—

বনমধ্যে বেলা অবশেষ সঙ্গে কেহ নাই।
ডাকিলে বোলান না দেও অভরসা পাই।৪

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় এই বোলান শব্দের অর্থ করেছেন "জবাব"। হরিদাস পালিত মহাশয়ও গম্ভীরাগ্রন্থে "জবাব" নামক গানের কথা বলেছেন। আবার অধ্যাপক শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় "বোলানে"র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য —"ছড়া কেটে ঢোল-কাঁসির সঙ্গেতে গান ধর্ম ও শিবের গাজনে গাওয়া হ'ত। এই ছড়া আর্যা বা তর্জা নামে পরিচিত। বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলত তাকে বলা হয় দাঁড়া কবি। ধর্মঠাকুর বা শিবের গাজন উৎসবে মূল সন্ন্যাসী গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে যে তর্জা ছড়া বলত, তার বিশিষ্ট নাম বোলান।"৫ নদীয়ার এই গানগুলি গাজন উৎসবের জন্যে রচিত। গাজন উৎসবেই এগুলি গীত হয়। সন্ন্যাসীদের সহ গায়নদল গ্রামের পথে বের হয়। ঢোল, কাঁসি ও বাঁশীসহ ছড়া ও গান পরিবেশিত হয়। নীলপূজার দুই-তিন দিন পূর্ব্ব হতে গায়নরাই এ বিষয়ে মুখ্যস্থান অধিকার করে। পূজা উৎসবের চাঁদা সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে প্রতিটি বাড়ীতে এই সমস্ত গানগুলি পরিবেশন করা হয়। গায়নগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে গান করে। প্রত্যেক গায়নের পায়ে ঘুঙুর থাকে। প্রথম দল সুরের সূচনা করে ও কথারম্ভ আরম্ভ করে—দ্বিতীয় দল সেই সুর ও কথাকে তরঙ্গায়িত করে ও গ্রাম্য বৈশিষ্ট্যর আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে ঢাক, ঢোল, কাঁসি ও বাঁশীর প্রভাবও কম নয়। সঙ্গীত পরিবেশনের এই লক্ষণ প্রকৃত বোলান গানেরই অনুরূপ। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই সঙ্গীতগুলির বালাকি নাম হ'ল কেন ? চড়কপূজার প্রধান পাণ্ডাকে বালা বলে। শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় "নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধে এই বালা ও চড়কপূজা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি একস্থলে বলেছেন—"বালা নামক চড়কপূজার পাণ্ডা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া চৈত্রের ভীষণ রোদ্রে লোকের বাড়ী বাড়ী যে গীতগান করিয়া থাকে, তাহার সুর, ভাব, নৃত্য ও শব্দবিন্যাস শুনিলে ইহা যে আর্য্যজাতির উপাসনার অঙ্গ তাহা আদৌ স্মৃতিতে আইসে না।……ইহা ছাড়া বালা মহাশয় নারায়ণের দশাবতার বর্ণনা করিতে বৈষ্ণব কবি মহাত্মা জয়দেবের উপরও একহাত চাল চালাইয়া থাকেন। এই দশঅবতার বর্ণনাকালে বালাগণ বন্দনা-নামে একটি শ্লোক বলিয়া থাকে ……এইভাবে কোন সময় শ্লোক, কোন সময় গীত গাইয়া বালা মহাশয় চড়ক উৎসবে প্রধান পাণ্ডা-গিরি করিয়া থাকেন।"৬

আমাদের এই অঞ্চলে গাজনের মূল সন্ন্যাসীকে আজিও কেহ কেহ বালা বলেন। সম্ভবতঃ এই বালা হতেই 'বালাকি' কথাটি এসেছে। বালার, বালা সংশ্লিষ্ট ও বালা প্রভাবিত গানগুলিই 'বালাকি'।

গাজন ও গোষ্ঠবিহার এই দুই অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করেই এই গানগুলি রচিত হয়েছে। গানগুলি আনুষ্ঠানিক। গানগুলি কোন প্রকার ভাবমূলক না হয়ে আখ্যানমূলক। চিরপরিচিত ধর্মগ্রন্থ বা সাহিত্য হতে এই আখ্যানভাগ গৃহীত। আবৃত্তি করার পরিবর্ত্তে এগুলি গীত হয়। এর ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী ও সুরে লোক-বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেজন্য এগুলি গীতিকাশ্রেণীর। যদিও শিব-পূজোই এই গীতগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য—তথাপি দেখা যায় শিববন্দনা-

২। সঙ্গীত রত্নাকর—বটতলা হইতে প্রকাশিত।
৩। বোলান গান—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৬২তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।
৪। "চণ্ডীর [illegible]" অধ্যায়।
৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম।
৬। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১২শ বর্ষ।

মূলক গান একেবারে কম। এখানে শিবকে রামায়ণ, মহাভারত, শচীমাতা, নিমাই, নন্দ, যশোদা, কৃষ্ণবলরাম, মেনকা, উমা, রাধা-কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীতও শোনানো হয়। গম্ভীরা এবং বালা মহাশয়ের উৎসবেও এইরূপ বিবিধ প্রকার গান পরিবেশনের দৃষ্টান্ত আছে। এই গ্রাম্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেবদেবী ও বিভিন্ন শাস্ত্রকাহিনীর অবাধ মিশ্রণ দেখা যায়। ইহা এই অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। এখানকার গ্রামীণ কবি রামায়ণকথা শিবকে শোনায় ও ভনিতা করে :

রামলীলা মধুর কথা মধুর ভারতী।
সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

কৃষ্ণের ননীচুরি আখ্যানও শিবকে শোনানো হয়। গীতিকার শেষ অংশটুকু এইরূপ :

কাল সকালে যাব আমি মাতুলের বাড়ী।
মোহন বাঁশী বাঁধা দিয়ে নিব নবনীর কড়ি॥
এ দেশেতে থাকিব না মা অন্য দেশে যাব।
পরের মাকে মা বলিয়ে উদর পুরে খাব॥
অর্জ্জুনচন্দ্র দাসে বলে ভাবিয়ে ভবানী।
সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও অনুরাগের কাহিনী বর্ণনা করেও পল্লীকবি শিবের কাছে গান শোনার প্রার্থনা করেন :

কাঁকে কুম্ভ বিনোদিনী জল আনিতে যায়।
ধীরে ধীরে কালো কানাই রাধিকারে চায়॥
জল পরো জল পরো রাধে, বিরাজ কেন মন।
আমায় দেখে রাখলে ঢেকে কত রাজার ধন॥
আপনার ধনেরে কানাই আপনি রাখি ঢেকে।
এখান হতে যাওরে কানাই কে এনেছে ডেকে।
কেহ ত আনে নাই ডেকে এসেছি আপনি।
তাতে কেন ব্যাজার হলে রাধে বিনোদিনী॥

শিবের গাজনে এই ভাবে কৃষ্ণকাহিনী অগ্রসর হয়। কিন্তু গ্রামীণ কবি শেষে ভনিতা করেন :

শ্রীকেশবচন্দ্র দাসে কহে ভাবিয়ে ভবানী।
(আর) সংক্ষেপেতে কহিলাম কথা শুন শূলপাণি॥

কৃষ্ণবিষয়ক এই গানগুলি সম্ভবতঃ গোষ্ঠবিহার উৎসবের জন্য রচিত। কারণ গাজন ও চড়ক উৎসবের পরেই এখানে গোষ্ঠ-বিহার হয়। কিন্তু সম্প্রতি গাজন উৎসবই মুখ্য—গোষ্ঠবিহার যেন গাজনের জের। এই অঞ্চলে গোপ বা ঘোষেদের সংখ্যা একটু বেশী। সেজন্য এইরূপ কৃষ্ণকাহিনী সাধারণের প্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। এই সমস্ত গীতিকার কবিরা খুব শিক্ষিত নহেন, বরং অধিকাংশই নিরক্ষর। কিন্তু নিরক্ষর হলেও এই সব কবি অনেক সময় ভদ্রসমাজের নিকট যাতায়াত করেন এবং সেখান হতেই পুরাণের তত্ত্ব ও ভদ্রজন-ব্যবহৃত শব্দ শিক্ষা করেন। আমাদের এই গীতিকা-রচয়িতাদের মধ্যে প্রহ্লাদচন্দ্র ভৎকদাসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর স্মৃতি এই অঞ্চলের প্রবীণ লোকের মুখে আজও শোনা যায়। এখানে তাঁর উমাবিষয়ক তিনটি গীতিকা উদ্ধৃত করছি :—

১

মাগো আগে যদি জানতাম তোর জামাই করে এত ছলনা।
ঐ বরণ করতে আমরা সকলে মরতে আসতাম না॥
তুমি পাষাণী, তোমার কন্যা ঈশানী, রাণী জামাই পেলে
মনের মত নামটি শূলপাণি।
কিন্তু বিধাতা ঘটালো দোষ নারদ হোল এক দোষী॥

রাণী এই বুঝি তোর জামাই সদাশিব কৈলাসীবাসী।
যোগেন্দ্র যোগ তপস্বী উদাসী কি সন্ন্যাসী তা দেখে পায়
দারুণ হাঁসি॥
মাগো ঐ আবার এসেছে দেখ নারদ দেব ঋষি।
এখন উমায় উমায় কান্‌তে দিগে কাঁদগে মা দিবানিশি॥

বিদায় দে মা গৃহে যাই ওগো ও রাজমহিষী।
রাণী গো তোমার জামাই হলেন গঙ্গাধর,
অনাদি অনাদ্যে কান্ত অন্ত পাওয়া ভার।
দেখ উলঙ্গ হয় কেবা কোথায়, বর বেশেতে আসি॥

ভাল বলি কিসে ভাল না বললে মরণ হবে শেষে।
যদি বলি ভাল নয় অমনি সবে ভূতে পায়।
অবশেষে শত্রুগণ হাসে।

মাগো শিব পূজে শিব জামাতা পেলে তোমার পুণ্যেরি ফলে।
ঐ আদর করে এনে আমাদের কি লজ্জা দিলে॥
প্রহ্লাদ পাটিনী বিনয় কহিছে বাণী,
ওগো আপন আপন গৃহে এখন যায় গো সবধনী।
দেখ শিব জামাই পেলে রাণী, নারদ হ'ল এক দোষী।

২

ওগো যোগানন্দে যোগমায়ারূপিণী আছেন গিরিনন্দিনী।
ঐ গৌরী নিতে বরবেশেতে এলেন শূলপাণি।
গিরিবর রাজন উমায় করলে তর্পণ।
আনন্দিত হয়ে রাণী করতে যায় বরণ।
আবার সঙ্গিনীগণ কয় রাণীকে এ আবার মা কি বালাই।

ছি, ছি লজ্জায় মলাম মলাম রাণী গো দেখে তোর জামাই।
বরণ করা থাক সাথে—পথ পেলাম না পালাতে
হাতের ফুল রয়েছে হাতে,
মাগো কেমন করে করবো বরণ দেখে চক্ষেতে,
যদি ফিরিয়ে নয়ন করবো বরণ তাতে অব্যাহতি নয়।

মনে এখন ভাবি তাই মাগো করলে কি গোঁসাই।
হলো একি দায় পাছে ভুজঙ্গেতে খায়।
ঐ নাগফণী দংশালো পাছে নাগভূতে বা ঘায়।
দেখ ভূত ভুজঙ্গ লয়ে সঙ্গ উলঙ্গ হয় কে কোথায়॥
মাগো একি রকম লয়ে এসেছ যেন কালান্তকে যম।
কারোর চতুর্মুখ, কারে দেখি চতুর্ভুজ
কেউ আবার বলছে বো, ব্যোম্ ব্যোম্॥

আমার মনের মানস পূর্ণ হলো ও-শিব হবে উমার বর।
ঐ ছল করে এনেছে ঋষিবর নেংটা দিগম্বর॥
প্রহ্লাদ কাতরে বলে রাণী তোমায় কাঁদালে।
কত মুনি ঋষি কাঁদে বসে নারদের ছলে॥
আমি জীর্ণ তরী লয়ে কাঁদি পারে যেতে পারি নে॥

৩

গিরি নিবাসিনী ধনী কেন মা বল অকারণ
একে ত বুক ফেটে যায় উমারে হেরে
আবার তোমরা সব করছো জ্বালাতন॥
চণ্ডী পূজে চণ্ডী পেয়ে হরষিত মন করলাম দণ্ডী সমর্পণ।
লজ্জার মান পরিহরি, আয় গো মা বরণ করি,
চাতুরী ত্রিপুরারি করেন কি কারণ।
আমার শঙ্করী শঙ্করে দিব ছিল বাসনা।
এ যে বহুরূপে চুপে চুপে নারদ মুনির ছলনা॥

মাগো করলাম কি কিবা হোল খেদেতে প্রাণ বাঁচে না।
প্রমাদ ঘটালে যে দেবঋষি।
উমার বর এনে দিল যেন সন্ন্যাসী।
মাগো আগে জানতে পারলে পরে অমন কর্ম্ম হ'ত না॥

বিধি বাদী হয়ে আজ দিলে একি যন্ত্রণা।
কন্যাসন্তান হলে মাগো এ বড় বালাই
ওমা লজ্জায় মরে যাই।
যাতনা সয় না প্রাণে দিলাম ছাই আপন মানে,
পাছে বা মরি প্রাণে কিসে বা প্রাণ বাঁচাই॥
তোরা সকল ধনী করিস না মিছে।
দেখে জামাই রঙ্গ জ্বলছে অঙ্গ জল দিলে জুড়াবে না॥

মাগো মিলন হোল ভাল
উমার কপালে বিধি এই লিখেছিল।
আমি যেমন পাষাণী কন্যে তেমনি ঈশানী, জামাই শূলপাণি,
এ জামাই শ্বশুর যিনি তিনি ত অচল।
আমার মনের দুঃখ বলি আর কারে এ দুঃখে মলেও যাবে না।
মাগো মা কন্যা গর্ভে ধরে যে জনা ও তার প্রতি হয়
অশেষ যন্ত্রণা॥

প্রহ্লাদ কহে ও রাজরাণী ভেবো না তুমি
বেদে শুনেছি আমি দক্ষালয় যজ্ঞভঙ্গি,
হিমালয় হয় উলঙ্গ আরও বা কত রঙ্গ দেখিবা তুমি॥
মাগো আমার অঙ্গ তরঙ্গেতে কেবল ঢেউ গুনে।
লয়ে—ভগ্নতরী ভেবে মরি পারে যেতে পারি নে।

এ ছাড়া একটি শচী-নিমাই বিষয়ক ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক দুটি গীতিকা প্রহ্লাদের নামে প্রচলিত আছে। এখানে সবগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। গ্রামীণ গায়নাদের মুখে শুনেছি, ভনিতাহীন গীতিকাগুলিও নাকি প্রহ্লাদের রচিত। এই প্রহ্লাদচন্দ্র তরফদার প্রায় সত্তর বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন—এই সংবাদ তাঁর আত্মীয় শ্রীসতীশচন্দ্র তরফদারের কাছে জেনেছি। প্রহ্লাদের বাসস্থান ছিল শিবনিবাসের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পারচন্দননগরে। তিনি জাতিতে পাটিনী। সতীশচন্দ্রকে তাঁদের জাতিকথা জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন তাঁরা রামায়ণান্তর্গত মাধববংশীয়। এই মাধব নাকি রামচন্দ্রকে খেয়ায় পার করেছিলেন। প্রহ্লাদেরও পেশা ছিল খেয়া দেওয়া। তাঁর রচিত কবিতাতেই এর ইঙ্গিত আছে। শোনা যায় তিনি রামায়ণ মহাভারত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও দাশরথি রায়ের পাঁচালীর সঙ্গে বেশ পরিচিত ছিলেন। ছোটবেলা হতেই গানবাজনায় তাঁর গভীর স্পৃহা ছিল। যৌবন কাল হতেই তিনি মুখে মুখে গান রচনা করতেন। পরে কৃষ্ণপুরের ঘোষেদের মধ্যে তিনি একটি গানের দল তৈরি করেন। এখানেই তাঁর গান কয়টির সন্ধান পাওয়া গেছে। তাঁর আরও অনেক গান নাকি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রহ্লাদের পিতার নাম ছিল সদাশিব। প্রহ্লাদের দুই পুত্র, কার্ত্তিক ও গণেশ। উভয়েই পরলোকগমন করেছেন। গণেশ অপুত্রক। কার্ত্তিকের দুই পুত্র জীবিত। নন্দলাল ও কালীপদ। এদের জাতিপেশাই সম্বল।

সাজা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর আবহাওয়াটা শান্তিপূর্ণ নয়; বয়স্থ যারা তারা বেশ একটু সন্ত্রস্তই, ছোটদের মধ্যে একটা চাপা চাঞ্চল্যের ভাব আছে। অথচ ব্যাপারটা বিশেষ এমন কিছু নয়—ললিত-মোহনের সেই নূতন গোলাপ গাছটায় আবার একটা ফুল ফুটছে।

কিন্তু বাইরে থেকে বিশেষ এমন কিছু মনে না হলেও পরিবারটির আভ্যন্তরিক জীবনে বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ছোট্ট গোলাপবাগানটুকু ললিতমোহনের প্রাণ বললেও চলে। কিন্তু পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে সংসার, তাদের বাগানের সখ নেই বটে তবে ফুলের সখ ললিতমোহনের চেয়ে কিছু কম নয়। যতক্ষণ থাকে বাড়ীতে ললিত বাগান নিয়েই থাকে, কিন্তু রূপকথার কুলগাছ-আগলানো বুড়ীর মত অষ্টপ্রহর তো পাহারায় বসে থাকা সম্ভব নয়, কাজ আছে, তার কামাই আছে; এই রকম অবসরে বাগানের ওপর প্রায়ই উৎপাত এসে পড়ে। ফুল অদৃশ্য হয়। চুরিই তো, গুছিয়ে ধীরেসুস্থে তোলা নয়, তাতে ভাঙ্গা ডাল, ছেঁড়া পাতায় বাগান তছনছ হয়ে থাকে। এর পর ললিত-মোহনের যে প্রতিক্রিয়া তাতে দোষী-নির্দোষের কিছু বাদ-বিচার থাকে না। কান্নাকাটি, আপসানি, বড়দের বকাবকি, সব মিলিয়ে একটা যেন ঝড় বয়ে যায় বাড়ীর ওপর দিয়ে।

অবশ্য রোজ নয়; ললিতমোহনের অনুপস্থিতিতে সাবধানও তো থাকে সবাই। কিন্তু কড়া পাহারার মধ্যে থাকার জন্যই যেন এক এক সময় দেখা যায় ছেলেমেয়েগুলি চুরি বিদ্যায় আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠছে, কোন্ ফাঁকতালে কি হয়ে যায়, ব্যাপারটা আর সব দিনের তুলনায় একেবারে গুরুতর হয়ে উঠে। এই রকমটা হয়েছিল যখন এই গোলাপগাছেরই প্রথম ফুলটি ফোটে; সে এক মহামারী কাণ্ড। আবার এই ফুটছে, কি যে হবে কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।

এই গাছটি বাগানের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। ফুলের দিক দিয়ে আর মূল্যের দিক দিয়ে তো বটেই, তা ভিন্ন আভিজাত্যের দিক দিয়েও এর দোসর এ বাগানে তো নেই-ই, সারা শহরের মধ্যে আছে কি না জানা নেই ললিতের। লক্ষ্ণৌয়ের একটি অভিজাত গোলাপ-বাগিচা থেকে বহু আয়াসে এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা। এর আদিপুরুষ শোনা যায় নবাব আমলে নবাব-হারেমে ফুল যোগাত। গাছটি যেদিন বংশ-কাহিনী নিয়ে প্রথমে এল এ বাড়ীতে, সবারই মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

আশঙ্কা ফলল যেদিন প্রথম ফুলটি ফুটল...এবং চুরি গেল।

ছেলেমেয়েদের ওপর দিয়ে যা হবার তা তো হ'লই, অন্য বারের চেয়ে বেশী করেই হ'ল, একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করবার জন্য বড়দের তরফ থেকে যে প্রতিবাদটা উঠল তার ফলে ললিতমোহন আক্রোশের বশে নিজের হাতেই বাগানের গাছপালা ছিঁড়ে উপড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে যাচ্ছিল বাগানটা, বাধা পেয়ে আহার-ত্যাগ করল, তাতেও আক্রোশ না মেটায় দিনদুয়েক বাড়ী-ছাড়াই হয়ে রইল।...গাছটিকে ভালবাসে ললিত ছাড়াও এমন লোকের অভাব নেই বাড়ীতে, কিন্তু যারা খুব ভালো-বাসে তারাও খানিকটা আতঙ্কের দৃষ্টিতে দেখে। ক্রোধে-অভিমানে ললিত যেদিন বাগানটাকে নিঃশেষ করতে উদ্যত হয়েছিল সেদিন তার অস্ত্রের প্রথম আঘাতটা এই গাছটির ওপরই এসে পড়েছিল, যাদের মনে লেগেছিল তারাও মনে করেছিল আপদ গেছে; কিন্তু সেই কোন্ যুগের বেগমদের আশীর্ব্বাদ শিরে বহন করেছে, গাছটি আবার ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠল।

আবার একটি কুঁড়ি ধরল, কিশলয়ের ওড়নায় একটি ছোট মরকতের বুটি; আস্তে আস্তে রূপান্তর ঘটছে, অভিজাত পুষ্প, তার কুঁড়িটাই কত বড়। সবুজের ফাঁকে ফাঁকে গোলাপীর রেখা বেরিয়ে আসছে, প্রসারিত হয়ে উঠছে—পান্নার মুখে চুণির হাসি। তার পর আস্তে আস্তে সেই হাসি বিকশিত হয়ে উঠছে, পাপড়িগুলি বৃন্তের ওপর পড়ছে এলিয়ে এলিয়ে।

একটি ফুলেই সমস্ত বাগানটিকে আলো করে দিচ্ছে।

ললিতমোহন বলছে—এ ফুল গেলে সে যা কাণ্ড করবে, সেটা কারুর কল্পনাতেও আনতে পারে না।

একটা চাপা অশান্তি লেগে রয়েছে বাড়ীর আবহাওয়ায়। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো যায় না, তবু তাড়াতাড়ি ফুটে উঠে ঝরে গেলেই সবাই বাঁচে যেন।

ততদূর আর পৌঁছাতে হ'ল না কিন্তু।

সে দুঃখের কাহিনী বলতে গেলে রুচিরার একটু পরিচয় দিয়ে আরম্ভ করতে হয়।

মেয়েটি ললিতমোহনের ভাইঝি, মেয়েদের মিডল স্কুলের ছাত্রী, এইবার এই স্কুল ছেড়ে হাই স্কুলে গিয়ে উঠবে।

পূর্বেই বলেছি, কড়া পাহারার মধ্যে থেকে ফুল সরাতে হয় বলে যতগুলি এ লাইনে রয়েছে—ছেলেয়মেয়েই গুটি-সাতেক—সবগুলি কম-বেশ করে বেশ দক্ষ। তার মধ্যে, বয়সে সবচেয়ে বড় না হলেও এই মেয়েটি আবার সবার ওপরে যায়। এর কারচুপির আর একটা বিশেষত্ব এই যে, চুরি ধরা পড়লেও চোরাই মাল যে কোথায় যায় তার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। রহস্যটা অবশ্য খুব গভীর নয়, তবে এমন ধরণের যে কারও সন্দেহ সে পথে অগ্রসর হতে পারে না। চোরে-চোরে এক ধরণের ভাই-ব্রাদারির মিল থাকে, সবার গোপন কথা সবাই কিছু কিছু জানে, রুচিরা কিন্তু তার কাজের এটুকু খুব সন্তর্পণে সবার কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছে।

ও ওদের স্কুলের বড় দিদিমণি অর্থাৎ প্রধান শিক্ষয়িত্রীকে ফুল যোগায়। অবশ্য নিত্য নয়, পাবে কোথায়? তবে পাঁচ সাত দশদিন অন্তর যেটি দেয় সেটি একেবারে বাছাই করা। না, এই চৌর্যবৃত্তির মধ্যে তিনিও যে লিপ্ত আছেন এমন নয়। তিনি সাদা মনেই ছাত্রীর উপহার গ্রহণ করে যাচ্ছেন, তবে একদিন প্রশংসা করে বলেছিলেন—'তোমার কাকার দেখছি বাগানের খুব সখ' সেই থেকেই চলছে ব্যাপারটা।

এই উপহার দেওয়ার ব্যাপারটাও আড়ালে রেখেছে রুচিরা, যাতে করে আলোচনাটাও বাইরের দিকে তত আসতে পায় না। যেদিন সংগ্রহ হয় ফুল, স্কুল বসবার বেশ খানিক আগে থাকতেই গিয়ে উপস্থিত হয়, একেবারে দিদিমণির বাসায়, প্রশংসায়, আহ্লাদে দীপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

"বাঃ, কি চমৎকার ফুল। তোমাদের বাগানের নিশ্চয়? এ রকম ফুল আর এখানে কার বাগানেই বা আছে? তা আনলে কি করে? তোমার কাকা শুনেছি ফুল সম্বন্ধে বড্ড কড়া।"

"তিনি নিজেই তো তুলে দিলেন দিদিমণি।" একটু হেসে বলে রুচিরা।

"সত্যি নাকি।..."

"বড্ড ভালবাসেন যে আমায়..."

"সেটা অবিশ্যি বুঝতে পারা যায়, ভালবাসার মতন মেয়েই তুমি; আর কাকাই তো নিজের। তা তোমায় দিলেন, তাঁর ইচ্ছেটা নিশ্চয় তোমার কাছেই থাকে। যদি খোঁজ করে দেখেন..."

আবার একটু হাসে রুচিরা। বলে—

"ফুলটা তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—দিলাম তো, কিন্তু করবি কি বল দিকিন। বললাম—ঘরে রেখে দোব ফুলদানিতে।...বললেন—সেটা কি ঠিক? কোন একটা ভাল জিনিস পেলে সব চেয়ে যাকে ভালবাসা যায়, কি ভক্তি করা যায় তাকে দেওয়া উচিত, এই যেমন তুই ভাইঝি, সবচেয়ে ভালবাসি তোকে, তাই তোকেই দিলাম আমি। তা তুই সবচেয়ে কাকে ভালবাসিস কি ভক্তি করিস?... বললাম স্কুলের বড় দিদিমণিকে।...বললেন—তা হলে তাঁকেই দেবে। গুরুজনও তো তিনি।...কাকা আবার মাঝে মাঝে ধর্ম্ম উপদেশও তো দেন আমাদের..."

ফুল সরবরাহের সঙ্গে যে ধরণের ভূমিকা থাকে তার একটা নমুনা দেওয়া হ'ল। এর পর ওদিকেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবার কথা নয়।

ভক্তির আতিশয্যেই যে দুষ্কর্মটা হয়ে যাচ্ছে এমন মনে করবার অবশ্য কোন কারণ নেই। ভাল ফুল সংগ্রহ করবার একটা স্বাভাবিক আনন্দ আছে, বিশেষ করে ছোটদের মধ্যে, যদি চোখে ধুলো দিয়ে সংগ্রহ করতে হয় ত আনন্দটা আরও বেশী, আবার সে আনন্দ আরও উচ্চাঙ্গের হয়ে ওঠে যদি আরও পাঁচজনের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে সবার চোখে দেওয়া যায় ধুলো।

তার পর চোরাই মাল নিজের ভোগে লাগল কি পরের ভোগে সেটা তেমন বড় কথা নয় ত। এ ত ব্যবসা নয়, নিছক আনন্দ।

একটু স্বার্থের গন্ধ হয়ত থাকে লেগে, স্কুলের কর্ত্রীই তো। একটু বেশীও হয়ত থাকে কখনও কখনও; সামনেই বাৎসরিক পরীক্ষাটা পড়ছে। ফলাফল একটু ভাল দেখিয়ে যেতে পারলেই তো সুনাম।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মত ফুলটি পূর্ণতর হয়ে উঠছে দিন দিন। যতই পূর্ণতর হয়ে উঠছে, আকাশের নক্ষত্রের মতই আর যা যা ফুল—ললিতের বাগানের বাছাবাছা ফুলই সব—সবগুলিই যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। সাত জোড়া চোখ লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে—এ ঘরের জানালার ফাঁকে, ও বারান্দার কোণ থেকে, সেই ও থামের আড়াল থেকে। বাড়ীর সবাই সতর্ক। সশঙ্কও, যখন না হৈ-হৈটা উঠছে এবার।

তার পর উঠল হৈ-হৈ।

উঠল বলার চেয়ে ওঠার উপক্রম হ'ল বলাই ঠিক।

এক জায়গায় আটকে গিয়েছিল ললিত। রাত হয়ে গেছে, প্রায় ন'টা; হন্তদন্ত হয়েই এসে একেবারে বাগানে ঢুকেছিল, যেমন ওর রেওয়াজ; ফুলটি নেই!

অন্য বার ঐখান থেকেই আরম্ভ হয়, হাতের কাছে ওদের যাকে পায় তার ওপরই ঝাল ঝাড়তে ঝাড়তে ঢোকে বাড়ীতে, আজ আর তা নয়, সমস্ত রাগটা চেপে হন হন করে চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে এল, তার পরেই বাড়ী কাঁপিয়ে এক হুঙ্কার—"মা, পোড়ারমুখী অরুচি কোথায়? ফুলটা সরিয়েছে!"

অত বড় বাড়ীটায় যেখানে যা আওয়াজ উঠছিল সব সঙ্গে সঙ্গে গেল থেমে। তার পর যেন সাড়া ফিরে এল—

"নিলে তুলে! এত সাবধানের মধ্যে থেকেও!...কি সব ছেলেপুলে বাবা!...তা ওই যে তুলেছে..."

"ও-ই—ও-ই আর কেউ নয়—কোথায় সে?...আমি বেরুবার সময় যেমন পৈঠের ওপর ভালমানুষের মতন বসেছিল—তখুনি টের পেয়েছিলাম ফুলটার পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে—তা আমার ফুলের পরমায়ু শেষ হলে ওর পরমায়ুও শেষ আজ—কোথায় সে? কোথায় গেলি? কোথায় থাকতে পারিস লুকিয়ে দেখছি আমি—কতক্ষণ থাকতে পারিস..."

এ-ঘর, ও-ঘর, এ-বারান্দা ও-বারান্দা করে গর্জাতে গর্জাতে ওপরতলায় চলে গেল। সবাই শিউরে রয়েছে, একটা অনর্থ ঘটবেই। ভাজ বলছে—"ওরই কাজ। দিন্ শেষ করে—মেয়েছেলের এত বাড়! উনি না শেষ করতে পারেন আমি আছি..."

এক ধার থেকে ওপরের ঘরগুলো দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে ললিত। শিকারকে কোণঠাসা করে এনেই যেন গর্জনটা গেছে কমে, যেটুকু আছে—একটা চাপা ফোঁস-ফোঁসানি। সব ঘর দেখে নিয়ে একেবারে শেষের ঘরটার চৌকাঠের সামনে এসে দাঁড়াল; তারই ঘর এটা। আন্দাজ ভুল নয়, রয়েছে রুচিরা এবং যেভাবে হাত দুটো গলার কাছে জড়ো করে গুটিসুটি মেরে আলমারিটা ঘেঁষে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাজটা যে ওর-ই তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

নিঃসন্দিগ্ধ কণ্ঠেই প্রশ্ন করল ললিত—"ফুল কোথায়? বল্ নয়ত..."

বলবার অবস্থা নেই; রুচিরা শুধু ঘাড়টা ঘুরিয়ে ঘরের অন্যদিকে খাটটার ওপর দৃষ্টিপাত করল...ললিত চৌকাঠ ডিঙিয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দাঁড়াল।

পুবের জানলা দিয়ে ঢালা জ্যোৎস্না এসে চাঁপা রঙের বেড-কভারটার ওপর পড়েছে। নববধূ শুক্লা সমস্ত শরীরটি ঘুমের কোলে এলিয়ে দিয়ে আছে শুয়ে। আজকাল ঘুমাতে তো তেমন করে পারে না বেচারী, এই রকম অবসর খুঁজে একটু আশা মিটিয়ে নেয়।

সেই গোলাপটি—প্রায় পূর্ণপুষ্ট—খোঁপার পাশে বালিশের ওপর রয়েছে পড়ে। এক বৃন্তে দুটি ফুটন্ত ফুল।

স্পষ্টই তো বোঝা যায়, আর উপায় না দেখে তাড়াতাড়ি বুদ্ধি করে নূতন কাকীমার খোঁপায় গুঁজে দিতে গিয়েছিল রুচিরা, অতি ত্রস্ত বলেই পেরে ওঠে নি।

না, অত অকৃতজ্ঞ কি মানুষ হতে পারে? কিন্তু তবু একটা সাজা দিতে হয় বৈকি—লোকদেখানো; একেবারে অত গনগনে হয়ে ঠেলে উঠল।

রাগটা যেন অতি কষ্টে চেপে দোরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—"বেরো পোড়ারমুখী—এখখুনি বেরো—আর আর সাত দিন তুই ঢুকতে পারবি না এ ঘরে...বেরুলি?"

অকৃতজ্ঞ নয়। দিত না নিশ্চয়, এটুকুও সাজা।...কিন্তু, দেখতে হবে না নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ? তার পর ভাইঝির অসম্পূর্ণ কাজটুকু সম্পূর্ণ করে আস্তে আস্তে ঘুম ভাঙাতে হবে না শুক্লার?

নন্দঋষি

(১৩৭৭—১৪৩৮)

অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকে কাশ্মীরে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় কাশ্মীরের সাংস্কৃতিক জীবনে ঘোরতর দুর্দ্দিন চলিতেছিল। মুসলমান বিজয় কাশ্মীরের সংস্কৃতিকে নবজীবন দান করে। চতুর্দ্দশ শতকে কাশ্মীর-দুহিতা লল্ল যোগেশ্বরী ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠে যে সাম্য ও সমন্বয়ের বাণী উদগীত হইয়াছিল, কাশ্মীরের জীবন-দর্শনে আজও বুঝি তাহার রেশ শুনিতে পাওয়া যায়।

লল্ল যোগেশ্বরী যে পথের পথিকৃৎ, তাঁহার শিষ্য শেখ নুরউদ্দিন সেই পথেরই অন্যতম অমর পথিক। নুরউদ্দিনের ধমনীতে রাজরক্ত প্রবাহিত হইত। তাঁহার প্রপিতামহ কিস্তওয়ার-এ রাজত্ব করিতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গৃহযুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় পরিবারবর্গ কাশ্মীর উপত্যকায় কাইমুতে বসবাস করিতে থাকেন। তাঁহার পৌত্র অর্থাৎ নুরউদ্দিনের পিতা শেখ সালারউদ্দিন পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাইমুতে নুরউদ্দিন ভূমিষ্ঠ হন। জনশ্রুতি এই যে, সদ্যোজাত নুরউদ্দিন মাতৃস্তন্য পান না করায় তাঁহাকে লল্ল যোগেশ্বরীর নিকট লইয়া যাওয়া হয়। তিনি নুরউদ্দিনকে বলিলেন যে, তাঁহার বৈরাগ্য-মর্কট বৈরাগ্য। শিশু কি বুঝিল সেই জানে। কিন্তু ইহার পর হইতে নাকি সে স্তন্যপানে আপত্তি করে নাই।

নুরউদ্দিন বাল্যকাল হইতেই গতানুগতিকতার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। ধর্ম্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং গতানুগতিক শিক্ষার উপর তাঁহার আস্থা ছিল না। নির্জ্জনতাপ্রিয় বালক প্রহরের পর প্রহর গভীর চিন্তায় আত্মহারা হইয়া থাকিত। সে কি চিন্তা করিত সে-ই জানে। চারিপাশে কি ঘটিতেছে তাহার প্রতি তাহার কোন লক্ষ্যই থাকিত না। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশী সকলের চোখেই নুরউদ্দিনের চালচলন বিসদৃশ, অস্বাভাবিক মনে হইত। যাহাকে লইয়া আলোচনা চলিত সে কিন্তু নির্ব্বিকার। নুরউদ্দিন তখন সত্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত, সংসারের স্তুতিনিন্দায় তাঁহার কি যায় আসে? নুরউদ্দিন অনন্তের ডাক শুনিতে পাইয়াছেন। অনন্তের সুরে নিজের জীবন-বীণার তার বাঁধিবার দুশ্চর তপস্যায় তিনি প্রবৃত্ত। কে কি ভাবিল বা বলিল তাহার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার অবসর তাঁহার কৈ?

নুরউদ্দিন ইহার পর লল্লেশ্বরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গুরুর কৃপায় তাঁহার সমস্ত সন্দেহ দূর হইল। তাঁহার মানসমুকুল সহস্রদল পদ্ম হইয়া ফুটিয়া উঠিল। পরম প্রশান্তিতে তাঁহার অন্তর ভরিয়া গেল।

নুরউদ্দিন বরাবর শান্ত, সংযত জীবনযাপন করিয়াছেন। তিনি আজীবন ধর্ম্মসমন্বয়ের সাধনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, সমস্ত ধর্ম্মই মূলতঃ এক। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্ব তৎপ্রচারিত ধর্ম্মের মূলসূত্র। মাংস, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য তিনি স্পর্শও করিতেন না। জীবনের শেষভাগে দুধ এবং মধুও তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ১৪৩৮ সনে একষট্টি বৎসর বয়সে তিনি দেহরক্ষা করেন। বুদশাহ (১৪২০-১৪৭০) এই সময় কাশ্মীরের সুলতান। তিনি নুরউদ্দিনের শবানুগমন করিয়া তাঁহার আত্মার শান্তি ও মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কাশ্মীর উপত্যকার চার-এ নুরউদ্দিনকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার জীবনের শেষভাগ চারেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক গুরু নানকের মত তিনিও 'হিন্দুকা গুরু, মুসলমানকা পীর' —অর্থাৎ, হিন্দুর গুরু এবং মুসলমানের পীর ছিলেন।* চারে প্রতিষ্ঠিত নুরউদ্দিনের সমাধিমন্দির কাশ্মীরবাসীর পরম পবিত্র তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুদিবসে এখানে বহু যাত্রীসমাগম হয়। হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাঁহাকে কাশ্মীর উপত্যকার রক্ষক এবং অধিষ্ঠাতৃ মহাপুরুষ মনে করে। লল্ল যোগেশ্বরীর ন্যায় তাঁহার পবিত্র স্মৃতিও কাশ্মীরের জনচিত্তে অমর হইয়া রহিয়াছে।

কাশ্মীরবাসী হিন্দুগণ মনে করেন যে, জাতিতে মুসলমান হইলেও নুরউদ্দিন প্রকৃত প্রস্তাবে অতি উন্নত স্তরের হিন্দুসাধক ছিলেন। তাঁহাদের নিকট তিনি সহজানন্দ নামে পরিচিত। হিন্দু ভক্তগণ কর্ত্তৃক তদীয় বাণী এবং উপদেশ ঋষিনামা গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তক সারদা লিপিতে† লিখিত। নুরউদ্দিনের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে তাঁহার ভক্ত শিষ্য নাসিরউদ্দিন গাজী ফারসি ভাষায় গুরুর জীবনকাহিনী এবং তাঁহার উপদেশাবলী ফারসি

* পাঞ্জাবে গুরু নানক সম্বন্ধে বলা হয়—
"গুরু নানক শাহ ফকির
হিন্দুকা গুরু মুসলমানকা পীর"

† পূর্ব্বে কাশ্মীরী ভাষা সারদা লিপিতে লিখিত হইত।

অক্ষরে লিপিবদ্ধ করেন। ফারসি অক্ষরে লিখিত নুরউদ্দিনের উপদেশাবলী নুরনামা নামে পরিচিত।

কাশ্মীর উপত্যকার সাধারণ মানুষের নিকট নুরউদ্দিন নন্দঋষি নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় চারি শত বৎসর পর, উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কাশ্মীরের আফগান শাসনকর্ত্তা আতা মোহাম্মদ খাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কাশ্মীরবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি নুরউদ্দিনের নামে মুদ্রা প্রচলিত করেন। এই মুদ্রার এক দিকে "হে নুরউদ্দিন, হে বিশ্বপতি" এবং অপর দিকে "এই সংসার গলিত মাংস, ইহার নিকট হইতে যাহারা কিছু প্রত্যাশা করে তাহারা কুকুর"—এই কথা কয়টি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম শিখগুরু নানক এবং দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মগুরুর নামে মুদ্রা প্রচলনের কথা আমরা জানি না। পঞ্জাবকেশরী মহারাজা রণজিৎ সিংহের নানকশাহী মুদ্রায় ইঁহাদের নাম পাওয়া যায়।

ভগবৎপ্রেম এবং ভগভক্তি নন্দঋষির জীবনবেদের মর্ম্মকথা। তাঁহার একটি বাণীতে পাই—

"প্রেমের আগুনে যে জ্বলিতেছে, সে নিজেই ত মূর্ত্তিমান প্রেম, কাঞ্চনের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় প্রেমিকের সত্তা। প্রেমের অগ্নিশিখায় হৃদয়মন উদ্ভাসিত হইলে তবেই ত অনন্তের সন্ধান পাওয়া যায়।"

অপর একটি বাণীতে নুরউদ্দিন ভগবৎ-প্রেমকে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে ব্যথিতা জননীর শোকের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শোকার্ত্তা জননীর ন্যায় ভগবৎ-প্রেমিকের চোখেও ঘুম থাকে না।

লল্লেশ্বরীর মত নুরউদ্দিনও বলিতেন যে, সাধনার পথে বাধা বিপত্তিতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না। অন্তরের মণিকোঠায় সত্য ও প্রেমের দীপ জ্বালিবার প্রয়াস—প্রতিকূল প্রভাবে হয়ত বার বার ব্যর্থ হইয়া যাইবে।' কিন্তু সত্যসন্ধানী সাধককে বাধা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে—'জীবন-কণ্টক পথে যেতে হবে নীরবে একাকী—সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি, বিরলে মুছিয়া অশ্রু-আঁখি,...।' ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকিলে সাধনায় সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

একটি বাণীতে নুরউদ্দিন বলিতেছেন, "বিধাতার আঘাতের বিরুদ্ধে নিজেকে বর্ম্মাবৃত করিও না। তাঁহার উদ্যত খড়্গের আঘাত এড়াইবার জন্য মুখ সরাইয়া লইও না। দারিদ্র্যকে চিনির মত মধুর মনে করিও। তবেই ইহলোক এবং পরলোকে মর্য্যাদা লাভ করিবে।"

এ সুর আমাদের অপরিচিত নয়। 'বিধাতার বিধানকে বরণ করিয়া লও'—এই ত শাশ্বত ভারত-আত্মার মৃত্যুহীন বাণী।

নুরউদ্দিন সম্বন্ধে প্রচলিত বহু কাহিনীর মধ্যে একটির উল্লেখ করিতেছি। একবার নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি এক গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হন। শতছিন্ন মলিনবসন-পরিহিত নুরউদ্দিনকে ভোজন-সভায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইল না। বাড়ী ফিরিয়া খুব দামী কাপড়জামা পরিয়া নুরউদ্দিন দ্বিতীয় বার নিমন্ত্রণ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। এইবার মহাসমাদরে তাঁহাকে খাওয়ার জায়গায় লইয়া যাওয়া হইল। খাবার দেওয়ার পর সকলে অবাক হইয়া দেখিল যে, নুরউদ্দিন কিছুই খাইতেছেন না; নিজের জামার লম্বা আস্তিন এবং চোগার নীচের দিক খাওয়ার জিনিষের উপর রাখিয়া চুপচাপ বসিয়া আছেন। গৃহস্বামী এবং অন্যান্য অতিথিগণ এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জানিতে চাহিলে নুরউদ্দিন বলিলেন যে, তাঁহার জামাকাপড়কেই ত খাইতে দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে নয়। মুখের মত জবাব পাইয়া সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

নুরউদ্দিনের জীবদ্দশায় বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠন করেন নাই। প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের মধ্যে বাবা নাসিরউদ্দিনই গুরুর সর্ব্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিলেন। গুরু শিষ্যকে আদর করিয়া নসরু বলিয়া ডাকিতেন। নাসিরউদ্দিনকে সম্বোধন করিয়া রচিত নুরউদ্দিনের একটি কবিতায় তাঁহার নিজের অতীত জীবনের আভাস পাওয়া যায়—

এমন দিন গিয়াছে যখন নদীর কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হইতে নসরু, নিজেকে বাঁচাইবার কোন আবরণ আমার ছিল না। মণ্ড এবং অর্দ্ধ-সিদ্ধ শাকসব্জিই ছিল আমার জীবনধারণের একমাত্র উপায়।

নসরু, আবার এমন দিনও গিয়াছে যখন প্রিয়া আমার পাশে ছিল। গরম কম্বলেরও সেদিন অভাব হয় নাই। তখন মাছ এবং অন্যান্য খাদ্যও জুটিয়াছে।

নুরউদ্দিনের মৃত্যুর পর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যগণের চেষ্টায় একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হয়। এই সম্প্রদায়-ভুক্ত সকলকেই ঋষি বা বাবা বলা হইত। মুসলমান হইলেও ইঁহারা ধর্ম্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করিতেন। ইঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, ত্যাগপরায়ণতা এবং চরিত্রমাধুর্য্য কাশ্মীরে ইসলাম প্রচারে সহায়তা করিয়াছে।* কাশ্মীরের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনও ঋষি-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। ঋষিগণ কোন দিনই রাষ্ট্রের আনুকূল্য বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইঁহাদের আদর্শনিষ্ঠা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা কাশ্মীরবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর স্বীয় জীবনস্মৃতিতে মুক্তকণ্ঠে ইঁহাদের

---

* "The Muslim mystics, well-known as Rishis or Babas or hermits, considerably furthered the spread of Islam by their extreme piety or self-abnegation which influenced the people to a change of creed."—Kashmir, by Ghulam Mahiyi'd Din Sufi, vol. I, p. 36.

প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঋষিগণ শাস্ত্রজ্ঞ বা পণ্ডিত নন, কিন্তু ভণ্ড বা প্রতারকও তাঁহারা নন। ইঁহারা কাহাকেও কটু কথা বলেন না। ইঁহারা নির্লোভ এবং কিছুই বাঞ্ছা করেন না। ইঁহারা কেহই বিবাহ করেন না। মাংস ইঁহারা খান না। ইঁহারা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করেন। কিন্তু নিজেদের রোপিত বৃক্ষের ফলভোগের কামনা ইঁহারা করেন না। পরের সুবিধার জন্যই ঋষিগণ বৃক্ষ রোপণ করেন। সংখ্যায় ইঁহারা ন্যূনাধিক দুই সহস্র।

সারনাথে

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

১

সাবধান পদক্ষেপে চলি ফিরি চত্বরে চত্বরে ;
বিশীর্ণ পাণ্ডুর কত শিলালিপি পড়ে যে নয়নে !
চৈত্যের কঙ্কাল কত শিলায়িত মৃত্তিকার 'পরে।
মৈত্রীর মিতালী ক্ষেত্রে হারানো অতীতে পড়ে মনে।

২

মৃগদাব সারনাথ, আলোর আলোক-তীর্থ এ যে !
কত না মুহূর্ত্ত হেথা অক্ষয় হয়েছে প্রেমামৃতে !
প্রজ্ঞার প্রথম বাণী বুদ্ধকণ্ঠে উঠেছিল বেজে।
স্মরণের স্বর্ণরেখা আজো লেখা স্তূপে চারিভিতে।

৩

রত্নোদ্ধারে ব্রতী নহি, জ্ঞানের ডুবারী নহি জানি।
সত্যের সাক্ষাৎ পাব সে এষণা কিছুমাত্র নাই।
অতীত অতলে মন তবু ডুবে খুঁজে নিতে বাণী।
ভগ্ন সংঘারামে যদি ইতিহাস এতটুকু পাই।

৪

শতাব্দীর ধূলিচাপা নষ্টপৃষ্ঠ মহা ইতিহাস
মরণের মুঠো হতে ছিনাইয়া রেখেছে আপনা।
হারানো মানিক কত, কত ঝরা কুসুমের বাস
হেথা হোথা স্তূপ-স্তম্ভে ছড়ায়ে রয়েছে কণা কণা।

৫

ধামেক স্তূপের শীর্ষ মিশে যেন নীলিমার নীলে।
সবুজের পটভূমে রবি-কর-বর্ণালি-বিলাস।
অনন্তের পদপ্রান্তে অনিত্যের নিয়ত মিছিলে।
প্রীতিকামী প্রসন্নতা উছলিয়া উঠে বারোমাস।

৬

মারজয়ী অমিতাভ, পঞ্চজন প্রিয় শিষ্য সাথে
হেথা এই সারনাথে প্রচারেন অহিংসার কথা।
দাবদগ্ধ মানবের অন্তর্গূঢ় মর্ম্মবেদনাতে
শান্তির প্রলেপ দানে স্নিগ্ধ পরলোকের বারতা।

৭

অশোকের মৈত্রী-স্বপ্ন মূর্ত্ত হেথা চিহ্নিত পাষাণে।
ঘরে ঘরে থরে থরে সারনাথে হের নিদর্শন।
সিংহ-শীর্ষ-স্তম্ভ, চক্র, কি অপূর্ব্ব ভাবাবেগ আনে।
শিল্পের চাতুর্য্যে মুগ্ধ চিরদিন করে গণমন।

৮

বুকে নিয়ে কত কথা প্রান্তরেতে ঘুমায় অতীত।
আজো হয় মৌন-স্তূপ মুখরিত মন্ত্র গুঞ্জরণে।
ভিক্ষুকণ্ঠে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-স্মরণের মহিমা ধ্বনিত
প্রেমঘন তথাগতে বার বার পড়ে আজো মনে।

"তারা নাচতে ভালবাসে"

শ্রীএস. এন. ব্যানার্জ্জি

গত তিন বৎসর যাবৎ কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের বার্ষিক উৎসব-দিনগুলিতে কতকগুলি নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করে আসছে। গত বার্ষিক উৎসব-দিবসে তাদের দ্বারা শকুন্তলা নাটকের একটি দৃশ্যের নৃত্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দৃশ্যপট উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল আশ্রমে তপস্যায় রত ঋষি কণ্ব। প্রবেশ করল আশ্রমশিশুরা, আহরণ করতে লাগল ফল এবং ফুল—বিশ্বছন্দের তালে তালে আনন্দে নৃত্য করতে লাগল তারা। তাদের খেলার সাথী একটি বাজপাখীও নাচতে থাকে তাদের সঙ্গে। ঋষির কাছে গিয়ে তারা তাঁর পায়ে দেয় ফল-পুষ্পের অর্ঘ্য। মুনিবর উঠেন তাঁর আসন থেকে, আশীর্ব্বাদ করেন শিশুদের —নাচিয়ে শিশুর দলটি তখন মঞ্চ পরিত্যাগ করে।

তার পর এক দিক থেকে বাজপাখীটি আবার এসে মঞ্চে প্রবেশ করে, মঞ্চের আর এক দিক থেকে তীরধনুসহ এসে আবির্ভূত হন রাজা—বাজপাখীটির পশ্চাদ্ধাবন করেন তিনি।

নৃত্য করতে করতে প্রবেশ করে শকুন্তলা—নিজের অন্তরে নিহিত জীবনানন্দ অভিব্যক্ত হয় তার চরণছন্দে। তার সখীরাও এসে হাজির হয়। ঋষির জন্য আপন অর্ঘ্য নিয়ে চলে যায় শকুন্তলা। পুনরায় প্রবেশ করেন মৃগের পশ্চাদ্ধাবনরত রাজা—রাজার সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হয় সখীরা। মঞ্চে আবার দেখা দেয় শকুন্তলা—নৃত্যপরা সখীরা তাকে বলে রাজার উপস্থিতির কথা—শকুন্তলার অন্তরে প্রদীপ্ত হয়ে উঠে প্রেমের প্রথম স্ফুলিঙ্গ। নিজের আহৃত পুষ্পসমূহ দ্বারা মাল্যরচনা করতে বসে যায় সে—সখীরা চলে যায় তাকে একাকিনী ফেলে।

পুনরায় প্রবেশ করে নৃপতি কর্ত্তৃক বিতাড়িত বাজপাখী, এবার সে আশ্রয় নেয় শকুন্তলার পেছনে। মঞ্চে আবার দেখা যায় রাজাকে। শকুন্তলার অনুপম সৌন্দর্য্যে অভিভূত হন রাজা, হাঁটু গেড়ে বসে তাকে প্রেমনিবেদন করেন তিনি। রাজার গলদেশে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় শকুন্তলা—তার পর পরস্পরের হাতধরাধরি করে আনন্দ-নৃত্যে মেতে উঠেন তাঁরা। আবার আসে সখীরা এবং নৃত্য করে তাঁদের সঙ্গে—যবনিকা নেমে আসে।

নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হলে পর কয়েক জন ব্যক্তি আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। বালিকাদের হর্ষপ্রদীপ্ত আননগুলো থেকে প্রতীয়মান হচ্ছিল যে, তারা খুব আনন্দ উপভোগ করেছে, কিন্তু কেমন করে উপভোগ করবে তারা —তারা যে বধির! ঐকতানের সঙ্গে তালই বা রাখতে পেরেছিল তারা কেমন করে।

সেদিন দিল্লী থেকে একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। কলিকাতায় আসবার আগে দিল্লীতে তিনি ড. হেলেন কেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ড. কেলার যে গানবাজনা ভালোবাসেন এতে তিনি প্রবল বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

সাধারণতঃ সঙ্গীতের দুটি অংশ আছে—সুর এবং তাল। অবশ্য পরিপূর্ণ মাত্রায় সঙ্গীত উপলব্ধি করতে হলে বুঝতে হবে এর উভয় অংশকেই। ড. হেলেন কেলার বধির হয়েছিলেন অতি শৈশবকালে এবং সঙ্গীতের সুর সম্বন্ধে তাঁর ন্যূনতম ধারণাও নেই কেবলমাত্র এইটুকু ছাড়া যে, স্পর্শের দ্বারা তিনি স্বরগ্রামের উর্দ্ধসীমাসমূহের বিভিন্নতা উপলব্ধি-করতে পারেন। কিন্তু তাঁর আশ্চর্য্যজনক ভাবে উৎকর্ষ-প্রাপ্ত স্পর্শের দ্বারা তিনি গীতবাদ্যের ছন্দায়িত গতি অনুভব এবং উপভোগ করেন। এটা বলা অবশ্য অতিশয়োক্তি হবে যে, আমরা—শ্রবণশক্তিসম্পন্ন লোকেরা, গীতবাদ্য যেমন ভালবাসি ড. হেলেন কেলারও তেমনি ভালবাসেন। কিন্তু একথা বলা পুরোপুরিই সমীচীন হবে যে, ছন্দ বা তালের প্রতি তাঁর অনুরাগ আছে এবং একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের অনেকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর-

রূপে তিনি ছন্দ ও তাল বোঝেন এবং ভালবাসেন—কেন-না সুন্দর জিনিষ উপলব্ধি করবার মত একটি অনন্যসাধারণ মনের অধিকারিণী তিনি।

এখন আমাদের বিদ্যালয়ের বালিকাদের দ্বারা প্রদর্শিত নৃত্যানুষ্ঠান প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসা যাক।

কি ভাবে ঐকতানের সঙ্গে তাল রাখতে পেরেছিল তারা? এ প্রশ্নের জবাব কিন্তু খুবই সহজ। তারা তো ঐকতানের অনুসরণ করে নি, বরং ঐকতানই অনুসরণ করেছিল তাদের। বস্তুতঃ একজন নৃত্যকারী সেই ছন্দেই নৃত্য করে, যা আছে তার অন্তরে নিহিত, নিজের আত্মায় যে ছন্দের স্পন্দন অনুভব করে তাই রূপায়িত হয়ে ওঠে তার চরণছন্দে। ইসাডোরা ডানকানের মত একজন মহীয়সী নৃত্যশিল্পী তাঁর নৃত্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা এখানে আমি উদ্ধৃত করছি: "মঞ্চের উপরে যাবার আগে আমাকে অবশ্যই আমার আত্মার ভিতরে রাখতে হবে একটি 'মোটর'। সেটি যখন সক্রিয় হতে আরম্ভ হবে তখন আমার পদদ্বয়, বাহুদুটি এবং আমার সারা দেহ সঞ্চালিত হবে আমার ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে। কিন্তু আমার আত্মায় সেই মোটর রাখবার সময় যদি আমি না পাই তা হলে আমি নাচতে পারি না।" আত্মায় এই মোটর রাখাই হচ্ছে দিব্য নৃত্য-সৃষ্টির প্রথম উপজীব্য। যা আয়তনে বিরাট এবং হাওয়ায় পালের মত ফুলে ওঠে—তেমনি সহায়ক একটি ঐকতান নৃত্যশিল্পীকে আত্মাকে আহ্বানকারী সঙ্গীত শুনতে এবং অন্তরসত্তার বিরাট শক্তির উপস্থিতি অনুভব করতে আর তাঁর সঙ্গে দিব্যানন্দে নৃত্য করতে সাহায্য করে।

আমার মূক নৃত্যকারিণীদের দুর্ভাগ্য এই যে, নিজেদের পদদ্বয়, বাহুযুগল এবং শরীর দোলানোর আগে সঙ্গীত শ্রবণ করবার ক্ষমতা থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। কিন্তু তাদের ভিতরে আছে এমন এক আত্মা যার কল্যাণে তারা বিশ্বছন্দ অনুভব ও জীবনানন্দ উপভোগ করতে এবং তাদের অন্তরে বাস করছে যে মহাশক্তি, তাঁর সহিত যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়। একবার যদি তাঁরা এই অনুভূতির স্পর্শটুকু পর্য্যন্ত পায় তা হলে অন্তরের অন্তরে তারা যে ভাবাবেগ অনুভব করে তারই ছন্দে ছন্দে তারা নৃত্য করে আনন্দে। আত্মা যখন আনন্দে নৃত্য করে তখন ঐকতানের প্রয়োজন তাদের কিসের? প্রত্যেকেই হতে পারে না নৃত্যকারিণী—তা সে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন হোক, কিংবা বধিরই হোক—এর জন্যে তার অনুভব থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যে ছোট মেয়েটি বাজপাখীর ভূমিকাকে রূপ দিয়েছিল সে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে আন্দাজ আধ ঘণ্টাকাল ছিল মঞ্চের উপরে। নৃত্যানুষ্ঠান যতই এগোতে লাগল ততই আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, বালিকাটি হারিয়ে ফেলেছে তার আপন ব্যক্তিত্বকে আর ডুবে গেছে বাজপাখীর নর্ত্তন কুর্দ্দনের মধ্যে। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যাঁরা, তাদেরও অভিমত তাই। প্রিয়প্রতীক্ষমাণা শকুন্তলার ব্যাকুল প্রতীক্ষা ফুটে উঠেছিল তার আননে, স্মিতহাস্যে এবং লীলায়িত দেহভঙ্গীতে।

সকলেই হতে পারে না শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী। তার মধ্যে থাকা উচিত সেই সৌন্দর্য্য, সেই কবিত্ব, সেই সত্য যা তাকে নিয়ে যাবে উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে—তার আত্মাকে লীন করে দেবার জন্যে মহান বিশ্বাত্মার সঙ্গে। কোন মূক বালিকার ভেতরে যদি থাকে সেই আত্মা এবং সে যদি পায় সুযোগ ও উৎসাহ তবে ডানকান বা নিজিনিস্কি কিংবা প্যাভলোভার মত শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী না হলেও সেও হতে পারে একজন প্রকৃত নৃত্যশিল্পী। শারীরিক দিক দিয়ে তার একটি নিদারুণ ত্রুটি আছে এই যে, সে গান শুনতে পায় না। কিন্তু সে এমন জড়বুদ্ধি নয় যে, তাকে মৃতের সামিল বলে, সকল ভাবাবেগের নিকট পাষাণবৎ বলে একপাশে ঠেলে রাখতে হবে—যাবতীয় স্বাভাবিক ভাবাবেগের অধি-কারিণী সে—তাকে দিতে হবে সেগুলির বিকাশসাধনের সুযোগ এবং উৎসাহ।

তরুণ মূকবধির শিল্পী সতীশ গুজরাল
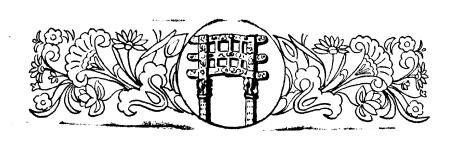
শ্রীআম্মু কৃষ্ণস্বামী

"আমার মনে হয়, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের তরফ থেকে না এলেই ভাল করতেন আপনি।" এই হেঁয়ালিপূর্ণ কথাগুলি দ্বারাই প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় স্বাগত করলেন আমাকে আজকের দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী সতীশ গুজরাল। তিনি যদি শিল্পী না হতেন তা হ'লে তাঁর এই উক্তি বিশেষ ভাবে বিব্রত করে তুলত আমাকে। আমি জানতাম এ ধরনের কথা বলবার সপক্ষে যুক্তি ছিল তাঁর—অচিরেই আমি কল্যাণ দৃষ্টিকোণের প্রতি তাঁর চরম ঔদাসীন্যের হেতু উপলব্ধি করতে পারলাম। নিষ্ঠাবান পিতামাতার স্পর্শকাতর শিশু সতীশ গুজরাল শ্রবণশক্তি হারান দশ বৎসর বয়সে—এক অসুখের সময় মাত্রাতিরিক্ত ঔষধ সেবনের ফলে। তিনি এক মূক-বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু এক মাস হাজিরা দেওয়ার পরই তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করলেন—কেননা সেখানে গিয়ে তাঁর এই অনুভূতি হ'ল যে তিনি সাধারণ মানুষের চেয়ে পৃথক ধরনের। তাঁর মধ্যে যে অদ্ভুত একটা কিছু ঘটেছে সে বিষয়ে যে তিনি সচেতন ছিলেন তা তিনি স্মরণ করতে পারলেন। গৃহের স্নেহতপ্ত এবং আরামপ্রদ পরিবেশে এ অনুভূতি তাঁর হয় নি। "কিন্তু অন্য শিশুদের সাহচর্য্য", তিনি বললেন, "আমি আমার ভিতরে এমন একটা নিঃসঙ্গতা অনুভব করলাম যা আমার সত্তাকে করে দিয়েছিল চূর্ণবিচূর্ণ।"—কাজেই সেখানে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে তিনি পারলেন না। তাঁর শিক্ষার তত্ত্বাবধান করা হতে লাগল গৃহের হৃদ্যতম পরিবেশে। গুজরাল সঙ্গত ভাবেই এ কথা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন যে, তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে আলাদা ধরনের, আর তাঁর বধিরতা দৈহিক ত্রুটিও যদি হয় তা হলেও —সম্পূর্ণ বধিরতাকে পর্য্যন্ত সামান্য অসুখের বাড়া আর কিছু বলে গণ্য করা যেতে পারে না। নিজের দায়িত্ব বহনের উপযোগী ভাবে জীবনযাত্রা অনুশাসিত করতে সমর্থ হয়ে একজন বয়স্ক ব্যক্তিরূপে যখন তিনি সংসারের মুখোমুখি দাঁড়ালেন—কেবলমাত্র তখনই তাঁকে তীব্রভাবে সচেতন হতে হ'ল চতুষ্পার্শ্বের নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে, এমন এক জগৎ সম্বন্ধে যা তাঁকে তার শ্রবণশক্তির বিনষ্টি ভুলতে দিতে প্রত্যাখ্যান করলে। এমনি ভাবে তাঁর জীবনে যে ব্যর্থতার আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই ব্যর্থতাই কিন্তু গড়ে পিটে তৈরি করেছে গুজরালকে—আজ গুজরাল যা হয়েছেন তা কিন্তু সেই ব্যর্থতারই শুভ পরিণাম।

"আপনি জানেন", বললেন সতীশ গুজরাল "মানুষের মধ্যে আছে অভ্যুত্থানের একটি স্বাভাবিক এষণা। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাই 'একলা চলতে', নিজেদের সহজ সরল জীবনযাপন করতে, কিন্তু তা করতে দেওয়া হয় না আমাদের।

অনেক দিক দিয়ে ভাগ্যবান ছিলেন গুজরাল। এমন এক পরিবেশের মধ্যে তিনি বেড়ে উঠেন যেখানে তাঁর অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের জন্য ছিল শিল্পকলা, দর্শন এবং সাহিত্য। সাহিত্য ছিল প্রারম্ভিক পন্থাসমূহের অন্যতম যার সাহায্যে তিনি চিনতে পেরেছিলেন নিজের বাইরের জগৎকে। দুঃখদুর্গতিভোগ কাকে বলে তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন তিনি। এই অনুভূতির মাত্রা আরও প্রবলতর হয় এই বিষয়টির দরুন যে, অন্যান্য অনেক উৎসাহী জাতীয়তাবাদী দেশভক্তের ন্যায় তাঁর পরিবারের লোকেদের ভাগ্যেও জুটেছিল অশেষ দুঃখ-দুর্গতি এবং অভাব-অনটন। এই দুঃখ-দুর্গতিই তাকে দিয়েছিল মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের হৃদয়হীনতা উপলব্ধি করবার সূক্ষ্ম দৃষ্টি।

জীবনের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক সতীশ গুজরালকে সমাজের মনস্তাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের হেতুসমূহ, আচরণ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে গভীরতর ভাবে চিন্তা করতে প্রণোদিত করেছে। তিনি যা দেখলেন তা তাঁকে করল নিরাশ, কেননা, তিনি বললেন—"কোন জাতি যখন আর্থিক দিক দিয়ে অনুন্নত হয় তখনও সে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু জাতি যখন মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনুন্নত হয় তখন নৈতিক দিক দিয়ে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এইটিই হচ্ছে আমাদের যুগের ট্র্যাজেডি। কিছুকাল পূর্ব্বে আমি বিশ্বাস করতাম যে, দীর্ঘকালান্তরে এ সবের পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু লোকেরা যদিও বধির অথবা অন্য যে-কোন ধরনের দৈহিক অপটু লোকেদের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন তথাপি ভাবাবেগের দিক দিয়ে কিন্তু তারা সমস্তরের মানুষ হিসাবে তাদের গ্রহণ করতে নারাজ। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের

সভ্যতার যা বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে সে হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের ভাবাবেগসমূহ কিন্তু রয়ে গেছে ঠিক তেমনিধারাই যেমনটি ছিল প্রস্তরযুগে। এর পরিচয় পাওয়া যায়— দৈহিক দিক দিয়ে অপটু লোকেদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং কর্ম্ম-সন্ধানের ব্যাপারে লোকেরা যে ভাবে তাদের অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করবার চেষ্টা করে, তা থেকে।

গুজরাল অতঃপর রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে আশ্রয়-সন্ধান করলেন এই আশায় যে, তা তাকে চতুষ্পার্শ্বস্থ তিক্ততা থেকে নিষ্ক্রমণের একটি পথপ্রদর্শন করবে। কম্যুনিজম হবে, তিনি ভাবলেন, বেরিয়ে যাবার সুবর্ণসরণী, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অচিরেই এই উপলব্ধি তাঁর হ'ল যে, এতে অনেকের অধিকতর অন্নসংস্থান হয় বটে, কিন্তু তা প্রভাবিত করতে পারে না হৃদয়বিদীর্ণকারী মূলগত ভাবাবেগ-সমূহকে।

"চিত্রকলার চর্চ্চায় যখন আমি প্রবৃত্ত হলাম তখনও এই বিষাদ—এই তীব্র যন্ত্রণা। লোকেরা বললে এইটেই সবটুকু নয়—একটি উজ্জ্বলতর দিকও আছে। কিন্তু আমি দেখছি যে, আমি তথাকথিত বীরপনায় বিশ্বাস করি না। লোকে চেষ্টা করে এবং সংগ্রাম করে—শুধু নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকবার জন্যে যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জিত হয়, সেইটেই ত বীরোচিত।" এই জীবন-দর্শনের মুখ্য অংশ হচ্ছে এই যে, এতৎসমুদয় সত্ত্বেও মানুষের অস্তিত্ব মানবীয় মর্য্যাদা লাভ করে চেষ্টা করবার নিমিত্ত।

সতীশ গুজরাল ভ্রমণ করেছেন ব্যাপক ভাবে, সর্ব্বত্রেই তিনি বধির সঙ্ঘগুলো দেখেছেন এবং নিজের বক্তব্য বলেছেন। বধিরদের যে জিনিষটি দেওয়া হয় না, তা হচ্ছে মানবীয় মর্য্যাদা। "এই সকল হতভাগ্য"—এই মনোভাবই সর্ব্বদা বিদ্যমান এবং তিনি বললেন, যে সকল বধির লোকেদের তিনি দেখতে পেয়েছেন তারা নৈতিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়েছে—কেননা নিজেদের ভাগ্য নিয়ে তারা হয়েছে সন্তুষ্ট।

আমি তাঁকে নিয়ে গেলাম বিষয়ান্তরে—তাঁর চিত্রকলা এবং তার পেছনে যে উদ্দেশ্য এবং বাণী নিহিত আছে সেই প্রসঙ্গে। "শিল্পকলায়" সতীশ গুজরাল আমাকে বললেন—"আপনি এগিয়ে যান কোন চরিতার্থতার দিকে। সংসারের অর্দ্ধেকই হচ্ছে শিল্পকলা। কৃত্রিম ভাবে আপনি সৃষ্টি করেন সেই মায়া, জীবন যা থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেছে। অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এই হচ্ছে আমার শেষ প্রতিরক্ষা। আমার চিত্রকলা প্রদর্শন করে অধিকতর গতিবেগ এবং এই গতি থেকে সৃষ্টি হয় শব্দের—যা থেকে আমি বঞ্চিত। অনুরূপ ভাবে আপনি যখন দুঃখকে এরূপ জোরালো ভাবে চিত্রিত করেন, আনন্দের প্রয়োজনীয়তা তখন উপলব্ধ হয় প্রবলতররূপে। লোকেদের আমি কানাগলিতে নিয়ে যাই না। আমার চিত্রকলার সবলতা যখন তারা দেখে, তখন তারা নিজেরাই দণ্ডায়মান হয় প্রচণ্ডতার শক্তিনিচয়ের বিরুদ্ধে। বিষাদের মত আনন্দও রয়েছে অন্তরে এবং তার কথা বলতে হবে এমন বিশ্বজনীন উপায়ে যে তার কল্যাণে আমরা একে দেখা অপেক্ষা বরং অনুভব করতে সক্ষম হব। মুখ বুজে শান্ত হাসি হেসে তিনি আরও বললেন, "সময় সময় আমি দেখি লোকেরা চিত্রকলার দিকে তাকিয়ে চার দিকে ঘুরে বেড়ায়—কিন্তু প্রায় কিছুই তারা লক্ষ্য করে না, কিছুই তারা দেখে না—কেবল এগিয়ে চলে তারা একটা থেকে আর একটার দিকে। এই সকল লোকেরা দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন, এরাই হচ্ছে সেই সকল লোক যারা শ্রবণশক্তিরও অধিকারী, কিন্তু হায় সেই শ্রবণশক্তি বুঝতে পারে না বীটোফোনের সিম্ফনির সঙ্গে টোঙ্গাওয়ালার গানের পার্থক্য। আমি মনে করি এরাই প্রকৃতপক্ষে দৈহিক দিক দিয়ে অপটু।"

তিরুভাল্লার মূকবধির বিদ্যালয়

শ্রীডি. পালচৌধুরী

কেরলরাজ্যে আমাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনোপলক্ষে আমার ভ্রমণকালে আমি দেখিতে পাই যে, তিরুভাল্লার মূকবধির বিদ্যালয়ই হইতেছে উক্ত রাজ্যে স্বেচ্ছামূলক প্রচেষ্টায় পরিচালিত, দৈহিক দিক দিয়া অপটু বালক-বালিকাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

১৯৩৮ সনে পাল্লোমে মাত্র পাঁচটি শিশু লইয়া ঐ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় এবং ১৯৪১ সনে উহা স্থানান্তরিত হয় তিরুভাল্লায়। ১৯৫২ সনে দান, চাঁদা এবং রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে নির্মিত একটি পাকাবাড়ীতে এই প্রতিষ্ঠানটিকে জায়গা দেওয়া হইয়াছে। জাতি এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মূকবধির শিশুদের ভর্তি করা হয় এই বিদ্যালয়ে। সাধারণতঃ, কেবলমাত্র দশ বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদেরই এই বিদ্যালয়ে লওয়া হয় এবং তাহাদের ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহারা এখানে থাকে। হাজিরা-বহিতে ৮৪ জন ছাত্রছাত্রীর নাম লিখিত আছে, তন্মধ্যে ৫৬ জন বালক এবং ২৮ জন বালিকা। এই সকল বালক-বালিকা হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নতম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া একটি শিশুকে আট বৎসরের জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট শিক্ষণক্রমের অনুসরণ করিতে হয়; ইহার পরিসমাপ্তির পর সে এমন সুষ্ঠুভাবে কথা বলিতে সমর্থ হয় যে, অপরে তাহার বক্তব্য বুঝিতে পারে এবং ওষ্ঠ-পঠনের (Lip-reading) সাহায্যে সে অপরের স্বাভাবিক কথাবার্ত্তার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। কথন এবং ওষ্ঠ-পঠনের শিক্ষাদান ছাড়া শিশুদের লিখিতে ও পড়িতে, সহজ আঁক কষিতে শেখানো হয় এবং ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি-অধ্যয়ন (Nature study) ইত্যাদি বিষয়েও তাহারা জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে। খাদ্যশস্যের চাষ, মৌমাছিপালন, হাঁসমুরগীপালন, রান্নাবান্না ইত্যাদিও তাহারা করে। বিদ্যালয়ের ছুটির পরে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বহির্গৃহ (outdoor) খেলাধুলাও পরিচালিত হয়। শিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচালনাধীনে একটি জুনিয়ার স্কাউট ট্রুপও আছে। টিচার আছেন সবসুদ্ধ ১৫ জন, তন্মধ্যে ৭ জন শিক্ষিকা, একজন পুরুষ টিচার এবং দুই জন শিক্ষিকা নিজেরাই মূকবধির। বিদ্যালয়ের শিশুরা যাহাতে জীবিকার জন্য একটি যথোপযুক্ত বৃত্তি বাছিয়া লইতে পারে তদুদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের সহায়তায় প্রতিষ্ঠানটি তাহাদিগকে বিভিন্ন কারুশিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগকে যে সকল কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয় তন্মধ্যে কতকগুলি হইতেছে—মাদুর তৈরি, দর্জ্জির কাজ এবং তাঁতবোনা।

বোর্ডিং গৃহ—মাত্র তিনটি ছাড়া আর সকল শিশুই অবস্থান করে বোর্ডিং বিভাগে। একজন মেট্রন বা তত্ত্বাবধায়িকা খাদ্যাদি যোগানো বিভাগ এবং শিশুদের সাধারণ কল্যাণকর্ম্মাদির তত্ত্বাবধান করেন।

পরিচালনা—বিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় সাত জন সদস্যের একটি কমিটি দ্বারা, তন্মধ্যে একজন হইতেছেন ম্যানেজার। নানা সম্প্রদায়ের এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক ব্যাপারের প্রতিনিধি ষোলজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি উপদেষ্টা পরিষদও (Advisory Council) আছে।

আর্থিক অবস্থা—শিশুদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার হইতে আগত বলিয়া বোর্ডিং এবং টুইশুনের খরচ দিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। ৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে কেবলমাত্র পনের জন পুরা বেতন অর্থাৎ বোর্ডিং এবং টুইশুনের জন্য বৎসরে ১৮০৲ টাকা দিতেছে, ২০ জন দেয় অর্দ্ধেক বেতন, বাদবাকী সকলে অবস্থান এবং শিক্ষালাভ করিতেছে বিনামূল্যে। বিদ্যালয় চালাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানটির গড়পড়তা বার্ষিক খরচ হইতেছে ১৪,০০০৲ টাকা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মপ্রচেষ্টা পরিচালনাকল্পে যে সকল সূত্রে অর্থসাহায্য পাওয়া যায় তন্মধ্যে বদান্য ব্যক্তিদের দান, বেতনাদি সংগ্রহ, মিশ্র (compound) কৃষি, রাজ্যসরকার এবং মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির অর্থানুকূল্য—এই সকল প্রধান।

কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ ১৯৫৫-৫৬ সনের জন্য অর্থ-সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন ৪,০০০৲ টাকা। এই প্রতিষ্ঠান যাহাতে অধিকতরসংখ্যক দৈহিক দিক দিয়া অপটু শিশুদের মধ্যে নিজের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পর্ষদ একটি পঞ্চবার্ষিক ২৫,০০০৲ টাকা সাহায্যদানের নিমিত্ত ইহাকে নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে মূকবধিরদের কল্যাণ-প্রচেষ্টা

পি. সুটিয়াজিন

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একটি স্বেচ্ছামূলক সমাজ-সংস্কাররূপে প্রতিষ্ঠিত "দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ মিউটস" (নিখিল রুশীয় মূকবধির সমিতি) এখন রাশিয়ান ফেডারেশনের যাবতীয় মূক-বধিরদের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিতেছে। সমস্ত সোভিয়েট রিপাবলিকগুলিতে অনুরূপ সমিতিসমূহ বিদ্যমান আছে।

বিভিন্ন উদ্যোগ এবং আপিসের কর্ম্মকর্তৃগণ মূক এবং বধিরদের স্বেচ্ছায় কাজে নিয়োগ করিয়া থাকেন এবং কলা-কৌশলের জটিলতা আয়ত্ত করা এবং শ্রমের উন্নত ধরনের যোগ্যতা অর্জ্জন করার পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় অবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

সোভিয়েট শিল্পের অনেকগুলি বৃহৎ উদ্যোগে ২০ জন কিংবা তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক মূকবধিরের এক একটি দলকে কর্ম্মরত অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। কোন কোন শিল্পোদ্যোগে—দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়—দি ষ্টালিনগ্রাড এণ্ড চেলিয়াবিনস্ক ট্রাক্‌টার প্ল্যাণ্টস, মস্কো ভ্লাডিমির ঈচ লেনিন ওয়ার্কস এবং অপর কয়েকটির কথা—তাদের সংখ্যা ১০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

উৎকৃষ্ট শ্রবণ-শক্তিসম্পন্ন, অপিচ সাঙ্কেতিক ভাষার (Sign language) সহিত পরিচিত কতিপয় দোভাষীকে এই সকল গ্রুপের প্রত্যেকটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। বাদবাকী কর্ম্মী, ইঞ্জিনীয়ার এবং যন্ত্রশিল্পীদের (Technicians) সহিত মনের ভাব প্রকাশে ইহারা প্রত্যহ তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। এই সকল দোভাষীরা আছেন প্রশাসন বিভাগের বেতনভোগীদের তালিকায়।

সুতরাং বধির কর্ম্মী এটা অনুভব করে না যে, সে তার উদ্যোগের যৌথ কর্ম্মপ্রচেষ্টা হইতে পৃথকীকৃত। যেখানেই বধিরদের কর্ম্মে নিয়োগ করা হোক না কেন সেখানেই তাহারা শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কর্ম্মীদের মত একই মজুরি পায় এবং প্রায়ই উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাহারা সেরা কর্ম্মী বলিয়া প্রমাণিত হয়।

ভালিয়া ৎসাপারিনা দেশের অন্যতম প্রধান বয়নশিল্প-কেন্দ্র ইভানোভো অঞ্চলের এক তন্তুবায়দের পরিবারে জন্মিয়াছেন বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন। তাঁর বাবা, মা, ভাই এবং দুটি বোন ইয়ুসকায়া বস্ত্রশিল্পের কারখানায় কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন।

অতি শৈশবকাল হইতেই ভালিয়া একজন বয়নশিল্পী হইবার স্বপ্ন দেখিতেন এবং ১৯৪৯ সনে যখন তিনি মূকবধিরদের একটি বিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইলেন তখন দৃঢ়তার সহিত সঙ্কল্প করিলেন—"আমি হইব একজন বয়নশিল্পী।" তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কিন্তু সকল প্রকার চেষ্টাই করা হইল। "এ বড় কঠিন ব্যবসা" তাঁকে বলা হইল—"বরং দর্জ্জি হতে শেখ।" বালিকাটি কিন্তু নিবৃত্ত হইল না, অবশেষে শিক্ষানবিসরূপে একটি বয়নশিল্পের কারখানায় কাজ করিতে গেল।

ভালিয়া ৎসাপারিনা আজ ইয়ুসকায়া বস্ত্রশিল্পের কারখানার একজন অভিজ্ঞ বয়নশিল্পী এবং যুগপৎ আটটি তাঁত চালাইতে পারেন তিনি।

তিনি একজন উৎকৃষ্ট বয়নশিল্পী এবং কারখানায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজকর্ম্মী"—এ কথা বলেন ভালিয়ার ফোরম্যান।

এই বালিকাটি "অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটসে"র কারখানা সংগঠনের (Factory organisation) প্রেসিডেণ্ট এবং উক্ত সমিতির আঞ্চলিক কর্ম্মেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সংগঠনের সদস্যদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন তিনি ঘনিষ্ঠভাবে, তাহাদের মধ্যে তিনি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক কার্য্যপরিচালনা করেন এবং যাহাতে তাহারা দৈনন্দিন খবর এবং সাম্প্রতিকতম সাহিত্যকর্ম্মের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন।

উৎপাদনে উৎকৃষ্ট কর্ম্মের জন্য ভালিয়াকে পুনঃ পুনঃ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে, তা ছাড়া তিনি দুইটি যোগ্যতার মানপত্রও (Testimonials of merit) পাইয়াছেন। গত বৎসর তিনি অবকাশ যাপন করিয়াছিলেন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্ত্তী গেলেন্দঝিকস্থ মূকবধিরদের একটি স্বাস্থ্য-নিবাসে।

"অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস"-এর সদস্যদের মধ্যে ভালিয়ার মত এমন হাজার হাজার কর্ম্মী আছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কারখানা-সমূহের টেকনিকাল স্কুল বা কারিগরি বিদ্যালয়ের, 'ট্রেড' স্কুল অথবা বাণিজ্যিক বিদ্যালয় প্রভৃতির ছাত্র কিংবা গ্রাজুয়েট। বধির শিশুদের ৩৩৭ নং মস্কো বিদ্যালয়ের সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট "আইগোর উবোগোভ" "মেটালারজিক্যাল

ফ্যাকাল্টি অব দি মস্কো ষ্টীল ইনষ্টিটিউট" নামক প্রতিষ্ঠা যোগদান করেন ১৯৫০ সনে।

১৯৫৫ সনে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে গ্রাজুয়েট হা উবোগোভ "মেটালারজিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারের ডিপ্লোমা প্র হন। অতঃপর, চীনা প্রজাতন্ত্রে এক প্ল্যান্টের জন্য এটি ষ্টীল ফাউণ্ড্রি বা ইস্পাত ঢালাইয়ের কারখানার এবং ভাত একটি মেটালারজিক্যাল বা ধাতুবিদ্যাসংক্রান্ত প্ল্যান্টর অপর একটি প্রোজেক্টের পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ কতে পারিয়া এই তরুণ ইঞ্জিনীয়ার প্রভূত আনন্দ এবং উন্মনা লাভ করেন।

ভারতের প্লান্টে উবোগোভকে বিশেষ ভাবে ঠোর পরিশ্রম করিতে হয় পরিকল্পিত 'ফার্নেস'গুলির কৃতিসাধ্যতা (feasibility) সম্পর্কে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ নিরসন করিবার নিমিত্ত।

এখনও পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত তাঁর কর্ম্মজীবনে উগোভ কতকগুলি চিত্তাকর্ষক টেকনিক্যাল প্রোজেক্টের কার্য্যকরী-করণে সহায়তা করিয়াছেন। মূক-বধিরদিগকে পো দিয়া জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং তাহাদের বাচিত কর্ম্মলাভের ব্যাপারে উক্ত সোসাইটির উৎপাদনশিক্ষণ-কেন্দ্রসমূহ (The Production Training Catres) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে।

অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস-এর চেল্লিশটি বিভাগের অধীনে অধুনা উৎপাদন শিক্ষণকেন্দ্র আ ৫৬টি। সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত এই সকল উদ্যোগ হইত প্রতি বৎসর শত শত মূক-বধির বিভিন্ন ব্যবসা এবং পেশা নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়া বাহির হইয়া আসে—এই সকল নরী এবং পুরুষকে পরিকল্পিত প্রণালীতে রাজ্য অথবা সমবায়মূলক উদ্যোগসমূহের কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়।

বধির এবং মূক-বধিরদিগকে সাফল্যের সহিত কাজে লাগানো হইয়াছে—কৃষিকর্ম্মে ভূঁইচাষী (Tillrs of the Soil), গবাদি গৃহপালিত জন্তুর পোষক, উদ্যানরচনাকারী, মালী, কৃষি-যন্ত্রপাতি সারানো কারিগর (repair mechanics) —এমনকি ট্রাক্টার ড্রাইভার এবং কম্বাইন্ অপারেটার প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে।

ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার কৃষি-সংক্রান্ত তাহাদের কর্ম্মকে সংযোজিত করে সক্রিয় সমাজকর্ম্মের সহিত।

ক্রাসনেডোর অঞ্চলের যৌথ ফার্ম্মের ধাতুশিল্পী নিকোলাই পেসিজিন শ্রবণশক্তি হারান শৈশবেই, মানুষের কণ্ঠস্বর যে কিসের মত তা তিনি স্মরণ করিতে পারেন না কিংবা যে ধাতু তিনি নাড়াচাড়া করেন তার ঝনৎকার তাঁর কানে প্রবেশ করে না। ইহার দরুন যৌথ ফার্ম্মের ধাতুশিল্পী-গোষ্ঠীর নেতৃরূপে তাঁহার কর্ম্ম কিন্তু ব্যাহত হয় না।

পেসিজিন ছাড়া এই ফার্ম্মে কর্ম্মরত আরও কুড়িজন বধির এবং মূক-বধির আছেন। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই সমিতির একটি প্রাথমিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত—পেসিজিন হইতেছেন এই গ্রুপের চেয়ারম্যান। যৌথ ফার্ম্মে মূক-বধিরদের জন্য বিশেষ ক্লাবগৃহের ব্যবস্থা করিয়াছেন যেখানে ছুটির দিনে বা কর্ম্মাবসানে সকল মূক-বধির একত্রিত হয়—বন্ধু-বান্ধবদের সহিত গল্পগাছা করা, বই, দৈনিক পত্র এবং মাসিক পত্র পাঠ, দাবাখেলা বা সতরঞ্চ খেলা ইত্যাদির জন্য। জাতীয় অর্থনীতির অন্যান্য সমুদয় ক্ষেত্রের ন্যায়, কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত বধির এবং মূক-বধিরগণকেও তাদের কাজের জন্য, অন্যান্য কর্মীরা যা পায় তার সমান হারে মজুরি দেওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নিজ সম্পত্তিও অর্জ্জন করিয়াছে: কুটীর এবং ভূমিখণ্ড, গরুবাছুর, হাঁসমুরগী এবং অন্যান্য গৃহপালিত জন্তু। যৌথ ফার্ম্মে তাহাদের কাজের জন্য তাহারা যে মজুরি অর্জ্জন করে তাহার সঙ্গে তাহাদের গৃহ হইতে লব্ধ আয় যুক্ত হইয়া তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে অবস্থানের ব্যবস্থা হয়।

"দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস" যেমন প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত থাকে সেই সকল মূক এবং মূকবধির শিশু ও বয়স্কদের লালন-পালন এবং শিক্ষাদান লইয়া যাহারা কোন বিদ্যালয়গত শিক্ষা পায় নাই তেমনই ইহার লক্ষ্য থাকে সারা দেশে ছড়ানো বধির এবং মূকবধিরদের সাংস্কৃতিক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারণ, সদস্যদের যেমন সখের কলাচর্চ্চার প্রচেষ্টায় তেমনি শরীর-চর্চ্চা এবং খেলাধুলায় উৎসাহ দান।

কেবলমাত্র "আরএসএফএসআরআর"-এই বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সী এবং প্রাগ-বিদ্যালয় বয়সী সকল বধির এবং মূকবধির শিশুদের প্রতিপালনের জন্য ২২০টি বিশেষ বিদ্যালয় এবং প্রাগ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান আছে।

ওখানে মূকবধিরদের জন্য আছে দুইটি মাধ্যমিক করেসপণ্ডেন্স বিদ্যালয়, বয়স্কদের জন্য ৪৫১টি স্কুল এবং প্রাথমিক স্কুলের ক্লাস, তা ছাড়া মাধ্যমিক কারিগরি বিদ্যালয় (Technical School) এবং উচ্চতর বিদ্যালয়গুলিতে বধির এবং মূকবধিরদের জন্য বিশেষ কোর্স বা শিক্ষাক্রমেরও ব্যবস্থা আছে।

এদেশে আছে বধির এবং মূকবধিরদের জন্য ১০০টি বিশেষ সংস্কৃতি ভবন, প্রেক্ষাগৃহসমন্বিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, পাঠাগার, তাদের নিজস্ব সিনেমার সরঞ্জাম, টেলিভিশন সেট ইত্যাদি। এই সমস্ত ক্লাবের লাইব্রেরীতে পুস্তকের সংখ্যা ২০০,০০০।

এই সকল ক্লাব ব্যতিরেকে শহরে, গ্রামে এবং যে সকল উদ্যোগে বধির এবং মূকবধির দলকে কর্ম্মে নিয়োগ করা হইয়াছে তৎসমূদয়ে সবসুদ্ধ আরও ৩১০টি ক্লাবগৃহ আছে।

সোসাইটির সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সখের অভিনয়কলাদি ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত। সবগুলি ক্লাবেরই তাদের নিজস্ব অভিনয় এবং নৃত্য বৃত্তি (circles) আছে।

বধির শিল্পীদের অভিনয় এবং অন্যান্য প্রদর্শনসমূহে আনুষঙ্গিক হিসাবে ঘোষকদের কথনও পরিবেশিত হয় এবং নৃত্যগুলি নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত হয়, পিয়ানো অথবা করডিয়ন নামক বাদ্যযন্ত্রের সুরচ্ছন্দে—ফলে ইহা দর্শকদের মধ্যে যাহারা শুনিতে পায় তাহাদের পক্ষে হইয়া উঠে অধিকতর উপভোগ্য।

সোসাইটির সদস্যদের মধ্যে খেলাধুলার শিক্ষণ ব্যাপক ভিত্তিতে প্রসারিত হইয়াছে। বধির এবং মূকবধিরদের মধ্যে দেহানুশীলনকারীদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে পনের হাজারে। বধির এবং মূকবধিরদের ক্লাবগুলিতে বহুসংখ্যক খেলাধুলার বিভাগ আছে। যথা: লঘু ব্যায়াম, ভলিবল, বাস্কেট বল, স্কি-ক্রীড়া, আইস (তুষার) হকি, দাবাখেলা, ভ্রমণকারীদের বিভাগ ইত্যাদি। প্রায়শঃই সকলরকম ক্রীড়া-কৌতুকের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

১৯৫৬ সনের নভেম্বর মাসে রাশিয়ান ফেডারেশন এবং উক্রেইনিয়ান রিপাব্লিকের মূকবধিরদের প্রধান টিমগুলির মধ্যে একটি দাবাক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইয়াছিল 'আরএসএফএসআর'-এর টিম।

ক্লাবগুলির কার্য্যসূচীতে সিনের দীর্ঘকাল ধরিয়াই সুদৃঢ় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। সোভিয়েট ফিল্ম ফ্যাক্টরীসমূহ বধিরদের জন্য অভিধাসম্বলিত সবাক চিত্র নির্ম্মাণ করে। এই সকল ফিল্ম পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পথে দেশের সর্ব্বত্র বধির এবং মূকবধিরদের বিভিন্ন ক্লাবে প্রেরিত হয়।

সিনেমা অনুষ্ঠানে দোভাষীরা অভিধাবিহীন ফিল্মগুলির বিষয়বস্তু বুঝাইয়া দেয়।

১৯৫৬ সনে সমিতির কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক পর্ষদের (The Central Administrative Board) আদেশে নির্ম্মিত "of those who cannot hear" বা "যারা শুনতে পায় না," নাট্য লোকরঞ্জক, চার অংশে বিভক্ত বিজ্ঞানানুগ ফিল্মটিতে চিত্রিত হইয়াছে—ইউএসএসআর-এর বিশেষ প্রাগ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানসমূহে, বাণিজ্য বিদ্যালয়ে (Trade Scbl), মাধ্যমিক এবং উচ্চতর বিদ্যালয়সমূহে মূকবধির শিশুকিশোর এবং বয়স্কদের প্রতিপালন ও শিক্ষণের জটিল পদ্ধতি। কৃষি ও শিল্পে বধির এবং মূকবধিরগণ কিভাবে কাজ করে; বৈজ্ঞানিক এবং সমাজকর্ম্মে কিভাবে তাহারা অংশগ্রহণ করে, কেমন করিয়া তাহারা থাকে এবং আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করে তাহাও ঐ ফিল্মে দেখানো হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত রিপাব্লিকের সমিতিসমূহের ক্লাবগুলিতে উক্ত ফিল্মটি ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং বাহিরেও কোন কোন দেশের জাতীয় সংগঠনে প্রেরিত হইয়াছে।

নিখিল রাশিয়ান সোসাইটি অব ডেফ-মিউটস—যাহা সোভিয়েট ইউনিয়নে এ ধরণের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সংস্থা—অন্যান্য ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির অনুরূপ সমিতিসমূহের সহিত সতত স্বকীয় অভিজ্ঞতার বিনিময় করিয়া আসিতেছে। বিদেশের মূকবধিরদের সমিতি, ইউনিয়ন, সঙ্ঘ প্রভৃতির সহিত উক্ত সংস্থা ব্যাপক সংযোগ রক্ষা করিয়া চলে।

১৯৫৫ সনের আগষ্ট মাসে যুগোস্লাভিয়ার জাগ্রেব নগরীতে অনুষ্ঠিত মূকবধিরদের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে—যাহাতে ৬টি বিভিন্ন দেশ হইতে বধিরদের জাতীয় ইউ-নিয়নের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন—সোভিয়েট প্রতিনিধিদল কর্ত্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়নে বধির এবং মূকবধিরদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কৃত্য সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পঠিত হয়। সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের এই রিপোর্ট কংগ্রেস কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। উক্ত কংগ্রেসে যেমন অল-রাশিয়ান সোসাইটি অব দি ডেফ-মিউটস-এর প্রতিনিধিবৃন্দ তেমনি সারা ভারত মূকবধির সমিতির প্রতিনিধিগণও মূক-বধিরদের ওয়ার্লড ফেডারেশন বা বিশ্ব সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

দি অল রাশিয়ান সোসাইটি অফ ডেফ-মিউটস আজ বধির এবং মূকবধিরদের যাবতীয় সেবামূলক উন্নয়নকার্য্য চালাইয়া যাইবার মহান্ কৃত্যে এবং তাহাদের সাংস্কৃতিক স্তর ও জীবনচর্য্যার মানের উন্নতিবিধানে ব্রতী হইয়াছে।

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা ব্যবহারে ফুটে উঠবে!

নিয়মিত রেক্সোনা সাবান ব্যবহার করলে আপনার লাবণ্য অনেক বেশি সতেজ, অনেক বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! তার কারণ, একমাত্র সুগন্ধ রেক্সোনা সাবানেই আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের সৌন্দর্য্যের জন্যে কয়েকটি তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ।
রেক্সোনা সাবানের সরের মত ফেণার রাশি এবং দীর্ঘস্থায়ী সুগন্ধ উপভোগ করুন; এই সৌন্দর্য্য সাবানটি প্রতিদিন ব্যবহার করুন। রেক্সোনা আপনার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

রেক্সোনা—একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান

রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারি লিমিটেড'এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত

RP. 140-X52 BG

"হরিজন"

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

পৌষের (১৩৬৩) 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের "হরিজন সেবায় অর্থসাহায্য" শীর্ষক লেখাটি পড়ে এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

১৯৫১-৫২ সনে আমি কয়েক মাস দিল্লীতে ছিলাম। সেই সময়ে আমার ভগিনী করুণা সেন দিল্লীতে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি হরিজন কলোনীতে বয়স্কদের পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন। কৌতূহলবশে আমিও তাঁর সঙ্গে যেতাম। হরিজনকেন্দ্রেও গিয়েছিলাম কয়দিন।

মধ্যে কলোনী বা নিবাসভূমি। পাকা দোতলা বাড়ীর সমষ্টি। শুনলাম আড়াই শ' ঘর হরিজন পরিবার তাতে আছেন। পুরুষদের মধ্যে বি-এ, আই-এ পাসও দু' একজন আছেন। পাকা দোতলা বাড়ী ছাড়া একতলা টিনের ঘরও অনেকগুলি আছে। ঠিক খানিকটা আমাদের গ্রে ষ্ট্রীটের করোগেটের চালে পাথরচাপা ঘরগুলির মত ঘর। তেমনি সামনে খাটিয়া পাতা—খাটিয়ার পাশে উনুন, কাঠ, কয়লা, খাবার, ফেরীওয়ালা, শিশু-বালক-বালিকা সমন্বিত সে নিবাসগুলি। অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অশক্ত দু'এক জন সেখানে শুয়ে-বসে আছে দেখতাম।

পাকা দোতলার অধিবাসী ও একতলার বস্তির অধিবাসীদের মধ্যে কোন্ শ্রেণী বা বর্ণভেদ আছে কিনা জানি না। অবশ্য এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। সেকথা যাক্। কি কি দেখলাম তাই বলি।

গেটের ভেতরে ঢুকেই খানিকটা গেলে বাঁদিকে পড়ে হরিজন কলোনীর বাড়ীগুলি। সকল জায়গাতেই আজকাল যখন বাড়ীঘর দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, তখন এই সকল চমৎকার দোতলা বাড়ী, বড় বড় জানালা-দরজা, রৌদ্রভরা লম্বা বারান্দা দেখে বেশ ভাল লাগছিল। মনে হচ্ছিল বেশ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে নিশ্চয়।

বাঁদিকে খানিকটা উঁচুনীচু জমি। তার ওপারে দেয়াল-ঘেরা গান্ধীজীর বাসগৃহ ও বাল্মীকি-মন্দির।

'কলোনী' বিভাগে ডানদিকে একটি ছোট ঘর। সেখানে গুটিকতক আলমারী, চরকা, তকলী, লাটাই ও সুতা। আলমারীতে ছিল রঙীন সুতার কারুকার্য্য করা চটের থলি, চাদর আর ঝাড়ন-জাতীয় কিছু জিনিষ। বেতের কাজের নমুনা দু'একটা মোড়া যেন ছিল বলে মনে হচ্ছে। সেগুলি সংরক্ষণের এবং দেখানোর ভার ছিল একজন মরাঠী মহিলার উপর। শেখানোর দায়িত্বও ন্যস্ত হয়েছিল তাঁরই উপর; শিক্ষার্থী অবশ্য কেউ ছিল না। দ্রব্য-সংগ্রহও ছিল অতি অল্প। মনে হ'ল শেখানোটা গৌণ, আসলে দর্শকদের দেখাবার জন্যেই সেগুলো সাজানো আছে। নিকটেই চারদিক খোলা উপরে মস্ত একটি নাটমন্দিরগোছের দালান। সেইখানেই সকালে বসে শিশুদের এবং বালক-বালিকাদের পাঠশালা আর রাত্রে সেটা হয় বয়স্ক নারী ও পুরুষের পাঠশালা।

সকালে ঝুড়ি কুলো (ওদের ভাষায় চামচ) ঝাটা হাতে বয়স্ক নর-নারী সব বেরিয়ে যায় মিউনিসিপ্যালিটির নানা কাজে। রাস্তা-ঘাট ঝাট দেওয়া, ড্রেন, খোলা ড্রেন পরিষ্কার করা, পুরনো দিল্লীর সনাতন প্রথায় শৌচাগার সাফ করা ইত্যাদি এ ধরনের যাবতীয় কাজের ভার তাদের উপর। কাজ সেরে তারা ঘরে ফেরে সম্ভবতঃ দুটো-আড়াইটায়। তার পর স্নান, রান্না খাওয়া আছে। তখন ডিসেম্বর মাস—অগ্রহায়ণ-পৌষের শীত, সাড়ে পাঁচটায়ও অন্ধকার। পাকা বাড়ীগুলির বারান্দায় লেপ-তোশক কাঁথা-নেকড়া শুকাচ্ছে। বয়স্ক লোকজন নেই বললেই চলে। কাঁচা বাড়ীগুলির সামনে খাটিয়া পেতে বসে দু'একজন বুড়োবুড়ী, আশপাশে মাছি, মাটি-কাদা জঞ্জালের মধ্যে শিশুরা খেলা করছে।

ওপাশে স্কুল বসেছে আটটায়। আড়াই শ' পরিবারের মধ্য থেকে মোট পঁয়ত্রিশটি বালক-বালিকা পড়তে এসেছে। যারা বয়সে কিছু বড় তারা জীবিকার দায়ে বা প্রয়োজনে মা-বাপের সঙ্গে কাজে বেরিয়েছে বোধ হয়। মোটামুটি ঘরপিছু বা পরিবারপিছু চারটি সন্তানও যদি ধরি, তা হলে ছাত্রছাত্রীর শতকরা সংখ্যা কত হয় তা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

সেখানে ছিল ভাইয়ের কোলে ছোট্ট বোন, বোনের কোলে কাঁদুনে ভাই—মুখ চোখ নাক যতদূর নোংরা হতে পারে। ছোটদের হাতে রুটি, মোয়া, চীনেবাদাম, নাকে-চোখে জল। সকলে পড়তে বসল। পরিদর্শিকাকে দেখে কর্ম্মে নিযুক্ত শিক্ষয়িত্রী যথাসম্ভব তাদের কান্না থামাতে ও পরিষ্কার করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, জল গামছা তোয়ালে নিয়ে। এগারটা অবধি স্কুল চলল। বড় দু'একটি বালক-বালিকা খুব চটপটে দেখলাম।

সন্ধ্যার পরে বয়স্কদের পাঠশালা। সেখানে আমরা দেখতে পেলাম পাঁচ-সাত জন নরনারী। বাকি মেয়েরা অনেকেই রুটি করতে গেছে, কেউ গেছে ছেলেমেয়েদের ঘুম পাড়াতে—কেউ বা বিশ্রাম করছে। একে সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি, তার উপর দিল্লীর দারুণ শীতে স্বল্প শীতবস্ত্র গায়ে দিয়ে বসে, প্রথম ভাগের 'লাল' 'লালা' 'নল' 'নালা' (বয়স্কদের পড়ায় বর্ণপরিচয় নেই, আছে বাক্যপরিচয়) এবং দ্বিতীয় পুস্তকের "শেঠজী বগগীমে সওয়ার হোকর সয়েল করনে গয়ে" অর্থ শেঠজী গাড়ী চড়ে বেড়াতে গেলেন—

ইত্যাদি মূল্যবান বাক্য পড়তে তাদের তেমন উৎসাহবোধ না হওয়াই স্বাভাবিক।

পুরুষের সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে বেশী হয় সত্য, কিন্তু তাদেরও খাটুনির পর আমোদ-প্রমোদ এবং গান-বাজনা ইত্যাদি অন্য খেয়াল-খুশি মেটা প্রয়োজন। সাধারণতঃ নারীদের ও পুরুষদের পাঠশালা আলাদাই বসে। মেয়েরা কিসের জন্যে লেখাপড়া শিখতে চায়, দু'এক জায়গায় সেকথা জিজ্ঞাসা করলাম। তরুণী মেয়েরা—পড়া-শুনা তারা ভালই করে—সলজ্জ ভাবে বলে, স্বামীর চিঠিপত্র এলে পড়তে পারবে আর নিজেরাই লিখতেও পারবে। মায়েরা বললে, বিদেশগত সন্তানদের খোঁজখবর নিতে ও দিতে পারবে।

যাক শেষ অবধি কে পড়েছিল কতদূর জানি না। তবে তখন নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুন তিন মাসেও যে প্রথম ভাগ বা প্রথম পাঠ শেষ হয় নি তা জানি। বয়স্কদের সময় নেই, অবসর নেই। বয়স্কা মেয়েদের বাইরে জীবিকার কাজ ত আছেই, তদুপরি আছে ঘরের কাজ, সন্তানপালন, লৌকিকতা ইত্যাদি। জননী এবং গৃহিণীরা যখন পাঠশালায় পাঠাভ্যাস করেন তখন ঘর থেকে প্রায়ই ডাক আসে—খোকা কাঁদছে, খুকীর জ্বর এসেছে, দেখা করতে এসেছে কেউ···। সুতরাং লেখাপড়া শিকেয় তোলা থাকে, হন্তদন্ত হয়ে তাঁদের ছুটতে হয় ঘরের পানে।

এর পরে একদিন হরিজনকেন্দ্রে বাল্মীকি-আশ্রমে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। গান্ধীজীর ঘরখানি পরিষ্কারই রয়েছে। বাল্মীকির মূর্তিসমন্বিত মন্দিরও একটি রয়েছে। শান্ত পরিবেশ। সেখানে রয়েছেন এক জন বাঙালী মহিলা (নোয়াখালির) যাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্যারীলালজীর (গান্ধী-চরিত লেখক) বিবাহ হয়েছে। ডাঃ সুশীলা নায়ারের ভাই তিনি।

দু'চারটি কথাবার্তার পর আমরা ফিরলাম।

কয়েকটি কথা মনে হয়েছিল সেদিন, বলবার সুযোগ পাই নি। আজ বলি। প্রথম হ'ল এই : হরিজনদের 'হরিজন' রেখেই শিক্ষা দেওয়াতে তারা কি সত্যই সাধারণের মত শিক্ষা পাবার সুযোগ পাচ্ছে ? তাদের পরিবেশ, তাদের জীবিকা অর্জ্জনের কাজের ধারা—তাদের ছেলেমেয়েদের 'মানুষ' হবার পথে কি পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে না ? যদি সকালে-বিকালে বালকবালিকারা দিনমজুরি বা জীবিকার জন্য চাকরি করে তা হলে কখন তারা লেখাপড়া শিখবে ? এবং যদিই বা শেখে, কি লাভ হবে তাদের ? সমাজের কোন খানে তারা সম্মানিত মানুষের মত জীবনযাপন করতে পারবে—গান্ধীজীর দীর্ঘ-কালের সেবাধর্ম্ম এবং আন্দোলন সত্ত্বেও তারা কি এতদিনে কোথাও প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছে ? কোন্ উন্নত স্তরের জীবন ও জীবিকা জুটেছে এদের অদৃষ্টে ?

অপরিচ্ছন্ন শিশু এবং বালক-বালিকাগুলিকে দেখে মনে হ'ল তাদের জন্য 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' যে আজও অর্গলবদ্ধ। ভাল বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে দেখে এসেছি। কিন্তু উন্নত পরিবেশ কোথায় ?

যে জ্ঞান তাদের নূতন জগতের নূতন আলোর সন্ধান দেবে, আশা আশ্বাস, কল্পনা জাগাবে তাদের মনে, সে জ্ঞানের সন্ধান কি তারা পেয়েছে ? জাতে, জীবিকায় (জমাদার ভাঙ্গী) শিক্ষাতেও কেন হরিজন তারা ? এ শিক্ষা কোন্ শিক্ষা ?

এবার হরিজনসেবার সাহায্য সম্বন্ধে একটু বলি। দিল্লীতে লোকে বলে যে, গান্ধীজীর হরিজন ফণ্ডে প্রায় দু'আড়াই কোটি টাকা ছিল এবং এখনও আছে। সে টাকা সমগ্র ভারত-বর্ষের জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত—কোন এক জনের বা প্রদেশবিশেষের দান নয়। সে টাকা কার কাছে গচ্ছিত আছে ? কে বা কারা তার হিসাব-কিতাবের কর্ত্তা ? সেই টাকা কেন ঐ তথাকথিত 'হরিজন' শিশুগুলির জন্য খরচ করা হয় না ? কেন চিরদিনের জন্য প্রগতির দ্বার রুদ্ধ থাকবে তাদের নিকট ? তৃতীয়তঃ, হরিজন নাম অথবা সংজ্ঞাই বা কেন ? শ্রেণীগত নাম তাদের নাই-বা হ'ল। 'হরিজন' নামটি যে তাদের পৃথক করে দিচ্ছে সাধারণ মানুষদের থেকে।

পরিকল্পনা ও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

স্মরণ থাকতে পারে, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চেয়েছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাছ থেকে তেমন সাড়া পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়—পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটা কাজ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ পছন্দ করেন নি। মোট কথা হ'ল এই যে, যে আশা নিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিল সে আশা সফল হয় নি। এটা সত্যি দুঃখের বিষয়, ব্যাঙ্ক ভারতের প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে চান নি। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ব্যাঙ্ক পৃথিবীর এমন কতকগুলো দেশকে কর্জ্জ দিয়েছেন যেগুলো আয়তনের দিক থেকে ক্ষুদ্রতর। শুধু তাই নয়। এগুলোর লোকসংখ্যা যেরূপ কম সেরকম এগুলোর আভ্যন্তরীণ সম্পদও তেমন নেই। অথচ ব্যাঙ্ক ভারতের প্রয়োজন ভালভাবে বিবেচনা করতে চান নি। ফলে, ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রার দরকার ছিল, ভারত ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সে মুদ্রা পায় নি। বলা হয়েছে, আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা। তা ছাড়া সকলেরই হয়ত জানা আছে, ব্যাঙ্কটির পিছনে বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটি দেশের প্রচেষ্টা রয়েছে। যাতে সামগ্রিক ভাবে সমস্ত বিশ্বের উন্নতি সাধিত হতে পারে সেজন্য যখন এই ব্যাঙ্কটি স্থাপন করা হ'ল তখন কোন জাতি কিংবা বর্ণ অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের প্রশ্ন উঠে নি। কাজেই প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে ভারতের প্রতি ব্যাঙ্ক যে বৈষম্যমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেছেন, সে মনোভাব কিছুতেই সমর্থন করা চলে না।

অনুমান করা হয়েছে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে বেসরকারী স্তরে দু'হাজার কোটি টাকারও বেশী খরচ করা হবে। অর্থাৎ, সরকারী এবং বেসরকারী উভয় স্তরে মোট সাড়ে সাত হাজার থেকে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। বাইরে থেকে কলকব্জা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য উপকরণ আমদানীর জন্য এর বিরাট অংশ শেষ হয়ে যাবে। একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এজন্য প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। সকলেরই হয় ত জানা আছে, মূল হিসাব অনুযায়ী পাঁচ বছরে প্রায় এক হাজার এক শত বিশ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছিল। ব্রিটেনে ভারতের যে তহবিল গচ্ছিত রয়েছে সে তহবিল থেকে বিদেশী পাওনাদারদের দাবি মিটাবার জন্য দু'শত কোটি টাকার মত তোলা যেতে পারে বলে ভারত সরকার আশা করেছেন। এ ছাড়া, আমাদের দেশে যে সব শিল্প রয়েছে, বাইরে থেকে সে সব শিল্পও প্রায় এক শত কোটি টাকা ঋণ পেতে পারে। কাজেই বাকী বৈদেশিক মুদ্রার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী লগ্নী সংস্থার উপর নির্ভর করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর নেই। কাজেই মূল হিসাবে উল্লিখিত টাকার উপর আরও চার-পাঁচ শত কোটি টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্যের গুরুত্ব বিশেষ ভাবে বেড়ে গেছে। অবশ্য এই চার-পাঁচ শত কোটি টাকার মধ্যে কত বৈদেশিক মুদ্রা দরকার হবে সেটা এখনও পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত ভাবে জানা যায় নি। তবে আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য চলছে—বিশেষ করে মিশরের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-ফরাসী সামরিক অভিযানের পরে যেভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের তীব্রতা বেড়ে গেছে, তাতে মনে হয়, আন্তর্জ্জাতিক বাজারে দর চড়বার এবং বাইরে থেকে মাল আমদানীর জন্য মাশুল বৃদ্ধি পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছেন। প্রথমতঃ, ট্রম্বের কারখানায় বাষ্প থেকে আরো অধিকতর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর কিনা সে সম্বন্ধে এঁরা তদন্ত করেছেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের জাহাজ চলাচল এবং বন্দর উন্নয়নের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এঁরা খোঁজখবর নিয়েছেন। তৃতীয় বিষয় হ'ল, দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের দুটো নয়া পরিকল্পনা। চতুর্থতঃ, ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল কয়না এবং রিহান্দ নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তদন্ত করেছেন। পঞ্চম বিষয় হচ্ছে, ভারতের রেলপথ-প্রসার। এজন্য এক হাজার কোটি টাকা লগ্নী করার কথা চলছে। এ ছাড়া ব্যাঙ্কের বিশেষজ্ঞদল ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানা দ্বিতীয় দফা প্রসারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত সমাপ্ত করেছেন। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই কোম্পানীকে দু' কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজী হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে, অদূর-ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় তদন্ত চালাবেন।

ভারতের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, যে সব উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা হয়েছে সে সব কাজের অনেকগুলোই সরকার নিজে পরিচালনা করবেন। সরকারী পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে বরাদ্দীকৃত টাকার মোট পরিমাণ হ'ল চার হাজার আট শত কোটি টাকা। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে বরাদ্দীকৃত টাকার উপর এ বাবদ আরো

চার-পাঁচ শত কোটি টাকা খরচ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত যে বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পড়বে তা প্রধানতঃ চারটি উপায়ে পূরণ করা যেতে পারে। প্রথম উপায় হ'ল, আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণ করা। এই ব্যাঙ্কের কাছ থেকে দু'ধরনের ঋণ নেওয়া যেতে পারে, যথা: দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণ। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। সে প্রশ্ন হ'ল, কোনপ্রকার সুদ দাবি না করে বিশ্বব্যাঙ্ক কোন দেশকে ঋণ দিতে পারেন কিনা। এই প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। অর্থাৎ, যেহেতু বিশ্বব্যাঙ্ক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত সেহেতু বিনা সুদে ঋণ দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারে ঋণপত্র বিক্রী করে ভারত ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, নিউইয়র্ক, প্যারিস, লণ্ডন ইত্যাদি হ'ল আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারের প্রধান কেন্দ্রস্থল। কেন্দ্রস্থলগুলিতে যে সব বেসরকারী লগ্নীকারী রয়েছেন তাঁদের কাছে ঋণপত্র বিক্রী করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করা দরকার। অনেকেরই হয়ত জানা আছে, মাত্র অল্প কয়েক দিন আগে শ্রীবি. কে. নেহরু এবং আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী লণ্ডন, প্যারিস ইত্যাদি স্থান পরিদর্শন করেছেন। এঁদের এই সফর খুব গুরুত্বপূর্ণ। ভারত সরকারের অর্থ-মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে এই সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বলা হয়েছে, সফরটির আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জ্জাতিক টাকার বাজারে ভারত সরকার কর্ত্তৃক ঋণপত্র বিক্রী করার সম্ভাবনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া। যাঁরা সফরে গিয়েছিলেন তাঁরা সবাই বলেছেন, আগে ঋণপত্র বিক্রীর যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে সে সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে, কারণ তাঁরা যেখানে গিয়েছেন সেখানে ঋণপত্র ক্রয় করার আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন।

তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক সরকারের কাছ থেকে দীর্ঘ এবং স্বল্প উভয় মেয়াদী ঋণ এবং সাহায্য গ্রহণ করেও বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আশ্বাস দিয়েছেন, এতদিন পর্য্যন্ত মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে ভারতকে যে ঋণ এবং সাহায্য দেওয়া হয়েছে সে ঋণ এবং সাহায্যের পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। প্রচারিত খবরে প্রকাশ, রুশ সরকারও এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, ভারতকে বারো বছরের মেয়াদে যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জা সরবরাহ করা হবে। অনুমান করা হয়েছে, এই যন্ত্রপাতি এবং কলকব্জার মোট মূল্য এক শত কোটি টাকার বেশী। রাশিয়া কেবলমাত্র বার্ষিক আড়াই শতাংশ সুদ দাবি করেছেন। এখানে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কারখানার জন্য প্রচুর যন্ত্রপাতি দরকার। কিন্তু যন্ত্রপাতির সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা ভারতের পক্ষে কষ্টকর। হয়ত পরিশোধ করার ক্ষমতা আপাততঃ ভারতের নেই। কাজেই যন্ত্রপাতির মূল্য বাবদ একটি অংশ ঋণ দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কয়েকটি ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ভারতের উপকার করেছেন। অবশ্য প্রদত্ত ঋণের জন্য অন্যান্য দেশ যে হারে সুদ দাবি করেন সে হারের চাইতে ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির সুদের হার অনেক বেশী। তবুও ভারতের অসুবিধা দূর করার জন্য ব্রিটিশ ব্যাঙ্কগুলি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন সেজন্য ভারত কৃতজ্ঞ।

চতুর্থ উপায় হ'ল, আন্তর্জ্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশনের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা। মাত্র অল্প কয়েকদিন আগে এই কর্পোরেশনটি গঠিত হয়েছে। আন্তর্জ্জাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্কের সঙ্গে এর নিবিড় সংস্রব রয়েছে। বেসরকারী শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী লগ্নীর ব্যবস্থা করা কর্পোরেশনটির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ইচ্ছা করলে ভারত এর সাহায্য গ্রহণ করতে পারে।

"বাংলার জাগরণ"

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনবিংশ শতাব্দী সমগ্র বিশ্বের পক্ষে, এবং বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে একটি অতীব গৌরবময় যুগ। 'বিশেষ করিয়া' বলিতেছি এই জন্য যে, বহু শতাব্দীর পরাধীনতার মধ্যেও ইহা এই শতাব্দীতে—প্রধানতঃ ইহার প্রথমার্দ্ধে, নিজেকে যেন খুঁজিয়া পাইয়াছিল। এই আত্মবোধ বা আত্মমর্য্যাদা ও গৌরববোধ এদেশবাসীদের ঐ সময়ের এবং পরবর্ত্তীকালের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মবোধ, সামাজিকতা, শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই নিজস্ব শক্তির উৎসের সন্ধান তাঁহারা পান এবং এতদ্‌বিষয়ে স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বশক্তি বিনিয়োগ করিতে অগ্রসর হন। গত শতাব্দীর এই জাগরণ একদিনে বা অকস্মাৎ হয় নাই। এ বিষয়ের আলোচনাকালে ইহার প্রস্তুতি-যুগের কথাও কমবেশী আমাদের জানা দরকার। কোন সন-তারিখ উল্লেখ দ্বারা কোন বিশেষ যুগের সূচনা হইল সঠিক বলা যায় না। তবে আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত আমরা সচরাচর এরূপ সন-তারিখের আশ্রয় লই। এদিক দিয়া বলিতে গেলে, গত শতাব্দীর বাংলার জাগরণের প্রস্তুতি-কালের সূচনা হয় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের 'রেগুলেটিং এক্ট', ১৭৭৪ সনে (মতান্তরে, ১৭৭২) রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এবং ১৭৮৪ সনে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হইতে। এ-কথা যেন আমরা না ভুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এতদিন অসম্পূর্ণ বা ভাসা-ভাসা ছিল। গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই যুগটি লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান, গবেষণা ও আলোচনা হইয়া আসিতেছে। সরকারী বেসরকারী রেকর্ডস বা দলিল-দস্তাবেজ, সমসাময়িক ব্যক্তি ও ভ্রমণকারীদের প্রত্যক্ষীভূত রচনা, বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের রিপোর্ট বা কার্য্যবিবরণী, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত চিঠিপত্র, দিনলিপি, মনীষীদের আত্মজীবনী, এবং সমকালীন সাহিত্য—সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র প্রভৃতির ভিত্তিতে আলোচনা গবেষণার নূতন নূতন পথ অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। আমাদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে এতদিনকার অজ্ঞানতা এবং ভাসা-ভাসা জ্ঞান নিরাকৃত হইয়া পুরাপুরি ও তথ্য নির্ভর জ্ঞানলাভ শিক্ষিত সাধারণের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নব্যসংস্কৃতি ও নবজাগরণের কাহিনী এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকটও উপেক্ষিত নয়। এ বিষয়টি উচ্চতম শিক্ষার পাঠ্য-তালিকায় মধ্যেও এখন স্থান পাইয়াছে। নবাবিষ্কৃত তথ্যাদির ভিত্তিতে বাংলার রেনেসাঁস বা নবজাগরণের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার সময় হয়ত আসিয়াছে। আমরা কাজী আবদুল ওদুদ লিখিত উপরের শিরোনামায় পুস্তকখানি* পাইয়া এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হই যে, এত দিনে হয় ত বাংলার নবজাগরণের একখানি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস আমরা পাইলাম। বিশেষতঃ তিনি যখন নিজেই 'মুখবন্ধে' লিখিয়াছেন, "...বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা, ভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করে আসছি গত ত্রিশ বৎসর ধরে।"

'রেনেসাঁস' (জাগরণ বা নবজাগরণ) সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে হইলে, এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটির নিগূঢ়ার্থ সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। একখানি প্রামাণিক অভিধানে 'রেনেসাস' শব্দটির এইরূপ মানে দেওয়া হইয়াছে:

"A new birth; resurrection; revival. 2. Specif., the revival of letters, and then of art, which marks the transition from medieval to modern history. The renaissance began in Italy in the 14th century and gradually spread over Western Europe, until the domination of scholasticism, of feudalism, and of the Church in secular matters was displaced by nationalism. Its precursor was 'The Revival of Learning', incident upon the recovery of classical Greek and Roman literature, led by Petrarch and Boccaccio and resulting in humanism. The movement soon extended to and transformed manners, philosophy, science, religion, politics, and art. The fall of Constantinople in 1453 sent many Greek scholars into exile throughout Europe. The passage of the Cape of Good Hope and the discovery of America, the invention of printing and paper-making, the acquisition of the Mariners' Compass, the contemporaneous spread of the reformation and the study of ancient classical art, all contributed to the renaissance."—*New Standard Dictionary,* vol. III, p. 2084.

'চেম্বার্স টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকশ্যনারি' ("Mid-Century Version") এবং অক্সফোর্ড ডিকশ্যনারিতেও সংক্ষেপে উক্ত বিশদ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে। 'কাজী আবদুল ওদুদ কৃত 'রেনেসাঁসে'র ব্যাখ্যাও ইহার কাছাকাছি খানিকটা গিয়াছে। তিনি

---

* বাংলার জাগরণ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। পৃঃ ২০০। মূল্য তিন টাকা।

লিখিয়াছেন : "এই অভিব্যক্তির সাধারণ নাম রেনেসাস, অর্থাৎ নবজন্ম। সাধারণতঃ তিনটি ধারায় ভাগ করে দেখা যেতে পারে এই নবজন্মকে—প্রাচীন জ্ঞান ও কাব্যকলার নূতন আবিষ্কার, জীবন সম্বন্ধে মানুষের নূতন আশা আনন্দ, ধর্ম্ম বা জীবনাদর্শ সম্বন্ধে নূতন বোধ" (পৃঃ ১)। আভিধানিকঅর্থ কিন্তু আরও ব্যাপক। 'রেনেসাস' অর্থ—পুনর্জ্জন্ম, পুনরুজ্জীবন, পুনরুত্থান; প্রথমে সাহিত্য, পরে শিল্পের পুনরুজ্জীবন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইটালিতে এবং ক্রমে পশ্চিম ইউরোপ পরিব্যাপ্ত রেনেসাসের কথা বলা হইয়াছে। সমাজের রীতিনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং শিল্পকলার আশ্চর্য্য উৎকর্ষ সাধিত হয় ইহার কল্যাণে। ইউরোপে নানা কারণে এই রেনেসাস সম্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি হইল 'reformation' বা ধর্ম্মসংস্কার। তাই বলিয়া রেনেসাসের মানে শুধু রিফর্মেশ্যন বা ধর্ম্মসংস্কার অথবা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন নয়। আবার, রিফর্মেশ্যনও রেনেসাস নহে। তবে একটি অন্যটির পরিপূরক এবং পরস্পর-সম্বদ্ধ এইমাত্র বলা যায়।

কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদের পুস্তক-পাঠে পাঠক-পাঠিকার মনে এই প্রতীতি জন্মিবার বিশেষ অবকাশ ঘটে যে, তিনি বাংলার রেনেসাসকে 'রিফর্মেশ্যন' বা ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলনের সমতুল অথবা সমানার্থবাচক মনে করিয়াছেন। আর এইখানেই যত গোল বাধিয়াছে—একপেশে আলোচনার আবর্ত্তে চিন্তার স্বচ্ছতাও পদে পদে ব্যাহত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায় হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হইতে শশধর তর্কচূড়ামণিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করাইয়া, এক পক্ষের প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব এবং অন্য পক্ষের প্রতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া, বিচারকের স্থলে লেখক এডভোকেটের আসন গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিহাসের মানদণ্ডে বিচার করিলে তাঁহার পুস্তকের এই একটি গুরুতর ত্রুটি। রাজা রামমোহন রায় যুগন্ধর মহাপুরুষ। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে তাঁহার স্থান সুদৃঢ়, এমনকি সকলের শীর্ষে—একথা আজিকার দিনে অস্বীকার করিলে বিশেষ প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে নিঃসন্দেহ। রামমোহন চিন্তাকে মুক্তি দিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যাখ্যায় যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন, শ্রেয়ঃকে প্রেয়ের উপরে স্থান দান করিয়াছেন, মুসলমান ও খ্রীষ্টান শাস্ত্রকে সুনির্দ্দিষ্টরূপে আলোচনান্তে উভয়ের সত্য শাশ্বত-রূপ পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছেন—সবই সত্য। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তিনি হিন্দুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বেদান্তকে অগ্রাহ্য করেন নাই, ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ীদের জন্য স্থান করিয়া দিলেও বেদপাঠ ব্রাহ্মণ দ্বারা পর্দ্দার আড়ালে করাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, নির্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিদায়ের ব্যবস্থাও করা হয়। তবে লেখক এ সকল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তৎকালীন হিন্দুসমাজ কত অপোগণ্ড, অনুন্নত, অসাড়, সুতরাং নিকৃষ্ট ছিল। যে সমাজে রামমোহন জন্মিয়াছিলেন, রামমোহনের কীর্ত্তিকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে সে সমাজ সম্বন্ধে পাঠকের মনে এই ধারণাই জন্মাইবার চেষ্টা হইয়াছে। রেনেসাসকে গ্রহণ করিবার মত, বা রামমোহনের জীবনাদর্শ বুঝিবার মত শক্তি কি হিন্দুসমাজের কাহারও ছিল না? জমি উষর হইলে বীজ তো অঙ্কুরিত হয় না। হিন্দুসমাজ উষর হইলে এরূপ শ্রেষ্ঠ মানুষের আবির্ভাব হইল কিরূপে? 'প্রচলিত' হিন্দুধর্ম্ম ও সমকালীন হিন্দুসমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করায় লেখকের একটি অবাঞ্ছিত obsession বা মানসিক আবিষ্টতা প্রকট হইয়া পড়ে না কি?

ডিরোজিও এবং তাঁহার শিষ্যদলের কথা বলিতে গিয়াও তিনি হিন্দুসমাজের উপর একহাত লইয়াছেন। 'প্রচলিত' হিন্দুধর্ম্মের উপর এই শিষ্যদল ঘোরতর বিরূপ ছিলেন, একারণ রক্ষণশীল হিন্দুদের নিকট তাঁহারা 'বিপ্লবী' আখ্যাও পান। তথাপি মাত্র দুই-এক জন খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও অধিকাংশই কিন্তু ক্রমে সমাজে স্থিতিলাভ করেন এবং স্বজাতীয়দের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিসাধনে সবিশেষ তৎপর হন। তাঁহারা কেহ কেহ ছাত্রাবস্থায়ই নিজ হিন্দুসমাজের দুঃস্থ সন্তানদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনা বেতনে শিক্ষাদান করিতে আরম্ভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়াও লেখক স্থানে স্থানে বিরূপ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন। রামমোহনকে যেমন 'বিচিত্র মানসিক সংকীর্ণতা ও অদ্ভুতত্ব ছিল যাদের পরিচয় তাদের নিয়ে"। (পৃ. ১৮) কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রকেও সেইরূপ করিতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা কেশবচন্দ্রের মধ্যে গ্রন্থকার পূর্ণতর জীবনাদর্শ লক্ষ্য করিয়াছেন, কেননা তাঁহার মতে তিনি হিন্দুত্বের গণ্ডী ছাড়াইয়া ছিলেন এবং বিশ্বমানবত্বে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও লেখকের বিরূপ সমালোচনা হইতে রেহাই পান নাই, যেহেতু নববিধানের মূলমন্ত্রস্বরূপ তিনি 'সর্ব্ব ধর্ম্মই সত্য' এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন। 'সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য' হইলে তো 'বহুনিন্দিত' হিন্দুধর্ম্মও সত্য হইয়া যায়! লেখক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু 'obsession' সে সে স্থলেও সত্যনির্ণয়ে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছে। "ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষ রূপে ভারতবর্ষের ব্রহ্ম।...এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষে ইহাকে বিশেষ রূপে রোপণ করিতে হইবে।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি লেখকের আদৌ পছন্দসই নয়। ইহা হইতে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন যে, "প্রকৃত ধর্ম্মবোধ এইকালে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে জাগে নি" (পৃঃ ১৭০)। হিন্দুদের সংস্পর্শ বেশী করিয়া করায় দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও লেখক এইরূপ উক্তি করিতে ক্ষান্ত হন নাই: "কিন্তু ভগবৎ-অনুরাগ শুধু যে সমাজকল্যাণধর্ম্মী হয় তা নয়, অনড় সংস্কার ও আচার, তুকতাক এসবের সঙ্গেও তাকে সংযুক্ত দেখা যায়..." (পৃ.৯৪-৫)। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক প্রস্তাব" সম্পর্কে লেখকের ঘোরতর বিরাগের কারণও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তিনি এমন একটি যুগান্তকারী সারগর্ভ রচনার মধ্যে পাইয়াছেন "পরিবর্ত্তনবিরোধী মনোভাব"। অথচ, এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন :

"তিনি [রাজনারায়ণ বসু] বলেন যে, ব্রহ্মোপাসনাই হিন্দুধর্ম্ম। অতএব ব্রহ্মোপাসনা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কেবল তাহার সমর্থন করা তাঁহার উদ্দেশ্য। এ দেশের সাধারণ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—কিন্তু আমাদের দেশের চলিত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এমন কথা তিনি বলেন না। যে ধর্ম্মকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলেন, তৎসম্বন্ধে লোকের বড় মতভেদ নাই। পরব্রহ্মের উপাসনা—সকল ধর্ম্মের অন্তর্গত—সকলেরই সারভাগ।"

লেখক কি এ কথাগুলির তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়াছেন ?

বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে লেখকের বিরূপতা, নানারূপ যুক্তি-জালের আবরণের মধ্যেও, অতি স্পষ্ট হইয়া ধরা দিয়াছে। শিল্পী ও প্রচারক—এই দুই রূপে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার প্রধান ত্রুটি নাকি তাঁহার "হিন্দুঐতিহ্য-গর্ব্ব"। লেখকের মতে "বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতরে সার্থক চিন্তা ও অসার্থক চিন্তা যে এমত জট পাকিয়েছে সেই জটিল বন্ধ মোচন করতে না পারলে একালে তাঁর চিন্তা থেকে তেমন সুফল লাভের আশা নেই। তাঁর যে শ্রেষ্ঠ অবলম্বন জাতীয় ঐতিহ্য-গর্ব্ব আজকার জগতে সে চিন্তার অকিঞ্চিৎকরতা—শুধু অকিঞ্চিৎকরতা নয়, বিপদসঙ্কুলতা—প্রমাণিত হয়েছে। শিল্পী হিসাবে তাঁর গৌরব অবশ্য আজও অক্ষুণ্ণ,··· শিল্পীরূপেই বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্ত্ব অবিসংবাদিত, চিন্তানেতারূপে তাঁর ত্রুটি সত্যই বড়ো রকমের···" (পৃ, ১০২-৩)। পুনশ্চ লেখক বলিতেছেন, "দেশের ও জাতির পুনর্গঠকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি যে পরিচ্ছন্ন নয়, তাঁর বহু প্রমাণ তাঁর কৃষ্ণচরিত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্গদেশের কৃষক প্রভৃতি বিখ্যাত আলোচনায় রয়েছে (পৃ, ১০২)।" লেখক বলেন, "অবশ্য দেশ তাঁকে দিয়েছে, অথবা এক সময় দিয়েছিল, ঋষির মর্য্যাদা—স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্রদ্রষ্টা জ্ঞানে। ব্যাপারটা ভেবে দেখবার মতো : ··কিন্তু তাঁর মন্ত্রের যে মহাত্রুটি তাও চিন্তনীয়—সেই মন্ত্রের হোতা আসলে সত্য বা ভগবান নন, সেই মন্ত্রের হোতা উগ্র জাতীয়তা।···তাঁর কোন কোন রচনায় দেশের লোকদের এই মনোভাবের সমর্থন যে নেই তাও নয় (পৃ, ১০২)।" বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনকালেও গ্রন্থকার গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হইতেছে। বঙ্গের রেনেসাঁস বা বাংলার জাগরণই তাঁহার আলোচ্য। রেনেসাঁসের সংজ্ঞা আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রে এবং তাঁহার রচনাবলীতে (কি রসসাহিত্য, কি মননসাহিত্য) ইহার লক্ষণগুলি তিনি পরিষ্কার দেখিতে পান নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, humanism বা মানবিকতা এবং Nationatism বা জাতীয়তা—এসবের মধ্যেই তো রেনেসাঁসের প্রকৃত লক্ষণগুলি খুঁজিতে হইবে। আর এই কথাটি ভুলিলেও চলিবে না—বঙ্কিমচন্দ্রের কালকে আধুনিক যুগের মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন নয়। সাময়িককে শাশ্বতের পর্য্যায়ে ফেলিয়া আমরা ভুল করি। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র আদর্শ মানুষকে দেখিয়াছেন। বঙ্গদেশের কৃষকের মধ্যে 'জমিদারী চাই না' জিগীর থাকা কিরূপে সম্ভব ? এ তো অতি আধুনিক বুলি! বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় উগ্র জাতীয়তার ফল 'সন্ত্রাসবাদ'ও নাকি প্রশ্রয় পাইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, গ্রন্থকার স্বদেশীযুগের 'বিপ্লব' বা 'বিপ্লববাদ' এবং পরবর্ত্তী কালের বিপ্লবকর্ম্মকেও বরাবর 'সন্ত্রাসবাদ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ; একটি বারও 'বিপ্লব' বা 'বিপ্লববাদ' বলেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মন্তব্য পাঠে প্রতীতি জন্মে যে, উদার দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য গভীর ভাবে অধ্যয়ন ও অনুশীলন করার এখনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

কতকগুলি কথার প্রয়োগে লেখকের বিশেষ অনুরক্তি দেখিতেছি। 'সন্ত্রাসবাদ' কথাটি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলাম। 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদ', 'হিন্দু-জাতীয়তাবাদী', 'হিন্দু ঐতিহ্য-গৌরব', 'তুকতাক', 'কবি-খেউড়ের সেই হীরক যুগে', 'সঙ্কীর্ণ মানসিকতা'—আর কত উল্লেখ করিব ? হিন্দুরা বড় 'অপরাধী' কেননা তাঁহারা 'জাতীয়তা' বা 'ন্যাশনালিজম্'-এর উন্মেষে সর্ব্বপ্রথম প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদের প্রশ্রয় বড় একটা দেন নাই ; পরে, জাতীয়তাবাদী হইলেও তাঁহারা বেশীর ভাগই মুসলমান বা মুসলিমই রহিয়া গিয়াছিলেন। সে যুগের একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে শুধু 'হিন্দু' নামের সংযোগ দেখি—সেটি 'হিন্দু মেলা'—অথচ আর সকল প্রতিষ্ঠানই তো অসাম্প্রদায়িক, যেমন—বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান লীগ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়ান্স, ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্ম এসোসিয়েশন—আর কত নাম করিব ? অন্যপক্ষে মুসলমান-প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলির নাম দেখুন : ন্যাশন্যাল মোহামেডান এসোসিয়েশন, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মোসলেম এডুকেশনাল কনফারেন্স, আঞ্জুমান ইসলাম। এমনকি যাঁহারা 'বুদ্ধির মুক্তি'র ("Emancipation of the Intellect") উদ্যোক্তা ও সমর্থক, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' নামটিতেও 'মুসলমান', 'মোহামেডান' বা মুসলিম শব্দটি সংযুক্ত। উগ্র সাম্প্রদায়িকতা তথা স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের কথা আলোচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্বভাবতঃই সংযমের পরিচয় দিয়াছেন ; এমনকি সেই ওহাবীদের সম্পর্কেও, যাহাদের "War-Song" বা সমর-সঙ্গীতের শেষ চরণ দুইটি ছিল :

"Fill the uttermost ends of India with Islam, so that
No sounds may be herd but 'Allah Allah'"

পুস্তকখানিতে বহু অসতর্ক উক্তি রহিয়াছে। তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তিও নজরে পড়িল। এখানে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করি। "ধর্ম্মসমাজ" নয়, ধর্ম্মসভা। (পৃ, ২৫) ; 'Partheon' নহে, "Parthenon", ডিরোজিও পত্রিকাখানি বাহির করেন নাই, এখানি তাঁহার ছাত্রদের কাগজ (পৃ, ৫২ পাদটীকা)। সুরাপান-নিবারণী আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন 'প্যারীচাঁদ মিত্র' নহেন, প্যারীচরণ সরকার (পৃ, ৫৬) ; 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন', না—বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ? (পৃ, ৬৬-৭) ;

'১৮৩৪ সনের রিপোর্ট' (পৃ, ৭০)—কাহার রিপোর্ট? নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সুরু হয় ১৮৩৬ সনে, ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে নহে (পৃ, ১১৯-২০) ; ফারসি হইতে আদালতের ভাষা ইংরেজীতে পরিবর্ত্তিত হয় ১৮৩৯ সনের জানুয়ারী হইতে, '১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে' নহে পৃ, ১১৯)। "হিন্দু কলেজ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত" হয় নাই (পৃ, ১২২, ১২৪), হইয়াছে ১৮৫৪ সনে, পুরাপুরি ভাবে ১৮৫৫ সনে ; পূর্ব্ব সন হইতেই মুসলমান ছাত্রও এখানে ভর্ত্তি হইতে থাকে। 'ডক্টর চক্রবর্ত্তী' কে—লেখকের তা জানা নাই (পৃ, ১২২)। ইনি সুবিখ্যাত ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী। "একমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ভিন্ন দেশের সাহিত্যে অবশ্য ডিরোজিওপন্থীরা কিছু দান করতে পারেন নি" (পৃ, ৫৬),—এ উক্তি ঠিক নয়। জ্ঞানান্বেষণ-সম্পাদক রসিককৃষ্ণ মল্লিকের কথা, এবং মাসিকপত্রে'র অন্যতর সম্পাদক রাধানাথ শিকদারের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, ডিরোজিও-শিষ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা-সাহিত্য-সাধনা তো সর্ব্বজনবিদিত ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য পুস্তকখানি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত—বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত ছয়টি বক্তৃতার সমষ্টি। "বাংলার জাগরণ" বা রেনেসাস সম্বন্ধে সুদীর্ঘ কালব্যাপী আলোচনার পর লেখক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার "জাগরণ" হয় নানা দিকে, বিভিন্ন বিষয়ে, আর ইংরেজী শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য দর্শন-সাহিত্য-ইতিহাস, সংবাদপত্র প্রভৃতি আমাদের আত্মস্থ করিয়া তুলিবার প্রধান সহায় হয়। নিজেদের হৃত এবং বিস্মৃত গৌরব সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। তখন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য চর্চ্চায় নূতন করিয়া আমরা উদ্বুদ্ধ হইলাম। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, বাংলা সাহিত্য সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক সভা-সমিতি, দেশবাসী-পরিকল্পিত বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই সকলের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে আসে বাংলার জাগরণ বা রেনেসাস। গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকের ঐ সময়ের কতকগুলি বিষয়ের, বিশেষ করিয়া ধর্ম্মভিত্তিক মতবাদের, অনুকূল ও বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কিছু কিছু তথ্যপরিবেশনেরও প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু আসল বিষয় হইতে বহু দূরে সরিয়া যাওয়ায় পুস্তকখানির উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফল হয় নাই। যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী থাকিলে বাংলার নবজাগরণের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করা যাইত, বর্ত্তমান পুস্তকে তাহার অভাব আমাদিগকে পীড়া দিয়াছে।

অসমতল

শ্রীরবিদাস সাহা রায়

দূর থেকে দেখতে পেয়েছিল অমল, একটি মেয়ে বাড়ীর নম্বর খুঁজতে খুঁজতে আসছে। হয়ত পথ ভুল করেছে মেয়েটি। নতুবা ঐ চেহারার আর ঐ পোশাকের মেয়ে এই বস্তি অঞ্চলে আসবে কেন? ঐ সব মেয়ের এ জায়গায় কোন আত্মীয় বা পরিচিত লোক থাকারও কথা নয়।

অমল আবার চা খেতে সুরু করল। বিস্বাদ—মিষ্টিহীন চা। রোজকার অভ্যাস, তাই ছাড়তে পারে না, নইলে এই দুগ্ধ-বর্জ্জিত ও শর্করাশূন্য চা খেয়ে খেয়ে যে লিভারটার বারটা বাজিয়ে দিচ্ছে তা কি আর জানে না অমল?

স্বাদহীন চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে আবার সে বাইরের দিকে তাকাল—মেয়েটি এদিকেই আসছে। ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে আসছে মেয়েটির মুখ, সুন্দর চেহারা। খুব ফরসা না হলেও গায়ের রঙে ঔজ্জ্বল্য আছে। শাড়ী পরেছে দামী।

তবু বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে অমলের ভাল লাগে না। নিত্য নূতন মেয়ের দিকে চেয়ে থাকার উৎসাহ অমলের চলে গেছে। কেবল বয়সের দিক দিয়েই নয়—মনের দিক দিয়েও। সংসারের পেষণযন্ত্রে জীবনের রস কেমন করে ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে, কেমন করে কবে থেকে জীবনের স্বপ্নময় রঙীন দিনগুলি হয়ে উঠেছে রুক্ষ, ধোঁয়াটে—অমল তা হিসেব করে বলতে পারে না।

তবু বয়সের দিক দিয়ে না হলেও মনের দিক দিয়ে অনেক বুড়োটে হয়ে গেছে অমল। তাই আগ্রহের সঙ্গে নয়—কৌতূহলের সঙ্গেই সে তাকাতে লাগল মেয়েটির দিকে।

এবার অনেক কাছে এসে গেছে মেয়েটি। অমলের ঘরেরই প্রায় কাছাকাছি। কেমন যেন লাগল অমলের। অনেকটা চেনা চেনা মুখ—অথচ চিনতে পারছে না। সে যেন আগে মেয়েটিকে দেখেছে অনেকবার—একটি অতি-পরিচিত মুখের ছবি যেন ভেসে উঠছে ঐ মুখের চেহারায়।

অমলেরই ঘরের কাছাকাছি এসে জিজ্ঞেস করল—এখানে কি অমল রায় থাকেন?

যেন একটা ধাক্কা খেয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল অমল। অর্দ্ধ-ভুক্ত গরম চা পেয়ালার মধ্যে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে যেন ধূমান্বিত অগ্নিগিরির উদ্গার তুলল।

ততক্ষণে মেয়েটি এগিয়ে এল আরও কাছে।—আরে, এই যে অমলদা।—বলে তার ঘরের দিকেই পা বাড়াল।

—ইস, কি খোঁজাটাই না খুঁজলাম এতক্ষণ ধরে। কি জায়গায় তুমি থাক অমলদা। মেয়েটি মনের আক্ষেপ জানাল।

ঘরের ভেতর ঢুকে অমলের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল মেয়েটি।—ইস, কি চেহারা হয়ে গেছে তোমার। চেনাই যায় না।

অমলের ঠোঁটের ফাঁকে একটুখানি হাসি নেমে এল।

বলল মেয়েটি—আমি ত চিনতে পারলাম তোমাকে, তুমি আমাকে চিনতে পারলে কি?

চিনতে পেরেও অমলের একটু খুশী হওয়া উচিত ছিল। সাদর অভ্যর্থনা করা উচিত ছিল মেয়েটিকে। অন্ততঃ বলা উচিত ছিল —অনেক দিন পর তোমাকে দেখলাম, সুমিত্রা। এত দিন পর মনে পড়ল তোমার হতভাগ্য অমলদাকে?

কিন্তু বলতে পারল না। নিজের দীনতায় নিজেই সে সঙ্কুচিত। আনন্দ-উচ্ছলতার রাশটিকে যেন পেছন দিক থেকে টেনে ধরেছে তার দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলি।

অভ্যর্থনার অপেক্ষা রাখল না মেয়েটি। নিজেই বসে পড়ল জীর্ণ তক্তাপোশটার উপর। শাড়ীর চাকচিক্য তক্তপোশটার উপর বিছানো ছিন্ন মলিন চাদরটাকে যেন লজ্জায় কুঁচকে দিল।

বলল মেয়েটি—খুব ত গল্প লিখছ আজকাল। অনেক দিন পর আবার লিখতে সুরু করেছ বুঝি? যা হোক্, তাই তোমার ঠিকানাটা কাগজের আপিস থেকে পেয়ে গেলাম। টাকা পাচ্ছ নিশ্চয়ই। বাংলা দেশের কাগজগুলি নাকি আজকাল টাকা দেয় লেখকদের। কিন্তু এ কি হাল করেছ ঘরটার?

ঘরের চারটি দেয়ালের দিকে দু'চোখের দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে হেসে উঠল মেয়েটি। ওর বেশভূষার আভিজাত্য যেন ব্যঙ্গ করে উঠল ঘরটিকে।

আরও সঙ্কুচিত হ'ল অমল।

এমন সময় ঘরে ঢুকল সন্ধ্যা—অমলের মেয়ে, বছরপাঁচেক বয়স হয়েছে। একটি অপরিচিত স্ত্রীলোককে ঘরে দেখেই সন্ধ্যা থমকে দাঁড়াল। তার পর অমলকে বলল—মায়ের কাপড়টা দাও ত বাবা।

ঘরের এক পাশে দড়িতে ঝুলানো কাপড়চোপড়। তার থেকে একখানা শাড়ী নিয়ে অমল সন্ধ্যার দিকে ছুঁড়ে দিল। সন্ধ্যা সেটা নিয়ে চলে গেল কলতলার দিকে।

একটু পরেই অমলের স্ত্রী অদিতি ঢুকল ঘরে। সুমিত্রার মনে হ'ল যেন এ মানুষ নয়, কাপড়জামায় ঢাকা একটি চলন্ত কঙ্কাল।

সুমিত্রা একটু চমকেই উঠল যেন। বলল—একি অমলদা, এই তোমার বউ? আমাদের বৌদি?

অদিতি সুমিত্রার দিকে চেয়ে একটু হাসল। হাসির ভেতর আন্তরিকতা থাকলেও শুষ্ক নীরস সে হাসি।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা
লাইফবয় সাবান দিয়ে
নিত্য স্নান করেন
রোজকার * ময়লা জনিত বীজানু ইহা ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজানু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেই-জন্য স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজানু ধুয়ে সাফ করেন আর এইভাবে নিজেদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন।
লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
L. 256-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

এবার কথা বলল অমল—বেঁচে যখন আছে তখন বৌদিই বলবে বৈকি। কিন্তু না বেঁচে থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক।

অদিতিই কথাটার বিশ্লেষণ করে দিল—যে অসুখে পড়েছিলাম ভাই।

অমল আবার ভুল ধরিয়ে দিল তার—পড়েছিলে বললে কেন? বল—পড়ে আছি। চিরকালই ত অসুখে ভুগছ তুমি?

সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল—বিয়ে করলেই বা কবে আবার বৌয়ের অসুখও ধরালে কবে?

অমল জবাব দিল—প্রায় সাত বছর।

সুমিত্রা বলল—ইস, এতদিন হয়ে গেল? জানতেও পারলাম না?

অমল তাকাল সুমিত্রার মাথার দিকে। সিঁথিতে সিন্দুর—বিবাহিত জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বলল—তুমিও কি খবর আমাকে দিয়েছিলে?

সুমিত্রা জবাব দিল—কি করে জানাব? তুমি কি আমাকে ঠিকানাটা জানিয়ে ডুব মেরেছিলে?

লজ্জিত হ'ল অমল।

সুমিত্রা বলল—একটা কথা বলব, চল একটু রাস্তায়, নিরিবিলি।

অমল বলল—অত ব্যস্ত কেন? বসো, চা খাও আগে।

সুমিত্রা যেন এবার ব্যস্ততার ভাব দেখাল—মাপ কর, আজ অনেক বার চা খাওয়া হয়ে গেছে, আর মোটেই খাব না।

হাতজোড় করে এমন কাতর অনুনয় জানাল সুমিত্রা, যাতে অনুরোধের চেয়ে প্রত্যাখ্যানটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ, এই পরিবেশে তার রুচিতে বাধে বলেই যেন এই প্রত্যাখ্যান—এ কথাই সে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিল।

কাজেই অমল আর অনুরোধ করল না। নিঃশব্দে সুমিত্রার সঙ্গে রাস্তার দিকে যাবার জন্ম পা বাড়াল।

খানিকটা চলে রাস্তার বাঁক ঘুরে দুজনেই একটু থামল। একটু নির্জ্জন এই পথটা। সুমিত্রা বলল—একটা জিনিষ তোমাকে দেবার জন্ম নিয়ে এসেছি, নিতে আপত্তি করবে না ত?

অমল একটু অবাক হ'ল। জিজ্ঞেস করল—এমন কি জিনিস?

—আগে প্রতিজ্ঞা কর তবে দেখাচ্ছি।

—প্রতিজ্ঞা করলাম।

সুমিত্রা তার হাতের ছোট ব্যাগটা খুলে বের করল আরও ছোট একটা জিনিস। হাতের মুঠোয় সেটা ধরে এগিয়ে দিল অমলের দিকে। বলল, এই নাও।

অমল হাত বাড়িয়ে নিল জিনিসটা। কিন্তু নিয়েই আবার চমকে উঠল। বলল, এটা ফেরত দিলে যে!

সুমিত্রা বলল, এটার কি প্রয়োজন আছে আর?

অমল বলল, এককালে আমাদের দু'জনের পরিচয় ছিল, এটা তো তারই স্মরণ-চিহ্ন। লকেটের এপিঠে রয়েছে তোমার নাম আর ওপিঠে রয়েছে আমার। আমাদের বিয়ে হয় নি বলে কি আজ এর কোন দাম নেই?

সুমিত্রা বলল, দামের প্রশ্ন এখানে নয়। দামী জিনিসের প্রয়োজন সব মানুষের সব সময় থাকে না।

অমল জিজ্ঞেস করল, কেন একথা বলছ সুমিত্রা?

সুমিত্রা জবাব দিল, আমার সংসার আছে, ভবিষ্যৎ আছে। সেখানে এটাকে রেখে একটা দ্বন্দ্ব রাখতে চাই না।

অমল স্তব্ধ হয়ে রইল।

সুমিত্রা বলে যেতে লাগল, এটাকে এতদিন পরম যত্নেই রেখে এসেছিলাম অমলদা। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ আমার স্বামীর চোখে পড়ে যায়, সে থেকেই হ'ল তাঁর সঙ্গে আমার মনান্তর।

—তা হলে এটাকে নষ্ট করে ফেললেই পারতে। জের টেনে এত দূর নিয়ে যাবার কোনই দরকার ছিল না।

—অনেক আশাতেই এটাকে যত্ন করে রেখেছিলাম অমলদা। কথা বলতে গিয়েই যেন হঠাৎ থেমে গেল সুমিত্রা।

অমল জিজ্ঞেস করল, থামলে যে!

সুমিত্রা বলল, কৈ, তুমি তো আমার স্বামীর কথা কিছুই জিজ্ঞেস করলে না অমলদা? একটু থেমে আবার বলল—ওঃ, আমার গা-ভরতি গয়না দেখেই বুঝি বুঝতে পেরেছ আমার স্বামী খুব বড়লোক? তা ঠিক। কিন্তু বড়লোক স্বামীর কাছে পড়লেই কি শুধু মেয়েরা সুখী হয়?

অমল বলল, আমার তো তাই মনে হয় সুমিত্রা?

সুমিত্রা বলল, সেটা তোমার ভুল অমল-দা। গল্প লেখো তবু এ কথাটা বুঝতে পার না? টাকা সব সময় সুখ দিতে পারে না। সুখভোগ করতে হলে ভাগ্য চাই। আমার এ বিয়ে হয়েছিল অনেকটা জেঠামশাইয়ের চক্রান্তে। তাঁরই আপিসের পার্টনার। কিন্তু কিছুদিন পরেই জানতে পারলাম তাঁর চরিত্রে রয়েছে অনেক অমার্জ্জনীয় কলঙ্ক।

—তার পর?

—যার নিজের ভেতর গলদ থাকে সে অপরের গলদও খুঁজে বেড়ায়। আমাকেও তিনি সন্দেহ করতে লাগলেন।

—তার পর?

—তার পর একদিন তাঁর চোখে পড়ে গেল এই সরু হারে ঝুলানো লকেটটা। জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি?

—তুমি কি বললে?

—আমি সত্যি কথাই বললাম।

কাঁটা দিয়ে উঠল অমলের সর্ব্বাঙ্গ। সর্ব্বনাশ, তুমি বললে?

সুমিত্রা বলল, ভয় নেই, ঘাবড়ে যেও না। নিজেদের অমর্য্যাদা করে কিছুই বলি নি। শুধু বলেছি, কলেজে পড়ার সময় তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল, আমার জন্মদিনে তুমি এটা উপহার দিয়েছিলে।

ধৈর্য্যের বাঁধ মানছিল না অমলের। জিজ্ঞেস করল—তার পর কি হ'ল?

সুমিত্রা জবাব দিল—তার পর স্বামী তোমার খবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, তার খবর আর জানি না, অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। আমি বললাম, এত বড় সত্য কথাটা যখন বলতে পেরেছি তখন এ কথাটাও সত্য বলে ধরে নিতে পার।—স্বামী তা বিশ্বাস করলেন কিনা জানি না, কিন্তু সেই থেকে ভয়ানক গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে যেটুকু তাঁর মনের যোগাযোগ ছিল তা-ও বুঝি ছিন্ন হয়ে গেল।

অমল বলল, এটা যখন এত সংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল তখন ছুড়ে ফেলে দিলেই পারতে।

—কিন্তু তা দিই নি শুধু আমার স্বামীর উপর অভিমানের বশবর্ত্তী হয়ে। ভেবেছিলাম তাঁর অন্যায়ের প্রতিশোধ নেব। নিজের ভেতর এত কলঙ্ক, এত অন্যায় থাকতেও অপরের সামান্য একটু ত্রুটি কেন মানুষ সহ্য করতে পারে না বলতে পারো?

অমল নির্ব্বাক।

সুমিত্রা বলল, অনেকদিন পর তোমার খোঁজ পেয়ে দেখতে ইচ্ছা হ'ল তোমাকে। তাই দেখে গেলাম।

—কিন্তু এ না দেখাও যে ভাল ছিল সুমিত্রা।

—হয় তো ভাল ছিল। কিন্তু মনটা হয় তো আমার হাল্কা হ'ত না। সারা জীবন একটা বোঝা নিয়েই থাকতাম। যাক্, নিজের কথা অনেক বলা হ'ল। তোমাদের কথা হ'ল না কিছুই। অভাব-অনটনের মধ্যে আছ তা দেখেই বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু মনে হয় ভালই আছ।

—কেমন করে বুঝলে?

—রুগ্না তোমার স্ত্রী, সুরূপাও সে নয়—তবু তাকে নিয়ে ঘর করছ তো? আর আমি রুগ্না নই, কুরূপাও বোধ হয় নই. তবু ঘর করতে পারছি কৈ? তাই তো বলি শুধু অর্থই সব সময় মানুষকে সুখ দিতে পারে না।

অমল জিজ্ঞেস করল—তোমার স্বামীর আর খবর তো কিছু বললে না সুমিত্রা?

সুমিত্রা এবার চলতে সুরু করল। চলতে চলতে জবাব দিল—আর বলেই বা কি হবে? অনেকদিন ধরে তাঁর কোন খোঁজ নেই।

কেঁপে উঠল অমল। খোঁজ নেই? কেন?

—সে কথা জিজ্ঞেস করো না অমল-দা।

—তোমাদের ঠিকানাটা তো বললে না?

—সেটাও জিজ্ঞেস করো না।

সুমিত্রা চলার গতি তখন বাড়িয়ে দিয়েছে। অমল ভাবল ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। কিন্তু পা বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল। হাতের মুঠোর মধ্যে তখন ভারী হয়ে উঠেছে হারসুদ্ধ লকেটটা। সুমিত্রার কাছে দাম না থাকলেও অমলের কাছে এটার দাম আজ অনেক। মর্য্যাদা হিসাবে না হলেও ধাতব মূল্য হিসাবে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে তাঁহার চারি খণ্ডে সমাপ্ত রবীন্দ্র-জীবনীর জন্ম এবার (১৯৫৬-৫৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে রবীন্দ্র-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। প্রভাতকুমার সুদীর্ঘ কাল যাবৎ একাগ্র নিষ্ঠায় সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত আছেন। 'রবীন্দ্র-জীবনী' তাঁহার অপূর্ব্ব কীর্তি। এই সাহিত্যসাধকের শ্রেষ্ঠ সম্মান-লাভে সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছেন।

নদীয়া জেলার রাণাঘাট শহরে ১১ই শ্রাবণ, ১২৯৮ (২৭শে জুলাই, ১৮৯১) প্রভাতকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় রাণাঘাটের উকিল ছিলেন। প্রভাতকুমারের বিদ্যারম্ভ হয় রাণাঘাট পালচৌধুরী স্কুলে। ১৯০৬ সনে তিনি গিরিডি স্কুলে ভর্তি হন। ১৯০৫-এর ৭ই আগষ্ট লর্ড কার্জ্জন-কৃত বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভায় যোগদানের অপরাধে গিরিডি স্কুল হইতে তিনি বিতাড়িত হন। অতঃপর জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষায় ইতিহাসে প্রথম স্থান এবং গুণানুসারে পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করেন। সেই সময় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীবৃন্দের সান্নিধ্যলাভ করেন। অসুস্থতার জন্ম কলিকাতার কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া ১৯০৯-এর নবেম্বর মাসে শান্তি-নিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আসেন এবং ১৯১০ হইতে ১৯১৬-এর ডিসেম্বর অবধি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। অতঃপর ১৯১৭-১৯১৮ অক্টোবর পর্য্যন্ত। কলিকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৮ সনেই আবার শান্তি-নিকেতনে চলিয়া যান এবং ঐ বৎসরের অক্টোবর হইতে ১৯৫৪ সনের ২৭-এ জুলাই পর্য্যন্ত সেখানে বিশ্বভারতীর কর্ম্মী; পাঠভবন, শিক্ষাভবনের অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিকরূপে কর্ম্মময় জীবনযাপন করেন। এইরূপ কর্ম্মব্যস্ত জীবনেও ১৯২১ সনে তিনি বিখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ্ সিলভ্যালেভির নিকট শিক্ষা ও গবেষণা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯১৯ সনে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কন্যা সুধাময়ী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৯২৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে তাঁহাকে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে হয়। ১৯২৭ সনে তিনি রবীন্দ্র-নাথের সহিত পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯২৭-১৯৩০ সনে জাতীয় শিক্ষাপরিষদে (বর্ত্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) 'হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপকরূপে বৃহত্তর ভারতে হিন্দু ও বৌদ্ধ-সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহাকে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতে হয়। বাংলাভাষায় এবং সাহিত্যে

শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য ১৯৫৩ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণ-পদক লাভ করেন। ১৯৪১ সনে পাবনা জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির পদে বৃত হন। ১৯৫৫ সনে প্রভাতকুমার খিদিরপুরে নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সনে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিশিষ্ট বক্তারূপে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু বিশেষ কারণে যাওয়া হয় নাই। প্রভাতকুমার নিখিল-ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি। ১৯৫৪ সনে তিনি নিখিল-বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদেরও সভাপতি হন। ইহা ছাড়া আরও নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

প্রভাতকুমার বর্তমানে একটি জ্ঞানকোষ এবং পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় লিপ্ত আছেন। তা ছাড়া বাংলাভাষায় দশমিক বর্গীকরণ সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া লিখিতেছেন।

প্রভাতকুমারের পুস্তকাবলীর নাম প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সহ এখানে প্রদত্ত হইল: শুধু রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণের চারিটি খণ্ডের প্রথম প্রকাশের সময় দেওয়া হইয়াছে।

১। প্রাচীন ইতিহাসের গল্প। (আচার্য্য যদুনাথ সরকারের ভূমিকা সম্বলিত) ১৩১৯।

২। ভারত পরিচয়। (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা সম্বলিত) ১৩২৮।

৩। ভারতে জাতীয় আন্দোলন। (ভূমিকা—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। ১৩৩১।

৪। বঙ্গপরিচয়। হৃষীকেশ সিরিজ ১৯নং।

১ম খণ্ড—১৩৪৩ বঙ্গাব্দ

২য় খণ্ড—১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। ইতিহাসের দপ্তর; পুরানো ভারত। ১৩৩৮।

৬। দশমিক বর্গীকরণ বা Melvil প্রবর্ত্তিত Decimal Classification অনুসারে বাংলা লাইব্রেরী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতি। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৭। জ্ঞান-ভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ। (ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১ম খণ্ড—১৩৪৭

২য় খণ্ড—১৩৪৮।

৮। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী। ১৩৩৯।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

৯। রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক। ১ম খণ্ড (১৩৪০); ২য় খণ্ড (১৩৪৩)।

১০। রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী। ১৩৩৮।

১১। রবীন্দ্র-জীবনী (২য় সংস্করণ) ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক [পরিবর্দ্ধিত সং ১৩৫৩, ১৩৫৫, ১৩৫৯]।

১ম খণ্ড—১৩৫৩

২য় খণ্ড—১৩৫৫

৩য় খণ্ড—১৩৫৯

৪র্থ খণ্ড—১৩৬৩।
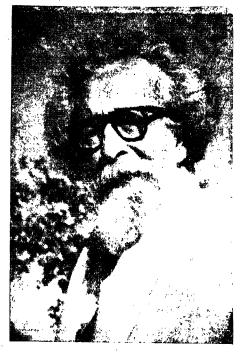
১২। Indian Literature in China and the Far East, 1931.

দেশ-বিদেশের কথা

সরকারী টাঁকশালে নূতন দশমিক মুদ্রা নির্ম্মাণ

গত ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক বর্গের নূতন মুদ্রা চালু হইয়াছে—ইতিমধ্যে আলিপুর, বোম্বাই এবং হায়দরাবাদ এই তিন জায়গায় তিনটি সরকারী টাকশাল সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ করিয়া এক নয়া পয়সা এবং দুই, পাঁচ ও দশ নয়া পয়সা এই চারিটি এককের প্রায় ৬১ কোটি খণ্ড নূতন মুদ্রা তৈরি করিয়াছে। ইহাদের সম্মিলিত উৎপাদন হইতেছে প্রতি মাসে প্রায় আট কোটি মুদ্রা-খণ্ড।

এই নূতন মুদ্রার বৃহদংশ তৈরী হইয়াছে এবং হইবে দুই কোটি বিশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ভারত সরকারের পুনর্নির্ম্মিত আলিপুরস্থ টাকশালে। কলিকাতার নিকটে ৮৭ বিঘা জমি জুড়িয়া অবস্থিত প্ল্যাণ্ট এলাকাসহ আলিপুর টাকশাল আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম সমন্বিত এবং প্রত্যহ ১২ লক্ষ মুদ্রাখণ্ড তৈরি করিবার ক্ষমতা ইহার আছে।

১৯৫৭ সনের ১লা এপ্রিলের পর হইতেই তিনটি টাকশাল তাহাদের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে। ইহা আশা করা যায় যে, ১৯৫৭ সনের জুনের শেষে তাহারা অতিরিক্ত ২৩ কোটি মুদ্রাখণ্ড তৈরি করিবে।

শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

গত ১১ই মার্চ্চ বাঁকুড়ার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ স্থানীয় টাউন উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া শহরে তাঁহার নিজ বাসভবনে সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বৎসর মাত্র।

বাঁকুড়ার বিখ্যাত চট্টোপাধ্যায় পরিবারে ১৯০৪ সনের ১৪ই জুলাই শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'জেলার' ছিলেন। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিয়ু'র প্রতিষ্ঠাতা রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়ের খুল্লতাত।

ছাত্রজীবনে শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায় বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি স্থানীয় ক্রিশ্চান কলেজে ভর্ত্তি হন। উক্ত কলেজ হইতে বি-এসসি পরীক্ষায় সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হন। তার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ হইতে ফলিত রসায়নে প্রথম বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। তিনি কিছুকাল উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। পরে অনিবার্য্য কারণে বাঁকুড়ায় ফিরিতে বাধ্য হন এবং বাঁকুড়া টাউন উচ্চ-(ইংরাজী) বিদ্যালয় ও দি স্বস্তিকা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠা করেন।

শরৎকুমার সারাজীবন জেলার এই স্কুলটির উন্নতিবিধানে ব্যাপৃত ছিলেন। সুদীর্ঘ ২০ বৎসর কাল (১৯৩৭-১৯৫৭) শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি বহু শত দরিদ্র ছাত্রকে শিক্ষালাভের সুযোগ দিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলার শিক্ষক সমিতির তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সভ্য। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী, সহনশীল, আদর্শ, বিনয়ী গৃহস্থ।

জগদীশ গুপ্ত

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক জগদীশ গুপ্ত গত ২রা বৈশাখ পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

১৮৮৬ সনে ফরিদপুর জেলার মেঘচামীতে জগদীশ গুপ্তের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্যকাল মফঃস্বলেই কাটে। অতঃপর তিনি কলি-

কাতায় পড়িতে আসেন। সিটি কলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া তিনি কলেজে ভর্ত্তি হন। কিন্তু অনিবার্য্য কারণে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। আদালতে পত্র ও দলিল লেখার কাজ করিয়া তাঁহাকে সংসার খরচ চালাইতে হইত। এই কাজে তাঁহাকে যশোহর, পাবনা, বীরভূম প্রভৃতি জেলার নানা স্থানে যাইতে হইত। এই উপলক্ষে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে তিনি যে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, পরবর্ত্তীকালে তাহা তাঁহার সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়ক হইয়াছিল।

কবিতা রচনা দ্বারা জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা হয়। প্রথম বয়সে তিনি ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ দাসের আদর্শে কবিতা লিখিতেন। 'অক্ষরা' নামে তাঁহার একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করেন অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কথাসাহিত্যিক রূপে। তাঁহার রচিত গল্পগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, তন্মধ্যে কতকগুলি বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবার দাবি রাখে।

কল্লোল, কালিকলম, বঙ্গবাণী, আত্মশক্তি প্রভৃতি নানা পত্রিকায় তাঁহার অজস্র রচনা প্রকাশিত হইত। 'প্রবাসী'তেও তাঁহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গল্প বাহির হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এবং প্রমথ চৌধুরী তাঁহার গল্প-রচনা-শক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ক্রমে একজন শ্রেষ্ঠ গল্পকাররূপে জগদীশচন্দ্র বিপুল খ্যাতির অধিকারী হন ঔপন্যাসিকরূপেও তিনি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে—বিনোদিনী, রুতিনী, রতি ও বিরতি, অসাধু সিদ্ধার্থ, দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা, তাতল সৈকতে, লঘুগুরু, মেঘাবৃত অশনি, দুলালের দোলা, তৃষিত সৃক্কণী, শ্রীমতী ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষ জীবনে একদিকে যেমন ব্যাধির আক্রমণে জগদীশবাবুর শরীর ভাঙিয়া পড়িয়াছিল, অন্য দিকে তেমনই নিদারুণ অর্থাভাবের মধ্যে তাঁহাকে দিনাতিপাত করিতে হইত—এই সময় প্রধানতঃ তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয় সরকার-প্রদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর। কিন্তু এই শোচনীয় এবং সঙ্কটজনক অবস্থায়ও তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় বিরাম ছিল না—এই সময়েও যুগান্তর সাময়িকী এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁহার বহু গল্প ও রঙ্গ-কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কিছুকাল আগে বসুমতী সাহিত্যমন্দির হইতে জগদীশ গুপ্তের একখানি গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

সঙ্গীতেও জগদীশ গুপ্ত বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, বেহালা বাদনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। এই একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের তিরোধানে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

আলোচনা

বেদে জন্মান্তরবাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

মাঘ ১৩৬৩-র প্রবাসীতে "শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা" নামক প্রবন্ধে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন, "জন্মান্তরবাদ বেদের কালে সৃষ্ট হয় নাই (পৃঃ ৪৯৪)।" ইহা যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। ঋগ্বেদ সংহিতায় ৪.২৭।১ ঋক এইরূপ :—

গর্ভেনু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।

শতং মাপুরবায়সীররক্ষন্নধ শ্যেনো জবসা নিরদীয়ম্।

ঋষি বামদেব বলিতেছেন, "আমি গর্ভে অবস্থানকালে দেবতাদের জন্মসকল জানিতে পারিয়াছিলাম, আমাকে শত (বহুসংখ্যক) লৌহময় নগর রক্ষা করিয়াছিল (যেমন লৌহময় নগর ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাওয়া দুরূহ, সেইরূপ দেহব্যতিরিক্ত আত্মাকে জানা দুরূহ। এখানে দেহকে লৌহময় নগরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।) অধুনা আমি শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বেগে নির্গত হইয়াছি (অর্থাৎ দেহাত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া আবরণহীন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছি।)"

এখানে বামদেব স্মরণ করিতেছেন, তিনি পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের নিম্নলিখিত মন্ত্রেও পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় :

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা

দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মনা।

অপো বা গচ্ছ যদি তত্রতে হিতম্

ওষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ। ১০-১৬-৩

মৃত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে, "তোমার চক্ষু সূর্যকে প্রাপ্ত হউক, তোমার প্রাণ বায়ুকে প্রাপ্ত হউক। (অথবা) তুমি ধর্মের দ্বারা (যজ্ঞাদি কর্মের ফলে) স্বর্গগমন কর এবং পৃথিবীতেও (গমন কর) অথবা জল (বা অন্তরীক্ষে) গমন কর। যদি তোমার কর্মফল সেইখানে (থাকে)। অথবা উদ্ভিদের মধ্যে তোমার অবয়বের দ্বারা অবস্থান কর।" এখানে পরলোক নিম্নলিখিত কয় প্রকার গতির উল্লেখ করা হইয়াছে—(১) ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষ। মোক্ষ হইলে সূক্ষ্ম শরীর অবশিষ্ট থাকে না। সূক্ষ্ম শরীরের বিভিন্ন অংশ (চক্ষু, প্রাণ প্রভৃতি অংশ) তাহাদের অধিষ্ঠাতা দেবতাদের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। চক্ষু সূর্যে বিলীন হয়, প্রাণ বায়ু দেবতাতে বিলীন হয়। এইরূপ অন্য অংশও। (২) দ্বিতীয় পথ পিতৃযান মার্গ নামে পরিচিত। যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মের ফলে স্বর্গে গিয়া সুখভোগ করা হয়, তাহার পর পুণ্য ফুরাইলে

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই পথ সম্বন্ধে গীতাতে বলা হইয়াছে :—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপাঃ
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্। ৯।২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামা লভন্তে। ৯.২১

"যাঁহারা যজ্ঞের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে তাহারা (যজ্ঞাবশিষ্ট) সোমপান করিয়া পাপমুক্ত হয়, তাহারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গ কামনা করে, পুণ্যময় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকল ভোগ করে। বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া যখন পুণ্য ক্ষীণ হয় তখন তাহারা মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। এই ভাবে সকামকর্মীরা পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যাতায়াত করে।" ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদেও পিতৃযানের উল্লেখ আছে। (৩) তৃতীয় পথ, জল বা অন্তরীক্ষে গমন. অথবা উদ্ভিদের মধ্যে অবস্থান করা। উপনিষদে এই পথকে "জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইত্যেতৎ তৃতীয়ং স্থানং" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৫।১০।৮) বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহারা ঈশ্বরের পূজা করে না, পুণ্যকর্মও করে না। ইহারা কীটপতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া বার বার জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ঋগ্বেদের পূর্বোধৃত শ্লোকে নরক ভিন্ন অন্য তিনটি মৃত্যুর পরবর্তী পথ এবং পুনর্জন্মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। মৃত আত্মীয়কে লক্ষ্য করিয়া এই শ্লোক বলা হইয়াছে। তিনি যে নরকে যাইতে পারেন একথা মৃত্যুর সময় তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা সঙ্গত হয় না।

এই প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, বেদ ও উপনিষদে অবতারবাদের উল্লেখ নাই। ইহাও ঠিক নহে। ঋগ্বেদ সংহিতার ৬।৪৭।১৮। ঋকে বলা হইয়াছে, "ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়াশক্তির দ্বারা বহু রূপ গ্রহণ করেন। ইহাই অবতারবাদের মূলতত্ত্ব। ঋগ্বেদ সংহিতার ৭।১০০।৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণু তাঁহার ভক্তদিগকে "উরুক্ষিতি" অর্থাৎ বিস্তীর্ণ ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে বিষ্ণুর বিশেষণ রূপে "সুজনিমা" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। অর্থাৎ যাঁহার "জনিম" বা জন্মসকল "সু" অর্থাৎ শোভন, যাঁহার জন্মসকল শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি করিলে সুখলাভ হয় (সায়নভাষ্য)। ইহাতেও দেখা যায় যে, বিষ্ণুর অনেক জন্ম ছিল। অর্থাৎ ইহা অবতারবাদ সমর্থন করে। কেনোপনিষদে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্ম একটি মনোহর মূর্তি ধারণ করিয়া দেবগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই সকল উক্তি অবতারবাদের সমর্থক বলিয়া মনে হয়।

এই বৈশাখে

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

এই বৈশাখে তোমাকে নূতন করে'
পেলাম মনের সকল উষ্ণতায়।
শরৎকে নয়, হেমন্তকেও নয়—
মন-বিহঙ্গ বোশেখকে পেতে চায়।

বাইরে সেদিন ঝড়ের হুহুঙ্কার,
প্রলয়ঙ্কর বজ্রের গর্জ্জন।
অন্ধ আকাশে থর বিদ্যুৎ জ্বলে,
দেবে ও দৈত্যে বেধেছে বুঝি বা রণ।

ঠক্ ঠকা ঠক্ কাঁপছে বসুন্ধরা
টাইমপিসের থেমে যায় স্পন্দন।
সহসা গোপন গুণ্ঠন খুলে দিয়ে
করলে নিজেকে নিঃশেষে অর্পণ।

হুহু-করা ঐ ঝড়ের দোলাতে বুঝি
মনেতেও দোলা লেগেছিল নিশ্চয়।
এসেছিলে কাছে, হৃদয়ের কাছাকাছি,
পেলাম তোমার সমগ্র পরিচয়।

সেদিন তোমার পড়েছি চোখের ভাষা,
পড়েছি কপোত-বক্ষের ধুক্ ধুক্।
কেউ যেন নাই সুদূরে বা অন্তিকে,
কেবল দুইটি অন্তর উৎসুক।

ভুললাম ঝড় সেদিন তোমাকে পেয়ে
বৈশাখে তাই ভালবাসি সব চেয়ে।

পৌরাণিকী—গিরীন্দ্রশেখর বসু। প্রাচ্য বাণীমন্দির গ্রন্থমালা—দশম পুষ্প। ৩ ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪। মূল্য ২॥০ টাকা।

ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর প্রতিভা বহুমুখী। তিনি একাধারে ছিলেন মনোবৈজ্ঞানিক, পুরাণার্থবিৎ, চিকিৎসক এবং সাহিত্যিক। "স্বপ্ন" প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি এবং মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। "গীতা"-ব্যাখ্যায় তাঁহার বিপুল শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "পুরাণ-প্রবেশ" পাঠে পাঠক বুঝিতে পারিবেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইলে পুরাণ ছাড়া গতি নাই। আলোচ্য গ্রন্থখানি বেদ ও পুরাণ বিষয়ক সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি। ডক্টর বসুর পরলোকগমনের পর এই প্রবন্ধগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া প্রাচ্য বাণীমন্দির পাঠকের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। 'নিবেদনে' কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। অন্যতর সম্পাদক ডক্টর রমা চৌধুরী গিরীন্দ্রশেখরের স্মৃতির প্রতি 'শ্রদ্ধার্ঘ্য' প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঋষি-কবি আখ্যা দিয়াছেন। জ্ঞানের মধ্য দিয়া গিরীন্দ্রশেখর আনন্দ পাইয়াছেন এবং আনন্দ বিতরণ করিয়াছেন। পুস্তকের কলেবর বৃহৎ না হইলেও এক-একটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু লইয়া এক-একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইতে পারিত। "প্রাচীন ভারতে সভ্যতার উদ্ভব" প্রবন্ধে সুদূর অতীতের সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিদ্যা, শিক্ষা, ধর্ম্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহার এবং জীবনযাত্রা-প্রণালী লইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবন্ত চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া ওঠে। "ঋগ্বেদে ইন্দ্র" প্রবন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন, ইলাবৃতবর্ষের অপর নাম স্বর্গ। এই স্বর্গ ভৌম স্বর্গ। জার বা কৈসরের ন্যায় ইলাবৃতবর্ষের সম্রাটগণের সাধারণ নাম ইন্দ্র। ইন্দ্র এক নয়—বহু। বিপশ্চিত, সুশান্তি, শিবি, বিভু, মনোজয়, পুরন্দর প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইন্দ্রগণের নাম পুরাণে ধৃত হইয়াছে। ইলাবৃতবর্ষ, কাশ্মীর, বিন্ধ্যোত্তর ভারত পর্য্যায়ক্রমে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্ত, অথবা দেবলোক, পিতৃলোক ও মর্ত্তলোক, অথবা ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামে পরিচিত ছিল। দক্ষিণাপথ পাতাল। দেব ও অসুরগণ একই দেশের অধিবাসী এবং জ্ঞাতি ছিলেন। দুই দলের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ প্রায়ই লাগিয়া থাকিত। কখনও কখনও অসুরগণ প্রবল হইত। পরবর্ত্তী কালের আসিরিয়ার সেমেটিক অসুরগণ হইতে ইঁহারা ভিন্ন। বৃত্র তদানীন্তন ইন্দ্রকে যুদ্ধে অষ্টাদশ বার পরাজিত করেন। ত্বষ্টা ইন্দ্রকে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিলে ইন্দ্র তদ্দ্বারা বৃত্রকে হনন করেন। বজ্র অস্থিনির্ম্মিত (স্কন্দ পুরাণ)। প্রথমে সম্রাট ইন্দ্র নরেন্দ্ররূপে সম্মান পাইতেন। সম্মানার্হ অতিথিকে মানপত্র প্রদানের ন্যায়—আমন্ত্রিত ইন্দ্রকে অভ্যর্থনা করা হইত। এই অভ্যর্থনার নাম ছিল যজ্ঞ। সম্মানার্হ অতিথিকে বলা হইত যজ্ঞপুরুষ। ইন্দ্রগণ লুপ্ত হইলেও ইন্দ্রযজ্ঞ লুপ্ত হয় নাই। ক্রমে ইন্দ্র অদৃশ্য-দেব, আকাশ-দেব বা অন্তরীক্ষ-দেবে এবং পরিশেষে পরম দেবে পরিণত হইয়াছেন। ইহা বুঝিতে হইলে পৌরাণিক 'দিবি-আরোহণ তত্ত্ব' এবং 'অবতার-তত্ত্ব' বুঝিতে হইবে। আদিতে শূর-বীরগণের উদ্দেশ্যেই বৈদিক সূক্তগুলি রচিত হইয়াছিল। পুরুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মত স্বতঃস্ফূর্ত্ত মানবের চিরন্তন কামনাসমূহ ঋষির মনে প্রতিফলিত এবং নির্ব্বিচারে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই বেদ অপৌরুষেয়, ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা।

পুরাকালের রাজাদের নাম, কীর্ত্তিকলাপ এবং বংশবৃত্তান্ত কালনির্দ্দেশ সহ পুরাণে ধৃত হইয়াছে। পুরাণই প্রাচীন কালের 'হিষ্টরি' বা ইতিবৃত্ত। তৃতীয় প্রবন্ধে 'পৌরাণিক গাথা'-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পুলস্ত্যপুত্র নিদাঘ কেমন করিয়া গুরু-শ্বশুর নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন চতুর্থ প্রবন্ধে তাহার কথা আছে। রজি ছিলেন ভারতবর্ষের নৃপতি। তিনি ইন্দ্রকে জয় করিয়া স্বর্গের রাজা হইয়াছিলেন। পঞ্চম প্রবন্ধ এই রজি রাজার কাহিনী। "কি নাম রাখা যায়?" প্রবন্ধে গ্রন্থকার মনুসংহিতা এবং বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণের নামকরণের বিধিনিষেধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আধুনিক কালের নামসমূহের সহিত অতীত কালের নামের তুলনা করিয়াছেন। সপ্তম প্রবন্ধে "পুরাণে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে"র কথা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। বিষয়ের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার অনায়াস ক্ষমতা ছিল বলিয়া গিরীন্দ্রশেখর তাঁহার বক্তব্য এত সহজ ও সরলভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। চিন্তার স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের স্পষ্টতা তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য। "পৌরাণিকী"-পাঠে পাঠক জ্ঞানের সহিত গভীর আনন্দ লাভ করিবেন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ—স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী। রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০ টাকা।

সাধন-জগতে একটি কথা প্রচলিত আছে—অধিকারীভেদ। অধিকারী-ভেদে পরমতত্ত্বের প্রকাশধারা বিভিন্ন হইয়া থাকে। একই বাণীর নানা রূপান্তর, একই ছন্দের নানা সুর, একই পরম বস্তুর নানা মূর্ত্তি-কল্পনা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায়—"বাড়ীতে একটা বড় মাছ এলে ঝোল ঝাল কালিয়া রেঁধে মা ছেলেদের পাতে দেন, যার পেটে যা সয়।" আলোচ্য গ্রন্থের শ্লোকগুলি পড়িবার সময় এই কথাগুলিই বার বার মনে হইয়াছে।

শ্লোকগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত—স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদও করিয়াছেন স্বামীজীর অনুবাদ মূলানুসারী তো বটেই, গভীর অর্থব্যঞ্জকও। এগুলি ছন্দে এবং সুরে অপূর্ব্ব, শুধু বক্তব্যকে প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট করে নাই, একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া দিব্য অনুভূতির ক্ষেত্রটিকে সুগম করিয়াছে। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তরালে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের গুণাভাস-গঠিত ভাবঘন স্বরূপটি উপলব্ধি করা যায় ইহার দ্বারা।

ইষ্ট, গুরু ও সাধন, এই তিন পর্ব্বে শ্লোকগুলিকে ভাগ করিয়াছেন কবি, মাঝে মাঝে ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। যাঁরা আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং আত্মিক পিপাসায় পীড়িত—তাঁদের সংশয়, বেদনা ও ভয়-ভাবনা মোচনের আশ্বাস শ্লোকগুলির মধ্যে নিহিত। সর্ব্বসাধারণের পক্ষে এই তত্ত্বগুলি সহজবোধ্য।

যাবার বেলায়—ডাঃ শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ২॥০ টাকা।

গল্পের বই। সংগ্রহটিতে—অভিসারিকা, মা, অতিথি, চোর, সাগর-বেলায় প্রভৃতি নয়টি গল্প আছে। লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, গল্পগুলি অনেক দিন পূর্ব্বের লেখা।

গল্পগুলি পড়িবার সময় লেখকের এই স্বীকৃতিটুকু স্মরণ করা আবশ্যক। কারণ ইতিমধ্যে ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বাংলা-সাহিত্য পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। রচনাশৈলী, প্রকাশভঙ্গী, বিষয়বস্তুনির্ব্বাচন প্রভৃতি নানা দিক দিয়াই উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, বৈচিত্র্যস্বাদলুব্ধ পাঠকের রুচিও বদলাইয়াছে। আলোচ্য সংগ্রহের গল্পগুলি পরিবর্ত্তিত রুচির সঙ্গে ঠিকমত না মিলিতেও

পারে, কিন্তু এগুলিতে যে অকপট সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় আছে তাহা পাঠক-মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিশ্বসভ্যতার ধারা—শ্রীহরিপদ ঘোষাল। নিউ বুক ষ্টল পক্ষে শ্রীগোপালচন্দ্র পান কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

গ্রন্থকার শিক্ষাবিদ্‌। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার সুদীর্ঘ মনন-সাধনার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বিশ্বসভ্যতার দূরপ্রসারী বনিয়াদ কেমন করিয়া যুগ হইতে যুগান্তরের মধ্য দিয়া বিভিন্ন জাতির অবদানপুষ্ট হইয়া এক বিরাট রূপ ধারণ করিল, গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে তাহারই এক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। জনশক্তি এবং পশুবল, যান্ত্রিক অথবা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা জাতির সভ্যতার পরিমাপ হয় না। জাতির মনন-সাধনার ইতিহাস লুক্কায়িত থাকে তাহার দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা জ্ঞানচয়ন-স্পৃহার সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে। ইহাই যথার্থ সভ্যতার নিদর্শন। মারণাস্ত্র সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্যোতক নহে। মৃত্যুভয়ভীত ও মদমত্ত হন্তারক মানুষের কর্ণে এই নিত্য সত্যের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার সে প্রয়োজন পূর্ণ করিয়াছেন। মানুষের আত্মার স্বাক্ষর যেখানে সেখানেই সভ্যতার শতদল বিকশিত হইয়া উঠে। মানবসত্তার দুইটি দিক—ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়। ভারতীয় সভ্যতা ইন্দ্রিয়কে স্বীকার করিয়াও অতীন্দ্রিয়বাদকে পরম সত্য বলিয়াছে। লোকায়ত-দর্শন ভারতবর্ষে উপেক্ষিত হয় নাই। পরমার্থ-দর্শন শ্রদ্ধার সহিত স্বীকৃত হইয়াছে। তাই আমাদের দর্শন অতীন্দ্রিয়বাদীর পরম জ্ঞানান্বেষণের আলোকে ভাস্বর। গ্রীস ও ইটালীতেও আমরা আমাদের সমধর্মী সভ্যতার বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছি। তাহারাও শ্রেয়ঃকে পরিত্যাগ না করিয়া যে ভূয়োদর্শন সারা পৃথিবীকে দিয়া গেল তাহার তুলনা নাই। প্রেয়ের মোহ হইতে মুক্ত এই সভ্যতা-ত্রয়ী শ্রেয়ের সাধনায় আত্ম-নিমগ্ন রহিল। একদিকে সর্ব্বযুগীয় অধ্যাত্মদর্শন, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং অন্য-দিকে সর্ব্বকালিক শাণপত্যবাদ—ইহাদের ক্রমিক উত্থান-পতন বিশ্বসভ্যতাকে চিহ্নিত করিয়াছে। ইহাদের সমন্বয়েই বিশ্বসভ্যতার সুবিশাল দেউল নির্মিত। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সভ্যতানিচয়ের অপরূপ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহাদের মূলগত ঐক্যটির কথা গ্রন্থকার নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাহা যেমন মনোজ্ঞ তেমনি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। বিভিন্ন সভ্যতার সমন্বয়ীকরণ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'বিভিন্ন সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির সমন্বয়ে যে মানস-জাগরণ তার নাম বিশ্বসভ্যতা'।

আদান এবং প্রদানের মধ্য দিয়া ব্যক্তি এবং জাতি আপন আপন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখে। এই দেওয়া-নেওয়াই জাতির জীবনে মহৎ সম্ভাবনার প্রতীক্‌। গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, অসূয়া, হিংসার মধ্য দিয়া জাতির প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ হয় না। হিংসার সর্ব্বপ্রকার মালিন্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া এ যুগের ইতিহাস লিখিত হইবে। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ইংরেজদের জাতীয় পতাকাকে নেলসন ও ট্রাফালগারের স্মারক বলিয়াছেন। ইহা জাতিবিদ্বেষের প্ররোচনা দান করে। ইংরেজ জাতির জাতীয় পতাকা তাহার ডারউইন, সেক্সপীয়র ও নিউটনকে স্মরণ করায় না। ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক। তাই হিংসা ও দ্বেষের প্রাবল্য সে সভ্যতার অঙ্গভূষণ হইয়াছে। ইসলাম এই বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াছে। চীনা সভ্যতাও লেখকের মতে বস্তুতান্ত্রিক। এশীয় সভ্যতার অন্যতম অগ্রনায়ক ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ চীনা জীবনবাদকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহার আত্মনিষ্ঠ ভাবটুকু সৃজনে সহায়তা করিয়াছিল। এইভাবে গ্রন্থকার সভ্যতার চরিধারার আলোচনা করিয়া তাহাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের কাহিনীটুকু সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন প্রায় অর্দ্ধশত সুলিখিত ইতিহাস-পর্ব্বে। গ্রন্থকার কোন মৌলিক গবেষণার দাবি রাখেন না। তবু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, এই ধরনের গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

ভারতে স্বাধীনতার ইতিহাস—শ্রীরণজিৎকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায়। ৩৪।৬, মুরারিপুকুর রোড, কলিকাতা-১১। পৃষ্ঠা ২৯৫+১৮; দাম ৩, টাকা।

গ্রন্থখানি যে ইতিহাস সে কথা গ্রন্থকার নামকরণেই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু গ্রন্থখানির বাংলা নামটি ছাড়াও একটি ইংরেজী নামও আছে—"The Discovery of India's Independency." তবে এটি পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার্থে ইংরেজীতে ব্যাখ্যাও হতে পারে। আবার, গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় অথবা মর্যাদা বৃদ্ধিকল্পে ব্যবহৃত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই রীতি গ্রন্থমধ্যেও অনুসরণ করা হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের দুটি করে নাম—একটি বাংলা, অপরটি ইংরেজী। যেমন "জীবন-সঙ্গীত" Validity of Life; "আনন্দ-ভেল" The Field of Pleasure ইত্যাদি। গ্রন্থখানিতে বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় বিচিত্র গদ্যে পদ্যে নানা বিষয় লেখা হয়েছে, লেখা হয়নি কেবল ইতিহাস। অগণিত মুদ্রাকর প্রমাদে অভিনব শব্দ প্রয়োগে ও বানানে গ্রন্থখানি "কিউরিওতে" পরিণত হয়েছে। শ্রীজবাহরলাল নেহরুর নামের পূর্বে লেখক "পণ্ডিত" শব্দটি ব্যবহারের কৈফিয়ত পাদটীকায় দিয়েছেন: "the period written this, the Pandit was in existence not suppression the commentators" এবং "শ্যামাপ্রসাস প্রয়ানে" খেদ করছেন, "কাশ্মীর! কাশ্মীর! বিকট অরাতি-স্বেদ মৃসল্‌ আকার ত্রিদিব" ইত্যাদি। আমরা বলি, বুঝ সাধু যে জান সন্ধান।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মানুষ চিত্তরঞ্জন—শ্রীঅপর্ণা দেবী। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। পৃ. ৩৪৬। মূল্য পাঁচ টাকা আট আনা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সময়ে পুরোভাগে ছিলেন। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রাক্কালে বিপুল আয়ের আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমির সেবায় পুরাপুরি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি তখন স্বদেশবাসীর চিত্ত এতখানি জয় করিয়াছিলেন যে, তাহারা স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাকে "দেশবন্ধু" আখ্যা দিয়াছেন। বর্ত্তমানেও 'দেশবন্ধু' বলিতে আমরা আর কাহাকেও বুঝি না, বুঝি সর্ব্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে। ইহার পূর্ব্বে তিনি 'দাশ সাহেব' ছিলেন, ঐ সময় হইতে হইলেন 'দেশবন্ধু'। কিন্তু 'দাশ সাহেব' কিরূপে 'দেশবন্ধু' হইলেন এই বিষয়টি হয়ত আধুনিকেরা তেমন তলাইয়া দেখিবার অবকাশ পান না। তাই "মানুষ চিত্তরঞ্জন" গ্রন্থখানির আজ এত সার্থকতা! 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন চিরকাল স্বদেশগতপ্রাণ ছিলেন। স্বদেশীয় ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতির ছিলেন তিনি একনিষ্ঠ সাধক। বাহিরে ছিলেন তিনি 'দাশ সাহেব' বা 'সাহেব', কিন্তু অন্তরে ছিলেন তিনি খাঁটি বাঙালী—ভারতবাসী। স্বদেশবাসীর দুঃখদৈন্যের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত অবিরাম; তিনি প্রচুর আয় করেন, সাধারণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন হইলে বিপুল বিত্তের অধিকারী হইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি হন নাই। তিনি যেমন প্রচুর আয় করিয়াছেন তেমনি স্বদেশবাসীদের মধ্যে দুই হাতে বিলাইয়া দিয়াছেন। তিনি 'হিসাবী' দাতা ছিলেন না। সব সময়ে যে, দান সুপাত্রে পড়িত তাহাও বলা যায় না। তাঁহার গভীর মানবপ্রীতির সম্মুখে এ সকল হিসাব বা বিবেচনা ছিল অতি তুচ্ছ। 'নরনারায়ণে'র প্রতি অফুরন্ত দরদ, অপরিসীম প্রেম তাঁহার সাহেবিয়ানার ভিতরে ফল্গুনদীর মত প্রবহমাণ ছিল। অসহযোগের 'সোনার কাঠি' স্পর্শে তাহা লোকচক্ষুর সম্মুখে অতি প্রবল হইয়া দেখা দিল। আমরা এই সময় রাজনীতি ক্ষেত্রেই চিত্তরঞ্জনকে প্রতিষ্ঠিত দেখি। কিন্তু রাজনীতিকে ভারতমাতার বন্ধনমুক্তির উপযোগী ও শক্তিশালী করিতে হইলে যে সর্ব্বত্যাগব্রত প্রয়োজন ছিল,

চিত্তরঞ্জন নিজের জীবন দিয়া তাহা করিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুতে স্বল্প কথায় এই সত্যটিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয়, এমন মানবদরদী স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জনের জীবনকাহিনী রচনায় বাঙালী মনীষা অগ্রসর হয় নাই। আলোচ্য পুস্তকখানিতে এই অভাব পূরণের কথঞ্চিৎ প্রয়াস আছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

দেশবন্ধুর ছোটবড় কয়েকখানি জীবনী আছে। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার একখানি ইংরেজী জীবনী লেখেন খ্যাতনামা সাংবাদিক পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। নানা কারণে এই সকল পুস্তকের অধিকাংশই আমাদিগকে পাঠ করিতে হইয়াছে। দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যকলাপের কথাই এ সমুদয়ে কমবেশী আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী যুগে বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের কথা অন্য সূত্রে জানিয়া লইতে হয়। কিন্তু 'দরদী' চিত্তরঞ্জন বা 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে যে সকল কাহিনী আমরা সে যুগে শুনিতাম, তিনি যে কত বড় দাতা, তাঁহার প্রাণ অপরের দুঃখে কত গভীর ভাবে ব্যাকুল হইয়া উঠে, নানা ঘটনার মধ্যে এ সমুদয় প্রকাশ পাইত; আমরা শৈশবে ও কৈশোরে লোকমুখে ইহা শুনিতাম, শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইতাম। এখন স্বীকার করি, তথাকথিত চিত্তরঞ্জন-জীবনী গ্রন্থগুলি ইহার অনুল্লেখে বড়ই অপূর্ণ বলিয়া মনে হইত। মানুষ চিত্তরঞ্জনকে বরাবর খুঁজিয়াছি, আলোচ্য পুস্তকখানি যে সে আকাঙ্ক্ষা খানিকটাও পূর্ণ করিতে পারিয়াছে এজন্য ইহাকে অভিনন্দিত করি। বিখ্যাত দাশ-পরিবারের বহু খুঁটিনাটি তথ্য, আচার-আচরণের ধারা, সামাজিকতা, ঐতিহ্য প্রভৃতি—যাহা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভবপর ছিল না, লেখিকা নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত 'দেশবন্ধু'কে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন দেশমাতার সর্ব্বপ্রকার শ্রীবৃদ্ধিরই প্রয়াসী ছিলেন। বাংলার ভাষা সাহিত্য লোক-সংস্কৃতি—এক কথায় বাঙালী জীবনের বিভিন্নমুখী কর্ম্মপ্রয়াসে তাঁহার দান ও কৃতি সর্ব্বদা স্মরণীয়। লেখিকা বিভিন্ন অধ্যায়ে এ সকল বিষয়ও বিবৃত করিয়াছেন। আবার 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন রাজনীতিজ্ঞ, রাষ্ট্রনেতাও বটেন। লেখিকা স্বতঃই এ বিষয়টিরও আলোচনা করিয়াছেন। 'মানুষ' চিত্তরঞ্জন কতকগুলি বিষয়ে 'পাইওনীয়ার' বা অগ্রদূতের সম্মানের দাবি রাখেন। অসহযোগের মূল ভাবনা তাঁহাতেই প্রথম আসে। স্বরাজ্য দল গঠনের ভাবনা, কলিকাতা করপোরেশনের মত বিরাট পৌর প্রতিষ্ঠানকে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা-প্রতিষ্ঠানে রূপায়ণ-প্রয়াস—এ সকলের কৃতিত্ব আর কাহার প্রাপ্য? চিত্তরঞ্জনের অসহযোগ-পরবর্ত্তী কার্য্যাবলীকে অনেকে 'নেতিবাচক' বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, কিন্তু রচনাত্মক কার্য্যেও যে তাঁহার তৎপরতা কম ছিল না—সমসাময়িক ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। চিত্তরঞ্জনের কৃতিত্ব ও গুণাপকর্ষের অপচেষ্টা আমরা অনেক উচ্চমহলেও দেখিতে পাই। কিন্তু এ সকল সর্ব্বথা নিন্দনীয়। 'মানুষ চিত্তরঞ্জনে' দেশবন্ধু-জীবনীর বহু তথ্য যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী-গ্রন্থের উপকরণ ইহার মধ্যে আছে। এ কারণেও পুস্তকখানির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার্য্য।

মহাসোভিয়েট—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। বিচিত্রা, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১৮৮। মূল্য তিন টাকা আট আনা। চিত্র-সম্বলিত।

সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে একটা বিরূপ মনোভাব কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও সাধারণের মধ্যে বলবৎ ছিল। রাশিয়া সম্পর্কে তথ্যবহুল রচনা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই আমরা পড়িয়া আসিতেছি। ওয়েব দম্পতির বিখ্যাত পুস্তক, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সোভিয়েট-ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার ভালর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান রাশিয়ার বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্য এত গভীর ও এরূপ ব্যাপক যে, তাহার মধ্যে ঐ সব প্রখ্যাত পণ্ডিত মনীষী ও কবিশ্রেষ্ঠের রচনাও তলাইয়া গিয়াছিল। এখন আবার রাশিয়ার দিকে জগদ্বাসীর নজর পড়িয়াছে। কেননা বিশ্বরাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তি প্রবল বলিয়া প্রতীতি জন্মিতেছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর ভারত রাষ্ট্রের সন্দেহ সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে অনেকটা রদবদল হইয়াছে, আমরা সোভিয়েটকে 'বন্ধু'-রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিতেছি। এখন ভারতবর্ষ হইতে প্রতিনিধিদল রাশিয়ায় আকছার যাইতেছেন, ওদেশ হইতেও আসিতেছেন; রাষ্ট্রনেতারাও পারস্পরিক সম্প্রীতিসূচক উভয় দেশ 'পরিদর্শন' করিতেছেন। রাশিয়া সম্পর্কে বাংলায় পুস্তকে ও পত্রিকায়—প্রত্যক্ষদর্শীদের দ্বারা নানা তথ্যও পরিবেশিত হইতেছে।

আলোচ্য পুস্তকখানিও যে এইরূপ একটি রচনা, নাম হইতেই তাহা বুঝা যায়। তবে প্রচলিত পুস্তকগুলির অপেক্ষা এখানিতে বৈশিষ্ট্যও প্রচুর রহিয়াছে। লেখিকা মুখ্যতঃ সোভিয়েট-পরিভ্রমণে যান নাই, তিনি গিয়াছিলেন ১৯৫৫ সনে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বমাতৃসম্মেলনে অন্যান্য ভারতীয় মহিলা প্রতিনিধি সমভিব্যাহারে যোগ দিতে। সম্মেলনের কাজ হইয়া গেলে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ায় যান। তাঁহার ও অন্যান্য ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভ্রমণ-ব্যবস্থা সরকার পক্ষ হইতে করা হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছামতই তাঁহারা কয়েকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। এই বইখানিতে লেখিকা মস্কো, লেনিনগ্রাদ এবং উজবেকিস্তানের অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করিয়াছেন। মস্কো ও লেনিনগ্রাদের কথা অন্যান্য রচনায়ও পাঠ করিয়াছি। বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলের বিষয় পণ্ডিত নেহরুর সাম্প্রতিক সফরের বৃত্তান্তের মধ্যেও জানিয়া লইয়াছি। কিন্তু উজবেকিস্তানের মত একটি মরুদেশ মাত্র ষোল-সতর বৎসরের ঐকান্তিক প্রয়াসে কেমন করিয়া এক সুজলা সুফলা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে—এই কাহিনী পড়িয়া চমৎকৃত হইয়াছি। এই প্রসঙ্গে বার-তের বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়ে। যুদ্ধশেষের মুখে ড. মেঘনাদ সাহা প্রমুখ এক দল ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান টেনেসিভ্যালি পর্য্যবেক্ষণের জন্য। এই উপত্যকা ছিল সুবিস্তীর্ণ মরু-প্রান্তর। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এ প্রদেশ সুজলা সুফলা ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এখানে জাত কমলালেবু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা মিটাইয়া থাকে। ড. সাহা ১৯৪৫ সনে মেদিনীপুর সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিরূপে যে দীপ্ত ও দীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন তাহা শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ শ্রবণ করেন এবং আমরা সব তথ্য জানিয়া বড়ই বিস্ময় বোধ করি। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকর্ত্রীর মরুময় উজবেকিস্তানের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের কথা শুনিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। উজবেকিস্তান মুসলমান-অধ্যুষিত। এ স্থানের অধিবাসীরা যুগ-যুগ-সঞ্চিত সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার কাটাইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কারের অত্যাচার, অজ্ঞতার তামস কত অল্প সময়ের মধ্যে নূতন বিধানের প্রবর্ত্তনের বলে তাহারা কাটাইয়া উঠিয়াছে ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কৃষি-শিল্পে দেশটি সমুন্নত হইয়াছে। কারখানা স্থাপিত হইয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সমগ্র রাশিয়ার তুলা সরবরাহ হয় একদা ঊষর এবং বর্ত্তমানে উর্ব্বর উজবেকিস্তান হইতে। সাধারণ শ্রমিক নরনারী শিল্প কারখানায় শুধু জন খাটিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করে না, এ সকল পরিচালনায়ও তাহাদের দায়িত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত। শ্রমিক নরনারীর স্বাস্থ্যরক্ষার আয়োজন যথেষ্ট। শিশু ও কিশোরদের স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত সহজেই চোখে পড়ে।

"মংপুতে রবীন্দ্রনাথ"-রচয়িত্রীর বাচনভঙ্গী এবং বর্ণনা-পারিপাট্যের সঙ্গে প্রবাসীর পাঠক-পাঠিকা সুপরিচিত। 'মহাসোভিয়েট' পুস্তকেও তাঁহার রচনা-শৈলীর অনুপম নিদর্শন চোখে পড়ে। তাঁহার লিপিকৌশলে সোভিয়েটের যে-যে অংশের কথা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন চোখের সম্মুখে চিত্রের মত প্রকট হইয়াছে। পুস্তকখানির বিষয়বস্তু অতি দরদ দিয়া লেখা। সোভিয়েটের অঞ্চলবিশেষে তিনি যেসব নূতন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্থানে স্থানে স্বদেশের সঙ্গে তুলনা করিয়া তাহার মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানির প্রকাশ সময়োপযোগীও বটে। ইহা পাঠে দেশবাসী উপকৃত হইবেন আমরা এই আশা পোষণ করি।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট লিঃ), ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

অর্চ্চনা

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

আরণ্য শোভা

[ফোটো : শ্রীঅলক

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ

৫৭শ ভাগ ১ম খণ্ড | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৪ | ২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলার অবস্থা

নির্ব্বাচন ত হইয়া গিয়াছে। মন্ত্রীসভা নিয়োগও প্রায় সর্ব্বত্রই হইয়া গিয়াছে। এখন বাকী আছে কিছুদিনের মত নির্ব্বাচনের ফলাফল লইয়া বিভিন্ন দলের বড়কর্ত্তাদের বাজে বক্তৃতা ও তাহারই পথেঘাটে চর্ব্বিতচর্ব্বণ। দেশের দুরবস্থা বর্দ্ধিতই হইবে এবং দেশের লোকের দুঃখকষ্টও উত্তরোত্তর বাড়িবে।

নির্ব্বাচনে কলের পুতুলের মত চালিত হইলেই এইরূপ ঘটে। দুইবার একই রকম হইল এবং অপর বারও এইরূপই ঘটিবে যদি না দেশের লোকের চৈতন্য উদয় হয়। যদি না হয় তবে বাঙালীর দুর্গতির সীমা থাকিবে না। এখনই ত ভারতে তাহার স্থান সর্ব্ব-পশ্চাতে—সর্ব্বনিম্নে, এমনই যোগ্য লোকদের আমরা প্রতিনিধি-রূপে বা অধিকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে কেরলে এক নূতন ব্যবস্থার পরীক্ষা চলি-তেছে, সেখানে শুধুমাত্র বলা যায় "ফলেন পরিচীয়তে।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা সম্বন্ধে আমাদের বলিবার অধিকার নাই, কেননা লোকসভায় আমাদের ওজন কম এবং ব্যক্তিত্ব হিসাবে গণ্যমান্য লোকও আমরা এবার বিশেষ পাঠাই নাই। সুতরাং যেখানে, ভারের অভাবের সঙ্গে ধারেরও অভাব যুক্ত হইয়াছে সেখানে কোনও কথা বলা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। বুদ্ধিমান বাঙালীর বুদ্ধির পরিচয় এমনই হইয়াছে লোকসভায়! কাজে কাজেই ঘরের কথা আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ, যদিও তাহাতেও কোন কাজ অগ্রসর হইবে না।

এই যে নূতন বাজেটে বাঙালী মধ্যবিত্তের গঙ্গাপ্রাপ্তির ব্যবস্থা হইতেছে সে বিষয়ে আমাদের প্রান্তীয় সরকার ত একেবারে নাচার। কেননা ভিক্ষার ঝুলি যাহার সম্বল, যাহার পরভৃত্বৃত্তির উপর নির্ভর, সে কোন্ সাহসে কেন্দ্রীয় সরকারকে ঘাঁটাইবে? যাহার মুখপাত্র বলিতে কেহ নাই, লোকসভায় তাহার মতামতেরই বা কি মূল্য?

যদি মূল্য কিছু থাকিত তবে বলিতাম এখন প্রত্যেক প্রতিনিধির কাছে হাজার হাজার চিঠি যাওয়া প্রয়োজন যে, অর্থদপ্তর-মন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর নিকট প্রতিশ্রুতি আদায় কর—দেশের লোকের রক্তমাংস শুষিয়া এই যে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ঘৃতাহুতি দেওয়ার আয়োজন হইতেছে, তাহার বক্রকাল পূর্ণ হইলে—অর্থাৎ ১৯৬১ সনে—বাংলা ও বাঙালী পূর্ণরূপে সচ্ছল ও স্বাবলীল ভাব পাইবে। অন্যথায় এই আকাশকুসুমে প্রয়োজন নাই। এবং যদি কোনরূপ প্রতিশ্রুতিই না পাওয়া যায় তবে বাংলা দেশে আইন অমান্য আন্দোলনের পূর্ণ আয়োজন আরম্ভ করিতে হইবে।

প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনে ও লবণ আন্দোলনে পশ্চিম-বঙ্গই শেষ পর্য্যন্ত লড়িয়াছিল সকল বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার ও দমন-নীতি অগ্রাহ্য করিয়া। অবশ্য তখনকার আন্দোলনে নেতৃত্ব ছিল অন্যরূপ, এবং কংগ্রেসও এইরূপ জাহান্নামে যায় নাই।

যাহাই হউক, সে সব কথা এখন অবান্তর। এখন প্রথম কথা হইল, দেশের যে শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছে সে বিষয়ে করা হইবে কি? মন্ত্রীসভার তালিকা ও দপ্তরের ফিরিস্তি এইবারেরই "বিবিধ প্রসঙ্গে" অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে। যোগ্য লোক যে তাহাতে নাই তাহা নহে, কিন্তু দপ্তরগুলির বাঁটোয়ারা নিরীক্ষণ করিয়া মনে হয় যে, এবার শ্রাদ্ধ গড়াইবে আরও অধিক। কেন মনে হইতেছে তাহাও কিছু বলা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যাপার এমনিই শোচনীয়। কাগজে নানাপ্রকার স্তোকবাক্য প্রকাশিত হয়, কিন্তু আমাদের মত ভুক্তভোগী মাত্রেই জানে যে, এদেশে অসংখ্য চুরি-চামারি—এমন-কি খুনজখম—নিরন্তর ঘটিতেছে যাহার কোন কিনারাও হয় না এবং তাহার সংবাদও প্রকাশিত হয় না। দেশে নিরাপত্তা বলিয়া কোনও কিছু নাই। এমত অবস্থায় পুলিস ও সংরক্ষণের ভার পাইল কে তাহা দেখুন!

শিক্ষায় বাঙালী ছিল কোথায় এবং গত নয় বৎসরে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে কোথায়? এ অবস্থায় সে-দপ্তরে ডাক্তার রায়ের ষষ্ঠাংশ মাত্র যথেষ্ট!

বাংলার পথ-ঘাটের অবস্থা যে কি তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। শুধুমাত্র ইহা বলিলেই হইবে যে, ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতার উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-পশ্চিমের দশটি বৃহৎ রাজপথের পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃতিতে কোথায়ও দুই শত গজ পথ নাই যাহা পূর্ণ মেরামতি অবস্থায় আছে। বাঙালীর গৃহ ও বাসস্থান ত এখন বস্তীতে ও ভগ্ন কুটীরে। এমত অবস্থায় পূর্ত্ত, গৃহ ও বাসস্থানের দপ্তর পূর্ব্ববৎ রাখাই ঠিক হইয়াছে। কেননা দেশের সন্তানের চিতা সাজানো যখন চলিতেছে তখন তাহার দেশের পথঘাট ও ঘরবাড়ী শ্মশানে পরিণত হওয়াই শ্রেয়ঃ।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কট

পশ্চিমবঙ্গ পুনরায় এক ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। প্রায় প্রতি জেলা হইতেই অন্নাভাবের সংবাদ আসিতেছে। অবস্থা যেরূপ তাহাতে রাজ্যে নূতন করিয়া দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার বলিয়াছেন, খাদ্যপরিস্থিতিতে শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বলিয়াছেন, বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের মূলে রহিয়াছে বন্যাজনিত ফসলহানি এবং মজুতদারী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মুদ্রাস্ফীতিরও উল্লেখ করিয়াছেন। মজুতদারী যদি বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া থাকে তবে মজুতদারদিগকে তাহাদের মজুত চাউল ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করা এবং খাদ্যশস্য মজুত রাখিয়া কালোবাজার সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য তাহাদিগের কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা সাধারণ এখনও জানে না।

প্রায় সর্ব্বত্রই খাদ্যসঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। মুর্শিদাবাদের কান্দী মহকুমার দুরবস্থা দৈনিক সংবাদপত্রে বিস্তারিত প্রকাশিত হইয়াছে। মফস্বল হইতে প্রকাশিত যে সকল সংবাদপত্র আমাদের নিকট আসে, বিভিন্ন স্থানে খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে তাহাদের কয়েকটির অভিমত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সকল বর্ণনা হইতে খাদ্যাভাবের গভীরতার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "দামোদর" পত্রিকা "সাতান্নর মন্বন্তর" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ৩রা মে লিখিয়াছেন, "সরকার পূর্ব্ব হইতে সচেতন ও সাবধান হইলেন না,—এদিকে বর্দ্ধমানের ন্যায় জেলার নানা স্থানে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। অতর্কিতে এই বিপদ আসে নাই—সময়মত বিজ্ঞপ্তি দিয়াই আসিয়াছে। সরকারের এ কথা অজানা নহে যে, এই জেলার কোন কোন অংশে উপর্য্যুপরি তিন বৎসর ব্যাপকভাবে শস্যহানি হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই অনাবৃষ্টির জন্যও এবং বিগত বন্যা ও জলপ্লাবনে যেরূপ ব্যাপকভাবে শস্যহানি হইয়াছে—এরূপ সচরাচর দেখা যায় নাই। ধান্য ও চাউলের দর হু হু করিয়া বাড়িয়া বর্ত্তমানে সাধারণ মানুষের নাগালের বাহিরে। যে শস্য জন্মিয়াছে তাহার মধ্যে দরিদ্র চাষী ধান উঠিবার পরই ক্ষুধার অন্ন হইতে দেনা শোধ করিয়াছে। মধ্যবিত্ত চাষী সংসারের জন্য বাধ্য হইয়া ধান নিঃশেষ করিয়াছে এবং যাঁহারা সঙ্গতিসম্পন্ন, শত শত মণ ধান্য যাঁহারা মড়াই বাঁধিয়া লাভের আশায় রাখেন, এ বৎসর দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনিয়াই বর্ত্তমান মোটা দরে ধান্যলক্ষ্মীকে বিদায় দিয়া থোক টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতেছেন। পল্লী-অঞ্চলে কোথাও কোথাও এমন অবস্থা হইয়াছে যে, টাকা দিয়াও ধান্য পাওয়া যাইতেছে না। এই ত সবেমাত্র বৈশাখ চলিতেছে, ইতিমধ্যেই ধানের দর ১৪।০ টাকা এবং চাউলের দর ২৫ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের ক্ষেতমজুর, দরিদ্র চাষী, মধ্যবিত্ত এমনকি এক শত বিঘা জমির মালিকের বাড়ীতেও ধান্য নাই। সম্মুখে বর্ষা আসিতেছে, আগামী ফসল উঠিতেও অন্ততঃপক্ষে ছয় মাস লাগিবে। কিন্তু এই দারুণ বিপদকে দেশ কেমন করিয়া কাটাইয়া উঠিবে?"

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "ভারতী" পত্রিকা ২রা মে এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জঙ্গীপুর মহকুমার শোচনীয় খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ জেলায় সুনিশ্চিতভাবে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া পড়িয়াছে। জঙ্গীপুর মহকুমার পরিস্থিতি বর্ণনা সম্পর্কে "ভারতী" লিখিতেছেন,

"অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি ও প্লাবনের ফলে এই মহকুমারও বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করিয়া সমসেরগঞ্জ, ফরাক্কা ও সুতি থানার বহু স্থানে এবার বিপুল শস্যহানি ঘটিয়াছে। রাঢ় অঞ্চলেও এবার ফসল অন্যান্য বছরের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম হইয়াছে। রবিশস্য মহকুমার সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শীতকালীন ঝড়বৃষ্টির ফলে এই মহকুমায় প্রায় পাঁচ হাজার গরু ও মহিষ প্রাণ হারাইয়াছে। আম ও কাঁঠালের বাগানে কোন ফলই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ও সর্ব্বশেষে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে এবং দীর্ঘদিন বৃষ্টির অভাবে মহকুমার দিয়াড় অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার সমস্ত জলি ধান শুকাইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর প্রতিদিনই অগ্নিকাণ্ডের ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকের ক্ষয়ক্ষতি লাগিয়াই আছে। এই অবস্থায় এই মহকুমার মানুষ আজ সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও বিপন্ন। এখনই এতদঞ্চলে চালের দর ২৩।২৪ টাকা মণ, কাজেই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে যে এই দর কি দাঁড়াইবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান না করা গেলেও চাল যে অধিকতর দুর্মূল্য হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। অন্যান্য বৎসর এই মহকুমার সংলগ্ন বীরভূম এলাকা হইতে প্রচুর চাল-ধান আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর বীরভূমেই যেরূপ খাদ্যাভাব তাহাতে সেদিক হইতেও খাদ্য আমদানী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ ছাড়া মহকুমার সীমান্ত অঞ্চলের গলিপথে প্রতিনিয়তই যে খাদ্যবস্তু পাকিস্থানে পাচার হইতেছে তাহার পরিমাণও বড় কম নহে।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন যে, মুর্শিদাবাদ অনেকদিন হইতেই খাদ্যের দিক হইতে ঘাটতি জেলা। এতদিন পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলা হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করিয়া জেলার খাদ্যশস্যের ঘাটতি মিটান হইত। এবারে বন্যা এবং পরে অনাবৃষ্টির ফলে মুর্শিদাবাদে প্রায় কোন ফসলই হয় নাই, উপরন্তু পার্শ্ববর্ত্তী জেলাগুলিতেও ফসল হয় নাই। গৃহস্থের ঘরে যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল বন্যায় সে সকল গিয়াছে। এ অবস্থায় আশু ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ রোধ করা প্রায় অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

দৃষ্টান্ত আর বাড়াইয়া লাভ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্বত্রই খাদ্যপরিস্থিতি প্রায় একই প্রকার। সরকার দুর্গত অঞ্চলে টেষ্ট

রিলিফের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, উহা ভাল কথা। কিন্তু সরকারী আচরণ এবং কর্মপদ্ধতি দেখিয়া মনে হয় না যে, তাঁহারা সমস্যার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাদ্য-পরিস্থিতির প্রতিকার

পশ্চিম বাংলার খাদ্য-পরিস্থিতি দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিমত এই যে, যদিও প্রদেশের কোনও কোনও জায়গায় ধান-উৎপাদন ভালরকম হয় নাই, তথাপি খাদ্য-পরিস্থিতি তেমন আশঙ্কাজনক কিছু নয়। কতকগুলি জেলায় সম্ভবপর সাহায্যকার্য্য সুরু করা হইবে বলিয়া কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং প্রায় ১২টি জেলায় কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত বণ্টন-ব্যবস্থা প্রচলন করা হইবে। খাদ্যমন্ত্রীর হিসাবমত নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও অন্যান্য বন্যাপ্লাবিত জেলাগুলির উৎপাদন-ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই বৎসর পশ্চিম বাংলায় মোট ৪২ লক্ষ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ১০ শতাংশ বীজ ও অপচয় বাবদ বাদ দিলে আভ্যন্তরিক খরচের জন্য থাকে প্রায় ৩৮ লক্ষ টন এবং গত বৎসরের তুলনায় ইহা ৩ লক্ষ টন বেশী। তাঁহার হিসাবমত বর্ত্তমানে পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৮০ লক্ষ এবং বৎসরে গড়পড়তায় মাথাপিছু ৪ মণ ১০ সের হিসাবে বাংলা দেশের মোট প্রয়োজন ৪২ লক্ষ টন। সুতরাং মোট ঘাটতির পরিমাণ হইবে ৪ লক্ষ টন। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বাংলা বৎসরে প্রায় দেড় লক্ষ টন করিয়া চাউল অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করে, কিন্তু প্রায় সমপরিমাণ চাউল বাংলা দেশের বাহিরে রপ্তানী করিত।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কাগজেকলমে হিসাব দেখান সোজা এবং সেই কারণে হিসাব ঠিক থাকিলেও আসলে জিনিষের (অর্থাৎ ধানের) ঘাটতি আছে। চাউলের মূল্য কোন কোন জেলার প্রায় ৩০ টাকা মণে দাঁড়াইয়াছে। কর্তৃপক্ষের কৈফিয়ত এই যে, জমির মালিকরা চাউল ধরিয়া রাখিয়াছে চড়া দামে বিক্রয় করিবার আশায়, ইহা অবশ্য সম্ভবপর। কিন্তু ইহার প্রতিকার-ব্যবস্থা সরকার কি অবলম্বন করিয়াছেন? ইহার দুইটি প্রতিকার-ব্যবস্থা আছে। প্রথমতঃ, যাহা পাকিস্থান সরকার অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ সৈন্য দ্বারা গ্রামের সমস্ত বাড়ী তল্লাসী করা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান, কিংবা চাউল পাইলে তাহার জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতবর্ষ অবশ্য এইরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে রাজী হইবে না। দ্বিতীয় উপায় হইতেছে যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এবং প্রয়োজন হইলে ভারতবর্ষের বাহির হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল আমদানী করা। আভ্যন্তরিক চোরাগুপ্তাকে হঠাইতে হইলে প্রয়োজন প্রচুর সরবরাহ রক্ষা এবং তাহার জন্য চাউল আমদানী করা। চাউলের প্রচুর সরবরাহ থাকিলে জমির মালিকরা আর গুপ্তভাবে চাউল জমাইয়া রাখিবে না। পাকিস্থানে বর্ত্তমানে চাউলের খুবই অভাব, সুতরাং সেখানে গুপ্তভাবে চাউল অবশ্যই চালান যাইতেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের কর্তৃপক্ষের আরও সজাগ ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার খাদ্যমন্ত্রীর হিসাব অনুসারে প্রায় তিন লক্ষ চাষী ছয় লক্ষ মণ ধান আটক করিয়া রাখিয়াছে ভবিষ্যতে চড়া দামে বিক্রয় করিবার আশায়। পশ্চিম বাংলায় চাউলের অভাবের কারণ যাহাই হউক না কেন, ইহার সত্বর প্রতিবিধান করা প্রয়োজন, তাহা না হইলে জনসাধারণের অনাহারে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। তবে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, কারণ তাহাতে চোরাকারবার আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া আমদানী দ্বারা সরবরাহের প্রাচুর্য্য বজায় রাখা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে চাউলের ঘাটতি হইতে দুইটি জিনিষ প্রতীয়মান হয়। প্রথমতঃ, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাদ্য উৎপাদনে ভারতকে স্বাবলম্বী করিতে পারে নাই, শুধু তাহাই নহে বহু-বিঘোষিত নদী-পরিকল্পনাগুলিও দেশের মানুষকে এবং কৃষিকে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় (যথা, বন্যা) হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। নদী-পরিকল্পনার পরিকল্পনাতেই যেন গলদ আছে এবং গত দুই বৎসরের বন্যার ধ্বংসলীলা দেখিয়া প্রশ্ন জাগে যে, নদী-পরিকল্পনার কার্য্যকারিতা বাস্তবিক পক্ষে কতখানি আছে। ১৯৫৬ সনে যে ভীষণ বন্যা বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় ঘটিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে নদী-পরিকল্পনাগুলি যদি নাও থাকিত তাহা হইলেও ইহার চেয়ে ভীষণতর কিছু হইতে পারিত না। দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যশস্যের পরিসংখ্যান ব্যাপারে যথেষ্ট গোঁজামিল আছে, তাই কাগজেকলমের হিসাব বাস্তবে কার্য্যকরী হয় না।

কেন্দ্রীয় বাজেট

এ বৎসরের কেন্দ্রীয় বাজেট কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর শ্যেনদৃষ্টির আঘাতে জর্জ্জরিত, তিনি দেশের কোন স্তরের লোককেই তাঁহার করবাণের আঘাত হইতে রেহাই দেন নাই। ক্ষমতা থাকা এক জিনিষ, তাহার অপব্যবহার অন্য জিনিষ। অর্থমন্ত্রী গাওনা গাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে বাঁচাইতে হইলে এইরূপ ব্যাপক ভাবে করজাল বিস্তার ব্যতীত তাঁহার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে বাঁচানো নয়, পরিকল্পনাকে বাঁচানো। অর্থকে সবাই বোঝে, কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যাপারকে সবাই বোঝে না, এবং বোঝে না বলিয়াই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সনের বাজেট হইতেই কর্তৃপক্ষ অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন এবং এক ভুলের কুফলকে চাপিতে গিয়া আরও ভুল করিয়া বসিতেছেন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দোহাই দিয়া আইনপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সভ্যবৃন্দ দ্বারা বাজেট গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়কে প্রতিরোধ করা সম্ভবপর নহে।

উৎপাদক দ্রব্য ব্যতীত ও ব্যবহারিক দ্রব্যের উপর যে উচ্চহারে

কর বসান হইল তাহাতে দ্রব্যমূল্য অতিরিক্ত অনুপাতে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। শুধু যে চা চিনি প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, ইহাদের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাবে সমস্ত জীবনযাত্রার মান দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যখন বাস্তব ভিত্তি ত্যাগ করিয়া কল্পনাপ্রবণ হইয়া ওঠে তখন তাহা জাতির পক্ষে দুঃখময় হইয়া উঠে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য আগামী বৎসর সরকারী ক্ষেত্রে ৯০০ শত কোটি টাকা খরচ করা হইবে এবং সেই টাকা সংগ্রহের জন্য এই করজালের বেড়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। এবারকার নূতন বাজেটে বহু প্রকার কর সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ধনকর ও ব্যয়কর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। রেলপথের উপরও যাত্রীবহন ও মালবহন উভয় মূল্য ৫ হইতে ১৫ শতাংশ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ধনকর স্থাপনের প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমানে যে আয়করের ব্যবস্থা আছে তাহার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের করপ্রদান ক্ষমতার যথাযথ বিচার সম্ভবপর হয় না এবং সেই কারণে আয়করকে ন্যায়সঙ্গত করিবার জন্য ধনকর স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার দ্বারা নাকি আয়কর ফাঁকি খানিকটা বন্ধ করা যাইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, অবিভক্ত হিন্দু যৌথ সম্পত্তি এবং কোম্পানী সম্পত্তির উপর এই কর ধার্য্য করা হইবে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে সম্পদমূল্য দুই লক্ষ টাকার উর্দ্ধে এবং অবিভক্ত হিন্দু যৌথ সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে সম্পত্তির মূল্য তিন লক্ষ টাকার উর্দ্ধে সেখানে প্রথম দশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উপর অর্দ্ধশতাংশ হারে কর প্রদান করিতে হইবে, তার পরের দশ লক্ষ টাকার উপর এক শতাংশ হারে এবং বাদবাকী সম্পত্তির মূল্যের দেড় শতাংশ হারে কর ধার্য্য করা হইবে। কোম্পানীর সম্পত্তির ক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পর্য্যন্ত অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু এই ধনকরের আওতা হইতে কয়েকপ্রকার সম্পত্তিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যথা: কৃষিজমি, ধর্ম্ম কিংবা দানসংক্রান্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি, জীবনবীমার টাকা ইত্যাদি। তবে মোট পঁচিশ হাজার টাকার মূল্য পর্য্যন্ত সম্পত্তি রেহাই পাইবে। ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে; বহুক্ষেত্রে আয়করকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য ট্রাষ্ট সম্পত্তি সৃষ্টি করা হয়। যদিও ইহা আইনতঃ ট্রাষ্ট সম্পত্তি কিন্তু কার্য্যতঃ ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাত্র এবং এইপ্রকার সম্পত্তি হইতে ব্যক্তিরাই আয় ভোগ করে। কার্য্যতঃ দুই লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তিও রেহাই পাইবে।

এবারকার বাজেটে আর একটি নূতন প্রত্যক্ষকর স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহা ব্যয়কর। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ ক্যাল্ডরের অনুমোদনের উপর ভিত্তি করিয়া এই ব্যয়কর ধার্য্য করা হইবে। এই করব্যবস্থা ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নূতন এবং পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও ইহার প্রচলন আছে বলিয়া শোনা যায় না। ভারতবর্ষে ইহা একটি নূতন অভিজ্ঞতা। যে সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য আয়করের জন্য নির্দ্ধারিত বৎসরে ষাট হাজার টাকার অন্যূন সেই সকল সম্পত্তির উপর এই কর আরোপিত হইবে।

বাৎসরিক খরচের উপর ক্রমবর্দ্ধিত হারে কর আদায় করা হইবে। ১০ হাজার টাকা খরচ পর্য্যন্ত ১০ শতাংশ হারে কর ধার্য্য হইবে, ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচের উপর ২০ শতাংশ হারে, ২০ হাজার হইতে ৩০ হাজার টাকার বাৎসরিক খরচের উপর ৪০ শতাংশ হারে, এবং বাৎসরিক খরচ ৫০ হাজার টাকার অধিক হইলে করের হার হইবে শত শতাংশ।

সুতরাং নূতন বাজেট অনুসারে ভারতবর্ষে প্রত্যক্ষকর হইবে: আয়কর, সম্পদাশুল্ক, ধনকর ও ব্যয়কর। ধনকর ও ব্যয়কর পরস্পরবিরোধী, অর্থাৎ ব্যয় বেশী হইলে তাহার জন্য অধিক হারে কর দিতে হইবে, কিন্তু ব্যয় কম হইলে ধনবৃদ্ধি হইবে এবং অতিরিক্ত ধনবৃদ্ধির জন্য কর দিতে হইবে। অর্থাৎ ব্যয় করিলেও কর দিতে হইবে, না করিলেও কর দিতে হইবে, ধনকর ও ব্যয়কর পরস্পর প্রতিরোধক ও পরিপূরক। কিন্তু বিষয়টি কার্য্যতঃ অত সোজা হইবে না, কারণ ধনকরের আওতা হইতে এত বিষয়কে বাদ দেওয়া হইয়াছে যে জনসাধারণ ব্যক্তিগত ব্যবহারিক খরচ কমাইয়া সেই সকল বিষয়ে সম্পত্তি ক্রয় করিবে যেগুলি ধনকরের ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। ইহাতে দেশের লোকের টাকার জমা বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু শিল্প-মূলধন বৃদ্ধি (যাহার বৃদ্ধি দেশের পক্ষে বর্ত্তমানে অতীব প্রয়োজনীয়) সেই পরিমাণে ব্যাহত হইবে।

নূতন বাজেটে করধার্য্য-ব্যবস্থার মোট ফলাফল দেখা যায় যে, ধনিকশ্রেণীর উপর হইতে করভার লাঘব করিয়া দিয়া মধ্যবিত্ত-শ্রেণী ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করভারের বেড়াজাল ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হইতেছে। আয়করের ন্যূনতম সীমা ৪,২০০ টাকা হইতে বাৎসরিক আয়ের ন্যূনতম সীমা ৩,০০০ টাকায় নামাইয়া আনা হইয়াছে, ইহার ফলে যাহার মাসিক আয় ২৫০৲ টাকার কিঞ্চিদধিক তাহাকেও কর দিতে হইবে। কিন্তু আয়কর ও অতিরিক্ত আয়করের উচ্চতম হারকে হ্রাস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুপার্জ্জিত আয়ের উপর হইতে করের হার ৯২ শতাংশ হইতে বর্ত্তমানে উচ্চতম হার ৮৪ শতাংশে হ্রাস করা হইয়াছে এবং উপার্জ্জিত আয়ের উপর উচ্চতম করের হার ৯২ শতাংশ হইতে ৭৭ শতাংশে নামাইয়া আনা হইয়াছে ইহার ফলে নাকি দেশে শিল্পমূলধন বৃদ্ধি পাইবে, অন্ততঃ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তাহাই মনে করেন।

পরোক্ষ করব্যবস্থাকে এমন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হইয়াছে যে, আপামর জনসাধারণ ইহার আওতায় পড়িবে। দেশলাই, চা, চিনি, পোষ্টকার্ড, কাগজ, কেরোসিন তেল, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি প্রভৃতি বেশ প্রবল ভাবেই জনসাধারণকে নিষ্পেষণ করিবে। শুধু কেন্দ্রীয় করবৃদ্ধিই শেষ কথা নহে, ইহার পরে আছে প্রাদেশিক করব্যবস্থা, মূল্যবৃদ্ধি ও জীবনমান মূল্যবৃদ্ধি। কর্ত্তৃপক্ষের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ দ্রব্যমূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। গত বৎসরের তুলনায় পাইকারী মূল্যমান প্রায় ৩৫ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেবলমাত্র খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ৪৭ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং চাউলের মূল্য

বৃদ্ধি পাইয়াছে ৮১ পয়েন্ট। ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য সরবরাহের অবস্থা তেমন আশাপ্রদ নহে এবং মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে।

দেশে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে বাধ্য। সরকারী চিন্তাধারা পরস্পরবিরোধী, যথা, মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করিতে হইলে ব্যবহারিক দ্রব্য অধিক পরিমাণে আমদানী করা প্রয়োজন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ ব্যবহারিক দ্রব্যের আমদানী ক্রমশঃ কমাইয়া দিতেছেন এবং ইহার ফলে শুধু যে মূল্যমান আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা নহে, রাষ্ট্রের আমদানী শুল্কও বহুলাংশে হ্রাস পাইবে। বাজেটের হিসাব অনুযায়ী সরকারের প্রায় ৩৩ কোটি টাকা মাত্র ঘাটতি পড়িতেছিল এবং এই টাকা কিছু পরিমাণে উচ্চ আয়ের উপর প্রত্যক্ষকর বৃদ্ধি দ্বারা এবং কিছু পরিমাণে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঘাটতি মিটানো সম্ভবপর হইত। ৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি মিটানোর জন্য অর্থমন্ত্রী তুলিতেছেন প্রায় ৮৮ কোটি টাকা এবং তাহার জন্য অধিকাংশ অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের উপর করধার্য্য হইতেছে যাহার ফলে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক জীবন আজ বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত।

আসানসোলে পুলিশ অফিসারের রহস্যজনক মৃত্যু

আসানসোল থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা মতিলাল সরকারকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময় একরাত্রে বুলেটবিদ্ধ অবস্থায় মৃত দেখিতে পাওয়া যায়। সংবাদে প্রকাশ যে,শ্রীসরকার রাত্রে ডিউটিতে বাহির হইবার পর আর ফিরিয়া আসেন নাই। করোনার তাহার রায়ে বলিয়াছেন যে শ্রীসরকার সম্ভবতঃ আত্মহত্যা করিয়াছেন। কিন্তু পুলিশের ধারণা ইহা আত্মহত্যা নহে, একটি খুন।

থানা অফিসারের এইরূপ রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনায় স্থানীয় সাপ্তাহিক "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন, "এই মৃত্যু যদি হত্যা হইয়া থাকে (ঘটনা দেখিয়া যাহা অনেকের মনে বিশ্বাস) তাহা হইলে প্রকৃত দোষীর এত দিনে ধরা পড়া উচিত ছিল।"

হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশী তদন্তের মামুলি রীতির সমালোচনা করিয়া "বঙ্গবাণী" লিখিতেছেন,

"অনেক সময় পুলিশ কেসে মুখরক্ষার জন্য দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও একজনকে ধরিয়া চালান দেওয়া হয় এবং নিম্ন ও দায়রা আদালতে কয়েক মাস মোকদ্দমা চলার পর এই ব্যক্তি দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণের ফাঁকে সন্দেহের অবকাশে খালাস পাইয়া বাহির হইয়া আসে। অনেক পুলিশ-মোকদ্দমাতেই এই প্রকার হইতে দেখা যায়। কয়েক মাস পরে এই তথাকথিত আসামী যখন মুক্তিলাভ করে তখন জনসাধারণ হয়ত ঘটনার কথা ভুলিয়া যায়, সংবাদপত্রও সেই পুরাতন কাহিনী লইয়া আর নূতন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করে না এবং পুলিশ কেসও হয়ত এইখানেই ধামাচাপা পড়িয়া যায়। Investigating officer বা তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারীও হয়ত এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন—চালান ত একজনকে দিয়াছিলাম, কিন্তু দায়রায় টিকিল না তার আমি কি করিব।

"মতিলাল সরকারের মৃত্যু ব্যাপারে কোন Investigating officer যেন এই প্রকার আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা না করেন। দুর্ব্বল ও অপ্রচুর প্রমাণবিশিষ্ট কতকটা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চালান দিয়া তাড়াতাড়ি এই গুরুতর ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা প্রকৃত অপরাধীকে বাহির করিবার চেষ্টা করুন এবং তাহার বিরুদ্ধে সন্দেহের অবকাশবর্জ্জিত অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করুন। ইহাতে তাঁহাদের জাল যদি বড় ও গভীর করিয়া ফেলিতে হয় তাহাও করণীয় এবং সময় যদি লাগে তাহাও সহনীয়। মোট কথা এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় প্রকৃত দোষীর শাস্তিই জনসাধারণের কাম্য। গণআন্দোলনের ফলে তাড়াহুড়া করিয়া অকাট্য প্রমাণবর্জ্জিত কেবলমাত্র সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে চালান দিয়া তদন্তকারী পুলিশ যেন এই ঘটনার উপর একটা ছেদ টানিবার চেষ্টা না করেন।"

বেতিয়া প্রত্যাগত উদ্বাস্তু

হাওড়া ও শিয়ালদহে যে উদ্বাস্তুর দল রহিয়াছে তাহাদের লইয়া একটা আন্দোলন গঠনের চেষ্টা একদল লোক করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে বাস্তবের কথা ভুলিয়া কাণ্ডজ্ঞানবিহীন কাজ করিয়া বসেন। কিন্তু আর একদল এই দুর্ভাগা ছিন্নমূল নরনারী ও শিশুর দুঃখ যন্ত্রনা নিজেদের এবং নিজদলীয়দের, ঘৃণ্য স্বার্থের কাজে লাগাইতে উৎসুক। ডাক্তার রায় সকলকেই উদ্দেশ্য করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন, যাহা আংশিক ভাবে আমরা "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এই অবস্থার উৎপত্তি হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্বাস্তু সম্পর্কে অতি বিশৃঙ্খল ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন কার্য্যকলাপের ফলে :

"গত ২৬শে বৈশাখ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বি. সি. রায় বেতিয়াপ্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দাবি মানিয়া লওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণই যেখানে খাদ্যাভাবে রহিয়াছেন, সেখানে নূতন করিয়া ইহাদের খাদ্য-সংস্থানের দায়িত্ব সরকার কিভাবে লইবেন ? উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই উদ্বাস্তুদের জন্য বিহার সরকারকে ওদিকে সাহায্যও করিয়াছেন।

"হাওড়া ও শিয়ালদহে অবস্থানকারী উদ্বাস্তুদের বেতিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনই সমস্যা সমাধানের পথ বলিয়া উল্লেখ করিবা ডাঃ রায় প্রস্তাব করিয়াছেন—ইচ্ছা করিলে উদ্বাস্তুনেতৃবৃন্দও ইহাদের সহিত যাইতে পারেন এবং বেতিয়ার ট্রানজিট ক্যাম্পসমূহে যদি কোন গলদ থাকে, তাহা দূর করার চেষ্টা করিতে পারেন। বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই উহাতে সম্মতি দিয়াছেন।

"উপসংহারে ডাঃ রায় উদ্বাস্তুদের লইয়া গণ-আন্দোলনের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

"ডাঃ রায় তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন—জনসাধারণ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পরিস্থিতি অবগত আছেন।

"মোট ৩১ লক্ষের অধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ১৯ লক্ষ নিজেদের চেষ্টায় কিংবা সরকারী সাহায্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অবশিষ্ট উদ্বাস্তুদের মধ্যে ক্যাম্পে অবস্থানকারিগণ ব্যতীত অপর সকলে কোন-না-কোন প্রকারে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গের ক্যাম্পগুলিতে প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার লোক আছে, তন্মধ্যে আশ্রয়সমূহে অশক্ত লোকদের জন্ম নির্ম্মিত নিবাসসমূহে অবস্থানকারী ৫৪ হাজারের ভরণপোষণ সরকারকে তাঁহাদের স্থায়ী দায় হিসাবে নির্ব্বাহ করিতে হইবে। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে ১৯৫৪ সনের জুনের পূর্ব্বে আগত ৫০ হাজার এবং তৎপর আগত ১ লক্ষ ৭১ হাজারের সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন মন্ত্রণালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় যে, ১৯৫৪ সনের পর আগত সকল লোকের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিবেন এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বসতির জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বাহিরের স্থানসমূহে লইয়া যাওয়া হইবে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্ম জমি পাওয়া যায় না বলিয়া এই সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক হয়। সংখ্যায় ১ লক্ষ ৭১ হাজার এই সকল উদ্বাস্তুকে পশ্চিমবঙ্গে ট্রান্সিট ক্যাম্প-গুলিতে রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত ৩৩ হাজার উদ্বাস্তুকে পার্শ্ববর্ত্তী বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে ট্রান্সিট ক্যাম্পগুলিতে রাখা হয়। অন্যান্য রাজ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থাসাপেক্ষ উদ্বাস্তুদিগকে খাদ্য ও আশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে এই ট্রান্সিট ক্যাম্পগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"বিহারে প্রেরিত ২৮ হাজার উদ্বাস্তুর মধ্যে ৫ হাজারের পুনর্ব্বাসন হইয়াছে, অবশিষ্ট ২৩ হাজার পুনর্ব্বাসনের অপেক্ষায় বেতিয়ায় ট্রান্সিট ক্যাম্পগুলিতে অবস্থান করিতেছে।

"কোন কোন মহল হইতে অনবরত দাবি করা হইতেছে—শিয়ালদহ ও হাওড়ার এই দশ হাজার লোকের জন্ম এখানেই খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ইহা বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক উদ্বাস্তু আন্দোলনগুলির নেতৃবৃন্দ উহা স্বীকার করিয়া লইতেছেন না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ইহাদের খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার পক্ষে যে বহু অসুবিধা আছে—ইহা স্পষ্ট। এই সব লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশার প্রতি তাঁহারা যে কম সহানুভূতিশীল তাহা নহে বা যে কষ্টের মধ্য দিয়া ইঁহারা দিন কাটাইতেছে কাহারও চেয়ে তাঁহারা ইহা কম বোঝেন না। কিন্তু যখন দেখা যায় খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রত্যাশী এই উদ্বাস্তুরা যাহারা তাহাদের খাদ্য যোগাইতেছে তাহাদের তাড়াইয়া দেয়, তাহাদের সহানুভূতির অপমান করে, শিশুদের জন্ম আনীত দুগ্ধ নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করে—তখন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিটি মানুষই ভালভাবে বুঝিতে পারেন যে, এই আন্দোলন যত না সহানুভূতি-সঞ্জাত, তার চেয়েও বেশী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

"এই সব কারণেই একটি প্রস্তাব উঠিয়াছে এবং এখানে উহার পুনরুক্তি করা হইতেছে। প্রস্তাবটি হইল—বেতিয়া হইতে আগত উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদী বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, উদ্বাস্তুদের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব থাকিলে তাঁহাদের উচিত ইহারা যাহাতে বেতিয়ায় ফিরিয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা। সেখানে ইহাদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হইবে। ইচ্ছা করিলে এই সব ভদ্রলোকও উদ্বাস্তুদের সহিত যাইতে পারেন এবং বেতিয়া ট্রান্সিট ক্যাম্প-সমূহের যদি কোন গলদ থাকে, তাহা দূর করার ব্যবস্থা করিতে পারেন। বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে সম্মতি দিয়াছেন।

"এমতাবস্থায় উদ্বাস্তুদের মুখপাত্র বলিয়া কথিত ভদ্রলোকদের দাবির সারবত্তা উপলব্ধি করা যায় না। আর উদ্বাস্তু আসিবে না এবং ১৫ দিন পরে এই উদ্বাস্তুরা যে-যার পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া যাইবে—এই ভরসায় ১৫ দিনের জন্ম ইহাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা বলিতেছেন। উদ্বাস্তুদের হইয়া যাঁহারা কথা বলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা দল এ সম্পর্কে কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারেন না।

"এই সব ভদ্রলোকের বোঝা উচিত যে, তাঁহারা যে-কোনও আন্দোলনে উদ্যোগী হউন না কেন—উহাতে বিরোধের সৃষ্টি হইবে।"

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচন

পশ্চিমবঙ্গের নির্ব্বাচনে কতকস্থলে কংগ্রেস হটিতে বাধ্য হয়। তৎসম্বন্ধে সরকারী তদন্তের এক অংশ নিম্নে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' হইতে উদ্ধৃত হইল:

"বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী শিল্প-এলাকাগুলিতে বামপন্থী দলগুলির সাফল্যের কারণ সম্পর্কে এক্ষণে নয়াদিল্লীর উচ্চতম সরকারী পর্য্যায়ে বিচার-বিশ্লেষণ করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি দিল্লীতে এই সম্পর্কে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, তাঁহারা ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সমক্ষে বামপন্থী এবং অন্যান্য দলগুলির সাফল্যের ব্যাপার সম্পর্কে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কতকগুলি কারণ উপস্থাপিত করেন: ১। নিম্নমধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক বেকারসমস্যা; ২। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে তীব্র সরকার-বিরোধী মনোভাব। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্ত্তৃক আহূত ঐ বৈঠকে অন্যান্য রাজ্যের পুলিস অফিসারগণও যোগদান করেন।

প্রকাশ, ঐ বৈঠকে এইরূপ প্রস্তাব করা হয় যে, কলিকাতার ও শিল্পাঞ্চলগুলিতে বিবিধ চাকুরিতে কর্ম্মরত যে ৮ লক্ষ পাকিস্থানী নাগরিক আছে, পশ্চিমবঙ্গের নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত তাহাদের স্থলে ভারতীয় নাগরিক

নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রকাশ, ভারত সরকার নাকি এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আরও প্রকাশ, দিল্লীর নির্দ্দেশে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি বর্ত্তমানে ঐ প্রস্তাবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কেও খোঁজখবর করিতেছেন।

জানা যায়, কলিকাতার চল্লিশটি প্রতিষ্ঠান পুলিস কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহাদের অধীনে যে সকল পাকিস্থানী কাজ করে, তাহারা "অপরিহার্য্য"। মাত্র দশটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে, ঐগুলিতে পাকিস্থানীদের পরিবর্ত্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই তদন্তকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই।

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে পুলিস যে অনুসন্ধান চালায় উহার ফলে এই ব্যাপারে কতকগুলি উল্লেখ-যোগ্য তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ: ১। সরকারী কর্ম্মচারীদের অধিকাংশই বামপন্থী প্রার্থীদের অনুকূলে ভোট দিয়াছেন, ২। নির্ব্বাচন উপলক্ষে কর্ত্তব্যরত অনুমান ৩০ হাজার পুলিস কর্ম্মচারীর মধ্যে অধিকাংশই ভোট দিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহাদের সর্ব্বদাই এদিক-ওদিক চলাফেরা করিতে হইয়াছে। পুলিসের বিশ্বাস, ঐ সকল পুলিস কর্ম্মচারী ভোট দেওয়ার সুযোগ পাইলে আরও কতিপয় বামপন্থী দল প্রার্থী হয় ত নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হইতে পারিতেন।

রাজ্য সরকার সরকারী দপ্তর ভবনের ক্যান্টিন হলে লাউড স্পীকার মারফত নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকাশ, বামপন্থী প্রার্থীর জয় ঘোষিত হওয়ামাত্রই উহা তথায় সমবেত সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা বিপুল ভাবে অভিনন্দিত হয়। আরও প্রকাশ, কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। এই ধরনের সরকার-বিরোধী অভিব্যক্তির ফলে নাকি শেষ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টকে ঐ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিতে হয়।

রাজ্য বিধানসভায় কম্যুনিষ্ট দলের শক্তিবৃদ্ধি কি জনসাধারণের উপর ঐ দলের প্রভাব বিস্তারের সূচনা করে? এতৎসম্পর্কেও পুলিস কর্ত্তৃক অনুসন্ধান চালানো হয়। প্রকাশ, তদন্ত করিয়া পুলিস যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে তাহাতে ঐ দলের প্রভাব প্রকৃতই বিস্তৃত হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রহিয়াছে। ঐ তদন্তের ফলে নাকি জানা যায় যে, ১। সংহত প্রচারকার্য্যের ফলে কম্যুনিষ্টদল জনসাধারণকে বহুল পরিমাণে বিভ্রান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে; ২। এই দলের অর্থ ও জনবল থাকায় দল-প্রচারিত পুস্তকাদি বহুসংখ্যক লোকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়াছে; ৩। কম্যুনিষ্ট দলে বহুসংখ্যক 'হোল-টাইমার' (সকল সময়ের জন্ত কর্ম্মী) আছেন; ৪। প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় এই দলের নিজস্ব সংবাদপত্র আছে এবং প্রধান প্রধান ভাষায় অধিকাংশ ভাষায়ই একাধিক সংবাদপত্র আছে; ৫। রাশিয়া ও চীন হইতে ভারতে প্রেরিত প্রচার-পুস্তিকাসমূহ ব্যাপকভাবে বিক্রয় হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট দলের উনবিংশ কংগ্রেসে ষ্টালিন কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার ১৩,৫৯১টি কপি বিক্রয় হয়। তবে এই প্রকার ব্যাপক বিক্রয়ের অন্ততম কারণ হইতেছে ঐ সকল পুস্তিকার সস্তা দর।

পণ্ডিত নেহরু ও কংগ্রেস

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহরুর কিছু চেতনার উদয় হইয়াছে মনে হয়। তাঁহার মতামত সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা নীচে দেওয়া হইল।

অবশ্য চৈতন্যলাভ করা ভাল কথা। কিন্তু তাহার পরিণতি কি হয় সেইটাই আসল। সে বিষয়ে পণ্ডিত নেহরু যে বিশেষ সচেষ্ট তাহা মনে হয় না।—

"নয়াদিল্লী, ২রা মে—প্রধানমন্ত্রী নেহরু কংগ্রেসসেবীদিগকে কংগ্রেসের সততার খ্যাতি বজায় রাখিতে, ভারতের যুবকশ্রেণীর মনোভাব উপলব্ধি করিতে এবং দেশে নূতন শক্তির স্ফুরণের বিষয় মনে রাখিয়া জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাদাতারূপে কাজ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গত মাসে অনুষ্ঠিত প্রদেশ কংগ্রেসসমূহের সভাপতি ও সম্পাদক-বৃন্দের গোপন বৈঠকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ অধোগতির হেতু বিশ্লেষণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মুখপত্র 'ইকনমিক রিভিয়ুর' অধুনাতন সংখ্যায় এই প্রথম বার বক্তৃতাটি প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু বলেন, "কংগ্রেসসেবীদের সততা এবং তাঁহাদের ত্যাগ ও ব্রতনিষ্ঠা খ্যাতির জন্তই পূর্ব্বে কংগ্রেসের এমন শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। আমি একথা বলি না যে, প্রত্যেকেই এরূপ আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কংগ্রেসসেবীদের সততা এবং জাতির জন্ত সেবা ও ত্যাগের সুনামের ফল। আগের মত আর তেমন কংগ্রেসের সুনাম নাই। আমি অবশ্য ব্যক্তিবিশেষের কথা বলিতেছি না। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাহারও খ্যাতি থাকিতে পারে। নির্ব্বাচনের সময় আমরা বহু রকমের এবং অন্ত সময় সততাহীনতার অভিযোগ পাইয়া থাকি। এরূপ অভিযোগও আমাদের কানে আসে যে, কংগ্রেসসেবীরা পদলোলুপ, পরস্পর বিবদমান এবং উপদল গঠনকারী। আদর্শভিত্তিক উপদল গঠনের বিরোধী আমি নই। কিন্তু যখন শুধু ব্যক্তিগত কারণেই এই সব উপদল ও সংঘাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে তখন স্বভাবতঃই জনসাধারণের শ্রদ্ধা কমিয়া যায়। সাধারণ কংগ্রেসসেবীর প্রতি জনসাধারণের আর তেমন শ্রদ্ধাও নাই। তবে ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন কংগ্রেসসেবী এখনও সেরূপ শ্রদ্ধার অধিকারী হইতে পারেন, কিন্তু গড়পড়তা সাধারণ কংগ্রেসসেবীর প্রতি জনসাধারণের কোন আস্থা নাই। প্রত্যেক কংগ্রেসসেবীই পদ আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহেন। যখনই পদলোভ কাহাকেও পাইয়া বসে তখনই কংগ্রেসের শক্তিসঞ্চারী মৌলিক উপাদানও নষ্ট হইয়া যায়।"

তিনি প্রশ্ন করেন, "কংগ্রেস কতটা পরিমাণ বয়স্ক লোকদের সংস্থা এবং কতটাই বা এখানে নূতন চিন্তাধারা ও নবীনদের প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে ? যাঁহারা নূতন করিয়া চিন্তা করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন ও যাঁহাদের ধারণা-শক্তির অভাব, তাঁহারা সংখ্যায় কত এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস যুবসমাজের সহিত কতটুকু সংস্পর্শ বজায় রাখিতে পারিয়াছে ?"

উহার জবাবে তিনি বলেন, "যুবসমাজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনও কিছু আছে। কংগ্রেসে অসংখ্য যুবক আছে, বহু নূতন বিভাগও খোলা হইয়াছে এবং উহার মাধ্যমে চমৎকার কাজও হইয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে ছাত্ররা কমবেশী আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য ও ভোট সংগ্রহে বিশেষ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কেহ কেহ তাহাদের কাজকে ছেলেমানুষি বলিতে পারেন, এবং কেহ বলিতে পারেন যে, তাহারা শৃঙ্খলাপরায়ণ নহে। কিন্তু আসল কথা হইল এই যে, তাহাদের সহিত আমাদের কোন যোগাযোগ নাই। আর তাহারা কংগ্রেসকে পছন্দ করিলেও কোন কোন কংগ্রেসসেবীর প্রতি তাহাদের আদৌ কোন শ্রদ্ধা নাই।"

"কংগ্রেস যে শক্তিকে মুক্ত করিয়াছে তাহার সহিত কংগ্রেস-সেবীদের তাল রাখিতে আহ্বান জানাইয়া তিনি মন্তব্য করেন, 'জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনাই কংগ্রেসের সম্বল। যে মুহূর্ত্তে জনতার উদ্দীপনা উহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই উহার অবস্থা কাহিল হইবে। তবে পরিস্থিতি এখনও এত শোচনীয় নয়। তবে বিপদ উপলব্ধির জন্য আমি কতকটা বাড়াইয়া বলিতেছি। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অধোগতির হেতু এই যে, যেসব সচ্চরিত্র ও কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি একদা কংগ্রেসের মেরুদণ্ড ও শক্তির আধারস্বরূপ ছিলেন, তাঁহারা আর এক্ষণে ক্রিয়াশীল নহেন। আমি ইচ্ছা করিয়াই এ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। যেহেতু ক্ষেত্রবিশেষে কম্যুনিষ্ট পার্টি, অন্যত্র অপর কোন কোন দল এবং অন্য কোন ক্ষেত্রে হয়ত অপরাপর বিরুদ্ধ শক্তি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সক্রিয়। ইহার ফলে যে জনোৎসাহ কংগ্রেসের এত দিনের সম্বল তাহাই হয়ত তাহার বিরুদ্ধে কাজে লাগান হইতে পারে। প্রবাদ আছে, যাঁহারা বিপ্লবের স্রষ্টা, বিপ্লব তাঁহাদিগকেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। সে বিপ্লব ফ্রান্সে, রাশিয়া বা অন্য যে কোন স্থানের হইতে পারে। অবশ্য আমাদের বিপ্লব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। তবে যে শক্তির স্রষ্টা কংগ্রেস নিজেই, সেই শক্তিই কংগ্রেসকে পিছনে ফেলিয়া আজ অগ্রগামী। সুতরাং উহাকে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে এবং উহার সহিত তাল রাখিতেও হইবে।"

তিনি আরও বলেন, "৩৪ বছর আগে আমরা গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করি। উহা আমরা পরিচালনা করিয়া লাভবানও হইয়াছি। কিন্তু স্বতন্ত্র ধরনের আন্দোলন মাথাচাড়া দেওয়ায় আমরা পশ্চাদগামী হইয়াছি। এজন্য আমরা নানারূপ অভিযোগ করিয়া থাকি। উহা সত্য হইতে পারে, আবার না-ও হইতে পারে। তবে আসল ব্যাপার এই, আমরা সেকেলে হইয়া গিয়াছি। প্রতিষ্ঠান-গতভাবে আমাদের যৌবনোচিত গতি ও শক্তি আর নাই, আমরা এখন তাল সামলাইতে পারিতেছি না। বরং অনিশ্চিত সম্ভাবনাকে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছি। তবে মোদ্দা কথা এই যে, প্রত্যেক সংস্থা এবং বৃহৎ শক্তিই মানসিক উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। ধীশক্তির নেতৃত্ব ছাড়া কেহ বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ, মানসিক ও ধীশক্তির নেতৃত্বই এক্ষেত্রে নিয়ন্তা। দ্বিতীয়তঃ, সংস্থার অন্তর্নিহিত প্রেরণা, ধর্ম্মপ্রচারকের উদ্দীপনা, ব্রতনিষ্ঠা ও ব্রত উদযাপনের কর্ম্মধারা সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি মুখ্য শক্তি যে-কোন সংস্থার প্রাণস্বরূপ।

ভারতে আমরা যে সাফল্য লাভ করিয়াছি, তাহা বহুলাংশে কৃষক ও পল্লীবাসীদের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। আমরা মোটামুটি শহরবাসীদের সমর্থন হারাইতেছি। অতীতে মস্তিষ্কজীবীদের সাহায্য তেমন না পাইলেও চলিতে পারিত। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শৃঙ্খলাপরায়ণ সেনাদলের প্রয়োজন ছিল বেশী। কিন্তু বিষয়টির গুরুত্ব এখন খুব বাড়িয়াছে।

কোন সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা হৃদয়ঙ্গম না করিলে তাহার প্রতিকারের উপায় নিরূপণ করিয়া লাভ নাই। আমি মনে করি, কংগ্রেসের টিকিয়া থাকার প্রকৃত ও অন্তর্নিহিত শক্তিই খালি নাই, উহার আগাইয়া যাইবার ক্ষমতাও আছে। অবশ্য এই বিষয়টি উপলব্ধি করার এবং যথোচিতভাবে কাজে লাগান প্রয়োজন। যদি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা জাতিবিশেষের সহজাত ব্যর্থতা থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন প্রতিকার নাই। যদি কেহ ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি ও কর্ম্মোৎসাহ লোপ পায়, সে আশাভঙ্গ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। ইহাই সহজাত ব্যর্থতার অর্থ। যে-কোন সংস্থার পক্ষেও ইহা খাটে। তবে কংগ্রেসে যে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, আমি একথা বলি না। কিন্তু সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হইতে হইবে। যেহেতু বহু কংগ্রেসসেবীর সে অবস্থা ঘটিয়াছে।

যেখানে সমস্যা প্রাদেশিক অথবা সাম্প্রদায়িক রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, সেখানে জনসাধারণকে যুক্তিতর্ক দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সারবত্তা বুঝাইয়া দিতে হইবে। সাধারণ লোকের ঐক্যবোধ নষ্ট হইতে পারে, যেহেতু বিভেদপ্রবণ প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, কংগ্রেসের প্রধান কাজই হইল, ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষা করা।

গত পাঁচ, সাত, আট ও নয় বছরে বিভিন্ন কংগ্রেস সরকার দেশে মোটামুটি ভাল কাজই করিয়াছেন। ভারতের বাহিরে আমাদের বিরুদ্ধবাদীরাও আমাদের স্বদেশবাসীদের চেয়ে বেশী মাত্রায় এ বিষয়টি উপলব্ধি করিয়া থাকেন। মার্কিন নাগরিক ডাঃ এপলবি ভারতে দুই-তিন বার আসিয়াছেন। তিনি কঠোর সমালোচক, সবকিছুই তিনি সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন যে, ভারত বহু বিষয়ে চমৎকার কৃতিত্বের পরিচয় দিলেও প্রত্যেকে গবর্ণমেণ্টের সমালোচনায় পঞ্চমুখ, ইহাতে সত্যই

অবাক হইতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতিটি কৃত কর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই অনেকের কাজ। ভারতে বহুকিছুর সমালোচনা করা যাইতে পারে বলিয়াই এ জাতীয় সমালোচনা করা সহজ। আমাদের বহুবিধ বিরুদ্ধতার বিরুদ্ধে লড়িতে হইতেছে। বহু শতাব্দীর জাড্য ও স্বভাবদোষ নাশের এবং বৈষয়িক পাঁক উদ্ধারের কাজ আমাদের করিতে হইতেছে। আমরা সেই অচল অবস্থা ও পঙ্ককুণ্ড হইতে মুক্তি লাভ করিতেছি। জনসাধারণের নিকট কংগ্রেসকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে হইবে।"

সংবিধানের প্রতি আনুগত্য

বিধানসভার এবং পার্লামেণ্টের নির্ব্বাচিত সদস্যদিগকে বিধানসভায় যোগদানের পূর্ব্বে ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আনুগত্য জানাইয়া একটি শপথ গ্রহণ করিতে হয়। প্রত্যেক সদস্যকেই ঐ শপথ গ্রহণ করিতে হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের নবনির্ব্বাচিত সদস্যগণও ঐ শপথ গ্রহণ করিবেন। সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে ভারতের এমনকি পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি অঞ্চলে এক ধরনের লোক নির্ব্বাচনে জয়ী হইবার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সাম্প্রদায়িক প্রচারের সাহায্য গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদে এইরূপ রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচার চরমে উঠে। যাঁহারা নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রচারের আশ্রয় লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে যে সকল প্রার্থী নির্ব্বাচনে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও বিধানসভায় যোগদানের সময় সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ লইবেন। এই ধরনের সদস্যদের শপথ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ২৭শে এপ্রিল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"বিধানসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণের সময় ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কথা তুলিয়া দস্তখত যাঁরা করিয়াছেন, সদস্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে অর্থাৎ নির্ব্বাচনের সময় তাঁহারা সংবিধান-বিরোধী কোন কার্য্য করিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে সংবাদ সত্য হইলে, তাঁহাদের সদস্যপদ বাতিল সম্পর্কে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা করা উচিত কিনা, তাহাও চিন্তা করা প্রয়োজন। সদস্য নির্ব্বাচিত হইলে সংবিধানের প্রতি অবিচল আনুগত্যের শপথ যাঁহারা করিতেছেন, নির্ব্বাচন-বৈতরণী অতিক্রম করিতে তাঁহারা সংবিধানিক আনুগত্যের কি জাতীয় পরিচয় দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইলে, শপথকারী সদস্যদের অনেকের সম্বন্ধেই নিষ্ঠাহীনতার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে।

"মুর্শিদাবাদ জেলার কয়েকটি নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে কয়েক ব্যক্তি গত নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে যেভাবে ধর্ম্মসভার নামে ভোটের জন্য প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা জন্মে যে, নির্ব্বাচনের সময় বিধানসভার নির্ব্বাচনপ্রার্থী সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ এক শ্রেণীর লোক বিধানসভায় প্রবেশের জন্য সংবিধান-বিরোধী কার্য্য ও উক্তির দ্বারা প্রচারকার্য্য চালাইতে পশ্চাদপদ হন না। তাঁহাদেরই কেহ যদি নির্ব্বাচনে ভোটাধিক্যে জয়ী হইয়া বিধানসভায় যান এবং সেখানে সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন, তখন মনে হয় যে, এই শপথের ভিতর আন্তরিকতার অভাব থাকিয়া গিয়াছে।"

"মুর্শিদাবাদ সমাচারের" মন্তব্য বিশেষ সমীচীন বলিয়াই আমরা মনে করি। পৃথিবীর অপর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের দায়িত্বশীল অংশের মধ্যে এইরূপ রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব নাই। গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণে এই অন্তর্ঘাতী মনোভাব বিশেষভাবেই পরিপন্থী। ইহাতে শাসক এবং শাসিত শ্রেণী উভয়ের আচরণের মধ্যেই সন্দেহ ও অনাবশ্যক কঠোরতা দেখা দেয়, যাহার চরম পরিণতি ঘটে নিরঙ্কুশ একনায়কত্বে স্বেচ্ছাচারিতায়। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা যেরূপ সরকারের দায়িত্ব, গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলিকে কঠোরভাবে দমন করাও সরকারের সেইরূপ কর্ত্তব্য। কিন্তু সরকারী দলও সুবিধাবাদী, সেহেতু তাহারা অপরাপর দল এবং ব্যক্তিবিশেষের অসাধু আচরণের শাস্তি বিধানে বিশেষ তৎপরতা দেখাইতে পারেন না। এইরূপ পরিস্থিতি ভবিষ্যৎ বিপদের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ—ইহার প্রতিকার সম্ভব একমাত্র ক্রমবর্দ্ধমান গণচেতনা এবং আন্দোলনের দ্বারা। কিন্তু এই আন্দোলন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং দলবিশেষের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের যন্ত্রে পরিণত হইতেছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

১৭ই এপ্রিল নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত এই মন্ত্রীসভায় উনচল্লিশ জন সদস্য রহিয়াছেন। পুরাতন মন্ত্রীসভার সদস্যদের মধ্য হইতে যাঁহারা পুনঃনির্ব্বাচিত হন তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ এবং শ্রীমহাবীর ত্যাগী ব্যতীত আর সকলেই নূতন মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে মাত্র একজন নূতন সদস্য স্থান পাইয়াছেন; তিনি হইলেন বোম্বাইয়ের শ্রীসদাশিব কানুজী পাতিল। ক্যাবিনেটে বাংলা দেশ হইতে কোন সদস্য নাই, তবে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে শ্রীঅশোক সেন, শ্রীহুমায়ুন কবীর এবং শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বাংলা দেশ হইতে আছেন। উনচল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র দুই জন মহিলা আছেন—শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন ও শ্রীমতী ভায়োলেট আল্ভা। শ্রীকৃষ্ণ মেনন হইয়াছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী।

মন্ত্রীসভার নূতন সদস্যদের নাম :

১। শ্রীজবাহরলাল নেহরু, প্রধানমন্ত্রী—পররাষ্ট্র ও পরমাণবিক শক্তি ; ২। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; ৩। শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ—স্বরাষ্ট্র ; ৪। শ্রীমোরারজী দেশাই—বাণিজ্য ও শিল্প ; ৫। শ্রীজগজীবন রাম—রেলওয়ে ; ৬। শ্রীগুলজারীলাল নন্দ—শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা ; ৭। শ্রীটি. টি. কৃষ্ণমাচারী—অর্থ ; ৮। শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—পরিবহন ও যোগাযোগ ; ৯। সর্দ্দার শরণ সিং—ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি ; ১০। শ্রীকে. সি. রেড্ডী—পূর্ত্ত, গৃহনির্ম্মাণ ও

সরবরাহ ; ১১। শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন—খাদ্য ও কৃষি ; ১২। শ্রীভি কে কৃষ্ণমেনন—প্রতিরক্ষা ; ১৩। শ্রীসদাশিব কানুজী পাতিল—সেচ ও বিদ্যুৎ।

রাষ্ট্রমন্ত্রী

১। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ—সংসদীয় বিষয় ; ২। শ্রীবালকৃষ্ণন বিশ্বনাথ কেশকার—তথ্য ও বেতার ; ৩। শ্রীডি পি. কারমারকর—স্বাস্থ্য ; ৪। ডাঃ পাঞ্জাবরাও এস. দেশমুখ—খাদ্য ও কৃষি ; ৫। শ্রীকে. ডি. মালবীয়—ইস্পাত, খনি ও জ্বালানি ; ৬। শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না—পুনর্বাসন ; ৭। শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো—বাণিজ্য ও শিল্প ; ৮। শ্রীরাজ বাহাদুর—পরিবহন ও যোগাযোগ ; ৯। শ্রীবি. এন. দাতার—স্বরাষ্ট্র ; ১০। শ্রীএম. এম. শাহ—বাণিজ্য ও শিল্প ; ১১। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে—সমষ্টি উন্নয়ন ; ১২। শ্রীঅশোককুমার সেন—আইন ; ১৩। ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; ১৪। শ্রীহুমায়ুন কবীর—পরিবহন ও যোগাযোগ।

উপমন্ত্রী

১। সর্দার সুরজিৎ সিং মাঝিথিয়া—প্রতিরক্ষা ; ২। শ্রীআবিদ আলী—শ্রম ; ৩। শ্রীঅনিলকুমার চন্দ—পররাষ্ট্র ; ৪। শ্রীএম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা—খাদ্য ও কৃষি ; ৫। শ্রীজয়সুখলাল হাতী—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৬। শ্রীসতীশ চন্দ্র—বাণিজ্য ও শিল্প ; ৭। শ্রীশ্যামানন্দ মিশ্র—পরিকল্পনা ; ৮। শ্রীবলীরাম ভগৎ—অর্থ ; ৯। ডাঃ মনোমোহন দাস—শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ; ১০। শ্রীশাহ নওয়াজ খান—রেল ; ১১। শ্রীমতী লক্ষ্মী এন. মেনন—পররাষ্ট্র ; ১২। শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা—(পরে ঘোষণা করা হইবে)।

পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীসভা

২৬শে এপ্রিল (১৩ই বৈশাখ, ১৩৬৪) দার্জ্জিলিঙে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী শপথ গ্রহণ করেন। আটাশ জন মন্ত্রীবিশিষ্ট নূতন মন্ত্রীসভায় তের জন মন্ত্রী, তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বার জন উপমন্ত্রী আছেন। নূতন ক্যাবিনেটে চার জন নূতন সদস্য আছেন, তাঁহারা হইলেন শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, আবদুস সত্তার এবং শ্রীসিদ্ধার্থ রায়। পরে পরাজিত স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়কেও নাকি ক্যাবিনেটে লওয়া হইবে।

নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নাম ও দপ্তর নিম্নরূপ :

ক্যাবিনেট মন্ত্রী—

ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী—স্বরাষ্ট্র (পুলিস ও প্রতিরক্ষা বাদে), অর্থ, শিক্ষা, উন্নয়ন, সমবায়, কুটিরশিল্প।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, সাহায্য, সরবরাহ এবং উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি—পুলিস ও অসামরিক প্রতিরক্ষা।

শ্রীখগেন্দ্র দাশগুপ্ত—পূর্ত্ত ও গৃহ, বাসস্থান।

শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি—সেচ ও জলপথ।

শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর—বন, মৎস্য ও পশুপালন।

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বর্ম্মণ—আবগারী।

ডাঃ আর. আমেদ—কৃষি, পশুপালন ও বন (বন ও মৎস্য-বিভাগীয় বিষয় ব্যতীত)।

শ্রীঈশ্বরদাস জালান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও পঞ্চায়েৎ।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—ভূমি ও ভূমি রাজস্ব।

শ্রীভূপতি মজুমদার—শিল্প ও বাণিজ্য।

শ্রীসিদ্ধার্থ রায়—বিচার, আইন ও উপজাতি কল্যাণ।

জনাব আবদুস সত্তার—শ্রম।

রাষ্ট্রমন্ত্রী—

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি—কারা ও উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ—উন্নয়ন ও উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

ডাঃ শ্রীঅনাথবন্ধু রায়—স্বাস্থ্য।

উপমন্ত্রী—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সিংহ—পরিবহন।

শ্রীসৌরীন্দ্র মিশ্র—শিক্ষা।

শ্রীতেনজিং ওয়াংদি—উপজাতি কল্যাণ।

শ্রীস্মরজিৎ ব্যানার্জ্জি—কৃষি, পশুপালন ও বন।

শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক—সাহায্য ও সরবরাহ।

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়—সরবরাহ, সমবায়।

সৈয়দ কাজেম আলি মির্জ্জা—কুটীর ও ছোটখাটো শিল্প।

ডাঃ জিয়াউল হক—স্বাস্থ্য।

শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জ্জি—উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্ব্বাসন।

শ্রীচারুচন্দ্র মহান্তি—খাদ্য, সাহায্য ও সরবরাহ।

শ্রীজগন্নাথ কোলে—প্রচার।

শ্রীনরবাহাদুর গুরুং—শ্রম।

নূতন মন্ত্রীসভায় রদবদল সম্পর্কে "যুগান্তরে"র ষ্টাফ রিপোর্টার লিখিতেছেন :

বিদায়ী ক্যাবিনেটের নয়জন সদস্য নূতন ক্যাবিনেটে স্থান পাইয়াছেন এবং চার জন নূতন সদস্যকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই চার জনের মধ্যে অবশ্য শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ ও শ্রীভূপতি মজুমদার ডাঃ রায়ের প্রথম মন্ত্রীসভায় ছিলেন। জনাব আবদুস সত্তার ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায় এই প্রথম বিধানসভায় ও মন্ত্রীসভায় আসিলেন।

তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে দুই জন পূর্ব্বেকার মন্ত্রীমণ্ডলীতে উপমন্ত্রী ছিলেন। এইবার তাঁহাদের পদোন্নতি ঘটিল। ডাঃ অনাথবন্ধু রায় নবাগত।

উপমন্ত্রীদের মধ্যে অর্দ্ধেকই নবাগত। বাকী ছয় জন আগেও উপমন্ত্রী ছিলেন।

বিদায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীতে ১৫ জন মন্ত্রী, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী ও ১২জন উপমন্ত্রী ছিলেন। ইহা ছাড়া তিন জন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী ছিলেন। ক্যাবিনেট মর্য্যাদাসম্পন্ন মন্ত্রীর সংখ্যা এবার দুই জন কম

হইলেও মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যদের মোট সংখ্যা এইবারও ২৮ জনই রহিয়াছে।

বিগত মন্ত্রীসভার ১৫ জন মন্ত্রীর ভিতরে ছয় জন এবার বাদ পড়িয়াছেন। ইহার মধ্যে তিন জন—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, ডাঃ শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীজীবনরতন ধর নির্ব্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন, দুই জন—শ্রীযাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা ও শ্রীরাধাগোবিন্দ রায়, নির্ব্বাচনে দাঁড়ান নাই এবং শ্রীমতী রেণুকা রায় লোকসভার সদস্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীগোপিকাবিলাস সেন একমাত্র রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি নির্ব্বাচনে পরাজিত হওয়ায় পদচ্যুত হইয়াছেন এবং তাঁহার স্থানে তিন জন রাষ্ট্রমন্ত্রী আসিয়াছেন।

যে সাত জন উপমন্ত্রী গত নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জনাব সুকুর বাদে আর সকলেই পুনরায় স্থান লাভ করিয়াছেন। দুই জন উপমন্ত্রী উপরের পদে গিয়াছেন, দুই জন—শ্রীবীজেশচন্দ্র সেন ও শ্রীশিবকুমার রায়, নির্ব্বাচনে হারিয়া গিয়াছেন এবং উপমন্ত্রী শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই।

পুরাতন মন্ত্রীমণ্ডলীর যে সকল সদস্য পুনঃনির্ব্বাচিত হইয়া বিধানসভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র জনাব সুকুরই এইবার বাদ পড়িলেন।

গতবারের তুলনায় এইবার মন্ত্রীমণ্ডলীতে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গতবার একজন মুসলমান মন্ত্রী ও একজন মুসলমান উপমন্ত্রী ছিলেন। এইবার মুসলমান সদস্যদের মধ্য হইতে দুই জন মন্ত্রী ও দুই জন উপমন্ত্রী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বের মতই মন্ত্রীসভায় তপশীলভুক্ত জাতির দুই জন সদস্যকে স্থান দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু একজন মাত্র সদস্যা মন্ত্রীসভায় মহিলাদের যে প্রতিনিধিত্ব করিতেছিলেন এইবার তাহা রাখা হয় নাই। তবে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে একজন ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে আর একজন মহিলা আছেন। পূর্ব্বের মতই একজন তপশীলভুক্ত উপজাতির উপমন্ত্রী আছেন।

দার্জ্জিলিং জেলা হইতে যে একমাত্র সদস্য এইবার কংগ্রেস টিকেটে বিধানসভায় নির্ব্বাচিত হইয়া আসিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরূপে নির্ব্বাচিত যে সদস্যটি পরে কংগ্রেস পরিষদ দলে যোগ দিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই উপমন্ত্রীরূপে মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান লাভ করিয়াছেন। এই মন্ত্রীমণ্ডলীতে জেলা হিসাবে চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধি সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী। এই জেলা হইতে পাঁচ জনকে লওয়া হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ডাঃ রায় সহ তিনজন এবং বাঁকুড়া হইতে তিন জনকে গ্রহণ করা হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে তিন জন, জলপাইগুড়ি হইতে একজন, পশ্চিম দিনাজপুর হইতে একজন, মুর্শিদাবাদ ও হুগলী হইতে দুই জন করিয়া, বর্দ্ধমান জেলা হইতে একজন, নদীয়া মালদহ ও কুচবিহার হইতে একজন করিয়া সদস্য গৃহীত হইয়াছেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীতে বিধান পরিষদের দুই জন সদস্য আছেন। তাঁহারা হইলেন শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়।

পুরুলিয়ার সমস্যা

১০ই বৈশাখ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পুরুলিয়ার সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সংগঠন" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, পুরুলিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা জলাভাব। জলের অভাবে কৃষিকার্য্য বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে; পানীয় জলের অভাবে দারুণ গ্রীষ্মে গ্রামবাসীদের দুর্গতির শেষ নাই। পুরুলিয়ার সর্ব্বত্রই আজ জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত।

"সংগঠন" লিখিতেছেন, "পুরুলিয়া জেলার অধিবাসীরা আজ সর্ব্বপ্রকারে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের মধ্যে অনগ্রসর। পেটের অন্ন নাই, পরনের বস্ত্র নাই, তৃষ্ণার জল নাই, রোগের ঔষধপথ্য নাই, মাথা গুঁজিবার মত সকলের ঘর নাই। তাহার উপর পঞ্চকোট বাঁধের ফলে (D. V. C.) দশ হাজার নরনারী নিরাশ্রয়। তাহাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা আজও হইল না।

"পুরুলিয়াবাসীর সমস্যাগুলি নির্ণয় ও সমাধানের উপায় নির্ণয়ের জন্য আমরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি কমিশন নিয়োগ করিতে অনুরোধ জানাই এবং অবিলম্বে তাহার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করি।"

পুরুলিয়ার সমস্যা সমাধান সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব করিয়া পত্রিকাটি লিখিতেছেন যে, পুরুলিয়াবাসীর অনগ্রসরতার কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার। এই জেলার জমিও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর; জমির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ (ceiling) নির্ণয়ের সময় এই কথাটি স্মরণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। পুরুলিয়ার বনগুলি ধ্বংসোন্মুখ, উহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন। উপরন্তু পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা বিশেষতঃ বাঁকুড়ার সহিত পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনও করা প্রয়োজন।

পুরুলিয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতির সমালোচনা করিয়া "সংগঠন" লিখিতেছেন যে, রাজ্যপালের বক্তৃতায় পুরুলিয়া সম্পর্কে কোনও উল্লেখই নাই। খাজনার হার এবং স্কুলের শিক্ষক তথা সরকারী চাকুরিয়াদের প্রতি সরকারের সুস্পষ্ট নীতি এখনও ঘোষণা করা হয় নাই। "স্কুলের শিক্ষকদিগকে বা আরও অন্যান্য সরকারী চাকুরিয়াদিগকে আর কতদিন বিহারের স্কেল-এ বেতন লইতে হইবে? শুধু তাই নয় আর কতদিন পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুরুলিয়ার স্কুলগুলিতে বিহারের শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখিবেন?" "সংগঠন" প্রশ্ন করিতেছেন।

ত্রিপুরায় রেলপথ

ভারতের সর্ব্বত্রই খাদ্য এবং অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যেও খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই মূল্যবৃদ্ধি তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই পরিস্থিতির মূলে কয়েকটি বিশেষ কারণ রহিয়াছে। ত্রিপুরার সহিত ভারতের অন্য অংশের রেলপথে যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নাই। ত্রিপুরাকে সকল সরবরাহের জন্যই পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয়। কোন কারণে যখন পশ্চিমবঙ্গ হইতে সরবরাহ-ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন করিমগঞ্জ হইতে অতিরিক্ত খরচে জিনিষপত্র আমদানী করিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ত্রিপুরায় মালপত্র আমদানীর উপায় বিমানপথ এবং পূর্ব্ব-পাকিস্থানের রেলপথ। বিমানপথে মালপত্র আমদানী বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ এবং পূর্ব্বপাকিস্থানের রেলপথে সরবরাহ ব্যবস্থাও যথাযথ কার্য্যকরী হয় না। ত্রিপুরার বাজারে সর্ব্ববিধ দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কুড়ি হাজার টন চাউল মঞ্জুর করিয়াছেন। এই চাউলের প্রায় সবটাই কলিকাতা হইতে পাকিস্থান-পথে আমদানী হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র চাউল আমদানী করিলেই ত্রিপুরার চলে না—অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যও আমদানী করিতে হয়, কিন্তু যে পরিমাণ মাল ত্রিপুরায় আসে এবং ত্রিপুরা হইতে রপ্তানি হয় তাহা বহন করার ক্ষমতা পূর্ব্বপাকিস্থান রেলওয়ের নাই। বিমানযোগে এই সকল পণ্য আমদানী-রপ্তানির অসুবিধা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই চাউল আমদানীকে অগ্রাধিকার দেওয়ায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য্য সামগ্রী আমদানীতে ব্যাঘাত ঘটিতেছে, ফলে বাজারে অন্যান্য দ্রব্যও মহার্ঘ হইয়াছে।

ত্রিপুরার বর্ত্তমান দুরবস্থার আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন, "একমাত্র বিমান সার্ভিস ও পাক রেলওয়ের উপর নির্ভরশীল থাকায় ইহার সব রকম অসুবিধা ত্রিপুরার সাধারণ লোককেই বহন করিতে হয়। এই জন্যই আমরা প্রথম হইতেই ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপন করার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি। ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপিত হইলে সাধারণ লোক উপকৃত হইবে, সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইতে সাহায্য করিবে, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হইবে এবং নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া উঠার সুযোগ আসিবে।"

আসামে বাঙালী পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা

১৩ই বৈশাখ 'যুগশক্তি' আসামের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন, প্রাসঙ্গিক বোধে আমরা তাহা বিনা মন্তব্যে তুলিয়া দিলাম :

"ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চলিতেছে। ইংরেজী তৃতীয় প্রশ্নপত্রে মাতৃভাষা হইতে ইংরেজীতে অনুবাদের অংশ অসমীয়ার চেয়ে বাংলা কঠিন হইয়াছে। এই অভিযোগ প্রায় প্রতি বৎসরই করা হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন মডারেশন করার সময় তাহা সকলের চোখ এড়াইয়া যায়। ভূগোলের প্রশ্নও কঠিন হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় এই দুই ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করিলে পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করা হইবে।"

করিমগঞ্জে খাদ্যপরিস্থিতি

আসামের করিমগঞ্জ জেলায় চাউলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাইকারী ২৪৲ টাকার কম মূল্যের কোনপ্রকার চাউল নাই, খুচরা মূল্য ২৭৲ টাকায় উঠিয়াছে। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি এখানেই থামে নাই—ক্রমশঃ উহা বাড়তির দিকে।

করিমগঞ্জে চাউল-সঙ্কটের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্থানীয় "যুগশক্তি" পত্রিকা লিখিতেছেন যে, গত বৎসর বন্যার সময়ও করিমগঞ্জে চাউলের এরূপ অভাব ঘটে নাই। কিন্তু সরকারী নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ফলে এ বৎসর প্রকৃতপক্ষে কোন স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকটই চাউল নাই।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "গত ডিসেম্বর মাস হইতে গবর্ণমেণ্ট দুইটি স্বতন্ত্র আইন প্রণয়নপূর্ব্বক প্রথমতঃ আসাম ও অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ধান-চাউলের ব্যবসা পারমিট ব্যতীত নিষিদ্ধ করেন। দ্বিতীয় আইনে সীমান্তবর্ত্তী কাছাড় ও কতিপয় জেলার বাহিরে ধান-চাউল আমদানী-রপ্তানি নিষিদ্ধ করেন এবং কতিপয় এলাকাকে নোটিফাইড এরিয়া ঘোষণাপূর্ব্বক তথায় আমদানী-রপ্তানী খুব কড়াভাবে পারমিট দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। করিমগঞ্জ মহকুমার নোটিফাইড অঞ্চল অতিমাত্রায় ঘাটতি এলাকা—বাহির হইতে ধান-চাউল আমদানী ছাড়া এই অঞ্চলের লোকের উপায় নাই। এইসব ও অন্যান্য কারণ বিবেচনায় আমরা এতদঞ্চলকে নোটিফাইড এরিয়া ঘোষিত করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছিলাম। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা উক্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কুফলের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। স্থানীয় মার্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন হইতেও দীর্ঘ স্মারকলিপি মারফত প্রতিবাদ জানান হইয়াছিল। তখন সরবরাহমন্ত্রী ও সেক্রেটারী করিমগঞ্জ আগমন করতঃ ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় দৃঢ়ভাবে এই আশ্বাস দেন যে, কোন অবস্থায়ই করিমগঞ্জ এলাকায় আমদানী-রপ্তানীর কোনপ্রকার অসুবিধা ঘটিবে না, স্বাভাবিক ব্যবসায় চালু থাকিবে এবং সাধারণ ক্রেতার কোনপ্রকার দুর্ভোগ হইবে না।—কেবল যাহাতে পাকিস্থানে খাদ্যশস্য চোরাই পথে চালান না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা।"

জনসাধারণ এবং ক্রেতার কোনরূপ অসুবিধা হইবে না বলিয়া সরকার যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা কোনদিক হইতেই রক্ষিত হয় নাই। এখন কেবল শিলচর এবং হাইলাকান্দি হইতে মাত্র চাউল আমদানীর পারমিট দেওয়া হয়। কিন্তু সামান্য কয়েক মণ চাউলের পারমিটের জন্য যে পরিমাণ অসুবিধা সহ্য করিতে হয় তাহাতে অনেক সাধু ব্যবসায়ীই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন এবং কোন কোন ব্যবসায়ী চাউলের কারবারই বন্ধ করিয়া

দিয়াছেন। উপরন্তু হাইলাকান্দির খাদ্যপরিস্থিতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া হাইলাকান্দির মহকুমা-শাসক চাউল রপ্তানীর জন্য পারমিট দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। ইহা ব্যতীত শিলচর এবং হাইলাকান্দি অঞ্চলেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধির দিকে।

পাকিস্থানে চাউল গুপ্তপথে রপ্তানী হইতেছে বলিয়া যে প্রচার করা হয় তাহার উল্লেখ করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন, "বর্ত্তমানে এখানকার (করিমগঞ্জের) সহিত পাকিস্থানভুক্ত সীমান্ত এলাকার চউলের মূল্যের যে পার্থক্য তাহাতে শতকরা ৪০৪২ টাকা বেসরকারী বাট্টা তদুপরি বেআইনী চালানের পেসারত দিয়া ধান-চাউলের চোরাকারবার বর্ত্তমানে মোটেই লাভজনক নহে।"

অর্থাৎ, করিমগঞ্জের বর্ত্তমান খাদ্যসঙ্কটের জন্য প্রধানভাবে দায়ী দ্বিধাগ্রস্ত সরকারী নীতি।

পেট্রোল সন্ধানে

পশ্চিম বাংলায় খনিজ তৈল আছে কি না সে বিষয়ে শেষ নিষ্পত্তির চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ঐ বিষয়ের সংবাদ আমরা নীচে আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অবশ্য খনিজ তৈলের আকর পশ্চিম বাংলায় পাওয়া যাইলে যে এ অঞ্চলে পেট্রোল সস্তা হইবে তাহা নয়। কেননা দেশের টাকা শুধু দেশের মন্ত্রীমণ্ডল ও তাঁহাদের লোকসভা এবং বিধানসভার অনুচরবর্গের সমৃদ্ধির জন্য। জনসাধারণ 'চিনির বলদে'র অবস্থায় থাকিবে।

"রবিবার মধ্যাহ্নে শেষ বৈশাখের তপ্ত রৌদ্র তখন তাতার দস্যুর মত মাঠময় ঝাপাইয়া পড়িতেছিল। কলিকাতা হইতে আগত একদল সাংবাদিক তখন আশাভরা চোখে ১৪৭ ফুট উচ্চ ইস্পাতের মিনারটির দিকে চাহিয়াছিলেন। ত্রস্ত-ব্যস্ত ফটোগ্রাফারগণ একের পর এক ফটো তুলিতেছিলেন। সেই সময়, ঠিক সেই সময় বর্দ্ধমান শহর হইতে প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে বর্দ্ধমান-কালনা রাজপথের ধারে এক গ্রামে ষ্ট্যান-ভ্যাক অয়েল কোম্পানীর সুদক্ষ একদল ইঞ্জিনীয়ার এবং ভূতাত্ত্বিক মাটির মধ্যে পাইপ বসাইয়া তৈল অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

"পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে পেট্রোলের অনুসন্ধান সুরু হইল। সেই দিক দিয়া এই রবিবারটি পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

"এই তৈলকূপ হইতেই পেট্রোল পাওয়া যাইবে কিনা, সেকথা অবশ্য এখনই বলা শক্ত। অন্ততঃ বিশেষজ্ঞগণ জোর দিয়া বলিতে পারেন না। তবে ইঁহাদের প্রচেষ্টা যদি ফলবতী হয়, যদি পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম ভূগর্ভ অকৃপণ হস্তে তাহার ভাণ্ডার খুলিয়া দেয়, তবে নানা সমস্যায়, নানা দুর্দ্দশায় প্রপীড়িত পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যলক্ষ্মী আবার যে সুপ্রসন্না হইবেন, পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি আবার যে নূতন জোয়ারে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"ভূতাত্ত্বিকগণ নানাবিধ লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষামূলক তৈল-কূপ খননের জন্য বর্ত্তমান স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ ধরিত্রীর অন্তঃস্থলে লম্বা লম্বা পাইপ চালাইয়া পেট্রোলের গোপন ভাণ্ডারের নাগাল পাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ষ্ট্যান-ভ্যাক অয়েল কোম্পানী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পরীক্ষা চালাইতেছেন। ভারত সরকার সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দিতেছেন।

"রবিবার সমাগত সাংবাদিকগণকে উদ্দেশ করিয়া ষ্ট্যান-ভ্যাকের চীফ জিওলজিষ্ট মিঃ আর. জি. প্রোগ বলেন, এই স্থানে তৈল পাইবার "ভাল সম্ভাবনা আছে।" আর এই অঞ্চলে যদি তৈল মেলে, তবে "কাজ করিবারও যথেষ্ট সুবিধা আছে।" অবশ্য তৈল যে "এখানে আছেই, সে সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নাই।"

"পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫০ সন হইতেই তৈল সম্পর্কে অনুসন্ধান সুরু হইয়াছে। ১৯৫১ সনে এরোপ্লেনযোগে এই সম্পর্কে জরিপও করা হয়। তার পর হইতে ক্রমাগত ভূস্তর পরীক্ষা সুরু হয়। ১৯৫৪ সনে ১০ হাজার বর্গ মাইল স্থানে নানারূপ পরীক্ষা চলে।"

তদন্তের প্রহসন

১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-ভারতের মহবুবনগর নামক স্থানে একটি সেতুর অংশবিশেষ ধ্বসিয়া যাওয়ায় শতাধিক লোকের জীবননাশ ঘটে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই দক্ষিণ-ভারতে অনুরূপ আর একটি দুর্ঘটনায় বহু লোকের জীবনান্ত হয়। এইরূপ ঘন ঘন রেল দুর্ঘটনায় জনচিত্তে যে আলোড়নের সূচনা হয়, আসন্ন নির্ব্বাচনের কথা চিন্তা করিয়া সরকার তাহাতে উদাসীন থাকিতে পারেন না। ফলে, বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি এস. এল. টি. দেশাইকে লইয়া গঠিত একটি অনুসন্ধান কমিশনের উপর এই রেল-দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হয়। অনুসন্ধানের পর বিচারপতি দেশাই যে রিপোর্ট দেন তাহাতে বলা হয় যে, উক্ত সেতুর তলা দিয়া জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করার জন্যই ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। রেলের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ ব্রীজের গার্ডের উপর সকল দোষ চাপাইবার যে চেষ্টা করেন শ্রীদেশাই তাহাতে সম্মত হন নাই। তাঁহার রিপোর্টের সারমর্ম্ম হইল যে, ইঞ্জিনীয়ারদের ব্যর্থতার জন্যই দুর্ঘটনা ঘটিতে পারিয়াছে।

ভারত সরকার দেশাই কমিশনের রিপোর্ট মানিয়া লইতে অস্বীকার করিয়াছেন। সরকারের অভিমতে ঐ ঘটনার জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না। সরকার তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তিও দেখাইয়াছেন।

ভারত সরকারের এইরূপ সিদ্ধান্তে সর্ব্বত্রই বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। সরকার বস্তুতঃপক্ষে বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের রিপোর্টকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তাঁহাদের যদি এইরূপ উদ্দেশ্য পূর্ব্ব হইতেই স্থির থাকিত তাহা হইলে এইরূপ অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগের প্রহসন না করাই উচিত ছিল। পৃথিবীতে বোধ হয় আমাদের দেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে নিরপেক্ষ অভিমতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কুচবিহারে গুলীচালনা সম্পর্কে তদন্ত হইল, রিপোর্ট

প্রকাশিত হইল না—সরকার সেই রিপোর্টের উপর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন—জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিল না। ট্রামভাড়া বৃদ্ধি-সংক্রান্ত আন্দোলনে পুলিশী নির্যাতন সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট ছাপাইয়া পোড়াইয়া ফেলা হইল, কিন্তু প্রকাশিত হইল না। এইবার সরকার অনুগ্রহ করিয়া তদন্ত কমিশনের রায় প্রকাশিত করিয়াছেন; কিন্তু তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়াছেন।

সরকার নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের লইয়াই কমিশন গঠন করেন, কিন্তু তথাপি সরকার সেই সকল কমিশনের রায় স্বীকার করিতে পারেন না কেন জনসাধারণ তাহা বুঝিতে অক্ষম। একজন হাইকোর্টের বিচারপতির অভিমত অপেক্ষা একজন বিভাগীয় ইনস্পেক্টরের রিপোর্ট কি কারণে সরকারের নিকট অধিকতর গ্রহণযোগ্য মনে হইয়াছে তাহাও অনেকের বোধগম্য হয় নাই। পর পর এতগুলি ট্রেণ দুর্ঘটনায় শত শত লোক নিহত হইল, অথচ তাহার জন্য কেহই দায়ী নহে—এ কথা মানিয়া লওয়া কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।

পাকিস্থানে যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে ঢাকায় পাকিস্থান জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশনে কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য হিন্দু-মুসলমানের যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। পশ্চিম পাকিস্থানের রাজনীতিবিদ্‌গণ এই নূতন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের প্রতিনিধিদের মধ্যে এক রফা হয় এই সর্ত্তে যে, যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা পাকিস্থানের সর্ব্বত্র চালু না করিয়া কেবলমাত্র পূর্ব্ব-পাকিস্থানেই করা হইবে।

কিন্তু গত ২৪শে এপ্রিল পাকিস্থান জাতীয় পরিষদ (পার্লামেণ্ট) আর এক প্রস্তাবে সমগ্র পাকিস্থানের জন্যই হিন্দু মুসলমানের যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলনের সিদ্ধান্ত করিয়া মুসলিম লীগের দ্বিজাতি-তত্ত্বের উপর চিরকালের মত কুঠারাঘাত করিয়াছেন। হিন্দুমুসলমান পৃথক জাতি এবং তাহারা একসঙ্গে থাকিতে পারে না—উহাই ছিল মুসলিম লীগের মূলমন্ত্র! কিন্তু লীগসৃষ্ট পাকিস্থানেই হিন্দু-মুসলমান যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইল। ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া যে বেশীদিন চলা যায় না ইহা তাহার এক নূতন দৃষ্টান্ত।

বিতর্কের সময় পশ্চিম পাকিস্থানের স্বতন্ত্র প্রতিনিধি মিঞা ইফতিকার উদ্দীন লীগ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন যে, তাঁহাদের নীতির ফলে ভারত খণ্ডিত হইয়া পাকিস্থান সৃষ্ট হইয়াছে; তাহারা যেন পুনরায় ঐ নীতির দ্বারা পাকিস্থানের মধ্যে আবার একটি নূতন হিন্দুস্থান সৃষ্টি না করেন।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসন দাবি

সম্প্রতি পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বিধানসভা কার্য্যতঃ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাইয়া এক প্রস্তাব পাস করেন। সরকার এবং বিরোধীপক্ষের প্রায় সকল সদস্যই প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেন। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জনসাধারণের এইরূপ সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তকে পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকার, বিশেষতঃ জনাব সুরাবর্দী বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেন। পশ্চিম পাকিস্থানের কোন কোন লীগ নেতা পূর্ব্ব-পাকিস্থান বিধানসভার এই সিদ্ধান্তের মধ্যে ভারতীয় "চক্রান্ত"ও দেখিতে পান।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অন্তর্গত শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "জনশক্তি" পত্রিকা পূর্ব্বপাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি পশ্চিম পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দের বিরূপ মনোভাবের সমালোচনা করিয়া লিখিতেছেন যে, পশ্চিম পাকিস্থানের স্বার্থসন্ধানী নেতৃবৃন্দ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে আজ পাকিস্থানের মৌলিক পরিকল্পনার বিরোধী বলিতেছেন, অথচ ইংরেজী ১৯৪০ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে পাকিস্থান দাবি করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহাতে ভারতের দুই প্রান্তে অবস্থিত পাকিস্থানের দুই অংশ স্বায়ত্তশাসন এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন হইবে এইরূপ বলা হইয়াছিল।

প্রতিরক্ষা পররাষ্ট্র এবং মুদ্রাব্যবস্থা এক রাখিয়াও পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে স্বায়ত্তশাসনদানে পশ্চিম পাকিস্থানের নেতৃবৃন্দের এই অনিচ্ছার সহিত পশ্চিম পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাজনীতির তুলনা করিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন :

"পশ্চিম পাকিস্থানের চারটি প্রদেশকে এক ইউনিটের ভিতরে বাঁধিয়া রাখিয়া সংহতি বাড়াইবার যে প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল, বৎসর শেষ হইতে না হইতেই সেই এক-ইউনিট ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দিয়া পশ্চিম পাকিস্থানকে পুনরায় ৪টি প্রদেশে বিভক্ত করার জন্য জনমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষমতাসীন দল ছলে বলে কৌশলে যে ব্যবস্থা দেশের লোকের উপর জোর করিয়া চাপাইয়াছিলেন তাহাকে আর বেশী দিন জোড়াতালি দিয়া বজায় রাখিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। একই ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে থাকিয়াও পশ্চিম পাকিস্থানের ৪টি প্রদেশ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ফিরিয়া পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছে।"

অথচ শত শত মাইলব্যাপী ভৌগোলিক ব্যবধানকে অস্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে এক জোয়ালে বাঁধিয়া রাখিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠার পর হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উপর কিরূপ শোষণ চালানো হইতেছে তাহার বিবরণ দিয়া "জনশক্তি" লিখিতেছেন :

"বিগত ৯ বৎসর যাবৎ—পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে কিভাবে শোষণ করা হইয়াছে তাহার বিবরণ সময় সময় প্রকাশিত হইয়াছে। পাকিস্থান-প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আট বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্থান কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের তহবিলে মোট ১১১ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিল। উহা হইতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আট বৎসরে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জন্য ব্যয় করিয়াছেন সর্ব্বমোট ৪৬ কোটি ৪৯ লক্ষ

টাকা। কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট আট বৎসরে মোট রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন ৯১৫ কোটি ৪ লক্ষ টাকা—উহা হইতে করাচীর উন্নয়নের জন্ম খরচ করিয়াছেন ৫৩০ কোটি টাকা। মূলধন খাতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ২৮৩ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন—তাহা হইতে পূর্ব্ব-পাকিস্থান পাইয়াছে ৩২ কোটি টাকা। দেশরক্ষা খাতে সামরিক বিভাগের জন্ম কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট ৪০০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে পূর্ব্ব-পাকিস্থানে ব্যয়িত হইয়াছে মাত্র ১৪ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা।

"শুধু যে রাজস্বের ন্যায্য অংশ হইতেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহা নহে, বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের ব্যাপারেও এই কয় বৎসর যাবৎ পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রতি ঘোরতর অবিচার চলিয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থান ৪২১ কোটি ২১ লক্ষ টাকা রপ্তানি-বাণিজ্যের দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিল, তাহা হইতে আমদানী-খাতে পূর্ব্ব-পাকিস্থানকে মাত্র ১৬৭ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে, অথচ পশ্চিম-পাকিস্থান রপ্তানি-বাণিজ্যের দ্বারা ৩৪২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আমদানী-খাতে ৪১১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকার অংশ পাইয়াছে।

"পাটের রপ্তানী দ্বারা ১৯৪৮ সনে পূর্ব্ব পাকিস্থান ১৫৬ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াছিল। মুদ্রামূল্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বনাশা বুদ্ধির ফলে পাট রপ্তানি দ্বারা অধুনা মাত্র ৭৮ কোটি টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব হইতেছে।

"কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিবৎসর সামরিক বিভাগের জন্ম পশ্চিম-পাকিস্থানে ৮০ কোটি টাকা ব্যয় করিতেছেন। মুদ্রাস্ফাতির হাত হইতে সেই প্রদেশকে রক্ষা করার জন্ম সেখানে দ্রুত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা হইতেছে—পূর্ব্বপাকিস্থান ইহার অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত।

এইরূপ সর্ব্বাত্মক শোষণের ফলে পূর্ব্ব-পাকিস্থান স্বভাবতঃই আজ দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আজ পূর্ব্বপাকিস্থানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অবশ্য-প্রয়োজন।

উপসংহারে "জনশক্তি" লিখিতেছেন:

"মৌলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্থানের এই দাবি আদায়ের জন্ম যে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, সমগ্র প্রদেশের লোক তজ্জন্ম তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আঞ্চলিক স্বায়ত্ত-শাসনের এই দাবি লক্ষ কণ্ঠে ঘোষিত হইতেছে। পশ্চিম পাকিস্থানের বন্ধুগণ এখনও স্থির বুদ্ধিতে বিষয়টি বিবেচনা করিবেন আমরা এই আশা পোষণ করিতেছি।"

কেনিয়ায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ

পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের উপর নির্যাতনের নানারূপ অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ আংশিকভাবে নিশ্চয়ই সত্য। কিন্তু উক্ত রাষ্ট্রগুলি সহত্নে নিজেদের আচরণের কথা চাপিয়া যান। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে এই সকল রাষ্ট্র যে বিশ্বব্যাপী অভিযান চালাইয়াছে তাহার সমর্থনে বলা হয় যে, একনায়কত্ব-শাসিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোন মূল্য নাই, কেবলমাত্র পাশ্চাত্য "গণতন্ত্র"গুলিতেই ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার মানিয়া চলা হয়।

ব্রিটেন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠীর কমিউনিষ্ট-বিরোধী অভিযানের অন্যতম নেতা এবং গণতন্ত্রেরও অন্যতম ধ্বজাধারী। ব্রিটিশ-শাসিত কেনিয়ায় কেনিয়ার অধিবাসী কিকিউদের ব্যক্তিস্বাধীনতা কিরূপ রক্ষিত হইতেছে, নিম্নলিখিত বিবরণটি হইতে তাহা বুঝা যাইবে। ইহার যথাযথ তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্ম এখনে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তথ্যগুলি সকলই ব্রিটিশ সরকারী সূত্র হইতে প্রাপ্ত।

ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত এক বিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, কেনিয়ার সামগ্রিক অবস্থার 'উন্নতি' হইয়াছে। 'উন্নতি'র ফলে কেনিয়ার জেলে আটক মাউ মাউ সমর্থকের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার পরও আটাশ হাজার রহিয়াছে। প্রত্যেক মাসে দেড় হাজার হইতে দুই হাজার বন্দী মুক্তি পাওয়ার পরও এখন আটাশ হাজার কিকিউ নাগরিক কেবলমাত্র সন্দেহবশে ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রহিয়াছেন। এই আটাশ হাজার কিকিউ ব্যতীত আরও সাত হাজার কিকিউ নাগরিক বন্দী রহিয়াছেন মাউ মাউ সংঘের সদস্য-পদের "অপরাধে"র জন্ম।

এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত যে সকল 'অপরাধে'র জন্ম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত তাহাদের মধ্যে একটি হইল মাউ মাউ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার অপরাধ। "সন্দেহ-জনক" ব্যক্তিদের সহিত সংস্রব রক্ষা করা বা তাহাদের সাহায্য করার অপরাধের শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সরকার এখন মহানুভবতার সহিত ঘোষণা করিয়াছেন—এখন সংস্রবজনিত অপ-রাধের দণ্ড হইবে দশ বৎসর।

পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসকদের সমস্যাবলী

গত ১১ই ও ১২ই মে তারিখে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত নবব্যারাকপুরে (মধ্যমগ্রামে) ষোড়শ বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসক সম্মেলনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন মুন্সী এবং উদ্বোধন করেন ডাঃ শ্রীঅমলকুমার রায়-চৌধুরী। সভাপতি এবং উদ্বোধক উভয়েই পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেন।

উদ্বোধনী ভাষণদান-প্রসঙ্গে ডাঃ রায়চৌধুরী সাম্প্রতিককালে চিকিৎসক এবং জনসাধারণের মধ্যে সম্পর্কের অবনতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের সহিত চিকিৎসকগণ যদি একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে অসমর্থ হন তবে তাহাতে সকলেরই সমূহ ক্ষতি।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য-সমস্যার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী

বলেন যে, একটি উপযুক্ত স্বাস্থ্যসংরক্ষণ পরিকল্পনায় তিনটি প্রধান অংশ থাকে। সেগুলি হইতেছে: (১) চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা, (২) চিকিৎসা-সাহায্য এবং (৩) চিকিৎসাবিদ্যাসংক্রান্ত গবেষণা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা রচনা করিতে হইলে এই তিনটি বিষয়ের প্রতি সমান গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কিন্তু এই-গুলিকে দেশের অবস্থার সহিত সুসমঞ্জস করিয়া লইতে হইবে।

পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসাদান-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে ত্রুটিপূর্ণ এবং ইহা দ্বারা সমাজ-কল্যাণের কোন আদর্শেরই বাস্তব রূপায়ণে সাহায্য হইতে পারে না। এই বিষয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার তিনি কঠোর সমালোচনা করেন।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-পদ্ধতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া উহার উন্নতিবিধানের জন্য সুপারিশ-দানের নিমিত্ত অবিলম্বেই একটি কমিশন নিয়োগ করা উচিত।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে সরকারী মনোভাবের সমালোচনা করিয়া ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, কি কারণে সরকার এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিতে অসম্মত তাহা তিনি বুঝিতে অক্ষম। তবে সরকার যদি নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া অভিহিত করেন তবে ভারতীয় চিকিৎসক সমিতির মত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাবের প্রতি তাহাদের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

রাজ্যের জনসাধারণকে চিকিৎসাব্যাপারে সাহায্যদানের প্রশ্নটি অবশ্যই জটিল, কিন্তু সরকারী প্রচেষ্টায় এখনই অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা-ব্যবস্থার জাতীয়করণ করিবেন বলা হইয়াছে। ডাঃ রায়-চৌধুরী বলেন, এই জাতীয়করণ আরও অল্প সময়ে সম্ভব নহে কেন—তিনি তাহা বুঝিতে পারেন না। কেবল যদি আর্থিক কারণেই তাহা অসম্ভব হয় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্য-সরকারকে উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য করা—যাহাতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূর্ণ জাতীয়করণ সম্ভব হয়।

তবে ইত্যবসরে সরকার যাহাতে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের সাহায্যার্থে চিকিৎসকদিগকে সংগঠিত করেন তজ্জন্য ডাঃ রায়চৌধুরী সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। পরে এই সাংগঠনিক কেন্দ্রগুলিতে বিস্তৃততর-ভাবে জাতীয়করণ করা সহজতর হইবে।

উপযুক্ত আয়ের অভাবে অনেক চিকিৎসক অপরাপর জীবিকা গ্রহণ করিতেছেন। ইহা বিশেষ উদ্বেগের বিষয় এবং ইহাতে জাতীয় শক্তির অপচয় ঘটিতেছে। জাতীয় স্বার্থেই এ বিষয়ে আশু নজর দেওয়া প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকদের অবস্থা বিশেষ-ভাবেই শোচনীয়। তাঁহারা যে কিরূপ দুরবস্থায় দিন কাটাইতেছেন, শহরের অধিবাসীদের পক্ষে তাহা অনুমান করা কঠিন। যে সকল চিকিৎসক এই সব অসুবিধা সহ্য করিয়া গ্রামবাসীদিগের সেবা করিয়া যাইতেছেন, সরকার তাহাদের সাহায্যের জন্য কোন ব্যবস্থা না করায় ডাঃ রায়চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি হেল্‌থ বোর্ড গঠন করিবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়াছেন।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, যখন ডাক্তারগণ অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছেন এবং জনসাধারণ বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে তখন ব্যয়বহুল এবং জমকালো অট্টালিকা ও পরিকল্পনা বিদ্রূপাত্মক মনে হয়। তিনি বলেন, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন হইলে ক্ষেত্রবিশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট ব্রিটেন হইতে পশ্চাতে পড়িয়া থাকাও ভাল।

ডাঃ রায়চৌধুরী বলেন, ভারতে চিকিৎসাবিষয়ক যে গবেষণা চলিতেছে তাহার সহিত দেশের প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় রোগ সারানো অপেক্ষা রোগ প্রতিরোধ করাকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও সুস্থ, সবল নাগরিক গঠনের উদ্দেশ্যেই চিকিৎসাবিষয়ক গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত।

সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে ডাঃ শ্রীনীহারকুমার মুন্সী বলেন, যাঁহারা মনে করেন যে, ভারতে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়াছে, তাঁহারা বিশেষরূপে ভ্রান্ত। এক ম্যালেরিয়া ব্যতীত আর কোন রোগকেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নাই।

তিনি সরকারী আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন, সমাজতান্ত্রিক ভারতের আদর্শ এবং কর্মপন্থা সাম্রাজ্য-বাদশাসিত ভারতের ন্যায় একরূপ হইতে পারে কি? গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকদের দুরবস্থার উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুন্সী বলেন যে, ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণ গ্রামেই বাস করে; সুতরাং গ্রামাঞ্চলের চিকিৎসকদের অবস্থার প্রতি অবিলম্বেই সরকারের মনোযোগ দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আড়াই কোটি, কিন্তু পাস-করা ডাক্তারের সংখ্যা মাত্র ১৬,০০০। এইরূপ অবস্থায় ডাক্তারের সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছে বলা চলে না। ডাঃ মুন্সী বলেন যে, এখন হইতেই গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার জন্য সরকারী সাহায্যের প্রবর্তন করা উচিত। ইহাতে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসংরক্ষণ-ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা সহজতর হইবে।

লাইফ ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থার জাতীয়করণের ফলে যে বহুসংখ্যক ডাক্তার কর্মহীন হইয়াছেন, ডাঃ মুন্সী তাঁহাদের সমস্যার কথাও উল্লেখ করেন।

কয়েকটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের দুর্নীতি সম্পর্কে যে সকল অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া ডাঃ মুন্সী বলেন যে, এই বিষয়ের গুরুত্ব কোন রূপেই ন্যূন করিয়া দেখা চলে না, কিন্তু একশ্রেণীর সংবাদে ডাক্তারের বিরুদ্ধে যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে সমস্যা সমাধানে সাহায্য হইবে না।

নাট্যকার ভাস

শ্রীউমা দেবী

প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের নাট্যকারগণের মধ্যে মহাকবি ভাস অবিসংবাদিতরূপে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। উনিশ শ' বার সনের আগে ভাসের নাম ও যশ শোনা যেত মাত্র, তাঁর নাটকের কোন সন্ধান তখনও পাওয়া যায় নি। উনিশ শ' বার থেকে পনেরোর মধ্যে গণপতি শাস্ত্রী ভাসের তেরখানি নাটক ত্রিবাঙ্কুর থেকে প্রকাশিত করেন কিন্তু এগুলির মধ্যে কোনটিতেই গ্রন্থকারের নাম বা রচনাকালের কোন উল্লেখ নেই। এ জন্য সত্যসত্যই এগুলি ভাসের রচনা কিনা—এ নিয়ে বহু বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে। উভয় পক্ষই প্রচুর যুক্তির অবতারণা করেছেন। এগুলি ভাসের মৌলিক নাটক নয়—মূল নাটক থেকে গৃহীত হয়েছে মাত্র—এমন কথাও উঠেছে। নাট্যশৈলীর দিক থেকেও ভরতের নাট্যশাস্ত্রে অনুমোদিত রীতির বহু ব্যত্যয় ঘটেছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ঐ তেরটি নাটক ভাসের রচিত বলেই এখন মেনে নেওয়া হয়েছে, কারণ নাটকগুলির মধ্যে লেখকের নাট্যপ্রতিভার যে বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় সেই প্রাচীন যুগে কালিদাসের পরবর্তী বা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র ভাস ব্যতীত সে পরিচয় নিয়ে আর কেউই দাঁড়াতে পারেন না। ভাসের নাট্যপ্রতিভার অসামান্যতার কথা পরবর্তী বহু গ্রন্থকার বলে গেছেন। কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে ভাসের নাট্যপ্রতিভার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে ভাসের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাক্‌পতি তাঁর গৌড়বাহে এবং রাজশেখর তাঁর একাধিক গ্রন্থে ভাসের শক্তিমত্তার প্রশংসা করেন। এ ছাড়াও বামন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ কর্তৃক নাট্যসূত্র-ব্যাখ্যানে ভাসের বিভিন্ন নাটকের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কালিদাসের নাট্যনির্মিতি-কৌশলের সুমার্জিত রূপটি আমরা ভাসে পাই না, কিন্তু বক্তব্য বস্তুর সহজসৌন্দর্য্য ও অনায়াস-সুকুমার ঋজুতা ভাসের নাটকগুলিকে এমন একটি রূপ দিয়েছে যা পূর্ববর্তী নাট্যকার অশ্বঘোষ ও পরবর্তী নাট্যকার শূদ্রকাদির কোন নাটকেই পাওয়া যায় না। রচনাশৈলীর সাবলীলতা ও ঋজুতা তাঁর নাটকের ঘটনাবলীর মধ্যেও স্পষ্টরূপেই বর্তমান। সংস্কৃত নাটকে বর্ণনামূলক বা কবিত্বব্যাপক শ্লোকপ্রাচুর্য অনেক ক্ষেত্রেই রচনাশৈলীর ভারস্বরূপ হয়ে থাকে। বিক্রমোর্বশী নাটকে স্বয়ং কালিদাসও এ দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তরু-লতা-পশু-পক্ষীকে উদ্দেশ্য করে উর্বশীবিরহাতুর রাজার আত্মোচ্ছ্বাসের কাব্যগত মূল্য যাই থাক, নাটকীয় সৌন্দর্যের ঋজুতাকে তা রক্ষা করতে পারে নি। মৃচ্ছকটিকেও বসন্তসেনা এবং বীটের বর্ষাবর্ণনার মধ্যে ও বিদূষকের বসন্তসেনার প্রাসাদবর্ণনার মধ্যে এই অসংযত নাট্যবিরোধী কাব্যোচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। কিন্তু ভাস তাঁর নাটকে এই শ্লোকগুলিকে কোথাও ঔচিত্যের সীমা লঙ্ঘন করে নাটকীয় ঘটনাপ্রবাহের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে দেন নি। এ দিক দিয়ে তাঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে এপিক-কাব্যের রচনাশৈলীর তুলনা হতে পারে।

রামায়ণ-মহাভারতের মত মহাকাব্যের প্রভাব যে ভাসের উপর কম ছিল না তার আরও একটি প্রমাণ তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনের মধ্যে পাওয়া যায়। রামায়ণ থেকে তিনি প্রতিমা ও অভিষেক নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। মহাভারত থেকে মধ্যমব্যায়োগ, দূতকাব্য, দূত-ঘটোৎকচ, কর্ণভার, উরুভঙ্গ এবং পঞ্চরাত্র—এই ছ'টি নাটকের বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, বিষয়বস্তু নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভাস যে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন অন্য কোন সংস্কৃত-নাট্যকারের নাট্যকৃতিতে সে বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। কৃষ্ণ-কথা নিয়ে বালচরিত নামে একটি নাটক তিনি রচনা করেন। গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কাহিনী নিয়ে রচিত তাঁর স্বপ্নবাসবদত্তা ও প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ। অবিমারক ও দরিদ্রচারুদত্ত—নাটক দুটি লৌকিক কাহিনী বা কল্পিত কাহিনী নিয়ে রচিত। শেষের নাটকটি বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যদিও এটিকে অসমাপ্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। নাটকগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, নাট্যকার হিসাবে কোন একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে ভাস নিজেকে বেঁধে রাখেন নি।

মহাকাব্যের বিষয়বস্তু নিয়ে যে নাটকগুলি ভাস রচনা করেছেন, সেগুলিতেও অনেক সঙ্কট তিনি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে কাটিয়ে উঠেছেন। ভাস যদি এপিক-কাব্যকার হতেন তা হলে এপিক-কাব্যের একটি মহৎ দোষকে তিনি এড়াতে পারতেন না। এ দোষ হচ্ছে বর্ণনার অনুচিত

সীমাহীন উচ্ছ্বাস। সমুদ্রের তরঙ্গ-ভঙ্গের মত উপমার পর উপমা হিল্লোলিত হ'য়ে চলেছে—কাব্যের ঘন সৌরভে অন্তশ্চেতনা নিঃসাড়, সুদীর্ঘ সমাসবন্ধনে জর্জরিত পদগুলি অর্থকে বয়ে নিয়ে চলেছে ক্লিষ্ট হয়ে—এ শৈলী নাটকে সর্বথা বর্জনীয়। তাই নাট্যকার ভাসকে এ রীতি বর্জন করে চলতে হয়েছে। ফলে এপিকের নিষ্কলঙ্ক সাবলীল সহজ রূপটিকে তিনি নাটকে ধরে দিতে পেরেছেন।

আরও কথা—কাব্যে কবির যে ভাবমানস মূর্ত হয়ে ওঠে নাটকে তা সম্ভব হয় না। সেখানে চরিত্রের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে কথার জাল ফেলতে হয়, কাজেই বাধ্য হয়েই নাট্যকারকে আত্মগোপন করতে হয়। এ জন্যেও আমরা নাটকে ভাববস্তুর একটি সংহত রূপ দেখতে পাই। ভাসের নাটকে ভাবপ্রকৃতির এই সরল অভিব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপদক্ষতা। সুরুচি ও ঔচিত্যবোধ তাঁকে রাজ-কবিকুলের জটিল কারুকার্যমণ্ডিত কাব্যনির্মিতির পক্ষপাতী করে নি। তাঁর কাব্যনির্মিতির এই সঙ্গতি ও সুষমাবোধ কালিদাসকেও যে প্রভাবান্বিত করেছিল তার বহুল উদাহরণ উভয়ের নাটক থেকে দেখানো যেতে পারে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে, কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার সুমার্জিত রূপটি জনচিত্তকে অধিক মুগ্ধ করেছে। ভাসের অনুসরণে যে সকল ভাবকে তিনি তাঁর নাটকে গ্রহণ করেছেন সেগুলিতেও তাঁর প্রতিভার মায়াদণ্ডস্পর্শে রূপান্তর ঘটেছে। ভাসের প্রতিমা নাটকে প্রথম অঙ্কে সীতা যেখানে লীলারঙ্গিণী হয়ে বল্কল পরিধান করেছেন সেখানে তাঁর সখীর একটি উক্তি আছে—"সব্বসোহণীঅং সুরূবং ণাম"—অর্থাৎ সুরূপার সবই শোভা। নাটকস্থ পাত্রপাত্রীর মুখে এর চেয়ে অলঙ্কৃত কোন উক্তির প্রয়োজন হয় না। তবু কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে দুষ্যন্ত যখন বলেন :

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্॥"
—শৈবালে আচ্ছন্ন কমল আরো রমণীয়,
কলঙ্কের মলিন চিহ্নে চন্দ্র আরো সুন্দর,
বল্কলপরিধানা এই তন্বীও আরো মনোহর,
মধুর যার আকৃতি—কি না তার আভরণ ?

তখন কালিদাসের কবিকর্মের মার্জিত নৈপুণ্যে কার চিত্ত না অধিক মুগ্ধ হয়!

ভাসের অভিষেক নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আছে—

"যস্যাং ন প্রিয়মণ্ডনাপি মহিষী দেবস্য মন্দোদরী
স্নেহাল্লুম্পতি পল্লবান্ ন চ পুনর্বীজন্তি যস্যাং ভয়াৎ।
বীজন্তো মলয়ানিলা অপি করৈরস্পৃষ্টবালদ্রুমাঃ
সেয়ং শক্ররিপোরশোকবনিকা ভগ্নেতি বিজ্ঞাপ্যতাম্॥"

—শক্ররিপু রাবণের অশোকবন ভগ্ন হয়েছে—একথা জানাও। আহা—এই অশোকবনের তরুণ তরুগুলিকে কেউ স্পর্শও করত না, ভয়ে প্রবহমাণ মলয়ানিল এর পল্লব-গুলিকে আন্দোলিত করত না, এমনকি প্রসাধনে উৎসুক মন্দোদরীও এ বনের পল্লব কখনও ছিন্ন করেন নি।

অনুরূপ একটি শ্লোক শকুন্তলা নাটকেরও চতুর্থ অঙ্কে আছে—

"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি পয়ো যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

—তোমাদের জলপান না করিয়ে যে প্রথমে জলপান করে না, আভরণপ্রিয়া হয়েও যে স্নেহবশতঃ তোমাদের নূতন কিশলয় ছিন্ন করে না, তোমাদের নূতন কুসুম-শোভা দেখে যার পরম আনন্দ—আজ তোমাদের সেই শকুন্তলা স্বামীগৃহে চলেছে। তোমরা তাকে অনুমতি দাও।

পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে, সাদৃশ্যটি শুধু অর্থের দিক দিয়েই নয়; শব্দ ব্যবহারের ধ্বনিকৌশলটিও অনুরূপ। "প্রিয়মণ্ডনা", "স্নেহাৎ", "পল্লবান্", "সেয়ং" ইত্যাদি শব্দ উভয় শ্লোকেই বর্তমান।

ভাসের বালচরিত নাটকের প্রথম অঙ্কে দেবকীর একটি মানস-সঙ্কটের বর্ণনা আছে। যখন তিনি বসুদেবের হাতে কৃষ্ণকে তুলে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছেন তখন—

"হৃদয়েনেহ তত্রাঙ্গৈর্দ্বিধাভূতেব গচ্ছতি।
যথা নভসি তোয়ে চ চন্দ্রলেখা দ্বিধাকৃতা॥"

—স্থির আকাশে ও চঞ্চল জলে চন্দ্রলেখা যেমন দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায় তেমনি তাঁর দ্বিধাবিভক্ত হৃদয় চলেছে একদিকে এগিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে আর অন্যদিকে ক্লান্ত দেহ ফিরে চলেছে কারাগারের ভূমিশয্যায়।

শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কেও অনুরূপ একটি শ্লোক আছে—যখন মাতৃ আজ্ঞায় দুষ্যন্ত ফিরে চলেছেন রাজধানীতে তখন আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার জন্য আশ্রমবাসে উৎসুক দুষ্যন্ত বলছেন—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য॥"

—বাতাসের বিরুদ্ধে নিয়ে চলা চীনাংশুকের মত শরীর

যত এগিয়ে চলেছে সম্মুখদিকে, অস্থির চিত্ত ততই পিছনে ফিরে চাইছে।

স্বপ্নবাসবদত্তার প্রথম অঙ্কের "বিশ্রব্ধং হরিণাচরন্ত্যচকিতা দেশাগতপ্রত্যয়াঃ"—এই পংক্তিটিকে একটু পরিবর্তিত ভাবে পাচ্ছি শকুন্তলা নাটকের প্রথম অঙ্কে—"বিশ্বাসোপগমাদ-ভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ" এই পংক্তিটিতে।

প্রতিমা নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রথবেগের বর্ণনায়—"রজশ্চাশ্বোদ্ধুতং পততি পুরতো নানুপততি"—পংক্তিটির অর্থটিকে শকুন্তলা-নাটকের প্রথম অঙ্কে রথবেগের বর্ণনায় কালিদাস অন্য ভাষায় বলেছেন—"আত্মোদ্ধুতৈরপি রজোভিঃ অলঙ্ঘনীয়াঃ।"

অবশ্য রথবেগের এই বর্ণনায় কালিদাস আরও বেশী বর্ণসম্পাত করেছেন। ভাস যেখানে শুধুমাত্র একটি শ্লোকে রথাশ্ববেগের বর্ণনায় গতির তীব্রতা বোঝাবার জন্য "দ্রুমা ধাবন্তীব" গাছগুলি যেন দৌড়ে চলেছে—বলে আরম্ভ করেছেন কালিদাস সেখানে একটি ধাবমান মৃগশিশুর অত্যাশ্চর্য বর্ণনা দিয়ে রথগতির অতুলনীয় আপেক্ষিক তীব্রতা দেখিয়ে বলছেন:

"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি॥"

—অভিনব গ্রীবাভঙ্গি করে মৃগটি মুহুর্মুহু পশ্চাদ্ধাবিত রথের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে। শরপতন ভয়ে দেহের পশ্চার্দ্ধের অধিকাংশই যেন পূর্বার্দ্ধে প্রবিষ্ট হয়েছে। দ্রুত ধাবনের ক্লান্তিতে ঈষদ্ উন্মুক্ত মুখ থেকে অর্ধচর্বিত কুশতৃণ স্খলিত হয়ে পথে বিকীর্ণ হয়েছে—দেখুন—দেখুন—দ্রুত উল্লম্ফনের জন্য মনে হচ্ছে যেন শূন্যপথেই মৃগটি ধাবিত হচ্ছে—ভূপৃষ্ঠ স্পর্শ করছে মাত্র।

রথগতির একটি চিত্তগ্রাহী বাস্তবানুগ বর্ণনা দিয়েছেন ভাস:

"দ্রুমা ধাবন্তীব দ্রুতরথগতিক্ষীণবিষয়া
নদীবোদ্ধতাম্বুর্নিপততি মহী নেমিবিবরে।
অরব্যক্তির্ণষ্টা স্থিতমিব জবাচ্চক্রবলয়ং
রজশ্চাশ্বোদ্ধতং পততি পুরতো নানুপততি॥"

—বৃক্ষগুলি ধেয়ে চলেছে, রথের বেগে মনে হচ্ছে যে, তাদের মধ্যেকার স্থান হঠাৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। জলপূর্ণ নদীর মতন উচ্ছ্বসিত হয়ে যেন ভূমিভাগ রথনেমির ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করছে। নেমির অরগুলি আর স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় না—বেগবশে ঘূর্ণমান চক্রগুলি যেন স্থির হয়ে গেছে। অশ্বক্ষুর থেকে উত্থিত ধূলিরাশি সম্মুখেই পতিত হচ্ছে—রথের অনুগামী হতে পারছে না।

শকুন্তলার প্রথম অঙ্কে কালিদাসের বর্ণনা অনুরূপ হলেও আরও বেশি চমৎকৃতিজনক কারণ আরও বেশি তথ্যবহুল ও বাস্তবানুগ। তিনি বলেছেন:

"মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্দ্ধকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ॥"
"যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥"

—রথরজ্জু শিথিল করে দেওয়াতে অশ্বগুলি দেহাগ্রভাগ নিঃশেষে বিস্তারিত করে যেন মৃগের দ্রুত ধাবনশক্তিকে সহ্য করতে না পেরে ছুটে চলেছে—তাদের চামরশিখা নিশ্চল, কর্ণদেশ উন্নত ও নিস্পন্দ এবং স্বীয় ক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিকেও যেন তারা লঙ্ঘন করতে পারছে না।...রথের বেগে দুরস্থ সূক্ষ্ম বস্তুকে মুহূর্তমধ্যে বিপুল, বিভক্ত বস্তুকে অবিভক্ত ও বক্র বস্তুকে ঋজু ব'লে মনে হচ্ছে। কোন বস্তুই মুহূর্তের জন্যও পার্শ্বস্থ বা দুরস্থ বলে অনুভূত হচ্ছে না।

মানুষের সাধারণ সু দুঃখকে সহজ সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করতে ভাসের তুলনা পাওয়া বিরল। তাঁর প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটকে কন্যার বিবাহের পর আসন্ন বিরহ-কল্পনায় ব্যথিতচিত্ত মায়ের উক্তি আছে—

"অদত্তেতি আগতা লজ্জা দত্তেতি ব্যথিতং মনঃ।
ধর্মস্নেহান্তরে ন্যস্তা দুঃখিতা খলু মাতরঃ॥

—কন্যা দান করা ধর্ম, কন্যাকে কাছে রাখতে চায় স্নেহ। অদত্তা কন্যা লজ্জার কারণ—দত্তা কন্যা বেদনার কারণ। ধর্ম ও স্নেহের মধ্যে পড়ে মায়েরা শুধু দুঃখভোগই করে থাকে।

আনন্দ বেদনাময় কন্যাবাৎসল্যের এই কথাই কালিদাসও তাঁর শকুন্তলাকাব্যের চতুর্থ অঙ্কে বলেছেন:

"যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
কণ্ঠঃ স্তম্ভিতবাষ্পবৃত্তিকলুষশ্চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমিদং স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥

—আজ শকুন্তলার যাবার দিন! হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। কণ্ঠ বাষ্পগদ্‌গদ স্তম্ভিত! চিন্তামগ্ন দৃষ্টি তাই আচ্ছন্ন। আমি বনবাসী তবু তনয়াবিরহ দুঃখে আমার এই দশা—না জানি গৃহীদের এতে কতই কষ্ট!

উপরে উদ্ধৃত দুটি শ্লোকে প্রথমটির অনাড়ম্বর সহজ প্রকাশে ও দ্বিতীয়টির বিশ্লেষণাত্মক ভাবগাম্ভীর্যে ভাসের বিশুদ্ধ নাট্যকলা ও কালিদাসের কাব্যাশ্রয়ী নাট্যকলার বিশিষ্ট স্বাদ পাঠকমাত্রেরই অনুভবগম্য।

এই ভাবে ভাসের বহু শ্লোকের ভাব কালিদাসের কাব্যে এক নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। ভাসের মত শক্তিমান্ নাট্যকারের প্রভাব যে কালিদাসের মত শক্তিমান্ পরবর্তী নাট্যকারের উপর থাকবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

শুধু শ্লোকবিশেষের ভাবের সম্বন্ধেই নয়, নাটকের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও চরিত্রকল্পনাতেও কালিদাসের উপর ভাসের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। ভাসের প্রতিমা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে আছে—রাম সীতাকে বলছেন, আশ্রমের তরু-লতা, মৃগশিশু, পশুপক্ষী, বিন্ধ্যগিরি ও সখীদের নিকট থেকে বিদায় চেয়ে নিতে। সেখানে সীতার আসন্ন বিরহদুঃখে সন্তাপিত হয়েছে তরুলতা ও হরিণশিশু—যাকে সীতা পুত্রের মত পালন করেছেন। ঠিক এইরূপ একটি প্রকৃতিদুহিতার চরিত্রকল্পনা আমরা শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কে পাই যেখানে আশ্রমপালিতা শকুন্তলা তপোবনের তরুলতা, মৃগশিশু, সখী প্রভৃতির কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। প্রতিমা নাটকে সীতার পালিত মৃগ যেমন ভরতকে অবিশ্বাস করেছিল তেমনি শকুন্তলা নাটকে শকুন্তলার পালিত মৃগ-শিশুও দুষ্মন্তকে অবিশ্বাস করেছে। স্বপ্নবাসবদত্তা নাটকের বহু ঘটনা ও কথার সঙ্গেও এই ভাবে শকুন্তলা নাটকের সাদৃশ্য আছে।

ছোটখাটো স্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রবাদ রচনায় ভাস ও কালিদাস উভয়েরই সমান কৃতিত্ব। ড্রামাটিক আয়রণি বা নাট্যোচিত বাগ্‌ভঙ্গিবিশেষের পরিস্থাপনায় উভয়েই সমান কৃতী। তবে অলঙ্কার সংরচনায় ভাসের রুচি যেমন সরল ও সুকুমার কালিদাসের রুচি তেমনি বিচিত্র ও উজ্জ্বল।

ভাস প্রধানতঃ বীররসের পরিবেশক কিন্তু শৃঙ্গাররসের পরিবেশকরূপেও তিনি কম শক্তিশালী নন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আদিযুগের নাট্যকাররূপে আঙ্গিকের কতকগুলি অমার্জনীয় ত্রুটিকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেন নি। এই শ্রেণীর ত্রুটি কিন্তু আমরা কালিদাসে পাই না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে কাল-জ্ঞানের কথা। প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে একই ব্যক্তি এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিলেন যে ঘটনা ঘটতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়। তাঁর অভিষেক নাটকের শঙ্কুকর্ণের বিবৃতি এখানে স্মরণীয়।

ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা তাঁর নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে যেমন অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটক কালিদাসের নাটকগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এই দুটি নাটকেই নাট্যনির্মিতির একটি অপূর্ব কৌশলকে আমরা প্রত্যক্ষ করি—পাই পরিপূর্ণ জীবনদর্শন, পাই নাট্য ও কাব্যের এক অননুকরণীয় সমন্বয়।

প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রে নাট্যনির্মিতির যে সর্বাঙ্গীন একটি পরিপূর্ণ আদর্শ ছিল—সে আদর্শ আজকের দিনেও সর্বতোভাবে ও সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। রসের একটি স্থির বিন্দুকে লক্ষ্য রেখে নানা ঘটনার মাধ্যমে চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গতি নাটক রচনার একটি সর্বকালীন আদর্শ। শুধুমাত্র ঘটনার চমৎকারিতা কিংবা চরিত্রসৃষ্টির অক্লান্ত প্রয়াস নাটকের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। প্রাচীন নাট্যাদর্শে তাই চিত্তকে উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত করে যে রস তারই অনুকূল করে ঘটনা-সংযোজন ও চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা ছিল।

আরও একটি কথা এই যে, মনুষ্যত্বের একটি আদর্শকেও সেই প্রাচীনযুগের নাট্যকার ধরে দিতেন দর্শক ও পাঠকের সম্মুখে। জটিল ও অসুস্থ চরিত্র থেকে জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিক্রিয়া বিশ্লেষণের প্রণালীতে কোন অন্তর্নিহিত মহত্ত্বকে আবিষ্কার করবার চেষ্টাও তাঁরা করেন নি। আনন্দ পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণকে যুক্ত করে তাঁরা নাট্যাদর্শের যে ধ্রুবতারাকে সাহিত্যগগনে উদিত রেখে গেছেন আজকের দিনেও সেই কথা বিশেষ করে স্মরণ করা যেতে পারে।

প্রতিঘাত

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

দোকান থেকে বাড়ী ফিরে সদর দরজা থেকেই যুগল হাঁক পাড়তে থাকে, কি গো রান্না হ'ল ?

তার গলা শুনে ছেলেমেয়েরা ভয়ে জড়সড়। স্ত্রী শশব্যস্ত। রাঁধতে রাঁধতে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার বাইরে তাকায়। উঠোন পেরিয়ে একেবারে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায় যুগল। বগলে খেরোর বটুয়া, হাতে ছাতা। কোঁচকানো কপালে ঘাম। মোটা ভুরুর ছাঁচতলায় বাঁকা চোখের রূঢ় চাউনি—তাচ্ছিল্যভরা। গোঁফদাড়ি কামানো। খোঁচা চুল তেলো ঘেঁসে ছাঁটা। গলায় তুলসীর মালা। বেঁটে, আঁটসাট শরীর। গায়ের রং কালো। হাতগুলো লোমশ।

দরজায় দাঁড়িয়েই ভেতরের পানে চেয়ে বলে ওঠে, এখনও রান্না হয় নি ?

আগুনের ঝাঁজে আতপ্ত মুখ না তুলেই উমা বলে, হয়ে এল। যাও না, হাতমুখ ধুয়ে নাও। ডাকছি।

মুখ ফুলিয়ে চোখ ঘুলিয়ে যুগল হুমকি দেয়, হুঁ! ডাকছি। সবই খুশিমত; কিছুই ত হয় নি এখনও। একটু হুঁসপর্ব যদি আছে। বলে গেলাম না, হরিসভায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে।

খুন্তি নাড়তে নাড়তে উমা বলে, বেশ ত যাও না। এই ত তরকারিটা নামিয়ে রুটি ক'খানা সেঁকে দোব। ময়দা মাখা রয়েছে।

—তবেই আর কি ? মাথা কিনে নিয়েছ ? সুশী কি করছে ? গেল কোন্ চুলোয় ? রুটি ক'খানা বেলে দিতে পারে না ?

দশ-এগার বছরের মেয়ে সুশীলা। ঘরের দাওয়ায় বেরিয়ে এসে শঙ্কিত কণ্ঠে বলে, এই যে আমি। খোকা কাঁদছিল তাই ভোলাচ্ছিলুম।

ঘরের দিকে যেতে যেতে যুগল বললে, কাঁদছিল কেন ? হতভাগা ছেলের দিনরাত কান্না। মেরে পস্তা খুলে দিচ্ছি দাঁড়াও। তবে কান্না থামবে।

ঘরের ভেতর ঢুকেই যুগল হুঙ্কার দিয়ে ওঠে, বুড়ী, তুই কি করছিস ওখানে ? লাথি মেরে মুখ ভেঙে দেব। উঠে আয় ওখান থেকে।

উমা রাঁধতে রাঁধতে অসহায় দৃষ্টিতে ভেতর পানে তাকায়।

সুশী এসে দরজায় দাঁড়ায়।

—দে মা, রুটি ক'খানা বেলে দে। হরিসভা যাবে। ভীরু পাখীর মত সুশী রান্নাঘরে ঢোকে। চুপি চুপি মাকে জিজ্ঞেস করে, ফিরতে অনেক রাত হবে, না মা ?

—হ্যাঁ। উমা তার মুখের পানে চেয়ে মৃদু হাসে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। ছেলেমেয়েরা বাপকে কেউ ভালবাসে না। বাপ যতক্ষণ বাইরে থাকে ততক্ষণ তারা হাত-পা মেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বাপ বাড়ী এলেই তারা নিজেদের গুটিয়ে নেয়। তারা ভয়ে কাঁটা। তাদের দম বন্ধ হয়ে আসে।

ঘরের ভেতর থেকে কাঁচের বাসনভাণ্ডার শব্দ আসে। মা ও মেয়ে একসঙ্গে চমকে ওঠে।

সুশী বলে, পল্টু বোধ হয় গ্লাস ভাঙলে। মার খেয়ে মরবে।

মার আরম্ভ হয়ে গেছে। দমাদম্ কিল, চড়। চিলের মত চেঁচাচ্ছে ছেলেটা। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে যুগল, গ্লাসটা ভেঙে চুরমার করে দিল। লক্ষ্মীছাড়ার সংসার। হতভাগা, হাবাতের দল, কিছু রাখবে না। সব তছনছ করে দিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে উমা ছুটে এসে ছেলেটাকে যুগলের কবল থেকে মুক্ত করে নেয়।

স্বামীর অগ্নিমূর্তির পানে চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয় না উমার। বুড়ীকে জিজ্ঞেস করে, কেমন করে ভাঙল রে ? হাত-টাত কাটে নি ত ?

বুড়ী কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ফুরসত দিল না যুগল। মেয়েটার চুলের মুঠি ধরে তার পিঠে দিল একটা চাপড় বসিয়ে। বললে, এই হারামজাদা মেয়েকে বললুম এক গেলাস জল দিতে। উনি জলভরতি গেলাসটা বসিয়ে দিলেন ঐ হতভাগার সামনে। ব্যস্! এক টানে দিল সাবাড় করে। কোত্থেকে সব এসেছে ? হাড়ে টক। হতভাগার দল।

ছেলেটাকে বাইরে বসিয়ে দিয়ে এসে, উমা নিঃশব্দে ভাঙা কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিল।

বুড়ী কাঁদছে, মুখে হাত চাপা দিয়ে ভয়ে ভয়ে। পাছে শব্দ হলে আবার মার খেতে হয়।

যুগল আপনমনে গজরাচ্ছে, নবাবী করে কাচের গেলাস বের না করলে চলে না।

উমা কোন কথা বললে না।

দুমদাম শব্দ করে যুগল উমাকে হুমকি দিয়ে বলে উঠল, চুলোর ছাই তোমার রান্না হবে, না এমনি চলে যাব।

তার মুখের দিকে না চেয়েই উমা বললে, এস না। রান্না ত হয়ে গেছে। সুশী রুটি সেঁকছে।

উমার এ সব গা-সওয়া। এই তাদের স্বামীস্ত্রীর প্রাত্যহিক জীবনের ধারা। এই তার স্বামীর নিয়ম-সেবা। বারো বছরের বিবাহিত জীবনে এ তাদের দৈনন্দিন ব্যাপার। মার খেয়ে খেয়ে উমার গায়ের ছাল-চামড়া পুরু হয়ে গেছে। এসব আর তাঁকে স্পর্শ করে না। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে শুধু মাতৃহৃদয়ের তন্ত্রীগুলো ঝনঝন করে ওঠে তার সন্তানদের ব্যথায়—তাদের উর্দ্ধশ্বাস কাতরতায়।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার সময় যুগল ছেলেটার সামনে গিয়ে ধমক দিল, ইস্! এখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না হচ্ছে? চোপ। চোপ। নইলে এখখুনি তুলে আছাড় দোব।

উমা নিঃশব্দে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে চলে গেল। সুশী অসহায় দৃষ্টি মেলে মায়ের পানে তাকাল।

যুগল চোখের বাইরে যেতেই ছেলেটা চুপ করল। বুড়ী কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছিল, বেরিয়ে এসে মায়ের কাছে বসল। উমা মনে মনে হাসল। কিন্তু তার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল।

সুশী মায়ের মুখের পানে চেয়ে মনে মনে বল পায়। কিছুক্ষণ পরে সে আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা মা, বাবা অমন করে কেন? কারুকে কি বাবার ভাল লাগে না? আমাদের একটা ভাই, তাকে কোনদিন একটু আদর করতে ইচ্ছে যায় না? আরও ত পাঁচ জনের বাবা দেখেছি। ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলা করে, হাসে, গল্প বলে। কত আদর করে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি, আমাদের বাবা অমন কেন?

উমা যে কি বলবে ভেবে পায় না। সুশী ত আর কচি খুকীটি নয়। তার চোখ ফুটেছে। সংসারকে সে দেখতে শিখেছে, বুঝতে শিখেছে। তার কাছে আর লুকোবে কেমন করে?

উমা বললে, ও ঠিক যে আমাদের দেখতে পারে না বা ঘেন্না করে তা নয়। বোধ হয় ও ইচ্ছে করলেও পারে না, বা ওর শক্তি নেই ভাল ব্যবহার করবার।

প্রশ্নভরা চোখে সুশী মায়ের পানে তাকায়। উমা বলে, কুঁজো, খোঁড়া দেখেছিস ত? তাদের অঙ্গ বিকল, ওর মন বিকল; পেঁচালো। ও অন্যায়কে ন্যায় ভাবে, ন্যায়কে অন্যায় ভাবে। ও কারুকে ভাল চোখে দেখতে শেখে নি।

উমা চুপ করে তাদের পানে চেয়ে থাকে। হঠাৎ সন্তান তিনটিকে কাছে টেনে নেয়। নিবিড় ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে। পক্ষীমাতা যেমন করে শাবককে পক্ষপুটে ঢেকে রাখে আঘাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।

ছেলেটাকে কোলে আর দু'হাতের বেষ্টনে মেয়ে দুটিকে আঁকড়ে ধরে সে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল।

কি যেন ভাবছে সে। ভাবনার মাঝে ডুবে সে যেন শক্তি-সঞ্চয় করছে—বাঁচবার শক্তি, সন্তানদের মানুষের মত বাঁচাবার শক্তি।

সে মা। মায়ের কর্তব্য, সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্য-বোধ তার বুকের তলায় ঝনঝনিয়ে বেজে উঠেছে। সে এই দীর্ঘকাল—প্রায় এক যুগ, জড়ের মত অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করেছে, তবু স্বামীর অধিকারকে সে কোনদিন ক্ষুন্ন করে নি। কিন্তু তার সন্তানদের ওপর এই হৃদয়হীন ব্যবহার সে সহ্য করবে না, কিছুতেই না। এই আতঙ্কের পাষাণভারে ওদের শরীর বাড়তে পারছে না, মন বাড়তে পারছে না। বাপের মত ওদের মনও বিকল হয়ে যাবে, ওরা হাসতে ভুলে যাবে।

উমা হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, দেখ, তোরা আর ওকে ভয় করিস নি। একটুও ভয় করবি না, বুঝলি? আমি দেখব কেমন করে তোদের গায়ে ও হাত তোলে কিংবা হুমকি দেয়। আমি যতক্ষণ আছি তোদের কোন ভয়-ভাবনা নেই, তোরা যত পারবি হাসবি, খেলবি, নাচবি, গাইবি। যা বলে বলবে, ওর কথা আমি বুঝব, আমার কথা তোরা শুনবি।

অবাক হয়ে গেছে সুশী মায়ের মুখের পানে চেয়ে। মায়ের এ চেহারা সে আর কখনও দেখে নি। মায়ের মুখখানা আগুনের মালসার মত গনগনে। বড় বড় চোখ দুটো আরও বড় হয়ে জ্বলে উঠেছে, গলার স্বর গেছে বদলে।

মুখের ওপর থেকে ভাসা চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে উমা বললে, হ্যাঁ, এখন থেকে আমাদের বদলাতে হবে, আর এমন ভাবে চলতে পারে না।

সুশী ভয়জড়িত স্বরে বললে, কিন্তু তোমাকে যে মারবে মা!

—আমি বুঝব তোকে ভাবতে হবে না।

বারো বছর। বিবাহিত জীবনের প্রথম বারোটি বছর তার কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেছে এই স্বামী নামক অপূর্ব্ব জীবটির মর্জির ওপর ভর করে, তার মনেও পড়ে না। অতীত তার অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। তবু একথা মনে আছে, স্বামীর প্রতি কর্তব্যবোধকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে এসেছে সে নিঃশব্দে মুখ বুজে, কোন দিন কোন নালিশ জানায় নি। 'যার অদৃষ্টে যেমন জোটে'—ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে। জীবনকে ঘোরালো করে তোলে নি। স্বামীর অধিকার যেখানে চরম সেখানে লড়াই করে লাভ নেই ভেবেই সে সব কিছু নীরবে সহ্য করছে। ধর্মের সনাতন ভিতকে আলগা হতে দেয় নি, অনেক ঝড়ঝাপটা তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। স্ত্রীর কোন অধিকারই সে পায় নি, দাবিও করে নি কোনদিন। টাকা-পয়সা যখন যা দয়া করে স্বামী তাকে দিয়েছে তাই হাত পেতে নিয়েছে। নিজের গয়নার ওপর তার অধিকার নেই। লোহার সিন্দুকে তোলা থাকে, দরকার হলে চাইতে হয় স্বামীর কাছে। লোহার সিন্দুকের চাবি থাকে স্বামীর কাছে। এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যে সে কখনও চাবি হাতে পায় নি, সিন্দুক খোলবার অধিকার পায় নি।

যুগলের সোনারূপার কারবার, নিজের দোকান। অবস্থা সচ্ছলই বলা চলে। কিন্তু সংসারে সচ্ছলতার কোন নিদর্শন মেলে না, বরং অভাবের ছায়া আছে। যুগল অতিরিক্ত কৃপণ এবং তার মর্জির ওপর কারুর কথা বলবার সাহস নেই। সে যা হাত তুলে দেয় তাতেই উমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়, সে মুখ ফুটে কিছু চায় নি।

কেন চায় নি?

দীর্ঘ অতীতের বিড়ম্বিত জীবনের পানে চেয়ে সে শিউরে ওঠে। তার নিজের ওপর রাগ হয়, তার হৃদপিণ্ডটা মোচড়াতে থাকে। নিজের বাকি জীবনটাকে হয়ত সে স্বামীর ইচ্ছার যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারত, কিন্তু সে ঠেকেছে তার ছেলেমেয়েদের মুখের পানে চেয়ে। তাদের জীবনকে সে এমন ভাবে বিড়ম্বিত হতে দেবে না, তাদের জন্য তাকে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। উচিত-অনুচিত, নিয়ম-অনিয়ম, ন্যায়-অন্যায়ের সব বাধা ডিঙিয়ে বুক ফুলিয়ে সে তার সন্তানদের আড়াল করে দাঁড়াবে।

ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে সে স্বামীর কাছে গিয়ে বললে, কাল আমি ছেলেদের নিয়ে কলকাতা যাব, দিদির কাছে।

—তার মানে?

—মানে আমার শরীরে কুলোচ্ছে না। শরীর আমার ভাল নেই। একবার ডাক্তারকে দেখাব।

—এখানে কি ডাক্তারবদ্যি নেই নাকি? আর কি এমন অসুখ যে কলকাতা গিয়ে একেবারে বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে?

উমা গলায় জোর দিয়ে বললে, দরকার বুঝলে তাই করতে হবে। শুনে রাখ, কাল আমি যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হতে পারে। তোমার রান্নার জন্যে কাল সকালে লোকের ব্যবস্থা করবে।

নাক সিঁটকে মুখ বেঁকিয়ে যুগল বললে, তোমার হুকুম নাকি?

—হুকুম না হলেও আমার ইচ্ছে।

—তোমার ইচ্ছেতেই আমাকে চলতে হবে নাকি?

—বারো বছর তোমার ইচ্ছেয় আমি চলেছি মুখ বুঁজে। এখন থেকে ঠিক তেমনি ভাবে তোমাকে চলতে হবে আমার ইচ্ছেয়।

যুগল চমকে উঠল তার গলার রূঢ় স্বরে, তার কথা বলার ভঙ্গিমায়। এ স্বর ত সে শোনে নি কোন দিন, সে বিছানায় উঠে বসল। বললে উঠল, তোমার হয়েছে কি? পাগল হলে নাকি?

গম্ভীর ভাবে উমা উত্তর দিল, তা না হলে ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছি কেন? ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে ছেলেদের ঘুম ভাঙিও না, ঘুমোও।

আলো নিবিয়ে দিয়ে উমা ছেলেদের বিছানায় নেমে গেল।

এ ত স্পর্ধা হ'ল কেমন করে। নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।

গজরাতে লাগল যুগল।

সত্যিই যুগল অবাক হয়ে গেছে। এ ত উমার মত নয়, উমার হ'ল কি?

নিজের মাথাও গরম হয়ে উঠল, ঘুম এল না।

ভোরের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। রোজই উমা ভোরে উঠে নীচে নেমে যায়। নীচে থেকে ওপরে এসে সে যুগলের ফতুয়ার পকেট থেকে আস্তে আস্তে লোহার সিন্দুকের চাবিটা নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে সিন্দুক খুলল। যুগল ঘুমোচ্ছে, মাঝের দরজাটার শিকল তুলে দিল। সিন্দুক থেকে চুপি চুপি বের করল, নিজের গয়নার বাক্স। সুশীর হার চুড়ি। আর নিল দু'শ টাকার খুচরো নোট।

সিন্দুক বন্ধ করে আবার চাবিটা যথাস্থানে রেখে দিল। যুগল জানতেও পারলে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যুগল যায় প্রত্যহ গয়লাবাড়ী দুধ

আনতে। তার পর চা খেয়ে বাজার করে দিয়ে দোকানে যায়। দুপুরে আবার বাড়ীতে খেতে আসে।

ঘুম থেকে উঠে সিঁড়ি কাঁপিয়ে যুগল নীচে এল। রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে উমা দেখলে তার মুখখানা দুর্বাসার মত আওরে আছে।

মুখ ধুয়ে যুগল বললে, সুশী যা, গয়লাবাড়ী থেকে দুধ নিয়ে আয়।

ঘরের ভেতর থেকে কঠোর আদেশের ভঙ্গিতে উমা বলে উঠল, না। সুশী গয়লাবাড়ী যেতে পারবে না, কাজ করছে সে।

উমা যুগলের গায়ে যেন বোমা ছুঁড়ে মেরেছে। আঘাতের তীব্রতায় সে ছটফট করতে করতে রান্নাঘরের দোরে গিয়ে বললে, কাজ? এটা কাজ নয়?

—না, এটা ওর কাজ নয়। ভদ্রঘরের কচি মেয়ে এক মাইল পথ ভেঙে ঘটি হাতে নিয়ে একা যাবে গয়লাবাড়ী দুধ আনতে? না, ও যাবে না।

রান্নাঘরের দোরের বাজু চেপে ধরে ভঙ্গিটাকে বেশ শক্ত করেই দাঁড়িয়ে আছে উমা। মায়ের মুখের চেহারা আর গলার স্বর শুনে উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সুশী। যুগলও ভড়কে গেছে, দাঁতে দাঁত চেপে সে থমকে দাঁড়িয়েছে।

উমার দাঁড়াবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে, মুখের কাঠিন্যে, বহ্নিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠের ঝাঁজে যুগল ভয় পেয়েছে। ভয় পাবারই কথা, এ মূর্তি তার চোখে অভিনব। উমা চিরদিন দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে, কখনও প্রতিবাদ করে নি, কখনও মুখ ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়ায় নি। তাই যুগলের সন্দেহ হ'ল হয়ত মাথাখারাপের লক্ষণ। নইলে এ সাহস, এ স্পর্ধা রাতারাতি হ'ল কেমন করে?

উমা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডাকলে, সুশী, ঘরে এসে চা ছেঁকে দাও।

বাজার থেকে যুগল ফিরে এলে, রান্নাঘর থেকেই উমা বললে, দোকান যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

যুগলের মুখখানা বেলুনের মত ফেঁপে ফুলে উঠল। সে মুহূর্তকাল থমকে দাঁড়াল।

এ বলে কি? 'তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, দেখা করে যেও।'

যে এতকাল শুধু তার কথাই শুনে এসেছে, মাথা নীচু করে নিঃশব্দে, আজ সে মাথা তুলে হুকুম করছে। মাথাখারাপ ছাড়া আর কি? নইলে—হুঁ!

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে একটা অস্ফুট শব্দ করে যুগল ওপরে উঠে গেল।

উমা ওপরে উঠে যাচ্ছিল। সুশী তাকে বাধা দিয়ে বললে, কেন যাচ্ছ মা? মারধোর করবে আবার।

—ইস্! এমনি আর কি? তুই যা! তরকারি কুটগে।

উমা সামনে এসে দাঁড়াল। তার পানে চেয়ে যুগলের মনে হ'ল উমার চেহারার ঢেউ যেন বদলে গেছে। এ যেন সে উমা নয়, তার উপর যেন কেউ ভর করেছে।

উমা সোজা তার চোখে চোখ রেখে বললে—শোন। তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

যুগল কি বলতে যাচ্ছিল। উমা তার মুখের সামনে আঙুল নেড়ে ধমকের সুরে বলে উঠল, গাঁ গাঁ করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ো না। আমি যা বলি, আগে স্থির হয়ে শোন।

যুগল ভাল করে তাকে দেখে নিল। উমা বটে ত, না আর কেউ? সে যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না।

উমা আঁট হয়ে বসে গম্ভীর ভাবে বললে, দিন বদলেছে। এখন তোমার চাল বদলাতে হবে। তোমার চোখরাঙানি, হুমকি আর হাততোলার ওপর চিরদিন চলতে পারে না।

—কি করতে হবে?

—আমার ছেলেমেয়েদের ভদ্রঘরের ছেলেমেয়ের মত খাইয়ে, পরিয়ে, লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলতে হবে, এই হ'ল এক নম্বর। দু'নম্বর হচ্ছে, বাড়ীতে ঝি-চাকর চাই। আমার মেয়েদের আমি ঝিয়ের মত সংসারের কাজ করতে দোব না বা আমিও আর করব না। তিন নম্বর, আমার কিছু টাকা চাই। ছেলেমেয়েদের ভাল কাপড় জামা কেনবার জন্যে আর কলকাতা যাওয়া-আসার খরচের জন্যে।

যুগলের চোখ দুটো কোটর ফেটে বেরিয়ে এল। সে গর্জে উঠল, কেন, আমি রেস্কোর্সের বাজি জিতেছি নাকি? টাকা, টাকা খোলামকুচি, না?

উমা ধমক দিল, চেঁচাচ্ছ কেন? ভদ্রলোকের মত অন্ততঃ একটা দিন কথা বল না। না দাও, বল, না, দোব না। আমি পারি, আমার ক্ষমতা থাকে, আদায় করে নোব।

—মুখ সামলে কথা বল। জুতিয়ে মুখ ভেঙে দোব। নবাবী করতে এসেছ? কি আমার রাজরাণী, ঝি চাই, চাকর চাই, টাকা চাই। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে। ঘাড় ধরে সব বের করে দোব। কিচ্ছু দোব না, একটি তামার পয়সাও নয়।

উমা বুক ফুলিয়ে চোখ রাঙিয়ে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

বললে, ছোটলোকের মত ইতরোমো করো না, মুখ ছোট করো না। অনেক সহ্য করেছি, আর করব না মনে রেখ।

ক্ষিপ্তের মত যুগল হঠাৎ ছাতাটা দিয়ে উমার কপালে সজোরে মেরে দিল। কপালটা কেটে মুখের ওপর রক্ত গড়িয়ে পড়ল। যুগল আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বাড়ীতে খেতে এসে যুগল অবাক হয়ে গেল। কেউ নেই। তাদের পুরনো ঝি পার্বতীর মা বললে, বউদি আমায় কাজে বাহাল করে গেছে। রান্নাঘরে তোমার ভাত ঢাকা আছে।

সত্যিই উমা ছেলেমেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে গেল। এও সম্ভব? কিন্তু হঠাৎ এত স্পর্ধা উমার হ'ল কেমন করে?... কেন হ'ল?

কোথায় যেন একটা আগুনের ধোঁয়া দেখতে পেলে যুগল।

তার বুকের নীচেটা ধড়াস্ করে উঠল। লোহার সিন্দুক খুলে গয়না নিয়ে গেছে, টাকাও নিয়ে গেছে। তা হলে ত ব্যবস্থা কায়েমী করেই গেছে।

উমা ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিদির বাড়ী এসেছে। দিদি ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। উমা সব কথাই তাকে স্পষ্ট বললে—যুগলের বদমেজাজ, দুর্ব্যবহার ও নির্যাতনের কথা, নিজের ও ছেলেমেয়েদের দুঃখের ধারাবাহিক কাহিনী। কোন কথাই সে গোপন করলে না।

উমার ভগ্নীপতি পরেশবাবু রসিক লোক। সব শুনে হাসতে হাসতে বললে, মাথা খারাপ করেই যখন এখানে এসেছিস, দিনকতক মাথা খারাপ করেই থাক্। এ খবর শুনলেই কর্তার মাথার ব্যামো সেরে যাবে। মাঝে মাঝে চোখের আড়াল হওয়াটা দরকার।

পরেশবাবুর চিঠি পেয়ে যুগল এল উমাকে দেখতে, কিন্তু দেখা হ'ল না উমার সঙ্গে। পরেশবাবু যুগলকে বললে, তোমার ওপর ওর জাতক্রোধ। থাকতে থাকতে চিৎকার করছে, আমি ওকে খুন করব। আমার ছেলেমেয়েদের খেতে দেয় না, তাদের মেরে আধমরা করে দেয়। তোমাকে দেখলেই ও ক্ষেপে উঠবে। তাই কোবরেজ মশায়ের নিষেধ।

যুগলের মুখ গেল মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে। সে মুখ তুলে পরেশবাবুর দিকে চাইতে পারলে না।

গম্ভীর মুখ কালো করে পরেশবাবু বললে, কোবরেজ মশায় বিশেষজ্ঞ। তিনি স্পষ্টই বলছেন, দুশ্চিন্তায় দুর্ব্যবহারে মনমরা হয়ে রোগটা জন্মেছে। আতঙ্কের আঘাতে বেচারীর স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে।

যুগল নিঃশব্দে মাথা হেঁট করে বসে রইল।

দিদি বলে, শুধু কি তাই?—ছেলেমেয়েগুলোর অবস্থা দেখ দিকি? বাছারা আমার ভয়ে কাঁটা। বাপ এসেছে শুনে ভয়ে ঘরের কোণে গিয়ে মুখ লুকিয়েছে। তুমি ওদের বাপ না পেয়াদা? এদিকে গলায় কণ্ঠি পরেছ। হরিসভায় গিয়ে কেত্তন গাও শুনতে পাই।

যুগল যে কি বলবে ভেবে পেলে না। লজ্জায় সে মাথা তুলতে পারলে না।

দিদি বললেন, ও ভাল হলেও তোমার সঙ্গে আর ঘর করবে বলে ত মনে হয় না। বলে, 'আমরা আলাদা থাকব, আমাদের খোরাকির ব্যবস্থা করে দিক।'

যুগলের মুখখানা শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। সে অর্ধস্ফুট স্বরে বললে, মাথার গোলমাল ত।

—গোলমাল ত বাধিয়ে দিলে তুমি। এখন ঠেলা সামলাও।

স্ত্রীর গায়ে বা মেয়েদের গায়ে যারা হাত তোলে, তাদের মত কাপুরুষ সংসারে বিরল। যুগলও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ী ফিরে এল। উমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হ'ল না। দেখা করতে সাহস হ'ল না পরেশবাবুর কথা শুনে।

প্রতি সপ্তাহে যুগল আসে কলকাতায়, ফল মিষ্টি হাতে নিয়ে। ছেলেমেয়েদের কাছে ডেকে আদর করে, হাসে গল্প করে।

আড়ালে দাঁড়িয়ে উমা দেখে আর মনে মনে হাসে।

পরেশবাবু জিজ্ঞেস করেন, কি রে, ওষুধ ধরেছে?

চোখে ঝিলিক দিয়ে উমা হাসে।

পরেশবাবু বলেন, এ রোগের একমাত্র দাওয়াই হ'ল ফাষ্টিং, যাকে বলে অনশন। বুনো বাঘ নিয়ে ত খেল দেখানো চলে না। সার্কাসের বাঘকে না খাইয়ে শুকিয়ে নির্জীব করে তোলে, তবে না বশ করতে হয়।

উমার মুখখানা সঙ্কোচে রাঙা হয়ে ওঠে।

যুগলের মনের ভিতরটা ছটফট করতে থাকে উমাকে দেখবার জন্যে, কিন্তু কবিরাজের নিষেধ, পরেশবাবুর সতর্কতা। পরেশবাবু তার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নিয়ে তাকে সহিষ্ণু করে তুলতে চান। বিচ্ছেদের আগুনে পুড়িয়ে তাকে খাঁটি করে নেবার ইচ্ছা তাঁর।

উমা মনে মনে হাসে। আড়াল থেকে যুগলকে দেখে তার মনে হয় সে যেন হঠাৎ বুড়ো হয়ে গেছে। রগের চুলগুলো সাদা হয়েছে, মুখে চিন্তার রেখা পড়েছে, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। স্বামীর ম্লান মুখের পানে চেয়ে

তার মনে মায়া জাগে, নিজেকে নিষ্ঠুর মনে হয়। তার নিষ্ঠুরতার আঘাত কিন্তু যুগলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। পাষাণ কেটে জল বেরিয়েছে। সে ছেলেমেয়েকে কাছে পেলে হাসে, সে হাসিতে প্রাণধর্মের প্রকাশ। তার স্বভাবকাঠিন্য অনেকটা নম্র হয়ে এসেছে।

উমার মনে আশা জাগে—হয়ত মতিগতি বদলাতে পারে।

যুগলের জীবনে উমা ছিল অনেকটা আলো-বাতাসের মত। কাছে থাকলে বোঝা যায় না। দূরে সরে গেলে দম বন্ধ হয়ে আসে, প্রাণ আইঢাই করতে থাকে। উমার অভাবে যুগলের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে সেই রকম। খালি বাড়ীতে তার দম আটকে আসে। রাত্রির অন্ধকারে একা ঘরে সে হাঁপিয়ে ওঠে, বিভীষিকা দেখে। মনে হয় ঘরের ছাদটা আস্তে আস্তে নেমে আসছে, এখুনি তার বুকে চেপে তাকে পিষে ফেলবে। সে আতঙ্কে শিউরে ওঠে, ভয়ে চোখ বুজতে পারে না।

সে একমনে উমাকে ভাবে। যেসব কথা পূর্বে কোন দিন মনেও হয় নি সেই সব চিন্তা তার মনের মাঝে জটলা করে। উমা, উমা, উমা। উমা ছাড়া আর কোন কিছুই যে ভাবতে পারে না সে। তন্ময় হয়ে যায় উমার চিন্তায়, চোখ দুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। এরই নাম কি বিরহ? সে হরিসভায় কথকতা শুনেছে—শ্রীমতীর শত-বর্ষের বিরহের কথা। যুগলের মনে হয়, উমার বিচ্ছেদ দুঃসহ হলেও তার চিন্তা মধুর, এর মাঝে যেন একটা আনন্দ আছে, মাধুর্য আছে।

তার মনের চেহারা ছিল নিতান্ত স্থূল। এ সব সূক্ষ্ম অনু-ভূতি ছিল না তার কোনদিন। তার মনে হয় উমা দূরে গিয়ে তার সবচেয়ে কাছে এসেছে, এত কাছে তাকে পায় নি সে কোন দিন।

বাড়ী ফিরে সে চমকে ওঠে। মনে হয় তেলচিটে, হলুদের ছোপলাগানো শাড়ির আঁচল বিছিয়ে ভূমিশয্যায় ক্লান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে উমা, আর সে চেঁচিয়ে বাড়ী মাথায় করছে। তারই প্রতিক্রিয়া আজ তার বুকে ভারী হয়ে পাথরের মত চেপে বসেছে।

সে ছটফট করে বাড়ীময় ঘুরে বেড়ায় এ ঘরে থেকে ও ঘরে। তার মনে হয় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে তার মনের দোর খুলতে না পেরে হতাশ হয়ে অভিমানে উমা দূরে সরে গেছে। আসলে দেহকামনার উর্দ্ধে মিলন তাদের হয় নি। এবার উমা চোখের আড়ালে গিয়ে তার চোখ খুলে দিয়েছে।

লোকচক্ষে উমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির একটা সঙ্গত কৈফিয়ত খাড়া করবার জন্তই বোধ হয় যুগল বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগাল। পুরনো বাড়ী ভেঙে নতুন করে মেরামত করাল। ইটের ওপর থেকে নোনাধরা বালি খসিয়ে নতুন করে পলস্তারা ধরাল, নতুন করে রং করাল, নতুন করে ইলেক্‌-ট্রিকের লাইন বদলাল। ঘসিয়ে-মাজিয়ে বাড়ীখানার ভোল বদলে দিল।

আবার নতুন করে সে সংসার পাতবে। পুরনো উমাকে নতুন করে সেই সংসারে প্রতিষ্ঠা করবে, নতুন করে সে জীবনকে গড়ে তুলবে।

আর কিছু সে ভাবতে পারে না—সংসার ছাড়া, উমা ছাড়া, নিজের ছেলেমেয়েদের ছাড়া আর কোন কথা তার চিন্তায় আসে না। তাদের মুখে হাসি ফোটানোই হবে এখন তার জীবন-সাধনা।

কলকাতায় সোনাপটিতে গিনি কিনতে আসে যুগল। অবিনাশ আঢ্যির সঙ্গে তার ছেলেবেলার আলাপ। অবিনাশের দোকানেই সে কেনাবেচা করে। সময়ে সময়ে বৌ-বাজারে অবিনাশের বাড়ীতে এসেও ওঠে।

রবিবার—দোকান বন্ধ। শেয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা সে অবিনাশের বাড়ীতে গিয়ে উঠল, সঙ্গে ছিল কিছু পুরনো সোনারূপো। সেগুলোর ব্যবস্থা করে তার পর সে ছেলেমেয়েদের দেখতে যাবে। আর যদি উমার সঙ্গে দেখা হয়, সেই আশা।

ছলনাময়ী আশা যে অপার করুণাময়ীর রূপ ধরে নিকটেই দাঁড়িয়ে আছে সে বুঝবে কেমন করে?

অবিনাশের বাড়ী ঢুকেই যুগল রীতিমত চমকে উঠল। মাটিতে পা দুটো যেন পুঁতে গেল।

ওপরে উঠবার সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে উমা অবিনাশের বউয়ের হাত ধরে।

যুগল নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। উমাই বটে ত! না, আর কেউ?

তার চেনা উমার সঙ্গে যেন এর মিল নেই। রং অনেক ফরসা হয়েছে, শরীরে মাংস হয়েছে। দেহের ঢেউ বদলেছে, হাসির ছাঁদের পরিবর্ত্তন হয়েছে। একখানা ছাপা শাড়িতে তাকে অপরূপ মানিয়েছে।

উমাও অবাক হয়ে গেছে তাকে দেখে। মাথায় শাড়ির আঁচলটা তুলে দিয়ে সে মুখ নীচু করল। অবিনাশের বউ উমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, চেউয়ের পিঠে কেনা।

উমা ভাবলে, হয়ত ও-বাড়ী থেকে খবর পেয়ে যুগল এখানে এসেছে।

অবিনাশের বউ যুগলকে বললে, কি গো, অমন করে দাঁড়ালে যে? একে কখনও দেখ নি নাকি?

যুগল প্রকৃতিস্থ হয়ে হাসতে হাসতে বললে, আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে যে তোমরা এখানে এনে বন্দী করে রেখেছ, জানব কেমন করে?

উমার ভয় হ'ল পাছে ভেতরের কথা যুগল ফাঁস করে দেয় এদের কাছে। সে চোখ তুলে সোজা যুগলের পানে তাকাল। যুগল ভয় পেলে তার দৃষ্টির কাঠিন্যে।

যুগল দিশাহারা হয়ে গেছে। পালছেঁড়া নৌকো যেন তরঙ্গের সঙ্গে কানামাছি খেলছে।

তার ধৈর্য আর সবুর মানছে না। এখনই উমার সঙ্গে একটা আপোষ করতে না পারলে যেন সে স্থির হতে পারছে না। উমাকে চোখের আড়াল করতে তার ভরসা হচ্ছে না, পাছে সে তার সঙ্গে দেখা না করেই দিদির বাড়ী চলে যায়। উমার মন ফেরাবার জন্য সে যে-কোন মূল্য দিতে আজ প্রস্তুত। এ যোগাযোগ তার প্রত্যাশার অতীত।

অবিনাশ বললে, তোর বউ এখানে রয়েছে বলিস নি ত? সেদিন হঠাৎ সিনেমায় দেখা হ'ল তাই জানতে পারলাম। বউ আজ ওকে নিয়ে এসেছে।

যুগল ঢোঁক গিলে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, হঁ্যা, এই কদিন হ'ল ওর দিদির ওখানে এসেছে। ছেলেদের সঙ্গে আনে নি বুঝি?

—না, একাই এসেছে।

—ছেলেটা ভাল আছে ত? শরীরটা ভাল ছিল না কিনা?

অবিনাশ বললে, জিজ্ঞেস কর্ না ভেতরে গিয়ে।

অবিনাশের বউ কাঁসিতে জলখাবার সাজাচ্ছিল। ছেলের ছুঁতো করে যুগল ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। বললে, ওখানে ছেলেটা আবার কান্নাকাটি করবে না ত?

অবিনাশের বউ কটাক্ষ হেনে জবাব দিল, ছেলের বাপ গিয়ে ছেলেমেয়েদের চার্জ নিক্ না। ও আমার সঙ্গে সিনেমা যাচ্ছে।

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গম্ভীর অধস্ফুট স্বরে বললে, তুমি দিদির ওখানে যাও। ছেলেমেয়েদের খানিকটা ঘুরিয়ে নিয়ে এস। আমি ফিরলে তার পর তুমি বাড়ী যেয়ো।

উমার বলার ভঙ্গীটা প্রায় আদেশের কাছাকাছি। যুগল প্রথমটা চমকে গেল, কিন্তু রাগ হ'ল না। সে অপরাধীর মত ভঙ্গীতে বললে, তোমার শরীর যে এত খারাপ হয়েছিল, আমি জানতাম না।

উমা মনে মনে হাসল। মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললে, আমার শরীর তোমার ত জানবার কথা নয়।

যুগল হঠাৎ মেঝেয় বসে পড়ল তার পায়ের কাছে। বললে, আমি দোষ করেছি, তোমার কাছে মাপ চাইছি।

উমা পিছিয়ে সরে গেল, ঘরের আলগা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। বললে, তুমি বড়, তুমি সংসারের হর্তাকর্তা। তোমার আবার দোষ কি?

উমা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যুগল কাকুতি করে বললে, যেও না, আমায় দয়া কর। বল কবে বাড়ী যাবে? আমি আর একা থাকতে পারছি না।

মুখ টিপে হাসল উমা। বললে, কেন, তুমি ত একা থাকতেই ভালবাস।

—মোটেই না। ভুল তুমিই করেছিলে। নিজেকে এত সস্তা করে আমার চোখের সামনে ধরেছিলে যে, তোমার দাম বুঝতে দাও নি, আমিও বুঝবার চেষ্টা করি নি।

উমা হেসে ফেললে।

যুগল বললে, অনেক আগেই তোমার কঠিন হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল আমাকে ধাক্কা দিয়ে, আমার চোখে আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে দেওয়া।

মধুর হাসি হেসে উমা কি বলতে গেল। যুগল হঠাৎ তার হাত দু'খানি ধরে বললে, যথেষ্ট হয়েছে, সন্ধি কর যে-কোন সর্তে। তোমার সর্তই আমি মেনে চলব।

প্রশ্নভরা চোখ তুলে উমা তার পানে তাকাল।

যুগল বললে, চাল বদলে দিয়েছ। এত দিন তুমি যেমন নিঃশব্দে আমার কথা মেনে এসেছ, আমি এখন থেকে ঠিক তেমনি ভাবেই তোমার সব কথা মানব।

উমা মনে মনে লজ্জা পেল।

বৈষ্ণব পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস

শ্রীবেলা দাশগুপ্তা

বাংলার সাহিত্য-রসিকসমাজে চণ্ডীদাসের নাম সুপরিচিত। বহুকাল ধরিয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী বাংলার জনসাধারণের সাহিত্যরস-পিপাসার পরিতৃপ্তিসাধন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবির জীবনী জটিল সমস্যাজালে জড়িত। চণ্ডীদাস-জীবনীর উপকরণের অপ্রতুলতা এই সমস্যাসৃষ্টির কারণ নহে, বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাহিত্যের উপকরণগুলিই এই সমস্যাসৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই সমস্যার গ্রন্থি মোচন করিয়াই পদকর্তা চণ্ডীদাসের পরিচয়লাভ করিতে হইবে।

বিখ্যাত পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাস কে?

বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে একজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। সনাতন গোস্বামী বৃহৎ-বৈষ্ণব তোষণী টীকায় চণ্ডীদাসের কাব্যান্তর্গত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য 'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও রায়ের 'নাটকগীতি'র রসাস্বাদন করিতেন; শ্রীচৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা জয়ানন্দ মিশ্র জানাইয়াছেন, "জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন তারা করিল প্রকাশ।"

বৈষ্ণব-সহজিয়া-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদি এবং চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত রাগাত্মিক পদ হইতে চণ্ডীদাস-জীবনীর নূতন উপকরণ সংগৃহীত হয়। মুকুন্দদাসের সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়, আকিঞ্চনদাসের বিবর্ত্তবিলাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার রাগাত্মিক পদ হইতে জানা যায়—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পদকর্তা চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন। চণ্ডীদাস ছিলেন পরকীয়া প্রেমের সাধক, বাশুলীর আদেশে তিনি এই সাধন-সংক্রান্ত পদ রচনা করেন, রজকিনী বা ধোবানীর আশ্রয়ে অর্থাৎ রজককন্যিয়ারী তারা বা রামীর আশ্রয়ে তিনি সহজসাধন করিতেন।

বিভিন্ন বৈষ্ণব পদকর্তা তাঁহাদের পূর্ববর্তী কবি চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়াছেন। এই সকল পদ হইতে জানা যায়—তিনি ছিলেন অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তিসম্পন্ন। মহাপ্রভু তাঁহার পদাবলীর রসাস্বাদন করিতেন, বাশুলী আদেশে তিনি 'যুগল রসের' গীত রচনা করেন। কেহ কেহ চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীরও উল্লেখ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যের এই সকল প্রমাণানুসারে এই জ্ঞানলাভ হয় যে, চণ্ডীদাস একজন প্রাচীন কবি, এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, কারণ মহাপ্রভু তাঁহার পদের রসাস্বাদন করিতেন; তিনি সহজিয়া সাধক হইলেও সকলের নমস্য, কারণ তাঁহার পদাবলী কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া সকলকে আকুল করিয়াছে।

বৈষ্ণব-পদাবলী-রসিক জন বহুদিন হইতেই চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর সুমধুর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের মনে ১৩০৫ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পুথি হইতে চণ্ডীদাসের পদগুলি সঙ্কলনের কাজে কেহ কেহ অগ্রসর হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের এই পদগুলি সাহিত্য-রসিকদের মনে অভূতপূর্ব্ব সাড়া জাগাইয়াছিল। কিন্তু ১৩০৫ সালে নীলরতন মুখোপাধ্যায় বীরভূমের নান্নুর গ্রামনিবাসী এক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে চণ্ডীদাস ভনিতার রাসলীলার ৭১টি পদ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পদাবলী-অভিজ্ঞেরা এই পদগুলির প্রশংসা করিতে পারিলেন না, বরং এই সময়ে তাঁহাদের মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইল। সতীশচন্দ্র রায় ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (২য় সংখ্যা) চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত সকল পদই যে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের নহে, এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পরে বাংলা ১৩২১ সালে ব্যোমকেশ মুস্তফী চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাবিষয়ক ৬২টি সম্পূর্ণ ও একটি খণ্ডিত পদ পরিষৎ-পত্রিকায় (২১শ ভাগ) প্রকাশ করেন। চণ্ডীদাস পদাবলীর সুরের সহিত সুপরিচিত পণ্ডিতদের নিকট পদগুলি নিতান্তই অপরিচিত বোধ হইল। এই পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখিয়াছেন—"আমি যেভাবে দেখিয়াছি তাহাতে এখানিকে সে চণ্ডীদাসের রচনা বলিতে একটুকুও সাহস হয় না।"

শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলার পদগুলিই পণ্ডিতদের সংশয়ান্বিত করিয়াছিল। ইহার পরে ১৩২৩ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের সম্পাদনায় বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য প্রকাশিত হইলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পণ্ডিতগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, ভাব ভাষা ও বিষয়বস্তু কোন দিকেই এই কাব্য পূর্ব্ব-প্রচলিত পদাবলীর সমগোত্রীয় নহে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাঁহার মনের সংশয় প্রকাশ করিয়া লিখিলেন—"তবে কি আমাদের চিরপরিচিত চণ্ডীদাস আর এই নবাবিষ্কৃত চণ্ডীদাস এক চণ্ডীদাস নহেন?" এইভাবেই চণ্ডীদাস ও তাঁহার পদাবলী যে সমস্যার সৃষ্টি করিল, তাহা আরও জটিল আকার ধারণ করিল দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইবার পরে।

মণীন্দ্রমোহন বসু দুইখানি অপ্রকাশিত পুথি হইতে ১১০টি নূতন পদ সংগ্রহ করিয়া ১৩৩৩-৩৪ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীসংগ্রহের দুইটি খণ্ড ১৩৪১ ও ১৩৪৪ সালে প্রকাশ করেন। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে ও এই পদাবলীর ভূমিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, চণ্ডীদাস একজন নহেন, দুইজন; একজন খাঁটি বড়ু চণ্ডীদাস ও অন্যজন খাঁটি দীন চণ্ডীদাস; এই দুই চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কোনমতেই স্বীকার্য্য নহে।

কিন্তু সতীশচন্দ্র রায় চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে দীন চণ্ডীদাসের ন্যায় একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনারূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি পদকল্পতরুর ভূমিকায় লিখিলেন : "এই দীন চণ্ডীদাসের ভাল ও মন্দ বহু পদাবলীর বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইঁহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।" শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলির সহিত চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলির পার্থক্য স্বীকার করিলেন, (বীরভূম বিবরণ, ৩য় খণ্ড)। এই-ভাবেই চণ্ডীদাস সমস্যাটি ক্রমশঃই জটিলতর হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৩৩৩ সালের প্রবাসীতে 'ছাতনায় চণ্ডীদাস' শীর্ষক প্রবন্ধে বাসলী সেবক এক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব জানাইয়া আর একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিলেন, কারণ এতদিন বীরভূমের নান্নুরকেই চণ্ডীদাসের লীলাস্থল জানিয়া সকলে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এই ক্রমবর্দ্ধমান চণ্ডীদাস-সমস্যাটি বৈষ্ণবপদাবলী-বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। যাঁহারা এই সমস্যার সমাধান-কল্পে প্রবন্ধাদি রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহাদের মধ্যে নলিনীকান্ত ভট্টশালী, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার সেন, সতীশচন্দ্র রায়, মহম্মদ শহীদুল্লাহের নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, চণ্ডীদাস একজন, তিনিই বিভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন কাব্য ও পদাবলী রচনা করেন। (ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ সাল, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা।)

অধ্যাপক সুকুমার সেন চণ্ডীদাসের রচনাবলীকে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন—এই দুই চণ্ডীদাসের রচনাভেদে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, বড়ু চণ্ডীদাস প্রাচীন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য ও উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতা এবং দীন ও দ্বিজ ইত্যাদি ভণিতার চণ্ডীদাস অর্ব্বাচীন, তিনিই অবশিষ্ট পদাবলীর রচয়িতা। চণ্ডীদাসের নিবাসস্থল সম্বন্ধে তাঁহার মত এই যে, চণ্ডীদাস যে ছাতনার অধিবাসী তাহা প্রমাণের চেষ্টা আধুনিক। (বিচিত্র সাহিত্য, চণ্ডীদাস সমস্যা।)

সতীশচন্দ্র রায় দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত মন্তব্য করিয়াছেন—"আমরা দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজী আছি, কিন্তু দীন চণ্ডীদাসকে কিছুতেই দ্বিজ বলিয়া মানিতে পারি না।" (পদকল্পতরুর ভূমিকা।) চণ্ডীদাসের নিবাস সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কোন মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায় না। 'চণ্ডীদাসের রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক সমগ্র পদের রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও ছাতনার অধিবাসী, সেই জন্যই তাঁহার পদে বাশুলীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়: (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, ৩য় সংখ্যা।) মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস ভিন্ন আরও দুই জন চণ্ডীদাস পদ রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দ্বিজ ও দীন চণ্ডীদাস। (পরিষৎ-পত্রিকা, ৬০বর্ষ, ২য় সংখ্যা।)

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, চণ্ডীদাস-সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া সমালোচকগণ একমত হইতে পারেন নাই।

চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কাব্য ও যে সকল পদাবলী এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে দুই যুগোপযোগী ভাবধারার বৈশিষ্ট্য সকল সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের ভাব, ভাষা ও রসের ধারা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বা পরবর্ত্তী যুগের শ্রীকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য-নাটকাদি এবং রসশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের অনুরূপ নহে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত পদাবলীসমূহ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বৈষ্ণবাচার্য্যদের শ্রীকৃষ্ণ-লীলা ও রস-সিদ্ধান্ত গ্রন্থাদির অনুসরণেই রচিত। চণ্ডীদাস-পদাবলী অনুসারে কন্দর্পনিন্দিত কান্তি, কালিয়াবরণ শ্যামবন্ধুর রূপ দর্শনে শ্রীরাধিকা প্রথমাবধি আত্মহারা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধা প্রথম দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা নহেন, প্রথম পরিচয়ের পরেও বারংবার তাঁহার নিবেদিত প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পদাবলী অনুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলনের সহায়ক সখী বা সখাগণ, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই সখী বা সখার কোন প্রয়োজন স্বীকৃত হয় নাই। পদাবলীতে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকার প্রতিনায়িকা, এই কাব্যে তিনি শ্রীরাধার সহিত অভিন্ন। এই সকল বিরুদ্ধ ভাববস্তুর সমাবেশ ও ভাষা-বৈশিষ্ট্য এই কাব্যের প্রাচীনত্বের সূচনা করে। এই কাব্যের দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডই সম্ভবতঃ সনাতন গোস্বামীর উদ্দিষ্ট দান ও নৌকালীলা। সুতরাং চৈতন্যপূর্ব্বযুগে যে এক বাসলীসেবক বড়ু-চণ্ডীদাস ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য রচনা করেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। ভাষাবিশেষজ্ঞদের মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কাব্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীর রচনা, মুহম্মদ শহীদুল্লাহও এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ছাতনার সামন্তরাজবংশের অনুগৃহীত কৃষ্ণপ্রসাদ সেন "ছাতনার রাজবংশ পরিচয়ে" সামন্তরাজ হামীর উত্তরের রাজ্যকালে এক চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলাকাব্য রচনার উল্লেখ করেন। (যোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসচরিত।) এই প্রমাণানুসারে ১৩৫৩-১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকাব্য রচিত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই রচনাকাল পূর্ব্বোক্ত অনুমানের পরিপোষক। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে যে কবি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকাব্য রচনা করিয়াছেন, চৈতন্যোত্তর যুগে রচিত পদের তিনি রচয়িতা হইতে পারেন না, একথা স্বীকার্য্য।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকাব্য ভিন্ন দ্বিজ, দীন, আদি, কবি ইত্যাদি বিশেষণযুক্ত চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত বহু পদাবলী এযাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় দুই হাজার পদ সম্বলিত

চণ্ডীদাস ভনিতার কৃষ্ণলীলা বিষয়ক একখানি খণ্ডিত পদাবলীর পুথি আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি খণ্ডিতাংশগুলি অন্যান্য পুথি বা চণ্ডীদাস পদের অন্যান্য সঙ্কলন হইতে সংগ্রহ করিয়া পূরণ করিয়াছেন এবং দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী নামে প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুই হাজার পদের চিহ্নবিশিষ্ট পুথিতে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীই শুধু সংগৃহীত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ পুথি আবিষ্কৃত না হইলে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে এই পুথির প্রমাণানুসারে ধার্য্য হয় যে, চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা দুই হাজারের অধিক।

মণীন্দ্রমোহন বসু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি বিভিন্ন ভনিতার পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক পদ রচনাবৈশিষ্ট্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সমগোত্রীয় নহে বলিয়া তাঁহার মতে সন্দেহজনক। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ের কয়েকটি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, দীন চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের সম্পূর্ণ পালাটি আবিষ্কৃত হয় নাই, মণীন্দ্রমোহন বসু অন্যান্য সঙ্কলনগ্রন্থ হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া পালাটি পূরণ করিয়াছেন। শ্রীরাধার রূপবর্ণনামূলক চণ্ডীদাস ভনিতার 'তড়িৎবরণী হরিণীনয়নী', 'নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী', 'পথে জড়াড়ড়ি দেখিলু নাগরী', 'বেলি অসকালে দেখিলু যে ভালে', ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভনিতার পদ; 'সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম', সোনার নাতিনী এমন যে কৌনি', ইত্যাদি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ; 'এ ধনি এ ধনি বচন শুন', 'সে যে নাগর গুণের ধাম', ইত্যাদি বড়ু চণ্ডীদাসের পদ এবং আরও অনেক প্রচলিত পদকে তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা দীন চণ্ডীদাসের রচনাবৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন নহে বলিয়া জাল ও সন্দেহজনক—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পূর্ব্বোক্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধটিতে বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিভিন্ন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার, 'সে যে বৃষভানু সুতা', 'শুনলো রাজার ঝি', 'বন্ধুর লাগিয়া সেজ বিছাইনু', প্রভৃতি পর্য্যায়ের পদকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির রচনা প্রমাণিত না হওয়ায় মণীন্দ্রমোহন বসুর ন্যায় এগুলিকে জাল সাব্যস্ত করিয়াছেন। এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে দীন এবং বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার ভাব ও বিষয়বস্তুর সহিত না মিলিলেই দ্বিজ বা বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলিকে জাল কিংবা সন্দেহজনক ধার্য্য করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রন্থের প্রমাণানুসারে পদগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কি না তাহার বিচার প্রয়োজন।

বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণলীলা স্মরণ ও কীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে বহু পদাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদকর্ত্তার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া পালার আকারে গ্রথিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রহকর্ত্তারা তৎকালপ্রচলিত বিখ্যাত পদকর্ত্তাদের পদ হইতেই রস-পরিপোষক অধিকসংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র এবং নরহরি (ঘনশ্যাম) চক্রবর্ত্তীর গীত-চন্দ্রোদয় এইরূপ দুইখানি সংগ্রহগ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সঙ্কলিত এই দুই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে দ্বিজ চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর চণ্ডীদাস ভনিতার মোট নয়টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন—বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদ চারিটি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুইটি এবং অবশিষ্ট পদ চণ্ডীদাস ভনিতার। গীত-চন্দ্রোদয়ের প্রথম ভাগে পূর্ব্বরাগ পর্য্যায়ের এক হাজারের অধিক পদের মধ্যে (অন্যান্য পর্য্যায়ের পদ আবিষ্কৃত হয় নাই) চণ্ডীদাস ভনিতার পদ মোট চব্বিশটি। ইহার মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুইটি, বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতার পদ দুটি ও অবশিষ্ট পদগুলি শুধু চণ্ডীদাস ভনিতার। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দীন চণ্ডীদাস পদাবলীর পূর্ব্বরাগ পালায় যে কয়টি পদ মণীন্দ্রমোহন বসু সন্দেহজনক সাব্যস্ত করিয়াছেন, সেই পদগুলি গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বরাগ পালার অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কর্ত্তৃক বিবেচিত সন্দেহজনক বড়ু চণ্ডীদাসের পদ—পদামৃতসমুদ্র ও গীতচন্দ্রোদয় উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সঙ্কলিত, বিশ্বভারতী পুথিশালার পদমেরু গ্রন্থ ও বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে দ্বিজ, বড়ু ও চণ্ডীদাস ভনিতার পূর্ব্বোক্ত পদগুলি এবং অতিরিক্ত আরও অনেক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। গীতচন্দ্রোদয়ের পূর্ব্বরাগ পালার চব্বিশটি পদের মধ্যে পদমেরুতে আটটি ও পদকল্পতরুতে ২৪টি পদই উদ্ধৃত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত সমালোচকদ্বয়ের জাল বা সন্দেহজনক বিবেচিত পদগুলিও ইহাতে বাদ যায় নাই।

দীন চণ্ডীদাসের আক্ষেপানুরাগের সম্পূর্ণ পালাটিও আবিষ্কৃত হয় নাই। সম্পাদক মহাশয় নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাস পদাবলী হইতে পদ আহরণ করিয়া পালাটি সজ্জিত করিয়াছেন। দীন চণ্ডীদাসের ভনিতায় এই পর্য্যায়ের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই অংশের পদগুলির সহিত পদকল্পতরুর আক্ষেপানুরাগের যে পদপালা পূরণার্থে ইহাতে গৃহীত হইয়াছে তাহার তুলনা করিয়া দেখিলেই দুই কবির পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়িবে। এই পর্য্যায়ে পদকল্পতরুর, 'সকলি আমার দোষ হে বন্ধু সকলি আমার দোষ,' 'কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান,' 'তোমারে বুঝাই বন্ধু তোমারে বুঝাই,' 'সজনি লো সই,' 'কালো গরলের জ্বালা,' 'যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায় রে', ইত্যাদি দ্বিজ চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস ভনিতার পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের পদের তুলনায় ভাব ও কবিত্বের বিচারে অনেক উৎকৃষ্ট। পদামৃতসমুদ্রে আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে মাত্র একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, গীত-চন্দ্রোদয়ের সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এই পর্য্যায়ের পদগুলির অকৃত্রিমতা বিচারে পূর্ব্বোক্ত পদমেরুর প্রমাণই গ্রহণযোগ্য। পদমেরু গ্রন্থে এই পর্য্যায়ে পঁচিশটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং পদকল্পতরুর ঐ উৎকৃষ্ট পদগুলি এই গ্রন্থেরও অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ। সুতরাং আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ের এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের পদ প্রমাণিত না হইলেও এগুলির অকৃত্রিমতার সন্দেহ করা যায় না।

পূর্ব্বোক্ত সমালোচকদ্বয়ের সংশয়িত পদগুলি যে ভিত্তিহীন নহে এবং দীন ও প্রাচীন বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন না হইলেই যে কোন পদ কৃত্রিম সাব্যস্ত হয় না, পূর্ব্ব-আলোচনা হইতে তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। এক্ষেত্রে প্রাচীন সংগ্রহগ্রন্থের প্রমাণানুসারে অকৃত্রিম নির্দ্ধার্য্য পদগুলিকে অন্য কবির রচনারূপে গ্রহণ করিলেই এই সমস্যার মীমাংসা হয়।

উপরের আলোচনায় বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতায় পদ ও পূর্ব্বরাগ এবং আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ের উৎকৃষ্ট পদগুলি যে অকৃত্রিম তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এই পদগুলি বিচার করিয়া অন্ততঃ দুইজন চণ্ডীদাসের রচনা-বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বড়ু চণ্ডীদাস ভনিতায় পদগুলি বেশীর ভাগ একাবলী পয়ার ছন্দে রচিত এবং কবিত্বের বিচারে পূর্ব্ব-আলোচিত দ্বিজ ও চণ্ডীদাস ভনিতায় অনেক পদের তুলনায় নিকৃষ্ট। ভাব, ভাষা ও রচনারীতির বিচারে দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং চণ্ডীদাস ভনিতায় পদগুলিকে পৃথক সাব্যস্ত করা যায় না, সুতরাং এই পদগুলি একজনের রচিত এবং তিনি বড়ু চণ্ডীদাস হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্বোক্ত উৎকৃষ্ট পদগুলির কয়েকটিতে 'বাশুলী আদেশে'র উল্লেখ আছে। পদগুলির এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে এই কবি সম্বন্ধে বলা যায় যে, বাশুলীভক্ত কোন চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন পদে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতা ব্যবহার করিয়াছেন। অন্য চণ্ডীদাসের সহিত পার্থক্যনির্দ্দেশের জন্য এই পদকর্ত্তাকে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতায় পদামৃতসমুদ্রে একটি, গীত চন্দ্রোদয়ে দুইটি, পদমেরুতে সাতটি এবং পদকল্পতরুতে কুড়িটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই পদকর্ত্তা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতা অপেক্ষা চণ্ডীদাস ভনিতায় অধিক পদ রচনা করিয়াছেন অনুমান করা যায়। দীন এবং বড় চণ্ডীদাসও চণ্ডীদাস ভনিতায় পদ রচনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর যে একটি বিশেষ সুরের সঙ্গে সাহিত্যরসিক বাঙ্গালী সুপরিচিত, সেই সুরেরই মাধুর্য্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদগুলিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন চণ্ডীদাসের যে একটিমাত্র সুরের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন সে সুর এই দ্বিজ চণ্ডীদাসের এবং সতীশচন্দ্র রায় দীন চণ্ডীদাসের রচনার তুলনায় উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতা যে তৃতীয় চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলেন তিনিই এই দ্বিজ চণ্ডীদাস। বাঙালী এই দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই উৎকৃষ্ট পদাবলীর রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের মধ্যে সঙ্কলিত সুপণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীত চিন্তামণি ও দীনবন্ধু দাসের সঙ্কীর্ত্তনামৃতে চণ্ডীদাস ভনিতায় কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। এই দুইখানি সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাস ভনিতায় কোনও পদ উদ্ধৃত না হইবার দুইটি কারণ অনুমেয়। প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কাব্যের ভাবাদর্শ তাঁহাদের পদাবলীসংগ্রহে প্রমাণরূপে তাঁহারা গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, দ্বিতীয়তঃ, দ্বিজ চণ্ডীদাসের কোন পদ তাঁহাদের সময়ে প্রচলিত ছিল না। দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ রচিত হইবার অনতিবিলম্বে ইহাদের প্রচার হইয়াছিল এবং প্রচারিত হইবামাত্র লোকের মন জয় করিয়াছিল—বৈষ্ণবসমাজে ও কীর্ত্তন-গানের আসরে সমাদৃত হইয়াছিল, এ সকল অনুমান অসঙ্গত নহে। পদামৃতসমুদ্র ও পরবর্ত্তী প্রত্যেক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে চণ্ডীদাসের পদ একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থাদির প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকের মধ্যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। অতএব পদকর্ত্তা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের দেশ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস নিজেকে বাসলীর সেবকরূপে পরিচয় দিয়াছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস বাশুলীর আদেশে পদাবলী রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে তাঁহার নিবাসস্থলের বা বাসলীদেবীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রের পরিচয় নাই, দ্বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদে বাশুলীদেবীকে নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। 'কানুর পিরিতি চন্দনের রীতি'—এই পদোক্ত নান্নুরের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হইলে চণ্ডীদাসের 'দেশ' সমস্যার সমাধান হয়।

বিশেষজ্ঞদের কাহারও মতে বীরভূমের 'নান্নুর' গ্রামই চণ্ডীদাসের লীলাভূমি, কাহারও মতে তিনি ছাতনার নান্নুর গ্রামের অধিবাসী। ঐতিহাসিক প্রমাণানুসারে ছাতনার বাসলীদেবীর প্রাচীন ঐতিহ্য স্বীকার করিতে হয়। ছাতনার সামন্তরাজ হামীর উত্তরের রাজত্বকালে শিলামূর্ত্তিতে বাসলীর অধিষ্ঠান হয় (চণ্ডীদাস-চরিত—কৃষ্ণপ্রসাদ সেন)। ১৪৭৫ শকে এই রাজবংশের উত্তর রায় বা দ্বিতীয় হামীর উত্তর বাসলীর যে মন্দির নির্ম্মাণ করান, তাহার প্রাচীরবেষ্টনের ইটে ১৪৭৫ শক ও ছাতনা নাগরেশ উত্তর রায়ের নাম লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। (ছাতনা রাজবংশের পরিচয়ের ভূমিকা, যোগেশচন্দ্র রায়)। যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত ইটেরও পরিচয় দিয়াছেন। পদ্মলোচন শর্ম্মার বাসলীমাহাত্ম্য, উদয় সেন ও কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত, কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের ছাতনার রাজবংশের পরিচয়, সর্ব্বোপরি ইটের লেখা হইতে ছাতনার বাসলীদেবীর প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হয়। যোগেশচন্দ্র বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, বীরভূমের বাশুলী বা বিশালাক্ষীর কোনও প্রাচীন ঐতিহ্য নাই (প্রবাসী, ১৩৩৩)। সুতরাং যে বাসলী-সেবক চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই ছাতনার বাসলীর সম্পর্ক স্বীকার করা অযৌক্তিক নহে। ছাতনার বাসলীকে কৃষ্ণপ্রসাদ সেন ভবের ভবানী চণ্ডী-তারার সহিত অভিন্ন-তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রমাণানুসারে বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসকে চণ্ডীভক্ত শাক্ত সাব্যস্ত করা যায়।

সুতরাং তিনি যে ছাতনা বাসলীর সেবক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত ছাতনার বাসলীর সম্পর্ক প্রমাণিত হইলেও, দ্বিজ চণ্ডীদাসের পদোক্ত নান্নুরের বাশুলীর এবং ছাতনার বাসলীর অভিন্নত্ব প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বোক্ত পদের, 'নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা', এই উক্তিতে নান্নুরের বাশুলীদেবীর অবস্থান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ছাতনায় নান্নুরের মাঠ ও হাটের কথা অস্বীকার করা যায় না বটে (রামানুজ করের মাপচিত্র), কিন্তু নান্নুরের হাটে বাসলীর অবস্থিতির অনুকূল প্রমাণাপেক্ষা বিরুদ্ধ প্রমাণ প্রবল। ছাতনায় বাসলীর থান বা মন্দির কোনটি নান্নুরে অবস্থিত নহে। যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, নান্নুরের হাটের কাছে 'জলহরির' গায়ে হয়ত বাসলীর মন্দির ছিল। ইহা অনুমান মাত্র। কারণ, চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর বাসলীর অধিষ্ঠানক্ষেত্রের চিহ্ন ছাতনায় বিংশ শতাব্দীতেও অবলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের সময়ের অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর বাশুলীর কোন নিদর্শন ছাতনা নান্নুরে পাওয়া যায় না, ইহা সন্দেহজনক। অপরপক্ষে বীরভূমের নানোড় নামক গ্রামের অস্তিত্বও যেমন অস্বীকার করা যায় না (রেনেলের মানচিত্র দ্রষ্টব্য), খুব প্রাচীন না হইলেও বাশুলীদেবীর অস্তিত্বও তেমনি উড়াইয়া দেওয়া যায় না। গ্রাম থাকিলে মাঠ ও হাট থাকিতে পারে। সুতরাং এই পদোক্ত বাশুলীকে বীরভূম নানোড়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপেই গ্রহণ করা সমীচীন। লিপিকারের হাতে, ছন্দের অনুরোধে অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ নানোড় এই পদে নান্নুরে পরিণত হইয়া থাকিবে (বর্ত্তমানে 'নানোড়' নান্নুর নামেই পরিচিত)। এই অনুমান সত্য হইলে দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বীরভূমের কবি স্বীকার করিতে হইবে।

অন্য প্রমাণবলেও দ্বিজ চণ্ডীদাস বীরভূমের অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়। যোগেশচন্দ্র রায় পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বীরভূম নান্নুরের বাশুলী বিশালাক্ষী; ছাতনার বাসলী বিশালাক্ষী নহেন। নান্নুর ও ছাতনার দেবীমূর্ত্তির পার্থক্যও বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। বড়ু চণ্ডীদাস কাব্যে সর্ব্বত্র 'বাসলী' ব্যবহার করিয়াছেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস পদাবলীতে সর্ব্বত্রই 'বাশুলীর' উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই উক্ত দেবীদ্বয় ও তাঁহাদের অধিষ্ঠান-স্থলের পার্থক্য সূচিত হয়। এই বিচারেও দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বীরভূমের পদকর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়।

রামীর সহিত পরকীয়াসাধন প্রবাদের বিচার

কোনও প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনিতায় রামী-প্রীতির নিদর্শনসূচক অথবা রামী এবং চণ্ডীদাসের সম্পর্কজ্ঞাপক কোনও পদ প্রচলিত নাই। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামী ভনিতার পাঁচটি পদ (একটি প্রাচীন পুথি হইতে প্রাপ্ত) উদ্ধৃত করিয়াছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে রামীর পদোক্ত চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস, তিনিই সহজ সাধক (রামীর পদে সহজ-সাধনার কোন ইঙ্গিত নাই), এবং তাঁহার দণ্ডদাতা গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের পৌত্র শামসুদ্দীন আহমদ (১৪৩১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ)। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে এই যবনরাজ গণেশের পুত্র জালালুদ্দীন। রামীর পদগুলির প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া লইলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রণেতা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত এই রামীর সম্পর্ক স্বীকার করা যায় না। কারণ, রামী ভনিতার পদের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষার অনেক পার্থক্য। এই পদগুলির ভাষা যে প্রাচীন হইলেও চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা নহে তাহার একটি প্রমাণ পুথির দুইটি পদে 'আসক' শব্দটির ব্যবহার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক পদে এই শব্দটি এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে—'শুন প্রিয় রজকিনী আসকে হারালাও প্রাণী'; 'আসকে লভিত প্রাণ তখনি করিলে গান'; 'আসক আনন্দে পড়াইলে' ইত্যাদি। বিশেষজ্ঞদের মতে আরবী-ফারসী আসক (ইশক) শব্দটির—'পীরিতি' এই অর্থে বাংলায় ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত হয় নাই (সুকুমার সেন, বিচিত্র-সাহিত্য, চণ্ডীদাস-সমস্যা)। সুতরাং রামী-চণ্ডীদাসকে শামসুদ্দিন বা জালালুদ্দীনের সমসাময়িক—এরূপ বলায় বাধা আছে।

কিন্তু রামী-চণ্ডীদাসের কাহিনীটির উদ্ভব যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কৃষ্ণপ্রসাদ সেনের চণ্ডীদাস-চরিত গ্রন্থ উদয় সেনের চণ্ডীদাস-চরিতামৃতের কিছু অংশ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেই রামী-চণ্ডীদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উদয় সেনের 'চণ্ডীদাস-চরিতামৃতম্' ছাতনার সামন্তরাজ উত্তর-নারায়ণের রাজত্বকালে ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। সুতরাং সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উদ্ভূত এই কাহিনীর সহিত দ্বিজ চণ্ডীদাসের সম্পর্ক স্বীকার করা সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব-সহজিয়া সিদ্ধান্ত গ্রন্থগুলিতে এক চণ্ডীদাসের রজকঝিয়ারীর সহিত পরকীয়াসাধনের উল্লেখ আছে। আকিঞ্চনের বিবর্ত্তবিলাসে এই সাধনসঙ্গিনীর নাম রামিনী, বাশুলী-আদেশে এই চণ্ডীদাস সহজ-সাধনসংক্রান্ত পদ রচনা করেন; সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয়ের মতে চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীর নাম তারা। রাগাত্মিক পদের রচয়িতা কোন চণ্ডীদাস 'ধোবিনী আবেশে পিরিতি সাধন' করেন (১ম দফা চণ্ডীদাসের চতুর্দ্দশ পদাবলী), কোন চণ্ডীদাস রজকিনী-চরণ আশ্রয়ে আসক সাধন করেন (২য় দফা ঐ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ২য় সংখ্যা)। এই সহজ-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হইতে সহজ-সাধন সম্পর্কীয় জ্ঞানলাভ সম্ভব হইলেও চণ্ডীদাস এবং তাঁহার সাধনসঙ্গিনী সম্বন্ধে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যলাভ হয় না; রাগাত্মিক পদগুলি নিশ্চিতই বিভিন্ন সহজ-সাধক চণ্ডীদাসের রচনা, সুতরাং রাগাত্মিক পদের কোন প্রমাণ বৈষ্ণব-পদাবলীর রচয়িতা কোন চণ্ডীদাস-জীবনীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে।

পদকল্পতরু ধৃত নরহরি-ভনিতায় চণ্ডীদাস-বন্দনায় একটি পদে সাধকসঙ্গিনীর উল্লেখ নাই, কিন্তু নরহরি ভনিতায় অন্য দুইটি পদে (গৌরপদ-তরঙ্গিণী, পৃঃ ৩৭০) আকিঞ্চনদাসের গ্রন্থানুসারে বাশুলী-দেবীর উপদেশে চণ্ডীদাসের পদ-রচনায় ও তারা-ধুবনীর সহিত রস-সাধনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই পদ দুইটি কাহার রচিত

ঠিক বলা যায় না। প্রাচীন পদকর্ত্তাদের নাম-সাদৃশ্যের জন্যই কোন পদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না বলাই বাহুল্য। এই পদগুলিও নিশ্চিতই সহজিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকদের প্রচারমূলক পদ। দ্বিজ চণ্ডীদাসকে বন্দনা করিয়া দীন গোবিন্দদাস, প্রসাদদাস পদরচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের উল্লেখ হইতেই চণ্ডীদাস যে কিরূপ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইবে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের এই খ্যাতির জন্যই সহজিয়া সম্প্রদায় রামী-রজকিনীর নামটি তাঁহার নামের সহিত জড়াইয়া তাহাকেই পরকীয়া সাধকরূপে প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং কোন প্রমাণ অনুসারেই দ্বিজ চণ্ডীদাসের সাধনসঙ্গিনীর প্রবাদ ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না।

দ্বিজ চণ্ডীদাসের মৃত্যু

পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ ও কাহিনী প্রচলিত আছে। রামী-নামাঙ্কিত পূর্ব্বোক্ত পদগুলিতে বাদশার আদেশানুযায়ী বন্ধাবস্থায় কশাঘাতে চণ্ডীদাসকে হত্যার করুণ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, রামী-কাহিনীর সহিত দ্বিজ চণ্ডীদাস জড়িত নহেন।

প্রচলিত একটি প্রবাদানুসারে বৃন্দাবনধামে এক চণ্ডীদাসের সমাধির কথা জানা যায়। নরোত্তম-বিলাসে নরহরিদাস নরোত্তম-শিষ্য এক চণ্ডীদাসের এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—'জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্ব্বগুণে। পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে।' পদকল্পতরু ধৃত নরহরিদাসের চণ্ডীদাস বন্দনার পদটিতে (১৪ সংখ্যক) নরোত্তম-শিষ্য চণ্ডীদাসের এই বৈশিষ্ট্যের সহিত দ্বিজ ও বড়ু চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্যও এক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। পদটি বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া মনে হয়—সকল গুণে মণ্ডিত চণ্ডীদাসকে উপলক্ষ্য করিয়াই পদের শেষের দিকে, 'বৃন্দাবনে রতি যার তার সঙ্গ সতত সে সুখে ভোর'—এইরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। 'বৃন্দাবনে রতির' উল্লেখে বৃন্দাবনবাসের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। সুতরাং বৃন্দাবনে কোন চণ্ডীদাসের সমাধির যদি অস্তিত্ব থা[illegible] তাহা এই চণ্ডীদাসের সমাধি হওয়া অসম্ভব নহে। শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় দীন চণ্ডীদাসের একটি নরোত্তম-বন্দনার পদ আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই অনুসারে দীন চণ্ডীদাস নরোত্তম-শিষ্য সাব্যস্ত হইয়াছেন। অতএব দ্বিজ চণ্ডীদাস এই প্রবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন বলিয়া মনে হয়।

বীরভূম-নান্নুরের একটি প্রবাদ অনুসারে চণ্ডীদাসের প্রতি বেগমের প্রেমসঞ্চার ও নবাবের আদেশে চণ্ডীদাসের মৃত্যু, রামী-বর্ণিত কাহিনীর প্রভাবে পুষ্ট মনে হয়। নবাবের শাস্তি-বিধানের পদ্ধতিটিতে শুধু উভয় মতের পার্থক্য। রামীর বর্ণনানুসারে হস্তী-পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়, বীরভূমের প্রবাদ অনুসারে নবাবের আদেশে কামান দ্বারা নাট্যশালা ধ্বংস হয় ও কীর্ত্তনের দলসহ চণ্ডীদাস ধ্বংসস্তূপে সমাধিলাভ করেন। সুতরাং এই প্রবাদের যে অংশে রামী-কাহিনীর প্রভাব, তাহা বাদ দিয়া এই চণ্ডীদাসের স্বাভাবিক মৃত্যু স্বীকার্য্য। বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত অন্য মতানুসারে জীর্ণাহারে চণ্ডীদাসের মৃত্যু হয়, এই চণ্ডীদাসের সহিত রামীর নামও জড়িত। বীরভূম-নান্নুরের কবি দ্বিজ চণ্ডীদাসের নান্নুরেই স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়।

নীড়ে ও নীলাকাশে

শ্রীকালিদাস রায়

বহু দিন ধরি অসীম আকাশে দু'পাখায় ভর দিয়ে
আশ্রয়হারা জীবন-বিহগ উড়িয়া বেড়ালো প্রিয়ে।
উড়িতে উড়িতে ক্লান্ত হইল পাখা
পাইয়া সহসা তোমার প্রেমের পুষ্পিত তরুশাখা –
আশ্রয় পেয়ে পুরিল মনস্কাম
পেয়ে সে উপনিবেশ
দূরদুরান্তের যাত্রা হইল শেষ।
ছায়া দিল তার ঘন পল্লবদল
তৃষা দূরিবারে পাইল সে মধু ক্ষুধা মিটাইতে ফল।

কাঠকুটা দিয়ে বাঁধিল সেথায় বাসা
প্রাতে সন্ধ্যায় কণ্ঠে জাগিলি ছন্দের কলভাষা।
আকাশ তবু সে ভুলিতে পারে নি, উড়ে যায় প্রতি প্রাতে
ফিরে আসে তার কুলায় খুঁজিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাতে।
বাঁধন হইতে মুক্তির মাঝে ধাওয়া
মুক্তি হইতে বাঁধনে ফিরিয়া যাওয়া
এমনি করিয়া দিন কাটে তার নীড়ে আর নীলাকাশে
চরম মুক্তি যত দিন নাহি আসে।

শ্রীদীপক চৌধুরী

বসন্ত সরকারের বিবৃতি

বেলা ত কম হয় নি। বোধ হয় বারোটাই বাজল। মহীতোষের আসবার সময় হ'ল। তপা এখনও ফেরে নি। দোতলার বারান্দা থেকে আমি দেখেছি, মেয়েটা তপন লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে। এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর গাড়িটাও আমি দেখতে পেয়েছিলাম। বেশ বড় গাড়ি। চ্যাপ্টা মত, লম্বা ধাঁচের মাস্টার বিয়ুইক। ছাই রঙের ছাউনির তলায় লালরঙের 'বডি'। সুতপা ছোট সাহেবের পাশে গিয়েই বসল।

কলকাতার দিকে গাড়িটাকে ফিরে যেতেও দেখলাম। গড়িয়া খালের ওপর দিয়ে যেতে হয়। বারান্দা থেকে পোলটা স্পষ্ট দেখা যায়। যাওয়ার সময় সুতপা কিছু বলে যায় নি। কখন ফিরবে তাও আমরা কেউ জানি না। রান্নাঘরের দায়িত্ব সব শম্ভু ঠাকুরের ওপর পড়ল। লালুর মা ত সেখানে শেষ পর্যন্ত থাকবেনই।

সরকার-কুঠির বড় ফটক দিয়ে মহীতোষকে ঢুকতে দেখলাম। বারোটার মধ্যেই তার আসবার কথা ছিল। মহীতোষ যা বলে তাই করে। বারোটা মানে এগারোটা কিংবা সাড়ে বারোটা নয়। আমি নীচে নেমে গেলাম। বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় ওর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বললাম, "চল, সরকার-কুঠিটা ঘুরে ঘুরে দেখবে, খিদে পায় নি ত?"

"না, খানিকটা সময় ঘুরে বেড়ানো যাক।" বলল মহীতোষ। ....

ওকে নিয়ে আমি চলে এলাম সরকার-কুঠির পেছনে। এক সময়ে একটা ভাল রাস্তা ছিল এইখানে। গাড়ি-বারান্দার সামনে থেকে রাস্তাটা বাগানের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে এসেছে খালের কিনার পর্যন্ত। রাস্তাটা তৈরি করিয়েছিলেন আমার বাবা। দু'দিকে আম আর কাঁঠাল গাছের সারি। মাঝে মাঝে লিচু আর পেয়ারা গাছও আছে। গাছগুলোতে আজও ফল হয়। আগে এর চেয়ে অনেক বেশী হ'ত। যত্নের অভাবে এরা আজ আমার মতই বুড়ো হয়ে গেছে।

রাস্তাটাও নষ্ট হয়ে গেছে। লাল সুরকির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। দু'দিকের ঘাস লম্বা হয়ে হয়ে নুয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। ঘাসের চেয়ে বেশী জন্মেছে আগাছা। খিদে পেলেও গরু পর্যন্ত এতে মুখ লাগায় না। খালের ওপারে লক্ষ্মণ গোয়ালার খাটাল। আমি একদিন গিয়েছিলাম লক্ষ্মণের কাছে। অনুরোধ করেছিলাম, দু'দশটা গরু আর মোষ এখানে এনে ছেড়ে দেবার জন্যে। লক্ষ্মণ আমার অনুরোধ রাখে নি। সে বলেছিল, "বাবু, এক-একটা গরুর দাম হাজার টাকা। এরা বনজঙ্গল চিবোয় না।" লক্ষ্মণ মিথ্যে বলে নি। ওর গরুগুলো যা পায় তা খায় না। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় কি দেখেছিলাম?

খালের পারে এসে মহীতোষ বলল, "গড়িয়ার পোলটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

বললাম, "আরও একটু নীচে নেমে এস।" আমার সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষ নীচে নামল। গড়িয়া খালের পুরোটাই এখান থেকে দেখা যায়। মহীতোষের চোখে নীল চশমা লাগানো ছিল। চশমাটা সে খুলে নিয়ে বলতে লাগল, "এটা সত্যিই মরা খাল। মাঝে মাঝে অনেক জায়গায় এক ফোঁটাও জল নেই। দূর থেকে মনে হয়, দুটো অংশকে পৃথক করবার জন্য দাগ কাটা হয়েছে। হয় ত কোন এক সময়ে সত্যিই তাই ছিল। দুই জমিদারের দুই এলাকা। কিন্তু প্রথম যেদিন আমি সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করি সে-দিন আমার অন্য রকমের ধারণা হয়েছিল।"

"কি রকমের?"

"হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল যে, গড়িয়ার খালটা বুঝি দুটো সভ্যতার মাঝখানে একটা সীমারেখা।"

"তোমার ধারণা মিথ্যে নয় মহীতোষ। কলকাতার সভ্যতাকে বুক দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছিল গড়িয়ার খাল। এর বুকে অনেক জল ছিল। আজ দেখছ এখানে জলের কত অভাব। কিন্তু এর বুকের জল শুকোতে অনেক সময় লেগেছে। বিনাযুদ্ধে এ নত হয় নি। ভারতবর্ষের সভ্যতার মত খালটারও সারা বুকে রয়েছে সংগ্রামের দাগ। শেষ পর্যন্ত এ বোধ হয় মরবে না। তুমি কি বল মহীতোষ?"

"এর বুকে কল বসানো দরকার। পুরনো মাটি ফেলে দিতে হবে। এর বুকের গর্ত গভীর না হলে জল সব শুকিয়ে

যাবে।...ওই দেখুন, পোলের ওপর দিয়ে বাস যাচ্ছে। এটাই বোধ হয় আশী নম্বর বাস ?"

"তুমি ত এসপ্লানেড থেকে পাঁচ নম্বর ধরেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। আশী নম্বরটা কত দূর পর্যন্ত যায় ?"

"উত্তর ভাগ পর্যন্ত। একদিন চল, ওই অঞ্চলটা ঘুরে আসি।" এই বলে আমি ওপরে উঠে এলাম। খুব কড়া রোদ উঠেছে আজ।

সবচেয়ে বুড়ো আমগাছটার তলায় এসে বসলাম আমরা। এ শুধু বুড়ো নয় বড়ও। মাটির তলা থেকে একটা শিকড় ওপর দিকে বেরিয়ে পড়েছে। বেশ মোটা শিকড়। শক্তও খুব। আমরা দুজনেই বসে পড়লাম শিকড়ের ওপর। মহীতোষ একটু ইতস্ততঃ করছিল। জামাকাপড় ওর শুধু পরিচ্ছন্ন নয়, দামীও। তপার সঙ্গে ওর ভাব জমছে। তাই বোধ হয় মহীতোষ আজকাল দামী দামী জামাকাপড় পরে গড়িয়ায় আসে। গড়িয়ার বাসে এত ভিড় যে মোটা করে কলপ-দেওয়া কাপড়ের ইস্ত্রি পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়।

মহীতোষ আমার পাশেই বসল। পকেট থেকে রুমালটা বার করে শিকড়ের ওপর বিছিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু দিলাম না। হঠাৎ আমার মনে পড়ল, মহীতোষের কাপড়ে নস্যির দাগ লাগতে পারে। মহীতোষকে সুপুরুষই বলা যায়। বাঁ হাতের কব্জিতে সে ঘড়ি বেঁধেছে। ভেজিটেবল ঘি খেলে ওর কব্জির হাড় এত চওড়া হ'ত না। মহীতোষ ঘড়িতে সময় দেখল। সময় আমি জানতে চাই নি, তবুও সে ঘোষণা করল, "প্রায় সাড়ে বারোটা।"

আমি জানি মহীতোষের ক্ষিধে পায় নি। সে সুতপার কাছে যেতে চাইছে। কিন্তু সুতপা কৈ ? ওকে ত বলাও যায় না যে, ছোট সাহেবের সঙ্গে সুতপা বেড়াতে বেরিয়েছে। প্রসঙ্গটা চেপে যাওয়ার জন্যে আমি ওকে বললাম, "সরকার-কুঠির ইতিহাসটা তোমার শোনা উচিত।"

"বিয়াল্লিশের সেই ইতিহাস আমি কখনও ভুলব না।" বলল মহীতোষ।

"তুমি লালুর কথা ভাবছ ?" আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম, "লালুর কথা মনে রেখে কি করবে ?"

"একথা কেন বলছেন মেসোমশাই ? লালুকে ভুলে যাওয়া পাপ। সে যে ভারত-ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায় !"

"ভোট কুড়োবার আগে অনেকে এমন কথাই বলেন। কিন্তু এটা ত ভোটের সিজন নয়। মহীতোষ, জোড়া বলদের ভাষা দেয়ালের গায়ে লেখা রয়েছে আমি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু...থাক। আজ আর রাজনীতির আলোচনা নিয়ে সময় নষ্ট করতে চাই নে। বিয়াল্লিশের পরে এখানে রাজনীতির নোংরা জল ঢুকতে পারে নি। খালটা ত শুকনোই। তবুও সরকার-কুঠির সারা দেয়ালে নতুন ইতিহাসের পলস্তারা আমি দেখলাম। সুতপা রায় এখানে এল। সে এল ইতিহাসের একটা আলগা মলাটের মত নয়। সে এল একটা নতুন অধ্যায়ের উত্তপ্ত সূচনার মত। এসে দখল করল দোতলার বড় ঘরখানা। তখন অবিশ্যি গড়িয়ার জঙ্গল অনেক সাফ হয়ে গেছে। তার পাঁচ বছর আগে আমার চাকরি গেল। লালুকে ধরিয়ে দিলে আজ আমি সরকারী পেনসন পেতাম পৌনে দুশ' টাকা।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "মিসেস রায় কি জানেন যে, আমি এসেছি।"

"বারোটার মধ্যে তুমি আসবে তা সে জানে। চল ওঠা যাক। সরকার-কুঠির আধুনিক ইতিহাসটা তোমায় অন্য একদিন শোনাব।"

"ভাল লাগছে শুনতে। আপনি বলুন—অন্ততঃ যতক্ষণ না খাওয়ার জন্যে ডাক আসছে ততক্ষণ শুনি। মিসেস রায় এখানে কবে এলেন থাকতে ? মাসীমার হোটেল বোধ হয় তখনও খোলা হয় নি ?"

মহীতোষের মনস্তত্ত্ব বুঝতে আমার কষ্ট হ'ল না। সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ওর আগ্রহ নেই। শুধু সুতপার কথাই সে শুনতে চায়। কিন্তু শুনেই বা মহীতোষের লাভ কি ? সুতপা ত কুমারী নয়। ওর স্বামী আছেন। যতদূর জানি তিনি বেঁচেই আছেন। এইটুকুই শুধু আমরা জানি। তিনি কোথায় আছেন এবং কি কাজ করেন সে সম্বন্ধে সুতপা কিংবা আমরা সঠিক করে কিছু বলতে পারব না। হয়ত তিনি আবার বিয়ে করে কলকাতার কোন অঞ্চলে নতুন ঘরসংসার পেতেছেন। সুতপার স্বামীকে আমরা চিনি।

কিন্তু মহীতোষের তাঁকে চেনবার দরকার কি ? সুতপা বিবাহিতা বলে মহীতোষ তাকে ভালবাসতে পারবে না কেন ? প্রশ্নটা কঠিন, হয়ত জটিলও।

মহীতোষ একটু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এ চঞ্চলতা ওর সুতপার কাছে পৌঁছবার জন্যে। আমি বলতে লাগলাম, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বছরখানেক আগের কথা। চাকরি ত আমার বিয়াল্লিশ সনেই চলে গিয়েছিল। টাকা-পয়সার অভাব এত বেশী হয়ে পড়ল যে, তোমার মাসীমার চোখেও তা ধরা পড়ল। গত কয়েকটা বছরের মধ্যে এক দিনের জন্যেও তাঁর চোখের জল আমি শুকোতে দেখি নি। চোখের চারদিকে লোনা জল জমে জমে চামড়ার ওপরে গজিয়ে উঠল বড় বড় ক্ষত। গাঁদাফুলের গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলাম। তারই রস দিয়ে ক্ষতের ওপরে প্রলেপ

লাগিয়ে দিতাম আমিই। তাঁর দৃষ্টিশক্তি যে এরই মধ্যে অনেকটা কমে এসেছে তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু একদিন তাঁর কথা শুনে সত্যিই আমি চমকে গেলাম! তিনি বললেন, 'প্রত্যেক দিন সন্ধ্যেবেলা কোথায় যাও আমি জানি। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ভিক্ষে করতে বেরুচ্ছ, না? পৈতৃক বাড়িটা রেখে আর কি করবে, বেচে দাও। একদিন দেখবে নতুন পৃথিবীতে সংস্কারের কোন দাম থাকবে না। ভালমন্দ, সৎ-অসৎ কথাগুলোর মূল্য ব্যক্তিগত বিচারের ওপর নির্ভর করবে। এদের মূল্য শাশ্বত নয়।'

তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার মত বুদ্ধি আমার ছিল না, আজও নেই। বুঝতে পারলাম, তিনি আমার শূন্য তহবিলের খবরটা জেনে ফেলেছেন। বাড়ীটা বেচে ফেলবার জন্যে দালালদের কাছে যাওয়া-আসা আরম্ভ করলাম। সেই সময় এই দিকটাতে জমি কিংবা বাড়ীর দাম তেমন বাড়ে নি। গড়িয়ার পোলের এ পাশে কেউ বড় একটা আসতেও চাইত না। ঘন জঙ্গলে সমাকীর্ণ ছিল আমাদের এই গোটা অঞ্চলটাই। পোলের ওপর থেকে সরকার-কুঠির ছাদটা পর্যন্ত দেখা যেত না। আজ ত তুমি এখান থেকে আশী নম্বর বাসটাও দেখতে পেলে মহীতোষ।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রায় পনর মিনিট পর পর একটা করে আশী নম্বর যাচ্ছে। সবসুদ্ধ চারখানা দেখলাম।"

'তুমি ঠিকই দেখেছ। তার মানে এক ঘণ্টার হিসেব দিলে। সুতপা একটু বাইরে গেছে। ও ফিরে না আসা পর্যন্ত কি তুমি অপেক্ষা করতে চাও না?"

"আজ ত রবিবার, দু'এক ঘণ্টা দেরি করে থেলে আমার কিছু অসুবিধে হবে না" বলল মহীতোষ। সুতপা যে বাড়ী নেই, সে খবরটা ওকে দিতেই হ'ল। আমি দেখলাম, মহীতোষ এবার সুস্থির হয়ে বসল। শুধু সুস্থির হয়ে বসল না, সে আমায় অনুরোধও করল, "পুরনো ইতিহাস শুনতে ভাল লাগছে। কিচ্ছুই বাদ দেবেন না, সবটুকুই বলুন।"

আমি পুনরায় বলতে লাগলাম, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার বোধ হয় এক বছর আগে বিকেলবেলার দিকে গড়িয়ার জঙ্গলে হঠাৎ একটা জীপগাড়ি ঢুকে পড়ল। গুলি খাওয়া বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে জীপগাড়িটা যেন আক্রমণকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে! জঙ্গলের নিরেট নিস্তব্ধতা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। আমি ওই বড় ফটকটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তাটার ওপরেও লম্বা লম্বা বুনো ঘাসের কিছু অভাব ছিল না। গাড়িটা এগিয়ে আসতে লাগল এই দিকেই। বুনো ঘাসের বুক চিরে একটা সকরুণ আর্তনাদও বোধ হয় বেরিয়ে এল। আমি দেখলাম, ভাঙাচোরা রাস্তাটার ওপর দাগ পড়ল। গভীর দাগ। হ্যাঁ, তা প্রায় ছ'ইঞ্চি ত হবেই। জীপগাড়িটার বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করবার মত। এর চাকার তলায় ছিল নতুন বিপ্লবের তেজোদ্দীপ্ত গর্জন। গর্জন না শুনলে সুতপা বোধ হয় সরকার-কুঠিতে আশ্রয় নিতে আসত না। আজ মনে হচ্ছে, সুতপা আসবে বলেই বুঝি সেদিন বায়না নিয়েও শেষ পর্যন্ত বাড়ীটা আমি বেচে ফেলতে পারি নি। একটু দাঁড়াও মহীতোষ, নস্যি নিয়ে নি। জানি বদ-অভ্যাস। কিন্তু মানুষের একটা অন্ততঃ বদ অভ্যাস থাকা উচিত। তুমি কি বল, মহীতোষ?"

বদ-অভ্যাস সম্বন্ধে মহীতোষ কোন মতামত দিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, "জীপগাড়িতে কে ছিল?"

"একজন ইংরেজ। বোধ হয় বছর ত্রিশ বয়স হবে—ক্যাপটেন। সামরিক পোশাক তাঁর পরাই ছিল। হিন্দী ভাষা খুব ভাল করেই শিখেছে। গড়িয়া পোলের পশ্চিম দিকে যে চওড়া পিচের রাস্তাটা দেখলে ওটা এঁকে বেঁকে চলে গিয়েছে রিজেণ্ট পার্ক হয়ে টালিগঞ্জে। গোটা রিজেণ্ট পার্কে তখন শুধু মিলিটারী ক্যাম্প ছিল। সাহেবটি সেখান থেকেই এসেছে। এসে বলল যে, সে এখানে থাকতে চায়। তোমার মাসীমা ত তাকে দেখেই ক্ষেপে উঠলেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই মুখপোড়া বাঁদরটা কি চায়?

ইতিমধ্যে সাহেবটিকে আমি বলেই দিয়েছিলাম যে, সরকার কুঠি মেস কিংবা হোটেল নয়। আমার কথায় ক্যাপটেন খুব নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। তার হাবভাব থেকে মনে হ'ল, সে যেন অনেক দিন ধরে ঠিক এমন একটি জায়গায়ই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দু'দশ মিনিট ভেবে চিন্তে ক্যাপটেন বলল, অল্ রাইট, আমি তোমাদের পেইং গেস্ট হয়ে থাকব। মাসে কত করে লাগবে? আড়াই শ'? অল্ রাইট, তিনশ' করেই দেব। এই বলে সে পকেট থেকে টাকা বার করল। আগাম তিনশ' টাকাই সে দিতে চাইল। আমি বললাম যে, ওল্ড লেডীকে জিজ্ঞেস না করে টাকা নেওয়া চলবে না। মহীতোষ, এর পর তোমার মাসীমার কথা শুনে আমি ত হতভম্ব হয়ে গেলাম। মনে হ'ল, দীর্ঘ ত্রিশ বছর এক সঙ্গে বসবাস করবার পরেও আমি আমার নিজের স্ত্রীকে চিনি না। তিনি হঠাৎ দেখি বেরিয়ে পড়লেন সাহেবটির সামনে। জিজ্ঞাসা করলেন, কেয়া মাংতা? ক্যাপটেনের মুখে হাসি! সাম্রাজ্যলিপ্স ইংরেজের মুখে ত শুধু লোভের হাসিই থাকবার কথা—আমরা দেখলাম, লোভ ত দূরের কথা হাসির মধ্যে তার দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাটাই সবচেয়ে প্রবল। তা ছাড়া হাসির মধ্যে এমন একটা সরলতা ফুটে উঠল যে, তোমার মাসীমা আমায় বললেন, এমন হাসি

ত এদেশে কোন শিশুর মুখেও দেখা যায় না। যায় না তার কারণ, এখানে বোধ হয় প্রতিটি শিশু জন্মেই বুড়ো হয়ে পড়ে। মহীতোষ, কথাটার মধ্যে খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। অন্ততঃ সবটুকুই এর মিথ্যে নয়। ক্যাপটেনের সঙ্গে তোমার মাসীমার আলাপ জমতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। দোতলা এবং একতলার ঘরগুলো তিনি ওকে দেখাতে লাগলেন। তোমার মাসীমার মন্তব্য আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েও শুনতে পাচ্ছিলাম। প্রত্যেকটা ঘরে ঢুকেই তিনি একই মন্তব্য প্রকাশ করছিলেন—এহি কামরাই সবসে আচ্ছা হায়। ক্যাপটেন কি ভাবছিল জানি না, আমি ত নিজের মনে হাসতে হাসতে খুন! শেষ পর্যন্ত দেখি, পেছন দিকের ঐ ভাঙাচোরা গোয়ালটাই পছন্দ করল ক্যাপটেন। আমরা সত্যিই খুব অবাক হলাম। সাহেবটি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ারকি করছে? না, ঠাট্টা-ইয়ারকি নয়। জীপগাড়ি থেকে সে তার জিনিসপত্র নামিয়ে নিয়ে এল। বিছানা, বাক্স, ফোল্ডিং খাট এবং ছবি আঁকবার একটা মস্তবড় ইজেল। বোধ হয়, আধ ঘণ্টার মধ্যে সে নিজের হাতে গোয়ালটা ঝেড়ে পুছে পরিষ্কার করে ফেলল। সাজিয়ে ফেলল ঘর। তার পর সে জিজ্ঞাসা করল: আণ্টি, আলোর কি বন্দোবস্ত হবে? সরকার-কুঠিতে তখনও ইলেকট্রিক লাইট আসে নি। তোমার মাসীমা ছুটে গিয়ে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে এলেন। এনে বললেন, কেরোসিন তেল যোগাড় করে আন। কন্ট্রোলের দোকানে তালা ঝুলছে, এক ফোঁটাও তেল নেই। ডবল দাম দিলে মাড়োয়ারী দোকানদার নিজেই বাড়ী এসে তেল পৌছে দিয়ে যায়। ক্যাপটেন বলল: না আণ্টি, ব্লাক-মার্কেট থেকে তেল কেনবার দরকার নেই। তেল আমি ক্যাম্প থেকে নিয়ে আসছি। এই বলে ক্যাপটেন মুহূর্তের মধ্যে জীপগাড়িতে চেপে উধাও হয়ে গেল।

তিনশ' টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে তোমার মাসীমা যে কতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে গোয়ালের মধ্যে বসে ছিলেন আজ আর তা মনে নেই। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ত হবেই। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবছ?

—ভাবছি, ইয়োরোপের লক্ষ লক্ষ তাজা তাজা ছেলে-মেয়েগুলো যখন যুদ্ধের আগুনে পুড়ে মরছে, আমাদের সোনার চাঁদেরা তখন টাকা লুটছে চোরাবাজার থেকে! কাল রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে লালুর সঙ্গে কথা হ'ল। সে বলল, 'মা, দেখছ ত লক্ষ লক্ষ লালু আজ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের লালুরা ত প্রায় হাজার বছর ধরে সুখশান্তিতে জীবন কাটাচ্ছে। থানেশ্বরের কলঙ্কের পর প্রায় সাড়ে সাতশ' বছর পর্যন্ত আমাদের কিছু করতে হয় নি। নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটিয়েছি। রাজ্যশাসনের ঝামেলা বহন করেছে পাঠান আর মোগলেরা। তার পর তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধের কলঙ্ক আমাদের আরও পৌনে দুশ' বছর ঘুম পাড়িয়ে রাখল। দোষ আমাদের নয় মা। সবটুকু দোষই সেই দুটি লোকের যাঁদের দুষ্কৃতির জন্যে থানেশ্বর আর পাণিপথে হাজার বছরের দাসত্ব পাকা হয়ে রইল। দেশের জন্যে সর্বস্ব পণ করার শিক্ষা আমাদের নেই। রক্তপাতের মধ্য দিয়েই ত মা তেমন শিক্ষা আমাদের পেতে হবে। নইলে স্বাধীনতা পেলেও আমরা তা ধরে রাখতে পারব না। মা, শুধু ইংরেজদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তপা যে তিলে তিলে পুড়ে মরছে তার জন্যে দায়ী তোমাদের দেশ, তোমাদের সমাজ।' লালুর কথা শোনবার পর থেকে আমার দৃষ্টির অস্পষ্টতা যেন অনেকটা কমে গেছে। স্বাধীনতা কথাটার একটা নতুন ব্যাখ্যাও যেন আমার কাছে ক্রমশঃই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সে ব্যাখ্যার পটভূমি জুড়ে রয়েছে সারা পৃথিবী। ভারতবর্ষের সীমিত সাম্রাজ্য তার একটা অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিই লালুর ছেলেমানুষি আর বোধ হয় আমায় ব্যথা দিতে পারবে না।...মহীতোষ, ক'টা বাজল?"

চমকে উঠে মহীতোষ তার হাতঘড়িতে সময় দেখল। দেখে বলল, "আড়াইটা।"

"তা হলে তপার জন্যে আর অপেক্ষা করা চলে না। চল আমরা খেয়ে নিই গে।"

"কিন্তু...কিন্তু মিসেস রায় কি এবেলা আর ফিরবেন না? তা ছাড়া আপনার গল্পটাও ত শেষ হয় নি। ক্যাপটেন যে কেরোসিন তেল আনতে ক্যাম্পে গেলেন সেখান থেকে তিনি ফিরলেন কখন?"

"খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ক্যাপটেনকে নিয়ে আলোচনা করা যাবে। আমরা না খেলে তোমার মাসীমারও খাওয়া হবে না।"

মহীতোষকে নিয়ে খাওয়ার ঘরে প্রবেশ করলাম আমি। তপার ব্যবহারে আমরা সবাই আজ শুধু বিরক্ত বোধ করলাম না, ক্ষুণ্ণও হলাম।

দুই

মহীতোষের খাওয়ার ধরন দেখে লালুর মা দেখলাম একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাল করে খাচ্ছে না সে। কি খাচ্ছে সে, তাও মহীতোষ যেন জানতে চায় না। লালুর মা জিজ্ঞাসা করল, "কি বাবা, ভাল করে খাচ্ছ না ত? মাসীমার হোটেলের রান্না কি হ্যারিসন রোডের হোটেলের চেয়ে খারাপ হয়েছে?"

"কি যে বলেন!" মহীতোষ যেন ঘুম থেকে উঠল, "কি যে বলেন মাসীমা! চমৎকার রান্না হয়েছে। মনে হচ্ছে, বহু

কাল পরে আমি খেতে বসলাম। আমাদের হোটেলে আমি ত ঠিক খাই না, নিয়মরক্ষা করি। থালায় করে যা এনে হাজির করে তাই খেয়ে নিই। শুধু মাছি কিংবা পোকামাকড় দেখলে ফেলে দিই।"

লালুর মা বলল, "তা হলে ছানার ডালনাটা আর একটু খাও বাবা। পোনা মাছটা নিজে রাঁধবে বলে তপা সেই ভোরবেলাতেই হেঁসেলে এসে ঢুকেছিল···কিন্তু কোথা থেকে কি একটা খবর এসে পৌঁছল, অমনি ছুট করে মেয়েটা ছুটল ···যাওয়ার সময় অবশ্যি সে বার বার করে বলে গেছে, মহীতোষবাবুর যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়। হ্যাঁ বাবা, তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?"

"অসুবিধে?" আলুবখরার চাটনী চাটতে চাটতে মহীতোষই বলল, "মাসীমার হোটেলে কোনদিনই কারও অসুবিধে হবে না।···মিসেস রায় বুঝি আজ বাইরেই খাবেন?"

"এত বেলা পর্যন্ত যখন ফিরল না তখন—তপার কথা কিছু বলা যায় না বাবা। হয় ত সমস্ত দিন উপোস করে থাকবে।"

"উপোস করে কোথায় থাকবেন তিনি?"

হাসতে হাসতে লালুর মা বলল, "কিছু বলা যায় না। হয়ত দুপুরের শো-তে সিনেমা দেখতে বসেছে। সন্ধ্যের শো-তেও আবার সেই সিনেমাটাই দেখবে। পাগলী! বলে, মাসীমা, হাউসের মধ্যে ঠাণ্ডা, সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা গায়ে গরম হাওয়া লাগে নি। এই সন্দেশটা আবার ফেলে রাখলে কেন মহীতোষ?"

"গলায় আটকে যাচ্ছে। বড্ড বেশী খেয়ে ফেললাম।"

"এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নাও। খাবার জিনিস নষ্ট করতে নেই বাবা। মহীতোষ, সংসারে তোমার আর কে কে আছেন?"

"মা। তিনি বড়দার কাছেই থাকেন, ঢাকায়।"

"ঢাকায়? সে ত বাবা পাকিস্থান? সেখানে ওরা থাকেন কি করে? রিফিউজী ক্যাম্পে বুঝি?"

"এদেশের খবরের কাগজগুলোতে সেই রকমই খবর বেরোয়। বড়দা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন। বাবা একটা দোতলা বাড়ী তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন। বড়দারা দোতলায় থাকেন। একতলায় ভাড়াটে।"

খাওয়া শেষ হতে সাড়ে তিনটেই বাজল। বাইরে আবার আমরা বেরিয়ে এলাম। মহীতোষ দেখলাম একটু অস্বস্তি বোধ করছে।

আমি বললাম, "সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস আছে নিশ্চয়ই। হয় ত আমার সামনে খেতে তোমার লজ্জা করছে। আমি নিজেই অনুমতি দিচ্ছি তুমি খাও। আমিও একটু নস্যি নিয়ে নিই।"

মহীতোষ সিগারেট ধরাল। আমি তাতে খুশীই হলাম। ভেবেছিলাম, ওর বোধ হয় কোন বদ অভ্যাসই নেই। সিগারেটে বার দুই টান দিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "দোতলার একটা আলাদা ঘর নিয়ে থাকলে মাসিক কত টাকা খরচ পড়ে?"

"আমি ঠিক খবর রাখি নে। তোমার মাসীমাই বলতে পারবেন। কেন, তুমি এখানে উঠে আসতে চাও নাকি?"

"প্রত্যেক দিনই একটু একটু করে লোভ বাড়ছে আমার।"

"আজ তোমার মাসীমার হোটেলে যা খেলে তার সবই সুতপার টাকায় রান্না হয়েছে। প্রত্যেক দিনকার রান্নায় কিন্তু এত স্বাদ থাকে না। আইটেমের সংখ্যা থাকে এর সিকি ভাগ।"

"তবুও মনে হয়, প্রতিদিনকার সাধারণ স্বাদেও আকর্ষণ থাকবে অনেক বেশী।"

"হয়ত তোমার কথাই ঠিক। স্বাদ নির্ভর করে যার যার ব্যক্তিগত রুচির ওপর। তোমরা একটু বেশী ঝাল খাও, না মহীতোষ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"সুতপা তোমার খবর রাখে।"

মহীতোষের সিগারেট খাওয়া শেষ হ'ল। আর বোধ হয় ওকে ধরে রাখা ঠিক হবে না। এখান থেকে সরকার-কুঠির বড় ফটকটা দেখা যায়। সুতপা কি গাড়ি চেপেই ফিরবে, না পাঁচ নম্বর ধরবে? বাসে চেপে আসাই ওর উচিত। সকালবেলাতে ছাটসাহেবের মাস্টার বিয়ুইক ফটকের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। ফটকের পলস্তারা খানিকটা খসে পড়েছিল। আমার বাবা যখন ফটকটা তৈরি করেন, তখন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, এক শতাব্দী পরে এখানে এত বড় একটা গাড়ি ঢুকে পড়বে। শতাব্দীর ব্যবধান বড় কম সময় নয়। কল্পনায় অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায় স্বীকার করি, হয়ত আমাদের পূর্বপুরুষেরা খানিকটা দেখতেও পেয়েছিলেন, কিন্তু আমার বাবা এই বিয়ুইক গাড়িটা দেখতে পান নি। সামাজিক নিয়ম সম্বন্ধে কি এই কথাটা খাটে না? আমি এই মুহূর্তে সুতপার কথাই ভাবছি। বহু পুরাতন সামাজিক বিধিনিষেধগুলো তপা যদি না-ই মানে? আমি ত দেখতে পাচ্ছি, ওর মনের ফটকটা এত চওড়া যে, ওর আধুনিকতম অসামাজিক আচরণের মাস্টার বিয়ুইকটাও অতি অনায়াসে সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করছে। মহীতোষকে নেমন্তন্ন করে সে হয় ত খেতে

বসেছে ছোটসাহেবের সঙ্গে। কিছুদিন আগে মহীতোষের কোল চেপে গড়ের মাঠটা পার হ'ল সুতপা, আর আজকেই সে কলকাতার একাধিক রাস্তা পার হচ্ছে তপন লাহিড়ীর মোটরগাড়ি চেপে। বুড়োমানুষের চোখ দিয়ে ওর সবটুকু আমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছি না। তা ছাড়া তপা যুবতী, ওর মন এবং দেহের রহস্য আমাদের মত বুড়ো লোকের পক্ষে দেখা সম্ভবও নয়। আর দেখলেই বা কি, যার অনুভব-শক্তি লোপ পেয়েছে তার এসব ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ। আঙুর ফলগুলোর নাগাল পেলাম না বলে তাদের টক ঘোষণা করবার চেয়েও বড় অপরাধ এটা।

মহীতোষ এবার জিজ্ঞাসা করল, "কেরোসিন তেল নিয়ে সাহেবটির বুঝি সেদিন ফিরে আসতে খুবই দেরি হয়েছিল, না মেসোমশাই ?"

আমার অন্যমনস্কতা ধরে ফেলেছে মহীতোষ। বললাম, "না, তেমন খুব বেশী দেরি হয় নি, সন্ধ্যের মধ্যেই সে ফিরে এল। এক টিন তেল পেয়ে তোমার মাসীমা ত আনন্দে আত্মহারা। অনেক দিন হ'ল তিনি সরকার-কুঠির একতলায় দোতলায় একই সঙ্গে আলো জ্বালাতে পারেন নি। আজ যেন তিনি সুদে আসলে সব উশুল করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাহেবটি ত তাঁর পেছনে 'আণ্টি, আণ্টি' করে আঠার মত লেপটে রইল। তাঁর হয়ে সে-ই আলো জ্বালিয়ে দিচ্ছে। চৌকির তলা থেকে ভাঙা লণ্ঠন টেনে বার করল ক্যাপটেনই। আমি ত অবাক হয়ে কাণ্ড দেখছি দু'জনের। তোমার মাসীমা ক্রমাগত তার ওপর আদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, আর সে প্রত্যেকবারই বলছে 'অল্‌রাইট'।

'রাত্তিরে কি খাবে সাহেব ? কড়াইয়ে শুধু একটু দুধ আছে।'

'অলরাইট, শুধু দুধ খেয়েই থাকব।' জবাব দেয় ক্যাপটেন।

'তা কি করে হবে, বাছা ? টাকা দিলে তিনশ', শুধু একটু দুধ খাইয়ে রাখি কি করে ? যাও না, বাজার থেকে ক'টা আণ্ডা আর পাঁউরুটি কিনে নিয়ে এস।' সাহেব অমনই বলে বসল. 'অল্‌রাইট—আঙ্কেল্‌কে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

মহীতোষ, সত্যি সত্যি আমাকে সে টেনে টুনে ঠেলাঠেলি করে জীপগাড়িতে তুলল। গড়িয়ার নির্জনতায় প্রচণ্ড কোলাহল তুলল সামরিক কর্মচারীটি। পরের দিন সকালেই খালের ওপারের খাটাল থেকে লক্ষ্মণ গয়লা এসে হাজির। সে সাতশ' গরু আর তিনশ'টি মোষের মালিক। কোনদিনও সে আমাদের সরকার কুঠিতে পায়ের ধুলো দিত না। কখনও-সখনও ডেকে পাঠালে সে নিজে আসত না, দু' তিনটে চাকর পাঠিয়ে দিত। তাদের বলত, 'দেখে আয়, বুড়োবাবু কি চায়। টাকা ধার চাইলে বলিস, আজকাল দুধের কারবারে এক পয়সাও নাফা হয় না।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তৃতীয় বৎসরেই লক্ষ্মণ গোয়ালা লক্ষপতি হয়েছিল। হাসপাতাল আর মিলিটারী ক্যাম্পে দুধ সাপ্লাই দিয়ে কলকাতায় সে বাড়ী কিনল দুটো। যাই হোক, পরের দিন সকালবেলা সে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাত তুলে মস্তবড় একটা সেলামও করল লক্ষ্মণ। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ কি মনে করে ?'

'হুজুরকে দেখতে এলাম। মাঈজীর তবিয়ৎ ভাল আছে ত ?'

হ্যাঁ। তোমার কারবার কেমন চলছে ?'

'বড় খারাপ হুজুর। শুনছি লড়াই নাকি থেমে যাবে। মিলিটারী সাহেব আপনার কোঠিতে কেন আসল হুজুর ? কোথা থেকে আসল ?'

'রিজেণ্ট পার্কের ক্যাম্প থেকে। এখানে মাস দুই থাকবে। সাহেব এখানে বসে ছবি আঁকবে।'

'সে ত আচ্ছা বাত। মগর সাহেবকে বোলুন না, রিজেণ্ট পার্ক ক্যাম্পে দুধ সাপ্লাই কো লিয়ে। ওখানে সাপ্লাই দিচ্ছেন একজন বাঙালীবাবু। আরে রাম কহো, ও কি দুধ দিচ্ছে ? সোব পানি। বাঙালীবাবু গোরু কোথা পাবে ? বুঢ়াবাবু, আপকো ভি থোরা কুছ মুনাফা মিল জায়েগা। সোব লিখা-পড়ি কোরে লিন।'

'লিখাপড়ি'র দরকার হ'ল না। ব্যর্থমনোরথ হয়ে লক্ষ্মণকে তখনি ফিরে যেতে হ'ল। ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে, আমার এই বুড়ো বয়সে মুনাফার আর দরকার হবে না।

ক্রমে ক্রমে সাহেবটিকে চিনতে পারলাম আমরা। ধনী লোকের ছেলে। লেখাপড়া করেছে প্রচুর। যুদ্ধের সময় সৈন্যদলে ভর্তি হতে হয়েছে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক ছিল খুব, আঁকতেও পারে ভাল। পৃথিবীর বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে এই ক'বছর ঘুরে বেড়িয়েছে। বহুবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। তোমার মাসীমার কাছে গল্প করছিল একদিন, 'আণ্টি, তুমি বিশ্বাস কর, মৃত্যু যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন প্রত্যেকটি মানুষই মরতে ভয় পায়। দেশের জন্যেই হোক, আর প্রেমের জন্যেই হোক সুস্থ মানুষ সহজে জীবন দিতে চায় না। জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে একটা সুতোর মাত্র ব্যবধান, কিন্তু মানুষের কাছে সেই সুতোটারই দাম সবচেয়ে বেশী। কি ভীষণ অভিজ্ঞতা! দুশ' গজ তফাৎ থেকে শত্রুপক্ষের সঙ্গে গুলি-ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছে, কানের কোণ ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যাচ্ছে প্রতি

সেকেণ্ডে, আমি তখন কি ভাবছি জান? মা, বৌ, শিল্প এবং দেশের কথা সব মন থেকে মুছে গেছে। শুধু ভাবছি, হায় ভগবান জীবনটা যেন বাঁচে! আণ্টি, এমন অভিজ্ঞতা যাদের জীবনে বহুবার ঘটেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই আজ বেঁচে থেকেও মৃত।' ইজেলের দিকে আঙুল তুলে সাহেবটিই আবার বলল, 'এই শিল্পই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে আজ আমি পুরোপুরি জন্তু বনে যেতাম। আণ্টি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, পৃথিবী থেকে যুদ্ধ যেন চিরদিনের জন্যে লোপ পেয়ে যায়।'

মহীতোষ, তোমার মাসীমার মনের অবস্থা বুঝতে আমার বাকি রইল না। এই ত সেদিন লালুই নাকি স্বপ্নে তাঁকে বলেছে যে, দেশের জন্যে ভারতবর্ষ আজও জীবন দিতে শেখে নি। লালু যুদ্ধ চায়, রক্তপাত চায়, আর ইংরেজটি প্রার্থনা করে যে, যুদ্ধ যেন চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়।

লালুর মায়ের মনে ক্রমেই পরিবর্ত্তন আসতে লাগল। তিনি যে খুব বুদ্ধিমতী তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারছ। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতি তাঁর যেন তেমন আর আগ্রহ নেই। সামাজিক মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি ঝোঁক বাড়ল তাঁর। তিনি আমায় একদিন বললেন, 'পৌনে দু'শ বছরে ইংরেজরা আমাদের যত না ক্ষতি করতে পেরেছে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে লক্ষণ গয়লারা। ইংলিশ চ্যানেল আর গড়িয়া খালের পার্থক্য আমি বুঝতে পারছি।'

বুঝলাম, স্বাধীনতা কথাটার নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে লালুর মা মত্ত হয়ে উঠেছেন। বোধ হয় বিশেষ কোন দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতার চেয়ে তিনি ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বেশী কাম্য বলে মনে করেন। স্বদেশপ্রেমের ধোঁয়াটে অংশটা চোখে পড়ল তাঁর। এমনকি তিনি যেন বিপিন চাটুজ্জেকেও ক্ষমা করবার জন্যে পুরনো মনটার সংস্কার সাধন করতে লাগলেন। হয় ত করলেনও। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর লুকনো সত্তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। গোটা মানব-সমাজটার মা হতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় যে, তিনি শুধু লালুরই মা। হয়ত এ দ্বন্দ্ব তাঁর আজও মেটে নি। কোনদিনও মিটবে বলে কি তোমার মনে হয়, মহীতোষ?"

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "সাহেবটি কি ঐ গোয়ালঘরটার মধ্যে দু'মাসই রইল?"

"দু'মাসের বেশীই রইল। ছবি সে ভাল আঁকত সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। মস্তবড় একটা ক্যানভাসের ওপর একদিন দেখি গড়িয়া খালটা ফুটে বেরিয়েছে। দু'দিকে জংলী ঘাসের সবুজ শীর্ষ—মাঝখানটায় লাল রঙের ঢেউ। গড়িয়া খালে এত রক্ত কোথা থেকে এল? সাহেবের পাশে বসে তোমার মাসীমা তার ছবি আঁকা দেখতেন। রান্নাবান্না আর তাঁকে করতে হয় না। সাহেবের পরামর্শে তিনি শম্ভুঠাকুরকে তখন কাজে নিয়োগ করে ফেলেছেন। তোমার মাসীমা শুনি সাহেবকে প্রশ্ন করছেন, 'খালে ত জল নেই, এত রক্ত কোথা থেকে যোগাড় করলে?'

'ইতিহাস থেকে, আণ্টি।'

'কাদের ইতিহাস?'

'মানবজাতির।'

'মানবজাতির রক্ত এখানে আসবে কেন রে মুখপোড়া, সে ত যাবে তোদের ঐ ইংলিশ চ্যানেলে?'

তোমার মাসীমার গালে চুমু খেল ক্যাপ্টেন। খেয়ে বলল, 'রাগ করো না, আণ্টি। তোমার ছেলে কি ইংলিশ চ্যানেলে গিয়েছিল মরতে?'

'আমার ছেলের খবর তুমি জানলে কি করে?'

'বা রে! তোমার বুকে সেদিন কান পেতে কি শুনলাম?'

মহীতোষ, একদিন দুপুরবেলা সাহেবকে তার ষ্টুডিয়োতে দেখতে পেলাম না। আমি দোতলায় গিয়ে উঠলাম। দেখি, তোমার মাসীমার ঘরের একটা দরজা রয়েছে খোলা, অন্যটা ভেজানো। ঘরের ভেতরের দৃশ্য দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম! সত্যি সত্যি সাহেবটি তোমার মাসীমার বুকের ওপর মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে বিলেতের গল্প বলছে। সংসারে তার বাবা আছেন, মা নেই। আপন ভাইবোন কেউ নেই। বাবা দ্বিতীয় বার বিয়ে করেছেন। অনেক টাকা তাঁর। নানা রকমের ব্যবসা আছে। ভারতবর্ষের বহু কারবারেও তাঁর টাকা খাটছে প্রচুর। যুদ্ধের সুরুতে তিনি বিয়ে করেছিলেন। প্রেমের বিয়ে নয়, সামাজিক বিয়ে। তিন মাসের বেশী একসঙ্গে থাকতে পারে নি। তাঁকে চলে আসতে হয় যুদ্ধক্ষেত্রে। ইটালী দেশ দখলের সময় তিনি খবর পেলেন যে, নাৎসী বৈমানিকদের বোমা খেয়ে স্ত্রী তাঁর মারা গেছেন। স্ত্রীও তার নারী-সৈনিক দলে ভর্তি হয়েছিলেন।

লালুর মা বোধ হয় মনে মনে সাহেবটিরও মা হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সন্ধ্যের সময় জীপগাড়ীতে করে তাঁকে সে নিয়ে যায় লেকের দিকে বেড়াতে। কোন কোন দিন গঙ্গার ধারেও যায়। সময়টা তাঁর ভালই কাটছিল। সংসারের অভাব অনটনও কমল। তিনশ' টাকায় শুধু সাহেবের নয়, আমাদের খরচও সব মোটামুটি কুলিয়ে যাচ্ছিল। সাহেব একদিন তোমার মাসীমাকে বলল, 'আণ্টি তোমার বাড়ীটার মধ্যে অনেক জায়গা পড়ে রয়েছে। রাঁধবার জন্যে একজন 'কুক'ও রাখা হ'ল। আরও ক'জন পেইং-গেষ্ট রাখলে কেমন হয়? না, না মিলিটারী লোকদের

কথা আমি বলছি না। ইণ্ডিয়ান পেইং-গেষ্টই তুমি রাখ।'

তোমার মাসীমা তাতে আপত্তি করলেন না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্যাপ্টেনের সব কথাতেই সায় দিতে লাগলেন। তখণি অবশ্যি আমরা পেইং-গেষ্ট রাখি নি। রাখতে যখন আরম্ভ করলাম, তখন সাহেবটি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিলেতে চলে গিয়েছে। চলে যাওয়ার দিনটির কথা মনে পড়লে আমার বুড়ো বয়সেও চোখের পাতা ভিজে আসে, মহীতোষ।

তারই জন্যে শেষ পর্যন্ত সরকার-কুঠি রক্ষা পেল। শুধু তাই নয়, যাওয়ার সময় সে বলে গিয়েছিল যে, সুতপাকেও যেন আমরা রক্ষিতের মোড় থেকে তুলে নিয়ে এসে সরকার-কুঠিতে জায়গা দিই। সুতপাকে চিনিয়েছিলেন তোমার মাসীমাই। জীপগাড়ীতে চেপে তিনি মাঝে মাঝে যেতেন রক্ষিতের মোড়ে, তপাদের বাড়ী। সেইখানেই তপার সঙ্গে আলাপ হয় ক্যাপ্টেনের।

তপাকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম সত্যি, কিন্তু এসে-ছিলাম অনেকদিন পরে। সে কাহিনী আজ নয়, অন্য একদিন বলব। সন্ধ্যে হয়ে এল। সমস্তটা দিন তোমার বোধ হয় নষ্টই হ'ল। কানের কাছে বুড়ো লোকটা সারা দিন বকবক করল। তপার ব্যবহারে সত্যিই আমি আজ ব্যথা পেয়েছি, মহীতোষ। তোমায় নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে সে সারাদিনের জন্যে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমি লজ্জিত।''

"না, না—জীবনে বোধ হয় এই প্রথম আমার একটা দিন এত ভাল কাটল। মেসোমশাই, আমি ভাবছি, মিসেস রায়ের কোন বিপদ ঘটে নি ত?''

"কলকাতা শহরে সবকিছুই ঘটতে পারে। কিন্তু খবর না পেলে এত বড় জায়গায় কি করেই বা খোঁজ করব ওর? জান মহীতোষ, ওই মেয়েটার জন্যেই শেষ পর্যন্ত আমায় সরকার-কুঠি বাঁধা দিতে হয়েছে?''

"কেন?'' মহীতোষের সুরে উৎকণ্ঠা।

"চিকিৎসার জন্যে অনেক টাকা খরচ করতে হ'ল।"

"মিসেস রায়ের অসুখ হয়েছিল বুঝি? কি অসুখ? মানে, নিশ্চয়ই সাংঘাতিক রকমের ব্যাধি। অসুখটা কি মেসোমশাই?''

"ঠাণ্ডা—মানে, তপার প্রকৃতি একেবারে ঠাণ্ডা। গরম সহ্য করতে পারে না। মহীতোষ, সে দু'বার পর পর একই বই দেখে। সিনেমা হাউসের ঠাণ্ডা ও গায়ে লাগায়।"

"কিন্তু ব্যারামটা কি?''

"ওই যে বললাম ঠাণ্ডা—ওই যে তপা আসছে। চল, ওঠা যাক।''

মহীতোষকে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম ফটকের দিকে। বকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ওকে আর বকতে পারলাম না। শুধু মুখে নয়, সুতপার সারা দেহে যেন উষ্ণতার একটা মোলায়েম প্রলেপ পড়েছে আজ। জমাট-বাঁধা বরফের ওপরে এই বুঝি প্রথম, সত্যিই প্রথম এই সূর্যের তাপ পড়ল। তপন লাহিড়ীই কি তপার জীবনে প্রথম সূর্য?

আমাদের দেখতে পেয়ে সুতপা বলল, "ক্ষমা চেয়ে সময় নষ্ট করতে চাই নে। কাল আপিসে দেখা হবে, মহীতোষ বাবু।'' এই বলে আমাদের সামনে দিয়েই সে চলে গেল।

সুতপা ঘর্মাক্ত। সদ্যস্নাতার দেহলাবণ্য সুতপার দেহেও দেখতে পেলাম আজ। মহীতোষ কি দেখল জানি না। সে শুধু হাত তুলে সুতপা রায়কে নমস্কার জানাল।

২৭৭ ক্রমশঃ

বুদ্ধের নির্ব্বাণ, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, কলিকাতা

বুদ্ধ-প্রসঙ্গে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র
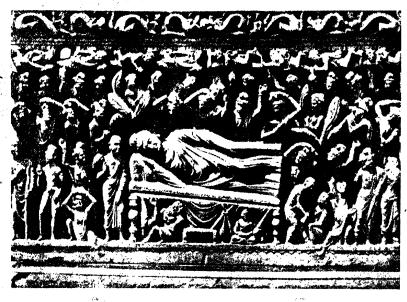
বুদ্ধ ও তৎপ্রচারিত সদ্ধর্ম্ম সম্বন্ধে পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজ এ যাবৎ যত আগ্রহ প্রকাশ এবং আলোচনা করেছেন এত আর কোন ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তক ও তৎ প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে করেন নি। অবশ্য ভারতীয় ধর্মগুলির মধ্যে বৌদ্ধধর্মই সর্ব জগতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু সে অতীতের কথা। বর্তমানে ভারতেই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প। তবুও জগতে এখনই যেন বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও শান্তির বাণীর প্রয়োজন বেশী করে অনুভূত হচ্চে। বুদ্ধের শিক্ষা সকলের ও সর্ব-কালের জন্য।

বুদ্ধের শিক্ষা ও সদ্ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে যে বিশেষ করে এশিয়ায় যে মহান শিল্প ও সাহিত্য গড়ে ওঠে তা মূলত এক হলেও তাতে এক এক দেশের এক এক রীতি বা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। ভারতে ও বিভিন্ন অঞ্চলে বুদ্ধের যে সকল মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সকল শিল্পীই বুদ্ধকে কল্পনা করেছেন শান্তির প্রতি-মূর্তিরূপে। এই শান্ত সমাহিত রূপের সঙ্গে আছে করুণা ও প্রেম মিশ্রিত। বুদ্ধের জন্ম, জীবনের ঘটনা ও পরিনির্বাণও এই সকল ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু। এগুলির সবই যে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। যেগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিকে ভিত্তি করেই আমরা এ কথা বলতে পারি। আবার, এমন দেশও আছে যেখানে লোকে বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্ম পালন করে না, বৌদ্ধ সংস্কৃতিও ক্ষীণ। সেখানেও বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেই মূর্তি একটি অতীত যুগের ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপ থেকে এই সত্যের দিকে নীরবে ইঙ্গিত করছে যে, এক সময়ে সেখানেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল। অনুপ্রেরণা ব্যতীত সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি হয় না, হলেও তা প্রাণহীন। যেখানে শিল্প ছিল, সেখানে সাহিত্য থাকাও সম্ভব। তবে সেখানকার সে সাহিত্যই বা কোথায় গেল?

খ্রীষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে বুদ্ধের যে মূর্তি গান্ধার দেশে গঠিত হয় সেটি পরবর্তীকালে ভারতে যে মূর্তিগুলি

বুদ্ধের আননে ধ্যানলব্ধ প্রশান্তি (গান্ধার খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী)

রচিত হয় সেগুলি থেকে কিছু পৃথক। এই মূর্তি কঠোর তপস্যায় মগ্ন ও তপঃ শীর্ণ বুদ্ধের।

গান্ধার দেশের ভাস্কর্য্যের রীতি অনুসারে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকেও বুদ্ধমূর্তি গঠিত হয়। কিন্তু সে মূর্তির মুখমণ্ডলে চিন্তা ও পরম শান্তি পরিব্যাপ্ত সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিলাভের পর যা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ভারতে কুশানদের সময়ে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বুদ্ধের নিকটে দেবরাজ ইন্দ্রের আগমন কাহিনী অবলম্বনে শিল্পী মন্দির-গাত্রে যে মূর্তি গঠন করেন তাও অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মূর্তিটি লাল বালি পাথরে গঠিত এবং এটি আবিষ্কৃত হয় মথুরায়। ভাস্কর্য্যটি অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় না। [illegible] মথুরাঞ্চল উত্তর ভারতের [illegible]

মতই আবার হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাবাধীন হয়। কিন্তু এখানে বুদ্ধের অহিংসা, প্রেম ও শান্তির শিক্ষার বৈপরীত্য ঘটে না। এই মূর্তিতে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে এবং বৌদ্ধধর্মকে দেওয়া হয়েছে সর্বোচ্চ আসন।

এই প্রসঙ্গে বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি কাহিনী অবলম্বনে সাঁচি ও অজন্তায় যে ভাস্কর্য্য গঠিত হয়েছিল তার উল্লেখ করা যেতে পারে।

সাঁচি-স্তূপের পূর্ব তোরণগাত্রে শিল্পী পাষাণে যে কাহিনী রূপ দিয়েছেন তা কাল্পনিক নয়, ঐতিহাসিক। বুদ্ধত্ব লাভের পর সিদ্ধার্থ গৌতম একবার কপিলাবস্তু দর্শনে গমন করেন। তাঁকে দেখতে নগরবাসিগণ অধীর হয় এবং নগরের পথে, গৃহ-অলিন্দে ও অপরাপর স্থানে কৌতূহলী নরনারীর

কপিলাবস্তু নগরে প্রত্যাবর্ত্তন, পূর্ব্বতোরণ, সাঁচি

ধ্যানী বুদ্ধ (তক্ষশিলা)

সমাবেশ হয়। সকলে তাঁকে স্বাগত জানান। শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে এই কাহিনী শিলাফলকে খোদিত করেছেন।

সাঁচির ঐ পূর্ব তোরণেই আরও একটি কাহিনী আছে —কাশ্যপগণের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা। এটিও শিল্পীর অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

অজন্তা গুহাগাত্র চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে শিল্পীর ভাবলোক। একাধিক শিল্পী বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের এই বিশ্রাম-কক্ষটি নিজ নিজ শিল্পে অপরূপ সৌন্দর্যে পূর্ণ করেছেন। সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধত্ব লাভের উদ্দেশ্যে ধ্যানমগ্ন থাকাকালে মারগণ তাঁকে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করতে নানা মূর্তি ধারণ করে। শিল্পী এই কাহিনীটি শিলাগাত্রে অপূর্ব নৈপুণ্যে খোদিত করেছেন। বুদ্ধের কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তনের মতই এটিতেও নানা মূর্তির সমাবেশ করা হয়েছে। সেজন্য বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। এতেও মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা, মুখভাব ও অঙ্গসৌষ্ঠব বিভিন্ন। কিন্তু বুদ্ধ দৃঢ়তায় অটল, তাঁর মুখে অবিচল নিষ্ঠা। জয়ী তিনি হবেনই।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে গঠিত তক্ষশিলায় আবিষ্কৃত বিখ্যাত মূর্তিটি ধ্যানী বুদ্ধের। এই মূর্তিটির মুখমণ্ডলে পরমা শান্তি পরিব্যাপ্ত। এটি সিদ্ধার্থ গৌতমের বোধি লাভের পর যে রূপ হওয়া সম্ভব শিল্পী তাই ধ্যান করেছিলেন, এবং পাষাণে তা গঠন করেন। বুদ্ধের বাণীর মতই মূর্তিটিও যেন অক্ষয়ত্ব লাভ করেছে।

চীন ও জাপানে বুদ্ধের অনেকগুলি দারুমূর্তি রক্ষিত

মৈত্রেয় বুদ্ধ (জাপানের কাঠ-খোদাই মূর্তি)

গভীর ধ্যানে নিমগ্ন বুদ্ধ (গান্ধার, খ্রীষ্টীয় ১ম-২য় শতাব্দী)

হয়। এ সকল মূর্তি চীনা ও জাপানী শিল্পিগণ যে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে গঠন করেন এ কথা বলাই বাহুল্য। জাপানে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ সপ্তম শতকে সুইকো যুগে শিল্পিগণ বুদ্ধের যে সকল দারুমূর্তি গঠন করেন সেগুলির মধ্যে চুগুজি-নারার দারুমূর্তিটি উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তি ও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের। তবে ভঙ্গীমা ভারতীয় নয়। কিন্তু মুখে গভীর প্রশান্তি বিরাজিত।

গত বৎসরে বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের পর থেকে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ণ হয়েছে। সেজন্য কেবল আমাদের ভারতেই নয় ভারতের বাইরেও বহু দেশে জয়ন্তী-উৎসব পালিত হয়। তাতে বৌদ্ধ ভিন্ন অপরাপর ধর্মাবলম্বিগণও যোগদান করেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধ কুশিনগরের শাল-বনে পরিনির্বাণ লাভ করেন। আগামী ৩০শে বৈশাখ সেই দিন। শিল্পী পরিনির্বাণের করুণ দৃশ্যটিও কল্পনা করে পাষাণে খোদিত করেছেন। পরিনির্বাণে পরমা শান্তি। কিন্তু শায়িত বুদ্ধের মুখে বিরাজ করছে দুঃখ ও বেদনা। এই দুঃখ বেদনা তাঁর নিজের জন্য নয়, জীবের জন্য।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৩ অব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় নির্বাণ লাভ করেন। তাঁর দেহ ভস্মীভূত করা হয়। তাঁর দেহান্তে ভিক্ষুগণ রাজগৃহে সমবেত হন। এই সম্মেলনে তাঁর উপদেশাবলী তাঁরা তিন ভাগে বিভক্তকরে তিনটি সাজিতে

(রিলিফ প্যানেল) বুদ্ধের নিকট ইন্দ্রের আবির্ভাব: (মথুরা, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)

কাশ্যপগণের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, পূর্ব্ব তোরণ, সাঁচি

বা পিটকে রাখেন। ঐ সকল উপদেশ একখানি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। এই গ্রন্থই ত্রিপিটক, বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ।

সুখী ও শান্তিময় জীবনযাপনের উপায়স্বরূপ বুদ্ধ আটটি পথের নির্দেশ দেন। তাঁর শিক্ষার মূল কথা অহিংসা ও প্রেম। সেই সুদূর অতীত যুগে যদি এই উপদেশের প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে তা হলে কি এ কথা বলা ভুল হবে যে, মানুষের তখনকার ও এখনকার অবস্থার মধ্যে প্রবৃত্তির দিক দিয়ে পার্থক্য বিশেষ নেই? একালেও এক মহামানব অহিংসা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন। এক মহাকবি "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"র জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ঈশ্বরের কাছে শান্তি প্রার্থনা করেছেন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন, সম্যক্ দৃষ্টি, সদ্‌বাক্য, সৎকর্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎজীবন, সম্যক্ সমাধি, অহিংসা ও প্রেমধর্ম পালনের। তাঁর উপদেশাবলী কোটি কোটি মানুষ গ্রহণ ও পালনের চেষ্টা করে। কিন্তু বর্তমানে তার প্রভাব ক্ষীণ। এখন বিশ্ববাসী শান্তির জন্য আকুল, মানুষের দুঃখ-বেদনার অন্ত নেই। কোন্ পথে শান্তি ও সুখলাভ হবে? বুদ্ধের পরেও মানুষ তার দুঃখ বেদনা দূর করার ও শান্তি লাভের উপায় চিন্তা করেছে। তখনকার ও এখনকার জীবনযাত্রায় প্রভেদ বিস্তর। সামাজিক কাঠামও তখনকার মত নেই। পৃথিবীর দূরতম

কোণও এখন মানুষের অজ্ঞাত নয়। এখনও কি বুদ্ধ-প্রদর্শিত পথ ও বুদ্ধ প্রচারিত শিক্ষা সুখ-শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়? তা হোক্ বা না হোক, অহিংসা ও প্রেম, সত্য কথন ও সৎ জীবনকে সর্বকালে, সর্বলোকে মর্যাদা দিয়ে থাকে, আদর্শ রূপেও গ্রহণ করে। এখনও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী কি ঈশ্বরবাদী ছিলেন এ নিয়ে বিতর্ক হয়। এই প্রসঙ্গে পৃথিবীর দু'জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের কথোপকথন মনে পড়ছে।

একদিন টলষ্টয় ও ম্যাকসিম গর্কির মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে। টলষ্টয় গর্কিকে বললেন, "তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না?"

গর্কি উত্তরে বললেন, "না।"

টলষ্টয় বললেন, "তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর। কারণ ঈশ্বরবিশ্বাসী হলে মানুষ যে সকল সৎকাজ করে তুমিও তাই করে থাক।"

গর্কি নিরুত্তর।*

মারের প্রলোভন, (অজন্তা গুহা, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী)

* East and West অবলম্বনে।

মৌচাক

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

অনেক মনের মধু নিয়ে
আমার এ মৌচাক—
থাক যা আছে থাক।

ব্যাকুল খুঁজে যে মধু ভরি
হয় ত কিছু যায় সে ক্ষরি—
যেটুকু আছে সেইটুকু মন
আবেগভরে রাখ।
থাক যে আছে—থাক।

আর কতকাল বনে-বনে
মন-কুসুমে ফেরা—
দূর বাসনার আঁধার পথে
স্নিগ্ধ-ভুলে ঘেরা?...

মিলল যা সে মর্ম্ম দহি'
রাখ গভীরে ও সঞ্চয়ী,
যায় যতটুক স্বপন ভাঙি
আপনি ঝরে যাক—
থাক যা আছে থাক।

পণ্ডিত-প্রয়াণ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সম্প্রতি অতি অল্পদিনের ব্যবধানে চার জন খ্যাতনামা পণ্ডিত আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন—বাংলার বিদগ্ধসমাজ চার জন গুণী লোককে হারাইয়াছে। ইঁহারা সকলেই অধ্যাপনাকার্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাচীনতম শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ এম-এ মহাশয় দীর্ঘকাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন—তবে তাঁহার দীর্ঘ চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময়ই আসামে কাটিয়াছিল। দর্শন ও সাহিত্য ছাড়া ব্যাকরণ পুরাণ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞানের অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার লিখিত গ্রন্থ ও নিবন্ধের মধ্যে—কারণ তাঁহার লেখার পরিমাণ অল্প। তাঁহার সঙ্গে সামান্য আলাপ-আলোচনা করিলেই তাঁহার জ্ঞানের গভীরতার আভাস পাওয়া যাইত। তাঁহার সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল তাঁহারা জানেন—তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহাদের প্রতি পত্রে তাঁহার লিখিত অসংখ্য টিপ্পনী একদিকে যেমন তাঁহার ব্যাপক পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করিতেছে, অন্যদিকে তেমনি গ্রন্থগুলির মূল্য বর্ধিত করিয়াছে। যোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়িলে ইহাদের মধ্য হইতে অনেক মূল্যবান্ উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারিবে। সংস্কৃত শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ও সরলতা সম্পাদনবিষয়ে বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ছিল। এজন্য তিনি অনেক চিন্তা ও বহু যত্ন করিয়াছেন। তাহার লিখিত "সহজে সংস্কৃত শিক্ষা", "A Manual of Sanskrit", "প্রবেশিকা সংস্কৃত ব্যাকরণ", "The Present State of Sanskrit Learning in Bengal" প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার প্রমাণ স্বরূপ বর্তমান রহিয়াছে। আসামে সংস্কৃত শিক্ষার সুব্যবস্থা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত আসাম সংস্কৃত এসোসিয়েশনের তিনি দীর্ঘকাল কর্ণধার ছিলেন। বাংলার সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁহার নিবিড় যোগ ছিল। এই দুই প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় তাঁহার কিছু কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা বহুদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'র পুরাতন সংখ্যাগুলির মধ্যেও তাঁহার লেখার সন্ধান মিলিবে। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার নিদর্শন কতকগুলি প্রবন্ধ—'ধর্ম, সমাজ ও স্বাধীন চিন্তা' নামে ১৩১৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সরকারী চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বসবাস আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার লেখা প্রবন্ধ 'প্রাচ্যবাণীনিবন্ধাবলী'তে প্রকাশিত হয়। এই সময়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহার প্রবেশিকা সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল বিস্তৃত টিপ্পনী সমলঙ্কৃত গোভিলগৃহ্যসূত্রের ইংরেজি অনুবাদও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। পরিণত বয়সে অপটু শরীর লইয়াও তিনি বেশীর ভাগ সময় পড়াশুনা করিতেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় গত ১২ই চৈত্র তাঁহার দেহাবসান হয়।

দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এম-এ মহাশয় রাজসাহী, চট্টগ্রাম, হুগলী প্রভৃতি স্থানে সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে রাজসাহীতে কাজ করার সময় তিনি বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সহিত যুক্ত হন এবং ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাসের অনুশীলনে উৎসাহ লাভ করেন। আমরণ তাঁহার এই উৎসাহ অক্ষুণ্ণ ছিল। বহু বৎসর তিনি নানাভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পত্রিকাধ্যক্ষ ও পুথিশালাধ্যক্ষরূপে অনেকদিন তিনি ইহার সেবা করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরে তিনি উহার সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারদের সম্পর্কে তাঁহার বহু ইংরেজী এবং বাংলা প্রবন্ধ বিভিন্ন প্রখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলায় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রবাসী, আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁহার লেখা অনেকদিন প্রায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থ আলোচনা ও পণ্ডিতদের বিবরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়াছেন—প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। কোথাও কোন নূতন পুথির সন্ধান পাইলেই তিনি তাহা দেখিবার জন্য ছুটিয়াছেন। এজন্য অর্থব্যয় ও শারীরিক কষ্ট তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহার এই একনিষ্ঠ সাধনার নিদর্শন তাঁহার লেখার ছত্রে ছত্রে দেখিতে

পাওয়া যায়। তাঁহার এই জীবনব্যাপী সাধনার মূল্য তাঁহার পরিণত বয়সে রাজ্যসরকার কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল—তাঁহার রচিত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : বঙ্গে নব্য ন্যায়-চর্চা' গ্রন্থ রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছিল। তিনি গ্রন্থ বেশী লেখেন নাই—গ্রন্থরচনার উপযোগী বহু উপকরণ তাঁহার অজস্র প্রবন্ধের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে। তাঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ হইতেছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সাহিত্যসাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত 'রামপ্রসাদ সেন' এবং শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের সহযোগিতায় সম্পাদিত রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র বিরচিত শিবায়ন। সম্প্রতি দ্বারভাঙ্গার মিথিলা রিসার্চ ইনষ্টিটিউট তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। গ্রন্থখানির নাম 'History of Navyanyaya in Mithila'। দুঃখের বিষয়, ভট্টাচার্য মহাশয় এখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সবেমাত্র গ্রন্থখানি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—ইতিমধ্যে গত ২৩শে চৈত্র তারিখে তিনি করাল কালের কবলিত হন। তাঁহার সংকলিত অনেক কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়াছে—অনেক উপকরণ তিনি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সেগুলির সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা হইলে দেশের সাহিত্যিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ মহাশয় প্রাচীন ধরনের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং বাংলা ও বাংলার বাহিরে বিভিন্ন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিয়াছেন। নবদ্বীপের পাকা টোল, বিশ্বভারতী, ইন্দোরের হোলকার সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল। গত প্রায় কুড়ি বৎসর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুথিবিভাগে কাজ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল তাঁহার সংকলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পুথির তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সংস্কৃত অনুবাদ করিয়া তিনি সাহিত্যিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার এই অনুবাদ 'গীতাঞ্জলি' নামে ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে নির্বাচিত পঁচিশটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। অনুবাদের মধ্যে অনুবাদকের সাহিত্যিক শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায়প্রবেশ ও সরল ন্যায় নামক পুস্তক দুইখানিতে ন্যায়ের তত্ত্ব সরলভাবে সাধারণ পাঠককে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কলিকাতা সংস্কৃত সিরিজ নামক গ্রন্থমালায় প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদন-কার্যে তিনি পূর্ণ বা অংশিকভাবে যুক্ত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার পাণ্ডিত্য যথোচিত বিকাশ ও মর্যাদালাভের সুযোগ পায় নাই। হতাশা ও ক্ষোভের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে তিনি গত ৩রা বৈশাখ মৃত্যুবরণ করেন।

সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিত না হইলেও ডক্টর হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম সংস্কৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে করা চলিতে পারে। তিনি আজীবন সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের দুরূহ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার কৃত কার্য বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ঐতিহাসিক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও প্রাচীন ভারত সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধাবলী নানা মূল্যবান্ উপকরণে সমৃদ্ধ। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া প্রচুর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার যশ সুদূরপ্রসারী। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও গভীর পাণ্ডিত্য তাঁহাকে সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে তাঁহার শরীর অপটু হইয়া পড়ে। দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ২১শে বৈশাখ তিনি দেহত্যাগ করেন।

বাঁশরী-শিক্ষা
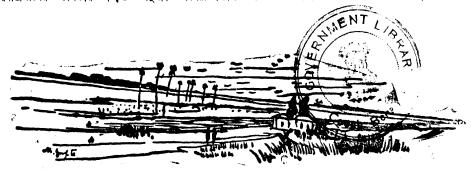
শ্রীকৃষ্ণধন দে

সখীরা মিলিয়া সাজায় রাধারে বিরলে বসি',
চুয়া-চন্দন-কুঙ্কুমে শোভে সে মুখশশী,
তবু রাধা আজ পরিতে চাহে না মুকুতাহার,
ঘটে বিলম্ব, মণি-মেখলায় কি কাজ আর ?
করে যে বিধুর বাঁশরীর সুর শ্রবণে পশি'।

নিত্য শাসনে মাতে ননদিনী শাশুড়ী হায়,
দিবানিশি শুধু মিছা কলঙ্ক সহা কি যায় ?
যমুনায় জল আনিবার ছলে সকাল-সাঁঝে
কুলবধূ হয়ে বনপথে যাওয়া আর না সাজে,
তবু বারে বারে একথা রাধারে শোনাতে চায়।

আসে সখীদল নিরালা দুপুরে রাধার কাছে,
বলে : চল সখি, নীপনিকুঞ্জে শ্যাম যে আছে।
শোন নি বাঁশরী বার বার শুধু তোমারে ডাকে,
আকাশ বাতাস সে মধুর সুরে ভরিয়া থাকে,
ক্ষণ-দরশন-লোভাতুর মন মিলন যাচে।

খুলিও তোমার চরণ-নপুর এ অভিসারে
শিঞ্জন তার গুরুজনকানে পশিতে পারে !
তব বক্ষের মণিহার সখি, মিলনক্ষণে
লুকায়ে রাখিও কাঁচলীর তলে সে আবরণে,
পাছে হার হায়, ছিঁড়ে যায় কর-পীড়ন ভারে।

নখে চাঁদ হেরি' ভ্রান্ত চকোরী রহে না দূরে,
রাঙা পদতল ভাবি উৎপল ভ্রমরী উড়ে,
মেঘ-কুন্তলে চাতকীর দল যাচিছে বারি,
সুরভি আঁচলে লুটায় সমীর কুসুম ছা।ড়',
হেরিয়া নয়ন সাথে খঞ্জন মরিছে ঘুরে !

সখীদের কথা শুনি রাধা কয় আবেগভরে—
"শিথিল কবরী বেঁধে দাও সখি, কুসুমথরে,
নীল সাড়ীখানি পরাও যতনে অঙ্গে মোর
নীল যমুনার তটে যাব যেথা হৃদয়চোর,
শিখিব বাঁশরী কি মায়ায় মন আকুল করে।"

চলে রাধা ধীরে বনপথে যেথা বাজিছে বাঁশী,
লুকায় সখীরা মাধবীকুঞ্জ-আড়ালে আসি'।
কৃষ্ণচূড়ার ফুটিছে মুকুল পথের পাশে,
কৃষ্ণকলির ফুলগুলি যেন গরবে হাসে,
কৃষ্ণতমাল ছায়া দেয় মেলি' পত্ররাশি।

মৃদু কঙ্কণ-শিঞ্জনে শ্যাম ফিরিয়া চায়,
কবরী এলায়ে বসে রাধা কালো তমালছায়,
মিলন আবেগে মৃদু হাসি ফোটে বিম্বাধরে,
আঁখির পিয়াসা মেটে না যে তবু ক্ষণের তরে,
ভরে' ওঠে মন শ্যামদরশন-চিরসুধায়।

বাঁশরীর সুরে ওঠে "রাধা" নাম শতেক বার,
রাধা নামে যেন ভরিয়া গিয়াছে এ সংসার ;
সজল নয়নে বলে রাধা—"হায়, এ কোন্ রীতি,
তোমার বাঁশীতে"রাধা"ছাড়া আর নাহিক গীতি ?
রাধারে কাঁদাতে একি নিশিদিন লীলা তোমার !

আমারে শিখাও তোমার বাঁশরী হে অভিরাম,
আমিও গাহিব সুরে সুরে শুধু "কৃষ্ণ" নাম,
বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে বাঁশীর তোল কি ধ্বনি,
কেমনে নিখিলে ছোঁয়াও সুরের পরশমণি,
কি সুরে উজানে বহাও যমুনা অবিশ্রাম।

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে ফোটালে নীপমুকুল,
বন-নিকুঞ্জ ফুলে ফুলে তাই হ'ল আকুল,
কোন্ সুরে লতা নবমঞ্জরী ধরিল বুকে,
তরুরে বেড়িয়া উঠিল দুলিয়া কি কৌতুকে,
কোন্ সুরে ঢেউ আছাড়িয়া পড়ি ভাঙিল কূল।

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে নাচালে শিখীর হিয়া,
কলাপ মেলিয়া মিলন-স্বপনে খোঁজে সে প্রিয়া,
কেকারব তার বাঁশীতে তোমার ছলনা করি'
ভুলিলে যে তুমি বনময়ূরীর চিত্ত হরি'
গেল সে তোমার চরণে কলাপ-অর্ঘ্য দিয়া।

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে ডাকিলে সে ঋতুরাজে,
শিশির-কাতরা জাগিল যে ধরা পুলকে লাজে,
রসালের শাখে বুঝি পারিজাত উঠিল ফুটি',
চতুর পবন ভয়ে ভয়ে যায় সুবাস লুটি',
সারা নিধুবন সাজিল এবার নবীন সাজে।

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে কোকিল মধুর স্বরে
বন-হরিণীরে ডেকে আনে সাথী-মিলন তরে,
তোমার বাঁশরী ভরে হিয়া তার হরষ-গানে,
মধুমাধবীতে মধুমিলনের স্বপন আনে,
বকুলচম্পা ফুটায় বনানী-অলকথরে।

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে শিহরি' কদম জাগে,
ফুল-দেহে তার ওঠে রোমাঞ্চ কি অনুরাগে!
বনছায়াতলে কি মোহনসুরে বাজাও বেণু,
কাঁপে যে কেতকী থর-থর, ঝরে শিরীষ-রেণু,
কুন্দ-অতসী পদতলে খসি' করুণা মাগে!

বল মোরে কোন্ রন্ধ্রে তুলিলে নাম রাধার,
বারে বারে ডেকে তবু কি মেটে না সাধ তোমার?
তোমার রাধারে কেন বাঁধ বল এ ছলনায়,
সব দিয়ে রাধা পায় নি যে হায়, আজো তোমায়,
হবে কি বিফল সারা জীবনের এ অভিসার?

রাধা-মুখপানে চাহি মৃদু হাসি মাধব বলে—
"রাধা নাম নিতি সুরে সুরে জপি হৃদয়তলে,
নিখিল হারায়ে ফেলি না শুনিলে রাধার নাম,
তাই যে বাঁশীতে তুলি সেই সুর নাই বিরাম,
রাধা আছে মোর বাঁশীতে, হাসিতে, অশ্রুজলে!"

বাঁশরী তুলিয়া ধরিল মাধব রাধার মুখে,
কাঁপে থর-থর রাধা-অন্তর অসীম সুখে,
শ্যামের মুখের পরশে যে বাঁশী ধন্য হয়,
সে বাঁশীতে আজ ফুৎকার দিতে প্রাণে কি সয়?
লাজে অভিমানে সরে যায় রাধা বেদনা বুকে।

কুসুম-কোমল স্বেদ-সুশীতল রাধার কর
ধীরে ধীরে শ্যাম রাখিল যতনে বাঁশীর 'পর,
বলে: "রাধে, বাঁশী লভিয়া তোমার অধরসুধা
ছাড়ি পুরাতন মিটাবে নূতন সুরের ক্ষুধা,
বাঁশী পাবে প্রাণ পরশি ও চারু বিম্বাধর।"

লাজকম্পিত স্বরে বলে রাধা: "শিখায়ে নাও,
আগে তুমি তব অধর-পরশ বাঁশীতে দাও,
যেখানে তোমার শ্রীমুখ ছুঁয়েছে বাঁশরীখানি
আমার অধর রাখিব সেখানে ধন্য মানি,
বাঁশরীতে আজ তোমার রাধার সাধ মিটাও!"

শুনি রাধা-বাণী কৌতুক মানি বাঁশরী ধরি'
সুর তোলে শ্যাম রন্ধ্রে রন্ধ্রে শ্রীমুখে মরি!
তারপর দেয় রাধার অধরে পরশখানি,
অমনি জাগিল "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" অমৃতবাণী,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠে সুধানাম বাতাস ভরি'।

আর কোন সুর কেন যে জাগে না বাঁশীতে তার,
মরমে মরমে জানে শুধু রাধা এ লীলা কার?
ভিজে যায় বাঁশী আকুলা রাধার অশ্রুজলে,
তবু যে বাঁশরী শুধুই "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলে,
রাধা-মুখপানে চাহিয়া মাধব কহে এবার—

"নীপ-কেতকীর গন্ধমদির যমুনাতটে
দেবে না কি ধরা আমার বাঁশীর এ ছায়ানটে?
তোমার কলস-কাঁকনে বেজেছে যে শিঞ্জিনী,
বন-বীথিকায় সেই গীতিকায় আমি যে চিনি,
গোধূলির মেঘে সে সুর কেঁপেছে গগনপটে।

বন-তমালের কচি পাতা ফেলে আলো ও ছায়া,
তোমার কোমল অলস চরণে জড়ায় মায়া,
পরিজন-দিঠি এড়ায়ে লুকায়ে ঘরের কোণে
শিখীপাখা দিয়ে বেঁধেছ কবরী উতলা মনে,
শ্যামবেশে সাজি' দেখেছ মুকুরে আপন ছায়া।

জানি না কেন এ বাঁশী ভরে শুধু তোমারি গানে,
"রাধা" "রাধা" নামে তুলি সুর তাই আকুল প্রাণে,
উছল যমুনাবুকে ওঠে ঢেউ ছলাৎ-ছল্,
কানে ভেসে আসে—সাঁঝ হ'ল সখি, ফিরেই চল,
বাঁশীতে ভুলায়ে কেন করে ছল শ্যামই জানে!

সাঁঝের তারাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে যমুনা-নীরে,
তমালতলায় এস বসি রাধে বাহুতে ঘিরে',
কেলিকদমের ফুলে ফুলে ফেরে মৃদু সমীর,
তট-নিকুঞ্জে এখনি নামিবে ঘন তিমির,
বাঁশরীতে আজ মিলনের সুর জাগাব ধীরে।

বিশাখা-ললিতা-চন্দ্রাবলীরা দূরেই থাক্,
আমার বাঁশরী তোমার অধর-পরশ পাক্,
দখিনা বাতাস তোমার সে সুরে উঠুক দুলি'
বনমালঞ্চে জাগুক নবীন মুকুলগুলি,
ঢেউ আর বাঁশী একসাথে আজ সুর মিলাক্।

পিয়ালের শাখে থেকে থেকে ডাকে যে বিরহিণী,
হোক্ বিহঙ্গী, তবু রাধে, আমি তারে যে চিনি,
তোমারি মনের গোপন কথা সে কেমনে জানে,
বারে বারে ডেকে তবুও যে সাধ মেটে না প্রাণে,
তারি ব্যথা বুকে বহিছে যমুনা কল্লোলিনী।

ব্রজবাসীদলে কানাকানি চলে তোমারে ঘিরে',
কেহ বুঝিল না কেন তুমি এস যমুনাতীরে,
না হতে আমার বাঁশরী-সুরের প্রদীপজ্বালা
তুমি যে পরালে কণ্ঠে মৃণালভুজের মালা,
সকল বিরহ ধুয়ে দিলে তুমি নয়ননীরে।

মলয়জ চুয়াচন্দনমাখা ও বরতনু
পরশ করিতে পারে নি আজিও পুষ্পধনু,
তবু লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শত সহিলে শেষে
তব জীবনের অপবাদ মোর জীবনে মেশে,
তোমারি পরশ মাগে এ তনুর প্রতিটি অণু।

কবে বেণুরবে গোধন ফিরেছে আপন ঘরে,
মধুমাধবীর কুঞ্জ ভরেছে কোকিলস্বরে,
ফুল-বাসরের নব অভিসারে কুন্দকলি
রূপের দীপালি সাজায়ে রেখেছে ভুলাতে অলি,
সাঁঝের যূথিকা ফুটেছে বনানী-কবরী 'পরে।

তনুবল্লরী ভরে স্বেদকণামুক্তামালা,
উৎপল-করে প্রণয়ের রাখী বেঁধেছ বালা,
কাজল-উজল ছল-ছল দিঠি কি অভিমানে
আকুল আবেগে ফিরায়েছ মোর মুখের পানে,
অনুরাগ-ফুলে ভরিয়া রেখেছ হৃদয়ডালা।

অঙ্গরাগের প্রেমলিপিখানি লিখিও প্রিয়,
চন্দনরেখা-কুসুমে কপোল সাজায়ে নিও,
কৃষ্ণাকবরী বেঁধেছে যামিনী তারার ফুলে,
রাকাশশী আসি দেখা দেবে কবে উদয়কূলে,
সে শুভলগনে তুষার মালাটি কণ্ঠে দিও।

হের, সমীরণ আসে অভিসারে মাধবীতলে,
প্রণয়ের স্মৃতি রেখে যায় ঝরা কুসুমদলে,
আমার বাঁশীর সুর যদি থাকে তোমায় ঘিরে
শুক্লাতিথির মধুযামিনীর যমুনাতীরে,
সে স্মৃতি রাখিও মিলন-ব্যাকুল অশ্রুজলে।

জাগিব আমরা দোয়েলের সুধা-কূজন সাথে
কালো তমালের ছায়াঘনবনে শুক্লারাতে,
জীবন-যমুনা কল্লোল তুলি বাঁশরী-মুখে
পরম তৃষ্ণা জাগাবে তোমার তরুণ বুকে,
দু'টি প্রাণ মিশে যাবে চিরমধু পূর্ণিমাতে।

ধরণীর মায়া, আলো আর ছায়া, দিবা ও রাতি,
মিলন-বিরহ হবে অহরহ মোদের সাথী,
এই কাছে পাই, এই যে হারাই ক্ষণিক ভুলে,
আমরা দু'জনে দাঁড়াব নিখিল যমুনাকূলে,
কলঙ্ক-ফুলে গৌরব-মালা লব যে গাঁথি।

নীল-উৎপল-নয়ন সজল অমিয়মাখা,
দু'টি পল্লব ভ্রমরের মত মেলিছে পাখা,
দেখি যতবার তবু তৃষ্ণার শেষ যে নাই,
বাঁশরীতে তাই "রাধা" "রাধা" নাম সদাই গাই,
বিহ্বল মন যায় না এখন লুকায়ে রাখা।

তটতরুমূলে ব'স তুমি রাধে ফুলের সাজে,
মনোমালঞ্চে তোমারি স্বপনে বাঁশরী বাজে,
শুধু একবার বল তুমি চির-দয়িতে মোর,
সুরের আরতিমাঝারে বাঁধিবে প্রেমের ডোর,
বাঁশী-শেখা তব সার্থক হবে মিলন মাঝে?"

শ্যামের নিবিড় বাহুবন্ধনে জ্যোছনা-তলে
রাধার বাঁশরী "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" শুধুই বলে,
কর-অঙ্গুলি শিহরি' শিহরি' উঠিল কাঁপি'
অমিয়-সাগর-সিনানে মধুর লগন যাপি',
বাঁশরী-শিক্ষা শেষ হ'ল প্রেম-অশ্রুজলে।

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

১

আজকাল আমাদের দেশের প্রচুর লোক ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যান, কাজেই সে দেশের কথা লেখার মধ্যে নূতনত্ব খুব নেই, যেমন ছিল সেকালে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' লেখায়। রবীন্দ্রনাথের মত লেখক হলে অবশ্য এখনও থোড়-বড়ি-খাড়া যাই লিখুন তার মধ্যেই নূতনত্ব কথায় কথায় প্রকাশ পায়। সামান্য লোকদের তাঁর সঙ্গে তুলনা চলে না। তবু পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের চেহারায় যেমন কিছু না কিছু পার্থক্য আছে, তেমনি প্রত্যেক লোকের দেখায় এবং চিন্তায়ও কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। তাই ভারতবর্ষে বসেই আজও লোকে কাগজে যখন-তখন দিল্লীর কথা, বোম্বাই ভ্রমণ, মাদ্রাজ পরিভ্রমণ পড়ছে। বেলুড় দক্ষিণেশ্বরের কথাও কলকাতার পাঠক পড়ে থাকেন, যতই কেননা তা হাতের কাছে হোক।

সেই ভেবেই সমুদ্রপারের কথা মাঝে মাঝে লিখতে সাহস হয়। বিলেতে প্রথম পা দেবার পর কি রকম লাগল তাই বলি। আমরা লিভারপুলে নেমে লণ্ডন গিয়েছিলাম ট্রেনে। জাহাজ থেকে যখন লিভারপুলের ডাঙার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল একটা নূতন দেশে ত এলাম, নূতনটা কোন্ বিষয়ে তা ভাবা উচিত। সবার আগেই চোখে লাগল প্রাসাদ-অরণ্য। বোম্বাই কলকাতার ঘাটেও ত জাহাজ দাঁড়ায়, ধরিত্রীর অঙ্গ সেখানে ত এমন কণ্টকিত নয়, করাচীতে ত বালি ছাড়া প্রায় কিছুই দেখা যায় না। আর লিভারপুল দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর সব বাড়ীগুলো যেন কে এখানে উপড়ে এনে বসিয়ে দিয়েছে। যখন ডাঙায় নামলাম তখন অবশ্য বাড়ীর আশেপাশে পথঘাট গাছপালা সবই অল্পবিস্তর চোখে পড়ল; কিন্তু জাহাজ থেকে মনে হচ্ছিল বাড়ীর পর বাড়ী, তারপর বাড়ী, কোথাও একবিন্দু ফাঁক নেই।

সকাল থেকেই জাহাজে সাহেব কুলিরা উঠে মাল খালাস করতে সুরু করল। মাল-জাহাজে সব ঘাটেই এক কাজ, কিন্তু ঘাটে ঘাটে মানুষগুলোর চেহারা আলাদা, পোশাক আলাদা, চোখের দৃষ্টিও আলাদা। মনে হয়, আমাদের দেশের লোকেরাই সবচেয়ে নির্বিকার। মাথায় গামছা বেঁধে, হাঁটুর কাপড়টা আরও এক বিঘত উপরে তুলে তারা মাল ওঠাচ্ছে আর নামাচ্ছে, যাত্রীদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না কেউ, তা সে সাহেবই হোক, কি কালা আদমিই হোক। সাহেব-কুলিরা কিন্তু যাত্রীদের একবার ভাল করে দেখে নিয়ে তবে কাজে হাত লাগায়। যাত্রিণী থাকলে ত কথাই নেই।

কাস্টম্‌সের লোকেরাও দেশে দেশে কিছু ভিন্ন ধরণের। বোম্বাইওয়ালারা ত এমন নাস্তানাবুদ করে মানুষকে যে বলবার নয়। আমি একলা স্ত্রীলোক যখন জাপান থেকে ফিরেছিলাম আঠার বছর আগে তখন এ বিষয়ে আমার বিশেষ জ্ঞান ছিল না। সঙ্গে কি জাপানী জিনিষ আছে জিজ্ঞাসা করায় আমার ব্যবহৃত অব্যবহৃত ক্ষুদ-কুঁড়ো যা ছিল সবই আমি বলেছিলাম। ফলে জিনিষের দামের চেয়ে মাশুল বেশী আদায় হ'ল। এবার যখন আমেরিকা থেকে ফিরলাম তখন এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা একটু বেড়েছে, তাই জাহাজের আপিসে খোঁজ নিলাম কোন্ কোন্ জিনিষের মাশুল লাগে এবং কোন্ জিনিষের লাগে না। সেই বুঝেই আমি জিনিষ নিয়েছিলাম। কিন্তু বোম্বাই ডকে নেমে দেখলাম মাশুলওয়ালারা ধরেই নিয়েছে যে, আমরা দলবদ্ধ ভাবে ওদের ঠকাতে নেমেছি। তারা অপেক্ষা ত করাল ঘণ্টাতিনেক, তার পর যত আজগুবি এবং অদ্ভুত প্রশ্নে প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলল। অতঃপর শুনলাম আমাদের সঙ্গের গোটা কুড়ি বাক্স ব্যাগ ইত্যাদি খোলা হবে। সব খুলে দেখাতে হলে সেদিন আর ট্রেন ধরা যেত না, হোটেলে ঘরভাড়া করে রাত্রিবাস করতে হ'ত। অকস্মাৎ একজন ভদ্রলোক মাশুলওয়ালা সাহেবের কাছে আমাদের পরিচয় দেওয়াতে দেখলাম এদের সুর বদলে গেল। কোন বাক্সই আর খোলা প্রয়োজন হ'ল না। সবগুলির উপর ছাড়মার্কা দিয়ে তিনি আমাদের ছেড়ে দিলেন। মানুষের নামের পিছনে কি অক্ষরমালা আছে তার মূল্যই বড় হ'ল।

কিন্তু লিভারপুলে যখন নেমেছিলাম দেখেছি কাস্টম্‌সের সাহেবের রূপ একেবারে অন্য রকম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কি কি নূতন জিনিষ এনেছেন?" আমরা বললাম, "আমাদের ব্যবহারের জিনিষ।" তিনি বললেন, "কারুর জন্য উপহার আনেন নি?" বললাম, "খান দুই-তিন শাড়ী এনেছি।" ভদ্রলোক শুধু হাসলেন এবং আমরা

রেহাই পেলাম। ভেবেছিলাম বড় বাক্সগুলো জাহাজে রেখে যাব এবং জাহাজটা যখন লণ্ডন পৌঁছবে তখন সেগুলো নামিয়ে নেব। কিন্তু সেটা কাস্টমসের কর্তার পছন্দ হ'ল না। মালপত্র সবই এখানেই নামিয়ে নিতে হ'ল। ঘরের ঘাটের চেয়ে পরের ঘাটে কিন্তু ব্যবহার ভাল পেলাম।

এখানে জাহাজঘাটের ব্যবস্থা মোটামুটি বেশ সহজ। কিন্তু ষ্টেশনে যে লোকারণ্য তা দেখেই ত ভড়কে গেলাম। ভারী ভারী বাক্স দু'হাতে দুটো তিনটে নিয়ে সারি সারি স্ত্রী-পুরুষ ঠেলাঠেলি করে চলছে। অনেকে আমাদের হাঁ করে দেখছে। মেয়েদের দেখে দু'চার জন বলল, "aren't they lovely ?" এক জায়গায় বোধ হয় ওজন করার জন্য সব বাক্স জমা দেওয়া হচ্ছে। জমা দেওয়া সহজ, কিন্তু ফিরে পেতে প্রাণান্ত। ট্রেন ছেড়ে যায় তবুও জিনিষ পাওয়া যায় না। আমাদের সঙ্গে জাহাজের তিন জন অফিসার ছিলেন, তাঁরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করেও যখন জিনিষ এল তখন ট্রেন ছাড়বার সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। গাড়ীটা লেট ছিল তাই রক্ষা। গাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বন্ধুরা যখন বিদায়-সম্ভাষণ করলেন, তখন প্লাটফর্মে দণ্ডায়মান একদল শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েও হেসে আমাদের দিকে হাত নাড়তে লাগল।

আমাদের দেশের লোকেরা সাদা চামড়াকে ভয় পায়, তাই মেম সাহেবদের সঙ্গে সহজে কেউ অভদ্রতা করে না। যদিও স্বদেশিনীদের প্রতি ব্যবহার ভারতীয় গুণ্ডাদের কিছু ভাল নয়। একদিনের অভিজ্ঞতায় বিদেশের লোক সম্বন্ধে একটা পাকা মত প্রচার করা উচিত নয়। কিন্তু তবু সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম যখন আমরা ট্রেনে ওঠবার খানিক পরেই দুটো অপরিচিত শ্বেতাঙ্গ আমার মেয়েদের ডেকে বলল, "এস না আমাদের সঙ্গে একটু (মদ্য) পান করবে।" লোক দুটো বোধ হয় সৈন্যশ্রেণীর। বিদেশী মেয়েকে গায়ে পড়ে পান করতে ডাকা তাদের কি রকম ভদ্রতা বুঝলাম না। ট্রেনে একটি ভদ্রপরিবারের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। তারা ব্রিটিশ কিন্তু আমেরিকা থেকে ফিরছে। আমরা আমেরিকা যাচ্ছি শুনে তাদের গৃহিণী বললেন, "তোমরা যেমন নূতন দেশ দেখছ, আমার ছেলেরাও নিজের দেশ তেমনি নূতন মনে করে দেখছে। ওরা ইংলণ্ড আগে দেখে নি।"

লিভারপুল থেকে লণ্ডন পর্য্যন্ত যেতে এ দেশের ঢালু জমির তরঙ্গ ভারী সুন্দর লাগে। মাঝে মাঝে সরু সরু নদী। আমাদের দেশে ট্রেন থেকে আমরা সমতল ভূমি দেখতেই বেশী অভ্যস্ত। পাহাড়ে জমি আমাদের দেশে পুরাপুরি পাহাড়ের ছবিই দেখায়। কিন্তু ওদেশে সাধারণ জমি কেবলি নামছে আর উঠছে ঢেউয়ের মত। তার মাঝে পথগুলি যেন আঁকা, এলোমেলো এদিক-ওদিক চলে যায় নি। মাঠ ক্ষেত পথ সব সবুজ; সবেরই ওদেশে কত যত্ন! তখন গ্রীষ্মকাল তাই দুই-একটা জায়গায় দেখলাম ছেলেরা জলে নেমে স্নানের চেষ্টা করছে, কেউ বা সাঁতার দিচ্ছে। দল বেঁধে ছেলেরা বেড়ার উপর বসে আছে এবং ট্রেন দেখেই আমাদের দেশের ছেলেদের মত হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মাঠের মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম বা কৃষিকেন্দ্র। বাড়ীগুলি লণ্ডনের মত ঝকঝকে নয়, রংচটা। গরুগুলির পিঠের হাড় দেখা যায় না, ঘোড়ার মোটা বেঁটে পায়ে চামড়া বাঁধা।

সন্ধ্যায় আমরা লণ্ডনে পৌঁছলাম। আত্মীয় বন্ধু অনেকে আমাদের নিতে এসেছিলেন। তাঁদের সাহায্যে একটা বোর্ডিং হাউসে এসে ওঠা গেল। পাড়ার যত ছেলে-মেয়ে ছুটে এল আমাদের গাড়ী দেখে। আমাদের বাক্স-ডেক্স ঘরে তোলবার লোকের দরকার হ'ল না। এই বালখিল্য দলই টেনে টুমে সব ভিতরে তুলে দিল। সম্ভবতঃ ওখানে হাতের কাছে ভাড়া করা লোক পাওয়াও যায় না। আমাদের বাসার উল্টা দিকে যে বাড়ীগুলি তাতে থাকে প্রতি ঘরে এক একটি আলাদা পরিবার। এদের বাড়ীঘর বোমায় ভেঙে গিয়েছিল, তাই এই স্বল্প স্থানে তাদের এখন দিন কাটাতে হয়। এদেরই ছেলেমেয়েরা রাস্তায় তখন খেলা করছিল। যদিও এটা বকশিশের দেশ, তবু এরা পয়সার প্রত্যাশায় জিনিষ তুলে দেয় নি। আমরা তাদের ২।১ শিলিং দেওয়াতে বড় ছেলেটি হাতে নিয়ে বলল, "We have to share this."

ওখানে ওয়াই-এম-সি-এ'তে ভারতীয় ছাত্রদের একটি হোষ্টেল আছে। রাত্রে আমরা সেখানেই খেলাম। এখন হোষ্টেলের মস্ত চার-পাঁচতলা নূতন বাড়ী হয়েছে, তাতে 'লেকচার হল', উপাসনার ঘর, সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ঘরদোর সব সুন্দর সুসজ্জিত। তখন ১৯৫২-তে এ বাড়ী হয়নি, ছোট একটা বাড়ীতে কোন রকমে কাজ চলছিল। হোষ্টেলের ভার ছিল শ্রীযুক্ত মালাইপেরুমনের উপর। তিনি আশ্চর্য্য ভদ্র এবং আতিথ্যপরায়ণ। আমাদের কত যত্নই যে করেছেন। অনেকদিন এত যত্ন কারুর কাছে পাই নি। ওখানে তখন চা চিনি বাজারে পাওয়া যেত না। ভদ্রলোক আমাদের বাড়ী ঠিক করা, ষ্টেশন থেকে আনা, একবেলা খাবার ব্যবস্থা সব ত করলেনই, তার উপর চা চিনি পেয়ালা পিরিচ সব দিয়ে গেলেন যেন আমরা ইচ্ছা করলে ঘরের গ্যাস রিং জ্বালিয়ে চা খেতে পারি। হোষ্টেলে অনেক বাঙালী এবং ভারতীয় অন্য প্রদেশের ছেলেদের দেখলাম।

সপ্তাহের শেষে আমরা লণ্ডনে এলাম। শনিবার সন্ধ্যায় খাবার পরে রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরোলাম। পথঘাট

আশ্চর্য্য চুপচাপ, ভাবলাম, এই কি লণ্ডনের বিশাল নগরী! বড় রাস্তার খুব কাছে থাকি, কিন্তু কোন গোলমাল, গাড়ী চলার হাঙ্গামা নেই। বড় রাস্তাও ত কলকাতার চেয়ে জনবিরল এবং গাড়ীবিরল মনে হ'ল। দোকানপাটের কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে সুন্দর সুন্দর জিনিষ দেখা যায়। কিন্তু মানুষ কৈ?

সকালবেলাও দেখি তেমনি চুপচাপ। পরে মনে হ'ল শনি-রবিবার ক্রীশ্চান দেশে হয়ত এমনি হয়। যাই হোক চুপচাপ শহরেই একটু বেড়িয়ে দেখি। Euston স্টেশনের টিউব রেলে গাড়ী ধরে হল্যাণ্ড পার্কে আমার ভ্রাতৃজায়ার বাড়ী যাব ঠিক করলাম। টিউব রেলওয়ে ত কখনও দেখি নি, কাজেই দেখবার ইচ্ছায়ই প্রধানতঃ গেলাম। তা ছাড়া উপরের বাসের চেয়ে এগুলি সস্তা। যদিও দেশ দেখতে হলে সুড়ঙ্গর ভিতর দিয়ে না বেড়িয়ে আকাশের তলায় জমির উপর দিয়ে বেড়ানই লোকের উচিত। আমাদের কলকাতা শহর থেকে এতদূরে লণ্ডনে এসে সব জিনিষই ঝকঝকে চকচকে লাগে এবং মনে হয় এ শহরটা চৌরঙ্গীরই যেন একটা বড় এডিশন। সাহেব মেম আমরা দেশেও অনেক দেখেছি, সুতরাং তার মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই, কিন্তু টিউব রেলওয়েটা সত্যিই নূতন কিছু! আমাদের মত বয়সে পার্থিব কোন জিনিষ দেখে ছেলেমানুষের মত বিস্ময় মনে জাগে না বটে, তবু স্বীকার করতে হবে টিউব রেলওয়ে দেখে ভারী চমৎকার লেগেছিল। মাটির তলায় বলে হয়ত মনে হবে মানুষের মন বিষণ্ণ লাগছে আকাশের টুকরোও না দেখে। তাই বোধ হয় চাকচিক্যের আড়ম্বর খুব বেশী। সচরাচর Escalator বা চলমান সিঁড়ি দিয়ে মানুষ এখানে ওঠানামা করে। কষ্ট করে সিঁড়ি ভাঙতে হয় না, একটা ধাপে কোন রকমে পা দিয়ে দাঁড়াতে পারলে সিঁড়ি আপনি উপরে বা নীচে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। লিফট বা সাধারণ সিঁড়িও আছে। তবে সর্ব্বত্র চট করে চোখে পড়ে না। আমরা প্রথম দিন একটা সাধারণ সিঁড়ি দিয়ে টিউবে নামি। সে সিঁড়ি এতই নীচু যে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল পাতালে যাচ্ছি। এদেশের জমি সমতল নয় বলে বোধ হয় কোন কোন জায়গায় বহু গভীরে না নামলে টিউবের নাগাল পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্র কিন্তু এত গভীর মোটেই নয়।

প্রথম দিন রবিবার সকাল বলে বোধ হয় ইলেকট্রিক ট্রেনে মানুষ বড় কম দেখলাম। মনটা ক্ষুণ্ণ হ'ল, আশা করেছিলাম বিরাট শহরে বিশাল জনপ্রবাহ দেখব। ষ্টেশনে নেমে পথে যেটুকু হাঁটলাম লোক কম। বেশ বাগান ঘেরা ঘেরা বাড়ী। দরজায় দরজায় দুধের বোতল সাজান রয়েছে। আজ হয়ত সকলেই দেরীতে দরজা খুলে দুধ ঘরে তুলে নেবে। পথের ধারের বড় বড় লম্বা সবুজ গাছগুলির দিকে চাইতে চাইতে আমরা যথাস্থানে এলাম।

পর দিন সোমবার কাজের দিন। সেদিন আমাদেরও ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে যাবার কথা। আজ আমার জনপ্রবাহ দেখার সখ মিটে গেল। রবিবারের জন-বিরল পথ আজ লোকে লোকারণ্য। সর্ব্বত্রেই মনে হচ্ছে এই-মাত্র সিনেমা ভেঙেছে কি ফুটবল খেলা শেষ হয়েছে। এত ভিড়ের মধ্যেও বুঝতে পারছিলাম আমরা সাহেব দেখতে যত অভ্যস্ত এতকাল আমাদের দেশে রাজত্ব করেও ইংরেজরা আমাদের দেখতে তত অভ্যস্ত নয়। প্রত্যেক জায়গাতেই লোকে আমাদের খুব মন দিয়ে দেখছিল এবং নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। আমাদের বাসার পাড়ায় একটি মেয়ে বলছিল, 'আমার ছেলেরা বলে মা এই লেডিরা কি রাজকন্যা? এরা কপালে কেন সবাই রুবি পরেছে?' আমার মেয়েরা কপালে টিপ পরত।

লণ্ডনে পথ হারানো খুব সহজ। অসংখ্য বাস, অসংখ্য টিউবের পথ। নূতন মানুষ সহজেই গোলমাল করে। আমরাও ভুল করলাম। কেউ কেউ এগিয়ে এসে আমাদের পথ বলে দিচ্ছিল। শুধু মেয়েরা থাকলে আরও বেশীই সাহায্য করছিল। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের লোকেরা আমেরিকা বা ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে বোধ হয় সদয়। ইউ-রোপের বহুস্থানে অবশ্য ভাষার বাধাও একটু অসুবিধা ঘটায়। তবে ফ্রান্স ও ইটালীতে মানুষ ভারতবাসীদের দিকে এমন করে তাকায় এবং মিচকে হাসে যেন মনে হয় ভারতীয় মেয়েরা মিউজিয়ম কিংবা চিড়িয়াখানার দ্রষ্টব্য বস্তু। ইংলণ্ডে এ ধরণের দৃষ্টি চোখে পড়ে নি। মানুষ সব দেশেই মানুষ এবং চোখের ভাষা সবাই বোঝে। মানুষের দিকে যদি সম্ভ্রমের সঙ্গে না তাকানো যায় তবে চোখ বন্ধ রাখাই ভাল।

লণ্ডনে আমরা সেদিন লয়েড্‌স ব্যাঙ্ক খুঁজতে বেরিয়ে-ছিলাম। ব্যাঙ্কের যে শাখাটি খুঁজতে বেরিয়েছিলাম অনেক কষ্টে তার সন্ধান পাওয়া গেল। জুলাই মাসে আমেরিকার স্কুল-কলেজে ছুটি। সে সময়ে প্রফেসার ও ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশে বেড়াতে বেরোয়। তাই ব্যাঙ্কেও আমেরিকানদের ভিড় দেখলাম। পিঠে পুঁটলি নিয়ে মাথায় কদমছাঁট-চুল ছেলেদের দেখলেই আমেরিকান বলে বোঝা যায়। সাজ-পোশাক ইংরেজদের মত কায়দাদুরস্ত নয়। একটি ছেলে এগিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করল। আমরা ইউরোপ হয়ে আমেরিকাতে মিনেসোটা ষ্টেটে যাব কথা ছিল। সেই ছেলেটির বাড়ীও মিনেসোটাতে। ছেলেটি হেসে বললে, "আশ্চর্য্য! পৃথিবীটা কি রকম ছোট! আমি কত দূর

থেকে সমুদ্র পার হয়ে আসছি, তোমরাও কতদূর অপর পার থেকে আসছ। দেখা হ'ল মাঝখানে, আবার তোমরা যাচ্ছ কিনা ঠিক আমাদেরই প্রভিন্সে।" ওদেশে কি রকম ঠাণ্ডা তার অনেক গল্প করল ছেলেটি। কাছেই একজন সুসজ্জিতা মহিলা বসে ছিলেন। গহনাগাঁটি পরা দেখে আমেরিকান মনে হচ্ছিল। তিনি উৎসুক হয়ে আমাদের কথা শুনছিলেন, শেষে তিনিও নিজে থেকেই আলাপ করলেন। আশ্চর্য্য যে এঁদেরও পরিচয় অনেকটা বুঝলাম। হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট সিনক্লেয়ার এঁর স্বামীর বন্ধু। ভদ্রমহিলা স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং আমরা যে সিনক্লেয়ারের বন্ধু তা বলে দিলেন। মনে হচ্ছিল, যেন কলকাতায় এ-পাড়া ও-পাড়ায় ঘুরছি, ব্যাঙ্কের চেনা বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে।

এখান থেকে গেলাম ইণ্ডিয়া হাউসে। সেখানে অনেক চেনা লোক দেখা উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্বপরিচিত দুজনকে মাত্র দেখলাম। আমাদের দেশ গরীব, কিন্তু লণ্ডনে আমাদের ইণ্ডিয়া হাউস দেখলে মনে হবে টাকা আমাদের ছড়াছড়ি যাচ্ছে। বাড়ীটাও খুব জাঁকালো এবং ব্যবস্থা সাজসজ্জাও খুব আমিরী। দুপুরে আজ এদের খাবার ঘরেই খেলাম। খুব ঘটার আয়োজন, দুধ, ভাত-রুটি, মাংস, ডাল সব পাবে। আমরা বোধ হয় ৬।৭ জন লঞ্চ খেয়েছিলাম, খরচ হ'ল এক পাউণ্ড দুই শিলিং। এক দিন একটা ছোট কাফেতে পাঁচ জন লঞ্চ খেয়ে দেখলাম খরচ হ'ল সতের শিলিং। খাদ্য খুবই সামান্য। প্লেট ভর্ত্তি আলুভাজা, দুটা মাছ ভাজা, ছোট্ট একচামচ কড়াইশুঁটি, আর সুপ। শেষে অল্প একটু আইসক্রীম। ইণ্ডিয়া হাউসে খাবারের আর একটু রকমারি আছে, পরিমাণও যতটা মনে পড়ছে, বেশী। খাবার উভয় ক্ষেত্রেই সুস্বাদু।

এই কাফেতে যে সুন্দরী তরুণীটি কালো ফ্রক আর সাদা টুপী ও এপ্রন পরে আমাদের পরিবেশন করল সে ভারী মিষ্টি দেখতে। এমন মার্জ্জিত চেহারা যে মনেই হয় না ওয়েট্রেস। পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি আশ্চর্য্য সুন্দর দেখতে—অল্পবয়স্ক ছেলে খেতে বসেছে। ভাবলাম এদেশে হয়ত সবাই এমনি হয়, শুধু আমাদের দেশে যারা সর্দ্দারী করতে আসত তারাই অদ্ভুত দেখতে। একটি মেয়ের সঙ্গে সে গল্প করছিল খাবার পর। গলার স্বরটাও সুন্দর ভরাট। দু'জনেই খুব হাসিখুশী এবং জলস্রোতের মত অনর্গল গল্প করে চলেছে। একটু পরে লক্ষ্য করলাম ছেলেটি বসে আছে হুইল চেয়ারে, তার পা নেই। খানিক পরে ছেলেটি গাড়ী ঘুরিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। তার পরই মেয়েটি ক্রাচ নিয়ে হেঁটে বেরোল। অবাক হয়ে দেখলাম দু'জনেরই পা চলে না। রাস্তায় একটা মোটর গাড়ীতে উঠে তারা চলে গেল।

দু'তিন দিন মাত্র লণ্ডন বাস করেই চোখে পড়ত যেখানে সেখানে খোঁড়া, বাঁকা, হস্তহীন মানুষ। আর দেখতাম দোকান, বাজার, ট্রেন যেখানেই যাই সর্ব্বত্রই কেউ না কেউ কর্ণে যন্ত্র পরে যাচ্ছে। কানের দোষ আমাদের দেশেও প্রচুর, কিন্তু কেউ যন্ত্র ব্যবহার করে না। বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ীও লণ্ডনের চারিদিকে। যুদ্ধের সাত-আট বৎসর পরেও এই রকম অবস্থা। তার উপর সর্ব্বত্রই পুরুষ কম, মেয়ে বেশী। ডি. এল. রায় বলেছিলেন, 'বিলেত দেশটা মাটির'; ভাঙা বাড়ীর উপর কাঁটা গাছ ও ঘাস গজান দেখলে 'মাটির দেশ' যে তা আরও ভাল করে বোঝা যায়। কিন্তু ঐ ভাঙা-চোরাটুকু পার হলেই ভাল পাড়ায় ও কাজের পাড়ায় মাটির দেশের অন্য রূপ। সর্ব্বত্র এমন চাকচিক্য এবং এমন মানুষের ভিড় যে বিলিতী সিনেমায় দেখা স্বর্গের মত মনে হয়। সে স্বর্গে সবাই সুসজ্জিত, সবাই হাসিখুশী, সেখানে পথেঘাটে সর্ব্বত্রই ফুল সাজান, জানালা দরজা সাজান। মেয়েতে দেশটা ভর্ত্তি, কাজেই সাজ-পোশাক আরও চোখে পড়ে। তখন গ্রীষ্মকাল, প্রায় সকলেই ফুলের মালা আঁকা ঘাগরা পরে চলেছে। অনেকের গ্রীষ্ম-সজ্জা এমন যে, আমাদের গরম দেশকেও হার মানায়। কেউ কেউ ছোট ছোট কোট পরেছে। কিন্তু যারা ঘরের ভিতর কাজ করছে তাদের অনেকের এমন পাতলা কাপড় যে গা দেখা যায়। আমরা তখন সবাই গরম কাপড় পরি।

সন্ধ্যায় একটা সভায় মেয়েরা গিয়েছিল শ্রীযুক্ত কারিয়াপ্পাকে সম্বর্দ্ধনা করতে। মেয়েরা আমেরিকা যাচ্ছে শুনে তিনি তাদের বললেন, "Please don't say 'Yah' when you come back from America !"

আমার বেড়াবার সখ খুব ছিল। কিন্তু টিউব রেলে গাড়ী ধরতে হলে Escalatorএ চড়ার নামে আমার সব আনন্দ নিভে আসে। চলন্ত সিঁড়িতে পা রাখতে পা মাতালের মত টলে যায়, হাত দিয়ে রেলিং ধরতে গেলে হাতটা পায়ের আগেই দোতলায় উঠবার চেষ্টা করে। অগত্যা কারুর পিঠে হাত রেখে উঠি। ষোল বছর আগে যখন জাপানে চলন্ত সিঁড়িতে চড়তাম তখন আমার ছোট্ট মেয়েটি ভয় পেত আর আমি সাহস দিতাম তাকে। এখন আমি ভয় পাই, আমার মেয়ে আমায় ধরে নিয়ে যায়।

তাঁতিয়া তোপী

কুনওয়ার সিং

নানাসাহেব

বাহাদুর শাহ্

বৃত্ত

(একাঙ্কিকা)

শ্রীসুভাষ সমাজদার

প্রথম দৃশ্য

[একটি ছোট সাদা একতলা দালানের বারান্দায় কালো বোর্ডের ওপর সাদা অক্ষরে লেখা—অনিমেষ বাগচী—রেজিষ্ট্রার। 'বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে হইলে এখানে আসুন।' বারান্দার এক কোণে একটা ডেক চেয়ারে বসে আছেন মিঃ বাগচী। সৌম্য শান্ত মুখশ্রী। মোটা কালো ফ্রেমের চশমার নীচে উজ্জ্বল দুটো চোখ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। তাঁর সহকারী সন্তু এক পাশে দাঁড়িয়ে খাতাপত্র ঠিক করে রাখছে। মিঃ বাগচী খবরের কাগজ পড়ছেন। চারিদিকে বিকেলের ছায়া নামছে। নেপথ্য থেকে বাগচী মশায়ের পোষা কোকিল হঠাৎ ডেকে উঠল]

মিঃ বাগচী। বল ত সন্তু, কোকিলটা কি বলছে ?

সন্তু। কি আর বলবে সার্‌! এই আপিসবাড়ীর সব প্রাণীই শুধু দুটো কথাই জানে—'বিয়ে দিন' কিংবা আমরা 'ডাইভোর্স চাই।'

বাগচী। (হো হো করে হেসে উঠলেন) ঠিক বলেছ সন্তু, আজকালকার ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে ভালবেসে বিয়ে করার জন্য যেমন উদ্দাম হয়ে ওঠে, তেমনি ডাইভোর্সের জন্য একেবারে ক্ষেপে যায়।

(সন্তু গোছগাছ শেষ করে একটু এগিয়ে এল)

সন্তু। কেন এ রকম হয় বলেন ত সার্‌? যারা বিয়ের আগে পরস্পরকে খুব ভালবাসে; তারাই আবার কেউ কারও ছায়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।

(মিঃ বাগচী কোন কথা বললেন না। চোখ দুটো বুঁজে কি ভাবতে লাগলেন)

বাগচী। পিঁপড়ের পাখা ওঠে কখন সন্তু ?

সন্তু। শুনেছি পিঁপড়ের পাখা ওঠে ডিম পাড়ার কিছু আগে।

বাগচী। বাঃ বাঃ তুমি অনেক কিছু জান দেখছি। তোমার বয়স কত হ'ল সন্তু ?

সন্তু। (মাথা চুলকে) আজ্ঞে—চব্বিশ।

(হঠাৎ নেপথ্যে একটা ঘোড়ার গাড়ীর শব্দ হ'ল—খট-খট-খট। মিঃ বাগচীর কানদুটো খাড়া হয়ে উঠল। সন্তু বলল)

সন্তু। দেখুন, হয় ত আসছে একজোড়া। হয় বিয়ে, না হয় তালাক।

(নেপথ্যে সেই কোকিলটা ডেকে উঠল—'ঘরবাঁধা, না হয় ঘরভাঙ্গা'—যেন স্পষ্ট উচ্চারণ করল কোকিল)

বাগচী। এই সপ্তাহে 'ডাইভোর্সের কেসই বেশী পেয়েছি। কি যে হয়েছে! সারা দেশে একটা চরম দুর্দিনের কালো ছায়া নেমেছে। কোন অনূঢ়া মেয়ে একটা যেমন-তেমন স্বামী পেলে খুশী হয়, আবার কেউ স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে বাইরের হাওয়ায় পাখা মেলতে চায়।

সন্তু। মেয়েরা বি-এ, এম-এ, পাস করছে কিনা। চাকরি করছে, উপার্জ্জন করছে। আর আমাদের আইনও মেনে নিয়েছে বিবাহবিচ্ছেদ। তাই মেয়েরা পান থেকে চুন খসলেই একেবারে খাপ্পা হয়ে রেজিষ্ট্রারের কাছে ডাইভোর্সের সার্টিফিকেট নিতে চলে আসছে।

বাগচী। আমি দুটো তরুণ-তরুণীর বিয়ে দিয়ে যেমন আনন্দ পাই তেমনি আমার ভয়ানক দুঃখ হয়, ওদের ডাইভোর্সের ডিক্রী দিতে।

(নেপথ্যে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল)

সন্তু। (গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়ে নেপথ্যে তাকিয়ে বলল) হুঁ, ঠিক এই আপিসেই আসছে একজোড়া। সার্‌, আপনি রেডি হয়ে নিন।

(বাগচী প্রস্থান করলেন এবং কিছুক্ষণ পরে চকচকে একটা ড্রেসিং গাউন পরে, মুখে পাইপ দিয়ে বাইরে এলেন)

(নেপথ্যে) এটা রেজিষ্ট্রার সাহেবের আপিস ?

সন্তু। আজ্ঞে হাঁ। আসুন।

[ঝড়ের মত মধ্যবয়সী সুরেন খাসনবীশ এবং কুসুমের প্রবেশ। কুসুমের পরনে চুলপাড় ধুতি। হাতে কাঠের হাতললাগানো ব্যাগ। বয়স ত্রিশের উপরে। কৃশ-করুণ চেহারায় দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট চিহ্ন। সুরেনের পরনে ময়লা পাজামা। গায়ে রঙীন ছিটের শার্ট। রোগা, লম্বা চেহারা, কিন্তু কালো ফ্রেমের চশমার নীচে উজ্জ্বল দুটো চোখে বুদ্ধির দীপ্তি)

সুরেন। (রেজিষ্ট্রারকে) স্যার, চটপট আমাদের দুটো হাত এক করে দিন ত। আমরা—

বাগচী। (হাত তুলে থামতে বললেন) পরে শুনছি সব কথা, আগে আপনারা বসুন ত ?

সুরেন। না, না বসার সময় নেই আমাদের। তাড়াতাড়ি একটা বিয়ের সার্টিফিকেট দিয়ে দিন না স্যার।

কুসুম। আমাদের সময় খুব কম সার্‌।

বাগচী। আশ্চর্য্য! বিয়ের মত একটা কাজ, তার জন্যও এতটুকু সময় হাতে রাখেন নি?

সুরেন। আমাকে আবার সন্ধ্যার মোটরেই 'কালিয়াগঞ্জে' যেতে হবে কিনা।

বাগচী। আপনার পেশা?

সুরেন। আগে ছিল স্কুলমাষ্টারী। সংসার চলে না দেখে, মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে জমির দালালী করছি।

বাগচী। (কুসুমকে) আপনি?—আপনার পেশা?

কুসুম। আমি সোশ্যাল ওয়ার্কার।

বাগচী। আপনাদের পরিচয় কত দিনের?

সুরেন। সাত দিনের।

বাগচী। মাত্র।

কুসুম। ঐ যথেষ্ট। সাত দিন কি কম সময় হ'ল?

বাগচী। আপনারা পরস্পরকে ভালবাসেন?

সুরেন। (বিরক্ত হয়ে) এখন আবার ওসব আছে নাকি? সার্ এটা 'স্ট্রগল ফর এক্জিস্টেন্সে'র যুগ। বেঁচে থাকতে হলে দু'হাতে নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে হয়। তাই ভালবাসার মত মন—

কুসুম। স্যার, অতশত বুঝি না। আজকালকার দিনে এক-জনে বাসা করলে যে খরচ পড়ে, তার চেয়ে অনেক কম পড়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকলে—তাই বিয়ে করছি। প্রেম ভালবাসা আবার কিসের?

বাগচী। আশ্চর্য্য!

সুরেন্। আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে সার্? এটা 'সিম্পলি' কো-অপারেশনের ব্যাপার? এই যুগটাই—

বাগচী। থামুন। আপনাদের বার্থ সার্টিফিকেট সাবমিট করুন।

কুসুম। বার্থ সার্টিফিকেট মানে?

সুরেন। অত ঝামেলা করছেন সার্?

বাগচী। ঝামেলা নয়। আমি আমার কর্ত্তব্য করছি। বার্থ সার্টিফিকেটে আপনাদের বয়সের সঠিক হিসেব পাওয়া যাবে—

কুসুম। (কঠিন গলায়) ও সব গোলমাল করবেন না। তাড়াতাড়ি দুটো হাত এক করে বার্থ সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিন না সার্।

বাগচী। না—না। বিয়ে করতে হলে বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন।

সুরেন। সার্, এক ডেপুটি মিনিষ্টারের সঙ্গে কুসুমের আত্মীয়তা আছে। বিয়ের সার্টিফিকেট দিয়ে দিন সার্! আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

বাগচী। (কঠিন গলায়) রাজ্যপালের সঙ্গে আপনার ভাবী স্ত্রীর আলাপ থাকলেও আমি উইদাউট বার্থ সার্টিফিকেট আপনাদের বিয়ে ভ্যালিড করতে পারি না?

কুসুম। কি বললেন? সার্টিফিকেট দেবেন না?

বাগচী। 'নো', বাই নো মিন্স।

সুরেন। (হলদে দাঁতগুলি বিকশিত করে) খুব পারবেন। এখনি টু পাইস দিলে—

বাগচী। (চীৎকার করে) এই বেয়ারা—এই সন্তু—ওদের বের করে দাও—

সন্তু। (সুরেনকে) মশাই, যান আপনারা চলে যান। সাহেবের রাগ হলে একেবারে জ্ঞান থাকে না।

সুরেন। (ক্রুদ্ধ হয়ে, আকাশের দিকে ঘুষি বাগিয়ে) আই উইল সি ইউ—আপনি কত বড় মরালিষ্ট অফিসার—

বাগচী। বেরিয়ে যাও স্কাউণ্ড্রেল—

[সুরেন ও কুসুম দু'জনেই পিছনে হটতে লাগল। সুরেন রাগে গরগর করতে লাগল]

সুরেন। ওপরে বলে আপনার চাকরির ক্ষতি—

বাগচী। যান—যান ওসব ভয় দেখাবেন না।

[সুরেন ও কুসুমের প্রস্থান। নেপথ্য থেকে শোনা গেল সুরেনের গলা]

সুরেন। হাকিমী মেজাজ কি রকম দেখেছ!

বাগচী। যত সব ফোরটুয়েন্টির দল।

(হঠাৎ সন্তু হো হো করে হাসতে লাগল। হাসির দমকে একেবারে ফেটে পড়ল)

বাগচী। কি হে? তোমার আবার কি হ'ল! তুমি হাসছ কেন?

সন্তু। সার, ওরা যা বলল সব—সব মিথ্যা কথা।

বাগচী। মানে?

(এমন সময় নেপথ্যে আবার পায়ের শব্দ শোনা গেল)

সন্তু। আবার কেউ আসছে বোধ হয় সার।

বাগচী। না—এরা আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি, (দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) পাঁচটা বাজতে এখনও অনেক বাকী। কি হে সন্তু, এখন আপিস বন্ধ করে যাওয়াও ত যাবে না।

(নেপথ্য থেকে কে একজন বলল)

"এটা কি রেজিষ্ট্রি আপিস?"

সন্তু। আজ্ঞে হ্যাঁ। আসুন।

(তরুণ ও দীপ্তির প্রবেশ। দুজনেই সুশিক্ষিত অভিজাত যুবক-যুবতী)

বাগচী। (গম্ভীর গলায়) আপনারা কি ঘর বাঁধতে না ভাঙতে এসেছেন?

তরুণ। (হাতের আঙুলগুলো মুঠো পাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে) ঘর বাঁধতে নয়—ভাঙতে—ভাঙতে এসেছি (দু' হাতে বুক চেপে ধরে জলন্ত চোখে দীপ্তির দিকে তাকিয়ে) উঃ! সংসার, সংসার ত নয় যেন একটা নরককুণ্ড।

দীপ্তি। তোমার মত উড়নচণ্ডীর কাছেই সংসার নরককুণ্ড। চাঁদের আলোও তোমার মনে হয় শকুনের ঘোলা চোখের মত।

তরুণ। চুপ কর। কথা বলতে এস না তুমি আমার সঙ্গে। তোমার মত একটা ছোট-মনের মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করে আমার জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।

দীপ্তি। ছোট মন আমার? মুখ সামলে কথা বলো। বৌয়ের রোজগারের পয়সায় বসে বসে খাও। তোমার কথা বলতে লজ্জা করে না?

বাগচী। আহা—আহা ঝগড়া করবেন না। এটা আপিস।

(তরুণ ও দীপ্তি দু'জনে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বীর মত তীব্র আক্রোশভরা চোখে তাকিয়ে রাগে ফুলতে লাগল। সন্তুর প্রস্থান)

দীপ্তি। সার, আমার জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমি পাগল হয়ে যাব। আপনি কাইগুলি আমাকে সেপারেশন সার্টিফিকেট দিন।

তরুণ। সেপারেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দিন স্যার। ওর সঙ্গে আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে আমিও পাগল হয়ে যাব। যার স্ত্রী চাকরি করে ঘাড়ে ভ্যানিটি ব্যাগ ঢলিয়ে রাত দশটায় বাড়ীতে এসে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, রান্না হয়েছে কি না; যে স্ত্রী উঠতে বসতে স্বামীকে কটু কথা বলে—

দীপ্তি। যে পুরুষ অপদার্থ, শুধু রাতদিন যে খাতায় ছাই-পাঁশ গল্প-নভেল লেখে, কাব্যি করে আর স্ত্রীর উপার্জ্জনের পয়সায় সিগারেট ফোঁকে, তাকে আমি স্বামী বলে মেনে নিতে পারি না—

বাগচী। (তরুণকে) আপনি নূতন লেখক বুঝি?

তরুণ। আজ্ঞে হাঁ। আমি গল্প লিখি।

বাগচী। পয়সা পান কিছু?

তরুণ। পয়সা! মাথা খারাপ নাকি আপনার?

বাগচী। লেখার চেষ্টা না করে অন্য কাজ করেন না কেন আপনি? জানেন না, এ দেশে লিখে পেটের ভাত হয় না।

তরুণ। কি করব? না লিখলে যে ঘুম হয় না। শরীর-মন খারাপ হয়ে যায়। ছোটকাল থেকে লিখি কি না। আমার লেখার ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে একদিন ও আমাকে ভালবেসে বিয়ে করেছিল জানেন?

বাগচী। এখন ঐ সাহিত্যচর্চ্চার ওপরই আপনার স্ত্রীর সবচেয়ে বেশী আক্রোশ না?

তরুণ। আজ্ঞে হাঁ। ঠিক বলেছেন। বিয়ের আগে ইউনিভারসিটি করিডোরে, আউটরাম ঘাটে, কফি হাউসে ও আমার কত লেখা শুনেছে। আর ওর দুটো চোখের দৃষ্টি নিবিড় হয়ে উঠেছে। ও বলত, আমি চাকরি করে তোমাকে খাওয়াব। তুমি থাকবে তোমার সাধনা নিয়ে।

বাগচী। মেয়েদের মাথায় সিঁদুর দিলেই ওদের সত্তা বদলে যায়, তা আপনি জানেন না বুঝি? সাহিত্যচর্চ্চা কি কোন সুকুমার শিল্পের জন্য সাধনার যে দুঃখ, তা ওরা বোঝে না। খ্যাতি আর প্রতিষ্ঠার প্রতি ওদের অন্ধ আকর্ষণ থাকে। আপনার গলায় ফুলের মালা, রাস্তায় ঘাটে প্যাম্ফলেটে বড় বড় হরফে আপনার নাম প্রচার হলে ওরা সুখী হবে। কোন বই আপনার সিনেমা হয়েছে?

তরুণ। না।

বাগচী। তা হলে সাহিত্যচর্চ্চা ছেড়ে দিন। চাকরির চেষ্টা করুন।

দীপ্তি। সাধু, (হাতঘড়ি দেখে) আমার সময় কম। আমি আজই আমার দাদার বাড়ী চলে যাব। আপনি আপনার 'জুরিসডিকশনের' বাইরে কথা বলছেন। তাড়াতাড়ি আমাকে সেপারেশন সার্টিফিকেট দিন।

তরুণ। সার্টিফিকেটটা দিয়ে দিন সার। আমি একমুহূর্ত্তও টাকার দেমাকে অন্ধ ঐ মেয়েকে সহ্য করতে পারছি না।

বাগচী। (নেপথ্যে তাকিয়ে হেঁকে উঠলেন) সন্তু—সন্তু।

সন্তু। (নেপথ্যে) যাই সার্।

(সন্তুর প্রবেশ)

বাগচী। 'ল এণ্ড ষ্ট্যাটিউটস অফ ডাইভোর্স' এণ্ড ম্যারেজ ম্যানুয়্যাল'টা নিয়ে এস।

সন্তু। কোনটা সার্? ঘর বাঁধা, না, ভাঙার ভল্যুমটা?

বাগচী। ভাঙার ভল্যুম।

দীপ্তি। ভাগ্যিস, আইনটা তৈরী হয়েছিল। তা না হলে ও আমার হাড়মাস কুরে কুরে খেয়ে ফেলত।

তরুণ। যা-তা বল না। তুমিই আমাকে চাকরি খুঁজতে দাও নি। তুমি আমার জীবন থেকে চলে গেলে, মস্তবড় একটা ফাঁড়া আমার কেটে যাবে।

বাগচী। শুনুন, আপনারা দু'জনেই কি বিবাহবিচ্ছেদে পুরো-পুরি রাজী? সাময়িক উত্তেজনা নয় ত? বেশ করে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন।

তরুণ ও দীপ্তি। (একসঙ্গে) ষোল আনা রাজী। অনেক ভেবেছি আমরা।

বাগচী। বেশ। 'দি ল এণ্ড ষ্ট্যাটিউটস অফ ডাইভোর্সে'র সেকশনটা কি বলছে শুনুন।

তরুণ। বলুন।

বাগচী। (চশমা লাগিয়ে, আইন বইটির পাতা উল্টে বললেন) স্বামী যদি দুশ্চরিত্র, উন্মাদ ও কুৎসিত রোগগ্রস্ত কিংবা প্রজননক্ষমতায় অক্ষম হয় একমাত্র তা হলেই সম্ভব হয় ডাইভোর্স—বুঝলেন দীপ্তি দেবী! আপনার স্বামীর ঐ সব দোষ কিছু আছে?

দীপ্তি। আমি আপনার এখানে আসার আগে উকিলের কাছে বুঝে এসেছি। দেখুন একটা এক্সেপশন আছে—স্বামী

বা স্ত্রী, যদি কেউ কারও মনের সুখশান্তি নষ্ট করে, কিংবা তারা পরস্পরকে না ভালবাসে এবং যদি তারা সংসার করতে রাজী না হয়, তা হলেও সেপারেশন হতে পারে।

বাগচী। হ্যাঁ আছে বটে ঐরকম একটা সেকশন। মা, আপনি কি আইন পড়াশোনা করেছিলেন ?

দীপ্তি। আমি ল পড়তাম। ফাইন্যালটা দেওয়া হয়ে ওঠে নি।

[বাগচী হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। সারা মুখে বেদনার কালো ছায়া নেমে এল। ব্যথাভরা গলায় বললেন]

"আপনারা দু'টি কেমন সুন্দর সুস্থ সবল তরুণ-তরুণী। পরস্পরকে ভালবাসেন, স্নেহ মমতা প্রীতি দিয়ে দু'জনে দু'জনকে ভরে দেবেন। তা, না এ সব কি পাগলামি—"

দীপ্তি। আজ্ঞে না। পাগলামি নয়। ওকে বিয়ে করেই পাগলামি করেছি।

বাগচী। প্রেম ভালবাসাই আনসাউণ্ড মাইণ্ডের লক্ষণ। আপনারা বড় সহজে ভালবাসেন। কিছু দিন পরেই সেই ভালবাসা কর্পূরের মত উবে যায়।

দীপ্তি। এসব আপনার অনধিকারচর্চ্চা। আপনি আপনার কাজ করুন।

তরুণ। ওর সঙ্গে বেশী কথা বলবেন না স্যার। আপনি সেপারেশন সার্টিফিকেট দিয়ে দিন।

বাগচী। সার্টিফিকেট দিচ্ছি। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদের প্রার্থনা করছেন কে—আপনি না দীপ্তি দেবী।

তরুণ। আমি—আমি করছি।

বাগচী। তা হলে আপনাকেই কোর্ট ফি খরচ এবং রেজিষ্ট্রেশন ফি দিতে হবে।

তরুণ। কত টাকা ?

বাগচী। পঁচিশ টাকা।

তরুণ। (আর্ত্ত গলায়) পঁচিশ! অত টাকা আমি কোথায় পাব ?

বাগচী। টাকা না দিলে সার্টিফিকেট দিতে পারব না।

তরুণ। (আপন মনে অস্ফুট গলায়) কি পাপ যে করেছি! (পাঞ্জাবীর পকেট থেকে পঁচিশ টাকা বের করে বাগচীর হাতে দিয়ে বলল) আমার প্রিয় বইগুলি বিক্রী করে আপনাকে ফি দিলাম। আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব আজ থেকে—

[বাগচী টাকাটা মনিব্যাগের ভেতরে রেখে, একটা কাগজের ওপরে সার্টিফিকেট লিখতে সুরু করলেন। তরুণ ও দীপ্তি পরস্পর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল)

বাগচী। শুনুন—এই আপনাদের সেপারেশন সার্টিফিকেট। "এতদ্বারা জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, তরুণ রায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি রায় আজ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করে। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করে যে, তাঁহারা আর পরস্পরকে ভালবাসিবে না, কাহারও প্রতি কাহারও কোন দায়িত্ব থাকিবে না। তাঁহারা সুস্থ শরীরে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ মনে এই বিবাহবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছে।" (বাগচী থামলেন, চোখ তুলে তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন।) এই সার্টিফিকেটের নীচে লিখুন, এই অঙ্গীকারপত্র আমার জ্ঞানমতে সত্য।

[তরুণ নিঃশব্দে স্বাক্ষর করল]

বাগচী। দীপ্তি দেবী, আপনি সিগনেচার করুন।

দীপ্তি। সই করব নিশ্চয়ই, কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে।

বাগচী। কি ?

তরুণ। ও মেয়ে কি কম! ও কালী মোক্তারের মেয়ে। দেখুন আবার কি ফ্যাসাদ বাধাবে।

দীপ্তি। আমি ওকে বিয়ে করেছিলাম কালীঘাটে। ও আজও বেকার, সেদিনও বেকার ছিল। তাই কালীঘাটের পুরোহিতের দক্ষিণা, ভোগ, বিয়ের যাবতীয় খরচ আমি দিয়েছিলাম। আমার সেই টাকা ফেরত চাই।

বাগচী। কত খরচ হয়েছিল আপনার ?

দীপ্তি। পঁচিশ টাকা।

বাগচী। (চিন্তিত হয়ে) তাই ত আবার একটা সমস্যায় ফেললেন দেখছি। দি ল এণ্ড ষ্ট্যাটিউটস অফ ডাইভোর্স ম্যানুয়েলে কিন্তু বিয়ের সময়কার খরচটা ফেরত দিতে বলেছে। (তরুণকে লক্ষ্য করে) তরুণবাবু, আপনি পঁচিশটা টাকা ওঁকে দিয়ে দিন।

তরুণ। (দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আক্রোশভরা গলায়) আপনি বলছেন কি ? কোথায় পাব টাকা ? কাল যে কি খাব, তার সংস্থান নেই আমার। ওর টাকায় ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। রাস্তায় গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হবে। আমাকে মাপ করুন স্যার—আমি পঁচিশ পয়সাও দিতে পারব না—

বাগচী। তা হলে আপনাদের সেপারেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

দীপ্তি। না। টাকা আমি চাই নিশ্চয়ই। কিন্তু সেপারেশন সার্টিফিকেটও চাই।

বাগচী। আপনি এত লেখাপড়া শিখেছেন—কিন্তু এমন অবুঝ কেন ?

দীপ্তি। ছোটবেলা থেকেই দুঃখকষ্টের সঙ্গে লড়াই করে বড় হয়েছি। ঐ টাকা আমার রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের উপার্জ্জন। একটা পয়সাও আমি ছাড়ব না।

[চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সন্ত সুইচ টিপে ইলেকটিক লাইট, জ্বালিয়ে দিল।]

বাগচী। আমার আপিস বন্ধ করার সময় হয়ে এল। দীপ্তি-দেবী, আপনি অনুগ্রহ করে আজকের রাত্রিটা স্বামীর সঙ্গে থাকুন।

দীপ্তি। না। এক মুহূর্ত্তও থাকব না।

বাগচী। (ক্রোধে জ্বলে উঠে) আশ্চর্য্য ব্যাপার ত। দীপ্তি দেবী, ইট ইজ মাই অর্ডার। ইউ মাষ্ট পুট এ সিগনেচার ইন দিস ডিক্রী।

দীপ্তি। টাকা?

বাগচী। তরুণবাবু, ইউ আর লায়েবেল টু বি প্রসিকিউটেড ইফ ইউ আর নট এবল টু পে ব্যাক দি মানি ডিমাণ্ডেড বাই হার।

এখন আমার পরনের জামাকাপড় ছাড়া আর কিছু দিতে পারব না সার। একটা পয়সা কাছে নেই, বিশ্বাস করুন।

দীপ্তি। আচ্ছা সার, সেপারেশন সার্টিফিকেটে সিগনেচার দিচ্ছি। কিন্তু তরুণবাবু টাকা না দিলে সার্টিফিকেট নেব না।

বাগচী। বেশ সই করুন।

(দীপ্তি সেপারেশন সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর করল)

কাল বেলা দশটায় আপনারা আসবেন। তরুণবাবু যেমন করে পারেন, পঁচিশ টাকা যোগাড় করে নিয়ে আসবেন। টাকা দিলেই সার্টিফিকেট দিয়ে দেব। এখন আপনারা আসুন। দেড় মাইল দূরে আমার বাড়ী। খুব দেরি হয়ে গেছে—

দীপ্তি। নমস্কার। কাল ঠিক দশটায় আসব।

[দীপ্তি ও তরুণ পরস্পরের পানে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুই বিপরীত দিকে প্রস্থানোদ্যত। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তরুণ নিজের চুলের মুঠো ধরে তীব্র যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল।]

তরুণ। পঁচিশ টাকা! কোথায় পাব আমি টাকা? বিয়ে করে কি পাপ যে করেছি। হা ভগবান! আমাকে তুমি বাঁচাও। (একটু থেমে) শিক্ষিতা, চাকরে মেয়েকে যেন কেউ ভালবেসে বিয়ে না করে—

[বলতে বলতে সে প্রস্থান করল। নেপথ্য থেকে ভেসে এল তার ক্রুদ্ধ গলার স্বর]

ভালবেসে যেন কেউ বিয়ে না করে—

[তার কণ্ঠস্বর দূরে মিলিয়ে গেল। আবার আপিস-ঘরের আড়াল থেকে সেই কোকিলটা ডেকে উঠল]

'ঘরবাঁধা, না হয় ঘরভাঙ্গা'

বাগচী। চল হে সন্তু, যাওয়া যাক। পাতিপুকুরের ঐ কাল-ভার্টের পরে রাস্তায় আবার লাইট নেই। তুমি লণ্ঠনটা ধরিয়ে নাও। কোকিলের খাঁচাটাও নিয়ে এস।

সন্তু। চলুন রাস্তায় লণ্ঠন ধরিয়ে নেব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[মঞ্চে ছায়া ছায়া অন্ধকার নেমেছে। অস্পষ্ট মূর্ত্তির মত দুই জন যুবককে দেখা গেল, যেন কারুর জন্য উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। ঐ দুই জন যুবকের নাম, লালু ও গদা। তারা তরুণ ব্যায়াম সমিতির সভ্য এবং তাদের পাড়ার নবীন সাহিত্যিক তরুণের প্রতি সহানুভূতিশীল।]

লালু। কি ব্যাপার রে গদা? তরুণদা বলল, সেপারেশন সার্টিফিকেট নিয়ে এখখুনি চলে আসবে। কিন্তু—

গদা। আমার মনে হয় দীপ্তি দেবী আবার তরুণদাকে কোন সমস্যায় ফেলেছে।

লালু। সাংঘাতিক মেয়ে বটে!

গদা। (চিন্তিত হয়ে) দেখ লালু, ভালবেসে বিয়ে করে সুখী হয়েছে কেউ—এ রকম কোন স্বামী-স্ত্রী আমি দেখি নি।

লালু। না তোর কথা মানতে পারলাম না। তরুণদা যে বেকার আর দীপ্তিদেবী নিজে উপার্জ্জন করেন কি না, এই জন্যেই তাঁর অত দেমাক।

গদা। (নেপথ্যে তাকিয়ে) ঐ ত তরুণদা আসছে বলে মনে হচ্ছে!

লালু। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ডাকল) এই যে তরুণদা, আমরা এখানে। কি হ'ল? সেপারেশন সার্টিফিকেট পেলেন?

(উদ্‌ভ্রান্তের মত তরুণের প্রবেশ। মাথার চুল উস্কখুস্ক। চোখের তারায় আগুনঝরা দৃষ্টি)

তরুণ। না ভাই, সেপারেশন সার্টিফিকেট পেলাম না। দীপ্তি আমাকে পাগল করে দেবে। আমার মাথা ঘুরছে। উঃ, কি পাপ যে করেছি।

লালু। আহা! অত উতলা হচ্ছেন কেন? ব্যাপারটা খুলে বলুন না? দেখি আমরা কি করতে পারি।

তরুণ। সেপারেশন সার্টিফিকেটের জন্য পঁচিশ টাকা ফি দিয়েছি, তার উপরে আরও পঁচিশ টাকা দীপ্তিকে দিতে হবে।

গদা। কেন?

লালু। কেন দিতে হবে? জুলুম না কি?

তরুণ। দীপ্তি বিয়ের সময় পঁচিশ টাকা খরচ করেছিল, সেপারেশন সার্টিফিকেট নিতে হলে, সেই টাকা ফেরত দিতে হবে।

গদা। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়ে ত?

তরুণ। ও কালী মোক্তারের মেয়ে। ডেঞ্জারাস।

লালু। (একমুহূর্ত্ত কি যেন চিন্তা করে বলল) আচ্ছা তরুণদা, আপনি পঁচিশ টাকা ফি সেই রেজিষ্ট্রারকে দিয়েছেন?

তরুণ। হ্যাঁ, আমার বই বিক্রী করে নগদ পঁচিশ টাকা দিয়েছি।

গদা। কতক্ষণ আগে দিয়েছেন?

তরুণ। এই ত মিনিট কুড়ি আগে।

লালু। রেজিষ্ট্রার ত এই পথ দিয়েই বাড়ী যাবে। বুড়ো কলোনীতে থাকে। (গদাকে ইঙ্গিত করে) গদা তুই—

তরুণ। তোরা আমাকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার কর ভাই। পকেটে একটা পয়সা নেই। কাল কি করে দিন চলবে, তার কোন উপায় নেই। তার উপরে পঁচিশ টাকা দিতে হবে।

লালু। আচ্ছা তরুণদা আপনি সোজা আমাদের বাড়ীতে চলে যান ত। আপনি বিশ্রাম করুন।

গদা। আপনার পঁচিশ টাকা আমরা যোগাড় করছি।

তরুণ। তোরা পঁচিশ টাকা দিতে পারবি? পারবি ভাই?

লালু। হ্যাঁ হ্যাঁ, পারব। আপনি চলে যান ত?

তরুণ। আমি তা হলে ঐ ছিনে জোঁকের হাত থেকে উদ্ধার পাব?

গদা। আপনার ওপরে অন্যায় জুলুম হবে আমরা থাকতে? যান—টাকা আপনি পাবেন।

তরুণ। তোদের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোরা আমাকে বাঁচালি ভাই।

[প্রস্থান]

লালু। গদা, তুই দৌড়ে আমাদের বাসায় গিয়ে আমার ছোট ভাইয়ের কাছে থেকে মুর্গীহাটার টয় পিস্তলটা নিয়ে আয় ত?

গদা। টয় পিস্তল দিয়ে কি হবে?

লালু। আঃ, যা বলছি—তা কর না। যা—

[গদার প্রস্থান]

(নেপথ্য থেকে একটা আলোর রেখা আছড়ে পড়ল মঞ্চে। মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল। লালু চোখের পলকে আড়ালে মিলিয়ে গেল। সন্তু আগে এক হাতে লণ্ঠন আরেক হাতে কোকিলের খাঁচা নিয়ে, পরে মিঃ বাগচীর প্রবেশ।

বাগচী। রাস্তাটা বড় নির্জন না হে সন্তু? পকেটে টাকা আছে। আমার গা কেমন ছমছম করছে।

সন্তু। এত করে বললাম, টাকাটা আপিসের দেরাজে রেখে দিয়ে আসি। তা আপনি কথাটা কানেই তুললেন না।

বাগচী। রাস্তাটাও এত অন্ধকার! মিউনিসিপ্যালিটিকে তিন বার লিখলাম, রাস্তায়—অন্ততঃ ঐ কালভার্টটার কাছে, একটা আলো দিতে। তারা সে কথায় কান দিলে না। ও সন্তু, আস্তে হাঁট। আমি আবার রাত্তিরে চোখে ভাল দেখি না।

সন্তু। আস্তে হাঁটলে এই জঙ্গলে-ঘেরা জায়গাটা পার হতেই যে রাত আটটা বেজে যাবে সার!

বাগচী। ওহে সন্তু, আমার যে ভয়ভয় করছে হে! সরকারী টাকা! একটা কিছু হলে—

(হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে লালু ও গদার প্রবেশ। তাদের মুখে কালো রুমাল বাঁধা)

সন্তু। কে—কে—কে? তোমরা?

(ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগল সন্তু। লণ্ঠনটা মাটিতে পড়ে গিয়ে দপ করে নিভে গেল। কোকিলের খাঁচাটা ফেলে দিল ভয়ে। মঞ্চে ঘন অন্ধকার নেমে এল। ভীত হয়ে দৌড়ে প্রস্থান করতে করতে সন্তু চীৎকার করে বলল)

"সার—ডাকাত—ডাকাত সার—ওরা আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে।"

লালু। (ভীত,পাথুরে মূর্ত্তির মত স্থাণু বাগচীর পানে তাকিয়ে) হ্যাণ্ডস আপ!

(বাগচী দুই হাত তুলে ককিয়ে চীৎকার করে উঠলেন)

বাগচী। কি চাও তোমরা? আমাকে মেরে ফেলবে?

গদা। আপনার কাছে যত টাকা আছে, দিয়ে দিন।

লালু। (টয় রিভলবার নাচিয়ে বলল) দেরি করবেন না—তাড়াতাড়ি বের করুন টাকা।

বাগচী। কিছু নেই—বিশ্বাস করুন।

লালু। ফের মিথ্যা কথা? দেখছেন আমার হাতে পিস্তল রয়েছে—কোন কথা বলার চেষ্টা করলেই ট্রিগারে আমার আঙুলটা চেপে বসবে আর—

বাগচী। না—না খুন করো না। দিচ্ছি টাকা—নিশ্চয়ই দেব। বাড়ীতে আমার বৌ রয়েছে, ছোট ছেলেমেয়েগুলো একেবারে অনাথ হয়ে যাবে। আমি ছাড়া ওদের কেউ নেই—কেউ নেই।

গদা। কান্নাকাটি করে সময় নষ্ট করবেন না। তাড়াতাড়ি দিয়ে দিন টাকা।

বাগচী। টাকা নিশ্চয়ই দেব। কিন্তু তোমরা কে? কেন তোমরা আমার উপর এই অন্যায় জুলুম করছ?

লালু। আমাদের পাড়ার কোন তরুণ সাহিত্যিকের উপর অবিচার হয়েছে। তাই।

বাগচী। ওঃ! তোমরা তরুণবাবুর লোক। তা সে ত তাদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার। তোমরা—

গদা। কোন কথা শুনতে চাই না। টাকা বের করুন।

লালু। দেরি করবেন না। প্লিজ বি কুইক।

বাগচী। টাকা আছে—কিন্তু সে ত সরকারী টাকা!

লালু। সেই টাকাই দরকার। দিন। ওয়ান—টু—

বাগচী। না—খুন করবেন না। দিচ্ছি—টাকা দিচ্ছি।

(বাগচী কাঁপা হাতে পনের টাকা বের করে লালুর হাতে দিয়ে বললেন)

আর আমার কাছে কিছু নেই—বিশ্বাস করুন।

লালু। মিথ্যা কথা। আপনার কাছে আরও দশ টাকা আছে। দিয়ে দিন।

বাগচী। (কেঁদে ফেললেন) গবর্ণমেণ্টের টাকা। আমার জেল হবে—আমার চাকরি যাবে।

গদা। লালু, রাস্তায় কার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

লালু। তা হলে টাকা আপনি দেবেন না। ওয়ান-টু।

বাগচী। খুন করবেন না। আমার স্ত্রী-পুত্র পথে বসবে—দিচ্ছি, সব দিয়ে দিচ্ছি।

(আরও দশ টাকা লালুর হাতে দিয়ে, তার পায়ের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বাগচী)

বিশ্বাস করুন। আমার কাছে আর কিছুই নেই।

লালু। আপনি এখন স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।

(লালু ও গদা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল)

বাগচী। (চীৎকার করতে করতে প্রস্থান) পুলিস—পুলিস। আমি রেজিষ্ট্রার, গবর্ণমেণ্ট সারভেণ্ট! আমার ওপরে রাহাজানি! দেখে নেব—আমি দেখে নেব।

তৃতীয় দৃশ্য

[অবিকল প্রথম দৃশ্যের মত দৃশ্যপট, বেলা দশটা—নেপথ্যে দ্রুত পায়ের আওয়াজ হ'ল। সন্তু নেপথ্যে তাকিয়ে বলল]

"সার! আবার ঐ দুটো খ্যাপাটে স্বামী স্ত্রী আসছে।"

(তরুণ ও দীপ্তির প্রবেশ)

বাগচী। তরুণবাবু, টাকা নিয়ে এসেছেন। দীপ্তি দেবীকে টাকা দিতে না পারলে কিন্তু সেপারেশন সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।

সন্তু। (বাগচীর কাছে সরে এসে) সার কাল রাত্রের ব্যাপারটা একটু বলবেন ত লোকটাকে।

বাগচী। থাম তুমি—তোমাকে মাতব্বরি করতে হবে না।

দীপ্তি। তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট দিন। না হলে একটা ব্যবস্থা করুন। টাকা নিশ্চয়ই তরুণবাবু আনতে পারেন নি।

তরুণ। টাকা আমি নিয়ে এসেছি সার। আপনি সেপারেশন সার্টিফিকিট দিন।

বাগচী। বেশ, টাকাটা দীপ্তি দেবীকে দিয়ে দিন। আমি সেপারেশন সার্টিফিকেট দুটো কপি করে দুজনকে দিচ্ছি।

(তরুণ, টাকাটা দীপ্তির হাতে দিয়ে বলল)

"টাকাটা ভাল করে গুনে নিন আপনি। ঠিক পঁচিশ টাকাই পেয়েছেন কি না দেখুন।"

(দীপ্তির চোখেমুখে ব্যথার ছায়া নেমে এল। মৃদু গলায় বলল)

"গুনতে হবে না। তুমি কি আমাকে কম দেবে?"

তরুণ। কৈ সার, সেপারেশন সার্টিফিকেটের কপি আমাকে দিন।

বাগচী। (তরুণের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে) তরুণবাবু, একটা কথা আমাকে বলবেন?

তরুণ। কি?

বাগচী। এই টাকা আপনি কোথায় পেলেন?

তরুণ। মানে?

বাগচী। কাল রাত্রে আপনার নাম করে দু'জন ষণ্ডা গোছের ছোকরা আমার কাছ থেকে পঁচিশ টাকা কেড়ে নিয়েছে।

তরুণ। সে কি!

বাগচী। হ্যাঁ মশাই, দস্তুরমতরি ভলবার উচিয়ে ভয় দেখিয়ে কেড়ে নিয়েছে। ছেলে দুটো আপনার কথা বলল। আপনাকে আমি পুলিসে দেব। আপনি গুণ্ডাদের—

তরুণ। কি বলছেন পাগলের মত। আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে না কি? তারা যে আমার নাম বলেছে, তার প্রমাণ কি?

বাগচী। তা হলে আমি মিথ্যা বলছি?

তরুণ। কে না কে, ভয় দেখিয়ে আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে গেল। আর দোষ হ'ল আমার?

বাগচী। কিন্তু তারা স্পষ্ট আপনার নাম করল যে।

তরুণ। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে আপনার কাজ করুন। সেপারেশন সার্টিফিকেটের কপি দিন।

বাগচী। আপনি সাহিত্যিক নন—আপনি—

তরুণ। অকারণে আমাকে ইনসাল্ট করবেন না। সার্টিফিকেট দিন।

বাগচী। দিচ্ছি। সন্তু, কপিদুটো দুই জনের হাতে দিয়ে দে। (সন্তু আপিসের সীল মেরে কাগজদুটো দুই জনের হাতে দিল। তরুণ ও দীপ্তি স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রইল)

বাগচী। আপনারা এখন মুক্ত।

দীপ্তি। (তরুণকে) তুমি এখন কি আমাদের ফ্ল্যাটে ফিরবে?

তরুণ। তোমাদের ফ্ল্যাটে মানে?

দীপ্তি। রাত্রে কোথায় থাকবে বল? তোমার ত কোন থাকবার জায়গা নেই, এই মাস পর্যন্ত ফ্ল্যাটের ভাড়া-দেওয়া আছে। তুমি আজ রাতের মত ঐ বাড়ীতে থাকতে পার।

তরুণ। না, আমি গাছতলায় থাকব কিংবা কোন দোকানের বাঁশের মাচায় শুয়ে রাত কাটাব। তবুও তোমার টাকায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে আমি এক মুহূর্তও থাকব না।

দীপ্তি। রাত্তিরে কোথায় ভিখিরীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াবে? তুমি অত রাগ করছ কেন লক্ষ্মীটি! শোন আমাদের শোয়ার ঘরে আমার দামী দেয়াল-ঘড়িটাতে আজ চাবি দেওয়ার দিন। তুমি রাত্রে থাকবে এবং চাবি দেবে।

তরুণ। তোমার ঘড়িতে চাবি দেওয়ার জন্ত আমাকে ঐ বাড়ীতে ফিরতে হবে? আচ্ছা আব্দার ত!

দীপ্তি। অত উঁচুতে ঘড়িটা টাঙানো আছে—তুমি ত জান আমি নাগাল পাই না। বরাবর তুমিই ত চাবি দিতে।

তরুণ। তুমি নিশ্চয়ই তোমার দাদার বাড়ীতে যাবে?

দীপ্তি। (ব্যথার ছায়া ফুটে উঠল তার মুখে) যাব কি না ঠিক নেই। গতকাল রাত্রে দাদার বাড়ীতে থেকেছিলাম। দাদা-বৌদি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেন নি।

তরুণ। তবে তোমার কোন বন্ধুর বাড়ীতে যাও। তুমি ত আমাকে ছেড়ে থাকার জন্ত উন্মাদ হয়ে উঠেছিলে।

দীপ্তি। (করুণ বিষণ্ণ গলায়) দেখ তোমার উপরে আমার কোন জোর নেই। তবুও তুমি পরিচিত বন্ধু বলে অনুরোধ করছি—ফ্ল্যাটে আমার অনেক দামী জিনিস আছে। তুমি একটা রাত থাক লক্ষ্মীটি!

তরুণ। বেশ—বেশ একটা রাত না হয় থাকলাম। কিন্তু

সবাই জানে আমার সঙ্গে তোমার জুডিশিয়াল সেপারেশন হয়েছে। পাড়ার লোক, তোমার টাকায় ভাড়া করা ফ্ল্যাটে আছি বলে যদি ঠাট্টাবিদ্রূপ করে!

দীপ্তি। পাড়ার লোকের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? তাই বলে তুমি রাত্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে? সেপারেশন ত হয়েই গেছে। তোমার সঙ্গে ত আমি থাকছি না।

তরুণ। সে ত তুমি চাও না! আমিও চাই না।

দীপ্তি। হ্যাঁ। সেকথা অবান্তর। আমি তা হলে আমার কাকার ওখানেই যাই আপাততঃ।

তরুণ। কিন্তু অত বড় ফ্ল্যাটটায় আমি একলা থাকব? আর অত দামী ঘড়ি! যদি চাবি দিতে গিয়ে খারাপ হয়ে যায়, কি যদি চুরি হয়ে যায়?

দীপ্তি। দামী ঘড়ি তাতে হয়েছে কি? ঘড়িটা চাবি দিতে কি ওটাকে পাহারা দিতে আমাকে তোমার সঙ্গে যেতে হবে? তুমি একটা অপদার্থ! এই জন্যেই তোমার সঙ্গে আমার বনিবনাও হয় না।

তরুণ। বেশ তাই যাচ্ছি—

(প্রস্থানোদ্যত হতেই দীপ্তি ডাকল)

দীপ্তি। শোন—শোন চলে যাচ্ছ যে!

তরুণ। (ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে) কি, আবার ডাকছ কেন?

দীপ্তি। সকালে ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলাম। রান্নাঘরে তাকের ওপরে কিছু মাছ ভাজা আছে। তুমি রান্না করে নিও। মাছগুলো নষ্ট হয়ে যাবে?

তরুণ। না, না, ওসব আমাকে দিয়ে হবে না।

দীপ্তি। আঃ, অত অস্থির হচ্ছ কেন? পাশের বাড়ীর হরি-নারায়ণ বাবুর বৌকে বলো রান্না করে দেবে।

তরুণ। (ব্যঙ্গের সুরে) খুব যে দরদ দেখছি তোমার। আমার খাওয়ার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি চলি—

দীপ্তি। অত ছটফট করছ কেন? যাবেই ত।

(ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে, ষ্টিম লণ্ড্রীর একটা রসিদ বের করল)

শোন, আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। এই কাপড়গুলোর আজকেই 'ডেলিভারী ডেট,' তুমি লণ্ড্রী থেকে নিয়ে আসবে।

তরুণ। (রসিদ হাতে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে) আমার দুটো পাঞ্জাবী আছে—কিন্তু তোমারও যে তিনখানা শাড়ি আছে। তোমাকে আমি কোথায় পাব?

দীপ্তি। কেন? আমার কাপড়গুলো দাদার পৌঁছে দেবে। পারবে না?

তরুণ। না। কেন যাব আমি তোমার দাদার বাসায়? (কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করে) তার চেয়ে আমার সঙ্গে এখনি লণ্ড্রীতে চল না কেন, ডেলিভারী দিয়ে, তোমার কাপড় তোমাকে দিয়ে দেব।

দীপ্তি। (চোখদুটি উল্লাসে ঝকমক করে উঠল] তোমার সঙ্গে যাব—তুমি বলছ? চল। তাই ভাল হবে।

তরুণ। চল।

[দু'জনে প্রস্থানোদ্যত হতেই তীব্র গম্ভীর গলায় বাগচী বললেন]

"থামুন। একসঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন আপনারা?"

[তরুণ ও দীপ্তি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনে ঘুরে দাঁড়াল। দীপ্তির মুখে লজ্জার ছায়া পড়ল। তরুণ বলল]

"একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেও পারব না?"

বাগচী। না। দি ল এণ্ড ষ্ট্যাটিউটস অফ ম্যারেজ এণ্ড ডাইভোর্স-এর নামে বলছি, আইন অমান্য আপনারা করতে পারেন না। নিবিড় ভালবাসায় ভরা দুটো হৃদয় থেকে ঘৃণা আর রাগ মুছে গিয়েছে দেখে খুব খুশী হয়েছি। কিন্তু রাষ্ট্রের নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শৃঙ্খলার যে ব্যবস্থা রয়েছে আপনারা তার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন না।

[দীপ্তি পরম আদরে তরুণের ডান হাতটা জড়িয়ে ধরল।]

তার চোখে আশঙ্কার কালো ছায়া পড়ল। রেজিষ্ট্রারের আইন যেন তরুণকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। বাগচীর মুখে মৃদু হাসি ফুটল]

বাগচী। অবশ্য আমি রেজিষ্ট্রার হিসেবে বিবাহবিচ্ছেদের সার্টিফিকেট যেমন দিই তেমনি বিয়েও দিই—

দীপ্তি। বিয়ের জন্য রেজিষ্ট্রেশন ফি কত?

বাগচী। কোর্ট ফি এবং আনুষঙ্গিক খরচ মিলিয়ে ঐ—

সন্তু। পঁচিশ টাকা।

দীপ্তি। পঁচিশ টাকা?

তরুণ। পঁচিশ টাকা?

দীপ্তি। [কাতর করুণ চোখে তরুণের দিকে তাকিয়ে] তরুণ!

তরুণ। কি? কিছু বলবে আমাকে?

দীপ্তি। তুমি আমাকে—

তরুণ। তোমাকে বিয়ে করতে বলছ আবার? [ম্লান হেসে] আজ থেকে চার বছর আগে আউটরাম ঘাটে দাঁড়িয়ে এক মেঘলা দুপুরে তুমি এই ভাবেই ত আমাকে বিয়ে করতে বলেছিলে দীপ্তি—

[দীপ্তির চোখে সজল ছায়া পড়ল। কান্নাভরা গলায় বলল] "আজ কোর্টে, রেজিষ্ট্রি আপিসে দাঁড়িয়ে বলছি তরুণ, তোমাকে আর আমি কষ্ট দেব না, তোমার মনে দুঃখ দেব না। তুমি যে মুহূর্ত্তে আমার জীবন থেকে বিদায় নিচ্ছ, ঠিক তখনি আমি বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে কত গভীর ভাবে ভালবাস—

তরুণ। তোমার তা হলে হৃদয় আছে? কিন্তু তুমি যে স্বাধীন মেয়ে দীপ্তি। শুধু তাই নয়। শিক্ষিতা এবং উপার্জ্জনক্ষম।

দীপ্তি। তুমি লেখক, এটুকু জান না, নারী যতই স্বাধীন হোক, কি চাকরি করুক তার নারীত্বের সার্থকতা কিন্তু পুরুষের সঙ্গে প্রেম-ভালবাসার বন্ধনে। তোমাদের ছাড়া আমাদের চলে না তরুণ—

[মিঃ বাগচী মাথা নীচু করে খস খস করে বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট লিখছিলেন। সন্তু শব্দ করে দুটো কপিতে আপিসের সিল লাগিয়ে দিল। দীপ্তি হাতব্যাগ থেকে পঁচিশ টাকা বের করে বলল]

"এই নিন আমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন ফি।"

বাগচী। [দুটো নকল দুজনের হাতে দিয়ে] এই নিন আপনাদের বিয়ের সার্টিফিকেট।

[তারা দুজনেই নকল হাত পেতে নিল। দীপ্তি ব্যস্ত হয়ে হাতঘড়ি দেখে বলল]

"চল—চল তরুণ। আপিসে লেট হয়ে যাবে—"

[হাতে হাত দিয়ে তরুণ ও দীপ্তির দ্রুত প্রস্থান]

বাগচী। দুনিয়াটা একটা চিড়িয়াখানা হে সন্তু! আরও কত যে দেখতে হবে।*

যবনিকা

* ও'. হেনরীর একটি গল্পের ছায়া অবলম্বনে।

সুরশিল্পী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

গান গাই আমি বীণা বেণুও বাজাই,
ভুবনে আনিয়া দিই কমনীয়তাই।
গড়ে তুলি সুরলোক যথায় তথায়,
দীনের কুটীরে রহি বাজার সভায়।
ভাবীরে নিকটে আনি, অতীতে জীয়াই।

২

সুর মোর দ্রিম্ দ্রিম্ তাদ্রিম্ তাদ্রিম্—
মরু হতে,তাপ আনি, মেরু হতে হিম।
রেশ আনি সুদূরের গীতি গন্ধের,
স্মৃতি আমি ফিরে আনি জনমান্তের,
ধ্বনি আমি ক্ষণিকের, তবুও অসীম।

৩

শব্দ-সাগর যথা সুধা যে আমার—
মোর 'পরে সুধা পরিবেশনের ভার।
আমার এ সৃষ্টির নাহি যেন ওর,
দেখি আর হয়ে থাকি পুলকে বিভোর,
সুরে রচি রবি শশী তারকার হার।

৪

এনে দিই কালজয়ী কত দুখ সুখ,
আনি রামায়ণ মহাভারতের যুগ।
মানসসরের আনি মরালের ঝাঁক,
দেবীর চরণ ছোঁয়া পদ্মপরাগ—
অজানা লাবণ্যেতে ভরে দিই বুক।

৫

ভাসাই ডোবাই আমি জ্বালাই আগুন
শোভার শরৎ আনি—ফুলন ফাগুন।
ঘনাইয়া ছুটে আসে আষাঢ় শ্রাবণ
ভাবের প্লাবনে গড়ি নব দেহ মন।
ফুল হয় ধরা—শুনি মোর গুনগুন্।

৬

সুরে মোর যত ব্যথা তত মমতা,
ভস্মেতে রাজসূয় যজ্ঞ-কথা—
মানুষে জাতিস্মর করিতে জানি,
হারানো মণি যে কত কুড়ায়ে আনি—
সুধা ভরা কত মধু নিশি বিগতা।

কালিদাস সাহিত্যে 'নদী'

শ্রীরঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাস তাঁহার সাহিত্যের স্থানে স্থানে নদী সম্বন্ধে নানাভাবে বর্ণনা ও উপমা দিয়াছেন, এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখানো গেল।

বরযাত্রীদের লম্বা দল নগরের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছে শুনিয়া কন্যাপক্ষের লম্বা দল নগরের দ্বার খুলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া দুই পক্ষ মিলিত হইয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, এই দৃশ্যটিকে মহাকবি নদীর সহিত উপমা দিয়া বর্ণনা করিতেছেন—

'সমীয়তুর্দূরবিসর্পিঘোষৌ
ভিন্নৈকসেতু পয়সামিবৌঘৌ॥' (কু—৭।৫৩)

যেন দুইটি জলস্রোত মাঝখানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উচ্চশব্দে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গেল।

দুইটি জলস্রোত বিপরীত দিক হইতে আসিয়া তাহাদের মাঝখানের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া যখন তুমুল শব্দে পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া একই পথে প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন তাহাদিগকে যেমনটি দেখায়, ঠিক তেমনটি দেখাইল যখন বরযাত্রীর দল আর কন্যাযাত্রীর দল পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়া একসঙ্গে নগরের ভিতরে চলিতে লাগিলেন।

রাজা বাহির হইয়াছেন দিগ্বিজয়ে, চলিয়াছেন পূর্ব্বদিকে। প্রথমে রাজা, পশ্চাতে অসংখ্য সৈন্য—মহাকবি এই অভিযান নদীর সহিত উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

'স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্ব্বসাগরগামিনীম্।
বভৌ হরজটা-ভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥' (রঘু—৪।৩২)

রাজা যখন বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাতে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন তখন দেখাইতেছিল যেন ভগীরথের পশ্চাতে গঙ্গার তরঙ্গ শিবের জটা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পূর্ব্বসাগরে মিলিত হইতে চলিয়াছে।

'মেঘদূতে' মহাকবি একটি বেশ অভিনব উপমা রচনা করিয়াছেন, হিমালয়ের শিখর হইতে নামিয়া আসিতেছে ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ, দেখাইতেছে যেন স্বর্গে উঠিবার জন্য প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে।

যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

'তস্মাদ্ গচ্ছেদনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয় স্বর্গসোপানপঙক্তিম্॥' (পূ-মে—৫১)

'সেখান হইতে চলিয়া যাইও হিমালয়ের উপর যেখান হইতে নামিয়া আসিতেছে জাহ্নবীর প্রবাহ, দেখিলে মনে হয় যেন সগর-রাজার সন্তানদের স্বর্গে যাইবার জন্য সিঁড়ির ধাপের পর ধাপ নির্ম্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে, পর্ব্বতের পথ প্রস্তরময়, কোথাও উঁচু কোথাও বা নীচু তাহার উপর দিয়া নামিয়া আসিতেছে জাহ্নবীর স্রোত, যেন ধাপের পর ধাপযুক্ত এক বিরাট সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া স্বর্গের সহিত মর্ত্ত্যকে যুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে।

এখানে যেমন হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রবাহিতা গঙ্গার প্রবাহকে স্বর্গে উঠিবার সিঁড়িরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তেমনি 'পূর্ব্বমেঘের'ই আর একস্থানে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিতা রেবা বা নর্ম্মদা নদীকে কালো হাতীর দেহে ভস্মের রেখা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—

'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥' (পূ-মে—১৯)

বিন্ধ্যপর্ব্বতের পাদদেশ দিয়া প্রস্তরময় পথ দিয়া প্রবাহিতা রেবা নদীর শীর্ণ স্রোত, দেখিলে মনে হইবে বুঝি হস্তীর দেহের উপর ভস্মের রেখা চিত্রিত রহিয়াছে।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্ণ কালো, দূর হইতে দেখায় যেন প্রকাণ্ড এক কালো হাতী, আর পর্ব্বতের উপর দিয়া প্রবাহিতা নর্ম্মদা নদীর স্বচ্ছ শীর্ণ জলস্রোত যেন হাতীর দেহে ভস্মের দ্বারা রচিত শুভ্র রেখাটি।

নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহারই একস্থানে জলের উপর সারি বাঁধিয়া পাখীরা ভাসিয়া রহিয়াছে, মহাকবি এই পক্ষীশ্রেণীকে নদীর মেখলা বা কাঞ্চী বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন—

'বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণি কাঞ্চীগুণায়াঃ' (পূ-মে—২৯)।

নদীর তরঙ্গের উপর পাখীরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ভাসিয়া রহিয়াছে, (দূর হইতে) দেখাইতেছে যেন উহারা নদীর মেখলা—নদীর শোভা বৃদ্ধি করিতেছে।

মহাকবি এখানে নদীকে নারীরূপে কল্পনা করিয়া সোনালী রঙের চক্রবাকপাখীদিগকে নারীর মেখলা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু 'রঘুবংশে' স্বয়ং নদীকেই নগরীর মেখলা রূপে কল্পনা করিয়াছেন। মাহিষ্মতী নগরীর প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলিয়াছে রেবা নদী, মহাকবি তাহা দেখিয়া বলিতেছেন—

মাহিষ্মতীব প্রনিতম্ব-কাঞ্চীম্। (রঘু—৬।৪৩)

মাহিষ্মতী নগরীর নিতম্বে যেন মেখলা শোভা পাইতেছে।

নর্ম্মদা নদী যেন মাহিষ্মতী নগরীর রশনাদাম।

রেবা নদীর জল স্বচ্ছ বলিয়া মহাকবি যেমন তাহাকে মাহিষ্মতী নগরীর কাঞ্চী বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তেমনি যমুনার জল কালো

বলিয়া তাহার প্রবাহকে মথুরা নগরীর কালো কেশ বলিয়া উপমা দিলেন—

'তত্র সৌধগতঃ পশ্যন্ যমুনাং চক্রবাকিনীম্।
হেমভক্তিমতীং ভূমেঃ প্রবেণীমিব পিপ্রিয়ে॥' (রঘু—১৫.৩০)

'সেখানকার অট্টালিকার উপর হইতে যখন দেখিতে পাইবে চক্রবাকপাখী-শোভিত যমুনার জল শহরের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, নিশ্চয়ই তোমার মনে হইবে বুঝি নগরীর কালো কেশের রাশির মাঝে মাঝে স্বর্ণের রেখা শোভা পাইয়াছে, মন তোমার আনন্দে ভরিয়া যাইবে।'

কালিন্দীর কালো জল যেন মথুরার আলুলায়িত কালো কেশ, আর জলের মাঝে মাঝে ভাসমান সোনালী রঙের চক্রবাকপাখী যেন কালো কেশের মাঝে সোনার নির্মিত গুটিকয়েক 'পিন' বা 'কাঁটা'।

বহু ঊর্দ্ধ হইতে—সেই আকাশপথ হইতে—নিম্নে পৃথিবীর উপর প্রবাহিতা নদীর স্রোতকে কিরূপ দেখায়, মহাকবি তাহা কল্পনানেত্রে দেখিয়া যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে শুনাইতেছেন। মেঘ যখন চর্ম্মণ্বতী নদীর নিকটে গিয়া তাহার জল পান করিতে থাকিবে, তখন—

'প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন-গতয়ো নূনমাবর্জ্যদৃষ্টী
রেকং মুক্তাগুণমিবভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥' (পূ-মে-৪৭)

আকাশে যাহারা বিচরণ করে (এ দৃশ্য দেখিলে) তাহাদের মনে হইবে নদীটি যেন বসুন্ধরার কণ্ঠে এক ছড়া মুক্তার হার, আর মধ্যে তুমি (কালো মেঘ)—যেন সে মুক্তাহারের মাঝে বড় একখানি নীলমণি বসান রহিয়াছে।

নদীর স্বচ্ছ জল যেন ধরার কণ্ঠে একগাছা সুচিক্কণ মুক্তার হার, আর তার মধ্যে কালো মেঘ, যেন মুক্তাহারের মাঝে বসান একখানি নীলমণি।

'মেঘদূতের' মত 'রঘুবংশে'ও কালিদাস পৃথিবীর উপর প্রবাহিতা নদীকে আকাশপথ হইতে বসুন্ধরার কণ্ঠে শোভিত একছড়া মুক্তার মালার মত দেখায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

'মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥' (রঘু-১৩।৪৮)

পর্ব্বতের নিকট দিয়া প্রবাহিতা মন্দাকিনীর জলস্রোত (আকাশ-পথ হইতে) দেখাইতেছিল যেন বসুন্ধরার কণ্ঠে একছড়া মুক্তার মালা শোভা পাইতেছে।

মেঘ যখন আকাশ হইতে নদীর উপর নামিয়া আসিয়া তাহার স্বচ্ছ জল পান করিতে থাকে, আর জলের মধ্যে তাহার কালো ছায়াটি পড়ে তখন কিরূপ দেখায় তাহা বুঝাইবার জন্ম মহাকবি যক্ষের মুখ দিয়া মেঘকে বলিতেছেন:

"সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত যমুনা-সঙ্গমেবাভিরামা॥' (পূ-মে-৫২)

'স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জলের মধ্যে যখন তোমার ঐ (কালো) ছায়াটি পড়িয়া থাকিবে, দেখিলে মনে হইবে স্থানটি প্রয়াগ না হইলেও এখানেও বুঝি গঙ্গা-যমুনার মিলনের মনোহর দৃশ্যটিই দেখা যাইতেছে।'

মহাকবি আরও একস্থানে—সে স্থানটি যদ্যপি প্রয়াগ নয়, তবু সেখানেও যেন গঙ্গা-যমুনার মিলনদৃশ্য দেখা যাইতেছে—এই ভাবটি বর্ণনা করিয়াছেন:

'যস্যাবরোধস্তনচন্দনানাং
প্রক্ষালনাদ্বারি-বিহার-কালে।
কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি
গঙ্গোর্মিসংসক্ত জলেব ভাতি॥' (রঘু-৬।৪৮)

যাঁহার অন্তঃপুরের নারীরা যখন এখানকার (মথুরার) যমুনার নীরে জলক্রীড়া করিতে থাকেন আর তাঁহাদের বক্ষলিপ্ত চন্দন নদীর জলে প্রক্ষালিত হইয়া যায়, মনে হয় বুঝি মথুরায় গঙ্গা না থাকিলেও, গঙ্গা-যমুনায় মিলনদৃশ্য দেখা যাইতেছে।

মথুরায় গঙ্গা নাই, তবু যমুনা নদীতে জলক্রীড়া করার সময় মথুরারাজ সুষেণের অন্তঃপুরবাসিনীদের দেহে লিপ্ত শ্বেত চন্দন যখন যমুনার জলে মিশিয়া যাইতে থাকে ও জলের কতক অংশ শ্বেত হইয়া যায় তখন দেখায় যেন যমুনার কালো জলের সঙ্গে গঙ্গায় সাদা জল মিশিয়া যাইতেছে।

মহাকবি দুই স্থানে গঙ্গা-যমুনার কাল্পনিক মিলনকে উপমা করিয়া বর্ণনা দিলেন, 'মেঘদূতে'গঙ্গার স্বচ্ছ শুভ্র জলের উপর মেঘের কালো ছায়া, আর 'রঘুবংশে' যমুনার কালো জলে শ্বেত চন্দনের রাশি। দুইটি উপমা উপভোগ্য, কিন্তু 'রঘুবংশে'র ত্রয়োদশ সর্গে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন কাল্পনিক মিলন নয়, প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার প্রকৃত মিলনদৃশ্য, একটি বা দুইটি উপমা দিয়া নয়, দিয়াছেন পর পর সাতটি উপমা, এখানে তাহাদের সব কয়টি দেখান গেল।

যমুনার কালো জল মিশিয়া যাইতেছে গঙ্গার শুভ্র জলের সাথে, দেখাইতেছে যেন—

একছড়া মুক্তার হারের মাঝে মাঝে ইন্দ্রনীলমণি যুক্ত করিয়া দেওয়ায় তাহারা মুক্তাগুলির উপর নীল আভা বিস্তার করিতেছে; যেন একটা শ্বেতপদ্মের মালার মাঝে মাঝে নীলপদ্ম গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে; যেন রাজহংসের শ্রেণীর সাথে নীলহংসের শ্রেণী মিশিয়া গিয়াছে; যেন বসুন্ধরার মুখের উপর শ্বেতচন্দনে অঙ্কিত রেখার পাশে কৃষ্ণ অগুরুর পত্ররচনা দেখা যাইতেছে; যেন ঘন ছায়ায় অন্ধকার চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নাকে জড়াইয়া রহিয়াছে; যেন শঙ্করের অঙ্গে অঙ্কিত বিভূতিরেখার পাশে কালো কালো সাপ শোভা পাইতেছে।

'পুষ্পক' বিমানে বসিয়া লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময় নিম্নে প্রবাহিতা সরযূ নদীকে দেখিয়া রাম বলিতেছেন:

'সামান্য ধাত্রীমিব মানসং মে
সম্ভাবয়ত্যুত্তর-কোশলানাম্॥' (রঘু-১৩।৬২)

যে সরযূ নদীর জল স্তনদুগ্ধের মত পান করিয়া উত্তরকোশলের

অধিবাসীরা সংবর্ধিত হন, ও যাহার তটরূপ ক্রোড়ে অবস্থান করিতে পাইয়া তাঁহারা সুখ অনুভব করেন, "সকলের ধাত্রীস্বরূপা ওই সরযূকে দেখিতে পাইয়া মন আমার প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে।"

এ শ্লোকে যেমন সরযূনদীকে সকলের ধাত্রী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহারই পরের শ্লোকে রামচন্দ্র তাঁহাকে বিধবা জননীর মত স্নেহময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :

'সেয়ং মদীয়া জননীব তেন
মান্যেন রাজ্ঞা সরযূর্বিযুক্তা।
দূরে বসন্তং শিশিরানিলৈর্মাং
তরঙ্গহস্তৈরুপ গূহতীব।' (রঘু-১৩.৬৩)

বহুদূরে বাস করার পর আবার আমি ফিরিয়া আসিতেছি দেখিতে পাইয়া এই সরযূ যেন আমার বিধবা জননীর মত, শীতল বাতাস কর্তৃক উত্থিত তাহার ঐ তরঙ্গরূপ হাত উপর দিকে বাড়াইয়া দিয়া আমায় যেন আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে।

সরযূনদী যেন তাঁহার বিধবা জননী, বহুকাল পরে আবার পুত্রকে বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহার তরঙ্গরূপ হাতগুলি উপর দিকে বাড়াইয়া দিয়া যেন জননীর মত স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছে।

নদী যে চৈতন্যসম্পন্না ও কল্যাণময়ী তাহা মহাকবি 'রঘুবংশে'র চতুর্দ্দশ সর্গেও দেখাইয়াছেন। সীতাকে মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য লক্ষ্মণ তাঁহাকে লইয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—

সম্মুখে গঙ্গা, গঙ্গার ঢেউগুলিকে উচ্চ হইয়া তীরের দিকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণের মনে হইল, তিনি নিরপরাধ সীতাকে জ্যেষ্ঠের আদেশে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন বুঝিতে পারিয়া যেন মা জাহ্নবী সম্মুখে আসিয়া তাঁহার তরঙ্গরূপ হাত নাড়িয়া এমন কাজ করিতে নিষেধ করিয়া দিতেছেন। (রঘু-১৪।৫১)

'রঘুবংশের' দুই জায়গায় মহাকবি যেমন নদীর তরঙ্গকে নদীর হাত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তেমনি আবার 'মেঘদূতে'র দুই জায়গায় নারীর ভ্রূভঙ্গীর সহিত নদী-তরঙ্গের উপমা দিয়াছেন।

'উত্তর মেঘে' বিরহী যক্ষ তাহার প্রিয়াকে কি বলিতে হইবে মেঘকে তাহা জানাইতে গিয়া বলিতেছেন—

'উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্' (উ-মে-৪৩)

"প্রিয়াকে বলিবে যে, নদীর তরঙ্গের দিকে যখন চাহিয়া থাকি তখন তোমার ভ্রূভঙ্গীগুলিই মনে পড়িয়া যায়।"

'পূর্ব্ব মেঘে'ও মহাকবি এই ভাবটিই ব্যক্ত করিয়াছেন; মেঘকে একবার আকাশ হইতে নীচে নামিয়া আসিয়া বেত্রবতীর নদীর জল পান করিয়া লইবার জন্য যক্ষ বলিতেছেন :

'সভ্রূভঙ্গং মুখমিবপয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্মি'—(পু-মে-২৫)।

বেত্রবতী নদীর চলন্ত জল ভ্রূভঙ্গীভরা মুখের অধর পান করার মত, পান করিয়া লইও।

নদীও যে তাঁহার প্রিয়ের দিকে অনুরাগভরা দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে পারে তাহা জানাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন—

'মোঘীকর্তুং চটুলশফরোদ্বর্তন প্রেক্ষিতানি'—(পু-মে-৪১)

পুঁটিমাছগুলি যখন খেলিতে থাকিবে, দেখাইবে যেন নদী বুঝি তার ঐ চক্ষুগুলির অনুরাগভরা দৃষ্টি দিয়া তোমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, এ দৃষ্টিকে যেন ব্যর্থ হইতে দিও না।

মেঘের জল পাইয়া নদীরা পুষ্টিলাভ করে বলিয়া কবিদের মতে মেঘ নদীর প্রিয়, আর সাদা সাদা পুঁটিমাছগুলিকে মনে হয়—ওগুলি বুঝি নদীর চঞ্চল চোখ, তাই আকাশে যখন মেঘ উঠে, পুঁটিমাছগুলি যদি সেসময় জলের ভিতর খেলিতে থাকে, তখন মনে হয় যেন নদী তার ঐ চঞ্চল চোখের ইশারায় তাহার প্রিয়কে হৃদয়ের অনুরাগ জানাইয়া দিতেছে—সুতরাং জল দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট করিও।

নদীর সহিত রূপসী নারীর উপমা 'বিক্রমোর্ব্বশী'র চতুর্থ অঙ্কে পাওয়া যায়, উর্ব্বশী যখন লতায় পরিণত হইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহার প্রিয় পুরূরবা তাঁহার অন্বেষণে বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে এক নদীর তীরে আসিয়া যেমন নদীর জলের দিকে চাহিয়াছেন, তাঁহার মনে হইল, এই নদীই বুঝি তাঁহার প্রিয়া—প্রিয়ার সকল সাদৃশ্য তিনি নদীর মধ্যে দেখিতে পাইতেছেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়া যে ওই নদীরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছেন, ইহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তিনি বলিতেছেন—

'তরঙ্গভ্রূভঙ্গা ক্ষুভিত বিহগশ্রেণি-রসনা
বিকর্ষন্তী ফেনং বসনমিব সংরম্ভশিথিলম্।
যথা জিহ্মং যাতি স্খলিতমভিসন্ধায় বহুশো
নদী ভাবেনেয়ং ধ্রুবমসহমানা পরিণতা।' (বিক্রম-৪র্থ অঙ্ক

নদীর তরঙ্গ যেন প্রিয়ার ভ্রূভঙ্গী, স্রোতের উপর ভাসমান পক্ষীদিগকে দেখাইতেছে যেন প্রিয়ার মেখলা, ফেনার রাশি—যেন প্রিয়া কুপিতা হওয়ায় তাহার বসন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, আর নদীর এই বক্রগতি যেন মনে পড়াইয়া দেয় প্রিয়ার সেই গতি-ভঙ্গীটি—যখন সে আমার কোনও অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ফুট বাক্য বলিতে বলিতে অভিমানভরে চলিয়া যাইত। তাই মনে হয়, নিশ্চয় আমারই প্রিয়া এই নদীরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

বর্ষার জলের অভাবে ও গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতায় শুষ্কপ্রায় ক্ষীণকায়া নদীকে মহাকবি প্রিয়ের অদর্শনে শীর্ণা বিরহিণী নারীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। নির্বিন্ধ্যা নদীর উদ্দেশ্যে যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন—

বেণীভূত-প্রতনুসলিলাসাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরু ভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ।' (পু-মে-৩০)

নদীর ওই স্বল্প জল যেন তার বেণী, আর তীরস্থিত বৃক্ষ হইতে শুষ্ক পাতাগুলি জলের মধ্যে পড়িয়া থাকায় তাহাকে পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছে; সুতরাং তোমারই বিরহে যখন তার এ দশা তখন তুমি যে ভাগ্যবান সেকথা বলিতেই হয়। আর যাতে তার এ শীর্ণ অবস্থা না থাকে সে ব্যবস্থা তোমারই করা উচিত।

বিরহিণী নারীর যেমন প্রিয়ের অদর্শনে দেহ ক্ষীণ ও বর্ণ পাণ্ডুর হইয়া যায়, সংস্কারের অভাবে কেশেরও পারিপাট্য থাকে না, তেমনি নির্ব্বিন্ধ্যা নদীও তাহার প্রিয় মেঘের অদর্শনে শীর্ণা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছে। মেঘের দেখা পাইলে, তাহার সোহাগরূপ জল লাভ করিলে এ শোচনীয় অবস্থা তাহার আর থাকিবে না, নদী আবার পরিপুষ্ট ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিবে।

পার্ব্বত্য নদী প্রস্তরময় প্রদেশে চলিতে চলিতে যদি শিলাখণ্ডে বাধা পায় ও তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন নদীর যে অবস্থা হয় কালিদাস সে অবস্থাকে উপমান করিয়া দুইটি উপমা রচনা করিয়াছেন।

'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে রাজা পুরূরবা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিতা প্রেয়সীকে দেখিতে না পাইয়া মনের বিরহজনিত বেদনার রূপ প্রিয়বন্ধু বিদূষককে জানাইতেছেন—

'নদ্যা ইব প্রবাহো বিষমশিলা সঙ্কটস্খলিত বেগঃ।
বিঘ্নিত সমাগমসুখো মনসিশয়স্তুগুণো ভবতি।' (বিক্রম ৩য় অঙ্ক)

নদীর প্রবাহ চলিতে চলিতে যদি কঠিন শিলার সমষ্টিতে বাধা পাইয়া রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, আমারও তেমনি প্রিয়ার সহিত মিলনের বিঘ্ন হওয়াতে মনের রুদ্ধ অভিলাষ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

অল্পপরিসর ভূমির মধ্যে রুদ্ধ প্রবাহ যে ভাবে স্ফীত হইয়া উঠে, পুরূরবারও আসক্তি মিলনের পথে বাধা পাইয়া সেই ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'কুমার সম্ভবে'ও এই ধরনের একটি উপমা পাওয়া যায়। কঠোর তপস্যারতা পার্ব্বতীর ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়া ব্রহ্মচারী ছদ্মবেশী শিব যখন বুঝিলেন যে, পার্ব্বতীর দেহ-মন-প্রাণ তাঁহারই উপর অর্পিত, তখন তিনি ছদ্মবেশ ছাড়িয়া নিজমূর্ত্তি ধরিয়া পার্ব্বতীকে বক্ষে টানিয়া লইলেন। পার্ব্বতী সে সময় চলিয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিলেন, এমন সময় শিবের বাধা পাইয়া আর চলিয়া যাইতে পারিলেন না, অথচ সেখানে থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল না, তাঁহার তখনকার সে অবস্থা বর্ণনা করার জন্য মহাকবি বলিতেছেন :

'মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।' (কু-৫ ৮৫)

নদীপ্রবাহের গতি পথিমধ্যে সহসা রুদ্ধ হইলে তাহার যে আকুল অবস্থা হয়, পর্ব্বতরাজ কন্যারও তখন সেইরূপ অবস্থা হইল. তিনি না পারেন যাইতে, না পারেন থাকিতে।

অতি দুষ্ট-প্রকৃতি নারীর সহিত মহাকবি বর্ষাকালের পঙ্কিল জল-যুক্ত নদীর কুটিল গতির উপমা দিয়াছেন—

"নিপাতয়ন্ত্যঃ পরিতস্তটদ্রুমান্
প্রবৃদ্ধবেগৈঃ সলিলৈরনির্ম লৈঃ।
স্ত্রিয়ঃ সুদুষ্টা ইব জাত-বিক্রমাঃ
প্রয়ান্তি নদ্যস্ত্বরিতং পয়োনিধিম্।"

ঋতু বর্ষার এই শ্লোকটিতে মহাকবির টীকাকার দুষ্টস্বভাবা নারী ও বেগবতী নদী এই দুইয়ের সামঞ্জস্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এখানে যে কয়টি শব্দ নদীর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির দুইটি করিয়া অর্থ বলিতে হইবে। একটি নদীর পক্ষে, অপরটি নষ্টা মেয়ের পক্ষে। তাঁহার মত অনুসারে অর্থ হইবে—যেমন নষ্টা মেয়েরা নিজেদের দেহের লাবণ্য কালি করিয়া, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের অভিভাবকদের সুনাম নষ্ট করিয়া বিলাস-লালসাপূর্ণ ভঙ্গীসহকারে উৎসাহভরে নাগরদের সহিত মিলিত হইতে যায়, নদীও তেমনি তাহার কলুষিত জল লইয়া, উভয় তটের বৃক্ষগুলিকে উপড়াইয়া ফেলিয়া বিক্রম সহকারে সমুদ্রের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় ত্বরিৎগতিতে বহিয়া চলিয়াছে।

তুমি আর আমি

আ. ন. ম. বজলুর রশীদ

"কে তুমি গুণ্ঠনবতী, এই মেঘে আকাশের নীলে
এত কাছে পাশে থেকে বার বার কেন ধোঁকা দিলে,
কেন খেলা লুকোচুরি? পথে পথে পাতার মর্ম্মরে
কত দিন বর্ষা বুকে উদ্বেলিত সমুদ্রের ঝড়ে
আশ্বস্ত হয়েছি বুঝি এই তুমি এই তুমি এলে—
আঘাত পেয়েছি শুধু—উদাসিনী তুমি ছায়া মেলে
দিগন্তে দিয়েছ পাড়ি, কিংবা দূর আরেক জগতে
চলেছে তোমার খেলা। বিরহের দিন কোনোমতে
এদিকে আমার কাটে। কত বিশ্ব, কত প্রাণলোক
তোমার সন্ধানে চলে—যত দুঃখ যত দিন হোক,
তবু কি মিলিবে দেখা? বলো বলো শুধু বলে যাও।"
"আমি যে তোমার কাছে, মন তবু হয়েছে উধাও,
কেন এই অধীরতা, চঞ্চলতা? উতলা অধীর
তুমি কবি। কত দিন মনে পড়ে রক্তকরবীর
গুচ্ছে আমি ডেকেছি যে, সে রঙ সে দোলার ইশারা
পড়ে নি তোমার চোখে। বাতায়নে আমি সন্ধ্যাতারা
চেয়ে থাকি নিনিমেষ, সারা রাত, তুমি অচেতন।"
"আমি? জানি কিন্তু বড়, বড় দূর, কেঁদে মরে মন
এত কাছে, তবু কত ব্যবধান তোমার নাগাল
মাটির মানুষ আমি কি করে যে পাই, কত কাল
আহা কত বর্ষ গেছে···তোমার সান্নিধ্য সঙ্গ বিনে—
উড়ে যায় বলাকারা—তাদের পাখায় নেব চিনে
তোমায় চলার পথ। এই মাটি দূরের আকাশ
স্পর্শ করে বার বার—অবিরাম অশান্ত উচ্ছাস।"

গোঁয়ার

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

যজ্ঞেশ্বর যে কি ধাতুতে গড়া আজও ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। স্কুলে ঢুকে গোড়ার দিকে নজরই পড়ে নি যে, যজ্ঞেশ্বর বলে কেউ আছে একজন। কোন বৈশিষ্ট্য নেই। না আকৃতিতে, না চাল-চলনে। পাশে পাশে থাকে অথচ ভূতের মত খেটে চলে মাথা নীচু করে নীরবে। লোকটা স্কুলের মালী। কিন্তু মালী হলে কি হয়, হেন কাজ নেই যা তাকে করতে হয় না। ছোট বড় সবার আদেশ নত মস্তকে পালন করে।

টিফিনের ঘণ্টায় যজ্ঞেশ্বর আমাদের চা এনে দেয়। আদিনাথ-বাবু, আবার চায়ের বেজায় ভক্ত। পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেলে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে চলে যায়। ওঁর জন্যই যজ্ঞেশ্বরের বেশী তাড়া। কাঁপতে কাঁপতে কুঁজো দেহটাকে আরও ঝুঁকিয়ে চায়ের কাপগুলো সামনে ধরে একের পর এক, তটস্থ ভঙ্গীতে। ঐ সময়টুকু ছাড়া তার দিকে মন দেবার অবকাশ পেতাম না।

কি একটা উপলক্ষে কিছুদিনের জন্য স্কুল ছুটি হয়ে যাচ্ছে। যজ্ঞেশ্বরের দীন অবস্থা দেখে বাস্তবিকই মায়া লাগে। একটা টাকা দিয়ে বললাম, মিষ্টি কিনে খেয়ো যজ্ঞেশ্বর।

শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে মাটির পানে চোখ রেখে সশ্রদ্ধ ভঙ্গীতে টাকাটা নিয়ে চলে গেল ও।

অল্পক্ষণ পরই দেখি, যজ্ঞেশ্বর চা সিঙ্গাড়া এনে ধরে দিচ্ছে সবার সামনে। মাঝে মধ্যে কোন ছুতোয় কারও কারও ঘাড়-ভাঙা হয়। সেই রকমই ভেবেছিলাম। দু'একজন জিজ্ঞাসাও করলেন, কে খাওয়াচ্ছে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করে বিনীত ভাবে বলল, এজ্ঞে আপনাদেরই কেউ খাওয়াচ্ছেন বৈ কি। নইলে পেলাম কোথায়?

শেষে জানা গেল, যে টাকাটি আমি দিয়েছিলাম ওকে মিষ্টি খেতে, সেটির সদ্ব্যবহার এই ভাবে ও করলে। খুবই আশ্চর্য্য হয়ে-ছিলাম। লোকটির প্রতি সেই দিনই প্রথম আকৃষ্ট হই আমি।

জিজ্ঞাসা করলাম একান্তে, তুমি টাকাটা এভাবে খরচ করলে কেন?

আজ্ঞে···আপনারাই আমার দেবতা। আপনাদের আশীর্ব্বাদে করে খাই—আপনাদের সেবা না করে পারি!

অন্য কেউ হলে তেড়ে উঠতাম, কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের বলার ভঙ্গীটা এমনই ছিল যে, অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

এর পর থেকে লক্ষ্য করতাম যজ্ঞেশ্বরকে। কি ভূতের মত খাটতে পারে লোকটা। অথচ শরীরে শক্তি নেই। বৈশাখের খর দহনে জলে-যাওয়া শুক্‌না প্রান্তরে শীর্ণ একটা গাছের মত রসকষ-হীন চেহারাখানা ওর। গায়ের চামড়া কুঞ্চিত। ন্যুব্জ হয়ে গেছে দেহযষ্টি। ললাটে একটি একটি করে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলিরেখা। আর মুখখানা? রোদে পুড়ে তেমনি হয়েছে তামাটে রঙের। বসন্তের সবুজ সমারোহ-চিহ্ন এতটুকু নেই সেখানে।

খাটতে চাইলে খাটাবার লোকের অভাব হয় না। কুড়ি জন শিক্ষক এবং কেরানীর মুহুর্মুহুঃ হুকুম। বড়কর্ত্তার সাত ভেজালের আদেশ। তা ছাড়া দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ত আছেই। ভোরবেলা মুড়ি খেয়ে বেরিয়ে আসে। চার মাইল আসতে হয় হেঁটে কাঁপতে কাঁপতে। স্কুলে এসে বাগানের কাজ। তার পর টিফিনের জল তোলা, সবার কুঁজোয় জল দেওয়া, ছেলেদের টিফিন আনা প্রভৃতি বাঁধা কাজ ছাড়াও অবিশ্রান্ত ফরমাশ আছে এর ওর—'যজ্ঞেশ্বর যাও ত পোষ্টকার্ড নিয়ে এস,' 'ওহে যজ্ঞেশ্বর, এক-বার বাসায় গিয়ে গিন্নীমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে এস ত হে···' 'যজ্ঞেশ্বর, এক প্যাকেট সিগারেট···' ইত্যাদি একের পর এক হুকুমের পালা। কারও নজরে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন একটা হুকুম চড়বেই। এমনকি পিওন-দারোয়ানেরা পর্য্যন্ত ছেড়ে কথা কয় না। সবাই ফাঁকি দিতে চায় অল্পবিস্তর। যজ্ঞেশ্বরের মুখে সাত চড়ে রা নেই জানে, তাই তারাও হুকুম করে। নোটিশের খাতা চড়িয়ে দেয়—যাও ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিয়ে নিয়ে এস। না বলতে জানে না যজ্ঞেশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে চলবে। ক্লাসের দরজায় গিয়ে মাথা নীচু করে বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে, ঢুকতে সাহস পায় না। খেঁকিয়ে ওঠে কোন কোন দুষ্ট ছেলে; হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে হাবার মত! দাও না হে নোটিশটা···!

অপরাধীর শঙ্কিত ভঙ্গী ফুটে ওঠে যজ্ঞেশ্বরের অবয়বে। ম্লান মুখে একবার তাকায়। দু'চোখের দৃষ্টিতে তার ফুটে ওঠে—না এক বিন্দু অভিযোগ বা অভিমান। বিনয়ে মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে পারলে বোধ হয় ভাল হ'ত তার পক্ষে।

লোকটাকে শুধু আশ্চর্য্য হয়ে দেখতাম। প্রতিবাদ করতে জানে না কোন কথার। হাঁপিয়ে পড়েছে ছুটাছুটি করতে করতে—ফরমাশের পর ফরমাশে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছে তবুও ভগ্ন দেহে টলতে টলতে প্রাণপণে ছুটছে। বলতাম—ছাতাটা নিয়ে যাও আমার যজ্ঞেশ্বর! রৌদ্রে বেয়ো না, বুড়ো হয়েছ।

শীর্ণ মুখে যথাসম্ভব হাসি ফুটিয়ে যজ্ঞেশ্বর হাতজোড় করে মাথা নীচু করত, আজ্ঞে মাষ্টারবাবু আমার রোদকে ভয় করলে চলে! আমার কিছু হবে না।

—হবে না কি বলছ যজ্ঞেশ্বর! রৌদ্রে ঘেমে হাঁপিয়ে পড়ছ যে। একটু জিরিয়ে নাও।

—না না আপনি কিছু ভাববেন না। কাজ করবার জন্যই ত মাইনে পাই।

কথাটি চমৎকার! এমন যদি সবাই বুঝত তা হলে দুনিয়াটা স্বর্গ হয়ে যেত এতদিন। শুধু মাইনে নিয়ে নিজের কাজ ফাঁকি দিলেও না হয় চলে, কিন্তু তার চেয়ে বড় অপরাধ আমার চোখে ধরা পড়েছিল।

যজ্ঞেশ্বর চা নিয়ে আসত সবার জন্য, টিফিনের ঘণ্টায়। কেউ নগদ মিটিয়ে দাম দিতেন, কেউ বাকী রাখতেন। মাসের শেষে হিসাবমত দিতেন তারা, আবার দু'একজন সহকর্মী যা ব্যবহার করতেন, তা না বলাই ভাল। মাসের পর মাস কেটে যেত—যজ্ঞেশ্বরকে তাঁরা একটি পয়সা ঠেকাতেন না। যজ্ঞেশ্বর বেচারাও চাইত না মুখ ফুটে। বিনা বাক্যব্যয়ে চা সরবরাহ করত প্রত্যহ। দোকানী তাকে তাড়া দেয়, গালি দেয়, বাকী শোধের জন্য। যজ্ঞেশ্বর নিজের মাইনে থেকে মিটিয়ে দেয় কড়াক্রান্তি। আমরা কথনও কথনও মনে পড়িয়ে দিয়েছি সহকর্মীকে। তিনি তখনকার মত সচেতন হয়ে উঠেছেন, ও হ্যাঁ তাইত···ওহে যজ্ঞেশ্বর!

যজ্ঞেশ্বর সামনে এসে দাঁড়ায় তটস্থ ভাবে। ধমক দেন তাকে, টাকা চেয়ে নাও না কেন? কত হয়েছে তোমার?

যজ্ঞেশ্বর তিন-চার মাসের হিসাব দাখিল করে। সহকর্মী চেঁচিয়ে ওঠেন, কি যা-তা হিসাব করেছ! নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সব হিসেব আমার লেখা আছে! চা আর ক'দিন খেয়েছি! এ্যা? এই দেখ এত হবে—হবে না?

যজ্ঞেশ্বর বিনয়ে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চায়, আজ্ঞে মাষ্টারবাবু, আপনার হিসেবে কি ভুল হবে! তাই ঠিক।

আমি অবাক মানতাম। লোকটাকে নিরীহ ও অনুগত পেয়ে যা খুশি করিয়ে নেয় ওরা। বিবেক বলে কি কিছু নেই ওদের! অবনমিত মানুষের প্রতি এহেন ব্যবহার লক্ষ্য করে পীড়িত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার মত নেই আমার। যজ্ঞেশ্বরকেও কি বলব আর! এমন লোক কি দুনিয়ায় হয়! আর একটা ঘটনার কথা বলি—

দারোয়ান ছুটিতে গেল কিছুদিনের জন্য। হেড মাষ্টার হুকুম দিলেন, যজ্ঞেশ্বর তার জায়গায় কাজ করবে। যজ্ঞেশ্বরের কি ব্যক্তিত্ব বলে কিছু আছে! যা বলা হ'স তাই। কাজ করছিল ওর জায়গায়। কিছু পাওনা হয় যজ্ঞেশ্বরের। স্কুলের ঝাড়ুদার রাত্রে দু'একদিন যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গেও ছিল। কি জানি, বুড়ো লোকটা যদি ঠিক ঠিক আগলাতে না পারে। যাই হোক মাসের শেষে উভয়ের পাওনা হ'ল বারো টাকা। কেরানীবাবু ঝাড়ুদারের হাতে দুটি টাকা আর যজ্ঞেশ্বরকে দশ টাকা দিলেন। যায় কোথায়, দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঝাড়ুদারটি পাকা শয়তান। চেঁচামেচি সুরু করলে—দু'টাকা কিছুতেই নেবে না সে।

ছোটকর্ত্তা গোলমাল শুনে এসে হাজির হলেন, কি হয়েছে যজ্ঞেশ্বর?

যজ্ঞেশ্বর টাকা কয়টি স্পর্শ করে নি পর্য্যন্ত। টেবিলে পড়ে আছে। নীরবে দাঁড়িয়ে আছে, মাথা নীচু করে।

কেরানীবাবু বললেন ব্যাপারটা। মাত্র দু'দিন ঝাড়ুদার রাত কাটিয়েছে। অথচ দু'টাকা নেবে না সে। এর বেশী পাওনা হয় না তার।

ঝাড়ুদার একপ্রস্থ বক্তৃতা করে বোঝালে কম করেও পাঁচ টাকা পাওনা হয় তার। ছোটকর্ত্তা বললেন যজ্ঞেশ্বরকে, কি বল হে! আরও কিছু দেওয়া যাক ওকে? তবে তোমার ইচ্ছা না থাকলে দেব না।

যজ্ঞেশ্বর মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, আপনার যা খুশি তাই দেন বাবু! আমার কিছু বলার নাই! আপনাদের সেবা করেই আমার আনন্দ!

আরও দুটো টাকা ঝাড়ুদারকে দেওয়া গেল।

ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিলাম নিকটে বসে। প্রাপ্য টাকা ক'টি ত নিয়ে বের হয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর। কিন্তু অল্পক্ষণ পরই দেখি, একটা ঝুড়িতে করে বাজার থেকে খাবার নিয়ে এসে হাজির। সবার মুখের সামনে সাজাতে লাগল। সঙ্গে চা।

আমি যৎপরোনাস্তি ধমকালাম যজ্ঞেশ্বরকে। বললাম, ছিঃ, তোমার মত গরীবের উপর জুলুম করব না কিছুতেই।

যজ্ঞেশ্বর হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করতে লাগল। এমন অবস্থায় কি করা যায়! বাধ্য হলাম খেতে। এই অদ্ভুতরকম আচরণ কেন যে যজ্ঞেশ্বরের বুঝতে দেরি হয়েছিল। সকালে আসে। খাওয়া নেই, স্নান নেই, শুধু ছুটোছুটি বুড়ো হাড়ে! কেবল কি মাইনে পায় বলেই, না আর কিছু। সেই রাত্রে ফিরে গিয়ে রান্না করে খায়। শুনেছি একটি ছোট ছেলেও আছে তার। স্ত্রী নেই। কার কাছে রেখে আসে ছেলেটাকে, কে জানে! এ কি রকম পিতৃহৃদয়। চাকরির পায়ে সবকিছু সমর্পণ করে বসে আছে।

সেদিন যজ্ঞেশ্বরের কাছে দাঁড়িয়ে পঞ্চম শ্রেণীর বাবুয়া বলে একটি ছেলে কাঁদছে দেখে এগিয়ে গেলাম—ব্যাপার কি যজ্ঞেশ্বর, হয়েছে কি?

—আজ্ঞে দেখেন না, মারামারি করতে গিয়েছিল। অমন একটু-আধটু হয়, ছেলের ছেলেয়!

বাবুয়াকে জানি। বড্ড নিরীহ, গোবেচারা। ক্লাসের ছেলেরা ওকে দেখতে পারে না। বিশেষতঃ বড়লোকের ছেলেরা ক্লাসে ঢুকতে না ঢুকতে দশ দফা নালিশ পেশ করে ওর বিরুদ্ধে। পাশের ছেলেরা অনবরত খুনসুড়ি করে ওর সঙ্গে। তা যাই হোক, বাবুয়া যজ্ঞেশ্বরের কাছে কাঁদে কেন? জিজ্ঞাসা করলাম; কেউ হয় নাকি তোমার?

—আজ্ঞে আমার ছেলে!

—তোমার ছেলে?···আকাশ থেকে পড়লাম। টেরও পাই নি ওর ছেলেটি এই স্কুলেই পড়ে। অথচ এতটুকু সুযোগ-সুবিধার

জন্ম বলে না আমাদের। ভাবলাম, এই কারণেই বুঝি যজ্ঞেশ্বর আমাদের এত খোশামুদি করে। কেরাণীবাবুর কাছে বাবুয়ার ভর্ত্তি হওয়ার কাহিনী শুনলাম—

বাপের সঙ্গে ছেলে আসত স্কুলে। দরজার পাটি ধরে দাঁড়িয়ে থাকত ক্লাসের সামনে। অবাক হয়ে পড়া শুনত। ছেলের দলে সে মিশে যেত অবাধে। সব ছেলে সমান নয়। কেউ 'দূর' 'দূর' করলেও সবাই করে না। গায়ে পড়ে আলাপ করে অনেকেই। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয় যখন ক্লাস চলে। দুরন্ত খেলোয়াড় ছেলেরা সুবোধ বালক সেজে বেঞ্চে বসত। শুনত পড়া। কত কি যে লিখত। বাবুয়া বারান্দার থাম ধরে অপলক নেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখত শুধু। টুকিটাকি কাজের মধ্যে যজ্ঞেশ্বর তাকে টানতে চায়। ছেলে নড়ে না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। রেগে গিয়ে হয় ত দু'চার ঘা মেরেছে ছেলেকে। একটি কথা বলে নি সাত বছরের বালক। দুরন্ত অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে ফুঁপিয়েছে সারা-দিন। কিছু খায় নি, রাত্রেও ঘুমোয় নি। মাতৃহারা ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে যজ্ঞেশ্বর কেঁদেছে কৃত কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ। আহা, বেচারাকে কেন মারতে গেল।

—বাবুয়া কি নিবি বল?

—বাবা বই নেব!

—দূর বোকা! বই নিয়ে কি করবি? পড়াবে কে?

—না, বই নেব,······জেদ করে বাবুয়া। ক্রুদ্ধ হয়ে যজ্ঞেশ্বর শাস্তি দেয় অবাধ্য বালককে। তার পর নিজেই কাঁদে। মা-মরা ছেলেটাকে কিভাবে মানুষ করবে ভেবেই পায় না যজ্ঞেশ্বর; গোপন মনে আশা তারও জাগে। ছেলেকে স্কুলে পড়াবে। পরমুহূর্ত্তে নিজের কাছে নিজেই লজ্জায় মরে যায়। সদ্গোপের ছেলে—লাঙল না ঠেলে পড়বে! একথা শুনলে লোকে বলবে কি!

উপায় নেই। ছেলের ঝোক! স্কুলের কেরানীবাবুকে ধরে বসল একদিন, বই দিতেই হবে মশাই আপনাকে যে করে হোক।

'স্পেশিমেন কপি'—অনেক বই-ই পড়ে থাকে। কেরানীবাবুকে আভূমি প্রণাম করে গদগদ হয়ে বলে যজ্ঞেশ্বর, সোনার দোয়াত-কলম হোক! চিরকাল দুধে-ভাতে থাকুক আপনার ছেলেরা।···

······কেবল বই পেয়ে বাবুয়া সন্তুষ্ট নয়। স্কুলে পড়বে সে। নিত্য বায়না ধরে। যজ্ঞেশ্বর এক দিন চুপি চুপি পেড়ে ফেলল কথাটা হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে। বদলী হয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাই যাবার আগে যজ্ঞেশ্বরের ইচ্ছাটা পূর্ণ করে গেলেন। নিম্নতম ক্লাসে ভর্ত্তি হ'ল বাবুয়া। কি আনন্দ তার। বাপ ত দুরন্ত আবেগে ছুটে গিয়ে দেবতার থানে বারবার মাথা খোঁড়ে।···

সেই বাবুয়া উঠে এসেছে পঞ্চম শ্রেণীতে। পড়াশোনায় বেশ ভাল। চতুর্থ শ্রেণী থেকে ফার্ষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐ শ্রেণীতে এবার ভর্ত্তি হয়েছে আমাদের সহকর্মী তারিণীবাবুর ছোট ছেলে। ছেলেটি অসম্ভব রকম দুষ্ট। পড়াশোনা কিছু করে না। বাবুয়ার উপর তার রাগ খুব বেশী। ক্লাসের সারাটা ঘণ্টা বাবুয়ার সঙ্গে বিবাদ-নিষ্পত্তি করতেই কেটে যায়। তারিণীবাবু বলেন, তাঁর ছেলে ভারি 'ব্রিলিয়াণ্ট'। অথচ কাজে তার নমুনা দেখি না, বিশ্বাসও হয় না—কারণ, নানা কায়দা-কৌশল করে ছেলে পাস করানোর অভ্যাস তাঁর আছে। তারিণীবাবুকে সবাই ভয় করে। ওঁর ছেলেকে ফার্ষ্ট না করালে নানা উপায়ে বিভ্রাট ফেলবেনই। হয় টিউশন কেড়ে নিয়ে, নয় ত আপিস সংক্রান্ত কোন ভেজালে এমন জড়িয়ে ফেলবেন যে, প্রাণান্ত হতে হবে।

ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় বাবুয়াই প্রথম হ'ল। টীচার্স রুমে বসে তারিণীবাবুর কি রোষ! বলেন, মাহীর ব্যাটা চুরি করে প্রথম হয়। দেখবেন এমুয়েল পরীক্ষায় আমার ছেলেকে ঠেকাতে পারবে না কেউ।

আমি ঠিক করেছিলাম, কপালে যত অঘটনই ঘটুক না কেন প্রাপ্য নম্বরের এতটুকু বেশী কাউকে দেব না। তারিণীবাবু যত প্রলোভন বা ভীতিপ্রদর্শনই করুন, আমি বিচলিত হব না। আমার মত নূতন আর দু'চার জন যাঁরা এসেছেন তাদেরও এ পথে টানলাম।

ঘটনা দাঁড়াল, যা ভাবা গিয়েছিল সেই রকম। বাবুয়াই সব বিষয়ে প্রথম হয়ে গেল। তারিণীবাবু ওর নম্বর কমিয়ে দেবার জন্ত প্রথমে অনুনয়বিনয়, শেষে ভীতিপ্রদর্শন করলেন। আমরা কোন কিছু না জানিয়ে নম্বর, খাতা সব জমা করে দিলাম, হেডমাষ্টারের কাছে। যা হোক অন্যদিকে চেষ্টা-চরিত্র করে তারিণীবাবু তাঁর ছেলেকে দ্বিতীয় স্থানে টেনে তুলেছেন।

আমরা ন্যায়ের পথ বেছে নিলাম যার জন্ত, শেষ পর্য্যন্ত সে-ই যে এরকম গোঁয়ার্ত্তুমি করে বসবে কে জানত!

প্রমোশনের দিন যজ্ঞেশ্বরের কোন ভাবনা চিন্তা নেই। নিশ্চিন্তে বাগানে কাজ করে চলেছে। একের পর এক ক্লাসে নাম-ডাকা চলছে। ছেলেরা হল্লা করছে। স্কুল কম্পাউণ্ড লোকে গিজ-গিজ করছে। অভিভাবককুল বা অন্ত স্কুলের ছেলেরা ভিড় জমিয়ে আলাপ-আলোচনায় চারিদিক মুখর করে তুলেছে। তবু যজ্ঞেশ্বরের মনে কোন কৌতূহল নেই। সব উত্তাপ যেন জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে তার। একমনে মাটি খুঁড়ছে ত খুঁড়ছেই, যন্ত্রের মত। সহসা বাগানের রেলিং টপকে তারিণীবাবুর ছেলে প্রবেশ করল, আর দু'জন সঙ্গী নিয়ে। ঢুকেই যজ্ঞেশ্বরকে আক্রমণ; ব্যাটা চাষা! চাষ করে খাস না কেন? স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছে ছেলেকে! চোর! চুরি করে ফার্ষ্ট হয়!···

যজ্ঞেশ্বর হতভম্ব হয়ে যায়; কি হয়েছে খোকাবাবুরা! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!···

—তা পারবে কেন? ন্যাকা কোথাকার।

এক জন বললে ভেংচি কেটে; চুরি না করলে তোর ছেলে ফার্ষ্ট হয় কি করে!

যজ্ঞেশ্বর আকাশ থেকে পড়ল, ফার্ষ্ট হয়েছে বাবুয়া! এ্যাঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ! না···না খোকাবাবু আপনিই ফার্ষ্ট বটেন!

আপনি মাষ্টারবাবুর ছেলে, জেতে বামুন, আপনারা ফাষ্টো হবেন না তো কে হবে !

—কে হবে !···খেঁকিয়ে উঠল তারিণীবাবুর ছেলে ; দাঁড়াও তোমার চাকরি থাকে কি করে দেখছি !

আমি গোলমাল শুনে এগিয়ে গেলাম বাগানের ধারে ; কি হয়েছে তোমাদের ! বাগানে ঢুকেছ কেন ?

ছেলে কয়টি চক্ষের নিমিষে বাগান টপকে পালাতে তৎপর হ'ল। যজ্ঞেশ্বর 'হায় হায়' করে ওঠে ; ওদের কিছু দোষ নাই মাষ্টারবাবু ! বাবুরা সর্ব্বনাশ করলে আমার !

—কি সর্ব্বনাশ করলে তোমার ?···বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

যজ্ঞেশ্বর বিলাপ করতে লাগল ; হায়, হায়, কি সর্ব্বনেশে ছেলে হয়েছে মাষ্টারবাবু ! আপনাদের ছেলেরা ফাষ্টো না হয়ে ও হতে যায়। এত সাহস !

রাগে সত্যই যজ্ঞেশ্বর থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমি অবাক হলাম। কত রকমে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ; পরীক্ষার ব্যাপারে মাষ্টারের ছেলে না মালীর ছেলে—কোন বিচার নেই। যে ভাল পড়বে সেই ফার্ষ্ট হবে !

কিন্তু কে শোনে সে কথা। যজ্ঞেশ্বরের ঐ এক উক্তি ; পড়তে পাচ্ছিস সেই কত ভাগ্যির কথা। কেনো ফাষ্টো হবে মাষ্টারবাবুর ছেলে থাকতে !

পরের দিন স্কুলে ঢুকেই যজ্ঞেশ্বর তারিণীবাবুর পায়ে আছড়ে পড়ল ; হেই বাবু ক্ষেমা করুন। আপনার ছেলেই ফাষ্টো। মালীর ছেলে, ছুটজাত কখনো ফাষ্টো হয় ! দেখেন গিয়ে বাবুয়াকে মেরে ঢিট করে দিয়েছি···।

তারিণীবাবুর 'সেন্টিমেন্টে'র বালাই নেই। একটা ঝাকি দিয়ে সরিয়ে দেন ওকে ; যাও, যাও, ন্যাকামি করতে হবে না···!

যজ্ঞেশ্বর কেঁদে কেঁদে কাকুতিমিনতি করতে লাগল। কিন্তু তারিণীবাবুর কানে তার কথার একবর্ণও প্রবেশ করল না। যজ্ঞেশ্বরকে যতই দেখছিলাম, ততই অবাক হচ্ছিলাম। থাকতে পারলাম না, ডেকে জিজ্ঞাসা করি—কি, কি হয়েছে যজ্ঞেশ্বর ! ছেলেকে মেরেছ ?

যজ্ঞেশ্বর ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠল। এমন চেহারা তার কখনো দেখি নি। বলল রুষ্ট কণ্ঠে, মারব না ? অমন ছেলেকে মেরে ফেলাই ভাল। কাল বাড়ী ফিরতে না ফিরতে এসে ধরলে জড়িয়ে, "বাবা গো বাবা, ফাষ্টো হয়েছি", যেন কত বড় কাজ করেছে ! থাকতে পারলাম না মাষ্টারবাবু। চাল থেকে বাখারি পেড়ে আচ্ছা চাবকেছি··· !

চাবকেছ ?···আর্ত্ত রব বেরুল আমার কণ্ঠ থেকে ; তার পর কেমন আছে ও !

মরুক ! ও ছেলে মরুক···, যজ্ঞেশ্বর গর্জ্জন করতে লাগল।

প্রমোশন হয়ে গেছে। ক্লাস নেই। একজন সহকর্মীর সঙ্গে ছুটলাম যজ্ঞেশ্বরের বাড়ী।

বাবুয়া মেঝের একটা ছেড়া মাদুরে পড়ে ছটফট করছে, বাবাগো, বাবা আর কখনো ফার্ষ্ট হবো না···আর মারিস না গো··· আর মারিস না··· !

এমন করুণ দৃশ্য কখনো দেখি নি।

ডাক্তার এলেন···ওষুধ, ইনজেকশন কত কি। যজ্ঞেশ্বরের একেবারে ভ্রূক্ষেপ নেই।···স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ওর ছুটির বালাই নেই। সমানে স্কুলে যেতে হয়। নানা কাজ সারতে হয়। ছেলের অসুখ সাংঘাতিক বলে তার কি কামাই করা চলে। সাফ বলে দিয়েছে, অমন ছেলের মরাই ভাল। নম্র, দীন, বিনীত যজ্ঞেশ্বরের এ এক আলাদা রূপ। ও যে এত গোঁয়ার হতে পারে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।···

যজ্ঞেশ্বরের চোখে না দেখলাম এক ফোটা জল, না মুখ হতে বেরুল আর্ত্ত রব। খনখনে গলায় বললে, পাপের ফল ভুগতেই হবে মাষ্টারবাবু। গরীব লোকের ছেলের বেশী বাড় কি ভাল ! ভগবান শাস্তি দিয়েছেন !

অকেজো কাঠ ও কুটীরশিল্প

শ্রীপরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দশটা ভাল জিনিষের সঙ্গে একটা মামুলি কিংবা সাদাসিধা কিছু থাকলে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুলনায় ওদের সাধারণত্ব যেন আরও প্রকট হয়ে ওঠে। সাধারণ বলেই যে এগুলি সব সময় অবহেলার যোগ্য তাও নয়। নইলে গত ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসে দেরাদুন বন-গবেষণা মন্দিরের (F. R. I.) সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সুপরিকল্পিত প্রদর্শনীতে অকেজো কাঠের ষ্টলটি সবাইকে আকর্ষণ করতে পারত না।

সঙ্গেই মিঃ রাওয়ের তরফ থেকে প্রশ্ন আসে দর্শক তাঁর কাছ থেকে কিছু জানবার জন্য উৎসুক কিনা।
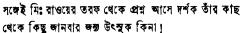
পিছন থেকে একটি টিপয় সামনে ধরে হাসিমুখে মিঃ রাও বলেন—দেখুন এর উপরটা কেমন চমৎকার। অথচ এটা তৈরী হয়েছে এই পাতলা অকেজো বিশ্রী কাঠের সাহায্যে। অর্থাৎ, এমনি জিনিষ দিয়ে—যা একমাত্র উনুন জ্বালানো ছাড়া আর কোন কাজেই লাগানো সম্ভব নয় বলে মনে করেন।

বিভিন্ন প্রকারের নক্সা

নানারকম প্যাটার্ন—মাঝখানে এবং নীচে ফুলের নক্সা

চারদিকে সাজান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে সবকিছু দেখতে দেখতে দর্শক বুঝবার চেষ্টা করছেন কেমন করে বনরক্ষার সঙ্গে আমাদের অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কি ভাবে বনজ-সম্পদ আমাদের জাতীয় সম্পত্তি বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়াতে পারে, আমাদের পারিপার্শ্বিককে করে তুলতে পারে প্রীতিকর, কেমন করে ঘর সাজাবার নানা জিনিষ তৈরী হয় গাছপালা আর অন্যান্য বাজে সম্পদ থেকে—এ সব দেখতে দেখতে একু সময় যখন ক্লান্তি আসে, তখন হয়ত চোখে পড়ে—এক ভদ্রলোক যত রাজ্যের পাতলা টুকরো কাঠ, পুরানো প্রায় পচে যাওয়া বাঁশের ফালি, দেশলাইয়ের খালি বাক্স, যত্ন করে টেবিলের উপর গুছিয়ে রাখছেন। মূল্যবান বনজ সম্পদের পাশে এই সকল আজেবাজে জিনিষের সযত্ন বিন্যাস দর্শকের মনে এমনি কৌতূহলের উদ্রেক করে যে, তিনি এগুলির সামনে দাঁড়িয়ে যান। সঙ্গে

জিনিষটা সুন্দর বলে মেনে নিয়েও কিন্তু একটা কথা বিশেষভাবে মনে জাগে। এমনি বা এর চেয়ে সুন্দর জিনিষের অভাব নেই, কিন্তু দামটা এসব জিনিষের বেশ চড়া। কাজেই এটা নূতন প্রয়াস হলেও এর সার্থকতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এ ধারণা যে ভুল মিঃ রাও তা বুঝিয়ে দেবেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, এ জিনিষ খুবই সস্তা। যদি প্রশ্ন করা যায় যে, প্রদর্শনীতে লোকে নিছক তাক্ লাগানোর জন্যই সরকারী অর্থ ব্যয় করে, আর দামী দামী যন্ত্রপাতি দিয়ে এ-গুলি তৈরী করে অল্প মূল্যের জিনিষ হিসেবে এগুলি প্রদর্শন করা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার মত শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে গেলেই এর সত্যিকারের রূপ প্রকাশ পাবে। মিঃ রাও কিন্তু সহজ-ভাবেই জানান যে, এ অভিযোগ স্বাভাবিক হলেও সত্য নয়।

বাজারে ছাড়বার মত করে এ শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য তথাকথিত মূল্যবান যন্ত্রপাতির দরকার হয় না। অতি সাধারণ কাঠের ছাঁচ, ছুতার মিস্ত্রীর হাতিয়ার, চাপ দেওয়ার মত একটা যন্ত্র, আর ও কয়েকটা টুকিটাকি যার জন্য আমাদের বিদেশের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন হবে না। কাঁচা মালের মধ্যে চাই অকেজো কাঠ, বাঁশ, খালি দেশলাইয়ের বাক্স, রং, আঠা, কাপড়-কাচা সোডা এমনিতর নানা সাধারণ জিনিষ। উদ্যোগী হলে অনেক সাধারণ অবস্থার লোকই এর মালিক হয়ে নিজ হাতে পারিবারিক শিল্প হিসেবে দু'পয়সা রোজগারের পথ করতে পারেন। তবে যে সকল লোকের উৎসাহ-উদ্যম আছে কিন্তু আর্থিক সংস্থান নেই—তারা এটিকে গড়ে তুলতে পারেন সমবায় প্রচেষ্টা হিসেবে। মোট কথা, কুটীরশিল্প হিসেবে এর সম্ভাবনা প্রচুর।

"মোড্ডা", ব্লক এবং একটি তেপায়া

কাঠের স্প্রিং

কাঠ চেরাই বা প্লাই-উড কারখানার ঝড়্তি-পড়্তির উপরই যে এ কুটীরশিল্প নির্ভরশীল হবে তা নয়, পাতলা বাঁশের কাফিও একই কাজে লাগানো যাবে। এ দুটির একটিও সাময়িকভাবে না পেলে কাজ ব্যাহত হওয়ার কথা নয়। একটা সুদৃশ্য কাঠের ব্লক দেখিয়ে মিঃ রাও জানালেন—"এটা কিন্তু পরিত্যক্ত খালি দেশলাইয়ের বাক্স থেকে তৈরী। ভেবে দেখুন—লক্ষ লক্ষ দেশলাইয়ের বাক্স দৈনিক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একে কাজে লাগালে শুধু যে সস্তায় সুন্দর জিনিষ পাওয়া যাবে তা নয়, অনেকে পয়সা রোজগারও করতে পারবে। পুরানো শিশি-বোতল-ওয়ালার সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাওয়া যায় খালি দেশলাইয়ের বাক্সওয়ালার আওয়াজ। বাড়ীর গিন্নীরাও এগুলো জমিয়ে পারিবারিক আয়—তা সে যত স্বল্পই হোক না কেন—বাড়াতে পারবেন।

এ সমস্ত অকেজো কাঠে তৈরী জিনিষের ব্যবহারিক ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। শুধু আসবাবপত্রের শোভাবৃদ্ধির কাজেই এর সীমারেখা টানা হবে না, এর থেকে তৈরি করা যাবে কমদামী সুদৃশ্য মেঝে-ঢাকনি। দেয়াল-কাগজ হিসেবেও এর ব্যবহার হতে কোন বাধা নেই।

মিঃ রাওয়ের বাড়ীতে দেখলাম কাঠের স্প্রিং দিয়ে দিব্যি সোফা তৈরি করেছেন। লোহার মতই নাকি মজবুত। তৈরি হয়েছে এই স্প্রিং পাতলা কাঠ জোড়া দিয়ে টিন আর পেরেকের সাহায্যে। চাহিদার তুলনায় আমাদের দেশে ইস্পাতের উৎপাদন যৎসামান্যই, সেই দিক দিয়ে দেখলে কাঠের স্প্রিং-এর প্রবর্তন—ইস্পাত আমদানীর প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে মেটাতে সক্ষম হবে।

এমন অনেক কাঠ আছে যা চেরাই করলে তার করাত-গুঁড়ো থেকে দামী বান বা উদ্‌বায়ী তৈল বার করা যায়। এ ছাড়া এই করাত-গুঁড়ো জমাট করে নানান রঙের খেলনা-পুতুল ব্যতীত পাতলা নানা জাতীয় বোর্ড তৈরি করা যায়। এগুলি যেমন শক্ত তেমনি দামে সস্তা। মাটি কিংবা চিনামাটির পুতুলের সঙ্গে এসব পুতুলের তফাৎ এই

আলোকোদ্ভাসিত প্রধান ফটক, বন গবেষণা মন্দির, দেরাদুন
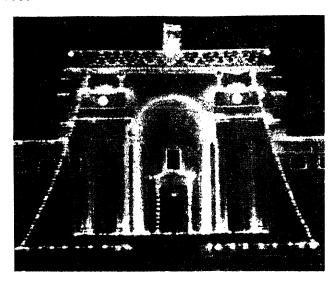
যে, এগুলো সহজে ভেঙে যায় না। পাথরে-বাঁধানো মেঝেয় আছাড় মারলে বলের মত লাফিয়ে ওঠে।

কার্ডবোর্ডের ব্যবহার খুব ব্যাপক। করাত-গুঁড়ো থেকে বোর্ডের সাহায্যে তৈরী স্যুটকেস বাঁধানো বই বেশ টেকসই হবে, অথচ কার্ডবোর্ডের চাইতে সস্তা।

পেন্সিলের চাহিদা আমাদের দেশে ব্যাপক। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এর চাহিদা আরও বেড়ে চলবে। কিন্তু এই চাহিদার মোটা অংশই সরবরাহ হয় বিদেশ থেকে। দেশী পেন্সিল যে বাজারে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সেগুলো উৎকৃষ্ট নয় বলে অধিকাংশ স্থলেই ইচ্ছা না থাকলেও শেষ পর্যন্ত বিদেশী পেন্সিল কিনতে লোকে বাধ্য হয়। অথচ এ জিনিষটি তৈরি করতে বিশেষ শিল্প-কৌশল অনাবশ্যক, এবং এমন কোন মাল-মশলাও দরকার হয় না যা আমাদের দেশে নেই। অথচ এ জিনিষটি পারিবারিক শিল্প হিসেবেও প্রচলিত করা যায়। মিঃ রাও দেখালেন, তাঁর স্ত্রীর হাতে তৈরী পেন্সিল। পচা কিংবা কচি বাঁশ বা পাতলা নরম কাঠে তৈরী হয় পেন্সিল। সিস্‌টিও ঘরে তৈরি করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ পরিকল্পনা সার্থক করে তুলতে হলে ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে নানা জাতীয় কুটীরশিল্প। নইলে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারের সংখ্যা কমবে না। ভোগ্যদ্রব্যও চাহিদামাফিক পাওয়া কঠিন হবে। তার মানে হবে জিনিষ-পত্রের দুর্মূল্যতা। এমনি অবস্থা যে-কোন দেশের পক্ষেই আশাপ্রদ নয়। আমাদের ত কথাই নেই। এমন অবস্থা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পথে পরিপন্থী।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বনজ সম্পদের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তার ফলে দিনের পর দিন কাষ্ঠশিল্পের প্রসার হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যরূপে অকেজো কাঠের পরিমাণও বাড়তির পথে যাবে। তাকে ভোগ্যবস্তুর কাঁচামালরূপে ব্যবহার করে সস্তা ও মনোরম দ্রব্য তৈরির কাজে লাগিয়ে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। সুপরিকল্পিত উপায়ে আর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে পারলে শুধু যে আমাদের দেশের জনসাধারণ উপকৃত হবে তা নয়, তৈরী জিনিষ বিদেশে রপ্তানি করাও সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

অকেজো কাঠ, ফেলে দেওয়া বাঁশের ফালি, খালি দেশলাইয়ের বাক্স ইত্যাদিকে যদি কাঁচামালরূপে ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তবে এমনি আরও অবহেলিত জিনিষ খুঁজে পাওয়া হয়ত কঠিন হবে না—নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে গেলে। বন গবেষণা মন্দিরে যে সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল তা আমাদের জাতীয় সম্পদ আহরণের নূতন পথ প্রদর্শন করছে।*

---

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য :—

(i) "Diaper and Marquetry" by K. R. Rao, M. E. published in Indian Forester, April, 1954.

(ii) "F. R. I. Diaper" by K. R. Rao, M. E. published in Indian Forester, July, 1954.

(iii) "F. R. I. Bamboo Diaper" by K. R. Rao, M. E published in Indian Forester, May, 1956,

তপস্বিনী গৌরীমাতা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

জন্ম ও মৃত্যু—সৃষ্টি ও বিনাশ—পৃথিবীর চিরন্তন এ দুটি চরম সীমারেখার ব্যবধানেই পার্থিব সকলকিছুর হয় বিকাশ, পরিপুষ্টি ও মাধুর্য্যের খেলা। তপস্বিনী গৌরীমাতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ছিলেন দিব্য খেলার সঙ্গিনী ও জগজ্জননী শ্রীসারদা-দেবীরও ছিলেন অন্যতমা সহচারিণী। শ্রীরামকৃষ্ণদেব গৌরী-মাতাকে চিনেছিলেন নিজের অন্যতম পরিজন হিসাবে—যেদিন তিনি দেখেছিলেন তাঁকে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে ভক্তপ্রবর বলরাম বসুর সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহচর ভক্ত অক্ষয়কুমার সেন শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে একথা উল্লেখও করেছেন। তিনি লিখেছেন—

অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়।
বলরামে পুছিলেন প্রভু দেবরায়॥
কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয়।
গুপ্ত উপযুক্ত মুখ ইহার তো নয়॥
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়হারা ঘরবাড়ী-ছাড়া।
কৃষ্ণ হেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা॥

ভক্তপ্রবর বলরামবাবু গৌরীমাতার পরিচয় দিলেন এবং গৌরী-মাতা নিজেও মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিলেন সেদিন তাঁর জীবনের চিরপথ-প্রদর্শককে—তাঁর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য দেবতাকে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে গৌরীমাতার এই পুণ্যমিলন ঘটে দক্ষিণেশ্বরে ১২৮৯ সালে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও আদ্যাশক্তি কালী এই তিন দেবতারই পরম পূজারিণী ছিলেন গৌরীমাতা। কিন্তু এই তিনের মহাসমন্বয়-সাধন হ'ল সেদিন দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনে। গৌরীমাতা এই সার্থক দর্শনের পর থেকে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন হরগৌরীমূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণির পবিত্র সেবায় ও আরাধনায়। সারদামণি তখন বাস করেন দক্ষিণেশ্বরের নহবতখানার দ্বিতলের ঘরটিতে। শ্রীরাম-কৃষ্ণ সমর্পণ করলেন গৌরীমাতাকে সারদামণির হাতে ও সেদিন থেকেই আদ্যাশক্তিরূপিণী শ্রীমার সঙ্গিনী হলেন গৌরীমাতা। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদার আদর্শ-দীপ-শিখাকে প্রজ্জ্বলিত রেখেছিলেন তিনি তাঁর ভাবপ্রদীপ্ত জীবন-মন্দিরে।

চিরব্রহ্মচারিণী তপস্বিনী গৌরীমাতা বিশ্বের নারীমাত্রেরই আদর্শস্থানীয়। শাস্ত্রজ্ঞানে, সঙ্গীতে, সঙ্গীত ও স্তব-রচনায়, বাগ্মিতায়, ধর্ম্মালোচনায়, বিচিত্র কর্ম্মে ও প্রচেষ্টায়, নারায়ণ-জ্ঞানে জীবসেবায়, গৌরীমাতা ছিলেন অদ্বিতীয়া। কর্ম্মযোগের মূর্ত্ত প্রতীকরূপেই তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁর জীবনের শেষের দিনগুলিতে। গঙ্গোত্রীর স্বতঃপ্রবাহিনী জলধারার মতই উচ্ছলিত ছিল তাঁর করুণা ও আশীর্ব্বাদ সকল নরনারীর উপর। ভারতের নিজস্ব ভাবধারা ও আদর্শকে অনুসরণ করে তিনি নারীশিক্ষাব্রতে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। বেদ, ব্রাহ্মণ, মহাকাব্য ও পুরাণ সাহিত্যের যুগের ব্রহ্মবাদিনী বাক্, গার্গী বাচক্নবী, সুলভা, মৈত্রেয়ী, বাড়বা প্রাতিথেয়ী, লোপামুদ্রা, সাধ্বী সীতা, সাবিত্রী, বেহুলা ও দময়ন্তী প্রভৃতি পুণ্যশ্লোকা নারীদের জীবনাদর্শকে আবার বিংশ শতাব্দীর ভারতে বাস্তবে রূপায়িত

গৌরীমাতা
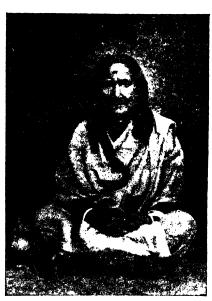
করতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। সার্থক হয়েছিল তাঁর সেই কল্যাণ-প্রচেষ্টা ও সাধনা। সারদাদেবীর নামাঙ্কিত করে "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি সর্ব্বপ্রথম বারাকপুরের গঙ্গাতীরে। নারীশিক্ষার প্রসার, দুঃস্থ বালিকা ও নারীদের আশ্রয়দান এবং পবিত্রতার পথে নারীজাতিকে মহীয়সী করে তোলাই ছিল সে আশ্রমের ব্রত ও উদ্দেশ্য। ক্রমে সন ১৩১৮ সালে কলিকাতার গোয়াবাগান লেনে নির্ব্বাচন করে-ছিলেন তিনি তাঁর আশ্রমের স্থান। ১৩৩১ সালে উত্তর-কলিকাতার বুকে এই বর্ত্তমান (২৬ মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীটে) আশ্রম-

মন্দিরের পুনরায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। সুপ্ত বীজ শিশু-বৃক্ষে হয়েছিল পরিণত ও শিশুবৃক্ষ ক্রমে শাখান্বিত, ফলফুলে সুশোভিত বিরাট মহীরুহে হ'ল পরিণত।

আজ থেকে শতবর্ষ আগে ১২৬৪ সালের এক শুভ তিথিতে পুণ্য মুহূর্তে মহীয়সী নারী গৌরীমাতার শুভ আবির্ভাব হয়েছিল আমাদেরই এই ঐতিহ্যের ধারাবাহী বাংলাদেশের বুকে এবং তিরোভাব হয় সন ১৩৪৪ সালের ১৭ই ফাল্গুন। দীর্ঘ আশী বছর তিনি তাঁর ত্যাগ ও তপস্যাদীপ্ত জীবনের যে জলন্ত আদর্শ রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর জন্য তা শুধু প্রতিটি নারীর জীবনের নয়—প্রতিটি মানুষের অগ্রগতির ও শান্তিলাভের পথকে করবে সুগম, উজ্জ্বল ও চিরসার্থকতায় পূর্ণ। আমাদের অন্তরের কামনা—তাঁর শতবার্ষিকী-উৎসবের প্রেরণা ও অনুষ্ঠান চিরতরে নির্বাপিত করুক বিশ্বের চারিধারে লেলিহান অশান্তি-বহ্নিশিখা ও পররাজ্যলোলুপতাকে। ভারত চিরদিনই বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছে মৈত্রী, প্রেম ও শান্তির উদাত্ত বাণী। তপস্বিনী চিরপ্রণম্যা গৌরীমাতার এই স্মরণীয় উৎসবানুষ্ঠান আজ সার্থক করুক ভারতের সেই কল্যাণী বাণীকে।

যৌবনমুগ্ধা

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমার নয়ন হ'তে আমায় আড়াল করো, লুকিয়ে নাও!
লুকিয়ে নাও গো, উজল রূপের আভায় কেন লজ্জা দাও!
চাঁদ্‌নি-রাতে অমল-আলোয় ঢেউ উঠেছে রূপের, আর—
নিলাজ-নয়ন এমন করে হান্‌ছ কেন বার‌্বার?

পূর্ণিমাতে চকোর যখন চাঁদের রূপে বিভোর প্রায়,
তখন কেন আড় নয়নে মুখের পানে চাইছ হায়!
কিরণ-সম স্বচ্ছ-রঙে রং মিলিয়ে তোমার রূপ,
সেই রূপেরি কোমলতায় সলাজ ভাষা—সে নিশ্চুপ।

জ্যোৎস্না-জরীন্ কাননভূমির ঘাস-গালিচায় ঘুরছ, আর—
রূপের ছটায় বিভোর করে চাইছ পানে হায়, আমার!
শুভ্র তোমার জরীর বসন, উজল-আলোয় ধূমল-ধূপ!—
বুকের মাঝে কাঁপন তোলে, গোপন করো অমন রূপ।

যৌবনেতে মুগ্ধা আমি, আপন রূপেই বিভোর-প্রায়,
বিভোরতর করতে হেন এমন কেন চাইছ হায়!
তোমায় উজল চোখের পানে নয়ন মেলে চাইলে, মোর
আঁখির 'পরে স্বপ্ন ঝরে, পরীর দেশের ঘুমের ঘোর!

এস, এস সমুখ পানে, হেথায় খানিক দাঁড়াও, আর—
তোমার উজল তীক্ষ্ণ নয়ন হানো সখা, বারংবার!
তোমায় ছাড়া থাক্‌তে নারি, হায় গো প্রিয়, কঠিন বুক!
তোমার মুখে চাইলে পরে তবেই আমার হয় যে সুখ!

থাকো যখন আমার কাছে, হানো যখন দুই নয়ন,
থাক্‌তে নারি, সইতে নারি কখন তোমার রূপ অমন!
কিন্তু সখা, যেম্‌নি তুমি কুঞ্জ ছেড়ে উধাও ধাও—
অম্‌নি বুকে ঘনায় ব্যথা!—বন্ধু, বারেক চক্ষে চাও।

তোমায় নিয়ে এই তো লীলা! তোমায় ছাড়া আমার তাই
প্রেমের খেলা—লজ্জা-মধুর—কোনখানে কিছুই নাই!
বুঝছো নাকো মনের কথা, বক্ষে ব্যথা ঘনায়, আর
দুই নয়নে অভিমানে অশ্রু জমে বারংবার।

যৌবনেতে মুগ্ধা আমি, তাই তো এমন লীলার ছল,
সাম্‌নে যখন লুকোই তোমায়, আড়াল হ'তে চাই কেবল!
তোমার নয়ন হ'তে আমায় গোপন করো, লুকিয়ে নাও!
গভীর বুকে ঘনায় ব্যথা!—বন্ধু, ক্ষণেক চক্ষে চাও!

কালান্তর

শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ

—তুমি যাই বল বাবা—সতী ও বাড়ীতে বিয়ে করবে না কিছুতেই। মেয়ের মুখ-চোখের ভাব পালটে গেছে একদিনেই। —আত্মঘাতী হবে কি শেষটায়! কাল সকালেই মাধবপুরে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দাও বাবা।—ওরা আবার গায়ে হলুদের সব জিনিষপত্তর কেনাকাটা করে ফেলবে হয়ত।—

শুধু ওই কথাই নয়। কাল সন্ধ্যায় আরও অনেক অভাবনীয় কথা শুনেছে অবিনাশ পাল। কথাগুলি শোনার পরমুহূর্ত থেকেই দুর্বিবহ একটা চিন্তার আলোড়ন সুরু হয়েছিল সারা চিত্ত জুড়ে। দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে তাই ছটফট করছিল অবিনাশ পাল। অস্বস্তি আর অস্থিরতা এখন অনেকটা প্রশমিত হয়ে এসেছে বটে, চোখে কিন্তু আজ আর ঘুম আসছে না কিছুতেই।

শেষ বৈশাখের রাত। একটানা গুমোটের পর আচমকা ঝড়ের মত বাতাস উঠেছে একটা। দুর্বিনীত এলোমেলো বাতাস যেন। আবেশ-বিহ্বল হয়ে উঠেছে উঠানের কোণের নাজনে গাছটা। আত্মহারা হয়ে, দুলে দুলে উঠছে ঘন ঘন। শাখা-প্রশাখা নেড়ে নেড়ে ঝোড়ো হাওয়াকে স্বাগত জানাবার জন্যে পুকুরধারের বুড়ো বটগাছটার মধ্যেও আকুলতা জেগেছে যেন। অন্ধকারে অস্পষ্ট হলেও—তা বোঝা যাচ্ছে বেশ। সারাদিন ধরে আগুন ঝরেছিল যেন আকাশ থেকে। পুড়ে পুড়ে ঝলসে গিয়েছিল মেদিনীর সারা অঙ্গ। সে জ্বালা আর অন্তর্দ্দাহ জুড়িয়ে এসেছে এখন অনেকটা। ঘরে-বাইরে সর্ব্বব্যাপী নিদ্রাচ্ছন্নতা। বিনিদ্র একটি জীবাত্মা শুধু দাওয়ায় পড়ে পড়ে—এলোমেলো নানা চিন্তা নিয়ে জট পাকিয়ে চলেছে—একা একা।

দূরে—নক্ষত্রখচিত দিগন্তের পটভূমি। তালগাছের পশ্চিম প্রান্তের আকাশে হেলে পড়েছে কখন সপ্তর্ষিমণ্ডল। ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করে ঘড়ির কাঁটার মত অবিরাম ঘুরে চলেছেন—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ প্রভৃতি। অনন্তকাল ধরে চলেছে এই ভাবে অন্তহীন পথ-পরিক্রমা। চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত হয়ে আসছে ক্রমশঃ অবিনাশ পালের চোখদুটি। বশিষ্ঠের কোলের কাছটিতেই ঠিক মিট মিট করে জ্বলে ক্ষীণপ্রভ জ্যোতিষ্ক একটি—পতিব্রতা অরুন্ধতী। মনে পড়ছে—সিদ্ধেশ্বর ভটচাজ্যি মশায়ের কথা। বহুকাল আগে তিনিই একদিন চিনিয়ে দিয়েছিলেন একটি একটি করে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তারাগুলিকে। জ্যোতিষী মানুষ ছিলেন। চিনতেন জানতেন অনেক কিছু। বলতেন শোনাতেনও কত কি কথা সব। কুশণ্ডিকার সময়ে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে অনুরাগ-ভরে নববধূকে দেখাতে হয়—ঐ অরুন্ধতী নক্ষত্র। বধূ নাকি একান্ত পতি-অনুরাগিণী হয় এর ফলে। তা ছাড়া পরমায়ু যার নিঃশেষ হয়ে আসে প্রায়—অরুন্ধতী একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় তার দৃষ্টির সীমা থেকে। দেখা দেয় না আর তাকে। বহুকাল বাদে —আজ আবার আকুল দৃষ্টি দিয়ে হাতড়াতে লাগল অবিনাশ পাল —আকাশের কোলে—অরুন্ধতীর অস্তিত্ব। কোথায় অরুন্ধতী! নজরে পড়ছে কৈ আজ—সেই পতিপ্রাণা ঋষিজায়ার স্নিগ্ধপ্রভ অস্তিত্ব! চমকে উঠল অবিনাশ পাল। আয়ুসূর্য্য একেবারে প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে নিশ্চয়ই। অস্তাচলে ঢলে পড়বার দিন আসন্ন হয়ে এসেছে—তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এ। বয়েস কত হয়েছে—সঠিক হিসাব নেই তার কোন রকম। অস্পষ্ট ছায়াছবির মত মনে জাগছে একটি পুণ্য অনুষ্ঠানের আনন্দঘন দৃশ্য। ষষ্ঠীতলায় অশ্বত্থ গাছ 'পিতিষ্ঠে' করলেন—দিগম্বর চাটুর্য্যের বিধবা মেয়ে জগত্তারিণী দেবী। পাড়ার মুরুব্বির তারিণীপিসী। পাঁচ গাঁয়ের লোক পেট পুরে খেলে চাটুজ্যেবাড়ীতে। অনুষ্ঠানের সে কি ঘটা! আট কি দশ বছরই আন্দাজ বয়েস হবে হয়ত তখন অবিনাশ পালের। আজকের কথা নয়। সে গাছ কত বড় হয়ে গেল চোখের সামনে। শাখায় কাণ্ডে তার পরিণত বয়সের লক্ষণ সব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। মাত্র তিন আনায় এক পসুরি চাল মিলত তখন। পাকী ওজনের। কলমা, নাগরা, ঝিঙেশাল, বাদশা-ভোগ—সব ঐ একদর প্রায়। দু'চার পয়সার ফারাক হয়ত। পাই পয়সার চলন ছিল—কড়িও চলত দিব্যি। বেশ মনে পড়ে—এক পয়সায় ফেনি বাতাসা মিলত পুরা চার গণ্ডা। না চাইলেও মুচকি হেসে মহেশ ময়রা আবার ফাউ দিত একখানা করে। সেকাল অতীত হয়ে গেছে কবে। মনে পড়ে না ভাল। দিগন্তের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিলে অবিনাশ পাল। আরও একটু যেন হেলে পড়েছে সপ্তর্ষি আকাশের কোলে। আকাশ নয় ঠিক—কালের প্রয়াণ-পথ। অবিচ্ছিন্ন—অবিরাম—কায়াহীন একটা প্রবাহ চলেছে ঐ পথ ধরে। কালের প্রবাহ। চোখের সামনে দিয়ে চির-নেপথ্যের আড়ালে চলে গেল—জীবনের কত স্বর্ণোজ্জ্বল দিন—সঙ্ঘাত প্রতি-ঘাত চিহ্নিত—কত বৎসর—কত যুগ। পুরা একটি শতাব্দীর আয়ু নিঃশেষ হয়ে আসতে ক'টা বছর আর বাকি আছে—কে জানে!

আবার—আবার সেই অস্বস্তিকর চিন্তারাশি স্নায়ুগুলির উপর তীব্রভাবে দাঁত বসাল যেন। দিক্‌প্রান্ত থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এল অবিনাশ পাল। না—অবিনাশ পাল নয় আর—পালকর্ত্তা। ঐ বলেই এখন ডাকে সবাই। নাম ধরে ডাকবার মত বেঁচে নেই আর কেউ এখন—এ তল্লাটে কি আশপাশের কোন গ্রামে। চিন্তায়

দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কের মধ্যে বেজে উঠল আবার মেয়ের মুখের সেই কথাগুলি :—

—তুমি যাই বল বাবা—সতী ও-বাড়ীতে বিয়ে করবে না কিছুতেই।—কথাটা মর্ম্মে পৌঁছতেই চমকে উঠেছিল পালকর্ত্তা। অভাবনীয় কথা বই কি! বিয়ে করবে না কিছুতেই সতী—আত্মঘাতী হবে!—বলে কি আনন্দময়ী। দেহের পুরানো কাঠামোটার সঙ্গে দেহাশ্রয়ী সেকেলে মনটাও আকস্মিক একটা ঝাকানি খেয়ে কেমনতর হয়ে গিয়েছিল যেন।

পালকর্ত্তার বড় আদরের নাতনী—এই সতী। সতের পেরিয়ে আঠার বছরে পা দিয়েছে সবে। প্রতিমার মত মুখচোখ। কাঁচাসোনার রঙ। তার উপর পর্য্যাপ্ত লাবণ্যের ঢল নেমেছে যেন ইদানীং। এ পাড়ায় কুমোরদের ঘরে এমন মেয়ে—আচমকা বিদ্যুৎচমকের মত। বেশী দিনের কথা নয়। পীতাম্বর বৈরাগী প্রতি বছরেই বাড়ী বাড়ী নাম দিতে আসত তখন। রাধামাধবের নাম গান। বৈশাখে, কার্ত্তিকে, মাঘে—মাসভোর নাম গেয়ে যেত পীতাম্বর রোজ সকালের দিকে। মন্দিরার আওয়াজ পেলেই বুড়ো-বৈরাগীর কাছে ছুটে আসত সতী। সতী নয়—সাত বছরের একটি অপরূপ কমলকলি সামনে এসে দাঁড়াত যেন। নামগানের মহিমায় অতটুকু মেয়ের মনেও আনন্দ-মন্দিরা বেজে উঠত যেন। চেয়ে চেয়ে অভিভূত হয়ে যেত পীতাম্বর। হেসে হেসে প্রায়ই বলত—তোমার কপাল ভাল পালকর্ত্তা—এমন নাতনী পেয়েছ। আহা, মহামায়াই ঘরে এসেছে তোমার—এ অন্য কেউ নয়। চেরকাল ভক্তি দিয়ে মায়ের 'পিরতিমে' গড়ে এসেছ—মা তাই ধরা দিয়েছেন তোমায়।

রূপের প্রশংসা! সাত বছরের সতী কেমন করে চাইত যেন। কোথা থেকে একঝলক লজ্জার আভা নেমে সতীর মুখচোখকে আচ্ছন্ন করে তুলত সঙ্গে সঙ্গে। ছুটে চলে আসত সতী দাওয়ার উপরে—একেবারে পালকর্ত্তার খুব কাছটিতে। পিঠের দিক থেকে জড়িয়ে ধরে দাদুর কাঁধের কাছে অপরূপ মুখখানা লুকিয়ে ফেলে—বাঁচত যেন কোন রকমে। এত লজ্জা ছিল মেয়ের।

তা পীতাম্বরের কথাটা নিতান্ত অত্যুক্তি বলে উড়িয়ে দেবার মত নয়। প্রতিমা গড়ত না তো পালকর্ত্তা! রঙ মাখিয়ে—চোখ চানকাবার আগে—ধ্যান করত যেন অবিনাশ পাল। মহামায়ার ধ্যান। ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ভক্তিভরে তুলির টান দিত একটির পর একটি। দেখতে দেখতে মাটির প্রতিমার মুখেচোখে প্রকাশিত হয়ে উঠত জগজ্জননীর বিশ্ববিমোহন রূপ। হাতের গুণই বলতে হবে বই কি? ষষ্ঠী, সপ্তমীতে রায়বাড়ীর দুর্গাপ্রতিমার মুখে শ্বশুরবাড়ী থেকে সদ্যফেরা মেয়ের মতই স্মিতহাসি ফুটে উঠত যেন। অষ্টমীতে সন্ধিপূজার সময়টায় কিন্তু মুখচোখ যেন পালটে যেত মায়ের। ভটচাজ্যি মশায় বলতেন—দেবী চামুণ্ডার ভর হয় নাকি ও-সময় প্রতিমার উপর। আবার নবমীর রাত পোহালেই কান্নায় করুণ হয়ে উঠত প্রতিমার মুখখানি। আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা ঘনিয়ে আসত দুটি চোখে।—সব হাতযশ ওই পালকর্ত্তার। বড়কর্ত্তা পরমেশ্বর রায় ঠাকুরদালানে দাঁড়িয়ে গদগদ হয়ে বলতেন—অবিনাশের তুলির টান তো আছেই—তার সঙ্গে আছে ওর ভক্তির টান। তাই মায়ের আমার অমন রূপ ফুটেছে। এসব বেশী দিনের কথা নয়। জলজল করছে যেন দিনগুলো আজও চোখের সামনে। সে সব আনন্দদীপ্ত দৃশ্যপট কিন্তু কোথায় মিলিয়ে গেল কয়েক বছরের মধ্যেই। কর্ত্তাদের চোখ-বোজার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মা-লক্ষ্মী বিদায় নিলেন রায়বাড়ী থেকে। অতবড় জমিদারী! শরিকানা ভাগাভাগি হয়ে হয়ে—মামলার মোকদ্দমায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে—দেখতে দেখতে কোথায় কি হয়ে মিলিয়ে গেল যেন সব। সেই ঠাকুরদালান—সাতপুরুষ ধরে প্রতি বছরে যেখানে প্রতিমা হাসত—সে সব ভেঙে ভেঙে বিক্রি হয়ে গেল পুরানো ইট-কাঠের দরে। নাতনীর দিকে চেয়ে চেয়ে এমনি কত কি কথা সব ভাবত পালকর্ত্তা। কিন্তু যাক ও-কথা। সেই লাজুকলতা আজ এমন প্রগলভা এমন অনমনীয় হ'ল কেমন করে—ভাবে তাই অবিনাশ পাল। নিজের মুখে দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিয়েছে আনন্দময়ীকে—কিছুতেই বিয়ে করবে না—আত্মঘাতী হবে, তবু বিয়ে করবে না ওখানে।

ওখানে অর্থাৎ বেশী দূরে নয়—ওই পাশের গাঁ মাধবপুরে। মাধবপুরের নিকুঞ্জ পালের নাম এ তল্লাটের সবাই শুনেছে—দেখেছেও তাকে সবাই। গঞ্জের আড়তদার। খোল-ভূষির চালু কারবার লোকটার। তা ছাড়া তেজারতীও আছে। ওই করে দালান-কোঠা তুলেছে—ক্ষেতখামারও বাড়িয়েছে দিব্যি। কাচ্চাবাচ্চায় ভরা বাড়-বাড়ন্ত সংসার। কিন্তু কপালে নাকি সব সুখ লেখে না বিধাতা। না হলে মাত্র তিন দিনের জ্বরে বউটাই বা ওর মারা যাবে কেন হঠাৎ? বাড়ীতে বয়স্থা স্ত্রীলোক বলতে দ্বিতীয় জন নেই আর। এখন সংসার সামলায় কে—ছেলেপুলেদেরই বা দেখাশোনা করে কে। ক'টা মাস কেটেছে অবশ্য কোনরকমে। কিন্তু ইদানীং বেশী একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যেন বেচারী। বেশ বাড়ন্ত গড়নের একটি ডাগর মেয়ে খুঁজছিল তাই নিকুঞ্জ। হাঁ, দ্বিতীয় সংসার না করে আর উপায় কি! নিকুঞ্জ নিজে বাড়ী বয়ে এসে কথা পাড়ে নি অবশ্য। সপ্তাহ দুই আগে নীলমণি চক্রবর্ত্তী এসেছিলেন একদিন, পাওনা টাকার তাগাদা দিতে। নিকুঞ্জ নিজে নিরক্ষর। কারবারের হিসেবপত্র দেখেন ওই চক্রবর্ত্তী মশাই। আদায়-উসুলও করেন উনি। নিকুঞ্জর কাছ থেকে হাওলাত নিয়েছে পালকর্ত্তা বড় কম নয়। তা তিন-চার দফায়—পুরো পাঁচশো টাকাই হবে প্রায়। ধার না নিয়ে উপায় ছিল না অবশ্য। রাজরোগ ঢুকল সেবার সংসারে। শিবের অসাধ্য ব্যাধি। ছেলে, ছেলের বউ আর একমাত্র নাতি—ক'বছর ধরে ক্ষয়কাশে ভুগে ভুগে সংসারকে ছিন্নভিন্ন করে দিলে যেন। চিকিৎসার ত্রুটি করে নি পালকর্ত্তা। কবিরাজে ডাক্তারে ওষুধে পথ্যে—পয়সার কি শ্রাদ্ধই হয়েছে ক'টা বছর ধরে। ধরে রাখতে পারে নি কিন্তু পালকর্ত্তা কাকেও। তিন বছরের মধ্যেই একে একে তিনখানা পাঁজরা খসে গেছে পালকর্ত্তার। যাক সে কথা। খরা কাঁধে

নিয়ে জল আনতে যাচ্ছিল তখন সতী। চক্রবর্ত্তী মশাই চিনতেন ওকে। বাড়ন্ত গড়নের সতীকে দেখেই বললেন সেদিন ফস করে—আহা, এমন দুর্গাপ্রতিমের মত মেয়ে—কোথায় কোন্ বে-হাতে পড়বে হয়ত! বল ত, নিকুঞ্জর কাছে কথাটা পাড়ি পালকর্ত্তা। এমনি ডাগর মেয়েই তো খুজছে নিকুঞ্জ। মা লক্ষ্মী বেশ বড়সড়টি হয়ে উঠেছে। ওর সংসারের হাল ধরতে পারবে গিয়ে। ছেলেপুলের সংসারে মাকে আমার মানাবেও ভাল।

প্রস্তাবটা শুনে প্রথমটায় চমকে উঠেছিল পালকর্ত্তা। অন্য কিছুর জন্যে নয় অবশ্য। খেতে পরতে পাবে মেয়েটা—সুখের মুখও দেখবে হয়ত। কিন্তু বয়স তো নিতান্ত কম হয় নি নিকুঞ্জর। ধর্ম্মদাসের সমবয়সীই হবে বোধ হয়। ধর্ম্মদাস সতীর বাবা—পালকর্ত্তার স্বর্গত পুত্র। নিকুঞ্জর রঙ ময়লা। মুখখানারও শ্রীছাঁদ নেই কোনরকম। তা ছাড়া নিকুঞ্জ একেবারে নিরক্ষর। সতীর রূপের কথাটা বাদ দিলেও ওর বিদ্যের কথাটা একটু ভাবতে হয় বৈ কি? কিছু না হোক—আপার প্রাইমারী পাস করেছে সতী। জলপানি-পাওয়া মেয়ে। রায়েদের ললিত বি-এ পাস করা ছেলে। লেখাপড়ায় মাথা দেখে শতমুখে প্রশংসা করত সতীর। কত দিন পড়িয়ে গেছে সতীকে নিজের ইচ্ছেয় বাড়ী বয়ে এসে। তা ছাড়া এখনও মাঝে মাঝে কত কি সব বই পড়তে দিয়ে যায় সতীকে। নিকুঞ্জ একেবারে নিরক্ষর বটে, কিন্তু পয়সা আছে লোকটার—দিব্যি শাসালো। ওদিক দিয়েও না হয় মানিয়ে যাবে কোনরকমে। কিন্তু একপাল কাচ্চা-বাচ্চা রয়েছে নিকুঞ্জর সংসারে। একটি-দুটি নয়, পাঁচ-পাঁচটা—ছেলেতে-মেয়েতে। বড় ছেলেটা সতীর সমবয়সীই হবে বোধ হয়। মাস দুই আগে এসেছিল একবার এখানে বাপের সঙ্গে। নিজে চোখে দেখেছে তাকে পালকর্ত্তা। জীবনে সাধ, আহ্লাদ, সখ—সব মেয়েরই থাকে। সতীর মনে ধরবে কি নিকুঞ্জকে—কে জানে!

পালকর্ত্তাকে চিন্তাবিষ্ট দেখে চক্রবর্ত্তী মশাই উৎসাহ দিয়ে বলে উঠেছিলেন সঙ্গে সঙ্গে—আরে খরচ-পত্তরের কথা ভাবছ তো পালকর্ত্তা? সে সব ব্যবস্থা হবে 'খন—ভেবো না তুমি। নিকুঞ্জ দায়ে পড়েছে বলেই না কথাটা পাড়ছি। তোমার এখানকার সব ঘর-খরচা দিয়েই মেয়ে নিয়ে যাবে নিকুঞ্জ—ভেবে দেখ একটু। তা ছাড়া—বলে পালকর্ত্তার কানের কাছে মুখ এনে স্বরটা একটু নামিয়ে বড় আশ্বাসের কথাটিও শুনিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। দেনার টাকাও আর শুধতে হবে না তোমায়—বুঝলে পালকর্ত্তা! তমসুকী কাগজপত্তর সব ছিঁড়ে ফেলে দিলেই চলবে। নিকুঞ্জর টাকাকড়ি বলো, বিষয়-সম্পত্তি বলো, সবই তো হবে তখন গিয়ে তোমার ওই নাতনীর গো—বল কি না? টেনে টেনে হেসেছিলেন সেদিন চক্রবর্ত্তী মশাই।

বড় আশ্বাস এবং আশার কথাই বটে। পাঁজরাভাঙা হাল হয়েছে সংসারের অনেক দিন আগে থেকেই। যোজগারের সব পথ জুড়িয়ে দিয়েছেন ভগবানই নিজের হাতে। না হলে একমাত্র ছেলে ধর্ম্মদাস চোখ বুজবে কেন অকালে! একপাল ছেলেমেয়ে হয়েছিল পালকর্ত্তার। সব বেঁচে থাকলে ঘরে-দোরে জায়গা হ'ত না এমন দিনে। কত কাণ্ড করে, ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে—শেষ বয়সের দুটি মাত্র ছেলেমেয়ে টিকেছিল কোনরকমে। তারও একটি চলে গেল। একমাত্র নাতিটাও গেল সেই সঙ্গে। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ—দুই-ই নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে পালকর্ত্তার চোখের সামনে থেকে। উত্তর-পুরুষহীন সংসারে পুরুষ বলতে পালকর্ত্তা এখন একা। জীর্ণ অতীতের অবসন্ন কঙ্কাল একটি। কোমরটা অনেকটা ভেঙে পড়েছে ইদানীং। হাত-পায়ের সামর্থ্যও নিঃশেষ হয়ে আসছে ক্রমশঃ। অবলম্বন বলতে সংসারে ওই দুটি মাত্র নারী—আনন্দময়ী আর সতী। মেয়ে আর নাতনী। মাথার উপর ওই দেনার বোঝা। সুদে-আসলে তারও ভার বাড়ছে ক্রমশঃ। এদিকে দিন দিন অরক্ষণীয়া হয়ে উঠছে সতী চোখের সামনে। কলাগাছের চেয়েও বাড় যেন মেয়ের। একাল বলেই চলছে—না হলে ঘরে রাখা যায় না আর ওকে কোন মতেই। রূপের ঐশ্বর্য্য আছে অবশ্য সতীর। সোনার প্রতিমা বললেই হয়। হলে কি হবে, বাপ-মা ক্ষয়কাশে ভুগে মরেছে। ভাইটিও গেছে ওই রোগে। জেনে-শুনে ও-মেয়েকে ঘরের বউ করতে চায় না কেউ। কত জায়গা থেকে তো বিয়ের কথা এসেছে—কথা পেড়েছেও কত জায়গায়। কিন্তু ওই এক বাধা বিন্ধ্যাচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের মুখ থেকে বড় আশ্বাসের কথা শুনে তাই একটু যেন আশাদীপ্ত হয়ে উঠেছিল পালকর্ত্তা।

পড়ন্ত বেলা তখন। উঠানের একপাশে চাক ঘুরছিল বন্‌বন্ করে। কুমোরের চাক। আঙুলের টিপনির মহিমায় নরম মাটির তাল থেকে দেখতে দেখতে হয়ে উঠছিল তিজেলের মুখের মাপসই এক একটি সরা। নিবিষ্ট মনে একটির পর একটি সরা গড়ে চলেছে তখন আনন্দময়ী। এ কাজে পটু ও ছেলেবেলা থেকেই। ওদিকে নজর পড়েছিল পালকর্ত্তার। গতর খাটিয়ে মেয়েই এখন সংসারের হাল ধরে বেয়ে নিয়ে চলেছে কোনরকমে। এমন কি আর বয়স হয়েছে ওর! কিন্তু দেখতে দেখতে বুড়ী হয়ে আসছে যেন আনন্দময়ী। চকিতের মধ্যে মনে পড়েছিল পালকর্ত্তার—আনন্দময়ীর বিয়ের ব্যাপারটা। আজকের কথা নয়। প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। আনন্দময়ী তখন কিশোরী। তের বছরও পুরো হয় নি তখন বয়স ওর।—কুড়োলের নিবারণ পাল—হাঁ, সেও দোজবরে ছিল। বয়সও বেশ একটু বেশী ছিল বৈ কি? কালো বেঁটে—মাথাভরা টাক। সত্যি, চেহারাটা বেশ খানিকটা বেমানান ছিল নিবারণের। সব জেনেশুনেও শেষটায় তাকে মেয়ে দিতে রাজী হয়েছিল পালকর্ত্তা। গৃহিণীর আপত্তিকেও আমল দেয় নি সেদিন। বাড়ী বয়ে এসে বিয়ের কথা পেড়েছিলেন—অন্য কেউ নয়—নকুলেশ্বর ভটচাজ্যি মশায় নিজে। ধরতে গেলে এ বাড়ীর তিনপুরুষের গুরু তিনি। প্রাচীন মানুষ। তাই কথা ঠেলতে পারে নি পালকর্ত্তা কিছুতেই। হ'লই বা বয়স

একটু বেশী। পেটে বেশ দু'কলম বিদ্যে রয়েছে লোকটার। তা ছাড়া ফিকিরে লোক নিবারণ। বিশ বছর হ'ল সোনাডাঙার জমিদারদের নায়েবগিরি করছে। কিছু না হোক—সোনাদানায় আর জমিজমায় মিলিয়ে এক করলে—নিবারণ নিজেই ত ছোটখাটো একটা জমিদার-গোছের। ভটচাজ্যি মশায়ের কথাগুলো যেন স্পষ্ট মর্ম্মের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে আজও। মেয়ের তখন নিজের ভালমন্দ বোঝবার বয়স হয় নি মোটেই। দ্বিরাগমনের সময়ে যা আকুল হয়ে খুব খানিকটা কেঁদেছিল আনন্দময়ী। তা সব মেয়েই কাঁদে অমন। বিয়ের পর প্রায়ই ত যেত পালকর্ত্তা কুড়োলে—মেয়ের খোঁজ-খবর নিতে। বেশ মনে পড়ে—কচি মেয়ে দু'দিনেই দিব্যি গিন্নীবান্নীগোছের হয়ে উঠেছিল যেন নিবারণের সংসারে। মানিয়েও গিয়েছিল দিব্যি। হাসিখুশিভরা মুখ। সতীনের মেয়ে ছিল পাঁচটি। দু'টির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। একটি ছিল ওর সমবয়সী প্রায়। আর কোলের দুটি ছোট ছোট। পালকর্ত্তা গেলেই একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে মেয়েদের কথা শোনাত আনন্দময়ী। সন্তান-গৌরবে মেয়ের মুখ-চোখে সেই বয়েসেই কি এক ধরনের অপরূপ ভাব ফুটে উঠত যেন। শুধু বিস্মিতই হ'ত না পালকর্ত্তা—বিমুগ্ধও হ'ত যেন। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল যেন। জমিজমা, ঘরবাড়ী, মায় সোনাদানা যথাসর্ব্বস্ব ঘুচে গেল বিধাতার কলমের একটিমাত্র খোঁচায়। কলমের খোঁচা নয় ত কি! না হলে,নিবারণের মত ফিকিরে লোক তহবিল তছরুপের দায়ে পড়বে কেন? এক-আধ টাকা নয়—একেবারে কয়েক হাজার টাকার ফের। পুরনো মনিবরা তখন গত হয়েছিলেন সব। নতুন কর্ত্তারাই ষড়যন্ত্র করে প্যাঁচে ফেলেছিল সম্ভবতঃ। জেলে যাওয়ার বিপাক অবশ্য এড়িয়েছিল নিবারণ কোনরকমে—যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে। কিন্তু বিধাতার মার অন্য দিক দিয়ে এল আবার। সেই বছরেই সাপে কাটল নিবারণকে। চার তল্লাটের ওঝারা এসে সে বিষ আর নামাতে পারলে না কিছুতেই। কালেই খেয়েছিল নিবারণকে। মেয়ের বয়স তখন বোধ করি উনিশ কি কুড়ি। অদৃষ্টে ওর কিছুই সইল না তাই, না হলে, আনন্দময়ীর মুখ থেকে অতৃপ্তির গুঞ্জন শোনে নি কেউ কোনদিন।

ভাবতে ভাবতে সেদিন দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তভূমিতে দৃঢ়সঙ্কল্পের একটা ভিত্তি গড়ে উঠেছিল যেন একটু একটু করে। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ীকে ডেকেছিল পালকর্ত্তা—কথাটা শোনাবার জন্যে। হাঁ, মেয়েরও একটা মতামত নেওয়া দরকার বৈ কি এ ব্যাপারে! সব কথা শুনে আনন্দময়ীও প্রথমটায় চমকে উঠেছিল যেন। পরক্ষণেই আনমনা হয়েছিল যেন একটু। অতীত-পরিক্রমায় মেতেছিল হয় ত মেয়ের মনটা চকিতের জন্যে। সতীর অদৃষ্ট যেন তারই ভাগ্যের সঙ্গে সমান্তররেখায় পা ফেলতে চলেছে—এ ধরনের কোন কথা ভেবে অবচেতন মন ওর আতঙ্কে উঠেছিল কিনা কে জানে! কিন্তু আনন্দময়ীর মুখচোখে সেদিন সে রকম কোন ভাবের দ্যোতনা লক্ষ্য করে নি পালকর্ত্তা। নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু আনন্দময়ী। মতামত কি ওর তা বোঝা যায় নি তখন ভাল করে। চোখমুখ দেখে বরং মনে হয়েছিল পালকর্ত্তার—কথাটা শুনে একটু যেন আশ্বস্ত হয়েছে আনন্দময়ী। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিল বটে মেয়ে—তা কিন্তু তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস বলেই মনে হয়েছিল পালকর্ত্তার। ডাগর মেয়ে ঘরে থাকা যে কি জ্বালা—সে শুধু ভুক্তভোগীই জানে। মেয়ের মুখ থেকে তাই কোনরকম উক্তি প্রকাশ পাবার আগেই আশাদীপ্ত চোখজোড়া তুলে আকুলভাবে বলেছিল পালকর্ত্তা—এতে আমাদের কোনরকম অমত নেই চক্কোত্তি মশাই।—নিকুঞ্জ যদি দয়া করে মেয়েটাকে ঠাঁই দেয় ঘরে—সে ওর ভাগ্যি। মন খোলসা করে একেবারে পাকা কথাই দিয়ে ফেলেছিল সেদিন পালকর্ত্তা।

বিয়ের সব ঠিকঠাক। কাল বৈকালে মাধবপুরের ওরা এসে আশীর্ব্বাদ করে গেছে সতীকে। সাড়ে তিন ভরির হার দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছে। তা ছাড়া, ঘরখরচার দরুন নগদ দুশ' টাকা গুনে দিয়ে গেছেন চক্রবর্ত্তীমশাই—নিকুঞ্জর হয়ে। হাত পেতে নিয়েছেও তা পালকর্ত্তা। বিয়ের আর দিন তিনেকমাত্র দেরি এখন অপ্রত্যাশিতভাবে সতী হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়েছে। শুধু স নয়—আনন্দময়ীও কেমন কেমন সব কথা কইলে যেন-কাল সন্ধ্যার সময়। ভাইঝির হয়ে ওকালতীই করলে যেন তখন। সতী যে বেঁকে দাঁড়িয়েছে—এ ব্যাপারে আনন্দময়ীরও অনুমোদন আছে নিশ্চয়ই। না হলে অমন সব কথা বলবেই বা কেন আনন্দময়ী! আকুল হয়ে ভাবতে লাগল পালকর্ত্তা। এতকাল ধরে নিজের মেয়েকে কি তা হলে ভুলই বুঝে এসেছে পালকর্ত্তা! শান্ত-নিরাসক্ত আবরণের তলায় আনন্দময়ীর দ্বিতীয় একটা সত্তা লুকিয়ে আছে যেন। সে সত্তার স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে কাল চকিতের জন্যে। তলে তলে পরম অতৃপ্তির ক্ষুধা নিয়েই তা হলে ধীরে ধীরে বয়োজীর্ণ হয়ে উঠছে আনন্দময়ী! বাড়ীঘর, টাকাকড়ি, বিষয়সম্পত্তি—এ সবের কোন দাম থাকবে না বাবা—কোন দাম থাকবে না। আধবুড়ো সোয়ামী—আর সতীনের একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে কোন মেয়ে সুখ পায় নি বাবা, কোন জন্মে,—কোন মেয়ে নয়। আনন্দময়ীর আবেগোচ্ছল কথাগুলো কানে একেবারে তালা ধরিয়ে দিয়েছিল যেন পালকর্ত্তার। তিরিশ বছর আগে যে-সব কথা অন্তরের মধ্যে দুর্ব্বার হয়ে উঠেও হয়ত প্রকাশের পথ পায় নি, এত দিন পরে কাল সন্ধ্যায় সেই সব কথাই দুর্দ্দম-আবেগে আনন্দময়ীর মনের সব আগল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছিল যেন। উত্তেজনার ঝোঁকে প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে সেই সঙ্গে বলেছিল আনন্দময়ী, দিনকাল পালটে গেছে বাবা। মেয়েদেরও ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, প্রাণ বলে জিনিস আছে। জোর করে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেবে যে মেয়েটাকে—সে-কাল নেই আর।

শুধু হতবাক নয়—বজ্রাহতের মতই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল পালকর্ত্তা প্রথমটায়। চকিতের জন্যে ছায়াছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল মেয়ের বিবাহিত জীবনের কয়েকটি দৃশ্যপট। কয়েকটা বছরের জন্যে গিয়ে মেয়ে তার তা হলে অভিনয়ই করে-

সমগ্র মানব-সমাজ যেন একই পরিবার সম্ভূত এইরূপে কার্য্য করিয়াছে।

আমরা সবাই এক, সকল মানুষই নিবিড় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ—এই মহান চিন্তা কেবল কবিকল্পনা নহে, ধীর চিন্তায় ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যায়। দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ এই পৃথিবীর কলুষ দূর করিতে আজ এই 'একাত্ম' ভাবের প্রচার বাঞ্ছনীয়, এই প্রকার প্রীতিপূর্ণ নির্বিরোধ আবহাওয়াতেই মানুষ আত্মোন্নতির এবং দেশোন্নতির সুযোগ পাইয়া থাকে।

বিশ্বমানব-মৈত্রী বা প্রীতি ভারতবর্ষের নিকট নূতন নহে। তপোবন-সভ্যতার সময় হইতে সুরু করিয়া মানবতার যে আদর্শ ভারতবর্ষ প্রচার করিয়াছিল রবীন্দ্রনাথের আন্ত-র্জাতিকতাবাদে তাহা পূর্ণতর পরিণতি লাভ করে এবং বর্তমান ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল সুর ভারতের এই সনাতন বাণীর মধ্যেই নিহিত আছে।

ভারতের এই শান্তির বাণী পর পর দুই মহাযুদ্ধ-জর্জরিত পৃথিবীতে নূতন যুগের সূচনা করে; ভারত-অনুসৃত নীতি প্রথমে অবিমিশ্র অভিনন্দন লাভ করে নাই। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ কোনরূপ বিবেচনা ব্যতিরেকেই ভারতের নীতিকে বাতিল করিয়া দেন; যুযুধান দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ কর্তৃক বাতিল হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষ প্রাচ্য হইতে উত্থিত এই বাণীর মধ্যে তাদের ঈপ্সিত সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের ইঙ্গিত দেখিতে পায়। বিশেষতঃ যে সকল দেশ পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া সম্প্রতি স্বাধীন হইয়াছে তাহাদের নেতৃবর্গ ভারতবর্ষের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি রচনা করিয়াছেন; পঞ্চশীলের পাঁচটি নীতি দ্বারা ভ্রাতৃত্ববন্ধনে ভারতের সঙ্গে এশিয়ার বহু দেশ আবদ্ধ হইয়াছে, যুগোশ্লাভিয়া পোলাণ্ড প্রভৃতি দেশও ভারতের সঙ্গে এই নীতির ভিত্তিতে প্রীতির বন্ধনে জড়িত হইয়াছেন। যে তাচ্ছিল্য সহকারে একদিন ভারতের নীতি বহু দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন আজ সেই মনোভাবের পরিবর্তন হইয়াছে; পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তিস্থাপনে ভারতের ভূমিকা দিন দিন গুরুত্বলাভ করিতেছে। সাম্প্রতিক বিশেষ কয়েকটি ঘটনায় ভারতবর্ষের বর্তমান চিন্তাধারা বিশেষ সমাদর ও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করিয়াছে।

কর্ম্মরত

মানবমৈত্রীর বাণী প্রচারে ভারতবর্ষ পুনরায় পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করিবে এ আশা আজ অনেক দেশই করিয়া থাকে এবং আমরা এদেশবাসীও বিশ্বাস করি, মানবপ্রীতির এই বাণী একদিন বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের সংগ্রামী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাইয়া এক মানবসংসার গঠনের প্রথম সোপান হইবে।

‡ প্রকাশিত ছবিগুলি ইউ.এস.আই.এস আয়োজিত মানব পরিবার' প্রদর্শনীর সৌজন্যে প্রাপ্ত, ৬৮টি বিভিন্ন দেশে ছবিগুলি গৃহীত হইয়াছে।
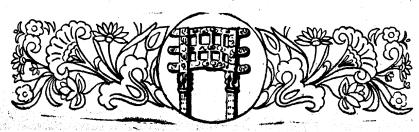
রূপকথার দেশ

শ্রীকরুণাময় বসু

হাসনুহানা ফুলের গন্ধে ঝিমঝিম নিশি পাওয়া রাত,
ঘনবনের মাথার উপরে ম্লান ছলছল চাঁদ ;
ঝিরিঝিরি হাওয়া কাঁপে, লতায় পাতায় কানাকানি,
ঘুম ঘুম চোখে গল্প শুনি : এক ছিল রাজা, এক রাণী।
মনে হয় কোন অচেনা সাতসাগরের পারে দেশ,
পায়ের চিহ্ন কি মুছে গেছে, ছেলেবেলাকার খেলা শেষ ?
দূর হতে ভেসে আসে সুর রাজার ছেলে যায় বাণিজ্যে,
সোনার পালঙ্কে সুয়োরাণী কাঁদে, চোখের জলে ভিজে।
সপ্তডিঙা নোঙর করেছে, সামনেই দেখে কড়ির পাহাড় ;
জনশূন্য রাজপ্রাসাদ, কেবল মানুষের হাড়।
সোনার দাঁড়ে হীরামনি পাখী, অঘোরে ঘুমোয় রাজকন্যে,
জীয়নকাঠিতে জাগায় মেয়েকে, বলে তোমার জন্যে
এসেছি পার হয়ে দুধসাগর, ক্ষীরসাগরের দেশ ;
পক্ষিরাজের ঘোড়ায় চড়ে তোমায় নিয়ে যাব নিরুদ্দেশ।
চোখে ঘুম ঘুম, মন কেমনকরা ঝিমঝিম রাত ;
তার পর কি হ'ল রাজার ছেলের ? ফাগুন আকাশে চাঁদ,
পদ্মকুঁড়িতে ছাওয়া দীঘির কালোজল থৈ থৈ,
লতায় পাতায়, ঘাসের ডগায় জ্যোৎস্নাফুলের খৈ।

স্ফটিকস্তম্ভে রাক্ষসের প্রাণ ঘুমোয় সোনার ভ্রমর ;
কেশবতী মেয়ের চুলের গন্ধে বায়ু হ'ল মন্থর।
ফাগুন চলে যায়, আমের মুকুলে ওড়ে মৌমাছি,
গল্পের কি শেষ আছে, মার কোলের আরো কাছাকাছি
ঘেঁষে আসি, ঘুম ঘুম মনে আফিমফুলের নেশা ;
রাজার ছেলে যদি আমি হতাম, মনে রঙীন স্বপ্নে মেশা।
রাজার মেয়ে আনে জাঁতি, যুঁথী ফুল, ভরি কুসুম ডালা,
রাজার ছেলে দিল রাজকন্যেকে গজমোতির মালা।

পক্ষিরাজ মেলেছে পাখা সাঁই সাঁই সাঁই, পথ নিঃসীম,
ঘুম ঘুম চোখ, বৃষ্টি পড়ে চাঁপার বনে রিম ঝিম ঝিম।
এসেছি ফিরে রাজার কুমার দুধবরণ মেয়ে সাথে,
গলায় মণি-হার, রতন সিঁথি, হীরার কাঁকন হাতে।
সুয়োরাণী আসে মুখে হাসি, চোখে জল, ছেলের মুখে দেয় চুমো;
আমার গল্পটি ফুরুলো, খোকন এবার ঘুমো।
মল্লিকা বন চুপচাপ, মন কেমনকরা রাত নিঝুম,
ফুলের শব্দ টুপটাপ, চাঁদের চোখে যেন ঘুম ঘুম।

আজো ফিরে আসে নব ফাল্গুন সন্ধ্যা-মালতী ফুলবনে,
রিম ঝিম ঝিম শ্রাবণের ধারা ছায়া আঁকা ঘন নির্জনে।
পথ চলে যায় পাহাড় ডিঙিয়ে তেপান্তরে,
ফুল পাখী চাঁদ আগেকার মত, মন কি কেমন করে ?
হয়ত এখনো নোঙর করেছে ময়ূরপঙ্খী নাও,
পাশাবতী মেয়ে কেঁদে বলে, রাজার কুমার কোথা যাও ?
সাতসাগরের লহর তুলেছে, সোনার পরীরা করে স্নান,
উতলা হাওয়ায় আজো ভেসে আসে চিকণ সুরের মিহি গান।
কিশোর বেলায় কতদিন ভাবি ইচ্ছামতীর চরে
সরু আল ধরে পথ চলে যায় কোথায় বনান্তরে,
ভাঁটবনে আর কাশজঙ্গলে, বেতঝোপে ফাঁকে ফাঁকে
হারিয়ে যাওয়া কি রাজার কন্যে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকে।
ঘন কেয়াবনে ছায়ানির্জনে উদাসিনী বুঝি কাঁদে কেউ,
কান্নার ফুলে সুরভি-স্বপ্ন, আতাল পাতালে লাগে ঢেউ।
সবই ত রয়েছে, শুধু নেই মনে আগেকার বিস্ময়,
পরশমণির পরশ গিয়েছে, গল্প কি কভু সত্য হয় ?
তবু ভেবে মরি যদি তারা-পরী আকাশ-সিঁড়িতে আসে নামি,
হঠাৎ কখন ঘুম ভেঙে ওঠে ছেলেবেলাকার সেই আমি।
সাত ভাই বোন চম্পা পারুল হারিয়ে গিয়েছে কোন্ বনে,
হাসিমুখে আর আসিবে কি কাছে কোনদিন তারা অকারণে।

ব্যবহারিক জীবনে রূপ ও রুচি

শ্রীঅমূল্যধন দেব

ধর্মভাবকে যাঁহারা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রবৃত্তির পরিব্যাপ্তি এবং বিকাশ জনসাধারণ বাহ্যিক রূপ ও রুচির নিদর্শন হইতেই আন্দাজ করিয়া লয়। লৌকিক সম্ভাষণ 'গুড মর্নিং' বা নমস্কার দ্বারা সম্পন্ন হয়। কেহ কেহ 'জয় গুরু', 'রাম রাম' বা 'হরেকৃষ্ণ' স্মরণ করিয়াও সম্ভাষণ করেন। অনেকেই দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে কোন ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করেন কিংবা কাগজে লেখেন। আপিসের বয়স্ক কেরানীদের মধ্যে অনেকেই, কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রীহরি বা শ্রীদুর্গা অথবা 'মা' এই একাক্ষর শব্দটি কাগজে লিপিবদ্ধ করিয়া, কলম মাথায় ঠেকাইয়া কাজে হাত দেন। সাংসারিক ব্যাপার-সম্পর্কিত পত্রাদি লিখিবার সময়ও অনেকে প্রায় অনুরূপ ভাবে প্রারম্ভেই দেবদেবীর নাম লিখিয়া থাকেন। অনেক ব্যবসায়ী দোকান খুলিয়াই অন্যান্য কাজের আগে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী 'দান' পৃথক করিয়া রাখেন। গঙ্গাজল দ্বারা বাক্স মোছা বা কোনও পট কিংবা বিগ্রহের সম্মুখে ধূপদীপ জ্বালানোও প্রচলিত প্রথা। এইরূপ আচরণ ধর্মীয়, কিন্তু কতটুকু ধর্মের উপলব্ধির জন্য আর কতটুকু ধর্মের ব্যবহারিক নিদর্শনের নিমিত্ত তাহা একমাত্র অনুষ্ঠানকারীই জানেন। যাঁহাদের ধর্ম উপলব্ধি অন্তর্মুখী তাঁহাদের বাহ্যিক অভিব্যক্তি দৃষ্ট নাও হইতে পারে; কিন্তু যাঁহাদের ধর্মের আচরণ ব্যবহারিক তাঁহাদের ধর্মভাবের রূপ ও রুচি বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষের মজ্জাগত। কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার নিষ্পেষণে আধ্যাত্মিকতাকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে—বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের প্রসারের জন্য। আমরা এখন এতদুভয়ের মাঝখানে আছি। বস্তুতান্ত্রিক না হইয়াও উপায় নাই, আবার আধ্যাত্মিকতা ত্যাগ করিতেও দ্বিধা বোধ হয়। এই উভয় সঙ্কটে আদর্শের অবলুপ্তি না হইলেও আদর্শচ্যুতি অসম্ভব নহে। কিছু আধ্যাত্মিক কিছু বস্তুতান্ত্রিক ভাবের আবেষ্টনীতে আমাদের ধর্মভাবের রূপ ও রুচির বিকাশ প্রণিধানযোগ্য।

কসাইয়ের দোকানে একদা বিজ্ঞাপন দেখা যাইত—বাঙালীর পাঁঠার দোকান বা রাজবন্দীর পাঁঠার দোকান। ইহার সঙ্গে ধর্মভাবের সংস্রব নাই। কিন্তু মাংসের দোকানের সাইনবোর্ডে কালীর মূর্তি আঁকা কি দোকানীর কালীভক্তির বহিঃপ্রকাশ? জয়কালী ভাণ্ডার, শ্রীদুর্গা ভাণ্ডার ত আছেই। শ্রীহনুমান জুট মিল, শ্রীকৃষ্ণ ওয়ার্কশপও আছে। অন্নপূর্ণার নামে হোটেল আছে। আর আছে গণেশ তৈল, লক্ষ্মী ঘি, মহাবীর আটা, জবাহর আটা। যেহেতু দেবতার (কোন কোন ক্ষেত্রে মহৎ ব্যক্তিদের) নিজস্ব নামে এই সব নিত্য-ব্যবহার্য, জীবনধারণের অতি-প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিক্রয় হয় তখন এগুলি যে ভেজালহীন সেই ধারণাই ক্রেতাদের মনে জন্মাইয়া দিবার প্রয়াস এই সকল নামকরণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

সাম্প্রতিককালে পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত গ্রন্থের মাধ্যমে পরমহংসদেবের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে ভক্তিমিশ্রিত কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান যুগে বাংলাদেশে আধ্যাত্মিকতার তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ যে আবার নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তাহা সুপ্রকট। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীমহলে ইহার প্রতিক্রিয়া প্রতিবিম্বিত হইয়াছে—রামকৃষ্ণ লণ্ড্রী, বিবেকানন্দ রেষ্টুরেণ্ট, রামকৃষ্ণ বিড়িপাতার দোকান, রামকৃষ্ণ টেলারিং ইত্যাদি নামকরণে। এই প্রকার নামকরণ ধর্মভাব বা ভক্তির নিদর্শনসূচক কিনা এবং এই রকম বাহ্যপ্রকাশ শোভন কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। ব্যবহারিক জীবনে লাভের জন্য এই রকম নামকরণ করিতে যাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন না তাঁহাদের আচরণ প্রশংসনীয় বলা যায় কি?

দেবতা এবং মহাপুরুষের পর আসে নেতাদের কথা। ধর্মের আঙ্গিক ভক্তি। নেতাদের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা-প্রদর্শন অনেক ক্ষেত্রে ধর্মভাবের অভিব্যক্তির সমপর্যায়ে গিয়া পৌঁছে। গান্ধী, চিত্তরঞ্জনের নামে কত যে ব্র্যাণ্ড আছে বা কি ব্র্যাণ্ড যে নাই তাহার ইয়ত্তা করা সাধ্যের অতীত। নেতাজীর নামে রাস্তাঘাট নামকরণের মধ্যে কি ভাব নিহিত আছে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের নামে অনেক রাস্তাঘাটের নামকরণের হেতু সাধারণের নিকট দুর্বোধ্যই থাকিয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য দেশে—যেমন আমেরিকা ও রাশিয়ায় সাধারণতঃ রাস্তার নম্বর থাকে। আমাদের দেশে অন্য রকম। পাঁচু খানসামা, ছকু খানসামা, হায়াৎ খাঁ,

ছিদাম মুদি, অখিল মিস্ত্রী, গুলু ওস্তাগর সকলের নামেই কলিকাতার বুকের উপর রাস্তা আছে। আবার আছে ব্রিটিশ আমলের ভারতবর্ষের শাসনকর্তাদের নামে রাস্তা—যেমন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট। ক্লাইভের নামে যে রাস্তা ছিল তাহার নাম বদল করা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নামে কোন্ রাস্তার নাম হইবে বা কোন্ রাস্তার নাম বদলাইয়া রবীন্দ্রনাথের নামে নামকরণ করা হইবে তাহা লইয়া আজকাল আলোচনা হয়। অবশ্য এই ভাবে স্মৃতিকে বাঁচাইয়া রাখার প্রণালী রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত ছিল কিনা তাহা ভাবিবার বিষয়। এণ্ডারসন হাউস, ব্রেবোর্ণ স্টেডিয়াম, উইলিংডন ব্রীজ, লিনলিথগো ষাঁড় শুধু স্মৃতি বহন করে। নাম বদল করিলেও সেই স্মৃতি অবলুপ্ত হইবে না। কিন্তু বিবেকানন্দ সোসাইটি, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, অরবিন্দ পাঠচক্র, গৌড়ীয় মঠ, ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত শুধু স্মৃতিবহনের জন্য নয়, জনসমাজকে উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য। যেখানে আদর্শের প্রশ্ন, সেখানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নামে রাস্তাঘাট পুলের নামকরণ নগণ্য। তবুও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নামে রাস্তাঘাট পুল হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহাতে যদিও কোন ধর্মভাব প্রচ্ছন্ন থাকে তবে তাহা নিতান্তই গৌণ। মহাপুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করাই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা। সেদিক দিয়া আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি, আজিকার দিনে তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বুদ্ধদেবকে উপলক্ষ করিয়া সিনেমা ব্যবসায়ীরা লাভবান হন, কিন্তু ইহার মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মভাবের প্রচার কতটা হয় তাহা চিন্তনীয়। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন না করিলে ছবি দর্শনে কৌতূহলনিবৃত্তি ছাড়া আর কোন ফললাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। যে সকল সিনেমা ব্যবসায়ী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন, তাঁহার কি কোন লভ্যাংশ স্বামীজী-প্রচারিত দরিদ্রনারায়ণের সেবাব্রত উদ্‌যাপনের সাহায্যার্থ কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিয়াছেন ?

কোনও লটারী খেলার ফল যখন বাহির হয় তখন দেখা যায় অনেকে উপনাম দিয়াছেন—কালী, 'মা', বিবেকানন্দ ইত্যাদি। অর্থপ্রাপ্তির জন্য তাঁহারা দেবতা বা মহাপুরুষের নাম ব্যবহার করেন। প্রকৃত ধর্মভাব থাকিলে এই রকম করা যায় কিনা তাহা বিচার্য্য।

আনুষ্ঠানিক ভাবে দেবদেবীর পূজার সংখ্যা আজকাল পরিমাণে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সর্বজনই এই পূজার সঙ্গে জড়িত থাকেন। সংখ্যা দ্বারা বিচার করিলে বলিতে হইবে, পূজা-অর্চনার দিকে আমরা বেশী আকৃষ্ট হইয়াছি। যাঁহারা উদ্যোক্তা, ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহাদের ধর্মভাব নিশ্চয়ই জনসাধারণ অপেক্ষা বেশী। সভাপতি, প্রধান অতিথি, প্রদর্শনী-দ্বার উদ্‌ঘাটক, প্রতিমার আবরণ উন্মোচক সকলেরই অন্তরে ধর্মভাব নিহিত থাকিলে তবেই এই সকল অনুষ্ঠানের প্রকৃত সার্থকতা। ডেমোক্র্যাসীর যুগে সর্বজন যাহা চায় উদ্যোক্তাদের তাহাই করিতে হয়। পূজার হিসাব দেখিলেই বুঝা যায় পূজায় কোন বিষয়ের জন্য শতকরা কত হারে খরচ হয়। পূজাটা পুরোহিতকে এক রকম কণ্ট্রাক্টই দেওয়া হয়। সর্বজন দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন না। কেহ কেহ হাত তুলিয়া নমস্কার করেন মাত্র। পূজা উপলক্ষে ভিড় সকলেই দর্শন করেন। মৃন্ময়ী মূর্তির দর্শনেই তাঁহারা সন্তুষ্ট, চিন্ময়ীর অনুভূতির প্রয়োজন হয় না। পূজাদর্শন কি ধর্মভাব প্রকাশের দ্যোতক ? মাইকের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণকে দমন করিবার জন্য আজকাল পুলিস আইন জারী করিতে বাধ্য হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। গত পূজার সময় 'চিত্তরঞ্জনে'র প্রধান পূজাকমিটি নিজ তত্ত্বাবধানে পূজাপ্রাঙ্গণে একচেটিয়া একটি ক্যান্টিন খুলিয়াছিলেন। আরতির পরই মাইক দ্বারা ঘোষিত হইত, "আমাদের আর মাত্র সামান্য কিছু কাটলেট আছে, আপনারা শীঘ্র আসুন"। পূজাকমিটির সম্পাদককে প্রশ্ন করায় উত্তর দিলেন, সর্বজন চায় তাই ক্যান্টিন খোলা হইয়াছিল। পাদুকাসহ পূজামণ্ডপে প্রবেশ, ধূমপান করা সর্বজনীন পর্যায়েই আসিয়াছে।

বাঙালীর মাতৃপূজার অর্থনৈতিক নীতির পরিবর্তন হইয়াছে এবং সেই নীতি অনুযায়ী আমরা পূজা-উপলক্ষে কুটিরশিল্পের সাহায্য না করিয়া বৃহৎশিল্পের সহায়তা করিতেছি। ভক্তিমূলক পূজা কেমন করিয়া ক্রমে ক্রমে সাম্প্রতিককালে বস্তুতান্ত্রিক পূজায় রূপান্তরিত হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। নাগরিক জীবনে আমাদের পূজাপার্বণের এই রূপান্তর যে-কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরই চোখে ধরা পড়ে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন প্রকার গুণ। গুণানুযায়ী পূজা সর্বজনীন মণ্ডপে আজকাল তামসিকতাতে রূপান্তরিত হইয়াছে। পূজা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যম। ভবিষ্যতে দুর্গাপূজায় সিনেমা প্রচলিত হইলেও আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। টেলিভিশনে বিছানায় শুইয়াই দুর্গাপূজার দৃশ্য দেখা যাইবে। ধর্মভাবের রূপের পরিবর্তনের সঙ্গে রুচিও বদলাইবে। কৃত্রিমতা এবং বাহ্যাড়ম্বর অভ্রভেদী হইয়া সর্বসাধারণের ধর্মভাবের সমাধিরচনা করিবে, বস্তুতান্ত্রিকতার নিষ্পেষণে অধ্যাত্ম উপলব্ধির নাভিশ্বাস উঠিবে—এই আশঙ্কা বর্তমান সমাজের গতিপ্রকৃতি দেখিয়া দিনের পর দিন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

অন্বেষণ

শ্রীতাপস দাশগুপ্ত

শীতের সমাগমে উত্তর কোণ থেকে যে একটা ঠাণ্ডা বাতাস দেয়, সেটা আজ সুরু হ'ল। চারিদিকের গাছের পাতাগুলিকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, দুর্ব্বল পাতাগুলিকে ঝরিয়ে দিয়ে হু হু শব্দে কি অনিশ্চিত পরোয়ানা নিয়ে পেয়াদা এসে উপস্থিত। সবাই শঙ্কিত, চকিত হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এ রকম একটা অবাধ্য হাওয়ার তোড়ে সামনের সুদৃশ্য দেওয়ালপঞ্জীটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। এতক্ষণ একটা অবসর-সমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম। এবার উঠতে হ'ল। গাত্রোত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আকাশপাতাল ভাবনা-চিন্তার ছন্দপতন ঘটল।

আজ দু'বছর ধরে আমি কর্ম্মের চেষ্টায় উদয়াস্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রথম প্রথম একটা দুরাশা ছিল আর মনে মনে দিনের হিসেব করতাম; একটা শুভ দিনে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। ক্রমশঃ সে সব দুরাশা অন্তর্হিত হ'ল, ইদানীং হয়ে উঠেছিলাম ভয়ঙ্কর সিনিক। হঠাৎ আজ খোঁজ পেলাম আমার এক বাল্যবন্ধুর। কিছু ক্ষমতা আছে কিনা জানি না, তবে আজ বিকেলেই যাব দেখা করতে। সে পুলিসের একজন ইন্‌স্পেক্টর।

লাভলক ষ্ট্রীটে একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই কালো প্লাষ্টিকের জমিনের ওপর সাদা হরফে লেখা ছিল, পি. গুহ, বি-এসসি—চীৎকার করতে করতে একটা 'ককার স্পেনিয়েল' তেড়ে এল।চোর কিংবা দুর্জ্জন কেউ এসেছে কিনাএই তদারকে। আমি চোর নই, দুর্জ্জনও নই, তবে এরকম পরিস্থিতিতে দুর্লভ বটে। ছোটবেলাকার সেই কায়দাটায় ট্রাউজারের পকেটে হাত দিয়ে শিস দিতে আরম্ভ করলাম। কুকুর যথাস্থানে প্রস্থান করল। কিন্তু আর একটা জিনিষের আগমন হ'ল, সেটা হচ্ছে টাটকা শিউলি ফুলের গন্ধ। শুধু অবাক হলাম না, অভিভূতও হলাম বিস্ময়ে। যে প্রবীরকে ছেলেবেলা থেকে জানি নিরীহ ছেলেদের কাছে দৈত্যের মত। রাস্তাঘাটে পৃষ্ঠদেশে 'কেমন আছিস' বলে সশব্দে চপেটাঘাতের মত কি একটা এসে পড়ত এবং সেটা চড় না ঘুসি তা আজও বুঝে উঠতে পারলাম না। আর রসপোলব্ধি! এ সবের ত কোন বালাই তার ছিল না। ভাবলাম প্রবীরের আবার ফুলের ওপর এ অনুরাগ কোথা থেকে এল? কিন্তু সে জবাবের জন্য বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না।

—কি রে কেমন আছিস?

একটা পরিচিত অথচ ভারী গলা কানে এল।

—আয় আয় ভিতরে আয়, বোস এখানে, কি খবর তোর?

যেন অনেক দিনের জমা-করা কথা নিমেষে বলে গেল।

বসতে বসতে আমি দেখলাম, সেই প্রবীর—ছ'ফুট লম্বা, স্বাস্থ্যবান, বলবান, সেই প্রবীর, যে ষ্টীমারের ওপর-ডেক থেকে ভয়ঙ্কর ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিত, ক্লাস-টিচারের নামে রাস্তায়, ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে ছড়া কাটত। সেই প্রবীর ট্রপিক্যাল লিনেনের প্যাণ্ট আর একটা হাওয়াই সার্ট পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা ষ্টেব্রাইট ষ্টীলকেসের ঘড়ি, ব্যাকব্রাশ করা চুল, কপালের মাঝখান দিয়ে আড়াআড়ি কি যেন ফোলার মত একটা দাগ। ওঃ, ওটা টুপী পরার দাগ। পায়ে একটা স্লীপার।

—তোর কি খবর প্রবীর? ভাল আছিস ত।

—হ্যাঁ, এই এক রকম, তুই একটু বোস আমি আসছি।

পাতলা পর্দ্দা সরিয়ে প্রবীর ওঘরে—মানে ভেতরে চলে গেল।

প্রবীর কি বিয়ে করেছে নাকি? বাড়ীতে কি আর কোন লোক নেই। তা হলে এই পরিষ্কার ড্রয়িং রুম, সৌখিন আসবাব, ফুলের ভাসে রজনীগন্ধা, ঝিল্লীর মত পাতলা ফুলকাটা পর্দ্দা, কয়েকখানা হাঙ্গেরীয়ান ল্যাণ্ডস্কেপ, সর্ব্বশেষ কবিগুরুর একখানা ছবি। অবাক বিস্ময়ে এর একটা সঙ্গতি খুঁজতে আরম্ভ করলাম।

চায়ের ট্রে নিয়ে একজন ভদ্রমহিলা প্রবেশ করলেন, সেই সঙ্গে প্রবীর। ওর মুখে গর্ব্বের স্মিত হাসি। ভাবলাম, প্রবীর এত শিষ্টাচার শিখল কোথা থেকে?

—এই হচ্ছে আমার বৌ বাসন্তী, আর এই হচ্ছে আমাদের 'স্ফুলিঙ্গে'র সম্পাদক রজতশুভ্র সেন, ওরফে বিশু।

প্রতিনমস্কার হ'ল, ওদিকে দুটো পদ্মের মত বাহু, তার ওপরে ফুটফুটে চাঁপাকলির মত আঙুল, দু'হাত জোড় হতেই মিশে একাকার হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, করজোড় ত নয়, একটা ফুলের স্তবক। একখানা মিষ্টি মুখ। তিমিররাত্রির মত দুটি কালো চোখ। তার মধ্যে দুটি তারা জ্বলছে; কৌতুকে, অনুরাগে আর বুদ্ধির দীপ্তিতে।

—সৌন্দর্য্যময়ী!

একটা অস্ফুট উক্তি বের হ'ল, হঠাৎ এই অভাবনীয় পরিবেশে ভ্যাবাচাকা খাওয়া দুটো ঠোঁটের মাঝখান দিয়ে।

দামী ব্লেণ্ডের চা খেতে খেতে আলাপ হ'ল বাসন্তী গুহর সাথে, প্রবীর বলল, কি খবর বল ত?

—কি আর করব বল, এত করে লেখাপড়া শিখেও কিছুই করে উঠতে পারছি না। বাবার মৃত্যুর খবর ত কাগজে দেখেছিস, বাড়ীর আর সবাই দেশে আছেন, এখানে রেশন আপিসে কর্ম্ম লিখি, রাত্রে হিসেব লিখি, আর কিছু কিছু···বলে থেমে গেলাম, ভারী লজ্জিত মনে হচ্ছিল নিজেকে।

—আর কিছু কিছু, কি করিস?

—না না, সে সব কথা শুনে আর তোর কাজ নেই, আমার একটা ম্যানেজ করে দে না ভাই।

—ও, আমার কাছে সব বলবি না!

—না না, ওগুলো বলা বা শোনা কিছুর মতই নয়।

প্রবীর বোধ হয় ক্ষুব্ধ হ'ল, বোধ হয় মনে মনে ভাবল, পুলিসের চাকরে বলে আমার মনে একটা সানুরাগ কটাক্ষ আছে।

—শোন, আজকালকার বাজার বুঝিস ত? তোর মত এম-এ অনেক আছে। তুই সামনের সপ্তাহে একবার আসিস, তোর কথা আমি গিলাণ্ডার্সে বলে রাখব।

এম-এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েও এই প্রথম মনে হ'ল এটা এমন কিছু নয়।

—বা রে, তোমরাই যে কথা বলছ! তা হলে আমাকে কি জন্যে সামনে বসিয়ে রেখেছ।

ঘরের মধ্যে কোথায় যেন একটা সেতার বাজল। কথা বলল বাসন্তী। কিন্তু কথা শেষ না হতেই প্রবীর জোরে হেসে উঠল।

—আচ্ছা আচ্ছা, এবার তোমরা বল।

—আপনার এম-এতে কি সাবজেক্ট ছিল, বাসন্তী বলল।

—ইংরেজী।

—কিন্তু বাংলায়ও আপনার বেশ দখল?

তাড়াতাড়ি কোন জবাব খুঁজে পেলাম না। মাথা নামিয়ে দু'হাত কচলাতে লাগলাম।

—ও, একটু গর্ব্ব হচ্ছে, না? স্মিতহাস্যে বাসন্তী বলল।

মুখ তুলে চাইলাম। চোখে রয়েছে সহানুভূতি, সমস্ত শরীরে মিশে আছে প্রসন্নতার একটা কোমল প্রলেপ।

—জানিস বিশু, বাসন্তীর বাংলায় অনার্স ছিল, প্রবীর বলল।

—তাই নাকি? তাই নাকি?

আরও কি বলতে যাচ্ছি এমন সময় ফোন বেজে উঠল। পাশেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি অনেক রাত হয়ে গেছে।

বিদায় নিলাম, সেই নেমপ্লেটটার কাছে যেতেই শুনি—

—আবার আসবেন কিন্তু, নিশ্চয়ই।—সেই সৌন্দর্য্যময়ী বাসন্তী গুহ।

লাভলক ষ্ট্রীট, শীতের রাত। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে। সেই ঝরা শিউলির গন্ধ, মনে ভাবছি কিছু খোঁজ হ'ল, আর ভাবছি যা ভাবা উচিত নয়, কতকটা অনধিকারচর্চ্চা।

প্রবীরের কথামত আবার ওর বাড়ীতে গেলাম, তার পরের সপ্তাহে। আস্তে আস্তে পথ চলছি। সেই নেমপ্লেটটা পার হলাম। গানের একটা সুমধুর সুর ভেসে এল কানে।

'মোর ভাবনারে একি হাওয়ায় মাতালো
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে'···

কিন্তু গান গাওয়া আর হ'ল না। আমাকে পর্দ্দার ফাঁক দিয়ে দেখেই বাসন্তী উঠে বাইরে এল।

—কখন এলেন, আসুন।

কৌতুক করে বললাম, আমি রজতশুভ্র।

—আপনি মোটেই শুভ্র নন।

—প্রবীর বাড়ী নেই?

—আর বলবেন না। শুধু ইন্‌ভেষ্টিগেশন। টাকা নয়, গান নয়, কবিতা নয়, শান্তি নয়, শুধু অপরাধীর অন্বেষণ।

অনুযোগটা বুঝলাম। দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। এসেছি চাকরির খোঁজে। কোন জবাব দিতে পারলাম না।

—পালাবেন না, বসুন চা আনছি, আপনি ত চিনি ভীষণ কম খান, তাই না?

—হ্যাঁ, একটু কম।

ভারি বিব্রত বোধ হচ্ছিল নিজেকে, প্রবীর বাড়ীতে নেই। গিলাণ্ডার্সের চাকরিটার কি হ'ল। একের পর এক ভেবে চলেছি, চাকরির জন্য আমাকে অনেক রকম কথা বলতে হয়েছে। তারই পুনরাবৃত্তি করে চললাম।

—প্রবীর কি রোজই এ রকম করে?

—হ্যাঁ, আজকাল প্রায়ই। খুব কম দিনই রাত্রিতে ফেরেন। বউবাজার ষ্ট্রীটে একটা জুয়েলারী দোকানে ডাকাতির কেস।

প্রসঙ্গটা বদলে ফেললাম, বাসন্তীর মুখের প্রসন্নতা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে যাচ্ছিল, নিজের প্রতি একটা ধিক্কার এল, এ রকম একটা অপ্রীতিকর কথা না বললেই হ'ত।

—প্রবীরের সঙ্গে আপনার বিয়ে হ'ল কোথায়?

—সে এক ইতিহাস! শুনবেন?

—আপত্তি যদি না থাকে, আর যদি ক্ষুব্ধ না হন।

বাসন্তী হাসল। সেই হাসি, মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক উজ্জ্বল রৌদ্র। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

—আমার বাবা মফস্বলের এক ষ্টেটের নায়েব ছিলেন। কাছারি শহরেই ছিল, এক মিথ্যা মামলায় বাবা হঠাৎ জড়িয়ে পড়লেন। আমাদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। সে কেসটার ভার নিয়ে আপনার বন্ধু সেখানে যান এবং কোনক্রমে বাবা শাস্তি থেকে রেহাই পান। কিন্তু বাবার ধারণা হ'ল, ইন্‌স্পেক্টর গুহই তাঁকে বাঁচিয়েছেন। তাই আপনার বন্ধুর প্রতি বাবার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। আমি সেবার বি-এ দিয়েছি।

আপনার বন্ধু আমার প্রতি আকৃষ্ট হন, আর আমি···বলেই বাসন্তী থেমে গেল।

—আপনার চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে—মৃদু ভর্ৎসনা করে বাসন্তী বলল।

—তার পর?

—তার পর, বাবা আমাকে ইন্‌স্পেক্টর গুহর হাতে সঁপে দিলেন, শতকরা নব্বইটি বাঙালী মেয়ের যা হয়। হ্যাঁ বা না, কিছুই বলার অবকাশ রইল না।

'দেখুন, যা হবার হয়ে গেছে। ও নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই।' আবার বাসন্তী বলল। 'জীবনে কত লোক কি চায়, কত লোক কি ভালবাসে। আমি চাই গল্প করতে, গান গাইতে, বই পড়তে আর একটু অনাবিল শান্তি, সারা জীবন ধরে তাই খুঁজে আসছি।'

—আপনি কিছু ভাববেন না। প্রবীর চিরকালই ঐ রকম।

—না মিঃ সেন, জিনিসটা যত সহজ মনে করছেন, ততটা নয়। আমি খুঁজেই চলেছি। আজ পর্য্যন্ত পাই নি, পাব কি না কে জানে?

বাসন্তী হাসল। ব্যাথাতুর, ক্লান্তিময়—পরাজয়ের, গৌরবের ম্লান হাসি।

মনে হ'ল আজ বোধ হয় সূর্য্য ওঠে নি; মনে হ'ল আজ বোধ হয় পৃথিবীটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ থেমে গেছে।

—আজ তা হলে উঠি।

আবার ফোন বেজে উঠল। বাসন্তী ফোনটা রেখে দিয়ে ফিরে এল। মুখের ওপর কে যেন কালি মাখিয়ে দিয়েছে। চোখের কোলে দুটো দুর্লভ নিরেট মুক্তোর মতন অশ্রুবিন্দু।

—কি খবর আবার?

—আজকে রাত্রে ফিরবেন না।

শেষের কথাগুলো আমাকে যেন ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বার করে দিলে।

সেই লাভলক ষ্ট্রীট, শিউলি ফুলের গন্ধ, কালোর ওপর সাদা দিয়ে লেখা প্লাষ্টিকের নেমপ্লেট—পি. গুহ।

নিরুদ্বেগে নিত্যনৈমিত্তিক খবরের কাগজের পাতা ওল্টাই। শুধু খোঁজ আর খোঁজ। এর শেষ নেই, বোধ হয় আরম্ভও নেই। বাড়ী থেকে খবর এসেছে, দিন আর চলে না। দিনের আর কি দোষ, চলার কি আর শেষ আছে? আমিই বা কি করব। প্রবীরের আজ বহুদিন ধরে পাত্তা নেই। কোথায় আশ্বাস, কোথায় খোঁজ, মেসের চাকুরেরা বেরিয়ে গেছে। আমার মত ভবঘুরে বেকার কাগজের কাসুন্দি ঘাটছি। একটা কুকুর আরামে রোদ পোয়াচ্ছে। কিন্তু আরাম আর হ'ল না। ব্যাঘাত ঘটাল একখানা জীপগাড়ী।

—সর্ব্বনাশ প্রবীর যে!

এ কি প্রবীরের চেহারা। চোখের কোণে কালো দাগ। মুখে বহুদিনের অনিদ্রার ক্লান্তি, সারা শরীরে কঠোর পরিশ্রমের সুস্পষ্ট চিহ্ন। সেই প্রবীর যে ছেলেবেলায় আগুন পোয়াবার জন্য রাত্রে ওয়াগন ভেঙ্গে কয়লা আনত।

—কিরে কেমন আছিস বিশু।

—ভাল, তুই কোত্থেকে?

—চল চল বাড়ী চল। বলে আমায় টেনে গাড়ীতে নিয়ে চলল, আমি ছোটবেলাকার মত অসহায় বোধ করলাম।

গাড়ী চলতে লাগল। প্রবীরের এক হাতে ষ্টীয়ারিং ঘুরছে। চেনা-অচেনা দোকানপাট নিমেষে সরে যেতে লাগল দু'পাশ দিয়ে।

—জানিস, বউবাজার ষ্ট্রীটের সেই কেসটা প্রায় খুঁজে বের করেছি।

—তাই নাকি, ভারি আনন্দ হ'ল।

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই ত এত পরিশ্রম।

—কনগ্রাচুলেশন প্রবীর।

—দাঁড়া দাঁড়া, এখনও শেষ হয় নি বিশু, রিং লিডারকে এখনও খুঁজছি।

এবার নির্লজ্জের মত নিজের কথাটা বলে ফেললাম।

—ওঃ হো, তোর কথাটা ভুলেই গিয়েছি। আচ্ছা চল গিয়েই একটা রিং করব।

লাভলক ষ্ট্রীট, গাড়ী থামল। সেই নেমপ্লেট পি. গুহ। শিউলিফুলের গন্ধ।

—তুই একটু বোস বিশু, আমি আসছি।

—বাসন্তী কোথায় রে?

—বোধ হয় রান্নাঘরে আছে।

নিশ্চিন্তে বসে আছি। অনেকদিন পর বেশ আড্ডা জমিয়ে নেওয়া যাবে।

প্রবীর ফিরে এল স্নান সেরে। শিস দিতে দিতে চুলের ওপর চিরুণী চালাচ্ছিল। আমি দেখছিলাম ফুলের ভাস থেকে শুকনো দু'একটা রজনীগন্ধার কলি পড়ে গেছে। প্রবীর এবার একটা ম্যাগাজিন পড়ছিল। আমার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল:

—বোস বোস, আসবে এখুনি।

স্বপ্নে লোকে অনেক সময়ে পরিচিত দৃশ্যের রূপান্তর দেখে। আমার অবস্থা সেইরকম মনে হচ্ছিল।

প্রবীর ধৈর্য্যহারা হয়ে উঠে গেল। আমি টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। একখানা চিঠি। ডাকটিকিট নেই। 'প্রবীর গুহ'—মেয়েলি হাতের লেখা, পরিষ্কার হরফে। এই যে যদি বাসন্তী দেখে?

—বিশু!

আচমকা ফিরে তাকালাম। উদভ্রান্তের মত প্রবীর আর্ত্তনাদ করে উঠল।

—বাসন্তী নেই, দেখছি না।

প্রবীর গুহ রসিকতা জানে না।

—এই তোর একটা চিঠি দেখ।

চিঠি খুলল। চিঠির ভাঁজ ভাঙল প্রবীর, জোরে শব্দ হ'ল।

প্রিয়তমেষু,

এরকম ভাবে চলে যাচ্ছি বলে নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

যে সব লোকের মনের মধ্যে বৈচিত্র্যের রহস্যময় প্রকাশ নেই, যারা জীবনের উত্তাপ দিয়ে প্রদীপ জ্বালতে পারে না, তাদের কাজের খ্যাতি থাকতে পারে, কিন্তু জীবনের পাথেয় একেবারে নেই। সেই পাথেয়ের অন্বেষণেই আমি চললাম।

আমি অপরাধী। কিন্তু আমাকে আর খোঁজ করো না।

—বাসন্তী।

লাভলক ষ্ট্রীট। ঝরা শিউলির গন্ধ। ইনস্পেক্টর পি. গুহ, বি-এস-সি—প্লাষ্টিকের নেমপ্লেট। হঠাৎ ককার স্প্যানিয়েলটা চীৎকার করে উঠল। আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম।

শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে উমেশচন্দ্র দত্তের বিদায়ের পর তিন বৎসরের মধ্যেই উক্ত স্কুল বঙ্গমাতার আর এক সুসন্তানকে প্রধান শিক্ষকরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছে। ১৮৭৩ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং তিন বৎসর বিদ্যালয়ের নিকটে অবস্থিত পর্ণকুটীরে বাস করিয়া শিক্ষকতা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপন ভাগিনেয় (১৯শে মাঘ ১২৫৩) ৩১শে জানুয়ারী ১৮৪৭ চাংড়িপোতায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

পিতৃপরিচয়

পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় "পণ্ডিতী" করিতেন। জীবনের অধিকাংশ কালই গ্রামে অতিবাহিত করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, সত্যানুরাগী আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্বমতপ্রিয়তা শিবনাথের জীবনে অনেক দৈহিক ও মানসিক ক্লেশের কারণ হইয়াছে। সেই হেতু শিবনাথকে নিজ বিচারবুদ্ধিমতে অগ্রসর হইতে বিশেষ শ্রম ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়। হরানন্দের মুখে নীতির উপদেশ প্রায়ই শোনা যাইত না, তিনি স্বয়ং প্রতি কর্ম্মে নীতির মর্য্যাদা পালন করিয়া চলিতেন। তাঁহার "কথার দাম" রক্ষা করিবার কঠোর সঙ্কল্প ছিল, ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে, বিশেষতঃ দরিদ্রকে তিনি যে আশ্বাস দিতেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। দরিদ্রের দুঃখে তাঁহার প্রাণ আকুল হইত এবং সে দুঃখ মোচনে তিনি নিজ পরিবারকে বহু অসুবিধায় ফেলিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেই মহাপুরুষের বহু গুণ এবং দোষেরও অধিকারী তিনি হইয়াছিলেন। একদিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "তেজস্বিতা, বিরাট ব্যক্তিত্ব, অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান, পরদুঃখকাতরতা" আবার অপর দিকে "সমতাপ্রিয়তা, ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব, আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসাভাব, তাহাও ছিল।"

শিবনাথের বাল্যজীবন

বহু অসুবিধার মধ্যে শিবনাথ পাঠ্যজীবন অতিক্রম করিয়াছেন। কৈশোরেই তিনি আনুষ্ঠানিক বৈদিক আচারপদ্ধতির উপর আস্থাহীন হন এবং ক্রমে তৎকালীন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ১৮৬৯ সনে ২২শে আগষ্ট প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পরিবর্ত্তিত ধর্ম্মমতের জন্য পিতার সহিত মতান্তর হয় এবং তাঁহাকে নানাবিধ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়। চরিত্রের দৃঢ়তাগুণে আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হওয়া-সত্বেও তিনি নিজ মত পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করা লইয়া বহু আন্দোলন হয়। তাহার প্রতিক্রিয়া উমেশচন্দ্রকেও কতক পরিমাণে ভোগ করিতে হইয়াছিল। শিবনাথ বরাবরই তাঁহার নির্ব্বাচিত পথের সমর্থন পাইয়াছেন মাতুল বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট।

ছাত্রজীবন

১৮৬৬ সনে শিবনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগীয় বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৬৮ সনে ইংরাজি ও সংস্কৃতে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পান। যথাকালে এম-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি অপরাপর উপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিয়া পিতা ও মাতুলের ন্যায় শিক্ষকতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। মাতুলের অনুরোধে ১৮৭৩ সনে হরিনাভিতে গিয়া সোমপ্রকাশের সম্পাদনা ও হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে মাতুলের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়।

ছাত্রাবস্থায় তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন এবং উপাসকমণ্ডলী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ প্রচারকদিগের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ক্রমে মতবিরোধ হওয়ায় প্রীতির বন্ধন থাকিলেও আদর্শগত বিরোধ প্রকাশ পায়। ১৮৭৪ সনের শেষভাগে হরিনাভি হইতে তনি সুবারবন স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া ভবানীপুর আসেন এবং ১৮৭৬ সালে হেয়ার স্কুলে যোগদান করেন।

কর্ম্মজীবন

ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি আত্মোৎসর্গ করাই স্থির করেন এবং ১৮৭৭ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সরকারী কর্ম্ম পরিত্যাগ-পত্র দেন। ক্রমে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম প্রচারক হিসাবে ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। ১৮৮৮ সনের ১৫ই এপ্রিল তিনি ছয় মাসের জন্য ইংলণ্ডে গিয়া তথাকার রীতিনীতি, মানবচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেন। যে গুণে ইংরেজ জাতি এত বড় হইয়াছে তাহার কতক অংশ দেশবাসীর মধ্যে প্রচার করাই তাঁহার বিলাতযাত্রার প্রধান লক্ষ্য ছিল।

হরিনাভি স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়া তিনি কর্ম্মভারে বিব্রত হইয়া পড়েন, কিন্তু ভার লইয়া তাহা হইতে বিরত হওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তিনি সকল কার্য্যই যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিতেন। প্রত্যেক ব্যাপারে ন্যায় ও নীতিকে সম্মুখে রাখিয়া ফলাফল উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

গ্রামবাসীর সহিত বিরোধ

তাঁহার সময় স্কুলের পরিচালনায় বিশেষ অব্যবস্থা ছিল। তাহার মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা স্থাপন করিতে গিয়া তিনি পরিচালক সমিতি ও শিক্ষকদের বিরাগভাজন হন। পরিচালক সমিতির সহিত বোঝাপড়া করিয়া শিক্ষকদের নিকট প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন, তাঁহার মতের সমর্থনে বিশেষ কাহাকেও পান নাই। স্কুলের মর্য্যাদা-বৃদ্ধির ও সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানোর আশায় মাহিনার খাতায় স্ফীত অঙ্ক দেখাইয়া কম বেতন দেওয়া হইত। যদি কখনও বেশী আয় হইত, তবে তাহা শিক্ষকদিগের অপ্রাপ্ত বেতনের অংশের কুক্ষিগত হইত; ফলে লাইব্রেরী ও স্কুলের গ্লোব, ম্যাপ প্রভৃতির অভাব ছিল। যত টাকা শিক্ষকেরা মাসিক পাইতেন ঠিক ততটা কল্পিত বেতন হইতে কাটিয়া হিসাবের খাতা রাখা আরম্ভ হইলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। শিক্ষকদিগের অধিকাংশই প্রকৃত অবস্থা ও তাঁহার যুক্তি গ্রহণে অসম্মত হইয়া নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শিবনাথ অনন্যোপায় হইয়া অসন্তুষ্ট শিক্ষকদিগকে ডাকিয়া—হয় স্কুলের শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে নতুবা দশ মিনিটের মধ্যে পদত্যাগপত্র দিয়া স্কুল পরিত্যাগ করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। তিনি তখন প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক; তাঁহার দৃঢ়তা দেখিয়া আর কেহ উচ্চবাচ্য করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; শান্তভাবেই সকলে গৃহে গমন করিলেন; বিদ্যালয়ে শান্তি স্থাপিত হইল।

স্কুল পরিচালনায় তাঁহাকে শ্রম ছাড়া আর্থিক ক্ষতিও স্বীকার করিতে হইয়াছে। শিক্ষকদিগের বেতন মিটাইবার জন্য তাঁহার নিজ বেতনের সামান্য মাত্র রাখিয়া সম্পাদক রূপে স্কুলের খাতায় চাঁদা হিসাবে বাকী টাকা জমা দিতেন। এ বিষয়ে মাতুল বিদ্যা-ভূষণ মহাশয়ের আচরণ মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকসংক্রান্ত ব্যাপারে তিনিও নূতন এক অশান্তির মধ্যে পড়িয়া যান। তাঁহার সময়ে ঐ অঞ্চলে যাত্রাগানের বিশেষ প্রচলন ছিল এবং দু'একজন শিক্ষক তাহাতে অভিনেতারূপে অংশ গ্রহণ করিতেন। তিনি ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। তাঁহার মতে ইহাতে ছাত্রদিগের মধ্যে—পেশাদার যাত্রার লোকদিগের প্রতি যেমন একটা অশ্রদ্ধার ভাব থাকে, শিক্ষকদের সম্বন্ধেও সেইরূপ হওয়ার সম্ভাবনা। স্কুল কমিটির মধ্যে এই ব্যাপারে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। চিরাচরিত প্রথা হিসাবে ইহাকে কেহ কেহ জোরের সহিত সমর্থন করেন। শেষ পর্য্যন্ত শিবনাথ যুক্তি প্রদর্শনে অধিকাংশকে স্বমতে আনিতে সমর্থ হন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তিনি শিক্ষকরূপী যাত্রার অভিনেতা এবং যাত্রা পরিচালক ভদ্রমহোদয়দের বিশেষ বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।

জনসেবা

হরিনাভি বাসকালে তাঁহার কাজের অন্ত ছিল না। সকল জন-হিতকর কার্য্যে নেতৃত্ব করিবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ আসিত। পাছে তাঁহার ধর্ম্মমতের জন্য আত্মীয়বন্ধুদের অসুবিধা হয়, সেজন্য তিনি পঠন-পাঠনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বিশেষ চেষ্টায় বেহালা মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বাহির হইয়া ১৮৭৩ সনে রাজপুরে স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। সেই সময় বিশেষ অর্থাভাব সত্ত্বেও সরকারী দাতব্য চিকিৎসা বিভাগ স্থাপিত হইলে তাঁহার কর্ম্মপ্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে। প্রথম কিস্তি ঔষধপত্র তাঁহার নামে প্রেরিত হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে শিবনাথের বিশেষ চেষ্টায় সোনারপুর হইতে রেল লাইন দক্ষিণে বিস্তারলাভ করে এবং চাংড়িপোতা ষ্টেশন স্থাপিত হয়।

তাঁহার সময় হরিনাভির ব্রাহ্মসমাজ ও সমাজমন্দির সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁহার চেষ্টায় উমেশচন্দ্র দত্তের আরব্ধ কার্য্য বিশেষ প্রসারলাভ করে। হরিনাভি ব্রাহ্মমন্দির ও তাহার কার্য্যপদ্ধতির অভিজ্ঞতালাভের জন্য শিবনাথের অনুরোধে হরি-নাভিতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ বহু মনীষীর আগমন সম্ভব হইয়াছিল।

সাহিত্যানুরাগ

সাহিত্যে শিবনাথের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। নির্ব্বাসিতের বিলাপ, পুষ্পমালা, পুষ্পাঞ্জলি, প্রভৃতি কবিতা পুস্তক, ধর্ম্মজীবন, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রবন্ধাবলী প্রভৃতি গদ্যরচনা;

মেজবৌ, যুগান্তর, নয়নতারা প্রভৃতি উপন্যাস, ইংরেজী ভাষায় লিখিত তাঁহার Men I have seen, Self-examination, History of the Brahmo Samaj প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সোমপ্রকাশ, সমদর্শী, তত্ত্বকৌমুদী, মুকুল প্রভৃতি বাংলা পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার প্রভৃতি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদনের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। সংগঠনকার্য্যে ব্রাহ্মসমাজ ব্যতীত "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক সভা", ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন, সিটি স্কুল, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, সাধনাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় শিবনাথ নিজ অপরিসীম শক্তি ও দূরদৃষ্টির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের প্রেসিডেন্টপদে বহুদিন সমাসীন ছিলেন।

ভগবদ্‌বিশ্বাস

বাল্যকাল হইতেই শিবনাথ ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। মনে বল পাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিতেন। ওঠা-পড়ার মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাসবলে তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। প্রবৃত্তিনিচয়কে দমন করিবার জন্য তিনি সংযম রক্ষা করিয়া নিজেকে ভবিষ্যতের গুরু-কর্ত্তব্যের জন্য গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি বড়ই হাস্য-রসিক ছিলেন।

শিবনাথ যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া একবার গ্রহণ করিতেন তাহাতে "দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার সহিত দণ্ডায়মান" হইতেন, "ফলাফল বিচার" করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই পিতার অনুজ্ঞা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন ধর্ম্মবিশ্বাসের কথা আসিয়া পড়িল তখন দৃঢ় ভাবে পিতাকে তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিতে অনুরোধ করিয়া-ছিলেন। সমাজ-সংস্কার, বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পতিতা ও পাপীর উদ্ধার তাঁহার জীবনের ধর্ম্ম ছিল; তিনি তাহার জন্য বহু কষ্ট পাইয়াছেন এবং অর্থব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার পরিবারে যথেষ্ট আর্থিক অভাব গিয়াছে। পতিতা নারীকে আশ্রয় দিয়া সৎপথে ফিরাইবার চেষ্টায় যদি কখনও কৃতকার্য্য হইয়া-ছেন, তখন অপার্থিব আনন্দ পাইয়াছেন। তাঁহার পরিচারক-পরি-চারিকা তাঁহাকে পিতার ন্যায় সম্মান করিয়াছে এবং তিনিও কৃতজ্ঞ চিত্তে চিরকাল তাহাদের স্নেহ ও সেবা স্মরণ করিয়া গিয়াছেন। মানুষের ব্যবহার অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া নিজের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে, শিবনাথের অমায়িক অথচ দৃঢ় ব্যবহার তাঁহাকে সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতির আসন দান করিয়াছে।

চরিত্রবত্তা

শিবনাথের পিতা ও "বড় মামা" তাঁহার চরিত্র গঠনে অশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগিনেয়কে "চক্ষের উপর মানুষ করিয়াছিলেন। বাল্যাবধি তাঁহার দৃষ্টান্ত না দেখিলে, ধর্ম্ম ও নীতির ভাব" পাইতেন কিনা, শিবনাথ নিজেই সন্দেহ-প্রকাশ করিয়াছেন। যেখানে আত্মসম্মানের প্রশ্ন, শিবনাথ দৃঢ়চিত্ততা ও অকুতোভয়ে সেখানে জাতীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, নিজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল বিচার করেন নাই, বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেখানে তাঁহাকে "আমার ভাগিনেয়ের মত কাজ করেছ" বলিয়া উৎসাহ দিয়াছেন; শিবনাথ তাহা শুনিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন: পিতা হরানন্দ সম্বন্ধে শিবনাথের মত, "ইহা নিশ্চিত কথা যে, শৈশব হইতে ঐ তেজস্বী, অধর্ম্মবিদ্বেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধীনে না থাকিলে আমার চরিত্র গঠিত হইত না।"

সাধারণতঃ মানুষ "বড়" হইলে নিজের ত্রুটির কথা ভুলিয়া যায়। কিন্তু শিবনাথ-চরিত্র সর্ব্বদাই আত্মবিশ্লেষণে রত। নিজে বুঝিতে পারিলে বা কেহ ধরাইয়া দিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সে দোষ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং সর্ব্বদাই তাহ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন।

আমাদের ভবিষ্যৎ কৃত্য

শ্রীদুর্গাবাঈ দেশমুখ

১৯৫৭ সন আমাদের সম্মুখে প্রকৃতপক্ষে একটি চ্যালেঞ্জ উপস্থাপিত করিয়াছে—আমাদের গ্রামীণ কর্ম্মের ক্ষেত্রে একটি বিপুল বর্দ্ধিতায়তন চ্যালেঞ্জ। আপনারা অনেকেই নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, 'কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট' বা সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের তরফ হইতে উপস্থাপিত একটি প্রস্তাব সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি। প্রস্তাবটি হইতেছে এই যে, কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকসমূহে নারী, শিশু এবং দৈহিক দিক দিয়া অপটু লোকেদের কল্যাণকর্ম্মের ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্ল্যানিং কমিশনের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃকও—প্রধানমন্ত্রী যাহার প্রেসিডেণ্ট—এই প্রস্তাব অনুমোদিত হইয়াছিল।

অধিকতর দায়িত্ব বহন

শেষ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের স্কন্ধদেশকে সম্প্রসারিত করিয়া এই নূতন দায়িত্ব বহন করা স্থিরীকৃত করিয়াছি। এই বিষয়টি দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে—আমাদের দীর্ঘ যাত্রার সূচনা। আমাদের উপর অর্পিত এইরূপ বর্দ্ধিত কর্ম্মভারের তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মীদের উপর অন্যান্যদের যে আস্থা আছে তাহা—তাহাদের উপর আমাদের গ্রামবাসীরা যাদৃশী আস্থা স্থাপন করিতে শিখিয়াছে তাহার সমান। সুতরাং এখন আমাদের উচিত, এই নূতন পরিস্থিতিতে আমাদের নিকট হইতে কি প্রত্যাশা করা হয় তাহা পরিপূর্ণ ভাবে এবং সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করা। আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য—ইহা দেখাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা যে, স্বাধীন ভারতের কল্যাণপ্রচেষ্টা-সঞ্জাত ফলসমূহ যাহাতে আমাদের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত সকল গ্রামের দরিদ্রতম স্ত্রীলোক, ক্ষুদ্রতম শিশু এবং সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী দৈহিক দিক দিয়া অপটু ব্যক্তির নিকটও পৌঁছিতে পারে তজ্জন্য আমরা—ভারতের নারীরা আমাদের সময় এবং শক্তি ব্যয় করিতে সদাই প্রস্তুত ও ইচ্ছুক।

১৯৫৭ সনের এপ্রিল মাস হইতে আমরা ১০০টি কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট ব্লকে নারী শিশু এবং দৈহিক দিক দিয়া অপটু (বধির, অন্ধ এবং খঞ্জ) লোকেদের কল্যাণকর্ম্মের ভার গ্রহণ করিব। এই বৎসরেরই অক্টোবর মাসে আরও ১০০টি ব্লক আমাদের তত্ত্বাবধানে আসিবে। যখন আপনারা উপলব্ধি করিবেন যে, প্রত্যেক সি. ডি. ব্লকের অধীনে আছে ১০০ গ্রাম, তখন আপনারা দেখিবেন এর মানে হইতেছে, যে-এলাকার দায়িত্বভার আমাদের উপরে অর্পিত তাতে আশু ১০,০০০ গ্রাম-সংখ্যার বৃদ্ধি। ইহা দ্বারা এটাও বুঝায় যে, শীত পড়িবার আগে ইহা হইবে দ্বিগুণিত।

এই পরিকল্পনার আসন্ন ফল হইতেছে: (১) এপ্রিল হইতে যে সকল নূতন ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকের কাজের ভার লওয়া হইবে তাহাদের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া 'ডবল্যু. ই. পি.' খোলা হইবে। নূতন ডবল্যু. ই. পি.গুলি চালু প্রণালীতে পরিচালিত ১৫টি গ্রামের পরিবর্ত্তে ১০০টি গ্রাম লইয়া কাজ চালাইবে।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যোন্নয়ন কর্ম্ম

আপনারা সকলে অবশ্যই ইহা জানিতে ইচ্ছুক যে, গ্রামীণ কর্ম্মের এই নূতন সংগঠনের কার্য্য কি ভাবে নির্ব্বাহ হইবে ; ব্লক এলাকায় সি. ডি. স্টাফের যে সকল কর্ম্মী যথারীতি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তাঁদের সঙ্গে আপনারা কিভাবে কাজ করিবেন ? সুতরাং সাধারণতঃ সি. ডি. ব্লকে কি কি প্রাপ্তব্য, আপনাদের সকলের পক্ষে তাহা জানা প্রয়োজন। প্রত্যেকটিতে থাকিবে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র—ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন একজন ডাক্তার, একজন মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শিকা এবং চার জন ধাত্রী। কাজেই আমাদের বাজেট হইতে কর্ম্মীসংসদকে পোষণ করা প্রয়োজনীয় নহে

এবং এখন পর্য্যন্ত আমরা যেভাবে চালাইয়া আসিতেছি তেমনি ভাবেই আমাদিগকে প্রত্যেক প্রোজেক্টে পাঁচ জন করিয়া শিক্ষিতা দাই রাখিতে হইবে। এই সংযোজনার মানে সি. ডি'র দিক দিয়া আমাদের গ্রামীণ চিকিৎসামূলক সেবাকর্ম্মের পরিপুষ্টি। ইহার দৌলতে পূর্ব্বে যাহা সম্ভবপর ছিল না সেই গৃহ হইতে গৃহান্তর পরিদর্শনের খুঁটিনাটি কাজ জোরালো ভাবে নিষ্পন্ন হইবে।

অন্য যে উপায়ে সি. ডি. ব্লক বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী সেবামূলক কর্ম্মের ব্যবস্থাকল্পে সহায়তা করিবে তাহা হইতেছে শিক্ষাক্ষেত্রে। পূর্ব্বের ন্যায় পাওয়া যাইবে একজন নারী সমাজশিক্ষা সংগঠক (Social Education Organiser) এবং দুই জন গ্রামসেবিকা—ইঁহারা সকলেই শিক্ষাপ্রাপ্তা। প্রশাসনের দিক দিয়া এই সকল কর্ম্মীরা এখনও থাকিবেন বি.ডি.ও'র অধীনে এবং বি.ডি.ও-ই তাঁহাদের মাহিনা দিবেন, ছুটি মঞ্জুর ইত্যাদি করিবেন। অপর সকল বিষয়ে ইঁহারা কাজ করিবেন পরিকল্পনা-রূপায়ণ সমিতির অধীনে। আমাদের কর্ম্মীসংসদের ছাঁচ থাকিবে পূর্ব্ববৎই, কিন্তু এখন একত্রীভূত কর্ম্মীসংসদের সদস্যসংখ্যা হইবে ৩১ জন। এইরূপে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রামসেবিকা হইবেন দশ জন এবং কারুশিল্পশিক্ষক (craft Instructor) দুই জন। এতদ্ব্যতীত প্রায় আট জন স্থানীয় স্ত্রীলোককে অত্যন্ত স্বল্প সম্মান-মূল্য (honorarium) দিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহারা বালওয়াদিসমূহ এবং বয়স্কশিক্ষাকেন্দ্র ইত্যাদিতে অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করিবেন। উপরে যে স্বাস্থ্যসম্পর্কিত কর্ম্মীসংসদের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করা হইল তাহা ছাড়া দুইজন মুখ্য তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মী হইবেন প্রধান কল্যাণ-সংগঠক (Welfare Organiser) এবং সমাজ-শিক্ষা-সংগঠক (The Social Education Organiser)।

একটি বড় রকমের পরিবর্ত্তন

এখানে আসিতেছে একটি বড় রকমের পরিবর্ত্তন। প্রতি প্রোজেক্টে পাঁচটি কেন্দ্র—আমাদের এই বর্ত্তমান ধারণার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কুড়ি জন ক্ষেত্রকর্ম্মী (Field Worker) এবং পাঁচ জন দাই মোট এই পঁচিশ জনকে এমন ভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে প্রত্যেক নারীকর্ম্মী অবস্থান করিতে পারিবেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং গড়পড়তা পাঁচটি গ্রাম জুড়িয়া থাকিবে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র। পাঁচ জন দাইকে রাখিতে হইবে মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত উপযুক্ত স্থানে। প্রত্যেককেই বর্ত্তমান অপেক্ষা বৃহত্তর এলাকা জুড়িয়া কাজ করিতে হইবে।

নূতন পরিকল্পনাসমূহের অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া এখানে আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। একথা কিন্তু আমি উল্লেখ করিব যে, রাজ্য-সরকারসমূহের অংশ এবং পি-আই.সি কর্ত্তৃক স্থানীয় অর্থ-সংগ্রহ মোটামুটি একই থাকিবে—যদিও অর্থসংগ্রহের এলাকা বাড়াইতে হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় ওয়েপ (WEP)এর জীপ পাওয়া যাইবে—প্রতি ১০০টি গ্রামের জন্য একটি করিয়া এবং এগুলি প্রাপ্তব্য হইবে মুখ্যতঃ ক্ষেত্রকর্ম্মীদের ব্যবহারার্থ।

গ্রামে দৈহিক অপটুদের জন্য পরিকল্পনা

আর একটি বিষয় যাহা আপনাদের সকলের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক বলিয়া প্রমাণিত হইবে তাহা হইতেছে দৈহিক অপটুদের নিমিত্ত রচিত পরিকল্পনাসমূহ। আমাদের কর্ম্মীসংসদের সদস্যেরা যে যে স্থানে যান সেই সেই স্থানে—প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রামস্থ অন্ধ, বধির, বিকলাঙ্গ এবং মানসিক জড়তাগ্রস্ত শিশুদের অধিকতর সেবামূলক কর্ম্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলেই সচেতন এবং এখন আমরা আশা করি যে, গ্রামীণ স্তরে কাজের ক্রমবর্দ্ধমান সংহতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপরোক্ত শ্রেণীর মানুষদের জন্য সি.ডি ব্লকসমূহের অভ্যন্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইব। ইহা হইবে এক বিরাট সাফল্য, কিন্তু ইহার জন্য যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদিগকে এই সকল জনসমষ্টির সমস্যাসমূহ বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।

এই ছাঁচের প্রত্যেকটি সি. ডি. ব্লক প্রোজেক্টের জন্য থাকিবে একটি পৃথক পি-আই-সি—কেননা এক শতেরও অধিক গ্রাম ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে পি-আই-সি গঠিত হইবে একজন চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ছয় জন সদস্য, তিন জন অফিসিয়াল সদস্য (ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসারও ইঁহাদের অন্তর্ভুক্ত), ব্লক উপদেষ্টা সমিতি হইতে গৃহীত তিন জন বেসরকারী সদস্য—এই কয়জনকে লইয়া।

মনের প্রসারতাসাধন

সুতরাং আমাদের সামনে কি তাহা আপনারা দেখিতে পারিতেছেন। আমাদিগকে আমাদের মনের এবং কর্ম্ম-নীতির প্রসারতাসাধন করিতে হইবে আমাদের কাজকে আরও অধিকতর সুদূরপ্রসারী করিবার জন্য। সরকার আমাদিগকে সাহায্যদানের যে সকল পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন

এবং এখনও পর্যান্ত যেগুলি যথেষ্ট কার্য্যকরী ভাবে আমাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় নাই তৎসমুদয়ের ব্যবহার আমাদিগকে করিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়—আপনাদের মধ্যে কয় জন নিখিল ভারত কারিগরি শিল্প-পর্ষদের স্থানীয় শাখা-সমূহের সহিত পরামর্শক্রমে কারিগরি শিল্পের গুণাগুণ এবং বিক্রেয় দ্রব্য হিসাবে উৎকর্ষসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। আপনাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সেখানে যে সকল অফিসার আছেন, তাঁহাদের আনুকূল্যে এখন আপনারা ইহা সহজতর রূপে করিতে পারিবেন। আপনাদের ভিতরে অনেকে ইতিমধ্যেই নিখিল ভারত খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প-পর্ষদের নিকট হইতে সাহায্য লইয়াছেন। এখন আরও বেশী লোক ইহা করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাঁহাদের অভিজ্ঞতামূলক সেবাকর্ম্ম ও পরামর্শকে অধিকতর প্রণালীবদ্ধ ভাবে কাজে লাগাইতে পারিবেন। অম্বর চরকা পরিকল্পনার যাবতীয় সম্ভাবনাসমূহ রহিয়াছে আমাদের সম্মুখে। ইহা মনে করিবেন না যে, আমরা সকলে এখানে কেন্দ্রে আছি কেবলমাত্র উপদেশ দিবার জন্য। সংগঠনের নূতন পন্থায়, আমাদের উপরও নূতন কৃত্যসমূহ অর্পিবে। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদের প্রত্যেক বেসরকারী সদস্যকে একটি সংসক্ত (compact) অঞ্চলে দুই অথবা তিনটি ষ্টেট ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। তিনি ঘুরিয়া বেড়াইবেন, নূতন কর্ম্মনীতিসমূহ বুঝিতে আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন, আপনাদের এবং আমাদের মধ্যে তিনি হইবেন যোগসূত্র-স্বরূপ। এই সকল কৃত্য কেবল গ্রামসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, সংশ্লিষ্ট রাজ্য এলাকার সংস্থাসমূহেও সম্প্রসারিত হইবে। তাঁহাদের নিজেদের যে সকল এলাকার দায়িত্বভার তাঁহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে তৎসমুদয়ে প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার প্রতিও তাঁহারা দৃষ্টি রাখিবেন।

অনুরূপ ভাবে রাজ্য পর্ষদের প্রত্যেক সদস্যকে একটি অধিকতর সুনির্দিষ্ট এলাকা ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, প্রত্যেকে কতকগুলি জেলার ভার লইবেন। প্রত্যেক পি-আই সি সদস্যও বণ্টন-করিয়া-দেওয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কেন্দ্র এবং গ্রামের দায়িত্ব লইবেন। আমরা প্রত্যেকেই তখন পাইব একটা বিশিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র এবং এক-একটা বিশিষ্ট ভূমিকায় আমাদিগকে অবতীর্ণ হইতে হইবে। কোন কোন এলাকায়—যেখানে পি-আই-সি চেয়ারম্যান ও অপর একজন বা দুইজন সদস্যকে প্রোজেক্টের সমস্ত কর্ম্ম সম্পাদন ও দায়িত্ব বহন করিতে হয় আর অন্যান্যেরা তাহাদের কাজে অবহেলা করেন—যে সকল অসুবিধাজনক অভিজ্ঞতা হইয়াছে, এই ভাবে তৎসমুদয় পরিহার করিতে পারিব বলিয়া আমরা আশা করি।

কর্ম্মের দূরগামিতা

উপরে যে সকল কথা বলা হইল তাহা হইতে আপনাদের নিকট ইহা পরিস্ফুট হইবে যে, একজন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত কর্ম্মীর নিকট হইতে এ পর্যান্ত যাহা প্রত্যাশা করা গিয়াছে তদপেক্ষা আমাদের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কাজ করিতে করিতে আমরা শিখিতেছি। আমাদের অনেকের মধ্যে বিকাশলাভ করিয়াছে সেই জিনিসটি যাহাকে বলা যাইতে পারে সেবাকর্ম্মের পেশাগত মান। ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রামসংগঠনের এই সকল কৃত্যের জন্য অনেকে কেবল তাঁহাদের অবসর সময়ের নয়, কাজের সময়েরও এক বিরাট অংশ ব্যয় করিয়াছেন।

নূতন প্রোজেক্টগুলি কি ভাবে কাজ করিবে, আমাদের নিজেদের সকল লোকে যাহাতে তাহা বুঝিতে পারে, এখন হইতে আমরা তাহার সূচনা করিব। আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে ধৈর্য্য সহকারে এবং একত্রে কাজ করিবার কালে আমাদিগকে এটা বুঝিতে হইবে যে, যাহা একটি প্রোগ্রাম মাত্র ছিল, কেমন করিয়া তাহা ক্রমশঃ এমন এক পরিস্ফীত আন্দোলনে পরিণত হইতে পারিল যাহা ভারতের সকল রাজ্যসমূহ জুড়িয়া অনুষ্ঠিত গ্রামসংগঠন এবং কম্যুনিটি ডেভেলপমেণ্ট বা সমাজ-উন্নয়ন কর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে।

শিশু-মৃত্যুহারের হ্রাস

কোন সমাজে শিশু এবং মাতৃ-মৃত্যুহারের হ্রাসকে, ইহার জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের নির্দ্দেশক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী মাতৃনীতি ও শিশুকল্যাণ-মূলক সেবাকর্ম্মের দ্রুত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিশু এবং মাতৃ-মৃত্যুর হার বিশেষ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

১৯৩২ সনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাতৃ-মৃত্যু সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় না। কিন্তু এই দুর্ঘটনা এমন-কি শহরগুলিতেও যে খুব বেশী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই, ১৯৩৯ সনে সন্তানের জন্মদানকালে মাতৃ-মৃত্যুর হার দাঁড়ায় হাজারকরা প্রায় ২০ জনে। ১৯৫৪ সনের মধ্যে ইহা কমিয়া হয়—গ্রামাঞ্চলে হাজারকরা দশজন ও শহরগুলিতে—যেখানে কল্যাণমূলক সেবাকর্ম্মের ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট—এই সংখ্যা এত কমিয়া যায় যে, মৃত্যু হয় হাজারকরা মাত্র দুই জনের।

শিশু-মৃত্যুর হারও হ্রাস পাইয়াছে। ১৯১০ সনে জাত শিশুদের মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ২১২ জন, ১৯৫০ সনে এই সংখ্যা কমিয়া গিয়া হয় ১২৭ এবং ১৯৫৪ সনের মধ্যে ইহা আরও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া দাঁড়ায় ১১৬ জনে। যে-সকল অঞ্চলে শিশুকল্যাণকর্ম্মের অধিকতর উন্নয়ন সাধিত হইয়াছে সেগুলিতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা এতদপেক্ষাও ন্যূনতর—জাত শিশুদের মধ্যে হাজারকরা ৯৬ জন মাত্র।

চেষ্টা-উদ্যমসমূহ এখন কেন্দ্রীভূত মুখ্যতঃ গ্রামীণ ধাত্রী-বিদ্যাসংক্রান্ত সেবাকর্ম্মের উন্নয়নের এবং দেশে দ্রুত বর্দ্ধমান মাতৃমঙ্গল এবং শিশু-স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহে কাজে লাগাইবার জন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদের ব্যবস্থা করার উপর। আজ দেশে এই ধরনের কেন্দ্রের সংখ্যা ৩,০০০-এর উপর উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ টাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে—দাইদিগকে আধুনিক আঙ্গিকসমূহে শিক্ষা-দানের জন্য।

ইহা প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, সংক্ষিপ্ত পাঠক্রম অনুযায়ী ৩৬,০০০ দাইকে শিক্ষাদান করা হইবে—প্রত্যেকটি পাঠক্রম অনুসৃত হইবে ছয় মাসের অধিককাল ব্যাপিয়া। শিক্ষণ প্রদত্ত হইবে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রসমূহে এবং চালু মাতৃনীতি ও শিশুকল্যাণ-কেন্দ্রগুলিতে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে লক্ষ্যবস্তু ছিল ৬০০ স্বাস্থ্য-পরিদর্শক এবং ২৪০০ ধাত্রীকে শিক্ষাদান। সম্প্রতি চালু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির অধিকতর সম্প্রসারণের এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীনে আরও ১৭০০ জন স্বাস্থ্য-পরিদর্শককে শিক্ষাদানের নিমিত্ত নূতন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীনে মোট পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সংস্থান করা হইয়াছিল অধিকতর অনুন্নত গ্রামীণ এলাকাসমূহে মাতৃনীতি এবং শিশুকল্যাণমূলক সেবাকর্ম্মের সম্প্রসারণকল্পে। এই প্রোগ্রামের অঙ্গ হিসাবে চালু ডিস-পেন্সারীগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট ২০১টি মাতৃনীতি এবং শিশু-কল্যাণ 'একক' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাদের প্রত্যেকটির দ্বারা ৬০ হইতে ৭০ হাজার লোকের সেবাকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইত। প্রত্যেকটি ইউনিটে যে কর্ম্মীসংসদের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা হইতেছে—একজন স্বাস্থ্য-পরিদর্শক আর যেমন মুখ্যকেন্দ্রের তেমনি এই অঞ্চলে ভাগ করিয়া দেওয়া তিনটি উপকেন্দ্রের জন্য চার জন ধাত্রী।

মায়েদের এবং শিশুদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত সেবাকর্ম্ম—কম্যুনিটি প্রোজেক্ট ডেভেলপমেণ্ট কর্ম্মসূচী এবং এন. ই. এস ব্লকসমূহেরও কর্ম্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাতৃনীতি ও শিশুকল্যাণের কর্ম্মীসংসদের শিক্ষণ এবং কতকগুলি অনুন্নত অঞ্চলে মাতা ও শিশুদের সেবাকর্ম্মের উপচয়ের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ করা হইয়াছিল।

ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনাকালে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনে থাকিবে ৩,০০০ জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক। মাতৃনীতি এবং শিশুকল্যাণমূলক সেবাকর্ম্মসমূহ হইবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্ম্মপ্রচেষ্টার অন্তর্ভুক্ত, হু (W.H.O.) এবং ইউনিসেফের (U.N.I.C.E.F.) আনু-কূল্যে ১২টি রাজ্য ব্যাপক মাতৃনীতি এবং শিশুস্বাস্থ্য কর্ম্মসূচী হাতে লইয়াছে। ইউনিসেফ ব্যবস্থা করে সাজ-সরঞ্জামের আর কারিগর-কর্ম্মীদের সংস্থান হয় হু কর্ত্তৃক।

কতিপয় বেসরকারী সংস্থাও মাতৃনীতি এবং শিশু-কল্যাণ কর্ম্মপ্রচেষ্টায় ব্যাপৃত আছে। সেগুলি হইতেছে: বোম্বাই মাতৃ এবং শিশুকল্যাণ সমিতি, বিহার মাতৃ এবং শিশুকল্যাণ সমিতি, কস্তুরবা স্মারকনিধি, নিউ দিল্লী শিশু-কল্যাণের ভারতীয় পরিষদ এবং ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটি। কেন্দ্রীয় সমাজ-কল্যাণ পর্ষদও মাতৃনীতি এবং শিশুমঙ্গলসংক্রান্ত সেবাকর্ম্মের উন্নয়নে রাজ্যপর্ষদসমূহকে সাহায্য করিতেছে।

"আমি বুঝতে পারি না"

সি. ই. ড্য. সি. চিত্তেনডেন
(অধ্যক্ষ, ফ্লোরেন্স সোয়েইনসন বধির বিদ্যালয়, পালামকোটা)

আপনি যদি অশিক্ষিত জন্ম-বধিরের মনের ভেতর ক্ষণিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তা হলে এই অনুভূতি আপনার হবে যে, তাদের সাহায্যার্থে একটা কিছু অবশ্যই করণীয়। সারা ভারতে এই সকল হতভাগ্যের সংখ্যা ন্যূনকল্পে তিন লক্ষ—বয়স্ক এবং শিশু দুইই আছে এদের মধ্যে। তাদের একমাত্র রব হচ্ছে—"আমরা বুঝতে চাই"—এবং বিশেষ শিক্ষাই হচ্ছে এর একমাত্র সমাধান। এর সত্যতা প্রতিনিয়ত প্রতিভাসিত আমাদের চোখের সামনে—দক্ষিণ ভারতের নীচেকার দিকে—ফ্লোরেন্স সোয়েইনসন বধির বিদ্যালয়ে।

এখানে একটি ছেলে আছে পুলিস যাকে ডিণ্ডিগুল ষ্টেশনে পেয়েছিল বছরকয়েক আগে। তার বয়স ছিল পাঁচ বছর এবং তার পিতামাতা অথবা পটভূমিকা সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নি, অবশ্য সেও তাদের কিছু বলতে পারে নি। তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এক ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে, তিনি তার নামকরণ করেন "মুথু"। তার পর শুধরানোর জন্যে তাকে পাঠিয়ে দিলেন কোন প্রতিষ্ঠানে। তাকে সেখানে রাখতে অপারগ হয়ে তারা তাকে পাঠালেন এই স্কুলে। এখানে উপস্থিতির পর তার অবস্থা ছিল সকরুণ এবং তার প্রথম প্রয়োজন হ'ল হাসপাতালের তত্ত্বাবধানের। সেই দিনগুলোতে ছোট্ট মুথু এটা অনুভব করতে পারলে যে, জীবন বড়ই কঠোর। ঐ সময় থেকে প্রায় দশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এখন তার সঙ্গে দেখা করলে খুশী হবেন আপনারা। সে এমন একটি ছেলে—মন যার সক্রিয় এবং মুখখানি যার হাসিমাখা—রসবোধের সহিত মিশ্রিত হৃদ্য মেজাজ উচ্চতর শ্রেণীতে তাকে করে তুলেছে সকলের প্রিয় পাত্র। সম্প্রতি এখানে মুদ্রণ হাতের কাজের পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, এর সুফল দাঁড়িয়েছে এই যে, মুথুর মনে এখন জেগেছে কম্পোজিটার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

সেদিন আমাদের কাছে এসে পৌছল একটি বিয়ের নিমন্ত্রণ। চিঠিখানা খুলে এটা দেখে আমরা বাস্তবিকই খুশী হয়ে উঠলাম যে, প্রাক্তন ছেলেদের মধ্যে আরও একজন পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনের পথে আরও দূরে পদক্ষেপ করেছে। বিত্তশালী পিতামাতার সন্তান হওয়াতে জীবনে সকল সুযোগই পেয়েছিল সে, কিন্তু সে জন্মেছিল বধির হয়ে, কাজেই বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে হয়ে উঠল মূক এবং অজ্ঞ। বিদ্যালয়ে থাকাকালে সে তার জীবনের বিরাট শূন্যতার অনেকখানি পূর্ণ করার সুযোগ পেলে। তার ওষ্ঠ-পঠনের ও তামিল ভাষা বুঝবার কষ্টার্জিত শক্তি এবং তৎসহ পরিষ্কার কৃত্রিম (Synthetic) ভাষার কল্যাণে পিতার ব্যবসায়ে একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মলাভের ব্যবস্থা তার হ'ল। সুতরাং তার ছোট ভাই যে, তার সম্বন্ধে গর্ব্বানুভব করে এবং সে যে উত্তেজনা সহকারে তার সহপাঠীদের বিবাহের আমন্ত্রণপত্র দেখিয়েছিল এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নেই।

সহশিক্ষামূলক বিদ্যালয়ের কথা যখন বিবেচনা করা হচ্ছে তখন মেয়েদের কথা উল্লেখ না করা হবে অসমীচীন, কেননা তাদের প্রয়োজনসমূহও যে সমপরিমাণেরই। একটি বধির বালকের পক্ষে গ্রামের রাস্তার ছেলেদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা কুয়োয় জল তুলবার কালে অপরের পরিহাস বরদাস্ত করা একটি মূকবধির মেয়ের পক্ষে অধিকতর সহজ নয়।

একটি বধির বিদ্যালয় হচ্ছে এমন স্থান যেখানে প্রত্যেক শিশুকে তারিফ করা হয় তার স্বকীয় যোগ্যতা অনুসারে, এবং নিশ্চতই তাকে গণ্য করা হয় না "আজব চীজ" বলে। প্রত্যেক বধির শিশুই শিখতে পারে বুঝতে এবং নিজের কথা বুঝাতে—এটা তাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করে সুখ এবং স্বাধীনতার বিস্ময়কর তোরণদ্বার। এরই সন্ধান পেয়েছিল একটি পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালিকা। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকালের (Term) শেষে, পরীক্ষার ফলাফল যখন প্রকাশিত হয় তখন সে খুব উচ্চস্থান অধিকার করে না বটে কিন্তু অপরাহ্ণশেষে যখন সে আসে বাচ্চাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে তখন তার আননে ফুটে ওঠে এক বিস্ময়কর আনন্দের হাসি। সাদামাটা আলাপন এবং একটি বার্তাকথনের জন্যে ছুটে যাওয়া এখন তার কাছে প্রীতিকর—দুঃস্বপ্ন নয়। প্রীতিপূর্ণ সহানুভূতি এবং কৌতুকপরায়ণ মেজাজের জন্য—"সোনার মা" (Mother of Gold) তার এই তামিল নামকরণ খুবই সমীচীন হয়েছে।

এখন এই ধরনের সাফল্য অর্জন সম্ভবপর কেবলমাত্র একটি ক্লাসে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক শিশুদের নিয়ে। প্রায়শঃই

দর্শকরা একেবারে বিস্মিত হয়, যখন তারা দেখে একটি দলে (group) প্রায় দশজন মাত্র। কিন্তু বাকপঠনে (speech lesson) শিক্ষক এই ইচ্ছা করেন যে, তাঁর হাতে মাত্র পাঁচ জন শিক্ষার্থী যদি থাকত।

নিজের মাতৃভাষায় অত্যন্ত প্রাথমিক অধিকার অর্জন করতে গিয়ে একটি বধির শিশুকে যে কি পরিমাণ প্রযত্ন করতে হয় কয়জন লোক সেকথা উপলব্ধি করেন তা ভেবে আমি অবাক হই। শ্রবণশক্তিসম্পন্ন শিশু কিন্তু স্কুলে যাওয়ার আগেই স্বাভাবিক ভাবে এবং বিনা আয়াসেই দ্রুত কথা বলার শক্তি অর্জন করে। যা বলতে শিখছে তা যারা শুনতে পায় তাদের কথন শেখানোর কাজের যে কি কি মোহ খুব কম লোকেরই তা জানা আছে। শব্দের দ্বারা যে সকল সাড়া উৎপন্ন হয় তা তারা জানতে পারে স্পর্শের মাধ্যমে। উপরন্তু দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য তারা শেখে শব্দের নির্ভুল উচ্চারণের জন্যে কোথায় রাখতে হবে জিহ্বাকে।

সুষ্ঠু ভাবে এর ব্যাখ্যা করা যেতে পারে একটি সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা। ধরুন আমরা একটি শিশুকে 'আর্ম' কথাটি উচ্চারণ করতে শেখাচ্ছি। এখানে মেঝের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে আছে একটি ছোট্ট মেয়ে, বিস্মিত হচ্ছে সে এই ভেবে যে, কেন তার হাত ন্যস্ত হয়েছে শিক্ষকের বুকের ওপর। জিভ সমান করে রেখে (flat) শিক্ষক যখন মুখ খুলে হাঁ করেন তখন শিশুর যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে তা আপাতদৃষ্টিতেই প্রতীয়মান হয়। ব্ল্যাকবোর্ডে ছাত্রকে দেখানো হয় যে, 'এটা হচ্ছে স্বরবর্ণের ধ্বনি 'আর'-এর দ্যোতক। তার পর শিশুকে উৎসাহিত করা হয় তার নিজের বুকের উপর হাত রেখে এইমাত্র সে যা দেখেছে এবং অনুভব করেছে তার অনুকরণ করতে। বিপুল আনন্দ হয় শিক্ষকের এবং তার পরে শিশুর যখন সৃষ্টি হয় অনুরূপ অনুভূতির। সচেতন ভাবে উচ্চারণ করতে শিখেছে সে অনেকগুলি শব্দের আদ্যক্ষর—যেগুলির দ্বারা তৈরী হয় কথিত ভাষা। শিশুর কৌতূহল আবার উদ্রিক্ত হয় যখন তার মুষ্টিবদ্ধ হাত রাখা হয় শিক্ষকের গালের উপর—মুখ যদিও বন্ধ দেখা যায় তথাপি সেখানে একটি কম্পন অনুভূত হয়। শিশু যখন ঠিক অনুরূপ ভাবে এটা করতে কৃতকার্য্য হয় তখন বুঝতে হবে যে, 'এম'ধ্বনিটি আয়ত্ত করতে সে সক্ষম হয়েছে—এই দুইটি যখন সংযোজিত হয় তখন সে বলতে পারে "আর্ম"। যে দু' হাজার শব্দ দ্বারা সাধারণ পাঁচ বৎসরবয়স্ক শিশুর কথিত শব্দ-ভাণ্ডার তৈরী তন্মধ্যে এখন সে একটি মাত্র উচ্চারণ করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু প্রত্যেকটি নূতন শব্দের সংযোগ আছে উপযুক্ত বস্তু অথবা ক্রিয়ার সহিত সেজন্যে তাদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

আপনারা যাঁরা এই প্রবন্ধ পাঠ করছেন তাঁদের কখনও লোকের ঠোঁট এবং মুখের সঞ্চালনের দিকে কোন রকম নজর রাখতে হয় না। আপনি আপনার বন্ধুর কথা শোনেন। তা সত্ত্বেও কিন্তু তিনি কি বলছেন তা আপনি কখনই বুঝতে পারতেন না যদি না তাঁর ঠোঁট এবং মুখ নড়ত। শব্দ যাদের কাছে এক অজানা বিষয় তাদের একমাত্র বিকল্প অর্থাৎ যে কথা বলছে তার ওষ্ঠসঞ্চালনের উপর নির্ভর করতে শিখতেই হবে। এইটেই শেখানো হয় বধিরদের —যাতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করবার পর শ্রবণশক্তিসম্পন্ন লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলবার কিঞ্চিৎ ক্ষমতা তারা অর্জন করতে পারে।

সাধারণ লোকে যেমন অপরের কথাবার্ত্তা বুঝতে শেখে প্রতিনিয়ত কথিত ভাষা শ্রবণের মাধ্যমে, তেমনি বধিররাও তবেই ওষ্ঠপঠনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে যদি বাক্যাংশ বা সমগ্র বাক্য ইত্যাদি উচ্চারণ-কালে ওষ্ঠসঞ্চালন এবং মুখভঙ্গী দেখবার পৌনঃপুনিক সুযোগ তাদের দেওয়া হয়। এর প্রাথমিক সূচনা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে এটা হয়ে ওঠে ক্রমবর্দ্ধমানরূপে দুরূহ। শব্দসমূহের মধ্যে যদিও পার্থক্য বিদ্যমান, দুর্ভাগ্যক্রমে অনেকগুলি শব্দের উচ্চারণকালীন ওষ্ঠ এবং মুখসঞ্চালন কিন্তু প্রায় একইরূপ। বধির ব্যক্তিকে সেজন্যে প্রভূত প্রতিবন্ধ অতিক্রমের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়।

এখানে ওষ্ঠপঠনের পাঠক্রমের প্রাথমিক স্তরটি উপস্থাপিত করাই হবে যথেষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়: শিশুরা দেখে শিক্ষক তার মুখের নিকট ধরে রেখেছেন একটি বল, একই সময়ে পরিলক্ষিত হয় নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ওষ্ঠ এবং মুখ সঞ্চালন। এগুলি পুনঃকৃত হয় বহুবার। বস্তুতঃ শিক্ষক "বল" শব্দটি বার বার আবৃত্তি করেন। অন্যান্য বস্তু এবং বিষয়ের জন্য এই একই পদ্ধতি অবলম্বিত এবং পরবর্ত্তী সপ্তাহ ও মাসগুলিতে বহুবার পুনঃকৃত হয়। ছাত্রেরা তখন এই ওষ্ঠসঞ্চালনগুলিকে তাদের নিজ নিজ বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে। এমনি উপায়ে তাদের ওষ্ঠ-পঠন-ক্ষমতা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হয়।

বর্ত্তমানে ভারতে বধিরদের জন্য প্রায় তেতাল্লিশটি বিদ্যালয় আছে এবং তিন লক্ষ বধির লোকের জন্য কমপক্ষে ঐ ধরনের ছয় শতটি বিদ্যালয়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধ লেখবার সময় পালামকোটা বিদ্যালয়ে আমাদের প্রতীক্ষমাণদের তালিকায় আছে ১১৪ জন—ঐ

জেলাতেই আর একটি স্কুলের প্রয়োজন যে কত জরুরি এই সংখ্যাই তার প্রমাণ।

সন্তোষজনক ফললাভের পক্ষে এটা অত্যাবশ্যক যে, বধির শিশুরা যেন পাঁচ বৎসর বয়সের মধ্যেই শিক্ষারম্ভ করে। কোন কোন দেশে দু'বৎসর বয়স থেকেই বিশেষ শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদেরও চূড়ান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত এইটেই। ইতিমধ্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে শিক্ষকের এবং যতগুলি সম্ভব স্থানে নূতন বিদ্যালয় খুলবার জন্যে গৃহের। শিক্ষকেরা হবেন মাধ্যমিক গ্রেডের অথবা গ্রাজুয়েট ষ্ট্যাণ্ডার্ডের। কিন্তু এইটা সম্পূর্ণ অযথেষ্ট। এই ধরণের শিক্ষাদান নিশ্চিত ভাবে হওয়া উচিত একটি বৃত্তি (vocation)—কেননা এর জন্যে প্রয়োজন অনন্ত ধৈর্য্য এবং শিক্ষকের তত্ত্বাবধানাধীন প্রত্যেকটি শিশুর জন্য উদ্বেগ।

কোনটা ন্যায় এবং সৎ—বধির শিশুরা তা শিখবে শিক্ষক অথবা শিক্ষিকার দৈনন্দিন জীবনের এবং শব্দের যে জ্ঞান তিনি প্রদান করেন তার মাধ্যমে। কেবলমাত্র তখনই তারা, যে পৃথিবীতে বাস করে তাকে বুঝবার অবস্থায় উপনীত হবে এবং যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা তাদের এই মহান্ দেশের প্রয়োজনীয় এবং সম্মানিত নাগরিক রূপে তৈরি করবে তার দ্বারা প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হতে সমর্থ হবে।

ভারতের লোকনৃত্য

শ্রীদেবেন্দ্র সত্যার্থী

"এই ছোট্ট গ্রামটি তোমার নিকট চাঁদের মত প্রিয়।" এই পংক্তিটি হচ্ছে মধ্যভারতের একটি গোন্দ লোক-সঙ্গীতের ধুয়া। এই উক্তির যাথার্থ্য আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন কেবলমাত্র তখনই যখন কোন গোন্দ গ্রাম পরিদর্শনের সুযোগ আপনার হবে তাদের কোন কোন নৃত্যোৎসব কালে। এ কথা বলা চলে যে, গোন্দরা হচ্ছে জাত-নাচিয়ে। একটি গোন্দ হেঁয়ালি-প্রশ্নে আছে—"গাছের ডালে বসেছে মূক পক্ষী। গাছটিকে নাড়া দাও, পাখীটি তখন জেগে ওঠে এবং গান করে"। এর জবাব হচ্ছে—"যে মেয়ে নাচতে যাচ্ছে তার পায়ের নূপুর।"

ভারতের সর্ব্বত্র নৃত্যোৎসবের মরশুমে বৃক্ষে উপবিষ্ট মূক পক্ষীরই মত, গ্রামগুলো জেগে ওঠে এবং গান করে। গোন্দদের মধ্যে প্রচলিত কর্ম্ম নৃত্য-সঙ্গীতে সর্ব্বদাই হয় পৃথিবী এবং আকাশের জীবন্ত কাব্যরূপায়ণ। স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের দ্বারা সমবেত ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নৃত্য হচ্ছে বসন্তকালে বনে বনে সবুজ শাখা উদ্গমের প্রতীক। বাস্তবিকই তারা গ্রামে একটি বৃক্ষ রোপণ করে তার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য করতে পারে। প্রতীতি হয় যেন বনের বাণীতে—গান-গাওয়া হাজারো গাছের আহ্বানে পরিপূরিত হয়ে ওঠে 'কর্ম্ম'। পুরুষেরা নৃতচ্ছন্দে উল্লম্ফন করে এগিয়ে যায় সুমুখের পানে—এমনিধারা করে তারা মাদলের গুরু গুরু ধ্বনির তালে তালে। কিন্তু অনতিপরেই প্রতীয়মান হয় যেন এক দমকা হাওয়ার ঝাপটায় পিছিয়ে আসছে নৃত্যপরা নারীদের হিল্লোলিত মূর্ত্তিগুলো। এই ত সময় যখন 'কর্ম্ম' বিস্তার করছে তার যাদুমন্ত্রের প্রভাব। মাটির দিকে নত হয়ে নৃত্য করে নারীরা। নূপুরশোভিত চরণগুলি তাদের ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয় সুষ্ঠু নৃত্যচ্ছন্দে। তার পর দেখতে পাওয়া যায়, গায়কদল এগিয়ে যাচ্ছে নারীদের পানে। এমনি ভাবে চলতে থাকে কর্ম্ম নৃত্যের অনুষ্ঠান। মেয়েদের পানে অগ্রসর গায়কদল প্রতিবারেই তাদের দেহকে আন্দোলিত করে এদিক-ওদিক—নৃত্যে এই হ'ল তাদের প্রত্যুত্তর। মাদলের বাজনা গ্রহণ করে মুখ্য অংশ, পরিশ্রমে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয় মাদল-বাজিয়েরা, কিন্তু সুখী তারা। এমনি ভাবে সারারাত ধরে চলতে থাকে কর্ম্ম। বংশপরম্পরাক্রমে আগত উপজাতীয় সঙ্গীত নির্ব্বাচনে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। উপস্থিত ক্ষেত্রে মুখে মুখে তারা একেবারে আনকোরা নূতন গানের চরণ রচনা করে ঐ সকল সঙ্গীতের সঙ্গে জুড়ে দেয়। ওরূপ করে তারা সৃষ্টিমূলক প্রেরণার দিব্য আনন্দে আত্মহারা হয়ে।

মান্দলা জেলার একটি কর্ম্মগীতি দেওয়া হচ্ছে এখানে:

> কালো গাছের নীচে জন্মাল একটি কাঁটা,
> আমার কোমরে দুলছে মাদল
> কার ওপর আশা রাখব আমরা?
> কার ওপর আমরা রাখব আস্থা?
> বিশ্বাস করো না আর কাউকে তোমার বন্ধু ছাড়া
> কালো গাছের নীচে জন্মাল একটি কাঁটা
> আমার কোমরে দুলছে মাদল।

এটা লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সকল সময়েই—কর্ম্ম যতক্ষণ চলতে থাকে তখনও জীবনের সমস্যাসমূহ ছুঁয়ে যায় তাদের মনের দিগন্ত।

কার উপর আমরা আশা রাখব? কার উপর আস্থা

স্থাপন করব আমরা, এইটেই আজকের দিনে গ্রামীণ ভারত থেকে উত্থিত আর্ত্ত রব ? কালো গাছের নীচে জন্মান যে কাঁটা সেটি হ'ল জনগণের শত্রুর প্রতীক এবং দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় জনগণ শিখেছে যে, বন্ধু ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে সমীচীন নয়। এইটে হয়ত মাদলের শিক্ষা।

বিহারের ছোটনাগপুরের ওরাওঁরা আগষ্ট মাসে কর্ম্ম-নৃত্যের অনুষ্ঠান করে, তারা একে বলে করম্। গ্রামীণ নৃত্যভূমিতে একটি করম গাছের তিনটি শাখার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই শাখাত্রয়ের গ্রামপ্রবেশের আনুষঙ্গিক হিসাব হয় নৃত্যানুষ্ঠান। ঐতিহ্য অনুসারে এই সকল শাখাকে বলা হয় "করম রাজা"। রাজার অভিষেকের পর জাতীয় কল্যাণের এই মহান্ প্রতীকের চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য করে অতিবাহিত হয় সমগ্র রজনী। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে করম রাজাকে মাল্যভূষিত করা হয়। করম উপাখ্যান-সমূহ বর্ণনা করার সময়ও এটা। করম রাজার উপর পুষ্প-বর্ষণ করা হয় আনুষ্ঠানিক নিষ্ঠা সহকারে। দধি এবং চালের নৈবেদ্যও প্রদান করে তারা।

এই সকল অনুষ্ঠানের পর বিশেষ ভাবে পোষিত যবের বীজের চারা বেঁটে দেওয়া হয় ছেলে এবং মেয়েদের মধ্যে। খুশির সঙ্গে তারা নিজেদের কেশে পরে হলদে তৃণপত্র। এখন তারা করম রাজার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। শাখাগুলিকে তখন উঠিয়ে নেওয়া হয়—স্ত্রীলোকেরা তাদের বয়ে নিয়ে যায় গাঁয়ের ভেতর দিয়ে। তাদের চিরাচরিত প্রথা হচ্ছে ধর্ম্মীয় এবং সমাজের প্রধান গাঁয়ের পাহান ও মাহাতোর বাড়ীর সামনে থামা। প্রতি গৃহে শাখাগুলিতে সিঁদুর মাখানো হয়। এর পর শাখাগুলিকে নদীতে বিসর্জ্জন দেবার পালা।

ওরাওঁদের দেশে করম রাজার গ্রামপ্রবেশ অনুষ্ঠানের সময় এই লোকসঙ্গীতটি গাওয়া হয়:

করম আসছে
তার ডালপালা নাড়িয়ে
নাড়িয়ে নাড়িয়ে
নাড়িয়ে নাড়িয়ে—
মাগো, ও আসছে
তেল মাগবার জন্যে
উজ্জ্বল লাল রং (সিঁদুর)
চাইবার জন্যে
তেল মাগবার জন্যে
চাইবার জন্যে সিঁদুর।

করম-সঙ্গীতের সংখ্যা প্রচুর। "ছোট্ট পাহাড়ের ওপর বাঁশী কেটেছিল কে ?"—এই হচ্ছে একটি ওরাওঁ করম সঙ্গীতের ধুয়া। আর একটি গানে বলা হয়েছে—"একটি মাদল কেনো, তা হলে মনে হবে তোমার যেন একটি বৌ আছে। মাদল যদি তোমার ভেঙে যায় ভাই, তা হলে মনে হবে তোমার বউ যেন তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে।" আর একটি গানে আছে একটি ওরাও বালিকার অনুভূতির অভিব্যক্তি—"ফুলের মত পোশাক আমার, জীবন আমার সোনার মত"। লোকগীতিতে একথা বলা হয়েছে বটে, জীবন কিন্তু এদের তেমন আরামের নয়। সময় সময় বিদায়ী করম রাজাকে শুল্ক দেওয়া পর্য্যন্ত যে হয়ে দাঁড়ায় কঠিন সমস্যা তা বিধৃত হয়েছে করম গাছের শাখাগুলির বিদায়কালে গীত নিম্নে প্রদত্ত ওরাওঁ লোকসঙ্গীতে:

করম চলে যাচ্ছে
চলে যাচ্ছে করম
বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে করম
তাকে তৈল দাও
দাও তাকে উজ্জ্বল লাল রং (সিঁদুর)
করমকে দাও বিদায়।
চাইছে করম
ঝুড়িতে চাল
কুয়োতে টাকা
করম দাবি করছে তার শুল্ক।

একথা বলা যেতে পারে যে, উপজাতীয় নৃত্যসমূহ অধিকতর রমণীয়। ভারতের উপজাতীয় সমাজে প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষেই নৃত্যানুষ্ঠান হয় এবং প্রত্যেকবারই এর মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয় উপজাতীয় লোকেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা। এটা কেবলমাত্র তাদের সমাজের বহিরঙ্গের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট নয়, প্রকৃতপক্ষে দেবতাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে তুষ্টিসাধনের ব্যাপারেও হয়ে থাকে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ। পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্যও নিবেদিত হয় এর মাধ্যমে। নৃত্য ব্যতিরেকে কোন বিয়েই সিদ্ধ হতে পারে না, কোন শস্যই আহরণ করা যেতে পারে না নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়া, উপজাতীয় সমাজে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই গৃহীত হতে পারে না সমভাবে উপযোগী জাঁকালো নৃত্যানুষ্ঠান ছাড়া।

প্রত্যেক নাচেরই আছে স্বকীয় নিয়ম-পদ্ধতি। এটি হচ্ছে নিয়মানুবর্ত্তিতার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রতি অনুষ্ঠানেই থাকে একজন নৃত্যশিক্ষক—দলের উপর যে কতকটা ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। কতকগুলি নৃত্য অপেক্ষাকৃত অধিক-তর বৈচিত্র্যপূর্ণ।

ঘৃতং পিবেৎ ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগপ্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গপ্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বইখাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা—আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

HVM. 293A-X52 BG

মার

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

স্মর শব্দ হইতে মার শব্দের উৎপত্তি। মার অর্থাৎ কামদেব। প্রথমে ইহার ইহাই অর্থ ছিল। অশ্বঘোষ তাঁহার বুদ্ধচরিতে লিখিয়াছেন: "লোকে যাঁহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ, পুষ্পশর প্রভৃতি বলে, সেই কামসম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্মের কর্ত্তাকে মোক্ষরিপু মারও বলা হয়।"

সিদ্ধার্থ যখন তপস্যায় মগ্ন হন, তখন কামদেব তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করেন। প্রলোভনে যখন তাঁহাকে আকৃষ্ট করা সম্ভব হইল না, তখন মার তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইলেন। তাহাতেও যখন তিনি অটল রহিলেন তখন তাঁহার সিদ্ধিলাভ হইল।

বুদ্ধের পূর্ব্বে এবং পরে, বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যেই তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদনের জন্য প্রলোভন এবং বিভীষিকা প্রদর্শনের নানা কাহিনী প্রচলিত আছে।১

এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে সেই সব কাহিনী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই বিশ্বাস করিবেন না। যদিও উচ্চ-শিক্ষিতেরও একাংশ আজও বিশ্বাস করেন যে, সাধনার ক্ষেত্রে হুবহু এইরূপ ঘটনা ঘটে।

অনেকে ঐ কাহিনীগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেন। তাঁহাদের মতে উহা রূপক।

"যতদিন পর্য্যন্ত কৃতার্থ না হই, ততদিন পর্য্যন্ত আমি এই আসন হইতে উত্থিত হইব না।"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তপস্যায় বসিলেও যাঁহাদের চিত্তের দৃঢ়তা চরম উৎকর্ষলাভ না করিয়াছে, তাঁহাদের তপোভঙ্গ হয়।

'অজানার পথে পা বাড়াইয়াছি, যাহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসিলাম, তাহা সত্যই আছে কিনা—কে জানে?' গভীর তপস্যার মধ্যেও যখন সিদ্ধিলাভের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তখন মনের মধ্যে এইরূপ সংশয় আসা স্বাভাবিক।

যে প্রাণাধিক প্রিয়জন ও সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধক ঐ কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়াছেন—মনের এই অবস্থায়, তাঁহাদের কথা স্বতঃই তাঁহার স্মৃতিপথে জাগ্রত হইতে থাকে।

রাজপুত্র যিনি, যশঃ, মান, পদগৌরব ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সব বিসর্জ্জন দিয়া, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় প্রিয়জনকে, রূপসী যুবতীদিগকে এবং মানুষের কাম্য অন্যান্য ভোগ্য-সামগ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, তপস্যার কঠোরতার মধ্যে অকিঞ্চনতার মধ্যে যিনি জীবনযাপন করিতেছেন, তাঁহার মনে পূর্ব্বোক্ত সংশয় জাগ্রত হইলে পূর্ব্বজীবনের প্রিয়জন, ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ্যবস্তুসমূহ প্রবলবেগে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে থাকিবে। চিত্তের অপূর্ব্ব দৃঢ়তার বলেই সিদ্ধার্থ ঐ প্রলোভন জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রলোভন জয় সম্ভব হইলেও ভয়কে জয় করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। সাধনার পথে ভয় কি?

'নিশ্চিত বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের দিকে চলিয়াছি। যদি উহা না থাকে, যদি উহা কাল্পনিক হয়, তাহা হইলে যে জরা ও মৃত্যুর ভয়ে তপস্যায় মগ্ন হইয়াছি, সেই জরা এবং মৃত্যু আরও অগ্রসর হইয়া আসিয়া উভভ্রষ্ট ব্যর্থজীবন, কঠোর তপস্যারত ক্ষীণপ্রাণ তপস্বী আমাকে গ্রাস করিবে—হায়, হায়! আমার একুল ওকুল দুকুলই নষ্ট হইল'—সাধকের মনে এইরূপ বিভীষিকা জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু মানসিক দৃঢ়তায়, তপস্যার লক্ষ্যবস্তুর অস্তিত্বের উপর অসীম বিশ্বাসবলে, ঐ ভয় বা বিভীষিকাকে জয় করা সম্ভব। বুদ্ধ তাহাই করিয়াছিলেন এবং অন্য উচ্চশ্রেণীর সাধকগণও তাহাই করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত মনস্তাত্ত্বিকদের মতে—পুষ্পশর, কামদেব, স্মর, বা মারের উপাখ্যানের—ইহাই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব।২

আমরা কিন্তু উহাকে নিছক রূপক বলিয়া মনে করি না। অতনু হইলেও কামদেব আজও নানারূপে তপস্বীর তপস্যা ভঙ্গ করেন।

নির্জ্জন বনে গিয়া ফলমূল আহার করিয়া সাধনা করাই তপস্যা—তপস্যাকে আমরা এত সংকীর্ণ অর্থে সীমাবদ্ধ করি না। এই সংসারের মধ্যেও বহু মানব তপস্যা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহামানবও আছেন।

কেহ বিদ্যার জন্য, কেহ জ্ঞানের জন্য, কেহ স্বাস্থ্যসম্পদের জন্য কেহ স্বাধীনতার জন্য, কেহ বা অন্য কোন উচ্চ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া লোকালয়েই তপস্যা করিতেছেন। ইঁহাদের সকলকেই সংযত জীবনযাপন করিতে হয়, অনেক দুঃখক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

এযুগে আমাদের দেশে আমরা বহু স্বাধীনতাকামী দেশসেবক দেখিয়াছি। তাঁহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিয়াছেন। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দুঃখক্লেশ বরণ করিয়া, তপস্বীর কঠোর জীবন তাঁহারা যাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের তপস্যা সে-যুগের মুনি-ঋষিদের তপস্যা অপেক্ষা কম নহে। এই তপস্বীদের নিকটও বিভীষিকা এবং যশঃ, মান, প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য, সংসারের যাবতীয় কাম্য সামগ্রীর সমষ্টিরূপী মার, বার বার দেখা দিয়াছিলেন। মারের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাঁহাদের বহুজনের তপোভঙ্গ হইয়াছে।

এইরূপে ভারতের স্থানে স্থানে, প্রদেশে প্রদেশে, বহু তপস্বীর, বহু বিশ্বামিত্রের পদস্খলন হইয়াছে। বহু জরৎকারু ঘোর সংসারী হইয়াছেন। বহু ঋষ্যশৃঙ্গ রাজকন্যাসহ রাজ্যভোগ করিতেছেন। পুরাকালের বিশ্বামিত্র তপোভঙ্গ হইলেও পুনরায় দ্বিগুণ উৎসাহে

তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; এ যুগের বিশ্বামিত্রগণ তপোভঙ্গকেই সিদ্ধিলাভ মনে করিতেছেন।

ইঁহাদের এই অধঃপতন সমস্ত ভারতবাসীর নিকটই অত্যন্ত শোচনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার চেয়েও অধিকতর শোচনীয় এই যে, ইঁহাদের অধঃপতন কেবলমাত্র ইঁহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই; অগণিত ভক্ত ও অনুগামিগণের মধ্যেও উহা দ্রুত সংক্রমিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় উহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যুবা, কিশোর এমনকি শিশুগণের শুদ্ধ চিত্তও উহার দ্বারা আক্রান্ত হইতেছে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক দুঃখ।

আর কোন যুগে সারা ভারতবর্ষে মারের অত্যাচার মহামারীর ন্যায় এরূপ মারাত্মকভাবে দেখা দিয়াছিল কিনা জানি না।

১। বুদ্ধের পূর্ব্বেও প্রলোভনের দ্বারা মহাদেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা কামদেব করিয়াছিলেন। বুদ্ধের পরে পৌরাণিক যুগে অপ্সরাগণ প্রলোভনের দ্বারা মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করিতেন।

তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে—সাধনায় রত সাধককে প্রলোভন ও বিভীষিকা দেখানো হয়।

২। ইহার অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও আছে—নির্জ্জন অরণ্যে তপস্বী তপস্যা করেন। নির্জ্জন স্থানে চিত্তে স্বভাবতঃ কাম এবং ভয় ক্রমান্বয়ে উভয়ই উৎপন্ন হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক ঋণ ও মূলধনের গুরুত্ব

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে পশ্চিমীগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর, অর্থনীতি সম্বন্ধে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা সে সব দেশের শিল্পের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক মূলধন শিল্পপ্রসারের পথ অনেকখানি প্রশস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, যে পরিস্থিতিতে পশ্চিমীগোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা সম্ভবপর হয়েছে সে পরিস্থিতি বর্ত্তমানে বিদ্যমান আছে কিনা। আমাদের মনে হচ্ছে সে পরিস্থিতি বিদ্যমান নেই। আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে। যে সময়ে ক্যানাডা কিংবা অষ্ট্রেলিয়ায় বৈদেশিক মূলধন পাওয়া গিয়েছিল সে সময়ে শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কীয় প্রশ্নটি প্রধান হয়ে ওঠে নি। যাঁরা মূলধন বিনিয়োগ করতেন তাঁদের মনে এই মর্ম্মে কোন আশঙ্কা জাগে নি যে, মুনাফা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হবে। কিন্তু আজকাল যে দেশ প্রগতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে সে দেশের পক্ষে বৈদেশিক মূলধনের ব্যাপারে একেবারে অবাধ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভবপর নয়। আজকের দুনিয়ায় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ দেখা যাচ্ছে। মতবাদগুলো সম্পর্কে বিদেশী লগ্নীকারীদের মনে স্বভাবতঃই যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সে প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রয়োজনের সময়ে বৈদেশিক মূলধন পাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠে। অবশ্য, ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে বৈদেশিক মূলধন পাবার পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। সরকারের দায়িত্বে বাইরে থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ পাওয়া কষ্টকর হবে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া দেশের মধ্যে একদিকে যেরকম রপ্তানী-বাণিজ্য প্রসারিত করার জন্য চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়, সেরকম অন্যদিকে যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। তবে সকলের আগে ভারতকে ভোগ্যপণ্য সম্পর্কে স্বাবলম্বী হতে হবে। এজন্য দরকার ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করা।

সম্প্রতি ভারত সরকার পণ্য আমদানীর পরিমাণ প্রভূত পরিমাণে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়েছেন। দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে ভারত সরকারের এই আমদানী সঙ্কোচের নীতির প্রভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জ্জাতিক বাটা তহবিল থেকে প্রভূত অর্থ কর্জ্জ নেবার জন্যও ভারত সরকার ব্যবস্থা করেছেন। তবুও বৈদেশিক মুদ্রার গোটা চাহিদা মেটানো ভারতের পক্ষে সম্ভবপর হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই দেখতে পাচ্ছি বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্য ভারত সরকার অন্য ধরনের উপায় অবলম্বন করেছেন। আমাদের দেশের শিল্প-উদ্যোক্তাদের সরকার নাকি বলেছেন, বাইরে থেকে তাঁরা এমন ভাবে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যবস্থা করতে পারেন যার ফলে কয়েকটি বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে তাঁরা সমর্থ হবেন। প্রকাশিত সরকারী ইস্তাহারে সুস্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে, আমদানী সম্পর্কিত বাধানিষেধগুলির আওতা থেকে যন্ত্রপাতি বাদ দেওয়া হবে না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমের কথাও বলা হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ কোন পরিকল্পনা সম্বন্ধীয় আরব্ধ কাজের কথা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শীঘ্র যেসব যন্ত্রপাতি না পেলে এই কাজ বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে সেসব যন্ত্রপাতি অবাধে আমদানী করা যাবে। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে এখনও কাজ আরম্ভ হয় নি সে সব ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমতি পেতে

বিলম্ব ঘটবে। অবশ্য যদি মনে করা হয়, সরকারের এই আদেশ কেবলমাত্র বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা হলে ভুল হবে। সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপরও এটি বলবৎ থাকবে। কাজেই উন্নয়ন-পরিকল্পনাগুলি যেভাবে কার্য্যকরী করা হচ্ছে তাতে অর্থনীতিবিদরা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। বিশেষ করে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন অধিকতর পরিমাণ যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানী করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু যেহেতু বৈদেশিক মুদ্রার অভাব রয়েছে সেহেতু কি ভাবে পরিকল্পনাটির সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হবে সে সম্বন্ধে সরকার এবং অর্থনীতিবিদদের চিন্তার শেষ নেই। আমাদের অনেকেরই হয় ত জানা আছে, বহুদিন ধরে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি প্রায় লেগেই রয়েছে। এই নিত্যনৈমিত্তিক ঘাটতির চলতি চাহিদা মেটাতে বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিরাট অংশ নিঃশেষিত হয়ে যায়। কাজেই বৈদেশিক মুদ্রার যেটুকু অংশ বাকী থাকবে বলে অনুমান করা হয়েছে সেটুকু অংশ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি আমদানীর খরচ মেটান সম্ভবপর হবে বলে মনে হচ্ছে না। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বৈষয়িক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের আশা করা বৃথা।

বাইরে থেকে কয়েকটি বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সর্তে যন্ত্রপাতি আমদানী করার জন্য শিল্প-উদ্যোক্তাদের ভারত সরকার যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সে নির্দ্দেশের গুরুত্ব পরীক্ষা করে দেখা দরকার। অবশ্য বার্ষিক কিস্তির সংখ্যা আট-নয়টির বেশী হবে না। তবে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা করছেন, সরকারী নির্দ্দেশের ফলে শেষ পর্য্যন্ত হয় ত এমন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে যেটি ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থের দিক থেকে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থাৎ বিদেশে যাঁরা যন্ত্রপাতি তৈরি করেন এবং যাঁদের কাছ থেকে ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সর্তে যন্ত্রপাতি আমদানী করবেন তাঁরা স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত চড়া দর আদায় করতে চাইবেন। এর পিছনে দুটো কারণ আছে বলে মনে হয়। প্রথমতঃ যেহেতু ভারতীয় ক্রেতার যন্ত্রপাতি ক্রয় করার প্রয়োজন বেশী সেহেতু বিদেশী বিক্রেতারা এই প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে কিছুটা অতিরিক্ত দর আদায় করতে সচেষ্ট হবেন। দ্বিতীয় কারণ হ'ল এই যে, ভারতীয় ক্রেতারা মূল্য বাকী রেখে যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে চাইছেন। যদি নগদ লেন-দেন হ'ত তা হলে ন্যায্য দরের উপর ভারতীয় ক্রেতারা জোর দিতে পারতেন। সুতরাং যেক্ষেত্রে মূল্য বাকী রেখে যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে হচ্ছে সেক্ষেত্রে বিদেশী বিক্রেতারা বিক্রয়মূল্যের উপর সুদ আদায় করতে সচেষ্ট হয়ে উঠবেন। তাই অর্থনীতিবিদ্রা আশঙ্কা করছেন, শেষ পর্য্যন্ত সরকারী নির্দ্দেশের প্রতিক্রিয়া হয়ত এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করবে যেটি ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে দুর্ব্বল করে ফেলবে। কয়েকটা ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বাকীতে যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য কি রকম চড়া সুদ দাবি করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের অনেকের নিশ্চয় ধারণা আছে। কাজেই মূল্য বাকী রেখে বাইরে থেকে যন্ত্রপাতি আমদানীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

জলে এক দ্বীপ আছে

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

সলজ্জ শঙ্কিত কোন্ সেই মনোচোর
অলক্ষ্যে ছিঁড়িল যে সমস্ত মায়াডোর!
আমার যা সম্বল নিয়ে গেল সাথে তার,
সাগরে যে দ্বীপ আছে—সেটা নাকি হাতে তার!
সে দ্বীপের দেওয়ালী যে যবনিকা পারে হয়।
ফাগুনের ঝড় উঠে গোলাপের ঝাড়ে বয়!
ত্রস্ত শশক সে যে—গুণ অত কাতে আর?
জলে এক দ্বীপ আছে, যাব নাকি সাথে তার?*

---

* ডব্লু. বি. ইয়েটসের "To an ISLE in the water" অবলম্বনে।

দেখুন! মাত্র অর্দ্ধেক সানলাইট সাবানেই

এত সব জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ !

ফেণার আধিক্যের দরুণই সানলাইট সাবান এত ক্রিয়াশীল। আপনি দেখে অবাক হয়ে যাবেন যে মাত্র **অর্দ্ধেকটী সানলাইটে** কতগুলি জামাকাপড় কাচা যায়!

সানলাইটের এই অতিরিক্ত ফেণার দরুণই প্রতিটী ময়লার কণা দূর হয়ে যায়—জামাকাপড় হয়ে ওঠে আশ্চর্য্যরকম সাদা এবং উজ্জ্বল!

সানলাইটের ফেণার আধিক্যের দরুণই জামাকাপড় বিনা আছাড়ে পরিস্কার হয়। তার মানে আপনার জামাকাপড় টেঁকে আরও অনেক বেশী দিন।

ভারতে প্রস্তুত

সানলাইট জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে

S. 243-X52 BG

"লেখাপড়া-জানা মূর্খ"

শ্রীজগদীশচন্দ্র দে

একালে এক শ্রেণীর লোক দেখা যায়, যাহারা লেখাপড়া জানিয়াও মূর্খের মত কাজ করে। স্কুল-কলেজে তাহারা বিদ্যাশিক্ষা করে, কিন্তু সত্যকার বিদ্বান্ হয় না। বিদ্বানের মত আচার-আচরণ তাহাদের নয়; অথচ পুথিগত বিদ্যার অহঙ্কারে তাহারা 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করে। মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজী যখন রাজ্যস্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন আর রাষ্ট্রগুরু সমর্থ রামদাস স্বামী জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিবার, জন্য মঠে মঠে, মন্দিরে মন্দিরে জনসভা আহ্বান করিয়া লোককে উপদেশ দিতেছিলেন, তখন তিনি তাঁহার চারিদিকে ঐরূপ লেখাপড়া-জানা বহু মূর্খের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

রামদাস তাঁহার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "দাসবোধ" মহাগ্রন্থের একটি স্থানে ঐ সকল মূর্খের লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন। গ্রন্থটিতে "মূর্খলক্ষণ" নামে একটি অধ্যায়ই সংযোজিত হইয়াছে, উহার শেষাংশটির নাম "পঢ়ত মূর্খ লক্ষণ"। তাহার কয়েকটি মূল শ্লোক অনুবাদ-সহ পাঠকগণকে উপহার দেওয়া হইল।

মূল শ্লোক	পদ্যানুবাদ
১	১
আপলেন জ্ঞাতেপণেঁ। সকলাঁস শব্দ ঠেবনেঁ। প্রাণীমাত্রাচেঁ পাহে উনেঁ। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥	নিজজ্ঞানের অভিমান যার ষোল আনা, সকলের মাঝে দোষ খুঁজিতে সেয়ানা; প্রাণীমাত্রেই দোষ দেখিতে যে পায়, লেখাপড়া-জানা মূর্খ জানিও তাহায়।
২	২
রজোগুণী তমোগুণী। কপটী কুটীল অংতঃ করণী। বৈভব দেখোন বাখানী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥	রজোগুণী, তমোগুণী সাত্ত্বিকতা হীন, কপট, কুটিল আর অন্তরেতে দীন; বৈভবশালীর গুণ যেজন বাখানে, সেও এক মূর্খ, কিন্তু লেখাপড়া জানে॥
৩	৩
জ্ঞানপর্নে ভরী ভরে। আলা ক্রোধ না বরে। ক্রিয়া শব্দাস অংতরে। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥	সব-জান্তা বলি যার আছে অভিমান, ক্রোধকালে থাকে না কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান; কথা-কাজে মিল যার নাহি কোনকালে, লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ তারে বলে।
৪	৪
দোষ ঠেবী পুঢ়িলাঁসী। তেঁ চিন্তয়েং আপনাপাসী। ঐসে কলেনা জয়াসী। তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥	যেজন পরের ছিদ্র খুজিয়া বেড়ায়, আপনার ছিদ্র কিন্তু দেখিতে না পায়; পড়াশুনা হয়ত সে করিয়াছে ঢের, অতিবড় মূর্খ সে যে পায় না তা টের।

৫

বর্ণী স্ত্রিয়াঁচে আবেব।
নানা নাটকেঁ হাবভাব।
দেবা বিসরে জো মানব।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

৬

ভরোন বৈভবাচে ভরী।
জীব মাত্রাস তুচ্ছ করী।
পাষাংড মত্ত থাবরী।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

৭

যেথার্থ সাঁডুন বচন।
জো রক্ষুণ বোলে মন!
জ্যাচেঁ জিনে পরাধেন।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

৮

জ্ঞান বোলোন করী স্বার্থ।
কৃপণা-ঐসী সংচী অর্থ।
অর্থাসাঠী লাবী পরমার্থ।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

৯

বর্তন্যা বীণ সিকবী।
ব্রহ্মজ্ঞান লাবনী লাবী।
পরাধেন গোসাবী।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥

৫

রমণীর রূপ আর নাটকীয় ভাব,
বর্ণণা করাই যার হয়েছে স্বভাব;
ঈশ্বরে বিশ্বাস যার নাহি এক কণা,
লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ সে জনা।

৬

বৈভবের গরবে যে থাকে ভরপুর,
তুচ্ছ জ্ঞানে জীব মাত্রে করে 'দূর দূর',
পাষণ্ড মতের করে পোষকতা,
লেখাপড়া জানিলেও যায়নি মূর্খতা।

৭

যথার্থ বচন ছাড়ি অসত্য যে বলে,
যোগায় পরের মন অতি কুতূহলে;
জীবন যাপন করে পরাধীনতায়,
পড়াশুনা করিলেও মূর্খ বলে তায়।

৮

জ্ঞানের বচন বলি' স্বার্থসিদ্ধি করে,
কৃপণের মত যে ধনসঞ্চয় করে;
পরমার্থ প্রয়োগ যার অর্থলাভ তরে,
লেখাপড়া জানিয়াও মূর্খ নাম ধরে।

৯

আপনার আচরণে যাহা নাহি আসে,
পরকে শিখাইতে তা চায় অনায়াসে;
ব্রহ্মজ্ঞান প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ,
লেখাপড়া জানা মূর্খ, নাহি পায় সুখ।

মেরুদণ্ডীদের আবির্ভাব

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

জৈব-বিবর্ত্তন সরল রেখার গতিপথে অগ্রসর হয় নি। ভিন্ন ভিন্ন বিক্ষিপ্ত পথ দিয়ে বক্রগতিতে নানা অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে আজ মানুষ বর্ত্তমান স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে—এর না আছে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস, না আছে কোন একটানা গতি। জীবের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু স্তরবিভাগ নেই, কোনও বিশেষ জীবকুলকে নির্দ্দেশ করে বলতে পারা যায় না যে, এরা অপরের পিতৃপুরুষ, অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাসে ক্রমপর্য্যায় নেই, জীবজীবন শাখা-প্রশাখাসমন্বিত বিশাল বনস্পতি।

তবে এমন কয়েকটি বিশিষ্ট অবস্থা জীবজীবনের ইতিবৃত্তে এসেছে যার ফলে পূর্ব্বদশার আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে সম্পূর্ণ নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে জীবজগৎ। সেই অভিনব রূপান্তরগুলির পরিচয় উল্লেখ করতে হলে প্রথমে অ-জীব থেকে প্রাণ উৎপত্তির কথা বলতে হয়; দ্বিতীয়তঃ, যখন উদ্ভিদজগৎ স্বতন্ত্র হয়ে গেল জীবজগৎ থেকে; তৃতীয়তঃ মেরুদণ্ডীর জন্ম। এ পরিবর্ত্তনগুলিকে সাধারণ ক্রমবিকাশ বললে সবখানি পরিচয় দেওয়া হয় না, এই আমূল পরিবর্ত্তন রাষ্ট্র-বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়, আকৃতি-প্রকৃতি, দেহ মন স্বভাব সমস্ত বদলে জীব হয়েছে সম্পূর্ণ নূতন। মেরুদণ্ডী এমন একটা অবস্থার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল যখন পৃথিবীপৃষ্ঠে চলছিল দিগন্তবিস্তারী পরিবর্ত্তন: ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলপ্লাবনের মধ্যে পাষাণময় পাহাড় ও অনন্ত সমুদ্রের স্থানপরিবর্ত্তন হচ্ছিল নিরন্তর। কেম্ব্রিয়ান ও সিলুরিয়ান যুগের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সামুদ্রিক কর্কটজাতীয় প্রাণীরাই পৃথিবীতে আধিপত্য চালিয়ে এসেছিল, এদের স্কন্ধ-মস্তকে সুদৃঢ় বর্ম্মের আবরণ এবং দাঁড়ার অগ্রভাগ নিষ্পেষণের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত। তদানীন্তন উত্তাল তরঙ্গমালার হাত হতে রক্ষার জন্য বর্ম্মের উদ্ভব হয়েছিল। এই সময়ে মেরুদণ্ডীরা দেখা দিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্যের আকারে। প্রথম মেরুদণ্ডীর দল নিশ্চয়ই কঠিন বর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা সুসজ্জিত ছিল না—কারণ, তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কর্কটকুল জীবন-সংগ্রামে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছিল।

মেরুদণ্ডীর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বের জীব কারা?

কিছু কিছু অস্তিত্ব এখনও আছে—জীবের সামুদ্রিক-স্কোয়ার্ট, চুরুটের আকৃতি ল্যান্সলেট, অবলুপ্ত বালাং গ্লোসাস। মেরুদণ্ডী বলা হয় না এদের, তা হলেও এরা মেরুদণ্ডীদের পরমাত্মীয়, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাদৃশ্য এদের মেরুদণ্ডীদের সহিত। উভয়েরই লেজ আছে; সুষুম্নাকাণ্ড পিঠকে আবর্ত্তন করে রেখেছে; যকৃতের ন্যায় যন্ত্র উভয়েরই পরিপাককে সরল করে; মাংসপেশীর সঞ্চালনক্রিয়া যে অস্থিসমূহের উপর নির্ভরশীল সেই নোটোকর্ড দুই জাতেরই অমূল্য সম্পদ।

অনেকে মনে করেন, মেরুদণ্ডীরা সন্ধিপদদের সাক্ষাৎ বংশধর, কর্কটজাতীয় কোন প্রাচীন সন্ধিপদোদ্ভূত। উভয়ের দেহেই গ্রন্থির সমাবেশ, গতায়াত-উপযোগী সু-উন্নত উপকরণ এদের দেহে; সুবিন্যস্ত জটিল মস্তিষ্ক—স্বতন্ত্র দেহাংশের একত্রিত অবস্থা হতে ক্রমবিকাশের ফলে উদ্ভূত; খাদ্যদর্শন শিকার পরিপাক ইত্যাদি সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। যেহেতু সন্ধিপদেরা মেরুদণ্ডীদের কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েছিল সেজন্য সন্ধিপদের দেহগঠন পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হয়েছিল; মেরুদণ্ডীকুলের উন্নতির আরও কারণ এই যে, তাদের বনিয়াদ পাকা।

অন্যপক্ষ এ যুক্তি স্বীকার করেন না। সন্ধিপদ ও মেরুদণ্ডীর ভিতর অসাদৃশ্যই অধিক। মেরুদণ্ডীর অনধিক চারিটি হস্তপদ, গলদা চিংড়ীর উনিশ জোড়া অংশ আছে, শতপদীদের অংশ শতাধিক; সন্ধিপদের অঙ্গকে হস্তপদ বলা যায় না। ওগুলি কয়েকটি কঠিন অঙ্গগ্রন্থি; সন্ধিপদকুলের দেহভাগ বর্ম্মের আস্তরণে ঢাকা, মেরুদণ্ডীর ত্বক কোমল।

মেরুদণ্ডী যে-কোন কুলোৎপন্ন হোক না কেন, প্রাচীন প্রাণী—যাদের মধ্যবর্ত্তী বলা হয়, তাদের দেহযন্ত্রে উচ্চ মেরুদণ্ডীর পূর্ব্বাভাস। আদিম-মেরুদণ্ডী-দেহে-ইতস্ততঃ সঞ্চরণের জন্য উদ্ভূত ছোট ছোট রক্তিম মাংসতন্তু, গতায়াতের যন্ত্র, পরবর্ত্তী যুগে বিবর্ত্তন হয়েছে এদের, শত সহস্র প্রকারভেদে নানা অবস্থায় বিশ্বপ্রকৃতিতে জৈবজীবনকে রূপদান করেছে। সমগ্র মেরুদণ্ডীজগতের একমাত্র বিশিষ্ট পরিচয় পৃষ্ঠদেশের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডীজগতে আকৃতি, স্বভাব ও গুণে তারতম্য অশেষ। এদের উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী; ভিন্ন ভিন্ন বর্গ-উপবর্গ গোষ্ঠী; কিন্তু তা সত্ত্বেও অ-মেরুদণ্ডীদের মত অসাদৃশ্য এখানে নেই (যেমন, মথ ও তারা-মাছে কত ব্যবধান, কিন্তু সামুদ্রিক এনিমন বা কাটলফিশ আকৃতি, গড়ন কোন দিক দিয়েই উকুন বা জোনাকির মত নয়)। সবাই একটি সাধারণ নির্ম্মাণকৌশলের উপর নির্ভরশীল। সুবৃহৎ তিমি হস্তী জিরাফ ঈগল থেকে আরম্ভ করে বনমানুষ শশক বাদুড় বাজ কোকিল ছোট্ট টুনটুনি বাবুই লালমণি সকলের আকৃতিতে একটা সমতা আছে। বলা বাহুল্য, মানুষ এই সমরূপত্বের বাইরে নয়। অনেক অ-মেরুদণ্ডীর কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নেই। এমনকি সামুদ্রিক স্কোয়ার্ট, যারা নাকি অ-মেরুদণ্ডী-মেরুদণ্ডীর সংযোগস্থল, তারাই একতাল

সুস্থ ছেলেমেয়েরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও
বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই
রোগের বিপদ। সেইজন্তে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয়
সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP

আকৃতিবিহীন মাংসপিণ্ড। শামুককুলের খোলস বাদ দিলে বিশেষ কিছু থাকে না। কণ্টকচর্ম্মী তারামাছ, আরচিন সামুদ্রিক-লিলি উচ্চকুলের অ-মেরুদণ্ডী, কিন্তু চেহারায় সামঞ্জস্য নেই কোনও। কৃমিরা শুধুই লম্বা, জেলীমাছ পর্তুগীজ-যুদ্ধজাহাজ যাকার মত, স্কুইডদের চেহারা অদ্ভুত। কিছু ভদ্রগোছের হয় সন্ধিপদরা, তবে তাদের ভিতরেও মাকড়সা বিছু প্রভৃতি বিদকুটে। মাছ থেকে আরম্ভ করে উভচর সরীসৃপ স্তন্যপায়ী বনমানুষ মানুষ প্রত্যেকের কাঠামো এক ধরণের, তারা খেচরই হোক, ভূচরই, হোক অথবা গভীর জলের জীবই হোক। কেউ হয়ত সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী (যেমন মৃগ), কেউ শুধু মৎসে জীবনধারণ করে (যেমন সীল), মাংসাহারী স্বভাবের জন্য কিন্তু কারও দৈহিক কাঠামো বদলেছে সামান্যই।

মৎস্যযুগ

মাছেরা এল প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে।

ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ সিন্ধুতরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করেই হোক বা বৃহৎ কর্কট-জাতীয় প্রাণীদের কবল হতে পলায়নদ্বারা নিষ্কৃতিলাভে ক্ষিপ্রগতি উদ্ভবের জন্যই হোক, অর্ডোভিসিয়ান স্তরে পাওয়া গেছে প্রথম শির-দাঁড়া-সমন্বিত জলজ প্রাণীর দেহাবশেষ। এই অভাবনীয় অথচ একান্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ প্রাণীদেহে দেখা দিল এই যুগে, এরা আদি মাছ। বহুকাল ধরে ভারী ভারী বর্ম্মবিশিষ্ট প্রাণীকুল সমুদ্রে একাধিপত্য করে বেড়াত। সম্মুখভাগে বর্ম্ম থাকায় এদের গতি কালক্রমে হয়ে এল মন্থর, সেজন্য পরবর্ত্তী যেসব নতুন প্রাণীরা এল তারা হাল্কা লঘুগতি-বিশিষ্ট। সাঁতারে ও খাদ্যসংগ্রহে, গুরুভার প্রাণীদের চেয়ে এরা গেল এগিয়ে—মেরুদণ্ডীর পূর্ব্বপুরুষ এরা। জীবন-সংগ্রামে বৃহৎ বৃহৎ অ-মেরুদণ্ডীদের পরাজিত করে তাদের পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করে বসল এরা এবং তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত জলভাগের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এদেরই হাতে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে, মাঝে মাঝে হয়ত স্থান বেদখলও হয়ে গেছে (সরীসৃপ যুগে), কিন্তু সে পরাভব সাময়িক, আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে শক্তিক্ষয় বিশেষ হয় নি। মাছেরা সর্ব্বপ্রথম মেরুদণ্ডী, আমাদের দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষ। ডিভোনিয়ান যুগের মাছ ও তাদের বর্ত্তমান বংশধরের আভ্যন্তরীণ কাঠামোয় মানব-জ্রূণের প্রথম দিককার অবস্থার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য থাকে। পরিপাক-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন, শ্বাসপ্রণালী ও প্রজনন উভয়েরই প্রায় সমরূপ। সিলুরিয়ান স্তর থেকে আরম্ভ করে ক্রমশঃ কত বিভিন্ন শাখাপ্রশাখায় যে এরা বিভক্ত হয়ে গেছে তার হিসাব রাখা কঠিন। সিলুরিয়ানের মৎস্যকুলের কিছু আঁশ আর প্লেট সমন্বিত ত্বক ছিল, অপর কোন কঠিনাংশের চিহ্ন পাওয়া যায় না। মস্তকের কয়েকটি মেরুদণ্ড ছিল তবে কোমল, শিলীভূত হতে পারে নি, শুধু দাগের নিদর্শন থেকে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে। পরের স্তর রক্তিম বালুকাপ্রস্তরের। এ যুগে যারা অগভীর জলতলে থাকত তারা এবং উপরের সন্তরণশীল মৎস্য উভয়েরই ত্বকাবরণে উজ্জ্বল এনামেলের কলাই দেখা দিল, 'গনয়েড' মৎস্য নামে অভিহিত এরা। আগে-পিছের পাখনা প্যাডেল রূপে ব্যবহৃত হ'ত অধিক, সাঁতার বিশেষ কাটত না নীচের দিকে বুকে হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করত বেশী। কঠিন চোয়াল বিশিষ্ট প্রাণীরা ক্রমে বিশালাকার ধারণ করেছিল—মাথার আয়তন তিন-চার ফুট ত বটেই, বর্ম্মের স্থূলত্ব স্থানে স্থানে চার-পাঁচ ইঞ্চির কম হ'ত না। বাক্সের আকৃতি হ'ত প্রথম দিককার মাছেরা (যেমন কাঁকড়া), দ্রুত গমনাগমনই পরিণত করল লম্বা আকৃতিতে। এর পরে সন্তরণরত জীবের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পাখনার হ'ল প্রভূত উন্নতি—লেজের পাখনায় পরিণতি প্রপেলারে। শেষে ভিতরের অস্থিপঞ্জর সুকঠিন হাড়ে পরিণত হয়ে জটিল আকার ধারণ করেছিল, বহু স্থলে আঁশের গাত্রাবরণ পাতলা হয়ে আসায় ছোটাছুটির সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।

উন্নততর গতি ও জলজ খাদ্য আহরণ, এই দ্বিবিধ ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ধারাপর্য্যায়াভিমুখে হ'ল মাছেদের ক্রমিক অগ্রগতি ; পরবর্ত্তীকালে সংখ্যাতীত প্রকারের মাছ সমুদ্র, হ্রদ, নদী, নির্ঝরিণী, খাল-বিলে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের বংশধরেরা এখনও আমাদের খাদ্যের একটা বৃহৎ অংশ যুগিয়ে চলেছে। সেদিন সেই প্রাচীন যুগে জীবনপ্রবাহের যে অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল মৎস্যকুলে, কোটি কোটি বৎসর ধরে তাই প্রকাশিত হয়েছে নানারূপে বিবিধ আকারের ভিতর দিয়ে। জীবনধারা বিকাশে যখন কোন অঙ্গ জীবকে জীবনসংগ্রামে সাহায্য করে তখন সে অঙ্গ থেকে যায়, তার সার্থক উদ্বর্ত্তন সমগ্র জাতিকে পরিচালিত করে শ্রীবৃদ্ধির পথে। বিভিন্ন যুগের মাছেদের শিলীভূত দেহাবশেষ সন্দেহাতীতরূপে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করছে। আধুনিককালে গভীর সমুদ্রে খড়্গাধারী মৎস্যের আস্তানা, এদের বিবর্ত্তন জুরাসীক যুগ থেকে লক্ষ্য করা যায়। তখন থেকেই উপর-চোয়ালের সম্মুখ দিয়ে তুণ্ড খাড়া হয়ে উঠছিল অল্পে অল্পে, খড়িযুগে ছুঁচলো অস্ত্র হয়ে উঠল শেষের দিকে বেশ ধারালো ও লম্বা অস্ত্ররূপে পরিগণিত হ'ল। কালের অগ্রগতি যেমন তার পরিচয় রেখে গেছে বিভিন্ন মৃত্তিকাস্তরের বিন্যাস করে, তেমনি এই প্রকার অঙ্গবিবর্ত্তনও ফসিল প্রাণীদের দেহে অকৃত্রিম স্বাক্ষররূপে বিরাজমান।

প্রত্নজীববিদদের অনুমান—প্রথম মাছেরা ছিল আকারে ছুরিকা-ফলকের ন্যায়—তাদের 'বকলস-মাথা' বলা হয়, এদের সগোত্র আর যারা জলপৃষ্ঠে খেলে বেড়াত তারা লঘু ও উপলগতিবিশিষ্ট। ডিভোনীয়ান যুগ পর্য্যন্ত এইরূপ চলেছিল। কঠিন বর্ম্মওয়ালা ভারী ভারী জীবেরা ক্রমশঃ সংখ্যায় কমে গিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে, আর এই ছোট ছোট মৎস্যাকৃতি জীব মহানন্দে আসর দখল করে জমিয়ে বসেছে ; এদেরই হয়েছে বিবর্ত্তন। মৎস্যযুগের মধ্যকালে যেসব আঁশযুক্ত মাছ জন্ম নিতে লাগল তাদের মধ্যে 'ডিপেট্রাস' শ্রেণীর মাছেদের দন্তপংক্তি দেখা যায়, 'টেরিথিস' জাতীয় মাছেদের দেখা দিল কানকোর মত অঙ্গ, চরবার সুবিধা পেল।

মৎস্যযুগ চলেছে বহুকাল ; সরীসৃপদের আবির্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত এদের রাজত্ব নিরঙ্কুশ। যেরূপভাবে অ-মেরুদণ্ডী চিংড়ি-কর্কটরা ভীষণাকার হয়ে উঠেছিল সেইভাবে মাছেরাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'ল। ২০।২২ হাত পরিমিত লম্বা মাছ ও তাদের করাল দন্তশ্রেণী

নিশ্চয়ই অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীদের ভীতি উৎপাদন করত, তথাপি বেঁচে রইল এই ছোট মাছেরা বংশবৃদ্ধি করে। সেকালের ভীষণ-দর্শন মাছেদের আজ কোনও অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। আধুনিক-কালে যে সমস্ত মাছ আমাদের নয়নগোচর হয় তারা প্রায় কেউ কৌলিন্যের দাবি করতে পারে না, এদের অস্তিত্বের কোন আভাস নেই সেযুগে। সে সময়ে একরূপ অদ্ভুত ধরনের মাছের সন্ধান পাওয়া গেছে যার তুলনা মেলা ভার: আঁশগুলো কঠিন, হাড়ের লেজেও বৈচিত্র্য, এদের বংশধরেরা আজও নীল নদের ঘোলাটে জলে খেলা করে বেড়ায়। আর একটি জীবের বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন—হাঙর। কত বৎসর কত যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, সমুদ্রতলে এদের আধিপত্য আজও অক্ষুণ্ণ, যেমনি হিংস্র তেমনি ভয়াল এরা। হাঙরজাতীয় জীব তখনও ছিল, এখনও আছে—সামান্য পরিবর্তন হয়েছে আকৃতিতে। 'কারছারোডন' অধুনালুপ্ত এক জাতের হাঙর, মুখব্যাদান করলে আস্ত মানুষের স্থান হ'ত অবলীলা-ক্রমে। জাহাজডুবিতে নিমজ্জিত ত্রস্ত নরনারীকে নিয়ে এদের পড়ে যায় মহোৎসব। পুরাকালের মৎস্যকুলধারা অধিকাংশই আজ অবলুপ্ত, যাদের ক্ষীণ স্রোত এখনও বইছে তাদের ভিতর পাইকমাছের ন্যায় দীর্ঘ বিশালচোয়াল ও তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট কানকোযুক্ত মাছেদের সঙ্গেই স্থলচর মেরুদণ্ডীর নিকট সম্বন্ধ; কঠিন যুগ্ম কানকোদ্বয় কালক্রমে পরিণত হয়েছে হস্তপদে, স্কন্ধবন্ধনীবাহিত প্যাডেলচতুষ্টয় ভবিষ্যৎ যুগের স্কন্ধ-গ্রীবাস্থি, পশ্চাতের প্যাডেলধৃত অস্থিপ্লেট, নিতম্ব।

আধুনিক কালে মৎস্যকুল জলতলের সর্বত্র স্থান করে নিয়েছে। নির্মল জল, খাল-বিল-পুষ্করিণী-তড়াগ-প্রস্রবণ-সমুদ্রগর্ভের সমস্ত স্তরে এদের অবস্থান। অসংখ্য আকারে, বৈচিত্র্যকরভাবে এদের দেহ ও স্বভাব গড়ে উঠেছে, মৎস্যবিবর্তন যত না বিস্ময়জনক, এদের দেহবৈচিত্র্য ততোধিক বিস্ময়কর। আজকের জলভাগ যত বিভিন্ন প্রকারের মৎস্যকুলকে আশ্রয় দিয়েছে, পুরাতন পৃথিবীতে নিশ্চয়ই তার ক্ষুদ্র একাংশও ছিল না, পৃথিবীর বয়স যত বেড়েছে শাখা-প্রশাখাসমন্বিত হয়ে, মৎস্যকুলও ততই ছড়িয়ে পড়েছে। এই বহু-বিধ পরিবর্তনের মূলে খাদ্যানুসন্ধান ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর পার্থক্য বিদ্যমান; তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতির বৈশিষ্ট্য জাতিকে মূলধারা থেকে নিয়ে গেছে অনেক দূর।

মাছেরা আকাশেও উঠবার চেষ্টা করেছিল। ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এদের বংশধর এখনও আছে। সমুদ্রের মধ্যস্তরের অনেক মাছ দেহসংযুক্ত ছিপ-বঁড়শি দিয়ে শিকার ধরে; ছিপের অগ্রভাগের উজ্জ্বল দ্যুতিতে আকৃষ্ট হয়ে ছোট মাছেরা বঁড়শি গেলে। মহাসাগরের তলদেশে সূর্যালোক পৌঁছয় না, সেখানে দিনরাতের ভেদ নেই, ঋতুপরিবর্তনের বৈচিত্র্য নেই। সেই চির অন্ধকারময় প্রদেশের বাসিন্দারা অলস নিথর; অল্প কয়েক প্রকারের মাছেদের দেহজাত বৈদ্যুতিক দীপ্তি আলোকিত করে রাখে পথ। কেউ কেউ আত্মরক্ষার্থে দেহে উদ্ভব করেছে 'বৈদ্যুতিক-শক', ব্রেজিলের জলাভূমিতে যে 'ইলেকট্রিক ঈলদের' বাস তাদের শক্তি-শালী শক অশ্বকে পর্যন্ত মূর্চ্ছিত করে দেয়। বানেদের মত লম্বা আকারে পাইপমাছ—এদের স্ত্রীরা পুরুষ-দেহে ডিম্ব প্রসব করে যায়। সন্তান লালন-পালনের ভার পুরুষের। আরও যেসব পুরুষ-মাছ সন্তান লালন-পালন করে তাদের মধ্যে ষ্টীকল ব্যাক, রামধনু-রঙের স্বর্ণমাছ (চীন), থাইদেশের লড়াকমাছ প্রসিদ্ধ। আকৃতির দিক থেকেও এরা নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। সর্পাকৃতি বানমাছ অনেকে দেখেছেন, এর ঠিক উল্টো হচ্ছে ব্রেজিলের চেপ্টা চওড়া বিরাট কানকোযুক্ত চিত্রিত এঞ্জেল মাছ। গোল বেগুন-আকৃতি বাঘামাছ প্রায় অনুরূপ দেখতে, এদের মাংস বিষাক্ত, মানুষের অখাদ্য অনেকে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত হতে পারে শত্রুকে ভীতিপ্রদর্শনের জন্য। অনেকে আবার এত অধিক উদর স্ফীত করতে পারে যে, নিজ দেহের অপেক্ষা বহুগুণ ভারী স্কুইডকে অব-লীলাক্রমে গলাধঃকরণ করে ফেলে। মেক্সিকো উপসাগরের ফটো-করনিসের আকৃতি বীভৎস—মুখ জুড়ে দন্তপংক্তি ও মাথা ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশ না থাকারই মধ্যে; এদের পুরুষের বাস স্ত্রী-দেহে এবং আহারও বেচারা স্ত্রীর দেহস্থিত জৈবপদার্থে।

গন্ধ-শব্দ-দৃষ্টির দিক থেকেও অনেক মাছের বিবর্তন ঘটেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মাছেরা শুনতে পায় কি না? শ্রুতি এদের আছে সকলেই জানেন, কিন্তু কর্ণযন্ত্র শোনার চেয়ে প্রয়োজনীয় আর একটি কাজ করে—ভারসাম্য রক্ষা। যে মানুষ বদ্ধকালা সে কখনও দ্বিচক্রযান চড়তে পারে না, তার ভারসাম্যরক্ষা-যন্ত্র বিকল। মাছেরাও শোনে, তবে কান দিয়ে নয়, দেহ দিয়ে—জলতরঙ্গ শব্দবহন করে এনে ধাক্কা দেয় দেহে, সেখান থেকে মস্তিষ্কে। কোন কোন মাছের ঘ্রাণশক্তি এত তীব্র যে, বহুদূর হতে খাদ্যের গন্ধ পায়। আমেজান নদীতে থাকে দন্তবিশিষ্ট পিরান। মাইলখানেক দূর থেকে এসে মানুষকে পর্যন্ত আক্রমণ করে। চক্ষুর অবস্থান নানা মৎস্যের নানা রূপ। সর্বদা জলধৌত হয় বলে মাছেদের চক্ষুপল্লব নেই, অথচ একশ্রেণীর হাঙর ও হিংস্র কুকুরমাছ চক্ষু মুদ্রিত করতে পারে। সাধারণতঃ চক্ষুর অবস্থান মস্তকের উভয় পার্শ্বে, কিন্তু স্কেটদের একই দিকে, এরা চেপ্টা, ঠিক যেমন সোল টারবো ইত্যাদি: সাধারণ মৎস্যদের আকৃতি রুই, কাতলা, মৃগেলের মত বেলনাকার—এদের থেকে চেপ্টামাছ অবধি বিবর্তনের স্তর দেখা যায় মেকরেল কডদের আকৃতিতে। সোল যেমন শৈশবের বাসস্থান নির্মল জল পরিত্যাগ করে চলে যায় সমুদ্রে, তেমনি অঙ্গাকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে তার চক্ষুর অবস্থানেরও পরিবর্তন হয়।

কই মাছেরা ডাঙায় চলে বেড়ায়। এক জাতের মাছ কানকো ও আঁশের সাহায্যে গাছে চড়ে যেতে পারে সটান, সমুদ্র তথা নদীগর্ভে বুকে হেঁটে বেড়ায় এমন মাছ আছে একাধিক। এই সূত্র ধরে জীব-জীবনের ইতিহাসে যুগান্তকারী গবেষণায় সূচনা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও চন্দননগর

শ্রীহরিহর শেঠ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব স্মরণ করিয়া স্মৃতিপূজা উপলক্ষে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। চন্দননগরে প্রতিনিয়ত কত উৎসব-অনুষ্ঠানই না উদযাপিত হইয়া থাকে, কিন্তু চন্দননগরবাসীর পক্ষে এমন গৌরবের অনুষ্ঠান দ্বিতীয়টি বুঝি আর নাই। বিশ্বকবিকে প্রথম দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে। এই মন্দিরে ঠিক এইখানে দাঁড়াইয়াই এখানকার পৌরসভার সংবর্দ্ধনার উত্তরে তাঁহার কবিপ্রতিভার উন্মেষ সম্পর্কে তিনি মনোহর ভাষায় যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা হয়ত এখনকার অনেকের শ্রবণ করিবার সুযোগ হয় নাই। এই অবসরে তাহা স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন :

"ছেলেমানুষের বাঁশি ছেলেমানুষী সুরে যেখানে বাজত সে আমার মনে আছে। মোরাণ সাহেবের বাগান-বাড়ী, বড় যত্নে তৈরী, তাতে আড়ম্বর ছিল না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী ছিল বিচিত্র। তার সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় একটি ঘর ছিল, তার দ্বারগুলি মুক্ত, সেখান থেকে দেখা যেত ঘন বকুলগাছের আগডালের চিকন পাতায় আলোর ঝিলিমিলি। চারদিক থেকে দুরন্ত বাতাসের লীলা সেখানে বাধা পেত না, আর ছাদের উপর থেকে মনে হ'ত মেঘের খেলা আমাদের পাশের আঙিনাতেই। এইখানে ছিল আমার বাসা, আর এইখানেই আমার মানসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলাম :

"এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।"

কবিগুরুর "My Boyhood Days" পুস্তকে ঠিক তার এই ভাবের কথা বলিয়া শেষ করিয়াছেন :

"Here a fit of wakefulness by night came upon me, and I used to pace to and fro, as I did later on on the banks of Sabarmati,"

'আমাদের বিশ্বকবি' পুস্তকে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন : "মোরাণ সাহেবের বাগানবাড়ীর ত্রিতলের হাওয়াখানায় বসিয়া অনেক সময় যুবক কবি ভাবাকুল লোচনে কলনাদিনী গঙ্গার ও তাহার অপর পারের পল্লীদৃশ্য উপভোগ করিতেন। তাঁহার সত্যকার কবি-জীবনের সূচনা হয় এই বাগানবাড়ীতে। "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" ও "প্রভাত-সঙ্গীতে"র কয়েকটি কবিতা তিনি ত্রিতলের ঐ উন্মুক্ত ঘরখানিতে বসিয়াই সম্ভবতঃ রচনা করিয়াছিলেন।"

কবিবর 'জীবন-স্মৃতি'তেও উল্লিখিত বাগানবাড়ী সম্বন্ধে সবিস্তারে লিখিয়াছেন। ' বিশ বৎসর পূর্ব্বে চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশতিতম বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে আসিয়া বঙ্গভারতীর বরপুত্র রবীন্দ্রনাথ বহু বুধজনপূর্ণ সভায় উদাত্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

"আজকে আমার প্রতি ভার অর্পণ করেছেন এই সম্মেলনের উদ্বোধনের। উদ্বোধন এই কথাটি শুনে আমার মনে আর এক দিনের কথা এল। সেই সময় এই শহরের একপ্রান্তে একটা জীর্ণপ্রায় বাড়ী ছিল ; সেইখানে আমি আমার দাদার সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তার পর মোরাণ সাহেবের বিখ্যাত হর্ম্ম্যে আমাকে কিছু দীর্ঘকাল যাপন করতে হয়েছিল। বস্তুতঃ এই গঙ্গাতীরে, এই নগরের একপ্রান্তেই আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেটা ছিল আমার জীবনের সত্য ও সহজ উদ্বোধন।"

তার পর তিনি আবার বলেন :

"সেটা হ'ল প্রথম বয়স। তখন বাণী ফোটে নি, সুর বেরোয় নি * * তখনই আমার কবি-জীবনের প্রথম সূচনা হয়েছিল।"

কবির কাব্যরচনার ইতিহাসে এই সময়টা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য মনে হয়। উদ্ধৃতাংশ হইতে স্পষ্টই জানা যায়, তিনিই স্বহস্তে চন্দননগরের ললাটে অমূল্য অক্ষয় তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। চন্দননগরবাসী কোন দিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাই আজি তাঁহার জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের দিনে এই কথা মনে না আসিয়া পারে না যে, কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে প্রথম তাঁহার জগতের আলোর দর্শনলাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু যে সাধনার ফলে সাহিত্য-জগৎকে তিনি আলোকিত করিয়াছেন এবং তজ্জন্য জগতের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, সে সাধনার সূত্রপাত হয় এইখানে।

পরবর্ত্তীকালে কবিকে সংবর্দ্ধনা জানানো হইলে তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ছোটবেলায় যখন তিনি এখানে এসেছিলেন, কোন ব্যক্তি কোন দল সে সময় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে নি, কেবল আদর পেয়েছিলেন এখানকার প্রকৃতিরাণীর কাছ থেকে। অতিথি-বৎসলা বিশ্বপ্রকৃতির অবারিত আঙিনা হয়ত সকলের জন্য আজিও সমান উন্মুক্ত আছে।"

প্রকৃতির সমাদর অতিথিকে হয়ত আজিও তেমনই মুগ্ধ করে। তাঁহাদের পক্ষে হয়ত তাহাই গরীয়ান। তাঁহারা প্রকৃতি-দেবীর কাছ হইতে সেই সুধা আকণ্ঠ পানে বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন। ভারতচন্দ্র, মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতিকে হয়ত সেই সুধার আকর্ষণই এখানে টানিয়া আনিয়া-ছিল। এই কবিজন-বাঞ্ছিত শহরটি, বিশেষ করিয়া গঙ্গার ধারটি রবীন্দ্রনাথের খুবই প্রিয় ছিল। তিনি শেষজীবনেও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। চন্দননগর-প্রীতি শেষ পর্য্যন্ত কোন দিনই তাঁহার ম্লান হয় নাই। মৃত্যুর মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও মধ্যে মধ্যে দুই-একদিন করিয়া চন্দননগরের গঙ্গাবক্ষে বজরায় কাটাইয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া চন্দননগরকে যদি 'রবিতীর্থ' নামে অভিহিত করা যায় ত তাহা খুবই শোভন হয়।

সাহিত্য-সম্মিলনের সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, দিনকতক তিনি আমার "জাহ্নবী-নিবাস" বাটিতে আসিয়া বাস করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। পরে তিনি পত্রদ্বারা আমাকে জানাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আসা সুবিধা হইল না, পরে ইচ্ছা রহিল।*

---

* চন্দননগরে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে সংবর্দ্ধনা সভায় সভাপতির ভাষণ।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জীবন-দর্শন

(মূল জার্মাণ থেকে অনূদিত)

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

[প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটের নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁর সম্বন্ধে দু'একটি কিংবদন্তীও অনেকেরই জানা আছে—তবে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ও কর্ম্মবহুল জীবনের অনেক তথ্যই আমরা তেমন জানি না। সম্প্রতি উনবিংশ শতাব্দীর একজন খ্যাতনামা জার্ম্মান লেখক—গুষ্টাভ ফ্রাইটাকের (১৮১৬-১৮৯৫) একটি প্রবন্ধ পড়ে বড় ভাল লাগল। তদানীন্তন জার্ম্মানীর সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের অনেক সাদৃশ্য থাকায় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু আমাদের পথনির্দ্দেশে অনেকটা সহায়তা করবে মনে করে এর অনুবাদ বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি।]

একজন প্রগতিপন্থী আদর্শচরিত্র শক্তিমান্ সম্রাটের শাসনাধীনে দেশের কিরূপ সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধিত হতে পারে—প্রুশিয়ার সম্রাট ফ্রেডারিক দি গ্রেটের জীবন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাঁর রাজত্বকালের প্রথম তেইশ বৎসর যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা শক্তি প্রতিষ্ঠিত করায় অতিবাহিত হয়—পরবর্ত্তী তেইশ বৎসর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জ্ঞানী ও কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় তিনি প্রজাপালন করেন। রাজ্য পরিচালনায় তিনি যারপরনাই আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেছেন—কিন্তু নিজে যা ভাল বুঝতেন তা করতে কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। সর্ব্বোচ্চ আদর্শের নিষ্ঠাবান্ পূজারী হয়েও দীনদুঃখীর কথা কদাচ তিনি ভোলেন নি। চিন্তার স্বাধীনতা দিতেন তিনি ষোল আনা; কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে থেকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করুক, এই ছিল তাঁর সব চেয়ে কাম্য। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থ তিনি রাজ্যের কল্যাণে নিয়োজিত করতেন—বার্ষিক মাত্র ২ লক্ষ টাকার (প্রায় ৬ লক্ষ মার্ক) রাজপরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যই তাঁর কাছে অগ্রাধিকার লাভ করত—নিজের সম্বন্ধে সবচেয়ে কম চিন্তা করতেন; তাই যখনই তিনি নতুন কোনও কর ধার্য্য করতেন, প্রজারা সানন্দে তা অনুমোদন ও বহন করত। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন যে, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ শিক্ষা-দীক্ষা ও জন্ম অনুসারে সেই পরিবেশের মধ্যে থাকবে—সম্ভ্রান্ত লোকেরা জমিদারী দেখবেন ও যোদ্ধা হবেন, নাগরিকগণ নগরের উন্নতি, শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষাদান কার্য্যাদি নিয়ে থাকবে—কৃষকেরা চাষ ও চাকুরি করবে। অবশ্য অসাধারণ মেধাবী ও প্রতিভাশালীর পক্ষে এ নিয়ম খাটবে না। তবে প্রত্যেকেই তার নিজ গণ্ডীর মধ্যে উন্নতি করতে থাকবে ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবে। প্রত্যেকের জন্যই পক্ষপাতহীন, কঠোর ও দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা—সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে বিশেষ কোনও অনুগ্রহ দেখানো হবে না—বরং সন্দেহজনক স্থলে গরীবকেই সুবিধা দেওয়া হবে। কর্ম্মঠ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, প্রত্যেক কাজেরই মান যথাসম্ভব বাড়িয়ে তদনুসারে বেতন বা পুরস্কারের ব্যবস্থা আবশ্যক দ্রব্যাদি দেশেই উৎপন্ন করা, বিদেশ থেকে যত কম সম্ভব আমদানী এবং করা দেশের উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশে চালান দেওয়া এই ছিল তাঁর রাজ্যশাসনের মূল নীতি। নিরলসভাবে তিনি আবাদী জমির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছিলেন। জলা জায়গা ভরাট করে আবাদী জমি করা, বাঁধ ও খাল দ্বারা শস্যের ফলন বাড়িয়ে তোলা, রাজকোষ থেকে টাকা দাদন দিয়ে নতুন নতুন কারখানা স্থাপন, গ্রাম ও নগর সংস্কারে মুক্ত হস্তে অর্থদান, কৃষিঋণের প্রচলন, ফায়ার ব্রিগেড ও রাজকীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা তাঁর প্রধান প্রধান কীর্ত্তি। রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। শিক্ষিত লোকেদের তিনি যোগ্য সমাদর করতেন। উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্রবল না থাকলে এবং কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে কেহ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত হতে পারত না।

দীর্ঘ সাত বৎসরব্যাপী যুদ্ধে তিনি যে অমানুষিক পরিশ্রম ও শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন—শান্তিকালে জনগণের কল্যাণবিধানেও তিনি সেইরূপ শ্রম এবং নিষ্ঠা প্রদর্শন করায় তাঁর সমসাময়িক লোকেরা তাঁকে অতিমানব বলে মনে করত। সমষ্টির হিতসাধনই তাঁর সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ছিল—সমষ্টির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কাছে ব্যষ্টিস্বার্থ ছিল তাঁর নিকট নিতান্তই নগণ্য। একবার তাঁর জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের ত্রুটি বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাঁকে পদচ্যুত করেন। অতি দ্রুত কার্য্য সম্পাদন তাঁর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। বড় একটা জলা-জায়গা সংস্কারের জন্য তিনি কয়েক হাজার লোক নিযুক্ত করেন—কর্ম্মীরা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে এই সংবাদ পাওয়ামাত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে সাময়িক ভাবে হাসপাতাল খুলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং স্বয়ং প্রত্যেক রোগীর খোঁজখবর লন। এই সব কারণে প্রজাদের অকুণ্ঠ ও আন্তরিক শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

পান-ভোজনের কোলাহল বর্জ্জিত সম্রাটের প্রাসাদ ও উদ্যান ছিল নিস্তব্ধ ও নির্জ্জন। বাগানের অন্যান্য গাছের মধ্যে তাঁর প্রিয় কমলালেবু গাছের ছিল প্রাচুর্য্য। গরমকালের চাঁদনী রাতে প্রাসাদে কারও প্রবেশের সৌভাগ্য হলে সে দেখতে পেত—রক্ষীহীন

উন্মুক্ত-দ্বার শয়নকক্ষে অতি সাধারণ বিছানায় সম্রাট শায়িত আছেন—ফুলের সুবাস, নৈশ পাখীর গান এবং চন্দ্রালোক নির্জন প্রাসাদে তাঁর একমাত্র প্রহরী।

এই মহামতি সম্রাট চুয়াত্তর বৎসর বয়সে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে ভৃত্যেরা ভিন্ন অপর কেউ তাঁর শয্যাপার্শ্বে ছিল না। যৌবনে চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি জীবনপথে যাত্রা করেছিলেন—নিজের ভাগ্য নিজ হাতে গড়ে তুলেছিলেন—জীবনে যা কিছু গৌরবের, যা কিছু বরণীয় সকলই তিনি লাভ করেছিলেন। কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রতাপশালী যোদ্ধা—একাধারে বহুগুণের অধিকারী হয়েও তাঁর বিরাট মন তৃপ্ত হয় নি। পার্থিব যশ-সম্মান তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। অনলস কর্তব্যপালনই তাঁর সমস্ত চিত্ত পূর্ণ করে রেখেছিল। কবি হিসাবে আদর্শচরিত্র ব্যক্তিত্বের ছিলেন তিনি একনিষ্ঠ উপাসক—চারপাশের জনতা ছিল তাঁর কাছে মূল্যহীন অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তাঁর এই একান্ত প্রিয় ধারণা বিসর্জন দিতে হয়েছিল—ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করে সমষ্টির মঙ্গলসাধনেই তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। অত্যুচ্চ আদর্শবাদ নিয়ে তিনি জীবনে প্রবেশ করেছিলেন এবং জীবনের ভীষণতম পরীক্ষা ও তিক্ততা-রূঢ়তার মধ্যেও সেই আদর্শচ্যুত হন নাই—বরং দিনে দিনে তাঁর আদর্শ আরও মহত্তর এবং পবিত্রতর হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, পরিবর্দ্ধন ও পরিচালনায় তাঁকে বহুলোকের জীবন বলি দিতে হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যে তাঁর নিজের জীবন বলিদানই বোধ করি সকলের চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার।

ফ্রেডারিক দি গ্রেটের দেশপ্রেমের গভীরতা, বাস্তবজ্ঞান ও মননশক্তির প্রখরতা এবং সূক্ষ্ম রুচিবোধের আভাস পাওয়া যায় ভলটেয়ারকে লিখিত তাঁর চিঠি এবং জার্মান ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধ থেকে।

পটসডাম থেকে ১৭৭৫ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর ভলটেয়ারকে তিনি নিম্নলিখিত পত্রে লিখেছিলেন—

"আপনি সত্যই বলেছেন, আমার প্রিয় জার্মানদের সাংস্কৃতিক জীবনে সবেমাত্র উষার রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে।···ত্রিংশ বার্ষিক যুদ্ধে জার্মানীর যে কি বিপুল ক্ষতি ও বিপর্যয় ঘটেছে, বাইরের লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

সর্ব্বপ্রথমে এখন আমাদের কৃষির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে—তার পর ছোটখাটো শিল্পস্থাপনের ও পরিশেষে অল্পস্বল্প বাণিজ্যের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এগুলি কার্য্যে রূপায়িত করে তুলতে পারলে প্রথমে লোকের খাওয়া-পরার অভাব ঘুচবে এবং ধীরে ধীরে সচ্ছলতা আসবে। সচ্ছলতা এবং প্রাচুর্য্য না এলে কোন দেশে চারুকলা বিকাশলাভ করতে পারে না। কারণ জনগণের উদরান্নের সংস্থান ব্যতিরেকে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না—আর প্রকৃত শিক্ষা না পেলে স্বাধীন চিন্তাও জন্মাতে পারে না। চারুকলা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এথেন্স এরূপ করেছিল—স্পার্টানদের আগে। গ্রীক, রোমান ও ফরাসীদের ক্লাসিক গ্রন্থাবলী অভিনিবেশের সঙ্গে পাঠ ও আয়ত্ত না করলে জার্মানদের রুচিজ্ঞান আসবে না। ঐগুলি আয়ত্ত করার পর আমাদের দু'চার জন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ভাষার সংস্কার করবেন। প্রাথমিক প্রচেষ্টা ত্রুটিবিচ্যুতিবর্জ্জিত না হলেও বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ ক্রমশঃ নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করবার পর নতুন সৃষ্টির পথ ধীরে ধীরে খুলে যাবে বলেই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

সমাজে কৃষি ও কৃষকের স্থান কোথায়—ফ্রেডারিক দি গ্রেট দৃপ্ত কণ্ঠে তা প্রকাশ করেছেন—তিনি বলেছেন—

"যে ব্যক্তি একটি শস্যশীষের স্থলে দু'টি জন্মাতে পারে সমাজের প্রকৃত কল্যাণের ক্ষেত্রে তার দান দেশের সমুদয় রাজনীতিবিদ্‌দের দানের চাইতে অনেক বেশী মূল্যবান্।"

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক দি গ্রেট লিখিত জার্মান সাহিত্য সম্বন্ধে নিবন্ধের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :

"বর্ত্তমান সময়ে জার্মানীতে রুচিজ্ঞানের যে কিরূপ নিদারুণ অভাব বিদ্যমান, তা আমাদের সাধারণ প্রেক্ষাগৃহগুলি থেকেই বোঝা যায়। সেক্সপিয়রের নিকৃষ্ট কতকগুলি নাটকের অনুবাদ আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে আর তা দেখে আমাদের দর্শকমণ্ডলী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠছে—কানাডার আদিম অধিবাসীরা ভিন্ন এরূপ থিয়েটার দেখে এত উৎফুল্ল হতে পারে বলে আমি মনে করি না। আমার এই মন্তব্য করার কারণ এই যে, এতে থিয়েটারের কোনও নিয়মকানুন মানা হচ্ছে না। এই সব নিয়মকানুন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিভাবে বিয়োগান্ত নাটক চিত্তহারী করে তুলতে হয়—এরিষ্টটল তাঁর গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উল্লিখিত ইংরেজী নাটকে সে নিয়ম পালিত হয় নাই। শববাহক ও সমাধিখননকারী থেকে আরম্ভ করে রাজা-রাণী-মন্ত্রী সবাই সমানে বক্তৃতা দিয়ে চলেছে—এইপ্রকার জগাখিচুড়ি, ভাঁড়ামি এবং গাম্ভীর্য্যের যুগপৎ পরিবেশন মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করতে পারে না—কাজেই এতে করে থিয়েটারের মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। সেক্সপিয়ারের এ সকল ত্রুটিবিচ্যুতি ক্ষমা করা যেতে পারে, যেহেতু আর্টের জন্ম এবং পরিণতিলাভ একই সময়ে আশা করা যায় না। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের রঙ্গমঞ্চে সেক্সপিয়রের হীন অনুকরণে 'গোয়েটজ ফন বারলিখিংগেন' (গ্যয়টের প্রথম বয়সে লেখা নাটক) নামে যে তৃতীয় শ্রেণীর নাটক অভিনীত হচ্ছে এবং যা দেখে আমাদের আবালবৃদ্ধবনিতা আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ছে—তাতে এদের রুচিজ্ঞানের চরম অভাব আমার যৎপরোনাস্তি পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।

সুখের বিষয়, আমাদের বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের ফল মাতৃভাষায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সৎসাহসের পরিচয় দিচ্ছেন।···বাধা অবশ্য অনেক আছে এবং সেজন্য আমাদের এগিয়ে চলার গতি যথেষ্ট মন্থর হয়ে পড়ছে। তবে একথাও সত্য যে, যারা অনেক পরে যাত্রারম্ভ করে সময় সময় তারাও পুরোগামী-

দের ছাড়িয়ে চলে যায়। আমাদের বেলায় এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়—যদি আমাদের ধনী ও জমিদার সম্প্রদায় সাহিত্যের যথার্থ অনুরাগী হয়ে ওঠেন এবং সাহিত্যিকদের তাঁরা উপযুক্ত উৎসাহ, সম্মান ও পুরস্কারদানে মুক্তহস্ত হন। ইটালির সাহিত্যিক উন্নতি এই ভাবেই ঘটেছিল। আমাদের মধ্যেও 'মেডিসিস' বা 'অগষ্টাস' জন্মালে 'ভার্জিলের' মত প্রতিভার অচিরাৎ আবির্ভাব অসম্ভব নয়। জার্মানীতে এখন ক্লাসিক লেখক চাই—যাঁদের লেখার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শিক্ষিতশ্রেণীকে আকৃষ্ট করে তাদের জার্মান ভাষা শিখে নিতে বাধ্য করবে। আমাদের রাজসভায়ও এই ভাষার মাধ্যমে আদান-প্রদান করতে কেউ লজ্জাবোধ করবে না। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমাদের জার্মান সাহিত্য ও দর্শন পঠিত এবং সমাদৃত হবে। সেই শুভদিন এখনও আসে নি, কিন্তু আমি মনে-প্রাণে বুঝতে পারছি যে সেদিনের আর বেশী বিলম্বও নাই। আমার বয়স হয়েছে—সেই শুভদিন প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য হয়ত আমার হবে না। 'মোজেজের' মত আমি দূর থেকে সেই অভীপ্সিত রাজ্য দেখে যাচ্ছি—সেখানে পদার্পণ আমার জীবনে ঘটে উঠবে না।"

দূরদর্শী সম্রাটের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কিরূপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছে—তাঁর তিরোধানের পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জার্মানীর কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের অসাধারণ উন্নতিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এইচ. জি. ওয়েলস তাঁর পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জার্মানীতে আধুনিক বিজ্ঞানের বিবিধ শাখা—বিশেষ করে রসায়ন-বিজ্ঞান এত বেশী উন্নতিলাভ করেছিল যে, পৃথিবীর যে-কোনও সভ্য দেশের বিজ্ঞানসাধক জার্মানভাষা শিক্ষা করতে বাধ্য হয়ে পড়েছিলেন।"

দেশ-বিদেশের কথা

ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

গত ২৬শে বৈশাখ ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীদের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সপ্তনবতিতম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস, এম-এ, বি-টি এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও

ব্যাপটিষ্ট মিশন গার্লস হাই স্কুলে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

অভিভাবকবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তরুলতাবেষ্টিত প্রকৃতির কোলে মুক্ত আকাশের নীচে দেবদারু শাখাপল্লব দ্বারা পটভূমি রচিত হয় ও একটি শুভ্র বেদীর উপর ফুল, মালা, ধূপ, চন্দন প্রভৃতির দ্বারা কবির প্রতিকৃতি সজ্জিত করিয়া স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়ের সঙ্গীত-শিক্ষিকা শ্রীমতী ইন্দুলেখা মিত্র, বি-এ, গীত-ভারতীর পরিচালনায় ছাত্রীরা রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কবিতা, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে কবির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। "আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে বিরাজ সত্য সুন্দর," "আজ কি তাহার বারতা পেল রে কিশলয়," "তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি," "আসা যাওয়ার পথের ধারে কেটেছে দিন," "বসন্তে কি শুধুই কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে," প্রভৃতি গান গীত হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা মিত্র তাঁহার ভাষণে বলেন, "বিরাট ব্যক্তিত্বশালী এই মহামানবকে শুধু তাঁর অমর কাব্য ও সঙ্গীতে, গল্প ও প্রবন্ধের মধ্যে খণ্ডভাবে পাওয়া যাবে না। তাঁকে পরিপূর্ণভাবে জানতে হলে তাঁর সমগ্র জীবনের পরিচয়

নৃত্যানুষ্ঠান

জানতে হবে। একাধারে তিনি ছিলেন কবিগুরু, শিক্ষাগুরু—ছিলেন দার্শনিক, দেশপ্রেমিক, সমাজ-সংস্কারক। এ সমস্তর ভেতর দিয়ে তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রসার।"

বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার ভাষণে বলেন, "আজকের এই সভায় আমরা যদি অঙ্গীকার করি যে, অন্ততঃ আমরা চেষ্টা করব আমাদের বিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের আদর্শে পরিচালিত করতে, তা হলে বোধ হয় তাঁর প্রতি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাতে পারব। এই দিক থেকে আমাদের একটা সুযোগও আছে। আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা মিত্র শান্তিনিকেতনে শিক্ষাপ্রাপ্তা; সুতরাং কবিগুরুর শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। তাঁর এবং অন্যান্য শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় আমরা এদিকে খানিকটা অগ্রসর হতে পারি।"

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীবামনদাস মণ্ডল একটি সারগর্ভ ভাষণে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীপ্রমোদচন্দ্র দাস একটি সুচিন্তিত সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন এবং কবির বাণী উদ্ধৃত করিয়া ছাত্রীদের সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে উপদেশ দেন। সুষ্ঠু ও গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে

গানের আসর

অনুষ্ঠানটি অতি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা শ্রীমতী সবিতা দাসের নিপুণ হস্তে বেদী ও বেদী-মূলে আঁকা আলপনা উৎসব-প্রাঙ্গণকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ,

বিষ্ণুপুর শাখা

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরের ন্যায় প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান একান্ত প্রয়োজনীয়। পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের পুরাবস্তু ও প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে একটি সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইয়াছেন। আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির নামানুসারে এই পরিকল্পিত সংগ্রহশালাটির নামকরণ হইয়াছে "যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।" ইতিমধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার কর্ত্তৃপক্ষ বহু পুথি ও প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সমস্ত দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিষৎ-শাখার ভবন নির্ম্মাণকল্পে কর্ত্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতা তাঁহাদের উদ্দেশ্যসাধনের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিষ্ণুপুরে পরিষৎ-শাখার একটি ভবন নির্ম্মাণের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকার এবং দেশবাসী সকলেরই সচেতন হওয়া উচিত। অর্থসাহায্য—সম্পাদক, বিষ্ণুপুর শাখা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—পোঃ বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া—এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

রাজবৈদ্য শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের সম্মান

অখিল ভারত আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান মহাসম্মেলন কর্ত্তৃক পাটনায় আয়োজিত আয়ুর্ব্বেদ-পুস্তক প্রতিযোগিতায় রাজবৈদ্য ড. শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায় আয়ুর্ব্বেদ-বৃহস্পতি মহোদয় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহাকে "আয়ুর্ব্বেদ লেখক রত্ন" এই উপাধি দেওয়া হইয়াছে।

কুমুদভূষণ রায়

গত ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৭ কুমুদভূষণ রায় তাঁহার শম্ভুনাথ স্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। কুমুদভূষণ রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বহু দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা-আসাম রেলপথের ডেপুটী চীফ-ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হন—ইহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙালী ঐ উচ্চ পদাভিষিক্ত হন নাই। ১৯৪৭ সনে তিনি নদী-সমস্যা সমাধানকল্পে আসাম সরকারের উপদেষ্টা নিযুক্ত হন; গঙ্গানদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ ব্যাপারে তিনি বিহার সরকারের নদী-উন্নয়ন সংস্থার পরামর্শদাতাও নিযুক্ত হন। ইহা ব্যতীত ভারতবর্ষের নদী-সমস্যা এবং তাহার সমাধান সম্পর্কিত তাঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন এবং পশ্চিমবঙ্গ পল্লী-উন্নয়ন সমিতির একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি নিরহঙ্কারী ছিলেন, তাঁহার সরল ও অমায়িক ব্যবহার সকলকেই মুগ্ধ করিত।

আশুতোষ চক্ষুচিকিৎসালয়

হুগলী জেলার বিখ্যাত কংগ্রেসনেতা দেশপ্রেমিক ডাক্তার আশুতোষ দাস সুদূর পল্লীগ্রামে লোকেদের চোখের ছানি তুলাইবার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন। প্রথম চক্ষুচিকিৎসালয় খোলা হয় ১৯৩৪ সনে আরামবাগ মহকুমার বন্দর গ্রামে। ইহার পর প্রতি বৎসর এক একটি স্থানে চক্ষু চিকিৎসালয় বসাইয়া ছানি তোলার কাজ চলিতে থাকে। আশুতোষের পরলোকগমনের কয়েক বৎসর পরে তাঁহার কয়েকজন সহকর্ম্মী পুনরায় ১৯৪৮ সনে খামারগোড়ী গ্রামে চক্ষুচিকিৎসার আয়োজন করেন। এই সময় হইতে ইহার নামকরণ করা হয় "আশুতোষ চক্ষুচিকিৎসালয়।"

আগে হইতে ব্যবস্থা করিয়া কোন গ্রামে এই চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়; ছানি তোলার কাজের জন্য প্রধানতঃ চাঁদা তুলিয়া অর্থাদি সংগ্রহ করা হয়। গত কয়েক বৎসর পশ্চিমবঙ্গ রেডক্রশ সোসাইটি ঔষধাদি দিয়া কর্ম্মীদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতার অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার শ্রীঅনাদিচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেবাকার্য্য হিসাবে ছানি তুলিয়া দেন।

১৯৩৪ হইতে ১৯৫৭ পর্য্যন্ত হুগলী এবং হাওড়া জেলার ২৫টি গ্রামে বহু লোকের ছানি তোলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২০ বৎসরের যুবক হইতে ৮৮ বৎসরের বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আছেন। ১৯৫৭ সনে হুগলী জেলার আইয়া গ্রামে ৩৫ জনের ছানি কাটা হয়।

LUX
TOILET SOAP
LUX
TOILET SOAP

চক্ষুচিকিৎসালয় দ্বারা পল্লীবাসীদের কত যে উপকার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ইহার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ অর্থসাহায্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরিতব্য :—

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়—আশুতোষ চক্ষুচিকিৎসালয় সমিতি
২৭-৩বি হরিঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

গত ৩০শে মার্চ্চ কলিকাতায় 'রূপকথার রাজা" দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স আশী বৎসর হইয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য দক্ষিণারঞ্জন সারা জীবন অক্লান্তভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। প্রধানতঃ শিশুদের জন্য রূপকথা রচয়িতারূপে পরিচিত হইলেও ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি কিশোরদের জন্যও অনেক গল্প উপন্যাস লিখিয়াছেন। বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করিয়া তিনি ছড়া, লোক-সঙ্গীত, ব্রতকথা, ঘুম পাড়ানিয়া গান ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

দক্ষিণারঞ্জনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম্ম তাঁহার রচিত রূপকথাসমূহ। শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "বঙ্গবাণীর মন্দিরে তিনি যে রূপকথার অর্ঘ্যডালি সাজিয়ে গেছেন তার তুলনা নেই।" বস্তুতঃ "ঠাকুরমার ঝুলি' হাতে লইয়া যেদিন দক্ষিণারঞ্জনের আবির্ভাব হইল সেদিন বাংলা সাহিত্যের—বিশেষতঃ বাংলা শিশু-সাহিত্যের—এক পরম শুভ দিন। সংস্কৃতির এক সঙ্কটপূর্ণ সময়ে আমাদের কত বড় জাতীয় সম্পদের সহিত যে দক্ষিণারঞ্জন আমাদের পরিচয়সাধন করাইয়া দিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—তখন "স্বদেশের দিদিমা কোম্পানি একেবারে দেউলে। তাহাদের ঝুলি ঝাড়া দিলে কোন কোন স্থলে মার্টিনোর এথিক্স এবং বার্কের ফরাসী বিপ্লবের নোট বই বাহির হইয়া পড়িতে পারে, কিন্তু কোথায় গেল রাজপুত্র, পাত্তরের পুত্র, কোথায় গেল বেঙ্গমা বেঙ্গমী, কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের সাত রাজার ধন মাণিক।" তাঁর রূপকথাগুলির মধ্যে বাংলার অগণিত শিশু পাইয়াছে সেই সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধান, ঠাকুরমার ঝুলি পড়িতে পড়িতে বয়স্কেরা আবার ফিরিয়া গিয়াছে সোনার শৈশবে। এমন ভাবে কথার যাদুতে বালক-বৃদ্ধ সকলের মন জিতিয়া লইতে দক্ষিণারঞ্জনের মত কেহই বোধ করি সফলকাম হন নাই।

সুদীর্ঘ জীবনে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কুড়িখানার অধিক। তন্মধ্যে ঠাকুরমার ঝুলি ছাড়া নিম্নলিখিতগুলি অধিকতর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে : দাদামশায়ের থলে, ঠানদিদির থলে, চারু ও হারু, বাংলার ব্রতকথা, ফার্ষ্ট বয়, বাংলার ছেলে এবং আর্য্যনারী। তাঁহার সর্ব্বশেষ প্রকাশিত পুস্তকের নাম চিরদিনের রূপকথা। বাংলা সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য কৃতির জন্য দক্ষিণারঞ্জন নানা ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন, বাংলার বিভিন্ন সংস্থা হইতে তাঁহাকে পুরস্কার প্রদানও করা হইয়াছে। গত বৎসর তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত হন।

বাংলা শিশুসাহিত্যে দক্ষিণারঞ্জনের আবির্ভাব এক পরম বিস্ময়—তাঁহার পরলোকগমনে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হইল, এবং অগণিত বাঙালী শিশু এমন একজনকে হারাইল যিনি ছিলেন তাদের একান্ত আপনার জন্য। তিনি যে রসনির্ঝরিণী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহাতে অবগাহন করিয়া শুধু বর্ত্তমানকালের নয় অনাগত যুগের শিশুরাও ধন্য হইবে।

উইলিয়ম্ ইয়েট্স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

এখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার ৯৬ সংখ্যক গ্রন্থ। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার নিয়মিত প্রকাশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুণ্যকৃত্যসমূহের অন্যতম। এই চরিত-মালার মাধ্যমে আমরা একদিকে যেমন ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর দিক্‌পাল অনেক বাণীসাধকের জীবন ও সাহিত্যসাধনার সঙ্গে অনায়াসে পরিচিত হইতেছি, অন্যদিকে তেমনি যে সকল সাহিত্য-সাধকের চরিতকথা ও সাহিত্যকর্ম্ম বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছিল তাঁহাদের সম্বন্ধেও আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ হইবার সুযোগ ঘটিতেছে।

বর্ত্তমান পুস্তকে যে তিন জন কৃতী পুরুষের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাঁহারা প্রত্যেকেই বঙ্গভারতীর মন্দিরে এক-একটি বিশিষ্ট আসন দাবি করিতে পারেন, অথচ ইঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ছিল অপরিসীম। এই ত্রয়ীর মধ্যে দুইজন বিদেশী মিশনরী। খ্রীষ্টান মিশনরীদের মধ্যে, বাংলা সাহিত্যে কেরী এবং মার্শম্যানের দানের কথা অনেকেই অল্পবিস্তর অবগত আছেন, কিন্তু এই দুই জনের পরেই যাঁহার স্থান সেই বহুভাষাবিদ্ এবং বাংলা ভাষায় নানা গ্রন্থ-প্রণেতা ইয়েটস্-এর সাহিত্য-প্রচেষ্টার সহিত যোগেশবাবুই প্রথম বঙ্গীয় পাঠকদের পরিচয়সাধন করাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল মাসে ধর্ম্মপ্রচারব্যপদেশে ইয়েটস কলিকাতায় পৌঁছেন। শ্রীরামপুরে কিছুকাল কেরীর অধীনে শিক্ষানবিসীর পর তিনি কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে বিদ্যাচর্চ্চায় ও সাহিত্য-সাধনায় প্রবৃত্ত হন। "তাঁহার ত্রিশ বৎসর ব্যাপী সাহিত্য-সাধনার ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয়: ১) বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা, (২) অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন এবং (৩) ধর্ম্মগ্রন্থাদির অনুবাদ।...... কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাঁহাকে 'পাইওনিয়ার বা অগ্রদূতের' সম্মান দেওয়া যায়।" তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে দুইখানি বিজ্ঞানবিষয়ক: (১) পদার্থবিদ্যাসার, (২) জ্যোতির্বিদ্যা। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের দৈন্য

আজও লজ্জাকর। বিশেষতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুলিখিত গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এখনও আমরা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। কাজেই আজ হইতে সোয়া শতাব্দীরও অধিককাল পূর্ব্বে যে বিদেশী বিদ্বান বঙ্গীয় যুবকদিগকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যা শিখাইবার উদ্দেশ্যে বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভিত্তিপত্তনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ঋণ আমাদের অপরিশোধ্য।

জন ম্যাক ছিলেন আমৃত্যু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের কর্ম্মী। ছাত্র-জীবনে যেমন সাহিত্যে তেমনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। রসায়নশাস্ত্রেই ছিল জন ম্যাকের সকলের চেয়ে বেশী অনুরাগ। এই অনুরাগেরই ফল বাংলা ভাষায় রচিত তাঁহার "কিমিয়া বিদ্যার সার", অর্থাৎ "রসায়নবিদ্যার মূলকথা" নামক পুস্তক। বাংলা ভাষায় রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধে ইহাই প্রথম পুস্তক। ম্যাক তাঁহার অনতিদীর্ঘ জীবনে একখানির বেশী পুস্তক রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু এই একখানি মাত্র গ্রন্থই তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। আজ আমাদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনার দিকে কাহারও কাহারও ঝোঁক দেখা যাইতেছে। মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। এমত অবস্থায় গত শতকের তৃতীয় দশকে একজন বিদেশী বিজ্ঞানী ও সাহিত্য-সাধক বাংলার যুবকদের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসায়নিক পদার্থসমূহের নামকরণ করিতে গিয়া পুরাপুরি সংস্কৃতে অনুবাদ না করিয়া কেন তিনি ইউরোপীয় পারিভাষিক শব্দাবলী বাংলা অক্ষরে দেওয়া সমীচীন মনে করেন, তাহার সপক্ষে যে সকল যুক্তি ম্যাক দেখাইয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষণীয় নয়।

আর এক দিক দিয়া অগ্রদূতের গৌরবের অধিকারী মধুসূদন গুপ্ত—তিনিই এদেশে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী। কর্ম্মব্যস্ত জীবনে তিনি সাহিত্য-সাধনাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ দুইখানি—"লণ্ডন ফার্ম্মাকোপিয়ার বঙ্গানুবাদ" এবং "এনাটোমী"। যোগেশবাবু স্বল্পপরিসরের মধ্যে মধুসূদনের কৃতিত্বকে সুনিপুণভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

সমালোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের দাবি করিতে পারে এইজন্য যে, ইহাতে এমন তিন জনের কথা বলা হইয়াছে—একদা যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রদূতের আসন অধিকার করিয়া বিপুল প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিন জনেই বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থরচনা দ্বারা বাংলা গদ্যসাহিত্যের শৈশবাবস্থায় ইহার অঙ্গপুষ্টি করিয়া গিয়াছেন। আজ শতাধিক বর্ষ পরেও বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের আশানুরূপ সমৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া ইঁহাদের কথা ও কৃতি আরও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

যোগেশবাবুর অন্যান্য রচনার ন্যায় এখানিও সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত নিরলঙ্কৃত অথচ চিত্তাকর্ষক। রচনার নিদর্শনগুলিও সুনির্ব্বাচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকা এবং পুস্তকাদি ঘাঁটিয়া যোগেশবাবু বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্য-সাধকের কথা শুনাইয়েছেন বলিয়া বাঙালীজাতি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রক্তরাগ—শ্রীদেবেশ দাস। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য চার টাকা

শ্রীদেবেশ দাস কাব্য, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, ছোট গল্প এবং রম্যরচনা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। "রক্তরাগ" উপন্যাস। প্রারম্ভে পুস্তকের পরিচিতি লিখিয়াছেন রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীদেবেশ দাস ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন উচ্চ পদাধিকারী। নিজের উচ্চ পদের কর্ত্তব্যগুলি করেও ইনি বাংলা সাহিত্যের রসগ্রহণ ও তার সমৃদ্ধির জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করেন।·····সামরিক জীবন সর্ব্বসাধারণের কাছে একরকম রহস্য হয়ে আছে। সেই জীবনের উপর এই বই আলোক-পাত করেছে।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতের 'পূর্ব্বসীমান্তে' এবং মণিপুরে আই. এন. এ যখন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে লেখক তখন আসামে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। আক্রমণের একেবারে গোড়ার দিকে তাঁহার সহিত একজন ইংরেজ জেনারেলের যে কথাবার্ত্তা হয় তাহারই মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া গ্রন্থকার ভূমিকা লিখিয়াছেন। "লড়াইয়ের এলাকার বাইরে ও পিছনে শুধু আপনিই একমাত্র ভারতীয় যিনি জানবেন··শুধু জাপানী নয়, এসেছে সঙ্গে আই. এন. এ। আপনাদের সুভাষ বোসের তৈরী, তারই নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত সৈন্যদল। সেই খবর আমরা কোন ভারতীয়কেই জানতে দিতে চাই না।" লেখক বলিতেছেন, "জেনারেলের চুরুটটা তৎক্ষণে ছাই হয়ে গেল, কিন্তু আমার মনে ধরে গেল আগুন।·····সবার চেয়ে দামী মাল-মশলা জড়ো করা আছে যুদ্ধদপ্তরের কাগজপত্রে। লাল কেল্লার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিচারের সময় বেরিয়েছে অনেক খবর। তারা আলোর মুখ দেখেছে অন্যান্য সূত্রে। কাহিনীর চরিত্রগুলি কাল্পনিক। কিন্তু ঘটনাগুলি, এমন কি খণ্ডযুদ্ধগুলি পর্য্যন্ত সত্য, সাহিত্যের ময়ানে রূপান্তরিত সত্য।"
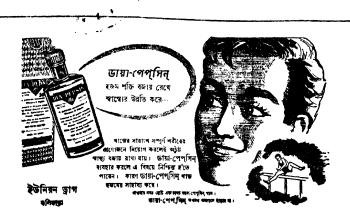
কাহিনীর নায়ক লেফটেনাণ্ট দেবল সিংহ। বাঙ্গালী। সিঙ্গাপুরে ইংরেজরা ভারতীয় সৈন্যদের সম্পর্কে কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল উপন্যাসে তাহার বিবরণ আছে। ইংরেজদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের সৃষ্টি সহজ ও বহুলপরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল। আই. এন, এ-র সৃষ্টি নেতাজীর এক বিরাট কীর্ত্তি। সেই কীর্ত্তিকাহিনীর একটি অজ্ঞাত অধ্যায় এই পুস্তকে আছে। দেবল সিংহ ও মিতার প্রেমের উপর ভিত্তি করিয়া উপন্যাসের সামরিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কাহিনী রহস্য-উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর। মণিপুরী উত্তমা মেয়েটিকে আমাদের ভাল লাগে। তাহার গভীর প্রেম এবং আত্মত্যাগের কাহিনী পাঠকের মনকে নাড়া দেয়। সৈন্যদলের মেস-জীবনের মধ্যে পাঠক নূতনত্বের সন্ধান পাইবেন। আই, এন এ-র অনুষ্ঠিত অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ বেশী দিনের কথা নয়। সেই কার্য্যকলাপের অধিকাংশই আমাদের অজানা। নিকট-অতীতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপন্যাসের পাত্রপাত্রী ও ঘটনাগুলি উজ্জ্বল এবং জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। উপন্যাস ইতিহাস নয়—এ কথা সত্য, কিন্তু উপকরণের ঐশ্বর্যে ইতিহাস উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করে। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ রক্তাক্ষরে যে কাহিনী রচনা করিয়া গিয়াছে, "রক্তরাগ" তাহারই অনুসরণে উপন্যাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। পাঠকের কৌতূহলকে উদ্দীপ্ত করিবার মত যথেষ্ট উপাদান ইহাতে পাই। উপন্যাসের মধ্যে অনেক করুণ কাহিনী, গভীর কথা এবং বেদনার নিবেদন আছে, তাই বলিয়া লেখক বইয়ের সমস্ত ঘটনা গুরুগম্ভীরভাবে বর্ণনা করিয়া পাঠকের মনকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। লঘুলীলায়িত ভঙ্গীতে লেখা কাহিনীর প্রবাহ সাবলীলভাবে বহিয়া গেছে। সে কাহিনী পাঠকের চিত্তকে শেষ পর্য্যন্ত সমান আকর্ষণে টানিয়া লইয়া যায়। এইখানে "রক্তরাগে"র সার্থকতা।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

বৈদিক জীবনবাদ—ডক্টর শ্রীমতিলাল দাস। শিবসাহিত্য কুটির, ব্লক কে, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৩৩। মূল্য এক টাকা।

লেখক তাঁর সরকারী কর্ম্মজীবনের মধ্যেও বিদ্যাচর্চ্চা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগের পরিচয় তাঁর বহু গ্রন্থেই পাই। বর্ত্তমান গ্রন্থে তিনি বৈদিক যুগের জীবনাদর্শ আলোচনা করেছেন। "বৈদিক ঋষি জীবনবাদী।" সংসারকে তাঁরা উপেক্ষা করেন নি। এই ঋজু বলিষ্ঠ পবিত্র জীবনবাদের আজ একান্ত প্রয়োজন। বেদমন্ত্র উদ্বুদ্ধ করুক আমাদের চিত্তকে, আনুক নূতন কর্ম্মপ্রেরণা।

এ বইয়ে দু'টি প্রবন্ধ আছে : বৈদিক জীবনবাদ ও বৈদিক কর্ম্মবাদ। দু'টিই ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণরূপে পঠিত হয়েছিল।

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু মহিমা—শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধন সঙ্ঘ। ৬০ সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। 'প্রণামী' আট আনা।

ক্ষুদ্র পুস্তিকা। ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ থেকে কয়েকটি নীতিগর্ভ ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। সদ্‌গুরু—শ্রীমদ্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তাঁর সাধনা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা সুবিদিত।

ব্যবহারিক হিন্দী ব্যাকরণ—শ্রীব্রজনন্দন সিংহ। দি ঢাকা ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী। ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

সর্ব্বভারতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে ভারতীয়মাত্রেরই হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে হিন্দী রাষ্ট্রভাষা রূপে গৃহীত হবার পর এর ব্যবহারিক প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে সহজ বাংলায় হিন্দী ব্যাকরণের নিয়মাবলী বিশদভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছন্দ এবং অলঙ্কারের মূল কথাগুলিও এতে বিবৃত হয়েছে। বাঙালী পাঠকের পক্ষে এ গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অংকুর শ্রীসুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম দেড় টাকা।

বাংলার বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের অভিনয়োদ্দেশ্যে রচিত একখানি সচিত্র নাটক। নাটকখানিতে আছে পনেরটি পুরুষ-চরিত্র, স্ত্রী-চরিত্র একটিও নেই। নাটকের ঘটনাবলীর পটভূমি একটি স্কুল; চরিত্রগুলির অধিকাংশই একটি শ্রেণীর ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষক। যে দুটি চরিত্র বাইরের, তাঁদেরও যে স্কুলটির সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে কিছু সম্পর্ক বর্ত্তমান তা ঘটনাচক্রে প্রকাশিত। আবশ্যক উৎসাহ ও সুযোগের অভাবে মানুষের সৃজনশীল প্রতিভা বিনষ্ট হয় এইটেই নাটকখানির উপজীব্য। একেই ভিত্তি করে দুটি অঙ্কের আটটি দৃশ্যে কয়েকটি স্বাভাবিক ঘটনার সমাবেশ করা হয়েছে। নাটকের আবেদন তার সুন্দর অভিনয়ে, কিন্তু পাঠেও যে তা কিছু অনুভূত হয় না একথা বলা যায় না। তা হলে নাট্য-সাহিত্য কেউ পাঠ করত না। এই নাটকখানি সেদিক থেকেও যথেষ্ট আনন্দদায়ক এবং পাঠকচিত্তে গুরুত্বপূর্ণ উপজীব্যটি বেশ স্পষ্ট করে তোলে। নাটকখানির প্রধান চরিত্র
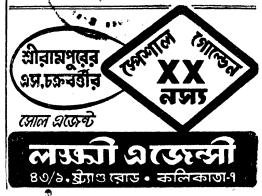
এক দুরন্ত কিন্তু প্রতিভাবান কিশোর-বয়স্ক ছাত্র—সংসারে যে স্নেহের কাঙাল ওপরান্নসেবী। শিশু ও কিশোরকে বুঝতে হলে তাকে স্নেহ-ভালবাসায় অভিসিঞ্চিত করা দরকার তার শিক্ষার মূলেও এ দুটির প্রয়োজন। এই কিশোরটিকেও তাই কেউ বুঝতে পারত না; বুঝতে পারত না যে, তার মধ্যেও প্রতিভার বীজ বর্ত্তমান—যা অনাদরের শুষ্কতায় বিনষ্ট হতে চলেছে। শিশুচিত্ত চঞ্চল; আনন্দরসভোগে সে স্বতঃই উন্মুখ। তার চারধারে, বিশেষতঃ শহরে, আনন্দের নানা ক্ষেত্র বর্ত্তমান। বয়স্কগণের দেখাদেখি সেও তাতে প্রলুব্ধ হয়। সেজন্য যা তার দেখা উচিত নয় সে তাই দেখে এবং অকালে পরিপক্বতা লাভ করে—যার জন্য দায়ী সে নয়। তাদের জন্য না আছে ছায়াচিত্র, না আছে রঙ্গালয়—আধুনিক যুগে যেগুলিকে আনন্দ ও শিক্ষার মস্ত সহায়করূপে গণ্য করা হয়। ছাত্রগণের নৈতিক মানের অবনতির জন্য বস্তুতঃ তারা কতটা দায়ী? উদাহরণই তাদের আদর্শ। নাটকখানিতে এ সমস্যারও ইঙ্গিত আছে। এই সকল কারণে নাটকখানি প্রয়োজনীয় সাহিত্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। তবে এ সকল কথা শিশু ও কিশোরগণ বোঝে না। তাতে ক্ষতিও নেই, তারা শ্রেণীতে সাধারণতঃ যে অশোভন আচরণ করে থাকে অভিনয়ে তারই চিত্র দেখে যেমন কৌতুকবোধ করবে, হাসবে, তেমনি অন্তরে অন্তরে তাদের লজ্জিত হবারও সম্ভাবনা। অবশ্য চিত্রখানিতে রঙ কিছু বেশী চড়ানো হয়েছে এবং যে সংলাপ আরও একটু বেশী বয়সের ছাত্রগণের মুখেই মানায় সে সংলাপ দেওয়া হয়েছে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ছাত্রদের মুখে। তবুও সংলাপটি স্বাভাবিক জোরালো ও সময় সময় তীক্ষ্ণ। নাটকখানির পরিসমাপ্তি নিষ্কণ্টক। এর অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ প্রচুর আনন্দ ও উত্তেজনা ভোগ করবে এবং যা মন্দ তার প্রতি বিমুখতা এবং উন্নতির আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে জাগবে, এমন আশা করা যায়। বয়স্কগণও নাটকখানি দর্শনে ছাত্রসাধারণের সমস্যা এবং অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করবেন। এইখানেই আলোচ্য নাটকখানি ও নাট্যকারের সার্থকতা। নাটকের প্রধান চরিত্রটি সার্থক সৃষ্টি। নাটকখানির অভিনয়ও ব্যয়সাধ্য নয়, সেটা সুবিধার কথা। এই ধরনের নাটক যতই রচিত, প্রকাশিত ও অভিনীত হয় ততই জাতির মঙ্গল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

শিক্ষার নূতন পথে—শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্ত্তী। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৬ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃ. ১১৫। মূল্য দুই টাকা।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিপুল প্রসারের জন্য সরকার বহু বিদ্যালয় খুলিয়াছেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও অনেক বিদ্যালয় খোলা হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য বহু সহস্র শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রয়োজন। কিন্তু এরূপ শিক্ষার জন্য মাত্র কয়েক সপ্তাহ সময় পাওয়া যাইবে। এই অল্প সময়ের মধ্যে যাহাতে নবনিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষণ-বিজ্ঞানে অন্ততঃ শিক্ষকতা আরম্ভ করার মত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন সেই দিকে নজর রাখিয়া বর্ত্তমান পুস্তকখানি প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রারম্ভিক পাঠ্য হিসাবে পুস্তকখানি খুবই সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষক-নির্ব্বাচনে সরকার কতকটা বেকার-সমস্যার সমাধান করিতেছেন। শিক্ষিত বেকারগণ শিক্ষণবিষয়ে কতকটা জ্ঞান আহরণ ও আয়ত্ত করিলে তাঁহারা আর আনাড়ি থাকিবেন না এবং শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব সুষ্ঠ ভাবে পালন করিতে পারিবেন ইহা খুবই আশা করা যায়।

লেখক প্রথমে শিক্ষকদের কথা বলিয়াছেন—কয়েকটি মূলনীতি—কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী-পদ্ধতি, ডাণ্টন প্রণালী, কার্য্য-সমস্যা-পদ্ধতি, যৌথ-পদ্ধতি, বুনিয়াদী শিক্ষা মোটামুটি আলোচিত হইয়াছে। বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর শিশু বা শিক্ষার্থীর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন শিশুর প্রকৃতি (প্রত্যেক শিশু এক একটা সমস্যা স্বরূপ), শিশুকে আয়ত্তে আনার উপায় বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তব দৃষ্টান্তগুলি খুবই সুন্দর হইয়াছে। দুরন্ত ছেলের কথা, কড়া শাসনের দোষ, শাস্তিদানের উদ্দেশ্য ও নীতি, খেলাধূলার উপকারিতা, পরিবেশের প্রভাব, শিশুর মানসিক অসুস্থতা, অভ্যাস ও চরিত্র গঠন, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে শিক্ষণ-বিজ্ঞানকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষণীয় এই তিন ভাগে ভাগ করিয়া খুব নৈপুণ্যের সহিত সহজ সরল ভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। যাঁহারা স্কুল-কলেজের পরীক্ষা পাস করিয়া শিক্ষাব্রতী হইতে যাইতেছেন তাঁহাদের সাহায্যার্থে প্রণীত এই পুস্তক সার্থক হইয়াছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট লিঃ), ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সোনার ধান"
শ্রীশ্রীমুনি সিং

"মেলার যাত্রী" [ফোটো—শ্রীঅলক দে

করাতে কাঠ চেরাই [ফোটো—শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ ১ম খণ্ড | আষাঢ়, ১৩৬৪ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

শিক্ষার অধোগতি

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এসসি পরীক্ষার যে ফল প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, পরীক্ষায় পাসের হার প্রতি বৎসর উত্তরোত্তর কমিয়া চলিতেছে, তার পর প্রথম শ্রেণীতে পাস-করা ছেলেমেয়ের সংখ্যা আরও কমিয়াই চলিতেছে। আমরা অন্যত্র এই বিষয়ের পূর্ণতর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে দেখা যায় যে, আই-এতে সমস্ত পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র শতকরা ৪ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। আই-এসসিতে সে স্থলে প্রায় শতকরা ১৪ জন প্রথম বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এই প্রথম বিভাগের শীর্ষস্থলে আই-এ ও আই-এসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ আই-এসসিতে উচ্চতম আসন পাইয়াছে ও বেলুড়ের শিক্ষাকেন্দ্র আই-এতে ঐ সম্মান অর্জন করিয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শ্রেষ্ঠ কুড়ি জনের মধ্যে এই দুই কলেজের ছাত্রই তিন-চতুর্থাংশের অধিক। এইরূপ হওয়ার কারণ কি তাহা জানা এবং তাহার প্রতিকারও হওয়া আশু প্রয়োজন।

সরকারের নিকট অনুযোগ-অভিযোগ বৃথা। সেখানে এইরূপ অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করিবার অবকাশ কাহারও নাই। শিক্ষামন্ত্রী ত কেহ নাই-ই এবং দপ্তরটিও অতিশয় অবহেলিত হইয়া আছে। নহিলে শিক্ষার ব্যবস্থায় এরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখা যাইত না।

বেসরকারী মহলেও এ বিষয়ে খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই বোধ হয়। অন্ততঃপক্ষে এই বিষয়ে যেরূপ ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা হওয়া উচিত তাহার কোনও নিদর্শন আমরা এতাবৎ পাই নাই।

শিক্ষার ব্যাপারে এইরূপ অবহেলার ফলে সরকারী ও বেসরকারী কাজে বাঙালীর স্থান ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া চলিতেছে। আমরা মনকে প্রবোধ দিই অন্যের উপর বাঙালী-বিদ্বেষের দোষারোপ করিয়া। বাঙালী কর্ম্মপ্রার্থী যদি শিক্ষার মানে অন্যের নীচে চলিয়া যায় এবং উপরন্তু যদি তাহাদের উদ্ধত, উদ্দাম ও নিয়মভঙ্গপ্রবণ বলিয়া কুখ্যাতি থাকে তবে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান জুটিবে কিরূপে?

খোঁজ হওয়া প্রয়োজন যে, দেশের ছেলেমেয়েদের মাথা খাইতেছে কাহারা ও কি প্রকারে। যে দুইটি কলেজ পরীক্ষায় এরূপ সাফল্য দেখাইয়াছে তাহাদের সাফল্যের কারণই বা কি এবং নন্-কলেজিয়েট গৃহ-শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাই বা সাধারণভাবে কলেজে-পড়া দল অপেক্ষা ভাল পাস করিয়াছে কেন তাহারও কারণ বিশ্লেষণ দরকার। শেষোক্ত বিষয়টিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে কলেজে-পড়া ছেলেমেয়েদেরই শিক্ষার মান অধিকতর নামিয়া যাইতেছে।

এবারের নির্ব্বাচনের পালা সাধারণভাবে পরীক্ষার্থীদিগের পড়াশুনার বিশেষ ব্যাঘাত করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে ত সাময়িক, দুই বৎসরের মধ্যে বড়জোর দুই মাস হট্টগোল গিয়াছে। অবশ্য দেশ দুর্নীতি-দুরাচারে ছাইয়া গিয়াছে। শান্তিশৃঙ্খলা নিরাপত্তা ত নাই বলিলেই চলে। চুরি, জুয়াচুরি, কালোবাজার, সরকারী কর্ম্মচারীর উৎপীড়ন ও উৎকোচগ্রহণ, মারপিট, নারীহরণ, নারীধর্ষণ এ সব ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা দিনে দিনে সমগ্র ভারতে এক দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাও সত্য যে, সাধারণভাবে দেশের আবহাওয়া যদি এরূপ কলুষিত হয় ত ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের আশা কোথায়?

এ বিষয়েও সরকারের উপর নির্ভর করা বৃথা। শিক্ষার ব্যাপারে যেমন পৃথক দপ্তর করা হয় নাই তেমনই শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার দপ্তর দেওয়া হইয়াছে অতি অপরূপ যোগ্য (?) লোকের হাতে। যাঁহারা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় ব্যাপক ট্রাম পোড়াইবার সময়ে—এই মন্ত্রীপ্রবরের বুদ্ধিভ্রংশ ও বিভ্রান্ত অবস্থার কথা স্মরণ রাখেন, তাঁহারাই জানেন ইঁহার যোগ্যতার কথা।

তবে উপায় কি? উপায় আগেকার দিনে, যখন দেশের শাসনযন্ত্র আমাদের অধিকারে ছিল না—তখন আমাদের যাহা ছিল তাহাই আছে। আগেকার দিনে চিন্তাশীল লোকেরা সম্মিলিত ভাবে দেশের যাবতীয় সমস্যার বিচার করিতেন ও তাহার সংশোধন এবং পূরণের পথ খুঁজিতেন। সেই বিচার ও খোঁজের ফলেই আমরা অতীতে উন্নতি লাভ করিয়াছিলাম।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৭-৫৮ সনের বাজেটে রাজস্বখাতে ঘাটতির পরিমাণ ১০·২৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ৬১·৮৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় হইবে, আর মোট ব্যয় হইবে ৭২·১৭ কোটি টাকা। রাজস্ব আয় ব্যতীত অন্যান্য খাতে আয় হইবে ১১৫·২৪ কোটি টাকা এবং এই বাবদ খরচ হইবে ১১৭·১২ কোটি টাকা। রাজস্বখাতে ও অন্যান্য খাতে খরচের বাবদ মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২·১৬ কোটি টাকায়। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" নীতির অনুসরণ করিয়া মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, নূতন কোন কর ধার্য্য করা হইবে না; পরে পাদটীকা হিসাবে বলিয়াছেন, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য আগামী বৎসর যে ১১·৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে, তাহার মধ্যে সাড়ে চার কোটি টাকা নূতন কর ধার্য্য দ্বারা তোলা হইবে।

পরিকল্পনাগুলির মধ্যে শিক্ষাপরিকল্পনাগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহাদের জন্য বেশ মোটা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। শিক্ষাপরিকল্পনার সমস্তটাই অলীক কল্পনায় ভরা। প্রথমতঃ, উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সদ্য কি কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে? দ্বিখণ্ডিত ও সঙ্কুচিত পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে কলিকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কি যথেষ্ট নহে? পাঁচ বৎসর কি দশ বৎসর পরে উত্তরবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলে কি দেশের বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে? কল্যাণী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোটি কোটি টাকা নিরর্থক ব্যয় করিতেছেন; এই টাকায় বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিলে পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যার কিছু সুরাহা হইতে পারিত। নূতন বাজেটে কল্যাণীতে একটি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিবে তাহাদের কোথায় এবং কি প্রকার চাকুরিতে নিয়োগ করা হইবে? কৃষি-চাকুরির সংস্থান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি কিছু করিয়াছেন? পশ্চিমবঙ্গে ধনী কৃষক ও গরীব কৃষকের সংখ্যাই অধিক, প্রথম শ্রেণী কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিকে কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিয়া অযথা লাভের বখরা দিতে রাজী হইবে না, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর এই সকল পারদর্শী ব্যক্তিকে কার্য্যে নিয়োগ করার সামর্থ্য নাই। সরকারী কৃষিজমির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য, তাহাতে মুষ্টিমেয় লোকের কার্য্য-সংস্থান হইতে পারে মাত্র, তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন হয় না। টালিগঞ্জে যে সরকারী কৃষিবিদ্যালয় আছে তাহাতে যাহারা শিক্ষালাভ করিতেছে তাহারা সকলেই কি চাকুরি পাইতেছে? তাহাদের মধ্যেও বহু বেকার থাকিয়া যাইতেছে? কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র পাওয়া যাইবে কিনা সে বিষয়েও বিশেষ সন্দেহ আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা মুখ্যমন্ত্রীর ভাববিলাসিতার পরিচায়ক এবং ইহাতে আর একটি টাকার খেলা হইবে মাত্র।

শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে আর দুইটি বড় খরচের উৎস হইতেছে—বহু-উদ্দেশ্য সাধনশীল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও সরকার-কর্ত্তৃক নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা। বহু উদ্দেশ্য সাধনশীল বিদ্যালয়গুলি সরকারী টাকা লুঠের ব্যবস্থার একটি বৃহৎ আয়োজন মাত্র, ইহার দ্বারা বাস্তবিক আর কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ১১ বৎসর শিক্ষার ফলে বৎসরে ৮।১০ হাজার ছাত্র কারিগরী বিদ্যার ছিটেফোঁটা লইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে। তাহার পর তাহাদের উচ্চশিক্ষার কি বন্দোবস্ত হইবে? শিবপুর, যাদবপুর ও খড়্গপুরে মোট ১০০০।১৫০০ ছাত্র হয়ত উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্ত্তি হইতে পারিবে। বাকী ছাত্রেরা কোথায় যাইবে? সরকারী পরিকল্পনা এই যে, তাহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে চ্যুত হইয়া কারখানার শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে। বহু-উদ্দেশ্য সাধনশীল বিদ্যালয়-গুলির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে যে সকল বিরাট বিরাট অট্টালিকা উঠিতেছে তাহাতে ভবিষ্যতে ছাত্রদের মঙ্গল হইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কিন্তু বর্ত্তমানে কণ্ট্রাক্টররা যে লাভবান হইতেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সরকারের অমিত-ব্যয়িতার পরিচায়ক হইতেছে সরকারী প্রচেষ্টায় নূতন নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা। এই কলেজগুলির প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে জনসাধারণের উপর করধার্য্য দ্বারা।

একদিকে যেমন সরকারী অমিতব্যয়িতা চোখ ধাঁধাইয়া দেয়, অন্যদিকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে কার্পণ্য সরকারের উদারতাবোধের অভাবের পরিচয় দেয়। এই কলিকাতা শহরে বৎসরের বার মাস সপ্তাহে গড়ে ৭০জন করিয়া যক্ষ্মারোগে প্রাণত্যাগ করে, ইহারা প্রায় সবাই গরীব, ইহাদের না আছে ভাল চিকিৎসা করিবার সংস্থান, না আছে ভাল খাদ্য গ্রহণ করিবার সংস্থান। কলিকাতার বাহিরে জেলাগুলিতেও যক্ষ্মারোগের প্রকোপ কম নহে; বাংলাদেশে বৎসরে প্রায় ১৫।২০ হাজার লোক যক্ষ্মারোগে মারা যায়; প্রায় এক লক্ষেরও অধিক লোক এই রোগে আক্রান্ত, কিন্তু সরকারী হাসপাতালসমূহে এক হাজার রোগীও এককালীন ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ে সরকারী কার্পণ্য ও উদাসীনতা আশ্চর্য্যজনক। কলিকাতার মত বিরাট শহরে অন্যান্য রোগের জন্য হাসপাতালের যথেষ্ট অভাব আছে। যে দেশের লোক বিনা চিকিৎসায় রাস্তায়, ফুটপাতে মারা যায়, সে দেশে রাজ্যপালের পক্ষে ১২০ খানা কামরা বিশিষ্ট প্রাসাদ লইয়া থাকার কিছু অর্থ হয় না। ইহা আর যাহাই হউক, সমাজতন্ত্র অন্ততঃ নয়। কলিকাতার রাজ্যপাল ভবন একটি বৃহৎ হাসপাতালে রূপান্তরিত হইয়া পীড়িত জনসাধারণের উপকারে আসিতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজ্যপালের রাজপ্রাসাদ শুধু বেমানান নহে, বিগর্হিতও বটে।

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বাংলার বাজেট হইতেছে ঘাটতি বাজেট, সুতরাং পরিকল্পনার জন্য সমস্ত খরচটাই আসিতেছে কেন্দ্রের নিকট হইতে, কিছু ঋণ হিসাবে এবং কিছু সাহায্য হিসাবে। সুতরাং টাকা খরচের হিসাব কিছু নাই বলিলেই চলে, যেমন দেখা

যায় যে, বেহালায় আবার রিফিউজীদের জন্য বাড়ী তৈয়ার হইতেছে। গাঙ্গুলীবাগানে যখন কয়েকখানি বিরাট বিরাট বাড়ী খালি পড়িয়া আছে এবং তাহাতে রিফিউজীরা যায় নাই, ইহার পর বেহালায় বাড়ী নির্ম্মাণ সরকারী অর্থের শুধু অপচয় নহে, ইহা বেআইনী অপচয় এবং এইরূপ বেপরোয়া খরচের জন্য যথোচিত শাস্তি ভোগ করা প্রয়োজন। ডাঃ রায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রাম্য এলাকায় শতকরা ৭০ জনেরও অধিক চাষী মাথাপিছু ৫ একরেরও কম জমির মালিক, সুতরাং নিজেদের জন্যও তাহারা প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করিতে পারে না। কিন্তু সে অবস্থার জন্য ত দায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ভূমি-বণ্টন আইনের দ্বারা যখন মাথাপিছু ২৫ একর করিয়া জমি রাখার নিয়ম করা হইয়াছে, তাহার ফলে ধনিক চাষী থাকিয়া যাইতেছে এবং সেই কারণে ৭০ শতাংশ চাষীর জমির পরিমাণ ৫ একরেরও কম হইতে বাধ্য।

পৃথিবীর জনসংখ্যাতথ্য

সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে বাৎসরিক সংখ্যাতথ্য বাহির করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৫৫ সনে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ২৬৯ কোটি, ১৯৫৭ সনে অবশ্য ইহার সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২০ সনে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ১৮১ কোটি, ১৯৩০ সনে ২০১ কোটি এবং ১৯৪০ সনে ছিল ২২৪ কোটি। সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত পৃথিবীর অধিকাংশ জনসাধারণ এশিয়া মহাদেশে বাস করে (১৪৮ কোটি)। কিন্তু ইউরোপে ঘনবসতি সবচেয়ে বেশী। ইউরোপের জনসংখ্যা বর্তমানে ৪০ কোটি, আফ্রিকায় ২২ কোটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ৩৬ কোটি এবং ওশেনিয়ায় ১.৪৬ কোটি। পৃথিবীর জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ঘণ্টায় ৫,০০০; প্রতিদিনে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও বৎসরে ৪.৩০ কোটি। এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ এই যে, জন্মহার যদিও অপরিবর্ত্তিত আছে, কিন্তু মৃত্যুহার হ্রাস পাইয়াছে।

পৃথিবীর জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৩৪ ও ১৮। প্রতি বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৬ শতাংশ এবং প্রতি শতবর্ষে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দশ শতাংশ বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ আমেরিকায় বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৬ শতাংশ; আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও ওশেনিয়ায় বৃদ্ধির হার ২ শতাংশ; সোভিয়েট রাশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে ১.৭ শতাংশ; ইউরোপে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম—মাত্র ০.৬ হইতে ১ শতাংশ পর্য্যন্ত। ভারতবর্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বৎসরে ১.২৫ শতাংশ।

ইউরোপের গড়পড়তা আয়ুষ্কাল ৭০.৭৩ বৎসর, সেই তুলনায় ভারতবর্ষে মাত্র ৩২ বৎসর। গড়ে পৃথিবীর জনসাধারণের ৩৪ শতাংশের বয়স ১৫ বৎসরের নিম্নে, ৫৮ শতাংশের বয়স ১৫-৫৯ বৎসরের মধ্যে এবং ৮ শতাংশের বয়স ৬০-এর উর্দ্ধে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য আমেরিকায় শিশুদের আনুপাতিক সংখ্যা অধিক। এই সকল দেশে জনসাধারণের ৪০ শতাংশের বয়স ১৫ বৎসরের নিম্নে। কিন্তু এই সকল দেশে কার্য্যক্ষম জনসাধারণের অনুপাত ৫০ শতাংশেরও কিছু অধিক; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহাদের অনুপাত ৬০ শতাংশেরও অধিক।

খাদ্যসঙ্কট

ভারতের সর্ব্বত্রই ভীষণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। খাদ্যসঙ্কটের কথা জনসাধারণ এবং সংবাদপত্রসমূহ বহুদিন হইতেই আলোচনা করিতেছিলেন, কিন্তু চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সরকার তাহাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। খাদ্যসঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভারতের খাদ্যমন্ত্রী এবং তাহার কয়েক দিন পর পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী সরাসরিভাবে খাদ্যাভাবের কথা অস্বীকার করেন। কিন্তু পক্ষকাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সরকারের পক্ষে খাদ্য-সমস্যার অস্তিত্ব স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-সমস্যার কারণ জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইল।

কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন পার্লামেন্টে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতবর্ষে খাদ্যোৎপাদন গত বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। তিনি বলেন, জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহারা বেশী আহার করিতেছে; অপর পক্ষে মজুতদারেরাও খাদ্য মজুত করিতেছে। এই দুই অবস্থার সংমিশ্রণেই খাদ্যসঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন খাদ্যাভাবের কোন কারণ নাই বলিয়া যে বিবৃতি প্রচার করেন তাহার পর এক মাস যাইবার পূর্ব্বেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসঙ্কটের কথা স্বীকার করিতে হইল। তবে ডাক্তার রায় বলিয়াছেন যে, বাঙালীরা পেটুক বলিয়াই খাদ্যাভাব ঘটিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে কম খাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।

খাদ্যাভাব সম্পর্কে সরকারী যুক্তির অসারতা বিশেষ আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। দেশের সর্ব্বত্রই খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে—যদি খাদ্যোৎপাদন সত্যই সেরূপ বেশী হইত তবে এত দ্রুত খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইত না। সরকার হইতেই কতকগুলি অঞ্চলকে ঘাটতি এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কাহারও আয় বৃদ্ধি হয় নাই বলা চলে না—কিন্তু যাহাদের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, জনসাধারণ অর্থে কেহই তাহাদের বুঝেন না এবং সেই সকল সৌভাগ্যবানের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। সরকারী তথ্য অনুযায়ীই দেখা যায় যে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পর দেশের মধ্যে আর্থিক অসাম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্যমান বৃদ্ধিতে জনসাধারণের প্রকৃত আয় ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ব্যবসায়ীরা স্থানবিশেষে অসাধুতা করিলেও দেশের সাবেক খাদ্যাবস্থায় মজুত খাদ্যশস্যের খুব যে প্রভাব রহিয়াছে তাহা মনে হয় না। সরকার আজ পর্য্যন্ত কোন বড় মজুত শস্য আবিষ্কার

করিতে পারেন নাই। আর দেশের লোক অত্যধিক খাইতেছে বলিয়া ডাঃ রায় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সারবত্তা বুঝিবার জন্ম বেশী দূর যাইতে হইবে না। শীর্ণকায়, কঙ্কালসার, জীর্ণ বস্ত্রপরিহিত নাগরিকগণই ত "অতিভোজনের" অতি বড় সাক্ষ্য। দেশে যে যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার কারণ "অতিভোজন" (?) ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ভারতীয় জনসাধারণের খাদ্য সুস্থ দেহের পক্ষে নিতান্তই অপ্রতুল বলিয়া সকল দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞই যে সর্ব্বসম্মত অভিমত প্রদান করিয়াছেন, আজ কংগ্রেস সরকারের হুকুমে তাহাকেও মিথ্যা মনে করিতে হইবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের খাদ্যাবস্থা সম্পর্কে মফস্বলের স্থানীয় পত্রিকা-গুলিতে যে সকল মন্তব্য করা হইয়াছে আমরা এখানে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

করিমগঞ্জে খাদ্যাভাব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "যুগশঙ্খ" লিখিয়াছেন:

"কাছাড় জেলায় বিভিন্ন স্থানে—বিশেষভাবে করিমগঞ্জ মহকুমায় দারুণ খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যেই অনাহার অর্দ্ধাহারের দুঃসংবাদ পাওয়া যাইতেছে। জনকল্যাণব্রতী সরকার এই দুরবস্থার আশু প্রতিবিধানকল্পে কার্য্যকরী কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কিনা তাহা আমরা জানি না। পরন্তু শোনা যাইতেছে যে, নওগাঁ ও কামরূপ জেলার কোন কোন প্রভাবশালী মিলমালিক যেভাবেই হউক সরকারের অনুমতি লইয়া কাছাড় জেলা হইতে লক্ষাধিক মণ ধান্য লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হইবে।

"কাছাড়ের করিমগঞ্জ মহকুমা নিঃসন্দেহ ঘাটতি এলাকা। শিলচর ও হাইলাকান্দির ধান-চাউলের অবস্থাও এবার শোচনীয়। এতৎসত্ত্বেও ইতিমধ্যে কাছাড় জেলা হইতে অনেক ধান-চাউল রপ্তানী হইয়াছে। এর পর কাছাড়ে ধান-চাউল আমদানীর সুব্যবস্থা না করিয়া যদি আরও রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে কাছাড়বাসী নিদারুণ দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইবে এবং কর্তৃপক্ষের অবিমৃষ্যকারিতাই এজন্য মুখ্যতঃ দায়ী হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।"

ত্রিপুরারাজ্যে খাদ্যসঙ্কট সম্পর্কে আলোচনা করিয়া আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সেবক" "চিরস্থায়ী খাদ্যসঙ্কট" শীর্ষক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

"মহকুমার সদর কার্য্যালয় ও মফস্বল অঞ্চল হইতে প্রত্যহই খাদ্যমূল্যবৃদ্ধির সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে। সংবাদে দেখা যায়, একমাত্র খোয়াই তহশীল এলাকা ও ধর্ম্মনগর মহকুমার কতক অঞ্চল বাদ দিলে ত্রিপুরার কোথাও ৩২৲ টাকার কম মূল্যে চাউল পাওয়া যায় না। পরন্তু কৈলাসহর, কমলপুর ও অমরপুর মহকুমায় চাউলের মূল্য চল্লিশ টাকায় উঠিয়াছে। চাউলের মূল্য সর্ব্বত্রই যেভাবে উর্দ্ধগতিতে বাড়িতেছে তাহাতে মনে হয় আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাজ্যের অন্যান্য অংশেও ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কটের বিস্তৃতি ঘটিবে।

"চাউলের বর্ত্তমান মূল্যেই শতকরা ৯৫জন লোক গোলকধাঁধা দেখিতেছে, আর কিছু বাড়িলে কি হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, তাহা প্রতিটি ত্রিপুরাবাসীর ক্রয়শক্তির বাহিরে। কৈলাসহর, কমলপুর ও অমরপুরে ইতিমধ্যেই অনশন অর্দ্ধাশন চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। যে রাজ্যে লোকসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ উদ্বাস্তু, শ্রমিক ও জুমিয়া সেখানে চল্লিশ টাকায় চাউল সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না এবং অনশন অথবা অর্দ্ধাশন ছাড়া তাহাদের আর কি গতি থাকিতে পারে?"

খাদ্য-পরিস্থিতি

ভারতবর্ষে খাদ্য পরিস্থিতি ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও অতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারী কৈফিয়ত হইতেছে এই যে, চাষীরা খাদ্যশস্য জমা করিয়া রাখিতেছে, বাজারে ছাড়িতেছে না এবং তাহার ফলে মূল্য অযথা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা সত্য হইলেও আংশিক সত্য, কারণ ভারত-বর্ষে বর্ত্তমানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন-ঘাটতি হইতেছে। রবিশস্য বাদ দিলে দেখা যায় যে, ১৯৫৩-৫৪ সনে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৫·৮৩ কোটি টন, ১৯৫৪-৫৫ সনে হয় ৫·৫৭ কোটি টন, ১৯৫৫-৫৬ সনে ৫·৫৪ কোটি টন এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে ৫·৭৫ কোটি টন। ১৯৫১-৫২ সনে খাদ্যশস্যের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪·২৯ কোটি টন এবং ১৯৫৩-৫৪ সনে হঠাৎ ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৫·৮৩ লক্ষ টনে দাঁড়াইল; ইহাতে মনে হয় যে সরকারী হিসাব যেন সঠিক নয়, কোথাও গলদ আছে।

১৯৫১-৫২ সনে মাথাপিছু বৎসরে গড়পড়তা খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল ৩৩৫ পাঃ, আর ১৯৫৬-৫৭ সনে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৩২৬ পাউণ্ডে নামিয়াছে। খাদ্যশস্যের ঘাটতির কারণ প্রধানতঃ দুইটি—জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উৎপাদন হ্রাস। ১৯৫১ সনের পর ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত প্রায় তিন কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং ১৯৫১-৫২ সনের গড়পড়তা মাথাপিছু উৎপাদন ধরিলেও দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের ঘাটতি প্রায় ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টন হইবে। যুদ্ধ-পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ঘাটতির পরিমাণ আরও অধিক, কারণ ১৯৫১-৫২ সনে নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং থাকার ফলে মাথাপিছু খরচের হার কম করিয়া ধরা হইয়াছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যে চুক্তি করিয়াছেন তাহার ফলে আভ্যন্তরিক খাদ্য-উৎপাদনের ঘাটতি আমদানী দ্বারা পূরণ করা সম্ভবপর হইবে।

অন্যান্য আনুষঙ্গিক খাদ্যের অভাবে অদূর ভবিষ্যতে খাদ্যশস্যের মাথাপিছু চাহিদা বর্ত্তমানের ১৫ আউন্স হইতে দৈনিক সাড়ে ১৭ আউন্সে বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে ঘাটতির পরিমাণ কমপক্ষে ১ কোটি টন হইতে বাধ্য। তাই দেখা যায় যে, দ্রুত জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সমতা রাখিতে

সক্ষম হইতেছে না। বাঁচিবার জন্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি ভারতবর্ষকে অবশ্যই করিতে হইবে এবং তাহার জন্য প্রয়োজন জমির গভীরতম কর্ষণ ও সার প্রয়োগ। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন জমিবণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। ব্যক্তিগত চাষের দ্বারা গভীরতম কর্ষণ সম্ভবপর নহে, এবং মালিকানা-স্বত্বের পরিমাণ মাথাপিছু ২ কিংবা ৩ একর করিয়া রাখিয়া বাকী উদ্বৃত্ত জমি সমবায় প্রথায় চাষের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় ডেপুটি মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপ্পা কলিকাতায় বলিয়াছেন যে, দেশে খাদ্যশস্যের কোন অভাব নাই, এ বৎসর নাকি ধান্যের উৎপাদন হইয়াছে ২'৮১ কোটি টন এবং ইহা রেকর্ড উৎপাদন। পশ্চিম বাংলায় চাউলের অভাব হওয়ার প্রধান কারণ নাকি অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে আমদানী বন্ধ ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে পশ্চিম বাংলা মাসে ১৫,০০০ টন করিয়া চাউল আমদানী করে; গত চার মাস এই আমদানী বন্ধ ছিল এবং সেই কারণে পশ্চিম বাংলায় চাউলের অভাব হইয়াছিল। বেশী লাভের আশায় অন্ধ্রের চাউল-ব্যবসায়ীরা ঐ প্রদেশ হইতে চাউল রপ্তানী বন্ধ করিয়াছিল। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ যে "প্রয়োজনীয় দ্রব্য আইনটি" পাশ করেন তাহার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, প্রয়োজনক্ষেত্রে জমা কিংবা উদ্বৃত্ত চাউল বাজারের গড়পড়তা মূল্য দিয়া বাধ্যতামূলক ভাবে ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। ১৯৫৫ সনের মে মাস হইতে খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন খাদ্যদ্রব্যের পাইকারী মূল্যমান-সূচী ছিল ২৭৬, আর ১৯৫৭ সনের মে মাসে এই মূল্যমান-সূচী উঠে ৪১৯এ, অর্থাৎ, মূল্যমান প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণপ্পার আশ্বাসবাণী যে ভারতবর্ষে চাউলের অভাব নাই তাহা বাস্তব তথ্যের দ্বারা সমর্থিত নহে।

মফস্বলে জলকষ্ট

প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে মফস্বলে জলকষ্ট দেখা দেয়। এই বৎসর বৃষ্টির অভাবে জলকষ্ট বিশেষরূপেই প্রকট হইয়াছে। মফস্বলের শহরগুলিতেই উপযুক্ত পরিমাণ জল পাওয়া যাইতেছে না। পল্লীবাসীদের কথা না তোলাই ভাল—বহুক্ষেত্রে তাহাদিগকে দুই-তিন মাইল দূর হইতেও পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হইতেছে। বহু বৎসর যাবৎ এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থা চলিতেছে, কিন্তু অবস্থার কোনরূপ প্রতিকার হইতেছে বলিয়া মনে হয় না।

বর্দ্ধমান জেলায় জলকষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "দামোদর" লিখিতেছেন,

"এই জেলার আসানসোল মহকুমা সর্ব্বপ্রকারের জলকষ্টের জন্য কুখ্যাত। সরকার হইতে ডি-ভি-সি'র মাইথন জলাধারের জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা এবং কোলিয়ারী পিটগুলি হইতে প্রচুর পরিমাণ জল তুলিয়া উহা সরবরাহ করিবার কথা আমরা দীর্ঘদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহা বাস্তবে দেখা গেল না। অন্য তিনটি মহকুমার হিসাবে বহু নলকূপ দেখানো হইলেও অধিকাংশ নলকূপই অচল হইয়া পড়িয়া আছে, মেরামতের কোন ব্যবস্থা নাই। গ্রামবাসী শত শত আবেদন করিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন। এই তিনটি মহকুমায় এমন গ্রামও রহিয়াছে যেখানে দুই মাইল দূর হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করিতে হয়। এই নলকূপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার ফলে গ্রামাঞ্চলের সমস্ত পুকুর ও দীঘি অব্যবহার্য্য হইয়া মজিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ গ্রামেই আজ স্নানের উপযুক্ত পুকুরও নাই। ঐ নলকূপের জলেই অধিকাংশকেই কোন প্রকারে কাজ সারিতে হয়। গবাদি পশুর পানীয় জলও ঐ নলকূপ ও ইন্দারার উপর নির্ভর করে। পুকুরগুলি এইভাবে অনাদৃত হওয়ায় বাংলার মৎস্যসম্পদও নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে। সরকারের পুকুর উন্নয়ন বিভাগের যে রীতি তাহাতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত পুকুরই অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। বাংলা দেশের শস্যশ্যামলা চিত্র যেন ক্রমে ক্রমে মরুভূমির দেশে রূপান্তরিত হইতেছে। সেজন্য আজ বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে দেশের পুকুর দীঘি ও জলাশয়গুলি ব্যাপকভাবে সংস্কার করিবার এবং মজা পুকুরগুলিকে জমিতে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টাকে বাধা দিবার।"

২৪ পরগণার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত হাবড়া থানায় জলকষ্ট সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, থানার সর্ব্বত্রই ব্যাপক ভাবে জলাভাব দেখা দিয়াছে। পুষ্করিণীগুলি সবই প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সকল প্রকার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকটি নলকূপই মাত্র সম্বল। স্বভাবতঃই প্রয়োজনের অনুপাতে নলকূপগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কয়েকটি নলকূপ অবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন। সরকার-প্রতিষ্ঠিত নলকূপগুলির কার্য্যাক্ষমতা সম্পর্কে উক্ত বিবৃতিতে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, সরকারের সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

হাবড়া থানার অন্তর্গত ৩নং বেড়াবেড়ী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীইন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ইউনিয়নে জলকষ্টের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:

"এই ইউনিয়নে ১৬-১৮ বৎসরের অল্প গভীর নলকূপ হইতে জল পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু হাবড়ার সমাজ উন্নয়ন বিভাগ হইতে ২।৩ বৎসরের মধ্যে যতগুলি নলকূপ বসান হইয়াছে সেইগুলি হইতে জল পাওয়া যাইতেছে না। গ্রামবাসীদের নিকট হইতে বেশী পরিমাণে চাঁদা লইয়া ঐ সকল নলকূপ বসাইয়া ২।৩ বৎসরও চলিতেছে না—ইহার কারণ কি? গলদ কোথায়?

গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল

আমাদের দেশে হাসপাতালের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। কয়েকটি শহর ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে কোন হাসপাতালই নাই। শহরের

হাসপাতালগুলিতে শহরের অধিবাসীদেরই চিকিৎসার সুব্যবস্থা নাই। গ্রামবাসীদের পক্ষে শহরে আসিয়া সুচিকিৎসা পাওয়া তাই প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। উপরন্তু, অধিকাংশ গ্রামবাসীরই আর্থিক সামর্থ্য শহরে আসিয়া চিকিৎসা করানোর অনুকূল নহে। এই অবস্থায় শহরাঞ্চলের বাহিরে গ্রামাঞ্চলে হাসপাতাল স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলার পাটকেবাড়ী এ-জি. হাসপাতাল সম্পর্কে "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" যে সম্পাদকীয় আলোচনা করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

পাটকেবাড়ী হাসপাতালটির ঘরগুলি খড়ের—উহাদের বর্তমান অবস্থা বিশেষ শোচনীয়—আলোবাতাসের বিশেষ অভাব। কিন্তু হাসপাতালটির পরিচালন-ব্যবস্থা খুবই প্রশংসার্হ এবং হাসপাতালটি হইতে ঐ অঞ্চলের জনসাধারণ বিশেষভাবে উপকৃত হইতেছেন। হাসপাতালে কয়েকটি 'বেড'ও রহিয়াছে—নার্স, ডাক্তার এবং ঔষধপত্রেরও মোটামুটি ভাবে সুবন্দোবস্ত আছে। হাসপাতালটির সুনাম এরূপ যে, মুর্শিদাবাদ জেলা ত বটেই, এমনকি পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলা হইতেও রোগী চিকিৎসার জন্য এখানে আসে। কিন্তু উপযুক্ত গৃহাভাবে হাসপাতালটি বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত হইয়াছে। খড়ের ঘর মেরামত করিতে প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থব্যয় হয়—ফলে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি ক্রয়ে ব্যাঘাত ঘটে। ঘরগুলির শোচনীয় অবস্থার দরুন রোগীদেরও বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হয়।

হাসপাতালের একটি ঘর ভাঙিয়া পড়িয়াছে—তাহা মেরামত করিবার জন্য এই বৎসর সাত হাজার টাকার এক কন্ট্রাক্ট দেওয়া হইয়াছে। ঘরটি এবার মেরামত হইবে—কিন্তু তার পরই হয়ত আর একটি ঘর মেরামতের জন্য আরও সাত হাজার টাকা খরচ করিতে হইবে। যদি হাসপাতালের একটি পাকা বাড়ী থাকিত তবে হাসপাতালটির এবংবিধ অসুবিধা সহ্য করিতে হইত না।

পাটকেবাড়ী এ. জি. হাসপাতালটির জন্য একটি পাকা বাড়ী সংগ্রহের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" (৬ই জ্যৈষ্ঠ) লিখিতেছেন :

"অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, পাটকেবাড়ীতে মেদিনীপুর জমিদারীর যে একটা পাকা বাড়ী আছে তাহা জমি সমেত সাঁইত্রিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইবে। এই বিরাট অট্টালিকাতুল্য বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রচুর খোলা জায়গা আছে। সামনে প্রশস্ত রাস্তা। নিকটে নদী, চতুর্দ্দিকে ফাঁকা মাঠ। পরিবেশটি শান্ত ও স্বাস্থ্যপ্রদ। ইহাকে হাসপালের উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইল। বাটীতে চার-পাঁচটি কামরা আছে। একটি বড় হল আছে। চাকর ও নার্সদের থাকিবার আলাদা ঘর আছে। এখানে ২৫।৩০টি বেড রাখা চলিতে পারে। কোম্পানীর নিজস্ব ডাইনামো আছে তাহার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা চলিবে। জল তুলিবার পাম্পেরও ব্যবস্থা আছে। অথচ সবসুদ্ধ মূল্য মাত্র সাইত্রিশ হাজার টাকা। একটু চেষ্টা করিলে মূল্যটা কিছু কমও হইতে পারে। সরকার যদি বাজে খরচ না করিয়া এই কুঠিবাড়ীটি ক্রয় করেন তবে হাসপাতালের পক্ষে খুবই ভাল হইবে। স্থানীয় লোকেরাও চাঁদা তুলিয়া কিছু টাকা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সব টাকা দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। মোটের উপর সাঁইত্রিশ হাজার টাকায় এই কুঠিবাড়ী ও তৎসংলগ্ন মাঠ এবং আসবাবপত্র ক্রয় করা কোন মতেই অশোভন হইবে না।

"আমরা অনুরোধ করি যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোম্পানীর নিকট হইতে এই কুঠিবাড়িটি ক্রয় করিয়া লইতে দ্বিধা করিবেন না। জেলার সিভিল সার্জ্জেন মহোদয় যদি একটু চেষ্টা করেন তবে এ কুঠিবাড়ী ক্রয় করা সম্ভব হইবে।"

ডাক্তারের রহস্যজনক মৃত্যু

২৯শে এপ্রিল, ১৯৫৬ সনে জগদ্দল এংলো ইণ্ডিয়ান জুট মিলের চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সত্যচরণ ভট্টাচার্য্যকে কে বা কাহারা অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের পর এক বৎসরেরও অধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠানকারীদের কোন শাস্তিবিধান হয় নাই। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পুলিশের বিরুদ্ধে কর্ত্তব্যচ্যুতির অভিযোগ করিয়া "শ্রীনিরপেক্ষ" "যুগান্তর" পত্রিকায় যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সত্য হইলে বিষয়টির গুরুত্ব কোন ক্রমেই ছোট করিয়া দেখা চলে না।

"শ্রীনিরপেক্ষ"র বিবরণে প্রকাশ যে, হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই পুলিশ ঘটনাস্থলে তদন্ত করিতে যায়, কিন্তু যে-কোন কারণেই হউক পুলিশের অফিসারগণ যথারীতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য করেন নাই। ডাঃ ভট্টাচার্য্যের বিধবা স্ত্রী স্বয়ং ইনস্পেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে, তাঁহার স্বামীর হত্যাকাণ্ডের পিছনে এক বিরাট ষড়যন্ত্র লুক্কায়িত রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীসরকার তাহাতে কোনরূপ কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। পরে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের নির্দ্দেশে নূতন করিয়া হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান-কার্য্য আরম্ভ হয়—সেই অনুসন্ধান এখনও শেষ হয় নাই।

"শ্রীনিরপেক্ষ" লিখিতেছেন, "দ্বিতীয় তদন্তেও অপরাধীর সন্ধান পাওয়া যায় নি; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের একটি চমৎকার চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। দ্বিতীয় তদন্তে গোয়েন্দা দপ্তর লক্ষ্য করেছেন যে, প্রথম তদন্ত এমন ভাবে চালানো হয়, যাতে অপরাধের কতকগুলি মূল্যবান সূত্রকে তদন্তকারীরা নষ্ট হতে দিয়েছিলেন। ডাঃ ভট্টাচার্য্যের ঘরের মধ্যে আসামীদের আঙুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলি তদন্তকারীরা এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যা পুলিশের তদন্ত-পদ্ধতিতে কখনও করা হয় না এবং এই গুরুতর ব্যতিক্রম সন্দেহজনক।"

হত্যাকাণ্ডের নায়কদের সহিত পশ্চিমবঙ্গের পদস্থ পুলিশ অফিসার প্রভৃতির কোন গূঢ় যোগসাজশের ইঙ্গিত করিয়া "শ্রীনিরপেক্ষ" লিখিয়াছেন যে, একজন ইউরোপীয় অফিসারের প্রতি ডাঃ ভট্টাচার্য্যের পত্নী বিশেষভাবে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু

পুলিশ প্রথমে তাঁহার সম্পর্কে কোন অনুসন্ধানই চালায় নাই—সেই অফিসারটি ইতিমধ্যেই ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। লেখক বলিয়াছেন, "তদন্ত যারা ব্যর্থ করতে চেয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কর্ত্তারা তাদের সফলকাম হতে দিয়েছেন। আইনগত কারণে আমার পক্ষে সম্ভব নয়, (এই বৃহৎ রহস্যের মধ্যে যে বড় বড় পদস্থ ব্যক্তি এবং বিদেশীর হস্তক্ষেপ ছিল বলে সন্দেহ করা যায়) তার সমস্ত তথ্য বিবৃত করা। কিন্তু এই অসাধারণ হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র ছিল এবং সেই ষড়যন্ত্রে পুলিশও সাহায্য করেছে, আজ যদি ইনস্পেক্টর জেনারেলের দরবারে শ্রীআশা ভট্টাচার্য্য এই অভিযোগ করেন, তা হলে কোন অন্যায় হবে না।"

"শ্রীনিরপেক্ষ" এই সঙ্গে পুলিশের বড়কর্ত্তা শ্রীহীরেন সরকারের আচরণ সম্পর্কে যে সকল তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন, সুস্থ এবং নিরপেক্ষ শাসন-ব্যবস্থার খাতিরে সেই সম্পর্কে অবিলম্বে সবিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলিয়াও আমরা মনে করি।

আসামে বাঙ্গালী-বৈষম্য নীতি

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ভারত সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, নাগরিকদিগের সমানাধিকার, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সংবিধানবর্ণিত উদ্দেশ্যসাধনই ভারত সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, একাধিক রাজ্যসরকার কার্য্যক্ষেত্রে নাগরিকদিগের এই সকল মৌলিক অধিকার খর্ব্ব করিতেছেন। ভারতীয় নাগরিকদিগের বিধিসম্মত অধিকার সঙ্কোচনবিষয়ে আসাম এবং বিহার রাজ্যসরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহই সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয়। উক্ত রাজ্য দুইটিতেই বেশ কিছুসংখ্যক বাঙ্গালী অধিবাসী রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা বাংলাভাষাভাষী বলিয়া রাজ্যের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের সকলপ্রকার সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু অবস্থার কোনরূপ উন্নতিসাধন ঘটে নাই।

সম্প্রতি আসামে বেকার-সমস্যা বিশেষ তীব্ররূপে দেখা দিয়াছে। আসাম রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে বাঙ্গালীদের সংখ্যাই বেশী; বাঙ্গালীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উদ্বাস্তু; বাকী সকলে স্থায়ী বাসিন্দা। উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আসাম রাজ্যের নিমিত্ত যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন তাহা পরিপূর্ণরূপে উদ্বাস্তুদের সাহায্যার্থে ব্যয়িত হয় না বলিয়া অভিযোগ উঠিয়াছে। অপরপক্ষে আসাম রাজ্যের চাকুরির ব্যাপারে রাজ্যসরকার উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবেই বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

আসামে বাঙ্গালীদের উপর যে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইতেছে তাহার সমালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "যুগশক্তি" লিখিতেছেন,

"এমনকি আসামের স্থায়ী অধিবাসী বাঙালীদিগকেও সর্ব্বত্র সমান সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম হাইকোর্ট, ডিব্রুগড় মেডিক্যাল কলেজ, আসাম ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী কাজ করিয়া থাকেন; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বঙ্গভাষাভাষী প্রায় নাই বলিলেই চলে।

"আজকাল আসাম অয়েল কোম্পানী এবং চা-বাগানসমূহেও বাঙালী নিয়োগে নানারূপ প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হইতেছে।

আসামে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বাঙালীদের সংখ্যা যেখানে রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার ন্যূনাধিক এক-তৃতীয়াংশ, সেখানে এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণের কোন যুক্তি থাকিতে পারে কি?—আমরা এই বিষয়ে রাজ্য-কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণক্রমে আশু সুবিচার দাবি করিতেছি।"

গৌহাটি বেতারকেন্দ্রে বাংলা ভাষার প্রতি অবিচার

আসামের কেবল যে রাজ্যসরকারই বাঙালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিতেছেন তাহা নহে; কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন বিভাগও তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে আসামে ডাক ও তার বিভাগে লোক নিয়োগ সম্পর্কে বাঙালীদের প্রতি অবিচারের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে গৌহাটি বেতারকেন্দ্রে বাংলা ভাষাকে কিভাবে উপেক্ষা করা হইতেছে তাহাই আলোচিত হইবে।

গত ৪ঠা মে হইতে গৌহাটি বেতারকেন্দ্রে একটি শক্তিশালী শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপিত হইয়াছে। এই শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যে সমগ্র আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা এলাকায় বেতার কর্ম্মসূচী প্রচারের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত এজেন্সী, নাগা পার্ব্বত্য অঞ্চল, খাসিয়া-জয়ন্তিয়া, গারো-মিকির, উত্তর কাছাড়, লুসাই (মিজো), মণিপুর এবং ত্রিপুরা অঞ্চলের শ্রোতাদের জন্য বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হইয়াছে। যে অঞ্চলের জনসাধারণের নিকট গৌহাটি বেতার হইতে প্রচারিত অনুষ্ঠানাদি পৌঁছায় সেই অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাঙালী। কিন্তু বাঙালীদিগের জন্য গৌহাটি বেতারকেন্দ্র হইতে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

বাঙালীদের এই অসুবিধার কথা আলোচনা করিয়া "যুগশক্তি" লিখিতেছেন যে, গৌহাটিতে শক্তিশালী নূতন বেতার প্রেরকযন্ত্র স্থাপিত হওয়ায় সকলেই সুখী হইবেন। "কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক মনে করি। গৌহাটি বেতারকেন্দ্র হইতে বর্ত্তমানে যে ব্যাপক অঞ্চলে বেতার-সূচী প্রচারিত হইতেছে তাহার মোট অধিবাসী-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক বঙ্গভাষাভাষী। তন্মধ্যে সমগ্র কাছাড় জেলা ও ত্রিপুরারাজ্য এবং গোয়ালপাড়া জেলার অধিকাংশ বাঙালী। ত্রিপুরায় বহুকাল যাবৎ বাংলা ভাষা সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত এবং প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু গৌহাটি বেতার-

কেন্দ্র হইতে বঙ্গভাষাভাষীদের জন্য আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থাই করা হয় নাই। গৌহাটি বেতারকেন্দ্রের সাম্প্রতিক উন্নততর ব্যবস্থায় ত্রিপুরার জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠানসূচী রচিত হইতেছে, তাহাতেও বাংলা ভাষা বাদ দিয়া মাত্র ত্রিপুরী ও রিয়াং ভাষারই প্রচারকার্য্য চলিতেছে। ইহাতে এই ধারণাই হয় যে, ত্রিপুরারাজ্যে বোধ হয় শুধু ত্রিপুরী ও রিয়াং ভাষাই প্রচলিত। তদুপরি এই আশঙ্কাও কোন কোন মহল হইতে ব্যক্ত হইতেছে যে, এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা আসামের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায়ও বাংলা ভাষার অস্তিত্ব লোপ না হইলেও প্রভাব হ্রাসের আয়োজন হইয়াছে। কিন্তু এইসব প্রশ্ন বাদ দিয়াও আমাদের মনে হয়, গৌহাটি বেতারকেন্দ্রের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত এলাকার ন্যূনাধিক ৩৫ লক্ষ বঙ্গভাষাভাষীর জন্য বিশেষ বেতারসূচীর ব্যবস্থা করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

"গৌহাটিতে নূতন ট্রান্সমিটার স্থাপনকালীন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি. ভি. কেশকার এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীও বলিয়াছেন যে, বেতার শুধু গীতবাদ্যাদি আনন্দানুষ্ঠানের জন্য নহে,—বেতার মারফতে জনগণের শিক্ষা এবং দেশোন্নয়নেরও ব্যবস্থা হয়। ইহা খুবই সত্য কথা এবং এই জন্যই গৌহাটি বেতারকেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংশ্লিষ্ট বিরাট বাঙালী সমাজ তাঁহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে এতৎসম্পর্কিত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ন্যায্য অধিকারী নহেন কি ?"

মুর্শিদাবাদে পাকিস্থানীদের দৌরাত্ম্য

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই মুর্শিদাবাদ সীমান্তে পাকিস্থানী দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরাও কয়েকবার তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সাম্প্রতিক সংবাদে দেখা যাইতেছে যে, সময়ের সঙ্গে দুর্বৃত্তদের উপদ্রব কমা দূরে থাকুক, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। এই সম্পর্কে ২২শে জ্যৈষ্ঠ (৫ই জুন) "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় আলোচনা করা হইয়াছে, সকলের অবগতির জন্য আমরা তাহা এখানে তুলিয়া দিলাম। 'মুর্শিদাবাদ সমাচার' যাহা লিখিয়াছেন তাহা সর্বৈব সত্য হইলে বিষয়টি বিশেষ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে সন্দেহ নাই। কর্তৃপক্ষের উচিত এসম্পর্কে পরিপূর্ণ অনুসন্ধানের সকল তথ্য জনসাধারণের গোচরে আনা—যাহাতে এরূপ রাষ্ট্রবিধ্বংসী কার্য্য-কলাপের সুযোগ আর কেহ না পায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় পাকিস্তানী পঞ্চম কলম কাজে নামিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জেলার বিভিন্নাংশে বিশেষ করিয়া বাগড়ী অঞ্চলের থানাগুলিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক থাকিয়া গিয়াছে, যাহারা ভারতে সম্পত্তি থাকায় বাধ্য হই থাকিয়া গিয়াছে এবং ভারতে থাইয়া পড়িয়া পাকিস্তানের খোওয়াব দেখিতেছে। তাহাদের আত্মীয়কুটুম্ব পূর্ব্ব-পাকিস্তানে থাকে, নানাবিধ কাজকর্ম্ম করে, মাঝে মধ্যে পাসপোর্ট করিয়া এই জেলার পৈতৃক ভিটায় আসিয়া বাপদাদাদের মনে পাকিস্তানের খোওয়াব লাগাইয়া যায়। তাই সাধারণ নির্ব্বাচনে ভোট দিতে গিয়া সাধারণ অশিক্ষিত চাষী-পত্নী ব্যালট বাক্সে ভোটপত্র দিয়া বলে, হায় আল্লা, মুর্শিদাবাদে পাকিস্তান কায়েম কর। এই শ্রেণীর নরনারী ছাড়া সীমান্তবর্ত্তী থানাগুলিতে আর এক শ্রেণীর মুসলমান থাকিয়া গিয়াছে, যাহাদের দোঘরা বলা চলে। পদ্মানদীর এপারে-ওপারে পশ্চিম বাংলায় ও পূর্ব্ব-পাকিস্তানে তাহারা ঘর বানাইয়া রাখিয়াছে, বাপ বেটা কিংবা দুই ভাইয়ে ব্যবস্থা করিয়া উভয় রাষ্ট্রে বসবাস করে, সম্ভবতঃ দুই রাষ্ট্রের প্রজা বলিয়া পরিচয় দিবারও একটা ব্যবস্থা আছে। তাহারা যথেচ্ছ এপার-ওপার করে, তাহাদের পাসপোর্টের প্রয়োজন করে না। এই শ্রেণীর সীমান্তবর্ত্তী দোঘরাদের সঙ্গে পাকিস্থানীদের পরিচয় গভীর থাকায় বিনা কাগজ-পত্রে ভারতরাষ্ট্রে আসা-যাওয়া তাহাদের পক্ষে সহজ হইয়াই আছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে, মুর্শিদাবাদে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ হইয়াই আছে এবং পাকিস্থানী চর ও মুর্শিদাবাদী স্বপ্ন-বিলাসী মুসলমানদের মধ্যে একটা গোপন বুঝাপড়ার ফলে মুর্শিদাবাদকে পাকিস্থান করিবার গুপ্ত প্রচেষ্টা জেলার নানাস্থানে চলিতেছে। গত নির্ব্বাচনে কোনও কোনও স্বতন্ত্র প্রার্থী যাহা বলিয়াছেন, কিংবা যাহা ভোট গ্রহণার্থে করিয়াছেন তাহাতে অশিক্ষিত-মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, চেষ্টা করিলে কাশ্মীরের মত অবস্থা হয়ত মুর্শিদাবাদেও করা যাইতে পারে।

সম্প্রতি একটি ঘটনা উপরিউক্ত ব্যাপার সপ্রমাণ করিয়াছে। বেলডাঙ্গা থানার কাপাসডাঙ্গা, কাজীসা, মাঝপাড়া ও খোল্লা মিঞি প্রভৃতি গ্রামে গত ২৭-৪-৫৭ তারিখে পুলিস কয়েকটি গৃহে অকস্মাৎ হানা দিয়া কার্ত্তুজ, বারুদ, বোমার সরঞ্জাম, পাকিস্তানী পতাকা, গোপন চিঠিপত্র প্রভৃতি পাইয়াছে বলিয়া শোনা গিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বহুলপরিমাণ ছাপানো রসিদের বই পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে লেখা আছে—"মুসলিম লীগ ঢাকা, ব্রাঞ্চ—বেলডাঙ্গা, আপনারা কেন চাঁদা দিতেছেন জানেন কি ? মুর্শিদাবাদকে পাকিস্তান করার জন্য চাঁদা দিতেছেন"...... এই সম্পর্কে পুলিস যাহাদের গ্রেপ্তার করিয়াছে, তন্মধ্যে আছেন ইউ-বি মেম্বর, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টার প্রভৃতি। লীগের রসিদের বই প্রাপ্তি সম্পর্কে এই সমস্ত শিক্ষিত তথা গ্রামের মাতব্বর শ্রেণীর লোকে কি কৈফিয়ত দিয়াছেন তাহা আমাদের অজ্ঞাত। তবে এই ঘটনা সহজেই পাকিস্তানী পঞ্চম কলমের জেলায় উপস্থিতি এবং ঢাকার মুসলীম লীগের মুর্শিদাবাদ জেলায় ব্রাঞ্চ স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রমাণিত করিতেছে। এই জেলার আর কোন্ কোন্ থানায় ঢাকার মুসলীম লীগ ব্রাঞ্চ খুলিয়াছে, তাহা জানা অতঃপর হয়ত সম্ভব হইবে না। বেলডাঙ্গার এই ঘটনা

সম্পর্কে রাজ্য ও ইউনিয়ন সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত হইয়া উপযুক্ত প্রতিকারের প্রয়োজন হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার নেতৃস্থানীয় হিন্দু মুসলমানদের এই ঘটনাটি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে এবং অঙ্কুরেই যাহাতে এই জাতীয় পাকিস্তান প্রীতির বিনাশ হয়, তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে সর্ব্ববিধ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা কাশ্মীরের মত মুর্শিদাবাদেও পাকিস্তানী কার্য্যকলাপ আর এক গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়া রাষ্ট্র-স্বার্থ বিপন্ন করিতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে নারীধর্ষণ

নারীধর্ষণ সমাজের এক কলঙ্কজনক ব্যাপার। কোন সভ্য মন এইরূপ কার্য্য সহ্য করিতে পারে না। পৃথিবীর অপরাপর কোন রাষ্ট্রেই বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় নারীধর্ষণের হিড়িক নাই। অবিভক্ত বাংলায় কোন বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সম্প্রদায়বিশেষের স্ত্রীলোকদের পক্ষে নিজেদের মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলা প্রায় অসম্ভব ছিল। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর এই কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিবে। কিন্তু মফস্বলের—বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত সংবাদগুলির মূলে যদি কোন সত্য থাকে (যেরূপ নামধাম-সহ সংবাদগুলি প্রকাশিত হয় তাহাতে অবিশ্বাস জন্মাইবার বিশেষ কারণ নাই) তবে দুঃখের সহিত বলিতে হইবে যে, এই লজ্জাকর-জনক অপরাধ এখনও পুরাদমেই অনুষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে। "মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার ২৯শে জ্যৈষ্ঠ (১২ই জুন) সংখ্যায় এক সপ্তাহের মধ্যে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থানে তিনটি নারীধর্ষণের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। অপরাধীদের মধ্যে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক রহিয়াছে। নারীর এইরূপ অপমান আমাদের রাষ্ট্র আর কতদিন সহ্য করিবে? এই জাতীয় অপরাধ দমনে সরকারের কি কোনই দায়িত্ব নাই? থাকিলে এইরূপ অসহ্য অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন জনসাধারণকে তাহা জানাইবেন কি? নারীধর্ষণ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ; পুলিস আন্তরিক-ভাবে চেষ্টা করিলে সহজেই এই অপরাধের অনুষ্ঠান বন্ধ হইতে পারে। অপরপক্ষে এই শ্রেণীর অপরাধীদের জন্য কঠোরতম শাস্তি-বিধান করা প্রয়োজন, যাহাতে এই ধরনের অপরাধে লিপ্ত হইতে কেহ সাহস না পায়।

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ছাত্রাবাস

দেশ বিভাগের পূর্ব্ব হইতেই ঢাকা হল এবং জগন্নাথ হল উভয়ই হিন্দু হোষ্টেল ছিল। দেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় জগন্নাথ হল হিন্দু হোষ্টেলটি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং তথায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি হোষ্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা হলটি যথারীতি হিন্দু হোষ্টেল রূপেই চলিতে থাকে; তবে হলটির অর্দ্ধাংশে মুসলমান ছাত্রগণও বাস করে। এতদিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই হোষ্টেলটি চলিয়া আসিতে-ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিষদ এই মর্ম্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, ঢাকা হলটি আর হিন্দু হোষ্টেল রূপে না রাখিয়া উহাকে একজন মুসলমান প্রভোষ্টের পরিচালনায় একটি সার্ব্বজনীন হোষ্টেলরূপে পরিণত করা হইবে। যে সকল হিন্দু ছাত্র বর্ত্তমানে ঢাকা হলে রহিয়াছে তাহাদিগকে জগন্নাথ হলের একটি অংশে স্থানান্তর করণের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের এই নূতন নির্দ্দেশের বিরোধিতা করিয়া শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জনশক্তি" লিখিতেছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হইতেই ঢাকা হলটি হিন্দু ছাত্রদের জন্য হোষ্টেলরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাম্প্রতিক-কালে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় ইতিমধ্যেই জগন্নাথ হল এবং ঢাকা হলের অর্দ্ধাংশ হিন্দু ছাত্রগণ ছাড়িয়া দিয়াছে। ঢাকা হল হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে সরিয়া যাইবার জন্য যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, এই সকল কারণে তাহার যৌক্তিকতা বুঝা শক্ত। উপরন্তু, জগন্নাথ হলের যে অংশে হিন্দু ছাত্রদিগকে সরিয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই গৃহখানিতে আলোবাতাস বা আধুনিক হোষ্টেলের উপযোগী কোন সুব্যবস্থা নাই। তবুও সেখানেই ১লা জুলাই হইতে হিন্দু ছাত্রদিগকে চলিয়া যাইতে হইবে।

"জনশক্তি" সুচিন্তিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধটিতে বলিতেছেন,—"খাদ্যাখাদ্য, আচার-আচরণ ইত্যাদির পার্থক্যজনিত কারণে অনেক হিন্দু ছাত্র এবং তাহাদের অভিভাবকের সার্ব্বজনীন হোষ্টেলে ছাত্রদের রাখিতে অসুবিধা বা আপত্তি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু মেয়েদের জন্য কোন স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকায়—বহু অভিভাবককেই বাধ্য হইয়া মেয়েকে উচ্চ শিক্ষাদানের জন্য ভারতে পাঠাইতে হয়, অথবা উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহে বসাইয়া রাখিতে হয়। মুসলমানদের জন্য যদি স্বতন্ত্র হোষ্টেল রাখিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তাহাদের রুচি ও কৃষ্টি অনুযায়ী স্বতন্ত্র হোষ্টেলের ব্যবস্থা থাকিবে না কেন? যদি একান্তই সার্ব্বজনীন হোষ্টেল করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা হইলে সলিমুল্লা মুসলিম হল, ফজলুল হক হল ও ইকবাল হলের যে-কোন একটিকে সার্ব্ব-জনীন হোষ্টেলে রূপান্তরিত করিলেই চলিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হিন্দু ছাত্রগণ কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রীসভার কাছে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। মুষ্টিমেয় লোকের ঈর্ষ্যা ও দুরভি-সন্ধিপ্রসূত প্রচেষ্টার নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিষদ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এই প্রচেষ্টায় শুধু হিন্দু ছাত্রদের মনেই বেদনা হইতেছে না, সমগ্র হিন্দু সমাজ তাহাতে বেদনাবোধ করিতেছে। পূর্ব্ব বাংলার সাধারণ মুসলমান সমাজ আজ সাম্প্রদায়িকতার কলুষ-মুক্ত হইয়া তাহার উর্দ্ধে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় লোক তাহাদের নিজ স্বার্থেই সাম্প্রদায়িক ভেদ ও বিদ্বেষের দুষ্ট বুদ্ধিকে জীয়াইয়া রাখার অপচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ম্মপরিষদে বহু উদার শিক্ষাবিদ আছেন। তাঁহা-

দের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন এই যে, তাঁহাদের সিদ্ধান্তটি সম্পর্কে তাঁহারা যেন পুনর্বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানকে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির অপযশ হইতে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান শিক্ষামন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্রদের ন্যায্য দাবি সমর্থন করিয়া ন্যায়পরায়ণতা ও সমদৃষ্টির আদর্শ সংস্থাপন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে অপযশের হাত হইতে রক্ষা করিবেন বলিয়াও আশা করি।"

সোভিয়েটে ব্যক্তিস্বাধীনতা

হাওয়ার্ড ফাষ্ট প্রখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক এবং আন্তর্জ্জাতিক বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা স্থাপনের অন্যতম সমর্থক। হাওয়ার্ড ফাষ্টের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি বিশ্বখ্যাতি লাভ করিয়াছে এবং কয়েকখানি বাংলা ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বশেষ উপন্যাস "স্পার্টাকাস"-এর খ্যাতি সর্ব্বত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক এবং নিগ্রোদের সমানাধিকারের আন্দোলনে হাওয়ার্ড ফাষ্টের দান অসামান্য। যুদ্ধকালে হাওয়ার্ড ফাষ্টের পুস্তক মার্কিন সরকার সৈন্যদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি লেনিন শান্তি (পূর্ব্বে ষ্টালিন শান্তি) পুরস্কারও লাভ করেন।

হাওয়ার্ড ফাষ্ট পনর বৎসর যাবৎ মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম্যুনিজমের আদ্যাক্ষর উচ্চারণ করা পর্য্যন্ত বিপজ্জনক ছিল তখনও তিনি নির্ভীকভাবে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার এই নির্ভীকতার জন্য তাঁহাকে কম দুর্ভোগ ভোগ করিতে হয় নাই। একদা যে হাওয়ার্ড ফাষ্টের পুস্তক প্রকাশের জন্য পুস্তক-ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়া যাইত সেই হাওয়ার্ড ফাষ্টেরই পুস্তক "স্পার্টাকাস" প্রকাশ করিতে কোন মার্কিন প্রকাশক রাজী হন নাই।

বর্ত্তমানে তাঁহার এই নির্ভীকতার জন্যই তিনি সোভিয়েট রুশিয়ার কোপে পড়িয়াছেন। ক্রুশ্চেভ প্রদত্ত রিপোর্টে সোভিয়েট ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত বর্ব্বরতার বিবরণ পাঠ করিয়া মানবপ্রেমিক ফাষ্ট স্বভাবতঃই বিচলিত হন। তিনি খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁহার মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। তিনি সোভিয়েটের বন্ধুই থাকিবেন বটে, তবে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধ ভাবে সোভিয়েটের সকল কার্য্যকেই প্রশংসা করিয়া চলিবেন না। সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির অন্ধ প্রশংসার সরকারী নীতি না মানিতে পারিলে যে-কোন ব্যক্তিকেই কম্যুনিষ্টরা শত্রু বলিয়া মনে করে। সোভিয়েট সম্পর্কে হাওয়ার্ড ফাষ্টের এইরূপ স্পষ্টবাদিতা সেই কারণেই মার্কিন কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং পৃথিবীর অন্যান্য কম্যুনিষ্ট পার্টির নিকট রুচিকর হয় নাই। কম্যুনিষ্ট পার্টির মতবাদ চাপাইবার নীতি মানিয়া চলিবার নীতির সহিত তাঁহার বিবেকের বিরোধ ঘটায় ফাষ্ট সম্প্রতি কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ইহাতে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি বিশেষ ক্রুদ্ধ হয় এবং তাহাদের ভাড়াটে লেখকগোষ্ঠী ফাষ্টকে কাপুরুষ বলিয়া অভিহিত করিতে থাকে। এই সম্পর্কে নিউইয়র্ক হইতে ১১ই জুন "মার্কিনবার্ত্তা" যে সংবাদটি পরিবেশন করিয়াছেন তাহা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রাভদা পত্রিকার প্রতিনিধি এবং সোভিয়েট রাইটার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী বোরিস পোলিভয়ের সঙ্গে বিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাষ্টের যে পত্রবিনিময় হইয়াছে তাহাতে এই কথাই প্রকাশিত হইয়াছে যে, কম্যুনিজম লেখকবর্গকে, এমনকি তাহাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছেও সত্য কথা বলিতে দেয় না। মিঃ ফাষ্ট ১৫ বছর কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত তাঁহার সম্পর্কচ্ছেদের কথা প্রকাশ করেন এবং গত ১লা ফেব্রুয়ারী "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হয়। তিনি আর একজন সোভিয়েট লেখকের মারফত পোলিভয়কেও পৃথকভাবে এই কথা জানাইয়া দেন।

পোলিভয় মস্কো হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী মিঃ ফাষ্টের পত্রের উত্তর দেন। সেই চিঠি তাঁহার হস্তগত হয় নাই। স্পষ্টতঃই এই চিঠিখানি সোভিয়েট সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষ আটক করিয়াছিলেন। মার্চ্চ মাসের মাঝামাঝি পোলিভয় যে দ্বিতীয় পত্রখানি লেখেন তাহা মিঃ ফাষ্টের হস্তগত হয়।

মিঃ ফাষ্ট এই চিঠি পাওয়ার দশ দিন পরেই উত্তর দেন। কিন্তু প্রায় দুই মাস পার হইয়া গেলেও আজ পর্য্যন্ত পোলিভয়ের কাছ হইতে সেই চিঠির কোন উত্তর আসে নাই, অথবা পোলিভয় কোন উত্তর দেন নাই। মিঃ ফাষ্ট পরিশেষে এই সকল চিঠি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেন এবং "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় ঐ চিঠি-সমূহ প্রকাশিত হয়।

পোলিভয় তাঁহার চিঠিতে প্রধানতঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মিঃ ফাষ্টের সম্পর্কচ্ছেদের সিদ্ধান্তের সংবাদ পাইয়া তিনি যে মর্ম্মাহত হইয়াছেন ও মিঃ ফাষ্ট যে তাঁহাকে নিরাশ করিয়াছেন এই কথা বলিয়াছেন এবং কাপুরুষতা প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন। প্রাভদার এই প্রতিনিধিটি তাঁহার চিঠিতে মিঃ ফাষ্টের ১লা ফেব্রুয়ারীতে "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই মার্কিন ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সংযোগ অতি নিবিড় ও দীর্ঘদিনের। যে যে কারণ ও যুক্তি দর্শাইয়া তিনি এই সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন, তাহার কোন উল্লেখ পোলিভয় তাঁহার চিঠিতে করেন নাই।

টাইমস পত্রিকায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, মিঃ ফাষ্টের উপন্যাস ও নাটকসমূহ সোভিয়েট ইউনিয়নে খুবই সমাদৃত হইলেও কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত তাঁহার সম্পর্কচ্ছেদের কথা কোন সোভিয়েট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তবে তাঁহার কম্যুনিষ্ট পার্টি ত্যাগের কথা প্রকাশিত হইবার তিন দিন

পরেই সোভিয়েট রাশিয়া হইতে তাঁহার চিঠিপত্র আসা হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়।

পোলিভয়ের চিঠির উত্তরে মিঃ ফাষ্ট যে সকল কারণে কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন তাহা প্রশ্নাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু পোলিভয় এই সকল প্রশ্ন উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন, কোন উত্তর দেন নাই।

ইহুদী লেখকবর্গকে রাশিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাতে পোলিভয় কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, তিনি নীরব রহিয়াছেন। এই নীরবতা এবং পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসাবে বুলগানিন যে ইহুদী বিরোধিতার মনোভাব দেখাইতেছেন, মিঃ ফাষ্ট তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। তিনি তাঁহাদের লজ্জাকর সর্বজনীনতাবাদের এবং পোলদের মতানুসারে পোল্যাণ্ডের অন্তর্বিরোধের অবসানকল্পে ক্রুশ্চেভের ইহুদী বিরোধিতাকে কাজে লাগাইবার চেষ্টারও তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে মিঃ ফাষ্ট প্রশ্ন করিয়াছেন, আজ এইসব অভিযোগের কেউ প্রতিবাদ করে না কেন, যে সকল বিষয়ে আমরা এত কথা শুনিতেছি তাহার সামান্যতম সমালোচনা বা আত্মসমালোচনা কেন দেখিতে পাই না?

মিঃ ফাষ্ট অতঃপর তাঁহার চিঠিতে সোভিয়েট সংবাদপত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কচ্ছেদের কথা কেন প্রকাশিত হয় নাই এবং সোভিয়েট রাশিয়া হইতে তাঁহার চিঠিপত্র আসাই বা কেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, সেই প্রশ্ন পোলিভয়কে করিয়াছেন।

ফরমোজায় বিক্ষোভ

২৪শে মে ফরমোজায় প্রবল মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। জনতা ফরমোজার রাজধানী তাইপে শহরে মার্কিন দূতাবাস এবং মার্কিন সরকারের প্রচার দপ্তরে বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া সকল কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। চীনা জাতীয় সরকারের পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী বিপুল জনতার এইরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শনে কোনরূপ বাধা দিবারই চেষ্টা করে নাই। পরে অবশ্য সামরিক আইন জারী করিয়া চিয়াং সরকার বিক্ষোভপ্রদর্শনকারীদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের কারণ এইরূপ: তাইপে শহর হইতে কিছুদূরে মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক সার্জেণ্ট রবার্ট রেনল্ডস এবং তাহার স্ত্রী বাস করিত। গত ২০শে মার্চ মধ্যরাত্রির কিছু পূর্বে মিসেস রেনল্ডস স্নান করিবার সময় দেখিতে পায় যে একজন চীনা উঁকি মারিয়া তাহাকে দেখিতেছে। মিসেস রেনল্ডস তাহার স্বামীকে ডাকিলে সার্জেণ্ট রেনল্ডস একটি পিস্তল লইয়া বাহিরে যায় এবং দুইবার গুলী করিয়া সেই চীনাটিকে হত্যা করে। একটি মার্কিন সামরিক আদালতে সার্জেণ্ট রেনল্ডস-এর বিচার হয় এবং বিচারে রেনল্ডসকে নির্দোষ বলিয়া রায় দেওয়া হয়।

রেনল্ডস-এর এই বিচারে ফরমোসাবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহাদের মনে হইয়াছে যে, মার্কিন সামরিক আদালত সার্জেণ্ট রেনল্ডস-এর প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ২৪শে তারিখে মৃত চীনা মিঃ লিউর পত্নী এক প্লাকার্ড হাতে করিয়া তাইপে শহরে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সেই প্লাকার্ডে লেখা ছিল ঘাতক রেনল্ডস নির্দোষ নহে। মার্কিন সামরিক আদালতের অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর।" শীঘ্রই মিসেস লিউকে ঘিরিয়া এক জনতা জমিয়া উঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তেজিত জনতা মার্কিন দূতাবাস এবং প্রচার দপ্তর আক্রমণ করে।

২৫শে মে চীনা জাতীয় সরকার এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি দেন এবং মার্শাল চিয়াং কাই-শেক তিন জন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে অযোগ্যতার অজুহাতে বরখাস্ত করেন।

বাগদাদ চুক্তি

মে মাসের মাঝামাঝি করাচীতে বাগদাদ চুক্তি অর্থনৈতিক কমিটির যে অধিবেশন বসে তাহাতে প্রকাশ পায় যে, পাকিস্থান আইসেনহাওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। করাচী বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ণ সদস্যরূপে যোগদান করে। বাগদাদ চুক্তি অর্থনৈতিক কমিটিতে এই প্রথম সরাসরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সদস্যরূপে যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তি সংস্থার পূর্ণ সদস্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির সামরিক কমিটির সদস্যরূপে যোগদান করে; এত দিন পর্য্যন্ত বাগদাদ চুক্তি সংস্থা এবং উহার অর্থনৈতিক কমিটির বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি "পর্য্যবেক্ষক"রূপে যোগদান করিয়া আসিতেছিল, এবার অর্থনৈতিক কমিটির সদস্য হওয়ার ফলে বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক (যাহা বরাবর হইতেই ছিল) আরও বেশী প্রত্যক্ষ হইল। এই বৎসরের গোড়ার দিকে ঘোষিত আইসেনহাওয়ার "শূন্যস্থান পূরণের" নীতি স্মরণ রাখিলে বাগদাদ চুক্তি সংস্থার সহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের তাৎপর্য্য আরও স্পষ্ট হয়।

করাচীতে অনুষ্ঠিত বাগদাদ চুক্তি অর্থনৈতিক কমিটির বৈঠকে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী সভাপতিত্ব করেন। তিনি আইসেনহাওয়ার নীতির প্রতি পাকিস্থানের আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়া এই আশা প্রকাশ করেন যে, শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তি সংস্থার পূর্ণ সদস্যরূপে যোগদান করিবে।

২৭শে মে ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পাকিস্থান আইসেনহাওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পূর্বে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, আইসেনহাওয়ার নীতি-গ্রহণের ফলে পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে অর্থনৈতিক সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সাহায্যও পাইবার অধিকারী হইবে। বস্তুতঃ পাকিস্থানের এই নূতন ঘোষণার ফলে ভারতের সীমান্ত পর্য্যন্ত আইসেনহাওয়ার নীতি বিস্তৃত হইল। পাকিস্থান

কখনও মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র ছিল না—তথাপি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য পরিকল্পিত বাগদাদ চুক্তি এবং আইসেনহাওয়ার নীতির সহিত পাকিস্থানকে জড়ানো হইয়াছে। ইহার একটি ফল হইল এই যে, যদি কোন কারণে পাকিস্থান কাহারও সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে উক্ত চুক্তি এবং আইসেনহাওয়ার নীতি অনুযায়ী পাকিস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে সামরিক সাহায্য পাইবে।

কিন্তু কোন্ রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির বিরুদ্ধে পাকিস্থানের এইরূপ সামরিক ব্যবস্থা? পাশ্চাত্য দেশের সংবাদপত্রগুলি খোলাখুলিই বলিতেছে যে, প্রধানতঃ ভারতের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জনই পাকিস্থানের নীতির প্রধান লক্ষ্য—যেরূপ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় ইরাক এবং জর্ডানের বাগদাদ চুক্তিতে যোগদানের অন্যতম লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিয়াছে যে, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্থানকে প্রদত্ত মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হইবে না। কিন্তু সেই আশ্বাসের মূল্য কোথায়? পাকিস্থান যদি ভারতকে আক্রমণ করে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ভাবে তাহাকে বাধা দিবে? বাধা দিবার একটি উপায় হইতেছে—পাকিস্থানের উপর মার্কিনী প্রভুত্ব আরও প্রবলভাবে কায়েম করা অথবা যুদ্ধসৃষ্টির মূল—অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং উস্কানীদান—উচ্ছেদ করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে প্রথমটি অচল এবং দ্বিতীয়টি অবলম্বনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনিচ্ছুক। ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে তাহাতে ভারতের উক্ত নিরাপত্তার উপর ইঙ্গ-মার্কিন-পাকিস্থানী জোটের এক বিরাট চাপ পড়িয়াছে। ইহাকে প্রতিহত করাই ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পরীক্ষায় ফলাফল

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিতেছেন:

"গত বৎসরের তুলনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এসসি পরীক্ষায় এবারে পরীক্ষার্থীরা অনেক কম হারে পাস করিয়াছে। তাহা ছাড়া এবার আই-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা আই-এসসিতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেক হইয়াছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের বৈঠকে এই প্রসঙ্গটি উদ্বেগের সহিত আলোচিত হয়।

এ বৎসর আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৪৬'২ জন এবং আই-এসসিতে শতকরা ৪৯'৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর ঐ দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার ছিল যথাক্রমে ৫৩'৬ জন এবং ৫৩ জন। তাহার আগের বৎসর (১৯৫৫) আই-এ পরীক্ষায় শতকরা ৫৩ জন এবং আই-এসসিতে শতকরা ৪৭ জন পাস করে।

সিণ্ডিকেট এই দিন আই-এ এবং আই-এসসি পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করেন। প্রকাশ, এরূপ স্থির হয় যে, যাহারা এগ্রিগেটে এক নম্বরের জন্য ফেল করিয়াছে তাহাদের পাস করাইয়া দেওয়া হইবে। তাহা ছাড়া কয়েকটি বিষয়েও অল্পের জন্য যাহারা ফেল করিয়াছে তাহারাও যাহাতে যথাসম্ভব পাস করিবার সুযোগ পায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিতেও বলা হয় এইরূপ প্রকাশ। ঐসব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আই-এ এবং আই-এসসিতে উত্তীর্ণের উপরোক্ত হারে দশমিকের দুই-এক পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আগামী ১৪ই জুন তারিখের মধ্যে ঐ দুইটি পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

এ বৎসর আই-এ পরীক্ষা দিবার জন্য ২৪,৪১৬ জন এবং আই-এসসির জন্য ১৪,৫৬৭ জনের নাম তালিকাভুক্ত হয়। তন্মধ্যে সামান্য কিছুসংখ্যক ছাত্র নানা কারণে পরীক্ষা দিতে পারে নাই। নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে আই-এতে মোট ১০,১১০ জন উত্তীর্ণ হয়। তাহার মধ্যে প্রথম বিভাগে ১,০৫৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪,৮৭৮ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৪,১১৯ জন উত্তীর্ণ হয়। আই-এসসি পরীক্ষায় মোট ৬,৯১৩ জন উত্তীর্ণ হয়। তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে ১,৯৯১ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৩,৩৩৬ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১,৫৮৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

সকল বিষয় লইয়া কলেজ-বহির্ভূত পরীক্ষার্থী হিসাবে এবার যাহারা আই-এ পরীক্ষা দেয়, গতবারের তুলনায় তাহাদের পাসের হারও কম দেখা যায়। প্রকাশ, কলিকাতার কেন্দ্রগুলিতে ঐ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের শতকরা ৪০'৪ ভাগ উত্তীর্ণ হইয়াছে। গতবার ঐ উত্তীর্ণের হার ছিল শতকরা ৪৪ জন। সিণ্ডিকগণ এই বিষয়টিও আলোচনা করেন এবং গতবারের তুলনায় কলেজ-বহির্ভূত ছাত্রদের পাসের হার এবার কম হইলেও সাধারণভাবে ঐরূপ ফলে সন্তোষ প্রকাশ করেন। কারণ নিয়মিতভাবে কলেজে পড়াশুনা করিয়া ছাত্ররা যে হারে পাস করিয়াছে তাহার তুলনায় বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়া (অনেক ক্ষেত্রে ইহাদের আবার আপিস-সমূহে কাজ করিতেও হইয়াছে) যাহারা পরীক্ষা দিয়াছে তাহাদের মধ্যে পাসের হার ভাল বলিয়াই অনেক অভিমত প্রকাশ করেন।"

জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা

"উন্নয়নের" গতি কোনমুখে নিম্নের বিবৃতিতে তাহা দেখা যায়:

"পুণা, ৩রা জুন—বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীসি. ডি. দেশমুখ গত কাল "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়ন" শীর্ষক বক্তৃতামালার উপসংহার বক্তৃতায় দেশবাসীকে "জাতীয় উন্নয়নে"র শিক্ষা-শাখাকে "অবহেলা" করার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করিয়া দেন। তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনকে যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা নির্ব্বাহ করার মত অর্থ বরাদ্দ করা হয় নাই বলিয়া অভিযোগ করার হেতু আছে।

তিনি অতঃপর বলেন যে, বাজেটের সামঞ্জস্যবিধানের অজুহাতে কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষামন্ত্রণালয়ে অর্থবরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। ইহা সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে তিনি বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ এইচ. জি. ওয়েলসের উক্তি উদ্ধৃত করেন। মিঃ ওয়েলস বলিয়াছিলেন, "ইতিহাস শুধু শিক্ষা ও

বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রতিযোগিতা।" এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, বিশৃঙ্খলাই অগ্রগামী হইতেছে।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন রাজ্যসরকার ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি ইহার যৌক্তিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলেন, বর্ত্তমান অবস্থায় যেসব বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাঁহাদের মাধ্যমে যান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক ও মানব-সংস্কৃতিসংক্রান্ত শিক্ষার উন্নয়ন করাই আশু ও প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য।

নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি আলোচনা করিয়া শ্রীদেশমুখ বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন রাজ্যসরকারসমূহের উপর এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা যেন কমিশনের সহিত পরামর্শ করেন। কিন্তু রাজ্য-সরকারসমূহের উত্তরোত্তর নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়াইবার আগ্রহ এত বেশী যে, তাঁহারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার পর অর্থমঞ্জুরী কমিশনের সহিত পরামর্শ করেন।

শ্রীদেশমুখ ইহাও বলেন যে, বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উহা রূপায়ণের যোগ্যতা না থাকায়, তাঁহারা তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ করা অর্থ ব্যয় করিতে পারেন না। কেবল টাকা হইলেই ভাল কাজ করা যায় না। উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ও সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে বহু উন্নয়নসাধন করা যাইতে পারে।

শিক্ষার মাধ্যমের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীদেশমুখ বলেন, ইংরেজীর পরিবর্ত্তে যাহাতে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া যায়, যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা উচিত।

শ্রীদেশমুখ ইহাও প্রস্তাব করেন যে, একই পরীক্ষাপত্রের এমনকি একই প্রশ্নেরও ইংরেজী এবং আঞ্চলিক উভয় ভাষায় উত্তর দিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজী পরিভাষায় আঞ্চলিক ভাষায় তর্জ্জমার তিনি বিরোধী। তাঁহার মতে ইহার ফলে সমস্যা আরও জটিল হইবে।"

নূতন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান

আনন্দবাজার পত্রিকা খবর দিতেছেন:

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্গাপুরে কয়েকটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান খুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুইটি সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় এবং একটি কলেজ খোলা হইবে। ইহা ছাড়া কলা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য সহশিক্ষার ভিত্তিতে অপর একটি কলেজ খোলা হইবে। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা হয় বলিয়া প্রকাশ।

দুর্গাপুরে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত উক্ত স্কুল-কলেজ এবং অন্যান্য বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যুক্ত করা হইবে বলিয়াও জানা গিয়াছে।

এইদিন মন্ত্রীসভার অধিবেশনে পঞ্চায়েত আইনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পঞ্চায়েত গঠনের প্রস্তাবটি আলোচিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই পঞ্চায়েতগুলি বর্ত্তমান বৎসরেরই মধ্যেই গঠিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই জন্য ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার একটি পঞ্চায়েত ডিরেক্টরেট স্থাপন করিয়াছেন।"

জাতীয় উন্নয়নে উদ্ভট বাক্য

জবাহরলালজীর সারকথা এই যে, জাতীয় উন্নয়নের পূর্ব্বে দেশের লোকের অবনতি প্রয়োজন।

"নয়াদিল্লী, ৪ঠা জুন—প্রধানমন্ত্রী জবাহরলাল নেহরু অদ্য এখানে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের দুই দিনব্যাপী আলোচনার সমাপ্তি অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভারত সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে বদ্ধপরিকর।

শ্রীনেহরু বলেন, "আমরা যখন অর্থনৈতিক এবং আরও বহু রকম সঙ্কটের সম্মুখীন, তখনই আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। এই সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছি বলিয়া আমি আনন্দিত। কারণ, কোন বাধা অতিক্রম করিতে না হইলে, কাহারও কোনরূপ মহৎ কাজ সম্পাদনের প্রেরণা আসে না।"

শ্রীনেহরু বলেন যে, আগামী দুই বৎসর বাস্তবিকই বিশেষ সঙ্কটের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। তিনি আশা করেন যে, ইহার পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের শ্রমের সুফল দেখা দিতে থাকিবে। বাধাবিপত্তি এড়াইয়া গেলে হইবে না, এই সকল সমস্যা সমাধানের অন্য কোন পথ নাই।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোন কেন্দ্রীয় সরকারেরই—তাহা যত ভালই হোক না কেন—জনগণের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া চেষ্টা ফলবতী হইতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকার, বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা ছাড়া সমগ্র পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা সম্ভব নয়। অসুবিধাগুলি জনগণের বুঝা উচিত এবং অসুবিধার কথা তাহাদের কাছে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করা হইবে। বরাবরই তিনি দেখিয়াছেন, অসুবিধার কথা বুঝাইয়া বলিলে জনগণ তাহা অনুধাবন করিতে পারে। শ্রীনেহরু বলেন, "আশা করি, আমরা আমাদের মহৎ কর্ত্তব্যের কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বিরত থাকিব না, নির্ভীক চিত্তে উহার সম্মুখীন হইয়া সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে সচেষ্ট হইব।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য অর্থাগমের উপায়, পরিবার পরিকল্পনা এবং খাদ্যশস্যকে ১৯৫৬ সালের কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর বিলের 'ঘোষিত পণ্য' তালিকাভুক্ত করার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনাকালে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ যথাসম্ভব শীঘ্র পরিবার পরিকল্পনা অফিসার নিয়োগের প্রস্তাবটি মানিয়া লন।

মিলজাত বস্ত্র, তামাক (তামাকজাত পণ্যসহ) ও চিনির উপর বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক যে বিক্রয়কর ধার্য্য আছে, তৎস্থলে এই সকল দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ধার্য্য উৎপাদন-

উপর 'সারচার্জ্জ' ধার্য্য করার প্রস্তাবটিও পরিষদে আলোচিত হয়। পরিষদ এই সম্পর্কে অর্থ কমিশনের সুপারিশের জন্ম অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ পুস্তকসমূহকে বিক্রয়করের আওতা হইতে রেহাই দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

বৈদেশিক সহযোগিতা

আমাদের কর্ত্তাদের কার্য্যকলাপ বিচিত্র। নিম্নের সংবাদে তাহার কিছু দেখা যাইবে।

"নয়াদিল্লী, ৯ই জুন—বৈদেশিক সহযোগিতায় বড় রকমের শিল্প-পরিকল্পনাগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ম জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন ও কয়েকটি বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কথাবার্ত্তা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

দেশেই নূতন নূতন শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা এই সকল শিল্প-পরিকল্পনার লক্ষ্য। কর্পোরেশন এই প্রকার অনেকগুলি পরিকল্পনার কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিকের পরীক্ষাকার্য্য শেষ করিয়াছেন।

কর্পোরেশন গবর্ণমেন্টের অনুমোদনক্রমে (ক) শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, (খ) ঔষধ, রঞ্জক ও প্লাষ্টিক শিল্পের আনুষঙ্গিক উৎপাদন এবং (গ) এলুমিনিয়াম ও কৃত্রিম রবারের মত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল উৎপাদন সম্পর্কিত পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করিবেন। ভারী যন্ত্রপাতির কয়েকটি অংশ নির্ম্মাণের জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়া ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের একটি করিয়া ও পশ্চিম জার্ম্মানীর দুই ফার্ম্ম মোট চারটি ফার্ম্মের নিকট হইতে বিস্তৃত রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞ দল এবং ব্রিটিশ হেভী ইঞ্জিনিয়ারীং মিশনের সুপারিশ প্রাপ্তির পর ভারত সরকার সম্প্রতি ভারী মেশিনারী নির্ম্মাণের নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি কার্য্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন: ভারী মেশিন তৈয়ারীর একটি কারখানা, একটি ঢালাই কারখানা, ভারী ধাতুর চাদর ও কাঠামো নির্ম্মাণের কারখানা, মেশিন টুল কারখানা এবং খনিসংক্রান্ত মেশিনারী তৈয়ারীর কারখানা।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও মেশিনারী নির্ম্মাণের জন্ম আবশ্যক বিশেষ ধাদ ষ্টেনলেস ষ্টীল প্রস্তুত সম্পর্কে কর্পোরেশন চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, ইটালী ও ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের কয়েকটি ফার্ম্মের নিকট হইতে প্রাথমিক রিপোর্ট পাইয়াছেন। পরিকল্পনাগুলির আকার ও ঐগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক সুপরিচিত মেটাল কর্পোরেশনের বিশেষজ্ঞগণ ১০ হাজার টন উৎপাদনে সক্ষম একটি এলুমিনিয়াম কারখানার কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক সম্বন্ধে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া কয়েকটি প্রসিদ্ধ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের সহিত কথাবার্ত্তা চলিতেছে। জনৈক আমেরিকান বিশেষজ্ঞ বৎসরে ২০ হাজার টন কৃত্রিম রবার উৎপাদনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়াছেন।"

শিল্পাঞ্চলে কর্ম্মসংস্থান

শ্রীযুক্ত গুরুগোবিন্দ বসু অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। কর্ম্মসূত্রে বহু ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ তাঁহাকে করিতে হয়। সেজন্ম "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে উদ্ধৃত নিম্নস্থ বিবরণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

"বুধবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় জাতীয় বণিক-সভার ৭০তম বাৎসরিক সাধারণ সভায় বিদায়ী সভাপতি শ্রীজি. বসু পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলে প্রকৃত কি কারণে কর্ম্মসংস্থান ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে তাহা নির্ণয়ের জন্ম রাজ্য সরকারের উদ্দেশে আবেদন জানান।

পশ্চিমবাংলার শিল্প-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য রাজ্যে স্থানান্তরিত হইতেছে এই মর্ম্মে প্রকাশিত সংবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, সামান্য যেটুকু খবর বাহির হইয়াছে তাহাতে সুনিশ্চিত কোন উপসংহারে উপনীত হওয়া কঠিন। কেননা স্থানান্তরিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুব বেশী নহে। কিন্তু পরিসংখ্যান দেখিয়া মনে হয়, গত কয়েক বৎসর যাবৎ অন্যান্য রাজ্যের শিল্পাঞ্চলে যেখানে কর্ম্মসংস্থানের অবকাশ বৃদ্ধি পাইতেছে, পশ্চিমবাংলার শিল্পাঞ্চলে সেখানে মোট কর্ম্মসংস্থানের অবকাশ উল্লেখযোগ্য রকমে হ্রাস পাইতেছে। কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্ম্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও অন্যান্য রাজ্যে অনুরূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অনুপাতে অতিরিক্ত কর্ম্মসংস্থানের হার অনেক কম হইয়াছে। তাঁহার মতে পশ্চিমবাংলা যে শিল্পোদ্যোগীদের পক্ষে কম আকর্ষণযোগ্য হইয়া পড়িতেছে, ইহা তাহার একটি লক্ষণ। ইহার মূলে ক্রমবর্দ্ধমান শ্রমিক-অসন্তোষ অথবা সর্ব্বত্র ইস্পাতের একমূল্য প্রবর্ত্তন কিংবা অন্য কোন কারণ ক্রিয়া করিতেছে, তাহা সযত্নে খতাইয়া দেখা দরকার। "আমি আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন।"

শ্রীবসু তাঁহার ভাষণে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা, কর, মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যসমস্যা, বিক্রয়কর, উদ্বাস্তু ও বেকার-সমস্যা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করেন।

আগামী বৎসরের জন্ম শ্রীপি. এন. তালুকদার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং গত দুই বৎসর শ্রীবসু যেভাবে বণিকসভার নেতৃত্ব করিয়াছেন, তিনি তাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বেকার-সমস্যা সম্পর্কে শ্রীজি. বসু আরও বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিশেষভাবে এই সমস্যাটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং ইহা তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে, রাজ্যে যে সব শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের যথেষ্ট কর্ম্মসংস্থান হয় না। বলিতে গেলে পশ্চিম বাংলার সকল শিল্পে দক্ষ ও সাধারণ শ্রমিকদের পশ্চিম বাংলার বাহির হইতেই লওয়া হয়। আরও ভাবনার কথা এই—সম্প্রতি লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কর্ম্মখালি হইলে তথায় রাজ্যের অধিবাসীদের

লওয়া হইতেছে না। আগে এই ক্ষেত্রেই রাজ্যের অধিবাসীদের বেশীর ভাগ কাজ পাইত। ফলে উন্নয়নকার্য্যের সম্প্রসারণসত্ত্বেও স্কুল-কলেজোত্তীর্ণ যুবকেরা কোন কাজ পাইতেছে না। রাজ্যের জননেতাদের এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় হইয়াছে এবং তিনি মনে করেন, সময় থাকিতে এই সমস্যা সমাধানে যত্নবান না হইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

শ্রীজি. বসু তাঁর অভিভাষণের প্রথমেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সমালোচনাকালে কয়েকটি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, গত এক বৎসরের ঘটনাবলীতে তাঁহাদের এই আশঙ্কা যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে. অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অর্থনৈতিক কাঠামোয় জবরদস্তি করিয়া এরূপ উন্নয়ন-পরিকল্পনা চালু করিতে যাওয়া সমীচীন হয় নাই। ইহা এখন স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, পরিকল্পনা বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ হইয়াছিল তাহা যথেষ্ট হয় নাই এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ পরিকল্পনার কল্পনাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। পরিকল্পনা রচনাকালে খাদ্যাবস্থার অবনতি গণ্য করা যায় নাই। বিদেশী মুদ্রার বিষম অপ্রাচুর্য্য ঘটিলে কি হইবে তাহারও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। তিনি মনে করেন, পরিকল্পনা কমিশনের মত যোগ্য সংস্থার ভবিষ্যতের জরুরী অবস্থা সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়া উচিত ছিল। সরকার সম্ভবতঃ এই অভিমত পোষণ করেন যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা যখন লোকসভার অনুমোদন লাভ করিয়াছে, তখন উহা হইতে আর পিছাইয়া আসিবার উপায় নাই। সুতরাং, সরকার যেসব কাজ হাতে লইয়াছেন তাহাদের গতি মন্দীভূত করা হইবে "এরূপ কল্পনা করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।"

করভার সম্পর্কে শ্রীবসু বলেন, পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর এমনভাবে কর ধার্য্য করা হইয়াছে, যাহাতে পাঁচ বৎসরে ৮০০ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যায়। পরিকল্পনার এখনও তিন বৎসর বাকি। সুতরাং, কমিশন যে সীমারেখা টানিয়াছেন তাহা উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীবসু বলেন, সরকারী ক্ষেত্রে খরচের বহর যেভাবে স্ফীত হইতেছে তাহাতে সব দ্রব্যেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, আরও বাড়িবে এবং সঙ্গত সীমারেখা ছাড়াইয়া গেলে সরকারের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদেশী মুদ্রার স্বল্পতাহেতু বিদেশ হইতে ব্যবহার্য্য দ্রব্য আমদানী অপেক্ষাকৃত সহজ করিয়া দিয়া স্ফীতি নিবারণের জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনও সরকারের পক্ষে এখন সম্ভব নহে। রপ্তানী কারবারের দ্বারা এই অবস্থার লাঘব করার মত রপ্তানী কারবারও হইতেছে না। সেখানেও বিদেশের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা।

শ্রীবসু বলেন, খাদ্যাবস্থা উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িয়াছে এবং পশ্চিম বাংলায় অজন্মার ফলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়াছে। রাজ্যান্তর হইতে চাউল বা ধান আমদানী করার পথে যে বাধা আছে তাহাও অবস্থাকে জটিলতর করিয়া ফেলিতেছে। দেখা যাইতেছে, সমগ্র দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করা ছাড়া উপায় নাই। আশা করা যায়, কাহারও নিকট মজুত খাদ্যশস্য আয়ত্ত করার যে নীতি সরকার অবলম্বন করিতেছেন, তাহা মূল্যমানে স্থিরতা আনিয়া দিবে।

ব্যাঙ্কের সহায়তা ও পুঁজি নিয়োগে কারবারীদের পক্ষে যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে শ্রীবসু তাহা উল্লেখ করেন এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনে মধ্যভারতে দণ্ডকারণ্যের পরিকল্পনা সফল হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন।"

সরকারী দুর্নীতির দৃষ্টান্ত

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :

"পশ্চিমবঙ্গ ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের পরিচালন-ব্যবস্থায় নানা গলদ, হিসাবপত্রে অসঙ্গতি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্নীতি এমন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে, এই বোর্ডের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ বোর্ড সম্পর্কে রীতিমত উদ্বেগ বোধ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

একাউণ্টস ও ষ্টোরস বিভাগের হিসাবপত্রে নানাপ্রকার অসঙ্গতি, কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে পক্ষপাতিত্ব এবং স্বজন-পোষণ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বোর্ডের মোটরগাড়ী যথেচ্ছ-ভাবে ব্যবহার, কণ্ট্রাক্ট দিবার কালে সাধারণ বিধি লঙ্ঘন, পার্চ্চেজের ব্যাপারে ত্রুটিবিচ্যুতি প্রভৃতি গলদ সম্পর্কে অভিযোগ বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল মহল হইতেই আমাদের নিকট করা হইয়াছে। উক্ত মহল বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, প্রত্যেকটি অভিযোগ প্রমাণ করিবার মত কাগজপত্র যথেষ্ট আছে এবং এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য সরকার যদি কোন নিরপেক্ষ কমিটি নিযুক্ত করেন তাহা হইলে উহার সম্মুখে সেগুলি উপস্থিত করা যাইতে পারে।

ওয়াকিবহাল মহলের অভিযোগে প্রকাশ, বোর্ডের জনৈক প্রভাবশালী সরকারী সদস্যকে কেন্দ্র করিয়া বোর্ডের ভিতরে কয়েকজন পদস্থ কর্ম্মচারীর এক "তাঁবেদার চক্র" সৃষ্ট হইয়াছে। এই চক্রটিই যাবতীয় গলদের মূল কারণ।

বোর্ডের কার্য্য পরিচালনায় যে অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি রহিয়াছে তাহা দূর করিতে হইলে অবিলম্বে এক নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন বলিয়া বোর্ডের সহিত যুক্ত কোন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করেন এবং "এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের" প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বোর্ড গঠিত হইবার পর দুই বৎসর অতীত হইয়াছে অথচ আজ পর্য্যন্ত পূর্ণ হিসাব বোর্ডের সামনে পেশ করা হয় নাই। বোর্ডের জনৈক বেসরকারী সদস্য এই সম্পর্কে চীফ একাউণ্টস অফিসারের নিকট যে প্রশ্নাবলী পাঠান তাহার সন্তোষজনক জবাবও দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। তবে চীফ একাউণ্টস অফিসার স্বীকার করিয়াছেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এবং ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারের আপিস হইতে হিসাব প্রভৃতি পাইবার কোন বিধিবদ্ধ

রীতিই নাই। প্রচুর কাজ যে বাকী পড়িয়া আছে চীফ একাউণ্টস অফিসার তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। খাতাপত্রে দেখা যায় যে, বোর্ড গঠিত হইবার পূর্ব্বের হিসাবও তৈয়ারি করা হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৯৫২-৫৩ সনের হিসাবও বাকী পড়িয়া আছে।

তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে অফিসারের অযোগ্যতার ফলে এত হিসাব বাকী পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকেই আবার উচ্চতর পদে উন্নীত করা হইয়াছে। তাঁহার বেতনও মাসে ১০০ টাকা করিয়া বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বিধান-সভায় নিন্দাবাদ

রাজনীতিতে খেউড় গানের ও লম্ফঝম্পের যে নিদর্শন বাংলায় পাওয়া যায় তাহা অদ্ভুত। সম্প্রতি সকল সীমা লঙ্ঘন করার ফলে রুলিং জারি হইয়াছে—

"শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জ্জি এরূপ এক গুরুত্বপূর্ণ রুলিং দেন যে, সভাকক্ষে কোন সদস্য যদি অপর কোন সদস্য বা তাঁহার দল অথবা বাহিরের কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কোন অভিযোগ করেন যাহার সমর্থনে তাঁহার নিকট কোন সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য নাই তবে তাহা অসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইবে। শ্রীব্যানার্জ্জি বলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কোন সদস্যকেই ঐ ধরনের তথ্যাদি দ্বারা অসমর্থিত অভিযোগ সভাকক্ষে উত্থাপন করিতে দিবেন না। কয়েকদিন পূর্ব্বে বিধানসভা কক্ষে কংগ্রেস দলের শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্ল বিরোধী পক্ষের শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার দল আর-এস-পি সম্পর্কে বিপক্ষীয় নরনারীদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন, গান্ধীজী নেতাজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আলেখ্য অপবিত্রকরণ প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ করিলে সভাকক্ষে উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ঐ সম্পর্কেই এই দিন স্পীকার উপরোক্তরূপ রুলিং দেন।"

পণ্ডিত নেহরুর স্তোকবাক্য

"নয়াদিল্লী, ১লা জুন—প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু অদ্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে কঠোর আত্ম-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করান। পণ্ডিত নেহরু কংগ্রেসকর্ম্মীদের মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণ মনোভাব, কলহ ও লজ্জাকর মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া তীব্র সমালোচনা করেন।

এই আত্মসমালোচনা হইতে পণ্ডিত নেহরু নিজেকেও অব্যাহতি দেন নাই। তিনি বলেন, কংগ্রেস শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় বৃদ্ধ এবং অন্যান্য যাঁহারা গদি আঁকড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত একটি সম্প্রদায়বিশেষে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা নবীনদের কাজ করিতে দেন না, নবীনরা আসিলেও তাহাদের বিশেষ কোন কাজ থাকে না।

পণ্ডিত নেহরু অবশ্য দৃঢ়তার সহিত ইহাও বলেন যে, এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিবার শক্তি কংগ্রেসের আছে এবং অতীতে স্বাধীনতা-সংগ্রামকালে কংগ্রেস যেরূপ কাজ করিয়াছে পুনরায় সেইরূপ কাজ করিতে পারিবে। তিনি কঠোর আত্মবিশ্লেষণ দ্বারা ত্রুটিসমূহ দূর করিয়া মূল হইতে শক্তিসংগ্রহের আহ্বান জানান।

কংগ্রেসকে আরও সক্রিয় এবং ব্যাপকতর ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

কংগ্রেসের ত্রুটিবিচ্যুতি ও সাংগঠনিক গলদ দূর করিবার জন্য আত্মসমালোচনা বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া পণ্ডিত নেহরু উল্লেখ করেন এবং বলেন, ইহা আভ্যন্তরীণ উন্নতিরই লক্ষণ। তিনি বলেন, কংগ্রেস ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে এবং ইতিহাস সৃষ্টি করিবে, কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে তখনই যখন কংগ্রেস ইতিহাসের বিবর্ত্তনের সহিত উহার চিন্তাধারা ও আদর্শের সহিত এবং পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে। তিনি বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান যা ইতিহাসের কোন বিশেষ পর্য্যায়ে ভাল ছিল, পরবর্ত্তী কোন পর্য্যায়ে তাহা ভাল নাও থাকিতে পারে। শুধু কংগ্রেস নহে, ভারতের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাধারণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে ও পরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইতে এবং ভারতের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞান হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ভাল নহে। বস্তুতঃপক্ষে বহু এলাকায় ইহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মূল ভিত্তিই আজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানের শক্তি তাহার ঊর্দ্ধতনদিগের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে নীচের দিকে মূল ভিত্তির উপর। কয়েকটি ক্ষেত্র ভিন্ন এই প্রতিষ্ঠানের নীচের দিকে মূল ভিত্তিতে আজ আর কোন কাজ হইতেছে না। কংগ্রেসের সভাপতি, ওয়ার্কিং কমিটি অথবা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কতখানি উপযুক্ত তাহাতে আসিয়া যায় না, কিন্তু মূল হইতে শক্তি সংগ্রহ ও পুষ্টি সঞ্চার না হইলে প্রতিষ্ঠান সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। মূল আজ শুকাইয়া যাইতেছে, অবশ্য সর্ব্বত্র নহে, কোন কোন স্থানে। আমি এইরূপ প্রবণতার উল্লেখ করিতেছি মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ কংগ্রেস যে প্রণালীতে আজ কাজ করিতেছে তাহা সন্তোষজনক নহে। কাগজে-কলমে আমাদের এক কোটি বা দু' কোটি সদস্য আছে। কিন্তু তাহারা কয়জন প্রকৃত সদস্য? এক কোটি বা দুই কোটি সদস্য কংগ্রেসকে একটি বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত করিতে পারিত যদি তাহারা প্রকৃত সদস্য হিসাবে যথাযথ-ভাবে কাজ করিত। ভুয়া সদস্যেরা আমাদের শক্তি সঞ্চার করিতে পারে না। আমি বরং শতকরা ৯০ ভাগকে বাদ দিয়া সেই ১০ ভাগকে রাখার পক্ষপাতী, যাহারা আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, শৃঙ্খলার অভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। শৃঙ্খলাবোধ একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অত্যাবশ্যক। অতীতে স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছে। অপর কোন মহত্তর আকাঙ্ক্ষা দ্বারা আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

অম্বুবাচী

শ্রীসুখময় সরকার

আষাঢ় মাস। গগনে গগনে ঘনঘটা। একদিন আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ আরম্ভ হয়, জলের ভাষায় দিগ্‌দেশ মুখর হইয়া উঠে সেদিন 'অম্বুবাচী'। বঙ্গাব্দ গণনায় ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হয়, ১০ই আষাঢ় নিবৃত্তি।

অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে নানাস্থানে নানাবিধ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভারতের শ্রেষ্ঠ তন্ত্রপীঠ কামরূপের কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে যে উৎসব হয়, তাহাই অম্বুবাচী উপলক্ষ্যে বৃহত্তম উৎসব। প্রসিদ্ধি আছে, দেবী সেদিন রজস্বলা হন। একটা ত্রিকোণাকার শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া গৈরিক জল-স্রোত প্রবাহিত হয়, ইহা হইতেই উক্ত কল্পনার উদ্ভব হইয়াছে। ভারতবর্ষ কবির দেশ, আমাদের শাস্ত্রকারগণ সকলেই কবি ছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ বর্ণনাই উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত। অলঙ্কারের প্রাচীর ভাঙিয়া তথ্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু আমরা তাহা করি না. করিতে চাহি না। আমরা আমাদের জীবনকে কবি-কল্পনায় অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিতেই আনন্দ পাই। তথ্যানুসন্ধানের জন্য আমরা কিছু-মাত্র ব্যগ্র নহি। কবি যাহা কল্পনা করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহাই সত্য হইয়া উঠিয়াছে; সে কল্পনার তথ্যগত মূল্য সম্বন্ধে আমরা প্রশ্নমাত্র করি না। কবি যাহা কল্পনা করেন, শিল্পী তাহাকে রূপ দেন; কবি ও শিল্পীর এই মিলিত শক্তি সমগ্র জাতির জীবনে যত প্রভাব বিস্তার করে, এমন বোধ হয় আর কিছুতেই করে না। বেদ ও পুরাণের প্রত্যেকটি উপাখ্যান এবং আমাদের দেব-দেবীর মূর্তি-কল্পনায় এই সত্যের ইঙ্গিত আছে।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলেন। প্রিয়তমা পত্নীর শোকে উন্মত্ত শিব রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া প্রলয়-নৃত্য আরম্ভ করিলেন। বিশ্ব-সৃষ্টি রসাতলে যাইবার উপক্রম হইল। দেবগণ প্রমাদ গণিলেন। সতীদেহ যতক্ষণ শিবের স্কন্ধে আছে, ততক্ষণ তাঁহার তাণ্ডব-নৃত্য থামিবে না। সুতরাং বিষ্ণু তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করিয়া তাঁহার অগোচরে চক্রের দ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। এইরূপে সতীদেহ একান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 'পৃথিবী'র নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইল। যে-যে স্থানে এক-একটি অঙ্গ পতিত হইল, সে-সে স্থানে একটি করিয়া পীঠস্থান গড়িয়া উঠিল। কামরূপে দেবীর যোনি পতিত হইয়াছে। ইহা তান্ত্রিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান।

বলা বাহুল্য, এই উপাখ্যানের 'পৃথিবী' ভারতবর্ষ। পুরাকালে স্বদেশই ছিল পৃথিবী। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একান্নটি পীঠস্থান অবস্থিত। পুরাণকার বলিতেছেন, "হে ভারতবাসী, সমগ্র ভারতভূমিই জগন্মাতার পবিত্র দেহ; সমস্ত দেশ তোমার পূজ্য।" তখন দেশ, জগৎ ও জগন্মাতা একাকার হইয়াছিল। চিন্তার এই ধারাটি অদ্যাবধি আমা-দের মধ্যে অব্যাহত আছে।

অম্বুবাচীতে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হইলে ধরিত্রী জলসিক্তা হন। কামরূপে (আসামে) বারিপাত সর্বাপেক্ষা অধিক। সেখানকার ভূমি সর্বাধিক রসসিক্ত হয়, কবি-কল্পনায় সেখানেই জগন্মাতার রজঃপ্রকাশ হয়। রজোদর্শন না হইলে গর্ভধারণ সম্ভবপর নহে। পৃথিবীও জলসিক্তা হইলে শস্য-ক্ষেত্রে কর্ষিত এবং শস্যবীজ উপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে কল্পনা ও বাস্তব মিলিয়া মিশিয়া এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের উদ্ভব হইয়াছে। প্রাকৃত রমণী রজস্বলা হইলে অশুচি হন, ধরিত্রীও অম্বুবাচীতে অশুচি হন। সুতরাং অম্বুবাচীতে সদাচারী ও নিষ্ঠাবান্ লোকেরা, বিশেষতঃ বিধবারা, অশুচি ভূমির উপর খাদ্য-পানীয়াদি রাখিয়া তাহা গ্রহণ করেন না। কেবল তাহাই নহে, অম্বুবাচীর কয়দিন তাঁহারা সদ্যঃপক্ব অন্নাদি গ্রহণ করেন না, পর্যুষিত শুষ্ক খাদ্য এবং অম্বুবাচী প্রবৃত্তির পূর্বে সংগৃহীত পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। যতক্ষণ অম্বুবাচী থাকে, ততক্ষণ হলকর্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

স্থানবিশেষে অম্বুবাচীর কয়দিন আম্রভক্ষণ ও দুগ্ধ-পানের প্রথা আছে। পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চলবিশেষে অম্বুবাচী শব্দ প্রাকৃতজনের মুখে 'অম্ববতী' কোথাও বা 'আমড়াবতী' রূপ ধারণ করিয়াছে। যাহারা 'অম্ববতী' বলে, তাহারা মনে করে 'অম্ব' মানে আম, তাই ঐ দিন আম খাইতে হয়। যাহারা 'আমড়াবতী' বলে, তাহারা সত্য সত্যই ঐ দিন আমড়া (আম্রাতক) খাইয়া থাকে। শব্দ-বিকৃতি হইতে অর্থ-বিকৃতি এবং তাহা হইতে লোকাচারের এইরূপ বৈষম্য অনেক দেখা যায়। অম্বুবাচীর কয়েক দিন ফলাহারের যে বিধি আছে তাহার কারণনির্ণয় সহজসাধ্য। সে সময় প্রবল বারিবর্ষণ হয়, ঘরদ্বার জলে পরিপূর্ণ হয়, জ্বালানি কাঠ সিক্ত

হইয়া যায়, রন্ধন প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কারণেই অনেকে ফলাহার করেন এবং কেহ কেহ পর্যুষিত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করেন।

৭ই আষাঢ় রবির দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়, দক্ষিণ-সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প লইয়া মৌসুমী বায়ু বহিতে আরম্ভ করে। সেদিন আসাম অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অন্যত্র ইহার দুই-এক দিন পরে পরে বর্ষণ আরম্ভ হয়। ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে, ইহা বর্তমানকালের ঘটনা। কিন্তু চিরকাল কি ৭ই আষাঢ় অম্বুবাচী হইত? অয়নদিন শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্‌গত হয়, সুতরাং ঋতুর আরম্ভ-কালও পিছাইয়া আসে। ঋতু এক মাস পশ্চাদগত হইতে কিঞ্চিদধিক দুই সহস্র বৎসর সময় লাগে। প্রাচীনকালে আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী হইতে পারিত না—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক ইত্যাদি মাসে অম্বুবাচী হইত। তাহার প্রমাণ আমাদের পুরাতন সাহিত্যে, পৌরাণিক কাহিনীতে এবং পূজাপার্বণে ছড়াইয়া আছে। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব।

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বর্ষা নামিতে দেখিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আবার উক্ত পাঠ যে ভ্রান্ত তাহাও প্রমাণ করিবার জন্য কেহ কেহ লেখনী চালনা করিয়াছেন। কথাটা পুরাতন হইলেও আর একবার আলোচনা করিতে দোষ নাই। বর্তমানকালে অম্বুবাচী হয় ৭ই আষাঢ়। ১লা আষাঢ় অম্বুবাচী হইতে এখনও প্রায় পাঁচশত বৎসর বিলম্ব আছে। কালিদাস দেড় হাজার বৎসর অথবা দুই হাজার বৎসর পূর্বে জীবিত থাকিলে তাঁহার পক্ষে ১লা আষাঢ় বর্ষা নামিতে দেখা কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না। "আষাঢ়স্য প্রশম দিবসে" পাঠ ধরিলে বরং অর্থ-সঙ্গতি হয়। প্রশম দিবসে, অর্থাৎ শেষ দিনে। আষাঢ় মাসের শেষ দিনে বর্ষা নামিত অদ্য হইতে প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৫ম শতকে। সে সময় গুপ্ত রাজগণের রাজত্বকাল। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল এবং সেই সময়ের পঞ্জিকা অনুযায়ী কালিদাস "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" বর্ষা নামিতে দেখিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই যুক্তিযুক্ত। কালিদাস যে গুপ্তরাজগণের সময়েই জীবিত ছিলেন তাহার সপক্ষে প্রমাণের সংখ্যাই অধিক, বিপক্ষে প্রমাণের সংখ্যা অতি অল্প।

শ্রাবণ-পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। ঝুলনের অপর নাম হিন্দোল। পুরাণে বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ সেদিন দোলায় আরোহণ করিয়া দুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণ বিষ্ণু, বিষ্ণু সূর্য। প্রকৃতপক্ষে সেদিন সূর্য রূপ কৃষ্ণ দোলায় আরোহণ করিয়া দক্ষিণায়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই রূপক হইতে বুঝিতেছি, এককালে শ্রাবণ পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, অম্বুবাচী হইয়াছিল। ঝুলনযাত্রা উৎসবে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে। ঝুলনযাত্রা শ্রাবণ মাসের শেষে ধরিতে পারি। এখন আষাঢ়ের ৭ই অম্বুবাচী হয়। অতএব অম্বুবাচীর দিন প্রায় ১¾ মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অয়নাদি এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২০০০ বৎসর লাগে; অতএব ২০০০ × ১¾ = ৩৫০০ বৎসর পূর্বে শ্রাবণ-পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন ও অম্বুবাচী হইয়াছিল।

শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসাপূজা। সেদিন উনানের মধ্যে সিজ-মনসার ডাল রাখিয়া দুগ্ধ দিয়া মনসাদেবীর পূজা করিতে হয়। কোন কোন স্থানে মৃন্ময় সর্পাঙ্কিত ঘটে মনসাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থানে মনসাদেবীর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া আড়ম্বরের সহিত পূজা হয়। পূর্ববঙ্গে মনসাপূজা প্রায় দুর্গোৎসবের প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। অবশ্য সর্পাঙ্কিত ঘটে ও প্রতিমায় মনসাপূজা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন; কিন্তু উনানের মধ্যে সিজ-মনসার ডালে মনসাপূজা একটি প্রাচীন উৎসব। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে যে সময় অম্বুবাচী হইত, সেই সময় মনসাপূজার প্রবর্তন হইয়াছিল। ঘোর বর্ষা নামিয়াছে, চারিদিকে খাল-বিল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সর্পের গর্তের মধ্যে জল প্রবেশ করিয়াছে; তাহারা আশ্রয়ের জন্য ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া অবশেষে গৃহস্থের রন্ধনশালায় উনানের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। দুগ্ধপান করিতে পাইলে সর্প কাহাকেও দংশন করিবে না, এই বিশ্বাসে সর্পের জন্য উনানের ভিতর এক বাটি দুধ রাখিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে সর্পপূজা তথা মনসাপূজার উদ্ভব হইয়াছে। উনানের মধ্যে সর্প আশ্রয় লইয়াছে, সুতরাং তাহাতে অগ্নি-প্রজ্বালন করিয়া রন্ধনের উপায় নাই। অতএব মনসাপূজার দিন 'অরন্ধন' বিহিত হইয়াছে। ঘোর বর্ষায় রন্ধনের আয়োজনও অতি কষ্টকর। এইজন্য পূর্বদিনের পর্যুষিত অন্নব্যঞ্জন সেদিনকার আহার্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভাদ্র মাসেও একদিন অরন্ধনের রীতি অঞ্চলবিশেষে প্রচলিত আছে। তারিখ নির্দিষ্ট নাই, ভাদ্রের মাঝামাঝি ইহা অনুষ্ঠিত হয়। বাঁকুড়ায় ইহার নাম 'খইধারা', বর্ধমানে 'খই-দই'। লোকে সেদিন অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করে না, খই মুড়ি মুড়কি চিঁড়া দই দুধ ইত্যাদি খাইয়া থাকে। এই আচারটিও প্রাচীনকালের অম্বুবাচীর স্মৃতি বহন করিতেছে। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে অম্বুবাচী হইয়াছিল প্রায় ৩১০০ বৎসর পূর্বে; ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি অম্বুবাচী হইয়াছিল তাহারও প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে।

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্ম-

বৈবর্তপুরাণ ও হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের জন্মক্ষণের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সেদিন আকাশ ভাঙিয়া বর্ষা নামিয়াছিল, অম্বুবাচী হইয়াছিল। ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী ধরিতে পারা যায়। অতএব তদবধি অম্বুবাচীর দিন দুই মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। স্থূল গণনায় প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল; জন্মাষ্টমী উৎসবে সেই কালের স্মৃতি রক্ষিত আছে।

ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে শক্রোত্থান। ইহার প্রচলিত নাম ইন্দ-পরব। এই দিনে ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করা হয় এবং কোন কোন স্থানে অদ্যাপি ইন্দ্রযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বৈদিক সাহিত্য পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, দক্ষিণায়ন দিনে সূর্যের যে শক্তি বৃষ্টি আনয়ন করেন, তিনিই ইন্দ্র। বৈদিক যুগে ইন্দ্রদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ করা হইত। বিশ্বাস ছিল যে, ইন্দ্রদেব যজ্ঞের হব্য-কব্য ভোজন করিয়া শক্তিসঞ্চয়-পূর্বক বৃত্রাসুরকে হত্যা করিবেন, তখন বৃষ্টিধারা অসুরের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধরায় নামিয়া আসিবে। কবে দক্ষিণায়ন হইবে, তাহা জানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; কারণ বর্ষাকাল আরম্ভের পূর্বেই কৃষিকর্মের আয়োজন করিতে হয়। চেদী দেশের রাজা উপরিচর-বসু শক্রোত্থান উৎসবের প্রবর্তন করিয়া দক্ষিণায়ন-দিন নির্ণয়ের কৌশল দেখাইয়া দিয়াছিলেন। 'প্রবাসী'তে (পৌষ, ১৩৬১) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে শক্রোত্থান এককালের দক্ষিণায়ন দিনের স্মৃতি বহন করিতেছে। ভাদ্র শুক্ল-একাদশী ভাদ্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহে ধরিতে পারা যায়। অতএব তদবধি দক্ষিণায়ন দিন প্রায় ২$\frac{১}{২}$ মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। অদ্য হইতে ২০০০ × ২$\frac{১}{২}$ = ৫০০০ বৎসর পূর্বের কথা। সূক্ষ্মতর গণনায় পাইয়াছি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে ভাদ্র শুক্ল-একাদশীতে রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, অম্বুবাচী হইয়াছিল।

আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে জিতাষ্টমী। এই দিনে জীমূত-বাহনের পূজা বিহিত হইয়াছে। জীমূতবাহন ইন্দ্র। জীমূত-বাহনের পূজাও প্রকৃত পক্ষে ইন্দ্রযজ্ঞের অনুকল্প। 'জিতাষ্টমী' প্রবন্ধে (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৬১) দেখাইয়াছি, অতি প্রাচীন-কালে আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমীতে রবির দক্ষিণায়ন হইত, সেদিন বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি ছিল। আশ্বিন কৃষ্ণাষ্টমী আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহে পড়ে। অতএব দক্ষিণায়ন দিন তদবধি তিন মাস পিছাইয়া আসিয়াছে। এক মাস পিছাইতে প্রায় ২০০০ বৎসর লাগে; অতএব ২০০০ × ৩ = ৬০০০ বৎসর পূর্বের অম্বুবাচী-দিনের স্মৃতি জিতাষ্টমী-পর্বে রক্ষিত হইয়াছে।

আশ্বিন-পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। কোজাগরী লক্ষ্মীর প্রতিমাটি লক্ষ্য করুন। প্রসন্নবদনা, স্নিগ্ধনয়না, পদ্মাসনা, শস্যশীর্ষপাণি এক মাতৃমূর্তি। চারিটি হস্তী জলপূর্ণ ঘট লইয়া এই মূর্তিটিকে স্নান করাইতেছে। পুরাণে কোজাগরীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যাই থাকুক না কেন, প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিতে কষ্ট হয় না। লক্ষ্মী আর কেহ নহেন, শস্যশ্যামলা জীবধাত্রী ধরিত্রী। বৈদিক সাহিত্যে ইনিই ইলা, গ্রীকপুরাণে ইনিই সেরিস (Ceres)। যে চারিটি হস্তী লক্ষ্মীকে স্নান করাইতেছে, তাহারা দিগ্‌গজ; পূর্বাদি চারিদিক রক্ষা করে। হস্তী মেঘের দ্যোতক। লক্ষ্মী দেবীকে তাহারা স্নান করাইতেছে; প্রকৃত ব্যাপার পৃথিবীতে বর্ষা নামিয়াছে, অম্বুবাচী হইয়াছে। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নারিকেল-চিপিটক ভক্ষণ বিহিত। এই বিধান হইতেও বুঝিতেছি, সেদিন প্রবল বর্ষণের জন্য 'অরন্ধন' হইত। অতএব এককালে আশ্বিন পূর্ণিমায় অম্বুবাচী হইত, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা তাহারই স্মৃতি। সে কত কালের কথা? আশ্বিন-পূর্ণিমা আশ্বিনের শেষে ধরিতে পারা যায়। তদবধি অয়নদিন—

আষাঢ়ের	২২।২৩ দিন	= $\frac{৩}{৪}$ মাস
শ্রাবণ	৩১।৩২ দিন	= ১ মাস
ভাদ্র	৩১ দিন	= ১ মাস
আশ্বিন	৩০ দিন	= ১ মাস
	মোট	৩$\frac{৩}{৪}$ মাস

৩$\frac{৩}{৪}$ মাস পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। সূক্ষ্মতর গণনায় অয়ন-দিন এক মাস পশ্চাদ্‌গত হইতে ২১৬০ বৎসর লাগে। অতএব ২১৬০ × ৩$\frac{৩}{৪}$ = ৮১০০ বৎসর, স্থূলতঃ ৮০০০ বৎসর পূর্বে কোজাগরী পূর্ণিমায় রবির দক্ষিণায়ন ও অম্বুবাচী হইয়াছিল।

কার্তিক অমাবস্যায় দীপালী। সেদিন পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে দীপদান ও শ্রাদ্ধাদি বিহিত হইয়াছে। 'প্রবাসী'তে (মাঘ, ১৩৬২) দীপালীর উৎপত্তি ও প্রকরণ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করিতেছি। কেবল একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কার্তিক অমাবস্যায় ছায়াপথের যে অংশ সন্ধ্যাকালে প্রায় মধ্যগগনে দেখা যায়, তাহাই এককালে পিতৃযান কল্পিত হইয়াছিল এবং পিতৃযান পাইবার জন্য দক্ষিণায়ন-দিনের অবশ্যই প্রয়োজন হইয়াছিল। বেদে ও মহাভারতে সুপর্ণ উপাখ্যানটিও কার্তিক অমাবস্যায় দক্ষিণায়ন-দিনের ইঙ্গিত করিতেছে। সুতরাং অতি প্রাচীনকালে কার্তিক অমাবস্যায় রবির দক্ষিণায়ন হইয়াছিল, দীপালী-উৎসবে সেই স্মৃতি রক্ষিত

আছে। কোজাগরীর পনর দিন পরে দীপালী। কোজাগরীতে ৮০০০ বৎসরের পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত আছে ; অতএব দীপালীতে ৯০০০ বৎসরের অম্বুবাচী দিনের স্মৃতি রক্ষিত আছে।

পর পর সাত-আটটি দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইল যে, অম্বুবাচীর দিন কার্ত্তিক অমাবস্যা হইতে শনৈঃ শনৈঃ পশ্চাদ্‌গত হইয়া ৭ই আষাঢ় তারিখে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নয় সহস্র বৎসর ধরিয়া অম্বুবাচীর বিভিন্ন দিবস ও তৎসংশ্লিষ্ট উৎসবাদির পরিবর্তন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, অয়ন-চলন (Precession of the Equinoxes) ব্যাপারটা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় জ্যোতিবিদ্‌গণের জ্ঞানগোচর হইয়াছিল ; এমনকি জনসাধারণও এবিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যাঁহাদের হস্তে ভারতপঞ্জিকা সংস্কারের ভার ন্যস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে একজন পণ্ডিত মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিবিদ্‌গণ Precession of the Equinoxes সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে বা অন্যান্য পুরাতন জ্যোতিগ্রন্থে 'অয়ন-চলন' বা 'বিষুব-চলন' শব্দ পাওয়া যায় না সত্য, তাই বলিয়া ব্যাপারটা যে তাঁহারা একেবারে জানিতেন না, এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিহীন বলিয়া মনে হয়। যাহার উল্লেখ পাই না তাহার অস্তিত্ব ছিল না— এরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায়শাস্ত্র অনুমোদন করিবেন না।

ভারতে আর্য-সভ্যতার বয়স লইয়া ঘোরতর তর্ক আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের সমর্থক এতদ্দেশীয় কোন কোন পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ভারতে আর্যসভ্যতার প্রাচীনতা চারি সহস্র বৎসরের অধিক নহে। তাঁহারা কেবল ঋগ্‌বেদের ভাষা দেখিয়া এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বেদ যে শ্রুতি, বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া গুরুশিষ্য-পরম্পরায় শ্রুত ও স্মৃত বেদের ভাষা যে বিপুল পরিবর্তনের সম্মুখীন হইয়া অবশেষে বর্তমান লিখিত রূপটি লাভ করিয়াছে, এই সত্য তাঁহারা অস্বীকার করেন। আমরা সে তর্কে না যাইয়া একমাত্র অম্বুবাচীর ইতিহাস হইতেই প্রমাণ করিতে পারি যে, ভারতে আর্যসভ্যতার বয়স নয়-দশ সহস্র বৎসরের ন্যূন নহে। কেহ বলিতে পারেন, গণিত-কর্মের দ্বারা দশ-বিশ হাজারের একটা অঙ্কপাত করিলেই হইল, তাহাতে কুষ্টিকালের প্রাচীনতা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমরা গণিতকর্মকে প্রাধান্য দিই নাই। প্রথমে উপজীব্য ও তাহার স্বাভাবিক ব্যাখ্যা দিয়াছি, পরে গণিতের সাহায্যে তাহার কাল-নির্ণয় করিয়াছি।

আষাঢ়ের কবি

শ্রীকালিদাস রায়

চম্পাগন্ধে আমোদিত রবিকরোজ্জ্বল
বৈশাখের কবি মোর গুরুদেব। সঞ্চারি মঙ্গল
বৈশাখই তাঁহার সঙ্গী ফুলেফলে ভরিয়া পসরা
পথ তাঁর আলোছায়া আলিম্পনে ভরা।
বৈশাখের ঐশ্বর্য্য প্রতুল
তাই গুরুজীর দান এ বিশ্বে অতুল।

পূর্ণকুম্ভ বৈশাখের কক্ষে শোভে সে কুম্ভের জল
সারাপথ করিয়াছে ধূলিমুক্ত পবিত্র শীতল।

বিরহিণী প্রকৃতির অশ্রুধারাপাতে
পরিষিক্ত জলদের মলিন কন্থাতে
যবে চন্দ্র রবি তারা সমাচ্ছন্ন, সে আষাঢ় মাসে
আসিলাম ধরার প্রবাসে।

আমি আষাঢ়ের কবি। সারাটি জীবন
সে আষাঢ় করে আছে আমারে বেষ্টন।

আষাঢ়ে দিয়াছি ভাষা। সেই ভাষা আর্ত্তনাদবৎ
মুখরিত করিয়াছে জীবনের পথ।
মেঘস্তূপ রন্ধ্রপথে মাঝে মাঝে রবিরশ্মি আসি
এ জীবন তুলেছে উদ্ভাসি'।
নবধারাপাতসিক্ত মৃত্তিকার গন্ধ সমীরণে
মাঝে মাঝে পাই মৃদু যূথীগন্ধ সনে।
আষাঢ় সারাটি পথ করেছে পিছল,
বাদল মাথার 'পরে নেচে নেচে বাজায় মাদল।
যে মেঘ করিল দৌত্য এ আষাঢ়ে বিরহী কবির
তারি মন্দ্র উদাস গম্ভীর
আবিষ্ট করেছে মোর মন্দাক্রান্তা প্রাণ-প্রবাহিণী
ভালবাসি মেঘদূত, উদয়ন রাজার কাহিনী
ভালবাসি ছায়াচ্ছন্ন মায়াচ্ছন্ন মেদুর ভারত।
ভালবাসি নীপগন্ধে ভরা অভিসারিকার পথ।
ভালবাসি ইন্দ্রচাপে বিষ্ণুর সে গোপবেশটিরে
শঙ্করের রাশীভূত অট্টহাস্য হিমাদ্রির শিরে।

শ্রীদীপক চৌধুরী

"লেখকের বিবৃতি"

এক

মহীতোষ চলে গেল। সারাটা দিন গল্প শুনেছে। শুনেছে তা ঠিক, কিন্তু সরকার-কুঠির বড় ফটকটার দিকে সে দৃষ্টি রেখেছিল সর্বক্ষণ। ঐ পথ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ ছিল না মাসীমার হোটেলে প্রবেশ করবার। মহী-তোষের ধারণা মিথ্যে হয় নি। সুতপার সঙ্গে ওর ঐ প্রবেশ-পথের সামনেই দেখা হয়েছিল। মাত্র এক মিনিটের জন্যে। আগামীকল্য আপিসে দেখা হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোতলার ঘর পর্যন্ত পৌছতে সুতপার দু'মিনিটের বেশী সময় লাগে নি।

সময়ের হিসেবটা বসন্ত সরকারের। তিনি লক্ষ্য করে-ছেন, সুতপার পদক্ষেপে অশোভন তাড়া রয়েছে। কি যেন সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আজ। সুতপার দেহের ভূমিতে নতুন আবেগের অঙ্কুর! বসন্ত সরকারের বুড়ো চোখে অন্বেষণের আগ্রহ ছিল প্রচুর—কিন্তু সুতপা অপেক্ষা করল কৈ? দু'মিনিটের মধ্যেই সে দুমদাম করে উঠে গেল দোতলায়। সরকার-কুঠির পুরনো কাঠের সিঁড়িতে এমন আওয়াজ বড় শোনা যায় না। বসন্ত সরকার একতলার বারান্দায় উঠে এলেন।

সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। একটু আগেই পার হ'ল। কিন্তু সরকার-কুঠির চারদিকে যেন মধ্যরাত্রির পরিবেশ! হোটেলের বাসিন্দারা কেউ এখনও ফিরে আসে নি। বোধ হয় আসে নি! বিজয় মাস্টার এখন রক্ষিতের মোড়ে ছাত্র পড়াচ্ছে। চণ্ডী ভটচাজ ফেরে সবার আগে। আকাশে তারা ওঠবার পরে সে হোটেলে বসে মক্কেলদের গ্রহ-নক্ষত্র খোঁজে। বিচার করে পরের দিন তাকে পৌঁছে দিতে হবে শুভফলের সংবাদ। পয়সা খরচ করে কেউ অশুভ সংবাদ শুনতে চায় না। বসন্ত সরকার হাঁটতে লাগলেন দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির দিকে।

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। একতলার স্নানঘরটার বাঁ পাশ দিয়ে একটা আলোর রেখা ভেসে উঠেছে। এ আলো কোত্থেকে আসছে? স্নানঘরটার ঠিক পাশেই ত ষষ্ঠীর ঘর। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে বসন্ত সরকার উঁকি দিয়ে দেখলেন, ষষ্ঠী আজ ঘরেই আছে। মেঝের ওপর মাদুর পেতেছে সে। বুকের তলায় বালিশ দিয়ে ষষ্ঠী দত্ত কি যেন লিখে যাচ্ছে—ওর তন্ময়তা লক্ষ্য করলেন বসন্ত সরকার। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন, ওর তক্তপোশের ওপর বলরাম আজ প্রমোশন পেয়েছে। সেও বুকের তলায় বালিশ দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়েছে। সামনে ওর শ্লেট। দিশী শ্লেটের বুকটা বড্ড বেশী এবড়ো-খেবড়ো। বলরাম তারই ওপর অ, আ, ক, খ লেখবার চেষ্টা করছে। বোধ হয় আজকেই ওর হাতেখড়ি হ'ল।

তিনি আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। চণ্ডী ভট্টচাজের ঘরেও আলো দেখতে পেলেন তিনি। সেই দিকেই হাঁটতে লাগলেন বসন্তবাবু। সুতপার সঙ্গে কথা বলতে হলে আরও একটু অপেক্ষা করতে হবে তাঁকে। সুতপা কি একবার নিচে নামবে না আজ?

বলরাম এবার ষষ্ঠী দত্তের চৌকির ওপর সোজা হয়ে উঠে বসল। হাতের পেন্সিলটা কানের পাশে গুঁজে সে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা ষষ্ঠীদা, অ, আ, ক, খ যে শিখতেই হবে তেমন কথা কোন্ শাস্তরে লেখা আছে?"

"মেলাই বকছিস বলরাম—শাস্তরে লেখা না থাকলে কি নাম সই করতে শিখবি নে? ভাত খাওয়ার কথা ত শাস্তরে লেখা নেই, তবে খাস কেন?"

বলরাম চৌকির কিনারায় পা ঝুলিয়ে বসল। তার পর সে বলল, "খিদে লাগে বলেই ত ভাত খাই"। পেটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলরামই বলতে লাগল, "তুমি যাই বল ষষ্ঠীদা, দুনিয়ার স-ব শাস্তরের চেয়ে এই জায়গাটুকু অনেক বড়।" একটা বেশ বড় রকমের ঢেঁকুর তুলল বলরাম। তাড়াতাড়ি মুখের কাছে হাতটা তুলে এনে ঢেঁকুরের হাওয়া হাতে লাগিয়ে সে আবার বলল, "পোনামাছের ল্যাজাটা এখনও পেটের মধ্যে তাজা রয়েছে ষষ্ঠীদা। হাতের চেটোতে ঢেঁকুরের গন্ধ লেগে গেল। খুব খেয়েছি আজ, বারণ করলাম, মাসীমা তবু আমার থালার ওপর ল্যাজাটা থপাস করে ফেলে দিয়ে বললেন, খা মুখপোড়া, যত পারিস খা।

তপা নেই বলে মহীতোষ ত কিছুই খেলে না। ষষ্ঠীদা, তপাদি নেই বলে বাবুটি কম খেলেন কেন? একজন বাড়ী নেই বলে অন্য জনের খিদে থাকবে না, তেমন নিয়ম কি ধর্ম-শাস্ত্রে লেখা আছে?"

"চেপে যা বলরাম, চেপে যা—" ষষ্ঠী দত্ত কলম রেখে সোজা হয়ে বসল "ব্যাপারটা কি শুনি? সন্ধ্যের সময় আজ একটু বিশ্রাম করবার জন্যে ঘরে ঢুকলাম, আর তুই দেখছি ধর্মশাস্ত্রের ঢিল ছুঁড়ছিস ঘন ঘন। তোর মনে আজ এত ধর্ম এল কি করে বলরাম?"

"মনে নয় ষষ্ঠীদা, পেটে। যত বলি আর খাব না, মাসীমা তবু বলেন, খা, গলা পর্যন্ত ভরে নে। শুনে শুনে পাঁচটা রসগোল্লা আমার থালার ওপর ফেলে দিলেন তিনি! ধর্ম কি আর বইতে লেখা থাকে ষষ্ঠীদা, ধর্ম সব পেটে।" এই বলে বলরাম চৌকি থেকে নেমে এসে বসে পড়ল মাদুরের ওপর। তার পর ষষ্ঠী দত্তর কানের কাছে মুখটা এগিয়ে নিয়ে নিচু সুরে সে বলতে লাগল, "সাহেবটি বড় ভালমানুষ। তিনি যখন বসবার ঘরে বসে তপাদির সঙ্গে গল্প করছিলেন, তখন আমি চলে গেলাম ফটকের কাছে। ইয়া বড় মোটর-গাড়ি—দেখলাম, গাড়িতে অনেক ধুলো। গড়িয়ার রাস্তায় ধুলো ছাড়া আর আছেই বা কি? এখানে যে আসবে তার গায়েই ধুলো লাগবে। কোমর থেকে গামছাটা খুলে নিয়ে আমি গাড়ীটা সাফ করে ফেললাম। টাইগার আমার সঙ্গেই ছিল। বিশ্বাস না হয় টাইগারকে জিজ্ঞেস কর। একটু বাদেই সাহেবটি এলেন। গাড়ীর গতরে একটুও ধুলো নেই দেখে তিনি ত অবাক! পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে তিনি বললেন, 'বখশিশ।' আমি টাকা নিলাম না। বললাম, বখশিশ চাই না, একটা চাকরি চাই। তপাদির দিকে চেয়ে সাহেবটি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি কে? তপাদি বললেন, রিফিউজী, ষষ্ঠীদা রাস্তা থেকে ধরে এনেছে। আমি বললাম, রাস্তা থেকে নয়, স্টুডিয়োর সামনে থেকে। এক্টর হতে গিয়েছিলাম। তপাদি তুমি ভাবছ, আমি রিফিউজী বলে আমার কোন ঠিকানা নেই? ঠিকানা আছে। বাঘা যতীন কলোনীর ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখো না, আমি পাব। ওখানকার পিওন ভোলাদা আমায় চেনে। কলোনীতে সেও একটা ঘর তৈরি করেছে। যাদবপুরের বাজার থেকে ঘরের খুঁটি চারটে মাথায় করে নিয়ে এল কে? ইয়া মোটা মোটা চারটে খুঁটি একবারে আনতে পারি নি, চার বারে এনেছি। খুশী হয়ে ভোলাদা আমায় আট আনা পয়সা দিয়ে বলল, যা হোটেলে গিয়ে পেট ভরে ভাত খেগে যা। আট আনায় পুরো একটা মিল্লি খাওয়া যায়। আমার কথা শুনে সাহেবটি আজ কি বললেন জান ষষ্ঠীদা?"

"না—"

"তিনি বললেন, নামসই করতে শিখলে একটা কাজ তিনি জুটিয়ে দিতে পারবেন।"

"সেই জন্যে তুই আমার পয়সা দিয়ে শ্লেট-পেন্সিল কিনে নিয়ে এলি?"

"হ্যাঁ। নামসই করতে শিখলে আমার চাকরি জুটবে। ষষ্ঠীদা, অ, আ, ই আমি লিখতে পারি। চাকরিটা যদি একটু বড় হয়, তা হলে এক বছরের মধ্যে একশ' টাকা জমিয়ে ফেলতে পারব। তার পর তুমি আর আমি রওনা হয়ে যাব—কি যেন জায়গাটার নাম বললে তুমি? ও হ্যাঁ, বোম্বাই।"

"এই কি তোদের পেশা! দুধ খাইয়ে সাপ রেখেছি ঘরে। তুই চাকরি করতে যাবি? আর আমি এখানে একলা একলা থাকব?" এই বলে ষষ্ঠী দত্ত চৌকির ওপর থেকে শ্লেটটা হাতে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সামনের বারান্দার দিকে, সরকার-কুঠির পলস্তারা-খসা কোন্ একটা দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে শ্লেটটা বোধ হয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বলরাম নিজের কান দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল বাইরের দিকে। কিছুই সে দেখতে পেল না—সরকার-কুঠির বারান্দায় শুধু ঘন অন্ধকার।

বসন্ত সরকার চণ্ডী ভট্চাজের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কি লিখছ, চণ্ডী?"

"ফলাফল—" চণ্ডী ভট্চাজ খাগের কলমটা দোয়াতের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে বলল, "কালই সব বলে দিতে হবে। জরুরি কাজ এটা।"

বসন্ত সরকার চণ্ডী ভট্চাজের পাশেই এসে বসলেন। সঙ্গে চশমা ছিল না, তবুও তিনি রাশি নক্ষত্রের ছকটার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন দেখছ? দুটো ছক কেন? বিয়ের সম্বন্ধ নাকি?"

"না। স্বামী আর স্ত্রী। মহাশয়টি ভাগ্যবান। মাসে প্রায় দু'হাজার টাকা মাইনে পান। তা ছাড়া তিনশ' টাকা বাড়ীভাড়া দেয় কোম্পানী। মোটরগাড়িও কোম্পানী কিনে দিয়েছে। ড্রাইভারকে মাইনে দিতে হয় না, দুপুরের খাওয়াও কোম্পানীর পয়সায় চলে।"

"ছক থেকেই এসব হিসেব বার করলে নাকি চণ্ডী?"

"না—মহাশয়টির নিজের মুখ থেকেই সব শুনেছি। মেসোমশাই, বিলেতী কোম্পানীর ব্যবস্থাই আলাদা। স্বাধীন ভারতবর্ষে এরা টাকা ছড়াচ্ছে দু'হাতে।"

"কি বললে? ছড়াচ্ছে না সরাচ্ছে? দু'দশ জন

ভাগ্যবান বাঙালীর দিকে চেয়ে তুমি ওদের সুখ্যাতি করলে বটে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জান? অনাবশ্যক খরচ বাড়িয়ে বাড়িয়ে গবর্ণমেণ্টকে ট্যাক্স দিচ্ছে কম। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বণিকের মনে অনেক জ্বালা। তোমার গণনায় এসব কথা ধরা পড়বে না চণ্ডী। দু'হাজার টাকা মাইনে-পাওয়া মহাশয়টির নাম কি?"

"তপন লাহিড়ী।"

বসন্ত সরকার সহসা উঠে পড়লেন। বললেন তিনি, "যাই—দেখি তপার সঙ্গে একটু দেখা করে আসি। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মহীতোষকে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে নিজেই সমস্তটা দিন অনুপস্থিত রইল। চণ্ডী, লাহিড়ী সাহেবের কোষ্ঠীতে কি দেখলে? কোন দিন কি তিনি বড়সাহেব হতে পারবেন? কিন্তু আমি ভাবছি, সাধারণ একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী দু'হাজার টাকার বেশী মাইনে পাবেই বা কেন।" এই বলে বসন্তবাবু দরজার দিকে পা বাড়ালেন। চণ্ডী ভটচাজ পেছন থেকেই বলল, "লাহিড়ী সাহেব আর্থিক উন্নতি দেখবার জন্যে কোষ্ঠী বিচার করাচ্ছেন না।"

"তবে?" ঘুরে দাঁড়ালেন বসন্তবাবু।

"পারিবারিক গোলযোগ—" চণ্ডী ভট্চাজ চোখ থেকে চশমা খুলতে লাগল। খুলতে মিনিট-দুই সময় লাগল। অনেক দিনের পুরনো চশমা। সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়। শুধু কোষ্ঠীবিচার করবার জন্যেই সে চশমা পরে। বালিগঞ্জের রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় বড় বড় বাড়ীগুলো চেনবার জন্যে তাকে চশমা পরতে হয় না।

বসন্ত সরকার অপেক্ষা করছিলেন। চণ্ডী ভট্চাজ বলল, "লাহিড়ী সাহেবের স্ত্রীর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। তাঁর রাশিচক্রের মধ্যে সবিশেষ গোলমাল চলছে। আরও কিছু দিন চলবে বলে মনে হয়। একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। ছ'মাস বয়স না হতেই সন্তানটি মারা গেছে। মাস দুই আগে তার মৃত্যু ঘটে। আর ঠিক সেই সময় থেকেই মিসেস লাহিড়ীরও অসুখ হ'ল।"

"কি অসুখ?"

"মাথার অসুখ বলেই ত মনে হয়। দিনরাত চুপ করে বসে থাকেন। কাজ করেন না কিছু, কথা কন না কারো সঙ্গে। মাঝে মাঝে শুধু নিজের মনে বলেন, পাপ করেছি, পাপ করেছি—সেই জন্যেই খোকা বাঁচল না।"

"তার পর?" বসন্ত সরকারের আগ্রহ বাড়ল।

"লাহিড়ী সাহেবের সাজানো-গোছানো সংসার ভেঙে পড়ছে। মিসেস লাহিড়ী কি যে পাপ করেছেন কিছুই তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রশ্ন করলেও জবাব পান না।"

"তুমিই বা জবাব দেবে কি করে, চণ্ডী? এর জবাব ত জ্যোতিষশাস্ত্রে নেই। তুমি ত মনস্তত্ত্বের ডাক্তার নও।"

"শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করতে বলছেন লাহিড়ী সাহেব।"

"কত টাকা পারিশ্রমিক পাবে?"

"হিসেব এখনও দিই নি মেসোমশাই। মনে হয় খ'-খানেক টাকার মধ্যে কুলিয়ে যাবে।"

বসন্তবাবু একটু হাসলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বললেন, "পাপের প্রায়শ্চিত্ত অত অল্প টাকায় হয় না, চণ্ডী।" চলেই যাচ্ছিলেন বসন্ত সরকার। ফস করে তিনি বলে বসলেন,"সন্তানটির জন্মের পেছনে বোধ হয় রহস্য ছিল।"

কোষ্ঠী দুটো একধারে সরিয়ে রেখে চণ্ডী ভট্চাজ বলল, "ব্যাপার দেখে তাই ত মনে হয়। সন্তানটি না জন্মালেই ভাল হ'ত। কিন্তু—" একটু ভেবে নিয়ে চণ্ডী ভট্চাজই বলল, "কোষ্ঠীতে দেখতে পাচ্ছি সন্তান তাঁর হ'তই এবং প্রথম সন্তান যে বাঁচবে না তাও গণনায় ধরা যাচ্ছে।"

"এ ছাড়া আর কিছু ধরতে পারছ না, চণ্ডী?"

"পারছি···মেসোমশাই, মহিলাটি অন্য পুরুষের প্রতি অনুরক্তা।"

"ভট্চাজ।"

"গণনায় আমার ভুল নেই।"

"তপার কানে যেন একথা তুলে দিও না চণ্ডী।"

"তপার বিরুদ্ধে তোমরা ষড়যন্ত্র করছ বুঝি? আহা, মেয়েটির যে কেউ নেই রে—" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মাসীমা। চণ্ডী ভট্চাজের দিকে চেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তপার কোষ্ঠীতে কিছু পাওয়া গেল না কি রে? খারাপ কিছু?"

"না না মাসীমা। তপাদির ত ভাল সময় আসছে।"

"তোর কথা মিথ্যে নয়, চণ্ডী। ভাল সময় বোধ হয় আজ সকাল থেকেই সুরু হয়েছে। পঞ্চানন ঠাকুরের পায়ে ফুল-বেলপাতা দেওয়ায় শুভলগ্ন কি এল, চণ্ডী?"

বসন্ত সরকারের সারা দেহে যেন দুর্নীতির খোঁচা লাগল। লালুর মাকে তিনি আজও বুঝে উঠতে পারলেন না। পঞ্চানন ঠাকুরকে তিনি দেবতা বলে জানেন, তাঁর মন্দিরে তিনি গত পনেরো বছরের মধ্যে একবারও প্রবেশ করেন নি। দেবতার কাছে মানুষ কল্যাণভিক্ষা করে। কিন্তু লালুর মা কি ভিক্ষা করছেন? সুতপার স্বামী ফিরে আসুক তা তিনি চান না—অথচ ছোটসাহেব আজ সকাল-বেলা এখানে এসেছিলেন বলে লালুর মা মনে মনে পঞ্চানন

ঠাকুরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। পূজো দেবার শুভলগ্ন খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি! এর চেয়ে নিকৃষ্টতর দুর্নীতি মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বসন্তবাবু। দোতলায় উঠতে লাগলেন তিনি। সুতপার ঘরের দরজা যদি খোলা থাকে, তা হলে তিনি ওকে জিজ্ঞাসা করবেন, মহীতোষকে এমন করে বার বার অপমান করবার জন্ম সুতপা কি দায়ী নয়?

সুতপার ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বসন্তবাবু দোতলার বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। যত দেরিই হোক সুতপাকে ত একবার অন্ততঃ বাইরে আসতেই হবে। খাওয়ার জন্যে নামতে হবে একতলায়।

সুতপা স্নানঘরে ঢুকেছে। বড্ড বেশী গরম পড়েছে আজ। দুপুরের দিকে কলকাতার উত্তাপ ছিল একশো সাত ডিগ্রী। বাইরে দাঁড়িয়েই বসন্তবাবু বুঝতে পারলেন সুতপার স্নান এখনো শেষ হয় নি। কল দিয়ে জল পড়ছিল।

সত্যিই পড়ছিল। সুতপা ঘরে ঢুকে ঘামে-ভেজা কাপড়-চোপড় সব খুলে ফেলেছিল তখখুনি। স্নানঘরে ঢোকবার আগে একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছিল, রতন ঘুমুচ্ছে, না জেগে রয়েছে। রতনের ঘর ওর ঘরেরই সংলগ্ন। মাঝখানে দরজা। দরজার ওপরে দু'তিনটে বড় বড় ফুটো আছে। ফুটোর ওপরে চোখ রাখলে গোপন অস্তিত্বের সবকিছুই দেখা যায়। সুতপার বিশ্বাস, আজ পর্যন্ত রতন ওর কোনকিছুই দেখতে পায় নি। রতন টি-বি রোগে ভুগছে। ভুগছে অনেক দিন থেকে।

জামাকাপড়গুলো চৌকির তলায় পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে রাখল সুতপা। মাথার ওপরে পাখার গতি বাড়িয়ে দিল সে। মাঝখানের দরজাটার কাছে এগিয়ে গিয়ে সুতপা আঙুল নেড়ে নেড়ে রতনের বয়স হিসেব করতে লাগল। করলও। আষাঢ় মাসের ষোল তারিখে রতন সতেরোতে পড়বে।

ফুটোর ওপর চোখ রাখল সুতপা। পোকায় খাওয়া রতনের অস্তিত্বটা দেখতে ওর ভাল লাগে। দু'টো অস্তিত্বের তুলনামূলক মূল্যবোধ সম্বন্ধে সুতপা সর্বক্ষণই সচেতন। রতন অসুস্থ বলেই সুতপা সুস্থ বোধ করে। রতন মরছে বলেই সুতপা বাঁচে।

ফুটোর ওপর চোখ রেখে সুতপা উবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মিনিট পাঁচেক। পাখার হাওয়ায় পিঠের দিকের ঘাম শুকোচ্ছে। স্নানের আগে ঘাম শুকোনো দরকার। আজকে ওর সামনের দিকেও ঘাম জমেছে প্রচুর।

রতনকে দেখতে পেল সুতপা। একটা পাতলা চাদর দিয়ে পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তাও দেখল সে। বাঁচবার আগ্রহ বাড়ল সুতপার। চলে এল স্নানঘরে। কলের তলায় চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল, আগামী কাল রতনের ইনজেকশন নেওয়ার দিন। সকালেই ছুটতে হবে ইনজেকশন কেনবার জন্যে। ঘরে আর ষ্টক নেই। মাইনের টাকা ভেঙে ভেঙে ইনজেকশন কিনতে হয়, ডাক্তারের ভিজিটও দিতে হয়। এযাবৎ সবসুদ্ধ কত টাকা খরচ হয়েছে তার একটা হিসেব করা দরকার। মরবার আগে রতনের জেনে যাওয়া উচিত যে, তার দিদি কর্তব্যকাজ করতে কখনও অবহেলা করে নি। রতনের জন্যে সে যদি টাকা খরচ না করত? বাংলা দেশে টি-বি রোগীর সংখ্যা কিছু কম নয়। রতন ছাড়া আর কারও জন্যেই ত সে একটা টাকাও খরচ করে নি। করবার ইচ্ছাও হয় নি কোনদিন। তবে রতনের জন্যেই বা এতগুলো টাকা নষ্ট করল কেন সে? সংসারের চার দেয়ালের মধ্যে যা কর্তব্য, পৃথিবীর বৃহত্তর ক্ষেত্রে তা ত কখন কর্তব্য বলে স্বীকৃত হয় না! হাজার হাজার রতনের জন্যে একটা টাকাও তার খরচ করতে হয় নি বলে সংসারের কোন লোকই ওকে আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র অনুযোগ দেয় নি। তবে কি সাংসারিক আর সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ? শুধু রক্তের সম্পর্কটা সামাজিক সম্পর্কের চেয়ে বড় হ'ল কি করে?

টার্কিশ তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে সুতপা প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে লাগল। লম্বা তোয়ালে দিয়ে দেহটাকে ঢেকে ফেলল সে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। জবাবটা পরে খুঁজলেও চলবে। উপস্থিত সে জামাকাপড় খুঁজতে লাগল স্নানঘরের আলনায়।

আলনাটা খালি। সুতপার মনে পড়ল, তোয়ালের ওপর নির্ভর করেই সে স্নানঘরে ঢুকে পড়েছিল। ঢুকে পড়বার আগে সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রতনের ঘরের দরজার সামনে। মনে মনে হিসেব করেছিল সুতপা, আসছে আষাঢ়ে রতন সতেরো বছরে পড়বে। আজ সকালে তপন লাহিড়ীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে, রতনের গা-হাত-পা সে গরম জল দিয়ে মুছে দিয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে মুছে দিতে হয়। রতনের বয়সের কথা সুতপার কোন সপ্তাহেই মনে পড়ে নি। আজকে, শুধু আজকে সকালেই আষাঢ় মাসের তারিখটা মনে পড়ল ওর। তপন লাহিড়ীর পাশে গিয়ে বসবার সুযোগ না ঘটলে একশো সাত ডিগ্রীর উত্তাপ আজকে আর ও বহন করতে পারত না। জলে-পুড়ে কিংবা একাধিক ফোস্কা নিয়ে বাড়ী ফিরত পা।

এবার স্নানঘর থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। রতন যতদিন বাঁচবে, প্রত্যেক দিনই বয়স বাড়বে ওর। প্রকৃতির বিশেষত্বই হচ্ছে বৃদ্ধি। টি-বি রোগের পোকাগুলোও রতনের বয়স কমাতে পারে নি। রতন বাড়ুক, বেঁচে থাক। মাইনের টাকা ভেঙে ভেঙে সুতপা ইনজেকশন কিনে আনবে। নগদ টাকা খরচ করে ডাক্তারও ডাকবে সে। তাঁরই পরামর্শমত রতনের গা-হাত-পা গরম জল দিয়ে ধুইয়ে দেবে সুতপা। রক্তের সম্পর্কের জন্যে না হোক, সামাজিক সম্পর্কের জন্যেও সে কর্তব্যকাজে অবহেলা দেখাবে না। রতন মানুষ, রতন অসহায়—শুধু এইটুকু জানা থাকলেই দায়িত্ব নেওয়া চলে এবং সেই দায়িত্বের জন্যে টাকাও খরচ করা যায়। এমনি একটা নির্ভরযোগ্য উপসংহারে পৌঁছে সুতপা বেরিয়ে এল স্নানঘর থেকে।

বসন্তবাবু পায়চারি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠলেন। কল থেকে জল পড়ার আওয়াজ আর নেই। সদ্যস্নাতার কাপড় পরাও বোধ হয় শেষ হ'ল। বসন্তবাবু দরজায় টোকা দিতে গিয়ে খোঁচা মারলেন। দরজাটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। সুতপা ভেতর থেকে খিল লাগাতে ভুলে গেছে।

চমকে উঠে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "কে ?"

"আমি—" এই বলে বসন্তবাবু দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলেন। চোখে তাঁর চশমা ছিল না। ইতিমধ্যে সুতপা সুইচ টিপে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়েছে।

"একটু দাঁড়াও মেসোমশাই—"সুতপা অন্ধকারেই কাপড় পরা শেষ করল। শেষ করার আগে সে নিশ্চিন্ত বোধ করল এই ভেবে যে, মেসোমশাই আজো তাঁর চোখের জন্যে চশমা কিনতে পারেন নি। মাসীমার চশমাটাই কখনো-সখনো তিনি চোখে লাগিয়ে উকিলের নোটিশ পড়েন। সুদ এবং আসল টাকা চেয়ে উকিল নাকি আজকাল মাঝে মাঝেই নোটিশ পাঠাচ্ছেন। হাসি পেল সুতপার। ওরই অসুখের জন্যে বাড়ীটা তাঁকে বাঁধা দিতে হয়েছিল!

একটু বাদেই বসন্তবাবু ঘরে ঢুকলেন। সুতপার ঘরে চেয়ার ছিল একটা। বসন্তবাবু চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন তাতে। অনেক দিন হ'ল সুতপার ঘরে তিনি প্রবেশ করেন নি। চোখে তাঁর চশমা ছিল না বটে, তবু তিনি মুহূর্তের মধ্যেই যা দেখলেন তাতে মনে হ'ল, ঘরখানা আগের মতই পুরনো। নতুন আবহাওয়ার প্রমাণ পেলেন না তিনি।

চুল আঁচড়ানো শেষ করল সুতপা। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সে ঘাড়ের ওপর দিয়ে ব্লাউজের ফাঁকে পাউডার ঢালছিল। বসন্তবাবুর বুঝতে আর বাকী রইল না যে, সুতপার দেহে আজ প্লাবন বইছে। ভেতরের বাষ্পে দেহটা ভিজে উঠছে বার বার। একদা এই দেহটাই বরফের মত ঠাণ্ডা ছিল! সুতপা আজ পাউডার ঢেলে ঢেলে শরীরের ঘাম শুকোচ্ছে। আলোচনা সুরু করবার আগে বসন্তবাবু নস্যি নিলেন। ঘরময় পাউডার আর নস্যির গন্ধ ভেসে বেড়াতে লাগল।

খাকী রঙের ময়লা রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন বসন্তবাবু। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "সারাটা দিন কোথায় ছিলি, তপা ?"

"তোমার কি মনে হয় ?" ঘুরে দাঁড়াল সুতপা।

কোন কিছু মনে হওয়ার আগে বসন্তবাবু দেখলেন, সুতপার সারা মুখে নতুন আবেগের চাপা ইঙ্গিত। ফস করে বসন্ত সরকার প্রশ্ন করে বসলেন, "প্রেমে পড়লি না কি ?"

"প্রেমের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছি, মেসোমশাই।" এই বলে সুতপা শুয়ে পড়ল তার নিজের বিছানায়।

"মহীতোষ ত সারাটা দিন ডাঙার ওপর বসে সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাস শুনে গেল।" সুতপার দিকে মুখ করে ঘুরে বসলেন বসন্তবাবু।

"সরকার-কুঠির প্রাচীনতার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ? রক্ষিতের মোড়ে গিয়ে দেখে এস, জেঠমল মাড়োয়ারী আমাদের পুরনো বাড়ীটা ভেঙে ফেলেছে। ওখানে নতুন ইমারত উঠবে। গড়িয়া খালের ধারে সারি সারি ইটের পাঁজা। পাঁজার গায়ে আগুন লাগিয়েছে জেঠমল। আজ ক'দিন থেকে দেখছি, দিনরাত আগুন জ্বলছে। মেসোমশাই, গড়িয়া খালের এঁটেল মাটি পুড়ে পুড়ে শক্ত হ'ল।"

"তোর তাতে কি ?"

গলার নিচে হাত বুলোতে বুলোতে সুতপা জবাব দিল, "এখানেও নতুন ইমারত উঠছে—মাটি আর নরম নেই।—শুধু সরকার-কুঠিটাকে ধরে রেখে কি করবে ? এটাও দিয়ে দাও জেঠমলকে।"

"আমার দেওয়ার জন্যে সে অপেক্ষা করে নেই, আইনের জোরেই সে সরকার-কুঠি একদিন দখল করবে। হ্যাঁরে তপা, তোর কি মনে নেই, জেঠমলের কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলাম তোকে রোগমুক্ত করবার জন্যে ?"

"রোগ বোধ হয় আমার আর নেই, মেসোমশাই।"

"সারাটা দিন যখন তপন লাহিড়ীর সঙ্গে কাটিয়ে এলি, তখন আর রোগ থাকবার কথাও নয়।"

"মেসোমশাই!"

"তপা—তপা, তুই না পঞ্চানন ঠাকুরকে পুজো করিস ?"

খিলখিল করে হেসে উঠল সুতপা। রায়, বিছানার ওপর গড়াতে লাগল সে। হাত দুটো আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে ফেলে

রাখল বুকের ওপর। তার পর বুকের ওপর মৃদু চাপ দিয়ে সে বলতে লাগল, "তপন লাহিড়ীকে তুমি চেন না। তাঁর ওজনও ওই মাটির ঢেলাটার চেয়ে অনেক কম।" এই বলে চোখ বুজল সুতপা রায়। বসন্তবাবু অপেক্ষা করে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে গেলেন আলোটা নিবিয়ে দিয়ে।

দুই

মাসীমা খবর নিয়ে জানলেন, সুতপা ঘুমোয় নি। খবর নিতে এসেছিল বলরাম। ঘরটা অন্ধকার দেখে সে বাইরে থেকেই জিজ্ঞাসা করেছিল, "তুমি ঘুমোচ্ছ নাকি, তপাদি?"

"না, ভেতরে আয়।"

"কি করে আসব, অন্ধকার যে?"

"সোজা নাকবরাবর চলে আয়—এসেছিস? এবার ডান দিকে ঘুরে দাঁড়া। বেশ, হাতটা বাড়িয়ে দে দেখি—"

"কোন্ হাতটা বাড়াব, তপাদি?"

"ডান হাতটা।"

"যে হাত দিয়ে ভাত খাই?"

"হ্যাঁ। পুরুষমানুষেরা ডান হাত দিয়ে শুধু ভাত খায় না, বলরাম—"

"তপাদি—"

"আজ পেট ভরে খেয়েছিস ত?"

"খেয়েছিলাম। এখন সব হজম হয়ে গেছে। খুব খিদে পেয়েছে আবার। মাসীমা বললেন, তুমি না খেলে আমি খেতে পাব না। তুমি এখন খেতে যাবে না, তপাদি?"

"রাত্তিরে আজ আর আমি খাব না।"

"ঠিক বলছ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে যাই, মাসীমাকে খবরটা দিই গে যাই।"

ঘরের অন্ধকার খুব ঘন, সুতপা তবু বুঝতে পারল, বলরাম দরজার দিকে চলে গেল খুব দ্রুত গতিতে। বলরামের ডান হাতটা ধরে ফেলতে পারলে এত তাড়াতাড়ি সে চলে যেতে পারত না। খানিকটা আলাপ-আলোচনার পর বলরামকে হাতে ধরে বিছানার পাশে বসিয়ে রাখবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল সুতপা। রাতের নির্জনতা আজ ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। কথা বলার জন্যেও কাউকে কাছে পাওয়া দরকার।

বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে লাগল সুতপা। এ পর্যন্ত একটা রাতও এমন অসহ্য বলে মনে হয় নি ওর। রাতের বিস্তৃতি ক্রমশঃই ওর দেহের ওপরে চেপে বসতে লাগল। ওজনের আস্বাদ পাচ্ছে সরকার-কুঠির সুতপা রায়।

তপন লাহিড়ীর কথা মনে পড়ল ওর। কোনকিছু একটা মনে না পড়লে অচেতন মনের অন্ধকার অপসারিত হ'ত না। খুবই কাছে এসে পড়েছেন ছোটসাহেব। পাঁচ বছরের দূরত্ব ঘুচে যেতে পনরটা দিনও লাগল না। পাশ ফিরে শুলো সুতপা রায়।

পনর দিন আগেই ত ওর দিকে প্রথম ছোটসাহেব মুখ তুলে চেয়েছিলেন। আপিস-ঘরে সুতপা ছাড়া অন্য কেউ তখন ছিল না, বড়বাবু পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। লাহিড়ী-সাহেব নিজের কামরায় বসে কাজ করছিলেন। তিনি আগেই খবর পাঠিয়েছিলেন যে, নোট নেওয়ার জন্যে সুতপাকে অপেক্ষা করতে হবে। বাড়ী ফিরতে আজ রাত হবে ওর।

সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত সুতপা তার নিজের টেবিলে বসে কাজ করেছে। কৈ, ছোটসাহেব ত ওকে এখনও ডাকলেন না? উঠে পড়ল সুতপা। এগিয়ে গেল লাহিড়ীসাহেবের কামরার দিকে। উঁকি দিয়ে সে দেখল ছোটসাহেব ফাইল পড়ছেন না, বই পড়ছেন। বইটাতে খবরের কাগজের মলাট দেওয়া।

বইখানার সঙ্গে সুতপার পরিচয় হয়েছিল তিন দিন আগেই। তিন দিন আগে থেকেই ছোটসাহেব বইখানা পড়ছিলেন। বাড়ী যাওয়ার সময় ফাইলের তলায় বইটা তিনি লুকিয়ে রেখে যেতেন। সুতপা লক্ষ্য করেছিল সব, মনে মনে হেসেও ছিল খুব। চল্লিশ বছর পার হওয়ার পরে ছোটসাহেব ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের মই বেয়ে অজানা জগতে পৌঁছবার চেষ্টা করছেন! সুয়েজ খালের সঙ্কট তিনি অতিক্রম করেছেন অনেকদিন আগেই।

দরজার বাইরে থেকে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "আসতে পারি কি স্যার?" আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করল না সে, ভেতরে চলে এল সুতপা। লাহিড়ীসাহেব বইখানা ফাইলের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে বললেন, "নোট নাও। সেরাইকেলাতে ইস্পাত তৈরীর কারখানা বসছে—"

"আপনি একটু সরে বসুন ত স্যার, ফাইলগুলো সব গুছিয়ে রাখি।"

সুতপা এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। লাহিড়ী-সাহেব ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "না না, এখন থাক। নোট নাও—" সামনের ফাইলটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে তিনিই আবার বললেন, "বড্ড পরিশ্রান্ত আজ। ভারত-বর্ষে ইস্পাত তৈরী হ'ল কি না হ'ল তাতে আমাদের কি, সুতপা?"

বিস্মিত দৃষ্টিতে সুতপা চেয়ে রইল লাহিড়ীসাহেবের দিকে। তার পর ধীরে ধীরে সে বলতে লাগল, "সাতটা ত বাজল, এবার বাড়ী যান স্যার। মিসেস লাহিড়ী হয় ত ভাবছেন।"

"সবিতা আজকাল আর আমার কথা ভাবে না। বোধ হয় কোনদিনই ভাবে নি।" তপন লাহিড়ী উঠে পড়লেন। দক্ষিণ দিকের জানালাটা খুলে দিলেন তিনি। চৌরঙ্গীর আলো ঢুকে পড়ল ঘরে। জানালার ওপর ভর দিয়ে তিনি চেয়ে রইলেন চৌরঙ্গীর দিকেই। সুতপার বুঝতে আর বাকী রইল না যে, ছোটসাহেব আহত হয়েছেন, আঘাত পেয়েছেন খুবই। সাংসারিক গোলযোগে মনটি তাঁর সহানুভূতি-প্রয়াসী। এ সহানুভূতি সুতপা ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখাতে পারে না। স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য তিনি কামনা করছেন। সুতপা জানে, সে যদি একটু ঝুঁকে দাঁড়ায় ছোটসাহেব বসে পড়বেন। আর সুতপা যদি বসে পড়ে, ভেঙে পড়বেন বণিক অফিসের তপন লাহিড়ী। গত পাঁচটা বছর তিনি ওর দিকে চেয়েও দেখেন নি। আজকে পরিস্থিতি একেবারে বিপরীত। সুতপা যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়?

সুতপার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন লাহিড়ীসাহেব। পরিপুষ্ট বুর্জোয়া আঙুলগুলোতে তাঁর মসৃণতার ঢেউ! সুতপার শীর্ণ দেহের ঘাড়ের অস্থিতে ঢেউগুলো সব ভেঙে পড়তে লাগল। মুহূর্তের জন্যে স্বপ্ন দেখল সুতপা রায়। প্রেমের সম্পর্ক একটা গজিয়ে উঠতেও সময় লাগল না। প্রেম? সশব্দে হেসে উঠল সুতপা, শূন্যতার হাসি! মানব-জীবনের অস্তিত্ব এত হাল্কা বলেই ত স্বপ্ন দেখার প্রলোভন সুতপাও ত্যাগ করতে পারল না। শূন্যতাকে এড়িয়ে যাওয়ার অপর নামই ত প্রেম।

নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'ল সুতপা। ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বলল, "অনেক রাত হয়েছে। স্ত্রীর কাছে এবার আপনি ফিরে যান।"

"তুমি কোথায় ফিরে যাবে, সুতপা?"

"মাসীমার হোটেলে।"

"সেখানে কি আছে?"

"বাঁচবার জ্বালা।"

"চল, তোমায় আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না, আমি পাঁচ নম্বর ধরব।"

লাহিড়ী সাহেব এগিয়ে এলেন সুতপার কাছে—খুবই কাছে। বললেন তিনি, "ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়েছি, আমি নিজেই তোমায় পৌঁছে দেব। সুতপা—"

লাহিড়ীসাহেবের সুরে লোভের আবেগ। ফস করে তিনি সুইচটা টিপে দিলেন, ঘর অন্ধকার হ'ল। কার্জন পার্কের কলরব থেমে গেছে। ট্রাম চলার আওয়াজও তেমন নেই। এসপ্লানেডের কোণ থেকে শুধু বিজ্ঞাপনের আলো জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ল আপিস-ঘরটায়। সুতপা আর লাহিড়ীসাহেবের মাঝখানে কেবল একটা মুহূর্তের ব্যবধান দুলতে লাগল অস্থিরভাবে। এসপ্লানেডের মোড়ে রাতের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা না থাকলে এমন মুহূর্তটাও দেখতে পেত না সুতপা। সে জানে মুহূর্তটাকে অগ্রাহ্য করলে অস্তিত্বকেও অগ্রাহ্য করা হয়। মুহূর্ত মানেই জীবন। পরের মুহূর্তটার সবটুকুই স্বপ্ন, সবটুকুই শূন্যতা। সতীত্ব-রক্ষা ওর কাছে স্বপ্নমাত্র,তবুও সে সরে এল লাহিড়ীসাহেবের কাছ থেকে। সবিতা দেবীর দেহের মধ্যে অধিকারের পরিতৃপ্তি রয়েছে বলেই লাহিড়ীসাহেব নতুন দেহের সান্নিধ্য চাইছেন। তপন লাহিড়ী পুনরায় এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন সুতপার কাছে।

সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "কি চান আপনি?"

"ভালবাসতে চাই।"

আলো জ্বালিয়ে দিল সুতপা রায়। দিয়ে বলল, "নির্জন আপিস-ঘরে ষ্টেনোগ্রাফারকে ভালবাসবার জন্যে আলো নিবিয়ে দেবার দরকার কি? আপনি এবার বাড়ী যান, আমি চললাম। পাঁচ নম্বর ধরে গড়িয়ায় পৌঁছতে আমার দেড় ঘণ্টা লাগবে। চলি, স্যার?"

"একটু দাঁড়াও।" এই বলে ছোটসাহেব ডান দিকের ড্রয়ার খুললেন।

এই ড্রয়ারটা সুতপা চেনে। ড্রয়ারের গায়ে লেবেল লাগানো রয়েছে—কনফিডেনশিয়াল।

নতুন একটা মুহূর্তের জন্ম হ'ল! এই মুহূর্তটির মধ্যেও অস্থিরতার বীজ লুকানো। অসহায় বোধ করতে লাগল বণিক-আপিসের স্টেনোগ্রাফার মিসেস সুতপা রায়। মানব-জীবনের মূলে সত্যিই কোন রহস্য নেই, আছে অসহায়তা।

ছোটসাহেব ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বার করলেন। দু'চারটে পাতা ওলটালেন তিনি। তার পর ফাইলটা এগিয়ে ধরলেন সুতপা রায়ের চোখের সামনে। সুতপা পড়ল। কাগজের ওপরে মাত্র তিনটে লাইনই লেখা ছিল। শ্যাম-নগরের দিকে কোম্পানী একটা নতুন কারখানা খুলেছে। সেখানকার ম্যানেজার একজন অভিজ্ঞ স্টেনোগ্রাফার চাইছেন। সুতপাকে সেখানে বদলী করার প্রস্তাব পেশ করেছেন বড়বাবু। এখন শুধু লাহিড়ীসাহেব সই করলেই বদলীর ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে যায়।

সুতপা বলল, "গড়িয়া থেকে প্রত্যেক দিন শ্যামনগরে যাওয়া ত সম্ভব নয়।"

সিগারেট ধরিয়েছিলেন ছোটসাহেব, তখনি তিনি জবাব দিলেন না। সিগারেটে মৃদু মৃদু টান দিতে লাগলেন। কষ্ট পাক সুতপা, যন্ত্রণাভোগের সময়টা বিলম্বিত হোক।

সুতপা পুনরায় বলল, "আমার একটি ভাই আছে। আমিই তাকে দেখাশুনা করি, আমাকে শ্যামনগরে যেতে বলার অর্থ হচ্ছে আমায় চাকরি থেকে বরখাস্ত করা।"

এর পরেও লাহিড়ীসাহেব কিছু বললেন না। নতুন একটা সিগারেট ধরালেন। সুতপার আর্থিক স্বাধীনতার সৌধ এরই মধ্যে ভেঙে চুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পায়ের তলার মাটিতে ওর কম্পন উঠেছে! এখন কি করবে সুতপা রায়? মানুষ নাকি স্বভাবতঃই ক্ষমাশীল, দয়াবান, কল্যাণকামী এবং ধর্মপ্রবণ? শুধু তাই নয়, মানুষের দেব-সুলভ চারিত্রিক সম্পদের গল্পও ওর শোনা আছে অনেক। ছোটসাহেবও ত মানুষ। তাঁর দেবত্বের প্রতি আবেদন জানানো ছাড়া সুতপা আর দ্বিতীয় পথ দেখতে পেল না। অসহায় সুতপা মনে মনে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতেই সে দেবত্বের চোরাবালিতে পা ঢুকিয়ে দিল।

রাত্রির মাদকতা ক্রমশঃই ঘনতর হচ্ছে। পনর দিন আগের ঘটনাটা মনে মনে আলোচনা করবার পরেও সুতপা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিছানা থেকে উঠে পড়ল সে। রতনের ঘরে এসে নিচু সুরে ডাকল সুতপা, "রতন, রতন—"

সাড়া পেল না রতনের। রতন ঘুমুচ্ছে। রাত এখন কত? রতনের বিছানার পাশে ছোট টেবিলের ওপরে একটা ঘড়ি ছিল। ঘড়িটা দেখবে মনে করেও সুতপা বসে পড়ল ওর বিছানার পাশে। ঘড়িতে সময় দেখল, সাড়ে বারোটা।

টিক্ টিক্ করে ঘড়িতে আওয়াজ হচ্ছে। রতনের আয়ু কমে যাচ্ছে এক এক সেকেণ্ড করে। প্রত্যেকটি মানুষেরই আয়ু কমছে বটে, কিন্তু সুতপা তাতে বিব্রত বোধ করে না। শুধু রতনের জন্যেই ওর ভাবনা। রতন এত বেশী অসুস্থ বলেই সুতপা ওর আয়ুর হিসেব করে সেকেণ্ড গুনে গুনে। রতন মরে গেলে সুতপার জীবনে আবার নতুন সঙ্কট আসবে, বেঁচে থাকবার সঙ্কট। অসুস্থ রতনের জন্যেই সুতপা বেঁচে থাকবার তাগিদ অনুভব করে।

রতনের গায়ের ওপর আলগা ভাবে হাত রাখল ও। হাতের তালুতে ওর টি-বি রোগের তাপ লাগল। কাল সকালে ইন্‌জেকশন কেনবার জন্যে ছুটতে হবে। শ্যামনগরে বদলি হয়ে গেলে মুখে ওর জল দেবারও লোক থাকবে না। বদলি হওয়ার প্রস্তাব পাকা হয় নি বটে, কিন্তু বাতিলও হয় নি। সুইচ টিপে আলোটা নিবিয়ে দেবার পরে সেদিন ছোট-সাহেবের সঙ্গে আর কোন কথা হয় নি, কথা তিনি বলতে চান নি। আলোটা শুধু জ্বালিয়ে দিয়ে ছোটসাহেব বেরিয়ে গিয়েছিলেন আপিস থেকে। পাঁচ নম্বর ধরেই ওকে ফিরে আসতে হয়েছিল গড়িয়ায়।

সেই থেকে লাহিড়ীসাহেব নোট নেওয়ার জন্যে ওকে আর ডাকেন নি, তিনি বোম্বাই গিয়েছিলেন আপিসের কাজে। বোম্বাইয়ের আপিসটাই এঁদের সবচেয়ে বড়। এ ক'টা দিন সুতপার মনে হয়েছিল যে, সে শুধু একা নয়, পরিত্যক্তা। পৃথিবীটাকে যাঁরা বিরাট এবং জনসঙ্কুল বলে কল্পনা করেন, তাঁরা মানুষের এই নির্দয়-একাকিত্বের সত্য কখনও স্বীকার করেন না। অন্তরের গুহায় প্রতিটি মানুষই কি একা নয়?

রতনের দেহ থেকে সুস্থতা সব লোপ পেয়েছে। ওর গায়ে হাত বুলোচ্ছিল সুতপা। টি-বি রোগের পোকাগুলো মাংস ত সব খেয়েছেই, এখন বোধ হয় রতনের হাড় চাটছে ওরা। এই আষাঢ়েই রতন সতের বছরে পড়বে। ফস করে হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল সে। রতন জেগে গেছে।

"দিদি, তুমি আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? আজ ত রবিবার।"

"রবিবার? রবিবার মানে কি, রতন?"

"যে দিনটাতে আপিস-আদালত সব বন্ধ থাকে। মানুষ যেদিন কাজ করে না।"

"আমাদের জীবনে রবিবার বলে বিশেষ কোন দিন নেই। কতকগুলো মুহূর্ত আছে মাত্র। প্রত্যেকটা পরের মুহূর্তই এক-একটা অন্তহীন গহ্বর।"

"কিসের গহ্বর দিদি।"

"শূন্যতার। তুই এখন ঘুমো, রতন।" এই বলে সুতপা রতনের পায়ের দিকটা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে লাগল। চিৎ হয়ে শুয়েছিল রতন। এবার সে এপাশ ফিরে শুয়ে পুনরায় প্রশ্ন করল, "সারাটা দিন তুমি কোথায় ছিলে?"

"ছোটসাহেবের সঙ্গে। তিনি আজ সকালে এখানে এসেছিলেন।"

"দিদি, লোকে যদি নিন্দে করে? তা ছাড়া, জামাইবাবু যদি কখনও শুনতে পান—"

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুতপা। কথা বলল না সে। নিজের ঘরে এসে ও শুধু ভাবল যে, টি-বি রোগের পোকাগুলোকে যতটা মারাত্মক সে মনে

করেছিল, ততটা মারাত্মক ওরা সত্যিই নয়। সংস্কারের দেহে ওরা আজও দাঁত বসাতে পারে নি।

সামনের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। সরকার-কুঠির বাগানটা এখান থেকে দেখা যায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নইলে বড় ফটকটাও স্পষ্ট দেখা যেত। ছোটসাহেব আজ মাষ্টার বুইক গাড়ী নিয়ে ওই ফটক দিয়েই ঢুকে পড়েছিলেন সরকার-কুঠিতে। পুরনো ফটকের পলস্তারা নাকি খসে পড়েছে আজ। ছোট সাহেবের চেয়ে গাড়ীটার বলিষ্ঠতা অনেক বেশী। তাই, ও গাড়ীটার গায়ে আজ হাত বুলিয়েছে বারকয়েক। ভাল লেগেছে হাত বুলাতে। কল্পনা করেছে মনে মনে, একদিন যেন এই গাড়ীটাই ফটকটাকে ভেঙে চৌচির করে দেয়। পুরনো পচা মাটির ভগ্নাংশকে ওরা নাম দিয়েছে পঞ্চানন ঠাকুর! সুতপার বিগ্রহকে এরা কেউ চিনতে পারে নি। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল সুতপা। মধ্য-রাত্রির শান্ত আবহাওয়াতেও উষ্ণ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে। সুতপা ঘর্মাক্ত।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এল সে। ফটকের ভাঙা পলস্তারা পা দিয়ে নেড়ে দেখতে চায় ও। তপন লাহিড়ীর মধ্যে সত্যিই কিছু দেখবার ছিল না। সবিতা দেবী বিয়ের পরেও তাঁকে ভালবাসেন নি। সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মহিলাটির দেহ পেয়েছেন, মন পান নি তিনি। হোটেলে বসে তিনি আজ কত কি-ই না বললেন। হাজার দুই টাকা মাইনে না পেলে এমন গল্প কেউ বলতে পারে না। সংসারে কত রকমের যে সৌখিনতা আছে ভেবে আশ্চর্য হয়ে গেল সরকার-কুঠির সুতপা রায়।

একতলায় নেমে আসতেই সে দেখতে পেল, ষষ্ঠী দত্তর ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাত অবধি কি করছে ষষ্ঠীদা? সুতপা খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি লিখছ তুমি?"

"গল্প," লেখা-কাগজগুলো গুছিয়ে সে গুঁজে রাখল বালিশের তলায়,—"তারপর, এত রাত্রে কি মনে করে? এসো, ভেতরে এসো।"

ভেতরে গিয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ল সুতপা। পুব-দিকের দেয়ালের গায়ে বেশ বড় রকমের একটা কুলুঙ্গি। ষষ্ঠীদার যাবতীয় দরকারী জিনিস সব কুলুঙ্গিতে সাজানো। লম্বা পাটাতনের ওপর ফ্রেমে বাঁধানো তিন-চারখানা ফোটো রয়েছে। ফোটোগুলো সব মেয়েদের। দু' একটি মুখের সঙ্গে সুতপার যেন পরিচয় আছে বলে মনে হ'ল। বোধ হয় রাস্তাঘাটে দেয়ালের গায়ে দু' একটি মুখ সে দেখে থাকবে।

"ফোটোগুলো কাদের, ষষ্ঠীদা?"

"সবার নাম ত আমার মনে নেই। খবরের কাগজে এদের নাম বেরোয়। অভিনয় করে এরা। এদের মুখেই আমায় রং মাখাতে হয়।"

"মাঝখানের মেয়েটির মুখটা ত ভা-রি সুন্দর!" সুতপা ফোটোর কাছে উঠে গিয়ে দাঁড়াল।

ঘাড় ফিরিয়ে কুলুঙ্গির দিকে দৃষ্টি ফেলল ষষ্ঠী দত্ত। তারপর সে বলল, "সুন্দর? ওর মুখের চামড়ায় ত হাত দাও নি তপাদি—গণ্ডারের চামড়ার মত খসখসে। তারপিন তেল দিয়ে মুখের চামড়া ওর ঘণ্টা দুই ভিজিয়ে রাখতে হয়। সবচেয়ে কুৎসিত বোধ হয় ঐ মেয়েটিই। সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা—মুখের চেয়ে মুখোশের দাম এখানে অনেক বেশী।"

সুতপা ষষ্ঠী দত্তর মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলল। চেয়ে রইল দু' এক মিনিট। তারপর সে জিজ্ঞাসা করল, "রাত জেগে লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি গল্প লেখ কেন, ষষ্ঠীদা? কার জন্যে লেখ?"

"নিজের জন্যে। এ-গল্পের হিরো আমি নিজেই।"

"গল্পটা একটু শোনাও না?"

"আজ নয় তপাদি—অন্য এক দিন। তোমায় নিজে আমি ডেকে নিয়ে আসব।"

"তা হলে—" ঘরের চারদিকটা দেখতে দেখতে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "বলরাম কোথায়? তাকে ত দেখছি না।"

"দোতলার ছাদে গেছে ঘুমুতে।"

"চলি ষষ্ঠীদা—"

সুতপা বেরিয়ে এল ষষ্ঠী দত্তের ঘর থেকে। পেছন থেকে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "শাড়ির আঁচলটা তোমার মাটিতে লুটোচ্ছে, তপাদি।"

"ও, তাই নাকি!" লুটানো-আঁচল গুছিয়ে ঘাড়ের ওপর তুলে রাখবার চেষ্টা করল না সে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল। দোতলার সিঁড়ি শেষ হলে, আরও একটা লম্বা সিঁড়ি ওকে ভাঙতে হবে। ছাদ পর্যন্ত উঠবে সুতপা। মাসীমার হোটেলে যে একটা ছাদ আছে সেই খবরটা ওর জানা ছিল না। আজ যেন এই প্রথম জানল। ষষ্ঠীদার খবরটা হয়ত মিথ্যে নয়। বলরাম নিশ্চয়ই ঘুমুতে গেছে দোতলার ছাদে।

বলরাম? সুতপা কি তবে বলরামের খোঁজ করবার জন্যেই নেমে গিয়েছিল একতলায়? বোধ হয় না। অচেতন মন থেকে ও তপন লাহিড়ীকে তাড়িয়ে দিতে পারে নি। সমস্ত দিনের সান্নিধ্যটা ভিন্ন ভিন্ন নামে আজ ওর মনের মধ্যে এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। অবাক হ'ল সুতপা। ক্লান্ত পদক্ষেপ টলমল করছে। ঘর পর্যন্ত পৌঁছতে বাকি রাতটুকু হয়ত শেষ হয়ে যাবে।

তা যাক, তবুও পৌঁছনো চাই। বারান্দায় উঠে এল সুতপা। কি একটা অজানা আশঙ্কা যেন ওর গোটা অস্তিত্বটাকে অবশ করে দিতে চায়। থেমে গেল সুতপা। শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়েছে। শঙ্কা থেকে মুক্তি চায় ও। কিন্তু কি করে মুক্তি পাবে সে? শঙ্কা থেকে মুক্তি পাওয়ার মানেই ত মৃত্যু।

ধীরে ধীরে সুতপা এগিয়ে গেল নিজের ঘরের দিকে। দরজাটা সে খুলেই রেখে গিয়েছিল। এখন সে দেখতে পেল, দরজাটা ভেজানো রয়েছে। তবে কি বলরাম এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে গেল? ভেজিয়ে দিয়ে বলরাম কি ঘরে বসে অপেক্ষা করছে? হাতের মুঠোয় কি একটা পেল মনে করে সুতপা তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

তপন লাহিড়ী বসে ছিলেন সুতপার বিছানার ওপর। সুতপা ভেতরে ঢুকে প্রশ্ন করল, "তুমি? এত রাত্রে?"

"এটা ত হোটেল—এখানে রাত্রি হয় বটে, কিন্তু 'এত রাত্রি' হয় না। তপা, থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম। পালিয়ে এলাম দেওদার স্ট্রীট থেকে। বুইক গাড়ীর ট্যাঙ্কে কুড়ি গ্যালন পেট্রল মজুত। চল—"

রতনের ঘরের দরজাটা খুলে দিল সুতপা। আলোটাও জ্বালিয়ে দিল সে। ধীরে ধীরে ডাকতে লাগল, "রতন, রতন—ছোটসাহেব এসেছেন।"

"দিদি, এত রাত্রে?" চোখ খুলল রতন।

"এটা ত গৃহস্থের সংসার নয় রতন, এখানে 'এত রাত্রি' হবে কেন ভাই?"

সুতপা বসে পড়ল রতনের বিছানার উপর।

তপন লাহিড়ী উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "রতন তোমার ভাই?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিল সুতপা।

"কি হয়েছে ওর?"

"টি-বি।"

"টি-বি? শোবার ঘরের এত কাছে টি-বি? ভয় করে না তোমার?"

"জীবন মানেই ত ভয়, শঙ্কা। ছোটসাহেব, তুমিও এসে বস এইখানে। জীবনের দোয়াতটা ভাল করে দেখ। দেখ, টি বি রোগের পোকাগুলো কালির মধ্যে ডুবে রয়েছে। কলম এনে দিচ্ছি, ছোটসাহেব। আমার বদলির ব্যবস্থাটা তুমি পাকা করে যাও। চলে যাচ্ছ? একটা সই বসিয়ে দেবে না?"

রতনের কপালের উপর একাধিক জলের বিন্দু ভেঙে পড়তে লাগল। কাল সকালে আপিসে গিয়ে হাসবার আগে সুতপা আজকের রাতটুকু কেঁদে কেঁদে শেষ করে ফেলতে চায়। কুড়ি গ্যালন পেট্রল, ছোটসাহেবের হিসেবে নাকি অনেকটা তেল! ক্রমশঃ

শুভ লগ্ন

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

আজকে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়,
দিগন্তে তাই রক্ত মেঘের রঙীন উত্তরীয়;
আজকে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়।
রথীর বেশে আসছ তুমি আজ,
আলোর রথে শুক্লা রাতের মাঝ,
বাতাস যেন তাই হে মহারাজ,
বলছে সুরে সুরে;
নিশীথ রাতে আসবে প্রিয় আজ, আমার গোপন পুরে।

তোমার আমার পথটি চেয়ে কাটল কতই দিন,
বাদল রাতি, উজল প্রভাত, ধূসর মলিন সাঁঝ;
তোমার প্রেমের গানটি গাহি' ছিল আমার বীণ,
রিক্ত আমি, পূর্ণ তুমি—নেইকো কোন কাজ,
আমার নেইকো কোন কাজ।

তাই বুঝি আজ নিশীথ রাতে সবার গোপনে,
বঁধুর বেশে আসছ তুমি প্রিয়?
উজল ভাতি মধুর হাসি তোমার নয়নে,
মলিন আমার মাল্যখানি নিও।

প্রদীপ আমার সদাই ছিল জ্বালা,
দীপ্ত ছিল পূজার বরণডালা,
শূন্য এবে আমার গীতির মালা
পূর্ণ করি নিও,
জ্বালিয়ে নিও পরাণ-প্রদীপখানি,
স্বপন-পারের দীপ্তি নূতন আনি,
নূতন যে গান গাইব আমি জানি,
সুরটি তুমি দিও,
আজ যে তোমার লগ্ন আসার প্রিয়!

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

২

লণ্ডনে এমনকি আমেরিকাতেও আজকাল ভারতীয় মহিলা-দের দেখতে পাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। একবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের একজন ব্রিটিশ ভদ্রলোক বলেছিলেন, "আজকাল যদি লণ্ডনের রশেল স্কোয়ার যাও ত যত জন শাড়ীপড়া মহিলা দেখবে, তত জন ফ্রকপরা দেখতে পাবে না।" কথাটা সম্পূর্ণ সত্য না হলেও ওই পাড়াতে শাড়ী-পরা মহিলা অন্ততঃ চার-পাঁচ জন দেখি নি এমন দিন প্রায় যেত না। অধিকাংশকেই দেখতাম খাবারের দোকানে থলি হাতে ঘুরছেন। এঁরা হয় ত ছাত্রী নয় ত চাকরেদের স্ত্রী, নিজেরা নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করেন। হোটেলে, বোর্ডিং হাউসে বা কাফেতে খেতে যা খরচ হয় তার চেয়ে অনেক সস্তায় খাওয়া যায় যদি নিজেরা দোকান থেকে জিনিষ কিনে রেঁধে বা না রেঁধে কাজ চালাই। অনেকের ঘরে ছোট একটা গ্যাসরিং থাকে, এক পেনি দিলে সেটা খুলে জল গরম, দুধ গরম বা ভাজাভুজিজাতীয় ছোট রান্না করা যায়।

আমরাও প্রত্যহ ৩৫ অথবা ৪০ শিলিং খরচ করে লাঞ্চ এবং রাত্রের আহার না খেয়ে লাঞ্চটা এই ভাবেই খেতাম। রাত্রে ত প্রায়ই ওয়াই-এম-সি-এ'র হস্টেলে খাওয়া হ'ত। সকালে উঠে ১২।১৩ শিলিং দিয়ে ফল, মাছ, দই, রুটি, ক্রীম, শশা ইত্যাদি কিনে আনলে আমাদের পাঁচ জনের দু'দিনের লাঞ্চ হয়ে যেত। এর উপর রোজ আমরা দুধ কিনতাম। কাফে বা হোটেলে এত জিনিস খেতে দেয় না, তবে সেখানে নিজেদের কিছু পরিশ্রম করতে হয় না এবং ভাল বাসন ও চেয়ারের আরাম পাওয়া যায় এই যা লাভ। বাড়ী ভাড়া করে সংসার পেতে বসলে সব দেশের মত ওখানেও কমে চালানো যায়। কিন্তু দু'এক মাসের জন্য তার আয়োজন করা শক্ত।

বিলেতে যাঁরা অনেক টাকা খরচ করে যান এবং হয়ত-বা যাঁরা বেশ কিছু উপার্জ্জনও করেন সেই সব মেয়েরা দোকান বাজার রান্না ছাড়া সংসারের আরও সহস্র কাজই স্বহস্তে করেন এবং টিউবে সর্ব্বত্র ঘোরাঘুরি করেন। কিন্তু এঁরাই যখন দেশে থাকেন অথবা এঁদের চেয়ে দরিদ্রও যাঁরা তাঁরাও চাকর-বাকরের সাহায্য ছাড়া এক-পাও চলেন না, নিজস্ব 'কার' ছাড়া ট্রাম-বাসে চড়তে লজ্জা পান। এর একটা বড় কারণ অবশ্য আমাদের দেশের সামাজিক মর্য্যাদার ভ্রান্ত মাপকাঠি। আর একটা কারণ আমাদের দেশের অব্যবস্থা। আমাদের বাড়ী তৈরীর সময় সহজে কি করে কাজ করা যায় সে বিষয়ে আমরা ভাবি না, তাই চার তলায় রান্না, দোতলায় খাওয়া, একতলায় বাসনমাজার ব্যবস্থা করি। আবার গৃহিণীদের বিশ্রামের কথা ভুলে যাই বলে পুরুষদের যদৃচ্ছ বিহারে স্থান ও কালের অবাধ স্বাধীনতা দিই। এই রকম আরও অনেক কারণ আছে তার ভিতর সব চেয়ে বড় হচ্ছে চিন্তায় কার্য্যে ও সংস্কারে সুশৃঙ্খলার অভাব।

লণ্ডনে বোর্ডিং হাউসে যারা থাকে তারা যদি সকালে ঠিক সময় না ওঠে এবং যথাকালে না খেতে যায় তা হলে তাদের অবস্থা যে কি হয় তা একদিন বেলায় উঠে বুঝেছি। খাবার ঘরে গিয়ে দেখি, টেবিলে চামচ আছে ত কাঁটা নেই, চা আছে ত পেয়ালা নেই। ল্যাণ্ডলেডি সেজেগুজে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং আমাদের দুরবস্থা দেখে কিছুমাত্র লজ্জিত হচ্ছেন না। মুক্তোর মালা এবং বাহারের টুপি পরে তখন তিনি নিজের অন্য কাজে চলেছেন। পয়সা-দেওয়া অতিথিদের জন্য ভাববার তখন তাঁর সময় নেই।

যে দেশেই যাই না কেন পর্য্যটক হয়ে বেরোলে কয়েকটা জিনিস দেখা নিয়ম। শুধু নিয়ম বললে অবশ্য অন্যায় হয়, মানুষের দেখতে ভালও লাগে এগুলি। ট্রাফেলগার স্কোয়ার এবং সেখানকার ন্যাশনাল গ্যালারির জগদ্বিখ্যাত ছবিগুলি দেখব একদিন ঠিক হ'ল। আমাদের শৈশবে ইয়োরোপীয় ছবি দেখা খুব অভ্যাস ছিল। কিন্তু শৈশব অতিক্রম করার আগেই অবনীন্দ্রপ্রমুখ স্বদেশী শিল্পীদের প্রচার দেখলাম আমার পিতৃদেবের চেষ্টায়। এখন চোখ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে ভাল ও মন্দ ইণ্ডিয়ান আর্টে। স্বদেশী ছবি থেকে প্রাচীন ইয়োরোপীয় ছবির দিকে মনটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে হয় আবার এই সব ছবির মূল্য বুঝতে হলে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছিল প্রাচীন ইয়োরোপীয় পন্থা।

ন্যাশনাল গ্যালারিতে কি চমৎকার করে ছবিগুলি সাজিয়ে রেখেছে। ভাবি নি যে কখনও 'লিওনার্ডো' বা মাইকেল এঞ্জেলো'র ছবিগুলি দেখব। এখানে শুধু যে দেখলাম তাই নয়। ভাল ভাল ছবির সামনে সুন্দর উচ্চাসন সাজানো, যাঁরা ছবিগুলির বা এই শিল্পীদের ভক্ত তাঁরা মুগ্ধ হয়ে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন দেখে আমাদেরও বসে দেখার লোভ হ'ল। কিন্তু মাত্র এক ঘণ্টা সময়ে ওই রকম করে আর ক'টা ছবি দেখা যায়? তবু লিওনার্ডোর Virgin of the Rocks-এর অপূর্ব্ব মুখশ্রী এবং আশ্চর্য্য আলোছায়ার

খেলা স্থির হয়ে না দেখে পারা যায় না। মনে হয় না কেউ তুলি দিয়ে এঁকেছে, যেন আপনি মূর্ত্তি ধরে ফুটে উঠেছে ক্যানভাসের উপর। ভ্যানডাইকের 'রাজা চার্লস দি ফার্ষ্ট', র‍্যাফেলের 'সেণ্ট ক্যাথেরিনা' মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত। এই সব ছবির বহু প্রতিলিপি আমরা নানা পুস্তক ও পত্রিকায় দেখেছি। মাইকেল এঞ্জেলোর "খ্রীষ্ট ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়" এতই সুন্দর যে বর্ণনায় তাহার কোন পরিচয় দেওয়া যায় না। শিল্পীদের নামের তালিকা দিয়ে কোন লাভ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা শিল্পগুরুর ছবিই এখানে আছে। রেম্‌ব্রাণ্ট, রুবেন্‌স্‌, টার্নার, গেন্‌স্‌বরো এই নামগুলি আমাদের দেশে সুপরিচিত।

দর্শকদের জন্য ন্যাশনাল গ্যালারিতে খাবার জন্য কাফে-টেরিয়ার মত ব্যবস্থা আছে। রেলিং-ঘেরা একটা পথের মধ্যে ট্রে, কাঁটা, ছুরি ইত্যাদি নিয়ে ঢুকতে হয়। তার পর নিজের ইচ্ছামত খাবার বেছে নিয়ে পথের অন্য প্রান্ত দিয়ে বার হতে হয়। বেরোবার সময় জিনিসের উপর লেখা দাম দেখে দাম আদায় করে নেন একজন। আমরা ছবি দেখবার পর এখানে ডিম, স্যালাড ইত্যাদি খেয়ে ২।টার সময় ফিনিক্স থিয়েটারে শেক্সপীয়রের 'Much ado about nothing' দেখতে গেলাম।

থিয়েটারের বাড়ীটা খুব বড় নয়, অসম্ভব ভীড়। ষ্টেজে কোন মাইক (mike) আছে বলে মনে হ'ল না। অভিনেতাদের সাজ-পোশাক নিখুঁত। যার যখন অভিনয় হয়ে যায়, সে তখনই গ্রীণরুমে চলে যায় না, একটা আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়, দর্শকরা তাদের দেখতে পায়। প্রত্যেক দৃশ্যেই প্রায় আলাদা আলাদা সেট। কখনও আস্তাবল, কখনও দোতলা বারান্দা-দেওয়া বাড়ী ইত্যাদি নানারকম। ভারতীয় নাট্য-শাস্ত্রে যেমন কয়েকটা জিনিষ দেখানো বারণ, এদের রঙ্গ-মঞ্চেও (অন্ততঃ শেক্সপীয়রের) বোধ হয় সেই রকম নিয়ম আছে। প্রণয়ঘটিত ব্যাপারে তারা সাধারণ মঞ্চের মত উচ্ছ্বাস দেখায় না।

থিয়েটার যাঁরা দেখতে আসেন তাঁরা যদি সেখানে পৌছতে দেরী করেন তা হলে একটা দৃশ্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বাইরে অপেক্ষা করেন, পরে নূতন দৃশ্য সুরু হবার আগেই ঢুকে পড়েন। এতে অন্য দর্শকদের দেখায় বাধা সৃষ্টি হয় না। আমাদের দেশের মত নবাগতদের চলমান দেহের আড়ালে অন্যদের দৃষ্টি চাপা পড়ে না।

লণ্ডনে যে যেমন অবস্থার লোক সে সেই রকম খাবার জোগাড় করে নেয়। নানা রকমের ব্যবস্থা আছে। পথে পথে ফলের গাড়ী ওখানে প্রায় দেখতাম। লোকেরা পথের মাঝখা নেই ফল কিনে খেতে খেতে চলেছে, হয়ত আপিস যাচ্ছে, হাতে একটা টাইপ-রাইটার কিম্বা অন্য জিনিসের বাক্স ঝোলানো। এ ছাড়া মিন্টু-বার স্কুল-কলেজের পাড়ায় থাকে। আমরা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায় ছিলাম, সেখানে ছেলেরা আইসক্রীম খেতে খেতে যাচ্ছে, নয়ত বারে ঢুকে দুধ বা দুগ্ধজাত আর কিছু খাচ্ছে দেখা যেত। আমাদের দেশে অসংখ্য মানুষ দেখি যারা শুধু হাতে পথে চলেছে, মেয়েরা ফ্যাসানেবল হলে বড় জোর একটা সৌখীন ব্যাগ হাতে ঝুলিয়েছে। ওখানে কিন্তু অধিকাংশ মানুষের হাতেই বাক্স-ব্যাগ কিছু-না-কিছু পথ চলার সময় দেখা যায়। মেয়েরা ত দু'তিনটে ব্যাগ নিয়ে এবং কখনও বা সেই সঙ্গে একটা ছেলে ঠেলা গাড়ী ঠেলেও চলে। এরই মধ্যে তারা কেউ কেউ পথে খাবার কিনে খায়। ছোট ছেলের বাবা-মা দুজনে যদি একত্রে বেরোয় তা হলে অনেক সময় তারা শিশুটিকে একটা থলিতে শুইয়ে একদিকে মা ও অন্য দিকে বাবা থলি ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে যায় দেখেছি।

চায়ের কাটতি বাড়াবার জন্যে শুধু চায়ের দোকান ওখানে দেখা যায়। যেমন তেমন দোকান নয়, বেশ জাঁক-জমকের দোকান। ঢুকেই দেখি একটি ভারতীয় মহিলা অভ্যর্থনা করবার জন্য বসে আছেন। তিনি পথ বলে দেন। এক জায়গায় পেয়ালা-পিরিচ নিতে হয়। তার পর সিনেমা হলের উঁচু দালানের মত একটা বড় জায়গায় সবাই পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই একটা জানালার ভিতর দিয়ে একটা মহিলা চা ঢেলে দিচ্ছেন, অন্য আর একটা জানালা থেকে আর একজন দরকারমত দুধ ও চিনি যে যা চায় দেন। ইচ্ছা করলে আর একপ্রান্তে গিয়ে কেক ইত্যাদি কেনা যায়। কত লোক কিন্তু শুধু এক পেয়ালা চা খেয়েই চলে যাচ্ছে।

চায়ের বিষয়ে নানারকম প্রশ্নের খেলাও এখানে করতে দেয়। যেমন চা কি আফ্রিকায় জন্মায় না আসামে জন্মায়? আমাদের কাছে এসব প্রশ্ন অবশ্য হাস্যকর লাগে, কারণ আমরা চায়ের দেশের লোক।

ট্রাফেলগার স্কোয়ার অনেকে দেখতে যায় এবং তার আশেপাশে অনেক বিখ্যাত দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে বলে এখানে টুরিষ্ট এবং অন্য মানুষের খুব ভীড়। নেলসনের মূর্ত্তিসম্বলিত উঁচু স্তম্ভের চারধারে ফোয়ারার জল ছাড়া দেখা যায় পায়রার ঝাঁক। এত লোকের ভীড় দেখে এখানে মানুষ পয়সা রোজগারের নানা উপায় খোঁজে। দেখলাম একটা লোক ক্যামেরা নিয়ে সবাইকার ছবি তুলে দিতে চাইছে। ডাক-খরচ দিলেই ছবি তার বাড়ীতে ডাকে পাঠিয়ে দেবে। ছবি তোলার খরচও সামান্য।

লণ্ডনে আমরা একদিন ব্রিটিশ কাউন্সিলে গিয়েছিলাম। সখানে পোর্টার আমাদের সকলকে গুনে নিয়ে তার পর ওপরের ঘরে ঢোকালো। অন্য একটা ঘরে শ্রীযুক্ত ক্রদ ক্লেগ আমাদের সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন এবং আমাদের কাকে কি বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন জিজ্ঞাসা করলেন। আমার বড় মেয়েটি শিক্ষা বিষয়ে জানতে উৎসুক, দ্বিতীয়া সংবাদপত্র বিষয়ে এবং ছোটটি সঙ্গীত বিষয়ে উৎসাহী। ক্লেগ সাহেব খুব ভদ্র এবং খুব হাসিখুশী। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে পালা করে সঙ্গীত, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ে দীর্ঘ আলাপ করলেন। এ রকম সুশিক্ষিত, জ্ঞানী এবং মার্জ্জিতরুচি মানুষ দেখে ভারি ভাল লাগল। ক্লেগ সাহেব বললেন যে, আমাদের লণ্ডনের দু'চারটে ভাল জায়গা দেখাবার ব্যবস্থা করবেন এবং মেয়েরা যে যা ভালবাসে সে বিষয়ে যেন কিছু জানতে পারে তারও চেষ্টা করবেন। সময় বড় কম, না হলে ব্রিটিশ সভ্যতার বহু নিদর্শন দেখানো যেত।

সঙ্গীত বিষয়ে কথা উঠলে ক্লেগ বললেন, "এখন সঙ্গীতের যে রকম টিকিট পাওয়া যাবে তা জোগাড় করা শক্ত। যাই হোক, আমি কিছু একটা দেখাবো যাতে তোমরা নিশ্চয় বিস্মিত হবে।"

একদিন তিনি গাড়ী পাঠালেন মেয়েদের নিতে। আমার ছোট দুই মেয়ে গাড়ী করে ব্রিটিশ কাউন্সিলে গেল। সেখান থেকে ক্লেগ তাদের একটা বড়মানুষী পাড়ায় নিয়ে গেলেন। বাড়ীটাতে পুরু লাল কার্পেট-মোড়া সিঁড়ি দিয়ে চমৎকার একটা লাউঞ্জে উপস্থিত হতে হয়। সেখানে একটি সুসজ্জিতা মহিলা বসে আছেন। মেয়েরা তাঁকে দেখেই চমকে উঠে একজন আর একজনকে বলল, "ভদ্রমহিলা ঠিক ভিভিয়ান লে (Vivian Leigh)-এর মত সাজতে চেষ্টা করেছেন। ভাবছেন ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে।"

তখন কে জানত যে সত্যিই মহিলাটি স্বয়ং তিনি। ক্লেগ ওদের কথা শুনে একটু স্মিত হাসি হাসলেন, কিছু বললেন না। একটু পরে সেখানে একটি রোগা লম্বা যুবক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর পরিচয় দেওয়া হ'ল "ইনি জন মার।" জন মার করজোড়ে নমস্কার করলেন এবং কত বৎসর দাক্ষিণাত্যে থেকে সেখানকার সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন তা বললেন। শান্তিনিকেতনে যে প্রফেসর বাকে ছিলেন জন মার তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। মিঃ ক্লেগ বললেন, "এখানে ত গান শোনবার বিশেষ সুবিধা হবে না। আমরা উপরে ষ্টুডিওতে যাই, সেখানে গান হবে।"

উপরে গিয়ে জন মার মেঝের উপর ভারতীয় আসন করে বসে বিশুদ্ধ তান লয়ে এবং শুদ্ধ তাল দিয়ে দিয়ে মাদ্রাজী গণেশবন্দনা শোনালেন। চোখ বন্ধ করে শুনলে মনে হ'ত আদত দক্ষিণী কেউ গাইছেন। অকস্মাৎ দরজা ঠেলে এক জন ভদ্রলোক ঢুকে বললেন, "Excuse me, I think I have left my pocket book here"। বলেই তিনি মেঝের উপর হাঁটু গেড়ে বসে পিয়ানোর তলায় হাত দিয়ে খুঁজতে লাগলেন। মেয়েরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল, "লরেন্স অলিভিয়ার।" ক্লেগ বুঝতে পেরে স্মিত হাসি হাসলেন। ভদ্রলোক মেয়েদের একপাটি চটি হাতে করে তুলে নিয়ে তার তলাতেও পকেটবুক খুঁজতে লাগলেন। যাবার সময় মিঃ ক্লেগকে বললেন, "কি হচ্ছে মশায়, ভারতীয় সঙ্গীত?" ক্লেগ হেসে ঘাড় নাড়লেন, কারুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন না। উভয় পক্ষেরই কিন্তু ইচ্ছা ছিল যে একটু আলাপ করিয়ে দেন।

যখন ওরা ফিরে আসছে তখন একজন ভৃত্য পূর্ব্বোক্ত সুসজ্জিতা মহিলাকে বলল, "আপনার জন্যে সার লরেন্স অপেক্ষা করছেন।"

শুনে আমার কন্যা বলল, "আমার চটিটা বাড়ী গিয়েই বাঁধিয়ে রাখব। ক'জন ভারতীয়ার চটি সার লরেন্স হাতে করেছেন?" আমি আগে জানতাম না যে ভিভিয়ান লে সার লরেন্সের স্ত্রী।

মেয়েরা মিঃ ক্লেগকে বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, "উনি কি সার লরেন্স অলিভিয়ার?" ক্লেগ যেন ঠিক ভাল করে বুঝলেন না এমনভাবে বললেন, "হতেও পারেন।" মনে হ'ল তিনি এ বিষয়ে কিছু বলতে চান না।

বাড়ীশুদ্ধ সবাই বিদেশে চলেছি, কাজেই খরচ সম্বন্ধে সর্ব্বদা হিসেব করে চলতে হ'ত। কম খরচে একটা বাড়ীতে ঘর পেলাম বলে আগের বাড়ীটা ছেড়ে দিলাম। এখানে দৈনিক এক পাউণ্ড খরচ কমবে। এবাড়ীর ঘর ছোট এবং বাড়ীটা একটু পুরনো কিন্তু ল্যাণ্ডলেডি একলা কাজ করেন না; ঝি রাখেন এবং বাড়ীর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা একটু বেশী বলেন। বাড়ীটাতে নানা দেশের লোকের বাস। তার ভিতর একজন অন্ধ ভারতীয়। তাঁকে দেখতাম একলাই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা ত করছেনই, ফুটপাথে একলা চলেছেন, বাসে একলাই উঠছেন, হাতে ব্যাগ ও লাঠি। পথে অবশ্য লোকে তাঁকে সাহায্য করত। লণ্ডনের পথে গাড়ী চলার ব্যবস্থা ভারী সুন্দর। পথচারীদের বেশী বিব্রত হতে হয় না। গাড়ী যেখানে পুলিশের কলে থামে ও চলে সেখানে দল বেঁধে পথচারীরা গাড়ী থামার জন্য ফুটপাথে অপেক্ষা করে সবাই জানে। কিন্তু ছোট ছোট রাস্তায় যেখানে পুলিশ বা তার কল নেই, সেখানেও পথচারী দেখলেই গাড়ীর চালক দরকার বুঝলে গাড়ী থামিয়ে তাকে আগে পার হয়ে নিতে বলে। অন্ধ-আতুরকে তারাই পার করে দেয়। আমাদের

ল্যাণ্ডলেডি বলতেন যে, ওই অন্ধ ভদ্রলোকটি perfect gentleman।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের মিঃ ক্লেগ আমার কন্যা শান্তিশ্রীকে দুই একটি ব্রিটিশ বিদ্যালয় দেখাবার ব্যবস্থা করে দেন। এক জন সুসজ্জিতা মহিলা সঙ্গিনী তাকে নিয়ে যান। হয়ত ইনি গাইড হিসাবে কিছু রোজগার করেন। দুই থেকে চার বছর বয়সের শিশুদের স্কুল দুটি দেখানো হয়েছিল। যুদ্ধের পর স্কুলের বাড়ী ছোট ছোট কটেজের মত। কিন্তু অন্য ব্যবস্থা খুবই সুন্দর। খেলার জায়গা, নানা রঙের ছোট চেয়ার-টেবিল, খেলার বহু সরঞ্জাম, খাবার ইত্যাদি সবই ভাল। শিশুদের মায়েরা প্রতি শিশুর জন্য দিনে এক শিলিং করে দেন, তাইতেই শিশুরা প্রত্যহ তিন বার খেতে পায়। শিশুরা ভারি সুন্দর দেখতে, স্বাস্থ্যে আনন্দে উজ্জ্বল।

এর পর দেখে জড়বুদ্ধিদের স্কুল। জড়বুদ্ধি ছেলেমেয়েদের স্কুলে ছবি আঁকা, গান-বাজনা সবই করানো হয়। খেলার এবং কাজের নানা সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আছে, যার যেটা করতে ইচ্ছা করে সে তা করে। সব স্কুলেই খেলবার জায়গা প্রশস্ত। জড়বুদ্ধিদের এই স্কুলটা গরীব পাড়ায়, ছেলেদের স্বাস্থ্য দেখে রুগ্ন জীর্ণ মনে হয়। সাধারণ ছেলেমেয়েদের স্কুলে তারা একত্রেই পড়ে। এদের খুব বড় বড় ঘর। মস্ত ক্যান্টিন আছে, সেখানে নানারকম খাবার পাওয়া যায়, যার যা ইচ্ছা কিনে খেতে পারে। ওদের দেশে সব স্কুলেই খাওয়া এবং খেলার আয়োজন নিখুঁৎ করবার চেষ্টা দেখি। আমাদের দেশে স্কুলে খাদ্যের ব্যবস্থা খুব কম জায়গাতেই আছে। ব্রিটিশ স্কুলে খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু একটু বড় ছেলেমেয়েরা যুদ্ধের সময় তেমন পুষ্টিকর খাদ্যাদি পায় নি বলে, তাদের মধ্যে অনেক দুর্ব্বল ছেলেমেয়ে দেখা যায়। অনেকের চোখ ট্যারা। আমেরিকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা এদের তুলনায় অনেক লম্বা চওড়া এবং মজবুত দেহতে।

পুনশ্চ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোকিল তো বেশ বাবুই হয়ে,
আনন্দেতে বাঁধছো বাসা,—
কোথায় তোমার সে কুহুরব ?
মধুমাসের মধুভাষা ?
চৈতে চূত-মঞ্জরী ঘ্রাণ—
ব্যাকুল তোমার করে না প্রাণ,
ভালবাসা সব ভুলিয়া—
পেতে যে চাও ভালো বাসা।

২

হে মধুকর, চাক বাঁধিছ—
পাকাঘরের অলিন্দেতে।
সে মাধবী কুঞ্জ কোথা ?
ব্যথা তো কই নাইকো চিতে।
নেই মধুতে ফুলের কথা,
ও মধুর নাই মধুরতা,
ইট কাঠেতে আটকে রাখে
গুনগুনানি তোমার গীতে

৩

প্লাবন ভুবন বদলে দিলে
তুমি কি তায় আনন্দিত ?
সুধা ছেড়ে পেলে কি না
ভবন সুধাধবলিত।
ছিলে ভগবানের প্রিয়,
করছো এখন 'গৃহ' 'গৃহ'
তোমার এমন বদল হবে
স্বপ্নে আমি ভাবিনি তো।

৪

শুধাই তোমায় হে সন্ন্যাসী—
এ জীবন কি লাগছে ভাল ?
এলো মণি-মন্দিরেতে
অরণ্যে যে দিন গোঙালো!
ধ্যানের দেশের অধিবাসী
ছিলে—তোমায় ভালবাসি
হে ছায়াপথ এ বিপথে
কোথায় পাবে তারার আলো ?

বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীগণ (মুল চিত্র)   [শিল্পী : শ্রীযামিনী রায়

স্ফটিকে এশীয় চিত্রকলার রূপায়ণ
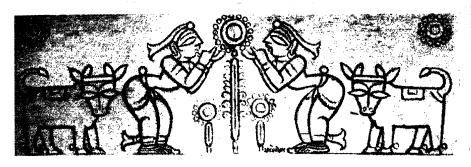
শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের, তথা প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের ভিত্তিপত্তন করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ সেদেশে বেদান্তের বাণী প্রচার করে। সেই ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে স্বামীজীর যোগ্য উত্তরসাধক স্বামী অভেদানন্দের দীর্ঘকাল-ব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও আমেরিকার অগণিত নরনারী মুগ্ধ বিস্ময়ে শুনেছে ভারতের সেই চিরন্তন আধ্যাত্মিকতার বাণী। তার পর নৃত্যকলার মাধ্যমে উদয়শঙ্কর আমেরিকার অধিবাসীদের সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করেছেন ভারত-আত্মার শাশ্বত মহিমাকে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের উপরে যে নির্ভর করে মানব-জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সে বিষয়ে আজ আর দ্বিমত থাকা উচিত নয়। আমাদের যা শ্রেষ্ঠ জিনিষ তা দেব আমরা পশ্চিমকে, আর শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করব পাশ্চাত্ত্যের সর্ব্বোত্তম সাংস্কৃতিক সম্পদ। এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ফলেই ত সমগ্র পৃথিবী এক অচ্ছেদ্য প্রেম ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

সম্প্রতি কলিকাতায় ৭, চৌরঙ্গী রোডস্থিত ইউসিস লাইব্রেরিতে "স্ফটিকে এশীয় চিত্রকলার রূপায়ণ" সম্পর্কিত যে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তা রচনা করেছে ভারতের, তথা এশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার মিলনের এক অভিনব যোগসূত্র। এখানকার প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারের মধ্যে হয়েছে প্রাচ্যের শিল্পকলার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের কারুশিল্পের এক সুষ্ঠু সমন্বয়। এ ক্ষেত্রেও এই চিরন্তন সত্যের আর একটা অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে, শিল্পকলা কোন একটা বিশেষ দেশকালের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত নয়, এবং এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, সাংস্কৃতিক অবদান হচ্ছে সভ্য মানুষের মধ্যে দৃঢ়তম যোগসূত্রসমূহের অন্যতম।

শিল্পী শ্রীযামিনী রায়

এই প্রদর্শনীতে যে সকল স্ফটিকের পাত্র প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলির জন্ম নক্সা এঁকেছেন এশিয়ার ছত্রিশ জন শীর্ষস্থানীয় শিল্পী, পাত্রগুলির আকৃতি এবং রূপদানের কৃতিত্ব ষ্টুবেন ডিজাইন ডিপার্টমেন্টের, আর নক্সাগুলিকে নিপুণভাবে ঝকঝকে স্ফটিকে খোদিত করেছেন আমেরিকান কারুশিল্পীরা। ভাবুক দর্শকের চোখের সামনে এই শিল্প-সংগ্রহের মাধ্যমে রূপোজ্জল মহিমায় ফুটে উঠেছে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং

চিত্রাঙ্কনরত রাম মহারাণা

মুসলিম এই তিনটি ধর্মের চিন্তা ও ঐতিহ্যের বিভিন্নমুখী তিনটি ধারা। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যে সকল কৃতী শিল্পী এই প্রদর্শনীর কাচপাত্রের জন্ম ছবি এঁকেছেন তাঁদের সকলের পরিচয় দেওয়া বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। এর মধ্যে ভারতীয় শিল্পী আছেন পাঁচ জন: কলিকাতার যামিনী রায়, গোপাল ঘোষ এবং ফণীভূষণ; পুরীর রাম মহারাণা আর বোম্বাইয়ের কুলকর্ণী। এঁদের কৃত নক্সাগুলির কথা আমরা যথাস্থানে বলব। আপাততঃ অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় যে সকল শিল্পীর রূপসৃষ্টি এই প্রদর্শনীটিকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে তুলেছে তাঁদের কথা একটু উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

ভারতের পাঁচ জন ছাড়া আর যে একত্রিশ জন শিল্পীর ছবি নবরূপায়ণ হয়েছে স্ফটিকে, তন্মধ্যে—চো, চুঙ-ইয়ুঙ (ইনি এখন ফরমোসায় নির্বাসিত), মা শৌ-হুয়া, রানু ইন-টিঙ এই তিন জন হচ্ছেন চীনের; সুয়েকিচি আকাবা, শিকো মুনাকাতা, কিয়োশি সাইতো, এই তিনজন জাপানের; কিম কি-চাঙ কোরিয়ার; আরটুর য়োজারিও লুজ, মানুয়েল আর রোডরিগুয়েজ ফিলিপাইন্‌স-এর দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার শিল্পীদের মধ্যে আছেন: ভিয়েৎনামের একজন, ইন্দোনেশিয়ার দুই জন, থাইল্যাণ্ডের দুই জন—তন্মধ্যে একজন মহিলা—নাম নারুমোল সারোভাসা, ব্রহ্মদেশের দুই জন আর

রাধাকৃষ্ণের বসন্তোৎসব [শ্রীরাম মহারাণা-কৃত নক্সাযুক্ত স্ফটিক
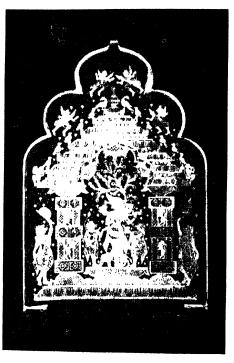
সিংহলের দুই জন। পাকিস্থানের শিল্পীদের মধ্যে আছেন করাচির শেখ আহম্মদ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার আর চার জনের মধ্যে একজন ইরাকের এবং তিন জন ইরাণের। নিকট-প্রাচ্যের শিল্পীদের মধ্যে একজন সিরিয়ার, দুই জন তুরস্কের, এবং চার জন মিশরের।

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, উক্ত প্রদর্শনীতে প্রাচ্যের প্রায় সকল সভ্য দেশের বহু প্রখ্যাত শিল্পীর রূপসৃষ্টির সঙ্গে আংশিকভাবে প্রত্যক্ষ পরিচয়লাভের সুযোগ দর্শকদের ঘটেছিল। ১৯৫৬ সনে এগুলি প্রথম প্রদর্শিত হয় ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল্‌ গ্যালারি অফ আর্টস-এ। এই সংগ্রহের মূলে রয়েছে ষ্টুবেন গ্লাস নির্ম্মাতাদের শিল্পানুরাগ এবং শুভ বুদ্ধি।

আগে পাশ্চাত্য শিল্পকলা নিয়েই ছিল ষ্টুবেন পরিকল্পনাকারীদের কারবার। কিন্তু ১৯৫৪ সনের গোড়ার দিকে ষ্টুবেন গ্লাস

নির্ম্মাতারা দূর এবং নিকট-প্রাচ্যের সমকালীন শিল্পীদের আঁকা ছবি একত্রে সংগ্রহ করবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটা তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই কাজের জন্ম এমন একজনের সহযোগিতা প্রয়োজন প্রাচ্যের সঙ্গে যিনি পরিচিত। ষ্টুবেন গ্লাসের প্রেসিডেন্ট আর্থার এন. হাউট এই কর্ম্মের ভার অর্পণ করলেন নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর স্পেন্সর সংগ্রহবিভাগের কিউরেটার কার্ল কুপের উপর। উক্ত গ্রন্থাগারের স্পেন্সার সংগ্রহের জন্ম বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি এবং পুস্তকের সন্ধানে কুপ ইতিপূর্ব্বে বারকয়েক সমগ্র এশিয়া পরিভ্রমণ করেছিলেন। কাঁচপাত্রের নক্সা সম্বন্ধে তখন কুপের যদিচ সামান্যমাত্র জ্ঞানও ছিল না তথাপি সানন্দে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এবং অচিরেই কাঁচ খোদাইয়ের সুকুমার শিল্প সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অর্জ্জন করতে সমর্থ হলেন।
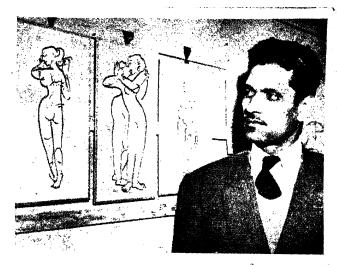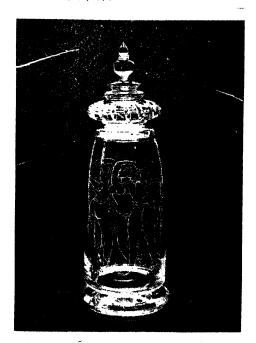
শ্রীকে. এস. কুলকর্ণী

"খাজুরাহো মন্দির"

[শ্রী কে. এস কুলকর্ণী-কৃত নক্সাযুক্ত স্ফটিক-পাত্র]

এইরূপে কুপের যখন চলছিল প্রস্তুতির পর্ব্ব তখন কেবলমাত্র দূতাবাসসমূহ, কনসুলেট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিকট থেকেই নয়, বেসরকারী সংস্থা এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট থেকেও এল সহায়তার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। সিউল থেকে বার্ত্তা এল—"যুদ্ধের দরুন যদিও কোরিয়ার শিল্পের উপর পড়েছিল গুরুতর চাপ তথাপি আমাদের শিল্পীরা কিন্তু কখনও বিরত হন নি ছবি আঁকা এবং স্কেচ করা থেকে।"

অতঃপর পাসপোর্ট ইত্যাদি যোগাড় করে মিঃ কুপ একদিন পাড়ি জমালেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। প্রথমে তিনি এসে পা দিলেন জাপানের মাটিতে, টোকিও নগরীতে। জাপানের 'স্বপ্ন-লোকবাসী' শিল্পীগুরু শিকো মুনাকাতার আসবাবহীন ষ্টুডিওতে মেঝের উপর বসে চা পান করতে করতে কুপ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, যন্ত্রের সাহায্যে প্রাচ্যের শিল্পকর্ম্মকে স্ফটিকের উপর রূপায়িত করে তুলবার জন্ম ষ্টুবেন গ্লাসের কর্ত্তৃপক্ষের এই অভিনব উদ্যমের কথা। দুটি দেশের শিল্পীদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধনের এই শুভ সঙ্কল্প শিল্পীর কল্পনাকে নাড়া দিল গভীর ভাবে। সঙ্গে সঙ্গেই কাগজের উপর দ্রুত গতিতে চলতে লাগল তাঁর তুলি। তৈরী হল পটভূমিকা। তার পর পূর্ব্বে নির্ম্মিত বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের একটি কাঠখোদাই নক্সার দিকে তাকিয়ে বললেন শিকো মুনাকাতা—"ইনি আনন্দ—এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের যোগস্থাপনের জন্যে ইনিও করেছিলেন সমুদ্রে সেতুবন্ধন। ষ্টুবেন গ্লাসের উপর রূপায়িত করবার জন্যে আনন্দকেই আমি দেব।"

জাপান থেকে কুপ গেলেন কোরিয়ায়—তার পর চলল ঝটিতি বিভিন্ন দেশ পরিক্রমণ। চীন, ফিলিপাইন, ভিয়েৎনাম, ইন্দোনেশিয়া—সর্ব্বত্রই শিল্পভাণ্ডারের দ্বার তাঁর নিকট হ'ল অবারিত, সংগৃহীত হ'ল চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহ।

বাঁদরের পাল [শ্রীগোপাল ঘোষ-কৃত নক্সাযুক্ত কাচপাত্র

শ্রীফণীভূষণ

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া পরিক্রমা শেষ করে কুপ অগ্রসর হলেন থাইল্যাণ্ডের দিকে। ব্রহ্মদেশ থেকে তিনি সরাসরি এসে উপনীত হলেন প্রাচ্য-শিল্পকলার পাদপীঠ ভারতবর্ষে (১৯৫৫ সনে)। থাইল্যাণ্ড, সিংহল এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষে প্রখ্যাত শিল্পীদের ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার সংস্পর্শে এসে তাঁর এই বোধ জন্মাল যে, বৌদ্ধ এবং হিন্দু এই উভয় ধর্ম্মই হচ্ছে এই সকল দেশে শিল্প-প্রেরণার মূল উৎস।

কলিকাতায় শিল্পীশ্রেষ্ঠ যামিনী রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন :—"চল্লিশ বৎসর ধরে হিন্দু চিন্তাধারা এবং দর্শন সম্বন্ধে আমি আলোচনা করছি।" এই কথাগুলি আমাকে বললেন যামিনী রায়—এক সন্ধ্যায় যখন আমরা বসে ছিলাম তাঁর কলকাতার বাড়ীতে—এটি বহুজনাকীর্ণ নগরীর উপকণ্ঠে নির্ম্মিত তক্তকে ঝক্ঝকে এবং চুণকাম করা একটি নূতন গৃহ। বৈদ্যুতিক প্রবাহের যোগসূত্র সে রাত্রে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাঁর ছেলে ধরে-রেখেছিল একটি পোর্সিলিনের পাত্রের উল্টাদিকে আটকানো অনেক গুলি ছোট মোমবাতির প্রান্ত। স্নিগ্ধ দীপালোকিত কক্ষে সৃষ্টি হয়েছিল একটি মোহময় পরিবেশ—দৃঢ়তার সঙ্গে যামিনী রায় ব্যক্ত করতে লাগলেন তাঁর মতবাদ—"বিশ্ববিধান সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা এই যে, তা চক্রবৎ আবর্ত্তনশীল। একটা অপরিবর্ত্তনীয় আরম্ভ অথবা চরম অবসানে আমরা বিশ্বাস করি না, কিন্তু এই ধারণা পোষণ করি যে, সৃষ্টি, অস্তিত্ব এবং ধ্বংস হচ্ছে এক অন্তহীন প্রক্রিয়া, চিরকাল ধরে চলছে তাদের পুনরাবৃত্তি। একথা মনে রেখে আমি ছবি আঁকি, এটা জানি যে, শিল্পকলার চক্রাবর্ত্তনেও আছে বিশ্বজনীনতা।" "বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীগণ" এই ছবির উপর 'ফিনিশিং টাচ' বা তুলির শেষ স্পর্শ তখন বুলাচ্ছিলেন তিনি। এটি ছিল টেম্পারায় আঁকা একটি ছবি—তাঁর তুলি চলছিল দ্রুত-গতিতে, তৎসত্ত্বেও কিন্তু তাঁকে আলাপনে আগ্রহশীল বলে প্রতীয়মান হ'ল। তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল গভীর চিন্তাপ্রসূত উক্তি :

'আজকের দিনের খাঁটি ভারতীয় চিত্রকলার উপরে ঠাকুরের (অবনীন্দ্রনাথ) প্রভাবই হয় ত সকলের চেয়ে বেশী, কিন্তু যার প্রতি আমার অনুরাগ সর্ব্বাধিক তা হচ্ছে শিল্পকলার মূলগত লৌকিক উপাদান এবং হিন্দু-অধ্যুষিত ভূখণ্ডসমূহের চিরাগত অঙ্কন-পদ্ধতি।"

মোমবাতিগুলি পুড়ে পুড়ে প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছিল, বাইরে থেকে আমাদের কানে আসছিল বাজার-থেকে-ফিরে-আসা একটি ছোট ছেলের সকরুণ সুললিত সুর—ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছিল সেই গীতধ্বনি। "দেশের আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও, পরিবর্ত্তন হয় নি ভারতের গ্রামীণ জীবনের" মন্তব্য করলেন যামিনী রায়, "এবং এই ভাবধারাকে —সহজ সরল জীবনকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার এই প্রবণতাকে আমি ধরে রাখতে চাই আমার শিল্পকর্ম্মে।"

এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যে শিল্পী যামিনী রায়ের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পসাধনার মর্ম্মকথা কেমন চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে!

যামিনী রায় আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী—তাঁর পরিচিতি সারা বিশ্বে। এশিয়ার শিল্পকলার ক্ষেত্রে আজ তিনি অন্যতম আচার্য্যস্থানীয়। সারা পৃথিবীর লোকের তাঁর চিত্রকলা দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে, শিল্পীর জীবন-দর্শন অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর বহু স্বদেশবাসীকে। মানুষ যামিনী রায় সম্বন্ধে কিন্তু খুব কম কথাই জানা যায়। বিনয়ী, খ্যাতিবিমুখ, প্রায় লাজুক এই শিল্পী তাঁর কলকাতার যে ষ্টুডিওতে থাকেন এবং কাজ করেন, তার দেয়ালগুলি ঢাকা তাঁর ছবিতে। সেখানে তিনি করেন অধ্যয়ন, অনুধ্যান আর ছবি আঁকেন তাঁর নিজের তৈরী ধাতব রং দিয়ে। শিল্পীর কাজে সহায়তা করে তাঁর দুটি ছেলে। সারা দুনিয়ার লোক আসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, তিনি নিজে কিন্তু কদাচিৎ ঘর ছেড়ে বাইরে যান।

ঘরে ফেরা (শ্রীফণীভূষণ-কৃত নক্সাযুক্ত স্ফটিকপাত্র)

যামিনী রায়ের জন্ম হয় ১৮৮৭ সনে বেলিয়াতোড়ে। গতানুগতিক শিক্ষালাভ খুব কমই হয়েছিল তাঁর যদিও কলিকাতা আর্ট স্কুলে স্বল্পকাল তিনি কাজ করেছিলেন। গোড়ায় পোর্ট্রেট বা আলেখ্য-চিত্রকর হবার ইচ্ছা ছিল শিল্পীর—তাঁর নিপুণ তুলিতে আঁকা অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পোর্ট্রেটও আছে। কিন্তু ১৯২১ সনে তিনি সরে আসেন চিরাচরিত পদ্ধতি থেকে এবং পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন হিন্দু চিন্তাধারা ও বাংলার লোকশিল্পের মূলগত উপাদানসমূহের অনুশীলনে। এগুলিই শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রেরণার প্রধান উৎস। পুরনো শিল্পসংস্কার খসে পড়ে গেল জীর্ণ পত্রের মত—জন্ম হ'ল নূতন যামিনী রায়ের—একেই বলে শিল্পীর নবজন্মলাভ। তাঁর রেখায় ছন্দ হ'ল স্বচ্ছন্দ, কল্পনা তার রাশ টেনে ধরল না। নিজের পছন্দমত এখন তিনি তাঁর তুলির ব্যবহার করতে সমর্থ হলেন—তাঁর শিল্পকলা বহন করতে লাগল আন্তরিকতা এবং আধ্যাত্মিকতার বাণী।

"বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীগণ" এই নক্সাটির ভিত্তি হচ্ছে যামিনী রায়ের অতি প্রিয় বিষয়সমূহের অন্যতম প্রভু শ্রীকৃষ্ণের লীলা-কাহিনী। রসিকচূড়ামণি, খেয়ালী কৃষ্ণ বৃন্দাবনের গোপিনীদের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি আসবেন উৎসবরাত্রে চন্দ্রালোকে তাদের সঙ্গে নৃত্য করতে। তীর্থক্ষেত্রে এবং মন্দিরসমূহে হ'ল বিপুল জনতা, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ, তাঁর যে দেখাই নেই।

'ব্লোইং রুমে' কাচশিল্প কর্মের একটি দৃশ্য

কাঁধে গরু নিয়ে চাষী ফিরে আসছে ঘরে—এই যে দৈনন্দিন কর্মচক্রের আবর্তন, এ হচ্ছে নিত্যকাল ধরে প্রবহমাণ জীবনধারার প্রতীক্।

১৯১৩ সনে কলিকাতায় গোপাল ঘোষের জন্ম হয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ দে—ভারতের এই চার জন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নিকট শিল্পচর্চ্চার এবং কলিকাতা জয়পুর ও মাদ্রাজ—এই তিনটি সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে শিক্ষানবিসির দুর্ল্লভ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এরই কল্যাণে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেন সাফল্যের পথে। আজকের দিনে কলিকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং তরুণ শিল্পীদের উপর তাঁর প্রভাব খুব গভীর।

ভারতের বর্ত্তমান শীর্ষস্থানীয় শিল্পীদের অন্যতম বলে পরিচিতি লাভ করেছেন গোপাল ঘোষ। তাঁর কাজ ব্যাপকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে ভারতে এবং লণ্ডনে। ১৯৪৭ সনে তিনি দুটি গুরুত্বপূর্ণ 'এককশিল্পী-প্রদর্শনী'র অনুষ্ঠান করেন—দিল্লীতে-অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল

যদিও গোপিনীরা তাঁকে খুঁজে বেড়াল সর্ব্বত্র, এমনকি গাছপালাও বাদ গেল না তথাপি মিলল না সেই চিরবাঞ্ছিত দয়িতের দর্শন—কৃষ্ণের সেই প্রতিশ্রুতি কখনও হ'ল না প্রতিপালিত।

কার্ল কুপ ভারতবর্ষ থেকে অপর যে সকল শিল্পীর ছবি সংগ্রহ করেন তার মধ্যে যামিনী রায় ছাড়া আরও দু'জন হচ্ছেন বাঙালী—ফণীভূষণ এবং গোপাল ঘোষ।

বাস্তবধর্মী হলেও ফণীভূষণ সেই সকল ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা তাদের দেশের অতীত সম্বন্ধে সচেতন এবং তার ঐতিহ্যগত আদর্শের পুনরুজ্জীবনে সমুৎসুক। ১৯১৯ সনে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়; তিনি শিক্ষালাভ করেন শান্তিনিকেতন স্কুলে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অচিরেই তিনি ভারতীয় তথা হিন্দু লোকগাথা ও লোকশিল্পকে তাঁর বিশেষ বিষয়রূপে নির্ব্বাচন করেন এবং স্কেচ করতে ও ছবি আঁকতে থাকেন—কলিকাতায় এবং ভারতের অন্যান্য নগরীতে তাঁর 'একক শিল্পীর প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯৪৫ সনে হারভার্ড ইউনিভার্সিটি এবং দু'বছর পরে লণ্ডন পরিদর্শন করেন।

১৯৫২ সনে ভারতে ফিরে আসার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর জীবনের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চিলড্রেন্স থিয়েটার বা শিশু নাট্যশালা। এই গুণী শিল্পী এখন প্রতি বৎসর কলিকাতা যাদুঘরের প্রাঙ্গণে শিশুদের কলা উৎসবের অনুষ্ঠান করেন—এতে শিশুরা নিজেরাই হিন্দু লোকগাথার বিভিন্ন অংশের অভিনয় করে থাকে।

স্ফটিকে রূপায়ণের জন্য ফণীভূষণ যে নক্সাটি করেন—তার বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরনো। এর অঙ্কনরীতির সঙ্গে রয়েছে ভারতীয় চিত্রকলার সহজ সরল পদ্ধতির মিল। দিনের কাজ সাঙ্গ করে লাঙ্গল

শ্রীগোপাল ঘোষ

নেহরু আর নিউ দিল্লীর প্রদর্শনীটির উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন হয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক। তার পর থেকেই তাঁর জীবনে আসছে পর পর অযাচিত সম্মান, বিপুল প্রতিষ্ঠা।

"বাঁদর" নামক তাঁর যে ছবিটি স্ফটিকে অনুকৃত হয়েছে, পরিমিত রেখার সাহায্যে স্বকীয় ভঙ্গীতে শিল্পী তাতে ফুটিয়ে তুলেছেন একপাল বাঁদরের ক্ষিপ্র গতিবেগের রমণীয়তাকে।

বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত শিল্পী কে. এস. কুলকর্ণীর 'খাজুরাহো মন্দিরের অনুকৃতি' স্ফটিকে খোদিত হয়েছে। ১৯৪৯ সনে ইনি যোগদান করেন দিল্লীর শিল্পীচক্রে এবং ১৯৫১ সনে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে

এনগ্রেভিং রুমে কাচের উপর নক্সার অনুকৃতি
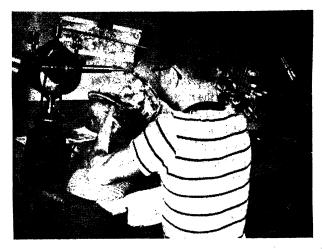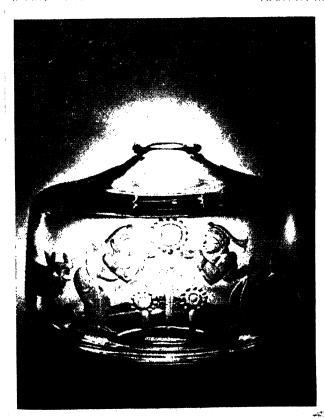
দেখা যায় ভারতীয় পুরনো ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন শিল্পপ্রবণতার সমন্বয়ের এক সার্থক প্রয়াস। খাজুরাহো মন্দিরের নক্সাটিতে রূপরসিকের চোখে ধরা পড়বে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির সঙ্গে ম্যাটিসি এবং মাইল্লোলের প্রভাবের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ।

সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে অপূর্ব্ব মহিমায় শোভা পাচ্ছিল উড়িষ্যার শ্রেষ্ঠ রূপভাবক রাম মহারাণা কৃত 'রাধা কৃষ্ণের বসন্ত-উৎসব' নামক পটের স্ফটিক অনুকৃতি। শিল্পীর নিপুণ তুলিকায় ফুটে-উঠা সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্য স্ফটিকে দ্যুতিমান হয়ে দর্শকদের বিমুগ্ধ দৃষ্টির সমক্ষে যেন মায়াজাল বিস্তার করেছিল। রাম মহারাণার কাজ হচ্ছে-মন্দিরের প্রাচীরচিত্র এবং হিন্দু গৃহস্থ-পরিবারের জন্য মঙ্গলসূচক নক্সা আঁকা। কৃষ্ণলীলার স্মরণার্থে যমুনাতীরস্থ মথুরায় উৎসবতিথিসমূহে ভারতের সকল অঞ্চল থেকে সমাগত তীর্থযাত্রীদের দ্বারা সমবেতভাবে যে আনন্দানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়, তা-ই অনবদ্য সুষমায় বিধৃত হয়েছে রাম মহারাণা-কৃত পটের স্ফটিকানুকৃতিতে।

ভারতের যে পাঁচজন শিল্পীর নক্সা এই প্রদর্শনীতে গৃহীত হয়েছে, তাঁদের শিল্পকৃতির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। স্থানাভাববশতঃ অন্যান্য দেশের, বিশেষতঃ চীন ও জাপানের কথা কিছুই বলা হ'ল

"বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীগণ"—শিল্পী শ্রীযামিনী রায়-কৃত নক্সাযুক্ত স্ফটিকপাত্র

না। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, এই প্রদর্শনী এশিয়ার বহুমুখী শিল্পধারার একটা মোটামুটি পরিচয়লাভের সুযোগ দর্শকদের সমক্ষে উপস্থাপিত করেছিল এবং পাশ্চাত্ত্য কাচ-শিল্পের যে কিরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তা উপলব্ধি করতেও তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন। ষ্টুবেন গ্লাসের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট জন মনটিয়েথ যথার্থই বলেছেন: "Each of the thirty six pieces has its own individuality and its own character. It is indeed a novel and refreshing marriage of the occidental with the oriental."

অর্থাৎ, "ছত্রিশটি শিল্প-দ্রব্যের প্রত্যেকটিরই ছিল বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তা—বাস্তবিকই এ হচ্ছে পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের এক অভিনব মিলন।"

এখন, এ মিলন সাধিত হয়েছে যে-শিল্পের মাধ্যমে সেই স্ফটিকের উপর অনুকৃতির কাজটি কোন্ প্রণালীতে সম্পন্ন হয় তার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক যামিনী রায় কৃত "বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীগণ" নামক নক্সাটির কথা।

প্রথমতঃ—স্ফটিক-কাচের (Crystal glass) উপাদানসমূহ বালি, পটাস, লেড-অক্সাইড এবং চূর্ণীকৃত কাচ (Powdered glass) দ্রবীভূত করা হয় একটি বিশেষ মাটির চুল্লীতে। সংগ্রাহক (gatherer) এই চুল্লী থেকে তার ব্লোয়িং আয়রণের প্রান্তে করে যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ দ্রবীভূত কাচ নিয়ে যায় এবং 'ব্লো' করায় প্রবৃত্ত হয়। তার পর সার্ভিটার তাকে দান করে নির্দ্দিষ্ট আকার। অতঃপর gaffer এর পালা—সে যৌগিক অংশগুলিকে (component parts) জোড়া দেয় এবং আকৃতি দান করে—বাড়তি কাচ সে কেটে ফেলে দেয় ছেদনাস্ত্রের (shear) সাহায্যে। কাচগুলিকে পরিপূর্ণ রূপদানের জন্ত সে সাধাসিধে কাঠের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। অবশেষে কাচের উপর প্রয়োগ করা হয় অলঙ্করণের উপকরণসমূহ।

ব্লোয়িং শেষ হলে পর কাচকে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। তার পর যে সকল কাচখণ্ডের কাজ শেষ হয়েছে তাদের প্রত্যেকটিকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা এবং যে-কোন অসম্পূর্ণ খণ্ড পরিহার করা হয়।

সকলের শেষে নক্সাকে স্ফটিকে অনুকৃত করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয় "কপার হুইল এনগ্রেভিং" কলাকৌশল।

অনুকৃতির কাজ পরিসমাপ্ত হলে পর একটি সুসম্পূর্ণ, বিচিত্রিত নিটোল স্ফটিকের উপর মেলবন্ধন হয়—শিল্পীদের এবং কারুশিল্পীদের কাজের। রূপলুব্ধ মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, স্ফটিকপাত্রের স্বচ্ছ গাত্রে অভিনব শোভায় রূপায়িত হয়ে উঠেছে শিল্পীকৃত সেই অনবদ্য নক্সা—"বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপিনীবৃন্দ।"

ছুটির দিনে

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

বহুদিন পরে আজ অবসর ;—
মিলেছে ছুটি।
কেন খোলো দোর? হয় হোক্ ভোর,—
কি কাজ উঠি'।
নিশিগন্ধার বুকে মূরছিয়া
বিবশ বাতাস রয়েছে পড়িয়া;
গরজ এত কি!—এখনো কেতকী
উঠে নি ফুটি'।
যমুনাপুলিন নিলীন অলস
হংসীসম,
আজি দিনমান রহিও শয়ান
বক্ষে মম।

বাহিরে জগৎ ধু ধু মহামরু,
হেথা গৃহকোণে তুমি ছায়াতরু।
দাও জুড়াইয়া জীবনের জ্বালা
গভীরতম।
খুলো নাকো দোর—হয় হোক ভোর,—
কি কাজ উঠে?
হায়, সংসার-আলেয়ার পানে
কি ফল ছুটে?
উদয়-অস্ত কাজ কোলাহল
ছিল চিরকাল—রবে অবিরল,—
এমন মধুর অবকাশ বল
ক'দিন জুটে।

নূতন পঞ্জিকা

শ্রীঅনিলকুমার আচার্য্য

সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সময়ের পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর এই পরিমাপের প্রথা ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ প্রথম প্রবর্তন করেন 'সিদ্ধান্ত যুগে' (৪০০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে)। তার পর মুসলমান যুগে ভারতে চান্দ্র হিজিরা (পঞ্জিকা) চালু হয়। মধ্যে আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ) কিছুকালের জন্য পারসিক সৌর পঞ্জিকার প্রচলন হয়েছিল। ব্রিটিশ অধিকারের সঙ্গে (১৭৫৭ খ্রীঃ) ভারতে গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা দেখা দেয়। জুলিয়াস সীজার (৪৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ) সময়-পরিমাপের যে পদ্ধতি প্রচলন করেন, ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে পোপ গ্রেগরি (ত্রয়োদশ) তার সংস্কারসাধন করেন। এই পঞ্জিকার নাম হয় তাঁরই নামানুসারে।

সাধারণতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী দেশসমূহে মোটামুটি গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা আর মুসলমান রাষ্ট্রে চান্দ্র পঞ্জিকা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে পঞ্জিকার অসংখ্য রকমফের। তন্মধ্যে ত্রিশটি পঞ্জিকা প্রধান। এই কারণে আমাদের বিভিন্ন প্রদেশে, এমনকি একই প্রদেশে একই ধর্ম্মোৎসব বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দিনে পর্য্যন্ত পালন করা হয়। গত কয়েক বৎসর দুর্গাপূজার সময়-বিভ্রাটের কথা আশা করি, সকলেরই মনে আছে।

এই বিভিন্ন রকমের পঞ্জিকার পরিবর্ত্তে একটি মাত্র পঞ্জিকার উদ্ভাবন ও প্রচলনের জন্য আমাদের দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বহুকাল যাবৎ চেষ্টা করে আসছেন, তন্মধ্যে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ও পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৩ সনে 'কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ' পঞ্জিকাসংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে। এর প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু। ড. মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে কমিটির কাজ সুরু হয়। ইউ-এন-ও'র (United Nations Organisation) সমীপে একটি বিশ্ব-পঞ্জিকা উপস্থাপিত করার দায়িত্বও এই কমিটি গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সনে ভারতের তরফ থেকে এ পঞ্জিকা ইউ-এন-ও-তে পেশ করা হয়। পৃথিবীর সব দেশে এই বিশ্বপঞ্জিকা চালু করার প্রস্তাব হয় ১৯৫৬ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে। কারণ ঐ দিনেই গ্রেগরিয়ান ও বিশ্বপঞ্জিকা পরস্পর মিলিত হয়েছিল। ঐ দিনে বিশ্বপঞ্জিকার প্রবর্ত্তন হলে সমগ্র পৃথিবীতে একটি মাত্র বিশ্ব-গ্রাহ্য পঞ্জিকা থাকত—আর তা হ'ত সামঞ্জস্যবিধায়ক নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্ত্তনশীল। পৃথিবীর গতি ও জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের তত্ত্বসমূহের উপর এই পঞ্জিকার ভিত্তি।

১৯৫৪ সনের জুলাই মাসে ইউনেস্কোতে (United Nations Economic and Social Council) পঞ্জিকাসংস্কার ও বিশ্ব-পঞ্জিকা সম্পর্কে বিবেচনার প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং ইউ-এন-ও'র অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের মতামতও আহ্বান করা হয়। কিন্তু আমেরিকার প্রতিকূলতাবশতঃ শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বপঞ্জিকা পরিত্যক্ত হয়।

কিন্তু বিশ্বপঞ্জিকা পরিত্যক্ত হলেও ডাঃ মেঘনাদ সাহার অধীনে যে পঞ্জিকা সংস্কার কমিটি গঠিত হয়, যথাসময়ে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল। ভারতবর্ষের প্রচলিত বিভিন্ন পঞ্জিকাসমূহের অন্তর্নিহিত ত্রুটিবিচ্যুতির সংশোধন ও দিন তিথি প্রভৃতির নির্দ্ধারণ ব্যাপারে কমিটি বিজ্ঞানসম্মত ধারা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করেন। সংশোধিত নূতন পঞ্জিকা এরই ফল।

গত ৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ হতে সংশোধিত পঞ্জিকা অনুসারে নূতন ভারতীয় বৎসর গণনা আরম্ভ হয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অব্দ প্রচলিত, কিন্তু শকাব্দের প্রচলন প্রায় সব অঞ্চলেই। সুতরাং নূতন পঞ্জিকায় বিভিন্ন আঞ্চলিক অব্দগুলিকে পরিত্যাগ করে শকাব্দকে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে গ্রহণ করা হয়েছে। নূতন পঞ্জিকামতে ৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ হ'ল ১লা চৈত্র ১৮৭৯ শকাব্দ। বর্ত্তমানে বর্ষগণনাক্ষেত্রে এ হিসাবই সরকারী ভাবে গ্রাহ্য।

নূতন পঞ্জিকা অনুসারে ভারতের সর্ব্বত্র শুধু শকাব্দই প্রচলিত হবে আর প্রতি বৎসর বিষুব সংক্রান্তির পর দিন হতে বর্ষারম্ভ হবে। বৎসরের আরম্ভ-দিবস হবে ১লা চৈত্র, আর বর্ষাবসান হবে ফাল্গুনের সংক্রান্তি তিথিতে। মাসের হিসাব হবে নিম্নোক্তরূপ: চৈত্র ৩০ দিন, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র প্রতি মাস ৩১ দিন, আশ্বিন হতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত প্রতি মাস ৩০ দিন। অতিবর্ষে (লীপ ইয়ারে) চৈত্রের ১ দিন বাড়বে।

নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ষগণনাক্ষেত্রে মাসের দিন নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আর বর্ষারম্ভ বৈশাখ হতে সরিয়ে এনে চৈত্র থেকে করা হয়েছে। অর্থাৎ, এখন হতে ইংরেজি মাসের মত আমাদের ভারতীয় মাস গণনার ক্ষেত্রে আমরা একান্ত পঞ্জিকা-নির্ভর না হয়েও স্বাধীন ভাবে মাসের দিন গণনা করতে পারব এবং মাসের দিন-সংখ্যা আগেকার মত প্রতি বৎসরে পরিবর্ত্তনশীল না হওয়ায় পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা হিসাব-নিকাশ, ছুটি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও প্রচুর সুবিধার সৃষ্টি হবে। তবে আমাদের নববর্ষকে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন আনন্দোৎসব, তার ভাবকল্পনার মূলে রয়েছে ১লা বৈশাখের দীর্ঘকালাগত সংস্কার। কাব্যসাহিত্যে রয়েছে তার

বিস্তর পরিচয়। নববর্ষের এই বৈশাখী ভাবনার সংস্কারকে চৈত্রালী চিন্তায় পরিণত করা সহজ হবে না। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষচক্রের এই পরিবর্ত্তন নূতন নয়। বহু পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অগ্রহায়ণ মাস থেকে বর্ষগণনা সুরু হ'ত—আর সেইজন্য অগ্রহায়ণ মাসকে এখনও জ্যোতিষশাস্ত্রে মার্গশীর্ষ বলা হয়ে থাকে। সুদীর্ঘকালের সংস্কারকে কাটিয়ে উঠে আমরা ধীরে ধীরে নব-বিধানে অভ্যস্ত হব—আশা করা যায়।

কিন্তু যা কিছু গোল বেধেছে—পুরাতন প'ঞ্জকার সাত সাতটি দিনকে নস্যাং করে দেওয়ার ফলে। পুরাতন হিসাবের ৮ই চৈত্র নূতন পঞ্জিকায় ১লা চৈত্রে দাঁড়িয়েছে। এমন ত নয় যে, ঐ সাত সাতটা দিন সূর্য্যের আকাশ পরিক্রমা বন্ধ হয়ে ছিল। তবে এই সাত-সাতটা দিনকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেওয়া কি সমীচীন? হিন্দুর জীবনচর্য্যা অনুষ্ঠান-শাসিত—অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, জন্মতিথি, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, কালযাত্রা, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য আমরা পঞ্জিকার উপর নির্ভরশীল। পরম্পরাগত পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা শত শত বৎসর যাবৎ যে পঞ্জিকার অনুসরণ করে এসেছি, তার সহিত নূতন পঞ্জিকার প্রভেদ অনেক গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি করবে। জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি, শ্রাদ্ধবার্ষিকী প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে। রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি ২৫শে বৈশাখ হয়ে গেল ১৮ই বৈশাখ। যে ২৫শে বৈশাখকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে, তার অভিব্যক্তি বাংলা কাব্যেও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধান দিবস ২২শে শ্রাবণ নূতন পঞ্জিকার হিসাবে ১৫ই শ্রাবণে এসে দাঁড়াবে। পুরাতন পঞ্জিকা-মতে যার পিতৃবিয়োগ-তিথি ১৫ই মাঘ, তা নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী ৮ই মাঘে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু এসব গণ্ডগোলের পিঠে একটা লাভের অঙ্কও আছে। আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকাগুলির মধ্যে অনেক গলদ, গোঁজামিল। শত শত বৎসর ধরে গতানুগতিক ধারায় চলার ফলে এসব গলদ ও গোঁজামিল অনেক হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। গত কয়েক বৎসর ধরে দুর্গাপূজার তিথি ও সময়-নির্ঘণ্ট নিয়ে পঞ্জিকায় পঞ্জিকায় মতভেদ ও পত্রপত্রিকায় বাদানুবাদের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। আমাদের দিন ও মাসের মধ্যে একটা বিজ্ঞানসিদ্ধ ধারা ছিল না বলে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী যে তারিখে যে তিথি পড়ার কথা, আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকার গণনায় সব সময় তা পড়ত না। সে সব ক্ষেত্রে বিদেশী ক্যালেণ্ডারের সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন অসঙ্গতির প্রতিকার করা হ'ত। নূতন পঞ্জিকাসংস্কার—এই সকল অসঙ্গতি দূর করে আমাদের তিথিনক্ষত্রকে একটা নির্ভুল গণনার মধ্যে আনার প্রশংসনীয় চেষ্টা। আমাদের মাসগুলির দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না—তাই দিনপঞ্জীকে অঙ্কের ছকে ফেলা যেত না। নূতন পঞ্জিকাসংস্কারের ফলে আমাদের মাসের দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয়ে বৈষয়িক ক্ষেত্রে বহু সুবিধার সৃষ্টি করবে। মাসের দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হলে প্রতি বৎসরের হিসাবের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাসের ভিন্ন ভিন্ন দিনসংখ্যা অনুযায়ী হিসাবের প্রয়োজন হবে না। দিনসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় পরিসংখ্যান, পূর্ব্বাভাস (forecast), হিসাব-নিকাশ, ছুটি প্রভৃতির ব্যাপারে পূর্ব্ব-প্রস্তুতির বহু সুযোগ-সুবিধা মিলবে।

কিন্তু আপিস-আদালত, স্কুল-কলেজ প্রভৃতিতে যদি চলে বিদেশী পঞ্জিকা, আর ছোটখাটো দোকান কাজ-কারবার, ঘর-সংসার প্রভৃতিতে চলে নূতন পঞ্জিকাসহ পুরাতন অব্দ, তবে বিশেষ গণ্ডগোল দেখা দিবার সম্ভাবনা। ৮ই চৈত্র, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ হতে নূতন পঞ্জিকা চালু হয়েছে। এখন (প্রবন্ধ লেখার সময়ে) বৈশাখ মাস শেষ হতে চলল। এই কিঞ্চিদধিক দেড় মাস কালের অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে, নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী দিন-তারিখ গণনার রীতি কোথাও প্রচলিত হয় নি। শুধু দৈনিক পত্রিকায় তারিখ-তালিকায় বিকল্প হিসাবে বঙ্গাব্দের তারিখের পাশে নূতন পঞ্জিকা অনুযায়ী তারিখ ও শকাব্দের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, যে-কোন সংস্কারের সাফল্যের জন্য চাই জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থন। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আইনগত সমর্থনের প্রশ্নও বিবেচ্য। নূতন পঞ্জিকাসংস্কারের পশ্চাতে গবর্ণমেণ্টের আইনগত কোন সমর্থন নেই; আবার পূর্ব্বোল্লিখিত বিবিধ বাস্তব অসুবিধার দরুন জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থনের সম্ভাবনাও অল্প। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, নূতন পঞ্জিকা সংস্কারকে সফল ও কার্য্যকরী করার কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা যদি শীঘ্র গ্রহণ না করা হয়, তবে তা আমাদের বহুবিধ পরিকল্পনার মত অচিরেই বিফলতার অতল গর্ভে বিলীন হবে।

রাজকন্যা

শ্রীঅর্ণব সেন

খুব ভোরেই মিনুর ঘুম ভেঙে গেল। চাঁপা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে খোলা জানালাটা দিয়ে। এখনও সূর্য্য উঠতে ঢের দেরি। সবে আকাশে একটু আলো ফুটছে। আর সেই সময়টাতেই বেশ ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বয়ে যায়। চাঁপাফুলের কমনীয়তা নিয়ে, শিশিরের স্নিগ্ধতা নিয়ে সে হাওয়া ছড়িয়ে যায় চারদিকে।

মিনু উঠে বসল। সাড়ীর আচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল ভাল করে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে ও গিয়ে দাঁড়াল জানালাটার কাছে। আকাশের দিকে চাইল মিনু। ফ্যাকাশে রঙের আকাশে তখনও মিটমিট করছে দু'একটি তারা। আবছা অন্ধকার তখনও চারিদিক ঘিরে আছে। বাড়ীর সামনেকার চাঁপা গাছটার দিকে চোখ ফেরাল মিনু। হলুদ রঙের অজস্র ফুলে ভরে গেছে গাছটা। ফুলের ভারে বুঝি ডালপালা নুয়ে পড়েছে নীচের দিকে। আর আশ্চর্য্য সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়। চাঁপা ফুলের গন্ধটা ভারি ভাল লাগে মিনুর। জানালার দুটো শিক দু'হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে ঝুকে পড়ল মিনু। তার কপাল ঠেকল লোহার শিকে। ঠাণ্ডা স্পর্শে একটু শিউরে উঠল মিনু। সেই মুহূর্ত্তে জানালা দিয়ে শিশির ভেজা হাওয়া ভেসে এসে লাগল ওর সদ্য ঘুমভাঙা দুটি চোখে। কেঁপে উঠল চোখের পাতা দুটি।

কি একটা পাখী ডাকছিল ও পাশের আর একটা গাছ থেকে। ভোরের নির্জ্জনতায় সে ডাক প্রতিধ্বনিত হয়। আরও একটা পাখী দূর থেকে সাড়া দেয় ডাকের। তার পর দুটি পাখীর ডাকে মুখর হয়ে ওঠে ভোরবেলার শান্ত আকাশ আর শিশিরভেজা বাতাস। মিনু চোখ বুজে সুরটুকু উপভোগ করে। সামনেকার ফুলভরা চাঁপাগাছটা ভোরের হাল্কা হাওয়ার ঝাপটেই কেঁপে ওঠে। পুরনো চাঁপার পাপড়ি খসে পড়ে মাটিতে। মিনু চেয়েই থাকে গাছটার দিকে। কতদিন ধরেই ত ও দেখছে গাছটাকে। তবু রোজই নতুন মনে হয় ওর। কত পরিবর্ত্তন ঘটেছে ঋতুতে ঋতুতে। কখনও বিবর্ণ, কখনও সবুজ—কখনওবা মৃত্যুর প্রতীক্। আবার কখনও এসেছে জীবনের প্রেরণা। সেই ছোটবেলা থেকে ও দেখে আসছে।

মিনু জানলা ধরে দাঁড়িয়েই রইল। এমন ভোর এত ভাল লাগে। এত ভাল লাগে এই বাতাসের ছোঁয়া। এত ভাল লাগে ওই ঘন সবুজ পাতার কেঁপে-ওঠা দেখতে। সবকিছু ভুলে যায় ও। এই সব দেখতে দেখতে ওর সমস্ত মন পালকের মত হালকা হয়ে ওঠে।

ভোরের আকাশে এবার দেখা দিয়েছে লালচে আভা। ভোরবেলাকার রঙিন মেঘে ভরে গেছে পূব আকাশ। নাঃ, আর কি দেরি করলে চলে? কত কাজ আজ করতে হবে। আজ যে ওর জন্মদিন।

বাবা আর মা ঘুম থেকে উঠলেই আজ প্রণাম করতে হবে। মা হয়ত উঠে পড়েছে। কলতলা থেকে জল ফেলার শব্দ মিনুর কানে এসে পৌঁছল। উনুনটা আজ একটু তাড়াতাড়িই ধরাতে হবে। তা না হলে রান্না শেষ করাই মুশকিল হয়ে উঠবে। একে ত আজ একটু বেশীরকম রান্না হবে, তার উপর মিনু আজ প্রথম পোলাও রাধবে। পোলাওটা মিনু এর আগে কখনও রাধে নি। মিনুর মাও জানেন না পোলাও রাধতে। মিনু ওর এক বন্ধুর কাছ থেকে শিখে এসেছে রান্নার উপকরণ আর প্রণালী। নিজের জন্মদিনেই মিনু পোলাও রাধবে ঠিক করেছে। আর কয়েকজন বন্ধুকেও ও নেমতন্ন করে এসেছে কাল। বীথি, সুনন্দা, সুমিতা, রেবা আর দু'একজন। মিনু ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরুল।

রান্নাঘরে ইতিমধ্যেই উনুনে আগুন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। মিনু রান্নাঘরে ঢুকতেই ওর মা বললেন, 'যা মিঁনু আর দেরি করিস না, চট করে স্নান সেরে আয়।'

মিনু কাছে গিয়ে মাকে প্রণাম করল। তার পর বলল, 'যাচ্ছি। বাবা ওঠেন নি এখনও? তুতুল, গোপা, শিশির, তোতা, ওরা কেউ ওঠে নি এখনও?' মা বললেন, 'না রে, এখনও কেউ ওঠে নি।'

স্নান সেরে এসে মিনু পরল একটা ঘন সবুজ রঙের সাড়ি। কাল বাবা কিনে এনেছেন ওর জন্যে। ফর্সা রঙ ওর। ভারি সুন্দর মানিয়েছে! ওর সুন্দর ধবধবে কাঁধের পাশ দিয়ে চলে গেছে ঘন সবুজ রঙের আঁচল। আরও ফর্সা মনে হচ্ছে ওকে। চুল আচড়াতে আচড়াতে মিনু নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিল। সত্যি, এত সুন্দর যে ওকে মানাবে, তা আশা করে নি মিনু। অল্প একটু হাসল ও। লজ্জাভরা মিষ্টি হাসি। ছি, ছি—এত সুন্দর দেখালে নিজেরই যেন লজ্জা করে কেমন। বীথি, সুনন্দা, রেবারা আসবে আজ। ঠিক ঠাট্টা করবে ওরা। বিশেষ করে বীথিটা ভারি দুষ্ট। বড্ড বেশী ফাজিলও হয়েছে বীথিটা। বীথি নিশ্চয় ওকে দেখে কিছু একটা মন্তব্য করবে চুপি চুপি। আর বাকি সব মেয়েরা তা শুনে হেসে উঠবে। বীথির সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে মিনুর মনে পড়ে কাল বিকেলের কথা।

মিনু কাল বিকেলে বীথিদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিল। ওই

ত, রাস্তার মোড়ে হলদে রঙের তিনতলা বাড়ীটা বীথিদের। সারা বাড়ীটা খুঁজল মিনু। কোথাও বীথিকে পেল না। কোন ঘরেই নেই। বীথির ছোট বোন কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হতেই মিনু বলল, 'কৃষ্ণা, বীথি কোথায় জান?'

'ও দিদি, দেখ গে হয়ত ছাতে বসে আছে চুপচাপ।' কৃষ্ণা চলে গেল অন্যদিকে।

মিনু ছাতে উঠে দেখল, সত্যিই বীথি একটা কোণে বসে আছে। কি একটা বই পড়ছিল ও। মিনুকে দেখেই ও ছুটে এল।

'ইস, দেখাই মিলে না রাজকন্যার। আমাদের বাড়ী এলে মান খোয়া যায় নাকি?'

'তুই আর বলিস না ভাই। আমাদের বাড়ী তুই কতদিন গেছিস বল ত? অবশ্য গরীবদের বাড়ী বড় লোকে যায় না তা আমি জানি।' কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলে মিনু।

'ওঃ, বড্ড কথা শিখেছিস দেখছি! তার পর, হঠাৎ কি মনে করে এখানে পদার্পণ করা হ'ল রাজকন্যার?'

হেসে উঠল বীথি খিল খিল করে। বিকেলের আকাশে তখন লাল মেঘের ছড়াছড়ি। ঘন নীল আকাশের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে টুকরো টুকরো লাল মেঘ। সবুজ গাছপালা আরও সবুজ হয়ে উঠেছে বিকেলের আলোয়। দূরে তিস্তার চর দেখা যাচ্ছে। বিবর্ণ বিস্তীর্ণ বালুচর। সে চর দূর দিগন্তে মিশে গেছে আকাশের নীলিমায়।

মিনু চেয়ে ছিল সেই দিকে। তিস্তার চরের দিকে চাইলেই ওর মনে জাগে একটা অনির্দ্দেশ্য ব্যাকুলতা। পাখীর ডানাতেই বুঝি আছে অমনি ব্যাকুলতা। সমস্ত মন পাখীর মত ব্যাকুল হয়ে ওঠে হয়ত। মিনু চোখ ফেরাল বীথির দিকে। তার ঘন পল্লব-ভরা দুটি চোখ বিকেলের আকাশের মতই করুণ।

বীথি আর একটু কাছে সরে এসে ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'জানিস মিনু, তুই এত সুন্দর দেখতে যে তোকে দেখলেই আমার হিংসে হয়। তোর জন্যে রাজপুত্তুর অপেক্ষা করে আছে, আর আমাদের জন্যে আছে দুষ্ট ছেলেদের ঠাট্টা।'

মিনু মাথা নীচু করে জবাব দিল, 'বাঃ, তুই ভারি ফাজিল হয়েছিস!'

বীথি এবার আর হাসল না। বলল, 'না রে, সত্যি বলছি, তোকে দেখলেই আমার হিংসে হয়।'

মিনু বীথির গালে আস্তে টোকা মেরে বলল, 'হিংসে করলি তো করলি! ওসব কথা থাক্ এখন। বীথি তোদের ছাদটা কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে।'

বীথি বলল, 'ভাল লাগে তো মহাশয়া আসেন না কেন? এখানে তো রাজপুত্র নেই। সুতরাং লজ্জা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তার পর কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হচ্ছেন?'

মিনু বলল, 'এই তো সবে রেজাল্ট বেরিয়েছে। ভর্ত্তি হব একটা কলেজে।'

'কোন্ কলেজে শুনিই না। শহরে তো দুটো কলেজ আছে মোটে। তোর ভর্ত্তি হওয়া দেখেই তো আমরা ভর্ত্তি হব। তুই ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস করেছিস। তার ওপর তুই আমাদের স্কুলের সব মেয়ের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছিস। বল না কোন্ কলেজে ভর্ত্তি হবি?'

'এখনো ঠিক করি নি। কোন্‌টা ভাল কলেজ রে?'

'সে কি রে! আমি তোকে বলব কোন্‌টা ভাল, কোনটা খারাপ! আশ্চর্য্য, থার্ড ডিভিশনে পাস-করা মেয়ে ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস-করা মেয়েকে শেখাবে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যে কলেজে ভর্ত্তি হব তুই সে কলেজেই ভর্ত্তি হোস। এখন শোন্, একটা কথা বলি। কাল সকালে আমাদের বাড়ী তোর নেমন্তন্ন রইল।'

'কিসের নেমন্তন্ন রে?'

'এমনি নেমন্তন্ন।'

'খুব হয়েছে, এমনি আবার নেমন্তন্ন হয়! পরীক্ষায় পাস হওয়ার নেমন্তন্ন বুঝি?'

'হ'ল না।'

'ও বুঝেছি। জন্মদিন?'

মিনু মাথা নিচু করে হেসে ফেলল।

মিনু আরশির সামনে আর একটু সরে এল। আয়নার মধ্যে নিজেকে দেখতে দেখতে অল্প হাসির রেখা আবার ফুটে উঠল ওর দুটি ঠোঁটে। সত্যিই ওকে সুন্দর দেখতে। বীথি মিথ্যে বলে নি। চুল আঁচড়ানো শেষ করে মিনু ওর চোখের কোলে টানল কাজলের সরু রেখা। তার পর দু'টি ভুরুর মাঝখানে পরল একটি ছোট্ট টিপ।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল মিনু। ওর বাবা অমিয়বাবু একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন। মিনু এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল। অস্পষ্ট স্বরে আশীর্ব্বাদ করলেন অমিয়বাবু মেয়ের মাথায় একটি হাত রেখে। তুতুল, গোপা, শিশির, তোতা, চার জনেই তখন উঠে পড়েছে। রান্নাঘরে গিয়ে হট্টগোল আরম্ভ করেছে। মিনু রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। মিনুর মা ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, 'যাও, তোমরা এখন ঘরে গিয়ে পড়াশুনো করোগে।' তার পর মিনুর দিকে চেয়ে বললেন, 'এত দেরি হ'ল কেন? ওদিকের বারান্দায় পোলাও রাঁধবার চাল শুকোতে দিয়েছি। এখন তুমি চট করে তরকারীগুলো কুটে দাও দেখি।'

মিনু তরকারী নিয়ে বসল। একটু পরেই অমিয়বাবু এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'দাও গো, কি কি আনতে হবে বলে দাও।'

মিনুর মা তখন পোলাও রাঁধবার উপকরণগুলো মিলিয়ে দেখছিলেন। জবাব দিলেন, 'দেখ গে যাও, বড়ঘরের টেবিলে ফর্দ্দ করে রেখে দিয়ে এসেছি। আচ্ছা, তোমাকেও বলিহারি! এতগুলো টাকা মিছিমিছি নষ্ট করবার কি দরকার ছিল? জন্মদিন বলেই কি একগাদা টাকার শ্রাদ্ধ করতে হবে? মেয়ে বললে,

পোলাও রাধব, বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াব, অমনি উনি বললেন 'বেশ ত।'

মিনুর বাবা অমিয়বাবু একটু ভীতু ধরনের, ভালোমানুষ গোছের লোক। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আহা, তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? আজ ওর জন্মদিনে তুমি কি বকাবকি করছ! তা ছাড়া শুধু জন্মদিনের খাওয়াই তো হচ্ছে না; মিনুর পরীক্ষা পাসের খাওয়াও বটে এটা। আচ্ছা, আমি এখন বাজার চললাম। কি রে মিনু, কিছু বলবি?' মিনু বঁটি থেকে চোখ তুলল। বলল, 'মাছটা একটু দেখে এনো। পচা মাছ এনো না যেন আবার।'

বীথি, সুনন্দা, সুমিতারা যখন এল তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। রান্না শেষ হতে অল্প দেরি ছিল। মিনুর মা বললেন, 'যা মিনু, তুই ওদের বসাগে তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে। বাকি রান্না আমি একলাই করে নিতে পারব।'

মিনু ওদের নিয়ে গিয়ে বসাল ওর ছোট্ট ঘরে। আজ ওর বন্ধুরা আসবে বলে ঘরখানি একটু সাজিয়েছিল মিনু। টেবিলে কয়েকটি ফুল—একটি সাদা ফুলদানিতে সাজানো। বিছানায় একখানা বকের পালকের মত শুভ্র চাদর পাতা। দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি। আর সমস্ত দেয়াল জুড়ে রয়েছে শূন্যতা।

বীথি, সুনন্দা, সুমিতারা ওদের উপহার-দিতে-আনা বইগুলো রাখল টেবিলটির ওপর। টেবিলের ওপর বই রেখেই বীথি বিছানায় বসে পড়ে বলল, 'ত্যাখ মিনু, আমাদের উপহারগুলোয় তোর মন উঠবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কি করব বল, রাজপুত্র তো আর আমরা তোকে প্রেজেন্ট করতে পারি না।' ওরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল, জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন। ঠিক সেই সময় রেবা এসে ঘরে ঢুকল। ওকে ঢুকতে দেখেই মিনু বলল, 'এত দেরি হ'ল যে!'

রেবা বলল, 'দেরি কোথায় হ'ল? হাসির ব্যাপারটা কি শুনি।'

সুনন্দা বলল, 'শুনে কাজ নেই তোর। ঠিক সময় আসতে পারিস না কেন? কাল বললাম এগারোটার মধ্যে সবাই মিট করব বীথিদের বাড়ী। তার পর সবাই একসঙ্গে এখানে আসব। তোর জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমরা এখানে চলে এসেছি। তোর কোন কথায় ঠিক নেই।'

রেবা রেগে উঠল সুনন্দার কথায়। বলল, 'ওঃ ভারি কথার ঠিক আছে তোর! শনিবার দিন আমাদের বাড়ী যাবি বলেছিলি, গিয়েছিলি?'

বীথি রেবাকে টেনে এনে খাটে বসিয়ে বলল, 'তোদের ঝগড়া থামা এখন। কোথায় দেখা হলে দু'একটা ভাল কথা বলবি, তা না খালি ঝগড়া! স্কুল ছাড়ার পর থেকে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই হয় না আর! কলেজে ভর্ত্তি হলে যখন আবার রোজ দেখা হবে, তখন ইচ্ছেমত ঝগড়া করিস!'

হঠাৎ সুনন্দা বলল, 'আমি কিন্তু ভাই কলকাতায় চলে যাচ্ছি। ওখানকার কলেজেই ভর্ত্তি হব।'

বীথি বলল, 'তাই নাকি? ইস কলকাতার কলেজে ভর্ত্তি হবি! সুনন্দাটা এক নম্বরের স্বার্থপর! আমরা সবাই এখানে পড়ব, আর উনি কলকাতায় ছুটবেন!'

সুনন্দা রাগ করল না বীথির কথায়। বলল, কি করব বল? বাবা কলকাতায় পাঠাচ্ছেন যে!'

বীথি বলে উঠল, 'ওঃ, বাবা পাঠাচ্ছেন, আর উনি চলেছেন! কেন, তুই বাবাকে বলতে পারিস না যে, তোর যাওয়ার ইচ্ছে নেই।'

মিনু এতক্ষণ জানলার কাছটিতে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। এবার ও বলল, 'উঃ, তোরা বক্‌তে পারিস বটে! এক মিনিট থাম, আমি রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।' মিনু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বেলা তিনটের মধ্যেই বীথিরা চলে গেল। মিনুর হাতের রান্নাকরা পোলাও খেয়ে ওরা প্রশংসাই করে গেছে। মিষ্টিটা বোধ হয় একটু কম হয়েছিল। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। প্রথম রান্নায় একটু আধটু খুঁত ত থাকবেই।

মিনু শুয়ে শুয়ে ওর জন্মদিনে পাওয়া বইগুলি দেখছিল। নতুন বইয়ের আশ্চর্য্য একটা গন্ধ ছড়িয়ে গেছে বিছানাময়। বই, বই আর বই। কত ধরনের, কত রঙের, কত আকৃতির বই। মিনুর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিষ বই। বই পড়ে সময় কাটাতেই ভালো লাগে ওর। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পর সুদীর্ঘ তিন মাস ছুটিতে ও পড়েছে কেবল গল্প আর কবিতার বই। দুপুর-বেলা যখন শিশির তোতা গোপা স্কুলে চলে যায়, বাবা আপিসে বেরিয়ে যান, তুতুল পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে তখন মিনু একখানি বই নিয়ে এসে বসে ওর ছোট্ট ঘরখানিতে। দুপুরের নির্জ্জন বাড়ীর সবচেয়ে নিভৃত ঘর। চাঁপাফুলের গাছটা তখন দুপুরের উজ্জ্বল সোনালী রোদে ভেসে যায়। রাস্তায় ওঠে ধুলোর ঝড়। মিনুদের পাড়াটায় এমনিতেই বাড়ীঘর কম। তার ওপর দুপুরবেলা পাড়াটা আরও বেশী নিস্তব্ধ মনে হয়। ক্লান্ত, বিষণ্ণ, দুপুর নেমে আসে রোদ আর ছায়া নিয়ে। মিনু বই পড়তে পড়তে এক সময় পড়া থামিয়ে দেয়। জানলা দিয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে, আকাশের দিকে—গাছপালার পানে। গাছের পাতার ঘন সবুজ ওর চোখ জুড়িয়ে দেয়। আবার এক সময় চোখ ফিরিয়ে আনে ও বইয়ের পাতায়। এমনি করে কেটে যায় এক একটি চমৎকার ভরা দুপুর।

কিন্তু আর খুব বেশী দিন দুপুরকে পাবে না মিনু। এবার কলেজে ভর্ত্তি হতে হবে। দিন পনেরোর মধ্যেই সব কলেজ খুলে যাবে। ভর্ত্তি আরম্ভ হবে। কলেজের কথা মনে পড়তেই মিনুর মনে একটা আনন্দের ঢেউ নামল। কলেজ! মিনুর ছোটবেলার স্বপ্ন কলেজ। সেখানে বুঝি আছে অখণ্ড আনন্দ। পড়াশুনা

আর আনন্দ বুঝি সেখানে একসঙ্গে মিশে গেছে। স্কুলের মত একঘেয়েমি সেখানে নেই। অবসর আর পড়াশোনা—কোনটাই সেখানে ক্লান্তিকর নয়। কত বন্ধুবান্ধব! কত কি আনন্দের উপকরণ সেখানে আছে। আর আছে বই। মিনুদের ভাল বই নেই বললেই চলে। কলেজে ভর্তি হলে ও আরও কত বই আনবে লাইব্রেরী থেকে। নূতন নূতন বই, কখনও বা পুরানো। পড়বে, আর জানবে কত নূতন জিনিষ!

মিনু ওর ঘরের কোণায় রাখবে একটি ছোট বুকশেলফ। স্কুলের প্রাইজ পাওয়া বই আর কলেজের পড়ার বই একসঙ্গে সাজিয়ে রাখবে তাতে। রোজ সন্ধ্যাবেলায় মিনু রবীন্দ্রনাথের ফোটোর কাছে জেলে দেবে ধূপ। ধূপের ধোঁয়ায় আবছা কবিগুরুর মূর্তিখানি যেন স্পষ্ট দেখতে পায় মিনু।

হঠাৎ মিনুর মনে পড়ল মা আজ রাগারাগি করছিল ওর জন্ম দিনে এতগুলি টাকা খরচ করার জন্যে। কিন্তু মিনু ত বলে নি কিছু করতে। বাবাই ত বললেন বন্ধুদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে। তা না হলে অন্য কোন বার মিনুর জন্মদিনে কিছু করা হয় না, কেবল মা একটু পায়েস রান্না করেন। কিন্তু এবারের কথা সম্পূর্ণ আলাদা। এবার ও ফার্ষ্ট ডিভিশনে পাস করেছে। তার রেজাল্ট বের হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই পড়েছে জন্মদিন। তাই এবার একটু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। অবশ্য মাকেও দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি, মিনুদের যা অবস্থা হয়েছে তাতে এ খরচ করাটাও অন্যায়। মিনুর বাবার যা চাকরি তাতে সংসার চালানোই কষ্টকর হয়ে উঠেছে এখনকার দিনে। মাসের প্রথমে মাইনে পাওয়ার কয়েক দিন পরেই মিনু শোনে আর টাকা নেই বাবার কাছে। তখন থেকেই বাবা আর মার মধ্যে আরম্ভ হয় ঝগড়াঝাটি। রোজ সেই বিরক্তিকর ব্যাপার দেখতে মিনুর ভারি খারাপ লাগে। তখন কিছুই আর ভাল লাগে না ওর।

ভাবতে ভাবতে মিনুর হঠাৎ মনে হ'ল এতগুলি টাকা খরচ না করলেও চলত। মিছিমিছি একদিনে বাবার কত কষ্টে সংগ্রহ করে আনা টাকাগুলি সে খরচ করিয়ে দিলে! তখনি ওর মনে হ'ল ও যখন কলেজে ভর্তি হবে তখন আরও ভাল হবে পড়াশোনায়। তখন বাবা আর মা টাকার কথা ভুলে যাবেন। তা ছাড়া শুধু ত এক দিনই ও খরচ করেছে। কত দিকেই ত টাকা বেরিয়ে যায়। ওর জন্মদিনে কিছু খরচ হ'লই বা। কলেজের কথাটা মনে পড়তে আবার মিনুর সমস্ত মন আনন্দে ভরে উঠল। আর মাত্র পনের দিন পরেই ও ভর্তি হবে কলেজে।

বাড়ী থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে কলেজ। বীথির সঙ্গে এক সঙ্গে চলে যাবে। কলেজ যাওয়ার পথে ও রোজ ডেকে নেবে বীথিকে। বীথিটা আবার যা সৌখিন, ওর সাজগোজ করতেই এক ঘণ্টা। ওকে ডাকতে গিয়ে হয়ত ও ঠিকমত কলেজেই পৌঁছতে পারবে না। কলেজ আবার দশটায় বসে। এ ত স্কুল নয় যে, রোজ এগারোর সময় বা বা রোদ্দুরে যেতে হবে! আর একটা সুবিধে আছে কলেজে। কলেজে প্রতিটি পিরিয়ডে আলাদা আলাদা করে নাম ডাকা হবে। কাজেই ফার্ষ্ট পিরিয়ডে না পৌঁছতে পারলেও ক্ষতি নেই। তা ছাড়া রোজই ত আর ফার্ষ্ট পিরিয়ড থাকবে না। হয়ত কোন দিন এগারটার সময়, কোনদিন বারোটার সময় যেতে হবে। আবার তিনটের মধ্যেই ছুটি। কোনদিন আবার দুটোতেই ছুটি। বাড়ী এসে গল্পের বই পড়ার যথেষ্ট সময় থাকবে। এক আশ্চর্য্য নূতন অনুভূতি ছেয়ে ফেলে মিনুর সমস্ত মন।

পাশের ঘরে বাবা, মার সঙ্গে কথা বলছিলেন। মিনু ভাবল, বাবার কাছে জেনে আসা যাক—কবে কলেজে ভর্তি হবে। তা ছাড়া শহরে দুটো কলেজ আছে। কোনটায় ভর্তি করানো বাবার ইচ্ছা তাও জেনে নেওয়া দরকার। বীথিদের বলতে হবে আবার। মিনু বিছানা থেকে নামল। আস্তে আস্তে পা ফেলে ফেলে ও এগোল পাশের ঘরের দিকে। কলেজের চিন্তায় ওর সমস্ত মন তখন ভরপুর।

মিনুর বাবা অমিয়বাবু মিনুর মাকে কি একটা কথা বলছিলেন। মিনুকে দেখেই একটু থামলেন। তার পর বললেন, 'এই যে আয় মিনু, তোর কথাই হচ্ছিল! হ্যাঁ, শোনো গো, তোমায় যা বলছিলাম! বাজার থেকে ফেরার পথেই যোগেনবাবুর ওখানে গিয়েছিলাম। অনেকদিন থেকেই ত বলা ছিল যোগেনবাবুকে। মহামায়া বালিকা বিদ্যালয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা বলতে ত যোগেনবাবুকেই বোঝায়। বুঝলে না? উনিই ত কমিটির সবকিছু! কমিটির আর সবাই ওঁর কথায় উঠে বসে। তা হবে না, যোগেনবাবু কি যে সে লোক! উনি আজ নিজে থেকেই বললেন মিনুর জন্যে দরখাস্ত করতে। ওঁদের স্কুলে একজন টিচার দরকার। আর দরখাস্ত করলেই হয়ে যাবে নিশ্চয়। যোগেনবাবু যখন পেছনে আছেন তখন মিনুর বয়স কম হলেও আটকাবে না। মাইনেও মোটামুটি ভালই। কি মিনু, তোর আপত্তি নেই ত?···না তুই আপত্তি করবি না আমি জানি। দেখ, শিশির, তোতা, গোপা, তুতুল এদেরও ত লেখাপড়া শেখাতে হবে। আর আমার অবস্থা ত জানিসই! আজকাল কত মেয়ে চাকরি করে বাবা, মা, ভাইবোন, সবাইকে খাওয়াচ্ছে। তুই ত সবই বুঝিস। কি রে মিনু তোর মত আছে ত?'

মিনু দরজার চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। তার ঘন সবুজ রঙের শাড়ি তখন ভাজ ভেঙে দুমড়ে গেছে। তবু সেই ভাজ ভেঙে যাওয়া অগোছালো শাড়িতে অপরূপ সুন্দর লাগছিল মিনুকে। দুপুরবেলা চলে যাওয়ার আগে বীথি দুষ্টুমি করে ওকে চন্দনের ফোঁটায় সাজিয়ে দিয়েছিল। চন্দনের টিপ তখনও মুছে যায় নি। মাঝে মাঝে চন্দনের মৃদু গন্ধ এসে লাগছিল ওর নাকে।

মিনু দরজায় এক পাশে সরে দাঁড়াল। ওর মুখখানি যেন সেই মুহূর্ত্তে বড় করুণ মনে হ'ল। মিনু ওর ফর্সা সুন্দর গ্রীবা নত

করল। ওর চোখ নেমে গেল মাটির দিকে ঘরের মেঝের। সত্যিই ওকে রূপকথার দেশের রাজকন্যার মতই অপরূপ লাগছিল! তার সবুজ শাড়ির ভাজে কত ক্লান্তি যেন জড়ানো। মিনু চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল।

মিনুর বাবা অমিয়বাবু আবার বললেন, 'কি রে মিনু, তোর মত আছে ত?' এবার গলার স্বর যেন একটু গম্ভীর। কুন্দশুভ্র গ্রীবা আরও নিচু করল মিনু। একটি ভীরু কপোতীর মত অসহায় মনে হ'ল ওকে।

শুকনো সিমেন্টের মেঝেয় বুঝি দু'ফোটা চোখের জল পড়েছিল। পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেই দু' ফোটা জল ঘষে ঘষে মেঝের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে দিতে মিনু বলল, 'হ্যাঁ, আমার মত আছে বাবা।'

অমিয়বাবু বললেন, 'মিনু আমি জানতাম তোর অমত হবে না। আর শুধু শুধু কলেজে পড়েই বা কি হবে?'

মিনু কান্নাভেজা গলায় জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ঠিকই ত।' একটা গভীর নৈঃশব্দ্য নামল ঘরের ভিতর।

ভারতীয় ভাষার ক্রমবিবর্ত্তন

শ্রীশুভেন্দুশেখর ভট্টাচার্য্য

"শব্দার্থৌ তে শরীরং, সংস্কৃতং মুখং, প্রাকৃতং বাহুঃ, জঘনমপভ্রংশঃ, পৈশাচং পাদৌ।" রাজশেখর, কাব্যমীমাংসা পৃ. ৬।

"হে কাব্যপুরুষ! শব্দ ও অর্থ তোমার শরীর। সংস্কৃত তোমার মুখ; প্রাকৃত ভাষা-নির্ম্মিত তোমার বাহুদ্বয়; তোমার জঘনদেশ অপভ্রংশভাষাময়; তোমার পদযুগল পৈশাচ ভাষা-বিনির্ম্মিত।" (সাহিত্য মীমাংসা, পৃ ৮০—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য কৃত বঙ্গানুবাদ)।

সংস্কৃত মৃতভাষা বলিয়া অনেকের ধারণা। কাহাকেও মৃত বলিলে এককালে তাহার জীবন ছিল একথা স্বীকার করিতে হয়। সংস্কৃত ভাষা কবে জীবিত ছিল? কবে মরিয়া গেল? আমরা যে সমস্ত সংস্কৃত বই সাধারণতঃ পাঠ করি—নৈষধীয়-চরিত (দ্বাদশ শতাব্দী), বেণীসংহার (দ্বাদশ শতাব্দী), মুদ্রারাক্ষস (অষ্টম শতাব্দী), উত্তররামচরিত (সপ্তম শতাব্দী) শিশুপাল বধ (সপ্তম শতাব্দী), কিরাতার্জ্জুনীয় (পঞ্চম শতাব্দী), মৃচ্ছকটিক (চতুর্থ শতাব্দী), মেঘদূত (তৃতীয় শতাব্দী), রঘুবংশ (তৃতীয় শতাব্দী), কুমারসম্ভব (তৃতীয় শতাব্দী), অভিজ্ঞানশকুন্তল (তৃতীয় শতাব্দী) স্বপ্নবাসবদত্তা (তৃতীয় শতাব্দী), সেগুলি যখন রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে সংস্কৃত মরিয়া গিয়াছিল। এ সকল গ্রন্থের পূর্ব্বে রামায়ণ, মহাভারত ও কিছু পুরাণ রচিত হইয়াছিল—সে যুগেও সংস্কৃত জীবন্ত ছিল না। তবে সংস্কৃত কবে মরিয়া গেল? এ প্রশ্নের উত্তর নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আরও দুই একটি বিষয়ের অবতারণা আবশ্যক।

সংস্কৃত নাটকগুলি আগাগোড়া সংস্কৃতে লিখিত নহে। রাজা সংস্কৃতে কথা বলেন, রাণী জবাব দেন প্রাকৃতে। উচ্চশ্রেণীর পুরুষপাত্র ভিন্ন সকলে প্রাকৃতে কথা বলিবে, অলঙ্কারশাস্ত্রে এরূপ নির্দ্দেশ আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, পরস্পরবোধগম্য সংস্কৃত ও প্রাকৃত নামে দুইটি ভাষা চালু ছিল। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে সমাধানযোগ্য নহে। সংস্কৃত যেরূপ মৃত ভাষা, প্রাকৃতও তদ্রূপ। মৃত ভাষার চিহ্ন কি? মৃত ভাষা বিকাররহিত, স্থির, অচঞ্চল। যুগে যুগে দেশে দেশে তাহার রূপ-পরিবর্ত্তন হয় না। সংস্কৃত ভাষা ব্যাকরণের দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। পাণিনী যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয়ের অধিকার নাই। যাঁহারা গ্রন্থরচনা করিয়াছেন তাঁহারা সযত্নে পাণিনীর বিধানগুলি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। ইহাই ভাষার প্রাণহীনতার লক্ষণ। আরও একটি আনুষঙ্গিক অসুবিধা আছে। ভাষা বলিতে সাধারণতঃ লোকের মুখের কথা ধরা হয় এবং তাহাকে মূল ধরিয়া ভাষার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। আজকাল মুখের কথা ধরিয়া রাখিবার এবং পরকে শুনাইবার নানাপ্রকার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে—যথা, সিনেমা, রেডিও এবং গ্রামোফোন। কিন্তু অতীতে এরূপ কিছুই ছিল না। আমরা ভাষার নিদর্শন যাহা পাইতেছি সবই সাহিত্যের ভাষা। কথ্য ভাষা হইতে লেখ্য ভাষা সাধারণতঃ কতকটা ভিন্ন হইয়া থাকে। সেইজন্য নাটকের কথোপকথনের মধ্যেও যে ভাষা আমরা পাইতেছি তাহাকে কথ্য ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা থাকা স্বাভাবিক। যদি বিভিন্ন পুস্তকের ভাষায় কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইত তাহা হইলে ভাষার সম্ভাব্য গতিপথের একটা নির্দ্দেশ হয়ত পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রাকৃত ভাষাও সংস্কৃত ভাষার মত স্থির এবং প্রাণহীন। এ সমস্ত পুস্তক রচিত হইবার বহুকাল পূর্ব্বে এ দুই ভাষাই মরিয়া গিয়াছে।

প্রাকৃত ছাড়া আরও একটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার সন্ধান আমরা পাইতেছি। ইহা হইল পালি। সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্ম-সাহিত্য এই ভাষায় রচিত। এই ভাষার পঠন-পাঠন ভারতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভারতের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তিব্বত,

ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান, এবং সিংহলে শ্রদ্ধার সহিত পালি যথাযথ পঠিত হইয়া আসিতেছে। লোকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া সাধারণের বোধগম্য পালি ভাষায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছিলেন। পালি সাহিত্যকে তাঁহার যুগের প্রচলিত কথা ভাষার সাহিত্যিক রূপ বলিয়া ধরা যায়। বুদ্ধদেব খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক—তাহা হইলে পালি সেই যুগের ভাষা। তাঁহার পরবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালের কয়েকটি শিলালিপি আমরা পাইতেছি। এগুলির ভাষা প্রাকৃত (পাদটীকা-১)। এরূপ অনুমান সঙ্গত যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর আগে পালি প্রাকৃতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে আমরা পরিবর্ত্তনের ধারা এইরূপ ধরিতে পারি। প্রথমে সংস্কৃত পালিতে পরিবর্ত্তিত হইল এবং পরে পালি প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

এই পরিবর্ত্তনের ধারা আদৌ সংস্কৃত হইতে সুরু হইল কিনা এ বিষয়ে অনেকে সন্দিহান। পালি এবং প্রাকৃতের মধ্যে যে সকল ধ্বনিগত এবং ব্যাকরণগত পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করি সেগুলি সংস্কৃত হইতে না হইয়া বৈদিক ভাষা (পাদটীকা-২) হইতে হইয়াছে বলিলে সাধন করা সুগম হয়। বৈদিক সংস্কৃত লৌকিক সংস্কৃত হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, অন্যান্য মৃত ভাষাগুলি বৈদিক সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার স্থান কোথায়? আমরা সাধারণতঃ এই ধারণা পোষণ করি যে, কোন অতীত যুগে প্রচলিত কথা ভাষা মার্জ্জিত হইয়া সাহিত্যিক সংস্কৃতের রূপগ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই মত স্বীকার করিলে সংস্কৃত একটি কৃত্রিম ভাষা হইয়া পড়ে। কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এইভাবে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন সংস্কৃত কোন কালে কথ্য ভাষা ছিল না। সম্প্রতি বাংলা ভাষার উৎপত্তি আলোচনা প্রসঙ্গে একেক বিশিষ্ট লেখকও এই মতের পুনরুক্তি করিয়াছেন (পাদটীকা-৩)

এইরূপ মতের প্রতিষ্ঠা ভাষতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্তের উপর। তাঁহারা নানাপ্রকার যুক্তি ও সূত্র অনুসরণ করিয়া যেভাবে ভারতীয় ভাষার বিকাশ ধরিয়াছেন তাহাতে অনুক্রম দাঁড়ায় এইরূপ—বৈদিক—পালি—প্রাকৃত—অপভ্রংশ। এই ধারায় সংস্কৃতকে স্থান দেওয়া যাইতেছে না। কাজে কাজেই সংস্কৃতকে একটি কাল্পনিক ভাষা বলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই সমস্যা সমাধানে একটু ইঙ্গিত কীথ সাহেব দিয়াছেন। বৈদিক ভাষা যখন জনসাধারণের মধ্যে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করিতেছিল তখন উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বৈদিক ভাষা সংস্কৃতে পরিণত হইয়া যাইতেছিল। Mass Language বা সাধারণের ভাষা হিসাবে জন্মলাভ করিতেছিল পালি, প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ; Class language বা বিশেষ শ্রেণীর ভাষা হিসাবে আবির্ভাব হইয়াছিল সংস্কৃতের। দুই শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন ভাষার ক্ষীণ স্মৃতি হিসাবে সংস্কৃত নাটকে প্রাকৃতের প্রয়োগ রহিয়া গিয়াছে। কীথ বলিয়াছেন :

"The fact that Sanskrit was regularly used in conversation by the upper classes, court circles eventually following the examples of the Brahmins in this regard, helps to explain the constant influence exercised by the higher form of speech on the vernaculars. Those who adapted the vernaculars for the purpose of writing in any form or literary composition were doubtless in constant touch with circles in which Sanskrit was actually in living use".

প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সাহিত্যের শেষ স্তরেই আমরা সংস্কৃতের দেখা পাই। তখনও কথা ভাষারূপে পালি প্রাকৃতের উদ্ভব হয় নাই। যদি বিভিন্ন দেশে শব্দের প্রয়োগে এবং উচ্চারণে ভেদ না থাকিত তবে পাণিনী ব্যাকরণে প্রাচাম, উদীচাম প্রভৃতি শব্দের কোন অর্থই থাকে না। একটি জীবন্ত ভাষার ব্যাকরণ রচনা করিতে না বসিলে কেহ এরূপ কথা প্রয়োগ করে না।

সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃতের এখন যে পঠন-পাঠন প্রচলিত আছে তাহা এগুলি সাহিত্যের ভাষা বলিয়া নয়। নিতান্ত ধর্মীয় প্রয়োজনে এ ভাষাগুলিকে বিভিন্ন সম্প্রদায় রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। সাহিত্য হিসাবে ইহাদের আস্বাদন নিতান্ত গৌণ প্রয়োজন। পালি ভাষায় রচিত সমস্ত গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত অথবা বিনষ্ট করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতের বাহিরে বৌদ্ধসম্প্রদায় সযত্নে ধর্ম্মগ্রন্থগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আজ পালি-ভাষাকে সঞ্জীবিত করা সম্ভব হইয়াছে। তিনখানি কাব্যগ্রন্থ (গাথা সপ্তশতী, রাবণবহো এবং গৌড়বহো) এবং নাটকে টুক্‌রা প্রাকৃত উক্তি পাঠ করিবার জন্য কেহ প্রাকৃত শিক্ষা করে না। জৈন সম্প্রদায়ের সমগ্র ধর্ম্মসাহিত্য এই ভাষায় রচিত এবং তাঁহারাই এই ভাষাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। নৈষধীয় চরিতের কবিত্বে মুগ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে বা উত্তররামচরিতের করুণরসে বিগলিত হইবার জন্য কাহাকেও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। কুমারসম্ভবের সৃজনী প্রতিভা বা স্বপ্নবাসবদত্তার বাস্তবানুগতার রসাস্বাদন করাও সংস্কৃত-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রক্রিয়া, সামাজিক বিধান, ধর্ম্মীয় কাহিনী, দার্শনিক চিন্তাধারা সব সংস্কৃতে নিবদ্ধ। বেদ, পুরাণ, আগম, কর্ম্মকাণ্ড, স্মৃতি, দর্শন, এই সমস্ত জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহই সংস্কৃতশিক্ষার মুখ্য আকর্ষণ। বিভিন্ন যুগের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং একনিষ্ঠ চর্চ্চার ফলে বহু প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া টিকিয়া আছে—"embalmed like mummies for the future generations."

ভাষার স্রোত নিশ্চয়ই অবিরাম গতিতে বহিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে যে সমস্ত উঁচু ডাঙ্গা জাগিয়া উঠিয়াছে, আমরা কেবল তাহাই ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছি। পর পর ভাষাগুলি দেখিয়া গেলে মনে হয় যেন মণ্ডুকপ্লুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু

বিকার ধীরে ধীরে হইয়াছে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। প্রত্যেক ভাষার মধ্যেও কালের অন্তর স্থূলভাবে ৫০০ বৎসর বলিয়া ধরা যায়। সংস্কৃত হিন্দুদের পবিত্র ভাষা—ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০ সনের ভাষা। পালি বৌদ্ধদের পবিত্র ভাষা—ইহা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সনের ভাষা। প্রাকৃত জৈনদের পবিত্র ভাষা ইহা খ্রীষ্টজন্মের সমকালীন ভাষা। আবার ৫০০ যোগ করিলে পাই অপভ্রংশ ভাষা। ইহা প্রাকৃত এবং আধুনিক ভাষার মধ্যবর্ত্তী ভাষা—যৎসামান্য নিদর্শন রাখিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আবার ৫০০ বৎসর ধরিলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১০০০ সনের কাছাকাছি আমরা আধুনিক ভারতীয় ভাষায় আসিয়া পৌঁছই।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা দেশভেদে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সর্ব্বত্র একরূপ। প্রাচ্য, উদীচ্য প্রভৃতি দেশভেদে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে যে সমস্ত উক্তি আছে, কালের বিস্তর ব্যবধানের ফলে তাহার স্বরূপনির্দ্ধারণ অসম্ভব। দেশভেদে ভাষাভেদ কবে আরম্ভ হইল? পশ্চাৎ-গতিতে আলোচনা করিয়া দেখা যাক। আধুনিক ভাষার পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর অপভ্রংশ ভাষা। অপভ্রংশের নিদর্শন এত সামান্য যে, দেশভেদে ইহাকে ভাগ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। কল্পনা করিয়া লওয়া হয় প্রত্যেক আধুনিক ভাষার মূলে একটি অপভ্রংশ ভাষা আছে। বাংলা এবং মরাঠীর পূর্ব্ববর্ত্তী অপভ্রংশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পঞ্জাবী, হিন্দী এবং গুজরাটীর পূর্ব্ববর্ত্তী অপভ্রংশ ভাষা পাওয়া গিয়াছে—ব্রাচট, নাগর এবং উপনাগর অপভ্রংশ (পাদটীকা-৪)। অপভ্রংশের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাকৃতে দেশভেদে ভাষাভেদ সুস্পষ্ট। প্রাকৃত প্রধানতঃ চারটি—মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, শৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্রী (পাদটীকা-৫)। এখানে নামের মধ্যেই দেশভেদ রহিয়াছে মাগধী (পাটলীপুত্র বা পাটনা অঞ্চলের ভাষা), অর্দ্ধমাগধী (মগধ ও শূরসেনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল অর্থাৎ বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশের ভাষা), শৌরসেনী (শূরসেন অর্থাৎ মথুরা অঞ্চলের ভাষা), মহারাষ্ট্রী (মহারাষ্ট্রের ভাষা)। সাহিত্যের ভাষা হিসাবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের সমধিক চর্চ্চা হইয়াছিল। পালিতে দেশভেদে ভাষাভেদ নাই—তবে অনুমান পালি মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী স্তর। সংস্কৃতে কোন ভেদ নাই পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সংস্কৃত মধুর রচনা, গম্ভীর রচনা, দুরূহ রচনা এবং সুখপাঠ্য রচনাকে বিশেষণগর্ভ নামকরণ না করিয়া বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী এবং লাটিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। দেশ অনুসারে রচনারীতির নামকরণ কি সুদূর অতীত যুগে দেশভেদে ভাষাভেদের স্মৃতি?

প্রধান ভারতীয় ভাষার তিনটি দ্রাবিড়বর্গের ভাষা বাদ দিলে বাকী থাকে ছয়টি। এই ছয়টি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, তিনটি অপভ্রংশ ভাষা, চারটি প্রাকৃত ভাষা একত্র মিলাইয়া দেখিতে গেলে ভারতীয় ভাষার উৎসসন্ধানের একটি নিম্নরূপ ছক তৈয়ারী করা যায়।

	প্রাকৃত	অপভ্রংশ		আধুনিক ভারতীয়
পালি	মাগধী	?	———→	উড়িয়া, বাংলা
	অর্দ্ধ মাগধী	?	আবধী	→ হিন্দী
সংস্কৃত	শৌরসেনী →	নাগর	ব্রজবুলি	
		উপনাগর		গুজরাটী
	?	ব্রাচট		পঞ্জাবী
	মহারাষ্ট্রী	?		মরাঠী

বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত অপভ্রংশ—এই ভাবে ধাপে ধাপে প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কি কি পরিবর্ত্তন আসিল তাহা জানা আবশ্যক। এতগুলি ভাষা সম্বন্ধে একসঙ্গে আলোচনা করা অসুবিধাজনক। আমরা সংস্কৃতকে স্থিরবিন্দু কল্পনা করিয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈদিক এবং পরবর্ত্তী প্রাকৃতের সঙ্গে তাহার প্রভেদটুকু মাত্র দেখিয়া লইব। পরস্পর অম্বিত ভাষার মধ্যে প্রভেদ তিন প্রকারের হইতে পারে—(১) ধ্বনিগত—Phonological, (২) ব্যাকরণগত—morphological এবং (৩) প্রয়োগগত—syntactical। প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় syntax বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। তাহা হইলে মাত্র দুই প্রকারের ভেদ অবশিষ্ট থাকে—ধ্বনিগত এবং ব্যাকরণগত। মোটামুটি ভাবে বলা যায় বৈদিক এবং সংস্কৃতের প্রভেদ ব্যাকরণগত—সংস্কৃত এবং প্রাকৃতের প্রভেদ ধ্বনিগত। বৈদিক ভাষার শব্দাবলী অবিকৃত ভাবে সংস্কৃতে গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার কালবশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে ব্যাকরণে বহু পরিবর্ত্তন আনয়ন করা হইয়াছে। বৈদিকে যে সমস্ত স্থলে একাধিক রূপ সাধন করা হইত—তাহার একটি রাখিয়া অন্যটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নর শব্দের রূপে তৃতীয়ার একবচনে নরা, প্রথমার দ্বিবচনে নর (নরা), প্রথমার বহুবচনে নরাসঃ, তৃতীয়ার বহুবচনে নরেভিঃ, সপ্তমীর বহুবচনে নরাম্ বাতিল হইয়া যথাক্রমে, নরেন, নরৌ, নরাঃ নরৈঃ, নরানাম্ অবশিষ্ট রহিল। ফল শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার বহুবচনে ফলা লুপ্ত হইল ফলানি থাকিয়া গেল। এইরূপ আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিল। ধাতু রূপের ক্ষেত্রেও মসি (লট্‌ উত্তমপুরুষ বহুবচন) এ (লট, আত্মনেপদী প্রথম পুরুষ একবচন) ধ্ব (লোট, আত্মনেপদী, দ্বিতীয় পুরুষ বহুবচন) স্থানে যথাক্রমে মস, তে এবং ধ্বম্ বিহিত হইয়া গেল। 'র' যুক্ত প্রথম পুরুষের বহুবচন কেবলমাত্র লিটে থাকিল (একমাত্র শী ধাতুর লটে আছে শেরতে), লোটে ধ্বং লুপ্ত হইল, 'হি'র বদলে 'ধি'র প্রয়োগ লুপ্ত হইল। লেট বিভক্তি একেবারে বাদ হইয়া গেল—কেবল উত্তম পুরুষের বিভক্তিগুলি লোটে যোগ করিয়া দেওয়া হইল।

লিঙ্গের বৈচিত্র্য বহুলাংশে খর্ব করা হইল। অসমাপিকা ক্রিয়ার সংখ্যা কমাইয়া মাত্র 'তুম্' রাখা হইল। ত্বি এবং ত্বায় বাদ হইয়া গেল, থাকিল ত্ব। অভিনবত্ব যাহা আমদানী করা হইল তাহা সামান্য—ভূ আস এবং কৃ ধাতুযোগে লিট্, বিধিলিঙ স্থলে তব্য এবং অনীয়ের প্রয়োগ লুটের আত্মনেপদ বিভক্তি এবং কর্তৃবাচ্যে ক্তবতু কৃদন্ত প্রত্যয়।

প্রাকৃতের সহিত সংস্কৃতের প্রভেদ প্রধানতঃ ধ্বনিগত। বৈদিক ভাষায় কথা বলার সময় গলা ওঠানামা করিত অনেকটা সঙ্গীতের ভঙ্গীতে। ইহাকে 'স্বর' বলা হয়। সংস্কৃতে তথা প্রাকৃতে স্বর লুপ্ত হইয়াছিল—ফলে প্রাকৃতে শব্দের রূপ পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। এ পরিবর্ত্তনের রূপ সহজ। ঋ, ঌ লুপ্ত হইয়া গেল, ঐ, ঔ লুপ্ত হইয়া গেল, উষ্মবর্ণ এবং নাসিক্যবর্ণের সংখ্যা কমিয়া গেল। যুক্ত ব্যঞ্জনের অংশদ্বয় যথাসম্ভব একরূপ হইল (assimilation of consonants)। প্রাকৃত এবং সংস্কৃতে কেবল রূপগত পার্থক্য থাকার দরুন প্রাকৃতকে সংস্কৃতে পরিবর্তিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। কিছুমাত্র প্রাকৃত না শিখিয়াও 'ছায়া' দেখিয়া আমরা নাটকের প্রাকৃত অংশ বুঝিতে পারি।

অপভ্রংশ, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত ও বৈদিক—আমরা পাঁচটি প্রাচীন ভাষা পাইতেছি। এই ভাষাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব কি? অপভ্রংশ ভাষা সাহিত্য হিসাবে নিষ্ফল, সাধারণের প্রচারিত কোন নিদর্শন না রাখিয়াই তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া গণ্য করা যায়। বৈদিক ভাষা আমাদের নিকট পরম পবিত্র, সংস্কৃত অপেক্ষা অনেক বেশী ইহার পবিত্রতা। তবে বৈদিক ভাষার চর্চা অত্যন্ত কম। মন্ত্রোক্তি আমাদের অধিকাংশের নিকট অর্থশূন্য আশ্চর্য শক্তিশালী শব্দসমূহ মাত্র। বেদের অর্থ বহু প্রাচীন কাল হইতে দুরবগাহ হইয়া পড়িয়াছিল। নিরুক্ত এবং সায়নভাষ্যে বহুস্থলে অর্থ কল্পনা করিয়া লইতে হইয়াছে। আধুনিক যুগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ অন্যান্য প্রাচীন আর্য ভাষার (গ্রীক, লাটিন এবং আবেস্তা) সহিত তুলনা করিয়া এবং ভাষার পরিবর্ত্তনের সূত্র ধরিয়া বেদের অর্থ নূতন করিয়া উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনার খাতিরে বেদের পঠন কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের জীবনে ইহা কোন নূতন প্রভাব বিস্তার করে নাই।

অপভ্রংশ এবং বৈদিক বাদ দিলে বাকী থাকে তিনটি ভাষা—সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত। এ তিনটি ভাষা বাঁচিয়া আছে তিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় প্রয়োজনে। সম্প্রদায়ভেদে এক একটি ভাষার মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। জৈন সম্প্রদায়ের নিকট প্রাকৃত সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে পালি বরণীয়, হিন্দুর কাছে সংস্কৃত পবিত্রতম। তিনটি ভাষাকে একত্রে দেখিতে গেলে সংস্কৃতকে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সর্ব্বাধিক প্রচারিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সংস্কৃতের গাঢ়বন্ধ রচনা, মধুর ঝঙ্কার, ভাবপ্রকাশের অসীম ক্ষমতা যুগে যুগে দেশী বিদেশী সমস্ত পণ্ডিতকে মুগ্ধ করিয়াছে। উইলিয়াম জোন্স সংস্কৃতের মধ্যে গ্রীক ভাষার সম্পূর্ণতা এবং ল্যাটিন ভাষার প্রাচুর্য্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন: "The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure more perfect than the Greek, more copious than the Latin and more exquisitely refined than either." তাই দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াও সংস্কৃত অমর হইয়া আছে। এ অপূর্ব্ব ভাষাকে আয়ত্ত করিবার সুকঠিন চেষ্টার বিরাম নাই, নিরন্তর পঠন-পাঠন চলিতেছে। সংস্কৃত এবং সংস্কৃতে নিবদ্ধ বিষয় লইয়া আলোচনা যুগে যুগে নানা দৃষ্টিভঙ্গীতে চলিতেছে—এমনকি আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত গতিতে সংস্কৃত ভাষায় সার্থক রচনা সৃষ্টি হইয়া চলিতেছে। সমগ্র লৌকিক সাহিত্য সংস্কৃতের মৃত্যুর পর রচিত হইয়াছে,ভাষার বিস্ময়কর প্রাণশক্তির ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক নিদর্শন থাকিতে পারে? ব্যাকরণের নিগড় পায়ে পরিয়া সংস্কৃত ভাষা মরিয়া যায় নাই। ব্যাকরণই সংস্কৃত ভাষাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। হিমালয়-শিখরে সূর্য্যকিরণসম্পাতের ন্যায় পাণিনীর অসাধারণ মনীষার দীপ্তিতে দেবভাষা উদ্ভাসিত হইয়া আছে। ব্যাকরণ নিগড় নয়, আভরণ। (পাদটীকা-৬)

সংস্কৃতের প্রভাব এত ব্যাপক,ইহার আবেদন এত অসামান্য যে, বৌদ্ধ এবং জৈনেরাও ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের জীবনী আবার নূতন করিয়া সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে (অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত)। জাতকের কাহিনী আবার সংস্কৃতে সঙ্কলন করা হইয়াছে (আর্য্যশূরের জাতকমালা)। দার্শনিক আলোচনার জন্য যুগপৎ পালি ও সংস্কৃত ব্যবহার করা হইয়াছে। (নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর রচনা) মহাযান সম্প্রদায় শেষ পর্য্যন্ত পালি বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়াছেন। আধুনিক যুগে দেশী ভাষায় রচিত বৌদ্ধগান ও দোঁহাকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য করিবার জন্য তাহার সংস্কৃত টীকা রচনা করিতে হইয়াছে। বৌদ্ধগণ ভারতীয় দর্শন ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রচণ্ড বিরোধিতা করিয়া ভারত হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অথবা সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করিয়া হিন্দুসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বভারতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে তাহাদের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নাই। তাহাদের বিরূপ সমালোচনা এবং বিদ্রূপের দরুন কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বজায় রাখিবার এবং দার্শনিক মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল এবং আলোচনার তীক্ষ্ণতা (তিক্ততাও বটে) ও বিশ্লেষণের গভীরতাকে তাহারাই নূতন করিয়া জাগাইয়া দিয়াছে। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে সমগ্র হিন্দু সমাজ নূতন করিয়া ভাবিতে শিখিয়াছিল। ইহাই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পরোক্ষ দান। ভারতীয় সংস্কৃতির বিকাশের পথে বৌদ্ধ চিন্তাধারা—bye-product—পালি ভাষাও কোন বাস্তব প্রভাব বিস্তার করে নাই।

জৈন সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে লিপ্ত হন নাই।

সেইজন্য তাঁহারা ভারতের মাটিতে আত্মরক্ষা করিয়া টিকিয়া আছেন। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ গোড়ার দিকে প্রাকৃতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যাঁহারা আলোচনা এবং সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রাকৃতকে পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতের আশ্রয় লইয়াছিলেন। সংস্কৃতে রচিত জৈন দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে প্রভাচন্দ্রের প্রমেয়কমল মার্ত্তণ্ড, মল্লিসেনের স্যাদ্বাদমঞ্জরী এবং হেমচন্দ্রের (পাদটীকা-৭) যোগশাস্ত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। নিজেদের আদরের ভাষা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত গ্রহণের নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ ছিল। সম্রাট অশোক সর্ব্বপ্রথমে প্রাকৃতকে সর্ব্বভারতীয় ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করেন। পরিশেষে জৈনেরাও এই পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁহারা ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "It was an effort which was clearly doomed to failure, so inferior is the Prakrit to Sanskrit (পাদটীকা-৮) as a means of expression."

সংস্কৃত মৃত ভাষা নহে, মৃত্যুঞ্জয়ী ভাষা। মধ্যযুগীয় ভাষাগুলি সংস্কৃতের অসীম ক্ষমতা এবং অপ্রতিহত প্রভাবের নিকট মাথা নোয়াইতে বাধ্য হইয়াছে। আধুনিক ভাষাসমূহ সংস্কৃতের আরও কাছে সরিয়া আসিয়াছে। ঐ সকল ভাষা সংস্কৃত শব্দকে ভাঙিয়া সরল করিবার প্রাকৃত রীতিকে একেবারে বর্জ্জন করিয়া, সংস্কৃত শব্দকে অবিকৃতভাবে অজস্রপরিমাণে গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে—এমনকি সংস্কৃতের পদ্ধতি অনুসারে নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণের সরলতা-সাধন প্রচ্ছন্ন ভাবে চলিতেছিল। দ্বিবচন, আত্মনেপদী, লিট, গণভেদে ধাতুরূপভেদ, চতুর্থী বিভক্তি, পঞ্চমী বিভক্তি লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল। ব্যাকরণের সরলতাসাধনের পথে আধুনিক ভাষাগুলি আরও অগ্রগামী হইয়াছে। সমস্ত আধুনিক ভাষার গতিপথ এক—denudation of all suffixes. কিন্তু শব্দের দিক দিয়া সমস্ত ভাষাগুলিই অত্যন্ত রক্ষণশীল। শুধু শব্দ নয়, ভারতের আকাশ-বাতাস সংস্কৃতের বাগভঙ্গী, সংস্কৃতে নিবদ্ধ পুরাণ, ইতিহাস, দর্শনে ছাইয়া আছে। সকলে সংস্কৃত শিখিয়া লইয়া যে ইহা আস্বাদন করিতেছে তাহা নহে। আধুনিক ভাষাতেই যুগে যুগে এইগুলি পুনরালোচিত এবং প্রচারিত হইতেছে। ইহাই ভারতের প্রাণশক্তি, আধুনিক সাহিত্য এই প্রাণধর্ম্মের বলে বলীয়ান। চিন্তাধারাকে জাগ্রত করিয়া, ভাবলোকের সৃষ্টি করিয়া, রসধারায় পুষ্ট করিয়া এই অদৃশ্য শক্তি নিয়ত সক্রিয় রহিয়াছে। আধুনিক ভাষাগুলির উৎপত্তি প্রাকৃতে, কিন্তু তাহাদের প্রাণের যোগ সংস্কৃতের সহিত। পালি বা প্রাকৃত না জানিলেও চলে, কিন্তু সংস্কৃত না জানিলে কোন ভারতীয় ভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান বা প্রয়োগদক্ষতা জন্মে না। ভাষার উৎসসন্ধানে অগ্রসর হইয়া আমরা যেন যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিত হারাইয়া না ফেলি।

পাদটীকা

১। The oldest Prakrit recorded is found in the Inscriptions of Asoka—Woolner, 'Introduction to Prakrit', p. 71.

২। যে সমস্ত ভাষার আলোচনা করা হইয়াছে, বিভিন্ন গবেষক তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। সংস্কৃত মুখ্যতঃ লৌকিক সংস্কৃত (Classical Sanskrit) এবং গৌণতঃ বৈদিক সংস্কৃত অর্থে প্রয়োগ করা হয়। এই প্রবন্ধে সর্ব্বত্র লৌকিক সংস্কৃতকে সংস্কৃত শব্দদ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং বৈদিক সংস্কৃতকে বৈদিক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাকৃত শব্দ কেহ কেহ ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন এবং পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ তিন ভাষাকেই প্রাকৃত বলেন। এখানে তিনটি ভাষাই তাহাদের পৃথক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। অপভ্রংশ শব্দের মুখ্য অর্থ বিকৃত ভাষা (corrupt speech)। মহাভাষ্যেও এই অর্থে ঐ শব্দের প্রয়োগ আছে। এই অর্থ ধরিলে সংস্কৃত ভিন্ন অপর সমস্ত ভাষাই অপভ্রংশ ভাষা। এই প্রবন্ধে প্রাকৃত এবং আধুনিক ভাষার মধ্যবর্ত্তী স্তরকে অপভ্রংশ নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

৩। গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা পৃ. ৮।

৪। পঞ্জাবী ভাষা এবং ব্রাচট অপভ্রংশের সম্বন্ধ সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত নহে।

৫। সোমদেবের কথা-সরিৎসাগর একখানি সুপ্রচলিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে—গুণাঢ্য কর্ত্তৃক পৈশাচী ভাষায় রচিত বৃহৎ কথা নামক পুস্তক হইতে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় বৃহৎ কথার আরও দুইখানি সংকলন আছে—ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎ কথামঞ্জরী এবং বুদ্ধ স্বামীর শ্লোকসংগ্রহ। সর্ব্বত্রই একই কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। পৈশাচী প্রাকৃত কোথাও ছিল? এ বইগুলির সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে বিন্ধ্য পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ছিল। গ্রীয়ার্সন বলেন, কাশ্মীর উপত্যকায় ছিল (দরদ শ্রেণীর ভাষার আদি স্তর)। পৈশাচীর কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় নাই।

৬। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য বলেন—"যে ভাষা অন্ধের মত সর্ব্বথা অনুসরণ করিয়া চলে সে ভাষার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সংস্কৃত তাহার প্রমাণ।" বাগর্থ, পৃ. ৮। এ উক্তি বিচারসহ নহে। কোন ভাষাই ব্যাকরণকে তুচ্ছ করিয়া চলে না—এমনকি আধুনিক ভাষাও নয়। সংস্কৃত ব্যাকরণের আলোচনা এত নিপুণ এবং ব্যাপক যে ভাষার মৃত্যুর পরেও তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ ইহা আমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

(৭) হেমচন্দ্রের মত দিক্‌পাল পণ্ডিত খুব কম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এমন কোন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নাই এবং প্রত্যেকখানিই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পাণিনীর বাহ্য-ব্যাকরণের মধ্যে সিদ্ধহেমশব্দানুশাসন সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অষ্টম পরিচ্ছেদ প্রাকৃত ভাষার প্রামাণ্য ব্যাকরণ।

বিজয়িনী

শ্রীমুক্তিকুমার সেন

তপতি, তোমায় আমি ভুলি নি। কোনদিন ভুলব কিনা জানি না। শুধু থেকে থেকে সেদিনের সেই ছবিটা চোখে ভেসে উঠছে, যেদিন শেষ তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মুখরিত এস্প্লানেডের বুক পেরিয়ে তুমি চলেছিলে মনুমেণ্টের নীচে বাস ধরতে। বৈশাখের বিকেলে তখন আকাশে ছেঁড়া মেঘের মেলা বসেছিল, আর পৃথিবীর বুকে ঘুরে মরছিল তপ্ত ঘূর্ণির দীর্ঘশ্বাস। হঠাৎ এমনি একটা ঘূর্ণিতে তোমায় অবলুপ্ত হয়ে যেতে দেখলাম। সেই তোমায় শেষ দেখা।

একসঙ্গে ভিড় করে কত কথাই মনে পড়ছে। সাঁওতাল পরগণার এই শালবনের নীচে কালো পাথরের বুকে আমার অফুরন্ত অবসর। একটু দূরে একটা পাথরকাটা ঝরণা ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। এখানে নেই কোন মানুষের সঙ্গ—লোকালয়ের কলকোলাহল। তাই চুপ করে জীবনে কি পেয়েছি আর পাই নি তার খতিয়ান করতে বসেছিলাম; হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ার মতই তোমার টুকরো একটা কথা মনে ভেসে এল—'অমিদা, উপন্যাস আর আমি পড়ব না। আমাকে সরস প্রবন্ধের বই দিও, সেই যে সেদিন দিয়েছিলে সেই রকম।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি ব্যাপার? উপন্যাসে অরুচি হ'ল কেন?

একটু হেসে বলেছিলে, উপন্যাস আর জীবন দুটোই এক। দুটোই ঘটনার স্রোত। আমি চাই শক্ত পাথরে দাঁড়াতে, ভেসে যেতে চাই নে।

কিন্তু তবু কি তোমায় ভেসে যেতে হয় নি? জীবনের ঘাটে ঘাটে নয়, তার হাটে হাটে। যেখানে মানুষের মূল্য নিরূপণ করা হয় তার বাইরের অর্জ্জনের উপর, অন্তরের আসল স্বরূপ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। একটু আঘাত পেয়েছিলে বোধ হয় সেদিন। তাই দুঃখ করে বলেছিলে, চাকরি বোধ হয় আমার আর হ'ল না। না হ'ল দুঃখ নেই, কিন্তু আমাকে ঠকাল কেন ওরা? আমাকে বোকা বানিয়ে ওদের কি লাভ?

—কি হ'ল, ইণ্টারভিউতে সুবিধে হয় নি বুঝি?

—হবে কোত্থেকে বল? আমার নাম ছিল সবার শেষে। তাই আমার ডাক পড়ল একেবারে পড়ন্ত বেলায়—তখন ওরাও উঠে পড়তে ব্যস্ত, তাই দু'এক মিনিট যা হয় দুটো কথা বলেই পালা চুকিয়ে দিলে এই প্রহসনের। অতএব আমার হ'ল বিদায়, আর ওদের ঘুচল দায়।

সান্ত্বনার সুরে বলেছিলাম, ওতে হতাশ হচ্ছ কেন? এটা না হয়, তার পরের বার হবে। প্রথম চেষ্টাতেই তুমি কেল্লাফতে করতে চাও। তোমার দুঃসাহস তো কম নয়?

—দুঃসাহস কোথায়? দুই আর দুইয়ে যোগ করলে তার ফল যেমন চার হতে বাধ্য, তেমনি সব প্রশ্নের ভাল উত্তর দিলে চাকরি আমার হবে না কোন্ নিয়মে?

—এইখানেই তো তোমার যোগে ভুল হ'ল তপতি, সব প্রশ্নের উত্তর কি তুমি দিতে পারতে?

খিলখিল করে হঠাৎ হেসে উঠেছিলে তুমি। তার পর বলেছিলে, যোগে ভুল আমার হয় নি, হয়েছে তোমার।

অবাক হয়ে তোমার দিকে চাইতেই তুমি হাসি থামিয়ে বলেছিলে, এটা বুঝলে না যে সবার শেষে আমার নাম ছিল, আর তাই সুযোগ আমি নিয়েছিলাম। অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক ক্যাণ্ডিডেটকেই জিজ্ঞেস করে নিয়েছিলাম ওদের প্রশ্নের মোটামুটি ধারা, সেগুলোর উত্তরও নিজের মনে গুছিয়ে তৈরি করে রেখেছিলাম। কিন্তু কপালে নেই, তাই প্রয়োগের সুযোগও আর মিলল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে যন্ত্রচালিতের মতই বলে বসেছিলাম, পুরুষ হলে তোমায় আর একটা পথের সন্ধান দিতে পারতাম।

ভ্রূ বাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে, শোনাই যাক না তোমার পৌরুষের বেদ।

—শুনতে পাই মিষ্টার সদাশিবম্ অত্যন্ত খেয়ালী, একবার যদি সাহস করে কেউ সোজা ওঁর কাছে গিয়ে পড়ে, তা হলে মুডে থাকলে উনি সময়ে সময়ে চাকরি দিয়েও দেন, কিন্তু বাড়ীতে গিয়ে দেখা করার মত বুকের পাটা ছেলেদেরই সব সময়ে হয়ে ওঠে না, তুমি ত—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিলে, অবলা মেয়ে! এই ত?

একটু হেসে শুধু তোমার ক্ষতে প্রলেপ দেবার চেষ্টা সেদিন আমি করেছিলাম। স্বপ্নেও ভাবি নি যে ঠিক এক সপ্তাহ পরেই তুমি হাসতে হাসতে এসে বলবে, ডবল ধন্যবাদ অমিদা, এই নাও। হাতে তুলে দিয়েছিলে নিয়োগপত্রখানা।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি করে সম্ভব হ'ল তপতি! দু'মিনিটের ইণ্টারভিউতেই এমন কি যাদুর খেলা তুমি দেখালে, যে সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি।

—ধীরে অমিদা ধীরে, তোমার স্মরণশক্তি ত খুব প্রখর বলে মনে হচ্ছে না। তুমিই না সেদিন বলেছিলে যে, সদাশিবম মাঝে মাঝে ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ করেন।

চোখ তখন আমি কপালে তুলেছি, বল কি তপতি, তুমি গিয়েছিলে সদাশিবমের বাড়ীতে ?

—অত কঠিন মনে করছ কেন এ কাজটাকে ? ওর বাড়ীতে ত সায়েবদের বাড়ীর মত একজোড়া গ্রে হাউণ্ড নেই, যে দেউড়ি পেরুতেই হার্টফেল করব। দিব্যি গট্‌গট্ করে উঠে গেলাম, স্লিপ পাঠালাম। সায়েব এলেন, কথা হ'ল, চলে এলাম, চিঠি পেলাম, কোথাও ত ভয়ঙ্কর কিছু করতে হয় নি।

মুখে আমার কথা সরে নি, কিন্তু আমার জমাট বিস্ময় পাছে স্তুতিতে বিগলিত হয়ে পড়ে তাই তাড়াতাড়ি তুমি বলেছিলে—নাও চল, তোমার ত ডবল খাওয়া পাওনা হ'ল। ইন্টারভিউর চিঠি পাওয়ানো আর সদাশিবমের বাড়ীর পথ বাতলানো, এই দুটো কৃতিত্বই ত তোমার, চল।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হঠাৎ চাকরি করার সখ তোমার হ'ল কেন ?

কি যেন ভাবলে কিছুক্ষণ, সখ বলছ কেন বুঝতে পারছি, তুমি ভাবছ সংসারের অভাব দূর করা ছাড়া মেয়েদের চাকরি করার আর কোন কারণ নেই। আমার কাকা যেহেতু বড় চাকরি করেন, কাজেই দু'বেলা দু'মুঠোর জন্ম কোন চিন্তাই নেই আমার—এই ত ?

—আমার চিন্তাধারাকে ঠিকই অনুসরণ করেছ তপতি, আর তা ছাড়া শুনেছিলাম শীগ্‌গিরই কোথায় তোমার বিয়ে হচ্ছে।

—সেইজন্মই চাকরি নিতে হ'ল।

আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে কি বেকারের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে নাকি ?

—বেকারেরও অধম, বিকারগ্রস্ত, 'হচ্ছে' নয় 'হচ্ছিল', আমিই বাতিল করে দিয়েছি।

—অয়ি রহস্যময়ি, তুমি যে কি বলতে চাইছ তা বোঝা সত্যিই দুষ্কর, হেঁয়ালি রেখে আসল কথাটা কি তাই বল।

—চুপ করে সবটা ব্যাপার শুনবে ?

কানের দুলটা ঝিকমিক করে উঠল, চোখে অপরূপ দুষ্টুমির বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল, কিন্তু তোমার বলা সুরু করার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই উঁকি মারল পর্দ্দা ভেদ করে উদ্দিপরা বেয়ারার মুণ্ড। হকচকিয়ে তুমি ক্ষণিকের জন্ম বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলে, তার পর একটু হেসে বিলটা আনতে বলে দিয়ে সুরু করলে, 'আসল ঘটনাটুকু শুধু বলছি। ভদ্রলোক প্রৌঢ়, না না দোজবরে নয়। প্রচুর অর্থবান, লোহার কারবারে বিস্তর টাকা কামিয়েছেন। কিন্তু যেটুকু দেখলাম তাতেই স্পষ্ট বুঝলাম লোহার মতই নিরেট। একে বিয়ে করা মানে টাটার আয়রণ ফার্নেসে চিরদিনের মত জ্যান্ত পুড়ে মরা—আজকের দিনে 'সতীদাহ' আর কি! তাই রাজী হতে পারি নি। সেজন্ম কাকা কাকীমা থেকে মা পর্য্যন্ত সবাই রেগে আগুন। এক আগুন থেকে আর এক আগুনে পড়লাম, কিংবা চাটু থেকে চুলীতে। তাই দমকল ডাকতে হ'ল—

—জল হ'ল গিয়ে তোমার চাকরি ? অদ্ভুত হোমিওপ্যাথি দাওয়াই বাতলেছ যা হোক।

পথে হাঁটতে হাঁটতে তুমি বলেছিলে—জীবনে ভুল করার চেয়ে বড় দুর্ঘটনা নেই, আর সেই অভিশাপ থেকে যদি নিজেকে বাঁচাতে পারি তা হলে অদ্ভুত পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, এমনকি তাতে যদি সবাই চটেও যায়, তবুও মনের প্রশান্তি একটুও কমে না।

—দর্শনশাস্ত্রের নূতন অধ্যায়টা কবে প্রকাশ করছ ?

ভুরু বাঁকিয়ে আমার দিকে ফিরে চেয়েছিলে, তারপর ক্লান্ত হাসি টেনে বলেছিলে—বিদ্রূপই কর, আর কথায় যত চিমটিই কাট না কেন, জীবনে যে জিনিষটা মর্ম্মান্তিক ভাবে সইতে হয়েছে, তা আমি বলবই। বাবা তাঁর জেদের জন্ম যে দুঃখ সমস্ত পরিবারের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেছেন, তা থেকে এটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছি যে, বে-হিসেবী চলা ভাগ্যবিধাতা কখনও ক্ষমা করেন না।

—তাই বলে কি তুমি অঙ্কের পরিধিতে জীবনকে সঙ্কুচিত করতে চাও ? কিন্তু সে বাঁচা ত বাঁচা নয়, সে যে মরারও বাড়া।

—ওসব কাব্যেই শুনতে ভালো লাগে অমিদা। জগতে মনের কোনও মূল্য নেই, অনুভূতির কোনও আবেদন নেই, আছে শুধু বাঁচার জন্ম যুদ্ধ; আর তাতে যার হুঁস যত বেশী তার হার হবে তত দেরিতে, হিসেবী বুদ্ধিই এ যুদ্ধে সব চাইতে বড় হাতিয়ার!

স্তম্ভিত হয়ে সেদিন তোমার কথা শুনছিলাম, একটা অজানা অব্যক্ত ব্যথায় মনটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তোমার চোখের মণির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবছিলাম, সেখানে কি জগতের সব ঘটনা—কাঁচের ওপর যেমন তেমনি শুধু ছায়াই ফেলে, কোন সাড়া জাগাতে পারে না। আচমকা তোমায় প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা তপতি, জীবনে কখনও তুমি কাঁদ নি ?

একটুও অপ্রতিভ না হয়ে এক রকম সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়ে-ছিলে—অনেক কেঁদে আর কাঁদিয়ে, কান্নার উৎস আমার শুকিয়ে গিয়েছে, আমার চোখে এখন শুধু হাসিই ঝিক্‌মিক্ করে—তাই না ?

শিউরে উঠেছিলাম তোমার উপমার ইঙ্গিত অনুধাবন করে। মরুভূমির বালুর বুকে একফোটা জল নেই, রয়েছে নিষ্ঠুর রৌদ্রোজ্জ্বল দীপ্তি। তার স্পর্শে চোখে জ্বালা ধরে যায়, ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায় ঝলসানো মণি দুটো।

কিন্তু সেই রক্ত-জমানো হৃদয়হীনতার কোন চিহ্নই ছিল না সেদিন তোমার চঞ্চল চোখের তারায় আর হাসিমাখানো ঠোঁটের অপরূপ বাঁকা রেখায়। নিজের মনকে তাই প্রবোধ দিয়ে বলে-ছিলাম, এ অসম্ভব, যে সৌন্দর্য্য দিয়ে বিধাতা তোমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাকে প্রাণহীন করে তোলা নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রায় ছিল না, হতে পারে না। তখন কি জানতাম, আমার এই প্রবোধ শুধু আত্মবঞ্চনার নামান্তর; এর মূল হ'ল অপ্রিয় সত্য থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া। আর যেদিন তা উপলব্ধি করলাম, তখন প্রতিষেধকও কিছু ছিল না আমার কাছে।

সেদিন প্রথম তোমার নিজের বাসায় গিয়েছি, অর্থাৎ কাকার বাড়ী ছেড়ে যে বাড়ীতে তোমরা—তোমার মা আর ভাই গিয়ে

উঠেছিলে। তোমার মা এসে আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন আর তুমি আবার টিউশনীতে বেরুনোর জন্য তৈরী হয়ে নিচ্ছিলে। তোমার মা দুঃখ করছিলেন, খুকীকে ত কিছুতেই আর বুঝিয়ে উঠতে পারি না বাবা, যে এত খাটুনি ওর কিছুতেই সইবে না, ছিলাম দেওরের বাসায় একসঙ্গে, যে টাকা ও আনত—তা দিয়ে আমাদের খরচ স্বচ্ছন্দে চলে যেত, কিন্তু ও কিছুতেই ওখানে রইল না। তা নয় নাই রইল, এক হিসেবে সে ভালোই; আর আলাদা থাকার জন্য সত্যকেও ম্যাট্রিক পাস করার পর চাকরি নিতে হয়েছে, তাও বুঝি, কিন্তু ওর আবার এই রাতে কাজে বেরুনোটা ভালো? এ না হলে নাকি সত্যর নাইট কলেজ চলবে না, কিন্তু তাই বলে এই শহরে এত রাতে অত বড় মেয়েকে কি করে আমি বেরুতে দিই? কিছু বললে শুধু হেসে সব উড়িয়ে দেবে, এ মেয়েকে নিয়ে আমি কি করি বল ত?

কথার স্রোত হঠাৎ ব্যাহত হওয়াতে ভাবলাম এবার আমার কিছু উত্তর দেওয়ার দরকার। তাই গম্ভীর মুখে বললাম—না না কলকাতা বড় কঠিন জায়গা, কিন্তু তপতী যে ভীষণ একগুঁয়ে।

—আর ব্যাখ্যানে দরকার নেই, মা এতক্ষণ যা বলেছে, তুমি হাজার চেষ্টা করলেও তার চাইতে নূতন কিছু বলতে পারবে না, কেন পণ্ডশ্রম করছ?

চমকে তাকিয়ে দেখি সেজে গুজে তুমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছ, কিন্তু তোমার মা ভীষণ চটে গেলেন তোমার টিপ্পনীতে—'আমি ত শুধু বকিই, কেন যে বকি, তা কি তুই বুঝবি? টিউশনিতে গেলেও এত দেরি তোর হবে কেন, সেটা ত বলবি। কাল ক'টায় ফিরেছিলি মনে আছে?'

—আঃ কাল যে অনিলদের বাড়ী গিয়েছিলাম।

—আবার পা দিয়েছিলি তুই ঐ নরকে?

চীৎকার করে উঠলেন ভদ্রমহিলা, চমকে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম। ভাঙা গলায় এবার আমায় লক্ষ্য করে তিনি বলে গেলেন, ওই অনিলটার বাপ খুকীর বাপের সঙ্গে সারাটা জীবন শত্রুতা করেছে। মামলা করে করে ওঁকে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছে। ধনে-প্রাণে শেষ করেছে। ব্যবসা করতে গিয়ে উনি কি তখন বুঝেছিলেন, কি কুমীর তিনি খাল কেটে আনছেন? সেই শত্রুর বাড়ীতে আবার তুই কোন মুখে গিয়েছিলি?

—আজ যে শত্রু কাল সে মিত্রও ত হতে পারে।

—ওরে হতভাগী, তুই কি ভুলে গিয়েছিস কি কাল ওরা তোর বাপের নামে ছিটিয়েছিল? এর পরও তুই যদি ওদের বাড়ী যাস, তা হলে বুঝব বাপের মর্য্যাদা নষ্ট করবার জন্যেই তোর জন্ম হয়েছিল।

হাঁপাতে হাঁপাতে ভদ্রমহিলা ছুটে চলে গেলেন পাশের বারান্দায়, রাগে দুঃখে চোখের কোণে তার জল চিকচিক করছে দেখলাম। কিন্তু তুমি? একটুও বিচলিত না হয়ে মুখে সেই অম্লান হাসি টেনে বললে, চল।

তোমার পাশে পথ চলতে চলতে জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার? মা অতটা বিচলিত হচ্ছেন কেন?

শান্ত গলায় তুমি উত্তর দিয়েছিলে, কেন যে মা এ জিনিষটাকে এত বড় করে দেখছে, ভাবলে অবাক হয়ে যাই। আমি যাই ওদের বাড়ীতে অনিলের বোনকে ইংরেজীটা একটু সাহায্য করে দিতে, বিনি পয়সার টিউশন।

—কিন্তু কেন? সত্যি যদি ওরা তোমার বাবার সঙ্গে অযথা দুর্ব্যবহার করে থাকে, তার পরও এমন দায় তোমার কিসের?

—বাবার সঙ্গে ওরা দুর্ব্যবহার করেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও তেমনি সত্যি যে অনিলের দাদা মস্ত বড় চাকুরে। আর অনিল ছেলেটাও খুব ঝকঝকে, একদিন ওরা দু'ভাই খুব উন্নতি করবে, তাই পুরনো দিনের জের না টেনে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যদি ওদের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক পাতানোর চেষ্টা করি, সেটা কি অন্যায়?

—কিন্তু তাতে কি তোমার অসুবিধা ভোগ করতে হয় না? ওরা কি তোমায় কোন আঘাত করে না? পুরনো দিনের দুটো একটা ছেঁড়া পাতা কি হঠাৎ দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে পড়ে না?

—পড়ে না যে তা নয়, কিন্তু অরুণা—যে মেয়েটিকে আমি পড়াই, অনিল আর বিমলদা এরা সবাই এসব পচা পুরনো জঞ্জাল থেকে মুক্ত। তাই আর কে কি বলল, বা টিপ্পনী কাটল, তাতে আমার কিছু এসে যায় না।

একটু থেমে আবার যোগ করেছিলে, এই ত সেদিন অরুণার খাতা দেখছি এমন সময়ে ওদের একজন আত্মীয় এলেন, আমাকে দেখে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। অরুণা অত বুঝতে পারেনি, তাই ঠিক পরিচয়টাই দিয়েছিল। শুনে ভদ্রমহিলা ভূত দেখার মত চমকে উঠে বারান্দায় যেখানে অরুণার মা মোড়ায় বসে ছিলেন সেখানে ছুটে গেলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'করছ কি বৌদি, সাপের বাচ্চাকে ঘরে ঠাঁই দিচ্ছ কি বলে?' অরুণার মা যে উত্তরটা দিলেন, মৃদু হলেও সেটা আমাদের দুজনেরই কানে এসে পৌঁছল—এখনও বিষদাঁত গজায় নি, ঠাকুরঝি, কোন ভয় নেই। তেমন অবস্থা বুঝলে ঝাপিতে পুরবার বিদ্যা আমাদের জানা আছে। দুজনেই জোরে হেসে উঠলেন, কিন্তু ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখি, অরুণার মুখ কালো হয়ে গিয়েছে, আর অনিলের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠেছে। ওদের সেই পরিবর্তন দেখে যে তৃপ্তি হয়েছিল তার বুঝি তুলনা নেই। সে তৃপ্তির কাছে অরুণার মার বিদ্রূপের খোঁচা অতি তুচ্ছ।

—কিন্তু যত তুচ্ছই হোক না কেন, সেটা যে খচখচ করে বুকে বাজে তাতে সমস্ত মাধুর্য্যই ত নষ্ট হয়ে যায়।

—তাই কি? গোলাপের কাঁটা ভুলে তার গন্ধ আমরা কামনা করি কি না?

—যে হতভাগ্যের কাঁটার জ্বালাময় স্পর্শের অভিজ্ঞতা হয়েছে তার পক্ষে কি হয় বলা শক্ত।

—তবু যদি সে গোলাপের গন্ধ কাঁটার জন্য ভুলে যায় ত তার অন্ধতা অমার্জ্জনীয়, আর অন্ধের দর্শন কত মারাত্মক তা ত জানই।

বি-বি-সি হিন্দী অনুষ্ঠানের জন্য মার্গারেট লকউডের সহিত সাক্ষাৎকার
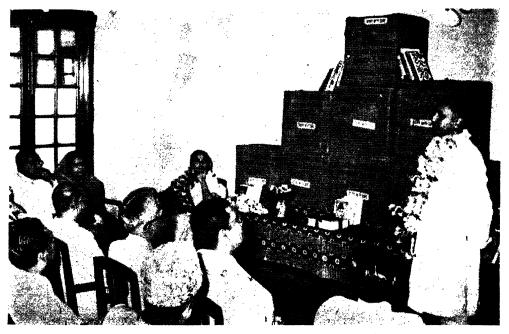
ভারত সরকার কর্তৃক পূর্ব্ব পাকিস্থানের বেঙ্গলী একাডেমিতে দশ সহস্র টাকার পুস্তক উপহার প্রদানের

আষাঢ়-সন্ধ্যা [ফোটো—শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

জওয়ালামুখীতে স্থাপিত ১৪২ ফুট উচ্চ 'ডেরিক' বা বেধনযন্ত্র। ইহা দশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত বিঁধ করিয়া খনিজ তৈলের সন্ধান করিতে পারে
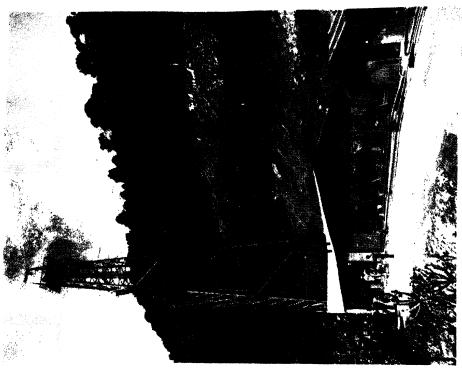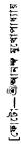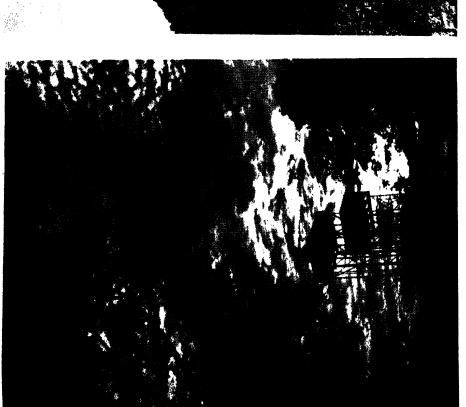
কোন উত্তর দিই নি, শুধু যে হৃদয়হীন যান্ত্রিকতার দিকে নিয়তি তোমায় টেনে নিয়ে চলেছে তার ভয়াল রূপ কল্পনা করে মনে মনে শিউরে উঠেছি। আমার নীরব চোখের ভাষা বোধ হয় তুমি বুঝতে পেরেছিলে। তাই স্বগতোক্তির মতই উচ্চারণ করেছিলে, পৃথিবী আজ আর বাষ্পের গোলক নেই, মাটি পাথরে কঠিন তার বুকের সবুজও ঢাকা পড়েছে ইটের ইমারতে। আধুনিকতার অর্থই হ'ল যা কিছু নরম, যার মধ্যে হিসেবের ঠাস-বুনানি নেই, তাকেই বাতিল করে দেওয়া।

—কিন্তু তাই বলে মানুষ যন্ত্র হয়ে যাবে? সে যে অসম্ভব। বাঁচতে হলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত যাওয়া দরকার, তার অর্থই হ'ল হৃদয় যতদিন স্পন্দিত হবে ততদিনই মানুষের জীবন, হৃদয় বাদ দিয়ে শুধু মস্তিষ্ক নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না, তুমি অসম্ভবের পেছনে ছুটে চলেছ তপতি!

অন্ধকারে যে পথ চলে, পথের পরিচয় যদি তার জানা থাকে তা হলে সতর্ক গতিতে সে এগোতে পারে, কিন্তু আচমকা তীব্র আলোর ছটা চোখে এসে পড়লে তার পরিচিত পথ হঠাৎ বদলে যায়, আর থমকে সে দাঁড়িয়ে পড়ে—তেমনি আমার কথা শুনতে শুনতে সহসা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলে সেদিন তুমি কিছুক্ষণের জন্যে। দূর থেকে ভেসে আসা হাস্নাহানার গন্ধ বাতাসে এনেছিল মদিরতা আর রেডিয়োতে সেতারের ঝঙ্কার সৃষ্টি করেছিল অপূর্ব মূর্চ্ছনার, ক্ষণিকের জন্য তুমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু সে মায়া কতক্ষণের? তার পরই সম্বিৎ যেন ফিরে এল, আয়ত চোখের উদাস দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তার মণিতে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বৃষ্টি-শিহরিত কদম্বের মতই আবেগে কেঁপে উঠেছিল তোমার পরিপূর্ণ ওষ্ঠাধর, তা ধারালো ছুরির মতই তীক্ষ্ণ কঠিন হয়ে উঠল।

—কাল তোমার বাড়ী গিয়েছিলাম।

—সে কি? কৈ আমি জানি না ত, তার পর? কতক্ষণ ছিলে?

—বেশ কিছুক্ষণ, তোমার মা এসে অনেক গল্প করলেন।

—তাই নাকি? যথা—

—ধর তোমার বিয়ের।

—ঠাট্টা হচ্ছে?

—আঃ! থাম না, তোমার মা বললেন তোমার একটি পছন্দ-মত বউ আনতে পারলেই ওঁর জীবনের সব দায় মিটে যায়। কি রকম মেয়ে হলে, তাঁর পছন্দসই হয়, তাও জেনে নিয়েছি কথাচ্ছলে।

—সুন্দরী, শিক্ষিতা, গৃহকর্ম্মে নিপুণা, এই সব ত?

—ওগুলি ত অস্তিবাচক, নেতিবাচক গুণও কিছু কিছু থাকা চাই।

—হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা কইতে জান না?

—আঃ, চটছ কেন? একটু ধৈর্য্য ধর, প্রথম নেতিবাচক গুণ হ'ল, বড়লোকের মেয়ে, টাকার দেমাক যার পাহাড়প্রমাণ, দ্বিতীয় হ'ল চাকুরে মেয়ে, সংসারে নিজেকে বিলিয়ে দিতে অশক্ত। দেখলাম এ বিষয়ে তিনি বেশ ভেবেছেন; তার ফলে তাঁর মতামত-গুলো খুবই জোরালো। অর্থাৎ, অস্তিবাচক গুণগুলোয় উনিশ বিশে হয় ত তাঁর আপত্তি হবে না, কিন্তু নেতিবাচকগুলোর সম্বন্ধে তিনি খুবই শক্ত, কিছুতেই বড়লোকের মেয়ে বা চাকুরে মেয়ে বৌ হিসেবে তিনি আনবেন না।

তোমার চাপা হাসির আড়ালে যে বিদ্যুৎ ছিল, তা আমি তখনও ধরতে পারি নি, তাই বলে বসেছিলাম—বিয়ে করব আমি, মার মতামত আমায় জানিয়ে কোন লাভ হচ্ছে কি?

—তোমার মা বিয়ে ছাড়া আর যে সব বিষয়ে গল্প করলেন, তার মধ্যে জানলাম তোমাকে ঘিরে তাঁর কত আশা। ছোটবেলা থেকে কত কষ্ট করে তিনি তোমাকে বড় করে তুলেছেন, আর তোমারও তার প্রতি যে শ্রদ্ধা তাও বলতে বলতে গর্ব্বে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খুব ছেলেবেলা থেকেই তুমি তাঁর একান্ত অনুগত, এমন কোনও কাজই তুমি নাকি এ পর্য্যন্ত কর নি, যাতে তাঁর মনে আঘাত লাগে। আর এ বিশ্বাসও তিনি রাখেন যে, যে ক'টা দিন তিনি বেঁচে আছেন, তার মধ্যেও এমন কিছু তুমি করবে না, যাতে তাঁর সেই অহঙ্কার মাটিতে মিশে যায়।

তোমার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মনে হয়েছিল, যেন আমি পর্ব্বতশিখরে সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছি, একটু দমকা বাতাস—আর তোমার একটা কথা, অমনি অতল অন্ধকারে আমার অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। তাই বোবার মত তোমার দিকে চেয়ে ছিলাম। আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি থামলে হঠাৎ, তার পর কি ভেবে প্রশ্ন করেছিলে—অমিদা, এমন কাজ তুমি করতে পারবে, যাতে তোমার মার সমস্ত জীবনের এই অহঙ্কার চিরদিনের মত মিথ্যে হয়ে যাবে? তোমার যা একান্ত কামনা, তা যদি তোমার মার সবচেয়ে বড় আঘাতের কারণ হয়ে উঠে, তখন তুমি কি করবে? তুমি মার মনে আঘাত দিয়ে তোমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে এগোবে না। তোমার মার চোখের জল অভিশাপের মত যাতে তোমার জীবনে না নেমে আসে, তার জন্য বুকের রক্ত ঝরিয়েও তুমি কি একটু ত্যাগস্বীকার করবে না?...না, না আজ নয়, এত শীগগির নয়, কাল তোমার যা বলবার আছে শুনব, আজ চলি।

জানি না, কি ভাবে সমস্ত রাতটা আর বাকি দিনটা কেটেছিল, কারণ জীবনে কখনও এমন অসাড়, অনড় বোধ করি নি। তাই তার পর দিন বিকেলে যখন তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, তোমার হাসিভরা চোখের দিকে তাকিয়ে শুধু প্রশ্ন করেছিলাম—আচ্ছা তপতি, জীবনে কোনও আঘাতই কি তোমায় স্পর্শ করে না? এত কঠিন তোমার মন। কোন ব্যর্থতাই কি তোমায় বিচলিত করতে পারে না। এমনি ঠাণ্ডা তোমার অনুভূতি, তুমি তা হলে পাথরের পুতুল।

মুহূর্ত্তে তোমার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সুগভীর বেদনায় অপরূপ গোধূলি দু'চোখের তারায় মূর্ত্ত হয়ে উঠল, গাঢ় স্বরে তুমি

বললে—অমিদা, আমি জানতাম একথা তুমি বলবে ; আমি জানি তোমার মনের ব্যথা, কিন্তু সে ব্যথা দূর করতে গিয়ে এমন অশান্তি কেন বরণ করবে যার তুষানল তিল তিল করে জ্বলবে সমস্ত জীবনে ? তার চাইতে আমাদের হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে যে নিষ্ঠুর নিয়তি, তার কাছে মুখের এই হাসি টেনে যদি দাঁড়াই, আর বলি, তোমার চক্রান্ত আমি ব্যর্থ করে দিয়েছি, আমি আবেগে অন্ধ হয়ে বুদ্ধির আলো হারাই নি, তাই তুমিও আমায় হারাতে পার নি, কি চমৎকার হয় তা হলে বল ত ?

আর কি কি যেন তুমি বলেছিলে, সমস্ত কথা আজ মনে নেই, শুধু এইটুকুই আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে যে, তার পর তুমি চলে গেলে এসপ্লানেড পেরিয়ে বাস ধরতে। এলোমেলো হাওয়ায় কাঁপছিল তোমার চুলগুলি। তারই উপর দূর থেকে দেখলাম, দাঁড়িয়ে রয়েছে মনুমেণ্ট—নিরলঙ্কার ঋজু, তার মধ্যে নেই কোন নমনীয়তা, শুধু রয়েছে মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে আকাশে পৌঁছানোর অদম্য কামনার উদ্ধত প্রকাশ। ঠিক যেন তোমার মতই দৃপ্ত স্পর্দ্ধায় উন্নত শির তুলে দাঁড়িয়েছে, বিসর্জ্জন করেছে সমস্ত অবান্তর বাহুল্য! তার পর ধুলোর ঝড় তোমায় মুছে নিল চোখের সামনে থেকে ; কিন্তু স্মৃতির মণিকোঠায় তোমার আসন রইল অক্ষয়! সেই শেষ। তোমাকে ভোলা আমার অসম্ভব।

ফিরে যাই

শ্রীকরুণাময় বসু

শনিবার অন্ধকার ম্লানমুখ মধ্যবিত্ত ঘরে
ফিরে যাই ধূলিলিপ্ত ক্লান্তিহীন পায়ে হাঁটা-পথে ;
হাতে কিছু ফলমূল, টুকিটাকি, জীবন বেচার
পণ্যমূল্যে প্রাণধারণের তুচ্ছ ব্যথার বেসাতি।

তবুও আনন্দ লাগে, কাছে এসে প্রেয়সী যখন
হাত থেকে বোঝা লয়, প্রেমস্নিগ্ধ দু' নয়ন ভরি
আশার আশ্বাসদ্যুতি ফেলে মোর মুখের উপর,
স্নিগ্ধ কণ্ঠে শুধায় আমারে, ভালো ছিলে এ ক'দিন ?

আমার শুভেন্দু আসে, অঞ্জু মঞ্জু শুভ্রা ও খোকন,
কন্থুও দাঁড়ায় কাছে, চোখে মুখে আনন্দ উল্লাস ;
শ্যামল কোথায় ছিল, 'বাবা' বলি প্রাণপণ বেগে
কোথা থেকে ছুটে এসে ব্যগ্র হাত বাড়ায় তাহার।

চার বছরের ছোট ছেলে শ্যামল চঞ্চল বন্ধু
নয়ন-লাবণ্য মোর, কাছে ডেকে কোলে টেনে লই ;
হেসে হেসে কথা কয়, 'জামা প্যাণ্ট এনেছ ত তুমি ?
এই দেখ ছেঁড়া জামা, বুলুদের লাল জামা আছে।'

তার পর রাত্রি আরো, গাঢ় হয়, শ্যামল কখন
পুষ্পপল্লবকোমল মুঠি দুটি দিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে
কণ্ঠ আঁকড়ি আমার শ্রান্ত দুটি আঁখিপাতা বোজে :
চেয়ে চেয়ে দেখি মোর মনগড়া মায়ার পুতুল।

একটি আশ্চর্য ব্যথা সূক্ষ্ম তীব্র কান্নার মতন
কখন গুমরি ওঠে, ফিরে যাই পিছনের পথে
ফেলে-আসা ছেলেবেলাকার শূন্য খেলাঘরে :
মা আমার জেগে আছে, কোলে চার বছরের আমি!

অন্ধকারে খুঁজে দেখি মা আমার যদি ফিরে আসে,
আমার কপালে রাখে স্নেহময় হাতটি তাহার ;
সে হাত আঁকড়ি ধরি ব্যগ্র কণ্ঠে শুধাব তাহারে,
মাগো, কোথা কোথা তুমি, কাছে থাক দূরে যেও নাক।

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

১৩৫৯ সালের আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে "গ্রামের নাম" সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম। আলোচনাটি কেবলমাত্র হুগলী জেলার গ্রামের নামসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র সম্পাদিত ১৩ খানি ডিষ্ট্রিক্ট হাণ্ডবুক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামের বা মৌজার নাম, আয়তন, লোকসংখ্যা, শিক্ষিতের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় দেওয়া আছে। গ্রামের নাম সহজলভ্য হইয়াছে। ইংরেজীতে টপোনমি সম্বন্ধে বহু আলোচনা রহিয়াছে; কিন্তু বাংলার গ্রামের নাম লইয়া বিশেষ কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া লেখক অবগত নহেন। এই সব হাণ্ডবুকে বাংলা গ্রামের নাম ইংরেজীতে অনূদিত। ইংরেজীতে "র" ও "ড়"-এর প্রভেদ বুঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এ-কার কি আ-কার ঠিক বোধগম্য হয় না। ইংরেজীতে প্রকাশিত নাম লইয়া আলোচনা করিলে কিছু ভুলভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। অনেক সময়ে বাংলা নাম ইংরেজীতে যথাযথ প্রকাশিত হয় নাই। যেমন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী "বরাহনগর" ইংরেজীতে Baranagar বলিয়া ছাপা হইয়াছে। যিনি প্রকৃত নাম জানেন না তিনি হয়ত বাংলা "বড়নগর" বা "বরনগর" বলিয়া বরাহনগরকে ভুল করিতে পারেন। "বনকাটি"কে "বঙ্কাটি" বলিয়া মনে হইতে পারে। থানার জুরিসডিক্‌শান লিষ্টে ইংরেজীতে ও বাংলায় নাম দেওয়া আছে; এবং কোন গ্রাম কোন পরগণাভুক্ত তাহারও উল্লেখ আছে। এই তালিকা ধরিয়া আলোচনা করিলে ভুলভ্রান্তি এড়ানো যায় এবং পরগণার বিস্তৃতি সম্বন্ধে সঠিক জানা যায়। এই তালিকা সংগ্রহ করা ব্যয়সাপেক্ষ ও সব তালিকা কলিকাতায় বসিয়া পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমরা কয়টি গ্রামের নামের শেষে "—পুর" আছে; কয়টির শেষে "—বাটী" আছে; কয়টির শেষে "—নগর" আছে ইত্যাদি বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। একটি জেলার গ্রামের নাম লইয়া আলোচনায় বিশেষ কোনও ফল পাওয়া যাইতে পারে না, বা ইহা হইতে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারা যায় না। ধরুন মেদিনীপুর জেলার গ্রামের নামের শেষে "—পুর" আছে এইরূপ গ্রামের অনুপাত শতকরা ৪০টি; হুগলী জেলায় ৩০টি; বর্দ্ধমানে ২০টি ও মুর্শিদাবাদে ১০টি। সব কয়টি জেলায় তথ্য বিশ্লেষিত হইলে পর বলা যাইতে পারে যে "—পুর"-এর অনুপাত দক্ষিণ হইতে উত্তরে কমিতেছে। কমিলে কেন কমিতেছে? "—নগর" বা "—বাটীর" সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া কি কমিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সবিশেষ তথ্য বিশ্লেষণের অভাবে কোনও কিছু বলা সম্ভব নয়। পশ্চিম বাংলায় ১৫টি "হরেকৃষ্ণপুর" আছে; ইহার অর্দ্ধেক মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার এক ফালি স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেন এইরূপ হইল? হরেকৃষ্ণ বলিয়া কোন রাজা কি এই সব গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন; না ওখানকার অধিবাসীদের ভিতর শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যবোধ না থাকার জন্য এইরূপ নামকরণ সম্ভব হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে ২৮টি "দুবরাজপুরের" মধ্যে ১৬টি "দুবরাজপুর" মেদিনীপুর জেলায়। কেন? কোন দুবরাজপুর হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল কিংবা গ্রাম পত্তন করিয়াছিল বলিয়া এইরূপ হইয়াছে? প্রশ্ন করা সহজ, উত্তর দেওয়া গবেষণাসাপেক্ষ।

কেহ কেহ বলেন যে, এইরূপ তথ্যসংগ্রহ বা তথ্য-বিশ্লেষণ কেবলমাত্র সময় নষ্ট করা—ইহাতে কাহারও কোনও লাভ অথবা উপকার হইবে না। আমরা এ বিষয়ে একমত হইতে পারিলাম না। আজ হয়ত আমরা যে তথ্যসংগ্রহ বা তথ্য-বিশ্লেষণ করিলাম তাহার কোনও উপকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু ইহা আমাদের উত্তর-পুরুষদের, ভবিষ্যতের গ্রামীণ সভ্যতার ইতিহাস লেখকের বা সমাজতাত্ত্বিকদের কাজে আসিতে পারে।

পশ্চিম বাংলায় ৩৯,১৫১টি গ্রাম বা মৌজা আছে। ইহার মধ্যে ৩,৫৬৯টিতে কোনও লোক-বসতি নাই। কেন এইরূপ হইল ভাবিবার বিষয়। আমরা আমাদের বর্ত্তমান আলোচনা কেবলমাত্র "গ্রামের নামের" মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিব। কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণকান্তের উইলের" হরিদ্রাগ্রাম কোথায় হইতে পারে ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলাম। হরিদ্রাগ্রাম একটি কাল্পনিক নাম, পশ্চিম বাংলার ৩৯,০০০ গ্রামের মধ্যে এই নামের কোনও গ্রাম নাই। এইরূপ "আনন্দমঠের" পদচিহ্ন গ্রামও কাল্পনিক নাম। পক্ষান্তরে "বিষবৃক্ষের" গোবিন্দপুর ও দেবীপুর সম্পূর্ণ কাল্পনিক নাম নহে। পশ্চিম বাংলায় ৯৫টি গোবিন্দপুর ও ২৭টি দেবীপুর আছে; তন্মধ্যে যথাক্রমে ১৬টি ও ৫টি চব্বিশ-পরগণায়। হরিপুর বলিয়া কোনও জেলা বাংলায় নাই; কিন্তু হরিপুর নামে ৬০টি গ্রাম আছে, তাহার মধ্যে ৫টি চব্বিশ-পরগণায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসস্থান কাঁঠালপাড়ার উল্লেখ মৌজা-তালিকায় নাই।

আমাদের দেশ পানিহাটী গ্রামে। এইটি বহুদিনের প্রাচীন গ্রাম। শ্রীচৈতন্যদেব এই গ্রামে আসিয়াছিলেন, তাহার স্মরণ-মহোৎসব আজিও হয়। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের ইহা একটি সমাজ-গ্রাম—পানিহাটীর করবংশ প্রখ্যাত। এই নামের আর একটি

গ্রামও পশ্চিম বাংলায় নাই। লোকমুখে ইহার নাম পেনেটী বা পেনিটী। চৈতন্ত ভাগবতের অন্ত্য খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে :

"কথোদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানিহাটী—রাঘবমন্দিরে।
* * *
"পানিহাটী গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপন সাক্ষাতে যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
* * *
"হেন মতে পানিহাটী গ্রাম ধন্ত করি।
আছিলেন কথোদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।"

চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আছে :

"পানিহাটী গ্রামে পাইলা প্রভুর দর্শন।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন॥
গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডির উপরে।
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে।"

পানিহাটী নাম বৈষ্ণবমহলে বিশেষ পরিচিত। কিন্তু দ্বিজ মাধবাচার্য্য (তিনি বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক) তাঁহার রচিত "মঙ্গলচণ্ডীর গীতে" ধনপতি সওদাগরের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :

"সেই বাঁক বাহে সাধু দাঁড়ে দিয়া ভর।
স্বর্ণকোণা বাহে তবে সপ্ত মধুকর।
সেই কোলাকুলি সাধু বাহে অবহেলে।
পক্কাটী বাহিয়া যায় আগরপুর জলে।
খিরাইতলা বাহিল বুঝিয়া ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি।
চিত্রপুর বাহি সাধু যায় সাবধানে।" ইত্যাদি

পানিহাটী এইখানে "পক্কাটী"তে পরিণত হইয়াছে। আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে সরকার মান্দারনের অন্তর্গত "পক্কেটী" পরগণার উল্লেখ আছে। নামটী বাংলা হইতে প্রথমে ফারসী ভাষায়, তাহার পর ফারসী হইতে ইংরেজীতে, ও ইংরেজী হইতে বাংলায় লিখিত হইতেছে। কিছু উচ্চারণের বা বানানের ভুল থাকা স্বাভাবিক। অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার একটি লেখায় এই গ্রামকে পেনিটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "জাল প্রতাপচাঁদ" পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন যে, কলিকাতার মুলুকচাঁদ বাবু, পানিহাটির জয়নারায়ণ বাবু প্রভৃতি কয়েকজন জাল রাজার নৌকায় ছিলেন"। ৭ম পরিচ্ছেদ (১২৪ পৃ.)

"ডেভিড হেয়ার সাহেব বলিলেন, "***আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একবার পানিহাটি গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; সেখানে আসামীকে দেখিয়াছিলাম'।" ঐ ১৩শ পরিচ্ছেদ (১৩৫ পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবন-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন ('বাহিরে যাত্রা' ৪৫ পৃঃ) "একবার কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়ায় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কিয়দংশ পেনিটিতে ছাতু বাবুদের বাগানে আশ্রয় লইল। আমরা তাহার মধ্যে ছিলাম।"

"পক্কেটি" পরগণার সহিত পানিহাটি গ্রামের কি কোন সম্বন্ধ আছে? পক্কেটি পরগণার জমিদার বা ভূস্বামী কেহ কি গঙ্গা-তীরবর্ত্তী এই গ্রামে থাকিতেন বলিয়া ইহার নাম পক্কেটি, পেনেটি, পক্কাটি বা পানিহাটী হইয়াছে? কিংবা, 'পক্কেটি' পরগণা কোন স্থানীয় অঞ্চলের নাম; ঐ অঞ্চলের কোন সুসন্তান ভাগীরথী-তীরে 'পানিহাটী' গ্রাম পুরাকালে পত্তন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম নিজ দেশের নামে রাখিয়াছিলেন। স্থানীয় স্কুলের হেড পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় বলিতেন যে, পানিহাটীতে চাউলপটি প্রভৃতি রহিয়াছে; এককালে পানিহাটীর চাউলপটিতে হাওড়া রামকৃষ্ণপুরের অপেক্ষা বেশী চাউল আমদানী-রপ্তানী হইত। অন্যান্য বহু দ্রব্যাদিও বিক্রয় হইত। ইহা ছিল 'পণ্য-হট্ট'; এই 'পণ্য-হট্ট' অপভ্রংশে কালক্রমে পানিহাটীতে পরিণত হইয়াছে। দ্বিজ মাধবাচার্য্যের "পক্কাটি" নাম কতকটা এই মতের পোষক।

বহুকাল আগে পানিহাটী যে বাণিজ্য-প্রধান স্থান ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, পানিহাটীতে বাঁধা ঘাটের প্রাচুর্য্য আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত ঘাট বাদ দিয়া তাহার পূর্ব্বেকার যাহা বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত টিকিয়া আছে এইরূপ দুইটি বাঁধা ঘাটের উল্লেখ করিব। একটি বাঁধা ঘাট—এখন ভাঙিয়া অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে—রাজা রামচাঁদের ঘাটের উত্তরে ইহা অবস্থিত। এই ঘাটে চৈতন্যদেব নামিয়াছিলেন। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের কথা। তাহার পূর্ব্বে এই ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছিল—এই ঘাট কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার নাম কেহ জানে না। সাধারণে ইহাকে 'মোচ্ছব-তলার ঘাট' বলে। দ্বিতীয়টি 'চাঁদ দালালের' ঘাট—শ্মশানঘাটের কিছু দক্ষিণে বাজারের নিকট। এই ঘাট কে তৈয়ারি করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। চাঁদ দালালের বাড়ী এই ঘাটের নিকট ছিল। চাঁদ দালাল সামান্য লোক ছিল; দালালী করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত। সাধুসন্ন্যাসীরা এই ঘাটে আসিলে চাঁদ দালালের মাতা তাঁহাদের সেবার জন্য চিঁড়ে, মুড়কি প্রভৃতি দিতেন। সাধুসন্ন্যাসীরা এই ঘাটকে "চাঁদ দালালের" ঘাট বলিয়া উল্লেখ করিতেন। পানিহাটীর জমিদার জয়গোপাল রায় চৌধুরী আন্দাজ ১৭৮০ সালে চল্লিশখানি ভাউলিয়ায় কাশী যান। কাশীতে তিনি খুব ধুমধাম করিয়া সাধুসন্ন্যাসীদের সেবা দেন। সাধুসন্ন্যাসীরা প্রশ্ন করেন—জয়গোপাল বাবুর বাড়ী কোথায়? পানিহাটীতে—কলিকাতার নিকট পানিহাটীতে বলিলে কেহই বুঝিতে পারেন না যে, পানিহাটী কোথায়। অনেক কথাবার্ত্তার পর একজন বৃদ্ধ সাধু বলেন, এইবার বুঝিতে পারিয়াছি পানিহাটী কোথায়?

যেখানে চাঁদ দালালের ঘাট সেইখানে পানিহাটী। জয়গোপাল বাবু ফিরিয়া চাঁদ দালালের খোঁজ করেন। চাঁদ দালাল বা তাহার বংশের কেহ তখন পানিহাটীতে ছিল না। এজন্য মনে হয়, "চাঁদ দালালের ঘাট" ইহার দীর্ঘকাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আলমগীর বাদশাহ তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে দরবেশ কাজীকে "দশ কাজাই"-এর ক্ষমতা (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিচার করিবার ক্ষমতা দিয়া) পানিহাটীতে বসবাস করান। তাঁহার বংশধরেরা এখনও ঐ গ্রামে আছেন। ইহা হইতে মনে হয় যে, এককালে ইহা গঞ্জ ছিল ও এখানে বহু লোকের সমাগম হইত।

হয়ত এককালে ইহার নাম "পণ্য-হাটি" ছিল। লোকমুখে কিন্তু পানিহাটী বা পেনেটী বলিয়া পরিচিত। রায়চৌধুরীবংশীয় জমিদারবাবুরা খুব ধুমধামের সহিত রাস করিতেন। রাসের সময় তাসের জুয়া খেলা খুব চলিত এবং তাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। এজন্য একটি ছড়া লোকমুখে শুনা যায়:

"রাস তাস লাঠি—তিন নিয়ে পেনেটী।"

বাংলা ১১৯৯ সালের চিঠাতে ইহার নাম পানিহাটী বলিয়া লিখিত। দেওয়ান গৌরীচরণ রায় চৌধুরী ইংরাজ সরকারকে যে ডোল দেন (খ্রীঃ ১৭৮৫) তাহাতেও "পানিহাটীর" উল্লেখ আছে।

পানিহাটীর উত্তরে সুখচর। এই নামের মাত্র একটি গ্রাম। এই গ্রামের বিশেষত্ব এই যে, এখানে সব জাতের লোক আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ছত্রিশ জাতের কথা আছে। রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, এখানে শঙ্খবণিক নাই। এজন্য তিনি বহু অর্থব্যয়ে কয়েক ঘর শঙ্খবণিক আনয়ন করেন। সে আজ হইতে সোয়া শত বৎসরের কথা। বর্ত্তমান লেখক ১৯২১ সনে স্থানীয় পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হিসাবে সেন্সাসের সময় এবিষয়ে লক্ষ্য রাখেন—দেখেন বাঙ্গালী ছত্রিশ জাতের মধ্যে ৩২টি তখনও আছে—শঙ্খবণিক এবং গন্ধবণিক নাই।

পানিহাটীর দক্ষিণে আগড়পাড়া। এই নামের ৭টি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে সোদপুর—৪টি সোদপুর আছে।

আবার কতকগুলি গ্রাম বা মৌজার নাম হইতে তাহার উৎপত্তির ইতিহাস খানিকটা বুঝা যায়। যেমন, চক্ পীতাম্বর দত্ত—পীতাম্বর দত্তের আনুকূল্যে এই চক্ সৃষ্টি হইয়াছে। কালীচরণ দাস পেস্কারের চক্—কালীচরণ দাস যখন পেস্কারী করিতেন সেই সময়ে বা তাহার কিছু পরে এই চক্ সৃষ্টি হইয়াছিল। "হাথিদবাটি পিলখণ্ডী" নাম হইতে বুঝা যায় যে, এককালে এইখানে হাতী রাখা হইত। ২৪-পরগণায় "হ্যামিল্টন আবাদ" স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের নাম রাখা হইত। ২৪-পরগণার "হ্যামিল্টন আবাদ" স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের নাম অনুসারে গত ৪০ বৎসরের মধ্যে হইয়াছে। হুগলী জেলার হরিপাল থানার "জামাইবাটী" গ্রাম আছে। ইহা কোন ভূস্বামী জামাতাকে দিয়াছিলেন ও বাটী তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া হয় ত এইরূপ নামকরণ হইয়াছে।

অনেক গ্রামের নামের আগে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব বা পশ্চিম সংযুক্ত আছে। যেমন ২৪-পরগণা জেলার থানা বাদুড়িয়ায় উত্তর চাতরা ও দক্ষিণ চাতরা নামে পাশাপাশি দুইটি গ্রাম আছে। উত্তর চাতরা দক্ষিণ চাতরার উত্তরে। ঐ গ্রাম দুখানির আয়তন, লোক-সংখ্যা ইত্যাদি নিম্নে দিলাম:

	উত্তর চাতরা	দক্ষিণ চাতরা
পরিমাণফল	৪০২ একর	৫৫৯ একর
লোকসংখ্যা	৬১১ জন	৮৬০ জন
বসতির ঘনত্ব	১'৫৪ জন একরে	১'৫৪ জন একরে
শিক্ষিতের সংখ্যা	২৯৩ জন	৩৬২ জন
শতকরা হিসাব	৪২'১	৪৭'২
কৃষিজীবী	৪১১	৪৪১
অ-কৃষিজীবী	২০০	৪১৪

মনে হয়, এককালে এই দুইটি গ্রাম একই গ্রাম ছিল—পরে কোন কারণে বিভক্ত হইয়াছে। গ্রামের নাম হইতে ঐ দুই গ্রামের সংস্থান বুঝা যায়। সামাজিক তথ্য দুই গ্রামেরই প্রায় একরূপ; তবে দক্ষিণ চাতরায় যে শিক্ষিতের অনুপাত ও অ-কৃষি-জীবীর সংখ্যা বেশী, তাহার কারণ দক্ষিণ চাতরায় ডাকঘর, ডিসপেন্সারি, প্রাইমারী স্কুল, হাই স্কুল যায় হাসপাতাল সবই আছে, উত্তর চাতরায় নাই।

কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব্ব-পশ্চিম একই নামের গ্রাম পাশাপাশি গ্রাম হইলেও সব সময়ে নহে। ২৪-পরগণা জেলার বারাসাত একটি মহকুমা শহর—বহুদিনের প্রখ্যাত শহর। ইহা কলিকাতা হইতে ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। ঐ জেলায় জয়নগর থানায় দক্ষিণ বারাসাত বলিয়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে—ডাকঘরের ও রেলষ্টেশনের নাম দক্ষিণ বারাসাত। কিন্তু দক্ষিণ বারাসাত বলিয়া কোন মৌজা নাই—যেখানে ডাকঘর আছে সেই মৌজার নাম কালিকাপুর-বারাসাত। অনেক ক্ষেত্রে দুই মৌজার জমি মিশিয়া যাইলে সরকার দুই নামে এক মৌজা রাজস্বের কাগজে লেখেন। এই ভাবে কালিকাপুর-বারাসাত মৌজার সৃষ্টি হইলেও ইহার নাম দক্ষিণ বারাসাত নহে। সাধারণ লোকে মহকুমা বারাসাত হইতে ইহার পার্থক্য বুঝাইবার জন্য ইহাকে দক্ষিণ বারাসাত বলে। ডাকবিভাগ ও রেলবিভাগ ইহা মানিয়া লইয়াছে। দুইটি স্থানের ব্যবধান প্রায় ৪০ মাইল।

দুইটি একই নামের গ্রাম থাকিলে ইহাদের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য লোকে এই নামের সহিত অন্য একটি নাম সংযুক্ত করিয়া দেয়। যেমন গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর ও খানাকুল কৃষ্ণনগর।

একমাত্র জয়নগর থানায় (যাহার পরিমাণ ২৮০ বর্গমাইল—এবং কোনও গ্রাম অপর গ্রাম হইতে ১৬।১৭ মাইলের বেশী দূর নহে) নিম্নলিখিত জোড়া জোড়া বা একই নামের ৩টি গ্রাম পাওয়া যায়। যথা:

উত্তর দুর্গাপুর দক্ষিণ ,,	উত্তর গয়ানকাটি দক্ষিণ ,,	পূর্ব্ব গাবতলা পশ্চিম ,,
পূর্ব্ব শ্যামনগর পশ্চিম ,,	পূর্ব্ব তেঁতুলবেড়িয়া পশ্চিম ,,	পূর্ব্ব চক্ পাঁচঘরা পশ্চিম ঐ ঐ
উত্তর রঘুনাথপুর পূর্ব্ব ,, পশ্চিম ,,	পূর্ব্ব গুড়গুড়িয়া মধ্য ,, দেবীপুর ,,	

এই সব গ্রামের পরস্পরের কি সম্বন্ধ? একখানি গ্রাম ভাঙিয়া কি ২।৩ খানি গ্রাম সৃষ্টি হইয়াছে? না তাহাদের ভৌগোলিক সংস্থান বুঝাইবার জন্য এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। পাঁচঘরা, পূর্ব্ব চক পাঁচঘরা ও পশ্চিম চক পাঁচঘরা কাছাকাছি মৌজা—এককালে একই জমিদারের জমিদারীভুক্ত ছিল বলিয়া মনে হয়। কালক্রমে মূলগ্রাম কাটিয়া আলাহিদা চকের সৃষ্টি হইয়াছে—কবে হইল? কেন হইল? এই সব বিষয়ের উত্তর স্থানীয় শিক্ষিত লোকের সাহায্য ব্যতীত দেওয়া অসম্ভব। শেষোক্ত গুড়গুড়িয়া গ্রাম তিনখানি পাশাপাশি গ্রাম বলিয়া শুনিয়াছি। কেন এইরূপ হইল? ইহার একটা জবাব (স্থানীয় জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও) দিবার চেষ্টা করিব।

গ্রাম	পরিমাণ একরে	লোক-সংখ্যা	লোক-বসতির ভিড় × ১০০	প্রতি বাড়ীতে কয়জন	শিক্ষিত	শতকরা
পুঃ গুড়গুড়িয়া	১,৭৪২	৪৮৯	২৮·১ জন	৪·৬	১১২	২৬·৯
পঃ ,,	১,৫২৭	৩৯০	২৫·৫ ,,	৩·৭	১০৩	২৬·৪
দেবীপুর	৩,২২৭	১,৯৫২	৬০·৫ ,,	৬·০	৫৪৯	২৯·১

নাম দেখিয়া ও গ্রামের আয়তনাদি দেখিয়া মনে হয় যে, দেবীপুর গুড়গুড়িয়াই হইতেছে মূলগ্রাম। পরে ইহা হইতে ভাঙিয়া বা লোকের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্য দুইখানি গ্রাম সৃষ্ট হইয়াছে। পুরাতন গ্রামে লোকবসতির ভিড় হইবে আশা করা যায়। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার দেশে লোকে সহজে পৈতৃক ভিটার মায়া ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না—এজন্য পুরাতন গ্রামে বাড়ীপ্রতি লোকের হিসাব বেশী হইবে মনে করা সঙ্গত। এই দুটি লক্ষণই দেবীপুর গুড়গুড়িয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য মনে হয় এই গ্রামই মূলগ্রাম। আয়তন দেখিয়া ও নাম দেখিয়া বুঝা যায় যে, এককালে দেবীপুর ও গুড়গুড়িয়া আলাদা গ্রাম ছিল, তাহার পর দুই গ্রাম মিলিয়া এক হইয়াছে।

পশ্চিম বাংলায় ৩৯,১৫১টি গ্রাম বা মৌজার মধ্যে বহু গ্রামের আগে একটি গ্রামের অবস্থান বা আকার অথবা রাজস্ব আদায়ী ইতিহাসের পরিচায়ক শব্দ আছে। আমরা সেই সেই শব্দ দিয়া আরব্ধ গ্রামের সংখ্যা নিম্নে দিলাম :

উত্তর	৩২০	বড়	২৮৭	চর	১৩৭
দক্ষিণ	৪৪৫	ছোট	২৫৩		
পূর্ব্ব	২৯৫	মধ্যম	৪৪		
পশ্চিম	২৪৮	খোর্দ্দ	৪২		
চক্	৭৬০	জোত	৯৩		
বাজে	৪১	আরাজী	৯৯		
ছাড়	১২৫	কিসমত	৯৩		
ছিট	৪	আয়মা	১০		
নিজ	৩২				

দেখা যায় "দক্ষিণ—" গ্রামের সংখ্যা "উত্তর—" গ্রামের সংখ্যা অপেক্ষা ঢের বেশী। শতকরা হিসাবে ১০০ "উত্তর—" গ্রামের তুলনায় "দক্ষিণ—" গ্রামের সংখ্যা ১৩৯টি। "পূর্ব্ব—" গ্রামের সংখ্যা "পশ্চিম—" গ্রামের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইলেও খুব বেশী নহে। ১০০ "পূর্ব্ব—" গ্রামের তুলনায় ৮৪টি "পশ্চিম—" গ্রাম। এই তথ্য হইতে এইরূপ অনুমান করা কি সঙ্গত হইবে যে, লোক-বসতি, তথা গ্রামের পত্তন পূর্ব্বকালে উত্তর হইতে দক্ষিণে; এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের শহরের রায়বাহাদুর বাল্মীকিপ্রসাদ সিং এবং রায়বাহাদুর দলীপনারায়ণ সিং মিতাক্ষরা-শাসিত খুড়তুতো জেঠতুতো ভাই। তাঁহারা পৃথগন্ন হইলে দলীপবাবু পৈতৃক বাড়ীর অংশ ছাড়িয়া দিয়া সেই শহরেই পিতৃভিটা হইতে বহু দূরে এক নূতন বাড়ী তৈয়ারি করান। ইহাতে বাল্মীকিবাবু দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দাদাসাহেব এ কি অনাচার করিলেন? কি অনাচার করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমাদের দেশের নিয়ম বা রেওয়াজ এই যে, পৈতৃক বাড়ীর পূর্ব্ব-দিকে নূতন বাড়ী তৈয়ারি করিতে হইবে। ইহাতে স্বর্গত পূর্ব্ব-পুরুষেরা খুশী হন। ইহা ইং ১৯২৫-২৬ সনের কথা। ইহা হইতে যদি আমরা এইরূপ অনুমান করি যে, আর্য্য-সভ্যতা ধীরে ধীরে এইভাবে গঙ্গার অববাহিকা ধরিয়া পূর্ব্বাঞ্চলে প্রসারলাভ করিয়াছিল তাহা কি অন্যায় হইবে? ইহা বিহারের কথা; বাংলায় অনুরূপ কোন প্রথা বা রেওয়াজের কথা শুনি নাই।

"বড়—" গ্রাম থাকিলেই যে সেই নামের "ছোট—" থাকিতে হইবেই এমন কোন কথা নাই। ২৪-পরগণা জেলায় ছোট জাগুলিয়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম; কিন্তু বড় জাগুলিয়া বলিয়া গ্রাম নাই। ২৪-পরগণা ও নদীয়ার সীমান্তে ছোট জাগুলিয়া হইতে কিছু দূরে জাগুলিয়া গ্রাম আছে। এই গ্রামকে কেহ কেহ ছোট জাগুলিয়া হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য বড় জাগুলিয়া বলিয়া উল্লেখ করেন; কিন্তু ইহার রাজস্ব বিভাগের কাগজে নাম হইতেছে জাগুলিয়া।

"বড়—" গ্রামের কালি যে "ছোট—" গ্রামের কালি অপেক্ষা বেশী হইবে এমন কোন কথা নাই।" "মধ্যম—" গ্রামের নামে মধ্যম কেন যোগ হইল সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা

নাই। নদীয়া জেলায় রাণাঘাট-বনগাঁ রেল লাইনের উপর "মাঝেরগ্রাম" বলিয়া একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামকে কেহ কেহ "মাঝিরগ্রাম" বলেন। প্রবাদ পূর্ব্বে এই গ্রামের অন্য নাম ছিল। এই গ্রামে কয়েকজন বদলোক একই কালে বাস করিত—ইহাদের নাম করিলে লোকের হাঁড়ি ফাটিত, যাত্রাভঙ্গ হইত—এজন্য কেহ ইহাদের নাম ত মুখে আনিতেন না, উপরন্তু তাঁহাদের বাসগ্রামের নামও উল্লেখ করিতেন না। ঐ গ্রামকে বুঝাইতে হইলে লোকে মাঝেরগ্রাম বলিয়া উল্লেখ করিত। কালে গ্রামের নাম "মাঝেরগ্রামে" পরিণত হইল। গ্রামের লোক এই অপবাদের ইঙ্গিত এড়াইবার জন্য—গ্রামের নাম এককালে বহু নৌকা-মাঝির বাসস্থান বলিয়া "মাঝিরগ্রাম" ছিল; মুখে মুখে মাঝেরগ্রামে পরিণত হইয়াছে, এইরূপ কৈফিয়ত দিয়া থাকেন। ইহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না—কারণ এই গ্রামের দুই-এক ক্রোশের মধ্যে কোন নদী ত বর্ত্তমানে নাই-ই, পূর্ব্বেও ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই।

যেমন মানুষের নামে অপবাদ রটে—কেহ কড়ায় গণ্ডায় সুদ আদায় করিলে লোকে তাহার নাম সকালবেলায় করে না, তাহাকে বুঝাইতে হইলে "একাদশী বাঁড়ুয্যে", "ফলনা দত্ত" প্রভৃতি বলে; তেমনই গ্রামবাসীদের কু-কীর্ত্তির জন্য গ্রামের নাম সম্বন্ধেও অপবাদ হয়। ২৪-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমায় "শিকড়া" এইরূপ একটি গ্রাম। এখানে বহু কুলীন কায়স্থের বাস। স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) এই গ্রামের সন্তান। বালেশ্বরের উকিল শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ও এই গ্রামের সন্তান। ইঁহার ওকালতির ৫০ বৎসর পূর্ণ হইলে সমগ্র উড়িষ্যার উকিলবৃন্দ একত্র হইয়া কটকের এডভোকেট জেনারেলের নেতৃত্বে তাহাকে সংবর্দ্ধিত করেন। আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির বাস এই গ্রামে। কিন্তু পাশের গ্রামের লোক এই গ্রামের নাম সকালবেলায় মুখে আনেন না—বলিতে হইলে বলেন, "গুয়োটার গাঁ"। কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি যে, বহুকাল আগে এক পথিক এই গ্রামের কোন ভদ্রলোকের নিকট বৈশাখ মাসে তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে দূরবর্ত্তী পানা-পুকুর হইতে জলপান করিতে বলিয়াছিলেন, তৃষ্ণার জল দেন নাই। এজন্য এই গ্রামের নাম কেহ করে না।

রেল ষ্টেশনের নাম শিকড়া-কুলীনগ্রাম; কিন্তু মৌজার নাম জয়পুর-গোপমহল। এই মৌজার কালি ৯৬·২৬ একর বা ২৯১ বিঘা। ১৯৫১ সনে লোকসংখ্যা ৯২৬ জন। বসতি খুব ঘন। শিক্ষিতের সংখ্যা ২৬০ জন, শতকরা ২৮। পল্লীগ্রামের পক্ষে এইটি একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ। শিকড়া বলিয়া একটি মৌজা আমডাঙ্গা থানায় আছে—ইহার সহিত শিকড়া-কুলীনগ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই।

এইরূপ নামপরিবর্ত্তন হইল কেন? পূর্ব্বে যদি গ্রামের নাম শিকড়া ছিল, পরিবর্ত্তনের হেতু কি? পরিবর্ত্তিত হইয়া জয়পুর-গোপমহল হইল কেন? আর পূর্ব্বে যদি গ্রামের নাম জয়পুর-গোপমহল ছিল, জনসাধারণে কেন ঐ গ্রামকে শিকড়া বলে? ইংরেজ আমলেও মধ্যে মধ্যে গ্রামের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাতন জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিলে এ বিষয়ে একটা হদিস পাওয়া যাইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে—দেখে কে?

গ্রামের নাম যে মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত হয় তাহার দুই-একটি উদাহরণ দিই। "ছাতনা" বলিয়া কোনও গ্রাম পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে "ছাতনি" চারটি, কোনটিই বীরভূম বা বাঁকুড়ায় নহে। চণ্ডীদাসের নান্নুর বা নান্নুরের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে "নান্না" বা "নান্ন" চারটি; একটি বর্দ্ধমানে, একটি বীরভূমে, একটি মেদিনীপুরে ও একটি ২৪ পরগণায়। কেন এইরূপ হইল অনুসন্ধান আবশ্যক।

গ্রামের নামের আদিতে বা আগে যে 'চক', 'ছিট', 'মৌর্দ্দ', 'জোত', 'আবাজী', 'আয়মা' 'কিসমত' প্রভৃতি শব্দ আছে তাহা বুঝিতে হইলে "মৌজা"র স্বরূপ বুঝিতে হইবে। ১৮৫৫ সনে উইলসন সাহেব 'গ্লসারি' নামক অভিধান প্রকাশ করেন। উহাতে মৌজা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:

Mauza—a village, understanding by that term one or more clusters of habitations, and all the lands belonging to their proprietory inhabitants; a Mauza is defined by authority to be 'a parcel or parcels of lands having a seperate name in the revenue records, and of known limits'—the lands, however, are not always contiguous and compact, but may have outlying portions inter-mixed with those of other villages, but these are brought under one head with the rest in the revenue settlement of the Mauza.

অর্থাৎ, মৌজা—(সামাজিক) গ্রাম; এক বা ততোধিক বসতবাটির সমষ্টি ও সেই সব বাড়ীর অথবা ঘরের লোকেদের চারিপাশের চাষ-আবাদের জমি। রাজস্ব আদায়ের কাগজপত্রে এক বা ততোধিক বন্দের নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জমি যদি একই নামে সরকারী কাগজে লিপিবদ্ধ থাকে তাহাকেই মৌজা বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়—আর এই সব জমি যে সকল সময়ে পরস্পর লাগাও হইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই; অন্য গ্রামের জমিও ইহার ভিতর থাকিতে পারে বা এই মৌজার জমিও অন্যান্য গ্রামের বা মৌজার অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতে আমরা মৌজার উৎপত্তি কতকটা ধারণা করিতে পারি। হিন্দু যুগের সামাজিক গ্রাম, অর্থাৎ কতগুলি কাছাকাছি বসতবাটীর সমষ্টি ও তাহার চারিপাশের চাষ আবাদের জমি লইয়া গ্রামের সৃষ্টি। এই গ্রামই কালক্রমে মুসলমানযুগের মৌজায় পরিণত হয়। এ বিষয়ে দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের ৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:

"The mauzas into which the present Par-

ganas are divided are said to be village divisions dating from pre-Muhammadan times and which were not affected by Akbar's divisions."

অর্থাৎ, প্রাক্-মুসলমানযুগের গ্রামই পরে মৌজায় পরিণত হয়। এ বিষয়ে বাদশাহ আকবর কোনও পরিবর্তন করেন নাই।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় 'Land System of Bengal'-এর ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :

A "village" corresponds to the older units called "mauza" and the still older "gramam" and comprises not only the inhabited portion, but also the cultivated and and other lands around."

বাংলা দেশে ১৮৪৭ সন হইতে ১৮৭২ সন অবধি রেভিনিউ সার্ভে হয়। এই সার্ভেতে প্রত্যেক গ্রামের বাহিরের সীমানা বা ঘের জরিপ করা হয়। দেখা যায় যে, প্রত্যেক মৌজার বাহিরের সীমানা বা ঘের-মাপ আঁকাবাঁকা এবং আয়তনও অনিয়মিত। সময়ে সময়ে এক গ্রামের বা মৌজার জমি অন্য গ্রামের কিংবা মৌজার জমি দ্বারা চারিধারে আবদ্ধ; আবার ইহার মধ্যেও অন্য গ্রামের বা মৌজার জমি আছে। ক মৌজায় ৫০ বিঘা খ মৌজার ভিতর; আবার গ মৌজার ২০ বিঘা ক গ্রামের পেটের ভিতর। এমনও দেখা গিয়াছে ক মৌজার বাহিরের সীমানার বা ঘেরের মধ্যে ক মৌজার ১৫০ বিঘা জমি আর খ গ ঘ···মৌজার মধ্যে ৩০০ বিঘা জমি। আবার খ গ ঘ···মৌজার মধ্যে ক মৌজার ২৫০ বিঘা জমি।

এইরূপ হইবার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ দুইটি। (১ম) যখন লোকসংখ্যা কম ছিল ও চাষ-আবাদের জমি বেশী ছিল, তখন যে যেমন সুবিধা পাইয়াছে—জঙ্গল কাটিয়া, জলের সুবিধা দেখিয়া যেখানে পারিয়াছে, সেইখানে কাছাকাছি বসবাস করিয়াছে এবং চাষ-আবাদ করিয়াছে। কোন নির্দিষ্ট প্ল্যান করিয়া বসবাস বা চাষ-আবাদ করে নাই। ফলে গ্রামের বাহিরের সীমানা আঁকাবাঁকা হওয়া স্বাভাবিক।

(২য়) এই সামাজিক গ্রামের লোকেরা কালক্রমে তাহাদের গ্রামের কাছাকাছি কিন্তু গ্রামের সংলগ্ন নহে এমন স্থানে জঙ্গল কাটিয়া, জমি উঠিত করিয়া চাষ-আবাদ আরম্ভ করিল—হয়ত বা কেহ কেহ এই নূতন জমিতে বসবাস করিতেও লাগিল। এই খণ্ড জমি সেই গ্রামের জমি বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিল। হরিপুরের ২০ জন বাসিন্দা বাড়ীর লাগাও ৫০০ বিঘা জমিতে চাষ করে। বংশবৃদ্ধির সহিত, লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা হরিপুর হইতে কিছু দূরে ৫০ বিঘা জমি উঠিত করিয়া চাষ করিতে লাগিল। হরিপুরের শ্যামের নিজগ্রামে ১০ বিঘা জমি ও এই ৫০ বিঘার মধ্যে ৫ বিঘা। রামের নিজগ্রাম হরিপুরে ১৫ বিঘা ও এই ৫০ বিঘার মধ্যে ২ বিঘা। রাজস্বের খাতায় শ্যামের নামে ১৫ বিঘা; রামের নামে ১৭ বিঘা জমি লেখা হইল। তাহারা হরিপুরের বলিয়া তাহাদের জমির পরিচয় হরিপুরে বলিয়া লিখিত হইল। এইরূপে এই ৪০ বিঘা হরিপুরের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইল। হরিপুরের পার্শ্ববর্তী গোবিন্দপুরের লোকেরা এই ৫০ বিঘার চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিতে চাষবাস করিতে লাগিল। তাহাদের জমি গোবিন্দপুরের রাজস্ব আদায়ী কাগজ-পত্রে গোবিন্দপুরের জমি বলিয়া লিখিত হইল। এইরূপে এই ৫০ বিঘা জমি গোবিন্দপুরের অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়া গেল।

আরও এক কারণে হরিপুরের লোকেরা এই ৫০ বিঘাকে হরিপুরের অন্তর্গত বলিয়া দাবি করিতে লাগিল। হরিপুরের চাষীরা হরিপুরের জমিতে খুদকাস্ত প্রজা, গোবিন্দপুরের জমিতে পাহিকাস্ত বা পাইকাস্ত প্রজা। খুদকাস্ত প্রজাকে জমিদার সহজে উচ্ছেদ করিতে পারিতেন না বা খাজানা পরগণা নিরিখের উপর বাড়াইতে পারিতেন না। অন্যান্য সুবিধাও ছিল। এই অধিকার বজায় রাখিবার জন্য হরিপুরের প্রজারা এই ৫০ বিঘা জমি হরিপুরের অন্তর্গত বলিয়া দাবি করিতে লাগিল। তাহাদের দাবি বহু ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইত।

উইলসন সাহেবের গ্লসারীতে ছিটের এইরূপ বর্ণনা আছে :

Chhit—balance, remainder.

হরিপুর মূলগ্রাম—তাহার ছিট ৫০ বিঘা গোবিন্দপুরের ভিতর। নিজেদের মধ্যে বিভাগ-বণ্টনের ফলে জমিদারী-সেরেস্তায় এই ছিট কখনও কখনও আলাদা মৌজা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ছিট মৌজার আয়তন সাধারণতঃ কম।

চক্ সম্বন্ধে উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন :

Chak—a portion of land divided off; as the detached fields of a village, or a patch of rent-free land, or any seperate estate or farm. In old revenue accounts the term was applied to lands taken from the residents of a village, and given to a stranger to cultivate.

উক্ত বিবরণ হইতে চক্ সৃষ্টির একটা হদিস পাওয়া গেল। পশ্চিম বাংলায় ৩৯,১৫১টি মৌজার মধ্যে ৭৬০টি চক্ (মৌজা)। অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২টি করিয়া চক্ সৃষ্ট হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলায় ১০,৫১৭টি মৌজার মধ্যে ২৫৭টি চক্; শতকরা ২·৪টি চক্। মেদিনীপুরের বাহিরে শতকরা ১·৭টি।

সাধারণতঃ চক্ ও যে গ্রাম হইতে চক্ সৃষ্ট হইয়াছে উভয়ই পাশাপাশি, কাছাকাছি থাকিবে। মেদিনীপুর জেলায় চকের কালি মূল মৌজার কালি অপেক্ষা অনেক কম। সাধারণতঃ চকের কালি মূল মৌজার কালি অপেক্ষা কমই হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৌজার সীমানা অত্যন্ত আকাবাঁকা (highly irregular); কিন্তু চকের আকার প্রায়ই সমচতুষ্কোণ, সমচতুষ্কোণ না হইলে আয়ত-

ক্ষেত্র। জমিদারী বিভাগ-বন্টনের ফলেও আবার চক্‌ সৃষ্টি হইয়াছে।

এইবার আমরা খোর্দ, কিসমত, আরাজী প্রভৃতির সৃষ্টির কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিব। উইলসন সাহেব তাঁহার গ্লসারীতে এইরূপ লিখিয়াছেন :

Khurd—little, small ; used as the designation of a village or town in opposition to *Kulam*, great..

খোর্দ কথাটি হিন্দুস্থানী, মানে ছোট। যে-যে মৌজার নামে খোর্দ আছে সেই সব গ্রামের নামকরণ যে নবাবী আমলে হইয়াছে একথা সহজেই অনুমান করা চলে। 'সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগরে'র সন্নিকটে খোর্দবহেড়া বলিয়া একটি গ্রাম আছে। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে ক্ষুদ্র বহেড়া বলে ও চিঠিপত্রাদিতে এই নামই ব্যবহার করে। খোর্দ গ্রামের আয়তন সাধারণতঃ ছোট।

Kismet—"applied in revenue matters to a portion of land detached from a larger division, as from a Taluk or a Pargana, especially if subject to a different jurisdiction ; a hamlet or dependent village".

বাংলার Settlement Manual-এ কিসমত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—Kismet, village, usualy a sub-division of a "mauza." মৌজার নামকরণ বিষয়ে শেষোক্ত ব্যাখ্যাটিই সমীচীন। ইহা কতকটা চকের ন্যায় ও এই সব মৌজা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট।

Arazi—applied especially to detached portions which are either rent-free, or have been recoverd from the retrocession of rivers.

আরাজী মৌজা এককালে নিষ্কর থাকিলেও বর্ত্তমানে অনেক ক্ষেত্রে নিষ্কর নহে। ইহা অনেকটা চরের মত। এই আরাজী নামও নবাবী আমলের সৃষ্টি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় আরাজী মৌজা নদী হইতে বহুকাল পূর্ব্বে উত্থিত হইয়াছে। যেগুলি হালের তাহাদের নামের আগে 'চর' সংযুক্ত আছে। এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

Aima—Land granted by the Mughal Government.

আয়মা—মুঘল বাদশাহেরা মুসলমানদের নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এইরূপ গ্রামের সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় মাত্র ১০টি ; তাহার মধ্যে তিনটি মৌজার নাম কেবলমাত্র "আয়েমা" ; অন্যান্যগুলির নাম এইরূপ "আয়মা হরিপুর" ইত্যাদি। এই দশটি আয়মা মৌজার মধ্যে সাতটি হুগলী জেলায়। হুগলী জেলার আয়মা-মৌজার কালি গড়ে প্রত্যেকটির ২৮২ একর বা ৯১৬ বিঘা। বাদশাহী দান প্রায় হাজার বিঘার কাছাকাছি হইত বলিয়া প্রবাদ আছে।

"চর—" গ্রামের নাম দেখিয়া মনে হয় যে ইহা এককালে নদীর চর ছিল। বাংলা দেশ নদীমাতৃক ; নদীর গতি বহুবার বহুরকমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক নদী মজিয়া গিয়াছে।

হুগলী জেলায় নিম্নলিখিত চর-গ্রাম আছে :

থানা মগরা—	চর জাজিয়া	(২৭)
	চর মধুসূদনপুর	(২৮)
থানা বলাগড়—	চর সুলতানপুর	(১)
	*ছেড়া চর কৃষ্ণবাটী	(১১)
	*নূতন চর কৃষ্ণবাটী	(১২)
	চর রামপুর	(১৪)
	চর সুদলপুর	(১৭)
	ভবানীপুর চর	(১০৩)
	*ডুমুরদহ চর	(১৩২)
	*রামনগর চর	(১৩৩)
	*নাওসরাই চর	(১৩৪)

এই চর-গ্রামগুলি সরস্বতী ও ভাগীরথীর নিকটবর্ত্তী। এককালে নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যেসব গ্রামের নামের শেষে "—দহ" আছে সেগুলিও নদী হইতে উত্থিত। সুপ্রসিদ্ধ খড়দহ গ্রাম সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, প্রভু নিত্যানন্দ ভাগীরথীর জলে একটি খড় ফেলিয়া দেন। খড় ভাসিয়া যেখানে ডুবিয়া যায় মা গঙ্গা ততদূর অবধি জমি ছাড়িয়া দেন। হাওড়া জেলায় সরস্বতী নদীর কূলে বহু '—দহ' গ্রাম আছে। এ সম্বন্ধে হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে লিখিত আছে :

"It [the Saraswati] is navigable up to Andul, but only by boats of 5 tons burden. Its high banks and the remains of large boats occassionally dug out from its bed, show that once it must have been a broader and deeper stream. This inference is confirmed by the numerous large pools, called *dahas*, found in its bed from which many river-side villages take their name, e. g. Makardah, Jhapardah, Bhandardah etc. The silting of the river began some centuries ago." (p. 7).

'বাজে' সম্বন্ধে উইলসন লিখিয়াছেন :

Baje—"some, several, miscellaneous ; vernacular corruption of Bazi."

বাজে-জমিনের অর্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

Miscellaneous lands, especially applied to Lakhiraj lands or to lands with a light quit-rent.

আমাদের মনে হয়, এককালে বাজে-গ্রাম লাখরাজ ছিল বা নামমাত্র খাজানা ইহার উপর ধার্য্য ছিল। পরগণা নিরিখ এই বাজে-গ্রামের খাজানার উপর প্রযোজ্য ছিল না। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানা দরকার।

Chhar (ছাড়) সম্বন্ধে গ্লসারীতে আছে :

"Letting go, relinquishing, allowing to pass etc. A deed of remission of rent or revenue granted by the proprietor or by the collector on the part of the Government".

ছাড়-গ্রাম অনেকটা বাজে-গ্রামের ন্যায় কম খাজানা বা কম রাজস্ব দিত।

জোত সম্বন্ধে উইলসনের গ্লসারীতে এইরূপ লিখিত আছে :

Jot—Tillage, cultivation; tenure of a cultivator; the rent or revenue paid by a cultivator.

জোত কথাটির অন্য অর্থও আছে। কিন্তু গ্রামের নামের আগে যদি জোত কথাটি থাকে তাহা হইতে আমরা কি বুঝিব? যে গ্রামের প্রজারা তাহাদের দেয় খাজানা কোন জমিদারকে না দিয়া সরাসরি নবাব সরকারে আদায় দিত, সেই সব গ্রাম জোত-গ্রাম বলিয়া রাজস্ব আদায়ী খাতায় উল্লেখ থাকিত। জমিদার বা জায়গীরদারদের অনেক নানকর জমি থাকিত। এই নানকর জমি হইতে প্রাপ্য খাজানা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ছিল সমগ্র বাংলার রাজস্বের শতকরা ০'৫ ভাগ, কিন্তু বিভিন্ন স্থানে ইহার পরিমাণ বিভিন্ন। বর্দ্ধমানে ইহার পরিমাণ শতকরা ২'২ ভাগ, দিনাজপুরে ১'৫ ভাগ, রাজসাহীতে ০'৪ ভাগ। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ বহু জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। ৯৩টি জোত গ্রামের মধ্যে ৩১টি ক্ষুদ্র মালদহ জেলায়, ১৫টি পশ্চিম দিনাজপুরে, ১১টি মুর্শিদাবাদে, ২০টি বর্দ্ধমান জেলায়। এই সব জেলায় জায়গীর বেশী ছিল বলিয়া শুনা যায়।

বর্ত্তমান কালে অবশ্য "জোত" গ্রামের প্রজারা তাহাদের দেয় খাজানা জমিদারকে দিত।

"নিজ-"গ্রামগুলি পূর্ব্বে জমিদারদের খামার ছিল, পরে ইহাতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। এই সব গ্রামের প্রজার অধিকার অন্যান্য গ্রামের প্রজাদের অপেক্ষা কম। ইহা বুঝাইবার জন্য গ্রামের আগে 'নিজ' শব্দ যোগ করা হইত। ইদানীং কিন্তু এই পার্থক্য নাই। (আগামীবারে সমাপ্য)

ডাক ও সাড়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

মীরা

এ কেমন প্রেমে বাঁধিলে আমারে—বাঁধিলে প্রেমে আমারে?
ত্যজি' রাজকাজ হয়ে প্রেমদাসী এসেছি তব দুয়ারে।
বাজালে কেমন মুরলী মোহন!
মজালে মীরার তনুপ্রাণ মন।
তব তরে হিয়া অধীর এখন—দাও দরশন তারে—
ত্যজি' রাজকাজ হয়ে প্রেমদাসী এল যে তব দুয়ারে।

গোপাল

এ কেমন প্রেমে সাধিলে—কেমনে সাধিলে প্রেমে আমারে!
প্রেমে তব করি' অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব দুয়ারে।
গাহি' হরি হরি নাম ঝংকার
আনিলে টানিয়া আঙনে তোমার,
সুদূরে রহিতে না পারিয়া আর এল শ্যাম অভিসারে,
প্রেমে যারে করি' অধীর বাঁধিয়া আনিলে তব দুয়ারে।

মীরা

এ কেমন প্রেমে বাঁধিলে আমারে—বাঁধিলে প্রেমে মীরারে!
লোকলাজ কুল মান ভয় দিলে ভুলায়ে বঁধু তাহারে!
প্রেমের উচ্ছ্বাসে ঝরে দুনয়ন,
প্রেমের বিরহে যাচি দরশন,
প্রেমে গাই: লহ তনু মন ধন—জীবন সঁপি তোমারে।
লোকলাজ কুল মান ভয় দিলে ভুলায়ে বঁধু মীরারে!

গোপাল

এ কেমন প্রেমে সাধিলে—সাধিলে কেমন প্রেমে আমারে!
শঙ্খ চক্র ত্যজি' বাঁশি হাতে এসেছি তব দুয়ারে!
ব্রজবল্লভ নাম ধরি প্রেমে,
নন্দদুলাল নাম ধরি প্রেমে,
মীরার গোপাল হ'য়ে ঝরি প্রেমে—করুণার সুধাধারে।
শঙ্খ চক্র ত্যজি' বাঁশি হাতে এসেছি তব দুয়ারে।

(ইন্দিরা দেবীর সমাধিপ্রাপ্ত হিন্দী ভজনের অনুবাদ)

'প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী টিফিন খাইতেছে

আমেরিকার প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাপদ্ধতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

আমেরিকা বিশ্বাস করে প্রত্যেক মানুষের নাগরিক দায়িত্বের অংশ গ্রহণ করার সক্ষমতার ওপরই মার্কিনী গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে; সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিক যাতে সমাজে তার ব্যক্তিগত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সে দেশে করা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের দায়িত্ব সম্পর্কে মার্কিনী শিশুদের সচেতন করে তোলবার জন্যে সেখানে অবৈতনিক "পাবলিক স্কুল শিক্ষা" ব্যবস্থার সূচনা করা হয়েছে। প্রত্যেক মার্কিনী শিশু—সে যত দূরেই থাকুক না কেন, এই পাবলিক স্কুলের সুবিধা পেয়ে থাকে, জাতিধর্ম্ম স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছেই শিক্ষার সুযোগ আমেরিকায় উন্মুক্ত।

প্রাথমিক বিদ্যালয় সমগ্র মার্কিন দেশে বিস্তৃত, এক লক্ষ ষাট হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় দু' কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছাত্র পড়াশোনা করে থাকে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ৬ থেকে ৮ বৎসর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে আর এটাই হচ্ছে মার্কিনী শিক্ষাব্যবস্থার মূল সোপান। অধিকাংশ মার্কিনী শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হয় ছয় বৎসর বয়স থেকে, পাঁচ বৎসর বয়সের ছেলেরা পাবলিক অথবা প্রাইভেট কিণ্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হতে পারে।

'থ্রি আর' বা রিডিং, রাইটিং ও রিথমিটিক হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের মূল ভিত্তি। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, পৌর বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও

বিদ্যালয়ে ছাত্রদের ব্যায়ামচর্চা

কলা প্রত্যেক বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে; বর্ত্তমান মার্কিনী শিক্ষাবিদগণ "মুখস্থ বিদ্যার" ওপর আস্থাশীল নন, তাঁদের মতে বিদ্যাশিক্ষা স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা

নয়, ছাত্রদের যাতে বুদ্ধির স্ফুরণ হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। তাঁদের মতে ছাত্রছাত্রীকে স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত করতে হবে, অভিজ্ঞতা আর অধীত বিদ্যার মিল ঘটিয়ে বাস্তব ক্ষেত্রে তার সুপ্রয়োগের ওপরই শিক্ষার সার্থকতা। প্রাথমিক শিক্ষাকালে প্রশ্নোত্তর অপেক্ষা আলোচনার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কয়েকটি অনগ্রসর অঞ্চল ছাড়া সমগ্র আমেরিকায় প্রাথমিক শিক্ষা এখন আর ঋজু অনমনীয় এবং কেতাদুরস্ত ব্যাপার নয়, বরং এটা ছাত্র ও শিক্ষকদের আবিষ্কার করার সক্রিয় বন্ধুত্বপূর্ণ সমবেত প্রচেষ্টা।

ছাত্রছাত্রীরা হাতের কাজের অনুশীলন করিতেছে

সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে এমন ভাবে সাজান হয়েছে যার ফলে প্রত্যেক ছাত্র আপন ব্যক্তিগত প্রতিভা, সহযোগিতার অভ্যাস আর অধীত বিদ্যার প্রয়োগ শিখতে পারে। এই ভাবে ইতিহাস পড়ে ছাত্রেরা ঐতিহাসিক ঘটনা নাটকীয়তার সঙ্গে প্রদর্শন করে, ভূগোল পড়ে মানচিত্র আঁকতে, ছবির বই প্রস্তুত করতে আর বিভিন্ন দেশের বেশবাস প্রদর্শন করতে শেখে। কেবল যে বিদ্যালয়গৃহের মধ্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তা নয়, ছাত্রদের দলবদ্ধ ভাবে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান আর শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়ে যাওয়া হয়; তা ছাড়া ভবিষ্যতের সুস্থ সবল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলবার জন্যে তাদের নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদিও করান হয়।

আমেরিকার সুদূর অভ্যন্তরভাগে এখনও প্রাচীন ব্যবস্থা বর্তমান থাকতে দেখা যায়। সেখানে একজন মাত্র শিক্ষক একটিমাত্র ঘরে পঞ্চাশ থেকে আশীজন ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন, কিন্তু এই প্রাচীন ব্যবস্থা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। যদি কোন অঞ্চলে একটা বড় বিদ্যালয় খোলবার অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা কম থাকে তা হলে সেই অঞ্চলের ছাত্রদের বিনাভাড়ায় বাসে করে নিকটবর্তী "কেন্দ্রগত বিদ্যালয়ে" প্রত্যেক দিন পড়তে পাঠানো হয়।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনসমূহ ইঁট দিয়ে তৈরি ২।৩ তলা উঁচু হয়; প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আলো-বাতাসে-ভরা

বিদ্যালয়ের ভোজনকক্ষ

অনেকগুলো ক্লাসঘর থাকে, এ ছাড়া অডিটোরিয়াম, জিমনাসিয়াম, ক্যান্টিন ও খেলাধুলোর জন্যে প্রশস্ত মাঠ ত আছেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্ররা পড়তে আসে। এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আমেরিকায় উচ্চ বিদ্যালয় বলে সুপরিচিত, এই উচ্চ বিদ্যালয় জুনিয়ার আর সিনিয়ার এই দু' ভাগে বিভক্ত।

প্রাথমিক বিদ্যালয় ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে থাকে, বর্তমান সমাজব্যবস্থার উপযোগী করে তোলার শিক্ষা মার্কিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেয় না। ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে প্রবেশ করার প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে হলে ছাত্রকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই হবে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে দু' ধরনের শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, সাধারণ শিক্ষা আর বিশেষ শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষার পঠিত বিষয় এমন ভাবে স্থির করা হয় যার ফলে সে কলেজে প্রবেশাধিকার লাভের উপযুক্ত হতে পারে। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, যে-কোন বিদেশী ভাষা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বীজগণিত, ইতিহাস ইত্যাদি সাধারণ শিক্ষা বিষয়-সূচীর

অন্তর্গত। যে সমস্ত ছাত্র অর্থকরী বা বিশেষ শিক্ষা লাভ করে থাকে তাদেরও পাঠ্যসূচীর স্থিরীকরণে যাতে করে তারা উত্তরজীবনে অনায়াসে জীবিকা অর্জন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, টাইপ শিক্ষা, ষ্টেনোগ্রাফী, বুক কিপিং, অঙ্কন-বিদ্যা, ইলেক্ট্রিসিটি, রেডিও নির্ম্মাণ, কৃষি ও পশুপালন—অর্থকরী শিক্ষাসূচী-ভুক্ত।

ক্লাস নেওয়া

প্রত্যেক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতামূলক খেলা-ধুলোয় উৎসাহ দেওয়া হয়, ফুটবল, সাঁতার, টেনিস, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম প্রত্যেক স্কুলেই আছে। এ ছাড়া নাটক আর সঙ্গীতেও তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়; উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজেদের মধ্যে সমিতি গঠন করে আর সংবাদপত্র প্রকাশ করে থাকে। প্রতিভার সম্যক্ বিকাশের মাধ্যমে তারা যাতে ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের দায়িত্ব সম্পাদনে সফলতা অর্জ্জন করতে পারে সেদিকে উচ্চ বিদ্যা-লয়েও সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়।

পাবলিক স্কুল রাজ্য সরকারের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক চালিত হয়। রাজ্যের শিক্ষা বোর্ড বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা কি হবে তা ঠিক করে। ধর্ম্মীয় বিদ্যালয়সমূহ চার্চ্চ দ্বারা পরিচালিত হয়।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষাসমাপ্তির সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশ করে, এই উচ্চতর শিক্ষার প্রসারও আমেরিকায় বিস্ময়কর। সেখানে এক হাজার আট শ' পঞ্চাশটি উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে প্রায় সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে। অনুমান করা হয়, শতকরা প্রায় ৪০ জন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী কলেজীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে।

উচ্চতর শিক্ষার এই প্রসার মার্কিনী শিক্ষাব্যবস্থার গর্ব্বের বস্তু। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতি দশ জন স্নাতকের মধ্যে চার জন কলেজে অধ্যয়ন করে থাকে। পৃথিবীর অন্য কোথাও উচ্চ বিদ্যালয়ের এত বেশীসংখ্যক ছাত্র কলেজে প্রবেশ করে না।

প্রত্যেক উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ নিজেরাই আপন কেন্দ্রের অনুসৃত নীতি নির্দ্ধারণ করে থাকেন। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান পরিমাপ করে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি কমিটি কোন কোন্ কেন্দ্র ঐ স্তরে পৌঁছেছে তা স্থির করে দেন। কোন রকম সময় নষ্ট না করেই যে-কোন ছাত্র উক্ত মান-পর্য্যায়ের এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্রে যেতে পারে।

মার্কিনী কলেজের মধ্যে অনেক রকম শ্রেণী বিভাগ বর্ত্তমান, তার মধ্যে সবচেয়ে নতুন ধরনের হচ্ছে 'জুনিয়ার

কলেজ'। কোন কোন ক্ষেত্রে এই কলেজগুলি সাধারণের অর্থে পরিচালিত হয়, সেই হিসেবে এদের "পাবলিক স্কুলে"র প্রসারণও বলা যেতে পারে। আমেরিকায় বর্তমানে পাঁচ শ'র বেশী জুনিয়ার কলেজ আছে আর সেগুলোতে প্রায় তিন লক্ষ ছাত্র পড়ছে। আমেরিকার কলেজ-পর্য্যায় শিক্ষাব্যবস্থায় সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হচ্ছে "লিবারেল আর্টস কলেজ"। এই কলেজে প্রথম দু' বছর শিক্ষাকালে সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, যে-কোন একটি বিদেশী ভাষা, ইতিহাস, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়। এই শিক্ষাকাল শেষ করবার পর ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান অথবা সাহিত্যের যে-কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার অনুমতি পেয়ে থাকে। ঐ চার বৎসর লিবারেল আর্টস কলেজে বিশেষ শিক্ষা পাবার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের স্বেচ্ছা-মনোনীত অন্য কয়েকটি বিষয় পড়াশুনা করে তাদের শিক্ষাগত পটভূমিকা বৃহত্তর করে তুলতে পারে। কোন একটি পঠিতব্য বিষয় যখন প্রস্তাবনা পর্য্যায়ে থাকে তখন আলোচনাই সে বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে থাকে, কিছু অগ্রসর হবার পর সেই বিষয়ের উপর অধ্যাপক কতকগুলি বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এই বক্তৃতামালা শোনা ছাড়াও সে বিষয় সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীকে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয় আর তার ওপর গবেষণামূলক রচনা লিখতে হয়।

বিদ্যালয়ের মত কলেজেও স্বাধীনভাবে পড়াশোনার ওপর এবং গবেষণার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হয়ে থাকে; গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করে সৃজনী-প্রতিভা বিকাশের সহায়ক পদ্ধতি অবলম্বন করা কলেজসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনভাবে পড়াশোনার এই উদার অধিকার পাওয়ার ফলে বিচারবুদ্ধি প্রসারের আগেই যে তারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তা নয়, বরং এই ব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরে শিক্ষকদের কাছ থেকে তারা এমন উৎসাহ এবং উপদেশ পায় যাতে করে তাদের স্বাভাবিক মনীষা সুপথে পরিচালিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় হোক, বড় কলেজ বা ছোট কলেজই হোক ছাত্রজীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন তারতম্যই নেই। প্রত্যেক ছাত্রকে প্রায় একই রকম ছাত্রজীবন অতিবাহিত করতে হয়। নিজের বাড়ী ছেড়ে ছাত্রছাত্রীরা বোর্ডিং হোষ্টেল বা আত্মীয়স্বজনের কাছে এসে শিক্ষাজীবন সুরু করে; দিনের মধ্যে অধিকাংশ সময় তাদের পড়াশোনা করতে হয় আর বিশ্রামের সময় নিজের খরচ রোজগার করে নেবার চেষ্টা করে। ছাত্রছাত্রীনির্বিশেষে নিজের খরচ রোজগার করার এই ব্যবস্থা লক্ষ্যণীয়। এই ব্যবস্থাকে শ্রমসাধ্য বলে বিবেচনা করা হয় না, উপরন্তু মার্কিনী ছাত্রের নিজের খরচ উপার্জ্জন করে নেওয়া উচিত বলে মনে করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ওয়েটার, হোটেল বয়, শ্রমিক, মালবাহক ও কেরাণী ইত্যাদি রূপে নিজেদের খরচ রোজগার করতে চেষ্টা করে। দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের কালে তারা পূর্ণ সময়ের জন্যে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে। রাস্তা তৈরীর কাজ, খামারের, শ্রমিক, ট্রাক চালনা ইত্যাদি কাজ তারা করে থাকে, অর্থাৎ যে-কোন রকম কাজ তারা ছাত্রাবস্থায় করে থাকে। বিদ্যালয় আর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যতটুকুই রোজগার করুক না কেন তার বদলে তারা যা পেয়ে থাকে তাকে পূর্ণ মূল্য দিতে শেখে।

শঙ্করের ব্রহ্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

শঙ্করের বেদান্ত-দর্শনের মূলকথা হ'ল পরমতত্ত্ব, পরমসত্য ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়। সেজন্য তিনি তাঁর অতুলনীয় মতবাদের প্রধানতম ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছেন সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন ছান্দোগ্যোপনিষদের সেই মহামন্ত্রটিকে: "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্'' (৬-২-১)। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব বা সত্য নেই, জীবজগৎও নেই, তিনিই একমাত্র সত্তা। সেজন্য, তথাকথিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় তত্ত্ব জীব ও জগৎ মিথ্যা, মায়ামাত্র, অথবা ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একীভূত ও অভিন্নাত্মা। এরূপে, শঙ্করের নিগূঢ়তম দর্শন অতি সুন্দরভাবে মাত্র একটি পংক্তি দ্বারাই ব্যক্ত করা চলে—

"ব্রহ্ম সত্যং, জগন্মিথ্যা, জগদ্‌ব্রহ্মৈব কেবলম্"

এই পংক্তির প্রত্যেকটি শব্দই কিন্তু গভীরার্থদ্যোতক, এবং সুষ্ঠুভাবে সেই অর্থ গ্রহণ করতে পারলেই শঙ্করের প্রকৃত মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে।

উপরের মহামন্ত্রটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্কর তাঁর ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যে বলছেন—

"সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্বিশেষং সর্বগতং একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্, যদবগম্যতে সর্ববেদান্তেভ্যঃ" (৬-২-১)।

এই একমাত্র 'সৎ' বস্তুই হলেন তিনি যিনি কেবলমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ, সূক্ষ্ম, নির্বিশেষ, সর্বগত, এক, নিরঞ্জন, নিরবয়ব, বিজ্ঞানস্বরূপ এবং সমস্ত শাস্ত্রের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই 'সৎ' বস্তুর সঙ্গেই অভিন্নস্বরূপ, এবং সেজন্যই সেই 'সৎ' বস্তু এক ও অভিন্ন। প্রশ্ন হতে পারে যে, 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' এই শব্দ দুটি ত' সমার্থক, সেক্ষেত্রে অদের দুবার করে উল্লেখ পুনরুক্তি দোষের সৃষ্টি করছে। এই আপত্তির উত্তরে শঙ্কর বলছেন—

"একমেবেতি—। স্বকার্যপতিতমন্যৎ নাস্তীত্যেকমেবেত্যুচ্যতে। অদ্বিতীয়মিতি। মৃদ্ব্যতিরেকেণ মৃদো যথা—অন্যদ্ ঘটাদ্যাকারেণ পরিণময়িতৃ-কুলালাদি-নিমিত্তকারণং দৃষ্টম্, তথা সদ্ব্যতিরেকেণ সতঃ সহকারি কারণং দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং প্রাপ্তং প্রতিষিধ্যতে—অদ্বিতীয়মিতি নাস্য দ্বিতীয়ং বস্ত্বন্তরং বিদ্যত ইত্যদ্বিতীয়ম্।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্য ৬-২-১)

অর্থাৎ সাধারণতঃ, এক কারণ থেকে যখন এক বা ততোধিক কার্যের উৎপত্তি হয়, তখন সেই কারণ আর 'এক' না থেকে 'দুই' বা ততোধিক হয়ে পড়ে। যেমন, 'এক' মৃৎপিণ্ড মৃন্ময় ঘটরূপে 'দুই', এবং মৃন্ময় ঘট, মৃন্ময় পাত্র, মৃন্ময় কলস প্রভৃতি রূপে 'বহু' হয়ে যায়। কিন্তু এই সদ্ বস্তু ব্রহ্ম থেকে কোনরূপ কার্যোৎপত্তিই হয় না। সেজন্যই তিনি শাশ্বত কালই 'এক', 'দুই' বা 'বহু' নন।

পুনরায়, সাধারণতঃ কারণ অথবা উপাদান-কারণের সহকারী কারণ হ'ল নিমিত্ত-কারণ—এই দুই কারণের সমাবেশেই হয় কার্যোৎপত্তি। যেমন, মৃন্ময় ঘটরূপ কার্যের উৎপত্তি হয় মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান-কারণ এবং যন্ত্রাদিপরিচালক কুম্ভকাররূপ নিমিত্ত-কারণের পরস্পর সহায়তায়। কিন্তু সেই 'সৎ' বস্তুর কোন সহকারী নেই, সেজন্যই তিনি 'অদ্বিতীয়'।

অর্থাৎ, 'সৎ'স্বরূপ ব্রহ্মের উচ্চস্তরীয় বা সমানস্তরীয় কোন বস্তু বা তত্ত্ব যে নেই, সেকথা ত বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে, কোন দিক থেকেই মতদ্বৈধ নেই, কোন বেদান্তসম্প্রদায়ই সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে না। কিন্তু ব্রহ্মের অপেক্ষা নিম্নস্তরীয় কোন বস্তু আছে কিনা সে সম্বন্ধে দ্বিমত হতে পারে। পুনরায়, এই নিম্নস্তরীয় বস্তু দ্বিবিধ। প্রথমবিধ বস্তু হ'ল, ব্রহ্মের উপর সম্পূর্ণরূপেই নির্ভরশীল, ব্রহ্মপ্রসূত কার্য, অথবা স্বীয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য ব্রহ্মেরই একান্ত আশ্রিত যেমন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। দ্বিতীয়বিধ বস্তু হ'ল, প্রথমবিধ অপেক্ষা উচ্চস্তরীয় বস্তু, অর্থাৎ ব্রহ্মের উপর সম্পূর্ণ রূপেই নির্ভরশীল, ব্রহ্মপ্রসূত কার্য, অথবা, স্বীয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের জন্য ব্রহ্মেরই একান্ত আশ্রিত না হলেও ব্রহ্মের সহকারী-কারণরূপে ব্রহ্মেরই দ্বারা পরিচালিত। যেমন, উপাদানরূপা প্রকৃতি। —'এক' এই শব্দের দ্বারা প্রথমবিধ নিম্নস্তরীয় বস্তু এবং 'অদ্বিতীয়' এই শব্দের দ্বারা দ্বিতীয়বিধ নিম্নস্তরীয় বস্তুর শাশ্বত অভাব নির্দেশ করা হয়েছে। শঙ্কর তাঁর ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ভাষ্যে বলছেন—

"একমেবাদ্বিতীয়মিত্যেতৌ চ সঙ্খ্যেন সমানাধিকরণৌ, তথা ইদমাসীদিতি। চ" (৬-২-১)

অর্থাৎ 'সৎ', 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' সমানার্থক। যিনিই 'সৎ', তিনিই 'এক', যেহেতু তাঁর সৃষ্ট কোন দ্বিতীয় কার্য নেই; তিনিই পুনরায় 'অদ্বিতীয়', যেহেতু তাঁর সহকারী কোন দ্বিতীয় কারণও নেই।

কেবল শ্রুতি নয়, যুক্তির ভিত্তিতেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। বস্তুর বস্তুত্ব বা সত্তার অস্তিত্বের অর্থই হ'ল এই যে, সেই বস্তুটি বা সেই সত্তাটি একটি পৃথক্ বস্তু, সত্তা, সত্য বা তত্ত্ব, যাকে পৃথক্‌ভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রভৃতি বলে গণনা করা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নেই। অবশ্য এই বস্তুটি স্বতন্ত্র বা পরতন্ত্র বস্তু হতে পারে; কিন্তু তাতে এ বিষয়ে কোন দিক থেকে প্রভেদ হয় না। যেমন, ব্রহ্মকে যদি স্বতন্ত্র, উচ্চস্তরীয় বস্তু এবং জীবজগৎকে যদি পরতন্ত্র, নিম্নস্তরীয় বস্তুরূপেও গ্রহণ করা যায়, তা হলেও ব্রহ্ম প্রথম বস্তু, জীবজগৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তু—এইভাবেই গণনা ও গ্রহণ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে ব্রহ্ম 'এক' ও 'অদ্বিতীয়' থাকলেন আর কি করে? এই ভাবে যুক্তির দিক্ থেকেও একমাত্র ব্রহ্মেরই সত্যতা স্বীকার করে নিতে হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, শঙ্কর এই 'একত্ব' ও 'অদ্বিতীয়ত্ব'কে কি কারণে ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব, পরমসত্তা ও পরমবস্তুর প্রথমতম ও প্রধানতম লক্ষণ বলে গ্রহণ করেছেন? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত হয়ে আছে মানবজীবনের চিরন্তনী আকুতিরই মধ্যেই। কারণ, বহুর মধ্যে একের অন্বেষণই ত হ'ল মানবমনের শাশ্বত, অদম্য প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। বহু বিচিত্র ও বিরুদ্ধ বস্তু এবং ঘটনাবলীর সমাবেশে সঙ্কুল এই দুর্বিজ্ঞেয় বিশাল বিশ্বকে যখন আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝতে চেষ্টা করি, তখন প্রথমতঃ আমাদের স্বীকার করে নিতে হয় যে, সেই সব আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বস্তু ও ঘটনা সত্যই তা নয়, কারণ, যা স্ববিরোধদোষদুষ্ট তা ত নিশ্চয়ই মুহূর্ত মধ্যেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন, খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, এই যে পরস্পরের অবিরোধী অসংখ্য বস্তু ও ঘটনা পাশাপাশি অবিরুদ্ধভাবে বিরাজ করছে, তা সম্ভবপর কি করে—এই ন্যায্য প্রশ্নের উত্তরে, পুনরায় স্বীকার করে নিতে হয় যে, অবিরুদ্ধ হয়েও আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন সেই সকল বহু বস্তু ও ঘটনা প্রকৃতপক্ষে একই মূলীভূত বস্তু ও ঘটনার বিভিন্ন প্রকাশই মাত্র। এরূপে, প্রথমতঃ, সকল বিরোধের মধ্যেও সামঞ্জস্য ও দ্বিতীয়তঃ সকল বহুর মধ্যেও একের আবিষ্কারই ত হ'ল মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠ ফল। সেজন্য কেবল দর্শন নয়, বিজ্ঞান, নীতিতত্ত্ব, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি প্রতি ক্ষেত্রেই একটি মূলীভূত তত্ত্ব বা নিয়ম অনুসন্ধান করাই হ'ল আমাদের চরম লক্ষ্য। দর্শনের ক্ষেত্রে, সেই মূলীভূত তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম। দার্শনিকপ্রবর শঙ্কর সেজন্য স্বভাবতঃই ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বকেই প্রপঞ্চনা করেছেন তদ্গতচিত্তে তাঁর অতুলনীয় মনীষার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। জগতের কোনো দর্শনেই ত পরমতত্ত্বের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব এরূপ অপরূপ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নি।

ব্রহ্মের এই প্রথম লক্ষণ একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব থেকেই তাঁর দ্বিতীয় লক্ষণ নির্বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, অর্থাৎ, সকলপ্রকার বিশেষ' বা ভেদ রহিত। ভেদ তিন প্রকার: সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। বিদ্যারণ্য স্বামী তাঁর "পঞ্চদশীতে" বলছেন:

"বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্প-ফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ (২।১৫)

অর্থাৎ, এক বস্তু থেকে অপর এক সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তা হ'ল 'সজাতীয় ভেদ' যেমন, এক বৃক্ষ থেকে অপর এক বৃক্ষের ভেদ। এক বস্তু থেকে অপর এক ভিন্নজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তা হ'ল 'বিজাতীয় ভেদ'। যেমন, এক বৃক্ষ থেকে অপর এক প্রস্তরের ভেদ। একই সমগ্র বস্তু বা অংশীর অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের যে পরস্পর ভেদ, তা হ'ল 'স্বগত ভেদ'। যেমন, একই বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতির মধ্যে ভেদ।

ব্রহ্মের ক্ষেত্রে এই তিন প্রকারের ভেদের অস্তিত্ব মাত্রও নেই। তাঁর যে সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ নেই তা বলাই বাহুল্য। কারণ, অনন্ত অসীম ব্রহ্মের বাহিরে তাঁর সমজাতীয় অন্য কোনো ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা দেবতা নেই; ভিন্নজাতীয় অন্য কোনো দানব বা পিশাচও নেই। কিন্তু শঙ্করের মতে, তাঁর অন্তর্গত কোনো স্বগত ভেদও নেই। কারণ, প্রকৃতকল্পে, তিনি অনন্তপ্রসারী, অসীমব্যাপী, সমগ্র সত্তা হলেও সাধারণ অর্থে 'অংশী' নন। সাধারণতঃ যা সমগ্র সত্তা, তাই হ'ল অংশী। অর্থাৎ, বহু বিভিন্ন অংশের সমবায়ে গঠিত অংশবান অংশীই হ'ল সমগ্র সত্তা বা একটি পূর্ণ বস্তু। যেমন, মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অসংখ্য অংশের সমন্বয়ে হ'ল একটি সমগ্র, পূর্ণ বৃক্ষ। কিন্তু শঙ্করের ব্রহ্ম এক সমগ্র পরিপূর্ণ সত্তা বা বস্তু হলেও, অংশবান অংশী নন—তাঁর কোনোই অংশ নেই, তিনি কেবল এক, অভিন্ন, অখণ্ড, অবিভাজ্য, অবিচ্ছিন্ন স্বরূপ। অর্থাৎ, তিনি সাংশ সমগ্র সত্তা (Concrete unity) নন, নিরংশ সমগ্র সত্তা (Abstract unity) পৃথিবীর প্রায় সকল দ্রব্যই সাংশ বলে, ব্রহ্মের এরূপ নিরংশ একত্ব, পূর্ণত্ব

ও সমগ্রত্বের উদাহরণ দেওয়া কঠিন। তবে ন্যায়বৈশেষিকাদি মতানুসারে আকাশ, দিক্ ও কাল নিরংশ, অবিভাজ্য সমগ্র সত্তা, এবং সেই দিক্ থেকে এই সকল বস্তু নিরংশ সত্তার উদাহরণস্বরূপ বলে পরিগণিত হতে পারে। এরূপে, শঙ্করের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মের স্বগত ভেদ নয়।

শঙ্কর কি কারণে ব্রহ্মকে এইভাবে নিরংশ সমগ্র সত্তা বলে গ্রহণ করেছেন, তা উপরেই বলা হয়েছে। অর্থাৎ, ব্রহ্ম যদি এক ও অদ্বিতীয়ই হন, তা হলে তাঁর ক্ষেত্রে কোনরূপ 'বিশেষ' বা 'ভেদের' প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু অন্ততঃ দুটি বিভিন্ন বস্তু না থাকলে এক থেকে অপরের ভেদ হবে কি করে? এমন কি, স্বগত ভেদও তাঁর নেই। যেহেতু এক সমগ্র অংশীর দুটি অংশ সাধারণ অর্থে ঘট ও পটের ন্যায় দুটি বিভিন্ন বস্তু না হলেও, নিশ্চয়ই দুটি বিভিন্ন অংশরূপেই পরস্পর ভিন্ন। সেজন্য, এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যে সম্পূর্ণরূপে ভেদলেশমাত্র শূন্য বা নির্বিশেষ, তা স্বীকার করে নিতে হবে, নিশ্চয়ই।

কিন্তু এইভাবে ব্রহ্মের একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বের সাহায্য ব্যতীতও তাঁর নির্বিশেষত্ব সাক্ষাৎভাবেও প্রমাণিত করা যায়। প্রথমতঃ, একটি সাংশ সমগ্র সত্তা বা অংশীর অসংখ্য অংশ যদি এইভাবে পরস্পর ভিন্ন হয়, তা হলে সেই সকল বিভিন্ন অংশ কিভাবে একত্রে, এককালে, পরস্পর বিরোধ না ঘটিয়ে অংশীর সমগ্রত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে, সেই ত হ'ল এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা। অচেতন বস্তুর ক্ষেত্রে যদিও বা তা সম্ভবপর হয়, চেতন বস্তুর ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, এরূপ চেতন বস্তুর প্রতি অংশও সমভাবে চেতনস্বরূপ বলে, অসংখ্য বিভিন্ন চেতন অংশ পরস্পর ভেদ ভুলে অংশীর অভেদত্ব সংঘটিত করবে—তা ত অচিন্তনীয়; এবং তাও যদি সম্ভব হয় তবে সে ক্ষেত্রে তাদের ভেদ ছাপিয়ে অভেদই প্রধান হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ চেতনস্বরূপ বস্তুর ক্ষেত্রে এরূপ অংশের অস্তিত্বই বা সম্ভবপর কিরূপে? জড় ও অজড় বস্তুর মধ্যে প্রধান প্রভেদই ত এই যে, জড় বস্তু সাংশ, অজড় বস্তু তা নয়। যেমন জড়দেহের অংশ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অজড় আত্মার অংশ কি চিন্তা বা কল্পনামাত্র করা যায়? তৃতীয়তঃ, ন্যায়বৈশেষিকাদি যেমন বলেছেন, নিরংশ পরমাণুই নিত্য, সাংশ পরমাণুজাত দ্রব্য নয়। কারণ, পরমাণুসমূহের সংযোগে হয় এরূপ দ্রব্যসমূহের সৃষ্টি; বিয়োগে লয়। এরূপে অংশসমূহের সংযোগে ও বিয়োগে তাদের যথাক্রমে সৃষ্টি ও ধ্বংস হয় বলে, সকল সাংশ দ্রব্য বা অংশী অনিত্য। এই সব যুক্তিবলেও বলা চলে যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম সাংশ সমগ্র সত্তা বা অংশী হতে পারেন না—তিনি নিরংশ সমগ্র সত্তাই মাত্র।

শঙ্কর মতে, ব্রহ্মের অন্যান্য লক্ষণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

শেষ লেখা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

কাজ থেকে ফেরার পথে ডাকপিয়নের সঙ্গে দেখা।—"এই যে যোগেশবাবু আপনার চিঠি আছে।" খামের চিঠি। শিরোনামার দিকে চোখ বুলিয়েই যোগেশচন্দ্র বুঝতে পারলেন—নরেশবাবু লিখেছেন। নরেশবাবু চিঠি লিখেছেন, এতদিন পরে! বড় আনন্দ হ'ল, বড় আগ্রহ হ'ল। কিন্তু চিঠিখানা বুক-পকেটে যত্ন করে রেখে দিলেন যোগেশচন্দ্র—ঠিক করলেন, একটু ধীরে সুস্থে পড়তে হবে। মাঠের ভিতর সেই বটগাছটার নীচে, যেখানে তিনি ফেরার পথে প্রতিদিন বিশ্রাম করেন—সেখানে বসে পড়বেন। তাড়াতাড়ি রেল-লাইন পেরিয়ে মাঠের মাঝখানের পথটা ধরে হেঁটে চললেন। সিকি মাইলটাক দূরে দেখা যাচ্ছে বটগাছটি। যে চট-কলে তিনি কাজ করেন - তা থেকে বাড়ী তাঁর কমপক্ষে মাইলতিনেক দূরে। বাড়ী? উদ্বাস্তুর আবার বাড়ী কি? কোনরকমে খানদুই চালাঘর খাড়া করেছেন মাত্র—বাড়ী কথাটি যোগেশচন্দ্রের মুখে আসে না—বলতে লজ্জা করে।

বটগাছটির নীচে এসে নিত্যকারের মত হাতের থলেটি একপাশে নামিয়ে রেখে কোঁচার খুঁটে কপালের ঘাম মুছলেন। এ পথটুকু আসতে রোজই তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন। তা ছাড়া বুকের দোষটা আজকাল বড্ড বেড়ে গেছে বলে খুবই কষ্ট হয়। ঘাসের উপরে বসে পড়ে কয়েক-বার জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে পকেট থেকে চিঠিখানা বের করে খুললেন তিনি। অনেক কথা লিখেছেন নরেশবাবু। বছরখানেক পরে চিঠি লিখছেন। নিজেদের পূর্ব্ব-জীবনের কথা—নিজের দেশ ছেড়ে আসার দুঃখের কথা, নিজের সংসারের অশান্তির কথা! এই সব পেরিয়ে একস্থানে এসে চুপ করে থেমে পড়লেন যোগেশচন্দ্র। কতক্ষণ চুপ করে থেকে চিঠির সেই অংশটা বার বার পড়তে লাগলেন—"মহা-কালের চক্র অনাদি কাল থেকে আবর্ত্তিত হচ্ছে—এরই আবর্ত্তনে আমরা ভেসে উঠছি আর ডুবে যাচ্ছি সব বুঝি চোখের পলকে ঘটছে। মহাকালের কোলে আমাদের স্থিতিটা কোন্ শক্তিশালী অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে পরিমাপ করলে বের করা যায় বলতে পার? দেহের নশ্বরতার কথা ভাবলে অনেক সময় মনে হয়—আমরা বুঝি অত্যন্ত ফেলনা মাল—আমাদের কথা ভাববার, একটু মনোযোগ দেবার মত সময় বা ইচ্ছে কারো নেই। নিখিল বিশ্বের এই আবর্ত্তনের মাঝে এত ক্ষুদ্র, এত তুচ্ছ আমরা! তবু আমাদের বেঁচে থাকবার কি প্রাণপাত প্রয়াস! এ সংসার থেকে চির-বিদায় নেবার পরও যাতে লোকে কিছু দিন আমাদের কথা ভাবে এ ইচ্ছা সকলেরই অল্প-বিস্তর থাকে। যোগেশ, তুমি আমার ছাত্র শিষ্যবন্ধু। তোমার উপরে প্রত্যাশা রাখতাম—তোমার খ্যাতিতে আনন্দ পেতাম—এক সময় মনে হ'ত, তুমি অনেক বড় হবে। যখন তুমি আর এ সংসারে থাকবে না, তখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত তোমার সাহিত্য-কীর্ত্তি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। যখন এক একটা লেখা তোমার কাগজে ছাপা হয়ে বেরুত, পড়ে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠত। অবশেষে এই লেখাও তুমি ছেড়ে দিলে? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা নাই—লেখা ছেড়ে দিয়ে তুমি আনন্দ পেয়েছ কি দুঃখ পেয়েছ জানি নে। কিন্তু আমি তোমার গুরু—তোমার ভক্ত—আমার দুঃখের তো সীমা নাই। মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রিকাগুলো খুঁজে খুঁজে হতাশ হই—তোমার লেখা চোখে পড়ে না।

যোগেশ, লেখা ছেড় না। আবার ধর—সংসারে দুঃখ তো থাকবেই। আর দুঃখ আছে বলে কি যা প্রেয়, যা শ্রেয়ঃ তা ছাড়তে হবে? লেখকের কাছে লেখা প্রেয় আর শ্রেয়ঃ ছাড়া কি? তোমার নূতন লেখার আশায় পথ চেয়ে রইলাম।"

চিঠিখানা হাতের মুঠোয় ধরে উদাস দৃষ্টিতে সামনের মাঠের দিকে চেয়ে ছিলেন যোগেশচন্দ্র। অনেক কথা একে একে মনে পড়তে লাগল। আজ সাতটা বছর তিনি কিছু লেখেন নি—দীর্ঘ সাত বৎসর কোন লেখা তাঁর ছাপা হয়ে বেরোয় নি। কেমন করে এ সম্ভব হ'ল? না লিখে বা লেখা সম্বন্ধে চিন্তা না করে এমনি ভাবে যে সময় কাটতে পারে—এ যে কল্পনার বাইরে ছিল। সন্ধ্যাবেলা কোন কিছুই আর তাঁকে আটকে রাখতে পারত না। সেই গৃহ-কোণ—যেখানে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য-চিন্তা করতেন—লিখতেন—সেইখানে প্রবল আকর্ষণে তাঁকে টেনে নিয়ে আসত। তাঁর প্রথম গল্প যখন চৈতালি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল—কি যে আনন্দ! ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রথম নিজের লেখা - নিজের নাম ছাপা হতে দেখবার কি সে আগ্রহ! সেই সাহিত্যসাধনা এতদিন পরে ছাড়তে হ'ল। অনেক

দিন কাজে যেতে যেতে—ফেরবার পথে কত গল্পের ছায়া মনের ভেতরে উঁকি মেরে যায়—যোগেশচন্দ্র মনে মনে ছবি এঁকে নেন, ঠিক করেন আজই লেখাটায় হাত দেবেন। কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছেই সমস্ত কল্পনা একেবারে উবে যায়। প্রতিদিনের অভাব, প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁর একেবারে বিষাক্ত করে রাখে। এমনি মন নিয়ে কি কখনও লেখা যায়! বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। বেলা পড়ে আসছে, তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌঁছুতে হবে—বাজার রয়েছে থলিতে। যোগেশচন্দ্র মন্থরগতিতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন, আবার কি লেখা আরম্ভ করা যায় না? কত বড় বড় সাহিত্যিক অত্যন্ত দৈন্যের ভিতরও ত সাহিত্যসাধনা করে গেছেন। দৈন্যকে তাঁরা স্বীকার করেন নি। আর যাই হোক, দীনতার চাপে সাহিত্য সাধনা থেকে বিচ্যুত হন নি। তা হলে তাঁর সাহিত্য-প্রীতি কি সত্যিকারের প্রীতি নয়? স্থির করলেন—না, তিনি আবার লেখা আরম্ভ করবেন।

প্রতিদিনের শত অভাবে আর তিনি নিজেকে বিচলিত হতে দেবেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাক্স খুলে একখানা পুরানো লেখবার খাতা বের করে রাখলেন। দুটি মাত্র লণ্ঠন—ছেলেরা পড়াশুনা করছে। ছেলেদের পড়া হলে রাত্রে আজ একটা লেখায় হাত দেবেন। অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে লেখার কথাই ভাবছিলেন। কি লেখা যায়! অনেকগুলো গল্পের ছায়া কিছুদিন ধরে মনে উঁকি মারছিল, তারাই ভিড় করে দেখা দিতে লাগল—কিন্তু কোনটাই মনে স্থির হয়ে দানা বাঁধছিল না।

একখানা ঘরের মাঝখানে মুলী-বাঁশের বেড়া দিয়ে দুভাগ করা—তারই একটায় যোগেশচন্দ্র শুতেন—অন্যটায় তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকতেন। রাত্রে আহারাদির পর যোগেশচন্দ্র একটা লণ্ঠন নিয়ে লিখতে বসলেন। চোখ-বুঁজে ভাবছিলেন—চেয়ে দেখেন গৃহিনী সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। যোগেশচন্দ্র জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকাতেই বলে উঠলেন, "কাল রামবাবুর ছেলের মুখে ভাত, পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর মেয়েদের নেমন্তন্ন করে গেছে।" যোগেশচন্দ্র বললেন,"বেশ ত!" কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল—মনে মনে অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন।

—বেশ তো বলছ, কিন্তু তার পর? কিছু দিতে হবে না?

—দুটি টাকা দিও।

—তোমার যেমন বুদ্ধি তেমনি কথা তো বলবে। দুটি টাকা দিয়ে কেউ ছেলের মুখ দেখে? সতীশবাবু একটা সিল্কের জামা, থালাবাটি এনেছেন। যতীনবাবুরাও নানান্ জিনিষ এনেছেন—আর আমি যাব দুটো টাকা হাতে করে। তোমার দেশের লোক—এত ভাব, তুমি বল কোন্ মুখে? আমি যেতে পারব না বলে দিচ্ছি।

যোগেশচন্দ্র জ্বলে উঠলেন—না পার যেও না—এখন বিরক্ত করো না বলছি।

স্ত্রী চলে গেলেন। যোগেশচন্দ্র ঠক্ করে হ্যারিকেনটি মেঝেয় নামিয়ে রেখে শুয়ে পড়লেন—এমনি মন নিয়ে কি আর লেখা হয়! ওপাশে ঘণ্টাখানেক ধরে তাঁর স্ত্রী গজ গজ করতে লাগলেন।

সারাটা রাত্রি যোগেশচন্দ্র ভাল করে ঘুমুতে পারলেন না।...কত কথা মনে পড়তে লাগল। সেই প্রথম জীবনের কথা—বিয়ে করবেন কি করবেন না—এই নিয়ে কি যে মানসিক দ্বন্দ্ব! অবশেষে হেরে গেলেন তিনি। বিয়ে হ'ল। কিন্তু তখনও কত রঙীন কল্পনা। সবিতা ভাল ঘরের মেয়ে, মার্জ্জিত রুচির মেয়ে। সাহিত্যিক স্বামী তাঁর গর্ব্বের বস্তু ছিল। যোগেশচন্দ্রের কত লেখা তিনি পরম আগ্রহভরে বার বার করে পড়েছেন। যোগেশচন্দ্রের লেখার কোন ব্যাঘাত না হয়, সেদিকে ছিল তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। সেদিন দুটি নেশায় যোগেশচন্দ্র সর্ব্বদা আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন—সাহিত্য-সাধনা আর স্বদেশীপ্রচার। সেদিনকার কংগ্রেসের কাজ তাঁর কাছে ধর্ম্মকর্ম্মের সামিল ছিল। গান্ধীজীর আহ্বান নদীর কাছে সমুদ্রের আহ্বানের মত কানে এসে পৌঁছত। গ্রামে গ্রামে প্রচারে বেরুতেন তাঁরা। সঙ্গের থলিতে লুকোনো থাকত গল্প উপন্যাস লেখবার খাতা। ঘাটে-মাঠে-পথে নিরিবিলি হলেই বসে যেতেন লিখতে। সেবার জেলে বসে, জেলের পঞ্চাশ জনের ওয়ার্ডে বাস করে, বড় একখানা উপন্যাস লিখে ফেললেন যোগেশচন্দ্র। এমনিই হয়—মনে শান্তি থাকলে একহাট লোকের গণ্ডগোলের ভেতরে বসেও লেখা যায়। কিন্তু আজকের মন নিয়ে? কি কুক্ষণেই দেশ ভাগ হয়ে গেল। বিদেশ-বিভূঁইয়ে পরিবার প্রতিপালন যে কি কঠিন সমস্যা—তা আজ হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। এত প্রিয় সাহিত্যসাধনা শেষ হয়ে গেল! স্থির করলেন—নাঃ, বৃথা চেষ্টা, আর লিখবেন না। সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু সাত বৎসর আগেই হয়ে গিয়েছে। যোগেশচন্দ্রের বুকের পাঁজরাগুলো মুচড়ে ভেঙে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

২

পরের দিন যথারীতি ছয়টার সময় চাটি নাকে-মুখে

গুঁজে কাজে চললেন যোগেশচন্দ্র। নরেশবাবুর চিঠি, গল্পের প্লট, গত রাত্রের ঘটনা কিছুই আর মনে রাখবার অবসর রইল না। ছুটতে ছুটতে তিন মাইল গিয়ে সাতটায় হাজিরা দিতে হবে। দিনের শেষে মিল থেকে বেরিয়ে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলতে লাগলেন—সারা দিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছে। রোজকার মত আজও বটগাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আরামে কয়েক মিনিট চোখ বুঁজে রইলেন। সেই যেদিন থেকে প্রথম এই পথে যাতায়াত করেন, সেই দিন থেকেই যেন পরমাত্মীয়ের মত বটগাছটিকে ভালবেসে ফেলেছেন। সারাটা দিনের পর এরই ছায়ার তলায় বসে এরই গায়ে হেলান দিয়ে বড় আনন্দ পান তিনি। চোখ মেলে মাঠের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন—দূরে মাঠের শেষে একটা গ্রামের সীমানা—সবুজ সুষমায় ভরা। দূর আকাশে কয়েকটা চিল কালো ফোঁটার মত দেখাচ্ছে। একঝাঁক বক মাঠের ভেতরে এধার-ওধার ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই দিকে চেয়ে চেয়ে যোগেশ-চন্দ্রের মন—কোন্ কল্পলোকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল। মনের কোণে ধীরে ধীরে জেগে উঠছিল কোন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভূতি—যে অনুভূতি জাগে কবির মনে—যে অনুভূতি জাগে শিল্পীর মনে। এই তো সৃষ্টির প্রেরণা! যোগেশচন্দ্র এক মুহূর্ত্তে সজাগ হয়ে উঠলেন। না—আর এসব নয়। সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র মরেছে তো। মনে পড়ে গেল—নরেশবাবুর চিঠিখানা এখনও তাঁর পকেটে রয়েছে। চিঠিখানার স্পর্শও যেন তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না—তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন বটগাছতলায়। তার পর উঠে—হন হন করে বাড়ীর দিকে ছুটে চললেন।

মাসখানেক কেটে গেল। এই এক মাসে পুরনো ক্ষত অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে। আবার রোজ ফেরবার পথে সেই বটগাছটির তলায় এসে চুপ করে বসে দূরের নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন—মাঠের শেষের সেই গ্রামের শ্যামল সুষমা আবার তাঁকে মুগ্ধ করে। মনের কোণে কত কল্পনা এলোমেলো ভাবে খেলে যায়—সৃষ্টির প্রেরণা আসে—আবার লিখতে ইচ্ছে হয়।

সেদিন রেল ষ্টেশনটির ভিতর দিয়ে যখন আসছিলেন, তখন পিছন থেকে কে ডেকে উঠল—যোগেশদা! যোগেশচন্দ্র পিছন ফিরে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, আরে নির্ম্মল যে!

—না, আমি নির্ম্মল নয়—বিমল।

—ওহো কতদিন দেখা নেই—তোমাকে নির্ম্মল ভেবে-ছিলাম—নির্ম্মল কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—এখানে কোথায়?

—এখানকার রেল-কলোনীতে আমার বোনের বাসায় দেখা করতে এসেছিলাম। কুশলপ্রশ্নের পর এক সময় বিমল বলল, তার পর আজকাল কি লিখছেন?

—লেখা? লেখা ত ছেড়ে দিয়েছি বিমল!

—ছেড়ে দিয়েছেন? তাই কোথাও আর আপনার লেখা দেখতে পাই না। বইয়ের বিজ্ঞাপনেও আপনার কোন বইয়ের নাম নেই। লেখা কেন ছাড়লেন যোগেশদা। আমাদের ক্লাবে এককালে আপনার লেখার ভক্ত ছিল অনেক। অনেককে বলতে শুনেছি—সাহিত্য-ক্ষেত্রে আপনি একটা বিশিষ্ট আসন লাভ করবেন। এত বড় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে নিজের হাতে নষ্ট করে দিচ্ছেন।

যোগেশচন্দ্র অনেকক্ষণ অভিভূতের মত চুপ করে চেয়ে রইলেন। বললেন, সেকথা তোমাকে বুঝাতে পারব না বিমল, তুমি হয়ত বুঝবে না। ইতিমধ্যে শব্দ করে গাড়ী এসে পড়ল। বিমল গাড়ীতে উঠে বসে পুনরায় জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, লেখা আপনি ছাড়বেন না দাদা, বাংলা দেশের পাঠকেরা এখনও আপনাকে ভোলে নি। ট্রেন বেরিয়ে গেল। যোগেশচন্দ্র আবার ধীরে ধীরে এসে সেই বটগাছতলায় বসলেন। মনের ভিতরে এক অদ্ভুত বেদনা ও আনন্দের ঢেউ বইতে লাগল। বাংলা দেশের পাঠকেরা তাঁকে ভোলে নি—নতুন করে আজ আবার আশার বাণী শুনিয়ে গেল বিমল। ভাল লাগল তাঁর। কিন্তু লিখবেন কেমন করে—সে কবি মন ত তাঁর আর নেই—আগের মত রসসৃষ্টি কি আর সম্ভব হবে? বাড়ীর কথা মনে হলেই তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হয়—সেখানে বসে লেখা অসম্ভব। লিখবেন কি লিখবেন না, এই দ্বন্দ্ব অনেকক্ষণ ধরে তাঁর মনের ভিতরে চলতে লাগল। অবশেষে স্থির করলেন—আর একটি লেখা তিনি লিখে যাবেন—সেইটি হবে তাঁর শেষ লেখা। নিজের সাহিত্য-জীবনের কথা—ব্যর্থতার কথা, ছিন্নমূল মানুষের জীবনের দুঃখের কথা, এই হবে তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। কিন্তু লিখবেন কোথায়? স্থির করলেন প্রতিদিন শেষবেলায় ফেরবার পথে অন্ততঃ ঘণ্টাখানেক এই বটগাছতলায় বসে লিখে যাবেন। নতুন উৎসাহ আর মন নিয়ে যোগেশচন্দ্র বাড়ীর দিকে পা বাড়ালেন।

লেখা আরম্ভ হ'ল। নিজের জীবনের ঘটনার উপরে রঙ চড়িয়ে গল্পাংশ মনে মনে তৈরি করে নিলেন।—বার তের বৎসরের একটি কিশোর বালক—তার সামনে সোনাপুর পাবলিক লাইব্রেরীর হাজার দুই গল্প, উপন্যাস, জীবন-চরিত,

ধর্ম্মগ্রন্থ প্রভৃতি নানা প্রকারের বই। লোভী বালকের মতই কিশোরটি গোগ্রাসে গিলতে লাগল সব। খাদ্যাখাদ্য কিছুই বিচার করবার বুদ্ধি সেদিন ছিল না। বছর তিন-চারেকের ভিতর সবগুলি গলাধঃকরণ করে কিশোরটি যৌবনের কোঠায় এসে পৌঁছল। রাজস্থানের রাণা প্রতাপ আর সাহিত্য-পত্রিকার বিদ্যাসাগর-চরিত মনের অর্দ্ধেকখানি জুড়ে বসল। বাকী অর্দ্ধেক অধিকার করল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আর রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এক সঙ্গে দুটি সাধনার ধারা বয়ে চলল মনের গহনে স্বদেশ-সেবী যোগেশচন্দ্র আর সাহিত্যসেবী যোগেশচন্দ্র। চোখ তখন ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন। কাব্যলক্ষ্মীর দরবারে গিয়ে পৌঁছাক আর নাই পৌঁছাক খেয়াল না করে—একমনে কবিতা লিখে চলছেন। ইতিমধ্যে এল ত্রিশ সালের জাতীয় আন্দোলন—ঝাঁপিয়ে পড়লেন যোগেশচন্দ্র। বছর-খানেক কাটল কারাগারে। জেল থেকে বেরিয়ে অল্পমাত্র ব্যবধানে আবার জেলে গিয়ে ঢুকতে হ'ল। এবার বছর দেড়েক পরে ফিরে এসে গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। বছর দুই এমনি চলল। তার পর একদিন স্বীকৃতি এল বাংলা দেশের অভিজাত পত্রিকা চৈতালির তরফ থেকে। চৈতালি পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে নিজের লেখা—এ যেন যোগেশচন্দ্র নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তার পর একদিন দুরু দুরু বুক নিয়ে পত্রিকার আপিসে গিয়ে হাজির হলেন। সম্পাদকীয় বিভাগের প্রবীণ বাঁড়ুজ্যে মশায় কাছে ডেকে বসালেন—খুব প্রশংসা করলেন লেখার—বাড়ী থেকে আনা নিজের খাবার ভাগ করে খেতে দিলেন।

সারা বেলা নিজের কাছে বসিয়ে রেখে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক মোহন মজুমদারের কাছে। সেই থেকেই মোহন মজুমদারের সঙ্গে তাঁর আলাপ। মোহনবাবু কত লেখা তাঁর সংশোধন করে দিয়েছেন—কত লেখা নানা পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। এমনি করে নিজের জীবনের কথা লিখে চললেন যোগেশচন্দ্র।

আবার লিখে চলেছেন—নিজেদের মহকুমা শহরটির কথা—এইটি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র। স্বদেশী আর সাহিত্যসেবা এখানে বসেই চলে। মনে পড়ে সেদিনের নরেশবাবুকে—যিনি তাঁর প্রত্যেকটি লেখা কি আগ্রহের সঙ্গে পড়তেন! কথায় কথায় নরেশবাবু একদিন তাঁকে বলেছিলেন—যোগেশ, আমি তোমার লেখার একজন বড় ভক্ত। যে নরেশবাবুর কাছে একদিন তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ নিয়েছেন, পরবর্ত্তী জীবনে রাজনীতির পাঠ নিয়েছেন—তাঁর এই কথায় বড় সঙ্কোচ বোধ করেছিলেন—বড় আনন্দ পেয়েছিলেন যোগেশচন্দ্র। মনে পড়ে তারাপদবাবুকে—অত্যন্ত সাহিত্য-বোদ্ধা ছিলেন তিনি। তাঁর কত লেখা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন, কত লেখার প্রেরণা জুগিয়েছেন। এমনি করে ফেলে আসা দিনগুলির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে চললেন। তার পর এল ছিন্নমূল-জীবন। নিজের সবকিছু ছেড়ে এসে অভাবের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। জীবনের সমস্ত রস শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেল। সাহিত্য-জীবনের হ'ল সমাধি। এই মর্ম্মান্তিক পরিচ্ছেদ লিখে গল্প শেষ করলেন যোগেশচন্দ্র। গল্পটির নাম দিলেন "শেষ লেখা।"

সাত বছর পরে এই লেখা! লেখাটি রসোত্তীর্ণ হ'ল ত? দুই দিন ধরে কয়েকবার করে লেখাটি পড়ে দেখলেন, অনেক জায়গায় কাটাকুটি করলেন। সেই প্রথম জীবনের লেখা নিয়ে যে সংশয় ও সঙ্কোচ মনের ভিতর জাগত—তেমনি করেই আজ আবার তা দেখা দিতে লাগল।

অবশেষে ঠিক করলেন—এই রবিবারে লেখাটি মোহন বাবুকে শুনিয়ে তাঁর মতামত জেনে আসবেন।

রবিবার সকালের দিকে মোহনবাবু নিজের পড়ার ঘরে বসেছিলেন। যোগেশচন্দ্র ঢুকতে অভ্যর্থনা করে বসালেন—কুশলপ্রশ্ন করলেন। চুপ করে যোগেশচন্দ্রের লেখা শুনতে লাগলেন মোহনবাবু। শেষ হলে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—এ লেখা তো রসোত্তীর্ণ হয় নি যোগেশবাবু। আপনার লেখার সে সুর—ভাষার সে গতি এতে নেই। এ লেখা পাঠকেরা গ্রহণ করবে না।

কোন রকমে নমস্কার সেরে—দোতলার সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলেন যোগেশচন্দ্র। শিয়ালদহ এসে গাড়ীতে চাপলেন। গাড়ী ছুটে চলছিল—দূর আকাশের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন তিনি। বুকের ভিতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। মোহনবাবু ত কারও তোয়াক্কা করে কথা বলেন না—রূঢ় স্পষ্টভাষী তিনি; চিরকাল মন্দকে মন্দ বলতে, ভালকে ভাল বলতে তাঁর এতটুকু বাধে না। সাহিত্য-সমালোচনার ব্যাপারে কেউ তাঁর আপনপর নাই। সেবার তাঁর "যাত্রা হ'ল সুরু" সেই যে উপন্যাসখানার পাণ্ডুলিপি তাঁকে পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন—শুনে কি সুখ্যাতিই না করেছিলেন মোহনবাবু। শুধু সুখ্যাতি নয়—সত্যকার আনন্দ ফুটে উঠেছিল তাঁর চোখেমুখে। সুতরাং মোহনবাবুর রায়ই আজও শিরোধার্য্য করে নিতে হবে—লেখা তাঁর ভাল হয় নি। লেখক-যোগেশচন্দ্রের সত্যিই মৃত্যু হয়েছে। বারে বারে মনে হতে লাগল—এ বিশ্ব-সংসারে আর বুঝি তার কিছুমাত্র প্রার্থনীয় নেই—কিছুই প্রয়োজনীয় নেই।

নিজেদের ষ্টেশনে নেমে—মাঠের ভিতরের সেই পথ দিয়ে হেঁটে চললেন যোগেশচন্দ্র।

ভাবছিলেন—তাঁর লেখক-সত্তার যখন মৃত্যু হয়েছে, তখন লেখক-সুলভ অভিমানটিকে, অহঙ্কারটিকেও ত পরিত্যাগ করতেই হবে। নইলে এত বড় ট্র্যাজেডি নিয়ে নিয়ে তিনি বাঁচবেন কি করে? আজ কলের শ্রমিকদের সঙ্গে, ঐ যে রেল লাইনে কাজ করছে যে কুলিরা, তাদের সঙ্গে আর দশ জনের সঙ্গে এক আসনে তাঁকে নেমে আসতে হবে। বৃথা অভিমান আর আভিজাত্য মনের কোণে পুষে রাখলে ত চলবে না।

চলতে চলতে বটগাছটার কাছে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। একি সমস্ত প্রান্তর যে খাঁ খাঁ করছে—একদম ফাঁকা। তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। করাত চালিয়ে কারা বটগাছটির গোড়া কেটে একেবারে ধরাশায়ী করে রেখে গেছে। সমস্ত শাখা-প্রশাখার উপরে ভর করে বিরাট কাণ্ডটি মাটির উপরে উঁচু হয়ে আছে—মনে হ'ল, পিতামহ ভীষ্মদেব যেন শরশয্যায় পড়ে আছেন। গুঁড়িটা হতে লাল লাল রক্তের মত রস ঝরে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা করে। যোগেশচন্দ্রের মন হায় হায় করে উঠল। কাণ্ডটিকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন তিনি—ঝরঝর করে দুই চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল তাঁর। ভাবতে লাগলেন—তাঁর শেষ শান্তির নীড়—শেষ আশ্রয়স্থলটুকুও আজ ধ্বংস হয়ে গেল! পকেট থেকে "শেষ লেখা"টি বের করে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিলেন ঘাসের উপরে। এ ত তাঁর শেষ লেখা নয়—তাঁর শেষ লেখা, শেষ হয়েছে কোন্ অতীতে—আজ আর তা মনে নেই। বটগাছের কাণ্ডটির উপরে অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে চুপ করে পড়ে থেকে ধীরে ধীরে উঠে আবার বাড়ীর দিকে হেঁটে চললেন।

সফল তপস্যা

(কুমারসম্ভব)

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গৌরীশৃঙ্গ নির্জন অতি,
ঋজু তরুশাখে জমে তুষার,
সন্ধ্যা উষায় কনকোজ্জ্বল
মণিময় রূপ গিরিভূষার।
গিরিরাজ-সুতা উমা বসে হেথা কঠোর তপে,
মুদিত নেত্রে মহেশের নাম শুধুই জপে,
কোথা বাঞ্ছিত শিব-জলধর,
—আনিবে তৃপ্তি মরু-তৃষার।

গিরি-আশ্রম-তরুমূলে বারি
করি' সিঞ্চন সন্ধ্যাপ্রাতে
মৃগশিশুগুলি ক্রোড়ে লয়ে তুলি'
খাওয়ায় সে তৃণ আপন হাতে,
যবে স্নানান্তে ত্রিপুবারি কথা গাহে সে গানে,
ভক্তি-প্রণত তাপসেরা চায় তাহার পানে,
কাল কেটে যায়, তবুও কোথায়
সিদ্ধি এ ঘোর তপস্যাতে?

ত্যজি মহার্ঘ বসনভূষণ
শুধু বল্কলে আবরে কায়,
সুর-বাঞ্ছিত চারু কুন্তল
এবে পরিণত পীত জটায়।
কুসুম-কোমল তনু যে লুটায় ক্লান্তিভরে,
শিলাবন্ধুর রুক্ষ কঠিন পথের 'পরে,
তবু বিশীর্ণ অধরপ্রান্তে
মহেশের নাম ফিরিছে হায়!

অতি দুষ্কর সুকঠোর তপ
উমা এইবার ধরিল শেষে,
দুঃসহ ঘোর রুদ্র নিদাঘে
সাজে সে উগ্র তাপসীবেশে।
জলদঙ্গার চারিপাশে তার সাজায়ে রাখে,
অপলকচোখে সূর্য্যের পানে চাহিয়া থাকে,
স্বেদধারা তার ঝরি অনিবার
রুক্ষ কঠিন মাটিতে মেশে।

বজ্র-নিনাদ কাঁপায় শৃঙ্গ
চমকে বিজলী জলদ-পাশে,
গিরিপঞ্জরে অবিরল ধারা
বরষি' যখন প্রাবৃট আসে,
নিশিদিন সহি' বারিবর্ষণ মাথার 'পরে,
সিক্তবসনা উমা জপে শুধু দিগম্বরে,
বরষার শতধারা-নিপীড়নে
যোগাসন হতে সরে না ত্রাসে।

নিদারুণ শীতে যবে গিরিশির
ধরে নবরূপ শুভ্র অতি,
হিমবাহবুকে জমাট তুষারে
রুদ্ধ যে হয় নদীর গতি,
সে তুষার-নদী-বক্ষে ডুবায়ে শরীর তার,
তাপসী উমা যে মহেশের ধ্যানে নির্বিকার!
সিদ্ধি কোথায়? তবু সাধনায়
রহে নিশিদিন নিষ্ঠাবতী।

ত্যজিয়া আহার পান করে শুধু
চন্দ্রকিরণ, আকাশবারি,—
ক্ষণেকের ছায়া দেয় শিরে তার
কভু বিহঙ্গ গগনচারী,
হেরিয়া উমার সুকঠোর তপ ঋষিরা বলে—
হেন তপস্যা দেখে নাই কেহ ভূমণ্ডলে,
গাছের পাতাও খায় নাক, তাই
অপর্ণা নাম দিল যে তারি।

গিরিতপোবনে যোগরতা উমা
একদা মেলিয়া শান্ত আঁখি
হেরে রূপবান্ তরুণ তাপস
চাহে তার পানে অদূরে থাকি'।
শিরে জটাভার, মৃগাজিন তার কটিতে দোলে,
ব্রহ্মচারীর সে রূপে বিশ্বভুবন ভোলে,
সচকিতা উমা প্রণাম জানাল
শির তার ধীরে ভূমিতে রাখি'।

কহিল তাপস: "ক্ষমিও আমায়
দিনু তপস্যা ভঙ্গ করি',
কে-বা সে দেবতা যার লাগি' তুমি
এ সাধনা-পথ চলেছ ধরি'?
তোমার অমল আননকমল কালিমা-ম্লান,
আজিও দেবতা আসে নি করিতে সিদ্ধিদান,
ব্যর্থ করিবে যৌবন, যাহা
দিয়াছেন বিধি অঙ্গ ভরি'?

আভরণহীনা, সাজায়েছ তুমি
শুধু বল্কলে তরুণ দেহ,
কোন্ তপস্যা পূর্ণ করিতে
ছাড়িয়া এসেছ পিতৃগেহ?
বসন্তনিশা সাজে যবে রাকাচন্দ্রকরে,
সে বেশ কি তার শুধু অনাগত তপন তরে?
রূপযৌবনবঞ্চিতা হলে
বরিবে না আর তোমারে কেহ।

বল কল্যাণি, কে সে গুণবান্,
এ তপ যাহার মিলন মাগি'?
ত্রিলোকবন্দ্যা রূপবতী তুমি,
কেন বা ব্যাকুলা দয়িত লাগি?
এ ধরণীতলে সকলে রত্ন খুঁজিয়া মরে,
রত্ন কোথায় নিজেরে বিলাতে যত্ন করে'?
কে সে নিষ্ঠুর, যার প্রতি তুমি
হয়েছ এমন প্রেমানুরাগী?

শুন পার্ব্বতি, ব্রহ্মচর্য্য
করিয়াছি আমি আযৌবন,
লভেছি শক্তি, বাঞ্ছা তোমার
যাতে হতে পারে পরিপূরণ।
মনের কথাটি শুধু বল আজ আমার কাছে,
দেখি খুঁজে আমি বাঞ্ছিত তব কোথায় আছে,
কৃচ্ছ্র-সাধনে বৃথা কাল হর,
কর তপস্যা সম্বরণ।"

বলে উমা ধীরে সলজ্জ বাণী—
"মহাদেব হন আমার স্বামী,
তাঁহারি পরম চরণ-ধেয়ানে
প্রাণটুকু ধরি' রয়েছি আমি।
মহেশ্বরের যদি পাই দেখা এ ভবে মোর,
কণ্ঠে তাঁহার পরাব যতনে বাহুর ডোর,
নয়নের জলে দেববাঞ্ছিত
ধোয়াব চরণ দিবসযামী।"

একথা উমার শুনিয়া তখন
কহেন হাসিয়া ব্রহ্মচারী—
"আর কোন স্বামী পেলে না খুঁজিয়া,
শেষে বেছে নিলে ভস্মধারী?
শ্মশানে বসতি, দিবানিশি শুধু চড়ে সে বৃষে,
নরকপালের হার পরে, মজে ধুতুরাবিষে,
বাঘের চর্ম্ম কটিবাস তার,
কখন বা থোরে বসন ছাড়ি'।"

ব্রহ্মচারীর কথা শুনি উমা
ক্রোধবশে কহে তীব্র স্বরে—
"নিখিল বিশ্ব বসন যে তাঁর,
তাই যে সাজেন দিগম্বরে।
ভেদাভেদ নাই, শ্মশানে যে তাই বসতি তাঁর,
এ বৈরাগ্য-পরম-তীর্থ কোথায় আর?
নিষ্কাম তিনি বিভূতিভূষণ,
তাই যে ভস্মে অঙ্গ ভরে।

বৃষারোহী তিনি, দর্শনে তাঁর
ইন্দ্রও ছাড়ি ঐরাবতে
নত করে শির পথের ধুলায়,
পূজা করে তাঁরে বিধানমতে।
সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা যাঁহারে জনক বলে,
কে যে তাঁর পিতা কে-বা জানে তাহা ভূমণ্ডলে?
গুণাতীত তিনি বিশ্ব-প্রতীক্,
শিব তিনি চির-সৃষ্টি পথে।"

রোষকম্পিতা শঙ্কিতা উমা
চলিতে চরণ বাড়ালো তাঁর,
শিবনিন্দায় অধীর-চিত্তা,
রহিতে চাহে না সেখানে আর।
বুকের বসন কবে অলক্ষ্যে গিয়াছে সরি'
অসহ ব্যথায় অশ্রু মুকুতা পাড়ছে ঝরি',
বহে দ্রুতশ্বাস, অগ্নিদৃষ্টি
হানে তার প্রতি বারংবার।

সহসা কাহার বাহুবন্ধনে
সচকিতা উমা দেখে যে ফিরে,
ব্রহ্মচারীর রূপধারী সেই
প্রাণের মহেশ দেবতাটিরে!
দেবতা কি এল বর দিতে তার তপস্যায়,
প্রেমের স্বপ্নে বক্ষে কি তারে জড়াতে চায়?
যেতে নাহি পারে, রহিতে না পারে,
সংজ্ঞা যেন সে হারায় ধীরে।

অসমাপ্ত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার রায়

"বহুদিন হতেই ওদের সংসারে একটানা অভাব চলছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই অতিপুরাতন ও নিত্যনূতন অভাবটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যাকে সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অভাবের আঁচলখানা দিয়ে অত বড় সংসারের একটা কোণও ঢাকা পড়ে না, বরং নিরন্তর টানাটানির ফলে নগ্নতা আরও প্রকট হয়ে পড়ে এবং সেই নিষ্ফল পরিশ্রমে হতাশার ভাবটা অভাবের সঙ্গেই বেড়ে চলে। বাড়ীর যিনি কর্তা তিনি বোঝেন একথা সবচেয়ে গভীর ভাবে, কিন্তু এ রকম পরিপূর্ণ উপলব্ধি অন্য সকলের আছে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। গিন্নী অবশ্য বিশদভাবে সবটাই বোঝেন যখন তেল আনতে নুন ফুরায়, যখন মশলা হিসেবে তেলহলুদ দূরে থাক নুনটাই বাড়াবাড়ি মনে হয় এবং যখন একে একে তরকারি ডাল মশলা সমস্ত বাদ দিয়েও দু'মুঠো চালের সংস্থান থাকে না। গিন্নীর এই হাড়ে-হাড়ে বোঝার ঠোকাঠুকিটা কিন্তু সশব্দে গিয়ে ফেটে পড়ে কর্তার মাথার উপরেই এবং দুর্গত সংসারের এই হাতা-বেড়ি-খুন্তি-শোভিতা উগ্রচণ্ডার সম্মুখে সেই সশব্দ বিদ্রোহের পদক্ষেপকে শিবতুল্য ভালমানুষ কর্তা মাথা পেতে স্বীকার করে নেন। কর্তা এতে অবশ্য বিশেষ ঘাবড়ে যান না, কারণ তিনি দেখেছেন অবস্থা একটু ভালোর দিকে ঘুরলে ওই উগ্রচণ্ডাই আবার হাতা-বেড়ি কুড়িয়ে, উনুন ধরিয়ে ছেলেপুলে সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই এদিক দিয়ে গিন্নীর সঙ্গে বোঝাপড়ায় কর্তার বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। এমনি করে তাঁদের সব রকমে অচল সংসারটা কোন্ একটা অনির্দেশ্য দিকে এগিয়েও ত চলেছে। গোলমাল হ'ল সংসারের অন্যান্য প্রাণীদের—কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী—এদের নিয়ে। অবুঝ শিশুরা সংসারে কোন বোধশক্তি নিয়েই আসে না শুধু এইটি ছাড়া যে, যেমন করেই হোক তাদের অভাব-অভিযোগ মিটিয়ে দেওয়া হবে—কে মেটাবে বা কেমন করে মিটবে তাতে তাদের প্রয়োজন নেই। শারীরিক শক্তি তাদের অত্যন্ত কম, ওটিকয় চড়চাপড়ে অত বড় বাহিনীটিকে কর্তা একাই অনায়াসে ঢিট করতে পারেন, কিন্তু তাদের বোঝাবে কে! তারা জানে তাদের বাবা চাকরি করছে, কিন্তু জানে না বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে চাকরিটির মূল্য কতটুকু। আজ খাতা নাই, কাল পেন্সিল নাই—অথচ লেখাপড়া না শিখলে ওদেরই বা কি উপায়। কিন্তু বইখাতা কিনতে গিয়ে হয়ত মনে পড়ে চালডাল শীগগিরই লাগবে এবং তার প্রয়োজনটা সকলের আগে। ছেলেমেয়েগুলো হয়ত ভাবে, ডালভাত ত আছেই তবে জামাজুতোও চাই বৈ কি। ওদিকে গিন্নী ভাবেন, লেখাপড়া সে ত ভাল জিনিষ, কিন্তু প্রাণে বেঁচে থাকলে তবেই ত। সুতরাং ভাণ্ডারের দাবিই অগ্রগণ্য, সেখানে গোলমাল হলে গিন্নী অনুযোগ করেন—তা হলে সবাই না খেয়ে মরি এই কি তোমার ইচ্ছে?

কর্তার হয়ত তাই ইচ্ছে। কিন্তু মুখে বলেন—ছেলেগুলো উঁচু ক্লাসে উঠছে, ওদের খরচটাও বাড়ছে, একটু বুঝে সুঝে না করলে চলে কেমন করে?

গিন্নী উত্তরে বলেন—উঁচু ক্লাসে উঠছে বলে খরচ বাড়ে আর সেই সঙ্গে বয়স বাড়লে ভাঁড়ারের খরচ বুঝি কমে যায়?

কথাটা বলে ফেলেই গিন্নী কেমন যেন বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি তাড়াতাড়ি কার উদ্দেশ্যে একটা ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে কতকটা কৈফিয়তের সুরে বলেন—দেখ, সব সময় চোখে আঙুল দিয়ে সব কথা মনে করিয়ে দিও না, ওতে ভাল হয় না।

কর্তা আর কিছু বলেন না, শুধু ভাবেন—হায় রে! কে কার চোখে আঙুল দিয়ে যে দেখায়!"

এই পর্যন্ত লিখেই শিবপ্রসাদ বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেন, এতক্ষণে তিনি যেন বাস্তব অভিজ্ঞতার কথাগুলো ঠিকই ধরে ফেলেছেন। সম্পাদক এবার না নিয়ে যান কোথায়!

শিবপ্রসাদ জন্ম-সাহিত্যিক। ছেলেবেলা হতেই সরস্বতী তাঁর উপরে ভর করেছিলেন, ফলে তাঁর কাব্যময় চোখে পড়া-শোনা, পরীক্ষা পাশ-ফেল সমস্ত একাকার হয়ে তাকে আকাশবিহারী করে তুলল! কিন্তু তিনি শূন্যে উড়তে চাইলেও সংসারের নাগপাশ তাঁকে ছাড়বে কেন—তাই সেই যে আরম্ভ হ'ল টানাটানি, ছেঁড়াছিঁড়ি, ফাঁকি ও ফাঁকের ইতিহাস তা আজও সমানে চলেছে। আর সাহিত্যের হাতিয়ারটা উপার্জনের বাজারে এতই ভোঁতা যে, ও দিয়ে

জীবনধারণের সর্বনিম্ন উপকরণগুলোও সংগ্রহ করা যায় না। তার উপর আছে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন।

তাই যখন সরস্বতীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ তাঁর কবিতার দাম বাজারে কাণাকড়িও স্বীকৃত হ'ল না তখন অন্যান্য অনেক আদর্শের মত তাঁকে এটাও ছাড়তে হয়েছিল। সম্পাদক তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন গল্প লিখতে, যা লোকে পড়বে। 'ডিমাণ্ড' অর্থাৎ চাহিদা যেখানে নেই সেখানে সেই বস্তুর যোগান দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজও নয়, লাভের ব্যবসাও নয়। প্রথমটা শিবপ্রসাদ একটু চমকে উঠেছিলেন, কারণ এ যে সরস্বতীর রাজহংসটিকে লাভ-লোকসান চাহিদা-যোগান দেওয়ার অর্থনৈতিক বাটখারার ঘায়ে মেরে ফেলে সোজা রান্নাঘরে চালান করে দেওয়া। অবশেষে তাই হ'ল, শিবপ্রসাদ গল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন। প্রথম প্রথম লিখতেন একেবারে কবিতার ভাষায়। অর্থাৎ, শুধু কবিতার ছন্দশৃঙ্খলটা খুলে নিয়ে কাগজের পাতায় তাকে এলোমেলো ভাবে ছেড়ে দেওয়া। অর্থনৈতিক বাটখারা আবার আঘাত হানল—হিতৈষী পরামর্শ দিলেন জীবনটা পদ্য নয়, ওটা একেবারেই নীরস গদ্য। সুতরাং যা হয় তাই লেখ, কল্পিত নয়কে হয় বলে চালাতে যেও না, ও অচল মেকিতে কারও কোন লাভ হবে না।

আজকাল তাই তাঁর মনের কোণে কোণে শুধু একটি কথাই ঘুরে বেড়াচ্ছে—যা হয় তাই লেখ। সরস্বতী কবিতার মন্ত্র কানে দিয়ে কোন্ রঙিন ভাবলোকে তাঁকে নিয়ে যেতেন, সেদিন তাঁর ফুরিয়ে গেছে। এখন কানে মন্ত্র দিতে সরস্বতী আসেন না, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য আসে সংসার-রাক্ষসটা, সেও মুখ হাঁ করে বলতে চায়—যা হয় তাই লেখ। এত দিনে বহুরকম বা খেয়ে শিবপ্রসাদের দৃষ্টি যেন এবার সত্যিই খুলে যাচ্ছে, যা হয় সেটা যেন এবার তিনি সত্যই দেখতে পাচ্ছেন। নুন আনতে তেল ফুরোচ্ছে, সবশেষে তেলটা একদিন বাহুল্যবোধে আর আসছেই না, চালের খরচ যোগাতেই প্রাণান্ত তাই ডালের কথা খুব কম দিনই মনে থাকে। বছরে কয়েক বারই ইস্কুলের খাতায় ছেলেদের নাম কাটা যায়, তাদের ছেঁড়া জামাগুলো ছুঁচসুতোর তীক্ষ্ণ শাসন অমান্য করে সমস্ত চক্ষুলজ্জা পার হয়েও দেহের লজ্জা আর রক্ষা করতে পারে না, ছিঁড়ে পড়ে। ছেলেরা বড় হচ্ছে, ভাঁড়ারের খরচ বাড়ছে, মেয়েরা বড় হচ্ছে—তাদের লজ্জা বাড়ছে এবং সব মিলিয়ে এই অভাবগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্র শিবপ্রসাদের নিরুপায়তার লজ্জাটাই বা কি কম! এই ত হয়, এর বেশী আর কি হতে পারে। হিতৈষীর কথা স্মরণ করে শিবপ্রসাদ আবার কলমটা ঠিক করে ধরে বসলেন।

"সকালে উঠে কর্তা একবার চায়ের চেষ্টায় বসেছিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল, কারণ নিতান্ত ঘুমের ঝোঁকে না ভুলে বসলে এটা তাঁর খুব মনে থাকা উচিত ছিল যে, ও পাট বেশ কয়েক দিন হ'ল উঠে গেছে। এখন চা হয় কদাচিৎ, বিশেষ কোন প্রয়োজনে। কর্তার আজ কি জানি কেন, মুখ ও মন দুই-ই বড় বিস্বাদ ঠেকছিল, সুতরাং মনে হ'ল—যাক্ গে, চারটে পয়সা খরচ করে বাইরে থেকে খেয়েই আসি। তিনি সকালে অন্য কিছু খান না, কারণ গিন্নী প্রাতরাশ বলে যে জিনিসটি ছেলেমহলে বিনা দ্বিধায় বিতরণ করেন সেটাকে খাদ্য বলা হলেও খাওয়া ঠিক যায় না। তার নাম হ'ল পান্তা। অন্যান্য যে-কোন প্রাতরাশের চাইতে খরচ কম, কিন্তু সকালে উঠে গরম চায়ের মুখচুম্বনের পরিবর্তে যদি পান্তার মুখচর্বণ করতে হয় তবে তার চাইতে ভাল ও দুটোরই কাছ হতে দূরে থাকা। তাই কর্তার সকালের উপবাসটা অভগ্ন অবস্থায়ই থাকে, কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে আসে না। শুধু মাঝে মাঝে এসে পড়ে চায়ের নেশাটা, কারণ ওর মত নিয়মিত জিনিষ কর্তার জীবনে খুব কমই ছিল। সেটাকেই কিনা বলা হ'ল আর প্রয়োজন নেই! সদ্যজাগ্রত চা-লুব্ধ কর্তার মনে এইখানে সত্যিই একটা অভিমান জেগে ওঠে। কে যেন তাঁর হাত হতে সংসারের সবকিছু একে একে হরণ করে নিচ্ছে এবং তাঁর সেই নিঃসহায় অবস্থায় তাঁকে সংসারের হাসি-খুশি আমোদ-প্রমোদ প্রয়োজনের সমস্ত সীমানা ডিঙিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে কোন্ সৃষ্টিছাড়া শ্মশানঘাটে যেখানে শুধু রয়েছে অভাব-অনটনের ভূতপ্রেতগুলো। সেই ভূতনাথ আজ সত্যিই ভুল করেছেন, চারুপী অমৃতের অধিকার দেবতারা আগেই নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছেন একেবারে তাঁরই চোখের সামনে। যেদিকে দু'চোখ যায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন সেই অমৃতের ছড়াছড়ি এবং সবাই ভাগ্যবান শুধু তিনি ছাড়া।"

শিবপ্রসাদ কলমটা থামিয়ে কিছুক্ষণ ভাবতে থাকেন। আজ সকালে উঠে চায়ের চেষ্টা তিনিও করেছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ওই একই কারণে।

"হয়ত ঠিক এমনি একদিনকার অবস্থায় পড়ে ভোলানাথ গৃহিণী পার্বতীকে ডেকে তাঁর ত্রিশূলটা দিতে বলেছিলেন এবং হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন—দেখি আমার প্রাপ্য অংশটা নিয়ে আসতে পারি কিনা। সব জিনিস যে-যার মনের মত লুটেপুটে ভাগ করে নিয়েছে—তাতে কি, আবার নতুন করে সব ভাগ করতে হবে,নইলে অমৃতের অধিকার কি শুধু চুরির

মধ্যেই মারা যাবে ? কর্তা ঠিক অনুরূপ অবস্থায় পড়েও কিন্তু দৈব ত্রিশূলের অভাবে হুঙ্কার ইত্যাদির দিক দিয়ে যেতে পারলেন না, বরং অতি সন্তর্পণে দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো বাজারে-যাওয়ার ছেঁড়া ময়লা জামাটির পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন, যদি কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল সদ্য পান্তা-খাওয়া মেজ ছেলেটা। হাতমুখ ভাল করে না মুছেই বইখাতাগুলো দুই হাতে ধরে বোধ হয় পড়তে যাচ্ছিল পাশের বারান্দাটায়। বাবার নড়াচড়ার আওয়াজ পেয়ে ঘরে ঢুকে কর্তাকে সেই অবস্থায় দেখেই আরম্ভ করল —বাবা তুমি বুঝি বাজারে যাচ্ছ ? আমার জন্য একটা পেন্সিল নিয়ে এস নইলে আমি আজ স্কুলে যাব না। এর-ওর নিয়ে ক'দিন চালালাম। দুদিন 'আনতে ভুলে গেছি' বলে পার পেয়েছি, এক পেন্সিলে পাশাপাশি দুজন বসে কাজ চালালাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কাল পরশু পর পর দুদিন ধরে ফেলে বলে দিয়েছেন—ওসব চালাকি আর খাটবে না।

কর্তা চমকে উঠে থমকে-পড়া তাঁর হাতখানা পকেট হতে টেনে বার করলেন, যেনচোর এবার ঠিকই ধরা পড়েছে। পয়সা ওতে একটিও নেই এবং শুধু চালাকির জোরে চা পাওয়া যায় না।

কিন্তু বিশুর পেন্সিল ? তিনি চোখ তুলে দেখলেন বিশু এখনও তাঁর পানেই চেয়ে আছে। ওই অত্যন্ত চালাক ছেলেটা কি বোঝে তার চা ছাড়ার রহস্যটা। হয়ত বোঝে, কিংবা খেয়ালই করে না।

বাবা চোখ তুলে তাকাতে ছেলের একটু ভরসা হয়, বলে —তুমি বাজারের পথে নিয়ে আসবে না আমায় দেবে, আমি নিয়ে আসি ?

কর্তা এবার কি একটু ভেবে নিয়ে বলেই ফেলেন কথাটা —আচ্ছা খোকা, মাস্টারকে বললেই ত পারতিস যে এখন মাসের শেষ, ক'দিন পরে কিনব।

—সেও আমি বলেছি বাবা, কিন্তু পণ্ডিতমশাই বললেন, তা হলে মাসের প্রথম দিকেই শুধু ইস্কুলে আসিস। আর বললেন—

খোকা হঠাৎ দারুণ অভিমানে থেমে যায়। কি যেন বলতে গিয়ে বলতে পারল না, গলায় আটকে গেল।''

শিবপ্রসাদের কলমও থেমে যায়। তাই ত, বলার আছেই বা কি ? কিন্তু গল্প ? এখানেই যদি গল্প শেষ হয় তবে সম্পাদক সহাস্যে বলবেন, বেশ, গল্প ত হ'ল কিন্তু ঘটনা কোথায় ? শুধু এক কাপ চা আর একটি পেন্সিল ?

সম্পাদক ত বলবেনই ওকথা। তাঁর জীবনে ও দুটি জিনিস ঘটনা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু শিবপ্রসাদের জীবনে ও দুটি ছাড়া আর কি ঘটতে পারে ?

এর পরে আর বলবারই বা কি আছে ? কর্তা শুধু একবার চোখ তুলে খোকার মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নেবার চেষ্টা করতে করতে কিছু একটা যেন নিতান্ত বলতেই হবে সেই সুরেই বললেন—"

বাবা !

মেজ মেয়ে ছন্দা কখন একেবারে শিবপ্রসাদের ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবা, আজ আমি ইস্কুলে যেতে পারব না—অত্যন্ত সঙ্কুচিত অভিমানের ভঙ্গিতে বলে ছন্দা।

বেশ ত, যাস্ না। অসুখ করেছে বুঝি ?

না।

তবে ? পড়া হয় নি বুঝি ?

হয়েছে।

শিবপ্রসাদ এবার একটু বিচলিত হন, বলেন, কি হয়েছে বল দেখি।

ছন্দার চোখ দুটো এবার ছল ছল করে ওঠে। সে ধরা গলায় নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণনা করে চলে কেমন করে তার ফ্রকটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে একেবারে শেষদশায় এসে পৌঁছেছে। মা এতদিন কয়েক বারই সেলাই করে দিয়েছেন, দু'একবার ব্যস্ত মায়ের দরবার পর্যন্ত যাওয়ার ভরসা না পাওয়ায় দিদিকে ধরেই কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু এই বিভিন্নমুখী চিকিৎসার ফলে ফ্রকটির সম্প্রতি একেবারে মরণদশা, যে দশা হতে উদ্ধার করতে তার দিদি কোনমতেই পারে নি, মা ত হাত দিতেই চান না। ফ্রকটির এই বেগতিক অবস্থাটা ঘটে পরশু দিন। ঘটনার প্রত্যক্ষ কোন কারণ ছিল না, কিন্তু মা তাই সন্দেহ করেন। সে খেলাধুলা করে অতি সাবধানে, লুকোচুরি খেলায় ধরা পড়লে সে আত্মসমর্পণ করে অতি সন্তর্পণে যাতে জামাটা— ইত্যাদি, ইত্যাদি···। দিদি অবশ্য সবকিছু জানে এবং একটুও সন্দেহ করে না, কারণ তাকেও এখনও ফ্রক নিয়েই কারবার করতে হয়। সে এটা সেরে তুলতে খুব চেষ্টা করে-ছিল, কিন্তু পারে নি বরং একটু বেশী টানাটানি করে মেলাতে গিয়ে সমস্তটাই মাটি করে দিয়েছে। তাতে সে অবশ্য দিদির দোষ দেয় না, কিন্তু মা এতে আর কিছুতেই হাত দিতে চাইছে না, কাল একবার তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে ওটা পরেই কাল ইস্কুল গিয়েছিল কিন্তু আজ—

এখানে এসে মেয়েটি যেন হঠাৎ হোঁচট্ খেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শিবপ্রসাদ বুঝতে পারলেন। এবার তিনি কলমটা রেখে হাত ধরে ছন্দাকে কাছে বসালেন এবং তার ছোট্ট মাথায় ও মুখে হাত বুলাতে বুলাতে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর বলার কি আছে, কি বলবেন ?

ছন্দাই বরং বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে অস্ফুট কান্নার ফাঁকে বলল—জান বাবা, মণ্টি বুলু ওরা কাল বলছিল লজ্জা করে না এমন ছেঁড়া পরে আসতে ? বা রে, এমনটা পরে আসতে হলে ওদের বুঝি লজ্জা করত না ?

শিবপ্রসাদ তড়িৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠলেন। ছোট মেয়েটির মুখে এ কি তীব্র অনুযোগ—নিজের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বের হীনতাকে একি উপহাস। লজ্জা ? কেন, তোমার নেই ? পেন্সিল না থাকলে তুমি চালাকি করতে না ? চা ভুলে থাকতে হলে তুমি পারতে ?

শিবপ্রসাদ নিঃশব্দে ছন্দার চোখ দুটি মুছিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—যা ত মা, জামাটা নিয়ে আয়, কি হয়েছে দেখি। আর সঙ্গে ছুঁচসুতোও আনিস।

ছন্দার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু পরক্ষণেই কি জানি কেন, উৎসাহে ও আনন্দে জামাটা আনতে ছুটল।

আর সে যখন ফিরে এল তখন শিবপ্রসাদের হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে মনে হ'ল তার হাতে ঐ কুৎসিত সংসার-রাক্ষসটা, যে কেবলই তাকে তাড়া দিয়ে বলছে—যা হয়েছে তাই লেখ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন জামাটা এবার পাতা হ'ল খাতাটাকে সম্পূর্ণ ঢেকে।

পারুলের ছবি

শ্রীবিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি কি একলা ?
দেয়ালে টাঙানো ছবিখানা ঐ ঘরের,
সেও জানে ওকে দূরের অতিথি বলে,
সেও জানে সব কথাগুলো তার পরের।

দূরের অতিথি—
পেছনে গড়ায় একটানা সেই পথটা…
সব ধূলিকণা যেন ছলছল চাউনি—
সমুখেতে আমি, কে জানে পথের কতটা ?

পারুলের ছবি,
পারুল তো জানে নিজেই তুলিয়ে ছিল সে,
আমার ক্যামেরা দিয়ে ফটো তুলে দাও,
চেয়ারটা টেনে, নিজেই বললে বসে।

ফটো তুলে দাও—
চোখমুখ তার দুষ্ট হাসিতে ভরা
সেদিন সকালে কি যে মনে মনে ছিল,
পিঠে এলোচুল, হলুদ শাড়িটা-পরা।

নিজেই বললে,
শেষরাত্তিরে স্বপ্ন দেখেছি কাল,
থেমে যাবে গাড়ী, পথ শেষ হয়ে গেছে,
সমুখে জলছে, সিগনালে আলো লাল…

ফটো তুললুম,
একগোছা লাল গোলাপের ফুল উতলা,
ফুলদানি থেকে হাতে নিয়েছিল তুলে,
কিছু কুঁড় কুঁড়ি, কোটা কিছু ঢলা ঢলা।

পারুলের ছবি—
ফুলগুলো আর পারুল ক'জনে মিলে,
কি জানি কেমন করে যে তাকিয়ে গেছে,
যেন শেষ কথা সবটুকু বলে নিলে

পারুলকে বলি :
পারুল, পারুল, ক্যামেরা সেদিন ভুলে,
তোমাকে হারিয়ে ছায়াটাই পেলো শুধু,
কেবল তোমার ছবিটাই নিলে তুলে—

পারুল তাকায়—
ঐ তো পারুল ছবিতে তাকিয়ে আছে,
পেছনে গড়ায় ধু ধু করা সেই পথটা,
পথ বেয়ে বুঝি এক্ষুনি এলে কাছে—

আমি তো একলা,
কতটা রাস্তা কে জানে এখনও বাকী,
আমি এইখানে পারুল ছবিতে বসে,
পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে নাকি ?

এই ছবি থেকে,
ঐ যে ওখানে হাসনাহানার গাছে…
তার পর ঐ খোলা গেটটার পাশে,
তার পর ঐ অস্তরবির কাছে

পারুলকে ডাকি—
পারুল, পারুল, আর কত দেরী হবে—
প্রলাপ বকছে, হাতের গোলাপগুলো,
এইবার বুঝি তুমি কিছু কথা কবে ?

আদিবাসীদের সমাজ-জীবনে বৃক্ষের স্থান

শ্রীগোপীনাথ সেন

আর্য্যগণ যেরূপ বৃক্ষকে দেবদেবীর প্রতীক হিসাবে পূজা করিতেন, আদিবাসীরাও তেমনি বৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকে। তাহারা প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকে এবং বহু দৈবদুর্বিপাকের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। বিরাট বৃক্ষগুলি তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় এবং ভক্তি উভয়েরই উদ্রেক করিয়া থাকে।

আদিবাসীদের নিকট বৃক্ষ কেবলমাত্র দেবতারূপী নয়, উহার নিকট হইতে তাহারা লাভ করে জীবনের পাথেয়। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে বৃক্ষের নিকট গিয়া তাহারা মনের কথা ব্যক্ত করে। রিজলে তাঁহার "The People of India" নামক গ্রন্থে সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং অন্যান্য আদিবাসীদের বিবাহের 'অভিভাবক' বৃক্ষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাঁওতালরা পানগাছ ও সুপারি-গাছকে এইরূপ অভিভাবক বলিয়া মনে করে।

ছোটনাগপুরের আদিবাসী মুণ্ডারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে উপাস্য দেবতা বলিয়া মনে করে। যেমন তাঁহারা সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কেই পূজা করে, তেমনি গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত ঋতুকে পূজা-উপচারে আমন্ত্রণ জানায়। শালবৃক্ষ যখন ফুলে ফুলে ছাইয়া যায় তখন তাহাদের প্রাণে আনন্দ-হিল্লোল খেলিতে থাকে। এই বাহা চাণ্ডু বা ফুলমাস মুণ্ডাদের নিকট বহু-আকাঙ্ক্ষিত। প্রস্ফুটিত শালফুলের শোভা তাদের অন্তরে নব অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। মুণ্ডাদের প্রধান ধর্মানুষ্ঠান কেদলেতা উৎসব, উহা গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত হয়। এটি আসলে ক্ষেত্রদেবতার পূজা। এই উৎসব যতক্ষণ না পাহান বা গ্রাম্য পুরোহিত সুসম্পন্ন করিবে, ততক্ষণ কোন ব্যক্তি ধান্য রোপণ করিতে পারিবে না। বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত তাহাদের কর্ম্ম বা করম উৎসবে বিশেষ সমারোহ হয়। এই সময়ে মুণ্ডারা করম বৃক্ষ রোপণ করিয়া, সারারাত্রি ধরিয়া নৃত্যগীত করে। করম উৎসবের দিনে ইন্দ নামে একটি উৎসব হয়। কাওয়াবোম উৎসব অর্থাৎ নবান্ন উৎসব এই মাসে তাহারা উদযাপিত করে।

বাবাংসা বা শীতকালের উৎসবে মুণ্ডাদের এই ঋতুর সর্বপ্রধান উপাস্য হার জুরাইত ইপিল বা জোয়ালের হাল পূজিত হয়। এই ঋতুর একটি বিশেষ উৎসব খারা পূজা বা খামারের উঠান পূজা। মুণ্ডাদের বৎসর আরম্ভ হয় মাঘ মাসে, উহাকে তাহারা গোলা মাগে চাণ্ডু বলে। চাণ্ডু অর্থে চাঁদ। যখন প্রতিপদের চাঁদ উঠে সেই সময় হইতে তাহাদের মাস আরম্ভ হয়। এই মাসে মুণ্ডারা জাইর সারনা বা পবিত্র কুঞ্জ দর্শন করে। উহার পূজা হইলে তাহারা সেন্দরা বা শিকার করিতে বাহির হইয়া যায়। এই উৎসব উপলক্ষে মুণ্ডারা ইদেলদারু নামক বৃক্ষের ডাল কাটে এবং জারাদারু বা বেড়ি গাছের ডাল কাটিয়া তাহা দ্বারা গ্রামের প্রতিটি গৃহের ছাউনিতে আঘাত করে। তার পর গৃহের মালিকের নিকট খড় চায়। খড়গুলি একত্র করিয়া আঁটি বাঁধে এবং সেই আঁটি পূজামণ্ডপে লইয়া যায়। সেখানে গ্রাম্য পুরোহিত ইদেল ও জারা ডালগুলিকে খড়ের আঁটি দিয়া বাঁধিয়া জ্বালাইয়া দেয়। যখন উহা পুড়িয়া যায় সেই সময় গ্রাম্য বালকেরা আসিয়া কুঠার দিয়া ডাল-গুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটে। ইহাকে ফাগ-কাটা বলে। বাহাপূজা না হওয়া পর্য্যন্ত পুরোহিত মহুয়ার রস পান করিতে বা শালপাতায় খাইতে পারে না। এই উৎসব সাধারণতঃ ফাল্গুন মাসে হয় বলিয়া উহাকে ফাগু চাণ্ডু বলে। উৎসবানুষ্ঠানে এইরূপ খড়ের আঁটি জ্বালানোর প্রথা বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে হিন্দু-দের ভিতর প্রচলিত আছে। এই খড় দিয়া একটি দৈত্যের প্রতি-কৃতি তৈরি করা হয়। নারায়ণশিলা রাখিয়া পূজা করিবার পর প্রতিকৃতিটি জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। উহাকে হোলি-জ্বালানো বলে।

ওরাওঁদের মধ্যে বৃক্ষপূজা একটি পুরাতন প্রথা। তাহারা লতা গুল্মে ঢাকা জায়গায় পূজা করে। এই লতাগুল্মঃবেষ্টিত স্থানকে তাহারা সারনা বলে। এই বৃক্ষকুঞ্জকে ওরাওঁরা কখনও অস্ত্রদ্বারা আঘাত করে না। প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ একটি করিয়া কুঞ্জ থাকে, গ্রাম্য পাহান তাহার পূজা করিয়া থাকে। এই পূজার সময় মুরগী বলি দেওয়া হয় ও দেবতার উদ্দেশে হাড়িয়া নিবেদন করিয়া শেষে সকলে মিলিয়া খুশিমত তাহা পান করে। ওরাওঁরা যে সকল উৎসবে বিশেষ আনন্দোপভোগ করিয়া থাকে তন্মধ্যে সোহরেল, করম এবং কানিহারি প্রভৃতি প্রধান। যখন সারাইবৃক্ষ ফুলে ভরিয়া যায় তখন তাহারা মনে করে সূর্য্যদেবতার সহিত ধরিত্রী মাতার বিবাহ হইতেছে। করম উৎসবে ধান রোপণ করা হয়। এই সময় তাহারা নৃত্যগীতে মাতিয়া উঠে, তাহাদের আনন্দ-সঙ্গীতে সারা-গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠে।

সাঁওতালদের বৃক্ষপূজা সম্পর্কিত পুরনো তথ্য Rev. W. J. Culshaw-এর 'Early Records Concerning the Santals' নামক প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৮৪১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী একজন বিদেশী পর্য্যটক সাঁওতাল পরগণায় গিয়া-ছিলেন। যেভাবেও Culshaw তাঁহার ডায়েরী হইতে যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা পাঠে সাঁওতালদের শালবৃক্ষপূজার কথা

জানিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, উক্ত পর্য্যটকের নাম জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার ডায়েরীর উদ্ধৃতাংশটি এই :—

9 February 1841. Started for a visit among the Santals. Crossed the River Patna and rode four miles to Lannporra, a Santal village of 20 houses, situated in the midst of a thick Jungle several miles in extent. Made some enquiries concerning their religion, customs, etc. They informed us that they have but one object of worship, that is the Sarl (sal ?) tree.

অর্থাৎ, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪১, সাওতালদের মুলুক পরিদর্শন করিবার জন্য যাত্রা করিলাম। পাটনা নদী পার হইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া চার মাইল দূরবর্ত্তী লানপোরাতে গেলাম। কতিপয় মাইল প্রসারিত ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত কুড়িটি গৃহসমন্বিত গ্রাম এটি। তাহাদের ধর্ম্ম, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু তথ্যানুসন্ধান করিলাম। তাহারা আমাকে জানাইল যে, তাহাদের একটি মাত্র উপাস্য বস্তু আছে, আর সেটি হইতেছে শালগাছ।

তখনকার দিনে এই ইংরেজ পর্য্যটক ও তথ্যসংগ্রাহক সাওতাল-পল্লীতে কোন গৃহে আশ্রয় পান নাই। তখন তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিল একটি বটবৃক্ষ। ইহার নীচে তিনি সঙ্গীদের লইয়া রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণীতে এইরূপ লিখিত আছে :

"As we arrived in the heat of the day we took shelter from sun under a neighbouring banian. At night we asked for a house but could obtain none, so the tree sheltered us for the night. So spreading our umbrellas over our heads to keep off the dew we lay down to sound and quiet slumber."

সাওতালদের বিবাহে মহুয়াগাছ ব্যতীত কোন শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। বিবাহের দিনে পাত্র ও কন্যা উভয়পক্ষের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে একটি মণ্ডপ তৈয়ারি করা হয়। অবিবাহিত যুবকগণ মহুয়াগাছের একটি ডাল লইয়া গিয়া সেই স্থানে রোপণ করে। অতঃপর একটি যুবতী পাঁচটি ধান, পাঁচটি হলুদ এবং পাঁচটি পয়সা ইহার গোড়ায় পুঁতিয়া রাখে। বিবাহের পরে মাটি খুঁড়িয়া যদি তাহারা দেখে যে, ধান ও হলুদের অঙ্কুর বাহির হইয়াছে তাহা হইলে বিবাহ সুখের হইবে, এই বিশ্বাস তাহাদের মনে বদ্ধমূল হয়। অঙ্কুরোদ্গম না হইলে তাহা ভাবী অশুভ ঘটনার সূচক বলিয়া তাহারা মনে করে। সাওতালদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার সময় শালপাতা ছিঁড়িবার প্রথা প্রচলিত আছে। সাওতাল যুবকগণ কলাগাছকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তাহাদের ধারণা উহা কাটিলে শক্তি নষ্ট হয়।

সাওতালদের সমাজে বিমোহনবিদ্যায় (witchcraft) বৃক্ষের কিরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তাহাদের লোকগাথা, লোককথা এবং লোকগীত হইতে জানিতে পারা যায়। সি. এইচ. বমপাস তাঁহার 'Folklore of the Santal Parganas' নামক পুস্তকে এইরূপ রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। বিমোহনবিদ্যায় দীক্ষা লইবার সময় ডাকিনী মেয়েরা পবিত্র কুঞ্জে প্রবেশ করে এবং সেই স্থানে তাহারা মুরগী বলি দিয়া উহার মাংস খায়। সাওতাল ডাকিনীরা কিরূপ ভয়ঙ্করী হয় ডব্লিউ. জি. আরচার এর সংগৃহীত লোকগীত হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই গীতের মধ্যে দেখা যায়—কলাগাছের ঝাড় এবং খড় বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আর্চারের সংগৃহীত বিমোহন-বিদ্যা সম্পর্কিত একটি গীতের ইংরেজী তর্জ্জমা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

I have cut the plantain grove
I have taken off my clothes
I have learnt from my mother-in-law
How to eat my husband
On the hills the wind blows
I have cut the thatching grass
I have grown weary
Weary of eating rice.

যখন কোন সাওতাল বালিকা ডাকিনীবিদ্যায় দীক্ষিত হয় সেই সময় হইতে তাহাকে ডাকিনীদিগের নিয়মকানুন পালন করিতে হয়। প্রথমতঃ তাহাকে আনুষ্ঠানিক উৎসবে এবং ডাকিনীদের সমাবেশে যোগ দিতে হইবে। ডাকিনী বালিকাদের প্রতি রাত্রে কিংবা প্রত্যেক সপ্তাহের শনি ও রবিবার দিন একত্র মিলিত হইতে হয়। এক জন বোঙ্গাকে এই ডাকিনীদের আহ্বান করিবার জন্য প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তাহাদের মিলনক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হয় মাঝিস্থানে, পবিত্র কুঞ্জে, নির্জ্জন উপত্যকায়, একটি বৃহৎ বৃক্ষে, গ্রামের শেষপ্রান্তে কিংবা রাজপথের চৌমাথায়। একটি লোককথায় আছে—একটি বালক মাঝিস্থানের পশ্চাতে থাকিয়া সারা রাত্রিব্যাপী তাহাদের নৃত্য ও বৃক্ষের উপর নানা ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়াছিল।

সাওতাল ডাকিনীদের ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝা আসিয়া কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করে। গ্রামে কোন বালিকা ডাকিনী হইলে গ্রামীণ জনসাধারণের বিশেষ চিন্তার কারণ হয়। সেইজন্য গ্রামের মাতব্বরেরা তাহাকে নিরাময় করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। ওঝা বা জান একটি শালবৃক্ষের পাতাসমেত ডাল লইয়া আসে। সাওতালরা পাতাগুলিকে ধোরোম বলে। একটি পাতা বোঙ্গার জন্য এবং অন্যান্য পাতাগুলি গৃহের স্ত্রীলোকদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যদি ধোরোম পাতাটি শুকাইয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, অপদেবতা ডাকিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য আদিবাসীদের মধ্যেও বিমোহনবিদ্যায় বৃক্ষের বিশেষ স্থান আছে। ইহা ব্যতীত আদিবাসীদের কুলদেবতাদের মধ্যেও বৃক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। আদিবাসী-সমাজে যে-সকল বৃক্ষ কুলদেবতার স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) আমমচি বা খাক্রা বৃক্ষ, (২) খোকাবল্লভি, (৩) ইরপাচি

বা মহুয়াবৃক্ষ, (৪) কাঙ্গালি. (৫) খুরসাম বা হারদ্ বৃক্ষ, (৬) কাদিলামা (৭) মাদভি বৃক্ষ, (৮) নাভদক (৯) মারকম বা আম্রবৃক্ষ (১০) কুমরা (কুম্ভিবৃক্ষ), (১১) গিন্দ্রম (১২) গিরসন (১৩) টিকম বা টিকবৃক্ষ এবং (১৪) ওয়াদকা বা বটবৃক্ষ।

গোন্দজাতিরা পিতৃকুলের পদবী গ্রহণ করে। তাহাদের মধ্যে জাতিবিভাগ করা হয় বৃক্ষগোষ্ঠীর উপর নির্ভর করিয়া। গোন্দদের মধ্যে কাহারও কাহারও ছয়টি দেবতা, পাঁচটি দেবতা এবং চারিটি দেবতা থাকে।

আসামের আদিবাসীদের সম্বন্ধে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের মত প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়। তাঁহার রচিত 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী' নামক পুস্তকে (পৃ. ১৬-১৭) আসামের জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সিন্টেং নামক আদিবাসীদের ভিতর প্রচলিত বৃক্ষপূজার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা সংক্ষেপে এখানে প্রদত্ত হইল। মহামারী দূর করিবার জন্য সিন্টেংরা বে-ডিং খ্লাম (লাঠিদ্বারা মহামারী তাড়ানো) উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে সিন্টেং যুবকগণ 'কা-ইং-পূজা'তে বা পূজাঘরে সমবেত হইয়া উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠে। সেখানে বাঁশ ও রঙিন কাগজ দিয়া তাহারা রথ তৈয়ারি করে। তার পর একদিন সকলে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে গোটা জোয়াই শহর প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর তাহারা নিকটবর্তী এক জলাতে যায় এবং একটি সজ্জকর্তিত বৃহৎ বৃক্ষকে সেখানে লইয়া আসিয়া সেটিকে জলে স্থাপিত করে। ইহার পর যুবকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়া বৃক্ষটিকে দখল করিবার জন্য টানাটানি করিতে থাকে। যে দল জেতে তাহারা মনে করে আগামী বৎসর তাহারা স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করিবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃক্ষটিকে জলায় বিসর্জন দিয়া যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে।

এই বৃহৎ বৃক্ষটিকে উ-ব্লেই বা সৃষ্টিকর্তার প্রতীক বলে। ঐদিন সিন্টেংদের বাড়ীতে গেলে দেখা যায়, পুরুষেরা একটি লাঠি দিয়া ঘরের চালের উপর আঘাত করিতেছে এবং মহামারীর ভূতকে বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার আদিবাসীদের মধ্যেও এইরূপ কেরপূজা বা বৃক্ষপূজার প্রচলন দেখা যায়।*

আসামের লুসাই পাহাড়ের অধিবাসী লাখের জাতিদের পবিত্র বৃক্ষ টিলউলিয়া। তাহারা উহাকে বোংচি বলে। প্রতি নববর্ষে গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রামে টিলউলিয়া বৃক্ষ রোপণ করে এবং প্রথম পূজা উহাকে দিয়া থাকে। এই বৃক্ষের নীচে স্থাপিত একটি পাথরের উপরে আর একটি পাথর বসানো থাকে, এটিকে তাহারা সৃষ্টিকর্তার প্রতীক বলিয়া মনে করে। তাঁহার উদ্দেশে লাখেরগণ মুরগী এবং একটি শূকর বলি দেয়।

লাখেরদের বিশ্বাস যে, কতকগুলি বৃক্ষে প্রেতাত্মারা বাস করে। এই প্রকার বৃক্ষগুলির মধ্যে সমরউ (Careya Arcorbea) নামক বৃক্ষ প্রসিদ্ধ। ইহার নিকট যাইতে তাহারা ভয় পায়। ভয়মুক্ত হইবার জন্য তাহারা বাঁশের বেড়া দিয়া ঐ বৃক্ষের চারিদিক ঘিরিয়া দেয় এবং একটি মুরগী ইহার উদ্দেশে বলি দিয়া থাকে। সমরউ বৃক্ষে অধিরূঢ় উপদেবতা কোন ব্যক্তির উপর ভর করিলে তাহার চক্ষুদ্বয় এবং নখগুলি নাকি হলুদবর্ণ হইয়া যায়। সমরউ বৃক্ষের উপ-দেবতার শক্তিপরীক্ষার জন্য ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির নখ কাটিয়া একটি জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি নখটি ডুবিয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহার উপর সমরউ বৃক্ষের উপদেবতার ভর হইয়াছে। যদি উহা ভাসিয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে উক্ত বৃক্ষটি উপদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র নহে। আর একটি অশুভ বৃক্ষের কথা জানা যায়—তাহা অমাংবি উপাথাং নামে পরিচিত। এই বৃক্ষের কাষ্ঠ যদি কেহ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে তাহা হইলে গ্রামের যাবতীয় মুরগী নাকি রোগাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়।

লাখেরদের দেশ হইতে আরাকান যাইবার পথে তাওলং নামে একটি প্রস্তর আছে। তাহাতে অমিত বলশালী এক অপদেবতা বাস করে। এই পথ দিয়া যেসকল লোক যাতায়াত করে তাহারা একটি করিয়া পাতা উৎসর্গ করিয়া থাকে। যদি কেহ এরূপ না করে তাহা হইলে তাহাকে নাকি বহু দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় এবং সে এত অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, কোন কাজ করিতে পারে না। এন. ই. প্যারি তাঁহার 'The Lakhers' নামক পুস্তকে এইরূপ একটি সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। সেই স্থানের একজন মিশনরী নাকি পালেতয়া যাইবার পথে তাওলংকে পত্রোপচারে পূজা দিতে সম্মত হন নাই, তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিদেরও তিনি পূজা দিতে বারণ করেন। যখন তাঁহারা সকলে কোলো-ডাইন নদীর উপর দিয়া যাইতেছিলেন সেই সময় তাঁহাদের নৌকা ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইল। মিশনরীদের সহযাত্রী উপজাতীয় লোকেরা তখন তাওলং-এর নীচে পত্রার্ঘ্য দিয়া আসিলে দেখা গেল যে, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

এইরূপ পাহাড়ের চূড়ায় পাথর কিংবা বৃক্ষের পাদমূলে বৃক্ষপত্র উৎসর্গ করিবার রীতি আসামের অন্যান্য পার্ব্বত্য অধিবাসীদের ভিতর দেখা যায়। মণিপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা তাওলংকে লাইফাম অর্থাৎ দেবতার আবাস বলিয়া থাকে। চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের ম্ররা তৃণ দিয়া পর্ব্বত-দেবতার পূজা করে। গারো পর্ব্বতের রাভা উপজাতীয় লোকেরা বৃক্ষের পত্র দিয়া পবিত্র প্রস্তরের পূজা দিয়া থাকে।

প্রায় সকল আদিবাসীর মধ্যেই বৃহৎ বৃক্ষ কোথাও দেবদেবী কোথাও বা অপদেবতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র হইয়া আছে। আদিবাসীরা বৃক্ষের আশ্রয়ে লালিতপালিত হয়। তাহাদের অন্তরে বিরাট বনস্পতি যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও বিশ্বাসের উদ্রেক করে। বৃক্ষ যে কেবল আদিবাসীদেরই পূজার বস্তু তাহা নয়, সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি

* হালাম নামক আদিবাসীদের মধ্যে থলাইরই পরবে বংশ-খণ্ডসমূহকে পূজা করিবার যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহার বিবরণ শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের "আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী" (পৃ ১০-১১) পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

মধ্যে বৃক্ষপূজার প্রচলন ছিল। এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য :

"In almost every part of the world travellers have observed the custom of hanging objects upon trees in order to establish some sort of a relationship between the offerer and the tree. Such trees not infrequently adjoin a well or are accompanied by sacred buildings. pillars etc. Throughout Europe also, a mass of evidence has been collected testifying to the lengthy persistence of "superstitions" practices and beliefs concerning them.

আদিবাসীদের সামাজিক জীবনে বৃক্ষের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ষকে কেন্দ্র করিয়া নানা বিধিনিষেধ, বিশ্বাস, যাদুবিদ্যা ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সকল দেশেই টোটকা ঔষধ প্রচলিত আছে। গাছ পালা হইতে এই সকল ঔষধ আহৃত হইয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে আদিবাসীরা যে সকল ঔষধ আহরণ করে, ডাক্তার ই. এসওয়ার্থ, অশুারউড তাঁহার 'The Medicine of the Aboriginal peoples in the British Commonwealh' নামক পুস্তকে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সংসারী বাউল

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলা দেশের পল্লীসঙ্গীত বাউলে বাঙলার পল্লীসমাজের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর গানের মধ্যে পল্লীবঙ্গের সাধারণ জনগণের কর্ম্মচঞ্চল জীবনের সুরই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাউল কবিরা অনেকেই সংসারী মানুষ। তাই রামপ্রসাদের ন্যায় তাঁহারাও নিজেদের ঘরের খুটিনাটি কথার মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত দিয়াছে।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারি,
যতন করে খাটাও রে মন দেহঘরে।
শমন মশকের বাসা, সব দুরাশা, ভেস্তে যাবে একেবারে।
পুণ্য বালিশে মাথা দিলে ব্যথা থাকবে না তোর ত্রিসংসারে।
দেখবি তুই বসে বসে মশা এসে, বেড়াবে চারদিকে ঘুরে।
সাধ্য কি প্রবেশিতে মশারিতে, আপসোসে পালাবে ফিরে।

শুধুই কি 'প্রেমমশারি' টাঙাইয়া সারারাত বসিয়া থাকিলে চলিবে?

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত মশকভীত পল্লীকবিরা তাই মশার উপমার দ্বারা ইঙ্গিত দিয়াছেন। প্রলোভন হইতে বাঁচিতে হইলে চাই জ্ঞানের সাধনা, ভ্রান্ত সংস্কারের সম্পর্কেও সতর্ক হইতে হইবে—

দেশ ছেড়ে যেতে হ'ল কাম মশায় কামড়ে।
মশা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কানের কাছে গান করে।
মশার কি-বা মধুর গান শুনে প্রাণ করে আনচান;
জ্ঞান চাপড়ে মারব মশা করেছি সন্ধান।
জ্ঞান হ'ল না মশা এল না বে-হুশিয়ারি চাপড়ে।

কেবল প্রেমমশারই নয়, ধর্ম্মগদি ও পুণ্যবালিশের ইঙ্গিত বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রেমমশারির সাহায্যে নিজেকে শমন-মশকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার মধ্যে অভিনবত্ব ও মৌলিকতা রহিয়াছে।

কেবল চলিত উপমাই নয়, বিংশ শতাব্দীর অতিপরিচিত যান সাইকেলের উপমা দিয়াও পল্লীকবিরা উপদেশ দিয়াছেন।

মন যদি চড়বি রে সাইকেল।
আগে সে কোম্পানী এটে অকপটে সাচ্চা কর দেল,
ফুটপিনে দিয়ে পা হপিং করে এগিয়ে যা,
পিনের 'পরে উঠে দাঁড়া, বেদবিধি হবি ছাড়া,
সামনে কর নজর কড়া, আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল।

বাউল গানের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এই সব তত্ত্ব-সঙ্গীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহা গ্রাম্য জনসাধারণের ভাষায় লিখিত এবং নিতান্ত অমার্জ্জিত বলিয়া উচ্চসাহিত্য কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত। বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণীর হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়। কিন্তু এই সব কবি-বাউলদের সাধন-পদ্ধতি মানব দেহতত্ত্বের যে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা জটিল ও দুরবগাহ।"

অতি তুচ্ছ কথার মধ্য দিয়া যে গভীর সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে তাহার প্রমাণ—

খাই না আমি ভাত কি তরকারি,
ময়ান-দেওয়া খাস্তা লুচি কিংবা খাস্তা কচুরি,

খাই না মুড়ি-মুড়কি-মণ্ডা-মিছরি,
আমি খাই না মাখন-ক্ষীর-ছানা।
শাল-দোশালা পোশাক নয় আমার।
রঙ-বেরঙের কোট-কামিজে আমার কি দরকার?
ছেঁড়া টেনা কৌপীনখানা তা-ও তো আমার লাগে না।

কবি-বাউলদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন যাদুবিন্দু বা যাদবেন্দু। তিনি ছিলেন কুবের গোঁসাইয়ের শিষ্য। তাঁহার রচিত বহু গান আজও বাউল ভিক্ষাজীবীদের জীবিকার অবলম্বন হইয়া আছে।

এই সকল বাউল-কবিদের সাধনা জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। তাঁহারা নিজেরাও অধিকাংশই গৃহী সাধক, গৃহজীবনের বিভিন্ন কর্মোদ্যমই তাঁহাদের গানের রূপক। যাদবেন্দুর রচিত নিম্নের গানটিতে মাছধরার রূপক সন্নিবিষ্ট—

আমার এই কাদামাখা সার হ'ল।
ধর্মমাছ ধরব বলে নামলাম জলে,
ভক্তিজাল ছিঁড়ে গেল।
কেবল হিংসে নিন্দে গুগলি ঘোঙা পেয়েছি কতকগুলো
কুসঙ্গে বিল গাবালাম, কুক্ষণে জাল নাবালাম,
ক্ষমা-খালুই হারালাম, উপায় কি করি বলো।
আমি বিল ঘুলে পাই চাঁদা পুঁটি লোভ চিলে লুটে নিল।

কৃষি অপেক্ষা বাস্তব সত্য বাঙালীর আর কি আছে? কেবল বাউল-কবিরাই নন রামপ্রসাদও তাঁহার আধ্যাত্মিক সঙ্গীতে রূপকচ্ছলে পতিত মানব জমিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। নিম্নের বাউলগীতটিতে ঐ ধরনের কথাই আছে—

গুরুবীজ অঙ্কুর হবে কি মোর এ পাষাণে?
চাষ হ'ল কই? পড়ল না মই, পতিত রইল জমি মনের গুণে।
মন-চাষা মোর বিষম কুঁড়ে, ভুলে যায় না জমির ধারে,
কৃষাণ ছ'টা গোঁফ খেজুরে, আলে বসে সদাই তামাক টানে।

রামপ্রসাদের ন্যায় ঘরোয়া কথার সাহায্যে যাদবেন্দুও আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনা পরিবেশন করিতেন। রূপকের মাধ্যমে তিনি তাঁহার সাধনপথের নানা গূঢ় কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রোতারাও বাউলধর্মের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি না করিলেও অন্ততঃ ঘরোয়া উপমা-গুলির কথার ভাব অনুধাবন করিতে পারে—

এমন চাষা বুদ্ধিনাশা তুই, কেন দেখলি না আপনার ভুঁই
তোর দেহজমির পাকা ধানে দেখ লেগেছে ছ'টা বাবুই।
বহু কষ্টে করলি কৃষাণি, এই মানবদেহ চৌদ্দ পোয়া
লাল জমিখানি, তাতে ভক্তি ফসল জন্মেছিল
সব খেয়ে গেল হিংসা চড়ুই।

কেবল যাদুবিন্দুই নন, সকল বাউল-কবিই গ্রামের কর্মময় জীবনের চাঞ্চল্যের রূপক দিয়া গান রচনা করিয়াছেন। বাঙলার পল্লীজীবন কৃষির উপর ভিত্তি করিয়াই আবর্তিত; তাই কৃষক-বাউলদের অধিকাংশ গানের রূপক বস্তু চাষবাস। কৃষির রূপকে রচিত বাউলগানসমূহ কর্মব্যস্ত কৃষকদের নিজেদেরই রচনা, কৃষি-ক্ষেত্রেই সেগুলি গীত হইত। যেমন:

নূতন চাষা ম'ল পরাণে চাষের ভাবনা জেনে।
আমজোর শুকনা ডাঙায় ধান বোনে বেগুন জানে।
যাদের জমি জোয়ার-জল ভরা, আমজোর বুনছে রে তারা,
যখন জল শুকাবে ধান মরিবে, তখন বেড়াবি মুষল টেনে।
অনুরাগের মই নইলে রে তুই ঢেলা ভাঙবি রে কোন গুণে।

পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের গানে যেমন আছে কৃষির উপমা, পূর্ব্ব-বঙ্গের বাউলদের গানের মধ্যে সেইরূপ প্রচলন আছে—নৌকার উপমার। খালবিল নদী-নালার দেশ পূর্ব্ববঙ্গের জনগণের কাছে নৌকার রূপকই ত স্বাভাবিক। তবে উভয়ত্রই প্রচুর হালের উপমা —পূর্ব্ববঙ্গে নৌকার হাল, পশ্চিমবঙ্গে ক্ষেতচষার হাল:

নদীবহুল ঢাকা জেলার বিখ্যাত আউলিয়া সম্প্রদায়ের বাউল-কবি রসিদের গানে আছে নৌকা বাওয়ার রূপক—

টেনে চল উজান গুন।
নইলে নৌকা ভাঁটার টানে হয়ে যাবে খুন।
টান শীঘ্র ভাঁটা এল, নৌকা বালি চরে প'ল
ছয় চোরেতে চুরি করে নিবেরে মূলধন।

রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে অনন্ত গোঁসাইয়ের গানগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ। তিনিও ধানভানা, মাছধরা, ভুইচষা প্রভৃতির রূপক দিয়া গান রচনা করিয়াছেন—

ওগো সুখের ধান-ভানা, ধনি, এমন ব্যবসা ছেড়ো না।
কর কৃষ্ণপ্রেমের ভানাকুটা, কষ্ট তোমার থাকবে না।
তোমার দেহ ঢেঁকশালে, অনুরাগের ঢেঁকি বসালে,
ভজনসাধন পাড়ুই দুটো দু'দিকে দিলে।
আবার নিষ্ঠা আঁশকল লাগালে, ঢেঁকি চলবে, ও সে টলবে না।

বীরভূম জেলার বাউল রাধাশ্যাম দাসের রচিত গানে গৃহস্থঘরের সুপরিচিত রস জ্বাল দেওয়ার উপমা রূপক আছে—

দেহে কাম থাকিতে সময়েতে রস ভিয়ান কর।
তোর কাম অনলে রস জ্বাল দিলে তরল রস হবে গাঢ়।
প্রেমখোলায় রস চাপিয়ে জ্বাল দিবে খুব হুঁশিয়ার হয়ে,
উথলে যেন যায় না পড়ে, তা হলে হবে শুধু কর্ম্মসার।

বৈষ্ণব কবিদের ন্যায় বাউলকবিদেরও ভনিতাগুলি বেশ ভাব-ব্যঞ্জক। যাদুবিন্দুর একটি ভনিতায় এই রস জ্বাল দেওয়ার কথা আছে—

অধম যাদুবিন্দু কয়, কুবের গোঁসাই সে রস পায়,
আমার ভাঁড়ের ঘোলা রস যে ওঠে গেঁজে;
ও সে রসে বীজ মরে না, মিছরি হয় না,
ঘুঁটতে ঘুঁটতে জীবন জীবন যায়।

আঁধারে আলো

শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী

প্রথম বসন্তের বিষণ্ণ বিকাল। সিন্দুর ছড়ানো সূর্য্য, পাখ-পাখালির নীড়ে ফেরার সময়। পলাশ আর শিমুল রূপের পসরা সাজিয়ে বসেছে। বট, অশ্বত্থ নতুন পোশাক পরেছে। আম্রমুকুলের সুমিষ্ট গন্ধ ঝিরঝিরে হিমেল বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। টুনটুনি, ছাতারেগুলো লেজ দুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এ সময় ঘরে বসে থাকতে মন চায় না ভলটুর। সামনের গাঁয়ে 'লাচনী নাচ' হচ্ছে। এধারের বহুলপ্রচলিত প্রসিদ্ধ নাচ, শিক্ষিত লোক শুনে হাসবে—তা হাসুক। 'ডিহাতি'রা এসব নিয়েই আছে।

কাজই বা এখন কি আছে?

পুরুলিয়ার থেকে ন'-দশ মাইল দূরে এই দেউল-চটি গাঁ। মানভূমে এ অঞ্চল থাকাকালীন একবার কলকাতা থেকে এক ভ্রাম্যমাণ দল এসেছিল। বলে গিয়েছিল এখানে নাকি কোন রাজার গড় ছিল, দেউল থাকাও অসম্ভব নয়। হর-গৌরীর মূর্ত্তি, লিঙ্গরাজ শিব দেখে অনুমান করেছিল এখানে শৈবমত এককালে চলিত ছিল। সে সব কথার কোন মূল্য নেই ভলটুর কাছে। ভলটুর এত ডাঙা ভালো লাগে না। যত না চাষের জমি, তার বেশী ডাঙা—পুরুলিয়ার আশে-পাশের এ জায়গাগুলো দেখে ডাঙার দেশ বললেই ভাল হয়। শোনা যাচ্ছে, এবার সরকার এগুলোকে হয় কাটিয়ে-কুটিয়ে জমিতে রূপান্তরিত করবেন, নতুবা কলকারখানা বসাবেন।

কলকারখানা বসালে 'ডিহাতি'রা (পল্লীগ্রামবাসীরা) বাঁচে—অন্ততঃ রাজুয়াড়, মাহাতো, হাড়ি, মুদিরা তো বাঁচেই।

এধারে ধনী ব্রাহ্মণের সম্মানসূচক ডাক হ'ল 'ঠাকুর'। ঠাকুরবাড়ীতেই পূজা-পার্ব্বণ হয়। ছত্রিশ জাতের ভোজ হয় বছরে দু'তিন বার। রাজুয়াড়দের ঘরে শ্রাবণ-ভাদরে মা-মনসার পূজা হয়।

ছোট ঠাকুর এসে বললে, চ ন ভলটু লাচনী নাচ দেখতে। শুনছি পঞ্চাশ টাকা দিয়া লাচনী এনেছে।

ভলটু বলল, হ ঠাকুর বাব—লুখাটা (কাপড়টা) গায়ে লাগাইয়া যেতেছি।

ভলটু জাতিতে রাজোয়াড়। মানভূম ও পুরুলিয়ার প্রায় প্রতি গাঁয়েই দু'চার ঘর রাজোয়াড় আছে।

এককালে হয়ত এরা রাজবংশীদেরই এক শাখা ছিল। এদের দেহে এখনও আদিম কাছাড়ী এবং মধ্যপ্রদেশের ক্ষত্রিয়-রক্ত বহমান। কালের গতিতে এখন এরা প্রায়শঃই দরিদ্র 'মুনিস','মাহিন্দার', বড়জোর ভাগচাষী।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ হাসছে। লাইট জ্বলছে। কাছেপিঠের স্থানটা গমগম করছে। মাদল বাজছে—ধা-তিং, ধা-তিং। বাঁ-হাতে রুমাল ঘুরিয়ে ঝুমুর গাইছে পঞ্চাশ টাকার লাচনী। পায়ের নূপুরের শব্দ উঠছে, রুম-ঝুম, ঝুম, ঝুম—।

"যাচলে না খায়, তবু যে খায় লাজে মরি,
এমনি অবোধ, নাই বোধাবোধ, বুঝাইয়ে না পারি।
আমি এত মারি, তবু গোপীর ঘরে করে চুরি,
ও কুটিলে যাও গো ফিরি তোমায় বিনয় করি।"

মাদল বেজে চলেছে—ধা-তিং, ধা-তিং—ঐ সঙ্গে ধামশা। গেঁজেলরা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। একদল ছোকরা ক্রমাগত আনি-দুয়ানি রুমালে বেঁধে লাচনীর উদ্দেশ্যে ছুঁড়ছে। অধিকারী রুমাল থেকে তা খুলে নিয়ে আবার দাতার দিকে হেসে পাণ্টা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

রুম, ঝুম, রুম, ঝুম—ধা-তিং, তিং তিং। তালে তালে চরণযুগল বোল ধরেছে।

"পরিহাস আর করিস না ভাই মোরে।
একে অঙ্গ জরজর রাই-বিরহ-শরে।
এ সময় রহস্য নয়, দ্বিগুণ আগুন জ্বলে হিয়ায়, (ভাই রে)
আর যাতনা দিস্ না আমায়, বিনয় করি তোরে।
দাস পীতাম্বর বিষয় ত্যজে, সাধ রে রাধার পদাম্বুজে (হায় রে)
অন্তিমে স্থান পদরজে, তরিবি সংসারে॥

পেছন থেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে মতিলাল ডাকল, ভলটু—বাইরে বেরিয়ে আয়, কথা আছে।

ভিড় ঠেলে ভলটু বেরিয়ে এল। জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইল মতিলালের দিকে।

মতিলাল বলল, আমি ভাত খাইয়া উঠলি, তোর বুড়ো মা এসে বললি ভলটোর বউটা পলাইছে রে—যা ন খবর দিয়ে আয়।

ভলটুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল যেন—বউ পালাইছে, চইলা গেছে? এই সেদিন শুঙা করেছে, এখনও দু'বছর হয় নাই—সেই বউটা পালাইয়া গেল।

ভলটু বলল, চ ন দেখি।

ভলটুর বুড়ো মা ছেলেকে দেখে কেঁদে উঠল।—আহা বাছা রে আমি পুকুর গেছলি, মেয়েটা রূপোর মল, তাগা, গোট সব লইয়া চইলা গেছে।

—হুঁ। ভলটুর মর্ম্মস্থল থেকে একটা চাপা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

বেশী দিনের কথা নয়। পাঁচ-ছ' বছর আগে চন্দনকিয়ারী থেকে সাদী করে নিয়ে এল প্রথম পক্ষের বউ পদ্মমণিকে। এ বিয়েতে পাঁচ-সাত দিন আগে থেকে অধিবাসের গান হয়েছিল। রাত বারোটা একটা পর্য্যন্ত মেয়েরা ছড়া গেয়েছিল। তখন তার বাবা ছিল বেঁচে। বউকে দিয়েছিল রূপার নানারকম গয়না।

কিন্তু সে বউকে নিয়ে ভলটু বেশী দিন ঘর করতে পারে নি। এ অঞ্চলে দুভিক্ষ গেল, মরা হাজা গেল। ডাঙায় বিরি, সুরগুঁজা, গুন্দলু, বাজরা হ'ল না। ক্ষেতে ক' মণ ধান হয়েছিল, তাও 'ঠাকুর'-ঘরের ঋণ শোধ করতে চলে গেল। সে বছর তারা ঠাকুরদের কত অনুনয়বিনয় করল, এ বছর থেকে ধানের দেড়া সুদ তুলে দেন ঠাকুর। সিকি সুদ নেন।

ঠাকুররা হেসেছিল, চিরকালের দেড়ি সুদ কি তোলা যায়? অন্যান্য বছরের মত চাষী রাজোয়াড় মাহাতোরা চাষ শেষ করে মা-মনসার পূজা দিতে পারল না। মনসা-মঙ্গল গাওয়া হ'ল না। ঝাঁপান হ'ল না। আষাঢ়ে-দশহরায় এক ফোঁটা জল না হওয়ায় সাপের বিষ বেড়ে উঠল। জেগে উঠলেন কলির জাগ্রত দেবী মনসা। দু'এক জন করে সাপের কামড়ে মরতে লাগল। গুণীনরা না খেতে পেয়ে অনেকেই মারা পড়ল। লোক পাওয়া গেল না তুক্-তাক্ ঝাড়-ফুঁকের। কোন গুণীন বলতে সাহস করল না 'স্বর্গ ভুবনে উড়িল পাখী, মর্ত্ত ভুবনে বাসা, স্বরূপ তত্ত্বে কহ গো হাড়ির ঝি এ বিষ উপজিল কোথা।' নাগমাতা ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

পদ্মমণিও মারা গেল সাপের কামড়ে। ঝাঁপান হ'ল না, জীইয়ে রাখার মত গুণীন মিলল না।

পদ্মমণি মারা গেল ভলটুর ঘরে নয়, ঠাকুরঘরের কাছারী-বাড়ীতে। সে এক কলঙ্কের কথা। সে সময় না খেতে পেয়ে, একবেলা খেয়ে কত নারীকে পরের অনুগ্রহের সামগ্রী হতে হয়েছে, কত সতীর ইজ্জৎ নষ্ট হয়েছে, নেমে আসতে হয়েছে পঙ্কিলতার মধ্যে।

ছোট ঠাকুরও এ সুযোগ ছাড়ল না। পদ্মমণির যৌবন ছিল, রূপ ছিল। ছোট ঠাকুরের কুনজর পড়ল তার উপর। রাতের আঁধারে রাক্ষুসে হাত পদ্মমণিকে একদিন গ্রাস করল।...

'খোঁজ খোঁজ' রব পড়ে গেল রাজোয়াড়-পাড়ায়।... কোথাও সন্ধান মিলল না পদ্মমণির। শুধু পেঁচাগুলো বার-কয়েক অশুভ ইঙ্গিত জানাল...রাত-জাগা কয়েকটা পাখী বারকয়েক ইতস্ততঃ ভাবে উড়ে গেল।

ভোর রাতের সময় ছাড়া পেয়ে পদ্মমণি তার ছোট কুঁড়ে ঘরে ফিরে আসছিল টলতে টলতে। আঁচলে ঠাকুরঘরের ধানবিক্রীর একমুঠো টাকা। মনসামেলার সম্মুখে নাগ-মাতা তাকে দংশন করল, কলঙ্কের বোঝা আর বইতে হ'ল না।

মাস পেরিয়ে গেল, বছর ঘুরে গেল। পদ্মমণির চলে যাওয়ায় ব্যথা ভলটু ভুলতে পারল না।

ছোট ঠাকুর একদিন নিজে ডেকে পাঠাল, ভলটু আমার ঘরে মাহিন্দার থাক ন—নইলে ভাগচাষ কর।

—হ দেখি ন।

ছোট ঠাকুর বলল, মরা হাজা বছরে নাগমাতার কোপে অনেকেরই তো অনেক কিছু গেছে—সে সব ধরে থাকলে পুরুষমানুষের চলে না। তা ছাড়া তোদের সমাজে শুঙা প্রথা রইছে ন—তুই সাঙা করে আবার সংসারী হ। আমি সাহায্য করব।

ভুলবার ছেলে নয় ভলটু। প্রতিশোধ সে একদিন নেবেই। তবু ছোট ঠাকুরের কথা ভলটুর মনে ধরল। সত্যিই তো পুরুষমানুষের ক্ষত বেশীদিন জীইয়ে রাখা চলে না।

সাঙা করল ভলটু। লাস্যময়ী, ক্রীড়াচঞ্চলা সাঙা-করা বউ। নাম রাণী। আগের পক্ষের বউয়ের রূপার গয়না ছাড়াও আরও দু'এক খান গাড়িয়ে দিল ভলটু। মাথায় খড়ের বিড়ের উপর মাটির কলসী চাপিয়ে বউ যখন বিলে জল আনতে যায়, না চেয়ে থাকতে পারা যায় না। ভলটু বউকে কারও ঘরে খাটতেও পাঠায় না। দূর, দূর—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটিয়ে তিন সের ধান দেবে—না, না ভলটুই দুজনের খাবার মত রোজগার করতে পারবে।

কিন্তু আজ মতিলাল তাকে এ কি শুনাল, বউ পলাইছে রে। কোথায়, কোথায়—বাপের ঘরে, না অন্য কোনখানে?

ভলটু গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।

মুরগীগুলো ওধারে ছাইগাদায় লাফালাফি করছে, শুয়োরগুলো শুয়ে শুয়ে চুক চুক শব্দ করছে। ওগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢোকাতে হবে।...

ও-পাড়া থেকে হাসি-হাসি মুখে পরী-বউ এগিয়ে এল।

রাণীর সই পরী-বউ।

—কি সেঙাৎ (বন্ধু) মনমরা হয়ে বসে যে।

—হ রাণী পলাইছে।

ভলটুর বুড়ো মা কেঁদে উঠল।

পরী-বউ অতি কাছে গিয়ে বসল ভলটুর। ফিসফিস করে বলল, রাণী আমার ঘরে গেছলি। সইয়ের পেটে ছেলে আইছে। তোর ঘরের চালে ত এখনও খড় উঠে নাই। ঝড়ঝাপটার দিন আসছে ন—তাই সই বাপের ঘরে ছেলে হওন লাগি অগ্রিম চইলা গেল।

ভলটু পরী-বউয়ের ডান হাতটা টিপে ধরল:—সত্যি বলছিস স্ঙাৎ ?

কালো মেঘ কেটে গিয়ে আলোর ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল ভলটুর চোখে মুখে।

আহা, লজ্জায় সুখবরটা রাণী দিতে পারে নি গো। কিন্তু সন্তানের উপর মায়ের কি টান দেখ! কালবৈশাখীর দিন আসছে। সময়ে-অসময়ে নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য চলবে। এখনও ঘর ছাওয়ানো হয় নি। ঘরে শুয়ে থাকলে চাঁদের আলো লুকিয়ে প্রবেশ করে খেলা করে বেড়ায়। হাতে টাকাও তেমন নেই। অনেক ভেবে চিন্তে রাণী তার বাপের টালির ছাদনঘরে চলে গেছে।

বেশ করেছে রাণী, বুদ্ধিমতীর কাজ করেছে ভলটুর সাঙা-করা বউ।

ভলটু লজ্জারক্তিম মুখে তার বুড়ো মাকে বলল, শুনুন মা, স্ঙাৎ কি বলছে···।

সাগর-পাখী

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

সাগর-পাখীরা বেঁধেছে কুলায় সাগর বেলায়—শাখে ;
ঘরকন্নার খুঁটিনাটি নিয়ে কত যে মাতিয়া থাকে!
উতলা বাতাসে পাখা ঝাপটিয়া খাবার খুঁজিয়া মরে,
যুগলে যুগলে কত কুতূহলে কিচির-মিচির করে ,
নিবিড় নেশায় সাগর-শীকরে ডানায় মিলায় ডানা ;
ডিম পাড়ে, আর তা দিয়ে আবার ফুটায় স্নেহের ছানা ;
রোদে-'জাড়ে'-ঝড়ে শতবার ক'রে উড়িতে শিখায় তারে।
সাগর-পাখীরা বেঁধেছে কুলায় অকূল সাগর-পারে।

২

সাগর গড়ায়—উথলিয়া যায়, প্রবাহে প্রবাহে তার
কত কথা যেন পড়ে আছাড়িয়া সিকতায় অনিবার!
কিছু যেন তার বোঝা যায়, আর বাকী সবই বুঝি মায়া!
সাগর-পাখীর আঁখির তারায় কাঁপে কি তাহারই ছায়া ?
সে ছায়া জানায় ডানায় ডানায় অজানার ঈশারা কি ?—
মাঝে মাঝে তাই উদাস—আকুল হয় কি সাগর-পাখী ?
আঁখি মেলি বুঝি করে খোঁজাখুঁজি ; গোধূলি-ধূসর দূরে
ডানা মেলে দিতে চাহে কি চকিতে অশরীরী কার সুরে ?

৩

পাতায় পাতায় পেতেছে কুলায় কত না বুকের স্নেহে!
কত মমতার লীলা বার বার সুখের—সাধের গেহে!
পুলকে আলোকে পাখায়-পলকে-মুখে মুখে কি যে তাপ!
তবু তারই পরে প্রহরে প্রহরে ঝরে কার অভিশাপ ?
সে কোন্ নিয়তি কুলায় ভুলাতে বুলায়—দুলায় মায়া ?
মনে হয় যেন সাগর-পারের সুখের জীবনই ছায়া।
কায়া ধরে কোন্ অচেনা জীবন ? নেশায়—নয়নজলে
নিঠুর মধুর বাসা-বদলের এ কি লীলা ফিরে চলে।

কণ্ঠস্থ করা

(মূল জার্মান থেকে অনূদিত)

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

[কণ্ঠস্থ করার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত উদাসীন বলে মনে হয়। প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে কণ্ঠস্থ করা যে কিরূপ মূল্যবান্ জার্মান দার্শনিক রবার্ট বোয়েরিঙ্গার তাঁর Auswendiglernen নামক প্রবন্ধে অতি সুন্দর ভাবে তা দেখিয়েছেন। আমাদের শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষার্থীগণ পড়ে লাভবান হবেন আশায় প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ প্রকাশে প্রয়াসী হলাম। অনুলিখন প্রভৃতি ব্যাপারে সহায়তালাভের জন্য শ্রীমান্ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্তকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।]

কণ্ঠস্থ করার অভ্যাস অতিশয় প্রয়োজনীয়। মোটের উপর শিক্ষার আরম্ভ ও প্রগতি উভয়ই স্মৃতির তথা মুখস্থ করার উপর নির্ভর করে। মনের বিকাশের পক্ষে এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী পন্থা আর দ্বিতীয়টি নেই। পা না তুলে হাঁটা যেমন সম্ভব নয়, মুখস্থ না করে শিক্ষালাভও তেমনি অসম্ভব। সিঁড়ি-খেলানো পাহাড়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠা ক্রমেই যেমন সহজ হয়ে আসে, মুখস্থ করার বেলায়ও তেমনি; অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করার ক্ষমতাও বাড়তে থাকে।

বাইবেলের অনেক জায়গা যাঁর কণ্ঠস্থ লোকে তাঁকে বলে বাইবেল-বিশারদ। মহাকবি গ্যয়টে এই ধরনের মুখস্থশিক্ষার উপযোগিতা উপলব্ধি করে অজস্র প্রশংসা করে গেছেন। প্রমাণস্বরূপ আমরা তাঁর 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য ডিভান' পুস্তকের দু'একটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি।

"বিগত শতকের প্রথমার্দ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, জার্মানীর প্রোটেষ্টাণ্টগণের মধ্যে শুধু পাদ্রীদের নয়, সাধারণ লোকদেরও বাইবেল সম্বন্ধে এমন গভীর জ্ঞান ছিল যে, বাইবেলের অনেক বাক্য ও অংশ সম্বন্ধে তাঁদের জীবন্ত গ্রন্থ বলা যেত এবং ঐ বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রামাণ্য বলে পরিগণিত হ'ত। তাঁরা বাইবেলের প্রায় অংশই মুখস্থ বলে যেতে পারতেন এবং এতে করে তাঁদের উচ্চস্তরের জ্ঞান লাভ হ'ত। এ'দের মনে প্রকৃষ্ট বিষয়ই স্থান পেত এবং তাঁদের হৃদয় ও মন বাইবেলের পবিত্র ভাবধারায় পুষ্টিলাভ করায় তাঁদের অনুভূতি এবং ভাবধারা এর দ্বারা সম্যক্ প্রভাবিত হ'ত। লোকে এ'দের বাইবেল-বিশারদ (bibelfest) বলত এবং এটা যথেষ্ট সম্মানসূচক ছিল। গ্যয়টে আরও বলেছেন যে, কোরান মুখস্থ করা ও নকল করা মুসলমানদের কেবল গৌরবের কথা নয়, পরন্তু তা ধর্মের অঙ্গ বলেও স্বীকৃত। কোরানের সমুদয় বয়েৎ নির্ভুল আবৃত্তি ও আয়ত্ত করার পরেই এর ব্যাকরণ আরম্ভ করার নির্দ্দেশ। সমুদয় কোরান মুখস্থ করার আগে তার অর্থ বুঝতে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

ফলত: যিনি বিভিন্ন সদবিষয় স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রেখেছেন তিনি সর্ব্বদা সকলপ্রকার অবস্থার জন্যই প্রস্তুত। কোনও অবস্থাবিপর্য্যয়ই তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য নষ্ট করতে পারে না। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কোনও না কোন কবিতা তাঁর মনে পড়বে—স্মৃতির আড়াল থেকে বহুদিন-সঞ্চিত কোনও নিগূঢ় ভাব বা দৃশ্য সহসা তাঁর চেতনায় উদঘাটিত হয়ে তাঁর মনে আনন্দ ও শান্তির সঞ্চার করবে। এরূপ স্মৃতি-সম্পদশালীর মনে কবিতার এক-একটি কলি গুঞ্জন করে উঠবে—তিনি জনবহুল সমাজে বা জনবিরল নির্ব্বাসনেই থাকুন, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অনুভূতিতে তাঁর চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠবে। ঘটনাচক্রে যদি তিনি অন্ধ হয়েও পড়েন তবু তিনি বসে বসে শুভ্র উজ্জ্বল সূর্য্যালোকের স্তোত্র বা নববসন্তের সবুজ সমারোহের কোনও বর্ণনা যখন আবৃত্তি করেন তখন তাঁর জীবনের এই চরম দুর্গতির অন্ধকারও যেন স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। স্মৃতি যতদিন অটুট থাকে, এই অফুরন্ত আনন্দের উৎসও ততদিন জীবন্ত থাকবে। স্মৃতির উৎসমূলে ভাবরাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলিকেই শুধু স্থান দেওয়া উচিত। তুচ্ছ ক্ষণস্থায়ী বিষয় দিয়ে স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করা সময় ও শক্তির অপচয় মাত্র। যা সত্য, শিব ও সুন্দর সেই সমস্ত বিষয়ই গ্রহণীয়। কবিতার মধ্যে শুধু সেই সব কবিতাই কণ্ঠস্থ করা উচিত যার অন্তর্নিহিত হৃদয়াবেগ ও মর্য্যাদা কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে গেছে। সত্যিকারের কবিদের চিনিয়ে দেবার দরকার করে না। কিন্তু যাঁদের ক্ষেত্রে সংশয় বিদ্যমান—মুখস্থ করার জন্য তাঁদের রচনা বাদ দেওয়াই সমীচীন। কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে নিশ্চিত পাথেয়ই মূল্যবান্ ও গ্রহণীয়। পরিমাণে বহুল কিন্তু তুচ্ছ ও অসার্থক রচনার মূল্য নেই। দান্তে, সেক্সপীয়ার, গ্যয়টে, গেওরগ প্রমুখ মনীষীদের ভাবধারা থেকে যদি স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখা যায় তবে তার চাইতে ভাল সম্বল জীবনে আর কি হতে পারে? এই ধরনের শিক্ষার মস্ত একটা সুবিধা এই যে, এঁতে ঠকবার সম্ভাবনা বিরল।

মুখস্থ করার প্রক্রিয়া: কেউ মুখস্থ করে জোরে জোরে শব্দ করে পড়ে, কেউ বা নিঃশব্দে মনে মনে পড়ে। কানে শোনা, আর চোখে দেখাতে মুখস্থ করা দ্রুততর হয়। মুখস্থ করার পক্ষে কোন্ নিয়ম প্রশস্ত?—যাতে সহজে মনোযোগ আসে—ক্লান্তি বা বিরক্তি না জন্মে। মুখস্থ করবার জন্য কেউ পড়ে বসে বসে—কেউ

বা শুয়ে শুয়ে—এক কথায় শরীরকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের ভঙ্গীতে রেখে। অনেকে আবার পড়েন—অঙ্গভঙ্গী করে, হেলে দুলে, পাদচারণা করতে করতে। কোনও বিষয় কণ্ঠস্থ করবার কালে মনোযোগের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে বা মনকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করতে পারে এমন সব বিষয় সর্বপ্রযত্নে পরিহার করতে হবে।

অনুলিখন বা কপি করার বেলায় যেমন, কবিতা মুখস্থ করার বেলাতেও অনেকটা তেমনি—বরং মুখস্থের বেলায় কবিতার প্রতিটি শব্দাংশ আয়ত্ত করা আরও বেশী দরকার। আবৃত্তিকালে কবির রচনা থেকে কমানো বা বাড়ানো অনুচিত। কবি ঠিক যেমনটি চেয়েছেন ঠিক তেমন উচ্চারণ করতে হবে প্রতিটি শব্দের। তাই শিক্ষার্থীকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে যাতে অবিকল মুখস্থ হয়—কোনরূপ বিচ্যুতি বা বিকৃতি এসে না পড়ে—যাতে সমগ্র বিষয়টি পুরোপুরি আয়ত্ত হয়। কপি করার বেলায় লেখাটিকে ভাগ করতে হয়, সাজাতে হয়, তাতে মনে রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু পড়ে মুখস্থ করাতে সে সুবিধা থাকে না—তাই মুখস্থ করায় নকল করার চাইতে বেশী মনোযোগের আবশ্যক হয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়টিকে সর্বাগ্রে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। কবিতার সারমর্ম, প্রধান ভাব বা মুখ্য চিত্র শিক্ষার্থীর মনে দাগ কেটে বসবে। কবিতায় বিশেষ বিশেষ শব্দের উপর জোর পড়ে—তাদের কেন্দ্র করে বহু শব্দের যোজনা হয়, সর্বোপরি ছন্দের বন্ধন শব্দগুলিকে জীবন্ত করে তোলে।

কবিতা মুখস্থ করবার প্রারম্ভে উবর অংশগুলি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে শিক্ষার্থীর মনোযোগ গিয়ে পড়বে রসালো বা মুখ্য অংশগুলির উপর। স্মৃতির পটে কবিতাটিকে তখন মনে হবে যেন সদ্য নক্সাকাটা ছবি। মাঝে মাঝে মূল চেহারা আর রং ফুটে উঠেছে—বাকি অংশ ফাকা ফাকা। এই ফাকা জমিনের উপর রেখা আর রং বুলাবার জন্য বার বার বই খুলে দেখা ঠিক নয়। স্মৃতির আড়াল থেকে হারানো অংশগুলি ভেবে ভেবে খুঁজে এনে বসাতে হবে। ভুলে-যাওয়া অংশগুলি মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করার কাজ এগোতে থাকবে। তাই কবিতার একটি ভুলে-যাওয়া চরণ মনে গেঁথে রাখবার জন্য দশবার বই না খুলে দশ মিনিট ধরে স্মরণ করার চেষ্টা বেশী উপকারী। কবিতাটি মোটামুটি মুখস্থ হবার পর আবার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা দরকার—যদি বা সামান্য কোনও ভুলত্রুটি থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত কবিতার নির্ভুল রূপটিই মনে গ্রথিত হয়ে থাকবে।

মুখস্থ-প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক শিথিল ও অগোছালো প্রয়াস বারংবার অনুশীলন দ্বারা দৃঢ় করতে হবে। ঘণ্টাকয়েক বিরতির পরে আবার অনুশীলন করা দরকার। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে এবং ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে, তা সে রাত্রেই হোক আর প্রাতঃকালেই হোক, আবার মুখস্থ-প্রক্রিয়ার অনুশীলন করতে হবে।

উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এইভাবে মুখস্থ করার কথা জানেন। তাঁরা প্রথম বয়সে এই সাধনা করেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মুখস্থ-বিদ্যার অনুশীলন করা, শিক্ষার্থীদের নিকট এর অশেষ মূল্য ও গুরুত্বের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই বিদ্যা একদিকে যেমন আমাদের মনকে পূর্ণতা দান করে ও শক্তিশালী করে তোলে, অন্যদিকে আবার তেমনি এ হচ্ছে প্রকৃতির অন্যতম বিশিষ্ট অবদান—কাব্যের অনুপম মাধুরীমণ্ডিত ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিত্তবৃত্তি-বিকাশের পরম সহায়তা করে।

জার্মানীর জ্ঞানরাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিকপাল হ্বিলহেলম ফন হুমবোল্ট তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বরাবরই এর চর্চার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন। মুখস্থবিদ্যার সুফল কীর্তনে তিনি কদাপি কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর একজন মহিলা-বন্ধুকে তিনি এ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

"তুমি মনে রাখতে পার না বলে আক্ষেপ করছ—যাক আমার কথাগুলি মন দিয়ে শোন। অধিকাংশ লোকই নিজের সম্বন্ধে সঠিক বলতে পারে না। স্মৃতিশক্তি বিষয়ানুগ। কোনও লোকই সব বিষয়ে সমান স্মৃতিধর হতে পারে না। একমাত্র কবিতা মনে রাখবার ক্ষমতা অল্পাধিক সকলের মধ্যেই সমান দেখা যায়। এই পটুতা কবিতার রসবোধ, কাব্যিক বিচারশক্তি ও আবৃত্তি-প্রতিভার উপর নির্ভর করে। মানুষের জীবন মহত্তর করবার পথে এ ভগবানের বিশিষ্ট দান। সুষ্ঠু আবৃত্তি শুধু শব্দের ঝঙ্কার নয়—জীবনের নানাদিকে এর প্রভাব পরিব্যাপ্ত। আবৃত্তি একদিকে লোকের সূক্ষ্ম অনুভূতি জাগিয়ে তোলে, প্রাদেশিকতামুক্ত নির্ভুল ও স্পষ্ট উচ্চারণের অভ্যাস জন্মায় এবং একইকালে বহু লোকের নিকট প্রকৃত শিক্ষামূলক বিষয় পরিবেশন করে। অপরদিকে আবৃত্তিকারীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য—গুরুগম্ভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর,—প্রতি শব্দাংশের অধিরোহণ-অবরোহণের সূক্ষ্ম অনুভবশীল শ্রবণেন্দ্রিয়, প্রকৃত কবিজনোচিত মনোভাব আর সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এমন একটি মন যার মধ্যে সমুদয় মানবীয় সেন্টিমেন্ট নিখুঁত অথচ শক্তিশালীভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবার সম্ভাবনায় ভরপুর। সত্যিকারের সুন্দর কবিতার এরূপ আবৃত্তি যে ধরনের রসঘন আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করে বাস্তবিক তার তুলনা মেলে না। আমার বেলায় প্রায়শঃ এরূপ ঘটেছে অত্যধিকমাত্রায় এবং জীবনে এরূপ মুহূর্তগুলিই আমার কাছে সবচেয়ে মধুর ও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কবিতা বা কবিতার অংশবিশেষ মুখস্থ করে রাখায় আমাদের নিরালা জীবন সরস ও মধুময় হয়ে ওঠে—জীবনের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে এরা আমাদের মহত্তর করে তোলে—প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্রতা নীচতার বহু ঊর্দ্ধে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করে। ছেলেবেলা থেকে হোমার, গ্যয়টে, শিলারের বহু উৎকৃষ্ট রচনা আমার মনের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছি; জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেগুলি মূর্ত হয়ে ওঠে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, জীবনভোর এরা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। যেসব মনীষীর নাম পৃথিবীতে চির উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁদের কাছ থেকে যে মহৎ চিন্তা ও পবিত্র ভাবধারা আমরা

পেয়েছি তাতে আপ্লুত হওয়া মানবজীবনের সার্থকতালাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা।"

একজন শ্রোতা বা সূত্রধার যিনি মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে শিক্ষার্থীর নির্ভুল ও নিখুঁত আবৃত্তি যাচাই করে দেখবেন, এমন কারুর সহায়তা পেলে মুখস্থ করার কাজ সহজ হয়। এই প্রচেষ্টায় রচনাটি সহায়কেরও মুখস্থ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থী ও সহায়ক উভয়েরই যদি ছন্দবোধ থাকে তবে স্বতঃই আবৃত্তি এবং পাঠের পাল্লা লেগে যায় এবং সমগ্র পরিবেশ কবিত্বময় হয়ে ওঠে। কবিতার স্তবকভেদে বর্ণিত বিষয়টি ভাগ করে নেওয়া হয়। এঁদের আবৃত্তি যেন কবির উদ্দেশেই সুর ও ছন্দের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন। ভাষা ও শব্দে বোনা জলছবি আবৃত্তিকালে যেন শিক্ষার্থীর কণ্ঠ হতে বেরিয়ে স্রোতের মত বয়ে যেতে থাকে। স্তবকের পর স্তবক—কণ্ঠস্বরের নামা-ওঠা—অবশেষে স্বর মন্থর ও ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে যাওয়া—এই যে অভিজ্ঞতা, এই যে অনুভূতি এ একান্তভাবেই শিক্ষার্থীর নিজস্ব সম্পদ। এতে তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ভগবানের আশীর্ব্বাদপূত এই মনোজগৎ হতে কদাচ তার বিচ্ছেদ ঘটে না।

মল্লবীর বা ব্যায়ামকুশলীর শরীর যেমন কঠোর নিয়ম-পালন দ্বারা সুগঠিত—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বহুল-অভ্যস্ত সঞ্চালন যেমন তার মধ্যে বিশিষ্টরূপে মূর্ত্ত—যিনি কবিতা মুখস্থ করার অভ্যাস করেছেন তাঁর মনও তেমনি সুগঠিত ও শক্তিমান্। এ কারণ কোন বিদেশী ভাষার ভাব উপলব্ধি করার পক্ষে সেই ভাষার কবিতা কণ্ঠস্থ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা। সর্ব্বাগ্রে বাক্যের গঠন ও ভঙ্গী এমন করে বুঝতে হবে যাতে করে বিষয়টি স্বচ্ছরূপে প্রতিভাত হয়—এর পরে বুঝতে হবে ভাষার অন্তর্নিহিত মহত্ব ও কবিত্বময় শব্দরূপ। অতঃপর বিষয় এবং মাত্রা, শব্দ এবং আকার, অর্থ এবং ছন্দ—এইরূপে ধীরে ধীরে ভাষাকে চিনতে হবে। এইভাবে বিদেশী ভাষার কবিতার স্তবক যখন মাত্রা ভাগ করে নিখুঁত উচ্চারণ ও নির্ভুল প্রকাশের ক্ষমতা জন্মাবে বা কণ্ঠস্থ হয়ে যাবে তখন ঐ ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পথ স্বতঃই সহজ হয়ে আসবে।

স্বর্গ-পারিজাত

শ্রীবেলা ধর

বিস্ময়ে অবাক হয়ে রই
কোথা ছিলি, কোথা হতে নেমে এলি ঐ
অনুপম কোমলতা নিয়া
গৌরবে উচ্ছ্বসি ওঠে হিয়া
অতৃপ্ত চিত্তের সাধ মেটেনাকো পলকে পলকে
নেহারিয়া তোকে।

আমার এ দেহ হতে করিয়া চয়ন
তোর এ জীবন
সৃষ্ট হল সংসারের নন্দনকাননে
এই কথা যত ভাবি মনে
এ কিরে পুলক জাগে সমগ্র সত্তায়
চিত্তে এ কি বিস্ময় জাগায়!

মনে হয়,
এই সত্য—নয় সত্য নয়,
বুঝি তুই ফুটেছিলি স্বরগের নন্দনকাননে
পারিজাত বনে।
(সেই) পারিজাত কুসুমের মালিকা রচিয়া
মনোরম কণ্ঠ সুশোভিয়া
দেবরাজ সভামাঝে স্বর্গের অপ্সরা
ছিল নৃত্যপরা।

সেই নৃত্যপরা উর্ব্বশীর মালিকাবিচ্যুত
তুমি শুভ্র পূত
একখানি স্বর্গ-পারিজাত
বিধাতার শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ।

"কহে শুভঙ্কর, মৌজুদ গন"

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর তাঁহার আর্য্যার শেষে মৌজুদ গনিতে উপদেশ দিয়াছেন। ১৯৪৭ সনে ভারতে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাই আজ নূতন করিয়া মৌজুদ গনিবার আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে। স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে আমাদের দেশ কত গরীব ছিল এবং এই দশ বৎসরে দেশের কতটা আর্থিক উন্নতি হইয়াছে, আমাদের মাথা-পিছু জাতীয় আয় পূর্ব্বে কত ছিল এবং এখনই বা কত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতে হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ণয় করা আবশ্যক।

আমাদের জাতীয় জীবনে মানুষের কর্ম্মশক্তি অবিরাম কর্ম্ম-প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই কর্ম্ম-প্রবাহ দুই শ্রেণীর পণ্য উৎপাদন করিতেছে—(১) বাস্তব পণ্য ও (২) অবাস্তব সেবা।

কোন এক নির্দ্দিষ্ট দেশে কোন এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদিত উক্ত দুই শ্রেণীর পণ্যের সমষ্টিগত মূল্য উক্ত দেশের, উক্ত সময়ের গ্রোস জাতীয় উৎপাদন হিসাবে ধরা যাইতে পারে।

এইখানে বলা আবশ্যক যে, উৎপাদনের অর্থ—সৃষ্টি করা নয়। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল উপাদান দিয়াছেন সেগুলিকে মানুষের কর্ম্মশক্তি স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত করিতে পারে মাত্র। এই স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত পণ্য-সৃষ্টির নাম উৎপাদন। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে। মাটি ভগবৎ-সৃষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থ। কৃষক মাটির প্রাকৃতিক উপাদানগুলির সহিত আরও কতকগুলি প্রকৃতিজাত জৈবিক সার মিশাইয়া দিয়া তাহাকে চাষের উপযোগী করিয়া তুলিল। সেই জমিতে সে গমের বীজ বপন করিয়া দিল ও কালে প্রচুর গম পাইল। সেই গম সে নিকটস্থ কোন পেষাই কলের মালিকের নিকট বিক্রয় করিয়া দুই হাজার টাকা পাইল। কল-চালক সেই গম পেষাই করিয়া আটা অথবা ময়দায় পরিণত করিল। সেই আটা অথবা ময়দা সে কোন রুটির কারখানায় আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিল। রুটি প্রস্তুতকারক তাহার দ্বারা যে রুটি তৈয়ারি করিল তাহা পাঁচ হাজার টাকা মূল্যে বিক্রীত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, পণ্য উৎপাদন-স্রোতে ক্রমাগত স্থানান্তরিত ও রূপান্তরিত হইতে থাকে। পণ্য কাঁচামাল হইতে তৈরী মালে পরিণত হইতে বহু হাত-বদল করে। কাজেই আমরা যদি এই তিন প্রকারের উৎপাদনের সমষ্টি অর্থাৎ ২০০০৲+২৫০০৲+৫০০০৲= ৯৫০০৲ টাকা জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসাবে ধরি তাহা হইলে ভুল করা হইবে। এইরূপ স্থলে হয় চূড়ান্ত মালের মূল্যকেই শুধু ধরিতে হইবে, নতুবা কাঁচামাল হইতে চূড়ান্ত-মাল পর্য্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্যগুলির সমষ্টিকেই ধরিতে হইবে। আমাদের উপরোক্ত উদাহরণে চূড়ান্ত মালের মূল্য পাঁচ হাজার টাকা। কাঁচামাল গমের মূল্য ছিল দুই হাজার টাকা। কল-চালক ঐ গমকে পেষাই করিয়া উক্ত মূল্যের সহিত পাঁচ শত টাকা যোগ করিয়া দিল। তাহাতে বর্ত্তমান মূল্য দাঁড়াইল আড়াই হাজার টাকা। রুটিওয়ালা এই মূল্যের সহিত আড়াই হাজার টাকা যোগ করিয়া দিল। কাজেই চূড়ান্ত মূল্য দাঁড়াইল পাঁচ হাজার টাকা।

গ্রোস জাতীয় উৎপাদনের অঙ্গীভূত চূড়ান্ত বাস্তব ও অবাস্তব পণ্যগুলিকে উৎপাদন এবং ভোগের ভিত্তিতে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১। ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্য। স্থায়ী পণ্য যথাঃ বাড়ী, গাড়ী ও অস্থায়ী পণ্য যথা খাদ্য, চলচ্চিত্র প্রভৃতি ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২। ব্যক্তিগত উৎপাদনের পণ্য। যথাঃ কারখানা-বাড়ী, যন্ত্রপাতি, গাড়ী প্রভৃতি।

৩। সরকারী পণ্য। ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনপণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

গ্রোস জাতীয় উৎপাদনের অঙ্গীভূত চূড়ান্ত বাস্তব ও অবাস্তব পণ্যগুলিকে আবার চারি শ্রেণীর কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফল-স্বরূপ ধরিয়া লইয়া চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ

১। কৃষি। পশুপালন, বনজাত দ্রব্য, মাছের চাষ এবং কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ের উপযোগী করিবার যাবতীয় কাজ ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২। খনিজদ্রব্য উত্তোলন, যন্ত্রশিল্প, ছোটখাটো শিল্পের কাজ।

৩। (ক) ব্যবসা-বাণিজ্য (খ) পরিবহন ব্যবস্থা (গ) সংস্করণ বা সংবাদ চলাচল ব্যবস্থা।

৪। শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, সরকারী চাকুরিয়া চাকর-বাকর, ভাড়াটিয়া-বাড়ীর বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর পণ্যের উপর ভিত্তি করিয়া সাধারণতঃ ভারতীয় গ্রোস জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করাহয়।

যে সকল রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে সেখানে প্রত্যেক উৎপাদিত পণ্য কাহারও না কাহারও অধিকারে। হয় উহা কোন ব্যক্তির, না হয় কোন প্রতিষ্ঠানের অথবা সরকারের। কাজেই আমরা বলিতে পারি, গ্রোস জাতীয় উৎপাদন গ্রোস জাতীয় আয়ের সমান। কিন্তু গ্রোস জাতীয় আয়ের মধ্যে রহিয়াছে সরকারকে দেয় কর, যন্ত্রপাতির সংরক্ষণ, মেরামত ও পরিবর্ত্তনের ব্যয়, বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আনয়নের ব্যয়।

কাজেই গ্রোস জাতীয় আয় হইতে সরকারী কর, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ, মেরামত, পরিবর্ত্তনের ব্যয় ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বিদেশীদের নীট পাওনা বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে।

এইরূপে নির্দ্ধারিত নীট জাতীয় আয় ভারতের লোকসংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে প্রত্যেকের মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

ইংরেজ আমলে ১৮৬৭-৬৮ সনে দাদাভাই নওরোজী প্রথম ভারতের জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার চেষ্টা করেন। পরে ১৮৯৫ সনে এট্‌কিনসন, ১৯২১-২২ সনে শা ওখাম্বাটা এই চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের হিসাবে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি ছিল। তাই তাঁহাদের হিসাবের কোনটাই নির্ভরযোগ্য হয় নাই। আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হিসাব পাই ডক্টর ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর নিকট হইতে। তাঁহার হিসাবমতে ১৯৩১-৩২ সনে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭৬৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে ভারতীয় জনগণের মাথাপিছু আয় দাঁড়ায় বাৎসরিক ৬৫৲ বা মাসিক প্রায় ৫।৷৹ টাকা। এই হিসাবের এখন এক ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া অন্য কোন ব্যবহারিক মূল্য নাই; কারণ দেশবিভাগের ফলে অখণ্ড ভারতের কৃষিপ্রধান অঞ্চলগুলির একটা বড় অংশ পাকিস্থানে চলিয়া গিয়াছে।

১৯৪৯ সনের ৪ঠা আগষ্ট ভারত সরকার জাতীয় আয় নির্দ্ধারণকল্পে এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটি ১৯৫১ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তাঁহারা ১৯৪৮ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪৯ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত পুরা এক বৎসরের নীট জাতীয় আয়ের হিসাব দেন। তাঁহাদের হিসাব ও ১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩ এবং ১৯৫৩-৫৪ সনের যে আনুমানিক হিসাব পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল:

নীট জাতীয় আয় শত কোটি টাকার অঙ্কে

উৎপাদন-প্রচেষ্টার প্রকৃতি বা আয়ের উৎস		১৯৪৮-৪৯	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪
কৃষি:					
কৃষিকর্ম্ম, পশুপালন ও ঐ জাতীয় কর্ম্মপ্রচেষ্টা		৪১·৬	৪৮·৮	৪৬·৯	৫২·৯
বনজাত দ্রব্য উৎপাদন		০·৬	০·৭	০·৬	০·৭
মাছের চাষ		০·৩	০·৪	০·৪	০·৪
	মোট	৪২·৫	৪৯·৯	৪৭·৯	৫৪·০
খনির কাজ, যন্ত্রশিল্প ও কুটীরশিল্প:					
খনিজদ্রব্য উত্তোলন		০·৬	০·৯	০·৯	১·০
কারখানা		৫·৫	৬·৯	৭·০	৭·৩
ক্ষুদ্রশিল্প		৮·৭	৯·৫	৯·৭	৯·৭
	মোট	১৪·৮	১৭·৩	১৭·৬	১৮·০
ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহন, সংসরণ					
সংবাদ চলাচল		০·৩	০·৪	০·৪	০·৪
রেলপথ		১·৭	২·১	২·০	২·০
ব্যাঙ্ক ও বীমা		০·৫	০·৮	০·৭	০·৮
অন্যান্য ব্যবসা ও পরিবহন		১৩·৫	১৪·৬	১৪·৭	১৪·৮
	মোট	১৬·০	১৭·৯	১৭·৮	১৮·০
অন্যান্য সেবাস্রোত					
বিভিন্ন পেশা বা স্বাধীন জীবিকা		৪·৩	৫·০	৫·২	৫·৪
সরকারী চাকুরি		৪·০	৪·৫	৪·৬	৪·৯
গৃহস্থ-বাড়ীর চাকর-বাকর		১·২	১·৪	১·৩	১·৪
ভাড়াটিয়া বাড়ী হইতে সেবাস্রোত		৩·৯	৪·১	৪·৩	৪·৪
	মোট	১৩·৪	১৫·০	১৫·৪	১৬·১
একুনে নীট জাতীয় উৎপাদন (উৎপাদক মূল্য হিসাবে		৮৬·৭	১০০·১	৯৮·৭	১০৬·১
বিদেশের প্রাপ্য আয় বাদ		০·২	০·২	০·১	০·১
নীট জাতীয় আয়		৮৬·৫	৯৯·৯	৯৮·৬	১০৬·০

(আনুমানিক)

১৯৫৪-৫৫, ১৯৫৫-৫৬ ও ১৯৫৬-৫৭ সনের মধ্যে তিন বৎসরে নীট জাতীয় আয় অল্প কিছু বাড়িয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই তিন বৎসরে শ্রমিক-বিরোধ, উন্নয়নকার্য্যে অপচয় ও বিশৃঙ্খলা, প্লাবন প্রভৃতি দৈব উপদ্রব, খনি-দুর্ঘটনা ও সাধারণ নির্ব্বাচন প্রভৃতি কারণে উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। ধরিয়া লওয়া যাক—আলোচ্য বর্ষে উর্দ্ধসংখ্যক নীট জাতীয় আয় বাড়িয়া ১০৮'০ (শত কোটি টাকার অঙ্কে) দাঁড়াইয়াছে। তাহা হইলেও ভারতের জনগণের মাথাপিছু মাসিক আয় ২৫৲ টাকার বেশী হয় না। মাসিক ২৫৲ টাকা আয়ের উপর নির্ভর করিয়া আজকাল একজনের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যে কি দুর্ঘট ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয়। এখন পর্য্যন্ত যে ভারতবাসীদের জীবন-যাত্রার মান ভয়ঙ্কর ভাবে নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাতে জাতীয় উৎপাদনও ব্যাহত হইতেছে। জীবন-যাত্রার নিম্ন মান, অদক্ষতা ও স্বল্প উৎপাদন হাত ধরাধরি করিয়া চলে।

যেহেতু গ্রোস জাতীয় আয় হইতে সরকারী কর, যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের ব্যয় ও বিদেশীদের পাওনা বাদ দিয়া নীট জাতীয় আয় নির্ণয় করিতে হয়, সেহেতু জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় সবই নির্ভর করে সরকারের করনীতির উপর। অত্যধিক করভার-পীড়িত রাষ্ট্রে জাতীয় উৎপাদন ব্যাহত হয়, নীট জাতীয় আয় কমিয়া যায় ও মাথাপিছু আয় সঙ্গে সঙ্গে কমিতে বাধ্য হয়। সরকারের করনীতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। স্বাধীনতালাভের পর আমাদের রাষ্ট্র গণতন্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ও কল্যাণব্রতী রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হয়। রাষ্ট্রের সরকার জনগণ নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হইলে ও জনকল্যাণে জনগণের দ্বারা পরিচালিত হইলে সে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা ব্রতী হইয়া থাকে। কিন্তু কল্যাণ রাষ্ট্রের কোন বাঁধাধরা সংজ্ঞা নাই। জগতের সব রাষ্ট্রই কমবেশী কল্যাণব্রতী। কল্যাণব্রতী না হইলে কোন রাষ্ট্রই বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কোথাও কোথাও গণতন্ত্র অথবা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও ব্রিটিশ আমল পর্য্যন্ত রাজতন্ত্রই সমধিক প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ আমলে আমলাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু সর্ব্বকালেই কখন কখন তদানীন্তন সরকার জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন—ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে।

পুরাকালে এক মুনি কোন এক রাজ্যের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজকন্যা মুনির আশ্রমে অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে একাগ্রচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। এক সময় মুনি-পত্নীর স্বর্ণালঙ্কার পরিবার সখ হইল। তাহার পরামর্শে মুনি অর্থ-প্রার্থনা করিয়া সেই রাজ্যের রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মুনিকে যথোচিত সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, "মুনিবর, আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি আপনাকে আমার রাজ্যের আয়-ব্যয়ের হিসাবটি দেখিতে অনুরোধ করি। ইহার মধ্যে যদি আপনি কোন উদ্বৃত্ত অর্থ দেখিতে পান অথবা যদি দেখেন এমন কোন খাতে অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছে যাহা প্রজার কল্যাণে ব্যয়িত হইবে না তবে তাহা আপনি নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। আমি সানন্দে তাহা আপনাকে দান করিলাম।" মুনি তন্ন তন্ন করিয়া হিসাব পরীক্ষা করিলেন। তিনি কোন উদ্বৃত্ত অর্থ দেখিতে পাইলেন না কিংবা এমন কোন খাতে অর্থবরাদ্দ দেখিলেন না যাহা প্রজার মঙ্গলে ব্যয়িত হইবে না। মুনি ব্যর্থমনোরথ হইলেও সানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

এই পৌরাণিক কাহিনীটির কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের জানা না থাকিলেও ইহাতে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের আদর্শ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আদর্শ অনুসৃত হইলে তাহা গৌরবজনক হইবে সন্দেহ নাই।

যখনই কোন রাষ্ট্র নিজেকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে তখনই রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রসূতি-সেবা, শিশু-পালন, শিশু-শিক্ষা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, কর্ম্মসংস্থান, অবসর-ভাতা, বেকার-ভাতা, বীমা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা যাবতীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে গ্রহণ করে। আর্থিক সঙ্গতি অনুসারে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এ বিষয়ে কতকটা তারতম্য হয় মাত্র। বর্ত্তমানে জগতের কয়েকটি রাষ্ট্র উপরোক্ত সবগুলি দায়িত্বই সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া যাইতেছে। ভারত এখনও ঐ সকল জাতির তুলনায় অনেক পশ্চাদ্‌পদ। এই সকল দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সাধারণতঃ চারি উপায়ে সংগ্রহ করা যাইতে পারে: (১) মুদ্রাস্ফীতি, (২) বৈদেশিক সাহায্য, (৩) দেনা, এবং (৪) কর।

১। গত মহাযুদ্ধের সময় আমাদের দেশ মুদ্রাস্ফীতির সম্মুখীন হইয়াছিল। তাহার কুফল এখনও আমাদের ভুগিতে হইতেছে। মুদ্রাস্ফীতির দরুন উচ্চমূল্যের ফলে স্থির-আয় ভোগী লোকদের অসীম দুর্দ্দশা হয়। উচ্চ দ্রব্য-মূল্য কমাইবার জন্ম এখনও আমাদের যুঝিতে হইতেছে। কাজেই এখন যদি মুদ্রাস্ফীতির নিকট আমরা আত্মসমর্পণ করি তাহা হইলে সরকার-প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার উপর

সাধারণের আস্থা শিথিল হইয়া পড়িতে পারে। পরিণামে সমগ্র মুদ্রাব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবারও সম্ভাবনা।

২। বৈদেশিক সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ভারত কোন সর্ত্তাধীনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিবে না, করা উচিতও নয়। যে রাষ্ট্র কোন সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই ভারতকে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক সেখানেও নৈতিক বাধ্য-বাধকতার কথা থাকিয়া যায়। তাহা ছাড়া সে দেশের কোন নূতন ধরনের যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে ও তাহার অংশ বদলাইতে আমাদিগকে সেই দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইরূপে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। পরিণামে ভারত সাহায্যকারী রাষ্ট্রের তাঁবেদারে পরিণত হইয়া তাহারই 'শক্তি-জোটে' যোগ দিতে বাধ্য হইতে পারে।

৩। রাষ্ট্র এরূপ ক্ষেত্রে দেনা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু দেনার দুইটি অসুবিধা আছে। দেনা করিলে মাঝে মাঝে সুদ দিতে হয় এবং মেয়াদ অন্তে সুদ ও আসল সমুদয় পরিশোধ করিতে হয়। দেশীয় ঋণের বেলায় এই দুই সময়ই প্রচলিত মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যাইতে পারে। বৈদেশিক ঋণের বেলায় ফল হইবে উল্টা-রকম। তখন দ্রব্যমূল্যের অকস্মাৎ হ্রাসের সম্ভাবনা। কিন্তু ইতিমধ্যে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্যমূল্যের অকস্মাৎ বৃদ্ধি অথবা হ্রাস ততটা অনুভূত নাও হইতে পারে। মোটের উপর বর্ত্তমান অবস্থায় উপরোক্ত উপায় দুইটি হইতে এই উপায়টি অধিকতর কাম্য বলিয়া মনে হয়।

৪। চতুর্থ উপায়টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক তাহাদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-দের দ্বারা পরিচালিত সরকারকে তাহাদের ও তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলের জন্য স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কর দিবে। ইহার চেয়ে বাঞ্ছনীয় আর কি হইতে পারে?

পুর্ব্বেই বলা হইয়াছে সরকারের করনীতি বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ইহা রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কালিদাস রঘুর করনীতি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, রঘু প্রজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন—সূর্য্য যেমন ধরণীর সলিল শোষণ করিয়া বৃষ্টিরূপে ধরণীকে তাহা সহস্র গুণ প্রত্যর্পণ করেন।

"প্রজানামেব ভূত্যর্থ স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥"

ইহাই কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের করনীতি হওয়া উচিত। যথেচ্ছ কতকগুলি দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিয়া দিলেই অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করা হয় না। তাহাকে কলা-কৌশলী ও ভবিষ্যদ্দর্শী হইতে হয়। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে করনীতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভ্রমর যেমন মধুস্রাবী বৃক্ষ হইতে মধুসংগ্রহ করে, বৃক্ষের সমুদয় রস নিঃশেষ করে না, গৃহস্থ গরুকে দোহন করিবার সময় বাঁটে কিছু দুধ বাছুরের জন্য রাখিয়া দেয়, স্তনকে ছেদন করে না, তেমনি রাজা রাজ্য হইতে কর সংগ্রহ করিবেন—

"মধুদোহং দুহে রাষ্ট্রং ভ্রমরা ইব পাদপং
বৎসাপেক্ষী দুহেচ্চৈব স্তনাংশ্চন বিকুট্টয়েৎ।"

অর্থমন্ত্রী যে শুধু কলাকৌশলীর ন্যায় উৎপন্ন দ্রব্যের ভোগোদ্বৃত্ত কররূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিবেন তাহা নহে, কিন্তু ভোগোদ্বৃত্ত ভবিষ্যৎবংশধরদের মুখ চাহিয়া পরিত্যাগ করিবেন। যে অর্থমন্ত্রী স্বর্ণ-অণ্ড-প্রসবকারী রাজহংসকে হত্যা করেন তিনি অচিরে সমগ্র রাষ্ট্রের ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন।

ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখ চাহিয়া কর ধার্য্য করা হইলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ সুস্থ-সবল শরীর মন লইয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব বহন করিতে সমর্থ হইবে। এ সম্বন্ধে ভীষ্ম অন্যত্র বলিয়াছেন:

"বৎসৌপম্যেন দোগ্ধব্যং রাষ্ট্রমক্ষীণ বুদ্ধিনা
ভৃতো বৎসো জাতবলঃ পীড়াং সহতি ভারত।"

অতি করভার-পীড়িত রাষ্ট্র কখনই মহৎ কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হয় না। এ সম্বন্ধে ভীষ্ম বলেন:

ন কর্ম্ম কুরুতে বৎসো ভৃশং দুগ্ধো যুধিষ্ঠির
রাষ্ট্রমপ্যতি দুগ্ধং হি ন কর্ম্ম কুরুতে মহৎ।

নানাবিধ কর ধার্য্য করিয়াও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে—এই সকল করে কোন্ কোন শ্রেণীর লোকের কষ্ট হইতেছে কিনা। তাহাদের কষ্টলাঘব করিবার ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দেন:

উচ্চাবচ করা দাপ্যা মহারাজ্ঞা যুধিষ্ঠির
যথা যথা ন সীদেরংস্তথা কুর্য্যান্মহীপতিঃ।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে শিল্পের উপর কর ধার্য্যকালে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। শিল্পের উপর কর ধার্য্য করিতে হইলে শিল্পের উৎপত্তি, উৎপাদন, কার্য্যকারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান প্রয়োজন। তিনি বলেন:

উৎপত্তিং দানবৃত্তিঞ্চ শিল্পং সংপ্রেক্ষ্য চাসকৃৎ
শিল্পং প্রতি করানেবং শিল্পিনঃ প্রতিকারয়েৎ।

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত করনীতি প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্রের যুগের করনীতি। তথাপি আজিকার গণতন্ত্রের যুগে এই নীতির আলোচনা নিরর্থক নয়, কারণ বর্ত্তমানে

যে-কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই নীতি অনুসৃত হইলে জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের স্বাধীনতালাভের দশ বৎসর পর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য্যক্রম শেষ হইবার পর এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী নূতন কতকগুলি করধার্য্যের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার বাজেট লোকসভার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। এই বাজেটকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া কেহ কেহ অভিনন্দিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়া ইহাকে 'শয়তানের বাজেট' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বাজেট সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় শ্রীকৃষ্ণমাচারী তিনটি মূলনীতির উল্লেখ করিয়াছেন :

১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যে কি এবং কেন উহা হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাই দেশের লোক ভবিষ্যৎ সুখের দিনের আশায় অধীর হইয়া দিন গনিতেছে।

২। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেশে অন্ন ও বস্ত্রের অভাব প্রায় লাগিয়াই ছিল। এখন এই দুই অভাবজনিত দুর্দ্দশা প্রায় লোপ পাইয়াছে।

৩। "আমাদের কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। আমরা বৈষম্য ঘুচাইতে চাই। আমরা সাধারণ লোকের সুযোগ-সুবিধা বাড়াইতে চাই। একমাত্র সমাজের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উদ্যম বাড়াইতে চাই। ইহাই আমাদের সোশ্যালিষ্ট সমাজের আদর্শ।"

শ্রীকৃষ্ণমাচারী বলিতে চাহিয়াছেন, এই আদর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে হইলে ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন। নূতন কর ধার্য্য করা ছাড়া এই অর্থসংগ্রহের অন্য উপায় নাই। এই কর এমন ভাবে ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে যাহাতে সমাজে ধন-বৈষম্য দূর হয়। এই কর অবশ্য জনগণের পক্ষে ক্লেশকর হইবে। কিন্তু দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য এবং তাহাদের নিজেদের ও ভবিষ্যদ্‌বংশধরদের মঙ্গলের জন্য এই ত্যাগস্বীকার করা তাহাদের কর্ত্তব্য। এক কথায় "সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ।"

কিন্তু অসুবিধার কথা এই যে, পাঁচ বৎসর না গেলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া সম্ভব নয়। মার্ত্তণ্ডদেব যদি জগদ্বাসীর নিকট প্রস্তাব করেন, "আমি জগতের সমুদয় বারি নিঃশেষ করিব এবং পাঁচ বৎসর পরে সহস্রগুণ তোমাদিগকে ফিরাইয়া দিব," তাহা হইলে জগতের জনগণ নিশ্চয়ই উৎফুল্ল হয় না। জীবনধারণের উপযোগী জল তাহাদের আবশ্যক। এখন দেখা যাক অর্থমন্ত্রীর প্রস্তাবিত বাজেটে এই জীবনধারণের উপযোগী জল অবশিষ্ট আছে কি না।

নূতন বাজেটে কয়েকটি আপত্তিজনক কর পরিত্যক্ত হওয়ার পর যে কয়টি নূতন করের বিরুদ্ধে তুমুল আপত্তি উঠিয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান :

১। আয়করের প্রসার।
২। রেলভাড়া বৃদ্ধি।
৩। দেশলাইয়ের উপর কর।
৪। চিনির উপর কর।

আয়করের প্রসার—আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর। সকল দেশে এই করকে সমাজের ধন-বৈষম্য দূর করিবার কাজে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে এই আয়কর ছিল ৯১·৮ পার্সেণ্ট। বর্ত্তমান বাজেটে উহা কমাইয়া অর্জ্জিত আয়ের হার ৭৭ এবং অনুপার্জ্জিত আয়ের হার ৮৪ পার্সেণ্ট করা হইয়াছে। ধনীদের উপর এই যে টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল তাহাতে ঘাট্‌তি পড়িবে সাড়ে সাত কোটি টাকার। এই ঘাট্‌তি মিটাইবার জন্য মাসিক ২৫০৲ টাকা আয়ের লোকের উপর আয়কর বসাইতে হইল। এই খানেই অর্থমন্ত্রী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ধন-সাম্যের মূলনীতি লঙ্ঘিত হইল। দরিদ্র পিটারের পকেট হইতে অর্থ লইয়া ধনী পলের পকেট ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। একেই সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী বহু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করভার বহন করিয়া আসিতেছে; তাহাতে এই আয়কর আসিয়া উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের মত তাহাদের উপর চাপিয়া বসিল।

এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান বর্ষের বাজেটের তুলনা করা যাইতে পারে। ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী মিঃ থরনিক্রফট তাঁহার বাজেট প্রস্তাবের প্রারম্ভে মূলনীতি বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, "সাধারণ লোকের সুখের জন্য করভার হ্রাস করাই বর্ত্তমান বাজেটের উদ্দেশ্য। দেশের আর্থিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ যদিও সরকারের কাম্য, তথাপি জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়া সে উদ্দেশ্য সাধন করার প্রয়োজন আজ নাই। আজ সর্ব্বভাবে সাধারণ লোকের সুযোগসুবিধা দেওয়াই রাষ্ট্রের কাম্য।"

ব্রিটিশ বাজেটে ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেকটি জিনিষের উপর করের হার শতকরা ৩০ হইতে ১৫তে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তেলের উপর কর তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। খেলাধূলার উপর হইতে কর তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। আমোদ-প্রমোদের উপর কর কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বৃদ্ধ ও শিশুদের ভাতা বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

১৬ বৎসরের অধিকবয়স্ক ছেলেমেয়েরা শিক্ষার সমুদয় ব্যয় পাইবে। এক কথায় ব্রিটিশ বাজেট সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাঁচাইবার উপায় স্বরূপ।

ইংরেজ জানে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমাজের মেরুদণ্ড। তাহারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও কষ্টসহিষ্ণু। তাহারা অতি দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও জাতির জাতীয়ত্ব, নীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতিকে উদ্দীপিত করিয়া রাখে। এ বিষয়ে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণী একই পর্য্যায়ভুক্ত। তাহাদের কাহারও জাতীয়তা, নীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতির বালাই নাই। কাজেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী লোপ পাইলে সমাজ দুর্নীতি, কুসংস্কার ও সংস্কৃতির অভাবে ধ্বংস পাইবে এবং দরিদ্র ও বিত্তশালীদের মধ্যে সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিবে। কাজেই ইংরেজ আজ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই রক্ষা করিতে অগ্রণী হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের কর-নীতি ইহার ঠিক বিপরীত পথে চলিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

২। রেলের ভাড়া বৃদ্ধি—বর্ত্তমানে রেলের বাড়তি ভাড়াকে প্রত্যক্ষ কর হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে; কারণ ভ্রমণকারী প্রত্যক্ষ ভাবে টিকিট ক্রয়কালে এই কর সরকারকেই দিয়া থাকেন। এই করের বেলায়ও ধন-সাম্যের নীতি বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। দূরপাল্লার ভ্রমণের বেলায় এই বাড়তি ভাড়ার হার কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫০০ মাইলের উর্দ্ধে ভ্রমণের জন্য বৃদ্ধির হার শতকরা ১০ ভাগ করা হইয়াছে। কাজেই ধনীরা রেহাই পাইয়াছেন। ৫০০ মাইলের মধ্যে মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত লোকেরাই অধিক সংখ্যায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন। কাজেই বাড়তি ভাড়ার হার তাহাদের বেলায় করা হইয়াছে শতকরা ১৫ ভাগ। জনমতের চাপে প্রথম ১৫ মাইল বাদ দিয়া ১৬ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত ৫ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রেলসংগঠনের অব্যবস্থা ও অপচয় নিবারণে সরকার অধিকতর মনোযোগী হইলে এই ভাড়া বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনই হইত না। জনসাধারণ বাড়তি ভাড়া ও রেল-দুর্ঘটনা উভয়ের হাত হইতেই রক্ষা পাইতে পারিত।

৩। দেশলাইয়ের উপর কর—দেশলাইয়ের উপর করকে পরোক্ষ কর বলা যাইতে পারে, কারণ এই কর ক্রেতা সরকারকে পরোক্ষভাবে দেয় ক্রয়কালীন অতিরিক্ত মূল্য হিসাবে। দেশলাই একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য। ইহা ধনী মধ্যবিত্ত দরিদ্র নির্ব্বিশেষে আপামর সাধারণ সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার কোন বিকল্প দ্রব্য নাই। তাই ইহার চাহিদাও অনড়। তথাপি ইহার যথেষ্ট ভোগোদ্বৃত্ত আছে। পূর্ব্বে ৬০ কাঠিপূর্ণ একটি বাক্স পাওয়া যাইত তিন পয়সায়। করধার্য্যের পর উহা পাওয়া যাইবে চার পয়সায় অর্থাৎ ছয় নয়া পয়সায়। তৎসত্ত্বেও নিতান্ত দরিদ্রের কাছেও উহার সামান্য কিছু ভোগোদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে। অতএব দেখা যাইতেছে—এই করের বিরুদ্ধে আপত্তির সন্তোষজনক কোন কারণ নাই। ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে একটি বাক্স ক্রয়কালে দেশের উন্নয়নমূলক কাজে সন্তুষ্ট চিত্তে একটি পয়সা অতিরিক্ত দিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়।

৪। চিনির উপর কর—ইহাও একটি পরোক্ষ কর, কারণ ক্রেতা প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে এই কর দিবে না, দিবে ক্রয়কালীন অতিরিক্ত মূল্য হিসাবে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চিনি একটি অত্যাবশ্যক খাদ্য। গুড় ইহার বিকল্প। ইহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক। আমাদের দেশে চিনি একটি সংরক্ষিত শিল্প। সংরক্ষণ-শুল্ক আরোপ করিয়া চিনির দর কৃত্রিমভাবে বাড়ানো হইয়াছে, কাজেই বিদেশী চিনি সস্তায় ভারতে বিক্রীত হইতে পারিতেছে না। ভারতে যে কয়েকটি চিনির কারখানা আছে তাহাতে উৎপাদিত চিনি সমগ্র ভারতের চাহিদা মিটাইতে অক্ষম। তাই এখনও আমাদের কিছু চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়। "Agricultural situation in India" নামক পত্রিকায় ১৯৫২ সনে লেখা শ্রী এস. এম. রায়ের এক প্রবন্ধ হইতে জানা যায়, একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে দৈনিক দুই আউন্স পরিমাণ চিনি বা গুড় আবশ্যক; কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯৩৪-৩৮ সনের মধ্যে চিনি ও গুড় ভারতে উৎপন্ন হইয়াছে জনপ্রতি ১·৬ আউন্স; ১৯৪৯-৫০ সনে জনপ্রতি ১·৪ আউন্স এবং ১৯৫০-৫১ সনে হইয়াছে জনপ্রতি ১·৫ আউন্স। শিল্প-উন্নয়ন সম্বন্ধে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথমে ঠিক করা হইয়াছিল যে, চিনির জন্য নূতন কারখানা না বসাইয়া যে কয়টি কারখানা আছে, তাহাই আরও ভালভাবে কাজে লাগাইয়া উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। কিন্তু উৎপাদন অল্পকিছু বাড়িলেও ভারত এখনও চিনি-শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক থাকাতে সাধারণ লোককে অত্যধিক মূল্যে চিনি কিনিতে হইতেছে। তাহাতে চিনির উপর কর ধার্য্য করিলে চিনির মূল্য আরও বাড়িয়া যাইবে এবং সাধারণ লোকের পক্ষে উহা বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে। অর্থমন্ত্রী আশা করিতেছেন, চিনির মূল্য বাড়িয়া গেলে অনেক লোক চিনি খাওয়া ছাড়িয়া বিকল্প খাদ্য গুড় ধরিবে। তাহা হইলে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ভারতীয় চিনি পাওয়া যাইবে। উক্ত উদ্বৃত্ত চিনি বিদেশে রপ্তানী করিলে উহা ভারতের বহির্বাণিজ্যিক ভারসাম্যকে ভারতের অনুকূলে আনিতে

সাহায্য করিবে। বহির্বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে আসিলে ভারত বিদেশী যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষমতা লাভ করিবে। এই সকল যন্ত্রপাতি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দেশের উৎপাদনবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হইবে। তখন দেশের সুখ ও সমৃদ্ধি সহস্র গুণ বাড়িয়া যাইবে।

এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয় যে, গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমাদের সরকার উৎপাদন বাড়াইবার জন্য চিনিশিল্পের মালিকদের উপর যথেষ্ট চাপ দিতে পারেন নাই অথবা দিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে উৎপাদন বাড়িলে সহজেই আমরা উদ্বৃত্ত চিনি বাহিরে রপ্তানী করিতে পারিতাম ও বহির্বাণিজ্যিক ভারসাম্য ভারতের অনুকূলে আনিয়া যথেষ্ট ক্রয়শক্তি লাভ করিতে পারিতাম। তাহা হইলে দেশের জনসাধারণকে অপরিসীম ক্লেশ দিয়া অর্থ-মন্ত্রীকে এই কৃত্রিম উপায়ের আশ্রয় লইতে হইত না। কিন্তু গলদ রহিয়াছে গোড়ায়। ইহা সংরক্ষণনীতির কুফল। শিশু-শিল্প প্রথমে থাকে শিশু। সে বাড়িয়া উঠে সংরক্ষণ-নীতির আওতায়। কিন্তু এই শিশু কিছুতেই সাবালক হইতে চায় না। দেশের চাহিদার অতিরিক্ত উৎপাদন দেখাইলে পাছে তাহার দ্রব্যমূল্য ও মুনাফা কমিয়া যায় এবং পাছে সরকার সংরক্ষণনীতি প্রত্যাহার করেন এই ভয়ে শিশু-শিল্প চিরকালই "শিশু" থাকিয়া যাইতে চায়। ভারতীয় চিনিশিল্পের বেলায় যে এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

আজব দেশের 'এলিস' যেমন আয়নার ভিতর নিজের ক্রমবর্দ্ধমান মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল তেমনি আমরা নূতন বাজেটের আয়নায় ভারতের ক্রমপ্রসারিত বিরাট আকার দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইতেছি। উত্তরে অর্থমন্ত্রী মহাশয় হয়ত বলিবেন, "আমরা এখন আর নিউটনের যুগে বাস করি না। আমরা আইনষ্টাইনের যুগের লোক। আমাদের কাছে সবই আপেক্ষিক। আজকার এই ক্রম-বর্দ্ধনশীল জগতে আমাদিগকে একই জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্য দৌড়াইতে হইবে।"—মন্তব্য অনাবশ্যক।

রাতের রেলের কামরা

শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

রাতের রেলের কাম্‌রা জুড়ে কত নিথর মানুষ
অচেনা সঙ্কোচ নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে বসে থাকে,
চোখেতে পলক নেই, মাথায় অসংখ্য চিন্তা ঘোরে।

ওদিকে ধক্ ধক্ শব্দে ধ্রুবলক্ষ্য গাড়ি ছুটে চলে,
কখনো বিরাট সেতু, নীচে গঙ্গা ঝিকিমিকি হাসি,
কখনো টাটার সামনে আগুনে রাতের শূন্য রাঙা,
অন্ধকারে কোথাও বা পার হ'য়ে চলেছে টানেল,

কোথা বা নির্জন কোন কুয়াশায় গুণ্ঠিত প্রান্তর,
থমথমে গাছের ফাঁকে কুঁড়ে ঘরে প্রদীপের আলো,

কত ছবি আসে যায়, ক্লান্ত মনে ছায়া ফেলে কারো,
গভীর গভীর রাত্রি, চোখে কারো ঘনায় স্বপন।

কা'ল ভোরে ছাড়াছাড়ি, র'বে না স্মরণচিহ্ন কোনো,
দিগন্তে ধোঁয়ার রেখা ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তখনো।

অনুবাদ-কুশলী সত্যেন্দ্রনাথ
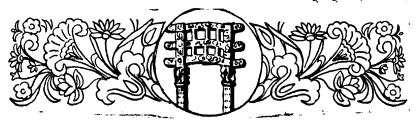
শ্রীকমল চক্রবর্ত্তী

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে বলা হয় 'ছন্দের যাদুকর।' ছান্দসিক কবি হিসেবে অসামান্য খ্যাতি থাকলেও এই অভিধায় কবি-প্রতিভার অপর দিকগুলির কথা অন্তরালে থেকে যায়। কবি হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ যথেষ্ট মৌলিক। রবীন্দ্র-যুগের শক্তিশালী কবিরূপে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ একজন সার্থক কবিতা-অনুবাদক। সংস্কৃত, জার্মান, চীনা, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষা থেকে তিনি বহু কবিতা বাংলায় রূপান্তরিত করে ভাষায় নূতন ছন্দ, শব্দসম্ভার ও ভাবধারা সঞ্চারিত করেছেন। তাঁর অনুবাদ-কবিতাগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে। কাজেই শুধু ছান্দসিক কবি রূপে সত্যেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করলে তাঁর প্রতিভার উপর সুবিচার করা হয় না।

"True poetry is untranslated"—সত্যিকারের কবিতা ভাষান্তরিত করা যায় না। একথা অনস্বীকার্য্য—ভাষান্তরের ফলে মূল কবিতার ভাবানুষঙ্গ ও সুরমাধুর্য্য অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্যে অনুবাদে প্রায়ই মূল কবিতার পুরোপুরি সৌন্দর্য্য পাওয়া যায় না।

সত্যেন্দ্রনাথ-অনূদিত কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মূলের রস কোনমতেই অনুবাদে ঠিকমত সঞ্চার করা যায় না, কিন্তু তোমার এই লেখাগুলি মূলকে বৃন্তস্বরূপ আশ্রয় করিয়া স্বকীয় রস-সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—আমার বিশ্বাস কাব্যানুবাদের বিশেষ গৌরবই তাই—তাহা একই কালে অনুবাদ এবং নূতন কাব্য। তোমার এই অনুবাদগুলি যেন জন্মান্তরপ্রাপ্তি—আত্মা এক দেহ হইতে অন্য দেহে সঞ্চারিত হইয়াছে—ইহা শিল্পকার্য্য নহে, ইহা সৃষ্টিকার্য্য।"

কবিগুরুর এই প্রশংসায় একটুখানি অত্যুক্তি থাকলেও অনুবাদ-কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর।

কোন কবিতা সামগ্রিকভাবে পড়লে তার শব্দগত, অর্থগত তাৎপর্য্য, উপমা ও ছন্দঝঙ্কার অতিক্রম করে মনের ভিতরে একটা সামগ্রিক ভাব-আবেদন জাগে। এই ভাব-আবেদন মনের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারলেই অনুবাদের সার্থকতা। ভাষান্তরের ফলে মূলের ভাবের সঙ্গে অনুরূপ ভাব-আবেদন অনুবাদের মধ্যে ফুটল কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয়।

এবার কবির কয়েকটি শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-কবিতা আলোচনা করে তার সার্থকতা বিচার করা যাক।

শেলির "Lines to an Indian air" একটি প্রসিদ্ধ পরিচিত কবিতা। সত্যেন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা অনুবাদ-কবিতাটির নাম 'মিলন-সঙ্কেত'।

মূল ইংরেজী কবিতাটিতে কখনও ম্লান, কখনও উজ্জ্বল, উদাসীন আত্মবিস্মৃত প্রেমিকের চিত্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রেমিকের অন্তর থেকে উৎসারিত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস কবিতাটিকে পূর্ণতা দিয়েছে। নিগূঢ়তা, বিহ্বলতা, শ্রান্ত অবসাদ, উন্মাদনা, অতর্কিত উচ্ছাস ও উত্তেজনা, নৈরাশ্যময় পরিসমাপ্তি, একটি বাঁশীর সুর, এক প্রেমিক-চিত্তের গোটা রাগিণী বিভিন্ন পর্দায় ধ্বনিত হয়েছে। একটি জটিল মানস-পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। মূল ছন্দ সংক্ষিপ্ত, দ্রুত, কখনও মৃদু।

প্রেমিক-চিত্তের সামগ্রিক অভিব্যক্তি, অখণ্ড ভাব-বিন্যাস অনুবাদের মধ্যে কতটা পাচ্ছি দেখতে হবে।

'First sweet sleep of night'-এর ভাবব্যঞ্জনা নষ্ট হয়ে গেছে 'কাঁচামিঠে ঘুমটুকু পড়ে গো টুটি' এইরূপ অনুবাদে। অতৃপ্তির জাগরণে প্রেমিকের চিত্তের বিহ্বলতা শেলি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, আকস্মিক জাগরণের বিভ্রম আমরা অনুবাদে দেখতে পাই না। 'Sweet' কথাটিতে যে ভাব-সঙ্গতি আছে 'রাণী' কথাটিতে সে ভাব-নিবিড়তা নেই। "নিথর নিবিড় কালো নদীর 'পরে"—কথাগুলি যেন প্রেমিকের অন্তঃকরণের দীর্ঘ চাপা নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসছে। অনুবাদে সচেতন কাব্য সৃষ্টি রয়েছে—আকস্মিকতার ভাব ফুটে উঠেছে। 'পাপিয়ার অনুযোগ ফুটিতে নারি' মূলানুযায়ী হয়েছে। "champak odours fail"—চম্পকের সুগন্ধ যেন রয়ে রয়ে মূর্চ্ছিত হচ্ছে ও হঠাৎ জেগে উঠছে। স্বপ্নে যেমন নিষ্ঠুর চিন্তা ও ভাবগুলি ভেঙে ভেঙে যাচ্ছিল তেমনি চাঁপার সৌরভেরও অবিচ্ছিন্নতা ছিল না। এর অনুবাদ "মিলায় চাঁপার বাস—নিবিয়া আসে।" অত্যন্ত কাব্যিক হয়ে গেছে—শেলির ভাবের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতি নেই।

"As I must die on thine" এই অতর্কিত ভাব-পরিবর্তন ও আত্মগত ভাবোচ্ছাসের প্রাধান্য, বিশ্বের প্রাণচাঞ্চল্য ও স্পন্দন যেন অন্তর্জগতে মূর্ত্ত হয়েছে—এই সূক্ষ্ম ভাব-পরিণতি প্রেমিকের অন্তরে কেন্দ্রীভূত করার যে প্রবণতা এই সুসঙ্গতি আমরা অনুবাদের ভিতর দেখতে পাই না। 'আমিও মরে যাব অমনি করে।'—এখানে সূক্ষ্ম ভাব-প্রেরণা অনুপস্থিত।

অনুবাদের গৃহীত ছন্দে ছন্দের সংক্ষিপ্ত, দ্রুত আবর্তন রক্ষিত হয় নি। অনুবাদ-ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছন্দ নির্ব্বাচন করা হয় নি। প্রেমের রহস্যময় অনুভূতি মূল কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে, কিন্তু অনুবাদে পাওয়া যায়—ঠাণ্ডা বাসি প্রেমের একটি দীর্ঘ

বিশ্লেষণ। প্রেমের উষ্ণতা, রহস্য ও আবেগের কোন চিহ্ন নেই অনুবাদে। প্রেমের তীব্র আহ্বান, urgency, দুর্দম আবেগ অনুবাদের এই ধীর-মন্থর বিবৃতিতে ফুটে ওঠে নি। মূল কবিতায়—

"O lift me from the grass !
I die, I faint, I fail !"

হাউই যেমন নিঃশেষিত হবার পূর্ব্বে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠে তেমনি প্রেমিকের নৈরাশ্য ও অবসাদ এখানে তীব্র উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। মৃত্যুর অনিবার্য্যতায় এটি সার্থক রূপায়ণ।

কিন্তু অনুবাদ-কবিতায় মৃত্যুমুখী প্রেমের অতলস্পর্শ গভীরতা, দুঃসহ আবেদন এই রকম শান্ত ছন্দের ভিতর কোথাও ফুটে ওঠে নি। সবটা মিলে অনুবাদ পড়ে উক্ত প্রেমের অনুভূতি ও উত্তেজনা পাঠকের চিত্তে জাগে না। এটা কাব্যোচ্ছাস—প্রেমের মাদকতা এর মধ্যে একতিলও অনুভব করা যায় না।

এবার আর একটি কবিতা। কীটসের "La Belle Dame sans Merci," সত্যেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত কবিতার নাম 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী !'

কীটসের কবিতাটি একটি গভীর প্রেমের ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলেছে। নিষ্ঠুরা প্রতারণা-পরায়ণা নারীর সঙ্গে যদি মানুষের প্রেম হয় তা হলে যে ছলনার সুর ফুটে ওঠে সেই অজ্ঞাত বিপদের পূর্ব্বাভাস কবিতাটির ছন্দের ভিতর ফুটে উঠেছে। ভয়াবহ বিপদের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সেটি কবি স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন নি। একটি অজ্ঞাত অতি প্রাকৃত ভয়ের শিহরণ এই কবিতায় ফুটে উঠেছে। অনুবাদ-কবিতায় এইটি ফুটেছে কিনা লক্ষ্য করতে হবে। নায়কের চেহারা ও মনের একটি ইঙ্গিতাত্মক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একটি অজ্ঞাত অভিজ্ঞতার ছাপ কোলরিজের 'Ancient Mariner' এর চেহারার ভিতর মুদ্রিত। অতিপ্রাকৃত প্রেমের ছলনা, মর্ম্মান্তিক পরিণতি, শোচনীয় উদভ্রান্তি ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছে। চেহারার ভিতর অপ্রকৃতিস্থ রূপ ফুটে উঠেছে—উন্মাদ ভাবটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। প্রকৃতির বিষণ্ণ বিজনতা ও রিক্ততার ভাবের সঙ্গে প্রেমিকের মনোভাব একসঙ্গে জড়ানো। 'Fairy' নায়িকার বর্ণনায় একটি অজ্ঞাত সম্ভাবনা ফুটে উঠেছে—এতে তার চরিত্রের দ্যোতনা করা হয়েছে। তার ভালবাসা অনুমানের বিষয়, প্রতীকের বিষয়। তার প্রেম চলিষ্ণু, দ্রুতগামী ও চঞ্চল, তাই স্থায়ী গার্হস্থ্য রূপ নেয় নি।

সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কবিতায় চতুর্থ পঙক্তি হ্রস্ব পঙক্তি হওয়ায় আমাদের প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যেন একটি দীর্ঘশ্বাস এই চতুর্থ পঙক্তিটিতে। শেষ পঙক্তির দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় একটা অজ্ঞাত সম্ভাবনা ফুটে উঠছে। 'ail' কথাটির অনিশ্চিত অর্থ রয়েছে, কথার মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়নি। 'haggard' কথাটির ভিতর যে ভাব-ব্যঞ্জনা সেটি শ্রীহীন কথাটিতে ফুটে ওঠে নি। কোন কোন শব্দের অনুবাদ ঠিক না হলেও একটি বিপদ-কণ্টকিত আবর্ত—'Atmosphere of Suspense' অনুবাদে ফুটে উঠেছে।

"মাঠে মাঠে যেতে নারী সনে ভেট,
সুন্দরী সে যে পরী-কুমারী"—

এটি কাব্যধর্ম্মী হয়েছে, দ্রুতসঞ্চারী ভাবব্যঞ্জনা এতে নেই। 'Fairy child'-এর ভিতর যে অনিশ্চিত ভাবানুষঙ্গ আছে, 'পরী-কুমারী'র মধ্যে সেটি নেই। কীটস প্রেমিক-প্রেমিকার পরিচিত প্রণয়-ভাবানুষঙ্গ এড়িয়ে একটা নতুন ভাবদ্যোতনা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই অলঙ্কার ও প্রসাধন বিন্যাসে পরীর উপযুক্ত সঙ্গতি আছে—এটা সাধারণ প্রেমিকার বেশবিন্যাস নয়। কবি অনিশ্চিত প্রেম দেখিয়েছেন। নতুন রহস্যময় ইঙ্গিত সঞ্চার করেছেন। কিন্তু প্রসাধন-বর্ণনায় প্রেমের পরিচিত ভাবানুষঙ্গকে সত্যেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেন নি।

গাঁথি মালা দিনু শিরে পরাইয়া
কাঁকন, মেখলা কুসুমে গড়ি'

এটি স্বাভাবিক প্রেমের বর্ণনা। অস্বাভাবিক বিপদ ও সঙ্কেতের প্রমাণ এতে পাওয়া যায় না।

"She looked at me, as she did love"-এর ভিতর যে অনিশ্চিত ব্যঞ্জনা ও অস্বাভাবিকতা আছে; অনুবাদে সে অনিশ্চয়তা ও রহস্য পরিস্ফুট হয় নি।

"And there I dreamed" এই উক্তির ভিতর নিদ্রাহীন রজনীর ইঙ্গিত, বেদনা ও মর্ম্মান্তিক ইতিহাস লুকানো আছে। কীটসের বাচনভঙ্গীতে বেদনাময় অনুভূতি প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের 'চরম স্বপন—তাও দেখেছি'—যেন সোজাসুজি প্রকাশ—এতে আবেগ-ব্যঞ্জনা কোথাও নেই, শুধু তথ্য বিবৃতিমাত্র।

কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, কীটস যে নিগূঢ় ভাবের ইঙ্গিত ও আশঙ্কাকল্পিত আবহাওয়ায় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, সে আবহাওয়া তাঁর অনুবাদের মধ্যেও সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথের এই অনুবাদ-কবিতাটি শিল্প ও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে।

ফুলের মত...
আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে

রেক্সোনা সাবানে আছে ক্যাডিল অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যের
জন্যে তেলের এক বিশেষ সংমিশ্রণ যা আপনার
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে বিকশিত করে তুলবে।

Rexona
BLENDED WITH CADYL

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত সাবান
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটারী লিঃ, এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত
RP. 148-X52-BG

অঙ্গার-যুগের উভচর

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

প্যালেওজোয়েক মহাযুগের শেষ পর্য্যায়ে দেখা দিল উভচর—অঙ্গার-যুগে। মাছেরা ডাঙায় উঠে উভচর রূপে পরিচিত হ'ল। জলের বন্ধন আমরা আজও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। আমাদের চক্ষুতারকা সর্ব্বদাই আর্দ্র, ফুসফুসের চারি পাশও ভেজা, অন্তরস্থিত দেহযন্ত্রগুলি জল না হলে বিকল। প্রতি স্থলচর প্রাণী ডিম্ব অবস্থায় জলে ভাসমান—শরীরে তিন ভাগ জল। ভেক, নিউট, সালমান্ডার প্রভৃতি স্থিচরেরা প্রথমে জলেই জীবন আরম্ভ করে, স্থলে এলে তাদের ফুলকা ফুসফুসে পরিবর্ত্তিত হয়। ঠিক যেমন শত শত জন্ম ধরে এই প্রণালী রূপ নিয়েছিল পুরাকালে। শুষ্ক কঠিন ভূভাগের চেয়ে এরা সরস কর্দ্দমাক্ত স্থান পছন্দ করে বেশী, ডিম্ব প্রসব করতে নামতে হয় জলে। স্বল্প জল ও স্থলের মাঝামাঝি নিবাসে এক জাতের হ'ল উদ্বর্ত্তন, এরা উভচর। এদের শরীরে শ্রবণ-ঝিল্লীর অভ্যুদয় প্রথম, অর্থাৎ—মাছেদের চেয়ে এদের শ্রবণশক্তি ভাল।

অঙ্গার-যুগে গাছপালার রাজত্ব

এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের গাছপালা পূর্ব্বে দেখা দেয় নি, গুল্ম লতা, বর্ষজীবী, ঝোপঝাড়, ফার্ন, অপুষ্পক, একদণ্ডী প্রভৃতি উদ্ভিদের উন্মেষ এই যুগে। বিরাট বিরাট পত্রহীন 'হর্স-টেল' ও ঝাউরূপ শৈবালপুঞ্জ নিবিড় মেঘের মত বনভূমির আকাশ করে থাকত আচ্ছাদিত, মাইলের পর মাইল জুড়ে এই বনভূমির বিস্তার, উপর দিকে উঠত প্রায় ১০০ ফুট। সমুদ্রোপকূল সরে গিয়ে স্থানে স্থানে বিশাল বিশাল কর্দ্দমপূর্ণ জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছিল, প্রাণরস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত—এই সব স্থানে সতেজ অতিবর্দ্ধনশীল উদ্ভিদ দলে দলে মেশামেশি ঠাসাঠাসি করে তৈরি করেছিল ঘন অরণ্যানী, সেখানকার গগনচুম্বী ফার্ন ঘাসের আবরণে বোধ করি সূর্য্যালোক ভূমিস্পর্শ করতে পারত না। এই জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে ধরণী সুশোভিত হয়েছিল, অনবদ্য রূপ ধারণ করে মরুপ্রায় ভূভাগকে শ্যামল করে তুলেছিল আর মৃত্তিকা দেখা দিয়েছিল এই সময়ে। এ যুগে উদ্ভিদের জয়যাত্রা।

কিন্তু এই সুদূরব্যাপ্ত অরণ্যকান্তার রইল না। কালের করাল স্পর্শে হ'ল এর সম্পূর্ণ রূপান্তর। কঠিন পেষণে-দলনে আবহ-পরিবর্ত্তনে সেযুগের গাছগাছড়া আজ কালো কঠিন কয়লা। আমাদের রন্ধনশালায় (একবার পোড়ানোর পর) যে কয়লা ব্যবহার হয়, যার শক্তিতে রেলগাড়ী, ষ্টীমার, জাহাজ গন্তব্য পথে ধাবিত হয়, কোল-গ্যাসের আলো জ্বলে, আশ্চর্য্যের বিষয়, তা এই যুগের অঙ্গীভূত গাছপালা, আজকের কয়লার খনি অঙ্গার-যুগের প্রস্তরীভূত জঙ্গল। কয়লার খনিতে যারা কাজ করে তাঁরা অবিকল বৃক্ষাকৃতি অঙ্গারস্তূপ দেখেছে, কত এরূপ অঙ্গারীভূত গাছকে গাঁতি দিয়ে খরাশায়ী করেছে। অপরিমিত কয়লা পৃথিবীর অভ্যন্তরে লুকানো, সকল মহাদেশেই রয়েছে অঙ্গারস্তর—যাকে আমরা শক্তির উৎসরূপে সহস্র বৎসর সমানে ব্যবহার করতে পারব।

পৃথিবীর উপরিস্থিত ভূভাগ যখন মহাকান্তারে পরিবৃত হচ্ছিল, জলভাগে তখন আদি প্রাণীদের 'পৌষমাস', ট্রিলোবাইট (ত্রিবলি) ইত্যাদি প্রাণীরা এই শেষবারের মত অস্তিত্ব দেখিয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। ভীষণভাবে বেড়ে ওঠে কর্কট, বিছা ইত্যাদি প্রাণীসমূহ; জলে শামুকজাতি ও প্রবালের সংখ্যাধিক্য হয়। এত বিভিন্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্গ এই সময়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করত যে, তাদের সংখ্যা কল্পনা করাও কঠিন। ফসিল অবস্থাতে যা পাওয়া গেছে এবং যা পাওয়া যায় নি অথচ উপস্থিত ছিল তারা অবাধে রাজত্ব করে গেছে জলে-স্থলে-শূন্যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। অঙ্গার-যুগ কেবল কয়লাই সঞ্চিত করে রাখে নি—ধারাবাহিক জীবনেতিহাসের হারিয়ে-যাওয়া ছিন্ন পৃষ্ঠাও এখানে মেলে।

এ সময়কার গাছেরা পর্য্যন্ত উভচর পর্য্যায়ের। ফুল-ফলের বীজ মাটিতে পড়ল আর তার থেকে চোখ মেলে চাইল নবীন গাছ—এ ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না, রেণু জলের মধ্যে প্রবেশ করলে সেখানে হ'ত গাছের জন্ম।

স্তব্ধ-নিঝুম ছায়াঘেরা অন্ধকার বনরাজির মধ্যে মাঝে মাঝে আকাশচারী বৃহৎ পতঙ্গের ডানার শব্দে ভঙ্গ হ'ত অখণ্ড নিস্তব্ধতা, বৃহৎ উভচরেরা আহারের অন্বেষণে উপর দিকে হয়ত বৃথাই তাকিয়ে থাকত। কুমীরের মত বৃহদাকৃতি উভচরও ছিল এবং এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করত না তা নয়, তবে তখনও শব্দ করার মত কোন অঙ্গের উদ্ভব হয় নি, মুখ দিয়ে কোনও প্রকার আওয়াজ করতে অসমর্থ ছিল তারা। ক্ষুদ্র বৃহৎ মাঝারি নানারূপ নিউট, সালমান্ডার পিচ্ছিল দেহে পঙ্কিল শিলার উপর বিচরণ করে বেড়াত, সে দাগ মাটির শিলায় আজও অক্ষয় হয়ে আছে। পাঁচ-ছয় ফুটের জাপানী সালমান্ডার আছে এখনও। সেকালে দশ ফুট দীর্ঘ টিকনটিকের ন্যায় লেবিরিন্থোডন্ট (উভচর) হামেশা টহল দিয়ে বেড়াত অপটু হস্ত-পদের সাহায্যে।

উভচরেরা যেমন হু হু করে বেড়ে উঠেছিল তেমনি নিঃসংশয়ে নিঃশেষ হয়ে যেতেও দেরি হ'ল না। এদের প্রধান শত্রু হয়ে এল তুষার যুগ। রাশি রাশি বরফে ঢাকা পড়ে গেল চতুর্দ্দিক, কোথায় বা গেল সবুজ বনানীর শ্যামলিমা গাছপালা, কোথায় গেল আকাশ-ছোঁয়া গাছের ভিড়! শ্বেতশুভ্র তুষারস্তূপ এসে বৃক্ষপত্র ঝোপঝাড় অরণ্যকান্তার খালবিলের উপরিস্থিত শৈবালদল, সমস্ত গ্রাস করে নিল। ভূমণ্ডলের দক্ষিণভাগে উচ্চতা বৃদ্ধি হওয়ায় বিরাট এক মহাদেশ দেখা দিয়েছিল, এনটার্টিক (দক্ষিণ মহাদেশ)—ফলে উষ্ণ স্রোত প্রতিহত হয়ে ফিরে যেতে লাগল। দক্ষিণ

আমেরিকা ও আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং ভারত তুষার-সাগরে আবৃত হয়ে গেল সম্পূর্ণ রূপে।

জলবায়ু পরিবর্ত্তন পৃথিবীতে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, জলবায়ু সদাচঞ্চল। পৃথিবীর কোনও স্থানের আবহাওয়া চিরদিন একরূপ থাকে না। অনেক সময় আমূল পরিবর্ত্তন হতে দেখা গেছে। 'মেসজোয়িক' যুগে মধ্য ইউরোপের শৈত্য বর্ত্তমানের চেয়ে শতকরা অন্ততঃ ৩০।৩৫ ভাগ কম ছিল। কারণ যে সকল জীবজন্তুর কঙ্কাল মৃত্তিকান্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে তারা বর্ত্তমান আবহাওয়ায় কিছুতেই বাঁচতে পারে না। গ্রীনল্যাণ্ড দারুণ শীতের দেশ, তৃণের লেশমাত্র নেই, কিন্তু একদা তৃণভোজীর দল চরে বেড়াত সেখানে; উত্তর মেরুর বল্‌গা হরিণ ও কস্তুরী বলদের দেহাবশিষ্ট পাওয়া গেছে উত্তর-নাতিশীতোষ্ণ-মণ্ডলে। আবার এক এক বার এত অধিক শীতের যুগ এসেছে যে বৃক্ষলতা জীবজন্তু সকলকারই হয়েছে সমাধি, প্রধানতঃ গলিত বরফের চাঁই চাপা পড়ে এবং নিদারুণ শৈত্য সহ্য করতে না পেরে—এইরূপ তুষারযুগের পরিচয় পৃথিবী পেয়েছে বার বার। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই বারচারেক হিমযুগের করাল স্পর্শে তদানীন্তন প্রাণীবর্গ মৃত্যুগহ্বরে গিয়েছিল। ধরণীপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্ত্তনের জন্য দায়ী হিমযুগসমূহ। আজও শীতের প্রারম্ভে পাখীরা দলবদ্ধ ভাবে শীতাঞ্চল পরিত্যাগ করে পালায়, এ স্বভাব সেই সেকালের। কেন যে পর্য্যায়ক্রমে এই তুষারযুগ এসেছিল, সন্তোষজনক কৈফিয়ত তার নেই। ভূতত্ত্ববিদেরা সমুদ্রের গতিপরিবর্ত্তনের দোহাই দেন, ভূপৃষ্ঠে শিলাস্তরের উঠানামার কারণ নির্দ্দেশ করেন; জ্যোতির্বিদেরা সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থান্তর, মেরুরেখা বা কক্ষপরিবর্ত্তন হিমযুগের কারণ বলেন, আবহতত্ত্ববিদেরা বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাসের অনুপাত বদলের কথা বলেন, কিন্তু এসব মত পরস্পরবিরোধী ও সামঞ্জস্যবিহীন। মোটের উপর হিমযুগের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণ অন্ধকারে থেকে গেছে।

অজানা-যুগের জীবজন্তু গাছপালাকে ধরাপৃষ্ঠ হতে একেবারে লুপ্ত করে দিয়ে হিমানীপ্রবাহ উত্তরপ্রান্ত হতে আরম্ভ করেছিল শীতের বিজয় অভিযান, সে প্রাণধারা বিতাড়িত ও ধ্বংস হ'ল। ক্রমশঃ উত্তর হতে দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত শীতের ও হিমবাতের প্রবল প্রকোপে চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব, এই অবস্থায় কে-যে রইল আর কে-যে গেল বলা যায় না। অনেকে গেল, বিরাট দেহধারীদের মধ্যেই অধিক কষ্ট সহ্য করতে পারল না এরা। গাছগাছড়াও রইল না—তুষারপিণ্ডের নীচে চাপা পড়ল, জীবনধারণোপযোগী উত্তাপের অভাব, তথা অনাহারে অনেক উদ্ভিদভোজীর দল মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গে মাংসাশীর দলও সবান্ধবে নিপাত। ছোটদের মধ্যে যারা বাঁচল, আমূল পরিবর্ত্তন হ'ল তাদের জীবনযাত্রায়। শীত ও অন্যান্য বাধাবিঘ্নের সহিত যুদ্ধ করবার জন্য কুমীরের মত বৃহৎ জীবেরা, সুউচ্চ ফার্ন গাছেরা কোথায় চাপা পড়ে গেল। যদিচ শৈত্য স্থলভাগে অনুভূত হয়েছিল অধিক, জলেও তার প্রভাব

কম হয় নি। জলজ প্রাণীরা মরেছিল অধিক সংখ্যায়, পালাতে না পেরে অসাড় অবস্থায় জমে গিয়েছিল তুষারস্তূপের নীচে। খাল-বিলে সম্ভবতঃ পর পর চুবার আবির্ভূত হয়েছিল এই নিদারুণ হিমপ্রবাহ, প্রথম বার উত্তর থেকে ও পরে সারা পৃথিবীতে। আরও অনেক পরে, সরীসৃপযুগের শেষে শীতের বিভীষিকা আবার উদয় হয় এবং সেবার ডাইনসোর গোষ্ঠীর দফা নিকাশ করে দেয়।

তবে তুষারযুগ যত বারই এসেছে তত বারই পুরাতনকে ধ্বংস করেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীর প্রাণীকুলকে নতুন রূপ দিয়েছে; শীতের সঙ্গে মিতালি করে করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার পেয়েছে যারা, উত্তর কালে তারাই অবাধে করেছে বংশবিস্তার, আধিপত্য—তাদেরই জয়জয়কার।

এক-একটি নূতন পরিস্থিতি এসেছে আর সসাগরা ধরণী তার নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গকে নিয়ে রূপ বদলেছে। জৈব রূপের সেই অপরূপ অভিব্যক্তি নিত্যকালের ভাষায় লেখা হয়ে গেছে পুরাতন শিলাস্তরে। কোনও জাতি অজরামর নয়, স্থায়ীভাবে আবদ্ধ নেই কোনও অচলায়তনের পাষাণ-কারায়। জৈব-জীবন বদলেছে, বদলাচ্ছে ও বদলাবে চিরকাল; ঠিক যেমন ব্যক্তি আসে যায়, জাতিও তেমনি নশ্বর। জৈব-বিবর্ত্তনের ইতিহাসে শিলাস্তর প্রামাণ্য। মহাসাগরের পরিধি ও গভীরতা পরিবর্ত্তন, পর্ব্বতমালার অভ্যুদয়-বিলয়, মহাদেশগুলির সংযোগ সেখানে সযত্নে লিপিবদ্ধ রয়েছে। গণনাতীত ভৌগোলিক ও আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে বসুন্ধরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জীবজন্তুকে সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন—তার অবিকৃত পরিচয় সেই শিলালিপির পাতায় পাতায়। অতীত ফসিল শিলাস্তরের ক্রোড়স্থিত জীবাশ্ম অভিব্যক্তিধারায় অকাট্য প্রমাণ। স্তরগুলি এক-এক যুগের পরিচয়, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে নতুন স্তর এসে পুরাতনকে চাপা দিয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাহিত হয়েছে সে যুগের প্রাণীকুল; আবার নতুন স্তর গড়ে উঠেছে। নতুন বেশ অপরিচিত জীব এসেছে, কিন্তু পূর্ব্বেকার স্তরের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘোচে নি—এরা তাদেরই বংশধর, চেহারায় আকৃতিতে অঙ্গসংস্থানে বেশ আছে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। জীব-জীবন ক্রমান্বয়ে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, এ অবিরল গতিতে ব্যস্ততা নেই, বিরাম নেই, ধারা অবিচ্ছিন্ন। শাখা-প্রশাখা বের হয়েছে বহুতর, পরজীবিতার উদ্ভব হয়েছে, জাতি ধ্বংস হয়েছে, অবনতি হয়েছে, মাঝে মাঝে কিন্তু জৈব-বিবর্ত্তন রয়েছে অক্ষুণ্ণ। পর্ব্বতশ্রেণীর অঙ্গে বহু স্তরের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সেখানে সামুদ্রিক জীবের ফসিল সংগুপ্ত। এরূপ সামুদ্রিক ফসিল হিমালয়ের ১৬,০০০ ফুট উচ্চ স্থান থেকে পাওয়া গেছে, আল্পসের ৮,০০০ ফুট ও আন্দিজের ১৪০০০ ফুট উপরেও তা বর্ত্তমান। তা হলে আজ যেখানে চিরতুষারশুভ্র উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী, একদিন সেখানে ছিল অনন্ত সমুদ্রের জলকল্লোল। প্রাকৃতিক পরিবেশের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন পৃথিবীর জীবজগতকে বদলেছে অনেক বার, অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিবর্ত্তনে জীবকে স্বভাব আচরণ বদলাতে হয়, না হলে মৃত্যু অবধারিত। যুগের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে জীবনের পরিস্ফুরণ এরূপ বিরাট ও বিপুল পরিমাণে সঙ্ঘটিত হয়েছে যে, তার কল্পনাও অবিশ্বাস্য অথচ সুদীর্ঘ যুগপরিবর্ত্তনকাল ধীরে ধীরে প্রাণীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন এনেছিল—তার অবশ্যম্ভাবী ফল অনুভূত হয়েছিল দেহ-মনে, বহিরঙ্গের পরিবর্ত্তন তার চিরাচরিত প্রকাশ। অশ্মীভূত শিলালিপি মৌন ভাষায় এই তথ্যকে জানাতে চেয়েছে অঙ্কিত ফসিলকুলকে সাক্ষী রেখে।

মেঘদূতের গাছপালা

শ্রীঃ—

মহাকবি কালিদাসের কাব্য অনেক দিন হতে আমাদের মনের খোরাক যুগিয়ে আসছে। তাঁর অমরাবতীর নন্দনকানন, ফুলে-ফলে বিভূষিত হিমালয়ের ক্রীড়াশৈল, সরোবরের নিত্য-বিকশিত কমলের সৌরভে আকৃষ্ট মধুকরের মোহন গানের তুলনা নাই। প্রকৃতপক্ষে কালিদাসের উপাখ্যানে, নায়ক-নায়িকার পটভূমির অন্তরালে যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির চিত্র দেখা যায়, তাতে মানুষ ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সমন্বয়ের সন্ধান পাই। মানুষের সুখ-দুঃখ-বেদনার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক লতা, ফুল, পাখী একটা আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রেখে ফুটে উঠেছে। তথ্যানুসন্ধানীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও এ সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

নিখিল বিরহী চিত্তের প্রতি সমবেদনার গান কালিদাস গেয়ে গেছেন তাঁর মেঘদূত কাব্যে। বিরহী যক্ষের বার্ত্তাবহনের জন্য তিনি মেঘের দৌত্য স্বীকার করেছেন। মেঘের যাত্রাপথ অনুসরণ করে তিনি পূর্ব্বমেঘে রামগিরি হতে অলকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথের সুন্দর বর্ণনা করেছেন। মেঘদূত যেন রামগিরি হতে অলকা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের বিরাট আলেখ্য। পথের পাশের নদী-গিরি-বন-উপবন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন পদার্থও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। পথের পাশের বনরাজির চিত্র ও ফুলের সৌরভ একটা আবেশময় তন্দ্রার সৃষ্টি করে। পূর্ব্বমেঘে কবি আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করে অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়ে নিয়ে চলেছেন। নব মেঘের পরশ পেয়ে পৃথিবী যেসব ফলে-ফুলে ভরে উঠে, মেঘের যাত্রাপথ অনুসরণ করে আমরা তাদের চিত্র দেখতে পাব।

মেঘকে দৌত্যে আহ্বান করতে গিয়ে যক্ষ প্রথমে তাকে কুর্চি ফুল দিয়ে অর্ঘ্য রচনা করে স্তুতি করছে। তারপর তাকে বলে দিচ্ছে তার যাত্রাপথে কোথায় বিশ্রাম করতে হবে, কোথায় কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য চোখে পড়বে। পূর্ব্বমেঘের এই সকল প্রাকৃতিক চিত্র তাদের রূপ নিয়ে সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, [illegible] করলে দেখতে পাব মহাকবি [illegible] যাত্রাপথের [illegible] বর্ণনা দিয়েছেন। [illegible]

ভূকন্দলী প্রাণের স্পর্শ পেয়ে মাটি হতে মুখ তুলে চাইছে। এক বৎসর পর মেঘের দেখা পেয়ে রামগিরি পাহাড় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, হঠাৎ মেঘের আগমনে রামগিরির সিক্ত বেতস-কুঞ্জ হতে সিদ্ধবালারা গৃহাভিমুখে পলায়ন করবে। অনুকূল বায়ু-ভরে রামগিরি হতে অলকার দিকে মেঘের যাত্রা সুরু হবে, পথে পথে তার ভ্রমণের পরশ দিয়ে গাছপালা সজীব করে ফুল ফুটিয়ে যাবে।

মেঘের যাত্রাপথে এর পর আসবে আম্রকূট পাহাড়। আম্র-কূটে রাশি রাশি বুনো আম পেকে সোনার রঙে পাহাড়টাকে মুড়ে রেখেছে। সেখানে বনচারিণীরা প্রফুল্ল মনে ঘুরে বেড়ায়। শ্যাম বর্ণ নিয়ে মেঘ আম্রকূট পাহাড়ে উঠলে পাহাড়টাকে দেখে মনে হবে ধরণীর বক্ষোদ্ভূত শ্যাম-মধ্য পয়োধরের মত।

আম্রকূট পাহাড়ের পর আসবে রেবা নদী। রেবার তীর জম্বু-বনে পরিপূর্ণ, পথশ্রান্ত মেঘ জম্বুবনসমাচ্ছন্ন রেবার জল পান করে তেজসঞ্চয় করে নিতে পারবে। পাহাড়ের বুকে বিশ্রাম করার সময় মেঘের পরশ পেয়ে কদম্বকেশর আনন্দ-শিহরণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠবে, ভূকন্দলীর নূতন কুঁড়ি মেঘের সজল পরশ পাবে। এর পর সদ্য-ফোটা কুর্চি ফুলের সুগন্ধময় ভূমি পেরিয়ে মেঘকে সম্মুখপানে দশার্ণ দেশে যেতে হবে।

দশার্ণে মেঘের পরশ পেয়ে কেতকী-মুকুল বিকশিত হবে। মেঘ সেখানে জামগাছের পাকা ফলের সুচিক্কণ কালো রূপ এবং পাখীর কাকলীমুগ্ধ অশ্বত্থ ও বটগাছ দেখে মোহিত হবে। দশার্ণের রাজধানী বিদিশায় বেত্রবতীর নীচে পাহাড়ের চূড়ায় কদম্বকেশরে মেঘ শিহরণ জাগাবে, মেঘের পরশ পেয়ে নদীতীরের বনযূথিকার কুঁড়ি স্নিগ্ধ মধুর হাসি হাসবে। এর পর মেঘ একটু বাঁকা পথ ঘুরে উজ্জয়িনী যাবে।

উজ্জয়িনীর পর নির্বিন্ধ্যা নদী, অবন্তীপুর পেরিয়ে কমল-কলির গন্ধে ভরা শিপ্রাতীরে হাজির হবে। শিপ্রার পর আসবে গম্ভীরা নদী। গম্ভীরা নদীর বুকে নুয়ে-পড়া বেতসলতা ঈষৎ ছোঁয়া শিথিল শাড়ীর মত দেখায়। মেঘের সজল পরশ পেয়ে সেখানে ডুমুরফল পেকে উঠবে।

তারপর আসবে কৈলাসগিরি, সেখানে বাঁশের রন্ধ্রে বাতাস-প্রবেশে সুমধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়। কৈলাসগিরির সরল বনে গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে মাঝে মাঝে দাবাগ্নির সৃষ্টি হয়। এইরূপ দাবাগ্নির শিখায় পুড়ে যাওয়া চমরীর চামরের জ্বালা মেঘ যেন সজল বর্ষণ দ্বারা নিবারণ করে। কৈলাসের পাশেই রয়েছে মানস-সরোবর, সোনার কমলে পরিপূর্ণ মানসের জল পান করে কৈলাসশিখরে আরোহণ করলেই মেঘ অলকাপুরী দেখতে পাবে।

মেঘ যে জড়-পদার্থ তা যক্ষ ভুলে গেছে। যক্ষের বর্ণনায় দেখি মেঘকে সজীব পদার্থের মত সবাই আদর করছে। পাহাড় তার চূড়ায় নিয়ে বসাচ্ছে, নদী জল পান করাচ্ছে, বায়ু গতি দিচ্ছে, ফুলেরা অর্ঘ্য নিবেদন করছে, শিখীরা নৃত্য উপহার দিচ্ছে, অর্থাৎ [illegible] সবাই তার [illegible]-অভ্যর্থনায় ব্যস্ত।

[illegible] বর্ণনায়

কবি প্রকৃতির অনুপম হাতের দাক্ষিণ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অলকা কালিদাসের এক অপরূপ সৃষ্টি—সেখানে একই সঙ্গে ছয় ঋতুর ফুল ফোটে। অলকাবাসীদের ফুলের সাজে চোখ জুড়িয়ে যায়। তাদের হাতে থাকে লীলাপদ্ম, কেশে কুন্দকুসুমের লহর, কখনও বা মন্দারগুচ্ছ, মুখে লোধ্ররেণু, কবরীতে কুরুবক, কানে শিরীষ, কখনও বা স্বর্ণকমল, সিঁথিতে কদম্ব। অর্থাৎ অলকায় একই সময়ে শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্ব পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কথায় সে-দেশের মেয়েরা—

"কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে কি জানি কোন কাজে,
অলক সাজত কুন্দফুলে শিরীষ পরত কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা—"

অলকায় নিত্য ফুল ফোটে, ভ্রমরগুঞ্জনে কুঞ্জবন মুখরিত, সরোবর নিয়ত বিকশিত, মন্দারবৃক্ষরাজিপরিপূর্ণ মন্দাকিনীর তীর, কল্পতরু সবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে।

অলকার রূপবর্ণনার পরে যক্ষ নিজ আবাসভূমির বর্ণনা দিয়েছে। কুবের আলয়ের উত্তরেই তা অবস্থিত, মেঘের নিকট যক্ষ তার বাড়ীর খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছে, যাতে মেঘের চেনায় কোন অসুবিধা না হয়। বাড়ীর এক কোণে যক্ষপত্নীর সযত্ন-পালিত একটি মন্দারগাছ, তার কচি ডালপালা ফুলের ভারে নুয়ে পড়ছে। বাড়ীর দীঘিতে সোনার কমল ফুটে রয়েছে। দীঘির তীরে হেম-কদলীর কাননঘেরা বিলাসভূমি, সেখানে কুরুবকের কুঞ্জ ও মাধবীবিতানের পাশে আছে অশোক আর বকুল গাছ। অশোক তার প্রিয়ার পদাঘাতে ও বকুল তার প্রিয়ার মুখ-মদিরাতে ফুলে ফুলে ভরে উঠত।

"অশোক কুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে—" —রবীন্দ্রনাথ

আজ তার প্রিয়া বিরহে শীর্ণ, তার সদা-প্রস্ফুটিত মুখখানি দিনান্তের কমলিনীর ন্যায় ম্লান। তাকে যেন মেঘ যক্ষের কুশলবার্তা জানায়।

প্রকৃতিবর্ণনা ছাড়াও মহাকবি মাঝে মাঝে ফুল এবং ফলের উপমা দিয়ে অনেক বর্ণনা করেছেন। যেমন পূর্ব্বমেঘের ৪১শ শ্লোকে পাই কুমুদশুভ্র শর্করীর কথা। উত্তরমেঘে অলকাপুরীতে দেখি বিম্বাধরাদের প্রাচুর্য্য, যক্ষের স্ত্রীর বর্ণনায় আছে তন্বী শ্যামা··· বিম্বোষ্ঠের বর্ণনা ও শ্যাম-কদলীর মত নিটোল উরুর কথা। উত্তর-মেঘের ২১শ শ্লোকে আছে স্থল-কমলের সঙ্গে আঁখির উপমা। বিরহী যক্ষপত্নীর কাজল-কালো আঁখি বাদল-ঘন আঁধারে আধো ফোটা আধো ঢাকা স্থল-কমলের মত দেখাচ্ছে।

বস্তুতঃ কালিদাস মেঘদূত কাব্যে বর্ষার অন্তর্বেদনা প্রকাশে যে প্রকৃতি-প্রীতির [illegible] মেঘদূতের আর তুলনা নেই।

দেশ-বিদেশের কথা

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং ডিভিশনের (ইউরোপীয় ভাষাসমূহ) সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল, ডিপ-লিব আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রদপ্তরের ইণ্টারন্যাশনাল এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম অনুযায়ী নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীবিনয়েন্দ্র সেনগুপ্ত

তাঁহার ভ্রমণের সমগ্র ব্যয় ভারতীয় হুইট লোন ফণ্ড হইতে দেওয়া হইয়াছে। সেনগুপ্ত মহাশয় ১৯৫৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস ও নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবলিওগ্রাফি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিকাগো, প্রিন্সটন, বোষ্টন, হার্ভার্ড, ওয়াশিংটন, বাল্‌টিমোর, নিউ ইয়র্ক প্রভৃতি স্থানের সকল প্রকার গ্রন্থাগারের কার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল সেণ্ট্রাল লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফির কার্য্যপদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া আসিয়াছেন। গ্রন্থাগারিক বৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর এই বিশেষ জ্ঞান এদেশের গ্রন্থাগার-উন্নয়নে সহায়তা করিবে।

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

নয়া দিল্লীর ইউনিয়ন একাডেমীর অধ্যক্ষ শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য সম্প্রতি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রিটিশ গিয়ানায় স্থিত টাগোর মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউটের অধ্যক্ষপদে বৃত হইয়াছেন। গত ১৮ই

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য্য

জুন তিনি ইউরোপ হইয়া দক্ষিণ আমেরিকায় যাত্রা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিল্লীর সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান "অনামিকা"র প্রাণস্বরূপ ছিলেন। গল্প লিখিয়া ব্রজমাধববাবু বাংলা সাহিত্যে পরিচিতিলাভ করিয়াছেন। "প্রবাসী"তে তাঁহার অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে।

সাহিত্য সংস্থার রবীন্দ্র-জন্মোৎসব

নবগঠিত সাহিত্য সংস্থার উদ্যোগে গত ১১ই মে শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীরবকৃষ্ণ সান্যালের আহ্বানে ৫৩০২ রাজা

রাজবল্লভ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব মনোরম পরিবেশে উদযাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক শ্রীপতঞ্জলি ভট্টাচার্য্য স্মরণানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সংস্থার পক্ষ হইতে কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সংস্থার সম্পাদক শ্রীজয়দেব রায়। রবীন্দ্রনাথের "জীবনদেবতা" তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরী রচিত এক আলেখ্যে বহু সঙ্গীতশিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় 'জীবনদেবতা' নিরূপণ তত্ত্বের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বক এক হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র-সংস্কৃতির তাৎপর্য্য এবং বর্ত্তমান যুগে তাহার মূল্য সম্পর্কে ভাষণ দান করেন। ইহা ছাড়া গোপাল ভৌমিক প্রমুখ বহু সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন কুমারী অরুণা ঘোষ, পদ্মরাণী সরকার এবং আরও অনেক সঙ্গীত-শিল্পী। কবি জ্যোতিকুমার রচিত "শুভ জন্মদিনে লহ প্রণাম" শীর্ষক একখানি সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল।

সাহিত্য সংস্থার রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল

তিলুড়ী পল্লী-লেখক-শিল্পী সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন

গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই জুন বাঁকুড়া জেলার তিলুড়ী গ্রামে পল্লী-লেখক শিল্পী সঙ্ঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের অধিবেশন বিপুল সমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র তিলুড়ী গ্রামে গিয়া অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ৭ই জুন রাত্রি সাতটায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাঁকুড়ার মহকুমা-শাসক কবি শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে শ্রীসুধাংশুকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীনলিনী-কুমার ভদ্র। সভায় তিলুড়ী এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। সভার কাজ শেষ হইলে পর, পল্লীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। শালতোড়ার অমূল্য কালিন্দীর ঝুমুর গান, কবিগান, বিশেষ ভাবে উড়িষ্যার, জয়পুরের মধু রায়ের ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ছৌ নৃত্য বিশেষ ভাবে উপভোগ্য হইয়াছিল। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বর্ত্তমান শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্কটের কথা উল্লেখ করেন।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পল্লীর সংস্কৃতির সহিত পল্লীবাসীদের জীবনের যে কি নিগূঢ় সম্বন্ধ সে বিষয়ে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। হাজার পাঁচেক শ্রোতার সম্মুখে প্রদত্ত তাঁহার ভাষণটি বিশেষ উদ্দীপনাপূর্ণ এবং মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। তিনি বলেন, "নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতার মধ্যে বাংলার আত্মাকে পাওয়া যাইবে না। বাংলার আত্মাকে, তাহার প্রাণসত্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে—লোকগীতি, লোককথা, ঝুমুর, কবিগান, ভাটিয়ালী, বাউল

গান, লোকনৃত্য ইত্যাদির মধ্যে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদা অগ্রণী হইয়াছিলেন—লালন শা ফকির প্রভৃতি বাউল-সাধকদের লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে। দীনেশচন্দ্র সেন এবং চন্দ্রকুমার দে'র প্রযত্নে সংগৃহীত পালা গানগুলি সিল্‌ভ্যাঁ লেভি এবং রমাঁ রলাঁর মত বিশ্ববিশ্রুত মনীষীদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। বাংলার লোক-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রাহক ছিলেন সদ্য লোকান্তরিত রূপকথার রাজা দক্ষিণারঞ্জন—বাংলার ব্রতকথাকে নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন অবনীন্দ্রনাথ, বাংলার আলপনা-শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তিনি গৌরবের আসনে। বাংলার এই সকল শ্রেষ্ঠ সন্তানদের আদর্শ যেন আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। বাংলাকে বাঁচাইতে হইলে যে তাঁর লোক-সংস্কৃতিকে বাঁচাইতে হইবে একথা যেন আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি।"

এই দিনকার অনুষ্ঠানে স্থানীয় সাধক গোরা পাগলার রচিত সাধন সঙ্গীতসমূহ তাঁহার শিষ্য এবং প্রশিষ্যগণ কর্তৃক গীত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করিয়াছিল। স্থানীয় একজন বাউলের গানও খুব উপভোগ্য হইয়াছিল। ঘেটুগান, তর্জ্জা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্মেলনটি বাংলার লোক-সংস্কৃতির বহুমুখী ধারার এক বিরাট রূপ দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সম্মেলনের মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের ক্ষেত্রে হিলুড়ীর এই সংস্থার কর্ম্মকর্ত্তাদের পথিকৃৎ বলা যাইতে পারে। এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে সতীশ-চন্দ্র সেন, সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রীশ্যামাপদ চৌধুরী, সাহিত্যিক শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী প্রভৃতির সংস্কৃতি প্রীতি ও কর্ম্মক্ষমতা।

ভারতীয় নৃত্যকলা ম৷ন্দরের নবম বার্ষিক উৎসব

গত ১২ই মে সন্ধ্যা ছয়টায় নেতাজী সুভাষ ইনৃষ্টিটিউটে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নবম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নৃত্যশিল্পী শ্রীনীরেন্দ্র-নাথ সেনগুপ্ত। সম্পাদক শ্রীঅসিত চক্রবর্ত্তী বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। সভাপতির পদে বৃত হন শ্রীজে. সি. গুপ্ত। প্রধান-অতিথির আসন গ্রহণ করেন—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। শ্রীমতী ঊষা গুপ্তা পুরস্কার বিতরণ করেন। এই উপলক্ষে 'চণ্ডালিকা' (নৃত্যনাট্য) এবং বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কলিকাতা, বাটানগর, কাঁচড়াপাড়া ও হরিণঘাটা চক্রবর্ত্তী মুক্তি শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। ছন্দা চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণা সরকার, মীনাক্ষী সেনগুপ্তা প্রমুখ নৃত্যশিল্পীদের বিভিন্ন নৃত্যকলা দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জ্জন করে। সঙ্গীত পরি-চালনায় শ্রীসমর মিত্রের সহযোগিতা করেন সমীর ঘোষ প্রভৃতি।

সাহিত্যতার্থে কথাসাহিত্যিক ও কবি-সম্মেলন

সাহিত্যতীর্থের গত ৩রা থেকে ৫ই জ্যৈষ্ঠ এই তিন দিন ব্যাপী কথাসাহিত্যিক ও কবিসম্মেলন "মন্মথনাথ মল্লিক স্মৃতিমন্দিরে" অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে একটি বাংলা কবিতাপুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। প্রদর্শনীটির দ্বারোদঘাটন করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর। এই বৎসর সাহিত্যতীর্থের পক্ষ হইতে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীহরিপদ মহলানবীশ। সাহিত্যতীর্থের তীর্থঙ্করবৃন্দের পক্ষে কবি শ্রীরমেন্দ্র-নাথ মল্লিক শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ ঘোষ কর্ত্তৃক বিচিত্রিত মানপত্র পাঠ করেন। উপেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া ভাষণ দান করেন শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ চৌধুরী, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বসু, গোপাল ভৌমিক, প্রভাতকিরণ বসু, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অখিল নিয়োগী এবং কুমারেশ ঘোষ। সংবর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে আনন্দ দান করেন।

কবিসম্মেলনের প্রারম্ভে কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন, সাহিত্য-তীর্থের এই কবিসম্মেলনে কবির সংখ্যা গৌরবের। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের হয়ত কিছু বিরোধ আছে, কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য নয়। বর্ত্তমান বাংলা কবিতায় দুইটি দিক আছে একটি রসের দিক অপরটি মননের দিক। এই দুইটি ধারায় বাংলা কবিতার আকাশ আজ উজ্জ্বল।

কবি অধ্যাপক ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা সম্পর্কে বলেন, রবীন্দ্রোত্তর সর্ব্বকনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে আজ মনন-শীলতার দিকে ঝোঁক দেখা যাইতেছে। তাঁহারা নূতন কথা নূতন ভঙ্গীতে নূতন আঙ্গিকে বলিতেছেন, ইহাতে প্রবীণ ও নবীনের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল কিন্তু আজ তাহা অতিক্রান্ত হইতে চলিয়াছে।

কবিসম্মেলনে শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কৃষ্ণধন দে, যতীন্দ্র সেন, হরপ্রসাদ মিত্র, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তশীল দাস, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র মল্লিক, দুর্গাদাস সরকার, আনন্দ বাগচী, কবিতা সিংহ, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। স্বরচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীতিকার শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। সভান্তে সমবেত কবিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কবিচন্দ্র শ্রীরাসবিহারী মল্লিক।

কথাসাহিত্যিক সম্মেলনের প্রারম্ভে বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। স্বরচিত ছোটগল্প পাঠ করেন শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দক্ষিণারঞ্জন বসু, কুমারেশ ঘোষ, সতীন্দ্রনাথ লাহা ও আশিস বসু। শেষে বাসন্তী সেনগুপ্তা সেতার বাজান, জয়কৃষ্ণ সান্যাল রাগপ্রধান বাংলা গান করেন। সভান্তে তিন দিন ব্যাপী বাংলা কবিতা কবিতা পুস্তকের প্রদর্শনী হয় ও তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনের উৎসবান্তিক ভাষণ দান করেন সাহিত্যতীর্থের সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক।

মাধ্ব স্মৃতি

অধ্যাপক শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়, এম-এ

দর্শনশাস্ত্র-পারঙ্গমের সহিত যে স্মার্ত্তদিগের বিশেষ কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই তাহা সর্ব্বজনবিদিত। উভয়ের সম্পর্কটা একেবারে অহিনকুল জাতীয় না হইলেও প্রীতিকরও নহে। এ প্রসঙ্গে শ্রীনাথাচার্য্য চূড়ামণির তাৎপর্য্যদীপিকা গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। সেখানে শ্রীনাথাচার্য্য বলিতেছেন যে, দার্শনিকেরা স্বভাবতঃই স্মৃতিশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন না (গজনিমীলনবন্ন মনশ্চিরং দধতি দর্শনতত্ত্ববিদঃ স্মৃতৌ, পদপদার্থ বিচারঃ জড়াঃ পরে তদিহ শিষ্যহিতায় মম শ্রমঃ)। প্রখ্যাতনামা দার্শনিক অথচ অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্মার্ত্ত এরূপ মনীষী আমাদের দেশে একেবারে যে জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহা বলি না, তবে তাঁহাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। হিন্দুর ষড়দর্শন প্রসিদ্ধ; কিন্তু ষড়দর্শনকারের মধ্যে একজনেরও স্মৃতিশাস্ত্রে অসাধারণ দখল ছিল বলিয়া শোনা যায় না। কণাদ, কপিল প্রভৃতি মুনিগণ—পরম রহস্যময় দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব-উন্মোচক রূপেই পূজ্য; মনুঅত্রি প্রভৃতির ন্যায় তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও যান নাই বা ধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যাতাও ছিলেন না। পরবর্ত্তী যুগের রামানুজ, শঙ্করাচার্য্য, উদয়ন প্রভৃতির সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য, আনন্দতীর্থমধ্বেরও উল্লিখিত দার্শনিকগণের ন্যায়ই অবস্থা, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতির ন্যায় প্রসারলাভ না করিলেও মাধ্বদর্শন অবহেলার বস্তু নহে। ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনের মত সর্ব্বজনস্বীকৃতি লাভ না করিলেও মাধ্বদর্শনের প্রচার তদানীন্তন কালে যে যথেষ্ট ছিল সৌর পুরাণ তাহার প্রমাণ। সেখানে মাধ্বদর্শনের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করার জন্য কি চেষ্টাই না করা হইয়াছে, মধ্বাচার্য্যের চরিত্রকে অত্যন্ত ঘৃণ্যরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে। তাহার সম্পর্কে অত্যধিক মাত্রায় বিষোদ্গার করা হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌর পুরাণকার এ বিষয়ে সাধারণ ভদ্রতার সীমাটুকুও নিঃসন্দেহে লঙ্ঘন করিয়াছেন। সে সময়ে মধ্বাচার্য্য পন্থানুবর্ত্তিগণ এক প্রবল সম্প্রদায় হইয়া উঠিতেছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাহারা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাহানি করিবার জন্যই যে বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের এই হীন প্রয়াস তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান পণ্ডিতসমাজে কাহারও কাহারও ধারণা এই যে, অন্যান্য দার্শনিকপ্রবরদের ন্যায় মধ্বাচার্য্যেরও স্মৃতিশাস্ত্রে সেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু এই প্রচলিত সিদ্ধান্তের সমর্থনে কোন যুক্তি নাই এবং মধ্বাচার্য্য-রচিত কোনও স্মার্ত্তগ্রন্থ পাওয়া যায় না।

কলিকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিশালায় (নং জি ১০৫০৩) 'সদাচার স্মৃতি' নামক এক পুথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি অধ্যাপক ডাঃ রাজেন্দ্রচন্দ্র হাজরা মহাশয়ই বর্ত্তমান লেখককে ইহার সন্ধান দেন। গ্রন্থখানি যে আনন্দতীর্থমধ্ব-বিরচিত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, কারণ ইহার সর্ব্বশেষ পংক্তিটি হইতেছে—ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎ পাদ-বিরচিতা সদাচারস্মৃতিঃ সমাপ্তা (পৃষ্ঠা ৭ খ)। চত্বারিংশৎ শ্লোকটিও এ বিষয়ের প্রমাণ। শ্লোকটি এইরূপ :

'আনন্দতীর্থমুনিনা ব্যাসবাক্যঃ (? বাক্য) সমুদ্ধৃতিঃ,
সদাচারস্য বিষয়ে কৃতা সংক্ষেপতঃ শুভা'।

এই কারণেই মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় বলিয়াছেন : "This is a short treatise on Sadachara compiled by আনন্দতীর্থ, the founder of the মাধ্ব school of vaisnavas from Vyasa's works"। শাস্ত্রী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন, অন্যান্য কোন প্রচলিত গ্রন্থে এ ধরনের সংবাদ পাওয়া গেলেও এটি যে মধ্বাচার্য্যেরই লেখা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত সংস্কৃত পুথির তালিকা খুলিলে সেখানে 'সদাচার' নামক আর এক স্মৃতি-গ্রন্থের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারা যায়। পুথিটির সর্ব্বশেষ অংশে এই সংবাদটুকু পাওয়া যায় :

'তথৈব মৎকৃতা টীকা বালবুদ্ধ্যা তু সাধবঃ।
ন্যূনাধিক্যঞ্চ যত্তত্র ক্ষময়ন্তু দয়ান্বিতাঃ।
অনেন প্রীয়তাং শ্রীমদ ভগবান্ বাদরায়ণঃ,
তব ভক্তপ্রবরঃ শ্রীমান্ পূর্ণবোধঃ প্রসীদতাম্।

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থ ভগবৎ পাদাচার্য্য বিরচিতঃ সদাচার, সম্পূর্ণঃ।'

ইহা হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, 'সদাচার' বা 'সদাচার স্মৃতি' নামক কোন গ্রন্থ তৎকালে প্রচলিত ছিল এবং সে গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্ব। এই গ্রন্থটির বহুল প্রচলন ছিল এবং ইহা মাধ্বপন্থিগণ কর্ত্তৃক ত গৃহীত হইয়াছিলই, অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট যে অনাদরণীয় ও অসমাদৃত হইয়াছিল তাহা নহে, কারণ কোনও গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজ কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও সমাদৃত না হইলে সেই গ্রন্থের টীকা লিখিবার প্রয়োজন হয় না। জনপ্রিয়তাই গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনীর প্রধান কারণ। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আলোচ্য 'সদাচার স্মৃতির'ও এক টীকার সন্ধান করিয়া উঠিতে সক্ষম হইয়াছি। এ প্রসঙ্গে বিকানীর মহারাজার গ্রন্থাগারস্থ

সংস্কৃত পুথির তালিকার ৯৬৬ সংখ্যক পুথির প্রতি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই, উহার শেষ পঙক্তিটি এ বিষয়ে অনুধাবনীয়।

'ইতি শ্রীমদ্ধিতার্থ সুরিসূনুনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য বিরচিতা সদাচার স্মৃতিটীকা সমাপ্তা'।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, হিতার্থ সুরি নামধেয় ব্যক্তির পুত্র আচার্য্য নারায়ণ পণ্ডিত এই সদাচার স্মৃতি গ্রন্থের টীকাকার। পুথি পরিচিতি প্রসঙ্গে ডাঃ মিত্র মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন—'A commentary on the work by Narayana Pandita, son of Hitartha Suri.

এই হিতার্থ সুরি কে বা কাহার পুত্র, নারায়ণ পণ্ডিতই বা কোথাকার এবং কোন সময়ের লোক, সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। আমরা এমন কোন সংবাদের সন্ধান করিতে পারি নাই যাহার দ্বারা এই পিতাপুত্রের পরিচিতি সম্পর্কে কিছুমাত্র আলোকপাত করিতে পারা যায়। তবে এইটুকুমাত্র বলা যায় যে, ইঁহারা মাধ্বপন্থী ও অত্যন্ত শক্তিশালী লেখক। মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইতেই আমরা টীকাকারের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাই, সেখানে তিনি বলেন—

'আম্নায়ৈরুদিতানি তানি বহুধা বৈতানিকাদীনি সং
কর্ম্মণি প্রবিধায় তৎফলভুজো ব্যাপারিণয়াংশয়া। (?)
সন্তঃ শ্রীকমলাদিতে হরিশিরো ভূযাখ্যু পূরাকরে
মোদন্তে বিনিবেশ্য যস্য চরণাম্ভোজে তমীশং ভজে'॥

মধ্বাচার্য্য স্বয়ং এই সদাচার স্মৃতি নামক গ্রন্থটির কোন খণ্ড বা পর্ব্ব কিংবা অধ্যায়বিভাগ না করিলেও আলোচিত বিষয়সমূহের পার্থক্যনিবন্ধন গ্রন্থটিকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগে আচারবিষয়ক আলোচনা এবং দ্বিতীয় ভাগে দার্শনিকতত্ত্বের প্রসঙ্গ দেখিতে পাই। কিন্তু গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বৈষ্ণব-স্মৃতি। কোনও স্থলে বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতার নামোল্লেখ নাই। সর্ব্বত্রই বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুচিন্তা, শ্রীবিষ্ণুর আরাধনার কথাই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে দার্শনিক রহস্য আলোচনা-প্রসঙ্গে সর্ব্বত্র সেই শ্রীবিষ্ণুর জয়জয়কার। সর্ব্বসময়েই শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে—কদাপি বিস্মৃত হইলে চলিবে না। ("স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ", ২৯ শ্লোক, পৃ, ৬ক) অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম বা স্থূল সকলপ্রকার বস্তুই শ্রীনারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা উচিত। বহিবুদ্ধিগোচরীভূত

সকল পদার্থ ও আন্তরবুদ্ধিগম্য সর্ব্ববিষয় শ্রীনারায়ণকেই নিবেদনীয়, ('কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবম্। করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ'। ৪১৯ শ্লোক, পৃ, ৪খ)। এক স্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকরূপে 'ধ্যেয় সদা সবিতৃ-মণ্ডল মধ্যবর্তী' এই নারায়ণ মন্ত্রটিরও উল্লেখ করিয়াছেন. কৃষ্ণৈক-প্রাণতা অহেতুক কৃষ্ণানুরাগই যে গ্রন্থকারের এবংবিধ বারংবার বিষ্ণু বা কৃষ্ণনামোল্লেখের কারণ সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীবিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন যে, সকল দেবের আশ্রয়স্থল রুদ্র, রুদ্রের অবলম্বন ব্রহ্মা, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণুকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয়স্থল কেহই নহে। ("রুদ্রং সমাশ্রিতা দেবা রুদ্রো ব্রহ্মণমাশ্রিতা। ব্রহ্মা মামাশ্রিতো নিত্যং নাহং কঞ্চিদুপাশ্রিতঃ'। ২৫ শ্লোক, পৃ, ৫ক।) রমা, ব্রহ্ম প্রভৃতিরও শ্রীবিষ্ণুই উপজীব্য ('রমা-ব্রহ্মদয়স্তস্য পরিবারতয়ৈব তু', ২৯ শ্লোক, পৃ, ৬খ)। শ্রীবিষ্ণু যে গায়ত্রী অপেক্ষাও শক্তিশালী তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ('গায়ত্র্যাস্ত্রিগুণং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নষ্টাক্ষরং জপেৎ', ১২ শ্লোক, পৃ, ৩ক) তিনি মহাপরাক্রমশালী পুরুষোত্তম ('সর্বোত্তমং বিষ্ণু' শ্লোক ১২, পৃ, ৩খ)। সকল সময়েই শ্রীহরি স্মরণীয়; এমনকি শ্রীহরির পার্ষদবর্গও নিরন্তর ধ্যেয়, পূজ্য এবং প্রণম্য—('প্রণম্য…হরিপার্ষদান্', ১১ শ্লোক, পৃ, ৩ক, ৩খ)। এই-প্রসঙ্গে লেখক শ্রীমদ্‌ভগবদগীতার "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু' (৩১ শ্লোক, পৃ, ৬ক) প্রভৃতি শ্লোক উল্লেখ করিয়া নিজ মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অবশ্য স্থানে স্থানে অত্যন্ত উচ্চস্তরের দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত মৌলিক শ্লোকেরও যে অভাব আছে একথা বলা যায় না।

কিন্তু এহেন বৈদিক মার্গানুসারী পরম বৈষ্ণব গ্রন্থকারও তাৎকালিক তান্ত্রিকধর্ম্মের চলোর্মি আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে তান্ত্রিক বৈষ্ণব ছিলেন এমন কোনও প্রমাণ কুত্রাপি পাওয়া যায় না, তথাপি তাঁহার এই 'সদাচার স্মৃতি'র একস্থলে তিনি তন্ত্রশাস্ত্রকে স্বীকার করিয়াছেন এবং যথোচিত সম্মানের আসন না দিয়া পারেন নাই। বস্তুতঃ সহজসাধ্য, অচিরফলপ্রসূ তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী সাধারণ জন-সমাজের মর্ম্মমূলে তখন তন্ত্র (কি বৈষ্ণব কি শৈব) দৃঢ়প্রোথিত ছিল। এমত অবস্থায় তাহাকে বলপূর্ব্বক অস্বীকার করিয়া মধ্বাচার্য্য স্বীয় অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই ইহা সৌভাগ্যের কথা। তন্ত্রকে একেবারে অস্বীকার করিলে হয়ত ফল ভিন্ন হইত, তাই তিনি সযত্নে তন্ত্রকে স্বীকার করিয়া বেদের সহিত সমান মর্য্যাদা দিয়াছেন ('জ্ঞাত্বা সংপূজয়েদ বিষ্ণুং বেদতন্ত্রোক্তমার্গতঃ', ১৬ শ্লোক, পৃ ৩ক)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি লেখককৃত কোন অধ্যায় বা বিভাগ দৃষ্ট না হইলেও গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের ভেদ অনুযায়ী গ্রন্থটি মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয় ভাগটি উচ্চ দার্শনিক চিন্তা-সম্বলিত, তাহার সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচিত হইল। প্রথম ভাগটি বিশুদ্ধ স্মৃতিসম্পর্কীয়, আমাদের দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কি ভাবে ও কি উপায়ে সম্পন্ন করা উচিত তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। ফলতঃ চতুর্থবর্ণের আহার বিহার সংযমের পন্থা প্রদর্শন করাই স্মৃতি-শাস্ত্রগুলির প্রধান উদ্দেশ্য, তাই দেখি যে, আলোচ্য গ্রন্থটিও সে মুখ্য আলোচনা হইতে বিরত হয় নাই। বস্তুতঃ গ্রন্থখানি সত্যই সার্থক-নামা—সদাচারগুলির যথাযথ নিরূপণই ইহার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে প্রচলিত অপরাপর শাস্ত্রগুলির সহিত ইহার পার্থক্য লক্ষণীয়। এখানে চতুর্বর্ণের নিত্যকরণীয় প্রত্যেকটি কার্য্যের সহিত শ্রীবিষ্ণুর নাম শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহা বিপ্রের সন্ধ্যাবন্দনাদির ন্যায় অবশ্যকর্ত্তব্য

বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রত্যুষে শয্যা-ত্যাগ করিবার সময়েই শ্রীবিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতে হইবে। তাহার পরে শৌচ দন্তধাবন স্নানাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে মৃত্তিকা দ্বারা স্বদেহ লিপ্ত করা বিধেয়। এই মৃত্তিকালেপনের সময়ে তিনটি মন্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—তিনটিই শ্রীবিষ্ণু সম্পর্কীয়—মন্ত্র তিনটি, 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়,' 'ওঁ নমো নারায়ণায়,' এবং ওঁ নমো বিষ্ণবে' যথাক্রমে দ্বাদশাক্ষর, অষ্টাক্ষর ও ষড়ক্ষর সম্বলিত ('উদ্ধৃতেতি মৃদালিপ্য দ্বিবষ্টষড়ক্ষরৈঃ', ৩ শ্লোক, পৃষ্ঠা ১খ), 'আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবঃ' ইত্যাদি সূক্ত আবৃত্তিকালে এবং জল-মগ্ন অবস্থায় বারত্রয় অঘমর্ষণ জপের সময়েও সকললোকস্রষ্টা সেই পুরুষোত্তম নারায়ণকে স্মরণ করিতে হইবে ('মৃদালিপ্য নিমজ্জ্য ? স্ত্রির্জপেদঘমর্ষণম্, স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং স্মৃত্বা নারায়ণং পরম্'। ৪ শ্লোক, পৃষ্ঠা ২ক)। প্রণবমন্ত্রের পরে পুরুষসূক্ত আবৃত্তি দ্বারা স্বদেহ-সিঞ্চনের বিধি আছে, কিন্তু সেখানেও স্বদেহস্থ হরিস্মরণ কর্ত্তব্য। ('সিঞ্চেৎ পুরুষসূক্তেন স্বদেহস্থং হরিং স্মরম্', ৫ শ্লোক,পৃষ্ঠা ২ক)। অনুক্ষণ এমন কি বেদমাতা গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি-সময়েও সূর্য্যমণ্ডল-গত শ্রীহরির স্মরণ করিতে হইবে ('অর্কমণ্ডলগতং বিষ্ণুং ধ্যাত্বৈব ত্রিপদীং জপেৎ', ৮ শ্লোক, পৃষ্ঠা ২ক)। একটি বিষয়ের দিকে মধ্বাচার্য্য বারংবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—সেটি হইল বাক্‌সংযম। ('বাগ যতঃ সর্ব্বদা জপেৎ', ৯ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৩ক।) তাহা হইলে উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না যে, যেখানেই জপ বা আবৃত্তির কথা আছে—সর্ব্বত্র মানসিক জপ বা মানস আবৃত্তির কথা বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ কিনা ধ্যানই হইল বড় কথা। পত্রপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনার কথা গ্রন্থের কুত্রাপি নাই, অর্চ্চনার মধ্যে ধ্যানই প্রধান। শ্রীহরির অর্চ্চনা বিষ্ণুর ধ্যানের মধ্যেই নিহিত। ('এবং সর্ব্বোত্তমং বিষ্ণুং ধ্যায়ন্নেবার্চ্চয়েদ্ধরিম্', ১২ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৩ খ।) উপাসনার সার কথা ধ্যান ও মানস প্রবচন। ('ধ্যানপ্রবচনাভ্যাং চ যথাযোগ্যমুপাসনম্', ১২ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৩খ।)

বেদ ও তন্ত্রোক্ত মার্গে বিষ্ণুর পূজার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৈষ্ণবদের বলি ও তর্পণ নিত্যকর্ম্ম রূপে প্রতিপালিত হইয়াছে। আহারের সময়েও ঐ একই কথা। সেখানেও গ্রন্থকার বলেন, 'ভুঞ্জীত হৃদগতং বিষ্ণুং স্মর তদগত মানসঃ'। (১৬ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৪ক) স্নান আচমন ব্যাপারেও বিষ্ণুস্মরণ বিধেয় ('আচম্য মূল মন্ত্রেন', ১৬ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৪ক) ('মূলমন্ত্রৈঃ সদা স্নানং বিকারেব চ তর্পণম্' ৩৪ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৬ক)। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদির মধ্যেও শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন, দিনশেষে রাত্রিতে শয়নের সময়ে শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করাই বিধি ('যামাৎ পরত এবাথ স্বপেদ্ধ্যায়ন্ জনার্দ্দনম্', ১৮ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৪ক)।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, চারিবর্ণেরই প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ হইতে রাত্রিতে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের মূল প্রধান কর্ম্মের সহিত বিষ্ণুর নাম স্মরণ কর্ত্তব্য বলিয়া আলোচ্য গ্রন্থে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সকল কার্য্যই যদি শ্রীবাসুদেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যায়, মাত্র তাহা হইলেই কৃতকৃত্য হওয়া সম্ভব। সর্ব্বদাই বিষ্ণু স্মরণীয়, বিস্মৃতি পাপমূলা ('স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণু-র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ', ২৯ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৬ক)। সকল বর্ণাশ্রমেরই শ্রীবিষ্ণুই আরাধ্য দেবতা। ('সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা', ৩৬ শ্লোক, পৃষ্ঠা ৬ক, খ)।

আলোচনা

"নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ"

(উত্তর)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

অনেকের ধারণা মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদক। কিন্তু এ ধারণার সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে আমি গত মাঘের 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিয়াছিলাম। কয়েকটি কারণে এই ধারণার সত্যতা সন্দেহাতীত বলিয়া মনে হয় না ; যথা :

১। মধুসূদনের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার মৃত্যুসংবাদ বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধাদি সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হয় তাহাতে তাঁহার এই সাহিত্য-কীর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই।

২। মধুসূদনের পত্রাবলীতে তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহের, এমনকি ছাত্রাবস্থায় লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরেজী কবিতার পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে, কিন্তু এত বড় একটি সাহিত্য-কীর্ত্তির কোন উল্লেখ নাই।

৩। তাঁহার মৃত্যুর কুড়ি বৎসর পরে যোগীন্দ্রনাথ বসু যে প্রামাণিক জীবনচরিত প্রকাশ করেন তাহার উপকরণ দীর্ঘকাল ধরিয়া মধুসূদনের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ভোলানাথ চন্দ্র প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের বিস্তৃত স্মৃতিকথায় এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু-রচিত মধুসূদনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক জীবন-চরিতের অনেকগুলি সংস্করণ হইয়াছিল (১৩০০, ১৩০১, ১৩১২, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ ইত্যাদি)। কোনটিতেই এই সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫। 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের জন্য রেভারেণ্ড জেম্স লঙ মানহানির দায়ে সুপ্রীম কোর্টে অভিযুক্ত হইলে তিনি গ্রন্থকার বা অনুবাদকের নাম প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে লিখিত বিবৃতি পেশ করেন তাহাতে স্পষ্টই বলেন, "এই গ্রন্থখানি এতদ্দেশবাসীদের অনুপ্রেরণায় বা জ্ঞাতসারে রচিত হয় নাই এবং তাহাদিগের মধ্যে বিতরিতও হয় নাই। এই মোকদ্দমার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। লঙ-প্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থটিতে লিখিত ছিল যে, একজন 'নেটিভে'র দ্বারা অনুবাদিত।

এস্থলে স্মর্তব্য যে 'Native' কথাটি মাইকেল মধুসূদনের নিকট অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন—"তিনি [মধুসূদন] যখন মান্দ্রাজে অবস্থান করিতেন তখন সেখানে Native man কথাটির বড় প্রচলন ছিল। সাহেবদিগের পক্ষে European gentlman এবং দেশীয়দিগের পক্ষে Native man এইরূপ ভাষাই সেখানে ব্যবহৃত হইত। মধুসূদন সংবাদ-পত্রে এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ করিয়া এইরূপ ভাষার পক্ষপাতীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।"

৬। নগেন্দ্রনাথ সোম তদীয় 'মধু-স্মৃতি'তে লিখিয়াছেন, (ভারতবর্ষ ১৩২১-৪, ১ম সং ১৩২৭, ২য় সং ১৩৬১) মধুসূদনের কোন জীবন-চরিতে ইতঃপূর্ব্বে ইহা প্রকাশিত হয় নাই, তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করিলেন যে, মধুসূদনের দ্বারাই নীলদর্পণ ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়।

৭। নগেন্দ্রনাথ সোম-কৃত মধুসূদনের জীবনকথা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কেহ কেহ নানা প্রবন্ধে মধুসূদনকে নীলদর্পণের অনুবাদক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম ইহার উল্লেখ পাই বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু-জীবনীতে। উহাতে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, নীলদর্পণের "ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তিনি তাঁহার জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্রও লিখিয়াছেন, "অনুবাদক মাইকেল মধুসূদন দত্ত সুপ্রীম কোর্ট হইতে লাঞ্ছিত হইলেন।"

এক্ষণে ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, মোকদ্দমার নথিপত্রে যাঁহার নামের উল্লেখ নাই বা কেহ প্রকাশ করেন নাই, তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্ট তিরস্কৃত ও অবমানিত করিতে পারেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্রকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বর্ত্তমান লেখককে বলিয়াছিলেন যে, দীনবন্ধু-জীবনীর পাণ্ডুলিপি তাঁহার কাছে আছে, মনে হয় মধুসূদন সম্বন্ধীয় অংশটি অন্য কেহ ভিন্ন হস্তাক্ষরে উহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বঙ্কিমের লেখার উপর কে কলম চালাইতে পারেন ? তাই তাঁহার অনুবাদ, উহা তাঁহার মধ্যমাগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র সন্নিবেশিত করিয়া থাকিবেন।

ফাল্গুনের 'প্রবাসী'তে শ্রীগোপালচন্দ্র রায় এই বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন।

(১) বর্ত্তমান লেখককে ললিতবাবু যাহা বলিয়াছিলেন তিনি তৎসম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, কারণ ললিতবাবু স্বয়ং তাঁহার

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্যে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলেছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগপ্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরুহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বইখাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা— আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্যে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্যে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

"History of Indigo Disturbances in Bengal" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, মাইকেল একরাত্রির মধ্যে নীলদর্পণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা সঞ্জীবচন্দ্র সংশোধন করিতে যাইবেন কেন এবং সঞ্জীবচন্দ্র কোন অসত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে বঙ্কিমই তাহা স্বীকার করিবেন কেন ?

(২) বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু ও মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বঙ্কিমের বিবৃত ঘটনা তাঁহাদের নিকট শুনিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

(৩) গৌরদাস ও ভূদেব-পুত্র মুকুন্দদেব বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ডেপুটি ও তাঁহার পরিচিত ছিলেন, সুতরাং দীনবন্ধু-জীবনীতে বঙ্কিম চন্দ্র ভুল লিখিলে গৌরদাস বা ভূদেব তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

(১) এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমের রচনায় কোন অংশ যে অন্য কাহারও দ্বারা সন্নিবেশিত ইহা তাঁহার কল্পনারও অগোচর ছিল। ললিতবাবুর "Indigo Disturbances" বাহির হইবার কয়েক বৎসর পরে তিনি বর্ত্তমান লেখককে উহার এক খণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। তাহার কিছুকাল পরে (যখন নগেন্দ্র বাবু 'মধুস্মৃতি' লিখিতেছেন তখন) ললিতবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি যে বলিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমান সঞ্জীবচন্দ্রের উহাতে হাত আছে, তাহা ইহা হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, নগেন্দ্রনাথকেও তিনি উহা বলিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লেখক বঙ্কিমের পাণ্ডুলিপিটি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, কিন্তু নগেন্দ্রনাথ যেরূপ জোরের সহিত লিখিয়াছেন, সঞ্জীবচন্দ্র "স্বহস্তে মধুসূদনের কথা উক্ত গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন" তাহাতে মনে হয় তিনি পাণ্ডুলিপি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহাতে কিছু আসিয়া যায় না, কারণ প্রবন্ধটি যখন বঙ্কিমচন্দ্রের নামে প্রকাশিত, তখন উহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের।

বঙ্কিমচন্দ্র যাহাই লিখুন না কেন, এখানে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন—যাঁহার নাম মোকদ্দমার নথিপত্রে নাই, তাঁহাকে সুপ্রীম-কোর্টের বিচারপতি সন্ধান করিয়া গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত করিবেন—ইহা কি সম্ভব ? বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মধুসূদনের কতদূর ঘনিষ্ঠতা ছিল, জানি না, তবে মনে হয় তাহার চেয়ে গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ প্রভৃতির সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহারা কি এ সম্বন্ধে কিছু জানিতেন না ? বঙ্কিমচন্দ্র "শুনিয়াছিলেন" মধুসূদনের সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত যাইতে বসিয়াছিল। (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কি মধুসূদন সুপ্রীম কোর্টে চাকুরী করিতেন ?)

(২) এক রাত্রির মধ্যে 'নীলদর্পণ' অনুবাদ করা সম্ভব কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

(৩) গোপালবাবু প্রশ্ন করিয়াছেন, যদি বঙ্কিমচন্দ্র সত্য কথাই লিখিয়া থাকেন, তবে গৌরদাস, ভূদেব, রাজনারায়ণ প্রভৃতি উহার প্রতিবাদ করেন নাই কেন ?

১৩০০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত, ইঁহাদের অনুমোদিত যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে উক্ত কাহিনীটি বর্জ্জন করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রতিবাদ আর কি হইতে পারে ? তাঁহারা কি মনে করিয়াছিলেন যে, সুপ্রীম কোর্টের তিরস্কার ও অবমাননা মধুসূদনকে লোকচক্ষে এত হেয় প্রতিপন্ন করিবে যে, তাঁহার এই সাহিত্য-কীর্ত্তির উল্লেখ হইতে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ।

মনে হয়, তিরস্কার ও অবমাননার কাহিনী এবং এক রাত্রির মধ্যে তারকনাথ ঘোষের বাটীতে সমগ্র নীলদর্পণ অনুবাদের কথা বৈঠকী গল্প হিসাবে চমকপ্রদ ও শ্রুতিসুখকর, কিন্তু ইতিহাস আরও প্রমাণ চায়।*

* এ সম্বন্ধে বাদ-প্রতিবাদ আর ছাপা হইবে না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

SUNLIGHT
SOAP

"শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব"

শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে মহামানবত্ব দিয়াছেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবও দুইটি প্রবন্ধে ইহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী কতখানি ঠিক তাহাই এখানে আলোচনা করিব।

মহাভারতের বহু স্থানে, সমগ্রভাবে গীতায় ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। যে-কোন রচনার অর্থ বুঝিতে হইলে সেই রচনার সুস্পষ্ট বাক্যগুলির সাহায্য লইতে হয়, রচনাটি বা তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিলে কিংবা তাহার কদর্থ করিলে rule of constructionকে মূলতঃ অস্বীকার করা হয়। এ বিষয়ে Maxwell এর "Golden Rule" প্রণিধানযোগ্য।

"When the language is not only plain but admits of but one meaning the task of interpretation can hardly be said to arise. It is not allowable, says Vallet, to interpret what has no need of interpretation. Absoluta Sententia Expositore Nonindiget."

গীতার সুস্পষ্ট বাক্যগুলিই ধরা যাক। চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্
প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"

আমি জন্মরহিত হইয়াও, অবিনশ্বর হইয়াও, প্রাণীসকলের প্রভু হইয়াও প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজ মায়া দ্বারা জন্মপরিগ্রহ করি।

যিনি অজ, অবিনাশী তাঁহার জন্ম বা মৃত্যু কিরূপে হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই দিতেছেন—আমার জন্ম বা মরণ না থাকিলেও অঘটনঘটনপটীয়সী ত্রিগুণময়ী মায়াকে স্বকীয় চিদাভাস যোগে আশ্রয় করিয়া দেহীর ন্যায় আবির্ভূত হই। এই অজ্ঞাদা মায়া আমার উপাধি মাত্র। ব্যবহারকাল পর্য্যন্ত উহা আমাতে থাকিয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করে। এই মায়িক আবির্ভাব ও তিরোভাবের নাম আমার জন্ম ও মরণ।

আবার দেখ মহাভারত শান্তিপর্ব্বে

"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ
সর্ব্বভূত গুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি"

হে নারদ, তুমি চর্ম্মচক্ষুতে আমার যে শরীর দেখিতেছ উহা মায়ারচিত। এই মায়িক শরীরাবৃত আমার স্বরূপ তুমি চর্ম্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইতেছ না।

সচ্চিদানন্দ পুরুষের স্বেচ্ছায় দেহধারণ করা তৎপ্রকৃতিসিদ্ধ। কোন প্রয়োজনে তিনি তাহা করেন, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন :

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"

ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, দেহ ধারণ করিয়া সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতের বিনাশ করিবার আবশ্যকতা কি? তাঁহার ইচ্ছামাত্রই ত ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে একথা বলা যাইতে পারে যে, লোকশিক্ষার জন্য তাঁহার দেহধারণ তাঁহার অলৌকিকী মায়ার লীলামাত্র।

শহীদুল্লাহ সাহেব সপ্তম শ্লোকের 'তদাত্মানং'-এর পরিবর্ত্তে অভিনব গুপ্তের শ্রীভগবদগীতার্থ সংগ্রহের 'তদাত্মাংশং' পাঠ গ্রহণ করিতে চাহেন। কঠোর শৈবমতাবলম্বী অভিনব গুপ্ত প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অংশ-অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ কর্ত্তৃক ধৃত পাঠে কিন্তু 'তদাত্মানং' দেখি। শঙ্কর ভাষ্য বলেন "অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম মায়য়া"। রামানুজাচার্য্য ইহার সম্বন্ধে বলেন "যদা যদা চ তদ্বিপর্য্যয়স্য ধর্ম্মস্যাভ্যুত্থানং তদাহমেব স্বসঙ্কল্পেনোক্ত প্রকারেণাত্মানং সৃজামি।" এই ভাবের প্রতিধ্বনি দেখি ব্রহ্মপুরাণে (১৮০।২৭) "যদা যদা চ ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ সমুপজায়তে অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজত্যসৌ।" সুতরাং এই সব পাঠ উপেক্ষা করিয়া সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিদুষ্ট অভিনব গুপ্তের অভিনব পাঠ গ্রহণ করিবার কোনই কারণ দেখি না।

শ্রীকৃষ্ণই ঈশ্বর এ কথা গীতায় বারংবার স্বীকৃত হইয়াছে। যথা পঞ্চম অধ্যায়ে ২৯ শ্লোক :

'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি'

আবার এই সর্ব্বলোকমহেশ্বর রূপ না জানিয়া তাঁহার মনুষ্য-মূর্ত্তিতে যে অবিবেকী ব্যক্তিগণ অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সম্বন্ধে নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে বলিতেছেন :

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম
পরম ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ"

তাহাদের আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ, কর্ম্ম ব্যর্থ, জ্ঞান ব্যর্থ, তাহারা ভ্রষ্টচিত্ত; তাহারা মোহনকারী রাক্ষস ও অসুরস্বভাবপ্রাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনকে অলৌকিক ঘটনা এবং অর্জ্জুনের উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বাদ দিলে গীতার সম্যক্ বিচার হয় না। অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া নররূপী কৃষ্ণদেহে বিশ্বরূপ দেখিয়া অভিভূত ও ভীত হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার মনুষ্যরূপ দেখিয়া প্রকৃতিস্থ হন।

শহীদুল্লাহ সাহেব কেন যে অর্জ্জুন সহস্রবাহু শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্ববৎ চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পান না। অর্জ্জুনের সহিত দ্বিভুজ কৃষ্ণমূর্ত্তিরই পরিচয় ছিল। ইতিপূর্ব্বে কবে তিনি কৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন যে আশ্বস্ত হইবার জন্য প্রথমেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে চাহিবেন? ইহার উত্তর শ্রীধর স্বামী দিয়াছেন "হে সহস্রবাহো হে বিশ্বমূর্ত্তে, এই বিশ্বরূপ উপসংহার করিয়া সেই কিরীটাদিযুক্ত চতুর্ভুজরূপে আবির্ভূত হও। এই শ্লোক দ্বারা অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বেও কিরীটাদিযুক্ত দেখিয়াছেন—ইহা জানা যায়।" অর্জ্জুন সহস্রবাহু মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের সৌম্যতর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া তাঁহার সৌম্যতম মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিলেন। ইহাতে অসঙ্গতি কোথায়?

শহীদুল্লাহ সাহেব ভীষ্মপর্ব্বের নজির তুলিয়া একাদশ অধ্যায় হইতে অর্জ্জুনের উক্তি বলিয়া কথিত ২৭টি শ্লোক বাদ দিতে চাহিয়াছেন। ভীষ্মপর্ব্বের শ্লোকটি এইরূপ:

"ষটশতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ"

অর্থাৎ, কেশব বলিয়াছেন ৬২০টি শ্লোক, অর্জ্জুন ৫৭টি ও সঞ্জয় ৬৭টি; ধৃতরাষ্ট্রের ১টি শ্লোক ধরিলে মোট শ্লোকসংখ্যা হয় ৭৪৫টি। প্রচলিত গীতায় দেখিতে পাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন ৫৭৪টি, অর্জ্জুন ৮৪টি, সঞ্জয় ৪১টি ও ধৃতরাষ্ট্র ১টি মোট ৭০০টি। সুতরাং প্রচলিত গীতায় মোট শ্লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ ও সঞ্জয় কথিত শ্লোকসংখ্যা কমিয়া অর্জ্জুন-কথিত ২৭ শ্লোক বাড়িয়া গিয়াছে। শুধু এই কারণেই কি একাদশ অধ্যায় হইতে অর্জ্জুন-কথিত ২৭টি শ্লোকসংখ্যা বাদ দিয়া তাঁহার বিশ্বরূপদর্শনকে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে? একাদশ অধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য অধ্যায় হইতেও ২৭টি শ্লোক বাদ দেওয়া সম্ভব। আর বাদ দেওয়ার প্রয়োজনই বা কি? শ্রীমদশঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামী অর্জ্জুন-কথিত ৮৪টি শ্লোকেরই ভাষ্য এবং অন্বয় করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্কলন প্রামাণ্য মনে করিব না কেন? এমনও হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত ভীষ্মপর্ব্বের হিসাবটিই প্রক্ষিপ্ত বা ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং ইহারই উপর নির্ভর করিয়া একাদশ অধ্যায় হইতে অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শন বাদ দেওয়া যায় না।

অর্জ্জুনের বিশ্বরূপদর্শনের সমর্থন আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়ের উক্তি হইতে পাই:

"তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপং অত্যদ্ভুতং হরেঃ
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ"

মহাভারতের অন্যত্র উদ্যোগপর্ব্বে দেখি কুরু-রাজসভায় শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথম বিশ্বরূপমূর্ত্তি প্রকট করেন। দুর্য্যোধন তাঁহাকে বন্ধন করিতে চাহিলে—

"পরবীরহন্তা কেশব উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই অট্টহাস্য সহকারে অগ্নিতুল্য তেজঃপুঞ্জধারী মহাত্মা শৌরির শরীর হইতে বিদ্যুদাকার অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেবতাসকল বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাটে ব্রহ্মা, বক্ষঃস্থলে রুদ্রগণ, ভুজনিকরে লোক-পালগণ এবং আস্যদেশে অগ্নি-আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাসবসহমরুদগণ, বিশ্বদেবগণ, তথা অসংখ্য যক্ষঃ-রাক্ষস ও গান্ধর্ব্বগণ প্রাদুর্ভূত হইলেন।...তাঁহার নিজ বাহুপুঞ্জেও শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তিশার্ঙ্গ, লাঙ্গল, নন্দন প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ সমস্ত সমুদ্যত দৃষ্ট হইল এবং নেত্রদ্বয়, নাসিকারন্ধ্র, শ্রোত্রযুগল ও সমুদয় রোমকূপ হইতে দিবাকরের প্রখর করনিকরের ন্যায় মহারৌদ্র, সধূম অগ্নিকণা সমস্ত বিনির্গত হইতে লাগিল।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলায় মা যশোদা দুইবার তাঁহার বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও শাহীদুল্লাহ সাহেব এই বিশ্বরূপ প্রদর্শনকে অতিপ্রাকৃত ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জ্জন করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু মানবদেহধারী ঈশ্বরের পক্ষে এই ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করা কি অসম্ভব? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি মায়িক নররূপ ধারণ করিতে পারিবেন না কেন এবং নররূপ ধারণ করিলেই তিনি সকল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইবেন কেন? এই জন্যই গীতা, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের ভিত্তির উপরই সমস্ত সৌধ গড়িয়া তোলা হইয়াছে।

গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি (বাসুদেব) অমৃতস্বরূপ, অব্যয়স্বরূপ শাশ্বত ও ধর্ম্মস্বরূপ এবং অব্যভিচারিসুখস্বরূপ ব্রহ্ম।

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।

গীতা শেষ করিবার পূর্ব্বে অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন:

'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত
তৎ প্রসাদাৎ পরং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম।'

যে ঈশ্বর সর্ব্বভূতের হৃদয়ে আছেন, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে বলিয়াই গুহ্যাতিগুহ্য হিতকর বাক্যটি এই ভাবে শেষ করিতেছেন:

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু
মাম এবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে'

ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া অর্জ্জুনকে তাঁহারই (শ্রীকৃষ্ণের) শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেন।

গীতা ব্যতীত মহাভারতের বহু স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্ব অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন:

'যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম্ম, যেখানে লজ্জা, যেখানে সরলতা সেইখানেই গোবিন্দ অবস্থান করেন। যে পক্ষে কৃষ্ণ থাকেন সেই পক্ষেই জয় হয়। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পুরুষোত্তম জনার্দ্দন যেন লীলা করিতে করিতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গকে পরিচালিত

করিতেছেন। বোধ হয় লোকের সম্যক্ মোহোৎপাদনের অভিপ্রায়ে পাণ্ডবদিগকে ব্যাজমাত্র করিয়া আপনার অধর্ম্মনিরত মূঢ় পুত্রদিগের দহনেচ্ছু হইতেছেন। ভগবান কেশব চৈতন্যযোগে কালচক্র, জগচ্চক্র ও কর্ম্মচক্র সমস্ত নিরন্তর পরিবর্ত্তিত করিতেছেন।

ভীষ্মপর্ব্ব ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ে ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে বলিতেছেন :

"তুমি কৃষ্ণকে শাশ্বত অব্যয়, সর্ব্বলোকময়, নিত্য, শাস্তা, ধাতা, বিশ্বাধার ও ধ্রুব বলিয়া অবগত হইবে। উনি ত্রিলোক ধারণ করিয়া থাকেন, উনি চরাচরের প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা সকলের প্রকৃতি ও ঈশ্বর। উনি সত্ত্বগুণময়, তমঃ ও রজোগুণ উঁহাতে নাই। যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষেই ধর্ম্ম, যে পক্ষেই ধর্ম্ম সেই পক্ষেই জয়।"

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব যে বেদজ্ঞ ঋষিরাও স্বীকার করিতেন তাহা আমরা যুধিষ্ঠিরের উক্তি হইতে জানিতে পারি।

"হে নিষ্কল, তোমার চরিত্রাভিজ্ঞ পুরাতন ঋষি মহামুনি মার্কণ্ডেয় পূর্ব্বে আমার নিকট তোমার প্রভাব ও মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন; অপিচ, অসিত, দেবল, মহাতপা নারদ আমাদিগের পিতামহ মহর্ষি ব্যাস তোমাকে পরম বিধাতা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তুমি তেজোময় পরব্রহ্ম, সত্য ও মহাতপস্যার স্বরূপ; তুমি এই ত্রিলোকমধ্যে উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিমান যশ, জগতের কারণ ও মঙ্গলস্বরূপ। এই স্থাবর জঙ্গমময় চরাচর জগৎ তোমাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া প্রলয়-সময়ে তোমাতেই প্রবৃষ্ট হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ তোমাকে জন্মমরণবর্জ্জিত দ্যোতনাত্মক বিশ্বনিয়ন্তা প্রজাপতি, ধাতা, অজ ও অব্যক্ত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তুমি সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ, মহাত্মা অনন্ত ও বিশ্বতোমুখ; এই-জগতের পালয়িতা ও আদিস্বরূপ। তুমি অব্যক্ত, অতএব দেবতা-রাও তোমাকে অবগত হইতে পারেন না। তুমি সর্ব্বজীবাশ্রয় পরমদেবতা, পরমাত্মা, সর্ব্বেশ্বর, জ্ঞানের কারণ, ত্রিতাপহারী, সর্ব্বব্যাপী এবং মুমুক্ষুদের পরম আশ্রয়। তুমি সনাতন পরমপুরুষ"

(দ্রোণপর্ব্ব, সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়)

মহাভারতের পরবর্ত্তী যুগে শ্রীমদ্ভাগবতকার উদাত্ত কণ্ঠে বলিতেছেন :

"এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে" ১।৩।২৮

ব্রহ্মাও ভগবান বাসুদেবকে স্তুতি করিয়া বলিয়াছেন :

"একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্য স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়োমুক্ত উপাধিতোঽমৃতঃ"

সুতরাং দেখিতে পাই মহাভারত হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত পুরাণাদির মত সংগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী "লঘু ভাগবতামৃতে" এবং শ্রীজীব গোস্বামী "শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে" কৃষ্ণতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের আলোচকগণকে শ্রদ্ধার সহিত ঐ দুইটি অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শহীদুল্লাহ সাহেব অভিযোগ করিয়াছেন—ঈশ্বরের পক্ষে পরদার-ধর্ষণ, চৌর্য্য, মিথ্যাকথন এসকলও কি সম্ভব? শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবনলীলার প্রতি এই ইঙ্গিত। গীতায় বা মহাভারতে ইহার আভাস নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই কাহিনীগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা অবাস্তর বলিয়া খ্রীষ্টান মিশনরীদের আক্রমণ হইতে অতিমানব শ্রীকৃষ্ণকে বাঁচাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বৃন্দাবনলীলা বুঝিতে হইলে ভাগবতের মূলসূত্রটি "কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" মনে রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—কৃষ্ণ শুদ্ধ, সত্ত্ব, নিরঞ্জন, অপাপবিদ্ধ। তিনিই এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষ, জীবমাত্রই নারীধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাকে পাইতে হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সব ত্যাগ করিতে হইবে। নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম লজ্জা, শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য গোপীদিগকে তাহাও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের "শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা" কবিতায় যখন পড়ি

"অরণ্য আড়ালে রহি কোনমতে
একমাত্র বাস নিল গাত্র হতে
বাহুটি বাড়ায়ে ফেলি দিল পথে ভূতলে"।

—তখন কি তাহার ত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ বলিয়া মনে হয় না?

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পরদার-ধর্ষণের কথাই উঠে না। ১০।৩৩।৩৮ শ্লোকে দেখা যায় যে, গোপেরা মনে করিত নিজ নিজ পত্নী তাহাদের পার্শ্বেই অবস্থিত আছে। ১০.৩৩.৩৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের, গোপীর পতিদের এবং যাবতীয় দেহীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন; যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী তিনিই ক্রীড়াচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণলীলার বিচার সাধারণ নৈতিক দৃষ্টিতে করা যায় না। শহীদুল্লাহ সাহেবের বহুপূর্ব্বে মহারাজ পরীক্ষিতের মনে অনুরূপ সংশয়ের উদয় হইয়াছিল। তাহার নিরসনের জন্য শুকদেব বলিয়াছেন (১০.৩৩.৩৩-৩৪) "এই সকল ব্যক্তির অহংবোধ নাই, সেইজন্য মঙ্গলানুষ্ঠান হইতে এই ধরাধামে ইঁহাদের কোনও অর্থের সম্ভাবনা নাই; অমঙ্গল আচরণ হইতে অনর্থেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যিনি তির্য্যক, মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীবের ঈশ্বর, যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের পতি, তাঁহার কুশলাকুশলের সম্ভাবনা কোথায়"।

চৌর্য্য, মিথ্যাকথন প্রভৃতি যে সকল তথাকথিত অপবাদ শহীদুল্লাহ সাহেব দিয়াছেন তাহা বালকসুলভ চাপল্যপ্রসূত মায়িক লীলা মাত্র। শিশু যদি শিশুর মতন আচরণ না করিয়া ভগবানের মত আচরণ করে তাহা হইলে তাহা একটি প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

পরিশেষে, শহীদুল্লাহ সাহেব বলিয়াছেন, যাঁহারা মনুষ্যকে পরমেশ্বর মনে করেন তাঁহারা বস্তুতঃ পরমাত্মাতত্ত্ব জানেন না। ইহার উত্তর শ্রীভগবান নিজেই দিয়াছেন।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীম তনুমাশ্রিতম
পরম ভাবম্ অজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম
মোঘাশা মোঘ কর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনী শ্রিতাঃ"

LUX
TOILET SOAP
প্রণতি ঘোষ লাক্স টয়লেট
সাবান পছন্দ করেন তিনি বলেন
"এর শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতা
প্রমাণ করে।"

উত্তর

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিদ্যাবাচস্পতি

আমি দেখিয়া সুখী হইলাম যে, গত বৎসর ভাদ্র এবং এ বৎসর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "গীতা ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব" আলোচনাটি উপেক্ষিত না হইয়া বরং কাহারও কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমি সর্ব্বপ্রথমে আমার সমালোচকদিগকে সবিনয়ে স্মরণ করাইয়া দিই এই বৃহস্পতিবাক্য :

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

দ্বিতীয় কথা, যেখানে কোনও দলিল লইয়া বিচার হয়, সেখানে যদি দলিলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কোনও রায় প্রকাশ করা যায় না। আমি আমার প্রবন্ধদ্বয়ে দেখাইয়াছি, মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র, দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, পাশ্চাত্য পণ্ডিত Winternitz এবং দর্শনাধ্যাপক গার্বে গীতাকে অভ্রান্ত 'দলিল' মনে করেন না। মহাভারত সম্বন্ধেও অনেকের এই মত। আমার প্রথম সমালোচক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহও তাহা এক প্রকার স্বীকার করিয়াছেন (মাঘ, ১৩৬৩)। শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাভারত-মধ্যে গীতার শ্লোকসংখ্যা ৭৪৫। কিন্তু বর্ত্তমান গীতায় তাহা ৭০০। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় বলেন, "এককালে গীতার শ্লোকসংখ্যা যে সাত শতের অধিক ছিল, তাহার ঐতিহাসিক সমর্থনও পাইতেছি।" বর্ত্তমান গীতাকে অপরিবর্ত্তিত অভ্রান্ত আদিম গীতা বলিয়া মান্ত করিলে তন্মতে যে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ ভগবান, তাহা একজন অন্ধও দেখিতে পাইবে। সুতরাং এখানেই তর্কের অবসান। কিন্তু কয়েকটি জিজ্ঞাস্য থাকিয়া যায়।

১। "আত্মাংশং" পাঠ ভিন্নও মহাভারতে এবং পুরাণে (যাহা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি) যে স্পষ্টতঃ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অংশ বলা হইয়াছে, তাহার কি ব্যাখ্যা হইবে?

২। পাণিনীর "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্ সূত্রে" এবং মহাভারতের বহুস্থলে (যাহা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি) কৃষ্ণার্জ্জুনকে যে সমপর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে, তাহার সমাধান কি?

৩। বেদান্ত-দর্শনে অবতারবাদের প্রসঙ্গ নাই কেন?

৪। মহাভারতে (যাহা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি) শ্রীকৃষ্ণকে দশাবতারের অন্যতম কেন বলা হইয়াছে?

৫। অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরম ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম॥৭।২৪

অর্থ—'অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আমার অব্যয় অনুত্তম পরম ভাব না জানায় অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত মনে করে।' এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহার বক্তা ভগবান এবং সেই ভগবদ্বাণী ঋষি শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত। অন্যথায় অর্থবিরোধ উপস্থিত হইবে। কেননা ভগবান্ অব্যয় ও অব্যক্ত। অথচ শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্তিত্বপ্রাপ্ত। এই সহজ ব্যাখ্যা কি অবতারবাদের বিরুদ্ধে নয়?

৬। শ্রীজগদীশচন্দ্র সিংহ বলিতেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহধারণ লোকশিক্ষার জন্য। অথচ তিনি শ্রীকৃষ্ণদ্বারা (আমি এরূপ মনে করি না) পরদার-ধর্ষণ, চৌর্য্য ও মিথ্যাকথন ইত্যাদির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য কি?

পরিশেষে আমি বলিতে চাই যে, শ্রীকৃষ্ণকে আমি ভারতের আর্য্যবংশীয় শ্রেষ্ঠ আদর্শ মহাপুরুষ বা ঋষি বলিয়া মনে করি। যাঁহারা তাঁহাকে পূর্ণ ভগবান বলিতে চান, যদি ভক্তিবশতঃ বলেন তবে তাঁহাদিগকে আমার বলিবার কিছুই নাই।

এ বিষয়ে বাদ-প্রতিবাদ আর ছাপা হইবে না।—প্রবাসী-সম্পাদক।

ম্যাজিক লণ্ঠন—পরিমল গোস্বামী। বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ। ২৫।২ মোহনবাগান রো। কলিকাতা—৪। মূল্য আড়াই টাকা।

বাঙালী লেখক ও পাঠকদের সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে যে পড়ে সে লেখে না, আর যে লেখে সে পড়ে না।" আমাদের মনন-সাহিত্যের দৈন্তের মূলে যে, লেখকদের অধ্যয়ন-বিমুখতা তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বর্ত্তমান বাঙালী লেখকদের মধ্যে মুষ্টিমেয় যে কয়জনের রচনায় গভীর অধ্যয়ন-প্রসূত মননশীলতা পরিলক্ষিত হয় পরিমল গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের অন্ততম। সার্থক রসস্রষ্টা, বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গগল্প-রচয়িতারূপেই তিনি পাঠক সাধারণের নিকট সমধিক পরিচিত। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন, এই স্রষ্টা সাহিত্যিক একজন অক্লান্ত পাঠকও বটেন।

বহু-বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং মননশীলতার সঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত রসিকতার এক অপূর্ব্ব সমন্বয় হইয়াছে সমালোচ্য 'ম্যাজিক লণ্ঠন' নামক পুস্তকখানিতে। ভূমিকায় লেখক বলিয়াছেন—"পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রচার ভ্যানে গুরু বিষয় প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে অকারণ কতকগুলি হাল্কা গানের রেকর্ড বাজাতে হয় শ্রোতার সংখ্যা বাড়াবার জন্য। আমার এই বইতেও মাত্র তিন-চারিটি গুরু বিষয় অবতারণার জন্য কুড়ি-বাইশটি হাল্কা গানের রেকর্ড বাজাতে হয়েছে এই একই উদ্দেশ্যে।" বইখানির আগাগোড়া ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত এই হাল্কা সুরটি পাঠকমাত্রেরই শ্রবণের পরিতৃপ্তি সাধন করিবে। কিন্তু বিদগ্ধ ভাবুক লেখকের অন্তর্লোকের যে গহন গভীর হইতে উৎসারিত এই রসনির্ঝর তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে সজাগ বুদ্ধি দ্বারা তাঁহার বক্তব্য বিষয়সমূহের গূঢ়ার্থ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে। 'ম্যাজিক লণ্ঠন' বইখানিতে সন্নিবিষ্ট চব্বিশটি নিবন্ধের প্রতিপাদ্য যিনিই অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিবেন তাঁহারই নিকট ইহা সুপরিস্ফুট হইবে যে, ব্যঙ্গ রূপক রসিকতা—এই রচনাবলীর বহিরঙ্গ মাত্র। আসলে সমাজ, সাহিত্য, শিল্প মানবজীবনের চিরন্তন রহস্য ইত্যাদি সম্বন্ধে নিজের চিন্তাধারা এবং ভূয়োদর্শনজনিত অভিজ্ঞতাকে লেখক প্রকাশ করিয়াছেন রঙ্গ ও ব্যঙ্গের রসান দিয়া। তাঁহার যুক্তিবাদী মনের গড়নের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনার পাকা গাঁথুনি হইতেও। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন বটে—"আরও ম্যাজিক চাই," কিন্তু তাঁর রচনাশৈলীতে শুধু ম্যাজিকের কলাকৌশলই নয়, লজিকের নিয়মশৃঙ্খলাও আছে এবং নিজের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকেই যুক্তিতর্কের কঠিন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে তাঁহার মানসিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বাঙালী চরিত্রের মাত্রাতিরিক্ত ভাবপ্রবণতাকে যে তিনি সমর্থন করেন না, তাহা বুঝিতে পারা যায় 'বিশেষণ ও বাঙালী' নামক নিবন্ধটি পাঠে। তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আন্তরিকতা চাই, কিন্তু উচ্ছাস চাই না।"

লেখক এক জায়গায় বলিয়াছেন, "আমি বুঝতে পেরেছি আমার মন বৈজ্ঞানিক মন।" বস্তুতঃ, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, শারীরবৃত্ত, জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা—এমনকি চিকিৎসাবিদ্যা পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই যে তাঁহার অবাধ সঞ্চরণ সে পরিচয় বর্ত্তমান পুস্তকের বহু স্থানে পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কিছুমাত্র বিকৃত বা অতিরঞ্জিত না করিয়া সার্থক রসরচনায় লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট "ধূমকেতুর উদ্দেশে খোলা চিঠি" নামক প্রবন্ধে। বহুদিন আগে লর্ড এভেবারির "The Pleasures of Life" নামক পুস্তকে এই মর্ম্মের একটি কথা পড়িয়াছিলাম যে, কেহ সাহিত্যের যাবতীয় বিষয় অধিগত করিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞানের কিছুই যদি তাঁহার জানা না থাকে ত তাঁহাকে বলা যাইতে পারে অর্দ্ধশিক্ষিত। এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে লেখক ও পাঠক আমরা কয় জন পূর্ণশিক্ষিত বলিয়া গণ্য হইতে পারি তাহা ভাবিবার বিষয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ সম্পর্কে আমাদের এই ঔদাসীন্য লজ্জাকর। সুখের বিষয় পরিমলবাবু এই দিক দিয়াও বর্ত্তমান বাংলার সৃষ্টিধর্ম্মী লেখকসমাজে ব্যতিক্রম। 'যুগান্তর সাময়িকী'তে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 'ইতশ্চেতঃ'তে বৈজ্ঞানিক তথ্যের যে ছিঁটেফোঁটা মাঝে মাঝে পরিমলবাবু পরিবেশন করেন তাহা বিজ্ঞানানুরাগী পাঠকবৃন্দকে মুগ্ধ করে। 'ম্যাজিক লণ্ঠনে' "জাগিল কি ঘুমালো সে" প্রভৃতি নিবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সুনিপুণ বিশ্লেষণ তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রতি রীতিমত শ্রদ্ধান্বিত করিয়া তুলিবে।

পরিমল বাবুর বহুমুখী ব্যক্তি-মানসের উপর বর্ণোজ্জ্বল আলোকসম্পাত করিয়াছে 'ম্যাজিক লণ্ঠন'। কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা এবং অধিকার! তাঁহার মানস-সত্তায় একদিকে আছে জ্ঞানের বুভুক্ষা—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় যাহা গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া হাঁ করিয়া সবকিছু গিলিতে চায়, অন্যদিকে তাঁহার শিল্পী মন শান্তি ও সান্ত্বনা খোঁজে প্রকৃতির লীলানিকেতন গালুডির নিভৃত নির্জ্জনতায়। শিল্পকলার একাডেমিক আলোচক পরিমলবাবু না হইতে পারেন, কিন্তু রূপসৃষ্টির কত বড় সমঝদার যে তিনি তাহা বোধগম্য হইবে রবীন্দ্র-শিল্পপ্রসঙ্গে নামক নিবন্ধ পাঠে। চরিত্র চিত্রণেও তিনি মুন্সীয়ানা দেখাইয়াছেন 'আমার দেখা শিশিরকুমার ভাদুড়ী নামক রচনায়। কুশলী শিল্পীর মত হালকা তুলির টানে তিনি একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন শিল্পী এবং মানুষ শিশিরকুমারকে। দশ বৎসর পূর্ব্বে 'প্রগতি ও দেশলাই' সম্পর্কে রসিকতার আবরণে তিনি যে সকল মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন, আজও সেগুলির নির্গলিতার্থ আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছি, কেননা আজও আমাদের দেশলাইয়ের উপর ট্যাক্স বৃদ্ধির দরুন "চার পয়সা দিয়েই দেশলাই কিনতে হয়।"

'ম্যাজিক লণ্ঠন' সম্বন্ধে রাজশেখর বসু মহাশয় বলিয়াছেন; "এমন রচনা দেখা যায় না।" বস্তুতঃ, ইহাতে কি বিষয়বস্তু, কি প্রকাশরীতি, কি দৃষ্টিভঙ্গী কি ব্যঙ্গকৌতুক সব দিক দিয়াই এমনি একটা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য আছে যে, বর্ত্তমানের তথাকথিত রম্যরচনা-কবলিত বঙ্গ-সাহিত্যে বইখানি একটা বিশিষ্ট স্থান দাবি করিতে পারে। গুরু বিষয়কে লেখক এমন মুখরোচক করিয়া পরিবেশন করিয়াছেন যে, ইহার আস্বাদ গ্রহণ করিলে পাঠকের রুচির উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

বাঁধ—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত। পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ। পত্রিকা হাউস। আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ছোটগল্পলেখক হিসাবে শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহার রচিত উপন্যাসগুলির কল্যাণে উত্তরোত্তর তাহা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনা এবং চরিত্র চিত্রণে তিনি

যে ক্ষমতার পরিচয় দিতেছেন তাহা তাঁহার খ্যাতিকে ক্রমশঃ সুদূরপ্রসারী করিয়া তুলিবে বলিয়া মনে হয়।

'বাঁধ' তাহার পূর্ব্বপ্রকাশিত 'প্রবাহ' নামক উপন্যাসের অনুবৃত্তি। ইহার পূর্ব্বকথা জানা প্রয়োজন। জমিদারের মেয়ে মঞ্জুষা—শিক্ষিতা, আধুনিকা, আলোকপ্রাপ্তা। মঞ্জুষার ভবিষ্যৎ জীবন যে মৃন্ময়ের সহিত বাঁধা পড়িবে এটা স্থির হইয়াই ছিল, কিন্তু ঘটনার আবর্ত্তে তাহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মঞ্জুষা মৃন্ময়কে ভুল বুঝিল এবং নিজের উপর শোধ তুলিবার জন্যই যেন সে আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃন্ময়ের বন্ধু নান্টুর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে উদ্যত হইল। কুশণ্ডিকা তখনও বাকী—এমন সময় মঞ্জুষার ভুল ধরা পড়িল, বিবাহ সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। মৃন্ময়কে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া বাহির করিল নান্টু এবং নিজের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করিবার দায়িত্ব তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

পাঠকের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়া, তাহার কৌতূহলকে পরিপূর্ণ মাত্রায় উদ্দীপ্ত করিয়া যেখানে শেষ হইয়াছিল 'প্রবাহে'র কাহিনী সেই স্থান হইতেই 'বাঁধে'র সূচনা। 'বাঁধ' প্রবাহের গতিকে রুদ্ধ করে নাই বরং বাঁধে প্রতিহত হইয়া ইহার মোড় ফিরিয়াছে, ক্ষণনিরুদ্ধ স্রোতধারা আকুল আবেগে উচ্ছসিত হইয়া, আবর্ত্ত রচিয়া দুর্ব্বার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বস্তুতঃ সুরু হইতেই যে ভাবে কাহিনীটি বহুবিচিত্র জটিল ঘটনার ভিতর দিয়া অবলীলাক্রমে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে তাহাতে পাঠক-চিত্ত কোথাও থামিবার অবকাশ পায় না, ঘটনার গতিবেগের সহিত তাহার মনও আগাইয়া চলে সুমুখের পানে।

উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই আমাদের অতিপরিচিত সাধারণ নরনারী, কিন্তু লেখার গুণে তাহারা অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছে। মৃন্ময়ের জীবনদর্শনের মধ্যে যেমন অভিনবত্ব আছে, তেমনি নান্টুর সমাজবিপ্লবমূলক মতবাদে চমকিত হইলেও তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মঞ্জুষা এবং লিলির শান্ত সংযত জীবনের অন্তরালে যেমন ব্যর্থতার একটা চাপা কান্না গুমরাইয়া উঠে তেমনি লীলার উদ্দাম জীবনযাত্রার ফাঁকে ফাঁকেও একটি অনাড়ম্বর স্নেহনীড় রচনার আকুল আকুতি প্রকাশ পায়। আবার সমস্যার এত জটিল আবর্ত্তের মাঝেও রাধু বোষ্টম সেই স্ত্রীকে লইয়াই ঘর করিতেছে যে তার কুলে কালি দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। তার মতে "ভুল কখনও মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠতে পারে না।"

বর্ত্তমান উপন্যাসখানিতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের নানা সমস্যা বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের শিল্পদৃষ্টির নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছে অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে মানুষের অন্তর্লোকের গভীর রহস্য। পাত্রপাত্রীর মনোজগতের ঘাত-প্রতিঘাতের বিশ্লেষণে লেখক বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

মোট কথা, ভাবের গভীরতা, কাহিনীর সুনিপুণ বিন্যাস, সাবলীল বর্ণনা-ভঙ্গী এবং ভাষার পারিপাট্যে বাঁধ একখানি উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস। সু-অঙ্কিত প্রচ্ছদপট ইহার বাহ্য সৌষ্ঠবকে রীতিমত নয়নানন্দকর করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

রসায়ন ও সভ্যতা—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, মূল্য আট আনা। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ৬ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

পুস্তকখানিতে ছয়টি অধ্যায় আছে—পূর্ব্বাভাস, রসায়নের আদিযুগ, মধ্যযুগে নবযুগ, নবতর ও ভাবীযুগ এবং উপসংহার। ৮টি চিত্রময় পৃষ্ঠা বিশিষ্টতা দান করেছে বইখানিকে। চিত্রগুলির বিষয়—(১) বেলুচিস্থানে প্রাপ্ত ৪০০০-৩০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বের ভারতীয় মৃৎশিল্প (২) হরপ্পায় প্রাপ্ত ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বের সিন্ধু সভ্যতার মৃৎশিল্প, (৩) মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত ২৫০০-২০০০ খ্রীঃ পূর্ব্বেকার সিন্ধুসভ্যতার তাম্রশিল্প, (৪) ৪০৩ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর লৌহস্তম্ভ (৫) হাতুড়ে-রসায়নের যুগে ব্রাণ্ড কর্ত্তৃক ফসফরাসের আবিষ্কার (৬) পেনিসিলিন প্রস্তুতপ্রণালী, (৭) রেডিয়ামের আবিষ্কার ও (৮) বেকেলাইটের প্রস্তুতপ্রণালী।

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় প্রাঞ্জল ভাষায় এই গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় রসায়নের ক্রমপরিণতির সঙ্গে সভ্যতার ক্রমবিকাশের বহু তথ্য সমাবেশ করেছেন। এতে আছে একাধারে রসায়নের জয়যাত্রার ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। কিন্তু গ্রন্থকারের দৃষ্টি ও চিন্তা এক পরম জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছে। দীর্ঘকালের রসায়নশাস্ত্রানুশীলকের সন্ধানী দৃষ্টির সম্মুখে যে সকল প্রশ্ন এসেছে তার দুই একটি তাঁর ভাষাতেই উদ্ধৃত করা গেল।

কৃত্রিম খাদ্যবিষয়—৩৭ পৃঃ—"জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন সুপ্ত আছে, তা খাদ্যরূপে উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তার বিকাশ হয়। উদ্ভিদ থেকে পুনরায় খাদ্যরূপে প্রাণী এবং মানুষের দেহে হয় তার পুরাপুরি জাগরণ। পরিশেষে মানুষে এর পরিণতি ঘটে বুদ্ধি এবং চেতনায়। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের এ শৃঙ্খলা থেকে উদ্ভিদকে বাদ দিতে গেলে তার ঐক্য ছিন্ন হয়ে যাবে এবং প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের ঊর্দ্ধপথের একটি সোপান ভেঙে যাবে। এতে মানুষের কল্যাণের পথ পরিণামে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।"

উপসংহার অধ্যায়, ৫৩ পৃঃ—'ক্ষণিক থেকে সনাতনের, দেহ থেকে দেহীর প্রভেদ করবার অক্ষমতা থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্ত্তমান সভ্যতার যত গুরুতর সমস্যা। ...মানুষের ক্ষমতা ও অর্থ থেকে মানুষকে আলাদা করে এখনও আমরা দেখতে শিখি নি। ...বিজ্ঞানের দ্রব্যময় যজ্ঞের কর্ম্মধারাকে জ্ঞান ও কর্ম্ম বুদ্ধির হোমাগ্নিতে শোধন করে না নিলে মানবসভ্যতার অগ্রগতির অচিরে অবরোধ হবে।"

এই ক্ষুদ্রায়তন পুস্তকে এত বেশী তথ্যের সমাবেশ দেখে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। বিপুল জ্ঞান, বিস্তৃত অভিজ্ঞতা এবং গভীর চিন্তা থেকে হয়েছে এ বইয়ের উদ্ভব। তাই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছে এর খুব সমাদর হবে।

এতকাল ইংরাজী ও অন্য বিদেশী ভাষাতেই রসায়নের মৌলিক গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছে। এ কারণ বাংলা পরিভাষা অবলম্বনে বাংলা ভাষায় এরূপ উন্নত ধরণের বই লেখা কঠিন। এই জন্য ৩১ পৃষ্ঠায় 'বহুগুণিত' লিখলে পাছে পাঠক বুঝতে না পারেন তাই বন্ধনীর মধ্যে polymerised লিখতে হয়েছে—কারণ polymerised এর পরিভাষা 'বহুগুণিত' খুব সুপ্রযুক্ত নয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

মুদ্রাকর—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট লিঃ), ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ইরাণী বধূ

শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা

মিনিকয় দ্বীপের সরকারী ডিসপেন্সারীতে রোগী-পরীক্ষায় রত জনৈক চিকিৎসক এবং তাঁহার সহকারীবৃন্দ

নৌকায় বোঝাইকরা নারিকেল ইত্যাদির [illegible]

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬৪

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

বাংলা ও বাঙালী একদিন আদর্শবাদ এবং আদর্শনিষ্ঠার বলে সারা ভারতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে ও সমগ্র জগতে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই আদর্শবাদ বিভিন্ন নীতির ও বিভিন্ন পথের ছিল, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠা একই প্রকার ছিল বলিয়াই বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ তাঁহাদের মাতৃভূমিকে গৌরবময় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রয়াণে দেশের এই অবস্থা!

এই আদর্শবাদ ও আদর্শনিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন সেই বিপ্লবী নায়কদের অন্যতম ছিলেন স্বর্গত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী। তাঁহার দেশপ্রেম, তাঁহার মরণজয়ী সাহস ও অপরিসীম পৌরুষ ঐ অগ্নিময় বিপ্লবযুগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া চিরস্থায়ী হওয়ার উপযুক্ত।

কিন্তু শুধুমাত্র দুর্জ্জয় সাহস ও অদম্য শৌর্য্যসম্পন্ন বিপ্লবী বলিলেই প্রতুলচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। কেননা তাহা হইলে তাঁহার দেহমন কি ধাতুতে গঠিত ছিল তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহার জীবনে আদর্শবাদের পূর্ণতা কতটা ছিল এবং তার প্রভাবে তাঁহার মনপ্রাণ সাধারণ জীবনের মলিনতা হইতে কত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছিল তার সাক্ষ্য দিতে পারেন তাঁহার শেষ জীবনের সুহৃদ্‌গণ এবং বাংলার এই স্বার্থসর্ব্বস্ব, ষড়রিপু-অধিকৃত, গ্লানিপূর্ণ অবস্থায় সেই সাক্ষ্য দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বিপ্লবীযুগের বাঙালী সকলেই কিছু এক ধাতুতে গঠিত ছিলেন না, যদিও দুরন্ত বিঘ্নবিপদ-তুচ্ছকারী সাহস প্রায় সকলের মধ্যেই ছিল। যদি সকলের ধাতু একই প্রকার হইত, তবে ঐরূপ অদম্য বিপ্লবপ্রয়াস অতটা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিত না, বারংবার ব্যর্থতায় রুদ্ধ হইত না। যদি সকলের জীবন সমান ভাবে উৎসর্গীকৃত হইত তবে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের মধ্যে অতটা দ্বেষ থাকা সম্ভব হইত না যতটা প্রকট হইয়াছে।

মানুষ কি ধাতুতে গঠিত তাহার সম্যক্ পরিচয় আমরা পাই তাহার জীবনে ব্যর্থতা ও দুঃখদহনের পরিণামে এবং তাহার কর্ম্মধারার উত্তরকালের গতিমুখ ও লক্ষ্য দৃষ্টে। উহাতেই বুঝা যায়, ঐ কার্য্যধারার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল এবং তাহা হইতে মানুষের ধাতুর নিকষ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, বুঝা যায় তাহার আত্মোৎসর্গ কতটা স্বার্থহীন ছিল।

আমাদের দীর্ঘ ব্যক্তিগত জীবনে আমরা বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দুই আদর্শবাদেরই নায়কগণের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইয়াছি। সেই পরিচয় হয় কিছু স্বাধীনতালাভের পূর্ব্বে, কিছু উত্তরকালে। এই পরিচয়প্রাপ্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দুঃখের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুঃখের কারণ এইজন্য যে, আমরা কি বিপ্লববাদী, কি গান্ধীবাদী দুই প্রকার যোদ্ধাদলেরই অধিকাংশের—প্রায় সকলেরই—উত্তরকালের লোভ-লালসা, ক্ষমতা-লোলুপতা, হিংসা-বিদ্বেষপূর্ণ নিন্দাবাদ বা কলুষিত চক্রান্তপ্রবণতা দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতাশ হইয়াছি। বাংলায় বিশেষতঃ রাজনীতির ক্ষেত্র জঘন্য দুর্নীতিতে পূর্ণ হইয়াছে এই দুই দলের দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থচেষ্টায়। যাঁহাদের পূর্ব্বকালে আমরা জানিয়াছি রিপুদমনকারী আত্মত্যাগী যোদ্ধারূপে, যাঁহাদের আমরা শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছি দেশপ্রেমিক আদর্শবাদী নেতৃরূপে, তাঁহাদেরই এই ঘৃণ্য ক্লেদপূর্ণ প্রকৃত রূপদর্শন আমাদের মর্ম্মাহত করিয়াছে। আমরা শুধু তাহাদেরই কথা বলিতেছি না, যাহারা কোনদিনই প্রকৃত বিপ্লবী ছিল না বা গান্ধীবাদের উপাসক ছিল না এবং আজ সংবাদ-পত্রের সহায়তায় মেকী চালাইয়া নিজের সুবিধাবাদের পথ পরিষ্কার করিতেছে। সেই তস্কর ও প্রবঞ্চকের দল ত আজ সকল রাজনৈতিক দলই প্রায় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। নচেৎ আজ ভারতের ভবিষ্যৎ এত সমস্যাপূর্ণ হইত না। আমরা বলিতেছি তাঁহাদেরই কথা যাঁহারা অতীতে দেশপ্রেমের প্রতীক্ বলিয়া প্রকৃতই শ্রদ্ধা—এমনকি পূজা পাইয়াছেন। আজ তাঁহাদের অন্তরের গলিত পূতিগন্ধময় রূপ দেখিয়া আমরা অবাক।

আমাদের মনের আলোক যে একেবারে নিবিয়া যায় নাই, দেশের সবকিছুই ঝুটা বলিয়া আক্ষেপে আমরা প্রবৃত্ত হই নাই,

(যেমন দুই একজন বাঙালী লেখক করিয়াছেন) তাহার কারণ এই দুই দলের কয়েকজনের উত্তরকালের জীবনদর্শনের প্রকাশ। তাঁহাদের মধ্যে আমরা উৎসর্গীকৃত জীবনের অকৃত্রিম আদর্শবাদের পরিচয় পাই। সেই জীবনের প্রকাশ স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, তাহার আদর্শবাদ দীপ্ত ও কলুষমুক্ত। প্রতুলচন্দ্র এই ক'জনের একজন।

বাস্তব পক্ষে প্রতুলচন্দ্রের পরিচয় বিপ্লবী বা দেশনায়ক নয়। আজ ঐ পরিচয়ের মূল্য বিশেষ কিছু নাই, দেশে মেকীর চলনে খাঁটির দাম এতই কমিয়াছে। তাঁহার ধাতু ছিল নিকষিত হেম, তাঁহার আদর্শবাদ ছিল মহাত্মাতিময়। আমরা তাহা বুঝিয়াছিলাম তাঁহার উত্তরকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে।

প্রতুলচন্দ্রের সহিত আমাদের পরিচয় প্রথমে হয় সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্তরূপে। সে পরিচয় সাময়িক মাত্র ছিল কেননা সে সময় তিনি অল্পদিনই জেলের বাহিরে ছিলেন। অবশ্য তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির বিবরণ তখন সর্ব্বজনবিদিত হইয়াছিল। উত্তরকালে অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের পর যখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা খ্যাতিপন্ন "ত্যাগী" নেতৃকুলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া হতভম্ব হইতেছি, তখন তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। সেই পরিচয় আমরা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করি, কেননা দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনায় তাঁহার নির্ম্মল অন্তরের যে স্বরূপ আমরা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহাতে আমাদের মনের অনেক গ্লানি দূর হয়, হৃদয়ও বলিষ্ঠ হয়।

যুদ্ধোত্তর ভারতে, যখন স্বাধীনতালাভের উদ্যোগপর্ব্ব ছিল তখন তিনটি ঘটনা ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যাপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল করে। প্রথমতঃ, শাসনতন্ত্রের অধিকার যাঁহাদের নিকট হস্তান্তরিত হয় তাঁহারা অনভিজ্ঞ, উপরন্তু বিষম খোসামোদপ্রিয় ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ভারত-বিভাগে এবং সেই সঙ্গে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যা-কাণ্ডে তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞানও লোপ পায়। তৃতীয়তঃ, বিশ্বব্যাপী অশান্তির ছায়া এবং কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গের ঘটনাবলী তাহা আরও আচ্ছন্ন করে। এই অবস্থায় শাসনতন্ত্র যাঁহাদের হাতে তাঁহারা অনেক নির্ব্বুদ্ধির কাজ করিয়া বসেন।

ইহার ফলে অসংখ্য চতুর ভাগ্যান্বেষী আমাদের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রই নিজেদের দখলে আনে। পরিণামে দেশে দুর্নীতি, উদ্দাম-বিশৃঙ্খলা ও দুরাচারের প্লাবন বহিতে থাকে। আমাদের আশা ছিল যে, বিপ্লবী নেতৃবর্গ ও গান্ধীবাদীরা এই দুর্নীতির স্রোত রোধ করিবার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইবেন। দেশকে হতাশ করিয়া তাঁহাদের অধিকাংশই এই লালসার স্রোতে ঝাঁপাইয়া স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা দেখিলেন। বিফলমনোরথ দল হিংসাদ্বেষপূর্ণ মন লইয়া চতুর্দ্দিকে বিষোদ্গার করিতে থাকিলেন। বাংলার সকল ক্ষেত্রে ও সকল দলের চরম অবনতির মূল কারণ এই।

প্রতুলচন্দ্র যোগ্য লোকও ছিলেন এবং কার্য্যক্ষমও ছিলেন। অথচ তিনি কোনও কিছু স্থান বা স্বীকৃতি পাইলেন না। তিনি বৈরনিপীড়নে অক্ষম ছিলেন না, সেকথা তাঁহার জীবনের দুর্দ্ধর্ষ ক্ষাত্রপর্ব্বের ঘটনাবলী স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া গিয়াছে। তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের কারণও ছিল, অথচ তাঁহার মন বিকারগ্রস্ত হয় নাই।

আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আমাদের প্রিয় সুহৃদ এই নির্ম্মলহৃদয় নিষ্কাম সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ আমাদের সহিত শতবারের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ-আলোচনায় একবারও কোন হিংসাদ্বেষ বা অনুশোচনার লেশমাত্র প্রকাশ করেন নাই। তিনি প্রকৃতই অনাসক্ত ছিলেন।

কলিকাতায় উচ্ছৃঙ্খলতা

গত ৩০শে আষাঢ় কলিকাতার ময়দানে ফুটবল খেলা লইয়া যে সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় তাহাতে সকল সুস্থ চেতনাসম্পন্ন নাগরিকই উদ্বিগ্ন হইবেন। ঘটনার বিবরণ "আনন্দবাজার পত্রিকা" এইরূপ দিয়াছেন :

"ঐদিন একটি ফুটবল লীগ ম্যাচ খেলার সময় এবং উহার পর ময়দানে উক্ত সংঘর্ষ হয়। ময়দান হইতে বিক্ষুব্ধ ফুটবল সমর্থকদের অপসারণের জন্য অশ্বারোহী পুলিসবাহিনীর সাহায্য লওয়া হয়। এসপ্লানেড এলাকায় বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ বন্ধ করিবার জন্য পুলিস কয়েক-বার মৃদু লাঠি চালনাও করে। কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারীও ঐ ব্যাপারে আহত হন বলিয়া প্রকাশ। পদস্থ পুলিস কর্ম্মচারীদের পরিচালনায় এক বিপুল পুলিসবাহিনী কিছুক্ষণের মধ্যে ঐ ঘটনা আয়ত্তের মধ্যে আনে। সন্ধ্যায় বাস ও ট্রাম চলাচল কিছুক্ষণের জন্য ব্যাহত হইলেও রাত্রে নির্দ্ধারিত সময় পর্য্যন্ত চালু থাকে।

"সোমবার রাত্রিতে প্রচারিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছে যে, সোমবার অপরাহ্নে এক ম্যাচ খেলায় দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল দলের সমর্থকগণ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এবং তাহার ফলে নির্দ্ধারিত সময়ের ৭ মিনিট পূর্ব্বে ঐ খেলা স্থগিত রাখিতে হয়। এই সম্পর্কে পুলিস ময়দানে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ম্যাচ খেলার পর প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল দল দুইটির সমর্থকগণের মধ্যে পুনরায় সঙ্ঘর্ষ বাধে এবং তাহারা পরস্পরের প্রতি ঢিল-পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি করে। অশ্বারোহী পুলিস জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

"ঢিল-পাটকেল ছোঁড়াছুড়ি ও লাঠিচালনার ফলে মোট ৫১ জন আহত হয় বলিয়া জানা গিয়াছে। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাত জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ছুরিকাহত হইবার দুইটি ঘটনার কথাও হাসপাতাল হইতে জানা যায়। কিন্তু এই দুইটি ঘটনা সন্ধ্যাকালের হাঙ্গামার সহিত সংশ্লিষ্ট কিনা, তাহা সঠিক ভাবে জানিতে পারা যায় নাই। কয়েকজন পুলিস অফিসার ও কর্ম্মচারীও আহত হন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। পুলিস ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।"

পুলিসের হস্তক্ষেপে অবস্থা শীঘ্রই আয়ত্তে আসিয়া পড়ে এবং তাহার পর হইতে অবশ্য আর কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

ফুটবল খেলা লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদলের সমর্থকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু তাহা গুণ্ডামীর পর্য্যায় যাইবে কেন, বুঝা কঠিন। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে মাঠে খেলা বন্ধ করিয়া দিতে হইল—কিন্তু মাঠ হইতে বহুদূরে এসপ্লানেডে আসিয়া পর্য্যন্ত

গুণ্ডামী ছড়াইয়া পড়িল—ইহাতে মনে হয় যে, একশ্রেণীর লোক সুযোগ পাইলেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাইবার জন্য ব্যগ্র রহিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে কলিকাতার ময়দানে ক্রীড়ারত দলগুলি এবং তাহাদের সমর্থকদিগেরও করণীয় রহিয়া গিয়াছে। খেলাতে হারজিত হইবেই—হার-জিত না থাকিলে খেলায় কোন আকর্ষণই থাকিত না—কাজেই কেহ কেহ যদি মনে করেন যে, খেলাতে কেবল জয়ই তাহাদের প্রাপ্য তবে তাহাদের পক্ষে কোন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় উপস্থিত না থাকাই উচিত—কারণ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা চেষ্টায় তাহাদের হাতে বরমাল্য তুলিয়া দিবেন না। কিন্তু কলিকাতার মাঠের মুষ্টিমেয় কয়েকজন খেলোয়াড় এবং নগণ্য দর্শক দৃশ্যতঃই মনে করেন যে, তাহাদের দলের জয় হইতেই হইবে—না হইলে সেই খেলা তাঁহারা অনুষ্ঠিত হইতে দিবেন না। তাঁহাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতায় অগণিত ক্রীড়ামোদীদিগকে পুলিসের লাঠির গুতা এবং গুণ্ডাদের নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। অপরাধ প্রমাণিত হইলে এই শ্রেণীর অসামাজিক জীবদের কঠোর শাস্তিবিধান নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ক্লাব এবং সমর্থকদিগেরও কর্ত্তব্য—এই সকল অসামাজিক কার্য্যকলাপের প্রকাশ্য নিন্দা করা। আলোচ্য ঘটনার দিন খেলায় মহমেডান স্পোর্টিং দলের গোলকীপার যেরূপ অশোভন ব্যবহার করেন তাহাতে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে ফুটবল ক্রীড়ামোদী মাত্রেই ব্যথিত হইয়াছেন—সকলেই আশা করেন যে, অন্ততঃ খেলোয়াড়দের তরফ হইতে যাহাতে এই সকল অবাঞ্ছিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য সকল ক্লাবেরই কর্ত্তৃপক্ষ সচেষ্ট হইবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের চা-নীতি

চা-শিল্পে ভারতবর্ষ বৃহত্তম উৎপাদক এবং পৃথিবীর মোট চা-উৎপাদনের প্রায় ৬০ শতাংশ এদেশে উৎপন্ন এবং পৃথিবীর মোট চা-রপ্তানীর ৫০ শতাংশ ভারতবর্ষ রপ্তানী করে। ১৯৫৬ সনে এদেশে ৬৬·৪৪ কোটি পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয় এবং তাহার মধ্যে সরকারী হিসাব অনুসারে ৫১·৬০ কোটি পাউণ্ড ১৪০ কোটি টাকায় বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে এবং ১৫·৫ কোটি আভ্যন্তরিক খরচ হইয়াছে। ভারতীয় চা-বোর্ডের হিসাব অনুসারে ভারতে বাৎসরিক আভ্যন্তরিক চা-খরচের পরিমাণ ২১ কোটি পাউণ্ড, সুতরাং সরকারী হিসাব অনুসারে গত বৎসর চা-উৎপাদনে ঘাটতি পড়ে, অর্থাৎ উৎপাদনের তুলনায় চাহিদা বেশী। এই ঘাটতি যে কেমন করিয়া পূরণ করা হইল সেইটাই আশ্চর্য্য, অর্থাৎ গত বৎসর উৎপাদনের চেয়ে ৬·৬০ কোটি পাউণ্ড বেশী খরচ হইয়াছে, কিন্তু কেমন করিয়া ইহা সম্ভবপর হইল—ভারতবর্ষ যখন চা আমদানী করে না। চায়ের সঙ্গে ভেজাল দিয়া এই ঘাটতির অনেকখানিই পূরণ করা অবশ্যই হইয়াছে। সম্প্রতি চা-বোর্ড বহু চায়ের নমুনা পরীক্ষা করেন, এবং তাহাদের মধ্যে দেখা যায় যে, ৫০ শতাংশ ভেজালে ভর্ত্তি। এহেন অবস্থায় ভারতবাসীদের ভেজাল চা খাইয়াই শান্ত থাকিতে হয়। খোলা চা-তে ভেজাল বেশী দেওয়া সুবিধাজনক। সেইজন্য ভারতীয় চা অনুসন্ধান কমিশন অনুমোদন করেন, প্যাকেট চা ও আলগা চায়ের মধ্যে বর্ত্তমানে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহারিক শুল্ক আছে তাহা রহিত করিয়া দেওয়ার জন্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। কমিশন ইহাও অনুমোদন করেন যে, ভেজাল বন্ধ করিবার জন্য ভারতীয় চা-বোর্ড অন্ততঃ কিছু পরিমাণ চা প্যাকেট করিয়া বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রস্তাবও কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন নাই।

রপ্তানী ও চাহিদার তুলনায় ভারতের চা-উৎপাদনে ঘাটতি পড়িতেছে। উৎপাদন ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া অধিক হারে লাভ করিবার আশায় ভারতীয় চা-বাগানের মালিকরা উৎপাদন কমাইয়া দিতেছেন। ১৯৫৫ সনের তুলনায় ১৯৫৬ সনে ৩০ লক্ষ পাউণ্ড কম চা উৎপন্ন করা হইয়াছে। আবার ১৯৫৬ সনের তুলনায় ১৯৫৭ সনে প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড কম চা উৎপাদিত হইয়াছে। চা-বাগানের মালিকদের এই চক্রান্ত ভারত সরকারের প্রতিরোধ করা উচিত। ভারতের আভ্যন্তরিক চাহিদা বৎসরে এক কোটি পাউণ্ড হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড চা-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে, অর্থাৎ বৎসরে ভারতবর্ষে ৯০ লক্ষ পাউণ্ড হারে চা-উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, কিন্তু দেখা যায় যে, চা-উৎপাদন ক্রমশঃ ঘাটতির দিকে। এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের আরও বলিষ্ঠ নীতি অনুসরণ করা উচিত। আর আন্তর্জ্জাতিক চা-চুক্তি ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর হইবে, কারণ ইহাতে চা-উৎপাদন ও রপ্তানী দুই-ই হ্রাস করিতে হইবে। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক চা-চুক্তির জন্য ভারত সরকার যে কেন চেষ্টা করিতেছেন তাহা বুঝা মুশকিল।

পুলিসের প্রতিহিংসাপরায়ণতা

"সাপ্তাহিক জি. টি. রোড" (১৯শে জুন) লিখিতেছেন :

"পশ্চিমবঙ্গের পুলিস বিভাগে দুর্নীতির ত অন্ত নাই, কিন্তু তাহাদের স্বার্থে ঘা লাগিলে তাহারা কি সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতে পারে তাহা নিম্নের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে।

"বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানায় জটাক মুচির বাড়ীতে চুরি হয়—মুচি চোর ধরিয়া শ্রীগৌরীশঙ্কর ঘোষ নামে জনৈক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করেন—ইহার কি প্রতিকার হইবে; শ্রীঘোষ তাহাকে থানায় যাইতে বলেন। ঘটনা এইটুকু মাত্র। দারোগা মোকদ্দমা রুজু করে এবং আসামীকে চালান দেয়। বলা বাহুল্য শ্রীঘোষকে সরকারী সাক্ষ্য মানা হয়। শ্রীঘোষকে কিন্তু কোনরূপ শমন দেওয়া হয় না, অর্থাৎ ঐ শমন গোপন রাখা হয়—উদ্দেশ্য শ্রীঘোষকে হয়রান করা। হয়রান করার কারণ হইতেছে, শ্রীঘোষ ইতিপূর্ব্বে উক্ত থানার দারোগা শ্রীঅনিল দে'র নামে ঘুষ লওয়ার অপরাধে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে জানান। শ্রীঘোষ শমন না পাওয়ায় সাক্ষ্য দিতে হাজির হন নাই, সেই জন্য উক্ত অফিসার

তাঁহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির করাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং জামিন না দিয়া হাতকড়া দিয়া বাঁধিয়া আনে এবং থানা-হাজতে আটক রাখে, পরে একদিন দেরি করিয়া পুনরায় হাতকড়া দিয়া বিষ্ণুপুরে চালান দেয়। শুধু এইখানে নহে, হাজতে ঐ অবস্থায় তাঁহার ফটো তোলা হয় এবং সেই ফটো তাঁহার বিরোধী দলদের মধ্যে বিলি করা হয়।

"শ্রীঘোষ একজন প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি, বহু জনহিতকর কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং এক সময় তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও জেলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন এবং অত্যন্ত মর্য্যাদাসম্পন্ন পরিবারের সন্তান।

"এই ব্যাপার আই. জি. অফ পুলিসের গোচরে আনা হইলে আই. জি. রেডিওগ্রামে সঙ্গে সঙ্গে ইহার তদন্তের আদেশ দেন এবং শ্রীঅনিল দেকে বদলী করা হয়।"

"জি. টি. রোড" পত্রিকা পুলিসের দুর্ব্যবহারের আরও দুইটি দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে এক মহিলার গলা হইতে দুর্বৃত্ত হার ছিনাইয়া লইলে উপস্থিত পুলিস সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। পরে জনসাধারণের চেষ্টায় ঐ দুর্বৃত্তকে যখন গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হইতে থাকে তখনও পুলিস নিষ্ক্রিয় থাকিয়া তাহার পলায়নের সুযোগ করিয়া দেয়।

অপর একটি দৃষ্টান্তে প্রকাশ যে, বৰ্দ্ধমান রেল-ষ্টেশনে জনৈক কুলি পুলিসকে চালানী মাছের ঝুড়ি হইতে মাছ লইতে দিতে অস্বীকার করায় স্থানীয় পুলিস দলবদ্ধভাবে কুলিদের উপর হামলা চালায় এবং একজন কুলিকে গ্রেপ্তার করে। প্রতিবাদে কুলিরা ধর্ম্মঘট করে। তখন সদর মহকুমা-শাসক বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন এবং সংশ্লিষ্ট পুলিস কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিত হইবার পর ধর্ম্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

"জি. টি. রোড" যে তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হইবেন। একজন সামান্য দারোগা তাহার ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যদি এরূপ নিরঙ্কুশভাবে সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে, তাহাতেই বুঝা যায় যে, পুলিসের ক্ষমতাবৃদ্ধি কিরূপ বিপজ্জনক রূপ ধারণ করিয়াছে। সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর কর্ম্মীর ন্যায় পুলিস ও সমাজের একটি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য করিয়া থাকে—সেজন্য পুলিসের এরূপ কোন অধিকার থাকিতে পারে না যে, সম্পূর্ণ নিরপরাধ ভদ্রসন্তানকে খেয়াল-খুশিমত অপমান করিতে পারিবে। ইন্‌স্পেক্টর-জেনারেল তদন্ত করিতেছেন ভাল কথা—দারোগা অনিল দে বিভাগীয় কার্য্যেও যে বিশেষ অযোগ্য, চাকুরীতে তাহার পদাবনতি হইতেই তাহা বুঝা যায়। কাজেই তদন্তে হয়ত অনিল দে'র দোষ ধরা পড়িতে পারে। কিন্তু অনিল দে'র শাস্তি হইলেও শ্রী ঘোষের অবমাননার কোনই প্রতিকার হইবে না—বর্ত্তমান আইনে এই সকল পুলিসী অত্যাচারের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই নাই। ঠিক একই ভাবে বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনের কুলিদেরও অপমানের কোন প্রতিকার হইবে না। অপরাপর কোন সভ্যদেশেই পুলিসের এইরূপ অপ্রতিহত ক্ষমতা নাই। আমাদের দেশে যুক্তি দেওয়া হয় যে, উপযুক্ত ক্ষমতা না থাকিলে পুলিসের পক্ষে কর্ত্তব্য পালন কঠিন হইয়া পড়ে। কিন্তু যথেচ্ছ ব্যক্তিস্বাধীনতা দলনের অধিকার ব্যতিরেকেও যে, পুলিস তাহার কর্ত্তব্য করিতে পারে, অন্যান্য রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই বুঝা যায়। অকর্ম্মণ্য পুলিস দুর্নীতিগ্রস্ত হইলে ক্ষমতা থাকিলেও যে কোন লাভ হয় না, বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনের মহিলার হার-চুরির ঘটনাই তাহার প্রধান প্রমাণ।

ভারতের শাসনব্যবস্থা

১৫ই জুলাই ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের শিক্ষাশাখার দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ প্রদান প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশনের বিশিষ্ট সদস্য ড. শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ভারতীয় শাসনপদ্ধতির বিশেষ সমালোচনা করেন। ড. ঘোষের এই খোলাখুলি সমালোচনা হয়ত আমাদের রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর ভাল লাগিবে না, কিন্তু জনসাধারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে এই সমালোচনার যাথার্থ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ।

ড. ঘোষ বলেন যে, ভারত সাধারণতন্ত্রী হইলেও প্রতিটি মন্ত্রীসভা এক-একটা ক্ষুদে সাম্রাজ্যবিশেষ।

কোন মন্ত্রীসভাই অপরাপর মন্ত্রীসভার সহিত সহযোগিতা করিয়া চলিতে প্রস্তুত নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ড. ঘোষ কেন্দ্রীয় শ্রম ও রাজ্যশিল্পদপ্তর এবং শিক্ষাদপ্তরের পারস্পরিক মনোভাবের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, উপর মহল হইতে এত ফতোয়া ও উপদেশ বর্ষিত হয় যে, 'তলা' মহলের আর উদ্যোগী হইয়া কাজ করিবার অবকাশ থাকে না।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এইরূপ আমলাতান্ত্রিক ফতোয়া জারীর বিপজ্জনক ফলাফলের আলোচনা করিয়া ড. ঘোষ বলেন যে, শিক্ষার উন্নতিসাধন-ব্যবস্থা মূলতঃ শিক্ষকদের উপরই নির্ভর করে, ফতোয়া জারীর ফলে শিক্ষকদের কর্ম্মোদ্যম নানাভাবে সঙ্কুচিত হয়।

ড. ঘোষ এই প্রসঙ্গে ভারতের নব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যশিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের কথাও উল্লেখ করেন তিনি বলেন, প্রত্যেক রাজ্যেই মাধ্যমিক শিক্ষার পরিচালনার ভার একটি স্বতন্ত্র সংস্থার উপর থাকা উচিত।

তিনি আরও বলেন যে, পরিকল্পনাতে শিক্ষার মান উন্নয়নের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল, তাহাতে সম্ভবতঃ পৌঁছান যাইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি ব্যাহত হওয়ার জন্য ড. ঘোষ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারের মন্ত্রণালয়গুলিকেই দায়ী করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় (Multipurpose schools) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম পরিকল্পনাকালে যে অর্থবরাদ্দ করা হইয়াছিল, কোন কোন রাজ্যসরকার তাহাও কাজে লাগান নাই।

পূর্ব্বপাকিস্থানের উদ্বাস্তু ও ভারত সরকার

পূর্ব্বপাকিস্থান হইতে ভারতে আগমনেচ্ছু হিন্দু উদ্বাস্তুদের

সম্পর্কে ৬ই আষাঢ় "যুগশক্তি" যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতেই তাহার গুরুত্ব বিধায় আমরা বিনা মন্তব্যে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যুগশক্তি" লিখিতেছেন :

"ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ যে, এক লক্ষ একষট্টি হাজার পরিবারের (প্রায় ৭ লক্ষ লোকের) বাস্তুত্যাগের আবেদনপত্র ঢাকাস্থ ভারতীয় ভিসা আপিসে দাখিল করা আছে। কিন্তু ভারতীয় কর্ত্তৃপক্ষ এখন আর মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে চাহিতেছেন না। ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা আজ নিতান্ত অসহায় বোধ করিতেছেন। ভারত সরকার ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারকে এরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ যে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করার ব্যাপারে অত্যন্ত কড়াকড়ি করিতে হইবে। এদিকে অনেক হিন্দু বাড়ীঘর, জায়গাজমি বিক্রয় করিয়া ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার আপিসে আবেদনপত্র পাঠাইয়াও কোন সাড়া পাইতেছেন না। ফলে, তাহারা আজ মৃত্যুপথের যাত্রী। পূর্ব্বের ন্যায় মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিলে নাকি প্রতি মাসে গড়ে ৩০,০০০ হাজার হিন্দু পাকিস্থান ত্যাগ করিত। সংবাদে ইহাও প্রকাশ যে, হিন্দুদের জমিজমা জবরদখল, বর্ত্তমান জরিপের সময়ে হিন্দুর বহু জমিজমা মুসলমানের নামে রেকর্ড করা, হিন্দুনারী অপহরণ, হিন্দুর বাড়ীতে ডাকাতি, হিন্দুর জমির ফসল কাটিয়া নেওয়া প্রভৃতি কারণে হিন্দুগণ বাস্তুত্যাগ করিতে উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে অবস্থা ভয়াবহ নহে কি?

"সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে উদ্বাস্তুদের আগমন হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। কিন্তু কি কারণে যে পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে আগমনেচ্ছু নিপীড়িত হিন্দুগণ ভারতে আসিতে পারিতেছে না, তাহা বলা হয় না। ভারত সরকার পূর্ব্ব-পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছেন একথা অনস্বীকার্য্য। তাই কেন্দ্রীয় দপ্তরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পাকিস্থানস্থ ভারতীয় হাই-কমিশনার নূতন আগমন বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্থানীদের অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া বাড়ীঘর তৈজসপত্র বিক্রী করিয়া মাইগ্রেশনের আশায় দিন কাটাইতেছে। হতভাগ্য হিন্দুরা যে কি শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া বাস্তুত্যাগ করিতে চাহিতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ প্রায় অরাজক পাকিস্থানে থাকিবারও এখন উপায় নাই, অথচ ভারত সরকারও তাহাদের গ্রহণ করিতে চাহিতেছেন না। পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দুদের অবস্থা এখন যেন 'জলে কুম্ভীর, ডাঙায় বাঘ'। দেশবিভাগের সময় ভারত সরকার পাকিস্থানের হিন্দুদের প্রতি তাহাদের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাহারা সেই প্রতিশ্রুতি পালনে পশ্চাৎপদ হইতেছেন।

বৃষ্টির অভাবে চাষবাসে অসুবিধা

বৃষ্টির অভাবে আষাঢ় মাসে পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই সময়মত চাষবাস করা সম্ভব হয় নাই। বর্দ্ধমানের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন :

"বর্ষা আরম্ভ হয় নাই। চাষকার্য্য চলিতেছে না। ক্যানাল-জল ছাড়ে নাই। নদীতে বর্ষার জল আসে নাই। চৈত্র মাস হইতে এখনও পর্য্যন্ত সুচারু বৃষ্টি হয় নাই। জেলায় সর্ব্বত্র চাষী, কৃষি-মজুর এক সঙ্কটের মধ্যে বাস করিতেছে। কাজকর্ম্ম পাইতেছে না। মজুর খাটিয়া অন্নসংস্থান করিবার কোন কাজ জুটিতেছে না। বৃষ্টিহীনতার জন্য সম্পন্ন গৃহস্থেরা মজুর খাটাইতে পারিতেছে না। এখানে-ওখানে যে সমস্ত টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও বন্ধ হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ফলে দরিদ্র জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। সরকার হইতে কৃষিঋণ কোন কোন স্থানে দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা এত স্বল্প যে, তাহাতে অভাব পূরণ হইতেছে না। অধিক পরিমাণে কৃষিঋণ এবং আশু বলদ-ক্রয়ঋণ না দিলে দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর দুর্দ্দশা চরমে উঠিবে। আমরা জেলা-শাসক ও মহকুমা-শাসকের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি এবং আশা করিতেছি যে, তাঁহারা ঋণ দিবার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবেন।"

বেসরকারী প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত বাঁধের দুরবস্থা

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকায় ৭ই আষাঢ় সংখ্যায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। সংবাদটি সম্পর্কে অবিলম্বে সরকারী তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি, কারণ সময়মত যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয় তবে বিপদ ঘটিলে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" লিখিতেছেন :

"কান্দী : বড়ঞা থানায় সুন্দরপুর ইউনিয়ন হাতিশালার খালে প্রায় চল্লিশটি গ্রামের অধিবাসিগণ নিজেদের চেষ্টায় এক পয়সাও চাঁদা না তুলিয়া ময়ূরাক্ষীর বানের প্রতিরোধকল্পে একটি বাঁধ তৈয়ার করিয়া নিজেদের গ্রাম ও জমি রক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাঁধটি আন্দাজ ২০০ হাত লম্বা, ৪০ হাত উঁচু, উপরে ৬ হাত ও তলদেশে ৮০ হাত চওড়া। ময়ূরাক্ষী নিজের গতিপথ পরিবর্ত্তন করিয়া ছোট খালটির মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে সুরু করায় এই বাঁধ বাঁধার প্রয়োজন হয়। গত মহাপ্লাবনেও এই বাঁধের কোন ক্ষতি হয় নাই।

"বর্ত্তমানে ঠিকাদার দ্বারা সরকার হইতে ময়ূরাক্ষীর বাঁধগুলির মেরামত ও সংস্কার করা হইতেছে। বাঁধটি মেরামতের নামে বাঁধের নীচের অংশ হইতে মাটি তুলিয়া উপরের অংশে দেওয়া হইতেছে। এই ভাবে বাঁধটি দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইতেছে। দূর হইতে মাটি না আনিয়া উচ্চ লাভের আশায় বাঁধের মাটি কাটিয়া বাঁধটিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হইতেছে। অথচ সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কোন প্রতিবিধান করিতেছেন না বলিয়া গ্রামবাসিগণ বাঁধের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া ভীত হইতেছেন।"

ত্রিপুরায় খাদ্যসঙ্কট ও সরকারী ব্যবস্থা

ত্রিপুরা রাজ্যের খাদ্যপরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে শঙ্কিত হইয়া ত্রিপুরার এক দল গণপ্রতিনিধি সম্প্রতি নয়াদিল্লী যাইয়া ভারত-সরকারকে ত্রিপুরার খাদ্যপরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করিয়া সরকারের নিকট অনুরোধ জানান যে, ত্রিপুরা রাজ্যকে যেন অবিলম্বে খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দৃশ্যতঃ, ত্রিপুরাবাসীর এই উদ্বেগ প্রশমনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি উপমন্ত্রী শ্রী এম, ডি. কৃষ্ণাপ্পা আগরতলা গমন করেন। তথায় এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বলেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এই বৎসর খাদ্যপরিস্থিতি গত বৎসরের তুলনায় অনেক ভাল, রাজ্যটিকে খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। ত্রিপুরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২০ সহস্র টন চাউল মঞ্জুর করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে আরও চাউল মঞ্জুর করা হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাবের সমালোচনা করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সেবক" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"সর্ব্বত্র রেশন দোকান খোলা হইয়া থাকিলে এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হইলে কোন অভিযোগ ছিল না। যতগুলি সস্তা দরের রেশন দোকান খোলা উচিত ছিল তাহার সামান্যই এখন পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। যে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামের অধিবাসী খাদ্যসঙ্কটে পড়িয়াছে সেখানে একটি রেশন দোকান হইতে আর একটির দূরত্ব ২৫।৩০ মাইলেরও বেশী। কাজেই রেশন দোকান হইতে মাত্র সামান্যসংখ্যক লোকই যে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। টেষ্ট রিলিফের কাজও যে ব্যাপক-ভাবে আরম্ভ হইয়াছে তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। টেষ্ট রিলিফ বলিতে এখানে মাটি কাটিয়া মজুরী পাওয়া। যাহারা মাটি কাটিতে অভ্যস্ত নয় তাহারা টেষ্ট রিলিফের কাজে যোগদান করিতে পারে না।

সংবাদে প্রকাশ, প্রায় এক লক্ষ রেশন কার্ড ইতিমধ্যেই বিলি হইয়া গিয়াছে। ১৯৫১ সনের সেন্সাস মতে ত্রিপুরার লোক-সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষেরও কম এবং বেসরকারী হিসাবে ১৯৫৭ সনে লোকসংখ্যা দশ লক্ষ। প্রতি কার্ডে গড়ে পাঁচজন ধরিলে দেখা যায়—পাঁচ লক্ষ লোকের জন্য রেশন কার্ড বিলি হইয়া গিয়াছে। ইহার পরেও বহু লোক রেশন কার্ড পায় নাই—প্রতিটি অঞ্চল হইতেই এই অভিযোগ পাওয়াও যায়। রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য অনেকে উপবাসে দিন কাটাইতেছে এমন সংবাদও আমরা পাইয়া থাকি। এই সকল ঘটনায় সন্দেহ হয় যে, রেশন কার্ড বিলি বিষয়ে এক বিরাট ষড়যন্ত্র চলিয়াছে। ত্রিপুরার রেশন কার্ডের চাহিদা কস্মিনকালেও ফুরাইবে না। রেশন কার্ডের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে অনেক তথ্য প্রকাশ পাইবে—ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বলিয়াছেন, ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হইতেছে। তাঁহার এই আশ্বাসে আনন্দিত হইলেও ভরসা পাইতেছি না। কারণ প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার খাদ্য উৎপাদন বাড়াইবার পরিকল্পনা থাকিলেও উৎপাদন বাড়িয়াছে বলিয়া মনে করিবার নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই না। আগরতলা বিমানঘাটি হইতে আগরতলা শহরে আসিতে রাস্তার পার্শ্বে এবং জিরানিয়া অঞ্চলে "জাপানী প্রথায় চাষের" কয়েকটি সাইনবোর্ড ব্যতীত সরকারী প্রচেষ্টায় খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির আর কোন সার্টিফিকেট আছে বলিয়া জানা নাই। বিনামূল্যে ২০০ টন এমোনিয়াম সালফেট বিতরণ কোথায় হইল এবং ইহা দ্বারা কি উপকার হইয়াছে তাহা কখনও কেহ শুনে নাই। পূর্ব্ব-পাকিস্থানে গত কয়েক বৎসর যাবৎ খাদ্যাভাব থাকায় ত্রিপুরা হইতে বিপুল পরিমাণ ধান্য ও চাউল পাচার হইয়া থাকে। কি পরিমাণ খাদ্য প্রতি বছর পাকিস্থানে বেআইনী রপ্তানী হইয়া থাকে তাহার হিসাব কেহই জানে না।

"শ্রীকৃষ্ণাপ্পা বেআইনী রপ্তানীকার্য্য বন্ধ করিতে সরকারের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। যে রাজ্যে বেকার-সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা থাকে না সেখানে পেটের জ্বালায় কিছু লোক কুকর্ম্ম করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি গত দুই বৎসরের মধ্যে পুলিশ ও কাষ্টম কি পরিমাণ ধান্য ও চাউল সীমান্ত অঞ্চল দিয়া পার হওয়ার সময় আটক করিয়াছে? পুলিস ও কাষ্টম দুর্নীতির উর্দ্ধে থাকিলে পাকিস্থানে খাদ্য পাচার কিভাবে হইতে পারে বুঝিতে পারি না।"

শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথ

শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথে প্রত্যহ ত্রিশটি যাত্রীবাহী ট্রেন যাতায়াত করে। যাত্রীসংখ্যার তুলনায় ট্রেনের সংখ্যা নিতান্তই কম; কিন্তু এই ট্রেনগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় ঠিক রাখিতে পারে না। কাজেই সময় সময় যদি অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথে ট্রেন-চলাচল সমস্যার কয়েকটি দিক আলোচনা করিয়া সাপ্তাহিক "বারাসাতবার্ত্তা" লিখিতেছেন :

"রেল-কর্তৃপক্ষ যদি বিক্ষুব্ধ যাত্রীসাধারণের দাবি বিবেচনা করিয়া দেখেন, আমরা অতিশয় বিনীত কণ্ঠে শিয়ালদহ-বনগাঁ রেল-পথের আমূল সংস্কারের অনুরোধ জানাইব। একটিমাত্র রেলের উপর দিয়া প্রত্যহ ত্রিশটি গাড়ী চালানো অন্ততঃপক্ষে এইরূপ ঘনবসতি অঞ্চলে সময় ঠিক রাখা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্বসাপেক্ষ বিষয়। কোন কারণে একটি গাড়ী বিলম্ব করিলে বিপরীতগামী গাড়ীকে দাঁড় করাইয়া পথ ছাড়িয়া দিতে হয়—ইহা ভুক্তভোগী-মাত্রই অবগত আছেন। ইহার উপর ইঞ্জিন বিকল হওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক হইয়া উঠিয়াছে।"

শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলগুলিতে জনবসতি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহাতে আর এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। জনবসতি যতই বাড়িতেছে, ততই নূতন নূতন ষ্টেশন স্থাপনের জন্য জনসাধারণ দাবি করিতেছেন। জনসাধারণের এই দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু ঐ অঞ্চলে একটি মাত্র লাইনের

পক্ষে এতগুলি ষ্টেশনের দাবি মিটান সম্ভব নহে, কারণ তাহাতে ট্রেন-চলাচলে সময়ানুবর্ত্তিতা রক্ষা করা আরও দুঃসাধ্য হইবে।

সমস্যাটির এই দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া 'বারাসাতবার্ত্তা' লিখিতেছেন :

"কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে, বর্ত্তমান দমদম জংশন হইতে বনগাঁ পর্য্যন্ত মোট ১৫টি ষ্টেশনের পরে ষ্টেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতে থাকিলে একটিমাত্র রেলযুক্ত লাইনের অবস্থা কি হইবে? উহার দ্বারা বিলম্বে ট্রেন-চলাচলের ব্যাধি মুক্ত হইবে, না, ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে। সমাজতান্ত্রিক ধাচে গড়া রাষ্ট্রে জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ও যুক্তিসঙ্গত দাবির প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাইতে হইলে আমরা মনে করি, শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথটি দুইটি রেলের উপর দিয়া গাড়ী যাতায়াতের ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের অনিবার্য্য আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় সরকারের তৎকালীন রেল-মন্ত্রী শ্রীযুত লালবাহাদুর শাস্ত্রী মহোদয় শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথে ডবল লাইন প্রবর্ত্তনের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। বর্ত্তমানের তুলনায় আরও বেশী গাড়ী চালাইবার আবশ্যকতা হইয়াছে, কিন্তু অতিশয় দুঃখের বিষয়, এই লাইনের মামুলী রীতির সময়োপযোগী সংস্কারের অভাবে প্রত্যহ রেলযাত্রী বিক্ষুব্ধ হইতেছেন, রেলের কর্ম্মচারীবৃন্দ বিক্ষুব্ধ জনতার বিদ্রূপ ও বিরক্তি ভাষণে জর্জ্জরিত হইতেছেন—সমস্যার মূল অংশটি সংস্কারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি-নিক্ষেপ হইতেছে না। আমাদের সমাজের পুরাতন রীতি বাস-গৃহের সংলগ্ন কর্ম্মস্থলব্যবস্থা ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে। বিশেষ করিয়া কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের কর্ম্মীদের বাসস্থান উক্ত রেল-পথের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। বাসস্থান হইতে কর্ম্মস্থলে প্রত্যহ যাতায়াতের একমাত্র সুলভ রেলপথ যদি সময়ের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া পুরাতন ব্যবস্থায় চলিতে থাকে তবে উহাতে যাত্রীসাধারণের ক্লেশ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইবে। বিগত সাত বৎসরের শিয়ালদহ-বনগাঁ রেলপথের লব্ধ অভিজ্ঞতার কি কোন মূল্য নাই?"

শিক্ষার উন্নতিকল্পে ভৃত্যের দান

কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজিয়েট স্কুলের একজন ভৃত্য—শ্রীকাশীকান্ত সরকার মৃত্যুর সময়ে তাঁহার জীবনের সঞ্চয় এগার হাজার টাকা কৃষকদের শিক্ষার উন্নতিবিধানকল্পে উইল করিয়া গিয়াছেন। উপরন্তু তাঁহার প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাও তিনি নিজ গ্রামে একটি ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য দিয়া গিয়াছেন।

একজন সামান্য ভৃত্যের এই অসামান্য বদান্যতার সপ্রশংস আলোচনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" ২৩শে আষাঢ় লিখিতেছেন :

"দানের প্রবৃত্তি থাকিলে সামান্য আয় হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া পরোপকার করা যায়। আমাদের দেশে বড় বড় দানবীরের বহু উদাহরণ আছে; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সামান্য অবস্থার লোকও মহৎ প্রবৃত্তির প্রেরণায় বিরাট দান করিয়া গিয়াছে। আজ চতুর্দ্দিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের দিনে দানের প্রবৃত্তি উবিয়া গিয়াছে। বহু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে। সেই সব টাকা বাজে কাজে ব্যয় করে। বড় বড় উপর-ওয়ালা অফিসারগণকে তুষ্ট করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না; কিন্তু তাহারা প্রকৃত দান করা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কণ্ট্রোলের যুগে কালোবাজারী ও মুনাফা শিকারের ব্যবসায় করিয়া অনেকে হঠাৎ অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহারা অন্যায়ভাবে অর্জ্জিত এই বিপুল টাকার কিয়দংশও সৎকাজে দান করিতে চাহে না। অবশ্য যদি কোন হাকিম-ম্যাজিষ্ট্রেট চাপ দেন তবে কিছু টাকা তাহাদের বদ্ধ মুষ্টি হইতে বাহির হয়, কিন্তু এই ভাবে যত টাকা বাহির হইয়া যায়, অন্যদিকে অসদুপায়ে তাহার চতুর্গুণ টাকা তাহারা আদায় করিয়া লয়। যাহাকে বলে স্বেচ্ছায় দান, তাহা কেহ বড় একটা করিতে চাহে না। এই দিক দিয়া বলা যাইতে পারে যে, দেশে "দানের দুর্ভিক্ষ" আরম্ভ হইয়াছে। দেশের অর্থশালী ব্যক্তিদের দানকাতর প্রবৃত্তি দেখিয়া মন হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন একটি স্কুলের সামান্য একজন ভৃত্যের বদান্যতা দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতের প্রাণকেন্দ্রে এখনও জীবনের রস শুকাইয়া যায় নাই।"

পত্রিকাটি লিখিতেছেন, কাশীকান্তের এই দান সত্যই দুর্লভ।

"সত্যই কাশীকান্ত সামান্য ভৃত্য ছিল, কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল রাজার মত। ফকিরের বেশে—দীন ভৃত্যের বেশে সে দীর্ঘদিন ভৃত্যের চাকরি করিয়াছে। কিন্তু তাহার হৃদয় ছিল উদার ও মহান্, তাই সে জীবনের সমস্ত সঞ্চয় অকাতরে দান করিতে পারিল। সে ত ভৃত্য নয়, সে রাজার রাজা, সে একজন মহানুভব ব্যক্তি। শ্রদ্ধেয় কাশীকান্তের উদাহরণ কি আমাদের দেশের মনে কোন প্রেরণা সৃষ্টি করিবে না?

"ধন্য কাশীকান্ত! ধন্য তোমার দান! তুমি আজ যে আদর্শ স্থাপন করিলে তাহা হইতে যেন দেশবাসী নূতন প্রেরণা পায়। কোন জীবনীকার কাশীকান্তের জীবন-কথা লিখিবে না। তাহার জীবনে হয়ত কোন বিরাট ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু মুহূর্ত্তের একটি মহৎ সৎকর্ম্মের প্রেরণায় সে এমন কাজ করিল যাহা তাহাকে বড় বড় দানবীরের পার্শ্বে স্থায়ী আসন করিয়া দিবে। তাহার জীবনের এই একটি ঘটনাই বহু জনের বহু ঘটনাপূর্ণ জীবনকে ম্লান করিয়া দিবে। প্রার্থনা করি এ দেশে এই রকম শত শত কাশীকান্ত জন্মগ্রহণ করুক।"

পশ্চিম বাংলার বেকার-সমস্যা

সম্প্রতি একটি সাংবাদিক অধিবেশনে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বাংলার প্রধান সমস্যাগুলির মধ্যে বেকার-সমস্যা একটি। এই উক্তির মধ্যে নূতনত্ব অবশ্য কিছুই নাই, কারণ ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু পুরানো জিনিষকে নূতন করিয়া স্বীকার করায় বেকার-সমস্যার গুরুত্ব অবশ্য কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। পশ্চিম বাংলায় মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি

পাইতেছে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই বিষয়ে পরিকল্পনা কিছুই নাই। বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বেকারের সংখ্যা প্রায় নয় হইতে দশ লক্ষ হইবে, এবং ইহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের রাজধানী দিল্লী পশ্চিম বাংলা হইতে বহুদূরে হওয়ার ফলে পশ্চিম বাংলাবাসীর পক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি পাওয়া সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরা বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত চাকুরি প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। কলিকাতায় দক্ষিণ ভারতীয় অধিবাসীদের আধিক্য দেখিয়া স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে, দক্ষিণ ভারতে সমসংখ্যায় বাঙালী আছে কিনা, কারণ সেখানেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক আপিস আছে। তবে মাদ্রাজে যে বাঙালী চাকুরের সংখ্যা মুষ্টিমেয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার জন্য অবশ্য উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্ম্মচারীরা বহুলাংশে দায়ী। বাঙালীরা স্বভাবতঃই অত্যন্ত উদার, অর্থাৎ সরকারী কোনও উচ্চ পদের অধিকারী যদি কোনও বাঙালী হন, তবে সেই বিভাগে আর কোনও বাঙালী সহজে চাকুরি পাইবে না। তিনি বাঙালী ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রদেশের লোককে চাকুরিতে নিয়োগ করেন। ভারতীয় রেলপথের ভূতপূর্ব্ব এক উচ্চপদস্থ বাঙালী কর্ম্মচারী সম্বন্ধে দুর্নাম আছে যে, একটি বাঙালীকেও তিনি চাকুরি দেন নাই।

সরকারী চাকুরিতে যেখানে একটি মাদ্রাজী কিংবা পঞ্জাবী উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী আছেন সেখানে তাঁহারা মাদ্রাজী বা পঞ্জাবী ব্যতীত অন্য কাহাকেও চাকুরি দিবেন না। কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা আপিসে বর্ত্তমানে দক্ষিণ ভারতবাসীদের সংখ্যাই অধিক, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি সাধারণ গুণের অধিকারী। তবে খুঁটির জোর আছে বলিয়া উহাদের চাকুরি পাইতে কোনও প্রকার কষ্ট হয় না, আই-এ কিংবা বি-এ পাস করিতে পারিলেই যথেষ্ট। তবে উহারা প্রথম হইতেই চাকুরি পাওয়ার জন্য সজাগ ও সচেষ্ট থাকে। চাকুরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী পরীক্ষার জন্য তাহারা সর্ব্বতোভাবে নিজেদের তৈয়ার করে এবং পরীক্ষা দেয়। বাঙালী ছেলেদের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য সে প্রকার আগ্রহ এবং নিষ্ঠার যথেষ্ট অভাব আছে। তাহারা অত্যন্ত আয়েসী এবং মনে করে যে, না পড়িয়াই পরীক্ষায় পাস করা যায়, তা সে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষাই হউক কিংবা সরকারী চাকুরির পরীক্ষাই হউক। পাঠ্যপুস্তক পাঠ করার রেওয়াজ বাংলা দেশ হইতে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি বর্ত্তমানে নোটবই এবং তার জন্য আমাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। ইহার ফলে চাকুরির পরীক্ষার বাঙালীর ছেলেরা তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

তবে এ প্রদেশে মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকার-সমস্যা যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়তির পথে তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না, কারণ তাঁহাদের বর্ত্তমানে না আছে ইচ্ছা, না আছে ক্ষমতা। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরই প্রধান দায়িত্ব এই বেকার-সমস্যার সমাধান করা, তাঁহাদের নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহাদের উচিত—বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠা করিয়া বেকার-সমস্যার আশু প্রতিবিধান করা।

সরকারী খরচের অনিয়ম

সরকারী খরচের অনিয়মই বর্ত্তমানে নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রকম খরচের অনিয়ম কিংবা বেআইনী খরচের দুই-চারটি উদাহরণ প্রত্যেক বৎসর হিসাব-পরীক্ষার সময়ে ধরা পড়ে, কিন্তু তাহাতে সরকারী চিত্তচাঞ্চল্য কিছু হয় না, ইহা গা-সওয়া হইয়া গেছে। এ বিষয়ে সরকারী নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয় যে, সরকারী খরচের বেআইনী খরচ স্বাভাবিক খরচেরই রূপান্তর মাত্র। ১৯৫৪ সনের সরকারী হিসাব-পরীক্ষার যে রিপোর্ট সম্প্রতি পশ্চিম-বাংলার আইন পরিষদে পেশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, কতকগুলি সরকারী ব্যয় অনিয়মিত ভাবে করা হইয়াছে এবং ইহার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ম এই যে, যে সকল কর্ম্মচারী কোনও প্রকার অনিয়মিত কিংবা বেআইনী খরচের জন্য দায়ী হন, সেই কর্ম্মচারীর মাহিনা হইতে সমস্ত খরচ বাদ দেওয়া হয়। ভারতবর্ষেও এই রকম ব্যবস্থা প্রচলন করা অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়, ইহার ফলে সরকারী খরচের দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভবপর হইবে।

ঐ অডিট রিপোর্টে পশ্চিম বাংলার মৎস্য বিভাগের একটি গুরুতর অন্যায় সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। পশ্চিম বাংলার মৎস্যবিভাগ তিনটি বিল ইজারা দেওয়ার জন্য টেণ্ডার আহ্বান করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডার গ্রহণ করা হয়। সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার গ্রহণ না করার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রথম বৎসর ৪,৮৪৮ টাকা—ঐ তিনটি বিলের ইজারা বাবদে রাজস্ব-খাতে ক্ষতি হয়, এবং তাহার পর দশ বৎসরে প্রতি বৎসর ২৫,৩৮২ টাকা করিয়া ক্ষতি হইবে। সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার গ্রহণ না করার কারণ হিসাবে সরকারী কৈফিয়ত এই যে, সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার প্রদানকারীর নাকি মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা নাই, কারণ তাহার হিসাব যথার্থ নহে, এবং তাহার হিসাব অনুসারে বস্তুতঃ কোন লাভ হইতে পারে না, সেই কারণে তাঁহার টেণ্ডার গ্রহণ করা হয় নাই। অডিট রিপোর্ট কিন্তু বলিয়াছে যে, সরকারী এই কৈফিয়ত একেবারেই সন্তোষজনক নহে। ব্যাপারটা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী—যে ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ টেণ্ডার দিয়াছিল সে অবশ্যই মৎস্য-চাষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা রাখে, কোনও নূতন ব্যক্তি এই ভাবে টেণ্ডার দিতে সাহস পাইত না। অর্থাৎ, সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডার প্রদানকারী ছিল মৎস্যবিভাগের কোনও ক্ষমতাশালী ব্যক্তির প্রিয়জন এবং সেই কারণেই তাহাকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সরকার কর্তৃক টেণ্ডার গ্রহণের তিন সপ্তাহের মধ্যেও ইজারাদার ঐ ইজারা রেজেষ্ট্রী করে নাই। শেষকালে ১৯৫৩ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ঐ ইজারাদারের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বিষয়টি আপোষ নিষ্পত্তির জন্য এক ব্যক্তির উপর ভার দেওয়া হয়, ইনি ছিলেন একজন সরকারী কর্ম্মচারী। এই আপোষরফাকারী যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন তাহা সমস্তই সরকারী স্বার্থের পরিপন্থী। ১৯৫০ হইতে ১৯৫৫ পর্য্যন্ত দেয় খাজনার পরিমাণ তিনি অর্দ্ধেক করিয়া দেন এবং সরকারকে একটি বিল ফেরত লইতে বাধ্য করান।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যবিভাগের আদৌ কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য-বিভাগের কি কাজ এবং ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস হইতে এই বিভাগ কি কি কাজ করিয়াছে সে সম্বন্ধে বিশদভাবে জানিবার দাবি জনসাধারণ অবশ্যই করিতে পারে। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এই বিভাগ না থাকিলে এই প্রদেশের একটুও ক্ষতি হইত না, পরন্তু একটা মোটা পরিমাণ সরকারী খরচ বাঁচিত। এই বিভাগ দুর্নীতি ও অকর্ম্মণ্যতায় ভরা. তাই আশা হইয়াছিল যে, নূতন সাধারণ নির্ব্বাচনের পর এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, কিন্তু তাহা হয় নাই।

পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনকালে মৎস্য-বিভাগের দোষ খণ্ডন করিতে গিয়া মৎস্যমন্ত্রী নস্কর মহাশয় বলিয়াছেন যে, পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ দুই কোটি লোক মাছ খায়। যদি প্রত্যেকের জন্য আধ ছটাক করিয়াও মাছ বরাদ্দ করিতে হয় তাহা হইলে প্রতিদিন সাড়ে পনেরো হাজার মণ করিয়া মাছের প্রয়োজন হইবে। এই পরিমাণ মাছের উৎপাদন করিতে হইলে ২৪ লক্ষ বিঘা বিস্তৃত খাল, বিল ও দীঘির প্রয়োজন। তাঁহার এই হিসাব তিনি কেমন করিয়া করিলেন সেকথা অবশ্য মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় বলেন নাই। তবে এই হিসাব দ্বারা তিনি যে বিপক্ষদলকে ভড়কাইয়া দিতে পারিয়াছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সারা বাংলা দেশের জন্য অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষ কিছুই করিতেছেন না; আর কলিকাতার বাহিরে মাছের অভাব তেমন প্রকট নহে, কারণ জেলায় ও গ্রামে খাল, বিল ও নদী হইতে মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু কলিকাতায় মাছের সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি করিতেছেন? পাকিস্থান হইতে মাছের আমদানী হইতেছে বলিয়া কলিকাতাবাসী মাছ খাইতে পাইতেছে। আভ্যন্তরিক সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টা অতি নগণ্য।

পশ্চিমবঙ্গের সরকারী অডিট রিপোর্ট

"আনন্দবাজার পত্রিকা" লিখিতেছেন:

"মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৫২-৫৩ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর হিসাবসংক্রান্ত অডিট রিপোর্ট (১৯৫৪) উপস্থাপিত করা হয়। উহাতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে আর্থিক ক্ষতি, অনিয়ম এবং ব্যয়-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বহু ত্রুটিবিচ্যুতির কথা উল্লেখ করা হয়। সেচ, বিচার, চিকিৎসা, কৃষি, মৎস্য, পূর্ত্ত ও গৃহনির্ম্মাণ, ত্রাণ ও পুনর্ব্বাসন, খাদ্য এবং রেশনিং দপ্তরে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা অডিট রিপোর্টে প্রকাশ পায়।

'বিলে মৎস্য চাষের' উন্নয়নের জন্য কাঁচড়াপাড়া উন্নয়ন ব্লকের ভিতরে তিনটি বিল লীজ দেওয়া, পূর্ত্ত এবং গৃহনির্ম্মাণ দপ্তর কর্ত্তৃক নির্ম্মাণকার্য্যের কয়েকটি কনট্রাক্ট দেওয়া, স্থানান্তরে প্রেরণকালে খাদ্যের অপচয় ইত্যাদি মারাত্মক অনিয়মের কয়েকটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ রিপোর্টে প্রকাশ করা হয়।

ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয় যে, আলোচ্য বৎসর ভোটে মঞ্জুরীকৃত ৭৪ কোটি ২ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় ১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয় নাই। তন্মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষ প্রায় ১৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা অর্থ দপ্তরে পুনরর্পণ করিয়াছেন এবং প্রায় ৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা অব্যয়িতভাবে তাঁহাদের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। উহা চূড়ান্ত সংশোধিত মঞ্জুরীর ৫'৭%, পূর্ব্বেকার বৎসরে উহা ছিল ১১%।

উক্ত রিপোর্টে আরও প্রকাশ, ভোটবহির্ভূত ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুরীর মোট প্রায় ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ২১ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত রহিয়া গিয়াছে। আলোচ্য বৎসরে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ১০'৬%, এবং পূর্ব্ব বৎসর ছিল ২১'৫%।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এই বৎসর অবস্থার কিছু উন্নতি হইলেও বহু ক্ষেত্রে উহা আশানুরূপ নহে।

রিপোর্টে প্রকাশ, ভোটে মঞ্জুরীকৃত ৩৯টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৩৬টি ক্ষেত্রে সব টাকা খরচ করা হয় নাই এবং সমষ্টি উন্নয়ন-পরিকল্পনা খাতেই সর্ব্বাধিক ৯৭'১% ভাগ টাকা বাড়তি রহিয়া গিয়াছে। এই বিভাগে ভোটে মঞ্জুরীকৃত মোট ১,৫৫,৬৯,০০০ টাকার মধ্যে মাত্র ৪,৫৪,০০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। অবশ্য সরকার-পক্ষ হইতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় কাজ আরম্ভ করা বিলম্বিত হওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। অনুরূপভাবে উদ্বাস্তু বিভাগে ভোটে মঞ্জুরীকৃত মোট অর্থের মধ্যে ৪২'১ ভাগ টাকা খরচ করা হয় নাই। এই সম্পর্কেও সরকারপক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিলম্বিত অনুমোদন এবং একটি পরিকল্পনা প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ করা হয়।

রিপোর্টে বলা হয়, ৪৩টি খাতের মধ্যে দশটি ক্ষেত্রে শতকরা দশ ভাগের অধিক, নয়টি ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচ হইতে দশ ভাগ, নয়টি ক্ষেত্রে শতকরা এক হইতে পাঁচ ভাগ এবং তিনটি ক্ষেত্রে শতকরা এক ভাগের কম তারতম্য লক্ষিত হয়। দুইটি ক্ষেত্রে কোন তারতম্য দেখা যায় না।

রিপোর্টে যে সকল ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতি ও অনিয়মের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মৎস্যবিভাগ পড়িয়াছে। উহা কাঁচড়াপাড়ায় ৩৬৭ একর পরিমিত কুলিয়া মাটিকাটা এবং ঘোকড়দহ বিল লীজ

দেওয়া সংক্রান্ত। গবর্ণমেণ্ট এজন্য টেণ্ডার আহ্বান করেন। সর্বোচ্চ টেণ্ডারার ১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত কুলিয়ার জন্য ৭,৫০০ টাকা এবং পরে তিনটি বিলের জন্য বৎসরে ৩৬ হাজার টাকা দিতে চাহেন। তাহার অব্যবহিত পরের টেণ্ডারার বৎসরে একরপ্রতি ৩০ টাকা ৪ আনা হারে ১৯৫১ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত তিনটি বিলের জন্য ১০,৬১৭ টাকা ১২ আনা এবং একই হারে কুলিয়ার জন্য ১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ২,৬৯২ টাকা ৪ আনা দিতে চাহেন। টেণ্ডারগুলি পরীক্ষা করিয়া উহাতে অন্যান্য কতকগুলি সর্তের মধ্যে এইরূপ নূতন সর্ত আরোপ করা হয় যে, এক বৎসরের সিকিউরিটি জমা দিতে হইবে এবং ৭০ টাকার অনধিক দরে মাছ বিক্রয় করিতে হইবে। সর্বোচ্চ টেণ্ডারারের মতে নূতন সর্তাদি 'অন্যায্য' বলিয়া অভিহিত হয়। তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট বৎসরে তিনটি বিলের জন্য ২০ হাজার টাকা লইতে রাজী হইলে তিনি উহা গ্রহণ করিতে রাজী আছেন বলিয়া জানান।

রিপোর্টে বলা হয় যে, উক্ত প্রস্তাব শেষোক্ত প্রস্তাব অপেক্ষা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অধিকতর গ্রহণীয় ছিল কিন্তু সর্বোচ্চ টেণ্ডারারের সামান্য অথবা কোন অভিজ্ঞতা নাই এবং যে হার দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পোষাইবে না, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া গবর্ণমেণ্ট শেষোক্তের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এজন্য ১৯৫০ সনের ১লা অক্টোবর হইতে ১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ৪,৮০৮ টাকা এবং তৎপর দশ বৎসর ধরিয়া বৎসরে ২৫,৩৮২ টাকা হারে লোকসান হয়। গবর্ণমেণ্ট যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। ইহা ছাড়াও ইজারাদার টেণ্ডার গ্রহণের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে রেজিষ্টার্ড দলিল প্রস্তুত করে নাই। ১৯৫৩ সনে ইজারাদার এবং গবর্ণমেণ্টের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে উহা একজন সালিশীর নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি (একজন সরকারী অফিসার) রায় দেন যে, ১৯৫০ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৫৫ সন পর্য্যন্ত খাজানা অর্দ্ধেক এবং ১৯৫৫-৫৬ সনের পুরা খাজনা হ্রাস করিতে হইবে এবং মাটিকাটা বিলের দরুন জমা-দেওয়া টাকা ইজারাদারকে ফেরত দিতে হইবে। এই রায়ের ফলে গবর্ণমেণ্টকে শুধু রাজস্বের ক্ষতিই নহে, প্রচুর ধারাবাহিক ক্ষতিও সহ্য করিতে হয়।

রিপোর্টে পূর্ত্ত দপ্তরের সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডার গ্রহণ না করার ব্যাপারে নিয়মকানুন না মানিবার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হয়। নিয়ম অনুসারে এক লক্ষাধিক টাকার কাজের জন্য প্রতিযোগিতামূলক টেণ্ডার আহ্বান করিতে হইবে।

রিপোর্টে বলা হয়, "দেখা যাইতেছে যে, ১৯৪৯-৫০ হইতে ১৯৫২-৫৩ পর্যান্ত এই ৪ বৎসরের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার ২৮টি নির্ম্মাণকার্য্যের ভার একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইয়াছে। মাত্র দুইটি ছাড়া বাকী ২৬টির প্রত্যেকটি কাজে এক লক্ষাধিক টাকা 'এষ্টিমেট' করা হইয়াছে। অর্থসংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া ৪৮ লক্ষ টাকার ১৬টি কাজ কোন টেণ্ডার ডাকার পরিবর্ত্তে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১২টির মধ্যে মাত্র ৭টি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের 'টেণ্ডার কোটেশন' সর্ব্বনিম্ন ছিল। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক প্রকাশ্য টেণ্ডার ডাকা হয় নাই।"

রিপোর্টে প্রকাশ, একটি ক্ষেত্রে টাকা দেওয়ার ব্যাপারে 'অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত কঠিন সর্ত্ত' আরোপ করা হয়। উহাতে দেখা যায় যে, ১৯ লক্ষ টাকার টেণ্ডারে দশ লক্ষ টাকা কাজ সমাপ্ত করার ছয় মাস পরে দেওয়া হইবে এবং বাকি টাকার কিছু সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মালমশলার দাম হিসাবে এবং কিছু নগদ দেওয়া হইবে—এইরূপ সর্ত্ত রহিয়াছে।

সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডারার ঐ কাজ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন এবং যে ফার্ম্মের টেণ্ডার ইহার অব্যবহিত উপরে ছিল, তাহার নিকট ইহা প্রেরণ করা হয়। ঐ ফার্ম্ম সর্ত্তাবলী মানিয়া লয়। কিন্তু শীঘ্রই বাধানিষেধমূলক ধারাগুলি শিথিল করার জন্য অনুরোধ জানায়। গবর্ণমেণ্ট ১৯৫০ সনের মার্চ মাসে এই মর্ম্মে আদেশ জারী করেন যে, ১৯৫০-৫১ সনে পাস করা বিলের উপর এবং সাজসরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য দেয় টাকা ১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চের মধ্যে দিয়া দিতে হইবে। ১৯৫১ সনের ৩১শে মার্চের পর যে সকল বিল পাস করা হইয়াছে, কেবল তাহাই কাজ শেষ হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে দিতে হইবে। ইহা সর্ব্বনিম্ন টেণ্ডারারকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারণ করারই সামিল।

রিপোর্টে উদ্বাস্তুদের নগদ টাকা বণ্টন এবং খাদ্যদপ্তরে টাকা ও ষ্টোরের জিনিষপত্রাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখ করা হয়।

১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বরের শেষে যে সকল ক্ষেত্রে আপত্তি করা হয়, তাহার সংখ্যা ছিল ১৫,৬৯৩। ইহাদের আর্থিক মূল্য ২৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা।

শাসনতন্ত্রে দুর্নীতি সংস্কার

নীচের সংবাদে মনে হয় এতদিনে সরকারীদলের হুঁস হইয়াছে। তবে ঐ পর্য্যন্তই থাকে কিনা দ্রষ্টব্য।

শাসন-পরিচালন-ব্যবস্থা হইতে দুর্নীতি ও অনাচার দূর করিবার উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পাঁচ জন সদস্য লইয়া একটি সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

উক্ত সাব-কমিটিতে আছেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীকালীপদ মুখার্জ্জি, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জ্জি ও শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়।

ইতিমধ্যে এডমিনিষ্ট্রেটর-জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টির আপিসসমূহের পরিচালন-ব্যবস্থায় দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠিয়াছে

তাহার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে উক্ত আপিসসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষার জন্য একাউণ্টেণ্ট-জেনারেলকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের খবরে প্রকাশ যে, বর্ত্তমান এডমিনিষ্ট্রেটর-জেনারেল ও অফিসিয়াল ট্রাষ্টিকে পদত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কারণ, রাজ্য সরকারের অভিমত এই যে, সংশ্লিষ্ট আপিসগুলির শাসন-পরিচালন-ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। হিসাব পরীক্ষার ফলাফল জানা গেলে রাজ্য সরকারের পক্ষ হইতে ঐ সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সরকারী খরচে দুর্নীতি

"আনন্দবাজার পত্রিকা" নিম্নস্থ তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

"বর্ষার সময় সুন্দরবনে বাঁধ নির্ম্মাণ ও মেরামতের জন্য সরকার প্রতি বৎসর যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাহার এক মোটা অংশ এক শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর পকেটে চলিয়া যায়, এমন অভিযোগ নানা মহল হইতে পাওয়া গিয়াছে।

"সুন্দরবন ডিভিশনে সেচ বিভাগের ওভারসীয়ারদের একটি অংশ বাজে এষ্টিমেট, ভুয়া মেজারমেণ্ট ইত্যাদি দেখাইয়া কিছু কিছু কনট্রাক্টারের সহায়তায় বাঁধ বাঁধিবার বরাদ্দ টাকায় প্রতি বৎসর ভাগ বসাইতেছেন এবং এই কার্য্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট-দের এক অংশও বখরার বিনিময়ে তাঁহাদিগকে সহায়তা করিতেছেন, তাহার কতকগুলি অভিযোগ সম্প্রতি আমাদের গোচরে আনা হইয়াছে।

"এমন অভিযোগও দায়িত্বশীল মহল হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, প্রতি বৎসর যাহাতে অনায়াসে সরকারী টাকা পকেটস্থ করা যায়, তজ্জন্য সুন্দরবনের ২২ শত মাইল দীর্ঘ বাঁধের নানা দুর্ব্বল স্থান 'দুগ্ধবতী গাভীর ন্যায়' জীয়াইয়া রাখা হয়। সময়ে যে 'ঘোগ'টি এক শত টাকা খরচ করিয়া মেরামত করিলে বাঁধে ফাটল রোধ করা যাইত, তখন তাহা না করিয়া যাহাতে সেই ফাটল বড় হয় এবং ক্রমে বাঁধে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়, এই শ্রেণীর লোকদের লক্ষ্য নাকি সেই দিকেই থাকে এবং তাঁহারা একগুণ কাজের জন্য 'দেড় গুণ এষ্টিমেট তৈয়ারী' করাইয়া উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে দিয়া তাহা 'স্যাংশন' করাইয়া লন।

"সুন্দরবনের এই সকল স্থান দুর্গম বলিয়া বড় বড় অফিসাররা বর্ষার সময় ও-পথ প্রায় মাড়াইতেই চান না। কাজেই ওভারসীয়ার-গণ প্রকৃতপক্ষে ঐ অঞ্চলের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহাদের হিসাব-নিকাশের উপর ভিত্তি করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা আদানপ্রদান হইতেছে।

"দুর্গম এবং অগম্য বলিয়া যেসব স্থানে অফিসাররা প্রায় উঁকি মারিতেই চান না, ওভারসীয়ারগণ কিন্তু সেই সব স্থান ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে চান না। দৈবে কখনও যদি তাঁহাদের কাহাকেও অন্য কোথাও বদলী করা হয় ত বহু তদ্বির তদারক করিয়া তাঁহারা আবার সুন্দরবনেই ফিরিয়া আসেন। সুন্দরবনের বাঁধে 'মধু'র এমনই ছড়াছড়ি।

"সরকারী চাকুরির নিয়ম অনুযায়ী ৩ বৎসরের বেশী কাহাকেও এক জায়গায় রাখা হয় না। কিন্তু সুন্দরবনের সেচ বিভাগের ওভারসীয়াররা আশ্চর্য্য কৌশলে নাকি সে নিয়ম এড়াইয়া চলেন। পাঁচ, সাত, আট বৎসর ধরিয়া সুন্দরবনে পড়িয়া আছেন, এমন ওভারসীয়ারদের সংখ্যা যে অল্প নয়, সরকারী খাতাপত্রেই তাহার প্রমাণ আছে।

"যে ওভারসীয়ারকে কিছু দিন পূর্ব্বে বহরমপুরে বদলী করা হইয়া-ছিল, ছয় মাস পার না হইতেই তিনি বহু তদ্বির করিয়া সম্প্রতি কেন যে সুন্দরবনে ফিরিয়া গেলেন, কোন বিচক্ষণ অফিসার তদন্ত করিলেই সে রহস্যের কিনারা হইতে পারে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।"

সুন্দরবনে সংস্কার ও সংশোধন

আনন্দবাজার পত্রিকা নীচের সংবাদও পরিবেশন করিয়াছেন:

"শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক বেসরকারী প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টকে সুন্দরবন-সমস্যার সমাধান-প্রচেষ্টায় অনতিবিলম্বে আইনসিদ্ধ একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করিবার অনুরোধ জানানো হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, 'বিধিবদ্ধ উক্ত সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড' সরকারী ও বেসরকারী সদস্যগণকে লইয়া গঠন করিতে হইবে এবং ঐ বোর্ড একদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের রক্ষা ও উহার উন্নয়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিবেন, অপরদিকে ঐ উদ্দেশ্যাদি সাধনের জন্য আবশ্যক ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিবেন।

ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টকে সত্বর নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করিতে সভা অনুরোধ জানান: (১) বাঁধগুলি ও স্লুইস গেট-গুলির সংস্কারসাধন এবং নলকূপ খননের কর্ম্মসূচী গ্রহণ ও ঐ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত অর্থবরাদ্দ, (২) কৃষি-জমিগুলিকে ভেড়ীতে রূপান্তরিত করিবার ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া, এবং (৩) খালগুলি যাহাতে কৃষি-জমি প্লাবিত করিবার কাজে ব্যবহার না করা যায় তদুদ্দেশ্যে ঐ খালসমূহ বেসরকারী লোকজনকে লীজ দেওয়া নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া।

"পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি দিনের মত এইদিনও সুন্দরবনের সমস্যা সমাধানের প্রশ্নে সরকার এবং বিরোধী—উভয়পক্ষেই এক আপোষ-সূচক মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং উহারই ফলে উপরোক্ত মীমাংসামূলক প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হয়। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, বিধানসভার নেতা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় (কংগ্রেস) এবং বিরোধীদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু (কম্যু)—উভয়েই এই আপোষমূলক মনোভাবের পটভূমিকা রচনা করেন।"

বাঙালী কর্ম্মচারীর মতিগতি

বাঙালী বেকারের সংখ্যা কেন বাড়িতেছে তাহার একটি কারণ নীচে পাওয়া যাইবে :

"বৃহস্পতিবার গবর্ণমেণ্ট প্লেস ওয়েষ্টস্থিত ইনকাম-ট্যাক্স আপিসের অনুমান ৪০০ কর্ম্মচারী ইনকাম-ট্যাক্স বিভাগীয় কমিশনার শ্রীভি. ভি. সুব্রহ্মণ্যমকে তাঁহার কক্ষে দশ ঘণ্টারও অধিককাল বন্দী করিয়া রাখেন।

"প্রকাশ, উক্ত আপিসের আট জন কর্ম্মচারীকে কলিকাতার বাহিরে বদলী করার ব্যাপারে তাঁহাদের সহকর্ম্মীদের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ঐ আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

"বেলা দুই ঘটিকা হইতে অনুমান চারি শত কর্ম্মচারী উক্ত কমিশনারের কক্ষের সম্মুখে সমবেত হন এবং তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইবার পথ আটকাইয়া রাখেন। তাঁহারা তথায় অবস্থান করিয়া বিবিধ ধ্বনি উঠাইতে থাকেন।

"রাত্রি ১২-৪০ মিনিটে পুলিসের সহায়তায় কমিশনারকে বাহির করিয়া আনা হয়।"

বাংলার সন্তানগণের অবনতি

নিম্নস্থ সংবাদে দেখা যায় যে, শতকরা আড়াই জন ছাত্রছাত্রীও প্রথম বিভাগে পাস হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ জড়াইয়াও শতকরা ১১ মাত্র হয়।

"পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের গত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বুধবারের সংবাদপত্রে প্রকাশ করিবার জন্ম মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সাংবাদিকগণকে দেওয়া হয়। উহা হইতে দেখা যায় যে, এবার মোট ৭২,৮২০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩৫,৩৪২ জন বিভিন্ন বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আবার মাত্র ১,৭৪৯ জন প্রথম বিভাগে এবং ৬,৩২৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"তবে এবার নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পাসের হার গতবারের তুলনায় শতকরা ৪ ভাগেরও কিছু বেশী হইয়াছে। এবার ঐ শ্রেণীর ৪৪,৫০৮ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দেয়। তন্মধ্যে শতকরা ৫৯'৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর এই হার ছিল ৫৫'১ জন; তৎপূর্ব্ব বৎসর ছিল ৫৪'৪ জন। এবার কিন্তু প্রাইভেট পরীক্ষার্থী-দের পাসের হার গতবারের তুলনায় ৪ ভাগেরও কম হইয়া শতকরা ৩২ জনে দাঁড়াইয়াছে। গত বৎসর প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল ৩৬'৬ জন। তৎপূর্ব্ব বৎসর এই শ্রেণীতে শতকরা ২৬'৯ জন পাস করিয়াছিল। এবার মোট ২৮,৩১২ জন ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষার্থী ছিল।

"নিয়মিত ও প্রাইভেট উভয় শ্রেণী মিলাইয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে এবার শতকরা ৮'৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

"পর্ষদের পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, পরীক্ষার্থীদের মার্কশীট-গুলি ১০ই জুলাই হইতে বিভিন্ন স্কুলে প্রেরণ করা আরম্ভ হইবে এবং উহা ১৮ই জুলাইয়ের মধ্যে সমাপ্ত হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন। পরীক্ষার্থীরা যে যে স্কুলের মারফত এই পরীক্ষার জন্ম আবেদন ও ফি দাখিল করিয়াছিল, সেই সেই স্কুল হইতেই মার্কশীটগুলি পাইবে। ১৯শে জুলাইয়ের পূর্ব্বে ডুপ্লিকেট মার্কশীট দেওয়া হইবে না। এই পরীক্ষার ফলসহ ছাপা যে পুস্তিকা পর্ষৎ প্রতি বৎসর প্রকাশ করেন, তাহা ১৮ই জুলাই হইতে কিনিতে পাওয়া যাইবে এবং এই পুস্তিকাগুলি তৎপর বিভিন্ন স্কুলে প্রেরণ করা হইবে বলিয়াও পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন।"

শিক্ষায় বাঙালী যুবক

বাঙালী যুবক ও যুবতীদিগের মস্তক চর্ব্বণ যাঁহারা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে (অর্থাৎ সরকারী ও বিরোধী পক্ষের) কৌতুককর আলোচনার বৃত্তান্ত আমরা আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে তুলিয়া দিলাম।

আমাদের মন্তব্য এইমাত্র যে বাঙালী যুবজনের অধিকাংশ চতুর কিন্তু বুদ্ধিহীন। এবং ততোধিক নির্বোধ তাহাদের অভিভাবকবর্গ, নহিলে তাহাদের এত দ্রুত অধোগতি হইত না।

"সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধান-চন্দ্র রায় সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী যুবকদের শোচনীয় ব্যর্থতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ইহার প্রতিকার-কল্পে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার্থীদের জন্ম "টিউটোরিয়াল ও ডেমনষ্ট্রেশন ক্লাস" খোলার কথা রাজ্য সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়াও তিনি জানান।

ঐদিন বিধানসভায় ১৯৫৪-৫৫ সনের পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরদানকালে মুখ্যমন্ত্রী উপরোক্ত মন্তব্য করেন। উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনাশেষে বেকার-সমস্যা সম্পর্কে একটি বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। আলোচনা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিধানসভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্ম মুলতুবী রাখা হয়।

বিতর্কের উত্তরদানকালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যদের অভিযোগ খণ্ডন করিয়া বলেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সরকারের মুখ চাহিয়া লোক নির্ব্বাচন করেন—এইরূপ অভিযোগ যাঁহারা করিতেছেন, তাঁহাদের "ভারতীয় সংবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতা পর্ব্বতপ্রমাণ।"

চাকুরিতে নিয়োগের পূর্ব্বে পুলিসী তদন্ত করার অভিযোগ সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন যে, নিয়মানুসারে চাকুরিতে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে প্রার্থীকে 'মেডিকাল টেষ্ট' ও 'পুলিসী' তদন্তের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। পুলিসী তদন্তে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু পাইলে তৎক্ষণাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে জানানো হয়।

সর্ব্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালী ছাত্রদের অকৃতকার্যতার কথা গভীর উদ্বেগের সহিত প্রকাশ করিয়া ডাঃ রায়

বলেন যে, ইদানীং একজন কি দুই জন বাঙালী যুবক ঐ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনেক ক্ষেত্রে উহারা আবার প্রবাসী বাঙালী বলিয়া দেখা যায়।

এই নৈরাশ্যজনক অবস্থার উল্লেখ করিয়া ডাঃ রায় মন্তব্য করেন যে, "চতুর এবং বুদ্ধিমান" হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী যুবকসমাজ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় দিন দিন পিছাইয়া পড়িতেছে।

এই সম্বন্ধে সকলকে অবহিত হইবার আবেদন জানাইয়া তিনি প্রকাশ করেন যে, সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষায় যোগদানেচ্ছু বাঙালী যুবকদের জন্য রাজ্য সরকার শীঘ্রই 'টিউটোরিয়াল' ও 'ডেমোনষ্ট্রেশন ক্লাশ' খোলার কথা বিবেচনা করিতেছেন।

ডাঃ রায় বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্নের কিরূপ "বিরক্তিকর" উত্তর দেয় তাহা তিনি জানিতে পারিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করেন। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বের পৃথিবী সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখার কোন চেষ্টাই করেন না বলিয়া ডাঃ রায় মন্তব্য করেন। তিনি অবশ্য ইহাও উল্লেখ করেন যে, বেতন কম বলিয়া মেধাবী ছাত্রেরা সরকারী চাকুরির প্রতি আকৃষ্ট হন না।

ডাঃ রায় বলেন যে, চাকুরির ব্যাপারে সরকার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই—এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখানো যায় নাই।

বয়ঃসীমা-অতিক্রান্ত ব্যক্তিদের চাকুরিতে নিয়োগ সম্পর্কে ডাঃ রায় বলেন, অবসরগ্রহণের সীমারেখা বর্দ্ধিত করার প্রশ্ন কেবলমাত্র রাজ্য সরকার নহেন, কেন্দ্রীয় সরকারও বিবেচনা করিতেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, কোন কোন বিভাগে উঁহাদের চাকুরিতে নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। ঐ সকল চাকুরির মেয়াদ তিন-চার বৎসরের বেশী থাকে না। তাই নূতন কোন ব্যক্তিকে ঐ সকল পদে নিয়োগ করা উচিত নহে, কারণ ঐ বিষয়ে তাঁহাদের ট্রেনিং দিতেই কিছু সময় কাটিয়া যায়।

ডাঃ রায় বলেন, তিনিও অস্থায়ী চাকুরী বেশী দিন না চালানোর পক্ষপাতী। অনেকগুলি ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের স্থায়ীকরণ সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া তিনি জানান।

পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অবস্থিত রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি

১৫ই জুলাই ভারতীয় লোকসভায় এক বিবৃতিতে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক সম্পত্তি পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার দখল করিয়া উহা একটি জাতীয় সংগ্রহশালায় পরিণত করিবেন বলিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান পণ্ডিত নেহরুকে জানাইয়াছেন। শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, যদি পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার প্রস্তাবিত সংগ্রহশালাটি সত্যই প্রতিষ্ঠা করেন তবে শান্তিনিকেতন হইতে যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়াও পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকারকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত দ্রব্যসমূহ যাহাতে রক্ষা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেন্ট ক্ষমতানুযায়ী সব ব্যবস্থাই করিবেন; তবে বৈদেশিক সরকারের সহিত ব্যবস্থায় ভারত সরকারের ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষার্থে একটি জাতীয় সংগ্রহশালা স্থাপনে মনস্থ করিয়াছেন জানিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রই সবিশেষ আনন্দিত এবং উৎসাহিত হইবেন। ভারতীয় বাঙালী সমাজ বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে পাকিস্থানী বাঙালী সমাজের প্রচেষ্টা ও আত্মত্যাগ বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের ছাত্র এবং জনসাধারণের আত্মত্যাগ সকল বাঙালীর মনের উপরই বিশেষভাবে রেখাপাত করিয়াছে। বাংলা ভাষা পাকিস্থানের রাষ্ট্র-ভাষার মর্য্যাদা পাইয়াছে, ঢাকা এবং রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের বিশেষ সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্ব-পাকিস্থানের এই প্রগতি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ পান নাই। হয়ত রাষ্ট্রীয় ভেদবৈষম্য উহার একটি কারণ; কিন্তু বহুদূরে অবস্থিত সম্পূর্ণ পৃথক কৃষ্টিসম্পন্ন রাষ্ট্র—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাষা, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি লইয়া যদি ভারত ও পাকিস্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ নিজ দেশের পত্র-পত্রিকায় আলোচনা করিতে পারেন এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির প্রয়াস পাইতে পারেন তবে ভারত-পাকিস্থান সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে বর্ত্তমানের পারস্পরিক উদাসীনতার কোনই কারণ থাকিতে পারে না।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের পত্র-পত্রিকা অথবা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশই এই পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে উদাসীন। পাকিস্থানী বাঙালীদের দায়িত্বের কথা বলিতে হয় এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গের পত্র-পত্রিকা এবং সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের শিক্ষিতসমাজ বিশেষরূপে ওয়াকিবহাল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্ব-পাকিস্থানের সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ নূতন বলিয়া ভারতীয়দিগের প্রায় অজ্ঞাত। এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপনে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের লেখক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদেরই অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহাদের দিকেও সমস্যা রহিয়াছে—হয়ত সেই সমস্যাই তাঁহাদিগকে উদাসীনতা অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতেছে। যেভাবে পাকিস্থান সরকার (বিশেষতঃ পশ্চিম পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দ) প্রায়শঃই জনপ্রিয় এবং স্বদেশ-প্রেমিক পূর্ব্ব-পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দকে "ভারতের দালাল" প্রভৃতি আখ্যা দেন তাহাতে যদি কেহ ভারতের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নতিবিধানের জন্য খোলাখুলি চেষ্টা হইতে বিরত থাকেন ত তাহাকে সম্পূর্ণ অন্যায় বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যদি পাকিস্থানের (পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় অংশেরই) সাংস্কৃতিক নেতৃবৃন্দ সাংস্কৃতিক মতবিনিময়ে আগ্রহী হন তবে অচিরেই এই বাধা অপসারিত হইবে। ভারত-পাকিস্থান দুইটি

স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয় ত যত দিন থাকিবে তত দিন তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে মতভেদও থাকিবে। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির পার্থক্য যদি অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক না হইয়া থাকে, তবে বহুভাবে যুক্ত হইয়াও ভারত এবং পাকিস্থানের বঙ্গ-সংস্কৃতির পরম্পরকে এড়াইয়া চলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

পাকিস্থানে রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি

নিয়ে প্রদত্ত সংবাদ দ্রষ্টব্য :

"নয়াদিল্লী, ১৫ই জুলাই—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় বলেন, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রী কিছুকাল পূর্ব্বে নয়াদিল্লী হইয়া যাইবার সময় এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে পৈতৃক সম্পত্তি রহিয়াছে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকারের উহা দখল করিয়া উহাকে একটি জাতীয় যাদুঘরে পরিণত করা উচিত।

শ্রীনেহরু শ্রীএ. সি. গুহকে বলেন, উহা জানিবার পর শান্তিনিকেতন-কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার যদি ঐরূপ করেন তবে তাঁহারা শান্তি-নিকেতন হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইবেন।

ইতিপূর্ব্বে পররাষ্ট্রবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্তা লক্ষ্মী মেনন শ্রীরাধারমণকে জানান যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থান সরকার রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্ব-পাকিস্থানস্থিত পৈতৃক সম্পত্তি দখল করিয়া নীলামে বিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া যায় তৎসম্পর্কে পাকিস্থান সরকারের নিকট লিখিত পত্রের জবাব এখনও পাওয়া যায় নাই।"

ফরাসী স্বেচ্ছাচার

উত্তর আফ্রিকার আলজিরিয়াতে ফরাসীরা নিরঙ্কুশ সন্ত্রাসবাদ চালাইতেছে। ফ্রান্সের খ্যাতনামা বহু নাগরিক আলজিরীয় স্বাধীনতাকামীদের দমনে ফরাসী সরকারের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। একজন বিশিষ্ট ফরাসী আইনজীবী সরকারী নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করিয়াছেন। আলজিরীয়া হইতে প্রত্যাগত বহু ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ফরাসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু ফরাসী সরকার সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বিকার।

ফরাসী সরকার কেবলমাত্র আলজিরীয়াতে সন্ত্রাসবাদ চালাইয়াই ক্ষান্ত নাই, আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গ করিয়া তাঁহারা টিউনিসিয়া অভিমুখে গমনরত আলজিরীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চারিজন প্রধান নেতাকে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে গ্রেপ্তার করেন। আফ্রিকাতে তাহার সামরিক প্রভুত্বের জোরেই ফ্রান্স এইরূপ দস্যুর ন্যায় আচরণ করিতে সাহস করিয়াছে।

ফ্রান্সের এই স্বেচ্ছাচারের সর্ব্বশেষ দৃষ্টান্ত হইল টিউনিসীয় জাতীয় দলের নেতার গ্রেপ্তার। টিউনিসীয় শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নিও-দস্তুর জাতীয়তাবাদী দলের নেতা আবদেল মাগি চাকের ১১ই জুলাই প্যারিস গমন করেন—ফরাসী সরকার এবং আলজিরীয় স্বাধীনতাকামীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সংক্রান্ত বার্ত্তা লইয়া। কিন্তু ফরাসী রাজধানীর মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করে।

একজন টিউনিসীয় নাগরিককে এইরূপভাবে গ্রেপ্তার করায় স্বভাবতঃই টিউনিসীয় সরকার ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। উপরন্তু মিঃ চাকের টিউনিসিয়ার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের অন্যতম। প্যারিসে অবস্থিত টিউনিসিয়ার রাষ্ট্রদূত মিঃ মাসমুদী ১২ই জুলাই ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিঃ চাকেরকে গ্রেপ্তার করায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাইপ্রাসে নির্যাতন

অ্যালজিরীয়া এবং সাইপ্রাস—এই দুইটি দেশে পশ্চিমী ঔপ-নিবেশিক গণতন্ত্রের নগ্নরূপ বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করিতেছে। একটি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণে লক্ষ লক্ষ নরনারী নির্যাতিত হইতেছে। টিউনিসিয়া এবং সাইপ্রাসে আজ সহস্র সহস্র নরনারী কারারুদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছেন—তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বহুদিন যাবৎ বিনা বিচারেই আটক রহিয়াছেন। সাইপ্রাসে এইরূপ বিনাবিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা সরকারী হিসাবমতই এক হাজারেরও বেশী। এই আটক বন্দীদের মধ্যে পুলিস, ছাত্র, আইনজীবী, শিক্ষক ও গৃহকর্ত্রী সর্ব্বস্তরের জনসাধারণই রহিয়াছেন।

এই আটক বন্দীদের উপর ব্রিটিশ সরকার যে অন্যায় আচরণ করিতেছেন তাহার প্রতিবাদে ১৫ই জুলাই হইতে দুইটি শিবিরের বন্দিগণ অনশন-ধর্ম্মঘট করিয়াছেন। এই অনশনব্রতী সাইপ্রাস-বাসী দেশপ্রেমিকদের জীবনরক্ষার দায়িত্ব সমগ্র বিশ্ববাসীর—সমস্ত দেশ হইতেই সেজন্য আজ এই পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠা উচিত।

সোভিয়েটে নেতৃত্ববদল

৩রা জুলাই সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বের বিরাট রদবদলের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কোন দেশের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্ববদল সম্পর্কেই এইরূপ আন্তর্জাতিক আগ্রহ দেখা যায় না, যেরূপ দেখা যায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর, বিশেষতঃ সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে। এইরূপ অস্বাভাবিক আগ্রহের অবশ্য কারণ আছে। কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর রাষ্ট্রে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে সাধারণতঃ শান্তি-পূর্ণ ভাবে এবং নেতৃত্ববদল হইবার ফলে কোন নেতারই জীবনাশঙ্কা দেখা দেয় না, অথবা পদচ্যুত নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্রদ্রোহীরূপে চিত্রিত করিবারও প্রয়াস হয় না। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং বেশীর ভাগ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রেই যাহা ঘটে তাহা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। ষ্ট্যালিনের সময় পর্য্যন্ত এবং সে সময়টি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর—সোভিয়েট ইউনিয়নে পদচ্যুত কোন নেতাই প্রাণে রক্ষা পান নাই। প্রথম দিকে দুই একবার অবশ্য ষ্ট্যালিন তাঁহাদের বিরোধী প্রতি-

পক্ষকে হত্যা করেন নাই—যেমন ১৯২৮ সনে ট্রটস্কিকে, ১৯৩৬ সনে জিনোভিয়েভ কামেনেভকে। কিন্তু পরে এই সকল এবং আরও অন্যান্য বহু নেতা কেহই ষ্ট্যালিনের কোপ হইতে রক্ষা পান নাই। ষ্ট্যালিন-কৃত হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা একটি ঘটনাতেই প্রতীয়মান হইবে—১৯৩৯ সনে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের নির্ব্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ১৩৯ জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন—১৯৫২ সনের মধ্যে ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত আদেশে কোনরূপ বিচার-বিবেচনা ব্যতিরেকেই ইঁহাদের মধ্যে ৯৮ জনকে হত্যা করা হয়। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বর্তমান নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ এবং প্রধান প্রধান নেতৃবৃন্দের সকলেই তখন ষ্ট্যালিনের সহযোগী ছিলেন; কিন্তু বহুক্ষেত্রে জানিয়া-শুনিয়াও তাঁহারা কেহ এই সকল নিরপরাধ দেশপ্রেমিকের হত্যার প্রতিবাদ করেন নাই। ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নূতন নেতৃবৃন্দ গদীতে আসীন হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লাভরেন্তি বেরিয়া এবং আরও কয়েকজন নেতাকে হত্যা করা হয়। কেবলমাত্র ম্যালেনকভের বেলাতেই গদীচ্যুত হওয়ার পরও তাঁহাকে হত্যা করা হয় নাই।

ম্যালেনকভকে প্রধানমন্ত্রীর পদ "ত্যাগ" করিবার সুযোগ দেওয়ার পর অনেকেই জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন—সোভিয়েটের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির রূপ কিভাবে পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে পারে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ষ্ট্যালিনবাদের নিন্দার পর এই জল্পনা-কল্পনা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সাম্প্রতিক নেতৃত্ববদলের ঘটনা হইতে ইহাই স্পষ্ট হইয়াছে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যক্তিবিশেষের একনায়কত্ব ব্যতীত চলিতে পারে না। সেজন্যই মলোটভ, কাগানোভিচ, ম্যালেনকভ এবং শেপিলভকে হটিতে হইল।

মলোটভ, কাগানোভিচ, ম্যালেনকভ এবং শেপিলভ ব্যতীত আরও বহু নেতা পদচ্যুত হইয়াছেন। ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ইঁহারা নাকি কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি পরিবর্ত্তিত করিতে চাহিয়াছিলেন। পার্টির নীতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা কোন সভ্যের পক্ষেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। মলোটভ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যদি সে চেষ্টা করিয়া থাকেন তবে মতদ্বৈধ ঘটিলে পার্টি হইতে তাহাদিগকে পদত্যাগ করিতে বলা বা তাঁহাদিগকে বহিষ্কার করা যাইতে পারে নিশ্চয়ই—কিন্তু সেজন্য তাঁহাদিগকে যেরূপ জঘন্যভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। উপরন্তু, যে সকল নীতিবিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল প্রশ্ন সম্পর্কে মলোটভ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রকৃত অভিমত কিরূপ ছিল তাহা কেহই জানেন না। অধিকন্তু, ইতিহাসের কথা স্মরণ রাখিলে এই সকল অভিযোগের ভিত্তির যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ জাগাই স্বাভাবিক।

লেনিনগ্রাড শহরের প্রতিষ্ঠার সার্দ্ধ দুই শত বার্ষিকী দিবসে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ বলেন যে, ম্যালেনকভ নাকি সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ভজনেসেনস্কির হত্যার জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী। বিখ্যাত পণ্ডিত আইজাক ডয়েশার এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বেও ক্রুশ্চেভ ভজনেসেনস্কির মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন, বর্ত্তমান বিবৃতিতে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। পূর্ব্বে ক্রুশ্চেভ বলেন, তিনি নিজে এবং ম্যালেনকভ ষ্ট্যালিনের নিকট ব্যক্তিগত ভাবে ভজনেসেনস্কির জীবনরক্ষার আবেদন জানান। উত্তরে ষ্ট্যালিন বলেন যে, ভজনেসেনস্কি দেশের শত্রু, সেজন্য তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে; ক্রুশ্চেভ এবং ম্যালেনকভ ভজনেসেনস্কির সমর্থন করিতে আসিয়াছেন, তবে কি তাঁহারাও রাষ্ট্রের শত্রু? অথচ এক বৎসরের ব্যবধানে ক্রুশ্চেভ এখন বলিতেছেন যে, ম্যালেনকভই ব্যক্তিগতভাবে ভজনেসেনস্কির মৃত্যুর জন্য দায়ী। ক্রুশ্চেভের কোন্ বক্তব্যটি সত্য?

সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রয়োজনসাধন ব্যতিরেকে সত্যের স্থান নাই। প্রয়োজনমত একই ঘটনার বিবরণ বিভিন্নভাবে দেওয়া হয় এবং কেহ যদি সেইভাবে তথ্যবিচারে সম্মত না হন তবে তাঁহাকে যমালয়ের পথ বাছিয়া লইতে হয়। ঘটনার এইরূপ ক্রূর বিকৃতি পৃথিবীর অপর কোন রাষ্ট্রেই হয় না। যত দিন ষ্ট্যালিন বাঁচিয়া ছিলেন তত দিন তিনি যাহা বলিতেন তাহা ছিল সত্য। এখন ক্রুশ্চেভ যাহা বলেন তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। হয় ত কাল যদি অপর কেহ ক্রুশ্চেভের স্থলে কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতা হন এবং তিনি যদি ক্রুশ্চেভের বিবৃতিগুলিকে অসত্য বলেন, তবে তখন আবার সেই নূতন মতকেই সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই হইল বর্তমান সোভিয়েট ব্যবস্থার মৌলিক জীবনাদর্শ।

ষ্ট্যালিনের আমলের দুষ্কৃতির কথা যখন সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ স্বীকার করিলেন তখন তাঁহারা বিশ্বকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ঐ সকল অন্যায়ের জন্য ষ্ট্যালিন ব্যক্তিগতভাবে দায়ী—সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার সহিত তাহার কোন যোগাযোগ নাই, যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই নিকট ইহা বিশেষ পরিষ্কার যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই এইরূপ ব্যাপক অত্যাচার-অনুষ্ঠান সম্ভব নহে। ষ্ট্যালিনের আমলের নিষ্ঠুরতার জন্য ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত দায়িত্ব নিশ্চয়ই রহিয়াছে; কিন্তু ষ্ট্যালিনের চারিত্রিক দোষগুলি সোভিয়েট সমাজব্যবস্থার মধ্যে আত্মবিকাশের বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিল। যেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টি-সেক্রেটারী যখন যাহা বলিবেন তখন তাহাকেই জাতীয়ভাবে প্রত্যেক নাগরিককে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হয় এবং যেখানে কম্যুনিষ্ট নেতার (তা তিনি যত অজ্ঞই হউক না কেন) সহিত মতপার্থক্য (তাহা যতই সুদৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন) অর্থই মৃত্যু, সে স্থলে ক্ষমতাসীন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান সর্ব্বক্ষেত্রেই নীতিনির্দ্ধারণের অধিকার

পার্টি, পাইবে অথচ শেষ বিচারে পার্টির নির্দ্দেশ ব্যক্তিগোষ্ঠীরই নির্দ্দেশ। পার্টি যে সকল ব্যাপারেই ভুল করিতে পারে সে সত্য সম্পর্কে আজ আর নিশ্চয়ই কেহ বিতর্ক তুলিবেন না। কিন্তু তথাপি যদি কোন সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক পার্টির সহিত একমত হইতে না পারেন, তবে তিনি যে কেবল জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ হইতেই বঞ্চিত হন তাহা নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনসংশয়ও ঘটে।

কিন্তু অকম্যুনিষ্ট দেশগুলির কম্যুনিষ্টগণ এই সকল তথ্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সোভিয়েট গুণগানে পঞ্চমুখ। সোভিয়েটের প্রতি ইহাদের অন্ধবিশ্বাস এই পর্য্যায়ে যে, তাহারা সোভিয়েট-ব্যবস্থার কোন ত্রুটিই দেখিতে পায় না। অথচ নাকের উপরই তাহাদের 'নয়নমণি' নেতৃবৃন্দ একের পর "দেশদ্রোহী", "পার্টিদ্রোহী" অথবা "বিদেশী চর" হিসাবে নিগৃহীত হইতেছেন। কিন্তু ৫২ বৎসর যাবৎ বিশ্বস্ত ভাবে দেশের সেবা করিবার পর কিভাবে একজন (মলোটভ)কে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিযুক্ত করা যায় তাহা কি চিন্তা করিয়া দেখিবার কোনই প্রয়োজন নাই?

"লণ্ডন, ৪ঠা জুলাই—সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি গতকল্য রাত্রে 'দলবিরোধী কার্যকলাপের' অভিযোগে মলোটভ, কাগানোভিচ, ম্যালেনকভ এবং শেপিলভকে বরখাস্ত এবং ১৫ জন সদস্য লইয়া নূতন প্রেসিডিয়াম গঠনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। ষ্টালিনের মৃত্যুর পর পার্টির ইতিহাসে ইহাই বৃহত্তম পরিবর্তন। ইঁহাদের মধ্যে শেপিলভ ছিলেন সোভিয়েট প্রেসিডিয়ামের বিকল্প সদস্য, অর্থাৎ প্রেসিডিয়ামের আলোচনা বৈঠকে তাঁহার যোগদানের অধিকার থাকিলেও ভোটাধিকার ছিল না—কিন্তু বাকী তিন জন ছিলেন পূর্ণ সদস্য। এই চার জনকে কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি হইতেও বরখাস্ত করা হইয়াছে। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির আড়াই শত শীর্ষস্থানীয় সদস্যদের লইয়া গঠিত এই কেন্দ্রীয় কমিটিই প্রেসিডিয়ামের সদস্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি যে নূতন প্রেসিডিয়ামের পনর জন সদস্যের নাম ঘোষণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিশিষ্ট সোভিয়েট সৈন্যাধ্যক্ষ মার্শাল জুকভ অন্যতম। যুদ্ধের পর জুকভের জনপ্রিয়তায় ভীত হইয়া মার্শাল ষ্টালিন তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির ২৯শে জুনের সাধারণ সভায় এই চার জন নেতাকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

এ সম্পর্কে পার্টি এক ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে এই উপদলটি 'জনগণের মধ্যে সোভিয়েট সরকারের শান্তি-নীতি প্রসারে বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, এই চার জনের মধ্যে আবার মলোটভ আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস এবং বিশ্বশান্তি সম্পাদনের পথে বিশেষ করিয়া প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছিলেন।'

যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েট নীতির জন্য মলোটভকে দায়ী করিয়া এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মলোটভই অষ্ট্রিয়া শান্তি-চুক্তি সম্পাদন এবং জাপানের সহিত স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সাতষট্টি বৎসর-বয়স্ক সোভিয়েট-নেতা মলোটভ ছিলেন পররাষ্ট্রক্ষেত্রে ষ্টালিনের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত মধ্যস্থ। রাশিয়ার বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই অধিককাল সোভিয়েটের শীর্ষস্থানীয় নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন। জর্জি মালেনকভ ষ্ট্যালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৩ সনের মার্চ্চ মাসে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী হন এবং ১৯৫৫ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন—তার পর মার্শাল বুলগানিন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ষ্ট্যালিনের শ্যালক ৬৪ বৎসর-বয়স্ক কাগানোভিচ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র ইহুদী। শেপিলভ আগে ছিলেন প্রাভদার সম্পাদক, গত বৎসর জুন মাসে তিনি মলোটভের স্থানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন, কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ গ্রোমিকো তাঁহার স্থানে পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত হন।

এই ইস্তাহারে উক্ত চার জন বহিষ্কৃত সদস্যের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ইঁহারা 'বাস্তব সত্য' হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন যে, যৌথ খামারের কৃষকদের দাবি মিটাইবার সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তাকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই একটা 'হামবড়া মনোভাব' লইয়া চলার ফলে যে সাধারণ অধিবাসীরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তাহাদের উপর পর্য্যন্ত আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। মলোটভের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তিনি ক্রুশ্চেভের 'অকর্ষিত ভূমি' পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি, ম্যালেনকভ ও কাগানোভিচ জনগণের অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং ষ্ট্যালিন-বাদ বিরোধিতারও বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তাহারে বহুবার মিঃ মলোটভকে মিঃ ক্রুশ্চেভের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতির তীব্র বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তাহারের মূল বক্তব্য হইতেছে—কমরেড ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ এবং মলোটভের মনোভাব পার্টির আদর্শ-বিরোধী—ইঁহাদের এই মনোভাব হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ইঁহারা এখনও প্রাচীন আদর্শ এবং পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ইঁহারা কম্যুনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েট জনগণের জীবনধারা হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছেন যে, নূতন অবস্থা ও পরিস্থিতি পর্য্যন্ত অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না। ইঁহারা এমন সব সেকেলে নীতি ও পদ্ধতিতে বিশ্বাসী যাহা কম্যুনিজমের পথে অগ্রগতির পরিপন্থী; সমগ্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী। পার্টির ইস্তাহারে বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দের বিভেদমূলক নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইঁহাদের বিরুদ্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা পার্টির সংহতিসাধনে এবং একই নির্দ্দিষ্ট আদর্শে পার্টির সংগ্রামে সহায়তা করিবে। নূতন প্রেসিডিয়াম হইতে মিঃ ম্যাক্সিম সবুরভকেও বাদ দেওয়া হইয়াছে, তবে তাঁহার কোন কারণ দেখান হয় নাই এবং অপর চার জন বহিষ্কৃত নেতার মত তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও আনা হয় নাই। সবুরভ প্রথম পর্য্যায়ের সহকারী প্রধানমন্ত্রী এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন।"

শঙ্করের ব্রহ্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

২

পূর্ব সংখ্যায় শঙ্করের ব্রহ্মের প্রথম লক্ষণ "একত্ব" ও "অদ্বিতীয়ত্ব" এবং দ্বিতীয় লক্ষণ "নির্বিশেষত্বের" বিষয় কিছু বলা হয়েছে। এবারে ব্রহ্মের অন্যান্য দু'একটি লক্ষণের সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ব্রহ্মের এই দ্বিতীয় লক্ষণ "নির্বিশেষত্ব" থেকেই তাঁর তৃতীয় লক্ষণ 'নির্গুণত্ব" সিদ্ধ হয়। ব্রহ্ম যদি সম্পূর্ণরূপে নির্বিশেষ বা ভেদশূন্য হন, তা হলে তাঁর মধ্যে গুণগ ভেদও থাকতে পারে না। দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ পরস্পর-ভিন্ন। যেমন—"পুষ্পটি শ্বেত"। এস্থলে 'পুষ্প' হ'ল দ্রব্য, 'শ্বেতত্ব' তার গুণ। কিন্তু 'শ্বেতত্ব' 'পুষ্পা'শ্রয়ী হলেও, 'পুষ্প' নয়, অর্থাৎ, 'পুষ্প' থেকে ভিন্ন। একই ভাবে, ব্রহ্মে গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করলে, ব্রহ্মে স্বগত-ভেদও স্বীকার করে নিতে হয়। সেজন্য, নির্বিশেষ ব্রহ্ম নির্গুণ।

এ ছাড়া সাক্ষাৎ ভাবেও ব্রহ্মের 'নির্গুণত্ব" প্রমাণিত করা যায়। প্রথমতঃ, দ্রব্যে কোন একটি গুণবিশেষের আরোপ মাত্রেই দ্রব্যটি সেই গুণদ্বারা সেইভাবে ও সেই পরিমাণে সীমিত হয়ে যায়। যেমন, যদি বলা যায়—"পুষ্পটি শ্বেত", তা হলে এই অর্থও হয় যে, "পুষ্পটি অশ্বেত নয়"। অর্থাৎ, শ্বেত ব্যতীত রক্ত, পীত, হরিৎ প্রভৃতি বর্ণ পুষ্পে নেই, পুষ্পের বাইরে অন্যান্য বহু গুণ আছে, যা পুষ্পটিতে নেই, এবং সেজন্য পুষ্পটি একটি সীমাবদ্ধ বস্তুই মাত্র। একই ভাবে, ব্রহ্মেও গুণবিশেষ আরোপ করলে, তিনি সসীম হয়ে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ, উপরে যা বলা হয়েছে, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-ভিন্ন; অথচ, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-সম্বন্ধযুক্তও নিশ্চয়ই। এই সম্বন্ধের নাম "সমবায়-সম্বন্ধ"। সেক্ষেত্রে, দ্রব্য ও গুণরূপ এই দুট স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পদার্থকে ("ক" এবং "খ") পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত করবার জন্য একটি তৃতীয় তত্ত্বের ("গ") বা সমবায়রূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন। পুনরায়, সেই তৃতীয় তত্ত্বটিও প্রথম দুটি তত্ত্ব থেকে বিভিন্ন বলে, তাকেও তাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত করতে অপর দুটি চতুর্থ ও পঞ্চম তত্ত্বের ("ঘ" এবং "ঙ") বা অপর দুটি সমবায়রূপ সম্বন্ধের আবশ্যক—এইভাবে অনাবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। অতএব, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-ভিন্ন নয়, অভিন্ন—অর্থাৎ, দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা স্বরূপই সব, তদতিরিক্ত ও তদ্ভিন্ন গুণ বলে তার আর কিছু নেই।

শঙ্কর তাঁর সুবিখ্যাত কার্যকারণের অনন্যত্ববাদ স্থাপন প্রসঙ্গে বলছেন—

"অপি চ কার্যকারণয়োর্দ্রব্যগুণাদীনাঞ্চাশ্ব-মহিষবদ্ ভেদ-বুদ্ধ্যভাবাৎ তাদাত্ম্যমভ্যুপগন্তব্যম্। সমবায়-কল্পনায়ামপি সমবায়স্য সমবায়িভিঃ সম্বন্ধেঽভ্যুপগম্যমানে তস্য তস্যান্যো-ঽন্যঃ সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থা প্রসঙ্গঃ, অনভ্যুপগম্যমানে বা বিচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ। অথ সমবায়ঃ স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদনপেক্ষ্যৈ-বাপরং সম্বন্ধং সম্বধ্যতে, সংযোগোঽপি তর্হি স্বয়ং সম্বন্ধরূপত্বাদন-পেক্ষ্যৈব সমবায়ং সম্বধ্যেত। তাদাত্ম্যপ্রতীতেশ্চ দ্রব্য গুণাদীনাং সমবায়-কল্পনানর্থক্যম্।"

(ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৮, শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ, কারণ ও কার্য, দ্রব্য ও গুণ অশ্ব ও মহিষের ন্যায় দুটি পরস্পর-ভিন্ন তত্ত্ব নয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক ও অভিন্ন। বৈশেষিক-মতে, কারণ ও কার্য, দ্রব্য ও গুণ পরস্পর-ভিন্ন হলেও, "সমবায়" নামক সম্বন্ধের দ্বারা যুক্ত। কিন্তু এই "সমবায়" সম্বন্ধ স্বয়ং কারণ ও কার্য, বা দ্রব্য ও গুণ থেকে ভিন্ন একটি পদার্থ বলে যাতে সে ঐ দুটির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেজন্য আরও দুটি 'সমবায়"-সম্বন্ধের প্রয়োজন, সেই দুটির জন্য পুনরায় আরও নূতন দুটি 'সমবায়'-সম্বন্ধের প্রয়োজন—এই ভাবে অনাবস্থা দোষের উদ্ভব হয়। যদি বলা হয় যে, "সমবায়" স্বয়ং সম্বন্ধ স্বরূপ বলে অপর কোন সম্বন্ধের সাহায্য ব্যতিরেকেই সম্বন্ধ স্থাপন করতে সক্ষম,—তা হলে "সংযোগ"ও ত সম্বন্ধ-স্বরূপ বলে "সমবায়ের" অপেক্ষা করবে না। বস্তুতঃ, দ্রব্য এবং গুণ এক ও অভিন্ন বলে তাদের মধ্যে "সমবায়"-কল্পনা নিরর্থক।

তর্কপাদে ন্যায়-বৈশেষিক মতবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গেও শঙ্কর এই "সমবায়" সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত অনবস্থা দোষের উল্লেখ করে বলেছেন—

"ন চৈবমভ্যুপগচ্ছতা শক্যতেঽণুকারণবাদঃ সমর্থয়িতুম্। কুতঃ? সাম্যাদনবস্থিতেঃ। যথৈব হ্যণুভ্যামত্যন্তভিন্নং সদ্ব্যণুকং সমবায়লক্ষণেন সম্বন্ধেন তাভ্যাং সম্বধ্যতে, এবং সমবায়োঽপি সমবায়িভ্যোঽত্যন্তভিন্নঃ সন্ সমবায়লক্ষণে-

নাক্তেনৈব সম্বন্ধেন সমবায়িভিঃ সম্বধ্যেত, অত্যন্তভেদ সাম্যাৎ। ততশ্চ তস্য তস্যাক্তোঽন্য সম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবস্থৈব প্রসজ্যেত।" (ব্রহ্মসূত্রে ২-২-১৩ শঙ্কর-ভাষ্য।)

অর্থাৎ, ন্যায়-বৈশেষিকসম্মত পরমাণু কারণ-বাদানুসারে, দুটি পরমাণু যুক্ত হয়ে দ্ব্যণুক হয়, এবং তারা এইভাবে যুক্ত হয় সমবায়রূপ সম্বন্ধের দ্বারা। কিন্তু এই সমবায় সম্বন্ধ ঐ দুটি অণুর থেকে অত্যন্ত ভিন্ন একটি তৃতীয় পদার্থ। সেজন্য, এই সমবায়-সম্বন্ধকে ঐ দুটি অণুর সঙ্গে যুক্ত করতে অন্য দুইটি সমবায়-সম্বন্ধের প্রয়োজন, তাদের জন্য পুনরায় একই ভাবে আরও অন্য দুটি সমবায়-সম্বন্ধের প্রয়োজন—এরূপে অনাবস্থা দোষের উৎপত্তি অনিবার্য।

দ্রব্য এবং গুণের সম্বন্ধও "সমবায়"-সম্বন্ধ বলে, সে-ক্ষেত্রেও, এই একই অযৌক্তিকতার সৃষ্টি হয়। সেজন্য, ব্রহ্ম নির্গুণ।

তৃতীয়তঃ, গুণ থাকলেই তার উপচয়-অপচয় অবশ্যম্ভাবী, এবং সেই সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সেই সগুণ বস্তুটিরও উপচয়-অপচয়। কিন্তু নিত্য ব্রহ্মে হ্রাসবৃদ্ধি, উৎপত্তি বিনাশ অসম্ভব। সেজন্যও ব্রহ্ম নির্গুণ। "অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ" (গীতা ১৩।৩১) এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—

"অনাদিত্বাৎ নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন ব্যেতি। তথা নির্গুণত্বাৎ সগুণোহি গুণব্যয়াৎ ব্যেতি, অয়ং তু নির্গুণত্বান্ন ব্যেতি, ইতি পরমাত্মায়ম্ অব্যয়ঃ, নাস্য ব্যয়ো বিদ্যতে, ইত্যব্যয়ঃ। (শঙ্করের গীতাভাষ্য ১৩।৩১)

অর্থাৎ, পরমাত্মা অনাদি ও নিরবয়ব, সেজন্য তাঁর বিনাশ নেই। পুনরায়, তিনি নির্গুণ, সেজন্যও তাঁর বিনাশ নেই। সগুণ বস্তুর গুণের অপচয় বা বিনাশ হলে, তারও বিনাশ হয়। কিন্তু নির্গুণ আত্মার ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা নেই বলে, বিনাশের সম্ভাবনাও নেই।

এরূপে, ব্রহ্মের তৃতীয় লক্ষণ নির্গুণত্বও শ্রুতি ও যুক্তি উভয় দিক্ থেকেই সিদ্ধ হয়। অবশ্য, শাস্ত্রে স্থলবিশেষে ব্রহ্মকে সগুণ বলেও বর্ণনা করা হয়েছে (শ্বেতাশ্বতর ৬।৮, ছান্দোগ্য ৮।১।৫ প্রভৃতি)। কিন্তু এই সকল বর্ণনা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত, অর্থাৎ, কেবলমাত্র ঈশ্বরবিষয়ক, ব্রহ্মবিষয়ক নয়।

ব্রহ্মের তৃতীয় লক্ষণ "নির্গুণত্ব" থেকেই তাঁর চতুর্থ লক্ষণ "নির্বিকারত্বও" সিদ্ধ হয়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম নির্গুণ বলে তাঁর বিনাশ নেই। বিনাশ না থাকলে বিকারও থাকতে পারে না। কারণ জন্ম-স্থিতি-বিকার-পরিণাম-জরা-মরণ—এই ত হ'ল জন্মমৃত্যুশীল বস্তুর উৎপত্তি-লয়-ক্রম। সেজন্য অবিনাশী পরমাত্মা অবিকারী বা নির্বিকার।

অন্যান্য যুক্তিদ্বারাও সাক্ষাৎ ভাবে ব্রহ্মের নির্বিকারত্ব প্রমাণিত করা যায়। প্রথমতঃ, বিকারের অর্থই হ'ল অবস্থান্তর। সেজন্য কোন বস্তুর বিকার বা পরিবর্তন হলে, হয় তাতে তার উৎকর্ষ, নয় তাতে তার অপকর্ষ সাধিত হবে। কিন্তু নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ব্রহ্মের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কোনটাই সম্ভবপর নয়। এরূপে, অপকর্ষ যে অসম্ভব, তা ত বলাই বাহুল্য। কারণ পরিপূর্ণস্বরূপ, সর্বদোষমুক্ত ব্রহ্ম কিরূপে অল্পত্ব, ন্যূনতা বা হীনতাভাগী হতে পারেন? অপর পক্ষে, এমনকি, উৎকর্ষও ব্রহ্মের ক্ষেত্রে সমান অসম্ভব। কারণ, তিনি প্রথম থেকেই, শাশ্বত কালই উৎকৃষ্টতম, পরিপূর্ণতম, শ্রেষ্ঠ সত্তা। সেজন্য তিনি পুনরায় উৎকৃষ্টতর, পরিপূর্ণতর, শ্রেয়ান্ হবেন কি করে? সেক্ষেত্রে মেনে নিতে হয় যে, পূর্বে তিনি পরিপূর্ণতম সত্তা ছিলেন না, তাঁর পূর্ণতা পরিমাণে কিছু অল্প ছিল, পরে পরিবর্তন বা বিকারের মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভ করে তিনি পূর্ণতর, পূর্ণতম হন। কিন্তু এ ত এক অসম্ভব কথা। সেজন্য উৎকর্ষাপকর্ষবিহীন ব্রহ্ম অবস্থান্তরবিহীন অথবা নির্বিকার।

দ্বিতীয়তঃ, বিকারের অর্থ অবয়বের বিকার। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নিরবয়ব ও নিরংশ। সেজন্যও ব্রহ্ম নির্বিকার। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবক", (গীতা ২।২৩) এই শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—

"কস্মাদবিক্রিয় এবেত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বান্নাবয়ব-ভাগং কুর্বন্তি শস্ত্রাণ্যস্যাদীনি। তথা নৈনং দহতি পাবকোঽগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি। তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ অপাংহি সাবয়বস্য বস্তুনঃ আর্দ্রীভাবকরণেন অবয়ব-বিশ্লেষাপাদানে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়ব আত্মনি সম্ভবতি।" (শঙ্করের গীতা-ভাষ্য ২।২৩)।

অর্থাৎ, কোন অস্ত্রশস্ত্র আত্মা বা ব্রহ্মকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতে পারে না, কারণ ছেদন করার উপায়ই হ'ল সেই দ্রব্যটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, অংশ বা অবয়ব ছেদন করা। কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব বলে, কোন অস্ত্রই তাঁকে ছেদন করতে পারে না, কোন অগ্নিই তাঁকে দহন করতে পারে না, কোন জলই তাঁকে আর্দ্র করতে পারে না, কোন বায়ুই তাঁকে শোষণ করতে পারে না। সেজন্যও তিনি অবিকারী ও অবিনাশী।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদকারিকা ভাষ্যেও শঙ্কর বলছেন—

"মায়য়া ভিদ্যতে হ্যেতদ্...ন পরমার্থতঃ, নিরবয়ব ত্বাদাত্মনঃ। সাবয়বং হ্যবয়বান্যথাত্বেন ভিদ্যতে...নিরবয়বমজং

নান্যথা কথঞ্চন, কেনচিদপি প্রকারেণ ন ভিদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ।” (অদ্বৈত-প্রকরণম্, ১৯)।

অর্থাৎ, ব্রহ্মে ভেদ, বিকার, পরিণাম বা পরিবর্তন হয় কেবল মায়িক ভাবে, পারমার্থিক ভাবে নয়। কারণ, আত্মা বা ব্রহ্ম নিরবয়ব। সাবয়ব পদার্থই অবয়ব পরিবর্তনের দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হয়, যেমন, মৃত্তিকা ঘটাদিভেদে পরিণত হয়। কিন্তু নিরবয়ব, অজ ব্রহ্মে কোনদিনও অন্যথা ভাব বা পরিবর্তন হতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে “অপরতন্ত্র” বা স্বাধীন। কিন্তু যিনি স্বাধীন, তিনি পরিবর্তন বা বিকারভাগী হবেন কেন? স্বরূপের পরিবর্তন ত কোনদিক থেকেই কাম্য নয়। বস্তুতঃ, কার্য কারণের অধীন, কার্যরূপ বিকার সংঘটিত হয় কারণের কর্তৃত্বাধীনে। সেজন্য উপাদান-কারণরূপী ব্রহ্ম যদি কার্যরূপ ধারণ করে বিকারভাগী হন, তা হলে তিনি অপর একটি নিমিত্ত-কারণের অধীন হয়ে পরাধীন হয়ে পড়েন। পুনরায়, তিনি যদি স্বয়ংই নিমিত্ত-কারণও হন, তা হলেও এরূপ স্বাধীন সত্তার অবস্থান্তর গ্রহণের কোনো যুক্তিযুক্ত হেতু পাওয়া যায় না। সেজন্য শঙ্কর তাঁর গীতা-ভাষ্যে বলছেন—

“অবিক্রিয়ত্বং চাত্মনঃ শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-প্রসিদ্ধম্ ...ন্যায়শ্চ নিরবয়বমপরতন্ত্রম্ অবিক্রিয়মাত্মতত্ত্বম ইতি রাজমার্গঃ।” (শঙ্করের গীতাভাষ্য ১৮।১৭)।

অর্থাৎ—শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি—এ সকলই নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, আত্মা বা ব্রহ্ম নির্বিকার। যুক্তির রাজপথ হ'ল এই যে, আত্মা নিরবয়ব, অপরতন্ত্র ও অবিকারী।

চতুর্থতঃ, এবং প্রধানতঃ, শ্রুতি, স্মৃতি, ও যুক্তিবলে আত্মাকে স্বয়ংসিদ্ধ, সেজন্য শাশ্বত, এবং সেজন্য নির্বিকাররূপে গ্রহণ করতে হয়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—

“আত্মনস্তু প্রত্যাখ্যাতুমশক্যত্বাৎ। য এব নিরাকর্তা, তস্যৈব আত্মত্বাৎ।” (শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।১।৪)

অর্থাৎ, আত্মাকে কোনো প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না—যিনি আত্মাকে অস্বীকার করেন তিনি ত সেরূপ অস্বীকার করেন স্বয়ং আত্মারই সাহায্যে; সেজন্য এই অস্বীকৃতিও আত্মার অস্তিত্বই সিদ্ধ করে।

ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৭র ভাষ্যে শঙ্কর এ সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট এবং বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ শঙ্কার স্থান বিন্দুমাত্র নেই। কারণ আত্মা কারও আগন্তুক ধর্ম বা কার্য নয়, কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব অন্যের দ্বারা সিদ্ধ নয়, অন্যের অস্তিত্বই আত্মার দ্বারা সিদ্ধ। এরূপে, আত্মা কোন প্রমাণেরই অধীন নয়, উপরন্তু সমস্ত প্রমাণই আত্মার অধীন। সেজন্য কোন প্রমাণের দ্বারাই আত্মাকে অস্বীকার করা যায় না। এরূপে শঙ্কর সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন—

“ন হ্যাত্মাগন্তুকঃ কস্যচিৎ, স্বয়ং সিদ্ধত্বাৎ।...আগন্তুকং হি বস্তু নিরাক্রিয়তে, ন স্বরূপম্। য এব হি নিরাকর্তা, তদেব তস্য স্বরূপম্। ন হ্যগ্নেরৌষ্ণ্যমগ্নিনা নিরাক্রিয়তে।” (শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৭)।

অর্থাৎ, আগন্তুক বস্তুকেই কেবল অস্বীকার করা চলে, স্বয়ংসিদ্ধ আত্মা বা স্বরূপকে কদাপি নয়। কারণ, এরূপ স্বরূপাস্বীকৃতি স্বরূপের দ্বারাই সম্ভবপর বলে তাতে স্বরূপকেই স্বীকার করা হয়। অগ্নি দ্বারা অগ্নির উষ্ণতার নিষেধ করা যেরূপ হাস্যকর, আত্মা দ্বারা আত্মার অস্তিত্বও ঠিক তাই।

এই আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ ও অনস্বীকার্য হলে, ব্রহ্মও ঠিক তাই। সেজন্য শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে বলছেন—

“সর্বস্যাত্মত্বাচ্চ ব্রহ্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধিঃ। সর্বো হ্যাত্মাস্তিত্বং প্রত্যেতি, ন নাহমস্মীতি। যদি হি নাত্মাস্তিত্ব-প্রসিদ্ধি স্যাৎ, সর্বোলোকো নাহমস্মীতি প্রতীয়াৎ। আত্মা চ ব্রহ্ম। (শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১।১।১)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সকলের আত্মা বলে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলেই জানেন। কারণ, প্রত্যেকেই স্বীয় আত্মার অস্তিত্ব জানেন। কোন ব্যক্তিই এরূপ ভাবেন না যে, 'আমি নেই'। যদি এইভাবে প্রত্যেকে স্বীয় আত্মাকে না জানতেন, তা হলে, প্রত্যেকেরই 'আমি নেই' এই প্রত্যয়ই হ'ত। কিন্তু তা কোন দিনও হয় না। এই আত্মাই ব্রহ্ম।

গীতাভাষ্যেও শঙ্কর একই ভাবে বলেছেন—

“তস্মাদ্ যথা স্বদেহস্য পরিচ্ছেদায় ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ততোঽপি আত্মানোঽন্তরতমত্বাৎ তদবগতিং প্রতি ন প্রমাণান্তরাপেক্ষা ইতি আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা বিবেকিনাং সুপ্রসিদ্ধা সিদ্ধম্। (শঙ্করের গীতাভাষ্য ১৮।৫০)

অর্থাৎ, নিজের দেহের অস্তিত্ব নিশ্চয় করবার জন্য যেমন প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করতে হয় না, তেমনি অন্তরতম আত্মার অবগতির জন্যও প্রমাণান্তরের প্রয়োজন নেই। সেজন্য তত্ত্বদর্শীগণের আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা সুপ্রসিদ্ধ।

এরূপ স্বয়ংসিদ্ধ, সদাস্বীকার্য আত্মাই ত নিত্য। ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যদি নিত্যই না হবেন, তা হলে তাঁকে ত কোন দিক থেকেই পরমতত্ত্ব বলা চলে না। বস্তুতঃ 'সৎ' ও 'নিত্য' সমানার্থক। যা অনিত্য, যা আজ আছে কাল নেই, তার ক্ষণস্থায়ী পরমুখাপেক্ষী অস্তিত্বের মূল্যই বা কতটুকু?

সেজন্য যিনি পরমতত্ত্ব বা পরমসত্তা, তিনি নিশ্চয়ই সমভাবে নিত্য।

গীতাভাষ্যে শঙ্কর বলছেন—

"ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ।" (শঙ্করের গীতাভাষ্য ২।১২)।

অর্থাৎ, আমরা সকলেই আত্মস্বরূপ বলে ত্রিকালে নিত্য।

"অতোঽব্যয়স্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি, ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতীশ্বরোঽপি, আত্মাহি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ। (শঙ্করের গীতাভাষ্য ২।১৭)

অর্থাৎ, অবিনশ্বর ব্রহ্মের বিনাশ সাধন করা কারও পক্ষেই সম্ভবপর নয়। কারণ, ব্রহ্মই ত সকলের আত্মা—"আত্মা চ ব্রহ্ম" (ব্রহ্মসূত্র শঙ্করভাষ্য ১।১।১) এবং স্বয়ং ঈশ্বরও ব্রহ্মকে বিনষ্ট করতে পারেন না—নিজের আত্মাকে কে ধ্বংস করে?

এরূপে, স্বয়ংসিদ্ধ ও শাশ্বত ব্রহ্ম বা আত্মাই জন্ম স্থিতি-পরিণাম-বিকার-ক্ষয়-মরণরূপ ষড়বিকাররহিত নির্বিকার, অবিনাশী পরমসত্তা।

পঞ্চমতঃ, স্বয়ংসিদ্ধ, সৎ ও নিত্য ব্রহ্মের যদি কোনরূপ বিকার, পরিণাম বা পরিবর্তন স্বীকার করা হয়, তা হলে তাঁর সত্তা, স্বরূপ বা স্বভাবেরই পরিবর্তন স্বীকার করে নিতে হয়—যা অসম্ভব। সাধারণ বস্তুরই ত স্বভাব পরিবর্তন হয় না, ব্রহ্মের ত দূরে থাকুক। যেমন, অগ্নি চিরকালই উষ্ণ, তা কোনও দিন তার উষ্ণ স্বভাব ত্যাগ করে শীতল স্বভাব হয় না। সেজন্য শঙ্কর মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকাভাষ্যে বলছেন—

"স্বভাবস্য অন্যথাভাবঃ স্বতঃ প্রচ্যুতিঃ ন কথঞ্চিৎ ভবিষ্যতি, অগ্নেরিব উষ্ণস্য।" ("অদ্বৈত-প্রকরণম্" ২১)

অর্থাৎ, স্বভাবের অন্যথাভাব বা স্বরূপের প্রচ্যুতি কোন দিনই হতে পারে না, যেমন অগ্নির উষ্ণতা কদাপি লোপ পায় না। অতএব অবিচলিত স্বরূপ ব্রহ্ম নির্বিকার। সেজন্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে ভাষ্যে বলছেন—

"সর্ববিক্রিয়া-প্রতিষেধ-শ্রুতিভ্যো ব্রহ্মণঃ কূটস্থত্বাবগমাৎ। ন হ্যেকস্য ব্রহ্মণঃ পরিণামধর্মত্বং তদ্রহিতত্বঞ্চ শক্যং প্রতিপত্তুম্। স্থিতিগতিবৎ স্যাদিতি চেৎ ন কূটস্থস্যেতি বিশেষণাৎ। ন হি কূটস্থস্য ব্রহ্মণঃ স্থিতিগতিবদনেকধর্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি। কূটস্থং নিত্যং চ ব্রহ্ম সর্ববিক্রিয়া-প্রতিষেধাদিত্যবোচাম।" (ব্রহ্মসূত্র ২।১।১৪, শঙ্করভাষ্য)

অর্থাৎ ছান্দোগ্যোপনিষদের উল্লিখিত মন্ত্রে (৬।১।৩) 'মৃত্তিকা'র দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে। এ থেকে ধারণা হতে পারে যে মৃত্তিকা যেমন ঘটে সত্যই পরিণত হয়, ব্রহ্মও তেমনি জগতে সত্যই পরিণত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মের পরিণাম অসম্ভব। একই ব্রহ্ম পরিণাম-শীল ও অপরিণামী হবেন কি করে? অবশ্য একই সগুণ বস্তু নানা বিরুদ্ধ ধর্মেরও আধার হতে পারে—যেমন একই ব্যক্তি এখন স্থিতিশীল ও তখন গতিশীল হতে পারে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম এই ভাবে বিভিন্ন ধর্মের আকর হতে পারেন না। সেজন্য কূটস্থ নিত্য ব্রহ্ম নির্বিকার।

এরূপে, নানারূপ যুক্তি তর্কের সাহায্যে ব্রহ্মের চতুর্থ লক্ষণ "নির্বিকারত্ব" সিদ্ধ করা যায়। ব্রহ্মের অন্যান্য লক্ষণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে।

অসংলগ্ন

শ্রীরবীন্দ্রকুমার রায়

শীতাংশু টুরিষ্ট। কাজ—শহরে শহরে ঔষধ ক্যানভাস করা। খুব যে ভাল মাইনে পায় তা নয়। তবে ভাতা আর রেলভাড়ার উদ্বৃত্ত বাঁচিয়ে যা পায় তা'তে সমান মাইনের কেরানীর চেয়ে ভালই থাকে। কিন্তু এ-কাজের একটা মস্ত অসুবিধা—পরিবারে লোক না থাকলে স্ত্রীকে একা রেখে যেতে হয়।

শীতাংশু বিয়ে করেছে বছর চারেক আগে। ছেলেপুলে হয় নি। পাড়ার গিন্নীরা বেড়াতে এসে কিছুটা আশ্চর্য্য হন শুনে। বলেন, 'বউমার ত না হওয়ার চেহারা নয়!' বরং তার উল্টো। একটু বেশীই রোগা সে। কিন্তু তা-ও তাঁরা আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আর বয়সই বা কি এমন! বছর আঠার হ'ল নাকি বউমা?' কিন্তু আসলে তার বয়স কুড়ি। কাজেই অমিতা উত্তর দেয় না। মুচকি হাসে একটু।

ঐ হাসিটুকু দিয়েই অমিতা জয় করে নেয় তাঁদের সবাইকে। এমন কিছু দেখতে ভাল নয় দূর থেকে। একহারা ঢ্যাঙা চেহারা। ময়লা গায়ের রঙ। ভ্রু-দুটিতেও তেমন ছাঁদ নেই। তবে বেশ চুল আছে মাথায়। ঠোঁট দুটিও ভারি মিষ্টি। সরু আর ধনুকের মত বাঁকানো। পান না খেলেও টুকটুক করে, কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি তার হাসি। হাসলে নিটোল চিবুকের ধারে একটি ছোট্ট টোল ওঠা-নামা করে, ওর সমবয়সীরা তাই দেখে চেয়ে চেয়ে।

শীতাংশু প্রায় মাসেই গড়পড়তা পনর-বিশ দিন বাইরে থাকে। সেই অবসরে পাড়ার বউ-ঝিরা অমিতার ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে গল্প করতে আসে। বাপের বাড়ীর কথা জিজ্ঞেস করে। শ্বশুরবাড়ীতে কে-কে আছে খোঁজ নেয়। অমিতার নিজের শাশুড়ী নেই শুনে বলে, 'তাই নাকি? তা হলে ভাই অনেক গঞ্জনা সয়েছ বল।'

অমিতার ওইখানেই একটা কাঁটা লুকিয়ে আছে। তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "না, ঠাকুরঝি। জন্মেই মা মারা গিয়েছিলেন ওঁর, উনিই মানুষ করেছেন সেই থেকে। আমাকেও একরকম কোলে বসিয়েই ভাত খাইয়েছেন গোড়ার দিকে। সেখানেই ত ছিলাম তিন বছর। শ্বশুর-শাশুড়ী আমার খুব ভাল।'

কিন্তু এর পরের প্রশ্নগুলির আর সহজ উত্তর দিতে পারে না অমিতা, কথা উঠলেই মুখ রাঙা করে সরে যাবার উপক্রম করে। 'বসুন দিদি, চা করে আনি।'

কিন্তু চা খেয়েও শান্ত হন না তাঁরা। বলেন, 'সে কি, চার বছর বিয়ে হয়েছে, এমন স্বাস্থ্যবান স্বামী, নষ্ট হয় নি ত আগে?'

অমিতার ভারি লজ্জা করে উত্তর দিতে। তাও প্রায় চোখ বুঁজেই ঘাড় নাড়ায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের পীড়াপীড়িতেই একটা মাদুলিও নিতে হ'ল হাত পেতে। অমিতা নিজে এক শিশি অশোকারিষ্ট আনালে স্বামীকে না জানিয়ে।

কিন্তু এত আলোচনার পরে অমিতার বুকখানাও যেন এবার খাঁ-খাঁ করতে থাকে। ভারি খারাপ লাগে একা ঘরে পড়ে থাকতে। ভাবলে, এবার শীতাংশু ফিরলেই বাপের বাড়ী যাবার কথা বলবে তাকে।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ নীচে কড়া নড়ে উঠল। শীতাংশু এসেছে। রাত আটটা। একা একা খেতেও ভাল লাগছিল না অমিতার। তাই খাবার ঢাকা দিয়ে দোতলার ঐ একখানা ঘরের সামনের দরজা খুলে অন্ধকারেই শুয়ে ছিল। দরজা খুললে সামনের বাগান পেরিয়ে দু'ধারের বাড়ীর ফাঁক দিয়ে বড় রাস্তার একটু অংশ চোখে পড়ে। সেখানে অনেক লোক হাঁটে, গাড়ী-ঘোড়া চলে। অমিতা তার নির্জ্জন ঘরের ভিতরে বসেও মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করে। আজ বুঝি সামান্য তন্দ্রা এসেছিল। কড়া-নাড়ার শব্দ পেয়েই অমিতা ধড়মড় করে উঠে গায়ের-মাথার কাপড় টানতে টানতে নীচে এসে দরজা খুলে দিলে।

শীতাংশু তার চোখ দেখে বললে, 'এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

অমিতা উত্তর দিলে না। একটু সরে দাঁড়িয়ে জড়ানো চোখে শীতাংশুর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে হাসল একটু।

শীতাংশু আর দাঁড়াল না। গটগট করে অন্ধকারে সিঁড়ি পেরিয়েই ওপরে উঠে গেল। অমিতা সদর দরজায় আবার খিল তুলে দিয়ে লণ্ঠন-হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

শীতাংশু সামনের খোলা দরজার দিকে চেয়ে হেসে বললে, 'দরজা খুলে রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' বলেই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে অমিতাকে লণ্ঠন রাখবার অবসর না দিয়েই বুকে টেনে নিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ল।

অমিতা হাতের লণ্ঠনটা সামলাতে সামলাতে বললে, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও, পড়ে যাব যে—'।

শীতাংশু সে কথায় কর্ণপাত না করে নিজেই লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁট দুখানা চেপে ধরল অমিতার মুখের ওপর। অমিতা বাধা দিলে না। অবশ হয়ে লেগে রইল শীতাংশুর বুকের ওপর।

শীতাংশু স্নান সেরে খেতে বসে বললে, 'ওকি, হাঁড়ি চাপাও নি? নিজে খাবে কি?'

অমিতা তেমনি খুশীমুখে বললে, 'খাও না তুমি বাপু, পুরুষ মানুষের অত হাঁড়ির খবর নেওয়া ভাল লাগে না।'

শীতাংশু পাল্টা জবাব দিল, 'কিন্তু আমারও যে ভাল লাগে না না জানিয়ে এসে আর একজনের মুখের খাবার কেড়ে খেতে।'

অমিতা এবার দুষ্টু হাসি হাসলে। চিবুকের সেই ছোট টোলটাও দোল খেয়ে উঠল হাসির সঙ্গে। বললে, 'আমি খেয়েছি।'

'কখখনো না।' বলেই শীতাংশু খপ করে অমিতার একখানা হাত ধরে কাছে টেনে নিয়ে এল।—'বেশ যদি খেতেই হয়, দুজনে সমান ভাগ করে খাব। নাও।'

শীতাংশু একেবারে রুটির টুকরা ডালে ভিজিয়ে অমিতার মুখে পুরে দিতে গেল। অমিতা বাঁ হাতখানা মুখের সামনে উল্‌টে ধরে এবার জোরে ঝাকানি দিলে। 'ছি-ছি, ওকি করছ। আমার এঁটো খাবে?'

শীতাংশুর একটু আটকাল না মুখে। বললে, সবই ত এঁটো করে দিয়েছ। শুধু খেতে আপত্তি?'

অমিতা রাগ করল না। অনুনয় করে বললে, 'অমন করে না লক্ষ্মীটি, ছিঃ। মেয়েদের অকল্যাণ হয় তাতে।'

কিন্তু ওই একটি কথায় শীতাংশুর অত বড় জেদ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি মনে করে অমিতার হাত ছেড়ে দিয়ে নীরবে খেতে লাগল। বললে, 'আদ্দেকটা খাব কিন্তু—'

অমিতা চাপ দিলে, 'না, সবখানিই খাবে।' এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যানের ঢাকা খুলে দেখালে আরও খাবার আছে তাতে।

শীতাংশু আকাশ থেকে পড়লেও এতটা অবাক হ'ত না। হাত থামিয়ে বললে, 'তুমি গুনতে জান নাকি?'

অমিতা মৃদু হাসলে কেবল। সেই-মন-জয় করা হাসি। একা খাওয়ার দুর্ভোগ বাঁচাতে সে কতদিন সকালে-বিকালে হাঁড়ি চাপায় না, সে কথাটুকু আর জানালে না স্বামীকে। কিন্তু তাই বলে অমন নয় সে: জিজ্ঞেস করলে বলত, কি হবে নিজের জন্যে মিছিমিছি কতগুলো কয়লা পুড়িয়ে।

অমিতা যে গুছানো সংসারী তা কেউ অস্বীকার করবে না। ফলে, নিজের প্রতি একটু অনুদার সে। কিন্তু অন্যদিকে তার অকৃপণ ঔদার্য্য বিস্মিত করে স্বামীকে। শীতাংশু যতবারই টুর থেকে ফিরে এসেছে, দেখেছে কিছু-না-কিছু নতুন করেছে অমিতা। ছুঁচের কাজেই তার বেশী ঝোঁক। কয়েকটি কাপ, একটি বাঁধানো সার্টিফিকেট আজও সাজানো রয়েছে ঘরে। বেশী পয়সা রেখে যেতে পারে না শীতাংশু। কিন্তু অমিতা তার থেকেই কখনও একখানা জানলার নতুন পরদা, কখনও টেবিলের ঢাকনি কিংবা ফুলতোলা একটা বালিশের ওয়াড় বানিয়ে রাখে। তার পর স্বামী খেয়ে দেয়ে শুলে তারই একটি নমুনা দেখিয়ে বলে, 'দেখ ত কেমন হয়েছে এ ডিজাইনটা?'

একটু আদর পাবার লোভ। শীতাংশু বুঝতে পারে। 'বাঃ, বেশ হয়েছে, চমৎকার।' বলেই অমনি শব্দ করে একটি চুমো বসিয়ে দেয় অমিতার ঠোঁটের ওপর।

অমিতা হঠাৎ রাঙা হয়ে সরে যায়। 'যাঃ, কেউ দেখে ফেললে কি বলবে বল ত।'

যদিও দেখার মত কেউ থাকে না আশেপাশে। বড় রাস্তা থেকে উঠে একটি অপরিসর গলি। তারই দক্ষিণ প্রান্তে ছোট একটি দোতলা বাড়ী। দোতলায় ঐ একটি মাত্র ঘর। সামনে পেছনে দুটি দরজা। একটি ছোট জানলা খাটের উঁচু দিকে। মাথার ওপর উঁচু পাঁচিল-ঘেরা এক টুকরো ছাত। তারই একপাশে খাপরা-ছাওয়া ছোট রান্নাঘর, জল তুলতে হয় দোতলার কল থেকে। পেছনের দিকে হিন্দুস্থানী বাড়ীওয়ালারা থাকে। তাঁদের বেরুবার রাস্তা আলাদা। মানুষের মধ্যে নজরে পড়ে পথচলা লোক। আর গলির মাথায় প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বাঙ্গালী মেস-বাড়ী। মাঝে মধ্যে মেস-বাড়ীর ছেলে-ছোকরারাই ছাদে উঠে তাকায় এদিকে। অমিতা সেদিকে চেয়েই বললে কথাটা।

শীতাংশু গোড়ায় এ আপিসেরই কলকাতার প্রধান কেন্দ্রে ছিল। 'বেকারি' খুব জোর তখন। কিন্তু চাকরির যোগাযোগটা হয়ে গেল খুব সহজে। চেহারা ভালই ছিল। দোহারা বলিষ্ঠ গড়ন। ব্যাকব্রাশ চুল। টানা টানা চোখ-নাক। প্রশস্ত ললাট। সাদা স্যুট আর কালো টাই পরে গোরা ম্যানেজারের সামনে দাঁড়াতেই চাকরি হয়ে গেল। ছোট হলেও বিলিতি আপিস। মাইনে কেরানীর চেয়ে ভালই দিলে। মানে, ত্রিশের জায়গায় ষাট। মাত্র ম্যাট্রিক পাস করে তখন এর বেশী শীতাংশু আশা করে নি। তাই খুব উৎসাহে কাজ দেখিয়ে মাইনে একশোয় বাড়িয়ে নিলে দু'বছরে। আগে কলকাতার ডাক্তারখানাতেই ঘুরে বেড়াতে হ'ত। স্থানীয় ডাক্তারদের কাছেই ধরণা দিয়ে বসে থাকতে হ'ত। কিন্তু এখন বদলী হয়েছে লক্ষ্ণৌ-এর ব্রাঞ্চ আপিসে। কিন্তু টুর করতে হয় উত্তর ভারতের নানা প্রান্তে। কাজটা আগের চেয়ে সহজ। অর্থাৎ, এদিকের ডাক্তাররা এখনও অত নির্দ্দয় হয়ে ওঠে নি। ছোট ক্যানভাসারকেও সম্মান দেয়।

কলকাতায় থাকতেই বিয়ে করেছিল শীতাংশু। বিয়ের ইচ্ছা ছিল না তার। বাপের আয় পড়ে গেছে। দেশের জমি-জায়গাও গেছে বোনের বিয়েতে। নাবালক ক'টি ভাই তখনও স্কুলে পড়ে। তাই নিজের পড়া ইতি করে বেরিয়ে আসতে হ'ল শীতাংশুকে। তার বাবাই পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায় ছোটকাকার কাছে। চাকরি হয়ে গেল। কিন্তু এর পরেই বাবা আর বিমাতা আব্দার ধরলেন বিয়ের। পরোক্ষে কাজ করছিলেন কন্যাদায়গ্রস্ত পিতারা। বছর দুয়েক তাঁদের ঠেকিয়ে রেখেও আর ঠেকাতে পারা গেল না। একেবারে বাবার টেলিগ্রাম এল 'ম্যারেজ সেটেলড অমুক তারিখ। বি রেডি।'

মাথা ঘুরে গেল শীতাংশুর। রেডি বললেই কি রেডিও হয়

যায় নাকি? কাকা মেয়ে দেখেছেন, তিনি নীরব। কাকীমা শুনেছেন, তিনি স্মিতমুখে এড়িয়ে যান। বোনেরা ঠাট্টা করে। কিন্তু কেউ বলে না মেয়ে কেমন? শীতাংশু বেরিয়ে গিয়ে গর্জ্জাতে থাকে বন্ধুমহলে। তার আদপেই বিয়ে করতে ইচ্ছা নেই। কিন্তু তাও অবশ্যম্ভাবী নিয়তির মত প্রজাপতির কাছে মাথা হেঁট করতেই হ'ল তাকে।

বাধ্য হয়ে শীতাংশু নাটোরের ট্রেনে চেপে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করলে। এ একরকম ভালই হ'ল। মেয়ে, সব মেয়েই সমান। বরং নিজে বাছতে গিয়ে ছেঁকা খেলে আরও খারাপ হ'ত। তবে রাণীভবানীর দেশ, ঘরানা ভালই হবে আশা করা যায়। শীতাংশুর নিজের একটু গান-বাজনার শখ ছিল। তাই ঘরানায় বিশ্বাস করে শীতাংশু।

জ্যৈষ্ঠের শেষ পূর্ণিমা। সে যেন আরব্য উপন্যাসের পাতা একখানা। বাংলা দেশের পূর্ণিমা বুঝি তার চেয়েও বেশী। মাসে মাসে তার রূপ বদলায়, দিনে দিনে চলে তার বর্ণ-অভিসার। শেষ জ্যৈষ্ঠ এসে সেই জোছনা তরল হয়ে ভাসে গলানো মোমের মত।

কিন্তু তখন শীতাংশুর মনের মাঝখানেও যেন ঝরে পড়ছে বিন্দু বিন্দু তপ্ত মোম। একটা শক্ত ধাক্কা খেয়েছে সে। তার বৌ এত কালো, এত রোগা? বাঁচবে কিনা তাই সন্দেহ। কালরাত্রি। তাই ছুঁতে পারবে না; নইলে দেখত তার গায়ের এক-একখানা হাড় পর্যন্ত গোনা যায়। কুশণ্ডিকায় যতটুকু দেখেছে, তাতেই বুঝে নিয়েছে শীতাংশু। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়েই যে আর একজন সেই গলানো মোম হাত পেতে তুলে নিচ্ছে। সেটুকু বুঝতেই পারলে না সে। কিন্তু তার পর মাত্র দুটো দিন, দুটো রাত। অমিতা তার হাসি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, প্রাণমাতানো স্পর্শ দিয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল শীতাংশুর দুঃখ-অনুশোচনা!

শীতাংশুও নিজের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'পটের বিবি নিয়ে তুমি কি করতে হে ম্যাট্রিক পাস ছোকরা? তোমার ঘাড়ে ছ'টি পোষ্য, এবার নিজে দেখে বিয়ে করলে, সে হিসেব রাখো।'

চার বছর পরে আবার এক জ্যৈষ্ঠের জোছনায় দড়ির চওড়া খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে সেই কথাই ভাবছিল শীতাংশু। এমন সময় খাওয়া সেরে একখানি নূতন ডুরে শাড়ি পরে মশলা চিবোতে চিবোতে উঠে এল অমিতা।

অমিতাকে পাশে বসতে দিয়ে বললে শীতাংশু, 'এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান?'

ছাতের উঁচু পাঁচিলের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি জানালা। অমিতা সেটা বন্ধ করে ফিরে এল। 'কি!'

শীতাংশু বললে, 'কিন্তু জানালাটা কি দোষ করল? একটু বাতাস আসছিল যে। তা ছাড়া চেয়ে দেখ, আকাশে আলোর বান ডেকেছে, এমন দিনে মনের পর্যন্ত দোর-জানলা খুলে দিতে হয়।

অমিতা উৎসাহিত হ'ল না সেকথায়। বললে, 'তুমি তাই বলছ। আজ তুমি এসেছ তাই চুপ করে আছে। নইলে এতক্ষণ—'

শীতাংশু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'নইলে কি? তুমি কার কথা বলছ।'

অমিতা ঘৃণাভরে একবার জানলার দিকে চেয়ে বললে, 'ওই মেসের ছেলেগুলো আর কি। এইসব ছেলে যে এত অভব্য হয় জানতুম না। ছাদে শুতে এলেই গান জুড়ে দেয়। কি সব আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। সব শুনতে পাই এখান থেকে। কাল কাগজ পাকিয়ে ফেলেছিস।' বলেই অমিতা বললে, 'তুমি বাপু একজন লোক রেখে যাবার ব্যবস্থা কর। আমার আর একা একা সাহস নেই।'

সহসা শীতাংশুর মনের সুর কেটে গেল। কিছুকাল গুম হয়ে বসে থেকে বললে, 'আচ্ছা, ভয় পেয়ো না। ওদের একজনের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে, বলে দেব। আর তুমিও বাড়ী-ওলার বউকে বল যদি কোন ঠিকে ঝি—'

আশ্বস্ত হয়ে অমিতা বললে এবার, 'কি ভাবছিলে বললে না।' ...বলেই বললে, 'দাঁড়াও, তার আগে একটা দরকারি কথা সেরে নিই। মা চিঠি দিয়েছেন, আরও কিছু টাকা পাঠাতে হবে।'

এবার চটে উঠল শীতাংশু। রুক্ষস্বরে বললে, 'আচ্ছা তুমিই বল ত, আমার কি টাকার গাছ আছে? এই সেদিন ত্রিশ টাকা পাঠালাম।...নিজের একটা ইন্সিওর পর্যন্ত করতে পারি নি এ-পর্যন্ত। বললাম, অংশুকে আর পড়িয়ে কাজ নেই। পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। সেও ত আড্ডা থামিয়ে একটা কাজের চেষ্টা করতে পারে।'

শীতাংশু যেন অমিতার দিকে চেয়ে তার সমর্থন চাইলে। অমিতা বললে, 'যাকগে, চেয়েছেন যখন, দশটা টাকা পাঠিয়েই দাও না। আমার হাতে পাঁচটা বেঁচেছে, আর ক'টা দিলেই...'

শীতাংশু বিরক্ত হয়ে বাধা দিয়ে বললে, 'আর ধর যদি কঠিন অসুখই হ'ত তোমার, কে সাহায্য করত বিদেশে?'

'অসুখ ত আর সত্যিই করে নি।' অমিতা হাসলে একটু। শীতাংশুও আর এসময়ে তর্ক করতে চাইলে না। টাকাটা কাল পাঠাবে স্থির করেই বললে, 'তোমার মুখখানাই তুলনা করছিলাম সেই নাটোর ষ্টেশনে-দেখা কনেবউয়ের মুখের সঙ্গে। সেদিনেও আকাশে এমনি জোছনা ছিল। এই মাস। মনে আছে তোমার?'

অমিতা শীতাংশুকে একটু ঠেলে দিয়ে বললে, 'কি জানি বাপু, অত কবিত্ব নেই আমার, সরো, শুতে দাও।'

শীতাংশু তাকে পাশে শুতে দিয়ে নিজে উপুড় হয়ে তার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, 'কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। কত মিষ্টি হয়েছ এখন। গায়ের রঙ পর্যন্ত—'

আত্মপ্রশংসা শুনে অমিতা তাড়াতাড়ি শীতাংশুর মুখে হাত চাপা দিলে। 'চুপ কর। মেলাই আর গুণ গাইতে হবে না।'

শীতাংশু তাও বললে, তুমিই বল, হয় নি? সব রুচি ভালের

গুণ। বলি নি এদেশে এসে রুটি ছাড়া স্বাস্থ্য ভাল হয় না। এই বুকের হাড়গুলো, হাত দুটো—' বলে তার বাহুমূল স্পর্শ করতে গিয়েই বাঁ-হাতে একটা মাদুলি দেখে চমকে উঠল, এ-সব কি আবার?'

অমিতা চোখ মিটমিট করে হাসলে।

শীতাংশু আবার জিজ্ঞেস করলে, 'কিসের মাদুলি?'

'রক্ষাকবচ।' বলে অমিতা পাশ ফিরে শুল।

কিন্তু ততক্ষণে বুঝতে পেরে গম্ভীর হয়ে গেছে শীতাংশু। সহসা তারও কেমন যেন লজ্জা হ'ল কথা বলতে। যেন তারই অপৌরুষের 'মেডেল' ওই মাদুলি। তাই প্রসঙ্গ চাপা দেবার ছলে কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে বললে, 'ছি ছি, লেখাপড়া শিখেও তোমার কুসংস্কার গেল না। মাদুলিতে বিশ্বাস কর তুমি?'

অপরাধীর মত মুখ করে বললে অমিতা—আমিই যেন নিজের ইচ্ছায় নিয়েছি। বেলার মা এত করে বলতে লাগলেন, শেষে—'

শীতাংশু একটি প্রগাঢ় চুম্বনে তার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে, 'এই তো বেশ আছি অমিতা। তুমি আর আমি। গান আর সুর। কবিতা আর ছন্দ। নদী আর—'

'উঃ, এত কবিতাও আসে তোমার। চুপ কর, চুপ কর।' বলে অমিতা শীতাংশুর হাত ধরে পাশে নামিয়ে দিলে তাকে।

শীতাংশু আবার টুরে গেছে। কিন্তু এবার একা বাড়ীতে সত্যি বিপদে পড়ল অমিতা। সহসা খবর না দিয়ে শীতাংশুর পিসতুতো বোন আর ভগ্নীপতি এসে পড়েছে এলাহাবাদ থেকে। অমিতা যেন অন্ধকার দেখল চোখে। তাও সাহসে ভর করে তাদের ডেকে নিয়ে এল ওপরে। কল্যাণীকে বললে, 'আমাদের ভাই এই জায়গা, তাও যে এসেছ বউদিকে মনে করে সেই আমার ভাগ্য।'

ভগ্নীপতি অবস্থাটা বুঝে বললে, 'তা হলে ত বউদি সত্যি বিপদে ফেললাম আপনাকে।'

'বিপদ কিসের!' অমিতা তেমনি স্মিতমুখে উত্তর দিলে। 'তবে আপনাকে খাটাব কিন্তু।' তার পর, জামাইকে খাটাবার কথার অসৌজন্য ঢাকা দিতে কল্যাণীর দিকে আড়চোখে চেয়ে বলল, 'আর তা ছাড়া, আমরা পরের বাড়ীর ছেলেমেয়ে, খাটবার জন্যেই এসেছি, নাকি রমেশবাবু?'

রমেশ স্কুল-মাষ্টার। সরল মানুষ। অত কথার মারপ্যাঁচ না বুঝে বললে, 'নিশ্চয়। আমি সর্ব্বদা রেডি।'

কল্যাণী তাতে একটু অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'সেজদার ফিরতে কি সত্যি দেরি হবে?'

অমিতা বললে, 'কেন ভাই আমাকে কি সত্যি পর মনে করলে? একা বাড়ীতে মুখ গুজে পড়ে থাকি। আমার কত ভাগ্য যে দুটো কথা কইতে পারব তাও।' বলে কল্যাণীকে একটু আড়ালে টেনে নিয়ে বললে, 'কোন ভয় নেই ঠাকুরঝি। বন্ধ ঘর আছে, খোলা ছাদ ওপরে, তোমাদের দুখানা বিছানা আটবে তাতে।'

কল্যাণীর নতুন বিয়ে হয়েছে। অমিতাকে একটা চিমটি কেটে বললে, 'যাঃ, এত অসভ্য তুমি। বেশ করে বকাচ্ছ তো দাদাকে?'

সেকথার কোন উত্তর দিলে না অমিতা। নীরব কৌতুকে এমন চোখে চেয়ে রইল যে, কল্যাণীরও বুঝতে বাকি রইল না তার সেজদা লোকটি কেমন। সেই সঙ্গে কল্যাণী লক্ষ্য করলে অমিতার গালের টোলটি আবার দোল খেয়ে গেল হাসি চাপতে গিয়ে।

এককালে কল্যাণীও ছোট মামার ওখানে থেকেই লেখাপড়া করেছে কলকাতায়। অমিতার যখন বিয়ে হয় তখনও ছিল সেখানে। কিন্তু বিয়ে হয়েই শ্বশুরবাড়ী চলে গেল বলে তেমন আলাপ করতে পারে নি কল্যাণীর সঙ্গে। গত বছর সেখান থেকেই তার বিয়ে হ'ল। অমিতার খুব ইচ্ছা ছিল যায় সে-বিয়েতে। কিন্তু খরচের জন্য যেতে পারলে না। কেবল সস্তার একখানা জর্জ্জেট কিনে পাঠিয়ে দিয়েছিল পার্সেল করে।

কিন্তু এবার আলাপ হতে দেখলে ভারি ভাল মেয়েটি। বাবা বেঁচে নেই। তাই মামা-মামীকে খুশী রেখে মানুষ হতে হয়েছে। বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছে, তাও মনের নিরীহ স্বভাবটি কাটে নি তার। সামান্য খাটো হলেও, বেশ ভরা চেহারা। তীক্ষ্ণ নাক-চোখ, মোটের উপর স্বামীও ভাল পেয়েছে। কালো, দোহারা। এম-এ পাস করে মাষ্টারি নিয়েছে। ঘরের অবস্থাও চলনসই, কিন্তু ব্যবহারটি ভারি সরল। একটু কথায় ঠকাতে ইচ্ছা করে।

সবাই স্নান সেরে চা-জলখাবার খেলে অমিতা জিজ্ঞেস করলে, 'তা রমেশবাবু, হঠাৎ এই লু-এর ভেতর যে হানিমুনে বেরুলেন বড়।'

রমেশের ভারি হাসি পেল হানিমুনের কথায়। বললে, 'যা বলেছেন বউদি! হানিমুনেরই টাইম বটে। এদিকে যে এত গরম তা জানব কি করে।...আসল কথা ছিল পশ্চিমে-পশ্চিমে ঘুরি নি বড়। স্কুলের ছুটি ছিল, গিয়েছিলাম ছোট-মাসীর ওখানে এলাহাবাদে। সেখান থেকে কল্যাণী টেনে আনলে এখানে।'

অমিতার যেন কথা খুলে গেছে। বললে, সেখানে বুঝি অনেক মানুষের ভিড়।

ইঙ্গিতটা ঠিক ধরতে পারে নি রমেশ। কিন্তু সামলে দিলে কল্যাণী। বললে, তার চেয়ে বাজারে যাও ত এখন।

অমিতা চট করে আধর কাটলে, 'আমার ত এখন রোজই নিরামিষ। আপনি অন্ততঃ ঠাকুরঝির একটু আমিষের ব্যবস্থা করুন; নাকি ঠাকুরঝি?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়, থলে দিন।' ব্যস্ত হয়ে উঠল রমেশ। অমিতা বাজারের থলে দিয়ে একটি টাকা গুজে দিল তার হাতে। রমেশ একবার বাধা দিতে গেল। কিন্তু মানলে না অমিতা। নিজে যতটুকু শুনেছে সেই মত রাস্তার নির্দ্দেশ দিয়ে এগিয়ে দিলে সিঁড়ির দিকে।

কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে গেছে এদিকে। অমিতাকে এখনই রান্নাঘরে ফিরতে হবে। তাই বললে, 'ঠাকুরঝি, তুমি বরং ভাই শুয়ে শুয়ে একটা বই পড় ততক্ষণ, কিংবা ঘুমোও। গাড়ীতে হয়ত কাল ঘুমোতে পার নি।'

বলে অমিতা বইয়ের আলমারি খুলতেই পাশে এসে দাঁড়াল কল্যাণী। দেখলে, ঘরের দক্ষিণ দেয়ালে একটি বন্ধ দরজা, তারই খোপের ভেতর সস্তা কাঠের একটি ঢাকা-পাল্লার আলমারি, কিন্তু বেশ মাজা-ঘষা ঝকঝকে। এরই উপর অগভীর একটি কাঁচের আলমারিতে সারি সারি বই সাজানো। সামনে অমিতার আয়না, পাউডারের কৌটা প্রভৃতি। কল্যাণী বেছে বেছে দেখলে বেশ কিছু রবীন্দ্রনাথের বই আছে। দুই খণ্ড গীতবিতান; একখানি ব্রহ্ম-সঙ্গীত, মাইকেল আর বঙ্কিমের রাজ-সংস্করণ একপাশে। শ্রীকান্তের সব খণ্ড নেই, কিন্তু শরৎচন্দ্রের বড় বইগুলি প্রায় সবই আছে। এক কোণে খানদশেক একালের লেখা বই।

কল্যাণী নতুন লেখকের একখানি বই হাতে তুলে নিয়ে বললে, 'সব পড়ে নাকি সেজদা?'

অমিতা একটু আগেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল যাবার জন্তে। কিন্তু বইয়ের আলোচনা উঠতে সেও দাঁড়িয়ে গেল। শীতাংশু বলে, ঘরে বই রাখার মত ভাল রুচি আর নেই। সে কথাটা মনে পড়তে অমিতা প্রায় সেই সুরেই বললে, টুর করতে হয় ত, তাই প্রায় প্রতি টি পেই কিনে আনেন একখানা করে। বিদেশে তবু সময় কাটে। আর, তা ছাড়া আমারও ত পড়া ছাড়া গতি নেই। ওঁর সঙ্গে সঙ্গে বাতিকটা আমার ঘাড়েও চেপেছে।

কল্যাণী এবার বইখানা হাতে নিয়ে নীচের দিকে চাইলে। সেখানেও কলিনস প্রেসের থান ত্রিশেক বাঁধানো ইংরেজী ক্ল্যাসিক। অমিতা সেদিকে দেখিয়ে বললে, কোথায় নিলাম হচ্ছিল, কিনে এনেছেন। এমন সুন্দর একরঙা চামড়ায় বাঁধানো বই, কে বেচলে কে জানে।

কল্যাণী ক্ষণকাল সেদিকে চোখ রেখে অন্ত দিকে চাইলে। মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে সেক্সপীয়ার এবং ইয়েটসের দু'খানি কাব্যগ্রন্থ। গোল্ডেন ট্রেজারীখানা পড়ে রয়েছে এক কোণে। সেখানি দেখেই হেসে ফেললে কল্যাণী। 'ভাবলাম আর বুঝি মুখ দেখতে হবে না ওখানার, এখানেও আছে? বি-এ কোর্সে ছিল ওখানা।'

কল্যাণীও এবার কৌতুক করে বলল, 'এই অখাদ্যগুলিও তোমার গেলাচ্ছেন নাকি সেজদা?'

অমিতা স্মিতমুখে বললে 'না ভাই, আমার বিদ্যে ম্যাট্রিক পর্যন্ত। ইংরেজীতে ফেল করি নি সেই যথেষ্ট। ওঁরই সখ বেশী।'

কিন্তু এদিকে টাইমপিসটা অসহযোগ বাধিয়েছে। সেদিকে চেয়েই অমিতা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঈস, কি দেরিটাই হয়ে গেল। তুমি দেখ ততক্ষণ ঠাকুরঝি। আমি উপরে চললাম।'

কল্যাণীর আদপে পড়ার ইচ্ছা ছিল না। বললে, 'তার চেয়ে চল বরং ওপরে গিয়েই গল্প করি।'

অমিতা বাধা দিয়ে বললে, 'না ভাই, ওপরে এখন খাপরা তেতে আগুন। তুমি সইতে পারবে না 'লু'য়ের ঝাপটা।'

আসলে অমিতার লজ্জা করছিল রান্নাঘর দেখাতে। ছোট্ট একটি খুপরি। অনেক মাটির হাঁড়ি। বছরখানেক মাত্র এসেছে। এখনও সব টিনের কৌটা যোগাড় হয় নি। অনেকখানি দৈন্ত আটকা পড়ে আছে। কিন্তু কল্যাণী তাও যখন মানল না, অমিতা কুণ্ঠিত হয়ে বলল, 'কিন্তু দেখে বউদির নিন্দে করতে পারবে না। সব জিনিস এখনও গুছিয়ে উঠতে পারি নি। এত করে বলি তোমার দাদাকে, কিন্তু ওসব বুঝতে চায় না একেবারেই। ওঁর যত সখ ওই শোবার ঘরের আসবাব নিয়ে। তাও যদি আর একখানা ঘর থাকত।'

কল্যাণী ক্ষণকাল ভাবল কথাগুলি। কিন্তু এবার তার মুখ দিয়ে অতর্কিতে বেরিয়ে গেল একটি পুরানো কথা। বললে, 'কিন্তু বাহাদুরি আছে তোমার বউদি! তুমি বাঁধতে পেরেছ মেজদাদাকে, আমরা ত ভেবেছিলাম শেফালিকেই বিয়ে করে একটা কেলেঙ্কারি করবেন শেষ পর্যন্ত।'

সংবাদটি নূতন। তাই অমিতা কান পেতে কথাগুলি শুনে কৃত্রিম হাসিতে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'তাই নাকি। খুব সুন্দরী ছিল বুঝি?'

'না,...হ্যাঁ, তা সুন্দরী বলা চলে।' কল্যাণী একটু ভেবে বললে, 'তবে মুখ-চোখ মোটেই ভাল নয়। তোমার মত ত নয়ই। শুধু গায়ের রঙ ছিল খুব ফরসা। আমার সঙ্গেই পড়ত। ভারী মেধাবী মেয়ে—সেবারই ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছিল।

অমিতা এবার ডালের হাঁড়ির ওপর ঝুঁকে আর একটু জল ঢেলে সরা চাপা দিয়ে ঘুরে বসল। 'সেই ত ভাল ছিল, তা বিয়ে হ'ল না কেন?'

কল্যাণী বিস্মিত হয়ে বললে, 'কি করে হবে। তার মামারাই বা দেবেন কেন? সে যে কায়েত, নন্দী। তবে শেফালির খুব ইচ্ছে ছিল।'

'খুব মেলামেশা ছিল বুঝি?' অমিতা করুণ মুখে জিজ্ঞেস করলে।

কল্যাণী বললে, 'সামনের বাড়ীতেই থাকত। প্রায়ই পড়তে আসত আমাদের এখানে। অনেকগুলি ভাই-বোন ত, পড়বার ব্যবস্থা ছিল না। তা ছাড়া, সেজদা খুব ভাল পড়াতে পারত কিনা।

বলেই কল্যাণী আবার চাইলে অমিতার মুখের দিকে। 'তা তুমিও ত বৌদি সেজদার কাছে পড়েই এদ্দিনে আই-এ দিতে পারতে। সেজদা, কলেজে পড়লে না তাই। নইলে এমনিতে ভারি পড়াশোনা ছিল।'

অমিতা একটু ম্লান হেসে বললে, 'আই-এ দিয়ে আমার কি হবে ভাই। ওটা ডিঙিয়েই ত একেবারে হাঁড়ির পাঠ নিয়েছি।'

অমিতার আর ভাল লাগছিল না অপ্রিয় আলোচনা। তাই চাপা দিয়ে বললে, শুনেছিলাম প'ড়তে পড়তে বিয়ে করেছিল। তুমি বি-এ দিলে না কেন?

কল্যাণী উত্তর দিলেন, এবার দিয়েছি ত। তবে খুব খারাপ হয়েছে পেপার, পাস করার আশা নেই।

অমিতা হেসে বললে, 'ঘরেই স্বামী গুরু, আর পাস করার আশা নেই? তাহলে গুরুদক্ষিণা ঠিকমত দাও নি বল।'

কল্যাণী লজ্জা পেয়ে বললে, 'ওই পর্য্যন্তই। পড়ালেন আর কতটুকু। দিনভর ইস্কুলের ছেলেরাই ত বাড়ীখানা ইস্কুল বানিয়ে রেখেছিল।'

এমন সময় নীচে কড়া নড়ে উঠল। রমেশ ফিরেছে। রমেশ দোতলার বারান্দায় কলের নীচে মাছের থলি নামিয়ে দিয়ে বললে, 'যাই বলুন বউদি, আপনাদের এখানে জিনিষপত্তর ভারি সস্তা।'

অমিতা হেসে বললে, 'কিন্তু আপনি আবার সস্তার জিনিষই খুঁজে খুঁজে আনেন নি ত।'

রমেশ ঠিক বুঝতে না পেরে সংশয়ক্লিষ্ট চোখে চেয়ে রইল অমিতার মুখের দিকে। অমিতা আর বললে না কিছু। মাথা নামিয়ে কলের কাছে বসে মাছ কুটতে লাগল। কল্যাণী ততক্ষণে রাস্তার দিকের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রমেশও গেঞ্জী খুলে একখানা হাতপাখা চালাতে চালাতে পাশে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল। কিন্তু অমিতার তখন হাত কাঁপছে বঁটির উপর। অমিতা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে শীতাংশুর ব্যবহার দেখে ত ধরা যায় না—সে আর কাউকে ভালবেসেছে। এমনও হতে পারে বয়সে একটা ঝোঁক এসেছিল, এখন কেটে গেছে।

অমিতা তাড়াতাড়ি মাছ কেটে একাই আবার ওপরে উঠে গেল। কল্যাণীকে জানতে দিলে না। সহসা তার সব উৎসাহ যেন এক নিমেষে দমে গেছে। অমিতা বাঁ গালে হাত দিয়ে অলসভাবে চিন্তা করতে করতে কড়ার ওপর ডালনার আলু ভেজে যেতে লাগল। দেয়ালের কোথায় একটা টিকটিকি লুকিয়ে ছিল। সহসা তর তর করে নেমে এসে সেও অবাক চোখে চেয়ে রইল অমিতার মুখের দিকে।

এর মাঝে কখন রমেশ ওপরে উঠে এসেছে, টের পায় নি অমিতা। সামনে এসে দাঁড়ালেই চমকে উঠে গালের উপর থেকে হাত টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বসল। 'এই যে রমেশবাবু।... বসুন এই পিঁড়িটাতে।' বলে নিজের পিঁড়ি ঠেলে দিলে।

রমেশ বসতে বসতে ঠাট্টা করলে, 'কি ভাবছিলেন গালে হাত দিয়ে? নিশ্চয় সেজদার জন্যে মন কেমন করছে।'

অমিতা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা জবাব দিলে, 'সে এখন করছে আপনাদের। আমাদের আর করে না।'

রমেশ এবার একটু অন্তরঙ্গ হয়ে বলল, "সে কি বৌদি, এর মধ্যেই?"

অমিতা তার কোন উত্তর দিলে না। রমেশ আর এক কাপ চা খাবে কি না জিজ্ঞেস করে কড়া নামিয়ে জলের প্যান বসিয়ে দিলে। দু'এক মিনিট নীরবে কাটল। আর চুপ করে থাকা ভাল দেখায় না ভেবে অমিতাই আবার কথা বললে, 'ঠাকুরঝি কি করছে?'

রমেশ সাদা গলায় বলল, 'শুয়েছে একটু।'

অমিতা মুচকি হেসে চাইলে তার দিকে। 'আপনিও শুলে পারতেন।' ঠাকুরঝির জল দিলাম যে।

রমেশ বলল, 'চায়ের নাম শুনলে ঠিকই উঠে বসবে।' বলে সপ্রশংস চোখে চেয়ে রইল অমিতার দিকে। তার সন্ধানী চোখের সামনে কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল অমিতার। কিন্তু বাধা দিলে না। রমেশ অবাক হয়ে দেখল, বোধ হয় প্রথম আবিষ্কার করল, চায়ের মত একরকম গেরুয়া রঙও হয় মেয়েদের এবং সে রঙটা কি সুন্দরই না মানিয়েছে অমিতা বৌদিকে। ছবির সূক্ষ্ম রেখা বিচার করতেও বুঝি এমনি গাঢ় রঙের প্রয়োজন হয়। রমেশ নিজের কল্পনা মিশিয়ে অমিতার সেই চিত্রখানাই মিলিয়ে দেখতে লাগল—তার চোখে মুখে আর টোলবসানো নিখুঁত নিটোল ওই চিবুকটা নিয়ে। একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে এবার কথা বললে রমেশ, 'ভাবছি বউদি, আমিও না হয় চলে আসি এদিকে। আপনি কি বলেন? কলকাতায় বড্ড ভিড়, স্কোপও পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে শুনেছি এখনও সে অবস্থা হয় নি, চেষ্টা করলে হয়ত কোনও কলেজেও চান্স পেয়ে যেতে পারি।'

অমিতা বললে, 'বেশ ত, ঠাকুরঝি যদি তাই বলে, বাড়ীর লোকে মত দেন, দেখুন না খোঁজখবর করে। উনি নেই, নইলে অনেক খোঁজ দিতে পারতেন। ফিরতে বোধ হয় এখনও দশ দিন লাগবে।'

রমেশ ভেবে বললে, 'তখন ত ওদিকের ইস্কুলও খুলে যাবে আবার।...সে দেখা যাবে। ফিরে গিয়ে চিঠিতেই না হয় খোঁজ নেব। না, সত্যি সত্যি আমার ভাল লেগেছে। এলাহাবাদ আরো খোলামেলা।'

অমিতা চা ঢালতে লাগল। তার পর আবার একা হবার জন্যে বললে, 'এখানে বড্ড গরম। চলুন নিচে যাই। বলে কেটলি নিচে এনে একটা ট্রের ওপর সাজিয়ে দিলে। ট্রের ওপর মিহি কাজ করা একটা ধবধবে ঢাকা দিতেও ভুল হ'ল না। অমিতা ট্রে সাজিয়ে এবার কল্যাণীকে ডেকে বললে, 'নাও ভাই ঠাকুরঝি, দু'জনে ঢেলে খাও! আমি চললাম রাঁধতে।'

রাঁধতে রাঁধতে অমিতার মন যেন আবার ফিরে গেল কলকাতায় সেই খুড়শ্বশুরের বাড়ীতে। তাঁরা আর সে বাড়ীতে নেই অবশ্য, কিন্তু পাড়াটা মনে আছে অমিতার। বাড়ীখানাও। পুরনো নোনা-লাগা হলদে দোতলা বাড়ী। কিন্তু বেশ খোলামেলা। উত্তরে ঘরের সামনেই প্রকাণ্ড ছড়ানো ছাদ। দক্ষিণের বাগানে দুটো বড় বড় কলাগাছ ছিল এখনও স্পষ্ট মনে আছে। অমিতা দেশ ছেড়ে ভাবতেই পারে নি অত বড় কলাগাছ দেখবে কলকাতার

এসে। কিন্তু বাঁঝা গাছ, শুঁয়াপোকায় ভরতি। এই কল্যাণীই বারণ করত জানলা ঘেঁষে দাঁড়াতে। হয়ত গায়ে উঠতে পারে।

কিন্তু এখন যেন খটকা লাগছে তার। তা হলে বাগানের ওধারের দোতলা সাদা বাড়ীটাই কি ছিল শেফালিদের? তাই বারণ করত দাঁড়াতে? অমিতার স্পষ্ট মনে পড়ছে তাকে দেখবার জন্যে একটি মেয়ে প্রায়ই কাপড় শুকোবার ছলে কাপড় তারে টাঙিয়ে তারই আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখত ওকে। অত কাছে অথচ কেউই কথা বলত না। কেমন যেন আশ্চর্য্য ঠেকেছিল অমিতার কাছেও। অথচ পূবদিকের ওরা ঠিকই এসেছিল দেখতে। আলাপও করে গিয়েছিল।

অমিতা মনে মনে ভাবলে এবার কলকাতায় গেলে সে একবার ঠিক খোঁজ নেবে ওইটাই শেফালিদের বাড়ী কিনা। তেমন বুঝলে কায়দা করে তার সঙ্গে আলাপ করতেও পশ্চাদপদ হবে না সে।

কিন্তু আর অলস চিন্তার সময় নেই। বেলা বয়ে যাচ্ছে। সময়ে খেতে দিতে না পারলে লজ্জার আর শেষ থাকবে না, তাই অমিতা এবার আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে বালতি হাতে তরতর করে নেমে গেল নিচের কলে।

কল্যাণীরা দিনচারেক ছিল অমিতার কাছে। সেই সুযোগে ঘরে তালা ঝুলিয়ে অমিতাও ওদের সঙ্গে শহর ঘুরে নিল। শীতাংশুর তেমন বেড়াবার অভ্যাস নেই। আর পারেও না। যে ক'দিন কাছে থাকে তার মধ্যেও একবার করে আপিস ঘুরে আসতে হয়। বাকি সময় শুয়ে বসে কিংবা বই নিয়ে কাটায়। অমিতা বলেও বাইরের সঙ্গ নিতে পারে না। কিন্তু তাতে এতদিন খারাপ লাগে নি অমিতার। বরং একেবারে হাতের কাছটিতে পেয়েছে স্বামীকে। কিন্তু হঠাৎ বুঝি আজ অমিতার স্বভাব বদলে গেছে। বাইরে বেরিয়ে তার উৎসাহই যেন এখন সবচেয়ে বেশী। অমিতার মনে এখন ঘুরে ফিরে কেবলই শেফালির কথাটাই খোঁচা দিচ্ছে। কয়েক বার খুব সাবধানে প্রসঙ্গ ওঠাবার চেষ্টা করেছে কল্যাণীর কাছে। কিন্তু সেও হয়ত হঠাৎ আবেগের মাথায় বলে ফেলেছিল কথাটা। অমিতার প্রশ্ন শুনে হয়ত পরে সতর্ক হয়ে গেছে। অমিতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আচ্ছা ঠাকুরঝি, সেই শেফালিরও কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

কল্যাণী কেমন ছাড়া-ছাড়া উত্তর দিলে, 'কি করে বলব বউদি, আমি ত আর যাই নি সেখানে।'

সব কথার ইতি হয়ে গেল সেখানেই। কল্যাণীরাও চলে গেল। অমিতা আবার একা পড়ল। কিন্তু না, এবার আর সে একা নয়। শেফালির ভাবনা আছে তার সঙ্গে।

হঠাৎ কেমন এক তীব্র অশ্রদ্ধা জাগল শীতাংশুর ওপর। টেবিলের ওপর খোলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁদুর দিতে দিতে অমিতা ভাবলে, 'ছি-ছি, একটা কি রুচি নেই? মান-মর্য্যাদা-বোধ নেই? কোন আক্কেলে বাপ-ঠাকুর্দ্দার মুখে কালি দিতে চেয়েছিল ও। পৃথিবীতে কি রূপটাই সব?'

অমিতা রোজ এ সময়টায় চুল বেঁধে এক কাপ চা নিয়ে এসে বসত খাটের ওপর। সামনের দরজা দিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে একটু একটু করে চুমুক দিত চায়ে। গরম চা খেতে পারে না। ওই এক কাপ চা নিয়েই তার আধ ঘণ্টা কেটে যেত। কিন্তু আজ আর সে সব কিছুই করলে না অমিতা। খাটের তলা থেকে শীতাংশুর ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে বসল চিঠি খুঁজতে। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। নিরাশ হয়ে ট্রাঙ্কটা বন্ধ করে দিলে অমিতা। কিন্তু কি মনে হতে আবার চট করে ডালাটা তুলে ধরে একটা নতুন রঙীন প্যাড টেনে বার করলে। চামড়া-বাঁধানো বিলিতী প্যাড। শীতাংশু বলেছিল আর অমন জিনিষ পাওয়া যায় না। তাই যত্ন করে কাগজে মুড়ে বাক্সের তলায় লুকিয়ে রেখে গেছে। অমিতারও কোন কৌতূহল হয় নি দেখার। তার কোন দিনই তেমন অহেতুক কৌতূহল নেই। কিন্তু আজ সেইখানেই তার সন্দেহ হ'ল। এবং ঠিকই হয়েছে সে সন্দেহ। বাঁধানো প্যাডটা খুলে দু'পাশে হাত দিতেই একটি ভাঁজ-করা চিঠি ভেতর থেকে বেরিয়ে এল—শেফালির বুককাটা ছবি। অমিতা জানালার সামনে উঠে এসে অস্তগামী সূর্য্যের তখনও অবশেষ যেটুকু আলো ছিল তাইতেই ভাল করে দেখলে ফটোখানা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করলে তার প্রতিটি অবয়বের। হাসি-হাসি মুখ, গাল-দুটি বুঝি একটু বেশী ফোলা। সামনের দু'টি দাঁত একটু উঁচু। জ্রহীন ছোট দুটি চোখে শেফালি যেন ব্যঙ্গ করছে অমিতাকে। অমিতা দেখে নিজের মনেই হাসলে একটু। এই চেহারা দেখেই ভুলেছিল তার স্বামী? শীতাংশুই পাশাপাশি মিলিয়ে দেখুক তার নিজের চেহারার সঙ্গে। কাকে বেশী মানায়।

কিন্তু একটি জায়গায় তাও অপূর্ণতা আছে। অমিতা নিজেই সূঁচের মাথায় সিঁদুর নিয়ে সে অপূর্ণতা ঘুচিয়ে দিলে শেফালির। এবার? কিন্তু তাও অমিতাই জিতে যাবে। ও সিঁদুর বসবে না কাগজে। কিন্তু অক্ষয় হয়ে বসেছে তার নিজের সীমন্তে।

তীব্র আক্রোশে অমিতা এবার ফটোখানা খাটের ওপর নামিয়ে রেখে চিঠিখানা খুললে। কিন্তু না, এ চিঠি শেফালির নয়। শীতাংশুর লেখা। একটি আস্ত প্যাডের কাগজে লেখা মাত্র একটি লাইন। গানের একটি কলি: 'ফাগুন বেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল।'

অমিতা আর দুবার পড়লে সে কলিটি। জানা গান, জানা সুর। তেমনি কৌশলে প্যাডখানা আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে বাক্স বন্ধ করে অমিতা ক্যালেণ্ডারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শীতাংশুর ফিরতে এখনও চার দিন বাকি।

শীতাংশু ফিরে এল। কিন্তু অমিতার চোখমুখের চেহারা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলে, 'ব্যাপার কি, শরীর ভাল ত?'

অমিতা কোন উত্তর দিল না। কিন্তু শীতাংশু তার কণ্ঠস্বরে

অনুমান করলে সর্দি লেগেছে তার। তাই বললে, 'দু'এক ডোজ 'ব্রায়োনিয়া' খেলেই পারতে। গরমের সর্দি। কাশি আছে সঙ্গে?'

অমিতা ক্লান্ত রুক্ষ স্বরে বলল, 'কি জানি, তুমি নিজের কাপড়-চোপড় ছাড়গে।' বলে উনুন ধরাতে চলে গেল।

শীতাংশু আর ঘাটালে না তাকে যদিও ব্যাপারটা নূতন মনে হ'ল। তা ও ভাবলে, হয়ত সত্যিই শরীর ভাল নেই অমিতার।

শীতাংশু খেতে বসলে আজ আর মুখের খাবার তুলে দিলে না অমিতা। বরং কষ্ট করে রেঁধেই খাওয়ালে স্বামীকে। তার পর নিজে খেয়ে শুয়ে রইল নিজের ঘরে। আকাশে আজ আর চাঁদ নেই। অগণিত তারার তারায় ছেয়ে আছে ছায়াপথ। শীতাংশু সেই দিকে চেয়েই শুয়ে রইল কতক্ষণ। কিন্তু তাও যখন এল না অমিতা, কেমন সন্দেহ হতে নিজেই নীচে নেমে এল। 'ওকি একাই শুয়ে আছ যে, এই গরম ঘরে?'

অমিতা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমার অসুবিধে হবে না। তুমি শোও গে ওপরে।'

এ রকম হয় মাঝে মাঝে। শীতাংশুই বা আপত্তি করবে কেন তাতে। সে শুধু বলতে চাইছিল—আমরা ত আলাদা ওপরেও শুতে পারত।

অমিতা তার সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'শরীর ভাল নেই।' কল্যাণীরা এসেছে। চলে গেছে। এত বড় একটা সংবাদ তার কাছে লুকানো। কিন্তু সে-কথাও আজ ক্লান্তিতে বলতে চাইল না অমিতা। সে কোন কথাই বলতে পারছে না আর।

কিন্তু শীতাংশু তাও প্রশ্নে প্রশ্নে একটি সংবাদ আহরণ করে নিলে। অমিতা সন্তানসম্ভবা। কিন্তু এর পরে সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না। সহসা উল্লাসিত হয়ে বলে উঠল, 'সত্যি!' তার পর একটু দম নিয়ে আবার বলল, 'ভেবেছিলাম এই দিনটিকে সার্থক করে তুলব আনন্দে, হাসিতে আর গানে। তা তুমিই শরীর খারাপ করে বসলে!'

কথাটা অমিতার মনে এসেও আঘাত করল। অনুশোচনা নয়, তবু এক দুর্ব্বার অভিমানে অমিতা আত্মসম্বরণ করতে পারছে না!

শীতাংশু আবার বিরস মুখে ফিরে যাচ্ছিল। অমিতাই তার হাত ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'একটু বস।'

এবার আর মানলে না শীতাংশু। সহসা দু'হাতে অমিতাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে উঠল, 'আজ যদি আকাশে চাঁদ থাকত!'

চাঁদ নেই। আকাশ সত্যি অন্ধকার। তাই আর অমিতার হৃদয়-মন্থন-করা অশ্রুটুকু দেখতে পেল না শীতাংশু।

হিসেব

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ঘাসের ওপরে খুব ছোট ছোট মাকড়সা-জাল পাতা;
কুয়াশার শেষে শিশির জমেছে, কিংবা সে কুয়াশাই—
রূপালি ঝালরে হীরের কুচির মত খুদে চেকনাই,
সূর্য্য এখন মেলে ধরে তার রোজনামচার খাতা।

ওড়কলমি ও পানা-শেওলার বেগুনী রঙের ফুলে
ফড়িঙেরা ওড়ে, পরাগের খোঁজে প্রজাপতি উন্মন;
কালো দীঘি-জলে নারকেল ঝাউ ছায়া ফেলে দুলে দুলে;
রোজনামচায় আমি লিখে রাখি বাতাসের গুঞ্জন।

হালকা হাওয়ায় গাঙে ভেসে যায় পাল-তোলা নৌকারা,
কোন দূর দেশে সূর্য্য পাঠায় বর্ণালি এঁকে এঁকে;
ঘাটের মেয়েরা হাসি-তামাসায় জল নিয়ে এঁকে বেঁকে
ঘরে ফেরে, আর রাখালের বাঁশী দিগন্তে হয় হারা।

সামনে টিলায় গোরু চরে, চাষী প্রাণ খুলে গান গায়;
সূর্য্যের খাতা আবছায়া-ঢাকা মেঘেদের ওড়নায়।
আমার খাতার গায়ে রোদ-ছাপা শালিকের কিচিমিচি
লিখে রাখি— কার কথা ভেবে মনে—অক্ষর হিজিবিজি।

চিল ওড়ে ধু-ধু শূন্য আকাশে রঙিন ঘুড়ির মত,
সময় এখন মনের মতই ছুটেছে অসংযত;
মাছরাঙা গাছে, মাঠে চড়াইয়েরা—হরেক রকম পাখী;
সূর্য্য কি দেখে, সময় কি ভাবে, আমি কি হিসেব রাখি।

ডাল হ্রদ, কাশ্মীর

কাশ্মীর

শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য

ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসের অধিবেশন বসছে কাশ্মীরের গিরি-মেখলা নগরী শ্রীনগরে। কাশ্মীরের নাম শুনলে বাঙালীমাত্রেরই মনটা আনচান করে ওঠে। শুধু একালে নয় সর্ব্বকালের মানুষের মন প্রকৃতির শান্ত সুনিবিড় কোলে বাসা বাঁধতে চেয়েছে—কোলাহল-মুখরিত জীবনতরী ঝঞ্ঝা পার হয়ে শান্ত দ্বীপটিতে গিয়ে উঠতে চেয়েছে। তাই কাশ্মীরের কথা শুনলেই মনে পড়ে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে ডালহ্রদের মন-মাতানো নীলিমা, আর চারিদিকে তার তুষারের গিরিশৃঙ্খল। এহেন শান্তি-নীড়ের আকর্ষণে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম। সাত জন সঙ্গী নিয়ে রওনা হলাম বহু-আকাঙ্ক্ষিত কাশ্মীরের পথে।

আগ্রা-দিল্লীর প্রখর তাপের মাঝে হা-হুতাশ করছি। ঘাম নেই অথচ অসহ্য গরম। দিল্লী থেকে কাশ্মীর মেলে চলেছি ভারতের পশ্চিম প্রত্যন্তে। ইতিহাসখ্যাত পাণিপথ, কুরুক্ষেত্র পার হলাম। পনেরই জুন সকালে এসে পৌঁছলাম পাঠানকোট ষ্টেশনে। ভারতীয় রেলপথের সীমান্ত। হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা বাষ্পযানের গতি ব্যাহত করেছে। মানুষের অমোঘ শক্তির উপর এ যেন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ। ষ্টেশনের পাশেই জম্মু ও কাশ্মীরগামী বাস। আগে থেকেই রিজার্ভ করা ছিল। বাসে আমরা আট জন যাত্রী ও পশ্চিম আফ্রিকা থেকে এসেছেন এক পরিবার। বাড়ী তাঁদের পুণা। আফ্রিকায় ব্যবসা করেন। সকাল ন'টায় বাস ছাড়ল পাঠানকোট থেকে কাশ্মীরের পথে।

আমাদের যাত্রা সুরু হ'ল। মনটা সকলের নূতন কিছু দেখার আনন্দে ভরপুর। ভূস্বর্গের সে স্বপ্নপুরী কেমন—যে যুগ যুগ ধরে টেনেছে সাধারণ মানুষকে; কবি এর গুণকীর্ত্তনে মুখর, এর শোভা এনেছে দার্শনিকের হৃদয়ে চিন্তার উদ্দীপনা। কবির সঙ্গীতে কোন্ দেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল, কোথাকার পর্ব্বত-গুহায় বন্দী হয়ে জয়ন্তভট্টের মত এমন দার্শনিক তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতি 'ন্যায়মঞ্জরী' রচনা করেছেন?

প্রায় আধ ঘণ্টা বাস চলার পর আমরা এসে পৌঁছলাম লক্ষ্মণপুর 'চেকিং পোষ্ট'-এ। ভারতের সীমান্ত শেষ হ'ল—কাশ্মীর এলাকা এবার সুরু। এখানে ভারতীয় পুলিসের অনুমতিপত্র দেখাতে হবে। বন্ধুবর ব্রহ্মানন্দের চেষ্টায় এ 'পারমিট' পেতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হয় নি। অনুমতি ত মিলল, কিন্তু চলার পথে এ আবার এক নূতন ব্যাঘাত। আমাদেরই সহযাত্রী সেই পশ্চিমী পরিবারের পাঁচ জন এসেছিলেন—কিন্তু অনুমতি আছে চার জনের। শত অনুনয়-বিনয়েও পুলিস বিভাগের অনুমতি পাওয়া গেল না।

ভদ্রলোক যখন পাঠানকোটে ভারতীয় পুলিসের স্থানীয় কর্তাকে এ বিষয় জানিয়েছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, লক্ষ্মণপুর পৌঁছে বিশেষ অনুমতি করে নেবার জন্যে। কিন্তু আমাদের পুলিসকর্তার অনুমান ব্যর্থ হ'ল। লক্ষ্মণপুর থেকে আবার ফিরে আসতে হ'ল পাঠানকোটে। অনুমতি নিয়ে ভদ্রলোক যখন পৌঁছলেন, সূর্যদেব

শ্রীনগরের রাজপথ

তখন অস্তাচলে নামছেন—প্রতীচীর সর্বাঙ্গে আবির মাখা। নূতন বেগে ছুটে চলল যন্ত্রযান। ইরাবতী পার হলাম। মাইলের পর মাইল এমন সোজা রাস্তা ভারতের আর কোথায় দেখেছি বলে মনে হয় না। যতদূর দৃষ্টি যায়—দু'পাশে শাল-পাইনের সারি। ক্রমশঃ পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আসি—চারিদিকে কখনও সুগভীর জঙ্গল—মাঝে মাঝে নদী। এবার বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় সমতলভূমি পার হয়ে পাহাড়ের দেশে এসেছি। ঘণ্টাখানেক পরে এলাম জম্মু। জম্মু গেষ্ট হাউসে এসে মহা বিপদ। ড্রাইভার যে কোথায় অন্তর্ধান করেছেন, তার পাত্তা আর মেলে না। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে জানাল, আমাদের নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। চল, খোদ বড়কর্তার কাছে—'মশাই, যাব কনফারেন্সে। কাল সকালেই সুরু হবে। আপনাদের মহারাজাই উদ্বোধন করবেন'—ইত্যাদি বাক্‌চাতুরীর ফল ফলল। গররাজী ড্রাইভার বাস নিয়ে চলল। পদে পদে এমন বাধা কেন—গোবরডাঙ্গা কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর ধ্যানেশনারায়ণ ত কেবলই সুললিত কণ্ঠে মঙ্গলশ্লোক আবৃত্তি করছেন। শঙ্কা ও ছমছম ভাব সকলের দেহমনে—পাহাড়িয়া পথ সুরু হ'ল। বাস ঘুরে ফিরে কেবলই উপরে উঠছে—এক পাশে কত গভীর খাদ। নীচের দিকে তাকানোই এক বিষম দায়। যে-কোন মুহূর্তে চালকের এক পলকের অন্যমনস্কতার জন্যে দুর্ঘটনা হতে পারে। ধারে ধারে পাথর সাজানো আছে বটে, কিন্তু তা নিশানামাত্র—প্রতিহত করার ক্ষমতা তার এতটুকু নেই। এমনি ভাবে রাত প্রায় দশটায় এসে পৌঁছলাম 'খুদ'-এর বাংলোতে।

রাতটা সেখানে কাটিয়ে বর্ষণমুখর প্রভাতে আবার যাত্রা। আজই অধিবেশন সুরু। মাত্র এক শ' মাইল এসেছি এখনও এক শ' পঁয়ষট্টি মাইল যেতে হবে। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে চলি—এঁকে-বেঁকে সার্পিল গতির ছন্দে ছন্দে—বুক দুরু দুরু। অন্যমনস্ক করবার আশায় স্নেহাস্পদা গীতিকা রবীন্দ্র-সঙ্গীতের অনুরণন তোলেন—"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই—"। অনেক উঁচুতে উঠে ধরণীর বিশালতা একই ক্ষণে
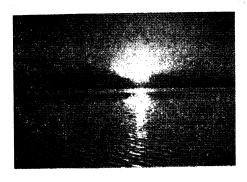
ডাল লেকে সূর্যোদয়

অনুভব করার সুযোগ যখনই আসছে তখন কে যেন ভিতর থেকে আপনিই বলাচ্ছে—'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।' দেখা যায় দূরে 'শুভ্রতুষারকিরীটিনী' শৈলমালা। চলে এসেছি একেবারে বরফের দেশে—বেলা অনেক হয়েছে অথচ এখনও রাস্তার দু'পাশে বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারেও মানুষ বাসা বেঁধেছে। একপাল ভেড়া নিয়ে চলেছে এক বৃদ্ধ, সঙ্গে তার কন্যা। তড়িৎ-গতিতে চলেছে আমাদের বাস—হাত জোড় করে আবেদন জানায়—ওগো মেরো না এদের—ভয় তার এতগুলো জীবকে একই সঙ্গে চাপা দিয়ে আমাদের গাড়ী চলে যাবে। ছোট্ট ছোট্ট শিশুর মত খণ্ড খণ্ড মেঘ পাহাড়ের গা বেয়ে উঠছে—যেন সেও মায়ের কোলে আশ্রয় চায়। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে গিরিসঙ্কট—যে পথে একদিন সুদূর চীন থেকে এসেছিলেন পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙ। কাশ্মীরে তখন নাগবংশের রাজত্ব। দুর্লভবর্দ্ধন রাজত্ব করছেন—সে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কথা। যে সঙ্কট একদিন শান্তির দূতকে পথ দেখিয়েছিল—চন্দ্রাপীড়ের রাজত্ব-কালে সেই গিরিসঙ্কটই দিল শত্রুকে সন্ধান। আরবরা এল—ভীতত্রস্ত চন্দ্রাপীড় চীনে দূত পাঠালেন এই পথেই—আশা তাঁর আরবদের বিরুদ্ধে চীনরাজ তাঁকে সহায়তা করবেন। কাশ্মীর-রাজের এ আশা ব্যর্থ হ'ল। কিন্তু তিনি নিজেই মহম্মদ ইবন কাসিমকে প্রতিহত করলেন। এই পথেই ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় ছুটেছিলেন তিব্বতে—দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে বাংলা পর্য্যন্ত এসে হাজির হয়েছিলেন। মুক্তাপীড়ের অস্ত্রের ঝনঝনানিতে দক্ষিণ ভারতেরও আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়েছিল। কালের অমোঘ গতির পথে ভূলুণ্ঠিত হ'ল সে 'কারকোট' রাজবংশ—নবম শতক পর্য্যন্ত

কাশ্মীরের ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন চঞ্চলা। আর এই গুহা ও গিরিসঙ্কট ছিল যেন সেদিনের ভাগ্যনিয়ন্তা।

এবার যেন কত উঁচুতে উঠেছি। ৮৮৪৪ ফুট—সত্যই মনে হয় কিন্নর-কিন্নরী দিগঙ্গনাগণ এখানে একদিন খেলা করতেন। এসে পৌঁছলাম 'বনিহাল টানেলে'। সমগ্র এশিয়ায় এই সর্ব্বোচ্চ গিরিপথ। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এর উদ্বোধন করেছেন। এর পরেই চোখের সামনে ভেসে উঠল কাশ্মীর উপত্যকার নয়নাভিরাম দৃশ্য। তীব্রবেগে নামতে সুরু করেছে আমাদের গাড়ী—ড্রাইভার মোহন সিং চালাচ্ছে গানের তালে তালে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে হাজির হলাম শ্রীনগর। সশস্ত্র
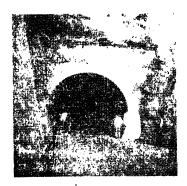
বানিহাল টানেল

প্রহরায় ঘেরা এই নগরীর বুক চিরে তখন কাজলঘন আঁধারের আনাগোনা সুরু হয়েছে। টুরিষ্ট আপিসের মধ্যে এসে আমাদের যাত্রা শেষ হ'ল।

কিছুদূরেই ডেলিগেটদের থাকবার ব্যবস্থা। ঝিলম ঘিরে রেখেছে বাহুবেষ্টনী দিয়ে তার প্রিয় নগরীটিকে। এই ঝিলমের একটি শাখার উপরে সুদৃশ্য 'হাউস বোটে' আশ্রয় নিলাম আমরা। পাশেই দর্শন-কংগ্রেসের সেক্রেটারীর আস্তানা। ওপারে বিশ্বভারতী ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের দুই অধ্যক্ষের বোট। এমন বিদ্বজ্জনগোষ্ঠীর মাঝে নিজেকে যেন নূতন করে চিনলাম।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সুরম্য উপত্যকায় রাজধানী শ্রীনগরে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন সুরু হ'ল। শ্রীনগর শুধু প্রকৃতির আদরের দুহিতা নয়, ভারতীয় মনীষার পুণ্যক্ষেত্র। কোন সুদূর অতীত যুগ থেকে ভারতের নানা প্রান্ত হতে কত শত সন্ধানী ছুটে চলেছে এরই শান্ত সুনিবিড় ছায়াতলে আশ্রয় নেবার জন্যে। কেউ গিয়েছে প্রকৃতির বন্য-মধুর ক্রোড়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আশায়, কেউ বা এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের রহস্য-সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে ঐ দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা অতিক্রম করেছে। আজকের শ্রীনগরের মানুষ সেকথা জানে না। অতীতের সে কীর্ত্তি-কাহিনী আজ ইতিহাসের মূক-অক্ষরের মাঝে হা-হুতাশ করছে।

কাশ্মীর উপত্যকায় একটি নদী

কাশ্মীর আজ নূতন স্বপ্নে মশগুল—রঙীন আশা তার বুকে। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সেও এগিয়ে চলেছে। নব নব পরিকল্পনার মাধ্যমে স্বাচ্ছন্দ্য তার জীবনকে করে তুলছে আনন্দ-মধুর। ভারতের সঙ্গে একই সূত্রে তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এত উজ্জ্বলতার মাঝেও কোথায় যেন ঘোর অমানিশার অন্ধকার—কাশ্মীরের অবকাশ থেকে ঘনায়মান কালো মেঘের ছায়া যেন এখনও মুছে যায় নি। তাই এত চঞ্চলতার মাঝেও যেন কত শঙ্কা তার জীবনকে রুদ্ধ করে রেখেছে। চারিপাশে তার সশস্ত্র সৈন্যের পাহারা।

এই অবরুদ্ধ শ্বাসের ব্যথা থেকে মুক্তির পথ দেখাবে কে? যুগে যুগে যারা দেখিয়েছে সে পথ—যারা এনেছে শান্তির বাণী তাদেরই আহ্বান—এবার কাশ্মীরের মনের দুয়ার খুলে দেবার জন্যে। সারা ভারতের দর্শনরসিক মানুষ ছুটে চলল ভূস্বর্গের পথে। মর্ত্ত্যের মানুষ স্বর্গের দুয়ারে হাজির শান্তির বাণী নিয়ে।

১৬ই জুন ১৯৫৭, শ্রীনগর এস. পি. কলেজের সুবিস্তৃত হলে

দর্শন-কংগ্রেসের অধিবেশন সুরু হ'ল। ভারতের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনরসপিপাসু বিদ্বজ্জন উপস্থিত হয়েছেন। সুদূর সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞান একাডেমির দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক এসেছেন তাঁর সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে। প্যারিসের মহিলা-অধ্যাপক এসেছেন। জম্মু ও কাশ্মীররাজ্যের সদর-ই-রিয়াসৎ যুবরাজ করণ সিং অধিবেশনের উদ্বোধন করলেন। সুদর্শন যুবরাজ তাঁর ভাষণে কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের সকল প্রত্যন্তের গভীর আত্মীয়তার কথা বললেন। কৃষ্টিগত ঐক্যের যে সূত্র এতদিন ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে—অতীত ইতিহাসের সেই মুখর কাহিনী আজ যেন আবার নূতন প্রাণস্পন্দন আনল। তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণে যুবরাজ বললেন, কাশ্মীরের অতীত জ্ঞান-গরিমার কথা—অনাগত প্রাণস্ফূর্ত্তির কথা—ভবিষ্যতের স্বপ্নলোকে যেন সকল শ্রোতা ডুব দিল।

ভাষণ দিতেন। অধিবেশনে চারটি বিভাগ ন্যায় ও তত্ত্ববিদ্যা (Logic aud Metaphysics), মনোবিজ্ঞান (Psychology) নীতিশাস্ত্র ও সমাজদর্শন (Ethics and Social Philosophy ও দর্শনের ইতিহাস। কটকের অধ্যাপক শ্রীশ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ন্যায় ও তত্ত্ববিদ্যা' বিভাগের সভাপতির ভাষণে মননক্ষেত্রে ন্যায়-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলেন। ন্যায় ও তত্ত্ববিদ্যা পরস্পরের পরিপূরক—এই তাঁর মূল বক্তব্য। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জাফর আহমদ সিদ্দিকী মনোবিজ্ঞান বিভাগের সভাপতির ভাষণে সশ্রদ্ধ চিত্তে ভারতীয় যোগীর কথা বললেন। ভারতীয় দর্শনের পদ্ধতিতে ফ্রয়েডের বহু মত তিনি খণ্ডন করলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির অবলুপ্ত বৈশিষ্ট্যটি যেন আবার নূতন রূপ নিয়ে ফুটে উঠল। পরে 'চিন্তা ও কার্য্য' সম্বন্ধে এক আলোচনা-সভায় বহু বিদ্বান যোগ দিলেন। সকাল থেকে সুরু করে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

ঝিলামের তীর

'খিলান মার্গ'-এর পথ

এর পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য সমাগত অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন তাঁর তীক্ষ্ণ অথচ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতার মাধ্যমে। তাঁর ভাষণের প্রতিটি ছত্রে বর্ত্তমান সমাজ, বিশেষতঃ ছাত্র সমাজের মধ্যে যে অভূতপূর্ব্ব বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করলেন। সংস্কৃতির এমন সঙ্কটক্ষণে দার্শনিক হবেন কর্ণধার, নূতন জীবনের পথ দেখাবেন তাঁরা—এই আশা তাঁর। সাধারণ অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত হয়েছিলেন সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় সিংহলের রাষ্ট্রদূত ডক্টর জি. পি. মললাশেখর। পালিভাষা ও বৌদ্ধদর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথী'র বুকের 'পরে শান্তির পতাকা উড়বে—বুদ্ধের ত্রিরত্নই সেই বাণী বহন করে আনবে—এ বিশ্বাস তাঁর আছে। স্থানীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ কর্তৃক জাতীয় সঙ্গীতের পর প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হ'ল।

অধিবেশনের প্রতিদিনই প্রাতে বিভাগীয় সভাপতিগণ তাঁদের

কেটেছে এই অধিবেশনে। বাংলাদেশ থেকে বহু প্রখ্যাত অধ্যাপক এসেছেন। ডক্টর কালিদাস ভট্টাচার্য্য, ডক্টর সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী, অধ্যাপক অমিয় মজুমদার, ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী প্রমুখ খ্যাতনামা অধ্যাপকের উপস্থিতি ও আলোচনা-সভায় যোগদান অধিবেশনটিকে সার্থক করে তুলল।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর প্রতিদিনই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক বক্তৃতায় তিনি বললেন, দর্শনপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা। দর্শন মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে শেখায়, ভাবতে শেখায়, শুধু চিন্তা নয়, ভালভাবে চিন্তা করতে শেখায়। তাই এক হিসাবে সকল মানুষই দার্শনিক। অতি সহজ সাবলীল মধুর তাঁর ভাষণ, কঠিন বিষয়কে এমন সহজ করে পরিবেশন তিনি করলেন, যাতে সত্যই অবাক হতে হয়।

প্রতিদিনের অধিবেশনের বিভিন্ন বক্তাকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত হতে হয়েছে। আলোচনা-সভায় বেশ প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছিল। একমাত্র বাঙালী মহিলা সবিতা মিশ্র 'ঋগ্বেদে অবৈজ্ঞবোধের

বীর' সম্বন্ধে তথ্যমূলক প্রবন্ধ পাঠ করলেন। বাঙালী নারীর এ কৃতিত্বে বেশ আনন্দ হ'ল। যুবরাজ করণ সিং একদিন প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করলেন তাঁর সুরম্য বাগানবাড়ীতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যও স্থানীয় বিখ্যাত 'নুডো' হোটেলে আমন্ত্রণ জানালেন। এমনিভাবে ভাবের আদান-প্রদান ঘটল। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হ'ল। শ্রীনগরের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা সেদিন সোনার অক্ষরে ক্ষোদিত হ'ল।
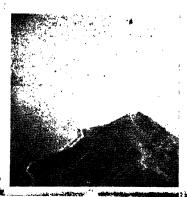
গিরিসঙ্কট

রাত বেশ হয়েছে। ঝিলমের তীর ধরে এগিয়ে আসছি হঠাৎ সামনে চোখে পড়ল শঙ্করাচার্য্য পাহাড়—শ্রীনগরের বুক ভেদ করে উঠেছে। সোজা বৈদ্যুতিক আলোর রেখা চলে গেছে নিচ থেকে পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরে। আঁধার রাতের সে দৃশ্য অপূর্ব্ব। পরদিন সকালেই আমরা দেবদর্শনে উঠলাম পাহাড়ের চূড়ায়। মনে পড়ল, ভারতের জনমানস তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবনে অভিষিক্ত—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ (?) শঙ্কর দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরলেন—কুমারিকা থেকে সুরু করে এই হিমশিখরেও তাঁর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হ'ল। প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি এই তুঙ্গ গিরিশিখরে শিবলিঙ্গ। বন্ধুবরের সুললিত কণ্ঠে 'প্রভুমীশমনীশমশেষগুণম'-এর আবৃত্তি যেন গিরিশৃঙ্গ অনুরণিত হ'ল। শিবলিঙ্গ ও শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিকে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম নগরীর বুকে।

পরের দিন সকালে গুলমার্গ চলেছি। টুরিষ্ট আপিসে এসে দেখি আমাদের রিজার্ভ বাস ছেড়ে দিয়েছে। ছোট দলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। মাত্র তিন জনে আমরা অন্য বাসে পাড়ি দিলাম। শ্রীনগর থেকে পঁচিশ মাইল, তার পর ঘোড়া। আর বাস যাবে না—এবার সকলেই অশ্বারোহী—পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে তিন হাজার ফুট। সাবে তিন মাইল চলার পর এল গুলমার্গ। স্থানটি চারিদিকে গিরিবেষ্টনী পরেছে—হিমশুভ্র ঐ গিরিমালা যেন এক বাহু-বেষ্টনীতে তাকে আবদ্ধ করে রেখেছে। উপর থেকে নিচে গুলমার্গ উপত্যকার এ দৃশ্য মনোরম। শ্রীনগরের সাজানো অন্তঃপুর মোগল বাদশার বিলাসকুঞ্জ নিশাতবাগ বা শালিমার বাগ কোথায় লাগে এর কাছে। প্রকৃতির বুকের পরে সার বেঁধে চলেছে অভিযাত্রীর দল। দুর্গম পথযাত্রীদের সাধ এখনও মেটে নি—তাই চলেছে আরও উপরে, প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে খিলানমার্গ-এ। এখানে এসে যখন পৌঁছলাম তখন ঝির ঝির

গ্রামের ছোট ছেলেরা

করে বৃষ্টি নেমেছে। হাত পা সব হিমশীতল হয়ে আসছে। শুধু বরফ আর বরফ। একদিকে ধরণীর ধূলি, অন্য দিকে হিমবাহ—কালো-সাদার এমন অপরূপ সংমিশ্রণে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হয়। বেশীক্ষণ থাকা যাবে না এখানে—তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হবে। 'ক্লিক' 'ক্লিক'—ছবি নেবার আওয়াজ শোনা যায়—কতদূর থেকে ছুটে আসছে অভিযাত্রীদল।

লক্ষণপুর চেকিং পোষ্টে লেখক (নীচে দণ্ডায়মান)

দেহমন অবসন্ন—আর নয় সকলের মুখে এক কথা। শিবানী দেবী বললেন, এসেছি যখন সব দেখা চাই। চল পহেলগাঁও—ইচ্ছা তাঁর অমরনাথের যাত্রী হবেন। পহেলগাঁও অমরনাথের

পথে। ক্লান্ত দেহ নিয়ে পহেলগাঁও-গামী বাসে উঠলাম। এই পাহাড়ের দেশে যেতে হবে বাষট্টি মাইল। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে চললাম। দু'পাশে ধানের ক্ষেত, কোথাও বা মাঝে মাঝে দেবদেউলের ভগ্নাবশেষ। পথে পড়ল মার্তণ্ড—দিগ্বিজয়ী ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। পুরানো মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়ে রয়েছে। নূতন মন্দির গড়ে উঠেছে তারই বেদীমঞ্চে। সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি। পাশেই আর একটি মন্দিরে রামসীতার মূর্ত্তি। দেবদর্শনের শেষে বাসে এসে উঠলাম। বিদ্যালয়ের ছাত্রে ভরে গেছে—বাস ছাড়ল—কাশ্মীরের ভক্তিমূলক গান গাইছে তারা। সে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় প্রতিটি যাত্রীর হৃদয় এক অপরূপ মোহে আবিষ্ট হয়েছে। দু'পাশে প্রকৃতির শান্তসমাহিত রূপ দেখতে দেখতে এসে পৌঁছলাম পহেলগাঁও—পাশ দিয়ে নৃত্যের তালে তালে বয়ে চলেছে পাহাড়ী নদী। কি উদ্দামতা তার—'আপন বেগে পাগলপারা' এ নদী গুরুগম্ভীর আওয়াজ তুলেছে। বন্ধুবর শক্তি বললেন—ঐ নদীর ধারে বসে আহারপর্ব্ব সমাধা করতে হবে। কিন্তু কাছে দেখালেও বেশ কিছু দূর। শ্রান্ত দেহ নিয়ে উঠলাম ঐ উঁচু টিলার উপরে। বেশ বর্ষা নেমেছে। আবার নদীর সেই গম্ভীর তান শুনতে শুনতে এগিয়ে এলাম শ্রীনগরের পথে।

নির্ব্বাসন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গহন বনের বনদেবতার
বৃদ্ধ পূজারী আসি'
হায় রে কপাল, মায়ার বাঁধনে
হয়েছে সৌধবাসী।
সুমুখে শুভ্র উচ্চ প্রাচীর-সারি,
দেখি', মন তার উচাটন হয় ভারি,
ধরে সে কাতরে, তার সেই বন—
সে দেবতা উপবাসী।

২

জানিত তাহার মতি বিশুদ্ধা—
সব সংশয়হীনা,
ঝরে না পাতা ও বহে না বাতাস,
হরির করুণা বিনা।
পর্ণকুটীরে রহিত সে দীন অতি,
যেথা সদা সাধু সন্তের গতায়তি,
তাহার ভাবের ছায়াপথ গড়া
দিয়া হরি-পদ-চিনা।

৩

কোথা বনানীর শ্যামল-টোপর
দেবের প্রেরিত হাওয়া?
কোথা সাথে সাথে বন-বিহগের
অবিরাম গান গাওয়া?
মৃগনাভি তারে আর ত দেয় না আনি,
অভয়ের কথা অভয়ার মহাবাণী
ফুরায়েছে সেই সজল নয়নে
অনুরাগে পথ চাওয়া।

৩

যার দৃষ্টির প্রসাদ লভিয়া
প্রসন্ন হ'ত দিক্,
প্রভাত রবিরে বন্দিত যার
নয়ন নির্নিমিখ।
আকাশ যাহার রঙে হ'ত লালে লাল,
ঘিরে ছিল যারে বংশীর সুরজাল,
সেই তপোবন-মৃগ গনে' আজ—
কুবের-কারার শিক্।

৪

যে রামধনুর বসত বিপুল
অকূল নীলাম্বরে,
দেখিনু সে আমি বেশ ত রয়েছে
ভেশিরা কাঁচের ঘরে।
মানস-সরের পূজার নীলোৎপল,
কেন মর্ম্মর-জলাধারে এল বল?
অমরনাথের কপোত ঢুকিল
গৃহ-বিটঙ্কে ওরে!

৫

ভাবের গোমুখীনীরে যার স্নান,
তীরে যার বাস-গুহা,
সমীর সোহাগে গায়ে দিত যার
হরিচন্দনচুয়া।
সেই মাখামাখি তুষারে-রৌদ্রে-মেঘে,
এখনো বক্ষে চক্ষে রয়েছে লেগে,
হায়! সুধাপায়ী গরুড় হইল
পাকাঘরে—কাকাতুয়া!

স্কুল-কলেজে ইংরেজী শিক্ষা

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারের ৩৮,৯৪৩ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার্থীর মধ্যে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১,৩২০। অন্যভাবে বলা যায়, প্রতি শ' পরীক্ষার্থীর প্রায় ৫৫ জনের ভাগ্যে জুটেছে বিফলতা। এই দুর্ভাগ্যদের পাঠের দক্ষিণা ও পরীক্ষার ফি বাবত খরচের অঙ্ক ষাট লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তার সঙ্গে বইয়ের ও ছাত্রাবাসে আবাসিক ব্যয় যোগ করলে টাকার অঙ্ক স্ফীত হবে বিপুল ভাবে। বহু অভিভাবক নিজেদের বঞ্চিত করে কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় করেছেন এদের শিক্ষার জন্য। কত বিনিদ্র রজনী আর হাড়ভাঙা খাটুনি ছিল পরীক্ষার প্রস্তুতির পিছনে তার হিসাব অঙ্কে ধরা পড়ে না। বহু তরুণ তরুণীর উচ্চ আকাঙ্ক্ষায় চিরতরে ছেদ টানা হয়ে গেল। পরীক্ষার ফল একুশ হাজার পরিবারে ছড়িয়ে দিয়েছে ব্যর্থতার মনোবেদনা।

পরীক্ষার আঘাত এদেশে নূতন কিছু নয়, বার্ষিক ঘটনা। বছরে বছরে দু'চার পার্সেণ্ট কমবেশী পাসের হার অবস্থার অনুভবযোগ্য প্রভেদ ঘটাতে পারে না। বিস্মিত হতে হয় এই ভেবে যে, অর্থ ও শক্তির এমন বিপুল অপচয় রোধের কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয় না কেন। পরীক্ষার্থীদের ব্যর্থতা শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়, কর্মক্ষেত্রে বাঙালীর এগিয়ে চলা বা পিছে হটার প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিফলতার দোষ ছাত্রছাত্রীদের কাঁধে চাপিয়ে নিষ্ক্রিয় থাকা কি সঙ্গত ?

এই ব্যাপক ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে বেশী দূর যেতে হয় না। সংবাদে প্রকাশ পরীক্ষার প্রাথমিক রিপোর্ট অনুসারে ইংরেজীতে ফেল হয়েছিল বাইশ হাজারের বেশী পরীক্ষার্থী। ইংরেজী আবশ্যিক বিষয় বলে মোট পাসের হার ইংরেজীর হার ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। পুনর্বিবেচনার ফলে অনুত্তীর্ণদের সংখ্যা ২১,৩২০তে নামানো হয়েছে। ইংরেজীর পাসের হার নিয়ন্ত্রিত করে মোট পাসের হার। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার বেলায়ই শুধু একথা সত্য নয়, পঞ্চম মান থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা অবধি প্রত্যেকটি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করে ইংরেজী স্কুল ফাইন্যাল, ইণ্টারমিডিয়েট ও উপাধি পরীক্ষায় ইংরেজী হয়ে দাঁড়ায় পরীক্ষার্থীর নিকট এক ভীষণ আতঙ্ক।

বাঙালীর জীবনে ইংরেজীর ভূমিকা

বাঙালীকে দ্বিভাষিক হতে হবে, এই ছিল চল্লিশ বৎসর আগের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সিদ্ধান্ত। ইংরেজী থাকবে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান, আপিস আদালত ও অবাঙালীর সহিত ভাব-বিনিময়ের ভাষা; বাংলা হবে তার সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ভালোবাসা ও স্নেহ-ভক্তি প্রকাশের মাধ্যম, এ ছিল কমিশনের অভিপ্রায়। বিদেশী ভাষার ক্ষেত্র বাঙালীর বহিরঙ্গে আর মাতৃভাষার অধিকার তার অন্তরঙ্গে। ইংরেজীর অধিকারের খানিকটা হস্তান্তরিত হয়েছে হিন্দীর—স্বাধীনতার পর। অন্তর্দেশীয় রাজনীতি, রাষ্ট্রকার্য, ব্যবসা ও ভাবের আদান-প্রদানের ভাষা এখন হিন্দী। দ্বিভাষিক বাঙালীকে হতে হবে ত্রিভাষিক। ভাষাশিক্ষার দায় বেড়ে গেছে, কিন্তু ইংরেজীর গুরুত্ব কমে নি। স্বাধীন ভারতের কর্মক্ষেত্র বহির্বিশ্বে প্রসারিত হবার পর থেকে ইংরেজী শেখার আবশ্যকতা আরও বেড়ে গেছে। অপর রাজ্যের ভারতীয়দের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঙালী যদি বাইরের কর্মক্ষেত্র তাকে প্রয়োজনীয় করে তুলতে চায় তা হলে সার্বভৌমিক ভাষা ইংরেজীকে করতে হবে তার ভাবের অপরিহার্য শক্তিশালী বাহন।

দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে বাংলার মত আঞ্চলিক ভাষার অনুবাদ-সাহিত্যের পক্ষে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব। পাঠকের সংখ্যাল্পতা মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের প্রধান বাধা। বিশ্ববিদ্যা ও বিশ্ব-সাহিত্যের পরিচয়লাভের জন্য সুধীজনের ইংরেজী বইয়ের উপর নির্ভর না করে উপায় নেই।

ইংরেজী শুধু উচ্চস্তরের লোকদেরই প্রয়োজন এমন নহে। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রের আধুনিক কর্মীদের দক্ষতালাভে অল্পবিস্তর ইংরেজী জ্ঞান অপরিহার্য। আধুনিক জীবনযাত্রায় প্রায় সর্বস্তরেই ইংরেজীর প্রয়োজন।

পরিবেশ অনুকূল না প্রতিকূল

ইংরেজী বর্জন যখন সম্ভব নয় তখন সঙ্কল্পবদ্ধ হয়ে তার মোকাবেলা করাই ত ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রমহলে এক অস্পষ্ট ধারণা প্রসারলাভ করেছে যে, ইংরেজ শাসনের অবসানের মত ভারতে ইংরেজী ভাষার শেষ দিনও ঘনিয়ে

এসেছে। এর ফলে ইংরেজী শেখায় ঢিলেমি ফুটে উঠেছে সর্ব্বত্র। ইংরেজী শেখার দিক থেকে বাঙালী ও অন্যান্য রাজ্যের ছাত্রছাত্রীগণ একই পথের পথিক। তা হলেও ইংরেজী শেখায় বাঙালীর অসুবিধা বেশী। ইংরেজী বাঙালীর প্রয়োজন বটে কিন্তু তা শেখার তাগিদ তার নেই। হায়দরাবাদের একই স্কুলে তেলুগু, মরাঠী, কানাড়ি, উর্দু এবং তামিলভাষী ছাত্র ও শিক্ষক দেখা যায়। সেখানে পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন করে ইংরেজী—স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে ইংরেজী ব্যবহার করতে না শিখলে মৌনী হয়ে থাকতে হয়। মহীশূর রাজ্যে কর্ণাটী, তামিল ও মরাঠীদের সাধারণ ভাষা ইংরেজী। ইংরেজীতে ভাবের আদান-প্রদান তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন। চাটগাঁ থেকে পুরুলিয়া আর দার্জিলিঙ থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত একমাত্র মাতৃভাষা সম্বল করে বাঙালী তার জীবন অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। স্কুল কলেজের বাইরে ইংরেজী বলা ও শোনার উপলক্ষ ঘটে কালে-ভদ্রে। বিদ্যালয়েও ইংরেজী বলার রেওয়াজ প্রায় উঠে গেছে। ফলে বাঙালী বিদ্বানদের অনেকে ইংরেজী বলেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, আর বাল্যকাল থেকে অভ্যাস করে করে দক্ষিণীরা ইংরেজী বলে যায় মাতৃভাষার মত অনর্গল।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি বিদেশী ভাষা শেখার পথে আর এক বাধা। সাধারণ মানুষের জ্ঞানপিপাসা এখন বাংলাই মেটাতে সক্ষম। বাংলা দৈনিকের উন্নতির ফলে ছাত্রসমাজে ইংরেজী কাগজ পড়া কমে গেছে। আগে ইংরেজী কাগজ পড়ে নিত্যনূতন ভাব ও ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটত; সে সুযোগ এখন সঙ্কুচিত হয়েছে। চলতি ইংরেজীর সহিত পরিচয়ের একমাত্র পথ সাধারণ বাঙালীর নিকট এখন রুদ্ধ। ইংরেজী শেখার জন্য বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের এখন একমাত্র পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করতে হয়।

পাঠ্য পুস্তক

যে পাঠ্য পুস্তকের উপর ইংরেজী-শিক্ষা নির্ভর করে তা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত হবে বলে আশা করা অন্যায় নয়। ইংরেজী ভাষার বিরাট শব্দ-সমুদ্র থেকে বাঙালীর প্রয়োজনীয় শব্দ-নির্বাচন পুস্তক রচনার প্রথম সমস্যা। সাহিত্যের পৃষ্ঠায় বহু ইংরেজী শব্দ 'মমি' হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর কালো ছায়া পড়েছে আরও কত শব্দের উপর। বিজ্ঞান ও দর্শনের পরিভাষা, পণ্ডিতের প্রিয় গুরু-গম্ভীর শব্দরাজি, কাব্যে ব্যবহৃত কাব্যগন্ধী শব্দ, নারী ও শিশুর মুখের ভাষা, বিভিন্ন বৃত্তি ও কারিগরের শব্দ, সর্বস্তরের অপভাষা প্রভৃতি এড়িয়ে আটপৌরে ব্যবহারিক শব্দ বেছে নিতে হবে বাঙালীর শিক্ষার জন্য। অপ্রচলিত বা স্বল্প-প্রচলিত শব্দ দিয়ে ছাত্রছাত্রীর স্মৃতি অযথা ভারাক্রান্ত করা হবে শক্তি ও সময়ের অপচয়।

প্রচলনের বহুলতা ও স্বল্পতার ক্রম অনুসারে কয়েক হাজার শব্দের তালিকা প্রস্তুত করে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেছেন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থর্ণডাইক। আরও বহু পণ্ডিত প্রয়োজনীয় শব্দ নির্বাচনে তাঁদের গবেষণার ফল প্রকাশ করেছেন। এতে সমস্যার পূর্ণ সমাধান হ'ল না। একাধিক অর্থবিশিষ্ট শব্দের কোন্ অর্থ বহুপ্রচলিত তা বের করা দরকার। এ কাজের ভার অর্পিত হয়েছিল ডাঃ ওয়েস্টের উপর। অনেক সহকর্মীর সাহায্যে তিনি সম্পাদন করেছেন "General Service List of English Words" নামক শব্দকোষ।

এর পর বিষয়বস্তুর কথা। মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি কোন্ বয়সে কোন্ বিষয় বালক-বালিকাদের মনোরঞ্জন করে বেশী। রূপকথার রাজ্য নিয়ে হয় জীবনের সুরু। কোন রূপকথা তাদের প্রিয় তা ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে জেনে নেওয়া আছে। প্রিয় বিষয় নিয়ে রচিত বইয়ের প্রতি শিশুরা স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। অভিভাবকের তাড়না আর শিক্ষকের রক্তচক্ষু তখন নিতান্তই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে।

পাঠ্য পুস্তকে শব্দের প্রয়োগ করা হয় পরীক্ষালব্ধ সূত্র অনুসারে। এক মানে শিক্ষণীয় শব্দাবলী প্রয়োজনের ক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠে প্রায় সমভাগে বিভক্ত করা হয়। কোন এক পাঠে সাধারণতঃ সাত আটটির বেশী নূতন শব্দ থাকে না। প্রথম পাঠের পর থেকে প্রত্যেক পাঠ পূর্ব-ব্যবহৃত শব্দ ও সাত আটটি নূতন শব্দ নিয়ে রচিত। স্কুলের শেষ মান অবধি এই শব্দ-নিয়ন্ত্রণ প্রণালী অনুসৃত হয়ে থাকে। একবার পড়া শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার নূতন নূতন পাঠে পড়তে হয় বলে তারা বিনা আয়াসে মনে গেঁথে যায়। বই পড়ার আগে শিশুরা মাতৃভাষা এই উপায়েই শেখে। শব্দ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করে এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশে ইংরেজী-শিক্ষার পথ সুগম করা হয়েছে।

এদেশে ট্রেনিং কলেজে ভাষা শিক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হয় বিদেশে ভিন্ন পরিবেশে উদ্‌ঘাপিত সূত্র অবলম্বন করে। বাংলা দেশে বাংলা ও ইংরেজী শেখার জন্য ভাষাশিক্ষার মূল সূত্রের কি পরিবর্তন আবশ্যক সে সম্বন্ধে গবেষণার কোন ব্যবস্থা নেই। ডাঃ ওয়েস্ট ব্যক্তিগত চেষ্টায়, বাংলার পরিবেশে বাঙালী ছাত্র নিয়ে পরীক্ষা করে বিদেশীর ইংরেজী শিক্ষার যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন তা-ই তাঁকে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে খ্যাতি দান করেছে। তাঁর রচিত বহুবিধ পাঠ্য পুস্তক,

ভারতের অন্য রাজ্যে, কলকাতার ইউরোপীয় পরিচালিত বিদ্যালয়ে ও এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত, কিন্তু বাঙালীর স্কুলে পড়ানো হয় তাঁর বইয়ের অক্ষম ও নির্লজ্জ অনুকরণের অনুযায়ী। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ডাঃ ওয়েষ্ট সম্পাদিত "General Service List of English Words" থেকে শব্দ নিয়ে বই রচনার নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর লিখিত পাঠ্য পুস্তক পড়াতে বলেন নি। বাঙালী ছাত্রছাত্রীদের দুর্ভাগ্য যে, প্রকাশকের ফরমায়েশে 'সাত দিনে' লেখা বাঙালী-রচিত বই পড়ে তাদের ইংরেজী শিখতে হয়। কোন অবাঙালী যদি রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ' থেকে বাংলা না শিখে পাদ্রী সাহেবের লেখা 'মথি লিখিত সুসমাচার' নিয়ে পাঠ সুরু করে তা হলে যা হয়, তাই দেখি অনেকটা এখানে। ইংরেজী শেখার পথে বাধা সৃষ্টি করে কোন কোন শ্রেণীর স্বার্থসংরক্ষণের এই চেষ্টা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

ইংরেজী শেখার স্থান, কলেজ না স্কুল

অক্ষয়কুমার দত্তের 'স্বপ্নদর্শন' পড়ে যেমন এ যুগের বাংলা শেখা চলে না—এডিসন, ষ্টীল, সুইফট, গোল্ডস্মিথ ও মেকলের লেখা পড়ে আধুনিক ব্যবহারিক ইংরেজী শেখাও তেমনি অসম্ভব। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য প্রধান পাঠ্য এঁদের লেখা। ইংলণ্ডের ইতিহাস যাদের অজানা তাদের অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতির পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটে, অপরিচিত শব্দের সঙ্গে কুস্তি লড়ে, অর্থ-পুস্তক থেকে পূর্ব-সূত্র খুঁজে খুঁজে সময় কেটে যায়, ইংরেজী শেখার ফুরসত কোথায়। কি উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী সাহিত্যের নামে ছাত্রছাত্রীদের এমন হয়রান করা হয় তা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। কলেজ যে ইংরেজী শেখার স্থান নয় তা বেশ বোঝা যায়। অথচ পরীক্ষার্থীর নিকট নির্ভুল ইংরেজীতে নিজের ভাষায় উত্তর দাবি করা হয়। ভাষা শেখানোর দায় কলেজ এড়িয়ে গেলে বাকী থাকে স্কুল। সেখানে কি হয় দেখা যাক।

ইংরেজী শেখার সময়

আগেকার দিনে ইংরেজী সুরু হ'ত তৃতীয় মানে, এখন হয় পঞ্চম মানে। তখন তৃতীয় ও চতুর্থ মানে প্রায় সাত শ' শব্দ এবং বহু ইংরেজী বাগ্‌ভঙ্গীর সহিত পরিচয় ঘটত। এখন ইংরেজী শেখার সময় মাত্র চার বছর, পঞ্চম থেকে অষ্টম মান। নবম ও দশম মানে চলে শুধু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার প্রস্তুতি। খুব ভাল ছাত্র ছাড়া কেউ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত ইংরেজী সংকলন অধ্যয়ন করে না। স্কুলের শিক্ষক অথবা কোচিং ক্লাসের 'কোচে'রা সম্ভাব্য প্রশ্নের যে উত্তর লিখে দেন তা কণ্ঠস্থ করাই বিদ্যালয়ের শেষ দু'বছরের প্রায় কাজ। এ দু'বছরের 'বাইবেল'—টেস্ট পোপারস। এ থেকে প্রশ্নের উত্তর লিখে পরীক্ষার রিহার্সেল বা মহড়া দেওয়া হয়ে থাকে। ইংরেজী সংকলন বা দ্রুত পঠনের জন্য নির্দিষ্ট বই থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রী কিছুমাত্র ইংরেজী শেখে না।

প্রতি বছর স্কুলে নীট পড়া হয় মাত্র পাঁচ মাস বা কুড়ি সপ্তাহ। সারা বছরে ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক পড়ানো হয় নব্বই ঘণ্টা; ব্যাকরণ অনুবাদ শিক্ষা ও পত্রলেখার জন্যও থাকে মোট নব্বই ঘণ্টা। চার বছরে তিন শ' ষাট ঘণ্টায় বালক-বালিকাদের ইংরেজীর ভিত্তি এমন দৃঢ় হওয়া দরকার যেন তার উপর নির্ভর করে স্কুল ফাইন্যাল ও অন্যান্য পরীক্ষায় স্বরচিত নির্ভুল ইংরেজীতে উত্তর লেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী

মাইকেল মধুসূদন বলতেন, ইংরেজী শিখতে হলে ইংরেজীতে ভাবতে হবে, স্বপ্ন দেখতে হবে, বলতে হবে ও লিখতে হবে। স্কুলে ইংরেজী পড়ানো হয় বাংলার মাধ্যমে, ইংরেজীতে কথোপকথনের ক্লাসটি তুলে দেওয়া হয়েছে, অবাঙালী ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপের ভাষা এখন হিন্দী, অভারতীয়ের সঙ্গে কথা বলার উপলক্ষ ঘটে কদাচিৎ, এমন-কি বাংলা কথার মাঝে মাঝে ইংরেজী ফোড়ন দেবার যে রেওয়াজ ছিল তাও কমে গেছে। বলতে বলতে ইংরেজী শেখার সুযোগ আর এখন নেই। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর আর আপিসের ফাইলে নোট লেখা ছাড়া ইংরেজী লেখার ক্ষেত্র শুধু চাকরি ও ছুটির দরখাস্ত। ইংরেজী লেখা বলতে মাইকেল নিশ্চয়ই এসব বোঝেন নি। বাংলাতেই এখন লঘু গুরু সকল ভাবনা ভাবা যায়, চিন্তার সূক্ষ্ম প্রভেদ ধরা পড়ে, মনোজগতের বিচিত্র ভাবধারা প্রকাশে বাংলাই সক্ষম। ভাবনা যদি বাংলায় চলে ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। প্রাক্-অসহযোগ যুগে ইংরেজী শেখার যে অনুকূল পরিবেশ ছিল তা ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে স্কুলের ক্লাসরুমে ঠেকেছে। মাটি ছেড়ে ইংরেজী চড়েছে টবে।

স্কুলে চার বছরে শ' তিনেক পাতার ইংরেজী থেকে দু' হাজারের মত শব্দ পড়ানোর কথা। বইয়ের পৃষ্ঠাসংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেন শিক্ষা অধিকার, কিন্তু এক বছরে কত পৃষ্ঠা পড়ানো হবে তা স্থির হয় শিক্ষকের ইচ্ছায়। এর ফলে কোন মানেই শিক্ষা-বিভাগ থেকে নির্ধারিত শব্দ পূর্ণ সংখ্যায় পড়ানো হয় না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীর অন্ততঃ চার হাজার ইংরেজী শব্দ জানা দরকার। কিন্তু স্কুলে পড়ার

শেষে সাধারণ ছাত্রের ইংরেজী শব্দের পুঁজি দু'হাজারে পৌঁছে কিনা সন্দেহ।

ইংরেজী পাঠের ক্লাস-ঘরে বাংলার থাকে প্রাধান্য, যদিও শিক্ষার একটি মূল নীতি এই যে, বিদেশী ভাষার ক্লাসে মাতৃভাষা যেন শোনা না যায়। ইংরেজী অর্থ বাংলায় বলা ও লেখা চলে অবাধে। এজন্যই ছেলেমেয়েদের বাংলার স্নেহ-পাশ কাটিয়ে উঠা কোনদিন সম্ভব হয় না। ইংরেজী লিখতে গিয়ে তারা বাংলা ভাবের তর্জমা করে করে এগিয়ে চলে। পরীক্ষায় চিঠি লিখতে দেওয়া হয়। বাংলায় পত্র লিখে তার ইংরেজী অনুবাদ করে দেবার উপদেশ ছাত্ররা পায় শিক্ষকের কাছ থেকে।

পাঠের সময় ইংরেজী শব্দের প্রতিপাদ্য পদার্থ বা ক্রিয়ার সহিত যোগসাধন না করে বার বার আবৃত্তি দ্বারা গাঁট বাঁধা হয়ে পড়ে ইংরেজী ও তার বাংলা প্রতিশব্দে। ইংরেজী প্রতিশব্দ মুখস্থ করলেও অবস্থার উন্নতি ঘটে না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিপাদ্য বস্তু দূরে সরে পড়ে। সকল শিক্ষার ব্যর্থতার মূলে থাকে এই অপ্রত্যক্ষ শিক্ষাপদ্ধতি।

অর্থের অসঙ্গতি বাংলায় অর্থ শেখার আর এক দোষ। "keep" ও "put" এ দুয়ের বাংলা অর্থ 'রাখা' কিন্তু ইংরেজীতে এ শব্দ দুটির অর্থ ও প্রয়োগ ভিন্ন। "doubt" ও "suspect" সম্বন্ধেও একই কথা। বাংলার অর্থ শেখায় ইংরেজী শব্দের প্রকৃত অর্থ ছাত্রেরা ধরতে পারে না।

ভাষার ব্যবহার একটি জটিল আর্ট। আর্ট মাত্রেই অবিচ্ছিন্ন তীব্র প্রয়াসের ফলে আয়ত্ত হয়। মাঝে মাঝে ফাঁক দিয়ে ঢিলেঢালা চেষ্টায় যে তা শেখা যায় না সে প্রমাণ মিলে সর্টহাণ্ড ও টাইপ শেখার সময়। প্রত্যেক আর্ট অভ্যাসের একটি মাত্রা থাকে। বার বার অভ্যাস করে সেই মাত্রায় পৌঁছলে কাজটি স্বয়ংচালিত যন্ত্রের মত মস্তিষ্কের সাহায্য-ব্যতিরেকে সম্পাদিত হয়। পাকা টাইপিষ্ট চোখ বেঁধে দিলেও টাইপ করে যেতে পারে। অভ্যাসের বলে আঙুল ঠিক জায়গায় গিয়ে পড়ে। হাঁটি হাঁটি পা পা করে সুরু করার পর আমরা এমন হাঁটতে শিখেছি যে, এখন আর চলার সময় পায়ের দিকে মন দিতে হয় না। বাংলায় দ্রুত কথা বলে যাই অভ্যাসের বশে। শুদ্ধ ইংরেজী যথাযোগ্য দ্রুততার সহিত বার বার অভ্যাস করলে তা মাতৃভাষার মত অনায়াসে জিহ্বাগ্রে বা কলমের ডগায় এসে পড়ে। অভ্যাস কম হলে সকল পরিশ্রম নিষ্ফল হয়ে যায়। ইংরেজী অভ্যাস করার রেওয়াজ আমাদের স্কুলে প্রচলিত নেই।

সঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠ ও যন্ত্রের ব্যবহার করতে না দিয়ে শিক্ষক যদি কথা ও সুরের ব্যাখ্যা করে যান, সুরকার ও কথাকারের জীবনী আলোচনা করেন, তা হলে যেমন গান শেখা হয় না, তেমনি ইংরেজীর বাংলা করে, ব্যাখ্যা করে, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উত্তর করে ইংরেজী ভাষা শেখা যায় না। ভাব গ্রহণ ও ভাষা শেখা ভিন্ন জিনিস। আমাদের স্কুল-কলেজে শেখানো হয় অধীত বিষয় থেকে ভাব সংগ্রহ করবার উপায়, ভাষা শেখান হয় না। অথচ পরীক্ষায় দাবি করা হয় ইংরেজীতে পারদর্শিতা। যা শেখানো হয় না তা দাবি করলে ছাত্র-ছাত্রীরা দলে দলে ফেল হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি।

কোচের সাহায্যে মুখস্থ করে যারা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, ইণ্টারমিডিয়েট ইংরেজীর গুরুভার তাদের অনেকে বইতে অক্ষম। সেখানে কোচের সাহায্য পাওয়াও আর্থিক সঙ্গতির বাইরে। ইংরেজীতে পাসের মান ছত্রিশ থেকে ত্রিশে নামিয়ে অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করা হয়েছে। পরীক্ষার মান নীচু করলে ত ইংরেজীর অজ্ঞতা দূর হয় না। নীচু মানের বছরেই ইংরেজীতে ফেল হয়েছে সবচেয়ে বেশী। প্রতিকার খুঁজতে হবে শিক্ষাপ্রণালীর উন্নয়নে, ইংরেজী পরীক্ষার মানের অবনমনের মধ্যে নয়।

পঞ্চবটীতে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

গোদাবরী-তীরে পর্ণকুটীরে রহেন সীতা
রঘুকুলবধূ শুচিস্মিতা,
ফুলভারনতা সে মাধবীলতা সাজায় দ্বার,
গুঞ্জরে অলি, শোনায় কাকলী বিহগ তার,
বনদেবীসমা সীতা মনোরমা, পতিসনে র'ন
আনন্দিতা।

কহেন শ্রীরাম—"নয়নাভিরাম পম্পাতীর,
হের শোভা সীতা ধরিত্রীর।
নিরমল জলে দলে দলে চলে হংসদল,
মৃণালের তরে ছেঁড়ে লীলাভরে নীলোৎপল;
চম্পা বকুলে ভরে ফুলে ফুলে শ্যামলাঞ্চল
বনশ্রীর।

বনহরিণীর বিলোল আঁখির কাজলছায়া
জাগায় যে মনে স্বপনমায়া,
তৃণমঞ্জরী ঠোঁটে চেপে ধরি' আসে সে কাছে,
ভয় নাহি মানে, চাহি মোর পানে কি যেন যাচে,
শৃঙ্গে জড়ায় বনলতিকায় দাঁড়ায় উষায়
স্বর্ণকায়া।

সারসের সারি আসে নীড় ছাড়ি তটের 'পরে,
নাড়ে ডানা উষা-তপন করে,
শুভ্র পালকে শোভায় ঝলকে স্বর্ণরেণু,
বেতসী-কাননে মৃদু সমীরণে বাজিছে বেণু
লঘু মেঘগুলি ভাসে পাল তুলি তরণীর মত
নীলাম্বরে।

নিষাদবালিকা গুঞ্জামালিকা কণ্ঠে পরি'
চলে ধীরে ধীরে ধনুটি ধরি'।
পিঠে দোলে তূণ, নয়নে আগুন, শিকারে মাতে,
পদসঞ্চার বনপথে তার নিত্য প্রাতে,
তব পাশে আসি' লাজে মৃদু হাসি' নত করি' শির
যায় সে সরি'।

আশ্রমবাসী ঋষিদল আসি' সমিধ-তরে
শুষ্ক তরুরে তাড়না করে,
হায়, তারি শাখে ফুললিপি আঁকে কোন্ সে লতা,
শুষ্ক শাখায় স্মৃতিশয্যায় তন্দ্রাগতা,
সহসা কখন সহিয়া পীড়ন ভগ্ন শাখারে
আঁকাড়ি ধরে।

নীলচূড়াশিরে শিখীদল ফিরে খুঁজিতে ফণী,
কণ্ঠে জাগায়ে কেকাধ্বনি।
জলপ্রপাতের গুরুনিনাদের ডমরু বাজে,
ভাবি' মেঘরব নাচে শিখীসব কলাপসাজে,
হেমরবিকরে নবশোভা ধরে পুচ্ছমাঝারে
চন্দ্রমণি।

বন্দনা-গান গাহি করে স্নান তাপসবালা,
তুলি কুবলয় গাঁথে সে মালা;
ইঙ্গুদী স্নেহে চর্চ্চিতদেহে আসে সে ধীরে,
বসি নির্জ্জনে রত প্রসাধনে পম্পাতীরে,
ছুটি আঁখি তার তরে কামনার ভস্ম-লুকানো
বহ্নিজ্বালা।

হেথা বারমাস ফেলে নিঃশ্বাস তোমার পাশে
দক্ষিণ বায়ু লাজে ও ত্রাসে।
তব কুন্তল ছুঁয়ে চঞ্চল মরমে মরে,
তাই পদতলে লোটে তৃণদলে ভকতিভরে,
স্রক-হবিভার-গন্ধ এবার আনে সে তোমার
অর্ঘ্য-আশে।

হের সীতা আজ পরি' নবসাজ হাসিছে ধরা
কত বিচিত্র সুবাসভরা।
আমরা দু'জনে বিহগকূজনে শুনি যে গীতি,
তারি মাঝে হায়, মনে পড়ে যায় হারানো স্মৃতি,
নদীকল্লোলে বনহিল্লোলে এল যে জীবন
নূতন-গড়া।

ছাড়ি শতদল ভৃঙ্গের দল আকুল প্রাণ
আসে নিতে তব মুখের ঘ্রাণ।
তুমি বার বার তুলি ঝঙ্কার কাঁকন-করে
কর প্রতিরোধ, তবু সে অবোধ কভু না সরে,
তুমি শেষে হায়, ডাকিয়া আমায় মিনতি জানাও
করিতে ত্রাণ।

পঞ্চবটীর লতাবিটপীর শ্যামলকায়ে
বাঁধি হিন্দোল দক্ষিণা বায়ে
চির-ঈপ্সিতা ধরা দেবে সীতা নূতনরূপে,
পূজি কান্তারে প্রেমদেবতারে আরতি-ধূপে?
অযোধ্যা হায়, কোথায় লুকায়, স্বর্গ নামে যে
মর্ত্ত্য-ছায়ে!

রাজ-আভরণ তুচ্ছ এখন এ বনবাসে,
ফুলসাজে যবে দাঁড়াও পাশে!
তন্দ্রাবিধুর গন্ধ মধুর কাননতলে
সারাটি দুপুর বাজে যে নূপুর নির্ঝর-জলে,
বনলক্ষ্মীর চপল অধীর চরণের ধ্বনি
বাতাসে ভাসে!

অতীতের স্মৃতি ব্যথাভরা গীতি থাকুক দূরে,
বেদনার মেঘ যাক সে উড়ে।
লক্ষ্মণ-সাথে পূর্ণিমা রাতে শিকারে গিয়া
বনবীথিকায় স্মরিব তোমায় হে মোর প্রিয়া,
আলো আর ছায়া সৃজিবে যে মায়া হেরিব তোমারে
সে বনপুরে।

ছায়া-ঘনবনে বেণুনিঃস্বনে অর্দ্ধরাতে
জড়াবে না মোরে ও দুটি হাতে?
চারু জ্যোছনায় কি তৃষা জাগায় কল্পলোকে,
সে রূপালি আলো লাগিবে কি ভালো তোমার চোখে?
কার্ম্মুক ধরি সজাগ প্রহরী দূরে লক্ষ্মণ
রহিবে সাথে।

স্বর্গ কোথায় জানি-না'ক হায়, তবু যে মন
চাহে প্রেমপূত ও যৌবন।
পঞ্চবটীর পম্পার তীর স্বপন গড়ে,
লতায় পাতায় শ্যামসুষমায় অমৃত ঝরে,
সেথা এ কুটীরে দু'জনায় ঘিরে রচিব স্বর্গ
অনুক্ষণ।"

শ্রীদীপক চৌধুরী

তিন

পরের দিন সকালবেলা বলরামকে ঘুম থেকে তোলবার জন্যে মাসীমা দোতলায় উঠে এলেন। ছাদে ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, হাঁফিয়ে পড়েছেন। বলরামের ওপর রাগ হ'ল তাঁর। সরকার-কুঠিতে এত জায়গা থাকতে ছেলেটা ছাদে গেছে কেন ঘুমোতে? বাগানেও ত জায়গার অভাব ছিল না। ছাদের দরজায় আজ তালা লাগিয়ে দেবেন বলে মনে মনে স্থির করলেন মাসীমা। তার পর তিনি ধীরে ধীরে ছাদের সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন।

টাইগার বসে ছিল বলরামের পাশে। মাসীমাকে দেখে সে লেজ নাড়তে লাগল। পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল সে। মাসীমা দেখলেন, গত কয়েক দিনের মধ্যে টাইগারের চেহারা গেছে বদলে, ঘাড়ে-গর্দানে মাংস গজিয়েছে। পাঁজরার হাড়গুলোও আর দেখা যাচ্ছে না। বলরাম কি তবে হেঁসেল থেকে ভাত চুরি করে করে টাইগারকে খাওয়াচ্ছে? কাল রাত্রে বিজয় মাস্টার হোটেল-খরচার হিসেব করছিল। প্রতি সপ্তাহের হিসেব বিজয়ই লিখে দেয় মাসীমাকে। কাল সে হিসেব করে মাসীমাকে বলেছিল যে, গত সপ্তাহে সেরদশেক চাল বেশী খরচ হয়েছে। টাইগারকে সামনে দেখতে পেয়ে মাসীমার সন্দেহ যেন সত্যে পরিণত হ'ল। বলরাম নিশ্চয়ই শম্ভু ঠাকুরের চোখে ধুলো দিয়ে ভাঁড়ারঘর থেকে চাল সরাচ্ছে। স্বাধীন ভারতবর্ষে চালের দাম এত বেশী বেড়ে গেছে যে, নতুন করে পরাধীনতার শিকল পরতেও আপত্তি ছিল না মাসীমার। সকালবেলা দোতলার ছাদে উঠে মনের শান্তি নষ্ট হ'ল মাসীমার। বলরামের ওপর রাগ বাড়তে লাগল। এক-জনের খাবার তিনি কোন রকমে যোগাড় করছিলেন। এখন দেখছেন, টাইগারকেও সে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত খাওয়াচ্ছে!

ধাক্কা দিয়ে টাইগারকে একদিকে সরিয়ে দিলেন মাসীমা, তার পর বসে পড়লেন বলরামের পাশে। বলরাম চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছিল। বুকের ছাতি চওড়া হয়েছে। হাতের পেশীতেও নতুন মাংসের গোলাকৃতি মসৃণতা। এত মসৃণতা এল কেমন করে? বলরাম কি তবে স্নানের আগে সরষের তেল গায়ে মাখে? গত সপ্তাহে সেরদুয়েক তেল বেশী খরচ হয়েছে বলে বিজয় মাস্টার হিসেব লিখল কাল। বুড়ো বয়সের রাগ সহজে কমতে চায় না। মাসীমা বলরামের দুটো কানই দু'হাত দিয়ে টেনে ধরলেন। টাইগার ছুটে এসে মাসীমার মুখের দিকে চেয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করে গর্জন করতে লাগল।

কানে টান পড়েছে বলে বলরামের ঘুম ভাঙল না। ঘুম ভাঙল টাইগারের গর্জন শুনে, উঠে বসল সে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "টাইগার চেঁচাচ্ছে কেন, মাসীমা?"

"চেঁচাবে না? জানোয়ারের পর্যন্ত কর্তব্যবোধ আছে, তোর নেই। কত বেলা হ'ল দেখ ত। ষষ্ঠীর সঙ্গে বাজারে যাবি নে? বাজার বইবার জন্যে মুটে ভাড়া করতে হবে নাকি রে?"

"মুটে কি আর আমার চেয়ে বেশী মোট বইতে পারবে মাসীমা? আমি যাচ্ছি।" এই বলে বলরাম উঠল। বার-দুই আড়মোড়া ভাঙল সে। তার পর ফস করে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা মাসীমা, তুমি কি আমার কান মলেছিলে?"

"কখন?"

"আমি যখন ঘুমোচ্ছিলাম?"

"না রে, আদর করছিলাম।"

"ঠিক ত?" ঘাড়টা বাঁকা করে দাঁড়িয়ে রইল বলরাম।

একটু হেসে মাসীমা বললেন, "ঘুমের মধ্যেও দেখছি বাঙালের গোঁ যায় না।"

এর পর বলরাম আর অপেক্ষা করল না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল নীচে। টাইগারও ছুটল ওর পিছু পিছু।

ফেরবার মুখে দোতলায় নেমে মাসীমা দেখলেন, সুতপার ঘরে তখনও আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা। লাহিড়ীসাহেব কালরাত্রে চলে যাওয়ার পরে সুতপা দরজা বন্ধ করে নি, করবার দরকার হয় নি। রতনের ঘর থেকে উঠে এসে সে বসেছিল টেবিলের সামনে। ঘুম আসে নি আর। মাথায়

ঠিক সামনে দেওয়ালের গায়ে একশ' পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছিল। হাত বাড়ালেই সুইচটার নাগাল পেত সে, কিন্তু আলোটা নিবিয়ে দেওয়ার কথা ওর মনেই পড়ে নি। একটুখানি ভুলের জন্যে 'বিলে'র অঙ্ক বড় হ'ল। সকাল থেকেই মাসীমা আজ দেখতে পাচ্ছেন, হোটেলের কোথাও যেন কেউ হিসেব মেনে চলতে চাইছে না।

"এমন বেহিসেবী হলে হোটেলটা চলবে কি করে তপা?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন মাসীমা। সুতপার মুখের দিকে চেয়ে তিনি সহসা থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। উবু হয়ে টেবিলের ওপর দৃষ্টি ফেললেন তিনি। একশ' পাওয়ারের বৈদ্যুতিক আলোয় মাসীমা দেখতে পেলেন যে, টেবিলের কাঠ ভিজে ভিজে নরম হয়ে গেছে। এত নরম হয়েছে যে, সকালের দিকের চোখের জল আর সে শুষে নিতে পারে নি। টেবিলের কিনারা দিয়ে জলের একটা সরু স্রোত গড়িয়ে পড়ছে মেঝের ওপর। মাসীমা সুতপার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন।

কথা কিছু হ'ল না। দুটো মনের আদান-প্রদানের পথ বাইরে থেকে দেখাও গেল না। সুতপা হাত বাড়িয়ে সুইচটা শুধু তুলে দিল ওপর দিকে। তারপর চেয়ারের ওপর থেকে তোয়ালেটা টেনে নিয়ে সে ঢুকে পড়ল স্নানঘরে। মাসীমা কোনকিছুই জানতে চাইলেন না। বেরিয়ে আসবার আগে তিনি তাঁর শীর্ণ হাতের পাঞ্জাটা ফেলে রাখলেন টেবিলের ওপর। জল পড়ে পড়ে যে জায়গাটুকু ভিজে চুপসে গিয়েছিল তার সঙ্গে মাসীমার যোগাযোগ ঘটল। জলের স্রোত আর নেই, শুকিয়ে উঠেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন মাসীমা, বারান্দায় বেরিয়ে এলেন তিনি। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে ভাবলেন, সুতপা বোধ হয় লালুকে আজও ভুলতে পারে নি। ওর চোখের জলের স্রোতে লালু নিশ্চয়ই এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। শীর্ণ আঙুলগুলো আর তাঁর কোন কাজেই লাগবে না। লালুকে ডাঙায় টেনে তোলবার মত শক্তি তাঁর নেই।

ইনজেকশন কিনে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে সুতপা যখন হোটেলে ফিরে এল তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আপিসে পৌঁছবার নিয়ম দশটায়। ছোটসাহেব ক্ষমা করলেও বড়বাবু হয়ত ক্ষমা করবেন না। আজ ক'দিন থেকেই সুতপার লেট হচ্ছে। ডাক্তারকে বিদায় করে গড়িয়ার মোড়ে এসে যখন সে পাঁচ নম্বরে উঠে বসল তখন পৌনে বারোটা। এমন অসময়ে আপিসে গিয়ে লাভ হবে না কিছু। এক দিনের জন্যে ছুটি নেওয়াই ভাল। ছুটি নিলে ত বড়বাবু খুশী হন। আপিসের কাজ না চললে নতুন স্টেনো নিয়োগ করবার জন্যে তিনি বড়সাহেবের কাছে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। সুতপা বাস থেকে নেমে পড়ল গড়িয়াহাটের মোড়ে। রাসবিহারী এভিন্যু পার হয়ে এসে আট নম্বর বাসষ্টপের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল। আট নম্বর ধরে দেওদার ষ্ট্রীটে যাওয়াই সে স্থির করেছে।

ছোটসাহেবের বাড়ীর নম্বরটা ওর জানা ছিল। মিসেস লাহিড়ীর সঙ্গে দু'একবার ওর দেখাও হয়েছে। হেণ্ডারসন সাহেবের বিদায়-সভায় তিনি এসেছিলেন। লাহিড়ীসাহেব পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সবিতা দেবীর সঙ্গে। সুতপার মনে আছে ওকে দেখে তিনি মনে মনে খুশী হয়েছিলেন খুব। স্বামীকে তাঁর সুতপার মত স্টেনোগ্রাফার কোনদিনই বিচলিত করতে পারবে না ভেবে নিশ্চিন্ত বোধ করেছিলেন তিনি।

দেওদার ষ্ট্রীটে পৌঁছে ওর মনে হ'ল, সেদিনকার অপমানের খোঁচা আজও সে ভুলতে পারে নি। সবিতা দেবীর জানা উচিত যে, সুযোগ ও সুবিধে পেলে দেবতুল্য স্বামীদেরও মানুষ হওয়ার লোভ হয়, তখন লাহিড়ী দেবতা নন, মানুষ।

সবিতা দেবী শুয়ে ছিলেন, ঘুমোন নি। খবর পেয়ে তিনি নেমে এলেন একতলায়। অযাচিত অভ্যর্থনায় সুতপাকে অভিভূত করে ফেললেন তিনি। ওর হাত ধরে সবিতা দেবী অনুরোধ করলেন, "চল ভাই ওপরে। শোবার ঘরে বসে গল্প করি। আজ ক'দিন থেকে ভাবছিলাম আমার একজন বন্ধু দরকার। জান, আমার একজনও কেউ বন্ধু নেই? তুমি আমার বন্ধু হবে ভাই?"

অপমানের কথা আর মনে রইল না সুতপার। সবিতা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে এল দোতলার ল্যাণ্ডিং পর্যন্ত। এখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ল্যাণ্ডিং-এর ঠিক পাশেই মস্ত বড় একটা অয়েল-পেণ্টিং। সবিতা দেবী বললেন, "এটা আমার খোকার ছবি। খোকা—খোকা—"

সবিতা দেবী ছবিটা হাত দিয়ে চেপে ধরলেন। আরও বার দুই 'খোকা খোকা' বলে ডাকলেন তিনি। তার পর সুতপার দিকে চেয়ে ঘোষণা করলেন, "খোকা মরে গেছে! জান খোকা কেন চলে গেল? আমার পাপের জন্যে। ছ' মাসের শিশুকে আমি মেরে ফেললাম!"

সুতপা বলল, "চলুন, ভেতরে যাই। এসেছি যখন সব কথাই শুনব।"

"ছিঃ ছিঃ, পাপের কথা বলি কি করে?"

"আমি আপনার বন্ধু, আমাকে না বললে আর কাকে বলবেন?"

এই বলে সুতপাই এবার সবিতা দেবীকে ঘরের মধ্যে

নিয়ে গেল। যেন কোম্পানীর ভাড়া নেওয়া বাড়ীটার ওপর সুতপারও অধিকার আছে। যেন বাড়ীটার প্রতি ইঞ্চি জায়গা ওর চেনা।

সামনেই বসবার ঘর। ঘরের মধ্যে ঢুকে সুতপার সত্যিই মনে হ'ল যে, এমন সাজানো-গোছানো বাড়ীটায় ওর একদিন থাকবার সৌভাগ্য হবে। কেমন করে এবং কোন্ পথ দিয়ে যে সৌভাগ্য আসবে তা সে জানে না। বাড়ীতে পা দেবার পরেই ওর মনে হয়েছে, এটা পরের বাড়ী নয়।

সবিতা দেবী বললেন, "কোম্পানীর বাড়ী। আমাদের ভাই ভাড়া দিতে হয় না। আসবাবপত্র যা দেখছ সবই কোম্পানীর পয়সায় কেনা। উনি যদি এখান থেকে বদলি হয়ে বোম্বে চলে যান, তা হলে বোম্বের ছোটসাহেব আবার এখানে এসে উঠবেন। যাওয়ার আগে আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে রেখে যাব। বোম্বে আপিসের ছোটসাহেবকে তুমি চেন ?"

"না।"

"ব্যাচিলার ভদ্রলোক, বাঙালী। বয়স ত কম হ'ল না, ওরই মত বয়স। বিয়ে করলেন না, মানে—"

বাধা দিয়ে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "লাহিড়ী সাহেব কি বোম্বে বদলি হচ্ছেন নাকি ?"

"না না, বদলির কোন কথাই হয় নি। আমি ভাবছি যদি কখনও বদলি হন—মানে, আমি নিজেই ভাই কলকাতায় থাকতে চাইছি না। কলকাতা অসহ্য হয়ে উঠেছে, আমার পাপের জন্যে খোকা এখানে মরে গেল।"

নতুন জটিলতার সন্ধান পেল সুতপা। কেমন করে যেন সেই পুরনো ভয়টা, বেঁচে থাকবার ভয়টা, ওর পিছু পিছু দেওদার ষ্ট্রীট পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। জীবনের নতুন ডালেও মানুষকে অসহায়তার কুটো দিয়ে ঘর বাঁধতে হয়। চুণ, সুরকি, সিমেণ্ট, বালির মধ্যেও মৃত্যুর নিশ্চয়তা সগৌরবে বিদ্যমান। সুতপা শক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

সবিতা দেবী বললেন, "চল, আমাদের শোবার ঘরে গিয়ে বসবে।"

"হ্যাঁ, তাই চলুন।"

ছোটসাহেবের শয়ন-কক্ষে এসে ঢুকে পড়ল সুতপা। ঘরের মাঝখানটায় একটা ডবল খাট পাতা রয়েছে। খাটের ঠিক পাশেই লম্বা খাঁচের ঝালর-দেওয়া টেবিল ল্যাম্প। তার নীচে গোলাকৃতি একটা টেবিল। টেবিলের ওপরে তিন-চারখানা বাংলা নভেল। ঘরখানা যদি সুতপার হ'ত ? ডিনার খাওয়া শেষ করে খাটের কিনারায় হেলে বসে উপন্যাসের পাতা ওলটাত সুতপা।

খাটখানার দিকে সুতপাকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতে দেখে মিসেস লাহিড়ী বললেন, "বাজারে যা ডবলখাট বলে বিক্রি হয় এটা তার চেয়েও বড়। আমরা বদলি হয়ে গেলে সীতাংশু এটা ব্যবহার করবে। সীতাংশু একলা মানুষ, এত বড় খাট দেখে সে আবার ভয় না পায়!"

"সীতাংশু ? তিনি কে ?" জিজ্ঞাসা করল সুতপা।

খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে মিসেস লাহিড়ী জবাব দিলেন, "বোম্বে আপিসের ছোটসাহেব।"

"তাঁকে আপনি চিনলেন কি করে ?"

"ওমা, কেন চিনব না ? আমার স্বামী আর সীতাংশু একই সঙ্গে অফিসার হয়ে এই আপিসে কাজ নিয়েছিল। সে প্রায় দশ-বারো বছর আগেকার কথা। আমার তখন সবে-মাত্র বিয়ে হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা সীতাংশু আসত, গল্প করত—সীতাংশুর মত বলিষ্ঠ পুরুষ লাখের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না।"

"কিন্তু আপনার ত তখন বিয়ে হয়ে গিয়েছে ?"

"হ্যাঁ ভাই, সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তবুও কেন যেন মনে হ'ত, বলিষ্ঠতার স্বাদ আমি পাই নি। সুতপা, তুমি আজ আপিসে যাও নি ?"

"না।"

"কেন ?"

"বিশ্রাম করবার জন্যে ছুটি নিয়েছি। ছোট ভাইটার অসুখ যাচ্ছে।"

"আমার কাছে এলে কেন ?"

"অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম, আপনার সঙ্গে এসে আলাপ করব। ছোটসাহেবের কাছে প্রায়ই শুনতাম, আপনার নাকি অসুখ হয়েছে—"

"অসুখ ?" মিসেস লাহিড়ী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "আমার অসুখের কথা তিনি তোমায় বলতে যাবেন কেন ? তুমি তাঁর স্টেনো, তোমার সঙ্গে তাঁর এত বেশী ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে হ'ল ?"

"আপনার অসুখ হওয়ার পর থেকে।"

"যাক, আমি বাঁচলাম। আমিও ভাই চেয়েছিলাম, লাহিড়ীসাহেব একটু পাপ করুক। লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসুক সে। সীতাংশুকে ভালবাসতাম বলে আর সে আমায় কথা শোনাতে পারবে না। দুজনেই আমরা সমান পাপী। তুমি একটু বস ভাই, টেলিফোন করে আসি।"

"হঠাৎ কাকে টেলিফোন করতে চললেন ?"

"ছোটসাহেবকে।" এই বলে উঠে পড়লেন সবিতা দেবী।

ভয়ে সুতপা এবার আড়ষ্ট হয়ে গেল। পরিস্থিতি

আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে ওর। নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে আর বোধ হয় দু'মিনিটও লাগবে না। পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনবার পথ খুঁজতে লাগল সুতপা রায়। সে বলল, "ছোটসাহেব এখন আপিসে নেই। শ্যামনগরের নতুন কারখানাটা পরিদর্শন করতে গেছেন তিনি। আপনি কি শোনেন নি, সেখানে আমাদের একটা নতুন কারখানা খোলা হ'ল? দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেলুনটাকে আকাশে উড়িয়ে রাখবার জন্যে আমরা গুটিপাঁচেক নতুন কারখানা খুলছি।"

"সেখানে কি তৈরী হবে?"

"অক্সিজেন—মানে, এখন আর ছোটসাহেবকে টেলিফোন করে লাভ নেই। আপনি ত বুঝতেই পারছেন, সংসারে যদি সতীর সংখ্যা কমে গিয়ে থাকে, তা হলে সৎ-এর সংখ্যা বাড়তে পারে না। আসলে সৎ এবং সতী এই কথা দুটো আপেক্ষিক। মিসেস লাহিড়ী আপনি যে সীতাংশুকে ভালবাসেন সেকথা কি লাহিড়ীসাহেব জানেন না—"

"না। সন্দেহ করেন। কিন্তু আমি ত সীতাংশুকে আর ভালবাসি না—"

"কবে থেকে?"

"যেদিন খোকা আমার মারা গেল। পাপ করছি বলেই ত সে মরল। এই খাটে শুয়েই সে চোখ বুজল।"

"এই খাটখানা বরং বেচে ফেলবার বন্দোবস্ত করুন। কোম্পানীর টাকার অভাব নেই, ওরাই আবার নতুন খাট কিনে দেবে। আমি আজ উঠি।" সুতপা উঠে পড়ল।

"আবার কবে আসবে? আমি একজন সত্যিকারের বন্ধু চেয়েছিলাম।"

"আমি আবার আসব। বণিক-আপিসে ছুটিছাটার সুযোগ বড় কম।" একটু থেমে সুতপাই আবার বলল, "ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, হয়ত কিছুদিনের মধ্যে চাকরিটা চলে যাবে আমার। তখন আমরা লম্বা ছুটি পাব। আপনার গল্প শোনবার জন্যে ছুটে আসব—"

"বাসের ভাড়া লাগবে না?"

"লাগবে। ফুরিয়ে গেলে আপনার কাছ থেকে চেয়ে নেব। আপনার হাতে ত দু'জন ছোটসাহেব রয়েছেন—তাঁদের দু'জনের মাসিক আয় চার হাজার টাকা। গড়িয়া থেকে দেওদার স্ট্রীটে পৌঁছতে আমার আজ চৌদ্দ পয়সা লেগেছে। মিসেস লাহিড়ী, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোক ভাত কিংবা রুটি খাওয়ার জন্যে দৈনিক চৌদ্দটা পয়সাও যোগাড় করে উঠতে পারে না। গড়িয়ায় ফিরে যেতেও আমার চৌদ্দ পয়সা লাগবে। তা লাগুক আপনার গল্প শোনবার জন্যে সাত আনা করে আমি খরচ করব আর চাকরিটা যদি যায়—"

"চাকরি যাবে কেন? কি অপরাধে চাকরি যাবে?"

"চাকরি থাকাটাই ত অপরাধ—" সুতপা বেরিয়ে এল ছোটসাহেবের শয়ন-কক্ষ থেকে, "আমি এখানে এসেছিলাম লাহিড়ীসাহেব শুনলে কি মনে করবেন জানি না।"

"তুমি ত ভাই বন্ধুর কাজই করে গেলে। আচ্ছা তোমার চাকরি যদি না থাকে, তা হলে তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে কোথায়?"

"সীতাংশুর সঙ্গে আপনার দেখা হ'ত কোথায়?"

"আমাদের পণ্ডিতিয়া রোডের পুরনো বাড়িতে। তোমার মত আমার ত স্বাধীনতা ছিল না, তুমি স্টেনো—"

"তা ঠিক, আমি স্টেনো, আমার স্বাধীনতা আছে। আমি যেখানে-সেখানে যেতে পারি, কিন্তু সকলের সে স্বাধীনতা নেই। নমস্কার মিসেস লাহিড়ী। আমি আপনাদের দেওদার স্ট্রীটের নতুন বাড়ীতে আবার আসব।" সুতপা তরতর করে নেমে এল একতলায়। সামনেই বাইরে বেরোবার দরজা। পেছন দিকে দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করল না সে। সবিতা দেবী দাঁড়িয়ে রইলেন সিঁড়ির ওপরে। নিচে নামবার সময় পেলেন না তিনি। সুতপা মুহূর্তের মধ্যেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

গলির মুখে মাষ্টার বুইকটা থেমে গেল। গাড়ি চালাচ্ছিল আপিসের ড্রাইভার রঘুনন্দন সিং। লাহিড়ীসাহেব বসেছিলেন পেছনের সীটে, সুতপা শুনল, তিনিই ড্রাইভারকে গাড়িটা থামাতে বললেন। সুতপা পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তায় এসে নম্বর-দেওয়া বাস ধরবার জন্যে ছুটছিল বটে, কিন্তু ওকেও থামতে হ'ল। ছোটসাহেব গাড়ি থেকে মুখ বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "এদিকে কি মনে করে, মিসেস রায়?"

রঘুনন্দন সিং ঘাড় ফিরিয়ে সুতপাকে দেখল।

সুতপা বলল, বেড়াতে এসেছিলাম। আপনি আজ এত তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরছেন কেন?"

"কাল রাত্রিতে একেবারে ঘুম আসে নি। মানে বাকি রাতটুকু এক রকম জেগেই কাটালাম।" সুর নীচু করে তিনিই আবার বললেন, "আপিসে বসে ঘুমোনো কি ভাল? বাড়ী ফিরলাম ঘুমোবার জন্যে। সবিতার সঙ্গে আলাপ হ'ল?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

"আপিসে যাও নি কেন?"

"ছুটি নিয়েছি—"

"ক'দিনের ?"

"সাত দিনের।"

"কৈ, আমি ত কোন ছুটির দরখাস্ত পাই নি ?"

"দরখাস্ত করব কাল সকালে—চলি সার।"

"দাঁড়াও। চল না, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি ?"

"এই সময়ে ? মানে ফিরতে কত রাত হবে !"

"সেখানে ত ডাকবাংলো আছে—"

"ডবল খাটের ব্যবস্থা সেখানে নেই।" শাড়ির আঁচলটা বুকের ওপর ভাল করে টেনে দিয়ে সুতপা সরে এল ওখান থেকে।

লাহিড়ীসাহেব বললেন, "তোমার বদলির ব্যবস্থাটা এই সপ্তাহের মধ্যেই পাকা করব।"

গড়িয়ায় ফিরে আসতে সন্ধ্যেই হয়ে গেল। হোটেলের বাসিন্দারা কেউ তখনও ফেরে নি। দোতলায় ওঠবার সময় সুতপা লক্ষ্য করল, মাসীমা মাদুর বিছিয়ে একতলার বারান্দায় বসে আছেন। এমন জায়গায় বসে আছেন যেখান থেকে সবারই আসা-যাওয়ার পথটা দেখা যায়। সুতপার পায়ের শব্দ পেয়েই তিনি বললেন, "বড্ড গরম পড়েছে। ভাবছি আজ রাত্রে এখানেই শুয়ে থাকব। এই বয়সে কাউকে ত আর ভয় করবার কিছু নেই। হ্যাঁরে তপা, শুনলাম ছোটসাহেব নাকি বোম্বে গিয়েছিলেন ?"

"তুমি শুনলে কার কাছে ? মহীতোষবাবু বললেন বুঝি ?"

"চণ্ডীর কাছে শুনলাম। কাল সকালে সে ছোট-সাহেবের কাছে যাচ্ছে। আমি ত যেতে ওকে বারণ করলাম।"

"কেন ?"

"বিচার-ফল শুভ নয়। বৌয়ের মন পাওয়ার জন্যে তাঁকে নাকি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। চণ্ডীর গণনায় কখনও ভুল থাকে না।"

সুতপা মাসীমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনছিল না। সে ভাবছিল, গত রাত্রের ব্যাপারটা কি তিনি জানতে পেরেছেন ? ছোটসাহেবকে হয়ত বা কেউ দেখে থাকবে। রাত একটা বেজে গিয়েছিল বটে, কিন্তু বঙ্কীদা ত জেগে ছিল। ছাদের ওপর থেকে বলরামও দেখে থাকতে পারে। হয়ত বা রতনের কাছ থেকেই তিনি শুনেছেন। সিঁড়ির পাশে শুয়ে মাসীমা বোধ হয় আজ রাত্রে পাহারা দেবার মতলব করেছেন। কথাটা ভাবতে গিয়ে সুতপার আত্মসম্মানে আঘাত লাগল খুব, সে উঠে এল দোতলায়। ছোটসাহেব যদি আজ রাত্রেও এখানে আসতে সাহস করেন

বিছানায় শুয়ে পড়ল সুতপা। ভয় করছিল ওর। জীবনটাকে খানিকটা গুছিয়ে এনেছিল সে। ভাবছিল, সব চেয়ে বড় সঙ্কটটা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। বাঁচবার স্বাধীনতা আয়ত্তে আসবার পরে পৃথিবীর কোনদিকেই দৃষ্টি ফেলবার দরকার হয় নি। মাসীমাকে মাসের টাকা চুকিয়ে দিলেই দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ওর ঘুচল। কিন্তু গত ক'দিনের মধ্যেই সব আবার ওলটপালট হয়ে গেছে। স্বাধীনতালাভের স্বল্প ভূমিতেও ফাঁকির অঙ্কুর ফুটে বেরুচ্ছে। অস্তিত্বের পরমায়ু কত ক্ষীণ !

ভেবে আর লাভ নেই। ভাবনার ওপরেই বা ওর স্বাধীনতা কোথায় ? ছোটসাহেব নাও আসতে পারেন। সুতপা কি সবিতা দেবীর কাছে স্বীকার করে আসে নি যে, ওর সঙ্গে ছোটসাহেবের ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে ? বলতে বাধ্য হয়েছিল সুতপা। ছোটসাহেবের নৈশ অভিযানের ইতিহাস সবিতা দেবীর জানা উচিত।

বারদুই বলরামকে পাঠিয়ে খবর নিলেন মাসীমা। না, আজ রাত্রিতে সুতপা আর নীচে নামতে পারবে না। শরীরটা ভাল নেই বলে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই, খেলও না সে, ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল মধ্যরাত্রিতে। সরকার-কুঠির সর্বত্র নিরেট নির্জনতা। উঠে বসল সুতপা। আলোটা জ্বালিয়ে রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘরের দরজাও খোলা। এমন ভুল ত ওর কখনই হয় না। তবে কি সে ইচ্ছে করেই দরজায় খিল লাগায় নি ? অচেতন মনের দরজায় খিল লাগানো সহজ নয়। সুতপা বোধ হয় চেয়েছিল, ছোটসাহেব আসুক। আসবে মনে করে সে আলো নেবায় নি, আপিসের সাড়ি পরে সতর্কভাবে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল সুতপা। এখান থেকে বাগানের বড় ফটকটা দেখা যায়। মধ্যরাত্রির অন্ধকারে এখন অবশ্য ফটকটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু মাস্টার বুইকটা এলে নিশ্চয়ই দেখা যাবে। আসবেই মনে করে সুতপা পায়চারি করতে লাগল লম্বা বারান্দাটার এ কোণ থেকে সে কোণ পর্যন্ত।

উল্টো দিকের কোণায় মাসীমা শুয়েছিলেন। মাদুরের ওপর পা পড়তেই চমকে উঠল সুতপা। জিজ্ঞাসা করল সে, "মাসীমা, তুমি দোতলার বারান্দায় উঠে এলে কখন ?"

"গরমে টিকতে পারলুম না রে—বলরামের সঙ্গে ছাদে যাচ্ছিলাম শুতে। তোর ঘরের দরজা খোলা দেখে ভাবলাম, এখানেই শুয়ে পড়ি। এই বয়সে শোবার জন্যে ত সমারোহ কিছু করতে হয় না। হ্যাঁ রে তপা, আজকাল আলো জ্বালিয়ে শুতে যাস কেন ?"

"নেবাতে ভুলে গিয়েছিলুম।"

"অনর্থক পয়সা নষ্ট হচ্ছে যে—"

"বেশী পয়সা যা লাগবে আমি দিয়ে দেব। মাসীমা তুমি এখনও জেগে রয়েছ কেন?"

"এই বয়সে শুলেই কি ঘুম আসে রে?" মাসীমা হাই তুললেন, "যা, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়গে যা।"

"যাচ্ছি।" সুতপা তবু গেল না, রেলিঙের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। চেয়ে রইল অন্ধকার ফটকের দিকে। একটু বাদেই চমকে উঠল সুতপা। টাইগারের গলার আওয়াজ এল ফটকের দিক থেকে। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "মাসীমা, টাইগারকে আজ বেঁধে রাখ নি? এটা ত গৃহস্থবাড়ী নয়, হোটেল। যখন-তখন লোক আসতে পারে।"

"বলরাম বোধ হয় ভুল করেছে। টাইগারের ত দোতলার ছাদে থাকবার কথা। কেন, টাইগারকে বাগানে দেখলি নাকি?"

"ফটকের দিক থেকে আওয়াজ শুনতে পেলুম। মনে হ'ল টাইগারের গলা।"

"বড্ড তেজ বেড়েছে কুকুরটার।" এই বলে দ্বিতীয় বার হাই তুললেন মাসীমা।

"বাড়বে না? বলরাম ওকে দিনরাত মাছভাত খাওয়াচ্ছে। কে জানে, হয়ত দুধের কড়াই থেকেও দুধ চুরি করছে বলরাম। মাসীমা, কাল থেকে রতনের দুধটা না হয় আমার ঘরেই রেখে দিও। বলা যায় না, বলরাম হয়ত কড়াইয়ে জল ঢেলে রাখে। ওরা সব করতে পারে। রতন আর টাইগারের মধ্যে যে তফাৎ আছে তা বোধ হয় বলরাম বুঝতে পারে না।"

"একথা কেন বলছিস রে তপা?"

..."রতন শুয়ে থাকে, আর টাইগার ওর পিছু পিছু ছুটতে পারে বলে বলরাম কুকুরটাকে ভালবাসে বেশী।"

ভেবে চিন্তে মাসীমা বললেন, "বলরাম ওর নিজের ভাত থেকে ভাগ দেয় টাইগারকে। এখন শুতে যা তপা, রাত জেগে ভাগ স্বাস্থ্যটাকে নষ্ট করিস নে, পরে আর কোন কাজেই লাগবে না।"

সুতপা চলে এল ওখান থেকে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার সময় এটা নয়। এক সের চালের ভাত খেয়ে হজম করতে পারলেই ভাল স্বাস্থ্য প্রমাণ হয় না। স্বাস্থ্য হচ্ছে ভেতরের সত্য—তার কোন বাহ্যরূপ নেই। সুতপার বিশ্বাস, বলরামের চেয়ে রতন বেশী সুস্থ। রতন চিন্তা করতে পারে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করতে পারে। বলরামের চিন্তাশক্তি নেই, ওর তাই শরীর আছে, স্বাস্থ্য নেই। ঘরের দরজা বন্ধ করল সুতপা।

বন্ধ করতে গিয়ে ওর যেন মনে হ'ল, সিঁড়ি দিয়ে বলরাম উঠে এল দোতলায়। তবে কি টাইগারকে নিয়ে বলরাম ফটকের কাছে বসে ছিল ছোটসাহেবের আগমন-প্রতীক্ষায়?

পরের দিন বড়বাবু বেলা এগারোটা নাগাদ মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন। ক'দিন থেকেই মহীতোষ বুঝতে পারছিল, বড়বাবু কি একটা নতুন উদ্দেশ্য নিয়ে ছোটসাহেবের কামরায় ঘন ঘন যাওয়া আসা করছেন। ব্যাপারটা এবার পরিষ্কার হ'ল। বড়বাবু বললেন, "এই যে আসুন মহীতোষবাবু। তার পর কেমন আছেন? আজকাল ত আর বুড়ো মানুষটাকে চোখেই দেখতে পান না। শুনলাম, আপনি নাকি কর্মচারী ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছেন?"

"ডেকেছেন কেন?" প্রশ্ন করে মহীতোষ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়ল। সে জানে, সাহেবসুবো ছাড়া অন্য কাউকে তিনি বসতে বলেন না। বালিগঞ্জের সেই সুন্দরী মেয়েটি এলে তিনি অবশ্য নিজের চেয়ারটা ছেড়ে দেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কাল সেই সুন্দরী মেয়েটি এসেছিল বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "ইউনিয়নের মেম্বার কত হ'ল?"

"প্রায় সবাই।"

"প্রায় কেন? মিসেস রায় বুঝি যোগ দেন নি? তাঁর সঙ্গে কি আজকাল আপনার দেখা হয় না? আমাদের ড্রাইভার রঘুনন্দন সিং একটু আগেই আমায় বলছিল যে, মিসেস রায় নাকি ছোটসাহেবের বাড়ী পর্যন্ত দৌড়চ্ছেন আজকাল। ব্যাপার কিছু জানেন আপনি?"

"আমায় ডেকেছেন কেন বড়বাবু?"

"এত তাড়া কেন মহীতোষবাবু? জানেন, মিসেস রায় সাত দিনের ছুটি নিয়েছেন। দরখাস্তটা এখনও এসে পৌঁছয় নি, তবে আসবে। ছুটি অবশ্য উনি পনর দিনেরও নিতে পারেন, অনেক ছুটি তাঁর পাওনা আছে। কিন্তু আপিসেরও কাজ চলা চাই ত—হু হু—" ডিবে থেকে তিনটে পান নিয়ে তিনি মুখে পুরে দিয়ে বললেন, "সুন্দরমকে আপাততঃ শ্যামনগরের কারখানায় পাঠানো হ'ল—সাত দিনের জন্যে। মিসেস রায় কাজে যোগ দিলে তাঁকে যেতে হবে শ্যামনগরে। উপস্থিত ছোটসাহেবের কাজ চলবে কি করে?"

"এ সব কথা শুনে আমি কি করব?" উঠে পড়ল মহীতোষ।

বড়বাবু বলে ফেললেন, "ছোটসাহেব এইমাত্র আবেদন-পত্রে সই বসিয়ে দিলেন। এখন অবশ্য অস্থায়ী ভাবে তাকে

নেওয়া হ'ল—হ্যাঁ বরাতে থাকলে স্থায়ী হতে আর কতদিন লাগবে বলুন। মেয়েটিকে কাল ছোটসাহেব দেখলেন—হেড আপিসের যোগ্য চেহারা বটে! শুধু আঙুলের ক্ষিপ্রতা থাকলেই স্টেনো আর টাইপিষ্ট হওয়া যায় না—যাচ্ছেন মহীতোষবাবু? মিস মিত্র মানে কেতকী মিত্র আজ আসবে নিয়োগপত্র নিতে। ওর নিকনেম হচ্ছে গিয়ে কাতু। কি কাটলেটই না সেদিন খাওয়ালে মশাই!"

শেষের কথাগুলো মহীতোষ শোনে নি, শোনবার ইচ্ছে ছিল না ওর। মহীতোষ বুঝতে পেরেছিল, সুতপাকে ঘিরে নূতন একটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। ছোটসাহেবের সঙ্গে অফিসিয়াল সম্পর্ক ছাড়াও তার অন্য সম্পর্ক রয়েছে। যদি সত্যিই তাই হয়ে থাকে, তা হলে ইউনিয়নের তরফ থেকে সুতপাকে কোন সাহায্যই করা চলবে না। কিন্তু সাহায্যের কথাই ব মহীতোষ ভাবছে কেন? সুতপাকে সে কি আজও চিনতে পারে নি? সুতপা মহীতোষের কাছে কোনদিনই সাহায্য চাইবে না, জ্ঞান থাকতে ত নয়ই। নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়বার পর মহীতোষের ইচ্ছে হ'ল, খুবই ইচ্ছে হ'ল যে, সুতপা যেন ওর কাছে সাহায্য চাইতে ছুটে আসে। সাহায্য করবার জন্যেই মহীতোষ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে। দুর্বলের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে মহীতোষ সহসা চঞ্চল হয়ে উঠল, উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। সামনের দরজা দিয়ে সুতপা ঢুকে পড়েছে হল-ঘরটায়।

বড়বাবুর সামনে দিয়েই মহীতোষের টেবিলে এসে পৌছোবার রাস্তা। সুতপাকে দেখতে পেয়ে বড়বাবু বললেন, "এই যে আসুন। দরখাস্তটা নিজেই বুঝি দিতে এলেন?"

জবাব দিল না সুতপা। সে সোজা চলে এল মহীতোষের কাছে। এসে বলল, "সাত দিনের ছুটি নিচ্ছি। শরীরটা ভাল নেই, দরখাস্তটা বড়বাবুর টেবিলে পৌঁছে দিতে পার?"

"তুমি নিজেই দাও, আমি তোমার সঙ্গেই যাচ্ছি।"

"সঙ্গে যাচ্ছ? কতদূর পর্যন্ত যেতে পার?" সুতপা বসে পড়ল চেয়ারে। চেয়ারটা মহীতোষেরই বসবার চেয়ার। একটু হেসে মহীতোষ বলল, "তুমি সত্যিই অসুস্থ। টেলিফোনে আমায় খবর পাঠালেই পারতে। চল, আপিসের বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।"

"চল।" উঠে পড়ল সুতপা। কিন্তু তার আগেই লাহিড়ী-সাহেব তাঁর কামরা থেকে বেরিয়ে এলেন, এলেন একেবারে বড়বাবুর টেবিল পর্যন্ত। সুতপাকে দেখলেন তিনি, কথা বললেন না। বড়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস মিত্রকে খবর দেওয়া হয়েছে?"

"তিনি এখুনি এসে পড়বেন।" দেওয়াল-ঘড়ির দিকে চকিতের মধ্যে একবার দৃষ্টি ফেলে বড়বাবুই বললেন, "এখন সোয়া বারোটা, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তিনি আসবেন।"

"এলেই আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আজ্ঞে—ইয়েস সার।"

ছোটসাহেব ঘুরে দাঁড়ালেন। হল-ঘরটার চতুর্দিকে দৃষ্টি ফেললেন তিনি—কেরানীরা সবাই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। হাসি পেল লাহিড়ীসাহেবের, তিনি ভাবলেন, এরা কত দুর্বল, কত অসহায়। একটা সামান্য কলমের খোঁচায় তিনি এদের জীবনে ঘনঘটার সৃষ্টি করতে পারেন। সুতপাও এদেরই একজন! লাহিড়ীসাহেবের দৃষ্টি সহসা এসে থেমে গেল মহীতোষের গা ঘেঁষে। সুতপা আর মহীতোষ একসঙ্গে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছিল বড়বাবুর টেবিলের সামনে। লাহিড়ী-সাহেবের দৃষ্টি ওদের বিচলিত করতে পারল না। তিনি যেন প্রথম এই অনুভব করলেন সুতপা দুর্বল নয়। বিরাট এই কোম্পানীটার সম্মিলিত শক্তি যেন মহীতোষ নামে নগণ্য একজন কেরানী বহন করছে একা। সুতপা আলাদা নয়, মহীতোষেরই অংশ।

ছুটির দরখাস্তটা বড়বাবুর টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সুতপা মহীতোষকে বলল, "তুমি ত আমার সঙ্গেই যাবে বললে।"

"হ্যাঁ, চল।"

বড়বাবু মুখ তুলে চাইলেন মহীতোষের দিকে। মহীতোষ বলল, "আমার অবশ্য ছুটি কিছু পাওনা নেই। একদিনের মাইনে আমার কেটে নেবেন বড়বাবু।"

"কিন্তু—" চঞ্চল হয়ে উঠলেন বড়বাবু, "কিন্তু সুরেন্দ্র খালের জন্যে সেদিন কাজের কত ক্ষতি হ'ল—মহীতোষবাবু আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন, তা হলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিণতি কি হবে?"

মুখ ফিরিয়ে মহীতোষ একটু হাসল, জবাব দিল না। সুতপাকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে গেল লিফটের দিকে।

ছোটসাহেব দেখলেন, দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছে মিস কেতকী মিত্র, দেখল সুতপাও।

তপন লাহিড়ী নূতন একটা সিগারেট ধরালেন।

মহীতোষের বিবৃতি

এক বিচিত্র জগতের আক্র আমার চোখের সামনে ক্রমশঃই উন্মোচিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই জ্ঞান বাড়ছে আমার। বণিক-আপিসে চাকরি করেও এতকাল আমি ভেবেছি যে, আমি বেকার। মনোযোগ দিয়ে করবার মত কাজ আমার কিছু ছিল না। আপিসের কাজ আমার কোন দিনই ভাল লাগে নি। পয়লা তারিখে মাইনে পাওয়ার

নির্দিষ্টতা আছে বলেই নিয়মিত ভাবে নিজের চেয়ারে এসে বসে পড়ি। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফানুসটা চোখের সামনে ওড়ে বটে, কিন্তু তবুও কাজের প্রতি উৎসাহ আমার বাড়ে না। মনে হয় এখানে আমি উপস্থিত নেই। প্রতিটি ফাইলের মধ্যে লোভ আর মুনাফার অঙ্ক পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। প্রতিটি ফাইল আমার শত্রু। শত্রু সমাজেরও। এরাই আমার টেবিলের ওপর প্রতিদিন এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। বিদ্বেষের কালি বুকে নিয়ে এরা আবার চলে যায় বিভিন্ন বিভাগে আপিস ছুটি হওয়ার আগে। বণিক-আপিসের ফাইল আমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় প্রতিদিন। বিরাট এই হল-ঘরটার মধ্যে ভালবাসার বাণিজ্য নিয়ে কেউ কোনদিনও মাথা ঘামায় নি।

আমাদের আপিসে কেরাণীর সংখ্যা বড় কম নয়। দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে যে যার চেয়ারে এসে বসে পড়ে। বসে পড়বার আগে দেয়াল-ঘড়িটার দিকে প্রত্যেকেই একবার দৃষ্টি ফেলে। যেন সময়মত আপিসে পৌঁছতে পারলেই সারা দিনের দায়িত্ব সব ঘুচে যায়। সত্যিই যায়। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। ছুটো টেবিলের মাঝখানে যেন বিরাট ব্যবধান। মনের আদান-প্রদানের পথও সেই ব্যবধানের মধ্যে বিলুপ্ত। প্রত্যেকটা চেয়ার যেন এক একটা ছোট ছোট দ্বীপ। জনবহুল আপিস-ঘরটার নির্জন-দারিদ্র্য আমায় পীড়া দেয়। এতগুলো মানুষের সামাজিক অস্তিত্ব আমার চোখে ধরা পড়ে না।

সুতপা আমায় কাল জিজ্ঞেস করেছিল, হঠাৎ কেন আমি একটা ইউনিয়নের সৃষ্টি করতে গেলাম। ইংরেজ বণিক-আপিসের মাইনের অঙ্ক ভারত-সরকারের যে-কোন আপিসের চেয়ে বেশী। ইউনিয়ন গঠনের মূলে যে সামাজিক সমস্যা রয়েছে, সুতপা তা জানত না। জানবার সুযোগ সে পায় নি। শুধু মাইনে বাড়াবার অস্ত্র হিসেবে ইউনিয়নের জন্ম হয় নি। ছোট ছোট দ্বীপগুলোর মাঝখানে যে ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যবধানের কৃত্রিমতা ভেঙে দেওয়া দরকার। সামাজিক সচেতনতা ফিরিয়ে আনা ইউনিয়নেরই কাজ। আজ কয়দিন থেকে দেখছি, ছেলেরা সব ইউনিয়নের আপিসে এসে আড্ডা জমাচ্ছে। পাশাপাশি চেয়ারে বসে এরা কাজ করছিল বছর দু-তিন। কেউ কাউকে চিনত না। একের চিন্তাধারার সঙ্গে অপরের পরিচয়ও ছিল না। আজকে ত আমি নিজের কানেই শুনে এলাম, স্টেনোগ্রাফার সুন্দরম্ ডেচপ্যাচ বিভাগের অরিন্দমের সঙ্গে মন খুলে গোপন কথা আলোচনা করছে। সুন্দরম্ নাকি এরই মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়েও করে ফেলেছে।

আজ আপিস ছুটি হওয়ার আগে ছোটসাহেব আমার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ খুব কম। আমার চাকরির পদমর্য্যাদা এত কম যে, ছোট-সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজনই হয় না।

তাঁর কামরায় প্রবেশ করতেই দেখি আপিসের নূতন স্টেনো মিস কেতকী মিত্র খাতা পেন্সিল হাতে নিয়ে ছোট-সাহেবের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়াবার নিয়ম ছোটসাহেবের সামনে। মুখ দেখতে না পেলে নোট নিতে অসুবিধে হয়।

ঘরে ঢুকতেই ছোটসাহেব বললেন, "মিস মিত্র, তুমি একটু বাইরে যাও। আবার তোমায় ডেকে পাঠাব—" হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে তিনিই আবার বললেন, "পাঁচটার পরে। আজ এক্সট্রা টাইম কাজ করতে হবে—বাড়ী ফিরতে তোমার রাত হবে।"

"তা হোক সার।" মিস মিত্র জবাব দিল নিচু সুরে।

"হ্যাঁ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হয়েছে। প্রত্যেকেরই সহযোগিতা চাই—স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর সোশ্যালিষ্ট স্টেট" এই পর্যন্ত বলে ছোটসাহেব আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ হেসে ফেললেন। আমার গাম্ভীর্য তাতে নষ্ট হ'ল না। কেন হবে? আমাদের 'স্যাক্রিফাইস' ত হাসির ব্যাপার নয়!

ছোটসাহেব কি বুঝলেন জানি না, তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন। মিস মিত্রের দিকে চেয়ে বললেন, "অনেক কাজ জমে রয়েছে। এই জন্যে অবশ্য দায়ী মিসেস রায়। মানে স্টেনোগ্রাফার সুতপা রায়। মিস মিত্র, শুধু চাকরি করলে চলবে না, কাজ করতে হবে। ওয়ার্ক, ওয়ার্ক—কিন্তু আমার দিকে চেয়ে ছোটসাহেব এবার মন্তব্য করলেন, "দল পাকাবার পর থেকে কেরানীরা আর কাজই করতে চাইছে না।"

"আমরা দল পাকাই নি, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি। আমায় ডেকেছিলেন কেন সার?" প্রশ্ন করে হাতঘড়িতে সময় দেখলাম আমি।

ছোটসাহেব কিছু বলবার আগে মিস মিত্র বলল, "নোট নেওয়ার জন্য পরে আমায় ডেকে পাঠাবেন।"

মিস মিত্র কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটসাহেব এবার বললেন, "আপিসে দেখছি অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে। আগে ত কৈ এমন কখনও দেখি নি?"

"অরাজকতা কোথায় দেখলেন আপনি?"

"হোয়াট! অরাজকতা কোথায় দেখলাম? আপনার টেবিলে। ফাইলগুলো সব ক্লীয়ার করেছেন?"

"কাল থেকে দেখছি বড়বাবু আমার টেবিলে ভরল করে

ফিনল্যাণ্ডের মানস্তা 'পেপার মিলস'-এ পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু

নরওয়ের 'কোরিক মিউজিয়ামে' এক পুরনো কাঠের কুটিরে একটি চরকায় সুতাকাটা দর্শনরত পণ্ডিত শ্রীজবাহরলাল নেহরু
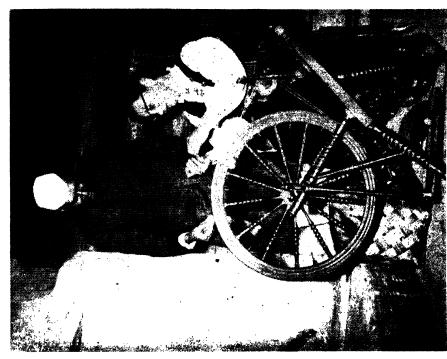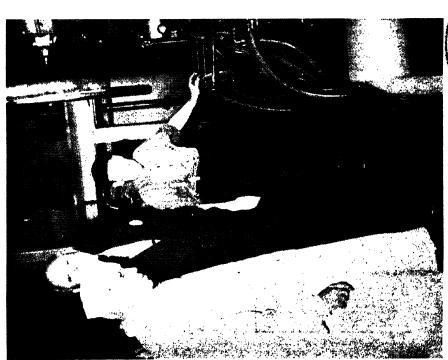
প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক অল-ইণ্ডিয়া রেডিও আয়োজিত "চিল্‌ড্রেনস কর্নার" বিশেষ বেতার-অনুষ্ঠান শ্রবণ

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচার

উড়িষ্যার রাজ্যপাল শ্রীওয়াই. এন. সুখটঙ্কর

ফাইল পাঠাচ্ছেন। একজন কেরানীর পক্ষে এত কাজ করা সম্ভব নয় সার।"

"কি করে সম্ভব হবে? আজকাল ত আপনি বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তা ছাড়া—যাক, তর্ক আমি করতে চাই নে। আজকে ফাইলগুলো সব ক্লীয়ার করে যাবেন।"

"আমায় তা হলে ওভারটাইম দিতে হবে।"

"দেব।"

বড়বাবু এসে কামরায় ঢুকলেন। মুখে তাঁর মুচকি হাসির আপাত সরলতার আভাস। আমার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "পাঁচটা বাজতে আর এক মিনিট বাকী। মিসেস রায় আপনার খোঁজ করছেন মহীতোষবাবু।"

"অসুখ বলে তিনি ছুটি নিয়েছেন। অথচ তিনি রোজই বিকেলের দিকে আপিসে আসছেন। ব্যাপার কি বড়বাবু?" জিজ্ঞাসা করলেন ছোটসাহেব।

বড়বাবু বললেন, "অনেক ছুটি তাঁর পাওনা আছে। অসুখ নেই বলে ছুটি চাইলেও তিনি পাবেন।" একটু থেমে বড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "মিস মিত্র আপনার কাজ চালাতে পারছে ত সার?"

"মাত্র দুশো টাকা মাইনেতে এত ভাল ষ্টেনোগ্রাফার পাওয়া যায়, আগে আমি তা বিশ্বাস করতাম না। একে পারমেনেণ্ট করে নিন।" ছোটসাহেবের সুরে আদেশের প্রাবল্য। কিন্তু আদেশ পালন করবার জন্যে বড়বাবু ব্যস্ততা দেখালেন না। তিনি বললেন, "মিসেস রায়ের বদলির ব্যবস্থাটা আজও পাকা হয় নি সার।"

"কেন হয় নি?"

"আপনি ত এখনও সই করেন নি—"

"এই সপ্তাহের মধ্যেই করব। আচ্ছা, আপনি এবার যেতে পারেন মহীতোষবাবু। ফাইলগুলো—"

"আজ আর ক্লীয়ার হবে না।"

"কেন?"

"মিসেস রায়ের সঙ্গে এখখুনি আমায় একবার বেরুতে হবে।" এই বলে আমি কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। দেয়াল-ঘড়িটার দিকে দৃষ্টি পড়ল আমার। পাঁচটা বেজে তিন মিনিট। সুতপা সময়ের হিসেব করেই আপিসে ঢুকেছে আজ।

বাইরে বেরিয়ে সুতপা বলল, "তোমার ত চা খাওয়া হয় নি, চল কোথাও গিয়ে চা খেয়ে নিই। হোটেলে ফেরবার তাড়া নেই ত তোমার?"

"না, তাড়া কিছু নেই। তবে ছ'টার সময় ইউনিয়নের আপিসে একবার যেতে হবে। ছোট্ট একটা সভা আছে। ভাবছি, তোমাকে আজ আমাদের আপিসটা দেখাব।"

আপত্তি করল না সুতপা। আমরা শেষ পর্যন্ত কফিহাউসে এলাম। চা খাওয়ার প্রস্তাব মাঝ পথেই পরিত্যাগ করতে হ'ল। কফিহাউসটা সামনেই পড়ে গেল। সুতপা বলল, "কফিহাউসের দুটো অংশ। পেছন দিকের অংশটায় বসলে খানিকটা ভদ্র-পরিবেশ পাবে, কিন্তু দাম দিতে হবে বেশী। কি করবে?"

বললাম, "যেখানে সস্তায় তৃষ্ণা মিটবে সেখানেই চল।"

"বড্ড বেশী ভিড় এখানে।"

"তা হোক, এসো, এখানেই ঢুকে পড়ি। আমি জানি ভিড় তুমি পছন্দ কর না।"

"না, একেবারে সহ্য করতে পারি না।"

"তার কারণ, সরকার-কুঠির নির্জনতায় তুমি প্রতি-পালিত। ভালবাসতে পারলে ভিড়ের মধ্যেই তুমি বাস করতে চাইবে।"

"মহীতোষ, অন্তরের গুহায় প্রতিটি মানুষই একা। ভালবাসার সম্পর্ক আমরা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করি বটে, কিন্তু সে ত আকাশে প্রাসাদ তৈরির চেয়ে বড় সৃষ্টি নয়। অবাস্তব ঐশ্বর্যের প্রতি আমার লোভ নেই। তবুও চল ভিড়ের মধ্যে বসে আজ তোমার সঙ্গে কফি খাব।"

সুতপাকে নিয়ে কফিহাউসে ঢুকলাম আমি।

আলাদা টেবিলে বসবার মত জায়গা ছিল না। আশে-পাশের আপিস সব ছুটি হয়ে গেছে। তাই ভিড় বেড়েছে খুব। হল-ঘরটার একপাশে দাঁড়িয়ে টেবিল খুঁজছিলাম আমি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল।

"দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"জায়গা খুঁজছি।"

"জায়গা ত রয়েছে।" এই বলে সুতপা এগিয়ে গেল ঘরের মাঝখানটায়। দুটি মাদ্রাজী ছেলে এক টেবিলে বসে কফি খাচ্ছিল। দুটো চেয়ার খালি পড়ে ছিল সেখানে। অনুমতি নিয়ে সুতপা একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলল, "এস মহীতোষ, এখানে জায়গা আছে।"

কফি খাওয়ার মাঝখানে মাদ্রাজী ছেলে দুটি উঠে পড়ল। তারপর সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "ঠিক ছ'টার সময় তোমায় যেতেই হবে, না?"

"হ্যাঁ।"

"খুব জরুরি সভা বুঝি?"

"প্রত্যেকটা সভাই আমার জরুরি। হাল্কা বিষয় নিয়ে আমরা সভায় আলোচনা করি না। আমরা সবাই ইউনিয়নের

অংশ—আপিসটা তার বাহ্যরূপ। তুমি ত আজও আমাদের ইউনিয়নে যোগ দিলে না।"

সুতপা একটু হাসল। আলুভাজার টুকরো একটা দাঁতের মাঝখানে ধরে রেখে সে বলল, "ইউনিয়নের প্রতি যে ছোটসাহেবের সুনজর নেই, তা আমি জানি। তোমারও জানা উচিত।" কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, "শুধু ছোটসাহেবের নজরের কথা ভাবলে চলবে কেন, আপিসে ত বড়সাহেবও একজন আছেন।"

"কে? হেওয়ার্ড সাহেব?"

"হ্যাঁ। তিনিই ত আমাদের সাহায্য করলেন—জান আমাদের আপিসটা কোথায়?"

"না।"

"বিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে। কোম্পানীর একটা গুদামঘর ছিল সেখানে। বড়সাহেব সেই ঘরটাই আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। ভাড়া আমাদের সামান্যই লাগবে। চল, এবার ওঠা যাক। ছুটো বাজতে আর পনেরো মিনিট বাকী।"

"কিন্তু—" উঠে পড়ল সুতপা, "কিন্তু ছোটসাহেবের অনুমতি না নিয়ে আমি তোমাদের আপিসে যেতে পারি না।"

জিজ্ঞাসা করলাম আমি, "কেন?"

বিলের টাকা মিটিয়ে দিল সুতপা। আপত্তি করলাম আমি। কিন্তু একটা পাঁচ টাকার নোট ওয়েটারের হাতে দিয়ে সুতপা আমায় বলল, "তোমার চেয়ে আমার মাইনে বেশী। তা ছাড়া এ মাসে দেখছি সব টাকা খরচও হয় নি।"

"বেশ। কিন্তু হঠাৎ যদি তোমার চাকরি যায়? মানে, শ্যামনগরে বদলি হলে কি করবে? সেখানে গিয়ে ত চাকরি করা সম্ভব হবে না।"

"সেই জন্যেই ত তোমাদের ইউনিয়নে আমি যোগ দিতে চাই মহীতোষ।"

পাঁচ টাকা থেকে তিন টাকা চার আনা ফিরে এসেছে। প্লেটের ওপর চার আনা ফেলে রেখে তিনটে টাকা তুলে নিল সুতপা। তার পর টাকা তিনটে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সে বলল, "ইউনিয়নের চাঁদা। প্রথম মাস বলে একটু বেশীই দিলাম, মহীতোষ।"

কফিহাউস থেকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে আসতে আমাদের দশ মিনিটও লাগল না। মনে হ'ল, সুতপাকে আমি আজও চিনতে পারি নি। ওর মনের তর্ক শেষ হয় নি। ছুটো বিপরীতমুখী হাওয়ার গতি যেন মনের রাজ্যে ওর সংঘর্ষের ক্ষেত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবে কি ছোটসাহেবের উল্টো দিকে আমাকে দাঁড় করাবার জন্তেই সুতপা আজ ইউনিয়নের খাতায় নাম লেখাতে চলল?

গুদামঘরটাকে দেখে আর চেনা যায় না। প্রতিদিনই এর রূপ বদলাচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—ঝকঝক করছে এর মেঝেটা। ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের অরিন্দম আজ বৌবাজার থেকে টেবিল চেয়ারও নিয়ে এসেছে দেখলাম। শুধু গুদামঘরটাতেই পরিবর্তন আসে নি, অরিন্দমের পরিবর্তনটাই আমায় চমক লাগিয়েছে সবচেয়ে বেশী। তেইশ কি চব্বিশ বছর বয়স হবে ওর। কাউণ্টারের পেছনে বসে চিঠি রাখা আর পাঠানোই ছিল ওর কাজ। এত অল্প বয়সেই মুখে ওর বার্ধক্যের ছাপ পড়েছিল। কেউ কোন দিন অরিন্দমের সঙ্গে বসে দু'চার মিনিটও গল্প করত না। সবচেয়ে ছোট চাকরি ছিল ওরই। গত ক'দিনের মধ্যে ইউনিয়নের সবচেয়ে উৎসাহী কর্মী হয়ে উঠেছে অরিন্দমই। দেখলাম, আড়াইশো টাকা মাইনের ভবানীবাবুও অরিন্দমকে ডেকে ডেকে কথা কইছেন। ব্যবধানের কৃত্রিমতা উধাও হয়েছে এরই মধ্যে। সুতপাকে বললাম, "মিনিটদশেক অপেক্ষা কর। সভার কাজটা শেষ করে নিই।"

হল-ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি ফেলল সুতপা। তার পর সে বলল, "দলটা বেশ ভাল ভাবেই পাকিয়েছ। ঘরদোর আর আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, মেম্বাররা অনেক টাকাই চাঁদা দিয়েছে। মহীতোষ, আমি আরও দশটা টাকা বেশী দিতে চাই।"

"তিন টাকাতেই মেম্বার হওয়া চলে। গুদামঘরটায়—"

বাধা দিয়ে সুতপা বলল, "না, না মহীতোষ, এটা গুদামঘর নয়। এই ত গোকুল—একাধিক কুঞ্জের বাল্যলীলাভূমি। ছোটসাহেব ঠিকই দেখেছেন। তাঁর পতনের অস্ত্র তৈরী হচ্ছে এখানে। দশ টাকা নয়, আসছে মাসের পুরো মাইনেটা তোমাদের দিয়ে দেব।"

"রতনের ইনজেকশন কিনবে কি দিয়ে?"

"ছোটসাহেবের কাছে ধার চাইব।"

'আমাদের ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তুমি বুঝতে পার নি।"

সভা আরম্ভ হ'ল। সবাইকে সম্বোধন করে আমি বললাম, "কমরেডস—" লক্ষ্য করলাম, সুতপা সহসা যেন চমকে উঠল। আমি দেখলাম, আমার পাশের চেয়ার থেকে উঠে পড়ল সে। বক্তৃতার মাঝখানে কখন যে সুতপা অরিন্দমের গা ঘেঁষে বসে পড়েছে তা অবিশ্যি আমি দেখতে পাই নি। যখন দেখলাম তখন বুঝতে পারলাম যে, সুতপা আজ তার নিজের অস্তিত্বকে সবার থেকে আলাদা বলে ভাবতে চায় না। মনে হ'ল, ওর আর্থিক স্বাধীনতার উদ্ধত

প্রচার-পতাকা নত হয়েছে। সামাজিক-সঙ্ঘবদ্ধতার অংশ হতে চাইছে আমাদের আপিসের সুতপা রায়।

আলোচনার বিষয় ছিল সামান্যই। বক্তৃতার সুরুতে আমি বলেছিলাম, "কমরেডস, আমাদের ইউনিয়নের জন্যে বড়সাহেব, মিষ্টার হেওয়ার্ড যে কত রকম ভাবে সাহায্য করেছেন তা আপনারা জানেন। আজ তিনি আমাদের দু' হাজার টাকাও দিয়েছেন। আমি নিজে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। আমাদের আপিসের জন্যে গোটাকয়েক টেবিল, চেয়ার ও আলমারীর দরকার ছিল। টাকা আমরা পেয়েছি। বৌ-বাজারের বিল আমরা এবার মিটিয়ে দিতে পারব। আমার ইচ্ছা, বড়সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়ে এই সভায় একটা প্রস্তাব পাস করি। আশা করি আপনাদের কোন আপত্তি নেই। আপত্তি থাকা উচিত নয় এইজন্যে যে, আমাদের ছোটসাহেবের কাছ থেকে একটি পয়সার সাহায্য পাওয়া যায় নি। উপরন্তু তিনি আমাদের ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছেন।"

অরিন্দম দাঁড়িয়ে পড়ল সহসা। ডান হাতটা তুলে দিল ওপর দিকে। মুখ এবং হাতের ভঙ্গিতে ওর অপরিমিত হিংসার প্রকাশ। সে বলতে লাগল, "ছোটসাহেবের পতন আমরা কামনা করি। ছোটসাহেব নিপাত যাক—কমরেড, আপনার প্রস্তাব আমি সমর্থন করলাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ!"

সুতপা উঠে এল অরিন্দমের কাছ থেকে। উঠে এসে আবার সে বসে পড়ল আমার পাশের চেয়ারে। দেখতে পেলাম, বড্ড বেশী অস্বস্তি বোধ করছে সুতপা। অরিন্দমের মত সে নিশ্চয়ই ছোটসাহেবের পতন চায় না।

সভা শেষ হওয়ার পরে সুতপা বলল, "তোমার কাছে তিনটে টাকা রেখেছিলাম আমি। টাকা তিনটে এবার ফিরিয়ে দাও আমায়।"

"কেন?" বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম আমি, "কেন, তুমি কি আমাদের ইউনিয়নের মেম্বার হতে চাও না?"

"না। টাকা তিনটে ফিরিয়ে দিলে আমি খুশী হব। আজই আবার রতনের জন্যে ইনজেকশন কিনতে হবে।" এই বলে হাত বাড়াল সুতপা। টাকা তিনটে ফিরিয়ে দিলাম আমি। ঠিক সেই সময়ে ঘরে ঢুকল মিস কেতকী মিত্র।

অরিন্দম তাকে অভ্যর্থনা করে ডেকে নিয়ে এল। বিপ্লবের আগুন এরই মধ্যে নিভে গেছে। কেতকী মিত্র সুন্দরী। বুঝলাম কেতকী মিত্রের সঙ্গে অরিন্দম আগে-ভাগেই পরিচয় করে নিয়েছে। সুতপা বলল, "কেতকী মিত্রের মত মেয়েদের ত ডেপুটি কিংবা মুন্সেফদের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। এরা আপিসে চাকরি করতে আসে কেন?"

"কার জন্যে ভয় পাচ্ছ? অরিন্দম, না ছোটসাহেব?"

"ভয় আমার কারও জন্যেই নেই, মহীতোষ। আমি শুধু ক্ষতির কথা ভাবছিলাম। কোন একটি কুৎসিত চেহারার ডেপুটি কিংবা মুন্সেফের ভাগ্যে সুন্দরী বৌ জুটল না।"

অরিন্দম সবার সঙ্গেই কেতকী মিত্রের পরিচয় করিয়ে দিল। আমি অবাক হলাম অরিন্দমের কথা শুনে। মিস মিত্রকে মেম্বার করে নেওয়ার জন্যে সে আমায় অনুরোধ করল। আমাদের ছোটসাহেবের প্রতিপক্ষ মনে করে সুতপা তার টাকা ফিরিয়ে নিল। আর কেতকী মিত্র ছোটসাহেবের কাছে কাজ করতে এসে মেম্বার হয়ে গেল সুতপার সামনেই!

আমি ভেবেছিলাম, কেতকী মিত্রকে সুতপা ঈর্ষা করছে। কিন্তু ওর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে সুতপা দেখলাম মিস মিত্রের সঙ্গে কথা কইছে প্রাণ খুলে। দু'জনের মধ্যে ভাব জমে উঠতে বোধ হয় দশ মিনিটেরও বেশী সময় লাগল না। সন্দেহ হ'ল আমার, সুতপাকে আমি একেবারেই চিনতে পারি নি। সরকার-কুঠির বাইরে সুতপাকে সম্ভবতঃ চেনাও যাবে না। আজ বিকেলবেলা আমার মনে হয়েছিল, তপন লাহিড়ীকে কেন্দ্র করে হয়ত বা একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। নিজের চেয়ারে বসে পরিস্থিতিটার পরিণতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম আমি। কৌতুক উপভোগের প্রত্যাশা যে আমার ছিল না তাই বা অস্বীকার করি কি করে? কিন্তু সে ধারণা আমার বদলাচ্ছে। বদলে দিচ্ছে সুতপাই। তপন লাহিড়ীর সত্যিই দ্বিতীয় কোন রূপ নেই। তিনি শুধু বণিক আপিসের ছোটসাহেব। পুঁজি-কোম্পানীর শুধু একজন প্রতিনিধি মাত্র।

সুতপাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললাম, "সাতটা বেজে গেছে, উঠবে না?"

"হ্যাঁ। গড়িয়ায় পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। চললাম ভাই কেতকী। আবার দেখা হবে। মহীতোষ, তুমি কি আমার সঙ্গে গড়িয়া পর্যন্ত যাবে?"

লক্ষ্য করলাম, সুতপা প্রশ্ন করল কেতকী মিত্রের দিকে চেয়ে। বোধ হয় আমার কাছ থেকে জবাব ও চায় না। তবে সে প্রশ্ন করল কেন? আমার সঙ্গে যে সুতপার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়ার হোটেল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে তেমন খবরটা কি ছোটসাহেবের জানা উচিত নয়? কেতকীর মারফত খবরটা বোধ হয় জানিয়ে দিল সুতপা রায় নিজেই।

ওকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। বেন্টিঙ্ক

ষ্ট্রীটের দিকে হাঁটছিলাম আমরা। হঠাৎ মাঝপথে দাঁড়িয়ে গেল সে। মুখ নিচু করে বারতিনেক সে 'কমরেড' কথাটা উচ্চারণ করল। মন্ত্রোচ্চারণের শ্রদ্ধা ভেসে উঠল ওর কণ্ঠস্বরে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি আমায় ডাকছ ?"

"তোমায় ? তোমায় কেন ডাকতে যাব ? আমি ডাকছি আমার কমরেডকে। মহীতোষ, এতদিন কেন এই কথাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি ?"

"এতদিন তুমি ত আমায় কমরেড বলে চিনতে পার নি। আমি তোমায় সাহায্য করতে চাই সুতপা।"

সুতপা তবু মুখ তুলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। হয়ত বা ওর জীবন-দর্শনের সংজ্ঞায় নতুন পরিস্থিতির কোন পরিচয় নেই। সুতপার বিশ্বাস—প্রেম, ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব এ সবই কুসংস্কার। সামাজিক সম্বন্ধবদ্ধতার মূলেও সে কুসংস্কারই দেখতে পেয়েছে।

ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমি আবার বললাম, "কমরেড, তুমি ত একটা নূতন বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছিলে—"

"বিগ্রহ ?" চমকে উঠল সুতপা।

"হ্যাঁ। বিপ্লবের নতুন বিগ্রহ।"

"বিগ্রহটা আমায় দেখাতে পার ?"

"পারি। মন্ত্রটা যখন তোমার কানে গিয়ে পৌছেছে, তখন আর ভয় নেই। বিগ্রহটা ক্রমে ক্রমে তৈরী হবে। পাঠান, মোগল আর ব্রিটিশ রাজত্বের মত পঞ্চানন ঠাকুরের রাজত্বও যে শেষ হয়ে গেছে সে কথা তোমার ভাল করেই জানা আছে।" একটু থেমে ফস্ করে আমি ওকে প্রশ্ন করে বসলাম, "সুতপা, তোমার স্বামী এখন কোথায় আছেন ?"

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটের কোলাহল থেমে গেছে। আপিস-গুলো সব বন্ধ। লাভ-লোকসানের হিসেব আর এখন আপিসঘরে নেই। পানের দোকানগুলোতে রাতের ব্যবসা শুরু হয়েছে। সুতপা চোখ তুলতেই দেখতে পেল, রাস্তার উল্টোদিকে একটা হোটেল ও 'বার'। দেওয়ালের গায়ে সাইনবোর্ড লাগানো। মদ্যপানের বিজ্ঞাপন তাতে লেখা হয়েছে। সেই দিকে চেয়ে সুতপা বলল, "দুচার কথায় সবটা বলা যাবে না। সময় লাগবে।"

বললাম, "আজকের পুরো রাত্রিটাই ত আমাদের হাতে আছে। চল, আমার হোটেলে বসে গল্প শুনব তোমার।"

"এ গল্প বুর্জোয়া-পরিবেশে ভাল জমবে না।"

"তবে ?"

"স্বপ্ন আমার গেছে অনেকদিন আগেই। চল, ঐ হোটেলে বসে আমার অশান্তির গল্প শুনবে। মহীতোষ, তুমি ত বিবাহিত নও ?"

"না।"

"স্ত্রী-পুরুষের নিকটতম সান্নিধ্য বলতে যা বোঝায় তার স্বাদ কি তুমি পাও নি, মহীতোষ ?

"না।"

"খাঁটি বুর্জোয়া, তুমি। তোমরা বিপ্লব আনতে চাও বুদ্ধি দিয়ে।" একটু হেসে সুতপাই বলল, "বিবাহিত লোকেদের ওপরই নির্ভর করা যায় না। তুমি খুব আশ্চর্য হচ্ছ, না মহীতোষ ? কিন্তু আমার ত দ্বিতীয় কোন পথ নেই, কমরেড। বার বার যদিও আমার দেহটা অপমানিত হয়েছে, তবুও—রক্তমাংসের বাস্তবতার মধ্যেই আমায় বাস করতে হবে। মহীতোষ, জীবনটা আমার আয়ত্তে দু'বার আসবে না। অতএব পরীক্ষা করে পথ বেছে নেবার দায়িত্ব আমি নিই কি করে ? আর বোধ হয় তুমি হোটেলে ঢুকতে চাও না ?"

"চাই।"

"সেই ভাল।" এই বলে সুতপা রাস্তাটা পার হতে যাচ্ছিল। আবার সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হোটেলের একপাশে ছোটসাহেবের গাড়ীটা এসে থামল। আমরা দেখলাম তপন লাহিড়ী কেতকী মিত্রকে নিয়ে প্রবেশ করলেন হোটেলে।

সুতপা ঘোষণা করল, "অনুতাপ করো না কমরেড, তোমাদের ইউনিয়নের স্বপ্নরাজ্যে মেম্বারের অভাব কোনদিনও হবে না।"

"অভাবের ভয়ে মিস মিত্রকে আমি মেম্বার করি নি।"

"তবে ?"

"মিস মিত্র ছোটসাহেবের স্পাই, সেই জন্যে।"

বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড় থেকে ট্যাক্সি নিলাম আমরা।

ক্রমশঃ

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

বাংলা দেশে বহু গ্রাম ঠাকুর-দেবতাদের নাম লইয়া আরম্ভ; যেমন কৃষ্ণনগর, ভবানীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সীতারামপুর ইত্যাদি। আবার একই নামের বহু গ্রাম আছে, যেমন গোপালপুর ১২৯টি, শিবপুর ৪০টি, রামকৃষ্ণপুর ২৮টি ইত্যাদি। এই সব নাম হইতে বা তাহাদের সংখ্যা হইতে গ্রাম-প্রতিষ্ঠাকালের অনেক সংবাদ কিংবা তথ্য অবগত হইতে পারি। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণ করা বড়ই শক্ত। উদাহরণস্বরূপ গোপালপুরের কথা ধরা যাক। গোপালপুর বর্দ্ধমানে ১১টি, বীরভূমে ৮টি, বাঁকুড়ায় ১৯টি, মেদিনীপুরে ৪১টি, হুগলীতে ৩টি, হাওড়ায় ২টি, ২৪-পরগণায় ১১টি, নদীয়ায় ৮টি, মুর্শিদাবাদে ৩টি, মালদহ জেলায় ৯টি, পশ্চিম দিনাজপুরে ৮টি এবং কুচবিহারে ৬টি। জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিং জেলায় একটিও গোপালপুর নাই।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, মেদিনীপুর জেলার লোকেরা বড় "গোপাল"-ভক্ত; কারণ গোপালপুর নামে যত গ্রাম আছে তাহার এক-তৃতীয়াংশ এই জেলায়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে অন্যরকম মনে হইবে। নিম্নে আমরা বিভিন্ন জেলার গ্রামসংখ্যা, গোপালপুরের সংখ্যা এবং আপেক্ষিক সূচকসংখ্যা—অর্থাৎ হাজারকরা কয়টি গোপালপুর, তাহার হিসাব নিম্নে দিলাম:

জেলা	মৌজার বা গ্রামের সংখ্যা	গোপালপুরের সংখ্যা	হাজারকরা হিসাব
১	২	৩	৪
বর্দ্ধমান	২,৮২৫	১১	৩·৯৬
বীরভূম	২,৪৮৯	৮	৩·২১
বাঁকুড়া	৩,৮৪৬	১৯	৪·৯৪
মেদিনীপুর	১২,২৮৮	৪১	৩·৩৪
হুগলী	১,৯৯৮	৩	১·৫০
হাওড়া	৮৪৭	২	২·৩৬
চব্বিশ পরগণা	৪,১১৩	১১	২·৬৭
নদীয়া	১,৪৫১	৮	৫·৫১
মুর্শিদাবাদ	২,২৮৯	৩	১·৩১
মালদহ	১,৮০২	৯	৪·৯৫
পঃ দিনাজপুর	২,৪০২	৮	৩·৩২
জলপাইগুড়ি	৮০১	...	...
দার্জ্জিলিং	৬৭১	...	...
কুচবিহার	১,৩২৯	৬	৪·৫১

নদীয়ায় গোপালপুরের অনুপাত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আর মালদহ, বাঁকুড়া, কুচবিহার ও বর্দ্ধমান জেলায় মেদিনীপুরের অপেক্ষা অনুপাত বেশী। নদীয়া শ্রীচৈতন্যদেব-প্রভাবান্বিত—সেজন্য গোপালপুরের অনুপাত অধিক হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

কিন্তু এক-এক জেলায় গোপালপুরের সংখ্যা এত অল্প যে, এই সব সংখ্যা হইতে একটা ভাসাভাসা আন্দাজ পাইলে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। নদীয়া জেলায় ৮টি গোপালপুর না হইয়া যদি ৭টি হইত তাহা হইলে সূচকসংখ্যা ৫·৫১ হইতে কমিয়া ৪·৮২ হইত—বাঁকুড়া ও মালদহ অপেক্ষা কম হইত।

গ্রামের নামের আগে শব্দ ধরিয়া একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহার পাশে সেই নামের গ্রামসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে। ইহা হইতে কতকটা বুঝা যাইবে—বাঙ্গালী কিরূপ ধর্ম্মভীরু। তালিকাটি এই:

"রাম—"	৪৮১	"রাধা—"	১৭৬
"শ্রীরাম—"	৯২	"লক্ষ্মী—"	৯৯
"রঘুনাথ—"	১১৫	"সীতা—"	৪৪
"রাঘব—"	২৪	"জানকী—"	৪
	৭১২		৩২৩
"কৃষ্ণ—"	১৯১	"চণ্ডী—"	১৭১
"শ্যাম—"	১০০	"কালী—"	১২৯
"গোপাল—"	২২৬	"দুর্গা—"	৭৫
"গোবিন্দ—"	১৫০	"ভবানী—"	৬৬
"শ্রীকৃষ্ণ—"	৩৮	"তারা—"	৪২
		"দেবী—"	৪০
	৭০৫	"গৌরী—"	২৪
		"পার্ব্বতী—"	২৮
"নারায়ণ—"	১০৭		
			৫৪৭
"হরি—"	৯৫	"গঙ্গা—"	৭৭
"মুকুন্দপুর"	৩৮	"ভগবতী—"	১৭
	২৪০		৯৪
মোট	১৬৫৭	মোট	৯৬৪

"শিব—"	১০৪
"শঙ্কর—"	৪২
"মহাদেব—"	২৩
"হর—"	১৩
"ভৈরব—"	১৬
"শম্ভু—"	৪
"রুদ্র—"	১৪
"মহেশ—"	৮৩
	১৯৯
"ভগবান—"	৪৫
"হরেকৃষ্ণ—"	১৫
"লক্ষ্মণ—"	৩৫
"ভরত—"	২০
	১১৫
মোট	২০৭১

মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, পুরুষ-দেবতাদের নাম-দেওয়া গ্রামের সংখ্যা যেখানে ২০৭১, সেখানে স্ত্রী-দেবতাদের নাম-দেওয়া গ্রামের সংখ্যা ৯৬৪টি। এক কথায় অনুপাত ২ : ১। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই অনুপাত সঠিক নহে। যেমন, "সীতা—" নামের গ্রামের সংখ্যা ৪৪টি; ইহার মধ্যে "সীতারাম-পুরের" সংখ্যা ২৩টি। "লক্ষ্মীকান্তপুর" পুরুষ-দেবতার নাম দিয়া আরম্ভ। "গঙ্গাধরপুর" ১৩টি; ইহাও তাহাই।

বিষ্ণুর বহু নাম; শক্তিকে আমরা বহু নামে পূজা করি; আবার হরি ও হরে বিশেষ কোনও প্রভেদ করি না। কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকলেই শিবপূজা করিয়া থাকে। তথাপি আমরা গ্রামের নাম হইতে দেখিতে পাই যে, বিষ্ণুর জনপ্রিয়তা শিব অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী। বিষ্ণুর তুলনায় বিষ্ণুশক্তির জনপ্রিয়তা খুব কম—অনুপাত ৫ : ১। শিবের তুলনায় শিবশক্তির জনপ্রিয়তা বেশী—অনুপাত ১ : ২।

দেব-দেবীদের মধ্যে রামের জনপ্রিয়তা খুব বেশী। ইহা হইতে যদি আমরা অনুমান করি যে, এককালে বাঙালী হিন্দু রামোপাসক ছিলেন, অন্ততঃপক্ষে বর্তমান অপেক্ষা বহুগুণ বেশী ছিলেন তবে অন্যায় হইবে না। বর্তমানে রামচন্দ্রের মূর্তি বা মন্দির খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। রামের তুলনায় রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি বা মন্দির প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাম যে এককালে বাঙালীর প্রাণের দেবতা ছিলেন, তাহা বাংলা ভাষার ও বাক্যধারার মধ্যে ছড়াইয়া আছে। আমরা ১, ২, ৩,......গুনিতে ছেলেকে শিখাই—রাম, দুই, তিন,......। কোন বিষয়ে বিরক্তি বা ঘৃণা প্রকাশ করিতে হইলে বলি 'রাম বলো—এ কাজ কি মানুষে করে' ইত্যাদি। কোন জিনিষ বড় বা শ্রেষ্ঠ বুঝাইতে হইলে বলি "রাম-ছাগল", "রাম-দা" ইত্যাদি। কবিরাজী ঔষধের নাম "রাম-বাণ"। কবি কৃত্তিবাস লিখিলেন রামায়ণ; ছুটী খাঁ লিখিলেন রামায়ণ। শতবৎসর পূর্ব্বেও গ্রামে গ্রামে রাম-যাত্রা গীত বা অভিনীত হইত। এখনও বহু গ্রামে রামলীলার মাঠ বা ময়দানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুদী দোকানে বসিয়া, কলু ঘানিগাছে চড়িয়া এখনও সুর করিয়া রামায়ণ পড়ে। যে-পরিমাণে রামায়ণ পড়ে সে পরিমাণে মহাভারত বা চৈতন্য-ভাগবত পড়ে না।

দুর্গাপূজা যে আমাদের জাতীয় পূজা হইয়াছে—বাসন্তীপূজা হয় নাই, ইহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি এই যে, রামচন্দ্র অকালে মায়ের বোধন করিয়াছিলেন; ইহা রামের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রমাণ।

স্ত্রী-দেবতাদের জনপ্রিয়তা কম হইলেও, লক্ষ্মী নারায়ণের সহিত সমান সমান যাইতেছেন। রাধা কিন্তু শ্যামকে হারাইয়া দিয়াছেন। শিব বিষ্ণুর কাছে হারিয়া গিয়াছেন—বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শক্তি-উপাসকদের মধ্যে কালীর জনপ্রিয়তা খুব বেশী। রামের তুলনায় লক্ষ্মণ বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন; লক্ষ্মণ অপেক্ষা ভরত কম জনপ্রিয়।

এই সংখ্যার তারতম্য হইতে গ্রাম-প্রতিষ্ঠাকালে সেই-সেই অঞ্চলে কোন্ কোন্ দেবদেবীর জনপ্রিয়তা ছিল তাহার একটা আন্দাজ পাই।

এবারে মুসলমান মহাপুরুষদের নামেরও যেসব গ্রাম পাইয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম :

"মহম্মদ—"	৩৪
"মামুদ—"	৩২
"আলি—"	৬২
"হাসান—"	৮
"হোসেন—"	৩৩
	১৬৯
"দাউদ—"	১৭
"কাসিম—"	১০
"আকবর—"	৪
"ফরিদ—"	২৬
"সৈয়দ—"	১৬
"আমিন—"	৯
"আলম—"	২৮
"মোবারক—"	১২
"মোল্লা—"	২৫
"আবুল—"	১১
	১৫৮

"মির্জা—"	৭০
"মোবারক—"	১২
"মুস্তাক—"	৫
"মুরাদ—"	৯
"নিয়ামত—"	৬
"নুরপুর—"	১৪
"ওসমানপুর—"	১০
"সাওদা—"	৯
	১৩৫
সর্ব্বমোট—	৪৬২

পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের অনুপাত শতকরা ১৯ জন। পূর্ব্বে এই অনুপাত আরও কম ছিল, কিন্তু সংখ্যায় কম হইলেও প্রতিপত্তি খুব বেশী ছিল। তথাপি মুসলমানী নামের গ্রামের সংখ্যা উপরি-উক্ত তালিকায় যতই বাদ পড়ুক না কেন তাহা খুব কম—শতকরা ২-এরও কম। আমাদের ভুলের জন্য যদি ইহাকে শতকরা ৩৪ ধরি, তাহাতেও এই সংখ্যাল্পতা দূর হয় না। ইহার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথম, মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া দেখিল যে, বহু গ্রাম রহিয়াছে এবং গ্রামেরও নাম আছে। নাম বদলাইবার কোন কারণ না থাকিলে সাধারণতঃ নাম বদলানো হয় না। দ্বিতীয় কারণ—নূতন গ্রামের পত্তন হিন্দুরাই করিত—মুসলমানদের করিবার তাদৃশ প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। যে শ্রেণীর লোক গ্রাম-পত্তন করে, মুসলমানদের মধ্যে সেই শ্রেণীর লোকের অভাব ছিল।

উপরোক্ত নাম পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, "আলি" খুব জনপ্রিয়। হাসান ও হোসেন দুই ভাইয়ের মধ্যে হোসেন জন-প্রিয়। বর্ত্তমান বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনের অধিক সুন্নী। তথাপি আলির প্রাধান্য দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্বে সিয়ারা বর্ত্তমানের ন্যায় সংখ্যাল্প ছিলেন না। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা হাসান-উল্‌-হোসেনী সিয়া। সিরাজ-উদ-দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন আলিনগর। এইরূপ বহু মৌজার হয়ত পরিবর্ত্তিত নাম—"আলি—"হইয়াছে। গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শাহের নাম অনুসারে মৌজার নাম "হোসেন—" হওয়াও বিচিত্র নহে। ৩৩টি "হোসেন—" গ্রামের মধ্যে ১০টি মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায়—এইটি বিশেষভাবে চিন্তা করা দরকার। আবার ৬২টি "আলি—" গ্রামের মধ্যে ১৭টি মেদিনীপুরে—কেন?

একই নামের বহু গ্রাম, তাহা দেব-দেবীর নামযুক্তই হউক বা অন্য নামেরই হউক, বাংলায় আছে। আবার এমন এমন কতকগুলি নাম আছে যাহার অর্থ সহজে করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, এগুলি অনার্য্য নাম। কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিই:

বেলদা	৭	কদমা	৭
বারাসাত	১০	কেন্দুয়া	১৭
বারাসাতি	৫	কালনা	৬
সোদপুর	৪	কয়ঞ্জ	৮
ঘোলা	৪	শিমলা	১৫
দমদমা	১০	শিমুলিয়া	২৫
দিঘা	১৫	নাচনা	৬
ভালুকা	১৫	পলসা	১০
পদিমা	৯	পানিমালা	১৮
পাথরা	১৪	মাদপুর	৭
পাটনা	৮	বালি	৫
পাড়ুলিয়া	৩১		
পলাশী	১৫		
পলাসিয়া	৮		

আবার কতকগুলি গ্রামের নাম এমনই যে, মনে হয় এককালে ইহার অর্থ ছিল, কিন্তু অর্থ এখন তত সুস্পষ্ট নহে। নিম্নের গ্রামগুলি এককালে অল্প বসতিসম্পন্ন ছিল বা কয়েক ঘর লোক গিয়া প্রথমে গ্রাম-পত্তন করিয়াছিল—নাম দেখিয়া মনে হয়:

	সংখ্যা
দো-ঘরিয়া	১
তে-ঘরিয়া	৪৬
পাঁচ-ঘরা (ঘরিয়া)	১০
ছ-ঘরিয়া	১
সাত-ঘরিয়া (ঘরা)	৮
আট-ঘরা	১১
ন-ঘরিয়া	১
দশ-ঘরা	২

তে-ঘরিয়া নাম লইয়া দলাদলি করিবার প্রবৃত্তির নিন্দাসূচক একটি প্রবাদ আছে যে, "গাঁয়ের নাম তে-ঘরে, তার আবার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া"। এই প্রবাদ হইতে অনুমান হয় যে, এককালে তে-ঘরিয়া গ্রামে লোক-বসতি খুব অল্প ছিল। ৪৬টি তে-ঘরি (ঘরিয়া)-র মধ্যে ১৮টি মেদিনীপুরে। দশ-ঘরা গ্রাম দুইটিই হুগলী জেলায়। নামের সহিত আয়তনের কোন সাদৃশ্য নাই।

	আয়তন	জনসংখ্যা
দশ-ঘরা (থানা ধনেখালি)	৪৫০ একর	৪৬০
" (থানা গোঘাট)	২৬৮ "	৩১৯

দেখা যায়, কোন কোন নামের প্রতি কোন কোন জেলার একটা টান আছে। মেদিনীপুর জেলার কথা ধরা যাক:

গ্রামের নাম	মোট সংখ্যা	মেদিনীপুরে	শতকরা কয়টি মেদিনীপুরে
বনকাটি	৩২	২৩	৭১.৭
শালবনী	২৬	২২	৮৪.৬
জামবনী	২৯	২৩	৭৮.৩
মাসুলবনী	১০	১০	১০০.০
মুড়াবনী	৯	৯	১০০.০
কুলবনী	২	২	১০০.০
ডুবরাজপুর	২৮	১৬	৫৭.১
বনকাটা	৮	৩	৩৭.৫
মোহনপুর	৪৮	২০	৪১.৬

সব কয়টি শতকরা হিসাব মেদিনীপুরের গ্রাম-সংখ্যার অনুপাত শতকরা ৩১.৪ অপেক্ষা বেশী।

ঐরূপ ১৪টি গোঁসাইহাটের সবকয়টি কুচবিহারে। ৭টি হাতীশালা গ্রামের মধ্যে ৪টি নদীয়া জেলায়।

৬টি আমডাঙ্গা, ১০টি বেলডাঙ্গা, ২৯টি তেঁতুলিয়া কিন্তু সব জেলাতেই ছড়াইয়া আছে। "তেতুল—" গ্রাম ৮৫টি। যে তালপুকুর—"তালপুকুর গ্রাম আছে বটে, কিন্তু ঘটি ডোবে না"—এই প্রবাদের মূলে, তা কিন্তু মাত্র দুইটি ; একটি বীরভূমে, অপরটি মালদহে।

নিম্নলিখিত গ্রামের নাম ও সংখ্যাগুলি অনেক কথা মনে করাইয়া দেয় বটে, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। যথা :

ঈশ্বরপুর	২	ঈশ্বরীপুর	৯
নবাবপুর	২	বেগমপুর	৬
রাজপুর	৯	রাণীপুর	১৬
রাজনগর	১৫	রাণীনগর	৭
মহারাজপুর	৯		
রাজবাড়ী	৬		

'রাম' নাম দিয়া আরম্ভ বহুপ্রকার গ্রাম আছে : রামপুর, রামনগর, রামগঞ্জ, রামভদ্রপুর, রামভদ্রবাটী, রামচক, রামকৃষ্ণপুর, রামচন্দ্রপুর, রামনারায়ণপুর, রামনাথপুর, রামপাল, রামপাড়া, রামরুদ্রপুর, রামরামপুর, রামরতনপুর, রামশরণপুর, রামসুন্দরপুর, রামতনুনগর, রামজীবনপুর, রামকেলি, রামগোপালপুর, রামহরিপুর, রামগড়, রামেশ্বরপুর, রামেশ্বরবাটী, রামেশ্বরনগর, রামদাসপুর, রামদেবপুর, রামচন্দ্রপুর, রামবাটী, রামবাগ, রামানন্দপুর ইত্যাদি ইত্যাদি।

অন্যান্য দেবতাদের বেলায় কিন্তু এত রকমের নাম পাওয়া যায় না। জন্তুদের নাম দিয়া আরম্ভ গ্রামের সংখ্যা নিম্নে দিলাম :

হরিণ	১৬
মহিষ	৭৩
গরু	৪
সিঙ্গি	৯
বাঘ	১১০

দেখা যায়, বাঘ ও মহিষের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। বাঘ বলিতে আমরা শুধু কেঁদো বাঘ (রয়েল বেঙ্গল টাইগার) বুঝি না, চিতাবাঘ নেকড়ে বাঘ ও হাঁড়ার বাঘ (হায়েনা)-কেও বুঝি। বোধ হয়, তাই "বাঘ—" গ্রামের সংখ্যা এত বেশী।

একই নামের গ্রাম কিরূপ সংখ্যায় আছে নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। তালিকাটি অসম্পূর্ণ।

গোপালপুর	১২৯	গোপীনাথপুর	৫২	হরিপুর	৬০
গোপালনগর	৩৫	ভবানীপুর	৫০	জগদীশপুর	২১
গোপালগঞ্জ	৫	বলরামপুর	৬০	শিবপুর	৪০
কৃষ্ণপুর	৬১	নবগ্রাম	৩৫	ইচ্ছাপুর	২০
কৃষ্ণনগর	৪৮	জয়পুর	২৮	হরিহরপুর	৩০
কৃষ্ণগঞ্জ	৩	জয়নগর	২৩	কৃষ্ণরামপুর	৯
রামপুর	৬২	জয়কৃষ্ণপুর	২৪	মালঞ্চ	১৭
রামনগর	৫৭	সীতারামপুর	২৩	বৈকণ্ঠপুর	২৫
রামগঞ্জ	৪	রামকৃষ্ণপুর	২৮	অনন্তপুর	২৩
যাদবপুর	১৯	বাসুদেবপুর	৫৪	কল্যাণপুর	২৭
যাদবনগর	৬	মধুপুর	৩৭	নিত্যানন্দপুর	১৬
যাদবগঞ্জ	১	নারায়ণপুর	৭১	নিশ্চিন্তপুর	৪৫
নন্দনপুর	১৪	নূতনগ্রাম	১৭	পাহাড়পুর	২৩
পাইকবড়	৮	পাইকপাড়া	২৫	পানপাড়া	১৩
পার্ব্বতীপুর	২৮	পাঁচপোতা	৯	পাচপুখুরিয়া	৭
ফুলবেড়িয়া	১৪	ফুলবাড়ী	৫		

দেখা যায়, যে নামের—পুর—নগর ও—গঞ্জ তিনটিই আছে, সেখানে "পুর" অপেক্ষা "নগর" সংখ্যায় কম ; আর "গঞ্জ" খুবই কম। ইহার কারণ নগর সাধারণতঃ সংখ্যায় কম। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান—যেখানে আমদানী রপ্তানী হয়—কৃষিপ্রধান বাংলায় সেই '—গঞ্জ' কম হওয়াই স্বাভাবিক।

এইবার কতকগুলি মুসলমানী বা হিন্দুস্থানী নামযুক্ত গ্রামের পরিসংখ্যান দিব। যথা :

মামুদপুর	৩১	ফতেপুর	৪১	মির্জ্জাপুর	২৫
জামালপুর	১৮	বাহাদুরপুর	৩৭	গাজিপুর	১৪
সৈদপুর	১৫	বাবুপুর	৫	সেরপুর	২৪
হামিদপুর	৮	বিরহানপুর	৭	হবিবপুর	৬
তাজপুর	২২	আলিপুর	২৩	নজিরপুর	১৩

এতগুলি ফতেপুর হইবার কারণ কি? এইখানে কি কোন কালে লড়াই হইয়াছিল? স্থানীয় রাজার সহিত যুদ্ধ হওয়াই সম্ভব—এই রাজা কে? এইসব সম্বন্ধে স্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রবাদ গল্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিলে হয় ত এসকল উপকরণ হইতে গ্রামের নামের ইতিহাস পাওয়া যাইতে পারে। গাজিপুর গ্রামগুলি কি লড়াইয়ে মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারকদের স্মৃতি বহন করিতেছে? স্থানীয় কিংবদন্তী কি বলে? বর্ত্তমানে এইসব গ্রামের লোক—হিন্দু না মুসলমান—জানিতে পারিলে কতকটা হদিস পাওয়া যাইতে পারে। আমরা দুই-তিনটি গাজিপুরের কথা জানি যেখানে

মুসলমানেরা সংখ্যায় অধিক ও মোল্লা-প্রধান। 'পাজি' উপাধিধারী মুসলমানেরা ঐ স্থানের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি।

বহু গ্রামের নামের শেষে "পাড়া" এই শব্দটি আছে। যেমন আগড়পাড়া, উত্তরপাড়া।

কিন্তু সাধারণতঃ 'পাড়া' বলিতে পল্লীগ্রামের কোন মহল্লাকে—ward-কে বুঝায়। যেমন পানিহাটী এই গ্রামটির জোলাপাড়া, কাজিপাড়া, ঘোষপাড়া ইত্যাদি। পাড়া শব্দটির অর্থ কি? উইলসন সাহেব তাঁহার গ্লসারীতে লিখিয়াছেন:

Para—(Bengal)—A village, part of a village or town.

(Marathi)—A cluster of houses situated at a little distance from the village to which they belong for the convenience of carrying on cultivation.

Also, an oulying village or hamlet.

পাড়া কথাটি সংস্কৃত পল্লীর অপভ্রংশ। সংস্কৃত বিশ্বপ্রকাশে পল্লীর অর্থ "পল্লী কুটী গ্রামকয়োঃ" এইরূপ দেওয়া আছে। পল্লী-গ্রাম কথাটির অর্থ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাংলা অভিধানে এইরূপ আছে—ছোট ছোট বা ছোট বড় জনপদবিশিষ্ট অঞ্চল, ক্ষুদ্র জনপদ।

পাড়া কথাটি দুই অর্থেই কমবেশী ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, বহু আগে 'পাড়া' গ্রামের এক ক্ষুদ্র অংশকে বুঝাইত। লোকবৃদ্ধির সহিত গ্রামের আয়তন বৃদ্ধি পাইল; পল্লীঅঞ্চলে রাস্তাঘাট নাই, বা ছিল না বলিলেই হয়। কোন লোকের বাড়ী কোথায় বুঝাইতে হইলে সে সেই গ্রামের কোন্ পাড়ায় বা অঞ্চলে থাকে বলিলেই যথেষ্ট হইত। পরে কোন কোন পাড়া গ্রামের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে; রাজস্বের খাতায় আলাহিদা করিয়া নিজসত্তা লিপিবদ্ধ করাইতে পারিয়াছে। কি কি কারণে বা কোন সময়ে 'পাড়া' গ্রামে উন্নীত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না।

পূর্ব্বে, সাউথ বারাকপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত সুখচর মৌজা একটী মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড ছিল। ১৯০০ সনে ঐ মিউনিসিপ্যালিটি হইতে দুইটি মিউনিসিপ্যালিটি সৃষ্ট হয়: পানিহাটী ও সাউথ বারাকপুর। সুখচর মৌজার বেশীর ভাগ পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত হয়। বাকী অংশ সুখচরের কুলীনপাড়া সাউথ বারাকপুরের ভাগে পড়ে ও ওয়ার্ডের মর্য্যাদায় উন্নীত হয়। সমগ্র সুখচর হইতে নির্ব্বাচিত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় পানিহাটী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রথম চেয়ারম্যান হন যদিও তাঁহার বাড়ী কুলীনপাড়া ওয়ার্ডে।

মনে হয়, অনুরূপভাবে 'পাড়া' পরে গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

সাধারণতঃ একই পল্লীগ্রামের মধ্যে কয়েকটি পাড়া থাকে, বিশেষ করিয়া যদি সেই পল্লীগ্রাম আকারে বড় হয়। অনেক গ্রামে একই জাতির বা একই ধর্ম্মের লোক এক-একটি পাড়ায় থাকে—যেমন, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া। আবার পেশা হিসাবেও পাড়ার নাম হয়—যেমন আগড়পাড়া গ্রামে গাঁড়ারপাড়া। গাঁড়ারেরা নৌকা তৈয়ারি করিত। আবার কোন কোন গ্রামে, যেমন, পানিহাটীতে ঘোষপাড়া, চাটুজ্যেপাড়া, বাঁড়ুজ্যেপাড়া, বাজার-পাড়া, মিত্রপাড়া, চৌধুরীপাড়া, কাজিপাড়া, জোলাপাড়া, মালাপাড়া, মুখুজ্যেপাড়া ইত্যাদি বহু পাড়া আছে যাহার কোনটি বিশিষ্ট বংশের লোক বাস করে বলিয়া, কোনটি ব্যবসা হিসাবে, পেশা হিসাবে বা জাতি হিসাবে—স্থানীয় লোকে বলে। পাড়ার আয়তন কোনটি ছোট, কোনটি বড়, কোনটি আবার অতি ক্ষুদ্র, একই পাড়ার মধ্যে অবস্থিত। পাড়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই, যেমন কলিকাতায় শ্যামবাজার ও বাগবাজারের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই—কেহ কেহ স্থানীয় ডাকঘর যেখানে আছে সেইটিকে বাঁড়ুজ্যেপাড়া বলে, আবার কেহ কেহ ইহাকে চৌধুরীপাড়া বলে। কালক্রমে পাড়ার নামও বদলাইয়া যায়। আজকাল কেহ জোলাপাড়া বলে না—বলে মুসলমানপাড়া। কাজিপাড়া উঠিয়া গিয়াছে, দরবেশ-কাজির বংশধরগণ তাঁহাদের জমিজমা বিভিন্ন কল-কারখানাকে বিক্রয় করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

এই পাড়ার কি কোন 'natural unit' আছে? আপনার বাড়ী ঘোষপাড়া ও চাটুজ্যেপাড়ার সীমান্তে, কিন্তু ঘোষপাড়ায় অবস্থিত। কতদূর অবধি আপনি গ্রামের লোককে আপনার নিজ পাড়ার লোক বলিয়া জ্ঞান করেন? আপনার পাড়া বলিতে কি আপনি ঘোষপাড়া বুঝেন, না আপনার বাড়ী হইতে ২০০,৩০০ হাত অবধি যত লোক তত লোককে আপনার পাড়ার লোক বলিয়া মনে করেন? এই প্রশ্ন বহু লোককে করিয়াছি, কিন্তু সদুত্তর পাই নাই। ফুটিগোদার ইন্দুভূষণ গাঙ্গুলী মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, কেহ মরিলে যতদূর অবধি কান্নার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ততদূর অবধি আমার পাড়া, তা আমার বাড়ী ঘোষপাড়ায়ই হউক বা চাটুজ্যেপাড়ায় হউক না কেন। আমি মরিলে আমার বাড়ীর লোকের কান্নার শব্দ শুনিয়া যতদূরের লোক ছুটিয়া আসিবে ততদূর অবধি আমার পাড়া। এইটি একটি natural unit—কথাটি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রশ্ন হইতেছে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে এই হিসাবে কি লোকে পাড়ার কথা ভাবে, না অন্য কোন মাপকাঠি আছে।

বাংলা দেশের অনেক গ্রামের নাম "পাড়া" দিয়া শেষ হইয়াছে; যেমন, উত্তরপাড়া, আগড়পাড়া, তেলিনীপাড়া ইত্যাদি। হুগলী জেলার ১৯১৮টি গ্রামের মধ্যে ৬৬টি এইরূপ "—পাড়া"। অর্থাৎ শতকরা ৩·৫ এইরূপ গ্রাম। ইহাদের কালির গড় ৩৪৫·৬ একর। হুগলী জেলার সমস্ত গ্রামের গড় কালি ৪৩০ একর। "—পাড়া" গ্রামগুলি আয়তনে ছোট। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট "—পাড়া" গ্রাম ২৭ একর; সর্ব্বাপেক্ষা বড় "—পাড়া" গ্রাম ১,২৬৩ একর। ২৬৫ একরের উপর ৩৩খানি এই গ্রাম, ২৬৫

একরের কম ৩৩খানি গ্রাম। তথ্যগুলিকে এভাবেও সাজানো যায়।

গ্রামের আয়তন
(একরে)

	১০০-র কম	১০১-২০০	২০১-৩০০	৩০১-৪০০	৪০১-৫০০	৫০১-৬০০	৬০১-এর উপর
গ্রামের সংখ্যা	১	২০	১৮	৬	৯	৫	৭

যে-যে গ্রামের আয়তন ২০১ হইতে ৩০০ একরের মধ্যে তাহাদের লোকসংখ্যা ১৯৫১ সনে গড়ে ছিল ৩৮৪ জন। আর সমগ্র হুগলী জেলার গ্রামের গড় লোকসংখ্যা হইতেছে ৬৩৫ জন। দেখা যাইতেছে "—পাড়া" গ্রামের লোকসংখ্যা—বিশিষ্ট কারণ ব্যতীত—সাধারণতঃ সাধারণ গ্রামের চেয়েও ঢের কম। এইটি হুগলী জেলার বেলায় আমরা দেখিয়াছি; অন্যান্য জেলায়ও এইরূপ হওয়া সম্ভব—কিন্তু হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে, হিসাবের পূর্ব্বে কোনা সিদ্ধান্ত করা উচিত হইবে না।

পূর্ব্বে দেশের লোকসংখ্যা কম ছিল। যুগে যুগে এই লোকসংখ্যা একবার বাড়িল আবার কমিল। মোটের উপর লোকসংখ্যা সমান ছিল। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রকাশিত Determinants and Consequences of Population Trends পুস্তকে আছে :

Davis has concluded that India's population was about the same at the beginning of the modern period as it was two thousand years earlier."

অর্থাৎ, ডেভিস সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগের আরম্ভে ভারতের যে লোকসংখ্যা ছিল, ২০০০ বছর পূর্ব্বেও সেই লোকসংখ্যা ছিল।

আর মোরল্যাণ্ড দেখাইয়াছেন যে, আকবরের মৃত্যুকালে (১৬০৫ খ্রীঃ অঃ) ভারতের লোকসংখ্যা ছিল ১০ কোটি। বর্ত্তমানে (১৯৫১ সনে) ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা (পাকিস্থান ধরিয়া) ৪৩'১ কোটি।

মৌজার সৃষ্টি হইয়াছিল হিন্দুযুগে। তাহার পরও লোকবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, অবস্থাপরিবর্ত্তনের সহিত মৌজা সৃষ্ট হইয়াছে। আমরা যদি বাদশাহ আকবরের সময় বর্ত্তমান সব মৌজা সৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লই তাহা হইলে খুব অন্যায় হইবে না। আকবরের সময় বর্ত্তমান অপেক্ষা লোকসংখ্যা সিকি পরিমাণ ছিল। এমতে হুগলী জেলার সাধারণ গ্রামে গ্রামপ্রতি ১৬০ জন; আর "—পাড়া" গ্রামে ৯৬ জন। এখন বাড়ীপ্রতি,—'ঘর' প্রতি ৫ জন। পূর্ব্বে যখন একান্নবর্ত্তী প্রথা প্রবল ছিল, যখন চুরি, ডাকাতি বা বন্যজন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় লোককে ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইত তখন বাড়ীপ্রতি, 'ঘরপ্রতি' লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই বেশী ছিল। ১৮৩৮ সনের কালনা থানার হিসাব হইতে আমরা বাড়ীপ্রতি, 'ঘরপ্রতি' এখনকার অপেক্ষা একজন বেশী দেখিতে পাই। আমরা যদি আকবরের সময় বাড়ীপ্রতি, 'ঘরপ্রতি' আট-দশ জন লোক ধরি ত খুব ভুল হইবে না। এ হিসাবে "—পাড়া" গ্রামে দশ-এগার ঘর লোক বাস করিত। আর সাধারণ গ্রামে উনিশ-কুড়ি ঘর বাস করিত।

লোকবসতির এই তারতম্য হইতে আমরা গ্রামের নাম তে-ঘরিয়া, পাঁচ-ঘরিয়া, দশ-ঘরা প্রভৃতি হইবার একটা হদিস পাই। আমরা বোকা, সরল প্রকৃতির লোককে অনেক সময়ে তাচ্ছিল্যভরে 'পাড়াগেঁয়ে ভূত' বলি। এটি শহরে লোকের সাধারণ পল্লীগ্রামের লোকের প্রতি অবজ্ঞাসূচক ততটা নহে, যতটা পল্লীগ্রামের লোকের অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের লোকের প্রতি প্রযোজ্য। হুগলী জেলার পল্লী-অঞ্চলে শতকরা ২৬'২ জন লিখন-পঠনক্ষম। আর এই "—পাড়া" গ্রামে শতকরা ১৭'৯ জন। পূর্ব্বে বহু গ্রামে বিশেষ করিয়া গণ্ড-গ্রামে পাঠশালা থাকিত, লোকে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। এডামস সাহেব তাঁহার 'Report on the State of Education in Bengal'-এ হুগলী জেলা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :

"The indigenous elementary Schools amongst Hindoos in this district are numerous".

পার্শ্ববর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার প্রতি থানায় গড়ে ৩২টি করিয়া পাঠশালা ছিল; ১৮৭২ সালে বর্দ্ধমান জেলায় ২২টি থানা ছিল; প্রত্যেক থানার এলাকা গড়ে ১২৩ বর্গমাইল। প্রতি থানায় ১২০টি গ্রাম। ১২০টি গ্রামের মধ্যে ৩২টি গ্রামে পাঠশালা ছিল, অর্থাৎ ৪টি গ্রামের মধ্যে একটিতে পাঠশালা ছিল, তিনটিতে ছিল না।

যে সময়ে প্রবাদটি সৃষ্ট হইয়াছিল সে সময়ে এই পার্থক্য হয়ত আরও বেশী ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। ছোট গ্রামের পক্ষে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করা শক্ত। একজন গুরুমহাশয়ের পক্ষে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের দুই-চারিজন ছেলে পড়াইয়া নিজের গ্রাসাচ্ছাদন চালানো যায় না। এজন্য পাড়াগাঁয়ের লোকের পক্ষে অশিক্ষার দরুন মূর্খ বা বোকা হওয়া আশ্চর্য্য নহে।

পরিশেষে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। গ্রামের নাম লইয়া এই আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের ৩৯,০০০ গ্রামেই সীমাবদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামের নাম জানা না থাকায় জন্য আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ, খণ্ডিত হইতে বাধ্য। অখণ্ড বঙ্গে ৮৬,০০০ গ্রাম—তাহার অর্দ্ধেক লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের সহিত পশ্চিমবঙ্গের যে ভৌগোলিক ও জলবায়ুর পার্থক্য আছে, যে সামাজিক ও অনবিধ পার্থক্য আছে—তাহার পশ্চাৎপটে আলোচনা করিলে অনেক জিনিব ধরা পড়িত, তাহা আমরা ধরিতে পারি নাই।

আরও একটি কথা—আমাদের এই আলোচনা প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। সময় ও জ্ঞানের অভাবে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ। এই বিষয়ে সুধীজনের যদি দৃষ্টি পড়ে ত ভাল হয়। যে-যে তথ্য পাইয়াছি বা সংকলন করিতে পারিয়াছি তাহার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ডেপুটী সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ও ঐ আপিসের কর্মচারী শ্রীশ্রীবাসচন্দ্র সাহা রায়ের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি জুরিসডিক্‌শান লিষ্ট হইতে সমস্ত গ্রামের বা মৌজার নাম (কোন কোন পরগণায় ইহা অবস্থিত), থানা-ওয়ারী, জেলাওয়ারী ইংরেজী ও বাংলায় একত্রে প্রকাশ করেন ত গবেষকদের বিশেষ কাজে আসিবে। ৩৯,০০০ গ্রামের নামের তালিকা সংকলন করিয়া প্রকাশ করিতে আমাদের মনে হয় তিন-চার হাজার টাকার মধ্যে কুলাইবে। সরকার কত দিকে কত ব্যয় করিতেছেন—সামান্য এই টাকাটা ব্যয় করিয়া যাঁহারা সামাজ-তাত্ত্বিক গবেষণায় নিযুক্ত—তাঁহাদের সাহায্য করেন ত ভাল হয়। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের নিকট কি আমরা ইহা দাবি করিতে পারি না?

সুদর্শন চক্র

শ্রীসুবোধ বসু

পাখা ভাড়া করিবই ঠিক করিয়াছিলাম। বন্ধু হরিপদ পরামর্শ দিল, 'সারা গ্রীষ্ম ধরে ভাড়া গুনতে যত টাকা লাগবে তা দিয়ে একটা সেকেণ্ড-হাণ্ড পাখা কিনেই ফেলা যায়। আমার একটা দোকানও জানা আছে পঞ্চু মিস্তিরির দোকান। বলিস ত একদিন নিয়ে যাব।'
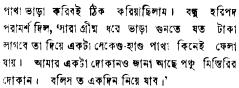
পরের রবিবার হরিপদর সঙ্গে পঞ্চু মিস্ত্রীর দোকানে হাজির হওয়া গেল। দোকান ত নয়, এক আস্ত কামার-শালা। এই কামারশালার চতুর্দিকে বিকল ইলেকৃট্রিক পাখাগুলি হাসপাতালের রোগীর মত অসহায় ভাবে হাত-পা ছড়াইয়া পঞ্চু মিস্ত্রীর হাতুড়ে-চিকিৎসার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। হাপর, কাঠকয়লা, ছেঁড়া জামা এবং নতুন জামা-পরা ইলেকৃট্রিকের তার, তাপ্পি মারার বিবিধ উপকরণ, হাতুড়ী, রেঞ্জ, চিমটে ও সাঁড়াশী প্রভৃতি চিকিৎসার সাজ-সরঞ্জাম পঞ্চু মিস্তিরির কর্মদক্ষতা সম্পর্কে সম্ভ্রম উদ্রেক করিয়া ছাড়ে।

'মিস্তিরি, একটা পাখা দিতে হবে।' হরিপদ পরিচিতের আব্দারের সঙ্গে কহিল।

পঞ্চু মিস্ত্রী একটা বিকলাঙ্গ টেবিল-ফ্যানের উদরে ইস্ক্রু মারিয়া ব্লেড আঁটিতেছিল, বিকৃত মুখে আরও গোটা পাঁচ-সাত প্যাঁচ মারিবার পর চোখ তুলিল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল 'টেবিল না সিলিং?'

'সিলিংই চাস ত?' আমার দিকে চাহিয়া হরিপদ কহিল।

পঞ্চু মিস্ত্রী জবাবের জন্য কপাল কুঞ্চিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, আমার সম্মতিসূচক ঘাড়নাড়া লক্ষ্য করিবার পর কহিল, 'সিলিং দিতে পারব না, মোশায়। খারাপ জিনিস দেব, আর সারা বছর ধোরে পঞ্চু মিস্তিরিকে গাল দেবেন, তার মদ্দে আমি নেই। শত হোক, বাজারে একটা নাম আচে। তবে হ্যাঁ, যদি টেবিল-ফ্যান হলে চলে, জিনিসের মত জিনিস দিতে পারি। ব্যবহার করে বলতে হবে জিনিস দিয়েছিল বটে পঞ্চু মিস্তিরি...'

'কি বলিস', হরিপদ কহিল, 'টেবিল-ফ্যানে চলবে?'

'মানুষ ক'জন?' আমার দ্বিধা ভাব লক্ষ্য করিয়া পঞ্চু-মিস্ত্রী নিজেই জেরা করিল।

'মানুষ ইনি একলাই', হরিপদ জবাব দিল, 'তবে বন্ধু-ইয়ার অনেক।'

'একজনের জন্য কেউ মিছিমিছি বিজলী নষ্ট করে!' পঞ্চু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মন্তব্য করিল। 'গোটা ঘরময় মিছি-মিছি হাওয়া ছড়িয়ে লাভটা কি? কেনার খরচা দু'গুণ, চালানোর খরচা তিন গুণ। বন্ধু-ইয়ার কতক্ষণের? আর পাখা টেবিল হলে কি হবে, এ ঘোরা পাখা—ঘুরে ঘুরে হাওয়া করবে—কেউ বাদ যাবে না।...তারপর যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান—এঘর, ওঘর, সর্বত্র। সিলিং পাখা খোঁড়া পাখা—এক পা নড়বার সাধ্যি নেই।...তা রাজী থাকেন ত বলুন, দামও সস্তা করে দেব। কেবল চল্লিশ টাকা, ব্যস।'

'একবার দেখতে পারি কি?' মিস্তিরি মশায়ের বক্তব্যের সারবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া কহিলাম।

'আলবৎ।' পঞ্চু মিস্ত্রী উৎসাহের সঙ্গে কহিল—'আর দু'মিনিট অপেক্ষা করুন, দুটো ব্লেড্ লাগিয়ে ফেলি, তখন

দেখবেন, কি পাখা। বলিয়া উপরোক্ত টেবিল-ফ্যানের উদরে আরও একটা ব্লেড্ স্থাপন করিল।

বেশ একটু দমিয়া গেলাম। এটাই তবে তাহার জিনিষের মত জিনিষ। মিস্ত্রীমশায়ের ভাঙা পাখার আস্তাবলের মধ্যেও এটাকে বিশেষ জীর্ণ জীব বলিয়া মনে হয়। বহু বৎসর এবং বহু ঝড়ঝাপটা যে জীবনের উপর দিয়া চলিয়া গেছে, তাহা ইহার চেহারাতে এতটা সুস্পষ্ট যে, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

'একটু বেশী বুড়ো পাখা নয় কি?' মিস্ত্রীমশায়ের ফিলিংস এ আঘাত না করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কহিলাম।

'বুড়ো পাখা!' পঞ্চু মিস্ত্রী বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিল। 'পক্ষিরাজ মশায়, পক্ষিরাজ। দেখতে রোগা, অথচ চলবে আকাশে পাখা মেলে। চেহারায় কি এসে যায়। দেখতে হবে মেশিন কেমনটি। মশায়, সৌখীন পাখার মেকী বাজারে এ জিনিসটি মাথা খুঁড়লেও পাবেন না। ওর পরমায়ু কম করে আরও কুড়ি বছর। পঞ্চু মিস্তিরি মেশিন চেনে মশায়, পঞ্চু মিস্তিরি মেশিন চেনে।...চালু করে দিচ্ছি, একবার নিজে দাঁড়িয়ে দেখে যান।'...

চালু না করা পর্য্যন্ত পঞ্চুমিস্ত্রীর কারখানায় নড়বড়ে বেঞ্চটিতে বসিয়া অপেক্ষা করিতে হইল। ব্লেড বসানো হইল, চাকি আঁটা হইল। তার পরানো হইল এবং কোথাও-বা আঁঠা-মাখা কালো কাপড়ের তাপ্পি জড়ানো হইল। অবশেষে পাখার মস্তকে দুই-তিনটা উৎসাহবর্দ্ধক চাপড় বসাইয়া পঞ্চু-মিস্ত্রী তাহা নিকটবর্ত্তী এক প্লাগে সংযুক্ত করিল। কহিল, 'পাখা নয় মশায়, একেবারে সুদর্শন চক্র। একবার আওয়াজখানা শুনুন।'

ঘোরাটা সতেজ সন্দেহ নাই। হাওয়ার প্রাচুর্য্য আমাদের জামা-কাপড়ে হিন্দোল তুলিয়া ছাড়িল। ঘোরের মধ্যে কয়েক মিনিট পরে পরে 'কটাং' করিয়া একটা শব্দ হয়। মনে হয় যেন কে হাড় চিবাইতেছে।

মিস্ত্রীমশায়ের দৃষ্টি ইহার প্রতি আকৃষ্ট করিলাম।

'তেল খায় নি মশায়, দুটো বছর ধরে তেল খায় নি। সাহেবের গুদোমঘরে পড়ে ছিল। কিন্তু এরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে—এক খাবলা গ্রীজ খাইয়েছি। ও আর দেখতে হবে না। দু'দিনের মধ্যে দখনে হাওয়ার মত হিস্‌হিস্ করবে। নির্ভাবনায় নিয়ে যান...' বলিয়া পঞ্চু মিস্ত্রী দুই হাতে তালি দিয়া হাত পরিষ্কার ও বিক্রয়-সম্পর্কিত কথাবার্ত্তা চূড়ান্ত করিল।

'পঁচিশ টাকা দিচ্ছি, দিয়ে দিন।' হরিপদ কহিল, 'শত হোক, পাখার বয়সটা দেখতে হবে—তা রাজী থাকেন ত বলুন। এবার যেতে হবে।'

পঞ্চু মিস্ত্রী যে দৃষ্টিতে দুই চোখ মেলিয়া চাহিল, তাহাকে আহত দৃষ্টি বলিলেও অবিচার করা হয়। এমন অন্যায্য দরদস্তুর যেন জীবনেও শোনে নাই। যেন একই সময়ে তাহাকে ও পাখাকে অপমান। আমার নিজের পাখাটি লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পঞ্চু মিস্ত্রীর আহত ভঙ্গিটার প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, নিজের মতামত জানাইবার সুযোগ হয় নাই।

পঞ্চু মিস্ত্রী প্রায় বিরক্তি-সহকারে পাখাটাকে একপাশে দুম্ করিয়া সরাইয়া রাখিল। হরিপদ আমার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিল দাম আর কিছু বাড়াইবে কিনা। আমিও ইঙ্গিতে নিষেধ করিলাম এবং পঞ্চু মিস্ত্রীর নড়বড়ে বেঞ্চ হইতে উভয়েই উঠিয়া পড়িলাম।

'তিরিশ দেবেন?'

'না।' আমার অনিচ্ছা জানিয়া হরিপদ কহিল।

'নিন, নিয়ে যান।' পঞ্চু মিস্ত্রী খদ্দের হাতছাড়া হয় দেখিয়া রাজী হইল। 'নিতান্ত গোটাকয়েক টাকার দরকার বলেই জলের দামে ছেড়ে দিচ্ছি। এই দামে এই মাল সারা বাজারে মিলবে না। ব্যবহার করলেই পরিচয় পাবেন।' বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া টেবিল-পাখাটা সে আগে বাড়াইয়া দিল।

এর পর আর না কিনিয়া উপায় ছিল না। পঞ্চু মিস্ত্রীর প্রশংসা-আঁটা টেবিল-পাখার মাথার উপরকার আঙটায় আঙুল গলাইয়া উহা মেসের কামরায় হাজির করিলাম। জিনিষটা জলের দামে কেনা হইয়াছে সন্দেহ নাই। এখন যদি ঠিকমত চলে তবে রীতিমত 'বারগেইন' করা হইয়াছে বলা চলিবে।

প্লাগ লাগাইয়া দিলাম। হাওয়ার হিল্লোল খেলিয়া গেল ছোট কামরাটায়। তেজী পাখা সন্দেহ নাই। হাওয়ায় জোর আছে। এক ঐ শব্দটা। চলিতে চলিতে হঠাৎ 'কট্টাস্' করিয়া উঠে। প্রতিবারই চমকাইয়া উঠিতে হয়। কিন্তু এতে ঘাবড়াইবার কিছু নাই। পঞ্চু মিস্ত্রীর কথামত যদি গ্রীজ-এর কল্যাণে এটা শুধরাইয়া যায় ত ভাল কথা। আর তা না হইলে কিছুদিনের মধ্যে এই আওয়াজে অভ্যস্ত হইয়া উঠিব—এমন করিয়া চমকাইয়া উঠিতে হইবে না।

রাত্রে শুইতে যাইবার আগে কিন্তু আর একটি দোষ লক্ষ্য করিলাম। টেবিলের যেখানটায় পাখা রাখিয়াছিলাম পাখাটা সেখান হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছে। চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে সে পাখাটা সরাইয়া আনিয়াছে কিনা। প্রত্যুত্তরে সে বলিল,

আমিই বরঞ্চ পাখার প্লাগ খুলিয়া যাইতে ভুল করিয়াছিলাম, এবং সে ঘরে আসিয়া দেখে পাখাটা ক্রমে সামনে দিকে হাঁটিয়া আসিতেছে। দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি প্লাগটা খুলিয়া ফেলে।

এ রকম কোনও দোষ সারা সন্ধ্যা চালাইয়াও লক্ষ্য করি নাই। নিজের চোখে ভৃত্যের অভিযোগ পরীক্ষা করিবার জন্য পাখাটা আগের জায়গায় সরাইয়া আনিয়া প্লাগ বসাইয়া দিলাম। বোঁ করিয়া আওয়াজ করিয়া পাখা চলিল। প্রচুর হাওয়ায় ঘর পূর্ণ হইল, কিন্তু আর কোনও রকম নড়াচড়ার লক্ষণ নাই। যেন একটা পাথর পড়িয়া আছে।

বুঝিলাম, আমি বেড়াইতে বাহির হইবার পর চাকর মহাপ্রভু নাড়াচাড়া করিয়াছেন। রাতে পাখা চালাইয়া শুইলাম।

মধ্যরাত্রে দুম করিয়া একটা শব্দ হইল। চমকাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। ক'দিন আগে মেসের এক ঘরে চোর ঢুকিয়াছিল। চোর নয় ত? অন্ধকারে আলো জ্বালাইতে গেলাম। হঠাৎ কে যেন পা জড়াইয়া ধরিল। ভীত হইয়া পা ঝাঁকুনি দিয়া উহাকে একদিকে ঠেলিয়া সুইচের কাছে উপস্থিত হইলাম।

আলো জ্বালাইবার পর দেখা গেল, আমার পাখা মেঝেয় বসিয়া আছেন, এবং অকাতরে তক্তপোশের নিচে হাওয়া বিলাইতেছেন। এই তেজী হাওয়ায় ধুতির খুট পায়ে জড়াইয়াই যে আমাকে অতটা শঙ্কিত করিয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই।

কিন্তু এ কি ব্যাপার! টেবিল-ফ্যান টেবিল হইতে লাফাইয়া নামিয়া ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইলে তাহা ত রীতিমত বিপদের কথা। কবে যে লাফাইয়া বিছানায় উঠিয়া বুকে চাপিয়া বসে, তারই বা ঠিক কি।

পরদিন পাখা রিকসায় চাপাইয়া পঞ্চুমিস্ত্রীর কারখানায় হাজির হইলাম ও বিপদের কথা জানাইলাম।

'আরে মোশায়', পঞ্চু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, 'এই সামান্য ব্যাপারে ঘাবড়ে গেলে কখনও সেকেণ্ড হ্যাণ্ড পাখা কেনা চলে। তা ছাড়া এ যে তেজী ঘোড়া। টগবগ করবেই ত। কষে বেঁধে রাখা চাই, তবে যদি স্থির থাকে। দু' চার পয়সার দড়ি-দড়া কিনে নিয়ে যান, ও হাঙ্গামা আর দেখা দেবে না।'

অর্থাৎ, দড়ি দিয়া পাখা বাঁধিয়া না রাখিলে কচ্ছপের মত গুঁড়িগুঁড়ি আগাইয়া আসিবে এবং পাগলা ঘোড়ার মত স্বেচ্ছায় লাফালাফি করিবেই। এ ছাড়া উহার আর চিকিৎসা নাই।

'আর ব্লেডের উপরকার ফ্রেমটা বড় বেশী নড়বড় করছে।' আমি কহিলাম, 'মনে হচ্ছে, যে-কোন সময়ই ব্লেডসহ ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারে। বলেছিলেন না, সুদর্শন চক্র।'

পঞ্চুমিস্ত্রী পরিহাসটা উপভোগ করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। কহিল, 'ক্ষেপেছেন, তাও কখনও হয়। তা দিন, প্যাঁচগুলি মেরে দিই।'

'আর সেই কট্রাস শব্দটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।'

'ক্রমে থেমে যাবে।' বলিয়া আর কথা না বাড়াইয়া সে প্যাঁচ কষিবার দিকে মনোযোগ দিল।

ইহার পর হইতে প্রতিদিনই পাখাটাকে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া তবে চালানো হইতেছে এবং পাখা গড়ে প্রত্যহ দু'বার করিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া বন্ধনমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমাদের চাকরটি বুদ্ধিমান। সেই পরামর্শ দিল, ইলেক্‌ট্রিকের প্লাষ্টিক মোড়া তার আনিয়া বাঁধিলে দেখিবার দিক হইতে সুশ্রী এবং বন্ধন হিসাবে আরও মজবুত হইবে। তাহার পরামর্শ শুনিলাম। পাখা বাছাধন শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়িল।

সেদিন রাত্রে সত্যই আর সে টেবিল হইতে বাহির হইতে পারিল না। কিন্তু এই বন্ধন তাহার তেজী প্রকৃতিতে কিরূপ মনোবেদনার সৃষ্টি করিয়াছে, দ্বিতীয় দিন মধ্যরাত্রে তাহা স্পষ্ট টের পাওয়া গেল। একটা চাপা আর্ত্তনাদের আওয়াজে ঘুম ভাঙিল। ক্রুদ্ধ বন্যজন্তু খাঁচায় আটকা পড়িলে রাগে যেমন গর্‌গর্‌ করিতে থাকে এই আর্ত্তনাদ সেই ক্রোধবিমিশ্রিত আর্ত্তনাদ। অভিজ্ঞতার ফলে সহজেই বুঝিলাম, বন্দী পাখার বিক্ষোভ। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্লাগ খুলিয়া ফেলিলাম। বেশী রাগিলে কি অনর্থ করিয়া বসে ঠিক কি। ক্রোধে বার বার কাঁপিয়া উঠিয়া তেজী ঘোড়া শান্ত হইল।

শান্ত হইল বটে, কিন্তু প্রতিশোধ লইতে ভুলিল না— তবে আমার উপরে নয়। প্লাগ খুলিয়া মুক্তি দিয়াছিলাম বলিয়া বোধ হয় কিছু প্রসন্ন হইয়াছিল।

আপিস-টাইমে চাকর আমার ভাত ঘরে পৌঁছাইয়া দেয়। আজও সে টিপয়ের উপর থালা নামাইয়া রাখিল এবং আমার আরামের জন্য পাখার প্লাগ লাগাইয়া দিয়া কাচের গেলাসটা ধুইবার জন্য বাহিরে গেল। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে মাথা নাড়িতে নাড়িতে পাখা কট্রাস কট্রাস শব্দে প্রতিবাদ উগড়াইয়া হাওয়ার ঝড় সৃষ্টি করিল। মনে হইল, ক্রুদ্ধ ঝাপটা মারিয়া আমার ভাতের থালা উল্টাইয়া ফেলিবে।

সহসা এই ঝড়ের মধ্যে বজ্রপাতের শব্দ শুনিয়া চম-

কাইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, ব্লেডসহ সারাটা সুদর্শন চক্র বোঁ বোঁ রবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ও সিলিঙের সাতিরের সহিত কড়কড় শব্দে সংঘর্ষ ঘটাইয়া এখন দরজার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। চাকরটা ঠিক এই সময়েই কাচের গেলাসে জল ভরিয়া ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিতেছিল। সুদর্শন চক্র কাৎ হইয়া তাহার গলায় কোপ বসাইয়া দিল।

ইহার পর চাকরকে লইয়া একটা সপ্তাহ হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি করিতে হইয়াছে। সুদর্শন চক্রের বোধ হয় লোকটার উপর জাতক্রোধ ছিল। তার দিয়া পাখা আটকাইবার পদ্ধতিটা সেই আমাকে শিখাইয়া দেয়।

ইহার পর বোধ হয় মাসখানেক কাটিয়াছে। রাস্তা দিয়া অন্যমনস্ক ভাবেই চলিয়াছিলাম, এমন সময় পাশের এক বাড়ী হইতে হাঁক শুনিলাম, 'আর পাখা-টাকা চাই? সিলিং, টেবিল যেমন চান, তেমনই পাবেন। উৎকৃষ্ট জিনিষ।'

চমকাইয়া ফিরিলাম। দেখি, পঞ্চুমিস্ত্রির কারখানা।

'আর পাখা!' আমি কহিলাম, 'সুদর্শন চক্রকেই বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে!'

'কেন, কেন হ'ল কি? ও রকম তেজী পাখা হাজারে একটা মেলে।'

'কিন্তু তেজ সহ্য করা গেল না। ফেলে দিতে হ'ল।'

'একবার কাণ্ড দেখেছ!' পঞ্চুমিস্ত্রী স্তম্ভিত হইয়া কহিল, 'একেবারে ফেলে দিলেন! এখেনে নিয়ে এলে ত উচিত মূল্যে কিনে নিতাম।'

'তাতে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু আবার অন্য লোকে বিপদে পড়ত।' আমি কহিলাম।

'ফেলেছেন কোথায়?'

'হেদোর জলে ডুবিয়ে দিয়েছি।' বলিয়া সটান আগাইয়া গেলাম।

প্রকৃতপক্ষে সুদর্শন চক্রকে পুরনো লোহার দরে পাড়ার শিউ মিশিরের কাছে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। গদা ও চক্রে বিভক্ত হইয়া ফ্যানটা কয়েক দিন আমার তক্তপোশের তলায় পড়িয়াছিল। তাতেও যেন কি রকম একটা অস্বস্তি বোধ করিতাম। মনে হইত, মধ্যরাত্রে বিশ্রী একটা গর্জ্জন শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়া হয় ত দেখিব, গদা ও চক্র একসঙ্গে জোড়া লাগিয়া লাফাইতে লাফাইতে মাথার কাছে হাজির হইয়াছে। এমন সময় চক্রাঘাতে ঘায়েল ব্যক্তিটির উপদেশ অনুসারে গদাচক্র ওজনদরে বেচিয়া সম্পূর্ণ আয় ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলাম।

কিন্তু সেকথা পঞ্চুমিস্ত্রীকে বলা নিরাপদ নয়। কে জানে, পাড়ার পুরনো লোহার আড়তদারের কাছ হইতে সুদর্শন চক্রের অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া উহা আবার চালু করিবার ব্যবস্থা করিবে কিনা।

'ও মোশায়, শুনছেন।'

প্রায় পাঁচ মিনিট চলিবার পর পিছন হইতে হাঁক শুনিলাম। তাকাইয়া দেখি, পঞ্চুমিস্ত্রী হাঁফাইতে হাঁফাইতে দৌড়াইয়া আসিতেছে।

'আজ্ঞে, দয়া করে যদি বলে যান হেদোর পুকুরের ঠিক কোন দিকটায় ফেলেছেন, তবে বাড়ীর ছেলেপিলেদের এক-বার নামিয়ে দেখতে পারি · '

সঠিক জায়গাটা বলিয়া দিয়াছিলাম। আমার সন্দেহমাত্র নাই, পঞ্চু মিস্ত্রী সপরিবারের পরের দিনই হেদুয়ার সারাটা পুষ্করিণী তোলপাড় করিয়া ছাড়িয়াছে। আপিস ছুটি থাকিলে এই মহৎ প্রচেষ্টা স্বচক্ষে দেখিতে পাইতাম। লোকটা আমাকে না-হক ঠকাইয়াছিল; ওকে সপরিবারে নাকানি-চুবানি খাওয়াইয়া তবু একটু পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

নাগপুরের কথা

শ্রীজিতেন্দ্রনারায়ণ রায়

শরীরটা কিছুদিন যাবৎ ভাল যাচ্ছিল না। ডাক্তার উপদেশ দিলেন—'হাওয়া বদলান।' সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মস্থলে দু'মাসের ছুটির দরখাস্ত, আর নাগপুরে ছোট ভাই রণেনকে সংবাদ—'৪ঠা জানুয়ারী বোম্বাই মেলে রওনা হচ্ছি'। দশ বছরের ছেলে দেবপ্রসাদকেও সঙ্গে নিলাম। হাওয়া বদলের অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারি নি; 'নহিলে খরচ বাড়ে।'

রণেন এগার বছর নাগপুরে আছে, স্থানীয় সিটি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। বহুবার নাগপুরে বেড়িয়ে যাবার অনুরোধ সে আমাকে করেছে; কর্ম্মের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে সে ফুরসত করে উঠতে পারি নি, যদিও, যাবার আগ্রহ ছিল প্রচুর। রণেন অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষক হিসাবে নাম করেছে। নাগপুরে পৌঁছে শহরের উপকণ্ঠে নতুন-গড়ে-ওঠা হনুমান নগরে তার বাড়ীতে এসে উঠলাম।

এই সেই নাগপুর—যেখানকার হিন্দু রাজাদের শৌর্য্য-বীর্য্য-গরিমার কাহিনী বলে শেষ করা যায় না—দীর্ঘকাল যাঁরা ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখে ছিলেন—যাঁদের বজ্রমুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ ব্রিটিশকে বহুকাল ধরে ঠেকিয়ে রেখেছিল। অতীতের অন্ধকার খানিকটা সরিয়ে ইতিহাসের আলোয় সেই পুরানো নাগপুরের কতকটা দেখে নেওয়া যাক্।

নাগপুরের ঐতিহ্য গৌরবময়। শহরের দক্ষিণ দিকে শীর্ণ-তোয়া নাগ নদী—এর বর্ত্তমান রূপ একটা খালের মত, বর্ষাকালে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে নাগজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এখানে বসবাস করেছিল। সম্ভবতঃ নাগ নদী ও নাগপুরের নামের উদ্ভব এই থেকেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গোন্দ রাজাদের প্রাচীন দুর্গের চারদিকে বর্ত্তমান নাগপুর গড়ে ওঠে বলে লোকের বিশ্বাস। রাষ্ট্র-কুট সম্রাট তৃতীয় কৃষ্ণের খ্রীষ্টীয় দশম শতকের মাঝামাঝি দেউলির তাম্রফলকে নাগপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে আবদুল হামিদ লাহোরীর শাজাহানের দশম বৎসর বর্ণনার মধ্যেও নাগপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

নাগপুর শহরটি প্রাকারবেষ্টিত দুর্গের মত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেউগড়ের গোন্দরাজগণ নাগপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। সাতারা জেলার মুধোজী প্যাটেল শিবাজীর অধীনে অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। তিনিই নাগপুরের ভোঁসলা রাজপরিবারের আদি পুরুষ। বাপুজী, পারসোজী ও শাহোজী নামে তাঁর তিন ছেলে। সামরিক বিভাগের বিশেষ কৃতিত্বের পুরস্কার-স্বরূপ পারসোজীর উপর বেরারের 'চৌথ' আদায়ের ভার পড়ে। আঠার শতকের গোড়ার দিকে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কার্ণহোজী সিংহাসনে বসেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভাই প্রথম রঘুজী দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হন।

আম্বাঝারি হ্রদ
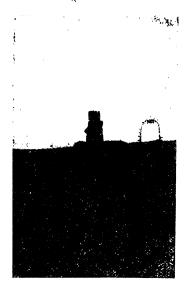
গোন্দরাজের অবসান ঘটিয়ে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রঘুজীরাও ভোসলা নাগপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। নাগপুর রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এই রঘুজী। আকবরের সময়ে যেমন মোগল-সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃতিলাভ করে ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে, সেইরূপ রঘুজীর জীবদ্দশায় নাগপুর রাজ্যের রাজনৈতিক বিষয়েও চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে অজন্তা আর উত্তরে নর্ম্মদা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী পর্য্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তার পর তাঁর পুত্র জানোজী ও মুধোজীর আমল থেকে রাজ্যের ক্রমশঃ অবনতি হতে থাকে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম ও পেশোয়ার সৈন্যেরা এই শহরটিকে লুঠপাট করে পুড়িয়ে দেয় এবং পিণ্ডারীরা আবার উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শহরটিকে আংশিকভাবে পোড়ায়। কারও কারও মতে দৈবক্রমে আগুন লাগায় প্রাসাদটি ভস্মীভূত হয়; আবার কেউ কেউ বলেন, ইংরেজরা এটিকে পুড়িয়ে দেয়—যেন পরবর্ত্তীদের মনে

এর জাঁকজমক ও পূর্ব্বগৌরবস্মৃতি জাগরূক না হতে পারে। ভোসলা রাজাদের রাজত্বকালে আবার নাগপুরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে সীতাবল্ডি দুর্গে যুদ্ধ হয় এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর মধ্যপ্রদেশের রাজধানী হয়। বর্ত্তমানে বোম্বাইয়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছে।

লক্ষ্মীনারায়ণ টেকনলজি ইনষ্টিটিউট

নাগপুরের বুক চিরে চলে গেছে রেলের লাইন, লাইনের পশ্চিমেই সীতাবল্ডি দুর্গ। বছরে দু'দিন মাত্র সাধারণকে এই দুর্গে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এ সুযোগ আমি গ্রহণ করেছিলাম। দুর্গটি ছোট একটি পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের অভ্যন্তরভাগও দেখলাম, ঘুরে ঘুরে সিঁড়ি নেমেছে। এক জায়গায় চোখে পড়ল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের রক্ষণাগার। পাহাড়ের শীর্ষভাগে রয়েছে শত্রুকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন দিকে কামানদাগার ব্যবস্থা। অনেকটা জায়গা জুড়ে কতকগুলি ভেণ্টিলেটার দেখলাম। নীচে জলের ব্যবস্থা আছে—অবরোধ প্রভৃতি দুঃসময়ের জন্য। পাহাড় থেকে প্রাসাদ পর্য্যন্ত এবং আর একদিকে দুটি সুড়ঙ্গও নাকি ছিল যার ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে অনায়াসে যাতায়াত করা যেত।

রেল লাইনের পূর্ব্বদিকে পুরানো শহর। প্রথমেই চোখে পড়ে ভোসলা রাজাদের তৈরী প্রকাণ্ড জুম্মা তলাব, আর তার পাড়ে কয়েকটি কাপড়ের কলের চিমনি। এম্প্রেস মিলটি জামশেদজী টাটা প্রতিষ্ঠিত মধ্যপ্রদেশের সর্ব্বপ্রথম কাপড়ের কল—এটি ভারতের শ্রেষ্ঠ কলগুলির অন্যতম। দীঘির পূর্ব্ব পাড়ে লোকমান্য তিলকের মর্ম্মরমূর্ত্তি। এই জায়গা থেকেই আদি শহর মহালের মধ্য দিয়ে প্রধান রাস্তাটি গিয়েছে জুম্মা-দরজার ভিতর দিয়ে পূর্ব্বদিকে। এই দরজাটি প্রাচীন নগর-প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র, এই রকম আরও দু'টি ফটক শহরে আছে।

জুম্মা-দরজার নিকটে ছিল রাজাদের পুরানো প্রাসাদ। এটি ভস্মীভূত হবার পর আর দু'টি প্রাসাদ ছোট করে এখানে তৈরি করা হয়। শহরের বাইরে দক্ষিণ দিকে শকরদারা বাগানে বর্ত্তমান রাজা-বাহাদুর রঘুজী রাও ভোসলার বাসস্থান। উল্লিখিত পুরানো শহরের প্রাসাদ দু'টির একটিতে তাঁর পুত্রগণ ও অপরটিতে তাঁর ভ্রাতা ৺রাজা লক্ষ্মণ রাওয়ের বংশধরগণ বাস করেন। প্রাসাদগুলির জাঁকজমক এখন কিছু নেই—এগুলি পূর্ব্বগৌরবের সাক্ষ্য দিচ্ছে মাত্র।

ইতোয়ারী ব্যবসাকেন্দ্র—এটি কলকাতার বড়বাজার। বহু সি. পি. টিকের গোলা, বিরাট একটি পাইকারী শস্যের বাজার, কয়েকটি কাঁচের ও চীনামাটির কারখানা। পুরানো শহরের বস্তি ও অলিগলি অসংখ্য। কম রাস্তায়ই জল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে—ধুলাবালিও প্রচুর। আগে বর্ষাকালে শহরটি খানা-ডোবায় পরিণত হ'ত। প্রতি বছর প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিত। শহরের বাইরে তাঁবুতে লোকজন সরানো হ'ত। এক ইংরেজ সিবিল সার্জ্জন হাতীর পিঠে বেড়াল চড়িয়ে শহরময় ঘুরাতেন—শ্লোগান ছিল—'বিল্লী পালো, জান বাঁচাও'। ক্রমাগত আন্দোলনের পর—১৯১৮ সনের পর আর প্লেগ হয় নি। বছর ত্রিশ যাবৎ ইমপ্রুভমেণ্ট-ট্রাষ্টের কাজ চলছে। অনেক পাকা রাস্তা তৈরী হয়েছে, ভাল ভাল ইমারত উঠেছে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সায়েন্স কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ, সরকারী আপিস, আদালত, সেক্রেটারিয়েট, কাউন্সিল হল, জেনারেল পোষ্ট আপিস, হাইকোর্ট প্রভৃতি সবই রেললাইনের পশ্চিমে। সুন্দর নতুন সেক্রেটারিয়েট ভবনটি সবেমাত্র তৈরী হয়েছিল; রাজধানী পরিবর্ত্তনের ফলে কাজে লাগে নি। পাথরের তৈরী সুদৃশ্য হাইকোর্ট ও অনেক আপিসেরই একই অবস্থা।

শহরটি বেড়ে চলেছে পশ্চিমের দিকে। পুরানো শহরে প্লেগের উৎপাত ও স্থানের অপ্রাচুর্য্যই শহর সম্প্রসারণের হেতু। ১৯০৫ সনে প্রায় চারশ' বিঘা জমির উপর ধানতলি শহর গড়ে ওঠে। ক্রমে গড়ে ওঠে গিরিপেট, ধরমপেট, রামদাসপেট প্রভৃতি অঞ্চলগুলি। আমাদের খালি পেট, ভরপেটের মত অনেক অঞ্চলই পেট জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মরাঠীতে পেট হচ্ছে পাড়া। নতুন শহরগুলি প্লান করে তৈরী, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবচেয়ে সুন্দর মনে হ'ল রামদাসপেট—যেখানে দশ বছর আগেও ছিল মেঠো জমি। ফাঁকা ফাঁকা গাছপালা, উদ্যানশোভিত সৌধমালা শুধু প্রচুর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সেরই নয়, সুরুচিরও পরিচায়ক।

শহরটা বেড়েই চলেছিল, হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়িয়েছে হোঁচট খেয়ে। সব মহলেই শুনি—নাগপুরের গুরুত্ব অনেকটা কমে যাবে, শহরের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যাহত হবে। কেউ বা প্লট কিনে ভুল করেছেন, কেউ বা বাড়ী করে পস্তাচ্ছেন।

এটি কসমোপলিটান শহর। মাদ্রাজী, গুজরাটী, মাড়োয়ারী,

সিন্ধী, পঞ্জাবী প্রভৃতি অনেকেই বাড়ীঘর করে বাস করছেন। সদর অঞ্চলে বহু খ্রীষ্টান ও পার্শীর বাস। বাঙালীর সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। অনেকেই বাড়ীঘর করে এদেশে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন। ধানতলি ও সদরে বাঙালীর সংখ্যা বেশী, অন্যান্য অঞ্চলেও বিচ্ছিন্নভাবে অল্পসংখ্যক আছেন। স্থানীয় দশ-বারোটি কলেজের প্রত্যেকটিতেই চার-পাঁচ জন বাঙালী অধ্যাপক অধ্যাপিকাও কয়েকজন আছেন। উচ্চ সরকারী চাকুরিতে, বিশেষ করে শিক্ষাবিভাগে বহু বাঙালী ছিলেন, সম্প্রতি সংখ্যা কমে আসছে—নিম্ন-মধ্যবিত্ত মাষ্টার, কেরানী প্রভৃতি বহু শিক্ষিত লোক আছেন। বাঙালীরা সভা-সমিতি ও পরস্পর মেলামেশায় সুবিধার জন্য ধানতলিতে নিজস্ব বেঙ্গলী এসোসিয়েশন হল নির্ম্মাণ করেছেন। এঁদের প্রচেষ্টায় প্রতি বছর কয়েকটি বারোয়ারী দুর্গাপূজা ও কালীপূজা হয়। মরাঠীরাও বাঙালীদের অনুকরণে এই সব পূজা কিছু কিছু আরম্ভ করেছেন। শহরের লোকসংখ্যা খুব বেড়েছে। ১৮৭২ সনে ছিল ৮৪,৪৪১ জন, আর বর্ত্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় সাত লাখ।

মাছ, মাংস, ফল, তরিতরকারী বাংলাদেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তা। তবে সবরকম মাছ বা তরিতরকারী মেলে না। বাজার সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বসে। মৎস্যপ্রিয় বাঙালীদের নিত্য মাছ সংগ্রহ করতে হলে বেশ অসুবিধা হয়।

নাগপুরের জলসরবরাহ হয় আম্বাঝারি ও গোরোয়ারা—এই দু'টি কৃত্রিম হ্রদ থেকে। আম্বাঝারি হ্রদটি ভোসলা রাজগণ এক শতাব্দীরও আগে নির্ম্মাণ করেন, পরে আরও বাড়ানো হয়। লোক-জন বাড়ার সঙ্গে জলের চাহিদাও বেড়েছে। ন' মাইল দূরে কাম্পটীর কাণহান নদী থেকে জলসরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জলশোধনের যন্ত্রটি ভারতের শ্রেষ্ঠ জলশোধন-যন্ত্রগুলির অন্যতম।

আম্বাঝারি হ্রদটি রেললাইন থেকে পশ্চিমে মাইলচারেক দূরে। একদিন দেখতে যাই—সঙ্গে মরাঠী যুবক শ্রীভি.জি. দেশমুখ—ইনি রণেনের সহকর্ম্মী, ইংরেজীর অধ্যাপক। মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে এবং অনেক কষ্ট স্বীকার করে ইনি আমাকে শহরের প্রায় সব জায়গাই দেখিয়েছেন। এ জন্য আমি তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। সুউচ্চ পাড়বিশিষ্ট এই হ্রদটি একেবারেই জনমানবশূন্য। শ্রীদেশমুখ বললেন—কয়েকজন বন্ধু মিলে তিন ঘণ্টায় হ্রদটি একবার চক্কর দিয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রায় দশ-বার মাইল পথ। আমরা পূর্ব্ব পাড়ে দাঁড়িয়ে, সূর্য্যদেব তখন ঢলে পড়েছেন দিগন্তের গাছের মাথায়। গম্ভীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! শ্রীদেশমুখ দেখালেন—উত্তর-পশ্চিম কোণের ঐ পাহাড়গুলি থেকে বর্ষায় নামে জলধারা, হ্রদের জল উপচে পড়ে দক্ষিণের কূল ছাপিয়ে, ভাসিয়ে দেয় আশে-পাশের গ্রাম। কাছেই দেখলাম নাগ নদীর উৎস-মুখ। যে নদী পড়ে থাকে আধমরার মত, বর্ষাকালে তাতে জাগে সহস্র প্রাণ! তন্ময় হয়ে দু'জনেই খানিকক্ষণ দেখছিলাম। শ্রীদেশমুখের হয়ত মনে পড়ছিল ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর কবিতার দু'চারটা লাইন। "শব্দহীন, গতিহীন, স্তব্ধতা উদার" আমাকে যেন অভিভূত করে ফেলেছিল।

নাগপুরে সাইকেল ও সাইকেল-রিক্সার সংখ্যা এত বেশী যে, রাস্তায় চলাই ভার। সাইকেলে শুধু আরোহীই নন, আরোহিণীও আছেন! ছাত্রীরা স্কুলে কলেজে যাচ্ছে, গৃহিণীরা সাইকেলে হাট-বাজার করছেন। আমাদের দেশের বীরাঙ্গনারা আগে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতেন; আর এই বীরাঙ্গনারা দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধ চালাচ্ছেন সাইকেলের পিঠে চড়ে।

কমলালেবুর পাইকারী বাজার
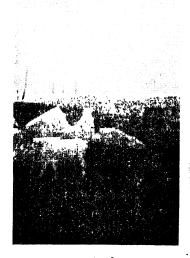
এদেশের মেয়েরা কাছা দিয়ে সাড়ী পরেন। তবে নবীনারা কাছা বর্জ্জন করেছেন, প্রবীণারা এখনও কাছার মায়া ছাড়তে পারেন নি। 'পেল্লায়' এক-একটা সাড়ী—আঠারো হাত লম্বা! এতটা ভার বহনের শক্তিও নবীনাদের আছে কিনা সন্দেহ। পুরানোকে আঁকড়ে ধরে লাভ নেই। এই নিদারুণ অর্থসঙ্কটের দিনে এই অনাবশ্যক ও মিতব্যয়িতার পরিপন্থী কাছাটা ছেড়ে আধুনিকারা বোধ হয় ভালই করেছেন। কাছা বনাম আ-কাছা নিয়ে একটা অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বও আছে। রক্ষণশীলা প্রবীণারা মুক্তকচ্ছা আধুনিকাদের ক্ষমার চোখে দেখেন না। আমাদের অনভ্যস্ত চোখ ও মন প্রবীণাদের কাছা আর নবীনাদের সাই-কেল আরোহণ এ দুয়ের কোনটাতেই সায় দেয় না।

রাস্তায় রাস্তায় চোখে পড়বে বহু উপহার-গৃহ। বন্ধু বা আপন জনের কাছ থেকে আমরা উপহার পেয়ে থাকি বিনা পয়সায় স্নেহ-ভালবাসার বিনিময়ে। চায়ের দোকান, খাবারের দোকান, রেস্তোরা, হোটেল সবই উপহার-গৃহ। উপহার কথাটা সংস্কৃত; এর প্রয়োগটা সম্বন্ধে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। এক

মরাঠী অধ্যাপকের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানলাম—কথাটা 'উপাহার' যেমন, উপাধ্যক্ষ, উপাচার্য্য অর্থাৎ আংশিক আহার। গোটা শহরটা ছাপার অক্ষরে বেকসুর ভুলটা চালিয়ে যাচ্ছে।

পৌষ-সংক্রান্তির দিনে চোখে পড়ল মনোহারী দোকানে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের উপহার কেনার ভিড়। বড়দিনের উপহারের মত বন্ধুদের মধ্যে বিনিময় হয় 'সংক্রান্ত-ভেট'। আমাদের পৌষ-সংক্রান্তি এখানকার তিল-সংক্রান্তি। আর 'তিলগুড়' মিষ্টি বিনিময় চলে বাড়ীতে বাড়ীতে—এর উদ্দেশ্য পরস্পরের মধুর সম্পর্ক আরও মধুর হোক।

সীতাবল্ডি দুর্গ

এদেশের লোকেরা বড়ই পানাসক্ত। কেউ কেউ হয় ত এর একটা কদর্থ করে ফেলবেন, তাই কথাটা পরিষ্কার করে বলা দরকার। দু'পা এগোলেই পড়বে পানের দোকান আর তাতে খদ্দেরের ভিড়ও যথেষ্ট। উচ্চ, নীচ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই অতিরিক্ত পান ব্যবহার করেন। অতিথি-অভ্যাগত আপ্যায়নে, ক্রিয়া-কর্ম্মে, মঙ্গলানুষ্ঠানে পান একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। বাংলা দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পূজাপার্ব্বণে পান-তামাকের নিমন্ত্রণ করা হয়। এখানকার নিমন্ত্রণের প্রথা পান-সুপারির। সিটি কলেজের এক কর্ম্মচারীর গৃহ-প্রবেশ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কলেজের অধ্যক্ষ ও অনেক অধ্যাপকই ছিলেন। কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, আর বাটাভরা আস্ত আস্ত পান। অধ্যক্ষ মহাশয় থেকে শুরু করে সকলেই নিপুণ হস্তে দিব্যি পান সেজে খাচ্ছেন। আমার অপটুতা লক্ষ্য করে এক অধ্যাপক মহাশয় আমাকে একটি পান তৈরি করে দিলেন। বাংলা দেশেও পানের ব্যবহার বড় কম নয়, তবে উপর-মহলে পান একরকম অপাংক্তেয় বললেই চলে। এখানকার পানের বাটারই বা কি বৈচিত্র্য! উপাধ্যক্ষ মহাশয়ের বাসায় গুটিচারেক নমুনা দেখলাম—রয়েল এডিশন থেকে যায় পকেট সংস্করণ। তাম্বুল-বিলাসে মহারাষ্ট্র যে বাংলাকে পেছনে ফেলেছে সে বিষয়ে আমার সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে উৎ-কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কে যে অগ্রগামী তা বলা দুষ্কর।

কুটীরশিল্পের মধ্যে এখানকার তাঁতশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতোয়ারীতে ষাট-সত্তর হাজার তাঁতীর বাস, প্রত্যেক পরিবারই এক-একটি কারখানা। বালক-বালিকা থেকে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকেও সাধ্যমত কাজে লিপ্ত দেখেছি। সাধারণ আটপৌরে ধুতি-সাড়ী থেকে, দেড়শ দু'শ টাকার দামী সাড়ী পর্য্যন্ত এখানে তৈরী হয়। তাঁতীদের এসোসিয়েশনটি খুব জোরালো। সরকার এদের নানান্ ভাবে সাহায্য করছেন। এরা শ্রম-সমস্যার সমাধান করেছেন অদ্ভুত এক উপায়ে। এক-একজন তাঁতী চার-পাঁচটা বিয়ে করে নেন, কাজ কি পরের দুয়ারে ধর্ন্না দিয়ে! বিয়ের বাজারে মেয়ে-দের দাম আছে। মেয়ের বাবাকে উচিত মূল্য দিয়ে বিয়ে করতে হয়। নতুন বিবাহ-আইনের আওতায় বেচারী স্বামীরা হয়ত অসুবিধায় পড়বেন—এই কুটীরশিল্পের ভবিষ্যৎই বা কি কে জানে!

নাগপুরের আশেপাশেই বহু কমলালেবুর বাগান—রেলগাড়ী বা বাস থেকেই চোখে পড়ে। কমলালেবু, নানাবিধ উৎপন্ন ফসল ও বেরারের তুলার জন্য বড় বড় তিনটি পাইকারী বাজার পুরানো শহরে। শত শত গরুর গাড়ী বোঝাই করে মালপত্র আনা হচ্ছে এই সব বাজারে। কমলালেবুর বাজার (সান্ত্রা মার্কেট) ষ্টেশনের ধারেই। পুরা মরশুমের সময় শতেকখানি কমলালেবু-বোঝাই মালগাড়ী রোজ চালান দেওয়া হয় ভারতের বিভিন্ন স্থানে।

শহরের এক প্রান্তে একদিন দেখলাম ব্যাণ্ড বাজিয়ে বিরাট এক শোভাযাত্রা চলেছে। বিয়ের শোভাযাত্রা নয়, একটি শবকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাধ্যানুযায়ী বাজনা বাজিয়ে মৃত-ব্যক্তিদের শ্মশানে নিয়ে যাওয়াই এখানকার প্রথা।

পুরানো শহরে নাগ নদীর ধারে চলার পথে কতদিন পড়েছে কতকগুলি মন্দির। এখানে আর পূজার শঙ্খ-ঘণ্টা বাজে না, সন্ধ্যায় আরতি কোনও দিন দেখি নি। মনে হয়েছে, দেবতা চলে গেছেন ভাঙা মন্দির ছেড়ে। তার পর অনুসন্ধান করে জানি—দ্বিতীয় রঘুজীর এক পুত্র পার্শোজীর কাশীবাড়ী নাম্নী এক রাণী ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। এই চিতার উপর সুন্দর কারুকার্য্যখচিত একটি স্মৃতিমন্দির তৈরী হয়। এর চার-দিকে আরও কতকগুলি চারু মন্দির। এটি ভোঁসলা রাজ পরি-বারের শ্মশানভূমি।

সীতাবল্ডি দুর্গের মাইল পাঁচেক দূরে 'টার্কি-পয়েন্ট'—ঐ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। এই দুর্গটি ছিল দুর্ভেদ্য। এক-মাত্র এই পাহাড় থেকে কামান দাগলে এই দুর্গ অধিকার করা যেতে পারে—এই তথ্য ইংরেজেরা সংগ্রহ করেন নাকি কিন্তু লক্ষ

টাকা ঘুষ দিয়ে। ঐ পাহাড় থেকেই দুর্গটি জয় করা হয়। পাহাড়টি এবং শীর্ষভাগের কামানদাগার স্থানটি একদিন সদলবলে দেখে আসি।

মরাঠীরা সাধারণতঃ সরল প্রকৃতির। অল্পেই এরা সন্তুষ্ট থাকেন, জীবনযাত্রা-প্রণালীও সাদাসিধে। বাড়ীঘর, আসবাবপত্রে প্রয়োজনীয়তার প্রশ্নটাই বড়, বাইরের পারিপাট্য গৌণ। পয়সা জমাবার ঝোঁক অনেকের মধ্যেই প্রবল, এমনকি উদরকে বঞ্চিত করেও। বাঙালীদের মত ভাবপ্রবণতা এদের নেই, তবে অনেক বিষয়েই মিল আছে। প্রকৃতিতে রুক্ষতা আছে—পাহাড়ে মাটিতে কোমলতা বোধ হয় তেমন সম্ভব হয় না।

সাধারণতঃ মরাঠীরা হয় চাকুরে, না হয় শ্রমিক—ব্যবসায়ের ঝোঁক কম। পল্লী অঞ্চলে বেশীর ভাগ লোকেরই চাষবাসই উপজীবিকা। এরা বৎসরে চার-পাঁচ মাস কাজ করেন, বাকি সময়টা শুয়ে-বসে ও গালগল্পে কাটিয়ে দেন। অভাব অল্প, পেট ভরে দু'বেলা ভাত রুটি জোটে। বেশী পরিশ্রম করে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার দিকে খুব মন নেই। পল্লী অঞ্চলে সরকার কুটীরশিল্প প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করছেন—এখনও বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নি। বলদের রেস, মুরগী ও মোষের লড়াই, জুয়াখেলা প্রভৃতিতে শহরের শ্রমিকশ্রেণীর লোকের খুব ঝোঁক।

বছর পঁচিশ আগেও শিক্ষাটা ছিল ব্রাহ্মণদের প্রায় একচেটে। এখন সকলেই শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছেন। তবে এখনও অনেক বড় বড় পদ, নেতৃত্ব প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের হাতেই। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের মধ্যে একটা রেষারেষির ভাব ছিল, ক্রমে এটা শিথিল হয়ে আসছে।

মরাঠী ভাষার ইতিহাস এক হাজার বছরের উপর। বর্ত্তমান মরাঠী ভাষার উদ্ভব—মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ও অপভ্রংশের ভিতর দিয়ে—সংস্কৃত থেকে। মুসলমান রাজত্বের সময় কিছু কিছু ফার্সি শব্দ মরাঠী ভাষায় প্রবেশ করে, বিশেষ করে শাসনসংক্রান্ত দলিলপত্রে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে মরাঠী ভাষার বর্ত্তমান যুগ বলা যেতে পারে। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। নূতন ভাবধারা, জীবনের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন অভিজ্ঞতা মরাঠী সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মরাঠী সাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। মারাঠীদের অনেকেই আজকাল বাংলা শিখছেন এবং বাংলা সাহিত্যের উপর তাঁদের বেশ অনুরাগ। স্থানীয় অনেক গ্রন্থাগারেই বহু বাংলা বই আছে।

কাব্য ও সাহিত্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও অনলস চর্চ্চায় বাঙালী ও মরাঠী উভয়েই সগোত্র। উভয়েরই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, উভয় দেশেই আবহমানকাল থেকে চলে আসছে টোলপদ্ধতি, গড়ে উঠেছে পণ্ডিতসমাজ।

একজাতিত্ব বা নেশন্যালিটি গড়ে ওঠার দিক থেকে বাঙালী ও মরাঠীর মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। একটি ভাষা যে একটি জাতিকে বেঁধে রাখতে পারে—তার দৃষ্টান্ত বাঙালী ও মরাঠী। বাঙালীর ভাষা কোমলকান্ত, তাই বাঙালীর গীতিকবিতায় সুরের মাধুর্য্য। জয়দেব থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ অবধি তার সাক্ষ্য বিদ্যমান। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত সংস্কৃত নাটকে মেয়েদের মুখে বসানো হয়েছে—তার কারণ ঐ ভাষার কোমল মধুর রূপ। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম'-এর 'হলা পিঅ সহি' স্মরণ করুন। কি মধুর, কি সুন্দর! 'সেকাল'

মেডিক্যাল কলেজ

কবিতায় কালিদাস-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি স্মরণ করেছেন।

শুধু মধুর রূপে নয়, কাঠিন্যের রূপে, পৌরুষে মরাঠীর সঙ্গে ছিল বাঙালীর প্রাণের নিবিড় যোগ। ব্রিটিশ-বিরোধী অগ্নিযুগের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করে বাঙালী ও মরাঠী। বাঙালী 'শিবাজী উৎসব' করেছে। তিলকের 'ভবানীপূজা' বাংলার বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের যুগে ছড়িয়ে পড়েছিল—অরবিন্দের 'ভবানীমন্দির'-এর পরিকল্পনা তারই ফল। কত দেশভক্ত মরাঠী ছিলেন বিপিন পাল, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জনের জাতীয়-আন্দোলনের দোসর। এঁদেরই একজন—সখারাম গণেশ দেউস্কর—তিনি ছিলেন বাঙালীর অকৃত্রিম বন্ধু—দুঃখে বেদনায়, অপমানে লাঞ্ছনায়। দেশসেবার মাধ্যম ছিল তাঁর সংবাদপত্র, বাংলা ভাষা হয়েছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাঁর 'দেশের কথা' এক দিন বাঙালীর চোখ ফুটিয়েছিল?

চাল-চলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে, জ্ঞানে কর্ম্মে, কৃষ্টিতে, চিন্তাধারায় ও অন্যান্য অনেক বিষয়েই রয়েছে বাঙালীর সঙ্গে মরাঠীর মিল।

উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতচর্চ্চা বহুকাল থেকেই মহারাষ্ট্রে চলে আসছে। প্রসিদ্ধ গাইয়ে রামমারাঠে গাইবেন সিটি কলেজের কি একটা উৎসবে। টিকিট কিনে ভাই বলল গান শুনে আসতে। সঙ্গীতের আমি বিশেষ কিছু বুঝি না। তবু ভাবলাম, একটু ঘুরে আসা

যাক। কলেজের প্রকাণ্ড হলটি ভরে গিয়েছে—গজল কি ঠুংরী, খেয়াল কি ধ্রুপদ, কানাড়া কি মেঘমল্লার কি যে গাইলেন জানি না—তবে কানে যেন সুধা বর্ষণ করছিল। আধুনিক সঙ্গীতে রাজেশ্বরী বাসুদেব (দত্ত) ও কোকিলকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকর বেশ নাম করেছেন। আধুনিক বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে পণ্ডিত নাগরকর, পুরোহিত, সরস্বতীবাঈ রাণে, হীরাবাঈ বরদেকার, কেশরবাঈ কেশকার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

জুম্মা দরজা

বিয়েতে পণপ্রথা এখানে ছিল না। তবে আজকাল এই দুষ্ট ব্যাধিটি সমাজদেহে প্রবেশ করছে, বিশেষ করে উচ্চ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে।

বিয়েতে গ্রাম বা শহরসুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করা হয়—ভোজের তেমন বালাই নেই। ভোজের ব্যবস্থা সাধারণতঃ আত্মীয়-স্বজন ও নিতান্ত অন্তরঙ্গের জন্য। ফুল, আতর, গোলাপজল ও পান দিয়ে সকলকে সংবর্দ্ধনা করা হয়। বিয়েতে যোগদান করা সকলে অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেন। বর-কনেকে সকলে আশীর্ব্বাদ করেন হলুদমাখা চাল ছিটিয়ে আর দু'চারটে পয়সা দিয়ে। পাশেই পুরোহিত দাঁড়িয়ে থাকেন পাছে অপাত্রে পয়সাগুলি চলে যায়। বিবাহিতাদের সিঁথিতে সিঁদুর দিবার প্রথা মহারাষ্ট্রে নেই, গলায় অলঙ্কারের সঙ্গে একটি মঙ্গলসূত্র ধারণ করতে হয়। কেউ কেউ হালে সিঁদুর পরতে আরম্ভ করেছেন। বিয়ের সময় নাকে 'নথ' পরতে হয়। ফুটফুটে তিনটি মেয়ের বিয়ে দেখেছিলাম। সৌন্দর্য্য খর্ব্ব করার কৃতিত্ব নথের অসাধারণ!

মরাঠীদের খাদ্যগ্রহণ সাদাসিধে। দু'বেলা ভাতের সঙ্গে চাপাটি (রুটি) খাদ্যের অপরিহার্য্য অঙ্গ। জল আর মোটামুটি রকমের দু'একটা তরকারী, চাটনি থাকা চাই। দু'চার রকম সব্জী মিলিয়ে কোনও ব্যঞ্জন তৈরি হয় না। আলু দিয়ে আলুর তরকারী, বেগুন দিয়ে বেগুনের তরকারী। কারও সঙ্গে কারও মিল-মিশ নেই—পূর্ণ অসহযোগ! ছোট-বড় সকলেই অল্প-বিস্তর ঘি ব্যবহার করেন। তরকারী মুখরোচক করার দিকে ঝোঁক নেই। বাঙালী মা-বোনেরা মুখরোচক কত কি রান্না করেন—সুক্ত, মোচার ঘণ্ট, আলুর দম, চচ্চড়ি, ইঁচড়ের ডালনা, ঝিঙে-পোস্ত, পটলের কোর্ম্মা, ছানার ডালনা—আরও কত কি! ব্যঞ্জনের এত রকম বৈচিত্র্য বোধ হয় ভারতের আর কোনও অঞ্চলে নেই। অব্রাহ্মণদের মধ্যে মাংসের প্রচলন আছে। ব্রাহ্মণদের মাছ-মাংস নিষিদ্ধ, অবশ্য সামাজিকভাবে, নিজ নিজ গৃহে। অনেকেই লুকিয়ে চুরিয়ে সাধ মেটান রেষ্টুরেণ্টে বা বাঙালী বন্ধুদের গৃহে।

বিয়ের একটা ভোজের কিছু আভাস দেব। ভোজের নামে অনেকেই হয়ত উল্লসিত হয়ে উঠবেন; কারও কারও রসনা হয়ত হয়ে উঠবে রসসিক্ত। সে সম্ভাবনা মোটেই নেই, যেহেতু ভোজে না আছে মাছমাংসের ঘটা, না আছে দই-মিষ্টি।

সাধারণতঃ ভোজের ব্যবস্থাও সাদাসিধে। ভাত, আলুভাত (পোলাওর ব্যর্থ অনুকরণ), এক-আধটুকরা চাপাটি, কিছু ভাজাভুজি সাধারণ তরকারী, পাঁপড়ভাজা ও কঢ়ী (লঙ্কা চটকানো গরম ঘোলের মত এক রকম জিনিষ)। আর যদি লাড্ডু ও জিলিপী থাকে, সে ত মহাভোজ। এই রকম এক ভোজে নিমন্ত্রিত হয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। রণেনের এক প্রাক্তন ছাত্রের বিয়ে। তাঁর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে চল্লিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল ট্রেনে, ট্যাক্সিতে বাসায় ফিরি রাত দেড়টায়। যে বয়সে 'বনং ব্রজেৎ'-এর কথা, সেই বয়সে ভোজের উপর লোভ ছিল না—লোভ ছিল এদেশের রীতিনীতির সঙ্গে কতকটা প্রত্যক্ষ পরিচয়ের। খাদ্যাদি না কিছু বাঙালীর রুচিসম্মত, না তোলা যায় মুখে ঝালের আতিশয্যে। যা খেতে চাই রসনা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কঢ়ীর সাহায্যে রসনাটা ঠাণ্ডা করে নেব সেই উপায়ও নেই। নিমন্ত্রণে রীতিমত বিভীষিকা হয়েছিল। অবশ্য পরে সে ভুল ভেঙেছিল।

খাবার বৈঠকে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের পাতার সামনে আলপনা দিয়ে এক-একটি করে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। পরে বাড়ীর নিমন্ত্রণেও এই আলপনা এবং ধূপকাঠির ব্যবস্থা দেখেছি। গোঁড়া মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রতিদিন ভোজনকালে এখনও এই ব্যবস্থা করে থাকেন। আহার্য্য পরিবেশন করার পর একজনে আহার আরম্ভ-সূচক 'ধ্বনি' দিলেন। আহার শেষেও এই ধ্বনি। বাঙালী বৈষ্ণবদের মহোৎসবেও এই রীতি আছে। ভাত দিয়ে আরম্ভ এবং ভাত দিয়েই শেষ করা ভোজনের রীতি। আমাদের দেশের মত 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' নয়। কয়েকজন বৃদ্ধ ভোজনের প্রায় শেষ-ভাগে একের পর একে ভক্তিমূলক ও হাস্যরসাত্মক গান ধরলেন (নিশ্চয়ই সুভোজ্য ও সুপেয় পেয়ে); কয়েকজন যুবকও যোগ

দিলেন। উৎসবের ভোজের গানের মাধ্যমে এরূপ আনন্দের অভিব্যক্তি রীতিবিরুদ্ধ নয়।

তার পরে মধ্যপ্রদেশের নাম করা অভিজাত শ্রী ভি. ভি. কালিকারের পরিবারে প্রথম নিমন্ত্রিত হই। ইংরেজ আমলের লাট-বেলাট এমন কেউ ছিলেন না যাঁর শুভাগমন এই বাড়ীতে না হয়েছে। নিমন্ত্রিত আরও কয়েকজন ছিলেন। উচু উচু সব কাষ্ঠাসন—সমতা রক্ষার জন্য থালাবাটিগুলিও পুরোভাগে ঐরূপ উচু আসনে বিন্যস্ত। প্রত্যেক থালার পাশেই জলপূর্ণ লোটা ও গ্লাস—বাসনপত্র সবই রূপোর। হিন্দুস্থানীর রুটি তৈরির থালা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন। ঐরূপে একটা থালা—থালা নয়—যেন এক-একটা গামলা। খাঁটি মহারাষ্ট্রীয় ষ্টাইল।

ঘিভাত, ঘি-ময়দা-চিনির সাহায্যে অতি উপাদেয় কি একটা জিনিষ (নামটা ঠিক মনে নেই, লুচির বদলে ব্যবহার করা হয়), তিন-চার রকমের ভাজা ও তরকারী, কয়েক রকমের চাটনি। সবই ঘৃতপক্ব ও সুস্বাদু। ব্যঞ্জনাদির জটিলত্ব ও সংখ্যাধিক্য কোথাও দেখি নি। কাউকে নিমন্ত্রণ করে অন্ততঃ আট-দশটা বাটি সাজিয়ে না দিলে বাঙালী মেয়েদের মন ওঠে না। অধ্যাপক দেশমুখের বাড়ীর পুরাচাবড়ি (এক রকম ভেজিটেবল চপ) ও শ্রীখণ্ড অপূর্ব্ব। শ্রীখণ্ড দইবিশেষ এবং এর তৈরির প্রক্রিয়া নাকি খুব জটিল—পাঁচ-সাত দিন ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রয়োজন হয়। শ্রী এন. আর. সিন্ধের বাড়ীর ডিমের সংযোগে মাংসের কারি নূতন অভিজ্ঞতা।

অতিথি সামান্য হ'লে কি হয়, আতিথেয়তা অসামান্য। থাই হোক এবার খাবার পালা সাঙ্গ করা যাক।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯২৩ সনে স্থাপিত হয়। জীবনব্যাপী সাধনায় এই বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলেন একজন বাঙালী—স্যর বিপিনকৃষ্ণ বসু। ইনিই ছিলেন এর সর্ব্বপ্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার। তাঁর স্মৃতি অবিস্মরণীয়।

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনটি উদারচেতা জে.এন. টাটার দান। শহরে দশ-বারোটি কলেজ-সেমিনারী, পাহাড়ের উপর মেয়েদের একটা কলেজ, বহু হাই স্কুল ও মেয়েদের আট নয়টি হাই স্কুল আছে। ধানতলিতে বাঙালীদের জন্য একটি পৃথক হাই স্কুল আছে। শুধু কলেজেই নয়, হাই স্কুলেও সহশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের কলেজেও কিছুসংখ্যক অধ্যাপিকা আছেন। সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষা এখানে বেড়েই চলেছে। এক বছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা আবশ্যিক ও বিনা বেতনে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষা সমাপনান্তে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এ বছর থেকে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ হয়েছে। তা ছাড়া, কলা, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সব বিষয়েই উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আয়ুর্ব্বেদ গবেষণার জন্য একটি বিভাগ সম্প্রতি খোলা হয়েছে। এর উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। পুরানো শহর ছেড়ে দক্ষিণ দিকে দু'তিন বছর হ'ল মেডিক্যাল কলেজ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে। কয়েক শ' একর জমির উপর সুরম্য হর্ম্ম্যগুলি দেখার মত। এশিয়ার মধ্যে এই কলেজটি নাকি বৃহত্তম।

রাণী কাশীবাড়ী স্মৃতি মন্দির

মধ্যপ্রদেশের মহাপ্রাণ রাওবাহাদুর ডি. লক্ষ্মীনারায়ণ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা অর্থাৎ তাঁর মোট সম্পত্তির বেশীর ভাগই ফলিত-বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষার জন্য নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর লক্ষ্মী-নারায়ণ টেকনলজি ইনষ্টিটিউট নির্ম্মিত হয়। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং ও অয়েল টেকনলজিতে বি. টেক ডিগ্রী দেওয়া হয়। নানারূপ তেল, তেলের বীজ, কয়লা, খনিজ পদার্থ প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থাও এখানে আছে। লোকালয় থেকে দূরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুন্দর ভবনটি শিক্ষা ও গবেষণার আদর্শ স্থল।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রি ভবনটি এই পাহাড়ের উপর তৈরী হয়েছে। এই বিভাগটি গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে নাগপুরের অধিবাসী শিক্ষানুরাগী শ্রীএম. জে. চিটনভীসের দান এবং একজন প্রখ্যাতনামা বাঙালী বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মাধবচন্দ্র নাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। ডাক্তার নাথের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল; তিনি ঘুরে ঘুরে তাঁর লেবরেটরী দেখালেন। ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান অধিবেশনে যোগ দিয়ে উক্ত চিটনভীস মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং এই থেকেই এই বিভাগের সূত্রপাত হয়। ডাক্তার নাথ এর প্রধান অধ্যাপক। সরকার এই শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাকল্পে প্রভূত অর্থসাহায্য করে আসছেন। ভারতে বায়োকেমিষ্ট্রিতে এম-এসসি শিক্ষাপ্রবর্ত্তন নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়েই

প্রথম। প্রতি বছর সারা ভারত থেকে আটটি মাত্র ছাত্র ভর্ত্তি করা হয় এবং গবেষণায় জন্যও কয়েকটি ছাত্র নেওয়া হয়। গত কয়েক বছরে কিছুসংখ্যক ছাত্র ডিগ্রী ও ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। বায়োকেমিষ্ট্রি শিক্ষাদানে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এবারে একটি তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের বর্ণনা দিই। নাগপুরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে পঁচিশ মাইল দূরে রামটেক পাহাড়। ভোর রাত্রে আমরা যাত্রা করি। সঙ্গে ডাকবিভাগের শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার রায় ও আমার পুত্র। ছুটির দিনের বিশ্রামসুখের মায়া না করে প্রদ্যোৎবাবু সানন্দে আমাদের সঙ্গী হয়েছেন।

রামটেক ষ্টেশনের মাইলখানেক দূরেই পাহাড়ের পাদদেশে রামটেক শহর। ষ্টেশনেই টাঙ্গায় চড়ি। শহরটি পেরিয়ে আমরা এগোতে থাকি আরও চার মাইল পথ, বাঁয়ে পাহাড়ের সারি চলেছে। তার পর পর তিন দিকে পাহাড়ঘেরা বিশাল খিন্ধী হ্রদের তীরে পৌঁছি। স্তব্ধ, স্বচ্ছ, গভীর হ্রদের নীল জল। মনোরম গাম্ভীর্য্যপূর্ণ চারদিকের পরিবেশ। বহুদূর পর্য্যন্ত খাল কেটে জল নেওয়া হয়েছে চাষের সুবিধার জন্য, মাছের চাষও হয়। টাঙ্গাওয়ালা বললে—মিঠে এই হ্রদের জল, মিঠে ফসল ফলে এর জলে। বাঙালীর কাছেও নিশ্চয়ই মিঠে এর মাছ।

তার পর ফিরি রামটেক পাহাড়ে, শহরের বিপরীত দিকে। পদমূলে আম্বারা সরোবর—পিতৃতীর্থ। তীরে কতকগুলি মন্দিরও আছে। কিছু পাণ্ডাও আছেন, তবে তাঁরা 'নিমেষে প্রাণটা ওষ্ঠাগত' করেন না। মাথাপিছু দু' আনা তীর্থযাত্রীদের খাজনা মিউনিসিপ্যালিটি আদায় করেন। এইখান থেকেই অসংখ্য সিঁড়ি ভেঙ্গে পাঁচ শ' ফুট উঁচু রামটেক পাহাড়ে উঠি, উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। রাস্তায় হনুমানের উৎপাতও কম নয়। পাওনাগণ্ডা আদায় করে তারা পথ ছাড়ে। নেহাত বেয়াদব বলা চলে না।

পাহাড়ের শীর্ষদেশে রামসীতার মন্দির, সামনেই লক্ষ্মণের মন্দির—এই মন্দিরটি ঘিরে কৌশল্যা, সত্যনারায়ণ, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বহু বিগ্রহের মন্দির। পুরোহিত বসে আছেন প্রতি বিগ্রহের কাছেই, আশীর্ব্বাদের বিনিময়ে কিছু প্রণামীর আশায়। অনেক লাল পাথর চোখে পড়ল। রামের মন্দিরের কাছে একটা কুণ্ডও দেখা গেল। এইখানেই নাকি সীতাদেবী স্নান করতেন। রামসীতা বনবাসকালে কিছুদিনের জন্য এই পাহাড়ে বাস করেছিলেন এই বিশ্বাস বহু পুরানো। এই থেকেই পাহাড়ের নাম হয় রামটেক বা রামগিরি। প্রথম রঘুজীর আমলে তৈরী একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই মন্দিরগুলির অবস্থিতি। মন্দির প্রবেশপথে কতকগুলি পুরানো অস্ত্রশস্ত্রও চোখে পড়ল। এই অঞ্চলের লোকেদের নিকট রামটেক মহাতীর্থ।

অমর কবি কালিদাসের মেঘদূতকাব্যের নির্ব্বাসিত যক্ষের আশ্রম নাকি ছিল এই রামটেক বা রামগিরিতে। কবির রামগিরি বর্ণনার সঙ্গে রামটেকের ভৌগোলিক অবস্থানের হুবহু মিল আছে—পণ্ডিতেরা বলেন। বিদর্ভে অবস্থানকালে রামটেক দর্শনের পর কালিদাস মেঘদূত লেখার প্রেরণা পান বলে অনুমান করা হয়েছে। এই পাহাড়ে অসংখ্য ছায়াযুক্ত বিটপী এবং বর্ষাকালে কুটজ ফুলও ফোটে বিস্তর। এই সেই রামগিরি যেখানে কুবেরের অভিশাপে যক্ষ নির্ব্বাসিত হয়েছিল, যেখানে দীর্ঘ আট মাস প্রিয়ার অসহ্য বিরহ-যন্ত্রণা ভুগে দিন দিন শরীর এত কৃশ হয়েছিল যে, তার হাতের স্বর্ণ-বলয় খসে পড়েছিল। তার পর এইখানেই প্রিয়াবিরহে উন্মত্তপ্রায় যক্ষ 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' শৈলসানুতে মেঘ দেখে জ্ঞানশূন্য হয়েছিল। কুটজ ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে বিরহী যক্ষ মেঘকে আকুল প্রার্থনা করলে—অলকায় তার বিরহিণী প্রিয়াকে তার কুশলসংবাদ দিতে—বলে দিল পথের নির্দ্দেশ, বলে দিল অলকার পথঘাট।

মহাকবির স্মৃতিবিজড়িত রামটেক পাহাড়ে তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য নাগপুরের কালিদাস মেমোরিয়েল সোসাইটি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইসচ্যান্সেলার ডাক্তার টি. জি. কেদার ১৯৪৩ সালের ৩০শে অক্টোবর ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন।

চারদিকের দৃশ্য নয়নবিমোহন। দূরের পাহাড়গুলি অলস মধ্যাহ্নে তন্দ্রাচ্ছন্ন। গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে নিসর্গ-সৌন্দর্য্য উপভোগের আর সময় নেই, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটি বাস ধরতে। বাসায় পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল।†

† আলোকচিত্রগুলি কমার্স কলেজের ছাত্র শ্রী এন. জে. পাহাড়ে কর্ত্তৃক গৃহীত।

মৌমবত্তী
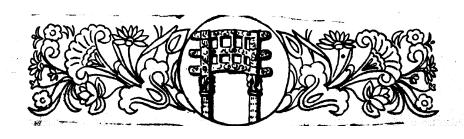
শ্রীউমাপদ নাথ

ঐ যে যে-বাড়ীটায় আট মাত্রার 'লাখনউ-ঠুংরী' শেখাচ্ছে গানের মাষ্টার আজ ক'দিন থেকে, তারই ঠিক পাশের বাড়ীটা আপনার দরকার। মাদ্রাজ হ্যাণ্ডলুমের বাসন্তী রঙের একখানা পর্দা দেখতে পাবেন দরজায় ঝোলানো। সামনের হাতায় পাবেন চন্দ্রমল্লিকা আর গোলাপের সারি, কোণাতোলা আধলা-ইটের সীমারেখা-দেওয়া বাগান-পথের দু'পাশে অজস্র বেলফুলের ঝাড়। পাথুরে দেশের কাঁকুরে মাটিকে হার মানিয়ে মালিকের মেহনতের মজুরি দিচ্ছে এই বাগানখানা। বাগান অবশ্য আরও আছে, প্রায় সব কোয়ার্টারের সামনেই। কিন্তু এমন সহজ-সরল, শুচি-সুন্দর রকমটি আর পাবেন না কোনখানে। এ যেন প্লেন জমির ওপরে ফিকে রঙের অভিজাত বুটি।

আরও একটি জিনিষ আছে যা এই-বাড়ীখানাকে আলাদা করে রেখেছে। অবিকল একই ডিজাইনের বাড়ীর মধ্যে নিজস্ব নম্বরের মত এটিও হ'ল তার স্বকীয় বস্তু। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কোন বাড়ীর খোলা জানালার দিকে তাকানোর অধিকার আপনার নেই, অবশ্য ভদ্রতার নিয়ম অনুসারে। তথাপি যদি একটু চোরা-দৃষ্টি ফেলেন ওই সাতাশ কি আটাশ নম্বরের জি. কোয়-এ, দেখবেন একটি জানালা আপনাকে অনধিকার দৃষ্টিপাতে আকৃষ্ট করছে রোজই। জানালার মুখে ঘরের ভিতরে একখানা টেবিল, উপরে পাতা একটি নক্সাতোলা টেবিল-ঢাকা, তার উপরে স্তূপীকৃত বই। বই, খাতা, পেনসিল, পেন—লেখাপড়ার রকমারি সামগ্রী। একপাশে বসানো ঘষা কাঁচের রীডিং ল্যাম্প। আপনি যদি দিনে যান—কোন ছুটির দিনে—ত দেখবেন, বইয়ের পাতা খুলে নিয়ে বসে আছে মেয়েটি। দূর থেকে অত বুঝবেন না; যদি কখনও কাছে যাবার সুযোগ ঘটে, দেখবেন চোখ হয়ত বইয়ের পাতায় আছে, কিন্তু লাইনে নেই। আবার চোখ থাকলেও মন নেই। রাত্রে যাচ্ছেন, দেখবেন, আলো জ্বলছে, দুধের মত সাদা অথচ জ্বালাহীন আলো ছড়িয়ে পড়েছে টেবিলের ওপরে। হাতের ডায়মণ্ডকাটা কঙ্কণজোড়া সেই আলোয় চকচক করে জ্বলছে সাঝের তারার মত। বইয়ের পাতা তেমনি চোখের সামনে পড়ে আছে, কিন্তু চোখে তার পাঠ্যবস্তু নেই। চোখ দুটো তখন ভিজে। তার ভিতরে জেগে উঠছে দুটি কোমল, মুগ্ধ, শান্ত অজ্ঞাত বেদনা।

এই অজ্ঞাত ইতিহাস আপনি জানতে চেয়েছেন। অনেকেই জানতে চেয়েছে, ভোর ছ'টা আর রাত দশটার ডিউটির লোকেরা—অনেকেই। ওকে চেনে অনেকেই, কিন্তু কেউই হয়ত ওকে জানে না। অন্তর দিয়ে যদি কাব্য লেখা যায়, তবে অনেক কাব্য লেখা হয়ে গিয়েছে ওর মনের খাতায়। রাত্রের আকাশের বুটিদার ঘন নীলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ হয়েছে নীলাম্বরী। সমুদ্র যদি কখনও নিজের গভীরতায় নিজেই ডুবে মরে, তবে তার মনের উপমা দেব সেদিন সেই ডুবুরী সমুদ্রের সঙ্গে। ডুবেই আছে, শুক্তির সন্ধান কি এখনও পেয়েছে? পায় নি বলেই হয়ত এখনও ওঠে নি। কোন দিন উঠবে কিনা তা কে জানে!

উমা তপস্যা করে সাফল্য পেয়েছিল। যদি না পেত, ঐ পর্ণাশ্রয়ী হোমাগ্নিবেষ্টিত তনুলতা হয়ত আর আসন ত্যাগ করত না। একাসনেই দেহ শুকিয়ে বিলীন হয়ে যেত! চোখের জ্যোতি নিভে মেঘলা রাতের আকাশের মত হ'ত। আর যদি তার দেহখানি ধরে রাখতে পারত কেউ—আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনটিকে—তবে বলতে পারতেন, সেই উমা এই দীপশিখা।

সমরেশের ললাটে উজ্জ্বল সম্ভাবনার লিপি দেখতে পেয়েছিলেন ব্রজবাবু। বাবার পছন্দ হয়েছে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল দীপশিখা। লোকচক্ষুর নেপথ্যে যে অনুরাগের পদসঞ্চার হয়েছিল, সেটা যে বালির দাগের মত মিলিয়ে যাবে না, এ ভাবনায় আনন্দ ছিল অসীম।

মাতৃহারা মেয়েকে নিয়ে গৃহীর দায়িত্বের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন ব্রজবাবু। বিপুল ধনসম্পত্তির পশ্চাৎপট না থাকলেও যে সঙ্গতি ছিল তাই তাঁর পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার পক্ষে যথেষ্ট। নিজের বাষট্টি বছর বয়সের আধা-ঝাপসা চোখে ধরে রেখেছেন মেয়ের একটি জলজ্বলে ছবি। সখ করে কচিৎ কখনও মেয়ের পড়ার ঘরে বসে সেক্সপীয়রের নাটকের ওপর একটু আলোচনা করেন। মেয়ের প্রতিভা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছেন আগেই, নিজের আলোচনায় তাকেই একটু নাড়া দিয়ে চোখ বুজে শুনতে থাকেন তার মৌলিক চিন্তার কথা। দীপশিখার চোখেও ধরা পড়েছে বাবার সেই স্বস্তির ছবি। বুঝতে পেরেছে, সে তার বাবার শেষ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার একমাত্র আশ্রয়। রায়সাহেব ব্রজবিলাস রায়ের স্বর্ণমিনারের কুঞ্চিকা রয়েছে তার মধ্যে—তার মেধা, বুদ্ধি, রুচি এবং চরিত্রের মধ্যে। ধ্যানমৌন পিতার মুখখানা চকচকে দেখা যায় মার্জ্জিত আয়নার মত। তার মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায় দীপা। নিজেকে চিনে নেবার সুযোগ পায় ভাল করে।

মেট্রোয় যাবার পথে অজস্র লোকের ভিড়ে সমরেশের হাতের উষ্ণ স্পর্শ তার ভাল লেগেছে, কিন্তু ভাবিয়েছেও। মনে হয়েছে, হাতের মুঠোর হাতটা না নিলে কি ক্ষতি ছিল?

গায়ের ছোঁয়া না লাগিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাওয়াতেই কি কম আনন্দ! শুধু শুধু কি দরকার এতটা ছেলেমানুষির? তাকে অনেক দিক ভাবতে হয়। সকলের বিশ্বাসকে সম্মান দিতে হয়।

সমরেশকে ভালবেসেছে সে। সমরেশের ভালবাসার প্রতিদান হিসাবে নয়, নিজের খুশিতেই ভালবেসেছে তাকে। সমরেশ নিজেকে খুলে ধরেছে দীপশিখার সম্মুখে। দীপশিখা আড়ালে থেকে দীপ্তি দিয়েছে ওর হৃদয় ভরে। সমরেশ বুঝতে পেরেছে···। সমরেশের প্রেমে আড়ম্বর আছে, যেমন থাকে ওই বয়সের সকল ছেলেদের প্রেমে। কিন্তু দীপশিখার প্রেম অনাড়ম্বর। ঐশ্বর্য্যের জৌলুষ নেই সেই প্রেমে। সে প্রেম অনুভূতিপ্রধান, ভাবনাভিত্তিক। সেটা রংবহুল শিখীনৃত্য নয়, স্থির ধ্যানের মৌন মূর্ত্তি।

সমরেশের যে সন্দেহ হয় নি তা নয়। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে ইডেন গার্ডেনে, গড়ের মাঠে, আউটরাম ঘাটে। দু'দণ্ড নির্জ্জনে বসে প্রেমের বিশদ ব্যাখ্যা জেনে নিতে চেয়েছে তারই মুখ থেকে। 'সবই যে ধোঁয়ার মত ঠেকে আমার কাছে', ডাইনে-বাঁয়ে একটু তাকিয়ে কথা তুলেছে, 'সত্যিই দীপা, কিছুই বুঝতে পারি না আমি।'

কিন্তু নৈয়ায়িকেরা কি বলে জানো? ধোঁয়া দেখতে পেলে আগুনের অস্তিত্বকে ঠাওরে নেওয়া কঠিন নয়। একটুখানি হাসে দীপশিখা। চোখে চোখ রেখেই হাসে। অথচ কত মার্জ্জিত—কত অভিজাত সে হাসি! লঘুতাও আছে, রসিকতাও আছে, অথচ নেই প্রেমের ন্যাকামি। আর তার অভাবেই সমরেশের মনে সংশয় জেগেছে বারে বারে। জানতে বাকি নেই ওর, ওই ধূম্রজাল থেকে অগ্নিশিখাকে আবিষ্কার করা বড় কঠিন। এ দীপের আলোই প্রধান, শিখা প্রধান নয়।

তা হলে বলতে হয়, এ প্রেম বড় অলস, বড় মন্থর, বড় ভীরু। মন্তব্য করতে বাধ্য হয় সমরেশ। যে বস্তুর প্রদর্শনে এত কার্পণ্য, তার অস্তিত্বে সন্দিহান না হয়ে উপায় কি? ধাতুর ঠাণ্ডা আরামের, কিন্তু মানুষের ঠাণ্ডা যে অসহ্য। অতটা হিমেল মেজাজ ভাল লাগে না চঞ্চল সমরেশের।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র সে। যন্ত্রপাতি আর বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে বেশীর ভাগ সময় কাটে যার, তার কাছে শুধু 'থিওরী অব লভ'টাই যথেষ্ট মনে হয় না, তারও একটা অভিব্যক্তি চাই। একটা মনের মত প্রতিক্রিয়া খোঁজে দীপশিখার কাছ থেকে। দোলার বদলে পেতে চায় একটা দোলা। আনন্দ-আন্দোলনে ব্যস্ত জীবনের তরঙ্গে তুলে দিতে চায় রোমান্সের অর্কেস্ট্রা। নিজের কানে শুনতে চায় তার রসসমৃদ্ধ লীলাপদাবলী।

পাশের বাড়ীর বোস-কাকার মেয়ে অনীতা কত ঠাট্টা করেছে দীপাকে। সাগরে বলে ভদ্রলোক কি এগোটাতেই না নেমেছে। গুমোর নিয়ে ঘরে বসে থাক, বই পড়, নোট লেখ, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হবে। হেডমিষ্ট্রেস হতে পারবি, ময়্যালিটি শেখাতে পারবি মেয়েদের। তোর ন্যাকাশে জলো প্রেমের চেয়ে আধ পয়সার একটা মোমবাতির আলোও বেশী। কিন্তু নামের বাহার কি—দীপশিখা! একটা ষ্ট্যাচু!

সত্যিই রোমান্টিক স্থাপত্য দীপশিখা। শিলামূর্ত্তি মুগ্ধ করে, নিজে মুগ্ধ হয় না। কিন্তু কবি হয়ত বলবে, না, সেও মুগ্ধ হয়। সে মুগ্ধ হয়েছে বলেই ত তাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছ। দেখ ভেনাসের মূর্ত্তিকে, দেখ আফ্রোদিতেকে। কি মনে হয়? পাথরের মধ্যে ঐ যে বীট দিচ্ছে একখানি হৃদয়। ও কি স্থবির? ও স্থবির নয়। হোক না স্থাপত্য! ওর মধ্যে স্থায়িত্ব পেয়েছে রোমান্সের পরাকাষ্ঠা, জীবন্ত প্রেমের একটা বহমান আবেগ। না পড়ুক তা অনীতার চোখে, না পড়ুক সমরেশের চোখে।

সমরেশ ফুল ভালবাসে, আর দীপশিখা যে ফুলের উপহার দেয় রোজ—হাতে গুজে দেয় বাছাই-করা গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আর বেলফুলের গুচ্ছ, সেটাকে শুধু হাত দিয়েই নেয়, একটু চোখে পড়ে সমরেশের! তার পছন্দের ফুল গুছিয়ে আনবার কি দায় এত দীপার?

সমরেশ ইঞ্জিনিয়ারীং পাস করে বেরুল। ভালভাবেই পাস করল। সোনার আর রূপার অনেকগুলি পদক জমা হ'ল তার নামে। সহপাঠী মহলে মাতামাতি হ'ল সমরেশকে নিয়ে। অধ্যাপকেরাও খুশী। সবারই আশা মিটিয়েছে সে।

আরও বেশী খুশী হলেন ব্রজবাবু। সমরেশ এবং সমরেশের কাকার চেয়েও বেশী আশা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলেন তিনি। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে কাকার তত্ত্বাবধানে মানুষ হচ্ছে। আজ মানুষের মত মানুষ হবার পথ খোলা রইল তার সামনে। সেই পথ যে খুলতে পেরেছে সে তার নিজের পরিশ্রম আর মেধার বলে, ব্রজবাবুর কাছে সেইটেই সব চেয়ে আনন্দের। যে উঠতে জানে, তাকেই ত তুলে ধরতে আরাম। তাঁর স্বপ্ন-সোপানের আর কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করলেন ব্রজবাবু। যার পিছনে পিছনে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন এত দিন, সে তাঁকে ঠকায় নি মোটেই। ব্রজবাবুর আশার অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়েছে সমরেশ।

—দীপা, ও দীপু, শুনেছিস? ধপ ধপ করে পা চালিয়ে এঘর ওঘর বার কয়েক খুঁজে বেড়ালেন ব্রজবাবু। অথচ অতটা খুঁজে বেড়াবার কোন দরকারই ছিল না। দীপা তার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় বসে চীনে ঢঙের ডিজাইনটা তুলে নিচ্ছিল টেবিল-ক্লথে।

হকচকিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল দীপা।

ওরে, বড় মারভেলাস রেজাল্ট করেছে সমরেশ। শুনেছিস?

শুনেছিল দীপা আগেই। সমরেশের পরীক্ষার ফল দীপা জেনেছে ব্রজবাবুর আগেই। যে মুহূর্ত্তে সমরেশ নিজে জেনেছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই। কিন্তু সে খবর সে বাবাকে দেয় নি। ইচ্ছে করেই দেয় নি। কি ভেবে অতটা গরজ দেখায় নি। এই ত, আর একটু পরেই জেনে যাবেন বাবা। আনন্দের কল্লোলধ্বনিকে চেপে দিয়ে অসমাপ্ত নক্সার কাজটা নিয়ে বসে ছিল চুপচাপ।

এইবার আরও কয়েকটা সিড়ি ভাঙলেন ব্রজবাবু। এখন তাঁর সেই সোনার সাধ। সমরেশকে সব কথা খুলে বললেন ব্রজবাবু। আনন্দের উচ্ছাস ফুটে বেরুল তাঁর সংযত ভাষার আবরণ ভেদ করে। ভরসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন মার্জ্জিত আভায়। সমরেশ এতটা ভাবে নি আগে, যদিও জানত ব্রজবাবু যথেষ্ট করবেন তার জন্মে।

নিজের ছেলের মত করেই সব করলেন ব্রজবাবু। বোম্বাইয়ের ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়বার পাঁচ দিন আগে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে গেল সমরেশ। পিতার মত মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন তিনি। নিজের কর্ত্তব্য বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণের জন্মে থতমত খেয়ে আচমকা একটা প্রণাম করল দীপশিখা সমরেশের পায়ে। যেদিন বোম্বাই থেকে চুসান জাহাজ ছেড়ে গেল, সেদিনটা একটা উল্লেখযোগ্য তারিখ তার আর সমরেশের জীবনে—আর বৃদ্ধ ব্রজবাবুর জীবনেও। ক্যালেণ্ডারের লাল তারকাচিহ্নের মত বিশেষ মূল্য পেয়েছে এই দিনটা। সমরেশের চোখে দূর ইংলণ্ডের অদৃশ্য তীরের রঙিন রামধনু, দীপশিখার হৃদয়ে হর্ষ এবং বিরহের রোমান্টিক দ্বন্দ্ব। ভাবগম্ভীর ব্রজবাবুর কল্পনায় ঊর্দ্ধ আকাশের অনন্ত অবসর —এই যেন এসেছে হাতের নাগালে, আর একটু এলেই হয়।

দীপশিখার দৈনিক কার্য্যসূচী সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল অনেকখানি। বিকেলের সময়টা প্রায়ই কাটে বাবার সঙ্গে একটু পায়চারিতে। সন্ধ্যায় বড়জোর একটু গানের গুনগুনানি। দূরচারী বিবাগী-মনের দু'একটি গোপন সুরসংলাপ।

কেমন যেন একা একা লাগে তার। ছাতের আলসে ধরে তাকিয়ে থাকে অন্ধকার আকাশে। কেমন ম্লান মনে হয় মালা থেকে খসা, ছড়িয়ে-পড়া ঐ তারাগুলি। ছোট্ট পরিবারটি ছোট্ট হয়ে গেল আরও। হয়ে গেল আরও সংবৃত, আরও সংযত, আরও ঘনীভূত।

ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্রী তখন দীপশিখা। পরের বছর ফাইন্যাল হয়ে গেল। ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়ে বি-এ পাস করল সে। আর একবার খুশিতে ভরে উঠল ব্রজবাবুর মন। আনন্দে আর একবার ফুলে উঠল বুকখানা। কল্পলোকের অনেক-গুলি সোপান উত্তীর্ণ হলেন তিনি।

খবর পেল সমরেশ, ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে দীপা। সেকেণ্ড হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। মনে একটা আঘাত লাগল সমরেশের। ঈর্ষায় নয়, অপমানে নয়—বিশ্বাসভঙ্গের লজ্জায়। দীপাকে যে এত দিন ভুলে ছিল, তার ধিক্কারে। কিন্তু এখন মধ্যপথে দাঁড়িয়ে সে নিরুপায়। সমরেশ খেলছে এখন ইংলণ্ডের রঙিন জলে। এ মোহের মৌতাত বড় কড়া, আবার কেমন মিষ্টি। কেমন যেন মিষ্টিকও। সত্যিই বড় অদ্ভুত হয়ে পড়েছে সে।

অনেক দিন পরে একখানা ছোট্ট জবাব এল সমরেশের। লিখেছে—খুব খুশী হলাম তোমার কৃতিত্বে। তোমাকে কনগ্র্যাচুলেট করছি।

বাস। এত ক্ষুদ্র পত্র আশা করে নি দীপশিখা। না, আশা করেন নি ব্রজবাবুও। তা হোক, সত্যি সময় নেই তার। বিদেশে গিয়েছে—দেশ দেখতে নয়, দেশ জয় করতে হবে তাকে। এখানকার সেরা ছাত্র সমরেশ, তাকে যে প্রমাণ করতে হবে—সে ওদেশেরও সেরা। ঠিক, ঠিকই করছে সমর। চিঠি না লিখতে পারুক, কাজ করে যাক। এগিয়ে যাক দৃঢ় পদক্ষেপে।

কিন্তু চিঠি যে আর একেবারে না লিখল সমরেশ তা নয়। চিঠি তাকে লিখতে হয়। লিখতে হয়, বরাদ্দ টাকায় কুলানো সম্ভব হবে না তার। এখানে খরচ বড্ড বেশী। ব্রজবাবু খুব বেশী বিড়ম্বিত বোধ করেন না তাতে। হবে হবে, নিশ্চয় হবে তা। ওখানে খরচ ত বেশী হবেই। নিজের পনর হাজারের ওপরে আরও পাঁচ হাজার টাকা যোগাড় করে পাঠাতে হয় তাঁকে। পাঠান তাড়া-তাড়ি, হাসিমুখেই।

তিন বছরের মাথায় ফিরে এল সমরেশ। সঙ্গে বিলিতী উপাধি এবং বিলিতী সংসার। কাজ দেখিয়ে বিলাতের সব ছোকরাদের হঠাতে না পারলেও মোটামুটি ভালই উতরেছে বলতে হয়। দেশে না ফিরতেই চাকরিও জুটে গিয়েছে তার। সরাসরি বিলাত থেকেই এপয়েণ্টমেণ্ট পেয়েছে বোম্বাইয়ের একটা বড় সাহেব কোম্পানীতে। জুলিয়ানের সুবিধা হয়েছে এতে যথেষ্ট। কোনও অজুহাত দেখাবার অবসর দেয় নি তার নতুন স্বামীকে। কার্ডিফ টাউনের সেণ্ট জন গীর্জ্জায় বিয়ের শপথ পড়ে রাস্তায় নামতে নামতে সমরেশ নিজেই অবশ্য বলেছিল, তাকে না নিয়ে ফিরতে পারলে ইণ্ডিয়ায় ফিরে যাবার আর কোনও মোহ নেই তার। জুলিয়ানকে ছাড়া নিজের জীবনকে সে ভাবতে পারে না।

জুলিয়ান এতে কি ভেবেছিল—সেকথা সমরেশ জানে না। 'ইণ্ডিয়ান ইমোশন' বলে মনে মনে যদি নাও হেসে থাকে তা হলেও খুব যে সম্মান দিয়েছিল এই উক্তিকে, এমন মনে করবার কোন কারণ ভেবে পায় নি সমরেশ। বরং কৌতুকের জেল্লা খেলে গিয়ে-ছিল মেয়েটির চোখে। সমরেশ ত জানে সে ভারতীয়, ভারতীয় রক্তের প্রেমপ্রবণতা তাকে দোলায়, নাচায়। তবে যেমন করে তুলিয়েছিল দীপা, এ তুলুনি তার চেয়ে অনেক বেশী। দীপা নাচায় নি, জুলিয়ান নাচিয়েছেও। জুলিয়ানের নীল চোখ আর সোনালি চুলের কুণ্ডলী সমরেশের মনকে তাতায় অনেক বেশী মাত্রায়। দীপাকে যদি বল কোমলগন্ধী কমল, জুলিয়ানকে বলতে হবে তবে রজনীগন্ধা বা বলতে পার হাস্নাহানা। হাঁ, হাস্নাহানার ঝাড়ই বটে জুলিয়ান। কড়া গন্ধের আকর্ষণে সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র শিথিল হয়ে আসে সমরেশের। সেণ্ট জন গীর্জ্জা থেকে বেরিয়ে শুধু জুলিয়ানই আশ্বস্ত হয় নি, হাঁফ ছেড়েছিল সমরেশও।

সমরেশদের বোম্বাইয়ে আসার প্রায় ছ'মাস পরে জানতে পারলেন তার কাকা। আরও অনেক পরে জানতে পারলেন ব্রজবাবু, অনেক চেষ্টার পর। ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ বিশেষ কোন মন্তব্য করতে পারলেন না। ধূসর চোখদুটোর সামনে মুহূর্ত্তের ধাক্কায়

ভেঙে পড়ল একটা বিরাট অভ্রচ্ছ মিনার। তারই প্রতিঘাতে ভূকম্পে নুয়ে পড়লেন তিনি। কপালের শিরা দুটো ফুলে উঠল অভিমানে। মাথার সাদা সাদা চুলগুলো দেখাতে লাগল একরাশ রোদে ঝরা সাদা ফুলের মত।—দীপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালিয়ে গেল কাছ থেকে। এ অবস্থা বেশী দিন চলল না। কয়েক দিন পরেই দেহ রাখলেন ব্রজবাবু।

নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করল দীপা। ব্যথার ওপর পড়ল বজ্রাঘাত। পায়ের তলা থেকে সরে যেতে চাইল পৃথিবীটা। কিন্তু কাকে কি বলবে? সমরেশকে জানাবে তার অবস্থার কথা! এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। কিন্তু পত্র এল ওদিক থেকেই। ব্রজবাবু যে তার কথা জানতে পেরেছেন, তাই জেনে চিঠি লিখেছে সমরেশ। লিখেছে দীপার কাছে। ক্ষুদ্র এক টুকরো চিঠি :

সত্যিই কিছু অন্যায় করেছি দীপা। কিন্তু এ চঞ্চল অনিশ্চিত জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের দাম কতটুকু? যাই হোক, যদি আঘাত পেয়ে থাক তবে ক্ষমা করো। তোমাদের টাকাগুলো কিছু কিছু করে শোধ দেবার চেষ্টা করব।

রক্তের মত দুই ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল দীপশিখার চোখ বেয়ে। রক্তের মতই তা গরম আর লোনা। একজোড়া শাণিত ফলার মত খসে পড়ল সমরেশের চিঠির উপরে। চিঠিখানাকে ছিন্ন করে অনেকটা সময় ধরে চেষ্টা করল এ দারুণ অপমানকে ভুলে যেতে।

পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। একটি মেয়ে-স্কুলের মাষ্টারী নিয়ে লৌহনগরী জামশেদপুরে এসে বাস করছে দীপশিখা।

দীপশিখা এল জামশেদপুরে, জুলিয়ান ফিরে গেল ইংলণ্ডে। মনের ক্ষোভ নিয়ে অনেক চেঁচিয়ে গেল জুলিয়ান—তোমাদের ড্যাম্ট ইণ্ডিয়ান লাইফ! এ তোমাদের কাছে জীবন হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে মৃত্যু। কোন সন্তান-সন্ততি হয় নি ওদের, ডিভোর্স নামায় সই করে একখানা ঘোলা ঘোলা লাল মুখ নিয়ে জাহাজে চেপে বসল রূপসী তরুণী জুলিয়ান। প্রায় দুই বৎসর আগেকার এমনি এক দিনে সেণ্ট জন গীর্জ্জায় মিলন-শপথের কথা স্মরণ করে ডেকের রেলিঙের গা ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল তার। তবে হঁ্যা, শুনিয়ে দিয়েছে সে সমরেশকে, আমি ইংরেজের মেয়ে, আমাকে ইটালীর মেয়ের মত অত চীপ পাও নি। তোমার ড্যাম্টপনাকে আমি ঘৃণা করি।

কোন প্রত্যুত্তর করা সম্ভব হয় নি সমরেশের। রূপালি লাভিং কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল শুধু। ডানাখসা পতঙ্গের মত নিস্ক্রিয় দেহটার মধ্যে একটা অসাড় ঘুমের বাসা। চোখের সামনে নৈরাশ্যের কৃষ্ণনাগর।

জুলিয়ান চলে যাবার পর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়েছে সমরেশ। ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সেই কৃতী ছাত্রটি বলে তাকে এখন চিনতে পারা মুশকিল। ঘন ভুরুর নিচেকার উজ্জ্বল আয়ত চোখ দুটো অনেকখানি ম্লান হয়ে পড়েছে অনিয়মের আতিশয্যে। প্রশস্ত চক্চকে কপালে একজোড়া কুঞ্চিত স্ফীত শিরাই এখন বেশী করে চোখে পড়ে। ব্রজবাবুর ভরসার আশ্রয়—মেডেলজয়ী সমরেশ চৌধুরী ঐ যে এখন পড়ে আছে ডাইনিং টেবিলে মুখ থুবড়ে। আর ঐ নবাগতা পারশী মেয়েটার বুকে আছাড় খাচ্ছে অপসৃতা জুলিয়ানের অভিমানের গোঙানি।

এরই মধ্যে দীপার কাছে আবার একটা চিঠি লিখে ফেলল সমরেশ : ফরগিভ এণ্ড ফরগেট, ডার্লিং। যা হবার হয়ে গেছে। জুলিয়ান গিয়েছে, ফিরোজা অস্থায়ী। যদি কিছু মনে না কর··· ইত্যাদি। মানে, যদি কিছু মনে না কর ত এস, স্থান খালি করে দিচ্ছি তোমার জন্যে।

কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করল না দীপা। সে রকম ক্ষমতাও নেই তার। তবে পাছে মৌন অর্থে সম্মতি বোঝায়, তাই চিঠিখানাকেই ফেরত পাঠিয়ে দিল খামে পুরে। ঠিকানা লিখতে গিয়ে ঘৃণায় রি রি করে উঠল গা।

কয়েক মাস পরে ভারত সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্য-বিভাগের একটা চাকরি পেয়ে রোমে রওনা হয়ে গেল সমরেশ। প্লেনের সিঁড়িতে উঠতে উঠতে নিজেকে জোর করে একটু হাল্কা করার চেষ্টা করেছিল সে। একরকম কসরত করেই একটা বিলিতী শিস বাজিয়ে নিয়েছিল ঠোঁটে।

তা হলে ও চলে যাচ্ছে রোমে! ভারত সরকারের গেজেট-বইখানা নামিয়ে রেখে বাবার ফটোর কাছে ঘন হয়ে বসল দীপশিখা। হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করতে চাইল বাবার নৈকট্যটুকু।

কিছুদিন পরে একগাদা বই এল দীপশিখার ঘরে। বই দিয়ে সযত্নে রচনা করে ফেলল একখানা সুন্দর পড়ার ঘর। তাকে এম-এ পড়তে হবে। বাবা তাকে এম-এ পড়িয়ে যেতে পারেন নি।

ঠিক আগের মত নিয়মিত পড়ার টেবিলে বসছে সে। পড়ার জন্যে মনকে একাগ্র করে তুলতে চেষ্টা করছে অহরহ। কিন্তু পড়া কি হচ্ছে? দূর থেকে দেখলে মনে হবে পাঠরতা ছাত্রী সে। কিন্তু পাথার মত মন নিয়ে কি পড়া হয়? তার যতই ঘনত্ব থাক, সে একলা দাঁড়াতে পারে না, একটা আধার চাই। মনের পারদে অরণ্যভ্রান্তির প্রতিভাস পড়ে চোখে।

···কোথায় সেই কলকাতার রাস্তা, সেই মেট্রোর পথ! কখন আসবে একটা রং ধরা তুলতুলে কবোষ্ণ অপরাহ্ন? কখন শাড়ীর আচল খেলিয়ে হাতে গোলাপ-বেলির গোছাটা নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ইডেন গার্ডেনে, গড়ের মাঠে, না-হয় গঙ্গার ধারে?

এক সময় আবর্ত্তন থেমে যায়। যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখে দীপা—যে চোখ তার জল-ছলছল হয়ে উঠেছে অনেক আগেই।

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

৩

লণ্ডনের ওয়াই.এম.সি.এ. হষ্টেলে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের ছেলেদের দেখা যায়, তবে মনে হয় বাঙালীরা সংখ্যায় কম। এখানে সব প্রদেশের সব ধর্ম্মের ছেলেরা বেশ মিলে মিশে থাকে, নিজেরাই পরিবেশনাদি করে, খাওয়া-দাওয়ায় কোন বাছবিচার নেই। কিন্তু দেশে ফিরলেই 'বারো বামুন তের চুলা'। বিদেশে ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে বড় বড় কথা না বললে আমাদের মান থাকে না এবং বাস্তবিক ভারতীয় কৃষ্টির মধ্যে গৌরবের জিনিস ত আছেই, কিন্তু ফিরে আবার দেশের মাটিতে পা দেওয়ামাত্র আমরা সব ভুলে যাই। তখন আগের মতই নানা ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতায় ডুবে যাই।

ওয়াই.এম.সি.এ. থেকে একটা বিশেষ ডিনারের নিমন্ত্রণে গেলাম। বাইরের কয়েকজন নিমন্ত্রিতও ছিলেন। খাবার পর 'ভারতীয় কৃষ্টি' বিষয়ে বক্তৃতা হ'ল। বক্তার কথা শুনে একজন মান্দ্রাজী বললেন, "আপনি ইউরোপের প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব করছেন।" তার পর খানিকক্ষণ খুব তর্কাতর্কি হ'ল। আমরা যে ওদেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা কয়েকজন দেশের লোকের মুখে শোনা গেল। দুঃখের বিষয়, সেই শ্রেষ্ঠতার কথা কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা মনে রেখে চলতে আমরা ভুলে যাই।

আমরা যে 'জলরাজেন্দ্র' জাহাজে লিভারপুলে নেমেছিলাম, লণ্ডনে সেই জাহাজে একদিন আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সুদীর্ঘ পথ টিউব দিয়ে গিয়ে একটা ভাঙাচোরা ষ্টেশনে নামলাম। অনেকখানি হেঁটে গিয়ে ময়লা সরু টেমস নদীতে 'জল-রাজেন্দ্রে'র দর্শন মিলল। একদিন যে জাহাজটা খাওয়া-দাওয়া খেলা গল্পে গম্‌গম্‌ করত আজ সেটা যেন মরার মত পড়ে আছে। কেউ কোথাও নেই, মাল নেমে যাওয়াতে জাহাজ এত উপরে ভেসে উঠেছে যে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাই যায় না। একজন ব্রিটিশ 'ওয়াচম্যান' জাহাজ পাহারা দিচ্ছিল, আমি উঠতে পারছি না দেখে আমায় হিড়হিড় করে টেনে ডেকে তুলে দিল। যে ঘরে বাস করেছিলাম প্রায় দেড় মাস, আজ তার দশা দেখে সেদিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে তাদের ক্যান্টিনে ভাত পরোটা মাছ-মাংস চাটনী ইত্যাদি খাওয়া হ'ল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, অজানা রাজ্যে কোথায় যেন এসেছি।

সেই ডকেই একটা রাশিয়ান জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। তার অফিসাররা সব মেয়ে, খালাসী মেয়েরা ধোওয়া-মোছার সাধারণ কাজও করছে। জাহাজে মেয়ে-কর্ম্মী, তাও দলে দলে, ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখি নি। পরেও যত জাহাজ দেখেছি কোথাও এমন ব্যবস্থা নেই।

যাবার-আসবার সময় দু'বারই পথে বেশ বৃষ্টিতে ভিজলাম। লণ্ডন যখন-তখন বৃষ্টির জন্য বেশ খ্যাত, তবু আমাদের ভাগ্যে বৃষ্টি কমই জুটেছিল। সঙ্গে বর্ষাতি ছিল না, বন্ধুদের কোট মাথায় চাপা দিয়ে কোন রকমে মাথাগুলো বৃষ্টি থেকে বাঁচানো গেল। জাহাজের এক পার্শী অফিসার আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে এত ভাষায় এত রসিকতা করছিলেন যে, ষ্টেশনের যাত্রীরা হাসছিল। এক-জন ভারতপ্রবাসী সাহেব ত নিজে থেকেই গল্প জুড়ে দিল। কোন প্রকারে ঘরে ফিরলাম। ঘরে একটা করে গ্যাসরিং ছিল, তাই বৃষ্টিতে ভেজার পর নিজেরাও একটু গরম চা খেলাম এবং বন্ধুদেরও আতিথ্য করা গেল।

আমাদের দেশের কোন কোন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু ইংলণ্ডে হয়েছে—তাঁর মধ্যে একজন দ্বারকানাথ ঠাকুর। লণ্ডনেই ঠাকুর মহাশয়ের সমাধি আছে। আমরা ব্রাহ্ম-বন্ধুদের সঙ্গে একদিন সেই সমাধি দেখতে যাব ঠিক হ'ল। ইউষ্টন ষ্টেশনের কাছ থেকে বাসে চড়লাম আমরা দু'জন। বেশ দু'ধার দেখতে দেখতে যাওয়া যায়। একেবারে সোজা গিয়ে কেনসাল গ্রীন সমাধিক্ষেত্রে হাজির হলাম। সুন্দর সবুজ বাগানের মধ্যে সমাধি-ক্ষেত্র। আমরা আট-দশ জন নানা দিক থেকে সেখানে জড়ো হয়েছিলাম। সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে "তুমি বন্ধু তুমি নাথ নিশিদিন তুমি আমার" গান হ'ল। গানের পর শ্রীযুক্ত সত্যব্রত রুদ্র প্রার্থনা করলেন। কিছু ফুল কিনে আনা হয়েছিল, সকলে সেই ফুল এবং ঘাসের ফুল সমাধির উপর রাখলাম। গানের সঙ্গে সঙ্গে বাগানের গাছের পাতার মর্ম্মরধ্বনি ভারি ভাল লাগছিল। সমাধিটি ভেঙে গিয়েছে কিছু কিছু। সেটি ভাল করে সারাবার কথা হ'ল। দ্বারকানাথকে লোকে আজ ভুলেই গিয়েছে; সুতরাং সমাধি সারানোর প্রস্তাব কতটা কাজে পরিণত হবে জানি না।

লণ্ডনে বাঙালী ডাক্তার ভট্টাচার্য্য কুড়ি-পঁচিশ বৎসর

কাজ করছেন। ওখানে তিনি বাড়ীও করেছেন। সমাধি-ক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আমরা ডাঃ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখতে চলে গেলাম। নালার মত সরু একটা নদীর পারে টিলার মত উঁচু জায়গায় জাপানী ধরনের ছোট্ট বাগান। সেখানে বসবার জায়গা হয়েছে, কারণ তখন গ্রীষ্মকাল। তারও একটু উঁচুতে ডাক্তার মহাশয়ের বাড়ী, ঝকঝকে তকতকে। রাত ন'টা-সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত সেখানে গল্প হ'ল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তখন লণ্ডনে ছিলেন, তাঁরাও সপরিবারে এসে যোগ দিলেন। সাড়ে ন'টার পর বাঙালী মজলিস ভেঙে আমরা বাড়ী ফিরলাম। এদিকে গ্রীনহিল প্রভৃতির প্রাকৃতিক পরিবেষ্টন ভারি সুন্দর লাগে। সুন্দর বাগান-ঘেরা ছোট ছোট কটেজের ভিতর দিয়ে রাস্তা মাঝে মাঝে ঘন গাছের বনের ভিতর চলে গিয়েছে। দূরে নীচু জমি দেখা যায়। সব জড়িয়ে কেমন যেন দার্জ্জিলিঙের মত মনে হচ্ছিল। ডাঃ ভট্টাচার্য্য আমাদের নিজের গাড়ী করে পৌঁছে দিলেন। এত বৎসর লণ্ডনে আছেন, কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বাঙালীয়ানা পুরোই আছে মনে হ'ল। সন্তানদের ওদেশেই মানুষ করেছেন, কাজেই তারা অন্যরকম অনেকটা হতেই বাধ্য। পরিবারটির সকলেই খুব ভদ্র; বাঙালীত্বটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরই সবচেয়ে বেশী আছে মনে হয়।

লণ্ডনে সপ্তাহের শেষে লোকে টাকা পায় এবং রবিবার ছুটিও থাকে। তাই শনিবার রাত্রে মাতাল বেশ দেখা যায়। আমাদের দেশে পথেঘাটে মাতাল দেখা আমাদের অভ্যাস নেই; তাই হঠাৎ কাউকে উদ্ভট কিছু করতে দেখলে সে যে মাতাল তা চট করে মনে আসে না। ওখানে মাঝে মাঝে দেখতাম অনেকে উপরতলার জানালা থেকে দুধের বোতল-গুলো ফেলে ফেলে ভাঙছে, কেউ-বা রাস্তার ধার দিয়ে যাবার সময় পরের দরজায় বোতলগুলো আছড়ে ভেঙে দিচ্ছে। টিউব রেলের গাড়ীতে একদিন এক ব্যক্তি নিজের গায়ের কোটটা খুলে ফেলে সেটা মাথার উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মহানন্দে নাচতে আরম্ভ করল। তার রকম দেখে দুই একজন একটু মুচকি হাসল, বাকিরা গ্রাহ্যই করল না। একদিন দেখি দুই তরুণ-তরুণী রেলগাড়ীতে গলা ফাটিয়ে গান করছে। অস্বাভাবিক মনে হ'ল, তবে মাতাল কিনা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। কারণ মাতাল দেখা অভ্যাস আমার নেই।

আমরা ট্যাভিটন ষ্ট্রীট নামক যে ছোট রাস্তাটিতে থাকতাম তার খুব কাছেই কোয়েকারদের একটি বিরাট বাড়ী। একদিন ভোর থেকে দেখি সেখানে বড় বড় গাড়ী, পুলিস লোকলস্কর জমা হচ্ছে। খানিক পরে রাস্তার দুধারেও কিছু লোক দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের বাড়ীর মেম ঝি বললে হয়ত ওখানে রাণী এলিজাবেথ আসবেন। আমরা সেই আশায় বারান্দায় ধন্না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটু পরে গলায় সোনার মালা পরে মেয়র এলেন। তার পরই দেখি মহাব্যস্ততা, কেউ মহারথী আসছেন বোঝা গেল। একটি মহিলার মাথায় টুপি ভিড়ের মাঝখানে দেখলাম। অল্পক্ষণ পরেই সব বড় বড় গাড়ি এবং ভিড় সরে গেল। পরে শুনলাম প্রিন্সেস মার্গারেট এবং তাঁর কাকা এসেছিলেন।

কলকাতায় থাকতেই কোয়েকারদের Friends centre-এর সঙ্গে আমাদের জানাশুনা ছিল। লণ্ডনে একদিন তাদের উপাসনা-সভা দেখতে যাব ঠিক হ'ল। বাড়ীর কাছেই, ১১টায় সময় গেলাম। ভিতরে গিয়ে দেখি উপাসকমণ্ডলী একটা বড় হলে সারি সারি বসে আছেন। অধিকাংশই বয়স্কা মহিলা, দু'চারটি অল্পবয়স্কা মেয়ে, একটি নিগ্রো মেয়ে আছে আর আমরা তিন জন ভারতীয়। পুরুষ খুবই কম। ওদের প্রার্থনা নীরবে হয়, কিছুক্ষণ সকলে নীরবে মাথা নীচু করে বসে থাকেন। তার পর এক-একজন উঠে কিছু বলেন। কেউ ভগবানকে উপলব্ধি করা বিষয়ে বললেন, কেউ কোন মৃত বন্ধুকে স্মরণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন। তার পর সকলে উঠে বেরোবার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। আমাদের দেশের লোকে অনেকেই নূতন আলাপে কথা খুঁজে পান না। এদেশের লোক মোটেই সেরকম নয়, অফুরন্ত কথা ওদের জোগায়।

ইংলণ্ড ছোট দেশ, স্থান খুব বেশী নেই, কিন্তু ওদের বাগান করার সখ খুব বেশী। শহরের মাঝখানের বাড়ীতে বাগানের জায়গা থাকে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ছোট পার্ক আছে, রাস্তার ধারে ধারে খুব বড় বড় গাছ। একেবারে বাস চলার পথ ছাড়া সর্ব্বত্রই একটা বাগানের মত আব-হাওয়া। রাসেল স্কোয়ারে যে পার্ক রোজ দেখতাম, সেখানে বেশ বেঞ্চ চেয়ার টেবিল পাতা, সর্ব্বদাই লোক বসে থাকে। কেউ লেমনেড খাচ্ছে কেউ কাগজ পড়ছে, কোন ছাত্র মাটিতে বসে কাগজ নিয়ে ছবি আঁকছে, কোন শিশু ছোট জলের ঝরণার কাছে জুতো ভিজিয়ে খেলা করছে, দেখতে বেশ লাগত। অত বড় রাস্তার পাশেই কেমন একটা নিরি-বিলি ভাব।

বলা বাহুল্য, বিরাট বড় বাগানেরও অভাব নেই এখানে। 'কিউ গার্ডেনস্' হচ্ছে এখানকার সব চেয়ে বড় বাগান। লণ্ডন থেকে এগার মাইল দূরে। আমরা বাসে গিয়েছিলাম বলে বেশী দূর মনে হয় নি। আগে এই বাগান রাজাদের সম্পত্তি ছিল। রাজারা পরে সাধারণের জন্যে তা দান করেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া সম্ভবতঃ তাঁর জুবিলির সময় এই বাগানে আরও একশ' একর জমি দান করেন। এখন

এটি তিনশ' একরের বাগান। আমরা বাসে চারদিক দেখতে দেখতে গেলাম। পরিষ্কার আকাশ, বাগানের গাছগুলি কিছু কিছু কাশ্মীরের গাছের মত। ওয়ালনট প্রভৃতি অনেক গাছ সব শীতের দেশেই হয়। তবে কাশ্মীরের মত মোটা গুঁড়ি এখানকার কোন গাছের নেই। লম্বায় কিন্তু খুব বড়। আমাদের এত জঙ্গলের দেশ, অথচ ওদের দেশের মত সবুজ সুন্দর বাগান আমরা করি না। কাশ্মীর ছাড়া ভারতবর্ষের কোথাও বড় বড় সুন্দর বাগান দেখি নি। কিউ গার্ডেনসে কাচের ঘরে গরমের মধ্যে কলা, পেঁপে, জবা প্রভৃতি ভারতীয় গাছপালা দেখলাম। গ্রীষ্মকালে নানা জায়গার লোক ছেলেপিলে নিয়ে শুয়ে বসে খেলে আনন্দ করছে।

এখানে চা ও অন্যান্য খাদ্যপানীয় ইচ্ছামত পাওয়া যায়। এত লোক আসে যে খাবার জন্য চেয়ার টেবিল দখল করতে সময় লাগে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে খাবারও সংগ্রহ করতে হ'ল। মেলার মত ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা চেয়ার জোগাড় করে একটু খাওয়া-দাওয়া হ'ল। বাগান বন্ধ হবার অনেক আগেই ফিরলাম একেশ্বরবাদীদের গির্জ্জায় যাবার জন্য। ইংলণ্ডপ্রবাসী সত্যব্রত রুদ্র ও আর একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে কয়েক জন গেলেন, সকলের যাওয়া হ'ল না। একেশ্বরবাদীদের উপাসনাপদ্ধতি অনেকটা সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানদের মতই মনে হ'ল। এঁরা রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কথা অনেকে জানেন। তাঁদের বিষয় কেউ কেউ কিছু আলোচনা করলেন ভারতীয়দের সঙ্গে।

আমরা ইউরোপ হয়ে প্যারিস, জেনিভা, রোম প্রভৃতি দেখে আমেরিকা যাব কথা ছিল বলে সঙ্গের বাক্স ব্যাগ ইত্যাদি সংখ্যায় কমানো প্রয়োজন সবাই বললেন। ইউরোপে অর্থাৎ কণ্টিনেণ্টে মুটে বা পোর্টার অনেক সময় পাওয়া যায় না, যদি বা যায়, তার অসম্ভব ভাড়া। ট্যাক্সিও ভীষণ ভাড়া নেয়, তাই নিজেদেরই জিনিস বইতে হয় যতটা সম্ভব। আমরা আমেরিকায় এক বৎসর থাকব এবং কলেজের কাজের জন্য বইও অনেক দরকার, তাই আমাদের সঙ্গের বোঝা হয়েছিল ভীষণ ভারী। তার উপর জাহাজের থেকে আছড়ানি খেয়ে কাঠের বাকসটা ভেঙেও গিয়েছিল। মোটা মোটা কাছি দিয়ে বেঁধে কোনপ্রকারে কাঠের টুকরোগুলো একত্রে রাখা হয়েছিল। এই সব জিনিষকে দু'ভাগে ভাগ করে এবং নূতন বাক্সে প্যাক করে পাঠাতে সময়, অর্থ ও পরিশ্রম প্রচুর ব্যয় হবে। কাজেই বেড়িয়ে ফিরেই এই সব কাজে রোজ আমাদের লাগতে হ'ত। আমরা যে জাহাজে আমেরিকা যাব তা নেপলস থেকে ছাড়বে। সেই পর্য্যন্ত আমাদের ভারী জিনিসগুলি অন্য জাহাজে সোজা পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। কাজের লোক সবই অনভিজ্ঞ মেয়েরা, তবু তারাই নানা জায়গায় ঘুরে জিনিষগুলির গতি করল। জিনিষ নিয়ে ঘোরার বিপদ এড়াবার জন্য মাল জাহাজ ভাড়ায় ৩০৯৲ টাকার বেশী খরচ হ'ল। অনেকে বলছিলেন, "মারা পড়বেন এত জিনিষ সঙ্গে নিয়ে।" তাই বাঁচবার জন্য এতটা দাম দিতে হ'ল।

লণ্ডনে এবং আমরা যে পাড়ায় ছিলাম, সেই রাসেল স্কোয়ারের কাছে এই জুলাই-আগষ্টে প্রচুর টুরিষ্টের মেলা। রাস্তার লোক দেখতে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেই দেখা যায় পিঠে বোঁচকা বেঁধে সারি সারি লোক হয় গাড়ীতে উঠছে নামছে, নয় সাইকেল করে ছুটছে। হোটেলের সামনে সারাক্ষণই নূতন নূতন লোক নামছে। বোর্ডিং হাউসে খাবার সময় দু'তিন দিন অন্তর নূতন নূতন মুখ দেখা দিচ্ছে। যদিও পাশ্চাত্য দেশে পোশাক সব লোকেরই মোটামুটি এক রকম বলে আমাদের ধারণা, তবু আমেরিকান মেয়েদের বেশী গহনা পরা এবং ছেলেদের গেঞ্জি পরে ঘোরা ব্রিটিশদের থেকে তাদের পার্থক্যটা বুঝিয়ে দেয় সহজেই। স্পেন প্রভৃতি দু' চার জায়গার মেয়েরা লণ্ডনেও চটি পরে বেড়ায় দেখেছি। জেনিভাতে ত অসংখ্য মেয়েকেই চটিপরা দেখা যায়। যারা লণ্ডনবাসী ব্রিটিশ মেয়ে তারাও সবাই একরকম সাজে না। এ বিষয়ে আমেরিকার মেয়েদের চেয়ে তারা স্বাতন্ত্র্য রেখে চলে। একই দিনে দেখি কেউ বিরাট লম্বা কোট পরে চলেছে, কেউ পরেছে শর্ট কোট, কেউ একটা জামি বা বা পুলোভার, আবার কেউ বা শুধু পাতলা একটা ব্লাউস গায়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত। চুল রাখার যুগ এখন আর নেই, প্রায় সকলেরই চুল ছোট করে কাট', কচিৎ মাঝে মাঝে খোঁপা-বাঁধা মেয়ে দেখতাম, তবে খোঁপাটা নকল কি আসল জানি না, কারণ আজকাল নকল খোঁপা পিছনে আটকে সাজা একটা ফ্যাশন উঠেছে। সে ফ্যাশন আমাদের দেশের কেশবতী কন্যারাও গ্রহণ করেছেন দেখতেই পান সকলে।

লণ্ডনে মাদাম তুস্যো নামে একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা একটা প্রদর্শনী করেন; সেটা কি জানতাম না তাই পথে পড়াতে একদিন দেখতে গেলাম। এদেশে সচরাচর কোন জায়গায় পয়সা দিয়ে ঢুকতে হয় না। কিন্তু ফরাসী মহিলা টাকা রোজগার করবেন বলে দরজায় ঢুকতেই চার জনের জন্য বারো শিলিং সেলামী দিতে হ'ল। তার উপর ক্যাটালগ এক শিলিং। সারি সারি মোমের পুতুল। জীবন্ত মানুষের অবিকল নকল হয়েছে হয় ত, আর্ট থাকুক বা না থাকুক। তাদের চোখ, মুখ, হাত, বসা, দাঁড়ান দেখে তাদের দিকে ভাল করে চাইতে বা আঙুল দেখাতে ভয় করছিল, কি জানি যদি ধমকে দেয়। তবে যাঁদের আমরা চিনি তাঁদের মধ্যে গান্ধী আর নেহরু একেবারেই হয়নি দেখেই বুঝলাম। অতি বিশ্রী

হয়েছে। বার্নার্ড শ'কে ছবিতে ছাড়া দেখি নি, তবু মূর্ত্তিটাকে বিশেষ ভাল লাগল না। ভাল লেগেছিল গ্ল্যাডষ্টোন আর চার্চ্চিল মূর্ত্তি। কিন্তু তাও আসলরা ত আমাদের অদেখা। 'চেম্বার অব হরারস' কেন যে মানুষ দেখে জানি না, যত খুনেদের মূর্ত্তি! রাজাদের গ্যালারীটা ভাল, ছেলেভুলানো বা ইতিহাস পড়ানোর কাজে লাগতে পারে। প্রথম উইলিয়ম থেকে সবাইকার মূর্ত্তি আছে। বাচ্চাকাচ্চাদের এবং বড়দেরও তাই খুব ভিড় হয়েছিল। প্রদর্শনীটি মোটামুটি পয়সা করার ব্যাপার, দ্রষ্টব্য অতি সাধারণ। আর্টের সন্ধানে গেলে খোরাক মেলে না।

সেই দিনই সত্যিকার ভাল জিনিস টেট গ্যালারী দেখতে গেলাম মস্ত দল করে। যাবার পথে পুরাতন লণ্ডনের বাড়ী পার্লামেণ্ট হাউস, ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবে, হোয়াইট হলের পথ প্রভৃতি চোখে পড়ল। দেশে প্রতিদিন কাগজে পড়ি, মনে হয় শুধু কাগজে লেখারই জিনিস। সত্যি ইটকাঠ দেখে দ্বিজেন্দ্রলালের গান আবার মনে হয় "বিলেত দেশটা মাটির।" পুরনো লণ্ডনের বাড়ীগুলোর দেওয়াল মোটা মোটা এবং ঘন গাঢ় রঙের, রাস্তাগুলি গলির মত, তাই সব জড়িয়ে একটা অন্ধকারের সৃষ্টি হয়। ছেলেবেলা থেকে পড়েছি, লণ্ডন অন্ধকার কুয়াশাচ্ছন্ন, এই কয়দিন তা মনে হয় নি, আজ মনে হচ্ছিল। টেমস নদীটা ছোট্ট, তার জল ঘোলাটে, তবে দূর থেকে ডক আর ক্রেন দেখা যায়, তাই বোঝা যায় একটা খ্যাতনামা নদী।

টেট গ্যালারীর ছবিগুলি ন্যাশনাল গ্যালারীর চেয়ে আধুনিক। বাড়ীটা ভারি সুন্দর, উপরে কাচের ছাদ এবং বড় বড় আলো, বসে দেখবার জন্য হলের মাঝে মাঝে ভাল উচ্চাসন দেওয়া। বাল্যকালে দেখা Golden stairs, Hope Begger maid প্রভৃতি অনেকগুলি ছবির মূল ছবি দেখে মনটা খুব খুশী লাগছিল। এসব ছবি ও নাম আমরা আজকাল প্রায় ভুলে যাচ্ছি। রসেটির ছবি যা পূর্ব্বে দেখেছি বা যা দেখিনি দুই মন মুগ্ধ করে। সেকালের শিল্পীরা কি চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপ আর পোর্ট্রেট আঁকতেন! ফোটোগ্রাফের মত বলে আধুনিকরা নাক সিঁটকোবেন। কিন্তু এমন রং, এমন তুলির টান, এমন মুখচোখ আধুনিকে দেখা যায় না। আধুনিক ছবির ভাষ্য চাই, এর ভাষ্য মানুষ নিজে করে নিতে পারে।

এই অশ্রু : এই হাসি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দত্ত

কি জানি কেন যে এই ধূসর হৃদয়-মরুদেশে
নয়ন-অঞ্জন-গলা দুটি ফোঁটা অশ্রু ভাল লাগে।
তাই নিশিদিন ধরে তোমাকে কাঁদাই সখি আগে
তার পর কেঁদে কেঁদে নিজে ক্ষমা চাই ফিরে এসে।

অশ্রুবিন্দু মুছে ফেলে কৃত্রিম আক্রোশ দৃষ্টি নিয়ে
তাকাতে আমার পানে ভয়ে আমি কেঁপে কেঁপে উঠি;
অকস্মাৎ কি যে মন্ত্রে তুমি হও হেসে কুটিকুটি
আমার চমক ভাঙে, বুভুক্ষু হৃদয় নাচে প্রিয়ে!

অতনুর অভিশাপ কিংবা আশীর্ব্বাদ, জানা নাই;
চিরদিন অকারণে তোমাকে কাঁদায়ে সুখ পাই।
তার পর অশ্রুধৌত সেই স্বচ্ছ চোখের আকাশে
নিজ প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকেই চিনি অনায়াসে।

এটুকু বুঝেছি এতদিনে—এই অশ্রু এই হাসি,
এ সকল আছে তাই পৃথিবীকে এত ভালবাসি।

কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় শিল্পের মূলধন

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত এম-এ

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পে যে মূলধন সরবরাহ করা হ'ত, সে মূলধনের একটা বিরাট অংশ তিন শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছ থেকে পাওয়া যেত। প্রথমতঃ করদ রাজাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেন দেশের বিত্তশালী জমিদাররা। তৃতীয়তঃ—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে ভারতীয়েরা যে মূলধন সরবরাহ করতেন সে মূলধনের বেশীর ভাগই আসত প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর কাছ থেকে। শেষোক্ত শ্রেণীর কাছ থেকে যা পাওয়া যেত সেটার পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও এর গুরুত্ব ছিল অনেকখানি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তখন শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী মূলধন সরবরাহ করা হচ্ছিল কি না। প্রকাশিত তথ্যাবলী থেকে দেখা যায়, প্রয়োজন মেটাবার মত মূলধন আগমের পরিমাণ সেরূপ ছিল না। ফলে কোন নূতন শিল্পের প্রসারের জন্য কিংবা যে সব শিল্প চালু ছিল সে সব শিল্প সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে সহজে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই দেখা গেছে ভারতের জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিল্প সম্প্রসারিত হয় নি।

একথা না বললেও চলে যে, শিল্পে মূলধন সরবরাহ করার ব্যাপারে অংশীদারদের দায়িত্ব অনেকখানি। বিশেষ করে, যদি দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করতে হয় তা হলে এঁদের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। অবশ্য এর পিছনে কারণও আছে। হয়ত একথা ঠিক যে, আমাদের দেশে যে সব লগ্নী প্রতিষ্ঠান আছে সে সব প্রতিষ্ঠান শিল্পে মূলধন সরবরাহ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা সমান নয়। এমন অনেক লগ্নী প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি সাধারণ পর্য্যায়ের এবং যেগুলির পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সরবরাহ করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। এগুলি হয়ত দশ-পনের বৎসরে পরিশোধের সর্ত্তে টাকা সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে চল্লিশ, পঞ্চাশ, কিংবা ষাট বৎসরে পরিশোধের সর্ত্তে টাকা সরবরাহের প্রশ্ন উঠে সে ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠান লগ্নী করতে পারে না। অথচ দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহের প্রয়োজন যখন রয়েছে তখন অন্য উপায় অবলম্বন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সাধারণতঃ দেখি, প্রথমে শেয়ার কিংবা ডিবেঞ্চার বিক্রী করে মূলধন সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়। যদি এর দ্বারা প্রয়োজন না মেটে তা হলে বিশেষ সর্ত্তের দ্বারা ঋণ সংগ্রহ করা ছাড়া উপায় থাকে না। মোট কথা হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদী মূলধন সংগ্রহ করার ব্যাপারে অংশীদারদের ভূমিকাই প্রধানতম।

অনেকেরই হয়ত জানা আছে, ভারতে কতকগুলি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। তবে কর্পোরেশনগুলিকে কোন একটা বিশেষ এলাকায় কেন্দ্রীভূত করা হয় নি। যে রকম কেন্দ্রে, তেমনই বিভিন্ন রাজ্যে কর্পোরেশন গঠন করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় হ'ল, কর্পোরেশনগুলির পিছনে রয়েছে সরকারের সাহায্য এবং প্রেরণা। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে ভারতের শিল্পপ্রসারের ক্ষেত্রে যে নৈরাশ্যজনক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, যতটা সম্ভব সে অবস্থার উন্নতিসাধন করে সমস্যার জটিলতা হ্রাস করাই হ'ল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইনান্স কর্পোরেশনগুলির প্রধান উদ্দেশ্য।

একথা বললে ভুল হবে যে, শিল্পে কেবলমাত্র দীর্ঘমেয়াদী মূলধন দরকার। অবশ্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বললে আমরা সাধারণতঃ সে মূলধনই বুঝে থাকি যা পঁচিশ, ত্রিশ কিংবা আরও বেশী বৎসরে পরিশোধ করা হবে। এই ধরনের মূলধনের গুরুত্ব খুব বেশী সন্দেহ নেই। হয়ত অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন পাওয়া না গেলে শিল্পের প্রসার শোচনীয়ভাবে ব্যাহত হয়ে যাবে। তাই বলে মাঝারি কিংবা স্বল্পমেয়াদী মূলধনের গুরুত্ব মোটেই কম নয়। শিল্পে বিনিয়োগের জন্য যে টাকা পনের-বিশ বৎসরে পরিশোধ করার সর্ত্তে পাওয়া যায় সে টাকাকে আমরা সাধারণতঃ মাঝারি মেয়াদের মূলধন বলে থাকি। যে টাকাটা সাধারণতঃ পাঁচ কিংবা আরও কম দিনে পরিশোধ করা দরকার সে টাকাকে বলা হয় স্বল্পমেয়াদী মূলধন। প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মাঝারি কিম্বা স্বল্পমেয়াদী কর্জ্জ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে কারখানার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা। দ্বিতীয়তঃ—মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী কর্জ্জের সাহায্যে কার্য্যকরী তহবিলের চাহিদা পূরণের চেষ্টা করা যেতে পারে। তৃতীয়তঃ—মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী

ঋণ—কারখানা সম্প্রসারণের আংশিক ব্যয়সঙ্কুলানের পথ অনেকটা প্রশস্ত করে দেবে।

দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে ভারত আজ মুক্তিলাভ করেছে, সন্দেহ নেই। একথাও সত্য যে, শিল্প-প্রসারের ব্যাপারে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার নানা-ভাবে সাহায্য এবং প্রেরণা দিচ্ছেন। তা ছাড়া বিদেশী শাসনের আমলে শিল্প-প্রসারের পথে যেসব অন্তরায় দেখা গিয়েছিল সে সব অন্তরায়ের অনেকগুলি দূর হয়েছে। তাই বলে আজ একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, মূলধনের চাহিদা বিশেষভাবে বেড়ে গেছে। অবশ্য এর পিছনে অনেক কারণ আছে। তবে দুটি কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম কারণ হ'ল, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোচনীয় আর্থিক অবনতি। দ্বিতীয়তঃ, ভারত স্বাধীন হবার আগে যে সব করদ রাজা এবং বড় বড় জমিদার মূলধন সরবরাহ করতেন তাঁরা এখন অবলুপ্ত। এখানে একটি কথা বলে রাখা দরকার। তা হ'ল এই যে, যদি আমরা মনে করি, স্বাধীন ভারতে মোট লগ্নীর পরিমাণ বর্দ্ধিত হয় নি, তা হলে গুরুতর ভুল হবে। ভারত স্বাধীন হবার আগে শিল্পে যে মূলধন সরবরাহ করা হ'ত সে মূলধনের পরিমাণের তুলনায় আজকের মূলধনের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু যে হারে আজকের দিনে মূলধনের চাহিদা বেড়ে চলেছে সে হারে লগ্নী পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশ্ন হতে পারে, মূলধনের চাহিদা বেড়ে যাবার কারণ কি। প্রধান কারণ হ'ল দুটি। প্রথমটি হচ্ছে—কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দর চড়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, সময়ের প্রয়োজনে শিল্প-প্রসারের তাগিদ বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে।

ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী সম্প্রতি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছেন। সে বিবৃতির একস্থানে বলা হয়েছে :

"In spite of the existence of bodies like the Industrial Finace Corporation, the State Financial Corporations and the Industrial Credit and Investment Corporations medium-term finance facilities in the private sector of industry are still found to be inadequate for the purposes of the overall objectives of the second Five-Year Plan. It may therefore, be necessary to establish financial institutions to provide medium-term loan assistance to industries."

মোট কথা হচ্ছে, ভারত সরকার এমন লগ্নী প্রতিষ্ঠান গঠন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন যেটা দরকারমত মাঝারি মেয়াদের কর্জ্জ সরবরাহ করবে। জানা গেছে, অনেকগুলি বৃহৎ এবং মাঝারি ধরনের ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। দেশের মধ্যে যেসব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ধরনের শিল্প আছে, প্রয়োজনের সময়ে সেসব শিল্পকে সাহায্য করাই হ'ল লগ্নী প্রতিষ্ঠানের আসল উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হ'ল, লগ্নী প্রতিষ্ঠান কোথা থেকে টাকা পাবে। বলা হয়েছে, প্রধানতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে টাকা সরবরাহ করা হবে। তা ছাড়া, প্রস্তাবিত লগ্নী প্রতিষ্ঠানকে 'ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'ও যাতে টাকা সরবরাহ করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও সরকার চিন্তা করছেন। তাই দেখ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার লগ্নী-পদ্ধতিকে প্রস্তাবিত লগ্নী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে ভারতীয় পার্লামেণ্টে দুটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। এই বিল দুটি যদি শেষ পর্য্যন্ত আইনে পরিণত হয় তবে তার ফল হবে এই :—

"The Reserve Bank and the State Bank of India will be able to assist in providing adequate medium-term finance to industries in the context of industrial development contemplated under the second Five-Year Plan."

রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড জীবনোপলব্ধি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

মহাকবি সেক্সপীয়ার কবির প্রকৃতি এবং কার্য্য সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, কবির কল্পনাদৃষ্টি এক সূক্ষ্ম বা দিব্য উন্মাদনায় দ্যুলোক হইতে ভূলোকে এবং ভূলোক হইতে দ্যুলোকে প্রসারিত হয়। তৎকালে কল্পনার আলোকে যে সকল বস্তু তাঁহার দৃষ্টিপথে অ-দৃষ্টপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া প্রতিভাত হয় তৎসমুদয়কে তিনি লেখনী-সাহায্যে বাস্তবসত্তার রূপ দিয়া পাঠকের উপলব্ধি গোচর করেন। কিন্তু এই প্রকার রূপ-সৃষ্টি "বিশ্বের উপর প্রশস্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে", ও নিত্য-কালের ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়—যদি শিল্পীর থাকে "ঐশী দৃষ্টি এবং প্রকাশ-শক্তি" (the vision and the faculty divine)। রবীন্দ্রনাথের ছিল সেই ঐশী দৃষ্টিশক্তি ও প্রেরণা; এবং তৎসম্পর্কে তিনি যে নিজেই অবহিত ছিলেন তাহার পরিচয় পাই তাঁহার "আত্মপরিচয়ে"র মধ্যে: "জগতে কাজ করবার লোকের ডাক পড়ে, চেয়ে দেখার লোকেরও আহ্বান আছে। আমার মধ্যে এই চেয়ে-দেখার ঔৎসুক্যকে নিত্য পূর্ণ করবার আবেগ আমি অনুভব করেছি।* এই দেখা এবং দেখানোর তালে তালেই সৃষ্টি।" তাঁর দেখা সত্য এবং সার্থক হইয়াছিল, কেননা তিনি ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় জগৎকে সমগ্র করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই সম্মিলিত রূপকে বিশেষ ভাবে সুন্দর রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখি তাই সত্যকে দেখিনে"; "বিদ্যা ও অবিদ্যাকে যাঁরা যুক্ত করে দেখেন তাঁরা সত্যকে দেখেন।"

সত্যকে দেখিবার পন্থা সম্পর্কে বলিয়াছেন, "এই প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক যেখানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করেছে সেখান থেকে আমাদের লক্ষ্য যেন একান্ত স্খলিত না হয়। যেখানে সত্যের মধ্যে উভয়ের আত্মীয়তা আছে সেখানে মিথ্যার দ্বারা আত্মবিচ্ছেদ না ঘটাই। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে, প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনই একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত"* (শান্তিনিকেতন, ২৬ পৌষ, ১৩১৫)। "আমি বল্‌ছি, এই চোখ দিয়েই, এই চর্ম্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখা দেখবার আছে যা চরম দেখা।" এই জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চরম সফলতা কি বিজ্ঞান? সূর্য্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে, নক্ষত্রগুলি এক-একটি সূর্য্যমণ্ডল—এ জেনেই বা কি হবে?...কাকে দেখবে? তাঁকে যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। সেই অপরূপ অনন্তরূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে" (৪ পৌষ ১৩১৫)। ঐ বৎসরই ১৭ই চৈত্র বলিতেছেন, "জগতের সমস্ত খণ্ড প্রকাশ সার্থকতা লাভ করেছে তাঁর অখণ্ড প্রকাশে"। তিনি এই সত্যটির উপলব্ধি প্রকাশ করিয়াছেন নানা সময়ে নানা ভাবে ও ভাষায়, কাব্যে ও গদ্য প্রবন্ধে। তাই দেখা যায়, কয়েক বৎসর পরে (১৩১৮) লিখিয়াছেন, "সীমা যে সীমাবদ্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে। তত্ত্বহিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা জানি না—কিন্তু আজ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্য্যন্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।" (জীবনস্মৃতি)

আবার দেখি জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়াইয়া, মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে বলিতেছেন, "এই জীবনযন্ত্র যে সকল মালমশলা দিয়ে তৈরি, গুণী তার থেকে আপন সুর সব সময়ে নিখুঁত করে বাজিয়ে তুলতে পারে নি। কিন্তু জেনেছি মোটের উপর আমার মধ্যে তাঁর যা অভিপ্রায় তার প্রকৃতি কি জানি নে ·· আর কখনো উপলক্ষ্য হবে কিনা, তাই আজ আমার আশি

---

* কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও বলিয়াছেন:

Poets, even as Prophets, each with each
Connected in a mighty scheme of truth,
Have each his own peculiar faculty,
Heaven's gift, a sense that fits him to perceive
Objects unseen before, ...

এবং নিজের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

Unto him hath also been vouchsafed
An insight that in some sort he possesses ...

---

* "On the earth the broken arcs; in the heaven,
a perfect round."—Browning: Abt Vogler

আবার—

"See all, and be not afraid"—Robbi Ben Ezra

বছরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের সত্যকে সমগ্র ভাবে পরিচিত করে যেতে ইচ্ছা করেছি।... আবাল্যকাল উপনিষদ আবৃত্তি করতে করতে আমার মন বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতাকে অন্তর্দৃষ্টিতে মানতে অভ্যাস করেছে। সেই পূর্ণতা বস্তুর নয়, সে আত্মার।"

সেই বৎসরই "জন্মদিনে" নামক কবিতাগুচ্ছের ১৩ সংখ্যক কবিতায় লিখিতেছেন—

বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।

যাহা তাঁহার "জন্মের শেষ অর্থ", তাহাই তাঁহার "জীবনের চরম তাৎপর্য", বা "তার নিহিতার্থ", "এই একটি মাত্র আইডিয়া" তাঁহার "রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে"; এবং এমার্সনের ভাষায় বলা যাইতে পারে, তিনি ছিলেন এবং অনাগতকালেও থাকিবেন, এই 'আইডিয়া'র 'Representative'।* কিন্তু বলা বাহুল্য যে, রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ছিলেন কাব্যপ্রতিভা ও তত্ত্বজ্ঞান একাধারে উভয় ভাবধারার যুগ্ম প্রতীক। যে আলোকে দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের "চক্ষু দৃষ্টি-দীপ্ত" ছিল তাহার প্রভাবে যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভালোক তদীয় জীবন-সায়াহ্নেও ম্লান হয় নাই তাহার প্রমাণ পাই যখন দেখি ইহজীবনের প্রান্ত-সীমানায় দাঁড়াইয়া প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসংবাদে লিখিতেছেন—

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয় মৃত্যু বিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ,...
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।
আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।

এখানে যে কেবল মর্ত্তলোকের পরবর্ত্তী অখণ্ড জীবনের প্রতি দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি-নিবদ্ধতার পরিচয় পাই তাহাই নহে, ইহা শিল্পী রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকারী কাব্য-প্রতিভারও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভার বর্ণনা ও তুলনা অনেক কবিই করিয়াছেন, কিন্তু সূর্য্যাস্তের আলোকের সহিত, "দৃষ্টি-দীপ্ত" চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত আধ্যাত্মিক আলোকের এমন অনন্যসাধারণ একটি তুলনা আর কোন্ কবি দিয়াছেন জানি না। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে এই অখণ্ড জীবনের উপলব্ধি তদীয় মর্ত্তজীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। নানা ভাবে নানা রূপ দিয়া তিনি এই উপলব্ধিকে ব্যক্ত করিয়াছেন। একটি বিশিষ্ট ভাবরূপ এই—"অস্ফুট চেতনার ডিমের ভিতর থেকে জন্মলাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। সেই জন্মের জ্ঞানোন্মেষ দ্বারাই আমরা দ্বিজ হব। সেই জন্মই জগতে যথার্থরূপে জন্ম—জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম" (১৩১৫)। যাঁহারা তাঁহার জীবনের "চরম তাৎপর্য্য"কে তাঁহার রচনাপাঠ হইতে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের নিকট অখণ্ড বা অনন্ত জীবনের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অখণ্ড-জীবনোপলব্ধির আর একটি দিক আছে যাহা কেহ কেহ হয় ত বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। সেই দিকটির আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

অখণ্ড জীবন বলিতে আমরা সাধারণতঃ ইহজীবনের সহিত পরবর্ত্তী জীবনের সংযুক্তি ও তাহার অনন্তত্বই বুঝি এবং বিশ্বাস করি। অনন্ত জীবন-বিশ্বাসী অন্যান্য সাধক ও উপদেষ্টার ন্যায় তিনিও তাঁহার কাব্যে এবং সঙ্গীতে অনেক স্থলে, জীবনের প্রথম হইতে, এই বিশ্বাস বা উপলব্ধি ব্যক্ত করিয়াছেন স্পষ্ট ভাষায়—

(১) জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর

(২) সম্মুখে অনন্তলোক
যেতে হবে যেথা হোক। ইত্যাদি

কিন্তু তিনি শুধু এই সম্মুখজীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, মানব-জীবনের অখণ্ডতা বা অনন্তত্ব দেখাইবার প্রয়াস করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। যাহা অনন্ত তাহা শুধু এই স্থান বা ইহলোক হইতে এবং এই ক্ষণ বা ইহজগতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হইতে সম্মুখে অনন্তকালপ্রসারী—এ রকম হইতে পারে না। অনন্ত বা eternal সম্মুখেও অনন্ত, পশ্চাতেও অনন্ত; ভবিষ্যতে অনন্ত; অতীতেও অনন্ত। ইহজীবনের পশ্চাতে মানবজীবনের সীমাহীন অস্তিত্বের উপলব্ধি ও তাহার প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ কিভাবে করিয়াছেন সে বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

তিনি যেমন বলিয়াছেন "সম্মুখে অনন্ত জীবন বিস্তার", তেমনই বলিয়াছেন যে, অচিন্তনীয় দীর্ঘকাল হইতে কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া নব নব জন্মের বিকাশের মধ্য দিয়া পরিস্ফুট হইতে হইতে বর্ত্তমানে এ ধরায় আমাদের আগমন হইয়াছে।

* Men are representative of ideas (মহাপুরুষগণ এক একটি ভাবধারার প্রতীক)।—"Representative Men"

(১) জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে
জীবন হতে নিয়েছ নব জীবনে।
(পরিণাম, ১৩০৬)

(২) জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে
শুধু তুমি আমি এসেছি।...
কত যুগ এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি।
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।
লক্ষ বরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে...
কী মুরতি মাঝে ফুটালে আমাকে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে!
হে চির পুরানো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া।
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর
রবে চিরদিন ধরিয়া।
["উৎসর্গ" (১৩) ১৩০৭]

"আত্মপরিচয়" পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধে এই কবিতাটির উদ্ধৃতিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন (১৩১১)—"আমি জানি, অনাদি-কাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে"।

ইহার সহিত তুলনীয়—"আজ মানুষের জ্ঞানের সম্মুখে সমস্ত কাল জুড়িয়া, সমস্ত আকাশ জুড়িয়া একটি চিরধাবমান মহাযাত্রার লীলা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকাশ... অপরিস্ফুটতা হইতে পরিস্ফুটতার অভিমুখে কেবলই আপনার অগণ্য পাপড়িকে একটি একটি করিয়া খুলিয়া দিকে দিকে প্রসারিত করিয়া দিতেছে। এই পরমাশ্চর্য্য নিত্যবহমান প্রকাশ-ব্যাপারে মানুষ যে কবে বাহির হইল তাহা কে জানে—সে যে কোন্ বাষ্পসমুদ্র পার হইয়া কোন্ প্রাণ-রহস্যের উপকূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হইল তাহার ঠিকানা নাই"।

ধর্ম্মের নবযুগ ; সঞ্চয়, ১৩১৮

(৩) জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে,
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন॥
গীতাঞ্জলি, ১৩,৬

তুলনীয়: 'বলাকা'র—
দেখিয়াছ কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায় কত একা!
...বহু শত জনমের চোখে চোখে কানে কানে কথা।
(৪০ সংখ্যক কবিতা)

(৪) কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে
সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসচি
তোমায় চেয়ে।
...ঝরণা যেমন বাহিরে যায়
জানি না সে কাহারে চায়
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে।
(১৩১৭)

(৫) আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
...কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।
(১৩১৯)

উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলিতে কবি যে ভাবধারা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ছিল তাঁহার "imaginative conviction" বা তাঁহার ভাষায়, "প্রত্যক্ষ উপলব্ধি"। তিনি অনুভূতির আলোকে "যাহা দেখিয়াছেন তাহার সত্যতাকে জীবনে গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন"। ইহার আরও প্রমাণ ক্রমশঃ পাওয়া যাইবে।

শেষোদ্ধৃত কবিতাটির রচনার বৎসরে ইংলণ্ডে ষ্টপফোর্ড ব্রুক-এর সহিত আলোচনাকালে মানবাত্মার পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ-প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন, "যখন চিন্তা করিয়া দেখি তখন মনে হয়, ইহা কখনও হইতেই পারে না যে, আমার জীবন-ধারার মাঝখানে এই মানবজন্মটা একে-বারেই খাপছাড়া জিনিষ—ইহার আগেও এমন কখনও ছিল না, ইহার পরেও এমন কখনও হইবে না ; যে কারণ-বশতঃ জীবনটা বিশেষ দেহ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে সে কারণটা এই জন্মের মধ্যেই প্রথম আরম্ভ হইয়া এই জন্মের মধ্যেই সম্পূর্ণ শেষ হইয়া গেল। শরীরী জন্ম পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত হইতে হইতে আপনাকে পূর্ণতর করিয়া তুলি-

তেছে এইটেই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। ষ্টপফোর্ড ব্রুক বলিলেন, তিনিও জন্মান্তরে বিশ্বাসটাকে সঙ্গত মনে করেন। তাঁহার বিশ্বাস, নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটা জীবনচক্র সমাপ্ত করিব তখন আমাদের পূর্ব্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি জাগ্রত হইবে। এ কথাটা আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটা কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্তর ভাবটা পরস্পর গ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয়, শেষ না করিলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটা অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটা জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি, গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারে ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটা পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি"। (১৩১৯)

ইহার পর 'বলাকা' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালে। উহার ৪০ সংখ্যক কবিতার ("এই ক্ষণে মোর") ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ ১৩২৮), "আমি কিন্তু পূর্ব্বজন্মবাদী। বার বার এই উপলব্ধি করেছি যে, এই জীবনের প্রত্যক্ষের পিছনে যা বেজে উঠল তার কারণ-তন্ত্রী সবটা এই লোকে নেই। পূর্ব্ব যুগের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অজ্ঞাত রসলোকের তন্ত্রীতে আঘাত পড়েই তার অনুরণনে এই কালের সব তার বেজে উঠল"। --

তাই যা দেখিছ তা'রে ঘিরেছে নিবিড়।
যাহা দেখিছ না তা'রি ভিড়। (১৩২২)

আবার—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে। (১৩২১)

এইপ্রকার conception বা উপলব্ধি—যা তাঁহার পরিণত বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধে ব্যক্ত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সমর্থন পাইয়াছিলেন যৌবনের প্রারম্ভে ইংরেজ-কবি টেনিসনের "De Profundis" নামক কবিতা হইতে, কারণ তিনি এই কবিতাটি একটি বিশদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করেন; অন্য কোন ইংরেজী কবিতার ব্যাখ্যা তিনি প্রকাশ করেন নাই। উক্ত কবিতার বিশিষ্ট ভাবটি রবীন্দ্রনাথের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া যে সুরের রণন তুলিয়াছিল, এই ব্যাখ্যাটি সেই রণন-ঝঙ্কৃত একটি অপূর্ব্ব রচনা। বিস্ময়ের কথা এই যে, ব্যাখ্যাটি যখন প্রকাশিত হয় (১২৮৮, "ভারতী" পত্রিকা) তখন কবির বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। উক্ত ইংরেজী কবিতার যে সকল অংশ রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় নিজস্ব ভাবসংযোগে সমৃদ্ধ ও অধিকতর তাৎপর্য্যপূর্ণ হইয়াছে সেইগুলি মাত্র উদ্ধৃত হইল:

"De Profundis" ('গভীর হইতে') পুত্রসন্তানের জন্ম উপলক্ষে টেনিসন কর্ত্তৃক রচিত—

Out of the deep, my child, out of the deep,
Where all that was to be, in all that was,
Whirl'd for a millon aeons thro' the vast
Waste dawn of multitudinous-eddying light—
Out of the deep, my child, out of the deep
Through all this changing world of changeless law,
And every phase ef ever-heightening life,
And nine long months of ante-natal gloom, . . .
. . . Touched with earth's light—thou comest
darling boy ; . . .

"প্রথম শিশু জন্মাইতেই তিনি ভাবিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? বৈদিক ঋষি-কবিরা মহা অন্ধকারের রাজ্য হইতে, দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রগর্ভ হইতে তরুণ সূর্য্যকে উঠিতে দেখিয়া যেমন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, এ কোথা হইতে আসিল? তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহা সৌর-জগতের যমজ ভ্রাতা। তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "বৎস আমার, মহাসমুদ্র হইতে, যেখানে যাহা-কিছু-ছিল-র মধ্যে যাহা কিছু হইবে (অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ) কোটি কোটি যুগযুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্ত্তনমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহামরুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।" অতীতের সেই উষাগর্ভে কবি প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলেন—অপরিস্ফুট* পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখানে আবর্ত্তিত হইতেছে—আজিকার সদ্যোজাত শিশুটির কারণপুঞ্জ সেইখানে ঘুরিতেছে। উভয়ের বয়স এক, কেবল একজন ত্বরায় আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আর একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।...তাঁহারই পুত্রকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারার সঙ্গে অতীত মাতা এক গর্ভে ধারণ করিয়াছে, এক জ্যোতির্ম্ময় দোলায় দোলাইয়াছে,* এক স্তন পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে।...

* তারকা-চিহ্নিত অংশগুলি (২) সংখ্যক পূর্ব্বে উদ্ধৃত কবিতাংশ ও তৎসংযুক্ত গদ্যাংশের সহিত তুলনীয়।

Out of the deep, Spirit, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden seeds
Down you dark sea, Thou comest, darling boy.

জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে সমুদ্রতলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমি মহাজ্যোতিকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে। পূর্ব্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সে অপরিস্ফুটতার অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন, সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"For in the world, which is not ours, they said
'Let us make man', and that which should be man,
From the one light no man can look upon,
Drew to this shore lit by the suns and moons
And all the shadows."

"সে জগৎ আমাদের নহে।" সে কোন্ জগৎ? কে জানে কোন জগৎ। মহাকবি আদি কবির মনোজগৎ কি? "They said"—তাহারা কহিল। কাহারা? কে জানে কাহারা?* কবি আলোকের রাজ্যে অন্ধ, এই নিমিত্ত তাঁহার কথা অস্পষ্ট। তিনি কহিতেছেন, "যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল—"আইস, আমরা মনুষ্য হই'—ভাবী মনুষ্য, মনুষ্যচক্ষুর অসহনীয় সেই এক আলোক হইতে এই ছায়ালোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল..."

O dear Spirit half lost
In thine own shadows and this fleshly sign
That Thou art Thou—who wailest being born
And banished into mystery, and the pain
Of this divisible-indivisible world,...

হে আত্মা, তুমি কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ!... তখন যে এক জগতে ছিলে, তাহা গণনার জগৎ নহে। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে, এখন যে দেশে যে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না অথচ সীমা আছে।...কিন্তু এইখানেই তোমার শেষ নহে। তুমি অসীমের নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ, তুমি অনন্ত কাল ধরিয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে।

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি কি এক অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! এই অনন্ত মন্দিরে গিয়া কবি কাহাকে দেখিতে পাইলেন? কি গান গাহিয়া উঠিলেন?

Hallowed be Thy name—Halleluiah!—
Infinite Ideality!
Immeasurable Reality!
Infinite Personality!
Hallowed be thy name—Halleluiah!

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্য। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, কিছুতেই তার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাবমাত্রকে যখন সত্য বলিয়া জানিলাম, তখন তিনি আমাদের আরও কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ, তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীত করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম তোমার জয় হউক:

We feel we are nothing—for all is Thou and in Thee;
We feel we are something—that also has come from Thee;
We know we are nothing—but Thou will help us to be.
Hallowed be Thy name—Halleluiah!

ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন সকলি তুমি। ইহাই আমাদের ভাবমাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাবমাত্রে ছিলাম। অবশেষে তোমার কাছ হইতে যখন আসিলাম, তখন অনুভব করিতে লাগিলাম আমরা কিছু, "We feel we are something—That also has come from Thee," ইহা বর্ত্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সত্য হইয়াছি। "We know we are nothing—but thou wilt help us to be"—ইহাই ভবিষ্যতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই—তুমি আমাদের ক্রমশঃই গঠিত করিয়া তুলিতেছ। আমাদের ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনও কালেই তাহা হইতে পারিব না, চিরকালই "Thou wilt help us to be"—অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। মর্ত্ত্য জীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা

---

* টেনিসন লিখিত 'They' শব্দটির অর্থ পরিস্ফুট নয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথ স্বীয় আলোকে উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া প্রথম সংস্করণে (১২৮৮) 'কাহারা' এই শব্দের পরে যোগ করিয়াছিলেন "তাঁহার মনোরাজ্যের অধিবাসীরা? তাঁহার ভাবসমূহ, তাঁহার কল্পনা?" এই প্রকার ব্যাখ্যা যে নিছক কল্পনামাত্র নয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ব্রহ্মানন্দ কেশব ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন, "অব্যক্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল...পিতার ইচ্ছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশিত হইল।" (সেবকের নিবেদন, ৪র্থ খণ্ড)। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রাদিতেও মানবের উৎপত্তি সম্পর্কে এই কথাই আছে, "স ঐক্ষত একোহহং বহুঃ স্যাম্" (শ্রুতি); "ইহারা আমারই ইচ্ছামাত্রে আমার প্রভাবসম্পন্ন হইয়া জন্মিয়াছিলেন" (গীতা ১০।৬)।

মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহা বাষ্পরাশির মধ্যে,* সমস্ত জগতের আদিভূতের মধ্যে মিলিয়া ছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পৃথক হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল। অবশেষে যতই সে বড় হইতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনন্ত ভাব, পরে অপরিমেয় সত্য ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন।"

তিনি যে "বৃহৎ বিশ্বতত্ত্বটি"কে (cosmic truth) "প্রত্যক্ষ উপলব্ধি" করিয়া বার বার প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হইল। স্থানাভাবে আর দৃষ্টান্ত দেওয়া সম্ভব নয়, প্রয়োজনও নাই। অন্তিমকালে যখন তাঁহার জীবনের পাঠ প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে, তখন নানা সময়ে প্রকাশিত এই 'বিশ্বতত্ত্ব'-সম্পর্কিত তদীয় ভাবধারার সমস্তটা তাঁহার মনে উদিত হইয়াছে* এবং তিনি উহাকে বিদায় বেলার হৃদয়াবেগ দ্বারা রঞ্জিত করিয়া "জন্মদিনে" নামক কবিতাগুচ্ছে প্রকাশ করিয়াছেন—

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্যবেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।৫
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি,
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবারাত্রি অবসানে
মন্থর গমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে।
কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না, সে কোথা হতে
হ'ল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়। (১১)
...সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।

সর্ব্বশেষে জীবাত্মার চরম পরিণতি সম্পর্কে উপনিষদের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিলেন—

বার বার মনে মনে বলিতেছি আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে, ··
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।

* 'ধর্ম্মের নবযুগ' হইতে গৃহীত ২য় সংখ্যক উদ্ধৃত বাক্যাংশের ভাব ও ভাষা প্রায় একই প্রকার।

* অক্সফোর্ড রকের সহিত আলোচনার শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

† ১৩১৯ সনে রকের সহিত আলোচনায় পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "কিন্তু পূর্ব্বজন্মে কোনো মানুষ পশু ছিল এবং পরজন্মেই সে পশুদেহ ধরিবে একথাও আমি মনে করিতে পারি না। কেননা, প্রকৃতির মধ্যে একটা অভ্যাসের ধারা দেখা যায়, সেই ধারার হঠাৎ অত্যন্ত বিচ্ছেদ ঘটা অসংগত।" সম্ভবতঃ, পরবর্ত্তীকালে কবি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ক্রমবিবর্তনবাদ ব্যাখ্যাত 'পশুলোকে'র মধ্যবর্ত্তিতায় আস্থা স্থাপন করিয়া থাকিবেন।

অভিভাবক ও শিক্ষক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

ইংরেজী একটা প্রবাদ আছে—'যে হাত দোলনা দোলায় সে হাত দেশ শাসন করে' ; এর অন্তর্নিহিত অর্থ সর্বজনবেদ্য। স্নেহ আর বাৎসল্যের মধ্যে দিয়ে পিতামাতা সন্তানদের যে শিক্ষা দিয়ে থাকেন ভবিষ্যৎ নাগরিকের চরিত্র গঠনে তার মূল্য অপরিমেয়। শিশুকে মানুষ করে তুলতে হবে—প্রকৃত শিক্ষক আর উপযুক্ত বাবা মা এই একই লক্ষ্যের সমান অংশীদার। তাঁরা প্রত্যেকেই চান ছেলেরা যেন উপযুক্ত ভাবে গড়ে ওঠে, শিশুরা যেন স্বাস্থ্যবান, জ্ঞানবান আর বোধসম্পন্ন হয়, ছেলেবেলা থেকেই তারা যেন অপরের সঙ্গে আনন্দে মিশতে পারে, তারা যেন ভবিষ্যতের প্রয়োজনে নিজেদের অভ্যাস এবং প্রতিভার যথাযথ বিকাশ ঘটাতে পারে।

প্রকৃত শিক্ষক ছাত্রকে বিদ্যালয়ে থাকা কালে তাঁর পরিণত বুদ্ধি আর উপদেশ দিয়ে ছাত্রের অধ্যয়ন অনুশীলনে সহায়তা করে থাকেন, বিদ্যালয়ের ভিতরেই কেবল নয়, বাইরেও শিক্ষকেরা নানা ভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

তেমনি মা বাবাও ছেলেরা যা করে যা পড়ে তার ওপর নিজেদের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে থাকেন, এবং শিক্ষক ও অভিভাবক প্রত্যেকেই আপন আপন প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকেন ; তবে কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষককে ছাত্রের গৃহপরিবেশ সম্পর্কে প্রায়ই সচেতন হতে হয়।

বিদ্যালয় সম্পর্কে ছাত্রের ধারণা নির্ভর করে বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর, এই বিষয়টি ছাত্রদের ওপর কু অথবা সুপ্রভাব বিস্তার করে ; যে বিদ্যালয়ে সন্তান পড়ে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর যদি অভিভাবকের আস্থা থাকে, তাঁদের বিবেচনায় শিক্ষক যদি অভিজ্ঞ হন তা হলে ছাত্র সুকুমার প্রবৃত্তি নিয়ে বিদ্যালয়ে আসবে, সে শিক্ষককে সম্মান করতে শিখবে, কিন্তু অভিভাবক যদি বিদ্যালয়ের সুনাম সম্পর্কে অবিশ্বাসী হন তা হলে ছাত্রদের আচার ব্যবহারে অভিভাবকের অবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটবে, তার ফলে বিদ্যালয়ের সকল অগ্রসর অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং শিক্ষকদের পক্ষে মূল কর্তব্য হচ্ছে বিদ্যালয় সম্পর্কে অভিভাবকদের আস্থা অর্জন করা।

এর পরেই বিবেচ্য অভিভাবকদের শিক্ষাগত লক্ষ্য। যে শিশুর পিতামাতা চান তাঁর সন্তান সাধারণ ভাবে স্কুল-কলেজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা পাবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অভিভাবক যদি যথার্থ ভাবে বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিশেষ মূল্যবান তিনি সন্তানের প্রতিভা এবং আগ্রহ সাপেক্ষ যতদিন সম্ভব তাকে বিদ্যালয়ে পড়াতে থাকেন, এর ফলে সন্তান শিক্ষাকে জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে। বিদ্যালয় শিক্ষা ত্যাগ করার অভীপ্সা তাদের কমে আসে। "কোন রকমে এগিয়ে যাবে" এই ধারণা শিক্ষাকে সন্তোষজনক মান পর্যায় উন্নীত করে না, বরঞ্চ অধ্যয়নের উগ্র ইচ্ছা আর সাফল্যের আশা নিয়ে ছাত্রদের বিদ্যালয়ে আসবে।

আবার অভিভাবকদের অতিরিক্ত উচ্চ আশাসম্পন্ন হওয়ার মধ্যেও বিপদ নিহিত আছে, তাঁরা চান তাঁদের সন্তান খুব দক্ষতা অর্জন করুক, কোন বিশেষ বিষয়ে সে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকুক অথবা সন্তানের ক্ষমতা এবং আগ্রহ ব্যতিরেকে আরও উচ্চ শিক্ষা লাভ করুক। অভিভাবকরা নিজেরা যেমন ছাত্রজীবনে সাফল্য অর্জন করেছিলেন যদি দেখেন তাঁদের আশা অনুযায়ী তাঁদের সন্তানরা সে রকম অগ্রসর হচ্ছে না তখন সেই সন্তানদের ছাত্রজীবন বিপদাপন্ন হয়ে ওঠে, এতে করে ছাত্ররা হতাশ হয়ে পড়ে আর আত্ম-ধিক্কারে তৎপর হয়ে ওঠে, অনেক শিক্ষককে অভিভাবকদের এই অধিক উচ্চাশাজনিত অবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, এই ক্ষেত্রে ছাত্রকে নিজের ওপর আস্থাশীল হয়ে তার ক্ষমতা অনুযায়ী বাস্তবের সম্মুখীন হতে শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তা করেন।

ছাত্রদের প্রতিভার স্ফুরণ অনেকাংশে তাদের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল, বহু সময়ে যে সব ছাত্র ক্ষুধার্ত হয়ে আসে, যাঁরা প্রয়োজনের সময় যথোচিত চিকিৎসা লাভ করে না, যারা অনিদ্রায় কষ্ট পায় তারা শিক্ষকদের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি করে, বেশীর ভাগ অভিভাবক সন্তানদের স্বাস্থ্যের জন্যে যতদূর সম্ভব সুব্যবস্থা করে থাকেন কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা জানেন না সন্তানদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কি প্রয়োজন।

গৃহপরিবেশ পাঠ অভ্যাসের অনুকূল থাকা দরকার, বিদ্যালয়ে সব সময় সব পড়া তৈরি করা সম্ভব নয়, বাড়িতেও ছাত্রকে পড়াশুনা করতে হয় ; কোন কোন পরিবারে পড়া-

শুনার ভাল সুযোগ-সুবিধে আছে। অনেক অভিভাবক বিভিন্ন সাময়িক পত্র কেনে, সঙ্গীত বা কলাবিস্থায় সন্তানদের উৎসাহিত করে তাদের সুকুমার বৃত্তির কর্ষণের ব্যবস্থা করে থাকেন; কিন্তু অনেক পরিবার সন্তানদের প্রতিভা-স্ফুরণের এই ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন না, এই রকম আথিক অনটনগ্রস্ত পরিবারভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্যে শিক্ষকদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

অভিভাবকরা কি সন্তানদের বুদ্ধিমত্তাকে উৎসাহিত এবং বর্দ্ধিত করে থাকেন? সন্তানকে মানুষ করতে গেলে অভিভাবককেও পড়াশুনা করতে হবে নিয়মিত, তাঁদেরও প্রতিভা বিচিত্র এবং বিস্তৃত হওয়া চাই, সন্তানরা যে প্রশ্ন করে থাকে সেগুলোর প্রতি অভিভাবকদের মনোভাবের ওপর তাদের মানসিক প্রস্তুতি অনেকাংশে নির্ভর করে; সন্তানদের কৌতূহল সীমাহীন, সেই কৌতূহল আলোচনায় তাদের উৎসাহিত করে তোলা প্রয়োজন; অনেক সংসারে এই পারস্পরিক আলোচনা শিক্ষাদানের এক বিশেষ পন্থা হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। জগৎ এবং সংস্কৃতি ও প্রতিভাগত ঐতিহ্য সম্পর্কে সন্তানদের ঔৎসুক্যকে গভীর করে তোলবার জন্যে অভিভাবকদের চেষ্টা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

গৃহে সন্তানদের যে ধরনের আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে বিদ্যালয়ে তাদের ব্যবহারের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়, গৃহের পরিবেশ যদি অসংস্থিত বা অকারণ কঠোর হয়ে থাকে তা হলে সন্তানদের আচার ব্যবহার এমন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে, বিদ্যালয়ের পক্ষে তা শোধরান অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ে এবং গৃহে যে আচার ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে সমতা থাকা বাঞ্ছনীয়, অন্যথায় ছাত্রদের ওপর অসমতার ফল প্রতিকূল ভাবে দেখা দেয়।

এ ছাড়া যিনি প্রকৃত শিক্ষক, ছাত্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাঁর বিশেষ ভাবে অবহিত থাকা প্রয়োজন; ব্যক্তিগত জীবন বলতে ছাত্রের বন্ধুবান্ধব, হাতখরচের অর্থের পরিমাণ, তার দায়-দায়িত্ব এবং যে সমস্ত বিষয়ে তার নিজস্ব মতামত গ্রহণের স্বাধীনতা আছে সেই সব।

গৃহ এবং বিদ্যালয় যখন একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে চলেছে তখন উভয়ের সাফল্য নির্ভর করছে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে। শিক্ষক এবং অভিভাবকের সম্পর্ক নির্ভর করার যথেষ্ট কারণ আছে, ছাত্রের বিষয় নিয়ে অভিভাবক এবং শিক্ষকের মধ্যে আলোচনা করা উচিত। প্রয়োজনানুসারে ছাত্রসম্পর্কিত তাঁদের অনুসৃত নীতি উভয়ের মধ্যে আলোচনা দ্বারা বদলান দরকার। সুতরাং আজকের ছাত্রকে ভবিষ্যতের জন্যে গড়ে তোলবার দায়িত্ব একক শিক্ষক বা অভিভাবকের নয়—উভয়েরই।

সাহিত্যে তরুলতা
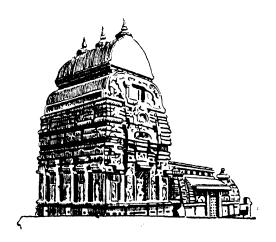
অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

এই নিখিল বিশ্বে সৃষ্টির আদি যুগে জীব-জগতের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই হয়েছিল তরুলতার উদ্ভব। কালক্রমে এল দেহধারী প্রাণীর দল। নতুন মানব-শিশুর প্রথম দৃষ্টি জুড়িয়ে গেল চারিদিকের অপূর্ব্ব শ্যাম সমারোহে। মানব-সভ্যতার পথিকৃৎ সেই প্রথম অমৃত-পুত্রের দল জীবন-প্রভাতেই তরুলতার সঙ্গে পাতিয়ে নিল মধুর মিতালি। যখন তাদের কারও মুখেই কথা ফোটে নি, তখনই তাদের একের প্রাণে অপরের জন্য মূর্ত্ত হয়ে উঠল অকথিত কথা, অ-গীত গান; রচিত হ'ল ভালবাসার বাঁধন, স্নেহের সূত্র। বন-লক্ষ্মীর তরুপুত্রদের সাহচর্য্যে মনুপুত্রেরা আরম্ভ করল জীবনের পথে যাত্রা। পরে, এই শ্যামল অরণ্যের স্নিগ্ধ ছায়াতেই তাদের মনে জাগল সভ্য হবার, পূর্ণ হবার, সমুন্নত হবার প্রেরণা। তাই, ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল নীল আকাশের তলে — বনানীর কোলে—তরুলতার শ্যামল পরিবেশে—শান্তরসাস্পদ তপোবনে। এই 'ছায়াসুনিবিড়' শান্তির নীড়েই ঋষি উপলব্ধি করলেন নিখিলের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান—বেদ-উপনিষদের মর্ম্মবাণী। আড়ম্বরহীন আরণ্য জীবনেই তাঁরা খুঁজে পেলেন পরম প্রশান্তি—চরম তৃপ্তি। এই অরণ্য হতেই আহরণ করলেন "অরণি", তাঁদের নিত্যকর্ম্ম ধর্ম্মযজ্ঞের প্রধান উপচার।

ফলে, কত কানন-কান্তারের, বনবনানীর বহু-বিচিত্র রূপ-বর্ণনায় ভারতীয় সাহিত্য হ'ল সমৃদ্ধ, কবিকণ্ঠ হ'ল মুখর। পঞ্চবটী, বিন্ধ্যাটবী, দণ্ডকারণ্য, নৈমিষারণ্য, রামগিরি প্রভৃতি বনের নামের মায়ায় আমরা আজও হই লুব্ধ ও মুগ্ধ। পৃথিবীর আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের ঋষি হতে আজকের দিনের কবিগুরু পর্য্যন্ত সবাই গাইলেন বৃক্ষের বর্ণনা, করলেন লতিকার স্তুতি।

তাঁদের সকলেরই সাহিত্যে একটি বিরাট এবং বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে এই তরুলতা। ভারতীয় কবিমানসের এক লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এবং প্রবল প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় তাঁদের সারস্বত-সাধনার পথ-পরিক্রমায়। বিশ্বপ্রকৃতির আপাতদৃশ্যমান জড়তার অন্তরালে পরম চৈতন্যময়ের অনন্ত লীলা-বিলাসই প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা প্রজ্ঞা-সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে। সেই "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" নিখিলের সর্ব্ব বস্তুতেই বর্ত্তমান। বাইরের দৃষ্টিতে যাকে অচেতন বলে মনে হয়, তারও অন্তরে চৈতন্যময় শক্তিকে তাঁরা করেছেন অনুভব। তিনি ত সৎ (চিরন্তন), চিৎ (চৈতন্যময়) এবং আনন্দঘন বিগ্রহ। তাঁর চৈতন্যময় এবং আনন্দময় সত্তাই ত বহির্বিশ্বের তথাকথিত জড়প্রকৃতির মধ্যে হয়েছে বিলসিত। এই মহাভাবধারায় অভিষিক্ত হয়ে উপনিষদের ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে সকল প্রাণের যিনি দেবতা, তাঁকে জানালেন আকুতি ও প্রণতি। এই বিশ্বচরাচরে অগ্নিতে জলেতে যে দেবতা রয়েছেন, তিনিই ত বিরাজ করছেন বনস্পতি ওষধিতে।

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ॥"

রবীন্দ্রনাথের কাব্যবীণাতেও ঝঙ্কৃত হয়েছে এই সুর:

"অগ্নিতে জলেতে, এই বিশ্বচরাচরে
বনস্পতি ওষধিতে এক দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য।" (নৈবেদ্য)

মহাভারতের প্রশস্তি-প্রসঙ্গে লোমহর্ষণ সৌতি বলেছেন:

"ইদং কবিবরৈঃ সর্ব্বৈরাখ্যানমুপজীব্যতে।
উদয়প্রেপ্সুভির্ভৃত্যৈরভিজাত ইবেশ্বরঃ॥ (মহাভারত-১ম পর্ব্ব)

"যে ভৃত্যেরা অভ্যুদয় কামনা করে, তারা সর্ব্বদাই আশ্রয় গ্রহণ করে অভিজাত প্রভুর। তেমনি ভারতের নিখিল কবিকুল এই আখ্যানকেই অবলম্বন করে কাব্যসাধনায় করেন যাত্রা।" এই কথাটি আরও সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয় বৈদিক ঋষিদের রচনা সম্পর্কে। সেই আর্য্য কবিকুলের সারস্বতসাধনার ধারাই পরবর্ত্তী কবিবর্গের ক্ষীণা কাব্যধারাকে সঞ্জীবিত এবং পরিপ্লাবিত করে ভারতীয় সারস্বত ভূমিকে করে তুলেছে সুজলা সুফলা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার উদয়াচলে রয়েছেন বেদ-উপনিষদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষিকুল, তার পরে রামায়ণ-মহাভারতের মহাকবি মহর্ষিযুগল, তার পরে কালিদাস-ভবভূতি প্রভৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী বাণীসাধক, তারও পরে বহু শতাব্দীর ব্যবধানে বর্ত্তমানের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। এদের প্রত্যেকেরই কাব্যবীণায় যুগে যুগে বৃক্ষ-বন্দনার যে বিচিত্র মধুর সুরটি ঝঙ্কৃত হয়েছে তাকেই রূপায়িত করার চেষ্টা করা যাক্ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে।

ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, "জন্মান্তরের কর্ম্ম-ফলে এদের এই বৃক্ষ-জন্ম। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে সংজ্ঞা বা চেতনা":

"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥ (মনুসংহিতা-১ম)

এই বিশ্বাসে পরিচালিত হয়েই ভারতীয়েরা চিরকাল বৃক্ষের সঙ্গে করেছে আত্মীয়ের মত সদয় ব্যবহার। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১৪৬ সূক্তে অরণ্যের বর্ণনা ও স্তুতির মধ্যে ঋষির কি নিবিড় অন্তরঙ্গতা! প্রথমেই তিনি বলছেন—

"অরণ্যান্যরণ্যান্যসৌ যা প্রেব নশ্যসি।

কথা গ্রামং ন পৃচ্ছসি ন ত্বা ভীরিব বিন্দতী। (ঋগ্বেদ ১০।১৪৬।১)
'ওগো অরণ্যানি, তুমি যেন দেখতে দেখতেই অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছ। কত দূর চলেছ, ঠিক করতে পারছি না। তুমি গ্রামে যাবার পথের নিশানা ত জিজ্ঞেস করলে না? তোমার কি একলা থাকতে ভয় করে না?" চতুর্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা "ক্ষেত্রপতি"র কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—যেন দ্যুলোক, ভূলোক, সলিল এবং ক্ষেত্রপতির সঙ্গে সঙ্গে "ওষধী"গুলিও আমাদের জন্ত মধুময় হয়ে ওঠে। আমরা অহিংসিত হয়েই তাঁকে অনুসরণ করব।

"মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্নো অস্ত—
—রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম।" (ঋগ্বেদ—৪।৫৭।৩)

বিখ্যাত মধুমতী সূক্তে প্রার্থনার যে পরিপূর্ণ রূপটি ঋষিকণ্ঠে উদ্গীত হচ্ছে, তাতেও ওষধি এবং বনস্পতির কথাটি বিশেষভাবেই উল্লিখিত হয়েছে :

ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো।
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাংস্ত সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।"

"মধুময় বনবায় মধুর জলধি, দিবানিশি সর্ব্বৌষধি হোক্ মধুময়
মধুমান্ পৃথীরেণু, স্বর্গ-পিতৃলোক অয় ; হউক্ মাধুরী গো বনস্পতিচয়।
মধু দাও হে সবিতা, মধু দাও বিধি।"
আবার বলছেন, "ধনের জন্ত আমার এই স্তুতি পৃথিবী এবং স্বর্গের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ এবং ওষধিবর্গের নিকট উপনীত হোক।"

"প্রৈষ স্তোমঃ পৃথিবীমন্তরিক্ষং
বনস্পতিরোষধী রায়ে অশ্যাঃ। (ঋগ্বেদ ৫।৪২।১৬)

আরো বলছেন—"পর্জ্জন্য ওষধিগণকে নিয়ে আমার সুখদাতা হয়ে উঠুন" :

"পর্জ্জন্যো ওষধীভির্ময়োভুঃ।" (৬।৫২।৬)

শুক্লযজুর্ব্বেদে (২২।২৪-২৮) অশ্বমেধযজ্ঞে নানা দেব-দেবতা এবং প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে বনস্পতি, পুষ্প, ফল, শাখা, ওষধি প্রভৃতিরও আহ্বান এবং বন্দনা রয়েছে। অথর্ব্ববেদের বহু স্থানে বনস্পতি, ওষধি ও বীরুধ (লতা) সমূহের নিকট জানানো হচ্ছে আকুল প্রার্থনা। ঋষি বলছেন যে, "বৃষ্টির রসধারা ওষধির ভিতর সঞ্চারিত হোক। নানাবিধ ওষধি ও লতা পৃথক পৃথক ভাবে জাত হয়ে ধরণীকে করে তুলুক সমৃদ্ধ ও বিভূষিত।"

"সমীক্ষয়ন্ত তবিষাঃ সুদানবো—
২পাংরসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্।
বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্ত ভূমিং
পৃথগ জায়ন্তাম্ ওষধয়ো বিশ্বরূপাঃ।"
"পৃথগ জায়ন্তাম্ বীরুধো বিশ্বরূপাঃ।"
(অথর্ব্ববেদ—৪।১৫।২-৩)

উপনিষদের ঋষি ত আত্মহারা হয়ে গেছেন বৃক্ষের বন্দনায়। তিনি দেখেছেন, "এই সব তরুলতার মূল, অগ্রভাগ ও মধ্যভাগ মধুময়। এদের পর্ণ ও পুষ্প মধুময়। এখানেই অমৃতরসের পান ও উপভোগ।"

"মধুমন্ মূলং মধুমদ্ অগ্রমাসাম্।
মধুমধ্যং বীরুধাং বভূব।
মধুমৎপর্ণং মধুমৎ পুষ্পমাসাম্।
মধোঃ সংভক্তা অমৃতস্য ভক্ষঃ।"

আরো বলছেন—"পুষ্পে প্ররোহে এরা ঐশ্বর্য্যবতী। ফলবতীই হোক আর অফলাই হোক, সমবেত মাতৃগণের মত আমাদের সকল বিঘ্ন হতে মুক্ত করার জন্ত স্নেহস্তন্যরসে এই বৃক্ষরাজি আমাদের অভিষিক্ত করুন।"

"পুষ্পবতী প্রসূমতীঃ ফলিনীরফলা উত।
সংমাতর ইব দুহ্রাম্ অস্মা অরিষ্ট তাতয়ে।"

এই রকমের প্রকৃতি বিষয়ক বৈদিক সঙ্গীতগুলিই পরবর্তী-কালের সাহিত্যে আরো বিভিন্ন সুরে, লয়ে, তানে হয়েছে গীত। বীজ পরিণত হয়েছে ফলে। গহনগিরির উৎসটিই ত লোকালয়ে এসে পরিণত হয় প্রবল প্রবাহিণীতে। এ যেন সাহিত্যের এক-একটি স্তর। পূর্ব্বতনটি পরেরটির পটভূমিকারূপে পাচ্ছে শোভা। বৃক্ষ-বল্লরীর অভ্যন্তরে যে প্রাণধারা নিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে, তারই ত প্রকাশ নিত্য-নূতন কাব্যে "নিতুই নব"রূপে। সেই আদিম কল্পনাই সার্থক সংকবির লেখনীস্পর্শে নতুন মণ্ডনকলায় সুশোভিত হয়ে অপরূপ সুষমা বিস্তার করে চলেছে যুগ হতে যুগান্তরে।

রামায়ণে দেখি নিয়তির অভিশাপে যুবরাজ রামচন্দ্র যখন বনগমন করছিলেন, তখন অযোধ্যাবাসীদের সঙ্গে তরুরাজিও হয়েছিল বিক্ষুব্ধ, শোকাহত। দ্বিজবৃন্দেরা বলছিলেন—"ঐ দেখ, মূলের দ্বারা উদ্ধতবেগ সমুন্নত পাদপরাজি তোমার অনুগমনে অশক্ত হয়ে বায়ুবেগে তাদের বিক্রোশ প্রকাশ করছে।"

"অনুগন্তুমশক্তাস্ত্বাং মূলৈরুদ্ধতবেগিনঃ।
উন্নতা বায়ুবেগেন বিক্রোশন্তীব পাদপাঃ।"
(রামায়ণ—অযোধ্যা ৪৫।৩০)

রামচন্দ্রের বনগমনের পর পুরবাসীরা সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এই ভেবে যে, রম্যকাননের অটবীগুলো তাঁর শোভা বর্দ্ধন করবে। এই প্রিয় অতিথি রামকে বহুমঞ্জরীধারী, ভ্রমরশালী বৃক্ষগুলি পরাবে কুসুমের শিরোভূষণ। ফুল-ফল দিয়ে আনন্দদান করবে এই বরেণ্য অতিথিকে।

"শোভয়িষ্যন্তি কাকুৎস্থমটব্যো রম্যকাননাঃ।
আপগাশ্চ মহানূপাঃ সানুমন্তশ্চ পর্ব্বতাঃ।

কাননং বাপি শৈলং বা যং রামোঽনুগমিষ্যতি।
প্রিয়াতিথিমিব প্রাপ্তং নৈনং শক্ষ্যন্ত্যনর্চিতুম্॥
বিচিত্রা কুসুমাপীড়া বহুমঞ্জরিধারিণঃ।
রাঘবং দর্শয়িষ্যন্তি নগা ভ্রমরশালিনঃ॥
দর্শয়িষ্যন্ত্যনুক্রোশাদ্ গিরয়ো রামমাগতম্।
পাদপাঃ পর্ব্বতাগ্রেষু রময়িষ্যন্তি রাঘবম্॥
(রামায়ণ-অযোধ্যা ৪৮।১৯-২৫)

আর সত্যই দেখা যায়, রাজগৃহে রাজ-ঐশ্বর্য্যে পরিপালিত, সুখের ললিত ক্রোড়ে লালিত রাম-লক্ষ্মণ-সীতার মনে বনবাসের জন্য কোনই দুঃখ হয় নি, নির্ব্বাসনের কোন ক্লেশ তাঁদের চিত্তকে স্পর্শ করে নি। চতুর্দ্দিকের স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশে তাঁদের অন্তর পরম প্রশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। জাগতিক ভোগবিলাসের তথা ঐশ্বর্য্যের নাগপাশের বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে মানুষের মন এই তরুলতার সান্নিধ্যেই খুঁজে পায় শান্তি ও তৃপ্তি। তাই ত দেখা যায়, বনবাসীর চিত্তে নেই কোন ক্ষোভ, চাঞ্চল্য ও অতৃপ্তি।

আর এক দিকে, পম্পাসরোবরতীরে বিরহী রামচন্দ্রের মনে বসন্ত সমাগমে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল অশোকস্তবক, পল্লবের তাম্র-অর্চ্চি এবং ভ্রমরগুঞ্জনের অগ্নিনিঃস্বন।"

"অশোকস্তবকাংগারঃ ষটপদস্বননিস্বনঃ।
মাংহি পল্লবতাম্রার্চ্চি বসন্তাগ্নিঃ প্রধক্ষ্যতি।"
(রামায়ণ-কি ১।২৯)

"হিমান্তে বনজবৃক্ষগুলিতে এত কুসুম বিকশিত হয়েছে যেন মনে হচ্ছে একে অপরকে ভ্রমরগুঞ্জনের দ্বারা স্পর্দ্ধা করছে, করছে প্রতিযোগিতা।"

"আহ্বায়ন্ত ইবান্যোন্যং নগাঃ ষটপদনাদিতাঃ।
কুসুমোত্তংসবিটপাঃ শোভন্তে বহু লক্ষ্মণ॥
(রামায়ণ-কি ১।৯২)

"ক্রূরকর্ম্মা রাবণের আগমনে সমগ্র আরণ্য-প্রকৃতি ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বনের বৃক্ষরাজি ভীত হয়ে শাখাবাহু করল না কম্পিত; প্রবাহিত হ'ল না স্নিগ্ধ সমীরণ।"

"তমুগ্রং পাপকর্ম্মাণং জনস্থানগতা দ্রুমাঃ।
সন্দৃশ্য ন প্রকম্পন্তে ন প্রবাতি চ মারুতঃ॥"
(রামায়ণ-আর ৪৭।৭)

জন্মদুঃখিনী অপহৃতা সীতা আরণ্য-প্রকৃতিকেই তাঁর একমাত্র সমব্যথীরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। বনবাসকালে তাদের নিয়েই ত তাঁর দিন কাটত। বনের পশুপাখী ও তরুলতাদের নিয়ে এক বিরাট সংসার তিনি পেতেছিলেন। প্রত্যেকের সঙ্গে বিভিন্ন বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর সুদীর্ঘ সাহচর্য্যে। তাই, দুরাচার রাবণ যখন তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন এই অসহায়া ধরিত্রী-দুহিতা ধরিত্রীসন্তান তরুরাজির কাছেই জানিয়েছিলেন করুণ আবেদন।

"আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারাংশ্চ পুষ্পিতান্।
ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ॥
দৈবতানি চ যান্তস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।
নমস্করোম্যহং তেভ্যো ভর্ত্তুঃশংসতমাং হৃতাম॥
(রামায়ণ-আরণ্য ৪৯।৩০-৩২)

"হে জনস্থান, ওগো কুসুমিত কর্ণিকারবৃন্দ, রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে—এই কথা সত্বর তোমরা রামকে জানাও, এই আমার একান্ত অনুরোধ। তরুরাজিসমাকুল এই বনে যত বনদেবতা রয়েছেন, তাঁদের সবাইকে জানাই প্রণতি। অপহৃতা আমার কথা যেন তাঁরা আমার স্বামীকে জানান।" সেই আর্ত্ত আবেদনে, করুণ ক্রন্দনে, মর্ম্মস্পর্শী বিলাপে সাড়া দিয়েছিল, আরণ্য-তরু। "নানা বিহগসমাকুল বনপাদপগণ উর্দ্ধগামী বায়ুভরে আন্দোলিত হয়ে অগ্রভাগ কম্পিত করে যেন অভয় দিয়ে বলছিল—"সীতা, আমরা এখানে রয়েছি; তোমার কোন ভয় নেই"।

"উৎপাতবাতাভিহতা নানাদ্বিজগণায়ুতাঃ।
মাভৈরিতি বিধূতাগ্রা ব্যাজহ্রুরিব পাদপাঃ॥"
(রামায়ণ-আরণ্য ৫২।৩৪)

রামচন্দ্র মারীচবধের পর পর্ণশালায় ফিরে দেখলেন—"সীতা-বিরহিতা পর্ণশালা হেমন্তের শ্রীহীন সরোবরের মত। চারিদিকে বৃক্ষগুলি রোদনরত। বনের পশু, পক্ষী, পুষ্প সবই ম্লান। সবই যেন শ্রীহীন, বিধ্বস্ত; কারণ, বনদেবতারাও সীতার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখে পর্ণশালা করেছেন পরিত্যাগ।"

"দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতং তদা।
প্রিয়াবিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব॥
রুদন্তমিব বৃক্ষৈশ্চ ম্লান-পুষ্প মৃগ-দ্বিজম্।
প্রিয়াবিহীনং বিধ্বস্তং সন্ত্যক্তং বনদৈবতৈঃ"॥
(রামায়ণ-আরণ্য ৬০।৫-৬)

শোকোন্মত্ত রামচন্দ্র বন হতে বনান্তরে প্রতিটি তরুলতাকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করছিলেন "পতিদেবতা" সীতার কথা। কারণ, তাদের সঙ্গেই ত ছিল তাঁর গভীর সখ্য।

"অস্তি কশ্চিং ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্ব-বন-প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুভাননাম্॥
স্নিগ্ধ-পল্লব-সঙ্কাশাং পীতকৌষেয়বাসিনীম্।
অথবার্জ্জুন শংস ত্বং প্রিয়াং তামর্জ্জুনপ্রিয়াম্॥
জনকস্য সুতা তন্বী যদি জীবতি বা ন বা।
ককুভঃ ককুভোরুং তাং ব্যক্তং জানাতি মৈথিলীম্॥
লতা-পল্লব-পুষ্পাঢ্যো ভাতি হ্যেষ বনস্পতিঃ।
ভ্রমরৈরুপগীতশ্চ যথা দ্রুমবরো হ্যসি॥
এব ব্যক্তং বিজানাতি তিলকস্তিলকপ্রিয়াম।
অশোক শোকাপনুদ শোকোপহতচেতনম॥
ত্বন্নামানং কুরু ক্ষিপ্রং প্রিয়াসন্দর্শনেন মাম।

অহো ত্বং কার্ণিকারাগ্র পুষ্পিতঃ শোভসে ভৃশম।
কার্ণিকারপ্রিয়াং সাধ্বীং শংস দৃষ্টা যদি প্রিয়া।
(রামায়ণ-আরণ্য ৬।১২-২০)

কদম্ব, বিল্ব, অর্জ্জুন, কুরুবক, বকুল, শোকরহিত অশোক, কর্ণিকার প্রভৃতি তরুরাজির কাছেই প্রথমে তিনি সীতার অনুসন্ধান করছেন। রামায়ণে আরো দেখা যায়, মহর্ষি ভরদ্বাজ মান্য অতিথি ভরতের জন্য বনের নিকট আহার্য্য, পেয় এবং ভূষণ প্রার্থনা করেছিলেন :

"বনং কুরুষ্ব যদ্দিব্যং বাসোভূষণপত্রবৎ।
দিব্যনারী ফলং শশ্বৎ তৎকৌবেরমিহৈবতু।
বিচিত্রাণি চ মাল্যানি পাদপপ্রচ্যুতানি চ।
(রামায়ণ-অযো ৯১।১৯-২১)

এইভাবে বনের সঙ্গে মানুষের নিবিড় একাত্মতা প্রাচীন ভারতের সর্ব্বত্রই মেলে। সেই যুগে গার্হস্থ্য আশ্রমই মানুষের একমাত্র আশ্রয় ছিল না। ব্রহ্মচর্য্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই আশ্রম-ত্রয়কে অবলম্বন করে জীবনের তিন-চতুর্থাংশই অরণ্যে অতিবাহিত হ'ত।

যোগী-ভোগী সবাইকে অনুসরণ করতে হ'ত শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" ফলে আরণ্য-প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের স্থাপিত হ'ত এক অখণ্ড ঐক্যবোধ, একান্ত একাত্মতা। বিদ্যাকেন্দ্র ছিল তরুরাজি পরিশোভিত শান্তরসাস্পদ তপোবন। সাধনপীঠ ছিল গহন অরণ্যানী। বৃক্ষমূলে আসন পেতে মুক্তিকামী করতেন কঠোর তপস্যা। দেবদারু বৃক্ষমূলে যেমন দেবাদিদেব মহাদেব ছিলেন ধ্যানমগ্ন, তেমনি বোধিদ্রুমমূলেই সিদ্ধিলাভ করেন ভগবান তথাগত। আবার আজকের দিনেও দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে সাধনায় ইষ্টলাভ করেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। সর্ব্বকালের সকল সাধকের প্রিয় স্থান তরুমূল। তাই বৃক্ষসমাকুল অরণ্য মানব-সমাজে লাভ করেছিল জনপদের চেয়েও অধিকতর মর্য্যাদা ও গভীর-তর প্রীতি।

মহাভারতেও মেলে রামায়ণের মত বৃক্ষের বন্দনা। আরও আশ্চর্য্য, সমস্ত জীবের মত বৃক্ষলতারও যে প্রাণ আছে, এই কথা মহাভারতকার স্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। তাদের ভিতরেও চলেছে পঞ্চভূতের লীলা :

"সুখদুঃখয়োশ্চ গ্রহণাচ্ছিন্নস্য চ বিরোহণাৎ।
জীবং পশ্যামি বৃক্ষাণাম অচৈতন্যং ন বিদ্যতে।

তেন তজ্জলমাদত্তং জরয়েদগ্নিমারুতৌ।
আহারপরিণামাচ্চ স্নেহো বৃদ্ধিশ্চ জায়তে।"
(মহাভারত-শান্তি ১৭২।১০-১৭)

"সুখদুঃখের গ্রহণে, ছিন্ন অংশের পুনরুদ্গমে, আমি দেখছি, তরুরাজিরও প্রাণ আছে। অচেতন কিছুই দেখছি না। এইরূপে বৃক্ষ যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি এবং বায়ু তাকে করে জীর্ণ। ফলে আহারপরিণামের দ্বারা বৃক্ষের আসে কোমলতা এবং হয় পরিপুষ্টি। আরও নানা ভাবে বিশ্লেষণ করে বৃক্ষের যে প্রাণ আছে, এই সত্য তাঁরা অপূর্ব্বভাবে করেছেন প্রতিষ্ঠা।

এমনকি মানুষের মত বৃক্ষেরও একটি চিকিৎসাবিজ্ঞান তখন আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল। বনৌষধির ক্রমবিকাশে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের ভেষজশাস্ত্র। বৈদিক আয়ুর্ব্বেদে একশত বনৌষধির নাম মিললেও পরবর্ত্তীকালের চরক এবং সুশ্রুত সংহিতায় সাত শত ভেষজের গুণাগুণ নিরূপণ করা হয়েছে। প্রাচীন রোমে ভারত হতে এত বনৌষধি রপ্তানি হ'ত যে, তার বিনিময়ে বহু স্বর্ণ রোম হতে ভারতে চলে আসত—এইজন্য প্লিনি (Pliny) খুবই আক্ষেপ করেছেন।

এই ভাবে ভারতের বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ উভয় জীবনই তরুলতার অবারিত দানে এবং অকৃপণ প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

কবি কালিদাস এই মহাসত্যকে তাঁর অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কৌশলের মধ্য দিয়ে এক রস-সুন্দর পরিণতিতে করেছেন উৎসারিত। বনবালা শকুন্তলা একদিন বলেছিলেন—"অত্থি মে সোদরসিনেহোবি এদেসু" (শকুন্তলা-১ম)। "এই তপোবন-তরুদের প্রতি রয়েছে আমার সহোদর স্নেহ।" তাই বায়ুচালিত পল্লবাঙ্গুলি দ্বারা সেই বকুলবৃক্ষও তাঁকে কাছে ডাকত—"বাদেরিদপল্লবাংগুলিহিং তুবরেদি বিঅ মাং কেসররুক্‌খও।" (শকুন্তলা-১ম)। কুমারীজীবনের লীলাভূমি পরিত্যাগ করে পতিগৃহযাত্রাকালে "যেতে নাহি দিব" বলে সহচরী শকুন্তলার বসনাঞ্চল টেনে ধরেছিল তপোবন-প্রকৃতি, মঙ্গলবাণী উচ্চারণ করেছিলেন বনদেবী এবং বধূবেশিনী শকুন্তলার জন্য বিবিধ উপহার যুগিয়েছিল তরুরাজি। বনস্থলী তাঁর আদরিণী কন্যাকে তরুরাজির মাধ্যমে উপহার দিলেন :

"ক্ষৌমং কেনচিদ ইন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতম্
নিষ্ঠ্যুতশ্চরণোপরাগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্ব্বভাগোত্থিতৈর্-
দত্তান্যাভরণানি নঃ কিশলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।"
(শকুন্তলা-৪র্থ অঙ্ক)

তার বিদায়লগ্নে "পাণ্ডুপত্র ঝরিয়ে দিয়ে লতাও করছিল অশ্রুমোচন" :

"মুঅন্তি অস্সূ বিঅ লদাও।" (শকুন্তলা-৪র্থ)

শকুন্তলা সম্বন্ধে রাজার যে পরিহাসোক্তি—"যাবপি আরণ্যকৌ" —তাতে নেই কোন অতিশয়োক্তি। মাতা সদ্যঃপ্রসূতা শকুন্তলাকে বনপ্রকৃতির অঙ্কে অর্পণ করে হলেন অন্তর্হিতা। বৃক্ষ-বল্লরীর সঙ্গে প্রকৃতির ক্রোড়ে সে বর্দ্ধিতা। তপোবনের সঙ্গে তার সহজ আত্মীয় সম্বন্ধ। বনজ্যোৎস্না তার লতাভগ্নী, সহকার হ'ল সহোদর। মানবে ও বনজে তার কাছে নেই কোন ভেদ। বাক্‌পটু ও মূকে যেটুকু পার্থক্য, সেই পর্য্যন্ত। পতিগৃহে গমনকালে তাপস তাপসীর সঙ্গে বনজ্যোৎস্নার কাছেও বিদায়গ্রহণ করা তার নিকট অপরিহার্য্য। তপোবনদেবতারা তার স্নেহময় আত্মীয়জন। তাই

তার যাত্রাকালে বনদেবতা অশরীরী কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন মঙ্গল-আশিস—"শকুন্তলার গমন হোক নিরুপদ্রব, কমলিনীসনাথ সরোবর তার নয়নরঞ্জন করুক ; ঘনপল্লব তরুদল তার যাত্রাপথে বিস্তার করুক স্নিগ্ধচ্ছায়া ; পদ্মরেণুর মত সুখস্পর্শ হোক পথের ধূলি, শান্ত এবং অনুকূল পবনে পথশ্রান্তি হোক দূর।"—

"রম্যান্তরঃ কমলিনীহরিতৈঃ সরোভি-
শ্ছায়াদ্রুমৈর্নিয়মিতার্কময়ূখতাপঃ।
ভূয়াৎ কুশেশয়রজো মৃদুরেণুরস্যাঃ
শান্তানুকূলপবনশ্চ শিবশ্চ পন্থাঃ॥" (শকু-৪র্থ)

কালিদাসের কাব্যে বালবৃক্ষ সর্ব্বদাই স্তন্যপায়ী শিশু। "কুমার সম্ভবে" দেখা যায় কিশোরী উমা অনলসভাবে ঘটস্তন-প্রস্রবণের দ্বারা বৃক্ষশিশুগুলিকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। এই পূর্ব্ব-জাত পুত্রদের প্রতি তাঁর সন্তানস্নেহ কার্ত্তিকের চেয়ে মোটেই কম নয় :

"অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান
ঘটস্তন-প্রস্রবণৈর্ব্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং
ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি॥" (কুমার-৫।১৪)

"রঘুবংশে"ও কবি আশ্রম-ঋষির কণ্ঠ দিয়ে সীতাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন :

"পয়োঘটৈরাশ্রবালবৃক্ষান্
সংবর্দ্ধয়ন্তী স্ববলানুরূপৈঃ।
অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিমবাপ্স্যসি ত্বম॥" (রঘু)

"কাদম্বরীতে" বাণভট্ট কালিদাসের প্রদর্শিত সরণিতেই তরুশিশুকে করেছেন বর্ণনা : "ভগবতো মহামুনেরগস্ত্যস্য ভার্য্যয়া লোপামুদ্রয়া স্বয়মুপরচিতালবালকৈঃ করপুট-সলিল-সংবর্দ্ধিতৈঃ সুতনির্ব্বিশেষৈরুপশোভিতং পাদপৈঃ···।" (কাদম্বরী) "রঘুবংশে" আরও দেখা যায়, লক্ষ্মণ যখন সীতাকে আবার নির্ব্বাসিত করে চলে গেলেন, তখন বিগ্না কুররীর মত সীতার করুণ ক্রন্দনে মাতা ধরণীর বুকের বনানীও বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছিল। সমগ্র বনস্থলীতে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। ময়ূর নৃত্য পরিত্যাগ করল, তরুলতা ফুলগুলি সব ঝরিয়ে দিল :

"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখভাবম্
অত্যন্তমাসীদ রুদিতং বনেঽপি॥" (রঘু-১৪·৬৯)

"কুমারসম্ভবে" বসন্ত-উজ্জীবিত বনস্থলীতে আরণ্য-তরুগণ পর্যাপ্ত-পুষ্পস্তবক-স্তনবতী প্রদীপ্ত পল্লবোষ্ঠযুক্তা মনোহর লতাবধূগণের বিনম্র শাখাভুজবন্ধনে অনুভব করছে নিবিড় আলিঙ্গন। এই পটভূমিকায় তরুলতার দান সুকুমার কুসুম-সম্ভারেই লাবণ্যময়ী উমার আবির্ভাব ঘটালেন কবি কালিদাস :

"অশোকনির্ভৎর্সিতপদ্মরাগম
আকৃষ্ট-হেম-দ্যুতি-কর্ণিকারম্।
মুক্তা-কলাপীকৃতসিন্দু বারং
বসন্ত-পুষ্পা-ভরণং বহন্তী॥
আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং-
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্য্যাপ্ত-পুষ্প-স্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব॥"
(কুমার—৩.৫৩,৫৪)

"উমা তাঁর সকল নারী-প্রকৃতি নিয়েই আরণ্য-প্রকৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলেন।" এমনি করেই কবি কালিদাস সর্ব্বত্র মানুষে-তরুতে, জড়ে-চেতনে স্থাপন করেছেন গভীর আত্মীয়তা। কবির এই চেতন-অচেতনের অদ্বয় ভাবটিই রূপায়িত হয়েছে "বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্" নাটকে। মেঘজলবর্ষণে ধৌতপল্লবা তন্বী লতা যেন কেঁদে কেঁদে অধরপল্লব করেছে বিধৌত। অকালে পুষ্পোদ্‌গম বন্ধ হওয়ায় যেন আভরণহীনা ; ভ্রমরের গুঞ্জন নেই বলে সে যেন চিন্তামৌন : মনে হয় পাদপতিত আমাকে ত্যাগ করে সেই অভিমানিনী প্রেয়সী দূরে দাঁড়িয়ে আছে।"—এই বলেই বিরহী বিক্রম বনলতাকে আলিঙ্গন করাতে সেই বনলতাই উর্ব্বশী মূর্ত্তিতে রাজার বাহুডোরে আবার করল আত্মসমর্পণ :

"তন্বী মেঘজলার্দ্রপল্লবতয়া ধৌতাধরেবাশ্রুভিঃ
শূন্যেবাভরণৈঃ স্বকালবিরহাদ্ বিশ্রান্তপুষ্পোদগমা।
চিন্তামৌনমিবাস্থিতা মধুলিহাং শব্দৈর্বিনা লক্ষ্যতে
চণ্ডী মামবধূয় পাদপতিতং যাতা প্রকুপ্যেব সা॥"
(বিক্রমোর্ব্বশীয়ম্)

বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে গভীর আত্মীয়তায় চেতন-অচেতনের, তরু-মানবের অভেদের ব্যঞ্জনাটিই প্রকাশিত হ'ল এই ঘটনায়। ভব-ভূতির "উত্তররামচরিতম্"-এ করুণার যে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়েছে, বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের যে করুণ রাগিণী মূর্চ্ছিত হয়েছে, তাতেও আরণ্য-তরুর প্রভাব অপরিসীম। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ নায়িকা বনানীর কোলে, আরণ্য-তপোবনের আশ্রমাঙ্গনে তরুলতার সাহচর্য্যে জীবনের এক বিরাট অংশ কাটিয়েছে। তাই ত তাদের জীবন লাভ করেছে এক অনির্ব্বচনীয় রোমাণ্টিক সৌন্দর্য্য ও কল্প-লোকের মাধুর্য্য।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও তাঁর পূর্ব্বসূরীদের অনুবর্ত্তনে অনুভব করেছেন—"ঐ গাছগুলি বিশ্ব-বাউলের একতারা। ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি, তা হলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ-সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।' সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল

পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে, ফলে, পল্লবে ; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।" একদিন সপ্তপর্ণ বৃক্ষের ছায়াতলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অন্তঃকর্ণে শুনেছিলেন বৃক্ষের ভিতর মৌন-মুখরতায় চঞ্চল প্রাণের সঙ্গীত তথা প্রাণময়ের আহ্বান। এই আহ্বানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও পেয়েছিলেন মুক্তির বাণী :

"আজি আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণ রূপ
ওই বনস্পতি মাঝে, ঊর্দ্ধে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
দিবস প্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে।" (প্রান্তিক)

এই মুক্তিমন্ত্রে ছাত্রদের হৃদয়কে উদ্বোধিত করার জন্য তিনি তপোবন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শালবনে ঘেরা আম্রকুঞ্জে। প্রকৃতি যখন তৃষাতুর বক্ষে প্রতীক্ষা করে প্রথম বর্ষণধারার, আষাঢ়ের সেই মেঘমেদুর অম্বরতলে কাজলঘন দিনে মঙ্গলঘটে আরোপিত শিশুতরুকে জানানো হয় আহ্বান :

"আয় আমাদের অঙ্গনে
অতিথি বালক তরুদল,
মানবের স্নেহ-সঙ্গ নে
চল্ আমাদের ঘরে চল্!
শ্যাম বঙ্কিম ভঙ্গীতে
চঞ্চল কলসঙ্গীতে
দ্বারে নিয়ে আয় শাখায় শাখায়
প্রাণ আনন্দ কোলাহল॥"

অন্তিমকাল পর্যন্ত কবি স্মরণ করে গেছেন বৃক্ষের সঙ্গে তাঁর পরম আত্মীয়তা—'সান্ত্বনা', 'আম্রবন', 'বোবার বাণী' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে! 'বনবাণী'তে 'বৃক্ষবন্দনা'র মধ্যে কবি জানিয়েছেন তাঁর অকুণ্ঠ প্রণতি—

"অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্য্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে তুমি বৃক্ষ, আদি প্রাণ,
ঊর্দ্ধ শীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ 'পরে। তব প্রাণে প্রাণবান্,
তব স্নেহচ্ছায়ায় শীতল, তব তেজে তেজীয়ান্,
সজ্জিত তোমার মাল্যে যে মানব, তারি দূত হয়ে
ওগো মানবের বন্ধু, আজি এই কাব্য-অর্ঘ্য লয়ে
শ্যামের বাঁশীর তানে মুগ্ধ কবি আমি
অর্পিলাম তোমায় প্রণামী!" (বৃক্ষবন্দনা)

যুগে যুগে আমাদের ঋষিপিতামহগণ এই বৃক্ষের মধ্যে দেখেছিলেন অনন্ত মাধুর্য্যের সমাবেশ। তরুলতায়, পত্র-পল্লবে, কুসুমে-কাণ্ডে তাঁরা দেখেছিলেন এক অসীম কল্যাণেচ্ছা, চিৎশক্তির প্রাণময়, আনন্দময় বিকাশ। প্রতিকূলতার মধ্যে অসহায় মানবসত্তাকে লালন করার জন্য জননীর দায়িত্ব নিয়েছিল অরণ্যানী। তাই, যা ছিল অদ্ভুত, তাই হ'ল উদ্ভূত। বসুন্ধরার অন্তরতম মণিকোঠা থেকে রূপ-রস-গন্ধ আহরণ করে উন্নত মাথা তুলে দাঁড়াল সে অনন্ত দ্যুলোকের দিকে। মানুষের যোগে দিল সে ওষধি, ক্ষুধায় দিল ফল, যজ্ঞে যোগাল সমিধ। তারই পত্র-বল্কলে লিপিবদ্ধ হ'ল বেদগান, স্নেহচ্ছায়ায় শান্তিময় হ'ল ঋষির তপোবন। আবার তারই পুষ্পগুচ্ছে সজ্জিত হ'ল মানুষের প্রিয়ার দেহ, পদতল রঞ্জিত হ'ল তারই লাক্ষারাগে। কালিদাস যে অম্লান-সুন্দর কুসুমদামে যক্ষপ্রিয়াকে সাজিয়েছেন, সে ত তরুলতারই দান :

"হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব রজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ (উত্তরমেঘ)

রবীন্দ্রনাথও সেকালের প্রেয়সীর দিনচর্য্যায় তরুলতার অবদানকেই বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন :

"অশোককুঞ্জ উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার মুখের মদিরাতে।
আসত তারা কুঞ্জবনে চৈত্র জ্যোৎস্নারাতে
অশোকশাখা উঠত ফুটে প্রিয়ার পদাঘাতে॥
কুরুবকের পরতো চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রৈত হাতে কি জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজত কুন্দফুলে
শিরীষ পরতো কর্ণমূলে।
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা।
কালাগুরুর গুরুগন্ধ লেগে থাকত সাজে।
কুরুবকের পরতো মালা কালো কেশের মাঝে॥"
(সেকাল—ক্ষণিকা)

প্রাচীন বাংলার পল্লী-বিলাসিনীদেরও প্রসাধনে পুষ্প-পল্লবের প্রাচুর্য্যই কবি চন্দ্রচন্দ্র বর্ণনা করছেন :

"ভালে কজ্জলবিন্দুরিন্দুকিরণস্পর্দ্ধী মৃণালাংকুরো
দোর্বল্লীষু শলাটুফেনিলফলোত্তংসশ্চ কর্ণাতিথিঃ।
ধম্মিল্লস্তিলপল্লবাভিষবণ স্নিগ্ধঃ স্বভাবাদয়ং
পান্থান্ মন্থরয়ত্যানাগরবধূবর্গস্য বেশগ্রহঃ॥"

"কপালে কাজলের টিপ, হস্তে চন্দ্রকিরণস্পর্দ্ধী শুভ্র পদ্মমৃণালের বালা ও তাগা, কর্ণে কচি ঘেঁঠাফুলের দুল, কেশ স্নানস্নিগ্ধ এবং কবরীতে তিলপল্লব, পল্লীবধূদের এই বেশ স্বতঃই পথিকদের গতি মন্থর করে দেয়।" আর একজন অজ্ঞাতনামা বাঙালী প্রাচীন কবি বাঙালী মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো এবং কর্ণে কচি তালপাতার দুল ব্যবহারের কথা উল্লেখ করছেন :

"মালাগর্ভঃ সুরভিমসৃণৈর্গন্ধতৈলৈঃ শিখণ্ডঃ।
কর্ণোত্তংসে নবশশিকলা নির্ম্মলং তালপত্রম্।..."

রবীন্দ্রনাথের "মধ্যাহ্ন" কবিতায়ও দেখা যায়, পুরনো দিনের তরুলতা-পরিশোভিত আশ্রম-জীবনেরই সুখ-স্মৃতি।

"বুঝিবে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা ;
পরিয়া বাকলবাস মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণশিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁষে
মালিনী বহিত পদতলে ;
দুচারি সখীতে মিলি কথা কয় হাসি-খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে। (মধ্যাহ্ন)

এইভাবে সেদিন মানুষের জীবন তরুলতাকে অবলম্বন করেই হ'ত অতিবাহিত। তখন আশ্রমের কুটিরাঙ্গণ হতে রাজপ্রাসাদের কুঞ্জবন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অনুষ্ঠিত হ'ত বৃক্ষবন্দনার উৎসব তথা বনমহোৎসব। সেদিনের গৃহলক্ষ্মী গৃহাঙ্গণের অশোক-তরুতল মার্জ্জনা করে আল্পনা দিয়ে আরম্ভ করতেন প্রতিটি প্রভাত। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে, বিল্বমূলে প্রণাম জানিয়ে শেষ করতেন প্রতিটি সন্ধ্যা। শকুন্তলার মত শত শত কুমারীর কন্যা-হৃদয়ের অসীম স্নেহে শোভন ও উন্নত হয়ে উঠত আলবালের তরুশিশুরা। রাজপ্রেয়সীর মুখের মদিরাতে পুষ্পিত হ'ত বকুলের শাখা, অলক্ত-রাঞ্জিত, নূপুরশিঞ্জিত পদাঘাতে মুঞ্জরিত হ'ত অশোক-পলাশের দল।

কালক্রমে এল নতুন যুগের নবীন জড়বাদী সভ্যতা। সভ্য-নাগরিক তার চিরদিনের সহযোগী তরুলতাকে নির্ম্মমভাবে নির্ব্বিচারে করল আক্রমণ।

বনদেবীর শ্মশানভূমিতে রচিত হ'ল নগরলক্ষ্মীর অশ্রুঘেরা শোকের তাজমহল। কল্যাণ-শীতল আশীর্বাদ নিয়ে, করুণা-বিগলিত স্নেহ নিয়ে যে শ্যামলী বনলক্ষ্মী মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলার জন্য এসেছিলেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে মানুষ নিয়ে এল অভিশাপের বিরাট এক পসরা। ভারতের উত্তরাংশ এক সময় ঋষি-মহর্ষি-অধ্যুষিত ছায়া-শীতল মহারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু, মানুষের গৃধ্নুতার জন্য আজ সেখানে মরুভূমি এগিয়ে আসছে তার সর্ব্বনাশা সাত্বিক রূপ নিয়ে, সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত করে দেশে দেশে এক সময় অরণ্যানী ধ্বংস করা হয়েছে। তার ফলে, এখন বালু উড়িয়ে ঝড় আসছে, শস্যক্ষেত্র হচ্ছে বিনষ্ট। বায়ুকে নির্ম্মল করার ভার যে তরুলতার ওপর, যার গলিত পত্রে মৃত্তিকা হয় উর্ব্বর, ভূমিক্ষয় রোধ করে যার শিকড়জাল, বিধাতার আশিস বৃষ্টিকে নিয়ে আসে যে অরণ্যানী, লোভী মানুষ তাকেই নির্ম্মূল করে ডেকে এনেছে নিজের মৃত্যুকে। যে অরণ্যের গভীর প্রশান্তিতে আরণ্যকের অমর শ্লোক রচিত হয়েছে, যে বনানীর কল্যাণ-স্নিগ্ধ ছায়াতলে তপোবনে তপোবনে জ্ঞানভিক্ষু বিদ্যার্থীর দল শত শত বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন অনলস অধ্যয়নে, নির্ব্বাসিত রাজকুমার রামচন্দ্র ও জন্মদুঃখিনী, রাজবধূ সীতাদেবীর জীবনের অশ্রুকরুণ কাহিনীর সাক্ষী ছিল যে চিত্রকূট, পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্য বিরহবিধুর যক্ষের বেদনাখিন্ন, ব্যথাদীর্ণ জীবনের সমব্যথী ছিল যে রামগিরি আশ্রম, রসিকশেখর কৃষ্ণকিশোর এবং কিশোরী রাধিকার লোকোত্তর লীলাবিলাসের আশ্রয় ছিল যে কালিন্দী-পুলিনের তমাল কুঞ্জরাজি, আজকের ভারত তাদের প্রসাদ হতে বঞ্চিত।

কবিগুরু দূরদৃষ্টিতে দেখেছিলেন সভ্যতার এই রিক্ত-মূর্তি। এই ছিন্নমস্তার গতিকে রোধ করার জন্য নতুন করে ব্রত নিলেন অরণ্যরচনার। আমাদের পিতামহেরা ধর্ম্মপালনের অঙ্গ হিসাবে বৃক্ষরোপণের বিধান দিয়েছিলেন মানুষকে।

"ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে" শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ১০২ অধ্যায়ে কল্যাণপ্রদ বৃক্ষের এক বিরাট তালিকা এবং প্রশস্তি দেখা যায়। "পদ্মপুরাণে"ও বৃক্ষরোপণের প্রশস্তিটি অপূর্ব্ব। ঋষি বলছেন—"অপুত্রকের পুত্রের কাজ এই বৃক্ষই করে থাকে। সহস্র পুত্রের কাজ সম্পাদনে একটি মাত্র বৃক্ষই সমর্থ। সকল প্রাণীর ভোগের জন্য ছায়াদানকারী পুষ্প এবং ফলপ্রসূ বৃক্ষ যিনি রোপণ করেন, তিনি জীবনান্তে লাভ করেন পরম বাঞ্ছিত গতি। তাই, শ্রেয়স্কামী ব্যক্তিরা বহু বৃক্ষ রোপণ করে পুত্রের মত তাদের পরিপালন করবেন। ধর্ম্মবিমুখ, স্বার্থবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষপুত্রদের চেয়েও নিঃস্বার্থপর তরুপুত্রেরা অনেক উৎকৃষ্ট। তারা পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বল্কল এবং কাষ্ঠ দান করে পরের উপকার সাধন করে। ফলে, এদের সুকৃতির জন্য পিতৃপুরুষের হয় সদ্গতি। মুনিদের মতই এরা হিংসাদ্বেষবিরহিত। কারণ, ছেদককেও এরা ফল, ফুল এবং ছায়াদানে বিরত হয় না। ধন-লোভে পিতাকে করে না হিংসা।"

"অপুত্রস্য চ পুত্রত্বং পাদপা ইহ কুর্ব্বতে।
যত্নেনাপি চ রাজেন্দ্র অশ্বত্থারোপণং কুরু।
স তে পুত্রসহস্রাণাং কার্য্যমেকঃ করিষ্যতি।
ধনী চাশ্বত্থবৃক্ষেণ অশোকঃ শোকনাশনঃ।
যঃ পুমান্ রোপয়েদ্ বৃক্ষান্ ছায়া পুষ্প ফলোপগান্।
সর্ব্বসত্ত্বোপভোগায় স যাতি পরমাং গতিম্।
তস্মাৎ সুবহবো বৃক্ষা রোপ্যাঃ শ্রেয়োভিবাঞ্ছিতা।
পুত্রবৎ পরিপাল্যাশ্চ তে পুত্রাঃ ধর্ম্মতঃস্মৃতাঃ।

কিং ধর্ম্মবিমুখৈর্মর্ত্ত্যৈঃ কেবলং স্বার্থহেতুভিঃ।
তরুপুত্রা বরং যেতু পরার্থৈকান্তবৃত্তয়ঃ।
পত্র-পুষ্প-ফল-ছায়া-মূল-বল্কল-দারুভিঃ।
পরেষামুপকুর্বন্তি তারয়ন্তি পিতামহান্।
ছেত্তারমপি সংপ্রাপ্তং ছায়াপুষ্প ফলাদিভিঃ।
পূজয়ন্ত্যেব তরবো মুনিবদ্দ্বেষবর্জ্জিতাঃ।
পিতরং নোপহিংসন্তি ক্রমা_ধনলোভতঃ।

তারয়ন্তি চ মে সম্যক সর্বপ্রাতিসাদায়কাঃ।
তস্মাত্তে পুত্রবৎ স্থাপ্যা বিধিবদ্দ্বিজপুঙ্গব।
(পদ্মপুরাণ-সৃষ্টিখণ্ড ২৬ অধ্যায়)

"বহ্নিপুরাণে"ও ঋষি বলছেন, এরা বড়ই উপকারী। ক্লান্ত পথিককে দান করে বিশ্রাম; বিহগকুলকে দান করে আবাসস্থান। আর মানুষকে দান করে পত্র, মূল, বল্কল ও ঔষধ।

"ছায়া-বিশ্রাম-পথিকৈঃ পক্ষিণাং নিলয়েন চ
পত্রমূলত্বগাদীংশ্চ ঔষধার্থন্তু দেহিনাম।
(বহ্নিপুরাণ)

"পদ্মপুরাণে" বৃক্ষরোপণরূপ ধর্মকর্মের বিরাট বিধান রয়েছে। সেই বিধি অনুসারে আনন্দিত চিত্তে যিনি বৃক্ষোৎসব করবেন, অনন্ত কালের জন্য তাঁর সকল বাঞ্ছাই হবে পূর্ণ। একটিমাত্র বৃক্ষ রোপণ করেই তিন শত ইন্দ্রের রাজত্বকাল পর্যন্ত স্বর্গবাসের অধিকার অর্জন করা চলে।

"অনেন বিধিনা যস্তু কুর্যাদ বৃক্ষোৎসবং মুদা।
সর্বান কামানবাপ্নোতু তৎ তদানন্ত্যমশ্নু তে॥
যশ্চৈকমপি রাজেন্দ্র বৃক্ষং সংস্থাপয়েদ বুধঃ।
সোপি স্বর্গে বসেদ রাজন যাবদিন্দ্রশতত্রয়ম॥
(পদ্মপুরাণ-সৃষ্টি-২৬ অ)

সুষ্ঠুভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপন করার মাঝেই রয়েছে সমাজের কল্যাণ। রবীন্দ্রনাথ ঋষিদেরই অনুসরণে জেনেছিলেন ভারত-ভূমির অন্তরলোকে লুকানো আছে শত সহস্র মানবের প্রাণরস। বিপুল খাদ্যশস্যের অনন্ত সঞ্চয়। মাটির বুক থেকে আহরণ করতে হবে সেই জীবনসুধা, শ্যামল করে তুলতে হবে এই অগণিত জনপদের অবহেলিত ভূমিকে শত সহস্র তরুলতায়। মন্ত্রে, ছন্দে সঙ্গীতে বন্দনা করে গ্রহণ করতে হবে এই শুভ ব্রত। আষাঢ়ের বারিবর্ষণে বাদলদিনের কাজলঘন আঁধারে রুক্ষ দগ্ধ মরু সভ্যতার উপর শ্যামলপ্রাণের বিজয়কেতন ওড়াতে হবে এই উৎসবের মাধ্যমে। তবেই অনাদৃতা বনলক্ষ্মী এতদিনের ধূলিশয্যা ছেড়ে উঠে আসবেন অমেয় দাক্ষিণ্যে অঞ্জলি পূর্ণ করে। অকৃপণ ভাবে ছড়িয়ে দেবেন তাঁর অজস্র আশীর্বাদ গ্রামে, জনপদে, নদীতীরে, শৈলমূলে। পুষ্পিত হবে কানন-কান্তার বিচিত্র কুসুমসম্ভারে, ফলভারে অবনত হবে তরুশাখা, বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা প্রান্তর মুখর হয়ে উঠবে নবজীবনের কলকল্লোলে। তবেই সার্থক হবে বনমহোৎসব এবং বৃক্ষবন্দনা লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণের বাসরে। তাই কবিকণ্ঠে তরুশিশুকে জানাই মাঙ্গলিক:

"প্রাণের পাথেয় তব পূর্ণ হোক, হে শিশু চিরায়ু
বিশ্বের প্রসাদ-স্পর্শে শক্তি দিক সুধাসিক্ত বায়ু।
হে বালক-বৃক্ষ, তব উজ্জ্বল কোমল কিশলয়
আলোক করিয়া পান ভাণ্ডারেতে করুক সঞ্চয়
প্রচ্ছন্ন প্রশান্ত তেজ। লয়ে তব কল্যাণ কামনা
বর্ষার বর্ষণ-যজ্ঞে তোমারে করিনু অভ্যর্থনা।"

ভ্রম-সংশোধন

গত আষাঢ় সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'মেঘদূতের গাছপালা' নামক প্রবন্ধের লেখক শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্তী।

শিবপুরীতে কয়েক দিন

শ্রীমাণিকলাল মুখোপাধ্যায়

১৯শে ফেব্রুয়ারী শিবপুরী যাত্রার উদ্দেশ্যে ষ্টেশনে এসে পৌঁছলাম। বোম্বাই মেল রাত্রি ন'টায়। আমাদের রিজার্ভ গাড়ীতে ছেলে-মেয়ে সমেত আমরা ছিলাম পনের জন। ট্রেন বর্দ্ধমান, আসানসোল, সীতারামপুর, ধানবাদ পার হয়ে এগিয়ে চলল। গতির বেগে মনে বেশ একটা পুলক-রোমাঞ্চ সৃষ্টি হয়েছিল, তার পর হঠাৎ কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম বলতে পারি না।

ঘুম ভাঙতেই চেয়ে দেখি—গয়া ষ্টেশন। এখানে ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের দ্বারা যে সেবামূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা খুবই প্রশংসনীয়। এখানে মেল অনেকক্ষণই দাঁড়াল। রাত্রি তখন আড়াইটা হবে।

ছত্রীর ভিতরের দৃশ্য
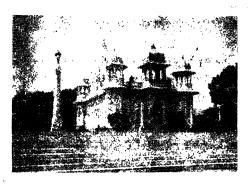
ভোরের দিকে শোণ নদীর উপর দিয়ে মেল চলতে লাগল। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নি। সকাল আটটা বাজবার পূর্ব্বেই মেল মোগলসরাই জংশনে এসে দাঁড়াল। বেলা দেড় ঘটিকার সময় মাণিকপুর ষ্টেশনে নেমে পড়লাম। এখানে জানতে পারলাম যে, আমরা আগামী কাল সকালে ঝান্সী পৌঁছব এবং সেখান থেকে বাষট্টি মাইল মোটরে অতিক্রম করে তবে শিবপুরীতে গিয়ে হাজির হব।

মাণিকপুর ষ্টেশনটি অত্যন্ত নোংরা, মাছি ভন্ ভন্ করছে দেখে গৃহিণীর নাসিকা কুঞ্চিত হ'ল। খাবারের কৌটা আর খোলা হ'ল না। মাণিকপুরে অস্বস্তিকর পরিবেশে আমাদের রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমাদের ট্রেন মাণিকপুর ছেড়ে বুন্দেলখণ্ডের ভেতর দিয়ে চলল। এই পথে চিত্রকূট তীর্থ এবং অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানও আছে। এই পথেই শুনলাম কুখ্যাত ডাকাত মানসিং ও পুৎলীর দলের উৎপীড়নে গ্রামবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

পর দিন প্রাতঃকালে চেয়ে দেখি আমরা মনোরম পার্ব্বত্য ভূমির মাঝখান দিয়ে চলেছি। আমরা যখন ঝান্সী এসে পৌঁছলাম, তখন সকাল সাড়ে আটটা হবে। শুনলাম ঝান্সীতে অনেক বাঙালীর বাস। বাঙালীর অনেক কীর্ত্তিও আছে এই স্থানে। এখানে আছে—কালীবাড়ী, স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি। শ্রীআর. সি. চ্যাটার্জ্জীর সহিত আলাপ হ'ল। তাঁর ভগিনী তুলিকা চ্যাটার্জ্জী মহিলা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। এই বাঙালী পরিবারটি সুদীর্ঘকাল যাবৎ বাংলার বাইরে প্রবাসী। উজ্জয়িনীর সন্নিকটে বরনগরে বাগানবাড়ী ও জমিজমা আছে এঁদের।

ছত্রীর বাহিরের দৃশ্য

ষ্টেশন থেকে টাঙ্গায় এক মাইল অতিক্রম করে আমাদের ঝান্সী শিবপুরী নামক স্থানে পৌঁছতে হ'ল—আমাদের গন্তব্য স্থান অন্ত শিবপুরী এখান থেকে বাষট্টি মাইল; এইখানেই মধ্যভারত রোড ওয়েজের আপিস। ভাগ্যক্রমে শ্রীজোয়ারদার মহাশয়ের সহিত আলাপ হ'ল। তিনি এই মোটর আপিসের স্থানীয় কর্ম্মকর্ত্তা। চমৎকার লোক। মধ্যভারত রোড ওয়েজ সরকারী কর্ম্মপ্রচেষ্টার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। মাদ্রাজ-ত্রিবাঙ্কুরে যানবাহন-ব্যবস্থা যেমনটি দেখেছি, এখানেও তদনুরূপ ব্যবস্থা লক্ষ্য করে আনন্দলাভ করলাম। নিয়ম ও নীতির ব্যতিক্রম নেই।

শিবপুরী পর্য্যন্ত মোটরভাড়া জনপ্রতি দুই টাকা। তিন থেকে দশ বৎসর বয়সের ছেলেমেয়েদের ভাড়া লাগল অর্দ্ধেক।

বাংলা দেশে কেন এরূপ করা হয় না বুঝি না। মোটর ছাড়ল বেলা এগারটায়। আমরা 'করেরা' এলাম বেলা প্রায় দুইটায়—এই রাস্তাটুকুর দূরত্ব বত্রিশ মাইল। নিকটেই একটি কেল্লার মত দেখলাম। কেল্লাটি অতি প্রাচীন বলে মনে হ'ল। তার পর আরও ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করে তিন দিনের দিন শিবপুরী পৌঁছলাম বিকালে পাঁচটায়—সূর্য্যদেব তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছেন।

ছত্রীর আর একটি দৃশ্য

শিবপুরী একটি ছোট শহর। মধ্যভারতের বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হ'ল এর পাথরের ঘরবাড়ী, বাজার ও রাস্তাঘাটে। শিবপুরী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০ ফুট উচুতে একটি পার্ব্বত্য উপত্যকার উপর অবস্থিত। স্বাধীনতার পূর্ব্বে এটি গোয়ালিয়র রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। শিবপুরী এক্ষণে মধ্যপ্রদেশেরই অংশ। এখানে উচ্চতম তাপমান —১০০° ডিগ্রীর বেশী হয় না এবং নিম্নতম তাপমান ৫০° ডিগ্রীর কম হয় না। এই জন্য এই স্থানকে সমশীতোষ্ণ বলা হয়। বৎসরে এখানে বাইশ ইঞ্চি বারিপাত হয়। জলহাওয়া এখানকার খুবই প্রীতিকর। কলিকাতা থেকে ঝান্সীর দূরত্ব ৭৬১ মাইল, মোটরে বাষট্টি মাইল আসতে হয়। কলিকাতা থেকে গোয়ালিয়র হয়েও শিবপুরী আসা যায়।

শিবপুরী শহর শিবপুরী জেলার সদর। এখানে সেক্রেটারিয়েট আছে। গোয়ালিয়র মহারাজার প্রাসাদ এর নিকটেই। মহারাজা তাঁর মাতার স্মরণে যে ছত্রী বা স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করেছেন তার শোভা অনুপম। শহর থেকে দুই মাইল দূরে এটি অবস্থিত। ছত্রীর নিকটে ভাদাইয়াকুণ্ড ঝরণা, বাণগঙ্গাকুণ্ড ও চাঁদফাটা দেখবার স্থান বটে। চাঁদফাটায় একটি ঝিলের মত আছে; বোট হাউসও আছে। ঝিলটি বিখ্যাত শিকারের জায়গা ভুয়া-খোতে পৌঁছেছে; এখানে শিকার-ঘর (Hunting Box) আছে। এক বৎসর পূর্ব্বে মার্শাল টিটো এখানেই শিকার করতে এসেছিলেন।

শিবপুরীর দুই মাইল উত্তরে মনসাপূরণ মহাবীরজীর মন্দির। সামনেই একটি খয়েরের কল রয়েছে। শুনলাম পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রোশনলাল নামক এক দরজি স্বপ্নে মহাবীরজীর মূর্ত্তির সন্ধান পেয়ে ভূগর্ভ থেকে উদ্ধার করে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন। এই পবিত্র স্থানে নাকি যে যা মানস করে তাই পূর্ণ হয়। স্থানটি নির্জ্জন, মন্দির-সংলগ্ন একটি অবৈতনিক পাঠশালাও আছে।

শিবপুরী শহরটি ছোট। রেল ষ্টেশনটি ন্যারো গেজ লাইনেই আছে। সম্মুখে গান্ধীপার্কের পাশে বালবিকাশ কেন্দ্রে ছেলেরা খেলা করে; নিকটেই বাজার, পোষ্ট-আপিস, স্কুল, থানা, হাসপাতাল ও সেক্রেটারিয়েট।

সর্দ্দার আংরের প্রেম-মন্দির

জৈন সাধু শ্রীবিজয় ধর্ম্মসূরী প্রতিষ্ঠিত শ্রীবীরতত্ত্বপ্রকাশ ইণ্টার-মিডিয়েট কলেজ ও স্কুলগৃহটি ভারি সুন্দর লাগল। আমি এর নিকটে শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই ছিলাম।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও যশস্বী শিক্ষাব্রতী। মধ্যভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দান অতুলনীয়। উজ্জয়িনীতে প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বমঙ্গলা পাঠশালা তাঁর প্রধান কীর্ত্তি। তদীয় ভ্রাতা স্বর্গীয় ডাক্তার পতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। প্রবাসে অনেকেই তাঁকে অকাতরে দীনের সেবা করতে দেখে বিস্মিত হয়েছে। গোয়ালিয়র শিক্ষা-সংসদের তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী। এঁরা গোবরডাঙ্গা-ইছাপুরের লোক। হরিদাস বাবু ১৯০৩ সালে প্রথমে জব্বলপুরে শিক্ষকতা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ইনি আমার আত্মীয় স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জামাতা। নগেনবাবু ইছাপুরের লোক। তিনি ১৮৮২ সনে জব্বলপুরে বার্ন কোম্পানির কার্য্যে নিযুক্ত হন। হরিদাস বাবুর বয়স বাহাত্তর বৎসর, কিন্তু এ বয়সেও তিনি শিক্ষকতাকার্য্যে সবিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিচ্ছেন। তিনি এখনও অবকাশ-সময়ে স্বহস্তে নিজ-বাগানের কাজ করেন, এতে নাকি তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করেন।

পূর্ব্বে মধ্যভারতে খাওয়াদাওয়ায় যথেষ্ট সুখ ছিল। গম টাকায় বিশ-বাইশ সের বিক্রি হয়েছে; ১৯৪০ সনেও ডাল টাকায় দশ-বার সের ছিল; দুধ টাকায় পনের-ষোল সের পাওয়া যেত। মাংস

এখনও এক টাকা চার আনা সের; এখানকার লোকে ঘরে ঘরে ছাগলপালে। মাছ বর্ষাকালে এক টাকা সের হয়। দুধ এখন ওয় টাকায় তিন সের দর। তবে গম এখন টাকায় আড়াই সের তিন সের হওয়ায় গরীবের কষ্ট বেড়েছে।

শিবপুরীতে দেব-দর্শন

শিবপুরী কৃষিপ্রধান জেলা। জেলাটি আগ্রা-বোম্বাই রোডের তেত্রিশ মাইল দক্ষিণে শিবপুরী থেকেই সুরু হয়েছে। জেলার ক্ষেত্রফল ৪০-৪১ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪,১৬,০৯২।

শিবপুরীর বনসম্পদের মধ্যে খয়েরগাছ প্রধান। খয়ের গাছ-গুলি যেন ফুলগাছের মতই দেখতে, তবে পাতা লঙ্কাপাতার মত। এখান থেকে ছয় মাইল দূরে বনবিভাগের জঙ্গল ভুয়া-ঘো ও টুণ্ডা ভরকার ঝরণা এবং গুহা দর্শনীয় স্থান। এখানে বাঘ থাকে। ভুয়া-ঘোতে একটি শিবমন্দির আছে, তার চারি পাশে খয়ের ও যুদ্বী জাতীয় জ্বালানি গাছের জঙ্গল। বনরক্ষক শ্রী এ. এস. চিতনবীস বললেন, ভুয়া-ঘো জেলার ন্যাশনাল পার্কের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। পার্কটির আয়তন উনসত্তর বর্গমাইল। এখানে বন্য শূকর, কাল হরিণ, নীল গাই, সম্বর হরিণ, চিতাবাঘ এবং ব্যাঘ্রও দেখতে পাওয়া যায়। কিরূপে পাহাড়ের গভীর খাদে বিরাট আম্রবৃক্ষ জন্মেছে দেখলে অবাক হতে হয়। পশু-সংরক্ষক শ্রীবিজয় সিং নিকটেই যাদবসাগরে থাকেন—অতি অমায়িক লোক।

টুণ্ডাভরকা যেতে হলে আগ্রা-বোম্বাই রোডে ভুয়া-ঘোর পথে চার মাইল গিয়ে বাম দিকে জঙ্গলের মধ্যে আরও দশ মাইল প্রবেশ করতে হয়। এটি দুর্গম ও ভীষণ স্থান।

ভুয়া-ঘোতে মহারাজা একটি ছোট বাংলো করেছেন। অনুমতি নিয়ে সাধারণে এটি ব্যবহার করতে পারে। চৈত্র মাসেও বেশ শীত পড়ে এখানে, তবে দুপুরে গরম থাকে তিন-চার ঘণ্টা। পাহাড়ে জায়গা, সেজন্য সাপখোপেরও ভয় আছে। শহরের বাইরে পথে বেড়াতে বেড়াতে চলমান ও নৃত্যপর ময়ূর দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

শহরে দু'টি সিনেমাগৃহ আছে, একটি ভাল ক্লাবও আছে।

এখানেই ছিল ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক দেশপ্রেমিক তাঁতিয়া তোপীর সমাধি। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে যে খেলার মাঠ আছে সেইখানেই ইংরেজ-শাসক তাঁতিয়া তোপীকে বটবৃক্ষে ফাঁসি দিয়েছিল এবং তাঁহার মৃতদেহও সমাহিত করেছিল

শিবপুরীতে সদলে

সেই স্থানেই। পরে গোয়ালিয়রের মহারাজা শ্রীমাধোরাও সেই সমাধি সরিয়ে নিয়ে নিজ প্রাসাদের পার্শ্বে রাস্তার ধারে স্থাপিত করেন। বর্তমানে সমাধিটি সেই স্থানেই আছে। নজরে পড়ল, সেখানে একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বেদীর উপর কয়েকটি ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে। এখনও কিন্তু কোন প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত হয় নি। শিবপুরীতে পি. ডব্লু. ডি'র কনট্রাক্টর শ্রীএস. পি. দত্ত ও শ্রীগৌরহরি সামন্তের সহিত আলাপ হ'ল। এঁরা অতি সজ্জন। এঁদের একটি আপিস ও বাসস্থান সাটীস্তূপের নিকট। তেজবাহাদুর সিং, ডাক্তার রাজেন্দ্র ধিংরা, ডাক্তার ডি. চৌধুরী ও এস. সেথী প্রভৃতি কয়েকজন অবাঙালীর সঙ্গেও বিশেষ হৃদ্যতা হ'ল।

মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত 'বালবিকাশ' কেন্দ্রটি চমৎকার। ব্যায়ামের সবকিছুই আছে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, আর একপার্শ্বে একটি দু'দিক খোলা হল-ঘর। তার দুই প্রান্তে দুইটি ছোট কামরা আছে। একটিতে ভারতের সাংস্কৃতিক মানচিত্র ও অন্যান্য অনেক-গুলি মানচিত্র দেওয়ালে টাঙানো আছে। প্রতিদিন বৈকালে ঘরটি খোলা হয়। একজন মহিলা-কর্ম্মীর তত্ত্বাবধানে ছেলেরা ব্যায়াম ও নানাপ্রকার খেলাধূলা করে। ছেলেদের দুগ্ধ বিতরণ করা হয়। শারীর-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়টি পুরানো গ্র্যাণ্ড হোটেলের স্থান দখল করেছে—অট্টালিকাটি সুন্দর। শিক্ষকেরা ন'মাসের কোর্স নিয়ে এখানে সমুদয় খেলাধূলা শিক্ষা করে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে ফিরে যান।

নিকটেই ডাক-বাংলো। তার পিছনে আছে জলমন্দির। মন্দিরটি একটি বিরাট কূপের উপর নির্ম্মিত। কূপের মধ্যভাগে মন্দিরটি একতলা, দোতলা করে নির্ম্মিত আর চার ধারে জল।

উপরে মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে পথ আছে তাও কূপের উপর নির্ম্মিত। এখানে শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার মূর্ত্তি ও শ্রীহনুমানজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের মধ্যে ধর্ম্মশালা আছে সাধুদের জন্য। শিবপুরীতে ধর্ম্মশালার সংখ্যা কম নয়। জলমন্দিরের পাশে একটি গঙ্গামন্দির রয়েছে

তাঁতিয়া তোপির সমাধিপার্শ্বে

দেখলাম। আগ্রা-বোম্বাই রোডে সব্জীবাজারের সম্মুখে একটি সুন্দর জৈনমন্দির নজরে পড়ে।

শিবপুরীর রাস্তাগুলি বেশ, তবে লাল ধুলায় ভর্ত্তি। বাজারটির একদিকে দুইটি তোরণের মত আছে। এক-একটি তোরণের মধ্য দিয়ে বাজারের পথ বার হয়ে শেষে আগ্রা-বোম্বাই রোডে গিয়ে মিশেছে। তোরণ দু'টির নিকটেই রেল ষ্টেশন।

শিবপুরী জেলায় অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান। নরওয়ার দুর্গটি দেখবার মত। শিবপুরী থেকে এর দূরত্ব ২৮ মাইল। পয়লা এপ্রিল থেকে এখানে মেলা বসে। বেলা সাড়ে দশটায় শিবপুরী থেকে নরওয়ার যাবার বাস পাওয়া যায়। রোজ একটি বাস বেলা ছটোয় শিবপুরীতে ফেরে। আর একটি বাস যায় বেলা সাড়ে তিনটায়। ট্রেনযোগেও নরওয়ার যাওয়া যায় সাতানবাড়া হয়ে। সাতানবাড়া শিবপুরী থেকে দশ মাইল, রেলভাড়া সাড়ে আট আনা মাত্র।

শিবপুরী থেকে দেড় মাইল দূরে সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরে যে গৌরীশঙ্কর ও বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, তা অতি চমৎকার। মূর্ত্তি দুটি নাকি নরওয়ারের নিকট পাওয়া গিয়েছিল।

নরওয়ার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, পৌরাণিক যুগে এখানে মহারাজ নলের রাজ্য ছিল। ইদানীং এটি জঙ্গলাকীর্ণ একটি বিরাট কেল্লা। সমস্তটা ঘুরলে সতের মাইল প্রদক্ষিণ করা হয়। কেল্লার মধ্যে মন্দির আছে, বড় বড় পুকুর আছে, সুড়ঙ্গপথ আছে, আর আছে বিরাট বিরাট পাথরের অট্টালিকা। শুনলাম কেল্লাটি সুরক্ষিত নয়। এটি এখন হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। শিকারীরা এখানে শিকার করতে আসেন। এই দুর্গটির যথাযথ সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মনোযোগী হওয়া উচিত।

একদিন শিবপুরীর হাটে গিয়ে দেখি অনেকগুলি গরুর গাড়ীতে করে মাল আসবার সঙ্গে সঙ্গেই নিলামে বিক্রয় হচ্ছে। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির আয় বাংলা দেশের যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি অপেক্ষা অধিক। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি বহিরাগত বিক্রেয় দ্রব্যের উপর শুল্ক বসায়। এই শুল্কের হার শতকরা বারো আনা। এটি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিরই প্রাপ্য। এইরূপে লব্ধ অর্থে শহরের অনেক উন্নতিবিধান সম্ভবপর হয়। বাংলা দেশে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে গঠনমূলক কার্য্যের সুবিধা হবে।

একদিন পোষ্ট আপিসে রসিদ-টিকিট (Revenue Stamp) কিনতে গিয়ে দেখি তা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। এতে অশোক-স্তম্ভের ছবির নীচে লেখা আছে 'মধ্যভারত'। শুনলাম এই অর্থ মধ্যভারতের প্রাপ্য। বাংলা দেশে এই অর্থ বাংলার খাতে জমা পড়লে দুর্গত বাংলায় পুনর্গঠনের অনেক সুবিধা হতে পারে। এ বিষয়ে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সমীচীন।

শিবপুরী থেকে গোয়ালিয়র পর্য্যন্ত যে ন্যারো-গেজ রেল আছে তার প্রকৃত দূরত্ব ৭৫ মাইল; কিন্তু রেলভাড়ার বেলায় কেন ১১৩ মাইল (inflated) ধরা হয় বুঝতে পারা গেল না। স্বাধীন ভারতে এইরূপ বৈষম্য থাকা উচিত কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। ৬ই এপ্রিল শ্রীতেজবাহাদুর সিংহের সৌজন্যে গেলাম টুণ্ডা-ভরকা জলপ্রপাত দেখতে। স্থানটি অতি মনোরম। নির্ঝরিণীর কলতানে প্রকৃতির এই নিভৃত নিকেতনটি প্রতিনিয়ত মুখরিত। এখানে খানিকক্ষণ বসলে এক গভীর প্রশান্তিতে মন ভরে ওঠে আর লোকালয়ে ফিরতে ভালো লাগে না। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও না ফিরে উপায় নেই। আমাদের এর পরবর্ত্তী গন্তব্যস্থল গোয়ালিয়র—আস্তানায় ফিরে গিয়ে তারই তোড়জোড় করতে হবে।

মুক্তি

শ্রীপরেশ ভট্টাচার্য্য

রাত শেষ হয়ে এল। বন্ধ জানালা দরজার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে বাইরের পৃথিবীর আলো। রাতজাগার অবসাদ অমিয়র দেহে—মনে এখনও দুঃসহ চিন্তার রেশ। অমিয় ভাবে—ভোর হয়েছে, হোক্, সূর্য্য আলো দিচ্ছে, দিক্। যে জীবনে অন্ধকার সত্যি, সে জীবনে আলোর দাম কি?

অমিয় শুয়ে আছে পাশবালিশ বুকে আঁকড়ে। তুলোর বালিশেও আরাম নেই, ইস্পাতের দেহে তুলোর স্পর্শ। ওপাশে মল্লিকা আর খোকন ঘুমোচ্ছে—মা ও ছেলে। অমিয়র মনে এখনও এলোমেলো চিন্তার জটলা। চেষ্টা করেও চিন্তার রাজ্য থেকে মনকে সরিয়ে নিতে পারে না।

মহানগরী কলকাতার নগণ্য গলির জীর্ণ বাড়ীর নীচের তলায় স্যাঁৎসেঁতে ঘরে শুয়ে আছে অমিয়। কানে আসছে বাইরের টুকরো কলরব। কলঘরে জল পড়ছে—হয়ত কাপড় কাচছে পাশের ঘরের বৌ-ঝিরা। ঐ ত শব্দ হচ্ছে বাসনকোসন মাজার, বালতিতে জল ভরার। বাড়ীতে পাঁচ ঘর ভাড়াটে, কিন্তু কল ঐ একটি। জল নিয়ে কাড়াকাড়ি হয়। সামান্য কথাকাটাকাটি বা মনকষাকষি হওয়াও নূতন কিছু নয়। ওপরের বারান্দায় পায়চারি করছেন সতীশবাবু। খড়ম পায়ে দিয়ে পায়চারি করা ওঁর প্রতিটি ভোরের অভ্যাস। ভদ্রলোক এই বাড়ীতে ভাড়াটে হয়ে আছেন তিরিশ বছর।

হাল্কা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল অমিয়। মল্লিকার টুকিটাকি কাজ সারা হয়ে গেছে। জল তোলা বাসন মাজা উনানে আঁচ দেওয়া সবকিছুই। এবারে চায়ের জল গরম করবে। অমিয় ঘুমোচ্ছে—ঘুমাক। মল্লিকা জানে, সারারাত প্রায় জেগে থাকে অমিয়। মল্লিকার যখনই ঘুম ভাঙে, দেখে অমিয় ঘুমোয় নি। জিজ্ঞেস করলে, বলে—এই মাত্তর ঘুম ভাঙল। ঘুমন্ত অমিয়র দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে, মল্লিকা। কত আশা ছিল ঐ জীবনে। সুখী সুস্থ জীবন, শান্ত দিন আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। কোথায় সে স্বপ্নে-দেখা জীবন, কোথায় সে আশা-আকাঙ্ক্ষার দিন।—আজ আর স্বপ্ন নেই, আশাকুসুমের পাপড়িগুলিও ঝরে গেছে ঝড়ো হাওয়ায়।

ঘুম ভাঙে অমিয়র। অবসাদজনিত হাই তুলে বলে—খোকন কোথায়?

—পাশের ঘরে পটলার সঙ্গে খেলছে। মল্লিকা বলে—যাও, মুখ হাত ধুয়ে এস, চায়ের জল চাপাচ্ছি।

অমিয় বলে—ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া এ আর কতদিন চলবে মল্লিকা?

সাধারণতঃ 'মলি' বলেই ডাকে অমিয়। তবে মনমেজাজ খারাপ থাকলে ডাকে পুরা নাম ধরে।

মল্লিকা বলে—অত ভাব কেন। দুনিয়া যখন চলছে তখন সবই চলবে।

অমিয় মৃদু হাসে। বলে—দুনিয়া ঠিকই চলবে মলি। লাখ লাখ কোটি কোটি বছর এই দুনিয়া চলে এসেছে, চলবে আরও কোটি কোটি বছর। কিন্তু আমরা চলতি-পথে আচমকা থেমে যাব। রক্তমাংসে গড়া মানুষের জীবনের বিপদ ত ঐখানেই।

মল্লিকা আর কথা বাড়াতে চায় না। বলে—যাও মুখ ধুয়ে এস।

চা পানান্তে অমিয়কে জামাকাপড় পরতে দেখে মল্লিকা জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবে এখন?

অমিয় বলে—নূতন কাজের সন্ধান পেয়েছি, তাই যাচ্ছি।

মল্লিকা বলে—কিন্তু ঐ ময়লা জামা-কাপড়ে কেমন করে যাবে ভদ্রলোকের বাড়ী।

অমিয়র মুখে শুক্‌নো হাসি ফোটে। বলে—তবে আজ আর যাওয়া হয় না। আমাদের জীবনটাই আবর্জ্জনার মত। ধোপ-দুরস্ত পোশাক আমাদের দেহে বেমানান। যাক চলি মল্লিকা। কাজ জুটিয়ে নিই, তার পর সাজ-পোশাকের দিকে নজর দিলে হবে।

সস্তা দামের চটিজোড়া পায়ে দিয়ে অমিয় বেরিয়ে গেল। মল্লিকা খানিকক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে চলে এল রান্নাঘরে। গন্‌গন্ করে জ্বলছে কয়লার আঁচ। লাল হয়ে উঠেছে কালো কয়লা। কয়লায় এই রূপান্তর আগুনের স্পর্শে, কিন্তু মানুষের রূপান্তর? সে কিসের স্পর্শে। জীবনের কালো কি মুছে যাবে না জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শে?

মল্লিকার চোখ দুটি দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। আজ জীবনকে নূতন করে চিনবার সময় এসেছে বিপর্য্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে। হয়ত শেষ হয়ে যাবে এ জীবন। পাদপ্রদীপের আলোয় আর আবির্ভাব ঘটবে না, তবু মন রেখে যেতে চায় যবনিকার আড়ালে জ্বলন্ত জীবনের স্বাক্ষর।

দুপুরের রোদ মাথায় নিয়ে বাসায় ফিরল অমিয়। এই শীতের দিনেও ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। জামার পিঠের দিকটা ভিজে গেছে। থিয়েটার রোড থেকে মাণিকতলা মাইল-চারেক পথ। এই পথ হেঁটে এসেছে ও।

অমিয়র খাওয়ার সময় মল্লিকা সামনে বসে থাকে। আজও বসে রইল।

অমিয় হতাশার সুরে বলে—কিছুই হ'ল না মলি, শুধু পথ হাঁটা সার।

মল্লিকা বলে—ওসব কথা এখন থাক।

অমিয় বলে—কথায় কি আসে যায়;—ওকি তোমার চোখে জল কেন? মল্লিকা আঁচলে চোখ মুছল।

অমিয় আবার বলে—কেঁদে কি করবে? জীবন যখন মরু-সাহারার মত, তখন চোখের জলে সেখানে কি মরুদ্যান সৃষ্টি হবে?

কবিত্ব করে কথা বলার সখ অমিয়র চিরদিনের। আর নিতান্ত অকবিও সে নয়। ছাত্র জীবনে কবিতা লিখেছে অনেক।

মল্লিকা বলে—কৈ, খাচ্ছ না যে?

—এই ত বেশ খাচ্ছি, তোমার খাওয়া হয়েছে। মল্লিকা মাথা নাড়তে অমিয় মৃদু ধমকের সুরে বলে—এই বেলা অবধি না খেয়ে থেকে কি লাভ?

মল্লিকা বলে—লাভ-লোকসান হিসেব করে চলতে জানি না।

খাওয়াদাওয়ার পর অমিয় শুয়ে পড়ল চাদরমুড়ি দিয়ে। মল্লিকা এক সময় পোষ্টকার্ডের চিঠি এনে দিল স্বামীর হাতে। দেশ থেকে মা লিখেছেন, সংসারের অবস্থার কথা জানিয়ে। জমি-জমা আর বাবার সামান্য আয়ে সংসার চলে না। ক'মাস অমিয় টাকা দেওয়া বন্ধ করাতে যারপরনাই অসুবিধা হয়েছে। অমিয় চিঠিখানি পড়ে বলে—কত আশা ছিল মা-বাবার মনে। ছোট ভাইবোনেরাও আমার মুখ চেয়ে থাকত।

মল্লিকা কোন কথা বলে না। সে ত জানে স্বামীর বেদনা কতখানি। শুধু কল্পনা আর আশা। অমিয় ভাবে—সে একা নয়। তার মত কত আশাহত মানুষ আছে এই দেশে। যারা অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের বেড়াজালে জড়িয়ে মুক্তির প্রহর গণনা করছে।

আর মল্লিকা। দীর্ঘ পাঁচ বছর আগেকার কথা ভাবছে বসে বসে। সেই আনন্দমুখর দিনের স্মৃতি আজকের দিনগুলোকে বেদনাকরুণ করে তোলে। সেদিন তরুণী মল্লিকার চোখের কোণে ছিল কল্পনার কাজলরেখা, মনে ছিল উচ্ছসিত প্রাণের বন্যা। কলেজের ছাত্র অমিয় দত্তর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয় হ'ল, সারা জীবনের বাঁধনের প্রথম গিঁট। অমিয় দেহমন দিয়ে চাইল মল্লিকা বোসকে। আর মল্লিকাও জীবনের সবকিছু দিল অমিয়কে। মিলিত হ'ল ওরা দু'জন।

অমিয়র বাবা সুশীল দত্ত শিক্ষকতা করতেন দেশের স্কুলে। যা মাইনে পেতেন তাতে সংসার চালিয়েও অমিয়কে পড়াশুনার জন্যে কিছু কিছু দিতেন—যদিও ক'লকাতায় থেকে কলেজে পড়ার বেশীর ভাগ ব্যয় অমিয় নিজেই বহন করত সকাল-সন্ধ্যে টিউশনি করে। অমিয় তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে—অবসর নিলেন সুশীল দত্ত। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাও ঘরে উঠল না প্রায় কিছুই। বেশী অংশটাই খরচ হয়ে গেছে দুটি মেয়ের বিয়েতে। বি-এ পরীক্ষা দেওয়া হ'ল না অমিয়র, কলেজের পথ ছেড়ে ধরতে হ'ল সওদাগরী আপিসের পথ। একশ' বাইশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি জুটিয়ে নিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। এরই মধ্যে এক সময় অমিয় বাবাকে জানায় মল্লিকার কথা। মল্লিকাকে বিয়ে করবে সে। বাবার সমর্থন পেল না অমিয়। তবু বিয়ে হ'ল। মল্লিকাকে ঘরের ঘরণী করে বাসাবাড়ীতে নিয়ে এল অমিয়। জীবনের এই শুভলগ্নে মা-বাবা আশীর্ব্বাদ করলেন না। অমিয় আজও ভাবে, মল্লিকাকে বিয়ে করে সে ত অন্যায় করে নি, তবু কেন মা-বাবা সমর্থন করলেন না এ বিয়ে।

অমিয় ভেবেছিল মল্লিকাকে নিয়ে যাবে বাড়ীতে মা-বাবার কাছে। মনের ভাবনা মনেই রইল। শহর ক'লকাতার অন্ধকার গলির জীর্ণ বাড়ীর নীচের তলার বদ্ধ ঘর থেকে যাওয়া আর হয়ে উঠল না। যাই হোক, অমিয় মা-বাবার ওপর কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয় নি। ক'লকাতার খরচ কোন রকমে চালিয়ে বাড়ীতে প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়েছে অমিয়। গেল বছর কালীঘাটের কালীদর্শনের অজুহাতে কলকাতায় এসে মা গোপনে আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছিলেন ছেলে, ছেলের বৌ আর দু'বছরের খোকনকে। দিন একরকম চলছিল। আচমকা এমনধারা হবে এ কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিল অমিয়। বিনা নোটিশে আপিস থেকে ছাঁটাই করা হ'ল অমিয়কে। আজ ছ'মাস হ'ল অমিয় বেকার হয়েছে। এর মধ্যে এখানে-ওখানে কত চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন ফল ফলে নি।

ক'মাস চলেছে মল্লিকার গয়না বিক্রী করে। তাও শেষ হয়ে এল। মল্লিকা সেদিন সন্ধ্যায় জানালার ধারে বসে ভাবছিল, কি করে চলবে সংসার।

অমিয় বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় সময় বাসায় ফিরে মল্লিকাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে বলে—কি ভাবছ মলি?

মল্লিকা একটু ইতস্ততঃ করে বলে—ম্যাট্রিক পাস করে টাইপ শিখেছিলাম তাই ভাবছি—।

অমিয় বলে—তুমি শেষটা চাকরি করবে মল্লিকা?

—দোষ কি।

—তুমি মেয়েছেলে, তোমার গুণও আছে—হয়ত সহজেই চাকরি পাবে।—মল্লিকা খুশী হ'ল না স্বামীর কথায়।

অমিয় বলে—একালের মেয়ে তুমি। পুরুষের সঙ্গে দায়িত্বের বোঝা ভাগ করে নেবে এ আর নতুন কথা কি?

দিন যায়। এক-একটা দিন যেন এক-একটা যুগ। অমিয়র দিন কাটে চাকরির উমেদারী করতে। শুধু ঘোরাঘুরি সার। মল্লিকাও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখে আবেদন-পত্র পাঠিয়েছে কয়েক জায়গায়। আজ পর্য্যন্ত কোনটার জবাব আসে নি।

এই ক'মাসে অমিয় যেন বুড়ো হয়ে গেছে। শীর্ণ চেহারা চোখ কোটরে-ঢোকা, চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। সেদিন দাড়ি কামাতে গিয়ে দেখেছে কানের পাশে কয়েকটা পাকা চুল। মাথার সব চুল যে পেকে ওঠে নি, এইটাই আশ্চর্য্য। ঘরভাড়া

বাকী দু'মাসের, এ মাসে টাকা না দিলে গোয়ালা দুধ দেবে না। অথচ খোকনের জন্যে দুধ একটু চাই। মুদির দোকানে দশ-পনের টাকা ধার। অমিয় গালে হাত দিয়ে বসে আছে বেতের মোড়ায়। মল্লিকা ছেঁড়া জামা রিফু করছে। খোকন বোধ হয় পাশের ঘরে পটলার সঙ্গে খেলছে।

মল্লিকা বলে—চল এখান থেকে চলে যাই।

—কোথায় যাবে ?

মল্লিকা বলে—কেন বাড়ীতে মা-বাবার কাছে।

অমিয় গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলে—সেখানে তোমার স্থান নেই মল্লিকা।

মল্লিকা আশার সুরে বলে—নিশ্চয় আছে। তাঁরা কখনো দূরে ঠেলবেন না আমাকে।

অমিয় কয়েক দিনের পুরনো একখানি পোষ্টকার্ডের চিঠি বার করে দেয় মল্লিকার হাতে। বলে—পড়, বুঝবে।

চিঠিখানি পড়ে মল্লিকা ভাবল—মানুষ সময় সময় কত নির্মম হতে পারে, ছেলেকে লেখা বাবার চিঠিখানি তার উদাহরণ।

অমিয় চিঠি লিখে বাবাকে এখানকার অবস্থার কথা জানিয়েছিল। আরো লিখেছিল, সে কলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়ীতে যেতে চায়। তার কথা সরাসরি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি বাবা। লিখেছেন—'তুমি বাড়ীতে এস আপত্তি নেই, কিন্তু তোমার স্ত্রীর স্থান এ ভিটেয় হবে না।'

অমিয় জিজ্ঞেস করে—কি চুপ করে রইলে যে ?

—তবু আমি যাব। মল্লিকা জিদ ধরে—বল নিয়ে যাবে আমাকে ?

—না, সে হয় না মলি। অমিয় উঠে দাঁড়ায়। বলে—দাও, জামাটা দাও একটু বেড়িয়ে আসি।

রিফুকরা পাঞ্জাবীটা মল্লিকা একরকম ছুড়েই দেয়। অমিয় বেরিয়ে যায় চটিজোড়া পায়ে দিয়ে। মল্লিকা দুপুরে ঘুমোয় না, যা হোক কিছু কাজ নিয়ে বসে। আজ বসল চালের কাঁকর বাছতে। এল ডাক-পিয়ন। রেজেষ্ট্রি চিঠি এসেছে মল্লিকার নামে। সই দিয়ে পিয়নের কাছ থেকে চিঠিখানি নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। মল্লিকার সারা দেহে বিদ্যুৎ-শিহরণ জাগে, ইণ্টারভিউ এসেছে চাকরির। আগামী সোমবারে বেলা বারোটায় ওকে যেতে হবে লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের আপিসে।

অন্তদিন সন্ধ্যার আগেই বাসায় ফেরে অমিয়। কোন কোনদিন যে একটু দেরি না হয় এমন নয়। আজ রাত দশটা বেজে গেল, এখনো আসে নি অমিয়। খোকনকে ঘুম পাড়িয়ে মল্লিকা বসে আছে চুপচাপ। সাড়ে দশটায় এল অমিয়। অমিয়কে দেখে শিউরে ওঠে মল্লিকা। অমিয়র মাথার চুল অবিন্যস্ত, চোখ টকটকে লাল, মুখের ওপর কালো ছায়া। আকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে তোমার ?

—কিছু না, জর। এতক্ষণ শুয়ে ছিলাম এক বন্ধুর মেসে।—বলে অমিয় সটান শুয়ে পড়ে বিছানায়। মল্লিকা হাত দেয় স্বামীর কপালে—ইস, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। বলে—মাথাটা একটু টিপে দেব ?

—না, দরকার নেই। এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দাও মলি।

ক'দিন ধরে ইণ্টারভিউর কথা বলি বলি করেও বলতে পারে নি মল্লিকা। এই তিন দিনে অমিয় কিছুটা সুস্থ হয়েছে, জর হয় নি। শেষে রবিবার রাত্রে মল্লিকা প্রকাশ করল ক'দিনের গোপন কথাটি।

অমিয় বলে—বেশ ত।

এই ছোট জবাবে মল্লিকা খুশী হ'ল না। বলে—তুমি যদি বারণ কর তবে আমি যাব না।

—না না। বারণ করব কেন ? অমিয় বলে—বেকার হয়েছি বলে কি বিবেকবুদ্ধি হারিয়েছি।

সোমবার অপরাহ্ণবেলা। মল্লিকা বাসায় এল আনন্দ-সংবাদ নিয়ে। চাকরি হয়েছে ওর। আসছে বুধবার থেকে কাজে বসতে হবে। মাইনে আর মাগগিভাতা মিলিয়ে মাসে একশো পঁচিশ—তাতে চলে যাবে কলকাতার এই ছোট সংসার। আগের মত দেশের বাড়ীতেও টাকা পাঠানো যাবে।

মল্লিকা কাজে যোগ দিয়েছে। খোকনের জন্যে একজন প্রৌঢ়াকে নিযুক্ত করেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে-ই খোকনকে দেখাশুনা করবে। প্রথম ক'দিন কান্নাকাটি করেছিল, আজকাল খোকন ভাব জমিয়ে ফেলেছে কুসুমপিসীর সঙ্গে। অমিয় আগের চেয়ে নিশ্চিন্ত মনে কাজের সন্ধান করতে পারছে। কত আবেদন-নিবেদন, কত তোষামোদ, তবু কিছুতেই কিছু হয় না।

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে মল্লিকা স্বামীর জন্যে জামাকাপড় নিয়ে এল। সঙ্গে একজোড়া দামী স্লিপার। বাড়ীতে কুড়ি টাকা পাঠিয়েছে অমিয়র নামে।

অমিয় বলে—কাজটা কি ভাল হ'ল ? বাবা যদি জানতে পারেন ও টাকা তোমার।

মল্লিকা বলে—জানবেন কি করে। আর আমি ত তাঁদের পর নই।

আরও কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। সংসারের চাহিদা মিটেছে। তবু অমিয়-মল্লিকা কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কাজ না জুটলেও সকাল-সন্ধ্যা টিউশনি করছে অমিয়।

অমিয় ভাবে—মল্লিকার প্রাণবন্যায় ভাটা পড়ল কেন। মল্লিকা আর সে মল্লিকা নেই। প্রাণ খুলে হাসে না, কথা বলে না।

মল্লিকা ভাবে—স্বামীর মুখে কি স্বচ্ছ হাসি ফুটবে না। দিন-রাতের মধ্যে কি একবারও 'মলি' বলে ডাকবে না!

এ চিন্তা ওদের মনের। এ জিজ্ঞাসা ওদের অন্তরের।

একদিন কথায় কথায় অমিয় বলে—তোমার আমার মধ্যে এক অজানা ফাকি রয়ে যাচ্ছে মল্লিকা।

মল্লিকা বলে—কেন ? তুমি কি জান না তার কারণ। আমি ত চাই নি তোমায় ফাকি দিতে।

অমিয় বলে—আমাদের মত মানুষের গোটা জীবনটাই ফাকি।…

সেদিন আপিস-ফেরত মল্লিকা কিনে এনেছে একগোছা রজনীগন্ধা। এনেছে অমিয়র জন্তে। অমিয় ফুলের গোছা সানন্দে গ্রহণ করে বুকে চেপে ধরে। কি সুন্দর এই ফুলগুলি! কি মিষ্টি এর গন্ধ! পরক্ষণে মনে হয়—এ রজনীগন্ধা ওর হাতে বেমানান। তাই ছুড়ে ফেলে দেয় ফুলের গোছা।

মল্লিকা বিস্মিত হয়। বলে—ফেলে দিলে কেন?

অমিয় কিছু সময় নীরব থেকে, অনুশোচনার সুর টেনে বলে—রাগ করো না মলি। আজকাল আমার বুদ্ধির স্রোতে ভাটা পড়েছে। তুমি আমার জীবনসঙ্গিনী, এনেছ উপহার, কোথায় তা আমি মাথা পেতে নেব তা নয় ছুড়ে ফেললাম। তুমি আমায় ক্ষমা কর মলি।

মল্লিকার চোখে জল ঝরে। আর্দ্র কণ্ঠে বলে—তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাইছ কেন? অপরাধ করেছি আমি।

রাত্রি দুঃসহ হয়ে ওঠে মল্লিকার কাছে। অমিয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আর মল্লিকা এত সময় বিছানায় এপাশ ওপাশ করে উঠে এসেছে বারান্দায়। মহানগরীর আকাশে চাঁদ উঠেছে; ঐ চাঁদ দেখতে আগে কত ভাল লাগত ওর। কিন্তু আজ ঐ চাঁদের আলো চোখে জ্বালা ধরায়। শীতের রাত্রি, তবু ঘেমে উঠেছে মল্লিকা। আকাশের পটভূমিকায় নক্ষত্র জ্বলছে। যেমন আপিসের সহকারী ম্যানেজার সুপ্রকাশ দত্তের দুটি চোখ লালসার আগুনে জ্বলে। দত্ত কি চায়, এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা দিয়ে মল্লিকা তা বুঝতে পেরেছে। মুখে না বললেও, আকারে ইঙ্গিতে যা বলতে চেয়েছে তা বুঝতে পেরে আতকে উঠেছে মল্লিকা। ছিঃ ছিঃ, মানুষের দেহে এরা পশু। মল্লিকা ফিরে আসে ঘরে। বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে অশান্ত আবেগে জড়িয়ে ধরে অমিয়কে।

অমিয়র ঘুম ভেঙে যায়। বলে—কি হ'ল মলি। অমন করছ কেন?

মল্লিকা ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। অমিয় খুঁজে পায় না এ কান্নার অর্থ। এখনও কি ফুল ফেলে দেওয়ার জের চলছে? জিজ্ঞেস করে—কাঁদছ কেন?

মল্লিকা কথা বলে না, শুধু গুমরে কেঁদে ওঠে মাত্র। অমিয় উঠে বসে বিছানায়। অজস্র চুম্বনে রাঙিয়ে তোলে মল্লিকার বেদনাবিহ্বল মুখ। তার পর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মল্লিকাকে। মল্লিকাও সবকিছু ভুলে যায়। অমিয়র আলিঙ্গনে যে এখনও তেমনি আনন্দ, তেমনি তৃপ্তি।

রাতশেষে আবার আসে আলোঝরা দিন। নিয়মের রাজত্বে এর এতটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই। হাসিকান্না, সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনায় পৃথিবীতে একই প্রথায় চলেছে দিনরাত্রির উদ্বোধন আর সমাপন।

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে। আসছে ফাল্গুনের বাইশ তারিখে ছোট বোন সবিতার বিয়ে। অন্ততঃ শ' দুই টাকা চাই অমিয়র কাছ থেকে। অমিয় ভেবে কূলকিনারা পায় না। বাবাকে চিঠির জবাবে কি জানাবে? চাকরি নেই, বর্তমানে মল্লিকার চাকরি ভরসা—এই সব, না আর কিছু?

আপিস থেকে ফিরে মল্লিকা দেখল একখানি চিঠি নিয়ে অমিয় চিন্তিত মনে বসে আছে। জিজ্ঞেস করে—কার চিঠি? অমিয় চিঠির কথা সংক্ষেপে জানাতে মল্লিকা বলে—বেশ ত, সবিতা সুপাত্রে পড়ছে।

অমিয় বলে—কিন্তু টাকা না হলে এ বিয়ে হবে না।

মল্লিকা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করেই বলে—টাকা আমি দেব।

অমিয় বিস্মিত হয়ে বলে—এত টাকা কোথায় পাবে।

মল্লিকা আশ্বাস দিয়ে বলে—কিছু ভেবো না, আমি ঠিক যোগাড় করব।...

মাঘ মাস শেষ হ'ল। বসন্তের বার্তা নিয়ে এল ফাল্গুন। মহানগরী কলিকাতা, এর পিচঢালা পথে, প্রাসাদে, কলকারখানায়—কি বসন্ত, কি বা শরৎ! তবু ওরই মধ্যে ফুটপাথের উপরকার শীর্ণ গাছগুলি, নতুন পত্রপল্লবে ভরে ওঠে।

মল্লিকা ফুটপাথ ধরে দ্রুত হাঁটছিল। এ পথে যাতায়াত তেমন নেই, তাই বোধ হয় মন্দ লাগছে না হাঁটতে। সূর্য্য ডুবে গেছে প্রাসাদনগরীর আড়ালে, দক্ষিণে বাতাসে সামান্য শীতের আমেজ। মল্লিকার গা সিরসির করছে। স্কার্ফটা নিয়ে বেরুনোই উচিত ছিল।

দিলখুশা ষ্ট্রীটে নিরুপমার বাসা। একই আপিসে চাকরি করে নিরুপমা সেন। বেশ মেয়েটি। হাসিখুশী স্বভাব, মধুর আলাপ আচরণ। দু'শ টাকা ধার দেবে বলেছে। মল্লিকার বিশ্বাস, নিরুপমা টাকা নিশ্চয়ই দেবে। আর টাকার ব্যবস্থা করবে বলেই ত সকাল সকাল আপিস থেকে বেরিয়েছে।

নিরুপমা অপেক্ষা করছিল মল্লিকার জন্তে। মল্লিকাকে পেয়ে নিরুপমা যারপরনাই খুশী। নিজের হাতে চা করে খাওয়াল, শুধু চা নয়, ডিমের মামলেট পর্য্যন্ত। তার পর একথা ওকথার শেষে নিরুপমা টেবিলের ড্রয়ার থেকে বার করল দুখানা এক শ' টাকার নোট। টাকা হাতে নিয়ে মল্লিকা আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে ধন্যবাদ জানাল।

নিরুপমা বলে—ধন্যবাদটা আমার পাওনা নয়।

—মানে! টাকা দিলে তুমি, আর ধন্যবাদ দেব কাকে?

—না, মানে বলছি—এ আর এমনকি যে ধন্যবাদ দেবে।

আচমকা ঘরে ঢোকেন আপিসের সহকারী ম্যানেজার সুপ্রকাশ দত্ত। ঠোঁটের ডগায় জ্বলন্ত সিগারেট। মল্লিকার মাথা ঘুরে যায়, একবার হাতে-ধরা নোট দুখানি আর সুপ্রকাশ দত্তর মুখের দিকে চায়।

জ্বলন্ত সিগারেট মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে সুপ্রকাশ দত্ত বলেন—দেখলেন ত মিসেস সান্যাল, আমি নিরুপমার কোন অভাবই রাখি নি। যাক্, টাকা পেয়েছেন ত?

টাকা। মল্লিকা উঠে দাঁড়ায়। ওর সারা দেহ কাঁপছে। নিরুপমা বসে ছিল, তার বুকের ওপর ছুড়ে দেয় দুখানি নোট। দৃপ্ত স্বরে বলে—ঐ নাও টাকা, আমি চললাম।

সুপ্রকাশ শব্দ করেই হাসেন। বলেন—আপনি নিরুপমার ওপর মিথ্যে রাগ করছেন মল্লিকা দেবী।

মল্লিকা কোন কথা না বলে ঝড়ের গতিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আলোঝলমল রাজপথে।···

অমিয় আজ আর ছেলে পড়াতে যায় নি। ঘরের কোণে বসে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্ল্যান করছিল। মল্লিকা এখানে চাকরি করছে করুক, অমিয় যাবে পল্লী-অঞ্চলে কোথাও। স্কুল-মাষ্টারি কি জুটবে না সেখানে? মল্লিকা বাসায় ফিরল। অমিয়কে দেখে জিজ্ঞেস করে—পড়াতে যাও নি?

—না। অমিয় বলে—তোমার এত দেরি হ'ল?

—বলব, সব বলব। মল্লিকা উতলা হয়ে উঠেছে। বলে—ক্ষমা করতে পারবে ত। অমিয় জানতে চায় কি হয়েছে মল্লিকার। মল্লিকাও বলে যায় সব কিছু—আপিস-ম্যানেজার দত্ত আর নিরুপমা সেনের কথা। শেষে জানায়, আর সে চাকরি করবে না।

পরের দিন জিনিষপত্র বাঁধাছাদা করছে অমিয়। মল্লিকাও সাহায্য করছে স্বামীকে। এরা আজ কলকাতার বাসা ছেড়ে যাবে দেশের বাড়ীতে। মল্লিকার আনন্দের অন্ত নেই।

অমিয় বলে—আমার কি মনে হচ্ছে জান। যেন দীর্ঘদিন কারাবাসের পর মুক্তি পেয়েছি।

—সত্যি। মল্লিকা বলে—আর, আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি।

—না বলব না।

এদের কথার মধ্যে ছুটে আসে খোকন। মায়ের হাঁটু জড়িয়ে আধো-আধো স্বরে বলে—মা গো, পটল কার সঙ্গে খেলবে?

আকাশেতে মেলো ঈগলের পাখা জোরালো

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

খোদার উপরে খোদ্‌কারি ভাই কোরো না!
তাঁরে রসিকের চূড়ামণি বলে জানিও।
এই সংসারে একঘেয়ে হোয়ে মোরো না;
বৈচিত্র্যের মহৎ সত্য মানিও।

এক-ছাঁচে ঢালা দুটি মুখ হেথা নাহিরে;
রুচির সঙ্গে রুচির তফাৎ কতনা!
কেহ গৃহী, কেহ পথচারী সন্ন্যাসীরে,
এই পৃথিবীতে কেহ ঠিক কারও মতো না।

কেহ আঁকে ছবি, কারও হাতে বাজে বাঁশরী,
বেদান্ত নিয়ে কেহ রহে মাথা ঘামাতে,
পরহিতে ব্রতী কেহ আপনারে পাসরি,
এক ক্ষুরে চাও সকলের মাথা কামাতে?

আলোতে ছায়াতে ভালোতে মন্দে জড়িত
সংসার অতি বিচিত্র—ঋষি বলেছে;
বৈচিত্র্যই এই সৃষ্টির অমৃত!
সবারে লইয়া স্রষ্টার তরী চলেছে।

নানান পুষ্পে সাজিটি তাঁহার সাজানো,
রঙ্‌বেরঙের খেলনা তাঁহার ঝাঁপিতে;
চুপ করো মূঢ়, অনন্ত তাঁর কি জান?
নুনের পুতুল, যেওনা সাগর মাপিতে!

প্রতিটি মানুষ অনুপম—ইহা জাননা?
জাননা পরম মৃত্যু পরানুকরণে?
ঈর্ষা—মূঢ়তা। ঋষির বচন মানোনা?
স্বকীয়তা মহাসম্পদ—রেখো স্মরণে।

ইহাই সত্য, আর সব বাজে—বলে কি!
কতটুকু জানে সত্যের বুড়ো-খোকারা?
লজিকের পথে জীবনের ধারা চলে কি?
'সিস্‌টেম্‌' নিয়ে নাচানাচি করে বোকারা।

জীবন জানেনা কোন 'ইজম'-এর খাঁচারে।
সত্যের বুকে সকল সীমানা ফুরালো!
কোটর-জীবন আনন্দ দেয় পেঁচারে,
আকাশেতে মেলো ঈগলের পাখা জোরালো।

বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিজ্ঞান-চর্চ্চার লক্ষ্য

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

যা জানা যায় তাই জ্ঞান এবং বিশেষ ধরনের জ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান। অবশ্য তলিয়ে দেখলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখা টানা কঠিন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এর পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানের মধ্যেও অনেকগুলি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গণিত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান,সমাজ-বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সুপরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সচরাচর আমরা বিজ্ঞানের সেই সকল বিভাগই বুঝি যেগুলির তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহস্র উপকরণ—সমাজ ও সভ্যতাকে সে চালিত করেছে দিন দিন উন্নতির পথে। সেই কারণেই গণিত-বিজ্ঞান অপর সকল বিজ্ঞানের জননী-স্বরূপ হলেও রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানই মর্যাদা পেয়েছে বেশী। সত্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য, পায়ের নীচের ধূলিকণার জন্মকথা থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি যোজন দূরের তারকার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও গতির সমস্যা সমাধান বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। যুগে যুগে মানব-সমাজে বৈজ্ঞানিক মনোভাবপন্ন লোকের অনুসন্ধিৎসার ফলেই মানবজাতি এতদূর এগিয়ে গেছে! জীববিদ্‌গণ বলেন, অন্যান্য প্রাণীর মগজের তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ তাহার দেহের অনুপাতে অনেক বেশী, তদ্ভিন্ন মানুষের মস্তকের তথা চোখের সংস্থানই সম্ভবতঃ তার মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। মানুষ দশ দিকে যেমন অবাধ দৃষ্টি প্রসারিত করতে পারে, অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। মানুষের গর্ব করার মত ইন্দ্রিয় বাস্তবিকই তার দুটি চোখ। বিজ্ঞান যে আজ এত অভাবনীয় উন্নতি করেছে তার মূলেও রয়েছে মুখ্যতঃ মানুষের দৃষ্টিশক্তির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স তিন-চার শত বৎসরের বেশী নয়, আর গত এক শত বৎসরের মধ্যেই তার আশ্চর্য্য প্রগতি আমরা লক্ষ্য করি, তবু একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক এই উন্নতির মূল রয়েছে সুদূর অতীতে যার পুরোপুরি ইতিহাস এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবালদ্বীপ যখন সমুদ্রগর্ভ থেকে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তখন দেখতে দেখতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা ফুল-ফলশোভিত মনোহর রূপ ধারণ করে, কিন্তু সমুদ্রতল হতে ঐ দ্বীপ গড়ে উঠতে কত হাজার হাজার বছর যে কেটেছে এবং কত কোটি কোটি প্রবাল কীটের দেহাবশেষে যে তা গঠিত হয়েছে সে বিষয় আমরা চিন্তা করে দেখি না। বিজ্ঞানের আকস্মিক উন্নতিও অনেকটা এইরূপ।

মানব-সভ্যতার আদিম ঊষা থেকেই আরম্ভ হয়েছে মানুষের এষণা—কতকটা তার ভাবাবেগপ্রযুক্ত, আর অনেকটাই তার প্রয়োজনের তাগিদে। আগুনের আবিষ্কার ও তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষের প্রাচীন কীর্ত্তির অন্যতম। মানুষের ভাষার ক্রমবিকাশ এবং তার চিন্তাধারাকে স্থায়িত্ব-দানকল্পে অক্ষর সৃষ্টিপূর্বক লিখন-প্রণালীর আবিষ্কার মানুষের উন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোপান। তার পর—সংখ্যার উদ্‌ভাবন ও তার লিখনপদ্ধতির বিকাশ। অনেকেই জানেন, সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত দশমিক প্রথা সৃষ্টি করেছেন প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ। একথা আজ সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে আধুনিক বিজ্ঞান আদৌ এগোতে পারত কি না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সুতরাং যদিও পাশ্চাত্য আজ আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলে গর্ব্ব করে, তথাপি এর মূল সূত্র যে সে পেয়েছে প্রাচ্যের কাছ থেকেই তা অস্বীকার করার উপায় নাই। গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভারতের দান অতি প্রাচীন ও অতীব উচ্চস্তরের। এমনকি রসায়ন-শাস্ত্রেও যে প্রাচীন ভারত অগ্রণী ছিল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের হিন্দু-রসায়ন সম্পর্কিত গ্রন্থে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই আরবেরা আয়ত্ত করেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়গণ তা গ্রহণ করেন। প্রাচীন পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে চীন এবং মিশরের দানও কম মূল্যবান নয়।

বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের স্থানই সকলের উপর, কারণ বিজ্ঞানের এই উভয় শাখার তথ্যাদির ব্যবহারিক রূপের দ্বারাই গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতার বিরাট সৌধ। খনির পাথর থেকে লৌহাদি ধাতু নিষ্কাশন হতে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটর-গাড়ী, বিমানপোত, রেডিও, র‍্যাডার, এমনকি আণ

উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠানের
"নিলাচলে মহাপ্রভুর"
সুন্দরী তারকা
সুমিত্রা দেবী বলেন "লাক্স টয়লেট সাবানের শুভ্রতাই এর বিশুদ্ধতার পরিচয় দেয়।"
সুমিত্রা দেবী দুইবার বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এ্যাসোসিয়েশন কর্ত্তৃক "বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী" নির্ব্বাচিত হয়েছেন। এই তাঁর গুণের নিঃসন্দেহ প্রমান। কিন্তু তবুও শুধু প্রতিভা নয়, তাঁর আছে সুকোমল সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যার জন্যে তিনি নানারকম চরিত্রে সার্থকতার সঙ্গে অভিনয় করতে পারেন।
এই লাবণ্য সুমিত্রা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেন
বিশুদ্ধ এবং শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে ত্বকের যত্ন নিয়ে।
এই বিশুদ্ধ, শুভ্র লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত মোলায়েম এবং সুগন্ধ ফেণার সাহায্যে আপনারও ত্বকের যত্ন নিন।
LUX
LUX TOILET SOAP
LUX
লাক্স টয়লেট সাবান
চিত্র-তারকাদের-সৌন্দর্য্য-সাবান।
সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে—
বড় সাইজ কিনে খরচ বাঁচান।
LTS. 528-X52 BG

বোমা নির্মাণেও এই দুই বিজ্ঞানের নিবিড় সহযোগিতা আবশ্যক। রসায়নশাস্ত্র যোগায় দেহ, পদার্থ-বিজ্ঞান যোগায় প্রাণ—একটি না হলে অপরটি অচল।

আজকাল বিজ্ঞানের কথা মনে হলেই তার ব্যবহারিক দিকটাই মনে পড়ে। কারণ বসন-ভূষণ, কাগজ-কালি, ঔষধ-পথ্য, রঞ্জন ও বিস্ফোরক পদার্থ, প্রসাধনসামগ্রী এবং আধুনিক সভ্যতার অধিকাংশ উপকরণই বিজ্ঞানের দান। তাই ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়েই আমরা মনে করি তারা বর্তমান সভ্যতার উপকরণ তৈরি করার উপায় শিখবে বা মানব-কল্যাণকর কোনও উপকরণ আবিষ্কারের খ্যাতিলাভ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটাই গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চা—বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্যের সমাধান-প্রচেষ্টাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলমন্ত্র। যাঁরা বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছেন—এদেশের নাগার্জ্জুন, আর্যভট্ট, লীলাবতী ; এবং পাশ্চাত্যের গ্যালিলিও, কোপারনিকস, নিউটন, ড্যালটন, ফ্যারাডে, মাদাম কুরি, রাদারফোর্ড প্রভৃতি মনীষীর জীবনে এরই সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা সবাই ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। প্রকৃতির রহস্যঘন অবগুণ্ঠনের ঈষৎ উন্মোচনই ছিল এঁদের প্রত্যেকেরই প্রধান ব্রত। সত্য সাধনায় এঁরা লাভ করেছেন গভীর অন্তর্দৃষ্টি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং অহঙ্কারশূন্যতা। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি ছিলেন তত বেশী নিরভিমান, কারণ তিনিই বেশী বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতির অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও প্রায় অস্পৃষ্ট রয়ে গেছে। জানার চেয়ে অজানার পরিমাণ অত্যধিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের মনোভাব প্রকাশ করলে বলতে হয়—

"এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ নেত্র অনিমেষ,
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়—
এখনও তোমার কোলে আছি
শিশু-প্রায়—মুখ পানে চেয়ে।"

উপযুক্ত ভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে, জাগতিক বিষয়বস্তুর কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি সহজেই দৃষ্টি পড়ে। জগতের সর্ব্বত্র সকল সময়েই অবিচ্ছিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে চরিত্রে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সংযম, শৃঙ্খলা, কর্ম্মস্পৃহা ও অহঙ্কারশূন্যতা দানা বেঁধে ওঠে—আরও বুঝবার আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকে।

বিজ্ঞান-সাধনা বলে কথাটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, কিন্তু এর সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই। কোনও একটি সত্যের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অনন্যমনে একান্ত ভাবে লেগে থাকবার কথা আমরা ভাবতেই পারি না। মুনি-ঋষিদের তপশ্চর্য্যার এরূপ কাহিনীই কেবল আমাদের শোনা আছে। কিন্তু আধুনিক কালে বিজ্ঞানের রহস্যোদ্‌ঘাটনে যে ঠিক এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনারই প্রয়োজন হয়েছে, সে ধারণা আমাদের নাই বললেই চলে। অথচ আমাদের দেশের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামন, সাহা, বোস এবং ইউরোপখণ্ডের গ্যালিলিও, নিউটন, ড্যালটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর, কুরি, কেকুলে, বেয়ার, ফিশার, রাদারফোর্ড প্রভৃতি মনীষীর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়েছে। এ স্থলে প্রসঙ্গক্রমে একজন জার্ম্মান বিজ্ঞানীর বিষয়ে দু'একটি কথা বলা যাচ্ছে। অগাষ্ট কেকুলে বলেছেন জৈব রসায়নশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লিবিগ তাঁকে উপদেশ দিতেন—"রসায়নশাস্ত্রের চর্চ্চায় স্বাস্থ্যহানি না ঘটালে ঐ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন না, আর পড়তেও হবে বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষ করে জার্ম্মান ভাষার মাধ্যমে।" কেকুলে এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি বলেছেন, একরাত্রি পড়াশুনা ও গবেষণার চিন্তা করে কাটানো তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করতেন না। যখন পর পর দুই-তিন রাত্রি জেগে তিনি এরূপ সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তখনই কিঞ্চিৎ আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এদিকে দিনের বেলায় ল্যাবরেটরিতে তিনি অসাধারণ পরিশ্রমও করতেন। অনেকেই জানেন কেকুলের এই সাধনা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। হফমানের মত অসামান্য কৃতী বিজ্ঞানীও আক্ষেপ করে বলেছেন—"কেকুলের একটিমাত্র আবিষ্কারের বিনিময়ে আমার জীবনের সমুদয় আবিষ্কার ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।" ফলতঃ কেকুলের বেনজিন ফরমূলা আবিষ্কৃত না হলে জৈব রসায়নশাস্ত্র এবং তৎসম্ভূত শিল্পরঞ্জন ও বিস্ফোরক পদার্থ, কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য এবং আধুনিক ঔষধ প্রভৃতি কিছুই দাঁড়াত কিনা সন্দেহ।

বিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যেও ক্রমে দু'টি উপ-বিভাগ দাঁড়িয়েছে—বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞান। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের লক্ষ্য, আর সভ্যতার উপকরণ প্রস্তুতকল্পে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তথ্যাদির প্রয়োগ-কৌশল সংক্রান্ত গবেষণা ফলিত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এই উপবিভাগ দুইটির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। জার্ম্মানির কবি শিলার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে স্বর্গের ও ফলিত বিজ্ঞানকে

গাভীর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। যদিও প্রত্যক্ষ ভাবে দুধ-মাখন খেয়েই আমরা পুষ্টিলাভ করি, তথাপি সূর্য্য না থাকলে ঘাস, পাতা জন্মাত না, ফলে গাভীও বাঁচত না, মানুষও বঞ্চিত হ'ত দুধ-মাখন থেকে। দেশে ফলিত বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা শিল্পোন্নয়ন করতে হলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতি যে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য—শিলারের উক্তিতে তা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে কিরূপ সহায়ক হতে পারে তার উদাহরণ দিচ্ছি। "অবস্তু থেকে বস্তুর উদ্ভব সম্ভব নয়" একটি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সত্য। দৈনন্দিন জীবনে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায়—যখন আমরা দেখি বীজ না পুঁতলে গাছ জন্মায় না, পরিশ্রম না করলে সাফল্য অর্জ্জিত হয় না—অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে জীবনে পাওয়ার মত বস্তু কিছুই পাওয়া যায় না।" "প্রকৃতি শূন্য স্থান সহ্য করতে পারে না" বলে বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে। এটা জড় জগতের বেলায় যেরূপ সত্য, নৈতিক চরিত্র গঠনেও সেইরূপ। যদি ভাল কাজ বা উচ্চ চিন্তা না করি তবে মন ভরে উঠবে বাজে চিন্তা বা কুচিন্তায়, ফলে বিষিয়ে তুলবে চিত্ততল, পিছিয়ে দেবে জীবনের অগ্রগতি। বিজ্ঞানের যে-কোনও বিভাগ থেকে এরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়।

বিজ্ঞান-সাধনা এবং বিজ্ঞান অনুশীলন ব্যতীত জনসাধারণের মধ্যেও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির যাতে বহুল প্রচার হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ-বোধ্য পুস্তিকা-পুস্তকাদির সাহায্যে বা বেতার-বক্তৃতার দ্বারা তার ব্যবস্থা করাও সর্ব্বতোভাবে সমীচীন।

সকলেই জানেন, বিজ্ঞানচর্চ্চায় একদিকে যেমন মানুষের অশেষ কল্যাণকর তথ্য ও পদার্থনিচয় আমাদের করায়ত্ত হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে পেয়েছি আমরা সর্ব্বধ্বংসী বিস্ফোরক পদার্থ যার চরমতম পরিণতি লক্ষিত হয় আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমায়। বিজ্ঞানের এই সংহারমূর্ত্তি দেখে কেউ কেউ বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন। তবে আগুনে ঘর পোড়ে বলে তার ব্যবহার যেমন কেউ ছাড়তে পারে না বিজ্ঞানের বেলায়ও অনুরূপ যুক্তিই গ্রহণীয়। বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপের কারণ অনুসন্ধান করলে এই কথাটিই মনে পড়ে যে, মানুষ জড়বিজ্ঞানের সাধনায় যত দ্রুত অসীম শক্তি অর্জ্জন করেছে সেই শক্তি সুপরিচালনার উপযোগী আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী সে এখনও হয়ে উঠতে পারে নি। হৃদয়কে পিছনে ফেলে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ গেছে অনেক এগিয়ে এতে করেই জমে উঠেছে যত অশান্তি, যত পুঞ্জীভূত দুর্গতি। তবে এইটুকু বিশ্বাস আমাদের আছে যে, প্রাচীন ভারতে জড় বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও তা যেমন সর্ব্বাংশে মানবকল্যাণেই নিয়োজিত হয়েছিল, ভারতবাসীরা আধুনিক বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করলেও ভারতের মজ্জাগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যহেতু বিজ্ঞানের কল্যাণমূর্ত্তিই এখানে বিকাশলাভ করবে।

ইহাদেরও ছিল স্বপ্ন—

শ্রীবিভুপ্রসাদ বসু

ইহাদেরও ছিল স্বপ্ন—বুকজোড়া উদ্দাম দুরাশা—
ইহাদেরও ছিল গান কুঞ্জবনে পল্লব-মর্ম্মরে,
মুঞ্জরিল মুগ্ধ প্রেম একদিন এদেরও অন্তরে,
মনের মানুষ লাগি ইহাদেরও কি সে ভালবাসা।...
জীবনে কত না সাধ—ইহারাও জেনেছে পিপাসা,
এরাও পিয়েছে বারি যৌবনের অমৃত-নির্ঝরে—
জয়স্তুতি জীবনের গাহিল এরাও মুক্তস্বরে,
জেগেছে নিবিড় মনে ইহাদেরও আকণ্ঠ জিজ্ঞাসা।...

তার পর কবে এরা মিশে গেল জনতার ভিড়ে...
ইহাদের কুঞ্জবনে বহে আজ মরুচারী ঝড়।
যৌবনের স্বপ্নজাল অলক্ষ্যে দিয়াছে কেবা ছিঁড়ে—
জীবনের উৎস-মুখে চাপাইল নিষ্ঠুর পাথর।...
আজও যবে দূর-স্মৃতি ভেসে আসে দক্ষিণ সমীরে
অসমাপ্ত ইহাদের ব্যঙ্গ করে জীবনের জর।

হার্লেম

ও' হেনরি

অনুবাদক—শ্রীমণিকা সিংহ

মিসেস ফিঙ্ক নীচের তলার মিসেস ক্যাসিডির ফ্ল্যাটে নেমে এসেছেন।

মিসেস ক্যাসিডি বললেন, 'ছাখ রে, কি সুন্দর নয়?' অনেকখানি গর্ব্বের সঙ্গে তিনি মুখটি ফিরিয়ে ধরলেন, যাতে মিসেস ফিঙ্ক ভাল করে দেখতে পান। একটা চোখ তাঁর ফুলে উঠে প্রায় বুজে গেছে। চার পাশে বেগনী-সবুজ আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটটা কেটে গিয়েছিল, এখনও অল্প অল্প রক্ত বেরুচ্ছে। গলার দু'পাশে আঙুলের দাগগুলো এখনও মিলোয় নি।

মনের ঈর্ষা গোপন করে মিসেস ফিংক বললেন, আমার স্বামী কিন্তু কখনও আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করবে না। এ জিনিস কল্পনাই করতে পারে না সে।'

মিসেস ক্যাসিডি সোজাসুজি বলেই দিলেন 'যে লোক হপ্তায় অন্ততঃ একদিনও আমাকে পিটবে না, তেমন লোকে আমার দরকার নেই। একটু-আধটুও না পিটলে তুই বুঝবি কি করে যে, তোর কথা ও কিছু ভাবে। উঃ, কিন্তু জ্যাক শেষবার যে মারটা দিলে সেটা কিছু হোমিওপ্যাথিক ডোজের নয়। এখনও যেন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি। কিন্তু এর ফলে কি হবে জানিস ভাই? হপ্তার বাকী দিন ক'টা ও এমন ব্যবহার করবে যে ওর চেয়ে মিষ্টি স্বভাবের লোক তুই তখন খুঁজলেও একটি পাবি না এ তল্লাটে।'

মিসেস ফিঙ্ক খুব শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'আমি আশা করি যে, মিঃ ফিংক কোনদিন আমার গায়ে হাত তোলবার মত ছোটলোক হবেন না।'

'হা-হাঃ ম্যাগি, তোর হিংসে হচ্ছে বুঝেছি।' চোখে উইচ-হেজেলের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে মিসেস ক্যাসিডি বললেন 'তোর কর্তাটি বড়ই মিইয়ে-পড়া কুঁড়েগোছের লোক। ও আবার তোকে পিটবে কি? বাড়ীতে ত দিনরাত চেয়ারে বসে থাকতেই দেখি। শরীরচর্চ্চা মানে হ'ল ওর খবরের কাগজ মুখে দিয়ে পড়ে থাকা। তাই নয় কি?

মিসেস ফিঙ্ক অস্বীকার করতে পারলেন না। মাথা ঝেঁকে বললেন, 'হাঁ, তা সত্যি বটে। বাড়ীতে থাকলে ও খালি কাগজই পড়ে। কিন্তু নিজে মজা পাবার জন্য কোনদিন আমাকে পিটতে আসে না এটাও ঠিক।'

মিসেস ক্যাসিডি হাসলেন। সন্তোষের হাসি। স্বামীর সদা-সতর্ক প্রহরায় রক্ষিত সুখী পত্নীরা এ রকমই হাসে। রাজকুমারী যেভাবে তাঁর হীরামুক্তার বাক্স খুলে সংসমাজে দেখাতে বসেন, সেই রকম ভাব দেখিয়ে উনি নিজের পঞ্জরের কিমোনোর কলারটা সরিয়ে দেখালেন সযত্নলালিত আর একটি আঘাতচিহ্ন। বেগনী রং তার ফিকে হয়ে এসেছে, ধারের দিকে অল্প কমলার আভা। চিহ্নটা প্রায় মিলিয়ে এসেছে, কিন্তু স্মৃতি তার এখনও প্রিয়।

এবার হার মানলেন মিসেস ফিঙ্ক। কলহের যে দীপ্তিটা দেখা দিয়েছিল ওঁর চোখে, ঈর্ষামিশ্রিত প্রশংসায় সেটা কোমল হয়ে এল। বিয়ের বছরখানেক আগে তিনি আর মিসেস ক্যাসিডি দু'জনেই কাগজের বাক্সের এক কারখানায় কাজ করতেন। এখন একই ফ্ল্যাটবাড়ীতে তিনি আর তাঁর স্বামী থাকেন উপরতলায়। আর মেম তার স্বামীকে নিয়ে বাসা বেঁধেছে ঠিক নীচের ঘরেই। সুতরাং মেমের কাছে চাল দেওয়া যায় না।

'ও যখন মারে তোর লাগে না?' অনেকখানি আগ্রহ নিয়ে মিসেস ফিঙ্ক শুধোলেন।

'লাগে না আবার?' কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠলেন মিসেস ক্যাসিডি। 'আচ্ছা, বল দেখি, কখনও তোর মাথার ওপর বাড়ী ভেঙে পড়েছে? ঠিক তখন যেরকম লাগে। সেই ভাঙা স্তূপ থেকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে বার করলে কেমন লাগে রে? বুঝলি, জ্যাকের বাঁ হাতের ঘুষির মানে হ'ল দুটো ম্যাটিনী শো আর নূতন জুতো একজোড়া। আর ওর ডান হাতের ঘুষির সেটা মেটাতে হলে একবার কোণী আইল্যাণ্ড ঘুরিয়ে আনতে হবে। তার সঙ্গে আবার চাই দুটো এমব্রয়ডারী করা নূতন ফ্রক।'

'কিন্তু ও তোকে মারে কেন রে?' বড় বড় চোখ করে মিসেস ফিঙ্ক জানতে চাইলেন।

'আরে বোকা', মিসেস ক্যাসিডির গলায় প্রশ্রয়ের সুর। 'তার মানেই হ'ল ওর পেটে কিছু পড়েছে। শনিবার বিকেলের দিকেই ব্যাপারটা হয়।'

'কিন্তু তুই মার খাবার মত রোজ কি করিস?' অনুসন্ধানী তবু ছাড়তে চায় না।

'আরে ওকে বিয়ে করেছি ত বটে। জ্যাক মদ ঠুসে বাড়ী এল, আর বাড়ীতে আমি রয়েছি, নয় কি? আমাকে ছাড়া আর কাকেই বা ওর মারবার অধিকার আছে? মারুক ত দেখি অন্য মেয়েছেলেকে? জানতে পারলে ইয়ারকি ওর শেষ করে দেব না। আমাদের ব্যাপারটা হয় কখনও খাবার কেন তৈরী হয় নি বলে। আবার কেন তৈরী হয়েছে বলেও হতে পারে। কারণ খুঁজতে ওকে কষ্ট করতে হয় না। যা হোক হলেই হ'ল। প্রথমে ও প্রাণ ভরে মদ ঠুসে নেয়। তার পর যখন বৌয়ের কথা মনে পড়ে তখন বাড়ী ফিরে দেখে যায়। আমি সাবধান হয়ে গেছি,
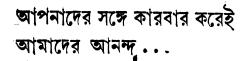
আপনাদের আমরা আরও ভাল করে জানতে চাই। সেইজন্যেই আমাদের বিশেষ মার্কেট রিসার্চ বিভাগ আপনাদের পছন্দ অপছন্দ, কি কারণে আপনারা কোন কোন জিনিষ কেনেন আবার কি কারণেই কেনেন না—এসব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। আমাদের প্রতিনিধিরা সারা ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়ান—বড় সহরে, মফস্বল সহরে, গ্রামে নানাধরণের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলোচনা করেন এবং এইভাবে আপনাদের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রয়োজন ও রুচির সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এই তথ্য অনুসন্ধান চালানো হয় বলেই আমরা রিন্সোর মত নতুন জিনিষ বাজারে ছাড়তে পারি বা কোন চলতি জিনিষ বদলাতে পারি—যেমন ধরুন আমরা বদলেছি লাক্স টয়লেট সাবানের সুগন্ধ।

আমাদের তৈরী অনেকগুলি জিনিষই আপনাদের পরিচিত এবং আমাদের প্রতিনিধিদের তৈরী রিপোর্টগুলিতে আপনাদের খবর আছে কিন্তু আপনারা আমাদের কাছে শুধু রিপোর্টের সংখ্যা আর তথ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন··· আপনাদের সঙ্গেই আমাদের কারবার। আপনাদের প্রয়োজন মেটাতে, ন্যায্য দামে উৎকৃষ্ট জিনিষ দিয়ে আপনাদের সন্তুষ্টি সাধনে, আমাদের চেষ্টার অন্ত নেই।

দশের সেবায়

HLL. 4-X52 BG

বুঝলি। শনিবার রাত্তির এলেই আমি ঘরের আসবাবপত্তরগুলো দেয়ালের দিকে সরিয়ে ফেলি। খোঁচা কোণগুলো বেরিয়ে থাকলে বেশী লেগে রক্তারক্তি না হয়। বাবাঃ, ওর বাঁ-হাতের ঘুষির যা জোর, একটা খেলেই মাথা ঘুরবে বোঁ-বোঁ করে। এক একবার মারামারির প্রথম দিকেই আমি মাটি নিই। কিন্তু যখন সারা হপ্তা ধরে ফুর্তি লুটতে ইচ্ছে হয়, কিংবা নতুন কাপড়চোপড় দরকার হয়, তখন আমি আবার মাটি থেকে উঠে আসি শাস্তিটা বেশী করে নেবার জন্য। কাল রাত্তিরে তাই হয়েছিল। জ্যাক জানে অনেক দিন থেকেই আমি কালো সিল্কের একটা জামা চাইছি। আর কালসিটে পড়া একটা চোখের কর্ম নয় ওটা। এই তোকে বলে রাখলেম ম্যাগ, আজই যদি সে ওটা না আনে তবে তোকে আইসক্রীম খাওয়াব।'

মিসেস ফিঙ্ক গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন। এবার বললেন, 'আমার মার্ট আমাকে কোনদিন চড়চাপড়টাও দেয় নি। তুই যা বলেছিস মেম, একেবারে ঠিক কথা। খালি গোমড়া মুখ করে বাড়ী এসে চুপচাপ বসে থাকবে। কোনদিন আমাকে নিয়ে যাবে না কোথাও। জানে কেবল কোণের চেয়ারটিতে বসে থাকতে। আমার জন্য জিনিষপত্তর কিনে আনে বটে, কিন্তু সে এত ব্যাজার মুখে যে আমার একদম পছন্দ হয় না।'

মিসেস ক্যাসিডি এক হাত দিয়ে বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আহা, বেচারী!' উনি করুণার সুরে বললেন। 'কিন্তু জ্যাকের মত স্বামী ত সবার হতে পারে না। স্বামীরা যদি সবাই ওর মত হ'ত তা হলে ফি-বছর এতগুলো করে বিয়ে ভেঙে যেত না। এই যে আজকাল হামেশাই অখুশী বৌদের কথা শোনা যায়, ওদের দরকার কি জানিস? দরকার এমন এক-একটি মরদের যে বাড়ী এসে হপ্তায় একদিন করে অন্ততঃ বৌকে দু'চার ঘা দিতে পারবে। তার পর সেটা পুষিয়ে নেবার জন্য আদরযত্ন না হয় চকোলেট ক্রীম ত আছেই। তবে ত জীবনে আসবে উৎসাহ। আমি চাই এমন লোক যে রাগ হলে এসে আমায় পিটবে। আর রাগ না হলে আদরে ভরিয়ে দেবে আমায়। যে লোক এর কিছুই করে না তার হাত থেকে ভগবান আমায় রক্ষা করুন।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল মিসেস ফিঙ্কের।

হঠাৎ বাইরের হলটায় নানারকম শব্দ পাওয়া গেল। মিঃ ক্যাসিডির পায়ের ধাক্কায় দরজাটা ফট করে খুলে গেল। দু'হাত তাঁর নানারকম কাগজের প্যাকেটে ভর্তি। মেম ছুটে গিয়ে ওঁর গলা ধরে ঝুলে পড়ল। ওর ভাল চোখটায় দেখা দিল প্রেমের দীপ্তি। মাওরী যুবতীর চোখে এই আলো দেখা যায় যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে বুঝতে পারে যে, প্রেমিকের কুটিরেই সে শুয়ে। প্রচণ্ড প্রহারে অজ্ঞান করে দেবার পর প্রেমিক তাকে টানতে টানতে এখানে নিয়ে এসেছে।

'কি গো?' মিঃ ক্যাসিডি চেঁচিয়ে ডাকলেন পত্নীকে। তার পর সাদর আলিঙ্গনে বেঁধে ওঁকে মেঝে থেকে তুলে নিলেন বুকের কাছটিতে। বারনাম এণ্ড বেলীর টিকিট কেটে আনলাম। আর ঐ বাণ্ডিলটার দড়ি খুললে তোমার কালো সিল্কের জামাটাও পাবে। আরে, মিসেস ফিঙ্ক যে, শুভ ইভনিং। আপনাকে প্রথমে দেখতে পাই নি। মার্টের খবর কি বলুন।'

'ও বেশ ভালই আছে। ধন্যবাদ, মিঃ ক্যাসিডি। আমি উঠব এবার। মার্ট এখনই খেতে আসবে। কাল তোকে সেই প্যাটার্নটা দিয়ে যাব মেম।'

নিজের ঘরে ফিরে উনি কাঁদলেন খানিকক্ষণ। কান্নাটার কোনই অর্থ বোঝা গেল না। এরকম কান্না জানে কেবল মেয়েরা। বিশেষ কোনও কারণে এ কান্না নয়। একেবারে অর্থহীনই বলা চলে। এর মানে যদি কিছু থাকে তা হ'ল এই যে, মার্টিন কেন তাঁকে কোনদিন মারে না। সে কি একটুও ভালবাসে না তাঁকে? লম্বাচওড়া সে জ্যাক ক্যাসিডির মতই। গায়ের জোরও সেই রকম। তবে? এমন তাঁর কপাল যে, মার্ট কোনদিন তাঁর সঙ্গে ঝগড়াই করল না। খালি বাড়ী এসে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে। রোজগার ত ওর ভালই। তবে যেগুলো না হলে জীবনটা বেশ জমে না সেগুলো করে না কেন?

মিসেস ফিঙ্কের স্বপ্নের জাহাজ শান্ত সমুদ্রে নোঙর ফেলেছে। জাহাজের কাপ্তেন খালি খাবার, টেবিল আর শোবার খোলা, এ দুয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মাঝে যদি একবার রাগ করে ডেকের ওপর পা ঠোকে তবে ত। তাঁর যে কত স্বপ্ন ছিল আনন্দে পাল তুলে দিয়ে ভেসে যাবার। মাঝে মাঝে জাহাজ ভিড়োবেন পছন্দের দ্বীপে। কিন্তু তা যদি না হয় ত তিনি এবার মারামারি লাগাতে প্রস্তুত। একটা আঁচড় অন্ততঃ গায়ে লাগুক। এতদিন যে স্বামীর ঘর করলেন তার কিছু একটা চিহ্ন কি পাওয়া যাবে না তাঁর মধ্যে? মুহূর্ত্তে তাঁর মনে হ'ল মেমকে তিনি ঘৃণা করেন। মেম, তার কাটাছেঁড়া, কালসিটে, তার উপহারের বোঝা, স্বামীর আদরযত্ন, আর তার স্বামী যে দিনরাত পিটোয় কিন্তু তবু তাকে ভালবাসে—এ সবকিছুকে তিনি ঘৃণা করেন।

সাতটায় মিঃ ফিঙ্ক বাড়ী এলেন। পোষমানা পশুর প্রশান্তি ওঁর সর্ব্বাঙ্গে। আরামের ঘরখানি ছেড়ে কোথাও তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই। তিনি সেই লোক যার গাড়ী ধরা হয়ে গেছে। সেই অজগর যার শিকারখেলা শেষ। সেই গাছ যে মাটিতেই পড়ে। যা হবার তা ত হয়ে গেছেই, এখন ব্যস্ত হওয়া বৃথা।

'খাবে না কি মার্ট?' মিসেস ফিঙ্ক যত্ন করে রেঁধেছেন আজ।

'উঁ-উঁ-উঁ হাঁ।' ফিঙ্ক বললেন যেন অনিচ্ছাভরেই। খাবার সময় কথাবার্ত্তা হ'ল অল্পই। তার পর কাগজগুলো যোগাড় করে জুতোজোড়া খুলে মোজাপরা পায়েই বসে গেলেন পড়তে।

পরের দিন ছিল শ্রমিক দিবস। মিঃ ফিঙ্ক ও মিঃ ক্যাসিডির সেদিন ছুটি। আজ মেহনতী মানুষেরা বিজয়গর্ব্বে রাস্তায় রাস্তায়

প্যারেড করে বেড়াবে কিংবা অন্য কিছু করে নিজেদের উল্লাসের পরিচয় দেবে।

মিসেস ফিঙ্ক সকাল সকাল সেই প্যাটার্নটা নিয়ে নেমে গেলেন নীচের ফ্ল্যাটে। মেম নূতন কেনা সিল্কের জামাটা পরেছে। তার ফোলা চোখটা থেকেও আনন্দের আলো ঝিলিক দিচ্ছিল। জ্যাকের অনুতাপের ফল হয়েছে বিস্তর। সারাদিনের জন্য চমৎকার প্রোগ্রাম তৈরী হয়েছে। বেড়ানো পিকনিক আর থিয়েটার এতেই কেটে যাবে দিনটা।

নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে মিসেস ফিঙ্কের মনে দেখা দিল ক্রোধ। ঈর্ষামিশ্রিত ক্রোধে তিনি তুলনা করে দেখলেন বান্ধবীর অবস্থার সঙ্গে নিজের। উঃ, মেমটা কি রকম সুখী! যেমন দিন-রাত চারদিক কাটছে ছিড়ছে, তার ওষুধও ত পড়ছে তেমন তেমন। কিন্তু দুঃখটা কি মেমেরই একচেটে? জ্যাক ক্যাসিডির চেয়ে মার্টিন ফিঙ্ক কম কিসে? আর তার বৌকে কি চিরকালটা মার না খেয়ে, আদর না পেয়ে কাটাতে হবে? মেমকে আজ তিনি দেখিয়ে দেবেন যে, তার জ্যাকের মত কড়া হাতের ঘুষি মারতে আর তার পর মিঠে আদর দিতে সব স্বামীই পারে।

ফিঙ্কদের ছুটির দিন ঐ নামেই। রান্নাঘরে মিসেস ফিঙ্ক দু'হপ্তার ময়লা জামাকাপড় বড় গামলাটায় ভিজিয়েছেন। সারা রাত ওগুলো ভিজেছে। মিঃ ফিঙ্ক সেই মোজাপরা পায়েই বসে বসে কাগজ পড়ছেন। শ্রমিক-দিবসের সূচনাটা এ রকম বিশ্রীই হ'ল।

ক্রোধে ফুলে উঠল মিসেস ফিঙ্কের অন্তর। আর একটা খুব সাহসী মতলব মাথা তুলল সেখানে। যদি তাঁর স্বামী তাঁকে আঘাত না করেন, এভাবে নিজের পৌরুষের পরিচয় না দেন—এটা ত ওঁর বিশেষ অধিকার, দাম্পত্য জীবনে ওঁর পরম আগ্রহের পরিচয়—তা হলে স্ত্রী ওঁকে বাধ্য করবেন ওঁর কর্ত্তব্য পালন করতে।

মিঃ ফিঙ্ক পাইপ ধরালেন। পরম প্রশান্তিতে মোজাপরা পা দিয়ে আর এক পা চুলকোলেন। চীনে ঘাসের পুডিঙে খানিকটা ঘাস যেন ঠিকমত মেশে নি, বিবাহিত জীবনে ওঁর স্থান সে রকমই। স্বর্গে যাওয়ার বদলে উনি এভাবে নিজের চারদিকে ছাপা অক্ষরের জগৎ রচনা করে বসে থাকতেই ভালবাসেন। এতে সুখ কি কিছু কম? বিশেষ যদি কানে আসে বৌয়ের কাপড়কাচার শব্দ, আর তার ফাকে ফাকে নাকে আসে ব্রেকফাস্টের খালি ডিশগুলো তুলে নিয়ে যাবার, আর ডিনারের জন্ম নূতন ডিশ সাজাবার মনোহর সুগন্ধ। একসঙ্গে বেশী চিন্তা আবার ওঁর মাথায় আসে না। বিশেষ করে বৌকে ধরে পিটবার কথা ত নয়ই।

মিসেস ফিঙ্ক গরম জলের কলটা খুলে দিলেন। কাপড় আছড়াবার তক্তাটা পেতে ফেললেন। নীচের ফ্ল্যাট থেকে মিসেস ক্যাসিডির খিলখিল হাসির শব্দ ভেসে এল। মেম কি ঠাট্টা করছে তাঁকে? মনে হ'ল উপরতলায় মার-না-খাওয়া বৌকে নিজের সুখটা দেখিয়ে আমোদ পাবার জন্যই এই নির্লজ্জতা। আচ্ছা, এবার মিসেস ফিঙ্কের পালাও আসবে।

হঠাৎ কাগজে ডুবে-থাকা লোকটির দিকে ফিরলেন মিসেস ফিঙ্ক। প্রচণ্ড ঝড় যেন।

'ওরে কুঁড়ে মড়া!' বিশ্রী চীৎকার করে উঠলেন তিনি, 'তোর মত গোমড়ামুখোর জন্য খেটে খেটে আমার শরীরে যে আর কিছু রইল না। তুই কি মানুষ না রান্নাঘরে শুয়ে-থাকা কুকুর?'

মিঃ ফিঙ্কের হাত থেকে কাগজটা খসে পড়ল। এত বিস্মিত যে, নড়তে চড়তে ভুলে গেছেন। স্ত্রী মনে করলেন খোঁচাটা বোধ হয় যথেষ্ট হ'ল না। এইটুকুতেই কি ওর মত শান্তশিষ্ট লোক বৌয়ের গায়ে হাত তুলতে পারে? তাই ঝাঁপিয়ে পড়ে উনি স্বামীর মুখে মারলেন সজোরে এক ঘুষি। মুহূর্তে প্রেমের শিহরণ জাগল তাঁর দেহে। এ যে তিনি ভুলতেই বসেছিলেন।—ওঠো মার্টিন ফিঙ্ক, নিজ রাজ্যে প্রবেশ কর।—তিনি নিজের মুখে যেন অনুভব করলেন ওর ঘুষির আঘাত। তবে বোঝা যাচ্ছে যে, ও সত্যই ভালবাসে।

মিঃ ফিঙ্ক চেয়ার ছেড়ে এবার লাফিয়ে উঠলেন। ম্যাগির অন্য হাতটা এবার ধড়াস করে এসে তাঁর চোয়ালে পড়ল। চোখ বুজল ম্যাগি বহুপ্রত্যাশিত আঘাতটির আশায়। সেই ভয়ঙ্কর অথচ আনন্দের মুহূর্তটির জন্য। আঘাতের জন্য সে এতই উৎসুক।

নীচের ফ্ল্যাটে লজ্জিত অনুতপ্ত মিঃ ক্যাসিডি মেমের চোখে রঙের প্রলেপ লাগাচ্ছিলেন। এবার তাঁরা বেরিয়ে পড়বেন। উপরতলা থেকে হঠাৎ শোনা গেল মেয়েলি গলায় তীব্র চীৎকার এবং ধুপধাপ জোর শব্দ। ঝনঝন করে বাসন পড়া, চেয়ার উলটানো, গার্হস্থ্য কলহের যেমন লক্ষণ হয়ে থাকে।

আশ্চর্য্য হয়ে মিঃ ক্যাসিডি বললেন 'মার্ট আর ম্যাগি কি ঝগড়া করছে? কোনদিন ত এমনটি হয় না। আমি কি ওপরে গিয়ে দেখে আসব? থামিয়ে দিয়ে আসব না কি?'

মিসেস ক্যাসিডির একটা চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল হীরের মত। আর একটা চোখ মিটমিট করল, খাঁটি হীরে না হোক, নকল হীরের মতই। মৃদু কণ্ঠে তিনি বিস্ময় জানালেন। মেয়েদের এসব বিস্ময়োক্তিতে অবশ্য মানে কিছুই থাকে না। 'ও হো, ভাবছি, আমি ভাবছি। আচ্ছা জ্যাক, তুমি যেয়ো না। আমিই দেখে আসছি ব্যাপারটা কি?

দৌড়ে উপরে গেলেন তিনি। হলে ঢুকতে না ঢুকতেই রান্নাঘরের দরজা খুলে পাগলের মত ছিটকে বেরিয়ে এলেন মিসেস ফিঙ্ক।

চাপা আনন্দে মিসেস ক্যাসিডি শুধোলেন, 'ম্যাগি, তাই হ'ল তবে, অ্যা?'

ছুটে এসে বন্ধুর বুকে মুখ লুকিয়ে মিসেস ফিঙ্ক অসহায় ভাবে কাঁদতে লাগলেন।

আস্তে আস্তে ওঁর মুখটি তুলে ধরলেন মিসেস ক্যাসিডি। অশ্রুলাঞ্ছিত সে মুখ মাঝে মাঝে লাল হয়ে উঠছে। তখখুনি সাদা হয়ে যাচ্ছে আবার। কিন্তু গোলাপীগোছের মোলায়েম সে মুখে একটা আঘাতেরও চিহ্ন দেখা গেল না। ফিঙ্কের খুষিতে কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি সে মুখের।

মেম ব্যগ্র অনুরোধ করল,—ম্যাগি, লক্ষ্মী মেয়ে, সব কথা খুলে বল। তার পর যত খুশি কাঁদিস। না হলে আমি এখখুনি ঘরে ঢুকে সব দেখে আসছি। ও কি করলে? তোকে মারে নি বুঝি?'

আবার বান্ধবীর বুকে মাথা লুকালেন মিসেস ফিঙ্ক।

'ভগবানের দোহাই, মেম। দরজা খুলিস নি।' কাঁদতে কাঁদতে বললেন তিনি। 'আর কাউকে যেন বলিস নি একথা একেবারে কাউকে না। ও—ও একটা আঙুলও ঠেকাল না আমার গায়ে। আর-আর এখন—হায় ভগবান—এখন ও কাপড়ের গামলা নিয়ে—গামলা নিয়ে কাচতে বসেছে।'

হীর-রঞ্জা

শ্রীসুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

"কিশোর যারা প্রাণের টানে চাইবে তারা কিশোরী" এই একটি মাত্র ছত্রে কবি সত্যেন্দ্রনাথ মানব-মনের একটি চিরন্তন সত্যকে রূপায়িত করিয়াছেন। যুগে যুগে, দেশে দেশে, কিশোরীকে কামনা করিয়াছে কিশোর। এই কামনা কখনও মিলনে সার্থক হইয়াছে, কখনওবা ব্যর্থতায় প্রেমের অপঘাত ঘটিয়াছে। বাঞ্ছিত-বাঞ্ছিতার বিরহ-মিলন, হাসি-কান্নাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে কত অপরূপ কাহিনী। বৃন্দাবনের 'নওলকিশোর' শ্রীকৃষ্ণ এবং চির-কিশোরী শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে অপূর্ব্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য। লয়লা-মজনুর কাহিনী প্রাচীন পারস্য সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

এই সমস্ত প্রেমকাহিনী আগাগোড়াই সত্য নাও হইতে পারে। সত্য ঘটনার সহিত 'আপন মনের মাধুরী' মিশাইয়া কবি যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ নরনারী আজও গভীর আগ্রহে তাহা পাঠ করে। নায়ক-নায়িকার দুঃখে তাহাদের চোখে অশ্রু ঝরে। নায়ক-নায়িকার সুখে তাহাদের মুখে হাসি ফোটে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই সমস্ত কাহিনী লোকসাহিত্যের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। পঞ্জাবী লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হীর এবং রঞ্জার কাহিনী এমনই একটি কাহিনী। নায়ক রঞ্জা পশ্চিম পঞ্জাবের বিতস্তা এবং চন্দ্রভাগা বিধৌত ঝঙ্গ জেলায় তখত হাজারা গ্রামের মুসলমান জাট চৌধুরী বা মোড়ল আজুর কনিষ্ঠ পুত্র। তাহার প্রকৃত নাম থিদো। কিন্তু রঞ্জা নামেই সে পরিচিত। তাহারা সাত (মতান্তরে আট) ভাই। সকলের ছোট বলিয়া সেই ছিল পিতার নয়নের মণি। রঞ্জা বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আজুর মৃত্যু হয়। বহুদিন পূর্ব্বে মাও মরিয়াছেন। রঞ্জার জীবনে দুঃখের মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

ভাইয়েরা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক, বিবাহিত। রঞ্জা ভ্রাতৃবধূদিগের চক্ষুশূল, অগ্রজগণও তাহার উপর বিরূপ। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইল। রঞ্জার বয়স কম। সংসারের কোন অভিজ্ঞতাই নাই। তাহার হইয়া কথা বলিবারও কেহ নাই। এক্ষেত্রে সচরাচর যাহা হয়, তাহাই হইল। রঞ্জা তাহার প্রাপ্য অংশ পাইল না।

দিনের পর দিন ভ্রাতৃবধূদিগের দুর্ব্ব্যবহার বাড়িয়া চলিল। অগ্রজগণও তাহাদের পক্ষে—নিক্রিয় দর্শক, কখনও কখনওবা সক্রিয় সমর্থক। রঞ্জা স্বর্গত জনক-জননীর কথা স্মরণ করে আর নীরবে চোখের জল মোছে। কিন্তু মানুষের সহনশীলতারও সীমা আছে। রঞ্জাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ভ্রাতা এবং ভ্রাতৃ-বধূদিগের অত্যাচার চরমে উঠিলে নিজের প্রিয় বাঁশীটিকে মাত্র সম্বল করিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। কাহারও নিষেধ মানিল না।

দিন চলিয়া যায়। রঞ্জা পথে পথে ঘুরিতেছে। বিশাল বিশ্বে সে একেবারেই নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ এবং নিরাশ্রয়। ঘর এবং আপনার জন থাকিয়াও নাই।

এই সময় রঞ্জা কিছুদিনের জন্য একটি মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করে। মসজিদে অবস্থানকালে এক তরুণী তাহার প্রতি আসক্ত হয়। তরুণীর মাতা অনেক বুঝাইল। কিন্তু তাহার এক কথা। এই অজ্ঞাতপরিচয় রূপবান্ তরুণ ব্যতীত কাহারও কণ্ঠে সে বরমাল্য দিবে না। মাতা একদিন কন্যার অজ্ঞাতসারে মসজিদে আসিয়া রঞ্জাকে দেখিয়া তাহার রূপে মোহিত হইয়া গেল। বাড়ী ফিরিয়া সে কন্যাকে বলিল যে, বয়স থাকিলে সে নিজেই রঞ্জাকে

ঋণং কৃত্বা...

এমন একদিন বোধহয় সত্যিই ছিল যখন লোকে ঘি খাবার জন্তে ধার করতেও পেছপাও হোতনা। মহাজনদের বিধান ছাড়াও তার অন্য কারণ ছিল। দুধ অমৃতের সমান আর সেই দুধ থেকে তৈরী ঘি, মাখন, ছানা, দই, ক্ষীর। সুতরাং স্বাস্থ্যের পক্ষে এইসব খাবার যে একেবারেই অপরিহার্য্য এ বিষয় কারো কোন দ্বিধা ছিলনা। আর সত্যিই দ্বিধা থাকবার কোন কথাও নয়। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ভাল টাটকা খাবার অপর্য্যাপ্ত পরিমানে পাওয়া যেত আর সাধারণ লোকে তা কিনতেও পারতো। দুধের সাধ ঘোলে মেটাবার কথা তখন উঠতোই না।

এখন দিনকাল বদলেছে। গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, পুকুরভরা মাছ পরিবৃত হয়ে জমিদার মশাই বসে তামাক খেতে খেতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খোসগল্প করছেন আর তাসপাসা খেলছেন—এ এখন গল্পকথায় দাঁড়িয়েছে। তাঁর বংশধরদের এখন সকাল নটায় পড়ি কি মরি করে আপিসে কিম্বা নিজের ধান্দায় ছুটতে হয়।

সত্যিই আজকের এই ডামাডোল আর মাগ্গিগণ্ডার বাজারে সংসার করা, আয়ের মধ্যে চলা অতি দুরূহ কাজ। সবদিক সামলে, নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে চলা যে কত শক্ত কথা তা সকলেই জানেন। বাড়ীভাড়া, কাপড়চোপড়, ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের মাইনে আর বই-খাতার খরচেই হিমসিম খেয়ে যেতে হয়, তাই অনেক সময়েই লোকে খাবার দাবারে খরচ কমিয়ে খরচ বাঁচাতে চায়। কিন্তু আজকাল আগেকার তুলনায় ঝামেলা বেড়েছে খাটাখাটুনি ও দুশ্চিন্তাও বেড়েছে। তাই ভেবে দেখুন যে খাবার দাবারে খরচ কমানো মানে কি? তার মানে হয় আধপেটা খেয়ে থাকা নয়'তো নিকৃষ্ট বা ভেজাল জিনিষ খাওয়া। কিন্তু তাতে কি সত্যিই পয়সা বাঁচে? যে পয়সাটা বাঁচে তাতো ডাক্তারের পকেটে বা ওষুধ পত্তরেই খরচ হয়ে যায় অনেক সময়। সুতরাং পুষ্টিকর স্বাস্থ্যদায়ক জিনিষ খাওয়া যে একান্তই দরকার একথা বলে বোঝাবার দরকার নেই, বিশেষ করে বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের, বাড়ীর কর্ত্তার, গিন্নীঠাকুরনের কথা তো ছেড়েই দিচ্ছি। সুতরাং ঋণং কৃত্বা ছাড়া উপায় নেই এই কথা ভাবছেন তো? না, আছে; উপায় আছে। আর সে উপায় অবলম্বন করা বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে খুবই সোজা।

একটা সোজা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। আপেল। আমরা সবাই জানি আপেল শরীরের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ইংরেজীতে তো প্রবাদবাক্যই আছে যে রোজ একটা করে আপেল খাওয়া মানে ডাক্তারকে দূরে রাখা। কিন্তু আপেল সাধারণতঃ দুর্মূল্য, তাই কজনেই বা রোজ আপেল খেতে পারে বলুন? কিন্তু আপেলের চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় সমান উপকারী ফল বা তরকারী খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায়। যেমন ধরুন টোম্যাটো, যাকে আমরা বিলিতী বেগুন বলি, বা কলা— আপেলের চেয়ে অনেক কম দাম কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। আরেকটা উদাহরণ হচ্ছে ঘি। খাঁটি টাটকা গাওয়া ঘি ভাল জিনিষ, কিন্তু তা পাওয়া গেলেও বেশী দাম। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্তে সব সময় গৃহস্থের পক্ষে খাঁটী ঘি কেনা হয়তো সম্ভব হয়না। সেখানে স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। ডালডায় খরচ কম আর ডালডা ঘি এর মতোই উপকারী। একথা জানেন কি যে ডালডা ও খাঁটী গাওয়া ঘিয়ে একই পরিমান ভিটামিন 'এ' আছে। ভিটামিন 'এ' শরীরের বাড়ের জন্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং দাঁত, চোখে ও গায়ের চামড়ার জন্তে অত্যন্ত উপকারী। ভিটামিন 'এ' স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি অত্যন্ত দরকারী জিনিষ। তাই এই স্বাস্থ্যদায়ক ভিটামিন 'এ' যুক্ত ডালডা আপনার শরীরের পক্ষে এত ভাল। ডালডায় ভিটামিন 'ডি' ও দেওয়া হয়। ভিটামিন 'ডি' ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভালো। ভিটামিন 'ডি' দাঁত ও হাড়কে সবল করে। শুধুমাত্র খাঁটী ভেষজ তেল থেকে ডালডা স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্ব্বদা শীলকরা টিনে খাঁটী ও তাজা পাবেন। এই সব কারনেই ডালডা আজ দেশের লক্ষ লক্ষ পরিবারে ব্যবহৃত হচ্ছে। নিশ্চিন্ত মনে আজই ডালডা কিনুন—কিনে পয়সা বাঁচান, শরীর ভাল রাখুন। মনে রাখবেন, ডালডা মার্কা বনস্পতি শুধুমাত্র খেজুরগাছ মার্কা টিনেই পাওয়া যায়, এই টিন দেখে কিনবেন।

বিবাহ করিত। কিছুদিন মসজিদে অবস্থানের পর রঞ্ঝা এই আশ্রয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কি কারণে জানা যায় না।

আবার পথে। ঘুরিতে ঘুরিতে রঞ্ঝা চন্দ্রভাগা নদীর কূলে উপস্থিত হইল। খরস্রোতা বিশালবক্ষ চন্দ্রভাগা। খেয়া নৌকা ছাড়িয়া যাইতেছে। রঞ্ঝা নৌকার কাছে গেল। পারাণির পয়সা নাই। মাঝি তাহাকে নৌকায় উঠিতে দিল না। রঞ্ঝা কাকুতি-মিনতি করিল। মাঝি নির্ব্বিকার। নিরাশহৃদয় রঞ্ঝা মনের দুঃখে বাঁশী বাজাইতে বসিল। রঞ্ঝার বাঁশীর সুরে নৌকার আরোহীরা মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারা সকলে রঞ্ঝাকে পার করিবার জন্য মাঝিকে অনুরোধ করিল। মাঝি এই অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না।

খেয়া নৌকা অপর কূলে ভিড়িলে যাত্রীরা যে যাহার গন্তব্য-স্থানে চলিয়া গেল। রঞ্ঝার নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যস্থান নাই। সে একা পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রভাগার কূলে সেয়াল গ্রাম। মুসলমান জাট চৌধুরী চুচক গ্রামের মোড়ল। তাহারই কন্যা হীর কাহিনীর নায়িকা। অসামান্য তাহার রূপ। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—

"থির বিজুরি বরণ গোরী"

সকলের মুখেই তাহার সৌন্দর্য্যের খ্যাতি। রঞ্ঝাও হীরের কথা শুনিয়াছিল। তাহার এক ভ্রাতৃবধূ রঞ্ঝাকে একদিন বলিয়াছিল—মরি, মরি, কি রূপের বাহার! রূপে হীরের যোগ্য পাত্র সন্দেহ নাই। সেদিন হইতে রঞ্ঝার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, হীরের সহিতই তাহার বিবাহ হইবে।

সম্পন্ন পিতার দুলালী হীর। তাহার কোন সাধই অপূর্ণ থাকে না। নৌবিহার এবং জলকেলির জন্য পিতা তাহাকে একখানা নৌকা করিয়া দিয়াছেন। নদীর ঘাটে প্রমোদ-তরণী বাঁধা। নৌকায় আরোহী কেহ নাই। নদীতীরে জনমানব নাই। রঞ্ঝা নৌকায় উঠিয়া হীরের বিছানায় গা ঢালিয়াছিল। নৌকার তত্ত্বাবধায়ক নিষেধ করিল। রঞ্ঝা তাহার নিষেধে কর্ণপাত করিল না। দীর্ঘ পর্য্যটনে শ্রান্ত, ক্লান্ত রঞ্ঝা অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িল।*

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। হীর স্নানের জন্য নদীতে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার ষাট সখী। হীর দেখিল যে, অজ্ঞাতকুলশীল কে একজন তাহার বিছানায় ঘুমাইতেছে। ক্রোধে আত্মহারা হীর তাহাকে পদাঘাত করিতে গেল। না চাহিতেই 'পদপল্লবমুদারম্'! গোলমালে রঞ্ঝার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে হীরের মুখের দিকে চাহিল। রঞ্ঝার দৃষ্টিতে কি মায়া মাখানো ছিল হীরই জানে। হীরও রঞ্ঝার দিকে চাহিল। মানুষের এত রূপ হয়!

হীর রঞ্ঝার রূপে মজিল। তাহার অবস্থা—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥"

রঞ্ঝাও হীরের প্রেমে পড়িল। দুয়েরই তখনকার অবস্থা—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

হীরের সুপারিশে হীরের পিতা রঞ্ঝাকে রাখালের কাজ দিলেন। রঞ্ঝা একে সুপুরুষ, তাহার উপর কর্ত্তব্যপরায়ণ। সকলেই তাহাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিত। রঞ্ঝার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি হীরের সতর্ক দৃষ্টি। থাকিবারই কথা। মা-বাপকে লুকাইয়া উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সে মাঠে রঞ্ঝাকে দিয়া আসিত। প্রেমিক-প্রেমিকা বাড়ীতেও নানা ছলছুতায় মিলিত হইত।

দিন যায়। এমন সময় হীর-রঞ্ঝার প্রেমের আকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইল কাইদো। সম্পর্কে সে হীরের মাতুল। তাহার একখানা পা খোঁড়া। হীর এবং রঞ্ঝার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ তাহার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তাহাদের নামে কুৎসা রটাইয়া বেড়াইতে লাগিল। হীর এবং তাহার সঙ্গিনীগণ একদিন তাহাকে বেদম মার দিয়া তাহার ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল। কাইদো ইহার পর একদিন হীরের পিতাকে বনের মধ্যে রঞ্ঝা ও হীরকে দেখাইয়া দিল। চুচক চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তিনি নিজে প্রথমতঃ কন্যাকে বুঝাইলেন। কোন ফল না হওয়ায় তিনি কাজীর দ্বারস্থ হইলেন। কিন্তু পিতার অনুরোধ, কাজীর উপদেশ, মায়ের তিরস্কার এবং চোখের জল সমস্তই বৃথা হইল। নদী উৎসমুখে ফিরিয়া যায় না, স্রোতমুখে বাধা পড়িলে স্রোত তীব্রতর হয় মাত্র। হীরের এক কথা। সে রঞ্ঝাকে ভালবাসে। রঞ্ঝাকেই সে বিবাহ করিবে।

চুচক রঞ্ঝাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই আবার তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হইল। নূতন রাখাল পশুপালকে ঠিকমত চরাইতে পারে না। তাহাদের দুধ বন্ধ হইয়া গেল। রঞ্ঝাকে দ্বিতীয় বার কাজে বহাল করিবার পর তাহাকে চোখে চোখে রাখা হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে হীর গ্রামের নাপিত-বৌ মিঠির দ্বারস্থ হইল। প্রেমিক-প্রেমিকা ইহার পর অন্যের অজ্ঞাতসারে মিঠির কুটীরে মিলিত হইত।

এদিকে চুচক হীরকে পাত্রস্থ করিবার সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির

* এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে, রঞ্ঝা নদীতীরে হীরের বসিবার এবং বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পড়িয়া ছিল।

করিয়া ফেলিলেন। পাত্র সাইদা রঙপুর গ্রামের মোড়লের ছেলে। হীর কিছুই জানে না। চুচকের বিশ্বাস যে, কোন রকমে রঞ্জাকে চোখের আড়াল করিয়া দিলেই হীর তাহাকে ভুলিয়া যাইবে। সেই জন্যই হীরকে পাত্রস্থ করিয়া স্বামীগৃহে পাঠাইবার নিমিত্ত তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভিজ্ঞ চৌধুরী তরুণ-তরুণীর হৃদয়-রহস্য জানিতেন না।

নির্দ্ধারিত দিনে বরযাত্রীর দল লইয়া সাইদা হীরের পিতৃগৃহে উপস্থিত হইল। কনেকে বিবাহসভায় আনা হইলে সে বাঁকিয়া বসিল। সে বলিল যে, পাঁচনি সাক্ষী করিয়া সে রঞ্জাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। সাইদাকে সে বিবাহ করিবে না। কেহই সে-কথা শুনিল না। জোর করিয়া সাইদার সহিতই তাহার বিবাহ দেওয়া হইল।

হীর কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর ঘর করিতে চলিল। সে সেখান হইতে রঞ্জাকে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাহার সহিত দেখা করিতে সংবাদ পাঠাইল। রঞ্জা যোগীশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথের শিষ্য বালনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। গুরুর কৃপায় সে কিছু যোগৈশ্বর্য্যও লাভ করিল।

সন্ন্যাসীবেশী রঞ্জা রঙপুরে উপস্থিত হইল। গ্রামের তরুণীরা তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল যে, ঘরের জ্বালা সহিতে না পারিয়া সে পথে বাহির হইয়াছে। কেহ-বা বলিল যে, হতাশ প্রেমিক। হীরের ননদিনী সেহিতি রঙ-পুরের তরুণীদের নেত্রী। সে বাড়ী ফিরিয়া জানাইল যে, গ্রামে এক অলৌকিক শক্তিশালী সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইয়াছে। সে হয় ত হীরকে ভাল করিতে পারিবে। বিবাহের পর হইতেই হীরের অসুখ। সে হাসে না। ভাল করিয়া কাহারও সহিত কথা বলে না। দিন রাত মুখ ভার করিয়া থাকে। স্বামী সাইদাকে কাছে ঘেঁষিতে দেয় না।

রঞ্জা ঘুরিতে ঘুরিতে হীরের স্বামীগৃহে উপস্থিত হইল। সেহিতি তাহাকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আনিল। হীরও সেখানে ছিল। রঞ্জা দেখিয়াই চিনিল। কিন্তু হীরের মুখে ঘোমটা। তাহার উপর রঞ্জাও ছদ্মবেশী। সে রঞ্জাকে চিনিতে পারিল না। রঞ্জাকে কৌশলে নিজের পরিচয় দিল। যোগীর হাবভাব সেহিতির ভাল লাগিল না। সে রঞ্জাকে কটুকাটব্য করিল। রঞ্জাও ছাড়িয়া কথা বলিল না। ফলে দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হইয়া গেল। রঞ্জা চলিয়া গেল। সেহিতি অজানা অচেনা পরপুরুষের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য হীরকে তিরস্কার করিল।

রঞ্জা রঙপুর গ্রামের মধ্যে বা তাহারই প্রান্তে একটি উপবনে আস্তানা ফেলিল। সেহিতি এবং তাহার সখীরা এখানে আসিয়া তাহাকে জ্বালাতন করিত। রঞ্জা ইহাদের একজনকে একদিন ধরিয়া ফেলিল। বন্দিনী প্রতিশ্রুতি দিল যে, সে হীরের নিকট তাহার সংবাদ পৌঁছাইবে। বন্দিনী মুক্তি পাইল। সে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে ভুলিল না। হীর গোপনে রঞ্জার আস্তানায় তাহার সহিত দেখা করিল। দীর্ঘ বিরহের অবসানে মিলন। আনন্দ আর ধরে না। হীরের দেহ-মনে এই আনন্দ প্রতিফলিত হইল। সখীরা ঠাট্টাতামাশা করিল।

অবশেষে হীর একদিন সেহিতিকে মনের কথা বলিল। সেহিতি নিজেও ভুক্তভোগী। সে হীরের দুঃখ বুঝিল। রঞ্জার সহিত দেখা করিয়া সে বলিল যে, রঞ্জা যদি তাহার (সেহিতির) মনের মানুষ মুরাদকে আনিয়া দেয়, তবে সে হীর-রঞ্জার মিলনে সহায়তা করিবে। রঞ্জা তাহাতেই রাজী। হীর নিয়মিত রঞ্জার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল। হীর, রঞ্জা এবং সেহিতি ব্যতীত কাক-পক্ষীও তাহা টের পাইল না।

হীর, রঞ্জা এবং সেহিতি গোপনে পরামর্শ আঁটিল। হীর
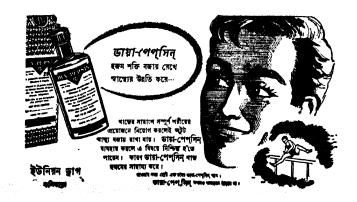
এবং সেহিতি তুলা তুলিবার জন্ম মাঠে যাইতেছে। হীর হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল। পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে। হীর বলিল, তাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে। ওঝা-বৈদ্য আসিল। কত ঝাড়-ফুক হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হীরের স্বামী সাইদা রঞ্ঝার আস্তানায় ধরনা দিল। রঞ্ঝা বলিল যে, কুমার এবং কুমারীর উপরই তাহার মন্ত্র কার্য্যকরী হয়। অন্তের উপর নয়। সাইদা বলিল যে, হীর বিবাহিতা হইলেও তাহার কৌমার্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্বামীর সহিত দৈহিক মিলন দূরের কথা, স্বামীকে সে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দেয় নাই। রঞ্ঝা হীরের চিকিৎসা করিতে রাজী হইল। হীরের শ্বশুর সমাদরে তাহাকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিলেন।

রঞ্ঝার নির্দ্দেশে বাহিরের একটি ঘর খালি করিয়া হীরকে সেখানে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। রঞ্ঝা বলিল যে, তীব্র বিষধর রঞ্ঝাকে দংশন করিয়াছে। অনেকক্ষণ ঝাড়-ফুক করিতে হইবে। রাত্রিতে চিকিৎসা আরম্ভ হইবে। একটি মাত্র কুমারী ব্যতীত সে সময় আর কেহ রোগিণীর ঘরে থাকিতে পারিবে না। রাত্রিতে সেহিতি তাহার কাছে রহিল।

গভীর রাত্রি। সমস্ত গ্রামখানি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ নিথর, নিঝুম। কচিৎ নিশাচর পাখীর ডাক নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। রঞ্ঝা মন্ত্রবলে সেহিতির পাণিপ্রার্থী মুরাদকে আনিয়া উপস্থিত করিল। হীর, রঞ্ঝা, সেহিতি ও মুরাদ রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া রঙপুর ছাড়িয়া গেল।

সকালবেলা হীর এবং সেহিতির গৃহত্যাগের কথা জানাজানি হইয়া গেল। তাহাদিগকে ধরিবার জন্ম চারিদিকে লোক ছুটিল। সেহিতি এবং মুরাদের দেখা পাওয়া গেলেও তাহাদিগকে ধরা গেল না। গভীর বনে ঘুমে অচৈতন্ম হীর এবং রঞ্ঝাকে ধরিয়া রাজদরবারে হাজির করা হইল। সাইদা এবং রঞ্ঝা দু'জনেই হীরকে নিজ নিজ বিবাহিতা পত্নী বলিয়া দাবি করিল। হীর রঞ্ঝার দাবির পোষকতা করিল। কাজীর বিচারে এই দাবি টিকিল না। হীরকে সাইদার হাতে দেওয়া হইল। রঞ্ঝা অভিশাপ দিল যে, রাজার রাজধানী আগুনে পুড়িয়া যাইবে। ইহার পর সত্যই রাজধানীতে আগুন লাগিল। কিছুতেই আগুন নিভানো যায় না। বিপন্ন রাজা রঞ্ঝাকে আগুন নিভাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। হীরের মন্ত্রবলে দেখিতে দেখিতে আগুন নিভিয়া গেল। রাজার আদেশে হীরকে রঞ্ঝার হাতে সমর্পণ করা হইল।

হীর এবং রঞ্ঝা সেয়ালে রঞ্ঝার পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিল। কয়দিন পর হীরের পরামর্শে রঞ্ঝা স্বগ্রাম তখত হাজারায় ফিরিয়া গেল। কথা রহিল যে, সে সামাজিক রীতি অনুযায়ী বরযাত্রীর দল লইয়া ফিরিয়া আসিবে এবং হীরকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে।

বড় অশুভক্ষণেই রঞ্ঝা তখত হাজারা যাত্রা করিয়াছিল। কন্যা ভৃত্যের সহিত কুলত্যাগ করিয়াছে। কুলত্যাগিনী কন্যা এবং তাহার প্রণয়ী দু'জনেই বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। দু'দিন বাদে কন্যা প্রণয়ীর সহিত তাহার ঘর করিতে যাইবে। এ অপমান হীরের পিতার নিকট অসহ্য হইল। কিন্তু রাজা স্বয়ং হীরকে রঞ্ঝার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ অমান্য করিবার সাধ্য বা সাহস চৌধুরীর নাই। শ্যালক কাইদো হীরকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার পরামর্শ দিল। চৌধুরী তাহাই করিলেন। মৃত্যু অভাগিনী হীরের সমস্ত জ্বালা জুড়াইয়া দিল।

হীরের মৃত্যুর পর রঞ্ঝা বরযাত্রীর দল লইয়া সেয়ালে ফিরিয়া আসিল। চোখে তাহার প্রিয়া-মিলনের স্বপ্ন। বাঞ্ছিতাকে লইয়া নীড় বাঁধিবার রঙীন স্বপ্নে সে মশগুল। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। গ্রামে পা দিয়াই সে হীরের মৃত্যুসংবাদ শুনিল। রঞ্ঝা এ শোক সহ্য করিতে পারিল না। শোকে এবং নৈরাশ্যে তাহারও মৃত্যু হইল। যদি মৃত্যুতেই সব শেষ না হয়, তাহা হইলে হীর এবং রঞ্ঝা দু'জনেই হয় ত পরলোকে মর্ত্ত্যের ব্যর্থতা এবং বেদনা ভুলিতে পারিয়াছে।

হীর এবং রঞ্ঝার কাহিনী সত্য ঘটনামূলক। তবে সত্যের সহিত কল্পনার খাদ মিশিয়াছে। কাহিনীর নায়ক-নায়িকা মোগল সম্রাট বাবরের সমসাময়িক। পঞ্জাবের অন্যতম খ্যাতিমান্ প্রাচীন কবি দামোদর সর্ব্বপ্রথম হীর এবং রঞ্ঝার করুণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। দামোদর নিজে সেয়ালের অধিবাসী ছিলেন। হীরও সেয়াল গ্রামের মেয়ে। দামোদর বলেন যে, তিনি স্বচক্ষে হীর এবং রঞ্ঝাকে দেখিয়াছেন। সেয়ালে তাঁহার একটি মুদিখানা ছিল। শিখগুরু গোবিন্দ সিংহের (১৬৬৬-১৭০৮) 'বচিত্তর নাটক' নামক গ্রন্থে হীর এবং রঞ্ঝার উল্লেখ পাওয়া যায়। একাধিক কবি হীর এবং রঞ্ঝার প্রেমকাহিনী অবলম্বন করিয়া হিন্দী এবং পঞ্জাবী ভাষায় উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়াছেন। মধ্যযুগের সুফী এবং ভক্ত সাধকদিগের লেখাতেও হীর ও রঞ্ঝার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

হীর-রঞ্ঝার মৃত্যুর পর কতকাল চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু পঞ্জাবের জনচিত্তে তাহাদের স্মৃতি আজও অম্লান রহিয়াছে। প্রেম তাহাদিগকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছে। পশ্চিম পঞ্জাবের ঝঙ্গ জেলায় হীর এবং রঞ্ঝার সমাধি আজও বর্ত্তমান। প্রতি বৎসর এখানে একটি বার্ষিক মেলা হয়। অচলায়তন সমাজ তাহাদের প্রেমকে স্বীকার করে নাই, কিন্তু পঞ্জাববাসী তাহাদের মহৎ প্রেমের যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হীর এবং রঞ্ঝার সমাধিক্ষেত্রে মেলা এই মর্য্যাদারই স্বীকৃতি।

আর্য্য হিন্দু

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

পৃথিবীতে মোরা আদিম আর্য্য হিন্দু,
আমাদেরি মহাঋষি অগস্ত্য গণ্ডুষ করি পান করেছিল সিন্ধু।
বিন্ধ্য তাহারে দিল বন্দনা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে কুমারীকন্যা,
আর্য্যেরি মহাসভ্যতায় সে জয়গৌরবে বহা'ল কৃষ্টিবন্যা।
আদি মহানর মোদেরি ব্রহ্মা তারি পৌত্রেরা স্বর্গ রচিল হর্ষে,
স্বর্গ হইতে দেবেরি বংশ আর্য্য আমরা এসেছি ভারতবর্ষে।
মোদেরি মনুর গোত্র হইতে মানবসৃষ্টি বিরাট সে পরিকল্প,
অমৃতের ছেলে আমরা আদিম, আমরা শ্রেষ্ঠ এ নহে কথনো গল্প।
তপস্যা দিয়া শক্তিকে বাঁধি' শক্তিজয়ের মোরাই প্রথম যাত্রী,
ধন্য আমরা—আমাদেরি দেশে অসুর নাশিল দুর্গা জগদ্ধাত্রী।

সূর্য্য পবন অগ্নি ও জলে প্রথম যাহারা বন্দিল মহানন্দে,
মন্ত্রে যাহারা দেবতা জাগায়ে যজ্ঞ করিয়া বেদ রচে গেল ছন্দে।
ঈশ্বর থেকে জীবের সৃষ্টি, আত্মা অমর তাহাদেরি মহাবাক্য,
উপনিষদ্ আর ষড়দর্শন গীতা ও চণ্ডী তারা রেখে গেছে সাক্ষ্য।
সকলের আগে একদা তারাই উড়াল বিমান বিজ্ঞানে মহানন্দে,
আদিতে তারাই সোনার সমাজ গাঁথিল সাম্যে রূপে রসে গীতে গন্ধে।
শাসক তাহারা ছিল না শোষক—প্রজাদের তারা করেছিল স্নেহে বন্দী,
সূর্য্যে তাহারা তূর্য্য বাজাল সৃষ্টির রসে গায়ত্রী দিয়া ছন্দি'।
ভূভার হরিতে জাগে এই দেশে অবতারদের জন্মের মহালগ্ন,
হেথা একদিন যা ছিল সত্য আজিকার এই পৃথিবীতে তাহা স্বপ্ন।

একদা তারাই করিল শাসন মহা গৌরবে সসাগরা এই বিশ্ব,
কত না প্রাচীন সভ্য জাতি যে সভ্যতা বহি' হইল তাদেরি শিষ্য।
সপ্তদ্বীপা এ মহাপৃথিবী ভাগ করি তারা রচিল সাতটি অংশে,
মহাসিন্ধুকে মন্থিল যারা ধন্য আমরা জন্ম তাদেরি বংশে।
আদি মহাকবি বাল্মীকি ব্যাস রচিলেন শ্লোক এই দেশ-মা'রি অঙ্গে
সত্যের লাগি শিশু প্রহ্লাদ যুদ্ধ করিল দৈত্যবলের সঙ্গে।
স্মরি গৌরবে মোদেরি রাঘব লঙ্কাজয়ের বাঁধিল মাতাল সিন্ধু,
চিররহস্যভরা এ দেশের পাহাড়নদীও ধূলিতে বিন্দু বিন্দু।
অমৃতস্য পুত্রার শ্লোকে অতীত মোদের মহাগরিমায় ধন্য,
গর্ব্বে ললাট রবে উন্নত বুদ্ধদেবের হেথা জন্মের জন্য।

এই মহাদেশে অগ্নির বুকে ইজ্জত লাগি ঝাঁপ দিল বধূকন্যা,
অগ্নির মাঝে পরীক্ষা দিয়া এ দেশেরি সীতা নারীলোকে হল ধন্যা।
পতির জীবন দিল সাবিত্রী তর্কযুদ্ধে জিতিয়া যমের সঙ্গে,
মৃত স্বামীশবে বাঁচাবার লাগি ভাসিল বেহুলা হেলায় নদীতে রঙ্গে।
এত নিষ্পাপ যে দেশের নারী সেই দেশমাতা স্বর্গ বলিয়া গণ্যা,
সেই স্বর্গেরে করেছে ধন্য তারা আমাদেরি আর্য্যেরি বধূকন্যা।

যে জাতির মাঝে ছিল না চৌর্য্য, সমাজে যাদের পাপ ছিল চিরলুপ্ত,
গ্রীসের রাজারে করেছিল জয় তাদেরি পুত্র মোদেরি চন্দ্রগুপ্ত।
জন্মভূমির মুক্তিযজ্ঞে রোমাঞ্চ দেয় আজো এ মাটিতে ফিরতে,
রব চিরদিন উন্নতশির হলদীঘাটের স্মরিয়া সমরতীর্থে।

পৃথিবী নেমেছে অনেক নিম্নে, কত জাতি দেশ হয়ে গেছে কবে ধ্বংস,
তবু বেঁচে আছে আর্য্যহিন্দু শ্মশানের মাঝে মনুর আদিম বংশ।
সেই শ্মশানের ভস্মের বুকে দাঁড়ালেন উঠে শঙ্কর গোরা ছন্দে,
শ্রীঅরবিন্দ এই ভারতের নবীন জন্ম দেখিলেন ধ্যানানন্দে।
বঙ্কিম রবি দিল সাহিত্য সুরেন্দ্রনাথ আনিল স্বদেশীবন্যা,
অহিংস রণ দানিল গান্ধী শ্রীরামকৃষ্ণে বহি দেশমাতা ধন্যা।
রামমোহন আর বিবেকানন্দ জ্বালিল ভুবনে ভারতের জ্ঞান-অগ্নি,
দেশবন্ধুর দীপ্ত পরশে জাগিয়া উঠিল কোটি কোটি ভাইভগ্নী।
বেতারবার্ত্তা দিল জগদীশ শ্যামাপ্রসাদে স্মরি মোরা মহাগর্ব্বে,
লক্ষ্মীবাই ও নন্দকুমার জন্মিয়াছিল এই ভারতেরি স্বর্গে।

যুগেরি চক্র ঘর্ঘরি হেথা ধূমকেতু সম উদিল সুভাষচন্দ্র,
জাগ্রত ভ্রাতা-ভগ্নীর বুকে জলদ মন্দ্রে ধ্বনিল মাভৈঃ মন্ত্র।
ব্রিটিশের চোখে ভেল্কি লাগায়ে লঙ্ঘি' সাগর বিরাট শৌর্য্য সঙ্গে,
জাপানী স্বার্থ হটাইয়া দিয়া দুঃসাহসী সে ঝাঁপ দিল রণরঙ্গে।
আজাদ হিন্দ সৈন্য গড়িয়া বিস্ময়সম ভারত করিতে মুক্ত,
তাড়াইয়া দিয়া ইংরেজ-সেনা কোহিমার পথ করেছিল উন্মুক্ত।
'দিল্লী চলরে, দিল্লী চলরে' এখনো গগনে উঠিছে তাহারি শব্দ,
জাতির হৃদয়জয়ের বার্ত্তা রবে ইহা চির সুভাষেরি জয়লব্ধ।
লালকেল্লার দখলের ধ্বনি সত্য হয়েও যদিও হয়েছে স্বপ্ন,
সুভাষের সেই যুদ্ধযাত্রা রবে ইহা চিরজাতির জীবনে লগ্ন।

ঝান্সীর রাণীবাহিনীর স্মৃতি ঐ জ্বলে ঐ নারীগরিমার ভর্গ,
ভারতের ভাবী শিশুদের বুকে জাগ্রত এই রূপকথা হবে স্বর্গ।
বুড়ীবালামের মুক্তিযুদ্ধে ঐ ত্যাথ কারা মৃত্যু বরিল ছন্দে,
জালালাবাদের সংগ্রামে যারা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ায়েছে মহানন্দে।
মৃত্যু তাদের করেছে প্রণাম—তারা কারা? তারা আমাদেরি ভাইভগ্নী,
মাতৃপূজার মৃত্যুবিজয়ী ঝাঁপ দেছে তারা ঐ জ্বলে তারি অগ্নি।
শ্রীকৃষ্ণ যেথা নিলেন জন্ম ঋষিরা যে দেশ করে গেছে ভাই ধন্য,
তাদের পুণ্য মহাসংস্কৃতি রবে অক্ষয় অসীম কালের জন্য।
তাঁহারা আর্য—চিরকাল তার ধ্বনিবে কীর্ত্তি হিমাচল থেকে সিন্ধু,
তাদের কখনো হবে না ধ্বংস, তাঁহারা অমর তাহারা আর্য্যহিন্দু।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

মায়াময়ী

শ্রীনির্ম্মলকুমার চট্টোপাধ্যায়

চক্ষেতে বিদ্যুৎ ! অধরেতে হাস্য !
আমি যেন অদ্ভুত আলেয়ার লাস্য !
আঁধারেতে ঘুমঘোরে বাঁধি কারে ফুলডোরে ?
ঠোঁট ঝরে চুম পড়ে—মায়াভরা আস্য !

ফুলরূপে লীলা করি অন্তরে ফূর্ত্তি—
হেসে আমি তাই ধরি মানবীর মূর্ত্তি !
ধরাবুকে জেগে উঠি, রমণীর রূপে ফুটি ;
নববেশে হেসে লুটি পেয়ে নব মুক্তি ।

মোর চোখ চঞ্চল, মোহ মোর অলকে,
এই নীল অঞ্চল উজ্জ্বল ঝলকে ।
হেসে তব পানে চাই, পুলকেতে দূরে ধাই,
অপরূপ গীত গাই চক্ষের পলকে ।

উন্মাদ চিত্তেতে চোখে চোখ মিলাতে
উচ্ছসি' নৃত্যেতে লহরের লীলাতে !
পুলকেতে উচ্ছল, স্বপনেতে উজ্জ্বল,
প্রেমে যেন বিহ্বল—চাই চুম বিলাতে ।

চক্ষেতে কজ্জল দিই লঘু পক্ষ্মে,
আঁখিজল-ছলছল প্রেমভরা বক্ষে ।
কতদূর অজানায় আঁখি হায় চলে যায়,
একমনে শুধু চায় অনিমেষ লক্ষ্যে ।

বেণী মোর পিঙ্গল ; কুঞ্চিত অলকে—
হেনাফুল বিহ্বল অনুরাগ-পুলকে !
মোর দেহ চঞ্চল, উচ্ছল অঞ্চল,
তাতে ঠিক উজ্জ্বল বিদ্যুৎ ঝলকে ।

মৃত্যুর সাথে তাই হয় মোর চুক্তি,
'দুখ বিনা প্রেম নাই' এই মোর যুক্তি !
নবরূপে সব ভুলি, মোহ-ঘুমে শুধু ঢুলি ;
সাগরের মাঝে তুলি মুক্তার শুক্তি ।

নিদাঘেতে ধরাতলে হয় তনু দগ্ধ,
ফুলরেণু মাখি ছলে করি ধরা স্তব্ধ ।
সুদূরের দিকে চাই, সুরহারা গান গাই,
নব আশা তাই পাই হয় প্রেম লব্ধ ।

আলো হয়ে ঠিক ফুটি রক্তিম-সূর্য্যে,
আহ্বান হয়ে উঠি যৌবন-তূর্য্যে !
আঁখি জাগে অনিমিখ, ঠিকরায় আলো ঠিক ;
করে যেন ঝিকমিক মণি-বৈদূর্য্যে ।

ফাল্গুন-ফুলবনে মন মোর নিঃস্ব,
দেখি শুধু একমনে অ-ধরার দৃশ্য ।
অধরের মদিরায় ঘুমঘোর চমকায়,
মোহ শুধু মূরছায়—লীলাভরা বিশ্ব ।

আকাশ-দীপেতে চাহি : জ্যোৎস্নার সিন্ধু !—
আমি কত গান গাহি, দেখি হাসে ইন্দু ।
বাঁশী বাজে সুরেতেই, কবি ! তুমি দূরে যেই
আঁখি হতে ঝরে সেই অশ্রুর বিন্দু !

নিশিভোর ক্রীড়া মোর প্রেমিকেরে বঞ্চি',
ঘুমঘোরে হাসি-চোর স্বপনে প্রবঞ্চি' !
অন্তরে প্রেমে মোর বাঁধা কত ফুলডোর :
চলে যাই আঁখি-লোর গোপনেতে সঞ্চি' !

ছল করে ভান করি রাগ করি সন্ত,
হেসে আমি পান করি খেয়ালের মন্ত !
তোমা হেরি মন ভোলে তব চোখে চোখ ঢোলে,
হাসি-বাঁশী কলরোলে চির অনবদ্য !

দিই ভুলে চুম্বন কবিরে ঘুমন্তে :
হাসি উঠে যৌবন মধুর বসন্তে !
হেসে তবে চলে যাই, ফিরে ফিরে শুধু চাই,
লীলা যেন করে ধাই ধরণী-অনন্তে ।

মৃত্যুর পুলকেতে ফুটে উঠি পলকে,—
হাসিসম ভূলোকেতে বিদ্যুৎ ঝলকে !
মরণের কোলাহলে মম মন দোলা দোলে ;
মৃদু ঘুমে চোখ ঢোলে, দোলে বায়ু অলকে ;

করি মন স্বপ্নিল নয়ন-মাধুর্য্যে,
দেহ হয় উর্ম্মিল রূপেরি প্রাচুর্য্যে !
চরণেতে কত হিয়া যুগে যুগে গুমরিয়া
কেঁদে মরে মূরছিয়া ছলনা-চাতুর্য্যে !

ভুলভরা যৌবন বিহ্বল উছলে,—
ফুলভরা যৌবন হাওয়া পেয়ে উতলে !
আকাশের আমি ফুল, স্বপনের ভরাভুল !
তন্দ্রায় সমতুল আঁখি মোর উজলে ।

তারকার ফুল আমি, ভুল ওগো মর্ত্তে,—
আমি ভুল-পথগামী প্রেম-পরিবর্ত্তে !
নীহারিক.-সমরূপে উজ্জলি নিশ্চুপে,
ফুটে উঠি ধোঁয়া-ধূপে স্বপনের অর্ঘে !

পূব থেকে পশ্চিমে—শ্রীরমেশচন্দ্র সেন। ভারতী লাইব্রেরী, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম পাঁচ টাকা।

শ্রীরমেশচন্দ্র সেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক। শতাব্দী, গৌরীগ্রাম, কুরপালা প্রভৃতি উপন্যাস লিখিয়া তিনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছেন। সমালোচ্য 'পূব থেকে পশ্চিমে' নামক পুস্তকে বাস্তবধর্মী উপন্যাস রচনায় লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাইয়া তাঁহার অনুরাগী পাঠকমণ্ডলী মুগ্ধ হইবেন।

দশ বৎসর পূর্ব্বে ভারত ছাড়িবার প্রাক্কালে ইংরেজ তাহার চিরাচরিত কুটনীতির বলে দেশবিভাগে নেতাদের সম্মত করিয়া বাঙালীর জাতিগত সংহতির উপর যে চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছে তাহার জের আজও মেটে নাই। এই নির্মম আঘাতের দরুন পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গত মানুষের জীবনে নামিয়া আসিল বিধাতার নিদারুণ অভিশাপ। স্বাধীনতার আগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল কলিকাতায়, স্বাধীনতার পর তাহা ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িল মফস্বলে—পূর্ব্ববঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে। শেষ পর্য্যন্ত প্রাণের চেয়েও যাহার মায়া বেশী, প্রাণের দায়েই সেই সাতপুরুষের বাস্তুভিটার আকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া ছিন্নমূল নরনারী ছুটিয়া আসিল পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে—অগ্নি-অক্ষরে ইতিহাসের যে কলঙ্কিত অধ্যায় একদা রচিত হইয়াছিল পূর্ব্ববঙ্গের শ্যামল অঙ্গে, তাহার হুবহু বাস্তব চিত্র আঁকিয়াছেন রমেশচন্দ্র তাঁহার 'পূব থেকে পশ্চিমে' নামক উপন্যাসে। বইখানি শুধু বুদ্ধি বা অনুভূতি দিয়া লেখা নয়, এখানি লিখিত হইয়াছে লেখকের বুকের রক্ত দিয়া—তাই দ্বিখণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গের বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের আকুল আর্ত্তি যেন ইহার ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আর্তনাদ শোনা যায়, উপন্যাসের একেবারে সূচনাতেই শ্রীপুরের শিবকালীর স্ত্রী গয়েশ্বরীর কণ্ঠে, যখন স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে পার্শ্ববর্তী ফাঁসিপোতার আগুনের আভায় প্রদীপ্ত আকাশের পানে তাকাইয়া এই ভীত সন্ত্রস্ত পল্লীবধূ উত্তর করিল, "আমাগো কপালের আগুন। যে কপাল করিয়া আইছি।"

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের এই আগুনে কপাল পুড়িল শুধু গয়েশ্বরী আর শিবকালীর নয়, শ্রীপুর গ্রামবাসী ভদ্র-ইতর সকল শ্রেণীর নরনারীর। অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া একদা একযোগে শ্রীপুর ত্যাগ করিল নিস্তারিনী, নির্মল, শিবকালী, গয়েশ্বরী, উমা, আন্নাকালী, নবকুমার এবং আরো অনেক আতঙ্কবিহ্বল নরনারী। কিন্তু গ্রামের মায়া ছাড়িতে পারিলেন না আদর্শবাদী, দেশহিতে সর্ব্বত্যাগী, কৌমার্য্যব্রতাবলম্বী ভাস্কর—তিনি রহিয়া গেলেন শ্রীপুরেই।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই বাস্তুহারার দল আসিয়া পৌঁছিল শিয়ালদহ ষ্টেশনে। ছিন্নমূল নরনারীতে সমাকীর্ণ শিয়ালদহের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখক বলিয়াছেন, "এ যেন এক নতুন জগন্নাথক্ষেত্র, মেয়ে-পুরুষ ভেদ নেই, জাতবিচার নেই, ছোঁয়াছুঁয়ির বিধিনিষেধ নেই। নতুন একটা জাত গড়ে উঠেছে—বাস্তুহারা।"

পশ্চিম বাংলায় মহানগরীর অভিনব অবাঞ্ছিত পরিবেশে 'পূবের এই নূতন জাতের মানুষদের' সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা সংগ্রাম ও শান্তি এবং জয়-পরাজয়ের কাহিনী রমেশচন্দ্রের নিপুণ লেখনীতে একেবারে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা যেমন বাস্তবানুগ তেমনি রসোত্তীর্ণও হইয়াছে। এই উপন্যাসের প্রতিটি অধ্যায়ে একদিকে যেমন রহিয়াছে লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির পরিচয়; অন্যদিকে তেমনি ছিন্নমূল নরনারীর জন্য তাঁহার অপরিসীম দরদ রচনা করিয়াছে ইহার এক বেদনা-

---

করুণ পটভূমিকা। দেশবিভাগের পর অগণিত ছিন্নমূল নরনারীকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল ঘটনা নাটকীয় দ্রুততায় আবর্তিত হইয়াছে সেগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মানবতার এই চরম দুর্গতি ও লাঞ্ছনার ইতিহাসও অনেকেরই নখদর্পণে। এই দশ বৎসরের বাস্তব ঘটনাকে অবিকৃত রাখিয়া এবং ইতিহাসকে অতিরঞ্জিত না করিয়া 'পুব থেকে পশ্চিমে'র মত এমন একখানি সার্থক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিয়া লেখককে সাধুবাদ জানাইতেছি।

উপন্যাসখানিতে কত স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, কিন্তু প্রায় সকলেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুবের মাটি হইতে নির্মূল হইয়া যাহারা পশ্চিমে আসিয়াছে, নির্মল যেন সেই বাস্তুহারাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির উৎস। তাহার জীবন হইতে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণের দীপশিখা জ্বালাইয়া লইয়া ঘোর তমিস্রার ভিতর দিয়া আলোকের সন্ধানে চলিয়াছে তিলকনগরে উপনিবেশ-স্থাপনকারী শ্রীপুরের নরনারী। আর অন্ধকার আকাশে শুকতারার মত, কলোনীর তমসাচ্ছন্ন ভাগ্যাকাশে স্নিগ্ধ জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে নির্মলের মাতা নিভাননীর প্রসন্ন আঁখিতারকা হইতে। সকলের ঊর্ধ্বে ভাস্বর মহিমায় বিরাজ করিতেছে নির্মলের পিতৃবন্ধু ভাস্করের চরিত্রমাহাত্ম্য ও জীবনাদর্শ। কিন্তু 'পাথরের দেবতা' হইলেও ভাস্কর যে রক্তমাংসের মানুষ সেকথা অত্যন্ত সংযতভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া লেখক যে লিপি-সংযমের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে মনে গভীর ছাপ রাখিয়া যায় জয়দ্রথ সর্দার। খোঁড়া পা লইয়া নির্মলের জন্য তাহার আত্মবলিদানের কথা ভুলিতে পারা যায় না।

অন্যদিকে আবার এই বিপর্যয়ের মধ্যে যাহারা মানুষের ভাগ্যকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়াছে, ব্যক্তিগত স্বার্থই যাহাদের কাছে মুখ্য লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে সেই ধরনের চরিত্র অঙ্কনেও যে লেখকের দক্ষতা কম নয় তাহার প্রমাণ স্বজনত্যাগী, স্বার্থান্ধ 'চাচা' শ্যামচাঁদ, অর্থগৃধ্নু মন্মথ, বংশগৌরবাভিমানী যদু এবং আরো কয়েকজন স্ত্রী-পুরুষ। বস্তুতঃ 'পুব থেকে পশ্চিমে' উদ্বাস্তু-জীবনের সার্থক ও সত্য চিত্রই নয় শুধু, সঙ্কটসঙ্কুল বন্ধুর পথে ইতিহাসের বিবর্তনের একটি বেদনাপূর্ণ অধ্যায়ও ইহার মধ্যে বিধৃত রহিয়াছে।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ল্যাম্পপোস্ট যা বলেছে—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৮। মোটা বোর্ডে বাঁধানো। দাম দু'টাকা বারো আনা।

গ্রন্থখানি ঠিক উপন্যাস নয়। কলিকাতা শহরের এক অঞ্চলের কয়েকটি পরিবার ও কতকগুলি মানুষের জীবনের ছোট-বড় কাহিনী এতে একত্রে গ্রথিত। কাহিনীগুলির কথক সেই অঞ্চলেরই এক রাস্তার মোড়ের সাবেক-কালের একটি ল্যাম্পপোষ্ট। কাহিনীটির ছোট-বড় প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত, ঘটনাগুলি অতি স্বাভাবিক এবং ঘটনার সংঘাতে চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। লেখক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন। বাঙালীর সমাজে পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনের বাস্তব ঘটনাবলীকে তাই কিছুতেই তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কাহিনীর বিশেষত্ব এইখানেই। কিছুটা

নূতন টেকনিকে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। এতে যেমন লেখকের দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি সামান্য ত্রুটিও চোখে পড়ে। রাস্তার মোড়ে ল্যাম্পপোষ্টের পক্ষে ঘরের ও দূরের মানুষগুলির জীবনের সকল ঘটনা দেখা সম্ভব নয়। মনে হয়, এ ত্রুটি সম্বন্ধে লেখক নিজেও সময়ে সময়ে সচেতন হয়ে উঠে তা সংশোধনে তৎপর হয়েছেন। তবুও গল্পটির রস কোথাও বিশেষ ব্যাহত হয় নি। সেকাল ও একালের কতকগুলি চরিত্র এমন স্বাভাবিক যে, পড়তে পড়তে মনে হয় তারা যেন আমাদেরই প্রতিবেশী এবং প্রতিদিনই তাদের আমরা দেখে থাকি, তাদের কথাও কানে আসে, কিন্তু মনোযোগ দিই না। লেখকের ভাষা মিষ্ট, মার্জ্জিত ও গতিশীল। কাহিনীটি বিয়োগান্ত, রচনাটিও সার্থক।

শ্যাওলা—শ্রীবাসব। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৭। মোটা বোর্ডে বাঁধানো। দাম আড়াই টাকা।

একখানি উপন্যাস। ছোট ছেলেমেয়েদের একটি প্রাইমারী স্কুলের নূতন দিদিমণি আভা। খুবই সুন্দরী। আর ঐ স্কুলের মাতৃহীন বছর দশেক বয়সের বড় সুন্দর কিন্তু বড়ই দুরন্ত ও বুদ্ধিমান এক পড়ুয়া বাবু। প্রথম দিন থেকেই প্রথম দর্শনে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। মাতৃহীন বালকটি শেষে একদিন পিতৃহীনও হয়ে আভাদির স্নেহাঙ্কলে আশ্রয়লাভ করল। তার পর সেখানেই দশটি বছর ধরে লালিত-পালিত হয়ে শিখল অনেক লেখাপড়া। দশ বছরে সে হয়ে উঠল বিশ বছর বয়সের অতি রূপবান এক তরুণ আর আভাদিরও বয়স ও বিদ্যা বাড়লেও এবং খুব নামকরা এক স্কুলে গিয়ে উচ্চতম পদ অধিকার করলেও তিনি দেহে রইলেন সেই আগের মতই। কিন্তু মন চলতে লাগল উল্টা পথে। তাতে দেখা দিল, বাৎসল্যরসের পরিবর্ত্তে আদিরস। তাই তাঁর লালিত-পালিত প্রাক্তন ছাত্রটিকে তিনি দেখতে লাগলেন, তাঁর প্রণয়ীরূপে আর সেও তাঁকে দেখতে লাগল সেই চোখে। কিন্তু গোলমাল বাধাল আভাদিরই জনৈকা ছাত্রী এবং হোষ্টেলবাসিনী সুন্দরী সুনন্দা। বাবু তাকে দেখেই তারও প্রেমে পড়ে গেল। তার পর দুই অনিন্দ্যসুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী ও এক অতি রূপবান শিক্ষিত তরুণকে নিয়ে শুরু হ'ল পঞ্চশরের বিষম খেলা। শেষে সুনন্দারই হ'ল জয়। যা হওয়াই স্বাভাবিক। আভাদির হ'ল পরাজয়। এমন শোচনীয় অবস্থায় আভাদির কান্নাও অস্বাভাবিক নয়। তাই তিনি কাঁদলেন। কিন্তু বিজয়িনী সুনন্দা "আঁচলে তার চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'ভিক্ষে চেয়ে নিচ্ছি'। জানি, স্নেহ হস্তান্তর করার মত মর্ম্মান্তিক আর কিছু নেই। তাই মা ভাবে, বউ এসে ছেলে কেড়ে নিল।" কিন্তু আভাদির অন্তরে ত বাবুর প্রতি বাৎসল্যরস ছিল না। কবির কথায় বলতে হয়, "রমণীরে কেবা জানে।" কাহিনীটিতে উদ্ভটত্ব আছে, স্বাভাবিকতা বড় একটা নেই। তবে লেখকের ভাষা ঝরঝরে। এইটিই "শ্যাওলার" ফুল।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী—সাহিত্যপ্রকাশিকা—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ সম্পাদিত। বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু'র এক অংশ অবলম্বন করিয়া খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রসময় দাস বাংলা পয়ারে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অপ্রকাশিতপূর্ব্ব এই গ্রন্থের একটি শোভন সংস্করণ বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে বিশ্বভারতী পুথিশালার একখানি পুথি আদর্শরূপে গৃহীত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত পুথিতে যে সমস্ত পাঠান্তর পাওয়া যায় তাহা পাদটীকায় উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত আর একখানি পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দীর্ঘকাল পূর্ব্বে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই বিবরণে উদ্ধৃত গ্রন্থের প্রারম্ভ ও সমাপ্তি অংশে যে পাঠান্তর লক্ষিত হয় তাহাও যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় পুথিগুলির পরিচয় দিয়াছেন। তাহা ছাড়া, গ্রন্থকারের পরিচয়, গ্রন্থোক্ত বিষয়ের পরিচয় এবং গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের মতে—'এক সময় প্রায় সমগ্র বঙ্গে গ্রন্থখানির প্রচলন ছিল, মনে হয়; কারণ উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর জেলার ইহার একখানি পুথি ও পশ্চিমবঙ্গে দুইখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে।' কেবল

তিনখানি পুথির উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার্য। গ্রন্থের নাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির প্রারম্ভে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পয়ার' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত পুথিতে ও বিশ্বভারতীর পুথিতে ইহার নাম যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণভক্তি-বল্লিকা ও শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী। সম্পাদক মহাশয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, গ্রন্থোক্ত বিষয়ে সহিত শেষোক্ত নামের সঙ্গতি আছে। তবে গ্রন্থনামের সহিত অধ্যায় বিভাগের নাম 'লহরী'র যে মিল নাই ইহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভক্তিরসমৃত সিন্ধু নামের সহিত অবলম্বিত মূল গ্রন্থ ও অধ্যায় নামের সঙ্গতি থাকায় তাহাই ন্যায্য বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থ-শেষে সংযোজিত টীকা-টিপ্পনী, গ্রন্থোল্লিখিত ব্যক্তিপরিচয় ও (গ্রন্থোল্লিখিত) আকর-গ্রন্থাবলী (পরিচয়) পাঠকের বিশেষ কাজে লাগিবে। প্রমাণ-পঞ্জীর মধ্যে এমন দুই-একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় যেগুলিকে ঠিক প্রমাণগ্রন্থ বলা চলে না—তাহা ছাড়া, প্রমাণপঞ্জীর মধ্যে পত্রিকার ও শেষ গ্রন্থের উল্লেখ সমীচীন মনে হয় না।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

হিন্দু আইনে বিবাহ—শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ—৬৭ পৃঃ। মূল্য ৷৹ আনা।

লেখক একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে হিন্দু ব্যবহার-শাস্ত্রের, তথা 'হিন্দু-আইনের' বিবাহ-ব্যবস্থার ও দেশভেদে বহু লোকাচারের কথা একসঙ্গে বলিতে গিয়া তিনি এমন অনেক কথা বলিয়াছেন যাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, ইহাতে সাধারণ পাঠক ভ্রমে পড়িতে পারেন। দুই-একটা উদাহরণ দিই। লেখক বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের লোকদের আসলে কোন গোত্র নাই। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ব্রাহ্মণ গুরুপুরোহিতদেরই গোত্র ধারণ করে থাকেন।" (১৬ পৃঃ) ব্যাপক ভাবে এ ধরনের উক্তি সঙ্গত হয় নাই। কমলাকর ভট্ট নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিয়াছেন:

"শূদ্রানাম গোত্রাভাবে ইতি কাশ্যপম্ জ্ঞেয়ম।
তস্মাদ্ আহয় সর্ব্ব কাশ্যপাঃ ইতি শ্রুতে ॥"

ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের গোত্র ছিল; তাহাদের গোত্রাভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। কোনও শূদ্রের গোত্রাভাব ঘটিলে তাহাকে কাশ্যপ গোত্র ধরিয়া লইবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এই বিধি হইতেই বাংলায় "হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র" এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা পিতৃপক্ষে তর্পণকালে ভীষ্মের তর্পণ করি। বলি:

"বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রায় সাঙ্কৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলম্ ভীষ্মবর্মণে ॥"

কিন্তু ব্যাসদেব পরাশর মুনির পুত্র; পাণ্ডবদের পুরোহিত ধৌম্য অসিত ঋষির পুত্র।

আদিশূরের সময় বাংলায় পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণের মধ্যে কাহারও গৌতম গোত্র নহে; অথচ বহু বংশের গোত্র গৌতম। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল?

লেখক লিখিয়াছেন, "হিন্দু আইন অনুসারে এমনকি বিধবা অবস্থাতেও মেয়েদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ।" (২৬পৃঃ) বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ১৮৫৬ সনের ১৫ আইনের পর আইন অনুসারে বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। লেখক হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রের কথাই বলিতেছেন। সেখানেও তিনি পরাশরসংহিতা এবং নারদসংহিতার কথা উল্লেখ করিলেও স্মৃতিকারদের উপর কটাক্ষ করিয়াছেন। ইহা সমীচীন হয় নাই। জীমূতবাহন দায়ভাগের ১০ম অধ্যায়ে পোষ্যপুত্রের অধিকার আলোচনাকালে এই মর্ম্মে বলিয়াছেন:

"যিনি যাহার বীজ হইতে উৎপন্ন তিনি তাহার ধন পাইবেন—অপরে পাইবেন না। নারদ বলেন, যদ্যপি দুই পিতার ঔরসজাত দুই পুত্রের মধ্যে মাতার ধন লইয়া বিবাদ হয়, তাহা হইলে যাহার পিতা যে ধন দিয়াছেন তিনি সেই ধন লইবেন; অপরে পাইবেন না। এ বিষয়ে বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন।"

উপরোক্ত বিধান হইতে জানিতে পারি যে, কেবলমাত্র অক্ষতযোনি বালবিধবা বা পুত্রহীনা বিধবাদের পুনর্বিবাহ হইত তাহা নহে, সপুত্র বিধবাদেরও বিবাহ হইত। নচেৎ এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন কি?

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন তাঁহার অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের অন্যতম দায়ভাগতত্ত্বে জীমূতবাহনের পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বহাল রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। তিনি তাঁহার "দায়ক্রম-সংগ্রহে" বিভিন্ন পিতার ঔরসজাত একই মাতার গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে ধনবিভাগ সম্বন্ধে ব্যবস্থা দিয়াছেন। সমস্ত প্রবন্ধটি এখানে তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়।

সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে এইরূপ ধনবিভাগের কথা থাকিত না। রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে অশৌচবিষয়ক যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ব্রহ্মপুরাণের একটি বচন তুলিয়া তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"অগ্রে কোনও স্ত্রী কোনও এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া ঐ ব্যক্তিরই ঔরসে একটি পুত্র উৎপাদন করিবার পর ঐ পূর্ব্বজাত পুত্রের সহিতই অপর পুরুষকে আশ্রয় করে এবং পরে ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির ঔরসেও আর একটি পুত্রের জন্মদান করে তবে ঐ দুই পুত্রের যথাসম্ভব জন্ম ও মৃত্যুতে দ্বিতীয় পুত্র-উৎপাদনকারী পিতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, এইরূপ বিষয়ে যে স্থলে পরস্ত্রীতে পুত্র উৎপাদনকারী পিতার ত্রিরাত্র হইবে, সেই স্থলে তাহার সপিণ্ডিদিগের একরাত্র অশৌচ হইবে এবং ঐরূপে উৎপন্ন পুত্রদ্বয়ের পরস্পরের জন্ম ও মরণে মাতৃজাতি বিষয়ে উক্ত অশৌচ হইবে।"

উপরোক্ত ব্যবস্থা হইতে দেখা যায়, পুনর্বিবাহিত বিধবার পুত্রের অথবা মাতার দ্বিতীয় স্বামীর বাড়ীতে অবস্থা হেয় ত নহেই বরং যখন অশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে তখন যথেষ্ট সম্মানের। জ্ঞাতিগণেরও একরাত্র অশৌচ হইত।

এইরূপ অসঙ্গত উক্তি থাকিলেও মোটের উপর পুস্তিকাখানি সুখপাঠ্য ও লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

হরিদাস ঠাকুর—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। ১০০নং রসা রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে শমীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। (১৬+১৪৪+১৬) পৃঃ। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যুগের অন্যতম কর্ম্মীরূপে সমালোচ্য পুস্তকের রচয়িতা একদা বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মধ্য বয়স হইতে এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত বৈষ্ণব দর্শন, ভক্তিতত্ত্বশাস্ত্রাদি মন্থনক্রমে গভীর জ্ঞান আহরণ করিয়া তিনি তারই সারস্বরূপ বাংলা ও ইংরেজীতে বিবিধ গ্রন্থরাজি প্রণয়ন করিতেছেন। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বজ এবং তদীয় পার্ষদ মহাভাগবত যবন হরিদাসের অমর জীবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহাকাব্যামৃতনিঃসৃত ভক্তিধারায় ইহা অভিষিক্ত। যবন হরিদাস নিজ সাধননিষ্ঠার অনুপম উজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা বৈষ্ণব জগতে মহাভাগবত ব্রহ্ম হরিদাসরূপে চিরপূজ্য হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য কোন জীবনীগ্রন্থ এতদিন ছিল না। তাঁহার জন্ম ও বাল্যজীবন সম্পর্কে মতভেদও বিদ্যমান। গ্রন্থকার প্রামাণ্য বৈষ্ণব কাব্যসিন্ধু মন্থনপূর্ব্বক এই অমর জীবনালেখ্য উদ্ধার করতঃ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহাপুরুষের এই জীবনকথায় চৈতন্যচরিত তথা বৈষ্ণবধর্ম্মজগতের সারতত্ত্ব আস্বাদনে পাঠক তৃপ্তিলাভ করিবেন। চারিটি চিত্র এবং রঙীন প্রচ্ছদপট গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

প্রতিকৃতি (জলরঙ্)

শ্রীপঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সাগর-জলে"

সমুদ্রে মৎস্যশিকার

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৫৭শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৬৪ | ৫ম সংখ্যা
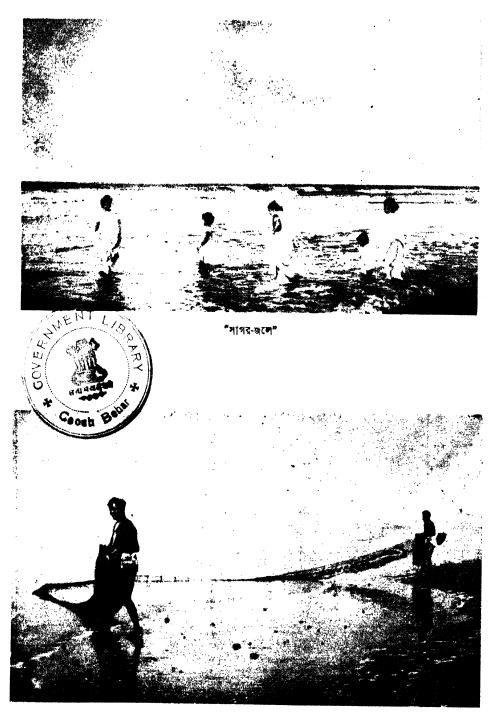
বিবিধ প্রসঙ্গ

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতার দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল। বার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দের উৎসব এখনও চলিতেছে এবং সেই সঙ্গে "প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম" নামে অধুনাখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকীও উদযাপিত হইতেছে। এই আনন্দ যথাযথ সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই, কেননা দুঃখকষ্ট, অভাব-অনটন পরিপ্লুত ও অশান্তিপূর্ণ যদিও জাতির জীবন এখন, তবুও বলিব শতসহস্র কণ্টকাকীর্ণ স্বাধীনতার পথ সুখের পরাধীন জীবনযাত্রা অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ।

এই আনন্দ-উৎসবে দেশের মুখপাত্র অনেকেই অতীতের স্মৃতির পুনরুল্লেখ করিয়াছেন ও পূর্ব্বসূরীগণের কীর্ত্তিকথা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আমরাও সকলের সহিত সমবেত হইয়া এই স্মৃতিতর্পণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

তবে এই উৎসব ও ঐ স্মৃতিতর্পণ তখনই সার্থক হইবে যখন আমরা বুঝিব স্বাধীনতার প্রকৃত সত্তা কি এবং উহা রক্ষা করিতে হইলে এবং উহাকে কল্যাণকর করিতে হইলে দেশের সকলকে কি ভাবে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে, স্বাধীনতা আমরা অন্যের আত্মবলিদানের ও শোণিত-তর্পণের ফলে সহজে পাইয়াছি বলিয়াই আমাদের দাবী-দাওয়ার সঙ্গে কর্ত্তব্যও অনেক আছে এবং সেই কর্ত্তব্যের দায়িত্ব গ্রহণে যদি আমরা অসম্মত বা অপারক হই তবে আমাদের স্বাধীনতা পূর্ণ হইতে কখনও পারে না, আমাদের দাবীদাওয়া কোনদিনই পূরণ হইবে না।

আমাদের নেতৃবর্গ এই উৎসব উপলক্ষে দেশের সেবায় অগ্রসর হইতে সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বান করিবার অধিকার তাঁহাদের আমরাই দিয়াছি এবং এই আহ্বান ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। সুতরাং সকলেরই উচিত এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া। কেননা স্বাধীনতার সংগ্রাম কোন দেশে কখনও শেষ হয় না, যত দিন দেশের লোকের প্রাণমন জাগ্রত থাকে। স্বাধীনতা অর্জ্জন কালের চক্রে অকস্মাৎ ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহার রক্ষা সম্ভব একমাত্র কঠোর পরিশ্রমে এবং অসীম বীর্য্যশুল্ক দানে। যে জাতি তাহাতে অক্ষম তাহার স্বাধীনতা স্থায়ী হইতে পারে না।

দেশের লোককে যাঁহারা এই স্বাধীনতা-যজ্ঞের ব্রতপালনে অগ্রসর হইতে বলিয়াছেন তাঁহাদেরও উচিত নিজেদের পরীক্ষা করা। দেশ তাঁহাদিগকে যে অধিকার দিয়াছে সেই অধিকার তাঁহারা এবং তাঁহাদের সহযোগিবর্গ কিভাবে ব্যবহার করিয়াছেন তাহার হিসাব-নিকাশ তাঁহাদেরও উচিত এই দিনের সন্ধ্যায় খতাইয়া দেখা। তাঁহাদের কথায় ও কার্য্যে, তাঁহাদের উপদেশে ও আচারে কতটা সামঞ্জস্য বা পার্থক্য আছে সেটাও তাঁহাদের দেখা প্রয়োজন।

সভ্য দেশে, যেখানে প্রজাতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রমতে রাষ্ট্র চালিত হয়, সেখানে অধিকারীবর্গের প্রথম লক্ষ্য থাকে দেশের সকল লোকের শ্রেণীনির্ব্বিশেষে জীবনযাত্রার পথ যাহাতে সরল থাকে, দেশের লোকে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি অত্যাবশ্যক ব্যাপারে যাহাতে অভাবগ্রস্ত হইয়া অক্ষম না হইয়া পড়ে, সেই বিষয়ে।

বিশ্বযুদ্ধের সময়েও ব্রিটেনে খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে কোন কিছুই অগ্নিমূল্য হইতে দেওয়া হয় নাই, যদিও সেই দ্বীপময় দেশে জীবনযাত্রার প্রায় সকল উপকরণেরই শতকরা ৭৫ ভাগ বা ততোধিক বিপদসঙ্কুল সমুদ্রপথে আনিতে হইত। আমাদের নেতৃবর্গের দেখা উচিত তাঁহারা সেই হিসাবে কতটুকু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের অভিজ্ঞতা কম এবং ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ কিন্তু নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণ সজাগ থাকিলে আজিকার এই অভাব-অনটন-অশান্তি এতটা বাড়িতে পারিত কিনা তাহার বিচার তাঁহাদের করা উচিত ছিল এই উৎসবে।

পণ্ডিত নেহরু দিল্লীতে ১৮৫৭ সনের সিপাহী যুদ্ধের শতবার্ষিকী উৎসবে যাহা বলিয়াছেন তাহা এইরূপ :

নয়াদিল্লী, ১৬ই আগষ্ট—১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে রামলীলা ময়দানে অদ্য এক বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী

শ্রীনেহরু এবং উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সমগ্র জাতির উদ্দেশে স্বার্থবুদ্ধির উর্দ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কষ্টার্জ্জিত স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত উদাত্ত আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ জনগণকে দেশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে এবং ১৮৫৭ সনের অগণিত শহীদের নির্ভীকতার আদর্শ পুনরুজ্জীবিত করিতে অনুরোধ জানান।

তাঁহারা বলেন, সমগ্র জাতি আজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অবনত মস্তকে সেই বীরদের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রত্যেক ভারতীয়কে ভারতের প্রতি সর্ব্বপ্রধান আনুগত্যের ব্রত গ্রহণের আবেদন জানান। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়ানুসন্ধান করার এবং প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতি, বর্ণ, ভাষা ও পল্লীস্বার্থের উর্দ্ধে ভারতের প্রতি আনুগত্যের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণের সময় আজ আসিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী বিমুগ্ধ জনমণ্ডলীকে প্রশ্ন করেন, আমি জানিতে চাই, আপনাদের প্রধান আনুগত্য কাহার প্রতি, ভারতের প্রতি, না সহস্র ক্ষুদ্র বিষয়ের প্রতি?

সহস্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়: "ভারত, ভারত, ভারত।"

শ্রীনেহরু বলেন, বিগত দশ বৎসরে ভারতকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তাহাতে ভারত বহুলাংশে সফল হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বে ভারতকে আরও পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে। বর্ত্তমান দুনিয়ার সংহতিহীন, দুর্ব্বল রাষ্ট্রের কোন স্থান নাই, কোন ভবিষ্যৎও নাই।

দশ বৎসরের ভারতের এই সাফল্যে বাহিরের অনেকে খুশী হইতে পারে নাই। তাহারা ভারতকে বৈষয়িক সাহায্য দান অস্বীকার করিয়াছে। শ্রীনেহরু অবশ্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাম উল্লেখ করেন নাই।

প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণকে জাতির স্বার্থ বিসর্জন দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া বিবাদ করিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, আমরা সকলে একই তরণীর যাত্রী। একই পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীনেহরু স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা বিগত এক শত বৎসরের ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষার কথা জনসাধারণকে স্মরণ করিতে বলেন এবং আনুগত্যের বিভিন্নতা এবং ভাষা, জাতিবর্ণ ও আঞ্চলিক সমস্যার প্রতি প্রাধান্ত দানের ফলেই ভারত স্বাধীনতা হারাইয়াছে। এই দুই ব্যাধি জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, যাহারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে শত্রুর সহিত হাত মিলাইয়াছে। ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, তাঁহাদের সহিত যাহারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়াছিল, তাহাদের কুৎসিত চরিত্রের কথাও আজ স্মরণ হইতেছে। তিনি বলেন, বিদেশী শাসনের অবসান হইলেও আমাদের আত্মপ্রসাদ লাভ করিলে চলিবে না।

আমরা তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছি, যদিও সিপাহী বিদ্রোহকে "স্বাধীনতা সংগ্রাম" আখ্যা দেওয়া বাতুলতা। সে যাহাই হউক, বিদেশী শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে কেহই অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন তিনিই শ্রদ্ধার যোগ্য ও স্মৃতি-তর্পণের অধিকারী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমাদের নিবেদন মাত্র এই যে, দেশের প্রতি পণ্ডিত নেহরুর সকল কর্ত্তব্য কি পালিত হয় শুধু এইরূপ বক্তৃতায়?

প্রথম পরিকল্পনার হিসাব

প্রথম পরিকল্পনার লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে ভারত সরকার একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনার অবদান সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পরিকল্পিত নীতি গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বেই প্রথম পরিকল্পনা সুরু হয়। ভারত বিচ্ছেদের ফলে দেশের অর্থ-নৈতিক জীবনধারায় সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হয়। সুতরাং প্রথম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য কৃষি, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও যানবাহনের বৃদ্ধির কথাও স্মরণে ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী খরচায় ঘাটতি পড়ে অর্থাৎ যে পরিমাণ ব্যয় নির্দ্ধারিত হয় তাহার চেয়ে কম খরচা করা হয়। সংশোধিত হিসাবে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ২৩৭৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, কিন্তু প্রকৃত খরচ হয় ২০১২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৫ শতাংশ কম ব্যয় করা হইয়াছে; ২৯২ কোটি টাকার স্থায়ী মূলধন সৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে বেসরকারী মূলধনের পরিমাণ ২৩৩ কোটি।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন খাতে ২৯৯ কোটি টাকা খরচ হয়। ইহা মোট খরচার ১৪.৮ শতাংশ। এই টাকার মধ্যে কৃষির জন্ত খরচা হয় ২২১ কোটি টাকা ও সমাজ পরিকল্পনায় হয় ৫৭ কোটি টাকা। নদী পরিকল্পনার জন্ত ২৪১ কোটি ব্যয় করা হয় (মোট খরচার ১২ শতাংশ), সেচ উন্নয়নের জন্ত ১৯১ কোটি টাকা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্ত ১৫৩ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনা ছিল প্রধানতঃ কৃষি ও যানবাহন পরিকল্পনা; সেই কারণে বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল যৎসামান্ত, অর্থাৎ মোট ৫৬ কোটি টাকা। ইহা মোট খরচার ৩ শতাংশেরও কম। যানবাহন পরিকল্পনায় ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ইহা মোট খরচার ২৬ শতাংশ। ইহার মধ্যে রেল-পথের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ ২৬৭ কোটি টাকা। ১৫৩ কোটি টাকা ও ১০১ কোটি টাকা যথাক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্ত খরচ হয়। মোট ব্যয়ের ইহা যথাক্রমে ৭.৬ শতাংশ ও ৫ শতাংশ। সমাজ কল্যাণের জন্ত ৫৩২ কোটি টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু মাত্র ৪২৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়। ১৯৫৫-৫৬ সনের সংশোধিত বাজেট অনুসারে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত মোট রাষ্ট্রীয় খরচার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯৬০ কোটি টাকায়।

১৯৬০ কোটি টাকার মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ কিংবা ১,১৭২ কোটি টাকা করধার্য্য, রেলপথ হইতে উদ্বৃত্ত আয় ও ঘাটতি ব্যয় দ্বারা সঙ্কুলান করা হয়। নিম্নলিখিত তালিকায় পরিকল্পনার খরচের জন্ত আয়ের উৎস ও শতাংশের পরিমাণ দেওয়া হইল :

	কোটি টাকা	শতাংশ
করধার্য্য	৭৫২	৩৮°৪
ঘাটতি ব্যয়	৪২০	২১°৪
স্বল্প আমানত	২৩৭	১২°১
প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড	৬৭	৩°৪
বিদেশী সাহায্য	১৮৮	৯°৬
বাজার দেনা	২০৫	১০°৫
অন্যান্য খাতে	৯১	৪°৬

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য বাবদ মোট ২৯৬ কোটি টাকা পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪২ কোটি টাকা ও বৈদেশিক দান ছিল ১৫৪ কোটি টাকা। এই অর্থের ৬৪ শতাংশ অর্থাৎ ১৮৮ কোটি টাকা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খরচ হয় ; বাকী ১০৮ কোটি টাকা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যয়ের জন্ত জমা আছে। বৈদেশিক সাহায্যের সবটাই খরচ না হওয়ার প্রধান কারণ যথা, পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার ও লোকের অভাব, এবং ইস্পাত ও জাহাজের অভাবও আংশিকভাবে দায়ী। বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে আসিয়াছে ২৩২ কোটি টাকা, কলম্বো পরিকল্পনার দেশগুলি দিয়াছে ৪৫°৫ কোটি টাকা, বিশ্বব্যাঙ্ক ১৫°৫ কোটি টাকার ঋণ দিয়াছে। ফোর্ড প্রতিষ্ঠান ৫°৪ কোটি টাকা ও নরওয়ে ৬৬ লক্ষ টাকার সাহায্য দিয়াছে। কলম্বো দেশগুলির মধ্যে কানাডা একাই দিয়াছে ৩২ কোটি টাকার সাহায্য।

নিম্নের তালিকায় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলাফল সংক্ষেপে দেওয়া হইল। ইহা ১৯৪২-৪৯ সনের মূল্যমান অনুসারে নির্দ্ধারিত।

মোট জাতীয় উৎপাদন

(১০০ কোটি টাকা হিসাবে)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	শতাংশ
কৃষি ও পশুপালন	৪৩°৪	৪৯°৮	১৪°৭
খনিজ ও শিল্পোৎপাদন	১৪°৮	১৭°৫	১৮°২
ব্যবসায় ও যানবাহন	১৬°৬	১৯°৭	১৮°৬
অন্যান্য শিল্প	১৩°৯	১৭°২	২৩°৭
মোট জাতীয় উৎপাদন	৮৮°৭	১০৪°২	১৭°৫
জনসংখ্যা (কোটি)	৩৫°৯৩	৩৮°৩১	৬°৬
গড়পড়তা বাৎসরিক ব্যক্তিগত আয়	২৪৬°৩	২৭২°১	১০°৫

প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মোট জাতীয় আয় ১৭°৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সনে ৮,৮৭০ কোটি টাকা হইতে ১৯৫৫-৫৬ সনে ১০,৪২০ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সেই অনুপাতে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পায় নাই, ব্যক্তিগত গড়পড়তা আয় বৃদ্ধির হার মাত্র ১০°৫ শতাংশ। ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণ ২°৩৭ কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পাঁচ বৎসরে ৬°৬ শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সনে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি প্রায় হয় নাই, এবং তার আগের দুই বৎসরে ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধির হার অতি নগণ্য ছিল। ব্যক্তিগত খরচের হার মাত্র আট শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন যেমন ১ কোটি টন বৃদ্ধি পাইয়াছে সেই অনুপাতে ২°৩৭ কোটি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ৫°৪০ কোটি টন হইতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৬°৪৯ কোটি টনে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিলবস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধি আশানুরূপ হইয়াছে, কিন্তু রপ্তানীর জন্ত ইহার উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। বিদেশগামী জাহাজ তৈয়ারী লক্ষ্য অনুযায়ী হয় নাই, মাত্র ২°৪০ লক্ষ টন তৈয়ার হইয়াছে। দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল জনসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। ক্রমবর্দ্ধমান মূল্যমান ও বেকার সমস্যা বৃদ্ধির চাপে প্রথম পরিকল্পনার কৃতিত্ব ম্লান হইয়া গিয়াছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদনের যাহা কিছু লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ৬০ লক্ষ টন কম উৎপাদন হইয়াছে। সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। ৮৫ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল কিন্তু কেবলমাত্র ৬৩ লক্ষ একর জমির জন্ত সেচের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রকৃত পক্ষে মাত্র ৪০ লক্ষ একর নূতন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল ৩৬ লক্ষ কিলোওয়াট, তাহার জায়গায় ৩৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইয়াছে। বহির্বাণিজ্যের ব্যাপারে প্ল্যানিং কমিশন কিরিস্তী দিয়াছেন যে, প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে মাত্র ৩০ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুসারে প্রকৃত ঘাটতি হইয়াছে প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বৎসরে প্রায় ১৭৫ কোটি টাকার ঘাটতি বহির্বাণিজ্যে হইয়াছে। এই ঘাটতি হওয়ার প্রধান কারণ এই যে পরিকল্পনায় রপ্তানীযোগ্য শিল্পোৎপাদনে একেবারে জোর দেওয়া হয় নাই এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে ব্যাহত হইতেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে অতি অবশ্যই উৎপাদনশীল হইতে হইবে। তাহা না হইলে মূল্যমান বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, যাহা বর্ত্তমানে দেখা দিতেছে। বহু প্রশংসিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েৎ প্রথা দ্বারা সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করা যাইতে পারিত।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি

খাদ্যদ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ মূল্য কমাইতে পারিতেছেন না। সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে; কমিটি খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করিবেন ও তাহার প্রতিকারের উপায় অনুমোদন করিবেন। গণতন্ত্রের প্রধান দোষ এই যে, ইহা দ্রুত কোন কার্য্যব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে না, আর কর্তৃপক্ষ সব জানিয়া-শুনিয়াও অজ্ঞতা কিংবা অজানার ভাব দেখান। ইহা জরুরী ও গুরুতর অবস্থাকে এড়াইয়া যাওয়ার একটি কৌশলী প্রচেষ্টা মাত্র। যখনই কোন জন-সমস্যা দেখা দেয় তখনই নিজেদের দায়িত্বকে এড়াইয়া যাওয়ার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। কমিটি নিয়োগের ফলে গণ-আন্দোলন অনেকখানি প্রশমিত হইয়া যায় এবং কমিটির রিপোর্ট যখন বাহির হয় তখন সময়ের গতিতে সমস্যা অনেকখানি সমাধানের পথে আগাইয়া থাকে। কমিটির রিপোর্টের উপর তখন কর্তৃপক্ষ করেন কোপরদালালি, অর্থাৎ সব-জান্তার ভাব দেখাইয়া কোন কোনও প্রস্তাবকে গ্রহণ করেন, আর অধিকাংশকেই এড়াইয়া যান। ভারতে কমিটির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই তথ্যই সমর্থিত হইবে। গণতন্ত্রে কমিটি হইয়াছে গণ-আন্দোলন প্রশমনযন্ত্র। চা-শিল্পের ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত এই মতের পক্ষে আধুনিকতম প্রমাণ।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে খাদ্যশস্যের মূল্য কেন বৃদ্ধি পাইতেছে সেই খবর কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই রাখেন, এবং ইচ্ছা থাকিলে প্রতিকার-ব্যবস্থা বহু পূর্ব্বেই করিতে পারিতেন। তাহার জন্য কমিটি নিয়োগ করিয়া ব্যাপারটিকে ধামাচাপা দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কমিটির রিপোর্ট যখন বাহির হইবে তখন বাজারে নূতন শস্য আসিয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সাম্প্রতিক ভাবে কিছু অবশ্য কমিয়া যাইবে। ১৯৫৬-৫৭ সনে অর্থাৎ চলতি বৎসরে চাউলের রেকর্ড উৎপাদন হইয়াছে বলিয়া সরকারী হিসাবে দেখা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সনে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী চাউল উৎপাদন হইয়াছিল, তার পর উৎপাদন হ্রাসের দিকে যায়। কিন্তু ১৯৫৬-৫৭ সনের উৎপাদন ১৯৫৩-৫৪ সনের পরিমাণকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কোনও কারণ নাই। ১৯৫৬-৫৭ সনে ভারতবর্ষে ২·৮১ কোটি টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছে, তার আগের বৎসর হইয়াছিল ২·৬৮ কোটি টন এবং ১৯৫৩-৫৪ সনে হইয়াছিল ২·৭৮ কোটি টন। ১৯৫৫ সনের তুলনায় ১৯৫৬ সনে ৫ শতাংশ অধিক চাউল উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতবর্ষে জনসংখ্যা অবশ্য দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তাহার জন্য খাদ্যের অভাব হওয়ার যথেষ্ট কোনও কারণ নাই। কারণ, যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার চেয়ে অধিক হারে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে শতকরা এক-চতুর্থাংশ, সেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন চার-পাঁচ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৫৬ সনে চাউলের অতিরিক্ত উৎপাদন হওয়ায় দরুন প্রায় ৮০ হাজার টন চাউল রপ্তানী করা হয়। রপ্তানীর বিরুদ্ধে তখন অবশ্য সাবধানবাণী উচ্চারণ করা হয়, কিন্তু কর্তৃপক্ষ সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তবে কর্তৃপক্ষের চক্ষুকর্ণ বলিয়া কোন শারীরিক অঙ্গ আছে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ আড়তদারদের মুনাফা লাভের স্পেকুলেশান (এই কথার বাংলা প্রতিশব্দ কিছু নাই, ফাটকা কথাটি ইহার যথার্থ সংজ্ঞাসূচক নহে)। এই স্পেকুলেশান সম্ভবপর হইতেছে ব্যাঙ্কলগ্নী দ্বারা। গত বৎসর ব্যাঙ্কলগ্নী অভূতপূর্ব্ব পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, প্রায় আট শত কোটি টাকার মত। গত বৎসর মে মাসে খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে আর ঋণ না দেওয়ার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্দ্দেশ জারী করে। কিন্তু আড়তদারদের স্বার্থরক্ষার্থে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীবিভাগের নির্দ্দেশক্রমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহাদের এই নিষেধ পরে নাকচ করিয়া দিতে বাধ্য হয়। ফলে উত্তরোত্তর খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। যদিও চাউল ও গম বিদেশ হইতে আমদানী করা হইতেছে তথাপি মূল্য হ্রাস পাইতেছে না। আর, ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলি যে অন্যায্যমূল্যে খাদ্যদ্রব্যের চোরাকারবারী করে ইহা সর্ব্বজনবিদিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির উপর সম্প্রতি আবার নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হইতেছে না কারণ ব্যাঙ্কগুলি যদিও খাদ্যদ্রব্যের বিরুদ্ধে আড়তদারদের ঋণ দিতেছে, তথাপি খাতাপত্রে খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ না করিয়া অন্য দ্রব্যের উল্লেখ করিতেছে। ইহার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। আর, যানবাহনের অভাবে উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশে যে প্রচুর পরিমাণে চাউল জমিয়া আছে তাহা বাংলাদেশে আসিতে পারিতেছে না। সুতরাং দুইটি উপায়ে চাউলের বর্ত্তমান ফাটকাবাজী বন্ধ করা যায়। প্রথমতঃ আগামী ছয় মাসের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনপ্রকার ঋণ ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে একেবারে দিবে না। ইহার ফলে ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পাইবে এবং আড়তদারদের নিকট হইতে বর্ত্তমান লগ্নী ফেরত চাহিতে বাধ্য হইবে। তখন প্রচুর চাউল বাজারে আসিবে। আর দ্বিতীয়তঃ উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ হইতে মজুত চাউল আনিবার জন্য প্রচুর সংখ্যায় মালগাড়ীর বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন। তাহাতে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবে। কমিটি নিয়োগ দ্বারা যে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইবে না তাহা কর্তৃপক্ষও জানেন ও জনসাধারণও জানে। তবে কমিটি নিয়োগের খরচ কোথা হইতে আসে সে কথা কেবলমাত্র কর্তৃপক্ষই জানেন, জনসাধারণ সে সম্বন্ধে ঠিক সজাগ নহে।

বর্দ্ধমান ষ্টেশনে দুর্বৃত্তদের উপদ্রব

বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনে দুর্বৃত্তদের উপদ্রব সম্পর্কে বর্দ্ধমানের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিতে প্রায়ই নানারূপ অভিযোগ থাকে। সময় সময় "প্রবাসী"তেও সেই সকল আলোচনার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু স্থানীয় পুলিস কর্তৃপক্ষ যে কোনরূপ ব্যবস্থা

অবলম্বন করিতেছেন তাহা মনে হয় না। বর্দ্ধমানের ন্যায় একটি শহরের রেল ষ্টেশনে যদি এই ধরনের দৌরাত্ম্য চলিতে থাকে তবে তাহাকে কোনক্রমেই সুশাসনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। পুলিস জনসাধারণকে অনাবশ্যকভাবে হয়রাণি করিতে কখনই ক্লান্তি বোধ করে না অথচ অপরাধীদের শাস্তিবিধানে —যাহা তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য তাহাতে—তাহাদের কোন উৎসাহ নাই। বর্দ্ধমানের প্রায় প্রতিটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রে পুলিসের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ প্রকাশিত হয়—আমরা নিম্নে "বর্দ্ধমান বাণী"র মন্তব্য তুলিয়া দিলাম :

"বর্দ্ধমান রেল ষ্টেশনে একদল দুর্বৃত্ত যেভাবে পীড়ন আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে রেল পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আশু কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি। কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় রেল পুলিসের সামনে যেভাবে রাহাজানি হইয়া গেল এবং পুলিস নিস্ক্রিয় দর্শকের মত সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করিল তাহাতে স্বতঃই সন্দেহ জাগে যে, রেল পুলিস যেন ইহাদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ষ্টেশনে এবং ষ্টেশন-এলাকায় বিদেশী যাত্রীদের প্রতি একশ্রেণীর লোক অকারণে অত্যন্ত অভদ্রতা প্রদর্শন করে এবং কয়েক ক্ষেত্রে মারধোর করিয়া টাকাকড়ি জিনিষপত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টাও করিয়াছে। পুলিসের সাহায্য চাহিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই, ষ্টেশনমাষ্টার এই সমস্ত কার্য্যকলাপের প্রতি লক্ষ্য দিলে এই প্রকার অরাজক অবস্থার অবসান ঘটিতে পারে। আমাদের আশা যে, রেলের উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ ও ষ্টেশন মাষ্টার সত্বর এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবেন এবং যাত্রীসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতি উদাসীন থাকিবেন না।"

আসানসোলের মহকুমা-শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নব প্রকাশিত পাক্ষিক "একতা"র পঞ্চম সংখ্যার এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আসানসোলের মহকুমা-শাসক শ্রীগুরুক্রম মজুমদারের বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ করা হইয়াছে। অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে আমাদের পক্ষে কিছু বলা অসম্ভব। কিন্তু সরকারের উচিত এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া একটি বিবৃতি দেওয়া—কারণ অভিযোগগুলি বিশেষ গুরুতর এবং তাহা সত্য হইলে উক্ত অফিসারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

আসানসোলের মহকুমা-শাসক শ্রীমজুমদারের বিরুদ্ধে দুইটি অভিযোগ করা হইয়াছে—জনসাধারণ এবং অভিযুক্তদের প্রতি দুর্ব্যবহার এবং বিত্তশালী লোকদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। তিনি নাকি প্রকাশ্য এজলাসে বসিয়া আসামীমাত্রকেই বিদ্রূপ করেন এবং নানারূপ অশোভন মন্তব্য করেন।

"একতা" লিখিতেছেন :

"মহকুমা-শাসক মহাশয় জনসাধারণের প্রতি ব্যবহারে যে কি পরিমাণে অসংযত হতে পারেন, তার একটা দৃষ্টান্ত সেদিনের ধেমুয়ার ঘটনা। মহকুমা-শাসক শ্রীমজুমদার গিয়েছিলেন ধেমুয়া গ্রামে গ্রামবাসীদের অভিযোগ শুনবার জন্তে। সেখানে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, তা মধ্যযুগীয় কোন একজন জমিদার তনয়ের পক্ষেই শোভা পায়। গ্রামবাসীদের ন্যায্য দাবি শুনে তিনি এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে, গালাগালির জন্ম তাকে বিজাতীয় ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। তিনি যে সব শব্দের বিজাতীয় প্রয়োগ করেছেন, বাংলা শব্দকোষে সে সব শব্দ নেই বলেই আমাদের ধারণা। থাকলে নিশ্চয়ই তিনি সেগুলো সহজ ভাবেই প্রয়োগ করতেন।

এবারে দ্বিতীয় অভিযোগে আসা যাক্।

"গত ২৭শে মে তারিখে ধেমুয়া গ্রামবাসীদের একটা মামলার শুনানীর দিন দিলেন। মামলায় সে সকল লোককে আসামী করা হয়েছিল, শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় তাদের অন্যতম। শুনানীর দিন শ্রীমজুমদার কোর্ট-ভর্ত্তি লোকের সামনে বাদী গ্রামবাসীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং গর্ব্বের সঙ্গে বলেন, শ্রীপ্রণব চট্টোপাধ্যায় কোম্পানীর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং তিনি নিজে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। এমন একজন মহৎ ব্যক্তিকে মামলার সঙ্গে জড়িয়ে গ্রামবাসীরা অন্যায় করেছে।

"আর একটা খেয়ালের কথা এই সম্বন্ধে দেওয়া যেতে পারে। ঘটনাটি ঘটে ৩রা জুন মহকুমা-শাসকের কোর্টে। সেদিন ঢাকেশ্বরী সুতাকলের একটা খুনের মামলার হাজিরার দিন ছিল। সুতাকল ইউনিয়নের একজন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী শ্রীবিধুভূষণ চৌধুরীকেও এই মামলার সঙ্গে জড়ানো হয়। মহামান্য হাইকোর্ট শ্রীচৌধুরীকে জামিনে মুক্তির আদেশ দেন। হাজিরার দিন মহকুমা-শাসক শ্রীচৌধুরীকে দেখামাত্র সহসা উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তীক্ষ্ণ শ্লেষের সঙ্গে তিনি বলেন, শ্রীচৌধুরী নাকি জামিনে মুক্ত থাকাকালীন ঢাকেশ্বরীতে সভাসমিতি করছেন এবং মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের উত্তেজিত করে তুলছেন। সুতরাং তাঁর জামীন প্রত্যাহার করা হ'ল। শ্রীচৌধুরীকে সঙ্গে সঙ্গে কোর্ট হাজতে আটক করা হয়। আসামী পক্ষের উকীল তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে জানান, মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ নাকচ করার অধিকার মহকুমা-শাসকের নেই। মহকুমা-শাসকের তখন চৈতন্যোদয় হয় এবং নিজের লেখা আদেশ নাকচ করে তিনি শ্রীচৌধুরীকে মুক্তি দেন। ঘটনার দিন নাকি ঢাকেশ্বরী মিলের কোন কোন পদস্থ কর্ম্মচারীকে কোর্ট-প্রাঙ্গণে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিল।

"উপরিউক্ত ঘটনাগুলো প্রকাশ্য আদালতে ঘটে এবং কোম্পানীর প্রতি মহকুমা-শাসকের এই নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্বে অনেকেই স্তম্ভিত হয়ে যান। এর পর আমরা যদি একদিন শ্রীমজুমদারকে ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর টেকনিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার বা ঐ রকম কোন একটা মোটা বেতনের পদে অধিষ্ঠিত দেখি, তা হলে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হব না। মালিকের প্রতি অপত্যস্নেহের পুরস্কার স্বরূপই তো আজ শ্রীনাথুনি, শ্রীজান

ব্যানার্জী প্রভৃতি অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা কোম্পানীর বড় বড় গদি দখল করে বসে আছেন।"

করিমগঞ্জ মহকুমা-শাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের দেশের প্রশাসন বিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টিভঙ্গী যে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বদেশীভাবাপন্ন হয় নাই—আসানসোলের মহকুমা-শাসকের ব্যবহার তাহার একটি সামান্য নিদর্শন মাত্র। সংবাদ লইলে দেখা যাইবে, অধিকাংশ স্থানেই শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী এবং তাঁহারা দেশের জনসাধারণ সম্পর্কে ঘৃণার ভাব পোষণ করেন। আসাম বিধানসভার সদস্য বিধানসভায় করিমগঞ্জের মহকুমা-শাসক শ্রীসোনেশ্বর কলিতার বিরুদ্ধে যে প্রকাশ্য অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় শাসকশ্রেণীর জঘন্য আচরণের আর একটি নিদর্শন রহিয়াছে। শ্রীদাস আসামের একজন বিশিষ্ট নাগরিক; তাঁহার অভিযোগের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে সেই জন্য আমরা তাহা বিস্তৃত ভাবে তুলিয়া দিলাম। আসাম সরকার এই অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই—তবে উক্ত সরকারী কর্মচারীটির পিছনে বিশেষ রাজনৈতিক সমর্থন রহিয়াছে—সে ক্ষেত্রে তাঁহার কোন শাস্তিবিধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

করিমগঞ্জের সাপ্তাহিক 'যুগশক্তি'র সংবাদে প্রকাশ:

"শ্রীদাস বলেন, কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা বাস্তবিক অপ্রীতিকর। আমি এখানে একজন সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই।—আমি এই জাতীয় ক্ষুদ্র কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করা পছন্দ করি না। কিন্তু করিমগঞ্জের সমগ্র জনসাধারণ এই কর্মচারীর বিপক্ষে।"

"শ্রীদাস গত ৩১।৭।৫৬ ইং তারিখে উক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে করিমগঞ্জ মোক্তার বার এসোসিয়েশনে আনীত প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বলেন—করিমগঞ্জে মহকুমাধিকর্ত্তা ছিলেন শ্রীআর. কে. শ্রীবাস্তব—একজন আই-এ-এস অফিসার। অতীতে গুরুত্বপূর্ণ এই মহকুমায় অভিজ্ঞ অফিসারদিগকে মহকুমাধিকর্ত্তার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হইত। কিন্তু শ্রী আর. কে. শ্রীবাস্তবকে সেক্রেটারিয়েটে আনিয়া সরকার গত কয়েকমাস যাবৎ এই গুরুত্বপূর্ণ মহকুমার দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে সিনিওর ই. এ. সি. শ্রীসোনেশ্বর কলিতার উপর রাখিয়া দিয়াছেন। কোন সুযোগ্য আই-এ-এস প্রেরণের চেষ্টাই সরকার করিতেছেন না। মোক্তার বার এসোসিয়েশনের প্রস্তাবে বলা হয় যে, করিমগঞ্জের হাকিম শ্রীসোনেশ্বর কলিতা যথাযথ জবানবন্দী না লিখিয়া, সততাহীন, অযৌক্তিক ও বিচারহীন এবং খামখেয়ালীভাবে জবানবন্দী গ্রহণ ও জেরাতে বাধাদান করিয়া দারুণ সঙ্কট সৃষ্টি করেন; তাঁহার খেয়ালানুযায়ী সময় সময় অবান্তর, ভ্রান্তিযুক্ত ও ভুলনির্দ্দেশক আদেশ লিখিয়া রাখেন; উক্ত হাকিম বিচারসুলভ সাম্য রক্ষা করিতে অক্ষম এবং আচরণে অশিষ্ট ও প্রতিহিংসাপরায়ণ...।

"তিনি অনাবশ্যকভাবে বিচার মুলতবী করিয়া রায় দিতে অকারণ সময় নিয়া পক্ষ এবং প্রতিপক্ষকে অযথা হয়রাণি করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া থাকেন ইত্যাদি।

"শ্রীদাস বলেন, একটি মোকদ্দমায় হাকিমপুঙ্গব ১৯টি তারিখ ফেলিয়াছিলেন, সেই মোকদ্দমায় যিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির সম্পর্কিত ভাই। মনি-অর্ডারের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। ছয় মাস সময়ে ১৯টি তারিখ ফেলিয়া উক্ত হাকিম রায়ে আসামীকে খালাসের আদেশ প্রদান করেন।

"শ্রীদাস বলেন যে, যদি তদন্ত করা হয় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, করিমগঞ্জে অসমীয়া, বাঙালী ও অন্যান্য সরকারী ছোট বড় কর্মচারিগণের মধ্যে কেহই উক্ত হাকিমের আচরণে সন্তুষ্ট নহেন, যেহেতু তিনি কারণে-অকারণে সকলের দোষ খুঁজিয়া ফেরেন এবং ইতিমধ্যেই কাহাকেও জরিমানা, কাহাকে পদচ্যুত এবং কাহাকেও বদলী করিয়াছেন। এই সমস্তই অযৌক্তিক এবং খেয়ালমাফিক হইয়াছে।

"...এই কর্মচারীর বিরুদ্ধে আরও গুরুতর অভিযোগ আছে। আমরা জানি ইংরেজ আমলে কোন কর্মচারী জনসাধারণের সঙ্গে অবাঞ্ছিত ও অধিক মেলামেশা করিলে জনস্বার্থের খাতিরে তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করা হইত। এই বিশেষ কর্মচারীটি করিমগঞ্জে ৩ ৪ বৎসর যাবৎ আছেন এবং স্থানীয় সর্ব্বপ্রকার রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। গত পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে যেখানে কংগ্রেস দল নির্ব্বাচিত হইতে পারে নাই, সেখানে বাজে অজুহাতে পুনর্নির্ব্বাচনের আদেশ দিয়াছেন। আবার অপর ক্ষেত্রে যেখানে কংগ্রেস-বিরোধী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেখানে নির্ব্বাচন বাতিলের আদেশ দান করিয়াছেন। শ্রীগৌরী-বদরপুর পঞ্চায়েতের সভাপতি নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্রীকলিতার অশোভন ও অসঙ্গত কার্য্যকলাপ সম্পর্কিত অভিযোগ বিশদভাবে আলোচনা করিয়া শ্রীদাস বলেন, আর একটি বিষয়ে আমি বিধানসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ৫২৮ (ক) ধারানুযায়ী না-রাজী দরখাস্ত দিয়া বহু মোকদ্দমা এই হাকিমের আদালত হইতে স্থানান্তরের প্রার্থনা করা হইয়াছে। যখন করিমগঞ্জের বহু লোকের এই কর্মচারীটির প্রতি অসন্তোষ, তখন তাঁহাকে অন্যত্র বদলী করাই সমীচীন। মিঃ মইনুল হক চৌধুরী বর্ত্তমানে একজন মন্ত্রী, এই হাকিমের বিরুদ্ধে এক না-রাজী দরখাস্তে তিনি উকীল ছিলেন।

"মৌলবী মইনুল হক চৌধুরী: আমি মনে করি, আমার বন্ধু আমাকে এই বিতর্কমূলক ব্যাপারে না জড়াইলেই ভাল হয়, কারণ আমি এখন একজন মন্ত্রী। হয় ত কোন মক্কেল কর্তৃক উপস্থিত হইয়াছিলাম।

"শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস: আমিও বলিয়াছি, মিঃ চৌধুরী মন্ত্রী হিসাবে নহেন, উকীল হিসাবেই তাহা করিয়াছিলেন। আমার বক্তব্য এই যে, এই কলিতার মত আরও শত শত কর্মচারী থাকিতে পারেন। কিন্তু এই কলিতার কার্য্যাবলী মন্ত্রের শীঘ্র

অতিক্রম করিয়াছে। সরকারের উচিত তাঁহার বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করা। যেরূপেই হউক সরকার আমাদিগকে এই কর্ম্মচারীর হাত হইতে নিষ্কৃতি দান করুন। সরকার খুশী হইলে তাঁহাকে শিলংয়ের ডেপুটি কমিশনার করিয়া ফেলুন (হাস্যরোল)। কিন্তু ভগবানের দোহাই, দুর্নীতিপরায়ণ ও অব্যবস্থিতচিত্ত এই ব্যক্তিটির হাত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ভারতীয় বেতার

ভারতে বেতার প্রতিষ্ঠার পর ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই ত্রিশ বৎসরে ভারতে বেতার ব্যবস্থার বিশেষ বিস্তার ও উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে লোকশিক্ষা এবং জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপনে বেতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই অল্পবিস্তর অবহিত। ভারতের ন্যায় অনগ্রসর দেশে বেতারের জনকল্যাণকর ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। সেদিক হইতে ভারতে বেতার প্রচার এবং শ্রবণ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু বেতার ব্যবস্থার কয়েকটি দিকে উন্নতি-সাধিত হইলেও উহার অন্যান্য দিক সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ সেরূপ সজাগ রহিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রতি ভারতীয় লোকসভায় বেতার সম্পর্কে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে বিভিন্ন সভ্যদের সমালোচনায় এই সকল ত্রুটিবিচ্যুতিরই উল্লেখ থাকে। সরকারের হাতে বেতারের পরিচালনাভার থাকায় বেতারে শিল্পী এবং লেখকদিগের উপর নানাবিধ বিধিনিষেধ আরোপের সমালোচনা করিয়া কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রী এম. কে. কুমারণ (কেরালা) বলেন যে "যদি জনগণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়ন বেতারের অন্যতম লক্ষ্য হয় তবে আমাদের লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী এবং অন্যান্য কর্ম্মীদিগকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনভাবে চলিবার অধিকার দিতে হইবে।" শ্রীকুমারণের এই মন্তব্যটি বিশেষ সমীচীন। আমাদের দেশে ক্রমশঃই একের পর এক শিল্প রাষ্ট্রের আওতায় আসিতেছে—যদি সর্ব্বত্রই কোন এক বিশেষ মতবাদ বা পদ্ধতি চাপান হয় তবে তাহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।

বেতার পরিচালনা সম্পর্কে আর একটি প্রধান সমালোচনার বিষয় হইল বেতার মারফত কংগ্রেস দলের মতবাদ প্রচারের প্রাধান্য। শ্রীকুমারণ এবং বাংলা দেশ হইতে নির্ব্বাচিত প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীবিমলকুমার ঘোষ এই অভিযোগ করেন। যেহেতু কংগ্রেস দল কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে সেহেতু সরকারী নীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি উপলক্ষে কংগ্রেস সদস্যদিগের (যাঁহারা মন্ত্রীরূপে রহিয়াছেন) বক্তৃতা প্রভৃতি দিবার অধিকতর সুযোগ স্বভাবতঃই থাকিতে পারে। কিন্তু এই সকল নীতি-সম্পর্কিত ঘোষণা ছাড়াও রেডিওর সংবাদ বুলেটিনগুলিতে কংগ্রেস দলের বিবৃতিগুলির যে অনুচিত প্রাধান্য থাকে সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যখন একই মন্ত্রীর একই বিবৃতি পর পর দুই-তিনটি সংবাদ বুলেটিনে বিস্তৃত ভাবে প্রচার হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকদের মন্তব্য সত্ত্বেও যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা মনে হয় না।

কিন্তু কয়েকজন সদস্য সিংহল রেডিওর অনুকরণে সস্তা ছায়াছবির গান এবং বিজ্ঞাপন প্রচার করিবার জন্য যে অনুরোধ জানান তাহাকে আমরা সুবিবেচনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে পারি না। এই বিষয়ে আমরা মন্ত্রীমহাশয় ডঃ কেশকারের সহিত সম্পূর্ণ একমত। সিংহল রেডিও হইতে যে শ্রেণীর গান প্রচারিত হয়—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের উপযোগী নহে।

বেতার-সংস্থাটিকে একটি স্বতন্ত্র কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য যে প্রস্তাব করা হয় তাহাও বিশেষ যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। বেতার পরিচালনা ব্যবস্থায় যে সকল ত্রুটি রহিয়াছে একটি স্বতন্ত্র কর্পোরেশনের হাতে পরিচালনা ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেই যে সেই ত্রুটিবিচ্যুতি দূর হইয়া যাইবে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। বেতার পরিচালনার ত্রুটিবিচ্যুতি অন্যান্য প্রশাসনিক বিভাগের ন্যায় সাধারণ এবং সেগুলি দূর করিবার উপায় সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংস্কারের সহিত ওতপ্রোতরূপে জড়িত। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, ভারতীয় বীমা কর্পোরেশন, জীবনবীমা কর্পোরেশন প্রভৃতির কার্য্যাবলী দেখিবার পর স্বতন্ত্র সংস্থার হাতে পরিচালনা ব্যবস্থা করিলেই কোন সংস্থার সকল ত্রুটিবিচ্যুতির অবসান ঘটিয়া যাইবে বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু বেতার-সংস্থা এবং কর্ম্মসূচী পরিচালনা ব্যবস্থাতে অনেক গলদ রহিয়াছে—কর্ত্তৃপক্ষের সেদিকে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ শিল্পী-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা এখনও গুণাগুণ অপেক্ষা ব্যক্তিগত পরিচয়, আত্মীয়তা প্রভৃতির উপরই অধিকতর নির্ভর করে। শিল্পীদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কেও সকল সময় উপযুক্ত বিচারবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় না। বেতারকর্ম্মীরা বহু ক্ষেত্রেই নানারূপ বৈষম্যমূলক নীতিতে বিরক্ত রহিয়াছেন, তাহাতে স্বভাবতঃই তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্যে সেইরূপ উৎসাহী নন।

কিন্তু বেতার পরিচালনা সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমালোচনার বিষয় হইতেছে বেতার কর্ত্তৃপক্ষের ভাষাসংক্রান্ত নীতি। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় লোকসভায় বিতর্কে কোন সদস্যই এই বিষয়টি তোলা প্রয়োজন বোধ করেন নাই। গৌহাটি বেতারকেন্দ্রে বাংলা-ভাষার প্রতি কিরূপ অবিচার করা হইতেছে আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। কলিকাতা বেতারকেন্দ্রেও বাংলা অনুষ্ঠান প্রচার ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে বাংলা ভিন্ন অপরাপর ভারতীয় ভাষার অনুষ্ঠান প্রচারে আমাদের আপত্তি নাই, কিন্তু বেতারের একটি সূচী ('ক' অথবা 'খ') সম্পূর্ণরূপে বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য রাখা উচিত। ভারতের একাধিক কেন্দ্র হইতে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচারিত হইতেছে—সেক্ষেত্রে কলিকাতা-কেন্দ্রে বাংলা অনুষ্ঠান

সংক্ষিপ্ত করিয়া হিন্দী প্রচারের কোন যৌক্তিকতা আমরা খুঁজিয়া পাই না। উপরন্তু গানের ক্ষেত্রেও (খেয়াল, ঠুংরি, ভজন ব্যতিরেকেও) বাংলা গানের পরিমাণ ক্রমশঃই কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং হিন্দী গীত প্রভৃতিকে অনুচিত প্রাধান্ত দেওয়া হইতেছে। বাংলা দেশের একশ্রেণীর শ্রোতার নিকট হিন্দী গান মাত্রই প্রিয় আমরা তাহাও জানি, কিন্তু বেতারের অন্ততম একটি কর্ত্তব্য জনসাধারণের সাংস্কৃতিক মান উন্নততর করা—অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনতার পশ্চাদ্ধাবন করা নহে।

হিন্দী কমিশনের রায়

১২ই আগষ্ট পার্লামেন্টে হিন্দী কমিশনের রিপোর্ট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। রিপোর্টটি এক বৎসর পূর্ব্বে প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করা হয়; পার্লামেন্টের নিকট রিপোর্টটি পেশ করিতে এক বৎসর সময় লাগিবার কারণ সম্পর্কে অবশ্য কিছুই বলা হয় নাই।

কমিশনের সভাপতি ছিলেন শ্রীবালগঙ্গাধর খের—কমিশনের মোট সদস্যসংখ্যা ছিল কুড়ি। কমিশনের সদস্যসংখ্যা ভাষাগত অনুপাতের কথা স্মরণ রাখিলে কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ হিন্দী প্রবর্ত্তনের পক্ষে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা অস্বাভাবিক মনে হইবে না। কমিশনের আঠার জন সদস্য হিন্দীর পক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—কেবলমাত্র দুই জন—কিন্তু সংখ্যায় দুই হইলেও ইহাদের অভিমতের মূল্য সবিশেষ—রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে হিন্দী প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করিয়াছেন। কমিশনের রিপোর্টের সহিত যে দুই জন সদস্য মতবিরোধ প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন বাংলা ভাষার প্রতি ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং তামিল ভাষার প্রতিনিধি ড. পি. সুব্বারয়ান (মাদ্রাজের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বর্ত্তমানে পার্লামেন্টে কংগ্রেসের সদস্য)।

কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অবশ্য বলিয়াছেন যে, ১৯৬৫ সনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কার্য্যপরিচালনা ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষার প্রচলন সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে তাঁহারা কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহাদের অপরাপর মন্তব্য দেখিলে কোনই সন্দেহ থাকে না যে তাঁহারা ১৯৬৫ সনের মধ্যেই হিন্দী চালু করিবার পক্ষপাতী।

ড. চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুব্বারয়ান অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৬৫ সনের মধ্যে সর্ব্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষার প্রচলন করিলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং এক বিস্তৃত জনসাধারণ ইহার বিরোধী হইবেন। তাঁহারা হিন্দী ভাষার সমর্থকদিগের অতি উৎসাহী মনোভাবের সমালোচনা করিয়াছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় এবং ড. সুব্বারয়ান মন্তব্য করিয়াছেন যে, এখনও বহু দিন যাবত ইংরেজী ভাষাকে চালু রাখা প্রয়োজন।

আমরা বিরোধী সদস্যদ্বয়ের অভিমত পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করি। হিন্দী কমিশনের বিচার্য বিষয় ছিল কেবল সরকারী কার্য্যে হিন্দী ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে বিচার করা। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপোর্টে এই সীমারেখা মানা হয় নাই, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের সর্ব্বত্রই বিদ্যালয়ে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিন্দী ভাষী ভারতীয়কে হিন্দী ভিন্ন অপর একটি ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। হিন্দীপ্রচারকের দুরভিসন্ধির মূল এই সুপারিশটিতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী হিন্দী প্রচলনের অন্ততম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের হিন্দী সমর্থকগণ তাহাদের উত্তেজনায় মহাত্মা গান্ধীর নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত স্মরণ রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখানেই হিন্দী ভাষা চাপাইবার চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ব্বভারতীয় পরীক্ষাগুলি হিন্দী এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পরিচালিত করা সম্পর্কেও ইহারা বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। এমনকি হিন্দীভাষীর ভারতীয়গণ আর একটি ভারতীয় ভাষা শিখিবেন বলিয়া শ্রীমগনভাই দেশাই পূর্ব্বে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন বর্ত্তমানে তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এককথায় হিন্দীভাষীদের ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ পুরাপুরি চালু করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসদলভুক্ত হইয়াও যে এই অন্যায় প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছেন বাঙালী হিসাবে আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। অনুরূপভাবে অপর কংগ্রেসী সদস্য ড. সুব্বারয়ান যে স্বাধীন এবং সুস্থ মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহাও সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করিবে।

নিম্নে আমরা হিন্দী কমিশনের কয়েকটি সুপারিশ তুলিয়া দিলাম।

নয়াদিল্লী, ১২ই আগষ্ট—সরকারী ভাষা কমিশন এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে এদেশে সরকারী কার্য্যে সরাসরি ভাবে ইংরেজী ভাষার পরিবর্ত্তে হিন্দী ভাষা প্রচলন করা বাস্তবিকপক্ষে সম্ভব হইবে কিনা, সে সম্পর্কে বর্ত্তমানে কোন মতামত প্রকাশ করার প্রয়োজনও নাই এবং সম্ভবও নহে। এখন হইতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে এ ব্যাপারে কিরূপ প্রচেষ্টা চলিবে, তাহার উপরেই সবকিছু নির্ভর করিতেছে।

কুড়ি জন সদস্য লইয়া গঠিত এই সরকারী ভাষা কমিশন অবশ্য একথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, সংবিধান অনুযায়ী ভারতে যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হইয়াছে, উহার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজী ভাষাকে আর ভারতের সর্ব্বজনব্যবহৃত ভাষা হিসাবে চালু রাখা সম্ভব নহে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষার মাধ্যমেই চলিতে পারে।

২৭০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টটি অদ্য সংসদের উভয় সভাতে পেশ করা হইয়াছে। দুই জন সদস্য ১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দী প্রচলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সময় যথেষ্ট নহে।

কমিশনের উপরোক্ত অভিমত বিদেশী ভাষার উপর বিদ্বেষপ্রসূত বা দেশাত্মবোধের ফল নহে। ইংরেজী ভাষার সাহিত্য-সম্পদ এবং উহার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা

করা হয় নাই। তবে কোন বিশেষ কারণে বিদেশী ভাষার ব্যবহার অথবা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে উহাকে গ্রহণ করা এবং শিক্ষা, শাসন-ব্যবস্থা, সমাজজীবন ও দৈনন্দিন কাজে প্রধান বা সাধারণ মাধ্যম হিসাবে ইহার ব্যবহারের মধ্যে বহু পার্থক্য রহিয়াছে। এই দিক দিয়াই ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। কমিশন বলেন, সর্ব্ব-ভারতীয় কার্য্যের মাধ্যম একমাত্র হিন্দী ভাষায়ই হইতে পারে। সংবিধানে হিন্দী ভাষা ভারত ইউনিয়নের রাষ্ট্রভাষা ও আন্তঃরাজ্য যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষা উৎকর্ষ বা সাহিত্যসম্পদের দিক দিয়া যে হিন্দী ভাষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট তাহা নহে। এই ভাষায় অধিকসংখ্যক লোক কথাবার্ত্তা বলিতে পারে এবং বুঝিতেও পারে বলিয়া ইহাকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

মূল রিপোর্টের স্বাক্ষরকারিগণের মতে ভাষা সম্পর্কে সংবিধানে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞজনোচিত ও ব্যাপক। অন্ত-র্বর্তীকালের জন্য সংবিধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। আর এই সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষার উৎকর্ষসাধন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার রদবদল করা চলে বলিয়া ১৫ বৎসর পরেও ইংরেজী ভাষার ব্যবহার চালু রাখা সম্ভব হইবে এবং সংবিধানের কোনও প্রকার সংশোধন না করিয়া পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলাও সম্ভব হইবে।

এক দিক দিয়া বলিতে গেলে হিন্দী আংশিকভাবে ইংরেজীর স্থান দখল করিবে, ইহা পুরাপুরিভাবে ইংরেজীর স্থান অধিকার করিয়া বসিবে না। আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান দেওয়া হইবে। আর এক দিক দিয়া বলিতে গেলে, বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক কর্ম্মসূচীর জন্য ইংরেজীর তুলনায় রাষ্ট্রভাষা অনেক বেশী লোকের কাছে গিয়া পৌঁছিবে।

রাষ্ট্রভাষা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষার লিখিবার জন্য ইচ্ছামূলক ভাবে দেবনাগরী লিপি ব্যবহারের কথা এ রিপোর্টে সমর্থন করা হইয়াছে। ইহাতে বিভিন্ন ভাষার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সাধনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

সরকারী কাজকর্ম্মে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করা ছাড়াও এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে, যাহাকে জাতীয় জীবনের বেসরকারী ক্ষেত্র বলা যাইতে পারে। সেখানে সকল প্রকার সর্ব্বভারতীয় সংযোগের জন্য একটি মাত্র ভাষা ব্যবহারের প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কমিশন বলেন, রাষ্ট্রভাষা ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়নের কাজ সুরু করার পর বিভিন্ন ভাষাগুলির পক্ষে এই ক্ষেত্র উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, যাহাতে কালে একটি ভাষাগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

ভারতীয় ভাষায় সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা

সম্প্রতি ভারত সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হিন্দী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সেই রিপোর্টে কমিশন ভারতীয় ভাষায় সংবাদ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রচলনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতে যে দুইটি প্রধান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে—প্রেস ট্রাষ্ট এবং ইউনাইটেড প্রেস উভয়েই ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সংবাদ সরবরাহ করে। সেজন্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলিকে বিশেষ অসুবিধা সহ্য করিতে হয়। কারণ ঐ সকল ইংরেজী সংবাদ অনুবাদ করিবার জন্য ঐ সকল সংবাদপত্রকে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে লোক নিযুক্ত করিতে হয়। ভাষা কমিশন এই সকল অসুবিধা বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, এক বা একাধিক ভাষায় যদি ভারতীয় সংবাদ-প্রতিষ্ঠানগুলি সংবাদ সরবরাহ করে তবে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইবে। এমনকি কেবলমাত্র হিন্দীভাষার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হইলেও ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির তাহাতে সুবিধা হইবে বলিয়া কমিশন বলিয়াছেন।

আমরা কমিশনের এই যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে অক্ষম। ইংরেজীতে সংবাদ সরবরাহ হওয়ার ফলে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির যে অসুবিধা হয় তাহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু যদি অন্ততঃপক্ষে প্রতিটি প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে সংবাদ সরবরাহ না করিয়া কেবলমাত্র হিন্দী অথবা দুই-একটি ভাষার মাধ্যমে সংবাদ পাঠান হয় তাহাতে হিন্দীভাষায় প্রকাশিত সংবাদগুলি ব্যতীত অপরাপর ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা-গুলির কি লাভ হইবে তাহা বুঝা কঠিন। ভারতীয় সংবাদপত্র-গুলিতে হিন্দী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদপত্র এখনও সংখ্যা-গরিষ্ঠ নহে। হিন্দী ভাষার মাধ্যমে সংবাদ প্রচারে এই সকল মুষ্টিমেয় পত্রিকার লাভ হইতে পারে—কিন্তু অহিন্দী অসংখ্য ভারতীয় সংবাদপত্রের তাহাতে কোন লাভ হইবে না। উপরন্তু, রয়টার এবং অন্যান্য বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি ইংরাজীর মাধ্যমে সংবাদ পাঠাইতে থাকায় অহিন্দীভাষী পত্রিকাগুলিকে বর্ত্তমানের একজন ইংরেজী অনুবাদকের পরিবর্ত্তে একজন ইংরেজী অনুবাদক এবং একজন হিন্দী অনুবাদক রাখিতে হইবে। ইহাতে এই সকল পত্রিকার উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ব্যতীত আর কোনরূপ সুবিধা হইতে পারে বলিয়াই মনে হয় না।

মফস্বলে টেলিফোনের হার

বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত "দামোদর" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলিতেছেন,

"টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলির রেট নির্দ্ধারণ বিষয়ে কি নীতি অবলম্বন করা হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা সাধারণতঃ আমাদের বর্দ্ধমান জেলার এক্সচেঞ্জগুলি সম্বন্ধেই লক্ষ্য করিতেছি। আসানসোল হইতে বরাকর ১৬ মাইল দূরত্ব এবং ইহার রেট কল-প্রতি তিন আনা, নিয়ামতপুর হইতে আসানসোল ১১ মাইল, তাহার রেট মাত্র দুই আনা। রাণীগঞ্জ হইতে আসানসোল ১২

মাইল তাহার রেটও দুই আনা, আসানসোল হইতে বহুলা ১৩ মাইল, রেট মাত্র দুই আনা। কিন্তু বর্দ্ধমান হইতে মেমারী এক্সচেঞ্জ মাত্র ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী, তাহার রেট কলপ্রতি দশ আনা, আবার মেমারী এক্সচেঞ্জ হইতে হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া মাত্র ১২ মাইল, তাহার রেট হইল নয় আনা এবং মেমারী হইতে শেওড়াফুলি ৪০ মাইল, তাহার রেট দশ আনা। টেলিফোন কর্ত্তৃপক্ষ কি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি দিবেন?"

পাঁচসালা প্লান ও বাংলা

ভারতের রাষ্ট্রচালনায় পশ্চিম বাংলার স্থান এখন কোথায় তাহার নিদর্শন আনন্দবাজারের ষ্টাফ রিপোর্টারের নিম্নস্থ বিবৃতিতে বুঝা যাইবে। বাংলার এরূপ অবহেলিত অবস্থায় প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে সকল প্রদেশের লোকই সজাগ ও তাহাদের মন্ত্রিসভাও কর্ম্মঠ। আমাদেরই এই দুরবস্থা।

ভারত সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের গড়িমসি এবং বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে অনিচ্ছার ফলে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায় উৎপাদনের কাজ পিছাইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ইস্পাত কারখানায় দুর্গাপুর বারাজ হইতে জলসরবরাহের ব্যাপারে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহার সমাধানকল্পে হয় ভারত সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে দুর্গাপুর বারাজের জন্য দুইটি বিশেষ ধরনের গেট ও ঐগুলি স্থাপন করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইবে নতুবা বিদেশী মুদ্রা বাঁচাইবার জন্য দুর্গাপুর বারাজকেই আবার নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

এই দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখে দাঁড়াইবার ফলেই ভারত সরকারের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে গড়িমসি করিতে হইতেছে।

বিদেশ হইতে মাল এবং ইঞ্জিনীয়ার আনিতে ভারত সরকারকে প্রায় ৪ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে বলিয়া প্রকাশ। কিন্তু উহা বাঁচাইবার জন্য যদি দুর্গাপুর বারাজের পরিবর্ত্তনসাধন করিতে হয়, তবে উহার জন্য ২০.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়াই বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

প্রকাশ, ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহ করিবার জন্য দুর্গাপুর বারাজে যে বিশেষ ধরনের দুইটি গেট নির্ম্মাণের কথা ছিল, বিদেশ হইতে তাহার মাল-মসলা ও ইঞ্জিনীয়ার আমদানীর কোন ব্যবস্থা সরকার আজ পর্য্যন্ত করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ গেট দুইটি নির্ম্মিত না হইলে দুর্গাপুর বারাজে সঞ্চিত জলের লেভেল উঁচুতে তোলা সম্ভব হইবে না এবং জল উঁচুতে উঠানো না গেলে ইস্পাত কারখানায় উহা সরবরাহ করা যাইবে না। ইহার ফলে ইস্পাত কারখানায় উৎপাদনই যে শুধু পিছাইয়া যাইবে তাহা নহে, দুর্গাপুরের ডি-ভি-সি থার্ম্মাল বিদ্যুৎ কারখানা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়লা-চুল্লির কাজেও অসুবিধা ঘটিবে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ আশঙ্কা করিতেছেন।

ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর এক কারখানা হইতে ঐ গেট দুইটি আনানো হউক, এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব কিছুকাল পূর্ব্বে ভারত সরকারের কাছে নিবেদন করেন বলিয়া ডি-ভি-সির সম্পর্কে ওয়াকেবহাল মহল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ গেট দুইটি স্থাপন করিবার জন্য জনৈক জার্ম্মান ইঞ্জিনীয়ার আনাইবার প্রস্তাবও নাকি ডি-ভি-সির পক্ষ হইতে করা হয়। কারণ এই গেট স্থাপনের কাজে জার্ম্মান ইঞ্জিনীয়ারের আবশ্যকতা তাঁহারা অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করেন।

কিন্তু ভারত সরকার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ায় ডি-ভি-সিকে গেট দুইটি ভারতেরই কোন কারখানায় নির্ম্মাণ করাইবার পরামর্শ দেন। ঐ পরামর্শ অনুযায়ী তুঙ্গভদ্রা, অমৃতসর এবং কলিকাতার কয়েকটি কারখানায় ঐগুলি নির্ম্মাণের চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ভারত সরকার নাকি এই প্রসঙ্গে প্রয়োজন হইলে দুর্গাপুর বারাজের গুরুতর অদলবদল করিবার কথাও চিন্তা করিতেছেন।

ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অবিলম্বে যদি এই গেট দুইটি নির্ম্মাণের অর্ডার জার্ম্মানীতে প্রেরণ না করা যায়, তবে ১৯৫৮ সনের মধ্যে ডি-ভি-সির পক্ষে ইস্পাত কারখানায় জল সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। (ঐ সনের অক্টোবর মাস হইতেই ইস্পাত কারখানায় উৎপাদন সুরু হইবার কথা।)

ডি-ভি-সি কর্ত্তৃপক্ষ এক জরুরী চিঠিতে ভারত সরকারের সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরকে অবিলম্বে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা নাকি ইহাও জানাইয়াছেন যে, ডি-ভি-সির খাতে বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট যে টাকা জমা আছে, এই কার্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করা হউক।

প্রকাশ, ডি-ভি-সির এই নূতন প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব এখনও জানা যায় নাই।

সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ

নিম্নস্থ বিবৃতিটির একমাত্র মূল্য এই যে পণ্ডিত নেহরু ও আমাদের লোকসভাস্থ মহাশয়গণ একদিন কথার ফোয়ারা খুলিবেন। কাজ অবশ্য কিছুই হইবে না।

"নয়াদিল্লী, ৯ই আগষ্ট—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীরাধারমণ ও অপর ১৮ জন সদস্য কর্ত্তৃক যুক্তভাবে রচিত এক প্রশ্নের উত্তরে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রশাসন ব্যাপারে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সরকার কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ ও তৎসমুদয়ের ফল সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে লোকসভায় বিবৃতি দেওয়া হইবে।

অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার প্রস্তাব করেন যে, সরকার কর্ত্তৃক বিবৃতি দান ব্যতীত সরকার যাহাতে সদস্যদের প্রস্তাবসমূহ দ্বারা লাভবান হইতে পারেন তজ্জন্য লোকসভা ব্যয়সঙ্কোচ ব্যবস্থাসমূহ আলোচনা করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে তিনি সরকারের সুবিধানুযায়ী যে-কোন দিন আলোচনায়

জন্য এক ঘণ্টা সময় দিবেন। অতঃপর প্রত্যেক অধিবেশনে এক বিবৃতি প্রদত্ত হইতে পারে।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী ব্যয়সঙ্কোচের জন্য সরকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন ব্যবস্থা বিশদভাবে বিবৃত করিয়া বলেন যে, কোন কোন পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে কিংবা রূপায়ণ স্থগিত রাখা হইয়াছে। কতকগুলি পথ রহিত করা হইয়াছে কিংবা অপূর্ণ রাখা হইয়াছে।

শ্রীনেহেরু বলেন যে, সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য সম্পদ যাহাতে প্রকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হয় তজ্জন্য সম্প্রতি স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মন্ত্রী ও সচিব প্রশাসন ব্যাপারে দক্ষতা, সততা ও মিতব্যয়িতা রক্ষার প্রতি সর্ব্বদা মনোযোগ দিবেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগকে সকল স্তরের কাজের প্রকৃত পরিমাণ ও গুণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং অপটুতা দূরীভূত ও ব্যয়সঙ্কোচ করিবার জন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এই কার্য্যে তাঁহারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয়সঙ্কোচ বিভাগের এবং মন্ত্রিসভা-দপ্তরের সংগঠন ও পদ্ধতি বিভাগের উপদেশ ও সাহায্য লাভ করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, সমস্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ব্যয়-সঙ্কোচ কমিটি গঠন করিয়াছেন এবং এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, সেক্রেটারীর নিজস্ব অনুমোদন ব্যতীত কোন নূতন পদ সৃষ্টি ও বর্ত্তমানে শূন্য পদসমূহ পূর্ণ করা যাইবে না এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ভ্রমণ, ভাতা, আসবাবপত্র, ষ্টেশনারী, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন প্রভৃতি বিষয়ে চরম মিতব্যয়িতা পালন করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে কি পরিমাণ অর্থ বাঁচিবে, এই অবস্থায় উহার পূর্ণ হিসাব দেওয়া সম্ভবপর নহে।

৮ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার নির্ম্মাণকার্য্য স্থগিত রাখা হইয়াছে। ১ কোটি টাকার তৈলকূপ খননকার্য্য বন্ধ রাখা হইয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় স্থপতিদিগের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ বাতিল করা হইয়াছে। বাঙ্গালোর, কলিকাতা, শিলং, ভুপাল, গোয়ালিয়র, ইন্দোর, রেওয়া ও পাতিয়ালার তথ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং চারিটি স্থানে হিন্দী টেলিপ্রিণ্টার সার্ভিস স্থাপনও বন্ধ রাখা হইয়াছে।

যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী মাসিক হাজার টাকা কিংবা ততোধিক টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের স্বেচ্ছায় শতকরা দশ টাকা কম বেতন গ্রহণের কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কাহারও উপর উহা চাপাইয়া দিতে পারি না, তবে কেহ কেহ কম বেতন গ্রহণ করিতেছেন।

অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দক্ষতার পরিবর্ত্তে ব্যয়সঙ্কোচ করা হইবে না। অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশ্যেই ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইবে।

পাকিস্থানের ষড়যন্ত্র

আমাদের দেশের শাসকবর্গ নিজেদের গণ্ডীর বাহিরে কিছুই দেখেনও না ও বলিলে বিশ্বাসও করেন না। ফলে দেশের নিরাপত্তা যে কি ভাবে বিপত্তির সম্মুখীন হইতেছে তাহার নিদর্শন আনন্দ বাজার পত্রিকা হইতে আমরা তুলিয়া দিলাম। যে অকেজো মন্ত্রীর হাতে এই সকল তদারক করার ভার তাঁহার নিদ্রা ও ক্ষুধার অবসরে এ বিষয়ে চিন্তার অবকাশ হইবে কিনা জানি না।

পশ্চিমবঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্ব্বপাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ করিয়া রাণীনগর, জলঙ্গী, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে একশ্রেণীর পাকিস্থানী মনোভাবাপন্ন মুসলমানের সমাজবিরোধী ও রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান জনগণের মধ্যে প্রবল ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছে বলিয়া যে মাসের শেষের দিকে আনন্দবাজার পত্রিকায় বিস্তৃত এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তথ্যাভিজ্ঞ মহলগুলিতে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অতঃ-পর পুলিস অধিকতর সজাগ হয় এবং এই ঘটনাগুলি সম্পর্কে অধিকতর সক্রিয়ভাবে গোপনে অনুসন্ধানাদি আরম্ভ করে। প্রকাশ, এই ধরনেরই তথ্যানুসন্ধান করিতে গিয়া পুলিস গত ৫ই আগষ্ট এমনকি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্য হাজি আবদুল হামিদের ভাবতাস্থিত একটি গৃহ তল্লাসী করে এবং ঐ গৃহের একটি কক্ষ হইতে বোমা, পাকিস্থানী পতাকা, বিস্ফোরক পদার্থ ইত্যাদি উদ্ধার করে। এই সংবাদ গত ৭ই আগষ্ট আনন্দবাজার পত্রিকা এবং অপর কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইলে কলিকাতার চিন্তা-শীল মহলগুলিতে বিশেষ বিস্ময়-বিহ্বলতার সৃষ্টি হয়।

সম্প্রতি সূতী থানা মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ জরুরী অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ঐ অঞ্চলের অপর একজন মুসলমান কংগ্রেসী এম-এল-এ'র কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া কলিকাতায় সংবাদ আসিয়াছে।

ঐ প্রস্তাবে এইরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, সূতী থানা এলাকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে মনোভাব পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ঐ কংগ্রেসী এম-এল-এ একশ্রেণীর অকংগ্রেসী বামপন্থী মুসলমান নেতাদের সহিত একযোগে সূতী এলাকা তথা জঙ্গীপুর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে গোপন সভায় মিলিত হইয়া নানাবিধ সমাজবিরোধী কার্য্যে উত্তেজনা জোগাইতেছেন। ফলে, সাম্প্রদায়িকতার বীজ ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করেন যে, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অনতিবিলম্বে মুর্শিদাবাদের সীমান্ত অঞ্চলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে পারে।

কংগ্রেসী এম-এল-এ হাজি আবদুল হামিদের গৃহ তল্লাসীর ফলে উদ্ঘাটিত তথ্যাদিতে ভাবতা-বেলডাঙ্গা অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে বিরাট চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে। গৃহতল্লাসী এবং হাজি সাহেবের গ্রেপ্তারের উক্ত সংবাদটি ৭ই আগষ্ট 'পরিক্রমা' নামক মুর্শিদাবাদের সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিস্তারিতভাবে বাহির হইয়াছে। ঐ সংবাদ-

পত্রে উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে অভিযোগাকারে যে তথ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইতেছে। উক্ত গৃহতল্লাসীকালে একটি কক্ষ হইতে ঢাকার মুসলিম লীগের নামে চাঁদা আদায়ের যে মুদ্রিত রসিদ বহি পুলিস সংগ্রহ করে তাহার অবিকল নকলও উক্ত 'পরিক্রমা' কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার প্রতিলিপিও নিম্নে দেওয়া হইল।

নিজস্ব প্রতিনিধি প্রদত্ত বলিয়া বর্ণিত যে অভিযোগ-সম্বলিত সংবাদটি 'পরিক্রমা'য় প্রকাশিত হয় তাহা নিম্নোক্তরূপ :

"বহরমপুর গত ৫ই আগষ্ট রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় ভাবতার হাজী আবদুল হামিদ এম-এল-এ ও তাঁহার পিতা হাজী আবদুল আজিজকে রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই গ্রেপ্তারের ফলে ভাবতা-বেলডাঙ্গা অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে ভীতিবিহ্বল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুলিসের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, আবদুল হামিদ এম-এল-এ'র গৃহতল্লাসীর ফলে তাঁহারা যে রাষ্ট্র-বিরোধী ও অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এরূপ বহু নিদর্শনাদি পাওয়া গিয়াছে। ২২টি ঘরের পর ২৩তম ঘরটি ঘরটি তল্লাসী করিতে গিয়া পুলিস হতভম্ব হইয়া যায়। উক্ত ঘর হইতে লাল পাতলা কাগজে জড়ানো সাতটি বড় বড় তাজা বোমা, বিস্ফোরক পাউডার, লোহার পেরেক, ভাঙা কাঁচের টুকরো, পাটের দড়ি, নূতন পাকিস্থানী জাতীয় পতাকা ও দুইটি মুদ্রিত চাঁদা আদায়ের রসিদ বহি পুলিস সংগ্রহ করে। রসিদ বহিতে মুদ্রিত রহিয়াছে 'মুসলিম লীগ, ঢাকা। শাখা অফিস ভাবতা। চাঁদা দিচ্ছেন কেন? মুর্শিদাবাদ পাকিস্থানে যাবার জন্য।' নীচে রহিয়াছে 'হাজি শেখ আবদুল হামিদ, সেক্রেটারী।' এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, গত এপ্রিল মাসে বেলডাঙ্গা থানার দেপ্সা-মির্জী অঞ্চলের কয়েকটি গৃহ হইতেও অনুরূপ দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল এবং পুলিস তাহার সম্পর্কে চার্জসীট দাখিল করিয়াছে।"

পাকিস্থানের প্রকৃত রূপ

পণ্ডিত নেহরু এখনও পাকিস্থানের বিষয়ে চোখে ঠুলি রাখিতে চাহেন। ফল কি দাঁড়াইতেছে নিম্নস্থ সংবাদে তাহা বুঝা যায়।

"শ্রীনগর, ১০ই আগষ্ট—পাকিস্থান হিলান গ্রাম হইতে কাশ্মীরে নাশকতামূলক কার্য্য চালাইয়া ছিল, তাহাদের কার্য্য এক্ষণে 'আজাদ কাশ্মীরে'র মোরীময়দান হইতে পরিচালনা করা হইবে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

কাশ্মীর উপত্যকার বশময়দানের অপর দিকে এই মোরীময়দান অবস্থিত। পাকিস্থান পুলিসের সালেম জাহাঙ্গীর নামক এক ব্যক্তির উপর মোরীময়দানের দায়িত্ব রহিয়াছে। এই লোকটি কাশ্মীর-উপত্যকায় বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল।

হিলান-কেন্দ্রের ভার যে পুলিস অফিসারের উপর ছিল, গোপন তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবার অভিযোগে তাহাকে পাক কর্ত্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আরও জানা গিয়াছে যে, কাশ্মীরের প্রত্যেকটি বোমা বিস্ফোরণের জন্য পাক কর্ত্তৃপক্ষ পাঁচ হাজার টাকা করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে সরকারী মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, কাশ্মীরে সাম্প্রতিক বোমা বিস্ফোরণ সম্পর্কে এই পর্য্যন্ত নয়জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। রেডিও পাকিস্থান অদ্য সকালে এই পর্য্যন্ত এক শত জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া যে প্রচার করিয়াছেন, উক্ত মুখপাত্র উহাকে 'ডাহা মিথ্যা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

পাকিস্থান রেডিও অদ্য সকালে আরও প্রচার করিয়াছেন যে, পাকিস্থান সমর্থক 'রাজনৈতিক সম্মেলন' এবং 'গণভোট ফ্রন্ট' সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে। উক্ত মুখপাত্র জানাইয়াছেন যে, কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় নাই।

নেহরু ও সুরাবর্দী

পাক প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর এখন একমাত্র ভরসা ভারতের ও নেহরুর প্রতি নিন্দাবাদ ও শত্রুতা চালানো। নিম্নস্থ সংবাদটি তাহার পরিচয় :

"ঢাকা, ১১ই আগষ্ট—পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী এইচ. এস. সুরাবর্দী অদ্য ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, তিনি ভারতের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহেন না। তবে কাশ্মীর ও খালের জল প্রভৃতি পাক-ভারত সমস্যা সম্পর্কে তিনি শ্রীনেহরুর মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

পাক-ভারত সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রীনেহরুর সাম্প্রতিক উক্তিসমূহের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, "ভারতীয় সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের সংবাদটি শ্রীনেহরু নিয়মমাফিক সৈন্য-পরিচালনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

পাক প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তিনি একজন সৈন্যকেও পাকিস্থানের সীমান্তে প্রেরণ করেন নাই।

"পাকিস্থানের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ কুমতলব আছে বলিয়া পাকিস্থানের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার-কার্য্য করা হইয়াছে" সমগ্র বিশ্বের লোক তাহা এখন পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন বলিয়া সুরাবর্দী মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, রাষ্ট্রপুঞ্জের ন্যায়বিচারের প্রতি আস্থাশীল হইবার জন্য তিনি শ্রীনেহরুর নিকট আবেদন করিয়াছেন। "শ্রীনেহরু বরাবরই রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিতেছেন।" বিশ্ববাসী ইহার জন্য শ্রীনেহরুকে "আন্তর্জাতিক অপরাধী ও দুর্বৃত্ত বলিয়া মনে করিবেন। জগৎসভায় শ্রীনেহরু এখনই সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁহার সাম্প্রতিক পরিভ্রমণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্থানের চিন্তাধারা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র পাক-ভারত সমস্যার সমাধানে ন্যায়বিচারের জন্য পাকিস্থানের সংগ্রামও অনুধাবন করিতেছেন।

তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, পাকিস্থান বিশ্বে বহু রাষ্ট্রের, বিশেষতঃ দুই-একটি রাষ্ট্র ভিন্ন ঐস্লামিক রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বলাভে সক্ষম হইয়াছে।

বৈদেশিক নীতি লইয়া মৌলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, দুই জনের মধ্যে জোরালো নৈতিক প্রভেদ থাকিলে ইহা ঘটা অবশ্যম্ভাবী।

রয়টারের একটি সংবাদে প্রকাশ, ১৯৫৮ সনের মার্চের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সরকার চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না।

পূর্ব্বপাকিস্থানের সংখ্যালঘু হিন্দুসম্প্রদায়

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জনশক্তি" পত্রিকায় ১৮ই আষাঢ় পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কে একটি দীর্ঘ সম্পাদকীয় আলোচনা করা হইয়াছে। গত দশ বৎসর যাবত পূর্ব্বপাকিস্থানের সরকার বারংবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বপাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা রক্ষায় তাঁহারা যথাসাধ্য করিবেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই করা হয় নাই। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমা-শাসকদিগের পূর্ণ সম্মতিতে মাইনরিটি বোর্ডগুলিতে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাও কার্য্যকরী করা হয় না। পুলিসের দারোগারা সংখ্যাগুরু (মুসলমান) সমাজের একশ্রেণীর দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় অপহৃতা হিন্দু নারী উদ্ধারের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। "সংখ্যালঘুর পুকুর হইতে মাছ ধরিয়া লইয়া যাওয়া, গাছের ফল কাড়িয়া খাওয়া, জমির ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া—এই উপদ্রবগুলি এত দিনে হিন্দুর গা-সহা হইয়া গিয়াছে। দশ বৎসর যাবতই ইহার কোন প্রতিকার হয় নাই। কাজেই এখন আর হিন্দুরা এই সব লইয়া নালিশ করিতেও আসেন না।"

সম্প্রতি হিন্দুদের কপালে আরও নূতন উপদ্রব জুটিয়াছে। "জনশক্তি" লিখিতেছেন :

"টেষ্ট রিলিফের কাজের টাকা দিয়া দেশে অনেক নূতন রাস্তা হইয়াছে—এবৎসর রাস্তাগুলি করিতে গিয়া আইনানুযায়ী নোটিশ ইত্যাদি যথারীতি দিয়া প্রয়োজনীয় জমি দখল করার সময় হাতে ছিল না—কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির মালিকগণের মৌখিক সম্মতি লইয়া অথবা তাহাদের আপত্তিকে উপেক্ষা করিয়াই জমির উপর দিয়া ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সমগ্র দেশের প্রয়োজনে—সরকারী কর্ম্মচারীর উপস্থিতিতে যে কাজ করা হইয়াছিল আজ তাহাকেই নজীর ধরিয়া একদল লোক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরের জমির উপর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিতেছে এবং ইহার সমস্ত দখলটাই হিন্দুদের উপর দিয়া চলিয়াছে। যেখানেই হিন্দু একটু দুর্ব্বল অথবা সংখ্যার কম সেখানেই একদল গুণ্ডাশ্রেণীর লোক এইভাবে হিন্দুদের জমির উপর দিয়া জোর করিয়া রাস্তা করিয়া লইতেছে। মরিয়া হইয়া বাধা দিবার সাহস এবং শক্তি হারাইয়া অসহায় হিন্দু আজ শুধু অদৃষ্টকে ধিকার দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন।

"যে কোন অজুহাত দিয়া জোর করিয়া হিন্দুদের জমি দখল করিয়া লইয়া যাওয়ার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইদানীং শ্রীহট্ট জেলায় দেখা যাইতেছে। অর্থসামর্থ্যহীন হিন্দুরা আদালতের সাহায্য পাইবার সুযোগ লইতে বঞ্চিত। মাইনরিটি বোর্ডের নিকট নালিশ জানাইয়াও কোন ফলই হইতেছে না। জমিদারী দখলের পূর্ব্বে গ্রামের জমিদার মিরাসদারগণের যে শাসন সমাজের গুণ্ডাশ্রেণীর লোককে সংযত রাখিত—জমিদারী দখল করিয়া লওয়ার পর হইতে তাহা সম্পূর্ণরূপেই লোপ পাইয়াছে। ফলে, গ্রামাঞ্চলে একটি অরাজকতার অবস্থা ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। থানার দারোগা পুলিস টাকার বশ—গুণ্ডাশ্রেণী সহজেই ইহাদিগকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইতে পারে। বিধবা নারীর একমাত্র অবলম্বন সামান্য জমিটুকুও আজ গুণ্ডা ও বদমায়েসদের হাত হইতে নিরাপদ নহে। এই অরাজকতার অবস্থাটি কেবল যে হিন্দুদের জন্যই মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে তাহা নহে। সংখ্যাগুরু সমাজের দুর্ব্বল ও নিরীহ লোকেরাও আজ এদেশে বাস করা নিরাপদ মনে করে না। সংখ্যালঘুর উপর হাত চালাইয়া যাহারা হাত পাকা করিতেছে তাহারা একদা এই পাকা হাত দিয়া সংখ্যাগুরু সমাজের উপরও অত্যাচার চালাইবে ইহা অবধারিত।

"দীর্ঘকাল যাবত যাহারা হিন্দুনারী হরণ করিয়া সমাজের নিকট হইতে বাহবা লাভ করিয়াছিল আজ তাহারা নিজ সমাজের মেয়েদের উপর অত্যাচার চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকায় শিল্পমেলায় গুণ্ডার দল ঢাকা শহরের মেয়েদের উপর যে সঙ্ঘবদ্ধ পৈশাচিক আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া সভ্য ব্যক্তিমাত্রই আতঙ্কিত হইয়াছেন। করাচীতে গুণ্ডাদের রাজত্ব কায়েম হইয়াছে। ঢাকার শিল্পমেলার ঘটনার পর তথায়ই ইতিমধ্যে আরও অনেকগুলি নারীহরণ, লুণ্ঠন, বলাৎকার ইত্যাদি ঘটিয়াছে। পত্রিকার পৃষ্ঠায় মুসলমান মহিলা সমাজের মুখপাত্রীগণ এই বর্ব্বরতার হাত হইতে দেশকে ও সমাজকে বাঁচাইবার জন্য আকুল আবেদন জানাইতেছেন।

"হিন্দু সমাজের উপর যতগুলি অত্যাচার মুসলমান গুণ্ডাশ্রেণীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার সবগুলিই নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে গুণ্ডাশ্রেণীর দ্বারা মুসলমান সমাজের উপরও অনুষ্ঠিত হইবে। হিন্দুরা যে সুখে এই দেশে বাস করিতেছে সেই সুখের ভাগী একদা মুসলমান সমাজকেও হইতে হইবে—এই সহজ সত্যটাকে সংখ্যাগুরু সমাজের নেতৃবৃন্দ কি আজও বুঝিবার চেষ্টা করিবেন না?"

মধ্যপ্রাচ্যে নূতন আক্রমণের সম্ভাবনা

মধ্যপ্রাচ্যের আবহাওয়া পুনরায় বিশেষ গরম হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটেন ওমান আক্রমণ করিয়াছে—এবারে মনে হয় সিরিয়ার পালা। সিরিয়া অভিযোগ করিয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়া সরকারের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে। মার্কিন সরকার অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন এবং এই অভিযোগের প্রত্যুত্তরে ওয়াশিংটনস্থিত সিরীয় রাষ্ট্রদূতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

সিরিয়া মধ্যপ্রাচ্যের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট এক সামরিক চক্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। মিশরের নেতৃত্বে সিরিয়া সর্ব্বদাই তাহার বিরোধিতা করিয়াছে। সেই জন্য সিরিয়ার সরকারকে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোট কখনই সুনজরে দেখে নাই। সম্প্রতি সিরিয়া সরকার সোভিয়েট সরকারের সহিত পারস্পারিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত করিয়াছেন—প্রধানতঃ তাহার পরেই সিরিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী কুৎসা প্রচারের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, সিরিয়ার সরকার কম্যুনিষ্ট পরিচালিত—অর্থাৎ এই সরকারের উচ্ছেদ প্রয়োজন।

সিরিয়ার সহিত সোভিয়েট ইউনিয়নের যে নূতন চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার মাধ্যমে সিরিয়া সোভিয়েট সরকারের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র ও সাহায্য পাইবেন—প্রধানতঃ চুক্তির এই ধারাটিই পছন্দ করিতে পারেন নাই। মিশরের ক্ষেত্রেও এই অপছন্দ যুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সিরিয়ার ক্ষেত্রেও সে হেতুই একটি নূতন যুদ্ধের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলি হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিলে পশ্চিমের রাষ্ট্রবর্গের এইরূপ উষ্মার কারণ এই যে, নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই ভাবে মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃ পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সামরিক প্রভুত্বকে অস্বীকার করিতে সাহসী হইয়া উঠিবে। যাহাই হউক, যে কোন অজুহাতেই মধ্যপ্রাচ্যে নূতন আক্রমণ সংঘটিত হউক না কেন বিশ্বজনমত কখনই তাহা সমর্থন করিবে না।

ওমান আক্রমণ

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত মুস্কটের ওমান একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। উহার লোকসংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে আট লক্ষের মধ্যে। কিন্তু রাজ্যটি ক্ষুদ্র হইলেও উহার অর্থনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্ব কম নহে। ওমানে বহু তৈলখনি রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও বহুসংখ্যক তৈলখনি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। উপরন্তু, সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী এক হাজার মাইল সীমান্তরেখা ওমানের সামরিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিয়াছে। ওমানের শাসক সুলতান একজন ব্রিটিশ আশ্রিত ব্যক্তি। তাঁহার শাসনে ওমানবাসীর মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ ছিল। সেই অসন্তোষের প্রতীক হিসাবে ১৯৫৫ সনের ডিসেম্বর মাসে সুলতানের বিরুদ্ধে ওমানের ইমামের (ধর্ম্মগুরুর) নেতৃত্বে এক বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়—অবশ্য সুলতান সহজেই তাহা দমন করেন। সম্প্রতি উক্ত ইমামের নেতৃত্বে সুলতানের বিরুদ্ধে আর একটি নূতন অভ্যুত্থান ঘটে—কিন্তু এবারেও প্রায় মাসাধিককাল যুদ্ধের পর ইমাম পরাস্ত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

এইবারের ওমান গৃহযুদ্ধের একটি নূতন বৈশিষ্ট্য হইল ব্রিটিশের হস্তক্ষেপ। ব্রিটেনের মধ্যপ্রাচ্য সামরিক কম্যাণ্ড সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া ওমানের সুলতানকে সাহায্য করেন। একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধে ব্রিটিশ সরকার যেভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাকে সকলেই আক্রমণের পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়াছেন। কার্য্যতঃ অবশ্য এই ব্রিটিশ আক্রমণই জয়যুক্ত হইয়াছে—বর্ত্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা যে কিরূপ ত্রুটিপূর্ণ ওমানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাহার সর্ব্বশেষ সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কিন্তু এই "জয়" বেশীদিন যে স্থায়ী হইবে না তাহারও ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দেখা দিতেছে। যে সকল রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের সামান্য অন্যায় আচরণে শান্তি, গণতন্ত্র এবং আন্তর্জ্জাতিক সম্প্রীতি নষ্ট হইতেছে বলিয়া চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলে এবং যাহারা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট আক্রমণ লইয়া এত মাতামাতি করে তাহারা যে কি সামান্য কারণে পররাজ্য আক্রমণ করিতে পারে ব্রিটিশের ওমান আক্রমণ তাহার এক দৃষ্টান্ত। আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতিতে স্পষ্টতঃই কোন নীতির স্থান নাই—উহা কেবল প্রভুত্ব বিস্তারের খেলা।

চীনে বুদ্ধিজীবীদের নিগ্রহ

চীনে বুদ্ধিজীবীদের উপর চরম নিগ্রহ চলিতেছে। ১৯৫৬ সনের গোড়ার দিকে চীনের সুপ্রীম ষ্টেট কনফারেন্স-এ (চীনের সংবিধানবর্ণিত বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও নাগরিক লইয়া গঠিত পরামর্শদাতা সভায়) চীন প্রজাতন্ত্রের কর্ণধার এবং চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ নেতা মাও সে-তুং বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে এক নূতন নীতি ঘোষণা করেন। প্রাচীন চীনা উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি এই নূতন নীতি ঘোষণায় বলেন, "একশত ফুল ফুটুক এবং একশত মতবাদ চালু থাকুক।" অর্থাৎ এক কথায় কম্যুনিষ্ট শাসনেও সকল বিষয়েই একাধিক মতবাদ থাকিতে পারিবে—অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় স্বাধীনতা থাকিবে। এই নূতন নীতির ব্যাখ্যা করিয়া এক বিশেষ প্রবন্ধে চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রচার-দপ্তরের উপকর্ত্তা মিঃ লিউতিঙ-ই বলেন যে, চীন কম্যুনিষ্ট পার্টি কেবলমাত্র মতপার্থক্যের জন্য কাহাকেও শাস্তি দিবে না বা তাহার অন্নসংস্থান ব্যবস্থারও কোন ক্ষতি করিবে না। চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির এই নূতন নীতির ঘোষণায় অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলেন যে, চীনে বোধ হয় কম্যুনিষ্ট গোঁড়ামির কুফলগুলি দেখা দিবে না, এবং সোবিয়েট ইউনিয়নে ম্যাক্সিম গোর্কি, মায়াকোভস্কি প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখকগণকে যে নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল চীনের বুদ্ধিজীবিগণ হয়ত তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। বিশ্বের জনসাধারণের এই আশা আরও বৃদ্ধি পায় বর্ত্তমান বৎসরের গোড়ার দিকে মাও সে-তুং-এর আর একটি নীতিসম্পর্কিত বক্তৃতায়। নূতন নীতি ঘোষণায় অবশ্য মাও এমন কথাই বলেন নাই যাহা নূতন। কিন্তু তাঁহার মত এইরূপ একজন প্রতিপত্তিশালী কম্যুনিষ্ট নেতার মুখের পুরানো কথায় পুনরাবৃত্তিরও মূল্য সবিশেষ। শ্রীযুক্ত মাও বলেন যে, চীনের পরিস্থিতিতে এখন

দুই রকমের বিরোধ রহিয়াছে—প্রথম বিরোধ হইল জনসাধারণের সহিত তাহাদের শত্রুর (কুয়োমিন্‌টাঙ, সাম্রাজ্যবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রদের) বিরোধ এবং দ্বিতীয় বিরোধ, হইল জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরোধ। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরোধের মধ্যে তিনি সরকারের সহিত জনসাধারণের বিরোধ এবং বুদ্ধিজীবীদের মতবিরোধকেও পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। (এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে জনসাধারণ বলিতে যাহা বুঝায় চীনে সব সময় ঠিক তাহা বুঝায় না। কম্যুনিষ্টদের মতে এক কথায় তাহাদের পার্টি এবং সরকারকে সমর্থন না করিলে কেহ জনসাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না।) মাও সে-তুং বলিয়াছেন যে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বিরোধের সমাধানে রাষ্ট্রের কোন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মতবাদকে মতবাদ দ্বারাই খণ্ডন করিতে হইবে—কখনও বলপ্রয়োগে মতবাদ ধ্বংস করা যায় না (ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য)।

মাও সে-তুং এই বক্তৃতা দেন ১৯৫৭ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে। কিন্তু বক্তৃতাটি জুন মাসের ১৯ তারিখ সর্ব্বপ্রথম সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা হয়। ইতিমধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি দেশের বুদ্ধিজীবীদের নিকট আবেদন জানান যে, তাঁহারা যেন কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করেন। ফলে চীন দেশে এক অভূতপূর্ব্ব সমালোচনার স্রোত বহিয়া চলিল। এই বাক্‌স্বাধীনতার যুগ স্থায়ী হয় এক মাস। এই একমাসে কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সরকার সম্পর্কে যে সকল সমালোচনা করা হয় শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট পত্রিকাগুলিতে তাহা প্রকাশিত হয়। চারিদিক হইতেই আশা উঠে যে, এইবার হইতে চীনে বোধ হয় সত্যই বাক্‌স্বাধীনতা এবং চিন্তার স্বাধীনতার যুগ আসিল।

কিন্তু প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই এমন সকল ঘটনা ঘটিতে লাগিল যে, এই আশা সমূলেই বিনষ্ট হইল। এতদিন রুদ্ধবাক্ থাকার পর বলিবার সুযোগ পাইয়া মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়ত তাহাদের স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে পারে নাই—হয়ত কেহ কেহ দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াও সমালোচনা করিয়া থাকিবে। কিন্তু যে কোন সামাজিক ব্যবস্থার ন্যায় বাক্-স্বাধীনতারও দোষ গুণ থাকে—কম্যুনিষ্টরা ইহা জানে না তাহা নহে। কার্য্যতঃ কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহাদের পূর্ব্ব ঘোষণা ভুলিয়া গিয়া বা তাহার ইচ্ছাকৃত ব্যাখ্যা করিয়া বুদ্ধিজীবীদের উপর নূতন ভাবে চাপ দিতে আরম্ভ করে যাহাতে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব সমালোচনা প্রত্যাহার করে। চীনের দুইটি পত্রিকা "কুয়াং মিন সি পাও" এবং সাংহাই-এর "ওয়েন লুই পাও" প্রধানতঃ বুদ্ধিজীবীদের মুখপাত্র। সেই পত্রিকাটির দুইটির সম্পাদকদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে এবং কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককেও পদচ্যুত করা হইয়াছে। সাহিত্যে পার্টি নিয়ন্ত্রণ নীতি মানিতে না পারায় জন্ত চীনা কম্যুনিষ্ট প্রকাশ ভবনের অধ্যক্ষ এবং প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট ঔপন্যাসিক তিঙলিঙকে নিন্দা করা হইয়াছে। এই সকল পদচ্যুতি এবং শাস্তিবিধানের মধ্যেও হয়ত ততটা দোষ ছিল না যতটা হইয়াছে ইহাদিগকে "ভুল" স্বীকার করিতে বাধ্য করায়। যাহাদের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে তাঁহাদের মতামতের ভালমন্দের কথা স্বতন্ত্র—কিন্তু একথাও ভুলিতে পারা যায় না যে, ইহাদের মধ্যে প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট লেখক, শিল্পী, অধ্যাপক রহিয়াছেন। যে কোন সমাজব্যবস্থাতেই ব্যক্তি-বিশেষের মতদ্বৈধের অধিকার থাকা উচিত। অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে অল্পবিস্তর এই অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু চীনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে কাহারও পক্ষে পার্টি (অর্থাৎ পার্টির নেতা) হইতে স্বতন্ত্র কোন মতবাদ পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

আলজিরিয়ায় হত্যাকাণ্ড

আড়াই বৎসর যাবত আলজিরিয়াতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ এবং বর্ব্বর আক্রমণ চলিয়াছে। এশিয়া এবং আফ্রিকার সকল রাষ্ট্রে এবং ইউরোপ এবং আমেরিকাতেও এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। আলজিরিয়াতে ফরাসীদের নগ্ন বীভৎসতা সুরুচিসম্পন্ন ফরাসী নাগরিকদিগকে পর্য্যন্ত উত্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু সরকার তথাপি অটল।

আলজিরিয়ার বীভৎসতা বুঝিতে হইলে একটি তথ্যই যথেষ্ট। ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দশ দিনে ফরাসীরা এক হাজার নিরীহ আলজিরীয়কে হত্যা করিয়াছে। আড়াই বৎসরে ছত্রিশ হাজার আলজিরীয়কে এইভাবে হত্যা করা হইয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিয়াছে ফরাসী স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনী।

ব্রিটিশ গিয়ানার নূতন নির্ব্বাচন

ব্রিটিশ গিয়ানার নূতন নির্ব্বাচনে ডাঃ চেদি জাগানের নেতৃত্বে পিপল্‌স প্রোগ্রেসিভ পার্টি পুনরায় জয়লাভ করিয়াছে। ডাঃ জাগান এবং তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী জেনেট জাগান উভয়েই বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন এবং তাহাদের দল বিধান পরিষদের চৌদ্দটি নির্ব্বাচিত আসনের মধ্যে আটটি দখল করিয়াছেন। শীঘ্রই ডাঃ জাগান ব্রিটিশ গিয়ানার নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবেন।

এখানে স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্রিটিশ গিয়ানার প্রথম নির্ব্বাচনে ১২৫৪ সনেও ডাঃ জাগানের দল বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে এবং ডাঃ জাগানের নেতৃত্বে তথায় প্রথম প্রথম জনপ্রিয় সরকার গঠিত হয়। কিন্তু এই নূতন সরকারের নীতি ব্রিটিশ সরকারের পছন্দ না হওয়ায় তাহারা জোর করিয়া ডাঃ জাগানের সরকারকে বিতাড়িত করে। ডাঃ জাগান এবং তাঁহার দলের তৎকালীন নেতা মিঃ এল্, এফ. এস. বার্ণহাম তাঁহার কিছুদিন পরে ভারতেও আসেন এবং ব্রিটিশ সরকারের ঐ অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে ভারতের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু গিয়ানায় নেতৃদ্বয় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই পিপল্‌স প্রোগ্রেসিভ পার্টিতে ভাঙন ধরে এবং নরমপন্থী বার্ণহাম উপদল জাগানের বিরুদ্ধে নানা-

রূপ অভিযোগ করিয়া দল ছাড়িয়া নূতন দল গঠন করে। তখন অনেকেই মনে করিয়াছিলেন যে, ডাঃ জাগানের নেতৃত্বের দিন বোধ হয় ফুরাইয়া আসিল। কিন্তু সর্ব্বশেষ নির্ব্বাচনের ফলে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গিয়ানার জনমত এখনও ডাঃ জাগান এবং তাঁহার দলের পিছনেই রহিয়াছে।

ভারতে মার্কিন সাহায্য

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দশ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে মোট ৪৭৬ কোটি টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছে। এই অর্থ সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মারফত দেওয়া হইয়াছে এবং এই অর্থের কতকাংশ দেওয়া হইয়াছে সাহায্য হিসাবে এবং কতকাংশ দেওয়া হইয়াছে ঋণ হিসাবে। এই অর্থের মধ্যে ১৯০ কোটি টাকা আসিয়াছে মার্কিন কারিগরী সহযোগিতা সংস্থা মারফত। ইহা ভিন্ন ১৯৫০-৫১ সনে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা মূল্যের মিলো সাহায্য, ১৯৫১-৫২ সনে চুরানব্বই কোটি মূল্যের গম সাহায্য। শিক্ষার উন্নতি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন সংস্থা কর্ত্তৃক আরও প্রায় চার কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সন হইতে বেসরকারী মার্কিন স্বেচ্ছাসেবক সমিতিগুলি হইতেও ২৫ কোটি টাকা মূল্যের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে যে দেশগঠন কার্য্য চলিতেছে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করিয়াছে। সেজন্য ভারতবাসী যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং জনসাধারণের নিকট অবশ্যই কৃতজ্ঞ। কিন্তু ভারত এবং ভারতের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহার ফলে ভারতবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্যের অধিকাংশ সুফল হইতেই বঞ্চিত হইতেছে। প্রধানতঃ সেই কারণেই এইরূপ বিরাট মার্কিন সাহায্য সম্পর্কেও সাধারণভাবে সকলেই উদাসীন।

ভারতীয় স্বাধীনতার দশ বৎসর

স্বাধীন ভারতের দশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে ভারতস্থিত মার্কিন প্রচার বিভাগ একটি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন—কয়েকটি বিশেষ দিক হইতেই তাহার বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রায় দুই শত পৃষ্ঠার এই পুস্তকটির নাম (স্বাধীনতার) প্রথম দশক, পুস্তকটি সম্পাদনা করিয়াছেন ডাঃ ক্লিফোর্ড ম্যানসহার্ডট। পুস্তকটিতে যে এগারটি প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়াছে উহাদের লেখকবর্গ কিন্তু সকলেই ভারতীয় এবং লেখকগণ সকলেই ভারতের সরকারী বা বেসরকারী ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। পুস্তকটিতে দশ বৎসরে ভারতবর্ষের শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে লেখকগণ (যাঁহারা সকলেই নিজেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি) তাহা বিবৃত করিয়াছেন। পুস্তকটি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। পুস্তকটির প্রচারক হিসাবে যদি মার্কিন প্রচার-সংস্থার বিভাগের পরিবর্ত্তে যদি ভারত সরকারের নাম বসাইয়া দেওয়া হইত তবে স্বচ্ছন্দে তাহাও চলিত। পুস্তকটি ভারত সম্পর্কে সকলেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে এ সম্পর্কে কোনই সন্দেহ নাই। ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ এল্সওয়ার্থ বাঙ্কার একটি ভূমিকা লিখিয়া পুস্তকটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে আংশিক রেশন

পশ্চিমবঙ্গের সব কাজই আংশিক ভাবে হইয়া থাকে এবং তাহাতে ফলও আংশিক ভাবে ভালমন্দ—মন্দই অধিক হয়। এই ব্যবস্থাও সেই মতই চলিতেছে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন রাজ্যের গড়পড়তা চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার কথা স্বীকার করিয়া কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলসমূহে ৪৭ লক্ষ লোকের মধ্যে আংশিক রেশনিং প্রথায় চাউল ও গম সরবরাহের সিদ্ধান্তের কথা জানান। এই প্রথায় জনপ্রতি সপ্তাহে সাত আনা সের দরে ১ সের করিয়া চাউল এবং ৬ আনা সের দরে এক সের করিয়া গম দেওয়া হইবে। কলিকাতা ও হাওড়ায় ইতিমধ্যে ২৯ লক্ষ লোকের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক্ষণে আরও ২৫ লক্ষ লোককে রেশনিং প্রথায় খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে বলিয়া শ্রী সেন জানান।

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত কলিকাতা ও হাওড়ার বস্তী অঞ্চলের ১০ লক্ষ স্বল্প-আয়ের লোকের মধ্যে আংশিক রেশনিং প্রথায় খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা হয়। পরে বস্তীবহির্ভূত লোকের মধ্যেও ঐ প্রথায় খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইতে থাকে। এই পর্য্যন্ত উপরোক্ত প্রথানুযায়ী বস্তীবহির্ভূত ১৯ লক্ষ লোকের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া শ্রী সেন জানান। প্রত্যহ ৫০,০০০ লোকের গণনা ও অনুসন্ধান চালান হয়।

রাজপথে দুর্ঘটনা

কিছুদিন যাবৎ কলিকাতার রাজপথে দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, ইহার প্রধান কারণ গত দশ বৎসরে শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ হইতে ৩৫ লক্ষে উঠিয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৩৬,৩০০ হইতে ৭৯,৯৭০ হইয়াছে। সব কিছুই বাড়িয়াছে, কেবল বাড়ে নাই আনুপাতিক হারে রাজপথের দৈর্ঘ্য ও প্রশস্ততা। শহরের পথগুলি প্রশস্ত না করা পর্য্যন্ত দুর্ঘটনার সংখ্যা হ্রাস করা প্রায় অসম্ভব। তবে পথচারী এবং গাড়ীর চালকরা সামান্য সাবধান হইলে এবং লরী ও বেবী ট্যাক্সিচালকদিগের উপর পুলিস কড়া নজর দিলে, অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যাইতে পারে।

গত দশ বৎসরের একটি তুলনামূলক হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, ১৯৪৭ সনে পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা ৮,৬১৮, অথচ ১৯৫৭ সনের জুন মাসের মধ্যেই ৮,২৩৫টি পথ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ দশ বৎসর পূর্ব্বে গোটা বৎসরের দুর্ঘটনার সংখ্যা বর্ত্তমান বৎসরের ছয় মাসের দুর্ঘটনার প্রায় সমান। ১৯৫৬ সনের পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা ১৬,৪০২।

শঙ্করের ব্রহ্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৩

পূর্বসংখ্যায় ব্রহ্মের তৃতীয় লক্ষণ 'নির্বিকারত্ব' বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

ব্রহ্মের এই চতুর্থ লক্ষণ 'নির্বিকারত্ব' থেকে তাঁর পঞ্চম লক্ষণ 'নিষ্ক্রিয়ত্ব' সিদ্ধ হয়। প্রত্যেক ক্রিয়াই অসংখ্য বিকার অথবা পরিণাম ও পরিবর্তনের জনক। ক্রিয়ার একটি কর্তা ও একটি কর্ম থাকে। যেমন, বস্ত্রবয়ন এক-প্রকারের ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার কর্তা হ'ল তন্তুবায়; কর্ম হ'ল তন্তু। এস্থলে কর্তা ও কর্ম উভয়েই পরিবর্তনভাগী হচ্ছে। যেমন, তন্তুবায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিচালনরূপ শারীরিক এবং ইচ্ছা ও চিন্তারূপ মানসিক পরিবর্তনভাগী হচ্ছে এবং তন্তুরও পরিবর্তনসাধন করছে। সেজন্য, ব্রহ্ম যদি ক্রিয়া-শীল হন, তা হলে তিনি এক, অদ্বিতীয় ও সর্বব্যাপী বলে, তাঁকেই একাধারে ক্রিয়ার কর্তা বা নিমিত্ত কারণ এবং কর্ম বা উপাদান কারণ হতে হয়। সেজন্য, এই উভয়রূপেই তাঁর বিকার বা পরিণাম ও পরিবর্তন অনিবার্য। সুতরাং নির্বিকার, অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।

শঙ্কর তাঁর গীতা-ভাষ্যে, অবিক্রিয় আত্মা বা ব্রহ্ম যে অকর্তা, তা বারংবার উল্লেখ করেছেন:

"তচ্চ সর্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বম্ অবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ" (শঙ্করের গীতাভাষ্য ২।২১)

অর্থাৎ, আত্মার কর্তৃত্বাদি অবিদ্যা-কল্পিত, যেহেতু আত্মা অবিক্রিয়।

"নৈষ দোষঃ, আত্মনোঽবিক্রিয়-স্বভাবত্বে অধিষ্ঠানাদিভিঃ সংহতত্বানুপপত্তেঃ। বিক্রিয়াবতো হি অন্যৈঃ সংহননং সম্ভবতি, সংহত্য বা কর্তৃত্বং স্যাৎ, ন তু অবিক্রিয়স্য আত্মনঃ কেনচিৎ সংহননমস্তি, ইতি ন সম্ভূয় কর্তৃত্বমুপপদ্যতে।" (শঙ্করের গীতা-ভাষ্য, ১৮।১৭)

অর্থাৎ, যদি বলা হয় যে, আত্মা দেহাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে, ক্রিয়াশীল হয়—তার উত্তর এই যে, অবিকারী আত্মার সঙ্গে দেহাদির কোন সংহতি বা মিলন সম্ভবপর নয়। যে বস্তু বিকারী, তারই সঙ্গে কেবল অন্য কোন বস্তু সংশ্লিষ্ট বা মিলিত হতে পারে এবং সেইভাবে সংহত বা মিলিত হবার পর, তার পক্ষে কর্তৃত্বও সম্ভবপর হতে পারে। কিন্তু আত্মা যখন নির্বিকার, তখন আত্মার সঙ্গে কারও সংহতি বা মিলন হতে পারে না এবং সেইভাবে আত্মার কর্তৃত্বও সিদ্ধ হয় না। সেজন্য, নির্বিকার আত্মা স্বভাবতঃই নিষ্ক্রিয়।

সুতরাং, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের বাণী:

"তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্" (গীতা ৪।১৩)

ব্যাখ্যা করে শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন—"মায়া-প্রবৃত্তেন সংব্যবহারেণ চাতুর্বর্ণ্যাদেস্তৎকর্মণশ্চ যদ্যপি কর্তাহং তথাপি তথাবিধং মাং পরমার্থতোঽকর্তারং বিদ্ধীতি।" (শঙ্করের গীতাভাষ্য ৪।১৩)

অর্থাৎ, মায়াময় ব্যবহারবশতঃ যদিও আমি সৃষ্টিকর্তা, তথাপি প্রকৃতপক্ষে, পারমার্থিক দিক থেকে, আমি অকর্তা।

অন্যান্য যুক্তির সাহায্যেও এই একই সিদ্ধান্তে সাক্ষাৎ-ভাবেও উপনীত হওয়া যায়। যথা, এস্থলে প্রশ্ন এই: ব্রহ্মের ক্রিয়া কি উদ্দেশ্যপ্রসূত? বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন কর্তার কর্মের পশ্চাতে থাকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য, যা লাভ করবার জন্যই তিনি ঐ কর্মে রত হন। যেমন, যে দ্রব্যটি আমরা লাভ করতে চাই, অথচ যা আমাদের নেই, সেটিকেই লাভ করবার আশায় আমরা একটি উপায় অবলম্বনে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই বা কর্মে নিযুক্ত হই। কিন্তু ব্রহ্ম ত আপ্তকাম, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যসিদ্ধ—তাঁর অতৃপ্ত কামনা বা অপ্রাপ্ত লক্ষ্য কিছুই থাকতে পারে না। সেজন্যও পরিপূর্ণসত্তা ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।

এরূপে শঙ্করের মতে, ব্রহ্মের প্রধান পঞ্চলক্ষণ হ'ল: তিনি এক ও অদ্বিতীয়, নির্বিশেষ, নির্গুণ, নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়। এইগুলি সবই যেন নঙর্থক, সদর্থক নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্ম হলেন তিনিই যাঁর কোন দ্বিতীয়, ভেদ, বিকার, গুণ ও ক্রিয়া নেই। এরূপ নঙর্থক জেনেই কি মুমুক্ষুকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে? অবশ্য, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ব্রহ্মজ্ঞান অতি দুর্লভ্য। অনন্ত, অসীম ব্রহ্মস্বরূপকে মন দ্বারা পূর্ণ উপলব্ধি করা এবং বাক্যদ্বারা পূর্ণ প্রকাশ করা ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে সত্যই অসম্ভব। সেজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলছেন—

"যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥"
(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ২।৪।২।৯)

অর্থাৎ, ব্রহ্মের স্বরূপ অবধারণ ও প্রকাশ করতে অসমর্থ

হয়ে বাক্য ও মন ফিরে আসে। কেনোপনিষদও বলছেন (১৷৩-৮)—

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো॥"

(কেনোপনিষদ ১৷৩)।

অর্থাৎ—"ব্রহ্ম চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন।

"যাঁকে বাক্য দ্বারা প্রকাশিত করা যায় না, কিন্তু যিনি বাক্যকে প্রকাশিত করেন, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান।

"যাঁকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান।

"যাঁকে চক্ষু দ্বারা দর্শন করা যায় না, কিন্তু যিনি সমস্তই দর্শন করেন, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান।

"যাঁকে কর্ণ দ্বারা শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু যিনি সমস্তই শ্রবণ করেন, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান।

"যাঁকে নাসিকা দ্বারা আঘ্রাণ করা যায় না, কিন্তু যিনি সমস্তই আঘ্রাণ করান, তাঁকেই ব্রহ্ম বলে জান।"

এরূপে কেনোপনিষদ সিদ্ধান্ত করছেন :

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥" (২৷৩)

অর্থাৎ, যিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মকে জানতে পারেন নি, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন। কিন্তু যিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মকে জানতে পেরেছেন, তিনিই ব্রহ্মকে জানেন না। এরূপে জ্ঞানিগণের বিশ্বাস যে, তাঁরা ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে জানেন না। কিন্তু অজ্ঞানিগণের বিশ্বাস যে, তাঁরা ব্রহ্মকে পূর্ণভাবেই জানেন।

ব্রহ্মের এই দুর্বিজ্ঞেয়তার উল্লেখ করে শঙ্করও "আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্" গীতার এই শ্লোকের ভাষ্যে বলছেন :

"দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃত আত্মা কিং ত্বামেবৈকমুপলভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে।—অতো দুর্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ।" শঙ্করের গীতাভাষ্য (২৷২৯)

অর্থাৎ, এই প্রকৃত আত্মা দুর্বিজ্ঞেয়, সেজন্য সাধারণতঃ আত্মা সম্বন্ধে কেবল ভ্রান্ত জ্ঞানই সকলের আছে। সুতরাং আত্মা দুর্বোধ্য।

এই কারণে, আত্মা বা ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ বা সর্বজ্ঞাত, অথবা অপ্রসিদ্ধ বা অজ্ঞাত—এই প্রশ্নের আলোচনা-প্রসঙ্গে, শঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে (১৷২৷২) বলেছেন যে, আত্মা সাধারণ ভাবে প্রসিদ্ধ হলেও, আত্মার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করা সুকঠিন। সেজন্য আত্মার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নানাবিধ ভ্রান্ত মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। যেমন, শঙ্কর নিম্নলিখিত নয়টি মতের উল্লেখ এস্থলে করেছেন (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ১৷১৷২) :

দেহই আত্মা ; ইন্দ্রিয়ই আত্মা ; মনই আত্মা ; বিজ্ঞান-প্রবাহই আত্মা ; শূন্যই আত্মা ; দেহাতিরিক্ত সংসারী, কর্তা ও ভোক্তাই আত্মা ; ভোক্তা কিন্তু অকর্তাই আত্মা ; জীবাত্মা ব্যতিরিক্ত সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই আত্মা, জীবাত্মার আত্মস্বরূপ ও জীবাত্মার সঙ্গে অভিন্ন ঈশ্বরই আত্মা।

এরূপে, "তদ্বিশেষং প্রতি বিপ্রতিপত্তেঃ", আত্মার বিশেষ ও প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নানারূপ পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচলিত আছে বলে স্বীকার করে নিতে হয় যে, আত্মা বা ব্রহ্মকে যথার্থ ভাবে ও পরিপূর্ণ ভাবে জানা অতি কঠিন।

সেজন্য, উপনিষদের বহুস্থলে ব্রহ্মকে নঞর্থক বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, ব্রহ্ম ঠিক কি, তা জানা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হলেও, তিনি কি নন, তা জানা সহজতর বলে সেই নঞর্থক ভাবেই ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করা। তা ছাড়া ব্রহ্ম যে জাগতিক দ্রব্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্—সে জ্ঞানও ত অল্প জ্ঞান নয়। সেজন্য সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বারংবার বলেছেন :

"অথাত আদেশো নেতি নেতি"

(বৃহদারণ্যক (২৷৩৷৬)

"স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি।"

(বৃহদারণ্যক, ৩৷৯৷২৬, ৪৷২৷৪, ৪৷৪৷২২, ৪৷৫৷১৫)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ হ'ল এই : তিনি এ' নন, এ' নন।

সেই আত্মাকে বর্ণনা করতে হবে এই ভাবে : তিনি এ নন, এ নন। তিনি অগৃহ্য, তাঁকে গ্রহণ করা যায় না ; তিনি অশীর্য, তাঁকে শীর্ণ করা যায় না ; তিনি অসঙ্গ, তাঁকে কোন কিছুতে আসক্ত করা যায় না ; তিনি অসিত বা তাঁকে কোন কিছুতে বদ্ধ করা যায় না। সেজন্য তিনি কোন কিছু দ্বারা ব্যথিত বা হিংসিত হন না।

সুপ্রসিদ্ধ 'অক্ষর-ব্রহ্ম' প্রপঞ্চনা-প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নঞর্থক বর্ণনা দিয়ে বিশদতর ভাবে বলছেন :

"স হোবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং ন তদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি কশ্চন।"

(বৃহদারণ্যক, ৩৷৮৷৮)

অর্থাৎ, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলছেন—ব্রাহ্মণগণ বলেন : ইনিই সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নন, অণুও নন, হ্রস্ব নন, দীর্ঘও নন, লোহিত নন, স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, তমঃ নন, বায়ু নন, আকাশ নন, তিনি কিছুতে আসক্ত নন, রস নন,

গন্ধও নন; তাঁর চক্ষু নেই, বাগিন্দ্রিয় নেই, মন নেই, তেজ নেই, প্রাণ নেই, মুখ নেই, মাত্রা নেই, অন্তর নেই, বাহ্য নেই। তিনি কাউকে ভক্ষণ করেন না, কেউ তাঁকেও ভক্ষণ করেন না।

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলছেন :

"যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং
তদপাণিপাদং নিত্যম্।
বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং
পরিপশ্যন্তি ধীরা॥" (১।১।৬)

অর্থাৎ, যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, চক্ষুবিহীন, শ্রোত্রবিহীন, হস্তপদরহিত, নিত্য, সর্বব্যাপী, সর্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয় ও ভূতযোনি—তাঁকেই জ্ঞানিগণ দর্শন করেন।

মাণ্ডূক্যোপনিষদ বলছেন :

"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যম-ব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।"৭

অর্থাৎ, তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ (স্বপ্ন) নন, বহিঃপ্রজ্ঞ (জাগ্রৎ) নন, উভয়প্রজ্ঞও নন, প্রজ্ঞানঘন (সুষুপ্তি) নন, প্রাজ্ঞ নন, অপ্রাজ্ঞও নন। যিনি, অদৃষ্ট, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্বচনীয়, একাত্মপ্রত্যয়গম্য, রূপরসাদির অতীত, শান্ত, শিব ও অদ্বৈতস্বরূপ—তাঁকেই 'চতুর্থ' (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি ব্যতীত তত্ত্ব) বলে জ্ঞানিগণ মনে করেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য।

কঠোপনিষদও একই সুরে বলছেন :

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।"
(কঠোপনিষদ ৩।১৫)

অর্থাৎ, ব্রহ্ম শব্দবিহীন, স্পর্শবিহীন, রূপবিহীন, বিকার-বিহীন, রসবিহীন, নিত্য ও গন্ধবিহীন।

এরূপে, শঙ্করও নঞর্থক ভাবেই ব্রহ্মের প্রপঞ্চনা করেছেন। এই সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা পরে করা হবে।

পরিব্রাজক চাই—কেন?

শ্রীবিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

গত শতবর্ষে ভারতে কতকগুলি ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তা থেকে লোকের ধারণা জন্মেছে যে, তার দৌলতে প্রাণের প্রসার কতকটা বেড়েছে। সত্য বটে ভারতের কিছু লোক, কোন কোন শ্রেণীর লোক উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে আর ইউনিভার্সিটির ভিতর দিয়ে দুনিয়ারও কিঞ্চিৎ জ্ঞানের প্রসার এখানে হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বড় একটা জিনিস আমার খুইয়েছি। আমাদের এখানে কেন্দ্রিত বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিল না, কিন্তু অনেক ভ্রাম্যমাণ ইউনিভার্সিটি ছিল। কেন্দ্রিত ইউনিভার্সিটি একেবারে ছিল না, তা নয়, কিন্তু জ্ঞান-প্রচারের কাজ ঐ সব ইউনিভার্সিটির ওপর ছিল না, ছিল উলটাটি পরিব্রাজকদের ওপর। এই পরিব্রাজক-সংস্থা ছিল ভারতের মস্ত বড় সংস্থা। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, বুদ্ধ, মহাবীর প্রভৃতি মহাপুরুষেরাও যে জ্ঞান-প্রচার করেছেন তা তাঁরা করেছেন পরিব্রাজকগোষ্ঠী সংগঠন করে। বস্তুতঃ সারা দেশের কোণে কোণে, ঘরে ঘরে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়ার জন্য পরিব্রাজকের দরকার রয়েছেই। ভূদান-আন্দোলনের সামান্যমাত্র যেটুকু প্রচার হয়েছে তা হয়েছে পর্যটনকারীর দ্বারা।
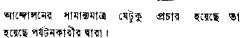
কিছু লোক একমনে, উৎসাহভরে ঘুরছেন। কিন্তু ঘুরছেন তাঁরা বছর-দু'বছরের সঙ্কল্প নিয়ে। সতত তাঁরা ঘুরবেন না। এটা কিছু দোষের নয়। এমনকিছু লোক ত থাকবেনই যাঁরা গার্হস্থ্য-ধর্মে থেকে সমাজ-সেবার জন্য কিছু সময় দেবেন। কিন্তু কিছু সময় যাঁরা পর্যটন করবেন তাঁদের দ্বারা নিয়ত জ্ঞান পৌঁছানোর কাজ হবার নয়। আসলে তাঁরা পরিব্রাজক নন, তাঁরা প্রচারক। প্রচারকের কাজ ক্ষণিক, আবেশক্ষণিক। আর পরিব্রাজক হচ্ছেন জ্ঞাননিষ্ঠ, ক্রান্তিনিষ্ঠ ও লোকনিষ্ঠ। কতদিন ঘুরেছি আর ঘুরতে কতদিন বাকি আছে, এ হিসাব তাঁরা করেন না। উলটা, লোকের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেওয়াই হয়ে যায় তাঁদের জীবন-কর্ম।

ভূদান মৌলিক আন্দোলন। তার পিছনে সর্বোদয়ের গহন তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে। অতএব প্রতি জনের কাছে ঐ

বিচার পৌঁছানোর জন্য নিরন্তর পর্যটনকারী জ্ঞাননিষ্ঠ পরিব্রাজক চাই-ই। এরূপ পরিব্রাজক সৃষ্টিও হবে তাতে সংশয় নাই। আর তাঁরা আসবেন ঐ সব প্রচারকদের মধ্য হতে। আজ যাঁরা প্রচারক, অল্পদিন মধ্যেই তাঁদের নিষ্ঠা স্থির হবে। যেহেতু এ কাজ গভীর তাই দিনকয়েক মাত্র কাজ করবার কথা ভাবলে চলবে না। এর এক অংশ পুরা হতে না হতে আর এক অংশের কাজ আরম্ভ হবে। কাজ থেকে কাজের সৃষ্টি হতেই থাকবে। শাখা ফুলফলের মত এ কাজ বেড়েই চলবে। আর ফল যখন পরিপক্ক হবে তখন কার্য পূর্ণ হবে। গাছ যতদিন না পুরোপুরি বাড়ে ততদিন কৃষকের চেষ্টার ক্ষান্তি নেই। তদ্রূপ লোক যতদিন না জ্ঞানী হয়ে উঠবে তত দিন জ্ঞান-প্রচারকের সোয়াস্তি কোথায় ?

তাই আমার দৃষ্টি পরিব্রাজকের ওপর অধিকতর নিবদ্ধ। দেশে তিন শত জেলা আর লোকসংখ্যা ছত্রিশ কোটি। তাই তিন শত জেলার জন্য অন্ততঃ তিন হাজার পরিব্রাজকের দরকার নয় কি ? এটা কি মস্তবড় দাবি ? কিন্তু লোক ভোগপরায়ণ হয়ে গেছে—এ হচ্ছে আজকের অবস্থা। ঘর-সংসারে যে খুব সুখ তা নয় তবু শখের প্রতি আসক্তির মোহ কাটে না! তাই বৈরাগ্যশীল, ক্রান্তিনিষ্ঠ লোক কম। অতএব আমার দৃষ্টি বিচার-প্রচারে সীমাবদ্ধ নয়, পরিব্রাজক সৃষ্টির দিকে তা সমধিক কেন্দ্রিত।

আমাদের দেশে খুব ধর্মনিষ্ঠা। কিন্তু পুরাতন ঢঙের ধর্মনিষ্ঠা আজ অচল। তা তান্ত্রিক হয়ে গেছে। কর্মকাণ্ডের রূপ ধারণ করেছে। এক মন্দির, তাতে এক মূর্তি আর আশপাশে অল্প কিছু লোক। একে কেন্দ্র করে ভক্তি প্রবাহিত হয়। কিন্তু লোকজীবনে ভক্তির পরশ লাগে না। ছোঁয়াচ লাগে অন্য সব জিনিসের, আক্রমণ চলে অপর সকল বস্তুর—বিড়ি, বিলাস, আলস্য, জড়তা, রাত্রি-জাগরণ, সিনেমার। এভাবে জীবনভোর সবদিক হতে আক্রমণ চলছে। লোক দেরিতে শোয়, দেরিতে ওঠে। তার ফলে দেশও দুর্বল হচ্ছে। তা যদি না হ'ত তার বুদ্ধিও পরাক্রমী হ'ত। চায়ের চলনও বেড়েছে। পেটে তৈল যায় কি যায় না, শিরে তৈল চাই-ই! তাও বাজারে-কেনা বিশ্রী তৈল। ফলে যৌবনেই লোকের চুল পেকে যায়। এভাবে অনেক মন্দ জিনিসে জীবন ভরে উঠেছে। বিশ-পঁচিশ বছর আগে যতটা নিয়মপরায়ণতা ছিল, আজ তা নেই। ঘড়ি দশগুণ বেড়েছে, কিন্তু লোকে দিন কাটাচ্ছে আলস্যে। ভাল জিনিসও কিছু আছে, কিন্তু সে-সবের উল্লেখ এখানে করছি না, কারণ দেশের জীবনে কতটা যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটছে তার ছবি আমি ধরছি। এর ওপর ধর্মসংস্থার, ভক্তির কোনই প্রভাব নেই। ভক্তি মন্দিরের আশপাশে আটক। লোকের কাজে তা আসে না। কিন্তু এই ভক্তির নামেই না শঙ্করাচার্য দেশময় ঘুরেছিলেন! আজ কেউ ঘুরছে কি ? লোকজীবনের ওপর ধর্ম-সংস্থার কোন প্রভাব আছে কি ? তাই ধর্ম একেবারে চেতনাহীন হয়ে গেছে। ফলে সিনেমার মত সাধারণ বিষয়কেও রুখবার শক্তি তার নেই। নিন্দা সবাই করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি নাই। কিন্তু এসব ভাববে কে ? এসব বিষয়ের জ্ঞান জনগণের কাছে পৌঁছাবে কে ? এক-কে দেখে আর-এক চলে। তাই পরিব্রাজকগোষ্ঠী চাই-ই। আর তাঁদের জ্ঞাননিষ্ঠ ত হতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রমনিষ্ঠও হতে হবে। তাঁরা গাঁয়ে গাঁয়ে যাবেন, লোকের সঙ্গে খাটবেন আর জ্ঞানও দেবেন। উৎসাহী লোক বেরিয়ে পড়েন ত গ্রামদান কি, মালিকানা বিসর্জন দেওয়া কি, একথা লোককে বুঝাতে বিলম্ব হবে না। আজ গ্রামে ত স্বরাজ নাই-ই। গাঁ বাজারদরের বশ। ধরুন, যুদ্ধ বেধেছে আর চাউলের দাম চড়ে গেছে ত আপনারা আত্মরক্ষা করবেন কিভাবে ? সকলের এক হয়ে যেতে হবে, মিলে মিশে চাষবাস করতে হবে আর গ্রামে কেউ না খেয়ে থাকে, ভূমিহীন না থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে—বাঁচার এই একমাত্র পথ। এভাবে নিজ নিজ সমাজ রক্ষা করেন ত হিন্দুস্থান সুখী হবে।

জীবনভোর এ কাজ করব এই ত ভাবনা হওয়া চাই। "'৫৭ সাল, তাই কিছু করতে হবে" এরূপ বললে এখন চলবে না, আর আরামপ্রিয় লোকের দ্বারাও জ্ঞান-প্রচার হবে না। কে কাঁপা আর কে কাঁপা নয় লোকে তা বোঝে। বল মাটিতে পড়ে ত মাটি তাকে উপর দিকে ঠেলে দেয়। কারণ মাটি জানে ওটা ফাঁপা। কিন্তু কোদাল দিয়ে মাটি কোপালে মাটি তাকে ভিতরে নিয়ে নেয়, ফেলে দেয় না। তদ্রূপ কর্মী যদি বলের মত হয় হয়ত লোকে তাকে ফেলে দেবে। '৫৭ সনের শেষ দিনের দিকে চেয়ে থাকতে তাকে হবে না, আজই ফেলে দেবে। কেননা সে যে ফাঁপা! লোকে বলবে, আমাদের জমির মালিকানা বিসর্জন দিতে বলছ, আর নিজে তা আঁকড়ে ধরে আছ! তাই শুদ্ধ বিচার লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজ খাঁটি লোক চাই। ইহা ক্রান্তিকার্য। মনে রাখবেন যে, আমরা ক্রান্তির নিকটে এসেও গিয়েছি। অতএব মনে-মুখে-এক এরূপ অকপট পরিব্রাজকের আজ সমধিক প্রয়োজন। সঙ্কল্প করে লোক বেরিয়ে পড়ে ত কাজ শীঘ্র হবে।

কুড়ন্নুর, পালঘাট (৬.৩.৫৭)

উজ্জয়িনী

দেবাচার্য

দোলপূর্ণিমায় সিদ্ধির সরবত খাওয়া বৈষ্ণবধর্মসম্মত কিনা জানি না, কিন্তু বন্ধুবর কবি কৃষ্ণচরণ বাঁড়ুজ্যে প্রতি সন্ধ্যায় এক লোটা সিদ্ধির সরবত খান এবং উপস্থিত অভ্যাগতকে খাওয়ান।

যে সন্ধ্যার কাহিনী বর্ণনা করছি, অর্থাৎ যে তারিখের সন্ধ্যায় এই অঘটন ঘটেছিল তা ঠিক আমার মনে নেই। যদিচ সন-তারিখ, দণ্ড-পলাদি নিয়েই আমার কারবার—কিন্তু সব সময় কি একই নিয়মে জীবনযাপন করা যায়?—সেদিন সবই ভুলে গিয়েছিলাম। মানে ভুল করে খেয়ে ফেলেছিলাম কবিবরের করাঙ্গুলি-ধৃত ও লোটাপরিমিত মিষ্ট পেস্তা-বাদামমিশ্রিত সিদ্ধির সরবত। স্থান - বৌবাজার ও আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের সন্নিকটে কোন একটি আরাম এবং বিরামস্থল, অর্থাৎ আধুনিক হোটেল। আরও কিছুটা কল্পনা করে নিন। হোটেলের একেবারে কোণের ঘরটা—সেখানে আগন্তুকের বিরামহীন পদশব্দ কানে পৌঁছয় না। আপনার মনের কোণে সঞ্জাত, ক্রমে ক্রমে আকারবতী ও শিরায় শিরায় সঞ্চারিণী বিদ্যুল্লতাকে আপনি পরিষ্কার চর্মচক্ষে দেখতে পান—ব্রীড়াবনতা নববধূর ন্যায় আপনার মানসী সহসা অবগুণ্ঠনবতী হয়ে ভীতা চকিতা হরিণীর মত সবেগে কক্ষত্যাগ করে পালিয়ে যায় না। আর আপনি আরাম-কেদারায় অর্ধ-নিমীলিত নয়নে অপার বিস্ময়ে পরম পুলকে ছায়া-নাটিকা দেখে যান—শিবরাত্রির হোলনাইট পারফরম্যান্স—একটার পর একটা সিনেমার ছবি—কখনও দেখেন, আকাশ যখন প্রভাত সন্ধ্যারাগে লোহিত, চন্দ্র তখন পদ্মমধুর মত রক্তবর্ণ পক্ষপুটশালী বৃদ্ধ হংসের ন্যায় মন্দাকিনীপুলিন হতে পশ্চিম সমুদ্রতটে অবতরণ করছেন, দিকচক্রবালে প্রৌঢ় রঙ্কুমৃগের মত একটি পাণ্ডুতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হচ্ছে, আর গজরুধির রক্ত সিংহজটার লোমের ন্যায় লোহিত এবং ঈষৎ তপ্ত লাক্ষাতন্তুর মত পাটলবর্ণ সুদীর্ঘ সূর্যরশ্মিগুলি ঠিক যেন পদ্মরাগশলাকার সম্মার্জনী—গগনকুট্টিম থেকে নক্ষত্রপুঞ্জগুলিকে ঝাঁট দিয়ে ফেলে দিচ্ছে কাদম্বরী জ্যোতির্লেখা।

আবার দৃশ্য বদলে যায়।—কিন্তু যাক, আর আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। আপনি বেশ বুঝতে পারছেন এতক্ষণে আপনি আর বিংশ শতাব্দী কলকাতা নামক নগরীর অলি-গলির অধিবাসী নন। নিত্য গৃহিণীর গঞ্জনা সহকারী আপিসের কেরানীবাবুই আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় নয়। অভাব-অনটনের জ্বালায় বাড়ীওয়ালা, ভাবী বৈবাহিক ও ঠিকে ঝির ভ্রূ-ভঙ্গিমাকে আপনি থোড়াই কেয়ার করেন। অন্ততঃ আজকের এই শুভ হিতবুক লগ্নে।

ওই শুনুন, কালভৈরব মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টাধ্বনি। স্থান উজ্জয়িনী। কাল শকাব্দ।—দুন্দুভির আওয়াজ কি এখনও শুনতে পান নি? শিঞ্জিনী বাজিয়ে মৃদঙ্গের তালে তালে—বীণা, মুরলী, মন্দিরা, কাহলের সুরের ঐকতানে উৎফুল্লা—মণিস্তবকিতবেণী রুচিরা ও বরারোহা শত নর্তকী নেচে চলেছে। আর নাটমন্দিরে দুইটি স্বর্ণসিংহাসনে পাশা-পাশি বসেছেন মহারাজ, আসমুদ্রমেখলা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বয়ং বিক্রমাদিত্য, বাঁ দিকে ভানুমতী, উর্বশীর ন্যায় শোভনাঙ্গী, ত্রিদিবেশ্বরীর ন্যায় রত্নবিভূষিতা। বিম্বাধরোষ্ঠী এমন গ্রীবা কি মরালের? এমন লোচনশোভা কি কুরঙ্গীর? এমন স্তনজ্যোতি কি ছায়াপথের? আর, আর নিম্নাঙ্গের বর্ণনা আধুনিক রুচিবিগর্হিত বলে কেষ্টদার সকল প্রশ্নগুলি এখানে উল্লেখ করলাম না, সেই জন্যে আপনাদের প্রশংসা দাবি করি!

একটা কথা আপনাদের বলা হয় নি। ডারউইনের ইভলিউশন অব দি এ্যানথ্‌পয়েড স্পিশিসের রুল মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই। শকাব্দের প্রারম্ভে আমরা হয়ে গিয়েছিলাম সদ্য-লেজ-খসা দুইটি টিকটিকি। নাটমন্দিরের স্তম্ভের পেলবগাত্রে ত্রিভঙ্গভঙ্গিমায় বিরাজমান—সকলকেই দেখতে পাচ্ছি, মানে প্রায় দশ ফুট উঁচুতে অবস্থান করছিলাম কিনা। কেষ্টদা টিক্‌টিক্ করে উঠলেন সহসা, আপনাদের বুঝবার সুবিধার জন্য টিকটিকির ভাষায় সেই সব কথাবার্তা উল্লেখ না করে আধুনিক বাংলা ভাষায় লিখছি, সেজন্যেও পুনরায় প্রশংসা দাবি করি।

কেষ্টদা—ভায়া, নিঃশব্দে নেমে এস, এবার মহারাজের কাছাকাছি ওই থামটায় যাওয়া দরকার, কবি কালিদাস আসছেন।

আমি—এ্যাঁঃ, কবি কালিদাস! কৈ কৈ?

—উই দ্যাখ, কি দেখছ?

—দেখছি, আমার মাত্র তিনশ' গজ দূরে একটি যাপ্য-যান।

—যাপ্যযান কথাটা শক্ত, বল পালকী।

—হ্যাঁ, পালকীর মত অনেকটা দেখতে বটে, তবে দোলা বলাই ভাল। চার ডাণ্ডা প্রকাণ্ড লম্বা, ছত্রিশ বেয়ারার কাঁধে চড়ে কবি এলেন মন্দিরে। কি উদ্দেশ্যে তা ত জানি না। বেয়ারাগুলোকে খুব ধমকাচ্ছেন, থুড়ি, ধমকানো ত দেখা যায় না, বেশ বুঝতে পারছি কিন্তু।

কেষ্টদা এইবার আবার টিকৃটিক্ করেন, বলেন—ঠিক আছে, তোমার প্রকাশের জাড্য ক্ষমা করলাম। আরও বেগে বুকে হেঁটে চল। নাচগানে সবাই অন্যমনস্ক। এই ফাঁকে আমাদের রাত্রির খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাক। কাল-ভৈরবের ঘরে অনেক আলো জ্বলছে, অনেক কীটপতঙ্গের আমদানী।

আমি—আজকে শিবরাত্রির দিনে কি হিংসে করা ঠিক হবে?

কেষ্টদা ক্রুদ্ধনয়নে ঘাড় বাঁকান, পরে একটু নরম হয়ে বলেন—স্তাথ ভায়া, হিংসা-অহিংসা, এসব কথা মানুষের রচনা। ভগবানের সৃষ্টিতে হিংসা বা অহিংসার সীমারেখা টানা অত সহজ নয়। চাল-কলার মধ্যেও কি প্রাণ নেই? যাক, নীরস জিনিস নিয়ে তর্ক করা আমার পছন্দ নয়, তোমাকেও নিষেধ করছি, যতদিন বেঁচে থাকবে শুধু দেখে যাও—নিজেকে রক্ষা কর, অকারণে জীবহিংসা করো না,কিন্তু প্রয়োজনের সময় সাহিত্যিক নিরীহদের কথা ভুলে যেতে পার। আন্তর্জাতিক অশোকের অনুশাসন মেনে চলতেই হবে এমন কোন চুক্তি করে ভগবান আমাদের সৃষ্টি করেন নি। আমরা স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত না হই, এইটেই বড় কথা।

অতঃপর আমরা দ্রুতবেগে মন্দিরের মধ্যভাগে প্রবেশ করি। থালায় থালায় নৈবেদ্য সাজানো, আর বাইশটা পুরোহিত—কি বিপুল তাঁদের বুকের ছাতি, আর পেট-গুলোও কি সুন্দর, সুগঠিত—ঠিক যেন আধমুনে জালা, কত বার তাঁদের কাঁধের উপর পড়ে পেট বেয়ে নেমে গেলাম, উঠে পড়লাম—দুইটি অনতিক্রান্তযৌবন পুরোহিত ছাড়া আর কেউ টেরই পেল না।

দুইটি পুরোহিতের নাম যথাক্রমে শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত। তাঁরা মন্দিরের এককোণে বসে অনুচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিল আমি কৌতূহলী হয়ে তাঁদের খুব কাছে যে থামটা সেই থামে উঠে বসলাম, কেষ্টদাও আমার অনুরোধে আমাকে অনুসরণ করলেন।

শার্ঙ্গরব—দেখ দেখ, দুটো টিকৃটিকি, একেবারে কালো, এঃ মা, কি বিশ্রী!

শারদ্বত—দুটোরই লেজ নেই। অর্থ কি জান, আজকে রাত্রেই ওদের মরণ ঘনিয়ে আসছে, কালভৈরবের আশীর্বাদে ওরা এবার জোড়া বলদ হয়ে জন্মাবে, আর যত রাজ্যের বস্তা-পচা গম আর সরষের তেলের ভাঁড় উজ্জয়িনী থেকে প্রতিষ্ঠানে বয়ে নিয়ে যাবে, তার পর—

শার্ঙ্গরব—যেতে দাও ওসব টিকটিকিদের কথা, জান 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' বলে কবি কালিদাস এক নূতন নাটক লিখেছেন। আজ রাত্রেই অভিনয় হবে। মহারাজ মহা-দেবী দু'জনেই এসে গিয়েছেন। বরাহমিহির, অমরসিংহ, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, আর্যভট্ট, বেতালভট্ট—ওঁরাও সবাই সস্ত্রীক এসে গিয়েছেন। কেবল কবি দিগ্‌নাগাচার্য আসেন নি, তাঁর নাকি ভয়ানক মাথা ধরেছে। মহারাজ অনুরোধ করে পত্রী পাঠিয়েছিলেন, তাও নিজে আসেন নি, ছেলেকে ও ছেলের মাকে পাঠিয়েছেন। আমার সন্দেহ হয়—

শারদ্বত—সন্দেহ আবার কি, ও ত সবাই জানে। এত দিন দিগ্‌নাগাচার্যের প্রতিপত্তি যাও-বা ছিল রাজসভায়, শকুন্তলা নাটক অভিনয় হবার পর আর তাঁর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মহাদেবী স্বয়ং নাকি কালিদাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছেন এবং মহারাজকে দুষ্যন্ত সাজিয়ে অন্তঃপুর-প্রেক্ষাগারে নিজেই শকুন্তলা হয়ে অভিনয় করেছেন। কঞ্চুকী বিশ্বনাথের জামাই ওই যে আমাদের হরদয়াল, তার দুই বোনই ত অনসূয়া আর প্রিয়ম্বদা সেজেছিল। শুনছি আমা-দের নাম দুটোও কালিদাস ব্যবহার করেছে নাটকে। ভারী অন্যায় কিন্তু।

শার্ঙ্গরব—তুমিও তা হলে খবর রাখ দেখছি।

শারদ্বত—খবর রাখব না, কবি কালিদাসের স্ত্রী মালবিকা—

কথাবার্তা আর শুনতে পাই না। নাকাড়া বেজে ওঠে, তার পর ঘোষণা শোনা যায়, শকারি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত চতুরুদধিমালা মেখলায়াভূর্বোর্জা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের আদেশে গীতপ্রিয় বিশ্বনাথ অনাদি ও অন্তের অধিপতি রঘু-নাথবরপ্রদাতা নাগপ্রিয় নরকার্ণবতারক মুক্তীশ্বর দেবাদিদেব মহেশ্বর মহাকালের প্রীতিকামনার্থে এক্ষণে কবি কালিদাস-রচিত "অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্" নাটক অভিনীত হবে। নাগ-রিকগণ নাগরিকবৃত্তিতে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেও কেন যে গ্রামবাসীর ন্যায় হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে বুঝতে কষ্ট হয় না এমন নাটকও কেউ কল্পনা করে নি।

আবার বুকে হেঁটে বিক্রমাদিত্যের কাছাকাছি থামের মাঝামাঝি উঠে গিয়েছি আমি আর কেষ্টদা। বলাই বাহুল্য টিকৃটিকি রূপে। পরিষ্কার দেখতে ও শুনতে পাই।

নান্দীপাঠ করেন স্বয়ং কবি কালিদাস। বাবরী চুল,

দাড়ি-গোঁফ কামানো, সুদীর্ঘ দেহ, লালটুকটুকে রং—মনে হয় পেস্তাবাদাম সিদ্ধি সরবত খান রোজ, আর গোটা লোটাভর দাড়িম বা বেদানার রস নিংড়ে, তা না হলে গাল দুটো অত লাল হবে কি করে?

কবিকণ্ঠ সুগম্ভীর। চীনে ঘণ্টার মত আওয়াজ, যেন গম গম করে নাটমন্দির। পুত্রবতীদের কোলে ক্রন্দনরত শিশুরাও ভয় পেয়ে চুপ করে যায়। আর মহাদেবী ভানুমতীর পশ্চাতে কবিজায়া মালবিকা নির্নিমেষ লোচনে তাকিয়ে আছেন দেখতে পাই।

যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা বহতি বিধিহুতং যা হবির্যা চ হোত্রী
যে দ্বে কালং বিধত্তঃ শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা বাপ্য বিশ্বম্।
যামাহঃ সর্ববীজপ্রকৃতিরিতি যয়া প্রাণিনঃ প্রাণবন্তঃ
প্রত্যক্ষাভিঃ প্রপন্নস্তনুভিরবতু বস্তাভিরষ্টাভিরীশঃ॥

তার পর সুরু হ'ল নাটক। সূত্রধারের কথা কয়টি এখনও পরিষ্কার মনে পড়ছে। নটী যখন বললে—আর্য, তুমি অভিনয়কার্যে যেমন ওস্তাদ, তাতে ত কোন ত্রুটি হবে বলে মনে হচ্ছে না, তখন সূত্রধার—পাগড়ীধারী, অনেকটা শিখ সর্দারের মত দেখতে বিশালকায় ব্রাহ্মণ বললেন—যতক্ষণ পণ্ডিতেরা তৃপ্ত না হন, ততক্ষণ আমরা যতই ভাল অভিনয় করি না কেন, আমাদের নৈপুণ্যের কোনই মূল্য নেই।

একেবারে মডার্ন রিং। আধুনিক যুগেও পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করবার ইচ্ছা দুরাকাঙ্ক্ষা নয় কি?

তার পর—?

তার পর সবাই ত জানেন। বাহুল্যভয়ে সব কথা লিখতে পারছি না। অনেক সব মজার ঘটনা ঘটেছিল। শকুন্তলা সেজেছিল রাজনটী বাসবদত্তা, আর অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদার ভূমিকায় নেমেছিল গান্ধার থেকে নবাগতা দুইটি তরুণী, একটির নাকি ঠাকুরমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল হুনেরা।—রংটা অবশ্য খুবই ফরসা, কানাঘুষা শুনতে পেলাম।

নাটক শেষ হবে হবে এমন সময় অঘটন ঘটল। যে অঘটন বর্ণনা করবার জন্যই এই কাহিনী।

কালিদাস ভরত-বাক্য উচ্চারণ করতে মঞ্চে উঠেছেন, সুরু করেছেন মাত্র এক পংক্তি: প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ সরস্বতী শ্রুত মহতাং মহীয়্যতাম। রাজা প্রজাবৃন্দের মঙ্গলানুধ্যানে প্রবৃত্ত হোন, বেদপ্রসিদ্ধা সরস্বতী সর্বত্র পূজিতা হোন—এমন সময়ে—

ফুড়ুৎ করে একটি শুকপাখী কোথা থেকে উড়ে এসে একেবারে কালিদাসের কাঁধের ওপর বসে পড়ল। সভাস্থ সকলে অবাক, এমনকি মহারাজ নিজেও নীরব নিস্পন্দ হয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন। কেবল দেখা গেল মহাদেবী ভানুমতী মৃদু মৃদু হাসছেন।

এ কি অঘটন! শুক ত নয়, সারী মানে মেয়ে-পাখী, ঠোঁট উঁচু করে কালিদাসের ঠোঁট ঠোকরাবে এই রকম ভঙ্গীতে গলা বাড়িয়ে পরিষ্কার মানুষীর কণ্ঠে বলে উঠল—

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, ক্ষণং তিষ্ঠ, শব্দমেকং ন গদসি।
যাবন্ন ব্রবীমি সভায়াং পাপিষ্ঠ তে দুষ্কৃতিকথনম্॥

থামো, থামো, ক্ষণকালের জন্যে থামো, শেষ করো না নাটক! সভায় দাঁড়িয়ে, হে পাপিষ্ঠ, আমি যতক্ষণ তোমার দুষ্কৃতির কথা সবাইকে না জানাচ্ছি ততক্ষণ তুমি আর একটা শব্দও উচ্চারণ করো না।

মহাকবি কালিদাসের সে মূর্তি স্মরণ করলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। না পারছেন কথা বলতে, না পারছেন পাখীটার গায়ে হাত দিতে। এমনই ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ক্ষুদ্র বিহগী চঞ্চু খাড়া করে আছে।

মহারাজ একবার প্রতীহারীর দিকে তাকান, একবার মহাদেবী ভানুমতীর দিকে। প্রতীহারী স্ত্রীলোক, অঙ্গনাজন বিরুদ্ধ কিরীচাস্ত্র লম্বিত থাকায় তাকে মনে হয় যেন বিষধরজড়িত চন্দনলতা। আবার সে শরৎলক্ষ্মীর ন্যায় কলহংসশুভ্রবসনা। বিন্ধ্যগিরির ন্যায় বেত্রলতাবতী। সে যেন মূর্তিমতী রাজাজ্ঞা, যেন বিগ্রহিণী রাজ্যাধিদেবতা।

মহারাজের ইঙ্গিতে প্রতীহারী রাজপুরোহিত ভার্গব সঙ্কটাচার্যকে ডেকে আনে। ভীষণদর্শন প্রধান পুরোহিত কালভৈরবের সিন্দুররাগরঞ্জিত ভালে একবার মাত্র হাত বুলিয়ে তিন তুড়ি দিয়ে হুঙ্কার দেন—কে তুই মায়াবিনী, বল, নাটকের ভরতবচন শেষ করতে তোর এমনকি আপত্তি। যদি বাছা প্রেতিনী হও, বলে ফেল সত্বর। কালই মহারাজ গয়ায় তোমার আত্মার মুক্তির জন্যে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করবেন। আর যদি যক্ষপুরী অলকা থেকে এসে থাক, তা হলে বল, তোমার কাহিনী আমরা শুনব। কিন্তু আমার অনুরোধ কবিবরের কাঁধটি ছেড়ে ওই ইন্দুকান্ত মণিদণ্ডের ওপর এসে বস। মহারাজ অনুমতি দিচ্ছেন।

কিন্তু সারীটা বড় ঠ্যাটা, সাফ জবাব দিল—কবির স্কন্ধদেশে আমার শাস্ত্রীয় অধিকার। আমার পরিচয় যাই হোক না কেন, আমি সব কথা সভাস্থ সকলের কাছে জানাতে বাধ্য নই। তবে কবি যদি সবার সমক্ষে আমার দাবি স্বীকার করে নেন, তা হলে তাঁর কাঁধ ছেড়ে গৃহের পিঞ্জরে থাকতেও আমার আপত্তি নেই।

এইবার বীণানিন্দিত কণ্ঠে মহাদেবী ভানুমতী সারীকে সম্বোধন করে বলেন—বল প্রিয়ংবদা, বল তোমার কাহিনী।

মহারাজ পরম বিস্ময়ে ভানুমতীকে জিজ্ঞেস করেন—তুমি কি করে জানলে সারীর নাম ? কী আশ্চর্য ! পাখীর নামও কি প্রিয়ংবদা হতে পারে ?

ভানুমতী চুপি চুপি মহারাজকে বলেন—হয় হয়, সবই হয়। পূর্বজন্মের স্মৃতিকথা যাদের মনে আছে, তারা জানে মানুষ আর বাঁদরেও তফাৎ নেই।

বিক্রমাদিত্য (নিম্নস্বরে)—তা হলে তুমি বলতে চাও তুমিও এককালে শাখামৃগী ছিলে।

মহাদেবীর ভ্রূভঙ্গীতে বাধাপ্রাপ্ত মহারাজ নিজেকে সামলে নিয়ে প্রকাশ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন—প্রিয়ংবদা বা অনসূয়া যেই হও না কেন, হে সারীরূপিণী, মনুষ্যকণ্ঠ-ধারিণী, সাবলীল ভাষায় কটুভাষিণী—হে গরুড়াত্মজে! বল ভদ্রে, বল, যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে তোমার কাহিনী শেষ কর।

এতক্ষণে মহাকবির বাক্যস্ফূর্তি হয়। কালিদাস বলেন—ভগবান চন্দ্রদেব অস্তাচলে। নিশা গভীর। জঠরে ও অরণ্যে বাড়বানলের তাপ আদৌ সুখকর নয়।

অশনিভয়পুঞ্জিত শৈলশ্রেণী। মধ্যগত কনকশিখরী মেরুর ন্যায় রাজন্যবর্গের মাঝখানে সম্রাট বিক্রমাদিত্য। যেন স্বর্গ-ধামে স্বর্ণসিংহাসনে রত্নবিভূষিত বাসব। নানা মাণিক্যাভরণ কিরণজালে তাঁর অবয়ব প্রচ্ছন্ন। মনে হয় যেন সহস্র ইন্দ্রায়ুধে অষ্টদিগ্‌বিভাগ আচ্ছাদিত করে বর্ষাকালের ঘন-গম্ভীর দিন বিরাজমান। লম্বিত স্থূলমুক্তাকলাপ ও স্বর্ণশৃঙ্খলে মণিদণ্ড চতুষ্টয়ে অমলশুভ্র অনতিবৃহৎ দুকূলবিতান বিস্তৃত, তারই অধোভাগে সিংহাসনে বসে রাজা। পরাভবপ্রণত শশীর ন্যায় বিশদোজ্জ্বল স্ফটিক পাদপীঠে তাঁর বামপদ বিন্যস্ত।

অকস্মাৎ কড় কড় করে মেঘ ডেকে ওঠে, প্রবল বেগে বাতাস বইতে সুরু করে, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যায়, আকাশ চিরে ছুটে চলেছে আলোকের রেখা। দমকা হাওয়ায় নিভে যায় সমস্ত স্বর্ণদণ্ডধৃত ঘৃতপ্রদীপের আলো, শুধু জলতে থাকে মশাল। আলোছায়ার মাঝেও ভানুমতীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায় নি। ঠিক পূর্বের মত দেখতে পাই তিনি তখনও মৃদু মৃদু হাসছেন আর তর্জনীর সাহায্যে মহার্ঘ্য শাড়ীর একপ্রান্ত জড়াচ্ছেন আর খুলছেন।

পরিষ্কার শুনতে পাই, এবার অতিশয় কোমল কণ্ঠস্বর—কোথায় সারী—কি অদ্ভুত ! আর্যবেশধারী ধবলবসন এক বৃদ্ধ চণ্ডাল, তার পশ্চাতে একটি তরুণযৌবনা কন্যা। নিদ্রার ন্যায় লোচনগ্রাহিণী এবং মূর্ছার ন্যায় মনোহরা।

অসুর-গৃহীত অমৃত অপহরণের জন্য কপটপটুবিলাসিনী বেশধারী ভগবান হরির ন্যায় সে শ্যামবর্ণা, যেন একটি সঞ্চারিণী ইন্দ্রনীলমণি পুত্তলিকা, আগুল্ফ-বিলম্বিত নীল-কঞ্চুকের দ্বারা তার শরীর আচ্ছন্ন এবং তারই উপরে রক্তাংশুকের অবগুণ্ঠনে যেন নীলোৎপলবনে সন্ধ্যালোক পড়েছে। একটি কর্ণের উপরে উদয়োন্মুখ ইন্দুকিরণচ্ছটার ন্যায় একটি শুভ্র কেতকীপত্র আসক্ত, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক।

—কে তুমি ? পরিচয় দাও। মহারাজ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

—ইনি কিরাতবেশা ত্রিলোচনা ভবানীর সখী—বৃদ্ধ চণ্ডাল নাটমন্দিরের মুক্তকুট্টিমে বেণুলতার গুচ্ছে জড়ানো যষ্টি আঘাত করে বলে। মহারাজ ও মহাদেবী উভয়েই সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দণ্ডবৎ হয়ে অভিবাদন জানান। অন্য সকলে হতবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

—আজ্ঞা করুন, মহামায়ার কি আদেশ ? মহারাজ বিনীত কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করেন।

বৃদ্ধ চণ্ডাল—মহামায়ার আদেশ জানাতেই আমি আপনার কাছে এসেছি, একে সঙ্গে নিয়ে।

—তুমি কে ?

—আমি মাতলি।

—আপনি মানে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের সারথি মাতলি ?

—হাঁ মহারাজ। দুষ্যন্তের বিদূষক মাধব্যের সখী চতুরিকার অভিশাপে আমার এই দুর্দশা।

—চতুরিকার রাগ হ'ল কেন ?

—জিজ্ঞেস করুন চতুরিকা আর মাধব্যকে।

—চতুরিকা আর মাধব্যকে জিজ্ঞেস করব। কি বলছেন আপনি ! ওরা ত নাটকের চরিত্র। আর ঘটনা ত অনেক দিন আগেকার।

— নাটকের চরিত্র হোক, আর ঘটনা যতদিনকার হোক না কেন, মহাকালের মন্দিরে এসব কথা অবান্তর। আপনার সভাকবি কালিদাস ও কবিজায়া মালবিকাই পূর্বজন্মে মাধব্য-চতুরিকা। আর মহারাজ স্বয়ং—

মাতলি থামেন। সভাস্থ সকল লোক হতভম্ব হয়ে অপেক্ষা করে।

এবার চণ্ডালকন্যা বলে—মহারাজ আমি জাতিস্মর, কোন কথাই ভুলি নি। আপনিই দুষ্যন্ত আর ভানুমতীই হ'ল শকুন্তলা।

চেয়ে দেখি ভানুমতী তখনও মৃদু মৃদু হাসছেন। নীরব হাসির অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। তা হলে ভানুমতী তিনিও কি জাতিস্মরা ? কেষ্টদার কানে টিক্‌টিক্ করি। কেষ্টদা টাক্ টাক্ করে প্রচণ্ড তিরস্কার করেন—থাম না

কেন, এখনই সব জটিল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ওই দেখ, মাতলি আবার কি বলছেন।

—মহারাজ মনোযোগ সহকারে শুনুন। ভবানীর আদেশে মহাকালের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আপনাকে ও উজ্জয়িনীর অধিবাসীবৃন্দকে সত্য ঘটনা সব জানাচ্ছি।

মহারাজের কাছে বিচার চায় এই মেয়েটি।

সে যে সারীরূপে কবির কাঁধে বসেছিল তার কারণ আছে। অধুনা ভবানীপ্রভাবে চণ্ডালকন্যা-বেশধারিণী, বড়ই হতভাগিনী এই মেয়েটি। এই মেয়েটির জন্যে আমি এখনও স্বর্গে ফিরে যেতে পারছি না। যদিও চতুরিকার শপথ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। চতুরিকা তার কাম্য বরলাভ করেছে, আমার ওপর কৃপাপরবশ হয়ে স্বয়ং বাসব এই মিলন ঘটিয়েছেন।

—দেবসারথি, ত্রুটি মার্জনা করবেন। চতুরিকা কেন অভিশাপ দিল আমাদের কবিবরকে, মানে আমি বলতে চাই দুষ্যন্তের সখা মাধব্যকে—সেকথা ত আপনি বললেন না। প্রকাণ্ডমস্তক বরাহ প্রশ্ন করেন।

—হে জ্যোতিভূর্ষণ, শুনুন তবে সেই কাহিনী। যে সময় আমি রথ নিয়ে রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর নিঃশব্দে নেমেছি, ইচ্ছে করলে আমি সশব্দেও নামতে পারি, আবার নিঃশব্দেও নামতে পারি—আমার রথের চাকায় স্বর্গীয় মখমল দিয়ে মোড়া দু'নম্বরের চাকা যোগ করে দেওয়া যায় কিনা—ঘটনার দিনে মখমলের সাহায্যে নীরবে নিঃশব্দেই নেমেছিলাম—আকাশভেদী 'মেঘপ্রতিচ্ছন্দ' নামক প্রাসাদে বিদূষক গিয়েছিলেন শকুন্তলার ছবি লুকিয়ে রাখতে। পাটরাণী বসুমতীর ভয়ে মহারাজ দুষ্যন্ত যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

—তার পর? এবার সৌখীনবেশ বররুচি প্রশ্ন করেন। বুঝলাম বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছে।

—তার পর, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসব, দেখি কয় ধাপ নীচুতে অন্ধকারে দুই ছায়ামূর্তি, একজন মেয়ে আর একজন পুরুষ। অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু কণ্ঠস্বরে আর সন্দেহ থাকে না, স্ত্রী-পুরুষে সুগোপনে কথা চলছে। যেসব কথা শুনেছিলাম তা সাধারণের কাছে প্রকাশ করায় বিপদ আছে, তাই আর বললাম না।

মাতলি দম নেন। পুনরায় বলতে সুরু করেন—দানববধে মহারাজ দুষ্যন্তের রোষ প্রজ্বলিত করবার জন্যে তার প্রিয়সখা মাধব্যকে দু'চার ঘা উত্তমমধ্যম দিয়েছিলাম। প্রণয়ে ব্যাঘাত ঘটাবার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু পরিণামে ফল হ'ল উল্টো—বাল্মীকির শিষ্য ঘৃতকৌশিক—সেই বংশের মেয়ে হ'ল চতুরিকা। ঘৃত ও অগ্নির সহযোগে কুশণ্ডের ন্যায় সহসা দপ করে জ্বলে উঠে মনে মনে আমাকে অভিশাপ দিয়েছিল—'চণ্ডাল হয়ে বাস করুন মর্ত্যে। যা শোনবার নয় (দেবতা হয়ে) তা শুনে নিয়েছেন অত্যন্ত অশোভন উপায়ে।' অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। চতুরিকার অভিশাপেই আমার এই দুর্দশা।

মাতলি কপালের স্বেদ মোচন করেন।

—ভবানীর নিকট অনেক কাকুতিমিনতি করেছেন আমার জন্যে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র। তাঁরই একান্ত চেষ্টায় চতুরিকা আজ মালবিকা হয়ে মর্ত্যে জন্মেছে। অধুনা কবি কালিদাসের গৃহিণী। মহারাজ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, আমার ওপর মালবিকা অর্থাৎ চতুরিকার আর রাগ নেই।

—বিচিত্র এ কাহিনী শোনাচ্ছেন দেবসারথি। মর্ত্যের লোকেরা কি এ কাহিনী সহজে বিশ্বাস করবে?

মাতলি, বৃদ্ধ চণ্ডালবেশী দেবসারথি এবার হাসেন—মহারাজ, এ কাহিনীর চেয়েও বিচিত্র কাহিনী আছে, এখনও শোনানো হয় নি। শুনুন তবে, এই চণ্ডালকন্যা পার্থিব সম্পর্কে আমার দৌহিত্রি হলেও পূর্বজন্মে এ ছিল ঋষিকন্যা। কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সখী।

অনসূয়া না প্রিয়ংবদা—?

—কে, কে উনি? প্রিয়ংবদা! সভাস্থ সবাই এক সময় প্রশ্ন করে ফিস্‌ফিস্ করে, কানে কানে। মনে হয় মধুচক্রের অলিগুঞ্জন ধ্বনি।—ক্রমে শব্দ মিলিয়ে যায়।

সভাস্থ সবাই উদগ্রীব হয়ে বৃদ্ধ চণ্ডালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ চণ্ডাল যেন ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছে মনে হয়। সত্যি কি মাতলি, না গন্ধিকাসেবক—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমার মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল বৈ কি।

জ্যোতিভূর্ষণ আচার্য বরাহ হঠাৎ খোঁৎ খোঁৎ করে গলা খাঁকার দেন, মাতলি ইতি চণ্ডালের কথায় বাধা দিয়ে বলেন—দাঁড়ান, আপনি যে বললেন, চতুরিকা আর মাধব্য সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কথা বলেছিল, কিন্তু আপনি যখন মাধব্যকে উত্তমমধ্যম দিচ্ছিলেন, তার একটু আগেই যে চতুরিকা মূর্ছিত মহারাজ দুষ্যন্তকে ধরে ফেলে বললে—সমস্সসউ ভট্টা (আশ্বস্ত হোন মহারাজ)।

—ওঃ, এই কথা। ও হ'ল কালিদাস বা মাধব্যের কারসাজি। কলমের এক খোঁচায় কত কি ঢেকে দেওয়া যায় তা কি মহারাজের প্রধান গণৎকার হয়েও আপনার জানা নেই?

বরাহ বলেন—বিলক্ষণ, জানি বৈ কি, খুব জানি।

—বলুন, আপনার আসল কাহিনীটা শেষ করুন, অনেক

রাত্রিও হয়ে গিয়েছে। পৌরজন ওঁরাও অভুক্ত কিনা। খাওয়া কারুরই হয় নি এখনও। এবার মহামন্ত্রী সৌগন্ধনারায়ণ মন্তব্য করেন।

মাতলি আবার সুরু করেন—সে এক অতি বিচিত্র কাহিনী। সে কাহিনীর কথা শুনলে অবাক হবেন। কবি কালিদাস সেসব কথা একেবারেই চেপে গিয়েছেন। প্রত্যাখ্যাতা শকুন্তলার স্মৃতি যখন মহারাজ দুষ্যন্তকে দিনরাত প্রদীপের সলতের মত পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে, তখন মহারাজের অনুমতি নিয়ে বিদূষক মাধব্য অর্থাৎ স্বয়ং কবি কালিদাস গিয়েছিলেন কণ্বমুনির আশ্রমে। সেই লতাকুঞ্জের অন্তরালে শুনলেন সখীদ্বয় প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার শোকার্ত হৃদয়ের বিলাপ। বার বারই প্রিয়ংবদা বলেছিল, পুরুষ হচ্ছে ফুলে ফুলে মধুলোভী অলি ছাড়া কিছুই নয়, সেই পুরুষের জন্যে কোন কুমারীর কৌমার্য ভঙ্গ করার কোন সঙ্গত অর্থ থাকতে পারে না, ইত্যাদি।

কিন্তু,

কিন্তু, চিরদিনই সাহিত্যিকেরা ছলনাকুশল। সোজা কথায় প্রতারক।

বিদূষক হয়েও তখন মাধব্যের মধ্যে ভাবী কালিদাসের রসিকতা অর্থাৎ ভাবার বাজারে কারবারী হয়ে ব্যবসায় করবার ক্ষমতা অঙ্কুর রূপে দেখা দিয়েছে। না, কথাটা ঠিক বলা হ'ল না, অঙ্কুর তখন সঞ্চারিত হয়ে দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে নয়নমনোহর শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় কদম্বতরুর ন্যায়। মাধব্য বাঁশী বাজাতেন কিনা তা আমার জানা নেই তবে শুনেছি হঠাৎ লতামণ্ডপে আবির্ভূত হয়ে এমনি ডায়ালগ সুরু করে দিলেন মাধব্যরূপী কালিদাস যে, শেষ পর্যন্ত একদিনের অতিথি সাত দিন, সাত দিন ছেড়ে এক মাসেও মাধব্য ছাড়া পান না প্রিয়ংবদা ও অনসূয়ার কাছে।

সুযোগ বুঝে মাধব্য দু'জনকেই প্রলুব্ধ করেন, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে। প্রিয়ংবদার চেয়ে অনেক বেশী সরলা ছিল অনসূয়া। তার মনে হিংসার ভাবও পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে কম। প্রিয়ংবদা অতিশয় চতুরা ও বুদ্ধিমতী। কিন্তু বুদ্ধিমতী হয়েও সে মজল সবচেয়ে গভীরে, কালিদাসের প্রেমে, মানে মাধব্যের প্রেমে।

কালিদাসের মনে দু'জনের প্রতি সমান টান, অর্থাৎ কবির পক্ষে যতটুকু টান থাকা স্বাভাবিক।

অবশেষে কণ্বমুনি টের পেলেন এবং প্রস্তাব করলেন—ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় মাধব্যরূপী কালিদাস যেন অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা দু'জনকেই গ্রহণ করেন—বললেন, কেন মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী যদি মিলে মিশে কাল কাটিয়ে দিলেন যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে, কোন বিরোধ, স্বাস্থ্যহানি বা মানসিক অশান্তির কথা ত শুনি নি—তবে কেন তোমরা মাধব্যের গৃহে এক সঙ্গে কাটাতে পারবে না। কাত্যায়নীর ন্যায় সরলা অনসূয়া বললেন—পিতা, যথা আজ্ঞা, আমি প্রিয়ংবদাকে সপত্নী জেনেও পূর্বের মত সখী ভাবতে কুণ্ঠিত হব না।

প্রিয়ংবদা নীরব, কোন কথাই বলে নি।

সেই রাত্রেই কালিদাস আশ্রম ছেড়ে পালিয়ে যান প্রতিষ্ঠানে। এমনকি বনের ব্যাঘ্রী সিংহী কাউকেই আর তার ভয় হয় নি।

—কি সাংঘাতিক কথা! আমাদের মহাকবি কালিদাস তিনি এত নিষ্ঠুর? এইবার ভানুমতী আবার কথা বলেন।

মাতলি বলে চলেন—মহাদেবী শকুন্তলা, অর্থাৎ এই জন্মে ভানুমতী আখ্যা নিয়ে জন্মেছেন। আপনার কি স্মরণ নেই, প্রিয়ংবদা ভাগীরথীর জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিল। সেই পাপেই ত আজ তার অধোগতি। চণ্ডাল-দৌহিত্রী রূপে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কিন্তু কঠোর তপস্যা করেছে সে। তার দুঃখের অবসান হওয়া উচিত। ভবানীর ইচ্ছা মহারাজ ও মহাদেবীকে জানালাম। এখন আপনারা বিবেচনা করুন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও মহাদেবী ভানুমতী ও নাট-মন্দিরের উপস্থিত সবাই কবি কালিদাসের দিকে তাকিয়ে। টিক্ টিক্ টিক্, কবি কেষ্টদা টিক্‌টিকি-ভাষায় মন্তব্য করেন—ঠিক ঠিক, কোনই সন্দেহ নেই, সাহিত্যিকেরা কাপুরুষ, কাউকেই তারা গভীর ভাবে ভালবাসে না। গভীর ভাবে ভালবেসেছ কি, কবিত্বের শেষ, একেবারে ময়রার কড়াইয়ে গরম ও গাঢ় রসে ডুবে মরে যাবে ভায়া, তোমার কলমে আর এক লাইনও প্রেমের কবিতা বেরুবে না।

—শোন শোন, কবি কালিদাসের ঠোঁট নড়ছে। আমি কেষ্টদাকে থামিয়ে দি।

কবি কালিদাস—মহারাজ যদি আদেশ করেন, চণ্ডাল-কন্যারূপিণী ভবানীসখী প্রিয়ংবদাকে গৃহে গ্রহণ করতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তবে গৃহের কর্ত্রীর অনু-মোদন থাকা চাই। মহারাজ শুধু দেশ শাসন করেন, মানিনী কুলকামিনীর অন্তরের রোষবহ্নি যদি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন, তবেই কাব্যলক্ষ্মীর সকল সখীদের প্রতি পক্ষপাতশূন্য হওয়া সম্ভব, নচেৎ—

কবিজায়া মালবিকার চোখ দুটো কি জলছে? আমি ভয় পেয়ে চোখ বুজি। আর সঙ্গে সঙ্গে পর্যঙ্ক থরথরিয়ে, একেবারে ভানুমতীর ক্রোড়ে।

সে কি আর্তনাদ। তক্ষক। তক্ষক। বুঝি কামড়ে দিল। ইত্যাদি শব্দে প্রতিধ্বনিত হ'ল মহাকাল মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির।

অলমতিবিস্তারেণ। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়ে দেখি—জোড়া বলদরূপে কলকাতার রাস্তায় গাড়ী টানছি না—বৌবাজারের মোড়ে মৃন্ময় মূর্তিযুগলের মধ্যে বিরাজ করছি আমি আর কেষ্টদা।

—ওঠ, ওঠ ভায়া, সকাল হয়ে গিয়েছে।

সারাটা রাত কাটিয়ে দিয়েছি আমরা দু'জনে আরাম-কেদারায় শুয়ে, বৌবাজারের হোটেলে। রাত্রে খাবার নিয়ে বারবার ফিরে গিয়েছে হোটেলের বয়। সে কি ঘুম! এমন ঘুমও আর কখনও আসে নি আমার চোখে।

কেষ্টদার হোটেলে একটি সাহিত্যচক্রের বৈঠক বসত। একদা আমার এই স্বপ্নের কাহিনীকে রূপ দিয়ে গল্প বলেছিলাম মুখে মুখে। মনে আছে সেই দিনের অধিবেশনের সভাপতি অম্বুজাক্ষবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন—অনসূয়ার কি হ'ল?

তাই ত কি হ'ল? সবাইয়ের চোখের দৃষ্টিতে সেই একই প্রশ্ন।

সে আরও বিচিত্র কাহিনী। কিন্তু বলার আর উপায় নেই!

হীরক

শ্রীকৃষ্ণধন দে

কালো কয়লার বিরাট স্তূপের তলে
এতটুকু আলো কেমনে বাঁধিল বাসা,
অন্ধ গুহার পাষাণ-কঠিন বুকে
লুকায়ে রেখেছে কে দরদী ভালবাসা?
যুগযুগান্ত চলে শুধু ভাঙাগড়া,
কবে যে তোমায় পেয়েছে বসুন্ধরা,
আদিম তৃষার অসহ ব্যথায় ভরা
একটি লুকানো ঘন-পুঞ্জিত আশা।

প্রণয়-স্বপনে তপনে বরণ করি
আজিও ধরণী ছুটেছে আবর্তনে,
হায় রে, তপন তবু রহে দূরে দূরে
বাঁধিতে পারে না চির-বাহুবন্ধনে।
গোপন অশ্রু বিরহের দাবানলে
শুষ্ক কঠিন, আঁধার মর্মতলে
প্রেমের অর্ঘ্য হীরা হয়ে তাই জ্বলে
নিভৃত গুহার অতলে সঙ্গোপনে।

সৌরকিরণ কেমনে বন্দী করি
রাখিয়াছ বুকে বিজ্ঞান নাহি জানে,
ইন্দ্রধনুর রঙের মাধুরী নিয়া
কি ছবি এঁকেছ হৃদয়ের মাঝখানে।
তীব্র আঘাতে কে গেছে তোমারে দলি,
অসহ প্রদাহে উঠেছিলে কবে জ্বলি,
কি যে বেদনায় ভরেছিলে অঞ্জলি
[illegible]।

খনির মাঝারে যাহারা তোমারে খোঁজে
জানে না'ক তারা কোথা এ ব্যথার নীড়,
সুদূর দিনের বনকঙ্কালে ঢাকা
প্রেমলিপিখানি বঞ্চিতা ধরণীর।
তোমারে ঘিরিয়া চলে কত অভিযান,
রক্ত আহবে হারাল কত না প্রাণ,
জয়-পরাজয়, লাঞ্ছিত অপমান
[illegible] দিয়ে হিমাজির।

রামধনু-আঁকা স্বপনপুরীর ছায়া
তব অন্তরে জেগে আছে চিরদিন,
কত প্রেমিকার চটুল আঁখির মায়া
তব জ্যোতিমাঝে আজো হয়ে আছে লীন।
কি রূপ ধরেছে প্রেমের বহ্নিকণা
বিজ্ঞান হায়, আজো তাহা বুঝিল না,
রূপ-বিহঙ্গী ক্ষণতরে উন্মনা,
আলোকপক্ষ মেলি হ'ল উড্ডীন।

নভোগঙ্গার উচ্ছল জ্যোতিকণা
শিশুধরণীতে কবে এসেছিল ছুটে,
সৃজন-লীলায় মত্ত সে শিশুমন,
লুকায়েছে তারে কুঞ্চিত করপুটে।
হায়, সেই শিশু তরুণী হয়েছে আজ,
সারা দেহে তার উজল শ্যামল সাজ,
শিশু-খেলাঘরে কি ছিল তাহার কাজ
সেকথা আসে না বিস্মৃতি-জাল টুটে।

পৃথ্বীর ভারে ক্লান্ত বাসুকি কাঁপে
কোন নিতলের সৃজন-সিন্ধুজলে,
ঠিকরিয়া পড়ে লক্ষ ফণার মণি
জানে না সে কোন্ নিঃসীম পথতলে।
যুগ যুগ ধরি ফিরি তারি সন্ধানে
মানুষ তাহারে আবার খুঁজিয়া আনে,
হেথা বাসুকির লাঞ্ছনা অপমানে
জলে ওঠে মণি ক্ষণেকের দাবানলে।

কিশোরী ধরার প্রথম প্রণয় আশে
পাঠায়েছে রবি উল্কার লিপিগুলি,
তারি মাঝে ছিল জ্যোতির অভিজ্ঞান
আজিও সে কথা যায় নি ধরণী ভুলি।
কোটি কোটি যুগ চলেছিল আরাধনা,
হয় নি বিফল প্রণয়ের বন্দনা,
লাজে সংকোচে বুকে ধরি প্রেমকণা
মণি-কৌটায় রেখেছে তাহারে তুলি।

আদিম বনানী ঋতু-আরাধনা তরে
চারু শ্যামলিমা রেখেছিল তনু ভরি,
অগ্নিগিরির ফুৎকার-কম্পনে
শেষ ফুল তার কখন গিয়াছে ঝরি।
যে প্রেম রচেছে ঋতু-বন্দনাগান,
অতল সমাধি হায় তার প্রতিদান ?
আজিও জ্বলিছে সে স্মৃতি অনির্বাণ
হীরক মাঝারে চির দিবা বিভাবরী।
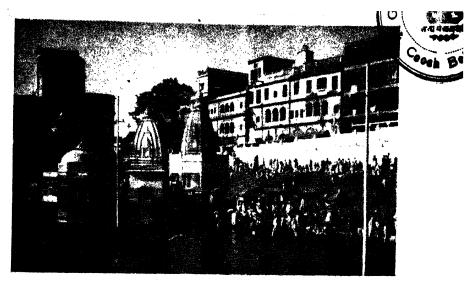
ব্রহ্মকুণ্ড, হরিদ্বার

হরিদ্বার

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

রাজধানীর মায়া কাটিয়ে আমরা মুসৌরী এক্সপ্রেসযোগে হরিদ্বারে এসে পৌঁছলাম। দিল্লী থেকে হরিদ্বার, কোট-প্যান্টের দেশ থেকে গেরুয়ার দেশে। নামতেই একজন আধাবয়সী লোক এসে কাছে দাঁড়াল। হাতে একটা মস্ত স্যুটকেসের মত জিনিষ। মনে করলাম কোন হোটেলের দালাল। সে বললে—'কিছু কেনো, স্যুচ, স্যুতো, বোতাম, টুথব্রাশ, পেষ্ট, হরেক রকম জিনিষ আছে আমার কাছে। আমরা পঞ্জাবের উদ্বাস্তু। এই ভাবেই দিন চলে।' একটা জিনিষ শিক্ষণীয় মনে হ'ল। সব হারিয়েও ওরা আত্মপ্রত্যয় হারায় নি। কারও কাছে ভিক্ষার জন্যে হাত পাতে না।

ষ্টেশনের বাইরে টাঙ্গা ষ্ট্যাণ্ড, টাঙ্গায় চেপে টাঙ্গাওয়ালাকে বললাম, 'রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে যাব।' সে ঠিক কথাটা বুঝলে না। বললাম, 'আশ্রম, অনেক গেরুয়া-পরা সাধু থাকে। 'এবারও কিছু হদিস পেলে না সে। আবার বললাম, হাসপাতাল আছে, রোগী থাকে। এবার সে ধরে ফেলেছে। 'বাঙালী হাসপাতাল, উ তো কনখল মে হ্যায়।' সপাত্ করে চাবুক পড়ল ঘোড়ার পিঠে, চাকায় গতিবেগ জেগে উঠল।

সামনেই দু'টো নাম-না-জানা গাছ শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। নাম জিজ্ঞাসা করলাম টাঙ্গাওয়ালাকে। কথা বুঝলে না সে। বললাম, 'য়হ পেড় হৈ, ভাই' ; 'পেড়, কিসকো বোলতা হৈ'—বলল সে। অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে তার দৃষ্টি গাছ দু'টির দিকে [illegible]। সে বললে, 'ও দুনোকা নাম শুনে কী বাবুজ নহী হৈ'—এরা পেড় বোঝে না। বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্লী অঞ্চলে গাছের প্রতিশব্দ পেড়। হরিদ্বারে বৃক্ষ আর তার উচ্চারণ খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণ—'বৃক্‌ষ', এখানে সূর্য্যকে বলে সূরীয়, শঙ্করাচার্য্যকে বলে, শঙ্করাচারীয়া। আগ্রা দিল্লীর হিন্দী আরবী-ফারসী ঘেঁষা, হরিদ্বারের হিন্দী সংস্কৃত-ঘেঁষা। দেবনাগরী এখনও স্বাক্ষর রেখেছে দেবস্থান হরিদ্বারে।

টাঙ্গা মোড় ঘুরতেই গঙ্গাদেবীর ফোয়ারামূর্ত্তি চোখে পড়ল। দু'হাতে দুটি জলপাত্র নিয়ে দেবী নিজের মাথাতেই জল ঢেলে চলেছেন। এই মূর্ত্তিই অভ্যাগতকে প্রথম স্বাগত-সম্ভাষণ জানায় হরিদ্বারে।

গঙ্গার সেতু অতিক্রম করে কনখলের পথে কদমে চলেছে অশ্বতর। পথ সাম্প্রতিক। পিচ-ঢালা পরিষ্কার রাস্তা। গঙ্গা এখানে কন্‌ট্রোলে বাঁধা। ইরিগেশন ক্যানেলের মধ্যে গঙ্গার ধারা শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সাহারাণপুর জেলার শিরায়-উপশিরায় চলে গেছে। তবু কি উন্মাদিনী বন্ধন মানতে চান। নৃত্যচপলা কিশোরীর উদ্দাম গতিচ্ছন্দে দ্রবময়ী উপলের বাহুবন্ধনকে উপেক্ষা করে শিবলিঙ্গ পর্ব্বতমালার পাশে পাশে গীতিমুখর কণ্ঠে প্রবহমাণা। কোথাও পুষ্পস্তবকাবনম্রা প্রকৃতি প্রসারিত বাহু দিয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করেছে, কোথাও ধূমল পাহাড় তাঁর গতিরোধ করতে চেয়েছে, কোথাও নিভৃত নিকুঞ্জ তাঁর বিশ্রামের আয়োজন করে দিয়েছে, কোথাও মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি আর অর্ঘ্যারতি দিয়ে

নর-মানব দেবীকে ভক্তির বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছে। কিন্তু কৈ, কেউ ত এঁর অজস্র ধারাকে ধরে রাখতে পারে নি। ইন্দ্রের ঐরাবত ভেসে গেছে খরস্রোতে, কেবল শিব নাকি এঁকে জটাজালে আবদ্ধ করেছিলেন। মর্ত্ত্যের মানব ভগীরথের আর্ত্ত কণ্ঠের ডাকে পতিত-পাবনী সে বন্ধনকেও ছিন্ন করে কৈলাসের কোল দিয়ে, গোমুখের মধ্য দিয়ে সগরবংশের মুক্তির জন্য নেমে এসেছেন সমতলভূমিতে। এই হরিদ্বারেই গঙ্গার প্রথম সমতলে অবতরণ। এই গঙ্গাপ্রবাহ সারা উত্তরাখণ্ডকে রসসিক্ত করে সমৃদ্ধ করেছে। এর কূলে কূলে জেগে উঠেছে যত জনপদ। গঙ্গাই গাঙ্গেয়দের জীবনধারা।

গঙ্গাদেবীর ফোয়ারামূর্ত্তি

কনখল। মিশনের সামনে টাঙ্গা থামল। গৈরিক রঙে রঞ্জিত মিশনের দেওয়াল। লতানে লতায় সুন্দর ভাবে ফটকটি সজ্জিত। গেরুয়া-রঙের ফুলগুলি দুলছে মৃদুমন্দ বাতাসে। ভেতরে ঢুকলাম। স্বামী রঘুবরানন্দজী গিয়েছিলেন সাহারাণপুর। তবু আশ্রয়ের জন্য ভাবতে হ'ল না। গেষ্ট হাউসে আশ্রয় মিলল। ফল ও ফুলবাগানের মধ্যে গেষ্ট হাউসটি। চারিদিকে গন্ধরাজ আর গোলাপ গন্ধ বিলাচ্ছে। যেন প্রকৃতির ক্রোড়েই আশ্রয় পেলাম। সায়াহ্ন সমাগতপ্রায়। তাড়াতাড়ি চা-পর্ব্ব শেষ করে ব্রহ্মকুণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। পথের একপাশে ক্যানেল-বাহিনী গঙ্গা, অপরপাশে স্রোতবহা নীলধারা। দুপাশেই দৃষ্টি-নিক্ষেপ করতে করতে কনখল থেকে হরিদ্বারের দিকে অগ্রসর হলাম। কনখল থেকে ব্রহ্মকুণ্ডের দূরত্ব দেড় মাইলের বেশী হবে না। আবার গঙ্গার সেতু পেরিয়ে মায়াপুরীতে প্রবেশ করলাম। হরিদ্বারের অপর নাম মায়াপুরী। মায়াদেবী এখানে জাগ্রতা। মহাদেবেরও ছড়াছড়ি। ভূতেশ্বর, বনকেশ্বর, বিবকেশ্বর, কালভৈরব —কত কি।

প্রাচীন হরিদ্বারের পথেঘাটে আধুনিক কাল তার স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে। এখানে, ওখানে রেস্তোরা, হোটেল, পথে পথে পঞ্জাবের বাস্তুহারার দল; চেলল আর সিল্কের সালোয়ার-পরা মেয়েদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। যে-কোন আধুনিক সহর থেকে হরিদ্বার এতটুকুও ভিন্ন নয়। ইুডিওতে টুরিষ্টরা ছবি তোলাচ্ছে, সিনেমাতে দর্শকেরা কিউ দিয়েছে, কফিখানায় ছেলে-ছোকরারা ভিড় জমিয়েছে, গোল হয়ে বসে

চণ্ডীপাহাড়ের দিকের একটি দৃশ্য—হরিদ্বার

সংবাদপত্রপাঠরত পাণ্ডারা রাজনীতি আলোচনা করছে, ক্যাশেনেবল সুবেশ যাত্রীর দল দোকানে দোকানে বেতের বাস্কেট, জেলি-জ্যাম, সোহাগ-সিন্দুর বা ছেলেদের কাঠের খেলনা কিনছে। তবু হাওয়াতে যেন একটু অধ্যাত্মভাব মেশানো। মন আপনা হতেই তন্ময় হয়ে পড়ে। জুতোজোড়া পড়ে থাকে টাঙ্গাতে। খালি পায়ে পথে নেমে পড়ি। খটখটি বাজিয়ে চলা সাধুর ভজন শুনতে ইচ্ছে করে। চোখ ঘুরে বেড়ায় পাহাড়ে পাহাড়ে আর গঙ্গার ধারায় ধারায়। মাছমাংস খাওয়ার কথা মনে আসে না, বরং মাছের মিছিলকে আটার গুলি নিক্ষেপ করে খাওয়াতে ভাল লাগে।

ব্রহ্মকুণ্ডের পথে নেতাজী সুভাষের মূর্ত্তি চোখে পড়ল। এক-সঙ্গে আনন্দ ও গৌরব দুই-ই অনুভব করলাম। সন্ধ্যারতিই পর্ব্ব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে ব্রহ্মকুণ্ডে। সারি সারি পাণ্ডার দল অর্ঘ্য, ঘৃতারতি, স্তোত্রের দ্বারা গঙ্গাদেবীকে বন্দনা করছে। সমবেত ঐকতান ও মন্ত্রের স্পষ্ট উচ্চারণ মধুস্রাবী করে তুলেছে পাণ্ডাদের গঙ্গা-বন্দনাকে। যাত্রীর দল ভাসিয়ে চলেছে ঘৃতের প্রদীপ, ফুলের নৌকা আর মালা। দীপান্বিতা ভাগীরথী কুসুমদামসজ্জিতা, ব্যঞ্জনাময়ী। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত গঙ্গার শোভা দর্শন করে সেবাশ্রমে ফিরে গেলাম। সেখানে পৌঁছে সবে বেশবাস পরিবর্ত্তন করেছি অমনি ঘণ্টাধ্বনিতে নৈশ ভোজনের আহ্বান প্রচারিত হ'ল। সেবাশ্রমের অনাড়ম্বর ভোজ্যে উদরপূর্ত্তি করে শয্যায় আশ্রয় নিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে দরজা খুলেই দেখি স্বামী রঘুবরানন্দজী দেখা করার জন্য গেষ্ট হাউসের সামনে পায়চারি করছেন। সেবাশ্রমের স্বরূপ চোখের সামনে ফুটে উঠল। এঁরা সত্যই সেবাব্রতী। বিনয়নম্র ব্যবহারে কৃতার্থ হলাম। কিছু অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানবার জন্য স্বামীজী ব্যগ্র হলেন। বললাম, বাড়ীর চেয়ে আরামে আছি। বিজলীবাতি, [illegible]

আরামপ্রদ বিশ্রামাগার এবং তার সংলগ্ন স্নানাগার ও শৌচাগার, অভাব কিসের ?

স্বামীজীর নিকট দর্শনীয় জায়গা ও মন্দিরগুলির নাম এবং পথ-রেখা জিজ্ঞাসা করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিলাম। স্থির হ'ল সর্বপ্রথম ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান, দান এবং কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃকৃত্য শেষ করতে হবে। তাই বেলা সাতটায় বেরিয়ে পড়লাম টাঙ্গায় চেপে। আশ্বিন মাসের প্রথম। কিন্তু বাতাস বেশ কনকনে। চাদর গায়ে দিলে ভাল হয়। অবশ্য শীত শীত ভাবটা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে যেতে লাগল।

স্পষ্ট দিবালোকে আজ হরিদ্বারকে দেখলাম। পাহাড় আর পাহাড়, যেন পাহাড়ের শোভাযাত্রা। পাহাড়ের স্তর ক্রমোচ্চ হয়ে চলে গেছে দূরে—বহু দূরে। কোথাও পাহাড়ের উপরে, কোথাও কোলেপিঠে মেঘ জমে আছে। এপারে মনসাপাহাড়, ও-পারে চণ্ডীপাহাড়। এপারে শিবপূজা, ওপারে শক্তিপূজা। গঙ্গার ও-পারের ঐ চণ্ডী পাহাড়েই নাকি শক্তিরূপিণী মহামায়া একদা

হর-কি-পিড়ির একটি দৃশ্য

মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। চণ্ডীপাহাড়ের ছায়া পড়েছে নীলধারার বুকে। এপার জনবহুল, ওপার জনবিরল। শুনলাম কুম্ভমেলার সময় ওপারেও জীবনের সাড়া জেগে ওঠে। এখানে গঙ্গাকে বলে সপ্তসরোবর। কিন্তু ধারা সব শুকিয়ে গেছে। এখন চোখে পড়ে তিনটি ধারা মাত্র। তাও একটি ছাড়া অপরগুলি সরকারের কুক্ষিগত অর্থাৎ ক্যানেল সিষ্টেমে বাঁধা পড়েছে।

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলাম আমরা। বাপুর পূজাপাঠের জন্য কিছু দেরি হ'ল। একজন পাণ্ডা জুটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। অন্যান্য তীর্থস্থানের মত এখানের পাণ্ডারা তত জুলুমবাজ নয়। যে যা দেয় তা নিতে তেমন আপত্তি করে না। ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যভাগে গঙ্গাদেবীর মন্দির। আর তার আনাচে-কানাচে খুপরি খুপরি ঘরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য দেবদেবী। রামচন্দ্র, সীতাজী, সত্যনারায়ণ, রাধাগোপাল এমনকি কালীমূর্তিটি পর্যন্ত। কুণ্ডের জলমধ্যে গঙ্গা-মন্দির সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, আকবর [illegible] মানসিংহের [illegible] ভূমিজলাদি দিয়ে [illegible] হিসাবে

ঐ মন্দির তৈরি করান। এটি নাকি মানসিংহের অন্তিম ইচ্ছার রূপায়ণ।

মনসা পাহাড়ের উপর মনসাদেবীর মন্দির

সমুদ্রমন্থনে উঠেছিল অমৃত। সেই অমৃত নিয়েই দেবতা-অসুরে বিবাদ। ইন্দ্রের পুত্র জয়ন্ত অমৃতের ভাণ্ডার নিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডে তিনি ভাণ্ডটি দুদিন লুকিয়ে রেখেছিলেন। তখন দু-এক ফোটা অমৃত উপচে পড়ে যায় এই কুণ্ডে। তাই কুণ্ডটির এত মাহাত্ম্য। আবার ব্রহ্মা তপস্যা করে-ছিলেন বলে এর নাম ব্রহ্মকুণ্ড। স্থানটি কপিলমুনিরও তপস্যাপূত। কুণ্ডটি নুড়ি পাথরে বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল, তাই বিড়লা শেঠ এটিকে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। এখন এর শ্বেত মর্ম্মরপাথরের সিঁড়ি। স্নান ও কাপড়ছাড়ার পৃথক পৃথক স্থান নির্দেশ করা আছে মেয়ে-

হরিদ্বারের গঙ্গার দৃশ্য

পুরুষের। ঘড়ি-ঘর তৈরি করে দিয়ে বিড়লা শেঠ স্মরণীয় হয়ে আছেন এখানে। ঘাটটির নাম হয়েছে হর-কি-পিড়ি। আমরা বলি হরিদ্বার, এখানে বলে হর-দুয়ার। হরিহরের মিলন এখানে। আমাদের হরি বা হরের যে আবাস, দেবতাত্মা হিমালয়, তার প্রবেশ-

পথের সুরু এই ব্রহ্মকুণ্ডের পাশ দিয়েই। এই পথই পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পথ। পাণ্ডবেরা যে এই পথ দিয়েই গিয়েছিলেন তারও স্বাক্ষর লেখা হয়ে আছে ভীমগোড়ায়। এখানে ভীম নাকি পায়ের গোড়ালির চাপে জল বের করেছিলেন। তার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এখনও পাণ্ডারা একটি কুণ্ড দেখিয়ে দেয়। কুণ্ডের পাশে মধ্যম পাণ্ডব পাথরের মন্দিরে অধিষ্ঠিত। যুধিষ্ঠিরও এই অঞ্চলে একবার যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। অনতিদূরেই দ্রোণভূমি দেরাদুন।

মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির

কুশাবর্ত্ত ঘাটে যাবার পূর্ব্বে পাণ্ডা চন্দন-তিলক এঁকে দিলে ললাটে। একতারা বাজিয়ে একজন সাধু ভজন গেয়ে চলেছে আপনমনে। কিছু দিতে গেলাম। ভ্রূক্ষেপ নেই। সাধাসাধি করলাম। হিন্দীতে বললে:

চা গিয়া ত চিন্তা গেয়ী মনুমে নেই প্রবাহ
যিসকা শুদে সন্তোষ রাজে উহি শাহানশাহ।

এখানে একটা জিনিষ দেখে বিস্ময় অনুভব করলাম। ছোট ছোট ছেলেরা গঙ্গায় ডুব দিয়ে যাত্রীপ্রদত্ত ফল, সোনা-রূপার টুকরা, পাই-পয়সা সবকিছু ছোঁ মেরে নিয়ে আসছে জলের তল থেকে। একটুও ভয়-ভাবনা নেই ওদের। আবার বিকেলে মোটর-টায়ারে চেপে ছেলেরা গঙ্গা পার হচ্ছে অবলীলাক্রমে।

কুশাবর্ত্ত ঘাটে পিতৃকৃত্য শেষ করে মনসাপাহাড়ে উঠলাম। এখানে পাহাড়শীর্ষে মনসাদেবীর মন্দির। পূজারী নিত্য এসে পূজা করে যায়। আমরা সৌভাগ্যক্রমে ঠিক পূজার সময়ে গিয়ে পৌঁছলাম। দেবীমূর্ত্তির মধ্যে বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। সমগ্র হরিদ্বার এখান থেকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। শুধু হরিদ্বার কেন, দূরে কেদারনাথের তুষারাবৃত চূড়ার একাংশেরও খানিকটা স্পষ্ট চোখে পড়ে এখান থেকে। পাহাড় থেকে নেমে সেবাশ্রমে ফিরতে মধ্যাহ্ন প্রায় গড়িয়ে গেল।

বিশ্রাম নিয়ে বেলা তিনটের সময় বেরিয়ে পড়লাম আবার। রৌদ্র বেশ প্রখর, গরমও বেশ। মায়াপুরীতে মায়াদেবীকে দর্শন করলাম। এটি দেবীপীঠ। এখানে ছিন্ন জিহ্বা পড়েছিল। দেবী চতুর্ভুজা। প্রথম হাতে বরাভয়, দ্বিতীয়ে নরমুণ্ড, তৃতীয় হাতে ত্রিশূল, চতুর্থে মহাচক্র। একটু অগ্রসর হয়ে কাল-ভৈরব মন্দিরে গেলাম। ভৈরব যেন কালীমূর্ত্তি। সেখান থেকে পশ্চিমে আর খানিকটা হেঁটে পাহাড়ের কোলে বিম্বকেশ্বর শিবমন্দির পেলাম। মন্দিরটি প্রাচীন। শিব পাতাল ফুঁড়ে উঠেছেন। পাহাড়ের গা বেয়ে একটু অগ্রসর হয়ে পেলাম গৌরীকুণ্ড। এখানে গৌরী শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। তৃষ্ণার্ত্তা গৌরীর পিপাসা নিবারণের জন্য শিব এই কুণ্ডের সৃষ্টি করেন বলে কিংবদন্তী
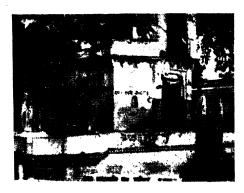
দক্ষপ্রজাপতির আলয়, কনখল

প্রচলিত আছে এ অঞ্চলে। পাহাড়ের উপর আছেন বনকেশ্বর মহাদেব। এই পথেই মহাত্মা ভোলাগিরির সাধনায় সিদ্ধিলাভের গুহাটি অবস্থিত। বার বছর নির্জ্জনে তপস্যা করে তবে সিদ্ধিলাভ করেন গিরিমহারাজ। সাপ তাঁর সঙ্গে এক গুহায় বাস করেছে, বাঘ পোষা কুকুরের মত তাঁর গুহার সামনে বসে প্রীতিতে ওষ্ঠ-লেহন করেছে। কেউ কাউকে হিংসা করে নি। গুহাদর্শনের পর টাঙ্গায় চেপে গিরিমহারাজের আশ্রমে এলাম আমরা।

সামনেই মন্দির। মাঝে শিব আছেন। বাঁ-পাশে শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি, ডান-পাশে ভোলাগিরি মহারাজের মূর্ত্তি। সুন্দর মন্দিরটি। এখানে বহু সন্ন্যাসী বাস করেন, অধিকাংশই বাঙালী। মন্দিরের পিছন দিকে গুম্ফা ছিল, সেখানে এখন দোতলা বাড়ী উঠেছে। নীচের ঘরে ভোলাগিরির সমাধির উপর ছোট একটি শিবলিঙ্গ আছে। দেওয়ালে গিরিমহারাজের বড় অয়েল পেন্টিং, খাট, বিছানা, আসন ইত্যাদি আছে। এগুলি কিন্তু আসল নয়, সাজানো, আসল দেখতে হলে সেক্রেটারী মহারাজের অনুমতির প্রয়োজন। আমরা অনুমতি নিয়ে অন্য ঘরে রক্ষিত গিরিমহারাজের ব্যবহৃত পুরাতন বিছানা, মশারি, খাট, পূজার বাসন, একটি রিক্সাগাড়ী, বাঘছাল, হরিণ-চামড়া প্রভৃতি দেখলাম। ভোলাগিরি মহারাজের একটি ধর্ম্মশালা একেবারে গঙ্গার উপরে। জল বাড়লে এর নীচের তলায় জল ঢুকে যায়। ধর্ম্মশালাটির উপর থেকে গঙ্গায় নয়নাভিরাম দৃশ্য চোখে পড়ে। দু'ধারে পাহাড়ের মধ্যে মর্ত্ত্যবাহিনী ভাগীরথী ছলছল কলকল ধ্বনি তুলে নেমে আসছে

আসন্ন সন্ধ্যায় ফিরে এলাম ব্রহ্মকুণ্ডে। পথে রামলীলার মহড়া দেখে এলাম। এখনি বেরুবে শোভাযাত্রা, আজ আমরাও একটি ফুলের বড় নৌকা কিনে তার মধ্যে ঘৃতের প্রদীপ বসিয়ে, আলো জ্বেলে ভাসিয়ে দিলাম গঙ্গার স্রোতে। এখানে একে বলে

সতীঘাটের পথের মন্দির

দোনা ভাসানো। জনসমাগম আজ কিছু বেশী। তিন জন পাণ্ডা একশো আটটি প্রদীপ দেওয়া বিরাট আরতি-প্রদীপে একসঙ্গে শঙ্খ, ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি করতে লাগল গঙ্গাদেবীর। আমরা এপারে অর্থাৎ ব্রহ্মকুণ্ড ও গঙ্গার মাঝে বাঁধানো দ্বীপের মত সেতুর উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম সন্ধ্যারতি। বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে আমরা শোভাযাত্রা দেখবার জন্য ব্রহ্মকুণ্ড হতে চলে এলাম।

চলেছে শোভাযাত্রা। আজ রামের বনবাস। শকটে শোভাযাত্রা বের হয়েছে। সারি সারি মানুষে-টানা শকট। শকটগুলি সুন্দরভাবে রথের আকারে সাজানো। প্রথমে চলেছে মন্থরা ও কৈকেয়ী। মন্থরা কৈকেয়ীকে কুপরামর্শ দিচ্ছে হাত-মুখ নেড়ে। পরের শকটে বৃদ্ধ শোকাতুর রাজা দশরথ। চোখে-মুখে তাঁর বেদনা ফুটে বেরুচ্ছে। তিনি একান্ত নিরুপায়, কারণ কৈকেয়ীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পর পর কয়েকটি শকটে মুহ্যমান অযোধ্যাবাসী। সর্বশেষ শকটে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, পথে লোকের ভিড় জমে গেছে। একজন বৃদ্ধা চোখ মুছতে মুছতে দশরথকে স্ত্রৈণ বলে হিন্দীভাষায় গালাগালি দিচ্ছে। রাত্রি প্রায় নয়টায় সেবাশ্রমে ফিরে এলাম।

পরদিন প্রত্যূষে সেবাশ্রমে বিশেষ রকমের কর্ম্মচঞ্চলতা জেগে উঠেছে দেখতে পেলাম। স্বামী অখণ্ডানন্দের জন্মতিথি। মন্দির বিশেষভাবে সাজানো হচ্ছে। হাসপাতাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে।

এখানের এই আশ্রম ও হাসপাতাল স্বামী বিবেকানন্দের আগ্রহে স্থাপিত হয়। সাধুদেরও রোগজ্বালা আছে। তাদের দেখবে কে? তাই এই সেবাশ্রম আতুর সাধুসন্তদের সেবার ভার নিয়েছে। সুন্দর পরিবেশ সেবাশ্রমের। এক কথায় একে সেবাকুঞ্জ বলা যায়।

চা-পর্ব্বের পর বেরিয়ে পড়লাম কনখল দর্শনে। সেবাশ্রমের সামনে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির। মন্দিরটি পাথরের। বেশ বড় ও সুন্দর। এর স্তম্ভ ও অলিন্দের ভাস্কর্য্য অনুপম। অনেকগুলি সাধু থাকেন এখানে। এটি হরিহর মঠের এলাকাধীন। একটু

নীলধারা ও নীলপাহাড়, হরিদ্বার

দূরেই নির্ব্বাণী আখড়া। এটি এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় আখড়া। মণ্ডলেশ্বর এখন এখানে নেই, কয়েকজন শিষ্য আছেন মাত্র। নকলদানার মত প্রসাদ কিছু হাতে দিলেন তাঁদের একজন।

নির্ব্বাণী আখড়া ঘুরে দক্ষপ্রজাপতির আলয়ে প্রবেশ করলাম। প্রাচীন গৃহ ও মন্দির। ভাঙাচোরা পরিবেশ, দক্ষেশ্বর দেবতা এখানকার। পাণ্ডারা বললে, এই যে দীপশিখা জ্বলছে দেখছেন, এ অনাদিকালের। বিচার করলাম না, শুধু শুনে গেলাম। পাশেই সতীঘাট। গিয়ে জমে-থাকা জলে হাত ছুঁইয়ে তা মাথায় নিলাম, গঙ্গা এখানে থমকে থেমে আছেন। স্রোত নেই, পুকুরের মত কিছুটা জল জমে আছে সতীঘাটে। জল ছাড়া না ছাড়া এখন সরকারের হাতে। বিশেষ বিশেষ যোগে তাঁরা জল ছাড়েন। তখন উল্লাসময়ী ভাগীরথী সতীঘাটে কলনাদিনী হয়ে উঠেন, যাত্রীরা আনন্দে স্নান করে, পাণ্ডারা দু' পয়সা পায়, এখন সবকিছুই বন্ধ।

সতীঘাটে দেখলাম ছোট ছোট কবরের মত স্মারকচিহ্ন। যে-সব সতীরা স্বামীর চিতায় সহমৃতা, এগুলি তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে রেখেছে। আবার যেসব উৎপীড়িতা রাজপুতানীরা সতীত্বরক্ষার জন্য জহরব্রত করে জীবনদান করেছিল, এগুলির মধ্যে তাদেরও স্মরণিক চোখে পড়ে। এটি আবার দাক্ষায়ণীর দেহত্যাগের স্থান। দক্ষালয়ের পাশে বর্দ্ধমানের রাণীর নাগেশ্বর মন্দির। যোগানন্দ স্বামী থাকেন এখানে। তাঁর কাছ থেকে 'হিমাদ্রিশিখরে' পুস্তকখানি উপহার পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করলাম। বইখানিতে স্বামীজীর কেদারবদরী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

এবার সতীকুণ্ড দেখব বলে টাঙ্গায় চাপলাম। পথে প্রায় এক মাইল ব্যাপী ভারোমলের (ভৈরব মল্ল) প্রাসাদ-বাগিচা দেখতে

পেলাম। এখন উদ্বাস্তুরা বাসা বেঁধেছে এখানে। একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের পাশের মাঠে সতীকুণ্ড সতীর স্মৃতিকে আজও পর্যন্ত বহন করছে। জল অপরিষ্কার।

নীলধারার প্রবাহ

এখানে একটি যজ্ঞস্থলের ধ্বংসাবশেষের মত কিছু চোখে পড়ে। পাণ্ডারা বলে এখানেই দক্ষযজ্ঞ শিব-শম্ভু পণ্ড করে দিয়েছিলেন, কুণ্ডের পার্শ্বে একটি ছোট মন্দিরে সতীর মূর্ত্তি আছে।

টাঙ্গায় চেপে গান্ধী সেবাশ্রম বাঁ পাশে রেখে এসে পৌঁছলাম গুরুকুলে। দু পাশে সেগুনের সারি, মাঝে বাঁধানো পথ, শ্রদ্ধানন্দ-দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রাবেশ করতেই চোখে পড়ল বাঁ পাশে গোশালা, একটি ছোটখাটো প্রাসাদ বললেই হয় এটিকে। গাছতলাতে ছোট ছোট ছেলেরা পড়ছে। কোথাও আবার ব্যায়ামের ক্লাস নিচ্ছেন শিক্ষকমশাই। সমবেত ডন বৈঠক নজরে পড়ল। চলেছি বাঁধানো রাস্তা ধরে। স্কুল, ছাত্রাবাস, কলেজ, সবই চোখে পড়ছে, সম্মুখে বিড়লার তৈরী বেদমন্দির। তার ভিতর ঢুকলাম, দেখলাম একটি বহু স্তম্ভযুক্ত বড় হল, উপরে তিন পাশে বারান্দা আর তাতে বৈদিক যুগের ঘটনা সম্বলিত প্রাচীরচিত্র, নীচে সম্মুখের প্রাচীরগাত্রে পতঞ্জলি, শ্রদ্ধানন্দ, ধ্যানী বুদ্ধের রঙীন চিত্র তিনটি, প্রভৃতি রয়েছে। উপরে উঠলাম বাইরের সিঁড়ি দিয়ে। উপরে মিউজিয়ামের মত প্রাচীন শিলালিপি, নানা রকমের পিতল ও প্রস্তরের প্রাচীন মূর্ত্তি, নানা প্রকারের চিত্র, প্রাচীন পুঁথি, ছাত্র-শিক্ষকের মিলিত ছবি প্রভৃতি রয়েছে। আবার নীচে নেমে এলাম। সামনে লাইব্রেরী ও বেদ-মহাবিদ্যালয়। বেদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছিল তখন। কি শ্রুতিমধুর সংস্কৃত উচ্চারণ! মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল দেখলাম। সারি সারি ছাত্রাবাস। কয়েক মাইল জায়গার উপর মনোরম জনবিরল পরিবেশে এটি একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। আর্য্যসমাজী স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রচেষ্টায় এটি গড়ে উঠেছে।

গুরুকুল থেকে বেরিয়ে আমরা ঋষিকুলের দিকে অগ্রসর হলাম। পথে পঞ্জাব ক্যানেল দু-বার পার হতে হ'ল। রামনগর পাশে রেখে এলাম। এর পূর্ব্বনাম ইসলামনগর। অধিবাসীরা পঞ্জাবে উঠে গেছে, তাই নামেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ডান পাশে মোড় ঘুরে আবার হরিদ্বারের রাস্তায় এসে পড়লাম। পিছনে রয়ে গেল রুড়কির রাস্তা। অতিক্রম করে গেলাম প্রেমনগর। বাঁ দিকে রাণীপুর, এলাম 'ঋষিকুলে', এটিও একটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ছাত্রাবাস, মালবীয় উদ্যান, অধ্যাপনার জায়গা, আয়ুর্ব্বেদ ভবন ইত্যাদি দেখলাম। ঠিক মাঝখানে যজ্ঞকুণ্ড, তার পাশে লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্দির ও পাকশালা। স্নান সেরে এসে আট ন' বছরের বালক ব্রহ্মচারীরা দণ্ডহস্তে যজ্ঞকুণ্ড ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তার পর বৈদিক প্রথায় তারা সমস্বরে উচ্চারণ করতে লাগল বেদমন্ত্র। ঘৃতাহুতি দিলে যজ্ঞকুণ্ডে সমবেত ভাবে। প্রাচীন সামগান মুখরিত ভারতবর্ষ চোখের সামনে ভেসে উঠল, আরণ্য-সভ্যতা হাত-ছানি দিয়ে ডাকলে।

এখানে অর্থাভাব আছে। তাই চাঁদার খাতা আনলেন একজন সেবক। এখানকার বালক-ব্রহ্মচারীর দল—তাদের পরিচ্ছদের পারি-পাট্য না থাকলেও, শৃঙ্খলায় সারল্যে এবং পবিত্র বৈদিক মন্ত্রের উচ্চারণে মনে ছাপ রেখে দিলে, এ রকম আশ্রম ও পরিবেশ দেশে আরও গড়ে উঠলে জাতির কল্যাণ হ'ত, ছাত্ররা উচ্ছৃঙ্খল হ'ত না।

প্রায় বেলা বারটায় আশ্রমে ফিরে এলাম। অখণ্ডানন্দের জন্মতিথি, তাই আহার্য্য দ্রব্যে আড়ম্বর ছড়ানো রয়েছে দেখলাম। কত রকমের মিষ্টান্ন। শুনলাম এই সবই ভক্তদের দেওয়া, পরিপাটী আহার করে শয্যাগ্রহণ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না।

বিকেলে এসে বসলাম নীলধারার ধারে। বিচিত্র বর্ণের নুড়ি পাথরের ভিড় এখানে। গঙ্গা এখানে খরস্রোতা, তরঙ্গময়ী, কলকল্লোলিনী—জনমানব নেই, কেবল সেবাশ্রমের একজন অবাঙালী সাধু আসনে বসে ধ্যান-ধারণা করছেন নিরালায়। আপন সত্তা হারিয়ে ফেললাম—আবাস, বৃত্তি, কিছুই মনে রইল না। তন্ময় হয়ে বসে রইলাম নীলধারার ধারে, আনন্দদোলায় মন দুলতে লাগল। মনের যে একটা ভগবদ্‌মুখী অংশও আছে, তা এখানে এসে উপলব্ধি করা গেল।

সন্ধ্যায় আশ্রমে বিশেষ ধরনের পূজাপাঠ ও স্মরণ-সভার ব্যবস্থা ছিল, তাই শীঘ্র ফিরে এসে সভায় যোগ দিয়ে অখণ্ডানন্দের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে ভাষণ শুনতে বসে গেলাম।

স্বামীজীদের নিকট বিদায় নিয়ে পরদিন দুন এক্সপ্রেসযোগে মুসৌরী যাত্রা করলাম।

---

* ছবিগুলির কয়েকটি শ্রীমান অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

শিশুদের শিক্ষা

শ্রীলীনা নন্দী

আজ যে শিশু মার কোলে শুয়ে ছোট্ট ছোট্ট হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছে বা দোলায় শুয়ে শুয়ে অবিরাম কেঁদে চলেছে, সেই হয়ত আগামী দিনের জনগণমন-অধিনায়ক বা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী অথবা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হবে। কি জানি কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে আমাদের এই নবজাতকের মধ্যে। প্রতিটি শিশুর মধ্যেই রয়েছে আগামী দিনের কিছু-না-কিছু সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে ঠিক পথে চালিত করে তার সত্য রূপ দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের, বিশেষ করে শিশুর মাতাপিতার। মানুষ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গুণ উত্তরাধিকারসূত্রে নিয়ে আসে ঠিকই। এখানে আমরা দার্শনিক 'লকে'র 'টেবুলা রেজা' (Tabula Rasa) তত্ত্বে বিশ্বাস করি না; আমরা বরং ফরাসী দার্শনিক 'দেকার্তে'র মতানুসারী। কারণ আমরা সংস্কারবাদী, আমরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। জাতক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বহন করে আনে বিগত জন্মের সংস্কার বা তার নিজস্ব কিছু গুণ। কিন্তু সেটাই সব নয়। সেই সংস্কারের বীজ এই জীবনের জল, হাওয়া ও মাটির গুণে বিশেষ ভাবে পল্লবিত ও মুকুলিত হয়ে ওঠে। শিশুর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, তার শিক্ষা-দীক্ষা তার উপর অনেক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিশুশিক্ষার সমস্যা সহজ নয়।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশুকে চিরকাল অবজ্ঞার পাত্র করে রাখা হয়েছে। তাদের মাতাপিতা অবজ্ঞা করেছেন শিশুদের মন, রুচি ও শিক্ষাকে। তাঁরা শিশুদের স্নেহ করেছেন, খাদ্য জুগিয়েছেন এবং ছ'সাত বৎসর অবধি দিয়েছেন তাদের খেলা করার প্রচুর সুযোগ। শিশুর সকল কথা ও কাজকে নিরর্থক ভেবে হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। এতটুকু মনোযোগ দেন নি তাঁদের শিশুদের প্রতি। তার পর একটু বড় হলে পাঠিয়েছেন সাধারণ বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষার জন্য। এই ভাবে তাঁরা শিশু-পালনের দায়িত্ব থেকে খালাস হন। এইজন্য আমরা দেখি আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশু গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলেছে। সত্যিকারের শিক্ষার অভাবে বা সুযোগের অভাবে তাদের সম্ভাবনাগুলি প্রকাশ পায় না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা আমাদের শিশুশিক্ষার অন্ধ ধারণার মূলে কিছুটা কুঠারাঘাত করেছে বলেই আজ আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্‌গণের কাছে শিশুশিক্ষা এক কঠিন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে। তাঁরা আজ এটুকু হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, শিশুশিক্ষাকে আজ আর সেই বাঁধাধরা পথে চালিত করলে চলবে না। শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ পথের ও বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন। শিক্ষাটা সেখানে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা করলেই চলবে না। আগামী দিনের নাগরিক গড়ে তুলতে হলে শিশুর মনের, স্বাস্থ্যের ও চরিত্রের শিক্ষা বিশেষ করে প্রয়োজন। একটি শিশুকে সুস্থ ও সবল করে মানুষ করতে হলে তার প্রতি ছোট্ট অবস্থা থেকেই বিশেষ ভাবে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শিশুমন এক তাল মাটির মতো; তার উপর আমরা যা' লিখব ভবিষ্যৎ জীবনে সেটাই চিত্ররূপে প্রতিফলিত হবে। অতএব জীবনের আরম্ভে মনকে চরিত্রকে গড়ে তোলার সময় উপদেশ নয়, অনুকূল অবস্থা এবং অনুকূল নিয়মই সকলের চেয়ে বেশী আবশ্যক। লোক-শিক্ষক রবীন্দ্রনাথও যে এই গতানুগতিক শিক্ষার বিরোধী ছিলেন তার উদাহরণ পাই আমরা তাঁর শিক্ষা গ্রন্থখানি পাঠ করলে। তাঁর লেখা কয়েকটি পংক্তি তুলে দিলেই আমরা সহজেই বুঝতে পারব যে তাঁর শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল—"কোন মতে সাড়ে নয়টা-দশটার মধ্যে তাড়াতাড়ি অন্ন গিলিয়া বিদ্যাশিক্ষার হরিণবাড়ীর মধ্যে হাজিরা দিয়া কখনই ছেলেদের প্রকৃতি সুস্থভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কণ্টকিত করিয়া, ঘণ্টা দ্বারা তাড়া দিয়া মানবজীবনের আরম্ভে এ কি নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে!…না-জানা হইতে ক্রমে ক্রমে জানিবার আনন্দ পাইবে বলিয়াই কি শিশুরা অশিক্ষিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে না!…শিশুদের জ্ঞানশিক্ষা বিশ্বপ্রকৃতির উদার রমণীয় আকাশের মধ্য দিয়া উন্মেষিত করিয়া তোলাই বিধাতার অভিপ্রায় ছিল—সেই অভিপ্রায় আমরা যে পরিমাণে ব্যর্থ করিতেছি সেই পরিমাণেই ব্যর্থ হইতেছি। হরিণবাড়ীর প্রাচীর ভাঙিয়া ফেল, মাতৃগর্ভের দশ মাসে পণ্ডিত হইয়া উঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করিও না—তাহাদিগকে দয়া কর।" অতএব আমাদের দেশের শিশুশিক্ষার আমূল পরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন সেটা আধুনিক যুগে সবাই উপলব্ধি করেছেন এটুকুই আশার কথা।

এখন কি পদ্ধতিতে এই শিক্ষা হবে এও এক সমস্যার বিষয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে আমরা দেখেছি এ নিয়ে বহু চিন্তামূলক গবেষণা চলেছে। আমাদের দেশেও তার ছায়া পড়েছে কিছু কিছু। কিন্তু এই শিক্ষা-পদ্ধতি নিরূপণ করার আগে আমাদের বুঝতে হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সত্য ধারণা না থাকায় আমরা এতদিন ভুল পথে চলেছি, এখনও শিক্ষার পথ অন্বেষণে হাতড়ে বেড়াই আনাড়ির মত ঠিক পথের সন্ধান পাই

না। আমাদের একটি ভুল ধারণা আছে যে, বিদ্যালয়ের কয়েকটি মোটা মোটা বই পড়ে ডিগ্রি লাভ করলেই বুঝি শিক্ষার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। এ যে কত বড় ভুল ধারণা সেটা আজ আমরা উপলব্ধি করছি প্রতিপদে। আমাদের দেশের বহু স্বনামধন্য বিদ্বান ও শিক্ষিত লোকেরা তাঁদের শিক্ষার গণ্ডীর বাইরে পঙ্গু হয়ে আছেন—জীবনযুদ্ধে তাঁরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন প্রতি পদে। তাঁদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মনুষ্যত্বের অভাব। একে আমরা সত্যকারের শিক্ষা বলব না। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের বা ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। শিশুকাল থেকে যদি আমরা শিশুর এই মনুষ্যত্ব বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দিতে পারি তবে সেই শিক্ষাই হবে সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা। মানুষের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটানোই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুর সামগ্রিক পুরুষীয় সত্তার কথা। চিন্তাশক্তিই তার সব নয়। তার ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটবে তার চিন্তা, কর্ম্ম ও অনুভূতির মাধ্যমে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছেন, দেহের সব রক্ত যদি মুখে এসে জমে তাকেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলব না। তেমনি চিন্তাশক্তির বিকাশকেই কি আমরা শিক্ষা বলব? অতএব শিশুর চারিত্র, চিন্তাশক্তি ও অনুভূতির বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের শিক্ষা-পদ্ধতি নিরূপণ করা উচিত। এইজন্য আমাদের গতানুগতিক শিক্ষার পথ ছেড়ে আসতে হবে।

আমাদের দেশের পণ্ডিতসমাজ পুঁথিগত শিক্ষা যথেষ্ট পেলেও তাঁরা অনেকেই মনের শিক্ষা পান নি। তাই তাঁরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা কোনও সুন্দরের রসাস্বাদন করতে পারেন না। কারণ, রুচি তাঁদের শিক্ষিত হয় নি, তাঁরা দীক্ষা পান নি সেই মন্ত্রে যে মন্ত্র তাঁদের উদার আকাশের সঙ্গে শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে শেখায়। তাঁদের চোখে সে মোহাঞ্জন কোনও দিনই লাগল না যে অঞ্জনের গুণে বিশ্বসংসার সুন্দর হয়। তাঁদের কান কোনও দিনই শুনল না ঈথারের সেই গান যে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় শব্দ-ব্রহ্মের আসন পাতা হয়েছে। আমাদের দেশের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষ জীবনের রূপ-রস, তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা বুদ্ধি দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তত্ত্বকথা শিখেছেন, বোধি দিয়ে 'রূপের ট্রুথ'কে বোঝেন নি।

এ কথা সত্য যে, "Ears to hear and eyes to see"—শোনার জন্য কান, দেখার জন্য চোখ। কিন্তু এর জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন এ কথা আজ আমরা বুঝতে শিখেছি। কারণ এই প্রকৃতির মধ্যেই Dorothy Wordsworth উপলব্ধি করেছেন একটি আত্মার উপস্থিতি তাই তিনি স্বগতোক্তি করেন, "Hush, there is a spirit in the woods"। বনলক্ষ্মীর অশরীরী আত্মার নিঃশব্দ পদসঞ্চার কবি-ভগিনী শোনেন; শ্রবণেন্দ্রিয় কোন উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকলে মানুষ এই অতীন্দ্রিয় শক্তি লাভ করে তা ভাববার কথা। যে ভাগ্যবান এই দুরূহ সৌভাগ্য লাভ করেছেন তিনি জানেন তাঁর চার পাশের জগত কত বিচিত্র, কত সুন্দর। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা; একবার তাঁকে তাঁর এক ভক্ত বলেন, 'গুরুদেব, আপনার লেখার মধ্যে সমালোচকেরা পশ্চিমদেশীয় লেখকদের লেখার ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন।' কবিগুরু হেসে বলেছিলেন যে, কোনও লেখকের কাছে কোনও ঋণ তিনি রাখেন নি কেন না প্রত্যূষে যখন উষা অনাগত তখন কবি পূর্ব্বমুখী হয়ে আত্মসমাহিত চিত্তে প্রকৃতির কাছ থেকে তাঁর ইন্দ্রিয়পথে যে অবদান গ্রহণ করেন তার প্রায় কিছুই তিনি তাঁর লেখায় প্রকাশ করতে পারেন না—হাজার হাজার সুন্দর ছবি মনের তলায় তলিয়ে যায়। সংখ্যাহীন সুন্দরের ভাব-ভাবনা হারিয়ে যায় অপ্রকাশের নীচে। তাঁর প্রয়োজন থাকে না অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করবার। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই দুরূহ সৌভাগ্যের অধিকারী। তাঁর শিক্ষা তাঁর অনুভূতিকে তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর সমগ্রীয় পুরুষীয় সত্তাকে চক্ষুষ্মান করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষা পেয়েছিলেন সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। যে শিশুর অনুভূতির বিকাশ ঘটল না সে কখনই সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারল না। এই অনুভূতি গড়ে উঠে চোখ ও কানের মাধ্যমে। সেইজন্য সেই চোখ ও কানকে দেখার ও শোনার জন্য উপযুক্ত ভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। প্রতিটি শিশুর মধ্যে রয়েছে গভীর অনুভূতি; তার নমুনা পাই যখন দেখি শিশু খুব কাঁদছে, তার মা চাঁদ দেখালেই সে চুপ করে যায় বা মায়ের মিষ্ট গানে সে ঘুমিয়ে পড়ে। অতএব আমরা দেখি যে, এই অনুভূতি মানুষের স্বভাব-প্রবৃত্তি। এইজন্য এমন শিক্ষা-পদ্ধতি গড়ে তোলা উচিত যে শিক্ষা শিশুর এই সুপ্ত অনুভূতির পূর্ণ বিকাশ ঘটাবে এবং তাকে সুশিক্ষিত করে তুলবে। শিশুকে ছোটবেলা থেকে গল্প ও ছড়ার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। শিশু চিরকাল কল্পনাপ্রবণ তাই আমরা যখন তাদের রূপকথা বলি বা গানের ছলে কিছু শেখাই তখন তারা অতি অল্প সময়ে সেগুলি শিখে নেয়। কিন্তু যখন আমরা তাদের ইতিহাস বা ভূগোল পড়াই তখন তাদের তথ্যভারে ভারাক্রান্ত মন হাঁপিয়ে ওঠে এবং কোনও রস পায় না বলেই পরজীবনে ভুলে যায় সে তথ্যের কথা। আজকাল আমরা দেখেছি বহু নার্সারী বা মন্টেসারী স্কুলে এই সঙ্গীত ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে শিশুদের অনেক-কিছু শেখানো হয়। এর দুটি দিক আছে—একদিকে শিশু অতি অল্প সময়ে এই সুরে আকৃষ্ট হয় বলেই বিষয়টি সহজে শেখে। দ্বিতীয়তঃ তাদের কান এমনভাবে তৈরী হয়ে যায় যে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা সঙ্গীতরসকে আস্বাদন করতে সমর্থ হবে। মানুষের জীবনে যে সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা সকলেই আজ উপলব্ধি করেছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ হাওয়ার্ড হোয়াইট হাউস-এর কথা উদ্ধৃত করে দিই:

"In simpler language this means that through music as well as through the Prophets and the mystics, we receive Spiritual truths by intuition. It is in this way among others, that men by following the prompting of their own heart or conscience or Spirit, call it what we may, are able to

enter into the fellowship of a great cultural and spiritual life.”

সেইজন্ত আমরা দেখি পাশ্চাত্য দেশে ‘nursery songs’-এর উপর এত জোর দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও আজ বহু ধরনের শিশুসঙ্গীত ও ছড়া প্রকাশিত হচ্ছে। শিশু-বিদ্যালয়গুলিতে সঙ্গীত, ছড়া, অভিনয়, অঙ্কন ও রূপকথার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আমি বলছি না প্রত্যেক শিশুই সুগায়ক বা শিল্পী হবে কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রুচিকে এমন ভাবে সুশিক্ষিত করতে হবে যাতে ভবিষ্যত জীবনে তারা সঙ্গীত ও শিল্পের রসোপলব্ধি করতে পারে। এই জন্ত শিল্প-কলা শিক্ষা শিশুশিক্ষার অন্ততম অঙ্গ হওয়া উচিত কারণ শিল্পের ভিতর দিয়াই মানুষের সত্যিকারের পূর্ণ সত্তার উন্মেষ হয়।

শিশুশিক্ষার প্রধান কথা হ'ল শিশুর মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলা। হাতে-কলমে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি যে, শিশুকে রুটিন-বাঁধা শিক্ষা না দিয়ে যদি তার মনের গতি ও রুচি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় তা হলে অতি অল্প সময়ে বিষয়বস্তুটি শেখান সহজ হয় এবং সে শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী। শিশুর মন একটি বিচিত্র বস্তু—তার খেয়াল, তার খুশী, তার কৌতূহল ও প্রশ্ন কোনটাই নিরর্থক নয়। শিক্ষককে ভাল করে বুঝতে হবে শিশুর মনের গতি ও খেয়াল-খুশীকে। যেমন শিশু কি চায় তার প্রিয় বস্তু কি এই সব। এগুলি বুঝতে না পারলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়াস ব্যর্থ হবে। দ্বিতীয়তঃ শিশুমন কৌতূহলী। সে পৃথিবীর সবকিছু জানতে চায়। শিশুমনের এক নিগূঢ় প্রশ্ন কবিগুরু অতি চমৎকার করে বলেছেন :—

“খোকা মাকে শুধায় ডেকে
এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে ?”

এ প্রশ্ন শিশুর জীবন-জিজ্ঞাসা। এ রকম নানা অর্থপূর্ণ প্রশ্নের ভিতর দিয়ে শিশু জানতে চায় তার পারিপার্শ্বিককে। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা দেখেছি শিশু যখন কিছু জানতে চায় তখন তার মা বা তার শিক্ষক বলেন, ‘বড় হও জানতে পারবে।’ এই ভাবে শিশুর প্রশ্ন বা কৌতূহলকে এড়িয়ে গিয়ে শিশুর মানসিক শক্তিকে আমরা প্রতিনিয়তই পঙ্গু করে দিচ্ছি। এই অবদমিত ইচ্ছা শিশুর মানসিকতার যে ক্ষতি করে তা অপরিমেয়। আধুনিকতম মনোবিকলন এ কথা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, শিশুর কৌতূহল বা তার ইচ্ছা যদি অবদমিত হয় তা হলে উত্তর জীবনে তার মানসিকতার বিপর্যয় ঘটে। তার ব্যক্তিত্ব ভিন্নমুখী হয়। যে মাটিতে শিব হয় ত গড়া যেত সেখানে মর্কটের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

শিক্ষকের কর্তব্য শিশুর কৌতূহল মিটান এবং স্নেহের সঙ্গে তার সকল ভয়, সঙ্কোচ ও দ্বিধা দূর করা। শিশু-মনঃতত্ত্ব শিক্ষকদের বোঝা একান্ত দরকার।

এই ধরনের শিক্ষা সাধারণ বিদ্যালয়ে হওয়া সম্ভব নয়। অতএব শিশুদের জন্ত এক বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হওয়া দরকার। আমরা দেখেছি রাশিয়ায়, চীনে ও পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আজকাল নার্সারী ও মন্টেসারী স্কুলের মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। সেই সব স্কুলগুলিতে মুক্ত প্রাঙ্গণে শিশুরা খেলা-ধুলা, সঙ্গীত ও শিল্পের ভিতর দিয়ে তাদের মন, শরীর ও চরিত্রের বিকাশ ঘটাচ্ছে। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীগণ তাঁদের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছেন তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের। খেলাধুলা ও নানান কাজের ভিতর দিয়ে তাদের নানা রকম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যেটা উত্তর জীবনে এদের সাহায্য করবে। এই সকল স্কুলের উদ্দেশ্য শিশুদের স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভর করে মানুষ করা। লোকশিক্ষক রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ‘শিক্ষা’ প্রবন্ধে এ রকম আদর্শ বিদ্যালয়ের ছবি এঁকেছেন। তাঁর কথা উদ্ধৃত করে দিই :—“আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। সেখানে অধ্যাপকগণ নিভৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং ছাত্রগণ সেই জ্ঞানচর্চ্চার যজ্ঞক্ষেত্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে···তাহাদের শিক্ষার কতক অংশ অধ্যাপকের সহিত তরু-শ্রেণীর মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে সমাধা হইবে। সন্ধ্যার অবকাশ তাহারা নক্ষত্রপরিচয়ে, সঙ্গীতচর্চ্চায়, পুরাণ কথা ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া যাপন করিবে।” বিশ্বকবি তাঁর শান্তিনিকেতনে এমন একটি আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রথম গোড়াপত্তন করেন। আজ আমা-দের দেশেও কিছু কিছু নার্সারী ও মন্টেসারী অনুকরণে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। দিকে দিকে নতুন পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষাদানের প্রয়াস চলেছে। এই প্রচেষ্টা সফল হবে যদি আমরা মনে রাখি মানুষের বিভিন্ন বৃত্তিনিচয়ের কথা এবং শিক্ষা হ'ল এই বৃত্তগুলির পরম ও পরিপূর্ণ বিকাশ।

সাগর পারে

শ্রীশান্তা দেবী

১৭ই জুলাই একটা স্মরণীয় দিন। চিরকালই ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডে কখনও গেলে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি দেখব। অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে আজ তার ব্যবস্থা হ'ল। এদেশে অসময়ে কেউ খেতে দেয় না, তাই কোন রকমে বাসি দুধ খেয়ে ব্রেকফাষ্ট বাদ দিয়েই পাঁচ জনে ছুটলাম ইউষ্টনে টিউব ট্রেন ধরতে। পথে আর তিন জন সঙ্গিনীকে পেলাম এবং প্যাডিংটনে বাকি দু' জন এলেন। এখান থেকে আসল ট্রেন ধরে রিটার্ণ টিকিট নিয়ে যাত্রা। ব্রিষ্টল পৌঁছতে পুরো তিন ঘণ্টা বোধ হয় লাগে না। সে ষ্টেশনে একটি পার্শী মহিলা, মিসেস মোহন এবং ডাঃ দত্ত সস্ত্রীক আমাদের নিতে এলেন। ডাঃ দত্ত বাঙালী বলে প্রথমে বুঝতে পারি নি, তিনি উল্লাসকর দত্তের ভাই, তাঁর স্ত্রী ওদেশেরই মেয়ে। দুটি ছেলে আছে, তাদের অনেক গল্প করলেন। আমাদের অনুরোধে ডাঃ দত্ত অতি-কষ্টে একটু বাংলা বললেন। তার পর আমরা তীর্থযাত্রীরা মহা উৎসাহে চললাম তীর্থক্ষেত্রে।

আমরা লণ্ডন থেকে এগার জন এসেছিলাম আর এঁদের অভ্যর্থনা সমিতির চার জন নিয়ে পনের জন মিলে প্রথমেই গেলাম এনোসভেল সেমিত্রিতে। এনোসভেল সুন্দর জায়গা, গাছে ফুলে সবুজে যেমন মনোহর, তেমনি পাহাড়ের বড় বড় গাছের আর বিরাট আকাশের মহিমাও আছে। মহা-পুরুষের অনন্ত শয্যার উপযুক্ত স্থান। সুন্দর ভারতীয় সমাধি-মন্দিরটি। "কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ" আর "অনেক দিয়েছ নাথ" গান হ'ল। আমাদের দলে খ্যাতনামা গায়িকা ছিলেন চিত্রা মজুমদার। "পিতা নোহসি" আবৃত্তির পর কিছু বলা হ'ল। সেখানে আমরা ফুল নিয়ে যাই নি। ঘাসের ফুলই কিছু দিলাম প্রণাম করে। জীবনের একটা ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল।

ব্রিষ্টল দেখতে চমৎকার। সমাধি দেখার পর একটা পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। নীচে আভন নদী বয়ে যাচ্ছে, পাশে ঘন সবুজ বন, দূরে সমতল ভূমি দেখা যায়। পৃথিবীতে সব দেশের সঙ্গেই সব দেশের নানা জায়গায় মিল আছে। মনে পড়ে যাচ্ছিল দার্জ্জিলিং, কখনও-বা কার্শিয়াং, কোথাও-বা জাপান। তবে ইংলণ্ডের চেয়ে এশিয়ার বিশেষতঃ ভারতের গাছপালা, পাহাড় আরও ঢের বড়, তার গাম্ভীর্য্য এবং মহিমাও বেশী। কিন্তু আমরা তাদের সাজাই না, রাখতেও জানি না, এরা সাজায় এবং সুন্দর করে রাখে। নদীটি দু'পাশে পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। সময় ও সুবিধা থাকলে এ সব জায়গায় ছবি তোলবার এবং ছবি আঁকবার অনেক জিনিস পাওয়া যায়। পাহাড়টি ফুলে ফুলে ভরা। বন্য 'ট্রাভেলারস জয়' ফুল আমাদের মেয়েরা গোছা গোছা করে তুলতে লাগল, ওদেশের ছোট ছোট মেয়েরাও খুব ফুল তুলছে। তারা আমাদের অনেক পথঘাট বলে দিল। বেশ মিশুক মেয়েগুলি।

শহরে বেড়াতে বেরোলাম, শহরটি ছোটই, তবে খুব পুরনো। একটা ঘাট (নদীর) শহরের মধ্যে; জাহাজ এসে শহরের মধ্যে ঢুকছে দেখতে ভারি মজা লাগে। অনেক পুরানো সব বাড়ী আর পুরনো গির্জ্জা। লঞ্চ খেলাম একটা সুন্দর হোটেলে। খাদ্য যা দিল দাম তার তুলনায় অনেক বেশী। লণ্ডনে যত জায়গায় খেয়েছি কোথাও কেউ ন্যাপকিন দেয় না। এই গল্প শুনে একটি আমেরিকান মেয়ে বলেছিল, "ওরা কি গায়ে হাত মোছে ?" এ হোটেলে কিন্তু সেসব ঠিক দিল। যাঁরা আমাদের আতিথ্য করছিলেন তাঁরা গাড়ীভাড়া আমাদের দিতে দেন নি, তবে খাদ্য আমরা যে যার নিজের দাম দিয়েই খেলাম। তীর্থযাত্রীদের অভ্যর্থনা ব্যাপারে ওঁদের এই রকমই নিয়ম।

ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারিতে রাজা রামমোহন রায়ের বিখ্যাত তৈলচিত্রটি আছে,আমাদের তাঁরা দেখালেন। একটু ছিঁড়ে গেছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের দেশে ছবির রং আর ক্যানভাস যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমন কিছুই হয় নি। এই ছবিটির প্রতিলিপি কলকাতায় রামমোহন লাইব্রেরীতে আছে। ব্রিষ্টলের ছবির রং আরও গাঢ়, মুখ আরও অনেক স্পষ্ট। পথে যেসব গীর্জ্জা দেখলাম তার কোন কোনটাতে কেশবচন্দ্র সেন ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাক্ষর আছে দেখা গেল। ভারতীয় আরও দুই-একজনের নাম ছিল এখন মনে পড়ছে না। রামমোহনের ব্রিষ্টল বাসকালে যে কার্পেণ্টার পরিবার তাঁর সেবাযত্ন করেছিলেন তাঁদের ছোট বাড়ীটিও সযত্নে রক্ষিত। এখানে এখন মেয়েদের রিফর্ম্মেটরি গোছের একটা স্কুল হয়। রামমোহনের কালের অনেক ছবি ও চিঠি-পত্র এখানে দর্শকদের জন্য সাজানো আছে, গেলে দেখানো

হয়। যে বাড়ীতে রামমোহনের মৃত্যু হয় সে বাড়ীটা মস্ত একটা জমি ও বাগানওয়ালা বাড়ী। সেখানে জড়বুদ্ধি ছেলেদের একটা স্কুল এখন হয়। আমরা যাবার সময় ছেলেগুলি হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিল। রামমোহনের মৃত্যুর পর এইখানেই তাঁর সমাধি হয়েছিল। বর্ত্তমান সমাধিতে দশ বৎসর পরে তাঁর দেহ তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরাতন সমাধিস্থানটি চিহ্নিত আছে। বিদেশের এই মহামানবের সব স্মৃতিকণা এরা কেমন ভাল করে রেখেছে দেখে মন খুশী হল।

এখানকার লর্ড মেয়রের সঙ্গে তাঁর কাউন্সিল রুমে আমাদের সাক্ষাৎ করানো হ'ল। দেড়শ' বৎসর আগের সোনার হার পরে তিনি আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রকাণ্ড ভারী হার! বাড়ীটা আশ্চর্য্য সুন্দর। খাবারঘরের মত একটা ঘরের সিলিং কি চমৎকার দেখতে। ইউনিটেরিয়ানদের যে গীর্জ্জায় রামমোহন উপাসনা করেছিলেন তাও দেখান হ'ল। কেবলই মনে হচ্ছিল ভারতের এই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্নের সম্মান ও যত্ন ভারতবর্ষে কতটুকু দেখি!

মিসেস মোহন বলে ভদ্রমহিলা বিকালে তাঁর বাড়ীতে আমাদের চা খেতে নিয়ে গেলেন। পনের জন মানুষকে চা কেক সব খেতে দিলেন। ভারী সুন্দর করে বাড়ী রেখেছেন। আমাদের মেয়েরা তাঁর বাসন-কোসন ধুয়ে দিল। তাঁর মেয়ে নেই বলে মিসেস মোহন দুঃখ করলেন। একলাই কত পরিশ্রম করেন! ওদের সাহায্য পেয়ে খুব খুশী হলেন।

ট্রেনে লণ্ডনে ফেরবার পথে আবার সেই তরঙ্গায়িত জমি, বন, ছবির মত বাড়ীঘর পথ। সবুজেরই কত যে 'শেড' তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে বড় বড় ফুলের চাষ, বিঘার পর বিঘা জমিতে লাল নীল হলদে অজস্র ফুল। এত বড় ফুলের চাষ দেশে কখনও দেখি নি।

ব্রিটিশরা চট করে কারুর সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু ট্রেনে একটি পরিবার আমাদের সঙ্গে বেশ ভাব করল। সুন্দরী মায়ের দুটি ছোট ছোট মেয়ে, লাল আপেলের মত গাল, মোটা মোটা পা, আমাদেরই একজনের কোলের উপর পা মেলে দিয়ে ছোট মেয়েটি ঘুমোচ্ছিল। তার মা অবশ্য প্রথমে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হচ্ছিলেন তাতে। বড় মেয়েটি বোধ হয় সবে কারুর কাছে চোখ মটকাতে শিখেছে, বারে বারে সেই খেলাই করছিল। এক বৃদ্ধ তাঁর খবরের কাগজটা আমাকে পড়তে দিলেন। মাঝপথে দু'জন 'এয়ার অফিসার' উঠলেন, তাঁরা মহা উৎসাহে গল্প জুড়লেন—ভারতবর্ষে কে কত ডাব খেয়েছেন, আম খেয়েছেন, বিড়ি খেয়েছেন। দুই-এক ঘণ্টার পরিচয়ে যেটুকু দেখা গেল ব্যবহার বেশ ভালই লাগল। মন্দ ব্যবহার নিজের দেশে এদের কাছে ত আমরা বহুকাল ধরেই পেয়েছি। এখন একটু ভাল ব্যবহার পাবারই কথা।

বাল্যকাল থেকে ওয়েস্টমিনস্টার আবির কথা কত পড়েছি, ইংরেজ রাজারাজড়া আর কবি ঔপন্যাসিকদের কথা ত দেশের লোকের কথার চেয়ে আমরা অনেক বেশীই শুনেছি আর পড়েছি। এতকাল পরে তাদের এত নিকটে আসব ভাবি নি। এরা ত ছিল পুঁথির জিনিস মাত্র। সেদিন যখন ওয়েস্টমিনিস্টার আবেতে ঢুকলাম মনে হ'ল পুঁথি কি করে সত্য হয়ে উঠল? আজ যেন প্রথম বুঝলাম এরা তবে সত্যই এই পৃথিবীতে জন্মেছিল এবং মরেছিল! পায়ে হেঁটে যেতে যেতে পা উঠছিল না যখন পদতলে এডিসন, নিউটন, ডিকেন্স পড়ে আছেন ভাবছিলাম। আমাদের দেশে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবভক্তরা মন্দিরে নিজেদের ছবি দেন মেঝেতে, ভক্তের পদধূলি পাবার জন্য। এটা তা নয়।

কোন পুরাকালের সব রাজারাণীর সমাধি। এতকাল পরে তাঁরা আমার মনে যেন হঠাৎ বেঁচে উঠল সব। কুমারী রাণী এলিজাবেথ, মেরি কুইন অব স্কটস, সব অহল্যা পাষাণীর মত পাথরে-গড়া শুয়ে আছেন সমাধির উপর। এরা যেন সব ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে এসে পড়লেন। রাণীরা তাঁদের দরবারী পোশাক পরেই সমাধির উপর শায়িতা। প্রথম দেখে মনটা কেমন করে। মহাপ্রতাপান্বিতা সুসজ্জিতা রাণী মহাকালের করস্পর্শে পাষাণ-স্তূপে পরিণত।

গীর্জ্জাটির অদ্ভুত স্থাপত্য ও রঙীন কাচের ছবি মন মুগ্ধ করে। কি অসম্ভব উঁচু খিলান আর কি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য! পাথর এমন ফুল হয়ে ফুটে আছে সিলিঙের চাঁদোয়ায়! সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে মানুষের ক্ষুদ্র প্রয়োজন এবং ক্ষুদ্রতর নীচতা হীনতার কচকচি দীর্ঘদিন ধরে দেখে ও শুনে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির আনন্দ উপভোগ করতে যেন ভুলেই গিয়েছিলাম এতদিন। অল্পবয়সে ছিল এই রসপিপাসা গভীর হয়ে, একদিকে শিল্প আর একদিকে সাহিত্য। আজ একত্রে মনের মধ্যে বেঁচে উঠলেন সেক্সপীয়র, গোল্ডস্মিথ, স্কট, বর্ণস, জনসন, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি। হাওয়ায় যেন তাঁদের নিশ্বাস ভেসে বেড়াচ্ছে। আর তাঁদেরই বন্দনা করছে পাথরের ফুলে নাম-না-জানা অমর সব শিল্পীরা। এমন অনেক স্মৃতিফলক দেখলাম যাঁরা ইংলণ্ডে খুব সম্ভব মারা যান নি, শুধু তাঁদের স্মৃতিকে সম্মান করবার জন্য এবং মানুষের মনে জাগিয়ে রাখবার জন্যই তাঁদের নাম এখানে লেখা হয়েছে। সুবিখ্যাত মানুষদের স্মৃতি এভাবে রক্ষা দেখতে ভাল লাগে।

বহু আমেরিকান টুরিষ্ট দল বেঁধে গীর্জ্জাটি দেখতে এসেছে। তারা যত সমাধি দেখছিল তার চেয়ে দলবদ্ধ বাঙালী মেয়েদের কিছু কম দেখছিল না।

এই গীর্জার যারা দেখাশুনা বা কার্ড বিক্রী ইত্যাদি কাজ করছে তারা সকলেই পাত্রীর পোশাক পরিহিত। সুন্দর ব্যবস্থা সর্ব্বত্র, সব সুসজ্জিত।

আমাদের দেশের অনেক ছেলেই কেম্‌ব্রিজ অক্সফোর্ডে পড়তে যায়, আজকাল মেয়েরাও যাচ্ছে। আমাদের বাড়ীর ছেলেমেয়েরাও পড়েছে। কিন্তু কেম্‌ব্রিজ দেখা আমার ভাগ্যে হ'ল না। বাড়ীর সবাই যখন কেম্‌ব্রিজ গেল তখন আমি অসুস্থ হয়ে বাড়ী বসে রইলাম। একলা একলা কি আর করি? প্যারিস যাত্রার জন্য জিনিসপত্র গোছানোতেই হাত দিলাম। আমার ভ্রাতৃজায়া আর ভ্রাতুষ্পুত্রী এসে পড়াতে ওদেশের নানা খবরও পেলাম। ফ্রান্সে ইটালীতে খাবার জলের খুব অসুবিধা সবাই বলে। ওদেশের লোকে জলের বদলে মদ খায় এবং যারা মদ খায় না তারা 'মিনারেল ওয়াটার' খায়। আগে আগে হোটেল না ঠিক করলে প্যারিসে জায়গা পাওয়া শক্ত, তাই গোটাতিনেক হোটেলে চিঠি লেখা ঠিক হ'ল।

পরে আরও দু'চার জন বন্ধু এলেন। কন্টিনেন্টে কে কত খরচ করেছেন তার হিসাব শুনে চক্ষুস্থির হয়ে গেল। ভাবলাম কি আর হবে ভেবে? বেরিয়েছি যখন তখন এগোতেই হবে। আমেরিকায় পৌঁছে না হয় হিসাব করা যাবে। আপাততঃ সমস্যা হচ্ছে বিরাট বিরাট বাক্সগুলো নিয়ে। এইগুলো সঙ্গে নিয়ে যদি দেশে দেশে ঘুরতে হয় তা হলে ট্যাক্সি আর পোর্টারদের পয়সা দিয়ে খাবার পয়সা থাকবে না। অগত্যা এগুলিকে 'আমেরিকান এক্সপোর্ট লাইসেন-এর সাহায্যে সাগরপার করে দিতে হবে। কিন্তু তাদের আপিস ওল্ড বেলি খুঁজতে প্রাণান্ত।

এক বৃদ্ধা মেমকে জিজ্ঞাসা করে বাসে ত উঠলাম মা মেয়ে মিলে। কিন্তু নেমে আর পথ পাই না। একজন বললেন, "টিউবে যাও"। কিন্তু তাতে মন উঠল না, তখন এক বুড়ো সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সব বলে কয়ে বুঝিয়ে দিলেন। লিফটে করে আপিসে গিয়ে হাজির হলাম। একদল মেয়ে দেখে তারা একটু বিস্মিত হ'ল। তবে কবে কখন কি করতে হবে সে সব ঠিকমত জানিয়ে দিল। পথের বৃদ্ধটি এবং এরা আমাদের অবস্থা দেখবামাত্রই বুঝেছিল।

গোটাত্রিশ পাউণ্ড খরচ করে লণ্ডন থেকে প্যারিসের পাঁচটা টিকিট রিজার্ভেসন ইনসিওরেন্স ইত্যাদি করা হ'ল। যথাসাধ্য কমে করবার চেষ্টায় এই হ'ল। সব কাজেই অনেক দূরে দূরে যেতে হয় এবং সময়ও প্রচুর দিতে হয়। মেয়েরা ভাগাভাগি করে চালিয়ে নিচ্ছিল কাজ এই রক্ষা। শীঘ্রই এখানকার ছোট্ট বাসা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে হবে। দু'খানি মাত্র ঘরে বাস, তার ভিতরই খাওয়া-শোওয়া, বন্ধুবান্ধবকে বসানো এবং আতিথ্য করা। সরু বারান্দাতে বেরিয়ে মাঝে মাঝে পথে লোক চলাচল দেখি। ইংরেজের দেশ তবু কত যে বিদেশী লোক তার ঠিক নেই। আফ্রিকানও প্রচুর। ভারতীয় ছাত্রদের ত দেখলেই চেনা যায়। ইংরাজ ললনাদের সঙ্গে বেশ ভাব অনেকেরই। কেউ কেউ একটু তফাতে চলে।

এই পাড়ায় পথের এবং পার্কের পত্রবহুল দীর্ঘ সবুজ গাছগুলি মনে থাকবে চিরদিন। আমাদের চিরহরিৎ দেশে পথের ধারে গাছ লাগালেই বিহারী গোয়ালার গরুর পেটে—তার শিশুজন্ম যেমন শেষ হয় এদেশে তা হয় না, তাই গাছগুলির কথা আরও বার বার মনে হয়।

শ্রীদীপক চৌধুরী

সুতপার বিবৃতি

কাল মহীতোষকে কোন কথাই বলা হয় নি। ট্যাক্সি করে সে আমায় বালিগঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর ধরে আমি চলে এসেছিলাম গড়িয়ায়। কথা আছে, মহীতোষ আজ বেলা তিনটের মধ্যে সরকার-কুঠিতে এসে পৌঁছবে। মহীতোষ আমায় ওদের দলে টানতে চায়। ওর বিশ্বাস, আমার আসল সমস্যা সামাজিক। ট্যাক্সিতে বসে কাল সে ঘোষণা করেছিল, ধনতান্ত্রিক সমাজের 'ভিক্‌টিম' আমি। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে লক্ষ লক্ষ সুতপার জীবন থেকে 'শঙ্কা' কখনও দূর হবে না।

তর্ক আমি করি নি, করে লাভও হ'ত না কিছু। মহীতোষ আশাবাদী, মহীতোষ ফ্যানাটিক। সে বিশ্বাস করে, আজকের রাত্রিটা পার হতে পারলে আগামী কল্যের সূর্যোদয় চিরস্থায়ী হবে। পুরনো ইতিহাস প্রতিক্রিয়াশীলতার অন্ধকার দিয়ে আবৃত। বিপ্লবের সূর্যোদয় যদি ঘটে তা হলে অন্ধকার সব বিদূরিত হবে চিরদিনের জন্যে। মানবসমাজের কল্যাণ কামনা করে মহীতোষ। কোন একটি বিশেষ মানবের সমস্যা ওকে বিচলিত করে না। ওর ভাবনা শুধু গোটা সমাজের সমস্যা নিয়ে।

কাল ট্যাক্সি থেকে নামবার পরে গড়িয়াহাটার মোড়ে দাঁড়িয়ে মহীতোষ বেশ খানিকক্ষণ বক্তৃতা দিয়েছিল। সব কথাই আমি ওর শুনেছিলাম। সরকার-কুঠিতে পৌঁছে দু' একটা কথা ওর মনে করবার চেষ্টা করেছিলাম বটে, কিন্তু কোন কথাই আমি মনে করতে পারি নি। ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমি নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, ওর কথাগুলো সব হাল্‌কা। কথার মধ্যে ওজনের ঐশ্বর্য থাকলে দু'ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো কথাও মনে থাকত আমার।

আজ ত শুধু দু'ঘণ্টার ব্যবধান নয়, প্রায় আঠারো ঘণ্টাই পার হয়ে গেছে। মহীতোষ আসবে বলে একতলায় নেমে আসছিলাম আমি। হঠাৎ ওর শেষ মন্তব্যটি মনে পড়ল আমার। মহীতোষ বলেছিল, "সুতপা, তোমার মনের একটা অংশ বড্ড বেশী বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। অস্ত্রোপচারের দ্বারা তাকে বিষমুক্ত করা দরকার। সার্জারীর মত সত্য-ভাষণও কাটে। কাটে তা ঠিক, কিন্তু তাতে সুস্থতা ফিরে পাওয়া যায়।"

মহীতোষ বোধ হয় বয়সে আমার চেয়ে বছর-দুই ছোট। হাসবার অধিকার আমার ছিল। কিন্তু কি একটা কারণে কাল আমি হাসতে পারি নি। আজ ত কালকের পুরনো কথাটাই বার বার স্মরণ করছি। আমার সমস্যা কি তবে সত্যিই সামাজিক?

তিনটে এখনও বাজে নি। সময় না হলে মহীতোষ আসবে না। হোটেলের প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। মাসীমা শুয়ে আছেন তাঁর নিজের ঘরে, আজ ক'দিন থেকে তাঁর শরীরটা ভাল নেই। মাথার যন্ত্রণা লেগেই আছে, হার্টের অবস্থাও খারাপ। দু-দু'বার আক্রমণ হয়েছিল, কোন রকমে সামলে নিয়েছেন তিনি। শুধু শরীরের ওপরে নির্ভর করে থাকলে মাসীমা এত দিন বেঁচে থাকতে পারতেন না—মনের জোর তাঁর অত্যন্ত বেশী বলেই আয়ু তাঁর ফুরিয়ে যায় নি।

বাগানে নেমে এলাম আমি। বসন্তের পূর্বাভাস চোখে পড়ল আমার। জামগাছের পাতা ঝরছে, চাল্‌তাগাছের ডালেও নতুন জীবনের নবকিশলয়। ঝরাপাতার বুকে শুধু উড়ে যাওয়ার মৃদু হাহাকার। হাঁটতে হাঁটতে আমি চলে এলাম সরকার-কুঠির পেছন দিকটায়। এসে স্তম্ভিত হয়ে বসে পড়লাম বুড়ো আমগাছের তলায়। এখান থেকে বড় ফটকটা স্পষ্ট দেখা যায়।

গড়িয়ার খালে জল নেই। বলরাম খালটা পার হয়ে ফটকের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসছিল এই দিকে। হাওড়া-হাটের গামছাটা পাগড়ীর মত মাথায় বেঁধেছে। তার ওপরে দু'সারি করে ছ'খানা ইট। ইট বইছে বলরাম! ব্যাপার কিছু বুঝতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জেটমলের ইটের পাঁজা থেকে এগুলো চুরি করে নিয়ে এলি নাকি?"

"না, ষষ্ঠীদা কিনেছে।"

"কিনেছে ষষ্ঠীদা কোথায় ?"

"রক্ষিতের মোড়ে, দোকানে বসে আছে। আজ একশ' ইট কেনা হ'ল। এক নম্বর কিনা, দাম নিয়েছে পঁয়ত্রিশ টাকা। বিশ্বাস না হয়, টাইগারকে জিজ্ঞেস কর।"

"টাইগারকে ?"

"হ্যাঁ, চল। গোয়ালের পেছন দিকে টাইগার দেখবে পাহারা দিচ্ছে।" এই বলে বলরাম সেই দিকে হাঁটতে লাগল, আমিও চললাম ওর পেছনে পেছনে। ভাঙাচোরা সরকার-কুঠি মেরামত করছে নাকি ষষ্ঠীদা ? বাড়ীটা শুধু পুরনো নয়, পতনোন্মুখ। দু'চারশ' ইটের সামর্থ্য দিয়ে একে ত ধরে রাখা যাবে না! তা ছাড়া ষষ্ঠীদার পাগলামির মশলা দিয়ে এ বাড়ী মেরামত হওয়াও অসম্ভব। জেটমল অপেক্ষা করে বসে আছে সরকার-কুঠি দখল নেওয়ার জন্যে। দখল পেলে এখানে সে ফ্ল্যাট-বাড়ী তুলবে বলেই ত খবর শুনেছি মাসীমার কাছে।

বলরামের পেছনে পেছনে এসে উপস্থিত হলাম খাল পর্যন্ত। সত্যি সত্যি টাইগার সেখানে ছিল। কিন্তু কি পাহারা দিচ্ছে সে ? মাথা থেকে ইটগুলো সব নামিয়ে ফেলল বলরাম। ফেলে সে বলল, "ষষ্ঠীদার হাতে যা টাকা ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। ইট, সুরকি, সিমেণ্ট কেনা হয়েছে। তপাদি, তোমার ছোটসাহেবের কাছে ধার পাওয়া যাবে ?"

"কেন ?"

"এবার ত রাজমিস্ত্রী লাগাতে হবে—এস, দেখবে এস।" বলরাম আমায় গোয়ালের পেছন দিকে নিয়ে এল। আমি দেখলাম, খানিকটা জায়গা জুড়ে মাটিতে ভিৎ গাড়া হয়েছে। বুকে টোকা মেরে বলরাম ঘোষণা করল, "মাটি কাটল কে জান ? আমি। পেছন দিকের দেওয়ালটা ভেঙে পড়েছিল। অনেক দিনের পুরনো ইট। তা হোক, যে ক'খানা ভাল ইট পেলাম সব মাথায় তুলে নিয়ে এসে ফেললাম এইখানে। ইটের ওপর ইট গাঁথল ষষ্ঠীদা। পুরনো ইটও আর পাওয়া গেল না। ষষ্ঠীদা বলল, এবার রক্ষিতের মোড়ে গিয়ে নতুন ইট কিনতে হবে, হ'লও কেনা। তপাদি, ক গজের ওপরে ষষ্ঠীদা নক্সা এঁকেছে।"

"কিসের নক্সা রে ?"

"মন্দিরের।"

"মন্দির ? তোরা লুকিয়ে লুকিয়ে এখানে মন্দির তৈরি করেছিস ?"

"লুকিয়ে লুকিয়ে নয় তপাদি। টাইগার ত সর্বক্ষণই দেখছে। মাসীমাকে আমরা একদিন অবাক করে দেব। পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরের চুড়ো দেখেছ ত ? হুঃ! আমাদেরটাও দেখ, তার চেয়ে উঁচু হবে এই মন্দিরের চুড়ো। ষষ্ঠীদা বলল যে, একটা বিগ্রহ না বসালে সরকার-কুঠির ঘাড় থেকে ভূত নামবে না।"

"তোরা এখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবি ?"

"হ্যাঁ। কালীঘাটের অর্ডারী বিগ্রহ নয়। তপাদি—" আমার কানের কাছে মুখটা তুলে আনবার চেষ্টা করল বলরাম, কিন্তু পৌঁছতে পারল না। তাই নিচুস্বরে সে বলল, "ষষ্ঠীদা সন্ন্যাসী। তার স্বপ্নে-পাওয়া বিগ্রহ। কাউকে যেন কিছু বলো না এখন। এই দ্যাখ, টাইগারটা আবার কান খাড়া করে শুনছে! দাঁড়াও - "

এই বলে বলরাম তেড়ে গেল কুকুরটার দিকে। টাইগার ভয় পেল না বিন্দুমাত্র, গড়িয়ে পড়ল বলরামের পায়ের কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার বলরাম বলল, "তপাদি, ছোটসাহেবের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার আনতে পার ? ষষ্ঠীদা বলেছে প্রত্যেক মাসে মাইনে থেকে অর্দ্ধেক টাকা সে ধার শোধ করবে।—ওঠ্, ওঠ্, মাটিতে শুয়ে থাকলে ত চলবে না, তোকে যে পাহারা দিতে হবে। দেখিস্, একটা ইটও যেন চুরি না যায়। চুরি গেলে তোকে আর আস্ত রাখব না—ঠেঙিয়ে লাশ বানিয়ে দেব—হুঃ! আমার নাম বলরাম-মাসীমাকে এখন কিছু বলো না তপাদি, যাই—"

গড়িয়ার খালে জল নেই। মাথায় গামছা বাঁধতে বাঁধতে বলরাম খালটা পার হয়ে গেল। আমি দেখলাম, কত সহজেই না সে টপকে চলে গেল ওপারে। চৌদ্দ-পনর বছর আগে লালুদা এই খালটাই পার হতে গিয়ে পারে নি, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। ঘাড়ের ওপরেই প্রথম গুলিটা লাগে। গুলি খেয়েও লালুদা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে গিয়েছিল ওপার কিনারা পর্যন্ত। একটা গুলির বারুদ লালুদার দেশ-প্রেমকে পুড়িয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু পার হতে সে পারল না, ওপার থেকে লক্ষণ গয়লা তার লোকজন নিয়ে ছুটে এল। হাতে তাদের ছিল বড় বড় টর্চলাইট। লক্ষ্মণ জানত, লালুদাকে ধরিয়ে দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবে। লোভের উত্তেজনায় ওরা চেঁচাতে লাগল, "পাকড়ো, পাকড়ো—"

খাটালের একশ'টা গরু আর পঞ্চাশটা মোষও সেই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তাতে পুরস্কার পাওয়ার লোভ ছিল না।

টর্চের আলোয় বিপিন চাটুজ্জের দ্বিতীয় গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না। তবুও সে ঘুরে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল দু'এক মিনিট। তখন আমার চোখ শুকনো ছিল। সে বুকের বিস্তৃতি ও অতলস্পর্শতা আমি দেখতে পেয়েছিলাম। চাঁদ-সদাগরের ভারী নৌকাও অনায়াসেই পার হয়ে যেতে পারত।

পঞ্চবটীর পুরনো গঙ্গা যেন লালুদার বুকের স্পর্শে শুধু বড় হয়ে উঠল না, লালও হ'ল। ভারতবর্ষের বুকে কেবল ভৌগোলিক বিস্তৃতি নেই, প্রেমের বিস্তৃতিও আছে।

লালুদাকে আমি ভালবাসতাম। আমার তখন ষোল বছর বয়স। দেহে হয়ত ষোল বছরের প্রমাণ ছাড়া আর কিছু ছিল না, কিন্তু মনের অবয়বে পরিণতির বলিষ্ঠতা দাগ কেটেছে গভীর ভাবে।

সেই দিন রাত্রি বোধ হয় আটটা হবে। লালুদার কাছ থেকে চিঠি পেলাম : রতন আর তোমার বাবা ঘুমিয়ে পড়লে একবার এস। বড় ফটক দিয়ে এসো না। লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের পথ ধরবে। খালে এখন জল বেশী নেই। ভোররাত্রি পর্যন্ত এখানে থাকব।

আমি এসেছিলাম লালুদার সঙ্গে দেখা করতে। অন্ধকারে পথ ভাল দেখতে পাই নি। খালের যে জায়গাটায় সবচেয়ে বেশী জল ছিল সেইখানে নেমে পড়লাম আমি। জলের উচ্চতা হাঁটুর ওপরে উঠে এল ক্রমে ক্রমে দেখলাম জলের গভীরতা বাড়ছে। বুকের লজ্জাও আর গোপন রইল না—ভিজে উঠল। বিপ্লবী লালু সরকারের গোটা অস্তিত্বটাই ছিল আগুনের মত গরম। ভেজা দেহের জল শুকোতে সময় লাগল না।

দোতলার ওই ঘরটাতে লালুদা আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পাজামা পরেছিল সে, পাজামার দড়িটা দেখলাম গরু বাঁধবার দড়ির মত মোটা। সরু কোমরটা তার দড়ির চাপে আরও সরু হয়েছে। নাভির চতুর্দিকে এক ইঞ্চি বাড়তি মেদ নেই, যৌবনের পৈশিক [illegible] পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লালুদার সবটুকুই খাঁটি, এমনকি মাংসপেশীও। আমি সেই দিকেই চেয়ে ছিলাম। মনে মনে অনেককিছুই কল্পনা করতাম বটে, কিন্তু সেদিন আমি বাস্তব স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, লালুদাও বাস্তবের নিকট-বর্তী হোক। কোমরের মোটা দড়িটা হাত দিয়ে চেপে ধরলাম আমি। লালুদা বলল, "এখানে পিস্তল বেঁধে রাখতে হয়।"

"আজ পিস্তলের কথা থাক। শুধু একটি বারের জন্যে আমায় তুমি বেঁধে রাখ লালুদা।"

আমার বুকের দিকে চেয়ে সে বলল, "মায়ের একটা শাড়ি নিয়ে আসছি, কাপড়টা তুমি বদলে নাও।"

"দরকার নেই। এতদিন পরে তোমায় আমি পেয়েছি, ছাড়ব না। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক আমি কি চাই না? চাই। তাই বলে তোমায় আমি চাইব না কেন? ঘুমন্ত বাদুড়ের মত হাত দুটো দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখলে কেন? আমায় তুমি গ্রহণ কর লালুদা—নাও। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা না এলে চলবে না—কিন্তু আমার স্বাধীনতা খোয়া না গেলে আমি কি নিয়ে বাঁচব? কুমারী-জীবনের নিষ্কলঙ্কতা—"

"সুতপা!"

"লালুদা, তুমি একদিন ধরা পড়বে। হয়ত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের গভীর নির্জনতায় তোমা'র যৌবনের পেশী যাবে ক্ষয় হয়ে। ভারতবর্ষের উপকূলে দাঁড়িয়ে আমি কি করব? আমি কি নিয়ে থাকব?"

"সুতপা, পিস্তলটা ফেলে এসেছি গোয়ালের সামনে।"

"আমার চেয়ে পিস্তলটা [illegible] বড় নয়।"

"পিস্তল ছাড়া হঠাৎ যেন অসহায় বোধ করছি। ছাড়—"

"আমায় তুমি ধর, লালুদা। আমার দেহের মধ্যে বিপ্লবের দাগ কাটো—আমার—"

লালুদার গায়ে শক্তির কিছু অভাব ছিল না। প্রেমিকা সুতপা [illegible] তাকে ধরে রাখতে পারল না। আমার [illegible] সে পিস্তলটার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। আমার চোখ তখনও [illegible]!

একতলার সিঁড়িতে তখন ভারী জুতোর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লালুদা হঠাৎ হেসে ফেলল। কি এক অদ্ভুত রকমের হাসি!

আমি দেখলাম, মুখের হাসি তার চোখের চরিত্র বদলাতে পারে নি, চোখের ভঙ্গিতে আগুনের হলকা! সে বলল, "তপা, তুমি বুঝি সঙ্গে করে পুলিশ ডেকে এনেছ? বোধ হয় আজ আমি ধরা পড়লাম।"

আমায় ভুল বুঝল লালুদা! ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। বাঘের মত লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ছাদের দিকে। তার পর যখন তাকে দেখলাম, তখন সে আর বেঁচে নেই। ঘাড়ের আঘাত তাকে খতম করতে পারে নি। চওড়া বুকটার বাঁ দিকে একটা গুলি লেগেছিল। আর তৃতীয় গুলিটা লেগেছিল নাভির নিচে—বোধ হয় নাভির ইঞ্চিতিনেক নিচে। বিপিন চাটুজ্জে খোঁচা মেরে লালুদার দেহটাকে চিৎ করে দিয়েছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম, গলার তলা থেকে নাভির নিচে পর্যন্ত সবটা জায়গাই লাল—তাজা রক্তের উত্তাপ যেন আমার গায়েও লাগল। পাজামার দড়িটা তখনও অটুট আছে বটে, কিন্তু পাজামার কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে অনেক জায়গায়ই। নাক দিয়ে নিশ্বাস টানতে লাগলাম ঘন ঘন। বিদ্রোহী লালু সরকারের রক্ত থেকে গন্ধ আসছিল—দেশপ্রেমের গন্ধ।

বিপিন চাটুজ্জেকে নমস্কার করে বললাম, "আপনাকে

ধন্যবাদ। আপনার জন্যেই লালুদার সবটুকু আজ আমি দেখতে পেলাম।"

"তুমি? তুমি কে?" তেড়ে উঠলেন বিপিন চাটুজ্জে।

বললাম, "লালু সরকারের প্রণয়িনী আমি। বাপের চোখে ধুলো দিয়ে অভিসারে এসেছিলাম। উঃ, আপনি কি উপকারই না আজ করলেন! এমন একটা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের স্বাদ পেলাম আমি, অস্তিত্বের অর্থ বুঝতে পারলাম আজই। অস্তিত্বটা এত ক্ষীণ যে দৈহিক দণ্ড দিয়ে তাকে সনাক্ত করা যায় না। কি অভিজ্ঞতা রে বাবা!"

একটু পরেই খালের ধারটা খালি হয়ে গেল। ধারে-কাছে কাউকে আর দেখতে পেলাম না, এমনকি মাসীমাকেও না। মনে হ'ল আমি শুধু একা নই, পরিত্যক্তা। মানুষের এই ত স্বাভাবিক পরিচয়। দীর্ঘ পথ তাতে সন্দেহ নেই, তবু তার একাকিত্বের বুকে সত্যের স্বাক্ষর রয়েছে।

ভোররাত্রির হাওয়া গায়ে লাগল আমার। হঠাৎ কেমন শীত-শীত করতে লাগল। খানিক বাদে মনে হ'ল, বরফের মত জমে যাচ্ছি আমি। নতুন রোগের সূচনা নিয়ে বাড়ী যখন ফিরলাম, তখন আমি আর ষোল বছরের কুমারী নই—শতাব্দীর ভার বহন করছি আমি।

তিনটে বেজে গেছে। মহীতোষ বোধ হয় কোন দরকারী কাজে আটকা পড়েছে। অনেকদিন ত আমি ওকে আসতে বলে কথা রাখি নি। আজ কি মহীতোষ আমার ওপর প্রতিশোধ নেবে? কেন যেন সারাটা দিন ধরে কেবলই মনে হয়েছে, মহীতোষ আমার বন্ধু, মহীতোষ আমার সত্যিকারের কমরেড। ওর সামাজিক বিপ্লবের পুরো খসড়াটি আমি দেখি নি বটে, কিন্তু আমি জানি, সেই খসড়া থেকে আমি বাদ পড়ি নি। সুতপা ওর নতুন সমাজের অংশ।

বড় ফটকটার দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। ইটের বোঝা মাথায় নিয়ে বলরামের এর মধ্যে আরও একবার ফিরে আসা উচিত ছিল। মন্দির-প্রতিষ্ঠার গোপন সংবাদ আমি জেনে ফেলেছি বলে কি ষষ্ঠীদা বলরামের ওপর রাগ করল?

সময় আর কাটতে চাইছে না। এইখানে বসে থাকতে গেলে বার বার করে লালুদার কথাই মনে পড়ে। চৌদ্দ বছরের ব্যবধান ঘুচে যেতে এক মিনিটও লাগে না। বিপ্লবী-দলে যোগ দেওয়ার আগে লালুদা প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ী। মা তখন বেঁচে নেই, রতনের বয়স বোধ হয় বছর তিন হবে। আমি আর বাবা রতনকে দেখাশোনা করতাম। বাবা একশ' কুড়ি টাকা মাইনেতে বড় পোস্ট-আপিসে কেরানীগিরি করতেন। রক্ষিতের মোড়ে ঠাকুরদা ছোট্ট একখানা বাড়ী তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন বলে একশ' কুড়ি টাকায় কোনরকমে আমাদের সংসার চলত। এই সময় বাবা অসুখে পড়লেন। চিকিৎসা তেমন ভাল করে হওয়ার সুযোগ ছিল না কিছু। শেষ পর্যন্ত হাত দুটো তাঁর বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। চাকরি থেকে বিদায় নিতে হ'ল, আমাদের দারিদ্র্য চরমে উঠল। লালুদা বোধ হয় এত বেশী দারিদ্র্য কখনও চোখে দেখে নি। মনে পড়ে, একদিন সে আমায় বলেছিল, "জান, এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী ইংরেজ।"

সত্যিই ইংরেজ দায়ী কিনা সে সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। তখন পর্যন্ত একটি ইংরেজ আমার চোখে পড়ে নি। গড়িয়ার পুল পার হয়ে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি এ অঞ্চলে বড় আসতও না। পুলিশের দারোগা ছিল গড়িয়ার সবচেয়ে সম্মানিত নাগরিক।

ক্রমে ক্রমে লালুদার মধ্যে পরিবর্তন আসতে লাগল। চোখের ভাষায় বিদ্বেষের আগুন। বুঝতে আমার বাকী রইল না যে, এ বিদ্বেষ ওর ইংরেজদের প্রতি। সে দেশপ্রেমের অধিকার নিয়ে জন্মায় নি। কি করে দেশকে ভালবাসতে হয় তেমন শিক্ষা সরকার-কুঠি ত দূরের কথা, সংসারের কোথাও সে পায় নি। সারা গড়িয়ার আবহাওয়ায় দেশপ্রেমের উত্তাপ কারো গায়ে লেগেছে বলে সেদিন আমার জানা ছিল না। এ অঞ্চলের ইতিহাসে লালুদাই ছিল এক-মাত্র ব্যতিক্রম। আমাদের অভাবের পথ দিয়েই সে তার বিপ্লবের আদর্শ খুঁজে পেয়েছিল।

বিয়াল্লিশের গণ্ডগোল সুরু হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে রক্ষিতের মোড়ে আর তাকে দেখতে পাই নি। সরকার-কুঠিও সে তখন ত্যাগ করেছে। গান্ধীজী জেলে যাওয়ার দুদিন আগে লালুদা এসে উপস্থিত হ'ল আমাদের বাড়ীতে। রাত বোধ হয় তখন এগারটা কি বারটা। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে আমায় বলল, "পুলিস আমার খোঁজ করছে। আর যদি তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়, দুঃখ করো না তপা। দেশের জন্যে জীবন দেওয়া ছাড়া আপাততঃ আমার হাতে আর বড় কাজ নেই।"

"কিন্তু আমার কি হবে?"

"স্বাধীন ভারতবর্ষ তোমার দায়িত্ব নেবে নিশ্চয়ই।"

"সে কবে, কতদিন পরে?" জবাব দিল না লালুদা। আমি এবার ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম, "গড়িয়ার একটি লোকও এ পর্যন্ত আসে নি দুটো মিষ্টি কথা বলতে। যারা আসে তারা বাবাকে ঠাট্টা করে যায়। মেয়েকে আজও কেন বিয়ে দিচ্ছেন না, তাই নিয়ে তারা রসিকতাও করে। এ রসিকতার মানে তুমি জান লালুদা?"

"না।"

"গড়িয়ার সমাজে আমি আর একলা নই। তোমার পাশে আমাকেও দাঁড় করিয়েছে ওরা। লালুদা, পিস্তল তুমি ফেলে দাও, তোমার সঙ্গে আমি থাকব। আমাকে পাওয়ার চেয়ে শহীদ হওয়ার প্রলোভন কি বড়? ইংরেজ নয়, আমাদের পাশের বাড়ীর রামবাবু থেকে সুরু করে লক্ষ্মণ গয়লা পর্যন্ত প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আমাদের এই ছোট্ট অসহায় পরিবারটির মুখ থেকে অন্ন কেড়ে নেওয়ার জন্যে। অন্নের 'মেনুতে' কি কি খাদ্য আছে শুনবে। আজ ক'দিন থেকে রতন কি খাচ্ছে জান? লালুদা এস, আমরা দু'জনে মিলে রক্ষিতের মোড়ের এই সংসারটিকে বাঁচাই। পঞ্চানন ঠাকুর যা পারছেন না, আমরা তা পারব।"

"সুতপা—"

"লালুদা—"

"পঞ্চানন ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি আমরা যে, ভারতবর্ষ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত হাতের অস্ত্র মাটিতে ফেলব না।"

এক রকম নিরাশ হয়েই বললাম, "এ-অস্ত্রের কোন মর্যাদা নেই।"

"কেন?"

"যে অস্ত্র মাথায় রাখা যায় না, পায়ে ছোঁয়াতে হয় তার দাম আমি এক পয়সাও দেব না।"

দরজার খিল খুলল লালু সরকার। নিঃশব্দে সে চলেই যাচ্ছিল। বারান্দায় কার একটা ছায়া দেখে সে সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ওখানে কে?"

"বোধ হয় বাবা।"

"এত রাত অবধি তিনি কি করছেন?"

"তুমি তাঁর যুবতী মেয়ের শয়ন-কামরায় ঢুকে পড়েছ মধ্যরাত্রে—পিতার কর্তব্য তাঁকে করতে দাও লালুদা।"

"তা হলে যাই?"

"যাওয়ার আগে কি জেনে গেলে?"

"জেনে গেলাম যে, ঠাকুর-দেবতার ওপরেও বিশ্বাস হারিয়েছ তুমি।"

"শুধু এইটুকুই জানলে? পোড়াকপাল আমার!"

"কেন আরও কিছু আছে নাকি জানবার?"

"এ বাড়ী থেকে আমাদের উঠে যেতে হবে। জেটমলের কাছে যে বাড়ীটা বাঁধা ছিল, তা ত তুমি জানতে। এক-একবার মনে হয়, জেটমলরা কত কাছে, আর ইংরেজরা কত দূরে! সুযোগ পেলে আবার এস লালুদা, আমি অপেক্ষা করে থাকব।

চারটে বেজে গেল। কোথায় যেন ঘণ্টাবাজার আওয়াজ হচ্ছে। সাড়ে চারটেয় কলেজ ছুটি হয়। কিংবা রক্ষিতের মোড়ের সেই ইস্কুলেই বোধ হয় ঘণ্টা বাজছে, ঘণ্টার আওয়াজটা খুব চেনা লাগছে। এক সময়ে আমি পড়তাম ওই ইস্কুলে।

ফটক দিয়ে ছোটসাহেবের গাড়ি ঢুকছে। অবাক হলাম খুবই, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না আমার। আমার কাছে কি চান তিনি? ভাবলাম, লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের রাস্তা দিয়ে সরে পড়ি, কিন্তু পারলাম না। গাড়ি থেকে নেমে পড়ল বলরাম। নেমেই সে ছুটতে ছুটতে চলে এল আমার কাছে। বলরাম বলল, "তপাদি, শীগগির এস। ছোটসাহেবের বৌ এসেছেন গো—পথ দেখিয়ে নিয়ে এলাম।"

"হাঁফাচ্ছিস কেন?"

"তপাদি, দশটা টাকা পেয়েছি। উনি দিলেন।"

"বকশিস বুঝি?"

"না, মজুরি। উনি বাড়ীটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রক্ষিতের মোড়ে দেখলুম গাড়ীটা দাঁড়িয়ে পড়ল। তোমার নাম করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ীটা কোথায় রে?"

"তুই কি বললি?"

"বললাম, বলব কেন? আমাদের মন্দির উঠছে, দুশ' টাকা চাঁদা দিলে তবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব। তপাদি, গাড়ি থেকে নামবার সময় তিনি বললেন, খুচরো নেই। দশটা টাকাই নিয়ে যাও। মন্দিরের কাজে আরও বেশী দেওয়া দরকার। চল, শীগগির চলে এস, ষষ্ঠীদার ফণ্ডে এখখুনি গিয়ে টাকা দশটা জমা দিতে হবে। উনি গাড়িতে বসে আছেন।"

বলরামের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এলাম। সবিতা দেবী গাড়ীতে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি ব্যস্ত আছ?"

"না।"

"তোমার খোঁজ করতে আপিসেও গিয়েছিলাম। শুনলাম তুমি নাকি এক মাসের ছুটি নিয়েছ।"

"ছোটসাহেব কেমন আছেন?"

"কেন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয় না?"

"না।"

"তা হলে ভাই তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড বসে গল্প করে যাই।" মিসেস লাহিড়ী নেমে পড়লেন গাড়ী থেকে। চারদিকে চেয়ে তিনিই আবার বললেন, "বাঃ, ভারী সুন্দর ত বাগানটা!"

"এক সময়ে সত্যিই সুন্দর ছিল। যত্নের অভাবে বড়

বড় আমগাছগুলো সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। হোটেল কিনা, যত্ন করবার লোক নেই।''

"হোটেল ?''

"আজ্ঞে হ্যাঁ। এটাকে মাসীমার হোটেল বলে। চলুন, ভেতরে গিয়ে বসি।''

বাড়ীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে মিসেস লাহিড়ী বললেন, "হোটেল হলেও জায়গাটি কিন্তু খুবই নিরিবিলি। ছোট-সাহেব এখানে কখনও আসেন নি ?''

"এসেছেন, মাত্র বার দুই।''

"মাত্র ?" প্রশ্ন করে থেমে গেলেন সবিতা দেবী।

"কে রে তপা ? গাড়ি করে কে এল ? ছোটসাহেব নাকি ?'' বলতে বলতে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন মাসীমা।

মাসীমার সঙ্গে সবিতা দেবীর পরিচয় করিয়ে দিলাম। আমরা এসে বসলাম বসবার ঘরে। ভাঙাচোরা আসবাবপত্রের দিকে চেয়ে মিসেস লাহিড়ী নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন, এটা সত্যি সত্যিই হোটেল।

মাসীমাকে আমি বললাম, "সকালে তোমার গায়ে জ্বর ছিল। হঠাৎ উঠে এলে কেন ?"

"আমি যাচ্ছি। তোরা বসে গল্প কর্, চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ রে বলরাম কোথায় ? সারাটা দিন ওকে দেখি নি, এঁটো বাসনগুলো সব পড়ে রয়েছে।"

জবাব দিলাম না আমি, মাসীমা উঠলেন। হাঁটতে তাঁর বিশেষ কষ্ট হচ্ছিল। ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন একটু। তার পর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন, "ছোটসাহেবের কাছে চাকরি পাওয়ার ভরসা পেয়েছে বলরাম! ছোঁড়াটা দিনরাত স্বপ্ন দেখছে! হোটেলের কাজে আর ওর মন নেই।" সবিতা দেবীর দিকে চেয়ে বক্তব্য তিনি শেষ করলেন, "তা বাছা ছোটসাহেবকে আমার হয়ে একটু অনুরোধ করো ত, যেমন তেমন কাজে একটা ওকে লাগিয়ে দিতে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখা ভাল। কিন্তু দিনরাত স্বপ্ন দেখলে ত ছেলেটা পাগল হয়ে যাবে ; যাই, শুয়ে পড়ি গে। হ্যাঁ মা, ছোটসাহেব ভাল আছেন ত ? সেই কবে একবারটি এসেছিলেন, তার পর আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।" এই বলে মাসীমা দৃষ্টি ফেললেন আমার ওপরে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টি, তাতে আর সন্দেহ ছিল না। মনে হ'ল, আমার মুখ থেকে কোন নূতন সংবাদ শুনতে চান তিনি। বললাম, "ছোটসাহেব আরও একদিন এখানে এসেছিলেন। রাত একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল বলে তোমায় খবর দিই নি।"

সবিতা দেবী একটু নড়ে চড়ে বসলেন। মাসীমা আর অপেক্ষা করলেন না, চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি বলে গেলেন, "এই বয়সে রাত বেশী হলেই কি ঘুম আসে ?"

মাথা নীচু করে বসে ছিলেন সবিতা দেবী। আলাপ-আলোচনা সুরু করা দরকার। সুরু না হলে ত শেষও হবে না। যে-কোন সময়ে মহীতোষ এসে উপস্থিত হতে পারে। মহীতোষের জন্যে বেলা তিনটে থেকে অপেক্ষা করে বসে আছি আমি। সবিতা দেবীর প্রেমের কাহিনী কিংবা পাপের কাহিনী শোনবার জন্যে সত্যিই আমি প্রস্তুত নই আজ। কিন্তু মহীতোষ এল কৈ ? মানুষের অসহায়তা কি করুণ! নিজের ইচ্ছামত সে কোনকিছুই করতে পারে না। যা ঘটছে তা আমি ঘটাচ্ছি না। প্রতিটি ঘটনা থেকে আমি বিযুক্ত। ভয় হয় একদিন হয়ত নিজেরই সত্তা থেকে আমার নিজের বিযুক্তি ঠেকিয়ে রাখাও যাবে না।

সবিতা দেবী মুখ তুললেন। আমি বললাম, "আপনাকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে।''

"আমি ত সুস্থ নই।" এই বলে আবার তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "হঠাৎ কি মনে করে এখানে এলেন, মানে—"

"বন্ধু খুঁজতে এসেছিলাম। তুমি কি আমার বন্ধু হতে চাও না সুতপা ?"

"শত্রুতা করবার জন্যে ত সেদিন অযাচিত ভাবে আপনার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হই নি।"

"আমায় তবে বলে দাও কি করে আমি সুস্থ হতে পারি। খোকা যখন আমার পেটে এল তখনও আমি সীতাংশুকে ভালবাসতাম। পাপের পরিধি তুমি দেখতে পাচ্ছ সুতপা ?"

মাথা নেড়ে বললাম, "না পাচ্ছি না। সীতাংশুকে ভালবাসা মানে যে পাপ তা ত আপনি এখনও বুঝিয়ে বলেন নি। মিসেস লাহিড়ী—"

কথাটা আমার শেষ করতে দিলেন না তিনি। ঝপ করে উঠে পড়লেন। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দাঁড়ালেন দেওয়ালের দিকে মুখ করে। বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে এই গর্তগুলো খুঁড়ল কে ?"

"ইতিহাস।"

আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন সবিতা দেবী। ইতিহাসের ব্যাখ্যা তিনি শুনতে চাইলেন না। আমি জানি, কোন কিছু শুনতে তিনি এখানে আসেন নি, বলতে এসেছেন। মুহূর্তকয়েক পরে বললেনও, "স্বামী এবং সীতাংশুর সামনে সব কথা কবুল করতে চাই।"

"হ্যাঁ, কন্‌ফেশন। তুমি হলে কি করতে ?"

প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললাম আমি। হাসতে হাসতেই

বললাম, "ছোটসাহেবের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলাটা আপনার কেটেছে ক্যাথলিকদের কন্‌ভেন্টে। মাষ্টার বুইক গাড়ীতে চেপে ছোটাছুটি করবার সুবিধে না থাকলে আপনি কন্‌ফেশনের খবর শোনাতে এত দূরে ছুটে আসতে পারতেন না। মিসেস লাহিড়ী, আর কি আপনার সন্তান হবে না? আমার পেছনেও একটু ইতিহাস আছে। আমিও একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার ছিল আপনার ঠিক উল্টো অবস্থা।"

"কি রকম?" আগ্রহ দেখালেন সবিতা দেবী।

বললাম, "খোকা যদি না জন্মাত আপনি হয়ত অসুস্থ-বোধ করতেন না। আর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, খোকা একটি হ'ল না বলে। সে এক অদ্ভুত কাহিনী! না, না মিসেস লাহিড়ী, আজ আমি সে কাহিনী শোনাতে পারব না, মাপ করুন আমায়। যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"একটা প্রশ্ন করতে চাই—"

"কর।"

"সত্যিই কি আপনি বন্ধু খুঁজতে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ—তবে এখানে নয়, পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দিরে। শুনেছি, তিনি নাকি জাগ্রত দেবতা।"

"তা হলে আমার কাছে আসবার অর্থ কি?"

"দেখতে এসেছিলাম, ছোটসাহেবের ওপর তোমার অধিকার কতখানি।" এই বলে সবিতা দেবী বাইরে বেরিয়ে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, "ড্রাইভার—"

তাঁর পেছনে পেছনে আমিও গেলাম বাইরে। বিনীত-সুরে বললাম, "পঞ্চানন ঠাকুর যা পারেন না, আমি তা পারি। আমি আপনার বন্ধু হতে পারি, হলামও।"

"শ্যামনগরের চাকরি নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পার?"

"অনায়াসে। যাব কথা দিলাম।"

গাড়ীতে উঠলেন সবিতা দেবী। সরকার-কুঠির বাগানে সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। বারান্দা থেকে তবু বড় ফটকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, মাষ্টার বুইক শ্লথ গতিতে ফটকটা পার হয়ে গেল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কি যে ভাবছিলাম মনে নেই। যতক্ষণ যে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তাও স্মরণ করতে পারছিলাম না। মহীতোষ যে আজ আর এল না এমন একটা উপসংহার টেনে দিয়ে দোতলায় উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আবার সেই বড় ফটকটার দিকে। হেড-লাইট ফেলে গাড়ী ঢুকল একটা। মাষ্টারবুইক নয়, তার চেয়ে ছোট একটা গাড়ী। গাড়ী থেকে নামলেন ক্যাপটেন। সেই পুরনো দিনের গাম্ভীর্য আর নেই—সারা মুখে তাঁর হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনতে পারছ?"

"ভুলব কি করে?"

তিনি হাত জোড় করে নমস্কার করতে যাচ্ছিলেন, আমি নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিলাম। করমর্দন করলাম আমরা।

ক্যাপটেন আমার হাত ছাড়লেন না। টানতে টানতে তিনিই আমায় বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "আন্টি? আন্টি কোথায়? আংকেল কেমন আছেন?"

মাসীমাকে আর খবর দেওয়ার দরকার হ'ল না। তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হলেন। খাপ থেকে চশমা বার করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কে রে এই মুখপোড়া? এত দিন কোথায় ছিলি বাঁদর?" চোখে চশমা লাগিয়ে মাসীমা ক্যাপটেনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ক্যাপটেন জড়িয়ে ধরলেন মাসীমাকে। তার পর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "এতদিন লণ্ডনেই ছিলাম। বাবার খাতিরে মস্ত বড় একটা বণিক-আপিসে চাকরি নিয়ে ঢুকে পড়লাম। গোড়াতে চাকরিটা এমনকিছু বড় ছিল না। তার পর পেছনে মুরুব্বি থাকলে যা হয় তাই হ'ল। কোম্পানী আমায় তাদের ব্যবসা দেখবার জন্যে কলকাতায় দিল পাঠিয়ে। ভারতবর্ষে এদের বিরাট কারবার। সবার উপরে এসে বসলাম আমি। আন্টি, এত বেশী টাকা মাইনে পাচ্ছি যে, টাকার প্রতি আমার আর আকর্ষণই নেই।"

"বিয়ে করিস নি রে ক্যাপটেন?"

"না।"

"তা হলে তোর আপিসে তপাকে একটা চাকরি দে। মেয়েটা শর্টহাণ্ড আর টাইপরাইটিং শিখেছে।" একটু চুপ করে থেকে মাসীমাই আবার বললেন, "বিয়ে হয়েছিল।"

"হয়েছিল মানে কি আন্টি?"

"স্বামী ওকে ত্যাগ করে গেছে। দোষ অবিশ্যি তারই।"

"দোষ যত বড়ই হোক, সেই জন্যে ত্যাগ করবে কেন?"

"করবে না? বিয়ের কিছুদিন আগে থেকেই তপার মাথা ঠিক ছিল না, কারও সঙ্গে কথা কইত না। যখন কইত

তখন আজেবাজে বকত। দেহটা শুকিয়ে আমসীর মত হয়ে গেল। স্বভাবটা হ'ল বরফের মত ঠাণ্ডা। কোন রকম উত্তেজনাই ওকে স্পর্শ করতে পারল না। ডাক্তার-বদ্যিরা বলল বিয়ে দিয়ে দাও। মরবার আগে বাপ ওর বিয়ে দিয়ে গেলেন। ভাল পাত্র যোগাড় করলেন তিনি। কোথা থেকে বিয়ের বাবদ টাকাও পেয়ে গেলেন! শুনলাম, বিয়েতে হাজার পাঁচেক ত নিশ্চয়ই খরচ হয়েছে। হ্যাঁ রে, যাওয়ার আগে তুই কি তাঁকে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গিয়েছিলি ?"

"না ত!" অবাক হলেন ক্যাপটেন।

মাসীমা পুনরায় বলতে লাগলেন, "সংসারটা বড় বিচিত্র জায়গা। কোথা থেকে কি হয় কিছুই বোঝা যায় না। লালু যে সেই রাত্রে এখানে আসবে এমন সঠিক খবরটাও ত পুলিস জেনেছিল! বাড়ীতে ঢুকেই লালু বলেছিল, মা একমাত্র ভগবান ছাড়া আমার আসবার খবর আর কেউ জানে না। এমন বোকা ছেলে কি করে যে তোদের বিরুদ্ধে লড়তে গেল ভেবে আজও আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। যাক্ গে সে সব কথা। বিয়ের উত্তেজনাও তপার গায়ে লাগল না। রাত্রিবেলা ওকে জোর করে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ত। কিন্তু দিলে কি হবে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে অস্থির করে তুলত সবাইকে। তার পর একদিন ওকে স্বামী এসে রক্ষিতের মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল, সরে পড়ল সে। বাপ তখন মারা গেছে। না খেতে পেয়ে ভাইবোন উপোস করছে। এদিকে জেটমলও বাড়ী দখলের জন্যে ব্যবস্থা সব পাকা করে ফেলেছে। কি করি তখন ? ভাইবোনকে নিয়ে এলাম এখানে। চিকিৎসার জন্যে কোন ডাক্তার-বদ্যিই আর বাকি রাখি নি। উনি ত বাড়ী বাঁধা দিয়ে জেটমলের কাছ থেকে টাকাও নিলেন। কলকাতার ডাক্তার বদ্যিদের কি সাংঘাতিক চেষ্টা বাবা! সবটুকু শুষে নিতে বছর দুই লাগল। জেটমলের কোন দোষ নেই। বার বার তিনবার সে টাকা দিয়েছে। বছর তিন পরে সবচেয়ে বড় ডাক্তারটি উপদেশ দিলেন যে, একটি সন্তান না হলে এ রোগ ওর সারবে না। উপদেশ যখন দিলেন তখন আমাদের আর টাকা নেই, স্বামীটিকেও খুঁজে পেলাম না। কোথাও কোন আপিসে কাজ করত আমরা তা জানতাম না। পুরনো বাড়ীও সে ছেড়ে দিয়েছিল, তপাও কোন খবর জানত না। কি করব তখন ? সন্তান হওয়ার জন্যে ত স্বামী চাই। তা ছাড়া—"

"মাসীমা—" আমার ধৈর্য তখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। বললাম, "ঘরে এসে ঢুকতে না ঢুকতে সাহেবকে যে অস্থির করে তুললে ?"

"তুলব না ? অত টাকা মাইনে পায়, তাকে অস্থির করব না ত কাকে করব ? থাক বাছা, থাক ওসব কথা। স্মরণ-শক্তি লোপ পাচ্ছে, এখন না বললে পরে আর কিছুই মনে থাকবে না। ক্যাপটেন, মেয়েটা নিজেই চেষ্টা করে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। শ'দুই টাকা মাইনে পাচ্ছে। চেহারাটা ভাল হলে আরও কিছু বেশী পেত।"

ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ আপিসে চাকরি কর ?"

বললাম, "বিলেতী কোম্পানীই। সরকারী চাকরি হলে এর অর্দ্ধেক মাইনেতে ঝুলে থাকতে হ'ত।"

"কোম্পানীটার নাম কি তপা ?" বিশেষ আগ্রহ দেখালেন সাহেব।

বললাম, "শেলী এণ্ড কুপার প্রাইভেট লিমিটেড।"

আমার ঘাড়ের ওপর হাত রাখলেন ক্যাপটেন। হাসতে হাসতে বললেন তিনি, "সেই কোম্পানীর বড় সাহেব আমিই।"

উত্তেজনার চাপে মাসীমা চোখ থেকে চশমা খুলে ফেললেন। শুধু তাই নয়, ক্যাপটেনের হাতে চশমাটা গুঁজে দিয়ে বললেন, "নে, খাপের মধ্যে ভরে রাখ। হ্যাঁ রে মুখ-পোড়া এতদিন আসিস্ নি কেন ? এবার আমি পায়ের ওপর পা তুলে মজা করে খাব—" এই পর্যন্ত বলে মাসীমা সত্যি সত্যি চৌকির ওপর পা গুটিয়ে এমন ভাবে বললেন যে, মনে হ'ল শান্তির স্বর্গ তিনি হাত দিয়ে ছুঁয়েই ফেলেছেন!

ক্যাপটেন বলতে লাগলেন, "এই ত সবে এলাম। প্রথমে বোম্বাই-আপিসটা দেখে দিল্লী গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ভারতবর্ষের আরও অনেকগুলো জায়গা দেখবার জন্যে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। শেলী এণ্ড কুপারের সাম্রাজ্য ত কম বড় নয় আণ্টি। কলকাতার আশপাশের কারখানাগুলো পরিদর্শন করতেও কম সময় লাগে নি। হেড-আপিসের সবার সঙ্গে ত এখনও পরিচয়ও হয় নি। তপা, তুমি কি আমার নাম শোন নি ?"

"শুনেছি। কিন্তু আপনিই যে মিস্টার হেওয়ার্ড কি করে জানব ? চারতলায় আপনার আপিস। আমাদের কাছে সেটা ত নিষিদ্ধ এলাকা। ওপরে ওঠবার এবং নিচে নামবার জন্য আপনার লিফট পর্যন্ত আলাদা। নাম শুনে-ছিলাম বটে, কিন্তু দেখবার সুযোগ পাই নি।"

"শোন ক্যাপটেন।" মাসীমা পা নামিয়ে বললেন, 'তপার ছোট ভাইটা টি-বিতে ভুগছে, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর। বলরাম বিকিউজী, তাকে একটা চাকরি দাও। ভদ্রলোকের ছেলে, বাসন মেজে মেজে হাতে ওর

প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু কায়রোস্থিত ভারতীয় ট্রেড সেণ্টারে কয়েকটি দেশীয় শিল্পদ্রব্য দেখিতেছেন

শ্রীজবাহরলাল নেহরু সুদানের রিপাব্লিকান পালেসে সুপ্রিম কমিশনের সভাপতি সিরিসিও ইরোর

গয়েশপুরে 'কণ্ট্রাক্ট অর্গ্যানাইজেশন' নামক সংস্থার অধীনে রাস্তা নির্ম্মাণরত বাস্তুহারাগণ

বিশ্বস্কাউট জাম্বরীতে একটি অনুষ্ঠান

ধা হয়ে গেছে। তপার মাইনে বাড়াও, চণ্ডীর জ্যোতিষী ব্যবসা ভাল চলছে না, সারা দেশটা নাকি শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। কেউ আর গণনায় বিশ্বাস করছে না। তার কি ব্যবস্থা করবে বল। বিজয়ের মাষ্টারীতেও আর সুখ নেই। এম-এ পাস, তাকে কোন্ চাকরিতে বসাবে পরে আমায় ভেবেচিন্তে বলবে। ষষ্ঠী? না থাক, ষষ্ঠীর চাকরির কোন দরকার নেই, ও যা করছে তাই করুক। ওর কোন ভবিষ্যৎ নেই—ষষ্ঠীর প্রায়শ্চিত্তের দরকার আছে। ক্যাপটেন, সবচেয়ে বড় কাজ তোমায় দিলাম—সবচেয়ে বড় কর্তব্য—সবচেয়ে বড় ধর্ম—তপার স্বামীকে খুঁজে এনে দাও। অন্ততঃ তার ঠিকানা বার কর, বাকী যেটুকু করবার তপাই করবে। ওখানে কে রে? বলরাম?"

"হ্যাঁ।"

"আলোগুলো সব জালিয়ে দে। চণ্ডীকে একবার ডাক না রে—ওর গণনা কখনও ভুল হয় না। সরকার-কুঠির ভাঙা ফটক দিয়ে কত বড় সৌভাগ্য আজ ঢুকে পড়েছে। ওরে তোরা সবাই আয়, ষষ্ঠীকে ডাক। শম্ভু? শম্ভু ঠাকুর কোথায়? ক্যাপটেন সরকার-কুঠিকে বাঁচাও। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। পৃথিবীর সব হাহাকার এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। মাসীমার হোটেল তোমারই সৃষ্টি সাহেব। পূব-পশ্চিমের ব্যবধান সুয়েজখালকে কলুষিত করেছে বটে, কিন্তু গড়িয়ার খালে কোন কলুষ নেই। লালুর রক্তে এর বুকের মাটি ধন্য!" মাসীমা হাঁপাতে লাগলেন, মিস্টার হেওয়ার্ড উঠে গিয়ে মাসীমাকে শুইয়ে দিলেন চৌকির ওপর। তার পর বললেন, "আজ আমি যাচ্ছি—আবার আসব।"

মাথায় করে একঝুড়ি ফল নিয়ে ঘরে ঢুকল বলরাম। মাসীমার দিকে চেয়ে সে বলল "সাহেবের ড্রাইভার দিয়েছে। রাখব?"

মাসীমা বললেন, "রিফিউজী যখন হয়েছিস বোঝা তোকে বইতেই হবে। বলরাম এর জন্যে দায়ী ভারতবর্ষের গুটি-কয়েক লোক। আর—" কথাটা শেষ করলেন না মাসীমা, চেয়ে রইলেন সাহেবের দিকে।

ক্যাপটেন হেওয়ার্ড বলরামের মাথা থেকে ঝুড়িটা নামিয়ে নিলেন নিজেই।

ক্রমশঃ

৫৬৭

এখনো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

অথৈ আকাশ থেকে খসে পড়া একফালি নক্ষত্র-ঝরণা,
রূপকথা-রহস্যের ঘরে তুমি জ্যোৎস্না-নীল স্বপ্নের প্রদীপ:
এখনো আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে, পাতায় পাতায় টিপটিপ
শিশিরের মোম গলে, মেঘ-ঝরা বর্ণের বিচিত্র বিকেলে
পাখীরা কুলায়মুখী। ভোরের নতুন রৌদ্রে চম্পক-বরণা
পৃথিবীর চোখে চেয়ে মনে হয় তোমারই সে উজ্জ্বল প্রেয়সী,
তোমারই স্মৃতিকে নিয়ে এখনো সে রূপময় দীপ জেলে জেলে
চলেছে আকাশমুখী—রূপের হৃদয়ে তুমি তারই প্রতিরূপ।
তোমারই সৃষ্টির ঘরে হিরণ্ময় শোক তার শিল্পী মধুপ।

তোমারই গানের মালা তার গলে সুশোভন, কনক হাতের
অম্লান ঐশ্বর্যে বেঁধে তুমি তার রূপকার। কান্নার পড়শী
আমরাও ভুলে যাই এই সব প্রত্যহের রক্তাক্ত দায়ভাগ,
তোমার আকাশ ছুঁয়ে মাটির গভীরে গিয়ে স্বল্পায়ু রাতের
জ্যোৎস্না থেকে ফুল তুলে অন্য এক আশাতীত বড় জীবনের
মানে যেন খুঁজে পাই, তোমার হৃদয়ে জাত সৃষ্টির পরাগ
গায়ে মেখে বড় হই: মনে হয়, আমরাও যেন অধিবাসী
সেই সুর-সাম্রাজ্যের, তোমার সে সুরম্য শিল্প-ভবনের

আভিজাত্য বুকে নিয়ে পথ চলি, অসহায় রুগ্ন প্রবাসী
বন্ধ্যা এ বিনষ্ট মন রক্তে পাপে অবসাদে করে যে নিহত।
তবু এ হৃদয় যেন ধু ধু নীল পীচ-গলা দিনের দাহন
কান্নার ক্লান্তির দাগ মুছে ফেলে কিছুকাল আকাশ-আয়ত
হয়ে ওঠে, যন্ত্রণাও যূথী হয়—তুমি তার শাশ্বত চারণ।
চেতনার চারুতায় তুমি যেন আমাদেরই অনেক স্বজন
মধুসংলাপী দিন তোমারই আবেগে ছাখো রূপভারনত।
স্বপ্নের সোনালী শিশু তোমারই দু'হাত ধরে আজো হেঁটে হেঁটে
উত্তীর্ণ আশার ঘরে—যা খুশী খেলায় মেতে খিল এঁটে এঁটে
কখন ঘুমিয়ে যায়। তোমাতেই অন্য এক আকাশের মন
এখনো জীবিত আর রঙ-রোল হৃদয়ের সুপ্রিয় চেতনা
তোমারই পাহাড় থেকে প্রাণ নিয়ে সমুদ্রের দিকে কলস্বনা।

প্রাণের প্রথম স্বপ্নে শোভমান উদ্ভ্রান্ত পচিশে বৈশাখ
তাই বুঝি বার বার বিষণ্ণ রক্তের স্রোতে দিয়ে যায় ডাক,
সূর্যের স্মরণতীর্থে আমাদের ভীরু মনও অম্লান আকাশে
ডানা মেলে, নতুন জ্যোৎস্নের সূচী-ভিসুকাস্ নদীতে বাতাসে।

বড়ু চণ্ডীদাস ও জয়দেব

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাক্-চৈতন্ত যুগের পদকর্ত্তাদের মধ্যে চণ্ডীদাস, জয়দেব ও বিদ্যাপতির নাম বাঙালীর কাছে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। এই চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস। মহাপ্রভু ইঁহাদের পদাবলী-কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসিতেন।

স্মার্ত্তপঞ্চোপাসক বিদ্যাপতির দেশ ও কাল অনেকটা সঠিক জানা গিয়াছে। তিনি পর পর তিন জন মৈথিলী রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন ও ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। জয়দেবের জীবন-চরিত সম্বন্ধে জনশ্রুতি ছাড়া ঠিকমত কিছু জানা যায় না। কেহ বলেন—তিনি ওড়িয়া। কিন্তু গীত-গোবিন্দের একটি পদে কেন্দুবিবের উল্লেখ দেখিয়া বুঝা যায়—তিনি বাঙালী ছিলেন। বৈষ্ণবদের ধারণা—তাঁহার তিন শত বৎসর পরে মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। এই হিসাবে জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া ধরিতে হয়। কিংবদন্তী অনুসারে, তিনি ছিলেন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি। ইহা কিন্তু সত্য নাও হইতে পারে। কারণ গীতগোবিন্দে জয়দেবের দেশ, মাতা, পিতা, ভার্য্যা বা প্রকৃতি, এমনকি বন্ধুর নামোল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পৃষ্ঠপোষক লক্ষ্মণসেনের নামগন্ধ নাই। অবশ্য, প্রচলিত একটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্নের প্রসঙ্গে 'ধোয়ী' প্রভৃতির সহিত জয়দেবেরও নামোল্লেখ আছে। কিন্তু এরূপ একটি মাত্র শ্লোকের উপর খুব বেশী নির্ভর করা যায় না। কারণ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সম্বন্ধেও অনুরূপ একটি শ্লোক আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের ধারণা নবরত্নের মধ্যে কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের সময়ে আদৌ বর্ত্তমান ছিলেন না। তাই মনে হয় জয়দেব লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী।

বড়ু চণ্ডীদাসেরও দেশ এবং কাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় নাই। যোগেশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও কৃষ্ণসেন বিরচিত 'চণ্ডীদাস-চরিতের' পরিশিষ্টে দেখি—'রাজা প্রথম হামীর উত্তরের রাজত্বকালে ১২৭৫ শকে ছাতনায় রাজকুলদেবী বাসলীর আবির্ভাব হয়, এবং দেবীদাস ও তদীয় অনুজ চণ্ডীদাসের উপর তাঁহার পূজার ভার পড়ে'। দেবীদাসের পৌত্র (প্রপৌত্র ?) পদ্মলোচন শর্ম্মাকর্ত্তৃক ১৩৮৭ শকে রচিত 'বাসলীমাহাত্ম্য' পুথিতে বাসলীর প্রথম পূজারী দেবীদাস, তদীয় পিতামাতা ও অনুজ কবি চণ্ডীদাসের উল্লেখ আছে। কিন্তু উক্ত পুথি দুখানির অকৃত্রিমতার সন্দেহ বিদ্যমান। বসন্ত-রঞ্জন রায় যখন কাঁকিল্যা গ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানি আবিষ্কার করেন, সে সময় পুথির শেষের দিকের পৃষ্ঠা না থাকায়, লিপিকারের নাম ও লেখা-সমাপ্তির তারিখ পাওয়া যায় নাই। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পুথির লিপিবিচারে সেখানিকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লেখা বলিয়া রায় দেন। প্রাপ্ত পুথিখানি যদি প্রতিলিপি হয় তাহা হইলে বড়ু চণ্ডীদাসের মূল পুথি নিশ্চয় ইহা অপেক্ষা প্রাচীন।

লেখকের রচনায় তাহার দেশ ও কালের ছাপ পড়ে। তাই লেখা পড়িয়া লেখকের দেশ, কাল ও মতিগতির আভাস পাওয়া যায়। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ভাষা ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটু গভীর ভাবে অনুশীলন করিলে বড়ু চণ্ডীদাসের দেশ ও কালের একটা মোটামুটি পরিচয় মিলিতে পারে। এইদিক দিয়া বিচার করিলে বড়ু চণ্ডীদাসকে জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বলিয়া অনুমান হয়। শুধু তাই নয়—মনে হয় জয়দেব চণ্ডীদাসের নিকট কিছু ঋণী। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব।

১। জয়দেবের কিংবদন্তীমূলক জীবন-চরিতে দেখিতে পাই—বৈরাগ্যবশে, তিনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় পুরীধামে যান ও দৈবাদেশে পদ্মাবতীকে সাধন-সঙ্গিনী করিয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। ইহা হইতে বুঝি—জয়দেবের সময় পুরীধামের তীর্থমাহাত্ম্য বাংলায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বারাণসী, গয়া, প্রয়াগ, বটেশ্বর, পুষ্কর, ভৈরব পাতন (পশুপতিনাথ ?), গঙ্গাবতারতীর্থ (গঙ্গোত্রী ?), কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, কুরুক্ষেত্র (কুশাবর্ত্ত-হরিদ্বার), গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, গোদাবরীতট, প্রভৃতি বহু তীর্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু একবারও পুরীধামের উল্লেখ করেন নাই। যিনি ভারতের এতগুলি তীর্থের নাম জানিতেন, হয়ত স্বয়ং দর্শন করিয়াও থাকিবেন—তাঁহার পক্ষে তীর্থরাজ পুরীর নামোল্লেখ না করা খুবই অস্বাভাবিক। সম্ভবতঃ বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে পুরীর তীর্থমাহাত্ম্য বাংলায় প্রচারিত হয় নাই। ইহা হইতে ধারণা হয় চণ্ডীদাস জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী।

২। জয়দেব কৃষ্ণোপাসক সহজিয়া বৈষ্ণব ছিলেন। সহজিয়ারা তাঁহাকে তাঁহাদের আদিগুরুর সম্মান দিয়া থাকেন। পদ্মাবতীকে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত দৈবী কাহিনী রচিত হইলেও তিনি যে দেবদাসী ছিলেন ইহা বুঝা যায়। সহজিয়া-দের 'পরকীয়া' বা 'প্রকৃতি'কে গুরু করিয়া সাধন করিতে হয়। সহজিয়া পদকর্ত্তাদের পদের ভনিতায়ও তাঁহাদের প্রকৃতির উল্লেখ থাকে। দ্বিজ চণ্ডীদাসের 'প্রকৃতি' ছিলেন রজকিনী রামী। গীত-

গীতগোবিন্দে জয়দেবও আপনাকে "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" ও "পদ্মাবতীরমণ জয়দেব ভারতী" ভণিতায় ভূষিত করিয়াছেন। জয়দেব যে সহজিয়া ছিলেন তাহার আর একটি নিদর্শন বীরভূমে কেন্দুলীর মকরসংক্রান্তির 'জয়দেবী মেলা'। ইহা প্রধানতঃ সহজিয়া নেড়ানেড়ীরই মেলা।

বৌদ্ধ লুইপাদ প্রবর্ত্তিত সহজিয়া ধর্ম্মে আদিতে রাধাকৃষ্ণের স্থান ছিল না। সাধনমার্গ ছিল যৌগিক। ভজন ছিল দেহতত্ত্ব-বিষয়ক। ক্রমে এই ধর্ম্ম 'মহাসুখবাদ' ও পরকীয়া ভজনে পরিণত হয়। পরবর্ত্তীকালে সহজিয়ারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের উপাস্য করেন। তবে ঠিক কোন সময় হইতে তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণোপাসনা প্রচলিত হয় বলা যায় না। শুনা যায়, মহাপ্রভুর পরম গুরু মাধবেন্দ্র পুরীই বাংলায় সর্ব্বপ্রথম রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে মধুর ভাবের সাধন প্রবর্ত্তন করেন। আমাদের মনে হয় মাধবেন্দ্র পুরীর বহু পূর্ব্ব হইতেই সহজিয়াদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিল। পুরী গোস্বামী তাঁহাদের নিকট হইতেই ইহার প্রেরণা লাভ করেন ও সহজিয়া মতবাদকে মার্জ্জিত এবং স্থূল পরকীয়াবর্জ্জিত করিয়া তাহার সহিত ভাগবতের ভক্তিবাদের প্রলেপ দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের গ্রহণযোগ্য করিয়াছিলেন। নতুবা মাধবেন্দ্র পুরী এ বিষয়ে অগ্রবর্ত্তী হইলে জয়দেব তাঁহার সমসাময়িক কিংবা পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন—যাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

অপর পক্ষে বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন, বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা 'বজ্রেশ্বরী' বা বাসলীর সেবক—যে দেবীর পোড়া মাছ নহিলে ভোগ হয় না। ইহার ধ্যানমন্ত্র "ধর্ম্মপূজা বিধানে" পাওয়া যায়। ইনি "বিশালাক্ষী' নন্। কারণ 'তন্ত্রসারে' বিশালাক্ষীর যে ধ্যানমন্ত্র আছে, তাহার সহিত বাসলীর ধ্যানমন্ত্রের কোনও সাদৃশ্য নাই। বাসলী 'বাশুলী'ও নন। বাশুলী গ্রাম্য দেবী। তাঁহার পূজার কোন লিখিত মন্ত্র নাই। বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রত্যেক পদ শেষ করিয়াছেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে সহজিয়া বৈষ্ণব সাজাইলেও তিনি কোন কালেই কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকাংশ স্থলে তিনি যেভাবে রাধাকৃষ্ণের 'ধামালী' বা প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণভক্তি সূচিত হয় না। তিনি তাঁহার সময়ের বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ জানিতেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' কৃষ্ণ, প্রণয়-যাচিকা রাধাকে বলিতেছেন, "অহোনিশি যোগ ধেয়াই, মনপবন গগনে রহাই। মূলকমলে কয়িলোঁ মধুপান, এবে পাই আহ্মো ব্রহ্ম-গেয়ান। ইড়া পিঙ্গলা সুষমা সন্ধি, মনপবন তাত কৈল বন্দি। দশমী দুয়ারে দিয়া কবাট, এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট।" ইহাতে আমরা সেই চর্য্যাপদেরই প্রতিধ্বনি পাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, তান্ত্রিক 'অভিচার', 'স্তম্ভন', 'মোহন','দহন, 'শোষণ' এবং 'উচাটন' প্রভৃতিরও উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ, বাংলায় সে সময় তান্ত্রিক মতবাদেরই প্রাধান্য ছিল। তৎকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রসারের নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না। তাই চণ্ডীদাসকে জয়দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হয়।

৩। চণ্ডীদাস ও জয়দেব, উভয়েই তাঁহাদের রচনায় বিষ্ণুর দশ অবতারের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণ গর্ব্ব করিয়া রাধার কাছে নিজের দশ অবতারের কথা শুনাইতেছেন। জয়দেব গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ হিসাবে দশ অবতারের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু অবতারের পর্য্যায় সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জয়দেব তাঁহার স্তোত্রে দশ অবতারের বর্ত্তমানে প্রচলিত পর্য্যায় বা ক্রম বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে অবতারের পর্য্যায় নিম্নরূপ: মীন, কমঠ (কূর্ম্ম), মহাকোল (বরাহ), নরহরি (নৃসিংহ), বামন, পরশুরাম, রাম, বুদ্ধ, কল্কি ("কল্কিরূপে দলিলোঁ দুষ্ট জন") ও কৃষ্ণ বা শ্রীধর ("এবে কৃষ্ণরূপে উপজিল কংসবধের কারণ")। এখানে হলধর বা বলরামের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকেই অবতার ধরা হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—চণ্ডীদাস এমনই অর্ব্বাচীন ছিলেন যে, তিনি অবতারের এই ক্রম জানিতেন না। আসল কথা বড়ু চণ্ডীদাসের সময় অবতারের এই শেষোক্ত পর্য্যায়ই প্রচলিত ছিল। তখনও "শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, তিনিই পূর্ণ ব্রহ্ম—কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" এই মতবাদ প্রচলিত হয় নাই। মহাকবি ভাসও নাকি তাঁহার "বালচরিতে" শ্রীকৃষ্ণকে কলির বা শেষ অবতার বলিয়াছেন। অবতারের বর্ত্তমান ক্রম পরবর্ত্তী কালের সৃষ্টি। এই সকল হইতে বুঝি জয়দেব চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী।

৪। চণ্ডীদাসের প্রাচীনত্বের একটি নিদর্শন তাঁর রচনার ভাষা ও বিষয়বস্তু। এই ভাষা চর্য্যাপদের সন্ধ্যাভাষার কিছু পরবর্ত্তী এবং ইহাতে অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষার যেন কিছু স্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয়। কবি তাঁহার কাব্যে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। ভাগবতে রাধাই নাই। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বা ছত্রখণ্ড নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই এইগুলির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়। পরবর্ত্তীকালের রাধার সহিতও চণ্ডীদাসের রাধার অনেক প্রভেদ। এ রাধা বৃষভানুনন্দিনী নন—পদুমার ঘরে কালিনীমা'র গর্ভে ইহার জন্ম। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী পৃথক গোপিনী নন—রাধারই আর এক নাম চন্দ্রাবলী। কুট্টনী বড়াই কৃষ্ণের দূতী বৃন্দা নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ, রাধার পূর্ব্বরাগ বা কলঙ্কভঞ্জন ইহাতে নাই।

চণ্ডীদাসের বিষয়বস্তু—জন্ম হইতে বৃন্দাবনলীলার শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণন। তাঁহার রাধা যৌবনোন্মুখী কিশোরী—এগার হইতে বার বৎসর বয়স, তাঁর কৃষ্ণ—"গরু রাখোয়াল", সেই মূর্ত্তিতেই তিনি মহাদানী সাজিয়া রাধাকে নাজানাবুদ করিতেছেন। কাজেই কৃষ্ণ রাধার সমবয়সী বা কিছু বড় বলিয়া মনে হয়।

জয়দেবও ভাগবতের অনুসরণ করেন নাই। তাঁর বর্ণনায় রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধা ও গোপিনীদের দৈহিক সম্ভোগলীলা।

এ রাস বাসন্তী রাস—হৈমন্তিক নয়। গীতগোবিন্দের গোড়ায় আমরা যে রাধার পরিচয় পাই—সে রাধা বেশ ডাগর মেয়ে। কৃষ্ণ তখন নিতান্ত বালক। তাই নন্দ, আকাশ মেঘমেদুর ও বনভূমি অন্ধকার দেখিয়া ভীরু কৃষ্ণকে, বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য রাধাকে নির্দ্দেশ দিতেছেন। জয়দেব তাঁহার বিষয়বস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে লইয়াছেন। গীতগোবিন্দের প্রস্তাবনার প্রথম শ্লোকটি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়েরই প্রতিধ্বনি।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণখানি দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি কোনও সময়ে রচিত। পুরাণখানি আরও পরের লেখা হইতে পারে। পুরাণকারও সম্ভবতঃ বাঙালী। ভবিষ্যৎ বর্ণনাচ্ছলে তিনি বলিয়াছেন—'দেশের লোক ম্লেচ্ছবিদ্যা শিখিবে। দ্বিজাতি তাহাদের জাতিগত বৃত্তি ছাড়িয়া লাক্ষা, লবণ ও লৌহের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণ অপরের গৃহে পাচকের কার্য্য করিবে। রাজাদের প্রতাপ কমিবে। রাজপুত্র পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে বসিবে' ইত্যাদি। সম্ভবতঃ পুরাণকারের জীবদ্দশাতেই এই সকল অনাচারের কিছু কিছু সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। পুরাণকার পুরাণে সৃষ্টিপ্রকরণে যে সকল জাতির উল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের অধিকাংশেরই বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের আর কোথাও অস্তিত্ব নাই। পুরাণে খাদ্যাখাদ্যের যে বিধিনিষেধ আছে সেগুলি প্রধানতঃ বাঙালীরই খাদ্য। তিনি ব্রাহ্মণকে ইচ্ছা করিয়া মাছ ও বৃথা মাংস খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। এই সকল কারণে মনে হয়, পুরাণকার বাঙালী। জয়দেবের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুসরণ হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে তাঁহার দেশে পুরাণখানির পঠন-পাঠন সমধিক প্রচলিত ছিল। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ পুরাণখানি দেখেন নাই, কিংবা তাঁহার সময়ে তাঁহার দেশে ইহার প্রচলন হয় নাই।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন, দুষ্টের দমনের জন্য ভগবানের কল্কি অবতার। জয়দেব লিখিয়াছেন, ম্লেচ্ছনিধনের জন্য কেশবের কল্কিরূপ ধারণ। ইহা হইতে মনে হয়, জয়দেবের সময় বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত, ও ম্লেচ্ছের অত্যাচার কিছু কিছু সুরু হইয়াছিল। এদিক দিয়াও জয়দেবকে চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী বলিয়া ধারণা জন্মে।

৫। বিস্ময়ের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটিমাত্র পদ "দেখিলোঁ প্রথম নিশি" আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া "প্রথম প্রহর নিশি" রূপে পদাবলীসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। অপর একটি পদের সংস্কৃত রূপ দেখিতে পাই "গীতগোবিন্দে"। পদটি জয়দেবের সেই বিখ্যাত মানভঞ্জনের পদ "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী"। কথিত আছে, এই পদটির "দেহি পদপল্লবমুদারম্" অংশটুকু, জয়দেবের স্নানার্থে অনুপস্থিতির সুযোগে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কবির ছদ্মবেশে তাঁহার ঘরে আসিয়া লিখিয়া যান। জয়দেবের পদটি অনেকেই জানেন। বড়ু চণ্ডীদাসের পদটির কয়েক ছত্র কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"যদি কিছু বোল বোললি রাধা, দশন রুচি তোহ্মারে
হরে দুরুবার ভয় অন্ধকার সুন্দরী রাধা আহ্মারে।

যবে সত্য কোপ করিলে, মোরে হান নয়নবাণে
দৃঢ় ভুজযুগে বান্ধিয়া রাধা অধর দংশ দশনে।

মদন গরল খণ্ডন-রাধা মাথার মণ্ডন মোরে
চরণপল্লব আরোপ রাধা মোর মাথার উপরে।
পলাও আহ্মার মদন-বিকার সত্বরে করহ আদেশে
বাসলী চরণ শিরে বন্দিয়া গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।"

একই বিষয়ের রচনায় উভয় কবির মধ্যে এতটা সাদৃশ্য আকস্মিক হইতে পারে না। একজন অপরের অনুকরণ করিয়াছেন। কে কার কাছে ঋণী—কে আগে, কে পরে, তাহাই বিবেচ্য।

প্রথমতঃ—চণ্ডীদাস যদি জয়দেবের অনুকরণ করিয়া থাকেন—তাহা হইলে অবতারের ক্রম ও অন্যান্য বিষয়েও তিনি তাঁহার অনুসরণ করিতেন। কিন্তু চণ্ডীদাস তাহা করেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ—যাঁহার কাব্যের ছত্রে ছত্রে স্বপরিকল্পিত উপমার ছড়াছড়ি; যাঁর অনেক ছত্র প্রবাদবাক্যের মত; যিনি রাধা-বিরহের অতুলনীয় পদগুলির মত পদ রচনা করিতে পারেন; যিনি বিন্দারণ্যের তরুলতার বর্ণনায় দেড়শত গাছের নাম করিয়াছেন; যাঁর কাব্যে প্রাচীন বাঙালী জীবনের বৈচিত্র্য রূপ পাইয়াছে—এহেন শক্তিধর কবি চণ্ডীদাস গীতগোবিন্দের উক্ত পদটি নিজের বলিয়া চালাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিবেন না—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন।

তৃতীয়তঃ—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যত্রতত্র, উক্ত পদের ছত্রগুলির অনুরূপ ছত্রের অভাব নাই। যথা—একস্থানে "ভুজযুগে বান্ধি রাধা দশন দংশনে মোর সমুচিত ফল দেহ হৃষ্ট মনে"। কিংবা অন্যত্র—রাধা কৃষ্ণকে যখন তাঁর পাপবাসনার জন্য তীর্থে গিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিতেছেন, তখন কৃষ্ণ উত্তর দিতেছেন—"রাধা তুই আমার সর্ব্বতীর্থসার। তোর ঊরু ভৈরব পাতন, সেখানে আমি গড়াগড়ি দিব। তোর দুই কুচকুম্ভ গলায় বাঁধিয়া তোর লাবণ্য-গঙ্গাজলে আমি ডুবিয়া মরিব। ইহাতেই আমার পাপ খণ্ডন হইবে। যে চণ্ডীদাস এরূপ রসাত্মক বাক্য-রচনা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে মানভঞ্জনের ঐ পদটি লেখা অসম্ভব কি?

৬। গীতগোবিন্দের ছন্দবিন্যাস, অলঙ্কার ইত্যাদি সংস্কৃত কাব্যের অনুগামী নয়। এগুলি জয়দেবের পূর্ব্ব হইতেই বাংলার নিজস্ব প্রাকৃত সাহিত্যে প্রচলিত ছিল। জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং" প্রভৃতি পদ দেখিলে মনে হয় যেন বাংলা ভাষায় অনুস্বার বিসর্গ যোগ করিয়া এগুলিকে সংস্কৃত করা হইয়াছে। জার্ম্মান ভাষাতত্ত্ববিদ Pischel গীতগোবিন্দের ভাষা শৈলী ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ দেখিয়া অনুমান করেন—গীতগোবিন্দের পদগুলি প্রথমে কোনও দেশীয় প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল, পরে সেগুলির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন

করিয়া সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হয়। 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' অনুরূপ পদের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জয়দেব যদি বাঙালী হন তবে তাঁহার দেশীয় প্রাকৃত ভাষা প্রাচীন বাংলা হওয়াই সম্ভব। Pischelএর অনুমান যথার্থ বলিয়া মানিয়া লইলে, তিনটি সম্ভাবনার কথা মনে জাগে—

১। জয়দেব গীতগোবিন্দের পদগুলি প্রথমে দেশীয় প্রাকৃতে লিখিয়া, পরে স্বয়ং সেগুলিকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করেন।

২। জয়দেব প্রাকৃতে পদগুলি রচনা করেন, পরে অপর কোনও পণ্ডিত সেগুলিকে সংস্কৃত করেন।

৩। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের দেশীয় প্রাকৃতে রচিত পদের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া জয়দেব সেগুলির সংস্কৃত রূপ দেন।

চণ্ডীদাসের মানভঞ্জনের পদটি এই ভাবে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মূল কি বলা যায় না। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে কৃষ্ণকথা থাকিলেও রাধার উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজগোপীদের রাগানুগ লীলা বর্ণনা থাকিলেও 'রাধা' নামের অস্তিত্ব নাই। ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম বৃহদ্গৌতমীতন্ত্রে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সুপ্রাচীন কাল হইতে লৌকিক সংস্কৃত ও প্রাকৃত কাব্যে যথা—নবম শতাব্দীর আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের 'ধ্বন্যালোকে,' দশম শতাব্দীর কবি ক্ষেমেন্দ্রের কাব্যে, প্রাকৃত 'গাথা-সপ্তশতী'তে 'রাধা'র উল্লেখ দেখা যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের কাহিনীর সহিত চণ্ডীদাসের কাহিনীর মিল নাই। মনে হয়, পুরাকালে সাধারণের মধ্যে রামায়ণের মত রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক একাধিক কাহিনী প্রচলিত ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস তাহারই একটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পদাবলী রচনা করেন।

আমাদের অনুমান—'চর্য্যাপদের' কথা ছাড়িয়া দিলে, বড়ু চণ্ডীদাস যে বাংলা ভাষার আদি কবি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনিই বাংলা ভাষায় পালাগানের অনুরূপ গীতিচ্ছন্দে রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পদরচনার পথপ্রদর্শক। তাঁহার পদাবলীর মাধ্যমে আমরা প্রাচীন বাঙালীর রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিচয় পাই। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নানা দিক দিয়া একটি অমূল্য গ্রন্থ।

একটি বিদায় অভিনন্দন

শ্রীপ্রণয় গোস্বামী

প্রিয়তোষের আপিস-জীবনে এটা একটা নতুন অভিজ্ঞতাই বটে। কোম্পানী এর্ণাকুলামে নতুন ব্রাঞ্চ খুলবে সেকথা এমনকিছু অভিনব নয়, এখান থেকে সেখানে লোক বদলি হয়ে যাবে তাতেও নূতনত্বের কিছুই নেই। অভিনবত্ব শুধু এইখানে যে, তাকে আবার 'ফেয়ারওয়েল' দেওয়া হবে।

এযাবৎ অনেক লোক এই ডিপার্টমেণ্ট থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেছে—অন্য ব্রাঞ্চেও বদলি হয়েছে অনেকে, কিন্তু এর আগে কোন দিনই একথা ওঠে নি।

রঞ্জনই কথাটা তুলেছে সবার আগে। নরেশবাবুকে একটা ভাল করে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। আপিসের প্রায় সকলেই রাজী এ প্রস্তাবে। গররাজী হলে দেখতেও ভাল দেখায় না। প্রিয়তোষই আগে সায় দেয়—আমি রাজী আছি হে রঞ্জন, তোমাদের কত করে ঠিক হয় আমাকে জানাবে।

রঞ্জন খুব খুশী হয়ে যায়। সত্যি, এমন এক কথায় আর কেউ রাজী হবে না। প্রিয়তোষের সম্পর্কে রঞ্জনের ধারণা, এ আপিসে একটিমাত্র লোক আছে যাকে মোটের উপর ভালমানুষ বলা চলে।

যাওয়ার দিন এখনও ঠিক হয় নি। মাসখানেক দেরি আছে। মণিবাবু একদিন প্রিয়তোষকে ডেকে বলেন, কি হে প্রিয়, বেশ ত রাজী হয়ে গেলে। কিন্তু বলি—এখানে আবার এসব নতুন উৎপাত কেন?

প্রিয়তোষ বলে, একে আপনি উৎপাত বলছেন? প্রায় দশ বছর আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। নরেশবাবু এখন আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেই সুদূর এর্ণাকুলামে। আমরা যদি একটু ছোট্ট ফাংশান করে তাকে বিদেয় দি, কিংবা ধরুন সামান্য একটা কিছু উপহারস্বরূপ তাঁকে দিয়ে দি, সেটা কি দেখতে ভাল হয় না?

মণিবাবু একটু গম্ভীর হয়েই বললেন, হবে ত ভালই, কিন্তু টাকাটা দেবে কে? তোমরা ত একটা হুল্লোড় কোনমতে লাগিয়ে দিতে পারলেই বেঁচে যাও। তার পরে শেষ সামলাবে কে?

প্রিয়তোষ বুঝিয়ে বলে, ও নিয়ে এমন ভাবছেন কেন? মাথাপিছু দুটো করে টাকা দিয়ে দিলে অনায়াসে হয়ে যাবে। ডিপার্টমেণ্টে চল্লিশ জন লোক—আশী টাকার ঢের হবে।

মণিবাবু বললেন, তোমার ত মাথায় ওসব নেই। মাসে মাসে কত রকমের চাঁদা দিতে হয় তা জান? লাইব্রেরী, ইউনিয়ন, পাড়ার ক্লাব, তার পর ত আবার রয়েছে অমুক জায়গার ধর্ম্মঘটীদের সাহায্য কর, তমুক জায়গার বন্যার্ত্তদের চাঁদা দাও—এমনি আরও সতের রকমের ঝুটঝামেলা।

প্রিয়তোষ এবারে পিছিয়ে যায়—সত্যি বলেছেন। তবে কি জানেন? আমি অবিশ্যি এক কথায় রাজী হয়ে গেছি ঝামেলা এড়াবার জন্যে। সবাইকার যদি মত থাকে, ফেলে দেব এখন দুটো টাকা। তা দেখলাম দুদিকেই ঝামেলা পুরোদস্তুর। স্বীকার না পেলে রঞ্জনের ঝামেলা আর স্বীকার পেয়ে দেখছি আপনার ঝামেলা। মোদ্দা কথা, যে দিকে যাও বাপু ঝামেলাটি ঠিক তোমাকে পোয়াতে হবে। এ এক আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে দেখছি।

প্রিয়তোষের কাছ থেকে বিশেষ সদুত্তর না পেয়ে মণিবাবু আস্তে আস্তে কেটে পড়লেন।

এ ডিপার্টমেন্টের ভিতর-বার দুটো দিক আছে। বাইরে বসে বড়বাবুকে ঘিরে কেরাণীবাবুরা। আর ভিতরের দিকে থাকে প্যাকাররা। তাদের মধ্যমণি হারাণবাবু।

হারাণবাবুর সঙ্গে তাদের খিটিমিটি সব সময় লেগেই রয়েছে। অকথ্য ভাষায় হারাণবাবু ওদের গালাগালি করে। অনর্থক একই কাজ দু'বার করায়। কাজের জন্যে তাড়া দেয়। প্যাকাররা হারাণবাবুর উপরে বিরূপ।

আজ পর্য্যন্ত হারাণবাবুকে কেউ কোন দিন চাঁদা দিতে দেখে নি। ভদ্রলোক খুব কঞ্জুষ। এইবারে তিনি একটা সুযোগ পেলেন জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করার।

রঞ্জন গিয়েছিল ভিতরে সবাইকে বলে দিতে—এবারে সবাই মাইনে পেয়ে দুটো করে টাকা দিয়ে যাবে। নরেশবাবুকে আমরা বিদায়-অভিনন্দন জানাব। সব্বার ফটো তোলা হবে।

যেই না বলা সবাই চটে আগুন। কোন কথাটি বলা নেই, কওয়া নেই, এসেই হঠাৎ দুটো করে টাকা দিও। টাকা কি অত সস্তা? কে যাবে, কোথায় যাবে, কবে যাবে, কেন যাবে, আর কেনই বা টাকা দেব—তা কিছু না বলেই দুটো করে টাকা দিও। টাকা ভেসে আসে কি না?

হারাণবাবুর পক্ষে এটি মওকা। টিফিনের সময়ে হারাণবাবু ভিতরের সবাইকে নিয়ে চলে এলেন সামনে। বললেন মণিবাবুকে, রঞ্জনকে, প্রিয়তোষকে।

মণিবাবু একান্তে প্রিয়তোষকে যা বলছেন এখন সবার সামনে তা বলায় ওঁর পক্ষে একটু অসুবিধা আছে। এক কথায় বলতে গেলে ওঁকে এ ডিপার্টমেন্টের 'ছোট বড়বাবু' বলা যেতে পারে, অথবা বড়বাবুর এসিষ্ট্যান্ট।

ভিতরের আঠারো জন প্যাকারের মুখপাত্র হিসাবে এসেছে কালীপদ পাত্র আর তারই সঙ্গে এসেছেন হারাণবাবু। হারাণবাবু এবং কালীপদ পাত্রের কাছ থেকে সকল কথা সবিস্তারে শুনে ওরা সবাই ঠিক করল, কাল টিফিনের সময় এ বিষয়ে আলোচনা করে ঠিক করা হবে।

পরদিন যথাসময়ে সভা সুরু হ'ল। সভাপতি মণিবাবু। রঞ্জন মাথাপিছু দু'টাকার প্রস্তাব তুলল। সভায় প্রায় জন পঁয়ত্রিশেক উপস্থিত।

আপত্তি করল কালীপদ পাত্র। যে ষাট টাকা মাইনে পায় সেও দেবে দু'টাকা আর যে দু'শো টাকা মাইনে পায়, সেও দু'টাকা—এ কেমন কথা? নরেশবাবু ত আর দুবার বদলি হবেন না, আমি বলি কি, বেশ একটু সমারোহ করেই বিদায় দেওয়া হোক ওঁকে। আমি বলছি, এবারে জানুয়ারী মাসে আমরা যে যা ইনক্রিমেন্ট পেয়েছি সেই টাকাটা এ ব্যাপারে দেওয়া হোক।—ভিতরের লোকেরা এতে খুব উৎসাহিত হয়ে সায় দিল। এই ঠিক কথা।

তারা জানে, এতে ভিতরের যে দু'একজন ডবল পেয়েছে তাদেরও মাত্র চার টাকা দিতে হবে। আর এদিকে বাবুদের দিতে হবে চল্লিশ, কুড়ি, আট, ছয়, পাঁচ। মণিবাবু এবারে ডবল পেয়েছেন—তাঁকে দিতে হবে চল্লিশ, বড়বাবুকেও দিতে হবে চল্লিশ, আর প্রিয়তোষবাবু, রঞ্জনবাবুকেও দিতে হবে পাঁচ-ছ' টাকা করে।

সভাপতি মণিবাবু প্রিয়তোষের দিকে কটমটিয়ে তাকান, এসব নিশ্চয় প্রিয়তোষের কাণ্ড। ও-ই সব ব্যাপারে ঐসব প্যাকার-ট্যাকারগুলোর পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়! নিশ্চয় তলে তলে সেই এই বুদ্ধি যুগিয়েছে ওদের। তা নইলে কালীপদর মাথায় এসব আসার কথা নয়।

এদিকে হারাণবাবুরও চক্ষুস্থির। এ কি কাণ্ড! শেষ পর্য্যন্ত তাকেও তা হলে ষোল টাকা দিতে হবে? কালীপদকে সে নিয়ে এসেছে এই ভরসায় যে, কালীপদ বলবে—আমাদের প্যাকারদের মধ্যে থেকে যখন কেউ বদলি হয়ে অন্যত্র যায় তখন ত আপনারা এগিয়ে আসেন না তাকে ফেয়ারওয়েল দেওয়ার জন্যে। তবে বাবুদের ব্যাপারেই বা আমরা চাঁদা দিতে যাব কেন?

এটা একটা বড় যুক্তির কথা। হারাণবাবু সেই ভরসাতেই নিয়ে এসেছিলেন। যেই একথা তোলা হবে অমনি গোলমালে ফেয়ারওয়েলের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ওরাই সংখ্যায় বেশী। ওরা অমত করে বসলে ওসব ফেয়ারওয়েল-টোয়েল কিছু হবে না। কিন্তু শেষকালে হ'ল তার উল্টো। এ যে এক রাজসূয় ব্যাপার হবে দেখছি। অথচ ও ব্যাটাদের ত দু' টাকাই দিতে হবে। ওদের ত দু'টাকা করেই বাড়ে বছর ঘুরলে। হারাণবাবু পড়েছেন মহাবিপদে, অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারেন না।

রঞ্জন উঠে আপত্তি করল, এ ভাবে হয় না। কোন একটা ব্যাপারে চাঁদা তুলতে এক একজনের এক একরকম করাটা ভাল নয়। কোন রকমে আমতা আমতা করে কথাকয়টি বলে রঞ্জন বসে পড়ল।

তার পর বলবার পালা মণিবাবুর। একে তোতলামির দোষ আছে, তাতে গেছেন চটে। ভদ্রলোক প্রায় কিছু পরিষ্কার করে

বলতেই পারলেন না। শুধু এইটুকু বোঝা গেল—তোমরা ত সব বিষয়েই সমান অধিকার দাবি কর। তোমরা খুব মস্ত বড় বড় সাম্য বাদী হয়েছ এক একজন, কিন্তু এটা কি? একথা বলতে তোমাদের একটিবার মুখে আটকাল না যে, কেউ দেবে চল্লিশ টাকা আর কেউ দেবে দু' টাকা? তোমাদের হাতে কোন কাজের ভার দেওয়া হলে কিংবা গিয়ে পড়লে তোমরা যে কি করবে তা ত এ থেকেই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম আমরা। তোমরা আবার নিজেদের সাম্যবাদী বলে জাহির কর।

সেদিনই মিটিঙে আর কিছুই ঠিক হ'ল না। টিফিনের সময়টা এভাবেই কেটে গেল।

এদিকে নরেশবাবুরও অবস্থা দোদুল্যমান। কারণ এমন অনেকবার হয়েছে যে, কোন ব্রাঞ্চ খোলা হলে অমুকবাবু যাবেন ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু দিনকয়েক পরে দেখা গেল কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে অপর লোকের যাওয়ার কথা ঠিক হয়েছে।

বাংলা দেশ ছেড়ে এর্ণাকুলামে যাওয়ার জন্যে যে নরেশবাবুর প্রাণটা খুব হাঁকু-পাঁকু করছে তা নয়। তবে যে-কোন ভদ্রলোকের পক্ষে একটি ছেলে এবং দুটি মেয়ের বাবা হয়ে নতুন ট্যাক্স বৃদ্ধির পরেও সোয়াশো টাকা মাইনেতে একখানা মাত্র ঘরের জন্য পঁয়ত্রিশ টাকা ভাড়া দিয়ে তিরিশটি দিন সংসার চালানো বড় কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়—যেটা নরেশবাবু সঠিক আয়ত্ত করতে পারেন নি আদৌ। আর সে জন্যেই তার মাস গেলেই শোনা যায়, আরও চল্লিশ পঞ্চাশটি টাকা ধারের অঙ্কের দিকে বেড়ে গেল।

অথচ কলকাতা ছেড়ে বাইরের ব্রাঞ্চে গেলেই তাকে ব্রাঞ্চ-এলাউন্স বলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেশী দেওয়া হবে। ফ্রি কোয়ার্টার। আর চাই কি হয়ত একটা গ্রেড উপরেও তুলে দিতে পারে! এমন অবস্থায় নরেশবাবুর পক্ষে বদলির হুকুম যে কি আশীর্ব্বাদের মত তা আশা করি কারও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। অন্যদের মত নরেশবাবুরও এ কথাটা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় নি। আর সেজন্যেই যত ভাবনা। শেষকালে হয় ত শুনতে পাবে, যাওয়া হবে না।

নরেশবাবু তাই কোনও কথার জবাব দেন না—যখন বন্ধুরা বলে, কি হে, আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ, ওখানে গেলে কি আর মনে থাকবে আমাদের কথা?

নরেশবাবু ভাবেন—আপিসের একটু মত যদি বদলায় ত এ কথাগুলো সবই আমার পক্ষে উপহাস হয়ে উঠতে পারে।

কেউ বলে, ওখানে গিয়ে কি আপনার সুবিধে হবে, নরেশবাবু? ছেলেমেয়েদের ধরুন আজ অসুখ করলেই কোম্পানীর ডাক্তারের কাছে গিয়ে নিখরচায় চিকিৎসা করিয়ে আনতে পারেন। সেখানে ত আর এসব সুবিধে পাবেন না।

জায়গা বদলানোর ফলে বাচ্চারা হয় ত আর এতটা নাও ভুগতে পারে। আর তা ছাড়া চিকিৎসার এতটা সুবিধে না হলেও, কিছু বন্দোবস্ত ওখানেও হবে।

ওখানে আর কত কি···বন্ধুটি ঠোঁট উল্টে কথাটি মাঝপথেই শেষ করে দেয়।

রঞ্জন বলে, ওসব কোন ভাবনার বিষয়ই নয় মোটে, আসল কথা হচ্ছে ব্লাড-প্রেসারটা যদি যাওয়ার আগের দিন একটু বেড়ে যায় তবেই ব্যস।

তা হলেই তোমরা খুশী হও ত?—হেসে বলেন নরেশবাবু।

এ আপিসে রঞ্জনই নরেশের খুব অন্তরঙ্গ। বাড়ীতে যাওয়া-আসার ফলে ওদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়েছে। নরেশবাবুর স্ত্রীকে ও বৌদি বলে ডাকে। বাচ্চারা রঞ্জনকাকা বলতে অজ্ঞান। সেও তার মর্য্যাদা রাখতে কার্পণ্য করে নি কোন দিন। ওদের বাড়ীতে যেতে হলেই চকলেট-লজেন্স না নিয়ে যায় না।

সেই রঞ্জনই যখন বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠল তখন বোঝা গেল এর অন্য কিছু রহস্য আছে, এটা শুধুই ফেয়ারওয়েল নয়। কাজেও তাই দেখা গেল।

শেষ পর্য্যন্ত যখন চাঁদাটাঁদা মোটামুটি কোন রকমে কিছু উঠল তখন ঠিক হয়ে গেল ফেয়ারওয়েল হবেই। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। রঞ্জন ঠিক করে ফেলল, আজেবাজে খরচা করে কিছু লাভ নেই। চা মিষ্টি খেয়ে টাকাটা নষ্ট না করে একটা ঝরণাকলম কিনে দেওয়া হোক, আর একটা গ্রুপ ফটো তুলে রাখা হবে এখন।

প্রিয়তোষ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে মনে যদিও একটু হাসল, কিন্তু প্রকাশ্যে স্বীকার পেয়ে গেল। ভদ্রলোকের আর্থিক প্রাপ্তিটাকে নষ্ট করে দিয়ে লাভ কি? বিশেষ করে রঞ্জনের যখন অত উৎসাহ!

প্রিয়তোষ বললে রঞ্জনকে ডেকে, কিন্তু ভাই—যাওয়ার ঠিক আগের দিনে ফেয়ারওয়েলই বল আর ঐ ফটো তোলাটোলা যাই বল, সে-সব হবে, তার আগে নয়। ধর আমরা ওঁকে বিদায় জানিয়ে দেবার পরেও দিন সাতেক উনি কাজ করবেন এখানে। আর এটা খুব অস্বাভাবিক নয় যে, কাজ করতে গেলেই নানা রকম মতান্তর-মনান্তর ঘটে থাকে। ফেয়ারওয়েল জানিয়ে দেওয়ার পরে তেমন-ধারা কিছু ঘটা সঙ্গত হবে না।

শুনে সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। কথাটা ঠিক বলেছে বটে প্রিয়তোষ।

নরেশের বদ মেজাজের কথা সবারই জানা ছিল। একবার বড়সাহেবের সঙ্গে কি একটা ব্যাপার নিয়ে একেবারে তুলকালাম। দরখাস্ত করে নাকি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে। আপিসের সবাই বুঝতেই পারল না কিছু – কি ব্যাপার। মণিবাবু অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে তবে ঠাণ্ডা করলেন। সেবারে সবাই জানতে পারল যে, নরেশের সঙ্গে মালিক তরফের কার যেন কি একটা আত্মীয়তা আছে। তাঁরা সে সম্পর্কের পরিচয় দিতে চান না; তিনি কিন্তু সেই গর্ব্বেই বুক ফুলিয়ে চলেন।

যথাসময়ে নরেশবাবু রওনা হয়ে চলে গেলেন এর্ণাকুলামে। যাওয়ার আগের দিন গ্রুপ ফটো তোলা হ'ল। আর তাঁকে দেওয়া হ'ল একটি ফাউন্টেন্ পেন।

বক্তৃতা, চা-খাওয়া এসব কিছুই হ'ল না। কারণ, চাঁদায় কুলিয়ে ওঠে নি। ফটো তোলার পরে সবাই চলে গেল। কেউ আর কিছু জানতে পেল না—বিশেষ করে ভিতরের লোকেরা।

পর দিন সকালবেলায় গাড়ীতে নরেশবাবু সপরিবারে যাত্রা করেছেন নতুন কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে। কিন্তু এদিকে তখনও পুরনো নিয়ে ঘাটাঘাটি চলছে।

কালীপদ পাত্র এসে সোজা কৈফিয়ত তলব করে বসল, আমরা চাঁদা কি দিই নি? তবে আমাদের কলমটা দেখানো হ'ল না কেন? শুনলাম নাকি কলম দেওয়া হয়েছে একটা? তার দাম কত? কে কিনেছে? কিছুই কি আমরা জানতে পারব না?

রঞ্জন এবারে চটে গেল।—আরে বাবা, আমাদের কারও কি আর অন্য কোন কাজ নেই। আমরা এই নিয়ে ঘুরে বেড়াব? পঞ্চাশ জন লোককে কলম দেখাতে হবে?

হবে বৈ কি? পঞ্চাশ জন লোকের কাছ থেকে চাঁদা নিতে হলে পঞ্চাশ জনকে ঘুরে ঘুরে দেখাতে হবে।

প্রিয়তোষ মিটিয়ে দেয়—এখন আর কোথা থেকে দেখবে বল? কলম এখন এর্ণাকুলামে চলে গেছে, কিংবা তার পথে।

যাবার সময়ে নরেশের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তা প্রিয়তোষের নজর এড়ায় নি। প্রিয়তোষ ভাবল, সত্যি মানুষের এমনি হয়। হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক কালের পরিচিতদের ছেড়ে কোথায় চলল তার ঠিক কি। সেখানে গিয়ে কেমন থাকবে কে জানে। চেনাশুনা সবাইকে পেছনে ফেলে রেখে এই যে এগিয়ে চলা—এতে যেমন আনন্দ আছে, তেমনি আবার একটা অজানা আশঙ্কাও মনকে আচ্ছন্ন করে। মানুষ ত!

প্রিয়তোষ বললে, নরেশবাবু চলে গেছেন অনেক দূরে। এখন আর এ নিয়ে মনোমালিন্য, কথাকাটাকাটি হওয়াটা ঠিক নয়।

নরেশবাবু এর্ণাকুলাম থেকে চিঠি দিয়েছেন অনেককেই। কেউ আর উত্তর দেয় নি। এত দিনে সবাই আবার নিজেদের কর্ম্ম-ব্যস্ততায় তাঁকে বেমালুম ভুলে বসে আছে।

শেষ পর্য্যন্ত চিঠি পেল প্রিয়তোষও। তাতে লেখা রয়েছে, রঞ্জনের কাছ থেকেও একটুকরা উত্তর পাওয়া যায় নি। এটাই নাকি নরেশবাবুকে আশ্চর্য্য করেছে বেশীরকম।

প্রিয়তোষ অবশ্য উত্তর দিয়েছে; কিন্তু সে ত প্রাণের টানে নয়, ভদ্রতার খাতিরে। আর বাদবাকিদের বিশেষ করে রঞ্জন-মার্কাদের যে সেটুকু জ্ঞানও নেই।

চাঁদার পয়সা সবই খরচ হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ পরে যখন ফটোগ্রাফার ফটো ডেলিভারি দিয়ে গেল তখন কথা উঠল, কি করে নরেশবাবুকে একটা কপি পাঠানো যেতে পারে।

রঞ্জন বললে, পূজোর ছুটিতে উনি যখন কলকাতা আসবেন তখন দিয়ে দেওয়া যাবে। উনি বেশ যত্ন করে নিয়ে যাবেন।

ফটো পাঠাতে হলে যে সামান্য ঝক্কিটুকু আছে, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যেই এ-সংক্ষিপ্ত পথের সন্ধান। প্রিয়তোষ সেকথা জেনেও আর কিছু বললে না। সত্যি, এখন একা ডাকমাশুলের পয়সাটাই কে দেবে নিজের গাঁট থেকে।

আপিসেরই র‍্যাকের উপরে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছিল ফটোটি। পূজার ছুটিতে নরেশবাবু কলকাতা এলে যখন সেটি খুলে ফেলা হ'ল, দেখা গেল, গ্রুপ ফটোর মাঝখানটাতে নরেশবাবুর ধুতি-পাঞ্জাবী পরা গলায় ফুলের মালা দেওয়া ফটো রয়েছে। কিন্তু চেহারাটি মালুম করা যাচ্ছে না। পিঁপড়েতে ডিম পেড়ে ঠিক নরেশবাবুর ফটোর উপরেই কাগজটুকু কেটে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। নরেশবাবুর দু'পাশে আপিসের আর সবাই যথারীতি বিরাজমান। শুধু মাঝখানে নরেশবাবুই নেই।

“ভেনট্রিলুকোইজম”

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বড় বড় পোষ্টার টাঙিয়ে দেওয়া হ'ল এদিকে-ওদিকে। লাল-নীল-কালো হরফে পোষ্টারগুলোর গায়ে লেখা হ'ল—চ্যারিটি শো! চ্যারিটি শো! অভূতপূর্ব্ব শারীরিক ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন—বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদ্‌দের সমাবেশ—দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা—ভারোত্তোলন—ট্রাপিজে ফ্লাইং ডায়েনার কসরত—প্যারালেল বারের ইন্দ্রজাল—লৌহগোলক লোফালুফি—জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ জীবন্ত মানুষকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা ইত্যাদি!! সবকিছু লেখার পর শেষে অতিরিক্ত আকর্ষণ হিসেবে খুব কায়দা-করা হরফে লেখা হ'ল—তৎসহ প্রোফেসার নির্ম্মল হালদারের ক্যারিকেচার এবং 'ভেনট্রিলুকোইজম!'

'ভেনট্রিলুকোইজম' শব্দটা শুনে আপনাদের দাঁতকপাটি লাগলে আর করব কি! আসলে কথাটা তো আর আমরা সৃষ্টি করি নি। নির্ম্মলদা নিজেই ওই কথাটা লিখতে বলেছিলেন।

শব্দটা প্রথমে আমাদের কানে যাবামাত্র আমরাও ঠিক আপনাদের মতই চমকে উঠেছিলাম। তার পর বারকয়েক ওটা সঠিক উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে করতে নির্ম্মলদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত কথা থাকতে অভিধান থেকে বেছে বেছে এই দাঁতভাঙা জমকালো শব্দটা নেওয়ার কারণ কি।

উত্তরে গম্ভীরভাবে নির্ম্মলদা বলেছিলেন, কারণ আছে হে, আছে। তা নইলে দেখে দেখে ও শব্দটা ব্যবহার করছি কেন। কিছু কারণ আছে নিশ্চয়ই—। তার পর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাস-তরলকণ্ঠে নির্ম্মলদা আবার বলেছিলেন, তোমরা কেবল ওই একটি কথাই শিখে রেখেছ—ক্যারিকেচার আর ক্যারিকেচার। কেন রে বাপু, ক্যারিকেচারিষ্ট কি আর ভেনট্রিলুকোইষ্ট হতে পারে না! যে থিয়েটারে পার্ট করে তার পক্ষে সিনেমায় নামা কি একেবারেই অসম্ভব! যেহেতু নির্ম্মলদা ক্যারিকেচার করে, অতএব তার দ্বারা অন্যকিছু শেখা একেবারে বিষম ব্যাপার! বলিহারি যাই তোমাদের ধারণাকে। কেন, আমি কি নতুন কিছু শিখতে পারি না ভাবছ?

ঠাট্টা করেও নির্ম্মলদা এমনভাবে কথাটা বললেন যেন প্রশ্নটা করে আমরা কত অপরাধ করেছি। আমরা যেন তাঁর দক্ষতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছি। তাই তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার অভিপ্রায়ে খানিকটা নম্রভাবেই বললাম, কি ব্যাপার জানেন নির্ম্মলদা, আপনি তো গাঁয়ে অনেক দিন ক্যারিকেচার করেন নি, কাজেই আমরা কি করে জানব আপনি নতুন খেলা কিছু শিখেছেন কিনা। সেইজন্যেই আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনাকে। তা ছাড়া ওই 'ভেনট্রিলুকোইজম' কথাটাও আমাদের কাছে অজানা। আমরা ওসব কোথায় শুনব বলুন। এক জানবার মধ্যে জানি ক্যারিকেচার—ওটা আমাদের গাঁয়ের ছেলেমেয়ে-বুড়ো সবাই খুব শিখেছে। তা সেটুকুও তো আপনার কল্যাণে। আপনিই তো গাঁয়ের মধ্যে প্রথম এই দিকে ঝুঁকেছেন।

স্তুতিবচনে অতি বড় রথী-মহারথী গলে যায়, আর নির্ম্মলদা কোন ছার! স্পষ্ট দেখেছিলাম সেদিন, প্রশংসা শুনে নির্ম্মলদার চোখমুখ দিয়ে খুশি উপচে পড়ছে। কাছে সরে এসে চারদিকে চেয়ে নির্ম্মলদা একটু আস্তে আস্তে বলেছিলেন, গোটাকতক নতুন খেলা বের করেছি হে নিজের মাথা থেকে, বুঝলে। সেগুলোরই একটা গালভরা নাম দিলাম—বুঝতে পারছ না! প্রোগ্রাম ছাপিয়ে দাও না ওই লিখে—প্রোফেসার নির্ম্মল হালদারের ক্যারিকেচার ও 'ভেনট্রিলুকোইজম।' তার পর দেখবে না তোমরা একবার! আসর জাঁকিয়ে দেব আমি—মনে করেছ কি, ষ্টেজসুদ্ধ হাসির বান ডাকিয়ে দেব, পেটের নাড়িভুঁড়ি গলিয়ে দেব হাসিয়ে হাসিয়ে—।

নির্ম্মলদার বাগাড়ম্বরের সঙ্গে আমাদের অল্পবিস্তর সকলেরই পরিচয় আছে। কাজেই তাঁর অতিশয়োক্তিতে পুরোপুরি বিশ্বাস করে ঠকবার পাত্র আমরা নই। সুতরাং সংশয় নিরসনের জন্য প্রথমেই অভিধানের শরণাপন্ন হয়ে দেখা গেল, 'ভেনট্রিলুকোইজম' শব্দটার অর্থ কি। তার পর অভিধানে-দেওয়া অর্থটা নিয়ে খানিক আলোচনা করার পর বোঝা গেল যে, আর কিছু না হোক, শব্দটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ আছে। এমনও হতে পারে—নির্ম্মলদা কোন নতুন কায়দা শিখে এসেছেন কোন জায়গা থেকে, যাতে বক্তার কণ্ঠস্বর নিয়ে কিছুটা কারচুপি করা যায়। তা ছাড়া শব্দটায় যে প্রচুর কৌতূহল মিশ্রিত আছে সেকথা অনস্বীকার্য্য। আমাদের নিজেদেরই মনে কৌতূহল যেমন সুড়সুড়ি দিচ্ছে এমনি ধরনের সুড়সুড়ি তো বাইরের লোকের মনেও দেবে। সবাই জানতে চাইবে, এ জিনিষটা আবার কি ব্যাপার রে বাবা! তাতে আমাদের লাভ বৈ লোকসান নেই। তার মানে, চ্যারিটি ফণ্ডে আরো টাকা, আমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং অনুরাগীবৃন্দের সংখ্যাবৃদ্ধি। বলা বাহুল্য, সেইটাই আমাদের কাম্য।

সুতরাং সবদিক ভেবে চিন্তে কেবল ভড়ং বজায় রাখবার জন্য ওই বিদ্‌ঘুটে বদখত শব্দটাকে আমাদের ছাপানো প্রোগ্রামে স্থান দিতে হয়েছিল।

তবু আপত্তি এল। আমরা জানতাম আসবে। কারণ গাঁয়ের অনেকেই নির্ম্মলদার ওপর প্রীত নয়। নির্ম্মলদার ক্যারিকেচার—মানে পরিহাসমূলক অভিনয়ের নাম শুনলে চটে যায়

এমন লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয় গাঁয়ে। অঞ্জনদা তাদেরই একজন। তিনিই এসে প্রতিবাদ জানালেন আমাদের কাছে। নির্ম্মলদার ক্যারিকেচার-প্রসঙ্গে নাক কুঁচকে বললেন, তোমরা আবার ওই নির্ম্মল হালদারটাকে ঢুকিয়েছ প্রোগ্রামের মধ্যে। আশ্চর্য্য! তোমাদের কি লাজলজ্জাও নেই হে। ছিঃ ছিঃ, গলায় দড়ি দেওয়া উচিত তোমাদের। নির্ম্মল হালদার জানে কি যে, ও ক্যারিকেচার দেখাবে! কথায় বলে, বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা—সেই হয়েছে ও। পেয়েছে মফস্বল জায়গা, তাই খুব লাফানি-ঝাঁপানি। দূর দূর—ওটাকে কেন তোমরা শো-এ চান্স দিলে!

অঞ্জনদার কণ্ঠে পরিষ্কার বিদ্রূপের স্বর, দৃষ্টিতে রাজ্যের পুঞ্জীভূত ঘৃণা। বেগতিক দেখে স্তোকবাক্য প্রয়োগ করলাম, আরে এবারে দেখবেন—নির্ম্মলদা আসর মাতিয়ে দেবেন। কি সব নতুন খেলা বের করেছেন। নাম শুনে বুঝতে পারছেন না, আর সেই পুরনো ক্যারিকেচার নয়। এবার আশমান থেকে কথা ভেসে আসবে—কিন্তু দর্শকদের সামনে নির্ম্মলদা ঠোঁটটিও নাড়বেন না। অডিয়েন্স মনে করবে নির্ম্মলদা কথা বলছেন—উনি কিন্তু অঙ্গভঙ্গী ছাড়া আর কিছু করবেন না।

এসব নির্ম্মলদা আমাদের বলে দেন নি। অভিধানে 'ভেনট্রি-লুকোইজম' শব্দটার যে অর্থ দেখেছিলাম, তার থেকেই বানিয়ে বানিয়ে বললাম। কিন্তু অঞ্জনদাকে ভোলানো কি অতই সহজ। খেলার বর্ণনা শুনে ঠোঁট বাঁকিয়ে উপহাস করে তিনি বললেন, তা হলেই হয়েছে। তবেই তোমরা চারিটি শো করেছ। শেষ পর্য্যন্ত গ্যালারী থেকে ঢেলা না পড়লে হয়। নির্ম্মল হালদার আবার ক্যারিকেচারিষ্ট, তার আবার ভেন্টিলুকোলুকি খেলা। ফুঃ! আরসোলা আবার পাখী—সাবরেজিষ্ট্রার আবার হাকিম! শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। যেমনি হয়েছ তোমরা—তেমনি তোমাদের নির্ম্মলদা। তার চেয়ে এখনও ভালোয় ভালোয় বলছি, আস্তে আস্তে নির্ম্মল হালদারকে বাদ দিয়ে দাও প্রোগ্রাম থেকে; দিয়ে দিব্যি নিজেদের খেলাগুলো দেখাও, ওতেই দেখবে দেদার লোক আসবে 'শো' দেখতে। ওই নির্ম্মল হালদারের পুরনো পচা খেলাগুলো আর কেউ পয়সা খরচ করে দেখতে চায় না। ও তোমাদের এমন একটা কিছু স্পেশাল এট্রাকশান নয়। শেষ পর্য্যন্ত আবার হিতে বিপরীত না হয়ে দাঁড়ায়। অডিয়েন্স যখন দেখবে, ভেন্টিলুকোলুকির নাম করে নির্ম্মল হালদার সেই পুরনো বস্তাপচা খেলাগুলোই ঝুলি ঝেড়ে বের করছে, তখন তারা খেপে না উঠলে হয়। তখন যদি কেউ বদমাশি করে রাগের চোটে ষ্টেজে-ফেজে আগুন ধরিয়ে দেয়—ব্যস, তাহলেই হয়েছে আর কি।

কথাটি বলে আমাদের বক্তব্য না শুনেই সোজা প্রস্থান করলেন অঞ্জনদা। নির্ম্মলদার নাম প্রোগ্রামে দেওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই আমাদের ভিতরে বাদানুবাদের তুফান উঠেছিল। শেষকালে নির্ম্মলদার নতুন কিছু দেবার প্রতিশ্রুতিতে আমরা রাজী হয়েছিলাম। বাস্তবিক, নির্ম্মল হালদারের খেলাগুলো আমাদের কাছে পচে গিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—সেই একই ধরণের ক্যারিকেচার। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, নির্ম্মলদার পুঁজি বড় অল্প। সেই বাঁধাধরা খেলাক'টাই একটু ভোল পাল্‌টে, একটু কায়দা করে, বার বার দেখায়। সেই খোনা আর দেঁতোর গান-গাওয়া—ঢু দে-জমিদারের ক্যাবলা-ছেলের, প্রথম প্রেমিকের, প্রথম প্রেমিকার, সদ্য-শ্বশুরালয়ে আগতা নববধূর, পাড়ার বখাটে ছোকরার, শীতকালে ঠোঁটফাটা লোকের, শ্যালিকা-পরিবৃতা নতুন-জামাইয়ের—রকম রকম হাসি; সেই নব্য রামায়ণ (যার একটা লাইন আমাদের স্পষ্ট মনে আছে—খোনা গলায় আবৃত্তি—হাঁয় রামের কিঁবা মহিমা); সেই মামা-ভাগনের পাত্রী দেখা; সেই মর্ত্ত্যে শ্রীদুর্গার আগমন; কুকুর-বেড়ালের ঝগড়ার আওয়াজ; —এক কথায় সেই সবকিছু। কিছু বদলায় নি। নির্ম্মলদার ঝুলিতে উল্লেখযোগ্য আর কোন নতুন সৃষ্টি নেই। এক সময়ে নির্ম্মলদার ক্যারিকেচার দেখে আমরা খুব মজা পেতাম, হাসতে হাসতে খিল ধরে যেত পেটে। ক্রমে ক্রমে ওগুলো দেখে দেখে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে উঠল। বড় হয়ে নির্ম্মলদাকে আমরা নতুন সৃষ্টির জন্যে চাপ দিতাম। বলতাম, আজকাল এতদিকে এত অনাচার হচ্ছে, এগুলোকে ব্যঙ্গ করে ক্যারিকেচার করতে পারেন না আপনি। নতুন কিছু বের করুন। চারদিকে এত সমস্যা, সেগুলোকে নিয়ে এবার নতুন কিছু আরম্ভ করুন।

জবাবে নির্ম্মলদা বহু বার সেই একই কথা বলেছেন, হবে হে বাপু হবে। দাঁড়াও না, আসছেবার পুজোয় কেমন একটা নতুন ভেলকি লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখবে না তোমরা, ভানুমতীর খেলের মত তাজ্জব বানিয়ে দেব সবাইকে। ছেলে-বুড়ো সব হেসে কুটিপাটি হয়ে যাবে।

বলেই অমনি বিশদ বর্ণনা করতে বসেন নির্ম্মলদা, সেদিন আদরার সাউথ ইনৃষ্টিটিউটে ডি. এস. তাঁর মুখে রেলচলার আওয়াজ শুনে হাততালি দিয়ে স্বয়ং হ্যাণ্ডশেক করে কেমন তারিফ করেছিলেন।

একবার আরম্ভ করলে সহজে নিস্তার নেই। নির্ম্মলদা সাত-সতের ফিরিস্তি দিয়েই চলবেন। হয়ত গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে বলবেন, আরে বলো না—সেদিন ট্রেনে আসছি—এমন সময় এক তোতলা ভদ্রলোকের সঙ্গে খচাখচি হয়ে গেল খামকা। ব্যাপারটা কি জান—যেই আমি বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক তোতলা অমনি আমিও তোতলাতে সুরু করে দিলাম। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আ—চ্ছা দাদা, ক—ক—ক—টা বেজ্রে—ছে বলতে পা—পা—পা—রেন? আমিও তেমনি করেই বললাম কি—কি—কি জানি ক—ক—টা বে—বে—জেছে। আ—আ—মার কাছে ত ঘ—ঘ—ড়ি নেই।

যেই না এই কথা বলা, অমনি দেখি—ভদ্রলোক চটে গেছেন। সঙ্গে আমার বড় ছেলে মুটু ছিল। ওকে চোখ টিপে ইশারা করে দিলাম—যাতে কিছু ফাঁস না করে ফেলে। ব্যাটা জানালার কাছে উঠে গিয়ে খুক খুক করে হাসতে লাগল। ওদিকে

ভদ্রলোক রাগে গুম হয়ে বসে রইলেন। বাকি রাস্তাটা কারও সঙ্গে কথা বললেন না। থেকে থেকে কেবল আমার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগলেন।

এমন অভিজ্ঞতা নির্ম্মলদার হাজারটা আছে। একবার আরম্ভ করলে আর শেষ হতে চায় না। আবার তেমন পাল্লায় পড়লে নির্ম্মলদাও চিট হয়ে যান। তারা হয় ত রগড় করবার জন্যে প্রশ্ন করে, আচ্ছা নির্ম্মলদা, সেদিন আপনাকে ঝরিয়ার রাজা কি বলেছিলেন?

বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ম্মলদা বুঝতে পারেন, গোটা প্রশ্নটার পিছনে কতখানি কৌতুক মেশানো আছে। অমনি ধাঁ করে উঠে পালাতে চান নির্ম্মলদা। সামনে উপবিষ্ট কোন ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেন, আচ্ছা ভাইপো, তোমার সাইকেলটা নিয়ে যাচ্ছি একটু। এই এখখুনি আসছি বাজার থেকে।

আর ভাইপো! ভাইপো তখন হাঁ-হাঁ করে সাইকেল সামলাতে ছোটে। নির্ম্মলদার 'এখখুনি'! তা হলেই হয়েছে আর কি! সকাল দশটায় সাইকেল নিয়ে 'এখখুনি আসছি', বলে কোন দিন রাত দশটার আগে ফেরত দিয়েছেন বলে ত শুনি নি! শুধু কি তাই! সাইকেলটা কি কখনও অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসে! অধিকাংশ সময়েই দেখা যায়, কোন না কোন একটা গোলমাল বাধিয়ে বসে আছেন নির্ম্মলদা।

লোকে ঠেকে শিখেছে। এহেন লোককে সাইকেল দেওয়া! ওরে বাবা, সে যে ডাইনীর হাতে পুত্র সমর্পণ! শুধু কি সাইকেল! আর টাকা! হেন লোক নেই গাঁয়ে যাঁর কাছে নির্ম্মলদা একবার না একবার হাত পাতেন নি। আমার কাছেই কতবার এসেছেন হন্তদন্ত হয়ে, বলেছেন, ভাই রবি, গোটাকতক টাকা দিতে পারিস এখখুনি! যদি দিস ত বড় ভাল হয়। আর বলিস না, হঠাৎ খুটুটার এক শ তিন-চার ডিগ্রী জ্বর। আজ এইমাত্র রাম ডাক্তারকে ডেকে দেখালাম। সে বললে—টাইফয়েড হয়েছে, চট করে অরিওমাইসিন নিয়ে এস বাজার থেকে। দেখ ত বিপদ এই রাতদুপুরে। বাড়ীতে ছিলাম না আমি, এই আজই ফিরে আসছি ধানবাদের একটা জলসা থেকে। এসেই দেখি এই বিপদ! এখন আমি কার কাছে যাই এত রাত্রে, তাই তোর কাছেই এলাম। দে ভাই গোটা কুড়ি টাকা—পার কর আজকের রাতটা —কাল বিকেলে আমি তোকে নিশ্চয়ই দিয়ে দেব।

কখন হয় ত এসে বলেছেন, আর বলিস না—আমি বাড়ীতে ছিলাম না—বার্ণপুরে একটা ফাংশান ছিল—ওদিকে মোড়লরা করেছে কি—আমার তিনটে গরুকেই খোঁয়াড়ে পুরে দিয়েছে। এই ভাখ বিপদ, রাত পোয়ালেই প্রতিটি গরুকে ছাড়াতে পাঁচটি করে টাকা লাগবে। এখনও যদি ছাড়িয়ে আনতে পারি তা হলে গরুপিছু দু'টাকা করে দিলেই চলবে। তা ভাই, যদি গোটা-ছয়েক টাকা দিস—

প্রথম প্রথম আর দ্বিরুক্তি করতাম না। টাকা হাতে থাকলে বিনা বাক্যব্যয়ে এনে দিতাম। কোনও দিন প্রশ্নও করি নি ধানবাদের জলসায়-পাওয়া টাকাটা তিনি খরচ করলেন কিসে কিংবা তাঁর আবার তিনটে গরু হ'ল কবে থেকে। জানতাম, জিজ্ঞেস করেও কোন লাভ নেই। নির্ম্মলদা এমন খরচের ফিরিস্তি দেবেন যে তাতে জলসায় পাওয়া টাকা ত তলিয়ে গেছেই, কিছু দেনা পর্য্যন্ত হয়েছে এবং গরুর প্রসঙ্গে বলবেন, আরে, তুই কোন খবরই রাখিস না দেখছি। ও তিনটে কালো গাই আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে আমার ছেলেপুলেদের দুধ খেতে দিয়েছে, সে বুঝি জানিস না।

বলেই নির্ম্মলদা হয় ত চোখ দুটো কপালে তুলে আকাশ থেকে পড়ার ভাব দেখাবেন। অর্থাৎ তাঁর দেনার পরিমাণ এবং কালো-গাই-প্রাপ্তির কোন সংবাদ না রেখে আমি কত বড় অপরাধই না করেছি।

যত দিন নির্ম্মলদাকে পুরাপুরি চিনতে পারি নি ততদিন টাকা চাইলে কোন অজুহাতের সৃষ্টি করিনি। কোন প্রশ্ন না করে সাধ্যমত সাহায্য করেছি। হ্যাঁ, সাহায্য বৈ কি। নির্ম্মলদা অবশ্য প্রতিবারই মুখে বলেছেন, কাল টাকাটা তিনি অতি অবশ্য দিয়ে দেবেন —কিন্তু সে কাল আর তাঁর জীবনে আসে নি। আমরা জানতাম আসবে না। অতঃপর নির্ম্মলদাকে টাকা দেবার সময় আমরা সাহায্য বলেই ধরে নিতাম মনে মনে।

কিন্তু নির্ম্মল হালদার মচকালেও ভেঙে পড়েন নি। অন্তরে অন্তরে তিনি স্পষ্ট জানতেন যে তিনি সাহায্য নিচ্ছেন। তবু তিনি টাকা চাইবার সময় নিত্য নূতন অছিলার সৃষ্টি করতেন। শেষে তিনি বুঝতে পারতেন, আমরা ওসব অছিলায় বিশ্বাস করি না। তবু শামুকের খোলার মত মিথ্যা অছিলাটুকুর আবরণে আশ্রয় না নিলে চলে না তাঁর।

অথচ লোকটার এককালে গাঁয়ে বেশ খাতির ছিল। তুখোড় বলিয়ে-কইয়ে ছেলে বলে লোকে তার নামও করত। সে একটা দিন গেছে নির্ম্মল হালদারের। কি সুনামই ছিল তখন তার সারা গাঁয়ে। লোকে একবাক্যে স্বীকার করত, হ্যাঁ, নির্ম্মল চালাক-চতুর ছেলে বটে। লেখাপড়া না শিখে কোন রকমে ত করে খাচ্ছে! সে যা করেছে, আর কেউ ত চট করে পারে না সে কাজ করতে। সিনেমায় নামা কি যে-সে লোকের কাজ! সে ত ধরাধরি করে শেষ পর্য্যন্ত নামতে পেরেছে সিনেমাতে!

হ্যাঁ, সিনেমাতেই নেমেছিলেন নির্ম্মলদা প্রথম জীবনে—যা আমাদের ও-তল্লাটে এযাবৎ কেউ পারে নি আর। সেইজন্যেই হয়েছিল তাঁর এত নামডাক। অল্প বয়সে বাপ-মা হারিয়ে পিসির আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন নির্ম্মলদারা চার ভাই। একটু বয়স হতেই পিসি দেখে শুনে বড় ভাইপো দু'টির বিয়ে দিয়ে দিলেন। বছর পঁচিশেক বয়সেই গোটাদুয়েক কাচ্চাবাচ্চা জন্মাবার পর সংসারের উপর হঠাৎ যেন বিরাগ এসেছিল নির্ম্মলদার। সেই অবস্থাতে হঠাৎ একদিন বাড়ীতে না জানিয়ে শুনিয়ে

কলকাতায় পালিয়েছিলেন নির্ম্মলদা। সেখানে গিয়ে কোন এক চিত্র-প্রযোজককে ভজিয়ে-ভাজিয়ে নির্ম্মলদা তাঁর কয়েকটা বইয়ে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করার সুযোগটুকু জুটিয়েছিলেন। আমাদের স্পষ্ট মনে আছে সে সব দিনের কথা। 'স্বপ্নমুগ্ধা' বলে একটা বইয়ে নাকি নির্ম্মলদার ভাগ্যে এক জমিদার-বাড়ীর খাসচাকরের ভূমিকা মিলেছিল। মাত্র একটি দৃশ্যে ভৃত্যরূপী নির্ম্মলদা ভীত-সন্ত্রস্তভাবে কাছারিবাড়ীতে এসে জমিদারবাবুকে জানিয়েছিলেন —হুজুর, হুজুর, রাণী-মা ভিতর-বাড়ীতে মূচ্ছো গেছেন।

ব্যস, সেই চিত্রাবতরণ থেকে নির্ম্মল হালদার খ্যাতনামা হয়ে গেলেন। সেই তাঁর প্রসিদ্ধিলাভের ইতিহাস। সেই থেকে আমাদের এলাকায় একডাকে নির্ম্মল হালদারকে সবাই চেনে।

কিন্তু চিত্রজগতে নির্ম্মলদা টিকতে পারেন নি। জানি না কোন অজ্ঞাত কারণে একদা তিনি সসম্মানে গ্রামে ফিরে এলেন এবং অতঃপর শুধু চিত্রাবতরণের আভিজাত্যটুকু ভাঙিয়ে খেতে লাগলেন। তখন নির্ম্মলদাকে দেখবার জন্যে সকলের সে কি আগ্রহ! পর্দ্দার বুকে যাকে দেখেছে, চর্ম্মচক্ষে তাকে দেখে চোখ সার্থক করতে চায়। নির্ম্মলদার মুখেও তখন সিনেমাজগৎ ছাড়া কথা নেই। হরদম এদিকে-ওদিকে বলে বেড়াতেন, তোমাদেরই যত সমস্ত বড় বড় আইডিয়া সিনেমা সম্বন্ধে। আসলে ওগুলো কিচ্ছু নয়—কেবল সাউণ্ড আর লাইটের কেরামতি। যারা সিনেমা করে তাদের তো ঘেন্না ধরে যায় সিনেমার ওপর। সেই জন্যে তারা কখখনো সিনেমা দেখতে চায় না। অথচ বাইরের থেকে তোমরা ভাবো, সিনেমাটা না জানি কি। ধরো—কোন একটা ঝড়ের দৃশ্য দেখে তোমরা ভাবো, বাবারে, কিনা ঝড় হচ্ছে, মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কড় কড় করে মেঘ ডাকছে, বিরাট বিরাট গাছগুলো নড়বড় করে উঠছে ঝড়ের দুলুনিতে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে দুনিয়া ভাসিয়ে দিচ্ছে! আসলে ওগুলো ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে খুব জোরে হু হু করে ফু দিলে দেখবে ঝড়ের সনসন শব্দ পাওয়া যায়। আর ঝড়ে ধুলো উড়ছে বোঝাবার জন্যে উইণ্ড মেশিনের সামনে মুঠো মুঠো করে ময়দা উড়িয়ে দেওয়া হয়। ওদিকে লাইট দিয়ে কায়দা করে বিদ্যুৎচমকানো দেখানো হয় আকাশের গায়ে। অমনি তোমরা ভাবো, বাপরে—কি দুর্য্যোগ! ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ—সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না পর্য্যন্ত!

অ্যাকটার-অ্যাকট্রেসদের কান্না দেখে তোমরা অস্থির হয়ে যাও। কেউ কেউ আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে সুরু করো জনমদুঃখিনী সীতার দুঃখে কিংবা কৃষ্ণের বিরহে রাধার বিলাপে। কিন্তু আসলে ওরা চোখে জল বার করে কিভাবে জানো? চোখে গ্লিসারিণ দিয়ে। কান্নার 'সিন' আরম্ভ হবার আগে ওরা চোখে গ্লিসারিণ লাগিয়ে নেয়। তখন আপনা থেকেই দরদর করে চোখের জল পড়তে থাকে। কিন্তু 'বন্ধন' বইটায় আমি সত্যিই কেঁদে ফেলেছিলাম। যেখানে সেই চুরি করার জন্যে আমাকে ধরে হাজতে পুরে দিলে, সেইখানে হাজতে গিয়ে আমার একটা কান্নার দৃশ্য আছে না! সেই দৃশ্যটাতে সত্যিই আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছিল। সেই জায়গাটা আসতেই আমি মনে মনে আমার বড় মেয়ে বুড়ীর মরার দিনটার কথা ভাবতে লাগলাম। যখন রাতদুপুরে বুড়ীকে কোলে নিয়ে আমরা শ্মশানের দিকে রওনা হই, সেই সময়টার চিত্র চোখের সামনে ভাসিয়ে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলাম। সেই দিনটার ছবি মনে পড়তেই হু হু করে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসতে লাগল।

সিনেমাজগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নির্ম্মলদা বাস্তবিক তখন আমাদের কাছে ছিলেন রূপকথার নায়ক। সবাই তাজ্জব বনে যেত নির্ম্মলদার বর্ণনা শুনে। এমনকি আশপাশের গ্রামগুলোতে পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের মর্য্যাদা বেড়ে গেল। সবাই বলতে লাগল, একটা গাঁয়ের মত গাঁ বটে। ওখানকার নির্ম্মলবাবু তো শেষ পর্য্যন্ত কলকাতায় গিয়ে সিনেমায় নেমেছে। হ্যাঁ—বাহাদুর বটে।

লোকে তখন ভাবত, নির্ম্মল হালদার নিশ্চয়ই আবার কলকাতা ফিরে যাবে। কিন্তু তিনি যে সে পাটটি চুকিয়ে দিয়েছিলেন, তা কে জানে! লোকে অবাক হয়ে ভাবে, সিনেমাজগতে যদি নির্ম্মল হালদারের এতই প্রভাব, এতই প্রতিপত্তি—আর একবার সিনেমায় নামলেই যখন প্রচুর টাকা পাওয়া যায়—ও তা হলে কলকাতা ফিরে যাচ্ছে না কেন?

আশ্চর্য্য! দিনের পর দিন নির্ম্মলদা গাঁয়েই বসে রইলেন। বাড়ী থেকে নড়ার কোন লক্ষণই দেখা যায় না।

ওঁর কলকাতাত্যাগের কারণ নিয়ে চারদিকে কানাঘুষো আরম্ভ হয়ে গেল।

শেষকালে সঠিক খবরটা পাওয়া গিয়েছিল ঐ অঞ্জনদার কাছ থেকেই। উনিও তখন কলকাতায় থাকতেন। তাঁর মুখেই শোনা গিয়েছিল, অর্থই নির্ম্মলদার জীবনে চরম ভাগ্যবিপর্য্যয় ডেকে এনেছে। অর্থই ফিল্মদুনিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়েছিল, পরিশেষে তাঁর সসম্মান বিদায়-গ্রহণের মাঝ দিয়ে যত অনর্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে। একদিন ছোট-বড়-মাঝারি সকল শ্রেণীর পাওনাদারদের ভোগা দিয়ে চুপিচুপি নির্ম্মলদা হাওড়া ষ্টেশনে এসে বাঁকুড়ার গাড়িতে চেপে বসেছিলেন।

তখন থেকে অঞ্জনদা তাঁর উপস্থিতিতে নির্ম্মল হালদারের প্রসঙ্গ উঠলেই চটে যান। নিঃসঙ্কোচে নিন্দা করেন তাঁর—খুব বল্ক পেয়েছে গাঁয়ের লোকদের। যা পারছে বলে বেড়াচ্ছে চারদিকে—হেঁই আমি অমুক করতাম, তমুক করতাম, অমুকের সঙ্গে আমার খুব খাতির ছিল। আরে বাবা—অত যদি আদর তো পালিয়ে এলি কেন সেখান থেকে। যা না তোর সেই মামা-মেসো-পিসেদের কাছে—আমার কাছে চালাকি চলবে না। হু হু ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ তো দেখনি যাদুমণি! কোথায় চালাকি করতে

এয়েছিস! কামারের কাছে এয়েছে ছুচ বেচতে! হু! অঞ্জন চাটুজ্যে ওর হাঁড়ির খবর জানে।

অতঃপর নির্মলদা পেশাহিসেবে ক্যারিকেচারিষ্টের কাজ বেছে নিয়েছিলেন। চিত্রাবতরণের আগেও কখনো কখনো তিনি এক-আধটা কৌতুকাভিনয় দেখাতেন। রুজিরোজগারের পথ না দেখে নির্মলদা শেষে হলেন পেশাদার কৌতুকাভিনেতা। সেদিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। তাঁর কথা বলবার ভঙ্গী, চোখের কায়দা, নাটকীয় হাবভাব—সবকিছুই লোকের মনে হাসির উদ্রেক করত। এমনকি, বাড়ীর গুরুজনদের সঙ্গে পর্যন্ত উনি অভিনয় করার ঢঙে কথা বলতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, একদিন নির্মলদাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভেতর-বাড়ীতে দারুণ ঝগড়ার আওয়াজ পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখি, উঠোনে দাঁড়িয়ে গুড়ভর্তি একটা জালাকে দুহাতে তুলে ধরে শূন্যে নাচাতে নাচাতে নির্মলদা সামনে দণ্ডায়মান বড়ভাইকে ভয় দেখাচ্ছেন—দেব ফেলে! দিই উঠোনে আছাড় মেরে? জালাটা ভেঙে গেলে আর ভাবনা কি! মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বেশ চার ভাইয়ে ভাগাভাগি করে চেটেপুটে গুড় খাওয়া যাবে।

সে সময়ে ওঁদের মধ্যে সম্পত্তিভাগ নিয়ে ঝগড়া চলছিল। বুঝতে পেরেছিলাম—ঐ একজালা গুড় ভাগকরা নিয়ে বড়ভাই হয়তো ঝগড়া করতে এসেছেন মেজভাই নির্মলদার সঙ্গে। তাই ওইরকম নাটকীয় ভঙ্গীতে নির্মলদার বিবাদ-নিষ্পত্তির চেষ্টা।

সুতরাং পেশাটা নির্মলদার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল বলতে হবে। প্রথম প্রথম বাইরে জলসা-টলসায় কণ্ট্রাক্ট পাবার আগে নির্মলদা গাঁয়েই দুর্গাপুজো কিংবা সরস্বতী পুজোয় ক্যারি-কেচার দেখাতেন। গাঁয়ের লোকদের কাছে কিন্তু নির্মলদা কোনদিন পয়সা দাবি করেন নি। পুজোর রাত্রে সবাই বসে আছে মেলায়। হঠাৎ নির্মলদাকে জনকয়েক ধরল—নির্মলদা, আপনাকে একটু ক্যারিকেচার দেখাতে হবে। গাঁয়ের এতগুলো ছেলেমেয়ে এসেছে মেলাতে—এদের সামনে একটু হয়ে যাক আজ।

প্রথমে নির্মলদা জোড়হাত করে মাফ চেয়ে পালাবার ভান করেন, গলাব্যথা, সর্দি-কাশির অছিলা দেখান; পরে অনুরোধের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলে মুখটা কিরকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে ক্যাবলা-পানা করে, চোখগুলো বড় বড় করে বলেন, আচ্ছা, তোমরা বলছ যখন—

বলেই হয়তো সামনে উপবিষ্ট কোন বৃদ্ধের কাছে গিয়ে ঢিপ করে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক অবাক হয়ে যান—কি ব্যাপার! হঠাৎ নির্মল তাঁকে প্রণাম করল কেন!

তাঁর বিস্ময়ের রেশ কাটতে না কাটতেই নির্মল হালদার ততক্ষণে হয়তো হাত কচলাতে সুরু করে দিয়েছেন—হেঁ হেঁ অনেকদিন পরে আবার আপনাদের একটু কমিক—মানে ঐ ক্যারিকেচার না কি বলে ইংরেজীতে—সেই দেখাব। প্রথমেই আজ আপনাদের একটা ভৌতিক ব্যাপার দেখিয়ে দিই। সেবার আমি কলকাতা থেকে বাড়ী আসছি। প্রথমে তো নামলাম বাঁকুড়া ষ্টেশনে। তার পর বাকি রাস্তাটুকু এলাম বি-ডি-আর ট্রেনে। তা সে ট্রেনটা কিরকম শব্দ করে আসে সেটা শুনিয়ে দিই আপনাদের:

বলে নির্মলদা বিকট মুখভঙ্গী করে. গলার শিরাগুলো ফুলিয়ে, চোখমুখ লাল করে—'বাবারে গেলাম রে—বাবারে গেলাম রে' ইত্যাদি ধ্বনি করে ট্রেন আসার শব্দ শোনান। তার পর বাড়ী এসে চাকরের মৃত্যুসংবাদে ব্যথিত হয়ে তার প্রেতাত্মার সঙ্গে পরলোক সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরটা আগাগোড়া দেখিয়ে দেন। এর পর আরম্ভ হয় নির্মলদার প্রসিদ্ধ কৌতুকাভিনয়—নিধুরামের কলকাতা-দর্শন। নিধুরাম নামে মানভূম জেলার কোন এক সুদূর গ্রামাঞ্চলের লোক প্রথম কলকাতা যাবার সময় ট্রেন দেখে কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল, টিকিট কিনতে গিয়ে ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে টিকিটের দর-দস্তুর করেছিল, গাড়িতে উঠে কামরার লাইট এবং ফ্যান দেখে কিরকম অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল, অবশেষে কলকাতা পৌঁছে অন্ততঃ বিশ জায়গায় নাকানিচোকানি খেয়ে ঘুরে ঘুরে নমস্কার করে কলকাতা থেকে বিদায় নিয়েছিল—সেই ঘটনাগুলি বিচিত্র ভঙ্গীসহকারে নির্মলদা ব্যক্ত করেন।

বলা বাহুল্য, গোড়ার দিকে গাঁয়ের সবাইকার কাছে এসব খুব উপভোগ্য ছিল। কিন্তু আগেই বলেছি, নির্মলদার পুঁজি ছিল অল্প। একই জিনিস দেখে দেখে আর শুনে শুনে লোকের বিরক্তি এসে গিয়েছিল। আর তা ছাড়া লোকের কাছে নির্মলদার ধাপ্পা-বাজিও ধরা পড়ে গিয়েছিল। চট করে তাঁর ফাঁদে আর পড়তে চাইত না কেউ। লোকে তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন বাঁচত। কি জানি—ফস করে এখুনি হয়তো পাঁচটা টাকা কিংবা সাইকেলটা কিংবা কোন-না-কোন একটা জিনিস চেয়ে বসবে।

নিজের গাঁয়ে নির্মলদার জনপ্রিয়তা-হ্রাসের ইতিহাস এই। ইদানীং নির্মলদাকে গাঁয়ের কেউ সহজে পোঁছে না বললে অত্যুক্তি হবে না। বেচারী নির্মলদা এতে মর্মাহত। আজকাল কথায় কথায় গাঁয়ের লোকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝরে পড়ে।

এখন আর পুজো-পার্বণে নির্মলদাকে ক্যারিকেচার দেখাবার জন্যে কেউ সাধাসাধি করে না। নির্মলদা তো বিনা সাধাসাধিতে কোনদিনই আসরে নামেন নি।

ইদানীং পাঁচ-ছ'টি ছেলেমেয়ের বাপ নির্মল হালদারের বাড়ীতে যে কি ভাবে হাঁড়ি চড়ছে সে খবর রাখা দরকার মনে করতাম না। মাঝে মাঝে বাজারে চায়ের দোকানে দেখতে পাই, নির্মলদা গাঁয়ের চাষাভুষোদের কাছে খুব হাত-পা নেড়ে বলে যাচ্ছেন, বুঝলে কন্নালী ভায়া, সেদিন সিয়ারসোল ষ্টেটের নায়েব এসে বললে, আপনাকে আমাদের ওখানে ক'দিন ক্যারিকেচার দেখাতে যেতে

হবে। তা আমি বললাম, যাব, নিশ্চয়ই যাব—যাব না কেন! ওটাই তো আমার পেশা। কিন্তু বলে দিচ্ছি, পঞ্চাশ টাকার একটি পয়সা কম নেব না আমি। দেড়টি ঘণ্টা প্রোগ্রাম আমার—তোমরা ঘড়ির কাঁটা ধরে দেখে নেবে। তবে কনট্রাক্টের একটি পাই-পয়সাও এদিক-ওদিক করা চলবে না। তা বুঝলে ভায়া, তাতেই রাজী হ'ল ওরা। আর রাজী না হয়ে যাবে কোথা! কলকাতার একজন আর্টিষ্টকে আনা তো চারটিখানি কথা নয়। তার জন্য রীতিমত খরচা করতে হবে! তা ছাড়া আর্টিষ্টরা এসে যা দেখাবেন সে তো জানাই আছে। তার ওপর তাঁদের আবার চৌদ্দপোয়া ডাট! আর এ বাবা পেয়েছে নির্ম্মল হালদারকে—কম খরচে হয়। তা বুঝলে ভায়া, আমার গাঁয়ের লোকরাই যা আমাকে চিনল না। আরে বাবা, চিনলি না তো বয়েই গেল—আমি কি উপোস দিয়ে পড়ে আছি! দিব্যি তো করে খাচ্ছি। আহা, গলাটা শুকিয়ে গেল যে হে, একটু ঠাণ্ডা জল—

মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রোতারা নির্ম্মল হালদারের কথাগুলো গিলছিল। শশব্যস্তে ছুটে এল তারা—এই যে দিচ্ছি জল।

নির্ম্মলদা তখন বারকয়েক মাথা চুলকে হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে বল্লেন, আহাহা, সকাল থেকে কিছু খেয়ে বেরুনো হয় নি তো। ওরে কেষ্টা, দে না ভাই, এক কাপ চা-ই দে—

সঙ্গে সঙ্গে চা আসে। চা খেয়ে পোড়া বিড়ি টানতে টানতে নির্ম্মলদা আবার গল্প জুড়ে দেন। কোন কোন দিন হয়তো ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাঁর। অমনি তিনি বলে ওঠেন, এই যে রবি, এসো। এই দেখ, এদের এতক্ষণ বলছিলাম সেদিনকার ব্যাপার—মানে টাটানগরে গত মঙ্গলবারে একটা কল্ পেয়েছিলাম। বিহার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী এন. বি. প্রসাদ আমার বাড়ীর ঠিকানায় একখানা চিঠি দিয়েছিল ত। এই দেখো না সেই চিঠি—আর এই দেখো সেই প্রোগ্রাম।

হাতে হাতে প্রমাণ। অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। পকেটে পকেটেই ঘোরে সেসব দলিল। চ্যালেঞ্জ করার জো নেই। অমনি চোখের সামনে তুলে ধরবেন—এই দেখ, আমি মিথ্যে কথা বলি নি। তোমরা মনে কর কি—হুঁ।

এক-একটা চিঠি আর ছাপানো প্রোগ্রাম দিয়েই বোধ হয় আজকাল বিপক্ষের বিরুদ্ধ মতকে খানখান করে দিতে চান নির্ম্মলদা। দলিল হিসেবে এক-একটা জলসার প্রোগ্রামে ছাপার অক্ষরে তাঁর নামটা দেখিয়ে তাঁর পারদর্শিতা সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্নদের ভ্রান্ত বুদ্ধিকে আঘাত করে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিতে চান তিনি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চান—তোমরা আমার কদর না বুঝলে, আমার তাতে বয়ে গেল। বাইরের লোক ঠিকই আমার মর্য্যাদা বোঝে!

অতএব, চোখের সামনে বিহার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী এন. বি. প্রসাদের চিঠি আর সেই সঙ্গে ছাপার অক্ষরের প্রোগ্রামে নির্ম্মলদার নাম দেখে অস্বীকার করবার কোন উপায় রইল না। নির্ম্মলদা তখন গর্ব্বভরে চিঠি এবং প্রোগ্রামটা পকেটে পুরে বললেন, তা বুঝলে ভাই, আসর মাত করে দিয়ে এলাম একেবারে। যতক্ষণ ষ্টেজে ছিলাম—ষ্টেজ একেবারে সরগরম হয়ে ছিল।

আমি হয় ত বোকার মত প্রশ্ন করি, আচ্ছা, আপনাকে ত হিন্দীতে বলতে হ'ল সবকিছু। আপনার আটকাল না? তা ছাড়া হিন্দীতে বললে ত আইটেমগুলিও সব বদলাতে হবে। কি করে ম্যানেজ করলেন আপনি?

'আঃ, আমার কপাল—কোথায় আছ তুমি! কেন, হিন্দী কি আমার আটকায় নাকি! আরে এ্যায়সা হিন্দী বলে দেব যে খাঁটি হিন্দুস্থানীরাও থ হয়ে যাবে। যখন আরম্ভ করব—হামারে বিহার রাজ্যকে কোই গাঁওমে এক বহুৎ সিধাসাধা ভুলাভালা আদমী থা, যসকা নাম থা বন্ বন্ সিং। তো উও বনবন সিংকা বহুৎ দিনসে শখ থা কি উও একবার শহর কলকাত্তা আপনা আঁখমে দেখ লে—তখন সব হাঁ করে চেয়ে দেখবে। যদি বলে, ইংরেজীতে বল। তাই সই। ইংরেজী ইংরেজীই। নির্ম্মল হালদার কি তাতে পেছপা নাকি! দু'চারবার ত তুড়ে ক্যারিকেচার করে দিয়েছি ইংরেজীতে। সেবার খড়্গপুরে রেলের ম্যানুয়েল স্পোর্টসের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন ওরা আমাকে বললে—হালদারবাবু, এখানে অনেক অবাঙালী রয়েছে, আপনি ইংরেজীতেই বলুন।

আমি বললাম, ঠিক আছে, সে আর এমন কথা কি বলেই ষ্টেজে গিয়ে আরম্ভ করলাম লেডিজ এণ্ড জেণ্টলম্যান—পারহাপস ইউ নো আই অ্যাম এ প্রফেশন্যাল ক্যারিকেচারিষ্ট। সো ফলোয়িং বার্নাড শ, আই এম অলসো এট লিবার্টি টু টেল দ্যাট আই লিভ অন মাই উইটস। ষ্টিল দেয়ার'স এ ডিফারেন্স বিট্যুইন ক্যাল-কেসিয়ান আর্টিষ্টস এণ্ড মি—এ পুওর—এ ভেরি পুওর ম্যান অফ লিটল ওয়ার্থ বিলঙ্গিং টু মফস্সল এরিয়া···নির্ম্মলদা হয়ত তাঁর সেদিনকার বক্তৃতাটা পুরাপুরি পুনরাবৃত্তি করতেন। কিন্তু আমাদের হাতে কাজ ছিল। তাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে একটা ছুতো ধরে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে। নির্ম্মলদা আবার তাঁর ধৈর্য্যশীল শ্রোতাদের দিকে মনোযোগ দিলেন। সাইকেলের প্যাডলে পা দিয়ে শুনতে পেলাম নির্ম্মলদা হাত নেড়ে বলে চলেছেন, সেদিন বুঝলে সুরযুভায়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে একটা ফাংশান ছিল—

এসব কথা নির্ম্মলদার মুখে আজকাল হরদম শোনা যায়। শুনে শুনে এমনিই মনে হতে আরম্ভ করেছিল কিছু দিন ধরে যে, সত্যিই গাঁয়ের লোক অন্যায় করেছে।

সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়েই আমাদের 'চ্যারেটি শোতে' নির্ম্মলদাকে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে উনি যখন নিজে এসে বলেছেন, তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে বাধ-বাধ ঠেকাটাই বড় কথা নয়। মনে মনে আমা-দের স্থির বিশ্বাস ছিল—নির্ম্মলদা দর্শকদের নতুন কিছু এবং তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ চমকপ্রদ কিছু দেখাবেন। বিশেষতঃ—ভেন্‌ট্রিলুকো-ইজম কথাটা আমাদের দারুণ উৎসাহিত করেছিল।

দেখতে দেখতে শো'য়ের রাতটি এসে পড়ল। আমরা আমাদের সঙ্ঘের সুনাম এবং মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, নির্ম্মলদার সম্বন্ধে ভাববার এক মুহূর্ত্ত অবকাশ ছিল না। আমরা জানতাম, তিনি এমন কিছু করবেন না, যাতে লোকের কাছে আমাদের বদনাম হয়। আমরা এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলাম তাঁর সম্বন্ধে।

পেট্রোম্যাক্স আর হাজাকের আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। উঁচু উঁচু বাঁশের খুঁটির ওপরে তেরপল দিয়ে তৈরী বেড়া। তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনটে গেট। ভেতরে মেয়েদের বসবার আলাদা জায়গা, পুরুষদের অন্যদিকে। মাঝখানে লোকের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা তক্তপোশগুলি সারি সারি পেতে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। ওরই ওপর খেলা দেখানো হবে। মঞ্চের খুব কাছাকাছি খানতিরিশেক চেয়ার। কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবী, চশমা, পাশে ছড়ি—গণ্যমান্যেরা বসেছেন। মঞ্চের পাশেই উঁচু উঁচু দুখানা শালখুঁটি—ট্রাপিজের খেলা দেখাবার ব্যবস্থা। তারই পাশে খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়ে রাখা হয়েছে। জীবন্ত মানুষ পোঁতা হবে মাটিতে। সেইটাই আজকের 'শো'য়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

খেলা আরম্ভ হ'ল। প্যারালাল বার দিয়ে আরম্ভ, তার পর ট্রাপিজ, তার পর রিঙ, ফিগার, লোহার বল লোফালুফি, অগ্নিচক্র অতিক্রম, ওয়েট লিফটিং—সব শেষ হ'ল একে একে। এবার বাকি আছে শুধু দুটি খেলা। নির্ম্মলদার 'ভেনট্রিলুকোইজম' আর জীবন্ত মানুষকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা। বিশেষ করে শেষের খেলাটার জন্যে লোকে উত্তেজনায় উসখুস করছে।

যদিও মফস্বলের 'শো' তবু আভিজাত্য-বর্দ্ধনের জন্য মাইক ছিল। মাইকে ঘোষকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এইবার দেখানো হচ্ছে প্রোফেসার নির্ম্মল হালদারের বিখ্যাত কৌতুকাভিনয়—'ভেন্ট্রিলুকোইজম্।

দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টি বারে বারে সাজঘরের দিকে ঘোরে। কখন নির্ম্মল হালদার বেরোবেন এবং কি মূর্ত্তিতে বেরোবেন। তাঁর ক্যারিকেচারই সবাই দেখেছে, 'ভেন্ট্রিলুকোইজম্' দেখে নি। তাই অন্তরীক্ষ থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর শোনার অসীম আগ্রহে সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

অঞ্জনদা সদলবলে বসে ছিলেন এক পাশে। নির্ম্মল হালদারের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে ব্যঙ্গবিদ্রূপের বাঁকা হাসি দেখা গেল। অনুচ্চ স্বরে দু'একটা টিটকারির শব্দও ভেসে এল।

মিনিট দুই তিন কেটে গেল। নির্ম্মলদার কোন পাত্তা নেই। ওদিকে দর্শকরা অধীর হয়ে উঠেছে। দু'একজন আসন থেকে উঠে এসে সাজঘরে উঁকি মেরে বলে, কৈ হে, তোমাদের নির্ম্মলের যে টিকিটি দেখা যাচ্ছে না। নাও, তাড়াতাড়ি করতে বল—রাত অনেক হয়ে গেল যে।

সত্যিই ত! কোথায় গেল নির্ম্মলদা। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখি—

—নাঃ, লোকটা ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে কোথায়!

নির্ম্মলদার ওপর আমরা বিরক্ত হয়ে উঠলাম। না, ওর একটা দায়িত্বজ্ঞান নেই। ওদিকে অঞ্জনদাদের তরফে হাসাহাসি সুরু হয়ে গেছে।

আচমকা দর্শকদের পিছন থেকে এক বাজখাঁই গলার আওয়াজ পাওয়া যায়—মাওসা হে, এ মাওসা—মাওসা হে—

দর্শকরা সচকিত হয়ে তাকিয়ে দেখে, আর কেউ নয়—স্বয়ং নির্ম্মল হালদার। এক কিম্ভুতকিমাকার বেশে হাঁকতে হাঁকতে মঞ্চের উপর এসে দেখা দিলেন নির্ম্মলদা।

পরনের কাপড়টা কসে মালকোঁচা এঁটে পরেছেন, মাথায় একটা পাগড়ি, গালে খোচা খোচা গোঁফদাড়ি এবং কানে একটি পোড়া-বিড়ি। ময়লা কাপড়ের একটা পুঁটুলি বগলদাবা করে নির্ম্মলদা অগ্রবর্ত্তী কোন সঙ্গীকে হাঁক দিতে দিতে চলেছেন। মঞ্চের ওপর এসে লোকটির দেখা পাওয়া গেল। অমনি পিছিয়ে পড়া লোকটি তার কাছে অনুযোগ জানাতে লাগল—বিদেশবিভুঁই জায়গা, মাওসা অর্থাৎ মেসো কেন তাকে একা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্চে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। যে গেঁয়ো চাষী, সেই তার তার মেসো। অর্থাৎ, দুটি ভূমিকারই অভিনেতা নির্ম্মলদা।

নির্ম্মলদার মঞ্চে ঢোকার কায়দাটা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তাই দর্শকরা নূতন কিছু কৌতুক ভেবে এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু নির্ম্মলদা মুখ খুলতেই দেখা গেল—সেই বস্তাপচা পুরনো খেলা! সেই গাঁয়ের ভালমানুষ চাষী নিধুরাম এবং তার মেসোর কলকাতাদর্শন।

ছি, ছি, এই কি নির্ম্মল হালদারের 'ভেনট্রিলুকোইজম!' লোকে অনেক আশা করেছিল। অঞ্জনদারা 'দূও দূও' করে উঠল। বড়রা বিরক্ত হয়ে ওঠেন, ধোৎ, নির্ম্মল শেষকালে এমনি করে ধাপ্পা দিলে। এ ত তার সেই আদ্যিকালের ক্যারিকেচার। এরাও যেমন—হুঁ! নির্ম্মলের চালবাজিতে আবার বিশ্বাস করে!

চারদিকে হতাশার ঢেউ। প্রথমে অস্ফুট গুঞ্জরণ। তার পর সরব প্রতিবাদ। শেষে প্রকাশ্য কলরব। ওদিকে নির্ম্মলদা প্রাণপণে গলার শিরা ফুলিয়ে, শীর্ণ হাত পা নেড়ে নেড়ে, মুখ-চোখের নানা রকম কায়দা করে খেলা দেখিয়ে চলেছেন। কিন্তু সামনে বসা জনকয়েক ছেলেমেয়ে ছাড়া মঞ্চের দিকে কেউ দৃকপাতও করছে না। সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই। শেষকালে নির্ম্মলদার কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে হৈ হৈ করে গোলমাল উঠল।

মাইকে বারবার ঘোষকের গলা শোনা যায়, আপনারা একটু চুপ করুন। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, নইলে আমাদের প্রোগ্রাম পণ্ড হয়ে যাবে। আপনারা ধৈর্য্য ধরুন—শান্ত হন আপনারা—এরপর আমাদের ভীষণ খেলা আছে—জীবন্ত মানুষকে ভূগর্ভে প্রোথিত করা—

একে মা মনসা তায় আবার ধুনোর গন্ধ! ওর জন্যেই লোকে

রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করছিল। ব্যস, ঘোষকের কথা কানে যাবামাত্র তারা ক্ষেপে উঠল। মাইকের আওয়াজ পর্য্যন্ত কোথায় ডুবে গেল। চারদিকে তুমুল কোলাহল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দেখি, অঞ্জনদারা হাতের মুঠি ওপরে ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করছেন, আমরা নির্ম্মল হালদারের ক্যারিকেচার দেখতে চাই না—বন্ধ কর ক্যারিকেচার—হয় ক্যারিকেচার থামাও, না হয় প্রোগ্রাম বন্ধ কর।

কি সর্ব্বনাশ! মাটি হয়ে যাবে নাকি 'শো' শেষ পর্য্যন্ত!

ধা করে মঞ্চে ঢুকে পড়লাম। নির্ম্মলদাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে করতে হবে। নইলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে যে! মঞ্চে তখন নির্ম্মলদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বোবাকষায়িত চোখে অঞ্জনদাদের কাণ্ডকারখানা দেখছেন। কাছে গিয়ে খপ করে হাত ধরে টানলাম—চলুন নির্ম্মলদা, ভেতরে চলুন ওরা পরের খেলাটা দেখবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আসুন আপনি আমার সঙ্গে। নির্ম্মলদা একবার হতভম্বের মত আমার দিকে চাইলেন। আবার মুখ ফেরালেন দর্শকদের দিকে। সেখানে এখনও তেমনি গোলমাল, তেমনি শিস দেওয়া চলছে। নির্ম্মলদার দৃষ্টি দেখলাম অঞ্জনদার দিকে। চোখ ধকধক করে জ্বলছে।

আমি আবার হাত ধরে টেনে বললাম—আপনি এখন ভিতরে চলুন নির্ম্মলদা। শো শেষ হলে ওদের আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবেন।

নির্ম্মলদা আমার দিকে মুহূর্ত্তের জন্য কটমট করে তাকিয়ে থেকে সাজঘরের দিকে চলে গেলেন দুমদাম করে পা ফেলে। আমিও পিছু নিলাম। ভিতরে এসে দেখি, নির্ম্মলদা গজগজ করতে করতে ধড়াচূড়া খুলে ফেলছেন। আমি ঢুকতেই রাগে ফেটে পড়লেন একেবারে—এরকম অসভ্য জানোয়ারদের সামনে তোমরা আমাকে ক্যারিকেচার দেখাতে বললে কেন! ছি, ছি, এরা না জানে ক্যারিকচারের মর্ম্ম, না জানে এতটুকু ভদ্রতা! ছি, ছি, ঘেন্না ধরে গেল গাঁ-টার ওপরে! এই শেষ, আর না। এই নাকে কানে খৎ দিচ্ছি—এই গাঁয়ে যদি কখনও খেলা দেখাই তবে আমার নাম নির্ম্মল নয়।

আমাদের মধ্যে একজন বলল, অডিয়েন্সকে পুরোপুরি দোষ দিলে ত চলে না নির্ম্মলদা। আপনি আমাদের বলেছিলেন 'ভেনট্রিলুকোইজম' না কি যেন আমাদের দেখাবেন! সবাই ত তাই মুখিয়ে ছিল। তা ষ্টেজে নেমে তো আপনি শেষকালে সেই আদ্দিকালের নিধুরামকে নিয়ে আরম্ভ করলেন—

বাধা দিয়ে নির্ম্মলদা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন, ওই যার নাম চালভাজা, তার নামই মুড়ি। ভেন্‌ট্রিলুকোইজম কি একটা আলাদা বস্তু নাকি! ওই যার নাম ক্যারিকেচার, তারই নাম ভেন্‌ট্রিলুকোইজম। আমি ওদের জন্যে ভেন্‌ট্রিলুকোইজম বলে আলাদা একটা কিছু সৃষ্টি করতে যাব নাকি! এ ত বড় মজার কথা। বোকা না হলে একথা কেউ বিশ্বাস করে—আশমান থেকে কথা ভেসে আসবে! তারা যদি বুদ্ধ হয় ত আমি কি করব। আমি কি তার জন্যে দায়ী।

আমরা ততক্ষণে আমাদের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হয়ে হয়ে পড়েছিলাম। নির্ম্মলদার কোন কথার জবাব দিলাম না আমরা। তিনি এককোণে দাঁড়িয়ে জামা পরতে পরতে নিজের মনে গজরাতে লাগলেন।

এমন সময় ধূমকেতুর মতন অঞ্জনদা সেখানে এসে হাজির। কাছে এসে তিনি নির্ম্মলদার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে—জানি নির্ম্মল হালদার শেষ পর্য্যন্ত ভরাডুবি করবে। ছি, ছি, কি কেলেঙ্কারী! নতুন খেলা দেখাব বলে শেষে ষ্টেজে উঠে যা তা আরম্ভ করল। ভাবল, লোকে এমনি বোকা কিনা—এ্যা, পয়সা দিয়ে লোকে ওঁর ভাঁড়ামো দেখতে আসবে। কি আস্পর্দ্ধা! তার আবার কত গালভরা নাম—ভেন্‌টিলুকোইজম। বাপরে, বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কর! তুই এককোটা ক্যারিকেচারিষ্ট—তোর আবার এত বড় 'শো'য়ে নামবার কি দরকার। ভারি মুরোদ ওঁর তাই—

আচমকা অন্ধকার থেকে একটা লোক ছুটে এসে অঞ্জনদার টুটি টিপে ধরল। হৈ হৈ আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি নির্ম্মলদা প্রাণপণে দু হাত দিয়ে অঞ্জনদার কণ্ঠাটা চেপে ধরেছেন। অন্ধকারে এককোণে কোথায় দাঁড়িয়ে জামা পরছিলেন তিনি, অঞ্জনদা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি।

আমরা হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে ওদের দুজনকে আলাদা করে দেবার আগেই অঞ্জনদা একঝটকায় নির্ম্মলদাকে ঝেড়ে ফেলে ধা করে তাঁর শীর্ণ পাঁজরায় এক ঘুষি চালিয়ে দিলেন। যন্ত্রণায় মুখটা বিকৃত করে বুক চেপে নির্ম্মলদা মাটিতে বসে পড়লেন। অঞ্জনদা সবিক্রমে তখন আস্ফালন সুরু করে দিয়েছেন, আমার সঙ্গে ইয়ার্কি! একটি ঘুষিতে ত্রিভুবন দেখিয়ে দেব, পাজী কোথাকার।

আপাততঃ তাঁর বিক্রম দেখানো বন্ধ রেখে বাইরে যেতে অনুরোধ করলাম অঞ্জনদাকে। অসহ্য! কেন যে লোকটা শুধু শুধু এত লেগেছে নির্ম্মলদার পিছনে!

নির্ম্মলদার কাছে গিয়ে ওঁকে সযত্নে মাটি থেকে তুলে বললাম, চলুন নির্ম্মলদা, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

বুকে হাত চেপে নির্ম্মলদা উঠলেন। হাড়-জিরজিরে পাঁজরা-বের-করা চেহারা। দেখলে মমতা হয়, করুণা জাগে। উঠে দাঁড়িয়ে সামনে চোখ তুলেই নির্ম্মলদা দেখতে পান অঞ্জনদাকে। অমনি তাঁর চোখে আগুন ঠিকরে উঠল। মুখোমুখি দুটি উদ্যতফণা বিষধর ভুজঙ্গ। কুরুক্ষেত্র বাধল বুঝি—

শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

হঠাৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে নির্ম্মলদা অঞ্জনদার দিকে তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, উঃ! বটে, তোর এত সাহস যে তুই আমার গায়ে হাত তুলিস। এই পৈতে ছুঁয়ে শাপ দিচ্ছি অঞ্জন, যদি তিন দিনের ভেতর—

নির্ম্মলদাকে বাধা দিয়ে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে আসতে

আসতে বললাম, কি হচ্ছে নির্মলদা, ছেলেমানুষের মত। চলুন বাড়ী চলুন শীগ্‌গির।

ওদিকে জ্যান্ত মানুষকে মাটিতে পোঁতার আয়োজন চলছে। ওটা দেখে দর্শকদের মনে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয় তা দেখতে উৎসুক ছিলাম। কিন্তু হ'ল না। মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল সেজন্যে। নির্মলদাকে বলে-কয়ে বাইরে আনতে হ'ল।

বাইরে বেরিয়ে অন্ধকারে দুজনে খানিকক্ষণ পাশাপাশি হাঁটলাম নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে ঠাহর হয়, অক্ষমতার লজ্জায় ঘাড় নিচু করে ভারবাহী পশুর মত নির্মলদা নিজের দেহটা টেনে নিয়ে চলেছেন। মানুষের নির্মম ঔদাসীন্য তাঁকে মূক করে দিয়েছে। হয়ত মনে মনে তিনি সারাজীবনের চেষ্টাকে পণ্ডশ্রম বলে ভাবছেন।

হাঁটতে হাঁটতে তাঁর বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম। সুমুখেই একটা চৌমাথা। নির্মলদার কাছে বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আচ্ছা নির্মলদা, আপনি ভেন্‌ট্রিলুকোইজম বলে শেষকালে সেই পুরনো ক্যারিকেচারই দেখালেন কেন? ওরা সবাই অন্য কিছু দেখবে ভেবেছিল—না দেখে চটে গেছে।

অন্ধকারে ভেসে এল নির্মলদার গলা, হাঁরে, তুইসুদ্ধ একথা বলছিস। নতুন কিছু নতুন কিছু করে ক্ষেপিস, নতুন কিছু আসে কোত্থেকে। জীবনে সুখের মুখ ত কখনও দেখলাম না, বৌ-ছেলে-পুলের দানাপানি জোটানোর চিন্তাতেই অস্থির। আমি যা কষ্টে দিন কাটাচ্ছি সে আমিই জানি, আর জানেন স্বয়ং ভগবান। —দু-খানা হাত কপালে ঠেকল কিনা অন্ধকারে দেখতে পেলাম না।

চলে আসব ভাবছি এমন সময় ফস করে খুব কাছে এসে নির্মলদা চুপি চুপি বলতে লাগলেন, আজ বড় আশা করেছিলাম যে, ক্যারিকেচারটা দেখিয়ে দু-চার জনকে এট্রাক্ট করতে পারব। শুনেছিলাম, টাউনে ওরা শীগগির একটা বড় রকমের 'শো'য়ের আয়োজন করছে। মনে আশা ছিল যে, এখানে আজ একটু ভাল করে দেখাব। যদি তা হলে ওরা খুশী হয়ে টাউনের প্রোগ্রামে আমার নামটাও দেয়। এমন টানাটানি চলছে যে আর কি বলব! সামনেই মুটুর পরীক্ষা—আজ পর্য্যন্ত ফি যোগাড় করে উঠতে পারলাম না। অথচ অন্তত: ওটাকে মানুষ করে দিয়ে যাওয়া ত দরকার। পাঁচ সাতটি ছেলেমেয়ে—নিজেরও চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর হ'ল। আজ যদি চোখ বুজি, কে দেখবে ওদের? কি করব বল—বিধি বাম। সবই আমার ভাগ্যের—সবই আমার ভাগ্য। নইলে এই লোকঠকানো ব্যবসায়ে নামতে হবে কেন শেষ পর্য্যন্ত।

কান্নায় ভেজা গলা—আর বলতে পারলেন না। চুপ করে গেলেন নির্মলদা। থমথম করতে লাগল নিস্তব্ধ রাত। হঠাৎ কি যে হ'ল—পকেটে চ্যারিটি শোয়ের টিকিট বিক্রির টাকা ছিল কিছু—ফস করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোটে খুচরোতে মিলিয়ে একমুঠো টাকা নির্মলদার হাতে গুজে দিয়ে বললাম, মুটুর ফি জমা দেবেন—বলেই ফিরলাম। আর দাঁড়ালাম না। টাকা দেবার সময় স্পষ্ট মনে হ'ল, নির্মলদার হাত কাঁপছে। অযাচিত অনুগ্রহের ভার সহ্য করতে পারছিলেন না বোধ হয়।

দ্রুতপদে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম, চ্যারিটি ফণ্ডের তহবিল ভেঙে ফেলেছি, কড়াক্রান্তিতে গুনে গুনে সব টাকা ফেরত দিতে হবে নিজের ট্যাক থেকে। হয় ত এজন্যে কৈফিয়ত দিতে হবে, হয়ত দু-চারটে নিজস্ব খরচ কাট-ছাট করতে হবে—তবু—তবু যেন মনটা কোন অজানা খুশির আমেজে ভরে রইল। অন্তত: একটিবারের জন্য ত নির্মলদার মুখ থেকে সত্যি কথা শুনতে পেয়েছি, তাঁর আসল রূপটি দেখতে পেয়েছি।

আকাশের ডাক

শ্রীপ্রভাকর মাঝি

তোমাদের এক ফোঁটা ঘরে
আকাশ দেখেছো কোন খানে?
বদলিয়ে যাবে তক্ষুণি
জগতের, জীবনের মানে।

ঝাপসা কুয়াসা নেই চোখে
সবুজ, সবুজ সব রঙ।
সারা মুখে স্বপ্ন ও সাধ—
প্রাণে বাজে গৌড়-সারঙ।

দুঃখটা বড়ো কিছু নয়,
শেষ আছে সব তমসার।
বুঝবে সেদিন প্রাণে প্রাণে,
জীবনটা ভালবাসবার।

প্রতিদিনকার অবসাদ,
খেদে আর ক্লেদে ভরা মন।
ফুৎকারে ফুরাবেই জানি,
আসবে, হাসবে যৌবন।

শোন যদি আকাশের ডাক,
এই তুমি হলে মৈনাক।

পান্থনিবাস, দীঘাঘাট

দীঘা সমুদ্রতটে সাত দিন
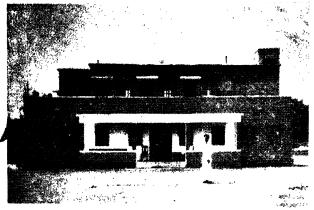
শ্রীকালীপদ গঙ্গোপাধ্যায়

কিছুকাল যাবৎ দীঘার সমুদ্রতটের চমকপ্রদ বর্ণনা সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায় ও লোকমুখে অবগত হইয়া আসিতেছিলাম। এবার জুনের শেষার্দ্ধে সাত দিনের জন্য দীঘায় অবস্থান করিয়া আসিলাম।

পথের দুর্গমতা, আশ্রয়স্থানের অনিশ্চয়তা, সর্ব্বোপরি বাঙালীসুলভ জড়তার বাধা ঠেলিয়া যাঁহারা এত নিকটের আনন্দটুকুর আস্বাদ হইতে এত দিন বঞ্চিত রহিয়াছেন তাঁহাদের জন্যই বিশেষ করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটির অবতারণা।

সাগরতীর স্বাস্থ্যকর ও আনন্দদায়ক। এত দিন আমরা পুরীর সমুদ্রতটকেই নিকটতম ও সহজলভ্য মনে করিয়া আসিয়াছি। পুরীতে 'রথদেখা ও কলাবেচা' একসঙ্গে সম্পাদিত হয়। সমুদ্র-উপভোগের সঙ্গে জগন্নাথদর্শনও ঘটে। প্রাচীন স্থাপত্যশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পুরী ও তৎ-সন্নিকটস্থ মন্দিরসমূহ। পুরী জনবহুল প্রাচীন শহর; বাস-স্থান আহারবিহারের অসুবিধা এখানে নাই। কাজেই পুরীই এত দিন আমাদের মনোরাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে। পুরী হাওড়া হইতে সাড়ে তিনশ' মাইল দূরে—পুরী এক্স-প্রেসে সাড়ে বারো ঘণ্টার অর্থাৎ এক রাত্রির পরিক্রমা।

অপর পক্ষে দীঘার সমুদ্রতট হাওড়া হইতে দেড়শ' মাইল মাত্র। ইহার অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিতে হয় বাসে; মোট সময় লাগে নয়-দশ ঘণ্টা মাত্র। দীঘা পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমায় অবস্থিত। কাঁথি শহর হইতে ইহার দূরত্ব কুড়ি মাইল।

দীঘার একমাত্র উপভোগ্য ইহার সমুদ্রতট। তাহার বর্ণনাটাই আগে সারিয়া লইব। পুরীর সমুদ্রতটের সহিত ইহার পার্থক্য আছে। এখানে পুরীর মত আর দশটা দর্শনীয় স্থান নাই। সমুদ্রস্নান ও সাগরসৈকতে বিচরণই এখানে একমাত্র উপভোগ্যের বিষয় এবং সেদিক দিয়া ইহার গৌরব অতুলনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

পুরীর বালুকাময় সৈকতভূমির গড়ান বড় বেশী। তট-ভূমির দৈর্ঘ্যও তিন-চার মাইলের অধিক নহে, স্থানে স্থানে দুর্গমও বটে। এখানকার তটভূমি দৈর্ঘ্যে বারো মাইল। বাংলার সীমানার মধ্যে আট মাইল ও বাকী চার মাইল উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত সুবর্ণরেখার মুখ পর্য্যন্ত। তটভূমির উপরিভাগ এত দৃঢ় ও সমতল যে, যাত্রীপূর্ণ একখানি বাস অক্লেশে এই বারো মাইল পথ অতিক্রম করিতে পারে। ছোটখাটো বিমানও এখানে মাঝে মাঝে অবতরণ করিয়া থাকে। তটের বিস্তৃতি এখন দেখিলাম দুই শত হাতের কম নহে, ভাঁটার সময় আরও বেশী।

সূক্ষ্ম বালুকণায় রচিত হওয়ায় এই তটভূমি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ; ইহার উপর সঞ্চরমাণ মূর্ত্তিগুলির প্রতিবিম্ব অধো-দিকে প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

তটভূমির গড়ান কম হওয়ার দরুন জলে নামিয়া পঞ্চাশ

ঘাট হাত গেলেও বুক-জল হয় না। পুরীর অপেক্ষাতরঙ্গের প্রচণ্ডতা এখানে অল্প। এজন্য শিশুগণও জলে নামিয়া সাঁতার কাটিতে ভীত হয় না। সমুদ্রজল অপেক্ষাকৃত ঘোলা। এই বিশাল সমুদ্রের বিস্তীর্ণ ও সুদীর্ঘ তটভূমি এখনও প্রায় জনমানবশূন্য। সমুদ্রতটে কোন নগরই এখনও গড়িয়া উঠে নাই ; গ্রাম ও জনপদগুলি দূরে দূরে অবস্থিত। দুই-চারিটি ধীবর জাল লইয়া মাছ ধরিতে নামে।

যিনি কলিকাতার কর্ম্মকোলাহল ও উত্তাপের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে দুই চার দিনের জন্যও বিশ্রাম কামনা করেন, এই সাগরতটে আসিয়া বসুন তিনি, ইহার গর্জ্জনমুখর—নির্জ্জন নিস্তব্ধতা তাঁহার সমগ্র সত্তাকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে !

বালুকা-দর্পণ

এইবার তীরের উপরে উঠিতে হইবে। কাঁথি রাজপথটি বরাবর সমুদ্রতটে নামিয়া গিয়াছে। সমুদ্রের কাছে দুই শত হাত দূর হইতে অপর একটি শাখা—সমুদ্রের সমান্তরাল ভাবে—পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। এই ফোরশোর রোডটির নির্ম্মাণ-কার্য্য আধ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে মাত্র এবং কাল-ক্রমে এই অংশটাই দীঘা সমুদ্রতট-কেন্দ্রে পরিণত হইবে। বাংলা সরকার তটপ্রান্তে একটি জনপদ বসাইবার পরিকল্পনা লইয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। সরকার এই ফোরশোর রোডের বামপার্শ্বে দুইটি সরকারী কাফেটেরিয়া বা পান্থনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। এখানে সুষ্ঠুভাবে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। বাসগুলি যাত্রী লইয়া এই পান্থনিবাসের হাতার ধারেই নামাইয়া দেয়। পান্থনিবাসের দুইটি বাড়ীই দ্বিতল। প্রথমটিতে পনর-ষোল জন এবং দ্বিতীয়টিতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন যাত্রীর স্থানসঙ্কুলান হয়। উভয় হোটেলের রন্ধন ও আহার-ব্যবস্থা এখনও প্রথমটিতেই চলিতেছে। এই খণ্ডে আরও দু'চারটি বাড়ী উঠিয়াছে—ভদ্রলোকদের ব্যক্তি-গত ভবন। ইহার একটিতে বর্ত্তমানে বিদ্যুৎ-সরবরাহের আপিস বসিয়াছে। গৃহস্বামীর অনুমতি লইয়া এই দুই-তিনটি বাড়ীতে যাত্রীরা মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তবে রন্ধনাদির ব্যবস্থা নিজেদেরই করিয়া লইতে হয়। আহার্য্য দ্রব্যাদি যাত্রীদের পক্ষে সংগ্রহ করিয়া লওয়া এখনও সুসাধ্য হয় নাই—যেহেতু বাজারহাট ও দোকানপাট তেমন কিছু গড়িয়া উঠে নাই।
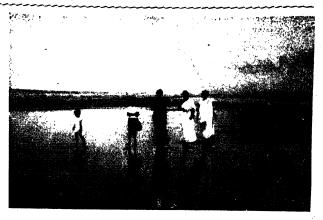
রাস্তার অপর পারে সারদা বোর্ডিং নামে আর একটি হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। বেসরকারী বন্দোবস্ত। চব্বিশ-পঁচিশ জন যাত্রীর আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এখানে আছে।

রাস্তার উত্তর পার্শ্বে কয়েকটি বাড়ী আছে—প্রসিদ্ধ জুয়েলার হ্যামিলটন কোম্পানীর অংশীদার স্মিথ সাহেবের সুদৃশ্য বাড়ী, নাড়াজোল রাজার বাগানবাড়ী, ঝাড়গ্রামের রাজবাটী, শাসমলদের বাড়ী, একটি সরকারী ইনস্পেকশন বাংলো, ডেভেলপমেণ্ট অফিসারের বাড়ী, বনবিভাগের কর্ম্ম-চারীদের বাড়ী। বাড়ীগুলি ঝাউবন দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বাড়ীগুলিতে যাত্রী থাকিবার কোন ব্যবস্থা নাই।

চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলির অধিবাসী শুনিলাম পাঁচ হাজারের কম নহে ; অধিকাংশ কৃষিজীবী ও ব্যবসায়ী ; অল্পসংখ্যক ধীবর।

যাত্রীসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, পরে আরও দুই-একটি সুলভ প্রাইভেট হোটেল গড়িয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থায়ী বাসিন্দা না থাকিলে বড় নগর গড়িয়া উঠে না, এখানে কিছু কিছু সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপন কর্তৃপক্ষের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত।

সরকারী পান্থনিবাসে দু'বেলা আহার, সকালে ও বৈকালে চা এবং জলখাবারের ব্যবস্থা আছে। ঘরগুলির সঙ্গে স্নানাগার আছে, স্যানিটারী পায়খানা ও স্নানের জন্য 'শাওয়ার বাথ'-এরও ব্যবস্থা আছে ;—এখানে বর্ত্তমানে মাথাপিছু দৈনিক সীট ভাড়া তিন টাকা ও দুই টাকা এবং আহার ও জলযোগের দরুন তিন টাকা চার আনা। কলিকাতার তুলনায় আহার এবং জলযোগের চার্জ্জ অধিক নহে বরং কমই। নূতন ২নং পান্থনিবাসে রন্ধন আরম্ভ হইলে উভয়বিধ ভাড়া কমাইবার কল্পনা আছে শুনিলাম। মাছ, তরকারী, ডিম ইত্যাদি বাসে কাঁথি হইতে বর্ত্তমানে আনা হইতেছে।

যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে একটি ছোট বাজার বসাইবার কল্পনা কর্ত্তৃপক্ষের আছে।

বেসরকারী সারদা বোর্ডিঙে জনপ্রতি সীটভাড়া দৈনিক এক টাকা, দু'বেলা আহার দুই টাকা; চা ও জলখাবার আলাদা।

হাটবাজার ও ভাল দুই-একটি দোকানের অভাবের কথা বলিয়াছি। আর একটি গুরুতর অভাব একজন সুযোগ্য ডাক্তারের। ছোটখাটো একটি চিকিৎসালয় এবং তৎসংলগ্ন দুইটি বেডযুক্ত হাসপাতাল একজন এম-বি ডাক্তারের পরিচালনায় স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন।

সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতেছি।

খড়্গপুর থেকে কনটাই রোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত তেইশ মাইল ভাল রাস্তা আছে। কনটাই রোড হইতে কাঁথি শহর পঁয়ত্রিশ মাইল, তথা হইতে দীঘা আরও কুড়ি মাইল। এই রাস্তাটি নবনির্ম্মিত এবং সুসম ও সুদৃশ্য। রাস্তায় যানবাহনের ভিড় নাই, বাসগুলিও নূতন।

পুরী প্যাসেঞ্জার হাওড়া হইতে রাত্রি সাড়ে দশটায় ছাড়ে এবং কনটাই রোডে পৌঁছে ভোরবেলায়। তখনই দীঘার বাস ছাড়িয়া দেয়।

ভাড়ার তালিকা নিম্নরূপ :

হাওড়া হইতে কনটাই রোড (প্যাসেঞ্জার)—

প্রথম শ্রেণী—৯৲৯

দ্বিতীয় শ্রেণী—৪॥৵৯

তৃতীয় শ্রেণী—২৷৶৯

কনটাই রোড-দীঘা বাস ভাড়া—২॥৴৹

খড়্গপুর-দীঘা " " —৩॥৴৹

ফিরিবার দিন দীঘা হইতে ভোরে বাসে চড়িয়া খড়্গপুরে সাড়ে নয়টার মধ্যে পৌঁছিয়া মান্দ্রাজ মেল ধরাই সুবিধাজনক। যদি লেট' না হয় তবে উহা বারোটা-সাড়ে বারোটার মধ্যে হাওড়ায় পৌঁছে।

যাত্রীদের আশঙ্কা থাকে—কনটাই রোডে বাসে যদি স্থানাভাব ঘটে অথবা দীর্ঘ পথ দাঁড়াইয়া কাটাইতে হয়। এ জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন—দীঘাযাত্রীর জন্য সম্মুখের দুইখানি বেঞ্চ প্রথমে রিজার্ভ রাখা। পরে যাত্রীর সংখ্যানুসারে অন্যদের বসাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

দীঘা পান্থনিবাসের ম্যানেজারের নামে (পোঃ আঃ—দীঘা) পূর্ব্বাহ্ণে একখানি কার্ড লিখিয়া রাখা নিরাপদ।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ এবং শিক্ষকগণ দুই-এক দিনের ছুটিতেও এখানে আসিতে পারেন। পূজার ছুটিতে এখানে আবহাওয়া ভাল থাকে।

দীঘা-পরিকল্পনা অভিনন্দিত হইবার যোগ্য। বাঙালীর ঘরের কাছে এমন একটি সমুদ্রতট তাহার শরীর ও মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। কি প্রণালীতে কাজ চালাইলে এখানে সহজগম্য ও আরামপ্রদ একটি জনপদ দ্রুত গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার নির্দ্ধারণ ও রূপদানের ভার একটি সুনির্ব্বাচিত কমিটির হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য।

একদা শ্রাবণে কবি

আ. ন. ম. রজলুর রশীদ

শালবীথি পিয়ালের বনে বনে এসেছে শ্রাবণ,
বর্ষণমুখর রাত, কেয়া ফোটে, আবেগ-স্পন্দন
কেলি-কদম্বের ফুলে, পথে পথে সোহাগী লতায়
এই তৃণে, সমুদ্রের বাষ্প-ঘন মেঘের কণায়।
মর্ত্ত্যের মাটিতে মেশে আকাশ ও সাগরের নীল,
সুরে সুরে ভরে যায় গানে গানে সমস্ত নিখিল,
ঝরো ঝরো—আজ শুধু ঝরে-যাওয়া আনন্দে কথন,
গন্ধ নিয়ে রসাবিষ্ট বকুলের ফুলের মতন।
আহা সে ত মৃত্যু নয় জীবনের পূর্ণতা পরম—
পরিণতি তার বুকে, সুন্দরকে জানি প্রিয়তম
তোমায় আমায় বলে। এই বেলাবুকে তারো আছে
অবিরাম স্পর্শ তার—আহা সে যে খুব কাছে কাছে
থাকে তবু কত দূরে। এই যে নিকটে তবু কেন
ব্যবধান দুস্তর, বার বার মনে হয় যেন
নাগালের বাহিরে সে চিরদিন, দেয় না ত ধরা
ছায়া ও ছবিতে দৃশ্যে রূপে রসে প্রলোভিত করা
শুধু তার সম্মোহন। সব ভুলে তবু মনে হয়,
একদা শ্রাবণে কবি বর্ষণের আবেশে বাঙ্ময়
হয়েছে, হৃদয়-মন ব্যাকুলিত এক মুহূর্ত্তেই
যাত্রা সুরু। আমি আছি, ভারমুক্ত সে এখানে নেই।
আহা নেই? তবু আছে মনে ভাবি এই উদীচীতে,
চোখের বিস্ময় তার লেগে আছে শাল-মঞ্জরীতে
ছাতিমের পত্রজালে—দেখা যায় দিক-চক্রবাল
উত্তরায়ণের খোলা বাতায়ন-পথে মহাকাল
স্তব্ধ হয়ে যায় সীমা, তারপর অতীত সে জন
ইশারা মেলিয়া দেয়। পাখা মেলে উড়ে যায় মন
তৃণ থেকে তারালোকে, সে যে কোন দিগন্ত-সন্ধ্যায়
মরাল ধরেছে পাড়ি, আকুলতা দুইটি ডানায়-
এ চলার শেষ কবে? মৃত্যু নাই, সে যে শুধু বায়-
প্রান্তে তার প্রসারিত বিহঙ্গের মুক্তি অভিসার।

লেখক কর্ত্তৃক অতিথিবৃন্দকে স্বাগত সম্ভাষণ

বন-মহোৎসব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত জুলাই মাসে প্রত্যেক রাষ্ট্রে অষ্টম-বার্ষিকী "বন-মহোৎসবে"র সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল ; অবশ্য শহরের উপরেই সাড়াটা যত বেশী ছিল, পল্লী অঞ্চলে ততটা ছিল না। এই কথা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। আমার গ্রামের (হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রাম) দৃষ্টান্ত দিতে পারি। অথচ ১৯৫১ সনের ২৪শে জুলাই এই গ্রামেই পশ্চিমবঙ্গের প্রথম "ভূমি-সেনানী"র দল গঠিত হইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে সেই দিনই অতি জাঁকজমকের সহিত "বন-মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৎস্য-মন্ত্রী শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রমুখ বহু গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং বহু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত বাঁধের উপর এক শত বাবলা-গাছের চারা রোপণ করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সরকার কর্ত্তৃক চলচ্চিত্র গৃহীত হইয়াছিল। পরে শহরের এবং পল্লী অঞ্চলের বহু প্রেক্ষাগৃহে এই চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় ; গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী এবং কোদাল হস্তে নব-গঠিত ভূমি-সেনানী দলের মধ্যে লেখকও একজন সেনানী হিসাবে ছিলেন। একশত কোদাল একশত ভূমি-সেনানীকে সরকার কর্ত্তৃক বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয় প্রত্যেক ভূমি-সেনানীকে একটি করিয়া 'ব্যাজ' নিজ হস্তে পরাইয়া দেন। সেদিন গ্রামের যুবকগণের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতিপথে এখনও উজ্জ্বল হইয়া আছে। নবগঠিত ভূমি-সেনানী দলের স্কন্ধে রক্ষিত কোদালসহ অভিযানের দৃশ্যটি এখনও মনে আছে। চলচ্চিত্র হয়ত এখনও আছে, স্থানে স্থানে প্রেক্ষাগৃহে হয়ত উহা আজও দেখানো হইতেছে, কিন্তু আমার গ্রামের সেই বাঁধের উপর সেদিনকার রোপিত একটিও বাবলাগাছের চারা আজ জীবিত নাই। বাঁধ পুনরায় জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভূমি-সেনানীরও অস্তিত্ব নাই। কোদাল-গুলি "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" গেল। আমার গ্রামে এ বৎসর "বন-মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হয় নাই, তবে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্ত্তৃক দুই-একটি বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া, গ্রামের জনসাধারণ বর্ষার সময় চিরাচরিত প্রথায় যেমন প্রতি বৎসর দুই-একটা গাছ রোপণ করেন, সেই রকম ভাবেই বৃক্ষ-রোপণ করিয়াছেন। বন-মহোৎসবের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য নিহিত আছে, সেই উদ্দেশ্য লইয়া কেহ কোন বৃক্ষ রোপণ করেন নাই।

উপরের কথাগুলি হয়ত অবাস্তব, কিন্তু রূঢ় সত্য। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে বন-মহোৎসবের উদ্দেশ্য এখনও ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় নাই এবং তাঁহারা এখনও বন-মহোৎসবের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

উৎসবান্তে মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীগণ

নূতন বসতি স্থাপনের জন্য বন, জঙ্গল, গাছপালা প্রভৃতির উচ্ছেদ করিতেছি, কিন্তু ইহাদের স্থানে নূতন বন, নূতন জঙ্গল, নূতন গাছপালার সৃষ্টি করিতেছি না। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইহার অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া শান্তিনিকেতনে "বৃক্ষ রোপণ" উৎসব প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় করে নিলে। অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়া-বস্ত্র হরণ করে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে, তাতে তার বাতাসকে করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটির উর্ব্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব করে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্য্যাবর্ত্ত আজ তাই খর সূর্য্যতাপে দুঃসহ। এই কথা মনে রেখে কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা যে অনুষ্ঠান করেছিলাম সে হচ্ছে 'বৃক্ষ-রোপণ।' অপব্যয়ী সন্তান কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত মাতৃ-ভাণ্ডার পূরণ করবার কল্যাণ-উৎসব।"

জনসাধারণকে এখনও তেমন ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই যে, ইহার পশ্চাতে কবি-কল্পনার কোন ধূম্রজাল নাই, ইহা কেবল একটি দর্শনীয় উৎসব মাত্র নহে। ইহা ভূমি-সংস্কারের একটি সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা। জনসাধারণ এখনও কি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে বৃক্ষের অভাবে বর্ষার অভাব ঘটিয়াছে, বন্যার প্রবলতা বাড়িয়াছে, জমির উর্ব্বরতা-শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, জমির ক্ষয় ও ধ্বংস বৃদ্ধি পাইতেছে, জ্বালানি, ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত কাঠের অনটন উপস্থিত হইয়াছে, ফলের অভাবে দেহের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই সকল সহজ সত্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করিবার জন্য সরকারী বা বেসরকারী কোন পরিকল্পনা অদ্যাবধি ব্যাপকভাবে অবলম্বিত হয় নাই।

শ্রীমুন্সীর কথায় বলি ভূমিক্ষয়ের করাল গ্রাস-হেতু একদিন যে অঞ্চল ছায়াশীতল ছিল আজ সেখানে ১১০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত তাপমাত্রা উঠিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি গোবর্দ্ধন, বৃন্দাবন, মধুবন প্রভৃতি আজ আর কুঞ্জকাননে আচ্ছাদিত নাই। একদিন যেখানে কদম্বফুলের সমারোহ ছিল আজ সেখানে একগুচ্ছ দূর্ব্বাঘাস জন্মায় কিনা সন্দেহ। পঞ্জাব হইতে আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত শিবালিক পর্ব্বত আজ বৃক্ষলতাশূন্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসিয়া প্রেম-পত্র রচনা করিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর কুলু উপত্যকার নূরপুরে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আজ তাহা রুক্ষ পর্ব্বত-গাত্র মাত্র। মনোরম নীলগিরি পর্ব্বত নগ্ন হইয়া পড়িতেছে। কুমায়ুনের নিকট হিমালয় পর্ব্বতে ভূমিক্ষয় সুরু হইয়াছে। এইরূপ আরও বহু স্থানের ভূমিক্ষয়ের উদাহরণ দেওয়া যায়। সমতল প্রদেশের বহু স্থানেও ভূমিক্ষয় নিঃশব্দে চলিতেছে। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা বৃক্ষলতাদি বেপরোয়া ভাবে বিনষ্ট করিয়া চলিতেছি। আমরা খাদ্যের সন্ধানে পশুচারণভূমি ও বন নির্ম্মূল করিয়া কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিতেছি, আমরা

আমাদের দেশের প্রত্যেক নর-নারীকে, যুবক-যুবতীকে, ছাত্র-ছাত্রীকে এই কল্যাণ-উৎসবের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিতে হইবে—এই কল্যাণ-উৎসবে—তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। গাছ হইতে জল, জল হইতে খাদ্য, খাদ্য হইতে জীবন—ইহার প্রতিটি শব্দ সত্য। অগ্নিপুরাণে আছে—একটি পুকুর দশটি কুয়ার সমান, দশটি পুকুর একটি পুত্রের সমান, দশটি পুত্র একটি গাছের সমান। ইহাই আমাদের জীবন-দর্শন—ইহাকে পুনরায় ছায়াশীতল মাটিতে নূতন করিয়া রচনা করিতে হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক—তাঁহাদের মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যতের নেতা-নেত্রী, সমাজ-সংস্কারক, শাসন-কর্ত্তা প্রভৃতি অঙ্কুর অবস্থায় আছেন। এই অঙ্কুরকে প্রস্ফুটিত করিতে হইবে, মহীরুহে পরিণত করিতে হইবে। বৃক্ষ রোপণের কল্যাণ-

উৎসব মণ্ডপ

উৎসবকে তাঁহাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইবে। প্রত্যেক শিক্ষালয়ে ইহার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই অনুষ্ঠান সপ্তাহব্যাপী চলিবে। শহরে সম্ভব না হইলেও পল্লী অঞ্চলের প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নেতৃত্বে প্রত্যেক ছাত্র প্রতি বৎসর যদি একটি করিয়া বৃক্ষরোপণ করে তবে অদূর ভবিষ্যতে পল্লী অঞ্চল পুনরায় তরুলতায় পরিপূর্ণ হইয়া ছায়া-শীতল হইবে, জমির ক্ষয় নিবারিত হইবে, কৃষির প্রভূত উন্নতিসাধন হইবে—ফলফুলে, গ্রামাঞ্চল সুশোভিত হইবে, দেশের শ্রী ও সৌন্দর্য্য পুনরায় ফিরিয়া আসিবে—দেশ আবার সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইবে।

শ্রীমতী মনোরমা বসুর নেতৃত্বে বৃক্ষরোপণ

আমি যে কয়টি বিদ্যালয়ের সহিত জড়িত আছি, প্রত্যেকটিতেই "বন-মহোৎসব" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদ্যালয়ে এইরূপ অনুষ্ঠানের অপর একটি দিক আছে, আজকালকার দিনে তাহার গুরুত্বও কম নহে। এইরূপ অনুষ্ঠানে শিক্ষাবিদ্, অভিভাবক-অভিভাবিকা, শিক্ষিকা ও ছাত্রীগণ পরস্পরের সহিত অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ পান এবং পরস্পরের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সকলের সহিত খোলাখুলি ভাবে বিদ্যালয়ের উন্নতির পথে বাধা, অসুবিধা, অন্তরায় প্রভৃতি আলোচিত হইতে পারে এবং ইহার ফলে ইহার উন্নতি ও সংস্কারের পথ সুগম হয়। গত ২৯শে জুলাই কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এইরূপ একটি শিক্ষাপ্রদ ও মনোরম এবং ভাব গম্ভীর বন মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্ত্রী-শিক্ষা বিভাগের প্রধান পরিদর্শিকা শ্রীমতী মনোরমা বসু, এম, এ (লণ্ডন), এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি অনুষ্ঠানে সরকারী আবরণে আচ্ছাদিত ছিলেন না। উপস্থিত সকলের সঙ্গে, শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহিত বিদ্যালয়ের উন্নতিমূলক বহু বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন—প্রত্যেক শিক্ষিকার সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপন করিয়াছিলেন। একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে "বন-মহোৎসবের" উদ্দেশ্য অতি সহজভাবে ছাত্রী-গণের সম্মুখে তিনি উপস্থাপিত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রীগণ নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"বুদ্ধ ও গান্ধীর দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং বর্দ্ধিত হইয়া আমি এই পবিত্র সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছি যে, স্বদেশের বনসম্পদ ও তথাকার নির্ব্বাক ও অবোধ জীবজন্তুকে অকারণ ও মারাত্মক ধ্বংস হইতে রক্ষা করিব।"

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীদের নৃত্যে ও সঙ্গীতে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল—এবং মনে হইয়াছিল যে তাহারা সত্য সত্যই বন-মহোৎসবে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত হইয়াছে; এই উদ্দীপনা ও উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মাত্র নহে। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিবার পর ছাত্রদের দ্বারা তাঁহারই রচিত "মরু বিজয়ের কেতন উড়াও" "আমরা চাষ করি আনন্দে" (নৃত্য সহযোগে), "নীল অঞ্জন ঘনপুঞ্জ ছায়ায়" (নৃত্য সহযোগে) "ফিরে চল মাটির টানে" গানগুলি গীত হয়। সর্ব্বশেষে "আয় আমাদের অঙ্গনে অতিথি বালক তরুদল" সঙ্গীতের মধ্যে শ্রীমতী মনোরমা বসুর নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের চারা রোপণ করেন। সুষমা বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা মুখোপাধ্যায়, গীতা কুমার, রহমৎ উন্নেসা বেগম ও সবিতা চৌধুরীর গান এবং জয়ন্তী রায়, গোপা দাসগুপ্ত, মীনাক্ষী রায়, সুমিত্রা

শ্রীমতী মনোরমা বসু কর্ত্তৃক একটি নারিকেলচারা রোপণ

মাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রীদের নৃত্য-সঙ্গীত

বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জুশ্রী চৌধুরীর নৃত্য উপস্থিত দর্শকগণকে মুগ্ধ করে। বিদ্যালয়ের সঙ্গীতশিক্ষিকা শ্রীমতী ইন্দুলেখা মিত্র, বি-এ "গীতভারতীর" তত্ত্বাবধানে নৃত্যসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী কল্পনা মিত্র, এম-এ, বি-টি কবিদ, শ্রীমতী হর্ষওইন, বি, এ ও তাঁহাদের সহকর্মিণীগণ কর্তৃক অনুষ্ঠানটি কেবল যে অতি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল তাহা নিয়ে উহা প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কেবল "বন-মহোৎসব" নহে, আনন্দের মধ্যে শিক্ষাপ্রদ জাতীয়

প্রাথমিক বিভাগের ছাত্রীদের নৃত্য-সঙ্গীত

কল্যাণমূলক এইরূপ অন্যান্য অনুষ্ঠান বিদ্যালয়সমূহে যত বেশী উদ্‌যাপিত হইবে ততই দেশের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। বিদ্যালয়ের এইরূপ অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ বা শিক্ষা-বিভাগের পরিদর্শকগণের যোগদান একান্ত বাঞ্ছনীয়, ইহার ফলে শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রীদের সহিত তাঁহাদের বর্ত্তমান দূরত্ব হ্রাস পাইবে, তাঁহাদের মনে এই ধারণা জন্মিবে যে, পরিদর্শকগণ কেবল বিদ্যালয়সমূহের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধানে আসেন না—তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতেও আসেন। পরিদর্শকগণের পক্ষেও অনেক সুবিধা হইবে—তাঁহারা বিদ্যালয়ের নানা জটিল বিষয় সম্বন্ধে অবহিত হইবেন—এবং অনর্থক চিঠিপত্র, রিপোর্ট প্রভৃতির আদানপ্রদানও হ্রাস পাইবে।

ঘর

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

শহরতলীতে বাড়ী করবার সখ হ'ল লিলির। টালিগঞ্জের ওদিকে শহর যেখানে এসে পাড়াগাঁয়ের গা ছুঁয়েছে সেইখানে তার জায়গা পছন্দ হ'ল। সরু মেটে পথ দিয়ে মোটর কোনমতে চলে, এদিকে-ওদিকে পানাপুকুর, দু'চারখানা একতলা পুরনো বাড়ী, আর সব খোলার ঘর।

অনেকখানি জমির উপর তিনতলা বাড়ী তুলতে লেগে গেছি। মাঝে মাঝে থিয়েটার রোডের বাড়ী থেকে মোটর নিয়ে লিলি আসে দেখতে, হুকুম করে এটা কর সেটা কর। সঙ্গে সঙ্গে তালিম করি তা। দেখতে দেখতে ছবির মত সুন্দর বাড়ী তৈরী হয়ে উঠল, তার সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা টেনিস লন, চারিদিকে লাল সুরকির রাস্তা, পাশে পাশে নামকরা বিলিতী ফুলের গাছ।

লিলি হুকুম করল, 'এক সপ্তাহে আমার বাড়ী টিপটপ চাই, বিজলীর মেসিন বসাও, ফার্নিচার আন, সামনের রবিবারে পার্টি দেব।' তথাস্তু। সাহেব কোম্পানী এসে বিজলীর মেসিন বসাল, চব্বিশ ঘণ্টায় বাড়ীময় আলোর আয়োজন করে চলে গেল, রাশি রাশি আধুনিক আসবাব এল ট্রাকে করে, দাস এল, দাসী এল—শনিবার সন্ধ্যায় লিলি এসে সব দেখে খুশী হয়ে বললে, "বাঃ, আমার মনের মতটি হয়েছে।"

আনন্দে আর গর্বে বুক আমার ফুলে উঠল।

রবিবার ভোর হতে হতেই একখানা দুখানা করে বড় বড় মোটর গাঁয়ের সরু পথে টাল খেতে খেতে এসে নূতন বাড়ীর গেটে ঢুকতে লাগল। সুরু হ'ল লিলির পার্টি। লনে টেনিস খেলা চলল, ড্রয়িং-রুমে পিয়ানো বেজে উঠল, ব্যালকনিতে জমে উঠল গল্প। আমি ব্লাডপ্রেসারের রোগী, বেশী ছুটাছুটি করতে পারি না, আমার চলাফেরার গণ্ডী সঙ্কীর্ণ, কিন্তু লিলির গতি অবাধ, আজ তার নাই একমুহূর্ত সুস্থসুস্ত, সেজেগুজে সুন্দর প্রজাপতিটির মত সে উপর নীচে, এ ঘর ও ঘর অবিরাম উড়ে বেড়াচ্ছে।

সারাদিন চলল উৎসব। সন্ধ্যায় বাড়ীময় জ্বলে উঠল আলো, উজ্জ্বল হয়ে উঠল ঘরদোর, অন্ধকার পাড়াগাঁয়ের মাঝখানে লিলির নূতন বাড়ী ইন্দ্রপুরীর মত ঝলমল করতে লাগল। সন্ধ্যা হতেই যে গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে, হাসি-গল্পের গানবাজনার আওয়াজে আজ তার চোখে ঘুম নাই। অনেক রাতে হেডলাইটের আলোয় গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখীদের চমকে দিয়ে বড় বড় মোটরগুলো একে একে আবার ফিরে গেল শহরে।

ক্লান্ত হয়ে সোফার এক কোণে চুপ করে বসে আছি, শেষ অতিথিকে বিদায় দিয়ে লিলি ছুটে এসে আমার পাশে ঝুপ করে বসে পড়ল। মুখে তার সার্থকতার হাসি। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "ওগো, আমি আজ সত্যিই সুখী।"

লিলির হীরেবসানো দুলে দোল দিয়ে বললাম, "আমিও।"

সকালবেলা ব্যালকনিতে বেতের চেয়ারে বসে আছি, কাঁচা রোদ পড়েছে মাঠে-ঘাটে, গাছে গাছে ডাকছে নানা রকমের চেনা-অচেনা পাখী। মাথায় শাকসবজির বোঝা নিয়ে পথ দিয়ে শহরের দিকে চলেছে দূরগ্রামের মেয়ে, টুং টুং করে ঘণ্টা বাজিয়ে জীর্ণ সাইকেল রিক্শা আসছে এক-আধখানা, টিউবওয়েলের ধারে জল নিতে এসেছে ঘোমটা-দেওয়া গুটিকয়েক বউ। দূরে কোথায় মন্দিরে বাজছে ঘণ্টা। সকালের এই শান্ত মাধুর্য আমার দেহমনকে আচ্ছন্ন করে আনছিল, ভারি ভাল লাগছিল আমার। ভাবছি এ আনন্দ একা উপভোগ করব না, লিলিকে এনে পাশে বসাই, এ বাড়ী তারই কথায় হয়েছে, এ জায়গা সে-ই পছন্দ করেছে —এমন সময় লিলির আওয়াজ পেলাম পেছনে। সামনে এসে সে দাঁড়াল, নীল রঙের শাড়ি পরেছে, মাথায় গুঁজেছে ফুল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে, এমন সময় হেসে লিলি আমার কোলের উপর একখানা চিঠি ফেলে দিয়ে বললে, "দেখ।"

চিঠি তুলে দেখলাম, বললাম, "এ ত তোমার চিঠি, আমার নয়।"

লিলি কাছে এসে বললে, "পড়ে দেখ, এ চিঠি তোমারও।"

পড়লাম, লিখেছে লিলির বন্ধু রেবা, মোটরে তারা আগামী কাল দিল্লী যাচ্ছে, লিলিকেও যেতে হবে, অনেক আগেই কথা দিয়েছে, সেই কথা রাখতে হবে লিলিকে,

তারই এই তাগিদ। বললাম, "এ খবর ত আমি জানতাম না।"

লিলি হেসে বললে, "তুমি আপত্তি করবে না জেনে তোমার হয়ে আমিই কথা দিয়েছিলাম। কালকেই যেতে হবে, অতএব প্রস্তুত হও।"

আমি বললাম, "না গেলেই কি নয় ?"

মাথা নেড়ে লিলি বললে, "না।"

দোল খেয়ে তার হীরেবসানো দুল ঝকমক করে উঠল। ভীত হয়ে পড়লাম, বললাম, "কাজ রয়েছে অনেক, তা ছাড়া ব্লাডপ্রেসার— ।"

"সঙ্গে ভাল ডাক্তার যাচ্ছে, রেবার স্বামী, ভয় নেই তোমার।" বলল লিলি।

ভরসা বিশেষ পেলাম না, বললাম, "আমি বোধ হয় যেতে পারব না, তুমি যখন কথা দিয়েছ তখন তুমি যাও।"

শক্ত মেয়ে লিলি, দমে যাবার পাত্রী নয়, তার মনস্থির করতে আমার মত দীর্ঘ সময় লাগে না, বললে, "তা হলে আমিই যাব।"

বললাম, "তাই যাও, নতুন গাড়ীটা নিয়ে যাও।"

মাথা নাড়ল লিলি। একটা মোটা টাকার চেক সই করে দিলাম তার হাতে।

লিলি বললে, "থিয়েটার রোডে চলে যাও, একা থেকো না এখানে।"

বললাম, "কয়েকটা দিন এখানেই থাকব, অসুবিধে হবে না।"

লিলি বললে, "সাবধানে থেকো।" তার পরে গাড়ী হাঁকিয়ে কলকাতার দিকে চলে গেল।

নিরিবিলি দিন কেটে যায় একটি-দুটি করে। তেতলার ঘরে জানালার পাশে সারাদিন বসে থাকি চুপ করে। গ্রামের সহজ জীবনধারা বয়ে যায় মন্থরগতিতে। আমার ব্যস্ত শহুরে মন ধীরে ধীরে তন্দ্রাতুর হয়ে ওঠে। একদিন সকালবেলা দেখি পাশের পানপুকুরের ওপারে গুটি-দুই লোক একবোঝা বাঁশ আর বাখারি নিয়ে কি যেন একটা কাজে লেগেছে। সারাদিন ধরে বাঁশ কাটাকুটি আর মাপজোখ চলে তাদের।

পরদিন সকালবেলা দেখি আবার তারা কাজে লেগেছে। বসে বসে দেখি। একটা-দুটো করে খুঁটি পোঁতা হয় মাটিতে, বাঁশ বাঁধা হয় তাদের মাথায় মাথায়, তার উপরে তুলে দেওয়া হয় বাঁশের চালা। এতক্ষণে বুঝতে পারি ওরা ঘর বাঁধছে। আশ্চর্য ব্যাপার—তিন দিনে ওরা বেঁধে ফেলল ঘরখানা। তার পরে এল টালি, ছাওয়া হ'ল দুটি ছোট্ট চাল আর সামনের আরও ছোট্ট বারান্দা। এ যেন মানুষের বাড়ী নয়, তৈরী হ'ল খেলাঘর, ওর মধ্যে থাকবে পুতুল।

দু'দিন আর কাউকে দেখলাম না ওখানে, তিন দিনের দিন সকালবেলা জানালা খুলে ওদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম—বাড়ীতে যে লোক এসেছে। আঙিনায় ঘুরছে একটি বউ, পরনে লালপেড়ে শাড়ি, সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে। বসে বসে দেখি সারাদিন বউটির কাজের অন্ত নেই—পানাপুকুর থেকে কলসী করে জল আনছে, কখনো মাটি আনছে, কখনও ঘরের বেড়ায় মাটি দিচ্ছে। মেয়েটি মায়ের কাজে যোগান দিয়ে চলেছে অক্লান্ত ভাবে।

বিকেলের দিকে দেখলাম গৃহকর্তাটিকে, লম্বা রোগা মানুষ, হাতে একটা থলে নিয়ে বাড়ী ফিরল কাজের শেষে। গরীব মানুষ, হয়ত কম মাইনের কেরানী, হয়ত আরও এক ধাপ নীচের, ময়লা জামাকাপড়, পায়ে ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। বউটি এগিয়ে এসে হাত থেকে নামিয়ে নিল থলেটি, কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেমেয়ে। গায়ের জামাটা খুলে মেয়ের হাতে দিয়ে সে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল, তার পরে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আজ সন্ধ্যায় আলো জ্বলল ওদের ঘরে। বিজলীর আলো নয়, মাটির ঘরে মাটির প্রদীপ। দরজায় কপাট বসে নি তখনও, কপাটের জায়গায় ঝুলছে একটুকরো ছেঁড়া ক্যাম্বিশ, সিনেমার বিজ্ঞাপনের ছবি তাতে আঁকা।

দিল্লী থেকে পেলাম লিলির চিঠি, নিরাপদে পৌঁছে গেছে, লিখেছে থাকবে সেখানে কয়েকদিন, তার পরে ফেরবার পথে বিহার প্রদেশটা পরিক্রমণ করবে। অবশেষে লিখেছে, আমাকে সাবধানে থাকতে। চিঠির জবাব দিলাম, সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম আর একখানা চেক।

খুব ভোরে ধোঁয়া ওঠে খেলাঘরের উপরে, আন্দাজ করি বউটি রান্না সুরু করেছে। গাছের মাথা ছাড়িয়ে সূর্য উপরে উঠতে না উঠতে ময়লা জামাকাপড়-পরা রোগা মানুষটি হাতে থলি নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে যায় চলে। তারপরে সারা-দিন বউটি এটা করে সেটা করে, আঙিনা ঝাঁট দেয় ঘাটে গিয়ে কাপড় কাচে, আবার সময় পেলেই বাড়ীর সামনেটা ঘিরে বেড়া বাঁধে। বসে থাকে না একমুহূর্তও। বিকেল বেলা ঘরের কাজ শেষ করে পরে একখানা কাচা শাড়ি, ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়ায় গিয়ে বেড়ার ধারে, চেয়ে থাকে পথের দিকে। গোটাদুই আমগাছ আর কৃষ্ণচূড়া গাছের তলা দিয়ে অনেকটা পথ দেখতে পাওয়া যায়—দূর থেকেই চিনতে পারে থলে হাতে লম্বা মানুষটিকে, মাথার কাপড়টা একটু

টেনে একপা-দু'পা করে এগিয়ে যায়, ছেলেমেয়েরা ছুটে যায় হৈ চৈ করে।

থিয়েটার রোডে এখনও ফিরে গেলাম না। লিলির চিঠি পেয়েছি চুনার থেকে, আমার জন্যে ভারি ভাবনায় আছে। তাকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যে তার করলাম—আমি ভাল আছি।

সকালবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বিকেলে গাছপালা মাঠঘাট বড় সবুজ, বড় পরিচ্ছন্ন মনে হ'ল। তেতলা থেকে নেমে এলাম নীচে, লাল সুরকির রাস্তা ধরে ফটকের পাশে এসে দাঁড়ালাম। পথ জুড়ে গাছের ছায়া পড়েছে, লোক চলছে একটি-দুটি। ফটকে দারোয়ান ছিল না তখন, কোঁচার খুঁটটি গায়ে দিয়ে চটি পায়েই বেরিয়ে এলাম পথে। কৃষ্ণচূড়া ঝরে পড়েছে পথ ছেয়ে, একপা-দু'পা করে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম আমার প্রতিবেশী আসছে লম্বা লম্বা পা ফেলে, হাতে ঝুলছে থলেটা। একটু পরেই সামনা-সামনি হলাম দুজনে, হাত তুলে নমস্কার করলাম। থতমত খেয়ে গেল লোকটি, থলেসমেত হাত তুলে কোনমতে প্রতি-নমস্কার করে অপ্রস্তুতের মত দাঁড়াল। সে জানে আমি মস্ত বড়লোক, দামী সুট পরি, বড় মোটরে চড়ি, দূর থেকে আমাকে বহুবার দেখেছে, কিন্তু এই ভাবে কোঁচার খুঁট গায়ে চটি পায়ে সে কখনও দেখে নি। অবস্থাটা সহজ করবার জন্য হেসে বললাম, "কাজ থেকে ফিরছেন বুঝি ?"

সে বিব্রত ভাবে বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কথা কইতে কইতে ফিরলাম তার সঙ্গে, নজর পড়ল থলেটার উপর, দেখি সেখানে মাথা বের করে আছে একফালি কুমড়ো, এক টুকরো থোড়, একখানা লোহার খুন্তি।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে পড়লাম, বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে-ছিল বউটি, আমাকে দেখে মাথার কাপড় টেনে সরে দাঁড়াল, ছেলেমেয়েরা এসে তাকে ঘিরে "বিস্কুট দাও, বিস্কুট দাও" বলে হৈ চৈ সুরু করল।

"দাঁড়া, দাঁড়া" বলে সে তাদের থামাতে চেষ্টা করল, কিন্তু থামবার পাত্র নয় তারা, একজন ধরল তার হাত, আর একজন আক্রমণ করল তার পকেট। লজ্জিতভাবে একবার আমার দিকে তাকিয়ে লোকটি পকেট থেকে বার করল বিস্কুটের ছোট একটা প্যাকেট, ছেলেটা খপ করে সেটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুট দিল বাড়ীর দিকে।

আমার বাড়ীর ফটকে না ঢুকে কেন যে চললাম পানা-পুকুরের পাশ দিয়ে ওর সঙ্গে এগিয়ে তার কোন কারণ ভেবে পেলাম না। সে যে খুবই আশ্চর্য হয়েছে তা বুঝতে পারলাম। তবু ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকলাম তার আঙিনায়। এইবার সে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে করুণ ভাবে বলে উঠল, "আমি যে গরীব, আমি যে সামান্য লোক, আপনি এলেন আমার বাড়ী, আপনাকে বসাবারও যে আমার যোগ্যতা নেই।"

সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে, রক্তাভ আকাশের গায়ে নারিকেলের গাছগুলো ছবির মত স্থির হয়ে আছে, মাথার উপর দিয়ে ঘরমুখো দুটো একটা পাখী উড়ে যাচ্ছে—আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, "তুমি যে আমার পড়শী, তুমি যে আমার বন্ধু।"

সে ডাকল, "ওগো।"

বউটি এগিয়ে এসে তার হাত থেকে থলেটি নিয়ে গেল, একটু পরে ঘর থেকে নিয়ে এল একখানা ছেঁড়া মাদুর, পরিষ্কার আঙিনার মাঝখানে তা বিছিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে সরে গেল।

লোকটি হাতজোড় করে বললে, "বসুন।"

আমি বসলাম। সে গিয়ে ঘরে ঢুকল, একটু পরে গা খালি করে এসে আমার পাশে বসল। আমি বললাম,"ছবির মত দেখতে আপনার ঘরখানা।"

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসল, তার পর বলল, "এ ত কুঁড়েঘর, ছেলেমেয়ে নিয়ে মাথা গোঁজবার স্থান-টুকু হয়েছে। এ কুঁড়েও কি আমি গড়েছি ? আজ্ঞে না, গড়েছে ঐ আমার স্ত্রী।"

মুহূর্তে মনের পটে বউটির কর্মব্যস্ত ছবি ফুটে উঠল। একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল, "দু'বেলা খাবার জোটাতে পারি না এমনই আমার অবস্থা, এর মধ্যে ও কেমন করে এই ঘর বাঁধবার পয়সা সঞ্চয় করল তা আমি ভেবে পাই না। আশ্চর্য মেয়ে।"

চুপ করে বসে শুনতে লাগলাম। সে বলতে লাগল, "দাদার অমতে ওকে বিয়ে করেছিলাম, তাই দাদা বাড়ীতে থাকবার জায়গা দিল না, রইলাম এক ভাড়া করা চালায়। পাঁচ বছর কেটে গেল সেখানে, কি কষ্টে তা আর কি বলব আপনাকে। একদিন ও বললে, 'একটু জায়গা কিনে নিজের একখানা ঘর কর।' শুনে বললাম, 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার, পরনের কাপড় আর পেটের দুটি অন্ন জোটাতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে—তা ঘর করব কি দিয়ে!' ওর পেটরা থেকে এনে দিল দেড়শ' টাকা আর খুলে দিল একমাত্র গহনা হাতের দু'গাছা চুড়ি।"

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, হঠাৎ দেখলাম সামনে এসে

দাঁড়িয়েছে বৌটি, এক হাতে একটা পেয়ালা আর এক হাতে গেলাস। আমাদের সামনে পাত্র দুটি রেখে সে সরে গেল। লোকটি কুণ্ঠিতভাবে বললে, "আপনাকে চা খেতে বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা, তবু আপনার সামনে কেবল আমাকেই চা দেওয়া অশিষ্টতা হবে তাই আপনার জন্যও এক পেয়ালা নিয়ে এসেছে। আপনি আর নোংরা পেয়ালাটা ছোঁবেন না।" আমি কোন কথাই বললাম না, পেয়ালাটা তুলে নিয়ে চায়ে চুমুক দিলাম।

দূরে মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল। চেয়ে দেখি ঘরের কোণে একটি মাটির প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। ছেলেমেয়ে দুটি বই খুলে বসেছে সেই আলোর সামনে, একপাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের মা, প্রদীপের মলিন আলো তার শীর্ণ মুখখানাকে সুকুমার করে তুলেছে।

চোখ ফিরিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখলাম আলো জ্বলেছে আমার বাড়ীতেও। বিদ্যুতের তীব্র আলোয় বাড়ীখানা ঝলমল করছে। এখনই ফিরতে হবে ওখানে। হঠাৎ মনের ভিতরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল—অত আলো অথচ উষ্ণতা নেই একটুও।

শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।
অশ্রান্ত অবাক্
হৃদয়েরে সাথে নিয়ে বাহিরিয়া এসেছিনু পথে,
বালুকা-ঝিনুকে ভরা সন্ধ্যার সৈকতে।
রাখিতে চাহিয়াছিনু পদচিহ্ন ধরে,
পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে মিশেছে প্রান্তরে।
তবুও অবাক চোখে কতদিন ভোরে
দেখিয়াছি সৌন্দর্যের স্বপন-মৈনাক।
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

দেশে দেশে অনবদ্য যে শীসমহল
গড়িয়াছে শক-হুন তাতারের দল—
পূর্ব আর পশ্চিমের মিলিত সংজ্ঞায়,
বলা যায়
তাহাদেরই পিরামিড, কালো ক্যাথিড্রল।
ময়ূরের পাখা-ছোঁয়া অরণ্য-প্রাচীর
মাঞ্চুরিয়া উপকূলে যেথা আছে স্থির,
সেথায় যাত্রায় মোর আসেনি বিরতি;
বারে বারে জীবনের যত ক্ষয়, ক্ষতি—
গ্রহ হতে গ্রহান্তরে—পার হতে পারে
বহিয়া এনেছে সেই উদ্দাম জোয়ারে—
সব পাপ, সব ক্লেদ বিধ্বংসী বৈশাখ।
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

কোথায় মালয় আর ম্যাডাগাসকর,
নরওয়ের রাত্রিভরা সূর্যরশ্মি শর—
ফিলিপাইনের বনে তাদেরই সংঘাত
ক্রনেনের হ্রদে তোলে ভোর করে রাত।
দ্বীপে দ্বীপে কথা চলে, পাহাড়চূড়ায়
লাইট হাউসের দীপ তারকা উড়ায়।
কথনো সবাক আর কথনো নির্বাক
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

গোবি সাহারার বুকে প্রলয়-আগুন
দেখেছি তাতায়ে তোলে সমুদ্রের নুন।
হাঙরের সাথে পীত মাছের মিতালি।
সফেন কল্লোল রাতে ঢেলে দেয় কালি।
বন্দরে বন্দরে স্বর—আকাশবাণীতে
দিক হতে দিগন্তরে ছোটে চারিভিতে
কেউ বা বাঁচিয়া ফেরে, কেউ কেঁদে ধায়
অশরীরা আত্মা হয়ে সাগর-বেলায়।
অশ্রান্ত উন্মনা সিন্ধুশকুনের দল,—
পাখায় তাদের শ্বেত-বিদ্যুৎ উছল।

তবুও দৃষ্টি ত গেছে সমুদ্রের মাঝ,
মেক্সিকোর অন্ধকারে দু'একটি জাহাজ—
যেথা হতে ধরেছিল আলোর মৌচাক।
শুনেছিনু একদিন সাগরের ডাক।

মানবপ্রেমিক উমেশচন্দ্র

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

মনীষার মহামিলন

এক একটা সময় এমন আসে যাহা নানাভাবে ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল অক্ষরে ছাপ রাখিয়া যায়। ক্ষুদ্র গ্রাম হরিনাভি এমনি এককালে তিন মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া অপার কীর্ত্তি স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছে। যতদিন বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা ভাষা বাঙালীর সমাজকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাদর সম্মান থাকিবে, ততদিন শহর হইতে দূরবর্ত্তী এই গ্রামের উক্ত তিন মহাপুরুষের মিলনের কথা লোকে ভুলিতে পারিবে না। ইঁহাদের মিলনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, মূকবধিরের প্রতি সহৃদয়তা, স্ত্রীশিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম, নির্ভীক সাংবাদিকতা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠান ও মতের বিরাট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। চরিত্রবত্তা, সহৃদয়তা, সত্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ, মানবের প্রতি প্রেম, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি গুণে ইঁহারা বাঙালী জাতিকে উন্নত করিয়া গিয়াছেন।

"ত্রিবেণী"

'হরিনাভি এংলো সংস্কৃত স্কুল' এই ত্রিবেণী সঙ্গমের প্রয়াগ-তীর্থ। শিক্ষাবিস্তারকল্পে প্রাতঃস্মরণীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮৬৬ সনে বর্ত্তমান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি নিজে ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। সোমপ্রকাশ পত্রিকা পরিচালনা, সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা, সাহিত্যরচনার সঙ্গে হরিনাভি স্কুলের প্রতিটি কাজের উপর তাঁহার লক্ষ্য থাকিত।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ১৮২০ সনের এপ্রিল মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আর যে দুই মহাপুরুষকে হরিনাভির কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন তন্মধ্যে প্রথম ৺উমেশচন্দ্র দত্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় অপেক্ষা বিশ বৎসরের ছোট ছিলেন; তাঁহার জন্ম সাল ১৮৪০, ডিসেম্বর। তিনি মজিলপুরের লোক, মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে কয়েক বৎসর হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কার্য্য পরিচালনা করেন। তাঁহার পরে আসেন জয়নগর গ্রামের শিবনাথ শাস্ত্রী, জন্ম ১৮৪৭ সনের জানুয়ারী। ইনি উমেশচন্দ্রের পর হরিনাভি স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক পদ অলঙ্কৃত করেন।

সাধারণ মানুষ

অর্থ, বংশগৌরব, রূপ, স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি কিছুই যাঁহার ছিল না, আজ তাঁহার জন্মের শতাধিক বর্ষ পরেও মানুষ তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে। জীবিতকালে তিনি সহকর্ম্মী ও সমবয়স্কদিগের অকৃত্রিম প্রেম অর্জ্জন করিয়াছেন। ছাত্র-মহলে দেবতার আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার হৃদয়দিতা, সেবা ও যত্নে স্থাপিত এবং পালিত প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য পাইয়া লাভবান হইয়াছে। তিনি সকলের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

উমেশচন্দ্রের জীবনে কোন ঘটনাতেই ধূমধাম হয় নাই। দরিদ্র-ঘরে জন্মলাভ করায় অপর সাধারণ শিশু-জন্মের মত তাঁহার মাতা ও আত্মীয়স্বজন আনন্দলাভ করিয়াছেন মাত্র।

সুরলোকে ডঙ্কা বাজিল কিনা কে জানে; আকাশবাণী, পুষ্পবর্ষণ প্রভৃতি কিছুই হইল না। মজিলপুরের একান্তে অবস্থিত দত্ত-বাড়ীর একটি শাঁখ বাজিয়া প্রতিবেশীদের নিকট তাঁহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিল।

আট বৎসর বয়সে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অভাবের মধ্যে তাঁহার দিন কাটে। শৈশবে ও কৈশোরে উল্লেখযোগ্য বা অসাধারণ কিছুই ঘটে নাই। অপর পাঁচজন কিশোরের মতই তাঁহার পাঠশালা ও বিদ্যালয়ের দিনগুলি কাটিয়া গিয়াছে। লক্ষ্য করিবার মত ঘটনা কিছুই পাওয়া যায় নাই। যাহা দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহা তাঁহার ধীর নম্রস্বভাব, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, তাঁহাদের আদেশ পালনে তৎপরতা। যেখানে ব্যথা, অভাব সেখানে তিনি সহৃদয়তা আর *আত্মিক শক্তি লইয়া আর্ত্তের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ১৮৫৮ সনে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি শিক্ষক ও অপর বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বিস্ময় উৎপাদন করিল।

পাঠের ব্যাঘাত

তাঁহার জীবনে বড় অভাব ছিল স্বাস্থ্য। যৌবনকালেও তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই। ১৮৬০-৬১ সনে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। আশা—চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে বহু লোকের সেবার সুবিধা হইবে; কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই চক্ষু ও শিরঃপীড়ার দরুন তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই দুই উৎপাত তাঁহার চিরসাথী হইয়া বাস করিয়া গিয়াছে। ইহার অনেক দিন পরে, ১৮৬৭ সনে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

মানসিক বল

দেহ দুর্ব্বল হইলেও মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়া তিনি সাধারণ গ্রামবাসী হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। ন্যায় ও সত্য বলিয়া যাহা মনে করিতেন তাহা গ্রহণ করিতেন ও অবিচলিত-চিত্তে তাহা ধরিয়া থাকিতেন। তাই যখন তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি

আস্থা হারাইলেন, নূতন ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোকে তাঁহার মনের অন্ধকার দূর হইবে বলিয়া প্রতীতি হইল, তখন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের উপদেশ, অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া ১৮৫৯ সনে প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সে যুগে পল্লীগ্রামের মধ্যে মজিলপুরের মত দাক্ষিণাত্য-বৈদিকপ্রধান স্থানে বাস করা এক বিরাট দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শিক্ষকজীবন

তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইল শিক্ষকতায়। ১৮৬২ সনে তিনি জয়নগর স্কুলে যোগদান করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার আচরণে, আদর্শে যুবকদের দল আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং তাহা গোঁড়া হিন্দুদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। গ্রামে বাস করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িল। তিনি কলিকাতার ট্রেনিং একাডেমিতে অস্থায়ী শিক্ষকতা গ্রহণপূর্ব্বক করিয়া গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া আসেন। এই সময় হিন্দু-স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ শূন্য হইলে তিনি কিছুদিনের জন্য সেখানে চলিয়া যান।

পল্লীর প্রতি তাঁহার গভীর মমতা ছিল। শহরে শিক্ষার ব্যবস্থা ত আছেই, উপরন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষকেরও বিশেষ অভাব হয় না। কতকটা এই কারণে তিনি দত্তপুকুর নিবাধুই হাইস্কুলে যোগদান করেন। সেখানে প্রচুর সুনাম চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইলে সে-সংবাদ দ্বারকানাথের নিকট পৌঁছিতে বিলম্ব হয় নাই।

হরিনাভি আগমন

তখন রাজপুরে একটি ও অপর একটি বিদ্যালয় হরিনাভিতে ছিল। কাহারও অবস্থা ভাল নয়, যদিও ১৮৬১ সনে রাজপুর এংলো ভার্ণাকুলার স্কুল হইতে একটি ছাত্র (রাইচরণ ঘোষ) এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষার সহায়ক জমিদার গোলকনাথ ঘোষ এবং বাণীর বরপুত্র, বিদ্যানুরাগী, শিক্ষার প্রসারে একাগ্রচিত্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ এই সময় উক্ত বিদ্যালয়ের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। দ্বারকানাথ উমেশচন্দ্রের পরিচয় জানিতেন, ১৮৬৬ সনে তিনি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া উমেশচন্দ্রকে হরিনাভিতে লইয়া আসেন। প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ লইয়া দুই সম্পাদকের মতান্তর হইলে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সতেরটি ছাত্র লইয়া হরিনাভি এংলো সংস্কৃত নামকরণ করিয়া বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভবনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। উমেশচন্দ্র হরিনাভিতে প্রথম অবস্থায় শরৎচন্দ্র দেব মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরে স্কুলভবনে চলিয়া আসেন।

গ্রামের লোকের বিরোধিতা

তখন গ্রামের কতিপয় লোক ব্রাহ্ম উমেশচন্দ্রের প্রতি বিরূপ হইলেন এবং উমেশচন্দ্রকে অপসারণের জন্য বিদ্যাভূষণের উপর বিশেষ চাপ দিতে লাগিলেন। উমেশচন্দ্রের প্রতি ছাত্রদের গভীর অনুরাগই এই আক্রোশের কারণ। শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম্মমতের সহিত ছাত্রদের বা বিদ্যালয়ের স্বার্থহানির কোনও সম্ভাবনা নাই বলিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় সে অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। গ্রামের অনেক লোক এ কারণে উমেশচন্দ্রের উপর বেশ চটিয়া রহিলেন। ১৮৬৮ সনে উত্তরকালে আলিপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (হাইকোর্টের বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ—জাষ্টিস সি, সি, ঘোষের পিতা) প্রধান শিক্ষকের পদ ত্যাগ করিলে উমেশচন্দ্র প্রধান শিক্ষক মনোনীত হন।

তাঁহার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ছাত্রেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করে। আর্ত্ত ও বিপন্নের দুঃখ জানাইতে, সৎপরামর্শ, সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়, সহায় সম্বলহীন রুগ্ন লোক একটু ঔষধ বা সেবার ব্যবস্থার আশায় তাঁহার আগমন-পথের দিকে চাহিয়া থাকে। তিনি ছুটির দিন নিয়মিত উপাসনা করিতেন। বহু ছাত্র এবং অভিভাবক ইহাতে যোগ দিতেন। সভা লোকে ভরিয়া যাইত। ব্রাহ্ম ভাব শ্রোতাদের অভিভূত করিত; বহু ছাত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং স্থানীয় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কয়েকজন ভদ্রলোকের কোপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতে লাগিল।

তাঁহার উপর নির্যাতন চলিতে লাগিল। উপাসনাসভা হইতে তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন ও শাস্তি দিবার জন্য কাঁটাবনের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। পুলিস সংবাদ পাইয়া তদন্তে আসিলে তিনি কাহারও নাম প্রকাশে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ধর্ম্মের জন্য নির্যাতন বহু মহাপুরুষকে সহ্য করিতে হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে দুঃখ অপেক্ষা আনন্দের কারণই সমধিক।

ধর্ম্মানুরাগ

তাঁহার এই অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ধর্ম্মানুরক্তি দেখিয়া সকলে বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং বিপক্ষদের মধ্যে অনেকে ভক্ত হইলেন। হরিনাভিতেই ব্রাহ্মমন্দির স্থাপনের জন্য জমি সংগ্রহ করিতে কষ্ট হইল না। এই মন্দির এখনও বর্ত্তমান। ইহাতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মগণ উপাসনা করিয়া তৃপ্তি-লাভ করিয়াছেন।

দিন কাটিতেছিল ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তার মধ্যে। কিন্তু এই সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভাগিনেয় শিবনাথ (শাস্ত্রী) যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করায়, আবার লোকে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাঁহারা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে গ্রামের মধ্যে সাময়িকভাবে ধর্ম্ম প্রচার হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তেজস্বী উমেশচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইলেন না, হরিনাভি স্কুলের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। ছাত্রেরা কাঁদিয়া ভাসাইল, এ বিচ্ছেদ তাহাদের নিকট গভীর বেদনাদায়ক। সঙ্গে সঙ্গে গুরুর চক্ষে অশ্রুর ধারা বহিতে লাগিল। তিনি এ সময় কোন্নগর স্কুলেও কয়েক মাস কাজ করেন।

জনহিতকর প্রতিষ্ঠান

এ পর্য্যন্ত আমরা উমেশচন্দ্রের শিক্ষকতার কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার কর্ম্ম বহুমুখী। হিন্দু স্কুলে থাকাকালীন তিনি 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। নারীজাতির কল্যাণই এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও বিবিধ রচনাসম্ভারে প্রকাশের অচিরকালের মধ্যেই পত্রিকাখানি সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

হরিনাভিতে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ও ব্রহ্মমন্দির স্থাপনার কথা উল্লেখ করা করা হইয়াছে। সোমপ্রকাশ পত্রিকার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম থাকিলেও তাঁহার উপর বহুলাংশে ইহার ভার আসিয়া পড়ে। সঙ্গে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা ছাপাখানা পরিচালনায় তাঁহাকে বহু সময়ক্ষেপ করিতে হইত। ১৮৭৪ হইতে ১৮৭৮ এই প্রায় পাঁচ বৎসর তাঁহকে ইহা লইয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।

এই সময় বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার যত ভার অর্পণ করেন তাহাতে উমেশচন্দ্রকে নিকটে না পাইলে বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ের মঙ্গল এবং নিজের প্রয়োজন-বোধে গ্রামবাসীর মত কতকটা উপেক্ষা করিয়া ১৮৭৭-৭৮ সনে তাঁহাকে পুনরায় হরিনাভি স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন; এখানে তিনি এক বৎসরকাল ছিলেন। বেথুন কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজেও তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র গড়িয়া উঠিল। 'বামাবোধিনী পত্রিকা দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সাধারণের উচ্চশিক্ষার জন্য সিটি কলেজ এবং মূক-বধিরের ব্যথা-বেদনা দূর করিবার জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই দুই প্রতিষ্ঠান আজও বর্ত্তমান এবং সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইতেছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার সংস্পর্শ ও পরিচালনায় পরম জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। হরিনাভি স্কুল, সোমপ্রকাশ, ছাপাখানা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রসারে তিনি অনুজকল্প শিবনাথকে ঠিক পরে পরেই পাইয়াছেন। যতদিন বিদ্যাভূষণ মহাশয় জীবিত ছিলেন ততদিন এই দুই কর্ম্মযোগী মানব-প্রেমিকের সহযোগিতা লক্ষ্য করিয়া সমসাময়িক লোকেরা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

পাণ্ডিত্যের সম্মান

ইংরেজী ভাষায় উমেশচন্দ্রের অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল; কালে তাঁহার ইংরেজীবিদ্যার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের মত পণ্ডিত ব্যক্তি উমেশচন্দ্রের ইংরেজী জ্ঞানের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে একদিন ক্লাসে ছাত্রদের নিকট কোনও ইংরেজী রচনার ব্যাখ্যার সৌকর্য্যার্থে তিনি প্রকাশ্যে উমেশচন্দ্রকে আনিয়া নিজের উপস্থিতিতেই ছাত্র-দিগকে পড়াইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। যিনিই উমেশচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে তিনিই অবিলম্বে জ্ঞানসংগ্রহ করিয়াছেন।

মানবপ্রেম

লোকের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার জন্য উমেশচন্দ্রের প্রাণ সতত আকুল হইত। কৃষ্ণনগরে বাসকালে তাঁহার এক সহধ্যায়ী বন্ধু অম্বিকাচরণ ঘোষ দারুণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং এই রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উমেশচন্দ্রের চরিত্র তাঁহার আত্মীয়-পরিজনের অজ্ঞাত ছিল না। বন্ধুর এই রোগাতুর অবস্থায় উমেশচন্দ্র স্থির হইয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নন। ওদিকে তিনিও যাহাতে এই দারুণ রোগে আক্রান্ত না হন সে কারণে আত্মীয়েরা তাঁহাকে একটি ঘরে একদিন বন্ধ করিয়া রাখেন। যাঁহার মন সেবার জন্য কাতর, বন্ধুর রোগযন্ত্রণা যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে নিজ দেহমনে অনুভব করিতেছেন, প্রতিবন্ধ তাঁহাকে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। উমেশচন্দ্র বাহির হইবার অসুবিধা দেখিয়া বিস্তর বিফল অনুনয়-বিনয় করিলেন। একসময় আত্মীয়েরা অন্যত্র নিশ্চিন্তে অবস্থান করিতেছেন বুঝিয়া ঘরের দেয়াল বহিয়া উপরে উঠেন এবং চালা ফুঁড়িয়া বাহির হন। তারপর যথাসম্ভব দ্রুত বন্ধুর গৃহের দিকে ছুটিতে থাকেন। অবিলম্বে রোগকাতর বন্ধুর শয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

যেখানে যত কাতরতা উমেশচন্দ্রের হৃদয় সেখানে ততই বেদনাতুর। বিপদের মাত্রা যেখানে যত বেশী, উমেশচন্দ্র সেখানে সেবা, সাহস ও সঙ্গতি দ্বারা ভয় অপনোদন করিয়াছেন; কায়িক শ্রমে বিপন্নের বোঝার অংশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হন নাই। দরিদ্র ছাত্রদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে নিজে কেবল সংবাদ লইয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন না; রোগে ঔষধ ও প্রয়োজনবোধে সেবার ব্যবস্থাও করিতেন। শুশ্রূষার জন্য অপর কাহাকেও পাওয়া না গেলে নিজেই উপস্থিত হইতেন।

হরিনাভির বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের নিকট দিয়া একদিন পথ চলিবার কালে তিনি লক্ষ্য করেন—তিন ব্যক্তি বাঁখারির চালের উপর দড়ি দিয়া বাঁধা এক শব বহন করিয়া চলিয়াছেন। ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ, অবিরল ধারায় ঘর্ম্ম ঝরিয়া চলার পথে সিক্ত পায়ের চিহ্ন দিতেছে। দেখিলেই মনে হয় তাহারা বহু দূর হইতে রাজ-পুরের শ্মশানঘাটে চলিতেছে। প্রচণ্ড রৌদ্র মাথার উপর, উত্তপ্ত অসমতল রাস্তা, গাছের ছায়া পাইলে স্বল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া আবার কোনও রকমে বোঝা বহিয়া চলিতেছে। উমেশচন্দ্রের চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত। সাধারণতঃ ধীর পদক্ষেপে তিনি পথ চলিতেন; সে গতি আরও মন্থর হইয়াছে। তিনি শববাহীদের নিকটে গিয়া সস্নেহ বচনে তাহাদের ক্লেশের অংশ গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তাঁহার পরিচ্ছন্ন বসন, পায়ে জুতা দেখিয়া তাঁহারা একবার মনে করিল যে, ভদ্রলোক পরিহাস করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার ভাষায় সেরূপ কোনও লক্ষণ নাই, উপরন্তু তাহা সমবেদনায় ভরা।

তাহারা অপরিসীম সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠে সম্মতিজ্ঞাপন করিল।

কোনরূপ ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করিবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া ধন্যবাদের আশায় সাহায্য করিবার প্রস্তাব এক কথা, কিন্তু যখন সত্য সত্যই এরূপ আকাঙ্ক্ষিত 'দায়' ঘাড়ে আসিয়া পড়ে তখনই প্রকৃত পরীক্ষা। উমেশচন্দ্র প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তাঁহার অসুবিধার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি যে ব্রাহ্ম সেকথা স্মরণ হইতেই মনে করিলেন যে, হিন্দু সংস্কার অনুসারে তাঁহার পক্ষে শব স্পর্শ করা বাধাস্বরূপ হইতে পারে; একথা মনে না করিয়া স্বভাব-সুলভ দয়াবশে সাহায্য করিতে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। যেন কত অপরাধী; তিনি প্রকৃত অবস্থা শববাহীদের জ্ঞাপন করিলেন। তাহাদের দুর্দ্দশায় এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব ছিল না। তাহার উপর ভদ্রলোক যে ভাবে কথা বলিতেছেন তাহাতে মনে হয় ইনি যেন করুণার অবতার।

উমেশচন্দ্র পথিপার্শ্বে জুতা খুলিয়া, বৃক্ষশাখায় জামা ঝুলাইয়া রাখিলেন এবং শব বহন করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের সহিত শ্মশান-ঘাট পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

আত্মীয়তা

উমেশচন্দ্রের কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি ১৮৬৯ সনে হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন; ১৮৭০ সনেই দুইটি ছাত্র—রমানাথ ঘোষ (পরে সরস্বতী) ও শ্যামাচরণ ঘোষ সরকারী বৃত্তিলাভ করেন। শ্যামাচরণ ৫২ বৎসর বয়সে ১৯০৬ ডিসেম্বরে দেহত্যাগ করেন। উমেশচন্দ্র তখন বিশেষ অসুস্থ, নিজে বহুমূত্র রোগে কাতর। তিনি প্রিয় ছাত্রের বিয়োগে স্বয়ং শ্যামাচরণের পল্লীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া শোকসন্তপ্ত পরিবারে সান্ত্বনাদান করিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্যামাচরণের বৃদ্ধা মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অপরাপর সকলে হতবাক্ হইলেন। তাঁহার অবস্থানকালে শোক অপগত হইয়া সমস্ত পরিবার পরম শান্তির স্পর্শ লাভ করিলেন।

দারিদ্র্য ও যশ

অর্থহীন অবস্থা হইতে ধনের না হইলেও যশের শীর্ষে উঠিয়া ভবিষ্যৎ সমাজের চিত্ত অধিকার করা যায়, উমেশচন্দ্র তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এমন অনাড়ম্বর, ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ স্বার্থলেশ-হীন, পরদুঃখকাতর, কর্ম্মবীর দেশের গৌরববৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৭ সনে জুন (?) মাসে তিনি এণ্টনীবাগানে দেহরক্ষা করেন। তাঁহার স্নেহস্পর্শে ধন্য লেখক আজ তাঁহার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিতেছে।

আকাশ ও মৃত্তিকা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভুলে গেছি কবি আমি! কল্পনার মধুর শিহর
জাগে নাই কতকাল মর্ম্মতটমূলে! লাস্য তার
দেখি নাই কতদিন হৃদয়-অঙ্গনে। জাতিস্মর
পূর্ব্বজনমের কথা স্মরি' যথা করে হাহাকার,—
সেই মত মাঝে মাঝে সংসার-সংগ্রামক্লিষ্ট প্রাণ
উঠে কাঁদি' প্রিয়া মোর কুহকিনী কবিতার লাগি'
সহস্র কর্ম্মের ফাঁকে। ভুলে-যেতে-বসা কোন গান
রিক্ত মর্ম্মকুঞ্জতলে গুঞ্জরিয়া উঠিবারে জাগি'
চঞ্চল অলির মত পাখা মেলি' অকারণে ধায়
সুদুর্লভ অলস প্রহরে! কোন্ ছন্দের স্পন্দন-
মত্ত কল্লোলিনীসম হিল্লোলিয়া ছুটিবারে চায়
উতল উল্লাসভরে নিয়মের টুটিয়া বন্ধন,
ভাঙি' বাধা জীবনের পুঞ্জীভূত জীর্ণ জড়তার!
অনাদরে ফেলি' দূরে লোভনীয় দুর্লভ কাঞ্চন—
কুড়াই কাঁচের খণ্ড! সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধিত সংসার
অতৃপ্ত রাক্ষসীক্ষুধা দিয়ে তার করে সে হরণ
জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন—দৈবলব্ধ কবিত্ব-আবেশ!
সহস্র তুচ্ছতা নিয়ে অবিশ্রাম কোলাহল মাঝে
কাটে কাল। ক্ষিপ্ত প্রাণ—তিক্তমন—লাঞ্ছনা অশেষ!
সহসা অন্তরতলে যেন কার কম্বুকণ্ঠ বাজে—
"ওরে মূঢ়, ভ্রান্ত ওরে, কি করিলি সে পরম ধন,—
প্রথম জনমলগ্নে যে সম্পদ দিয়েছিনু তোরে?"
ক্ষমা কর দয়াময়, তব দান মাণিক্য কাঞ্চন
ধূলায় দিয়েছি ফেলি! অসহায় দেবধর্ম্মী মোরে
অনন্ত করুণাছলে এ কি তব ক্রূর পরিহাস!
কেমনে মেলিবে পাখা দ্বিধাহত এ চিত্তচকোর?—
কোথায় আশ্রয় তার? নিশিদিন মৃত্তিকা-আকাশ
ডাকে তারে একসাথে! পায়ে তার সুকঠিন ডোর!
কবি যদি করেছিলে অকৃতীরে—তবে কেন তার
দিয়েছিলে ঘৃণ্য দেহ ক্ষুধাতৃষ্ণা কামনা-আকুল?
বাস্তবের বহ্নিতাপ—তার মাঝে কেন মোরে হায়,
দিলে ফেলি—সঙ্কুচিত সুকোমল বসন্তের ফুল!

শুধু একজন

শ্রীবিশ্বপ্রাণ গুপ্ত

এই মাত্র টেলিগ্রাম পেলাম শিবুমামা মারা গেছেন। নিজ বাড়ীতে নয়, হাসপাতালে নয়, এমনকি কোন আত্মীয়বান্ধবের বাড়ীতেও নয়। একেবারে নির্বান্ধব এক সরকারী পি-এল-ক্যাম্পে। এখানে এই কলকাতায় আমিই তাঁর একমাত্র আত্মীয় এবং একমাত্র আমারই ঠিকানা সরকারী খাতায় লেখা ছিল। তাঁর মৃত্যুসংবাদও সরকারী ভাবে আমার কাছেই এসেছে। টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

—কিসের টেলিগ্রাম গো, অমলিনা পাশে দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ মুছল। খেয়াল করি নি কখন একেবারে চুপি চুপি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অমলিনা।

বললাম—জান, শিবুমামা মারা গেছেন?

আমার চোখে চোখে অর্থহীন, ভাবহীন উদাস দৃষ্টি মেলে ধরল অমলিনা। কিন্তু ভাষাহারা স্তব্ধ সে দৃষ্টি শুধু পলকে কেঁপে উঠল একবার, আর কিছু নয়। এমনকি ঠোঁট দুটোও কেঁপে উঠল না তার একবারও।

—আমি এখুনি বের হব।—চঞ্চল হয়ে টেলিগ্রামটা পকেটে রাখলাম।

—কোথায়? উদ্বেগ যেন ছায়া ফেলল অমলিনার দু'চোখে।

—সেই পি-এল-ক্যাম্পে।

—না গেলেই কি নয়? অমলিনা বলল।

—তা কি করে হয়?—আমার কথায় আর চোখে-মুখে যেন শোকার্ত্ত ছায়া দুলে উঠল।

আর দেরি করলাম না এক মুহূর্ত্ত। তাড়াতাড়িতে মনি-ব্যাগটা ভুলে রেখে এসেছিলাম, আবার ফিরে গিয়ে সেটা পকেটে তোলার সময়, অমলিনা আমাকে সাবধান করে দিল—তাড়াতাড়ি ফেরো। শ্মশানে না গেলে যদি চলে ত যেয়ো না।

মনে মনে না হেসে পারলাম না একথা শুনে। আমার এই সাত বছরের বিবাহিত জীবনে দেখেছি—শুধু আমি আর বাপ-মা ছাড়া অন্য কিছুতে, অন্য কোন কথায়, বাইরের আরও পাঁচটা মানুষের সম্বন্ধে, সুখ-দুঃখের ব্যাপারে চিরকাল অমলিনা যেন নিস্পৃহ এবং নির্লিপ্ত। দিনের পর দিন, শিবু-মামাকে নিয়েও কি বিশ্রী ব্যবহার করেছে অমলিনা। ছিঃ ছিঃ! ভাবলেও মাথা হেঁট হয়ে আসে।

ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম এসব—এই অর্থহীন ক্লান্তিকর যত ভাবনা। একটা লোক্যাল ট্রেনের থার্ডক্লাস কামরায় বসে এসব ভুলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারি নি। গাড়ির ঘুম-আনা ঝাঁকুনি, আগ্নেয় কলিজায় বিরক্তিকর হুস্ হুস্ শব্দ আর সহযাত্রীদের মাতামাতির মাঝে বসে থেকেও ভুলতে পারি নি।

রবিবারের দুপুরের লোক্যাল ট্রেন। একটা করে ছুট দিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ছিল এক একটা ষ্টেশনে। কিন্তু ট্রেনের এই থামা, যাত্রীদের ওঠানামা, হুল্লোড় আর রৌদ্রদগ্ধ এক-একটা ষ্টেশনের মাঝে ট্রেনে বসে থেকেও স্মৃতিফলকের লেখা ফিকে হয় নি আমার।

বরং স্পষ্ট মনে পড়ল, আপিস-ফেরত একদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলাম। ক্লান্ত শরীর—অবসন্ন মন। বাইরে কড়ানাড়ার শব্দ।

—কে?

—খোল রে, আমি।

দরজা খুলে দিয়েছিলাম—শিবুমামা দাঁড়িয়ে। ছোট ছোট শুভ্র কদমছাঁট চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, দাঁতহীন শূন্য মুখ-বিবর।

—কি ব্যাপার শিবুমামা? হঠাৎ একেবারে চলে এলেন কোন খবর না দিয়ে?

ঘেঁড়িয়ে ঘেঁড়িয়ে শিবুমামা হাসলেন, হ্যাঁ রে, চলেই এলাম, আর থাকা গেল না পাকিস্থানে। কেন আমার চিঠি পাস নি?

—কৈ না ত! আমি বললাম।

অমলিনা বলল, হ্যাঁ দিন-দুই আগে একটা পোষ্টকার্ড এসেছিল। কিন্তু কোথায় যে রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না।

আমি এবং অমলিনা কেউ আর কোন কথা বললাম না। শুধু দু'জনে দু'জনের চোখে চোখে তাকালাম। সে চোখের ভাষায় আর যাই হোক সাদর আহ্বান ছিল না। অমলিনা বুঝল সেকথা এবং আমিও।

আমি সরে এসে চেয়ারে বসলাম। তার পাশের চেয়ারেই বসলেন শিবুমামা।

—তা আপনি সব ছেড়ে চলে এলেন? শিবুমামার দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকালাম।

—হ্যাঁ, যে ক'টা দিন বাঁচি এখানেই থাকব। শিবুমামা

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন, একটু স্নান করব—জল টল—

—দেবে।—বলে চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসলাম।

শিবুমামা ঘর গুছিয়ে গাঁট হয়ে বসলেন—কলকাতার মাণিকতলা ষ্ট্রীটের এই তিনের-দুই নম্বর বাড়ীতে। আমার ইচ্ছা ছিল না, তবুও, হ্যাঁ তবুও মুখে কিছু বলি নি। মায়ের খুড়তুতো ভাই শিবুমামা। কিন্তু অমলিনা? শিবুমামা থাকবেন শুনেই প্রথমটায় ভ্রূ কুঁচকাল। তার পর মাসের শেষ দিকে যখন মারাত্মক আর্থিক টানাটানি, তখন বলেই ফেলল একদিন, নিজে স্ত্রী-পুত্রকে খেতে দিতে পার না, আর একজনকে জুটিয়েছ।

—ছিঃ অমলিনা, শুনতে পাবে যে!

—শুনুক গে, আমি ডরাই না।—অমলিনার মুখটা লম্বাটে হয়ে উঠেছিল।

শুনতে পেয়েছিলেন শিবুমামা, সবই শুনতে পেয়েছিলেন, তবুও বলেন নি, অন্য কোথাও চলে যাব। কারণ যাওয়ার উপায় ছিল না। আত্মীয়বান্ধবহীন এই কলকাতায় আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না শিবুমামার। তাই আমার এখানেই ছিলেন পুরো দু'মাস এবং আড়ালে আবডালে রাত্রির অন্ধকারে, হয়ত আমার আর অমলিনার অগোচরে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছেন।

বালিশ ভিজিয়েছেন শিবুমামা। কিন্তু আমরা? আমি আর অমলিনা? আমাদের মনে কোন দাগ পড়ে নি, আঁচড় কাটে নি এতটুকু সহানুভূতি। বরং দিনে দিনে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি মনে মনে। লক্ষ্য করেছি বাইরের ঘরটায় কেমন এক ভ্যাপসা দুর্গন্ধ সারাক্ষণ বাতাস ভরে রাখে। সারা ঘরে ছড়ানো-ছিটানো শিবুমামার তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম, হুঁকো, কলকে, ছাই আর টিকে। জীর্ণ তোশক-বালিশ, বিবর্ণ। ভাঙা সুটকেস্টা কুৎসিত, হতশ্রী। আর সেই জীর্ণ শয্যায় শিবুমামা শুয়ে শুয়ে গীতা পাঠ করতেন, রোজ—নিয়মিত।

দু'বেলার ভোজন-পর্ব, অমলিনার দাক্ষিণ্য-ধন্য জল-মেশানো ডাল-ঝোল, শালিকের হৃদ্‌পিণ্ডের মত এক টুকরো মাছ, যেন বিদ্রূপ করত থালায়, রোজ দু'বেলা—ঐ ঘরে।

অমলিনা কেন, আমিও কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম ঘরটা বড় নোংরা হয়ে উঠেছে—বিশ্রী রকম নোংরা। ওটা পরিষ্কার করা দরকার। বাইরের ঐ ঘরটা এর আগে ছিল আমার বসবার ঘর। প্রয়োজনে অতিথি-অভ্যাগতদের বিশ্রাম-কক্ষ। কিন্তু অসুবিধা হ'ল, শিবুমামা দখল করার পর থেকে এবং এই অসুবিধা বড্ড বেশী অনুভব করলাম। সেই একদিন—যেদিন বন্ধু অপরেশ এক সন্ধ্যায় দামী একটা মোটর চড়ে এল মাণিকতলা ষ্ট্রীটের আমার ঐ বাড়ীতে। পরিচ্ছন্ন ছিমছাম শরীরে নেকটাই ঝুলিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে অপরেশ বলল, কৈ অনেক দিন ত যাস না।

— হয়ে ওঠে না আর কি! আমি সহজ হয়ে হাসতে চেষ্টা করলাম।

আমার কথা শুনল কি শুনল না অপরেশ, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরখানি দেখল বার বার। সেই ভ্যাপসা দুর্গন্ধটা এখনও বাতাসে পাক দিয়ে উঠছে থেকে থেকে। পরিবেশটা সহজ করে তোলার জন্য বললাম, অপরেশ, ইনি আমার শিবুমামা, দেশ থেকে এসেছেন। তার পর শিবুমামার দিকে তাকালাম, 'আমার বন্ধু অপরেশ, কৃতী ব্যবসায়ী।'

'—রিফিউজী'! অপরেশ শিবুমামার চোখে চোখে তাকাল।

শিবুমামা হাসলেন। যেন সে কৃতার্থ হওয়ার হাসি। অমলিনা আজ এল না এ ঘরে, কিন্তু অন্য দিন আসে ত। অন্য দিন অমলিনার হাসিতে, আলাপে আর রসিকতায় ভরে থাকত সন্ধ্যার বাতাস। কিন্তু আজ তা হ'ল না; আড়চোখে দেখলাম, দরজার ফাঁকে অমলিনার চোখ, মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে গেল, এমন আর কোনদিন হয় নি।

অপরেশকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম, পাশে এসে দাঁড়াল অমলিনা, উনুনের আঁচে সারা মুখ যেন লালচে হয়ে উঠেছে। আঁচলে মুখ মুছে বললে, কি লজ্জা পেলে ত?

—কেন? অমলিনার চোখে কিছু-না-বুঝার দৃষ্টিতে তাকালাম।

—কেন আর? এই সব জঞ্জাল। মা গো— অমলিনা যেন কেমন শিউরে উঠল।

—ছিঃ ছিঃ ও রকম বলতে নেই অমলিনা।—পাখার নীচে শুয়ে পড়ার আগে বললাম।

সেদিন এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন, আমায় ক্রমাগত বলল অমলিনা একটা কিছু ব্যবস্থা কর, এভাবে কতদিন চলে?

চলে না আমিও ভেবেছি, কিন্তু ছাপোষা চাকুরে আমি। এক ভাটিয়ার আমদানী-রপ্তানি আপিসের একশ' দশ টাকা মাইনের সাধারণ কেরানী। আমার কি ক্ষমতা? আমার কি সাধ্য কিছু করি, কোন ব্যবস্থা করে দিই শিবুমামার।

তাই যেমন চলছিল, তেমনি চলতে লাগল, হয়ত এমনই চলত আরও অনেক দিন।

কিন্তু একদিন সন্ধ্যায় আপিস থেকে ফিরে আমি চমকে উঠলাম অমলিনাকে দেখে। পরনে কালো রঙের তাঁতের শাড়ি। কুচকুচে কালো, আর সেই কালো রঙ যেন সারা মুখে মেখে নিয়েছে অমলিনা।

—কি ব্যাপার? কি হ'ল তোমার? ঘরের মাঝে থমকে দাঁড়াই আমি।

—কি আর হবে? দরদী ভাগনে তুমি—দেখগে ও-ঘরে। দেখে এস বমি করে ভাসিয়েছে।—অমলিনা গজরাল।

শিবুমামার ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম। উদ্গীরিত একরাশ অজীর্ণ খাদ্য। স্রোত বইছে সারা ঘরে, মাছি উড়ছে ভন ভন করে আর একটা বেড়াল লেহনে ব্যস্ত. বাতাসে থেকে থেকে ঘুলিয়ে উঠছে টকটক্ দুর্গন্ধ। শুয়েছিলেন শিবুমামা, উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। শরীরটা যেন আরও ক্লান্ত, আরও রুগ্ন হয়ে মিশে গিয়েছে বিছানায়। শিবুমামা ধীরে ধীরে ক্ষীণ দুর্ব্বল গলায় বললেন, ভাবছিলাম নিজেই পরিষ্কার করে রাখব মেঝেটা, কিন্তু শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। সারা দুপুর মাথা ঘুরছিল।

—ঠিক আছে, ও নিয়ে কিছু ভাববেন না। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমলিনাকে আর কিছু বলি নি। ধুয়ে মুছে ও ঘর আমিই পরিষ্কার করেছিলাম।

আর একদিনও দেরি করি নি। পর দিনই ভোরে অপরেশের বাড়ী গিয়ে কড়া নাড়লাম। তার পর শিবুমামাকে নিয়ে আমার পারিবারিক সমস্যা, আমার অসহায়তা অকপটে স্বীকার করলাম। জানি একথা বাইরে মানুষের কাছে বলা চলে না, তবুও বলতে বাধ্য হলাম। নিঃসংকোচে বললাম, তুই একটা ব্যবস্থা করে দে, তা ছাড়া—

অপরেশ সিগারেট ধরিয়ে বলল, দেখি কি করতে পারি।

অপরেশ দেখেছিল এবং তারই চেষ্টায় চাঁদমারী পি-এল-ক্যাম্পে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলাম শিবুমামাকে।

শিবুমামা চলে যাওয়ার পর প্রথম প্রথম ঘরটা কেমন শূন্য মনে হ'ত, বিশ্রী রকম ফাঁকা। মানুষটা যেন সারা ঘর জুড়ে ছিল। টেবিলের নীচে ভাঙা কলকেটা এখনও ফেলে দেয় নি কেউ।

শিবুমামা ভর্ত্তি হওয়ার পরও কয়েক বার গিয়েছিলাম পি-এল-ক্যাম্পে। রেললাইন পেরিয়ে ধু ধু মাঠ, এখানে-ওখানে তালগাছের ভিড়। ছায়াঘন প্রান্তর, তারই চারপাশে গড়ে উঠেছে এই আশ্রয়-শিবির। আগে ছিল মিলিটারী ব্যারাক। প্রতিবারই ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখর হতেন—জানেন, এমন লোক হয় না মশাই। সাতে-পাঁচে নেই, একা একা থাকেন, গীতা-ভাগবত পড়েন। কোন গোলমাল নেই।

খুশী হয়ে মনে মনে হাসতাম আমি।

—ক্যাম্পের বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলোর সঙ্গে কি ভাব! যেন প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের চোখে-মুখে হাসির ভাঁজ পড়ত।

আমি নিজেও দেখেছি সেসব। শিবুমামা গীতা পাঠ করে ব্যাখ্যা করে শুনাচ্ছেন। আর একটি প্রৌঢ়া মহিলা তার পাশে মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। কোনদিন দিনের আলোয় কিংবা কোনদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে পাশে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে।

—ঐ ভদ্রমহিলার নাম বিনোদিনী। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কথার শেষে মিষ্টি হেসেছিলেন।

আমি নিজেও দেখেছি বিনোদিনীকে। গল্পশোনার ফাঁকে ফাঁকে কিংবা কড়িখেলার বিরতি-মুহূর্ত্তে, পা মেলে বসে টুকিটাকি কাজ করতেন বিনোদিনী। যৌবনে বসন্তের শোভা হয়ত গায়ে মেখেছিলেন বিনোদিনী, এখন সেসব ঝরে গেছে। ফেরবার পথে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেদিন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, কেমন দেখলেন?

—খুব ভাল। গীতা-ভাগবত পড়ছেন—বেশ ত আছেন?

—এক বিধবা মহিলা—মানে বিনোদিনীকে দেখলেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সিগারেট ধরালেন।

—হ্যাঁ দেখলাম। একসঙ্গে দুজনে পাঠ করছেন।—রুমালে মুখ মুছে আমি বললাম।

—ওঁরা দুজন সারাদিন একসঙ্গেই থাকেন। একে অন্যের সঙ্গী আর কি।—উঁচু পর্দ্দার হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

—হ্যাঁ চিরকালই উনি একা—সংসারে কেউ ত ছিল না—না স্ত্রী, না পুত্র, না ভাই। শিবুমামার অতীত যেন টেনে নিয়ে এলাম এই ঘরে।

—তা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবেন আর কি! অন্য কাজে মনোনিবেশ করলেন ক্যাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। আমি উঠে এলাম।

এর পরেও গিয়েছি চাঁদমারীতে। শেষবারের মত গিয়েছিলাম মাসতিনেক আগে। তখন শীতকাল। শীতের বাতাসে তুহিন-তীর। মনোরম রোদ গুটিয়ে নিয়েছে কে যেন। শিবুমামার ঘরের দরজার পাশে থমকে দাঁড়ালাম।

মৃদু মৃদু হ্যারিকেনের আলোয় বসে পরম পরিতৃপ্তিতে জিলিপী খাচ্ছেন শিবুমামা। আমাকে দেখেই বললেন, আয়, আয়, বোস্। দেখ জিলিপী খাচ্ছি। অনেক দিন খাই না। বড় লোভ হচ্ছিল। ঠোঁটের দুই প্রান্তে হাতের তেলো আর আঙুলে রসের ছোপ। পাশে বসে জিলিপী দিচ্ছেন বিনোদিনী। আমাকে দেখে ঘোমটা টেনে দিলেন। ডান হাতটা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঠোঙায় লেগে রইল। আমি হাসলাম, 'জিলিপী খান, কিন্তু বেশী খাবেন না। শরীর খারাপ করবে।'

বিনোদিনী হাসলেন। আমি বললাম, বেশ ত আছেন আপনি।

বিনোদিনী বললেন, বুড়ো বয়স—এই ত বাবা একভাবে চলে যাচ্ছে।

সেদিন ফিরে আসবার সময়ে ক্যাম্পের গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিলেন শিবুমামা। আমি বলেছিলাম, বেশ আছেন শিবুমামা।

—এই আর কি! ভগবান যেমন রেখেছেন বার্দ্ধক্য-জীর্ণ ঘাড়-গলা কাঁপিয়ে হেসেছিলেন শিবুমামা।

—তা বিনোদিনী দেবী ত আপনার খুব ভক্ত। কথার শেষে শিবুমামার দিকে তাকালাম।

শিবুমামা বললেন, বিনোদিনী কি বলেন জানিস?

—কি?

—বলেন যে, পুরুষমানুষের বুড়াকালে সেবাযত্নের লোক না থাকলে বড় কষ্ট।—শিবুমামার চোখজোড়া চিক্ চিক্ করে উঠল।

—তা আপনি কি বললেন?—আমি জানতে চাইলাম।

—আমিও তাই বললাম। কি পুরুষমানুষ, কি মেয়ে-মানুষ বুড়োবয়সে সঙ্গী চাই। সেবা-যত্ন চাই। তা ছাড়া চলে না।—শিবুমামা এবার হাসলেন উচ্চৈঃস্বরে, উনি আর আমি একটা চুক্তি করেছি।

—কি চুক্তি?

—দুজনে দুজনকে দেখব এবং যে আগে মরবে তার মুখে অন্ততঃ গঙ্গাজল দেবে।

—বেশ ত খুব ভাল ব্যবস্থা। আমি খুশী হয়ে বললাম।

শিবুমামা বললেন, না খুব দয়ার শরীর ওঁর। এই ত সেদিন দুপুরের পর থেকেই মাথাটা কেমন ঘুরছিল—সারা দুপুর আমার পাশে বসে রইলেন। বাতাস করলেন মাথা ধোয়ালেন, এমন সেবা-যত্ন নিজের লোকও করে না রে! ফতুয়াটা ছিঁড়েছিল—উনিই সেলাই করে দিয়েছেন চোখে চশমা পরে। আর জন্মে বোধ হয় উনি আমার কেউ ছিলেন—পরম আত্মীয়।—শিবুমামার চোখজোড়া ভিজে উঠল।...

আজও যেন স্পষ্ট দেখছি সে চোখ। ছলছল, বেদনা-কাতর আর করুণ। এই আমার শেষ যাওয়া এবং শেষ দেখা। আর যাই নি। আজ চলেছি তিন মাস পর। মৃত্যু-সংবাদ পকেটে রয়েছে। আশ্চর্য্য! যে মানুষ সেদিনও বেঁচে ছিল আজ সে নেই। আজ সব খেলা ফুরিয়েছে। মাথার একটা শিরায় যেন ফস্ করে কেউ দেশলাইয়ের কাঠি ছুঁইয়ে দিল আমার। শিবুমামাকে কি দিলাম আমরা? কি দিলাম এ জীবনে? না প্রেম না প্রীতি, না ভালবাসা।

তিন মাস পর আজ বুঝি কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ দোল খাচ্ছে আকাশে। রূপাগলানো কেমন এক পাগলকরা জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে মাঠ, প্রান্তর আর ক্যাম্পের এই ব্যারাকগুলি। কিন্তু সব—সব যেন থমথমে। শোকাহত।

কাটা দরজায় আর্ত্তনাদ তুলে ভেতরে ঢুকতেই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সাদর আহ্বান, আসুন, আসুন আপনার অপেক্ষায় আছি।

—কখন মারা গেছেন? চেয়ারে বসতে বসতে জানতে চাইলাম।

—বেলা এগারোটায়। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আপনি এর আগে বলেছিলেন কিছু ঘটলে খবর দিতে। তাই মৃতদেহ এখনও রয়েছে। আপনি দেখে আসুন। হাতের কলমে হিজিবিজি অর্থহীন দাগ কাটলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

আমার আগে আগে হেঁটে এল ক্যাম্পের দারোয়ান। গুটি গুটি এল। সম্মুখের ঘরটা অব্যবহৃত। যুদ্ধের সময় বিদেশী সৈন্যদের শুয়োর কাটা হ'ত ও ঘরে। এ ঘরেই মৃতদেহ রয়েছে। ঘুলঘুলি আর বন্ধ দরজার ফাঁকে খানিকটা আলো যেন ছিটকে এসে পড়েছে বাইরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। অনেক ঝড়-বৃষ্টির দাগে বিবর্ণ এই ঘরের রং। পলেস্তারা জীর্ণ। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় বুকের পাঁজরার মত অসংখ্য ইঁটের গাঁথুনি—রহস্যময়, ভয়াবহ। ঠেলা দিয়ে দরজা খুলতেই ভক্ করে একটা দুর্গন্ধ নাকে এল। এক-চিলতে জ্যোৎস্নার আলো যেন আছড়ে পড়ল ও ঘরের দুয়ারে। পাখা ঝাপটে পালাল গোটা দুই চামচিকে। আর লণ্ঠনের ঘোলাটে আলোয় চোখে পড়ল, একটা সতরঞ্চিতে মোড়া শিবুমামার প্রাণহীন নিঃসাড় মৃতদেহ। কিন্তু ও কে? শবাধারের পাশে মড়া আগলে বসে রয়েছে? আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই চমকে উঠলাম। বিনোদিনী। কাঁদছেন। হাতের শিশিতে কি গঙ্গাজল?

তেমনই দাঁড়িয়ে রইলাম আমি—নির্বাক, অভিভূত। কাঁদছে কাঁদুক। শিবুমামার জন্য অন্ততঃ একজনও কাঁদুক এ পৃথিবীতে।

ত্রিভুবন রাজপথ

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্তৃক ৭২ মাইল দীর্ঘ ত্রিভুবন রাজপথ নির্ম্মাণ সাফল্যের সহিত সম্পূর্ণ হওয়ার ফলে ভারত এবং নেপালের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় উদঘাটিত হইয়াছে—ইহাই দুইটি দেশের মধ্যে সংযোগ-স্থাপনকারী প্রথম রাজপথ। স্বাধীনতার পর এই নূতন রাজপথ সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারদের একটি বিশিষ্ট কৃতি। সম্প্রতি রাজা মহেন্দ্রের নিকট এই রাজপথ হস্তান্তরিতকরণের পর আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ নিজেদের কার্য্যালয়সমূহ গুটাইয়া লইতেছেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাইয়ের মধ্যে তাঁহারা ভারতে তাঁহাদের নির্দিষ্ট কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিবেন।

রাজা ত্রিভুবনের নামাঙ্কিত এবং পৃথিবীর পরম রমণীয় পাহাড়িয়া রাজপথসমূহের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত এই রাজপথ নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুকে রাক্সাউলস্থ ভারতীয় সীমান্তের যাতায়াতের স্থলপথের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া প্রায় সম্বৎসর তিনটন-মোটর নিয়মিত চলাচল করিতে পারে। রাক্সাউল হইতে কাঠমাণ্ডুর দূরত্ব প্রায় ১৪০ মাইল, তন্মধ্যে ত্রিভুবন রাজপথের দৈর্ঘ্য ৭২ মাইল। মাঝারি গতিতে মোটর চালাইয়া একজন মোটরচালক অনায়াসে প্রায় নয় হইতে দশ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র পথ অতিক্রম করিতে পারে।

১৯৫৫ সনের মে মাসের প্রাক্কালে—অর্থাৎ ত্রিভুবন রাজপথ যখন পুরোপুরি তৈরী হয় নাই তখন পর্য্যন্ত বহির্জগৎ হইতে কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত যাতায়াতের কোন রাজপথ ছিল না। চলাচলের চালু পদ্ধতিটি ছিল দুরূহ এবং যথেষ্ট জটিলতাপূর্ণ। ভারতীয় সীমান্তের শেষ শহর হইতেছে রাক্সাউল। এখান হইতেই নেপাল সরকারের রেলপথের সুরু এবং ইহা শেষ হইয়াছে নেপালরাজ্যের প্রায় চল্লিশ মাইল অভ্যন্তরে আমলেকগঞ্জে।

সকল প্রকার আবহাওয়াতে যাতায়াতের উপযোগী ৩০ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ কাঠমাণ্ডুকে যুক্ত করিয়াছে—চালু রাজপথের কেন্দ্রস্থানীয় ভীমফেডির সহিত। ভীমফেডি এবং কাঠমাণ্ডুর মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক রজ্জুসরণী (Electric Ropeway) আছে যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে কেবলমাত্র খাদ্যসামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকারের মালপত্র পরিবহণের জন্য, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা যাত্রীবহনের নিমিত্তও ব্যবহৃত হইতে পারে না। ভীমফেডি একটি 'ব্রাইডল পাথে'র দ্বারা থানকোটের (কাঠমাণ্ডুর ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থান) সহিতও সংযুক্ত। এই ব্রাইডল পাথ ৬৮০০ এবং ৭২০০ ফুট উঁচুতে দুইটি পর্ব্বতশ্রেণীকে অতিক্রম করিয়াছে। ত্রিভুবন রাজপথ খোলার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ব্রাইডল পাথই ছিল ভীমফেডি ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে একমাত্র স্থলপথ এবং রজ্জু-সরণীর উপর দিয়া যে সকল মাল পরিবহণ করিতে পারা যাইত না, তৎসমুদয় এই পথের উপর দিয়া মনুষ্যবাহিত হইয়া স্থানান্তরে নীত হইত। কাঠমাণ্ডুতে বিমানপথ প্রথম খোলা হইল তখন যখন বিশেষ উদ্দেশ্য প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারদের একটি অংশ ১৯৫১ সনে নেপালে উপনীত হইয়া কাঠমাণ্ডু শহর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী গাউচারে একটি সাময়িক, উড্ডয়নের প্রাক্-কালীন মাটিতে ধাবনপথ (Runway) নির্ম্মাণ করিল।

গাউচারে বিমানক্ষেত্র নির্ম্মাণ

বহির্জগতের সহিত কাঠমাণ্ডু এবং নেপালস্থ অন্যান্য স্থানের সংযোগসাধনের জন্য রাজপথের সাহায্যে যথোচিত যোগাযোগ-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল যাবৎই অনুভূত হইতেছিল। ১৯৫১ সনের শেষের দিকে নেপাল সরকার ভারত সরকারের নিকট এমন একটি রাস্তা নির্ম্মাণের অনুরোধ লইয়া উপস্থিত হইলেন যাহা শেষ পর্য্যন্ত আমলেকগঞ্জ এবং ভীমফেডির মধ্যবর্ত্তী চালু রাজপথের সহিত কাঠমাণ্ডুর যোগাযোগ স্থাপন করিবে। উচ্চাবচ পার্ব্বত্য পথের মাঝখান দিয়া একটি সম্ভাব্য রাস্তা খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ বিধায় জরিপকরণের প্রাথমিক কৃত্যের ভার অর্পিত হইল আর্ম্মি ইঞ্জীনিয়ারদের উপর।

১৯৫২ সনের গোড়ার দিকে জরিপকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত দুইটি দল প্রেরিত হইল নেপালে। তিন মাস কাল তাহারা সম্ভাব্য রাস্তাসমূহ জরিপ করিল। এই দল দুটিকে জরিপকার্য্যের গোটা সময়টাই নিজেদের রেশন এবং অন্যান্য লওয়াজিম বহিয়া লইয়া যাইতে হইত এবং স্থানীয় যে সকল টাটকা জিনিষ পাওয়া যাইত সেগুলির উপরেই তাহাদিগকে জীবনধারণ করিতে হইত। এই অজ্ঞাত আরণ্যভূমিতে পথিকৃৎ হওয়া—সে ছিল এক বিরাট কৃত্য, কিন্তু ঐতিহ্যগত উদ্যম এবং সাহসের অধিকারী আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন এবং তাঁহারা এমন একটি সম্ভাব্য রাস্তা বাহির করিলেন যাহার কল্যাণে দক্ষিণী সমতল অঞ্চল হইতে কাঠমাণ্ডু উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্যভূমি উন্মুক্ত হইল এবং ভারতীয় সীমান্তের সহিত ইহা সংযুক্ত হইল।

ভারত এবং নেপাল সরকারের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সম্মেলনে পশ্চিমাঞ্চলে কাজ আরম্ভ করা স্থিরীকৃত হইল, কেননা দেশের উন্নয়ন এবং দক্ষিণী সমতল অঞ্চলের সহিত কাঠমাণ্ডুর সংযোগস্থাপনের পক্ষে ইহাই সকলের চেয়ে সেরা রাস্তা হইবে বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। এই রাস্তা নির্ম্মাণের দায়িত্বভার ন্যস্ত হইল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারদের উপর। তাঁহারা ইহার উপর কাজ সুরু করিলেন ১৯৫২ সনের অক্টোবর মাসে।

স্বাধীনতার পর পুরোপুরি ভাবে আমাদের আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্ত্তৃক যে সকল পূর্ত্তকার্য্যের ভার গৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে এই নেপাল রাজপথই হইতেছে ব্যাপক সিবিল ইঞ্জিনীয়ারিং প্রোজেক্ট। মূল পরিকল্পনা ছিল—উভয় প্রান্ত হইতে রাজপথ নির্ম্মাণের। অবশ্য ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, মুখ্য চেষ্টা সংহত করিতে হইবে কেবলমাত্র দক্ষিণ প্রান্তে—কেননা চালু ব্রাইডল পাথের উপর দিয়া থানকোটে কনষ্ট্রাকশন এবং অন্যান্য প্ল্যান্টসমূহ পরিবহণ তখন অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। বিমানে দুইটি বুলডোজার কাঠমাণ্ডুতে লইয়া যাওয়ার একটি পরিকল্পনাও ছিল। ব্রাইডল পাথ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরিপকরণের পর দেখা গেল যে, ইহার উপর দিয়া বুলডোজার লইয়া যাওয়া সম্ভব, অবশ্য ইহাতে বিপদাশঙ্কাও ছিল প্রচুর। ব্রাইডল পাথ স্থানে স্থানে স্রেফ শিলাময় পাহাড় এবং ভারবাহী টাট্টু ঘোড়া ও খচ্চরের পক্ষে পর্য্যন্ত সেগুলি অতিক্রম করা আয়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। রাস্তার চালু অংশ এরূপ বিপজ্জনক যে, বিচারে সামান্যতম ভুলের মানে হইতেছে কর্ম্মকৃতের (operator) মৃত্যু এবং তার মেশিনের সম্পূর্ণ বিনষ্টি। ১৯৫২ সনের নবেম্বর মাসে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল এবং এই মর্ম্মে আদেশ জারী করা হইল যে, ব্রাইডল পাথের উপর দিয়া তাহাদের স্বকীয় বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে, ডোজারসমূহ পরিবহণ করা হইবে। মহাবিপদের ঝুকি লইয়া, ব্রাইডল পাথের উপর দিয়া ডোজারগুলি চালিত হইত—এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র সৈন্যবাহিনীর কর্ম্মকৃৎগণই অনুরূপ ঝুকি লইতে পারিতেন। এই ব্যাপারটি পথনির্ম্মাণ কর্ম্মকে প্রভূত পরিমাণে ত্বরান্বিত করিল এবং

১৯৫৪ সনের গোড়ার দিকে অনুকূল আবহাওয়ায় যানবাহন চলাচলের উপযোগী একটি রাজপথের মাধ্যমে কাঠমাণ্ডুর যোগাযোগ স্থাপিত হইল ভারতের সহিত।

১৯৫৪ সনের মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের দরুন এই দেশের উপর অনুষ্ঠিত হইল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। ইহার দরুন আংশিক ভাবে বিধ্বস্ত হইল নূতন করিয়া কাটা জীপ রাস্তা, ভাসিয়া গেল কতকগুলি প্রকাণ্ড পোলসহ চালু আমলেকগঞ্জ-ভীমফেডি রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশ। নেপালের প্রাণরেখার (Life-line) সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—পুরোপুরি বিনষ্ট হইয়া গেল নেপালের সরবরাহ-ব্যবস্থা। এই সময় আগাইয়া আসিলেন আর্ম্মি ইঞ্জীনিয়ারগণ—ঐ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সহিত সংগ্রামে নেপালের জনগণের সাহায্যার্থে। দিনের পর দিন তাঁহারা কাজ করিতে লাগিলেন ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা অবস্থা আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইলেন।

১৯৫৪ সনের অক্টোবরে জীপ রাস্তা প্রশস্তকরণের কাজ সুরু হইল পুরা মরশুমে। এই সময়েই আরও আর্ম্মি ইঞ্জীনিয়ারগণ চলিয়া আসিলেন নেপালে—১৯৫৪ সালের বন্যায় মারাত্মক রকম বিধ্বস্ত, চালু আমলেকগঞ্জ-ভীমফেডি লিঙ্ক রোড মেরামত এবং কাঠমাণ্ডুস্থিত গাউচারে একটি স্থায়ী রাণওয়ে নির্ম্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে।

১৯৫৫ সনের মে মাস নাগাদ নূতন জীপ রাস্তাকে চওড়ার দিকে কাটিয়া পুরোপুরি ভাবে তৈরী করা হইল, ইহার পাশাপাশি আমলেকগঞ্জ-ভীমফেডি রাস্তাও ষোল আনা মেরামত হইল এবং গাউচারের স্থায়ী রাণওয়ের নির্ম্মাণকার্য্যও পরিসমাপ্ত হইল।

১৯৫৫ সনের মে মাসে (যদিও রাস্তাটি তখনও সাধারণ যানবাহনের জন্য খোলা হয় নাই) নেপালের ইতিহাসে প্রথম মৌসুমীবায়ুর প্রকোপের সময় মজুত রাখিবার জন্য ভারতের নিকট হইতে দান হিসাবে প্রাপ্ত তণ্ডুলবাহী দুইটি কনভয়—প্রত্যেকটি ২৩ টন-লরি—এই রাস্তার উপর দিয়া চালিত হয়। ১৯৫৫ সনের অক্টোবর হইতে ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বরের মধ্যে যখন রাস্তাটির নির্ম্মাণকার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিসমাপ্ত হইল তখন খাদ্যবস্তু, যন্ত্রপাতি, বাণিজ্যিক দ্রব্যসম্ভার, পেট্রল, তৈল এবং নেপালের জনগণের জন্য অন্যান্য রকমারি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করিয়া শত শত যানবাহন এই গোটা রাস্তা পার হইয়া বরাবর কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত গিয়াছে। অন্যথায় কাঠমাণ্ডুতে এগুলি পৌঁছিতে লাগিত অন্ততঃ মাসের পর মাস, এমনকি বৎসরের পর বৎসর। নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী রাজপথ নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হয় ১৯৫৬ সনের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জিনীয়ারগণ হিমালয় পাহাড়ের মালা জয় করিয়াছিলেন, নিরেট গ্র্যানাইটসহ পর্ব্বতসমূহকে বিদীর্ণ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, সাত হাজার হইতে আট হাজার ফুট উচ্চতায় মহাভারত এবং চন্দ্রগিরি পর্ব্বতশ্রেণীর উপরে

SKETCH. 'P'
N.
KATHMANDU
SOPYAN
DEVITHAN
NAOBISE 3170 FT.
THANKOT
KIRTIPORE
DEORALI 6636 FT.
ANGARI
CHITLANG
DEVITHAN
PALUNG VALLEY
SIMBHANJAMB 8218 FT.
BHANJYANG
SIMLANG
PHARPING
RULIKHANI
AGORE
CHISAPANI
JHANAL KOT
BHADAUR
BHIMPHEDI
KALITAR LOOPS
MALTA
BHAINSE DOBHAN
LEGEND.
ELECTRIC ROPE WAY.
TRIBHUVAN RAJPATH.
EXISTING ALL WEATHER ROAD
NEPAL GOVT. RLY.
FAIR WEATHER TRACK.
BRIDLE PATH.
AMLEK GANJ
SIMRA RS
RAXAUL RS
(INDO - NEPAL BORDER STATION)
GENERAL LOCATION OF TRIBHUVAN RAJ PATH

শিলাময় পাহাড়, স্রোতস্তাড়িত উপলখণ্ড (boulder) এবং জঙ্গলের ভিতর দিয়া তাঁহারা রাজপথ কাটিয়াছিলেন। ইহা এমন একটি রাজপথ যাহা দুইটি দেশের মধ্যে মৈত্রীর প্রতিনিধিস্বরূপ। এই রাজপথ সৃষ্টি করিয়াছে নেপালের এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ইঞ্জীনীয়ারদের ইতিহাসেও এক বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা। এই রাজপথ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে একটি দেশকে যাহা এতদিন ছিল পৃথিবীর বাকী অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন—স্বতন্ত্রীকৃত এবং অনুন্নত। ইহা এক অতি প্রশংসনীয় সাফল্য। অতঃপর পশুপতিনাথের অভিমুখে অগ্রসর তীর্থযাত্রী অথবা এমন কোনও পর্যটক যিনি এই দেশকে দেখিতে চান তার প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে—তার সবুজের কার্পেটে ঢাকা উপত্যকার শোভা, চতুর্পার্শ্বের রজতশুভ্র তুষারাবৃত শৈলমালা এবং শিখরসমূহের দৃশ্যসমেত—তিনি যদি কলিকাতার এবং সোপিয়াঙের লুপের ভিতর দিয়া মহাভারত ও চন্দ্রগিরি পর্ব্বতমালা পার হইয়া, যামেন পর্ব্বতশিখরের পার্শ্ব দিয়া এবং নাওবিসে ও পোলাঙের উর্ব্বরা উপত্যকাভূমির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মোটরে চড়িয়া যান—তাহা হইলে রাজপথের সর্ব্বত্র অপূর্ব্বমনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবেন—এই ভ্রমণ হইবে তাঁহার নিকট প্রীতিকর এবং চিত্তাকর্ষক।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ত্রিভুবন রাজপথ নির্মাণই আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ কর্ত্তৃক ১৯৫২ হইতে ১৯৫৬ সনের মধ্যে সম্পাদিত একমাত্র কৃত্য নহে। আমলেকগঞ্জ এবং ভীমফেডির মধ্যবর্ত্তী বিধ্বস্ত রাস্তাও তাঁহারা মেরামত করিয়াছেন। ভাসিয়া-যাওয়া সাঁকোগুলির জায়গায়ও তাঁহারা নূতন সাঁকো স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৫৫ সনের মধ্যে কাঠমাণ্ডুর গাউচারে একটি স্থায়ী বিমানক্ষেত্রের নির্ম্মাণকার্য্যও পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গাউচার বিমানক্ষেত্রে আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ ফ্লাইট শেড ইত্যাদিও তৈরি করিয়াছেন।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকার মধ্যে আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারগণ থানকোট-কাঠমাণ্ডু রাজপথ এবং কাঠমাণ্ডু হইতে প্রাচীন নগরী পাটন পর্য্যন্ত প্রসারিত, শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত রাজপথও মেরামত করিয়াছেন। এই আট মাইল দীর্ঘ রাজপথের—যাহার নির্ম্মাণকার্য্য পরিসমাপ্ত হওয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল উপরে কালো আস্তরণ দিয়া—কাজে হাত দেওয়া হয় ১৯৫৬ সনের গোড়ার দিকে এবং ১৯৫৬ সনের ২রা মে তারিখে রাজা মহেন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের প্রাক্কালে নেপাল সরকারের নিকট ইহা হস্তান্তরিত করা হয়।

১৯৫৭ সনের ৩রা জুলাই কাঠমাণ্ডুতে এক সংবর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে আর্ম্মি ইঞ্জিনীয়ারদের স্বাগত করিয়া নেপালের যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীপি. ঘোষ বলেন, 'এই রাস্তা নির্ম্মাণকল্পে ভারত সরকার কর্ণেল রত্নস্বামী এবং লেঃ কর্ণেল গ্রাণ্টের মত বিপুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারদের নেতৃত্বাধীনে শত শত বিশেষজ্ঞকে পাঠাইয়া আমাদিগকে যেভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাহা চিরকাল আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব।

আনন্দ এবং গর্ব্বের সহিত আমরা সেই ৫০০০ হইতে ৮০০০ নেপালী কর্ম্মীদের কথাও স্মরণ করিব যাহারা এই অভীষ্টসিদ্ধির জন্য শ্রম এবং তিল তিল করিয়া তাহাদের দেহের রক্ত দান করিয়াছে। এই পবিত্র এবং মহান্ প্রচেষ্টায় নয় জন ভারতীয় এবং বাইশ জন নেপালীর জীবনোৎসর্গের দৃষ্টান্ত আলোকস্তম্ভের মত আমাদিগকে কর্ত্তব্য-পথে পরিচালিত করিবে।

দুই সখী

শ্রীসাধনা মুখোপাধ্যায়

যখন চেতনা ম্লান প্রখর আগুন শিখামুখে,
পাতার সান্ত্বনা নেই-মুমূর্ষু গাছেদের বুকে,
কোকিল স্তিমিত-কণ্ঠ অবসন্ন কাকের প্রলাপ,
ফুলেদের সভা শেষ, রৌদ্রের অজগর সাপ,
আলোকের বিষ দিয়ে তাদের অস্তিত্ব নিল মুছে,
হাওয়ার দক্ষিণী ঢং লুয়ের চাবুকে গেল ঘুচে,
তখন বিস্ময় নিয়ে নেমে এল মর্মে পৃথিবীর,
দুই সখী, মিতালী পাতালো বুঝি সাথে অগ্নির।
প্রথমা লোহিতবর্ণা আগুনের সত্তার প্রতীক্,
জ্বেলেছে মশাল তার আকাশের কোলে নির্ভীক,
দীপ্তি তার তুচ্ছ করে তপ্ত তাম্র রোদের কটাহ,
সে আর জানে না কিছু চেতনায় শুধু আনে দাহ,
দূর করে ফেলে দেয় হৃদয়ের গ্লানি খুদকুঁড়া,
উচ্চগ্রামে সুর বাঁধে বৈশাখের দৃপ্তা কৃষ্ণচূড়া।

দ্বিতীয়া পীতাভ মোর নাম তার কি যে তা জানি না,
স্নিগ্ধ রূপ-সজ্জা তার বাজায় সে মনোলীনা বীণা,
পথের দু'পাশে বসে হৃদয়ের নিভৃত গভীরে;
রোদের ওঠে না ঢেউ লুয়ের চাবুক যায় ফিরে,
নিজের গানের স্রোতে নিজেকেই গেছে সে যে ভুলে,
যে গান প্রকাশ পেল হলুদ স্তবক-বাঁধা ফুলে।
রোদকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণচূড়া উদ্ধত-প্রাণ,
দ্বিতীয়া জানে না রোদ আছে কি না গায় শুধু গান।
বন্ধ্যা নিদাঘ জুড়ে এ কবি ফুলের শিল্পিনী,
বাজে আর নাম না জেনেও তাকে চিনি,
সরল সুরের স্তব ফুলে ফুলে করে যে একাকী,
হলুদ বসন দেখে তাকে আমি হলুদিনী ডাকি।

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

[ভারতেতিহাসের স্বর্ণযুগে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত পরিভ্রমণ করেন। তৎকালীন ভারত ও তাহার অধিবাসীদের বিবরণ হিসাবে ফা-হিয়েনের পর্যটনকাহিনী অতুলনীয়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন সঙ্গীর সহিত ৬৫ বৎসর বয়স্ক চীনাভিক্ষু ফা-হিয়েন ভারতের বিভিন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন এবং বিনয়পিটকাদি ও বিবিধ বৌদ্ধ শাস্ত্রাদির সহিত সম্যক্ পরিচয়-মানসে চীনদেশের চ্যাংগান শহর হইতে যাত্রা করিয়া, 'দুর্গম গিরি-কান্তার মরু' অতিক্রম করতঃ গান্ধারের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে একাকীই পরিভ্রমণ করিতে হয়। ভারতের নানা বৌদ্ধবিহারে তাঁহার অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হন ও সিংহল হইতে সমুদ্রপথে ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে বহু দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধধর্মগ্রন্থের পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া যান। প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁহার পর্যটনকাহিনী তিনি চীনা ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। এ যাবৎ ফরাসী ও ইংরেজী ভাষায় এই অমূল্য পর্যটন-কাহিনী অনেকেই অনুবাদ করিয়াছেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ এতন্মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জেমস লেগ কৃত ইংরেজী অনুবাদই বিশেষ প্রামাণ্য অনুবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সেজন্য বর্তমান বঙ্গানুবাদের ভিত্তি হিসাবে জেমস লেগ-এর অনুবাদটিকে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতি অনুবাদক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

হান১ (Han-বর্তমান চীন) দেশের অন্তর্গত চ্যাংগান২ শহরের অধিবাসী বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসন্ধিৎসু চীনা শ্রমণ ফা-হিয়েন৩ ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু সহ ভারত-পরিভ্রমণের এক সঙ্কল্প করেন—উদ্দেশ্য ভারতের বৌদ্ধতীর্থ-স্থানগুলি দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মানুশাসনসমূহের অনুসন্ধান করা এবং যদি সম্ভব হয় ঐসব অনুশাসনের প্রতিলিপি সংগ্রহ। তাঁর মতে চীনদেশের প্রচলিত ধর্মানুশাসন সূত্রাবলী ও বিহার৪ জীবনযাত্রার নিয়মাবলী শুধুমাত্র অশুদ্ধিকরই নয় অসম্পূর্ণও বটে। তাই তিনি সঙ্কল্প করেন যে, বৌদ্ধধর্মের আদি প্রচারক্ষেত্র ভারত-ভূমি থেকে সম্পূর্ণ ধর্মানুশাসনগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে সেগুলিকে চীনা ভাষায় অনুবাদপূর্বক স্বদেশে প্রচার করেন যাতে করে তাঁর স্বদেশবাসী নির্ভুল পথে ভগবান বুদ্ধের অনুগামী হতে সক্ষম হন ও তথাগতের কৃপারাশি থেকে বঞ্চিত না হন। কিন্তু শুধু সঙ্কল্প করলেই ত হ'ল না, সেটা কার্যে রূপান্তরিত করা চাই। তার সতীর্থদের মধ্যে হুই-চিং, তাও-চিং, হুই হিং ও হুই-ওয়েই৫ তাঁর মহান সঙ্কল্পের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে এগিয়ে এলেন তাঁকে সাহায্য করতে। তারা ভারততীর্থযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হতে রাজী হলেন। অবশেষে চী-হাই বর্ষপরিক্রমায় হাংশীর প্রথম

১। ফা-হিয়েন যখনই চীন সম্বন্ধে কোন উক্তি করেছেন তখনই তিনি চীনকে হান নামেই উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি চীনের একটি বিশিষ্ট রাজবংশের নাম। প্রায় ৫ শত বৎসর ধরে এই রাজবংশের উত্তরাধিকারীরা চীনদেশ শাসন করেছিলেন (Travels of Fa-hien by Legge)।

২। চ্যাংগান এখনও সেন্‌সি রাজ্যের একটি প্রধান শহরের নাম। প্রথমে এই শহরটি হান রাজবংশের রাজত্বকালে (খ্রীষ্টপূর্ব ২০২ থেকে ২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) এবং পরে সুয়ে রাজবংশের রাজত্ব-কালে (৫৮৯ থেকে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) চীনের রাজধানী ছিল। টি-সিন রাজবংশের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল নানকিং-এ অথবা তারই কাছাকাছি কোন স্থানে এবং চ্যাংগান এই সময় তিনটি রাজ্যের রাজধানীরূপেই খ্যাতিলাভ করেছিল।

("Travels of FA-hien by Legge.)

৩। ফা-হিয়েনের আসল নাম ছিল কুঙ্ এবং তিন বৎসর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পরই তাঁর ফা-হিয়েন নামকরণ হয়।

('A Record of the Buddhist Countries'—Liyungshi, p. 8.)

৪। বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণেরা যেখানে সংসার ত্যাগ করে এসে ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন, প্রচার ও ভগবান বুদ্ধের সাধনভজনে ব্রতী হন এবং বসবাস করেন সেই গৃহকে বিহার বলা হয়। বিহারগুলি সাধারণতঃ দেশের রাজারাই নির্মাণ করিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক বিহারের অধিবাসীদের (ভিক্ষু বা শ্রমণদের) খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। বিহারে সাধারণতঃ বুদ্ধমূর্তির উপাসনা-গৃহ, অধ্যয়ন-গৃহ, ভোজনাগার, ও ভিক্ষুদের শয়নগৃহ থাকে। বিহারের গাম্ভীর্য বজায় রাখবার মানসে বিহারের চারিদিক ঘিরে একটি বাগান থাকে ভিক্ষু ব্যতিরেকে কাউকেই এখানে থাকতে দেওয়া হয় না। সংস্কৃত ভাষায় বিহারকে সংঘারাম অর্থাৎ 'মিলনের ক্ষেত্র' বলা হয়।

৫। ফা-হিয়েনের মত এ দেরও এগুলি আসল নাম নয়, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের পর এ দের এই নূতন নামকরণ হয়।

('Travels of FA-hien' by Legge p. 10)

বৎসরের (৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে) এক শুভ প্রভাতে ফা-হিয়েন তাঁর উপরোক্ত চারিজন সতীর্থ সহ চ্যাংগান থেকে সুদূর ভারতবর্ষের অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা সুরু করলেন।

চ্যাংগান ছেড়ে লুং পর্ব্বতমালাকে৬ পিছনে ফেলে তীর্থযাত্রীদল যখন কিনকুই রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন তখন গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসানকাল৭ আগতপ্রায়। উপায়ান্তর না দেখে সেখানেই তীর্থযাত্রীরা বর্ষাবসানকাল অতিবাহিত করে সেখান থেকে যাত্রা করেন। ইয়াংলো পর্ব্বত পার হয়ে যখন তাঁরা সামরিক শহর চাংহেতে এসে পৌঁছল তখন সেখানকার পথঘাটের অবস্থা খুবই বিপদসঙ্কুল ছিল। নিঃস্ব-নিঃসম্বল তীর্থযাত্রীদের সাহায্যার্থে এ দেশের রাজা তুয়ান ইয়ে এগিয়ে এলেন এবং দানপতি৮ ভূমিকা গ্রহণ করে এঁদের থাকা খাওয়া ও রক্ষণাবেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব নিজেই মাথা পেতে নিলেন। এখানে থাকাকালেই ফা-হিয়েনরা চীন থেকে আগত অপর একটি তীর্থযাত্রীদলের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরাও একই পথের পথিক, অর্থাৎ এরাও ভারততীর্থ-দর্শনের অভিলাষী। এই নূতন দলের মধ্যে ছিলেন চে-ইয়েন, হুই-চিয়েন, সেং-সাও, পাও-ইউন এবং সেং-চিং৯। এখান থেকে দুই দলই একত্রে যাত্রা করে এসে পৌঁছল সীমান্তবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান শহর তুণ হোয়াং-এ১০। শহরটির বিস্তার পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৮০ লী ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪০ লী১১। তীর্থযাত্রীরা এখানে সানন্দে প্রায় মাসাবধিকাল কাটিয়ে দিলেন। এরপর ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থেরা আবার পথে পা বাড়ালেন, কিন্তু অপর দলটি এখানে আরও কিছুদিন কাটিয়ে যাওয়া স্থির করায় তাঁরা এইখানেই রয়ে গেলেন।

তীর্থযাত্রীদের দুর্গম পথযাত্রা সুরু হ'ল এখান থেকেই, কারণ এবার তাঁদের চলতে হবে মরুভূমির উপর দিয়ে (গোবি মরুভূমি)। টুনওয়ানের শাসনকর্ত্তা লী হাও১২ অবশ্য এই দুঃসাহসী শ্রমণদের মরুভূমি অতিক্রম করবার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করে দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করলেন। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে এক জন ভাল পথ-প্রদর্শকের সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু পান নি। অবশ্য এতে তীর্থযাত্রীরা বিন্দুমাত্র দমেন নি, কারণ যে মহান সঙ্কল্প নিয়ে তাঁরা মাতৃভূমি ছেড়ে বেরিয়েছেন তা থেকে তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারে এমন কোন বাধাই নেই। এই বিস্তীর্ণ মরুতে নেই কোন পথের চিহ্ন, নেই কোন সীমানা, আছে শুধু পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকদের ক্রমশঃ অগ্রগতির চিহ্নস্বরূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কঙ্কাল। সেই কঙ্কালসমূহের নিশানা করে অভিযাত্রীরা উত্তেজনার মধ্যে বাঁধনহারা ছন্দহারা হয়ে এগিয়ে চলেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মরুপথের প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'ল। তীর্থযাত্রীরা ১৫০০ লী মরুপথ অতিক্রম করে সতের দিন পর পাহাড়-ঘেরা রুক্ষ অনুর্ব্বর শেন্ শেন্১ রাজ্যের রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন। এ-দেশের রাজা নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এবং তাঁর সারা রাজ্য জুড়ে

৬। সেনসির পশ্চিম ও কানসুর পূর্ব্বদিক জুড়ে রয়েছে এই লুং পর্ব্বতমালা। বর্ত্তমানে এই পর্ব্বতমালা লংচো বলেই খ্যাত।

('Travels of FA-hien' by Legge p. 10)

৭। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভিক্ষুদের সাধারণতঃ বর্ষাকালে বিহারের মধ্যে থেকেই তাঁদের সাধনভজন করতে হবে এরূপ একটি নিয়ম বৌদ্ধদের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলিত আছে। চীনা শ্রমণরা এই বর্ষাকালকে ঠিক ভারতীয় বৌদ্ধ পঞ্জিকার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই এটি পালন করে থাকেন, কারণ চীন দেশে অনুরূপ সময়ে গ্রীষ্মকাল।

(Travels of FA-hien, p. 10)

৮। বৌদ্ধদের মতে ধর্ম্মার্থে কিছু দেওয়ার নামই দান। ছয়টি পারমিতা অর্থাৎ নির্ব্বাণলাভের উপায়ের মধ্যে দান হচ্ছে সর্ব্বপ্রথম উপায় এবং দানপতি হচ্ছেন তিনিই যিনি মর্ত্ত্যের দুঃখসাগর পার হবার নিমিত্ত দান করার অভ্যাস রেখেছেন। যেসব লোক দান করে বিহারের অধিবাসীদের ধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করেন তাঁদের সম্মানজনক উপাধি হিসাবে এটিকে ধরে দেওয়া যায়।

('Travels of FA-hien', p. 11)

৯। এই কয়জন সঙ্গীর মধ্যে পাও-ইউনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি ভারত থেকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে অনেক সংস্কৃত পুস্তকাদির চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন যার মধ্যে মাত্র একখানি পুস্তকই এখনও বর্ত্তমান।

১০। চীনের বিখ্যাত প্রাচীরের সীমান্তে গান-সি প্রদেশের একটি জেলার নাম এখনও তুন-হোয়াং আছে। ('Travels of FA-hien' p. 11)

১১। এক লী পথ হচ্ছে এক মাইলের এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৫৮৬ গজ।

১২। লী-হাও লুংসির অধিবাসী। তিনি হুয়াংদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং শেষে তিনি পশ্চিম লিং-এর ডিউক পর্য্যন্ত হয়েছিলেন। ইনি যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি দয়ালু বলে এঁর খ্যাতি ছিল।

('Travels of FA-hien' p. 12)

১। Mr Wylie—Journal of the Anthropological Institute—Aug. 1880তে বলেছেন যে, যদিও আমরা শেন্ শেন্-এর সঠিক স্থান নির্ণয় করতে পারি নি তা হলেও এমন প্রমাণ পেয়েছি যাতে বলতে পারা যায় যে, এটি লব লেক-এর নিকটবর্ত্তী কোন স্থান হবে।

প্রায় ৪০০০ ভিক্ষুর২ বাস। এরা সকলেই হীনযানপন্থী৩। এখানকার অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও পোশাক পরিধান-পদ্ধতির সঙ্গে চীনদেশের প্রচলিত পদ্ধতির কোন তফাৎই নেই। তীর্থযাত্রীরা আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতীয় বৌদ্ধেরা যতখানি নিষ্ঠার সঙ্গে ও নির্ভুল ভাবে ধর্ম্মানুশাসনগুলি মেনে চলেন, ঠিক ততখানি নিষ্ঠার সঙ্গে এদেশের বুদ্ধ-অনুগামীরা অনুসরণ করেন না। শুধু এখানেই নয়, এটা তীর্থযাত্রীরা তাঁদের যাত্রাপথের অন্যান্য স্থানগুলিতেও লক্ষ্য করেছেন। এখানকার বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা অবশ্য ভারতীয় ভাষা শিক্ষা করছেন এবং সেই ভাষার মাধ্যমেই অনুশাসনগুলি অধ্যয়ন করা থাকেন।

মরুপথশ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রায় মাসাবধিকাল বিশ্রাম-লাভের পর এখান থেকে উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে ষোল দিনের মাথায় এসে পৌঁছলেন উইদের৪ দেশে। এখানকার ৪০০০ হীনযানপন্থী ভিক্ষু বিশেষ। নিষ্ঠার সঙ্গেই বিহার-জীবন যাপনের নিয়মাবলী পালন করে থাকেন, তাই তাঁরা এই চীনা তীর্থযাত্রীদের প্রথমে তাঁদের বিহারে স্থান দিতেও ইচ্ছুক ছিলেন না, কারণ, তাঁদের ধারণা যে, চীনা শ্রমণেরা তাঁদের নিয়মাবলী মেনে চলতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত এখানকার বিহারের অধিবাসী এক চীনা শ্রমণ ফোকুন্ সুন্-এর মধ্যস্থতায় তীর্থযাত্রীরা এখানে দুই মাস থাকবার অনুমতি লাভ করেন। এই বিহারে অবস্থানকালেই পাও-ইউন ও তাঁর সতীর্থেরা আবার এসে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিলিত হন। বিহারে থাকবার অনুমতি পেলেও তীর্থযাত্রীরা উই-এর অধিবাসীদের কাছ থেকে খুব ভাল ব্যবহার পান নি, কারণ তারা সদাসর্ব্বদাই এ দের ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন, এমনকি ভিক্ষুর মর্য্যাদায় আঘাত করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাঁদের ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত চেন-ইয়েন, হুই-চিং এবং হুই-উয়েই এখান থেকে আবার কাও চাং (বর্ত্তমান কারসারে) ফিরে যান। তাঁরা ঠিক করেন যে, কাও চাং থেকেই তাঁরা যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে পুনরায় তাঁদের যাত্রা সুরু করবেন, অর্থাৎ মরুভূমির দ্বিতীয় পর্ব্ব অতিক্রম করবেন। ফা-হিয়েন ও অন্যান্য যাত্রীরা অবশ্য ফো-কুন-সুন-এর সহায়তায় এখানেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে সোজা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে যাত্রা করলেন। যাত্রীরা যতই সামনের দিকে এগোতে লাগলেন ততই পথের রুক্ষতা তাঁরা অনুভব করলেন,সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলেন প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দুর্য্যোগ। ক্রমশঃ যাত্রীদের পথ থেকে মানুষের লোকালয়ের চিহ্ন গেল মিলিয়ে, সেই সঙ্গে মিলিয়ে গেল জীবন্ত মানুষের সংস্পর্শ। মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেবল এগিয়ে চলেছেন সহায়হীন, সম্বলহীন নিঃশঙ্ক-চিত্ত মাত্র এই কয়টি দুঃসাহসী পথিক। একমাস পাঁচ দিন পরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হয়ে যাত্রীরা এসে পৌঁছলেন খোটানে। যে কষ্ট স্বীকার করে এরা মরুজয় করেছেন তা মানুষের ইতিহাসে কখন কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ।

২। যে সব ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়ে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের পর বিহার-জীবন যাপন করেন তাঁদেরই 'ভিক্ষু' বলা হয়। চীনদেশে এ দেরই শ্রমণ বলা হয়ে থাকে।

৩। বৌদ্ধধর্ম্মের দুইটি মুখ্য ভাগ আছে, একটি হীনযান ও অপরটি মহাযান। কালক্রমে এই দুইটি যান প্রায় দুইটি বিভিন্ন ধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছিল। হীনযান পুরাতন এবং মহাযান আধুনিক। হীনযান বুদ্ধের বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু মহাযানের প্রতিষ্ঠা দার্শনিক ভিত্তির উপর। এই দুইটি যানের ভিতর নানারূপ বিভেদ আছে। হীনযানে নিজের মুক্তিই প্রধান লক্ষ্যবস্তু, কিন্তু মহাযানে নিজের মুক্তির স্থান নাই। জগতের সকল মনুষ্য, পশু, পক্ষী ইত্যাদির মুক্তি আগে তারপর নিজের মুক্তি। মহাযানে দেবদেবীর বালাই নেই। হীনযানে কিছু কিছু হিন্দু দেবতার নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধ যখন পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন সেই সময় ইন্দ্র ও ব্রহ্মা এসে সেই দিব্যজ্ঞান পৃথিবীতে প্রচার করতে অনুরোধ করেন—(বৌদ্ধদের দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-১০)।

৪। Wetters তাঁর 'China Review'-তে বলেছেন (p. 115) যে, উই হয় কারসার কিংবা সেখান থেকে কুৎসচার মধ্যবর্ত্তী কোন অঞ্চলের নাম। Liy-ung-hsi তাঁর 'Record of Buddhist Contries by FA-hien'-এ উইকে অগ্নিদেশ বলে উল্লেখ করেছেন (p. 17)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঐশ্বর্য্যময়ী খোটান শুধু প্রাকৃতিক সম্পদেই সমৃদ্ধ নয়, এর অধিবাসীরাও সবাই বিত্তশালী। বোধ হয় ভগবান বুদ্ধের অনুগামী বলেই সুখী সমৃদ্ধ এক বৃহৎ পরিবারের মত এরা শান্তিতেই আছে। এখানে মহাযানপন্থী ভিক্ষুসংখ্যা হয়ত কয়েক লক্ষেরও বেশী। বৌদ্ধধর্ম্মানুশাসন অনুসারে এরা প্রত্যেকেই সাধারণ শস্যভাণ্ডার থেকে সম্বৎসরের খাদ্যশস্যাদি পেয়ে থাকে। এদের ঘর-বাড়ীগুলো বেশ ছাড়াছাড়া ও সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। প্রত্যেক বাড়ীর সামনেই বহিরাগত ভিক্ষুদের থাকার জন্য একটা করে স্তূপাকৃতি ঘর করে দেওয়া আছে যেখানে গৃহস্থেরা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা করে থাকেন। এদেশের রাজা নিজেই ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থদের গোমতী১ বিহারে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এই বিহারে প্রায় তিন হাজার মহাযানপন্থী ভিক্ষু বাস করেন। এ দের বিহার-নিয়মাবলীর মধ্যে ফা-হিয়েনের সবচেয়ে যা ভাল লেগেছিল তা হচ্ছে—খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটি। ঘণ্টাবাজার সঙ্গে সঙ্গে বিহারের অধিবাসী ভিক্ষুরা সবাই ভোজনগৃহে এসে উপস্থিত হন এবং যে যাঁর

১। এই বিহারের নাম গোমতী দেওয়ার কারণ বোধ হয় এখানে অনেক গরুও থাকত। ('Travels of FA-hien' p. 17)

নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেন। আসনগুলি সাধারণতঃ ভিক্ষুদের কৌলীন্য ও পদমর্যাদা অনুযায়ী পাতা হয়ে থাকে। সকলে আসন গ্রহণ করলে পর খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা হয়। যদি কারুর কোন বাড়তি খাদ্যের দরকার হয় তা হলে তিনি হাতের ইশারায় পরিবেশকদের ডেকে তার প্রয়োজনীয় বিশেষ খাদ্যটি দিতে ইঙ্গিত করবেন। কোনরূপ চেঁচামেচি করা চলবে না। সারা ভোজনগৃহে বেশ একটা গম্ভীর পরিবেশ বজায় থাকে—এমনকি ভিক্ষুর আনুষঙ্গিক বাসন-কোশনেরও কোনরূপ শব্দ করা নিয়মবিরুদ্ধ।

এখানে প্রতি বৎসর চতুর্থ মাসে একটা মূর্তি-শোভাযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শুনে তীর্থযাত্রীদের অনেকেই সেই উৎসব দেখে যাবেন বলে খোটানে আরো তিন মাস কাটিয়ে যাওয়া স্থির করলেন, কেবলমাত্র হুই-চিং, তাও-চিং ও হুই-ইং দলের অভিযাত্রীরূপে খালচা২ অভিমুখে আগাম চলে গেলেন। নগরীর অধিবাসীবৃন্দ চতুর্থ মাসে প্রথম দিন থেকেই নগরীর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে সুরু করেন। রাস্তাঘাট বেশ ভাল করে জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ঝক্‌ঝকে তকৃতকে করে ফেলা হয় এমনকি নগরীর অলিগলিগুলোও বাদ যায় না। এর পর সুরু হয়, সাজানোর পালা। নগরদ্বারে একটা বিরাট তাঁবু ফেলা হয় এবং তাঁবুটাকে যতদূর সম্ভব সুন্দর করে সাজানো হয়। উৎসবকালে এই তাঁবুতেই দেশের রাজারাণী ও সম্ভ্রান্ত মহিলারা এসে সাময়িক ভাবে বাস করেন।

গোমতী বিহারের ভিক্ষুরা মহাযানপন্থী বলে শোভাযাত্রার আগে যাবার অধিকার পান। নগরীর উপকণ্ঠে এই ভিক্ষুরা চারপায়ার একটা বিরাট রথ তৈরি করে সপ্তরত্ন দিয়ে বেশ সুন্দর ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রথের উপর মূর্তিগুলিকে রাখেন। রথটা উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুটেরও বেশী আর দেখতে অনেকটা চৈত্যের মতন। ভগবান বুদ্ধের মূর্তিটি রথের ঠিক মাঝখানে রাখা হয় ও তার দু'পাশে দুইটি বোধিসত্ত্বের মূর্তি বসানো হয়। এছাড়া বিভিন্ন দেবগণের মূর্তিও বেশ সুন্দর করে রথের চারিধারে সাজিয়ে বসানো হয়। রথটিকে সোনারূপা দিয়ে প্রায় মুড়েই ফেলা হয়। রথ যখন নগরদ্বারের একশ' হাতের মধ্যে এসে পড়ে তখন রাজা তাঁর বেশভূষা পরিবর্তন করে রাজমুকুট খুলে ফেলে খালি পায়ে ফুল ও ধূপধুনা নিয়ে রথের দিকে এগিয়ে যান। প্রথমে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে শ্রদ্ধানিবেদনের পর রাজা রথের চারদিকে ফুল ছড়িয়ে ধূপধুনো জ্বালিয়ে বুদ্ধদেবের মূর্তিকে পূজা করেন। রথটি যখন নগরদ্বার অতিক্রম করতে থাকে তখন রাণী ও তাঁর সঙ্গী মহিলারা রথমধ্যস্থিত মূর্তির উদ্দেশ্যে অফুরন্ত পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। এই ভাবেই এক শান্ত আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। প্রত্যেক বিহারের মূর্তি-শোভাযাত্রার জন্য একটা করে দিন নির্দিষ্ট করা থাকে এবং মাসের পয়লা থেকে সুরু হয়ে ১৪ই তারিখে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটলে পর রাজা ও রাণী প্রাসাদে ফিরে যান।

এ দেশের রাজা নগরের প্রায় ৮ লী পশ্চিমে সম্প্রতি একটি নূতন বিহারের নির্মাণকার্য্য সমাপ্ত করেছেন। বিহারটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে প্রায় ৮০ বৎসর অর্থাৎ বর্তমান রাজার ঠাকুরদা এর ভিত তৈরি করে গেছলেন আর ইনি সেটা সম্পূর্ণ করলেন। ২৫০ ফুট উঁচু এই নবনির্মিত বিহারটি স্থাপত্যশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সবচেয়ে সুন্দর এর খোদাইয়ের কাজগুলি। বিহারের ভিতরটায় সোনারূপা ও অন্যান্য রত্ন দিয়ে যে কারুকার্য্য করা হয়েছে তা সত্যই অপূর্ব। এর মধ্যে একটি স্তূপও৩ নির্ম্মিত হয়েছে যার পিছন দিকে একটা প্রার্থনাগৃহও আছে। এই গৃহের কড়িকাঠ থেকে সুরু করে জানালা-দরজা ও স্তম্ভগুলি পর্য্যন্ত সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বিহারে ভিক্ষুদের বাসগৃহগুলি এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে যার চমৎকারিত্ব বর্ণনা করতে ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। পামীরের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছয়টি দেশের রাজারা এই বিহারের জন্য খুব দামী দামী মণিমুক্তা দান করেছেন এবং এর নির্ম্মাণকার্য্যে সাহায্য করেছেন।

মূর্তি-শোভাযাত্রা উৎসব সমাপ্ত হলে পর ফা-হিয়েন ও সেং-শাও বাদে তাঁর অপর সঙ্গীরা এখান থেকে চাকুকার (সম্ভবতঃ বর্তমান ইয়ারখন্দ) দিকে অগ্রসর হন এবং প্রায় পনের দিন পর সেখানে গিয়ে পৌছেন। অপরদিকে সেংশাও অন্য একজন বিদেশী শ্রমণের সঙ্গে কোপে হেনির (সম্ভবতঃ বর্তমান আফগানিস্থানের রাজধানী কাবুল শহর) দিকে যাত্রা করেন।

ফা-হিয়েনরা চাকুকার এসে দেখেন যে, সেখানেও প্রায় এক হাজার মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস। এখানকার রাজাও বুদ্ধের একজন প্রধান ভক্ত। এখানে ১৫ দিন থাকবার পর পুনরায় যাত্রা করে তীর্থযাত্রীরা পামীরের মধ্য দিয়ে চার দিন ধরে পথ চলার পর আগঙীদের দেশে এসে পৌছেন। গ্রীষ্মকালীন বর্ষাবসানকাল

২। খালচার নাম ও তার অবস্থান নির্ণয় সঠিকভাবে করতে পারা যায় নি। এ বিষয়ে মতান্তর আছে। ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-কাহিনীর ফরাসী অনুবাদক Remusat বলেছেন, এটা সম্ভবতঃ বর্তমান কাশ্মীর। Kalaproth বলেন, ইসকারদু Beal-এর মতে কারচু চৌ ও লেগ-এর মতে এটা সম্ভবতঃ ল্যাডাক কিংবা এরই অঞ্চলভুক্ত কোন স্থানের নাম। Li-yunghsi বলেছেন এটি খালচা।

৩। কোন শ্রদ্ধেয় অর্হৎ, ভিক্ষু, বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধদেবের দেহাংশ বা তাদের পূতাস্থি নিয়ে সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা একটি করে সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বৌদ্ধেরা এই সব সমাধিমন্দিরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণপূর্ব্বক তাঁদের স্মরণ করে থাকেন। এই সমাধি স্মরণিক মন্দিরগুলিকে স্তূপ বলা হয়। সাধারণতঃ এর উপরিভাগ গোলাকৃতি। বৌদ্ধরা অনেক ক্ষেত্রে স্তূপ রচনা করেছেন যার নীচে কোন পূতাস্থিই নেই, বুদ্ধের কোন বিশেষ ঘটনাস্থলকে স্মরণ করেই সেইগুলি নির্ম্মাণ করা হয়েছে যা এই বিবরণীর অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যাবে—অনুবাদক।

এখানে কাটিয়ে তীর্থযাত্রীরা উত্তরদিকে এগোতে থাকেন এবং প্রায় ২৫ দিনের মাথায় খালচা এসে পৌঁছেন। এখানে এসেই ফা-হিয়েন তাঁর সতীর্থ হুই-চিং, হুই-ওয়ে ও চে-ইয়েন-এর সঙ্গে পুনরায় মিলিত হন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা যখন খালচায় এসে পৌঁছেন তখন সৌভাগ্যবশতঃ সেখানে মহাপঞ্চবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। এই মহাসভায় এ রাজ্যের প্রায় সমস্ত বৌদ্ধভিক্ষু যোগদান করেন। ভিক্ষুগণ যখন বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে এসে সমবেত হন তখন দেশের রাজা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বিশেষভাবে নির্মিত ও সজ্জিত সভামণ্ডপে নিয়ে যান। সভামণ্ডপে শুধু মাদুর বিছিয়ে দিয়ে তার উপরই ভিক্ষুদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ এই সভা বসন্তকালের প্রথম তিন মাসের যে-কোন একটি মাসেই অনুষ্ঠিত হয়। ভিক্ষুদের প্রতি রাজার শ্রদ্ধানিবেদনের পর রাজা তাঁর মন্ত্রীবর্গের অনুরূপ শ্রদ্ধা জানাবার নির্দেশ দেন। শ্রদ্ধানিবেদনের পালা শেষ হলে পর রাজা তাঁর মন্ত্রীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী সমভিব্যাহারে একটি সাদা পশমের কাপড় পরে ভিক্ষুদের মধ্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও সেই সঙ্গে দামী দামী মণি-মাণিক্যাদি বণ্টন করে দেন। দান সমাপ্ত হলে পর রাজা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী দ্রব্যাদি পুনরায় ভিক্ষুদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নেন।

চিরতুষারাবৃত এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত শস্যাদি উৎপন্ন হয় তার মধ্যে একমাত্র গমই পাকে। রাজা উপস্থিত ভিক্ষুদের সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় শস্যাদি দান করে পরে সাধারণ ভাবে অনুরোধ করেন যে, তাদের বিশেষ শক্তিবলে এই গম পাকিয়ে নিয়ে তবে যেন তারা সেগুলি গ্রহণ করেন।[১]

ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত প্রস্তরনির্মিত পিকদানীটি এখানেই আছে; আর আছে বুদ্ধের একটি দাঁত। বুদ্ধের এই পূতাস্থির উপর একটি স্তূপও নির্মিত হয়েছে। স্তূপের আশেপাশে হাজার ভিক্ষুর বাস। এখানকার ভিক্ষুরা যেসব নিয়মাবলী মেনে চলেন তা সত্যই চমকপ্রদ, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় এত বেশী যে, এ কাহিনীতে তা বিবৃত করা সম্ভব নয়। খালচা পামীরের মধ্যবর্তী অঞ্চল এবং এখান থেকে যতই পশ্চিমদিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই চীনদেশের সঙ্গে সেখানকার সর্ব্ববিষয়ে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যাবে। চীনদেশের সহিত তখন এ দেশের মিল পাওয়া যাবে মাত্র বাঁশ, বেদানা ও ইক্ষু গাছের।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে পশ্চিম দিকে অর্থাৎ উত্তর ভারতের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকেন। তুষারাবৃত পামীর পার হতে তীর্থযাত্রীদের সময় লাগল প্রায় এক মাস। এই পামীরের পথ এতই বিপদসঙ্কুল যে, দশ হাজারের মধ্যে বোধ হয় একজন পথিকও ফিরে আসতে পারে না। এখানকার পথে এক অদ্ভুত ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়, তারা রেগে গেলে তাদের নিশ্বাসপ্রশ্বাস এত জোরে বইতে থাকে যে, তাদের অবস্থান-ক্ষেত্রের বেশ খানিকটা জুড়ে এক বিরাট বালির ঝড় উঠে যায়। এখানে যারা বাস করে তাদের 'তুষার মানব' বলা হয়। ভগবান তথাগতের সবিশেষ করুণাবলে তীর্থযাত্রীরা নির্ব্বিঘ্নেই এই পথ পেরিয়ে উত্তর ভারতের সীমান্ত রাজ্য দারদায় এসে পৌঁছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তীর্থযাত্রীরা এই হিমের দেশেও অনেক মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস দেখতে পেয়েছেন। কথিত আছে, এই দেশে বহুপূর্ব্বে একজন অর্হৎ[২] বাস করতেন যিনি তাঁর ঐশ্বরিক শক্তিবলে একজন শিল্পীকে একবার তুষিতা স্বর্গে[৩] মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বের[৪] অবয়বের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই শিল্পী পরে পৃথিবীতে ফিরে এসে ঠিক সেই মাপের একটি কাঠের মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি তৈরি করেছিলেন। মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণ করবার জন্য শিল্পীকে তিনবার তুষিতা স্বর্গে যেতে হয়েছিল। মূর্ত্তিটি উচ্চতায় প্রায় ৮০ ফুট, এর নিচের দিকটা প্রায় ৮ ফুট চওড়া। মাঝে মাঝে, বিশেষতঃ উপবাসের দিনে এই মূর্ত্তি থেকে এক তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হতে দেখা যায়। দেশবিদেশের রাজারাজড়াদের মধ্যে এই মূর্ত্তিটির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। দারদার এই মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি তার অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আজও বিরাজ করছে, মহাকালের স্রোতে তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়ে যায় নি।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে ক্রমাগত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। যাত্রীরা এবার এক মহাবিপদসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথের সম্মুখীন হন। প্রায় ১০ হাজার ফুট উঁচু খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে একটি সংকীর্ণ পথ—যার এক পাশে অভ্রভেদী

১। Wathers-এর মতে খালচার ভিক্ষুদের পবনবিজয়ের বিশেষ ক্ষমতা ছিল সেইজন্যই তাঁদের খাদ্যশস্যাদি সুপক্ব করে নিয়ে গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ করা হ'ত—('Travels of FA-hien')

২। শুদ্ধাচারী আর্য্যেরা—যাঁরা বৌদ্ধসাধনতন্ত্রের আটটি পথই পার হয়ে ষড়রিপু জয় করেছেন তাঁরাই অর্হৎ-এর পর্য্যায়ভুক্ত হন। সাধারণতঃ অর্হৎরা কতকগুলি ঐশ্বরিক ক্ষমতার অধিকারী হন এবং তাঁদের পুনরায় বুদ্ধত্ব অর্জ্জন করতে হয় না, কারণ তাঁরা যে নির্ব্বাণের পথ অতিক্রম করে এসেছেন এটা ধরেই নেওয়া হয়। এদের আর মাটির পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না বলেই বৌদ্ধদের বিশ্বাস।

('Travels of FA-hien', pp. 24-25)

৩। তুষিতা স্বর্গকে চতুর্থ দেবলোক বলা হয় যেখানে সব বোধিসত্ত্বই পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে বুদ্ধ হয়ে জন্মান। তুষিতা স্বর্গে জীবন ৪০০০ বৎসরকাল স্থায়ী, কিন্তু সেখানকার ২৪ ঘণ্টা পৃথিবীর ৪০০ বৎসরের সমান। ('Travels of FA-hien' p. 25)

শিলাখণ্ড ও অপর দিকে গভীর খাদ, যার তলদেশ দিয়ে বয়ে গেছে সিন্ধু নদ। এই সঙ্কীর্ণ পথ কতকটা উঁচু দিকে গিয়ে পরে নিচের দিকে নেমে গেছে। পথটি ক্রমশঃ আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে এবং এক এক স্থানে এতই সঙ্কীর্ণ যে পা ফেলার স্থানটুকুও পাওয়া যায় না, অনেক কষ্ট করে খুঁজে বার করতে হয়। এই দুর্গম পথে চলার সুবিধার জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী পথিকেরা পাহাড় কেটে কেটে সিঁড়ি বানিয়েছেন এবং স্থানে স্থানে পথের সংযোগ পাহাড়ের ফাটলের জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে—সেখানে কাঠের মই লাগিয়ে দিয়েছেন। এ রকম মইয়ের সংখ্যা প্রায় সাত শত। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে তীর্থযাত্রীরা একটা ৮০ হাত লম্বা দড়ির সাঁকোর উপর দিয়ে সিন্ধুনদ অতিক্রম করে উত্তর ভারতে প্রথম পদক্ষেপ করেন।

তীর্থযাত্রীরা উত্তর ভারতে এসে পৌঁছলে পর এখানকার অধিবাসী শ্রমণেরা ফা-হিয়েনকে জিজ্ঞাসা করেন, পূবের দেশে (অর্থাৎ চীনে) বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম প্রচার কখন হয়েছিল? প্রত্যুত্তরে ফা-হিয়েন বলেছিলেন, আমি এ বিষয়ে সেখানকার অধিবাসীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম বহুযুগ পূর্ব্বেই সেখানে প্রচারিত হয়েছিল। তাঁরা বলেছেন যে, ভারদায় মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিস্থাপনের পর বহু ভারতীয় শ্রমণ ভগবান বুদ্ধের অনুশাসনলিপি ও প্রতিকৃতি সঙ্গে নিয়ে সিন্ধুনদ পেরিয়ে পূবের দেশে চলে যান তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের[৫] প্রায় ৩০০ বৎসর পরে মৈত্রেয়ী বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। ধরে নেওয়া যায়, সমসাময়িক চীনের রাজা পিয়েনের সময় থেকেই পূবের দেশে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। সেইটাই সম্ভবতঃ ঠিক, কারণ রাজা মিং-এর স্বপ্ন কখনও মিথ্যা হতে পারে না।[৬]

৪। বৌদ্ধদের বিশ্বাস মৈত্রেয় এখন বোধিসত্ত্বরূপে তুষিতা স্বর্গে বিরাজ করছেন এবং যথাসময়ে তিনি ধরাধামে ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হবেন। মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের রং সোনার মত হলদে এবং ইনি চতুর্ভুজ ও দ্বিভুজ এই দুই রূপেই কল্পিত হন।

(বৌদ্ধদের দেবদেবী—শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য। পৃষ্ঠা ৩০)

৫। সম্ভবতঃ ফা-হিয়েন এখানে বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণ লাভ অর্থাৎ মৃত্যুর পরের কথারই উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

৬। চীনের রাজা মিং ৬১ খ্রীষ্টাব্দে একদিন রাত্রে স্বপ্নের ঘোরে একটি জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি দেখতে পেয়েছিলেন। নিদ্রা-ভঙ্গের পর তিনি মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করলে পর তাঁদের মধ্যে একজন বলেন যে, রাজা স্বপ্নে বুদ্ধদেবকেই দেখেছেন। রাজা তখন পশ্চিমের দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করেন এবং ৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দূতেরা ২ জন শ্রমণকে চীনে নিয়ে যান—যাঁদের প্রচেষ্টাতেই চীনে পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারলাভ ঘটে। (Record of Buddhist kingdoms by Li-yung-Shi, p. 24)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রীরা উত্তর ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে এসে পৌঁছেন উড্ডিয়ান[১] রাজ্যের রাজধানীতে, এটা উত্তর ভারতের অন্তর্গত হলেও এখানে মধ্যভারতের ভাষারই চলন। মধ্যভারত বলতে মধ্য রাজ্যকেই বোঝায়, বুদ্ধের অনুশাসনগুলি এখানে বহুল-প্রচারিত। সাধারণতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যেখানে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করেন সে স্থানকে এখানকার অধিবাসীরা 'সংঘারাম'[২] বলে এবং বহিরাগত ভিক্ষুরা যখন এখানে তীর্থভ্রমণে আসেন তখন এই সংঘারামসমূহেই তিন দিনের জন্য তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের নিজেদের বাসস্থান খুঁজে নিতে অনুরোধ করা হয়। তীর্থযাত্রীরা এখানে প্রায় ৫০০ মহাযানপন্থী ভিক্ষুর বাস আছে দেখেছিলেন। এখানে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগবান বুদ্ধ যখন উত্তর ভারত পরিদর্শনে আসেন তখন এই উড্ডিয়ানই প্রথম তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয় এবং এখনও পর্য্যন্ত এই প্রবাদের সত্যতা স্থানীয় অধিবাসীরা স্বীকার করেন। বুদ্ধদেব যে শিলাখণ্ডটির উপর তাঁর উত্তরীয়খানি রৌদ্রে শুকোতে দেন সেটিকে এখনও এরা অতি যত্নসহকারে রেখে দিয়েছেন।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে হুই-চিং, তাও-চিং ও হুই-ইং এখান থেকে বর্ষাবসানকালের পূর্ব্বেই নগরহার[৩] রাজ্যভুক্ত যে স্থানে বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া আছে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, দলের অপরাপর যাত্রীরা এইখানেই বর্ষাবসানকাল কাটিয়ে সুবাস্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। কথিত আছে পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবকে পরীক্ষা করার মানসে একটি বাজপাখী ও একটি ঘুঘু-পাখী সৃষ্টি করে বাজপাখীটিকে ঘুঘুপাখীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। বুদ্ধদেব এই দেখে নিজের দেহের খানিকটা মাংস কেটে বাজ-পাখীটিকে দিয়ে ঘুঘুটির প্রাণভিক্ষা করেন। বুদ্ধত্বলাভের পর যখন তিনি শিষ্য সমভিব্যাহারে এই স্থান পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি উপরোক্ত স্থল লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'এখানেই আমি নিজ দেহের মাংসের বিনিময়ে একটি ঘুঘুর জীবন ক্রয় করি। ভবিষ্যৎ কালে বৌদ্ধধর্ম্মানুগামীরা এখানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও সেটিকে সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দেন।

১। পঞ্জাবের উত্তরে অবস্থিত বর্ত্তমান সুওয়াত অঞ্চলকে উড্ডিয়ান বলা হ'ত। ফুলফল ও বিভিন্ন গাছের বনে এ অঞ্চল বিখ্যাত।

২। কাবুল নদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী একটি রাজ্য। বর্ত্তমান জালালাবাদের ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

('Travels of FA-hien', p 29)

৩। সংস্কৃত ভাষায় বিহারকে 'সংঘারাম' বলা হয়—সম্ভবতঃ ফা-হিয়েন এখানে বিহারেরই উল্লেখ করছেন।—অনুবাদক।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে গান্ধারে৪ এসে পৌঁছেন। এককালে এই গান্ধার অশোকের পুত্র ধর্ম্মবিবর্ধনের শাসনাধীন ছিল, এইখানেই বুদ্ধদেব বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ে থাকাকালে একটি অন্ধকে নিজের চক্ষু দান করেছিলেন। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সবাই হীনযানপন্থী বৌদ্ধ। এখান থেকে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা সাত দিনের দিন তক্ষশীলায়৫ এসে পৌঁছেন। কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ে ছিলেন তখন এইখানেই তিনি তাঁর মস্তক একজনকে ভিক্ষাস্বরূপ দান করেছিলেন; সেই কারণেই বোধ হয় এই স্থান তক্ষশীলা নামে পরিচিত হয়েছে। বুদ্ধদেব এখান থেকে কিছু দূরে এক স্থানে একটি ক্ষুধার্ত্ত বাঘিনীকে খাদ্যস্বরূপ নিজেকে উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের স্মৃতিবিজড়িত উপরোক্ত প্রত্যেকটি স্থানেই একটি করে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে এবং রাজা-প্রজা নির্ব্বিশেষে সেইসব স্তূপে পুষ্প-ধূপাদি দিয়ে পূজা-অর্চনাদি করে আসছেন। তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে পুরুষপুরে (বর্ত্তমান পেশোয়ার) এসে পৌঁছেন।

কথিত আছে, বুদ্ধদেব যখন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে পুরুষপুর পরিদর্শনে আসেন তখন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে৬ বলেন, "আমার পরিনির্ব্বাণলাভের পর কনিষ্ক নামে একজন রাজা এখানে একটা স্তূপ নির্ম্মাণ করবেন"। ভবিষ্যৎকালে যখন কনিষ্ক এই পুরুষপুরে বেড়াতে আসেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র কনিষ্কের মনে স্তূপ নির্ম্মাণের বাসনা জাগাবার উদ্দেশ্যে এক ছোট মেষপালকের ছদ্মবেশ ধরে এসে রাজা কনিষ্কের যাত্রাপথের পাশেই একটি ছোট্ট স্তূপ রচনায় নিবিষ্ট হন। যাত্রাকালে রাজার এদিকে দৃষ্টি পড়ায় তিনি বালকটিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে কি তৈরি করতে ব্যস্ত? প্রত্যুত্তরে বালকটি জানায় যে, সে বুদ্ধের জন্ত একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করছে। রাজা বালকটির কথায় মুগ্ধ হয়ে যান এবং সেইখানেই একটি বড় স্তূপ নির্ম্মাণের বাসনা প্রকাশ করেন। রাজা যে স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন সেটি প্রায় ৪০০ ফুট উঁচু। সারা জম্বুদ্বীপে৭ যতগুলি স্তূপ তীর্থযাত্রীরা দেখেছেন তার মধ্যে এটিই স্থাপত্যশিল্পে, কারুকার্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও আভিজাত্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়।

বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্রটিও এই পুরুষপুরেই আছে। কথিত আছে, কোন এক শকরাজা৮ এক সময় তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এই দেশ আক্রমণ করেন ও জয় করেন। রাজা এবং তাঁর অমাত্যবর্গ ভগবান বুদ্ধের বিশেষ ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁরা বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্রটি এখান থেকে সঙ্গে নিয়ে যাবার সঙ্কল্প করেন। ভিক্ষাপাত্রটির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের পর একটি সজ্জিত আধারে ভিক্ষাপাত্রটি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে একটি হস্তীপৃষ্ঠে রাখা হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আধারটি হস্তীপৃষ্ঠে রাখার সঙ্গে সঙ্গে হস্তীটি বসে পড়ে, শত চেষ্টা করেও তাকে ওঠানো সম্ভব হয় নি। এর পরে একটি চার-চাকার শকটের ওপর এটিকে রেখে আটটি হস্তীকে শকট টানার জন্ত জুতে দেওয়া হয়, কিন্তু ফল পূর্ব্বের মতই, অর্থাৎ গাড়ীর চাকা একটুও ঘুরল না—আটটি হস্তীতেও নড়াতে পারলে না। দুবার নিষ্ফল চেষ্টার পর রাজা বুঝলেন যে, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় তাঁর এখনও আসে নি, তখন তিনি এই স্থানেই একটা স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করে দেন। ভিক্ষাপাত্রটির প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখবার জন্ত একজন রক্ষীও নিয়োগ করে দেন। রাজার এই নবনির্ম্মিত বিহারে এখন প্রায় ৭ হাজারেরও বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে তাঁরা (ভিক্ষুরা) ভিক্ষাপাত্রটি সহ উপস্থিত হন, সাধারণের সহযোগিতায় স্তূপের বাইরে নিয়ে আসেন ও সেটিকে পূজা-অর্চনা করে তাঁরা মধ্যাহ্নকালীন আহারাদি গ্রহণ করেন। সন্ধ্যাকালেও একবার ভিক্ষাপাত্রটি বাইরে নিয়ে এসে ধূপধুনো জ্বালিয়ে এর প্রতি ভিক্ষুরা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন।

৪। Eitel-এর মতে এটি একটি অতি প্রাচীন রাজ্য; ধেরি এবং বানজোর অঞ্চলের মধ্যেই এর অবস্থিতি (Travels of FA-hien, p. 31)

৫। Eitel-এর মতে গ্রীকদের Taxila বর্ত্তমান হুসুন আবদলের অঞ্চলভুক্ত। কানিংহাম বলেছেন, এটি বোধ হয় আর্য্যদের Taxila। পঞ্জাবের উপরিভাগে শাধেরি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, যার চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়, এবং এটি সিন্ধুনদ ও ঝিলাম নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ফা-হিয়েনের বিবরণীর সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই দেখা যায়। (Travels of FA-hien, p. 34)

৬। আনন্দ শাক্যমুনির প্রথম ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি শাক্যমুনির বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসনের রচনাকালে ইনি বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। এঁর সঙ্গে শাক্যমুনির খুব সদ্ভাব ছিল। বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণকালে এঁকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন মহাপরিনির্ব্বাণসূত্রে সেগুলির উল্লেখ আছে। আনন্দ অপর একটি কল্পে এই পৃথিবীতে আবার বুদ্ধ হয়ে জন্মাবেন বলে বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন। (Sacred Books of the East vol XI pp. 9)

৮। জম্বুদ্বীপ চারিটি বিরাট মহাদেশের মধ্যে একটি যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের খুবই প্রসারলাভ ঘটেছিল। এই দ্বীপের আকার জম্বুগাছের পাতার মত হওয়ার দরুন এর নামকরণ হয়েছে জম্বুদ্বীপ। ('Travels of FA-hien' p. 36)

৯। সম্ভবতঃ রাজা কনিষ্কের কথাই ফা-হিয়েন এখানে উল্লেখ করেছেন।

চিরদীপ্যমান এই ভিক্ষাপাত্রটিতে১০ বড়জোর দু'কুনকে চাল ধরবে। এর বাইরের দিকটা নানা রঙে সজ্জিত, তার মধ্যে কালো রঙটাই প্রধান এবং এটা প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি মোটা। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গরীব ভক্তজন সামান্যমাত্র পুষ্পও এর মধ্যে অর্পণ করলে এটি আপনা থেকেই ভরে ওঠে, কিন্তু ধনী লোকেরা লক্ষ লক্ষ পুষ্পের ডালি দিয়ে চেষ্টা করলেও এটা ভরাতে সক্ষম হয় না।

তীর্থযাত্রীদের মধ্যে পাও-ইউন এবং সেং-চিং ভিক্ষাপাত্রটির প্রতি তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার পর স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য মনস্থির করেন। দলের অপর তিনজন—যাঁরা ইতিপূর্ব্বেই বুদ্ধের প্রতিচ্ছায়া দর্শনের উদ্দেশ্যে নগরহারের দিকে যাত্রা করেছিলেন তাদের মধ্যে ফিরে এলেন কেবল হুই-ইং। তিনিও পাও-ইউনের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে যাওয়াই স্থির করলেন। অগত্যা সঙ্গীহীন হয়ে ফা-হিয়েন একাকীই হিলো নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৬ যোজন১ পথ অতিক্রম করে ফা-হিয়েন নগরহার রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী নগরী হিলোতে এসে পৌঁছেন। এখানকার এক বিহারে বুদ্ধদেবের মস্তকের একটি অস্থি রক্ষিত আছে। অস্থিটি আগাগোড়া সোনা দিয়ে মোড়া ও সপ্তরত্ন দিয়ে বিশেষভাবে সজ্জিত। নগরহারের রাজা বুদ্ধের এই পূতাস্থি যাতে কোন রকমে চুরি না যায় সেই জন্য নগরীর আট জন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের ওপর এই বিহারদ্বার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন ও এঁদের প্রত্যেককেই রাজা একটি করে মোহর দিয়েছেন। এঁরা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বিহারদ্বার রুদ্ধ করে তার ওপর এদের স্ব-স্ব মোহরের ছাপ দিয়ে যান ও প্রভাত-অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা স্ব-স্ব মোহরের ছাপ অটুট আছে কিনা দেখে তার পর পুনরায় দ্বার খোলেন। এর পর সুগন্ধি জলে নিজেদের হাত ধুয়ে পূতাস্থিটি বিহারের বাইরে বের করে এনে মণিমুক্তাখচিত একটি সিংহাসনের উপর রাখেন। পূতাস্থিটি ফিকে হলদে রঙের এবং এর আকৃতি ১২ ইঞ্চি পরিমিত এক গোলাকৃতি বৃত্তের মত ও মধ্যস্থানটা একটু উঁচু। বিহারের বাইরে পূতাস্থি আনার সঙ্গে সঙ্গে বিহার-রক্ষক একটি সু-উচ্চ স্থানে উঠে শাঁখ, কাড়ানাকাড়া প্রভৃতি বাজাতে থাকেন ও রাজা ঐ শব্দ শোনামাত্র বিহারের পূর্ব্ব-দিক দিয়ে এসে পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা পূজাপাঠ সাঙ্গ করে কপালে পূতাস্থিটি একবার ছোঁয়ান। তার পর পশ্চিম দিক দিয়ে প্রাসাদে ফিরে গিয়ে রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্যাবলী সুরু করেন। রাজার অনুচরবর্গ এবং বৈশ্যসম্প্রদায়ের প্রধানেরা পূতাস্থির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্ম্মে হাত দেন। এটি প্রতিদিনের ঘটনা এবং এই প্রথা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। সবাইকার পূজা সাঙ্গ হলে পর এটিকে আবার স্তূপের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিহারদ্বারে প্রভাতে প্রতিদিন ফুলওয়ালীরা ফুল ও ধূপাদি বিক্রয় করে থাকে। যারা পূজা করতে ইচ্ছুক তারা সেই সব ফুল ও ধূপ কিনে পূজাপাঠ করে থাকে। প্রায়ই বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁদের দূত মারফত এই পূতাস্থির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যাদি প্রেরণ করে থাকেন। বিহারটি এমন এক-স্থানে নির্ম্মিত যে, ভূমিকম্প বা বন্যায় পর্য্যন্ত এর কখনই কোন ক্ষতি হবে না।

ফা-হিয়েন এখান থেকে উত্তরদিকে আর এক যোজন দূরে অবস্থিত নগরহারের রাজধানীতে এসে পৌঁছেন। এইখানেই বুদ্ধ-দেব যখন বোধিসত্ত্বের পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন তখন একবার অর্থ দিয়ে পাঁচটি ফুলের গুচ্ছ ক্রয় করে দীপঙ্কর বুদ্ধের২ প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন। নগরীর মধ্যস্থানে একটি স্তূপও আছে। সেখানে বুদ্ধের একটি দাঁত রাখা হয়েছে, বুদ্ধদেবের ধাতুমণ্ডিত যষ্টিটি সেখানে রাখা হয়েছে, সেটি রাজধানী থেকে প্রায় এক যোজন দূরে অবস্থিত। যষ্টিটি গোশীর্ষ চন্দন কাঠের৩ তৈরী এবং লম্বায় প্রায় ১৭ ফুট। একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে এটিকে রাখা হয়েছে। বুদ্ধদেবের উত্তরীয়খানিও এখানকার বিহারের মধ্যে রক্ষিত আছে। দেশে যখন খুবই জলাভাব দেখা দেয় তখন এখানকার অধিবাসীরা সবাই মিলে বুদ্ধের উত্তরীয় বিহারের বাইরে বের করে এনে পূজা-অর্চনা করে থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রবল বৃষ্টি দেখা দেয়।

এখান থেকে দক্ষিণাভিমুখে আধ যোজন এগিয়ে গেলে একটি বিরাট শিলাখণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। ১০ হাত দূর থেকে যদি

১০। প্রদত্ত ভিক্ষাপাত্রটি যখন গৌতমের বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যায় তখন পৃথ্বীর পরিচালক চারি দেবতা বুদ্ধকে একটি পান্নার তৈরী ভিক্ষাপাত্র এনে দেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তা গ্রহণ করেন নি। এর পর দেবতারা চারিটি পাথরের তৈরী ভিক্ষাপাত্র এনে বুদ্ধের সামনে হাজির করেন এবং বুদ্ধদেব চারিটি ভিক্ষাপাত্র মিলিয়ে একটি ভিক্ষাপাত্রে পরিণত করেন, সেইটাই তিনি গ্রহণ করেন।

(Travels of FA-hien, p. 35)

১। এই প্রথম আমরা দেখছি যে, ফা-হিয়েন পথের দূরত্ব যোজন দিয়ে উল্লেখ করছেন। এক যোজন পথ একটি সৈন্য-বাহিনীর একদিনের অগ্রগতির সমান দূরে, কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্র অনুসারে কখন কখন যোজন পাঁচ মাইলের সমদূরত্ববিশিষ্ট বলে উল্লিখিত হয়েছে।

(Record of Buddhist Kingdom by Le-yung-Shi, p. 29)

২। শাক্যমুনির ২৪তম পূর্ব্বের বুদ্ধের নাম ছিল দীপঙ্কর বুদ্ধ।

৩। মেরুপর্ব্বতের দক্ষিণে অবস্থিত উলাবৃক্ষ পর্ব্বতে চন্দন-কাঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পর্ব্বতটি অনেকটা গরুর মাথার মত আকৃতিবিশিষ্ট, বোধ হয় তাই পর্ব্বতটিকে 'গোশীর্ষ পর্ব্বত' বলে ফা-হিয়েন অভিহিত করেছেন—অনুবাদক।

এই শিলাখণ্ডের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয় তা হলে তপ্ত কাঞ্চন রঙের বুদ্ধের যেন একটি প্রতিমূর্ত্তি শিলাখণ্ডের গায়ে দেখা যাবে, কিন্তু শিলার যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যাবে মূর্ত্তিটি ততই আবছা হয়ে আসবে এবং মনে হবে যেন পূর্ব্বের দেখা মূর্ত্তিটি একটি কাল্পনিক চিত্র। এর একটি প্রতিচ্ছবি অঙ্কনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের রাজারা তাঁদের শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের এখানে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোন শিল্পীই এই প্রতিচ্ছবিকে তাঁদের তুলিতে রূপ দিতে পারেন নি। প্রবাদ আছে যে, এই শিলাখণ্ডের উপরই এক হাজার বুদ্ধ তাঁদের প্রতিচ্ছায়া রেখে যাবেন; এরই আশেপাশে অসংখ্য স্তূপ রয়েছে, প্রত্যেক স্তূপের পিছনে বুদ্ধের জীবনের কোন-না-কোন অংশের স্মৃতি বিজড়িত—যেমন তার মস্তকমুণ্ডন, নখ-কর্ত্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইখানেই বুদ্ধদেব নিজে শিষ্যবর্গের সহায়তায় একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন, সেটি ভবিষ্যৎকালে স্তূপনির্ম্মাণের আদর্শস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর পাশেই একটি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে—যেখানে ফা-হিয়েন প্রায় সাত হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেছিলেন। অর্হৎ৪ ও প্রত্যেক বুদ্ধের৫ সম্মানে এখানে প্রায় এক হাজারের ওপর স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শীতঋতুটা ফা-হিয়েন এখানেই কাটিয়ে দেন। এখানে অবস্থান-কালেই তাঁর দু'জন সতীর্থ তাও-চিং ও হুই-চিং এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। শীতঋতুর তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত এখানে কাটিয়ে ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। পথে তাঁরা তুষারাবৃত এক পর্ব্বতমালার সম্মুখীন হন। পর্ব্বত-মালা অতিক্রমকালে তাঁরা হঠাৎ হিমশীতল ঝড়ের মুখে পড়ে যান এবং তাঁদের বাক্‌শক্তি কিছুক্ষণের জন্য প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হারিয়ে ফেলেন। ফা-হিয়েনের সতীর্থ হুই-চিং বিশেষভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর চলৎশক্তি রহিত হয়ে যায়। তাঁর মুখ দিয়ে কেবল সাদা গেঁজলা উঠতে থাকে। হুই-চিং বুঝেছিলেন যে, তিনি জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন, তাই তিনি ফা-হিয়েনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমি আর বেশীক্ষণ বাঁচব না, আপনারা যতশীঘ্র পারেন এখান থেকে চলে যান যেন আমরা একসঙ্গে সবাই মিলে এখানে মরে না যাই।" এর কিছুক্ষণ পরেই তাঁর জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হয়। ফা-হিয়েন তাঁর সতীর্থের এই অকালমৃত্যুতে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কেঁদে ফেলেন। তিনি তাঁর সতীর্থের উদ্দেশে বলেন, "আমাদের মূল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হয়ে গেল—নিয়তির কি নিষ্ঠুর পরিহাস, আমরা এখন কি করি?" যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে সর্ব্বশেষ সতীর্থ তাও-চিং সহ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে রোহি৬ নগরে এসে পৌঁছেন। এখানে ফা-হিয়েন প্রায় তিন হাজার ভিক্ষুকে বসবাস করতে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে মহাযান ও ও হীনযান এই উভয়পন্থী ভিক্ষুই আছেন, এখানে এঁরা বর্ষাবসান-কাল কাটিয়ে পোনাতে (বর্ত্তমান বান্নু) এসে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে পুনরায় সিন্ধুনদ পার হয়ে ভিদায় (বর্ত্তমান পঞ্জাবের অন্তর্গত) এসে পৌঁছেন। এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের খুবই প্রসারলাভ ঘটেছে এবং উভয়পন্থী ভিক্ষুরই বাস রয়েছে। এখানকার ভিক্ষুরা ফা-হিয়েন ও তাঁর সতীর্থকে দেখে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যান এই ভেবে যে, এত দূরদেশ থেকে ধর্ম্মানুশাসনের সন্ধানে এঁদের আসতে হয়েছে। তাঁরা অবশ্য খুবই সহানুভূতির সঙ্গে তীর্থ-পথিকদ্বয়কে আদর-আপ্যায়ন করেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়ে সাহায্য করেন। এখান থেকে ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হয়ে তীর্থযাত্রীরা মথুরায় এসে পৌঁছেন। পথিমধ্যে অসংখ্য বিহার ও শতসহস্র ভিক্ষুর সংস্পর্শে এসে এঁরা তৃপ্ত হন। (ক্রমশঃ)
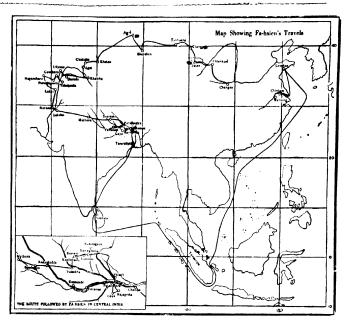
৪। ১২ পৃষ্ঠার ১নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৫। প্রত্যেক বুদ্ধ তাঁদেরই বলে যাঁরা নিজেরাই শুধু নির্ব্বাণ-লাভ করেছেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করেন নি। এইরূপ স্বার্থপর মনোভাব বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী বললেও অত্যুক্তি হয় না—অনুবাদক।

৬। রোহি আফগানিস্থানের একটি নাম, কিন্তু ফা-হিয়েন এর একটি অংশবিশেষকেই এখানে উল্লেখ করেছেন মাত্র। (Travels of FA-hien, p. 41)

অঘোরনাথ গুপ্ত

শ্রীসতীকুমার চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ স্থান। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশ হইতে সমস্ত ভারতবর্ষে শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতির অপূর্ব্ব জাগরণ আসিয়াছিল। এই নব অভ্যুদয়ের আলোকশিখাস্বরূপ যে সকল মহাত্মার আবির্ভাব হয়, সাধু অঘোরনাথ তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৪১ সনে নদীয়ায় শান্তিপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র গুপ্ত কবিভূষণ যোগীপুরুষ ছিলেন। ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। বার বৎসর বয়সে অঘোরনাথ পিতৃহীন হন। টোল ও পাঠশালায় তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করা হয়। ঐ সময়ে (১৮৫৭) তরুণ যুবক কেশবচন্দ্র কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত প্রবল উৎসাহে নবধর্ম্ম-রচনার আয়োজন করিতেছিলেন। এত দিন ব্রাহ্মসমাজগৃহে সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে বেদ, উপনিষদ ও তন্ত্রের বাক্য আবৃত্তি করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা হইত। তখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মসমাজের জীবনপ্রণালী গড়িয়া উঠে নাই। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'* ও 'সঙ্গত সভা'† গঠন করিলেন ; একটিতে উচ্চ ধর্ম্ম ও দর্শন শিক্ষা অন্যটিতে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ ও নিজ নিজ সমস্যার আলোচনা ও ব্যাকুল প্রার্থনার দ্বারা চারিদিক হইতে যুবকদলকে আকর্ষণ করিলেন। তাহার ভিতর দিয়া একটি সত্যনিষ্ঠ ধার্ম্মিক যুবকদল গড়িয়া উঠিল। ক্রমে তাঁহাদের মত ও বিশ্বাস এবং নূতন উপাসনা ও জীবন পদ্ধতি আকার লাভ করিল ; গৃহ ও সমাজ নূতন রূপ ধারণ করিল। তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ। অঘোরনাথ কলিকাতায় আসিয়া স্বভাবতঃই ঐ দলে মিশিলেন।‡ এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না, তিনি নবধর্ম্মের স্রোতে ভাসিলেন এবং ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকেই জীবনের ব্রত করিয়া শেষদিন পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্র, উচ্চ অধ্যাত্মজীবন, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান দিনে দিনে আরও প্রস্ফুটিত হইল। সকল বিষয়ে তিনি ব্রহ্মানন্দের দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইলেন। জীবন হইতে জীবন সঞ্চারিত হইতে লাগিল—বিজয়কৃষ্ণ, গৌর-গোবিন্দ, ত্রৈলোক্যনাথ, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অনেকে পরস্পরের চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া ব্রহ্মানন্দের দল পুষ্ট করিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মানন্দকে 'maker of men' বলিতেন। সত্যই, ব্রহ্মানন্দের অঙ্গুলিস্পর্শে তাঁহারা এক-একটি দিক্‌পাল হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মানন্দ নূতন নূতন আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেন, আর ইঁহারা তাহা দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তখন মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ব্রহ্মানন্দের উপর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বভার তুলিয়া দিলেন।

ঐ সময়ে দুর্নীতি, জড়তা এবং সাম্প্রদায়িকতা এই তিন ব্যাধি জীবনের উন্নতির পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সেই কারণে জাতীয় ঐক্য ও উন্নতি কল্পনার অতীত ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের (১৮৫৭-৫৮) পরিণাম তাহাই জানাইয়া দিল। তাহার চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, রাজা রামমোহন অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ এখন দুর্নীতি, জড়তা ও সাম্প্রদায়িকতাকে আক্রমণ করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চয় এবং বিশ্ব-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার নানাবিধ আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১৮৮০ সনে 'নববিধান' বা সমন্বয়ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়া নববিধির বিজয়-নিশান উড়াইয়া, ৮৮৪ সনে ব্রহ্মানন্দদেব ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন।

এই সূত্রে ব্রহ্মানন্দ এক 'নব অধ্যয়নে'র প্রবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। 'নব অধ্যয়ন' এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিল। জীবন দিয়া জীবনের অধ্যয়ন* চলিল। ইহা বিস্তৃত আলোচনার বিষয়। ঐ সময়ে ব্রহ্মানন্দ এক-এক জনকে এক-একটি ধর্ম্মের, যথা—অঘোরনাথকে 'বৌদ্ধধর্ম্মে'র, গৌর-গোবিন্দকে 'হিন্দুধর্ম্মে'র, প্রতাপচন্দ্রকে 'খ্রীষ্টধর্ম্মে'র, গিরিশ-চন্দ্রকে 'ইসলামধর্ম্মে'র অধ্যেতার পদে নিয়োগ করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, কিন্তু অধ্যাত্মদৃষ্টির আলোকে, ভিন্ন

---

* ১৮৫৯, ২৪শে এপ্রিল।

† ১৮৬০, সেপ্টেম্বর

‡ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'বীরপূজা' এবং 'নব্যভারত' পত্রিকার প্রবন্ধ দেখুন।

* 'জীবনবেদ' দ্রষ্টব্য

অঘোরনাথ গুপ্ত
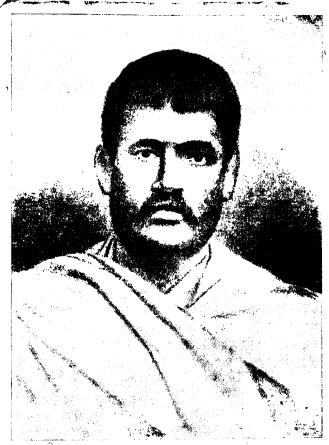
ভিন্ন ধর্ম্মের শাস্ত্রের ভিতর 'সমন্বয়ে'র সন্ধানে তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের জীবনে তাঁহারা যে সমন্বয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা সমন্বয়-বিজ্ঞানের জীবন্ত উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। জীবনে ও সাহিত্যে 'নব অধ্যয়নে'র অপূর্ব্ব ফল ফলিল। একে একে শাক্যমুনি-চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব, Oriental Christ, কোর্‌আন শরীফ, তাপসমালা, মহাপুরুষ মোহম্মদের জীবনচরিত, বেদান্তসমন্বয়-ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-সমন্বয়-ভাষ্য, গীতা-প্রপূর্ত্তি, শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা ও নানক-প্রকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং শিখধর্ম্মের সমন্বয় প্রকাশ করিল। সমন্বয়ের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া নূতন নূতন অধ্যেতা—কেশবমণ্ডলীর ভিতরে ও বাহিরে—ঐতিহাসিক, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সমাজসংস্কারক, শিক্ষক, দার্শনিকেরা বিরাট সমন্বয়-সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া চলিলেন। 'নব অধ্যয়নে'র ফল সমন্বয়-সাহিত্য। আবার সমন্বয় সাহিত্যের ফল জাতীয় সমন্বয়ের আদর্শ। ঐ আদর্শ নূতন মানুষের ও নব জাতির জন্ম ঘোষণা করিল।

অঘোরনাথ নববিধানের একটি স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সাধক-জীবনের চিত্রাঙ্কন অতি কঠিন কার্য্য। দৈনিক নিয়ম অনুযায়ী তিনি শেষরাত্রি হইতে ধ্যান ও নামগান আরম্ভ করিতেন; প্রত্যূষে স্নান ও শাস্ত্রপাঠ, তদনন্তর উপাসনা, পরিশেষে স্বহস্তে রন্ধনপূর্ব্বক আহার। তাঁহার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন অতি উপাদেয় হইত। তাহা প্রচারকগণ তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিতেন। তাঁহার ভক্তিভাব অতি প্রবল ছিল। তিনি আশৈশব নিরামিষাহারী, শুদ্ধাচারী, গম্ভীরপ্রকৃতি, সত্যপ্রিয় ও উপাসনানুরাগী ছিলেন।

নব সাধনের বিস্তারে সাধু অঘোরনাথের দানের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত প্রথমেই তাঁহাকে ১৮৬৩ সনে ঢাকায় পাঠানো হয়। সেখানে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, উপাসনাদির কার্য্য, লোকজনদের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্ত্তায় তিনি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সেখানে একটি সাধকমণ্ডলী গড়িয়া উঠে। ঢাকা হইতে ফিরিয়া তিনি অসবর্ণমতে এক বাল-বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের চারিটি সন্তান। গার্হস্থ্য জীবনেও তাঁহার নিপুণতা ছিল।

সাধু অঘোরনাথ ও পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মানন্দ ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারকার্য্যে বাহির হন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে এই প্রচারের একটি সুন্দর বর্ণনা আছে। তাহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ময়মনসিংহ নগরে কৃষি-প্রদর্শনী মেলা হয়। সেই সময় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন সাধু অঘোরনাথকে সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হন। তিনি উক্ত শকের ১৯শে কার্ত্তিক ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন, ঢাকা হইতে নৌকাযোগে ময়মনসিংহে উপনীত হইয়াছিলেন। আসিবার সময় তাঁহাদিগকে ছয়-সাত দিন পথে একখানা এক-দাঁড়ের ক্ষুদ্র নৌকায় যাপন করিতে হইয়াছিল। অপরাহ্নে ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে তাঁহাদের নৌকা সংলগ্ন হয়। কিশোরগঞ্জ সব-ডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেন তখন মেলার একজন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্রের আগমন-সংবাদ পাইয়া ঘাটে যাইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মানন্দ ও সাধু অঘোরনাথ দুই জনেই ঢাকা হইতে যাত্রা করিবার সময় জুতা হারাইয়া আসিয়াছিলেন। রামশঙ্করবাবু তাঁহাদের শূন্য পদ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে দুই জোড়া জুতা ক্রয় করিয়া আনিয়া দেন।...শীতকালে ক্ষুদ্র নৌকায় বড় ক্লেশে তাঁহাদিগকে ময়মনসিংহে যাইতে হইয়াছিল। বিছানা বালিশ ছিল না, ব্যাগ তাঁহাদের বালিশের স্থান পূরণ করিয়াছিল, দুই জনে একখানা লেপ ব্যবহার করিতেন। দুই বেলা সাধু অঘোরনাথ রাঁধিতেন, কেশবচন্দ্র তাঁহার রন্ধন-কার্য্যে সহায়তা করিতেন। শ্রুত আছি যে, ময়মনসিংহের পানে নৌকায় অবস্থানকালে আচার্য্য প্রসিদ্ধ True Faith পুস্তক লিখিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র চারি দিনের অধিক ময়মনসিংহে ছিলেন না। একদিন ইংরাজি বক্তৃতা ও একদিন বাঙ্গলা বক্তৃতা হইয়াছিল। সাধু অঘোর-নাথ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে -য় ফিরিয়া যাইবার সময় আমি আমার বালিশ ও তোষক কেশবচন্দ্রের ব্যবহারের জন্য দান করি।" অঘোরনাথ চার বৎসর পরে আর একবার ময়মনসিংহে যান। "তিনি প্রায় মাসাবধিকাল স্থিতি করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমাদের সঙ্গে একত্রে উপাসনা, সায়ংকালে ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন এবং তিনি চারিটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। অপিচ একদিন ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হইয়াছিল। সেই উৎসবে আট-নয় জন যুবা সাধু অঘোরনাথের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেবার তাঁহার প্রচারে বিশেষ ফল ফলিয়াছিল। অনেকের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও উপাসনার প্রতি অনুরাগ হইয়াছিল। অঘোরনাথ আমার গৃহেই বাস করেন, প্রতিদিন সায়ংকালে সকলে তাঁহার নিকটে সম্মিলিত হইয়া দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত উপদেশ শ্রবণ করিতেন। তিনি ঈশ্বর দর্শন, প্রত্যাদেশ শ্রবণ, বিশেষ করুণা ইত্যাদি এক-একটি বিষয়ে এক-একদিন উপদেশ দান ও বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশসকল লিখিত হইয়া পরে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই উপদেশ ও আলোচনায় সকলের সংশয় দূর, বিশ্বাস বৃদ্ধি ও ধর্ম্মভাব প্রবল হয়।... কিছুদিন পূর্ব্বে আমি হিন্দু সমাজাশ্রিত বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পরি-ত্যক্ত হইয়া একঘরে হইয়াছিলাম।...এক্ষণ আমার আবাসে সমবিশ্বাসী ব্রাহ্মবন্ধুদিগের স্থান হইয়া উঠে না।"

১৮৬৬ সনে অঘোরনাথকে উত্তরবঙ্গে ও আসামে প্রচারে যাইতে হয়। ঐ সময় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় ও সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তাঁহাদের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। পর বৎসর তিনি ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারে যান। এই সময়ে চেরাপুঞ্জি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ১৮৬৮ সনে উত্তর বঙ্গে প্রচারে যান ও পূর্ণিয়ার পথে নরঘাতী দস্যুদের হাতে পড়েন, কিন্তু বাঁচিয়া যান। ঐ সনে তিনি প্রথমে মুঙ্গেরে ও ক্রমে উত্তর-ভারতে প্রচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। মুঙ্গেরে দিবারাত্র সাধনভজন সৎপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার আর অন্য কার্য্য ছিল না। মুঙ্গেরের ভ্রাতৃবর্গ অনেকেই রেলওয়ে আপিসে কাজ করিতেন ও প্রতিদিন মুঙ্গের হইতে কাজের জন্য জামালপুর যাইতেন। তাঁহাদের যখন জামালপুর হইতে ফিরিবার সময় হইত, সে সময় সাধু অঘোরনাথ রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন। তার পর তাঁহারা পৌঁছিলে মহানন্দে কোলাকুলি, আলিঙ্গন, প্রণামাদি করিয়া সকলে গানকীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইতেন। তিনি উত্তর-ভারতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত গিয়া জনসাধারণের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ছড়াইয়া দিলেন। যখনই যে প্রদেশে গিয়াছেন, স্থানীয় ভাষা শিখিয়া তাঁহাদের ভিতর কার্য্য করিয়াছেন। লাহোরে স্বামী দয়ানন্দ ও কোন

কোন সাধুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি ১৮৭১ সনে উড়িষ্যাদেশে প্রচারের জন্য যান; সেখানেও মোহন্ত, মহারাজা ও সাধারণ ভক্তিমান হিন্দুরা তাঁহার সংস্পর্শে আকৃষ্ট হন। তিনি সাধনে এমনই প্রমত্ত হইতেন যে, এক-এক সময়ে দুই-তিন দিন একাকী অনাহারে থাকিতেন। নির্জ্জন স্থানে, গিরিকন্দরে সুযোগ হইলেই সমস্ত দিন ব্রহ্মধ্যানে বিভোর থাকিতেন। আসামে চেরাপুঞ্জি পাহাড়ে, মুঙ্গেরে পীরপাহাড়ে, পঞ্জাব সীমান্তে মরি পাহাড়ে, হিমালয়ের গুহায় তিনি যোগধ্যানে ইষ্টদেবতার সান্নিধ্য-সুখ লাভ করিয়া কিরূপ ধন্য হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার পত্রাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে। আবার যখন কলিকাতায় ফিরিতেন তখন গার্হস্থ্য কার্য্যে, উপাসনায়, স্ত্রী-নরম্যাল বিদ্যালয়ে ও কলিকাতা স্কুলে নীতিশিক্ষায়, পত্রিকা সম্পাদনায় এবং প্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন। আর একটি কথা, তাঁহার প্রকৃতি এমনই ছিল যে, কোথাও তাঁহার কোনও শত্রু দেখা যাইত না।

'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় ও 'সুলভ সমাচারে' তাঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার ভাবও যেমন পরিষ্কার, ভাষাও তেমনি মনোরম। তাঁহার লেখা 'ধ্রুব ও প্রহ্লাদ',* 'দেবর্ষি নারদের নবজীবন লাভ'† নামে দুইখানি উৎকৃষ্ট বই প্রকাশিত হইয়াছিল। 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকে তাঁহার রচিত কয়েকটি গান রহিয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশগুলির কয়েকটি মাত্র 'ধর্ম্মসোপান' ও 'উপদেশাবলী' পুস্তকে প্রকাশিত হয়। 'প্রত্যাদেশ অন্তরে' শীর্ষক প্রবন্ধটি তাঁহার প্রথম রচনা। ১৮৬৬ সনে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যখন সকল ধর্ম্মের শাস্ত্র হইতে সত্যধর্ম্ম-প্রতিপাদক বচন সঙ্কলন করিয়া 'শ্লোকসংগ্রহ' প্রণয়নের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি অঘোরনাথকে হিন্দুশাস্ত্রের বচন সংগ্রহ করিবার ভার দেন; অঘোরনাথ হিন্দুশাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া সেই সময় যে সকল বচন নির্ব্বাচন করেন তাহা আজও সাধক এবং পণ্ডিতদের বিস্ময় উৎপাদন করে।

'শ্লোকসংগ্রহ' দ্বিতীয় সংস্করণ (১৮৭৬) সম্পাদনার সময় তিনি ঐ পুস্তকে অনেক নূতন হিন্দুশাস্ত্র-বচন সংযোগ করেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া 'ভক্তমালা' নামে একখানি বই লিখেন; কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি হারাইয়া যাওয়ায় তাহা আর প্রকাশিত হয় নাই। এই 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' তাঁহার শেষ রচনা।

১৮৭৩ সনে ব্রহ্মানন্দ নূতন আধ্যাত্মিক সাধন আরম্ভ করেন। ইহার তিন বৎসর পরে সাধক নির্ণয় করিয়া তিনি তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ সাধন বিষয়ে উপদেশ দিতে থাকেন। ঐ সময় ব্রহ্মানন্দ অঘোরনাথকে যোগশিক্ষার্থীর ব্রত ও ভক্ত বিজয়কৃষ্ণকে ভক্তিশিক্ষার্থীর ব্রত দিয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে ও যোগ-দর্শনে যোগীবর অঘোরনাথের গভীর প্রবেশ ছিল। গীতা ও যোগবাশিষ্ঠ ছিল তাঁহার অতি প্রিয়। এই সাধনব্যাপারে তিনি ব্রহ্মানন্দের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

'ব্রহ্ম গীতোপনিষদ' উপদেশের সময়, এক বেলায় অঘোরনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, গৌরগোবিন্দের ভিতর একজন যোগ ও ভক্তি বিষয়ে শাস্ত্রের শিক্ষা বর্ণনা করিতেন; এবং অপর বেলায় ব্রহ্মানন্দ নবযোগ ও নবভক্তিতত্ত্বের অবতারণা করিতেন।*

ব্রহ্মানন্দ ১৮৭৯ সনে নব অধ্যয়ন প্রবর্ত্তনের সময় তাঁহাকে ধ্যান ও নির্ব্বাণের ধর্ম্মের অধ্যেতা পদে বরণ করেন। তখন তিনি পালি, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় ভাষায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে সকল মূল শাস্ত্র ও আলোচনা সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সময়ের আলোকে তাহার অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং দুই বৎসরের ভিতর 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' বইখানি লিখিয়া শেষ করিলেন। ব্রহ্মানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দল প্রচার উপলক্ষে† যানবাহনে ও পদব্রজে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া, সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া, ভারতের ঐতিহ্য, শাস্ত্র, তীর্থ ও জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সকল অভিজ্ঞতার ও নিজস্ব সাধনার আলোকে পুস্তকখানি আলোকিত। ১৮৮১ সনে অঘোরনাথ প্রচারকার্য্যোপলক্ষে রাওয়ালপিণ্ডি পর্য্যন্ত যান। প্রচারের পথে এ বইখানি লেখা শেষ করেন। ফিরিবার সময় লক্ষ্ণৌ হইতে পাণ্ডুলিপি ব্রহ্মানন্দকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু অঘোরনাথ আর ফিরিলেন না। ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮১ তারিখে লক্ষ্ণৌয়ে ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। চকিতে ব্রহ্মানন্দ দলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রপাত হইল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার নামের সহিত 'সাধু' শব্দ যুক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি মণ্ডলীর সমবেত শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন।

---

* ১৭৯২ শকে প্রথম প্রকাশিত তার পর ইহার পাঁচটি সংস্করণ হইয়াছিল।

† ১৭৯৭ শকে প্রথম প্রকাশিত ইহার দুইটী সংস্করণ বাহির হয়।

* 'ধর্ম্মতত্ত্ব' দেখুন।

† প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ' ও 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রচার বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

সাধু অঘোরনাথের তিরোধানে ব্রহ্মানন্দের ব্যবস্থায়, শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় গ্রন্থখানি তিন খণ্ড পর পর প্রকাশিত হইল।

খ্যাতনামা পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণার সহিত গ্রন্থকার অঘোরনাথ পরিচিত ছিলেন এবং নিজ পুস্তকে স্বাধীন ভাবে কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতামতের আলোচনা করিয়াছেন।

সাধু অঘোরনাথ লিখিত শাক্যমুনির জীবন ও নির্ব্বাণতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থখানি এক সময়ে বাংলা দেশের চিন্তাধারায় অশেষ প্রভাব বিস্তার করয়াছিল।

নবগ্রাম

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

পশ্চিম বাংলার গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, একই নামের বহু গ্রাম আছে। "নবগ্রাম" এইরূপ একটি নাম। পশ্চিম বাংলায় ৩৪টি নবগ্রাম আছে। এই নামের গ্রাম একটি জেলায় আবদ্ধ নহে; একটি বা দুইটি পার্শ্ববর্তী জেলায় আবদ্ধ থাকিলে হয় ত বলা যাইত যে, ইহা গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে স্থানীয় লোকেদের একটি বিশেষত্ব। পশ্চিমবঙ্গের ১৩টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই একথা বলা চলে না যে, ইহা একটি স্থানীয় বিশেষত্ব।

অথচ অন্যান্য তথ্যের সহিত ইহার একটু বিশ্লেষণ করিলে কিছুটা বিশেষত্ব বা বিশিষ্টতা বাহির হইতে পারে ইহা ধরিয়া লইয়া আমরা নবগ্রামের ভৌগোলিক বিস্তৃতি—প্রথমে মহকুমা হিসাবে সাজাইয়া লইলাম; আর যদি কোন মহকুমায় গ্রামের বা মৌজার সংখ্যা বেশী থাকে, এবং সেই অঞ্চলের লোকের যদি নবগ্রাম এই নামের প্রতি একটা আকর্ষণ থাকে, তাহা হইলে নবগ্রামের অনুপাতের কমি বা বেশী হইবে। ইহা দেখিবার জন্য মহকুমার নামের পাশে সেই সেই মহকুমার মৌজার সংখ্যা ও সেই সেই মহকুমা কত বর্গমাইল ধরিয়া বিস্তৃত তাহাও দিলাম। তথ্যগুলি এইরূপ :

মহকুমার নাম ও সংস্থান সংখ্যা	"নবগ্রামের" সংখ্যা	মহকুমার মোট মৌজার সংখ্যা	কত বর্গমাইল বিস্তৃতি
বর্দ্ধমান	—		
সদর	৬	১,২০০	১,২৮৭
আসানসোল	২	৫৬৪	৬২৪
কালনা	১	৫২৯	৩৮৫
কাটোয়া	২	৩৭০	৪০৯
বীরভুম			
সদর	১	১,৫৯০	১,১৩৭
রামপুর হাট	২	৭২২	৬০৬
বাঁকুড়া			
সদর	৫	২,৬৬৩	১,৯৩৩
বিষ্ণুপুর	২	৮৬৭	৭১৩
হুগলী			
সদর	১	৭৫১	৪৪৬
আরামবাগ	৩	৫৪৫	৪১২
মুর্শিদাবাদ			
লালবাগ	১	৪৯১	৫২২
কান্দি	৩	২১০	৪৫৪
হাওড়া			
উলুবেড়িয়া	১	৫৮৭	৩৮৬
মালদহ			
সদর	২	১,৫৭৯	১,৩৯২
পশ্চিম দিনাজপুর			
বালুরঘাট	২	১,০৫০	৫৮৬
২৪ পরগণা			
সদর	১	১,০৭৭	১,১০৭
জলপাইগুড়ি			
সদর	১	৪৩১	১,২৯৬

উপরোক্ত তথ্য হইতে একটা জিনিষ বেশ পরিষ্কার হয় যে, ভাগীরথীর পশ্চিম অঞ্চলে নবগ্রামের সংখ্যা পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা অনেক বেশী। আর উত্তরবঙ্গে নবগ্রামের সংখ্যা দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা কম। মেদিনীপুর জেলায় যে পশ্চিম বাংলার ৩৯ হাজার গ্রামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম আছে তাহার মধ্যে একটিও নবগ্রাম নাই। এক্ষণে বিভিন্ন মহকুমায় কতগুলি মৌজার মধ্যে একটি 'নবগ্রাম' আর কতখানি জায়গার মধ্যে একটি 'নবগ্রাম' আছে তাহার হিসাব করা যাক। মহকুমার বিস্তৃতিকে নবগ্রামের সংখ্যা দিয়া ভাগ করিয়া আমরা যে ভাগফল পাইয়াছি তাহাকেই 'নবগ্রামের'

এলাকা ধরিয়াছি এবং সেই এলাকার বর্গফলকে ইহার "ছন্দা" বলিয়া ধরা হইয়াছে। মহকুমা একটি স্বাভাবিক geographical unit বা ভৌগোলিক ইউনিট নহে। মহকুমার সৃষ্টি হইয়াছে শাসন-সংরক্ষণের সুবিধার জন্য। তথাপি জেলা অপেক্ষা মহকুমা অনেকটা বেশী স্বাভাবিক ভৌগোলিক ইউনিট। আমাদের পদ্ধতিতে একটি ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। "ক" মহকুমায় ৫টি "নবগ্রাম"; "খ" মহকুমায় ২টি নবগ্রাম। "খ" মহকুমার ২টি নবগ্রাম "ক" মহকুমার লাগাও হইতে পারে বা বহুদূরে হইতে পারে। আমাদের পদ্ধতিতে ইহা ধরা পড়িতে পারে না এবং আমরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি তাহাতেও একটি ভ্রম রহিয়া গেল। এইবারে আমাদের বিশ্লেষণটি দিলাম। যথা :—

অঞ্চল	নবগ্রাম পিছু— গ্রামের সংখ্যা	এলাকা	ছন্দা এলাকা মাইল
বর্দ্ধমান সদর	২০০	২১৩	১৪·৬
আসানসোল	২৮২	৩১২	১৭·৭
কালনা	৫২৯	৩৮৫	১৯·৬
কাটোয়া	১৮৫	২০৪	১৪·৩
বীরভূম সদর	১,৫৯০	১,১৩৭	৩৩·৭
রামপুরহাট	৩৬১	৩০৩	১৭·৪
বাঁকুড়া সদর	৫৩৩	৩৮৭	১৯·৭
বিষ্ণুপুর	৪৩৩	৩৫৬	১৮·৮
হুগলী সদর	৭৫১	৪৪৬	২১·১
আরামবাগ	১৮২	১৩৭	১১·৭
লালবাগ	৪৯১	৫২২	২২·৮
কান্দি	১৭০	১৫১	১২·৩
উলুবেড়িয়া	৫৮৭	৩৮৬	১৯·৭
মালদহ সদর	৭৮৯	৬৯৬	২৬·৪
বালুরঘাট	৫২৫	২৯৩	১৭·১
২৪ পঃ সদর	১,০৭৭	১,১০৭	৩৩·৩
জলপাইগুড়ি সদর	৪৩১	১,২৯৬	৩৬·০

উপরোক্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় যে, মোটামুটি উত্তর হইতে দক্ষিণে কান্দি—কাটোয়া—বর্দ্ধমান সদর—আরামবাগ এই অক্ষরেখায় মোট গ্রামের সংখ্যার তুলনায় "নবগ্রাম" এই নামের গ্রামের সংখ্যা বেশী, অর্থাৎ প্রতি "নবগ্রাম" পিছু গ্রামের সংখ্যা কম। কত কম তাহা নিম্নের প্রদত্ত তথ্য-তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। যথা :—

	প্রতি "নবগ্রাম" গ্রামের সংখ্যা
কান্দি	—১৭০
কাটোয়া	—১৮৫
বর্দ্ধমান-সদর	—২১৩
আরামবাগ	—১৮২

এই অঞ্চলে "নবগ্রাম" এই নামের প্রতি লোকের একটা বিশেষ পক্ষপাত আছে—এ কথা কতকটা জোরের সহিত বলা চলে। আর এই অঞ্চল হইতে যতদূর যাওয়া যায় পক্ষপাত বা আকর্ষণ তত কম দেখা যায়। কান্দিকে কেন্দ্র করিয়া দেখিতে পাই যে, রামপুরহাটে ৩৬১টি গ্রামে ১টি নবগ্রাম, কালনায় ৫২৯-এ ও লালবাগে ৪৯১-এ ১টি করিয়া নবগ্রাম। আবার বর্দ্ধমান সদর হইতে আসানসোলে ২৮২টি গ্রামে; বিষ্ণুপুরে ৪৩৩ গ্রামে ও তৎপরবর্ত্তী বাঁকুড়া সদরে ৫৩৩টি গ্রামে ১টি করিয়া নবগ্রাম। ঐরূপ আরামবাগকে কেন্দ্র ধরিয়া দেখিলে হুগলী সদরে ৭৫১টি গ্রামে ও উলুবেড়িয়ায় ৫৮৭টি গ্রামে একটি নবগ্রাম।

মহকুমা একটি স্বাভাবিক ভৌগোলিক ইউনিট (geographical unit) নহে, তথাপি মোটামুটি ভাবে ধরিলে উপরোক্ত বিশ্লেষণ সত্য। এইরূপ ভৌগোলিক বিস্তারের বিশিষ্টতার কারণ কি, অথবা এইরূপ কাছাকাছি "নবগ্রাম" থাকিবারই বা কি কারণ? আমরা কোন কারণ বলিতে পারিব না। এ বিষয়টি যদি সুধীজন, বিশেষ করিয়া ঐ ঐ অঞ্চলের লোক, চিন্তা করিয়া দেখেন ত বড় ভাল হয়।

"নবগ্রাম" কথাটির অর্থ হইতেছে নূতন গ্রাম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে "নূতনগ্রাম" এই নামের ১৭টি গ্রাম আছে। এই নামের গ্রাম কোন কোন জেলায় কয়টি করিয়া আছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। যথা :—

বর্দ্ধমান	৫	নদীয়া	১
বীরভূম	১	মুর্শিদাবাদ	১
বাঁকুড়া	৯		

"নওয়াপাড়া"র অর্থ হইতেছে নূতন স্থাপিত পাড়া। এই "নওয়াপাড়া" নামক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি। কোন কোন জেলায় এই নামের গ্রাম আছে নিম্নে দেওয়া হইল :

বর্দ্ধমান	৪	২৪ পরগণা	৪
মেদিনীপুর	১	মালদহ	১
হুগলী	১	পঃ দিনাজপুর	১
হাওড়া	১		

একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট যে, বর্দ্ধমান জেলার "নূতনের" প্রতি একটা টান আছে। এই জেলায় ১১টি "নবগ্রাম", ৫টি "নূতনগ্রাম" ও ৫টি "নওয়াপাড়া" আছে—মোট সংখ্যা ২০। তাহার পরেই বাঁকুড়া, এই জেলায় ৭টি "নবগ্রাম" ও ৯টি "নূতনগ্রাম" আছে—মোট সংখ্যা ১৬।

যে যে অঞ্চলে নবগ্রাম, নূতনগ্রাম, নওয়াপাড়ার সংখ্যা বেশী তাহা রাঢ় অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। রাঢ়ের জমির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই মাটির বৈশিষ্ট্যের সহিত এইরূপ নূতন গ্রাম পত্তনের কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ আছে বলিয়া সন্দেহ হয়। মেদিনীপুর জেলার মাটি laterite হইতে উদ্ভূত—এই জেলায় একটিও "নবগ্রাম" বা "নূতনগ্রাম" নাই।

পল্লী হইতে 'পাড়া'র উদ্ভব হইয়াছে। ডঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখো-

পাধ্যায় 'Land Revenue Commission Report'-এ (২য় খণ্ড ১৩৩ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন, 'Palli, a small non-Aryan settlement (Mbh. xii, 326, 20).' মেদিনীপুর জেলায় যাহাদের আমরা অনার্য্য বলি তাহাদের সংখ্যা বেশী। এজন্য হয়ত 'নওয়াপাড়া' দেখিতে পাইতেছি।

"নবগ্রাম" লইয়া আলোচনা প্রাথমিক আলোচনা মাত্র। ইহাতে ভ্রম থাকা খুব সম্ভব। আমাদের বিশ্বাস এইরূপে এক একটি গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলে বহু তথ্য জানা যাইবে—যাহা হইতে বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপকরণ পাওয়া যাইবে।

পরিশেষে একটি বক্তব্য আছে। যাঁহারা বাংলা দেশের গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা করিবেন তাঁহাদের একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। বহু মৌজার বা গ্রামের নাম জেলার সেটেলমেণ্ট জরিপের সময় লোপ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছোট ছোট গ্রামকে বড় বড় গ্রামের সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার বড় বড় গ্রামকে ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন গ্রাম সৃষ্টি করা হইয়াছে। কি হিসাবে নূতন গ্রামের নাম রাখা হইয়াছে তাহার হদিস আমরা পাই নাই। একটা উদাহরণ দিই। হাওড়া জেলার সেটেলমেণ্ট জরিপ হয় বিশ-পঁচিশ বছর আগে। Final Report on the Survey and Settlement operations in the District of Howrah, 1934-39 নামক রিপোর্টের ৬০ পৃষ্ঠায় এইরূপ তথ্য দেওয়া আছে :

Total no. of old mauzahs	No. of villages omitted by amalgamation	No. of villages created by splitting up	No. of villages sprung up in the bed of the river	Total no. of villages
940	134	25	I	832

ঐ রিপোর্টের ৯৩ প্যারায় আছে যে, সাধারণতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে রেভিনিউ সার্ভে হইয়াছিল সেই রেভিনিউ সার্ভের গ্রামকে বর্ত্তমান সার্ভেতে গ্রাম বা মৌজা ধরা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে রেভিনিউ সার্ভে গ্রামের কালির পরিমাণ কম, অর্থাৎ ১০০ একরের (=৩০৩ বিঘা) কম সেখানে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের সঙ্গে মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর যেখানে রেভিনিউ সার্ভের গ্রামের পরিমাণ ১,০০০ একরের বেশী ও গ্রামটি ছড়ান সেখানে সেই গ্রাম ভাঙ্গিয়া দুই-তিনটি গ্রাম করা হইয়াছে। এইরূপ গ্রাম সৃষ্টিকালে স্থানীয় স্বাভাবিক সীমা ও পাড়ার বসতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

এমন হইতে পারে যে, হাওড়া জেলার সদর মহকুমার বা উলুবেড়িয়ার কয়েকটি "নবগ্রাম" এইরূপে লোপ পাইয়াছে। যদি লোপ পাইয়া থাকে ত আমাদের বিশ্লেষণে একটি ভুল থাকিয়া গেল। "নবগ্রাম" এইরূপে সৃষ্ট হইলেও ভুল আসিয়া ঢুকিল। কিরূপভাবে জেলার সেটেলমেণ্ট জরিপের সময় গ্রামের বা মৌজার নাম পরিবর্ত্তন হয় তাহার একটি বিশদ উদাহরণ ২৪ পরগণা জেলার থানা খড়দহর গ্রামের নাম হইতে দিলাম :—

জেলা ২৪ পরগণা—থানা খড়দহ

গ্রামের বা মৌজার পূর্ব্ব নাম	নূতন নাম	নূতন গ্রামের কালি (একরে)
বারাকপুর কিসমত খড়দা	বনবারাকপুর	১২০
কিসমত পাটুলিয়া পাটুলিয়া	পাটুলিয়া	৫০১
রামচন্দ্রবাটী বা যোগিনপাড়া চক্ আনন্দপুর আনন্দপুর চক্ নাটাগড়	রামভদ্রবাটী	২১৭
জোত নারায়ণ দোপেড়ে	দোপেড়ে	১৯০
ডাঙ্গা দিঘলা চক্ পতুলিয়া	ডাঙ্গা দিঘীলা	৩৪০
দেওতি ঈশ্বরীপুর	ঈশ্বরীপুর	৬৩৪
জোত রূপ মাধবপুর কর্ণ	কর্ণ মাধবপুর	৫২১
বালিয়াগড় মহিষপোতা	মহিষপোতা	২১১
সহরপুর তালবান্দা	তালবান্দা	২৪৭
চক্ চাঁদপুর জুগবেড়িয়া	জুগবেড়িয়া	১৪৬
তেঘরি তেঘরি পাইকান	তেঘরি	১৮৯
মাসুন্দা আহারামপুর	আহারামপুর	১৮৪

২৭টি মৌজা হইতে বর্ত্তমানে ১২টি মৌজা সৃষ্ট হইয়াছে। অর্দ্ধেকের বেশী গ্রাম লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বনামও লুপ্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে নূতন নাম দেওয়া হইয়াছে। রেভিনিউ সার্ভের সময় কিন্তু এইভাবে গ্রামের নাম লোপ করা হয় নাই। ভালভাবে গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা করিতে হইলে থানার জুরিসডিক্‌শান লিষ্ট দেখা আবশ্যক।

পাকাঘর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

জানা ও অজানা খণ্ড খণ্ড স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ—
আমার লাগিয়া গড়েছে এই প্রাসাদ।
শোভন এবং লোভনীয় এ ত খাসা,
বটে নিরাপদে থাকার যোগ্য বাসা,
আছে বন্যায় আশ্রয় দিতে দৃঢ় প্রশস্ত ছাদ।

২

স্থাপত্য ইহা, সভ্যতা ইহা—নরের ক্রমোন্নতি—
কাঠে ইস্পাতে অঙ্কিত কাল-গতি।
প্রকৃতির সাথে করি ঘোর সংগ্রাম,
মানুষ জেনেছে তার শক্তির দাম,
গুহা-গৃহ হতে এলো অযোধ্যা-অবন্তী-দ্বারাবতী।

৩

ইহাতে রয়েছে বিশ্বকর্ম্মা শিল্পীর পরশন,
এ লীলার ধারা চঞ্চল করে মন।
কি সূক্ষ্ম রুচি, সজ্জা কি চারুতার!
কত শিল্পীর কতই আবিষ্কার,
চেষ্টা করেছে সুন্দর করে গড়িতে এই ভুবন।

৪

কত দেশ, কত গিরি দরী বন পাঠায় যে সম্ভার,
কত উপাদান সুদূরের প্রতিভার।
পরিকল্পনা ধীরে রূপ লয় মিঠে,
বাঁকা চাঁদ দেয় উঁকি প্রতিপদ-ইটে,
কাঙ্ক্ষিত অনাগত যে পাঠায় আগমন বাণী তার।

৫

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় গড়া এ ভবন সুন্দর—
বাহবা দিতেছে প্রসন্ন অন্তর।
কিন্তু এ মাছ স্ফটিকের সরোবরে,
কেমনে থাকিবে? তাহাই চিন্তা করে
বড় অমলিন, বড়ই নূতন—পদে পদে লাগে ডর।

৬

বিস্ময়ে স্মরি মানুষের জ্ঞান, মানুষের নিপুণতা,
যুগ ও জাতির রীতি ও অভিজ্ঞতা।
কে হেন অবোধ এ ভবন নাহি চায়?
সকলেই বলে—মন যে দেয় না সায়,
তাহারে কিন্তু স্মরায় কে সদা লোমশ মুনির কথা।

প্রেমের পাটীগণিত

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

ভেবেছিলেম পথটি তোমার ঝরা বকুল ছাওয়া
জোৎস্না তারি পর,
ছায়ার চোখে মাথায় মায়া আপনভোলা হাওয়া
স্বপন যাদুকর,
তমালশাখায় শুকের পাখা, পিয়ালপাতায় সারী,
মল্লিকা আর মালতীদের ঘুম জমালো পাড়ি।
ভেবেছিলেম সেথায় নিঝুম নীলের নিরালায়
সুরের কলিয়া,
কল্পলোকের গল্পে পাওয়া সোনার পেয়ালায়
পরাণ গলিয়া
কান্নাহাসির পান্না চুনীর গাঁথবে মাণিক হার,
কানায় কানায় খুসীর ফেনায় মাতবে তুফান তার।
ভেবেছিলেম ডাকবে তুমি রামধনুকের দেশে
এলিয়ে মেঘের কেশে,
রূপের আলোয় আঁধার করি মনোহরণ বেশে
কখন স্মিত হেসে,
পলাশ কলি উঠবে জ্বলি, জাগবে শেফালিকা,
ভুলের স্রোতে ভাসিয়ে ভেলা আসবে মালবিকা।
নয় ত দূরে সমুদ্দুরে বিজনদ্বীপের মাঝে
রাজকন্যার সাজে,
নয় ত যেথায় বলাকারা পথ হারালো সাঁঝে
রঙের কারুকাজে,
এইখানে এই চেনাপথের বেচাকেনার ভীড়ে
তোমার মুখের বোরখা গেল দুপুর হাওয়ায় ছিঁড়ে।
মানের মানা নেই, বুলুয়া, মরল সুখের ভয়,
সত্য জ্যোতির্ম্ময়!
অবাক তুমি, অবাক আমি, একি গো বিস্ময়!
অচিন পরিচয়!
দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরি, ভীরু তোমার হাত,
উড়িয়ে ধুলো কুড়িয়ে পেলাম স্বর্গ অকস্মাৎ।
আমার মাঝে তোমার লীলা, তোমার বুকে আমি,
এক যে হ'ল দুই;
এই যে প্রেমের পাটীগণিত সবার সেরা দামী
কোথায় বল থুই!
আকাশ দিলে অতল নীলে ডাগর আঁখি ভরি,
সেই অপলক মাধুরীতে এবার ডুবে মরি।
বল্লে বুলু "তাই ত বন্ধু, বুঝতে যে না পারি
দেশের মাঝে পরদেশী কে সব নিয়েছে কাড়ি।"

মেঘের প্রতি

শ্রীকালিদাস রায়

মিলনের দিনে গগন ভরিয়া কতবার এলে জলধর,
তোমারে চিনি নি তোমা পানে চেয়ে দেখিতে ছিল না অবসর।
নিভৃত কক্ষে প্রিয়া-বাহুপাশে
রহি তন্ময়, আষাঢ় আকাশে
শুনিয়া কেবল গভীর মন্দ্র উদাসী হয়েছে অম্বর।
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন
শুনিয়াছি যেন দূর ক্রন্দন
অজানা ব্যথায় অজানা কারণ ব্যথিয়া উঠেছে পঞ্জর।

বিরহের দিনে আজিকে তোমারে চিনিতে পেরেছি জলধর,
ইন্দ্রধনুর শিখিচূড়া শিরে তুমি যেন শ্যাম বেণু কর।
প্রথম আমার জুড়াইলে আঁখি
আজি তোমা প্রাণসখা বলে ডাকি,
বুঝেছি মিলনে যে নয় আপন বিরহে সে জন নহে পর।
তুমি সখা মোর বুঝেছ কি ব্যথা,
আনিয়াছ বুঝি প্রিয়ার বারতা ?
আমারো বারতা প্রিয়ার সকাশে বয়ে নিয়ে যাও জলধর।

ছাড়ল সবাই সংসারে

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

দূর-অতীতে যাদের সাথে খেলেছি, হায়, শৈশবে,
হল্লা করে বিদ্যালয়ে যেতাম মনের উল্লাসে,
আপন-মানা সঙ্গী সাথী এখন তারা কৈ সবে!

প্রথম যাকে বাসনু ভালো পাবার গভীর বিশ্বাসে,—
আধেক-ফোটা ফুলকুমারী তার মত নেই পৃথ্বীতে!
মুখখানি তার দেখবো না আর, স্মরছি প্রতি নিশ্বাসে!

যৌবনে এক বন্ধু পেলাম, পারিনে ঋণ শোধ দিতে ,
হঠাৎ সে যে হারিয়ে গেছে, রাত কাটে আজ ক্রন্দনে
কোথায় গেলে আবার পাব কোন্ সে ফিকির-ফন্দিতে!

ভায়ের চাইতে তুমিই বেশী বাঁধলে প্রীতির বন্ধনে!
হায়, কেন গো জন্মালে না আমার বাবার ঔরসে!
তোমার সাথে উড়বো কি আর কল্পনার শ্রী-স্পন্দনে ?

কতক বন্ধু পরলোকে, ভুলল কতক ভুল-বশে!
কেউ বা পরের বৌ বনে' যায়, ছাড়ল সবাই সংসারে।
আজকে ধূসর মরুর মাঝে দুঃখ উষর বুক চষে!

অভিসারিকা

শ্রীশান্তি পাল

মেঘ ডম্বরু বাজিছে সঘনে
গগনে ঝলিছে দামিনী।
জোনাকি নিভিছে, ঝিল্লী জলিছে,
তমসায় ভরা যামিনী।
বায়ুবেগে কাঁপে বিটপীর সারি,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ করিতেছে বারি,
বাসক বসনে পথে বাহিরায়
একাকিনী কুল-কামিনী
গগনে ঝলিছে দামিনী।

২

দোলে ভুঁইচাঁপা জুঁই-মালা গলে,
চলে মন্থর-গমনে,—
ভাবে ঢল ঢল আশা উচ্ছল
মিলিতে রাধিকা-রমণে।
সিঞ্জিত মাটি চরণে বাজিছে,
গুরু নিতম্ব কি বাদ সাধিছে,
অঞ্জন-খোয়া খঞ্জন-আঁখি
চঞ্চল স্মর-স্মরণে।
চলে মন্থর-গমনে।

৩

কবরী খসিয়া পৃষ্ঠে দোদুল
অঞ্চল লুটে ভূমিতে।
ব্রজের চকোরী চলে বেয়াকুল
গোকুলের চাঁদ চুমিতে।
যমুনার জলে উঠেছে তুফান,
কুঞ্জ ভবনে থেমে গেছে গান,
কালাচাঁদ কোথা লুকাল কালোয়,
নিশি কাটে বুঝি খুঁজিতে
অঞ্চল লুটে ভূমিতে।

আপনাদের সঙ্গে কারবার করেই আমাদের আনন্দ . . .

ছোটগল্পে জগদীশ গুপ্ত

শ্রীসুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়
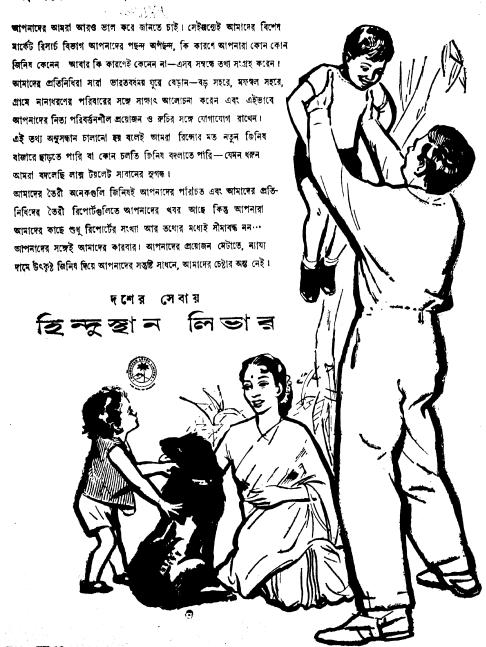
প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে কয়জন সাহিত্যিক বাংলা ছোটগল্পে উজ্জ্বল স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্ত অন্যতম। এই বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আঘাতের পরেও আছে অনড় ও অচল। প্রথম মহাযুদ্ধের সর্বধ্বংসী প্রভাব যখন মানুষের মনে হানল আদর্শজনিত আঘাত, শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা যখন হয়ে উঠলেন দিশেহারা, তাঁদের মধ্যে যখন দেখা দিল সংশয়বাদের ছায়া তখন জগদীশ গুপ্তের রচনা সুরু। কাজেই তাঁর সাহিত্যে তখন সেই যুগের প্রভাব পড়া ছিল খুবই স্বাভাবিক। কল্লোলযুগের সময় ও পরে অনেক শিল্পী ও সাহিত্যিকের মধ্যে পলায়নবাদ ও দুঃখবাদের সুর আমরা শুনেছি, দেখেছি রোমান্সবাদের আতিশয্য, কিন্তু মানুষের প্রতি চরমভাবে বিশ্বাস হারানোর নিদর্শন মেলে একমাত্র জগদীশ গুপ্তের রচনায়। আসল Cynicism-এর যথার্থরূপে ফুটে উঠতে দেখি তাঁর সাহিত্যে, মানুষের যা বিকৃতি তাকেই তিনি স্বাভাবিক সত্য বলে ধরে নিয়েছেন. এইখানেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রগাঢ় মননশীলতা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-গ্রাহ্য সাধনার প্রসূন নয়। এই ভঙ্গী একটা বিশেষ অনুভূতির ফল, যা প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় জন্মলাভ করেছিল—বিশেষ বিশেষ মানসিক বৃত্তি-সম্পন্ন পটভূমিকায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদের মধ্যে সমন্বয়কে স্বীকার করার প্রবণতা আছে। সমন্বয়বাদ জীবনকে একপেশে দৃষ্টি নিয়ে দেখবার প্রয়াস থেকে মানুষকে করে নিবৃত্ত। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিবাদ হয়ত অনেক সময় সঠিক কোন পরিণতিতে পৌছতে পারে না। একটা চিরন্তন দ্বন্দ্ববাদমূলক অবস্থায় মনকে বুঝিয়ে রাখে, এ কথা সত্য। কিন্তু একদেশদর্শী কোন ধারণাকে চরম বলেও মেনে নিতে দেয় না। এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবাদের ছায়া দেখি ধূর্জটিপ্রসাদের সাহিত্যে। কিন্তু সেদিক থেকে জগদীশ গুপ্তের রচনা সার্থক নয়। মননশীলতার রং তার সাহিত্যে আছে। আঙ্গিকের মধ্যে আছে জ্যামিতিক পরিকল্পনা। রচনাশৈলীতে আছে Sophistry-র প্রতিচ্ছায়া। কিন্তু নেই বুদ্ধির দ্বন্দ্ব। নেই নানামুখী যুক্তির অবতারণা পরিণতির প্রামাণ্যতার স্বপক্ষে। এই-জন্যে দায়ী তাঁর লেখায় objectivity-র অভাব যা মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে মেলে অনেক স্থানে। objectivity-র অভাব জগদীশ গুপ্তের অনেক ছোট গল্পকে প্রায় রম্যরচনার পর্য্যায়ে ফেলেছে। অনেক সময় কোন একটি মন্তব্যকে জ্যামিতিক আঙ্গিকের মাধ্যমে সজোরে ও নগ্নভাবে প্রচার করার প্রবণতা তাঁর ছোট গল্পের পক্ষে ক্রটি হয়ে দেখা দিয়েছে। এই প্রচার বলতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কথাই বলা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আছে তিক্ত ও অবিশ্বাসী মনের পরিচয়—আর morbidity বা শ্মশান-বৈরাগ্যের আধিক্য। বনফুলের অনেক গল্পে আছে নিরাশাবাদীর দীর্ঘশ্বাস বা সংশয়বাদীর বক্রতা কিন্তু রচনায় অনেকটা objectivity বজায় থাকায় এবং আঙ্গিকের মধ্যে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্যের জন্য শিল্প হিসাবে তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্প হয়ে উঠেছে প্রায় ক্রটিহীন ও উপভোগ্য। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আছে মানুষের জীবনের বিকৃতির কথা, আছে অস্বাভাবিকতার ইতিহাস। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে মানুষের বিকারের প্রতিফলন লেখকের নিজস্ব জীবন-দর্শনের পরিচয় দেয় না। তাঁর ছোটগল্পে বা উপন্যাসে এই বিকারের পরিচিতি দেওয়া হয়েছে পরম বস্তুনিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার সঙ্গে। তাই শিল্প হিসাবে তাঁর রচনাগুলি বিশেষ-ভাবে দাগ কাটে পাঠক-পাঠিকার মনে। জগদীশ গুপ্তের মানসিক প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গী রূপকের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর অনেক গল্পেই কাহিনী বা ঘটনা-অংশ হয়ে উঠেছে কমজোরী ও বৈচিত্র্যহীন ঘটনা বা কাহিনীর বৈশিষ্ট্যহীনতায়। স্থানে স্থানে রূপকবাদের সাহায্যগ্রহণ জগদীশ গুপ্তের সাহিত্যকে তাঁর যুগের অন্যান্য লেখকের সাহিত্য থেকে করে তুলেছে পৃথক, গল্পাংশে দারিদ্র্য বা অতিরিক্ত ভাব—পল্লবগ্রাহিতা তাঁর গল্পের কাঠামোকে করেছে ভাবসাম্যহীন অর্থাৎ গল্পের আদি ও মধ্যম হয়েছে অন্তের তুলনায় অতিরিক্ত সম্প্রসারণশীল। আদি থেকে প্রায় অন্ত পর্য্যন্ত ভাবেরই শাখা-প্রশাখা বিস্তার করার পর হঠাৎ পরিণতিতে এসে একটা চমক লাগানোর ঘটনা বা পরিস্থিতির মধ্যে শেষ হয় তাঁর অনেক গল্প। এই পদ্ধতি শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনেক সময় সহায়ক হয় না। ফলে পাঠক-পাঠিকার মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায় গল্পের শেষেও। "শশাঙ্ক কবিরাজের স্ত্রী" নামক গল্প সঙ্কলনে "অপহৃত আকাশ কুসুম" নামক গল্পটি এই আঙ্গিকে লেখার অন্যতম নিদর্শন। এই গল্পে আরও কয়েকটি ক্রটি পরিলক্ষিত হয়। তার মধ্যে প্রধান হ'ল, স্থানে স্থানে উপমাগুলির অপপ্রয়োগ বা অনর্থক জটিলতার মধ্য দিয়ে ভাবের প্রকাশ।....

অনেক স্থানে উপমার জটিলতা ও অস্বচ্ছ কৌশল লেখককে তীক্ষ্ণবুদ্ধিবাদী রচয়িতা বলে প্রতিভাত করানোর পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি রচনাশৈলীতে Sophistry থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গীতে মেলে না তীক্ষ্ণবুদ্ধিবাদীর পরিচয়। তা ছাড়া, তাঁর সাহিত্য আঙ্গিক ও বুদ্ধিবাদমূলক রচনার অনুপন্থী নয়, প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বলেছি। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়

ভাস্বর্য্যের দৃঢ়তা ও ঋজু দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বুদ্ধিবাদের সঙ্গে দরদের সংমিশ্রণ তাঁর রচনাকে করে তুলেছে অপূর্ব্ব রসঘন ও সার্থক। জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে দরদের অভাব ও রচনাশৈলীর জটিলতা ও বুদ্ধিবাদের ঢঙের ব্যঞ্জনা ছোটগল্পের মধ্যে একটা হিমশীতলতার স্পর্শ দেয় স্পর্শকাতর রসিক পাঠকচিত্তে। মনের এই হিমকাঠিন্য দিয়ে লেখক মানবমনে বীর মনের গহন অরণ্যে প্রবেশ করেছেন—টেনে বার করেছেন তাঁদের বাহ্যিক আচার ও আচরণের মূলসূত্রের কার্য্যকারণ। আবরণহীন করে দিয়েছেন তিনি পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ আর বলেছেন, "এত রঙচঙে মুখোশের তলায় আছে এমনি মাটি আর খড়, কাদা; খড় ও বাঁশের কাঠামো"। মানুষের সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তরালে রয়েছে একটা জৈবিক তাগিদ, বেঁচে থাকার প্রয়াস, পরম মাৎস্যন্যায়, দুর্ব্বল ও আশক্তকে ঠেলে দিয়ে শক্ত ও সামর্থ্যের বাঁচার প্রতিযোগিতায় সার্থকতা লাভ। একটা জৈবিক প্রতিযোগিতামূলক সংস্কার মানুষের জীবনের অন্তর্দেশের মনের ঢাকাকে প্রতিনিয়ত ঘুরিয়ে চলেছে, তারই রূপায়ণ দেখি জীবনের নানা রঙ-বৈচিত্র্যে। জীবনকে এই biological দিক থেকে দেখা বা দেখার প্রয়াস উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের বণিকসভ্যতার আবহাওয়ায় লালিত বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচায়ক, প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতার পৃষ্ঠপোষক হ'ল সমাজের বুর্জোয়া কাঠামো। বাংলা তথা ভারতের অর্দ্ধ বুর্জোয়া ও অর্দ্ধ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় প্রতিফলিত তদানীন্তন অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও পরে আবহাওয়ায় সাহিত্য-সাধনার সুরু হয়েছিল জগদীশ গুপ্তের জীবনে, কাজেই তার দৃষ্টিভঙ্গীতে এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যষ্টিবাদ থাকা স্বাভাবিক। এই প্রতিযোগিতামূলক ব্যষ্টিবাদ মহাযুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী ও সর্ব্বধ্বংসী প্রভাবে চৌচির হয়ে অন্তর্নিহিত স্বকীয় শূন্যগর্ভতায় প্রকাশ করলো শিল্প-সাহিত্যে। যে সব শিল্পী অতিরিক্ত স্পর্শকাতর, তাঁরা দুনিয়ায় দেখলেন কেবল হতাশার ছায়া যা এনে দিল তাঁদের জীবনে নানা বিচ্যুতি ও অস্বাভাবিকতা। এঁদেরই সমগোত্রীয় জগদীশ গুপ্তের রচনায় পাই frustration বা জীবনের অকৃতকার্য্যতাজাত বিক্ষোভ—হতাশার সুর যা কখনও নির্দ্দয়, কঠিন ব্যঙ্গ হয়ে কখনও শ্মশান-বৈরাগ্যের রূপ ধরে পাঠকমন চঞ্চল করে তোলে। তাঁর রচনায় আমরা পাই দয়াহীন অকরুণ বাস্তব, আদর্শের অপমৃত্যু, প্রতিযোগিতার নির্লজ্জতা ও মানুষে মানুষে পারস্পারিক সহযোগিতার অভাব। ভাঙ্গা জীবনের এই করুণ রূপায়ণ দেখি মূলতঃ তাঁর গল্পের নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলিতে। এঁদের স্বপ্নভঙ্গের কারণ লেখকের দৃষ্টিতে কেবল অর্থনৈতিক বিষয়ে নিহিত নয়। নিহিত রয়েছে প্রেম ও স্নেহের জৈবিক কারণের মূলে নানা complex-এর ঘাত-প্রতিঘাতে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধ, তুচ্ছ প্রতিষ্ঠা অহমিকা, যৌন আকর্ষণের স্থূলতা জীবনের গতি ও প্রবণতাকে করে নিয়ন্ত্রণ। তারই ফলে দেখা দেয় জীবনের স্বপ্নভঙ্গ এবং এই স্বপ্নভঙ্গই জীবনের যথার্থ সত্য।

এই স্বপ্নভঙ্গ ও জীবনের হীনতা, সঙ্কীর্ণতার কাহিনী তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে ব্যঙ্গ-রসাত্মক ঘটনার আকার নিয়েছে। ব্যঙ্গ-রসাত্মক কাহিনীগুলির মধ্যে বিশুদ্ধ humour নেই, নেই রাবীন্দ্রিক wit আছে নির্মম কষাঘাত, যা উন্মুক্ত করে দেয় জীবনের অনেক চরিত্রের অর্থহীনতা। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে যে নির্দ্দোষ ও বিশুদ্ধ হাস্যরস আমরা উপভোগ করি, সেই বিশুদ্ধতা ও বিমলানন্দ নেই জগদীশ গুপ্তের ছোট গল্পে। এদিক থেকে তাঁকে ইংরেজ লেখক জোনাথন সুইফট-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। সুইফট্-এর ব্যঙ্গ কষাঘাতে এক সময়ে সমস্ত ব্রিটেনের পাঠকসমাজ অস্থির হয়ে উঠেছিল, তাঁর দৃষ্টির বক্রতা ও নিষ্ঠুরতা সাহিত্যে এনেছিল একটা বৈশিষ্ট্য। এই বক্রতাই আবার তাঁর জীবনে এনেছিল শোচনীয় ট্র্যাজেডী। দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্যের দিক থেকে জগদীশ গুপ্তের সঙ্গে সুইফটের তুলনা করা চলে, অবশ্য কল্পনা-প্রসারতা ও বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতায় সুইফটের স্থান অনেকটা উচ্চে।

তা ছাড়া জগদীশ গুপ্তের রচনায় নেই সুইফটের কাহিনী-বৈচিত্র্য ও ঘটনা-বুণাণীর আকস্মিকতা। রূপকধর্ম্মী গল্পে যে সমান্তরালবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সুইফটের গল্পের সমান্তরালবাদের সমগোত্রীয়, কিন্তু সুইফট-এর গল্পের মতন অতখানি চিত্তাকর্ষক নয় জগদীশ গুপ্তের গল্প। সুইফট-এর রচনায় কোন প্রকার জড়তা ও অস্পষ্টতা না থাকায় শিল্পহিসাবে তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য। জগদীশ গুপ্তের রচনায় জড়তা না থাকলেও পুনরাবৃত্তির ও সম্প্রসারণশীলতার দোষে দুষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে গল্পগুলি হয়ে উঠেছে ভারসাম্যহীন।

জগদীশ গুপ্তের বক্রদৃষ্টির পরিচয় মেলে তাঁর রূপকধর্ম্মী ছোট গল্পগুলিতে। এইগুলির মধ্যে "আশা ও আমি" সার্থক রচনা। এই রচনাটি 'মেঘাবৃত অশনি' নামক সঙ্কলনের অন্তর্গত। এই সঙ্কলনটির সব গল্পই প্রায় রূপকধর্ম্মী এব সুরও প্রায় একই প্রকারের। মানুষের সঙ্কীর্ণতা ও দুর্ব্বলতা ও তামসিকতার তিক্ত-কষায় আস্বাদন মেলে এই গল্পগুলিতে। "আশা ও আমি" উপরোক্ত প্রকৃতির প্রতিনিধিমূলক গল্প। যৌন আকর্ষণ, পারস্পারিক মিলনের ব্যগ্রতা ও আকাঙ্ক্ষিত পরিণতির একটা দৃশ্যের মধ্য দিয়ে মানুষের আশা পূরণ ও পরিণতির প্রতিক্রিয়ার কথা প্রায় দার্শনিকতত্ত্বকথার আকারে রূপায়িত হয়েছে, রচনাটি ছোট গল্পের আঙ্গিকের পরোয়া না করে রূপকের আকারে একটি পুরাতন দার্শনিক তত্ত্বকে classical ভাষায় রূপায়িত করেছে। নতুনত্বের মেলে না—কেবল সন্ধান পাওয়া যায় লেখকের রচনাশৈলীর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের। ভাষায় কাব্যসম্ভারের সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর বক্রতা অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়ে রম্যরচনায় সৃষ্টি ঘটিয়েছে লেখকের লেখনীর যাদুস্পর্শে।

"আচরণের অক্ষুন্নি" গল্পটিও রূপকধর্ম্মী। গল্পটির বৈশিষ্ট্য হ'ল—এর বিশিষ্টভঙ্গী। গল্পের অন্তরালে মানবজীবনের রূপ-

দারিদ্র্যের চিরন্তনী প্রকৃতিটি শ্যামচরণের বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠে সুন্দরভাবে অঙ্কিত হয়েছে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ যেন সব কিছুরই অস্থায়িত্বের প্রতীক। সমস্ত সংসার যখন শ্যামচরণের প্রতি বিরূপ, ভাই রাধাচরণ অর্থ সাহায্যদানে গরীব বড় ভাই শ্যামচরণকে কৃতার্থ করতে নারাজ, স্ত্রী পর্য্যন্ত অক্ষমতার প্রতি বিরক্তিতে কুঞ্চিত, অসহিষ্ণু—তখন শ্যামচরণের অকস্মাৎ মৃত্যু সমগ্র বিরূপ ও কঠিন সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সমস্ত কিছুর অর্থহীনতাকে করে দিল নগ্ন। গল্পে ঘটেছে ব্যঙ্গ ও করুণ রসের সমন্বয়। এই গল্পটি মূলতঃ বর্ণনামূলক; একটা প্রতিপাদ্য বিষয়কে জ্যামিতিক পরিকল্পনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভাষা অনেকটা বাস্তবঘেঁষা।

"ভয়ার্ত্ত ত্রিপুরারী" গল্পটির রূপকধর্ম্ম অত্যন্ত প্রকট হওয়ায় গল্পে রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। স্থানে স্থানে মেলে লেখকের morbid মনের পরিচয়। বার্দ্ধক্যের রোগও জরা, স্নায়ু-দুর্ব্বল বৃদ্ধকে কতখানি চঞ্চল ও মৃত্যুভয়ে অস্থির করে তোলে তারই পরিচয় মেলে গল্পের পরিণতিতে অর্থাৎ বৃদ্ধের আত্মহত্যায়। এটি একটি অতি শোকাবহ বিকারগ্রস্ত ছবি।

"শঙ্কিতা অভয়া" গল্পটি নিছক গল্প হিসাবেও আকর্ষণীয় বলে মনে হবে। গল্পে একটি সার্থক পরিণতিসৃষ্টির প্রয়াস আছে। পালক পিতার পালিতা কন্যার প্রতি রূপজ মোহের উৎপত্তি এবং সেই মোহ সম্বন্ধে কন্যার মাতার অর্থাৎ গল্পের নায়ক অতুলের অবিবাহিতা সঙ্গিনী অভয়ার সশঙ্ক ও স্নায়ু-দুর্ব্বল আচরণ—শেষ, পর্য্যন্ত পালিতা কন্যার নিকট তার অতুলের যথার্থ পরিচয় দান—গল্পকে নিয়ে গিয়েছে climax-এ। এ দিক থেকে গল্পটি ক্রটিহীন এখানে বলা প্রয়োজন, লেখক এই গল্পটিকে বিশেষ একটি উপন্যাসের রূপদান করেছেন অন্যত্র। উপন্যাস হিসাবে খুব সার্থক না হলেও বড় গল্প হিসাবে এটি একটি সার্থক সৃষ্টি। সমাজের পক্ষে এই প্রকৃতির গল্প ন্যায়ানুমোদিত কিনা—সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো না। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে গল্পটি কতখানি সার্থক সে বিষয়ে সন্দেহপোষণ করা চলে। বিশেষ করে, কথোপকথনের ভাষায় অতি নাটকীয়তা গল্পটিকে বাস্তব থেকে একটু দূরে সরিয়েছে। মেলো-ড্রামাটিক ভাবাকে যদি আরও বাস্তবানুগ করে তোলা হ'ত, তা হলে আধুনিক গল্পহিসাবে এটি একটি ছোট গল্প হ'ত নিশ্চয়ই, ঈপ্সিত রসের আধিক্য সত্ত্বেও কারণ রচনার মধ্যে মুন্সিয়ানার যে পরিচয় আছে তা ছোট গল্প রচনায় অনুপন্থী বলা চলে। এই গল্পটির একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, লেখকের ব্যঙ্গ-কষাঘাত সুলভ মনোবৃত্তির অনুপস্থিতিতে। গল্পের কাব্য-ব্যঞ্জনা পরিচয় দেয় লেখকের কাব্য-প্রতিভারই।

সার্থক শিল্পরস হিসাবে "আরোহণ ও অবরোহণ" গল্পটি উল্লেখ-যোগ্য এই গল্পটির মধ্যে অতি প্রচ্ছন্নভাবে রূপকধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকলেও চিত্রকার্য্য বাস্তবানুগ। রচনায় গল্পাংশের দারিদ্র্যসত্ত্বেও রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে নি। কোন স্থানেই হয়ে উঠে নি অতি নাটকীয়। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে গল্পটি নিখুঁত। লেখকের পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় মেলে গল্পের আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত। এই গল্পটিও দীর্ঘ, কিন্তু মূলতঃ শিল্পরস ক্ষুণ্ণ হয় নি। দুইটি বোনের পরস্পরের প্রতি স্নেহ, ভালবাসা সামান্য অহমিকা-প্রসূত ভাবাবেগের বশে কেমন করে মানসিক ট্র্যাজেডীর সৃষ্টি ঘটায় তারই সন্ধান মেলে এই গল্পে। মূল আখ্যানভাগে অসাধারণত্ব কিছু নেই, কিন্তু আছে লেখকের মানসিক বক্রদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা। মানসিক Iconoclasticism-এর পরিচয়, চিরাচরিত মূল্যবোধকে আঘাত হানার আভীপ্সা।

"লোকনাথের তামসিকতা" গল্পটিতে রয়েছে লেখকের মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের অপরূপ স্বাক্ষর, এদিক থেকেও তাঁকে মানিক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করা চলে। বনের গহন অরণ্যে অনেক দমিত, রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সামাজিক আচার-আচরণে ছন্দপতন ঘটায়, তারই সুষ্ঠু ইঙ্গিত রয়েছে উল্লিখিত গল্পটিতে। ধনী লোকনাথ পুত্রের বধূ নির্ব্বাচনে সুন্দরী কন্যারই সন্ধান করেছিলেন এবং এ সন্ধানে তাঁর অসুন্দরী স্ত্রী ভবানীরও গভীর অনুমোদন ছিল। অনেক সন্ধান ও অনেক কন্যা বাতিলের পর যখন সত্যই অপরূপ সুন্দরী কন্যার সন্ধান পাওয়া গেল, সেই সময়ে গৃহে ফেরার পথে লোকনাথের মনে যে ভাব-বিপর্য্যয় ঘটে গেল তা নিতান্ত আকস্মিক বলা চলে না। সমস্ত যৌবনকাল নারীর সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সচেতন ভাবেই তিনি ছিলেন উদাসীন। কিন্তু প্রৌঢ়বয়সের প্রান্তে এসে পুত্রের পাত্রী নির্ব্বাচনে যখন সুন্দরী কন্যার মনোনয়নে অগ্রসর হলেন তখন তাঁর মনের উপর-তলায় ভেসে উঠল তাঁর নিজের অবদমিত সৌন্দর্য্য-পিপাসা। আর এই পিপাসা বোধ থেকেই এল বিদ্বেষ ও অসুস্থ প্রতিযোগিতা-পরায়ণ মনোভাব। এই বিদ্বেষবোধ মনোনীত পাত্রীকে বাতিল করে দিল। গল্পটির পরিণতি সম্পূর্ণ ন্যায়ানুগত ও উপভোগ্য। তবে গল্পাংশ অপেক্ষা বর্ণনা ও পরিবেশ রচনায় বাহুল্য গল্পের কাঠামোকে করে তুলেছে ভারসাম্যহীন। আলস্য ও শ্লথ গতিহীন-পরায়ণ। এর সঙ্গে রয়েছে সমস্ত গল্পের অবয়বে একটি অতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার নগ্ন প্রাবল্য, এক কথায় লেখার মধ্যে রয়েছে sensuousness; লোকনাথের রূপতৃষ্ণার মধ্যে যেন লেখকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণের পরিচয় মেলে প্রচ্ছন্নভাবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার প্রতি লেখকের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় আছে অনেক গল্পেই। "শঙ্কিত অভয়া" ও "আশা ও আমি" গল্পে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপের বর্ণনায় লেখকের লেখনী হয়ে উঠেছে বিশেষ মুখর, মাঝে মাঝে দেহবর্ণনা প্রায় শালীনতা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু লেখনী চাতুর্য্যে ও ভাষার ব্যঞ্জনায় এই দেহ-সর্ব্বস্বতা অনেক সময়ে লেখকের চোখ এড়িয়ে যায়। অল্প শক্তিসম্পন্ন লেখকের হাতে এই দেহপরায়ণতা যে অশ্লীলতার পর্য্যায়ে পৌঁছত তা বলা বোধ করি অসঙ্গত হবে না। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে অবশ্য তাঁকে চূড়ান্ত দেহ-বাদী বলে মনে হবে না—গল্পের দেহ-সৌন্দর্য্যপরায়ণতার প্রাধান্য থাকলেও। কারণ সংশয়বাদীর মত কোন তত্ত্বের বা কোন আদর্শের

স্থায়ী আনন্দপ্রদ ও কল্যাণকর দিককে স্বীকার করে না আদরের সঙ্গে। নৈষ্ঠিক জড়বাদী মানুষ দেহের বা দেহ-সৌন্দর্য্যের বা সৌন্দর্য্য-সম্ভারের মধ্যে পায় একটা পরম সান্ত্বনার সন্ধান ও মানুষিক মুক্তির উপায়। কিন্তু খাঁটি সংশয়ী মন বাহ্যিকভাবে দেহপরায়ণ হলেও দেহবাদকে স্বীকার করে না শাশ্বত সত্য বলে। এইজন্যই বোধ হয় যতদূর স্মরণ হয় শ্রীঅরবিন্দ এক জায়গায় বলেছেন যে, দেহবাদী চরম নাস্তিক যে তারও সার্থকতা আছে, কিন্তু সংশয়বাদীর ও অজ্ঞেয়বাদীর কোন পথ নেই। যাই হোক, শিল্পীহিসাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও জীবন-দর্শনের দিক থেকে তিনি ইন্দ্রিয়বাদী প্রতিভাত হবেন না বিশ্লেষণশীল পাঠকের কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্যের জন্য। তাঁর এই সংশয়বাদী ঠাণ্ডা মনের স্পর্শ পেয়েছে তাঁর গল্প বা উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্র। দরদের অভাবে তাঁর প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠেছে উত্তাপহীন, মানে, পাঠকের মনে তারা স্থায়ীভাবে কোন কাজ করতে পারে না।

তাঁর গল্পে চোখধাঁধানো পরিণতি আছে, পরিণতির মধ্যে আছে সুদূরপ্রসারী ইঙ্গিত, আছে ভাষার কাব্যসুষমা। শব্দের যাদুখেলা বাক্যবিন্যাসের চাতুর্য্য মাঝে মাঝে নাটকীয় পরিবেশ, আর আছে চলতি সংস্কারকে চরমভাবে আঘাত করার অভীপ্সা, কিন্তু জাতশিল্পীসুলভ এই সব গুণ থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক ও স্থায়ী সৃষ্টির ঘরে জমার অঙ্ক তাঁর শূন্য। তার প্রধান কারণ, তাঁর সুষ্ঠু ও সুস্থ জীবন-দর্শনের অভাব। সৃষ্ট চরিত্রগুলির উপর দরদহীন ঠাণ্ডা পাথর-মনের স্পর্শ, গল্পাংশের অতিরিক্ত দারিদ্র্য, সঙ্কেতময়তার অভাব, মাঝে মাঝে অনাবশ্যক শব্দপ্রয়োগ। এ ছাড়া উপমার অপপ্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসে মাঝে মাঝে ত্রুটি কিয়ৎ-পরিমাণে তার রচনাকে করেছে দোষদুষ্ট। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে গল্পগুলির কালের দরবারে স্থায়ী আসনলাভের সম্ভাবনা না থাকলেও বাংলার ছোট গল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট চিহ্ন রেখেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চিরাচরিত পথ ছেড়ে বাংলা-সাহিত্যে সে সব সাহিত্যিক আঙ্গিকের জগতে নূতনত্বের চমক লাগিয়ে দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভিনবত্ব দিয়ে পাঠক মন আকর্ষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে জগদীশ গুপ্তের স্থান নিশ্চয়ই আছে। বাংলাদেশে জগদীশ গুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বহু কাহিনীধর্মী ছোট গল্পের রচয়িতা বাংলা-সাহিত্যে গল্প রচনা করেছেন ও যশস্বী হয়েছেন, কিন্তু নিছক রচনাশৈলীর চাতুর্য্যে গল্পাংশের দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও পাঠক মন জয় করতে পেরেছেন জগদীশ গুপ্তের মতন কয়েকজন মুষ্টিমেয় লেখক মাত্র। আজকের দিনে যখন বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনই সাহিত্য-বিচারের প্রধান মাপকাঠি বলে প্রচার করা হয় যত্রতত্র, সে সময়ে জগদীশ গুপ্তের রচনায় যথার্থ মূল্য নিরূপণকরা সত্যই দুরূহ। কিন্তু দুরূহ বলে সুবিচারে বিরত হলে সাধুতার দাবি নিয়ে সাহিত্যের দরবারে হাজির হওয়া চলে না।

একটু দূরে ...
বাস্তবানুগ করে তো
একটি ছোট গল্প হ'ত
কারণ রচনার মধ্যে মুক্তি
রচনার অনুপন্থী বলা চলে।
লেখকের ব্যঙ্গ-কষাঘাত সুলভ মে
কাব্য-ব্যঞ্জনা পরিচয় দেয় লেখকের
'সার্থক শিল্পরস হিসাবে "আ
যোগ্য এই গল্পটির মধ্যে অভি
থাকলেও চিত্রকার্য্য বাস্তবানুগ।
রসসৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে নি
নাটকীয়। মনস্তত্ত্বের দিক

পশ্চিমবঙ্গ ও শিল্প-এষ্টেটের পরিকল্পনা

শ্রীআদিত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কে কার্ভে কমিটি দুটো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। প্রথমতঃ কমিটি বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এমন একটা পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা দরকার, যেটার হাতে কেবলমাত্র গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। দ্বিতীয়তঃ কমিটির তরফ থেকে এই মর্ম্মে সুপারিশ করা হয়েছে যে, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্প সম্পর্কীয় বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানদের নিয়ে একটা কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠন করা দরকার। এই ধরনের বোর্ডগুলো কোন একটা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। গোটা ভারতের নানা এলাকায় এগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। কার্ভে কমিটির ধারণা, বোর্ডগুলোর মধ্যে যদি সমন্বয় সাধিত না হয় তা হলে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এগুলো স্থাপিত হয়েছে সে উদ্দেশ্য সফল হবার পক্ষে অন্তরায় দেখা দিবার আশঙ্কা আছে। তাই বোর্ড-গুলোর চেয়ারম্যানদের নিয়ে কো-অর্ডিনেটিং কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে।

বেশ কিছুদিন আগে এই মর্ম্মে একটা খবর প্রকাশিত হয়েছিল যে, পশ্চিম বাংলার কল্যাণীতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপনের জন্য আয়োজন চলছে। সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট স্থাপনের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে ভারত সরকার সে পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন বলেও জানান হয়েছিল। তা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারও এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য সচেষ্ট। ফলে ইতিমধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু কিছু কাজও সেখানে শুরু হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, পশ্চিম বাংলায় কেবলমাত্র কল্যাণীতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার চেষ্টা হবে কি না? সম্প্রতি জানা গেছে, কল্যাণী ছাড়া পশ্চিম বাংলার আরও পাঁচটি স্থানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপনের জন্য আয়োজন চলছে, যদিও বর্ত্তমানে কেবলমাত্র কল্যাণীতে এই ধরনের এষ্টেট স্থাপনের জন্য কাজ সুরু হয়েছে। স্থান পাঁচটির নাম হ'ল হাবড়া, বিলটিকারী, শক্তিগড়, শিলিগুড়ি, এবং বারুইপুর। অবশ্যি এই সব স্থানে কাজ আরম্ভ করতে হয়ত কিছুটা বিলম্ব ঘটবে। তা ছাড়া এখনও পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সবগুলো পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার যদি তৎপর হন তা হলে পরিকল্পনাগুলো অনুমোদিত হতে বিলম্ব ঘটবে না।

আজকের দিনে এ কথা না বললেও চলে যে, জন-সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হয়ে পড়ছে। এর পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। তবে আপাততঃ দুটো প্রধান কারণ বিশেষ করে চোখে পড়ছে। প্রথম কারণ হ'ল গুরুতর বেকার-সমস্যা। দ্বিতীয়তঃ সরকার যে করনীতি প্রবর্ত্তন করে চলেছেন সেটা আর্থিক দুর্গতি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মধ্যে যদি কর্ম্মসংস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকত তা হলে সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত করনীতির ফলে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ত অতটা খারাপ হ'ত না। তাই বর্ত্তমানে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ হ'ল কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা করতে গেলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে কৃষির উপর। অবশ্যি এই পরি-প্রেক্ষিতে শিল্পের গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করছি না। আমাদের মনে হচ্ছে, বেকার-সমস্যার আশু সমাধানের জন্য কেবলমাত্র সেসব শিল্প-গুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া বাঞ্ছনীয় যেসব শিল্প থেকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার মত জিনিষ পাওয়া যাবে। তা ছাড়া কৃষি কিম্বা এই ধরনের শিল্পে যে মূলধন নিয়োগ করতে হয় সে মূলধনের তুলনায় কর্ম্মসংস্থানের অনেক বেশী সুযোগ পাওয়া যায়। জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে ভারী শিল্পের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। তবে এই ধরনের শিল্পের সাহায্যে খুব তাড়াতাড়ি কর্ম্মসংস্থান-সমস্যার সমাধান করা সম্ভবপর নাও হতে পারে। তাই আমরা এ ক্ষেত্রে এর উপর অতটা জোর দিতে চাই না। কল্যাণী, হাবড়া, বিলটিকারী, শিলিগুড়ি, শক্তিগড় এবং বারুইপুর এই ছয়টি স্থানে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপনের যে চেষ্টা চলছে তা খুবই প্রশংসনীয়। যদি শেষ পর্য্যন্ত এই নয়টি স্থানে এ ধরনের এষ্টেট স্থাপিত হয় তা হলে একদিকে যে রকম কাজের ব্যবস্থা হবে সে রকম অন্যদিকে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা কিছু লাঘব হবার আশা আছে। কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপন করতে গেলে প্রচুর টাকা দরকার হবে। জানা গেছে, কল্যাণীতে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সুরু হয়েছে সে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য সাতান্ন লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। অবশ্য হাবড়া, শিলিগুড়ি এবং বারুইপুরে এই ধরনের এষ্টেট স্থাপনের জন্য রচিত পরিকল্পনা ভারত সরকার এখনও পর্য্যন্ত মঞ্জুর করেন নি। তবে যে ভাবে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে তাতে খরচ মোটেই কম পড়বে না। বরং হাবড়ায় অনেক বেশী খরচ পড়বে বলে অনুমান করা হয়েছে। অর্থাৎ, হাবড়ার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে গেলে প্রায় পঁচাত্তর লক্ষ টাকা খরচ হবে। শিলিগুড়ি এবং বারুইপুরে পরিকল্পনার জন্য কিন্তু কল্যাণী পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম টাকা ধরা হয়েছে। এই দুটো স্থানের প্রত্যেকটিতে চার লক্ষ টাকার বেশী খরচ করা হবে না বলে জানা গেছে।

পশ্চিম বাংলায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেট প্রতিষ্ঠিত হোক এটা প্রত্যেকটি পশ্চিমবঙ্গবাসী চাইছেন। কিন্তু এষ্টেট স্থাপন করার সময়ে তিনটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথমতঃ দেখতে হবে, জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটের পরিকল্পনার সামঞ্জস্য রয়েছে কিনা। দ্বিতীয় বিষয় হ'ল কি ভাবে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটকে ব্যবহার করা সম্ভবপর। তৃতীয়তঃ দেখতে হবে পশ্চিম বাংলার লোকসংখ্যা, অর্থনৈতিক প্রয়োজন, এবং জনবসতির দিক থেকে কোন্ স্থানে এবং কি আকারে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেট স্থাপন করা দরকার।

প্রথমে শোনা গিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের যেসব স্থানে শিল্প এষ্টেট স্থাপিত হবে সেসব স্থানের মধ্যে দুর্গাপুর হ'ল অন্যতম। কিন্তু সরকার শেষ পর্য্যন্ত শিল্প এষ্টেট পরিকল্পনা থেকে দুর্গাপুরকে বাদ দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যেহেতু দুর্গাপুরে অনেকগুলো বৃহৎশিল্প স্থাপিত হবার সম্ভাবনা, সেহেতু দুর্গাপুরকে আসানসোল, বানপুর এবং খড়্গপুরের মত একটা পূর্ণাঙ্গ শিল্পনগরী হিসাবে গড়ে তোলার আশা আছে। তাই সরকার দুর্গাপুরে শিল্প-এষ্টেট স্থাপন করতেচ চাইছেন না।

জানা গেছে, যেসব শিল্প-এষ্টেট স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেসব এষ্টেটে যাতে জলসরবরাহ, পথঘাট, নর্দমা, গুদাম, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকার পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। হয়ত এই সব শিল্প-এষ্টেট সম্পর্কীয় ব্যাপারে সরকারের কাজ শীঘ্র অনেকদূর এগিয়ে যাবে। হাবড়া, শিলিগুড়ি, কল্যাণী এবং বিলটিকারীতে যেসব এষ্টেট স্থাপিত হবে সেসব এষ্টেটের প্রত্যেকটির আয়তন এক শত একরের কম হবে না বলে প্রচার করা হয়েছে। তবে শক্তিগড় এবং বারুইপুরে যে দুটো এষ্টেট স্থাপন করা হবে সে দুটোর প্রত্যেকটির আয়তন এর চেয়ে কিছু কম হবে বলে জানা গেছে। শিলিগুড়ির ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এষ্টেটটি হবে গোটা উত্তরবঙ্গের একমাত্র এষ্টেট। প্রকাশ, চা-বাগানে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় এই এষ্টেটে সে সব যন্ত্রপাতি তৈরি করা সম্ভবপর কিনা সেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিবেচনা করে দেখছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, প্রস্তাবিত শিল্প-এষ্টেটে কি ধরনের শিল্পকে স্থান দেওয়া হবে। এই এষ্টেটে স্থান পেতে হলে দুটো সর্ত্ত পূরণ করা একান্ত দরকার। প্রথম সর্ত্ত হ'ল, শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার বেশী হলে চলবে না। দ্বিতীয়তঃ শিল্পটি যদি বিদ্যুৎ-চালিত হয় তা হলে শ্রমিকের মোট সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ জন হওয়া চাই। আর যদি শিল্প বিদ্যুৎ-চালিত না হয় তা হলে শ্রমিকের মোট সংখ্যা একশত জনের কম হলে চলবে না।

হে সুন্দর

শ্রীকরুণাময় বসু

হে সুন্দর, তুমি মোরে বারবার করেছ আহ্বান,
পুষ্পাকীর্ণ তরুশাখে ফাল্গুনের অপরাহ্ণ বেলা
পাখি গাহে গান।
মেঘে মেঘে নানা রঙে অপূর্ব ব্যঞ্জনা,
রূপের তোরণ-দ্বারে হে সুন্দর তব অভ্যর্থনা।
মৌমাছি বিদায়বেলা নিয়ে গেল মধু স্মৃতিটুকু,—
সেই ত তোমার দান : পত্রপুটে ডাকে দুটি ঘুঘু
বনান্তের বকুলছায়ায়,
সেই পথে শিল্পীমন আনমনা কোথা চলে যায় ?

হে সুন্দর, জানি আমি আনন্দের কোন ঠাঁই নেই,
সবকিছু শূন্য করে এই জীবনেই
উদাসী বাউল সাজে,
হাতে আছে একতারা, ছেঁড়া তারে পৃথিবীর সব সুর বাজে।
আমার যৌবন গেছে, কানে শুনি কালিন্দীর ডাক,
তবু যেন যৌবন কহিছে মোরে শেষ বার,
ভয় নেই, থাক্ ওরে থাক্,
অনন্ত আনন্দ আজো উঠিছে উথলি,
রূপের পসরা হতে মধুক্ষরা প্রাণ-স্রোত উঠিছে চঞ্চলি'।

হে সুন্দর, তুমি যদি কাছে এসে
হাতে মোর হাতখানি রাখো,
সেই ক্ষণে পার হয়ে চলে যাব ভাঙাচোরা জীবনের সাঁকো।
পার হয়ে চলে যাব ঝরাপাতা দিয়ে গাঁথাশূন্য রিক্ত দিন,
যেখানে আনন্দ আছে, বয়সের সাথে যেথা
আমার যৌবনস্মৃতি কোন দিন হবে না বিলীন।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

শ্রীঃ

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী বাংলা [illegible]১ সনের ২রা বৈশাখ চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত চালতাতলি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাড়ী বিক্রমপুরে চুড়াইন গ্রামে ছিল। তাঁহার পিতা মহিমচন্দ্র গাঙ্গুলী নারায়ণগঞ্জের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন। সেই সময়ে নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম ভারতীয় চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন।

প্রতুলবাবু শৈশবে স্কুলে পড়ার সময় হইতে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন ও অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য হন। তাঁহার মাতা বগলাসুন্দরী দেবী পুত্রের এই সমস্ত কার্য্যে কোন দিন বাধা দেন নাই, তিনি বরং পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়া ও নানা ভাবে সাহায্য করিয়া অনেক কঠিন বিপদের বোঝা মাথায় লইয়াছিলেন। যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে।

প্রতুলবাবু নির্ভীক কর্ম্মকুশলতার দ্বারা বিপ্লবীদের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯১২ সনে ঢাকা কলেজে আই-এ পড়ার সময় বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁহার নামে পরোয়ানা বাহির হয়, কিন্তু পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। পলাতক অবস্থায় তিনি রাসবিহারী বসুর সহযোগে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেন ও অনুশীলন সমিতির সংগঠনকার্য্য বাংলা ও বাংলার বাহিরে করিতে থাকেন। এই সময় তিনি অনেকবার অতি আশ্চর্য্য উপস্থিতবুদ্ধির দরুণ পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইতে হইতে রেহাই পান। একবার কলিকাতা শহরে তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুলিস একটি মেস ঘেরাও করে। তিনি অন্যান্য বোর্ডারদের মত মুখ চাদরে ঢাকিয়া শুইয়া থাকেন—পুলিস তাঁহার ও অন্যান্য বোর্ডারদের মুখের চাদর সরাইয়া দেখে ও তাঁহাকে না চিনিতে পারিয়া চলিয়া যায়। ১৯১৪ সনে কলিকাতার রাস্তায় তাঁহার শৈশবের একটি প্রতিবেশী তাঁহাকে পুলিসের হস্তে ধরাইয়া দিয়া পুরস্কারলাভ করে। তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তীও (মহারাজ) এই সময়ে কলিকাতায় গঙ্গাস্নানের সময় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন।

গবর্ণমেণ্ট বরিশালের অতিরিক্ত মামলায় ইঁহাদের সোপর্দ্দ করেন। প্রতুলবাবুর নিম্ন আদালতে ১০ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়। ১৯১৬ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আপিল করেন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিনা পারিশ্রমিকে তাঁহার মামলা হাতে লন। হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তি পান; কিন্তু জেলের দরজায় তাঁহাকে ১৮১৮ সনের তিন আইনে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজবন্দী করিয়া রাখা হয়। মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলে থাকার সময় তিনি প্রায়োপবেশন করেন। এই সময় তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী ও তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী বঙ্গোপসাগরে মহেশখালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপে অন্তরীণাবদ্ধ হন। ১৯২০ সনে তাঁহারা তিন ভ্রাতাই মুক্তি পান। ১৯২১ সনে প্রতুলবাবু বিবাহ করেন। এক বৎসর পর তাঁহার পত্নী একটি কন্যা রাখিয়া মারা যান।

জেল হইতে বাহির হইয়া প্রতুলবাবু—মহারাজ ও শ্রীরবীন্দ্রমোহন সেন প্রভৃতির সহযোগে পুনরায় বিপ্লবীদল গঠন করেন। ১৯২৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লী কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হইতে কলিকাতায় রওনা হন। রাস্তায় খবর পান যে, কলিকাতায় প্রসিদ্ধ বিপ্লবীদের পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে। তিনি পুলিসকে এড়াইবার জন্য লিলুয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া দেশবন্ধু দাশের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহকর্ম্মী হন। নেতাজীর দেশ হইতে পলায়নের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি একযোগে কাজ করেন। প্রতুলবাবু এই সময় পলাতক অবস্থায় বৈপ্লবিক কাজের জন্য তাঁহার ঢাকার বাসায় যখন দুই দিনের জন্য আসেন তখন একজন গুপ্তচর তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিসে খবর দেয়।

খবর পাইবামাত্র বেলা ২টার সময় আই. বি. সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এনসন সাহেবের পরিচালনায় একটি বিপুল পুলিসবাহিনী তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করে। তিনি উপস্থিতবুদ্ধিবলে ও মাতা এবং ভগিনীদের সাহায্যে পুলিসবাহিনী এড়াইয়া পলায়ন করেন। দেওয়াল হইতে লাফ দেওয়ার সময় তিনি পায়ে খুব আঘাত পান এবং এই জন্য কিছুদিন তাঁহাকে ভুগিতে হয়। ১৯২৪ সনে ফরিদপুরের রাজবাড়ী ষ্টেশনে ট্রেন বদলের সময় একজন উচ্চপদস্থ পুলিস কর্ম্মচারী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গ্রেপ্তার করে। ১৯২৮ সনে তিনি মুক্তিলাভ করেন ও এই সময় তিনি ঢাকা শহর হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩০ সনে রাজসাহীতে একটি সভায় সভাপতিত্ব করার সময় পুলিস তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে ও তিনি ১৯৩৯ সনে মুক্তিলাভ করেন। তিনি বাংলা দেশের নানা জেলে, বক্সা বন্দীশিবিরে, ব্রহ্ম দেশের, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন জেলে বন্দীজীবন যাপন করেন। ১৯৪০ সনে তিনি পুনরায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪১ সনে তিনি পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হন। এই সময় তিনি নেতাজীর সহিত প্রায়োপবেশন করেন। তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায়

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

তিনি সাময়িক ভাবে মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু নেতাজীর পলায়নের পর আবার অসুস্থাবস্থায় তাঁহাকে জেলে আনা হয়। নেতাজী ব্রহ্মদেশ হইতে দুই জন বিশ্বস্ত বাঙালী বিপ্লবীকে প্রতুলবাবুর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য সাবমেরিণে ভারতে পাঠান কিন্তু তখন প্রতুলবাবু জেলে আবদ্ধ। ১৯৪৭ সনে তিনি মুক্তিলাভ করেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

প্রতুলবাবুর স্বভাব মধুর ও অমায়িক ছিল। বড় বড় পুলিস কর্ম্মচারীরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। বাংলার বাহিরে তাঁহার পরিচিত বহু অবাঙালী বিপ্লবী বন্ধু ছিলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় তাঁহার জেলে কিংবা পলাতক অবস্থায় কাটিয়াছে—সেই জন্য সাধারণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল না। তবে জনসাধারণ তাঁহাকে নির্ভীক বিপ্লবী বলিয়া জানিত এবং তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী রচনা করিত। ট্রেনে বা ষ্টীমারে চলার সময় তাঁহারই পাশে বসিয়া অপরিচিত যাত্রীদিগকে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প করিতে শুনিয়াছেন; ইহার অনেকটা ভিত্তিহীন ছিল।

১৯৪৭ সনের স্বাধীনতা লাভের পর তিনি রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে জীবনযাপন করেন। তিনি বলিতেন, "কবিগুরুর প্রশ্নের—'কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব পেয়েছি আমার শেষ'—উত্তর দেবার যোগ্যতা আমরা লাভ করেছি। আমাদের বিপ্লবীদের এর পর আর কিছু করিবার নাই আমাদের কর্ম্মে অধিকার থাকলেও ফলে অধিকার নাই।" এই জন্য তিনি নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কাহারও কাছে যান নাই। শেষ জীবনে তিনি স্বীয় বিপ্লবী-জীবনের অভিজ্ঞতা গল্পাকারে লেখা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গল্প 'প্রবাসী'তে ছাপান হয়। দুই বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় বার 'ষ্ট্রোক' হইবার পর ডাক্তারের কথামত তিনি লেখা বন্ধ করেন। মৃত্যুর প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হইলেই তাঁহাদের কাছে শেষ বিদায় লইতেন। তাঁহার কথাবার্ত্তায় বুঝা যাইত যে, তিনি বেশী দিন আর ইহজগতে থাকিবেন না। গত ৫ই জুলাই সকালে তাঁহার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয় এবং বৈকাল ৫-৩০ ঘটিকার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট

ডক্টর শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

[সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত "প্রোগ্রেসিভ জার্মান রীডারে"র সংকলন ব্যপদেশে জার্মান-কবি হায়েনের লিখিত কাণ্টের একটি অতি সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য চোখে পড়ে। কাণ্টের দু'একটি বাণীও আমাদের বর্তমান সমাজের 'কর্তাভজা' মনোবৃত্তি নিরসনে বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে হওয়ায় এগুলি বাঙালী পাঠকপাঠিকাদের সামনে ধরছি।]

কাণ্টের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করা বড় কঠিন কাজ। কারণ তাঁর না ছিল জীবন, না ছিল তার ইতিহাস। জার্মানীর উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত প্রাচীন শহর কোয়েনিগসবার্গের প্রত্যন্ত দেশে জনবিরল এক গলির মধ্যে চির-কুমার কাণ্ট বৈচিত্র্যবর্জিত একঘেয়ে জীবনযাপন করতেন। আমার মনে হয়, ঐ শহরের গীর্জার ঘড়িটির চাইতেও বেশী নিরাসক্ত ঘড়িধরা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তাঁর প্রাত্যহিক কাজকর্ম সম্পন্ন হ'ত। শয্যাত্যাগ, প্রাতর্ভোজন, প্রবন্ধাদি লিখন, অধ্যাপনা, আহার, সান্ধ্যভ্রমণ প্রত্যেকটি কাজই তিনি করতেন ঘড়ির কাঁটা ধরে। যখন ইমানুয়েল কাণ্ট তাঁর ছাই-রঙের ওভারকোট গায়ে স্পেনীয় বেতের লাঠি হাতে তাঁর দরজা থেকে বেরিয়ে ছোট্ট নেবু-এভিনিউতে বেড়াতে যেতেন তখন আশপাশের লোকেরা বুঝত সাড়ে

তিনটা বেজেছে। বর্তমানে তাঁর এই বেড়াবার জায়গাটিকে বলা হয় "দার্শনিকের পথ"। বৎসরের যে কোনও সময়েই হোক না কেন, তিনি এই স্থানে আট বার চক্র দিতেন। যখন আবহাওয়া খারাপ থাকত বা জলভরা মেঘ আসন্ন বৃষ্টির আভাস দিত তখন তাঁর প্রিয় ভৃত্যটি পুরাতন একটি লণ্ঠন হাতে এবং প্রকাণ্ড একটি ছাতা বগলে করে ব্যাকুল উৎকণ্ঠায় প্রভুর পিছনে পিছনে ঘুরত।

যাঁর চিন্তাধারা সারা বিশ্বকে তোলপাড় করে তুলত—যুগান্তসঞ্চিত কুসংস্কার ও সামাজিক গ্লানির বিরুদ্ধে যাঁর শাণিত লেখনী সর্বদা উদ্যত থাকত—সেই ইমানুয়েল কাণ্টের বাহ্য বেশভূষা বা আচার-আচরণে তা তিলমাত্র বুঝা যেত না। ঐ শহরের লোকেরা যদি তাঁর চিন্তাধারার মর্ম বুঝতে পারত তবে তারা ভীত চকিত ভাবে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করত—যেমন লোকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞাদানকারী বিচারকের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা তাঁকে নিরীহ একজন অধ্যাপক ভিন্ন আর কিছুই ভাবতে পারত না এবং যখন নির্দিষ্ট সময়ে তিনি তাঁদের পাশ দিয়ে চলে যেতেন তখন তারা তাঁকে আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতই সাদর অভিবাদন জানাত—তার পর তিনি একটু সরে গেলে তাদের ঘড়ির দিকে চেয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নিত।

স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা
—ইমানুয়েল কাণ্ট (১৭৩৪—১৮০৪)

যখন কেউ বলে, অমুক জাতি স্বাধীনতালাভের যোগ্য নয় তখন সেকথা আমার আদৌ ভাল লাগে না। এরূপ ধারণা প্রবল হলে কেউ কখনও স্বাধীনতা পেতে পারে না। কাউকে স্বাধীনতা না দিয়ে কখনই বুঝা যায় না যে, সে স্বাধীনতালাভের যোগ্য কিনা। স্বাধীনতার প্রথম পরীক্ষা হয়ত অকিঞ্চিৎকর, সাধারণ বা কষ্টকর এবং বিপজ্জনক হতে পারে অবশ্য যদি অপরের অভিভাবকতার আওতার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে, স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত কেউ নিজের বিচারবুদ্ধি পরিচালনাপূর্বক যথার্থ স্বাধীনতালাভের যোগ্য হতে পারে না।

যুক্তিবাদ কি?
—ইমানুয়েল কাণ্ট

মানুষের মজ্জাগত স্বেচ্ছাকৃত হেয় পরনির্ভরশীলতা (নাবালকত্ব) থেকে মুক্তিলাভই প্রকৃত যুক্তিবাদ বা র্যাশনালিজম। অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে নিজের বুদ্ধিবৃত্তি চালানোর অক্ষমতাই এস্থলে নাবালকত্বের পরিচয়। স্বেচ্ছাকৃত বলার উদ্দেশ্য এই যে, এই নাবালকত্ব বুদ্ধির অভাবপ্রসূত নয়—এর মূলে রয়েছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং সাহসিকতার নিদারুণ দৈন্য। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! যুক্তিবাদের মূলমন্ত্রই হ'ল সাহসের সঙ্গে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে চলা।

অধিকাংশ মানুষের বেলাতেই দেখা যায়, আলস্য এবং ভীরুতার জন্যই তারা অপরের বুদ্ধিতে চালিত হয়ে থাকে যদিও প্রকৃতি তাদের অনেক আগেই নাবালকত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। অপর চালাক লোকেরা এদের ভীরুতা এবং অলসতার সুযোগ নিয়ে তাদের অভিভাবক সেজে বসবার সুযোগ পায়। নাবালক হয়ে থাকার মজাও আছে অনেক।

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট সাবানেই এসব কাচা হয়েছে!

কোনও একখানি গ্রন্থে নিবদ্ধ থাকবে আমার যুক্তি-বুদ্ধি, জনৈক আধ্যাত্মিক গুরুর কাছে গচ্ছিত থাকবে আমার বিবেক, আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক করে দেবে এক জন ডাক্তার, কাজেই আমার নিজের ত কিছুই করণীয় নেই। আমার মাথা ঘামানোরই বা প্রয়োজন কি ?—আমি টাকা খরচ করেই খালাস! জীবনে যা কিছু ভাবনার বা বিরক্তির কারণ সব ত সঁপেছি অন্যের উপরে।

যুক্তিবাদের গোড়ার কথা হ'ল স্বাধীনতা—আর এই স্বাধীনতার স্বরূপ হ'ল সর্বকাজে সর্বতোভাবে নিজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করা। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে সবদিকেই আমরা প্রতিনিয়ত শুনতে পাচ্ছি—যুক্তিতর্কের কোনও ঠাঁই নেই। সেনাপতি হাঁকছেন—যুক্তি নয়, চাই নির্দেশমত কাজ! রাজস্বসচিব বলছেন—তর্ক নয়, ফেল টাকা! ধর্মগুরু বলছেন—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর! পৃথিবীতে একমাত্র ব্যক্তি যিনি বলতেন—"যার যা বিশ্বাস, অবাধে সেই ধর্ম মেনে চল, যত পার নিজের বিবেক অনুসরণ কর—যত পার যুক্তি তর্ক কর, তবে একটি কথা এই—অবাধ্য বা উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ো না।"—এই ব্যক্তি হচ্ছেন প্রুশিয়ার সম্রাট মহামতি ফ্রিডরিশ ডের গ্রোসে।

কাজেই স্বাধীনতা কোথায় ? সর্বত্রই ত বাধানিষেধের অন্ত নেই! যুক্তিবাদের পক্ষে কোন্ নিষেধ শুভ আর কোনটা অশুভ ? এ কথার উত্তরে বলব—তোমার বিচার-বুদ্ধির প্রকাশ্য পরিচালনা সর্বদাই দ্বিধামুক্ত হবে এবং উহাই যুক্তিবাদ বিকাশের প্রথম সোপান ও পরম আশ্রয়।

অবান্তর হলেও একটি কথা বলা প্রয়োজন যে, রাজা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ইদানীং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মনীষীরা আমাদের দেশেও যে যুক্তির যুগ আনয়নে সচেষ্ট হয়েছিলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে যুগ যেন ক্রমশঃ কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য বেশী গবেষণার দরকার নেই। খবরের কাগজে নিয়মিত রাশি-নক্ষত্রের ফলাফল ফলাও করে ছাপানো—ঠাকুর ও মায়ের শান্তি নষ্ট করে তাঁদের নিয়ে সমাজের সর্বস্তরেই যেরূপ টানা-হেঁচড়া চলছে তাতে যুক্তিবাদের বা দেশের প্রগতি যে রসাতলে যেতে বসেছে তা কয়জন তলিয়ে দেখছে ? আমাদের শিক্ষাও আদৌ যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে হচ্ছে না—তাই যত গলদ সমাজদেহে দুষ্টক্ষতের মত প্রসার লাভ করছে। অবিলম্বে এ সবের প্রতিকার না হলে—মানুষ তৈরির প্রকৃষ্ট পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হয়ে না উঠলে—কোটি কোটি টাকা খরচ করে অসংখ্য পরিকল্পনাতেও এদেশকে কল্যাণ-রাষ্ট্রে পরিণত করা যাবে না।

মূল জার্মান থেকে অনূদিত

সাংবাদিক সম্মেলনে বর্দ্ধমান বিভাগ জেলা সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষের বিবৃতি

সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মিলনে বর্দ্ধমান বিভাগ জেলা সম্মিলনীর তরফ হইতে সাতরাগাছি বিষ্ণুপুর (ভায়া রাধানগর আরামবাগ এবং কামারপুকুর) রেলপথটির সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে বিবৃতি দেওয়া হয় তাহার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার প্রায় ১০ লক্ষাধিক অধিবাসী স্বাধীনতাপ্রাপ্তির একাদশ বৎসরে পশ্চিম বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলিকাতা শহরের সহিত যোগাযোগের অভাবে চরম দুর্ভোগ সহ্য করিতেছে। উহার প্রতিকার না হওয়া পরিতাপের বিষয়।

বি. এন রেলওয়ে কোম্পানী রেলপথটি নির্ম্মাণের সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ মিঃ ডালচ-কৃত বিবরণী হইতে লাভের পরিমাণ জানিতে পারা যাইবে। ১৯১৪ সনে উক্ত বিবরণী মুদ্রিত করিয়া তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন। বিশিষ্ট ইঞ্জিনীয়ার শ্রীকালিদাস রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন, কেবলমাত্র কয়লা ব্যবসায়ের মাশুল বাবৎ বৎসরে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং ইহার দ্বারা ১০ বৎসরে রেলপথটি নির্ম্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পাওয়া যাইবে। ঐ টাকার পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি টাকা। দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতের সহিত কলিকাতা বন্দরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের পথও সুগম হইবে।

১৯৫১ সনের সরকারী সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯০১ সন হইতে ১৯৩০ সনের মধ্যে আরামবাগ মহকুমার ১৪টি গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে। ৪টি মহকুমার মধ্য দিয়া এই পথটি বিস্তৃত হইবে। আরামবাগ মহকুমার ন্যায় অন্য মহকুমাগুলিতেও জনশূন্য গ্রাম থাকিতে পারে। মোটামুটি হিসাবে জানিতে পারা গিয়াছে, থানাকুল থানার প্রায় ২০ হাজার অধিবাসী কলিকাতা শহরে অস্থায়ী ভাবে বাস করিতেছে। রেলপথটি আটটি থানার উপর দিয়া বিস্তৃত হইবে। আমাদের বক্তব্য জনশূন্য গ্রামগুলিতে অধিবাসীরা ফিরিয়া যাইবে—যাতায়াতের সুব্যবস্থার ফলে। পল্লীর শ্রীবৃদ্ধি হইবে এবং কলিকাতার লোকের চাপ হ্রাস পাইবে। শহরের সুখ-সমস্যারও সমাধান হইবে। ঐ সমস্ত স্থানে উদ্বাস্তুগণের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমান রেলপথের ৪৪ মাইল দূরত্ব কমিয়া যাওয়ায় বিষ্ণুপুর এবং পুরুলিয়ার অধিবাসিগণ অর্থ ও সময়ের অপচয় হইতে রক্ষা পাইবে। স্থানীয় কুটীর-শিল্পগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারে লাভের পথ সুগম হওয়ায় কৃষকগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইবে। রেলপথের বিস্তারকে জাতীয় কংগ্রেস বেকার-সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

থানাকুল থানা (হুগলী) পল্লী উন্নয়ন সমিতি ১৯৪৮ সনে একটি স্মারকলিপি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারের নিকট পেশ করিয়া রেলপথটি নির্ম্মাণের আবেদন জানাইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বহু বিক্ষিপ্ত আন্দোলন ১৯৫৫ সনের ৮ই মে এক মহতী সভায় সংহত হয়। এই সভায় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ড. শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার রায় বাহাদুর শ্রী এন. সি. ঘোষ উক্ত সভায় বলিয়াছিলেন, ভারতের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে অচিরে পশ্চিমবঙ্গে এই রেলপথটি নির্ম্মাণ করা উচিত। তিনি আরও বলিয়াছিলেন, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কয়লা-শিল্পের যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে তাহার স্বার্থও ইহার সহিত জড়িত।

বর্দ্ধমান বিভাগের জেলাসমূহের আটটি সংস্থা উক্ত সভার উদ্যোক্তা ছিলেন। "বর্দ্ধমান বিভাগ জেলা সম্মিলনী" নামে পরে তাঁহারা সংগঠিত হন। এই রেলপথের দাবিটি কার্য্যকরী করার জন্য এই সংস্থার উদ্যোগে যে প্রচেষ্টা চলিয়াছে তাহার একটি মোটামুটি বিবরণ এই :

১৯৫৫ সনের ২৭শে আগষ্ট ভারতীয় লোকসভায় এবং ১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই দাবি সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ ইহার জরুরি প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

১৯৫৫ সনের ৩০শে মে'র সভায় হুগলী জেলা বোর্ড একটি প্রস্তাবে এই রেলপথটি সত্বর নির্ম্মাণের জন্য রাজ্য-সরকার, পরিকল্পনা কমিশন এবং রেলওয়ে বোর্ডের নিকট অনুরোধ জানান।

৫,০০০ হাজার অধিবাসীর স্বাক্ষর এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিভিন্ন দলের একশত সদস্যের স্বাক্ষরসহ একটি স্মারকলিপি

১৯৫৫ সনের ২১শে অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে দিয়া তাঁহাকে অনুরোধ জানানো হইয়াছিল, উহা কেন্দ্রীয় রেলওয়ে বোর্ড ও রেলমন্ত্রী মহোদয়ের নিকট যেন তিনি পাঠাইয়া দেন।

২,০০০ হাজার স্বাক্ষর এবং ২০টি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রস্তাবসহ একটি আবেদন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পেশ করা হইয়াছিল।

১৯৫৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর আমাদের প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে একটি আবেদনপত্র দিলে শ্রীশাস্ত্রী রেলপথটির আশু নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-সংস্থা

গত ১৪ই জুলাই, রবিবার হোটেল মেট্রোপোলে 'সাহিত্য সংস্থা'র পক্ষ হইতে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রণতি রায় সাংবাদিকদের নিকট

সাহিত্য সংস্থা'র আদর্শ এবং ব্যাপক কর্ম্মসূচী বর্ণনা করেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সংস্থার মুখপাত্র বলেন যে, তাঁহাদের বিরাট পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্ত তাঁহারা সঙ্গীত-নাটক-আকাদামি এবং ইউনেস্কোর সাহায্য প্রার্থনা করিবেন। পতঞ্জলি ভট্টাচার্য্য, প্রণতি রায়, সুশীতল দত্ত, জ্যোতিকুমার ও চিত্তরঞ্জন দাশকে লইয়া গঠিত একটি বোর্ড সংস্থার পক্ষ হইতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন।

সাংবাদিক সম্মেলনের পর সুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ডক্টর কালিদাস নাগ উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শচীন সেনগুপ্ত, জয়কৃষ্ণ সান্যাল মন্মথ রায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অখিল নিয়োগী। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গোপাল ভৌমিক, এবং জ্যোতিকুমার। একটি মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে সংস্থার শিল্পীবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন।

গত ৪ঠা আগষ্ট 'প্রাচ্য-ভারতী'র গৃহে সাহিত্য-সংস্থার উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক শ্রীঅমূল্যরতন সান্যাল উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র। শ্রীআশু চট্টোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। একক সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন বীণা মিত্র, জয়শ্রী বসু ও কল্যাণী রায়। শ্রীদ্বিজেন ঘোষের পরিচালনায় সংস্থার শিল্পীবৃন্দের কণ্ঠে প্রারম্ভ ও উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। প্রধান অতিথি শ্রীনলিনীকুমার ভদ্রের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণের পর প্রাচ্য-ভারতীর অধ্যক্ষা শ্রীমতী নীলিমা দাসের তত্ত্বাবধানে এবং শ্রীমতী প্রতিমা রায়ের পরিচালনায় একটি নৃত্যানুষ্ঠান হয়। সাহিত্য-সংস্থার সভাপতি, কবি জ্যোতিকুমার অভ্যাগতদের স্বাগত জানান এবং যুগ্ম-সম্পাদিকা শ্রীমতী প্রণতি রায় সঙ্ঘের আদর্শ বর্ণনা করেন। অধ্যাপক শ্রীবিভূতি বসু এবং নৃত্যশিল্পী শ্রীপ্রহ্লাদ দাস সারগর্ভ আলোচনা করেন। সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজয়দেব রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীমতী শ্রীচৌধুরী। শিবু দত্ত ও অরুন্ধতী রায়ও অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। নাট্যকার শ্রীমন্মথকুমার চৌধুরীর কর্ম্মতৎপরতায় সাহিত্য সংস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রীদের কৃতিত্ব

এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ, আই-এসসি ও বি-এ পরীক্ষার পাসের হার খুব কম হইলেও লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের পাসের হার যথাক্রমে ৮৯,৯৪ ও ৯৮। এই বৎসর বি-এ পরীক্ষায় যে পাঁচ জন ছাত্রী প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তিন জনই ব্রেবোর্ণ কলেজের ছাত্রী। শ্রীতারা চক্রবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্রে একমাত্র প্রথম শ্রেণীর অনার্স, ফারসীতে শ্রীহাসনাবানু প্রথম শ্রেণীর প্রথম এবং শ্রীসিতারা তাবিন প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান এবং দুই জন ছাত্রী ডিসটিংশন লাভ করিয়াছেন।

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য বার টাকা।

বিগত কয়েক বৎসরে বিপ্লব-সংক্রান্ত অনেকগুলি পুস্তক বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি আত্মচরিত এবং সেখানে বিপ্লবের চেয়ে বিপ্লবীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক নিজেকে যথাসম্ভব অন্তরালে রাখিয়া বিপ্লবকে বড় করিয়া দেখাইয়াছেন। "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি"র ইহাই প্রধান বৈশিষ্ট্য। আলিপুর বোমার মামলার পর ক্রমে ক্রমে বিপ্লবী সংস্থার নেতৃত্বভার যাঁহাদের উপর গিয়া পড়ে শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। আজীবন স্বাধীনতার উপাসক এই বিপ্লবী বীর আদর্শবাদী। এই আদর্শবাদ তিনি এবং তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতারা উত্তরাধিকারসূত্রে পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিপ্লবের কাজেই ধনগোপালকে জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইতে হয় এবং সেখানে ভারতের গৌরব-ব্যাখ্যাতা গ্রন্থকার হিসাবে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেন। শৈশব এবং কৈশোরে লেখক পারিবারিক আবেষ্টন এবং সামাজিক পরিবেশ হইতে কি ধরনের বৈপ্লবিক ভাবধারা গ্রহণ করেন এবং কিভাবে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করে, 'প্রত্যূষ' এবং 'পূর্ব্বাহ্ণে'র পনেরটি পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। 'মধ্যাহ্ন' এবং 'উন্মেষে' কর্ম্মধারার পরিচয় আছে। লেখকের মতে বিপ্লব চতুরঙ্গ, এই চতুঃশক্তি ছাত্র বা যুবক, শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যদল। লেখক সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না বলিয়া বৈদেশিক সাহায্যের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হয়। প্রথম মহাসমরের সময় জার্ম্মানী হইতে সে সাহায্যের আশা আসে। সেই আশায় বিপ্লবীকেশরী যতীন মুখোপাধ্যায় বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। বুড়ীবালামের তীরের যুদ্ধ এই সব ঘটনার ফল।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাবের দিক দিয়া মানুষের মন স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অনেকটা প্রস্তুত হইয়াছিল। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ নিমিত্তস্বরূপ হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর দিয়া বাঙালীর মনকে মাতাইয়া তোলে। সে আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়, অথবা প্রকৃত প্রস্তাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টার সূচনার পর স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়। বহু বিচারের পর লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, "স্বাধীনতা-আন্দোলন দেশে দেশে শান্ত ও অশান্ত ভঙ্গিমায় ঢেউয়ের মত চলে। সবটাকে জড়িয়ে বলি বিপ্লব।...বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নেতৃত্বের উদ্ভব। যখন যে ব্যক্তি ঢেউয়ের মাথায় অবস্থান করে আমরা চারপাশের লোক তাকে তখন অসাধারণ মনে করি।...বিপ্লব তার নিজ পরিণতির তাড়নায় রূপান্তর গ্রহণ করে।" অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা, রাজনৈতিক নৈরাশ্য, সামাজিক দুর্গতি—এইগুলি পুঞ্জীভূত কারণ হইয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পূর্ব্ব হইতেই কাজ করিতেছিল। "সেইজন্য বাংলার মনস্তাপ সারা ভারতের বুকের বাড়বানলে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে।"

'যুগান্তর' এবং 'অনুশীলন' দলের নামকরণ সম্পর্কে সাধারণের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। এই অস্পষ্টতা অপসারণের জন্য গ্রন্থকার গ্রন্থের বহুস্থলে চেষ্টা করিয়াছেন। "সর্ব্বাগ্রে একটি মাত্র বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। তার নাম অনুশীলন সমিতি।...তার আভ্যন্তরীণ কর্ত্তৃমণ্ডলীতে ছিলেন পি. মিত্র ও শ্রীঅরবিন্দ।" সারা বঙ্গের বিপ্লবী-সঙ্ঘের উপর এই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব ছিল। দলের মধ্যে একটি দল গড়িয়া ওঠে। বারীন্দ্রকুমার, উপেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি "যুগান্তর" পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। পি. মিত্রের পরলোকগমনে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের যোগসূত্র নষ্ট হয়। ১৯১১ সাল হইতে ঢাকার অনুশীলন সমিতির নাম বিশেষ ভাবে শোনা যায়। কলিকাতায় বে-আইনী অনুশীলন সমিতির সদস্য এবং তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট "যুগান্তর" হইতে প্রেরণাপ্রাপ্ত বিপ্লবী-বৃন্দকে "যুগান্তর দল" বলা হইত। লালা হরদয়াল আমেরিকায় 'যুগান্তর আশ্রম' স্থাপন করেন। অন্যান্য দল হইতে পৃথক করিবার জন্য ইংরেজ সরকারই 'যুগান্তর গ্রুপ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করে। এই দুই দলকে মিলাইবার জন্য গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং চেষ্টা কখনও কখনও সাফল্যমণ্ডিত হয়। শেষ পর্য্যন্ত মিলন স্থায়ী হয় নাই।

বইখানির মধ্যে বিপ্লব-কাহিনীর ধারাবাহিকতা যতটা পাওয়া যায়, আত্মচরিতের ধারাবাহিকতা ততটা রক্ষিত হয় নাই। আত্মচরিত আর একটু পূর্ণাঙ্গ হইলে সাধারণ পাঠকের অতৃপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ হইত। বইয়ের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি চুম্বক-পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিপ্লব-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

সরকারী নির্যাতন বিপ্লব-প্রচেষ্টার অঙ্গ। লেখককে বহু দিন আত্মগোপন করিয়া সরকারী দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। পরে বঙ্গদেশ হইতে রাঁচীতে তাঁহাকে অন্তরিত করা হয়। ১৯৪২ সনে গণ-অভ্যুত্থানের আন্দোলনে তাঁহাকে কারাবরণ করিতে হয়।

বাংলার বিপ্লব শুধু বাংলায় বদ্ধ ছিল না, তাহা সকল প্রদেশেই ছড়াইয়া পড়ে। লেখক গ্রন্থে বিশদ ভাবে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। পুস্তকখানি সাড়ে ছয় শত পৃষ্ঠার উপর। কিন্তু এই বৃহদায়তন গ্রন্থের কোথাও আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কাহিনী ও বিবরণ পাঠককে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়। গ্রন্থে বহু অজ্ঞাত তথ্য, ঘটনা ও বীরের পরিচয় পাই। তথ্য-পরিবেশন, ঘটনা-সংস্থান এবং বর্ণনাভঙ্গীর দিক দিয়া "বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি" একান্তভাবে চিত্তাকর্ষক। স্বাধীনতা-আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার পক্ষে গ্রন্থখানি অপরিহার্য্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

দ্বৈত সঙ্গীত—শ্রীরঞ্জিৎকুমার সেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা—১২। মূল্য চার টাকা।

শ্রীরঞ্জিৎ সেন শুধু খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি একজন সমাজ-সচেতন লেখকও বটেন। যে সমাজ-সচেতনতা তাঁহার রচনার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, সমালোচ্য 'দ্বৈত সঙ্গীত' নামক উপন্যাসের মধ্যেও তাহা উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কাহিনীর নায়ক মনোবিজ্ঞানের ছাত্র সুমন্ত ভালোবাসিয়া ছিল তাহার সহপাঠিনী এবং কলেজ-ম্যাগাজিন সম্পাদনায় তাহার সহযোগিনী অনিমাকে—অনিমাও মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। দুই জনের মধ্যে সুরু হইল মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। এক চন্দ্রালোকিত নিশীথে পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়া গাছের অনতিদূরে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে দ্বিধাহীন কণ্ঠে সুমন্তকে বলিল অনিমা—"বল, আমাদের এই 'আছি'কে চিরন্তন রূপ দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলবে তুমি—বল এই চাঁদকে সাক্ষী করে বল তুমি।" সুমন্ত তার কথার জবাবে বলিল—

"আসলে হৃদয়ে যদি আমরা এক হয়ে থাকি, তবে এক হতে বাধা কি।" শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু এই তরুণ-তরুণীর পরিপূর্ণ মিলনের মাঝখানে নামিয়া আসিল চিরবিরহের নিদারুণ অভিশাপ। বাধার দুরতিক্রম্য ব্যবধান রচিত হইল, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতেই। সামাজিক বাধার হেতু সুমন্তর মায়ের রক্ষণশীল মনোবৃত্তি আর দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারকে এবং দেনার দায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত পিতাকে বাঁচাইবার জন্য প্রিয়তমের সহিত বিবাহবন্ধনজনিত মিলনের দ্বারা প্রেমকে সার্থক করিয়া তুলিবার আনন্দ হইতে নিজেকে চিরতরে বঞ্চিত করিল অনিমা। অনিমা-সুমন্ত এই দুটি প্রেমিক-প্রেমিকা যে দ্বৈত-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিল বিবাদী সুরের স্পর্শে তাহার স্বচ্ছন্দ বিস্তার ব্যাহত হইল—তনুশ্রীকে বিবাহ করিয়া সুমন্তই যে শুধু ভুল করিল তাহা নয়, তাহার অবহেলায় অনাদরে তনুশ্রীও হইয়া উঠিল জীবনের উপর বীতস্পৃহ। স্বহস্তে জীবনাবসান করিয়া সুমন্তকে সে নিষ্কৃতি দিল বটে, কিন্তু সঙ্গীতের সমাধি হইল সুমন্তর জীবনে—দোতারায় আর সুর-ঝঙ্কার উঠিল না।

সুমন্ত, অনিমা আর তনুশ্রী এই তিনটি তরুণ-তরুণীকে লইয়া প্রণয়-দেবতার এই যে নিষ্ঠুর খেলা 'দ্বৈত সঙ্গীত' তাহারই এক বেদনা-করুণ নিপুণ আলেখ্য। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া কাহিনীটি হয় ত অভিনব নয়, কিন্তু পরিবেশন-নৈপুণ্যে ইহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। প্রেম যুগে যুগে সম্ভবতঃ এক, কিন্তু যুগধর্ম্ম যে প্রেমকে প্রভাবিত করে বিপুল ভাবে একথা অনস্বীকার্য্য। বর্ত্তমান অর্থব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনের স্বপ্নসৌধকে কেমন করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া ফেলে, সুমন্ত-অনিমা এই দুইটি বিকাশোন্মুখ তরুণ জীবনের শোচনীয় ট্র্যাজেডি সে বিষয়ে পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিবে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলার সমালোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—"বন্ধনহীন গোপন মিলন চিরকালের অভিশাপে অভিশপ্ত।" কিন্তু শাস্ত্র-সম্মত উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে হইল সুমন্তর বিবাহিতা স্ত্রী তনুশ্রীকে। আজিকার দিনে এই ধরনের শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্যও যে মূলতঃ আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোই দায়ী তাহারও ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এই উপন্যাসে। এখানি শুধু যে রসসৃষ্টি হিসাবেই সার্থক হইয়াছে তাহা নহে, যুগোপযোগীও হইয়াছে।

কাহিনীর আর একটি বৈশিষ্ট্য—স্থানে স্থানে ইহা বুদ্ধির আলোকে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নায়ক-নায়িকা উভয়েই সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং মনোবিজ্ঞানের অনুশীলক। সজাগ বুদ্ধির দ্বারা নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতা দু'জনেরই আছে। গতানুগতিক প্রেমকাহিনীর সঙ্গে দ্বৈত সঙ্গীতের পার্থক্য এইখানে যে, ইহাতে প্রেমের প্যানপ্যানানি নাই—রোমান্সের মাধুর্য্যের পাশাপাশি আছে আত্মবিশ্লেষণ আর মনঃসমীক্ষণের প্রশংসনীয় প্রয়াস—সুমন্তর চেয়েও উজ্জ্বলতর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে অনিমার চরিত্র, তাহার গহন মানস-লোকের অন্তর্গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনে স্থানে স্থানে লেখক স্বচ্ছ এবং সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তনুশ্রী সুমন্তর হৃদয় পায় নাই; স্বামীর ভালবাসা হইতে সে বঞ্চিত। কিন্তু এমন দরদ দিয়া লেখক তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এই মুখরা বধূটির বঞ্চিত নারীজীবনের অপরিসীম শূন্যতা পাঠকের মনকে সহানুভূতিতে ভরিয়া তোলে—এই প্রশ্নটাই একান্ত হইয়া মনে জাগে যে, এই তরুণী গৃহলক্ষ্মীর আশাহত জীবনের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য কে দায়ী:—সে নিজে, না সুমন্ত-অনিমা, না আধুনিক সমাজের অর্থ-নৈতিক কাঠামো।'

দ্বৈত সঙ্গীতের কাহিনীতে ব্যথা-বেদনার যে ছায়াঘন পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার উপর মেঘবিচ্ছুরিত রৌদ্রের মত খুশির আমেজ ছড়াইয়া পড়িতেছে—মাঝে মাঝে অনিমার ছোটবোন হাস্যমুখী শীলার উপস্থিতি, উচ্ছলতা এবং উক্তিতে। অভিশপ্ত বিবাহিত জীবনের পাশে সুমন্তর ভগ্নী এবং ভগ্নীপতির সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবিটিও বড় মধুর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বৈত সঙ্গীতে কাহিনীর গ্রন্থন-নৈপুণ্য প্রশংসনীয় ত বটেই। চরিত্র-চিত্রণেও লেখক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আর একটি আকর্ষণ ইহার ভাষা—মাঝে মাঝে তাহা কাব্যিক সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, রিফ্লেকশনগুলির মধ্যে এক-একটি উক্তি পাঠককে মাঝে মাঝে চমকিত করিয়া তোলে—সে-গুলিতে পাওয়া যায় কোনও চিরন্তন সত্যের প্রকাশ—শিল্পীর সত্যদৃষ্টির সমক্ষে উদ্ঘাটিত কোন গভীর জীবন-দর্শনের অস্ফুট আভাস।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

নামাচার্য্য শ্রীরামদাস—শ্রীসুশীলকুমার সেন। প্রকাশক শ্রীভীমচরণ সেন। ১৬৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, কলিকাতা—৩৬

সমসাময়িক কালে আমাদের দেশে হরিনাম মহামন্ত্রকে সঞ্জীবিত করেছেন শ্রীশ্রীরামদাস বাবাজী। কীর্ত্তন বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এই কীর্ত্তনের ভিতর দিয়েই বাবাজী মহারাজ মহাসাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাংলার প্রেমভূমি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর কীর্ত্তনের অমৃততরঙ্গে প্লাবিত হয়েছে।

সুশীলবাবু এই মহাপুরুষের জীবনচরিত লিখে একটা মস্ত অভাব দূর করেছেন। এই জীবনী রচনায় তিনি নিজস্ব একটি পথ সৃষ্টি করে নিয়েছেন, মামুলি পথ ধরে চলেন নি। কোন এক বিশেষ দিনে কিংবা কোন একটি বিশেষ ঘটনায় বাবাজী মহারাজের যে রূপটি তাঁর হৃদয়দর্পণে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে, তাকেই তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এঁকেছেন। তের বৎসর বয়সে পোস্তা রাজবাড়ীর কীর্ত্তন-প্রাঙ্গণে, পুরীতে হরিদাসের নির্ব্বাণ উৎসবে, নবদ্বীপের সমাজবাড়ীতে, নীলাচলের রথযাত্রায়, পানিহাটি উৎসবে, দাস রঘুনাথের দণ্ড-মহোৎসবে বাবাজী মহারাজের যে আত্মিক পরিচয় লেখক পেয়েছিলেন তাকেই তিনি সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন।

বাবাজী মহারাজ অধ্যাত্মসাধনার এমন এক উন্নত স্তরে পৌঁছেছিলেন যে, মরমী না হলে, ভক্ত না হলে, প্রেমিক না হলে এই ভক্তশ্রেষ্ঠ, প্রেমিক-শ্রেষ্ঠকে বোঝা সম্ভব নয়। সুশীলবাবু ভক্ত ও প্রেমিক. তাঁর হৃদয়তন্ত্রী খুবই উচ্চ সুরে বাঁধা—তাই এক মহাজীবনের অপূর্ব্ব ভাষ্য র'না করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। তাঁর লেখার ধরনটি যেমন সুন্দর—ভাষা তেমনি সুমধুর।

শ্রীকুমারলাল দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা
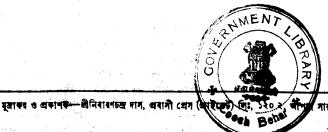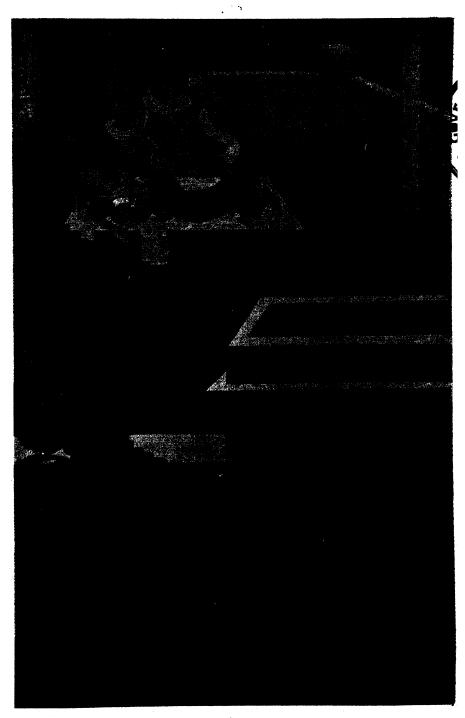
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ
শ্রীপ্রভাতেন্দুশেখর মজুমদার

নাম-গান

পূর্ণকুম্ভ [ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিংহ

'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্
নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"
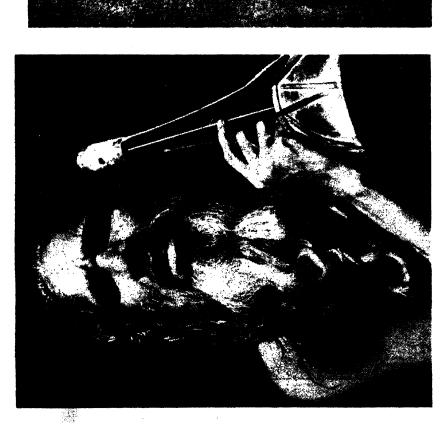
৫৭শ ভাগ ১ম খণ্ড } আশ্বিন, ১৩৬৪ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাস্তব ও পরিকল্পনা

ইংরেজীতে একটি প্রবাদবাক্য আছে, "নরকের পথ শুভ সঙ্কল্পে আচ্ছাদিত"। ইহার অর্থ মানুষ যদি বাস্তব দৃষ্টিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, ভাবের বশে কোনও কাজে হাত দেয় তবে তাহার ফল বিষময় হওয়াই সম্ভব। যাহা সামর্থ্যের অতীত, অথবা যাহাতে লাভের চাইতে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী, সেরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া মানেই বিপদ-বাধা ডাকিয়া আনা। আবার যেখানে অভিজ্ঞতা বা বিচারবুদ্ধির অভাব, অন্যদিকে সাফল্যের খ্যাতি অর্জ্জনের স্পৃহা বা ক্ষমতার লালসা অত্যধিক সেখানে সহযোগী ও সহকারী-রূপে অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ চাটুকারের অনুপ্রবেশও অবশ্যম্ভাবী—বিশেষতঃ যেখানে প্রধান উদ্যোক্তা ধনী, ধনভাণ্ডারের রক্ষক বা অর্থাগমের ব্যাপারে অধিকারী। এই দুর্নীতিপরায়ণ চাটুকারের ও তাহার অনুচরবর্গের চক্রান্তে বহু সদিচ্ছাপূর্ণ, পরম শুভসঙ্কল্পযুক্ত, সৎকাজও অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়ায়, যাহাতে বহু সৎলোকের সর্ব্বনাশ হয় ও পরিণাম বিষময় হয়।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যাহা চতুর্দ্দিকে চলিতেছে তাহাতে মনে হয় ঐ ইংরেজী প্রবাদ অতি যথার্থ।

কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মোহে আচ্ছন্ন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ বলা বাহুল্য, কেননা ইহার মূলগত নীতি দেশের কল্যাণ ও উন্নয়ন-প্রচেষ্টার উপর স্থাপিত। দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর করা, দেশ ও জাতিকে সভ্যজগতের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত করার মহান্ আদর্শের প্রেরণাই এইরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিগত নীতি। কিন্তু সেই অভীষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার পথ অতি সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম। পথনির্দ্দেশক সাজিয়া যাঁহারা আসিয়াছেন ও বসিয়াছেন, তাঁহাদের যোগ্যতা, সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও সন্দেহের অবকাশ যথেষ্ট আছে। সুতরাং পথের শেষে দেশ ও জাতি কোথায় দাঁড়াইবে এবং কি অবস্থায় পৌঁছাইবে তাহা এখন ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে।

দেশের লোক দীর্ঘদিন কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া আসিতেছে। মহা-যুদ্ধের মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইল। তাহার পর ভারত বিভাগের ফলে প্রায় এক কোটি লোক উদ্বাস্তু হইল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাহারা পৃথিবীর সকল জাতির মেরুদণ্ড এবং মানব সভ্যতার প্রতিটি প্রয়াসের প্রধান উদ্যোক্তা—এ দেশে রিক্ত ও সর্ব্বহারা হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে। এখন আহ্বান আসিতেছে আরও কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে, আরও বলিদানের জন্য। এবং আহ্বায়ক তাঁহারাই যাঁহারা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায়, গ্রামিক উন্নয়নে, শিক্ষার প্রচারে, ও জাতীয় প্রগতির ব্যাপারে, কিছুমাত্রই সাফল্যের বা সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

দেশে দুর্নীতির প্লাবন উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে সকল ক্ষেত্রে। ফলে জীবিকানির্ব্বাহ এক ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় পরিণত হইতেছে। এমত অবস্থায় পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্য উন্মাদের স্বপ্ন। দেশের লোক যদি দুঃখকষ্টে ও কৃচ্ছ্র সাধনে জীর্ণ ও মৃতপ্রায় হয় তবে এই পরিকল্পনা কাহার জন্য? রোগী মরিলেও কি চিকিৎসকের জয়গান চলে?

ঘরের কাছে দেখি বাঙালী ত অস্তাচলের পথে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব, তস্কর-প্রবঞ্চক ও ঘুষখোরের সর্ব্বত্রই জয়, উপরন্তু পশ্চিম বাংলায়ই জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছুরই মূল্য সারা ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাড়িতেছে। বেকারসমস্যা ক্রমেই এখানে বাড়িতেছে এবং দেশের শ্রমিক ও কর্ম্মী দলের 'নেতা' যাঁহারা, তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার গুণে পশ্চিমবঙ্গ এখন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে "প্লেগাক্রান্ত অঞ্চল"রূপে পরিগণিত হইতেছে। শিক্ষায় বাঙালী এই সেদিনও সারা ভারতের শীর্ষে ছিল, আজ তাহার স্থান কোথায় বলিতেও লজ্জা করে। বাঙালী যেন সর্ব্বক্ষেত্রেই হীনতার অভিশাপে জর্জ্জরিত।

আমরা যাঁহাদের হাতে অধিকার ও ক্ষমতা দিয়াছি, তাঁহাদের চৈতন্যোদয় কিভাবে করা যায় তাহাই এখন চিন্তার বিষয়। দলগত স্বার্থ, ক্ষমতার লালসা ও চাটুকারের চক্রান্ত, এই দারুণ রোগত্রয় হইতে তাঁহাদের মুক্ত না করিতে পারিলে বাংলারও উদ্ধার নাই এবং ভারতেরও উদ্ধার নাই। কেননা বাঙালীর আত্মবলিদান ও অন্য প্রয়াসের ফলে যে স্বাধীনতা অর্জ্জিত, বাঙালীকে বাদ দিয়া তাহাকে পূর্ণতা ও সাফল্যের গৌরবমণ্ডিত করা সম্ভব হইবে না।

দ্রব্যমূল্য মানবৃদ্ধি

দেশের সর্ব্বত্র নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্র অগ্নিমূল্য হইয়াছে। চাউল, চিনি, মাছ, তরিতরকারী এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত ঔষধপত্র এবং শিশুখাদ্য প্রভৃতির দর গত দুই মাসের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিগুণেরও উর্দ্ধে উঠিয়াছে। কলিকাতার বাজারে কিরূপ মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার প্রতীকরূপে দৈনিক "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকা একটি ইলিশ মাছের গলায় দশ টাকার নোট ঝুলান একটি ছবি ছাপাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ নির্দ্দিষ্ট আয়সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের পক্ষে এখন সংসার চালান কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কলিকাতায় ইহার উপর রহিয়াছে বাসগৃহের সমস্যা, বিদ্যালয়ের সমস্যা, কলেজের সমস্যা, যানবাহনের সমস্যা প্রভৃতি।

কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি কেবল যে শহরাঞ্চলেই হইয়াছে এরূপ মনে করা ভুল। দেশের সর্ব্বত্র গ্রাম-শহরনির্ব্বিশেষে এই বৃদ্ধি জনসাধারণকে আঘাত করিয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই অনেক স্থলে সরকারী টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আজ দেশব্যাপী এই যে মূল্যবৃদ্ধি দেখা দিয়াছে তাহার কারণ অনেক হইলেও প্রধানভাবে দুইটি বিষয়ই ইহার জন্য দায়ী—প্রথমতঃ সরকারী নীতি এবং দ্বিতীয়তঃ বড় বড় ব্যবসায়ীদের অসাধু আচরণ। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারসমূহ যে সকল নীতি কার্য্যকরী করিতেছেন তাহার ফলাফল যে জনজীবনে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করিবে তাহা পূর্ব্বেও অনেকেই বলিয়াছিলেন; কিন্তু সরকার তাহাতে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন বলিয়া আমাদের পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ মনে করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নয় শত কোটি টাকা ঘাটতি ছিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই অর্থ বিদেশ হইতে পাইবেন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু পাওয়ার আশা যে ক্ষীণ তাহাও স্বীকার করিয়াছিলেন। কার্য্যতঃ অবশ্য বিদেশ হইতে ঐ ঘাটতি পূরণে কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পরিকল্পনার এই ত্রুটির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছিল কিন্তু সরকার সকল সাবধানবাণী উপেক্ষা করিয়া ঐ ঘাটতি লইয়াই পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ করেন। তখন অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী সরকারের এই বিমূঢ়তার দায়িত্ব জনসাধারণের উপর চাপাইয়া বলিয়াছিলেন যে, যখনই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছিল—তখনই এই সকল মূল্যবৃদ্ধিকেও স্বীকার করা হইয়াছিল—অতএব এখনকার এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য সরকারকে সমালোচনা করা চলিবে না। এই ভাবে সরকারী অদূরদর্শিতার দায়িত্ব জনসাধারণের ঘাড়ে চাপাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব স্খালন করিতে চেষ্টা করিতেছেন।

একথা অনস্বীকার্য্য যে, দেশের সামগ্রিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে জনসাধারণকেও কিছু কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে; সকল দেশের জনসাধারণই তাহা করিয়া থাকেন ভারতীয় জনসাধারণও তাহাতে পরাঙ্মুখ নহেন। কিন্তু এই ত্যাগ স্বীকারের সীমা থাকা প্রয়োজন। ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্য সুবিদিত; দুই বেলা অধিকাংশেরই আহার জুটে না। এই অবস্থায় তাহাদের পক্ষে কতদূর ত্যাগ স্বীকার সম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। বাংলা দেশের কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণ কি অপরিসীম দুর্দ্দশাই না ভোগ করিতেছেন! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সর্ব্বোপরি দেশবিভাগজনিত দুর্দ্দৈবের ফলে বাঙালী জাতির স্বাস্থ্য এবং মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগেও খাদ্যাভাব, বন্যা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক দুর্য্যোগে তাহাদের শেষ শক্তিটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হইয়াছে—তাহাদের পক্ষে এখন জীবন ভিন্ন ত্যাগ করিবার আর কিছুই নাই। সুতরাং তাহাদিগকে পরিকল্পনা এবং জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে বলার অর্থ তাহাদিগকে বিদ্রূপ করা। আমাদের শাসকগণ তাহাই করিতেছেন। কোন সমস্যারই সমাধানে অপারগ হইয়া বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য তাঁহারা জনসাধারণকেই দায়ী করিতেছেন; পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন, বাঙালী অতিভোজী বলিয়াই বাংলা দেশে খাদ্যাভাব—এমনকি ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের ডিরেক্টর পর্য্যন্ত উপদেশ দিতে ছাড়েন নাই যে, কলিকাতার যানবাহনের সমস্যার প্রধান কারণই নাকি সস্তা ভাড়া। এই সকল বিবৃতি কি বিচারবুদ্ধির অভাবের লক্ষণ না ইচ্ছাকৃত বিকৃতি?

বিভিন্ন ট্যাক্স, রেলের ভাড়া বৃদ্ধি, আমদানী সঙ্কোচ প্রভৃতি নীতির দ্বারা সরকার সরাসরি মূল্যবৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছেন। অপর পক্ষে, অসাধু ব্যবসায়ীরা যখন ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জনসাধারণকে ঠকাইতেছে তখন সরকার তাহা দমনের কোন সক্রিয় ব্যবস্থা না করিয়া পরোক্ষভাবে জনসাধারণের দুর্গতিবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছেন।

জনসাধারণের এই অপরিসীম দুর্ভোগেও কিন্তু সরকার অটল। এত আবেদন-নিবেদন কিছুতেই সরকার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে রাজী নহেন। কারণ, সরকারের উচ্চ মহলে নীতি নির্দ্ধারণের ভার যাহাদের উপর তাহাদের অবস্থা এবং সাধারণের অবস্থার মধ্যে বিরাট প্রভেদ। জনসাধারণের দুর্ভোগের কোন ধারণাই তাঁহারা করিতে পারেন না বা না করিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের গতি

বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে এই বিষয়ে বহু বিতর্ক ও বাদানুবাদ হইয়াছে। বিপক্ষদলের প্রধান অনুযোগ এই যে, বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয়ের ব্যাপারে ভারতবর্ষের অনেক গলতি হইয়াছে যাহার ফলে ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যাপারে আজ এরকম দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। বিপক্ষদলের বক্তব্য ছিল যে, ব্যবহার্য্য দ্রব্যের অত্যধিক আমদানির ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা প্রায় সমস্ত ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

সরকারী হিসাবে দেখা যায় যে, মূলধনী যন্ত্রপাতি ইদানীং অধিক পরিমাণে আমদানি হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অধিক পরিমাণে ব্যয় হইতেছে। ১৯৫২ সনে ৩৬০ কোটি টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য আমদানি হইয়াছিল; এবং ইহার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯৫৬ সনে ১৯৩ কোটি টাকার ব্যবহারিক দ্রব্য আমদানি করা হয় এবং চলতি বৎসরে ইহার পরিমাণ আরও কম হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি যেন স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে ইহা প্রতীয়মান হইবে :

(কোটি টাকা হিসাবে)

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৪৮-৪৯	৭৬৬·৩	৪৮২·৫	—২৮৩·৮
১৯৪৯-৫০	৬০৩·৯	৫১৪·০	—৮৯·৯
১৯৫০-৫১	৬৫০·৩	৬৪৬·৮	—৩·৫
১৯৫১-৫২	৯৬২·৯	৭৩০·১	—২৩২·৮
১৯৫২-৫৩	৬৩৩·০	৬০১·৯	—৩১·১
১৯৫৩-৫৪	৫৯১·৮	৫৩৯·৭	৫২·১
১৯৫৪-৫৫	৬৩৮·৮	৫৯৬·৬	৮৭·২
১৯৫৫-৫৬	৭৫০·৬	৭৪১·১	১০৯·৫
১৯৫৬-৫৭	১,০৭৬·৫	৬৩৭·০	৪৩৯·৫

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভারতীয় আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক কাঠামোর একদিকে ছিল মুদ্রাস্ফীতি, অপরদিকে ছিল ব্যবহারিক দ্রব্যের অভাব, প্রধানতঃ খাদ্যাভাব। ইহার ফলে ভারতবর্ষকে অধিক মূল্যে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে হয় এবং তাহার জন্য বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি পড়ে। প্রথম পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর হইতে যন্ত্রপাতি অধিক পরিমাণে আমদানি হইতেছে, কিন্তু সেই পরিমাণে রপ্তানী বৃদ্ধি না পাওয়ায় ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। গত তিন বৎসর বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ অতিরিক্ত ছিল। সরকারী কৈফিয়ত এই যে, পরিকল্পনার জন্য অধিক পরিমাণে যন্ত্রপাতি আমদানি হওয়ার ফলে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত বহির্বাণিজ্যে ১৪৩ কোটি টাকা ঘাটতি হইয়াছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার কতকগুলি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন যথা : রপ্তানী-উন্নয়ন সমিতি গঠন। আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য এইরূপ আটটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সংস্থা স্থাপন ও রপ্তানী ঝুঁকি বীমা সমিতি সৃষ্টি দ্বারা কর্তৃপক্ষ রপ্তানী বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র বিভিন্ন সমিতি সৃষ্টির দ্বারাই রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে না। রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন ভারতীয় দ্রব্যকে আন্তর্জ্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সমর্থ করা। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সেই দিকে কোনও লক্ষ্য নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে চা রপ্তানী বহির্বাণিজ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। কিন্তু রপ্তানী শুল্কের হার এত অধিক যে, অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় চায়ের মূল্য অধিক হওয়ায় রপ্তানী আশানুরূপ হইতেছে না। এক সময় পাটজাত দ্রব্যের উপর অত্যধিক হারে রপ্তানী শুল্ক আরোপ করিবার ফলে ইহার রপ্তানী অসম্ভব পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং ইহার ফলে পাটশিল্পে বর্ত্তমানে মন্দা চলিতেছে।

ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতির কারণ অবশ্য অতিরিক্ত পরিমাণে যন্ত্রপাতির আমদানী। কিন্তু এই যন্ত্রপাতি আমদানী সকল ক্ষেত্রে উৎপাদক শিল্পের জন্য হয় নাই। অপ্রয়োজনীয় এবং আশু উৎপাদনশীল নহে এইরূপ বহুপ্রকার পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করা হইয়াছে। ইহার ফলে সকলক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই এবং উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে রপ্তানী আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। নদী পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ফলে ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু রপ্তানী বৃদ্ধি পায় নাই।

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি হয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত। ১৯৫৫ সনে ভারতের মোট ঘাটতির ৮০ শতাংশ ঘটিয়াছিল পশ্চিম জার্ম্মানী হইতে অত্যধিক পরিমাণে আমদানির দরুন। ১৯৫৬ সনেও মোট ঘাটতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী ঐ দেশ হইতে আমদানি। পশ্চিম জার্ম্মানীতে ভারতবর্ষ যে পরিমাণে রপ্তানী করে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আমদানী করে। মধ্য ইউরোপের বাণিজ্যিক সংস্থার সভ্য পশ্চিম জার্ম্মানী এবং সেই কারণে বিদেশ হইতে তাহাকে আমদানি করিতে হয়। ভারতবর্ষের উচিত যে, স্বর্ণের দ্বারা মূল্য প্রদান না করিয়া দ্বিমুখী বাণিজ্যিক চুক্তি দ্বারা রপ্তানী করিয়া ঘাটতি পূরণ করা।

কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্পনীতিও বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির জন্য অনেকখানি দায়ী। যে সকল জিনিষে ভারতের রপ্তানী ক্ষমতা আছে সেইগুলি সম্বন্ধে সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতির পক্ষে বিরোধিতাও করেন। যেমন, বস্ত্রশিল্প উৎপাদনকারী ও রপ্তানীকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু তাঁতশিল্পকে সাহায্য করিবার জন্য মিল বস্ত্রের উৎপাদনকে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, এবং সেই কারণে মিল বস্ত্রশিল্প প্রগতি লাভ করিতে পারিতেছে না এবং রপ্তানীও বৃদ্ধি পাইতেছে না।

জীবনবীমা

বেসরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্ম্মক্ষমতায় পার্থক্য থাকে, বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায়। এক-অধিনায়কতন্ত্রে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করিবার অধিকার না থাকায় গণতান্ত্রিক দেশগুলি হইতে উৎপাদন কিছু পরিমাণে বেশী হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বেশী হয় কারণ তাহাদের থাকে মুনাফা প্রবৃত্তি

এবং সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু সরকারী প্রতিষ্ঠানে মুনাফা প্রবৃত্তি না থাকায় কর্মচারীদের তেমন কর্মপ্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা জানে যে, কাজ যাহাই হউক না কেন, তাহাদের বাঁধা মাহিনা তাহারা পাইবেই। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমার ক্ষেত্রে ইহার কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই।

১৯৫৫ সনে কোম্পানীর আমলে যে কার্য্য হইয়াছিল জাতীয়-করণের ফলে ১৯৫৬ সনে ৬৮ কোটি টাকার কম কার্য্য হইয়াছে। চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে কাজের প্রগতির হার অপেক্ষাকৃত আরও কম। ১৯৫৫ সনে ২৬৮ কোটি টাকার নূতন জীবনবীমা করা হইয়াছিল। সেই তুলনায় ১৯৫৬ সনে ২০০ কোটি টাকার নূতন কাজ হইয়াছে। কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পক্ষ সমর্থনে চলিয়া গিয়াছেন ১৯৫৩ সনে যখন নূতন কাজ হইয়াছিল ১৫৫·২০ কোটি টাকার ; তাঁহাদের মতে ইহাই স্বাভাবিক ভাবে বাৎসরিক কার্য্যের হার। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সনে যে অতিরিক্ত কাজ হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ ছিল প্রিমিয়াম হ্রাস ও কর্মচারীদের জন্য যুক্ত জীবন-বীমা ব্যবস্থার প্রচলন। যুক্ত জীবনবীমার ব্যবস্থা অনুসারে ১৮ কোটি টাকার কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু ১৯৫৫ সনের শেষের দিকে এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বলিতে চাহেন যে, এই সকল কারণেই ১৯৫৫ সনে এত অধিক কার্য্য পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম।

প্রিমিয়াম হ্রাসের সুবিধা বর্তমান সরকারী কর্তৃপক্ষও পাইতে-ছেন ; অধিকন্তু প্রিমিয়ামের হার তাঁহারা আরও হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে কাজ আরও বেশী পাওয়া উচিত ছিল। বর্তমান সরকারী কর্তৃপক্ষ আরও একটি সুবিধা পাইয়াছেন যাহা বেসরকারী কোম্পানী তেমন পায় নাই। ইহা হইতেছে সম্পদশুল্কের জন্য জীবনবীমাকরণ। কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার ফলে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয় এবং সিদ্ধান্তগুলি দ্রুত পরিবর্তনশীল। যথা, প্রথম বলা হইল যে, যে এজেন্ট প্রথম বৎসর ৪০,০০০ হাজার টাকার কাজ দিবে তাহাকে পরের বৎসরের জন্য কাজ করিতে দেওয়া হইবে। কয়েক মাস পরে টাকার পরিমাণ হ্রাস করিয়া দেওয়া হয় ২০,০০০ হাজার টাকায়। পূর্বে কোম্পানীর আমলে ৩,০০০ হাজার টাকার কাজ দিলেই পরের বৎসরে তাহাকে কাজ করিতে দেওয়া হইত।

সরকারী আমলে প্রথম বলা হইল যে, এজেন্টদের কোনও লাইসেন্স লাগিবে না। পরে বলা হইল যে, তাহাদিগকে ফী দিতে হইবে এবং যে সকল এজেন্ট ইত্যবসরে জীবনবীমার কাজ সংগ্রহ করিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে জরিমানাসহ লাইসেন্স ফী আদায় করা হইল। পূর্বে বহু এজেন্ট ছিল যাহারা অবসর সময়ে নিজেদের নামে কিংবা বেনামীতে জীবনবীমা সংগ্রহ করিত এবং সামগ্রিক ভাবে এই কাজের পরিমাণ নেহাৎ কিছু কম হইত না। জাতীয়করণের পর এই সকল এজেন্টদিগকে রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ কর্তৃপক্ষ চাহেন প্রত্যক্ষভাবে কার্য্যকরী এজেন্ট। ১৯৫৭ সনের প্রথম ছয় মাসে মাত্র ৭৪ কোটি টাকার জীবনবীমা করা হইয়াছে। "জনতা পলিসির" ফলে কাজের পরিমাণ আরও অধিক হওয়া উচিত ছিল।

জীবনবীমা জাতীয়করণের ফলে সংস্থাগত সুসংবদ্ধতার অভাবও কম কাজের জন্য অনেকখানি দায়ী, এতগুলি বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে একত্রিতকরণও সহজসাধ্য ছিল না, তাই প্রথমদিকে সরকারী কর্মচারীদের জীবনবীমার কাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এজেন্টরা জীবনবীমার কাজ সংগ্রহ করে, কর্মচারীরা নহে, সুতরাং এজেন্টদের প্রতি সুনজর দিলে জীবনবীমার কাজ উন্নত হইবে।

কুটিরশিল্পের সমস্যা

ভারতীয় শিল্পনীতি অনুসারে ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির-শিল্পের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং গ্রামে বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য ইহার উন্নতি যে অতীব প্রয়োজনীয় সে কথা সর্ব্বতোভাবে স্বীকৃত। কিন্তু কোনও জিনিষের প্রয়োজনীয়তা থাকা এক জিনিষ আর তাহার জন্য যথেচ্ছ খরচ করা অন্য জিনিষ বিশেষতঃ সে খরচের উৎস যদি হয় জনসাধারণের উপর কর ধার্য্য দ্বারা। কুটিরশিল্পের জন্য সরকারী ব্যয় বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য ব্যয়ের সামিল, অর্থাৎ যুগযুগান্তর ধরিয়া খরচ করিলেও তাহা অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইবে, কোনও হদিস পাওয়া যাইবে না, কারণ যে উদ্দেশ্যে এবং যাহাদের জন্য খরচ করা হইতেছে তাহাদের হাতে কোনও সময়ে খরচের টাকা পৌঁছায় না। বাস্তুহারাদের পুনর্ব্বসতির জন্য যে খরচ করা হয় তাহাতে বাস্তুহারা ব্যতীত অন্যান্য সকলের পুনর্ব্বসতি ও অর্থনৈতিক প্রগতির সুরাহা হইয়া যায়।

১৯৫৬-৫৭ সনে কেন্দ্রীয় সরকার খাদি-শিল্পের জন্য ৪·৮২ কোটি টাকা ঋণ ও ৬·৩৫ কোটি টাকা দান হিসাবে দিয়াছেন, খাদি শিল্পের সঙ্গে অম্বর চরখার পরিকল্পনাও জড়িত আছে। ১৯৫৬ সন পর্য্যন্ত ১২·৮৬ কোটি টাকা শিল্পের জন্য সরকারী সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহার সহিত ১৯৫৭ সনের হিসাব যোগ করিলে দেখা যায় যে, খাদিশিল্পের উন্নতির জন্য গত ৫ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ২৪·০৩ কোটি টাকা খরচ করিয়াছেন। ১৯৫৬-৫৭ সনে ২·৪ কোটি গজ খাদি বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে। কার্ভে কমিটির হিসাব অনুযায়ী তাঁতশিল্পে প্রায় ১৬০ কোটি গজ বস্ত্র বৎসরে উৎপন্ন হওয়ার কথা, ইহার মধ্যে খাদির অংশ অন্ততঃপক্ষে ২৫ কোটি গজ উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। তবে সরকারী কথা হইতেছে যে গীতার অমর বাক্য স্মরণ রাখিয়া, অর্থাৎ ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া শুধু খরচ করিয়া যাও তাহাতেই মাহাত্ম্য আছে।

সরকারী হিসাব অনুসারে অম্বর চরখায় ৫৩,০০০ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। কিন্তু তাহারা কি উৎপাদন করিতেছে সে ফিরিস্তী সরকার দেন নাই। অম্বর চরখার জন্য ৭৫ কোটি টাকা

খরচ করা হইবে এবং খরচের বিজ্ঞাপন প্রায়ই কাগজে দেওয়া হয়, কিন্তু উৎপাদনের কোনও হিসাব দেওয়া হয় না কেন ?

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি

"নয়াদিল্লী, ৩১শে আগষ্ট—অদ্য এই স্থানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিন দিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তদ্দারা ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতির বৃত্তিমূলক সংস্থার প্রতিনিধিগণকে কংগ্রেসের সর্ব্বস্তরে পূর্ণাঙ্গ সদস্যরূপে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রথমে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'প্রাথমিক কমিটি'র পরিবর্ত্তে মণ্ডলের ভিত্তিতে গঠন করিয়া কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে সঞ্জীবিত এবং পুনর্গঠিত করার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডেবর এবং ওয়ার্কিং কমিটির মুখপাত্র শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলেন যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন এবং অন্যান্য সুদূরপ্রসারী পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত এবং একটি সুসম্বদ্ধ ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে।

আর একটি সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিসমূহের ন্যায় উচ্চতর কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের নীতি পরিত্যাগ করেন। দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধনের জন্য, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিসমূহের এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য এতদ্দারা পরোক্ষ নির্ব্বাচনের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করা হয়। নির্ব্বাচনের জন্য কার্য্যতঃ কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা হইবে, তাহা আগামীকল্য স্থির করা হইবে। শ্রীডেবর বলেন যে, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সাব-কমিটি এই সম্পর্কে সাময়িকভাবে কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এই সমস্ত প্রস্তাব ওয়ার্কিং কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। অদ্যকার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে। ছোট ছোট দলগুলি প্রথমে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটিগুলি দখল করিয়া পরে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিও দখল করিয়া ফেলুক, ইহা আমি চাই না।

শ্রীশাস্ত্রী বলেন, কংগ্রেস সংগঠনের ভিতরে নির্ব্বাচনী প্রচার-কার্য্য এত নিম্নস্তরে নামিয়া আসিয়াছে যে, নির্ব্বাচন প্রার্থীগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া পোষ্টার পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন। ইহা বন্ধ করিতে হইবে।

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে অদ্য যে বিতর্ক হয়, তাহা খুবই তীব্র হইয়াছিল। অন্ততঃপক্ষে দুইটি বিষয়ে সদস্যগণ ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষ হইতে উত্থাপিত সংশোধন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। একটি সংশোধন প্রস্তাবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করেন যে, বিধানসভাসমূহের সদস্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকার মণ্ডল কংগ্রেস কমিটিসমূহের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হইবেন। আর একটি সংশোধন প্রস্তাব দ্বারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করেন যে, পার্লামেণ্ট এবং বিধানসভাসমূহের সদস্যগণ পুনর্গঠিত জেলা কংগ্রেস কমিটিসমূহের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হইবেন। কংগ্রেস হাইকমাণ্ড ইঁহাদের জন্য শুধু সহযোগী সদস্যপদ অর্পণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন।"

শ্রীডেবরের নিকট আমাদের নিবেদন এই যে, "পালের গোদা"-গুলিকে যদি পাঁচ বৎসরের মত বহিষ্কার করা হয় তবেই কংগ্রেসের সংস্কার সম্ভব। নহিলে "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী"—

উন্নয়ন ব্যাপারে বৈষম্য

উন্নয়ন ব্যাপারটাই ত একটা প্রহসন। নিজের পাতে ঝোল টানা ও সমস্ত রাষ্ট্রে সরকারী দুর্নীতির প্লাবন বহাইয়া দেওয়া, এই ত এখনকার চলতি হাওয়া। শ্রীনন্দ শিখণ্ডী মাত্র, তাঁহার সহিত তর্কও একটা প্রহসন :

"নয়াদিল্লী, ১৭ই আগষ্ট—পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অদ্য লোকসভায় বলেন, উন্নয়ন ব্যাপারে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য সম্পর্কে আমরা জানি এবং উহা দূর করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

উড়িষ্যা গণতন্ত্র পরিষদের সদস্য শ্রীএস. মহান্তি প্রস্তাব করেন যে, পরিকল্পনা বিষয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য সম্পর্কে তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা হউক।

প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

কংগ্রেস ও বিরোধীদলের কয়েকজন সদস্য বলেন যে, বিভিন্ন অঞ্চলের বৈষম্য দূর করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবর্ণমেণ্টসমূহ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু শ্রীডি. সি. শর্ম্মা এবং আরও কয়েকজন বলেন যে, একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত করিলেই এই বৈষম্য দূর হইবে কিনা সন্দেহ।

শ্রীনন্দ বলেন, আঞ্চলিক বৈষম্য বর্ত্তমান, এ সম্বন্ধে আমি প্রস্তাবকের সঙ্গে একমত। কিন্তু কমিটি নিয়োগ সম্পর্কে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি না। কারণ, পরিকল্পনা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা এ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কোন অঞ্চল কতটা অনুন্নত তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

শ্রীনন্দ বলেন, দুই-একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল ব্যতীত দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই অনুন্নত এবং এই দীর্ঘ দিনের অবস্থা দুই-তিন বৎসরে পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। বর্ত্তমানে সমগ্র দেশের উন্নয়ন চেষ্টা হইতেছে এবং এ জন্য ঋণ করা হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমাদের সম্পদ যেন এমন কাজে লাগান হয় যাহাতে ভাল ফল পাওয়া যায় এবং দেশের উপকার হয়।"

খাদ্যসঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি

খাদ্যসঙ্কট, যাবতীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি ও তজ্জনিত জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের অবনতি, এইগুলি বর্ত্তমানে

যাঁহারা আমাদের শাসনতন্ত্রের অধিকারী তাঁহাদের কলঙ্কের চিহ্ন। তাঁহাদের যোগ্যতার ও সতর্কতার অভাবেই মুনাফাখোরের দল দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে। প্রতিবারে আমরা পাইতেছি শুধু তর্ক ও বাক্যের ধোঁয়াষা।

কংগ্রেস যদি আজ চৌরচক্রে পরিণত না হইত তবে দেশের এই দুর্দশার প্রতিকার নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল।

নীচে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রদত্ত সংবাদ উদ্ধৃত হইল:

"নয়াদিল্লী, ১লা সেপ্টেম্বর—খাদ্যসঙ্কট মোচনে সরকারী নীতির সুতীব্র সমালোচনা, ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা দ্রুত কার্য্যকরী করার দাবিতে জোরালো বক্তৃতা এবং সমবায়মূলক কৃষিকর্ম্ম সম্পর্কে মতানৈক্যের দরুন আজ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আট ঘণ্টা-ব্যাপী গোপন অধিবেশন প্রাণবন্ত ও বৈশিষ্ট্যময় হইয়া ওঠে।

অদ্যকার এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আগামীকাল একটি বিবৃতি প্রচারিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

অদ্যকার আলোচনাকালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুকে দুই-দুই বার বাধা দিতে হয়। প্রথমবার তাঁহাকে উঠিতে হয়, ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্য এবং দ্বিতীয়বার তাঁহাকে আলোচনায় বাধা দিতে হয় সমবায়মূলক কৃষিকর্ম্ম সম্পর্কে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করার জন্য। তিনি বলেন যে, একমাত্র ঐচ্ছিক ভিত্তিতেই সমবায়মূলক কৃষি-পরিকল্পনা সাফল্য-মণ্ডিত হইতে পারে।

পরিকল্পনামন্ত্রী শ্রী জি. এল. নন্দ ঘোষণা করেন যে, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা প্রয়োজন।

অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী আলোচনার সূত্রপাত করেন। প্রকাশ, শ্রী এন. ভি. গ্যাডগিল বলেন যে, খাদ্যশস্যের বেসরকারী কারবার একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। তিনি বলেন, অত্যাবশ্যক সামগ্রীর সরবরাহ যেখানে কম, সেখানে সুসম বণ্টনের জন্য নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং ব্যতিরেকে অন্য কোন পথ নাই। সর্ব্বাগ্রে এই ঘোষণা করা উচিত যে, কেহ পাঁচ মণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুত করিলে তাহা বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত পারিবারিক রেশন কার্ডের ভিত্তিতে উহা বণ্টন করা হইবে।

প্রকাশ, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ও রেশনিং-এর প্রস্তাব সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রেশনিং সম্পর্কে লোকের অভিজ্ঞতা সত্যই হয়ত তিক্ত। শুধু এই কারণেই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে কাহারও বিরূপ মনোভাব পোষণ করা সঙ্গত নয়। ১৯৪৮ সনে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবার পর ফল এই দেখা গেল যে, ব্যবসায়ীদের মোটা টাকা মুনাফা হইল। কাজেই বর্ত্তমানের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করিয়াই নিয়ন্ত্রণব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতে হইবে।

মূল্যবৃদ্ধি নিরোধ এবং বৈদেশিক মুদ্রা-সংরক্ষণ—উভয় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য কি ভাবে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহাই আজ সকালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী গোপন বৈঠকের প্রধান আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

প্রকাশ, খাদ্যশস্য মজুত নিরোধ, সেচব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ এবং সমাজ-উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ পরিচালন ইত্যাদি ব্যাপারের সদস্যগণ কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য সদস্যগণ নিম্নোক্ত মর্ম্মের কয়েকটি প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। (১) সমবায় দোকানের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীর কারসাজি নিয়ন্ত্রণ; (২) ভূমি-সংস্কার ব্যবস্থা রূপায়ণের কাজ ত্বরান্বিত করা; এবং (৩) খাদ্যশস্য, অর্থকরী শস্য ও ভোগ্য পণ্যের মূল্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী আলোচনার উদ্বোধন করেন। প্রকাশ, পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের পক্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই অন্যতম উপায় বলিয়া তিনি উহার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া অর্থমন্ত্রী নাকি বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনা রূপায়ণের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক সন্দেহ নাই তবে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে কোন কোন নূতন কাজ স্থগিত রাখা হইলেও নূতন অন্য কোন কাজ, বিশেষভাবে সমাজ-কল্যাণমূলক নূতন কাজ সুরু করিতেই হইবে।

খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এ. পি. জৈনও দেশের খাদ্যাবস্থা বিশ্লেষণ করেন।"

কংগ্রেস ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগষ্ট) কলিকাতার "যুগান্তর" পত্রিকায় বাঙালী মধ্যবিত্তদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রতীকরূপে কয়েকটি ছবি ছাপান হয়। ছবিগুলির সঙ্গে মধ্যবিত্তদের ক্রম-বর্দ্ধমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনাও থাকে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই ব্যাপারটি বিশেষ ভাল লাগে নাই। ঐদিনই বিকালে মনুমেণ্টের পাদদেশে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি ঐ ছবিগুলি এবং আলোচনার উল্লেখ করিয়া বিশেষ উত্তেজনার সহিত বলেন যে, কেহ যদি মনে করে যে কংগ্রেসের শাসনে জনসাধারণের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইতেছে তবে অবিলম্বে কংগ্রেস হইতে তাহার পদত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

অতুল্যবাবুর এই বক্রোক্তির লক্ষ্য ছিলেন স্পষ্টতঃই মন্ত্রীবর শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। প্রকাশ যে, অতুল্যবাবুর বিবৃতির পর শ্রীতরুণকান্তি ডাঃ রায়ের নিকট পদত্যাগপত্রও পেশ করেন। অবশ্য কংগ্রেসনিষ্ঠ দৈনিক "স্বাধীনতা" ব্যতীত আর কোন কাগজেই এই পদত্যাগের কথা প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ডাঃ রায়

তৎক্ষণাৎ পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন না। ইতিমধ্যে তরুণকান্তি ঘোষের পরিজনবর্গ এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের মধ্যে বিশেষ তোড়জোড় করিয়া গোপন আলোচনা চলিতে থাকে। এই আলোচনার ফলাফলরূপে ২২শে আগষ্ট "যুগান্তর" এবং "অমৃত-বাজার পত্রিকায়" দুইটি চিঠি প্রকাশ করা হয়। চিঠি দুইটির একটি সত্ত্ব (শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ) এবং অপরটি শ্রীঅতুল্য ঘোষ কর্ত্তৃক লিখিত। উভয় চিঠিরই তারিখ ছিল ১৬ই আগষ্ট। চিঠি দুইটির সারার্থ হইল অতুল্যবাবু তরুণকান্তির পদত্যাগ চাহেন না এবং "পত্রিকা" কর্ত্তৃপক্ষ চিরকালই কংগ্রেসের অনুগত হইয়া চলিবেন। ইহার পর মন্ত্রীবর শ্রীতরুণকান্তি তাঁহার পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিয়া লন।

এই ঘটনা হইতে কয়েকটি বিষয়ে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে। যেহেতু "যুগান্তর" পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীর একজন কংগ্রেসী মন্ত্রী সেহেতু কি "যুগান্তর" পত্রিকায় কংগ্রেসের কোনরূপ সমালোচনা করা চলিবে না? নাকি "যুগান্তরে" কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধ সমালোচনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই তরুণকান্তিকে মন্ত্রীসভায় লওয়া হইয়াছে? ভারতীয় সংবিধানের আইন অনুযায়ী কোন আইনসভার সদস্য অথবা মন্ত্রী কোন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর থাকিতে পারেন না। শ্রীতরুণকান্তি পূর্ব্বে "যুগান্তর" পত্রিকায় যে কর্ত্তৃত্বপদেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া থাকুন না কেন, এখন পত্রিকা পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার কোন অংশ থাকা উচিত নহে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীতরুণকান্তিকে "যুগান্তরে" প্রকাশিত সংবাদের জন্য পদত্যাগে আহ্বান জানাইবার একটি অর্থ হইতেছে যে, কেন তরুণকান্তি পত্রিকার উপর স্বীয় প্রভাব খাটাইয়া কংগ্রেসের সমালোচনা বন্ধ করেন নাই? ইহা একটি বিপজ্জনক ইঙ্গিত। কোন সভ্য দেশেই সংবাদপত্রের উপর এই ধরনের প্রভাব খাটান সমুচিত বলিয়া মনে করা হয় না। কংগ্রেসের সভাপতির ন্যায় একজন দায়িত্বপূর্ণ জননেতা যে কিরূপে প্রকাশ্যে এইরূপ দাবি করিতে পারিলেন তাহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, এই বিতর্কের অব্যবহিত পরে কলিকাতার একটি বৃহৎ বিরোধী সমালোচনার সংবাদ "যুগান্তর" প্রকাশ করে নাই। ইহা কি এক ধরনের সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ নহে?

চাষ-আবাদের অসুবিধা

পশ্চিমবঙ্গ এখন এক চরম খাদ্যসঙ্কটের সম্মুখীন। ইহার উপর রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চাষবাসের যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা সত্যই বিশেষ উদ্বেগজনক। রাজ্যের অনেক অঞ্চলেই বৃষ্টির অভাবে চাষীদের পক্ষে ধানবপন সম্ভব হয় নাই। তবে সর্ব্বশেষে যে বৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে হয়ত আংশিক ভাবে জলাভাবের অসুবিধা দূর হইবে।

কিন্তু জলাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে পোকার উপদ্রব। বর্দ্ধমান জেলায় এই পোকার উপদ্রব বিশেষ উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে "বর্দ্ধমানবাণী" লিখিতেছেন:

"জেলার বহু স্থান হইতে ধানে পোকা লাগার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন যে, কৃষিবিভাগে সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। পোকা লাগার ফলে ধানগাছের ঝাড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হইতেছে। ফলে ফসল অত্যন্ত কম হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। জেলার প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়নে সহকারী কৃষি কর্ম্মচারী আছেন। তাহার উপর মহকুমা কৃষিকরণ, জেলা কৃষিকরণ এবং ডেপুটি ডাইরেক্টারের আপিসও আছে। এই তিনটি আপিসের কর্ম্মচারী সংখ্যা কম নয়। দেশের বর্ত্তমান খাদ্যাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা যদি এই পোকার ব্যাপক আক্রমণরোধে অতি সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন তাহা হইলে আগামী বৎসর খাদ্যাবস্থা কি রূপ ধারণ করিবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তদুপরি কৃষকদের হাতে এমন অর্থ ও যন্ত্রপাতি নাই যে পোকার আক্রমণ হইতে ধানগাছ রক্ষা করে বা পোকা ধ্বংস করে। অবিলম্বে জেলার কৃষিবিভাগকে এই পোকা-বিনাশের কাজে আগাইয়া আসিতে হইবে।"

সরকারী কর্ম্মপন্থার নমুনা

নিম্নের সংবাদটি সত্য সত্যই চমকপ্রদ। এই সরকারী কর্ম্মচারীর নাম প্রকাশ ও তাঁহাকে "পদ্ম বিভূষণ" দেওয়া উচিত।

"ভারত সরকারের নিকট দুইটি ষ্টীমার জামিন রাখিয়া ৫। লক্ষ টাকা ধার লইয়া কলিকাতার একটি ষ্টীমার কোম্পানী সরকারের 'নাকের ডগার উপর দিয়া' একখানি ষ্টীমার পাকিস্থানে পাচার করে এবং তথায় উহা বেনামিতে নীলাম-খরিদ করিয়া লয়, এই মর্ম্মে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

টাকা আদায়কল্পে সরকারপক্ষ হইতে অপর ষ্টীমারখানির দখল পাইবার জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করিলে "ঋণদান দলিলখানি রেজিষ্ট্রি করা হয় নাই" বলিয়া সরকার মামলা হারিয়া যান।

ইতিমধ্যে উক্ত কোম্পানী কারবার গুটাইয়া ফেলায় টাকা আদায়ের ক্ষীণতম আশাও নির্ব্বাপিত হইয়াছে এবং সরকারী আমলাদের "অপূর্ব্ব দক্ষতার নিদর্শনের মূল্য হিসাবে" ভারত সরকারকে ৫। লক্ষ টাকা লোকসান দিতে হইতেছে।

সরকারী দক্ষতার নমুনা এমনই চমৎকার যে, যে কর্ম্মচারী এই ব্যাপারে মূলতঃ দায়ী, তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন দূরে থাকুক, এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাহার পদোন্নতি ঘটিয়াছে বলিয়া ঘনিষ্ঠসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ভারত সরকারের মার্কেন্টাইল মেরিন দপ্তর একটি ষ্টীমার কোম্পানীকে দুইটি ষ্টীমার জামিন রাখিয়া ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ধার দেন। কিছুদিন পরে ঋণের প্রথম কিস্তি পরিশোধ করিবার সময় আসিলে দেখা গেল উক্ত কোম্পানী একখানি ষ্টীমার সুকৌশলে পূর্ব্বপাকিস্থানে চালান করিয়া দিয়াছে এবং আরও দেখা গেল যে, চট্টগ্রাম বন্দরে ষ্টীমারখানি বেনামিতে নীলাম ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে।

কোম্পানীর অপর ষ্টীমারখানি অবশ্য কলিকাতা বন্দরে ছিল। ঐখানির উপর দখল লইবার জন্য ভারত সরকারের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হইলে সরকার মামলা হারিয়া যান। কারণ, যে দলিলবলে ষ্টীমার কোম্পানীকে টাকা ধার দেওয়া হইয়াছিল, হাইকোর্ট দেখেন উহা "রেজিষ্ট্রী করা হয় নাই।"

দুর্নীতির মূল কোথায় ?

২৭শে শ্রাবণ "মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" লিখিতেছেন :

"মাত্র দুইটি সাম্প্রতিক দুর্নীতির উল্লেখ করিতেছি। একটি ঘটিয়াছে এষ্টেট এ্যাকুইজিশন আপিসে। টেণ্ডার-নির্দ্দিষ্ট ২০ পাউণ্ড কাগজের স্থলে ১৪৷৷০ পাউণ্ড কাগজে ফরম ছাপা হইয়া ঐ বিভাগে ডেলিভারী দেওয়া ও বিভাগ কর্ত্তৃক নেওয়া এবং টেণ্ডার-দরেই বিল পেশ করাও হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। অবশ্য প্রতিযোগী টেণ্ডারদাতাদের চেষ্টায়ই এই দুর্নীতির বিষয় উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে আসিয়াছে।

"আর একটি হইতেছে, ভাগীরথী নদীর উপর নৌকায় সরকারী থামে ও থলিয়ায় বোঝাই গাঁজা ধরা পড়িয়াছে; নৌকার মাঝির এজাহারে যে সকল নাম প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি তাহাতে শুধু সরকারের নীচের তলার লোকই নাই, উপরতলারও আছে। এইসূত্রে সেণ্ট্রাল ওয়ার হাউসের মজুত মাল মিল করিতে গিয়াও নাকি বহু ঘাটতি পাওয়া গিয়াছে।

"ঘটনা দুইটি শুধু বলিলাম, মন্তব্য কিছু করিলাম না।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থা

গত ১৫ই আগষ্ট সরকারীভাবে ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের কার্য্যারম্ভ হইয়াছে। বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময়েই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে ত্রিপুরার আঞ্চলিক পরিষদের নির্ব্বাচনকার্য্য সমাপ্ত হয়। ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদে রহিয়াছেন ত্রিশ জন নির্ব্বাচিত সদস্য এবং দুই জন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্য। প্রথম দিনের অধিবেশনে কংগ্রেস দলের সদস্য শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ পরিষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের কার্য্যকালের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। তবে কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করিলে তাহা আরও এক বৎসর বাড়াইয়া দিতে পারেন। আঞ্চলিক পরিষদের হাতে কতকগুলি বিষয়ের সীমাবদ্ধ ভার দেওয়া হইয়াছে। পরিষদের যে-কোন সিদ্ধান্ত ত্রিপুরার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর লিখিত কারণ দর্শাইয়া নাকচ করিয়া দিতে পারেন। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনরূপ ক্ষমতাই এই পরিষদের নাই। তবে সাধারণভাবে এই পরিষদের উপর যে সকল বিষয়ের প্রশাসনিক ভার অর্পিত হইয়াছে যদি তাহা সততা ও পরিশ্রমের সহিত পরিচালনা করা হয়, তবে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধানে পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয়।

এইখানেই ত্রিপুরার প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ত্রিপুরার প্রশাসনিক সমস্যার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার সচেষ্ট হইয়াছেন মনে হয়। গত ২০শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জয়েণ্ট সেক্রেটারী শ্রী ভি. বিশ্বনাথন আগরতলায় যাইয়া এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

ত্রিপুরার প্রশাসনিক সঙ্কটের রূপ এবং সমাধানের পথ আলোচনা করিয়া স্থানীয় সাপ্তাহিক "সেবক" লিখিতেছেন :

"ত্রিপুরার উন্নয়নে মোটা অঙ্কের অর্থবরাদ্দ করিয়া কি হইবে, যদি যোগ্যতা সহকারে এই অর্থ জনস্বার্থে ব্যয়িত না হয়? একটি যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশাসনিক সংগঠন গড়িতে গিয়া দশ বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার একটি 'জগাখিচুরী' জাতীয় সরকারী সংস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে যে কারণে জনগণ ও সরকারী কর্ম্মচারী উভয়েই হতাশার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে—প্রতিটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বানচাল হইয়া সাধারণের সমস্যা সমাধান হওয়া দূরের কথা সমস্যাগুলি আরও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে "সমাজ-কল্যাণ" কখনও ত্রিপুরায় হইবে ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না; মনে হয় সমাজ-কল্যাণ কথাটাই যেন একটা প্রহসন বিশেষ।

"ত্রিপুরায় উপযুক্ত লোকের অভাব রহিয়াছে। উপযুক্ত লোক না পাওয়া গেলে প্রশাসনিক যোগ্যতা আসিতে পারে না। কিন্তু এই কথা বলিয়া আজ কেন্দ্রীয় সরকার রেহাই পাইতে পারেন না। কারণ সব দিক দিয়া ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার দশ বৎসর পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছেন।"

ত্রিপুরার প্রশাসনিক সঙ্কটে সরকারী নীতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া "সেবক" লিখিতেছেন যে, সরকার রাজ্যে কর্ম্মচারী নিয়োগের যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন তাহাতে কখনও প্রশাসনিক অযোগ্যতা দূর হইতে পারে না।

"স্থানীয় স্থায়ী অফিসার এবং অন্যত্র হইতে আগত অফিসার সম্পর্কে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। স্থায়ী অফিসারগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত—উপরওয়ালার মর্জ্জির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বিভিন্ন সার্ভিস হইতে অফিসার নিয়োগ করিয়া আনিলে প্রশাসনের যোগ্যতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না ইহা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। একটিমাত্র সার্ভিসের লোক দ্বারা শাসনকার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা ভিন্ন প্রশাসনিক উন্নয়ন অসম্ভব। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিমাচল প্রদেশের অফিসারগণের সার্ভিস পঞ্জাবের সহিত যুক্ত করিয়া পঞ্জাব হইতে হিমাচল প্রদেশে অফিসার সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা করাই একমাত্র পথ উন্মুক্ত আছে।"

মুর্শিদাবাদে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকলাপ

বাংলার বুকে যে রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকলাপ চলিতেছে মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকাগুলি সে সম্পর্কে বৎসরের পর

বৎসর ধরিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। আমরাও সময় সময় তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি। সম্প্রতি পুলিস হানা দিয়া একজন কংগ্রেসী এম-এল-এ'র গৃহ হইতে ভারতরাষ্ট্রবিদ্রোহী কার্য্য-কলাপের নানারূপ নথিপত্র আটক করিয়াছে। আশা করা যায়, এর পর সরকার এ বিষয়ে আরও সতর্ক দৃষ্টি দিবেন।

মুর্শিদাবাদের সাময়িক পত্রগুলিতে আরও এক শ্রেণীর সংবাদ প্রকাশিত হয়—সংখ্যাগুরু মুসলমান সমাজের একাংশ কর্তৃক জেলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উৎপীড়ন। হয়ত এই উৎপীড়ন রাষ্ট্রদ্রোহী কার্য্যকলাপের অঙ্গ হিসাবেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জেলার বিশিষ্ট মুসলমান নেতৃবৃন্দ পর্য্যন্ত এই সকল ঘটনার বিশেষ প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু এই সকল দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ইহাদের অত্যাচার ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে।

"মুর্শিদাবাদ সমাচার" পত্রিকার স্বাধীনতা সংখ্যায় শ্রীদিলীপ মজুমদার "কাশ্মীর ও মুর্শিদাবাদের কর্ম্মতালিকা কি এক?" শীর্ষক এক বিস্তৃত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

"মুর্শিদাবাদ জেলার মুসলমান সম্প্রদায়ের স্পর্দ্ধা সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। একমাত্র 'সমাচারে'ই জেলার বিভিন্ন এলাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের নিরীহ সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর বিভিন্ন পর্য্যায়ে অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী দিনের পর দিন প্রকাশিত হয়ে চলেছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নীরব। কিন্তু কেন?

"আমি দাঁইগ্রামের ঘটনার কথা আপাততঃ তুলব না। তুলব জলঙ্গী, রাণীনগর বা ভগবানগোলার কথা। সম্ভবতঃ আপনাদের মনে আছে ভগবানগোলা এলাকার বিশিষ্ট হিন্দু ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বক্রেশ্বর সরকারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গত ১০ই মার্চ্চ রাত্রি প্রায় ১২টার সময় শোচনীয়ভাবে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়।

"গত মে মাসের প্রথম দিকে একটা কূপের মধ্যে থেকে স্থানীয় জনসাধারণ বক্রেশ্বর সরকারের গলিত হাত-পাবিহীন একটা ধড় পুলিসের সহযোগিতায় উদ্ধার করে। অনেকের সন্দেহ যে মৃত-দেহটি মুসলমানরা লুকিয়ে রাখে একটা বাড়ীতে। আর ঈদের নামাজ পড়বার সময় যখন ওরা ছাড়া পায় তখন বাড়ী থেকে পচা গলিত শবটি কূপের মধ্যে ফেলে দেয়। এই বক্রেশ্বর সরকারই জেলার পুলিস বিভাগকে খুন-ডাকাতি ইত্যাদি বহু ঘটনায় সাহায্য করছিল। এমনকি কুখ্যাত সাহু ডাকাতকে ধরার ব্যাপারে বক্রেশ্বর সরকারই সাহায্য করেন।

"এর পর রাণীনগর থানার মুন্সীপাড়া এলাকার জনৈক হিন্দুর একটি গরুকে ফসল খাওয়ার জন্য চার-পাঁচ জন মুসলমান নৃশংস ভাবে হেঁসো দিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। গরুটির প্রাণফাটা চীৎকারে গরুর মালিক উপায়ান্তর না দেখে নাকি মুসলমান দুর্বৃত্তদের কাছে পায়ে ধরে (?) মার্জ্জনা চায়। "—যদি কের গরু আসে তবে গরুর মালিক সহ গরুকেও একেবারে কোরবাণী করে ছেড়ে দেব।" গরু ফসল খেলে খোঁয়াড়ে দেওয়ার রীতি আছে। কোরবাণী করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের কি স্পেশাল অর্ডার দিয়েছেন? সীমাহীন আস্পর্দ্ধা!

"এর পর জলঙ্গীর কথা—বলে শেষ করা যায় না। প্রকাশ্যে তারা পুলিসকে শাসায়—পাচার করতে না দিলে খুন করে ফেলব। পাচারের একচেটিয়া অধিকার ওদেরই তো! বাপ-জ্যেঠারা পাচার ব্যবসা করে আর যুবকেরা দিনের বেলাতেই দলবদ্ধ ভাবে হিন্দু বৌ-ঝিদের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করে। প্রতিবাদ করলে পাক পুলিস এদের সাহায্য করে। তখন শুধু ভারতীয় এলাকাতেই চলত এ কাজ, এখন আবার পাক পুলিস পাকিস্থানে চালান করে ক্যাম্পে বসিয়েই ফুর্ত্তি লোটে। সীমান্তের নিরীহ হিন্দুরা দিনের পর দিন নির্ব্বিবাদে এই অত্যাচারের খোরাক হয়ে চলেছে। এ সব কথা প্রায়ই শোনা যায়, তবে এই সময়কার পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসরচনাকারীদের এই পাশবিক অত্যাচারের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মত একটা বড় পয়েণ্ট বলা যেতে পারে।"

এই লেখায় হয় ত আংশিক ভাবাবেগজনিত অতিশয়োক্তি রহিয়াছে। কিন্তু মূলতঃ অভিযোগের বিষয় যে সত্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নাগরিকদের জীবন, মানসম্মান রক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্য। মুর্শিদাবাদে সরকার সেই কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতেছেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

সীমান্তে পাকিস্থানী ষড়যন্ত্র

নিম্নে আনন্দবাজার হইতে দুটি সংবাদ উদ্ধৃত হইল। অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু প্রতিকার কি? পণ্ডিত নেহরু ত "ব্যথিত হৃদয়ে" হা হুতাশ করিয়া ক্ষান্ত হইবেন:

"শিলচর, ৩০শে আগষ্ট—কাছাড় জেলায় এক শ্রেণীর মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নাগাদের সহিত যোগসাজস করিয়া জাতীয়তাবিরোধী চক্রান্তে জড়িত আছে এইরূপ নানা অভিযোগ পাওয়াতে এতদঞ্চলের শান্তিপ্রিয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, গত কয়েক দিন যাবৎ কাছাড়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, এই চক্রান্তকারীদের সহিত নাকি পাকিস্থানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও যোগাযোগ রহিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, সুযোগ পাইলেই পূর্ব্ব-পাকিস্থান হইতে নানা অস্ত্রশস্ত্র কাছাড় জেলার ভিতর দিয়া গোপনে নাগা পাহাড়ে সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতস্থিত পাকিস্থানী দূতাবাসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কাছাড় পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতে-ছেন।

প্রকাশ, মাওউ নাগার নিকট প্রাপ্ত একটি নোটবুকে যে সাঙ্কেতিক ভাষা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কলিকাতাস্থিত পাকিস্থানী ডেপুটি হাইকমিশনারের বিরুদ্ধ একটি সাঙ্কেতিক ভাষায়ও উল্লেখ আছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহল সন্দেহ করিতেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ

মালদহ প্রভৃতি জেলায় এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে অন্তর্ঘাতী কার্য্যকলাপের নানা অভিযোগের সহিত পাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী এই কাছাড় জেলারও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। সন্ত্রাসবাদী নাগাদের সহিত যোগসাজসের নানা অভিযোগ থাকা হেতু এই ব্যাপারে অবিলম্বে বিশেষ সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনও অনুভূত হইতেছে নচেৎ অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মনে করিতেছেন।

হাড়োয়া ও সন্দেশখালি অঞ্চলে বিশেষ এক সম্প্রদায়ভুক্ত দুর্বৃত্তগণের দৌরাত্ম্য সম্প্রতি এমনই বাড়িয়া গিয়াছে যে, তাহারা পুলিসের উপর হামলা করিতেও দ্বিধা করিতেছে না।

বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত ২১শে আগষ্ট হাড়োয়া থানার অন্তর্গত মৌলি (মালক) গ্রামে যে পুলিসবাহিনী এক মামলার তদন্ত করিতে যায়, সেই বাহিনীর উপর চড়াও হইয়া একদল দুর্বৃত্ত জনৈক সহকারী দারোগাকে নিদারুণ প্রহার করে এবং সেই অবস্থায় তাঁহাকে "পিছমোড়া" করিয়া বাঁধিয়া এক বাড়ীতে আটক করিয়া রাখে।

উক্ত দারোগার আঘাত এতই গুরুতর যে, "ছাড়া পাইবার পর" তাঁহাকে প্রথমে বসিরহাট ও পরে কলিকাতার পুলিস হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়।

এই অঞ্চলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত জনৈক দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলেন, পাক-ভারত সীমান্তের এই অঞ্চলটির উপর সরকারের আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত। এই অঞ্চল প্রথমতঃ দুর্গম, দ্বিতীয়তঃ পাক-সীমানায় অবস্থিত এবং তৃতীয়তঃ "প্রায় অরক্ষিত" বলিলেই চলে।

তিনি জানান, রাস্তাঘাটের বালাই এই অঞ্চলে নাই বলিয়া সীমান্ত পাহারার জন্ত যে রক্ষীদল ও পুলিসবাহিনী আছে তাহাদের পক্ষে কাজ চালান দুরূহ হইয়া উঠে।

সরকারী শাসনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ চোরাই চালানদার ও ভারতবিরোধী কার্য্যে রত ব্যক্তিগণ নাকি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতেছে। গত ঈদের সময় হাড়োয়া ও সন্দেশখালির কোন কোন অঞ্চলে পাকিস্থানের সমর্থনসূচক তৎপরতার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে।

এমনও সন্দেহ করিবার কারণ আছে বলিয়া উক্ত ওয়াকিবহাল সূত্র মনে করেন যে, "বাহিরের প্ররোচনার ফলেই একশ্রেণীর দুর্বৃত্তদল এই অঞ্চলে মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং পুলিসকে অগ্রাহ্য করিতেও সাহসী হইতেছে।"

বর্দ্ধমান শহরে রিক্সাচালকদের অসৌজন্য

"বর্দ্ধমানবাণী" ৩১শে শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্দ্ধমান শহরে রিক্সাচালকদের অসৌজন্যপূর্ণ আচরণের উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন, "শহরে রিক্সাচালকদের অত্যাচার প্রায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। শহরের জনবহুল ও কর্মচঞ্চল এলাকায় দাপট অত্যন্ত বেশী। রাস্তা অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা এবং পথচারীদের প্রতি অসৌজন্য প্রকাশ এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিছু বলিবার উপায় নাই। অভদ্র আচরণে ইহারা মত্ত হইয়া গিয়াছে। রেল ষ্টেসনে ইহাদের অত্যাচার আরও বেশী। বিশেষ করিয়া সকাল ৯টা হইতে ১০টা ও অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টার সময়ে যাত্রীদের প্রতি ইহারা যে ব্যবহার করে তাহা কল্পনাতীত। ঐ সময়ে কোন রিক্সা'চালক স্বল্প দূরত্বের কোন যাত্রী বহন করিতে চাহে না। বলে ভাড়া আছে। মহিলা বা মোট সঙ্গে থাকিলে ত কথাই নাই। নবাবী চালে মোটা ভাড়া হাঁকিয়া বসে। সকাল ৯টা হইতে ১০টার সময়ে কোন রিক্সা কাছারী, রাণীগঞ্জ মোড় আসিবে না। ইহাদের এই অবাধ প্রকাশ্য ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, প্রতিকারের জন্ত পুলিস বা পৌর কর্তৃপক্ষ কেহই আগাইয়া আসিবে না। তথাপি আমরা পুলিস ও পৌর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

বর্দ্ধমানের রিক্সাচালকদিগের দুর্ব্যবহার কলিকাতার একশ্রেণীর ট্যাক্সিচালকের অসভ্যতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সকল ট্যাক্সিচালক অতিরিক্ত ভাড়া ব্যতীত শহরের অনেক অংশেই যাইতে রাজী হয় না। পুলিসের নিকট নালিশ করিলে হয়ত পুলিস কর্তৃপক্ষ ঐ সকল ট্যাক্সিচালকের নিকট কৈফিয়ত দাবি করেন (সকল ক্ষেত্রে করেন কিনা তাহা অবশ্য বলা অসম্ভব) তথাপি অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতিই পরিলক্ষিত হয় না এবং শহরের সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্গতিরও অবসান হয় নাই।

ভাঙ্গনের মুখে কালনা শহর

বর্দ্ধমান জেলার অন্যতম শহর কালনা। কালনা শহর ক্রমশঃই ভাগীরথীর গর্ভে অবলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এ সম্পর্কে কালনা হইতে প্রকাশিত পাক্ষিক "ভাগীরথী" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

"কালনা শহর আজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে। ভাগীরথী ক্রমশঃ কালনা শহরকে গ্রাস করিতেছে। উপযুক্ত সময়ে দ্রুত দৃঢ়তর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে না পারিলে সমগ্র শহর হয়ত বিলুপ্ত হইবে। সমগ্র শহরের বিলুপ্তি আমাদের চোখে নতুন নয়, আমরা ইতিপূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রসিদ্ধতম বাণিজ্যকেন্দ্র ধুলিয়ান শহরকে গঙ্গার গর্ভে বিলুপ্ত হইতে দেখিয়াছি। সময়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিলে ধুলিয়ান শহরকেও রক্ষা করা সম্ভব হইত। একমাত্র ধুলিয়ান শহরে আবগারী বিভাগের আয় ছিল কয়েক লক্ষ টাকা। বিড়ির প্রচুর কারখানা ছিল, কম্বল, টিন প্রভৃতি নানা কুটির শিল্পের প্রচলন ছিল। ঐ শহরে পশ্চিমবঙ্গে পাট ও রবিশস্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল ধুলিয়ান।

"ধুলিয়ান শহরকে গঙ্গা গ্রাস করিয়াছে। আজ শহরের কোন চিহ্ন নাই। কালনা শহরেরও ঐ দুর্দশা হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি।

"স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কয়েকটি কারণে কালনা শহরের গুরুত্ব অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শহর পাকিস্থান সীমানা হইতে

মাত্র ২০ মাইলের মধ্যে। সামরিক দিক হইতে ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা শুনিয়াছিলাম, সামরিক দপ্তর কালনাতে বিমানঘাটি স্থাপনের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। উহা সত্য হইলে শহর রক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কলিকাতা হইতে মাত্র ৫০ মাইল দূরে আপৎকালীন অবস্থার জন্ম কালনা শহরের শুধু গুরুত্ব নয়, ইহা অতীব প্রাচীন শহর, শিল্পসংস্কৃতির দিকটাও বিবেচনা করিবার আছে। আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

"ভাগীরথী" কালনা শহরটি রক্ষার জন্ম সরকারের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন আমরা তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক শহর আজ নদীগর্ভে যাইবার পথে, একটি রাজ্যব্যাপী নদী-পরিকল্পনা না করিলে অচিরেই বহু প্রাচীন সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থানের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

পশ্চিমবঙ্গে শান্তিশৃঙ্খলা

আমরা কি প্রকার অবস্থায় আছি তাহার নমুনা নীচের সংবাদে বেশ পাওয়া যায়। দেশে অরাজকের বেশী বাকী নাই।

"সোমবার মাঝেরহাট ষ্টেশনে এক ঘটনার ফলে বজবজ সেকশনে ট্রেন চলাচল প্রায় তিন ঘণ্টার জন্ম বন্ধ ছিল।

প্রকাশ যে, একটি ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় অবৈধভাবে ভ্রমণ করার অভিযোগে একজন রেলকর্ম্মচারী এবং তিনজন যাত্রীকে গ্রেপ্তার করিবার পর ঐ দিন দ্বিপ্রহরে প্রায় পাঁচ শত লোক মাঝের-হাট ষ্টেশনের নিকট রেল লাইনের উপর বসিয়া পড়িয়া ট্রেন চলাচলে বাধা দেয়। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই রেল-কর্ম্মচারী বলিয়া প্রকাশ।

ধৃত চার ব্যক্তিকেই সোনারপুরে এক ভ্রাম্যমাণ আদালতে উপস্থিত করা হয়।

বেলা ১১টা হইতে দুপুর প্রায় ২।টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল বলিয়া প্রকাশ। আপিসের সময় ঐভাবে ট্রেন বন্ধ থাকায় যাত্রিসাধারণকে নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।"

বি-পি-টি-ইউ-সি কংগ্রেস

যে বুদ্ধিমানের দল বাংলা দেশের সকল শিল্পের অবনতি ও এই অঞ্চলকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রতিকূল অবস্থা যুক্ত করিয়া বেকারীর সমস্যা বাড়াইতেছেন তাঁহাদের জল্পনা-কল্পনার বৃত্তান্ত নীচে আনন্দ-বাজার হইতে উদ্ধৃত হইল :

"রবিবার কলিকাতায় মহাজাতি সদনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তিনদিবসব্যাপী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে। এইদিন বি.পি.টি.ইউ.সি'র নীতিসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং উহা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সংস্থার পরবর্ত্তী জেনারেল কাউন্সিলের বৈঠকে উহা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে।

ঐ প্রস্তাবে সকল স্তরের শ্রমিক ও কর্ম্মীর জন্ম শতকরা ২৫ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি, মূল বেতনের সহিত মাগগীভাতার সংযুক্তি-করণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের সহিত বেতন ও ভাতার সামঞ্জস্য বিধানের দাবি জানানো হয়।

প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, (১) শ্রমিক ও কর্ম্মীদের বাঁচিবার মত মজুরীর ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত তাঁহাদের ন্যূনতম এক মাসের বেতন বার্ষিক বোনাসস্বরূপ দিতে হইবে। যে সকল ক্ষেত্রে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি চালু করা হইবে না, সেইসকল ক্ষেত্রে র‍্যাশনালাইজেশনের নামে শ্রমিকদের কাজের বোঝা বাড়াইবার চেষ্টা কিছুতেই মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রবর্ত্তনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগকে এই আশ্বাস দিতে হইবে যে, "কোন শ্রমিক ছাটাই হইবে না অথবা তাহাদের বর্ত্তমান আয়ের ক্ষতি হইবে না, (২) উদ্বৃত্ত বলিয়া ঘোষিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, (৩) র‍্যাশনালাইজেশন ব্যবস্থার দ্বারা যে কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে শ্রমিক ও মালিকের সমান অংশ থাকা বাঞ্ছনীয়; (৪) শ্রমিকের কাজের বোঝার নিরপেক্ষ ও যথাযোগ্য নিরূপণ হওয়া দরকার।

শ্রমিক ও কর্ম্মচারীর চাকুরির স্থায়িত্ব বিধানের নিমিত্ত কণ্ট্রাক্ট ব্যবস্থায় শ্রমিক নিয়োগ-প্রথার বিলোপসাধন করিয়া সরাসরি নিয়োগ ব্যবস্থা, একাদিক্রমে ছয় মাস চাকুরি করিলে উহার স্থায়িত্ব বিধান, মালিকগণ কর্ত্তৃক উৎপাদন হ্রাস, কারখানা বন্ধ বা লক-আউট করিয়া দেওয়া সমাজবিরোধী কাজরূপে গণ্য করিবার দাবি জানান হয়। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম্মঘট ও পিকেটিং করিবার এবং আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন কার্য্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ না করিবারও দাবি জানানো হয়। শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তির জন্ম সালিশী ব্যবস্থা যাহাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় তজ্জন্য গবর্ণ-মেণ্টের বর্ত্তমান সালিশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করার জন্যও অনুরোধ জানানো হয়।"

প্রয়োজনীয় সংস্থায় ধর্ম্মঘট

এই বিলটি বোধ হয় এখনও রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া আমা-দের শাসনতন্ত্রে যুক্ত হয় নাই। যাহা হউক ইহার জন্ম বৃত্তান্ত আনন্দবাজার হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"৬ই আগষ্ট—জনসাধারণের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্ম যে সমস্ত সংস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়, সেই সমস্ত সংস্থায় ধর্ম্মঘট নিবারণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে জরুরী বিল উত্থাপন করিয়াছেন, অদ্য লোকসভায় সেই বিল ২২৬—৫১ ভোটে গৃহীত হয়। ছয় জন স্বতন্ত্র সদস্য ভোটদানে বিরত ছিলেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের আসন্ন ধর্ম্মঘট নিবারণের উদ্দেশে এই বিলে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে।

লোকসভায় কম্যুনিষ্ট, প্রজাসমাজতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী সদস্যগণ 'ধিক্ ধিক্' ধ্বনি করিয়া এই বিল গ্রহণের প্রতিবাদস্বরূপ লোকসভা-কক্ষ ত্যাগ করেন।

বিরোধীদলের সদস্যগণ অতিশয় দৃঢ়তার সহিত এই বিলের

বিরোধিতা করেন। বিলের প্রত্যেকটি ধারা এবং প্রধান প্রধান সংশোধন প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা ভোটগণনার জন্ত পীড়াপীড়ি করেন। বিল সম্পর্কে চূড়ান্ত ভোট গ্রহণের সময় স্বতন্ত্র সদস্যগণ ভোটদানে বিরত ছিলেন।

বিলের তৃতীয় দফা আলোচনাকালে বিরোধীদলের একমাত্র সদস্য কম্যুনিষ্ট দলের সহকারী নেতা অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্টকে তিনি এই কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে চাহেন যে, এই বিল শ্রমিক-শ্রেণীর হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করিবে। শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগিতা লাভ করিতে না পারিলে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইবে। "জনসাধারণের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব আছে আমরা যদি সত্য সত্যই তাহা পালন করিতে চাই তাহা হইলে আমরা এই অনিষ্টকর বিল পাশ করিতে পারি না।"

জাতির উদ্দেশে প্রচারিত প্রধানমন্ত্রীর বেতার ভাষণে যে মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে, অধ্যাপক মুখার্জী তাহার প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা না করিয়া সরকার শ্রমিকদের ধ্বংস করার জন্ত ব্যাপক ক্ষমতা গ্রহণ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কংগ্রেসীরাই ঐ পরিকল্পনাকে ছাঁটিয়া কাটিয়া উহাকে বানচাল করার চেষ্টা করিতেছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ বলেন—আমি আশা করি যে, প্রত্যেক দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সদস্যই—তিনি মাঝে মাঝে বিপথগামী হইলেও—শুধু এই বিল সমর্থন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, অত্যাবশুক সংস্থাসমূহের কাজকর্ম যাহাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবেন। অতঃপর পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, যদি এই বিল কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত না হয় তাহা হইলে তাঁহার চেয়ে আর কেহই বেশী সুখী হইবেন না।

পণ্ডিত পন্থ আরও বলেন যে ডাক, তার, টেলিফোন, বিমান এবং অন্যান্য অত্যাবশুক সংস্থার কাজ যদি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার ফলাফল কিরূপ হইতে পারে এই সভার সদস্যগণ তাহা যেন ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন। যদি তাঁহারা ধীরভাবে এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে তাঁহারা এই জাতীয় বিলের জরুরী প্রয়োজন এবং অপরিহার্য্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি এই সমস্ত সংস্থার কাজ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে সর্ব্বপ্রকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণরূপে বিপর্য্যস্ত হইবে। এমন কি সরকারী কাজকর্ম্মও অচল হইয়া পড়িবে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যাহারা অনশনে আছে কিংবা মহামারী এবং অন্যান্য দুর্দ্দৈবে যাহারা কষ্টভোগ করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে আমরা কোন সংবাদ পর্য্যন্ত পাইব না। যাহাতে এইরূপ সঙ্কটের উদ্ভব হইতে না পারে তজ্জন্য আমাদের এই প্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যদি প্রস্তাবিত ধর্ম্মঘট কার্য্যে পরিণত হয় তাহা হইলে উহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে যে দুর্গতি, অসুবিধা, বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে তাহার পরিমাণ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে এই বিল উত্থাপন করা হইয়াছে।

একটি আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া পণ্ডিত পন্থ বলেন যে, বিলে সকল ধর্ম্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করার প্রস্তাব করা হয় নাই। কোন ধর্ম্মঘট বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কর্ম্মবিরতির জন্ত কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হইবে না।

অদ্য লোকসভায় অত্যাবশুক সংস্থা বিলের দফাওয়ারী আলোচনা আরম্ভ হয়। এই বিলে অত্যাবশুক সংস্থাসমূহে ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিলের যে ধারায় অত্যাবশুক সংস্থার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে সেই ধারা সম্পর্কে দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হয়।

ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ, রেলপথ ও যানবাহন বিভাগ, বিমান বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, বন্দরসমূহের কর্ম্মচারিগণ, টাঁকশালের সিকিউরিটি প্রেসের এবং প্রতিরক্ষা সংস্থার কর্ম্মচারিগণকে বিলের এই ধারার আওতায় আনা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই ধারায় গবর্ণমেণ্টকে যে কোন সংস্থাকে এই আইনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী অত্যাবশুক সংস্থা বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে।"

দমদমে বিমান দুর্ঘটনা

১লা সেপ্টেম্বর রবিবার ভোরে দমদম বিমানঘাটিতে সাম্প্রতিককালের এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স কর্পোরেশনের চারি জন অফিসারের জীবনহানি ঘটে। লণ্ডন এয়ার ওয়ার্ক লিমিটেডের চার ইঞ্জিনযুক্ত একখানি হার্মিস বিমান আসিয়া ভারতীয় বিমানখানির উপর পড়াতেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনা ঘটিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিন জন ভারতীয় অফিসারের (সকলেই বাঙালী) জীবনহানি ঘটে। চতুর্থ ভারতীয় অফিসার ষ্টুয়ার্ড তারা সিং আর জি কর হাসপাতালে প্রেরিত হইবার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ভারতীয় বিমানখানি মাল বোঝাই করিয়া আসাম যাত্রা করিবার জন্ত চূড়ান্ত নির্দ্দেশের অপেক্ষা করিতেছিল। সেই সময় ৫৫ জন যাত্রী এবং ৬ জন ক্রু সহ হার্মিস বিমানখানি ভারতীয় বিমানখানির উপর অবতরণ করার ফলে ভারতীয় বিমানটির ককপিট অর্থাৎ সম্মুখস্থ ভাগ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহারই ফলে ভারতীয় বৈমানিকদের জীবনহানি ঘটে। ভারতীয় ডাকোটা বিমানটির ষ্টার বোর্ড অর্থাৎ ডান দিক এবং প্রপেলার অর্থাৎ পক্ষ দুইটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চার ইঞ্জিনযুক্ত হার্মিস বিমানটির দুইটি ইঞ্জিন বিধ্বস্ত হয়, তবে ৫৫ জন যাত্রীর মধ্যে কাহারও বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই।

হার্মিস বিমানখানি যখন দমদম বিমানঘাঁটিতে অবতরণ করে তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং সম্মুখের জিনিষ দেখার বিশেষ অসুবিধা ছিল।

প্রকাশ যে, চীফ এয়োনটিক্যাল ইনস্পেক্টর মিঃ মালহোত্রকে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, এই তদন্ত শেষ হইয়াছে—তবে তদন্তের ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলা হয় নাই।

দমদমের এই দুর্ঘটনাটি সত্যই মর্ম্মান্তিক। ভারতীয় বিমানটি ঘাটিতে অবস্থান করিতেছিল—ইহা অপেক্ষা নিশ্চিন্ত অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না, অথচ তথাপি বৈমানিক চতুষ্টয়ের জীবনহানি ঘটিল। এই দুর্ঘটনার বিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ঘাটিতে বিমান থাকা সত্ত্বেও কিরূপে ব্রিটিশ বিমানটি ভূমিতে অবতরণ ঐখানেই করিল—কাহার নির্দ্দেশেই বা করিল—সে সম্পর্কে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে। আমাদের দেশে অন্যান্য দুর্ঘটনার ন্যায় বিমান দুর্ঘটনাও যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিমান দুর্ঘটনাগুলির মামুলী তদন্তও হয়, কিন্তু দুর্ঘটনা হ্রাস পাওয়ার পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে। যে অবস্থায় দমদম বিমান-ঘাটিতে দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহা নিতান্তই অস্বাভাবিক। এ সম্পর্কে যে বা যাহারা দায়ী তাহাদের কঠোর শাস্তিবিধান কর্ত্তব্য।

বাঁকুড়া পৌরসভার অবস্থা

২৭শে শ্রাবণ "হিন্দুবাণী" পত্রিকায় শ্রীদুর্মুখ লিখিতেছেন :

"পৌরসভার অভ্যন্তরে যাহা ঘটে তাহার অনেকাংশই জনসাধারণের অবগতির মধ্যে আসে না। বাঁকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও জেলাশাসক প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ব্যবসায়ীর প্রায় ৮,৪০,০০০৲ টাকা মূল্যের সরিষা মনুষ্য ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া আটক করাইয়াছিলেন। উক্ত আটক করার বৈধতা লইয়া মামলা আজিও চলিতেছে। পৌরসভায় কয়েক হাজার টাকা ইহার পিছনে ব্যয় হইয়াছে। মামলার ফলাফলের সহিত পৌরসভার ভাগ্য জড়িত।

"অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়াও কমিশনারদের কোন সভায় আলোচনা হয় নাই, এবং চেয়ারম্যান ও দু'এক জন কেরানী ব্যতীত এই মামলার পিছনে পৌরসভার ব্যয়ের পরিমাণ কাহারও জানা নাই। ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাসের নির্দ্দেশমত ৫ই আগষ্টের সভায় বিষয়টি আলোচিত হইবার ও মোট ব্যয়ের হিসাব দাখিলের কথা ছিল। কিন্তু উক্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করা বৈধ কিনা তদ্বিষয়ে চার ঘণ্টা ধরিয়া বিতর্ক চলে। সভায় এই বিষয়ে যাহাতে আলোচনা না হয় সেজন্য কয়েকজন কংগ্রেসী ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কমিশনারের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইহার পিছনে কি রহস্য আছে তাহা পরে প্রকাশ পাইবে আশা করি।"

ক্ষুদ্র লৌহশিল্প ও সরকারী নীতি

ক্ষুদ্রশিল্পকে উৎসাহদান এবং সাহায্য করাই সরকারের ঘোষিত নীতি। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই নীতি এবং তাহার প্রয়োগের মধ্যে গভীর পার্থক্য থাকিয়া গিয়াছে।

সরকারী নীতি যথাযথ কার্য্যকরী না করায় ফলে আসানসোলের ক্ষুদ্র লৌহশিল্পগুলির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। "বঙ্গবাণী"তে এই সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় আলোচনায় বলা হইয়াছে যে, আসানসোলের ক্ষুদ্র লৌহশিল্পগুলিকে Pig iron ও লৌহ প্রভৃতির জন্য কোন 'কোটা' মঞ্জুর করা হইতেছে না। ফলে অনেক কারখানা নিষ্ক্রিয় রহিয়াছে এবং উৎপাদন ব্যাহত হইতেছে। 'বঙ্গবাণী' লিখিয়াছেন :

"সুস্পষ্ট সরকারী নীতি থাকা সত্ত্বেও কোন্ অব্যবস্থার ফলে এখানকার ছোট ছোট লৌহশিল্প তাহাদিগের কোটা ও তদনুযায়ী Pig iron ও লৌহ প্রভৃতি পাইতেছে না তাহাই দেখিতে হইবে এবং তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। আর আমরা যে ভাবে বুঝিয়াছি তাহা না হইয়া সরকারী নীতি যদি অন্যরূপই হয়, তাহাও জনসাধারণকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে জানাইয়া দিতে হইবে। জনসাধারণ যেন কোন বৃথা আশা লইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয়। আমরা আশা করি, সরকারী শিল্পবিভাগ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদনে একদিনও বিলম্ব করিবেন না।"

বিভিন্ন জেলায় রাস্তাঘাটের দুরবস্থা

মুর্শিদাবাদের রাস্তাঘাটের দুরবস্থা বর্ণনা করিয়া "মুর্শিদাবাদ" পত্রিকা লিখিতেছেন :

"আমাদের এই জেলায় কয়েকটি প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। বড় বড় রাজপথ। কোনটা কন্‌ক্রিট, কোনটা পীচঢালা। এই সব সুন্দর সুন্দর রাস্তা নির্ম্মাণের ফলে জনসাধারণেরও যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু এগুলি দেখিলেই চলিবে না। কয়েকটি বড় রাস্তা ব্যতীত জেলার অন্যান্য রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এই জেলায় বহু ছোট ছোট রাস্তা আছে। তন্মধ্যে কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের, কতকগুলি জেলা-বোর্ডের। এই সব রাস্তা যে কতদিন মেরামত হয় নাই, তাহা স্মরণ করাও মুশকিল। বর্ষাকালে এই সব রাস্তায় যানবাহন লইয়া চলাচল করা এক প্রকার অসম্ভব। জলকাদা ভরা রাস্তার উপর দিয়া যখন গো-মহিষাদির শকট যাওয়া-আসা করে তখন সে দৃশ্য সত্যই মর্ম্মান্তিক। কোন বিদেশী সে দৃশ্য দেখিলে বলিতে বাধ্য হইবে যে, ভারতবর্ষ এখনও মধ্যযুগের অবস্থার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে।"

"মুর্শিদাবাদ পত্রিকা" মুর্শিদাবাদের রাস্তাঘাটের যে বর্ণনা দিয়াছেন বাংলা দেশের প্রায় সকল জেলা সম্পর্কেই ইহা সত্য। কয়েকটি বড় বড় পিচঢালা রাস্তা ব্যতীত সকল জেলারই অধিকাংশ রাস্তা সামান্য বৃষ্টিতেই চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠে। এই সকল দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাস্তার অনেকগুলিরই রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নতির ভার ইউনিয়ন বোর্ড এবং জেলা বোর্ডগুলির উপর; কিন্তু এই সকল

প্রতিষ্ঠানের এমন আর্থিক সামর্থ্য নাই যে, উহারা এই রাস্তাগুলির সংস্কার সাধন করে। সরকার হইতে প্রচুর অর্থসাহায্য ব্যতীত এই সকল রাস্তা সংস্কারের কোন সম্ভাবনাই নাই।

অথচ সুগম রাস্তাঘাটের উপর মফঃস্বল বাংলার উন্নতি বিশেষ ভাবেই নির্ভরশীল। ইহা বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাটের উন্নতিবিধানের প্রতি আশু মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

এশিয়ার সমাজজীবনে নারীর ভূমিকা

আগষ্ট মাসের গোড়ার দিকে থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাঙ্কক নগরীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এশিয়ার সমাজজীবনে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলনে ভারত, চীন, ব্রহ্মদেশ, কোরিয়া, পাকিস্থান, থাইল্যাণ্ড প্রমুখ পনরটি দেশ হইতে মহিলা প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। আলোচনাটিতে মোট ৪৪ জন যোগদান করেন, তন্মধ্যে ২৮ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন; ১৬ জন যোগদান করেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে। এই সম্মেলনে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে ছিল: রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং দারিদ্র্যের রূপ এবং কি কি অবস্থা রাষ্ট্রীয় জীবনে নারীদের ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করে অথবা বাধা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে আলোচনা।

এই আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ সমিতিগুলির বিশ্ব ফেডারেশনের সভানেত্রী এবং থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পত্নী শ্রীমতী লাইয়াদ পিবুল সংগ্রাম এবং আলোচনা-চক্রটি পরিচালনা করেন থাইল্যাণ্ডের শ্রীমতী রায়েম প্রোমোবল বুন্না প্রাদপ। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী অন্যতম প্রধান সহঃ-সভানেত্রী রূপে নির্ব্বাচিত হন।

উদ্বোধনী ভাষণদান প্রসঙ্গে শ্রীমতী পিবুল সংগ্রাম বলেন যে, এশিয়ার নারীরা তাঁহাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য না হারাইয়াও নিজ নিজ দেশের সমাজজীবনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি বলেন, "পুরুষেরা সন্তান প্রতিপালন করুক এবং নারীরা পুরুষের বেশ ধারণ করুক এই দাবী লইয়া আমরা সম্মিলিত হই নাই।" তিনি বলেন যে, যদিও নারীদের রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি চুক্তি প্রস্তুত করিয়াছে, তথাপি একাধিক রাষ্ট্রে নারীদিগকে এখনও ঐ সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কয়েকজন অভিমত প্রকাশ করেন যে, এশিয়ার পুরুষদিগকে নূতন ভাবে শিক্ষিত না করিতে পারিলে নারীদের পক্ষে স্বাধীনভাবে চলা কঠিন। প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত নারীদের পক্ষে সমাজজীবনে অংশ গ্রহণ করা অসম্ভব।

কানাডার ডঃ এডওয়ার্ড এ. কারবেট-লিখিত একটি রচনার উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় দিনে যে আলোচনা চলে তাহাতে এই কথাই প্রকাশ পায় যে, যে সকল অগ্রগামী দেশে নারীদিগকে রাষ্ট্রীয় অধিকার দেওয়া হইয়াছে সেই সকল দেশেও নারীগণ পরিপূর্ণরূপে তাহাদের অধিকার প্রয়োগ করিতে পারে না—আংশিক ভাবে ইহার জন্য দায়ী তাহাদের সন্তানপালন এবং গৃহস্থালীর কর্ত্তব্য।

এশিয়ার মহিলা প্রতিনিধিগণ বলেন যে, এশিয়াতে নারীদিগের দুর্ব্বল স্বাস্থ্য তাহাদের সামাজিক কার্য্যে অংশগ্রহণের পথে অন্যতম অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাঁহারা নারীদের স্বাস্থ্যোন্নতি বিশেষতঃ যক্ষ্মারোগের নিরোধের উপর বিশেষভাবে জোর দেন। পরিবার-পরিকল্পনার উপরও জোর দেওয়া হয়। অপরাপর প্রতিনিধিগণ দারিদ্র্যের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দারিদ্র্যই এশিয়ার জনসাধারণের বহু সমস্যার মূল।

ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতী জেটী রিজালী নূর বলেন যে, পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কথা বলিলে তাঁহার দেশ ইন্দোনেশিয়াতে বিতর্কের সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া পরিবার-নিয়ন্ত্রণের কথা না বলিয়া মায়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার উপর জোর দেওয়াই বিশেষ সমীচীন হইবে। তাহাতে ধর্ম্মীয় এবং রাজনৈতিক সমালোচনার হাত এড়ান সহজতর হইবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী রিজালী নূর ইহাও বলেন যে, ইন্দোনেশিয়াতেও পরিবার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইন্দোনেশীয় সরকারও পরিবার-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের পক্ষে।

পাকিস্থানের প্রতিনিধি বেগম কাইসোরা আনওয়ার আলীও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া বলেন যে, পাকিস্থানের নারীরাও পরিবার-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহান্বিত। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও অনেক সাহায্য প্রয়োজন।

জাপানের প্রতিনিধি শ্রীমতী নোবুকো তোমিতা টাকাহাশী বলেন যে, পরিবার-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জাপানী নারীদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪৭ সনে যেখানে জাপানের জন্মহার ছিল হাজারকরা ৩৪ এখন তাহা দাঁড়াইয়াছে হাজারকরা ১৯।

ব্যাঙ্কক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তৃতার সারমর্ম্ম আমরা এখনও দেখি নাই। তবে মোটামুটিভাবে এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই নারীদের দুরবস্থা প্রায় সমান—যেটুকু প্রভেদ রহিয়াছে তাহা নিতান্তই নগণ্য। পশ্চিমের দেশগুলিতে স্ত্রীলোকদিগের আয়ু পুরুষদের প্রায় সমান সমান, কোন কোন দেশে পুরুষদিগের অপেক্ষা বেশীও; কিন্তু এশিয়ার প্রায় সকল দেশেই নারীদের আয়ু পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মুসলমান-প্রধান দেশগুলিতে স্ত্রীলোকদের প্রতি মনোভাবের পরিবর্ত্তন (যাহার অঙ্কুর ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান প্রমুখ দেশে দেখা গিয়াছে) ব্যতিরেকে জনজীবনে নারীদের অবস্থানের উন্নতি ঘটা অসম্ভব। কিন্তু এ সকলই সময়, অর্থ এবং বিশেষভাবে প্রচেষ্টা সাপেক্ষ। ব্যাঙ্কক সম্মেলনে আলোচনার ফলে এশিয়ার নারীদের সমস্যাবলী সাধারণের সম্মুখে আসিয়াছে। ইহাতে নারীদের বিভিন্ন সমস্যা

সম্পর্কে সকলে অনতিবিলম্বে সচেতন হইবেন এবং সেই অনুপাতে সমস্যার সমাধানও সহজতর হইবে।

এশিয়ায় নারী ও শিশুদের অবস্থা

ব্যাঙ্কক নগরীতে অনুষ্ঠিত এশীয় নারী সম্মেলনে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শিশুদের জরুরী তহবিল (UNICEF : United Nations International Children's Emergency Fund)-এর পক্ষ হইতে একটি রচনা পাঠ করা হয়—তাহাতে এশিয়াতে নারী এবং শিশুদের অবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

উক্ত রচনাটি হইতে দেখা যায় যে, এশিয়ার কোন কোন দেশে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা হাজারকরা ৩৫০ হইতে ৪০০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। অর্থাৎ ঐ সকল দেশে জন্মের এক বৎসরের মধ্যেই নবজাত শিশুদের এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সংখ্যার মধ্যে মৃতজাত শিশুদের ধরা হয় নাই।

যদি এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিতে (চীন বাদে) সকল জন্মের জন্য ধাত্রীদের ব্যবহার করা হয় তবে প্রায় ২,২৫,০০০ শিক্ষিত ধাত্রীর প্রয়োজন হইবে। সেস্থলে বর্ত্তমানে রহিয়াছে মাত্র ৪০,০০০। আরও উল্লেখযোগ্য যে, এই ৪০,০০০ ধাত্রীর অধিকাংশই বর্ত্তমানে শহরাঞ্চলে কর্ম্মরত। কিন্তু সমগ্র জন্মসংখ্যার শতকরা ৮০.৮৫ ভাগই গ্রামাঞ্চলে। ফলে, এশিয়ার অধিকাংশ শিশুরই জন্ম হয় অশিক্ষিত ধাত্রীদের হাতে।

যদি প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য একটি করিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয় তবে এশিয়ার অঞ্চলের জন্য ৭৫ হাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রয়োজন হইবে। সেস্থলে বর্ত্তমানে অতি সাধারণ শ্রেণীর কেন্দ্র লইয়াও মোট আছে মাত্র ১৫,০০০ কেন্দ্র।

পাকিস্থানী রাজনীতির একরূপ

পাকিস্থানী রাজনীতির গোড়ার দিকে হিন্দু এবং ভারত-বিরোধিতাই সরকারী দলগুলির অন্যতম উপজীব্য ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই নীতি রাজনীতিক্ষেত্রে আর সেরূপ ফলপ্রসূ রহিল না। বিশেষতঃ মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানী, খাঁন আবদুল গফফর খাঁ প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ বিশেষ সাহস এবং নির্ভীকতার সহিত পাকিস্থানী রাজনীতিকে এই বদ্ধ জলার বাহিরে লইয়া আসেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে পাকিস্থানের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি, জনকল্যাণ এবং সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর ভূমিকা বিশেষভাবে তুলিয়া ধরেন। পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা তুলনা করিলে পাকিস্থানী রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবর্তনের রূপটি সহজেই ধরা পড়িবে।

কিন্তু ভারতের ন্যায় পাকিস্থানেও স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকদের ভূমিকা এখনও নিঃশেষ হয় নাই। ফলে, ভাসানী সাহেবের প্রচেষ্টায় পূর্ব্বপাকিস্থানে যে নূতন রাজনৈতিক ক্ষেত্র রচিত হইল এক চক্রান্তের মারফত সেখানেও স্বার্থান্বেষীরাই প্রাধান্য লাভ করিল। ভাসানীকেই তাহার দল ছাড়িয়া আসিতে হইল। কিন্তু বৃদ্ধ হইলেও মৌলানা ভাসানী ভীত নহেন। তিনি নবীন উদ্যমে একটি নূতন দলগঠনে প্রয়াসী হইলেন। এবার বঙ্গমঞ্চে পাকিস্থানী কর্ত্তৃপক্ষ একটি নূতন অস্ত্র আমদানী করিলেন—গুণ্ডা-বাজী। যখন ঢাকাতে মৌলানা ভাসানী, মিঞা ইফতিকারুদ্দীন, খান আবদুল গফফর খাঁ প্রভৃতি নূতন একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার জন্য মিলিত হইলেন তখন গুণ্ডাবাজী দ্বারা তাঁহা-দিগকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা হইল। বলা বাহুল্য সে চেষ্টা মোটেই সফল হয় নাই। মৌলানা ভাসানীর নূতন দলটির নাম "ন্যাশনাল আওয়ামী দল"। এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হইতে না হইতেই পাকিস্থানী রাজনীতিকদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভাসানী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্থানের রিপাবলিকান দল দুইটিকে মিলাইয়া একটি দল গঠন করিয়া ন্যাশনাল আওয়ামী দলকে প্রতিরোধ করা যায় কিনা ইতিমধ্যেই ক্ষমতালোভী পাকিস্থানী নেতৃবৃন্দ সে সম্পর্কে বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তবে পাকিস্থানের জনসাধারণের প্রকৃত স্বার্থের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় রাজনীতিকের এই সকল প্রচেষ্টাও পরিণামে ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

তবে পাকিস্থানী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুবিধাবাদী সঙ্কীর্ণ নীতির সুযোগ লইতেছে একদল সরকারী কর্ম্মচারী। এবিষয়ে সকলেই একমত যে, কোন দেশের রাজনৈতিক নীতি সম্পর্কিত ব্যাপারে সেই দেশের সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রত্যক্ষভাবে মাথা ঘামান উচিত নহে। সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত নীতি কার্য্যকরী করা। ইতিহাস হইতেও দেখা যায় যে, যে সকল রাষ্ট্রে সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে সেই রাষ্ট্র কখনই শক্তি এবং সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে পারে না। অপর পক্ষে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থায় চরম অবনতি না ঘটিলেও কোন দেশে সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেয় না। পাকিস্থানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অকর্ম্মণ্যতার সুযোগ লইয়া বর্ত্তমানে একদল সরকারী কর্ম্মচারী যে রাজনৈতিক ব্যাপারে নাক গলাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাতেই পাকিস্থানের বর্ত্তমান রাজনৈতিক দুর্ব্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়। ২৯শে শ্রাবণ এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "জনশক্তি" ঠিক এই বিষয়টি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

"আমাদের রাষ্ট্রতন্ত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে "জনশক্তি" লিখিতেছেন ঃ

"আমাদের দেশের আদর্শ কাণ্ডারীরা ইতিপূর্ব্বে বিশ্ববাসীকে কয়েক

বারই চমৎকৃত করিয়াছে। কেহ বা রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর গদী আঁকড়াইয়া থাকেন। দেশের লোকের সমর্থন তাঁহার পশ্চাতে আছে কি না তাহা যাচাই না করিয়াই কোন প্রধানমন্ত্রীকে রেল-ষ্টেশন হইতে ডাকাইয়া আনিয়া পদচ্যুত করা হয়, ইত্যাদি প্রকারের অনেক ঘটনাই ইতিপূর্ব্বে ঘটিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে সরকারী চাকুরিয়াগণ যে ভাবে প্রকাশ্যে বিবৃতি দান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, আমাদের পাকিস্থান এখন পুরাপুরী ভাবেই 'মজাতন্ত্র' আখ্যা লাভ করিতে পারে।

"দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশে-বিদেশে জোর গলায় প্রচার করিয়াছিলেন যে, ১৯৫৮ সনে মার্চ্চ মাসের মধ্যেই দেশের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। সম্প্রতি নির্ব্বাচনী কমিশনার সুস্পষ্ট ভাষায়ই বলিয়াছেন যে, ১৯৫৮ সনে মার্চ্চ মাসের মধ্যে সাধারণ নির্ব্বাচন কিছুতেই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। চেষ্টা করিলে ১৯৫৯ সনের মার্চ্চ মাসে নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে। প্রধানমন্ত্রী জোর গলায়ই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথার কখনও বরখেলাপ হয় নাই—বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুর নরম করিয়া বলিয়াছেন, ১৯৫৮ সনে নির্ব্বাচন হইবে। আরও কিছু দিন পরে এই কথাও শুনা যাইতে পারে যে, সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় ১৯৫৯ সনের মার্চ্চ মাসেই নির্ব্বাচন করা সাব্যস্ত হইল।

"পাকিস্থান শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রকাশ্য ভাবেই কেন্দ্রীয় অর্থসচিব জোনাব আমজদ আলীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলিয়াছেন যে, তিনি শিল্প-উন্নয়নের পথে প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন। শিল্প-উন্নয়নের নীতি নির্দ্ধারণ করিবার মালিক মন্ত্রী না সরকারী কর্ম্মচারী এই অবান্তর প্রশ্ন অন্য কোন গণতান্ত্রিক দেশেই উঠিত না—কিন্তু আমাদের 'মজাতন্ত্রে' সরকারী চাকুরিয়াগণ এই দাবিই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন যে, যেহেতু এদেশের মন্ত্রিগণ আজ আছেন কাল নাই সুতরাং নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে স্থায়ী কর্ম্মচারীদের অভিমতই প্রবল হওয়া উচিত।"

স্বাধীন মালয়

৩১শে আগষ্ট মালয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। মালয় আমাদের প্রতিবেশী এশীয় রাষ্ট্র, মালয়ের স্বাধীনতালাভে ভারতবাসীমাত্রই আনন্দিত হইবেন।

বিষুব রেখার নিকট অবস্থিত মালয়ের আয়তন ৫০,৬৯০ বর্গমাইল—প্রায় ইংলণ্ডের আয়তনের সমান। দেশের তিন-চতুর্থাংশ গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। ১৯৫৫ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল ৬,০৫৮,৩১৭—তন্মধ্যে ২,৯৬৭,২৩৩ জন মালয়; ২,২৮৩,৮৮৩ জন চীনা এবং ৭১৩,৮১০ জন ভারতীয় এবং পাকিস্থানী; ২০,১৯১ জন অন্যান্য জাতীয়।

এগারটি রাজ্য লইয়া মালয় ফেডারেশন গঠিত হইয়াছে। গত [illegible] আগষ্ট টুয়াঙ্কু আবদুর রহমান ইবনি অল-মরহুম টুয়াঙ্কু মুহম্মদ, ইয়াং ডি-পার্টুয়ান বেসার মালয় রাষ্ট্রের প্রধান (Head of State) নির্ব্বাচিত হ'ন। রাষ্ট্রের সহঃ প্রধানরূপে নির্ব্বাচিত হ'ন সুলতান স্যর হিসামুদ্দীন আলম শা' ইবানি অল-মরহুম সুলতান আলাইদিন সুলেমান শাহ। মালয়ের প্রধানমন্ত্রী হইলেন টুঙ্কু আবদুল রহমান। রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রীর নামের সাদৃশ্য থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কোন আত্মীয়তা নাই।

মালয়ের এক বৃহৎ জনসংখ্যা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ; কিন্তু রাষ্ট্রটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ থাকিবে।

ফেডারেশনের একটি পার্লামেণ্টের হাতে সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকিবে। পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ থাকিবে : সিনেট (দেওয়ান নেগারা) এবং প্রতিনিধিসভা (দেওয়ান রা'য়াত)। সিনেটের আটত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে বাইশজন নির্ব্বাচিত এবং ষোল জন রাষ্ট্রনেতা কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। প্রতিনিধিসভার এক শত জন (প্রথমবারে ১০৪ জন) সদস্য সকলেই নির্ব্বাচিত হইবেন। একুশ বৎসর এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক সকলেরই ভোটাধিকার থাকিবে।

মালয়ের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান। রবার এবং টিন মালয়ের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মালয়ে ব্রিটিশ নিয়োগের পরিমাণ বিপুল। মিশর বাদে সমগ্র উত্তর আফ্রিকাতে যত বিদেশী মূলধন নিয়োজিত রহিয়াছে এক মালয়েই তত পশ্চিমী মূলধন রহিয়াছে। মালয়ের জনসংখ্যার অধিকাংশ তরুণ : শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী লোকের বয়স একুশ বৎসর বয়সের কম। মালয়ে এক হাজার মাইল রেলপথ, পাঁচ হাজার মাইল পাকা রাস্তা এবং এক হাজার মাইল কাঁচা রাস্তা রহিয়াছে। তথায় মোট নয়টি বিমান ঘাটি এবং বাটটি বিমান অবতরণের ক্ষেত্র রহিয়াছে।

মালয় বহির্বাণিজ্যে বিশেষ শক্তিশালী—ব্রিটিশ কমনওয়েলথের কোন দেশই মালয়ের ন্যায় ডলার অর্জ্জন করিতে পারে না। কিন্তু মালয়ের গৃহযুদ্ধের ফলে মালয় সরকারকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। বস্তুতঃপক্ষে এই গৃহযুদ্ধের জন্য সরকারকে এখনও মোট রাজস্বের এক ষষ্ঠাংশ ব্যয় করিতে হয়। ব্রিটেন অবশ্য এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ আগামী পাঁচ বৎসরে দুই কোটি পাউণ্ড ষ্টার্লিং দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মালয়ের সামনে এখন দুইটি প্রধান সমস্যা : প্রথমতঃ গৃহযুদ্ধের অবসান এবং দ্বিতীয়তঃ মালয়বাসীদের নাগরিকত্ব দান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট নীতি নির্দ্ধারণ। মালয়ের মোট জনসংখ্যার সংখ্যালঘু অংশ মালয়। কিন্তু বর্ত্তমান আইন অনুযায়ী অমালয়ী মালয়বাসীদের নাগরিকত্ব লাভের পথে নানারূপ অসুবিধা রহিয়াছে। সেগুলি দূর না করিলে বিরাটসংখ্যক চীনা এবং অন্যান্য অমালয়ী মালয়বাসিগণ কখনই মালয়কে আপন রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে পারিবে না। তবে আশা করা যায় যে, মালয়ের বর্ত্তমান কোয়ালিশন দল এই সমস্যার সমাধানে ফলপ্রসূ উপায় উদ্ভাবনে সক্ষম হইবেন।

শঙ্করের ব্রহ্ম

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

৪

পূর্ব সংখ্যায় অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে যে, শঙ্কর নঞর্থক ভাবেই ব্রহ্মের প্রপঞ্চনা করেছেন। বস্তুতঃ, তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়া ব্যতীত ব্রহ্মকে আর অন্য কোন উপায়েই বর্ণনা করা যায় না। কারণ, প্রত্যেক সদর্থক বর্ণনাই সগুণ-সবিশেষ বস্তুবিষয়ক এবং পূর্বে যা বলা হয়েছে, তাতে ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন। সেজন্য নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয়, ভাষায় বর্ণনার বিষয় নয়—ভাষা স্বভাবতঃই নির্গুণ, নির্বিশেষ বস্তুকে বর্ণনা করতে অক্ষম। এই কারণেই শাস্ত্রাদিতে নির্গুণ, নির্বিশেষ, নিরুপাধিক পর-ব্রহ্মের যে সকল সদর্থক বর্ণনা আছে, এমন কি সে সকলও তাঁর প্রকৃত স্বরূপের দ্যোতক নয়। পূর্বে উদ্ধৃত বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথাত আদেশো নেতি নেতি" (২৩৬) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্কর এই সম্বন্ধে স্পষ্ট করে তাঁর ভাষ্যে বলছেন—

"ননু কথমাভ্যাং নেতি নেতীতি শব্দাভ্যাং সত্যস্য সত্যং নির্দিদিক্ষিতমিতি ? উচ্যতে—সর্বোপাধিবিশেষাপোহেন। যস্মিন্ন কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি, নাম বা রূপং বা কর্ম বা ভেদো বা জাতির্বা গুণো বা তদ্দ্বারেণ হি শব্দপ্রবৃত্তির্ভবতি। ন চৈষাং কশ্চিদ্বিশেষো ব্রহ্মণ্যস্তি। অতঃ ন নির্দেষ্টুং শক্যতে—'ইদং তৎ' ইতি 'গৌরসৌ স্পন্দতে শুক্লো বিষাণীতি' যথা লোকে নির্দিশ্যতে, তথা। অধ্যারোপিত-নামরূপ-কর্ম-দ্বারেণ ব্রহ্ম নির্দিশ্যতে—'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম', 'বিজ্ঞানঘন এব ব্রহ্মাত্মা' ইত্যেবমাদিশব্দৈঃ। যদা পুনঃ স্বরূপমেব নির্দিদিক্ষিতং ভবতি নিরস্তসর্বোপাধিবিশেষম্, তদা ন শক্যতে কেনচিদপি প্রকারেণ নির্দেষ্টুম্। তদায়মেবাভ্যুপায়ঃ, যদুত প্রাপ্তনির্দেশ-প্রতিষেধদ্বারেণ 'নেতি নেতি' ইতি নির্দেশঃ।" (শঙ্করের বৃহদারণ্যক ভাষ্য, ২।৩।৬)।

অর্থাৎ, যে সবিশেষ বস্তুর নাম, রূপ, কর্ম, ভেদ, জাতি বা গুণরূপ বিশেষ ধর্ম আছে, সেই সবিশেষ বস্তুকেই কেবল শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা যায়—এরূপে নামরূপাদি বিশেষ বিশেষ ধর্ম অবলম্বন করেই শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু ব্রহ্মে এই বিশেষ ধর্মের একটিও নেই। সেজন্য "শৃঙ্গযুক্ত, শুক্লবর্ণ এই গাভীটা গমন করছে" বলে যেমন গাভীবিশেষের নির্দেশ করা হয়ে থাকে, তেমনি "এই ব্রহ্মই সেই" বলে ব্রহ্মকে কদাপি নির্দিষ্ট করা যায় না। এই কারণে "ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ", "ব্রহ্মই বিজ্ঞানঘন আত্মা" ইত্যাদি—শব্দসমূহ ব্রহ্মে নাম, রূপ, কর্ম প্রভৃতি আরোপ করেই ব্রহ্মকে নির্দেশ করে থাকে। কিন্তু যখন ব্রহ্মের সর্বোপাধিবিহীন, নির্বিশেষস্বরূপ নির্দেশ করাই কারও অভিপ্রেত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন প্রকারেই তাঁকে নির্দেশ করা যায় না। তখন কেবল আরোপিত ধর্মসমূহের নিষেধ দ্বারাই, 'নেতি নেতি' বলে নির্দেশই তাঁর স্বরূপ-নির্দেশের একমাত্র উপায়।

এই কারণে, সর্ববেদান্তসম্মত ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ সদর্থক বর্ণনা, 'সচ্চিদানন্দ'ও প্রকৃতপক্ষে নঞর্থক। শঙ্করের মতে 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' ব্রহ্মের স্বরূপ, গুণ নয়। অর্থাৎ, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সত্তাবান, জ্ঞানবান বা জ্ঞাতা ও আনন্দময় নন। তিনি 'সৎ' অথবা আদিবিহীন, অন্তবিহীন, বিকার-বিহীন।

তিনি 'চিৎ' অথবা অজড়, শাশ্বতকাল অজ্ঞানমুক্ত, জ্ঞান-স্বরূপ, স্বঃপ্রকাশ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (২।১)। বৃহদারণ্যক উপনিষদও ব্রহ্মকে "বিজ্ঞানঘন" (২।৪।১২) বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ একটি সৈন্ধবখণ্ড যেরূপ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই লবণাক্ত, লবণ ব্যতীত ঐ সৈন্ধবখণ্ডটিতে যেরূপ অন্য কিছুই কণামাত্রও নেই, সেরূপ ব্রহ্মও ওতপ্রোতভাবেই বিজ্ঞানস্বরূপ। এই জ্ঞান তাঁর স্বরূপ, গুণ বা ধর্ম নয়।

এরূপে, ব্রহ্ম শুদ্ধ জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নন। জ্ঞাতৃত্বের একটি উদাহরণ গ্রহণ করা হোকঃ 'আমি এই ঘটকে জানছি'। এই প্রতীতিকালে 'আমি', 'জ্ঞাতা' এবং 'ঘটটি' 'জ্ঞেয়' বা জ্ঞাতব্য বস্তু। এস্থলে, প্রথমতঃ জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞাতার গুণবিশেষ। কিন্তু পূর্বেই যা বলা হয়েছে, নির্গুণ ব্রহ্মে গুণের অস্তিত্ব অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, জ্ঞাতৃত্ব ক্রিয়াবিশেষও, অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার কর্তারূপে জ্ঞাতা সক্রিয়। কিন্তু নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম কোনরূপ ক্রিয়ার কর্তা হতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, জ্ঞাতৃত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদসূচক। এস্থলে জ্ঞাতা জ্ঞেয়কে জানছে, সেজন্য তাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু নির্বিশেষ ব্রহ্মে ভেদের লেশমাত্রও অসম্ভব। সেজন্য, ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র বা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানরূপ গুণের আধার বা জ্ঞাতা নন।

ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এবং অন্যান্য ভাষ্যে, শঙ্কর ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপত্বের উল্লেখ করেছেন বারংবার। যেমন ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বৃহদারণ্যকোপনিষদের পূর্বোক্ত সুবিখ্যাত মন্ত্রটি (৪-৫-১৩) অবলম্বনে তিনি বলছেন—

আহ চ শ্রুতিশ্চৈতন্যমাত্রং বিলক্ষণ-রূপান্তররহিতং নির্বিশেষং ব্রহ্ম।...এতদুক্তং ভবতিনাস্যাত্মনোঽন্তর্বহির্বা চৈতন্যাদন্যদ্রূপমস্তি, চৈতন্যমেবতু নিরন্তরমস্য রূপম্। যথা, সৈন্ধবঘনস্যান্তর্বহিশ্চ লবণরস এব নিরন্তরো ভবতি, ন রসান্তর-স্তথৈবায়মপীতি।"

(ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ৩-২-১৬)

অর্থাৎ শ্রুতির মতে, ব্রহ্ম চৈতন্যমাত্র, তাঁর অন্য কোন ভিন্ন রূপ নেই, তিনি নির্বিশেষ। এরূপে, এই আত্মার অন্তর্বাহ্য নেই, চৈতন্যব্যতীত অপর কোন রূপ নেই, একমাত্র চৈতন্যই তাঁর শাশ্বত রূপ—যেমন, একটি লবণখণ্ডের অন্তরে বাহিরে একমাত্র লবণরসই শাশ্বতকাল আছে, অন্য কোন প্রকার রসই নয়।

পুনরায় ব্রহ্ম 'আনন্দ' বা আনন্দস্বরূপ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার দুঃখ-ক্লেশের অতীত। কেবল এইমাত্র বলা চলে যে, ব্রহ্মে জাগতিক দুঃখ-শোকের কণামাত্রও নেই, কিন্তু তাঁর আনন্দের প্রকৃত পরিমাপ করা ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে অসম্ভব। তৈত্তিরীয় উপনিষদের "ব্রহ্মানন্দ-বল্লী" নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে "সৈষা-নন্দস্য মীমাংসা ভবতি" এই ভাবে আরম্ভ করে ব্রহ্মের আনন্দের একটি পরিমাপ প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, বলা হয়েছে যে, একজন বেদজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্মা, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও বিত্তপূর্ণ পৃথিবীর অধীশ্বর যুবকের আনন্দ এক পূর্ণ-মাত্রা মানবীয় আনন্দ তার শতগুণ মনুষ্য-গন্ধর্বের এক পূর্ণ-মাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ দেব-গন্ধর্বের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ চিরলোকবাসী পিতৃগণের এক পূর্ণ-মাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ আজানজ দেবগণের এক পূর্ণ-মাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ কর্ম-দেবগণের এক পূর্ণ-মাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ দেবগণের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ ইন্দ্রের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ বৃহস্পতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ প্রজাপতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। তার শতগুণ ব্রহ্মের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। এরূপে, ব্রহ্মের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ মানবের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দের (১০০)১০ গুণ। বলা বাহুল্য, এই বর্ণনা ব্রহ্মের আনন্দের অসীমতা, গভীরতা ও দুর্জ্ঞেয়ত্বই কেবল নির্দেশ করেছে, প্রকৃত পরিমাণ নয়।

ব্রহ্মসূত্রের সুবিখ্যাত "আনন্দাধিকরণে" (১।১।১২-১৯) শঙ্কর তাঁর সাধারণ প্রণালী অনুসারে, এই আটটি সূত্রকে প্রথমে ব্যবহারিক এবং পরে পারমার্থিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কেবল সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বরকেই 'আনন্দময়' বলা যেতে পারে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরব্রহ্ম 'আনন্দময়' নন, 'আনন্দ' বা 'আনন্দস্বরূপ'—অর্থাৎ 'আনন্দ' ব্রহ্মের গুণ নয়, স্বরূপ।

এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকেই ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বর্ণনা করেছেন 'ভূমা' ও 'সুখ'রূপে। ছান্দোগ্যের সেই সুবিখ্যাত মন্ত্র হ'ল এই :

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং, ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" (ছান্দোগ্য ৭।২৩।১)

অর্থাৎ, যা ভূমা, তাই সুখ, অল্পে সুখ নেই। একমাত্র ভূমাই সুখ, একমাত্র ভূমাকেই বিশেষভাবে জানতে ইচ্ছা করবে।

"ভূমা" শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন—

"মহৎ নিরতিশয়ং বহ্বিতি পর্যায়ঃ।"

অর্থাৎ "ভূমা" বা পরব্রহ্ম মহৎ ও বহু, যাঁর অপেক্ষা অধিক আর কিছুই নেই।

এই ভূমাই হলেন অদ্বৈততত্ত্ব। ছান্দোগ্য বলছেন—

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা, অথ যত্রান্যং পশ্যত্যন্যচ্ছৃণোত্যন্যদ্বিজানাতি তদল্পং, যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ যদল্পং তন্মর্ত্যম্।"

(ছান্দোগ্য ৭।২৪।২)

অর্থাৎ, যাতে অন্য কিছু দর্শন করে না, অন্য কিছু শ্রবণ করে না, অন্য কিছু জানতে পারে না, তাই হ'ল 'ভূমা'। এবং যাতে অন্য কিছু দর্শন করে, অন্য কিছু শ্রবণ করে, অন্য কিছু জানতে পারে, তাই হ'ল 'অল্প'। যা 'ভূমা' কেবল তাই হ'ল অমৃত, যা 'অল্প' তা মর্ত বা মরণশীল।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন —

"তদা দ্বৈত-সংব্যবহার-বিলক্ষণো ভূমেত্যুক্তং ভবতি।"

অর্থাৎ, ভূমাতে দ্বৈতব্যবহার নেই—তিনি অদ্বিতীয়, একাত্মতত্ত্ব।

এরূপে, সেই পরমতত্ত্ব, পরমসত্য, পরমসত্তা, পরমবস্তু, পরমাত্মা, পরব্রহ্মকে বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে নানাভাবে বর্ণনা ও বন্দনা করা হয়েছে। কিন্তু শঙ্করের মতে, সমস্ত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে, যুক্তির কষ্টিপাথরে তা পরীক্ষা করে, এবং পরিশেষে স্বীয় সাক্ষাৎ উপলব্ধির দিব্যালোকে তা উদ্ভাসিত করে, তিনি যে পরম অদ্বৈততত্ত্ব প্রকাশিত করেছেন, সেটিই হ'ল পরম ব্রহ্মতত্ত্বের একমাত্র কথা।

প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই যা বলা হয়েছে, ব্রহ্মই সকলের আত্ম-স্বরূপ বলে, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষদৃষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও, অজ্ঞানকলুষিত জীব আত্মজ্ঞানহীন বলে, এই আত্মজ্ঞান, যার

অপর নাম ব্রহ্মজ্ঞান, হ'ল শাস্ত্রগম্য। সেজন্যই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে বলা হয়েছে "শাস্ত্র-যোনি"। (ব্রহ্মসূত্র ১-১-৩) অর্থাৎ একমাত্র শাস্ত্রের সাহায্যেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায়।

সুবিশাল ও সুনিগূঢ় শঙ্কর-বেদান্তের প্রথম ও প্রধান তত্ত্ব যে ব্রহ্মতত্ত্ব সেই সম্বন্ধেই অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হ'ল। শ্রুতির নির্দেশানুসারে ব্রহ্মকে মনের অগম্য ও বাক্যের অপ্রকাশ্য বলে গ্রহণ করলেও শঙ্কর তাঁর স্বভাবসুলভ যুক্তিগম্ভীর অথচ সরল-মধুর প্রণালীতে ব্রহ্মস্বরূপ যে ভাবে ব্যক্ত করেছেন, তা বিশ্বজনের মনোহরণ করবে শাশ্বতকাল।

পিণ্ডদান

শ্রীকালিদাস রায়

আনন্দরাম রায়,
তোমারে একটি প্রশ্ন করিতে মোর আজি সাধ যায়।
পিতামহস্য তুমি ছিলে পিতামহ
কহ দেখি দাদু কহ
ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে কেমনে বাঁচিলে তুমি
পাষাণ যখন হ'ল রাঢ়ী মাটি, শ্মশান বধ্যভূমি ?
আমি পঞ্চাশী মন্বন্তরে খেয়ে রেশনের চাল
বাঁচিয়া গেলাম, ছিল না রেশন তোমার কি হ'ল হাল ?
তুমি ত তখন বারো বছরের ছেলে
ভিক্ষা করিলে ? ভিক্ষা বা কোথা পেলে ?
বাপ-মা তোমার উপবাসী রয়ে কত দিন কত রাত,
যোগাইল তব মুখে দুই মুঠা ভাত।
ঘরেই তোমার সম্বল ছিল ? লুটে নেয়নিক লোকে ?
কি ভাবিতে তুমি পাড়াপড়শীর মরণ দেখিয়া চোখে ?
ক্ষুধিতে হয় ত স'পিয়া মুখের গ্রাস
নিজে সারাদিন করিয়াছ উপবাস।

দুধ খেতে তুমি পোষা রোগা গাভীটার ?
তৃণটি ছিল না, চাল টেনে খেয়ে দুধ শুকায় নি তার ?
ভাদরের রাতে ক্ষুধা মিটাইতে পাকা তাল বুঝি খেলে ?
তাল কুড়ানীর অভাব ছিল না তাই বা কোথায় পেলে ?

ক্ষুধার জ্বালায় মরিল কি তব মাতা ?
কয়দিন তুমি চিবালে গাছের পাতা ?

তেঁতুল গাছেও পাতাটি ছিল না, পাতা দিল কোন্ তরু ?
কেমনে তরিলে ছিয়াত্তরের মরু ?

মোর পিণ্ডের অতীত যদিও হয়েছ পিতৃলোকে,
আজিকে তোমার শোকে
নান্দীমুখের আসনে বসিয়া অশ্রু ঝরিছে চোখে।

অশ্রুমাখানো পিণ্ড তোমায় আগে দেব পিতামহ,
তব পৌত্রের পৌত্রের এই তণ্ডুল ক'টি লহ।
বড় ব্যথা তুমি পেয়েছ পিণ্ডাভাবে
তোমারি কৃপায় ধন্য হয়েছি এ কবি-জন্মলাভে।

শিশুশিক্ষার নব রূপায়ণ

শ্রীচারুশীলা বোলার

শিশুর প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য

বর্ত্তমানে গ্রেটব্রিটেনে শিশুর লালন-পালন ও শিক্ষা সম্বন্ধে একটা নক্সা এর পূর্ব্বেই (ফাল্গুন ১৩৬৩) দেবার চেষ্টা করেছি। শিশু-পালনের জ্ঞান প্রত্যেক দেশের যে কোনও পিতামাতার থাকা প্রয়োজন। শিশুচরিত্র পিতামাতাদত্ত শিক্ষার পরিচয় দেয়। বর্ত্তমান শিশুশিক্ষার যুগে শিশু ও পিতামাতার মধ্যে সম্পর্কের অর্থ সকলেই উপলব্ধি করেছেন এবং শিশুকে সুস্থ ও পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে উৎসাহিত করাও প্রত্যেকের কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিশুপালন সম্পর্কে পিতামাতার গুণাবলী জন্মাগত নয়—কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার ফল। শিশু কি চায় এবং এই পৃথিবীর আলোয় নূতন চোখ মেলে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সজাগ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে কত অসংখ্য রকমের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—সেইগুলিকে পূর্ণ সহানুভূতি দিয়ে সমাধান করার বাসনা, জ্ঞান ও ঐকান্তিক চেষ্টা প্রত্যেক পিতামাতার থাকা বাঞ্ছনীয়।

গত ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য দেশে শিশুর প্রতি বয়স্ক ব্যক্তির মনোভাবের বহুল পরিবর্ত্তন দেখা গেছে। শিশুকে যে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন আগেকার দিনে এ কথা শুনলে যে-কোনও পিতামাতা হাসতেন। সাধারণতঃ এই ধারণাই সকলের মনে ছিল যে, মা সন্তান প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুপালনের জ্ঞান লাভ করে—শিশু বেঁচে থাকবে পিতামাতা ও গৃহের জন্য। যদিও এ ধারণা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়েছে তবুও কোনও কোনও ক্ষেত্রে এখনও তা একেবারে ঘুচে যায় নি।

আমাদের দেশের মায়েদের অজ্ঞতার একটি প্রধান কারণ দেশাচার ও পুরাতন রীতি। তারই প্রভাবে অন্ধ হয়ে মায়েরা শিশুপালনে অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। বর্ত্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, বিশ্রাম, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আলোবাতাসের প্রয়োজন কত বেশী। শিশু অবস্থা থেকেই নিয়মে যদি খাওয়ানো যায় তা হলে পেটের অসুখ, রিকেটস ও অন্যান্য রোগ থেকে শিশুকে বাঁচানো যায়। ফলে সে শারীরিক সুস্থতা ও শক্তি লাভ করে ভবিষ্যতে সুস্থ সবল সুখী হয়ে সমাজে চলতে পারে।

গৃহ এমন একটি স্থান যেখানে শিশুর জীবনের প্রথম কয়েকটি বৎসর কেটে যায়। ক্রমবৃদ্ধির এই গোড়াতেই তার সু-অভ্যাস গঠনের প্রয়োজন, যার গঠন ও গুণ নির্ভর করছে পিতামাতার আদর্শ ও পরিচালনার উপর। শিশুকে কেন্দ্র করে গৃহপরিবেশ রচিত হবে—এর অর্থ এই নয় যে শিশুই হবে গৃহকর্ত্তা, যা খুশী তাই করবে। পিতামাতার দায়িত্ব থাকবে তাকে ঠিক ভাবে লালন পালন করে প্রকৃত মানুষ করে তোলা। পিতামাতার দায়িত্ব থাকবে তার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ দান করা। শিশু যদি পিতামাতার সহানুভূতি ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না রাখতে পারে তবে তার ভিতর কতগুলি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

ডাক্তার, উকিল, বৈজ্ঞানিক, কুমোর, কামার এরা নিজেদের পেশার জন্য উপযুক্ত শিক্ষা পায়, কিন্তু যে দুটি পেশা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, আমাদের দেশে সে দুটিকেই সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করে নীচে ফেলে রাখা হয়েছে। সে দুটি হচ্ছে শিক্ষক ও পিতা-মাতা। ফ্রোয়েবেল এবং অন্যান্য শিক্ষাবিদ্‌গণ বহুপূর্ব্বেই শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বলে গেছেন, শিশুদের শেখাবার বিষয়গুলিই শুধু তারা আয়ত্ত করবে না কিন্তু শিশুর প্রকৃত চাহিদা কি তা জানতে হবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বসাধারণে এ কথা মেনে নিয়েছে কিন্তু পিতামাতার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজও তেমন ভাবে আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি।

শিশুর মন ও অনুভূতির দিক দিয়ে কতগুলি চাহিদা আছে সেগুলির জন্য পরিচালন বুদ্ধির প্রয়োজন। কি ভাবে সেগুলি উত্তেজিত হয়, বৃদ্ধি পায় পিতামাতার তা জানা দরকার। শিশুর ভাষা সীমাবদ্ধ, নিজেকে প্রকাশ করতে সে অপারক। একমাত্র আমাদের জ্ঞান, সহানুভূতি ও অভিজ্ঞতাই সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তিনটি উপায়ে এই জ্ঞান লাভ হয়—বই পড়ে, অন্যের সঙ্গে আলোচনা করে এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ধারাবাহিক বিবরণী লিখে। আমাদের দেশে আবশ্যিক শিক্ষার এখনও চাপ নেই সুতরাং বেশীর ভাগ পিতামাতাই নিরক্ষর, বই পড়তে পারে না। তবে অন্যান্য উপায়ে তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে—যথা, চলচ্চিত্র, আলোচনা, উপদেশ ও পর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা ইত্যাদি। এই কারণেই পিতামাতার শিক্ষাকে পেশা বলা যেতে পারে। অট্টালিকা নির্ম্মাতাকে (architect) পুরো শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু মনুষ্যনির্ম্মাতার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা একবারও উপলব্ধি করি না—যাদের হাতে রয়েছে মানবচরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভার—যা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

বিনা কষ্টভোগে কোনও শিশু বেড়ে ওঠে না। সুতরাং শৈশবকালকে সুখপূর্ণ বলা চলে না। এই জন্য প্রত্যেক পিতা-মাতার বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের প্রয়োজন। শিশুকে বুঝতে হলে শৈশব অবস্থায় শিশুর বৃদ্ধির চাহিদা কি তা জানা দরকার সবচেয়ে আগে। জন্মমুহূর্ত্ত থেকেই শিশু সমাজের জীব। খাদ্য, তাপ,

নিদ্রা, দৈহিক যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ এই গুলিই তার মূল প্রয়োজন। শিশুর পুষ্টি-সাধনের জন্য মায়ের মনোযোগিতার একান্ত আবশ্যক। জন্মের সময়েই শিশুর কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এতদিন সে সংরক্ষিত জলীয় পদার্থের ভিতর ছিল—আলো নাই—আবহাওয়ার কোনও পরিবর্তন নাই—কিন্তু জন্মাবামাত্র চলচঞ্চল পৃথিবীর সব-কিছুর অনুকম্পন সে অনুভব করে, এমন কি শব্দেরও। জন্মের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা বলতে গেলে তার কিছুই নাই। জন্মটাই শিশুর জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। জন্মের এক মাস পর থেকেই শিশু তার মায়ের মনোযোগিতায় সাড়া দেয়। ঘুম থেকে জেগে উঠলেই সে খেলতে সুরু করে। তখন মা-ই হচ্ছে তার প্রধান ও প্রথম খেলার সাথী এবং এই সময়েই জ্ঞান লাভের প্রথম উদ্দীপনা জাগতে থাকে তার। ক্রমশঃ সে বড় হতে থাকে, জেগেও থাকে অনেকক্ষণ—সঙ্গলাভের চাহিদা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে। প্রথমে বৎসরে শারীরিক যত্নই যে কেবল প্রয়োজন এবং কথা বলতে শিখলে তার মনের বৃদ্ধি সুরু হয় এ কথা ভাবা একেবারেই ভুল। খুব ছোট্ট শিশুরও আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি এবং কল্পনা খুব প্রবল থাকে। সে প্রকাশ করতে পারে না বলেই এ গুলি তার ভিতর আরও প্রবল হয়ে ওঠে। জ্ঞানলাভ ও বিবেচনাশক্তি হয়ত হয় নি কিন্তু ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ভয়, ক্রোধ, ভাল-লাগা, বিতৃষ্ণা এ সবই প্রথম থেকে শিশুমনে জাগ্রত হয়।

শিশুর ক্রমবিকাশের গতিভঙ্গিগুলিই খেলার আকারে প্রকাশ পায়। দুই মাসের শিশুকে স্নান করবার সময় সে পা ছুড়তে থাকে, নয় মাসের শিশু নানারকম শব্দে কথা বলতে চেষ্টা করে, এক বৎসর বয়সে মেঝে থেকে কোনও জিনিষ তুলে খুশী হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। আরও ভাল করে পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাব এই যে, আনন্দপূর্ণ গতিভঙ্গিগুলির দিনে দিনে কত পরিবর্তন হচ্ছে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শিশুমন বাড়তে থাকে। খেলার ভিতর দিয়েই শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতালাভ সুরু হয়। খেলনা ফেলছে আর বার বার তুলছে, বাটির উপর চামচ ঠুকছে জোরে, শব্দ শুনে আনন্দে নেচে উঠছে। মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ বার করাটাও তার খেলা। এই খেলার ভিতর দিয়েই সমাজের সঙ্গে তার প্রথম যোগাযোগ স্থাপন হয়। সে জানে কাঁদলে তার মা ছুটে আসবে, হাসলে মায়ের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। রাগের স্বর, দুঃখের স্বর, আনন্দের স্বর এর প্রকার ভেদ সে বুঝেছে, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য বিভিন্ন শব্দ সে জেনেছে। এইখানেই তার ভাষা শুরু। এক বৎসরের শেষেই তার পারিপার্শ্বিক যা কিছু—খেলনা, মানুষ, জায়গা এসব চিনতে শিখেছে—এখান থেকেই সুরু হ'ল তার কৌতূহল।

যতখানি সম্ভব শিশু অবস্থা থেকেই তাকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। স্বাভাবিক শিশুর কৌতূহল থেকেই তার বুদ্ধি বিকাশ পায়। সে আবিষ্কার করবে, অনুসন্ধান করবে—সুতরাং আকর্ষণীয় কিছু করতে দিবেন কমেই তার কৌতূহল কমে যাবে। শিশু যত বেশী বুদ্ধিমান তার তত বেশী কৌতূহল—সমস্যার সম্মুখীনও সে তত বেশী। জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার খাপখাওয়ানো প্রত্যেক স্বাভাবিক শিশুর কর্ত্তব্য। একটি সুস্থ সুখী শিশু সর্ব্বদাই জানতে চায় তার চারিপাশে কি আছে। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ ও শিক্ষাবিদ সুসান আইস্যাক্স বলেন, "কোনও নূতন সত্যতা অনুসন্ধানে একটি সুস্থ কর্ম্মঠ শিশুর প্রবল আকাঙ্ক্ষা একজন পরীক্ষালব্ধ বৈজ্ঞানিকের থেকে কিছু কম নয়।"

জন্মের পর থেকেই শিশু তার আবিষ্কারের পথে চলতে সুরু করে এবং সারাজীবনই এই ভাবে কেটে যায়। জীবনের প্রথম দুটি বৎসর শিশু বহু নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে এবং সবচেয়ে বেশী উন্নতির পথে এগিয়ে যায় এই সময়টিতেই। দুই বৎসরের শিশু দৌড়তে পারে, চড়তে পারে, নিজে খেতে পারে ও সবরকম খেলনা নিয়ে খেলতে পারে। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হওয়ার আগে পর্য্যন্ত শিশু একটি নূতন জগত আবিষ্কারের কাজে লিপ্ত থাকে এবং সেই জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কতখানি তা বুঝতে চেষ্টা করে। হাত, পা ও চোখের সাহায্যে তার আবিষ্কারের কাজ সুরু হয়। ক্রম-বিকাশের জন্য এইগুলি খুবই প্রয়োজন। পিতামাতার কর্ত্তব্য হচ্ছে বাধাবর্জ্জিত এমন একটি পরিবেশ রচনা করা যার ভিতর শিশু নিজেই শিক্ষালাভ করতে পারে—যে পরিবেশের ভিতর তার সুস্থ কৌতূহলের পরিতৃপ্তি, কল্পনা শক্তির বিকাশ, আত্মনির্ভরতা ও সৎসাহস বর্দ্ধিত হওয়ার সুযোগ ঘটবে; যে পরিবেশের ভিতর দিয়ে সে সহযোগিতা এবং সমাজের কাছে তার সত্য দাবী জানাতে পারবে।

(ক) এক বছরের শিশু হাতে যা পায় বার বার তা ছুড়ে ফেলে—মা বার বার কুড়িয়ে দেন—অবশেষে "আঃ বড় জ্বালাতন করে—আর দেব না" বলে ক্ষান্ত হন। কিন্তু সে কি মিছিমিছি এ কাজ বার বার করছে? না, ক্রমবিকাশের জন্য এর প্রয়োজন আছে। এটা সত্যই কি তার দুষ্টামি? (খ) চার বছরের শিশু বাগানে খেলতে গিয়ে হাতে পায়ে ধূলা মাখে, বেড়ায় চড়ে জামা কাপড় ছেঁড়ে—এতে পিতামাতা বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেন। এটা কি তার বিকৃতি বা অসাবধানতা? না, শরীরের ভারসাম্য এবং দক্ষতা লাভের জন্য ক্রমবৃদ্ধির আবেগ। (গ) কৌতূহলী হয়ে যখন প্রশ্ন করে আমরা এড়িয়ে যাই—কখনও বা মিথ্যে দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করি। এখানে আমাদের কর্ত্তব্য কি? (ঘ) দুই বৎসরের শিশু চায় নিজ হাতে খেতে। ছড়িয়ে ফেলে দেরী করে খাবে বলে মা খাইয়ে দিতে জোর করেন। এতে সে বাধা দেয়, রাগ করে—মায়ের হাতে খেতে চায় না। এটাও কি তার দুষ্টামী? এ ক্ষেত্রে মা কি করবেন? জোর করে খাইয়ে দেবেন? (ঙ) নোংরা পায়ে বিছানায় নাচানাচি, (চ) জল নষ্ট করা, (ছ) ছোট বোনকে চিমটি কাটা, (জ) খাওয়ার সময় খেতে না চাওয়া, (ঝ) চুরি করে খাওয়া—এগুলি শিশুদের করতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ কি পিতামাতা ভেবে নিতে

পারবেন, যে, এই সমস্তাগুলির সমাধানের উপায় কি? এটাও একটা সুনির্দিষ্ট ভাবে জানবার বিষয়। যা না জেনে, পিতামাতারা নিত্যই শিশু-সমস্যা সমাধানের পন্থায় না গিয়ে, শিশুকে নিজেদের সুবিধার জন্য, সংযত করে রাখার কঠোর, অস্বাভাবিক এবং সুলভ পন্থা অবলম্বন করেন।

দৈনিক সমস্যাগুলির সংশোধনের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নাই —কারণ পিতামাতা, শিশু এবং অবস্থার প্রকার ভেদ আছে। তবে মূলনীতি কতগুলি জানা এবং বোঝা প্রয়োজন যেগুলি এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। একজনের জন্য যে উপদেশ-কার্য্যকরী হবে, অন্যজনের জন্য হয়ত তা উপযুক্ত নয়। প্রত্যেক পিতামাতার উচিত আমাদের দেশে সাধারণত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীর কার্য্যকারিতা বিচার করে এবং আবশ্যক হলে তাকে ত্যাগ করে প্রত্যেক শিশুর নিজ অবস্থার প্রত্যক্ষ কাজগুলির কার্য্যকারণ আবিষ্কার করা—সঙ্গে সঙ্গে বোঝা দরকার—তাদের ক্রমবিকাশের জন্য কি উপায় অবলম্বন করতে হবে। সবচেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে শিশুকে বোঝাবার চেষ্টা করা। শিশুর যা সমস্যা তা ক্রমবিকাশ ঘটিত সমস্যা। এই কথা মনে রেখে শিশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে।

সাধারণতঃ পিতামাতা শিশুর প্রতি শাসনের প্রতীক্ 'না' শব্দটি বেশী প্রয়োগ করেন—করোনা, যেওনা, বলোনা, খেয়োনা, ইত্যাদি। এই সারাদিনের 'না' বলাগুলি হিসাব করলে দেখতে পাব যে, কতখানি শাসনের বেড়ায় ঘিরে শিশুর বুদ্ধিপ্রবণতাকে আমরা 'বামন' করে রেখে দেই। এই ভাবে 'না' এর হাতুড়ী পিটে পিটে হয় তাকে চির-অপরিণত, পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়, না হয়, 'না' শুনতে শুনতে শিশু এত অভ্যস্ত হয় যে, পরে আর ভ্রূক্ষেপই করে না অথবা একেবারে অবাধ্য এবং বিদ্রোহ হয়ে ওঠে। আবার এও দেখা যায় যে, তিক্তবিরক্ত পিতামাতা শিশুর উপর হুঙ্কার ছেড়ে তাকে হুকুম জানাতে চেষ্টা করেন। কারণ প্রায় দেখা যায় কিছু বললে শিশু মোটেই সেদিকে 'খেয়াল' দিচ্ছে না। এর কারণ অনেক সময়েই সে তার কল্পনার জগতে ডুবে থাকে—কখনও সে শিকার করছে, কখনও পরীর দেশে গেছে, কখনও শেয়াল হয়ে খরগোস ধরছে, কখনও ডাক্তার হয়ে রোগী দেখছে, কখনও বা রেল গাড়ী হয়ে ছুটে চলেছে।

সুস্থ শিশু সদাই চঞ্চল—চুপ করে বসে থাকা তার স্বভাব-বিরুদ্ধ। তার শরীর ও মন সর্ব্বদাই যদি ক্রীড়ারত না থাকে, তবে শীঘ্রই সে ঝিমিয়ে পড়ে অথবা কোনও কুকাজে মন দেয়। বাইরে বেরলেই সে লাফাবে, দৌড়বে। একটা জিনিষের ওপর মনোনিবেশ করা তার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। সেই জন্য খেলা ও লেখাপড়ার ভিতর থাকবে নূতনত্ব ও বৈচিত্র।

আমরা নিজেদের জিনিষ সম্বন্ধে যে বিশেষ সতর্ক শিশু সেটা বোঝে এবং এ বিষয়ে মনঃক্ষুণ্ণ হয়। শিশুর মনে এই নালিশ প্রায়ই তাকে কষ্ট দেয় যে "বাবার টেবিল থেকে একটা কাগজ নিলেই বকে, মায়ের সেলাইয়ের কলে হাত দিলেই মার খাই কিন্তু 'ভাই' যে আমার পুতুলের মাথাটা দাঁত দিয়ে চিবোলো, আমার বেলুনটা ফাটিয়ে দিল তার বেলায় ত কেউ কিছু বলল না।" আমরা ভুলে যাই ছোট শিশুর সম্পত্তিটা ছোট হলেও তার কাছে কত মহামূল্য।

আমরা নিজেদের স্বভাবগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে শিশু-মনের বিচার করি। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে কোনও কাজ করলেই তার বিধি-ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হই। নিজের স্বার্থের জন্য বা ক্রুদ্ধ মেজাজের জন্য তার কাজে আমরা বিরক্ত হই। একবারও ভেবে দেখি না কেন সে একাজ করছে। এই অজ্ঞতার জন্যই আমরা তার প্রতি অবিচার করি, তার এত ক্ষতি করি। শিশু চায় পিতামাতার সহানুভূতি, স্নেহানুরাগ, নিরাপদ নিশ্চিত আশ্রয়; চায়, পিতামাতা সহানুভূতিপূর্ণ বুদ্ধি ব্যবহার করবেন, ধৈর্য্য রাখবেন।

পিতা কখনও কখনও ভাবেন মা'ই শিশুর মন জুড়ে আছে। এটা কোনও কোনও ক্ষেত্রে আংশিক সত্য। আমাদের দেশে বেশীর ভাগ পিতাই, যে কোনও কারণেই হোক, সন্তানের ওপর মনোযোগ দিতে পারেন না—কিন্তু নিজ সন্তানকে জানতে হ'লে সময় দিতে হবে, কষ্ট করতে হবে। শিশুর কাছে পিতা বীরপুরুষের আদর্শ। পরিণত বয়সে এখনও বহু লোক মনে করতেই আনন্দ পায় যে, শিশুকালে বাবার হাত ধরে কত জায়গায় ঘুরেছে, কত অদ্ভুত ঘটনা শুনেছে। ছোট শিশুদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—'আমার বাবা বাঘ মারতে পারে, আমার বাবা বন্দুক দিয়ে শিয়াল মেরেছে, আমার বাবার গায়ে খুব জোর,' ইত্যাদি।

মা সম্বন্ধে শিশুর ধারণা কি? বীর নারী? না। আদর্শ সেবিকা বা ধাত্রী বা আরামদাত্রী। সারারাত জেগে সকালে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে গেলেও শিশু চাইবে মা যেন তাকে ঠিক সময়ে খেতে দেন হাসিমুখে। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরেও সন্ধ্যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও শিশুর কি আসে যায়! সে চাইবে তার বিছানার পাশে বসে গায়ে হাত বুলিয়ে রূপকথার গল্প শুনিয়ে মা তাকে ঘুম পাড়াবেন। জন্মের পর শিশু—মাকেই সব প্রথম সাথী হিসেবে পায়—কয়েক সপ্তাহ সে মা ছাড়া জগতের আর কিছুই বোঝে না। খাওয়ানো, নাওয়ানো, ঘুম-পাড়ানো এ সব মা'ই করেছেন—কাঁদলে আদর করে চুপ করিয়েছেন। মা ছাড়া আর কাউকে সে ভাবতে পারে নি। কিছুক্ষণ সময়ের জন্য ছেড়ে গেলে সে একা বোধ করেছে—ভয় পেয়েছে। তা হলে শিশুর কাছে মায়ের মূল্য নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে। শিশু নিরাপত্তার অভাব বোধ করে, ভয় পায় কারণ সে ক্ষুদ্র ও অসহায়। তার চারপাশের সবকিছু বৃহৎ ও অদ্ভুত। মায়ের আশ্রয় যদি সে না পেত শিশুর বেঁচে থাকা অর্থহীন হ'ত। মায়ের কর্তব্য এই ঐকান্তিক নির্ভরশীলতা থেকে শিশুকে ধীরে ধীরে আত্মনির্ভরশীল হতে শেখান—এতে শিশুরই মঙ্গল।"

সাধারণতঃ মা শিশুর দৈনিক শিক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকেন।

প্রায়ই দেখা যায় শিশু যা করতে চায় না তাই তাকে দিয়ে জোর করে করান হয়। সেই জন্যই সময় সময় শিশু মায়ের প্রতি বিদ্রোহ করে। সে ভাবে মা বুঝি খারাপ, নিষ্ঠুর। কিন্তু শিশু সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করাও ভুল। মা যদি তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিব্রত হন কিম্বা মুষড়ে পড়েন তখনই শিশু সেটা বুঝতে পারে। সেও বিব্রত হয়ে ওঠে। কারণ মায়ের ওপর সে সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার শিশুপালন সম্বন্ধে—পিতামাতার যদি মতভেদ থাকে শিশু যেন তা জানতে না পারে। মতের অমিল, ঝগড়াঝাটি এগুলি শিশুর সামনে হওয়া উচিত নয়। শিশু যাদের ভালবাসে তাদের এই সব ব্যপারে সে বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়ে।

মানবশিশুর স্বরূপ. প্রাথমিক পর্যায়ে বহুলাংশে পশুশিশুর মত। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা দূষণীয় সে অনেক সময় বোঝে, কিন্তু বিচার করতে পারে না। সুতরাং ভাল কাজের জন্য মা-বাবার প্রসন্নতা রূপ পুরস্কার ও খারাপ কাজের জন্য তাঁদের অপ্রসন্ন মুখ এই দিয়েই তাদের ভালমন্দ বোঝানো যায়। শিশুপালনের সময় ভাল আচরণের জন্য শিশুকে প্রসন্ন অনুমোদন (ঠিক বাহবা নয়)—দেখিয়ে পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। কিন্তু বেশী দূর যাওয়া উচিত নয়; তাতে তার এই ধারণা হবে প্রতিটি কাজেই বুঝি সে বাহবা পাবে। শিশুকে ন্যায় আচরণ শিক্ষা দিতে হলে পিতা-মাতার সহজ এবং শান্ত ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া দরকার। কোনও সময়ে কঠিন শাস্তি, কোনও সময়ে হাসি-তামাসায় উড়িয়ে দেওয়া—এতে সে কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় এবিষয়ে সঠিক বুঝতে পারবে না। অর্থহীন ভয় দেখানো শিশুর পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। অনেক পিতামাতা বলে থাকেন, "মেরে খুন করব; ছোট বোনকে যদি মেরেছো মাথা ভেঙ্গে দেবো" ইত্যাদি। প্রথম প্রথম শিশু একটা ভয়ঙ্কর ভবিষ্যৎ ভেবে ভয়ে আর সে কাজ করবে না; কিন্তু কিছুদিন পর সে উপলব্ধি করবে যা বলা হয় তা কাজে পরিণত করা হয় না—সুতরাং অন্যায় আচরণে আবার সে প্রবৃত্ত হবে। ভয় দেখিয়ে শিশুমন কখনও জয় করা যায় না। সবচেয়ে ভাল, সহানুভূতিপূর্ণ সন্দেহবন্ধভাবে শিশুর মেজাজ বুঝে চলা। অভিমানী ভীরু শিশুকে ধমকানো বা শাস্তি দেওয়া তার চিরজীবনের অনিষ্টের কারণ হতে পারে। স্নেহ, ভালবাসা ও প্রসন্ন মেজাজ এই দুটি জিনিষ সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তেও পিতামাকে জয়ী হতে সাহায্য করে।

শিশুর স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি সম্বন্ধে পিতামাতার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বয়সের তুলনায় খুব বেশী শিশুর কাছে আশা করা উচিত নয়। একটি তিন বৎসরের শিশুর ভিতর নষ্ট করার প্রবৃত্তি জাগা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, প্রথমতঃ সৃষ্টি বা গঠন শক্তি তার ভিতর এখনও পুষ্ট হয় নি। অথবা ভাঙাই গড়ার অন্যতম দিক। দ্বিতীয়তঃ, জিনিষের মূল্য উপলব্ধি করার মত বয়স তার হয় নি। তৃতীয়তঃ, যে জিনিষগুলির প্রতি সে আকৃষ্ট হয় অপরিণত কর্ম-শক্তি নিয়ে সেগুলিকে সে নাড়াচাড়া করতে পারে। সুতরাং এই বয়সে বিভিন্ন প্রকারের উপযুক্ত খেলনার প্রয়োজন। কিন্তু পাঁচ বৎসরের শিশুর ভিতর যদি নষ্ট করার আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তবে অবশ্যই তার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একই রকমের শিক্ষা ও যত্ন সত্ত্বেও একটি শিশু শান্ত, অন্যটি মেজাজী; একটি খেতে চায় না, অন্যটি চুরি করে খায়—কেন? কোন শিশু মিথ্যা কথা বলে, কেউ বা ভীত সঙ্কুচিত, কেউ বা ডানপিটে; কারও কারও ভিতর নষ্ট করার প্রবৃত্তি থাকে, কেউ বা রক্ষণশীল। শিশুর এই ধরনের কতকগুলি দৈনিক সমস্যা পিতামাতার উদ্বেগের কারণ ঘটায়। এগুলির শারীরিক, পরিবেশিক, মানসিক গঠন; হেরিডিটি প্রভৃতি নানা জটিল কারণ থাকে। বয়স্ক ব্যক্তির অসাবধানতা প্রভৃতি বিচিত্র কারণেও নানা সমস্যা দেখা দেয়। অনবরত শাস্তির ব্যবস্থা দিয়ে এর প্রতিকার হয় না, বরং শিশুমনে ভয় বা বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মেজাজ অনুযায়ী তা বিভিন্নরূপে প্রকাশ পায়। এর থেকেই পরে মিথ্যে কথা, ঠকানো, চুরি করা প্রভৃতি নানা সমস্যা কি স্বাভাবিক (normal child) শিশুর ভিতর, কি সমস্যাপূর্ণ (problem child) শিশুর ভিতর, কি কর্তব্যবিমুখ (delinquent child) শিশুর ভিতর দেখা দেয়। এই জন্যই বিশেষ করে শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে পিতামাতার বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক।

কতকগুলি নীতি পালন করলে সমস্যা সমাধান কতকটা করা যেতে পারে। বাঞ্ছনীয় জিনিষের প্রতি শিশুর মনটাকে প্রত্যক্ষ-ভাবে আকর্ষণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় শিশু যখন খেলায় মত্ত মা তখন হয়তো তাকে কোনও কাজ করতে বললেন। শিশু 'করছি' বলে আর কোনও সাড়া দেয় না। দু'তিন বার বলে মা রাগ করে বকে ওঠেন। তখন শিশু খেলা ফেলে ভয়ে উঠে পড়ে। শিশুর সম্পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করে তার পর শিশুকে কিছু করতে নির্দেশ দেওয়া উচিত। অনর্থক শিশুর কাজে বাধা সৃষ্টি করাও উচিত নয়। সে যখন সমস্ত মন ঢেলে কোনও কাজে বা খেলায় লিপ্ত তখন থাকে আচমকা তার জগৎ থেকে ছিনিয়ে এনে অন্য কিছু করতে বলাটা শুধু নিষ্ঠুরতা নয় অনিষ্টকরও বটে। খেতে যাবার আগে বা নাইতে যাবার আগে বা বিশেষ কোনও কাজ করাবার আগে সময় দিয়ে, শিশুকে সে বিষয়ে অবহিত করতে হবে। মেয়ে পুতুল খেলায় মত্ত, খাওয়ার সময় হয়েছে এখন তার ওঠা দরকার। মা বললেন, 'বুলু তোমার ছেলেমেয়েরা ততক্ষণ ঘুমোক; সেই ফাঁকে তুমি চারটি খেয়ে নাও।" বুলু বুঝবে এবার তার খাওয়ার সময় হয়েছে—তখনই ছুটে যাবে।

আদেশ অপেক্ষা বুঝিয়ে বলার মূল্য অনেক বেশী। সারা উঠোনে কাগজের টুকরো ছড়ানো। শিশু অসন্তোষ প্রকাশ করবে তখনই যখন তাকে আদেশের সুরে বলা হবে, "এ কি! যাও, কাগজগুলি তাড়াতাড়ি তুলে ফেল।" কিন্তু "বুলু কেমন সুন্দর উঠোনটা পরিষ্কার করতে পারে"—এ কথার মূল্য অনেক—তার মনে আগ্রহ জাগবে কাজটি করবার জন্য। ছুটে গিয়ে সাধ্যমত কাজটি সে সমাধা করবে। মায়ের মুখে প্রশংসা শুনলে আরও

উৎসাহিত হবে। দোষের জন্ত দোষারোপ না করে ভাল কাজের জন্ত মা-বাবা যদি খুশী হন, তা হলেই শিশু ভাল কাজে উৎসাহ পায়।

কাজে খুঁৎ ধরার অভ্যাস, শিশু বা বয়স্ক কেউই বেশীদিন বরদস্ত করতে পারে না। কাজেই ক্রমে তারা বিরূপ এবং অবশেষে অবাধ্য বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং অভিভাবকের উদ্দেশ্য (অর্থাৎ তাকে ঠিক পথে চালানো) বিফল হয়। অন্যপক্ষে কেবল প্রশংসার ঘুষ দিয়ে দিয়ে তাকে সৎকাজে প্রবৃত্ত করবার অভ্যাস করলে উত্তরকালে সে সর্ব্বকাজেই প্রশংসা ভিক্ষু হয়ে উঠে এবং অন্তরের প্রেরণায় সৎকাজ করবার প্রবৃত্তি তার নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বড় হয়ে সে যখনই যে কাজ করবে তখনই সে সকলের প্রশংসা (appreciation) পাবার অপেক্ষায় চারিদিকে চাইবে এবং প্রশংসা না পেলে তার আশা ভঙ্গ হবে, মন ক্ষুণ্ণ হবে, কাজ করবার উৎসাহ নষ্ট হবে, এবং জগতের struggle for existence-এ যাতে প্রবেশ করে জয়ী হওয়ার উপযুক্ত শিক্ষা তার পাওয়া দরকার—সে হটে যাবে। সুতরাং খুঁৎ ধরার চিমটিকাটা বা প্রশংসার মিঠাই দুটোকেই বর্জ্জন করা আবশ্যক কেননা প্রত্যক্ষ দৃষ্টে আপাতফলপ্রদ মনে হলেও দুটোই শিশুর চরিত্র নষ্ট করে। তার চেয়ে, শিশুর জ্ঞানবুদ্ধির ক্রমবর্দ্ধমান পরিণতির পথে তার সঙ্গে, দোষ প্রদর্শন বা প্রশংসা বর্জ্জন করে অকৃত্রিম প্রসন্ন সদয় ব্যবহার করলে এবং বন্ধুভাবে, যুক্তির পথে তার যথার্থ বাস্তব জ্ঞানটিকে জাগাবার চেষ্টা করলে শিশুর মধ্যে যে মর্য্যাদা এবং দায়িত্ববোধ জাগবে, উত্তরকালে তাতেই তাকে প্রতিষ্ঠা দান করবে। খুঁৎ ধরা বা নিন্দার দ্বারা যে গ্লানি শিশুর মধ্যে জমতে থাকে পরজীবনে তাতে সে সমাজ ব্যবহারে তীব্র ও তিক্ত হয়ে ওঠে এবং প্রশংসার দ্বারা যে উদ্দীপনা তার মধ্যে জাগানো হয় ভবিষ্যত জীবনে সেই উদ্দীপনার অভাবে সে নিস্তেজ, অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী ও আত্মমর্য্যাহীন হয়ে পড়ে।

শিশু যেন নিশ্চিত বুঝতে পারে তার কাছ থেকে মা বাবা কি আশা করেন। সর্ব্বদা মনে রাখা চাই যে, শিশু একান্ত নির্ভরশীল—সুতরাং সে বাধ্য। আগে থেকে যদি ভেবে নিই সে অবাধ্য হবে এবং তা কথায় বা ভাবে প্রকাশ করি তবে শিশু অবাধ্য হবে এবং আরও সমস্যা সৃষ্টি করবে। সর্ব্বদা তাকে বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মর্য্যাদা দিয়ে তার বোধগম্য করে যুক্তিপূর্ণ কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কেন তার কাছ থেকে এই রকম ব্যবহার আশা করা হচ্ছে।

শিশুকে কিছু করতে বলা খুব সহজ কিন্তু করার যে ইচ্ছা, আগ্রহ সেটা জাগিয়ে তুলব কি করে? অন্যের কর্তৃত্বে তার আপত্তি নেই যদি সেটা যুক্তিসঙ্গত ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঠিক পথে চালিত হয়। 'ঠিক' কোনটা এটা তার জানা চাই, এবং সেই 'ঠিক কাজটি' সে করতে অনুপ্রাণিত হবে কারণ, কারণগুলি সে জেনে নিয়েছে। কাজটি সে শ্রদ্ধার চোখেও দেখবে এবং করতে পারায় আনন্দে সে খুশী হবে।

শিশুর পছন্দ-অপছন্দ পিতামাতা থেকে ভিন্ন—অনেক সময় শিশুর ইচ্ছার সঙ্গে পিতামাতার ইচ্ছার একটা সংঘর্ষ হয়। এক দিক থেকে এটাকে ভাল মনে হয়। যে শিশুর নিজস্ব কোনও ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা নেই, অন্যের কথায় উঠছে বসছে সে ভবিষ্যতে দুর্ব্বলচিত্ত এবং অন্যের বশীভূত হয়ে পড়ে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শিশু বয়স্ক ব্যক্তির স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত না হয়ে যদি ঠিক পথে চালিত হয়, আমরা যদি তাকে ঠিক ভাবে বুঝতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে স্বায়ত্তশাসনে সে সৎপথে গঠনমূলক শৃঙ্খলার ভিতর দিয়ে উপযুক্ত স্থানে নিজেকে স্থাপন করবে। শিশু যা শোনে, যা দেখে, যে রকম ব্যবহার পায় তারই ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব ব্যক্তিত্বের নক্সা সে তৈরি করে।

বয়সোপযোগী কাজ বেছে নেবার স্বাধীনতা শিশুর থাকা প্রয়োজন। "শিশু সম্পর্কে মা সব জানতা" এই আদিম মনোভাব ভুলতে হবে। তাই বলে শিশুকে যথেচ্ছাচারী হবারও সুযোগ দেওয়া হবে না। মায়ের বুদ্ধিবিচারসম্পন্ন নির্দেশ ও পরিচালনা থাকবে। অনেক সময় পিতামাতা শিশুর কাছে খুব বেশী আশা করেন। সহযোগিতা, ভদ্রতা, জিনিষের প্রতি যত্ন ও শ্রদ্ধা, আত্ম-সংযম এগুলি শিশুর কাছে শব্দমাত্র। অথচ শিশুর খেলার জিনিষগুলি আবর্জ্জনা বলে মা যদি ছুড়ে ফেলে দেন, কি করে তিনি আশা যে করেন সে তার জিনিষের প্রতি যত্ন নেবে? শিশুর সঙ্গে রুক্ষভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যদি পিতামাতা কথা বলেন, কি করে তাঁরা আশা করেন—অন্যের সঙ্গে শিশু ভদ্রভাবে কথা বলবে? মা কিছু চাইলে বাবা যদি ধমক দেন বা অযথা রাগ করেন কি করে তাঁরা আশা করেন যে, সেই শিশু মাকে মানবে?

পিতামাতা অথবা শিশুর রক্ষাকর্ত্তার (যিনি লালনপালনের ভার নিয়েছেন) সঙ্গে শিশুর আন্তরিকতাপূর্ণ, ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধু-সম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে শিশুর মানসিক সুস্থতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টির একটি কারণ পিতামাতার সস্নেহ মনোযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া। অনাথ অথবা জারজ শিশুদের পরীক্ষা করে শিশু বিশেষজ্ঞদের ভিতর কেউ কেউ বলেন, এই রকম শিশুদের শারীরিক, মানসিক, আনুভূতিক, বুদ্ধিগত ও সামাজিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কোনও কোনও শিশু জীবনের মত সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গ্রেটব্রিটেনে দেখেছি এই সব বিকৃতির চিকিৎসার জন্য শিশু পরিচালন শিক্ষাকেন্দ্র (Child Guidance Clinic)-সমূহ খোলা হয়েছে। এটাকে সমাজশিক্ষার একটি অংশ বলে আলোচনা করা হয়। এর নীতি হলো বিব্রত, চিন্তিত পিতামাতার সাহায্য করা, শিশুপালনে সহযোগিতা করা। মনস্তত্ত্ববিদ পণ্ডিত (Psychologist), মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসক (Psychiatrist) আরোগ্যবিজ্ঞানী শিক্ষক (Educational Therapist),

এবং সমাজ-কল্যাণকর্ম্মী (Social Worker) এরা সকলে একযোগে এই ক্লিনিকে কাজ করেন।

পিতামাতা তাঁদের বক্তব্য নিয়ে আসেন, আলোচনা করেন, প্রকাশ করেন তাঁদের মনের অবস্থা। শিশু যদি পড়ুয়া হয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণও ক্লিনিকের এই সব মায়েদের নানা উপায়ে সাহায্য করেন। পিতামাতার সাক্ষাতের জন্ম একটি বিশেষ দিন ধার্য্য থাকে। ক্লিনিকের একজন কর্ম্মচারী আলোচ্য বিষয়টি উত্থাপন করেন। মায়েরা এক এক করে তাঁদের সমস্যা ব্যক্ত করেন। এর পর নির্দ্দিষ্ট দিন থাকে শিশুকে ক্লিনিকে আনার জন্ম। নিয়মিত ভাবে শিশুর মানসিক চিকিৎসা চলতে থাকে। কল্যাণ কর্ম্মিগণ দেখেন যে শিশু ঠিকমত মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কিনা।

এ ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশে মায়েদের শিশু লালনপালন শিক্ষার জন্ম কতকগুলি শিশুকল্যাণ কেন্দ্র (Child Welfare Centre) খোলা হয়েছে। সেখানে গর্ভবতী মহিলাদের বহু দিক দিয়ে সাহায্য করা হয়। ভবিষ্যতের শিশু যেন সুস্থ মায়ের কোলে সুস্থ ভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুতরাং গর্ভ অবস্থায় সুস্থ দেহে সুস্থ চিত্তে থাকতে হলে এবং শিশুর জন্মের পর তাকে সুস্থ ভাবে লালনপালন করতে হলে কি ভাবে চলতে হবে তা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে অনেকগুলি বিভাগ আছে। একটি হচ্ছে মাতৃশিল্পবিদ্যা বিভাগ (Mothercraft Home) যেখানে সুস্থ শিশুসহ মাকে ভর্ত্তি করা হয়। অসুস্থ শিশু যার হাসপাতালের চিকিৎসার প্রয়োজন তাকে ভর্ত্তি করা হয় না। সময়ের পূর্ব্বেই জন্ম হয়েছে এমন শিশুকেও মায়ের সঙ্গে ভর্ত্তি করা হয়। কারণ এই ধরনের শিশুর হাসপাতালের চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। অসুস্থ মা—স্তন্যদানে অক্ষম, অথবা তার স্তন দোষযুক্ত, সেক্ষেত্রে শিশুকে কৃত্রিম (artificial) উপায়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়। আবার অজ্ঞ মা, যার শিশুপালনে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই তাকে স্তনদান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুর পুষ্টির যেন অভাব না হয় সেই জন্ম নিয়মিত খাওয়ানো সম্পর্কে জ্ঞানলাভ মায়েদের একান্ত দরকার। গৃহজীবনে এই মাতৃশিল্পবিদ্যা শিক্ষার মূল্য অনেক—অথচ নানা কারণে এটা গৃহস্থ বিজ্ঞান-শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

শিশুশিক্ষার ব্যবস্থাপনায় শিশু লালনপালন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ সব প্রথমে পিতামাতার পক্ষে প্রয়োজন। শিশুর-চরিত্র গঠনে পিতামাতার চরিত্র প্রভাবিত দানের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা চাই। বৃহৎ সমাজে এই শিক্ষা তাকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে। এই শিক্ষা প্রাপ্তির সময়, পরিচালনার দায়িত্ব কেবল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকলে চলবে না; পিতামাতাকেও তাদের সঙ্গে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং একযোগে নিয়মানুবর্ত্তী হয়ে কাজ করতে হবে।

জগতের এই দ্রুত অগ্রগতির দিনে কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং দেশপ্রীতির প্রেরণায় বিস্তৃত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও সমাজ এবং সংহত ক্ষেত্রে পিতামাতা বা অভিভাবক ও শিক্ষক একযোগে, একচিত্তে, নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে গেলে তবেই দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি তথা সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথে দেশকে আমরা অগ্রসর করে দিতে পারব। নান্যঃ পন্থা: বিদ্যতে অয়নায়।

সংখ্যাগুরু

শ্রীভূদেব চট্টোপাধ্যায়

সেই যে কখন জন্ম লগনে কান্না হয়েছে সুরু
আজিও তাহার হ'ল না যে শেষ কাটিল না কালো রাত,
ব্যর্থ আশার লয়ে গুরুভার বুক কাঁপে দুরু দুরু,
আঁধার জীবনে আসিল না কভু মধুর সুপ্রভাত।
পাথেয় বিহীন পথ চলা হ'ল বিফল পরিক্রমা,
ব্যাধি আর ব্যথা এক সাথে আসি ধরিল উভয় কর,
পরাজিত প্রাণ কেঁদে মরে হায় কোথাও মেলে না ক্ষমা,
হাল ভাঙা তরী অকূল পাথারে খুঁজে ফেরে বন্দর।
অর্জ্জুন হতে হিটলার যুগে আমরা যে পদাতিক,
জগতের হাটে আমাদের প্রাণ হয়েছে যে বেচাকেনা
লাঞ্ছনা আর অপমানে ভরা জীবনে মোদের ধিক,
দীন হীন হয়ে যুগ যুগ ধরে পেয়েছি কেবল ঘৃণা।

মুষ্টিমেয়র তুষ্টি বিধানে গোষ্ঠীরা আজ সারা
কালো নিগ্রোর জলভরা চোখে প্রলয় নিশান তাই,
যন্ত্রযুগের নিঠুর পেষণে লাখে লাখে যাই মারা,
লাল চীন তবু ফুকারিয়া কহে ভয় নাই ভয় নাই।

দিগবলয়ের নীল নভোতলে ঘন কালো মেঘ জমে,
গুরু গুরু রবে নটরাজ করে বেজে ওঠে ডমরু
আধমরাদের ঘায় না যে মারা বিশাল এ্যাটম্ বমে,
শত জীবনের অভিশাপ লেয়ে জেগেছে সংখ্যাগুরু।

ফাঁকি

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অনেক দিন পরে দেখা হ'ল নরেনের সঙ্গে। পরস্পরের কুশল প্রশ্ন ও নানা বৈষয়িক বার্ত্তা আদান-প্রদানের পর নরেন বলল, বেশ ত, একদিন এস না আমাদের বাড়ী। দু'চারশ' মাইল ত নয়, কাছেই নবদ্বীপ—দু'ঘণ্টার পথ বৈত না। কেমন, কবে আসবে বল?

জিজ্ঞাসায় জানলাম—ওখানে ব্যবসা করে সম্পন্ন গৃহস্থ হয়েছে নরেন। বেশ চালু দোকান, বড়ও। গঞ্জে নাম আছে দোকানের, তারই দৌলতে বাড়ী হয়েছে, ছেলেরা লেখাপড়া শিখছে, মেয়েদের বিয়ে হয়েছে ভাল ঘরে, বিধবা মা দক্ষিণ আর উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থ দর্শন করে এসেছেন। ওর হাসি-উপচিত মুখ আর স্বচ্ছন্দ কথাবার্ত্তায় বুঝলাম—সংসারে সুখ বলতে যা বোঝায়—তা যথেষ্ট পরিমাণেই সঞ্চয় করেছে ও।

সঙ্গোপনে একটি নিশ্বাস টেনে নিলাম ঠিক ঈর্ষাজীর্ণ নিশ্বাস নয়—স্বাচ্ছন্দ্য আহরণে অক্ষমতাজনিত সামান্ত ক্ষোভের প্রকাশ। পাঠ্যজীবন থেকে আমরা পরস্পরকে জানি। দরিদ্র ঘরে প্রায়ই মেধাবী ছেলে জন্মায়, কিন্তু পড়াশুনাতে নরেনের মেধাহীনতা আমাদের কৌতুকের বিষয় ছিল। মাঝামাঝি ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ে ও ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছিল, তারপরে একটা মুদিখানা দোকানে ঢুকেছিল জীবিকা-নির্ব্বাহের তাগিদে। আসলে ও মেধাহীন ছিল না, পাঠ্য-বিষয়ে ছিল অমনোযোগী। দোকানের মালিক বলতেন, ছেলেটার সবই ভাল—একটু বেশী মাত্রায় চালাক। খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলে চমৎকার—জিনিস বিক্রীর ধরনটি ভাল, কিন্তু খদ্দেরকে ঠকিয়ে নেবার ফিকির খোঁজে সব সময়ে। ওতে দোকানের বদনাম হয়।

যাই হোক, আমরা যেমন ক্লাসের পর ক্লাস পেরিয়ে স্কুল সীমানা পার হলাম একদিন—নরেনও তেমনি অনেক দোকান বদল করে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তার পরে শুনলাম ও আর দোকানে চাকরি করছে না—একটি দোকানের পুরোপুরি মালিকই হয়েছে। আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে দু'একটি ডিগ্রী নিয়ে হয়েছি সাহেব-দোকানের কর্ম্মচারী। বুদ্ধির দৌড়ে অনেকখানি পেছিয়েই পড়েছি।

বিদেশী দোকানের কর্ম্মচারী হলেও স্বদেশী দোকানদারের সঙ্গে সামাজিক মর্য্যাদায় আমরা এক নই। আমাদের চোখে ওরা অসংস্কৃত, খানিকটা ভোঁতাও। ওরা বই পড়ে না, নানা জাতির ইতিহাস ঐতিহ্যের খবর রাখে না, ভূগোল-জ্ঞান ওদের সীমাবদ্ধ এবং জীবনযাপনের ধারাটাও পালিশ-হীন। ওরা জানে শুধু অর্থ উপার্জ্জন করতে—জীবনের বিবিধ শাখায় যে সমস্ত বর্ণময় কুসুম ফুটে শোভা গন্ধে জীবন-ধারণের অর্থ গৌরব প্রকাশ করে তা ওদের কাছে নিরর্থক। ওদের জীবনে দীপ্তি নেই, শান্তি কম, অনুভূতি অত্যন্ত স্থূল। আমাদের চোখে ওরা কৃপার পাত্র।

যাই হোক, বছরখানেক বাদে একবার সুযোগ এসেছিল নবদ্বীপ যাবার এবং সেইবার ওর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম।

বাল্যকালের পরিচয় নিয়ে ওর পরিবারে ঘনিষ্ঠ হতে বেশী বিলম্ব হয় নি। ভালই লাগল পরিবারটিকে। দিব্য সচ্ছল সংসার। পোশাক-পরিচ্ছদে ছেলেমেয়েদের দৈন্য নাই, বৌটিও স্বাস্থ্যবতী। নিজের হাতে সমস্ত গৃহস্থালীর ভার তুলে নিয়েও ক্লান্ত নয়। শুধু একটি অনুযোগ করলেন দ্বিতীয় দিনে।

বললেন, ঠাকুরপো, বড় ইচ্ছে করে দু'একটি তীর্থ দেখতে। অনেক দিন হ'ল সংসারে বদ্ধ হয়ে আছি একবার ফাঁকায় যেতে সাধ হয়।

নরেন হেসে ওকে সমর্থন করলে, কথাটা মন্দ বলে নি তোমার বৌদি। ওর যেমন সংসার আমার তেমনি দোকান—জন্মকাল থেকে ঘানিগাছে চোখঢাকা বলদ হয়ে আছি। তবে কি জান একলা একলা ভরসা হয় না বিদেশ-বিভুঁই যেতে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

ওর বৌয়ের চোখে অপার বিস্ময় লক্ষ্য করে আমিও অবাক হলাম। এই ধরনের প্রস্তাবে এমন অনায়াস সমর্থনটা বৌয়ের পক্ষে বুঝি আশাতীত। অবশ্য প্রশ্নটা আকস্মিকই।

নরেনের বৌ বলল, ঠাকুরপো, আর দেরী করবেন না—গিয়েই ছুটি নিয়ে নিন আপিস থেকে। কথা দিন—এবার যখন আসবেন নিরাশ করবেন না।

নরেনও অবাক হয়ে বলল, এত শীগগির? কোথায় যাবে?

কেন—প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, সাবিত্রী—

নরেন ত্রস্তকণ্ঠে বলে উঠল, ব্যস, ব্যস, ওই যথেষ্ট। আর বেশী বেড়ালে দোকান লাটে উঠবে।

লাটে উঠবার ভয়, না পয়সা খরচের? ঈষৎ ঝাঁজালো স্বরে বৌ প্রতিবাদ তুলল।

এবার ত্রস্ত হয়ে উঠলাম আমি। হাজার হোক অজানা তৃতীয় পক্ষ ত—তারই সামনে সুদৃশ্য পরদাটা দুলতে সুরু করেছে—হয়ত বা উঠেই যাবে। সে বড় বিশ্রী লাগবে।

নরেন বলল, তা মিথ্যে কি—ব্যবসায়ীদের কখনও বে-হিসাবী হলে চলে না।

তোমার কাছে ব্যবসায়ই সবচেয়ে বড়।

বৌয়ের অভিমান ক্ষুব্ধ স্বরে নরেন বিচলিত হ'ল না একটুও। হেসেই বলল, ব্যবসা হ'ল মূল শিকড় যা দিয়ে রস টানে গাছ, তার পর ডালপালা, পাতা, ফুল ফল—যা বল।

বৌ রাগ করে চলে গেল। এবং তাতেই ফলল সুফল।

নরেন বলল, সেই ভাল—এই বর্ষাকালেই যাব। ওই সময়ে ব্যবসার মন্দা—দু'এক হপ্তা না হয় ঘুরে আসা যাক। গিয়েই ছুটির দরখাস্ত করে দিয়ো। এতগুলিকে সামলানো আমার কর্ম্ম নয়—তোমাকে থাকতেই হবে। ট্রেন ভাড়াটা শুধু দিয়ো, খাওয়া-দাওয়ার ভার আমার।

পাকা ব্যবসাদারের দস্তুরই এই—লেনদেনে কিছু অস্পষ্ট রাখতে চায় না।

অগত্যা ছুটি নিয়ে সঙ্গী হলাম নরেনের। ষ্টেশনে এসে দেখি—নরেনের বর্ণনা অতিরঞ্জিত নয়—রীতিমত একটি বাহিনী ওর সঙ্গে। দ্বিতীয় জন না থাকলে সামলানো মুস্কিল। চারখানা ফুল, তিনখানা হাফ আর একখানি বিনা টিকিটের যাত্রীতে সুগঠিত বাহিনী—চাল আটা থেকে বার্লি হরলিকস পর্য্যন্ত যোগাড় করে নিতে হয়েছে।

অচল লটবহর কিছু কম—সকলের হাতে হাতে চারিয়ে দিয়ে কুলি ভাড়াটা বাঁচার মত।

হিসাবী মানুষ সে—বলল, একেবারে থ্রু টিকিটই কাট-লাম—আজমীড় পর্য্যন্ত। মাঝখানে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন দেখা হবে।

আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, ইচ্ছে করলেও এক জায়গায় বেশীদিন থাকা চলবে না—আইনে বাধবে। ভায়রাভাইকে জিজ্ঞেস করে তবে এ কাজ করেছি। রেলের টাইম-টেবল দেখে ওই ত বাতলে দিলে সব। একসঙ্গে টিকিট কিনে ভাড়াও সুবিধা হ'ল।

ততক্ষণে ট্রেন চলছে, বাইরে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়েছিল নরেনের বৌ। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, উঃ, কি যে ভাল লাগছে ঠাকুরপো! এক মাসের কম কিছুতেই ফিরছি না।

নরেন কথা কইল না, অল্প হেসে ট্রেনের বাতিটার দিকে চেয়ে রইল।

ট্রেন গতি লাভ করতেই বাতিটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবার স্টেশনে থামতেই নিবু নিবু হয়ে এল। নরেনের মুখ চোখের সঙ্গে ওর আশ্চর্য্য মিল। এর পর গল্পগুজব, খাবার খাওয়া, ছেলেমেয়েদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া—পাশের যাত্রীর সঙ্গে অল্প আলাপে অন্তরঙ্গ হওয়া যথানিয়মে ঘটতে লাগল। বেশ লাগল এই নূতন জীবনের স্বাদ। সবটাই পুরাতন কাহিনীর পুনরুক্তি, অথচ গতির মুখে নূতন ভরা স্বাদে স্বাদু।

ঠিক ছিল প্রথমে কাশী নামব, সুতরাং রাত্রির মত নিশ্চিন্তে আরাম করে নেওয়ার কথা। জায়গা যেটুকু আছে তারই মধ্যে শিথিলভঙ্গীতে দেহবিস্তার করে নিদ্রাটুকু পোষণ করা চলছে। আমি কিন্তু বহুক্ষণ জেগেছিলাম। বাইরের দু'ধারে ঘন অন্ধকার মাখা গাছপালা—দু'একটা পাহাড় অন্ধকারের ঢিবি সাজিয়ে ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছিল। কোথাও আলোর চিহ্ন ছিল না—এমন অফুরন্ত অন্ধকার কোনদিন চোখে পড়ে নি। ভাগ্যিস এক জোড়া পাতা লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন ছুটছিল—না হলে এও ত যে-কোন সময়ে অন্ধকারের বুকে ঝাঁপ খেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে পারত! জেগেছিলাম অনেকক্ষণ, তার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, কখন সকাল হয়েছে। কোলাহলমুখর শহরের মত একটা মস্ত বড় স্টেশনে এসে ট্রেন থেমেছে। শুধু আমাদের ট্রেনই নয়—দু'তিনখানা ট্রেন। অসংখ্য লাইন সরীসৃপের মত বিছানো, নানা পণ্য জিনিস নিয়ে ফেরিওয়ালারা সুর তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে—নানা প্রদেশের যাত্রীর মেলা বসেছে।

চোখ চাইতেই একটা আর্ত্ত করুণ সুর কানে গেল। ঠাকুরপো একবার দেখুন না, উনি কোথাও হারিয়ে গেলেন না ত!

নরেনের বৌ কাঁদছে। ট্রেনে চেপে যেতে যেতে মানুষ কখনও হারিয়ে যায়? এ কি কলকাতার পথ-ভুলানো পথ? নরেনও কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ নয়।

ছেলেমেয়েরা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, মা উই যে বাবা একটা পুলের ওপর উঠে উই উদিকে নেমে গেল।

নেমে গেল!

ওরা কাকে দেখতে কাকে দেখেছে।

বললাম, আচ্ছা দেখছি, যাবে কোথায়? চা খাওয়া হয়েছে তোমাদের?

নরেনের বড় মেয়ে খোকা বলল, কখন। বাবা চা

কিনে দিল—খাবার কিনে দিল, খোকার জন্য এক সেতে খেলনা। তার পর একটা লোক এই দিকে আসচে দেখে এই মাত্তরই ত ছুটে সিঁড়ি দিয়ে না উঠে—ঐ যে ওপরের কাঠের পুল—ওইখানেই ত—

নরেনের বৌয়ের সকরুণ স্বর, কি হবে ঠাকুরপো ?

হঠাৎ শোভা আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠল, কাকাবাবু উই যে লোকটা এই দিকেই আসচে।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি ফেলে একটা লোক কামরার সামনে এসে দাঁড়াল। অতঃপর কামরার মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে অস্ফুটস্বরে বলল, আশ্চর্য্য ত।

একটুখানি ইতস্ততঃ করল—তার পর সরাসরি আমাকেই প্রশ্ন করল, আচ্ছা স্যার বলতে পারেন, এইখানে যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন—ছেলেদের চা খাবার কিনে দিচ্ছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন ?

চেয়ে দেখি, নরেনের স্ত্রী দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকেছে—ছেলেরা অবাক হয়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে আছে।

বললাম, তাঁকে আমরাও খুঁজছি। নতুন মানুষ কখনও ঘরের বার হন নি, হারিয়ে গেলেন না ত।

ঈষৎ হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, না হারিয়ে যাবার ছেলে তিনি নন। তাঁর পাত্তা লাগাতে গিয়ে অনেকে বরং বেপাত্তা হয়েছে।

হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, জানেন তাঁকে ?

জানি বৈকি যাকে বলে হাড়ে হাড়ে জানা—তাই। এক-একটা লোকের সঙ্গে এমন জানা-চেনা হয়ে যায় জীবন-ভোর যার কথা ভোলা যায় না—নন্দবাবুও সেই গোত্রের লোক।

বললাম, ভুল করেছেন আপনি, ওঁর নাম নন্দবাবু নয়, নরেনবাবু।

লোকটি অবিচলিত কণ্ঠে বলল, ওই হ'ল—নন্দ নরেন নিতাই নৃপেন—সবের শুরুতেই ইংরেজী এন অক্ষর। ওরা আদিতে অজয়, অন্তেও অকূল পারাবার। দূর থেকে হলেও মানুষ চিনতে ভুল করি নি। কিন্তু প্রভু গেলেন কোথায় ?

এদিকে ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠল—নরেনের স্ত্রী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠল।

লোকটি সেই দিকে চেয়ে বলল, প্রভুর ফ্যামিলি বুঝি ? আর আপনি ? বন্ধু ? তা আপনার জিম্মাতেই রেখে অন্তর্দ্ধান হলেন বুঝি ? তবে আমিও সঙ্গ নিলাম আপনাদের, এতদিন পরে যদি গুণনিধির সাক্ষাৎ পেলাম···

চলন্ত গাড়ীতে লাফিয়ে উঠল লোকটা।

আর সাক্ষাৎ ? নরেন সত্যিই কোথায় হারিয়ে গেল। নরেনের স্ত্রী দেখলাম নিজেকে সামলে নিয়েছেন। প্রথমটা উতলা হয়েছিলেন বটে পরে আত্মস্থ হলেন।

বললেন, ও যে চুলোতেই যাক ঠাকুরপো, তীর্থ না সেরে আমি ফিরছি না। টিকিটগুলো আমার কাছেই আছে—আপনার কাছে কিছু টাকা আছে নিশ্চয়—আমাকে ধার দেবেন। না দেন ধার—গহনা বিক্রী করব—বৃন্দাবন পর্য্যন্ত আমি যাবই। চুলোয় যাক গে মানুষ—একদিন-না-একদিন ফিরবেই, তখন বোঝাপড়া ওর সঙ্গে।

লোকটি কাশী পর্য্যন্ত এসে আমাকে নমস্কার করে বলল, আপনার অবস্থা দেখে দুঃখ হচ্ছে মশাই, কিন্তু আমার অবস্থাও এক সময়ে কম শোচনীয় করেন নি ওই মহাপুরুষটি। দোকানটি প্রায় হাতিয়েছিলেন—অনেক কষ্টে উদ্ধার করেছি, টাকাগুলো যা মেরেছেন—উদ্ধারের চেষ্টা করছি। সে বোধ করি দুরাশা। যদি কোন দিন রাণীগঞ্জের বাজারে যান অনাদি পালের কাটা কাপড়ের দোকানে পায়ের ধুলো দেবেন দয়া করে, আর চলবেন সাবধানে, নমস্কার।

লোকটা চলে গেলে নরেনের স্ত্রী বলল, কি বললেন ওঁর নাম, অনাদিবাবু না ?

হাঁ—চেনেন ওঁকে ?

জানি। মৃদুস্বরে বলল নরেনের বো।

কৌতূহলী হয়েছিলাম স্বীকার করি, কিন্তু নরেনের বৌ আর উচ্চবাচ্য করেন না, অশোভন বোধে আমিও কোন প্রশ্ন করতে পারলাম না।

সেই দিন অপরাহ্ণে কৌতূহল মিটল। বৈকালে অহল্যা-বাঈয়ের ঘাটে বসেছিলাম একলা। নরেনের বৌ একবার কথকের আসরে গিয়ে বসেছিল, ছেলেমেয়েরা এদিক-ওদিক খেলা করছিল। বেশ লাগছিল অপরাহ্ণের বারাণসী বিশেষ করে এই পাথর-বাঁধানো চত্বর। ঘাটের শিলায় শিলায় কত যুগের পলস্তরা জমা হয়েছে, কত সাধুসন্তের পদচিহ্ন পড়েছে। রাজনীতির আবর্ত্তে ভারতবর্ষ প্রবল ভূকম্পনে নড়ে উঠেছে কতবার—সে কম্পন বেগ কাশীতেও সঞ্চারিত হয়েছে, তবু বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূল শীর্ষে স্থাপিত শিবময় কাশী রয়েছে অবিচল। কিন্তু ইতিহাসের বর্ব্বর নখরাঘাত কাশীকেও ক্ষতবিক্ষত করেছে। মণিকর্ণিকা, বিশ্বনাথের মন্দির, বেণী-মাধবের ধ্বজা এর অভ্রান্ত সাক্ষী। উত্তরবাহিনী গঙ্গার প্রশান্তি নষ্ট হয় নি। আজ মানবীয় সেতুর রাজকীয় আড়ম্বর দৃষ্টিকে বিস্ময়াম্বিত করে—সেদিন নিরাবরণ প্রকৃতিতে চমক লাগানোর চিহ্ন ছিল কি কোথাও ? ওপারের সীমাহীন বালুচরের মত মনের চরভূমিও বৈরাগ্যে ধূসর হয়ে উঠত হয় ত। বৈরাগ্য যদি মনের প্রান্তিক সীমায় লালিত হ

সংগোপনে তবে মানুষ-জন-পরিপূর্ণ কাশীর অন্তররাজ্যে একলা মানুষের সঙ্গে একাকিনী প্রকৃতির যোগাযোগটা অবশ্যম্ভাবী।

এমনই এলোমেলো চিন্তা করছিলাম—নরেনের বৌয়ের কথায় বাহ্যজগতে ফিরে এলাম।

ঠাকুরপো, এই বেলা একটা কথা জানিয়ে রাখি। ছেলে-মেয়েরা বড় হচ্ছে—ওদের সামনে সে কথা বলা যায় না। অথচ আপনাকে যদি সব কথা খুলে না বলি—অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।

সে কথা জানান কি একান্তই দরকার? প্রতিবাদ করলাম।

দরকার। অন্ততঃ আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আপনার বন্ধুটি যে কি মানুষ তা আপনি জানেন না! এক দিনের জন্য শান্তি দেয় নি আমাকে, ছেলেমেয়েদেরও জীবন নষ্ট করে দিতে চায়। আমি কত আর পারি বলুন? চারি-দিকে মানুষের সঙ্গে মিথ্যা শঠতা জাল জুয়াচুরি কত ঠেকিয়ে রাখতে পারি! শুধু এদের গায়ে যাতে আঁচ না লাগে সেই চেষ্টা করি, পারি না ঠাকুরপো।

ঝরঝর করে ওর চোখের জল ঝরে পড়ল। চুপ করে বসে রইলাম পাষাণ-সোপানের দিকে চেয়ে।

চোখ মুছে নরেনের বৌ বলল, জীবনভোর খালি ধাপ্পা খালি মিথ্যে কথা—খালি বিশ্বাসঘাতকী হওয়া। ওই যে অনাদিবাবু যা বললেন সব সত্যি। ওর তহবিল ভেঙে পালিয়ে এসে নবদ্বীপে দোকান করেছিল, কিন্তু সইবে কেন অধর্ম? সে দোকান করে অক্কা পেয়েছে। তার পর একে ওকে তাকে কত লোককে যে মজিয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নাই, কিন্তু বাসা বাঁধতে পারে নি কোথাও। কি বলব ঠাকুরপো বাবার কাছেও আজ আমি মুখ দেখাতে পারি নে—সে পথ বন্ধ করে ছেড়েছে। সম্প্রতি আবার কি ব্যবসায় ধরেছে—শুনি ত লাভের ব্যবসা, কিন্তু মানুষের রীতব্যাভার মনে হলে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। আবার কাকে যে নূতন করে পথে বসাবার উদ্যোগ করছে—

সবটা শোনা হ'ল না, ছেলেমেয়েরা ফিরে এল। নরেনের বৌ বলল, কোথাও বেরুতে পাই নে ঠাকুরপো, ক'টা দিন কষ্ট করে তীর্থের সেবা হবেন আমার।" আর হয়ত বেরুতে পারবও না জীবনে। তাই তাড়াতাড়ি করে ফিরতে ইচ্ছে হয় না। আর সেই ত ঘর।

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ছোট ছেলেটাকে বুকে চেপে ধরল।

সপ্তাহ তিনেক ঘুরলাম। হাতের টাকা প্রায় ফুরিয়ে এল।

নরেনের বৌকে বললাম, এবার ফিরতে হয় বৌদি, না হলে—

নরেনের বৌ বলল, এখুনি।

চিঠি লিখে নরেনকে জানালাম। যদিও জানি ও ষ্টেশনে আসবে না।

কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম নরেনকে প্লাটফরমে দেখে। আমাদের দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। ভাগ্যিস, মোগলসরাই থেকে চলে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ভগবান না হলে পাঁচ ছশ' টাকা জলে ডুবত। কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে ও বলল।

নরেনের বৌ চাপা ভৎসনার সুরে বলল, ভগবান! ও নাম মুখে এনো না আর।

নরেন আমার পানে চেয়ে চোখ টিপে হাসল। আমার পাশে চলতে চলতে এক সময় চাপা গলায় বলল, মেয়ে-মানুষের ডিম ওরা বোঝে কচু। ভগবান না থাকলে আমার মাথায় এমন বুদ্ধি দিলে কে? বিদ্যে ত হ'ল না, বুদ্ধির জোরেই বাজীমাৎ করে চলেছি। কত তা-বড় তা-বড় এম-এ, বি-এ, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদকে ঘোল করেছি জান? সে শুধু এই বুদ্ধির জোরে আর ভগবান এইটুকু দিয়েছিলেন তাই। মাথায় গোটাকয়েক টোকা দিয়ে ও হেসে উঠল।

নরেন বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, কিন্তু ফাঁকিটা কোথায় ধরতে পারবে কি কোনদিন?

আটঘরা

শ্রীকালিদাস দত্ত

বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ পূর্ব্বে বনময় হইয়া ব্যাঘ্র ও গণ্ডারাদি ভীষণ শ্বাপদকুলের আশ্রয়স্থান ছিল। নিম্ন-বঙ্গের ঐ অংশ বনময় হইবার কারণ অজ্ঞাত। বিগত উন-বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল হইতে সেখানে ক্রমশঃ বন হাসিল হইতেছে।[১] কিন্তু এই সুদীর্ঘকাল হাসিল কার্য্য চলিলেও ঐ প্রদেশের সর্ব্বত্র এখনও আবাদ হয় নাই এবং উহার দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে অনেকখানি ভূভাগ বনময় অবস্থায়

গাজীরভাঙ্গা স্তূপের একাংশ : উত্তরদিক হইতে

আছে। ভূতত্ত্ববিদগণ নিম্নবঙ্গকে বয়সে নবীন বলায় এবং পূর্ব্বে উক্ত ভূখণ্ড ঐরূপে শ্বাপদসঙ্কুল থাকায় অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে, অতীত যুগে সেখানে কোন সময় লোকালয় ছিল না।

সে কারণ ঐ প্রদেশে বনমধ্য হইতে হাসিল কালে স্থানে স্থানে যে সকল মন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সেগুলিকে ঐ প্রদেশের প্রাচীন লোকালয়ের নিদর্শন বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, পূর্ব্বে সময় সময় সেখানে যে সমস্ত আবাদকারী ব্যক্তি আসিতেন ঐগুলি তাঁহাদেরই কীর্ত্তি। কর্ণেল গ্যাষ্ট্রেল ও হাণ্টার সাহেবের এই উক্তিটি উহার একটি উদাহরণ :

"Some ruins of masonry buildings and traces of old courtyards remain to the present day. But by whom the buildings were erected and when inhabited no one seems to know... Remains of brick ghats and traces of tanks have also been found in isolated parts of the forest and in one or two localities brick kilns too were discovered. There can be no doubt that settlers did occassionally appear in the Sundarbans in olden times. But there is nothing to show that there was a general population."[2]

ঐ সকল পুরাকীর্ত্তি বিশেষভাবে পরীক্ষার অভাবেই যে ঐ সময় উল্লিখিত রূপ ভুল বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে কিছুদিন ঐ অঞ্চলে অবস্থানকালে সেখানকার প্রাচীন লোকালয়ের কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ আমার ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে এবং তখন আমি ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের ঐ প্রকার সিদ্ধান্তের অসারতাও সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করিতে পারি।

তদবধি অনুসন্ধিৎসু হইয়া কয়েক বৎসর কোথাও বা নৌকাতে আবার কোথাও বা পদব্রজে ঐ অঞ্চলের নানা স্থানে ঘুরিয়া যথেষ্ট অর্থব্যয়ে ও কায়িক কষ্টে আমি গুপ্ত, পাল ও সেনযুগের অনেক অভিনব ও মূল্যবান মৃন্ময়, ধাতব ও প্রস্তরের হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য বহুবিধ পুরাবস্তু সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই। ঐ সমস্ত দ্রব্য

1. Revenue History of the Sundarbans. Pergiter.

2. Statistical Account of Bengal. Hunter. Vol. I. Pages 320-321.

ঐ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে পুষ্করিণী ও খানা প্রভৃতি খনন-কালে ভূগর্ভে পাওয়া যায়। ঐ সকল স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন ইষ্টকস্তূপ, ভগ্নমন্দির, গড় ও মজা পুষ্করিণী প্রভৃতিও বনমধ্য হইতে আবিষ্কৃত হয়, ঐ সময় আমি সেগুলিরও আলোকচিত্র গ্রহণ করি।

যক্ষীমূর্ত্তির ভগ্নাংশ : আটঘরা

পরে মল্লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধে ঐ সমস্ত পুরাবস্তুর পরিচয় ও আলোকচিত্রের প্রতিলিপি বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে তৎপ্রতি পণ্ডিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহাদের অনেকে তৎকালে আমার মজিলপুরস্থ ভবনে রক্ষিত উল্লিখিত পুরাবস্তুসমূহ দেখিতে আসেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ননীগোপাল মজুমদার ও রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্ম্মসচিব শ্রীবিজয়-নাথ সরকার আমাকে উক্ত অনুসন্ধানকার্য্যে নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াও সাহায্য করিয়া উপকৃত করেন।

বিজয়বাবু উহার জন্য ঐ সময় কয়েকবার রাজসাহী হইতে মজিলপুরে আসিয়া আমার বাটীতে ছিলেন ও এক-বার বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া কয়েকটি দুর্গম স্থানে আমার সহিত গিয়া কতকগুলি পুরাকীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তিনি তখন যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে ঐ সকল পুরাকীর্ত্তির উপর আমার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ ও অনেকগুলি আলোক-চিত্রের প্রতিলিপিসহ তাঁহার সমিতির বার্ষিক বিবরণীতে ও মনোগ্রাফে প্রকাশ করেন।[১] তাহার ফলে বিদেশেও পণ্ডিতগণের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি হয় এবং বোষ্টন হইতে ডক্টর আনন্দকুমার কুমারস্বামী, সুইডেন হইতে ডক্টর ভোগেল ও লণ্ডন হইতে ডক্টর টমাস উক্ত বিষয়ে নানারূপ পত্রাদি লেখেন।

ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ও তৎকালে দুই-তিন

মেষের মস্তক ও দেহের উর্দ্ধাংশ : আটঘরা

বার মজিলপুরে আমার বাটীতে আসিয়া ঐ সমস্ত পুরাবস্তু পরীক্ষা করেন। তিনি পাটনার বঙ্গীয় প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণে আমার উপরোক্ত কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলেন :

"বাংলার প্রাচীনতম যুগের ইতিহাস অন্বেষণ করিতে

---

(১) ঐ সময়ের কিছুদিন পরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও আমার গৃহীত উপরোক্ত পুরাবস্তুসমূহের আলোকচিত্রের কতকগুলি প্রতিলিপি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বৃহৎবঙ্গ' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীতে লিখিত 'বাংলার ইতিহাস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষোক্ত গ্রন্থে উহার জন্য আমার নামোল্লেখও প্রয়োজন বিবেচিত হয় নাই। যে ভদ্রলোক ঐ আলোকচিত্রগুলি আমার নিকট হইতে লইয়া যান তিনি ঐগুলি নিজের নামেই উহাতে প্রকাশ করিয়াছেন।

হইলে বাংলার সমতল ভূমিকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। শ্রীকালিদাস দত্ত সুন্দরবনের বহুস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার ফলে দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশেও গুপ্ত ও পাল-যুগের বহু গ্রাম নগরাদি বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলে রীতি-মত অনুসন্ধান করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাংলার সমতল ভূমিকে আমরা যতটা নবীন বলিয়া মনে করিতেছি

বৃক্ষকাণ্ডোপরি পতিতা রমণী : আটঘরা

উহা ততটা নবীন নহে এবং ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে নবীন বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঐতিহাসিকগণ তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না।"[১]

তৎকালে চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যে কেবলমাত্র বারাসাত মহকুমার অধীন বেড়াচাঁপা গ্রামে[২] আবিষ্কৃত কতকগুলি রৌপ্যের punch marked ও তাম্রের ছাঁচে-ঢালা মুদ্রা, একটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর steatite প্রস্তরের সীল ও কয়েকটি মৃন্ময় দ্রব্য ব্যতীত ঐ প্রদেশের অন্য কোথাও প্রাক্‌-গুপ্তযুগের কোনরূপ পুরাবস্তু পাওয়া যায় নাই।[৩] কিন্তু সম্প্রতি উক্ত বেড়াচাঁপাতে ও ডায়মণ্ড-হারবার মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হরিনারায়ণপুর গ্রামে ভূগর্ভ হইতে মৌর্য্য ও মৌর্য্যোত্তর যুগের বহু পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে।[৪] ঐ সমস্ত বহু প্রাচীন নিদর্শন হইতে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় যে, মৌর্য্যযুগের পূর্ব্বকাল হইতে নিম্নবঙ্গের ঐ অংশে সমৃদ্ধ গ্রাম নগরাদি বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ মিউজিয়ামে উক্ত স্থান দুইটিতে প্রাপ্ত মৌর্য্যযুগের অনেক মূল্যবান পুরাবস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আলিপুর মহকুমার অধীন বারুইপুর থানার অন্তর্গত আট-ঘরা গ্রামেও কয়েকটি ঐ প্রকার পুরাবস্তু পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত গ্রামনিবাসী উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীহেমেন মজুমদার ও শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় সর্ব্বাগ্রে আমাকে ঐ আবিষ্কৃত দুইটি মৃন্ময়মূর্ত্তি প্রদান করেন। তাঁহাদের আমন্ত্রণে আমি কয়েকবার সেখানে যাই ও তথাকার পুরাকীর্ত্তিগুলি প্রত্যক্ষ করি।

বর্ত্তমান সময় ঐ স্থানটি ডায়মণ্ডহারবার ও লক্ষ্মীকান্তপুর রেলপথের জংসন ষ্টেশন বারুইপুরের প্রায় দুই মাইল পূর্ব্ব-দিকে বারুইপুর-চম্পাহাটি রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। অধুনা একটি সামান্য জনপদ হইলেও প্রাচীনকালে উহা যে সমৃদ্ধ ছিল তাহা সেখানকার পুরাকীর্ত্তি নিদর্শনগুলি দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ঐ সকল নিদর্শনের মধ্যে গাজিরডাঙ্গা, দমদমা ও সুন্দীপোতা নামে তিনটি ইষ্টক-স্তূপ, সীতামার মন্দির নামে একটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, চালধোয়া পাত্র ও নিরামন পুষ্করিণী নামে চারিটি জলাশয় উল্লেখযোগ্য (মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই পৌষ রবিবার, ১৩৫৪ সন

(২) প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই সর্ব্বাগ্রে ঐ স্থানটির বহু প্রাচীনত্বের উল্লেখ করিয়া সন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বার্ষিক বসুমতীতে 'চন্দ্রকেতুর গড়' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ও তৎকালে তথায় প্রাপ্ত প্রাক্‌গুপ্ত যুগের ঐ সকল পুরাবস্তুর পরিচয় দেন। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দের কার্য্য বিবরণীতে লঙহার্ষ্ট সাহেবের ঐ স্থানের পুরা-তত্ত্বের উপর লিখিত একটি রিপোর্টও প্রকাশিত হয়।

3. Descriptive List of Sculptures and coins in the museum of the Bangiya Sahitya Parisad. R. D. Banerjee. Pages 16 and 46.

4. The Amrita Bazar Patrika, May, 2, 1956 and June 16, 1956.

The Modern Review, April, 1956. Archaeological finds from Berachampa. By P. C. Dasgupta.

বৃক্ষকাণ্ডোপরি পতিতা রমণী : বুড়ার তট
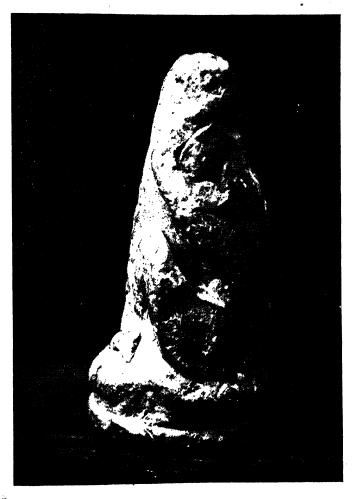
উক্ত ইষ্টক-স্তূপ কয়টির মধ্যে গাজিরডাঙ্গা নামক ইষ্টক-স্তূপটিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (চিত্র ১)। উহা উচ্চে প্রায় ১৩ ফুট হইবে এবং বারুইপুর-চম্পাহাটি রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে আনুমানিক তিন বিঘা ভূমির উপর অবস্থিত। উহার উপরিভাগে অনেকগুলি বড় বড় গাছ আছে। তন্মধ্যে একজন মুসলমান পীরের ইষ্টক নির্ম্মিত একটি ভগ্ন সমাধি-গৃহও আছে। স্থানীয় লোকে উহাকে দাওয়ান গাজীর সমাধি বলে। এই দাওয়ান গাজী কে এবং কোন্ সময় বর্ত্তমান ছিলেন তাহা অজ্ঞাত। বারাসাত মহকুমায়, বেড়া-চাঁপাতে, চন্দ্রকেতুর গড়ের উপরও ঐরূপ একজন মুসলমান পীরের ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি সমাধি আছে। মুসলমান অধিকারকালে গাজী ও পীর উপাধিযুক্ত অনেক ফকির দক্ষিণবঙ্গে ইসলামধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন।[১] উপরোক্ত দাওয়ান গাজী ঐ শ্রেণীর কোন একজন ফকির হইলেও হইতে পারেন। রায়মঙ্গল এবং কালু গাজী ও চম্পাবতী প্রভৃতি পুরাতন বাংলা গ্রন্থে ঐরূপ গাজী নামক ফকির ও

---

(১) গোরাচাঁদ শাহ, ডাক্তার আবদুল গফুর। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ৮ম অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ।

তাঁহাদের অনুচরগণের সহিত হিন্দু ভূস্বামীদের সংঘর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই দাওয়ান গাজীর স্তুপের কিয়দ্দূর পশ্চিমে, বারুইপুর-চম্পাহাটি রাস্তার উত্তরদিকে, উল্লিখিত দমদমা নামক স্তুপটি দণ্ডায়মান। উহা আকারে গাজীরডাঙ্গা স্তুপ অপেক্ষা ছোট এবং উচ্চে প্রায় আট-নয় ফুট হইবে। উহাও প্রায় এক বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া আছে। উহার উপরেও কয়েকটি বড় গাছ আছে।

এই স্তুপটির প্রায় চার-পাঁচ শত গজ পূর্ব্বদিকে এবং গাজীরডাঙ্গা স্তুপের উত্তরে পূর্ব্বোক্ত সুলীপোতা নামক স্তুপটি অবস্থিত। উহাই ঐ স্তুপ কয়টির মধ্যে আকারে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। উহার উচ্চতা প্রায় ছয়-সাত ফুট হইবে। উহাও আন্দাজ ষোল-সতের কাঠা ভূমি ব্যাপিয়া আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রথমোক্ত স্তুপটির উপরে দাওয়ান গাজীর সমাধি থাকায় উহা গাজীরডাঙ্গা নামে অভিহিত। কিন্তু শেষোক্ত স্তুপ দুইটিকে কি কারণে দমদমা ও সুলীপোতা বলা হয় তাহা অজ্ঞাত।

ঐ স্তুপ কয়টির চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত উচ্চভূমি অবস্থিত। তন্মধ্য হইতেও সময় সময় খননকালে নানাপ্রকার পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কয়েকটি মৌর্য্যযুগের ছাঁচেঢালা তাম্রমুদ্রা এবং সুঙ্গ, কুষাণ ও মধ্যযুগের কতকগুলি মৃন্ময়পাত্র ও মৃন্ময়মূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে। উক্ত মুদ্রাগুলি গোলাকার ও উহাদের একদিকে একটি হস্তী ও অন্যদিকে চৈত্যের প্রতীক দেখা যায়। সেখানে প্রাপ্ত ঐরূপ একটি মুদ্রা আমি আশুতোষ মিউজিয়মে দিয়াছি ও অন্য একটি আমার প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহে আছে। উক্ত মৃন্ময় দ্রব্যগুলির মধ্যে আমি এখানে তিনটি মূর্ত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

প্রথম মূর্ত্তিটিতে একটি নারীদেহের কিয়দংশ মাত্র আছে (চিত্র ২)। উহার সহিত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে রক্ষিত সাঁচীতে প্রাপ্ত প্রস্তরের যক্ষী মূর্ত্তির দেহের ঐ অংশের গঠন-পদ্ধতি ও অলঙ্কারের ঐক্য দেখিলে উহা সাঁচীর ঐ মূর্ত্তিটির সমকালীন অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের বলিয়া বোধ হয়।[1] উহাও যে সাঁচীর উক্ত মূর্ত্তিটির মত একটি যক্ষীমূর্ত্তির অঙ্গীভূত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটিতে একটি মেষের মস্তক ও দেহের উর্দ্ধাংশ আছে (চিত্র ৩)। উহা ভগ্ন নহে এবং সম্পূর্ণ। উহার নিম্নদিকে একটি যষ্টি লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। সম্ভবতঃ উহা একটি ক্রীড়নক ছিল। ঐ প্রকার মূর্ত্তি অন্যত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুষাণ যুগেই ঐ ধরনের দ্রব্য নির্ম্মিত হইত।

তৃতীয় মূর্ত্তিটিতে একটি বৃক্ষকাণ্ডোপরি পতিতা এক সালঙ্কারা নারীর প্রতিকৃতি আছে (চিত্র ৪)। গঠনপদ্ধতি ও অলঙ্কারাদি হইতে উহা মধ্যযুগের শিল্পনিদর্শন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত জি প্লটে, বুড়রতট গ্রামে, আমি আর একটি ঐ শ্রেণীর, উহা অপেক্ষা প্রাচীন মূর্ত্তি প্রাপ্ত হই। উহার দেহে অলঙ্কারাদি নাই (চিত্র ৫)। আমি উহা আশুতোষ মিউজিয়মে প্রদান করিয়াছি। উপরোক্ত মূর্ত্তি দুইটি সম্ভবতঃ দক্ষিণবঙ্গে প্রচলিত কোনরূপ বৃক্ষপূজার চলন (votive offering) ছিল। ঐ প্রকার বৃক্ষপূজা কিন্তু বর্ত্তমান সময় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার কোথাও প্রচলিত নাই। উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

উল্লিখিত মৃন্ময়মূর্ত্তি কয়টি ব্যতীত আটঘরাতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দুইটি কালো প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্ত্তি দুইটি বর্ত্তমান সময় সেখানকার কালী-বাড়ীতে রক্ষিত আছে। ঐ সকল পুরাবস্তু ভিন্ন সেখানে ভূগর্ভে একটি ring well ও কয়েকটি নরকঙ্কালও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আমার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া আশুতোষ মিউজিয়মের সহকারী সংরক্ষক শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তও আটঘরাতে কয়েকবার যান ও সেখানে কিছু পুরাবস্তু সংগ্রহ করেন। গত ৮ই ডিসেম্বরের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উহার যে সংক্ষিপ্ত সমাচার প্রকাশিত হয় তাহা এই:

"The discovery of another archaeological site about 2000 years old at Atghara near Baruipur in 24-Parganas has led experts to believe that the lower Bengal region was once prosperous with cities and ports.

Atghara is about 18 miles South-west of Calcutta and the archaeological finds especially cast coins collected from there bear a close affinity to those recovered from Harinarayanpur (24-Parganas) and Tamralipta (Tamluk).

The ancient site at Atghara near the dried up bed of the Adiganga, has been discovered by the Ashutosh Museum of the Calcutta

1. A Guide to the Sculptures in the Indian Museum, By. Nanigopal Mazumdar. Part I, Plate XI. Fig(b).
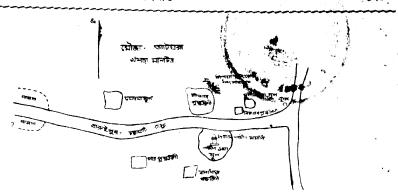
University very recently. The first clue to this was supplied by Mr. Kalidas Datta of Mozilpur, who sent an early copper cast coin found on the site to the Museum. This was followed up and Mr. P. C. Dasgupta, Assistant curator of the Museum during a short exploration of the area has found another cast copper coin about 2000 years old with an elephant and the so-called chaitya motif, as well as some terracotta figures, potteries and minor antiquities of ancient and mediaeval periods recovered from there.

Several extensive mounds and traces of ruins (ring wells and walls) have led the museum authorities to believe that Atghara might have been the site of a thriving city in the past and therefore can throw new light on the history of Bengal in the pre-Gupta period."

অমৃত

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

পেয়েছে অনেক স্বপ্ন পরিপূর্ণ নিরুপম রূপ,
অনেক জীবন্ত রূপ স্বপ্ন হয়ে গেছে মিলাইয়া
বহু সুখ দুঃখ আর বাসনা বেদনা আশা নিয়া,
যারা কল্পনায়, হ'ল মূর্ত্তি পেয়ে তারা অপরূপ।
তাদের পূজার তরে কবি জ্বালে জীবনের ধূপ,
প্রাণপ্রতিষ্ঠার লাগি' প্রাণ তার দেয় বিলাইয়া,
প্রতিমা জাগিয়া ওঠে, অনবদ্যা হয় অদ্বিতীয়া,
মানুষ থাকে না, থাকে সৃষ্টি তার সৌন্দর্য্যে অনুপ।

কোন্ বিস্মৃতির পারে চ'লে গেছে কবে চিত্রকর,
অজন্তার গুহাগাত্রে চিরজীবী তার চিত্রকলা,
কালিদাস নাই, কিন্তু আছে—আছে তার শকুন্তলা,
সব মুছে যায়, শুধু চিরন্তন কবির স্বাক্ষর।
সময়-সাগরে লুপ্ত জীবনের তটিনী চঞ্চলা,
মৃত্যু সত্য, তবু জানি মানবের স্বপ্নেরা অমর।

মিনতি

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ভাদরের অপরাহ্ণ। হলুদবরণ
ফুটেছে ঝিঙের ফুল। বহে সমীরণ
জাগায়ে মর্ম্মরধ্বনি শাখায় শাখায়;
উড়িতেছে প্রজাপতি রঙীন পাখায়।
ফিঙেরা করিছে খেলা; ঝিঁঝি পোকা ওড়ে;
আরণ্য-কপোতী কাঁদে বনানীর ক্রোড়ে।
আকাশ নির্ম্মল নীল; ধরণী অদ্ভুত
যেন কোন্ পটুয়ার আলেখ্য নিখুঁত!

দেখে দেখে তৃপ্তি নাই! বিদায়ের আগে
পৃথিবীর এ সুষমা কী যে ভালো লাগে!
তোমারে বাসিনু ভালো, ওগো বসুমতী,
সমস্ত হৃদয় দিয়ে! রহিল মিনতি,—
নির্ব্বাণে নাহিকো লোভ; শুধু যেন পাই
জন্মে জন্মে তব বক্ষে এতটুকু ঠাঁই!

সাগর-পারে

শ্রীশান্তা দেবী

ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সিংহ দরজায় বিরাট দুই সিংহকে পথে যেতে আসতে প্রায়ই দেখতাম। কয়েকবার ঢুকেওছি, কিন্তু এতই বড় মিউজিয়ম যে দেখা শেষ করা আর হ'ল না। নানা দেশের গহনা দেখতে স্ত্রীজাতির সহজেই ইচ্ছা হয়। জার্ম্মানীর কতকগুলি গহনা বিশেষ করে মুক্তোর কাজ আজও মনে আছে। স্বাভাবিক নানা আকৃতির বড় বড় মুক্তাকে এরা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে লেজ মুখ ইত্যাদি করে দিয়েছে। এই মুক্তার মাছ, মুক্তার পাখীগুলি অপূর্ব্ব গহনা। মুক্তার লোমাবৃত একটি ভেড়া এতই সুন্দর যে তুলে নিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। ঘড়িও গহনারই মত সযত্নে তৈরী করার জিনিষ অথবা গহনার চেয়েও যত্নে করতে হয় বলা উচিত। তার উপর আবার জাহাজ মন্দির ইত্যাদি কত বিচিত্র রূপই ঘড়িকে দিয়েছে। কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগল রবার্ট ব্রাউনিঙের মোটা পকেট-ঘড়ি ও চেন দেখে। ঐতিহাসিক গিবনের ঘড়ি চেনও এখানে রয়েছে। এই সব প্রত্যহ ব্যবহারের জিনিসগুলির মধ্যে যেন মানুষগুলিকেই দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাউনিং যে শুধু কাব্যগ্রন্থই নন, ঘড়ি চেনও পরতেন এটা প্রথম অনুভব করলাম।

বহু দেশের দুর্লভ জিনিসই ত এই মিউজিয়াম আছে। কামাকুরা বুদ্ধের মুখচ্ছবি, মৈত্রেয়বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর প্রভৃতির সোনার জল করা অপূর্ব্ব সব মূর্ত্তি। দেবতার মুখচ্ছবি রচনায় শিল্পীর যেমন নিপুণতা তেমনি নিপুণতা সামান্য উট-ঘোড়া প্রভৃতি তৈরীতে। কেহ বা জাপানী কেহ বা চীনা। কত দেশ থেকে কত বড় বড় মূর্ত্তি, ঈজিপ্ট প্রভৃতির কত সমাধির "মমী" ও আরও অনেক দুর্লভ জিনিস এরা এখানে এনে রেখেছে জনতাম কিন্তু দেখবার ভাগ্য এত দিনে হল।

ইংলণ্ডের দুই-একটা প্রাচীন অভিজাত বংশে হটন নাম আছে। লেডি হটন নামে একজন মহিলা একদিন আমাদের চা খেতে বলেছিলেন। তাঁর বাড়ীতে একটি পার্শী বা পঞ্জাবী দম্পতী এসেছিলেন, বাকি সব ইংরেজ। মহাত্মা গান্ধীর বন্ধু পোলককে আমাদের বাল্যকালে দেখেছিলাম, আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। এতকাল পরে এই পার্টিতে তাঁকে দেখলাম। মিঃ জেমস বলে ওয়াই-এম-সি-এ'র একজন ভদ্রলোককে দেখলাম। তিনি বললেন যে, যখন তিনি যুবাপুরুষ ছিলেন তখন কলকাতায় ছিলেন এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে কত ভাল (Kind) ব্যবহার করেছেন। আর দুজন নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ এসেছিলেন। দেখলাম এঁরা সকলেই বাবাকে জানেন এবং তাঁর বিষয় অনেক কথা আগ্রহ করে বলছেন। লেডি হটন ভদ্রতা করে আমার ছোট মেয়েকে বাংলা গান করতে বললেন এবং তাড়াতাড়ি নিজের পরিচারিকাকে ডেকে আনলেন। বললেন, "ও গান খুব ভাল বাসে, গীত-শিক্ষা করতে স্কুলে যায়।" তাকে একটা চেয়ার দিয়ে বসতে বললেন। এঁরা স্বামীস্ত্রী দুজনেই বোধহয় ডাক্তার। দুজনেই আমাদের খুব যত্ন করলেন, তবে আতিথ্যসংক্রান্ত কাজগুলি সবই ভদ্রলোক করছিলেন। আমাদের দেশের ঠিক উল্টা। অন্য এক বাড়ীতেও এইরূপ দেখেছি।

পোলকের আধুনিক মতামত আর আগেকার মত নেই, যাঁরা জানেন তাঁরা বলছিলেন পরে। বয়সের সঙ্গে অনেকের যৌবনের মতামত আদর্শ বদলে যায় সর্ব্বত্রই দেখি।

আমরা কলকাতা থেকে যে জাহাজে এসেছিলাম তাতে একটি ব্রিটিশ পরিবারও ছিলেন। তাঁদের মেয়ে লিওনি আমার মেয়েদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করেছিল। একদিন সে তার সারের বাড়ীতে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করল। যে বাড়ীতে সে থাকত সেটা নাকি তিনশ' বছরের পুরনো বাড়ী। তার মাটির তলায় অনেক লুকানো চোরকুঠুরি আছে। সে বিষয়ে নানা ঐতিহাসিক গল্প আছে।

আমাদের বোর্ডিং হাউসের ঝিটি ছেলেমানুষ এবং খুব গপ্পে। যখন বাড়ীতে মানুষ থাকে না তখন তার গল্প শুনি। মেয়েটি বলে, "আমি ভাল লেখাপড়া শিখি নি। পাঁচ বছরে স্কুলে ভর্ত্তি হয়েছিলাম চৌদ্দ বছর পর্য্যন্ত পড়েছি। অঙ্ক, বানান, ব্যাকরণ ওসব আমার ভাল লাগে না। যাদের ব্রেন আছে, আর যারা বুদ্ধিমতী, তারা আমার চেয়ে বেশী পড়ে, সবই ত বিনা পয়সায় পায়।"

আমি বললাম, "তোমার ছেলেকে কবে স্কুলে দেবে ?"

বলল, "তিন বছর হলেই দেব। সেখানে সে খেতে পরতে সব পাবে। স্কুল থেকে যখন বাড়ী আসবে ছুটিতে

তখন স্কুলের পোশাক স্কুলে রেখে বাড়ীর পোশাক পরে' আসবে।"

আমি বলছিলাম, "তোমাদের দেশে কিন্তু ঘরভাড়া বড্ড বেশী।"

সে বলল, "আমরা কিন্তু খুব বেশী দিই না। সপ্তাহে আটাশ শিলিং দিলে আমরা চারখানা ঘর পাই, আসবাব অবশ্য থাকে না। যাদের বাড়ী নেই তারা সপ্তাহে সতের শিলিং দিয়ে একখানা মাত্র ঘরে থাকে। খাওয়া-দাওয়া সবই ওতেই পায়।"

সত্য কিনা জানি না, শুনে খুবই বিস্মিত হলাম। যুদ্ধে গৃহহীনদের জন্য হয় ত বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এই সব।

মেয়েটির আমাদের দেশের ঝি-চাকর সম্বন্ধে খুব কৌতূহল। আমরা কত জন লোক রাখি, কত মাইনে দিই, সব জানতে চায়। আমি একটি দশ-বারো বছরের মেয়েকে মাসে এক পাউণ্ড মাইনে দি শুনে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিন্তু যখন শুনল যে কাপড়, খাওয়া, চকোলেট পুতুল সব দি তখন অবশ্য মহাখুশী। ওদের দেশের খাওয়া এবং কাপড় যে ঠিক আমাদের দেশের মত নয় তা যদিও সে জানত না।

Quaker খ্রীষ্টানেরা নিজেদের ফ্রেণ্ডস বলেন। আমরা যেখানে থাকতাম তার কয়েক পা দূরেই ফ্রেণ্ডস হাউস বলে ওদের একটা মস্ত বাড়ী আছে। কলকাতায় এদের সভ্যদের অনেককে আমরা চিনতাম। তাই তাঁরা তাদের সঙ্গে আমাদের একদিন বেড়াতে যেতে বললেন। সবাই মিলে চাঁদা করে সেণ্ট অ্যালবানস্ বলে জায়গায় যাচ্ছেন। সেখানে রোমান স্থাপত্যের ধ্বংসগুলি আছে। ছুটিতে ইংলণ্ডে বেড়াতে অনেক আমেরিকান মহিলা এসেছেন। তাঁরাই দলে বেশী। অনেকেই ধরে নিলেন যে, আমরা ওঁদেরই ধর্ম্মের লোক। তাঁরা আমাদের আমেরিকায় তাঁদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। কার ক'টা বাড়তি ঘর আছে বললেন। বোঝা গেল বেশ বড়লোক।

লণ্ডন পার হয়ে গেলে রাস্তাগুলি ছোট ছোট, বাড়ীও ছোট। আসল গ্রামের কাছে মিউজিয়ামের মত করে ছোট একটি বাড়ীতে কিছু রোমান মোজেইক ও অন্যান্য জিনিস সাজানো আছে। সেখানে গাড়ী থামল। এখানকার মেয়রের স্ত্রী এবং পরে মেয়র অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে এলেন, সবাইকার সঙ্গে আলাপ করলেন। সবাইকে হাল্কা রকম চা দেওয়া হ'ল। তার পর মাঠ আর ওটের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে অনেক হেঁটে রোমান রাজ্যে এলাম। পথে সেণ্ট অ্যালবানসের কোথায় মাথা কাটা হয়েছিল, কেন হয়েছিল ইত্যাদি যাত্রীরা দেখাতে এবং বলতে লাগলেন। সে সব জায়গা বেশ জঙ্গলের মত। সর্ব্বশেষে রোমান আম্পিথিয়েটারের মত গোল একটা জায়গার মাঝখানে একটি রোমান স্তম্ভ দাঁড়িয়ে। ঐতিহাসিক স্মৃতিজড়িত জিনিস, না হলে দেখবার মত কিছু নয়। তবু সেখানে ছবি বিক্রী হচ্ছে, সবাই ছবি তুলছেও। খোলা হাওয়ায় ঘোরাফেরার আনন্দ ত আছেই! সেণ্ট মাইকেলের গীর্জ্জা খুব প্রাচীন—৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী। সেখানে মহিলারা অনেকে নীরবে একটু বসলেন এবং কেউ কেউ বাক্সে পয়সা দিলেন। নূতন রাণী এলিজাবেথ তার আগের দিনই এখানে এসেছিলেন তাই সকলে খুব উত্তেজিত আলোচনা করছিল। খবরের কাগজে বড় বড় ছবি বেরিয়েছে। অনেকে কিনল। নিভৃত বাগানে গীর্জ্জাটি।

দুপুরে খুব ভাল জায়গায় রোটারি ক্লাবের বাড়ীতে মহা ঘটা করে খাওয়া হ'ল। আমেরিকান বড়লোকদের দল, কাজেই সস্তার খাওয়া নয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ইস্কুল মাষ্টার, তাও তারা আমাদের টাকায় ধরলে ১৫০০।২০০০ মাইনে পায়। অনেকগুলি বৃদ্ধা ছিলেন তাঁদের প্রচুর টাকা। আমেরিকায় গেলে তাঁদের বাড়ী যেতে এবং অতিথি হতে বললেন। একজনের বাড়ীতে ছ'টা শোবার ঘর, কাজেই অতিথিদের কোন কষ্ট হয় না। আর হতভাগ্য আমাদের দেশের ইস্কুল মাষ্টারেরা চাপরাসীর চেয়ে কম বেতনে দিন কাটায়।

বিকালে একটা ছোট গীর্জ্জা ধরনের বাড়ীতে ফেরবার পথে চা খাওয়া এবং ওঁদের কনফারেন্স হ'ল। সব ধর্ম্মের চেয়ে ওঁদের ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ—তা তাঁরা বার বার বললেন। মিশনারী ভাবে পৃথিবীটাকে ত্রাণ করবার কথা অনেক শোনালেন।

সেণ্ট অ্যালবানের গীর্জ্জাটি ক্যাথলিকদের, সেটাও দেখা হ'ল। এত সুন্দর গীর্জ্জা কমই দেখেছি। রিফর্ম্মেশনের সময় অনেক জায়গা ভেঙে দিয়েছে বটে। কাঠখোদাই করা খ্রীষ্ট এবং আরও ষাট-বাষটি জনের মূর্ত্তি শোভিত অংশটি অপূর্ব্ব! গীর্জ্জাটি ইংলণ্ডের সব গীর্জ্জার চেয়ে লম্বায় বড়, উচ্চতাও কিছু কম নয়। এখানে বেকনের সমাধি আছে। কাচের ছবিতে সুন্দর সব গল্প আঁকা।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের ফ্লেগ সাহেব আমাদের হাম্পটন কোর্ট দেখাবেন বলেছিলেন। ইংলণ্ডের রাজাদের এটি প্রাচীন ভবন। অষ্টম হেনরি থেকে তৃতীয় জর্জ্জ পর্য্যন্ত রাজারা এই প্রাসাদেই বাস করেছেন। একটি মেডিক্যাল কলেজের ছেলে আমাদের গাইড হয়ে এল। এরা অনেকে এই ভাবে টাকা রোজগার করে। আমাদের দেশের

ছেলেরাও এটা শিখলে কিছু পয়সা পেতে পারে। ইংলণ্ডের ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক গল্প ছেলেটির মুখস্থ।

অপূর্ব্ব দেখতে প্রাসাদ। খুব উঁচু উঁচু ছাদ, বড় বড় ঘরে কাঠের মেঝে, মস্ত মস্ত তৈলচিত্র, 'টাপেষ্ট্রি' যেখানে-সেখানে, আর সোনা-রূপা চড়ানো আসবাব রাজা-রাজড়ার। কত বিলাসে, আরামে-আড়ম্বরেই এরা দিন কাটিয়েছে। রাজবাড়ীতে যাঁদের সুন্দরী বলে বা অন্য কোন কারণে খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল সেই সব মহিলাদের বড় বড় ছবি। দেখলে মনে হয় একই রকম মুখ, বসার ভঙ্গীও এক রকম। মোগল রাজারাণীদের যেমন ছবি আঁকতে বসবার একটা বিশেষ ভঙ্গী ছিল, এই দেশের সুন্দরীদেরও বোধ হয় তা ছিল। এক সময় যে সব বাড়ীর আনাচে-কানাচেও মানুষের আসবার অধিকার ছিল না আজ তার শয়নকক্ষেও দর্শকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাঁকজমকে বাড়ী অতুলনীয়, কিন্তু মনে হচ্ছিল এই সব সোনারূপা মোড়া চেয়ারে বসে রাজারাণীরা যা আরাম পেতেন তার চেয়ে আধুনিক ইজি-চেয়ারে বসে মানুষ অনেক আরাম পায়। তবে উপর থেকে নদীর ধারে যে ফুলের বাগান দেখা যায় সেটি দেখলে চোখ জুড়োয়।

এই বাড়ীতে অষ্টম হেনরির মৃত্যুদণ্ডিতা রাণীদের নাকি মাঝে মাঝে দেখা যায় লোকে বলে। রাজাদের রান্নাঘর উনুন 'ওয়াইন সেলার' দেখতে ভারী মজা লাগে। বড় বড় বাসন, উনুনের উপর কেটলি এখনও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য সাজানো। যেন সদ্য সেখানে রান্নাবান্না হয়েছে এমনই একটা আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা আছে।

প্রাসাদ দেখে আমরা ক্লেগ সাহেবের বাড়ী চা খেতে গেলাম। ভদ্রলোক যে সুন্দর গান করেন তা আগে জানতাম না, চমৎকার গলা। আমার ছোট মেয়েকে গান করতে বলার পর আমরা তাঁকে গান করতে বললাম। উনি এক সময় গাইয়ে হিসাবেই নাম করেছিলেন। এঁর কন্যা ভালো বাজায়। ব্রিটিশ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গৃহকর্ত্তারাই বোধ হয় আতিথ্যে বেশী মন দেন। কাচের বাসন সংগ্রহ করা এঁর একটা খেয়াল, অনেক দেখলাম। ছবি তোলা, বাগান দেখানো, আমাদের ভারতীয় রেকর্ড বাজানো ইত্যাদি হ'ল। আশ্চর্য্য ভদ্র শিষ্টাচারী মানুষটি। বাড়ীর লোকেরা একটু গম্ভীরপ্রকৃতি মনে হ'ল। ইংরেজ জাতি খুব মিশুক বলে পরিচিত নয়। তবে গৃহকর্ত্তা তাঁর বিশেষ কার্য্যক্ষেত্রের জন্য হয় ত সম্পূর্ণ অন্য রকমের।

একদিন সকালে আমাদের দুজনকে বি-বি-সি'তে বলতে যেতে হয়েছিল। ওরা দুজনকে দশ পাউণ্ড পাঁচ শিলিং দিল। ফেরবার পথে পার্লামেণ্ট দেখতে ঢুকলাম। আমাদের দেখাবার কোন সঙ্গী সেদিন পাই নি। দেখলাম এক পাল টুরিষ্ট হাউস অব লর্ডস ইত্যাদি গাইডের সঙ্গে ঘুরে দেখছে, আমরা তাদের পিছনে জুটে গেলাম। আমাদের দেশেই যে শুধু রাজদরবারে সমারোহ ছিল তা নয়। পার্লামেণ্ট সাজ-সজ্জা আড়ম্বর ছবি মূর্ত্তি ও খোদাই কাজে ঝলমল করছে। হাউস অব লর্ডস ত সোনার গহনার মত উজ্জ্বল। ওর উপর কত শতাব্দীর কত ঐশ্বর্য্য যে খরচ হয়েছে জানি না। তার কাছে হাউস অব কমন্স ম্লান। রাণীর বসবার ঘর, রাজাদের মৃত্যুর পর in state রাখার স্থান সব ঘুরে যখন বেরোলাম তখন দেখি গাইড প্রতি টুরিষ্টের কাছে দক্ষিণা সংগ্রহ করছে। বোধহয় কোন বাঁধা রেট নেই। যার যা ইচ্ছা দিচ্ছে। আমরাও সেই মত দিলাম।

আমাদের যাবার সময় হয়ে আসছিল। অত দিন যে ইংলণ্ডে রইলাম তাতে কোন ইংরেজের সঙ্গে নূতন করে জানাশোনা বিশেষ হ'ল না। আমেরিকানরা কিন্তু পরের দেশেও আমাদের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব করছিলেন। ভারতবাসীরা এত দিন ইংরেজের মুখ চেয়ে কাটিয়েছে যে তাদের সম্বন্ধে ওদের আগ্রহ হবার কথা নয়। তবে কার্য্যসূত্রে বা পরের বাড়ীতে পরিচয় হয়ে গেলে ভদ্রতা অল্পবিস্তর সবাই করে।

হেঁয়ালি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

দশম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রচারিত বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে আমরা জানিতে পারিয়াছি গত দশ বৎসরে ভারতে কি পরিমাণ কৃষির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, এই দশ বৎসরে ভারতের কৃষির 'চেহারা' একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। জমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি, উন্নত শ্রেণীর বীজ, কৃষি-যন্ত্র, সার প্রভৃতি সরবরাহ, জলসেচন, উন্নত কৃষি-প্রণালীর প্রচলন, গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভূমি সংস্কার, কৃষি-ঋণ, কৃষিজাত পণ্য বিক্রয় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে তদ্দ্বারা অধিকতর শস্য উৎপাদনে কৃষকের শক্তি বৃদ্ধিত হইয়াছে এবং সমাজে তাহার স্থান উচ্চতর হইয়াছে।

নিম্নের তালিকায় বিভিন্ন প্রকার শস্যের তুলনামূলক বৃদ্ধির হার বা পরিমাণ দেখা যাইবে। ১৯৪৯-৫০ সনের উৎপাদন ১০০ ধরিয়া এই তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

শস্যের নাম	১৯৪৭-৪৮	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
চাউল	—	৯০·১	১১২·৭	১১৮·১
গম	—	৯৩·৯	১৩০·৫	১৩৮·১
সমগ্র তৃণজাতীয় শস্য (সিরিয়ালস)	৯৮·২	৯১·২	১১৩·৭	১১৯·৪
সমগ্র ডালজাতীয় শস্য	৯৭·৮	৯০·৩	১১২·৩	১২০·৯
সমগ্র খাদ্যশস্য	৯৮·১	৯১·১	১১৩·৫	১১৯·৬
সমগ্র তৈলপ্রদ শস্য	১৯১·৫	৯৭·৪	১০৯·২	১১৫·৯
তুলা	—	১১৯·২	১৫১·৬	১৭৯·৩
পাট	—	১৫১·৪	১৩৫·৭	১৩৬·৫
সমগ্র তন্তুপ্রদ শস্য	৭৬·২	১২৮·৩	১৪৮·৩	১৬৮·৯
ইক্ষু	—	১২২·৮	১২১·২	১৩৬·৭
বিবিধ শস্য	১১১·৬	১১৪·০	১২০·৬	১২৯·৫
খাদ্যপ্রদ শস্য নয়	১০১·৫	১১০·৫	১২০·৭	১২৯·৮
সর্ব্বপ্রকার শস্য	৯৯·২	৯৭·৫	১১৫·৯	১২৩·০

১৯৫৫-৫৬ সনের তুলনায় ১৯৫৬-৫৭ সনে চালের শতকরা বৃদ্ধির পরিমাণ ৪·৮, গমের ৫·৮। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইক্ষুর উৎপাদন ছিল ১১ লক্ষ টন, ১৯৫৬-৫৭ সনে ইহার উৎপাদনের পরিমাণ হইয়াছে ২০·২১ লক্ষ টন। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন প্রকার শস্যের উৎপাদনের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এবং উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে সত্য সত্যই মনে হইবে—ভারত অচিরেই পুনরায় সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা হইবে।

কৃষির উন্নতি বিশেষতঃ ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের অধিকতর উৎপাদনের দ্বারাই প্রধানতঃ খাদ্যের অভাব দূর হয় এবং উহার উপর খাদ্যের সচ্ছলতা নির্ভর করে। কৃষি উন্নত হইয়াছে এবং খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু খাদ্যের সচ্ছলতা ঘটিয়াছে কি? উহার অভাব দূর হইয়াছে কি? আমরা ইহাও শুনিয়া আসিতেছি যে খাদ্য সম্বন্ধে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে। তবে গলদ কোথায়? অনেকেই (বিশেষজ্ঞগণও) বলিতেছেন, সরকারী হিসাব-নিকাশ সম্পূর্ণ ঠিক নহে, উহাদের ভুলভ্রান্তিতেই এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, যানবাহনের অসুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ সরবরাহে বাধা পড়িতেছে। কেহ কেহ বলিতেছেন, Hoarding অর্থাৎ বড় বড় ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক ধান-চাল আটক রাখাই এইরূপ জটিল অবস্থার কারণ, আবার কেহ কেহ এক কথায় বলিতেছেন, প্রত্যেক স্তরে দুর্নীতিই ইহার কারণ।

যাহা হউক, একথা অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, খাদ্যশস্যের বা বিবিধ প্রকারের খাদ্যের দুর্ম্মূল্যতার জন্য

জাতির একটা অতি বৃহৎ অংশ আজ অনশনে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইতেছে, পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান ধনীরাও করিতে পারিতেছেন না। সেদিন একজন ধনী ব্যক্তি বলিতেছিলেন আলু, পটল হইতে চিচিঙ্গায় নামিয়াছি, আর কত নামিতে হইবে? আর একজন ধনী ব্যক্তি বলিলেন, শালিক পাখীর হৃদপিণ্ডের ন্যায় একটুকরা মাছ খাওয়াকে কি মাছ খাওয়া বলে?

উত্তর প্রদেশের একজন সুখী কৃষক—গমের ফলনে উৎফুল্ল

খাদ্যের বিশেষতঃ চাউলের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে সরকার বাহাদুর মাঝে মাঝে যে ফিরিস্তি দিতেছেন তাহা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করিতে অক্ষম। তাঁহারা বলিতেছেন, বড় বড় ব্যবসায়ীগণ কর্ত্তৃক 'মজুতীকরণই' চাউলের বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণ। তাই যদি হয়, 'মজুতীকরণ' নিবারণ করিতে তাঁহারা কি অক্ষম? এবং যদি তাই হয় সেই কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে, সরকারী ইস্তাহারে, সংবাদপত্রে পড়িতেছি যে, কৃষির প্রভূত উন্নতিসাধিত হইয়াছে, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, খাদ্য সম্বন্ধে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়াছে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন খাদ্যের দুর্মূল্যতা হেতু নিষ্প্রাণ হইয়া যাইতেছি। এই হেঁয়ালির মধ্যে আর কত দিন থাকিতে হইবে?

স্মরণে

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

বহুদিন পরে
মেঘে-ভরা বৃষ্টি-ঝরা শ্রাবণের সান্ধ্য অবসরে
শুয়ে থেকে রুগ্ন দেহে একা আনমনে
সহসা তোমার কথা পড়ে গেল মনে।
কত দিনকার কত স্মৃতি দিয়ে আঁকা
সেই স্নিগ্ধ মুখখানি প্রীতি-রসে মাখা।
সে প্রাণ-মাতানো হাসি, সে চাহনি পুলকে চঞ্চল
কভু অভিমান ভরে অশ্রু-টলমল,
নাম-না-ধরে সে-ডাকা শুধু চোখে চোখে,
কোন কথা পাছে বলে লোকে,
কাছে গেলে সেই ভয়ে আড়ে চেয়ে দূরে চলে যাওয়া,
অসময়ে বসে বসে একা গান গাওয়া,
মনের পর্দ্দায়—
ছায়া-ছবি সম সব একে একে উঁকি মেরে যায়।

বাইরে বিরামহীন ঝরে বৃষ্টিধারা,
ব্যাকুল বিরহী বায়ু রুদ্ধ বেদনায় কেঁদে সারা;
বিজলী ঝলকে
হেসে ওঠে অন্ধকার স্বপ্ন ঘোরে পলকে পলকে।
অশান্ত বরষা,
সঙ্গীহীন জনে আজ কে দেবে ভরসা!

জানি না কোথায় তুমি, কি তোমার পরিচয় আজ।
হয়তো তোমার হাতে আছে নানা কাজ,
হয়তো পুরানো কথা আসে না স্মরণে,—
তোমার সমস্ত মন ভরে আছে রঙীন স্বপনে।
হয় তো সার্থক তুমি পেয়ে অকৃপণ স্নেহ-প্রীতি,
আমার সম্বল আজ শুধু দীর্ঘশ্বাস আর স্মৃতি।

হৃদয়হীনা

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

ঘরের ভিতর পা দিয়েই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। উজ্জ্বল ঝলমলে দামী শাড়ীর জৌলুষে গোটা কামরাটাই যেন আলো হয়ে গেছে। আর, যার শ্রীঅঙ্গে ঐ শাড়ী জড়ানো ছিল তার কৃতিত্বও কম নয়। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি রূপ। শুধু বেমানান ভাবে নাকের উপর সোনার ফ্রেমের চশমাটা। ওটা না থাকলে বোধ হয় সাজতো ভালো। নিমেষের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গ দেখে নিয়েছিলাম, কিভাবে—ঠিক বুঝতে পারি নে। মুখের পানে তাকিয়ে দেখি বিশেষ একটা তির্য্যক দৃষ্টি হেনে লক্ষ্য করছে আমার অবাক হওয়াকে। কিন্তু এ-বয়সের মেয়ের অত চঞ্চল চোখ কখনও দেখি নি। পলকপাতে ঘূর্ণিপাকের মত তারাজোড়া ঘুরে এল চারিধারে। তার পর তাপসীদিকে বললে, "চললাম"। আবার আমার মুখের পানে চোখ থেকে বাঁকা হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে বঙ-পরীর মত হাওয়ার বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

তাপসীদি বললেন, কি ভাবছিস? গল্পের নায়িকা যে!

—না দিদি! যাকে দেখব সেই কি নায়িকা হয়? আপনাদের ভারী বদ্ ধারণা।

—কি জানি বাপু! তোর যে অত নারী-প্রুফ মন—তা জানতাম না।

—কই একথা তো আমি বলি নি। অকারণে একটা গোল-মাল পাকাবার চেষ্টা করেছেন মনে হচ্ছে! কি উদ্দেশ্য বলুন দেখি?

—উদ্দেশ্য ঘটকালি। রাজী আছিস?

—রাজী? বলেন কি তাপসীদি! আজ আমার মা বেঁচে থাকলে আপনার চেয়ে এত ভাল কথা শোনাতে পারতেন না। জানি আপনার কাছে এলে একটা হিল্লে হবেই, তাই তো এত জায়গা ছেড়ে এখানে ভিড়লাম।

তাপসীদি হাসলেন মুচকে; ভিজে বেড়াল আমি তোমাকে চিনি। মেয়েদের উপর খড়্গহস্ত যিনি, তিনি করবেন বিয়ে! আমারও আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, একটি মেয়ের কপালে তেঁতুল গুলি তোর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে।

—তাপসীদি, আপনার মুখে এত অকরুণ বাক্য মানায় না। ছেলে হিসাবে সত্যিই কি খারাপ আমি? বিয়ে করে বৌকে মারব, এই আপনার ধারণা? সত্যি বলছি, যে মেয়েটি এখুনি এসেছিল তার সঙ্গে যদি ঘটকালি করেন, হ্যাঁ ছেলেটির মত মুখ বুজে থাকব।

—এই আমাকে [illegible] তাপসীদি মৃদু হাসি হেসে বললেন, প্রথম দর্শনেই এই! নায়িকা বানাতে গিয়ে নিজেই নায়ক হয়ে গেলি যে!

ক্লিষ্ট স্বরে জবাব দিই, হ্যাঁ নায়ক, নায়ক মনে হচ্ছে নিজেকে। কিন্তু এ তো গল্পের পাতা নয়; এবার কি করা উচিত বলুন তো?

—ধন্যি বাবা! জাত-কুল, জ্ঞাতি-গোত্র জানা নেই, কোথাকার কে, কি বৃত্তান্ত না শুনেই—?

—ওসব আপনারা শুনবেন! আমরা দেখব শুধু রূপ আর গুণ!

—ওঃ রূপ তো দেখলি, বলি গুণও কি ঐ সঙ্গে দেখা হয়ে গেল? এই 'নিমে', তোকে বলে রাখছি এত কিছু ভাল নয়। চোখে দেখে যারা মজে, তাদের অবস্থা দেখে লোকে মজা পায় শেষ পর্য্যন্ত!

ক্যামেরাখানা চেয়ারে ঝুলিয়ে রেখে বসলাম,—দিদি! তোমরা এমনই হিংসুটে যে কারও রূপ-গুণের কথা পাড়লেই জ্বলে ওঠ। বেড়িয়ে যে এলাম, এক কাপ চা দেবে না?

—ওমা! ভুলে গিয়েছিলাম! একটু বস ভাই, এখখুনি এনে দিচ্ছি তার পর তোর কথার জবাব দেব—ভারী ছুটো সিনেমা পত্রিকায় গল্প লিখে মনস্তাত্ত্বিক হয়ে গিয়েছিস না?

তাপসীদি বের হয়ে চলে গেলেন দ্রুত। আমি আরাম করে বসলাম। আপিস থেকে দীর্ঘ এক মাসের ছুটি নিয়ে তাপসীদির কাছে বেড়াতে এসেছি। তাপসীদি আমার রক্ত-সম্পর্কের কেউ না। মা'র সঙ্গে হঠাৎ আলাপ হয়ে এতটা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। উনি বিদেশে এসেছেন, আমিও বড় হয়েছি। আমাকে লেখক বলে পরিচয় করিয়ে দিয়ে দশ জনের কাছে তাঁর বোধ হয় মর্য্যাদা বেড়ে যাবে খানিকটা। আর তা ছাড়াও নিজের জীবন-কাহিনীটা শোনাবার জন্ম অনেকদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। আমি কিন্তু তাপসীদির ফাঁদে ধরা দিই নি। সকালবেলা চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ি পাহাড়-জঙ্গলে। দুপুরে ফিরে ঘুম। বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়ি। তাপসীদি কারও সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন নি। আমিও গরজ করি নি। তবু একটু লক্ষ্য করে দেখেছি এ অঞ্চলে অনেকে চিনে নিয়েছে। বলতে শুনেছি, এ যে তাপসীদির ভাই। গল্প লেখে।

সেদিন একটা মেয়ের সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক করে ফেললাম। একটু বেহায়া গোছের মেয়েটি সম্ভবতঃ। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সঙ্গিনীকে পরিচয় দিচ্ছিল। বললাম, খুকি কি পড় তুমি?

—এবার ম্যাট্রিক পাশ করেছি!

—ওরে বস্ রে, তবে তো তুমি বলে ভুল করেছি! মাপ করবেন! কিন্তু আমি গল্প লিখি একথা কোথায় শুনলেন?

—তাপসীদির কাছে!

—পড়েছেন কিছু?

—না-তো।

—তবে বুঝতেই পারছেন, একটা নেহাৎ গুজব। এমন বাজে কথা রটাবেন না, বুঝেছেন?

মুখ কাঁচুমাচু করে মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। তার পর থেকেই লক্ষ্য করে দেখেছি, ইচ্ছা করেই শুধু মেয়েরা দেখিয়ে দেখিয়ে মুখ টিপে হেসে সরে যায়। আমি গ্রাহ্য করি না। সোজা দিগন্তের পানে চোখ রেখে হেঁটে যাই আর ফিরে আসি। তাপসীদির সঙ্গে এ নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেছে;—কেন তুই নিজকে প্রকাশ করতে চাস নে? লেখাগুলো সঙ্গে আনলেই ত পারতিস!

—তাতে লাভ? ঘটকালি করতে বুঝি?

—হ্যাঁ করতাম।···চোখ পাকিয়ে তাপসীদি চেঁচিয়ে উঠেছেন, ঘর-সংসার করতে হবে না! চিরকাল বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়াবে মনে করেছ! একদিন কোথায় কি গোলমাল বাধিয়ে বসবে ঠিক কি!

গম্ভীর হয়ে স্বল্প কথায় জবাব দিয়েছিলাম, দিদি ভুলে যাবেন না, আমি অবলা নারী নই।

তাপসীদি ফেটে পড়েছিলেন রাগে, তা ত বলবিই—যে জাতে পেটে দশ মাস দশ দিন ধরলে, বুকের রক্ত ঢেলে মানুষ করলে, তাদের সম্পর্কে এই কথা—টিকবে না, টিকবে না! তোদের ও সাহিত্য টিকবে না—যে সাহিত্য নারী বিদ্বেষ প্রচার করেছে, সে টেকে নি।

বলেছিলাম এর সহজ কারণ এই যে, যথার্থ বস্তুর আদর পৃথিবীতে নেই। চাঁদকে নারীমুখের সঙ্গে উপমা দিলে সে উপমা টেকে, কিন্তু ঝলসানো রুটির কথা তুললেই ললাটে কুঞ্চন দেখা দেয়। যে যত মিষ্টি করে মিছে কথা শোনাতে পারবে, তারই তত জয় জয়কার।

তাপসীদি একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন সেদিন।

—নে বল ত কি বলছিলি এবার?···চায়ের পেয়ালা হাতে তাপসীদি ঢুকলেন। পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বলি, কিছু না! সত্যি কথা ত আপনারা সইতে পারেন না।

—ওরে আমার সত্যি কথার যুধিষ্ঠির! বল ভাল চাস ত বলে ফেল, কি আছে তোর মনে, নইলে এই হয়ে গেল তোর সঙ্গে! ঐ মেয়েটাকে দেখে তোর মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে—তা কি বুঝি নে?

—এই ত ঠিক ধরেছেন দিদি! যদি বা একটু আমেজ লাগছিল, তা আপনি চেঁচামেচি করে নষ্ট করে দিলেন।

তাপসীদি হাতখানা মুছে সামনের চেয়ারে বসলেন, সত্যি আমেজ ধরেছে নাকি? ধন্যি মেয়েটার সাধনা বাপু!

—সাধনা? এ-কথার অর্থ?

—অর্থ অতি জটিল। তুই ত শুনতেই চাইলি নে! নায়িকা হবার উপযুক্ত গুণ ওর মধ্যে ছিল। তবে তোমাদের ঐ ঢুলু ঢুলু ভাবের নায়িকা সুবিধা হবে না।

বিরক্তভাবে বললাম, আঃ কি বলতে চাচ্ছেন, খুলেই বলুন না স্পষ্ট করে!

—বলছি থাম। একটা পান খেয়ে নিই, বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল।

তাপসীদি জুত করে গোটা দুয়েক পান মুখে পুরে বললেন, ঐ অমন স্বাস্থ্য, অমন রূপ, জৌলুষ দেখলি ত, কিন্তু ভিতরে কিছু নেই। এমন একটা রোগ হয়েছে যা কোন চিকিৎসাতেই সারে না। থেকে থেকে জ্বর হয়। একটু হাঁটলে বা কথা কইলেই নেতিয়ে পড়ে। অবশ্য টি-বি থেকে রোগটা দাঁড়িয়েছে। ভাল করে সারালে না প্রথমটায়, শেষে এই এক জটিল অবস্থা নিয়েছে। লোকে সবাই জানে, ওর হাতের ছোঁয়া নেয় না কেউ, বাড়ীতে এলে বিরক্ত হয়, তবুও নিজে থেকেই আসে। নূতন শাড়ী-জামা কিনেছে, চশমার ফ্রেমটা পাল্টেছে, তাই বাড়ী বাড়ী দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে তাকালেই ভারী খুশি হয়। তুই ঢুকে হাঁ হয়ে গিয়েছিলি, আমি লক্ষ্য করেছিলাম, কি খুশি হয়ে দেখছিল অথচ পাটনা থেকে ডিগ্রী পাস করেছে।

চায়ের তলানিটুকু শেষ করে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম, বলেন কি তাপসীদি! চরিত্রটা বিচিত্র বটে! কিন্তু আপনার একটা কথার প্রতিবাদ না করে পারছি নে,—ডিগ্রীধারিণী বলেই শাড়ী-গয়নার মোহ চলে যাবে—মেয়েমানুষের এ রকম স্বজাতি গর্ব্ব অশ্রদ্ধেয়। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত মেয়েমাত্রেই শাড়ী-গয়নার পুলকে ভিরমি যায়···।

—থাম থাম ভারী ফাজিল হয়েছিস। কলেজে দুটো মেয়ের সঙ্গে পড়ে আর নোট-খাতার লেন-দেন করে ভেবেছিস মস্ত বড় মনোবিজ্ঞানী হয়ে গেছিস না? যা জানিস নে, তা নিয়ে কথা কোস না! এই ত আমিও ডিগ্রী নিয়েছি, কই ক'টা শাড়ী-গয়না দেখে নাচি বল ত?

শান্তকণ্ঠে বললাম, আত্মীয়-গুরুজন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা শোভনতার পরিচয় নয়। আমি শিক্ষিত ছেলে মনে রাখবেন।

—ইস দেখিস শিক্ষার ভারী দর্প যে! এখনও মেয়েছেলে দেখলে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়িস, তার আবার শিক্ষার জাঁক।

হেসে বলি, হার মানছি তাপসীদি। রূপে-গুণে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, কালচারে আপনারা অদ্বিতীয়া। আমরা সব পৃথিবীর কীট। আপনাদের মহিমা বোঝার সাধ্য নেই। এখন দয়া করে ঐ রূপসীর কাহিনীটি শোনান—চিত্তে বড়ই চাঞ্চল্য উপস্থিত।

তাপসীদি হাসলেন, ওরকম চাঞ্চল্য কলেজে পড়বার সময় দু'-একজনের যে হয় নি যূথীকে দেখে তা নয়। যূথীর ঐ স্বভাব সেই তখন থেকে। ছেলেদের মুখের পানে আড়চোখে নির্লজ্জের মত

চাইত। ছেলেরা মজা পেত খুবই। রঙ্গ-রসিকতা করত আড়ালে-আবডালে। তার টুকরো টুকরো কথা আমাদের কানে ঠিকই এসে পৌঁছাত। বারণ করতাম, যূথী তাকাসনে! এই যূথী তাকাসনে! যূথী শুনলে ত! কোন ছেলে তার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলেই খুশী হ'ত খুব। পুলকে উচ্ছল হয়ে উঠত। তা তুইও তাকিয়ে ওকে খুশী করেছিস, ভালই—কিন্তু নিজে খুশী হতে যাসনে, মরবি!

—মরব? কেন রোগী বলে?

—ওরে না! হ্যাকামী শিকেয় তুলে চিকিৎসা করালে রোগ কতক্ষণ থাকে! আসল জায়গায় মরবি। তোর আমার মন বলে বস্তু আছে—ওর তা নেই।

—মিথ্যে কথা তাপসীদি! শাড়ী-গয়না লোককে দেখিয়ে খুশী ত নিজের মনকেই করে!

—তা করে, কিন্তু এটাও ওর একটা বিকার! মেয়েমানুষ নিজেকে নিজের মধ্যে কখনও খুঁজে পায় না। তোর জামাইবাবু যখন আসেনি তখন কি যে বোকা ছিলাম! তখন যূথীকে ঈর্ষ্যা হ'ত, এখন করুণা হয়। বেচারা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত রইল, কোন ফাঁকে দুনিয়ার এত উপচার হারিয়ে গেল টেরই পেল না। শুধু নিজেকে ভালবাসে ছেলেবেলা থেকে। এর চেয়ে আত্মহত্যা অনেক ভাল।

বললাম, তাপসীদি! ঘটনাটা বড় জটিল করে তুললেন। মূল টেক্সট কি তাই জানলাম না, ভাষ্য শুনে কি হবে?

—দাঁড়া, রসিয়ে রসিয়ে বলি! অত চট করে বলে ফেললে, এমন সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি হয়ে যাবে!

টেবিলে একটা জোরে কিল মেরে বললাম, আমি জানতে চাই, আপনি ঘটকালি করতে প্রস্তুত কি না?

—ধীরে নির্ম্মল, ধীরে! এত অধীরতা কেন? বলি বিয়ে করবি ওকে, বয়স কত জানিস? আমার সঙ্গে পড়ত।

—এ্যাঁ বলেন কি? দেখে ত সতের আঠার বলে মনে হয়। তা হোক, বয়স নিয়ে ঘোড়ার ডিম হবে—আপনি ঘটকালি করুন। বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের নাচের ধুম পড়ে যায় সুতরাং আপনার নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই।

তাপসীদি আমার তামাসা এক্ষেত্রে অনুধাবন করতে পারলেন না। মুখখানা গম্ভীর করে বললেন, মাসীমা তোকে যে এমন কুপুত্তুর করে গেছেন, তা জানতাম না।

—এবার জানলেন ত সুতরাং কখখনও আর নেমন্তন্ন করবেন না। বদনাম হয়ে যাবে!

তাপসীদির এবার অভিমান করবার পালা। বললেন মুখ ভারী করে—আমি বুঝি তাই বলেছি নির্ম্মল! ইস, তুই যে কি দুষ্ট হয়েছিস, ভাবতেও পারছি নে। কেবল কুতর্ক আর ঝগড়া করে বেড়াতে শিখেছিস।

—আচ্ছা, আচ্ছা দিদি, ঝগড়া করব না আর। কাহিনীটা শেষ করুন।

—বাধা দিতে পারবি নে আর।

—বেশ! সুবোধ বালকের মত শুধু শুনব!

তাপসীদি সুরু করলেন—

"যূথী আমার শুধু ক্লাস ফ্রেণ্ডই নয় এক পাড়ায় পাশাপাশি বাসও করতাম। নিজের জাত, কুল সম্পর্কে ওর টনটনে জ্ঞান জন্মেছিল ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু ভারী আমুদে আর উৎসাহী ছিল। কথায় কথায় হেসে গড়িয়ে পড়ত। অতো হাসি যে কি করে আসে অল্প ব্যাপারে তা আমাদের ধারণার অগম্য ছিল। ঐ প্রাণখোলা হাসির জন্য আমি তাকে ভালবাসতাম খুব। বেশ মিশত অথচ ঐ একটা জায়গায় বাধা এসে আড়ষ্ট করে দিত তাকে। এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে খেত না। নিজেদের স্বজাতি ছাড়া আর কারও পায়ে হাত দিয়ে পেন্নাম ত করতই না, নমস্কারও না। মাষ্টার বা দিদিমণিদেরও ঐ চোখেই দেখত।

"কালচারের অভাব ওর পরিবেশে থাকলেও ও ত স্কুলে পড়ছে। দশজনের মেলামেশা করছে। সিনেমা, থিয়েটার দেখছে, উপন্যাস পড়ছে—আশ্চর্য্য লাগত এক-একটা জায়গায়। আমাদের সঙ্গে ওর দুস্তর ব্যবধান তা বুঝিয়ে দিত সুযোগ পেলেই। ওরা বর্ণশ্রেষ্ঠ। সবার নমস্য। এককালে অন্য সব জাতের লোক, সে যে কোন বয়সেরই হউক, বর্ণশ্রেষ্ঠদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত। আজকাল আর সে ভক্তি লোকের নেই—ওর মা বলতেন। অথচ সবার আড়ালে গোপনে যার তার হাতে জল চালাতেন, খেতেও কোন দ্বিধা ছিল না, কিন্তু বাইরে লোক-দেখানো একটা মিথ্যা আচারকে সর্বস্ব বলে ধরে থাকতে ভালবাসত সবাই। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়ে যেত এ-নিয়ে। মানে তর্কাতর্কি আর কি! বিংশ শতাব্দীতে এত জাত-কুল যে কি করে লোকে মানে আর ওগুলোর সত্যকার কোন অস্তিত্ব আছে কি না ওরা বুঝত না কিছুতেই। অথচ অন্য সববিষয়ে আধুনিক। কোন সিনেমা বা আধুনিক প্রকাশিত গল্প-উপন্যাস বাদ যেত না। যূথীর মা সকলকে ফেলে রেখে প্রত্যেকদিন সিনেমায় সন্ধ্যেবেলা নয় দুপুরটা কাটিয়ে আসতেন। সংসারে খাটুনীর পর ঐটেই নাকি ছিল তাঁর একটু আরাম লাভের উপায়। তবু বর্ণবিদ্বেষটা দিন দিন প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। বহু গবেষণার পর স্থির করেছিলাম—ওটা ওদের মানসিক বিকৃতি, যার সুস্থবিকাশ কোন দিনই সম্ভব নয়। ঐ এক ধরনের নীচতা মানুষের মনের গভীরে আত্যোপান্ত শিকড় গেড়ে বসে, তা কোন রকমেই যায় না। আর একটা ব্যাপারে আমরা পীড়িত হতাম মর্ম্মান্তিকভাবে। মানুষ যে মানুষকে কতখানি ঘৃণা করতে পারে অকারণে, মনুষ্যত্ব বা মানুষের হৃদয়ের মূল্য কাণাকড়িও নয়, তা মাঝে মাঝে বুঝতে পারতাম ওদের ব্যবহারে। তুমি জান নির্ম্মল, আমার বাবা টি-বি-তে মারা গিয়েছিলেন। যূথীরা তখন কোথায়! এর বহুদিন পর ওরা

এসেছিল। এমনকি বারো বছর পাশাপাশি থেকেছি। তবুও ওরা এইটা নিয়ে কি কুৎসিৎ ব্যবহার পরোক্ষ থেকে করেছে—ভাবলে আজও মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঐ আমুদে প্রাণখোলা যুথীর মনটা কে অমন করে বিষিয়ে দিয়েছিল জানি নে, যার ফল মারাত্মকভাবেই পেয়ে গেল। ওর ছোট ভাইটা কোনক্রমে ভুল করে যদি এসে পড়ত আমাদের বাড়ী, যুথী চীৎকার করে উঠত জানালা থেকে, শীগ্‌গির আয় খোকা, মা ডাকছে!

কোন খাবার হয়ত দিয়েছি—টের পেয়ে কেড়ে ফেলে দিয়েছে, নয় মারধোর করেছে। আসা বন্ধ করে দিয়েছে আমাদের বাড়ী। অথচ যুথীর দাদা বা দিদি তারা কেউ অমন করত না। দাদা এসে আমাদের বাড়ীতে কতবার মাংস-ভাত খেয়ে গেছে—বাড়ী থেকে শাসন, শাসানি সমানভাবে উপেক্ষা করে। ওর দিদি সহজ, স্বচ্ছন্দই ছিল। মাঝে-মাঝে আসত আমাদের বাড়ী। কখনই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত না ছোঁয়াচ বাঁচাতে। আমাদের বাড়ীতে ঝাঁটার শব্দ উঠলেই যুথী ধমাধম শব্দে চারিদিক জানালা কপাট বন্ধ করতে লেগে যেত। এ-ও সহ্য করা চলত উপেক্ষার দৃষ্টিতে, কিন্তু মর্মান্তিক ঠেকত যখন লোকের কাছে বলে বেড়াত, আমাদের বাড়ীর পাশে থেকে ওদের রোগ-জ্বালা হচ্ছে বাড়ীতে।

আমি সাশ্চর্য্যে বলে উঠলাম, আপনারা উঠে চলে গেলেন না কেন?

কৈ আর যাওয়া হ'ল! অনেক ধাক্কা জীবনভোর পেয়ে পেয়ে ঐ-ই যেন পাওনা বলে মনে হত। মনে মনে কতবার বলেছি এর বিচার হবে, দেখতে পাব। দম্ভ নিয়ে কেউ কোনদিন টিকতে পেরেছে? ইতিহাস পড়লেই জলের মত স্পষ্ট বোঝা যায়। অথচ মানুষ তা বোঝে না। ভাবে আজকার দিনটির মত সত্য আর কিছু নেই। এমনিভাবে সুখেই কেটে যাবে সারা জীবনটা। তা' বলে এ-ও ঠিক যুথীর টি-বি হোক, আর আমরা দূরে দাঁড়িয়ে হাততালি দিই, এ কোনদিন ভাবি নি। অত নীচ মনের গড়ন আমাদের নয়। অমনভাবে ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয়। তবে ঠিক যে কি ভাবতাম তার কোন ভাষা নেই। বোবা পশুর মত অব্যক্ত কষ্টের যেমন কোন রূপ নেই, তেমনি আমরা পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় নিয়তির বিপাকে পড়ে তেমনি অসহায় বেদনা অনুভব করতাম। আমাদের কারও সামান্য মাথা ধরলে বা সর্দ্দি জ্বর হলে জানালা দরজা বন্ধ হয়ে যেত। ডাক্তারের কাছে এমনকি ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে জেনে আসত, কি হয়েছে আমাদের। আর মাঝে-মাঝে তির্য্যক বাক্যবাণ ছুড়ে জর্জ্জরিত করত।

তবে যুথীর সাথে আমার বন্ধুত্ব ছিল খুবই। আমি কোনদিন লোকের সঙ্গে আধাআধি ভাবে মিশতে জানিনে। যাকে ভালবাসি, প্রাণ খুলেই ভালবাসি। এই রকম ঘৃণা-বিদ্বেষের মধ্যে যুথীর সঙ্গে চলে এলাম কলেজ পর্য্যন্ত। আমি বরাবর ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড হ্যাণ্ড করতাম স্কুলে অথচ ফাইন্যালের বেলা দু'জনেই সেকেণ্ড ডিভিসান পেয়েছি। অবশ্য আমি যত নোট, বা বই যোগাড় করেছি, সবই সমানভাবে দিয়েছি যুথীকে। কলেজে উঠেই যুথীর স্বরূপ ফুটে উঠল ভাল করে। তখন ত বয়স কত বেড়েছে! বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা বেড়েছে। লক্ষ্য করলাম, ঈর্ষ্যার একটা প্রবল তরঙ্গ তার মনের মধ্যে। খুব সাবধানে বই খাতা ব্যবহার করত। কলকাতায় ওর এক কাকা চাকরি করে রাত্রে পড়ত। সে পাঠাত বহু নোট খাতা বা 'সাজেশান'। যুথী চেপে যেত সবকিছু। অবশ্য ওর কাকা কখনও কখনও বলে দিত আমাকে দেবার জন্য। সেগুলো যুথী না দিয়ে পারত না। এত সাবধানতা সত্বেও যুথী দ্বিতীয় বিভাগে আটকে রইল ইণ্টারমিডিয়েটে। আমি প্রথম বিভাগে বেরিয়ে গেলাম। পরীক্ষা দিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল মামার বাড়ী। আমার চিঠির জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। ফিরে এসে তখনও পর্য্যন্ত কথা বললে না ভাল করে। একটা কেমন গুমোর নিয়ে ঘরের কোণে ঢুকে রইল।

এই কলেজে ওঠার পর থেকে একটা ঘটনা বলতে বাদ দিলাম, যুথীর জীবনের একটা মস্ত বড় অপরাধ যা আমি ক্ষমা করতে পারি নে। বুঝতে পারছিস কি কথা বলছি?

একটি ছেলের কথা। ওর ভালবাসার কোন প্রতিদানই দিলে না। বেচারার আকুতি লক্ষ্য করেছে, তুষ্টি শুনেছে, নিয়েছে উপচার কিন্তু স্পষ্ট করে বললে না কোন কথা—শুধু এড়িয়ে যেতে লাগল। আমরা সবাই আশ্চর্য্য হলাম দেখে, যুথীর মন বলে বস্তুটি একেবারেই নেই। হয়ত বা ছিল, তাকে অন্যদিকে ফেরাবার কৌশল সে আয়ত্ত করেছিল। ছেলেটি তাকে অন্ধের মত ভালবাসতে লাগল শত বাধা পেয়েও। ঘৃণা উপেক্ষা দেখেও যদিও জলস্রোতের উচ্ছাস তাকে মনের গলিতেই চেপে রাখতে হ'ত। যুথী তাকে আমল দিলে না। বরং ওর মুখে রূপগুণের স্তুতি শুনে নিজের দিকে চোখ ফেরালে—কি একটা ধারণা হয়ে গেল, পুরুষের চোখে নিজকে যাচাই করবার। কলেজে শত শত ছেলে তার পানে কেমন অসভ্যের মত তাকায়—এ কথা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। অথচ কলেজের ছেলেরা বলত ওকে 'বক'। হাসিসনে নির্ম্মল, বক কেন যে বলত—জানি নে। ঘাড় না ফিরিয়ে মাটির পানে মাথা নিচু করে হাঁটলে ওকেই হয়ত মরালকণ্ঠী বলে বলত—ছেলেদের কিছুই বিশ্বাস নেই।"

—তাপসীদি! ফের সুরু করলেন? আমি কিন্তু প্রতিবাদ জানিয়ে রাখছি। ছেলেরা অত অবিবেচক নয়। পৃথিবীর যত মহাকাব্য তারাই বানিয়েছে। মেয়েদের দেবী করে তুলে যে অপরাধ তারা করেছে সেই ভার লাঘব করতে হলে আমাদের 'নারী-বিদ্বেষী' সাহিত্য প্রচার করতেই হবে।

—হয়েছে, হয়েছে বাক্যবাগীশ, পুরুষশ্রেষ্ঠ! এবার চুপ কর। এমন 'আন রোমাণ্টিক' হয়েছিস তুই—একটা কুমারী মেয়ের গল্প তাও মন দিয়ে শুনবি নে?

—তার কারণ, মেয়েদের সম্পর্কে কোন ইণ্টেরেষ্টই নেই আমার!

—তুই কত বড় বিবেকানন্দ সব জানা আছে আমার! এখন শুনবি না উঠে যাব?

—না···না বলুন, পরিহাস বোঝেন না? সবকিছুই 'সিরিয়াস' বলে নেন!

—আচ্ছা শোন তার পর···

"ছেলেরা বলত, ওর পানে কেউই তাকায় না, তাই অমনি করে হাঁ হয়ে দেখে। এসব কথা আমার ভাই শুনে এসে বলত আর বকত আমাকে, দিদি, তোর শুদ্ধ বদনাম হয়ে যাবে! বারণ করতে পারিসনে তোর বান্ধবীকে! এদিকে বাড়ীতে ত ভারী পর্দা, আর লোক এলে দরজা-জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলার অভ্যাস দেখতে পাই।"

বললাম—কিন্তু সেই ছেলেটির কি হ'ল বলুন? ও-কথা শুনে তার মনের অবস্থাটা?

"সেটা ভাই বুঝব কি করে! ওর মনে ঢুকতে গিয়েছি আমি! অন্যের মুখে শুনেছি, একটুখানি কথা, কি চোখের দেখা পেলেই সে সুখী হ'ত অথচ যূথী সেটুকুও বিলোতে রাজী নয়। কথা বলত অনাবশ্যক রূঢ়ভাবে, প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিত দড়াম করে। বেচারা শুকনো মুখে ফিরে যেত। যূথীর সম্পর্কে কলেজের ছেলেদের গল্প শুনে অন্তর বেদনায় তিলে তিলে পুড়ত। যূথী বুঝত সবই। তাতে ওর যেন উৎসাহ বেড়েই যেত। আমরা ভাবতাম যূথীর পছন্দ নয় ওকে: নিশ্চয়ই মনের মত হয় নি। এ নিয়ে ত জোর করা যায় না। কিন্তু ভুল! আমার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল। আশ্চর্য্য, আমি ভাবতেও পারিনে একটা মেয়ে কি করে এত স্বার্থপর হতে পারে, শুধু নিজেকে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। নিজের দেহ নিয়ে পরিপাটি পরিচর্য্যার অন্ত ছিল না ওর। দিনে দু'তিনবার সাবান ঘষত। ঘণ্টাখানেক ধরে প্রসাধন করত। শাড়ী-জামার ঘটাপটাও খুব সাধারণ ছিল না। মেয়েরা শাড়ী জামা পরে। নির্ম্মল, তুই জানিস তারা পছন্দ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। অপরের সামনে নিজেদের হীনতা প্রকাশ করে স্বচ্ছন্দ হতে পারে না, যেমনটি তোরা পারিস। তাই তাদের একটু সাজের দরকার। তা বলে আমার সাজ দেখে লোকে হাঁ হয়ে চেয়ে থাকুক—এই ভাবনা নিয়ে যারা সাজে, তাদের আমরা ঘৃণা করি।

যূথীর এই আত্মভালবাসা থেকেই জীবনের প্রতি অত মমতা গজিয়েছিল। ডিগ্রী পরীক্ষার কয় মাস মাত্র বাকী। 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সে'র একটা সদ্য প্রকাশিত বই অন্য জনার কাছ থেকে আনিয়েছি। যূথীরও দরকার। সকালে পাঠাব বলেছি। সেইদিনই ভাইটির খুব জ্বর। ডাক্তার বলে গেলেন টাইফয়েডের মত মনে হচ্ছে। পরদিন যূথীকে বইটা পাঠালাম ঝিয়ের মারফৎ। যূথী ফেরৎ পাঠালে। দরকার নেই তার।

বুঝলি? কাণ্ডটা বুঝলি নির্ম্মল? দমাদম জানলা দরজা বন্ধ করে দিলে আমাদের বাড়ীমুখো। জীবনের উপর কি মমতা দেখ! ঐ চেহারা, ঐ রূপ-যৌবনের জৌলুষ চিরকাল যূথী টিকিয়ে রাখবে এই করে, আর ছেলেদের চোখ ধাঁধিয়ে মনে মনে স্ফীত হয়ে উঠবে! ভারী দুঃখ পেয়ে ছিলাম।

ওদের বাড়ীতে কারও না কারও অসুখ চলেছেই। কঠিন অসুখও করেছে। অথচ আমরা ঘৃণা করিনি। গিয়েছি, এসেছি, খেয়েছি, যা দিয়েছে। কয় মাস আগে যূথীও কি একটা অসুখে পড়েছিল। মাস দুই কলেজ যায় নি। বাড়ীতে আলাদা বিছানা, আলাদা ঘর। ছোঁয়ানাড়ার ব্যবস্থা আলাদা। কি অসুখ জিজ্ঞাসাও করিনি, ভয়ও করিনি। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল এণ্টি-বায়োটিক্স গ্রুপের নূতন ওষুধ চলছে নিয়মিত—এক্সরে, থুথু পরীক্ষা হচ্ছে।

তবু কিছু মনে করিনি। যদি টি-বি হয়েই থাকে হোক না। আজকাল ভয়ের কিছু নেই। ভাল ব্যবস্থা বেরিয়েছে যখন। কিন্তু ওরা সেটা জানতে দিত না। নিজেদের সবকিছু পবিত্র বস্তু ত হবেই। বলত ওর মা; কিছু না···কিছু না, কলেজে রোদে হেঁটে হেঁটে দুর্ব্বলতা। আর আমাদের বাড়ী আসিস না কেন রে তাপসী?

সব সহ্য হ'ত, হ'ত না শুধু এই ভণ্ডামিটুকু। আমাদের কারও সর্দ্দি হলেই টি-বি হয় আর ওদের টি-বি, ক্যান্সার একটার পর একটা হয়ে গেলে কিছুই হয় না। মাঝে মধ্যে রাগ করে যেতাম না কিছুকাল! আবার ভুলে যেতাম। বাধ্য হতাম যেতে। না গিয়ে পারতাম না। মনের কোথায় যেন নিজের নীচতা নিজেকেই বিঁধত বার বার।

ভাইয়ের অসুখ করার জন্য আমাকে বইটা ফেরত দেওয়ায় বেশ লেগেছিল মনে। কি শোচনীয় মনের গতি! মানুষের কি অসুখ করে না! আর করলেও কি কাছে যাবে না কেউ! তাহলে মানুষ বাঁচবে কিসের ভরসায়?

ক'টা দিন গেল না। ভাই ভাল হয়ে উঠল। যূথী পড়ল সেই ঘুষঘুষে জ্বরে। বিকালে জ্বর আসতে লাগল। প্রত্যেক দিন ভোর রাত্রে কমপাউণ্ডার এসে ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন চালাতে লাগল আবার।

আমি তবুও খোঁজ নিতে গেলাম। বললে, কিছু না দুর্ব্বলতা। পরীক্ষার পড়ার চাপে এমনি হচ্ছে। ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন নিলে টি-বির জ্বরটা ছেড়ে যায়, এইটে জোর সুবিধা। সেই সময় তুমুল খাওয়া দাওয়া করতে পারলে শরীরটা অকস্মাৎ মোটা হয়ে পড়ে। আধুনিক টি-বি লোককে রোগা করে না—মেদবহুল করে দেয়।

বাড়ীর দারুন পরিচর্য্যার ফলে যূথীর জ্বর কমল। শরীরটা আশ্চর্য্য রকম সুন্দর হয়ে উঠল।

ওকে প্রথম ধাক্কা দিলে নীলিমা। পরীক্ষার দিন একখানা রিক্সা ডাকা হয়েছিল। ওর মা বললেন, একটাতেই যা না তোরা!

অসুবিধার কথা ভেবে আমি আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু

নীলিমা ফস করে বলে ফেললে, যূথীর অসুখ—আলাদা যাওয়াই ভাল।

নিমেষে যূথীর মুখখানা কি রকম কালো হয়ে উঠল তা আজও ভুলিনি। এতদিন পরকে ঘৃণা করে এসেছে, আজ তাকেও যে কেউ ঘৃণা করতে পারে, ভাবতে পারে নি। ওর মা বললেন, না··· না···ওর এমনকিছু হয় নি···।

নীলি তবু বললে জোর গলায়, তা হোক! আলাদা যাওয়াই ভাল।

তার পর থেকে ও চেঞ্জে চেঞ্জে ঘুরে বেড়ায়। বাপ-মা কাজ করতে দেন না। কাজ করবে কি করে? কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খায় নি কোন দিন। বসে বসে টেবিলে হুকুম করেছে, মা জল দিয়ে যাও ত এক গেলাস।

কাজ করতে গেলেই শরীর খারাপ হয়। এমনিতেই শরীর খারাপ হয়েই আছে।

এতদিন রোগ বা রোগীর স্পর্শ এড়িয়ে থেকেছে। এখন ওর স্পর্শ সবাই বাঁচাতে চায়।

যূথী মাঝে মাঝে বোঝে—সঙ্গে সঙ্গে শ্রাবণের ঘনঘটা ঘনিয়ে আসে মুখে! ভীষণ রেগে যায়। বল তো নির্ম্মল, রাগলে চলে! জগৎটা একটা দাঁড়িপাল্লা। যেমন ওজনের মাল দেবে, তেমনি ওজনেই ফেরত পাবে! দুনিয়ার সবাইকে ঘৃণা করেছে, আজ দুনিয়া ওকে ঘৃণা করে। তবু আছে শুধু ওর চেহারা আর সাজের চর্চ্চা নিয়ে। তোর মত নূতনদের কাছে কলকে পেয়ে নাচতে থাকে! মনের রোগটা সারে নি। লোকে অবাক হয়ে দেখলে জীবনটাকে সার্থক বলে মনে করে। ভালবাসার স্পর্শমণি সোনা করে দেয় যা কিছুকে ছুঁয়ে যায় কিন্তু ওর বেলা উল্টো দেখি। কুৎসিৎ একখণ্ড সীসের মত মনখানা নিয়ে পরমানন্দে আছে। আমার বিশ্বাস একদিন ভুল ওর ভাঙবে। ছুটে তাকে যেতেই হবে, যা ফেলে এসেছে পিছনে কিন্তু সম্ভবতঃ বড় দেরী হয়ে যাবে সেদিন। বার-চৌদ্দ বছর একান্ত তপস্যার ফল যাকে দেয় নি, আবার করে দেবে!

—বুঝলি নির্ম্মল, রূপ দেখে ভুলিস নে, আগে গুণ দেখবি, দেখবি মন আছে কিনা, ঘা দিলে সমব্যথী তার বেজে ওঠে কিনা, তবেই এগিয়ে যাস, নইলে সেই ছেলেটির মত পস্তাতে হবে। বেচারার আজও ধারণা যূথী তাকে ধরা দেবে। কিন্তু যূথী যে কত বড় স্বার্থপর, কত বড় আত্মবিলাসী তা ভাববার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই বেচারার। কি করেই বা বুঝবে! বিবেচনা না করে ভালবাসা আর চোখ-কান বন্ধ করে আগুনে ঝাঁপ দেওয়া একই কথা···।"

"ঐ দেখ! এত রাত্রেও মুখে পাওডার ঘষছে!"

তাপসীদির নির্দ্দেশে চেয়ে দেখলাম দূরে একটা জানালায় উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রঙ-ঝলমলে শাড়ীর অধিকারিণী মুখে কি যেন ঘষছে।

চোখের কোল দুটো ভিজে এল আস্তে আস্তে।

তাপসীদি নীরবতা ভঙ্গ করলেন, কি? আবার আমেজটা চাপল নাকি? বলিস ত ঘটকালিটা সুরু করি?

মুখ ফিরিয়ে বললাম, তাপসীদি! ও আপনি পারবেন না! কাগজ কলমের সঙ্গে যূথীর ঘটকালি করবার একটু চেষ্টা করে দেখব —আশা করি সেখানে সে বাঁধা পড়বে, আমার নামের সঙ্গে!

ইন্দ্রিয়ের অভ্যুদয়

শ্রীমিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক আজ জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য কিন্তু একদিন এরা ছিল না অথচ জীবন ছিল। সে জীবন এক শত কোটি বর্ষপূর্ব্ব ঊষা-যুগের শুধু স্পর্শ ও আহারের জীবন অপর কোন অনুভূতিশূন্য। প্রতিনিধিত্ব করবার জীব এখনও আছে, প্রবাল প্রভৃতি পলিপ গোত্রের প্রাণী। সেই স্মরণাতীত অন্ধবধির যুগ বংশধর রেখে গেছে সাক্ষী দেবার, অনেক প্রাণী আজও বেঁচে আছে যাদের দৃষ্টি শ্রুতি আঘ্রাণ তো দূরের কথা ঠিকমত অবয়বই নেই। স্পঞ্জ জেলিমাছ প্রবালরা এই ধরনের অতি প্রাচীনজাত ইন্দ্রিয়ের ক্রমবিবর্ত্তনের সাক্ষীহিসাবে এরা অদ্বিতীয়। জীবনে অনেক জিনিষই এসেছে প্রয়োজনের তাগিদে, ইন্দ্রিয়রাও তাই। এদের আবির্ভাব জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে, বিবর্ত্তনের ছাপ লাগিয়ে দিয়েছে অঙ্গে। সহস্র সহস্র বছর ধরে প্রথমে অঙ্গ সুগঠিত হয়েছে। তার পর গমনাগমনের ফলে উদ্ভব হয়েছে স্পর্শানুভূতি, শেষে এসেছে অপর ইন্দ্রিয়েরা।

জীবজীবনে গতি ও চলৎশক্তির প্রকাশ দুঃসাহসিকতাপূর্ণ রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার ইতিহাস। এককোষ এমিবার না আছে মস্তিষ্ক না আছে উদর, অঙ্গ তো দূরের কথা, সংগঠিত দেহই বলা চলে না। তবু এ চলে, খাদ্যবস্তু জড়িয়ে ধরবার শক্তি আছে। কতদিন এই অঙ্গহীন জীবনযাপন করতে হয়েছে বলা যায় না, তবে এই আগে পিছে পাশে চলবার অকুণ্ঠ প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি। পরের যুগের বংশধরদের দেখা গেল কয়েকটি অঙ্গের উন্মেষ হয়েছে, এরা পলিপ। এনিমন, কোরাল প্রত্যেকেই শুঁড়সমন্বিত, সেজন্য খাদ্য সংগ্রহ যাতায়াত ইত্যাদি কর্ম্ম সুচারুরূপে হয়ে যায়। এদের উন্নত সংস্করণ তারামাছ, এদের উপর নীচ সম্মুখ পশ্চাতের জ্ঞান

যথেষ্ট, উল্টে দেওয়া হোক কয়েক মিনিটের মধ্যে নিজেকে সোজা করে নেবে। মস্তিষ্ক নেই, আছে কয়েকটি নার্ভ মাত্র আর পেট। শামুক গোত্রের প্রত্যেকেরই মস্তিষ্ক আছে এবং কর্মক্ষেত্রে অল্প-বিস্তর চালনা করে। এ পরিবর্তন কিরূপে সংঘটিত হ'ল? এর উত্তর, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করে বেঁচে থাকবার আপ্রাণ চেষ্টাই তাদের জয়যুক্ত করে তুলল, তারা বহিপ্রকৃতির অবস্থার সঙ্গে নিজেদের যোগ্য করে নিল—দৈহিক পরিবর্তন তার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কথাটা আপাতদৃষ্টিতে অলীক কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে দৈহিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করা যেতে পারে না। মাকড়শা ও গুটিপোকা প্রয়োজনানুসারে দেহাভ্যন্তর থেকে হালকা রেশমের জাল বাহির করে, কোন কোন প্রাণী আশ্চর্য্য বর্ণ পরিবর্তনে সক্ষম, কেউ কেউ আকৃতি পরিবর্তনের উপায় জানে—এ সব পরিবর্তন অবশ্য সাময়িক ও ব্যক্তিগত। দিনের পর দিন ধরে, পলে পলে, তিলে তিলে যে পরিবর্তনের জন্য একাগ্র সাধনা, যার জন্য তনু মন উন্মুখ, সে হ'ল অন্তর্লোকের নিগূঢ় বৈচিত্র্য। দুই-এক পুরুষে বড় পরিবর্তন অসম্ভব, বংশপরম্পরায় এমনকি যুগ যুগ ধরে নিবিড় অনুভূতির গভীরতায় অনবদ্য জীবনব্যঞ্জনায় চলতে থাকে তার কাজ। এ ধারার বিজয়-পতাকা উড়িয়ে চলে সন্তান, পূর্ব্ব সংস্কার বশে।

প্রত্যেক প্রাণীর "ইচ্ছাশক্তির" অস্তিত্ব সুবিদিত। মানুষ এই প্রবলশক্তির ব্যবহার জানে এবং ফলিত মনোবিজ্ঞানে সর্ব্বদা এর ব্যবহার (যথা: সম্মোহন, সংবেশন)। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, জীব যেখানেই বাধা পেয়েছে সেখানেই দৃঢ় প্রবল হয়ে উঠেছে বিজিগীষা। অনেক ক্ষেত্রেই জয়ী হয় নি তথাপি যে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা তাদের অন্তঃকরণে সুপ্রতিষ্ঠিত তার উত্তরাধিকারী করে যায় ভবিষ্যৎ বংশীয়দের, উত্তরাধিকার ব্যর্থ হবার নয়। এক পুরুষ আপনার মানসিক ঐতিহ্য সন্তর্পণে সঞ্চিত করে রাখে পরবর্ত্তী পুরুষের জন্য, তারা আবার নিজেদের ব্যক্তিগত মনঃসত্তা দিয়ে পূর্ব্ব সংস্কারকে* শক্তিশালী করে তুলে জননকোষের ভিতর রেখে যায় অনাগত ভবিষ্যতের নিমিত্ত। এইরূপে জন্ম জন্ম ধরে কোনও একটি বিশেষ ভাব পুষ্টিলাভ করে হৃদয়ের গভীরে, দেহকে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে চলতে হয় সর্ব্বদা, না হলে অবিলম্বে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত।

শরীর ও মনের এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে অভিব্যক্তিবাদের দর্শন: মানসিক বাসনার ভিতর দিয়ে দেহ রূপ পরিগ্রহ করে। জন্ম জন্ম নিরন্তর সাধনার প্রয়োজন এজন্য, সহস্র সহস্র বৎসরে আসে সিদ্ধি। পর্য্যাপ্ত শক্তি সমাবেশ না হলে সমস্ত ব্যর্থ, প্রতিকূল শক্তি অতিমাত্রায় প্রবল হলে সমস্ত নিষ্ফল। ব্যক্তিগত মৃত্যু ঘটা বিশেষ কিছু নয়, অনেক ক্ষেত্রে প্রকারভেদের ফলে জাতি সমূলে উচ্ছেদ হয়ে গেছে। চারিপাশের প্রতিবেশের সহিত তাল রেখে চলতে না পারলে নাশ সুনিশ্চিত। দেখা যাচ্ছে, জীবের যথা অভিরুচি চলবার উপায় নেই, প্রতিবেশের কঠিন নিগড় সর্ব্বদেহে। শীত অধিক হলে দেহকে শীত নিবারণের ব্যবস্থা করতে হবে; উষ্ণ আবহাওয়ায় দেহকে তদুপযোগী করে নিতে হবে। খাদ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বস্থানে প্রয়োজনানুরূপ নয়, সুষ্ঠুরূপে বাঁচবার অধিকার শুধু তাদের, যারা দেহকে উচিতমত চালনা করতে শিক্ষা করে।

জীবজীবনের প্রথম পর্য্যায়ে যে সকল প্রাণী গতিশীল হয়ে উঠল তাদের অঙ্গ ছিল না, সূক্ষ্ম রোমে আবৃত ছিল দেহভাগ, এই রোমরাজির সাহায্যে এদের যাতায়াত—মাংসপেশী তখনও সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। সৃষ্টির প্রাচীন প্রাণীরা প্রত্যেকে অদ্ভুতভাবে যাতায়াত কৌশল আয়ত্ত করেছে। জেলিমাছ, অক্টোপাস, কাটল-মাছ প্রত্যেকেই চলে পিছন দিকে অর্থাৎ মাথা মুখ যে দিকে তার উল্টো দিকে। জেলিমাছের ছাতা কুঞ্চন ও বিস্তারের সময় যে জল ত্যাগ হয় তার বেগ ঠেলে দেয় পশ্চাতে। গমনাগমনের এই আদিম রূপ থেকে নানারূপ বিবর্তনের ভিতর দিয়ে অনেকে বর্ত্তমানে দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। স্থলচর প্রাণীর মধ্যে শিকারী চিতাবাঘ হ'ল সবচেয়ে দ্রুতগামী, বেগ ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল; মৃগ পঞ্চাশ মাইল, দৌড়বাজ ঘোড়া পঁয়তাল্লিশ, মানুষ বিশ মাইলের অধিক দ্রুত দৌড়তে পারে না।

আকাশমণ্ডলে প্রথম দেখা দেয় পতঙ্গকুল। পঁচিশ কোটি বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গার স্তূপে আঁকা রয়েছে তার অনবদ্য পরিচয়।

আকাশ-অভিযান কিরূপে আরম্ভ হ'ল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। বর্ম্মধর ছোট ছোট চিংড়ি জাতীয় জীবের লাফা-লাফি ছটফটানি ও তড়বড়ানি অনেকক্ষণ ধরে শূন্যভাগে থাকবার উপায় উদ্ভাবন করেছিল—একে দুঃসাহস নামে অভিহিত করা যায়। এই শঙ্কাহীন কার্য্যমনকে নূতন উদ্যমে অনুপ্রাণিত করে কালক্রমে পক্ষের উদ্ভব করে নিয়েছিল। সেজন্য আদিম পতঙ্গকুলের দেহে দু'জোড়া তিন জোড়া অবধি পক্ষোদ্গম হয়েছিল সে যুগে। এদের পক্ষ মেরুদণ্ডীর পক্ষের ন্যায় রূপান্তরিত হস্ত নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অঙ্গ। সে সময় অঙ্গ-সংগঠন সম্পূর্ণই হয় নি। সেজন্য রূপান্তরের ব্যাপার আসে নি। পতঙ্গদেরও আকাশে একাধিপত্য বেশীদিন চলেনি। কারণ দেহ ক্ষুদ্র হওয়ায় দহনশক্তি অল্প এবং এরা বিশেষ ভাবে শীত-কাতর, বেশী উঁচুতে উড়তে পারে না ও শীতকালে জীবন শেষ। মেরুদণ্ডী আকাশে উড়েছে এই সেদিন, তার বহু পূর্ব্বেই পতঙ্গকুল উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করেছে তবে এক বিষয়ে পাখীরা

---

* কুলস্মৃতির প্রভাব মানসিক জীবনে বিপুল। 'অফুরন্ত জীবনীশক্তি নূতনের সূত্রপাত করেছে বারংবার, যুগে যুগে তার অনির্ব্বাণ শিখা বিবর্তনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রাণিমনকে শক্তিশালী সঞ্জীবিত করে তুলেছে, জন্ম দিয়েছে নূতন নূতন প্রবৃত্তির, দিকে দিকে নব নব জীব-জগতের করেছে সৃষ্টি। মানসিক অভিব্যক্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রয়েছে কুলস্মৃতি, প্রাণ দিয়েছে তাকে, দিয়েছে ভাষা—কুলস্মৃতি ছাড়া অভিব্যক্তি অর্থহীন।' লেখকের 'কুলস্মৃতি', বার্ষিক আনন্দবাজার, ১৩৫৭।

আজও তাদের পরাজিত করতে পারে নি। সে হ'ল দ্রুতগতি। এক প্রকারের মাছি আছে যারা ঘণ্টায় আট শত মাইল বেগে ওড়ে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের অভ্যুদয় যে জীবজীবনের উষাকালে ঘটেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বহির্বিশ্বকে অনুভব করতে, প্রতিবেশকে অন্বেষণ ও অধ্যয়ন করতে অদ্বিতীয় এই ইন্দ্রিয় (চক্ষু)—সকল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মূল। চক্ষু নেই অথচ আলোয় সাড়া দেয় এমন প্রাণীও আছে যেমন, সেটেনটুব ; টিউব কৃমি থাকে জলতলে, চক্ষু বলে কিছু নেই, আছে কেবল আলোকানুভূতি-প্রবণ অসংখ্য চিহ্নস্থল। অনেক কৃমিই দৃষ্টিশক্তি হতে বঞ্চিত নির্মমভাবে। জলজ এককোষ প্রাণীদের কারও চক্ষু নেই কিন্তু সকলেই অল্প বিস্তর আন্দাজ করতে পারে আলোর উপস্থিতি, দৃষ্টির সূত্রপাত এই স্তর হতে, ক্রমোন্নতি হয়েছে জীবজগতের অগ্রগতির সঙ্গে। শামুক সম্প্রদায় জীবজগতের নীচের দিকে অবস্থিত হলেও চক্ষু বেশ উন্নত। গেঁড়ি গুগলীদের চক্ষু থাকে শুঙ্গের অগ্রভাগে ; কাটল মাছ ও অক্টোপসের চক্ষুদ্বয় বিশাল লেন্সের তৈরী। স্কুইডের চক্ষু উপরের দিকে উঠান টেলিস্কোপের মত। কীটকুলের নেত্র গঠিত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে। বহু প্রজাপতির চক্ষের লেন্স প্লেট সহস্রাধিক। মাছির দুই নয়নে ২০,০০০ লেন্স। তাই বলে এরা বস্তুর সহস্রাধিক প্রতিচ্ছবি দেখে না, মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছয় সঙ্কলিত হয়ে। দুই নেত্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত আর একটি নয়নের অস্তিত্ব জানা গেছে। রাজা কাঁকড়ার মস্তকে ও নিউজিল্যাণ্ডের এক প্রকারের গিরগিটির ভিতরে এইরূপ ত্রিনয়ন দেখা যায়। তবে এক্ষেত্রে তৃতীয় চক্ষুটি ব্যবহারহীন। মাকড়সার অষ্ট নয়নের কথা সুবিদিত, আটটিই সমান ভাবে ব্যবহৃত।

স্পর্শ ও শব্দের প্রভাব জীবজীবনকে উন্নতির পথে অগ্রসর করেছে বহুল পরিমাণে। উত্তরকালে এই দুই ইন্দ্রিয়ানুভূতি পৃথক ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হলেও এদের মূল যে এক তা কীট-পতঙ্গের দৈনন্দিন জীবন হতে অনুমিত হয়। বিছা-মাকড়সারা কর্ণ বিরহিত হলেও শুনতে পায় না এমন নয়! ঝিঁঝিপোকা উচিংড়ে ফড়িং স্তব্ধ নিশীথে পল্লীর জনবিরল পথে আসর জমিয়ে রাখে। এ ধ্বনি যে মুখবিবরজাত নয় তা সকলেই জানেন। মেরুদণ্ডীর (বিশেষতঃ উভচর) নীচে কোন জীবের স্বরযন্ত্র (ল্যারিংস্ক) নেই। উরু ও পক্ষের আচ্ছাদন ঘর্ষণে ধ্বনির উৎপত্তি এবং অচিনপ্রিয়ার উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ এর প্রকৃত লক্ষ্য। প্রণয়দৌত্য নিষ্ফল হয় না, যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছয়, শ্রুতি নেই কিন্তু জানুর নিকট এ ধরনের সংবাদ গ্রহণক্ষম যন্ত্র আছে। সমজাতীয় কীট নিঃসৃত শব্দতরঙ্গ বহন করে আনে হৃদয়ের সংবাদ। সে সংবাদ স্বীকৃত হয়, কীটবধূ সাড়া দেয়, অভিসারে চলে। অপর কোন আওয়াজের প্রভাব আছে বলে বোধ হয় না। যে সকল জীবের শব্দ করবার ক্ষমতা আছে তারা প্রত্যেকেই শব্দ গ্রহণ করতেও পারে। তবে নিম্নস্তরে জীবদের ধ্বনি আদিম-প্রবৃত্তির আবেদন ভিন্ন আর কিছু নয়, অপর কোন প্রকার ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা শিক্ষা তারা করে নি। বিশাল সমুদ্র নিস্তব্ধ কলকোলাহলশূন্য, এই সাধারণের ধারণা, এ ধারণা ভুল। জলধি গর্ভে প্রেম ও প্রণয়—গীতিরবের সমারোহ শোনা যায় মাঝে মাঝে, কাঁকড়া চিংড়ি ও অন্যান্য কবচী প্রাণীরা এ আসরে গায়ক ও সমঝদার শ্রোতা দুইই। লম্বা শুঙ্গ ওষ্ঠে ঘষে চিংড়িরা যে নাদ উৎপন্ন করে কয়েক ফ্যাদম তার গতি। আবার গলদা চিংড়ির পায়ের রোম শ্রবণক্ষম, শব্দ তরঙ্গ জড়ো হয় এসে, সেখান থেকে সারা দেহে ছড়ায়।

স্পর্শের প্রভাব যেমন শ্রবণ ও শব্দ যন্ত্রকে জন্ম দিয়েছে—স্বাদের সঙ্গে তেমনি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ গন্ধের। প্রাণী গতিশীল হয়ে উঠলে বাসস্থানের পরিধি গেল বেড়ে, অনুভূতি কেবল স্পর্শের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল-না শব্দ-তরঙ্গকে স্পর্শ করে বিচার করবার চেষ্টা করতে লাগল, ধ্বনির জন্ম সেইক্ষণে। গন্ধের উদ্ভবও এই মত। গতিশীল জীবনপ্রবাহে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের অবসান ঘটায় আদান-প্রদানের যখন প্রয়োজন হ'ল একান্তভাবে সেই আবশ্যকীয় অবসরে ঘ্রাণশক্তির উদ্ভব, প্রিয়-সম্মিলনকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, জীবজীবনের অগ্রগতিতে যার অবদান প্রচুর। পতঙ্গের জীবনে গন্ধের প্রভাব বড় অল্প নয়, কারণ প্রত্যেকেরই একজোড়া শুঙ্গ থাকে ও আঘ্রাণশক্তি অবস্থিত এই শুঙ্গে।

অমেরুদণ্ডী জগৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিশিষ্ট অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি থাকা সত্ত্বেও উন্নতি করতে পারে নি কারণ এদের মস্তিষ্ক নেই। নিচের অনেকেই স্পঞ্জ, হইড্রা, 'পোর্টুগীজ যুদ্ধ জাহাজ' এনিমন, কৃমি, জোঁক প্রভৃতি মস্তকহীন, কারো কারো দুই একটি নার্ভ থাকে মাত্র। মস্তকের অভ্যুদয় শামুক সম্প্রদায় থেকে এবং এদের সকলকে উন্নত বলতে দ্বিধা হলেও ঠিক 'অনুন্নতর' কোঠায় ফেলা চলে না। তবে সুনির্দিষ্ট নার্ভ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের অভাবে দেহযন্ত্র সুসংবদ্ধ নয়, অনুভূতি জমাট বাঁধে নি। বিশ্বপ্রকৃতির পরীক্ষাগারে উৎকর্ষের গবেষণায় দেখা গেল শামুকদের সঙ্গে আর একদল উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে সাড়াশীর মত দাড়াসংযুক্ত ৬" ইঞ্চ আয়তনের ভীষণাকার কর্কট জাতীয় প্রাণী। নিরীহ কোমলদেহ কণ্টকচর্ম্মী তারামাছ ও সামুদ্রিক আর্চিনের গোষ্ঠী সম্ভূত। বর্তমানে সমতল-ভূমি পর্ব্বত অরণ্যকান্তারে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় কর্কট ও বিছা জাতীয় মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। পুরাতনকালে সিলুরীয়ান ও ডিভোনীয়ান স্তরে রয়েছে এদের অস্তিত্ব—গঠনে অধিক পরিবর্তন হয় নি। 'রাজা-কাঁকড়া' নামে এই শ্রেণীর যে জীব আজকাল পাওয়া যায় তারা একটু উন্নত। জীববিদেরা বলেন যে, আধুনিক স্থলচর কর্কট মাকড়সা বিছা ইত্যাদি প্রাণীর এরা পূর্ব্বপুরুষ।
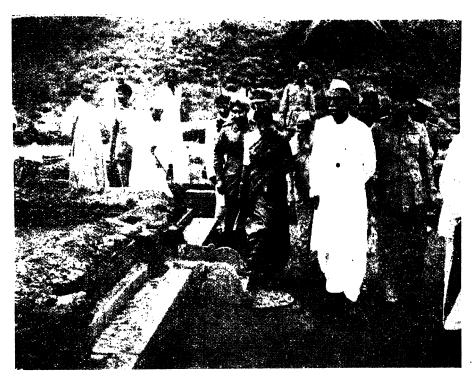
রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে হায়দরাবাদে নাগার্জুনকোণ্ডার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য্য দেখানো হইতেছে। স্থানটি প্রাচীনকালে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল।

ডেনমার্কের পার্লামেণ্ট ভবনের সম্মেলনকক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু ও ডেনমার্কের পার্লামেণ্টের চেয়ারম্যান মিঃ গুস্তাব পেডারসেন
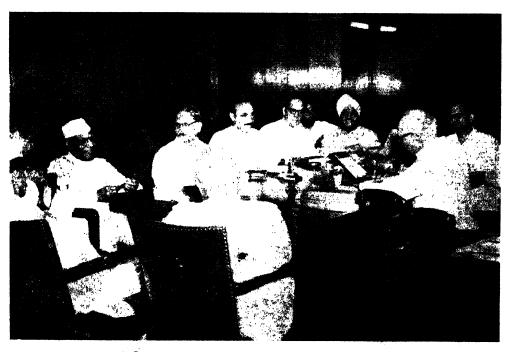
প্রধানমন্ত্রী শ্রীজবাহরলাল নেহরু দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করিতেছেন

শ্রীদীপক চৌধুরী

"লেখকের বিবৃতি"

এক

"ঠিক শুনেছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"আবার বল্ ত—"

"মাসীমা বললেন, ষষ্ঠীর চাকরির কোন দরকার নেই—"

"আর কি ?"

"ও যা করছে তাই করুক।"

"তার পর ?"

"ষষ্ঠীর প্রায়শ্চিত্তের দরকার আছে।"

"বলরাম—"

"ষষ্ঠীদা—"

"না থাক।"

বলরামের হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে ষষ্ঠী দত্ত নিজের মুখের ঘাম মুছল। ফাল্গুন সুরু হয়েছে, বসন্তের ঝিরঝিরে হাওয়ায় একটু আরাম লাগবারই কথা। কিন্তু ষষ্ঠী দত্ত ঘামতে লাগল অপরিমিত ভাবে। খানিক বাদে গামছাটা নিঙড়োতে নিঙড়োতে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "মন্দিরটা এবার শেষ হলেই কাজ ফুরোবে।"

"গামছাটা আমায় ফিরিয়ে দাও ষষ্ঠীদা, পুরনো হয়েছে ত। বাঘা যতীন কলোনীর ভোলাদার কথা মনে আছে তোমার ? ওই যে গো, যার ঘরের খুঁটিগুলো সব মাথায় করে বয়ে এনেছিলাম ? ভোলাদা গিয়েছিল হাওড়া-হাটে। ফেরবার মুখে আমার জন্যে গামছাটা কিনে নিয়ে এল। ভোলাদা দিলখোলা লোক, দান-খয়রাৎ না করতে পারলে পঁচিশ টাকা মণের চাল পর্যন্ত তার হজম হয় না। যাদবপুর পোস্ট আপিসে পিয়নের কাজ করে। গামছাটা আমায় দান করে দিয়ে বলল, চ' আমার পোস্ট আপিসে কাজ শিখবি—"

এই [illegible] বলরাম দাঁত দিয়ে ডান হাতের নখ কাটতে লাগল। [illegible]

[illegible] ষষ্ঠী দত্ত [illegible] [illegible] দেখি [illegible]

"[illegible] [illegible] নাপিতকে পয়সা দেব না কি ? দেখছ না, হাত-পায়ের নখ সব কত লম্বা হয়েছে ? গান্ধী কলোনীর দিগম্বর নাপিতকে চেন ? রিফিউজী। রক্ষিতের মোড়ে কাল দেখা হ'ল। বললাম, দিগুদা, এই দেখ হাতের কি হাল হয়েছে। নরুণটা একটু ছুঁইয়ে দেবে ? আমার হাতের দিকে চেয়ে সে বললে কি জান ? বললে, 'নরুণ নেই। তা ছাড়া লোহার নরুণ দিয়ে তোর নখ কাটা চলবে না, বিলেতী ইস্পাত চাই।' এই বলে দিগুদা সিল্কের পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকলো। ভাবলাম, ইস্পাত বার করছে বুঝি, তা নয়, সিগারেটের বাক্স বার করল একটা—কাঁচি। আকাশের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে দিগুদা বললে, 'সরকারী আপিসে চাকরির খোঁজে যাচ্ছি, তুই যাবি ?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'জাত ব্যবসা ছেড়ে দিলে নাকি ?' ভেংচে উঠে দিগুদা জবাব দিল, 'জাতের কথা তুলিস নি, সরকারী পয়সা সবাই খাচ্ছে। বামুন রিফিউজীও খাচ্ছে, আমরাও খাচ্ছি। বলরাম, শ্রেণীসংগ্রাম বড় সোজা কথা নয়। যাবি ত চল।' আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা আমার নখের কি হবে ?' রাস্তার ওপাশে গিয়ে দিগুদা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'মন্ত্রীদের বাড়ী যা, আপিসে যা, তাঁদের আড্ডায় যা, গিয়ে তাঁদের খামচে দিগে যা।' ষষ্ঠীদা তুমি ত আমার একটা কথাও শুনছ না—"

"শুনছি না ? তুই ত যাদবপুর পোস্ট আপিসে কাজ শিখতে যাচ্ছিলি রে ছোঁড়া।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভোলাদা নিয়ে গেল। বললে, 'আজ অনেক পার্শেল বিলি করতে হবে। বুড়ো হয়ে গেছি বলরাম, গামছাটা মাথায় বেঁধে নে। তার পর এই পার্শেলগুলো মাথায় তোল।' তুললাম, বেলা একটা পর্য্যন্ত তার পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালাম। নাঃ, ওজন তেমন বেশী ছিল না। কিন্তু রোজই দেখি ভোলাদা আমার মাথায় মোট চাপাতে লাগল। একদিন বাঘা যতীন কলোনী থেকে কেটে পড়লাম। গামছাটা এবার আমায় ফিরিয়ে দাও ষষ্ঠীদা। সাড়ে [illegible] আনার গামছা দিয়ে কি অত ঘাম মোছা যায় ?"

[illegible] ভাবে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "মাসীমা তা হলে সবই জানেন। [illegible] আগের [illegible] কি তিনি দেখতে পেয়েছেন। বলরাম—"

"ষষ্ঠীদা—"

"কোনদিন আমি যদি মরে যাই—"

বাধা দিয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "মরে যাই মানে কি ?"

"শ্মশানে গিয়ে পুড়ে যাওয়া। রিফিউজীর বাচ্ছা, শ্মশান দেখিস নি ?"

"না।"

"দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। গায়ের মাংস, চামড়া, হাড় সব ছাই হয়ে যায়। নাভিটা শুধু বদমাইসি করে গোঁ ধরে থাকে।"

"ঈশ!" দাঁতের ফাঁক থেকে সবচেয়ে লম্বা আঙুলটা নামিয়ে ফেলল সে, "তার পর কি হয় ?"

"তার পর আর কিছু হয় না। যত গোলমাল সব তার আগে। যারা পাপী তাদের দেহ সহজে পুড়তে চায় না। আগুন হচ্ছে গিয়ে সর্ব্বভুক। কিন্তু পাপীর দেহ খেতে আগুনেরও জান কাবার। শ্মশানবন্ধুরা তখন বাঁশ দিয়ে ঘন ঘন গুঁতো মারতে থাকে—"

"ঈশ!"

"ঈশ কি রে বলরাম ?"

"হ্যাঁ, ঈশ—আমি শ্মশানে যেতে চাই নে ষষ্ঠীদা।"

"যাবি নে কি, তোর ঘাড় যাবে। তোর বাপ গেছে, মা গেছে, তোকেও যেতে হবে।"

"বড্ড ভয় করছে—"

বিড়ি ধরিয়ে ষষ্ঠী দত্ত বলল, "ভয় নেই। পাপ করিস নে কখনও। আর তোদের ভয়টাই বা কিসের ? তোরা রিফিউজী গোটা সংসারটাই তোদের কাছে শ্মশান। সাড়ে ছ'আনার গামছা পরে ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছিস।"

কি একটা কথা মনে পড়ল বলরামের। গামছাটা নিয়ে সে নেমে গেল খালের দিকে। খালের মাটিতে বলরাম আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করল একটা। চারদিকে অল্পস্বল্প জল যা ছিল সব এসে গড়িয়ে পড়ল গর্তের মধ্যে। তার পর সে গামছাটা জল দিয়ে ধুয়ে চিপড়ে উঠে এল ওপরে। এসে বলল, "কাল আমি গামছা প'রে শুতে গিয়েছিলাম। ষষ্ঠীদা, জান আজকাল ভোর রাত্রির দিকে স্বপ্ন দেখি আমি ? সমস্ত শরীরটা যেন কেমন করে ওঠে! আগে কিন্তু এমন স্বপ্ন দেখতাম না ষষ্ঠীদা। রাত্রিবেলা তপাদির ঘরে যেতেও ভয় করে।"

"কেন ?" ষষ্ঠী দত্তর বিড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

"সেদিন রাত্রিবেলা তপাদি আমায় ডেকে পাঠালেন। দেখলাম বিছানায় তিনি শুয়ে আছেন—" বলরাম থেমে গেল।

বিড়ির টুকরোটা খালের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ষষ্ঠী দত্ত প্রশ্ন করল, অনেকটা শেষ প্রশ্নের মত, "আর কি দেখলি ?"

"তপাদি কি সুন্দর!"

আলোচনা শেষ হ'ল। দু'জন রাজমিস্ত্রি এসে সামনে দাঁড়াল। একজন বলল, "বাবু আমরা এবার নাস্তা খেতে যাচ্ছি। এক ঘণ্টা বাদেই আবার ফিরব। আর এক বস্তা সিমেণ্ট আনিয়ে রাখলে ভাল হয়।"

ষষ্ঠী দত্ত আর বলরাম এক সঙ্গেই গোয়ালের দিকে দৃষ্টি ফেলল।

সরকার-কুঠির পুরনো মাটিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করছে মেক-আপ ম্যান ষষ্ঠী দত্ত। সেই দিকে চেয়ে বলরাম জিজ্ঞাসা করল, "কি মূর্তি কিনবে ? কালীমূর্তি কিন্তু কিনো না ষষ্ঠীদা।"

পরের দিনও সুতপা হোটেল থেকে বাইরে বেরুল না। ছুটির মেয়াদ শেষ হতে এখনও বিলম্ব আছে। সুতপা ভেবেছিল, কাল যখন মহীতোষ আসে নি, আজ নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু কই বেলা ত প্রায় শেষ হয়ে এল মহীতোষ এল কই ? যাকে এতকাল অতি সহজেই হাতের মুঠোতে পাওয়া গিয়েছিল, তাকে অনুরোধ করেও এখন আনানো যাচ্ছে না। তবে কি কমরেড হওয়ার দায়িত্ব সে নিতে চাইছে না ? সুতপা নিজের ইচ্ছেতেই মহীতোষকে সেদিন "কমরেড" বলে অভিবাদন করেছিল। ভেবেছিল, পৃথিবীতে অন্ততঃ একটা মানুষের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে, যে ওকে সাহায্য করতে চায়। বিশ্বাস জন্মেছিল, ওর মুখের অন্ন কেড়ে নেবার জন্যে মহীতোষ কোনদিনও চেষ্টা করবে না। করেও নি।

গত কয়েকটা দিনের ছোটখাটো অনেক ঘটনাই ওর মনের মধ্যে এসে ভিড় করতে লাগল। চাকরী থেকে বরখাস্ত করবার জন্যে বড়বাবু কি ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কাজের ত্রুটি তার কোনদিনই হয় নি। যতখানি মনোযোগ দিয়ে সুতপা এ যাবৎকাল আপিসের কাজ করছে ততখানি মনোযোগ ভাড়াটে লোকের থাকে না। তবু সে বড়বাবুকে খুশী করতে পারে নি। কেন পারে নি ? ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে সুতপা শাড়ির আঁচলটা টেনেটুনে বুকের ওপর তুলে দিতে লাগল। ভেতরটা ওর কেউ দেখতে পায় নি—এমনকি লালু সরকারও না।

শয়নকামরার জানালাটা খুলে দিল সুতপা। জানালার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সে। বিকেলের সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিম-আকাশে। রৌদ্রের তেজ আর নেই। বুড়ো আম গাছগুলোর পাতার ফাঁক দিয়ে যেটুকু রোদ এখনও ঘাসের

ওপর ছড়িয়ে রয়েছে তার আয়ুও প্রায় শেষ হয়ে এল। মহীতোষ অসুস্থ হয়ে পড়ে নি ত? কি জানি, আয়ুর নিশ্চয়তা মানুষের এত বেশী কম যে, ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করা চলে না—মুহূর্তের নির্ভরতাও ধোপে টিকতে চায় না, কোন কিছু আশা করাই ভুল।

ভবিষ্যতের কোন আশাই সুতপার নেই। আশা করার অর্থই হচ্ছে নিরাশার আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া। মানবজীবনের সত্য যদি খুঁজতে যাওয়া যায়, তা হলে অসত্যের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হবেই। মানুষ যেদিন জন্মেছে সেই দিনই মরেছে। চতুর্দিকের তথাকথিত সত্যের সঙ্গে বিযুক্তি ঘটেছে তার। ঘটতে বাধ্য। তার নিজের সত্তার সঙ্গে কি সত্তা-হীনতার সংঘর্ষ নেই? আছে, ছিলও এবং থাকবেই।

আরও একটু নিচু হয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল সুতপা। কাঠের ফ্রেমের ওপর বুকের ভার নামিয়ে রাখল সে। ভেতরের সত্য গোপন থাক। বাইরে থেকে যারা যা দেখল তার সিকি ভাগও সত্য নয়। সত্যের অবয়বে জখম-চিহ্নের সংখ্যা তারা গুণতে পারে নি।

না, মহীতোষ আজও এল না। প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হোটেলের পরিবেশে নিশ্বাস টানতে হ'ল। বাইরে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সুতপা। ছোটসাহেবের সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। তিনিও ষোল আনা ভারতীয়। ভারত ভক্তির বক্তৃতা তাঁর মুখেও কম শোনে নি সুতপা। কিন্তু পা দিয়ে মাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা তিনিই বা কম করলেন কি? লক্ষ্মণ গয়লার পায়ের সঙ্গে তাঁর পায়ের কোন তফাৎ আছে কি? উত্তেজনায় সুতপার দেহ ক্রমশঃই গরম হতে লাগল। জেটমলের এতগুলো টাকা ডাক্তারদের পকেটে তুলে দিয়েও সে এক রত্তি গরম হতে পারে নি—আজকে সে ভিজিট না দিয়েই গরম হচ্ছে! বিস্মিত বোধ করল সুতপা, বিস্ময়ের মূলে গিয়ে পৌঁছতে চাইল সে।

ঠাণ্ডা দেহের মূলে বোধ হয় লালুদাই ছিল। সরকার-কুঠির সেই রাত্রিটার কথা মনে পড়ল ওর। লক্ষ্মণ গয়লার খাটালের পেছন দিকের নোংরা পথ দিয়ে সে ছুটে এসেছিল লালুদার সঙ্গে দেখা করতে। দেশভক্তির টানে সে আসে নি। কুমারীজীবনের সবটুকু আকাঙ্ক্ষা সেদিন যেন ওকে টেনে নিয়ে এসেছিল রক্তিতের মোড় থেকে। অভিসারিকা শ্রীরাধার মনের খবর ওর জানা নেই, কিন্তু সুতপা জানত, লালুদাকে ওর চাই। লুকিয়ে বিয়ে করার প্রস্তাব সে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। দেহের প্রার্থনা সে মঞ্জুর করাতে চেয়েছিল লালু সরকারকে দিয়ে। তার পর হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল! ভোররাত্রির হাওয়া ওর গায়ে লেগেছিল। শীত শীত করতে লাগল—খানিকবাদে মনে হ'ল, প্রতিটি রোমকূপে কাঁপন উঠেছে। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! যজ্ঞের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ওপর যেন বারিপাত হ'ল। অনুষ্ঠানের বিরাট আয়োজন নষ্ট হতে এক মিনিটও লাগল না। সুতপার দেহে কি সেদিন অশ্বমেধযজ্ঞের বিরাটত্ব ছিল না? আকাঙ্ক্ষার অশ্বটি সেদিন লালু সরকারও রুখতে পারত না। কিন্তু? কিন্তু কি এক ঠাণ্ডা অসুখের বরফ নিয়ে বাড়ী ফিরল সে। মন আর দেহ দুটোই একসঙ্গে জমাট বেঁধে গেল—ভাসতে লাগল এক খণ্ড হিমশৈলের মত। পাপপুণ্যের প্রশ্ন লোপ পেল সুতপার মন থেকে। সুতপা শুধু সমাজের 'ভিকৃটিম' নয়, 'ভিকৃটিম' সে দেশপ্রেমেরও। মহীতোষ ওর সবটুকু দেখতে পায় নি, হয় ত ক্রমে ক্রমে দেখবে। অস্তিবাদীর সচেতন-অভিজ্ঞতার শূন্যতা স্পর্শ করবে মহীতোষকেও।

বড় ফটক দিয়ে প্রবেশ করলেন ডাক্তার মিত্র। রতনের আজ ইনজেকশন নেওয়ার দিন। বোধ হয় সেই জন্যেই সুতপা এতক্ষণ বাইরে বেরোয় নি। মহীতোষ এল না বলে সে নিশ্চয়ই সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘরে বসে থাকত না। হয় ত সারাটা দিন সে নিজের মনকে ভাঁওতা দিয়েছে। ছিঃ, সুতপা কেন মহীতোষের এতটা সময় নষ্ট করতে যাবে? মহীতোষ ওর কে? কেউ কারও নয়। মহীতোষ কি চায়? মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে চায়। মানুষ আর ভেড়ার পালের মধ্যে তফাৎ রাখতে চায় না মহীতোষ। মানুষের দল গড়বে সে। হুঁঃ নেই কাজ ত খই ভাজ! ড্রয়ার খুলে সুতপা দেখল, খই যা আছে তাতে ডাক্তারকে পুরো ভিজিট দেওয়া চলবে না, ধার করতে হবে। ধার কেবল ষষ্ঠীদার কাছেই পাওয়া যায়। ষষ্ঠীদাই শুধু ধার দিয়ে ফেরত চায় না। সুতপা নেমে এল একতলায়।

ডাক্তার মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে সুতপা যখন ওপরে উঠে এল রতন তখন ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। রতনকে পায়চারি করতে দেখে চমকে উঠল সুতপা। রতন কি আরোগ্য হয়ে উঠল নাকি? টি-বি রোগ থেকে আরোগ্য হওয়া মানে কি নতুন রোগের জন্যে অপেক্ষা করা নয়? এই ত ভাল ছিল রতনের, রোগের নির্দিষ্টতা ছিল—জানা ছিল রোগটা টি-বি। যারা ভোগে, অথচ জানে না কি রোগে ভুগছে, তাদের কষ্ট কি সবচেয়ে সাংঘাতিক নয়? এমন রোগীর সংখ্যাই ত পৃথিবীতে বেশী।

ডাক্তার মিত্র একটুও অবাক হলেন না। মুখে তাঁর জয়ের হাসি। টেবিলের ওপরে দৃষ্টি ফেললেন তিনি। বড় একটা এলুমিনিয়ামের ডেকচিতে নানারকমের ফল রয়েছে। ফলের রং দেখে তিনি বললেন, "বিদেশী ফল। এমন সুন্দর আর টাটকা ফল আমাদের মাটিতে জন্মায় না। আমি ত

আগেই বলেছিলাম, ভাল করে খেতে পেলে ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠবে।"

সুতপা আঘাত পেল। তাই সে বলল, "দুশো' টাকা ত মাইনে পাই। তাও বিলেতী কোম্পানী বলেই পাই। তা থেকে ডাক্তার, ওযুধ আর দুধের টাকা বাবদ শ'খানেক টাকা খরচ হয়ে যায়। বাকি টাকায় হোটেল খরচও কুলোয় না।"

"আপনার মাইনে বাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ডাক্তার। আমি আমার নিজের শাস্ত্রের কথাই জানি। ছেলেটাকে ভাল করে খেতে দিচ্ছেন, ইঞ্জেকশনও পড়ছে নিয়মিত—"

সুঁচের মুখ দিয়ে ওষুধ টানতে টানতে ডাক্তার মিত্রই আবার বললেন, "সাত দিন আগে যে প্লেটটা নিয়েছিলাম, তাতে দেখলাম, রতন অনেকটা ভাল হয়ে উঠেছে—প্যাচ কমে আসছে। দেখি বাবা রতন, কোমর থেকে কাপড়টা নামিয়ে দাও ত। আরও নামাও, দিদির সামনে লজ্জা কি ?"

সুতপা বলল, "কিন্তু, দেখুন—রতন ফল খাচ্ছে ত আজ সকাল থেকে। মাত্র গোটাদুই ফল খেয়েছে—"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল ফল দুটো করেই খেলেই চলবে। হজমশক্তি বাড়ুক তার পর দেখা যাবে।" রতনের উরুর চামড়ায় স্পিরিট ঘষতে লাগলেন ডাক্তার মিত্র।

ইনজেকশন দেওয়া শেষ করে ডাক্তার মিত্র বললেন, "দু' সপ্তাহ পরে আবার একটা প্লেট নেব। এসব অসুখে খরচ একটু বেশীই লাগে। উপায় কি বলুন ?"

কোমরে গিঁট বেঁধে রতন বলল, "দিদি, কাল ত ক্যাপটেন সাহেব এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চাও না ?"

"ধারের টাকায় বাঁচতে ইচ্ছে করে তোর রতন ?"

"আমি ভাল হয়ে উঠলে চাকরি করব। মাইনের টাকা থেকে ধারের টাকা সব শোধ করে দেব।"

"চাকরি করার মত খারাপ রোগ—ডাক্তার মিত্র, এই যে আপনার ভিজিটের টাকা।" সুতপার কাগজের টাকা ক'টা এগিয়ে ধরল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার মিত্র টাকাগুলো হাতে নিয়ে পকেটে রাখলেন না, একটা লেফাপা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তিনি—লেফাপার মধ্যে ভরে রাখলেন ভিজিটের টাকা। তার পর লেফাপাটা গুঁজে রাখলেন ডাক্তারী ব্যাগটার ফ্ল্যাপের মধ্যে। টি-বি রোগের বীজাণুকে ভয় পান না এমন ডাক্তার কলকাতায় নেই। যাওয়ার আগে ডাক্তার মিত্র বলে গেলেন, "রতনের অবস্থার যে রকম দ্রুত উন্নতি হচ্ছে তাতে মনে হয়, মাসখানেক পর ওকে কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাতে হবে।"

স্বাস্থ্যকর জায়গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে রতনের বোধ হয় তন্দ্রা এল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সুতপা বেরিয়ে এল বাইরে, নিজের ঘরে। ঘড়িতে সময় দেখল। ছ'টা বাজতে এখনও বিশ মিনিট বাকি। স্নানঘরে ঢুকে পড়ল সে। চটপট স্নান সেরে বেরিয়ে পড়তে পারলে সাতটার মধ্যে দেওদার স্ট্রীটে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। পৌঁছনো দরকার। শ্যামনগরে বদলি করবার ক্ষমতা ছোটসাহেবের হাত থেকে ফসকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষমতা লোপ পেলে হয়ত তিনি খুবই অপমানিত বোধ করবেন। একটা সই বসিয়ে দেওয়ার গর্ব তাঁর থাক। সুতপা ছাড়া আর কেউ ত ছোটসাহেবের গর্বটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

সবিতা দেবী দেওদার স্ট্রীটের বাড়িতে ছিলেন না। শ্যামবাজারে বাপের বাড়ি গেছেন। দু'দিন সেখানে থাকবার কথা। আগামীকাল খুব ধুমধাম করে কি একটা পুজো হবে সেখানে। দেওদার স্ট্রীটে পুজো-পার্বণের সুবিধে কিছু নেই। কোম্পানীর বাড়ি বলে নয়, লাহিড়ীসাহেবের পুজো-পার্বণের প্রতি বিশ্বাস নেই বলেই সবিতা দেবী চলে গেছেন শ্যামবাজারে। বাবা তাঁর সাব-জজ—ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। টাকা জমিয়েছেন প্রচুর, পুণ্যের পরিমাণও কম নয়। সাব-জজ অঘোর চক্রবর্তীর 'রায়' পড়ে বাদী এবং বিবাদী দু'পক্ষই নাকি খুশী হয়। অন্ততঃ অঘোর চক্রবর্তীর নিজের ধারণা সেই রকম। মেয়ের প্রথম সন্তান হঠাৎ মারা গেল বলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। মেয়ের মনে অশান্তির ঝড় বইছে। আরদালী পাঠিয়ে অঘোরবাবু ভাটপাড়া থেকে দু'জন ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে এনেছেন। অশান্তি দূর করবার মন্ত্র পড়বেন তাঁরা।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, লাহিড়ীসাহেব আজ ঘড়ির দিকে চেয়ে আপিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পাঁচটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়লেন। প্রতিদিনকার মত কেতকী মিত্রকে ডেকে পাঠালেন না তিনি। কামরা থেকে বেরিয়ে হল-ঘরটা অতিক্রম করলেন মুখ নিচু করে। বড়বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কেতকী মিত্রকে ইশারা করলেন বড়বাবু। কি যে ঠিক এই মুহূর্তে করা দরকার মিস মিত্র তা বুঝতে পারল না। তবু প্রতিদিনকার মত হ্যাণ্ডব্যাগটা ঘাড়ের ওপর ঝুলিয়ে দিল সে। দেওয়ার আগে ছোট আয়নায় মুখ দেখল একবার। রঙের টিউবটা ঠোঁটের ওপর ঘষে নিতেও দু'দশ সেকেণ্ড সময় নিল। তার পর লিফটের দিকে ছুটে চলল কেতকী মিত্র। লিফট তখন সবেমাত্র একতলা থেকে উঠতে আরম্ভ করেছে।

কেতকী মিত্র পৌঁছল। জিজ্ঞাসা করল,"এত তাড়াতাড়ি কোথায় চললেন সার?"

"বাড়ি।"

"মিসেস লাহিড়ী ত আজ বাড়ি ফিরবেন না।"

"তুমি কি করে জানলে?"

"ড্রাইভার বলছিল।"

"খোঁজ নিলে বুঝি?"

ধাক্কা খেলো মিস মিত্র। এমন বাঁকা কথার ধাক্কা সে সহ্য করবে কেন? গত ক'দিনের নিবিড়তার মধ্যে ত এমন ব্যবহার সে পায় নি! পেলে সে যোগ্য জবাব দিতেও ছাড়ত না। কেন দেবে না? মিস মিত্র শুধু যুবতী নয়, সুন্দরীও।

লিফ ট এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। লাহিড়ীসাহেব দ্বিধা করছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দু'একটা দরকারী কথা মনে পড়ল তাঁর। মিস মিত্রকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। বললেন, "এস।"

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছোটসাহেব যেন আলাপ-আলোচনায় দাঁড়ি টেনে বললেন, 'তোমার চাকরি যাতে পাকা হয় তার ব্যবস্থা আমি করেছি। বড়সাহেবের হুকুম পেলেই কাজটা স্থায়ী হবে। আর কিছু বলবে?"

"পাকা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ বলবার কথা ফুরবে না। ড্রাইভারটাকে যেতে বলে দিন না সার।"

ইচ্ছে করেই ড্রাইভারকে ধরে রেখেছিলেন লাহিড়ীসাহেব, তিনি ভেবেছিলেন, ড্রাইভার সামনে থাকলে কেতকী হয় ত সত্য কথাগুলো সহজ ভাবে বলতে পারবে না, কিন্তু তেমন ধারণা তাঁর ভুল হয়েছে।

ড্রাইভারকে ছুটি দিতে বাধ্য হলেন তিনি।

ছোটসাহেবের অনুরোধের জন্যে কেতকী অপেক্ষা করল না! গাড়ির দরজা খুলে সে বসে পড়ল লাহিড়ীসাহেবের পাশে।

এসপ্লানেড ঘুরে মান্টার বুইক বেরিয়ে গেল গঙ্গার দিকে। কেতকী বললে, "এদিকে আমায় নিয়ে এলে কেন?"

"কোন দিকে যেতে চাও?" অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন তপন লাহিড়ী।

"বাড়ির দিকে। পাঁচটার সময় ট্রামের ভিড় ঠেলে বালিগঞ্জে পৌঁছতে কষ্ট হবে না আমার?"

"ভিড়ের মধ্যেই ত তোমার চলা উচিত। তুমি সুন্দরী, দর্শকের অভাব তোমার কোন দিনও হবে না। তোমার কাঁধের ওপর মাথাটা একটু রাখব কেতকী?"

"থাক।"

"লক্ষ্মীটি, তোমার কাছে যে একটা চিঠি লিখেছিলাম, সেটা কি পুড়িয়ে ফেলেছ?" কেতকীর দিকে হেলে বসে প্রশ্ন করলেন ছোটসাহেব। ডান হাত দিয়ে তাঁর ষ্টিয়ারিং ধরা ছিল।

কেতকী নির্বিকার ভাবে জবাব দিল, "লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়ে রেখেছি। বৌদি বাড়ি নেই বলে বুঝি তোমার মন খারাপ?"

"খুবই।"

"কিন্তু সেদিন ত মন তোমার খারাপ ছিল না।"

"কোন্ দিন?"

"বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলে? আমায় নিয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীটে ঢুকলে। গলগল করে মদ খেলে, খাওয়ালেও। তার পর কেবিনের পর্দাটা টেনে দিয়ে আমার পাশে এসে বসলে—তার পর আমার চিবুকের তলায় হাত দিয়ে আমার নিচু মাথাটাকে উঁচু করে ধরলে তুমি—তুমি তপন লাহিড়ী, শেলী এণ্ড কুপার কোম্পানীর ছোটসাহেব। সেদিনের সেই উঁচু মাথাটা আজ কেন নিচু করতে বলছ? আমায় তুমি ফাউ ভেবেছিলে, না?"

"কোন কিছুই ভাবি নি। ভাবব কি করে, মাতাল হয়ে গিয়েছিলাম না?"

"তাই বা কি করে বলি? পরের দিন আপিসে এসে বললে, এমন স্বাদ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না, কাতু! ভুলতে পারলে আজ তোমায় লম্পট বলে সম্বোধন করতাম না। তুমি শুধু ছোটসাহেব নও, লম্পটও।"

"তুমি কি কেতকী?"

"স্টেনো, আর—"

"থাক, আর তুমি কিছু নও—তোমার ইতিহাস আমি জানি। রাঁচীতে তোমার মা এখনও বেঁচে আছেন—"

"ছোটসাহেব, এইখানে আমায় নামিয়ে দাও।"

ষ্টোর রোডের মুখে এসে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে দিলেন তপন লাহিড়ী। কেতকী নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। নামল কিন্তু সরে পড়বার জন্যে সে চেষ্টা করল না। লাহিড়ীসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "আর কিছু বলবে?"

"ভাবছিলাম, একা একা বাড়ীতে তোমার সময় কাটবে কি করে? চল না, ডায়মণ্ডহারবার থেকে ঘুরে আসি? গতকাল ত তুমি নিজেই যেতে চেয়েছিলে।"

"বৌ বাড়ী নেই বলেই ত আজ আমি সন্ধ্যের আগে ফিরে যাচ্ছি ফেওলার ষ্ট্রীটে। সম্মুখ যুদ্ধে হেরে গেলে নীতির পরাজয় তাতে হয় না। থাক, এসব কথা তুমি বুঝতে পারবে না। আমি বরং ট্যাক্সিভাড়া দিচ্ছি, মহীতোষদের

ইউনিয়নের আপিসটা একবার ঘুরে এস। কাল আপিসে গিয়ে খবর সব শুনব।"

"যাওয়া-আসার ছ'দিকের ভাড়া দিলে যেতে পারি।"

"অনেক দিন ট্যাক্সিতে চাপি নি, কত লাগবে?"

"ছ'হাজার টাকা মাইনে পাও, হিসেব করে টাকা দেবে নাকি?"

রাস্তার একধারে গাড়ীটা রেখে লাহিড়ী সাহেব ফস করে নেমে এলেন রাস্তায়। এসে বললেন, "কেতকী, দেব, হ্যাঁ তোমায় ছ'হাজার টাকাই দেব, চিঠিটা আমায় ফিরিয়ে দাও।"

জবাব দিল না কেতকী মিত্র। চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে সে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গীতে উঠে বসল তাতে। মুখ বার করে মিস মিত্র শুধু বলে গেল, "চিঠির প্রথম লাইনে তুমি লিখেছ, ডারলিং। ইউনিয়নের আপিসে যাচ্ছি গো, ফিরে এসে খবর সব দোব। স্কাউনড্রেল! চলিয়ে ড্রাইভার—"

লাহিড়ীসাহেব পেছন দিকে চেয়ে দেখলেন, গ্যাসলাইটের খুঁটি বেয়ে একটা লোক উঠছে ওপর দিকে।

সন্ধ্যে হয়েছে।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, ছ'টার সময় বাড়ীতে জ্যোতিষ আসবেন। জ্যোতিষের নাম চণ্ডী ভটচাজ।

পাঁচ নম্বর ধরে সুতপা গড়িয়াহাটার মোড়ে এসে নামল। একবার সে ভেবেছিল, মহীতোষের খোঁজ করতে ইউনিয়নের আপিসে গিয়ে উপস্থিত হবে। ঘড়িতে সময় দেখল, সাতটা প্রায় বাজে, সেখানে পৌঁছতে আটটা বাজবে। মহীতোষকে হয় ত পাওয়াও যাবে না। তা ছাড়া মহীতোষ যখন কথা দিয়ে কথা রাখে নি, তখন সুতপাই বা কেন যাবে তার খোঁজ করতে? ইউনিয়ন নিয়ে নিশ্চয়ই সে মেতে আছে। থাক সে মেতে, আজ আর সুতপা যেতে পারবে না। হয় ত কাল-পরশুও সে যাবে না। খানিকটা অভিমান-ভরা মন নিয়ে সে উঠে বসল আট নম্বর বাসে। আট নম্বর ধরেই ৫ হুড়দার ষ্ট্রীটে যেতে হয়।

বাইরের দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকল সুতপা। সামনেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সিঁড়ির পাশে ক'খানা চেয়ার রাখা আছে। প্রথম ঢুকে সেইখানে বসে অপেক্ষা করতে হয়। বেয়ারা খবর নিয়ে কিংবা নাম লেখা কার্ড নিয়ে চলে যায় ওপরে। সুতপা দেখল, বেয়ারা সিঁড়ির রেলিং ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সতর্ক নজর রেখেছে দরজার দিকে, যেন হঠাৎ কেউ খবর না দিয়ে ওপরে উঠে যেতে না পারে। বিশেষ পাহারার প্রয়োজন ছিল আজ।

সুতপা ভেতরে প্রবেশ করতেই বেয়ারাটি সিঁড়ির পথ রুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "সাহেব একটু ব্যস্ত আছেন এখন। আপনি কি অপেক্ষা করবেন?"

"হ্যাঁ। কতক্ষণ ব্যস্ত থাকবেন তিনি?"

"জিজ্ঞাসা করব।"

"মেমসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"তিনি শ্যামবাজারে গেছেন। আজ ফিরবেন না।"

চিন্তিত হ'ল সুতপা। সাংসারিক বিপর্য্যয়ের মাঝখানে বোধ হয় ও এসে উপস্থিত হয়েছে। চলে যাবে, না অপেক্ষা করবে? অপেক্ষাই করবে সে। সুতপা কি সবিতা দেবীর কাছে প্রতিশ্রুতি দেয় নি যে, সে তাঁর বন্ধু হবে?

সুতপা সিঁড়ির পাশে বসে পড়ল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চেয়ারগুলির মাঝখানে একটা টেবিল ছিল। টেবিলের ওপরে দৈনিক কাগজ আর কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পড়ে রয়েছে। বিলেতী টেকনিক্যাল মাসিকপত্রই বেশী, কিন্তু সুতপা লক্ষ্য করল, ওপরের কাগজখানা ফিল্ম-ম্যাগাজিন, এবং সেইটেই যে সবাই এসে মনোযোগ দিয়ে নাড়াচাড়া করেছে তেমন বিশ্বাস জন্মাতে ওর এক মুহূর্ত্তও লাগল না। কভারের ওপরে একজন বিলেতী চিত্রতারকার ছবি। চিত্র-তারকার মুখ তাতে নেই, শুধু একটা পা গোটা পাতাটা দখল করে রয়েছে। ভাল করে নজর দিয়ে সুতপাও দেখতে লাগল ছবিটি। দেখবার মত পা বটে! হাঁটুর ওপরের অংশ টুকু হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে। পাতলা চামড়ার তলায় নরম মাংসের অনুভূতি আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঝুঁকে বসল সুতপা রায়। ছবিটার ওপর নখের দাগ! ছোটসাহেবের সঙ্গে ত টেকনিক্যাল লোক ছাড়া অন্য কেউ দেখা করতে আসেন না। কিন্তু টেকনিক্যাল লোকেদের নখের আগায় লোভ থাকবে না, সেই বা কেমন কথা?

বেয়ারাটি সুতপার খবর নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। সত্যিই গেছে কিনা ঘাড় বেঁকিয়ে একবার দেখে নিল সুতপা, তার পর শাড়ীর প্রান্ত টেনে তুলল ওপর দিকে। সুতপার পায়ের রং কালো বটে, কিন্তু মসৃণতায় বিলেতী পায়ের সঙ্গে সে টেক্কা দিতে পারে। ওর মনে আছে, ছেলেবেলায় মা ওকে বলতেন যে, পুরুষমানুষেরা তপার পায়ের সঙ্গে প্রেমে পড়বে। মেয়েদের সৌন্দর্য্য শুধু মুখেই থাকে না, যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে। নিশ্চয়ই পারে, বিলেতী পা-টি কি তার প্রমাণ নয়?

শাড়ীর প্রান্তটা হাতের মুঠোতে ধরে বসেছিল সুতপা। প্রতি রোমকূপে উত্তাপ জমছে। কত সহজেই না জমছে! অথচ দশ বছর আগে সরকার-কুটিটা বাঁধা দিয়েও এক মুষ্টি

উত্তাপ সে সংগ্রহ করতে পারে নি। ত্রিশ বছর পেরিয়ে সুতপা আজ যৌবনের স্বাদ পাচ্ছে।

বেয়ারা ফিরে এল। খবর পৌঁচেছে সাহেবের কাছে। আর পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে বললেন তিনি। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "মেমসাহেব শ্যামবাজারে বেড়াতে গেছেন বুঝি?"

"জী। না, শুনেছি কাল সেখানে পূজো হবে।"

"কি পূজো?"

"তা আমি বলতে পারব না। মেমসাহেব পূজো করবেন—"

"তোমার সাহেব গেলেন না কেন?"

"কি যে বোলেন আপনি!" হিন্দুস্থানী বেয়ারার মুখে ধিক্কারের ভঙ্গী, "সাহেব হোচ্ছেন গিয়ে—"

"সাহেব হচ্ছেন গিয়ে সাহেব। তিনি কেন দিশী-পূজো করতে যাবেন, এই ত?"

"জী।" বেয়ারার মুখে গর্বের হাসি।

পাঁচ মিনিটও পার হয়ে গেল। দৈনিক কাগজখানা এবার টেনে নিল সুতপা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে চলে এল বিজ্ঞাপনের দিকে। হঠাৎ ওর মনে পড়ল, আজকেই ত সেই বিজ্ঞাপনটা বেরুবার কথা! দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের দিকে চেয়ে তারিখটা একবার মিলিয়ে নিল সুতপা। হ্যাঁ, আজকেই বেরুবে, বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। কাগজটা ঠিক আছে ত? হ্যাঁ, এই ত চৌরঙ্গীর দৈনিক। একমাত্র দৈনিক যার কলমগুলো চিনতে ওর দেরি হয় না। হ'লও না দেরি, নোটিশটা বেরিয়েছে—চার লাইনের বিজ্ঞপ্তি। দশ বছর হ'ল স্বামী ওকে ছেড়ে গেছে। কোন খবর তার সুতপা জানে না। বিবাহিত জীবনের কোন কর্তব্য সে পালন করে নি, এবং দায়িত্বও গ্রহণ করে নি। অতএব পনর দিনের মধ্যে কোন খবর না পেলে সুতপা অন্য যে-কোন লোককে বিয়ে করতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল চণ্ডী ভটচাজ। অবাক হ'ল সুতপা। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "চণ্ডীদা, তুমি এখানে?"

"লাহিড়ীসাহেব আমার মক্কেল। এত রাত্রে তুমিই-বা এখানে কি করছ তপাদি?"

"ছোটসাহেবের সঙ্গে আমার একটু অফিসিয়াল কাজ আছে।"

ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক করবার জন্যে সুতপাই আবার বলল, "চণ্ডীদা, তুমি এইখানে একটু বসো। আমার পাঁচ মিনিটের বেশী লাগবে না। তার পর এক সঙ্গেই বাড়ি ফিরব।"

"[illegible] আছি।"

বেয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে ওপরে উঠে এল সুতপা। ল্যাণ্ডিংয়ের পাশে সেই ছবিখানা টাঙানো রয়েছে। খোকার ছবি। ছবিটার দিকে মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি ফেলল সে। তার পর চুলের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে প্রবেশ করল ছোটসাহেবের ড্রয়িং রুমে। বেয়ারা বলল, "একটু বসুন, সাহেব আসছেন।"

একা বসে রইল সুতপা। প্রকাণ্ড ড্রইং-রুমটা সেদিন সে ভাল করে দেখতে পারে নি। সবিতা দেবী টেনে ওকে একেবারে নিয়ে গিয়েছিলেন শোবার-ঘরে। শোবার-ঘরটির মত আজও ওর মনে হতে লাগল, ড্রইং-রুমটাও যদি সুতপার হ'ত! জীবনের ত্রিশটা বছর যেন সে দাঁড়িয়েছিল, বসতে পায় নি। এমন সুন্দর ঘরটিতে সত্যি সত্যি বসা যায়। প্রতি মুহূর্তের জীবন কেবল বসবার আনন্দেই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

শয়ন-কামরার পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এলেন লাহিড়ীসাহেব। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি? তুমি আসবে আমি তা ভাবতেই পারি নি। তুমি ত এখনও ছুটিতে আছ?"

"হ্যাঁ। ছুটি আর ভাল লাগছে না। তোমার দয়া ভিক্ষা করতে এসেছি। তোমার একটা সই চাইতে এসেছি ছোটসাহেব।"

"সই?" ভুরুর দিকে মণি দুটোকে চিলে তুললেন তপন লাহিড়ী, "সুতপা, আমি দয়ালু নই। তা ছাড়া, অপমান আমি কখনও ভুলে যাই না।"

"তোমায় আমি অপমান করলাম কবে?"

"মহীতোষ তোমার কমরেড, সে খবর আমি রাখি। ভাবছ, মহীতোষকে তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী করবে, না?"

"ছিঃ ছোটসাহেব! তোমার মুখে এমন কথা সাজে না। যাক, বেশীক্ষণ আমি বসব না—"

"কেন মহীতোষকে সঙ্গে নিয়ে এসেছ নাকি?" সিগারেট ধরালেন লাহিড়ীসাহেব।

সুতপা দেখল ঈর্ষার তাপ আর আগুনের তাপ ছোটসাহেবের মুখখানাকে বড্ড বেশী রাঙা করে তুলেছে। আলোচনা তাড়াতাড়ি শেষ করবার উদ্দেশ্যেই সুতপা বলল, "শ্যামনগরে আমায় তুমি বদলি করে দাও, ছোটসাহেব। তুমি ত শাস্তি দিতেই চেয়েছিলে আমায়।"

তৎক্ষণি জবাব দিলেন না তপন লাহিড়ী। ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন। নৈঃশব্দ্য প্রলম্বিত হতে লাগল, দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামে মুহূর্তগুলো দুলে দুলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সুতপা দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল, "কালই তুমি সই বসিয়ে দাও। সোমবার শ্যামনগরের আপিসে গিয়ে

কাজে যোগ দেব। এই কথাটা বলবার জন্তেই এখানে আমি ছুটে এসেছি।

"মহীতোষ—"

"মহীতোষের কথা আজ থাক।" সুতপা উঠল, "আমার অনুরোধ তুমি রাখবে সেই ভরসা নিয়েই আমি চললাম।"

"সুতপা, তোমার বদলির প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। মহীতোষকে বদলি করেছি শ্যামনগরে।"

সুতপার মুখের ওপর যেন চড় বসিয়ে দিলেন লাহিড়ী-সাহেব।

"এ তুমি কি করলে, ছোটসাহেব?"

"কেন, গরীব লোক, কুড়ি টাকা মাইনে বেশি পাবে সে।"

"না না, বেশী মাইনের লোভ এতে থাকলেও মহীতোষকে তুমি এখান থেকে সরাতে পার না।"

"ওঃ, এই। গড়িয়ার খালে বিরহের বান ডাকবে বুঝি? ফুঃ!"

"আমায় তুমি যত ইচ্ছে অপমান কর গায়ে লাগবে না, ছোটসাহেব। মহীতোষ ইউনিয়নের সেক্রেটারী। ওরই চেষ্টায় শিশু-ইউনিয়নটি বড় হয়ে উঠেছে—"

"শিশু-হত্যায় আজ আর আমি পাপ মনে করি নে। তোমরা সবাই মিলে আমায় ঠকাবে, আর আমি বুঝি—" কথাটা শেষ করলেন লাহিড়ী সাহেব। নতুন সিগারেট বার করলেন টিন থেকে। আঙুলগুলো তাঁর মুহূর্তের মধ্যে বুঝি কেঁপে উঠল একবার।

সুতপা তাঁর কাছে গিয়ে বলল, "আমি তোমায় ঠকাই নি ছোটসাহেব। বিশ্বাস কর—"

"বিশ্বাস করব? তোমায়? সবিতার মনে তুমি বিষ ঢুকিয়েছ—"

"সবিতা দেবীর বন্ধু আমি। তাঁর শুশ্রূষার পথ আমাকেই বেছে দিতে হ'ল।"

"বন্ধু? ফুঃ! তুমি সবারই বন্ধু হতে পার, আর আমার বেলাতেই কেবল—"

"তোমারও আমি বন্ধু, ছোটসাহেব।" এই বলে সুতপা হেঁটে চলে গেল দরজার দিকে। যা ভেবে এসেছিল তার কোন কিছুই ঘটল না। ছোটসাহেবের উঁচু মাথা হেঁট করবার জন্তেই কি সুতপা আজ হেওয়ার্ড স্ট্রীটে ছুটে আসে নি? শ্যামনগরে বদলি করবার ক্ষমতা যে ছোটসাহেবের নেই তেমন খবরটা তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্তে সুতপা গতকাল থেকে ছটফট করেছে। কোম্পানীর বড়সাহেব ক্যাপটেন হেওয়ার্ড যে ওর মুঠোর মধ্যে সেই খবরটাও সুতপা সরবরাহ করতে পারল না, করবার দরকার হ'ল না। ছোটসাহেব নিজে থেকেই ওর বদলির প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন। মনের জ্বালা ওর নিজে থেকে মিটে গেল বলে গোপন-সন্তুষ্টির স্বাদ সুতপা পেলে না। খানিকটা বিরক্তির মনোভাব নিয়ে সুতপা নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে।

গলির পথটা হেঁটে এসে পৌঁছে গেল হাজরা রোডে। সঙ্গে চণ্ডী ভটচাজও ছিল। আসবার পথে কোন কথাই হয় নি তার সঙ্গে। বাস স্টপে পৌঁছে চণ্ডী ভটচাজ বলল, "একটু বেশী রাতই হয়ে গেল তপাদি। আট নম্বর বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না।"

"কি করতে চাও, তুমি?"

"চল না, পণ্ডিতিয়া রোড ধরে রাসবিহারী এভিনিউ পর্যন্ত যাই। সেখান থেকে একেবারে গড়িয়া পৌঁছবার পাঁচ নম্বর পাব। নইলে চল, একটা ট্যাক্সি নিই, গড়িয়াহাটার মোড় পর্যন্ত আর কতই-বা লাগবে?"

"চণ্ডীদা, আজ রোজগার খুব বেশী হয়েছে বুঝি?" সুতপা তখন হাজরা রোড পার হয়ে পণ্ডিতিয়ায় ঢুকে পড়েছে। চণ্ডী ভটচাজও পার হ'ল রাস্তা। সুতপার কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, "আগের কিছু বাকীবকেয়া ছিল। সব মিলিয়ে আজ একটা বড় নোট দিলেন লাহিড়ীসাহেব। এক শ'টা টাকা এক সঙ্গে পেলাম। তা ছাড়া এ পর্যন্ত গণনা করে যা যা বলেছি তার মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ ত মিলেও গেছে।"

"ষাট ভাগ? একশ' ভাগ নয় কেন?"

"মিলবে, মিলবে—তপাদি তোমার ভবিষ্যৎ তুমি জানতে চাও না?"

"চণ্ডীদা, বর্তমানটা এত বিরাট আর জটিল যে ভবিষ্যতের ফল জানবার আমার লোভ নেই। গোবিন্দপুরে শুনলাম, তোমার স্ত্রী খুব অসুখে ভুগছেন?"

হোঁচট খেল চণ্ডী ভটচাজ। পণ্ডিতিয়া রোডের রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-খেবড়ো। তা ছাড়া রাস্তার আলোগুলো সব জ্বালানোও নেই। সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "লাগল নাকি?"

"না—চটিজুতো কিনা, পা থেকে বেরিয়ে আসে। গোড়ালিটা ক্ষয়েও গেছে, শুকতলাতে পা ঠেকছে এখন। রাস্তার কোন দোষ নেই। করপোরেশনের নতুন মেয়র ত আমার পুরনো খদ্দের।"

"বড় বড় খদ্দের ত তোমার অনেক চণ্ডীদা। কিন্তু নিজের ভাগ্যের রাস্তায় ত সারাজীবন শুধু হোঁচটই খাচ্ছ। বাচ্চাটা তোমার কেমন আছে?"

ঢোক গিলে চণ্ডী ভটচাজ, সুস্থ বোধ করবার চেষ্টা করছিল সে, বোধ হয় করলও। তার পর বলল, "হোমিও-

প্যাথি খেয়ে খেয়ে ও ওষুধে আর কাজ হচ্ছে না। দেড় বছর বয়স হ'ল, দেখতে সেই নেংটি ইঁদুরের মত। যা খায় সবই বমি করে ফেলে দেয়। কেবল হোমিওপ্যাথির বড়িগুলো হজম করতে পারে। ভাবছি এবার এলোপ্যাথি ধরাব।"

"এখানে ওদের নিয়ে এস না। মাসীমার হোটেলে যত্ন আত্তির অভাব হবে না।"

"তা ছাড়া ত অন্য পথ আর দেখছি না, তপাদি। ডাক্তার বরেন সেনগুপ্ত একসময়ে আমার মক্কেল ছিলেন। গোড়াতে গণনা করে বলেছিলাম অনেক পয়সা হবে। হ'লও—এখন বত্রিশ টাকা ভিজিট। ক'বার চেষ্টা করলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করবার, দেখা হ'ল না। আমার নাম শুনেই বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, ভিজিট দেওয়ার লোক আমি নই। শেষের দিকে গোটাকতক টাকা আমি পাই নি। হয় ত সেই জন্যেই দেখা করেন না—এই যে পাঁচ নম্বর এসে গেছে। এই রোকো, রোকো—ঘোড়ার ডিম, চটির আর কিছু নেই। ভাল জুতো ছাড়া সরকারী বাসে ওঠাও মুশকিল! আর একটু দাঁড়াও না বাবা—"

বাসে উঠে আর কোন কথা হ'ল না। বাস থেকে নেমে সরকার-কুঠি পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে হয়, রাস্তা বড় কম নয়।

চণ্ডী ভটচাজ জিজ্ঞাসা করল, "রিকসা নেব না কি তপাদি?"

"না। খরচ না করতে পারলে তোমার মন আজ শান্ত হবে না দেখছি চণ্ডীদা। বড় নোটখানা কাল সকালে বাড়ী পাঠিয়ে দিও।"

কথা বলতে বলতে ওরা গড়িয়ার পোল পর্যন্ত এসে গেল। আর একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরতে হবে। বড় রাস্তায় পথ খানিকটা বেশী। পোলের পাশ দিয়ে খাল পর্যন্ত নেমে যেতে পারলে তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছনো যায়। চণ্ডী ভটচাজ বলল, "চল, শর্টকাট্ করি। কাঁচাপথ তোমার কষ্ট হবে না ত তপাদি?"

"না, একটুও না।"

ওরা নেমে এল খাল পর্যন্ত। পথটা সুতপার অজানা নয়, লালু সরকারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সে এই পথ দিয়েই সরকার-কুঠিতে প্রবেশ করেছিল। ডান দিকে লক্ষ্মণ গয়লার খাটালটাও দেখতে পেল সুতপা—লম্বা ব্যারাকের মত খাটাল, খুবই লম্বা বলা যেতে পারে। সুতপা দেখল, পর পর দশ-বারোটা ঘরের সামনের দিকে একটা করে হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বলছে। চৌদ্দ-পনর বছর আগে এই দিকটা পুরো অন্ধকারে ঢাকা ছিল বলেই মনে পড়ল ওর। পেছন ফিরে সুতপা জিজ্ঞাসা করল, "মাথা নিচু করে কি ভাবছ চণ্ডীদা? গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান ত সব ওপর দিকে। বড় নোটটা তোমার ঘুম কেড়ে নেবে আজ।"

"না, ঠিক সেই জন্যে নয়, দিদি। লাহিড়ীসাহেবের জন্যেই ভাবছি। টাকা নিলাম, কিন্তু শুভফল কিছু দেখতে পেলাম না। ক'টা মাস বড্ড অশান্তি তাঁর—"

"ক'টা মাসের জন্যে অত বেশী ভাবছ কেন তুমি? যারা ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধরে অশুভ ফল বয়ে বেড়ায়? এই যেমন তুমি, তোমার কথা ত কেউ ভাবে না?"

"আমার কথা কে ভাববে!" চণ্ডী ভট্‌চাজ যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল।

"কেন সমাজ ভাববে—হয়ত ভাবনা সব রাষ্ট্রের।"

"না দিদি, রাজনীতির মধ্যে গিয়ে জড়াতে চাই না। মোদ্দা কথাটা কি বলতে চেয়েছিলাম জান? শনিগ্রহটা বেশ খানিকটা ক্ষতি করবে। অমন সাজানো-গোছানোবাড়ীটা ওলোট পালট হয়ে যাবে। যাবেই।"

"তাতে লাহিড়ীসাহেবের কি, বাড়িটা ত কোম্পানীর?"

দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে এসে সুতপা বলল, 'ঠাকুরকে বলে দিও আজ আর আমি খাব না। ওখানে কে রে?"

"আমি।" এগিয়ে এল বলরাম।

"অন্ধকারে বসে কি করছিস?"

"পাহারা দিচ্ছি। মাসীমার শরীরটা ভাল নেই, এখন একটু ঘুমিয়েছেন। ষষ্ঠীদা বলল দরজার কাছে বসে থাকতে। মাঝরাত্রে যদি মাসীমার অসুখটা আবার বাড়ে—তপাদি, তুমি বুঝি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলে?"

ওপর দিকে উঠে গিয়ে সুতপা জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে তোমার ভাত কে খাবে?"

"তুই খে গে যা।"

অন্ধকারে মিশে গেল বলরাম। সুতপা ওকে আর দেখতে পেল না। টাইগার যে বলরামের পেছনে পেছনে ছুটল তার আওয়াজ দোতলার বারান্দা পর্যন্তও উঠে এল।

দরজায় খিল লাগাল সুতপা। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে পারলেই রক্ষা পায় সে। দেওদার ষ্ট্রীট থেকে ঘুরে আসতে পরিশ্রম বড় কম হয় নি। তা ছাড়া ছোটসাহেবের বাড়ী থেকে বিন্দু পরিমাণ চাপা আনন্দও সে সংগ্রহ করে আনতে পারে নি বলেও বোধ হয় মানসিক ক্লান্তির বোঝা ওর বাড়ল, কেন গিয়েছিল সেখানে? কি সে চেয়েছিল? ক্যাপটেন হেওয়ার্ড আসবার পরে সুতপা নিশ্চয়ই জানত, ছোটসাহেব পরাজিত। নিজের খুশীমত সুতপা এখন সারা আপিসটায়

ঘুরে বেড়াতে পারে। চার তলার ঘরগুলো ওর কাছে আর নিষিদ্ধ এলাকা নয়। তবে সেখানে যাওয়ার কি দরকার ছিল? প্রতিশোধ-প্রয়াসী মন ওর নয়। তবে?

পাঁচ বছরের পেছন থেকে একটা অজ্ঞাত-অস্তিত্ব ভেসে উঠতে লাগল ওর চোখের সামনে। অস্তিত্বটা সুতপার। পাঁচটা বছর সে কাজের মধ্যে দিয়ে ছোটসাহেবকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। একদিনও তিনি সুতপার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন নি। তাঁর চোখের ভঙ্গীতে উপেক্ষার আর অন্ত ছিল। নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিল সুতপা। তার পর? বিপরীত অবস্থার পরিবেশ শুধু ঘন হয়ে আসছে! ছোটসাহেবের দম্ভ টিকল কই? মানুষ কত দুর্ব্বল। পরিণতির দাঁড়ি টানবার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু ছোটসাহেবের দুর্বলতার কারণ ত সুতপা নয়, সবিতা দেবী। দশ বছর বিবাহিত জীবনের ফাঁকিটা ধরা না পড়লে তিনি সুতপার দিকে মুখ তুলে চাইতেন না। তাঁর ভালবাসার মধ্যে কোন বস্তু নেই। একথা সুতপার চেয়ে বেশী আর কে জানে? ঘটনার সঙ্গে ঘটনা এমন করে বাঁধা রয়েছে যে, সুযোগের মধ্যে পা পড়লেই মানুষ বাধ্য হয়ে ভালবাসার কথা বলে। তবে কি ভালবাসা সুযোগের ওপর নির্ভরশীল? হয় ত তাই। এর সামাজিক রূপ ছাড়া দ্বিতীয় কোন রূপ নেই। সুতপা পাশ ফিরে শুল। কোন্ সুখের সংবাদ নিয়ে সে এখন ঘুমতে যাবে? ছোটসাহেব যে মহীতোষকে ঈর্ষা করছেন সেইটাই একমাত্র সত্য সংবাদ। কষ্ট পাক তপন লাহিড়ী। তাঁর ঈর্ষা-জর্জরিত অস্তিত্বের অংশটুকু হাতের মুঠোতে ধরতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সুতপা রায়।

কেতকী ট্যাক্সি চেপে সত্যিই ইউনিয়নের আপিসে এল। আপিস-ঘরে তখন সভা বসেছে। মহীতোষের গলা সে শুনতে পেল। বক্তৃতার শেষ অংশটুকুই শুনল সে। মহীতোষ বলছিল, "উনিশ শ' সাতচল্লিশ সালের আগষ্ট মাসে দিল্লীর বেতারকেন্দ্র থেকে হঠাৎ আমরা ঘোষণা শুনলাম—ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। কমরেডস, সেদিন স্বাধীনতার অর্থ ছিল, প্রোটিন সমৃদ্ধ লাল টুকটুকে বিদেশী হাত থেকে শাসনভার ন্যস্ত হ'ল সংগ্রাম-বিক্ষত দিশী হাতে। কিন্তু আজ দশ বছর পরে দেখতে পাচ্ছি, সেই সব দিশী হাতগুলোতে ক্ষতের চিহ্ন আর নেই। বিদেশীর হাতের চেয়েও সেই হাতগুলো আজ বেশী লাল। লোভ আর শোষণের রং লেগে লেগে হাতের স্পর্দ্ধা আজ এগিয়ে এসেছে আমাদের টুঁটি পর্যন্ত। কমরেডস, তপন লাহিড়ীর স্পর্দ্ধাও—"

"ইনক্লাব জিন্দাবাদ!" অরিন্দম চেঁচিয়ে উঠল প্রাণপণে। পাগলের মত ছুটে এল মহীতোষের টেবিল পর্যন্ত। টেবিলের ওপর গোটাদুই ঘুষি বসিয়ে দিয়ে সে বলতে লাগল, "মহীতোষদা, আর মিটিং নয়। জবাব আমরা দেব। শ্যামনগর তুমি যাবে না, যেতে দেব না। ধর্মঘট ছাড়া আমাদের হাতে আর অস্ত্র নেই। তপন লাহিড়ীকে তাড়িয়ে দিতে হবে, এই আমাদের দাবি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।" মঞ্চের ওপর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল অরিন্দম। কেতকীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সে ছুটে এল তার কাছে, বলল, "আপনিও এসেছেন?"

"কেন আসব না ভাই, আমিও তোমাদের দলের।"

"তবে যে শুনলাম আমাদের ঘরের খবর সব আপনি ছোটসাহেবের কানে পৌঁছে দেন? আপনি তাঁর স্পাই?"

লজ্জায় কেতকী মাথা নীচু করে রাখল। জবাব দিল না।

অরিন্দম বার বার করে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "জবাব দিন, জবাব দিন—"

বাধা দিল মহীতোষ। সে বলল, "ছিঃ অরিন্দম, এ কি হচ্ছে? এদিকে এস।"

সভা শেষ হতে আর বোধ হয় মিনিটপনর লাগল। প্রস্তাব কিছু পাস হ'ল না, তবে ধর্মঘটের কথা নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা চলল। প্রস্তাবের খসড়া নিয়ে বড়সাহেবের দরবারে যাওয়ার কথাও তুলল মহীতোষ। সাড়ে সাতটার মধ্যেই সবাই চলে গেল, কেতকী শুধু তখনও মাথা নিচু করে বসেছিল। মহীতোষ কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি যাবেন না?"

"যাব।"

"অরিন্দমকে ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন আমাকেও।"

"আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন?"

"অরিন্দমের কাছে কথাগুলো বলেছিলাম আমিই।"

"মিথ্যে বলেন নি। সেই জন্যেই লজ্জা পেয়েছি বিষম।" কেতকী উঠে পড়ল। বাইরে এসে ওর নিজেরই খুব অবাক লাগল এই ভেবে যে, সত্য কথা স্বীকার করবার সাহস ওর এল কেমন করে। কলকাতায় পা দেওয়ার পরে কাউকে ও সত্যকথা বলতে শোনে নি। নিজেও বলে নি কখনও। মুখের কথাগুলো কখন সত্য কিংবা মিথ্যে হবে তার মীমাংসা করে নিতে হয়েছে স্বার্থের যুক্তি দিয়ে। মহীতোষের কাছে সত্য স্বীকারের ত কোন দরকারই ছিল না—স্বার্থ ত ছিলই না। এমন একটা কাজ হঠাৎ করে ফেলেছে কেতকী। মহীতোষের মুখের দিকে একবার সে চোখ তুলে চেয়েছিল। চাইবার পরে ওর কেবলই মনে হয়েছে, শুধু আজ নয়, কোনদিনই মহীতোষের সামনে ও মিথ্যে কথা বলতে পারবে না।

বাইরে বেরিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কোন্ দিকে যাবেন ?"

"বালিগঞ্জের দিকে।"

"বাস, না ট্রাম ধরবেন ? চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে নি। কেতকী এবার জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোন্ দিকে থাকেন ?"

"আমি থাকি হ্যারিসন রোডে, হোটেলে।" আরও কিছু বলা দরকার মনে করে মহীতোষ বলল, "বালিগঞ্জে আর কে কে থাকেন ?"

"আমার কেউ নেই। আমাদের এক পরিচিত পরিবারের সঙ্গে থাকি, পেইংগেস্টের মত।"

"মা বাবা কোথায় ?"

"বাবা নেই, দেখি নি তাঁকে। ভাইবোনও আর কেউ নেই, মা থাকেন রাঁচীতে।"

"সেখানে তিনি একা একা থাকেন কেন ? এখন ত আপনার চাকরি হয়েছে। স্থায়ী হতেও সময় লাগবে না।"

একটু ভেবে নিল কেতকী, ভাবতেই হ'ল। সত্যিকথা বলবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে ওকে। অভ্যাসের দোষে আধখানা মিথ্যে কথাও বলা চলবে না। কেতকী চুপ করে আছে দেখে মহীতোষ বলল,"পারিবারিক প্রশ্ন তোলা আমার বোধ হয় উচিত হয় নি।"

"খুব উচিত হয়েছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনার কাছে যা বলব সব সত্য কথাই বলব। পুরনো অভ্যাস বদলাতে একটু সময় লাগছে। তা ছাড়া, আপনার প্রশ্ন শুনে আমি বেশ খানিকটা অবাকও হচ্ছি।"

"কেন ?"

"আমাদের পরিবারের দুর্নাম এত বহু বিস্তৃত যে, কেউ কোনদিন আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না। সহৃদয়তার প্রথম স্পর্শ আপনার কাছ থেকেই পেলাম আজ। থাক সে সব কথা। রাঁচীতে আমাদের একটা বাড়ি আছে—বাবা রেখে গিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন ছ'মাস। খুবই বিপদে পড়লেন মা—তার পর তিনি বাড়ীতে পেইংগেস্ট রাখতে লাগলেন। ভালই চলছিল, আজও চলে। লোকের অভাব হয় না।—মাঝখানের ইতিহাসটুকু ভাল না। হয়ত ভাল না।"

"থাক—অনেক রাত হয়ে গেছে। এই ট্রামটায় আপনি উঠে বসুন। কাল আসছেন কি ইউনিয়নের আপিসে ? আসা কিন্তু উচিত।"

"আসব।"

কেতকী চলে যাওয়ার পরেও মহীতোষ অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল ট্রাম লাইনের ধারে।

দুই

পরের দিন সকালবেলা মহীতোষ এল। সরকার-কুঠির বসবার ঘরেই সে অপেক্ষা করছিল। খবর নিয়ে বলরাম গেছে সুতপার কাছে। এখনও সে ফিরে আসে নি।

দেওয়ালের গর্ত দুটোর ওপর দৃষ্টি পড়ল মহীতোষের। গত ক'মাসের মধ্যে গর্ত দুটো আরও বড় হয়েছে। চারদিকে পলস্তারা যা একটু-আধটু ছিল তাও আর নেই। চ্যাপটা ধরনের ইটের কোণাগুলো বেরিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। পুরনো ইটের মধ্যে খুব বেশী সামর্থ্য না থাকলে এত বড় বাড়ীটা এতদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। একে ভেঙে না ফেললে এ বোধ হয় নিজে থেকে কোনদিনই ভেঙে পড়বে না। মেসোমশাই একদিন বলেছিলেন যে, মোকদ্দমা চলছে। জেটমল এখানে প্রকাণ্ড বড় ম্যানসন তুলবে। ম্যানসন ছাড়া আর কিই-বা এখানে সে তুলতে পারে ? ম্যানসনটায় ছোটবড় আকারের ফ্ল্যাট থাকবে অনেক। মধ্যবিত্ত পরিবারদের পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করবার সুবিধা হবে। লোকসান হবে শুধু মেসোমশাই আর মাসীমার।

গর্ত দুটোর দিকে চেয়ে মহীতোষ ভাবল, অন্যদিক থেকেও লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। শহীদ-স্মৃতির প্রতি যদি ভারতবর্ষের শ্রদ্ধা থাকত, তা হলে গর্ত দুটোর গভীরতায় জন্ম নিত নূতন ইতিহাস। কিন্তু ভারতবর্ষের বুড়ো ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এদিকে পড়ল কই ? ঝাঁসীর রাণীর তরবারির মুখে যাঁরা সরকারী পয়সায় মিথ্যে গবেষণার ধার তুলছেন তাঁরা সরকার-কুঠির ভাঙা দেওয়ালের সংগ্রামটুকু দেখতে পান নি। দোষ হয়ত তাঁদের নয়—দোষ সমগ্র দেশের। গর্ত দুটোর গভীরতা অনুভব করবার জন্যে একটা লোকও নিজের বুকে হাত রাখে নি।

মহীতোষ একটু নড়েচড়ে বসল। সমালোচনার চুল টানতে গিয়ে মাথাটাও এগিয়ে এল, মাথাটা ওর নিজের। সেখানে ত সংগ্রামের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই! স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়ার সুযোগ কি সে পায় নি ? অন্তত ঘরে বসে ত সে অহিংসার চরকা কাটতে পারত। অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেলতে গিয়ে ওর মনে পড়ল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সে যোগ দেয় নি বটে, কিন্তু ওর মনের দেওয়ালে ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট। সেই ক্ষতটাই ত আজ পরাধীনতার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠেছে নইলে ইউনিয়ন গড়বার দরকার ছিল কি ? মনন-রাজ্যে পরিভ্রমণ করতে লাগল কমরেড মহীতোষ। উজানের

স্রোতে স্মৃতির নৌকো ভাসিয়ে দিল সে। উপস্থিত হ'ল এসে উনিশ শ' সাতচল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে। হ্যাঁ, বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য প্রস্তুত ছিল সে। ওর মত ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ যুবক সেদিন তৈরী ছিল জীবন দেওয়ার জন্যে। স্মরণ করতে মহীতোষের কষ্ট হ'ল না যে, সেদিন সবাই ওরা দেখেছিল, বিপ্লবের বাষ্প সবেমাত্র ঊর্ধ্বদিকে গতি নিয়েছে। তার পর হঠাৎ সেই নষ্ট ইতিহাসের ঘোষণা ভেসে এল দিল্লীর বেতারকেন্দ্র থেকে—আমরা স্বাধীন।

দ্বিতীয়বার নড়েচড়ে বসল মহীতোষ ঘোষ। হ্যাঁ, সেদিনের সেই বাষ্পটুকু ফাঁকা আকাশে মিলিয়ে যায় নি। বুকের তলায় ধরা আছে। নতুন বিপ্লবের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাষ্পটুকু ঘন হচ্ছে প্রতিদিন।

বলরাম ফিরে এসেছে—মহীতোষকে ওপরে ডেকে পাঠিয়েছে স্মৃতপা। ওর শয়ন-কামরায় বসে গল্প করবার ব্যবস্থা মহীতোষের ভালই লাগল। ব্যবধান আর নেই। এত দিন পর স্মৃতপা নিজেই ব্যবধান সব ঘুচিয়ে দিচ্ছে।

বেরিয়ে এল মহীতোষ। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে লাগল সে। ভবিষ্যৎ-বিপ্লবের কিছু পরিমাণ বাষ্পও আর ওর চোখের সামনে ভাসছে না। সরকার-কুঠির শক্ত সবল মেরুদণ্ডের ওপর হাত রেখে মহীতোষ দোতলায় উঠছে। পুরনো মেরুদণ্ডের সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল ওর। আহা, জেটমল এখানে আধুনিক আঙ্গিকের ম্যানসন তুলবে! আরাম-আয়োজনের অভাব হয় ত থাকবে না, কিন্তু চরিত্রের অভাব ম্যানসনে চিরদিনই থাকবে। এই ভেবে মহীতোষ এসে দাঁড়াল স্মৃতপার ঘরের সামনে।

স্মৃতপা ডাকল, "এস, ভেতরে এস কমরেড। তোমায় বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখলাম। বুঝতে পার ত এটা হোটেল। ঘরটা গুছোতে একটু সময় লাগল। চারপেয়ে একটা চেয়ারও খুঁজে আনতে হ'ল তোমার জন্যে। বস।"

"প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিই। সেদিন আসব বলে কথা দিয়েছিলাম কিন্তু ইউনিয়নের একটা জরুরী কাজে আটকে গেলাম।"

"এবার ছোটসাহেব বুঝি কোপ বসিয়েছেন তোমার ঘাড়ে?"

"সেজন্যে ভয় নেই, ঘাড় আমার শক্ত আছে। দু'এক জন ছোটসাহেবকে আমি একাই সামলাতে পারব। তুমি ত এখন আর বদলি হচ্ছ না, কাজে যোগ দিচ্ছ কবে?"

"দেখি—" এই বলে স্মৃতপা বাইরের দিকে চেয়ে বলল, "তুই এখন যা বলরাম। বাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।—তার পর খবর কি বল? ভবিষ্যতের খবর আমি শুনতে চাই নে—"

"তোমার বর্তমান ত আপাততঃ ভাল মনে হচ্ছে। কিন্তু ভবিষ্যৎ না থাকলে আমি ত শুধু বর্তমানকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতে পারতাম না।"

"তা বটে। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রহীনতা দেখবার স্বপ্ন তোমার আছে। সেই জন্যে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছ, না?"

"হ্যাঁ।"

"পৃথিবীর সব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পার?"

"আদর্শের খসড়ায় তেমন পরিকল্পনার উল্লেখ আছে।" রুমাল দিয়ে মুখ মুছল মহীতোষ। ফাল্গুনের বুকে তাপের মাত্রা আজ অত্যন্ত বেশী। সকালেই এই রকম, দুপুরের দিকে কি হবে বলা যায় না। বলরাম দু' পেয়ালা চা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। টেবিলের ওপর চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রাখতে গিয়ে পিরিচের ওপর খানিকটা চা গেল পড়ে। বিব্রত ভাবে বলরাম বলল, "চুলগুলো চোখের ওপর এসে পড়ল, দেখতে পাই নি।"

"এত বড় বড় চুল রেখেছিস কেন?" জিজ্ঞাসা করল স্মৃতপা।

"কি করব তপাদি, সব জিনিসেরই দাম বেড়েছে। চুল কাটতে চার আনা পয়সা লাগে।"

"আমি দিচ্ছি তোকে চার আনা।" উঠে গিয়ে স্মৃতপা পয়সা বার করতে যাচ্ছিল। বলরাম ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, লাগবে না তপাদি, আজ আমি গোবিন্দপুর যাচ্ছি—চণ্ডীদা নিয়ে যাবে। প্রত্যেক দিন কিছু কিছু তার জিনিস আমি নিয়ে আসব। প্রতিবারে আট আনা করে দেবে বলেছে। আসছে রবিবারে চণ্ডীদার বউ এখানে উঠে আসবে। আমার সঙ্গে কুরণ করে নিয়েছে।"

মনের আনন্দে চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে বলরাম ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মহীতোষের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে স্মৃতপা বলল, "গোবিন্দপুর এখান থেকে প্রায় মাইল সাত হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল। মেসোমশাইয়ের কাছে তুমি ত সরকার-কুঠির প্রাচীন ইতিহাস খানিকটা শুনেছিলে মহীতোষ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে ত ক্যাপটেনের পরিচয়ও পেয়েছ?"

"পেয়েছি।"

"অনেকদিন আগের কথা— বোধ হয় উনিশ শ' চুয়াল্লিশ সালের গোড়ার দিকেই হবে। মাসীমাকে এজে নিয়ে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী আসতেন—রঞ্জিতের খোঁজে। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হ'ত। আমি অবশ্য অংশ

নিতাম না। মনে পড়ে, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে তিনি মাসীমাকে এক দিন বোঝাচ্ছিলেন, 'আন্টি, সব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে কি করবে? কার বিরুদ্ধে করবে? বরং জীবনটাকে অর্গানাইজ করা যায়—যায় তা সত্যি যদি ওপরের রহস্যকে বিরুদ্ধপক্ষ করে নাও—' মহীতোষ—"

বাধা দিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "ওপরের রাস্তাটা কি?"

"প্রশ্নটা আমার নিজেরও। ক্যাপটেন একটা মন্তব্য করেছিলেন মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, 'সেই রহস্যের বিরুদ্ধে নয়, তার মধ্যে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই।' তুমি কিছু বুঝলে মহীতোষ?"

"না। কিন্তু আশ্চর্য, এই কথাগুলো এত বৎসর পরেও তুমি মনে রাখলে কি করে তপা? কথাগুলো কি খুব বেশী জরুরী?"

একটু হেসে সুতপা জবাব দিল, "স্মরণশক্তির পাগলামী সব সময়ে বোঝা যায় না। কত জরুরী কথা ভুলে গেছি, অথচ এতগুলো বাজে কথা কি করে যে মনে রাখলাম ভেবে আমি নিজেও আশ্চর্য হয়ে যাই। তুমি আজ আপিসে যাবে না?'

"কেন, ক'টা বাজল?" চমকে উঠে মহীতোষ নিজের হাত-ঘড়িতে সময় দেখে বলল, "হ্যারিসন রোডে আর ফিরব না, এখান থেকে সোজা চলে যাব আপিসে। যেকথা তোমায় বলতে এসেছিলুম—"

এই বলে মহীতোষ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে প্রশ্ন করল, "দেখ ত বিজ্ঞাপনটা তোমার দেওয়া নাকি?"

"হ্যাঁ, কাল কাগজে বেরিয়েছে। দশ বছর পরে বিজ্ঞাপন দিলাম—খুব বেশী তাড়াতাড়ি হ'ল না ত? তুমি দুঃখ পেলে, না খুশী হলে?"

"অতীতের দাসত্ব তুমি ঘুচিয়ে দিলে—সুতপা, এবার তুমি মুক্ত। আনন্দে কাল রাত্রে আমি ভাল করে ঘুমতে পারি নি।"

উসখুস করতে লাগল সুতপা স্নায়ু। আলোচনার সুরটা মহীতোষ হঠাৎ যেন বদলে দিল। মনে হচ্ছে, এবার বুঝি ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও উঠে পড়বে। তা ছাড়া অতীতের দাসত্বই শুধু অগৌরবের বোঝা বইবে কেন? বর্তমানের দাসত্বের সবটুকুই কি গৌরবের? দাসত্ব সব সময়েই দাসত্ব।

সুতপা বলল, "ঠিক করলাম কিনা জানি না, কোনকিছুর সঙ্গেই আমি আর বাঁধা রইলাম না।"

"বাঁধা কি তুমি পড়তে চাও না? বাঁধা পড়া আর দাসত্ব যে এক অবস্থা নয় তা তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে। আমি এবার চলি।"

"এস।" ওকে ধরে রাখবার কোন চেষ্টাই করল না সুতপা। কিন্তু মহীতোষই বা যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছে কই সে উঠে গিয়ে পশ্চিমের জানালার কাছে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল, "গড়িয়ার পোলটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।"

"হ্যাঁ। আমি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা। রোজই দেখতাম, ঘাড়ের ওপর ব্যাগ ঝুলিয়ে মেয়েরা সব গড়িয়ার পোলটা পার হচ্ছে। মাসীমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ওরা সব কোথায় যায়? তিনি বললেন, আপিসে। মেয়েরা যে আপিস করে তা আমি জানতামই না। কথাটা শোনবার পর থেকে আমার মধ্যেও উৎসাহ হ'ল, চাকরি করবার উৎসাহ। এই উৎসাহটুকুই হ'ল আমার জড়ত্ব ভাঙবার প্রথম ওষুধ। তোমার বোধ হয় দেরি হয়ে যাচ্ছে—"

"হ্যাঁ, এবার চলি। আচ্ছা রতন কোথায় থাকে? তাকে ত আমি একদিনও দেখতে পেলাম না। কেমন আছে সে?"

"ক্রমশঃই ভাল হয়ে উঠছে। এস।" মাঝখানের দরজাটা খুলে ফেলল সুতপা, মহীতোষ এগিয়ে গেল রতনের ঘরের দিকে।

সুতপা বলল, "রতন, ইনিই হচ্ছেন মহীতোষ বাবু।"

মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ ভাই?"

"অনেকটা ভাল। দিদি, আমার চেঞ্জে যাওয়ার কি ব্যবস্থা করলে? বড়সাহেবের কাছ থেকে—"

সুতপা কথাটা শেষ করতে দিল না, তাড়াতাড়ি বলে ফেলল, "ব্যবস্থা সব ঠিকই আছে, তুই ভাবিস নে। চল, মহীতোষ।"

সিঁড়ির মুখে এসে হঠাৎ যেন মনে পড়ছে এমন ভাব দেখিয়ে মহীতোষ জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কি কেতকীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?"

"কেতকী? কোন্ কেতকী?"

"মিস কেতকী মিত্র, তোমার জায়গায় যিনি কাজ করছেন।"

"হাঁ। তোমাদের ইউনিয়নের আপিসেই আলাপ হয়েছিল।"

নিঃশব্দে দুজনেই নেমে এল একতলায়। একটা কথাও আর হ'ল না। বাগানে নেমে গিয়ে মহীতোষ বলল, "মাসীমার শুনলাম শরীরটা ভাল নেই। আজ আর দেখা করতে পারলাম না।"

"সন্ধ্যের পরে আজ কি তুমি আসবে ?"

"বোধ হয় আজ আর আসতে পারব না, যদি বাড়ী থাক কাল আসব।"

বড় ফটক পর্যন্ত সুতপা গেল মহীতোষের পেছনে পেছনে।

অন্তরঙ্গতার স্রোত আর সাবলীল নেই। খোলাখুলি ভাবে কেউ যেন কারো সঙ্গে কথা কইতে পারছে না। যা বলছে তার সবই প্রায় অবান্তর, না বললেও চলত। ফটকের বাইরে গিয়ে মহীতোষ বলল, "শুনলাম, কেতকীকে স্থায়ী করে নেবার জন্যে ছোটসাহেব মিষ্টার হেওয়ার্ডের কাছে সুপারিশ করেছেন।"

"ভালই ত, অস্থায়ী কাজে মনের অশান্তি বড্ড বেশী। তোমার কি মিস মিত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ? মানে আলাপ ত ছিলই—" কথাটা শেষ না করে সুতপা একটু হাসবার চেষ্টা করল।

লজ্জা পেল মহীতোষ, জবাব কিছু দিল না। সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে মহীতোষ দেখল, বড়সাহেবের বেয়ারা কৃষ্ণবল্লভ হনহন করে ছুটে আসছে সরকার-কুঠির দিকে। জিজ্ঞাসা করল সে, "ব্যাপার কি ? কৃষ্ণবল্লভ ত বড়সাহেবের বেয়ারা।"

"বোধ হয় মেসোমশাইয়ের কাছে আসছে। তাঁর সঙ্গে বড়সাহেবের পরিচয় আছে, আমিও অবশ্য চিনি।"

কৃষ্ণবল্লভ সুতপার সামনে এসে হাতটা যথাসাধ্য ভাবে লম্বা করল, তার পর কপালে ঠেকাল হাত। সেলামের সমারোহ শেষ করে সুতপার হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, "বড় সাহেব জবাব চেয়েছেন।"

খামের ওপর সুতপারই নাম লেখা ছিল, মহীতোষও দেখল নামটা। কি মনে করে সে আর অপেক্ষা করতে চাইল না। বলল, "আচ্ছা, আমি চলি। আমি বরং আজ রাত্রির দিকেই একবার আসব।"

"বেশ ত, এস। মহীতোষ, তুমি শুনলে হয়ত অবাক হবে, চুয়াল্লিশ সালের সেই ক্যাপটেনই হচ্ছেন শেলী এ্যাণ্ড কুপার কোম্পানীর বড়সাহেব।"

"আজকাল আর ছবি আঁকেন না ?"

"দেখা হলে জিজ্ঞাসা করব।"

মহীতোষ আর অপেক্ষা করল না। নানাবিধ মানসিক জটিলতার জট পাকিয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। সুতপা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে সবই দেখতে পেয়েছে। বুঝতেও পেরেছে যে, এতদিন পরে মহীতোষ সত্যি সত্যি বাস্তবের বেলাভূমিতে পা দিয়েছে। সংগ্রাম ওর ঘরের দরজায় অপেক্ষা করছে।

বিপ্লব শুধু জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে না, পোড়ায়ও।

ওখানে দাঁড়িয়েই চিঠিখানা পড়ল সুতপা। বড়সাহেব ওকে 'ডিনার' খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। বেয়ারা মারফৎ স্বীকৃতি পেলে তিনি নিজেই এসে ওকে নিয়ে যাবেন। ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও তাঁর। নেমন্তন্ন কোন হোটেলে নয়, বড়সাহেবের নিজের বাড়ীতে।

ঘরে এসে ভাল করে ঠিকানাটা টুকে নিল সুতপা। স্বীকৃতি জানিয়ে সুতপা তাঁকে লিখল, নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। ফিরিয়ে দিয়ে গেলেই চলবে।

ক্রমশঃ

দৃষ্টি প্রদীপ

শ্রীআরতি দত্ত

তোমার চোখের প্রদীপ শিখায়
আমার মনের গহন তলে।
কি জানি কোন গভীর নেশায়
চাঁদনী রাতের রোশনী জ্বলে।
শাওন রাতের আবছা আলোয়
চোখের ভাষা নির্নিমেষে।
আমায় নিয়ে যায় যেন কোন
স্বপ্নভরা অচিন দেশে।
বন্ধু, তোমার দীপ্ত চোখে
অনুরাগের আগুন দেখে।

আমার মনেও আগুন জাগে
সরম রাঙা আবির মেখে।
তোমার চোখের নেশার ঘোরে
আমার চোখে তন্দ্রা নামে।
আমার মনের ক্লান্ত ছায়া
তোমার চোখে আপনি থামে।
জ্বালিয়ে রেখো দৃষ্টি প্রদীপ
যুগান্ত কাল এমনি করে—
তোমার চোখের তারায় আমার
সত্তাটিও প্রহর ধরে।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্র

শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায়

নীলাম্বু আর নীলমাধব এই নিয়েই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ছুটে চলেছি তারই দুর্ব্বার আকর্ষণে, প্রথম বাধা পেলাম খড়্গপুরে। পুরী এক্সপ্রেস ধরব বলে বসে আছি। থাকব কিছুদিন পুরীতে। তাই কম হ'লেও টুকিটাকি নিয়ে সতেরটি লটবহর সমেত আমরা ছ'জনা বাষ্পীয়যানের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছি। ট্রেন এল একঘণ্টা দেরী করে, মানুষে মানুষে ঠাসাঠাসি, সাধ্য কি ভিতরে প্রবেশ করি। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট, ফার্ষ্ট ক্লাসে পালটাতে চাইলাম। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি, ফার্ষ্ট ক্লাস ভিতর থেকে বন্ধ। চেকারবাবুরা, গার্ডসাহেব, শেষে একজন এ. এস. এম পর্য্যন্ত হিমসিম খেয়ে গেলেন, কিন্তু দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনই রইল। শুধু নাসিকাগর্জ্জনের ধ্বনিটুকু দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠল।

কোনার্ক হতে আনা সূর্য্য মূর্ত্তি

ছেড়ে গেল পুরী এক্সপ্রেস। পুরী প্যাসেঞ্জার প্রায় রাত্রি তিনটায়। তার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম, সংবাদ পাওয়া গেল পুরী প্যাসেঞ্জারেও বুকিং বন্ধ। হা হতোস্মি! কুলিদের শরণাপন্ন হলাম। বেশী বকশিশের লোভে তারা যে-কোন উপায়ে ট্রেনে তুলে দিতে স্বীকৃত হ'ল। ট্রেন ষ্টেশনে থামবার পূর্ব্বে ধাবমান অবস্থাতেই তাদের দু'জন কোন একটা কামরাতে ঢুকে পড়ে জায়গা দখল করে নেবে, বাকী তিনজন ট্রেন থামলে সেই কামরায় মালসমেত আমাদের চড়িয়ে দেবে, এই হ'ল প্ল্যান। সৌভাগ্যক্রমে কুলিরা এমন একটা কামরাতে উঠেছিল, যার প্রায় সব যাত্রীই খড়্গপুরে নেমে গেল। এবার আরামে বসলাম গাড়ীতে। তবে সকাল আটটার পরিবর্ত্তে সন্ধ্যা ছ'টায় পৌঁছতে হবে পুরী।

ঝড়ের সমুদ্র

ভোর হয়ে গেল দাঁতনে। হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম, চা জুটল না ভাগ্যে। রূপসা ষ্টেশনে চায়ের অভাব মিটল। পার হয়ে গেলাম বুড়ীবালাম আর বালেশ্বর—বাঘা যতীনের স্মৃতিপূত স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষরী রণাঙ্গন। ভদ্রক বড় ষ্টেশন-এ লাইনের, কিন্তু ভদ্রতা নেই এর কোথাও। পুরী কিনতে গিয়ে ফ্যাসাদ। পুরীওয়ালা পুরীগুলো পাতার ঠোঙায় দিতে গিয়ে ফেললে প্ল্যাটফর্ম্মে। বললাম, ওগুলো নোব না, অন্য দাও, 'কঁড় কউচি, দিব না, বজাড়ি'…এর পর যে কথাগুলো সে প্রয়োগ করেছিল, সেগুলো ও-অঞ্চলে স্বাভাবিক রসিকতাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কথাগুলো শুনলে আমাদের মুখ-চোখ রাগে লাল হয়ে যায়।

বৈতরণী ব্রিজ পার হলাম। মস্ত বড় নদী বৈতরণী। দু'ধারে শিশু-পাহাড় তার মাঝ দিয়ে স্নেহময়ী বৈতরণী বয়ে যাচ্ছে। পাহাড়-শিশুরা যেন মাতৃস্তন্যে লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে উঠেছে। পাশেই শাল-তালের বন। সেখানে গরু চরছে, আর বাঁশীতে বাজছে তুরুর তুরা সুর।

জাজপুর ষ্টেশন। অন্ধ ভিক্ষুক গান গাইছে। সুর সুন্দর, কিন্তু ভাষা দুর্বোধ্য। হাঁটুতে বাঁধা দুটো করতাল। পায়ের পাতায় জড়ানো দুটো করতাল, এক হাতে বাঁশী। তা বাজাচ্ছে নাকের নিশ্বাসবায়ু দিয়ে। অপর হাতে মাদল বাজাচ্ছে। মাঝে মাঝে গানের সুর ছড়াচ্ছে।

নদীমাতৃক দেশ উড়িষ্যা। কত বড় বড় নদী পার হয়ে এলাম। উড়িষ্যার নূতন রাজধানী ভুবনেশ্বর পার হয়ে গেলাম। ট্রেন থেকে দেখা গেল একপাশে ধবলগিরি, অপর পাশে উদয়গিরি আর খণ্ডগিরি। লিঙ্গরাজের মন্দিরের চূড়াও ট্রেন থেকে চোখে পড়ল।

মালতীপাতপুর ষ্টেশন। ফেরীওয়ালা হাঁকছে, কাঁকুড়ি লিব, কাঁকুড়ি। নারিয়েল লিব, নারিয়েল ছ'পিসা দাম অছি। নারিকেল ও শশা এখানে বেশ সস্তা। বালিয়াড়ি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে কখন ইতিমধ্যে। দিগন্তপ্রসারী নারিকেল-সুপারির বাগান মাইলের পর মাইল চলে গিয়েছে। কেয়াগাছও সাথী হয়ে এসেছে এক রকম দাঁতনের পর থেকে। রেল লাইনের দু' পাশে কেয়াগাছ। কোথাও কোথাও কেয়াফুল ফুটে আছে। কেয়াখয়ের তৈরি হয় উড়িষ্যাতে প্রচুর। বাংলার শ্যামলতা আর বিহারের রুক্ষতা মিশে আছে এখানে।

বিকেল পাঁচটা পনর মিনিটে পুরী পৌঁছালাম। গন্তব্যস্থান এবার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। স্বর্গদ্বারে এদের যাত্রীনিবাসটি একেবারে সমুদ্রের উপরে। পথে পাণ্ডাদের প্রশ্নের জবাবে কতবার যে জেলা, গ্রাম ও বংশপরিচয়ের ফিরিস্তি দাখিল করতে হ'ল তার হিসেব দেওয়া মুস্কিল। আমাদের গাড়ী চলেছে সমুদ্রের তীরে তীরে। সারি সারি হোটেলগুলিতে জলে উঠেছে নীল, লাল, সবুজ নানা জাতীয় আলোকসম্ভার। প্রত্যেকেই তাদের আলোকের মারফতে যাত্রীদের আহ্বান জানাচ্ছে তাদের বিশেষ একটি প্রকোষ্ঠে অবসর-বিনোদনের জন্যে। সাগরজলে পড়েছে আকাশের ধূসর মেঘের ছায়া-গাঢ় নীলিমা হরণ করে। পাঁওটে জলের মাথায় শুভ্র তরঙ্গরাশি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে ভেঙে লুটিয়ে পাড় ছুটে আসে তীরের পানে অধীর আবেগে। কাতারে কাতারে নরনারী সমুদ্রশোভা দর্শন করছে, ছুটোছুটি করছে, মাতামাতি করছে।

ঘোড়ার গাড়ী এসে পৌঁছল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের যাত্রী নিবাসে, পূর্ব্ব হতে ওঁদের বালিগঞ্জের হেড আপিস থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী আমাদের সম্বন্ধে লিখে রেখেছিলেন। তাই ব্রহ্মচারী দীনবন্ধু আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে দোতলায় দু'টি মনোরম ঘরে ঠাঁই করে দিলেন।

দীনবন্ধু স্বামীজীর বয়স বেশী হবে না, কিন্তু কর্ম্মদক্ষতা প্রচুর
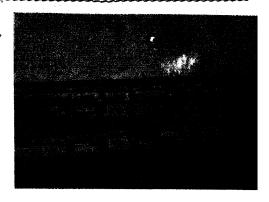
মাছ ধরা—পুরী

এবং ব্যবহার মধুর। তিনি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, সেইজন্য অনেক সময় একটু কঠোর। আবার উপাসনার সময় তাঁর কুসুমসুলভ পেলবতা খুব কম লোকের দৃষ্টি এড়ায়। বড় ভাল লাগল স্বামীজীকে।

জিনিষপত্র গুছিয়ে রেখে ছুটে চললাম সমুদ্রতীরে। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সেই অন্ধকারেও চোখ চিরে তাকাই আদি জননীর আদিম কালের ধারাবাহিক আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সমস্তটুকু নিঃশেষে উপভোগ করে নিতে। কিন্তু সমুদ্রের দিকদারী করা কি সম্ভব? শুধু দেখতে পাই একটার পর একটা, তার উপর আবার একটা, একটানা তরঙ্গ ছুটে আসছে অন্ধ আবেগে। লক্ষ্য করলাম, একটু দূরে যে তরঙ্গ ঐরাবতকেও অবলীলায় অতলশায়ী করতে পারে, সেই তরঙ্গ যখন উপকূলে বালির উপর লুটিয়ে পড়ছে তখন যেন স্নেহ তাতে বিছান। মনে হ'ল একি স্নেহের খেলা না সর্ব্বনাশের খেলা? ক্লান্ত শরীর। ফিরে এলাম আশ্রমে। রাত্রে যখনই ঘুম ভেঙেছে শুনেছি সিন্ধুর অশান্ত গর্জ্জন—যেন বেদনার রুদ্ধ অভিমান। কখনও মনে হয়েছে যেন একশ ঝড় এক সঙ্গে ছুটে আসছে হু হু শব্দে। আবার কখনও তন্দ্রাঘোরে শুনতে পেয়েছি কিনারায় ঢেউ আছড়ে পড়ছে ঝপাং ঝপাং ঝপ।

পরদিন সকাল হবার অনেক পূর্ব্বে সমুদ্রকিনারে ছুটে গেলাম, সূর্য্যোদয় দেখব। সূর্য্যদেব যেন জলে ডুবে ছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলেই লাফ দিয়ে গগনে উঠে পড়লেন। চমৎকার এ দৃশ্য। ভীড় জমে গিয়েছে স্বর্গদ্বারে। ঘটেছে সকল রকম বয়সের সমন্বয়। মেয়েরা ঝিনুক কুড়ুচ্ছে, মায়েরাও ঝিনুক সংগ্রহ করছেন, বুড়োরা হাওয়া খাচ্ছেন। ছেলেরা একেবারে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর ঢেউয়ের ফেনা পায়ে লাগাচ্ছে। কোন বেয়াদব ঢেউ কোন মহিলার কাপড় ভিজিয়ে দিচ্ছে। সম্মুখে রক্ষিত, তাঁর লাল স্যাণ্ডেল চটিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ মহিলাটির কাতরোক্তি শুনে যেন সদয় হয়ে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। একটা হাহাকার ধ্বনি জেগে উঠল। একটা ঢেউ একটি দু'-আড়াই বছরের

জগন্নাথদেবের মন্দির

মেয়েকে গ্রাস করে ফেলেছিল আর কি! এক বৃদ্ধ নুলিয়ার তৎপরতায় মেয়েটি রক্ষা পেয়ে গেছে। সমুদ্রে দেবতার গ্রাস প্রাত্যহিক ঘটনা। শুনলাম দু'দিন পূর্ব্বে একটি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার্থী সমুদ্র স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেছে। গতকালও একজন সাঁতারু যুবক সমুদ্রের চোরা স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে নুলিয়াদের কৃতিত্বে রক্ষা পেয়েছে। ভয় হ'ল একটু। অথচ এই ভয়ঙ্কর সমুদ্রে ঢেউয়ের মাথায় ডিঙি নাচিয়ে জেলেরা চলে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে। ছোট্ট ডিঙিতে দুজন করে আর একটু বড় ডিঙিতে চার-পাঁচজন করে নুলিয়া চলেছে মস্ত জাল নিয়ে বারদরিয়ায়। সকালে সমুদ্রের যে দিকে তাকাও ডিঙি-নাচ দেখতে পাবে।

অদ্ভুত জাত এই নুলিয়ারা। অনেকের চেহারা কুৎসিত, কাফ্রিমুলুকের অধিবাসীদের মত। ওদের সংসার ও সংসার-লক্ষ্মীদের চেহারাতেও কান্তি বা শান্তির ছাপ কোনটাই নেই। পুরুষরা বোহেমিয়ান, মেয়েরা কুঁড়ুলে। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয়, দুপুরের পূর্ব্বে তারা রূপালী মাছে ডিঙিগুলিকে বোঝাই করে নিয়ে আসে। মাছ বিক্রী করে বাড়ী বাড়ী। তারা যাত্রীদের সমুদ্রস্নান করায় সামান্য আনা-সিকার বিনিময়ে। তবে হাঁ, ওরা সমুদ্রকে চেনে, ভালভাবে জানে। কখন জোয়ার বাড়বে, কখন তুফান উঠবে, কখন ডিঙি ভাসবে ঢেউয়ের মাথায় দোল খেতে খেতে, আবার কখন ডিঙি বাওয়া চলবে না—এসব এদের নখদর্পণে। তিন-চারটে বাড়ীর উপর একজন করে নুলিয়া আছে। এসব বাড়ীর অধিবাসীদের এরা জিনিষপত্র বয়ে দেয়, সমুদ্র স্নান করায়, সময় সময় মজুরের কাজকর্ম্মও করে দেয়। আবার সন্ধ্যার অবসর সময়ে ওড়িয়া ভাষায় দু'চারটে ভজন গানও শুনিয়ে যায়। অবশ্য সবকিছুই পয়সার বিনিময়ে। এদের মাথায় থাকে অনেক সময় চোঙার মত মস্ত লম্বা মার্কামারা টুপী।

আমরা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের এক পরিচিত পাণ্ডাকে নিযুক্ত করলাম তীর্থগুরু হিসেবে। আসল পাণ্ডার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপাত্র। তবে আসলজনের দেখা একবার মাত্র পেয়েছিলাম, সেটা আর্টিকা বন্ধনের সময়ে। বাকী দর্শনের কাজ পাণ্ডাঠাকুরের প্রধান ছড়িদার নরসিংহদাসের দ্বারা সমাধা করতে হয়েছে। লোকটি সেবাপরায়ণ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামীজী মারফৎ পাণ্ডা ঠিক হলে স্বামীজী যা দিতে বলেন পাণ্ডা তাতেই রাজী হয়, জুলুমবাজী করে না, অন্যথা পাণ্ডারা সুফল আদায় করতে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয় করে ও বিব্রত হতে হয়। সঙ্ঘের পরিচিত নুলিয়ার সাহায্যে সমুদ্রস্নান পর্ব্ব সমাধা করে শ্রীমন্দির দর্শনে বের হলাম।

পথে অনেকগুলি দর্শনীয় স্থান থাকলেও আজ আর সেদিকে নজর না দিয়ে আকুলি-বিকুলির সমাধা করলাম দূর হতে মন্দিরের ধ্বজচক্র দর্শনে। অচিরেই গিয়ে পড়লাম শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখের অরুণ স্তম্ভটির নিকট। স্তম্ভটি পূর্ব্বে কোনার্কের সূর্য্যমন্দিরে ছিল। মহারাষ্ট্রগুরু বাবা ব্রহ্মচারী রাজা দ্বিতীয় দিব্য সিংহদেবের সময়ে এটিকে স্থানান্তরিত করে এনে মাধুকরী ভিক্ষার দ্বারা মন্দির দ্বারে স্থাপিত করেন। ছড়িদার বললে, 'দেখুন কেমন গরুড় মূর্ত্তি।' মূর্ত্তিটি কিন্তু অরুণ মূর্ত্তি, গরুড় নয়।

সিংহদ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, একজন

অরুণ স্তম্ভ ও সিংহদ্বার

গড়াগড়ি দিয়ে সিঁড়ি অতিক্রম করছে। এইভাবে বাইশ পাহাড় বা বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে দ্বিতীয় বেষ্টনীতে প্রবেশ করেন ভক্তরা। দ্বিতীয় বেষ্টনের পাশেই আনন্দ-বাজার। এখানে নানা প্রকার ভোজ্যদ্রব্য বিক্রয় হয়। জগন্নাথ-দেবের সাদা ভোগ এবং বলরামের রাজভোগ এখানে মেলে। আনন্দবাজারে স্পর্শদোষ বা উচ্ছিষ্টাদির বিচার নেই। জাতিভেদের বালাই নেই। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক হাঁড়ি থেকে অন্নগ্রহণ করে। অস্পৃশ্যতা এখানে হার মেনেছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে এমন সমবেত পঙক্তি ভোজনের যোগাশালা কোথাও আছে কিনা জানি না। জগন্নাথদেবের বিরাট রন্ধনশালা হতে শত শত আটিকা-ভোগ নূতন হাঁড়িতে পাক হয়ে উৎসর্গিত হয়। দ্বিতীয় বেষ্টনীতেও প্রবেশের পূর্ব্বে নৃসিংহদেব, সুগ্রীব, কাশীর বিশ্বেশ্বর, রামচন্দ্র প্রভৃতি অতিক্রম করে আসতে হ'ল। আর অতিক্রম করে এলাম সর্ব্ব-প্রথমেই জগন্নাথদেবের পতিতপাবন মূর্ত্তি।

দ্বিতীয় বেষ্টনীর প্রবেশপথে শোভা পাচ্ছে মূর্ত্তিখচিত কালো মর্ম্মর তোরণ। মনে হয়, এ মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলিও সূর্য্যমন্দির হতে আনা। এদের কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা তার প্রমাণ দিচ্ছে। কোন কোন মূর্ত্তির অঙ্গে কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্তের ছাপ কালের স্থূল হস্তানুলেপেও আজও অপসারিত হয় নি। পুরীর মন্দিরও কালা-পাহাড়ের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করতে পারে নি। তবে জগন্নাথ-দেব ভ্রাতা-ভগ্নিসহ স্থানান্তরিত হয়েছিলেন আক্রমণের পূর্ব্বে। বাঁ-পাশে রন্ধনশালা হতে ভোগমণ্ডপে ভোগ আনার জন্য আবৃত পথ। সেই পথের দক্ষিণ দিকে অধিষ্ঠান করছেন অন্নীশ্বর মহাদেব। এঁর দক্ষিণে কল্পবট। ছড়িদার বললে, এই বটবৃক্ষে ভূষণ্ডী-কাক ত্রেতাযুগ হতে রামনাম করেছেন। কাক গোটাকয়েক অবশ্য গাছটিতে ছিল। অমিতাভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে হাতের ছাতাটা উঁচিয়ে দিলে। অমনি কা-কা ধ্বনি করে বায়সকুল উড়ে গেল। ভূষণ্ডী-কাক মহাশয়ও রামনাম বিলোতে বিলোতে উড়ে গেলেন কিনা বুঝতে পারলাম না। ছড়িদার বললে, ভূষণ্ডী-কাক এখন ছদ্মবেশে আছেন, চিনবেন কেমন করে? নিকটে সত্য-নারায়ণ মন্দির। হয়ত সত্যনারায়ণ মুসলমান অভিযানের পরে এখানে স্থানলাভ করেছেন। ঠাসাঠাসি দেবদেবী মূর্ত্তি আর তাঁদের ছোটবড় মন্দিরগুলিও রয়েছে। ষড়ভুজ শ্রীমন্মহাপ্রভু মূর্ত্তি নজরে পড়ল এখানে। ষড়ভুজ মহাপ্রভুর পর মুক্তিমণ্ডপ। শঙ্করাচার্য্যের সময় হতে সাধুসন্ন্যাসীরা মিলিত হন এখানে। স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় মীমাংসা এখানে স্থিরীকৃত হয়। মুক্তি-মণ্ডপের পশ্চিমে আছেন আদি নৃসিংহ মূর্ত্তি।

বড় দেউলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীবিমলা দেবী পূর্ব্বাভিমুখিনী হয়ে বিরাজমানা, চতুর্ভুজা তিনি, এক হাতে অক্ষমালা, দ্বিতীয় হাতে অমৃতকলস, তৃতীয় হাতে অভয় বর ধারণ করে আছেন তিনি। এটি দেবীপীঠ। সকল কার্য্যের সাক্ষীস্বরূপ আছেন শ্রীসাক্ষীগোপাল। কানপাতা হনুমান আছেন কান পেতে। সমুদ্রের গর্জ্জন শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করলে তিনি সমুদ্র শাসন বা শোষণ করবেন। আশ্চর্য্য, জলধির জলদ-নির্ঘোষ মন্দিরে প্রবেশ করে না কোন দিনও।

মন্দির পরিক্রমা করছি। পশ্চিম দরজার দক্ষিণ দিকে আছেন রামেশ্বর শিব। এর পর জগন্নাথদেবের উদ্যান। তার মধ্যে চক্র-নারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর মহাদেব। উত্তর দিকে একটু গিয়ে চোখে পড়ল ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, বঙ্কুবিহারী, সত্যভামা, ষষ্ঠী, আরও কত কি। চোখে পড়ল লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আর তাঁর ভাণ্ডার। লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে এলাম। এই মন্দিরে রক্ষিত ছিল কোনার্কের আদি সূর্য্যমূর্ত্তি। ওটি আনা হয়েছিল নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে।

মন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি নাতি-উচ্চ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম একটি পদ্মাকৃতি মর্ম্মরপীঠের উপর স্থাপিত আছে। শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকতেন সকলের পশ্চাতে গরুড় স্তম্ভের পিছনে। কখনও তিনি এর বেশী অগ্রসর হন নি। সেখানে পাষাণ বিগলিত হয়ে পাদপদ্মের ছাপ অঙ্কিত হয়ে যায়। পাষাণ-দেওয়ালে যেখানে হাত রাখতেন সেখানেও অঙ্কিত হয়ে যায় আঙুলের তিনটি ছাপ। পাদপদ্মটি তুলে এনে মন্দিরের বাইরের মর্ম্মরপীঠের উপর স্থাপন করা হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী বলেন—

গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বলে?
গরুড় স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে?

গরুড় স্তম্ভের সামনের দরজা দিয়ে আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির চার ভাগে বিভক্ত ; গর্ভমন্দির বা বড় দেউল, শ্রীমুখশালা, জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ। শ্রীজগন্নাথদেব পূর্ব্বাভিমুখী হয়ে মন্দিরে বিরাজ করছেন। যে গর্ভমন্দিরে জগন্নাথ, বলরাম ও ও সুভদ্রাদেবী সমাসীন—তা মণিকোঠা নামে খ্যাত। একদা বহু মণিমাণিক্য ছিল এই মণিকোঠার রত্নবেদীতে। বিধর্মী-আক্রমণে তার অধিকাংশই লুণ্ঠিত হয়েছে। যা ছিল তারও কিছু কিছু চোরে চুরি করে নিয়েছে। জগন্নাথদেবের মাথায় নীলকান্ত মণিটিও এই অল্পদিন পূর্ব্বে কে বা কারা আত্মসাৎ করেছে। বড় দেউল বা মণিকোঠা দু'টি বিভিন্ন ঐককেন্দ্রিক প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত। বহিঃপ্রাকারটিকে বলে মেঘনাদ প্রাচীর। অন্তঃপ্রাকারটির নাম কুর্ম্মবেড়। বহিঃপ্রাকারের চার দিকে চারটি প্রবেশ দ্বার। বড় দেউলের বিমানাংশ উচ্চতায় ২০০ ফুট, পরিধিতে ৪২ ফুট। চূড়ায় নীলচক্র নামে একটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত সুদর্শন চক্র শোভা পাচ্ছে।

মণিকোঠার পরে শ্রীমুখশালা। এখান থেকে সাধারণ যাত্রীরা শ্রীমুখ দর্শন করেন। তার পর ভোগমণ্ডপ। এখানে ছত্রভোগ ও কোঠভোগ প্রদত্ত হয়। ছত্রভোগের ব্যবস্থা করেন পুরীর বিভিন্ন মঠ ও তীর্থযাত্রিগণ। কোঠভোগ মন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রাজভবন থেকে ব্যবস্থা করা হয়। ভোগমণ্ডপের পরেই জগমোহন। এখানে গরুড় স্তম্ভ বিরাজিত। এখানে রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের জন্য দেবদাসীর নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়। কিংবদন্তী বলে, জগন্নাথদেব কোন এক কুঞ্জবনে এক ভক্ত বৈষ্ণবীর কণ্ঠের গীতগোবিন্দ গান শুনতে যেতেন। তাই প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁর অঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখা যেত। এক ভক্তরাজ স্বপ্নাবেশে এই তথ্য পরিজ্ঞাত হয়ে সেই ভক্ত বৈষ্ণবীকে অনুরোধ করেন কুঞ্জবন পরিত্যাগ করে নিত্য শ্রীমন্দিরে ভগবানকে নৃত্যগীত শোনাতে। রাজী হন বৈষ্ণবী। হলেন তিনি দেবদাসী —দেবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়ে। এই হতেই দেবদাসীপ্রথার সৃষ্টি হয়।

দারুব্রহ্ম ভাসতে ভাসতে উপস্থিত হলেন চক্রতীর্থে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সেকথা পূর্ব্বাহ্নে জানতেন। প্রস্তুত ছিলেন তিনি। শঙ্খচক্র-অঙ্কিত নিম্ববৃক্ষটিকে সসম্মানে সাড়ম্বরে নিয়ে এলেন পুরীতে। কিন্তু কোথায় সে স্থপতি যে উপযুক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবে? তখন নীলমাধব নিজেই অনন্ত মহারাণা বেশে রাজসমক্ষে উপস্থিত হলেন। বললেন, বৃদ্ধ শিল্পী আমি, ২১ দিন লাগবে মূর্ত্তি প্রস্তুত করতে। তবে একটা মাত্র শর্ত্ত। এই ২১ দিন আমি রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাজ করে যাব। কেউ সেখানে থাকবে না, কেউ যাবে না সেখানে। কেউ ডাকবে না আমাকে। রাজা রাজী হলেন সেই শর্ত্তে। ১৫ দিনের পর রাজা অধীর হলেন। দরজায় কান পেতে রইলেন। শিল্পীর যন্ত্রপাতির কোন সাড়া-শব্দ কানে এল না। উৎকণ্ঠিত রাজা দরজা খুলে ফেললেন।

চক্রতীর্থ

কোথায় সে শিল্পী? কেবল হস্তপদহীন মূর্ত্তি তিনটি পড়ে আছে। দৈববাণী হ'ল—নীলাদ্রির উপর মন্দির নির্ম্মাণ করে এই অসমাপ্ত মূর্ত্তির পূজা প্রচলন কর। কলিতে দেবতা এরাই। তথাস্তু। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন উপযুক্ত দেউল নির্ম্মাণ করালেন। তিনি নীলমাধবকে পেলেন না, পেলেন দারুব্রহ্ম। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি নীলমাধবের সংবাদ এনেছিলেন। বিশ্বাবসু শবরের কন্যা ললিতা-সুন্দরীকে বিবাহ করে তিনি নীলমাধবের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। বিশ্বাবসুই পূজা করতেন নীলমাধবের এক গহন বনে নিশীথ রাত্রে। কন্যার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পিতা জামাতা বিদ্যাপতিকে চক্ষু বন্ধ অবস্থায় নিয়ে যান সেই নিভৃত নিলয়ে। ললিতা সুন্দরী স্বামীর সঙ্গে সর্ষপ দেন। বলেন, সর্ষপ ছড়িয়ে যেও, তা হলে দিবালোকে সেই পথ পুনর্ব্বার চেনা যাবে। পথ চেনা ঠিকই গিয়েছিল। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন সসৈন্যে নীলমাধবকে আনতে গেলেন, তখন কোথায় তিনি? দৈববাণী হ'ল—আমাকে নীলমাধবরূপে পাবে না, পাবে দারুব্রহ্মরূপে। সেই দারুব্রহ্মই চক্রতীর্থে এসেছিলেন ভাসতে ভাসতে।

ইন্দ্রদ্যুম্নের যুগ ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন অন্ধকারের যুগ। কিংবদন্তীর অধ্যায়ে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সমস্ত কার্য্যকলাপ বিধৃত হয়ে আছে। তবে সভ্যতার কোন একটা স্তর যে মাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে, তা পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখনও সাক্ষ্য দেয়। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে যে কপালমোচন শিবমন্দির আছে তা রাস্তা হতে কুড়ি ফুট নীচে কেন? মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বের পাঞ্জাবী মঠে কূপখননকালে প্রায় কুড়ি ফুট নিম্নস্থ আর একটি কূপের সঙ্গে বর্ত্তমান কূপটির সংযোগ ঘটে। নিম্নস্থ কূপটি কোন যুগের কে জানে! পুরীর সর্ব্বপ্রাচীন সরোবর মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর, যজ্ঞেশ্বর মন্দির, গোবর্দ্ধন মঠ, এগুলি বর্ত্তমান সময়ের রাস্তা হতে কুড়ি ফুট নীচে কেন?

শ্রীমন্দিরে রক্ষিত মাদলা-পাঞ্জী হতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান মন্দির অনঙ্গভীমদেবের দ্বারা প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর

গৌড়ীয় মঠ

নরেন্দ্র সরোবর
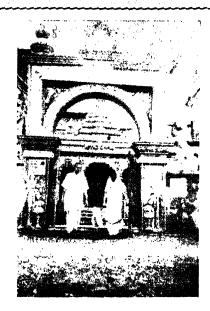
নির্ম্মিত হয়েছে। এই সুবৃহৎ মন্দির পরমহংস বাজপেয়ীর অধ্যক্ষতায় ৪০ হতে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল। হাণ্টারসাহেব তাঁর History of Orissa-র vol 1. পুস্তকে উল্লেখ করেছেন যে, মন্দিরটি ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। শ্রীব্রজকিশোর ঘোষ প্রণীত History of Pooree-ও এই অভিমত সমর্থন করে। Mr. Fergusson সাহেবও ১১৯৮ সালকেই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণের কাল বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ১১৯৮ সালের পূর্ব্বের ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির কোন যুগের ?

মন্দিরের হস্তান্তর ঘটেছে বহুবার। উৎকলরাজ যযাতি-কেশরী মন্দিরের উন্নতিবিধান করেছেন—এমন প্রমাণ পেয়েছেন পণ্ডিতরা। কপিলেন্দ্রদেব, পুরুষোত্তমদেব, প্রতাপরুদ্রদেব, এঁরাও প্রত্যেকেই মন্দিরের কিছু কিছু উন্নতিসাধন করেছেন। আবার কোন কোন খোদিত লিপি থেকে এমন কথাও জানা যায় যে। গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবর্ম্মণ চোড়গঙ্গদেবই সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দের অধিকারে এসেছিল মন্দির। তাঁরা 'সাতাইশ হাজারি মাহাল' উপহার দিয়ে মন্দিরের ভোগরাগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করেন।

আরও সুদূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায়, সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য্য শঙ্কর যখন পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাব পুরাদস্তুর চলেছে জগন্নাথ মন্দিরে। হুয়েন-সাংও এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন পুরীতে। তবে সে প্রাধান্যে তখন ছেদ পড়তে আরম্ভ করেছে। বুদ্ধদন্ত বহু পূর্ব্বেই সিংহলে নীত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের সন্ধিক্ষণে এলেন ফা-হিয়ান। তিনিও বুদ্ধধর্ম্মের পূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করে গেলেন ভারতে। পুরীতে তখন ত্রিরত্নের উপাসনা চলছে।

আরও পূর্ব্বের কথা। চণ্ডাশোক স্থলে-জলে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করে কলিঙ্গ বিধ্বস্ত করেছেন। কিন্তু শান্তি পেলেন উপগুপ্তের মৈত্রীমন্ত্রে, কিন্তু শান্তি পান নি মনে। তাই আবার তিনিই মৈত্রী, সাম্য ও করুণায় সমস্ত কলিঙ্গদেশকে প্লাবিত করে দিলেন। জগন্নাথদেবের মন্দির বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে পড়ল। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—এই ত্রিরত্নের সংজ্ঞাব চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠল জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার আকৃতিতে। দেবতাত্রয়ের ভ্রাতাভগ্নী সম্বন্ধ বৌদ্ধধর্ম্মের মেরুদণ্ড ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব হতে উদ্ভূত, তখনও যে জগন্নাথদেবের মন্দির ছিল তার প্রমাণ অকাট্যভাবে পাওয়া যাচ্ছে। সে মন্দিরের নির্ম্মাতা কে ? কোন যুগের সে মন্দির ?

ঘৃতপ্রদীপ হাতে নিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাখলাম গরুড় স্তম্ভের পাদদেশে, অগ্রসর হলাম শ্রীমুখ পর্য্যন্ত। মাথার উপর মাথা, এখন মণিকোঠায় প্রবেশের সম্ভাবনা নেই। মাঝে মাঝে অবাঙালী কণ্ঠে গগনভেদী ধ্বনি উঠছে, জগন্নাথ-জী কি জয়, ভিড় থাকলেও দূর হতে জগন্নাথদেবকে দর্শন করে তৃপ্ত হলাম। একটা প্রশ্ন মনে জাগল। এই হস্তপদহীন মূর্ত্তিগঠনের তাৎপর্য্য কি ? উড়িষ্যার স্থপতিরা অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তিগঠনে সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিলেও, কেন সেই স্থাপত্যের সুযোগ গ্রহণ করা হ'ল না এ ক্ষেত্রে ? হিন্দুরা প্রথমে পৌত্তলিক ছিলেন না। নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করতেন। মূর্ত্তিগুলি কি সেই ঐতিহ্যের বাহক ? অথবা এগুলি অরূপের মধ্যে রূপের পরিকল্পনা, অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের সমাবেশ, অব্যক্তকে ব্যক্ত করার দার্শনিক ইঙ্গিত।

বেলা বারটায় মন্দিরের বাইরে এলাম। একদল তরুণের উচ্চকিত হাস্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে হাস্যের কারণ মিথুন-মূর্ত্তিগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। স্থপতিদের শালীনতাবোধের অভাবের জন্য

আজ অনেকেই নীতির প্রশ্ন তুলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। ছড়িদার বললে—ঐ ধরনের ছবি মন্দিরগাত্রে থাকলে মন্দিরে বজ্রপাত হয় না। কথাটা কতদূর যুক্তিযুক্ত জানি না। তবে পুরাকালের অনেক রোমান ক্যাথলিক গীর্জাতেও ঐ ধরনের ছবি নাকি আছে। অনেকে এর রূপক ব্যাখ্যা করে থাকেন। মন্দিরের ভিতর কোথাও নীতিগর্হিত ছবি নেই। যা আছে তা বাইরে। তাই তাঁরা বলেন, বহির্জ্জগৎ কামনা-বাসনা নিয়ে ব্যস্ত। সে কামনা-বাসনার প্রতীক ঐ মূর্ত্তিগুলি, তাই ওগুলি মন্দিরের বাইরে আছে। কামনা-বাসনা জয় করলে তবে অন্তর্জ্জগতের লীলা-সুন্দরের দর্শন মেলে। যে যুগে ঐ ধরনের ছবি আঁকা হয়েছিল, সে যুগের লোকের সঙ্গে এ যুগের লোকের রুচির নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। আজকে যাকে আমরা রুচিবিকার বলে মনে করছি, সে যুগে সেইটেই রুচিসম্মত ছিল। তা ছাড়া, যাঁরা ঐ আদিরস-প্রধান ছবি বানিয়েছিলেন তাঁরা জিনিষটার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ছবিগুলি এমনসব জায়গায় দিয়েছেন যা লোকের দৃষ্টি সহজেই এড়িয়ে যায়।

তোটা—গোপীনাথের মন্দির

পরের দিন প্রত্যূষে জগন্নাথদেবের দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি দেখব বলে ছড়িদারের সঙ্গে মন্দিরে গেলাম। দরজা খোলা হ'ল প্রায় বেলা সাড়ে সাতটায়। তার পূর্ব্বে মণিকোঠায় প্রবেশের জন্য টিকিট করতে হ'ল। প্রতিটি টিকিট আট আনা করে। যাদের টিকিট আছে কেবল তাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হ'ল মণিকোঠায়। যারা টিকিট করল না তারা পাণ্ডাদের চোখে ফালতু লোক। মনে ব্যথা পেলাম যখন একটি বুড়ীকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে মণিকোঠা থেকে। অপরাধ—তার টিকিট কেনার পয়সা নেই। দেখলাম, দেবতার স্থানেও কাঞ্চন-কৌলীন্যের প্রাধান্য। বড় বিসদৃশ ঠেকল। প্রতিবাদ জানাব ভাবলাম। কিন্তু কার কাছে? ছড়িদার রসিক লোক, বললে, প্রভুর যে হাত-পা নেই। প্রতিকার করবেন কি করে? দাঁতনকাঠিগুলি দন্তধাবন করার ভঙ্গীতে পাণ্ডারা দেবতাদের উদ্দেশে কয়েকবার ঘুরিয়ে দিলে। মুখপ্রক্ষালনের জল ঢাললে তামার কুঁড়িতে। তার পর আনুষ্ঠানিকভাবে দন্তধাবনপর্ব্ব শেষ হ'ল বলে ঘোষণা করা হ'ল। দন্তধাবনের কাঠিগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্যদের ভিতরে বিতরণ করা হ'ল, বলা বাহুল্য অর্থের বিনিময়ে। এর পর বেশ পরিবর্ত্তন, ভোগ নিবেদন, আবার বেশ পরিবর্ত্তন। তার পর ঘণ্টাখানেক পরে স্নান।

ঘড়া ঘড়া তিন ঘড়া জল রাখা হ'ল সাড়ম্বরে। স্নানের জন্য জলচৌকি, বড় গামলা, জল ঢালার জগ, গামছা, আতর কুঙ্কুম, চন্দন—সবই রাখা হ'ল। তিনটি আর্শিতে তিন জন ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিফলিত করা হ'ল। শেষে আয়নায় সেই মূর্ত্তি তিনটিকে স্নান করানো হ'ল। এর পর পূজাপাঠ কিছু হ'ল। তার পর আবার স্নানজল নেবার পালা ও পয়সা আদায়পর্ব্ব। তৃপ্ত হতে পারলাম না দেখেশুনে। মুষড়ানো মন নিয়ে ফিরে এলাম আশ্রমে।

ফেরার পথে দেখলাম ভিখিরীদের ভীড় জমে উঠেছে স্বর্গদ্বারে। এই সময় তীর্থযাত্রীদের কেউ কেউ শ্রাদ্ধ করে সমুদ্রতীরে। তাদের ফিরে আসার পথের দু'ধারে অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা কাতারে কাতারে ভিক্ষার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়। শুধু হাত বাড়ানোই নয়, জুলুমও করে। ক্ষেত্রবিশেষে হাত চেপে ধরে পর্যান্ত এবং কিছু না দিলে রেহাই দেয় না। এ-পথেও লোটাকম্বল সম্বল সাধু চোখে পড়ল না। বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং রাজপুতানার মোট ঘাড়ে করে ঝুঁকে-চলা তীর্থযাত্রীর দলই আনাচে-কানাচে দেখতে পেলাম মন্দিরদ্বার থেকে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত।

বিকেলে সমুদ্রের ধারে এসে বসলাম। শুভ্র বলাকার মত ডানা মেলে ঢেউ ছুটে আসছে, আবার ব্যর্থ বেদনায় হতাশ্বাসে ফিরে চলে যাচ্ছে। বিকেলে জেলেডিঙি ভাসে না। জেলেরা সামুদ্রিক কাঁকড়া ধরে এ-বেলা। বালির গর্ত্ত থেকে পঙ্গপালের মত কাঁকড়ারা বেরিয়ে আসে। সাবধানে পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়েও দু-দশটার উপর পা পড়ে যায়। হঠাৎ পাশে এসে একজন বসল, যেন নতশের প্রেতাত্মা, কথা বলতেও হাঁফ ধরছে। বললে, ম্যাচিশ আছে সার, মানে দেশলাই? 'ক্ষমা করবেন, ধূমপান করি না'—উত্তর দিলাম। বসা আর হল না সেখানে। উঠলাম। টি-বি রোগী লোকটি। পুরীতে ওই এক ফ্যাসাদ। বড় সতর্ক থাকতে হয়।

দু'দিন পরে চন্দনযাত্রা আরম্ভ। তাই এই দু'দিনে পুরী পরিক্রমা করব স্থির করলাম। প্রথমেই গেলাম চক্রতীর্থে। উঁচু-নিচু বালিয়াড়ির মাঝ দিয়ে চলে গেছে পিচের পাকা রাস্তা। স্বর্গদ্বার হতে প্রায় মাইল তিন হবে। সারকিট হাউস, পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিস, কোর্ট, কলেজ প্রভৃতি এই পথের অর্থাৎ

সিদ্ধ-বকুল

স্বর্গদ্বার হতে যে পথ সমুদ্র ঘুরে চলে গিয়েছে সেই পথের নানা শাখা-প্রশাখা জুড়ে বসে আছে। চক্রতীর্থের পথে দোকানপাট কোথাও নেই। আছে শুধু তালাবদ্ধ করা ধনীর বায়ুপরিবর্ত্তনের ভবনগুলি। বছরে দু এক মাস তাঁরা আসেন। বাকি সময় বালির বল্মীকে বাড়ীগুলি ঢেকে গিয়ে ধ্যাননিমগ্ন যোগীর রূপ ধারণ করে। এ-পথে মাঝে মাঝে হোটেল আছে, তবে স্বর্গদ্বারের মত সংখ্যায় অত বেশী নয়। এ-পথের শেষে বি-এন-আর এর বিরাট হোটেলটি অবস্থিত। ঝক্‌ঝকে সুন্দর বাগানঘেরা বাড়ী। সমুদ্র থেকে হোটেল পর্য্যন্ত হোটেল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব রাস্তা তৈরি করে রেখেছেন। রৌদ্রাতপ নিবারণের ছাউনি এবং সমুদ্রতীরে বসবার আসন পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ করে রেখেছেন।

এ পথে পড়ে চক্রনারায়ণের মন্দির। এখানে বালিয়াড়িতেই কোন স্মরণাতীত কালে জগন্নাথদেবের কলেবরের নিমকাঠ ভেসে এসে আটকে গিয়েছিল। সেই স্থানটি চিহ্নিত করা আছে। এখন সেখানে গর্ত্তের মত হয়েছে এবং জল জমে আছে। জলের রং সবুজ। পোকা কিলবিল করছে। সেখানে এক পাণ্ডা বসে আছে। বলে, দেখুন জল খেয়ে, নোনা নয়, মিষ্টি। বললাম, মাথায় থাকুন জল। খাবার মত সাহস নেই। গর্ত্তের পাশে প্রস্তরময় সুদর্শনচক্র একটি বেষ্টনীর মধ্যে পূজিত হয়। পাণ্ডা বলে, এখানে বালিতে ঘর বানাও, সংসার শান্তিময় হবে, দক্ষিণা দাও মোটারকমের। যৎসামান্য দক্ষিণা দিলাম। বালিতে ঘর করার ইচ্ছে হল না।

সমুদ্র থেকে উঁচুতে বালিয়াড়ির উপর চক্রনারায়ণের মন্দির। মন্দিরে কালো পাথরের তৈরী তিনটি মূর্ত্তি আছে। সেখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে রাস্তা পেলাম। ঐ রাস্তায় কিছুদূর গিয়ে বাঁ-দিকে বেঁকে গেলে সোনার গৌরাঙ্গমন্দির। সামনে দারোয়ান বসে আছে। চামড়ার কোন জিনিষ ভিতরে নিয়ে যেতে দেবে না। সম্মুখে প্রশস্ত অঙ্গন দু-পাশে কুঠরী। বৈষ্ণবদের থাকার ব্যবস্থা আছে। মন্দিরের দাওয়ায় পূজারী বসে-ছিলেন। বললেন, বাচ্চাদের ভিতরে ঢোকার হুকুম নেই। অতএব, বাচ্চাদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হ'ল।

একটি তিন বছরের মেয়ে পিপাসার্ত্ত হ'ল। পূজারীর নিকট জল চাওয়াতে তিনি বললেন, এখানে জলসত্র নেই, বাইরে জলের চেষ্টা করগে। ভগবানের দরজা থেকে অপাপবিদ্ধ শিশু প্রত্যাখ্যাত হ'ল, সোনার বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হয়ে রূপার সিংহাসনে বসে একটু হাসলেন। ডানপাশের সিংহাসনে সমাসীন ধুতি-পাঞ্জাবী পরিহিত হিরণ্ময় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি এক হাততুলে রইলেন স্তব্ধবিস্ময়ে তাঁর পূজকের কাণ্ড দেখে। আশ্রমে ফিরে এলাম বেলা এগারটার সময়।

বিকেলে বের হলাম সরোবর পরিক্রমায়। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে গেলাম। গুণ্ডিচামন্দিরের উত্তর দিকে এই সরোবর। এর উৎপত্তি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়। এখানে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেব জলকেলী করতেন।

গুণ্ডিচা-বাড়ীও দেখে নিলাম ফেরার পথে। এখানে রথের সময় জগন্নাথদেব আসেন এবং উল্টোরথ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। এর অপর নাম 'মাসী-বাড়ী'।

এলাম নরেন্দ্র সরোবরে। চন্দনযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের বিজয়মূর্ত্তি মদনমোহনদেব এখানে নৌকাতে জলবিহার করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে :

> নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া,
> জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা।
> সেই কালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
> নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলী রঙ্গে।

এখান হতে মার্কণ্ডেয় সরোবরে গেলাম। প্রলয়কালে মার্কণ্ডেয়মুনি ভাসতে ভাসতে শঙ্খক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখতে পেয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। যেখানে মার্কণ্ডেয়মুনি আশ্রয় নিয়ে-ছিলেন, সেই স্থানেই এখন এই সরোবরটি দেখতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বশেষে শ্বেতগঙ্গা পরিক্রমা করে যখন আশ্রমে ফিরে এলাম তখন সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছে আশ্রমমন্দিরে। সমবেত-কণ্ঠে সঙ্ঘবাসীরা গুরুবন্দনার মন্ত্রপাঠ করছেন।

পুরীতে নানা মঠ। সর্ব্বপ্রাচীন মঠ গোবর্দ্ধন মঠ। আদি শঙ্করাচার্য্য সপ্তম শতাব্দীতে এ মঠ স্থাপন করেন। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব চলছে শ্রীক্ষেত্রে। বালিসাহি পল্লীতে সমুদ্রতীরে

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আশ্রম

গম্ভীরা

এই মঠটি। প্রায় বিশ ফুটের মত নীচের দিকে নেমে গিয়ে এ মঠে প্রবেশ করলাম। প্রবেশপথের প্রথম স্তরে কাঠের চরকী গেট, তাই ঘুরিয়ে একটি করে মানুষ এক একবারে প্রবেশ করে। বাঁধানো গাছতলায় আছেন গৈরীকবাস পরিহিত ফর্সা, রোগা, টিকোল-নাক এক বিশিষ্ট সন্ন্যাসী অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়। তাঁকে প্রণাম করতে মাথা নুইয়েছি অমনি তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, কাহাকু সাথ আসুচি, কঁড় কউচি—কথাগুলির লক্ষ্যস্থল কানাই। তার বুক-খোলা জামা আর উস্কোখুস্কো চুল দেখে সন্ন্যাসীঠাকুর মনে করেছেন কোন বখাটে ছেলে মঠে এসেছে। আমরা ওকে আমাদের লোক বলে স্বীকার করায় তিনি ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলেন ওকেও। নীচে নেমে গেলাম। সিঁড়ির দু'পাশে টবে সাজানো নানারকম পাতাবাহারের গাছ। ঢুকলাম একটা হল ঘরে। ঢুকেই দরজার বাঁপাশে কাষ্ঠসিংহাসনে একটি বড় ছবি ও দু'টি খড়ম দেখলাম। জিজ্ঞাসা করতে একটি ১৮।১৯ বছরের ছেলে বললে, উনি বর্ত্তমান মঠাধীশ ভারতীকৃষ্ণ তীর্থস্বামী। এখন দিল্লী গেছেন প্রচারে। ডান দিকে আছেন শ্বেতমর্ম্মরে খোদাই করা বড় আদি শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি। সামনের গদিতে আর একটি বড় ফটো এবং আর এক জোড়া খড়ম দেখতে পেলাম। ওগুলি ভারতীকৃষ্ণ তীর্থস্বামীর গুরুদেব শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামীর। আদি শঙ্কর-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি এখনও পূজিত হয় এখানে। ফেরার পথে দেখলাম গৌড়ীয় মঠ, সারস্বত গৌড়ীয় মঠ। সারস্বত গৌড়ীয় মঠে কালো মার্ব্বেলের শ্রীকৃষ্ণ, সাদা মার্ব্বেলের শ্রীরাধা আর এক পাশে হাত তুলে দাঁড়ান শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখতে পেলাম। রাস্তায় মোড়ে

এসে উঠলাম নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের সমাধিতে। পরিচ্ছন্ন মঠ, ধূপের গন্ধে আমোদিত। নিস্পৃহ নির্লিপ্ত ভাবটি বিশেষভাবে ফুটে আছে এখানে। সেখান হতে সোজা পশ্চিম-দক্ষিণে গিয়ে তোটা গোপীনাথের মন্দির পেলাম। এখানে উদ্যানকে বলে তোটা। উদ্যানপরিবেষ্টিত বলে গোপীনাথ হয়েছেন তোটা গোপীনাথ। তা ছাড়া গোপীনাথকে মহাপ্রভু উদ্যানমধ্যে আবিষ্কার করেন। পূজার ভার পেয়েছিলেন গদাধর পণ্ডিত। তিনি বৃদ্ধ, কুব্জ, দাঁড়াতে পারেন না সোজা হয়ে। তাই বিগ্রহপদদ্বয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করে নত হয়ে দাঁড়ালেন ভক্তপূজকের কষ্ট লাঘব করায় জন্য। এখনও গোপীনাথ সেই বামন অবস্থাতেই আছেন। বিগ্রহের সঙ্গে মহাপ্রভু মিলিয়ে যান—এ-মতও প্রচলিত আছে এখানে। দরজায় চার লাইন কবিতা লেখা আছে :

> কি করিব কোথা যাব বাক্য নাহি স্ফুরে
> হারাইলাম গোরাচাঁদে গোপীনাথের ঘরে
> গোপীনাথের ঘরে গেলা দর্শন করিতে
> অপ্রকট হইয়া গেলা গোপীনাথের অঙ্গেতে।

বিকেলে গম্ভীরা আর সিদ্ধবকুল দেখব বলে বের হলাম। স্বর্গদ্বার হতে শ্রীমন্দিরের পথে এগুলি রয়েছে। একটা অপরিচ্ছন্ন, দুর্গন্ধময় গলি, কিছুটা মাটির ভেঙে-পড়া প্রাচীর। তারই প্রান্তে প্রসিদ্ধ সিদ্ধবকুল। এত বড় একটা পবিত্র ঐতিহাসিক বৃক্ষ অথচ অপবিত্রতার লীলাভূমি হয়ে রয়েছে পথটি। এদিকে কেউ নজর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন না। স্বয়ং চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের এক দাঁতনকাঠি নিজের হাতে এনে হরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থানে রোপণ করেন। কালে তা বিরাট বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। তার পর অনেকদিন গত হয়েছে। মহাপ্রভু অস্তমিত, হরিদাস ঠাকুরও নেই। আছেন তাঁর শিষ্য জগন্নাথ দাস। একবার রথের সময় রাজ-কর্ম্মচারীরা কোথাও রথের চাকার কাঠ না পেয়ে এই বকুলগাছটিকে পরদিন প্রত্যূষে কেটে নিতে মনস্থ করেন। নিরুপায় জগন্নাথ দাস

জগন্নাথদেবকেই আবেদন জানালেন। প্রত্যুষে রাজকর্মচারীরা স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলেন গাছটি অন্তঃসারশূন্য, কেবল ছালটি আছে। সেই হতে এটি সিদ্ধবকুল নাম পেয়েছে। আজও গাছটি বেঁচে আছে মাত্র ছালের উপর দাঁড়িয়ে। এর শাখা-প্রশাখা সবই অন্তঃসারশূন্য। বেদী করে গাছটিকে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে।

সিদ্ধবকুল থেকে বের হয়ে এসে ঠিক তার পাশের গলিতেই প্রবেশ করে পেলাম গম্ভীরা। একটি ছোট্ট কুঠরী। সেখানেই থাকতেন মহাপ্রভু। একটি চৌকিতে রক্ষিত চন্দনমাখা এক জোড়া খড়ম, একটি কমণ্ডলু আর মহাপ্রভু-ব্যবহৃত কাঁথাটির একটুখানি একটি কাঁচের বাক্সে শীলমোহর করা আছে। কাঁথাটি মাতা শচীদেবীর তৈরি। খড়ম থেকে তুলে নিয়ে দুটি করে তুলসীপাতা বিতরণ করলেন একজন বৈষ্ণব।

গম্ভীরার বাইরে কয়েকজন বৈষ্ণব খোল-করতালযোগে কীর্ত্তন করছেন। অন্য একটি প্রকোষ্ঠে গদাধর পণ্ডিতের প্রতিকৃতি দেখলাম। ভিতরের কুঠরীতে অষ্টসখীসহ কৃষ্ণ। কালো পাথরের কৃষ্ণটিতে হলদে রং করা। সেখানে দলে দলে বাঙালীর ভীড়। বেরিয়ে আসছি, লাল কাপড়-মোড়া দুটি দণ্ড হাতে নিয়ে কীর্ত্তনীয়ার দল গম্ভীরা থেকে বেরিয়ে মন্দিরের দিকে যাচ্ছে দেখলাম। একজন বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম দণ্ড দুটি চৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রতীক। চন্দনযাত্রার সময় সর্ব্বাগ্রে এই প্রতীক ও কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায় অগ্রসর হন। সোজা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রমে চলে গেলাম। শান্তিময় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। দু-দণ্ড বসে থাকার জায়গা। মনে আনন্দ আসে।

আশ্রমে ফেরার পথে কপালমোচন শিবমন্দির দেখে নিলাম। রাস্তা থেকে কুড়ি ফুট নীচে এটি। অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দির, পিচ্ছিল পথ, ভিতর থেকে দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে, তাই ছুটে বেরিয়ে এলাম। কবে নাকি ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল। শিব দিলেন এক মুণ্ড কেটে। সে মুণ্ড শিবের হাতেই লেগে রইল। কিছুতেই ছাড়ানো যায় না। তখন জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হলেন শিব। জগন্নাথদেব শিবকে ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে মুক্ত করলেন। কপালমোচন নাম নিয়ে শিব রইলেন শ্রীক্ষেত্রে।

জয়দেব ও পদ্মাবতীর কল্পিত কুটীর দুটিও দেখে নিলাম। জরাজীর্ণ অবস্থা তাদের।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মঠের অন্ত নেই। এখানের বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন মঠ হ'ল রাধাকান্ত মঠ। ললিতা-বিশাখা মঠ, নন্দিনী মঠ রাধা-দামোদর মঠ, কতই না দেখলাম। গুণ্ডিচা বাড়ীর পথে জগন্নাথবল্লভ মঠ। এই মঠের বাগানে মহাপ্রভু প্রায়ই সমাধিস্থ হতেন। এখানে তাঁর গোপীভাব উদয় হ'ত।

জগন্নাথমন্দির হতে দু' মাইল দূরে জগন্নাথদেবের পঞ্চপালের অন্যতম লোকনাথ মহাদেবের মন্দির। জলে ডুবে আছেন মহাদেব। দেখার উপায় নেই তাঁকে। শিবরাত্রির সময় তাঁকে দেখা যায়, তখন জল সেচন করা হয়। চান্দ্রবৈশাখের শেষ সোমবার এখানে একটি মেলা হয়। গলিত কুষ্ঠ রোগীতে স্থানটি অধ্যুষিত। চারদিকে নুলো, পদহীন, বিকৃতমুখ ভিক্ষুক। সাধারণের বিশ্বাস শিব জাগ্রত এখানে। ধর্ণা দেয় অনেকে। সুফলও পায়। স্থানটির মাহাত্ম্য আছে বলে আমাদেরও মনে হ'ল। শিবের স্নানজল কুণ্ড থেকে তুলে দিলে পাণ্ডারা। যেমন বিস্বাদ, তেমনি দুর্গন্ধ জলে। তবু খেয়ে ফেললাম।

পুরী প্রবেশের পথের সেতুর নাম আঠারোনালা। এটিও ইন্দ্রদ্যুম্নের স্মৃতিবিজড়িত। আঠারোটি খিলান আছে এতে। কিংবদন্তী বলে, কিছুতেই সেতুটি তৈরী হচ্ছিল না। তখন একে একে আঠারো জন ছেলেকে নদীগর্ভে দান করলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। সেতুবন্ধন সম্পূর্ণ হ'ল।

প্রতি একাদশীতে মন্দিরের শীর্ষদেশে পতাকা উড়ানো হয়; এটি করা হয় মন্দির কর্ত্তৃপক্ষের তরফ থেকে। অবশ্য পয়সা দিলে যে-কোন দিন শীর্ষে পতাকা উড়ানো যেতে পারে। একশ্রেণীর লোক আছে তারা ত্বরিত গতিতে এই কাজটি সম্পন্ন করে। পতাকা উড়ানো দেখা হবার পর, একাদশীর মন্দিরে গেলাম। ছোট্ট মন্দিরটি একেবারে শ্রীমন্দির-সংলগ্ন বলা চলে। রাণু নোয়া, আলতা, চুবড়ী দিয়ে পূজা দেবেন একাদশীর। সেখানেও লাইন লাগাতে হ'ল, এত ভীড়। উপরে মার্ত্তণ্ডদেব, নীচে উত্তপ্ত পাষাণ। অসীম ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়ে রাণু পূজা সমাধা করালেন। আটিকাবন্ধনও আজ সমাপ্ত হ'ল। এইটিই পাণ্ডাঠাকুরের আশা এবং এইজন্যই তিনি ছড়িদার পাঠিয়ে এতদিন তদারক করাচ্ছিলেন।

পুরীর মরশুম চলেছে এখন। পথে পথে সুবেশ বাঙালীর ভীড়। বাড়ী ভাড়া চার গুণ বেড়েছে। রিক্সা ভাড়া হয়েছে দ্বিগুণ, সব্জী বাজার হু হু করে চড়ছে। আলু হয়েছে সাত আনা থেকে সাড়ে বার আনা সের, দুধে পাউডারের মাত্রা বেড়েছে। তাও এক টাকা সের এবং দুষ্প্রাপ্য। বাড়ী বাড়ী ফেরি করে বেড়ানো মিষ্টিওয়ালারাও ছোট মার্ব্বেলের মত কাটা ছানার রসগোল্লার দাম করেছে দশ পয়সা। বাঙালী দেখলে আর রক্ষে নেই। বাড়ীর বাঙালী মালিকেরাও বাঙালী ভাড়াটিয়াকে শীল, নোড়া, বঁটি ব্যবহার করতে দেয় পয়সার বিনিময়ে এবং সেটা পরিমাণে এত বেশী হয়েছে এখন যে, সেই পয়সার সঙ্গে সামান্য কিছু যোগ করে দিলে হয়ত বাজারে ঐ জিনিষগুলির নূতন সংস্করণ কিনতে পাওয়া যাবে। হোটেলে স্থানাভাব, ধর্ম্মশালাতেও তাই। সেবাশ্রমে স্বামীজী বাসস্থানের ব্যবস্থায় বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মাছ সব দিন মিলছে না। চিল্কা হ্রদ থেকে মাছ আমদানি হচ্ছে। দর বেড়েছে নাপিতের। দর বাড়িয়েছে ধোপা। তবে হাঁ, তাদের কাপড়কাচা চমৎকার। বাঙালী দেখলে ভিক্ষুকরাও 'গুটে পিসা দও' বলে ছিনে জোঁকের মত পিছু নিচ্ছে।

চন্দনযাত্রা দেখতে গেলাম। অক্ষয়তৃতীয়াতে এই অনুষ্ঠানের আরম্ভ। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা অষ্টমীতিথি পর্যন্ত প্রত্যহ এটি চলে।

প্রতিদিন জগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ মদনমোহনদেবকে মনিবিমানে চড়িয়ে নরেন্দ্রসরোবরে নৌকা-বিলাসে নিয়ে যাওয়া হয়। চলেছে সজ্জিত হস্তী সম্মুখে। পথে ছায়ামণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে। স্থানে স্থানে পত্রপুষ্পাদি দোদুল্যমান হয়ে আছে। রাজবাড়ীর দরজায় রাজপুত্রেরা। বধূমাতারা করজোড়ে দণ্ডায়মানা। প্রথমে সারি সারি পাঁচটি বিমানে চলেছেন লোকনাথ, যমেশ্বর, কপালমোচন, মার্কণ্ডেয়েশ্বর ও নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব। পশ্চাতে মণিবিমানে মদন-মোহন। তাঁর বাঁপাশে চলেছেন মহালক্ষ্মী ও সত্যভামার বিমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধুস্রাবী কীর্ত্তন গেয়ে চলেছেন মণি-বিমানের সম্মুখে। চন্দনযাত্রার অনুসরণ করে চন্দনপুকুরে গিয়ে নৌকা-বিলাস দেখে এলাম। মন্দিরে ফিরে এলাম আবার। খাঁ-খাঁ করছে মন্দির। ঘুরে ঘুরে মন্দিরের সম্মুখে, আশেপাশে খোদাই-করা স্মৃতি-প্রস্তর পড়ে দেখতে লাগলাম। এক জায়গায় বড় বাধা পেলাম। স্বামী তাঁর উনিশ বছরের পত্নীর বিয়োগকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে মর্ম্মরের উপর কবিতা উৎকীর্ণ করেছেন। পত্নীর মৃত্যুর তারিখ ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৫২—

কোথা রাণী হে প্রিয়া আমার
অকাল মরণে তব ব্যথিত অন্তর।
পুরে নাই কোন সাধ মিটে নাই আশা
অকালে ঝরিয়া গেলে রেখে ভালবাসা

ঠিক তার পরের স্মরণ-প্রস্তরে পুত্রহারা মাতার শোকদীর্ণ বেদনা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ৩৩ বছর বয়সে ৭ই শ্রাবণ, ১৩৫৫ সালে অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যুর তিন বছরেরও কম ব্যবধানে স্বামী মারা গেছেন, মা তাই বলেছেন পুত্র ও পুত্রবধূকে হারিয়ে—

থাক সুখে মুক্ত তুমি! ভাঙা বুক ধরি
অশ্রুজলে দিনু এ কে স্মৃতি যে তোমারি।

রথযাত্রা সন্নিকট। ছড়িদার রথের ভীড়ের যা বর্ণনা দিলে এবং জগন্নাথদেবকে যেভাবে বন্ধন করে আনা হয় শুনলাম গালা-গালি দিতে দিতে তাতে রথযাত্রাটা 'yarrow unvisited' থেকে যাক ভেবে আমরা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ত্যাগ করে এলাম।

* আলোকচিত্রগুলি শ্রীমান অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

গান্ধীভাষ্য

শ্রীকরুণাময় বসু

অনেক হাসিকান্নার গাঁথা দিনপঞ্জীগুলি
মাঝে মাঝে অগোচরে জমে ওঠে ধূলি;
তখনো পিছন পানে চেয়ে দেখি শালবনে চাঁদ ওঠে,
পদ্মপাতা ছাওয়া দীঘি, কালো জল করে থৈ-থৈ।
মাঠের ঘাসের ফুল, কেয়াবনে খেয়া পার হই;
পার হই জীবনের ভাঙাচোরা সাঁকো,
আজো ভাবি আকাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে
হাতে মোর হাতখানি রাখো।

অনেক হারানো দিন পার হয়ে যাই,
অনেক বসন্ত ফুল, অনেক শ্রাবণ-কান্না
স্মরণের ডালায় সাজাই।
স্মৃতির বেদনাগুলি আজো বেঁচে আশ্চর্য্য মধুর,
তার পর দূরে আজো সুর।

কতো দূর নোয়াখালি হিজল বনের ছায়া-পথ
ধোঁয়া ওঠা মাঠ ঘাটে একদিন নেমেছিল
প্রাণ-বহ্নি জ্বলে ওঠা আকাশের রথ।
কুয়াশায় ছায়া ঢাকা ছোট ছোট গ্রাম,
ঘুমন্ত প্রাণের নীচে মৃত শান্তি, শূন্য পরিণাম;
চোখ চেয়ে দেখেছিল স্বর্গের ঝালর
এক ঝাঁক ঝলোমলো ভোরের আলোর!
মাটির প্রদীপ হাতে স্বর্গের দেবতা
ঘরে ঘরে রেখে গেল ভালোবাসা, মমতার কথা।

তার পর চলে গেল দূর হতে দূর,
যেখানে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে পাখিদের সুর;
যেখানে মেঘেরা থাকে, আকাশের গায়ে আঁকে মায়ার কাজল,
মেঘের চোখের জল ক্ষেতে তাই সবুজ ফসল।
হেসে হেসে রেখে গেল চিরকাল অফুরন্ত প্রাণ,
আজো তাই পদ্ম ফোটে দীঘি জলে,
মাঠে মাঠে সোনা ঝরা ধান।

কাঁদনভরা বসন্ত

শ্রীসমর বসু

সন্ধ্যা হবার কিছু আগেই বাড়ী ফিরল কল্যাণী। কাপড় জামা না বদলেই ইজিচেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিল। অসংলগ্ন অনেক চিন্তা, গ্রন্থিহীন অনেক ভাবনা তার মনের মধ্যে এসে বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে দিচ্ছে। জানলা-বন্ধকরা ছোট্ট ঘরে অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দেবার মত শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে কল্যাণী। একটা অলস ঔদাস্যে তার শরীর মন এমনই গভীরভাবে আচ্ছন্ন যে মাটির উপর সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিও ছিল না তার।

ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই কল্যাণী ভাবে—কেন তার এই কৃচ্ছ্রসাধন; কেন তার এই আত্মনির্য্যাতন? কেন সে নিজেকে এমন ভাবে দিনের পর দিন প্রবঞ্চিত করেছে? কি পেয়েছে সে এর বিনিময়ে। আত্মীয়স্বজনদের প্রশংসা? কে চেয়েছে ওদের প্রশংসা। ওদের নিন্দাতেই বা কি এসে যেত কল্যাণীর? বান্ধবীরা ওকে দেখে [illegible] হয়, বিস্মিত হয় এবং আর কি হয়—তা আজই [illegible] জানতে পেরেছে। আজই বিকালে টিফিনঘরে অরুণা বলছিল, 'কল্যাণীদি, শরীরের দিকে একবার তাকিও…!' কেন? কি [illegible] কুরূপা হয়ে উঠেছে সে! বয়স তার হয়েছে—যৌবনের প্রদোষলগ্ন সমাগত। তাতে হয়েছে কি? চিরকালই [illegible] শরীর আর রূপের চর্চ্চা নিয়ে দিন কাটাবে নাকি। যৌবনের স্বাভাবিক লাবণ্য ঝরে গেছে বলে যদি তাকে দেখতে একটু খারাপই হয়ে থাকে তাতে কল্যাণীর কি করবার আছে? এসব কথা ওরা ভেবে দেখে না কেন? অথচ ওদের দিকে তাকালেও কল্যাণীর হাসি পায়—বয়সে ওরা হয়ত কিছু ছোট, কিন্তু অনেক বেশী ছোট হয়ে থাকবার একবার অস্বাস্থ্যকর চেষ্টা কেমন করে ওরা প্রকাশ করে ওদের সাজসজ্জার প্রসাধনে, চটুলতায়—একথা কিছুতেই বুঝতে পারে না কল্যাণী। তবুও পাছে ওরা মনে ব্যথা পায়—তাই ওদের নির্লজ্জতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে সে পারে না।

অরুণার কথাগুলোয় কেমন যেন ধার ছিল। শরীরের অবশিষ্ট কমনীয়তায় নিঃশেষিত লাবণ্য যেটুকু আছে তাতে দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেলেও মন হরণ করা যায় না—একথাও নাকি অরুণা জানিয়েছিল। অথচ অরুণা কল্যাণীকে চেনে—একটু অন্তরঙ্গভাবেই চেনে। তবুও কেন সে ওসব কথা বলতে গেল?

নির্জ্জন অন্ধকারের গভীরে এমন একটা মিষ্টি আকর্ষণ আছে—যা মানুষকে অভিভূত করে রাখে। স্মৃতির রোমন্থনে করে সাহায্য। কল্যাণীর ব্যথাহত চঞ্চল মন হঠাৎ কখন শান্ত হয়ে আসে—অস্থিরতা আশ্রয় নেয় স্নায়বিক শৈথিল্যের কোলে।

সঞ্জীবকে মনে পড়ে কল্যাণীর। বড় ভাল ছেলে এই সঞ্জীব। কিন্তু বড় বেশী ভাল ছেলে—বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকত ছেলেটা। কল্যাণীর ভাল লাগত ওর আত্মভোলা রূপটিকে। তাই লাইব্রেরী-হলে সঞ্জীব যখন পড়াশুনা করত কল্যাণী ওর পাশটিতে গিয়ে বসত। নানারকম দুরূহ সমস্যা নিয়ে ওদের চলত আলোচনা। এই সুযোগে কল্যাণী একবার চেষ্টা করেছিল ওর মনের দেওয়ালে সিঁধ কাটবার—কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল তার। বই আর নোট বুকের পাঁচিল টপকে সঞ্জীবের অন্তররাজ্যে প্রবেশ করবার সাধ্য ছিল না কারও। হঠাৎ সেই সঞ্জীবকেই আজ মনে পড়ল কল্যাণীর। ইংরেজীতে 'ফার্ষ্ট ক্লাশ' পেয়ে এই শহরেরই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করে সঞ্জীব—এ সংবাদও কল্যাণী জানত। আজ সঞ্জীবকেই তার বড় বেশী প্রয়োজন, একটা দুস্তর লজ্জা থেকে সঞ্জীবই হয়ত তাকে বাঁচাতে পারে।…

বাবা মারা যাবার পর তিনটি ভাই বোনকে মানুষ করবার কঠিন দায়িত্ব ইচ্ছা করেই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিল কল্যাণী। ছোটমামা আপত্তি জানিয়েছিল অনেক—কিন্তু কল্যাণী তা শোনে নি। মামা-মামীমার সংসারের সঙ্কীর্ণ পরিসরে নিজেদের এবং ওদের জীবনকে বিড়ম্বিত করতে চায় নি কল্যাণী। তাই চব্বিশ বছর বয়সে তাকে সরকারী আপিসে ঢুকতে হয়েছিল ১৯৪৯ সনে। চাকরিতে ঢোকবার আগেই বিয়ে করতে পারত সে—কিন্তু বাবার রুগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে একটা কঠিন সঙ্কল্প তাকে বাধ্য হয়েই নিতে হয়েছিল। সে অবস্থায় মা-ও তাঁর মতটাকে মেনে নিয়েছিলেন—তা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না তাঁর।

আজ স্পষ্ট মনে পড়ছে কল্যাণীর, বাবার 'গ্র্যাচুয়িটি' আর 'প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের' টাকাগুলো যেদিন মায়ের হাতে এসে পৌঁছল সেদিন চোখের জল মুছতে মুছতে মা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে কপালে মুখে হাত বুলিয়ে খুব ধীর কণ্ঠে বললে, "একটা কথা তোকে আজ বলব কল্যাণী, খুব ভেবেচিন্তে তার উত্তর দিস। তোর মামাকে আসতে বলেছি সন্ধ্যাবেলায়, তার কাছেই তোকে উত্তর দিতে হবে।" 'বেশত কথাটাই বল না—কল্যাণী যেন একটু বিরক্ত হয়েছিল। "আমি তোর বিয়ে দেব, এইভাবে আইবুড়ো থাকলে তোর বাবার আত্মা কোনদিনই শান্তি পাবে না, তোর বিয়ের জন্যে যে টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন—তা সবই আদায় হয়েছে—তাইতেই তোর বিয়ের ব্যবস্থা আমি করতে পারব।"

—"এসব কথাগুলো বলবার আগে তুমি কি সবদিক ভেবে দেখেছ মা? বুদু, শনুটু, এখনও ছেলেমানুষ, তা ছাড়া মায়ুও তোমার মেয়ে, তার প্রতিও তোমার কর্ত্তব্য আছে। আজ যদি

আমি চাকরি-বাকরী ছেড়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যাই তা হলে তোমাকেই বা কে দেখবে—আর ওদেরই বা কে মানুষ করে তুলবে ?"

—ওঁর ইন্‌স্যুরেন্সের দরুন এখনও হাজার পাঁচেক টাকা পাওয়া যাবে। তোর মামা বলছিলেন—সে টাকায় কিসের যেন 'শেয়ার' কিনলে…।

—"তুমি থামো"। মায়ের কথায় বাধা দিয়ে ঝেঁঝে উঠল কল্যাণী। "শেয়ার কিনলে বছরে কত টাকা পাওয়া যাবে শুনি ? মাস গেলে আমি যা ঘরে নিয়ে আনি তাইতেই ভাল করে সংসার চলে না—আর তুমি শেয়ারের ডিভিডেণ্ডের উপর ভরসা করে আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিতে চাও ; এর ফলে কি হবে জান—ভাই দুটো কোনদিনই মানুষ হবে না—আর বোনটা গিয়ে পড়বে কোন্ বাউণ্ডুলের হাতে।"

—সবই বুঝতে পারছি কল্যাণী, কিন্তু তুই ত জানিস—আপিসে চাকরি করতে যাস বলে আত্মীয়-কুটুম্বেরা কত কথা বলছে। মেয়েটাকে দিয়ে পয়সা রোজগার করিয়ে সেই পয়সায় অন্ন ওর মুখে রোচে কি করে—আমরা হলে ঐ আইবুড়ো ধিঙ্গী মেয়েসুদ্ধ নিয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতাম। এসব কথা আমি কি করে সহ্য করি বল ত ?"—গুমরে কেঁদে উঠলেন কল্যাণীর মা। মাকে সেদিন অনেক সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল কল্যাণী, অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। মাও হয়ত বুঝেছিলেন, কল্যাণীর মত মেয়ের মা হওয়া যে কত সৌভাগ্যের একথাও হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল, কিন্তু তবু একটা তীব্র অসন্তোষ তাঁর মনকে মাঝে মাঝে এমনই বিপর্য্যস্ত করে তুলত যে, কল্যাণীর সঙ্গে দু'চারদিন ভাল করে কথাও তিনি বলতেন না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কল্যাণীর মামা যখন কল্যাণীর মত জানতে চাইলেন—তখন দ্বিধাহীন স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে বলেছিল কল্যাণী, "আজ আমি মেয়ে না হয়ে যদি ছেলে হতাম তা হলে আজকে আমার পক্ষে বিয়ে করাটা হ'ত বিলাসিতা। মেয়ে হয়ে যখন ছেলের কর্ত্তব্য পালন করতে হচ্ছে তখন আমি অন্ততঃ মনে করি যে, আমার পক্ষে ঠিক এই সময়ে বিয়ে করাটা শুধু বিলাসিতা হবে না, বিয়ে করলে আমি হব নৈতিক অপরাধী। তুমি ত জান ছোটমামা, কেন আমি তোমাদের ওখানে গিয়ে থাকতে আপত্তি করেছিলাম। তোমার সীমাবদ্ধ আয়ের বেশী অংশই আমাদের ভরণপোষণে ব্যয়িত হ'ত এবং তার অনিবার্য্য কুফল ভোগ করতে হ'ত তোমাকে, তোমার ছেলেমেয়েকে। তাতেও কি আমরা অপরাধী হতাম না ? তাই আমি সেইদিন থেকেই চাকরির চেষ্টা শুরু করেছিলাম এবং ভগবানের কৃপায় তা অর্জ্জনও করেছি ; এখন আমার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন না হলে আমি বিয়ে করতে পারি না—না, ইচ্ছা হলেও না।"

ঘর থেকে পালিয়ে এসে আজকের মত ঠিক এই ঘরে এসে সেদিন লুকিয়েছিল কল্যাণী। আজকের মতই ঘরের আলো না জেলে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেইদিনও সে শুয়ে পড়েছিল। আজকে হয়ত তার চোখে জল নেই—কিন্তু সেদিন তার দু'চোখ ভরে গিয়েছিল লোণা জলের বন্যায়।…

কল্যাণী এম, এ পরীক্ষা দেবার আগেই বাবা হঠাৎ মারা গেলেন হার্টফেল করে। তবুও কল্যাণী পরীক্ষা দিয়েছিল—ফল আশানুরূপ না হলেও পাশ করেছিল সে। বাবা মারা যাবার আগেই বিয়ের সমস্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল কল্যাণীর। কিন্তু পড়ার অজুহাতে বিয়েতে সে আপত্তি করেছিল। তা ছাড়া বাবার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাওয়ায় এবং শরীর আশঙ্কাজনকভাবে ভেঙে পড়ায় সঞ্জীবের সঙ্গে পরামর্শ করেই একটা কঠিন সঙ্কল্প নিতে হয়েছিল কল্যাণীকে।

কল্যাণীর মুখে সমস্ত কথা শুনে সঞ্জীব বলেছিল, "দেখুন মিস ব্যানার্জ্জি, আজকের দুনিয়ায় মেয়েদের দায়িত্বও কম নয়। পুরুষের সঙ্গে যখন তারা সমান অধিকার দাবী করছে তখন পুরুষের মত তাদেরও দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। বৃদ্ধ পিতামাতার নাবালক ভাইবোনেদের ভার তাদেরও নিতে হবে। নইলে তাদের শিক্ষা হবে মিথ্যা—তাদের দাবি হবে নিরর্থক। সুতরাং ভগবান না করুন, সংসারের সমস্ত ভার যদি একদিন আপনার কাঁধে এসে চাপে তখন তা থেকে রেহাই পাবার আশায় কোন একটি পুরুষের আশ্রয়ে আত্মগোপন করা আপনার পক্ষে শোভন হবে না। অন্ততঃ আপনি যে তা করবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

সঞ্জীবের কথাগুলো শুনে কল্যাণীর একটু গর্ব্ব হয়েছিল বৈকি ! তাই বাবার দুর্ব্বল শরীরের দিকে চেয়ে এই কঠিন সঙ্কল্পই সে নিয়েছিল যে, পুরুষের মত সমস্ত দায়িত্ব বহনের শক্তি যে তার আছে সেইটাই সে প্রমাণ করে দেবে।

বাবা মারা যাবার পর তাই কঠোর সংসার-সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল কল্যাণী। দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে নিজের কথা ভাববার ফুরসৎ মেলেনি তার। নিজের দিকে ভাল করে তাকাবার মত অবকাশও সে পায় নি।

বাবার মৃত্যুর এক বছর পরে বুলু ম্যাটিক পাশ করে কলেজে ভর্ত্তি হ'ল। মানু আর শণ্ট তখনও স্কুলে পড়ে। আপিস থেকে ফিরে ভাইবোনেদের পড়াতে বসে কল্যাণী। 'রুটিন' মাফিক তার সমস্ত কাজে কোনও দিনই কিছুর ত্রুটি হয় না। তার পর তার এই কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে বি-এ পাশ করল বুলু, মানু আর শণ্ট স্কুল ফাইন্যাল।

বি-এ পাশ করার কিছুদিন পরে একটা মার্কেণ্টাইল ফার্ম্মে চাকরী পেল বুলু। সংসারের গুরুভার বহনের এক-জন অংশীদার পেল বলে সেদিন কল্যাণীর মনে একটু আনন্দ হয়েছিল। ছোটোখাটো কি একটা আনন্দানুষ্ঠানও সেদিন হয়েছিল ওদের বাড়ীতে।

তার পর মনে আছে কল্যাণীর, একাদশী এবং নানারকম তিথি ও পার্ব্বণ উপলক্ষে উপবাস করে করে মায়ের শরীর ভেঙে পড়ল। মায়ের কাজে সাহায্য করবার মত কল্যাণীর সময় মেলে-

নি কোনদিন, তাই ওদিকটায় নজর ছিল না তার। মানু যখন একটু বড় হ'ল তখন সে মাঝে মাঝে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকত, মায়ের টুকিটাকি কাজে করত সাহায্য, কিন্তু পাছে পড়ার ক্ষতি হয় তাই দিদির ভয়ে সেখানে সে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। ফলে মাকেই সামলাতে হ'ত সবদিক।

সেদিন কল্যাণী আবিষ্কার করল যে, মায়ের শরীরের যা অবস্থা হয়েছে তাতে করে এই সংসারযন্ত্রকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ভার বেশীদিন তাঁর হাতে ন্যস্ত রাখা ঠিক হবে না। অন্ততঃ একটি কর্ম্মঠ সহকারীর একান্ত প্রয়োজন। সেইদিনই বুলুর বিয়ে দেওয়ার কথা প্রথম মনে পড়ল কল্যাণীর। বুলুও আপত্তি করল না—মা-ও অনেক ভেবেচিন্তে মত দিলেন। সুতরাং একদিন অনুপমাকে বধূরূপে আসতে হ'ল এদের সংসারে। নববধূকে বরণ করে ঘরে তোলবার সময় কি জানি কেন কল্যাণীর বুকের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়ে উঠল—একটা অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল সারা শরীরটা। সেদিনও কল্যাণী আশ্রয় নিয়েছিল এই ঘরে—সেদিনও তাঁর চোখ দিয়ে ঝরেছিল অজস্র কান্না।

কল্যাণীর মনে পড়ে, প্রথম যেদিন সে আপিসে এসে ঢুকল সেদিন ছেলেদের মধ্যে কত ফিসফিসানি—তাকে কেন্দ্র করে কত কানাকানি। সারা আপিসে নানাবয়সী পুরুষদের মধ্যে সেদিন সে ছিল একটিমাত্র মেয়ে। সারাদিন কি অস্বস্তির মধ্যেই না সে-সব দিনগুলো সে কাটিয়েছে। মনের কথা বলবার, কিংবা দু-দণ্ড গল্প করে কাটাবার মত সময় মিললেও সঙ্গী মেলেনি সেদিন। ছেলেরা অবশ্য এগিয়ে আসত অনেক কথা বলতে, অনেক কথা জানতে, এগিয়ে আসত কাজে তাকে সাহায্য করতে, অহেতুক নানারকম উপদেশ দিতে। কিন্তু তাদের আচরণে এমন একটা বিশ্রী রকমের অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেত যাতে অত্যন্ত লজ্জা বোধ করত কল্যাণী। খুব প্রয়োজন না হলে কারুর সঙ্গেই সে ভাল করে কথা বলতে পারত না। তার পরে একে একে অনেক মেয়ে এল, আপিসের সহকর্ম্মীদের সঙ্গে বিয়েও হ'ল দু-এক জনের। দীর্ঘ আট বৎসর ধরে অনেক কিছু দেখলে কল্যাণী ; দেখলে একদিন যারা তাকে দেখে ছুটে আসত কাছে, প্রতি মুহূর্ত্তে কথা বলবার সুযোগ খুঁজত, আজকে কেউ তাকে যেন চেনে না, জানে না কিংবা খুব বেশী চেনে, খুব বেশী জানে—তাই সে ওদের কাছে যেন ফুরিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। তবুও কল্যাণী আপিসকে খুব ভালবাসে, নেহাৎ শরীর খারাপ না হলে আপিস কামাই সে করে না। ছুটির দিনে বাড়ীর মধ্যে মন যেন তার হাঁপিয়ে ওঠে। তবুও সাংসারিক কথাবার্ত্তায় আলাপ-আলোচনায় তাকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। সামাজিকতা, লোক-লৌকিকতা থেকে সুরু করে সংসারের যাবতীয় খুঁটিনাটি সর্ব্ববিষয়েই তদারক করতে হয় তাকে। কারণ বাড়ীর কর্ত্রী সে, তারই উপর নির্ভর করে এরা যেন সব বেঁচে আছে। আর কল্যাণী !—কি জানি সে হয়ত মরে গেছে কিংবা আত্মহত্যা করেছে। নইলে নিজের সম্বন্ধে সে এত উদাসীন কেন ?—কিন্তু সত্যই কি উদাসীন !—তা হলে অরুণার কথা শুনে সে এমন করে ভেঙে পড়বে কেন ? কেন তার বার বার মনে পড়বে সঞ্জীবের কথা !...

হঠাৎ মানু ঘরের মধ্যে এসে আলো জেলে দেখে দিদি শুয়ে আছে ইজিচেয়ারে। "দিদি, তুমি কখন এসেছ—মা ভাবছিল, এত রাত্তির হয়ে গেল—এখনও তোর দিদি কেন এল না রে ?" কল্যাণী কোনও কথার জবাব দিলে না। হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে রান্নাঘরে এসে সে ঢুকল।

—অনু কোথায় ? তোমার শরীর খারাপ, তুমি আবার রান্নাঘরে এসে ঢুকেছ কেন ?—মানু ! তোর বৌদি কোথায় রে ?

—দাদার সঙ্গে সিনেমায় গেছে।

—'ওঃ !'—বলে কল্যাণী বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। বুলুর এই ঔদ্ধত্যকে কেমন করে ক্ষমা করবে সে ! যে বুলু কোনদিন তাকে না বলে কোথাও যায় নি। স্কুলের ছুটির পর ফুটবল খেলা দেখতে যাবে, তা-ও সে দিদিকে জানিয়ে গেছে। আর আজ ! মায়ের শরীর খারাপ দেখেও তাকে না জানিয়ে সে চলে গেল সিনেমায় ! আর অনুপমাই বা গেল কি করে ?—ছিঃ, একটু লজ্জাও হল না। শাশুড়ীর শরীরের এই অবস্থা, এসব কথা একবারও মনে এল না ? বয়স ত তার কম হয় নি।...কিন্তু সেই বা কি করবে ? স্বামীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে কারই বা সাধ না যায় ? কল্যাণী আবার এসে ঢুকল রান্নাঘরে। মাকে নিয়ে এসে জোর করে শুইয়ে দিল বিছানায়।—'তোমাকে কিছু করতে হবে না—তুমি এইখানে চুপটি করে শুয়ে থাক...'।

—কিন্তু তুই সারাদিন খেটেখুটে এলি—আবার রান্নাঘরে ঢুকবি।'

—'কথা বাড়িয়ে লাভ কি মা, যা বলছি শোন।' মানুর হাত ধরে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল কল্যাণী। তার পর দুই বোনে মিলে অসমাপ্ত, অর্দ্ধসমাপ্ত, সমস্ত কাজ শেষ করে নিল তাড়াতাড়ি।

অনেক রাত্রে বুলুরা যখন ফিরল কল্যাণী তখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। মানুকেও বলেছিল খেয়ে নিতে। কিন্তু মানু পারেনি। কল্যাণী জানত, মানু খেতেও পারবে না—শুয়ে থাকতেও পারবে না। দাদা-বৌদির উপর হয় ত অভিমান করবে, কিন্তু রাগ করতে পারবে না। কল্যাণীর মত অত কঠিন জেদী মেয়ে সে নয়। যেমন কোমল স্বভাব তার, তেমনি ভীরু আর লজ্জাশীল তার মন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাঙ্গণের চেয়ে অঙ্গনকেই সে বেশী করে ভালবাসতে শিখেছে। মানু হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে—সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করার শক্তি যাদের নেই—লতার মত যারা শুধু গাছকে জড়িয়ে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। তাই মানুর বিয়ের চিন্তাও কল্যাণীকে করতে হয়। এ নিয়ে অনেক দিন আগেই মায়ের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে কল্যাণীর। মা খুব দৃঢ়কণ্ঠেই বলেছিলেন—'তুই আইবুড়ো থাকবি—আর মানুর

বিয়ে হয়ে যাবে—আমি বেঁচে থাকতে তা কোনদিনই সম্ভব হবে না। আমায় তুই আর জ্বালাসনে কল্যাণী—বুড়ো বয়সে আর কষ্ট দিসনে। তোর দিকে চেয়ে সত্যি বলছি মনে আমি শান্তি পাই না। দিনে দিনে তুই যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিস।' একটু থেমে মা আবার বলেছিলেন—'হ্যাঁরে, সত্যি কি তুই কোনও দিনই বিয়ে করবি নে ?'

—কল্যাণী সেদিন জবাব দিতে পারেনি—বলতে পারেনি—'না।'

নিজের প্রয়োজন না হলেও—মায়ের জন্যেই শেষে হয়ত কল্যাণীকে বিয়ে করতে হবে। কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে ? —কেন ? সঞ্জীব সেন! সে কি আজও তাকে মনে রেখেছে ? —নাই বা রাখলে, নিজেকে যদি নূতন করে পরিচিত হতে হয় তাতেই বা আপত্তি কিসের! বাসরঘরে নববধূর প্রথম সলজ্জ পদ-ক্ষেপের মত ভীরু কম্পমান অন্তর নিয়ে সে যদি একদিন সঞ্জীব সেনের ঘরে গিয়ে ঢোকে—সঞ্জীব কি পারবে তাকে প্রত্যাখ্যানকরতে ?

তার জীবনের এই সুদীর্ঘ কঠোর তপস্যার মন্ত্র কার কাছ থেকে পেয়েছিল সে ? উত্তাল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে দিনের পর দিন তার জীর্ণ নৌকাটাকে সে যে বেয়ে নিয়ে এসেছে আজকের এই নির্ভরশীল পোতাশ্রয়ে—সেকি তার একার শক্তি দিয়ে ? অন্তরে কি সেদিন কারও অনুপ্রেরণা তাকে সাহস দেয় নি ? শক্তি যোগায়নি ? এতদিন ধরে যার প্রত্যেকটি কথা নিবিড় বন্ধনে বেঁধে রেখেছে কল্যাণীর আন্তর সত্ত্বাকে—যাকে অবলম্বন করে অসহ্য দিনগুলিও সে কাটিয়ে দিয়েছে হাসিমুখে—তার কাছে পৌঁছতে যদি একটু দেরী হয়েই গিয়ে থাকে তাতে ত কল্যাণীর কিছু করবার ছিল না। যে তার হাতে তুলে দিয়েছিল গৈরিক পতাকা—বক্ষে সঞ্চার করেছিল অমিত শক্তি—তার কণ্ঠেই ত পরিয়ে দিতে হবে আজকের এই বিজয়মাল্য, নইলে কল্যাণীর সার্থকতা কোথায়! যান্ত্রিক জীবনযাপন করলেও কল্যাণী ত যন্ত্র নয়। তার কঠিন মনের আড়ালে কোমল ভাবালুতার একটুখানি আশ্রয়ে একটা ছোট্ট স্বপ্নমধুর কামনা যদি এতদিনেও না মরে গিয়ে থাকে—তাতে কল্যাণীর কি করবার আছে! তবে কল্যাণী কি নিজের প্রয়োজনেই বিয়ে করতে চায় ?—হ্যাঁ, তাই চায় সে! এতে লজ্জার কি আছে!—সে শুধু সঞ্জীবকে একবার জিজ্ঞেস করতে চায়—'এতদিনেও কি তার কর্ত্তব্য শেষ হয় নি !'···

দারোয়ানের 'স্লিপ' পেয়ে বিশ্রামকক্ষ থেকে বেরিয়ে এল প্রফেসর সঞ্জীব সেন।

—নমস্কার সঞ্জীববাবু, কেমন আছেন ?

চশমার লেন্স বুঝি ঝাপ্সা হয়ে আসে সঞ্জীবের। অভ্যাস-বশতঃ হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে কিছু না বলে—প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

—কি চিনতে পারছেন না ?—ককিয়ে উঠল কল্যাণী।

—হ্যাঁ—এবার চিনতে পেরেছি—প্রথমটা বুঝতে পারিনি। অনেকদিন দেখা নেই ত। কেমন আছেন ? হঠাৎ কলেজে এসে পড়লেন যে ?

সঞ্জীবের প্রশ্নের কি উত্তর দেবে কল্যাণী! সত্যিই ত কেন সে কলেজে এল ?—কি অজুহাত সে দেখাবে! এমন প্রশ্ন সঞ্জীব যে করতে পারে এ-ধারণা আগে কেন হ'ল না তার। একটু হেসে কল্যাণী বললে—'এমনি এসে পড়লাম। এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম। শুনেছিলাম এই কলেজের অধ্যাপক হয়েছেন আপনি, —তাই একটু দেখা করতে ইচ্ছা হ'ল। এসে কি খুব অন্যায় করলাম নাকি ?—আবার একটু হাসল কল্যাণী, দুষ্ট মিষ্টি হাসি।

—না, না, অন্যায় করবেন কেন ? ভালই হয়েছে। আপনাকে আমি অনেকদিন থেকেই খুঁজছি। অনেক আলোচনা করবার আছে আপনার সঙ্গে।

হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সঞ্জীব। একদল ছেলে-মেয়ে করিডর দিয়ে যেতে যেতে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল এ-ধারে। সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টাটাও বাজল।

—আচ্ছা, এক কাজ করুন মিস ব্যানার্জ্জি—আমার বাড়ীতে একদিন আসুন—অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়। এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে সবকথা বলা যাবে না। তা ছাড়া এখনই ক্লাসে যেতে হবে। আপনি কিছু মনে করবেন না যেন—বাড়ীতে নিশ্চয়ইআসবেন কিন্তু

একটু ব্যস্ত হয়ে বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল সঞ্জীব।

ছিঃ, কেন সে আপিস কামাই করল আজ ? কি দরকার ছিল সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করার ?···কিন্তু সঞ্জীব কেনই বা তাকে বাড়ীতে যেতে বলল ? এতদিন যার সঙ্গে দেখা নেই—হঠাৎ তার সঙ্গে এমন কি আলোচনার বিষয় থাকতে পারে ? তবে কি···! না —না, কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে কল্যাণীর। নিজের অন্তরের হাহাকারকে এমনভাবে কি করে সে ব্যক্ত করবে! এই নির্লজ্জ কাঙালপনা কেমন করে প্রকাশ করবে কল্যাণী!···কিন্তু সঞ্জীবের বাড়ীতে গেলে ক্ষতিই বা কি হবে তার—সে ত বিনা আহ্বানে যাচ্ছে না।···হ্যাঁ, রবিবারেই সে যাবে। নিশ্চয়ই যাবে···।

—আসুন মিস ব্যানার্জ্জি, বসুন। যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে পড়ারঘরে কল্যাণীকে বসালো সঞ্জীব।

—আমার সঙ্গে এমন কি আলোচনার বিষয় আছে আপনার, আমি ত ভেবেই পাই না—। পড়াশোনার পাট অনেক দিনই তুলে দিয়েছি—সুতরাং আলোচনাটাকে যেন ওদিক দিয়ে নিয়ে যাবেন না।

—আচ্ছা আচ্ছা—সে দেখা যাবে—।এখন কি করছেন বলুন ত ?

—কেন, সরকারী চাকরি—। বাবা মারা যাবার পর থেকেই ঢুকেছি—তা প্রায় আট বছর হ'ল।

প্রশ্নের উত্তর না হলেও শেষের কথাগুলি না বলে পারলো না কল্যাণী।

—তাই নাকি ? বেশ, বেশ—আপিসের ছুটির পর কিছু সময় পান নিশ্চয়ই।

—হাঁ, তা পাই বটে—কিন্তু কোথাও বেরুতে পারি না। তা হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন বলুন ত?

—দেখুন, আপনার খোঁজ আমি অনেক করেছি। কিন্তু কারুর কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা যোগাড় করতে পারি নি— যে খাতাটায় আপনার ঠিকানা লেখা ছিল—সেটাও খুঁজে পাই নি। তাই আপনার সঙ্গে এতদিন দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। যাই হোক, আপনার বাড়ীর খবর বলুন—ভাই-বোনেরা কেমন আছে?

সঞ্জীব থামল। কল্যাণী তার দীর্ঘ আট বছরের কঠোর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত খুব সংক্ষেপে জানাল সঞ্জীবকে, তার পর ছোট্ট একটা প্রশ্ন করল—মেয়ে হয়ে পুরুষের কর্ত্তব্য পালন করবার যে মন্ত্র আমায় আপনি দিয়েছিলেন তা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি; তাই এখন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই—পুরুষ হয়ে এই সুদীর্ঘ সময় আপনি নিজে কি কর্ত্তব্য করেছেন?

সঞ্জীব লজ্জিত হ'ল—মুগ্ধ হ'ল। বললে, 'কর্ত্তব্য কিছুই করতে পারি নি, কল্যাণী দেবী শুধু নিজের ভারবাহী হয়েই দিন কাটাচ্ছি, অনেক কাজ ছিল এবং আছে—কিন্তু কোনটাই এখনও সম্পাদন করা হ'ল না। এম-এ পাশ করে গিয়েছিলাম দেশের বাড়ীতে। ভেবেছিলাম স্কুল-মাষ্টারী করব। ছেলেগুলোকে অন্য ভাবে শিক্ষিত করে তুলব—যাতে করে শুধু বণিকদের সুবিধে না হয়ে সকলকার সুবিধে হয়। কিন্তু হঠাৎ এই কলেজ থেকে আহ্বান পেয়ে ছুটে আসতে হ'ল, ভাবলাম আমার কর্ম্মক্ষেত্র পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট এবং এইখানেই আমার সাধনার সার্থকতা সম্ভব। তাই কলেজে এসে যোগ দিলাম। আসবার সময় সঙ্গে নিয়ে এলাম আমাদের স্কুলের বাংলার মাষ্টারমশায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্যামলীকে।

সঞ্জীব থামল। বোধ করি কল্যাণীকে চমকে উঠবার সুযোগ দিল সে। কল্যাণী কিন্তু চমকালো না। একটুও ভাবান্তর ফুটে উঠল না ওর মুখে চোখে। নির্ব্বাক ধৈর্য্যশীল শ্রোতা।

সঞ্জীব আবার সুরু করল, 'ভাবলাম বাড়ীতে যেটুকু পড়াশুনা সে করেছে তাই মেজেঘষে তাকে আমি নূতন করে গড়ে তুলব—যাতে করে সেও আমার মত অধ্যয়ন আর অধ্যাপনার ব্রত গ্রহণ করতে পারে। আপনি বোধহয় জানেন, একজন শিক্ষিত মেয়ের প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে আরও পাঁচটি মেয়েকে শিক্ষিত করে তোলা। কেন না যে দেশের মেয়েরা শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সাহসে মরে আছে—সে দেশের পূর্ণতা কোনদিনই আসে না। আত্মশক্তির আধার এই নারী। তাই পৃথিবীর যা কিছু কল্যাণকর—যা কিছু মঙ্গলময় সবের পিছনে আছে এদের সুধাস্পর্শ।'

—বুঝলাম। শিক্ষিত মেয়েদের কর্ত্তব্য অন্য মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলা। আর শিক্ষিত ছেলেদের কর্ত্তব্য কি? সেই বিদগ্ধ মনটিকে আলাপে আলোচনায়—তর্কে বিতর্কে কুরে কুরে ক্ষয় করে দেওয়া?—হঠাৎ যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল কল্যাণী। আর ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলো অবগুণ্ঠনবতী শ্যামলী। এক হাতে মিষ্টির প্লেট আর অন্য হাতে একগ্লাস জল। নিজেকে অত্যন্ত কষ্টে সংযত করে সোজা হয়ে বসল কল্যাণী।

—এই বুঝি আপনার স্ত্রী—বাঃ বেশ চমৎকার দেখতে ত। মাথার ঘোমটা আর একটু দিয়ে শ্যামলী মৃদুস্বরে বললে, "একটু মিষ্টিমুখ করে নিন।"

—নিশ্চয়ই খাব বৈকি?—খিদেও খুব পেয়ে গেছে।"—একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল কল্যাণী। শ্যামলী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলে গেল।

—আপনাকে একটা অনুরোধ করছি কল্যাণী দেবী, হয়ত আপনিই সে অনুরোধ রক্ষা করতে পারবেন। সন্ধ্যাবেলায় এসে ঘণ্টাখানেক যদি ওর পড়াশোনা একটু দেখিয়ে দিয়ে যান—সত্যই বড় উপকার হয়। ভাবছি এই বছরেই স্কুল ফাইন্যালে ওকে বসাব। আমি নিজেই পড়াতে পারতাম—কিন্তু আমার কাছে ও কিছুতেই পড়তে চায় না।

—তার পর পাশ করে কি করবে? আরও পড়বে! গ্র্যাজুয়েট হবে, এম-এও পড়বে—এইত। কিন্তু সঞ্জীববাবু, আপনার বোধ হয় মনে আছে, এম-এ অধ্যয়নরতা একটি সুন্দরী মেয়ে তার রূপ-যৌবন-শিক্ষা সবকিছু নিয়ে একদিন এসেছিল আপনার কাছে আত্মনিবেদন করতে। সেদিন আপনি তাকে প্রত্যাখ্যান করে তার কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দান করেছিলেন। আজ অর্দ্ধশিক্ষিত একটি গ্রাম্য শ্যামলা মেয়েকে বধূরূপে পেয়ে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। অর্থহীন ভাবাবেগে আদর্শকে বড় করতে গিয়ে এক দরিদ্র মাষ্টারমশায়ের অরক্ষণীয়া কন্যাকে বিয়ে করে আপনি যে নিজেকে কি নির্লজ্জভাবে ঠকিয়েছেন তা এখন বুঝতে পারছেন—তাই আজকে হঠাৎ এতদিন পরে আমাকেই আপনার প্রয়োজন হ'ল। কিন্তু আপনি ত জানেন যে, আমার শরীরে রক্ত বয়, অস্থি-মেদ-মজ্জা সবই যে যার নিজের কাজ করে—সুতরাং আমারও ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে—আছে বাঁচবার সাধ। কিন্তু আমার ত কেউ নেই।—এসব কথা বলতে পারত কল্যাণী। কিন্তু বলে নি শুধু সঞ্জীবকে একদিন সে ভালবেসেছিল বলে। তাই সঞ্জীবের অনুরোধ রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়—এইটুকু কঠোর কথা জানিয়েই অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। পায়ের নীচের মাটি যেন অনেকখানি সরে গেছে। সমস্ত পৃথিবীটা যেন বিদ্রূপ করছে তাকে। রোদেপোড়া তামাটে আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে যেন একরাশ হাহাকার। একটা কাক উড়ে গেল কা কা করে।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে হাত পাতল কল্যাণীর সামনে, সঙ্গে বছর পাঁচেকের ছেলে। রাজ্যের বেদনা গলায় ঢেলে দিয়ে ছেলেটা বললে, 'একটা পয়সা দ্যান মা, বাবার বড্ড অসুখ'। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল কল্যাণী—মেয়েটির হাতে শাঁখা—কপালে সিঁদুর। বেদনাক্লিষ্ট অন্তর থেকে অস্ফুট কি একটা কথা কল্যাণীর সংবদ্ধ অধর-ওষ্ঠকে ঈষৎ বিস্ফারিত করে দমকা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল বাইরের পৃথিবীতে। কেউ শুনল না—কেউ বুঝল না।

সর্বোদয় বিচারের মূল আধার

বিনোবা ভাবে

অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ

জগতের যত কিছু অব্যবস্থা ও অশান্তির মুখ্য কারণ ব্যবস্থাপক লোক। তাদের কেউ-বা শাসক, কেউ-বা রাজ-পুরুষ, কেউ-বা পুলিস, কেউ-বা সৈনিক। উকিল, বিচারক এরাও ব্যবস্থাপক। তাই ব্যবস্থাপক নানা প্রকারের। ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপক আছে; তাদের বলা হয় পুরোহিত। এই সব ব্যবস্থাপকদের দরুন পৃথিবীতে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। দয়া করে এঁরা যদি নিজ নিজ কর্তব্য করেন ত জগতের মঙ্গল হবে।

পুলিস বনাম শান্তি!

অনেকে মনে করে, পুলিস আছে তাই না, নয় ত অশান্তির সীমা থাকত না। কিন্তু এ ত পরীক্ষাসাপেক্ষ মত। ভাল, আমাদের দেশে কত পুলিস আছে? দেশে পাঁচ লক্ষ গ্রাম। সব গাঁয়ে পুলিস আছে কি? তবুও লোকে পুলিসকে আশ্রয় মনে করে, ভাবে পুলিস আছে তাই শৃঙ্খলা আছে। ভাল, এই পুলিসের স্বরূপ কি? দুনিয়ায় জ্ঞানীদের বেছে বেছে যদি পুলিসবাহিনী গঠিত হ'ত ত কথা ছিল না। কিন্তু পুলিসে তাদেরই ভর্তি করা হয়, সেনাবাহিনীতে তাদেরই নেওয়া হয় যাদের ছাতি ছত্রিশ ইঞ্চি। সদ্‌গুণ ও সজ্জনতার বিচার করে নেওয়া হয় না। তাই এই সব লোককে (পুলিস ও সৈনিককে) আশ্রয় মানলে শান্তি থাকতে পারি কি?

স্বাধীনতার পরে অনেকবার গুলী চলেছে। আর সমর্থনও তা করা হচ্ছে। বন্দুক কি তবে শান্তি-স্থাপনার সাধন? বন্দুকই যদি শান্তিরক্ষার উপায় তবে দুনিয়ায় কেবল পুলিসই থাকুক। সে স্থলে শিক্ষা-বিভাগের আবশ্যকতা নাই, গুরুরও নাই, কেননা জ্ঞানদাতা পুলিসের লোকই যে রয়েছে! এটা আমাদের মস্ত ভ্রম। কেবল ভারতবর্ষ নয়, সারা দুনিয়া এই ভ্রমের কবলে। আর তাই লোকে শাসকের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছে। কোথাও স্বাধীনতা নাই। হরেক লোক আত্মবশ হবে, সংযমশীল হবে, তার নাম স্বাধীনতা। তার জন্য দরকার শিক্ষার বহুল প্রচার, জ্ঞানীদের সতত ঘুরে বেড়ান, গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে লোককে জ্ঞান বিতরণ। আজ ত জ্ঞানীদের সমাবেশ ইউনিভার্সিটিতে। তাঁদের কাছে কেউ যায় ত কি দিতে হয়। নয় ত জ্ঞান মিলবার নয়। এরূপ যেখানে বাধা সেখানে দুনিয়া জ্ঞানী হবে কি করে? পুলিসের স্থলে গাঁয়ে গাঁয়ে জ্ঞানীদের ঘুরতে হবে—এই ত হওয়া চাই। স্বয়ং লোকের দোরে গিয়ে হাজির হওয়া হচ্ছে জ্ঞানীদের দায় ও কাজ। তবেই না সমাজ-রচনা ভাল হবে ও লোক জ্ঞানী হবে।

কিন্তু দুনিয়ার সর্বত্র আজ সৈনিকের বাহবা। অস্ত্রশস্ত্র বেড়ে চলেছে। ব্যাপার এটম ও হাইড্রোজেন বোমা পর্যন্ত গড়িয়েছে। লোকমনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে যে, এ থেকে শান্তি আসবে এই ভ্রম থেকে দুনিয়াকে বাঁচতে হবে; নিজের ওপর অঙ্কুশ চালাও, অন্যের ওপর চালাতে যেও না—একথা প্রতিটি লোককে বোঝাতে হবে। নিজের ওপর অঙ্কুশ রাখ ত তার প্রভাব সমস্ত জগতের ওপর পড়বে। শিশুদের এই শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। ঘরে ঘরে এই শিক্ষা পৌঁছাতে হবে। আলো ও আহারের মত জ্ঞানও সকলের চাই। যে জিনিস না হলে কারও চলে না, সকলেরই চাই তা কেনা-বেচার বস্তু হতে পারে না। পয়সা দিয়ে তা কিনতে হবে কেন! হাওয়া যেমন অমনি মিলে জ্ঞানও তেমন অমনি মেলা চাই; গ্রামে গ্রামে যাতে জ্ঞান মিলে সে ব্যবস্থা হওয়া চাই।

জপ শান্তির, কাজ অশান্তির

শাসকগণ গাঁয়ে গাঁয়ে জ্ঞান পৌঁছনোর ব্যবস্থা না করে সেনা পাঠানোর ব্যবস্থা করে। আইন তাদের হাতে, আদালত তাদের হাতে, দণ্ডবল তাদের হাতে। তা দিয়ে তারা দুনিয়ায় শান্তি রাখতে চায়। ফলে দুনিয়ায় অশান্তি লেগেই আছে। শান্তির জপ আজকাল যতটা চলছে, আমার বিশ্বাস, ততটা পূর্বে কখনও বুঝি-বা চলে নাই। কিন্তু শান্তির কথা আজ ত বলা হয় অশান্তির জন্য, যুদ্ধের জন্য, অধর্মের জন্য।

ব্যবস্থাপকেরা বেশী অব্যবস্থা করে, পুলিসের কারণে অশান্তি বাড়ে, বিচারকেরা অন্যায় বাড়ায়, অসত্যের প্রচার উকিলেরা সব চাইতে বেশী করে, এ আমরা চিরকাল দেখে আসছি। উকীলবর্গের সৃষ্টি হয়েছিল সত্যানুসন্ধানের জন্য, সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু তাঁদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করে বলব যে, পৃথিবীতে অসত্য বাড়ানোর কাজ তাঁরাই করেছেন। ব্যবসায়ীরা সমাজের ব্যবস্থাকারী অঙ্গ।

সকলে [illegible] বিবিধ বস্তু সমান্য ও ঠিক ঠিক মত পায় সে ব্যবস্থা করা, সে বিষয়ে চিন্তা করা তাদের কাজ। কোথায় এই ভাব থেকে তারা লোকের সেবা করবে, না ত করে তারা তাদের লুণ্ঠন। প্রত্যেকের কাছ হতে কিছু-না-কিছু কেড়ে নেওয়ার তালে তারা আছে। ব্যবসায়ী ত কৃষকের সেবক। কিন্তু কৃষক গরীব আর তার সেবক তালেবর।

•

নির্ভয়তা খোয়ানোর ক্ষমা

শিক্ষকেরাও আমায় ক্ষমা করবেন। শিক্ষক ত ছাত্রের সেবক আর ছাত্রও শিক্ষকের সেবক। কিন্তু গুরু-শিষ্যের এই সম্বন্ধ আজ নাই। গুরু চায় শিষ্যকে হুকুমে চালাতে। গুরুর কথা ছেড়ে দিই, মাতাপিতা পর্যন্ত মনে করে যে, নিজ ছেলেমেয়েদের মারধোর করার এক্তিয়ার তাদের আছে। মা-বাপ মারধোর করার আবশ্যকতা কেন যে বোধ করে তা আমি ভেবে পাই না। আপনাদের কোলে ভগবান শিশু দিয়েছেন। সে একান্ত অবোধ, একান্ত নির্দোষ। মা যা বলে সে মেনে নেয়। মা বলে এটা চাঁদ ও সেও বলে এটা চাঁদ। পিতা বলে এটা সূর্য ত তা মেনে নিয়ে সে বলে এটা সূর্য। মাতাপিতার ওপর পরম নির্ভরশীল শিশু ভগবান ঘরে ঘরে দিয়েছেন। তাকেও মারধোর করার দরকার হয়! ভাই, কথাটা তুচ্ছ নয়, অত্যন্ত গম্ভীর। ভেবে দেখার মত। মেরে-ধরে ছোটদের মনে মা-বাপ কি বোধ জন্মায়, কি শিক্ষা তাদের দেয়? এই শিক্ষাই দেয় যে, যে তোমাদের দৈহিক যাতনা দিবে তার বশ্যতা স্বীকার করবে। তাদের তারা দেহ-বুদ্ধি শেখায়। বাপ-মায়ের মার খেয়ে যে বালক চুপ করে, পুলিসের ডাণ্ডা খেয়েও সে চুপ করবে। মারধর করার পাঠ ত বাপ-মাই শিশুদের শিখিয়েছে। তার ফলে বালক নিস্তেজ হয়ে যায়, ভীরু বনে' যায়, সত্য গোপন করতে থাকে, মাতা-পিতাকে ভয় করতে শিখে। কোন ত্রুটি হয়ে যায় ত মা-বাপকে তা সে কখনও বলে না। মা-বাপের যে মারধর করতে ইচ্ছা হয় তার মূলে রয়েছে দণ্ডশক্তিতে তাদের বিশ্বাস। ছেলে নিয়মিত ইস্কুলে আসে না। নিয়মিত ভাবে ইস্কুলে না এলে বিদ্যা হবে না, একথা শিক্ষক তাকে বুঝিয়ে বলেন। তবু বালক তাঁর কথায় কান দেয় না, নিয়মমত ইস্কুলে আসে না। গুরু একদিন তাকে খুব উত্তমমধ্যম দেয় আর তার পরদিন থেকে সে নিয়মিত ভাবে ইস্কুলে আসতে থাকে। শিক্ষক মনে করে বালকের সদ্‌গুণের বিকাশ হয়েছে। আপনারা ভাবেন যে মারধর করার ফলে নিয়ম-পরায়ণতা এসেছে। কিন্তু ভীরুও তৎসঙ্গে বনে' গেছে। নির্ভয়তা খুইয়ে নিয়মিততা এসেছে। ভাল, আপনি হারালেন কি পেলেন? আমি বলি এই নিয়মিততার মূল্য এক কড়িও নয়। অভয়-নির্ভয়তা সর্বাপেক্ষা বড় গুণ।

'ল এণ্ড অর্ডার'-এর সকরুণ কাহিনী

প্রজা নির্ভয় হোক এই ছিল আমাদের দেশের দস্তুর। আর সেকালের শাসকগণও তা চাইতেন। কিন্তু এখন নির্ভয়তার জায়গা নিয়েছে 'ল এণ্ড অর্ডার'। লোকে ভীরু হয় হোক কিন্তু অর্ডারে থাকুক এ হচ্ছে এখনকার দাবি। মুখ্য সদ্‌গুণ হারিয়ে গৌণ সদ্‌গুণের পিছনে দৌড়ে কোন লাভ হবে না। উলটে আপনি সবকিছু হারাবেন। ভয় করে তাই লোকে চুপচাপ থাকে। ব্যবস্থাপকদের দণ্ডশক্তিকে মানবেন না। ডাণ্ডার জোরে শান্তি বজায় থাকার চাইতে অশান্তি ভাল, তা আমার কাম্য। পুলিসের লোকে দাবায় তাই লোকে শান্ত থাকে। কিন্তু যথার্থ শান্তি তা নয়। যথার্থ শান্তি চাই ত পুলিস ও সৈনিক থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। শান্তিরক্ষার ভার কেন্দ্রের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাই ত তারা হেঁকে বলছে, দেশের সর্বত্র অবিলম্বে শান্তি আসা চাই। লোককে বোঝাতে বিলম্ব হবে, তা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই পুলিস ও সৈনিকের ব্যবস্থা থাকবে। শান্তি তাতে অবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই 'ল এণ্ড অর্ডার'-এর, পুলিস ও ফৌজের রাজত্ব চলছে।

এই মধ্যবর্তী রাজত্ব যতদিন চলবে ততদিন শান্তি আসবে না। ভারতের ডরে পাকিস্তান ফৌজ রাখে; পাকিস্তানের ভয়ে ভারত সৈনিক পোষে। রুশের শঙ্কায় আমেরিকা লস্কর বাড়ায়; আমেরিকার ত্রাসে রুশ সেনা বৃদ্ধি করে। মুখে ত শান্তির বচন, কিন্তু কাজ যা হচ্ছে তাতে হচ্ছে ত্রাসের সৃষ্টি। এ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। সে ক্ষেত্রে জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট রাজত্ব চলবে। গ্রামে গ্রামে গ্রামের শাসন চলবে। এই সভার ব্যবস্থা ও শান্তি রক্ষার দায় যেমন আমাদের তেমন গাঁয়ের শান্তি রক্ষার দায় হবে গ্রামের। এরূপ বিকেন্দ্রিত শাসন যেখানে চলবে সেখানে পুলিস ও সৈনিক ব্যতিরেকে শান্তি থাকবে। জোর দিয়ে আমি বলছি যে, তাই হবে সত্যিকার শান্তি আর তাই শ্মশান-শান্তি সেখানে দেখা দেবে না। অতএব নিজেরা শাসনমুক্ত হয়ে শাসনমুক্ত সমাজের রচনা আমাদের করতে হবে, শোষণরহিত সমাজের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে— তবেই সে লক্ষ্য লাভ হবে। এই যে রচনা তারই নাম সর্বোদয়। সর্বোদয়ের বিচার লোকে গ্রহণ করুক আর কেবল জ্ঞানীর কথা শুনে লোকে চলুক, এ হচ্ছে আমার অন্তরের আবেদন।

ফা-হিয়েনের দেখা ভারত

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মুখোপাধ্যায়

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মথুরায় পৌঁছানোর পর তীর্থযাত্রীরা যমুনা নদীর তীর ধরেই এগোতে থাকেন। নদীর দুই তীরে অনেকগুলি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে এবং সেখানে অনেক ভিক্ষু বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করছেন। ধর্ম্মানুশাসনগুলি যেমন এখানে বহুল-প্রচারিত তেমনি এখানকার অধিবাসীরা অনুশাসনগুলি মেনে চলতেও উদ্‌গ্রীব। মরুভূমির সীমান্ত থেকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত সবক'টি রাজ্যের রাজারাই বৌদ্ধ-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবান ও সেগুলি তাঁরা মেনে চলতে চেষ্টাশীল। যখন রাজারা কোন ভিক্ষুসম্প্রদায়কে কিছু দান করে থাকেন তখন তাঁরা তাঁদের রাজমুকুট খুলে রেখে রাজ-পরিবারবর্গ ও পারিষদবর্গের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেরাই ভিক্ষুদের খাদ্যাদি পরিবেশন করেন। এর পর রাজা ভূমিতে একটি কার্পেট বিছিয়ে ভিক্ষুপ্রধানের সামনা-সামনি হয়ে ভূমিতেই আসনগ্রহণ করেন। এঁদের (ভিক্ষুদের) সামনে সিংহাসনে বসবার তাঁর সাহস হয় না। ভগবান বুদ্ধ যখন এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন তখন তাঁকে রাজারা যে প্রথায় তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন আজও সেই প্রথাতেই তাঁরা ভিক্ষুদের শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকেন, এর কোনরূপ অদলবদল হয় নি।

এখান থেকে সুরু করে দক্ষিণদিকের সমগ্র অঞ্চলটাকেই মধ্য-রাজ্য বলা হয়। এই অঞ্চলের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। অন্যান্য স্থানের মত এখানে তুষারপাত হয় না বা 'লুও' বয় না। এখানকার অধিবাসীরা নিজেদের সম্পদে তৃপ্ত ও সুখী। রাজাকে এদের কোন করও দিতে হয় না বা এদের সম্পত্তির কোন হিসাবও দিতে হয় না। যারা রাজার জমি চাষ করে তাদেরই কেবলমাত্র জমি থেকে উদ্ভূত লাভের একটা অংশ রাজ-তহবিলে জমা দিতে হয়। এদেশের অধিবাসীরা যখন খুশী ও যেখানে খুশী চলে যেতে পারেন বা এসে বাস করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ড-প্রথা ব্যতিরেকেই এদেশের রাজা তাঁর রাজ্যশাসন করেন। অপরাধের তারতম্য অনুসারে অপরাধীকে লঘু ও গুরু দণ্ড দেওয়া হয়, এমনকি রাজ-বিদ্রোহীদেরও কেবলমাত্র ডান হাত কেটে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজার দেহরক্ষী ও পারিষদবর্গকে মাসিক মাহিনার কড়ারে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। একমাত্র চণ্ডালেরা বাদে কেউই প্রাণীহত্যা করে না, মদ্যপান করে না বা পিঁয়াজ-রশুন খায় না। যারা দুষ্ট-প্রকৃতির লোক তাদেরকেই চণ্ডাল নামে অভিহিত করা হয়। এরা অবশ্য সমাজ থেকে আলাদা ভাবেই বাস করে এবং এরা যখন কোন বাজারে বা নগরে ঢোকে তখন একটা লাঠি ঠুকে চলে, যাতে করে অন্যান্য লোকেরা তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলবার সুযোগ পায়। এদেশের কেউই মুরগী বা শুয়োর পোষে না বা কোন জীবিত গবাদি পশু বিক্রয় করে না। এদেশের বাজারে কোন শুঁড়ীর দোকান বা মাংস বিক্রয়ের দোকান নেই। জিনিষপত্র কেনাকাটা হয় কড়ির মাধ্যমেই। একমাত্র চণ্ডালেরাই মৎস্যজীবী বা শিকারী হয় এবং পশু-মাংস বিক্রয় করে থাকে।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণলাভের পর এদেশের রাজারা ও বৈশ্য-সম্প্রদায়ের প্রধানেরা ভিক্ষুদের জন্য বহু বিহার নির্ম্মাণ করে দিয়ে-ছেন বা তাদের ভরণপোষণের জন্য ধানজমি, গবাদি পশু, ঘরবাড়ী, ফলের বাগান প্রভৃতি দান করে গিয়েছেন। তাদের এই দানের কথা প্রস্তর-ফলকে খোদিত করে রেখে গেছেন যাতে করে তাদের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীরা এবিষয়ে অবগত হতে পারেন এবং এতে হস্তক্ষেপ না করেন। এখনও পর্য্যন্ত সেই সব ব্যবস্থাই বলবৎ আছে।

এদেশের ভিক্ষুদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে পুণ্যকার্য্যাদি সম্পাদন করা, ধর্ম্মসূত্র পাঠ এবং সাধন-সমাধিতে মগ্ন থাকা। যখন কোন বিহারে কোন বিদেশী ভিক্ষুর আগমন হয় তখন বিহারের পুরাতন বাসিন্দারা তার সঙ্গে দেখা করেন ও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। আগন্তুক ভিক্ষুর বস্ত্রাদি ও ভিক্ষাপাত্র তাঁরা নিজেরাই বহন করে নিয়ে যান এবং আগন্তুককে পদ প্রক্ষালনের জন্য জল দেন। তাঁকে (আগন্তুক ভিক্ষুকে) বিহারের সাধারণ খাদ্য গ্রহণের সময়ের ব্যতি-ক্রমেই জলীয় খাদ্যাদি পরিবেশন করা হয়। এর পর আগন্তুক কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলে পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তিনি কত দিন ধরে এই ভিক্ষুজীবন যাপন করছেন। সেটি জানান হলে পর বিহারের নিয়ম অনুসারে মর্য্যাদাসম্পন্ন ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

সাধারণতঃ ভিক্ষুসম্প্রদায়, যেখানে বসবাস করেন সেইখানে তাঁরা বুদ্ধের তিন প্রিয়শিষ্য শারিপুত্র১ মুদগল্যায়ন২ ও আনন্দের

---

(১) শারিপুত্র—(সিং? শেরিউৎ?) বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য এবং সম্ভবতঃ তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে বিদ্যায়, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ—যার জন্য তাঁকে 'জ্ঞানীর সম্মান' দেওয়া হয়েছিল। তিনি বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। এর মাতা শারিকা নালন্দার অধিবাসী ছিলেন এবং বোধহয় তাঁর নাম থেকেই ছেলের নামকরণ শারিপুত্র হয়। অনেকে এঁকে উপতিস্য নামেও অভিহিত করেন। ঐ নাম এঁর পিতার তিস্যের নামানুসারেই রাখা হয়েছিল। অভি-ধর্ম্মের ভক্তেরা এঁকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখেন। কারণ ইনিই

উদ্দেশ্যে একটি করে স্তুপ রচনা করে থাকেন। ত্রিপিটক (বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র) বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ অভিধর্ম্ম, বিনয় ও সূত্রের সম্মানার্থেও অনেকস্থানে স্তুপ নির্ম্মিত হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ বর্ষাবসানকালের এক মাস পরে প্রত্যেকটি ধার্ম্মিক পরিবার একত্রে মিলিত হয়ে ভিক্ষুদের দান করার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে তা বণ্টন করে দেন। ভিক্ষুরাও একটি বিরাট সভা ডেকে সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শোনান। সভা শেষে ভিক্ষুরা শারিপুত্রের স্তুপেতে পুষ্প ও ধূপাদি অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং সারারাত্রি ধরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন। অভিনেতা ও সঙ্গীতজ্ঞদের নিযুক্ত করে একটি পালা অভিনয়েরও আয়োজন তাঁরা করে থাকেন। এটা বলাই বাহুল্য যে, পালাটি শারিপুত্রের জীবনকে ঘিরেই অর্থাৎ তাঁর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, সংসারধর্ম্ম ত্যাগ, ভিক্ষুজীবন গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পালাটি রচিত। মুদগল্যায়ন ও আনন্দের জীবনকে নিয়েও অনুরূপ পালাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। ভিক্ষুণীরা সাধারণতঃ আনন্দের স্তুপেই তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন। কারণ আনন্দই বুদ্ধদেবকে নারীদের সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী জীবনযাপন করার অনুমতি দেবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্রমণীরা সাধারণতঃ রাহুলের৩ উদ্দেশ্যেই তাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে থাকেন। এটা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অনুষ্ঠানের জন্য এক-একটি দিন ধার্য্য করা হয়। মহাযান পন্থীরা প্রজ্ঞাপারমিতা৪ মঞ্জুশ্রী৫ ও অবলোকিতেশ্বরের৬ উদ্দেশ্যে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে পর ভিক্ষুরা তাঁদের বাৎসরিক খাদ্যশস্যাদি দান গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য-প্রধান কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেদের প্রয়োজনানুসারে গ্রহণ করে থাকেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের সময় থেকেই পবিত্র সম্প্রদায় বিশেষ যে সব নিয়মাবলী বা অনুষ্ঠানাদির প্রচলন হয়েছিল তা আজও পর্য্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। এর কোন অন্যথা হয় নি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

তীর্থযাত্রিদ্বয় মথুরা থেকে আঠার যোজন দূরবর্ত্তী সাংকাশ্যরং৭ এসে পৌছন। বুদ্ধদেব ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গে৮ তাঁর মাতাকে তিন মাস

তাঁদের গুরু। ইনি শাক্যমুনির পূর্ব্বেই মারা যান। ইনিও পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধ হয়ে পুনরায় ধরাধামে আবির্ভূত হবেন বলেই বৌদ্ধদের বিশ্বাস।

(২) মুদগল্যায়ন—এটি একটি সিংহলী নাম। ইনি বুদ্ধের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং ইনি বুদ্ধের বামহস্তস্বরূপ ছিলেন। এঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তির ও সম্মোহন শক্তির জন্য ইনি বিখ্যাত। ইনি তুষিত স্বর্গে শাক্যমুনির আকৃতির একটা আঁচ পাবার জন্য একজন শিল্পীকে তুষিত স্বর্গে নিজের বিশেষ ক্ষমতা দ্বারা নিয়ে গিয়েছিলেন। ইনি নিজের মাতাকে নরক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ইনিও শাক্যমুনির পূর্ব্বেই মারা যান। বৌদ্ধদের বিশ্বাস ইনিও ভবিষ্যতকালে পুনরায় মর্ত্তধামে বুদ্ধরূপে আবির্ভূত হবেন।

(৩) শাক্যমুনির জ্যেষ্ঠপুত্র রাহুল যশোধরার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ইনিও পিতার সঙ্গী হন এবং পিতার মৃত্যুর পর বৈভাষিক পন্থের প্রচলন করেন। ইনি নবাগত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের গুরু বলে খ্যাত। ইনি পুনরায় ভবিষ্যত-বুদ্ধের জ্যেষ্ঠপুত্ররূপেই জন্মগ্রহণ করবেন। (Travels of FA-hien)

(৪) প্রজ্ঞাপারমিতা—পারমিতা দেবীদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা শীর্ষ স্থানীয়। প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে তাঁর রূপকল্পনা করা হয়েছে। মহাযানে দশটি পারমিতার রূপ রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে—রত্ন, দান, শীল, বীর্য্য, ধ্যান, উপায়, বল, জ্ঞান ও বজ্রকর্ম্ম। (বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য পৃষ্ঠা—১০২-১০৪)

(৫) বৌদ্ধদের সঙ্ঘে মঞ্জুশ্রীর স্থান অতি উচ্চে। যত বোধিসত্ত্ব আছেন তার মধ্যে মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরই সর্ব্বপ্রধান। মঞ্জুশ্রীর পূজা পদ্ধতি সকল বৌদ্ধ দেশেই বিদ্যমান। মঞ্জুশ্রী পরাবিদ্যা ও পরাজ্ঞানের দেবতা। তাঁর মূল প্রহরণ দক্ষিণ করে উদ্যত অসি ও বাম করে হৃৎপ্রদেশে রক্ষিত প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক। অসি দ্বারা তিনি সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা ছেদন করেন এবং পুস্তক দ্বারা পরাব্রহ্ম বা পরাশুক্রের জ্ঞান জগতে প্রচার করেন। এঁর বিভিন্নরূপে পূজিত রূপগুলি হচ্ছে বাক বা বজ্ররাগ মঞ্জুশ্রী, ধর্ম্মধাতু, বাগীশ্বর, মঞ্জু ঘোষ, সিদ্ধৈকবীর, নাম সঙ্গীতি মঞ্জুশ্রী, বাগীশ্বর মঞ্জুবর, মঞ্জুবজ্র, মঞ্জুকুমার, অরপচন, স্থিরচক্র ও বাদিরাট।

(৬) মঞ্জুশ্রীর মত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের স্থান বৌদ্ধদের সঙ্ঘে অতি উচ্চে। যে কল্প এখন চলছে সেই ভদ্রকল্পের ইনিই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইনিই এখন সৃষ্টির রক্ষাকর্ত্তা। শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণের পর থেকে যতদিন না ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আসেন ততদিন সৃষ্টিরক্ষার জন্য ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য উপদেশ ইত্যাদি অবলোকিতেশ্বরই করবেন। অবলোকিতেশ্বর করুণার অবতার। ইনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতদিন পৃথিবীতে একটি প্রাণীও দুঃখে অভিভূত থাকবে ততদিন তিনি নির্ব্বাণলাভ করবেন না। (বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা ৩৪-৫৯)

(৭) কনৌজের ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই সাংকাশ্য গ্রাম।

(৮) দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গকেই ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গ বলা হয়। মেরু পর্ব্বতের চারি চূড়ার মধ্যে এই স্বর্গের অবস্থিতি। এখানে দেবতাদের বত্রিশটি নগর আছে যার আটটি মেরু-পর্ব্বতের চূড়ায়,

ধরে ধর্মকথা পাঠ করে শোনানর পর তিনি এইখানেই নেমে এসে প্রথম পৃথিবী স্পর্শ করেন। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যবর্গের অজ্ঞাতে স্বীয় ঐশ্বরিক শক্তিবলে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে যান এবং তিন মাস কাল পূর্ণ হবার সাত দিন আগে তিনি তাঁর অদৃশরূপ পরিগ্রহণ করেন। অনিরুদ্ধ৯ তাঁর ঐশ্বরিক দৃষ্টি দিয়ে বুদ্ধদেবকে দেখতে পান ও মুদগল্যায়নকে বুদ্ধদেবের পাদপূজা করার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী মুদগল্যায়ন বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদপূজা করেন। এর পর বুদ্ধদেব মুদগল্যায়নকে জানান যে আর সাত দিন বাদেই তিনি জম্বুদ্বীপে অবতরণ করবেন।

বহুদিন ধরে বুদ্ধদেবকে দেখতে না পেয়ে যখন সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে আকাশের দিকে বুদ্ধদেবকে দেখতে পাবেন বলে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তখন উৎপলা নামে একটি ভিক্ষুণী বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান যে, তুষিতস্বর্থ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করার পর সেই যেন বুদ্ধদেবকে প্রথম শ্রদ্ধা জানাতে পারে। বুদ্ধদেব তার সে প্রার্থনা পূরণ করেছিলেন।

বহুদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। নীল আকাশের বুক চিরে দেখা দিল তিন ধাপ বিশিষ্ট একটি মণিমাণিক্যখচিত সিঁড়ি যার মধ্যধাপে ভগবান বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন। তার ডান এবং বাঁ দিকে আরও দুটি সিঁড়ি দেখা গেল। ডান দিকের সিঁড়িটা রূপার তৈরী ও বাঁদিকের সিড়িটা সোনার তৈরী। ডান দিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ভগবান ব্রহ্মা তাঁর শ্বেতবর্ণের চামরটি নিয়ে বুদ্ধদেবকে ব্যজন করছেন ও বাঁদিকের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেবরাজ ইন্দ্র বুদ্ধদেবের মাথার ওপর একটি মণিখচিত ছত্র খুলে ধরে রয়েছেন। অসংখ্য দেবতাও বুদ্ধদেবের সঙ্গী হয়েছেন। বুদ্ধদেব মাটির পৃথিবী স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি সিড়িই পৃথিবীর বুকে মিলিয়ে গেল। মাত্র সাতটা ধাপ দৃশ্যমান হয়ে রইল। ভবিষ্যত কালে এই ধাপের শেষ প্রান্তের সন্ধান পাবার জন্য রাজা অশোক এই স্থানের মাটি খুঁড়িয়েছিলেন কিন্তু অনেক দূর পর্য্যন্ত খুঁড়েও যখন এর শেষ বার করতে পারলেন না তখন তিনি এখানকার স্থানমাহাত্ম্য স্বীকার করে নিয়ে এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দেন এবং ধাপের ওপর একটি ১৬ ফুট দণ্ডায়মান বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিহারের পিছন দিকে তিনি একটি ৫০ ফুট উঁচু প্রস্তর স্তম্ভও নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভের শীর্ষদেশে একটি সিংহের মূর্ত্তি১০ স্থাপন করা হয়েছিল। স্তম্ভ গাত্রের চারিপাশে চারিটি কাঁচের মতন স্বচ্ছ বুদ্ধের মূর্ত্তিও খোদিত করে দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে এক সময় অন্য ধর্ম্মাশ্রিত যাজকেরা এখানকার অধিবাসী ভিক্ষুদের এখানে বাস করার অধিকারের প্রশ্ন তোলেন। তর্কে ভিক্ষুরা হেরে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে তাঁদের আকুল প্রার্থনা জানান যে, যদি এই-ই তাঁর অভিপ্রেত হয় তা হলে তারা যাবেন কোথায়? একটা অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে এর মীমাংসা হোক এইটাই আমরা চাই। তাঁদের প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শীর্ষ দেশের সিংহমূর্ত্তিটি একটা বিরাট গর্জ্জন করে উঠে এ স্থানের মাহাত্ম্য প্রমাণিত করেন। এই ঘটনার পর অবশ্য যাজকেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যান। বুদ্ধদেব পৃথিবীতে অবতরণ করার পর প্রথম পূজা গ্রহণ করেন ভিক্ষুণী উৎপলার১১ কাছ থেকে। বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শে ধন্য প্রতিটি স্থানেই ভবিষ্যতকালে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে।

এই দেশ সত্যই খুব উর্ব্বরা এবং ধনধান্যে পূর্ণ। এ রকম সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সম্পদশালী দেশ দেখতে পাওয়া খুবই দুষ্কর। এমন একটা দেশ দেখা যায় না যার সঙ্গে এর তুলনা চলে। এ দেশের লোকেরা অতিথিপরায়ণ এবং বিদেশীদের খুবই আদর আপ্যায়ন করেন এবং সর্ব্বদিক দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেন যাতে তাঁদের কোনরূপ কষ্ট না হয়।

তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে যাত্রা করে ৫০ যোজন দূরবর্ত্তী অগ্নিদগ্ধ নামক একটি বিহারে এসে পৌঁছল। অগ্নিদগ্ধ প্রথম জীবনে একটি দৈত্য ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে বুদ্ধদেব একে তাঁর ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। দীক্ষা গ্রহণের পর এখানকার অধিবাসীরা একটি বিহার নির্ম্মাণ করে তাঁর উদ্দেশ্যে বিহারটিকে উৎসর্গ করেন। কথিত আছে যে, এই অরহত (অগ্নিদগ্ধ) একবার বুদ্ধদেবের হাতে জলপ্রদান করেন এবং প্রদানকালে বুদ্ধের হাত থেকে কয়েক ফোঁটা জল মাটিতে পড়ে যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে সেই সামান্য জলের দাগ শত চেষ্টা করেও মিলিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি। এখানে একটি স্তূপ আছে সেটি বুদ্ধের উদ্দেশ্যেই স্থাপিত। স্তূপটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব একটি ব্রহ্মদৈত্যের প্রতি অর্পিত হয়েছিল। একদা এক নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা পরীক্ষা করবার জন্যে তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করে স্তূপের চারিধার ঘিরে বিরাট একটা আবর্জ্জনা-স্তূপের সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মদৈত্যটি তার

উপরই অবস্থিত। ইন্দ্রের রাজধানী বেলীভূ এরই মধ্যস্থানে অবস্থিত। এখানে তিনি সহস্র মস্তক ও সহস্র চক্ষু নিয়ে সিংহাসনে বসে আছেন এবং তার রাজত্ব পরিচালনা করেন।

(Travels of FA-hien by Legge, pp. 48)

৯। অনিরুদ্ধ শাক্যমুনির কাকা অমৃতদানের পুত্র। বুদ্ধের জীবনের শেষভাগে এর উল্লেখ বহুস্থানে পাওয়া যায়। এর দিব্য-চক্ষুর জন্য ইনি বিখ্যাত।

(Travels of FA-hien by Legge, pp. 48)

(১০) ফা-হিয়েন তাঁর বিবরণীতে এখানকার স্তম্ভের শীর্ষদেশে সিংহমূর্ত্তি আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আসলে সেটি একটি হস্তীমূর্ত্তি। ইউ-এন-চাঙ তাঁর বিবরণীতে হস্তীর উল্লেখই করেছেন। (পৃ. ৫২)

(১১) ইনি সম্পর্কে শাক্যমুনির খুড়ী ছিলেন এবং শাক্যমুনিকে ইনি সেবাশুশ্রূষা করতেন। বৌদ্ধধর্ম্মে ইনিই প্রথম নারী যাকে ভিক্ষুণীর জীবনযাপন করবার প্রথম অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

(Travels of FA-hien p. p. 52)

নিজের ক্ষমতাবলে এমন একটি ঝড়ের সৃষ্টি করে যে,সেই আবর্জনা সমূহ উড়ে যে কোথায় চলে যায় কেউ তা বলতে পারে না এবং এই অঞ্চলের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা পূর্ব্বের মতই বজায় থাকে।

এই বিহারের চারিপাশে অসংখ্য স্তূপ আছে। এর মধ্যে প্রত্যেক বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভস্থানের উপর নির্ম্মিত স্তূপটাই উল্লেখযোগ্য। নির্ব্বাণস্থানটির পরিমাপ একটি গো-শকটের চাকার পরিমাপের চেয়ে বেশী নয়। অনেক চেষ্টা করও সেইস্থানে ঘাস জন্মান সম্ভব হয় নি যদিও এর পার্শ্ববর্ত্তী সমগ্র অঞ্চলটাই ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে।

এর পর তীর্থযাত্রীরা এখানে বর্ষাবসানকাল কাটিয়ে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হতে হতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কাণ্যকুব্জ নগরে এসে পৌছন। এখানে ২টি বিহার আছে এবং সেখানে হীনপন্থী ভিক্ষুরাই বাস করেন। এখান থেকে কিছু দূরে গঙ্গার উত্তর তীরে একটি স্থান আছে সেখানে বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যবর্গের ধর্ম্মশিক্ষা দেন। এইখানেই বুদ্ধদেব প্রচার করেছিলেন যে—"জীবনের কোনই স্থায়িত্ব নেই। জীবনটা জলবুদ্বুদের মতই ক্ষণস্থায়ী।" এখানে গঙ্গানদী পার হয়ে তীর্থযাত্রীরা হরিগ্রামে এসে পৌছন। এই হরিগ্রামেও বুদ্ধদেব ধর্ম্মপ্রচার করেছিলেন। তিনি যেখানে বসেছিলেন বা বেড়িয়েছিলেন তার প্রত্যেক স্থানেই ভবিষ্যতকালে একটি করে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এখান থেকে সাচী১২ নগরে এসে পৌছন। হরিগ্রাম থেকে সাচীর দূরত্ব মাত্র তিন যোজন। নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়ে এগিয়ে গেলে পথিপার্শ্বে একটি নিমগাছ দেখতে পাওয়া যায়, যার ডাল দিয়েই বুদ্ধদেব দাঁত মেজেছিলেন। গাছটি মাত্র ৭ ফুট উঁচু। এখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে যতবার এই গাছটা কেটে দিয়েছেন ততবারই নূতন করে গাছটিকে গজাতে দেখা গেছে অর্থাৎ এর বিনাশ কোনদিন হয় নি বা হবে না। এই সাচীতেই চারি বুদ্ধ১৩ এসে বসেছেন এবং বেড়িয়েছেন।

নবম পরিচ্ছেদ

এর পর তীর্থযাত্রীরা ৮ যোজন পথ অতিক্রম করে কোশল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত শ্রাবস্তী নগরে এসে পৌছন। শ্রাবস্তীতে তীর্থযাত্রীরা মাত্র ২০০ ঘর পরিবারের বসতি দেখেছিলেন। পুরাকালে রাজা প্রসেনজিত১৪ এখান থেকেই তাঁর রাজ্য পরিচালনা করতেন। এখানেও অনেকগুলি স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে তার মধ্যে যেখানে মহাপ্রজাপতির বিহার ছিল সেখানে সুদত্ত১৫ বাস করতেন। যেখানে অঙ্গুলিমালা১৬ অর্হত্ত লাভ করেছিলেন এবং যেখানে তাকে পরিনির্ব্বাণলাভের পর দাহ করা হয়েছিল সেইস্থানের স্তূপগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা এইগুলি ধ্বংস করবার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করতে পারেন নি।

নগরের দক্ষিণ দিকে সুদত্ত একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়েছিলেন যার নামকরণ করা হয়েছিল জেতবন বিহার১৭। এই জেতবন বিহারের চারিদিকের দ্বার যখন খুলে দেওয়া হয় তখন চারটি প্রস্তর স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায় যার শীর্ষদেশে একটি করে চক্র ও একটি করে ষাড়ের মূর্ত্তি খোদিত করা আছে—চক্রটি বামদিকে ও ষাড়টি দক্ষিণদিকে। বিহারের বামদিকে ও দক্ষিণদিকে দুটি পুষ্করিণীও খনন করা হয়েছিল। দুটি পুষ্করিণীরই জল অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। বিহারের চতুর্দ্দিকেই বিভিন্ন ধরণের সুগন্ধী বৃক্ষ ও ফুলের গাছ রোপণ করা হয়েছে। সেইজন্য এই বিহারের সমগ্ররূপটি শুধুমাত্র সৌন্দর্য্যমণ্ডিতই নয় এক অতুলনীয় সুন্দরের সাধনক্ষেত্রও বলা চলে।

বুদ্ধদেব যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে গিয়ে তাঁর মাতাকে ৯০ দিন ধরে ধর্ম্মবাণী পাঠ করে শোনাতে গিয়েছিলেন তখন রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের অদর্শনে বিমর্ষিত হয়ে একটি প্রস্তুতী চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়ে ভগবান বুদ্ধ যেখানে সাধারণতঃ বসতেন সেইখানে স্থাপন করেন; পরে বুদ্ধদেব যখন এই বিহারে পুনঃপ্রবেশ করেন তখন এই কাষ্ঠ মূর্ত্তিটি তাঁর সঙ্গে দেখা করবার উদ্দেশ্যে আপনা থেকেই এগিয়ে আসে কিন্তু বুদ্ধদেব মূর্ত্তিটিকে তার স্বস্থানে ফিরে যেতে নির্দ্দেশ দেন এবং বলেন যে, "আমার পরিনির্ব্বাণলাভের পর

১২। বিখ্যাত সাচী স্তূপের সঙ্গের এই সাচী নগরীর কোন সম্পর্ক নেই—অনুবাদক।

১৩। চারিবুদ্ধ হচ্ছেন কশ্যপ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও শাক্যসিংহ বা গৌতম। এ ছাড়াও আর তিনটি মানসী বুদ্ধের উল্লেখ আছে। তাঁরা হচ্ছেন বিপশ্বী, শিখী ও বিশ্বভূ।

(বৌদ্ধ দেবদেবী—বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য, পৃষ্ঠা-৪৪)

১৪। প্রসেনজিত শাক্যমুনির প্রথম দলের শিষ্য ও প্রধান ভক্ত। বুদ্ধমূর্ত্তিসমূহের প্রচলন ধরতে গেলে ইনিই করেছিলেন।

(Travels of FA-hien pp. 55)

১৫। সুদত্তর আসল নাম ছিল অনাথপিণ্ড। ইনি শ্রাবস্তী নগরীর বৈশ্যদের প্রধান ও নগরীর একজন সম্ভ্রান্তশালী লোক ছিলেন। ফা-হিয়েন তাঁর পুরাতন বাড়ীর দেওয়াল ও কুয়োটাই মাত্র ভারত পরিভ্রমণকালে দেখতে পেয়েছিলেন।

(Travels of FA-hien pp. 56)

১৬। অঙ্গুলিমালা এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত শৈব যাঁরা আত্মবিসর্জন করাকে একটা ধার্ম্মিক অনুষ্ঠান হিসাবে গণ্য করেন। বুদ্ধদেব এঁকে দীক্ষা দিলে পর ইনি ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। শেষ পর্য্যন্ত ইনি অর্হত পর্য্যায়ভুক্ত হন।

(Travels of FA-hien pp. 56)

১৭। শ্রাবস্তীর একটি বিখ্যাত বিহার। প্রসেনজিত পুত্র যুবরাজ জেতার কাছ থেকে অনাথপিণ্ড বুদ্ধের বাসস্থানের নিমিত্ত এটি কিনেছিলেন। এখানে বুদ্ধদেব বহুকাল ধরে বাস করেছিলেন।

(Travels of FA-hien pp. 57)

তুমিই আমার চারিশ্রেণী শিষ্যবর্গের আধারস্বরূপ হয়ে থাকবে।" এই কথা শোনার পর মূর্ত্তিটি পুনরায় স্বস্থানে ফিরে যায়। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে এইটাই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধমূর্ত্তি- যা দেখেই ভবিষ্যতকালের অসংখ্য বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছিল।

কথিত আছে জেতবন বিহারটি প্রথমে সাততলা উঁচু ছিল। বিভিন্ন দেশের রাজারা বিভিন্ন রঙের মণিখচিত সামিয়ানা দিয়ে বিহারের উপরটা মুড়ে দিতেন, ফুল ছড়াতেন ও ধূপাদি জ্বালতেন। দিনের আলোর মতন রাতটাকেও উজ্জ্বল করে রাখার জন্য অসংখ্য প্রদীপও জ্বালিয়ে রাখা হ'ত। এখানে পূর্ব্বে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পরিচালিত হ'ত। এইরূপ একটি উৎসব অনুষ্ঠানকালে একটি ইঁদুর একটি জলন্ত প্রদীপের সলতে মুখে করে নিয়ে ওপরে উঠে যায় এবং সেই সলতের আগুন থেকেই কিরকমভাবে সামিয়ানায় আগুন ধরে যায় যার ফলে সারা বিহারটাই অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বুদ্ধদেবের কাষ্ঠনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিটি অক্ষত থাকে। এর পর বিহারটিকে নূতন করে নির্ম্মাণ করা হয় এবং সেটি মাত্র দ্বিতল করা হয়। এইটাই ফা-হিয়েন দেখেছেন।

ফা-হিয়েন ও তার সতীর্থ যখন এই জেতবনের সবকিছু দেখে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁরা মনে মনে খুবই দুঃখিত হন এই ভেবে যে, ভগবান বুদ্ধ এই জেতবন বিহারে প্রায় ২৫ বৎসরকাল বাস করেছিলেন কিন্তু এই সব পুণ্যক্ষেত্র দর্শনলাভ করতে তাঁদের কত দূর দেশ থেকেই না আসতে হয়েছে। যখন ইচ্ছা তখনই এসব দেখার সৌভাগ্য তাঁদের নেই। তাঁদের সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা পথিমৃত্যু বরণ করেছেন বা যাঁরা মাঝপথে থেকেই ফিরে গেছেন তাঁরা ত দেখতেই পেলেন না ভগবান বুদ্ধের এই লীলাক্ষেত্র। ফা-হিয়েন ও তাঁর সঙ্গীকে দেখতে পেয়ে এখানকার ভিক্ষুরা যখন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন যে, এরা সুদূর চীন থেকে এসেছেন তখন তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, এ পর্য্যন্ত তাঁরা কোন চীনদেশীয় ভিক্ষুকে আসতে দেখেন নি বা এসেছেন বলে শোনেন নি।

এই বিহারের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটা বাঁশবন আছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'দৃষ্টিদান'। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে প্রায় ৫০০ জন অন্ধ লোকের বাস ছিল। বুদ্ধদেব তাঁদের মধ্যে তাঁর ধর্ম্মবাণী প্রচার করার পর তাঁরা দৃষ্টি ফিরে পান। আনন্দে অধীর হয়ে বুদ্ধের এই ৫০০ নূতন শিষ্য তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বুদ্ধের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানান এবং ভূমিতে তাদের যষ্টি পুতে ফেলেন। এই যষ্টি থেকেই নাকি পরবর্ত্তীকালে বাঁশবনের সৃষ্টি হয়। এখনও জেতবনের ভিক্ষুরা মধ্যাহ্ন আহার্য্য গ্রহণের পর এই বনেতেই সমাধিতে বসেন।

কিছু দূরে আর একটি বিহার দেখতে পাওয়া যায়। বিহারটি রাজা বৈশাখা নির্ম্মাণ করে একদা বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যবর্গকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এখানে ভিক্ষুদের জন্য নির্ম্মিত অনেক-গুলি বাড়ীও দেখতে পাওয়া যায়; প্রত্যেকটি বাড়ীরই দুটো করে দরজা—একটা উত্তরে অপরটি দক্ষিণে।

বৈশ্যপ্রধান সুদত্ত এই বনটিতে স্বর্ণমুদ্রা বিছিয়ে দিতে যতগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রয়োজন—ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে এই বনটি ক্রয় করেন ও বুদ্ধদেবের জন্য বাসস্থান নির্ম্মাণ করে দেন। বুদ্ধদেব মরজগতে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সময় কাটিয়েছেন এই জেতবন-বিহারেই। বনের মধ্যস্থানে একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে—যেখানে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় সুন্দরী নাম্নী একটি বেশ্যা একটি লোককে খুন করে খুনের দায় মিথ্যা করে বুদ্ধের উপর চাপিয়ে দেয়।১৮

জেতবনের পূর্ব্বদ্বারের বাইরে ৭০ হাত দূরে একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে যেখানে বুদ্ধদেব বিভিন্ন দেশের রাজা, রাজ-কর্ম্মচারীসমূহ ও সাধারণ জনসাধারণের মিলিত একটি সভায় ৯৬টি বিভিন্ন ধর্ম্মের ভুলগুলি বোঝাতে চেষ্টা করেন। এই সময় কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মানুরাগী লোকেদের প্ররোচনায় চঞ্চমালা নাম্নী এক নারী নিজের উদরের উপর মোটা কাপড় জড়িয়ে উদরটিকে বড় করে সর্ব্বসাধারণের কাছে মিথ্যা করে ঘোষণা করে যে, তার এই গর্ভাবস্থার জন্য বুদ্ধই দায়ী। দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা ভগবান বুদ্ধের এই অপ্রীতিকর অবস্থা দেখে সাদা ইঁদুরের রূপ ধরে চঞ্চমালার পেট-কোমরে বাঁধা কাপড়গুলির বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করে দেয়। ফলে সভামধ্যেই তার পেটবাঁধা অতিরিক্ত কাপড়সমূহ খুলে মাটিতে পড়ে যায় এবং সেখানকার ধরিত্রী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে চঞ্চমালাকে জীবন্ত গ্রাস করে। এখানে আরও একটি স্থান চিহ্নিত করা আছে যেখানে দেবদত্ত তার নখে বিষ মাখিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করতে উদ্যত হওয়ায় দেবদত্তের পাতালে জীবন্ত সমাধিলাভ ঘটে। পরবর্ত্তীকালে এর প্রত্যেকটি স্থানে স্তূপ নির্ম্মিত হয়েছে। বুদ্ধদেব যেখানে সভা করেছিলেন পরে ঠিক সেই স্থানেই একটি বিহার নির্ম্মিত হয় এবং বিহারে বুদ্ধের বসা অবস্থায় একটি মূর্ত্তিও স্থাপন করা হয়। এই বিহারের ঠিক পূর্ব্বদিকে হিন্দুদের একটি দেবালয় আছে। তার নাম হচ্ছে "চন্দ্রচূড়"। দেবালয়টি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতাদের পূজা-অর্চনা করার নিমিত্ত একজন পূজারীকে নিযুক্ত করা আছে যিনি পূজাপাঠ, সন্ধ্যারতি করে থাকেন এবং দেবালয়টি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। প্রভাতকালে যখন পূর্ব্বগগনে সূর্য্য উদিত হয় তখন বৌদ্ধবিহারের ছায়াটিতে দেবালয়টি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়ে যায়, কিন্তু সূর্য্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েন তখন কিন্তু দেবালয়ের ছায়া বিহারের

১৮। Li Yung Shi কিন্তু তাঁর Record of Buddhist kingdom-এ বলেছেন যে—বৌদ্ধধর্ম্মের একদল শত্রু সুন্দরী নাম্নী একটি বেশ্যাকে খুন করে মৃতদেহ জেতবনের মধ্যে পুতে রেখে ঘোষণা করে যে, বুদ্ধ তার সঙ্গে এক অবৈধ সংস্পর্শের পাপ ঢাকতে গিয়ে একে হত্যা করেছেন।

উপর না পড়ে উত্তর দিকে গিয়ে পড়ে যা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলেই চোখে পড়ে। এখানকার ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছেন। জেতবনের আশেপাশে প্রায় ৯৬টি বিহার নির্ম্মিত হয়েছে ও কেবলমাত্র ১টি ছাড়া সবগুলিতেই ভিক্ষুর বাস আছে।

মধ্যরাজ্যে প্রায় ৯৬টি বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে এবং এদের ধর্ম্ম প্রচারকরা প্রায় সবাই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে থাকেন কেবল বৌদ্ধভিক্ষুর সঙ্গে তাদের তফাৎ হচ্ছে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ না করা নিয়ে। বৌদ্ধভিক্ষুরাই কেবলমাত্র ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেন। এখানকার সাধারণ লোকেরা পথিপার্শ্বে সর্ব্বসুবিধাযুক্ত পান্থশালা নির্ম্মাণ করাকে পুণ্য অর্জ্জনের অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। পথশ্রান্ত পথিকদের বিশ্রাম ও আহারাদির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা এইসব পান্থশালায় আছে। নগরের দক্ষিণ দিকে একটা স্তূপ আছে। স্তূপটি বুদ্ধদেবে কর্ত্তৃক রাজা বিদর্ভকে শাক্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সঙ্কল্প থেকে নিবৃত্ত করার ঘটনাটিকে স্মরণ করেই রচিত হয়েছে।

এখান থেকে যাত্রা করে তীর্থযাত্রীরা পশ্চিমে পঞ্চাশ লী অগ্রসর হয়ে তাদওয়া নগরে এসে পৌছলেন। এইখানেই কশ্যপ বুদ্ধ (প্রথম বুদ্ধ) জন্মেছিলেন ও পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছিলেন।

শ্রাবস্তীতে পুনরায় ফিরে এসে তীর্থযাত্রীরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকেন ও প্রায় ১২ যোজন পথ অতিক্রম করলে পর নাপিকা নগরে এসে পৌছন। এখানে ক্রকুচ্ছন্দবুদ্ধ (দ্বিতীয় বুদ্ধ) জন্মেছিলেন। কনকমুনিবুদ্ধ (তৃতীয় বুদ্ধ) যেখানে জন্মেছিলেন সে স্থানটি এখান থেকে মাত্র এক যোজন দূরে অবস্থিত।

এর পর তীর্থযাত্রীরা কপিলাবস্তুর দিকে যাত্রা করেন ও মাত্র এক যোজন পথ অতিক্রম করে কপিলাবস্তুতে এসে পৌছান।

দশম পরিচ্ছেদ

গৌতম বুদ্ধের জীবন-স্মৃতি বিজড়িত এই কপিলাবস্তু নগরী এক সময় বহু লোকের কোলাহলে সব সময় মুখর থাকত, কিন্তু এখন সেই কপিলাবস্তুই একেবারে মূক-বধির হয়ে গেছে, কোনরূপ প্রাণের স্পন্দন নেই বলে মনে হয়। নগরী জনশূন্য বললেই হয়, মাত্র দুই-এক ঘর পরিবার ও কয়েকজন ভিক্ষু এই বিরাট নগরীর ধ্বংসস্তূপ আগলে পড়ে আছেন। এই নগরীতে অসংখ্য স্তূপ আছে, তার মধ্যে সুবোধন প্রাসাদ মায়াদেবীর গর্ভধারণের পূর্ব্বে শাক্যমুনির শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠশোভিত মূর্ত্তিটি যেখানে প্রথম দেখা গিয়েছিল, সেখানে রাজপুত্র (গৌতম) দুঃস্থ লোকদের দেখে তাঁর রথ ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন, সেখানে অসিত যুবরাজের দেহের চিহ্নসমূহ প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন, বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব যেখানে তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, যেখানে শাক্যসম্প্রদায়ভুক্ত পাঁচ শত নরনারী সংসার ত্যাগ করে এসে উপলীকে তাদের শ্রদ্ধা জানান, সেখানে বুদ্ধদেব দেবতাদের মাঝে তাঁর ধর্ম্মব্যাখ্যা প্রচার করেছিলেন যে, নয়া গ্রোধবৃক্ষের তলে বসে বুদ্ধদেব মহাপ্রসেনজিতের কাছ থেকে পোষাকাদি গ্রহণ করেছিলেন সেই সব বিশিষ্ট স্থলের উপর নির্ম্মিত স্তূপসমূহই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজ-উদ্যান লুম্বিনী কপিলাবস্তুর পঞ্চাশ লী পূর্ব্বদিকে। এই উদ্যানেরই পুকুরে স্নান করে রাণী মায়াদেবী যখন উদ্যানের মধ্য দিয়ে আসছিলেন সেই সময় তিনি গাছের ডাল ধরে পূর্ব্বমুখো হয়ে বসে পড়ে একটি সুন্দর রাজপুত্রের (গৌতম) জন্ম দেন। যুবরাজ জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে সপ্তপদ এগিয়ে যান এবং দুই জন দৈত্যরাজা যুবরাজকে স্নান করান। স্থানটিকে ঘিরে একটি কুয়ো গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, এখনও সেই কুয়োর জল খেয়ে ভিক্ষুরা তৃপ্ত হন। বিভিন্ন বুদ্ধের জীবনে চারিটি ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা গেছে এবং সেটা একই স্থানে বার বার ঘটেছে দেখা যায়। ঘটনাগুলি হচ্ছে বুদ্ধত্বলাভ, ধর্ম্মপ্রচার, ধর্ম্মে দীক্ষা দেওয়া এবং মাতাকে ধর্ম্মবাণী পাঠ করে শুনিয়ে ধরিত্রী পৃষ্ঠে পুনঃ পদার্পণ করেন। এ ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি বুদ্ধেরা সময়, কাল, পাত্র হিসাবে নিজেরাই নির্ব্বাচন করে নিয়েছেন দেখা গেছে।

তীর্থযাত্রীরা এর পর লুম্বিনী থেকে রামগ্রাম রাজ্যে এসে পৌছল। এই দেশের রাজা বুদ্ধের পূতাস্থির কিয়দংশ সংগ্রহ করে এই রামগ্রামেই এনে রাখেন ও একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করেন ও স্তূপের নামকরণ করেন রামগ্রাম। এই স্তূপের পার্শ্বেই একটি পুকুর আছে। কথিত আছে, এই পুকুরে পূর্ব্বে একটি নাগদৈত্য বাস করতেন এবং তিনিই এই স্তূপটি দিবারাত্র রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যখন রাজা অশোক বুদ্ধদেবের পূতাস্থির উপর নির্ম্মিত আটটি স্তূপ ভেঙে ফেলে তার জায়গায় চুরাশি হাজার স্তূপ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করেন এবং সেই সঙ্কল্প অনুযায়ী সাতটি স্তূপ ভেঙে এই অষ্টম স্তূপটি ভাঙতে আসেন তখন এই নাগদৈত্যটি অশোককে তাঁর প্রাসাদস্থিত বুদ্ধদেবের পূতাস্থির নিবেদনার্থে রক্ষিত অর্পণপাত্রগুলি দেখান। রাজা অশোক পাত্রগুলি দেখে বুঝতে পারেন যে, পাত্রগুলি মর্ত্তের নয়, বোধ হয় স্বর্গের। এইসব দেখে অশোক আর স্তূপটি না ভেঙে ভগ্নহৃদয়ে এখান থেকে বিদায় নেন। এই ঘটনার পর থেকে এই অঞ্চলটি একেবারে জনশূন্য হয়ে যায়। এমন কি নাগদৈত্যটি পর্য্যন্ত এখান ছেড়ে চলে যায়; কেবলমাত্র একদল হাতীকে এই স্তূপের কাছে আসতে দেখা যায়। তারাই তাদের শুঁড়ে করে জল ও পুষ্পাদি এনে এই স্তূপটির চারিধারে ছড়িয়ে দেয়। কোন এক সময় একজন বিদেশী ভিক্ষু এই স্তূপ পরিদর্শন করতে এসে খুবই বিস্মিত হয়ে যান এবং এখানেই তিনি স্তূপটি দেখাশুনা করার উদ্দেশ্যে থেকে যান। তাঁর এই প্রচেষ্টা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে এদেশের রাজা এখানে একটি বিহার নির্ম্মাণ করে দেন যেখানে আজও অনেক ভিক্ষু বাস করছেন। বিহারের প্রধান কিন্তু এখনও একজন বিদেশী ভিক্ষুই।

এখান থেকে চার যোজন পথ এগিয়ে গেলেই একটি স্তম্ভস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়। স্তূপটি বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণলাভের পর যেখানে তাঁকে দাহ করা হয়েছিল, সেই স্থলের ওপরই রচিত হয়েছিল এরই বার যোজন দূরবর্তী কুশী নগরে।

নদীর তীরে উত্তরমুখো মাথা রেখে বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণলাভ করেছিলেন। এখানেও অনেকগুলি স্তূপ আছে। তার মধ্যে যেখানে বুদ্ধদেব তাঁর জীবনের সর্ব্বশেষ শিষ্য্য সুভদ্রাকে দীক্ষা দেন সেখানে বুদ্ধের দেহ পরিনির্ব্বাণলাভের পর সাত দিন ধরে সর্ব্বজনীন প্রদর্শনার্থে একটি সোনার আধারে রাখা হয়েছিল এবং সেখানে বজ্ররাজ পানি তাঁর স্বর্ণদণ্ড পরিহার করেন। সেই স্থানের ওপর নির্ম্মিত স্তূপটিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তীর্থযাত্রীরা এর পর এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বার যোজন পথ অতিক্রম করে বৈশালী রাজ্যের সীমান্ত নগরে এসে পৌঁছলেন। বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণলাভের জন্য এখান থেকেই যাত্রা করেন। এই যাত্রাপথের সঙ্গী হবার জন্য লীচ্ছবীরা যখন তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ায় তখন কোন উপায়ান্তর না দেখে সেখানে একটি পরিখার সৃষ্টি করেন যাতে করে তারা (লীচ্ছবীরা) সেই পরিখা পার হতে না পারে। বুদ্ধদেব যাত্রাপূর্ব্বে তাঁর ভিক্ষাপাত্রটি লীচ্ছবীদের দান করে যান এবং বলেন যে এই দানকেই যেন তারা তাদের সংসারে ফিরে যাবার জন্য তাঁর (বুদ্ধদেবের) নির্দ্দেশরূপে মেনে নেন। লীচ্ছবীদের তিনি এই ভাবেই তাঁর সহযাত্রী হওয়ার বাসনা থেকে নিরস্ত করেছিলেন। পরে এখানে একটি প্রস্তর স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হয়। এই স্তম্ভগাত্রে উপরোক্ত ঘটনাবলীর বিবরণ খোদিত আছে। এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা বৈশালী নগরের দিকে অগ্রসর হন এবং দশ যোজন পথ অতিক্রম করে বৈশালী নগরে গিয়ে পৌঁছেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

এই বৈশালী নগরেরই উত্তর দিকে বনমধ্যস্থিত একটি দ্বিতল বিহারে বুদ্ধদেব তাঁর শেষ দিনগুলি কাটিয়েছেন এর নিকটবর্ত্তী আরও একটি বিহার আছে সেটি অমাপালী১৯ নাম্নী একটি বেশ্যা বুদ্ধদেবের প্রতি তার শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ নির্ম্মাণ করে দিয়েছিলেন। এর কাছাকাছি একটি স্তূপও আছে যেটি বুদ্ধশিষ্য আনন্দের পূতাস্থির ওপর নির্ম্মাণ করা হয়েছিল।

নগরের দক্ষিণ দিকে একটি বাগান আছে। এটি অম্বপালীই বুদ্ধদেবকে দান করেছিলেন। বুদ্ধদেব পরিনির্ব্বাণলাভ করার জন্য এই নগরী ছেড়ে যখন চলে যান তখন নাকি তিনি উক্তি করেছিলেন যে, "মরজগতে এই নগরীই তাঁর শেষ কর্ম্মস্থল।"

নগরীর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি স্তূপ আছে যার নামকরণ করা হয়েছে "অস্ত্রশস্ত্র নিবৃত্তি স্তূপ"। এই নামকরণের পিছনে পুরাকালের একটি ইতিবৃত্ত আছে। ইতিবৃত্তটি হচ্ছে—কোন এক সময়ে এই দেশের রাজার দুয়োরাণী একবার অসময়ে একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেন। রাজার সুয়োরাণী ঈর্ষাপরবশ হয়ে এই সময় রাজাকে এই অমঙ্গলকর পিণ্ডটি অবিলম্বে বিনষ্ট করে ফেলবার উপদেশ দেন এবং রাজাও তাঁর কথামত সেই মাংসপিণ্ডটি এক বিরাট কাঠের বাক্সের মধ্যে পুরে নদীতে ফেলে দেন। এই রাজ্যে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা একদা নদীতীরে পরিভ্রমণকালে এই কাঠের বাক্সটাকে ভেসে যেতে দেখে কৌতূহলপরবশ হয়ে সেটিকে নদী থেকে তীরে নিয়ে আসেন এবং ডালা খুলে বাক্সের মধ্যে প্রায় এক সহস্র সুন্দর নবজাত জীবন্ত শিশুকে দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ তাদেরকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত পরিচর্য্যা সহকারে মানুষ করতে থাকেন। কালে এই সহস্র শিশুই সহস্র বীর পুরুষে পরিণত হয় ও বিভিন্ন দেশ জয় করে তারা অপরাজের যোদ্ধা হিসাবে চতুর্দ্দিকে খ্যাতিলাভ করে। অবশেষে তারা অজান্তে তাদের পিতার রাজ্য আক্রমণ করতেই উদ্যত হয়। রাজা এই সংবাদ পেয়ে খুবই বিমর্ষিত হন এবং দুয়োরাণী যখন রাজাকে তাঁর এই বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করে সমস্ত ব্যাপারটা অবগত হন তখন তিনি রাজাকে অভয় দেন এবং অনুরোধ করেন যে নগরীর সীমান্তে একটি সু-উচ্চ মণ্ডপ তৈরি করে তাঁকে (দুয়োরাণীকে) যেন সেই মণ্ডপের উপরে উঠিয়ে দেওয়া হয়। তা হলেই সে শত্রুপক্ষদের যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে। রাজাও তাঁর পরামর্শমত সব কিছু করে দুয়োরাণীকে মঞ্চের উপর উঠিয়ে দেন। যখন সেই সহস্রবীর মঞ্চের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছয় তখন দুয়োরাণী তাদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে, "হে আমার পুত্রেরা তোমরা এরূপ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছ কেন?" এর প্রত্যুত্তরে সহস্র কণ্ঠ দাবী করে "প্রমাণ কি যে তুমি আমাদের মা"? দুয়োরাণী তখন বলে, "প্রমাণ আমি দিচ্ছি। তোমরা সবাই হাঁ করে আমার দিকে তাকাও।" তারা সবাই সেইরূপ করলে পর দুয়োরাণী তাঁর

(১৯) অম্বপালী (অম্রপালী? আম্রধারিকা?) অর্থাৎ আমবাগানের পরিচারিকা। বৌদ্ধদের কাছে আমবাগান একটি তীর্থস্থানবিশেষ। অম্বপালী এক রাজনটী ছিলেন। ইনি অনেকবার নরক দর্শন করেছেন। ইনি প্রায় লক্ষবার নারী-ভিখারী হয়ে জন্মেছেন এবং দশ হাজার বার বেশ্যা জীবন যাপন করেছেন। ইনি কশ্যপবুদ্ধের সময় থেকে বরাবর এই মর্ত্যভূমিতে জন্মে এসেছেন। একবার ইনি দেবী হিসাবেও জন্মেছেন, কিন্তু ইনি শেষবারের মতন পৃথিবীতে যখন জন্মান তখন বৈশালীর আম্রবৃক্ষের তলাতেই জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পৃথিবীতে এসে পুনরায় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেন এবং রাজা বিম্বিসারের ঔরসে এর একটি পুত্র সন্তান জন্মায়। শেষপর্য্যন্ত বুদ্ধদেব এর মনকে জয় করে নেন এবং ইনি ভোগ-ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে সাধনের দ্বারা অর্হতের পর্য্যায়ভুক্ত হন।

(Travels of F A-hien p. p. 72)

বুকের কাপড় সরিয়ে তার স্তনযুগল দু-হাতে টিপতেই স্তন থেকে অফুরন্ত দুগ্ধ বেরিয়ে সেই সহস্র মুখে গিয়ে পড়তে থাকে। এই ঘটনার পর বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে যে, সত্য সত্যই তারা তাদের পিতার রাজ্য আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তখন তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র সব মাটীতে নামিয়ে রাখে। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দুই রাজাই প্রত্যেকে বুদ্ধে পরিণত হন। বুদ্ধদেব বুদ্ধত্বলাভের পর এই স্থান পরিদর্শনকালে তাঁর শিষ্যদের জানান যে, "এই স্থানেই আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করেছিলুম।" আসলে এই সহস্র পুত্রই ভদ্রকল্পের সহস্র বুদ্ধ। এই অস্ত্রশস্ত্র নিবৃত্তিস্তূপের পাশে দাঁড়িয়েই বুদ্ধদেব আনন্দকে জানিয়েছিলেন যে, আর তিন মাস পরেই তিনি পরিনির্ব্বাণলাভ করবেন। আনন্দের যদিও ইচ্ছা হয়েছিল বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি আরও বেশী দিন থাকতে পারছেন না কিন্তু রাজা মর২০ তাকে এমন বোঝা করে দিয়েছিল যে তিনি বুদ্ধদেবকে এই প্রশ্নটি করতে সক্ষম হয় নি।

এই স্তূপের পূর্ব্বদিকে আরও একটি স্তূপ আছে। বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণলাভের সহস্র বৎসরকাল অতিবাহিত হবার পর দেখা যায় যে বৈশালী ভিক্ষুদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে দশটি নিয়মাবলী ঠিক ভাবে মেনে চলা হচ্ছে না তাই নিয়মাবলীর সংস্কার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সাত শত জন ভিক্ষু ও অরহত এখানে বসেই বৌদ্ধশাস্ত্র নিয়মাবলীর নতুন করে ব্যাখ্যা করে নিয়মাবলীর পুনঃসংস্কার করেন। এই ঘটনার স্মারক হিসাবেই স্তূপটি রচিত হয়।

এখান থেকে তীর্থযাত্রীরা পূর্ব্বদিকে চার যোজন পথ অতিক্রম করে পঞ্চনদীর সঙ্গমে এসে পৌঁছল। যখন আনন্দ মগধ থেকে পরিনির্ব্বাণলাভ করার উদ্দেশ্যে বৈশালীর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন তখন রাজা অজাতশত্রু দেবতাদের মারফত সংবাদ পেয়ে একদল দেহরক্ষী নিয়ে স্বয়ং এই সঙ্গমে এসে পৌঁছন। অপর দিক থেকে লীচ্ছবীরাও এসে পৌঁছন। আনন্দ কাউকেই অসন্তুষ্ট করতে রাজী নন তাই তিনি নদীমধ্যেই তার সমাধি রচনা করেন এবং তার দেহ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ নিয়ে যান অজাতশত্রু ও অপর ভাগ নিয়ে যান লীচ্ছবীরা এবং উভয় পক্ষই সেই পূতাস্থির উপর ভবিষ্যৎকালে স্তূপ রচনা করেন।

নদী পার হয়ে তীর্থযাত্রীরা দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হয়ে মগধের রাজধানী পাটুলিপুত্রে এসে পৌঁছন। (ক্রমশঃ)

২০। ইনি দৈত্যকুলের প্রধান। ধর্ম্মবিনাশ, ভালবাসা, পাপ ও মৃত্যুর এবং অসৎ কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ ইনি কামধাতু পর্ব্বতের শীর্ষদেশে পারমিতা বশাবর্ত্তিন স্বর্গে ইনি বাস করেন। ইনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকেন। অনেক সময় ভীতি প্রদর্শনার্থে ইনি দৈত্যের মূর্ত্তিতেই দেখা দেন। সময় সময় ইনি সহস্র হস্ত নিয়ে হস্তী চালনা করেছেন এই মূর্ত্তিতেই কল্পিত হন। কথিত আছে বুদ্ধদেব নাকি বলেছিলেন যে আনন্দ যদি তাকে তিন বার এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করত তাহলে তিনি তার পরিনির্ব্বাণ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতেন। (Travels of FA-hien by Legge, pp. 74)

হিন্দুদের যমরাজার সঙ্গে বৌদ্ধদের মররাজার অনেকখানি মিল রয়েছে বলেই মনে হয়, তবে সবটা নয় কারণ অনেক ক্ষেত্রে যমরাজাকে ধর্ম্মরাজরূপেও অভিহিত করা হয়েছে।—অনুবাদক

জগৎ-পারাবারের তীরে

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ বড় গরম। আমরা সবাই মিলে গঙ্গায় স্নান করতে যাব। গঙ্গায় আমাদের স্নান করতে যেতে দেওয়া হয় না, কারণ ডুবে যাওয়ার ভয় আছে। আমরা কিন্তু এমন একটা জায়গা জানি যেখানে জল খুব কম। নিকটে একটা চামড়ার কারখানা আছে। কি বোঁটকা গন্ধ আসে বাপরে বাপ! সেখানে আমরা বেশ জলের ভিতর দাঁড়াতে পারি। কেশব খুব বেঁটে, কিন্তু সেও বেশ দাঁড়াতে পারে। কেশব খুব জ্ঞানী। তরুণ সাতার কাটতে জানে। আমরা সবাই আমার কুকুর বাঘার গলা ধরে সাতার কাটি। কেশবও বাঘার গলা ধরে নেয়। জলে তার খুব ভয়। ডুবে গেলে বাড়ী গিয়ে মার খাবে; তার বাবা তাকে বলেছেন। তার বাবার মুখে বেশ কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো দাড়ি। তা ছাড়া তিনি আমাদের মুদী, তাঁর চোখের নীচে কালো কালো দাগ। কেশবের বাবাকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তিনি সব-সময় আমার মাথায় চাপড় মেরে আদর করেন, আমার চুলে মাখা-তামাকের গন্ধ লেগে যায়; স্নান করার পরও আমাকে আবার মাথা ধুয়ে ফেলতে হয়। কিন্তু কেশবকে আমার খুব ভাল লাগে, সে খুব জ্ঞানী। কেমন করে সে এত জানে তা বলতে পারি না, কিন্তু সে খুব জ্ঞানী। স্কুলের ছুটির পর আমরা মার্বেল খেলি। আমরা সবাই মার্বেল হারাই। কেশব কখনও মার্বেল খেলে না, তার বাবা তাকে বারণ করেছেন। কিন্তু আমরা ভাল মার্বেল তার কাছ থেকে কিনি। তরুণ বলে—কেশবরা নাকি বৈষ্ণব, তার বাবা তাকে বলেছেন। তরুণকে আমার ভাল লাগে, কিন্তু সে একটা মিথ্যেবাদী। সেদিন সে আমাকে বলেছিল প্রত্যেক বড় বাড়ীর দেওয়ালের মধ্যে একজন মিস্ত্রীর মৃতদেহ লুকিয়ে আছে। আমি এটা কিছুতেই বিশ্বাস করি না, এটা শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। তরুণের বাপ একজন ঠিকাদার, তিনি অন্যের জন্য বাড়ী তৈয়ারি করেন। তিনি তাকে একথা বলেছেন।

তরুণ নিশ্চয়ই একটা মিথ্যাবাদী। গঙ্গাস্নানের পর আমরা সবাই পাড়ে উঠে এলাম। রোদে আমাদের কাপড় মেলে দিয়ে ঘাসের উপর বসলাম গায়ের জল শুকিয়ে নেবার জন্যে যাতে কেউ বলতে না পারে আমরা গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিলাম। বাঘা এসে আমাদের কাপড়ের উপর বসে কাপড় ভিজিয়ে দিল। আমরা ঢিল মেরে বাঘাকে তাড়িয়ে দিলাম, যদিও কিছু আগে তার গলা ধরে আমরা সাতার কেটেছি। তরুণ কয়েকটা কচি ঘাস মুখে নিয়ে চিবোতে লাগল। সে বললে, কাল সে সন্ধ্যাবেলায় [illegible] হতে দেখেছে।

"তুমি একটা মিথ্যাবাদী", আমি তরুণকে বললাম। কেশব কোন কথাই বলল না, সে শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। সে খুব জ্ঞানী কি না, তাই সে মুচকি হাসে। আমি দেখতে পেলাম সেও বুঝে নিয়েছে তরুণ একটা পুঁচকে মিথ্যাবাদী।

"আমি মিথ্যে বলছি না। কাল আমি গঙ্গার ধারে এসে-ছিলাম; আকাশে দেখলাম একটা বড় বালিসের মত একখণ্ড সাদা মেঘ। তার থেকে ভগবান উড়ে এলেন, গঙ্গার জলের ভিতর পা রাখলেন ও আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন; তার পর আবার উড়ে চলে গেলেন মেঘের মধ্যে।"

আমরা সবাই আকাশের দিকে তাকালাম। কিন্তু কৈ? আকাশে বালিসের মত মেঘ ত দেখতে পেলাম না, শুধু কাশফুলের মত থোকা থোকা সাদা মেঘ। আমি ঠিকই জানতাম তরুণ একটা মিথ্যেবাদী। ভগবান কখনও এ রকম মেঘ থেকে উড়ে আসতে পারেন?

•

তবুও আমার হিংসা হচ্ছিল। আর দু'বৎসর পরে আমি দশ বৎসরে পড়ব এখনও আমি ভগবান দেখতে পেলাম না! মনে মনে ভাবলাম, হয়ত কেশবের ভাগ্য আমার চেয়ে ভাল। তাই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেশব তুমি কি ভগবান দেখেছ?" মনে হ'ল, সে যেন ভয় পেয়ে গেল। সে বললে যে, সে ভগবান সম্বন্ধে কোন কথাই বলবে না, তার বাবা তাকে বারণ করে দিয়েছেন। তার পর আমি তরুণের দিকে ফিরলাম, তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তরুণ, আমি জানি তুমি একটা মিথ্যেবাদী। আমার চোখের দিকে তাকাও, সত্যি করে বলত তুমি ভগবান দেখেছ কি না?" তরুণ চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। সে এখন পাশ ফিরে উপুড় হয়ে শু'ল ও আমার দিকে তাকাল। তরুণ বাস্তবিকই খুব সুন্দর। তার মুখের রং খুব ফর্সা, মাথায় গোছা গোছা কোঁকড়ান চুল, তার চোখ দুটি ঠিক সেই বড় লজেন্সের মত যেটা আমরা মুখের ভিতর চুষতে চুষতে আবার বের করে হাতে নিয়ে দেখি কতটা কমলো। মা যেমন করে আমার চোখের দিকে তাকান আমি ঠিক তেমনি করে তার চোখের দিকে চাইতে পারলাম না। তার চোখ দুটি যেন ঠিক তার কপালের উপর নেই, সে দুটি যেন নীল আকাশের গায়ে দুই খণ্ড সাদা মেঘের মত ভাসছে। আমি শুধু বললাম, "তরুণ আমার বিশ্বাস তুমি একটা মিথ্যেবাদী।" কিন্তু আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। তার পর আমরা সবাই, আমি, কেশব, তরুণ ও বাঘা বাড়ীর দিকে চললাম। পথে আর একটা কথাও হ'ল না।

আজ রবিবার। বাবার আপিস ছুটি। আজ আমি বাবার

সঙ্গে খাই। বাবা রবিবারে আগে খান। তাঁর নিজের বাটি থেকে বেছে বেছে মেটে তুলে আমার পাতে দিয়ে দেন, মেটে খেতে আমি খুব ভালবাসি কিনা। আমি মেটের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু বাবা আজ ভুলে গেলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঐ রকম ভুলে যান। আমি বললাম, "বাবা"—কারণ আমাকে 'বাবু' বলে ডাকতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমার চেয়ে ছোট ছেলেরা বাবাকে 'বাবু' বলে। আমি বললাম, "বাবা, তরুণ আমাকে বলছিল সে সন্ধ্যাবেলায় ভগবানকে দেখেছে—তুমি কি মনে কর এটা সত্যি?" বাবা মেটে খাওয়া শেষ করে বললেন, "তুই একটা গাধা।" আমি দুঃখিত হলাম। মা বাবাকে বললেন, "ছেলেপিলেদের কড়া কথা বলা উচিত নয়।" তার পর বাবা বললেন যে, মা আমাকে নষ্ট করছেন। তার পর তাঁরা দুইজনে ঝগড়া করতে আরম্ভ করলেন। আমি খাওয়া শেষ করলাম। মাকে আমি খুব ভালবাসি। সব ছেলেরাই তাদের মাকে ভালবাসে, কিন্তু তারা বাবাকে শ্রদ্ধা করে। আমার মা খুবই সুন্দরী। তাঁর মাথায় লম্বা লম্বা চুল, চোখ দুটি খুব বড় বড়, শরীর নরম ও মোটাসোটা।

কিন্তু আমার মন তখনও জানতে চাইছিল—তরুণ ঠিক ভগবান দেখেছে কি না। বাবা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, তুমি কি মনে কর তরুণ বাস্তবিকই ভগবান দেখেছিল?" মাকে খুব ক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। এইমাত্র তিনি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "তুই এত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে পারিস! আমি কি সব জানি?" তার পর তিনিও বাবার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

মা খুব সুন্দরী ও বেশ মোটাসোটা, কিন্তু তিনি আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব দেন না। আমি আমাদের বাড়ীর ঝি চপলাকে জিজ্ঞাসা করব। সে মার চেয়েও মোটা, কিন্তু মার মত সুন্দরী নয়। সে আমাকে বলেছে ছেলেপিলে কোথা থেকে আসে। সে নিশ্চয়ই জানে তরুণ মিথ্যেবাদীটা ভগবান দেখেছে কি না।

স্কুলে আজ আমি তরুণের সঙ্গে একটি কথাও বলি নি কারণ আমি এখনও ঠিক করতে পারি নি যে, সে মিথ্যাবাদী কি না। আজ খুব সুন্দর দিন। কয়েকদিন মেঘলা করার পর আজ আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। সূর্য্যের আলো জানালা দিয়ে ঢুকে আমাদের ক্লাসের বেঞ্চগুলিকে ধুয়ে দিয়ে গেল। আমাদের হাসতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু হাসবার উপায় নেই কারণ যদু মাষ্টারমশাই বেত হাতে করে বসে আছেন। তিনি অনেক গম্ভীর কথা বলে যাচ্ছিলেন। কেশব কতকগুলি পুরানো ডাকটিকিট এনেছিল। আমরা সকলেই ডাকটিকিট সংগ্রহ করি। কারণ কেশব বলে, পৃথিবীর মানচিত্র শেখবার এ একটা ভাল উপায়। রঘু ঠিক আমার পেছনের বেঞ্চে বসে। সে আমাদের খোপানীর ছেলে, জাতিতে মুসলমান। সে কেশবকে দুই চোখে দেখতে পারে না। যদু মাষ্টারমশাই বলেন, রঘু বড় বোকা। কিন্তু আমরা সকলেই রঘুকে খুব ভয় করি কারণ সে খুব জোয়ান, কথায় কথায় আমাদের গালে চড় লাগিয়ে দেয়। সে বলে, সাহেবরা পরস্পরের গালে কষে চড় লাগায় বলে তারা এত জোয়ান। কেশবের কাছে অনেক বিলাতী ডাকটিকিট আছে। তার এক কাকা সাহেবদের কোম্পানীতে কাজ করেন। তাঁর কাছ থেকে সে টিকিট পায়। সে-আপিসের সাহেবরা গালে চড় বসায় না। তারা শুধু অঙ্কের লেখা বই ছেপে বিক্রী করে—তার কাকা তাকে বলেছেন। রঘু যখন কেশবের গালে চড় বসিয়ে দিল কেশব শুধু হেসে বললে, "তোমার পাদ্রীসাহেব ও যীশুখ্রীষ্ট কি তোমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন?" রঘু রেগে কেশবের গালে লাগায় আর এক চড়। এতে আমরা সকলেই খুব উত্তেজিত হয়ে উঠি। এমন সময় যদু মাষ্টারমশাই ক্লাসে ঢুকে রঘুকে খুব বেত লাগান। তিনি আমাদের বলেন, আমরা সকলে ভারতবাসী। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে আমাদের সকলকে ভালবাসা উচিত। আমাদের মধ্যে একতা না থাকলে আমরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ব আর আমাদের শত্রুরা সহজেই আমাদের দেশ জয় করে আমাদের স্বাধীনতা হরণ করবে। দরকার হলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে। তার পর তিনি একজন বড় কবির কবিতা পড়ে শোনালেন। কবি লিখেছেন, ভগবানের মুকুট হচ্ছে পৃথিবী, সেই মুকুটের মণি আমাদের ভারতবর্ষ। যদু মাষ্টারমশাই আমাদের কবিতাটি মুখস্থ করতে বলেন।

তার পর যখন আমরা জাতীয়সঙ্গীত গান করি তখন দেওয়ালে টাঙানো রাষ্ট্রপতির ছবির দিকে আমাদের চোখ রাখি। কালো লম্বা কোট গায়ে, মুখে পাকা গোঁফ রাষ্ট্রপতি দেওয়াল থেকে আমাদের গান শোনেন। যদু মাষ্টারমশাই বলেন, রাষ্ট্রপতি এখন বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু তিনি যখন স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন তখন তিনি যুবক ছিলেন।

আমরা কবিতাটি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ করতে থাকি। কিন্তু মুখস্থ করা খুবই শক্ত। কারণ কবিতার লাইনগুলি সব একই ভাবে শেষ হয়েছে। রঘু পায়খানায় যাবার অনুমতি চেয়ে বসল। যখনই কিছু মুখস্থ করবার কথা হয় সে এই ফন্দি করে। কেশব উঠে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ত বলেছেন পৃথিবী একটা বলের মত গোল, তা হলে পৃথিবী কি করে ভগবানের মুকুট হতে পারে?" কেশব বাস্তবিকই খুব জ্ঞানী। আমরা ত কবিতা পড়তে পড়তে ভুলেই গিয়েছিলাম যদু মাষ্টারমশাই একদিন বলেছেন, পৃথিবী গোলাকার। আমরা সকলেই মাষ্টারমশাইয়ের মুখের দিকে তাকালাম। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম তিনি জবাব দিতে পাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি খুবই চেষ্টা করছিলেন। তিনি বললেন, কবিরা অনেক সময় এমন সব কথা বলেন যা সত্যি নয়। কিন্তু আমরা সকলেই বুঝলাম, কেশব আজ যদু মাষ্টারমশাইকে হারিয়ে

দিয়েছে। বোধ হয় যদু মাষ্টার মশাই ঠিকই বলেছেন, বোধ হয় তরুণ মিথ্যেবাদী নয়, সে শুধু একজন বড় কবি।

দিদিমা আজ শহর থেকে এসেছেন। দিদিমা মার চেয়ে অনেক বড়। এটা খুবই স্বাভাবিক। দিদিমা বেঁটে। তিনি অনবরত তাঁর আঙুল দিয়ে ঠোঁট মোছেন, তাঁর দাঁতগুলি খারাপ কিনা। তাঁকে আজ খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল কারণ বলাইমামাও তাঁর সঙ্গে এসেছেন। বলাইমামা তাঁর ছেলে। তিনি খুব অসুস্থ। তাঁর যে কি হয়েছে ঠিক বলতে পারি না, লোকে বলে তিনি পাগল। বলাইমামাকে কিন্তু আমার খুব পছন্দ, তিনি বেশ মজার লোক। খাবার সময় তিনি নিজের মুখ খুঁজে পান না। বাটিটা ধরে কখনও থুতনীতে ঠেকান, কখনও জামার কলার ফাঁক করে সমস্ত ঝোলটা ভিতরে ঢেলে দেন। এটা খুব মজার নয় কি? কিন্তু দিদিমা এতে খুবই দুঃখ পান। আমি হেসে উঠলে পা দিয়ে আমাকে ঠোক্কর মারেন। বলাইমামা শহরে কাজ করতেন। ঠিক তা নয়, যখন থেকে তিনি জামার ভিতর ঝোল ঢালতে আরম্ভ করেন তার আগে। এখন তিনি দিদিমার সঙ্গে থাকেন। তিনি তাঁর মা কিনা। বলাইমামা খুব বড় ও খুব গম্ভীর, কিন্তু তিনি আমার সঙ্গে খেলতে খুব ভালবাসেন। আমরা বাগানে গিয়ে খেলা করি, মাটি দিয়ে বাড়ী তৈরী করি। দিদিমা ও মা আমগাছের তলায় বসে আমাদের খেলা দেখেন। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তাঁরা নাক ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন। কেন যে তাঁরা কাঁদেন ঠিক বুঝতে পারি না। কেন? বলাইমামা ত আমার চেয়ে অনেক ভাল বাড়ী তৈরী করতে পারেন। তার পর তাঁরা বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। আমিও তাঁদের পেছন পেছন গেলাম হাত-পা ধোবার জন্যে। শুনলাম তাঁরা বলছেন—আমি কিন্তু শুনতে চাইনি, তবুও আমি শুনলাম। তাঁরা আমাকে লক্ষ্য করেন নি। মা বললেন, বলাইমামা একদিন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠতে পারেন। কাজেই তাঁকে এমন এক জায়গায় পাঠানো উচিত যেখানে দুর্দ্দান্ত হলে কারও কোন ভয় নেই। দিদিমা শুধু কাঁদছিলেন আর মামীকে গাল দিচ্ছিলেন। বলাইমামার দুই বউ—আর দুইজনই বলাইমামাকে খুব ভালবাসত। এটা তাঁর পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হয়েছিল। তার পর আমি রান্নাঘরে গেলাম, শুনলাম—চপলা-ঝি ঠাকুরকে বলছে। বলাইমামার মাথার মধ্যে জল জমেছে। তারা যখন আমাকে দেখল আর কোন কথাই বলল না।

কাজেই আমি আবার বলাইমামার কাছে ফিরে গেলাম। তিনি তখনও মাটি দিয়ে বাড়ী তৈরী করছিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম ও তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। তাঁর চোখ দুটি নীল ও ভাসা-ভাসা। আমার মনে হ'ল, তিনি হয়ত জানতে পারেন তরুণ ভগবানকে দেখেছিল কিনা। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি শুধু বললেন, "আয়, পাকা পাকা আম।" তারপর তিনি হাসলেন। তার পর তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর মাথার চুল একেবারে সাদা। তিনি বললেন, "চল, আমরা শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যাই। আমি সেখানে অঞ্জলি দেব।" আমি তাঁর হাত ধরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে এলাম, মাকে বললাম, "মা, বলাইমামা মন্দিরে যেতে চান।" মা ভয় পেয়ে গেলেন, কিন্তু দিদিমা আমাদের যাবার অনুমতি দিলেন। আমি বলাইমামার হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। শ্যামসুন্দরের মন্দিরে যখন এলাম তখন বেলা তিনটে। এমন সময় ভগবানের বাড়ীতে থাকার কথা নয়। মন্দিরের ভিতরটা অন্ধকার ও ঠাণ্ডা। রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির পাশে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। বলাইমামা আমার হাত শক্ত করে ধরে ছিলেন বলে আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি মন্দিরে কখনও যাই না, কারণ বাবা বলেন তিনি পুরুতদের সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন। আর ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন তবে তিনিও এই পুরুতদের ঘৃণা করেন। কিন্তু মন্দিরের ভিতর ফুল, চন্দন ও ধূপের গন্ধ খুব সুন্দর,—গঙ্গার যে জায়গাটায় আমরা স্নান করি সে জায়গাটার মত নয়। কারখানা থেকে চামড়ার যে বোঁটকা গন্ধ ছাড়ে! মন্দিরের ভিতরটা ছিল একেবারেই নিস্তব্ধ, আমি আর বলাইমামা ছাড়া আর কেউ সেখানে ছিল না। আমরা ঠিক মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বলাইমামা হাত জোড় করে হাঁটু-গেড়ে বসলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি চীৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ আমি মাকে বলতে শুনেছিলাম, বলাইমামা দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই শান্ত হলেন ও আমার হাতে টোকা মেরে বললেন যে, আমি তাঁকে মন্দিরে এনে ভাল কাজ করেছি। তিনি যেসব কথা বললেন তার কোনটাই ত খারাপ কথা নয়। আমি বলাইমামাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন তবে লোকে তাঁকে পাগল বলে। শুনে তিনি হেসে উঠলেন, এত জোরে হেসে উঠলেন যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কিছু আগে যেমন চীৎকার করে কাঁদছিলেন তেমনি চীৎকার করে হাসতে লাগলেন। কিন্তু পরে তিনি আবার শান্ত হয়ে গেলেন। আমরা মন্দিরের বাইরে চলে এলাম। বলাইমামা আমাকে কিছু খাবার জিনিষ কিনে দিতে চাইলেন। আমি তাঁকে আমাদের মুদীর দোকানে নিয়ে এলাম। এক বাক্স লজেন্স আমি পছন্দ করলাম। কেশবের বাবা চোখ বড় করে এক বাক্স লজেন্স বের করে দিলেন। তিনি আজ আমার মাথায় চাপড় মারতে ভুলে গেলেন বলে আমি বেঁচে গেলাম। বলাই মামা লজেন্সের দাম দিতেই ভুলে গেলেন। আমরা মা ও দিদিমার কাছে ফিরে এলাম।

পরদিন বলাইমামা ও দিদিমা ষ্টেশনে রওনা হলেন। আমরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। দিদিমা এত বেঁটে আর বলাইমামা এত লম্বা যে, দিদিমা যখন বলাইমামার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন আমার খুব হাসি পাচ্ছিল। আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বলাইমামার মুখখানি ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। তাঁর জন্যে

আমার মনেও দুঃখ হচ্ছিল। বলাইমামার মাথার মধ্যে জল ছাড়া আর কোন ভাল জিনিষ থাকলে বেশ হ'ত।

…আজ আমরা আবার গঙ্গায় স্নান করতে গেলাম ঠিক সেই জায়গাটায় যেখানে দুর্গন্ধ আসে। কিন্তু জায়গাটা নিরাপদ। আমি ডুব দিই নি। কানের ভিতর দিয়ে জল ঢুকে যদি বলাই-মামার মত মাথায় চলে যায়? তরুণের সঙ্গে আবার আমার ভাব হয়ে গেল। কেশবকে আমার ভাল লাগে। সে খুব জ্ঞানী। আমরা খুব দেরী করে গিয়েছিলাম বলে উলঙ্গ হয়ে স্নান করছিলাম, কিন্তু কেশব কাপড় পরেই স্নান করল। তার বাবা তাকে বলে দিয়েছেন। কেশবের হাত-পাগুলি সরু সরু। কিন্তু তরুণ তার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর। সে যখন উপুড় হয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার গায়ের উপর এসে পড়ল তখন আমি তাকে বললাম যে, এটা আমি মোটেই পছন্দ করি না। কারণ চপলা-ঝি আমাকে বলেছে, শুধু মেয়েদেরই ভালবাসতে হয়। তরুণ যখন সাঁতার কাটতে কাটতে আবার সরে গেল জলের উপর তার পিছন দিকটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু এটা বড় কুৎসিত। আমাদের শরীরের নীচের দিকটা আলগা করতে মা আমাকে নিষেধ করেছেন। আমরা যখন একা থাকি তখন আর ডাক্তার যখন বলবে তখন আমরা উলঙ্গ হতে পারি। কিন্তু অন্য সময় কখনই নয়। আমি তরুণকে একথা বলতে সে হাসল। সে আবার মিছে কথা বলতে সুরু করল। সে যখন কবিত্ব করে না তখন শুধু মিছে কথাই বলে যায়। সে বললে শিশুরা শ্বেতপাথর আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরী। তারা সর্ব্বত্রই সুন্দর। তারা যদি তাদের নিম্নাঙ্গ না ঢাকত তা হ'লে ত তারা তাদের বাপ-মার কাছে আরও বেশী সুন্দর হয়ে যেত। আমি তরুণকে বললাম, সে একটা মিথ্যেবাদী। মায়েরা ছেলেদের তৈরী করে। সেদিন রঘু তার নাড়ীটা আমাকে দেখিয়ে গিয়েছিল—যে নাড়ীটা নিয়ে সে জন্মেছিল। সেটা সে কাগজে জড়ান অবস্থায় একটা হাঁড়ির মধ্যে পেয়েছিল। কি বিশ্রী দেখতে! কেশব বললে, আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামান উচিত নয়। আমাদের শুধু পৃথিবীর মানচিত্র শেখবার জন্যে শান্তিতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করা উচিত। তার বাবা তাকে বলেছেন।

তথাপি আমি তরুণকে মিথ্যেবাদী বললাম। কারণ আমি দেখেছি বাঘা কেমন করে ভেলীর পেটে বাচ্চা তৈরী করে। চপলা আমাকে বলেছে বাবারাও ঠিক ঐরকম। তরুণ উত্তর করল না। সে শুধু ঘাসের ফুল শুঁকতে লাগল। সে বললে আমরা কি জানি আর না জানি তাতে তার কিছুই এসে যায় না। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে—শ্বেতপাথর আর গোলাপের পাপড়ি দিয়ে শিশুরা তৈরী হচ্ছে। এখন আমি বুঝতে পারলাম তরুণ কত বড় মিথ্যেবাদী। আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম—বলাইমামা ফিরে এসেছেন। আমি আমার ছুরিটা দিয়ে তাঁর মাথায় একটা ছ্যাঁদা করে দিলাম আর এত জল বেরুতে লাগল যে, আমাদের বন্ধু মাষ্টারমশাই সেই প্লাবনে ডুবে গেলেন। কিন্তু সকালে উঠে দেখি সব মিছে; বলাই মামা আসেন নি আর বন্ধু মাষ্টারমশাই ক্লাশে রীতিমত ইতিহাস পড়াচ্ছেন। আমি কেশবকে আমার পক্ষ অবলম্বন করতে বললাম; কিন্তু সে খুব জ্ঞানী কিনা। তাই সে শুধু শান্তিতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করবার পক্ষপাতী।

তরুণ তখনও ঘাসের ফুল শুঁকছিল। আমি জানি ঘাসের ফুলের কোন গন্ধ নেই। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তরুণ, বলতে পার আকাশের তারাগুলি কি?" সে বললে, সে পারে, কিন্তু কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি জান চাঁদ কি?" তরুণ উত্তর করল, "একটি পাংশুবর্ণের মহিলা হারানো পৃথিবী খুঁজে বেড়াচ্ছে।" শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমার মনে হ'ল বলাইমামার মত স্নান করবার সময় জল তার কানের ভিতর দিয়ে মাথায় ঢুকে গেছে। আমিও মাঝে মাঝে অন্ধকারে ভূত দেখি, কিন্তু ভূত বাস্তবিক অন্ধকারে থাকে না। মা আমাকে বলেছেন। আমি তরুণকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, বল ত সূর্য্য কি?" তরুণ তার চোখ আকাশের দিকে তুলে বললে, "সূর্য্য একটা ক্রুদ্ধ অগ্নি-শিখা পৃথিবীকে পুড়িয়ে খাক্ করে দিতে চায়। তাই পৃথিবী তার ভয়ে পালাচ্ছে।" তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমি ও কেশব দু'জনেই ভয় পেয়ে গেলাম। কেশব বললে, তরুণকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তরুণ নিশ্চয়ই একজন দৈবজ্ঞ। দৈবজ্ঞেরা যখন নীরব থাকেন তখনই আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। তার বাবা তাকে বলেছেন। তার পর আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলাম, পথে আর একটা কথাও হ'ল না।

…আজ চপলা রান্নাঘরে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা বোতল থেকে মদ ঢেলে খাচ্ছিল, মতি গোয়ালাকেও কিছুটা দিচ্ছিল। মতি আমাদের বাড়ীতে দুধ যোগান দেয় ও চপলার সঙ্গে গল্প করে। আমি মাকে কিছুতেই বলে দেব না। কারণ চপলা আমার সব প্রশ্নেরই জবাব দেয়। মা খুব সুন্দরী, কিন্তু তিনি আমার কোন প্রশ্নেরই জবাব দেন না। বাবা সব সময়েই রেগে যান। মতির মুখে কি বিশ্রী গন্ধ, ঠিক গরুর চোনার মত। মতি গরুর পরিচর্য্যা করে কিনা! মতি চপলাকে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু চপলা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললে, "ছেলেটার সামনে তোমার লজ্জা করে না?" হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে, আজ লীলার জন্ম-দিন, সে আমাকে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিল। কিন্তু মাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। আমি চপলাকে বললাম, জানলা দিয়ে আমাকে পাশের বাগানটায় গলিয়ে দিতে। বাগানে নেমে পড়ে লীলার পছন্দসই বড় বড় সাদা ও লাল গোলাপ তুলে নিলাম, একটা তোড়া তৈরী করে লীলার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। আমি লীলাকে ভালবাসতাম। বড় হলে আমি তাকে নিশ্চয়ই বিয়ে করব যদি সে সে-পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে। সে এখনই বেশ বড়সড়। সে চুলে গন্ধতেল মাখে। সে বড়লোকের মেয়ে, বড় বাড়ীতে থাকে। অনেক যুবক এসে তার সঙ্গে চা খায় ও তার

গান শোনে। লীলা তখন হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান করছিল। আমাকে দেখে সে হাত ধরে নিয়ে পাশে বসাল। যে মোটাসোটা লোকটা লীলাকে গান শেখাত, সে আমার গালে চিমটি কেটে দিল। আমি তাকে বললাম যে, আমি এটা পছন্দ করি না। মনে মনে ভাবলাম লোকটা কি বোকা। লীলা সেদিন কচি কলাপাতা রঙের একটা সুন্দর সাড়ী পরেছিল! সে যখন গান করছিল তখন তাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল। গান শেষ হলে লীলা আমাকে বললে, "চল আমরা বাগানে ঘুরে আসি।" বাগানে গিয়ে আমরা একটা আতাগাছের নিচে বসলাম। লীলার চোখ ছিল আকাশে চাঁদের দিকে। সে আমাকে বললে, "দেখেছ, কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে?" আমি বললাম, "হাঁ, ও একটা পাংশুবর্ণের মহিলা হারানো জগৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে।" বলে আমি লজ্জিত হলাম, কারণ এ কথাটা বাস্তবিক সেই মিথ্যেবাদী তরুণটা একদিন বলেছিল। লীলি আমার গালে চুমু খেয়ে বললে, কথাটা সত্যি বড় সুন্দর! সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল এইরকম আর কোন সুন্দর কথা আমি জানি কিনা। আমি তাকে বললাম, "সূর্য্য একটা ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখা—পৃথিবীকে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায়। তাই পৃথিবী তার ভয়ে পালাচ্ছে।" কথাটা বলেই আমি আবার লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। এটাও ত সেই তরুণ মিথ্যেবাদীটার কথা। লীলা আবার আমার গালে চুমু খেয়ে বলল, "ছোট ছেলেরা ত বেশ কবিত্বপূর্ণ কথা বলতে পারে।" তার পর আমরা উঠলাম। লীলা তার বাড়ীতে গেল। আমি তার সঙ্গে গেলাম না। কারণ সেই মোটা লোকটিকে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি বাড়ী ফিরে এলাম। এসে দেখি বাবা রান্নাঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আমি যদি আর কখনও রাত্রিতে না বলে বাড়ীর বার হই তা হলে তিনি আমার হাড় ভেঙ্গে দেবেন।" বলে তিনি আমার হাড় ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হয়েছেন এমন সময় মা এসে পড়লেন। মা বললেন, "ছেলেপিলেদের এ রকম কড়া কথা কেন বল?" তার পর তাঁরা ঝগড়া করতে আরম্ভ করলেন। এই অবসরে আমি ছুটে আমার ঘরে চলে এলাম। আমাকে যে মারে তাকে আমি দস্তুরমত ঘৃণা করি। আমার গায়ে যে হাত তুলতে সাহস করবে তাকে আমি খুন করে ফেলব; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বাবাদের ত খুন করা যায় না! মা আমাকে বলেছেন। আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। রাত্রে লীলাকে স্বপ্ন দেখলাম। কিন্তু সকালে উঠে দেখি সব মিছে। স্বপ্নের একটি কথাও আমার মনে নেই।

…রঘু আজ স্কুলে আসতে দেরী করেছে, কারণ তার একটি ভাই হয়েছে। এটা বড় আশ্চর্য্য। কারণ, রঘুর ত বাবা নেই। আমরা কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম না। কারণ যদু মাষ্টারমশাই তখন আমাদের ইতিহাসের কথা বলছিলেন। তিনি বলছিলেন, হাজার হাজার বছর আগে আমরা এদেশে ছিলাম না, অন্য জায়গায় বাস করতাম। আমরা প্রথমে কাসপিয়ান সাগরের তীরে ছিলাম। কিন্তু বংশবৃদ্ধি হওয়াতে আমাদের অন্য জায়গা খুঁজতে হ'ল। কাজেই আমরা ভারতবর্ষে এসে পড়লাম। এখানে অবিশ্যি অন্য জাতি বাস করত। আমরা তাদের যুদ্ধ করে হারিয়ে দিয়েছিলাম। দেবতারা আমাদের সহায় ছিল কাজেই আমরা কোন যুদ্ধেই হারি নি। আমাদের প্রাচীন ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময়। আমরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিলাম, কিন্তু আমাদের শত্রু অনেক বেশী ছিল। শক, হুণ, গ্রীক, পাঠান, মোগল, ইংরেজ এদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে।

আমরা সকলে বেশ গর্ব্ব অনুভব করছিলাম এমন সময় কেশব উঠে জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের এত শত্রু কেন?" যদু মাষ্টারমশাই অনেক জানেন। তাঁর কপালের উপর একটা বড় আঁচিল। কেশবও কম জ্ঞানী নয়। যদু মাষ্টারমশাই একটু চিন্তা করলেন ও পরে বললেন, পৃথিবীটা হচ্ছে ভগবানের মুকুট এবং সেই মুকুটের মণি হচ্ছে ভারতবর্ষ। কাজেই অন্য জাতিরা সবসময়ই আমাদের হিংসা করত।

তার পর আমরা সকলে দাঁড়িয়ে জাতীয়সঙ্গীত গান করলাম। দেওয়াল থেকে রাষ্ট্রপতি আমাদের গান শুনলেন। তার পর টিফিনের ঘণ্টা পড়তে যদু মাষ্টারমশাই ক্লাস থেকে চলে গেলেন।

আমরা সকলেই রঘুকে ঘিরে ধরলাম। সে অত্যন্ত মনমরা হয়ে গিয়েছিল। এখন তার মা এক মাস কাপড় কাচতে পারবে না। তার বাপ নেই। তারা এত গরীব যে না খেয়েই মারা যাবে। রঘু বলল, সে কোন ভাই চায় নি। কিন্তু মতি গোয়ালাই এই কাজ করেছে। সে একটা বন্দুক কিনে তাকে গুলি করে মারবে। তরুণ আমার জামার আস্তিন ধরে টেনে নিয়ে কানে কানে ফিস ফিস করে বললে, এখন রঘুর জন্য আমাদের চাঁদা তোলা উচিত। কারণ সে বড় গরীব। তখনই আমরা আমাদের জলখাবারের পয়সা থেকে চাঁদা দিতে রাজী হয়ে গেলাম এবং পরদিন বাড়ী গিয়ে আমাদের বাপ-মার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে আনব ঠিক করলাম। রঘু যদু মাষ্টারমশাইয়ের ঘরে গেল ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। যদু মাষ্টারমশাই তাকে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন। আমরা সকলেই যদু মাষ্টারের উপর ভয়ঙ্কর চটে গেলাম। তাঁকে 'কালো চিল' বলে ডাকতে আরম্ভ করলাম। টিফিনের পর যদু মাষ্টারমশাই আবার আমাদের ক্লাসে ইতিহাস পড়াতে এলেন। আমরা সকলে সার দিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। কেশব আমাদের সকলের আগে ছিল। সে আমাদের হয়ে বললে, রঘুকে স্কুলে আসতে দিতে হবে। কারণ সে ত কোন দোষ করেনি। সে ত মতি গোয়ালাকে এ কাজ করতে বলেনি। শুনে যদু মাষ্টারমশাই অত্যন্ত চটে গেলেন, কেশবকে তার জায়গায় গিয়ে বসতে বললেন। তিনি আমাদের সকলকে বললেন যে, আমাদের এসব বিষয় জানা উচিত নয়। রঘু ক্লাসের মধ্যে একটি অসৎ দৃষ্টান্ত। তার পর যদু মাষ্টারমশাই আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস

সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কিন্তু আমরা কিছুই শুনছিলাম না, আমরা শুধু রঘুর কথাই ভাবছিলাম। ঘণ্টা পড়বার পর যখন তিনি দেখলেন যে,আমরা মুখ-গোমড়া করে বসে আছি তখন তিনি বললেন, রঘুকে যাতে রাখা হয় সে সম্বন্ধে তিনি হেডমাষ্টারমশাইকে বলবেন। তখন আবার আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম, আবার আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের জন্ম গর্ব্ব অনুভব করতে লাগলাম।

•

আজ শুক্রবার জন্মাষ্টমীর ছুটি। কেশবকে আমি কতকগুলি পুরানো ডাকটিকিট দিয়েছিলাম বলে সে আজ আমাকে তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করেছে। আমি কেশবের বাড়ীতে যাবার অনুমতি পেলাম। ঘরটি বেশ গরম। বহু লোকের সমাগম হয়েছে। সকলেরই মাথা কামানো, শুধু মাথার মাঝামাঝি একটি টিকি, কপালে তিলক কাটা। কেশবের ভগবান নাকি এই বেশ খুব পছন্দ করেন। তাঁরা খোল-করতাল নিয়ে কীর্ত্তনগান করতে আরম্ভ করলেন। কেশব বললে, এই গান সারারাত চলবে। তা না হলে কেশবের ভগবান আসবেন না। তার ভগবান নাকি বৃন্দাবনে থাকেন, কেবল এই একটি দিনের জন্যে আমাদের গ্রামে আসেন। তখন রাধাকৃষ্ণের পূজা হচ্ছিল। পূজার পর আমরা প্রসাদ পেলাম। কেশবের অনেক আত্মীয়-স্বজন সেদিন এসেছিলেন। মেয়েরা সকলেই খুব মোটা। কেশবের মা নেই, তাই তার কাকীমা তাদের রান্না করেন। তাঁর রান্না খুব সুন্দর। কেশব বললে, বৈষ্ণবেরা খুব জ্ঞানী, কিন্তু যারা জ্ঞানী নয় তারা বড় বোকা। খাওয়ার পর আমার খুব গরম বোধ হচ্ছিল, তাই আমি কেশবকে বললাম আমরা বাগানে কিছু ফল পেড়ে খাই।

আমাদের বাগান খুব বেশী দূরে নয়। আমরা দুজনে বাগানের ভিতর ঢুকলাম। কেশবকে সেদিন খুব মন-মরা দেখাচ্ছিল। তার মা নেই কি না, তাই সে প্রতি শুক্রবার রাত্রে তার মায়ের কথা মনে করে। আমি তাকে ভুলোবার জন্যে গল্প বলতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু কেশব তবুও যেন অন্যমনস্ক হয়ে রইল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম, আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আমি ভাবতে লাগলাম, তরুণ কি এখনও তাদের সম্বন্ধে কোন ভাষা খুঁজে পায় নি? তার পর আমি কেশবকে লীলার সম্বন্ধে বললাম যে, আমি বড় হলে নিশ্চয়ই তাকে বিয়ে করব। কেশব শুধু হাসল আর বললে যে, বড় হলে আমি নিশ্চয়ই তার কথা ভুলে যাব। আমি জানি কেশব খুব জ্ঞানী, কিন্তু সেদিন সে যা বললে তা মোটেই আমি বিশ্বাস করি নি। আমাদের ফল খাওয়া হ'ল না। কারণ সামনে এগিয়েই দেখি আমাদের চপলা-ঝি একটা আমগাছের নীচে বসে কাঁদছে, বাবা বাবা বাগানের ভিতর এসে তাকে বলছেন, "দূর হয়ে যা, দূর হয়ে যা!" সে নাকি একখানা আঁশবঁটি দিয়ে মতি গোয়ালার গলা কেটে দিতে গিয়েছিল। কারণ মতি রঘুর মাকে যা করেছে চপলাকেও ঠিক তাই করেছে। মতির একটি বউ আছে। তা হলে তার তিন বউ হ'ল, কিন্তু তবুও তার মাথায় জল জমে নি। বলাইমামার ত শুধু দুই বউ, তাতেই তার মাথা জলে ভর্ত্তি। মা বাগানে এলেন, বাবাকে বললেন, "আহা, গরীব বেচারা! ওকে তাড়িয়ে দিলে না খেয়ে মারা যাবে।" বলে তিনি বাবাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে পুলিস এল চপলাকে থানায় নিয়ে যেতে। সে আঁশবঁটি দিয়ে মতির গলায় আঁচড় দিয়েছে। বাবা এলেন। পুলিসের সঙ্গে কি কথা হ'ল। বাবা তাকে একটা সিগারেট দিলেন। সে সিগারেট খেতে খেতে চলে গেল। মতি গলায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় এসে হাজির হ'ল। সে হেসে বললে, "ও কিছু নয়। ও একটা ভুল বোঝার ব্যাপার।" বাবা তাকে বললেন, "এ বাড়ীতে যদি আর কোন দিন পা দাও তবে মেরে হাড় ভেঙে দেব।" মা বললেন, "যাক, যাক, গরীব লোকদের কেন এত কড়া কথা বল?" ঠিক হ'ল চপলা আমাদের বাড়ীতে থাকবে, কিন্তু আমরা অন্য গোয়ালার কাছ থেকে দুধ নেব।

আমি কেশবকে বাগানের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিলাম। সে খুব জ্ঞানী। সে বললে, এর চেয়ে শান্তিতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করা ঢের ভাল। ভালবাসাই দুঃখের কারণ। তার বাবা তাকে বলেছেন।

আজ রবিবার। বাবা মাংস খাচ্ছিলেন। রঘুর জন্য চাঁদা দিতে হবে বলে আমি তার কাছে পয়সা চাইলাম। কিন্তু বাবা বললেন যে, চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার মত পয়সা তাঁর নেই। আমি দুঃখিত হলাম। মা বললেন, "ছেলেপিলেদের কড়া কথা কেন বল?" তার পর তাঁরা ঝগড়া করতে আরম্ভ করলেন। বাবা খেয়ে উঠে গেলে মা আমাকে বললেন, "আমি তোমাকে পয়সা দেব, কিন্তু তোমাকে বাবার কাছে ভাল হতে হবে।" আমি বললাম, "আমি ত বাবার কাছে ভাল হই, কিন্তু তিনি আমায় সঙ্গে কথা বলেন না।" মা বললেন, "তোমার বাবা আমাদের জন্যে খাটেন। আমাদের উচিত তাঁকে আনন্দ দেওয়া।" সবারই বাবাদের আনন্দ দেওয়া উচিত। তাঁরা তাঁদের স্ত্রী-পুত্রদের জন্যে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটেন। যখন তাঁরা খাটেন না তখন তাঁদের পরিজনরা দুঃখে পড়ে। কাজেই রোজ সকালে উঠে কখনই বাবাকে নমস্কার করতে ভুলব না। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মা, তুমি কেন বাবাকে বিয়ে করেছিলে?" মা হেসে বললেন। "ছেলেরা কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করতে পারে!" তাঁর পর তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। মা বেশ মোটাসোটা ও সুন্দরী, কিন্তু আমি তাঁর কথা বুঝতে পারি না। তার চেয়ে চপলার কথা আমি বেশ ভাল বুঝি। কিন্তু চপলা বড় বেশী মোটা। মা আমাকে রঘুর জন্য পয়সা দিলেন। মাকে আমি খুব ভালবাসি। রঘু রীতিমত স্কুলে আসতে আরম্ভ করেছে। সে আমাকে তার কাগজে জড়ানো নাড়ীটা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি সেটা নিলাম

না। সেটা দেখতে বড় বিশ্রী। রঘুটা বড় বোকা। সে প্রায়ই কেশবের গালে চড় বসিয়ে দেয়। কারণ সাহেবরা নাকি পরস্পরের গালে চড় মারে তাদের জোয়ান করে তুলবার জন্তে। কিন্তু কেশব বলে, সে হিংসা পছন্দ করে না। কারণ তার বাবা তাকে বলেছেন।

রঘু খুব খুশী হয়েছে যে, তার নূতন ভাইটি কাল মারা গেছে। রঘু আবার হ'ল তার মায়ের একমাত্র বাপ-মরা ছেলে। রঘু আমাদের তার বাড়ীতে যাবার জন্ত বললে। আমরা বিকালে স্কুলের ছুটির পর রঘুর বাড়ীতে গেলাম তার ভাইকে দেখবার জন্তে। আমরা উঠানের এক পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেটিকে একটা লম্বা ধরনের কাঠের বাক্সে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ও তার চারিদিকে মোমবাতি জলছে। আমাদের ধোপানী রঘুর মা সকলকে মদ দিচ্ছিল। সে আমাদেরও দিতে এল। কিন্তু আমরা নিলাম না। আমরা সকলে নীরবে দাঁড়িয়েছিলাম। কেশব খুব মন-মরা হয়ে গিয়েছিল। কারণ তার মায়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তরুণের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। সে ফিস ফিস করে আমার কানে কি বললে ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পর আমরা কাশতে লাগলাম। কারণ আমাদের চলে যেতে ইচ্ছা করছিল। রঘুর মা কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাদের সাহায্যের জন্ত কৃতজ্ঞতা জানাল। কাঁদতে কাঁদতে তার মুখ আপেলের মত লাল হয়ে গিয়েছিল। রঘুকে দেখলাম ঘরের দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় একটা সুযোগ মিলল। বাঘা একপাশে একটা হাড় নিয়ে খেতে সুরু করে দিয়েছে। তাকে তাড়া করতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রঘু দরজায় ঠেস দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সেদিন সে কেশবের গালে চড় বসিয়ে দিতেও ভুলে গেল।

...বাড়ীতে আজ একটা সোরগোল পড়ে গেছে। তরু-মাসী আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি আমার মায়ের ছোট বোন। মেসো চাটগাঁয়ের লোক। চাটগাঁ আগে বাংলা দেশের মধ্যে ছিল। বাংলা দেশ ভাগ হবার পর চাটগাঁ পূর্ব্বপাকিস্তানে পড়েছে। যদু মাষ্টারমশাই বলেছেন। কিন্তু তরুমাসীর বিয়ে হয় অনেক আগে। এখন তার ছেলেপিলে আছে। একটি ছেলে তাঁর সঙ্গেই এসেছে। তার নাম পটল। কি বিশ্রী নাম! মাসী যখন মেসোকে বিয়ে করেন তখন মেসো দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। একটা ব্যাঙ্কের বড়কর্ত্তা প্রায় হবো-হবো। কিন্তু ঠিক তা নয়। সেই ব্যাঙ্কের কাজে মেসো নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তখন মাসীর ছেলে হয়। আমরা সকলে বাগানে গিয়ে একটা মাদুর বিছিয়ে একটা আমগাছের তলায় বসে পড়লাম। তরুমাসী কাঁদছিলেন। যাই হোক তাঁর চোখে জল ছিল। বাবা বললেন, তরুমাসীকে মেসোর কাছে ফিরে যেতেই হবে। ছেলেপুলেদের কে দেখবে? চাটগাঁর লোককে বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না? শুনে তরুমাসী আরও কাঁদতে লাগলেন। মা বাবাকে বললেন, আমার বোনকে এ রকম কড়া কথা কেন বল? তার পর বাবা উঠে গেলেন।

তরুমাসী বললেন, ছেলেরা একটু বেড়িয়ে আসুক। আমি পটলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লাম। পটলের মুখখানি চ্যাপ্টা ও গোলগাল। সে যে ভাষায় কথা বলে তার একবর্ণও আমি বুঝি না। ভারি মজার কথা বলে সে। তাকে গঙ্গার ধারে নিয়ে গেলাম। গঙ্গায় তখন পুরো জোয়ার। এক একবার মনে হচ্ছিল পটলকে ধাক্কা মেরে গঙ্গার জলে ফেলে দি। তাহলে তরুমাসী বেঁচে যাবে। তাঁর চারটের জায়গায় তিনটি ছেলে থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হুকুম দিয়েছেন পাকিস্তানের লোকদের ভালবাসতে হবে। যদু মাষ্টারমশাই বলেছেন। আমাদের স্নানের জায়গাটায় এলাম। পটলকে বললাম নেমে গিয়ে স্নান করতে। মনে মনে ভাবলাম ডুবে যদি যায় বেশ হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে যদি কোন দিন যুদ্ধ বাধে একটা শত্রু ত কমবে। পটল ভয়ে চীৎকার করে উঠল। কাজেই আমি তাকে নিয়ে বাড়ী ফিরলাম। বাড়ীতে এসে দেখি মেসো এসে হাজির। তিনি মাসীর খোঁজে চাটগাঁ থেকে পরের গাড়ীতেই রওনা হয়ে এসেছেন। রাষ্ট্রপতির মতই মেসোর গোঁফ পাকা, কিন্তু তাঁর মত মেসো তত গম্ভীর নন। মেসো বললেন, মাসী চলে আসার পর থেকে তিনি শুঁটকী মাছের ঝোলের চেয়েও মাসীকে বেশী ভালবাসতে লাগলেন। কাজেই তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্তে পরের গাড়ীতেই ছুটলেন। মা মাসীকে বললেন, তাকে কালই চাটগাঁয় রওনা হয়ে যেতে হবে। আমরা সকলেই সকাল সকাল শুতে গেলাম। কারণ কাল ভোরে উঠেই মেসো-মাসী রওনা হয়ে যাবেন।

...রঘু আজ কসাই-এর ছেলে করিমের গালে এক চড় লাগিয়ে দিয়েছে। কারণ সে তাকে বিশ্রী গালাগাল দিয়েছে। কেশব তাকে বললে, "তুমি কি তোমার পাদ্রীসাহেব যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছ?" কেশব হিংসা পছন্দ করত না। সে আমাদের বলত শান্তিতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে। রঘু কেশবকেও চড় বসিয়ে দিল শুধু তাকে জোয়ান করবার জন্তে। আমি রঘুর পক্ষ নিলাম। কারণ গালাগালটা অতি বিশ্রী। রঘু তার নাড়ীটা আবার আমাকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সেটা আমি নিইনি। কারণ সেটা বড় বিশ্রী। রঘুকে পাদ্রীসাহেব কত কগুলি ছবি দিয়েছিলেন। সেগুলি সে আমাকে দিতে চাইল। ছবিগুলি বাস্তবিকই খুব সুন্দর। তার মধ্যে কুমারী মেরীর ছবিটি ঠিক যেন লীলার মত। শুধু লীলার কোন ছেলে নেই এই যা। কিন্তু ছবিগুলি আমি নিলাম না কারণ যদি কোন ভগবান থাকেন তবে তিনি এই পাদ্রীসাহেবদের দস্তুরমত ঘৃণা করেন। বাবা আমাকে বলেছেন।

রঘু আমার উপর খুবই খুশী কারণ আমি তার জন্তে চাঁদা তুলে দিয়েছি। সে বললে, আমি যদি কাউকে না বলি তাহলে সে আমাকে একটা গোপন কথা বলবে। সে বলল, আমাদের গ্রামে

দূরে মাঠের মধ্যে একটা বাড়ী আছে। তার সবুজ রঙের খড়খড়িগুলি দিনের বেলায় সব সময় বন্ধ থাকে। সেখানে যে মেয়েরা থাকে তারা দিনের বেলায় ঘুমোয় আর রাত্রিতে জেগে ওঠে। তারা খুবই সুন্দরী কারণ তারা মুখে রঙ লাগায় আর চুলে গন্ধতেল মাখে। সে একটি মেয়েকে জানে; তার নাম অমিতা। সে কুমারী মেরীর মতই সুন্দরী। কিন্তু সে কুমারীও নয়, তার কোন ছেলেও নেই। রাত্রিতে সেখানে অনেক লোক যায়। তারা কেউই ছেলে চায় না। আমার মনে হ'ল রঘু মিছে কথা বলছে।

আমি তাকে বললাম, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।" সে শপথ করে বললে, সে যা বলছে সবই সত্যি। তার মা এই-সব মেয়েদের কাপড় ধোয়। সে নিজে একদিন কাপড়ের মোট নিয়ে সেখানে গিয়েছিল। ঘরগুলি কি সুন্দর! বড় বড় আয়না আছে। মা তাকে বলেছিল কিছু লক্ষ্য না করতে। কিন্তু সে সব ভাল করে দেখে নিয়েছে। এখন আমার মনে পড়ল দূরে মাঠের মধ্যে সবুজ খড়খড়িওয়ালা একটা বাড়ী দেখেছি বটে; কিন্তু সেখানে যে মেয়েরা থাকে আর তারা যে রূপকথার পরীদের মত দিনের বেলায় ঘুমায় তা ত জানতাম না। আমি স্কুল থেকে ফিরে গিয়ে মাকে বললাম, "মা, আমি আজ তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।" মা খুব খুশী হলেন কারণ আমি রোজই কেশব ও তরুণের সঙ্গে বেড়াই। বেড়াতে বেড়াতে আমরা মাঠের দিকে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম মাঠের মধ্যে সেই সবুজ খড়খড়িওয়ালা বাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। আমি মাকে বললাম "মা, দেখ কি সুন্দর একটা বাড়ী!" মা লজ্জায় লাল হয়ে বললেন, "ও একটা বিশ্রী বাড়ী। আমি যেন ওর কাছে কখনও না যাই।" আমি বললাম, "আমি ভেবেছিলাম ওটা রূপকথার ঘুমন্ত পরীদের বাড়ী।" কিন্তু মা বললেন, "ওটা একটা খুব খারাপ বাড়ী। তুমি আমা গা ছুঁয়ে শপথ কর ওর কাছেও কখন যাবে না।"

মা বেশ মোটাসোটা ও সুন্দরী; কিন্তু তিনি আমার একটা প্রশ্নেরও জবাব দেন না। আমাদের ঝি চপলা আমার সব প্রশ্নেরই জবাব দেয়। কাজেই আমি রান্নাঘরে গেলাম চপলাকে জিজ্ঞাসা করতে সেই বাড়ীটার কথা। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি চপলা মতি গোয়ালার সঙ্গে কথা বলছে। মতির বোধ হয় মনে নেই বাবা তার হাড় ভেঙে দেবেন বলেছিলেন। চপলা এখন বলে, সে মতিকে ভালবাসে। কারণ রঘুর মায়ের ছেলেটি মারা গেছে, মতির বউও শীগগির মারা যাবে। সে যেন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে! সে মারা গেলেই মতি চপলাকে বিয়ে করবে। আমি মনে মনে ভাবলাম সেই বাড়ীর কথা চপলা নিশ্চয়ই বলতে পারবে না। কারণ সে ত আমাকে কোনদিন রূপকথা বলে নি। আমি কাউকে সেই মাঠের ভিতরের বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করব না। কারণ সব মেয়েরাই ত রাত্রে ঘুমোয়, যেসব মেয়েরা দিনের বেলায় ঘুমোয় তাদের সম্বন্ধে কিছুই জানা উচিত নয়।

...গরমের ছুটি প্রায় এসে পড়ল। ইতিমধ্যে আমরা যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শিখে ফেলেছি। আমাদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। আমরা অনেক কবিতাও মুখস্থ করে ফেলেছি। কবিতা আবৃত্তির জন্যে আমি একটা পুরস্কারও পেয়েছি। আমরা রোজ জাতীয়সঙ্গীত গান করি। রাষ্ট্রপতি দেওয়াল থেকে আমাদের গান শোনেন। গরমের ছুটি হলেই আমি মা ও বাবার সঙ্গে পুরী বেড়াতে যাব। পুরীর সমুদ্র দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। কিন্তু আমার মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। লীলার সেই মোটা লোকটির সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, সে আর আমার জন্যে অপেক্ষা করবে না। দিদিমা মাঝে একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তিনি বললেন, বলাইমামা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি জামার বোতামগুলি পর্য্যন্ত খেতে চেষ্টা করেন। তিনি বোধ হয় শীগগিরই মারা যাবেন কারণ তাঁর মাথায় আরও বেশী জল জমেছে।

আমি, বাধা, তরুণ ও কেশব গঙ্গায় স্নান করতে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা সেই জায়গাটাতে গেলাম যেখানে চামড়ার কারখানা থেকে দুর্গন্ধ আসে। কিন্তু আজ বিকালটা বড়ই সুন্দর। কারখানা বন্ধ থাকায় দুর্গন্ধ আসছিল না। পাড়ের বকুলগাছ থেকে একটা সুমিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছিল। তরুণ বললে, গঙ্গা খুব শান্ত, কিন্তু পদ্মা বড় সর্ব্বনাশী। পদ্মার তীরে যারা বাস করে তারা বাস্তবিকই বড় হতভাগ্য। তরুণ তার বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় ঘুরেছে কিনা, তাই সে জানে। সে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের গল্পও আমাদের কাছে বললে। কিন্তু আমার মন পদ্মা-তীরবাসী লোকদের জন্য বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমরা পাড়ে উঠে পড়লাম রৌদ্রে আমাদের শরীর শুকিয়ে নেবার জন্যে। তরুণ আমার গায়ে ঠেস দিয়ে বসল। আমি তাকে সরে যেতে বললাম কারণ আমাদের শুধু মেয়েদেরই ভালবাসা উচিত। চপলা আমাকে বলেছে। কেশবের আজ মন খুব খারাপ কারণ তার বাবার হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতা বেড়ে গেছে। তাই তাঁর চোখের নীচে কালো দাগ পড়েছে। আমি লীলার কথা ভাবছিলাম। এত সহজেই সে বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারল! আমরা উপুড় হয়ে শুয়ে কচি ঘাস দাঁতে কাটছিলাম। আমি বললাম, আমরা যখন বড় হব তখন আমাদেরও হৃদ্‌পিণ্ড দুর্ব্বল হবে, আমাদের চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে যাবে, হয়ত আমাদের মাথার মধ্যে বলাই মামার মত জল বসে যাবে। এখন থেকেই আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলা উচিত।

তরুণ চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের মেঘগুলি দেখতে লাগল। নীল আকাশের গায়ে পাল-তোলা নৌকার মত সাদা মেঘগুলি ভেসে চলেছে। তরুণ বললে, জগতের সবকিছু এই মেঘের মতই ভেসে যায়।

বাঃ, কি সুন্দর কথা! আমি ত একথাটা অতি সহজেই লীলাকে বলতে পারতাম। কিন্তু শেষকালে সে সেই মোটা লোকটাকে বিয়ে করল যার মধ্যে একটুও কবিত্ব নেই। আমি

ভাবনা ছেড়ে দিয়ে বাবার সঙ্গে খেলা করতে আরম্ভ করলাম। তরুণ তখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের খেলা দেখছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তরুণ, তুমি কি আর কখনও ভগবানকে মেঘ থেকে নেমে আসতে দেখেছ ?"

সে যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। কেশব খুব জ্ঞানী। সে বললে, আমাদের এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমাদের শুধু শান্তিতে ডাকটিকিট সংগ্রহ করে পৃথিবীর মানচিত্র শেখা উচিত। তার বাবা তাকে বলেছেন। তরুণ আমাদের কোন কথাই শুনছিল না। সে শুধু একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি তাকে সচেতন করবার জন্যে চিমটি কেটে দিলাম। তার পর আমরা বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথে আর একটি কথাও হ'ল না।*

* জোসেফ বার্ডের একটি গল্প অবলম্বনে।

গোপীবল্লভপুর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

গ্রামের নাম লইয়া আলোচনা কালে গ্রামের নাম যে সময় সময় পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াছিলাম। এইরূপ পরিবর্তন কেন হইল ও কোন সময়ে হইল, কোন কোন গ্রামের নাম এইরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে, পরিবর্তনের পূর্ব্বে কি নাম ছিল এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত না হইলে কোনও বিশদ আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। সম্প্রতি এইরূপ একটি তথ্যের প্রতি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ সাহা রায়, এম-এ, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

মেদিনীপুর জেলায় ঝাড়গ্রাম মহকুমায় থানা গোপীবল্লভপুরের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুর এইরূপ একটি গ্রাম। ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল কাশীপুর। এই গ্রামটি একটি বিখ্যাত গ্রাম; ১৯৪১ সনের আদমসুমারীর সময় ইহার জনসংখ্যা ছিল ১,১৫৩ জন। সকলেই বাংলা ভাষাভাষী। Village-wise Mother-Tongue Data for certain selected Border Thanas of Midnapore, Malda, West Dinajpur and Darjeeling Districts, West Bengal নামক পুস্তিকা যাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উড়িষ্যা ও বিহার সরকারের অনুরোধক্রমে রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের সময় প্রস্তুত হইয়াছিল দেখুন।

পশ্চিম বাংলায় গোপীবল্লভপুর নামে মাত্র একটি গ্রাম আছে; যদিও "গোপী—" দিয়া আরম্ভ নামের বহু গ্রাম পাওয়া যায়। কত রকমের "গোপী—" গ্রাম আছে, তাহা আমরা নিম্নে দিলাম। যথা—

নাম	সংখ্যা
গোপীবর	১
গোপীবাটি	১
গোপীচক্	১
গোপীকান্তবর	১
গোপীকান্তপুর	৪
গোপীমোহনবর	১
গোপীমোহনপুর	৬
গোপীনগর	৩
গোপীনগর-বাঘডাঙ্গা	১
গোপীনাথবাটি	২
গোপীনাথ চক্	২
গোপীনাথডিহি	১
গোপীনাথ গুপ্ত চক্	১
গোপীনাথ জোল	১
গোপীনাথপুর	৬৭
গোপীনাথপুর-ভিতরজলা	১
,, -বাহিরজলা	১
গোপীপুর	৩
গোপীরমণপুর	১
গোপীসাগর	১
গোপী সহর	১
গোপীবল্লভপুর	১
	৯৯

এই ৯৯টি গ্রামের মধ্যে ৪৩টি মেদিনীপুর জেলায়। এই জেলার "গোপী—" নামের প্রতি একটা টান আছে বলিয়া মনে হয়।

কি করিয়া কাশীপুর গ্রামের নাম গোপীবল্লভপুর হইল এবং কোন সময়ে এই পরিবর্ত্তন হইল তৎসম্বন্ধে এইবার কিছু বলিব। আমাদের তথ্যসমূহ "শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল" নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের ৫৭ বৎসর পরে ইংরেজী ১৫৯০ সনে

মেদিনীপুর জেলার ডোলঙ্গ নদীর তীরবর্তী রোহিনী* (লোকমুখে রাউনী) গ্রামে করণ বংশীয় জমিদার অচ্যুত পট্টনায়কের পুত্র মোহান্ত রসিকানন্দ দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি শ্যামানন্দ দেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও হরিনাম প্রচার করিতে থাকেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী "তদীয় শিষ্য শ্রীরসময় নন্দন অপ্রাকৃত কবি শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস সর্ব্বদা অনুচররূপে থাকিয়া বঙ্গভাষায় মঙ্গল-কাব্যের রীতিতে" শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল পদ্য রচনা করেন। এই গ্রন্থ ১৬৬০ সনে সমাপ্ত হয়। সুতরাং তাঁহার স্বীয় গুরুর জীবনের বহু ঘটনাবলী সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা সম্ভব ও যে যে স্থলে সাক্ষাৎ জ্ঞান থাকা সম্ভব নহে সেই সব স্থলে প্রকৃত তথ্য কি তাহা জানিবার বহু সুযোগ ও সুবিধা তাঁহার ছিল। শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গলের ২য় সংস্করণ সন ১৩৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।

রসিকানন্দ আঠার বৎসর বয়সে শ্যামানন্দর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ও পরে নাম-প্রচারের অসুবিধাহেতু নিজবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক কাশীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। রসিকমঙ্গলের দক্ষিণ-বিভাগের তৃতীয় লহরীতে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সুবর্ণরেখার দুই কুল দেখি খুলে।
মনোরম্য স্থান এক দেখি কুতুহলে ॥৩৬
দেখিল সুন্দর এক মনোহর স্থান।
কিবা বৃন্দাবন হেন দেখে বিদ্যমান ॥৩৭
সুবর্ণরেখার কুল অতি সুশোভিত।
আম্র কাঁঠালের বন শোভে চারিভিত ॥৩৮
পুলিন সুন্দর নদী দেখিতে সুন্দর।
যমুনার জল যেন দেখি পরিমল ॥৩৯
অতি সুকোমল স্থান কহন না যায়।
যতই বরষা করে কর্দ্দম না হয় ॥৪০
মল্লভূমি পরগণাতে চোর চিন্তা তপা।
তার মধ্যে নূরাবসান বড়ই সুরূপা ॥৪১
তাহার সমীপে এই গ্রাম মনোহর।
গুপ্ত হ'য়েছিল কারো না হয় গোচর ॥৪২
দেবেন্দ্রাদি সুপূজিত সেই স্থানখানি।
বৈকুণ্ঠ সমান স্থান ভূমি চিন্তামণি ॥৪৩
চতুর্দ্দিকে কানন দেখিয়ে পরিমল।
নবীন সঘন কুঞ্জ দেখিতে সুন্দর ॥৪৪
নানা তরু শোভে নানা পুষ্প ফলফুলে।
সদাই থাকেন গ্রাম ভিতর বাহারে ॥৪৫
সেই গ্রামশোভা কিছু কহন না যায়।
গুপ্ত বৃন্দাবন বলি' সব লোকে গায় ॥৪৬
রসিকেন্দ্র চন্দ্র তা'তে করিলা আলয়।
শতমুখে তাঁর গুণ কহন না যায় ॥৪৭
তা'র বিবরণ কহি শুন সর্ব্বজনে।
যেমনে রসিক তথা করিল গমনে ॥৪৮
রসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাস।
কাশীপুর বলি' নাম করিলা প্রকাশ ॥৪৯
দৈবে রাজা-অধিপতি আপন ইচ্ছায়।
কাশীপুর গ্রামে তিঁহ করিলা আলয় ॥৫০
সে গ্রাম দেখি' রসিক আনন্দিত মনে।
কুটুম্ব সহিত তথা করিল গমনে ॥৫১
চিরকাল বংশাবলী ঠাকুর আছিলা।
বলাৎকারে ভঞ্জ রাজা তাঁহারে লইলা ॥৫২
আপনি তথায় গিয়া ঠাকুর আনিলা।
তাঁরে হৃদে বাঁধি রসিক গমন করিলা ॥৫৩
বড়ই সম্পত্তি যা'র কুবের সমান।
কিছু না লইল তা'র তিল পরমাণ ॥৫৪
পতি পত্নী দোঁহে আর ঠাকুর সঙ্গেতে।
পরিলা বসন মাত্র গেলা ঘর হ'তে ॥৫৫
কাশীপুরে রহিলেন রসিকশেখর।
গ্রামের মধ্যেতে দিব্য করিলেন ঘর ॥৫৬"

রসিকানন্দ একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি বহু সাধুসেবা করিতেন ও নাম-প্রচার করিতেন। তাঁহার নামযশঃ দিকে দিকে প্রকাশ পাইল। একদিন তাঁহার গুরু শ্যামানন্দর আদেশে গ্রামের নাম গোপীবল্লভপুর হয়। এ বিষয়ে উক্ত গ্রন্থের ঐ বিভাগের তৃতীয় বল্লরীতে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"একদিন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ স্থানে।
কহিলেন শ্রীমূর্ত্তির বিবরণে ॥৮৩
শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হ'তে।
তাঁর নাম আজ্ঞা কর যেই লয় চিতে ॥৮৪
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
গোপীবল্লভ রায় বলিবে সর্ব্বজনে ॥৮৫
এ গ্রামের নাম শ্রীগোপীবল্লভপুর।
ইথে সাধু-কৃষ্ণ-সেবা হ'বে পরচুর ॥"৮৬

ইংরেজী আন্দাজ ১৬২১ সনে শ্যামানন্দ দেহরক্ষা করেন। সুতরাং তাহার পূর্ব্বে গ্রামের এই নামকরণ হইয়াছিল। রসিকানন্দ আঠার বৎসর বয়সে দীক্ষাগ্রহণ করেন—তখন ইং ১৬০৮ সন। ইহার কিছু পরে তিনি কাশীপুরে আসেন; তাহার পর এই নামকরণ হয়। নামকরণ ১৬০৮ হইতে ১৬২১-এর মধ্যে হয়—আজ হইতে সওয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বে।

উপরোক্ত বিবরণপাঠে মনে হয় পূর্ব্বে এই অঞ্চলে লোকবসতি বিরল ছিল অথবা নূতন বসতি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

* মেদিনীপুর জেলায় সাকরেল থানার অন্তর্গত রোহিণী বলিয়া একটি গ্রাম আছে; কিন্তু রাউনী বলিয়া কোন গ্রামের নাম আমরা পাই নাই।

গ্রামের বিশেষ কোনও নাম ছিল না। এই সময়ে উড়িষ্যায় হিন্দু-রাজত্বের অবসান (ইং ১৫৬৮) হইয়াছে। মোগল-পাঠানে সীমান্ত প্রদেশে যুদ্ধ হইতেছে; মোগল রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেশময় অরাজকতা। কিরূপ অরাজকতা তাহা নিম্নের উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যাইবে। যথা—

"নৃসিংহপুরের ভূঞা উদ্দণ্ড সে রায়।
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হিংসা করেন সদায় ॥৪০
শত শত গুধড়ি সে লয় ছাড়াইয়া।
দ্রব্যলোভে বৈষ্ণবেরে মারে মত্ত হৈয়া ॥"৪১

—দক্ষিণ-বিভাগ—১৬শ লহরী

এই উদ্দণ্ড রায় পরে শ্যামানন্দ কর্তৃক বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। উদ্দণ্ড বলিতেছেন—

"বড় দুষ্ট মহাপাপী মুই দুরাচার।
সহস্র সহস্র সাধু করিনু সংহার ॥৬০
এক ঘর ভরিয়াছে গুধড়ি তাহার।
যদি আজ্ঞা কর আনি সাক্ষাতে তোমার ॥৬১
শুনি শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল আনিবারে।
গুধড়ি আনিয়া কৈল পর্ব্বত আকারে ॥৬২
সাত শত অষ্টাদশ হইলা গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব কার্য্যজনে ॥৬৩

সামান্য একজন ভূঞার পক্ষে যদি ৭১৮ জন সাধুর প্রাণ-সংহার করিয়া তাঁহাদের গাত্রবস্ত্র—যাহা সাধারণ লোকের কাজে আইসে না—সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাধারণ গৃহস্থ কিরূপ অত্যাচারিত হইত তাহা সহজেই বুঝা যায়।

কাশীপুরের নাম পূর্ব্ব হইতেই কাশীপুর থাকা অসম্ভব নহে। তবে আমাদের মনে হয় রসিকানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাস নিজ নামানুসারে ইহার নাম কাশীপুর বলিয়া প্রকাশ করেন।

এইবার "নৃয়াবসান" সম্বন্ধে সামান্য দুই-একটি কথা বলিব। মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমানে ৬টি "নয়াবসান" নামের গ্রাম আছে, আর "নয়াবসান-ধাইপুখুরিয়া" ও "নয়াবসান-মাধব ঘর" বলিয়া দুইটি গ্রাম আছে। গোপীবল্লভপুর থানায় একটি "নয়াবসান" নামে গ্রাম আছে। "নৃয়াবসান" বলিয়া কোনও গ্রাম ঐ জেলায় নাই। আমাদের মনে হয় শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল গ্রন্থোক্ত "নৃয়াবসান" ভাষাতত্ত্বের প্রাকৃতিক নিয়মে কালক্রমে "নয়াবসানে" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমাদের উড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান নাই। পূর্ব্বে এই অঞ্চলে উড়িয়া ভাষার প্রাধান্য থাকা অসম্ভব নহে। বর্ত্তমানে নাই। ১৯৫১ সালে "নয়াবসান" গ্রামে ১,৪১৬ জনের মধ্যে শতকরা ৭৫·১ জন বাংলা ভাষাভাষী, আর শতকরা ২৩·[illegible] জন উড়িয়া ভাষা-ভাষী ছিল। গোপীবল্লভপুর থানার উড়িয়া [illegible]ভাষীদের অনুপাত শতকরা ১·৬ মাত্র। ঐ থানার [illegible]টি গ্রামের মধ্যে ৬০টি গ্রামে উড়িয়া ভাষাভাষী পাওয়া যায়—ইহার মধ্যে ১[illegible]টি গ্রামে উড়িয়া ভাষাভাষীর সংখ্যা মাত্র ১ জন করিয়া। এই নাম পরিবর্ত্তন ভাষার পরিবর্ত্তনের জন্য বা ভাষার সংমিশ্রনের জন্য হইয়াছে বা ভাষাতত্ত্বের প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। এ বিষয়ে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ মতামত প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

"নয়াবসান" নাম হইতে মনে হয় যে, যখন গ্রামের নামকরণ হইয়াছিল তখন গ্রামটি নূতন বসান হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলার বাহিরে কোন "নয়াবসান" গ্রাম নাই। ঐ জেলায় "নয়া-বসত" বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পশ্চিম বাংলার ৮টি "নয়াগ্রামে"র মধ্যে ৭টি মেদিনীপুরে। ৩টি "নয়াগাঁ" সবকয়টি ঐ জেলায়। এই "নয়া—" রীতিও মেদিনীপুরের বিশিষ্টতা বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীরসিকমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, কাশীপুর, পরে গোপীবল্লভপুর মল্লভূমি পরগণার চোরচিতাতপার অন্তর্গত। ইংরেজী ১৯১১ সনে প্রকাশিত মেদিনীপুর ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়রের ১৮২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, গোপীবল্লভপুর সুবর্ণ রেখার দক্ষিণতটে নয়াবসান পরগণায় অবস্থিত। নয়াবসান, রোহিণী মানভাণ্ডার ও মহাল বৈতালপুর পূর্ব্বে ময়ূরভঞ্জ মহারাজার জমিদারী সম্পত্তি ছিল। জমিদারী প্রথা লোপ হইবার পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাছে উড়িষ্যা সরকার ময়ূরভঞ্জ রাজ্য উড়িষ্যাভুক্ত হইলে এই অঞ্চল দাবি করে এই আশঙ্কায় উক্ত জমিদারী মহারাজার নিকট হইতে খোষ কোবলায় কিনিয়া লয়েন।

পরগণার নাম আলাহিদা হইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। আকবরের সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে যেখানে ৬৮২টি পরগণা ছিল ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত সময়ে সেখানে কালক্রমে ১৬৬০টি পরগণা হয়। একটি পরগণা ভাঙিয়া ২,৩টি করা হইয়াছে, এ পরগণার কিয়দংশ ও অপর-পরগণার কিয়দংশ লইয়া নূতন একটি পরগণা সময়ে সময়ে গঠিত হইয়াছে, সময়ে সময়ে পুরাতন পরগণার নামও বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কি কারণে মল্লভূমি পরগণার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নয়াবসান করা হইয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

পর্ব ও পঞ্জিকা

শ্রীসুখময় সরকার

দীর্ঘ বংশদণ্ড যেমন পর্বে পর্বে বিভক্ত, অনন্তকালকেও আমরা লোক-ব্যবহারের সুবিধার জন্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া লই এবং বংশপর্ব বা ইক্ষু-পর্বের সাদৃশ্যে তাহার নাম দিই 'পর্ব'। রবি-শশী আমাদের লোক-ব্যবহার্য কালকে পর্বে পর্বে বিভক্ত করিয়া দিতেছেন। এই কারণে প্রাচীনকালে পর্ব বলিতে কেবল অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বুঝাইত। এইরূপ পর্বাহ ধরিয়া নববর্ষ আরম্ভ হইত। নববর্ষ একটা বৃহৎ পর্ব। সীমাহীন কালকে ঐ দিন আমরা একটি বিশেষ সীমায় খণ্ডিত করিয়া লৌকিক প্রয়োজন সিদ্ধ করি। নববর্ষের পুণ্য দিবসে দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ হইত এবং পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইত। পরবর্তীকালে এই সকল ধর্মানুষ্ঠানও 'পর্ব' নাম পাইল। আধুনিককালে যে কোন তিথিতে বা দিবসে অনুষ্ঠেয় যে-কোন উৎসব পর্ব বা পার্বণ নামে অভিহিত হইতেছে।

বিশাল ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন কালে নানা উপলক্ষ্যে নানাবিধ পর্বের প্রবর্তন হইয়াছে। স্মৃতিতে সে সকল পর্বের প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থ হইতে পঞ্জিকায় উক্ত পর্বসমূহের বিধান লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে। অবশ্য পঞ্জিকার কর্মক্ষেত্র কেবল পূজা-পার্বণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পঞ্চবিধ বিষয় লইয়া ইহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত—তিথি, নক্ষত্র, বার, মাস বৎসর। এই কারণে ইহার নাম "পঞ্চিকা"। পঞ্জিকা শব্দ 'পঞ্চিকা' শব্দের বিকৃত রূপ। উত্তর-ভারতে এখনও 'পঞ্চাঙ্গ' শব্দ প্রচলিত আছে।

পূর্বকালে কেবল তিথি ধরিয়া পর্বদিন নির্দিষ্ট হইত। আমাদের অধিকাংশ ধর্ম-কর্ম, পূজা-পার্বণ বিশেষ বিশেষ তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দোল, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি প্রধান প্রধান পর্বসমূহ তিথির সঙ্গে বাঁধা আছে। তিথি, চন্দ্রের দিন। আবার, কতকগুলি পর্ব তারিখ (সৌর দিন) ধরিয়াও অনুষ্ঠিত হয়। যথা—শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসা-পূজা, ভাদ্র-সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মা পূজা, কার্তিক-সংক্রান্তিতে কার্তিক পূজা ইত্যাদি। চান্দ্র মাস ধরিয়া জন্মতিথিতে জন্মোৎসব এবং মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান চিরকাল প্রচলিত আছে। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা সৌরমাস গণনা করি, এই কারণে আধুনিক যুগে জন্মদিবস (সৌর) ও মৃত্যু-দিবস ধরিয়াও অনেক স্থলে যথাকৃত্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য ইত্যাদি অবতারগণের আবির্ভাব-উৎসব আমরা তিথি ধরিয়াই পালন করি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি ইত্যাদি আধুনিক যুগের মহাপুরুষগণের জন্মোৎসব আমরা তারিখ ধরিয়া উদ্‌যাপন করিতেছি।

এই রীতিটি পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির অনুকরণে আসিয়াছে। কাহারও কাহারও ধারণা মৃত্যুতিথি-পালন অনুষ্ঠানটিই ইউরোপের অনুকরণ। বস্তুতঃ তাহা নহে। মৃত্যুতিথিতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান অর্থাৎ মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন বিশুদ্ধ ভারতীয় রীতি।

আমাদের পঞ্জিকায় নানাপ্রকার অব্দ গণনার উল্লেখ থাকে,—বঙ্গাব্দ, শকাব্দ, সংবৎ, হিজিরা, খ্রীষ্টাব্দ, চৈতন্যাব্দ ইত্যাদি। বর্তমান বৎসরে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ হইলেও আভ্যন্তরীণ জ্যোতিষিক কারণে মনে হয়, অব্দটির গণনা আরও পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল। অর্থাৎ, এই অব্দটিতে যে জ্যোতিষিক গণনা-রীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহা ১৩৬৪ বৎসর পূর্বের নহে, আরও প্রাচীন। বঙ্গাব্দ-গণনায় ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি হয়, পরদিন ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরা হয়। প্রকৃত পক্ষে ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ গুপ্তাব্দ-মুখে ঐ দিনে মহাবিষুব-সংক্রান্তি হইত, বঙ্গাব্দ-গণনায় সেই স্মৃতিটি বিধৃত হইয়াছে। এখন কিন্তু ৩০শে চৈত্রে রবির মহাবিষুব-সংক্রান্তি হয় না, ৭ই চৈত্র মহাবিষুব-দিন হইয়া থাকে। নববর্ষের সঙ্গে একটা জ্যোতিষিক যোগ থাকা প্রয়োজন। বর্তমান বঙ্গাব্দের ৩০শে চৈত্র সেরূপ কোনও যোগ নাই। অয়ন-চলন (Precession of the Equinoxes) হেতু বিষুব-দিন (সুতরাং অয়ন-দিনও) ২৩ দিন পশ্চাদ্‌গত হইয়াছে। ২১৬০ বৎসরে বিষুব-দিন ১ মাস পশ্চাদ্‌গত হয়। ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি কিঞ্চিদধিক ১৬০০ বৎসরে উহা ২৩ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। এই জন্য আমাদের নূতন পঞ্জিকায় বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্রকে শকাব্দের ১লা চৈত্র ধরিয়া দিন গণনার বিধি দেওয়া হইয়াছে। এই বিধি যে বিজ্ঞান-সম্মত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিধির মধ্যেও একটি ত্রুটি থাকিয়া যাইতেছে, পরে তাহা আলোচনা করিতেছি।

ভারত-পঞ্জিকায় শকাব্দ-গণনার প্রবর্তন করিয়া পঞ্জিকা-সংস্কারকগণ আমাদের জ্যোতিষিক ঐতিহ্যকে মর্যাদা দি

করিয়াছেন। বরাহ মিহিরের কাল হইতে শক-গণনা জ্যোতিষিক ব্যাপারে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ প্রায় সকলেই তাঁহাদের গ্রন্থরচনা-কাল শকাব্দের সাহায্যেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বাংলাদেশেও এই রীতির ব্যাপক প্রচলন ছিল। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র লইয়া সমধিক গবেষণা করিয়া থাকেন। শকগণনার প্রতি তাঁহাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। পঞ্জিকায় শকাব্দের প্রাধান্য তাঁহাদের আনন্দ-বর্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শকাব্দ গণনার প্রবর্তন হইলেও বাংলাদেশে আমাদিগকে যে বঙ্গাব্দ-গণনা পরিত্যাগ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ইহা সম্ভবপর নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে শ্রীঅনিলকুমার আচার্য 'নূতন পঞ্জিকা' প্রবন্ধে "১লা বৈশাখের দীর্ঘকালাগত সংস্কার" পরিত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে আক্ষেপের কিছুই নাই। কারণ, বঙ্গাব্দ-গণনা যেমন আছে আমরা তাহা অবিকল রাখিয়া দিয়াও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে শকাব্দ-গণনা গ্রহণ করিতে পারি। "নববর্ষের বৈশাখী-ভাবনার সংস্কারকে চৈত্রালী চিন্তায় পরিণত" করার কোনও প্রয়োজন নাই। বঙ্গাব্দ-গণনায় আমরা চিরকাল ১লা বৈশাখ নববর্ষ ধরিয়া যাইতে পারি, এবং ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস পালন করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, আমাদের পঞ্জিকায় নানা প্রকার অব্দ-গণনার উল্লেখ আছে। শকাব্দ-গণনা প্রাধান্য পাইলেও বঙ্গদেশে আমরা বঙ্গাব্দ-গণনা লোক ব্যবহারের জন্য অব্যাহত রাখিতে পারি এবং তাহাই থাকিবে। উত্তর-ভারতে সংবৎ-গণনা প্রচলিত আছে; এই গণনানুসারে দোলপূর্ণিমার দিন নববর্ষ আরম্ভ হয়। বর্তমানকালে দোল-পূর্ণিমার সহিত কোনও জ্যোতিষিক 'যোগ' নাই। বহু প্রাচীনকালে ঐ দিনে রবির উত্তরায়ণ হইত, এখন আর তাহা হয় না, উত্তরায়ণ-দিন ৭ই পৌষে (বঙ্গাব্দ) পিছাইয়া আসিয়াছে। তথাপি সংবৎ-গণনায় নববর্ষ-দিবস পরিবর্তন করা হয় নাই অথবা উক্ত অব্দ-গণনা একেবারে রহিত করারও প্রয়োজন হয় নাই।

সুবিশাল ভারতভূমির ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে নববর্ষ আরম্ভ হইত, এখনও হয়। প্রাচীনকালে অগ্রহায়ণ মাসে নববর্ষ আরম্ভ হইত। অগ্রহায়ণ এখন হেমন্তঋতুর দ্বিতীয় মাস, তখন শরৎঋতুর প্রথম মাস ছিল। অর্থাৎ, শারদ-বিষুব-দিনে নববর্ষ আরম্ভ হইত। অগ্রহায়ণ মাসে বর্ষারম্ভের উল্লেখ করিতে গিয়া শ্রীঅনিলকুমার আচার্য একটি অদ্ভুত মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "বহু পূর্বে ভারতবর্ষে অগ্রহায়ণ মাস থেকে বর্ষ গণনা সুরু হ'ত —আর সেই জন্য অগ্রহায়ণ মাসকে এখনও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে মার্গশীর্ষ বলা হয়ে থাকে।" প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। মার্গশীর্ষ নামটি বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া নহে, এটি নাক্ষত্র নাম। মৃগশীর্ষ (প্রচলিত নাম 'মৃগশিরা') নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে যে মাস সমাপ্ত হয়, তাহার নাম মার্গশীর্ষ। মার্গশীর্ষ মাস এককালে বৎসরের প্রথম মাস গণ্য হইত; তখন ইহা 'অগ্রহায়ণ' নাম পাইয়াছে। 'অগ্রহায়ণ' শব্দের অর্থই বৎসরের প্রথম মাস। (অগ্র=প্রথম, হায়ণ= বৎসর)। অগ্রহায়ণ মাস হইতে বর্ষগণনা অবশ্য এখন আর কোথাও নাই। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে দীপালীর দিন (কার্তিক অমাবস্যা) নববর্ষ আরম্ভ হয়। এক সময়ে ঐ দিনে রবির দক্ষিণায়ন হইত, আর এক সময়ে শারদ-বিষুব হইত। এখন ঐ দিবসে উক্ত জ্যোতিষিক যোগদ্বয়ের একটাও ঘটে না। কিন্তু বর্ষ-গণনা অব্যাহত আছে, নববর্ষ-দিবসেরও পরিবর্তন করা হয় নাই। সুতরাং ১লা বৈশাখ এখন আর মহাবিষুব দিন না হইলেও বঙ্গাব্দ-গণনা রহিত করিবার কিম্বা অন্য দিবসে নববর্ষ আরম্ভ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্রকে শকাব্দের ১লা চৈত্র ধরিয়া নূতন পঞ্জিকায় দিবস-গণনা বিহিত হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে যে জ্যোতিষিক কারণ আছে পূর্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু অনিলবাবু তাঁহার প্রবন্ধে একটি অদ্ভুত মন্তব্য করিয়াছেন (এইরূপ কথা আরও অনেকের মুখে শুনিয়াছি)—"কিন্তু যা কিছু গোল বেধেছে—পুরাতন পঞ্জিকার সাত-সাতটি দিনকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ফলে।...এমন ত নয় যে ঐ সাত-সাতটা দিন সূর্যের আকাশ-পরিক্রমা বন্ধ হয়েছিল। তবে এই সাত-সাতটা দিনকে চিরতরে বিলুপ্ত করে দেওয়া কি সমীচীন?" এই মন্তব্য যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, জ্যোতির্বিদ্যায় অনভিজ্ঞ সাধারণ পাঠকও তাহা বুঝিতে পারিবেন। য'দ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র শকাব্দ আরম্ভ হয়, তবে পর বৎসর ৭ই চৈত্র শকাব্দ শেষ হইবে। এমন ত বলা হয় নাই যে, ৮ই চৈত্র বৎসর আরম্ভ হইয়া ৩০শে ফাল্গুন শেষ হইবে। সুতরাং "সাত-সাতটা দিন নস্যাৎ করিয়া দেওয়ার" প্রশ্নই উঠিতে পারে না। তাহা ছাড়া, পূর্বেই বলিয়াছি, বঙ্গাব্দ-গণনা যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে; শকাব্দকে ইহার সহিত

* সংক্রান্তি শব্দ 'শেষ দিবস' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু এই রীতিটি ভ্রমাত্মক। সংক্রান্তি=সংক্রমণ, অর্থাৎ আরম্ভ। ভাদ্রমাস শেষ হইলে আশ্বিন মাস আরম্ভ হয়। সুতরাং ভাদ্রের শেষ দিনকে আশ্বিন-সংক্রান্তি বলাই যুক্তি-সঙ্গত।

মিশাইয়া ফেলিবার প্রয়োজন নাই। শকাব্দের ১লা চৈত্র, বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র, খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ। ইহাতে গোল বাধিবার কোনও আশঙ্কা দেখি না। তবে ইহাতে অন্য একটি ত্রুটি আছে, এখানে তাহাই আলোচনা করিতেছি।

চৈত্রাদি মাস-নাম চান্দ্র গণনা হইতে আসিয়াছে। চিত্রা নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইলে যে মাস সমাপ্ত হয়, তাহার নাম চৈত্র। বিশাখা নক্ষত্রে পূর্ণিমা হইলে যে মাস শেষ হয়, তাহার নাম বৈশাখ। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ইত্যাদি মাস-নামও এইরূপ নাক্ষত্র। এই প্রকার পূর্ণিমান্ত মাস-গণনার রীতি সংবৎ-গণনায় প্রসিদ্ধ আছে। মুসলমানের হিজিরা-অব্দেও চান্দ্রমাস গণনা-রীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু শকাব্দগণনার আদিকাল হইতে সৌর-মাস গণনা-রীতির প্রবর্তন হইয়াছে। আমাদের ভারত-পঞ্জিকাতেও সৌর-গণনা গৃহীত হইয়াছে। চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রের সম্পর্ক, কিন্তু সূর্যের সহিত সম্পর্ক রাশির। সূর্যের সহিত নক্ষত্রের যে কোনও সম্পর্ক নাই তাহা নহে, তবে মাস বা বর্ষ-গণনার ব্যাপারে এই সম্পর্ক ভারতীয় জ্যোতিষে স্বীকৃত হয় নাই। বৎসরের দ্বাদশ মাসে সূর্য দ্বাদশ রাশিতে অবস্থান করেন। এক এক রাশিতে তাঁহার স্থিতিকাল ২৮ হইতে ৩২ দিন, অর্থাৎ সৌর এক মাস। আমরা এখন যে মাসকে সৌর চৈত্র নাম দিতেছি, সূর্য সে সময় মীন রাশিতে অবস্থান করেন। গণনাটি সৌর, নামটি চান্দ্র—এই বিধি বৈজ্ঞানিক বলিতে পারা যায় না। সুতরাং ঐ মাসের নাম হওয়া উচিত 'মীন'। ইহার পরবর্তী মাসসমূহের নাম হইবে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি। এইরূপে মীনাদি দ্বাদশ রাশিনাম দ্বাদশ মাসের নাম রূপে গৃহীত হইলে দুইটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। (১) সৌরগণনার অপেক্ষাকৃত বৈজ্ঞানিক রীতি অবলম্বিত হইবে; (২) যাঁহারা একই দিবসে দুইটি তারিখের জন্য গোল বাধিবার আশঙ্কা করিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন; কারণ, শকাব্দের ১লা মীন=বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র=খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মার্চ। রাশি-নাম অনুসারে মাস নাম যে একেবারে নূতন তাহা নহে। দ্রাবিড় দেশের কোন কোন অঞ্চলে এই গণনা-রীতির প্রচলন দেখা যায়। ভারত-পঞ্জিকায় এই গণনা-রীতি প্রবর্তিত হইলে যথার্থই মঙ্গল হইবে কিনা পঞ্জিকা-সংস্কারকগণকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র আমরা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে নববর্ষ আরম্ভ করিব; কিন্তু জনসাধারণকে কিরূপে এই সংবাদ জানাইব? কেবল কাগজে-কলমে ৮ই চৈত্র নববর্ষ ধরিলে আমাদের দেশের অসংখ্য নিরক্ষর নরনারী এ বিষয়ে একেবারেই অবহিত হইবে না। যাহারা লেখাপড়ার ধার ধারে না তাহাদের নিকট এই নবায়নের কেবল যে মূল্য থাকিবে না তাহা নহে, এ সম্বন্ধে তাহারা একেবারে অন্ধকারেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু কি উপায়ে নববর্ষ-দিবসকে সকলের নিকট স্মরণীয় করিতে পারা যায়? আমাদের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে দেখিতে পাই, নববর্ষ দিবসে এক-একটা বৃহৎ পর্বোৎসবের বিধান হইয়াছিল। আমরা বর্তমানকালে ১লা বৈশাখ নববর্ষ গণনা করি; তাহার পূর্বদিন, ৩০শে চৈত্র মহাসমারোহে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ৩০শে চৈত্র পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধও বিহিত হইয়াছে। বাঁকুড়ায় ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে এইদিনে পিতৃগণের উদ্দেশে শক্তু পূর্ণ শরাব নিবেদিত হয়; অতঃপর সকলেই শক্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে। সংবৎ গণনায় ফাল্গুনী পূর্ণিমায় নববর্ষ হয়, সেদিন দোলযাত্রা বিহিত হইয়াছে। দোলযাত্রা একটি বৃহৎ পর্ব। এককালে আশ্বিন শুক্লাদশমীতে (বিজয়াদশমীর দিন) নববর্ষ হইত, তাহার পূর্বে দিবসত্রয়-ব্যাপী জগন্মাতার অর্চনা বিহিত হইয়াছিল। নববর্ষ গণনাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু পর্বটি রহিয়া গিয়াছে। অতএব, আমরা যদি ৮ই চৈত্র দিবসটিকে নববর্ষের প্রাধান্য ও জনপ্রিয়তা দান করিতে চাই, তবে ঐ দিনে কোন পর্বোৎসবের বিধান দিতে হইবে।

নিখিল-ভারতীয় নববর্ষোৎসবের অনুষ্ঠান কিরূপ হইবে, ভারত সরকার লোকসভায় তাহার বিধান রচনা করিবেন অথবা দেশের পণ্ডিতগণের উপর তাহার ভার অর্পণ করিবেন। আমাদের ভট্টপল্লীর কিংবা নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী কি এ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিতে পারেন না? বলা বাহুল্য, পতাকা-উত্তোলন ও বক্তৃতা-প্রদানকে 'উৎসব' বলে না, জনসাধারণের নিকট এইরূপ অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নাই। দশ বৎসর পরেও তাই স্বাধীনতা-দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের কোটি কোটি দেশবাসীর হৃদয়ে রেখাপাত করিতে পারে নাই। যাঁহারা কেবল শহরে এই দুই অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দেখিয়া মনে করেন যে দেশের জনসাধারণ এগুলিকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছে, তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। উৎসবের অঙ্গ তিনটি—আদিতে দেবার্চনা, মধ্যে মূল উৎসবের অনুষ্ঠান এবং অন্তে ভূরিভোজন। নববর্ষোৎসবের অঙ্গহানি হইলে ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, নববর্ষোৎসব উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র তিন দিন ছুটি ঘোষণা করিতে হইবে। নববর্ষের পূর্ব দিন উৎসবের প্রস্তুতির জন্য এবং পরদিন বিশ্রামের জন্য ছুটি থাকা প্রয়োজন। ছুটির সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, এই জন্য ১লা জানুয়ারী ও ৩১শে ডিসেম্বর ছুটি রহিত করিয়া দিতে হইবে। আমরা যখন খ্রীষ্টাব্দ-গণনা পরিত্যাগ করিতেছি তখন ঐ দুই দিবসে ছুটি দিবার কোনও আবশ্যকতা

নাই। ভারতের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জনসাধারণের ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইবার কোনও কারণ নাই, কারণ বর্ষারম্ভ ও বর্ষশেষের সঙ্গে তাঁহাদের ধর্মসংক্রান্ত কোনও যোগাযোগ নাই। খ্রীষ্টানদের জন্য খ্রীষ্টম্যাস ডে এবং গুডফ্রাইডে ছুটিই যথেষ্ট বিবেচিত হওয়া উচিত। মহরম ও ঈদের ছুটিও অযথা দীর্ঘ করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।

পঞ্জিকা-সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য তিথির স্থিতিকালের যাথার্থ্য নির্ণয় এবং তদনুযায়ী ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান। আমাদের প্রায় সকল পর্বই তিথি ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কয়েকটি তিথির স্থিতিকাল সম্বন্ধে পঞ্জিকাকারগণের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহারা কেবল পুরাতন পঞ্জিকার নজীর দেখাইয়া আত্মমত সমর্থনের প্রয়াসী। কিন্তু তাঁহারা আকাশ পর্যবেক্ষণ করেন নাই। আমাদের নূতন পঞ্জিকা দৃগ্‌গণিতকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইবে। ব্রিটিশ নাবিক পঞ্জিকা (British Nautical Almanac) আশ্রয় করিয়া দুই-একখানা পঞ্জিকার গণনা অনেকদিন হইতেই প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের রক্ষণশীল মনোবৃত্তির জন্য সে গণনা প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। তিথির স্থিতি-কালনির্ণয় মোটেই জটিল ব্যাপার নহে, প্রাচীনপন্থীগণ ইহাতে অযথা জটিলতা আরোপ করিয়াছেন। একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দ্বারা তিথি-নির্ণয় বুঝাইতে পারা যায়। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাকালে রবি যখন পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যান, চন্দ্র তখন পূর্ব দিগন্তে উদিত হন। খ-বৃত্তের ব্যাসের দুই প্রান্তে দুইটি জ্যোতিষ্ক। অতএব তখন রবি ও চন্দ্রের দূরত্ব ১৮০° অংশ (ডিগ্রী)। পূর্ণিমা পঞ্চদশ তিথি। ১৮০কে ১২ দ্বারা ভাগ করিলে ১৫ হয়। ইহা হইতে এই সূত্র পাওয়া যায়,—$\frac{\text{র}-\text{চ}}{১২}$ = তি। অর্থাৎ কোনও মুহূর্তে রবি ও চন্দ্রের দূরত্ব যত অংশ, তাহাকে ১২ দ্বারা ভাগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, সেই মুহূর্তে সেই তিথি চলিতেছে বুঝিতে হইবে। তিথি-সম্বন্ধে দৃগ্‌গণিতের ইহাই মৌলিক নীতি। এই নীতি অবলম্বনে যে-কেহ তিথির স্থিতিকাল নির্ণয় করিতে পারেন। দুর্গাপূজায় সন্ধিক্ষণ নির্ণয় লইয়া এ তাবৎকাল বহু হাস্যকর বিতর্ক শোনা গিয়াছে। দৃগ্‌গণিতের কল্যাণে এক্ষণে সে তর্কের অবসান হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

রস-লীলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

গান গাহিবারে দিলে যারে ভার সে শুধু তোমার গানে
তোমারই আসর—তোমারই বাসর ভাসালো রসের তানে।
নিজে সে মজিলো—সবারে মজালো ; সোনার ভুবন ভরি'
আর-এক ভুবন—সুরের ভুবন সে শুধু তুলিল গড়ি' :
কথা-ছবি-গান নিশি-দিনমান ভাবের স্বপনে হায়
একাকার হয়ে লুটায়ে সেথায়,—রসে গড়াগড়ি যায়।
ভালোবাসাবাসি—এই রসারসি নিজে বুঝি ভালোবাসো !
হে রস-রসিক, রগড় জমায়ে কৌতুকে বুঝি হাসো !

এত লীলা জানো—মিলনে-বিরহে এত সব ছলা-কলা !—
তোমার আসরে মোরে দিয়ে চলা তোমার কথাই বলা।
গানের সুরেতে মাতোয়ারা মন লীলায় গলিয়া গিয়া
রসের বেসাতি তোমাতে-আমাতে যায় যে বলিয়া দিয়া ;
বেফাস কথায় তুমি ইসারায় চোখ টিপে করো মানা ;—
তোমায় রসের রসিক যাহারা—জেনো তা'রা নয় কানা।
আড়ালে আড়ালে লুকালে কি হবে ? তা'রাও জেনেছে প্রাণে
লেনা-দেনা শুধু তোমাতে-আমাতে চলিয়াছে গানে গানে।

গোপন প্রেমের গোপন কথাটি কেহ কি সহজে বলে !
তোমার গানের রসের প্রবাহ ফুটে ওঠে পলে পলে :—
এ গানের সেই গোপন মাধুরী যতই লুকাতে চাই,
রসে ভুরভুর তোমারই সে সুর—রসিকেই জানে গাই।
মৃগনাভি যদি করিলে আমারে, কি দোষ আমার বলো,
মোরে দিয়ে যদি তোমারই সুবাস বাতাসে ছড়ায়ে চলো !
তপনের আলো—আগুনের শিখা যায় কি কিছুতে চাপা ?
প্রেমের পরশমণির দ্যুতি কি গানে যায় প্রিয়, ছাপা ?

মানে-অভিমানে কোন কাজ নাই ; চলেছে যেমন করি
তেমনি চলুক ;—তুমি গান গাও, আমি তার ধুয়ো ধরি।
তুমি গান গাও অন্তরতম, মনের আড়ালে থাকি,
যুগল প্রেমের পরম মাধুরী যত পারি গানে ঢাকি।
প্রাণের পেয়ালা ছাপায়ে যে সুধা ক্ষরিতে আপনা হ'তে
সে সুধা ক্ষরুক—সে গান ঝরুক জীবনের পথে পথে।
যে লীলায় তুমি নিজে মশগুল—মশগুল তব কবি,
সে রস-লীলায় মশগুল হোক্ তোমার ভুবনে সবি।

বেনেদেত্তো ক্রোচে

শ্রীবিনয়গোপাল রায়

রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, ইটালীর মনীষার পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে সমন্বয় সাধনে। এই দেশের চিত্রকর, ভাস্কর, কবি, দার্শনিক ও সাংগীতিকরা যুগে যুগে সমন্বয়ের সাধনাই করে গেছেন। লিওনার্দো দ ভিঞ্চি, র্যাফেল, দান্তে—এঁরা প্রত্যেকে বহুর মধ্যে একের সন্ধান করেছেন। এই সমন্বয়ের দেশে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এক ক্যাথলিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, দার্শনিক বেনেদেত্তো ক্রোচে। ক্রোচের ছেলেবেলা কাটে নেপল্‌স শহরে। নয় বছর বয়সের সময় ইনি স্কুলে ভর্তি হন। ক্রোচের মা ছিলেন বুদ্ধিমতী ও নম্রস্বভাবা। তিনি ক্রোচেকে পড়াশোনায় খুব উৎসাহ দিতেন। ছেলেবেলায় ক্রোচে দিনরাত উপন্যাস পড়তেন, সবচেয়ে ভালবাসতেন ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস। ক্রোচের বাবা ছিলেন বিষয়ী। তিনি নিপুণ ভাবে তাঁর জায়গা-জমিদারী তদারক করতেন। ক্রমে ক্রোচে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। সতের বছর বয়সে মা বাবা সহ তিনি এক জায়গায় বেড়াতে যান। সেখানে এক দুর্ঘটনা ঘটে, প্রচণ্ড ভূমিকম্পে মা বাবা মারা যান। তিনিও এই দুর্ঘটনায় প্রায় মারা যাচ্ছিলেন। বারো ঘণ্টা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। পরে একজন লোক তাঁকে উদ্ধার করে।

মা বাবাকে হারিয়ে ক্রোচে চলে গেলেন রোমে। সেখানে তিনি তাঁর পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগলেন। নেপলসে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করেন। এবার রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেন উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। রোমে বাস করবার সময় প্রথমে তাঁর মনে গভীর নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। তাঁর কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না, কোন কাজেও তিনি উৎসাহ পেতেন না। জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি সন্দেহ পোষণ করতে লাগলেন। এক এক দিন এমন হ'ত গভীর নৈরাশ্যে ও হতাশায় তিনি আত্মহত্যার কথা চিন্তা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধা নিয়ম মত পড়াশোনা তাঁর ভাল লাগল না। তিনি পাঠ্য পুস্তকের পাতায় কোন রস পেলেন না। তাঁর মন তখন খুঁজছে চরমসত্তার জ্ঞান।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিরে এলেন তাঁর পূর্বস্থান নেপলস শহরে। মনের সংশয় অনেকটা কেটে গেছে। এবার তিনি জ্ঞানের চর্চায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখলেন, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বে গবেষণা শুরু করলেন। ইতিহাসের শিক্ষা কি—এ বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। দর্শনের সঙ্গে ইতিহাসের যোগ কোথায়, চরমসত্তা স্থাণু না চলমান এইসব সমস্যা তাঁর আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। রোমে বাস করবার সময় ক্রোচে অধ্যাপক অ্যান্টনিও লেব্রিওলার সংস্পর্শে আসেন। এই অধ্যাপকের প্রভাব তাঁর জীবনকে কিছুটা প্রভাবান্বিত করেছিল। এর প্রেরণায় ক্রোচে কার্ল মার্ক্সের অর্থনীতি বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করেন এবং মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন। অধ্যাপক লেব্রিওলা সাম্যবাদী ছিলেন। সাম্যবাদের ঢেউ একবার ক্রোচের মনকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু ক্রোচে মার্ক্সকে সরাসরি কোন দিনই গ্রহণ করেন নি। অনেক রচনায় তিনি মার্ক্সের নীতিকে খণ্ডন করেছেন, মার্ক্সবাদের ভুলও দেখিয়ে দিয়েছেন। ক্রোচের বয়স যখন ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে তখন তিনি দর্শন বিষয়ে রচনা লিখতে আরম্ভ করলেন। ১৯০২ সন থেকে তিনি আত্মার দর্শন (Philosophy of the spirit) বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তার ফল লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এই সময় তিনি 'লা ক্রিটিকা' নামে একটা পত্রিকাও বার করেন। এই পত্রিকার মারফং তিনি সমসাময়িক ইটালির সংস্কৃতির কথা জগতের সামনে প্রচার করতে লাগলেন। লা ক্রিটিকা যখন প্রথম প্রকাশিত হ'ল, তার পাতায় ক্রোচে লিখলেন—এই পত্রিকার উদ্দেশ্য জনগণের দার্শনিক দৃষ্টিকে আবার জাগরিত করা। পত্রিকা পরিচালনায় তিনি কয়েকজন শিষ্যের সাহচর্য পান, তার মধ্যে জেন্টিলেই প্রধান। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল। ক্রোচের সঙ্গে জেন্টিলের মতভেদ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত জেন্টিলের সাহচর্য থেকে তিনি বঞ্চিত হলেন। ১৯১৫ সনে যখন প্রথম পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ চলছিল, তখন জার্মানীকে সব দিকে হীন প্রতিপন্ন করবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু 'লা ক্রিটিকা'র পাতায় ক্রোচে জার্মানীর সংস্কৃতিগত উৎকর্ষের কথা নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করলেন।

ব্যবহারিক জীবনে ক্রোচে জনগণের শিক্ষার পোষক ছিলেন। সারাটা জীবন তিনি চেষ্টা করে গেছেন লোকের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য। ১৯১০ সনে ইটালির লোকসভার তিনি সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১৫ সনে তিনি ইটালির রাজনীতিতে আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তখনকার প্রধানমন্ত্রী ক্রোচেকে মন্ত্রীসভায় আহ্বান করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী হন। এই সময় শিক্ষার প্রসার-কল্পে তিনি দেশে অনেক সুব্যবস্থা করেন। তার পরে যখন মুসোলিনি ইটালির শাসনভার গ্রহণ করতে আরম্ভ করলেন, ক্রোচে রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলেন। তখন জেন্টিলে মুসোলিনির প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। মুসোলিনির রাজত্বকে ক্রোচে কোনদিনই সমর্থন করতে পারেন নি। এঁর রাজত্বকালে ক্রোচের মতবাদকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং ফ্যাসিবাদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। তাই রাজনীতিতে ক্রোচের শিক্ষাদানের ফল খুব শুভ হয় নি। রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে জ্ঞান সাধনায় ক্রোচে

দেখুন! অর্দ্ধেকটী সানলাইট
সাবানেই এসব কাচা
হয়েছে!
অতিরিক্ত ফেণার দরুণই
এ সম্ভব হয়
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট
সাবান
জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন। বহু মূল্যবান পুস্তক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি রচনা করলেন। মুসোলিনির পতনের পর ইটালির অধিবাসীরা আবার ক্রোচেকে আহ্বান করেন শাসন পরিচালনার জন্য। ক্রোচে অনায়াসেই মন্ত্রীসভা গঠন করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা পছন্দ করলেন না। যে দর্শনের পর্য্যালোচনা তাঁকে সারা জীবন প্রেরণা দিয়ে এসেছে সে দর্শন সাগরে তিনি ডুবে রইলেন। ১৯৫২ সনে এই প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মৃত্যু হয়।

বেনেদেত্তো ক্রোচের দর্শনকে আখ্যা দেওয়া হয় নব অধ্যাত্মবাদ। নব অধ্যাত্মবাদ বুঝতে হলে দার্শনিক হেগেলের দর্শনের মূল তত্ত্বটির অবতারণা প্রথমেই করতে হয়। ভাব ব্যক্তির মনের একটা বিলাস নয়, ভাবই বাস্তব। প্রতিটি বাস্তব একটা ভাবেরই বিভিন্ন প্রকাশ। যে সার্ব্বিক ভাবটি আমার মনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, সেই ভাবটি বাইরের প্রত্যেকটির বস্তুর মধ্য দিয়েও প্রকাশিত হচ্ছে। সসীম মন ও সসীম বস্তু—এক অসীম ভাবেরই অংশবিশেষ। এই অসীম ভাবকে হেগেল বলেছেন (Absolute) ব্রহ্ম বা অসঙ্গ। ব্রহ্ম সনাতন ও অপরিবর্ত্তনশীল। সসীম মন ও বস্তুর পরিবর্ত্তন সম্ভব কিন্তু অসীম ব্রহ্মের পরিবর্ত্তন কল্পনা করা যায় না। সান্তের ইতিহাস আছে কিন্তু অনন্তের আবার ইতিহাস কি করে সম্ভব হয়? অনন্ত যেন এক সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে উর্ম্মিমালার মহা কোলাহল, আলোড়ন ও মহাপরিবর্ত্তন, কিন্তু সমুদ্র নিশ্চল।

আবার প্রশ্ন ওঠে, সান্তের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের কি পরিবর্ত্তন হয় না? সান্ত যদি অনন্তের অংশ হয় তা হলে অংশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কি সমগ্রেরও পরিবর্ত্তন হয় না? হেগেল কেন তবে ব্রহ্মকে সনাতন বলেন? ক্রোচে বলেন, আমার দর্শনের শুরু হেগেলের মূলসূত্রে। ভাবই বাস্তব। ভাব ছাড়া আর কোন সত্তা নেই। কিন্তু একটা সার্ব্বিক অপরিবর্ত্তনীয় ভাব আছে, এ কথা আমি মানি না। যদি কোন সার্ব্বিক ভাব ব্রহ্ম থাকে তা হলে তাও পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনশীল।

ক্রোচে বলেন, আমার দর্শনের প্রথম কথাই হ'ল অভিজ্ঞতা। আমি আমার অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই জানি না। এই অভিজ্ঞতা আবার আমার মনের। মানসিক অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোন প্রকারের অভিজ্ঞতা হতে পারে না! এখানে প্রশ্ন হবে—আচ্ছা, আমি আমার সামনে একটা গাছ দেখছি। এখানে গাছটা কি আমার মানসিক ব্যাপার মাত্র? ক্রোচে বলেন, তলিয়ে দেখলে ব্যাপার তাই দাঁড়ায়। গাছটা ত আমার অভিজ্ঞতারই অংশ। অভিজ্ঞতা হ'ল সম্পূর্ণ মানসিক। কাজেই গাছটাও আমার ভাবেরই সৃষ্টি। আমার অভিজ্ঞতার বাইরে যদি কিছু থাকে তবে সে সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতে পারি না। যেহেতু আমি গাছটিকে জানি. সেজন্য গাছটি আমার অভিজ্ঞতার ভিতরে। তবে আমরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রসঙ্গে বলি, আমি গাছ দেখছি। এই যে আমার ও গাছের মধ্যে ভেদ, এটা আমিই সৃষ্টি করি। আসলে পুরোটা আমারই অভিজ্ঞতা। ক্রোচের দর্শন অনুযায়ী বলতে হয়—আমি কেবল আমার অভিজ্ঞতাকে বুঝি ও জানি। অন্য লোক বা অন্য জীব যে আছে তা কি করে জানি? আমি ত আর আমার অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারি না। অন্য লোক বা অন্য জীব আমার অভিজ্ঞতারই অংশ। তা হলে ভগবান বলেও কিছুই কি নেই? ন্যায়-শাস্ত্রের মাপকাটি দিয়ে বিচার করলে ক্রোচের দর্শনকে আত্মকেন্দ্রিক ভাববাদ বলতে হয়। তাঁর দর্শনে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ভিন্ন অন্য জীব বা বস্তু বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁর দার্শনিক রচনার কোন কোন স্থানে তিনি সার্বিক অভিজ্ঞতা বা মহামানসের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ইটালি যান, ক্রোচের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। সে প্রসঙ্গে ক্রোচে ভগবান সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন। নিম্নে তাঁদের কথোপকথনের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উদ্ধৃত করছি।

ক্রোচে—ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণার সঙ্গে আপনার ধারণার মিল আছে। ঈশ্বর একটা সত্তা কিন্তু সে সত্তা আর একটা ব্যক্তি-গত সত্তা নয়। ঈশ্বর সকল সত্তার সত্তা। ঈশ্বর পরম সত্তা।··· আর এক জায়গায় আপনার সঙ্গে আমার মিল আছে। আপনি ভাব আর বাস্তবের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেন নি। সসীম ভাব ও সসীম বাস্তব একই সনাতন ও অসীম অভিজ্ঞতায় বিধৃত হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ—আজকাল পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা কেবলমাত্র বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত। অন্তরঙ্গের অনুশীলন কোথায়?

ক্রোচে—বহিরঙ্গও চাই। অধ্যাত্মবাদে অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই দুয়েরই অনুশীলন চাই। প্রতিটি ভাব হবে বাস্তব, আবার প্রতিটি বাস্তব হবে ভাব। এর সমন্বয় সাধন দুঃসাধ্য কিন্তু এরও প্রয়োজন আছে।*

দেখা গেল, ক্রোচে ভগবান বা সার্বিক মহামানস মানতেন। কিন্তু তাঁর দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় ভগবান নন, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই প্রধান বিষয়। এই যে আমি লিখছি, তাঁর মতে "আমি"র অর্থ একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এর স্বরূপ সম্পূর্ণ মানসিক। এই অভিজ্ঞতা বা মনের দুটি দিক আছে, একটা জ্ঞানের দিক আর অন্যটা কর্ম্মের দিক। প্রথমে জ্ঞানের দিকটা বর্ণনা করছি। জ্ঞানের দুই স্তর। প্রথম স্তর বোধি (intuition) আর দ্বিতীয় স্তর সম্প্রত্যয় (concept)। আমি টেবিলটা দেখছি—এই জ্ঞানের বিশ্লেষণ করা যাক্। সাধারণ লোকে বলবে আমি একটা সত্তা, (existent) টেবিল আর একটা সত্তা, আর দেখাটা আমার মনের একটা ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার সাধন হয় দুইটি সত্তার যোগাযোগে। ক্রোচে বলেন, টেবিল বলে সে আলাদা সত্তা আর কোথায়? সে ত আমার অভিজ্ঞতার অংশমাত্র। তা হলে টেবিল কোথা থেকে আসে? ক্রোচে বলবেন, ঐ টেবিল

* দ্রঃ বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি, অক্টোবর—১৯২৬

তোমার মনই সৃষ্টি করে আবার সে মনই টেবিলকে জানে। সাধারণ লোক এই কথাটার তাৎপর্য্য হয় ত মেনে নিতে চাইবে না। যা হোক বোধির দ্বারা মন জ্ঞানের উপাদান সৃষ্টি করে। কলাকার প্রথমে বোধির দ্বারা একটা বিষয় সৃষ্টি করেন এবং সে বোধিকে সুর, ছন্দ বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। তেমনি জ্ঞানের ব্যাপারে মন প্রথমে বোধির দ্বারা উপাদান সৃষ্টি করে এবং সম্প্রত্যয়ের দ্বারা তা প্রকাশ করে। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। বোধি সম্প্রত্যয় ছাড়া থাকতে পারে না। কেবল বোধি হ'ল অথচ সম্প্রত্যয় হল না, এ সম্ভব নয়। আবার বোধি ভিন্ন সম্প্রত্যয় চলতে পারে না। বোধি ও তার প্রকাশ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কোন চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্র দেখে আমরা বলি, কি সুন্দর! কেন বলি? কারণ চিত্রকর চিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর বোধিকে সম্পূর্ণ প্রকাশিত করেছেন। মাধ্যম যখন বোধিকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ হয় তখন আমরা বলি, কি কুৎসিৎ! কলাপ্রসঙ্গে মুখ্য কি?—বোধি না তার প্রকাশ? যদিও দুই যুক্ত তবুও ক্রোচের মতে বোধিই মুখ্য। আসল সৌন্দর্য্য বোধিতে। কবির অন্তরস্থ বোধিকে রূপ দিয়ে প্রকাশ করাই কলা। এই যে অন্তরস্থ বোধি—এ ত কবির নিজের সৃষ্টি। এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রোচের প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের কবিমন যখন বোধির সৃষ্টি করছেন সে বোধি তাঁর ব্যক্তিগত মনের ব্যাপার নয়। তা পরম রসতত্ত্বের প্রকাশ। তা অরূপ, শাশ্বত ও আনন্দময়। কলার ব্যাপারে যেমন প্রথমে বোধি, পরে প্রকাশ, সেরূপ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রথমে বোধি ও বোধিজনিত প্রতিরূপ, (images) তার পরে তার প্রকাশ। এই প্রকাশ সাধিত হয় সম্প্রত্যয়ে।

বোধি থেকে এবার সম্প্রত্যয়ে আসা যাক। আমি টেবিল দেখছি। উপাদান ত সৃষ্ট হ'ল এখন কর্ত্তব্য তাকে বুঝা বা জানা। (to know) জানতে গেলে চাই সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ। শ্রেণীবিন্যাস ও নামকরণ। টেবিলের সংজ্ঞা কি? অন্য বস্তু থেকে টেবিলের পার্থক্য কোথায়? টেবিল বলে যে শ্রেণী আছে তার বৈশিষ্ট্যই বা কি? এই সব প্রশ্ন সম্প্রত্যয়ের আওতায় আসে। ন্যায়শাস্ত্র এই সম্প্রত্যয় নিয়েই ব্যস্ত। সম্প্রত্যয়ে চাই কতকগুলি পদার্থ বা জাতি (Categories)। এরা কিন্তু সম্পূর্ণ মানসিক। আবার এরা সামান্য, মূর্ত্ত ও ভাবপ্রকাশক। প্রতিটি সম্প্রত্যয়ে থাকবে গুণ, আকার আর সৌন্দর্য্য। কোনও অভিজ্ঞতা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, তার একটা বিশেষ গুণ, আকার ও সৌন্দর্য্য থাকবেই। তা না থাকলে অন্য অভিজ্ঞতা থেকে তার পার্থক্য বুঝা যাবে না। দেখা গেল, সম্প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা বোধিসৃষ্ট উপাদানকে বুঝতে পারি। বিজ্ঞানীরা সংকে বুঝবার চেষ্টা করেন। পদার্থবিজ্ঞানী পদার্থকে আর জীববিজ্ঞানী জীবকোষকে বুঝবার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ক্রোচের এক অভিযোগ আছে। তাঁর মতে, প্রত্যেক বিজ্ঞানী সামগ্রিক সৎ থেকে তাঁর বিষয়বস্তু বিচ্ছিন্ন করে নেন। কিন্তু আসল জানা ত সামগ্রিক জানা। এই বিচ্ছিন্ন করে জানার কিছু মূল্য অবশ্য আছে, এ নেহাৎ অলীক ব্যাপার নয়। কিন্তু সামগ্রিক সংকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে বোধি ও সম্প্রত্যয়ের সাহায্যে। বিজ্ঞানীদের মত বোধিকে বাদ দিলে চলবে না।

এবার মনের কর্ম্মকাণ্ডে আসা যাক। জ্ঞান যেমন মনের এক ধরনের সক্রিয়তা, কর্ম্মও অন্য প্রকারের সক্রিয়তা। কর্ম্ম উদ্ভূত হয় ইচ্ছা-ক্রিয়া থেকে। বোধি ও তার প্রকাশ যেমন অভিন্ন তেমনি ইচ্ছা-ক্রিয়া ও কর্ম্ম অভিন্ন। কর্ম্ম আবার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান রয়েছে কর্ম্মের জন্যই। দুই রকমের কর্ম্ম আছে, এক আর্থিক আর নৈতিক। আর্থিক কর্ম্মের মূল কথা হ'ল উপকারিতা আর নৈতিক কর্ম্মের মূল কথা মঙ্গলসাধন। আর্থিক কর্ম্মের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত কামনার পরিতৃপ্তি। আর্থিক কর্ম্মে নিছক স্বার্থপর কিন্তু নৈতিক কর্ম্মে আমরা পরার্থপর। নৈতিক কর্ম্মে আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও তৃপ্তি সমষ্টিগত প্রয়োজন ও তৃপ্তিতে মিশে যায়। এখানে একটা প্রশ্ন জাগে—মানুষের কর্ম্মকে এইভাবে কি দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ভাগে ভাগ করা চলে? ক্রোচে বলেন, কখনই নয়। প্রত্যেক কর্ম্মের দুই রূপ—উপযোগ ও মঙ্গল। এমন কোন কর্ম্ম নেই যা কেবল স্বার্থান্বেষী, আবার এমন কোন কর্ম্মও নেই যা কেবল পরমঙ্গলমুখী। ক্রোচের মতে স্বার্থে পরার্থ আর পরার্থে স্বার্থ লুকিয়ে আছে। আর্থিক কর্ম্মে মঙ্গল আর নৈতিক কর্ম্মে উপযোগ রয়েছে। প্রতিটি কর্ম্মই স্বার্থমূলক ও পরার্থমূলক।

ক্রোচে মনের দুইটি ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন যথা জ্ঞান ও কর্ম্ম। আর একটা ক্রিয়ার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি, সেটি হ'ল ভক্তি। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনে আমরা জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনটি ধারাকে পাই, কিন্তু ক্রোচের দর্শনে ভক্তির কোন অস্তিত্ব নেই। মনের আবেগ, কল্পনা ও আকুতিকে তিনি জ্ঞানকাণ্ডে পুরে দিয়েছেন। ভক্তিকে আবৃত করে তিনি জ্ঞানকে উজ্জ্বল করতে চেষ্টা করেছেন। ক্রোচের দর্শনকে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা বলা যেতে পারে। জ্ঞান, কর্ম্ম, বোধ, সম্প্রত্যয়, চারিত্রনীতি ও অর্থনীতির মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সার্ব্বিক মহামানসের সমন্বয় তিনি করতে পারেন নি। আগেই বলেছি তাঁর দর্শন আত্মকেন্দ্রিক। দর্শনের জটিলতম সমস্যা হ'ল এক ও বহুর মিলনসাধন। ক্রোচে বহুকে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। জড়জগৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ। স্বতন্ত্রভাবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। অভিজ্ঞতা থেকে মন কেন জড়বস্তুকে আলাদা করে দেখে? ক্রোচে কেবল বলবেন এই ভেদজ্ঞান মনেরই সৃষ্টি। কিন্তু "কেন"র কোন সদুত্তর তিনি দেন নি। এই ভেদজ্ঞান কি মায়া? শঙ্কর হয়ত এই প্রশ্নের একটা উত্তর দিতে পারেন কিন্তু নব অধ্যাত্মবাদ ত আর মায়া স্বীকার করবে না। এক মহামানস বহুর মধ্যে নানাভাবে নিজেকে

প্রকাশিত করেছেন—ক্রোচে হেগেলের এই উপসংহারটুকুও গ্রহণ করবেন না।

সৌন্দর্য্য-দর্শনে ক্রোচের দান তাঁকে অমর করে রেখেছে। সৌন্দর্য্যের উৎস হিসাবে বোধিকে তিনি এক উন্নত স্থান দিয়েছেন। বোধি থেকে কলার সৃষ্টি, আবার সেই বোধি জ্ঞানেরও জননী। কলাকারের বোধির প্রথম প্রকাশ প্রতিরূপে আর দ্বিতীয় প্রকাশ সুরে, ছন্দে বা চিত্রে।

ভারতীয় ভাববাদ আর ইটালির নব অধ্যাত্মবাদ—এরা অনেকাংশে ভিন্ন। ক্রোচের দর্শনে "অহং"এর স্থান খুব উচ্চে। মনই একমাত্র সৎ আর মনই সৎ সৃষ্টি করে। এই অহং বোধকে চোখের জলে ডুবিয়ে দেবার সাধনা ক্রোচের নয়। ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য মুক্তিলাভ। অহংবোধের বিনাশ ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। অহমিকা আমাদের অন্তর্দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই আবরণ ছিন্ন হলে দৃষ্টি নির্ম্মল হয় ও আসল সত্তাকে একান্ত ভাবে জানা যায়।

মাটির পৃথিবী

শ্রীকৃষ্ণধন দে

মাটির পৃথিবী, তোমারে যে আমি চিনি,
এ চেনা আমার আজো যে হয় নি শেষ,
তবু যে অ-ধরা রয়ে গেলে চিরদিনই,
তব পানে চেয়ে আছি যে নির্নিমেষ।
শুধু তুমি মাটি? সাগর, পাহাড়, বন,
নদ, নদী, হ্রদ, মরুভূ, নগর, গ্রাম?
আঁধার-আলোয় পরি' মায়া-গুণ্ঠন
নব নব রূপে ভুলাও কি অবিরাম?

মাটির পৃথিবী, কুয়াশা-মেশানো আলো
চুপি চুপি ভোরে এসেছে আমার ঘরে,
মন যেন আজ কাছে পেয়ে কি হারালো,
তারি খোঁজে যাই দূরে ও দিগন্তরে।
পথে যেতে যারা দিয়ে গেল ভালবাসা,
চিনি নি যাদের তবু তারা কত চেনা,
হারানো সাথীরে খুঁজিছে পিয়াসী আশা,
মন কেঁদে বলে: কেন তারে ফিরালে না?

মাটির পৃথিবী, তোমার শ্যামল বনে
ফুল ফোটে আর ঝরে যায় কার তরে?
উতলা বাতাস কিসের অন্বেষণে
দিগ্‌দিগন্তে ছুটে ছুটে শুধু মরে!
কেন ডাকে পাখী, কেন বহে নদীধারা?
অনাদি এ স্রোতে এ কি লীলা কালজয়ী,
বৈশাখীঝড়ে কভু দিগন্তহারা,
কভু জ্যোছনায় কল্পনা রূপময়ী!

মাটির পৃথিবী, তোমার ধূলির মাঝে
কত যুগরথ এঁকেছে চক্ররেখা,
কত বেদনার মর্ম্মরগীতি বাজে,
ইতিহাসে যার হয় নি কাহিনী লেখা।
কত যে তৃণের শিশির-অশ্রুকণা
বুকে ধরি তার স্বপ্নের নীলাকাশ,
চেয়েছে ক্ষণিক সূর্য্যের আরাধনা,
মেঘরেণু বুকে মিশে গেছে শেষ শ্বাস।

মাটির পৃথিবী, যুগযুগান্ত হতে
রেখেছ ও বুকে কত যে তৃষ্ণা, আশা।
আজো জীবনের মিলন-বিরহ-স্রোতে
দিতে পার এনে ফেলে-আসা ভালবাসা?
দেবে সেই নদী শুকালো যে মরুগা'য়?
দেবে সেই পথ হারালো যে দূর তটে?
দেবে সেই ফুল লুটালো যে ঝঞ্ঝায়?
দেবে সে গোধূলি লুকালো যে ছায়ানটে?

মাটির পৃথিবী, তোমারে বেসেছি ভালো
কত অনুরাগ-পুলক-বিষাদে গড়া,
কত প্রভাতের পরশমাণিক আলো
তোমারি শ্যামল স্বপ্নে দিয়াছে ধরা।
তিলে তিলে রচা প্রেমের বাঁধনখানি
ভুলিতে পারে না অসীম আকাশ আজো,
রূপসম্ভার দেয় তাই কাছে আনি,
কানে কানে বলে: সাজো, মৃন্ময়ি, সাজো!

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সব সময় লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন

খেলাধূলো করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই দরকার—কিন্তু খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন ধূলোময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে কখনই থাকা যায় না। এই সব ধূলোময়লায় থাকে রোগের বীজাণু যার থেকে সবসময়ে আমাদের শরীরের ক্ষতি হতে পারে। লাইফবয় সাবান এই ময়লা জনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে এবং স্বাস্থ্যকে সুরক্ষিত রাখে।

প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করুন—ময়লা জনিত বীজাণু থেকে আপনার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করুন। এতে আপনার শরীর ঝরঝরে করে তুলবে।

L. 266-X52 BG

দণ্ডকারণ্য

শ্রীঅণিমা রায়

অতি প্রাচীনকাল থেকে বাঙালী হিন্দুরা দণ্ডকারণ্যের নাম জানেন। শিক্ষিত বাঙালীরা জীবনের কোন না কোন সময়ে রামায়ণ পড়েছেন, যারা নিরক্ষর, তারাও রামায়ণ গান, কথকতা থেকে দণ্ডকারণ্যের বিষয় শুনেছে। অতি অজ পল্লীগ্রামেও রামায়ণ গান, চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পাঠ এবং "রামের বনবাস" পালা যাত্রা হয়ে থাকে। পিতৃআজ্ঞা পালন করবার জন্ম শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে যেতে প্রস্তুত হলেন, অত্রিমুনি তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তিনি যেন দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশবর্ষ কাটান। কেন না সেই অরণ্যে প্রচুর জল, ভাল ফল প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং স্থানটিও অত্যন্ত মনোরম—
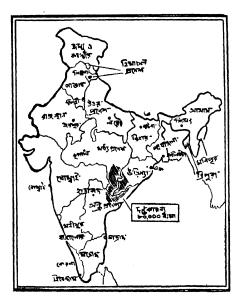
বনবাসের ক্লেশ কম হবে। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাকে সঙ্গে নিয়ে দণ্ডকারণ্যেই কুটীর বাঁধেন। এই দণ্ডকারণ্যেই রাবণ সীতাকে হরণ করেন। আর এই দণ্ডকারণ্যে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করেন। সুতরাং সহস্রাধিক বছর ধরে বাংলার সবস্তরের লোক দণ্ডকারণ্যের কথা শুনেছেন। কিংবদন্তীতে বলে যে, দণ্ডক নামে এক রাজার রাজ্য শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে অরণ্য হয়ে গিয়েছিল—সেই অরণ্যের নাম দণ্ডকারণ্য। কিন্তু এই দণ্ডকারণ্যটি কোথায় সে কথা খুব কম লোকেই জানে। রামায়ণে পাওয়া যায় যে, বিন্ধ্যপর্ব্বত ও শৈবালগিরি শ্রেণীর মধ্যবর্তী জঙ্গলটিই দণ্ডকারণ্য, ওর একাংশের নাম ছিল জনস্থান। ভবভূতি উত্তররামচরিতে লিখেছেন যে, জনস্থানের পশ্চিমে জঙ্গলটাই দণ্ডকারণ্য।

আধুনিক পণ্ডিতেরা গবেষণা করে দণ্ডকারণ্য কোথায় অবস্থিত তা ঠিক করবার চেষ্টা করেছেন। নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে, এখন যাকে মহারাষ্ট্র বলা হয় সেইটেই আগে দণ্ডকারণ্য ছিল। (The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India, Calcutta Oriental Seris, No. 21) এর মধ্যে নাগপুরও পড়ে। পণ্ডিত ভাণ্ডারকারেরও এই মত। পারজিটার বলেন যে, বুন্দেলখণ্ড থেকে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গলটাই দণ্ডকারণ্য (The Geography of Rama's exile in J. R. A. S., 1894)। বিশ্বকোষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র বসু মহাশয় লিখেছেন যে, গোদাবরীনদীর তীরে স্থিত বিশাল অরণ্যানীর নাম দণ্ডকারণ্য।

রামায়ণের দিনে ভারতের যে অংশ জঙ্গলে আবৃত ছিল আজ সেখানে জঙ্গল না থাকতেও পারে। এই সহস্র সহস্র বৎসরে কত ভীষণ জঙ্গল কেটে ফেলে মানুষের বসতি হয়েছে আর কত জনপদ জঙ্গলে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে দণ্ডকারণ্যের বহু অংশ যে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তা মনে করা অন্যায় হবে না। তবে রামায়ণের দণ্ডকারণ্যের সীমানা—আর আজ যাকে দণ্ডকারণ্য বলা হচ্ছে তার সীমানা এক হতে পারে না।

যা হোক, অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার সংযোগ-স্থলে যে বিরাট জঙ্গলটি অবস্থিত, ভারত সরকার সেইটিকে দণ্ডকারণ্য বলেন। এর খানিকটা উড়িষ্যার মধ্যে, কতকটা অন্ধ্র-প্রদেশের মধ্যে ও বাকিটি মধ্যপ্রদেশে পড়েছে। জঙ্গলটি ৮০,০০০ বর্গমাইল। এই স্থানটির লোকসংখ্যা খুব কম বলে প্লানিং কমিশন এই জঙ্গলের এক-তৃতীয়াংশ পরিষ্কার করে মানুষের বসতি স্থাপন করা স্থির করেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার ভার ও এই সম্বন্ধে যাবতীয় অনুসন্ধান করবার ভার "ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশনের" উপর দেওয়া হয়। "ন্যাশনাল ডেভেলাপমেন্ট করপোরেশন" সিদ্ধান্ত করেন, পূর্ব্বপাকিস্থানের যে লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা হিন্দু ভারতে আশ্রয়লাভের জন্ম এসেছে, জঙ্গলের পরিষ্কৃত অংশগুলিতে তাদের পুনর্ব্বাসনের তাঁরা ব্যবস্থা করবেন। অন্ধ্র সরকার, মধ্যপ্রদেশ সরকার, উড়িষ্যা সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছেন।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, দণ্ডকারণ্যের আয়তন ৮০,০০০ হাজার বর্গমাইল—এটি পশ্চিম বাংলার আয়তনের তিনগুণ। কিন্তু

এখানে লোকসংখ্যা খুব কম। পশ্চিম বাংলায় প্রতি বর্গমাইলে ৯০০ শত লোক বাস করে আর এখানে প্রতি বর্গমাইলে মোট ১০০ শত লোক বাস করে। কাজেই এখানে বহুলোকের পুনর্ব্বাসন হওয়া সম্ভব। ভারত সরকার এখানে কুড়ি লক্ষ বাস্তহারার পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করতে চান।

দণ্ডকারণ্যটি সমুদ্রতীর থেকে ২০০০ হাজার থেকে ৩০০০ ফুট উচু এবং এখানে বছরে বৃষ্টিপাত ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি হয়। বর্ষাকালে এখানে যা সামান্য কাঁচারাস্তা আছে তা একেবারে অগম্য হয়ে পড়ে, আর চতুর্দ্দিক জলে ভেসে যায়। এ যেন ঠিক পূর্ব্ব-পাকিস্থানের অবস্থা। গোদাবরী, ইন্দ্রাবতী, ওয়ান গঙ্গা, পোটারু প্রভৃতি কতকগুলি নদী ও তাদের অগণিত শাখা ও উপশাখা দণ্ডকারণ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এগুলির উপর বাঁধ বেঁধে ও জলসঞ্চয় করে খালের সাহায্যে সমস্ত জমিগুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এখানে জলের ব্যবস্থা হলে ধান, ভুট্টা, চিনেবাদাম ও আখের চাষ বেশ ভালভাবে হতে পারবে। কতক কতক জায়গায় বাগান, রেশম চাষ, রবারের চাষ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এই অরণ্যটির মধ্যে বহু খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। ঝারানভিলি, বিলায়ের খনিজকেন্দ্র মধ্য প্রদেশের পরালকোট থেকে মাত্র ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

কোরাপুট জেলার ১৯৪১ সালের 'গেজেটীয়ারে' দেখা যায় যে, এখানকার জমি অত্যন্ত অনুর্ব্বরা। জঙ্গল কেটে ফেললে দু' তিন বছরের মধ্যে জমি একেবারে বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। একথা বোধ হয় ঠিক নয়। কেননা মালকানগিরির আশেপাশে কতকগুলি গ্রাম আছে। সেখানকার অধিবাসীদের উপজীবিকা হ'ল চাষ এবং তারা ফসল ভালই পায়। জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেলে উৎকৃষ্ট জমি, সাধারণ জমি ও নিকৃষ্ট জমি সবরকমই পাওয়া যাবে।

অন্ধ্র প্রদেশ, সারকারের পূর্ব্ব অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশের বাস্তার রাজ্য (যাকে আগে হায়দ্রাবাদ বলা হ'ত) আর উড়িষ্যার জয়পুর জমিদারী দণ্ডকারণ্যের যে অংশে অবস্থিত সেখানে পাকিস্থানের বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ভূখণ্ডের অর্দ্ধেক জঙ্গল রাখা হবে আর বাকী অর্দ্ধেকের লোকসংখ্যা ৪০ লক্ষ বাড়ানো হবে; তার মধ্যে ২০ লক্ষ স্থানীয় অধিবাসী ও আদিবাসীদের দ্বারা এবং ২০ লক্ষ পূর্ব্ব পাকিস্থানের বাস্তহারাদের দ্বারা। মধ্যপ্রদেশ সরকার পরালকোট এলাকাটি পুনর্ব্বাসনের উপযুক্ত করার জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছেন। উড়িষ্যার সরকার মালকানগিরি মহকুমাটি ও তার আশেপাশে সমস্ত ভূখণ্ড পুনর্ব্বাসনের উপযোগী বলে ভারতসরকারকে জানিয়েছেন।

গত জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার প্ল্যানিং কমিশনের কয়েকটি সভ্য এবং কেন্দ্রীয় কৃষি ও পুনর্বাসন বিভাগের কয়েকটি বিশিষ্ট কর্ম্মচারীদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির উপর দণ্ডকারণ্যে বাস্তহারাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করবার ভার দেওয়া হয়। শ্রীএইচ. এম. প্যাটেলকে এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এই সমিতি উড়িষ্যার মালকানগিরি তালুক এবং মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার নারায়ণপুর তালুক পরিভ্রমণ করেন। এই দুই জায়গায় বাস্তহারার পুনর্বাসনের উপায় হতে পারে কিনা সেবিষয়ে সমিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেছেন। সমিতির মন্তব্য ভারত সরকারের দপ্তরে পেশ করা হয়েছে। ভারত সরকার এই মন্তব্য সম্বন্ধে বিবেচনা করছেন। শোনা যাচ্ছে যে,"এই সমিতি যেসব স্থান দেখেছেন সেগুলির উন্নয়ন করলে পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হবে বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উড়িষ্যার অন্তর্গত মালকানগিরিতে ৯০ হাজার বিঘা জমিকে বাসোপযোগী করবার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এখানে যাবার জন্য একটি বড় রাস্তা তৈরী হচ্ছে। মালকানগিরি থেকে ২০ মাইল দূরে বেলিমেলায় ৬০ বর্গমাইল একটি স্থান পূর্ব্বপাকিস্থানের বাস্তহারা পুনর্বাসনের জন্য স্থির করা হয়েছে। 'সালুর' এই স্থানটির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন। কিন্তু এটি বেলিমেলা থেকে ১৪০ মাইল দূরে। দণ্ডকারণ্যের উন্নয়ন করতে হলে যেসব স্থান পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে তার মধ্য দিয়ে একটি রেলপথের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কতকগুলি ভাল বড় রাস্তা নির্ম্মাণ করতে হবে। ভারত সরকার নিশ্চয় এবিষয়ে চিন্তা করছেন।

ভারত সরকার এই উন্নয়নের কাজ যতদূর সম্ভব পূর্ব্বপাকিস্থানের বাস্তহারাদের দিয়ে করাবেন স্থির করেছেন। অবশ্য তারা উপযুক্ত মজুরী পাবে। এতে বাস্তহারাদের ওখানে বাস করবার সহজেই ইচ্ছা হবে। ঠিকাদার দিয়ে কতকগুলি ঘর তৈরী করে বাস্তহারা পাঠালে গোলযোগ হবার সম্ভাবনা। হয় ত তারা গিয়ে দেখবে সব ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে এবং অনেক রকম ত্রুটি রয়ে গিয়েছে।

দণ্ডকারণ্য উন্নয়নের কাজ সুসম্পন্ন করবার দরুণ ভারত সরকার দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মতন একটি স্বয়ং-শাসিত কর্পোরেশন গঠন করবেন স্থির করেছেন। ২০ হাজার বর্গ মাইল জমি এই কর্পোরেশন যত শীঘ্র সম্ভব উন্নয়ন করবেন এবং পূর্ব্বপাকিস্থানের চাষীবাস্তহারাদের মধ্যে তা বণ্টন করে দেবেন। •

একটি বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাদ খান্না বলেছেন যে, অর্থসচিব কৃষ্ণমাচারী উদ্বাস্তদের দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের জন্য দশ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে আরও অধিক টাকা দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন তাও জানিয়েছেন।

ভারত সরকার স্থানীয় অধিবাসী ও উপজাতিদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করে, ভূমি সংরক্ষণ, যোগাযোগ, সেচ, কৃষি, শিল্প, জঙ্গল ও নূতন শহর স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়ে দণ্ডকারণ্যের উন্নয়ন করবেন স্থির করেছেন। তাঁদের এ চেষ্টা ফলবতী হোক্। জঙ্গল কেটে বৃষ্টিপাত কমে না যায়—এবিষয়ে ভারত সরকার নিশ্চয় মনোযোগী আছেন।

কতকগুলি বাঙালী রাজনীতিক গোলোযোগ করছেন যে, পূর্ব্ব-পাকিস্থানের বাস্তুহারাদের কিছুতেই বাংলার বাইরে পাঠানো উচিত নয়—তারা নাকি তা হলে অবাঙালী হয়ে যাবে এবং তাদের কৃষ্টি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এই দল বোঝেন না যে, ভারতের যে কোনও স্থানে যদি ১০,০০০ হাজার বাঙালী একত্র বাস করে সে স্থান মনে হবে বাংলার একটি অংশ; এবং কারও কৃষ্টি নষ্ট হবে না। এইভাবে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি হবে। ভারতের বহু স্থানে বহু প্রাচীনকাল থেকে বাঙালী এইভাবে বাস করছে। বাংলার কৃষ্টি সেসব স্থানের স্থানীয় অধিবাসীরা আংশিকভাবে গ্রহণ করেছে। তা ছাড়া স্বাধীন ভারতে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা কোন রকমে রাখা চলবে না। প্রত্যেকটি ভারতবাসীকে মনে করতে হবে যে, সারা ভারতই তার দেশ। ভাষার গণ্ডী, প্রাদেশিকতার গণ্ডী, জাতের গণ্ডী, এমন কি ধর্ম্মের গণ্ডীও কাটিয়ে উঠতে না পারলে আমাদের এই স্বাধীনতা রক্ষা করা শক্ত হয়ে পড়বে।

আর একটি কথা—ভারতে অসংখ্য রাজনৈতিক দল গজিয়ে উঠেছে—তারা পরস্পর বিরোধী। একদল কোন কাজ করতে গেলে সে কাজ ভাল হ'ক আর মন্দ হ'ক, আর একদল তার নিন্দা করতে আরম্ভ করে ও তাই নিয়ে দেশটাকে বিভক্ত করবার চেষ্টা করে। পূর্ব্বপাকিস্থানের হতভাগ্য বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন বিষয়ে সকল দলকে হিংসা, দ্বেষ, রেষারেষি ভুলে যেতে হবে। এটাকে একটি জাতীয় সমস্যা মনে করে, একযোগে তার সমাধান করবার চেষ্টা করতে হবে। দণ্ডকারণ্যে ২০ লক্ষ বাঙালী নূতন উৎসাহে নব-জীবন গঠন করবে—সমস্ত রাজনৈতিকদল যদি এবিষয়ে তাদের সাহায্য করেন—এই পুনর্বাসন অশেষ কল্যাণপ্রদ হবে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এবিষয়ে পথ দেখিয়েছেন। পুনর্বাসন পরামর্শ সমিতি গঠন করে তাতে বিরোধীদলের আজন্ম দেশসেবক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম মুখো-পাধ্যায়, ডাঃ সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীহেমন্তকুমার বসুকে সভ্য করেছেন। জাতীয় সমস্যা সমাধানে এই দৃষ্টান্ত সারা ভারতে যেন অনুসরণ করা হয়।

গাঁয়ের মেয়ে

শ্রীকালীপদ ঘটক

গাঁয়ের মেয়ে, ওগো গাঁয়ের মেয়ে,
কেন পথের পানে থাকো একলা চেয়ে।
এই নদীর ঘাটে নিতি কলসী কাঁখে,
তুমি দাঁড়াও এসে ওই পথের বাঁকে।
সে কি জলভরণে, তীরে কুঞ্জবনে—
খেলে স্বপ্নের ঝিলিমিলি পাতার ফাঁকে।

ওই ধনেখালি জামরঙা শাড়ীর ভাঁজে,
কত বেনারসী জর্জেট লুকায় লাজে।
তুমি পেটিকোট ব্লাউজের ধার ধার না,
আছে কাঁচলির বড়জোর নামটা শোনা।

ওই অঞ্চলে আঁটা তব নবযৌবন,
ও যে অজবসনে ঢাকা পরশ রতন।
জাগে বক্ষ জুড়ি ছুটি কমল কুঁড়ি,
সেথা জাগে নাকি অনাগত অলিগুঞ্জন।

ভীরু লাজভরা আঁখি ছুটি কাজলটানা,
তুমি কাব্যকথার বুঝি 'মৃগনয়না'।
যদি হতাম কবি এঁকে নিতাম ছবি,
মোর কবিতার নাম হ'ত 'চন্দ্রাননা'।

ওই দূরের বাঁশীতে বাজে রাখালিয়া সুর,
ধীরে বৈকালী ছায়া নামে স্নিগ্ধ মেদুর।
এই নিরালা ক্ষণে ঢেউ লাগে কি মনে,
কেন সলাজ চাহনিখানি বেদনা বিধুর।

ওগো মেয়ে মুখ তোল, কও না কথা,
এ যে দুঃসহ মৌন এ নির্জনতা।
এই বিজন ঘাটে আজি তোমার ঘাটে
মোরে ফিরাইলে, জুড়াবে কি সকল ব্যথা।

পাই যেদিন গোধূলিক্ষণে প্রথম দেখা,
ছিলে এমনিটি নদীকূলে দাঁড়ায়ে একা।
মোরে দৃষ্টি দিয়ে গেলে বারেক ছুঁয়ে,
বুঝি দূর বনে গেয়ে গেল কুহু ও কেকা।

আজো এই পথে আসি যাই সেই নদীকূল,
যেতে আনপথে বারে বারে হয় পথ ভুল।
তুমি জানো কি মেয়ে, কার সঙ্গ চেয়ে—
মোর মনখানি ঝুরে আজো ব্যথায় ব্যাকুল।

তুমি জান ত সবই তবু কথা বল না,
জানি লাজভরা সঙ্কোচ এ, নয় ছলনা।
যদি ফেটে যায় বুক, তবু ফোটে না যে মুখ,
তুমি ননীর পুতুল তবু তাপে গল না।

জানি সব জানি ওগো মেয়ে বেসেছ ভাল,
ওই দুটি চোখে ঝলকে যে প্রেমের আলো।
একা আমি শুধু নই, একসাথে জলসই,
চেনা-অচেনার ব্যবধান কে যে ঘুচালো।

আজি কোন্ দেশে থাকি মোর কোথায় সে ঘর?
তুমি তাই ভেবে ওগো মেয়ে ভেবো নাকো পর।
যাবে আমার দেশে? সে ত গ্রাম নয় ত সে,
সে যে নব্যযুগের সেরা সভ্য শহর।

সেথা আছে বহু লোকজন প্রাসাদপুরী,
নাই মানুষে মানুষে বাঁধা প্রাণের ডুরি।
আছে বিজলীবাতি, নাই চাঁদের ভাতি,
নাই রৌদ্রের ঝিকিমিকি অঙ্গন জুড়ি।

সেথা দুর্লভ একফালি উদার আকাশ,
সেথা সাতমহলায় ঘেরা বন্দী বাতাস।
নাই মাটির এ মায়া, নাই বটের ছায়া,
নাই দীঘিভরা কালো জলে কমল বিলাস।

তুমি শিখনি ত সে দেশের ছলা ও কলা,
এই গ্রাম তপোবনে তুমি শকুন্তলা।
সেথা অনসূয়া নাই, সখী প্রিয়ম্বদায়
খুঁজে পাবে না সে দেশে, অয়ি অচঞ্চলা।

এটা প্রগতির যুগ অতি আধুনিক কাল,
তাই আধুনিকা নারীদের বদলেছে চাল।
তারা নবশিক্ষায় নবতর দীক্ষায়
সেথা যুগের জোয়ারে টানে প্রগতির হাল।

তারা বিদ্যায় বুদ্ধিতে বচনে দড়,
সাজসজ্জার পরিপাটি কত না তর।
দেখে চমক লাগে, মনে সন্দ জাগে—
এই প্রগতি, না নারীত্ব, কোন্‌টা বড়।

তুমি জান কি মেয়ে, উঠে গেছে 'শ্রীমতী'
সেথা সাম্যের ধ্বজা ধরে এসে গেছে 'শ্রী'।
আর 'দেবী' বা 'দাসী' হয়ে গেছে সে বাসী,
মা ও ঠাকুমারা লভেছেন পরমা গতি।

শোন গাঁয়ের মেয়ে—অয়ি সতন্তরা,
বুঝি উঠে গেল শ্রীচরণে আলতা পরা।
সেই নয়নলোভা লাল কুমুদ শোভা,
আজ স্যাণ্ডেলে হাইহিলে বিগতপরা।

আজ ঘোমটা পড়েছে খসে কুন্তল সার,
তারা লজ্জা ও সরমের ধারে নাকো ধার।
ও ত ঘোমটা সে নয়, ও যে সতীর প্রণয়,
ওই আধো ঢাকা মুখখানি তুলনা কি তার।

ওই সিঁথির সিন্দুর আর হাতের নোয়া—
আর সইবে কি বেশি দিন অঙ্গে ছোঁয়া।
কোথা হারালো সে মন একি দুর্লক্ষণ,
আজ এ দেশে ছড়ালো কে এ বিষের ধোঁয়া?

কই সাঁজের প্রদীপ কই তুলসীমূলে,
বুঝি সন্ধ্যা প্রণাম নারী গিয়েছে ভুলে।
সেই পালপার্বণ, ব্রতকথা রামায়ণ—
আজ নবীনারা দিয়েছেন শিকায় তুলে।

সেথা এ যুগের কন্তেরা স্তন্যে কৃপণ,
রাখে ধাত্রীর হেফাজতে বক্ষের ধন।
আয়া দাসীর বুকে স্তন দেয় শিশুকে,
পাছে অকালে টলিয়া যায় স্থির যৌবন।

শুনি অধুনা সে যুগ নাকি হয়েছে বাসী,
যবে নারী ছিল পুরুষের অধীনা দাসী।
এ যে হেঁয়ালি কথা, ঘোর প্রগল্‌ভতা
এ যে ভুলেভরা সাম্যের বিষের বাঁশী।

যদি গৃহিনী সে দাসী হয় রাণী তবে কে,
তুমি পুরুষ পরশে নারী লীলাময়ী যে।
একা একা তুমি নাই এই বিশ্বখেলায়,
মিছে ভ্রান্তির কুয়াশায় ঢাকো নিজেকে।

আজ যতকিছু পুরাতন সেকেলে রীতি,
সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় কর—একেলে নীতি।
শত কলা কালচার ভেঙে হ'ল চুরমার,
প্রাক্ শিক্ষাসংস্কৃতি হ'ল যে ইতি।

ও কি—ওগো মেয়ে, এই শুনে এত বিস্ময়!
জেনো সে দেশের ইতিকথা রূপকথা নয়।
সেথা রাজার কুমার আজ বিদূষক সার,
তার সোনার কাঠিতে কারো জাগে না হৃদয়।

তুমি ঢের ভাল ওগো মেয়ে পল্লীবালা,
ওরা তোড়ার গোলাপ, তুমি পূজার মালা।
ওরা বাহিরে প্রিয়া, তুমি হিয়ার হিয়া,
তুমি প্রেমের সরসী, ওরা প্রেমপিয়ালা।

আর সে দেশে যাব না ফিরে এই ত ভালো,
এই উদার ধরণীতল আকাশ আলো।
এই তুমি ও আমি, চির সঙ্গকামী—
দুটি মুগ্ধ হৃদয় যেথা মন হারালো।

মোরা এইখানে বেঁধে নেব একখানি ঘর,
এই বালুচরে সাজাব সে ফুলের বাসর।
পাশে মাহালী পাড়া, দেবে মাদলে সাড়া,
জেগে রবে সাথে বাঁকা চাঁদ বনমর্মর।

ওই পাহাড়চূড়ায় শালবনের ছায়ে,
নাচে পাহাড়ী মেয়ের দল নূপুর পায়ে।
বাজে নাগরা মাদল, হিয়া গীতি উচ্ছল,
দিতে পারি নাকি তার সাথে হিয়া মিলায়ে।

যদি নৃত্য জাগে পায়ে বাঁধিয়ো নূপুর,
আমি আড়বাঁশী ভরে দিব রাখালিয়া সুর।
বনচম্পা খুঁজে দিব খোঁপায় গুঁজে,
কানে ঝুম্‌কো ফুলের দুল বন্য বধূর।

তুমি ভাবছ মেয়ে, একি অবাক কথা,
এ যে জংলী মনের আদি উদ্দামতা।
যদি সভ্য দলে গেঁয়ো বন্য বলে,
তবু এই ভাল, চাই নে সে কৃত্রিমতা।

মোরা সভ্য হয়েছি বহু দুঃখ সয়ে,
তাই প্রগতির পরবোঝা মরেছি বয়ে।
নব যুগের আলো শুধু চোখ ধাঁধাঁলো,
তার মূল্য মেটাতে চাই জংলী হয়ে।

এই গাঁয়ের মাটিতে প্রাণ ছড়ায়ে যাব,
এই প্রেমের পুতলি বুকে জড়ায়ে যাব।
দুঁহু প্রীতিরভসে নবজীবন রসে
মোরা শ্যামল তৃণের বুক ভরায়ে যাব!

বালুকণার নবজন্ম

শ্রীমণিকা সিংহ

বস্তুটিকে সত্যি অদ্ভুত বলতে হবে। একে মেঝেয় আছড়ানো যায়, মোচড়ানো যায়। আবার পেরেকও ঠোকা যায় এর ওপর। করাত দিয়ে কাটুন একে, ঠিক যেন কাঠ, পাক দিতে থাকুন, যেন সুতো, কাঠিতে পরিয়ে বুনুন, যেন পশম। জলে ফেলে দিলে এ ভাসতে পারে শোলার মত, কিন্তু ডুবতেও পারে ভারী সীসের মত। কখনও একে দেখবেন নরম যেন রেশম, আবার কখনও শক্ত যেন ইস্পাত। এ কুঁচকে ছোট হতে বা টানাটানির ফলে বেড়ে যেতে জানে না। মরচে বলুন বা কলঙ্ক বলুন, সবার কারসাজি ব্যর্থ এর কাছে। আগুনে পুড়বে না এ কিছুতেই, পচবে না কোন জন্মে।

এলুমিনিয়ামের চেয়ে হাল্কা এ, আবার ঢালাই লোহার থেকেও ভারী। জলরোধক, অগ্নিরোধক, ক্ষয়রোধক, এ বস্তুটি বন্দুকের গুলীও রোধ করতে পারে। এ না থাকলে আমাদের ঘরদোর অন্ধকার হয়ে থাকত, আমাদের স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হ'ত। আর বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থেকে যেত সেই প্রাথমিক পর্য্যায়েই। রান্নার সময় একে প্রয়োজন হয়। ঘরবাড়ী তৈরি করতে, বৈদ্যুত যন্ত্রপাতিতে, সার্জ্জারী, অ্যাষ্ট্রনমি আর কেমিষ্ট্রি, এর প্রতিটি ক্ষেত্রে এ হ'ল অপরিহার্য্য। আজকের কাগজের শিরোনামাগুলির মতই আধুনিক এ, প্রাচীনত্বে কিন্তু মিশরের পিরামিডগুলির থেকে কিছু কম নয়। মানুষের হাতে প্রস্তুত অন্য কোনো বস্তুই এর মত এত কম দামী, প্রচুর ও এমন সহজলভ্য উপাদান থেকে তৈরি হয় না। জিনিসটা কি বলতে পারেন? এ হ'ল বালি থেকে তৈরি সেই অতি আশ্চর্য্যজনক দ্রব্যটি, যাকে আমরা বলে থাকি কাচ।

ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি এমন প্রচুর পরিমাণে বালির সৃষ্টি করেছেন। এত বালি যে সম্ভবতঃ কোনদিনই পৃথিবীতে কাচের স্থায়ী ঘাটতি দেখা দেবে না। এই কাচ জিনিসটা কি? এর ভিতর দিয়ে আমরা যে দেখতে পাই সেটা কিসের ফলে সম্ভব হয়? সাধারণ কাচ তৈরি হয় মোটামুটিভাবে বালি বা সিলিকা থেকেই। কিছু চুন আর সোডাও এতে লাগে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, কাচ নামে এই কঠিন ভঙ্গুর পদার্থটি হ'ল প্রধানতঃ গ্যাস বা বাষ্প। সাম্প্রতিক এক্সরে গবেষণার ফলে প্রকাশ পেয়েছে যে এর আয়তন বা পরিমাণের বেশী অংশটা (শতকরা ৯৫ ভাগ) হ'ল অক্সিজেন, যা কাচকে দিয়েছে স্বচ্ছতা, এবং এর ভিতর দিয়ে চলাচলকারী আলোক-রশ্মিগুলিকে করেছে নিয়ন্ত্রিত। বালির অংশ এতে মাত্র শতকরা ১ ভাগ। এর কাজ হ'ল কারারক্ষীর। অক্সিজেন অংশটিকে বন্দী করে তাকে দিয়ে কাচ তৈরি করানো।

প্রাচীনকালে ভঙ্গুরতার জন্য কাচের ব্যবহার ছিল খুবই পরিমিত। ঐ যুগের মানুষ জানতও না যে, এর জন্য দায়ী কাচ ততটা নয়, যতটা হ'ল কাচনির্ম্মাতা নিজে। এখন আর সকল শ্রেণীর কাচকে নির্ব্বিচারে ভঙ্গুর আখ্যা দেওয়া যায় না। মানবসৃষ্ট বহু বিচিত্র রূপধারী পদার্থগুলির অন্যতম বলে একে গণ্য করা হয়। আজকাল এমন ভাবে একে তৈরী করা হচ্ছে যাতে এ শৈত্য ও উত্তাপ দুটোরই চরম অনায়াসে সহ্য করতে পারে। তীব্র বৈদ্যুত শকও সহ্য হয় এর। ইচ্ছেমত একে এ ভাবেও তৈরি করা যায় যাতে চিরকালের মত এ স্বচ্ছ, অস্বচ্ছ বা অর্দ্ধস্বচ্ছভাবে থেকে যাবে। এমনকি অস্বচ্ছ সেই কাচ এক্সরে, আলট্রাভায়োলেট যে বা অন্যান্য সব রকম হীট-রে প্রতিরোধ করতেও পারে। এক ধরনের কাচ আছে যা বসত-বাড়ী বা আপিস ঘর তৈরি করবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী। আর এক ধরনের কাচ দিয়ে পারাপারের সেতু ও যুদ্ধ-জাহাজ তৈরি হচ্ছে। মোটর গাড়ীর বডি এমনকি বাথার পর্য্যন্ত তৈরি করতে আজকাল কাচ লাগে। এরোপ্লেনের কাঠামো তাও হচ্ছে কাচের। গবেষণাকারীরা দেখেছেন যে কাচ হয় প্রায় হাজার রকমের, আর এর বিভিন্ন নির্ম্মাণ প্রণালী আছে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক।

টেম্পারড কাচ হচ্ছে একখানা কাচের ভারী চাদর যেটা এত মজবুত আর আঘাত সহ্য করতে বা আকস্মিক তাপ পরিবর্ত্তন সহ্য করতে সক্ষম যে তাকে ভাঙা প্রায় অসাধ্য। এ কাচ তৈরি করতে হলে প্রথমে সাধারণ কাচের পাতকে অত্যধিক উত্তাপের সাহায্যে প্রায় নমনীয় করে আনা হয়। তার পরেই হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের তীব্র প্রবাহের মুখে ফেলে একে করা হয় শীতল। ফলে যে কাচ তৈরি হ'ল সেটি কতকগুলি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। এই টেম্পারড গ্লাসের পাতলা একখানি পাত না ভেঙে, না দুমড়ে হাতীর ওজন বইতে পারে। সার্সির কাচ যতটা পুরু এই কাচের তেমনি একটি টুকরো বরফের চাঙড়ের ওপর চাপা দিয়ে তার ওপর ঢালা হয়েছিল গরম সীসে। বরফ ত গলেই নি, কাচেরও অবস্থার কোন তারতম্য দেখা যায় নি। দু' পাউণ্ড ওজনের ইস্পাতের গোলা পাঁচ-ছয় ফিট উচু থেকে সিকি ইঞ্চি পুরু এই কাচের ওপর ফেলে দেখা গেছে তাতে ফাট ধরে নি বা কোনো আঁচড়ও পড়ে নি। টেম্পারড গ্লাস নিয়ে রবারের মত ব্যবহার করুন। তাকে লক্ষবার বেঁকাতে থাকুন। রবার কিংবা কোনও ধাতু হলে এতক্ষণ ক্লান্তি দেখা দিত। টেম্পারড গ্লাসের ওসব বালাই নেই। লক্ষবার হয়ে গেলেও সে আবার নিজের পূর্ব্বোকার আকারে ফিরে যাবে। আমাদের জানা অন্য কোনও পদার্থ এমনটি পারবে না।

কোলকাতার নিউ মার্কেট, যাকে পুরোনো আমলের লোকেরা হগ সাহেবের বাজার বলেন, একটি অতি আশ্চর্য্য প্রতিষ্ঠান। কথায় বলে কোলকাতা সহরে পয়সা ফেললে মাঝরাতেও বাঘের দুধ পাওয়া যায়। নিউ মার্কেটের দোকান বাজার, আর হরেক রকমের মাল দেখে কথাটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দোকান পাট ছাড়াও নিউ মার্কেটে দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে, যথা নানারকম দোকানী ও খদ্দের ধরবার জন্য তাদের অভিনব উপায় অবলম্বন। শোনা যায় সাহেব, ও বিশেষ করে মেম সাহেব দোকানের সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই কোন কোন দোকানী নিজেকে একত্রে ইংরাজী ভাষাভাষী ও বিনয়ী দোকানদার প্রতিপন্ন করবার জন্য হাত নেড়ে বলেন "টেক তো টেক, নট টেক নট টেক, একবার তো সি" অর্থাৎ জিনিষ কিনুন বা না কিনুন, দোকানে এসে একবার দেখে তো যান! দোকানীর এই অভিনব আবেদনে বহু ঘোড়েল খদ্দেরও নাকি ঘায়েল হয়েছে বলে শোনা যায়। মাত্র এক মিনিটের জন্যে দোকানে গিয়ে শেষে ঘণ্টাখানেক পরে হরেক রকম মালপত্তর কিনে খদ্দেরকে বেরুতে দেখা গেছে।

আবার খদ্দেরও নানারকম। কেউ কেউ পুরনো ধরনের ও পুরনো প্যাটার্ণের জিনিষ পছন্দ করেন। আজকালকার বাজারে নিত্যই নতুন জিনিষ আবিষ্কার ও চালু হচ্ছে কিন্তু এঁরা সেই যে পুরনো জিনিষ আঁকড়ে বসে আছেন তো আছেনই তার আর কোন নড়চড় নেই। আর এক ধরণের খদ্দের আছেন যাঁরা নতুন ধরণের জিনিষ দেখলেই তা কিনে যাচাই করে দেখেন। যে কোন সমাজের পক্ষে এ ধরণের লোক বিশেষ দরকার কারণ এঁরা না থাকলে প্রগতি প্রায় বন্ধ হয়ে যাবে এবং নতুনত্বের স্বাদ চলে যাবে। সব নতুন জিনিষই যে ভাল হতে হবে তা বলছি না। আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগে জিনিষ ভাল না হলে বাজারে তা টিঁকতেও পারে না কারণ খদ্দের বিজ্ঞাপন দেখে বা নতুন জিনিষ বলে একবার কিনে পরখ করেই বুঝবে এবং ভাল না হলে দ্বিতীয়বার আর কিনবে না। আজকের এই দ্রুত বৈজ্ঞানিক যুগে ভালো নতুন জিনিষ আমাদের সংসারে রোজই প্রায় আসছে এবং স্থায়ী হয়ে যাচ্ছে। ধরুন পেনিসিলিন কদিনই বা বেরিয়েছে কিন্তু আজ ঘরে ঘরে ডাক্তাররা ব্যবহার করছেন। ইংরিজীতে একে বলা হয় ওয়াণ্ডার ড্রাগ বা অত্যাশ্চর্য্য ওষুধ। বিশ বছর আগে কজনের ঘরে নাইলনের জামাকাপড়, প্ল্যাষ্টিকের জিনিষ ছিল? অথচ আজ এ সব জিনিষ কত হাজার হাজার পরিবারে স্থান পেয়েছে। তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বনস্পতি। বনস্পতি, বিশেষ করে ডালডা বনস্পতি আজ দেশের লক্ষ পরিবারে নিত্য ব্যবহার হচ্ছে তার প্রধান কারণ ডালডা বনস্পতি ভালো জিনিষ।

বনস্পতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সরকারী গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং নিশ্চিন্ত হয়েছেন। ডালডা বনস্পতি স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো কিনা একথা অনেকেই প্রশ্ন করেন। এর উত্তর হচ্ছে ডালডা বনস্পতি ভালো না হলে আজ ঘরে ঘরে তার এতো আদর হোতনা। ঘি অতি উত্তম জিনিষ, কিন্তু আজকাল খাঁটী ঘি সাধারণ লোকে যে দামে কিনতে পারে, সে দামে সবসময় পাওয়া মুস্কিল। তাই রোজকার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি ব্যবহার করুন। জানেন কি ডালডার প্রতি আউন্সে ৭০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়, যা ভাল ঘিয়ের সমান? ডালডা স্বাস্থ্যের জন্যে তাই এতো ভালো। ডালডা শুধুমাত্র খাঁটি ভেষজ তেল থেকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী হয়। ডালডা সর্বদাই শীল করা ডবল ঢাকনা'ওলা টিনে পাওয়া যায়। ডালডায় সব রান্নাই মুখরোচক হয়। নিশ্চিন্ত মনে ডালডা বনস্পতি কিনুন—জানেন তো ডালডা শুধুমাত্র খেজুর গাছ মার্কা টিনে পাওয়া যায়—সর্বদা দেখে কিনবেন।

ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ে যাওয়া বস্তু মাত্রেরই ধর্ম্ম। কাঁচের নয় কিন্তু। ক্ষয় কাকে বলে এ যেন জানেই না। কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাঁচের পাইপ ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, বছরের পর বছর তা কাজ দিচ্ছে। অন্য সব রকমের পাইপের পরমায়ু সেখানে মাত্র ৬০ দিন। ইতিমধ্যেই বহু ডেয়ারী ফার্ম্ম, ফুড ফ্যাক্টরী ও বীয়ারিজ প্লান্টগুলিতে ষ্টেনলেস ষ্টীলের পাইপের বদলে কাঁচের পাইপ দিয়ে দুধ, ফলের রস বা ড্রিঙ্কস্ এল্ পাম্প করে পাঠান আরম্ভ হয়ে গেছে। ষ্টেন্‌লেস ষ্টীলের পাম্প যেখানে টিকত মাত্র কয়েক মাস, সেখানে পাঁচ বছর আগে লাগানো ৬টি কাঁচের পাম্প এখনও কাজ দিচ্ছে এবং ক্ষয়ের কোনও লক্ষণই তাদের দেখা দেয় নি! ইলেকট্রিক্ ওয়েল্ডিংয়ের নূতন প্রণালীর সাহায্যে মিস্ত্রিরা এখন ধাতু ঝালাইয়ের মতই অনায়াসে কাঁচের সঙ্গে কাঁচকে ঝালাই করে জুড়তে পারে। কাচের স্প্রাংও হয়। এ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট শুনুন, 'বৈজ্ঞানিকেরা আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, একটা কাঁচের স্প্রীংকে ৫০০,০০০,০০০ বার টানাটানি করবার পরও তাতে কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। টেম্পারড গ্লাস জিনিষটা এত কঠিন যে, কোনও মতে একটা আঁচড় এর গায়ে বসাতে পারলেই সমস্ত কাচটা অসংখ্য কোটি ছোট ছোট টুকরা হয়ে যায়। কিন্তু এ টুকরাগুলি কারও কোনও ক্ষতি করে না। যদিও এ ব্যাপারটা ঘটবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

কাঁচের সুতা—অবিকল রেশমী সুতার মত নরম ও নমনীয়—এখন আর কল্পনার বস্তু নয়! আধুনিককালে ফাইবার্ গ্লাস কি ভাবে তৈরী হয় শুনুন। প্রথমে গলানো কাঁচকে খুব সূক্ষ্ম ছেদা দিয়ে চুঁইয়ে পড়তে দেওয়া হয়! সেই চোঁয়ান ধারাটিকে এবার উচ্চ চাপের ষ্টীম্ বা বায়ুর ঝাপটা দিয়ে তুলে নেওয়া হয়, ও সেই টানে এটি ক্রমে মিহি দীর্ঘ সুতায় পরিণত হয়। এই ফাইবার্ বা সুতোগুলির পরিধি হ'ল '০০০২৭ ইঞ্চি, অথবা বলতে পারেন মানুষের মাথার চুলের পনের ভাগের এক ভাগ পুরু এগুলি। এক পাউণ্ড ওজনের এই সুতো পৃথিবীকে একবার পাক দিয়ে আসবে। এই সুতোগুলির প্রত্যেকটি হ'ল নিরেট কাঁচের এক একটি দণ্ড; কাচের সব গুণই আছে এদের মধ্যে। এ সুতা তাপ নিরোধক, অদাহ্য, জলশোষক নয়, পচে না বা ক্ষয় হয় না; অ্যাসিড, তেল, আর ক্ষতিকারী বাষ্প একে কিছুই করতে পারে না।

এক খাঁজলা কাচের টুকরো হাতে তুলে নিয়ে দু'হাতে চটকাতে থাকুন। কি, ভয় পাচ্ছেন নাকি? কাচের পশম নিয়ে এভাবে চটকে দেখুন, কিছু ক্ষতি হবে না হাতের। এ পশম রবার স্পঞ্জের মত নরম। এত হালকা এ জিনিষটি যে সম আয়তনের নিরেট কাচের থেকে ওজনে দশ গুণ কম। এই কাচে শতকরা নিরানব্বই ভাগ অক্সিজেন আছে, আর বাকী এক ভাগ কাচ। এই কারণেই পশম সকল ঋতুতেই তাপ ও শৈত্য দুয়েরই উৎকৃষ্ট অপরিবাহী। শীতের দেশে ঠাণ্ডা যখন হিমাঙ্কের চল্লিশ ডিগ্রী নীচে, তখন এই পশমের লাইনিং দেওয়া একটি মাত্র কোট আপনাকে গরম রাখবে বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়ে থাকে। অন্যদিকে আবার উনত্রিশ পাউণ্ড ওজনের একটি স্যুট—যা কাচের ফাইবার দিয়ে তৈরী তা পরে একজন লোক জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর পুরো দেড় মিনিটকাল থেকে, ২৪০০ ডিগ্রী ফারেনহিট উত্তাপ সহ্য করে স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে আসতে পারে।

বর্ত্তমান যুগে শক্তির প্রতীক হ'ল ইস্পাত। কিন্তু ওজনের অনুপাতে টান সইবার ক্ষমতা কাচের ফাইবারের ঢের বেশী। এই ফাইবারের পরিধিতে মোটে এক ইঞ্চির ২৩/১০০০০০ অংশ হলেও তার এক বর্গইঞ্চি ২৫০,০০০ পাউণ্ডের টান সইতে পারে। কতকগুলি ফাইবার এক করে পাকিয়ে যে সরু দড়ী তৈয়ী হয়, তা দিয়ে কয়েক হাজার পাউণ্ডের মাল ওঠানামা করান যায়। এই সুতোয় বোনা হোস-পাইপ সাধারণ পাইপের চেয়ে প্রতি একশত ফুটে কুড়ি পাউণ্ড হালকা হয়, অথচ টেকে বেশী দিন, আরও ঘনসম্বদ্ধ, জলে ভিজে ভারী হয় না বা অত্যধিক শীতে জমে গিয়ে অকেজো হয়েও পড়ে না।

কাচের ফাইবার ক্রমেই ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, পিতল, ব্রোঞ্জ এবং ঢালাই লোহার ব্যবহার উঠিয়ে দেবে। ধাতু নয় এখন বস্তুর বিভাগে কর্ক, নকল প্ল্যাষ্টিক, অ্যাসবেষ্টস, রেয়ন, রবার, তুলো আর লিনেন, এদের সব কয়টির পরিবর্ত্ত হিসাবে স্থান গ্রহণ করবে এ। বহুরূপী এই ফাইবারের ব্যবহার এড়িয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবন চালান অসম্ভব। চেয়ার-টেবিলের ঢাকা, দরজা-জানলার পর্দা, কাপড়-চোপড়, বাড়ীর আসবাবপত্র, মোটরের বাম্পার, লাগেজ ক্যারিয়ার ও গাড়ীর অন্য সাজসজ্জা সবই আজ তৈয়ী হচ্ছে বালি হতে সৃষ্ট এই বিস্ময়টি থেকে।

বালির সাগর সেঁচে পাওয়া গেছে আর একটি নিধি—ফোম গ্লাস। বাড়ীঘর তৈরীর উপাদানগুলির মধ্যে এবং তাপরোধক পদার্থগুলির মধ্যে সবচেয়ে হালকা এ। কাচের গুঁড়োর সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লিষ্ট কার্ব্বণ মিশিয়ে সেই মিশ্রণকে একটি ছাচের মধ্যে পুরে অত্যধিক উত্তাপে গরম করা হলেই দেখা যাবে ময়দার মিহি সেই পদার্থটা গলে গিয়ে কালো ফেনার মত দেখাচ্ছে। ক্রমে সেটা বাড়তে বাড়তে সমস্ত ছাচটা ভরে ফেলবে। ঠাণ্ডা হলে জিনিষটা যখন জমে যাবে, তখন দেখবেন মৌচাকের মত এটি অসংখ্য গর্ত্তের সমষ্টি। এর প্রতি ঘনফুটে রয়েছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের লক্ষ লক্ষ কোষ, কাচের অতি সূক্ষ্ম আবরণে পরস্পরের থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। আমাদের অবাক করে দেওয়া এই জিনিসটি সাধারণ কাচের চেয়ে ওজনে দশগুণ কম। এ আবার জলে ভাসতে পারে ঠিক কর্কের মত। আজকাল বাহাদুরী কাঠ আর সচ্ছিদ্র রবারের স্থলে প্রায়ই ফোম গ্লাসের ব্যবহার হচ্ছে। আগুন, স্যাতানি এবং পোকামাকড় সব কিছুই প্রতিরোধ করতে পারে এ। সেই জন্যেই এ দিয়ে আজকাল ঘরের ছাদ বা মেঝে তৈরির সুবিধে। ইট গাঁথা বা ঢালাই কংক্রীটের সব রকমের দেওয়ালে বাইরের তাপ রোধ করবার জন্যে এই কাচ ব্যবহার করা হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, নিকট-ভবিষ্যতে পৃথিবীতে প্রায় দশ হাজার বিভিন্ন রকমের কাচ পাওয়া যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিভাগে দরকার লাগবে এদের। ট্যাবুলেটিং মেশিন, উনানের দরজা, বিজ্ঞাপনের চিহ্ন, নাচঘরের মেঝে, ঘর ছাইবার টালি, ফুড ডিহাইড্রেটর ইত্যাদি কাচ থেকে তৈরি হবে। রেডিও রেকর্ডিং ডিসকের মাঝের অংশ, সার্জ্জিক্যাল স্পঞ্জ ও ব্যাণ্ডেজ এ থেকেই হতে পারবে। কৃষকদের জন্যে বোরণ সমন্বিত এক রকম অতি মূল্যবান সার; কারিগর ও ছুতারদের জন্যে হাতুড়ি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি—যা লোহার যন্ত্রগুলি থেকে বেশী টিকবে। খোঁড়ার জন্যে নকল পা—যার সঙ্গে আসল পায়ের তফাৎ বুঝা দুষ্কর এবং যেটির একটিতেই সারাজীবন কেটে যাবে; কেনাকাটা করতে বেরিয়েছে যারা তাদের জন্যে কাচের লাইনিং দেওয়া রেফ্রিজারেটর ব্যাগ—যা ঠাণ্ডা খাবার বা আইসক্রীম ইত্যাদিকে নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে দেবে; এ সবই কাচের কীর্ত্তি।

কেউ কেউ আবার এমন নিখুঁত কাচের কথা বলেছেন যাতে এক টন উপাদানের মধ্যে বালির একটি দানার এদিক-ওদিক হলেই সেটি দোষগ্রস্ত হয়ে পড়বে। এরকম কাচের ভিতর দিয়ে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি যাওয়া-আসা করে। কর্নিং গ্লাস ওয়ার্কস এমন স্বচ্ছ চশমার কাচ তৈরি করেছে যার দশ ফুট পুরু দেওয়ালের ওপার থেকেও খবরের কাগজ পড়া যায়। চশমা আজকাল তৈরী হচ্ছে পোল্যারাইজড লেন্স দিয়ে, যা চোখ-ধাধান আলো বা তার প্রতি-ফলকে গ্রহণ করবে না। কাচের ভেতর দিয়ে মানুষ লক্ষ্য করছে অতি দূরের নক্ষত্রের গতি আর অতি কাছের জীবাণুদের নড়াচড়া। জানলার কাচের শার্সী দিনের বেলায় লক্ষ লক্ষ ডলার দামের আলোকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। রাত্রে ইলেকট্রিক বাল্ব-গুলি মানুষের কাজের জন্যে আর খেলার জন্যে যে আলো জোগায় তারই বা দাম কত! কাচ থেকে তৈরী হয় যন্ত্রপাতির জুয়েল, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির বেয়ারিং, এত কাল যার জন্য লাগত স্যাফায়ার নামে দামী পাথর। এই অতি প্রয়োজনীয় কাচের একটি টুকরো, মাপে মোটে আলপিনের আগার মত, তার ওজন হ'ল এক আউন্সের এক সহস্রাংশ ভাগ, আর পরিধি এক ইঞ্চির শতকরা সাত ভাগ। এর সঙ্গে তুলনা করুন মাউণ্ট পালোমারে অতিকায় দূরবীণের কাচের চোখটির। ওজনে এটি ২০ টন, পরিধি ১৭ ফুট। এটি টেম্পার করতে লেগেছিল প্রায় এক বছর, এবং পালিশ করতে কয়েক বছর। এবার বোধ হয় এই বহুরূপীর বিচিত্র রূপের একটা আভাস পাচ্ছেন।

কাচের এখন সুবর্ণ যুগ চলেছে। এর এত সমাদর পাওয়ার অসংখ্য কারণগুলির মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি বলা গেল। ★ চ

না হলে এ জগতের কি হ'ত তা ভাবুন একবার। বিজ্ঞানের দিক থেকে বা কারিগরী কৌশলের দিক থেকে কাঁচের সাহায্য না পেলে জগৎ আজ কোথায় থাকত? ভাবুন ত একবার কঠিন পরিশ্রমে তৈরী, বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নিখুঁত, সেই অপ্টিক্যাল গ্লাসগুলির কথা। এগুলি আজ শুধু চশমা, টেলিস্কোপ, বাইনাকুলার, ফোটোগ্রাফিক লেন্স, মোশন-পিক্‌চার-প্রোজেক্টর, ষ্টীরীওস্কোপ ইত্যাদি তৈরী করতেই লাগে না,* বিজ্ঞান ও গবেষণার কত যন্ত্র—আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অসাধারণ—যেমন কন্‌টুর খেজারিং প্রোজেক্টর, অপ্টিক্যাল প্রোট্র্যাক্টর, মাইক্রো-প্রোজেক্টর এবং এক্সরে ষ্টীরীওস্কোপ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি কাচ না হলে হবেই না। মানুষের কাছে কাচের দাম কি বুঝুন তা হলে।

১৯৫৩ সালে শুধু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই ১ বিলিয়ন সংখ্যক (১,০০০,০০০,০০০,০০০) ইলেক্‌ট্রিক বালব ও টিউব তৈরী হয়েছিল। আর এর সঙ্গে ১৮০০০০০০ আলোর চিমনী এবং প্রায় আর এক বিলিয়ন গেলাস আর অন্যান্য পানপাত্র। কর্নিং গ্লাস ওয়ার্কস নামে নিউইয়র্কের কারখানাটি একাই প্রায় ৬৫০০০ বিভিন্ন রকমের কাঁচের জিনিষ তৈরী করে। মাত্র এক বছরেই ১২১,৫০০০,০০০ গ্রোস কাচের পাত্র—যার দাম হবে প্রায় ৬০০,০০০ ০০০, ডলার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রান্তে, বাড়ী-ঘর-দোকানের তাকে আশ্রয় পায়। এইগুলি ব্যবহারের ফলে কাচের প্যাক্ করা দ্রব্য-গুলির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় ১৪,৫০০,০০০,০০০ ইউনিটে। নর-নারী ও শিশু নির্ব্বিশেষে মাথাপিছু পড়ে প্রায় ৪৬৫টি কাঁচের দ্রব্য এক বছরে ব্যবহারে লাগে। আমেরিকার ৩০০ কাঁচের কারখানার মধ্যে মাত্র ৯টিই ১,৭০০,০০০ বর্গ ফুট কাচ তৈরী করে। গোড়ার দিকে এ ব্যবসাটি ছিল কাঁচের মতই পল্কা। এখন কাচ যেমন শক্ত হয়েছে, তেমনি এর ব্যবসাও বছরে দুই বিলিয়ন ডলার লাভের একটি শক্তসমর্থ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষুদ্র বালুকণা, কিন্তু তাতে কত না বিস্ময়! তবু জেনে রাখুন বর্ত্তমানের এই প্রতিষ্ঠা তার ভবিষ্যতের আভাষ মাত্র। আগামী দিনের লোকেরা সুদীর্ঘ কাল টেম্পারড কাচের বাড়ীতে আরামে বাস করতে পারবে, বদ-লোকের ঢিল ছোঁড়ার ভয় না রেখেই।*

* ওয়াচ টাওয়ার বাইবেল অ্যাণ্ড ট্র্যাক্ট সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা 'Awake' হতে।

শ্রাবণে বিরহিণী

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

শ্রাবণ মাস উত্তর হিন্দুস্থানের নারীদের হাস্তে, লাস্তে, সঙ্গীতে, নৃত্যে মুখরিত হয়ে যায়। চুনট করা ভারী ঘাঘরা চলবার তালে ছন্দ রেখে দুলে দুলে উঠে। পায়ের পায়েল বেজে উঠে রুণুঝুণু, ঝিন্‌ঝিনে রঙীন ওড়নার নীচে বিদ্যুত চমকের ন্যায় কাজলটানা আঁখি ঝিলিক দিয়ে উঠে, পথিক দিগভ্রান্ত হয়ে যায়। শ্রাবণের বারিধারা, মেঘমেদুর আকাশ নারীদের মনে কোন্ এক বিরহের বার্ত্তা বয়ে আনে। বর্ষার বারিধারায় সিক্তা ধরণী শ্যামলশ্রী ধারণ করে। প্রকৃতি মখমলের মত মসৃণ সবুজ আস্তরণ বিছিয়ে দেয় উন্মুক্ত প্রান্তরে। সেখানে রূপের হাট বসে যায় শ্রাবণ অপরাহ্নে, সুউচ্চ বটের শাখে নিমের শাখে হিন্দোল দুলতে দুলতে কাজরী গাইতে গাইতে প্রিয়-বিরহিণী তরুণীর মন উদাস হয়ে যায়, ছুটে যায় নিমেষে দূরে, দূরে বহু দূরে যেখানে প্রিয় তার কল্পনায় বিভোর হয়ে আছে।

আষাঢ়-শ্রাবণ মাস বিরহ গাথার জন্য প্রশস্ত। নানা কবি এই আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের বর্ণনায় বিরহিণী নারীদের হৃদয়ের ছবি আমাদের চোখের সামনে ধরে তুলেছেন। প্রায় সব পল্লীগীতির পদাবলীতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিরহের বর্ণনার ভিতর দিয়ে নারীরা নিজেদের হৃদয়চিত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে। পৌষ মাসে মিথিলার উৎসবে নারীরা যে সব আনন্দগীতি গেয়ে থাকে তার মধ্যে "বারহমাসা" গীতিগুলিতে প্রত্যেক কবি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রাবণের রূপ বর্ণনা করেছেন আর তাতে বিরহিণী রাধারূপিণী নারীদের হৃদয়জ্বালা ব্যক্ত হয়েছে।

শ্রাবণ মাস, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অবিরাম ভেকের ডাক বিরহিণীর মন উদাস করে তোলে, শ্রাবণ সন্ধ্যা এক বিষণ্ণতায় ভরে উঠে। অন্ধকার রাত্রিতে নিজেকে মনে হয় বড় একাকিনী, তাই মৈথিলী বিরহিণী প্রিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

সাওন অহিনিশি বরিস বাদরি
সুন পহুঁ বিনু খাট রে
কত দিনা গত ভেল হে সখি
সুন পহুঁ কর খাট রে।

শ্রাবণে অনবরত বারি ঝরছে, আমার শয্যা প্রিয়তম বিনা শূন্য। সখি কত দিন হয়ে গেছে আমার এ শয্যা অমনি শূন্য পড়ে আছে।

সাওন সখি সব ভাবে হিণ্ডোরা
ঝুলি ঝুলি বহয় পিয়া সঙ্গমে
হম্ ধনি সোচত ঠাড়ি অটরিয়া
হমরো বিরহ তন দয় কুবরী
দাদুর মোর মদন সর ভোদর
উঠত বিরহ তন গাও জরী।

শ্রাবণ এসে গেছে, সখিরা গাছের ডালে হিন্দোলাতে প্রিয়তমের সঙ্গে দুলছে, আর আমি শুধু একা আমার অট্টালিকায় দাঁড়িয়ে, হে প্রিয়তম, তোমার কথা ভাবছি। কুব্জা আমাকে তোমার কথা বলে বলে বিরহাকুল করে তুলেছে। ময়ূরের কেকারবে, আর ভেকের ডাকে আমি বিরহ জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি, এ অন্ধকার রাত আমার কি করে কাটবে, আমার ঘনশ্যাম কৃষ্ণ ত এল না।

সাওন সখি সব শ্যাম ঘটা সখি
সাজত সকল সিংগার
সন্ সন পবন লগায় সব ওর মে
তেজি গেল তরুণি গয়ার
পরদেশি মনমোহন রে।

শ্রাবণের আকাশে ঘনঘটা, বাদল ঘিরে এসেছে, দেখে সব সখীরা নিজ নিজ দেহ অলঙ্কারে সুশোভিত করছে। সন্ সন্ করে বায়ু বইছে আর তীরের মত এসে তরুণীর হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। হায়, প্রিয়তম তরুণীকে ছেড়ে পরদেশে চলে গেছে।

সাওন সুন্দরি সেজ কাঁপত
পঞ্চসর সত সাজি ইয়ো

সরস বণিতা সব সন্তায়োল
অজহু পতি নহি আয় ইয়ো।

শ্রাবণ মাস এসেছে, সুন্দরী শয্যার উপর বিরহানলে কেঁপে কেঁপে উঠছে। শত পঞ্চশরের জ্বালায় দেহ জর্জ্জরিত। হায় আজও সুন্দরীর পতি এল না।

সাওন সর্ব্ব সোহাওন সখি রে—
ফুললি বেলি চমেলি ইয়ো।
রমসি সৌরভ ভ্রমর ভ্রমি ভ্রমি
করয় মধুরস কেলি ইয়ো।
আ রে কেলি করথু পহু মন দয়
সখি অধিক বিরহ মন উপজয়।

সখি, শ্রাবণ সর্ব্বত্র শ্যামলশ্রী ধারণ করেছে, বাগানে বেলী চামেলী প্রস্ফুটিত হয়েছে, ভ্রমর উড়ে উড়ে ফুলের মধুপান করছে, তার গুঞ্জন তুলে ফুলের সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছে। সখি, এ সব দেখে মনে হচ্ছে আমার প্রিয়তমও এ ভাবে আমার প্রেমের খেলা খেলুক, আমি বিরহানলে দগ্ধ হচ্ছি।

আয়ল সাওন মেঘ বরিসত
ঘুমড়ি ঘোর সমীর ইয়ো
সুমরি যৌবন ওমড়ি আওত
প্রাণপতি নহি সাথ ইয়ো।

শ্রাবণ এসেছে, ঝম্ ঝম্ করে বারি ঝরছে, তীব্র বেগে বায়ু বইছে, হায়, আমার প্রিয়তম আমার সঙ্গে নেই ভাবলেই মনে হয় আমার এ জীবন যৌবন বৃথা।

সাওন সুন্দরি সজত সিংগার
শ্যাম বিনা সব শোক অপার
বাদল বরিসে নাচে বন মোর
পিউ পিউ রটত পপিহা চহু ওর
পিয়া নহি আওয়ে
মোর কন্ত দুরন্তর ছায় প্রীতি শর লাগে।

শ্রাবণ মাস, সুন্দরীরা সাজসজ্জা করছে। শ্যাম নেই। তাঁর শোকে আকাশে গুম্‌রে গুম্‌রে মেঘ ডেকে উঠছে, বৃষ্টি পড়ছে, চার দিকে পাপিয়া পিউ পিউ করছে, এখনও প্রিয় এলো না। আমার প্রিয়তম দূর দেশে, তাঁর প্রীতির বাণ আমাকে জর্জ্জরিত করছে।

সাওন সব সোহাওন
কানন বোলে মোর
তাপর দছিন পবন বহে
কঠিন হৃদয় পিয়া তোর।

শ্রাবণের চারদিকে সুন্দর শ্রী, কাননে ময়ূর ডাকছে, দখিনা বাতাস বইছে. হে প্রিয়, তোমার বড় কঠিন হৃদয়, আজো তুমি এলে না।

সাওন শরদ সোহাওন রে
বরষে দিন রাতি
ঝিঙুর দেত ঝোকরা রে—
সালৈ মোর ছাতী।

শ্রাবণ সর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন, দিনরাত বারি ঝরছে, ঝি ঝি পোকা ঝঙ্কার তুলছে, আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সাওন রিমঝিম মেঘ বরিষয়
জোর স ঝরি লাওঠী
চহু ওর চকিত মোর বোলে
দাদুর শব্দ সুনাওহী।

শ্রাবণ মাস, রিমঝিম করে মেঘ বারিবিন্দু হয়ে ঝরছে, জোরে বৃষ্টির ফোটাগুলি নাচানাচি সুরু করেছে; চারদিক সচকিত করে ময়ূর কেকারব তুলেছে। ভেক ডেকে চলছে।

সাওন হে সখি শব্দ সুহাওন
রিমঝিম বরসত বুঁদ হে
সবকে বলমুয়া রামা ঘর-ঘর আয়ল
হমরো বলমু পরদেশ হে।

হে সখি, শ্রাবণ মাস, মধুর আওয়াজে, রিমঝিম করে বৃষ্টিবিন্দু ঝরছে। সবার প্রিয়তম ঘরে ফিরে এসেছে, শুধু আমারই প্রিয়তম পরদেশে আছে।

হরি বিনু মোহি চন্দ্রিকা ভায
হার মোতিয়ন কে
রতন সিংহাসন রেশম ক ডোর
মোতিয়ন ঝালর লগয় চহু ওর
গরত হিণ্ডোরা
সাওন মাস গহি গহি ঘহরয়
সাথয়ন কে বাঁহ
মাঝ বহলাওয়ে—

হে সখি, হরি বিনা, চন্দ্রিকা আর মোতির হার ভার মনে হচ্ছে। রত্নসিংহাসনে রেশমের সুতোয় মোতির ঝালর গাঁথা, তবু ঐ হিণ্ডোরা কণ্টকসম লাগছে। শ্রাবণ মাস ঘড় ঘড় করে মেঘ ডাকছে। সখীদের প্রিয়তম তাদের বাহু বেষ্টন করে দোলায় বসে দুলছে, হে সখি ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণ বিনা রাধা বিরহে আকুল হয়ে উঠেছেন।

সাওন হে সখি লিখল পাতী
ওঠো পঠয়ল মোহিহে
চলহ সখি সব ঘাট যমুনা
দেখ ও কদম, চড়ি বাট হে।

হে সখি, শ্রাবণে আমি প্রিয়তমকে লিপি লিখে উদ্ধবকে দিয়ে পাঠিয়েছি। সখি, সবে চল যমুনার ঘাটে যাই, কদম্বগাছের ডালে বসে তার পথ চেয়ে থাকি।

বুন্দেলখণ্ডে নারীদের পল্লীগীতির মধ্যে শুধু বিরহ নয়, আমরা নানা ধরনের ভাব প্রকাশ দেখতে পাই। তারা সহজ সরল ছন্দে বাক্যে নিজেদের গ্রাম্যজীবনের রূপ ফুটিয়ে তুলেছে।

শ্রাবণ মাস, চাষীবধূরা আকাশের দিকে চেয়ে আছে, বর্ষার বারিধারার উপর চাষীদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করছে, তাই চাষীবধূ গেয়ে বলছে :

চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান

আর রাম্য, ওই ঘন ঘোর, বদরিয়াকারী রে হারী
অগম দিশা ... হ্যায়, পচ্ছম বরস গয়ে মেহ,
বদরিয়া কারীরে হারী।

হে রাম, গগনে ঘনঘটা, কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, উত্তর দিকের আকাশ মেঘে ঢেকে রেখেছে, পশ্চিম দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, চারদিকে বাদল ঘিরে এসেছে।

চাষী বউ ক্ষেতে কাজ করতে করতে গাইছে—

গোঁওরে জুনরিয়া রে অরে জিন বয়ো
কে রখবরিয়া জায়।
হমদূর জ্যাই হেঁ মায়কে
তোরে ভুণ্টা বরেদী খাঁয়।

কৃষকবধূ দূরে পিত্রালয়ে যাবে মায়ের কাছে, তবু মনে শান্তি নেই, সে চলে গেলে নিজের ক্ষেতকৃষি কে দেখবে তাই স্বামীকে ডেকে বলছে, গাঁয়ের পাশে জোয়ার বুনতে যেও না, কে তোমার ক্ষেত পাহারা দিবে, আমি মায়ের কাছে দূরদেশে চলে যাচ্ছি, তোমার ভুট্টা পোকাতে পেয়ে ফেলবে।

সদা নে তুরৈয়া অরে ফুলে, নে সদারে সাওন হোয়
সদা নে রাজা অরে রণ জুঝে, সদা ন জীবে কোয়।

সর্ব্বদা ঝিঙে গাছে ধরে না, শ্রাবণমাসও সর্ব্বদা থাকে না, সর্ব্বদা রাজা যুদ্ধ করে না, আর চিরকাল কেউ বেঁচেও থাকে না।

গ্রাম্যনারীরা এই দুটি পংক্তিতে সহজ সরল উপমা দিয়ে চিরকাল কেউ বেঁচে থাকে না, এই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশ করেছে।

অঙ্গনা সুখে সুখেন রে, বন সুখে কচনার
গোরী ধন সুখেরে কোই হীন পুরখ কি নার।

অঙ্গন শুকনো খটখটে, বন শুকিয়ে গেছে, আমাদের গোরী ধনও শুকিয়ে গেছে, হায় সে কোন হীন পুরুষের নারী।

চৌক চলাই অরে বন্ধু, বহাঁ জাত হো
করিয়া নে গৈল কাটি করিয়া নে।
সুহরী শাস কে দুখ দুদয়ে, বালম মিলে নাদান।

ও বধূ, আলপনা দিয়ে কোথায় চলে যাচ্ছ? কঠিনপ্রাণা শাশুড়ীর দেওয়া যন্ত্রণা ত আছেই, তদুপরি স্বামীও একেবারে অজ্ঞান। তবু ঘরের আলপনা দিয়ে তার কাজ শেষ করে এসেছে, এবার সে ঘরে ফিরে যাবে।

বুন্দেলখণ্ডে শ্রাবণ মাসে গৈরে নামে এক প্রকার নৃত্যগীতের প্রচলন আছে। নারীরা ব্রজের কৃষ্ণের রাসলীলার নকল করে হাতে ছোট ছোট কাঠি নিয়ে চটাচট বাজিয়ে নাচতে নাচতে গান গায়, গানে সখীদের উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে।

পুস্তক পরিচয়

মা হওয়ার আগে ও পরে—রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। প্রার্থনা পাবলিশার্স, ৭নং দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য আড়াই টাকা।

আমাদের পারিবারিক তথা সামাজিক জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিবার জন্য পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আজ বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে। সুপ্রজনন এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সন্তানপালন ইহার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সর্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থরচনার প্রস্তাব উত্থাপিত হয় পরলোকগত মেজর জেনারেল এ, সি. চ্যাটার্জ্জি কর্ত্তৃক এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত "শারীর বার্ত্তিক ও বাস্তব প্রয়োগ"-এর অধ্যায় লিখিবার ভার অর্পিত হয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং কৃতি চিকিৎসক ডক্টর শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয়ের উপর। যোগ্য ব্যক্তিকেই যে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল সমালোচ্য গ্রন্থখানির ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভবিষ্যতে যাহাতে জাতির সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায় সেজন্য আজিকার দিনে আমাদের দেশে পরিকল্পনার আর অন্ত নাই। কিন্তু জাতির ভবিষ্যত যাহাদের হস্তে সেই শিশুদের এবং তাহাদের জীবনগঠনের ভার মুখ্যতঃ যাঁহাদের উপর ন্যস্ত সেই মায়েদের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ব্যবস্থাই যে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে এখনো পর্য্যন্ত আমরা সম্যক সচেতন হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বস্তুতঃ, এক্ষেত্রে অন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের তুলনায় আমরা যে কতদূর অনগ্রসর তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। সুখের বিষয় এ বিষয়ে আমাদিগকে অবহিত করিয়া তুলিবার জন্য এমন একজন বৈজ্ঞানিক লেখনী ধারণ করিয়াছেন, চিকিৎসাবিদ্যায়ও যাঁর ব্যুৎপত্তি গভীর। "যাঁহারা মা হইয়াছেন, যাঁহারা হইতে চলিয়াছেন আর যাঁরা ভবিষ্যতে হইবেন" তাঁহাদের সকলের পক্ষেই উপযোগী যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সমালোচ্য পুস্তকখানিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং কার্য্যকরী পন্থার নির্দ্দেশসমূহ এমন সহজ সরল ভাষায় প্রদত্ত হইয়াছে যে, তৎসমুদয় সামান্য লেখাপড়া-জানা মায়েদেরও অনায়াসে বোধগম্য হইবে। সাহিত্যিক গুণপনার গুণে নীরস বিষয় যে কিরূপ চিত্তাকর্ষক ভাবে পরিবেশিত হইতে পারে ডাঃ পালের পুস্তকের বহুস্থানে তাহার স্বাক্ষর রহিয়াছে।

পুস্তকখানি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে আছে বিবাহ ও যৌনমিলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে যৌনমিলন গর্ভরোধক ব্যবস্থা, গর্ভাবস্থায়-যৌনমিলন. ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে, তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে গর্ভাধান প্রক্রিয়া ও সন্তান প্রসবের বিষয়, চতুর্থ অধ্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে বিস্তারিত ভাবে। পুস্তকের ষষ্ঠ, অষ্টম এবং নবম এই তিনটি অধ্যায় সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। এগুলিতে গর্ভিনীর স্বাস্থ্য ও গর্ভিনীর উপযুক্ত খাদ্যতালিকা, শিশুর খাদ্য এবং শিশুর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রত্যেক জননীর পক্ষে গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মোটের উপর "মা হওয়ার আগে ও পরে" এমন একখানি বই, ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া উচিত। বইখানি মায়েদের পক্ষে অপরিহার্য্য তো বটেই, সুস্থ এবং সুখী পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি যাঁহাদের কাম্য তাঁহাদের প্রত্যেকের পক্ষেই ইহা সযত্নে পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

ভারত পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)—শশিপদ সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ১৪৯ ছাওয়ানগাছি রোড, বালি, হাওড়া। মূল্য—৪৲ টাকা।

বাংলা সাহিত্যে রসোত্তীর্ণ ভ্রমণকাহিনী কয়েকখানি আছে। যেগুলির মধ্যে কোন কোনটি নিছক ভ্রমণ কথা নহে কাহিনীসুলভ রোমান্সে রমণীয় এবং নানা রসের মিশ্রণে জারিত, সেগুলি পাঠকমহলে সমাদৃত। নির্ভেজাল ভ্রমণবৃত্তান্তও কিছু আছে যাহার সাহিত্যমূল্য বিদগ্ধ সমাজে স্বীকৃত। আলোচ্য গ্রন্থখানি কোন পর্য্যায়ের তাহা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়াছেন কবিশেখর কালিদাস রায়। ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, এই গ্রন্থ সাহিত্যগ্রন্থ নয়। সাহিত্যানুরাগীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ইহা রচিত হয় নাই। ইহা তথ্যান্বেষী ভ্রমণকারীদের জন্য রচিত হইয়াছে।

সুতরাং ভারত-পরিক্রমার গোত্র প্রচলিত ভ্রমণকাহিনী হইতে পৃথক। ইহাতে ভ্রমণোপযোগী তথ্য আছে, মন-ভরানো কাহিনী নাই।

অতি বৃহৎ দেশ এই ভারতবর্ষ। অনার্য ও আর্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এখানকার অসংখ্য গ্রাম, জনপদ, নদী, প্রান্তর, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র—বহু মহৎ চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে মিলিয়া তীর্থভূমিতে পরিণত হইয়াছে রামায়ণ ও মহাভারত পুরাণ-ইতিহাসে এসবের ছবিও অত্যন্ত উজ্জ্বল। এই ছবিগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কৌতূহল স্বভাবতঃই জাগে। তবু [illegible] মানুষ ঘর ছাড়িয়া সহজে বাহির হইতে চায় না। আলোচ্য গ্রন্থে উত্তর, [illegible] এবং পাকিস্তান বাদে পূর্ব্ব ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি তীর্থক্ষেত্র, স্বাস্থ্যনিবাস, শহর, অরণ্য, পর্ব্বত, নদী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচয় বিশদ না হইলেও—তথ্যসমৃদ্ধ। মনে দেশভ্রমণের পিপাসাও বাড়াইয়া দেয়। ইহা শুধু দেশভ্রমণ বা পুণ্যার্জ্জনের স্পৃহা বাড়ায় না, সঙ্কীর্ণ সংসারবৃত্ত হইতে টানিয়া বৃহৎ জীবনক্ষেত্রে স্বরূপকে উপলব্ধি করার ব্যাকুলতাও জানায়। আহার, বাসস্থান, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে গন্তব্যস্থানের দূরত্ব, যানবাহনের সুবিধা, কিছু পৌরাণিক, কিছু বা ঐতিহাসিক বিবরণ, দু'একটি নামকরা কবিতার সাহায্যে স্থান বা জাতি মাহাত্ম্য বর্ণনা—প্রভৃতির সমাবেশে বইখানি তথ্যসমৃদ্ধ হইয়াছে। মোটকথা ভক্তি নম্র চিত্তে ও শিক্ষার সঙ্গে লেখক পরিক্রমার কার্য্যটি সারিয়াছেন এবং পাঠকের চিত্তে ভ্রমণপিপাসা উদ্রিক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রেলওয়ে টাইম-টেবলের সঙ্গে এই বইখানি সঙ্গে রাখিলে ভ্রমণকারীরা যথার্থই উপকৃত হইবেন।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

দেশ-বিদেশের কথা

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে শিশুসঙ্ঘের দান

…ত ২৫শে আগষ্ট সকাল ৮টায় 'শ্রী' চিত্রগৃহে "সবুজপ্রাণ" নামে এ… শিশুসঙ্ঘ যাদবপুর কে. এস. রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের সাহায্যের জ… এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভা…তিপদে আমন্ত্রিত হন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীরজনীকান্ত …মানিক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকেন যুগান্তর …াদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে শ্রীম… মীরা চৌধুরী বলেন—"কচিকাঁচাদের নিয়ে এই সঙ্ঘ যা শোভন, …সঙ্গত তাই সমষ্টিগত ভাবে করার জন্য জন্ম নিয়েছে। তিন ম…র মধ্যে তাদের প্রথম কাজ হয়েছে …আবৃত্তি, নাচগান দেখিয়ে হাস…তালে সাহায্য করা।"

যাঁরা দেখেছিলেন অনুষ্ঠান তাঁদের একাংশ

আভা (৮ বছর), আলপনা (৬ বছর) ও সুমিতার (৯ বছর) মাল্যদান ও জনগণমন জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু হয়। সাড়ে চার বছরের অভিজিৎ থেকে চৌদ্দ বছরের তারক পর্য্যন্ত শিশু বালক ও কিশোরদের প্রতিভা নানা ভাবে উপস্থিত দর্শকদের চমৎকৃত করে। 'তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা" রেকর্ড সঙ্গীতের সঙ্গে তিন মিনিটের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবি ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে এঁকে তাঁর বন্দনা করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের …না হয়, আধো আধো কথায় রূপালী (৫ বছর) আর সীমা (৭ বছর) কবিতা আবৃত্তি শ্রুতিমধুর হয়েছিল। গৌতম (…বছর), গীতা (৬ বছর) আর টুকুনের (৮ বছর) কৌতুক ক…া প্রেক্ষাগৃহে হাসির বন্যা বইয়ে দেয়। সুনীলের (১৪ বছর) সেতারের সুরমূর্চ্ছনায় স্তব্ধ হয়ে ওঠে প্রায় ৯০০ দর্শক এবং …পনের (৯ বছর) তবলা লহরার শেষে প্রচণ্ড করতালি দিয়ে …সাধারণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। 'যেমন খুসী তেমন সাজে' অনুষ্ঠানে দেবাশীষ (৯ বছর), বিশ্বনাথ (৮ বছর), শুভাংশু (১০ বছর), অনীতা (৫ বছর), দিলীপ (৯ বছর) যথাক্রমে …জী, বর, পাগল, দারোয়ান ও ডাক্তার সেজে সকলকে হাসা… কাবেরীর (৭ বছর) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আর অপর্ণার (১১ ব…) কত্থক নাচও বেশ আনন্দদান করে। …বিশেষে শ্রীমানসী মজুমদার পরিচালিত …মহুয়া" ক্লাবের সভ্যসভ্যাগণ কর্তৃক সমবেত …বীন্দ্র-সঙ্গীতে এবং শ্রীরণজিৎ দে পিয়ানো …্যাকোডিয়ানে রবীন্দ্র সুরে সকলে তৃপ্তিলাভ …রেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তিন মাস …সের এই সঙ্ঘের কর্ম্মকুশলতায় বিস্ময় …কাশ করেন এবং উদ্যোক্তাদের সময়জ্ঞানের …চ্ছসিত প্রশংসা করেন। তাঁর হাতে …ক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য সংগৃহীত ৫৭০৲ …াকা শুভাংশু (১০ বছর) অর্পণ করে। …ভাপতি শ্রীরজনীকান্ত প্রামাণিক অনুষ্ঠানের …অভিনবত্বে সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দের মধ্য দিয়ে, …জাতির প্রতি এই মহান কর্ত্তব্য পালনের …জন্যে 'সবুজপ্রাণ'কে আশীর্ব্বাদ করেন।

অনুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্যের জন্যে শ্রীপ্রভাস ঘোষ, শ্রীসত্যেন বসু, শ্রীত্রিলোক পাবন বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুপ্রিয় বসু, শ্রীসন্ধ্যা দে, শ্রীবিনয়… চৌধুরী (মডার্ণ …টার্স), শ্রীমীনুরাণী ঘোষ, শ্রীগীতা চৌধুরী, শ্রীনিমাই মণ্ডল (…কুট্রো ওয়েভ) ও শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তীর (এম. এম. ই. ডিও) আন্ত… কর্ম্মকুশলতা উল্লেখযোগ্য।

অনুষ্ঠানে খু…রে শ্রীমল্লিকা বসু, শ্রীবন্দনা মিত্র, শ্রীবাসবী ও ইন্দুলেখা মিত্র …দিলীপ চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅভয় সেন বিভিন্ন শিশু শিল্পীকে রৌপ্যপদক উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ, ১২০।২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা